৪র্থ বর্ষ কার্ত্তিক,—১৩৩৭ ১ম সংখ্যা

সম্পাদক—মোহাম্মদ আক্‌রম খাঁ

প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা

Himani Soap
THE HIMANI SOAP WORKS, CALCUTTA

সূচীপত্র—কার্ত্তিক ১৩৩৭

সূচীপত্র—কার্ত্তিক ১৩৩৭

সূচীপত্র—কার্ত্তিক ১৩৩৭

—সুনাম—

উৎপন্নকারীর পক্ষে সুনাম অর্জ্জন করা বড় কঠিন ব্যাপার। যে জিনিষ উৎপন্নের জন্য তাঁহার সুনামের ভিত্তি স্থাপিত, তাহা যদি তাঁহার সামান্য ত্রুটির জন্য একবার কোন অংশে নিকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তবে সহস্র চক্ষুর দৃষ্টি তাঁহার প্রস্তুত সেই জিনিষের উপরই পতিত হয় এবং ঈর্ষাপ্রণোদিত হইয়া তাঁহাকে বাজারে খেলো করিবার জন্যই লোকে সর্ব্বপ্রকারে প্রয়াস পাইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার প্রস্তুত জিনিষ যদি বরাবরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট থাকে তবে তাঁহার সুনাম অক্ষুণ্ণ অবস্থায় চিরকালই থাকিয়া যায়।

আজ ২৬০ বৎসর ধরিয়া মার্ক পরিবারের সুনাম সমভাবেই চলিয়া আসিতেছে আর তাঁহাদের এই সুনামের দৃঢ়ভিত্তি তাঁহাদের উৎপন্ন জিনিষের বিশুদ্ধতা ও নির্ভরশীলতার উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত ইহা বিদিত জগতে। 'মর্ক মার্কা' (Merck brand) প্রতি বোতল হাইড্রজেন প্যারক্সাইডের (১২ গুণ তেজস্কর) সহিতই এই সুনাম বিজড়িত—যাহা—

মার্কোজোন (Merckozone)

নামে পরিচিত। হাইড্রোজেন প্যারক্সাইড কিনিবার সময় সুবিখ্যাত মার্ক মার্কা (Merck brand) দেখিয়া কিনিবেন তাহা হইলে আর বাজে নিকৃষ্ট জিনিষ কিনিতে হইবে না।

গৃহস্থের শত শত প্রয়োজনে হাইড্রোজেন প্যারক্সাইড ব্যবহারে আসে। বাজারে যত প্রকার হাইড্রোজেন প্যারক্সাইড থাকুক না কেন, কোনটাই মার্কোজোনের (MERCKOZONE) সমকক্ষ নহে। যাহাতে মার্কোজোনই (MERCKOZONE) পান সে দিকে সর্ব্বদাই দৃষ্টিরাখিবেন কারণ ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিষ এবং ইহার নামের সহিতই ইহার সুনাম বিজড়িত। এবং ইহা ডার্ম্মষ্টাড, হেসী, জার্ম্মানীতে ই, মার্ক কর্ত্তৃক প্রস্তুত।

৪ আউন্স, ১০ আউন্স এবং ২০ আউন্স পেটেন্ট বোতলে থাকে।

আপনার পরিচিত ঔষধালয়ে পাইবেন।

... বঞ্চিত মানুষের বেদনা মথিত বাণী ...

... বিশ্ব বিপ্লবের প্রলয়োচ্ছ্বাস ...

পথের গান

(কবিতার বই)

শ্রমিক-কবি মহীউদ্দীন

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী, 'গণ-বাণী'র সম্পাদক ও প্রথম বাঙালী মুসলমান সাম্যবাদী মিঃ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ মীরাট জেল থেকে লিখেছেন—"আপনার "পথের গান" একখানা সেদিন আমার হাতে এসে পৌঁছেচে।......আপনি জানেন, কবিতার সমঝদার আমি নই। তবুও আপনার কবিতার ভিতরে যে একটা সুর আছে সেই সুরের সহিত আমার প্রাণের একটা যোগ নিশ্চিতই রয়েছে"......২৮।৩।৩০

মূল্য এক টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—১। মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ৯১নং আপার সার্কুলার রোড, ২। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ২০৩।১।১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

... ও কলিকাতার বড় বড় হিন্দু ও মুসলমান পুস্তকালয় ...

লিভার পকেট ওয়াচ

৩ বৎসরের গ্যারাণ্টি।
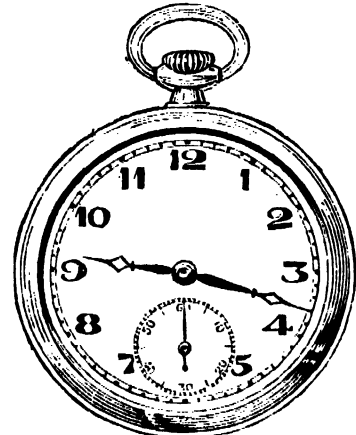
অল্প মূল্যে এমন সুন্দর নিখুঁত সময় রক্ষক উৎকৃষ্ট ঘড়ি আর নাই। লিভার কল, রূপালী নিকেল কেস, সুন্দর সেপ্ বা গঠন—মূল্য মাত্র ২৷৷০ টাকা প্যাকিং ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। প্রত্যেক ঘড়ি উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠান হয়। স্মরণ রাখিবেন এই সুবিধা মাত্র একমাসের জন্য—বিলম্বে হতাশ হইবেন।

দি এসিয়াটিক ট্রেডিং কোং
পোষ্ট বক্স ৬৭২০, কলিকাতা।

ম্যালেরিয়ায় ভুগিবার পর

দুর্ব্বলতার অবসান করুন।

যদিও কুইনাইন রক্ত মধ্যস্থ ম্যালেরিয়া বিষ ধ্বংস ক'রে থাকে—তথাপি রোগীর দুর্ব্বলতার অবসান ক'রে সাবেক স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়া পাইতে বহু দিন লাগে।

কিন্তু যদি নিয়মিতভাবে স্যানাটোজেন সেবন করেন, তবে অতি সত্বর দুর্ব্বলতার অবসান হয় এবং পূর্ণ স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ করা যায়। কারণ স্যানাটোজেনে এরূপ উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে আছে—যাহা শক্তি স্বাস্থ্য এবং দেহে প্রচুর তাজা রক্ত দান করিতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিষ।

কলিকাতার কোন একজন সুবিখ্যাত চিকিৎসক লিখিতেছেন—"দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর আমি যখন বিশেষ দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ি, সেই সময় অধিক মাত্রায় স্যানাটোজেন সেবন করিতে থাকি এবং অতি সত্বর দেহে প্রচুর শক্তি লাভ করি। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতায় স্যানাটোজেন সুন্দর কাজ করে।"

ম্যালেরিয়ায় ভুগিবার পর স্বাভাবিক ভাবে দেহে কবে বল পাইবেন, এই আশায় না থেকে, আপনিও কেন স্যানাটোজেন সেবন করিয়া পূর্ণ স্বাস্থ্য ও শক্তি সত্বর লাভ করুন না? আজই স্যানাটোজেন সেবন করুন।

স্যানাটোজেন প্রস্তুত বা প্যাক করিবার সময় হস্তদ্বারা স্পর্শ করা হয় না।

আদর্শ টনিক খাদ্য

সকল ঔষধালয়ে ও বাজারে প্রাপ্তব্য।

রাজবৈদ্য
রেজিষ্টার্ড
মদন মঞ্জরী
ফলপ্রদ মহৌষধ ক্ষুধাহীনতা দুর করিয়া শক্তি ও সামর্থ বৃদ্ধি করে ৪০ বটী পূর্ণ কৌটার মূল্য ১৲
নপুংসকত্বারী ঘৃত
বাহ্যিক প্রয়োগে নষ্ট পুরুষত্ব অল্প সময়ে দুর করিতে অদ্বিতীয়। ২ তোলা কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা
রমণবিলাসিনী বটিকা
শক্তি ধারণ করিয়া সুখভোগের কাল বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। ১৬ বটি কার মূল্য ১৲ এক টাকা
রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।
নারায়ণজী
কেশবজীর
কলিকাতা

ডেণ্টালবাম

সম্বন্ধে কলিকাতার একজন বিখ্যাত ডাক্তারের অভিমত দেখুন।

(ইংরাজী হইতে অনুদিত)

"আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে আমার নড়া দাঁতে অসহ্য যন্ত্রণা হওয়ায় আমি ডেণ্টালবাম ব্যবহার করিয়াছি, এবং তিনবার মাত্র প্রয়োগে যন্ত্রণা কমিয়া যাওয়ায় আশ্চর্য্য হইয়াছি।"

"দন্ত রোগীদের এই ঔষধ ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিই।"

(স্বাক্ষর) এস, বসাক এম, বি, এম এস, এফ।

* * * * * *

সর্ব্বপ্রকার দন্ত রোগ নিবারণ করিতে ডেণ্টালবামের শক্তি অপরিসীম। দাঁত নড়া, দাঁতের গোড়া দিয়া পূঁয রক্ত বাহির হওয়া, দাঁতে অসহ্য যন্ত্রণা হওয়া—প্রভৃতি উপসর্গের জন্য আপনি ডেণ্টালবাম ব্যবহার করিয়াছেন ত? না করিয়া থাকিলে আজই ডেণ্টালবামের জন্য পত্র লিখুন।

মূল্য বার আনা মাত্র, ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র। দুই আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে তিন দিনের ঔষধ বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কবিরাজ এস, দাস, গুপ্ত বি, এস সি।

৪০এ, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অকাল মৃত্যু নিবারণের এবং শরীর সুস্থ, সবল রাখিবার একমাত্র উপায়।

জার্ম্মাণী প্রত্যাগত ডাঃ কে, পি, গাঙ্গুলীর বিখ্যাত ঔষধ।

নবরস-রসায়ণ

বা

ডিস্‌পেপ্‌টিকবাম।

ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, অম্ল রোগ, পেটের পীড়া, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য অম্লশূল ও মেহরোগের ঔষধ। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার অম্লপিত্ত, অম্লশূল, অজীর্ণ, বুকজ্বালা ও ধড়ফড় করা, কোষ্ঠবদ্ধতা, মধ্যে মধ্যে দমকা ভেদ, আহার জীর্ণ না হওয়া, পেট গড়গড় করা, কলকল করা, স্বপ্নদোষ, পেট ফাঁপা প্রসাবকালীন খড়ি গোলার ন্যায় নির্গত হওয়া ইত্যাদি উপসর্গ **নবরস-রসায়ণ** ব্যবহারে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ জার্ম্মাণীর এক বিখ্যাত রাসায়নিকের ব্যবস্থামতে প্রস্তুত। মূল্য প্রতি ২ আঃ শিশি ১॥০ টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তি ঠিকানা :—মহাযোগ ঔষধালয়,

১১নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এজেন্টস্ :—মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

১৩নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

ইংরাজী, হিন্দি ও বাঙ্গালা ভাষায় পকেট প্রেস।
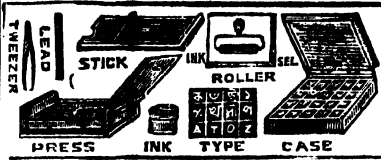
এই প্রেসের সমস্ত অক্ষর পাকা সীসার তৈয়ারী। ইহার দ্বারা সকলেই অনায়াসে ঘরে বসিয়া সকল প্রকার বাঙ্গালা ভাষার ছাপার কার্য্য যথা :—চেক, দাখিলা, চিঠি পত্রাদি, বিবাহের ও আমোদজনক উৎসবের নিমন্ত্রণপত্র, প্রীতিউপহার ইত্যাদি করিতে পারিবেন। ইহাতে সমস্ত রকম যুক্তাক্ষর, হিসাব নিকাসের জন্য ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত সাঙ্কেতিক চিহ্ন /০, ৵০, ৶০ ইত্যাদি সমস্তই আছে। ব্যবহার প্রণালী পুস্তক ও অপরাপর সরঞ্জাম সহ মূল্য—৩×৬ ইঞ্চি (১০০ অক্ষর সহ) ২।০, ৩×৬ ইঞ্চি (২০০ অক্ষর সহ) ৩।০, ৩×৬ ইঞ্চি (৩০০ অক্ষর সহ) ৪৲, ৪×৭ ইঞ্চি (৪০০ অক্ষর সহ) ৫৲ টাকা, ৪×৭ ইঞ্চি (৫০০ অক্ষর সহ) ৬৲ টাকা, ৬×৯ ইঞ্চি (৭০০ অক্ষর সহ) ১২৲, ৯×৬ ইঞ্চি (১০০০ অক্ষর সহ) ১৫৲, ১২×১০ ইঞ্চি (১২০০ অক্ষর যুক্ত) ২৪৲, ১২×১৮ ইঞ্চি (১৬০০ অক্ষর সহ) ৫৬৲। সীসার অক্ষর প্রতি শত মূল্য ৮০, অগ্রিম ১৲ টাকা না পাঠাইলে মাল পাঠান হয় না। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

রবারের ইংরাজী পকেট প্রেস—মূল্য ১নং ৮০, ২নং ১৲, ৩নং ১।০, মাশুল ।৵০ আনা। আমরা সকল ভাষাতেই নানাবিধ ডিজাইনে রবার ষ্ট্যাম্প, শীল মোহর, চাপরাস, মনোগ্রাম, উডব্লক, ইলেক্ট্রো ব্লক প্রস্তুত করিয়া থাকি। পত্রাদি পাঠাইবার ঠিকানা :—

স্বরাজ রবার ষ্ট্যাম্প ওয়ার্কস্,

প্রোপ্রাইটর :—বি, বি, শীল

৩৩১নং আপার চিৎপুর রোড, পোঃ আঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

এতদিনে একটি
অভাবের
অভাব
হইল !

কোরআনে মজিদ

ফোরকানে হামিদ

এর

বিস্তৃত তফছির

আড়াই পারায়

প্রথমখণ্ড সমাপ্ত

ছুরা ফাতেহা ও ছুরা
বকরাহএর বঙ্গানুবাদ

প্রকাশিত ইহয়াছে

হাদিয়া
সাড়ে চারিটাকা মাত্র

মোছলেম বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলেম ও মোহাদ্দেছ
মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ছাহেব কর্ত্তৃক অনূদিত

তফছিরের বিশেষত্ব

সিদ্ধ হাতের অনুপম অনুবাদ পাঠককে মোহিত করিয়া তুলিবে। মূলের ধারা, গাম্ভীর্য্য ও ঝঙ্কারকে সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়া বাঙ্গলা ভাষায় কোর-আনের এমন সরল ও সুন্দর অনুবাদ কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যায় বর্ত্তমান যুগের সব জিজ্ঞাসার উত্তর এবং সব সমস্যার সমাধান পাঠকগণ পাইবেন। অধিকন্তু তাঁহারা ইহাতে খুঁজিয়া পাইবেন এছলামের সেই বিস্মৃতপ্রায় প্রাণশক্তির সন্ধান—যাহার অভাবে জীবন যাত্রার সকল দিকেই মুছলমানের মন ও মস্তিষ্ক আজ পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে।

কোরআনের শিক্ষাকে এবং তাহার সত্যকে, নিজের দীর্ঘকালের গভীর সাধনার দ্বারা সত্যকার জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা শাস্ত্রও সাহিত্যের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা এই তফছিরে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। যে সকল অন্ধ বিশ্বাস ও আজগৈবী কেচ্ছা-কাহিনি তফছিররূপে উপস্থিত হইতে ছিল—অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা তাহা খণ্ডন করা হইয়াছে।

ভিতরের গুণের ন্যায় বাহিরের সৌন্দর্য্য-সৌষ্ঠবেও তফছির-খানা সত্য সত্যই অনুপম হই-য়াছে। তেলাওতের সুবিধার জন্য জর্ম্মানী হইতে যে নূতন টাইপ আনান হইয়াছে, তাহাতে ছাপার দরুণ মতনটা উচ্চ শ্রেণীর পাথরের ছাপার মতনই দেখাইতেছে।

ফোন নং
২৬৮০
বড়বাজার

প্রাপ্তিস্থান

ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সবই অত্যুৎকৃষ্ট

মোহাম্মদী বুক এজেন্সী,

৯১নং আপার সারকুলার রোড,

কলিকাতা

টেলিগ্রাম
"মোহাম্মদী"
কলিকাতা

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রণীত
মোস্তফা-চরিত
দ্বিতীয় সংস্করণ
মূল্য সাত টাকা
দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর
মহামানব হজরত মোহাম্মদের (দঃ)
পুণ্যময় জীবনের পূর্ণ ইতিহাস।
অসাধু খৃষ্টান পাদ্রীগণ হজরতের মহনীয় চরিত্রে যে সমস্ত কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়া আসিতেছেন, মওলানা ছাহেব অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগে তাহার খণ্ডন করিয়াছেন।
এক কথায় বাংলায় এমনকি কোন ভাষায় হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) পুণ্য চরিতামৃত এমন সুন্দর ভাবে পূর্ব্বে আর বাহির হয় নাই।
বঙ্গের শ্রেষ্ঠ মনীষীবর্গ ও উচ্চশ্রেণীর সংবাদপত্রাদি শত মুখে এই পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। স্থানাভাব বশতঃ মাত্র একখানির এক লাইন উদ্ধৃত করা হইল। "ফারুক-চরিতের" ভূমিকায় প্রঃ জে, এল, ব্যানার্জ্জি বলেন :—জীবন-চরিত হিসাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান মওলানা আকরম খাঁ ছাহেবের "মোস্তফা-চরিত"।
সর্ব্বত্র
প্রাপ্তব্য
--আজই একখানি সংগ্রহ করুন--
আপনার নিকটস্থ পুস্তকালয়ে খোঁজ করুন বা নিম্নঠিকানায় পত্র লিখুন
বিশেষ দ্রষ্টব্য :—টাকা মনি অর্ডার করিয়া পাঠাইলে, ডাক খরচা এক টাকা আমারই বহন করি।
মোহাম্মদী বুক এজেন্সী
৯১নং আপার সারকুলার রোড, কলিঃ।

Annas Eight Per Line — *Buyers' Guide.* — **Minimum Rupees Two only.**

বসন্তের অগ্রদূত—কোকিল,

সেও মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে

যখন ঘরের মধ্যে কিশোরীর বামা কণ্ঠের সুরে
স্বর মিলাইয়া বাজিতে থাকে—

মল্লিকফ্লুট হারমোনিয়ম

বাছাই করা
মাল-মসলায় গড়া।
সহজে খারাপ হবে না।
অথচ মূল্য সুলভ।

সাইকেল, হারমোনিয়ম
ও
সকলপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা।

মল্লিক ব্রাদার্স

টেলিফোন :—
কলি :—২৮৭৭

১৮-২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Telegrams :—
"Phonograph."

বর্ষ-সূচী

১৩৩৭-৩৮

কার্ত্তিক, ১৩৩৭ চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা

নব-বর্ষের নিবেদন

পরম কারুণিক খোদাতালার অসীম অনুগ্রহে আজ "মাসিক মোহাম্মদী" তৃতীয় বর্ষ পার হইয়া চতুর্থ বর্ষে উপনীত হইল।

যাঁহাকে স্মরণ করিয়া আমাদের যাত্রারম্ভ, নববর্ষারম্ভে পুনরায় তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রথমে স্মরণ করি। আজ এই বর্ষণ-ক্লান্ত শরতের উদার স্বচ্ছ নীল-আকাশ হইতে রৌদ্রকরে তাঁহারই আশীর্ব্বাদ আমাদের সম্মুখের পথকে আলোক-উজ্জ্বল করিয়া তুলুক।

আর স্মরণ করি, পথের বন্ধুদের, যাঁহারা নানাভাবে এই যাত্রাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন এবং তুলিতেছেন, যাঁহাদের অনুকম্পা ও সহানুভূতি ব্যতিরেকে এই তিন বৎসরের পথিকের পথ-চলা এত নির্ব্বিঘ্ন হইয়া উঠিত না।

বিশেষ করিয়া স্মরণ করি, এছলামের সেই সমস্ত সত্য-সাধকদের যাঁহারা আজ সমাজের এই নিদারুণ নিশীথ-অন্ধকারে, বাণী-সাধনার দুর্গম পথে, জাতি, সমাজ ও স্বদেশের মঙ্গলের জন্য কল্যাণের দীপ-শিখা হাতে করিয়া আমাদের সবার পথ আলোকিত করিয়া চলিয়াছেন। সত্য সাধনার দুর্গম পথের সেই অন্তরঙ্গ সহযাত্রীদের আজ বর্ষারম্ভে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং সেই সঙ্গে প্রার্থনা করিতেছি যে, অনাগত বহু বর্ষ ধরিয়া যেন তাঁহাদের প্রজ্ঞার দীপ-শিখা এমনি করিয়া অন্ধকার পথকে আলোকিত করিয়া জ্বলে, নৈরাশ্য-প্রপীড়িত অন্তরে যেন এমনি আশার স্পন্দন জাগাইয়া তোলে।

আর যাঁহাদের সাক্ষাৎ অনুকম্পা হইতে আজও বঞ্চিত আছি, তাঁহাদেরও আমাদের

অন্তরের কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন করিতেছি। সাধনা যদি সত্যমুখী হয়, অন্তরে যদি সত্য-উপলব্ধি থাকে, সবার অগোচরে নিজের মনে যদি কোন ফাঁকির স্থান না থাকে, তবে আমাদের বিশ্বাস যে, একদিন সমস্ত পথচারীকেই একই পথে আসিয়া মিলিতে হইবে।

সাহিত্য-হীন জাতি, নামহীন মনুষ্যের মত। জগতেরসভ্যতার ইতিহাসে তাহার কোনও নাম-পরিচয় নাই। নদ, নদী, গিরি-পর্ব্বত লইয়াই দেশ নয়, কতকগুলি মানুষের সমষ্টি লইয়াই জাতি নয়, প্রত্যেক দেশের ও প্রত্যেক জাতির সর্ব্বপ্রধান পরিচয় তাহার সাহিত্য। সেই তাহার প্রাণ, সেই তাহার শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, ধীরে ধীরে আমাদের সমাজ হইতে বাণী-সাধকগণ জাতি ও সমাজের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। বাঙ্গালার আড়াই কোটী মুছলমানের অন্তরে যে-কথা, যে-ব্যথা যুগ-যুগ ধরিয়া জমা হইয়া রহিয়াছে, আজ তাহা ধীরে ধীরে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। মুক আজ কথা বলিতে চাহিয়াছে এবং প্রকাশের বেদনাই আজ তাহাকে কথা বলাইতে বাধ্য করিয়াছে।

কিন্তু যে কথা কহিলে সকলের কথা বলা হইবে, যে এই কোটী কোটী লোকের অস্ফুট বাসনাকে মুখর করিয়া তুলিবে, ভাষার ভাণ্ডারে যে এই বিরাট জাতির হাসি ও কান্নাকে হীরা ও পান্নার মত সযত্নে ভরিয়া রাখিবে, যাহার বাণী এই মৃতকল্প সমাজকে আবার নব-শক্তিতে জাগাইয়া তুলিবে, তাহার আগমন-ধ্বনি এখনও আমাদের সাহিত্যে বাজিয়া উঠে নাই।

তবে সে আসিবে, যেমন করিয়া প্রভাত-সূর্য্য পূর্ব্ব-গগণে আসে, তেমনি একদিন সে আসিবেই। আজ শুধু প্রয়োজন তাহার আগমনের জন্য পথ প্রস্তুত করা। আজ কোন গর্ব্ব নয়, কোন সৃষ্টির অহমিকা নয়, শুধু একান্ত নিষ্ঠায় বাণী-সাধনায় পরিপূর্ণ-ভাবে আত্ম-নিয়োগ করা। একটী যুগের এই কঠোর আত্ম-নিয়োগের ফলেই পরবর্ত্তী যুগের নব-সৃষ্টি সম্ভব হইবে।

সেই নব-সৃষ্টির সম্ভাবনাকে সফল করিয়া তোলাই আমাদের বাণী-সাধনার আদর্শ এবং সে আদর্শ সফল হইবে আমাদের সকলের সম্মিলিত চেষ্টায়।

সাহিত্যের আদর্শ

প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় মনোনীত

আমীনউদ্দীন আহমদ

সাহিত্য

সাহিত্যের যথা-নির্দ্দিষ্ট কোন সূত্র প্রদান করা দুরূহ ব্যাপার। কারণ, অনেকেই ইহার অনেক প্রকার সূত্র প্রদান করিয়াছেন।

মানব-জগত ও মানস-জগতের সম্বন্ধ—বুক-পিঠের সম্বন্ধ। যেখানে মানব-জগতের রূপলীলা এবং মানস-জগতের রস-লীলা, ভাষা, ছন্দ, তাল, গতি ও অলঙ্কারের আবেষ্টনে লীলায়িত, রসায়িত, রূপায়িত এবং বিকশিত হয় সে-খানেই সাহিত্য রূপধারণ করে। অন্তর্জগত আপনাকে বহির্জ-গতের সহিত সম্পর্কিত ও সুসংবদ্ধ করিতে যে আকুলতা প্রকাশ করে, তাহারই ধাক্কায় সাহিত্য বহির্মুখী হইয়া উঠে,—অর্থাৎ ভিতর হইতে বাহিরে আসে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"হৃদয়ের জগত আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল। তাই চিরকাল মানুষের মধ্যে সাহিত্যের আবেগ।"

আমরা বহির্জগতের 'চিত্র'-দর্শনে যেমন মুগ্ধ,—অন্তর্জ-গতের চিত্রকে তেমন সকলের করিয়া প্রকাশ করিতে ব্যাকুল। ইহার কারণ,—স্রষ্টা আপনার সৃষ্টি-লীলায় যেমন পুলকিত, আমরা তেমনি আমাদের মনোবিকাশের স্ফূর্ত্তি-রসে আনন্দিত। এই করিয়াই মানুষ—সাহিত্যকে সৃষ্টি করে—অনুকরণ করে না, বিচিত্র করে,—চিত্রিত করে না।

সাহিত্যের বিষয়-বস্তু

বিজ্ঞান আপনার শক্তি-বৈচিত্র্যে গৌরবময়। বস্তু-জগতের অ-জানা, অ-দেখা ও অ-পাওয়া সত্যকে সে তাহার সোনার কাঠির পরশ দিয়া, জানা, দেখা ও পাওয়ার করিয়া তুলে। বস্তুজগত তাহার অধিকারের সীমানায়,—মনোজগতে তাহার প্রবেশ-নিষেধ,—সেখানে তাহার অনু-শীলন ব্যর্থ। মনোজগতের অধিকারী শুধু—সাহিত্য এবং সাহিত্যিক। মানবের রহস্যাচ্ছন্ন চরিত্র লইয়া আলোচনা, বিবেচনা ও বিচার করিবার সাহস ও শক্তি মাত্র সাহি-ত্যেরই আছে।

মানব-চরিত্রের লীলা এত সূক্ষ্ম, তাহার মানস-রাজ্য এত বৈচিত্র্যপূর্ণ, তাহার ভাবভঙ্গী এত অভাবনীয় এবং তাহার আবেগ ও কুণ্ঠা এত আকস্মিক যে, তাহার এই সমগ্র গুণের সামঞ্জস্য প্রদান করিয়া, পূর্ণাবয়বের নিখুঁত-সৌন্দর্য্য-মূর্ত্তি গঠন করিয়া তোলা অতি দুষ্কর। তবু এই দুষ্কর-কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন সাহিত্যিক—তাহার দুর্গম পথে আপনার ভাব-আলোকের রশ্মি-সম্পাতে রসের অপূর্ব্ব-রথ অবিরাম গতিতে চালাইয়া আসেন সেই সাধক,—ঋষিকল্প সাহিত্যিক। এই দুষ্কর-কর্ম্মে আমাদিগকে পরি-চালিত করে বিকাশের আনন্দ,—সাহিত্যের এই দুর্গম পথে আমাদিগকে টানিয়া আনে আমাদের প্রকাশের প্রেরণা।

সাহিত্যের অবলম্বন

অজ্ঞাতকে জানিবার জন্য যে বাসনা, তাহা আমাদিগকে জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করে, যখন আমরা তাহাকে জানি, তখন খুশী হই,—অজ্ঞতার অস্বস্তি চলিয়া যায় বলিয়া আমাদের মনের বোঝা অনেকটা নামে। কিন্তু এই যে

জ্ঞান—যাহার প্রতি আমাদের জানাজানির টান—তাহা বাছিয়া, প্রমাণ করিয়া তবে আমাদের গ্রহণ করিতে হয়। এই বাছা-বাছি-ময়-জ্ঞানকে অবলম্বন করিলে সাহিত্য-সৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নাই। পরখের পরে পরখ করা, যাচাইয়ের উপর যাচাই করা বিজ্ঞান-জগতে বা দর্শন-জগতে-ও চলিতে পারে, কিন্তু নিছক ভাবের জগতে কোনমতেই পারে না। জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া কিছু সৃষ্টি করিলে তাহার নাম দর্শন দেওয়া যাইতে পারে—সাহিত্য তাহার নাম দেওয়া চলে না। সাহিত্যের মেরুদণ্ড—ভাব, এবং তাহা বিচার সাপেক্ষ নহে, বরং সঞ্চার-সাপেক্ষ। ভাবকে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা—আর ছায়াকে দড়ি দিয়া বাঁধিতে যাওয়া একই কথা। তাই বলিয়াই ভাবের যে কৈফিয়ৎ নাই—তাহা নহে; তাহাকেও তাহার ধর্ম্ম—স্বাভাবিকতাকে মানিতে হয়। ভাবকে যুগে যুগে মানুষের বুকে—মানুষের হিয়ায় সঞ্চারিত ও সম্ভাবিত করিয়া তোলাই স্বাভাবিক—এবং ইহা করিয়াই সাহিত্য-সৃষ্টি সুসম্পন্ন হয়।

সাহিত্যিক মনের গতি-রথকে অবলম্বন করিয়া সাহিত্য-সাধনার পথে অগ্রসর হয়। এই গতিরথের যে চাকাধ্বনি, তাহা আমাদের গান, সুরের ছন্দ এবং গতির তাল। সম্রাটের স্বর্ণরথ যেখানে চলা-পথের ধূলায় ধাক্কা খাইয়া শব্দায়িত হয়, সেখানে তাহার চলার-সুরই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে,—তখন আমরা বলি—'রথ চলে'। তেমনি আমাদের ভাবের-রথটী মানব-জগতের পথে-পথে যখন বিচরণ করিতে থাকে, তখন তাহার চাকা বেদনা-ব্যথা ও অশ্রু-হাসির করুণ ধাক্কায় শব্দায়িত না হইয়া পারে না। সে-শব্দ, না-হয় আমাদের গান, না-হয় অন্তরের বাণী; তখন লোকে বলে—সাহিত্যের রথ চলিয়াছে।

তজ্জন্য আমরা বলিব, ভাবই সাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন। মানসহৃদের ফোটা-কলি অনিন্দ্যসুন্দর এই যে ভাব, তাহাই সাহিত্যের পুণ্যময় বেদীকে অলঙ্কৃত করে। ভাব ভাষার ছাঁচে এবং ছাঁদে পড়িয়া এমন ভাবে রূপান্তরিত হয় যে, আমরা তাহাকে অনায়াসে সাহিত্য নাম দিয়া ফেলি।

সাহিত্যের গতি

আমরা বহির্জগতের সব কিছু জানি বলিয়া ধারণা হয়; কিন্তু বিচার করিলে দেখিতে পাই, সবকিছুই জানি না—জানি মাত্র সবকিছুর—আবছায়া। দৃশ্যমান জগত আমাদের কাছে যেন সুস্পষ্ট হইতে চাহে না। তখন আমরা মনে মনে আবার জগত গড়ি, ভাঙি এবং সিংহাসনের পর্য্যন্ত পরিকল্পনা করি। এই করিয়াই আমরা অন্তরের জগতকে একান্ত করিয়া বাহিরের জগতে বসাইয়া দিই, এই অজানা ভাবে,—অজ্ঞাতসারে আমরা প্রকাশ হইয়া পড়ি। এইযে মনোবিকাশের গতি—তাহা সাহিত্য-প্রকাশেরই গতি।

প্রতিদিনের পরিচয়ে প্রকৃতি আমাদের এত কাছে বলিয়া মনে হয় যেন, আমরা সোজাসুজি তাহার কাছ হইতে কোন কিছু গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করি। এই গ্রহণের সঙ্কোচ ভাঙিতে সাহিত্যই আমাদের সহায়; কারণ তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ নহে,—তাহা আমাদের ভাব-গোচর; তাহা আসিয়া, স্ত্রীর চেয়ে শ্যালিকার যে বেশী দাবী তাহাই খাটাইতে শুরু করে। প্রকৃতির প্রাচীর ভেদ করিয়া ভাব যেদিন সাহিত্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে, সেদিন সে মানবপ্রকৃতির হাটে হাটে বিকাইতে বাহির হয়। সেই দিন বলিতে হইবে—তাহার তীর্থ-যাত্রা; নিরুদ্ধ জীবনের অবসানে তাহার যে আনন্দের উচ্ছ্বাস তাহাতেই সে সার্থক। গেঁয়ো-হাটে যাহা "রদি" বলিয়া বিকাইল না, রাজ-হাটে হয়ত তাহাই সোনার দরে চলিয়া গেল। পথের-পথিক যাহা হেলায় পায় দলিয়া গেল,—হয়ত তাহাই রাজকুমারের স্বর্ণরথে আরোহণ করিয়া রাজপুরীতে প্রবেশ লাভ করিবে। সাহিত্যের গতিটাও ঠিক এই ধরণেরই। প্রকৃতির গতি ও মনের গতি—এই উভয়টীর তাল সাম্‌লাইয়া সাহিত্যের ধারাকে গতিময় করিয়া তোলা সাহিত্যিকের পক্ষে কম সাধনার কথা নহে।

যেই গতির জন্য সাহিত্য অমরতার দাবী করিতে শক্তি পায়—তাহা তাহার সর্ব্বদিকের গতি। একের ভাব দশের হইয়া দেখা দেওয়া, ঘরের কোণ হইতে মুক্ত আকাশের নিম্নে আসিয়া জগতকে কোলা-কুলি করা, অবাধ গতি ও অবাধ প্রবাহের কারণেই সম্ভব হয়। মহা-বারি-ধারাইত মাত্র মহাসাগরের সঙ্গমলাভের সামর্থ্য রাখে?

সাহিত্যের ভিত্তি

দিন-ব-দিন চোখের পাশে কতকিছু দেখি, কতকিছু বা

পায় দলিয়া পিছে ফেলিয়া যাই; আবার হঠাৎ কোনদিন দেখি—সেই সামান্যতর জিনিষটাই আমাদের মনে লাগিয়া গিয়াছে—কারণ কবি তাহাকে ভাবের-অলঙ্কারে সাজাইয়া সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন। সাহিত্যিক তাহাকে আঁকিয়া তুলিয়াছেন—চরিত্রে সচিত্র করিয়া। আমরা মুগ্ধ হই! এইযে সাধারণ জিনিষকেও সুন্দর, মনোহারী করিয়া তোলা,—তাহা কি কম বিস্ময়? জীবনে যে 'জাহান্নাম' দেখি নাই, যে স্বর্গের কাহিনী-মাত্র শুনি,—সেই জাহান্নাম, সেই স্বর্গ আমরা কতবার প্রত্যক্ষ করি—এই জীবনে—সাহিত্যিকের-প্রসাদে, কবির অনুগ্রহে—শিল্পীর দয়ায়। এত সাধারণ যে,—এত সুন্দর হইয়া দেখা দিতে পারে, তাহা যেন আমাদের বিশ্বাস হইতেই চাহে না।

(সুন্দরের) সৌন্দর্য্যের অমর-প্রতিমা যে তাজ—তাহা কি আমাদের দালানের মত কড়ি কাঠ, আমাদের সাধারণ মস্‌জিদের মত মার্ব্বেল দিয়া প্রস্তুত বলিয়া মানিয়া লইতে প্রবৃত্তি হয়? তাজ সৃষ্টির মূলে যে একটা শিল্পী-প্রাণ, সৌন্দর্য্য-পূজারী হৃদয় লাগিয়াছিল—তাহার পর সেইত তাজ হইয়া আজ পর্য্যন্ত মানব সমাজকে বলিয়া দিতেছে—ভিত্তি আমার কড়িকাঠ-মার্ব্বেল—কিন্তু আমার অন্তরে আছে একটা জীবন্ত প্রাণ!

সাহিত্যের আর্ট

এখানে এই প্রসঙ্গে আর্টের কথা, অজ্ঞাতসারেই উঠিয়া পড়ে, কারণ সাহিত্য আর্টের মহিমায়ই জীবনের সফলতা লাভ করে; নইলে সাহিত্য আর "কাহিনী" বলায় কোন প্রভেদ ছিল না। যিনি স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা, তিনি তাঁহার সোণার কাঠির পরশ দিয়া ক্ষণিকের জিনিষকে চিরন্তনের, অসুন্দরকে সুন্দর করিয়া তুলিতে পারেন ও দেখাইতে পারেন।

সিনেমার নৃত্য, প্রেক্ষাগৃহের গান হয়ত আমাদের বেশই ভাল লাগে। কিন্তু তাহা কতক্ষণের? সেখানে নর্ত্তকী বা গায়িকা যাহারা, তাহাদিগকে আমাদের চক্ষেই ভাল লাগে—মনে নহে। তাহারা যে জিনিষ দেয়, তাহাকে ভালবাসিবার,—তাহাকে একান্ত নিজের করিয়া ভাবিবার মত উপাদন তাহাতে আছে কি? সকলে সোজা একটা 'না' শব্দেই তাহার উত্তর দিবেন! কেন? তাহার কারণ জীবন এখানে অসংযত, যদিও তাহা সত্য। ভাল লাগাতে এবং ভালবাসাতে যথেষ্ট পার্থক্যই রহিয়াছে।

সাহিত্যের আর্ট যেখানে এরূপ অসংযত, চঞ্চল, অন্তদৃষ্টি-হীন, সেখানে হয়তঃ তাহা রঙীন হইতে পারে, আপনার চাক-চিক্যে আমাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারে—কিন্তু তাই বলিয়া তাহা সুন্দর, সুষ্ঠু হইবার দাবী রাখে না। প্রেক্ষা-গৃহের নর্ত্তকীর জীবন পদস্খলনের শঙ্কায় যেমন শঙ্কিত, অবিরত আপনার প্রতি সন্দেহমান, তেমনি অসংযত-সাহিত্যের আর্টও আপনার পতনের ভয়ে সশঙ্ক, মেরুদণ্ড-হীন সরিসৃপের ন্যায় চঞ্চল গতিমান। সুন্দর হইবার দাবীত দূরের কথা,—সে-আব্‌দার করিবার সাহসও তাহার নাই। খেলানাকে শিশুর-খেলার আনন্দের জন্য রঙীন করিতে হয় সত্য, তাই বলিয়া তাহা যদি বৃদ্ধের হাতেও উঠে, তখন বৃদ্ধকে লোকে "পাগলের হাসপাতালে" পাঠাইবারই বন্দোবস্ত করিবে।

ক্ষণিকের আনন্দ আমাদের জীবনকে সার্থক করে না, করিতে পারেও না। কারণ, পূর্ণানন্দই জীবনের লক্ষ্য,—সাহিত্য-সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আনন্দের পূর্ণতা ও শান্তির সৌজন্যই যদি আমরা কামনা করি, তবে তাহা করিতে পারি স্বচ্ছ-প্রাণা মহিয়সী অন্তরলক্ষ্মীর নিকট ক্ষণিকা প্রেমিকার নিকট নহে; কারণ অন্তরলক্ষ্মী আমাদের ক্ষণিকা নহে,—সে আমাদের চিরন্তন। সে আমাদের চলে না যে, সে সুন্দরকে অসংযত, সত্যকে অসংলগ্ন করিয়া দেখাইবে। যদি তাহা সে করেই তবে প্রেক্ষাগৃহের বাইজীর মতই সে চমকিত ও মুগ্ধ করে—কিন্তু মহনীয় ও মহীয়ান করে না। আর্টকে উপলক্ষ্য করিয়া সাহিত্যরস যে আমাদের হৃদয় চুঁয়াইয়া বাহির হয়, তাহা সুসংবদ্ধ ও সুসংযত না হইলে জীবন পীড়িত ও লাঞ্ছিতই হয়। পদে পদে—অমঙ্গল অশান্তির শঙ্কা আনন্দকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে!

এই কথাটাই বিগত শতাব্দীর ঋষিকল্প শিল্পী টলষ্টয় বারবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

অনেক সমজ্‌দার সাহিত্যিক বলেন—আজকাল সাহিত্যের আর্টের বাজার দর অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছে।

'আর্ট' শব্দটীর ব্যবহার লইয়াই বিষম সমস্যায় পড়িতে হয়; কখনও বা বিড়ম্বনাও ভোগ করিতে হয়। Art for art's sake অথবা Art for beauty's sake লইয়া কুরুক্ষেত্র না হয়, থানেশ্বরত বাধেই! কথা দুইটীর কোন্‌টা যে নিছক ও নির্জ্জলা সত্য, তাহার মীমাংসা লইয়াই আরো যত কিছু কারবালা,—ট্রাফালগার!

আমরাও আমাদের দুই এক কথা বলিতে চেষ্টা করিলে দোষ কি? সত্য-সুন্দর-শাশ্বতের রূপকমলকে স্থায়ীভাবে ফুটাইয়া তোলাই সত্যিকার আর্টিষ্ট বা শিল্পীর কাজ। সত্যের মূল প্রতিষ্ঠা সৃষ্টির পরার্দ্ধে—অনন্তলোকে। সেখান হইতে শিল্পীর সজাগ-মন, দূর-দৃষ্টি, মূর্ত্ত-মনিষা ও প্রাণ-শক্তি গোপনে গোপনে রস এবং রসদ সংগ্রহ করিয়া লয়। দূরদৃষ্টিতে আর্টের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার সূচনা, মনিষাতে প্রকাশ-ভঙ্গী-সঙ্গত ও সংযত হয় এবং প্রাণ-শক্তিতে আর্ট জীবন্ত হইয়া উঠে। তখনই বলিতে হয়,—"শিল্পীর তুরীয়-প্রহেলিকা-বোধ ও আনন্দলোকের অনুভূতি, সৃষ্টির মূল প্রতিষ্ঠা—এবং অতলস্পর্শনা—সাহিত্যের ইন্দ্রজাল।"

সাহিত্যের বিচার

এই সঙ্গেই সাহিত্য-বিচারের কথা উঠে—কোন্‌ সাহিত্য যে স্থায়ী আর কোন্‌ সাহিত্য যে ক্ষণস্থায়ী অথবা অস্থায়ী ইহা বিচার করিবারও প্রয়োজন আছে।

জহুরী যেমন নিকষ-মণির সাহায্যে মাণিক্যের কৃত্রিমতা বা অকৃত্রিমতাকে বিচার করেন, স্বর্ণকার যেমন কষ্টি-পাথরের সহায়তায় খাঁটী বা মেকী সোনা পরীক্ষা করেন তেমনি সাহিত্য-মণির বিচারও বাছাই করিতে রহিয়াছে মহাকালের নিকষমনি—! যাহা চিরন্তন, যাহা স্থায়ী, তাহা মহাকালের ভ্রুকুটী-কটাক্ষকে অবহেলায় পিছে ফেলিয়া আপনার শক্তিবলে—মানবের বুকে-বুকে যুগে-যুগে ধ্বনিত হয়।

যেই সাহিত্য ক্ষণিকের অনুপ্রেরণায় রূপলাভ করিয়া থাকে—তাহা কালের কুটীল-কটাক্ষে, সময়ের স্রোতে মিশাইয়া যায় যেন—বৃষ্টির বুদ্‌বুদ্‌, বালির উপর বর্ষণ।

শেক্‌স্‌পিয়ারের Shylock, যেমনি যুগে যুগে জন্মায়, কালিদাসের বিরহী যক্ষ তেমনি অনাদি-কালের মানুষের বুকে, "প্রিয়া-বিচ্ছেদের" শোকে গুমরিয়া মরে, ওমর খাইয়ামের তন্বী-সাকী যেমন অনন্ত কালের তরুণ-প্রাণে ধ্বনিত হয়, রবীন্দ্রনাথের পুরাতন ভৃত্যও যুগে যুগে সেবার প্রতীক হইয়া প্রবাসী-রোগীর শিয়রে রাত্রি জাগে।

কত যে বাণী প্রভাতী তারার মত বাহিরে আসিয়া আবার কাল-সূর্য্যের কিরণ-উত্তাপে চোখের বাহিরে গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করে? যে ঋষি বর্ত্তমানে বসিয়া ভবিষ্যৎকে ধ্যান করেন, যে স্রষ্টা এবং দ্রষ্টাকবি বর্ত্তমানে থাকিয়া ভবিষ্যতের চিত্র দেখেন, যাঁহার উদার মন সমগ্র জগতকে ধারণ করিবার অধিকারী, যে শিল্পী বিশ্ব-মানবের চিত্রকে, চরিত্রকে চিত্রিত করিবার উপযোগী, যাঁহার স্নেহার্দ্র-দরদ সমগ্র জগতে বিচরণ করে—যাঁহার সহজ শক্তি বিস্তীর্ণ বাধাকে অতি সহজ ভাবে ঠেলিয়া দিতে সক্ষম, যিনি জীবনের স্বচ্ছালোকে বিশ্ব-জীবনের চিত্রকে, রূপকে স্বপ্নলোকের কল্প-ছবি করিয়া আঁকিতে পারেন, তাঁহার তুলি-ই অমর—তাঁহার সাহিত্যই চিরন্তন সাহিত্য—বিশ্ব-সাহিত্য!

অন্তর্দ্দৃষ্টি যেখানে সঙ্কীর্ণ, অনুসন্ধিৎসা যেখানে ভীরু, দরদ যেখানে পক্ষপাতদুষ্ট তুলি যেখানে রংয়ের বাহারে 'মস্ত্‌', ভাব যেখানে সংযমহীন, সাহিত্য সেখানে পঙ্গু—শিল্প সেখানে স্থবির, সৃষ্টি সেখানে সাময়িক—ক্ষণিক। এই জন্যই সাহিত্যিকের মন—আকাশের চেয়ে উদার, বাতাসের চেয়ে দ্রুত, নদীর চেয়ে চলমান, কোয়কের চেয়ে কোমল, ফুলের চেয়ে সুন্দর এবং বাঁশীর চেয়ে মধুর! কারণ কবির সৃষ্টি যে লোক বিশেষের নহে, সাহিত্যিকের সাহিত্য-সাধনা যে জাতি-বিশেষের নহে, তাহা যে সবার,—সব বিশ্বের! এই জন্যই ত চাই—বিশ্ব-মানবতার অনুভূতি।

জীবন ও সাহিত্য

জীবনের সহিত সাহিত্যের একটা নিবিড় সম্বন্ধ আছে; কারণ জীবন লইয়াই সাহিত্য ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে। জীবনকে যেম্‌নি আমরা দুইটী ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—যথা প্রাকৃত ও আধ্যাত্ম, তেম্‌নি সাহিত্যকেও দুইটী ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। প্রাকৃত বা লোক-সাহিত্য প্রাকৃত-জীবনেরই একটা ছায়া,—যেমন আধ্যাত্ম সাহিত্য আধ্যাত্ম জীবনের। এই সাহিত্যের বিষয়-বস্তু, ভাষা-ভঙ্গী, ভাব-ছন্দ সব কিছুই স্থূল। স্রষ্টা

এই সাহিত্যে, যাহা বাহিরের স্থূল দৃষ্টিতে ধরিতে পারেন—যাহা বুঝিতে পারেন,—তাহাই অঙ্কিত করেন। বস্তুর ভিতরে প্রবেশ করিতে যে আবেগময় অনুসন্ধানের প্রয়োজন,—যে অনুরাগ বা আবেগের টান বা সত্য-সৃষ্টির যে বেদনা,—তাহা যেন প্রাকৃত সাহিত্য-স্রষ্টার অন্তরে সজাগ নহে। তিনি যেন অর্দ্ধ-নিদ্রামগ্ন আবেশময় আঁখিতে বস্তুর বাহিরটুকু দেখিয়াই সন্তুষ্ট—অন্তরে প্রবেশ করিবার কষ্ট স্বীকার করিতে নিরত।

দ্বিতীয় প্রকারের সাহিত্যকে আধ্যাত্মিক সাহিত্য বলা যায়। ইহা সৃষ্টি করিতে স্রষ্টা আপনার বহির্জ্জগতকে ভুলিয়া তন্ময়তার মধ্য দিয়া, ধ্যান ও দিব্য দৃষ্টির মধ্য দিয়া, এক অপরূপ ভাবকে রূপ প্রদান করেন, জাগ্রত-স্বপনে তিনি বস্তুর ভিতরকে লক্ষ্য করেন এবং বার বার পাঠ করিয়া অন্তর্জ্জগতের চিত্র অঙ্কিত করেন। এই সাহিত্য লোক-সাহিত্য নহে,—এই সাহিত্য আধ্যাত্ম-সাহিত্য—আধ্যাত্ম জীবনের মতই সহজ অথচ গম্ভীর, গম্ভীর অথচ ঋজু! অসীম জীবনের মতই এই সাহিত্য—মানবকে অনন্ত সম্ভাবনার পথে পরিচালিত করে।

জীবনকে যে সাহিত্য কত দিক দিয়া গঠিত করে, কত দিক দিয়া আপনার প্রভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া তোলে, তাহার কোন প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই। স্বাধীন জাতির স্বাধীন সাহিত্য, বিজয়ী জাতির জয়দৃপ্ত সাহিত্য তার স্বরে তাহাই ঘোষণা করে। পরাধীন জাতি আপনার বুকে যে জীবনী শক্তি প্রাপ্ত হয়—তাহা এই সাহিত্যের কল্যাণেই। ফ্রান্সের বিপ্লব যাঁহাদের লেখনীতে সূচিত হইয়াছিল, সেই "রুসো"-"ভল্‌টেয়ার" যে কি সাধনাই না করিয়াছিলেন, তাহা আমরা এত সহজে বুঝিব কি করিয়া।

দুর্দ্দান্ত আরব যে দুর্দ্দম শক্তি পাইয়াছিল,—দুর্ম্মদ বেদুঈন যে নম্র-নত হইয়া সংযত ও সংহত হইয়াছিল—তাহা একমাত্র একখানা—কেতাবের বাণী—হৃদয়ঙ্গম করিয়া। আমরা অবশ্য কোরান মজিদকে এস্থলে সাহিত্য হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছি, যদিও সাহিত্য হিসাবে তাহার প্রভাব পরবর্ত্তী আরবীয় সাহিত্যিক-স্রষ্টা সমূহের ও আরব জাতির উপর কিভাবে বিস্তৃত করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস বর্ণনা করিবার ইহা উপযুক্ত স্থল নহে।   (ক্রমশঃ)

চির-রহস্য

কাদের নওয়াজ বি, এ

বলতে নারি কিসের লাগি'
বকুল কুঁড়ি ফুট্‌ছে,
উড়্‌ছে চকোর আস্‌মানে ঐ
পূর্ণিমা চাঁদ উঠ্‌ছে।
ছুট্‌ছে নদী লহর তুলি'
লুট্‌ছে মধু ভ্রমর গুলি
বর্ষা এলেই কোত্থেকে সব
জলদ আসি জুট্‌ছে।

দিনের পরেই হ'চ্চে রাতি
তারার বাতি জ্বল্‌ছে,
বুলবুলীরা ফুলের কানে
কিসের 'বুলি' ব'লছে।
পের্‌জাপতির ডানায় কে সে
রংয়ের তুলি বুলায় হেসে
কার হুকুমে শুক্তি-হৃদে
মুক্তা নিতি ফল্‌ছে।

কোন্ মায়াবীর ফুলের রেণু
হাওয়ার সনে ভাস্‌ছে,
'শলভ্' কেন দীপ্ শিখারে
এতই ভাল বাস্‌ছে।
কৃষ্ণসারের নাভীর কূপে
কস্তুরী কে রাখ্‌ল চুপে
জানিনে তার আকুল-করা
সুবাস কেন আস্‌ছে।

কোন্ খেয়ালী সবুজ পাতায়
রঙীণ লিপি লিখ্‌ছে,
কার কাছে ওই তূঁত্ পোকারা
বুন্‌তে রেশম শিখ্‌ছে।
চাতক পাখীর 'ফটিক্' ডাকে
দিচ্ছে কে ঐ সলিল তাকে
কার শাপে হায় গল্‌ছে গিরি
তিলেক নাহি টিক্‌ছে।

করিম চাচা হাঁকায় গাড়ী
রহিম জমি চ'ষ্‌ছে,
কার বরে ঐ 'পীণ্টু' সাহেব
সিংহাসনে ব'স্‌ছে।
সাগর বারি যায়না মাপা
রহস্য তার রইল চাপা
লাগ্‌ছে এসব প্রহেলিকা
হিয়ায় নাহি প'শ্‌ছে।

খেয়ালের ফেরদৌস

এস, ওয়াজেদ আলী বি, এ (কেণ্টাব) বার-এট-ল

আমার একান্ত স্নেহের এক বান্ধবী কাযের অসম্ভব এক প্লান করে আমার কাছে পাঠান, আর সে বিষয় আমার মত জানতে চান। সহজ, সাধারণ বুদ্ধিতে প্লানের কার্য্যকরিতার বিষয় যা বুঝলুম, তাই তাঁকে লিখে জানালুম। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার Practical Sense সে প্লানের সমর্থন করেনি; উপরন্তু, সেটা যে একবারেই অচল, আর তার অনুসরণ করা যে সময়ের অপব্যবহার ছাড়া আর কিছু নয়, চিঠিতে তাই আমি দেখাতে চেষ্টা করেছিলুম।

যথাসময়ে বান্ধবীর কাছ থেকে উত্তর এল—লাঞ্ছনা আর অনুযোগে ভরা! আমার কল্পনা শক্তি নাকি একান্ত দুর্ব্বল, দরদ জিনিষটা নাকি আমার ধাতুর মধ্যেই নেই, যুক্তি নামক নিরস একটা মনোবৃত্তিকে আমি নাকি অনাবশ্যক গুরুত্ব দিয়ে থাকি, এই রকম আরও সব কত কি! পত্রের উপসংহারে বান্ধবী লিখেছেন, প্লানটাকে সত্য-সত্যই কাযে পরিণত করার খেয়াল তাঁর কোন কালেই ছিল না! নিরস এই জীবনের নিরবিচ্ছিন্ন নিরানন্দ থেকে রেহাই পাবার জন্য, ইচ্ছে করেই নানা রকম অসম্ভব জিনিষের তিনি কল্পনা করেন, আর তাদের দিয়ে খেয়ালের অবাস্তব এক ফেরদৌস রচনা করে বাস্তব জীবন থেকে পালিয়ে সেখানে নিজের মনটাকে ক্ষণিকের তরে বিশ্রাম দেবার চেষ্টা করেন।

বান্ধবীর চিঠি পড়ে আমার যেন দিব্য চক্ষু খুলে গেল। সোহাগ আর অনুযোগের মাথায় জীবনের কত বড়, কত গভীর এক সত্যকে তিনি হেলায় ব্যক্ত করেছেন। মানব জীবনের একটী প্রধান কায, প্রকৃতপক্ষে সব চেয়ে উপভোগ্য, সব চেয়ে মূল্যবান, সব চেয়ে ফলপ্রসূ কায কি খেয়ালের এই ফেরদৌসের সৃষ্টি করা নয়? ইচ্ছে মত খেয়ালের এই অমরাবতীর সৃষ্টি করবার, আর অবাধে সেখানে যাওয়া-আসা করবার অধিকার যদি আমাদের না থাকতো, তা হলে এই পাপতাপময় পৃথিবীতে একদিনও কি আমরা থাকতে চাইতুম, কিম্বা পারতুম?

খেয়ালের বিচিত্র পত্রপুষ্পে শোভিত, কল্পনার অফুরন্ত আবেহায়াতে অভিষিক্ত, এই মানস মরুদ্যানই জীবনকে সহনীয় করে রেখেছে, বরণীয় করে রেখেছে, বাঞ্ছনীয় করে রেখেছে। প্রকৃতির মরুদ্যান বিনা ভৌগলিক মরুভূমি যেমন অসহনীয়, খেয়ালের এই মরুদ্যান বিনা জীবন নামক আমাদের আত্মিক মরুভূমিটাও তেমনি অসহনীয়! আল্লাকে শোকতাপ জর্জ্জরিত এই জীবনের জন্য কখনই আমরা ধন্যবাদ দিতুম না, যদি সঙ্গে সঙ্গে খেয়ালের স্বর্গ রচনা করবার, আর অবাধে সেখানে বিচরণ করবার অধিকারও তিনি আমাদের না দিতেন। তবে তা যখন তিনি দিয়েছেন, তখন স্বীকার করতে হবে যে, সত্যই তিনি একজন দাতা—আমাদের স্তব-স্তুতির ন্যায্য অধিকারী।

ছেলে বেলা থেকে নিজের জীবনের কথা যখন ভাবি, তখন বেশ বুঝতে পারি, খেয়ালের স্বর্গ-রাজ্যেই আমার শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্তগুলি কেটেছে। বাস্তব জীবন কখনও আমায় সন্তুষ্ট করতে পারেনি। বাস্তবের অনেক দূরে, খেয়ালের সুরঞ্জিত ছায়া-জগতেই আমি বাসা বেঁধেছি, সেখানকার অনিন্দসুন্দরী হুরপরীদের নিয়েই আমি ঘরকান্না করেছি, সেখানকার অবর্ণনীয় মাধুর্য্যময়ী বাদশাজাদীদের, দুষ্ট দেও-দানবদের হাত থেকে উদ্ধারের অমানুষিক প্রয়াসেই আমি অসাধ্য সাধন করেছি, আর, সেখানকার সুরসিক ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করেই অন্তরের গভীরতম অনুভূতিকে আমি ব্যক্ত করেছি!

এখনও মনে আছে, কতবার তুচ্ছ কোন অজুহাতে পাঠশালা কামাই করে, পুথি পড়ার মহফেলে গিয়ে বসেছি, আর আমির হামজা, হজরত আলি, হানিফা পাহালওয়ান প্রভৃতি চিরস্মরণীয় মহাবীরদের, সোনাভান, জৈগুণ প্রভৃতি

বাদশাজাদীদের! আর কোহে কাফের সবুজ পরী, লাল পরী প্রভৃতি অপ্সরীদের কেচ্ছা-কাহিনী অবর্ণনীয় আনন্দ আর আগ্রহের সঙ্গে শুনেছি। সে সব কেচ্ছা আমার মনে এমন গভীর রেখাপাত করেছে যে, দিনের পর দিন ধরে পাঠশালার পাত্তাড়ীর উপর বসে নিজের পাঠের কথা ভুলে তন্ময় হয়ে, পুথি-সাহিত্যের সেই নায়ক-নায়িকাদের কথাই ভেবেছি! তাঁদের চিন্তায় এমন আমি বিমনা হয়ে যেতুম যে, তখন যদি হানিফা পাহলওয়ান যুদ্ধে নিয়ে যাবার জন্য, ঘোড়ায় চড়ে স্বয়ং আমায় ডাকতে আসতেন, কিম্বা সুন্দরী সবুজ পরী আমায় কোহে কাফে উড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য পুষ্পক রথে চড়ে আকাশ থেকে সশরীরে নেমে আসতেন, তা হলে আমি কিছুমাত্র বিস্ময় অনুভব করতুম না।

সে দিন এখন চলে গেছে। হানিফা পাহলওয়ানের ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনবার জন্য এখন আর উৎকর্ণ হয়ে থাকি না, সবুজ পরী যে পুষ্পক রথে করে এসে আমায় আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যাবেন সে আশাও আর নাই! এখনও কিন্তু একটা খেয়ালী কিছুর জন্য, অবাস্তব কোন একটা সম্ভাবনার জন্য, অদৃশ্য একটা কোন আদর্শের জন্যই আমি কায করে যাচ্ছি; সেই সব তথাকথিত অলীক জিনিষ থেকেই আমার জীবনের গূঢ়তম প্রেরণা পেয়ে আসছি; আর, তাদের অবাস্তব উপকরণ দিয়ে গড়া খেয়ালের ছায়াময় ফেরদৌসে পরিভ্রমণ করেই নিজের চিত্তবিনোদন করছি, অবসর সময় যাপন করছি!

অনেক দিন পূর্ব্বে Maxim Gorkyর লেখা একটা গল্প পড়েছিলুম। গল্পের সব কথা ঠিক মনে নেই; তবে, তার ভিতরকার সত্যটী আমার মনে চিরকালের তরে গভীর এক ছাপ রেখে গেছে। পাঠককে গল্পটী উপহার না দিয়ে থাকতে পারলুম না।

এক পরিচারিকা একটী ভদ্রলোকের কাছে তার প্রণয়ীর চিঠি পড়াতে আসতো, আর সেই চিঠির উত্তর লিখিয়ে নিয়ে যেতো। প্রণয়ীর পত্রে প্রেমের এমন সব আবেগ আর উচ্ছ্বাসের কথা থাকতো যে, ভদ্রলোক তা পড়ে অবাক হয়ে যেতেন, আর কে যে সেই কুরূপা দাসীকে এমন করে ভালবাসতে পারে, বিস্ময়ের সঙ্গে তাই ভাবতেন।

একদিন ঘটনাচক্রে সমস্ত ভেদ খুলে গেল। তিনি তখন জানতে পারলেন পরিচারিকার প্রণয়ী তারই সৃষ্ট একটী মানস প্রতিমা ছাড়া আর কিছু নয়। বাস্তব জগতে স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব তার নেই। তাঁর কাছ থেকে চিঠি লিখিয়ে পরিচারিকা অন্য একটী ভদ্রলোককে দিয়ে তা পড়িয়ে নেয়, আর তাঁর কাছ থেকে সে চিঠির উত্তর লিখিয়ে নিজের নামে ডাকে ফেলে দেয়। যথাসময়ে ডাকযোগে চিঠি এসে পৌঁছুলে, প্রথমোক্ত ভদ্রলোকটীর কাছে সেটী পড়িয়ে শুনতে আর তার উত্তর লেখাতে যায়। এই অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, পরিচারিকা বললে:—বাস্তব জগতে কেউ তাকে ভালবাসে না, অথচ ভালবাসা ছাড়া জীবনটা তার কাছে শূন্য বলেই বোধ হয়। সত্যকার প্রেমিকের অভাব পূরণ করবার জন্য তাই সে তার এই কাল্পনিক প্রেমিকের সৃষ্টি করেছে। এরই সঙ্গে পত্রালাপ করে সে বাস্তব জীবনের ভালবাসার অভাব কতকটা পূরণ করে নেয়।

পাঠক হয়তো এই গল্পটী পড়ে হাসি দমন করতে পারবেন না। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সকলের দশাই কিন্তু গোরকির পরিচারিকার মত, নয় কি? আমরাও তারই মত, কল্পনার সাহায্যে বাঞ্ছনীয় একটা বস্তুর কিম্বা আদর্শের কিম্বা জগতের সৃষ্টি করে, তার ধ্যানেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখটুক পাবার চেষ্টা করি না কি?

বাস্তবের বাহিরে, উপলব্ধ বস্তুর বাহিরে, আপাতঃ অবাস্তব কিছুর জন্য, আপাতঃ অনুপলব্ধ কিছুর জন্য, প্রাণ আমাদের ব্যাকুল হয়। তাই আমরা নিত্য-নূতন সাধন-পথের পথিক হই, নিত্য-নূতন আদর্শের জন্য ছুটি। যথাসময়ে সাধনা আমাদের সফল হয়, আদর্শ আমরা উপলব্ধ করি, শান্তি কিন্তু আমরা পাই না। কে যেন আমাদের অন্তরের কানে কানে বলে দেয়, না না, সাধনা তোমাদের এখনও শেষ হয়নি। নূতন করে আবার সাধনা কর, নূতন পথের আবার পথিক হও। যা তোমরা উপলব্ধ করেছ, তোমাদের জন্য তা যথেষ্ট নয়। নূতন আদর্শ গ্রহণ কর, নূতন উপলব্ধির চেষ্টা কর। অন্তর নিয়ন্তার সেই বাণী শুনে আমাদের খেয়াল নূতন ফেরদৌস রচনায় ব্যস্ত হয়, আমাদের দেহ মন, সেই নূতন ফেরদৌসকে জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য চেষ্টা করে। এই করেই আমরা চলি অনন্তের শেষ প্রান্তে অবস্থিত পূর্ণতর, সুন্দরতর, কাম্যতর এক ফেরদৌসের উদ্দেশ্যে! জীবন

আমাদের বুদ্‌বুদের মত নশ্বর, অথচ পথ আমাদের অফুরন্ত, অন্তহীন! আমরা কি তা হলে পথ-ভ্রান্ত মরুযাত্রীর মত অলীক এক মায়া-মরিচিকার পিছনে ছুটে বেড়াবার জন্যই জন্মেছি? ব্যর্থ, বিরামহীন সাধনাই কি আমাদের তক্‌দীরের নির্ম্মম বিধি? সংশয়বাদী বলবেন তা ছাড়া আর কি? অর্থহীন এই বিশ্বে অক্লান্ত প্রয়াসের শূন্য ব্যর্থতাই হচ্চে একমাত্র প্রামাণ্য সত্য; বাকি সব মিথ্যা মোহ, আসার মায়া!

আমার কিন্তু মনে হয়, অতটা নিরাশ হবার কোন দরকার নেই, আর বিজ্ঞের মত ঝাঁকানি দিয়ে সংশয়ের মাথা অমন করে নাড়বারও কোন প্রয়োজন নেই। বাস্তবকে নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট হই না; কারণ, আল্লাহ তাঁর খলিফা (প্রতিনিধি) করে আমাদের এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, অথচ এখানে এসে আমরা দেখি, খলিফার উপযুক্ত আসবাব-পত্র জগৎ আমাদের জন্য সংগ্রহ করে রাখেনি। হক আদায় করবার জন্য, প্রাপ্য সম্মান পাবার জন্য তাই আমরা চঞ্চল হয়ে উঠি, বাস্তবের সঙ্গে কলহ করি, অবাস্তবের জন্য ব্যাকুল হই। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু, আমরা যা চাই, তাকে অবাস্তব বলা চলে না; সেই হচ্চে প্রকৃত জিনিষ, আমাদের পদ-মর্য্যাদার উপযুক্ত আসবাব-পত্র। আর মানুষ যাকে বাস্তব বলে, সে সব হচ্চে আমাদের প্রতারিত করবার তুচ্ছ উপকরণ। আমরা সে সব মেকি জিনিষ দেখে ভুলবো কেন?

তবে খলিফার উপযুক্ত আসবাব-পত্র পেয়েও আমাদের মন সন্তুষ্ট হয় না। তবুও অন্তর আমাদের কান্দতে থাকে, প্রাণ আমাদের ছটফট করে। বিষয়ে শান্তি নেই, বিভবে শান্তি নেই; সম্মানে শান্তি নেই, সাফল্যে শান্তি নেই; বিলাসে শান্তি নেই, ব্যসনে শান্তি নেই। এই পৃথিবী যা দেয় তার কিছুতেই শান্তি নেই। সুখ-সম্পদ যত বাড়তে থাকে, অশান্তির মাত্রাও তত বাড়তে থাকে। ততই আমরা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করি, শান্তি এ জগতের সুখের মধ্যে, এ জগতের সম্পদের মধ্যে, এ জগতের সাফল্যের মধ্যে আমরা পাব না, পেতে পারি না। শান্তি, যে শান্তিতে আমাদের দেহমন স্নিগ্ধ হয়, শীতল হয়, সে শান্তি আমরা পেতে পারি কেবলমাত্র খোদার স্মরণে; আর কিছুতে পেতে পারি না। লা তাতমাইন্নাল কুলুবে ইল্লা বেজিকরিল্লাহ (আল্লার স্মরণ ছাড়া আত্মার শান্তি নাই)। শত সুখের মধ্যে, শত মোহের মধ্যে আমরা ভুলতে পারি না যে, আমরা স্বর্গের অধিবাসী, পৃথিবী আমাদের প্রবাসভূমি ছাড়া আর কিছু নয়। তাই আমাদের আত্মার এই ব্যাকুলতা, এই বিরামহীন ক্রন্দন।

মওলানা রুমী বাঁশীর উপমা দিয়ে এই সত্যটীকে অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন:—

> বেশ্‌নো আজ নায়, চুণ হেকায়েৎ মিকুনদ,
> ও আজ জুদাইহা শেকায়েৎ মিকুনদ।
> কায নেস্তান তা মরা ববুরিদা আন্দ,
> আজ নফিরম মারদ ও জন নালিদা আনন্দ।
> সিনা খাহম শারহা শারহা আজ ফেরাক,
> তা বগোয়েম শরহে দরদে ইস্তিয়াক।
> হার কাসে কে দূর মানদ যে আসলে খেশ,
> বাজ যোয়েদ রোজগারে ওয়াসলে খেশ।

* * *

অর্থ:—

বাঁশীর কথা শোন, বিরহের জন্য যখন সে বিলাপ করে, দুঃখের কাহিনী যখন সে বলতে থাকে!

(সে কি বলে জান?)

সে বলে "যখন থেকে তারা আমার ঝাড় থেকে কেটে এনেছে, তখন থেকেই আমার করুণ ক্রন্দনে সকলের অন্তর ব্যথিত হয়েছে। আমি চাই বিরহ-বিধুর হৃদয়, বিচ্ছেদের যাতনায় যে হৃদয় খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়েছে; তার কাছেই আমি বলতে চাই, মিলনের জন্য আমার অন্তরের এই জ্বালাময় ব্যাকুলতার কথা!"

কাউকে যদি তার মাতৃভূমি থেকে দূরে রাখা যায়, সেখানে ফেরবার জন্য তার অন্তর ব্যাকুল হয়েই থাকে!

* * *

তকদিরের নির্ম্মম বিধানে আদম স্বর্গভ্রষ্ট হয়েছে কওসরের কল তানে মুখরিত, তুবার বিচিত্র ফল-ফুলে শোভিত চির-আনন্দময় ফেরদৌসের রম্যকানন ছেড়ে সে শোকতাপে জর্জ্জরিত এই দুনিয়ায় এসে পড়েছে। সে তার সেই চিরসুখ, চিরশান্তিময় জন্মভূমির কথা ভাববে না তো কিসের কথা ভাববে বল? প্রবাস আর বিরহই হচ্চে তার বর্ত্তমান জীবনের নিগূঢ়তম সত্য; তাই ক্রন্দনের মধ্যেই আমরা তার প্রকৃত স্বরূপটী দেখতে পাই, আর তা দেখে তাকে ভালবাসতে শিখি!

রাজ-পথ

ডাক্তার লুৎফর রহমান

বিধবা বোন সেবাকে রেখে যেদিন নগেন একটা নূতন ছোট মেয়েকে বিয়ে করে আনলে, সেদিন সেবা ভাবল, দাদা বউদি'র মরবার পর দু'মাসও অপেক্ষা করলেন না, আর আমি সারাজীবন কি করে বিধবা হয়ে থাকব?

সেবা যে তার স্বামীকে ভালবাসত না, তা নয়; কিন্তু দাদার ব্যবহারে আজ তার সংযম ও সহিষ্ণুতার সকল বাঁধই ভেঙ্গে গেল। যে গিয়েছে, সেত গিয়েছেই,—আর তো ফিরে আসবে না।

প্রতিদিনকার জীবনে নর-নারীর জন্যে সুখ-দুঃখ আছেই,—সে সব সুখ বা দুঃখের অংশ গ্রহণ করবার মত একটা লোক তো পার্শ্বে চাই!—তার জীবনের শূন্যতা এবং অশেষ দৈন্য বহন করবার মত একটা সঙ্গী চাই বৈ কি? কৈ, তার দাদা তো চিরদিন অবিবাহিত থেকে তার নিঃস্ব জীবনের নিঃসহায় অবস্থার প্রতি একটুও সহানুভূতি প্রকাশ কল্লেন না।—তার নিজের ঘরখানি খালি,—অন্তর বাহির, সব জায়গাই তার শূন্য!!—একটা ছেলেও যদি তার থাকত!

*　　*　　*　　*

দাদা হঠাৎ মারা গেলেন। দাদার নূতন বিধবা বউ—যামিনী আর শুধু সেবা রইল শূন্য ভিটায় বাতি দিতে। সে বাড়ীতে আর কেউ রইল না। এতদিন দুবেলা দু'মুঠা ভাত জুটতো, এখন সে পথও বন্ধ হয়ে গেল।

সেবা জিজ্ঞাসা কল্লে—বউদি, এখন আমরা কি করি?

যামিনী বল্লে—তাই তো ভাই!—সংসারে এত মানুষ থাকতে কি আমরা মারা যাব;—হরি বাবু, ননী বোস, কত প্রতিবেশী আমাদের,—তাদের কত ছেলেমেয়ে; এরাই আমাদের তত্ত্ব নেবে!—ভয় কি?

*　　*　　*　　*

আসলে ভয় করবার কারণ কিছু হয়েই উঠল। যেমন চিন্তা ও আশা করা যায়, সংসারে ঠিক তেমন হয় না। কি করে চলবে, সেই চিন্তাতেই সেবা অস্থির হয়ে উঠল। বাঙ্গালীর মেয়ে!—মেম্ তো নয়, যে যা তা একটা চাকরী-বাকরী করে বেটাছেলের মতই তারা জীবনে বেঁচে থাকবে।

সাকুল্যে তিন বিঘা জমী ছিল। জমীজমা নিজে না দেখলে এক সের ধানও ঘরে থাকে না। সময় মত বীজ না ছড়ালেও কিছু পাওয়া যায় না। জমীর আশা করাও বৃথা।

দুই জনে ঠিক করলে, বিড়ি তৈরী করবে। তাতে বেশ লাভ আছে, কিন্তু না শিখলে তো কোন কাজ হয় না। ও-পাড়ায় বিড়িওয়ালা রামধনের সঙ্গে দেখা করে সেবা বল্লে—ও রামধন, আমাদের বিড়ি তৈরী করা শিখিয়ে দিবি?

রামধন তো হেসেই আকুল!—ভদ্রলোকের বউ ঝি বিড়ি তৈরী করলে লোকে কি বলবে?—সেবা লজ্জিতা হয়ে ফিরে এল।

*　　*　　*　　*

হারাণ সন্ধ্যাবেলা গাইটা খুঁজতে এসে সেবাকে জিজ্ঞাসা কল্লে দিদি, কেমন আছ?

সেবা বল্লে—দশদিক অন্ধকার ভাই বউদি'র কাপড় নেই। কি করে সংসার চলবে, তাই ভাবছি।

হারাণ—এক কাজ কর। কোষ্টা কিনে, দিদি—বোনে মিলে রশি তৈরী কর, আর যাঁতা দিয়ে ডাল ভাঙ্গ। আমি হাটে বেচে দেব।

সেবা অশ্রুসিক্ত নেত্রে বল্লে—লোকে দলিল দিয়ে কথা ঠিক রাখে না, তুমি তোমার কথা ঠিক রাখবে ভাই?—তুমি আমাদের জন্যে এতটা করবে?—বড় দয়া তোমার।

হারাণ মাটীর দিকে মুখ করে বল্লে—গরীবই গরীবের দুঃখ বোঝে। এ কাজে আর আমার বিশেষ কি কষ্ট হবে?

দুদিন যেতে না যেতেই প্রতিবেশী হরিবাবু, বল্লেন—হারাণ সেবা ও যামিনী বউদি'র বাড়ী এত ঘোরে কেন? এই নিঃশ্বাস ঘোরাঘুরির অন্তরালে নিশ্চয় কিছু মানে আছে।

সেবার কাণে সে কথা এল। লজ্জায় সে খুব করে কাঁদল যামিনীও আঁচল দিয়ে দুই একবার চোখ মুছলো।

সকাল বেলা হারাণকে দেখেই সেবা বল্লে—এ বাড়ীতে আর এস না বাছা।—তোমরা মোছলমান জাত, আমাদের বাড়ীতে এলে আমাদের জল নষ্ট হয়!

হারাণ ভয় পেয়ে বল্লে—তা হলে আর কি করি দিদি? আমার কিন্তু কোন অপরাধ নেই।—কিছু মনে করো না, কিন্তু।

সেবা উত্তেজিত হয়ে বল্লে—তুই এখনই যা, আর দেরী করিসনে বলছি!

হারাণ থতমত খেয়ে সেবার সম্মুখ থেকে চলে গেল। দিদি কোন দিন তো তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে নাই।

* * *

একটা গাভী ছিল। তিন দিন হলো গ্রামের খোঁয়াড়ে গিয়েছে। কে আর এখন গাভীটার যত্ন নেয়?—মেয়ে মানুষ হয়ে আর কত পারা যায়।

সেবা গাভীটাকে খালাস করে আনবার জন্যে ননী বোসের কাছে যেয়ে একটা টাকা হাওলাত চাইল। ননী বল্লে—এখন সময় আমার বড় খারাপ যাচ্ছে, হাতে একটা টাকাও নেই।

সাত দিনের মধ্যেও গাভীটা খালাস করা সম্ভব হলো না। অষ্টম দিনে সেবা শুনতে পেলো ৩০৲ টাকার গাভীটা মাত্র ৭৲ টাকায় নীলামে বিক্রয় হয়ে গেছে। গাভীটা কিনেছে ননী বোস!

সেই দিন রাত্রে ঘরের দরজা এটে দিয়ে, একটা প্রদীপ জ্বেলে সেবা যামিনীকে সম্মুখে বসিয়ে বল্লে—চল্ বউদি, কলকাতা যাই,—আর কোন পথ দেখছি নে;—রাজপথ খোলা আছে!—যেমন কল্পনা অমনি কাজ। সেই রাত্রেই টিকিট কেটে তারা কলকাতা চলে গেল!

বৌবাজারে সেবা ও যামিনী বেশ্যাবৃত্তি করে। প্রতি সন্ধ্যাবেলা বেশ-বিন্যাস করে তারা ঘরের দুয়ারে দাঁড়ায়,—ক্রেতাও তাদের জুটেছে ঢের।

সেদিন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। মফস্বল হতে দুটী বাবু সন্ধ্যাবেলা ট্রেণ থেকে নেবে সেবাদের বাসার সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁরা সেই বাড়ীতে ঢুকে পড়লেন। সেবা যামিনীর গা টিপে ফিস ফিস্ করে বল্লে—ননী বোস ও হরিবাবু!

সেবা জিজ্ঞাসা কল্লে—কি চাই বাবু?

ননী—আমরা দুটী ভদ্রলোক এখানে রাত্রি বাস করব!

সেবা—দশ টাকা করে লাগবে।

ননী—আচ্ছা!

* * * *

প্রাতঃকালে ঝাড়ুদার বাসার উপর দুটী বাবুকে কাদার মধ্যে পাশাপাশি পড়ে থাকতে দেখে হেকে বল্লে শালা মাতাল!—

তখনও তাদের হুস্ হয় নি। ঝাড়ুদারের বকুনি খেয়ে কোন রকমে টলতে টলতে ফুটপাথের উপর যেয়ে ননী বল্লে সব চুরি হয়ে গেছে।

হরি জড়িত কণ্ঠে বল্লে—দুঃখ করো না ভাই।—সৎ কাজে যদি দু' এক শ' টাকা ব্যয় হয়ে যায়, তাতে আক্ষেপ করতে নেই।

জাগরণী গান

এস, মোদাম্মর হোসেন

বিশ্ব-জয়ী খোদার সেনা আবার তোদের জাগতে হবে
যোগ দিবি এই নিত্য-চলা নূতন জাগার মহোৎসবে
ভাঙ্‌তে হ'বে রুদ্ধকারা
এমন দিনে রোধ্‌বে কারা
এমন ক'রে শক্তিশালী খোদার সেনায় আট্‌কে রবে

জন্ম নিবি নূতন করে খালেদ এবং হামজারূপে
তুল্‌বি টেনে পঁচ্‌ছে যারা অন্ধকারের বদ্ধকূপে
নূতন আলি জন্ম নিও
ফের হৈদরী হাঁক মারিয়ো
আবার সারা বিশ্ব টারে ধমক হেনে কাঁপিয়ে দেবে

জাগতে হ'বে ওমর রূপে বন্‌তে হ'বে তারিক মুসা
পরতে হ'বে বিশ্ব-জয়ী বীর সেনানীর স্বরূপ ভুষা
ধরবি হাফেজ রূমীর বীণা-
বন্‌বি জাবের ইবনে সিনা-
আবার ধরা গজল্‌ ধারায় গভীর জ্ঞানে ফের ভাসিবে

গাজীর বেশে আসবি পুনঃ শহীদ হবি সত্য সেবি
দীপ্ত তেজে সত্য বাণী আবার তোরা বিশ্বে ক'বি
জাগ্‌রে তোরা আবার জাগ
মন্ত্রমুগ্ধ সুপ্ত-নাগ
চির-জাগার যাত্রীরা কি জাগার যুগেই ঘুমিয়ে রবে ?

জাগ্‌বি আবার হারুণ রূপে বন্‌বি আবার শাহন্‌শাহ্‌
বিশ্ব যে ভাই কর্ম্ম ভূমি নয়ত শুধু কাতল গাহ
সবল সেনার হেথায় ঠাঁই
দুর্ব্বল এবং ভীরুর নাই
জাগার যুগেই জাগতে হ'বে নয়'ত আবার জাগ্‌বি কবে

বীরাঙ্গনা খাওলা

কে, এ, এম্, ওয়াহেদল হক

অনেকের ধারণা যে ইসলামের পবিত্র পর্দাপ্রথা জগতের উন্নতির প্রতিকূল, অনেকে মনে করিতেছেন যে এই জঘন্য (নাউজবিল্লাহ) পর্দাপ্রথা নারীজাতিকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়া সমাজকে গতিহীন করিয়া দিতেছে; কিন্তু তাঁহাদের এরূপ ধারণা পোষণ করা একেবার ভিত্তিহীন। ইসলাম নারী-জাতিকে মনুষ্যত্বের মহিমান্বিত আসনে বসাইবার জন্য যাহা দান করিয়াছে, তাহা জগতের কোন ধর্ম্মই দিতে পারে নাই।

ইসলামের পর্দা একথা কোনদিনই ঘোষণা করে নাই যে, নারীদের প্রাচীর বেষ্টিত অন্দরমহলে চিরবন্দিনী করিয়া রাখিয়া সমাজকে পঙ্গু করিয়া দিতে হইবে; আবার ইহাও বলে নাই যে, নারীগণ বে-শরম বেহায়ার মত অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় লালসার প্রতিমূর্ত্তি হইয়া যথাতথা ঘুরিয়া বেড়াইবে। এই পর্দাপ্রথা নারী-পুরুষ উভয়কে সংযম শিক্ষা দিয়া আসিতেছে। ইহা কোনদিনই জগতের উন্নতির প্রতিকূল নহে, যদি তাহা হইত তাহা হইলে ইসলাম প্রচারের প্রারম্ভে মুসলমান মা-বোনগণ শিক্ষা-দীক্ষা, গুণ-গরিমা ও শৌর্য্য-বীর্য্য দেখাইয়া জগতকে পুলকিত ও চমকিত করিতে পারিতেন না। ইসলামের গৌরব-যুগে মুসলিম নারীগণ বোরখা দ্বারা নিজেদের ইজ্জত-শরম আবৃত করিয়াও ইসলাম জগতে যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা পবিত্র হাদিছ ও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সোনার অক্ষরে লিখিত রহিবে। পর্দাপ্রথা নারীজাতির দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের পথে বাধা দেয়নি, যদি দিত তাহা হইলে বোরখা পরিহিতা বীরাঙ্গনা হজরত খাওলা বিন্‌তে আজওরের মত মহিলাকে আমরা পাইতাম না। খাওলা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য পবিত্র পর্দার অপমান করেন নাই। কি করিয়া ধর্ম্মের সম্মান বজায় রাখিয়া নিজ নারীত্বের পূর্ণবিকাশ করিতে হয়, তাহা খাওলার জীবনে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। বক্ষমান প্রবন্ধ তাঁহার জীবনের কয়েকটী ঘটনা লইয়া প্রকাশিত হইল।

খাওলার পিতার নাম আজওর। আজওর হজরত মোহাম্মদের (দঃ) একজন বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন, এবং ইসলাম ধর্ম্মের সম্মান রক্ষার্থে নিজ প্রাণ উৎসর্গ করিয়া শহীদ শ্রেণীভুক্ত হন। বাল্যকাল হইতেই খাওলা ও তাঁহার ভ্রাতা জরার তাঁহাদের প্রিয় পিতার বীরত্বের আদর্শ হৃদয়ে রাখিয়া যুদ্ধকৌশল শিক্ষা করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর ইঁহারা যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত হইলেন, পিতা যেমন ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া শাহাদতের দরজা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা দুই ভাই-ভগ্নিও সেই শাহাদত লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

হিজরী ত্রয়োদশ অব্দে প্রথম খলিফা হজরত আবুবকরের (রাঃ) সময়ে মুসলিমগণ দামেস্ক অভিযানে বাহির হন। কয়েকবার যুদ্ধের পর রোমকগণ প্রাণভয়ে দুর্গ-দ্বার বন্ধ করিয়া নিজেদের রক্ষা করিল। মুসলিম গাজীগণ নগর অবরোধ করিয়া রাখিলেন, এমন সময় একটী দুঃসংবাদ আসিয়া তাঁহাদিগকে বিচলিত করিয়া দিল। তাঁহারা শুনিলেন যে, নিকটবর্ত্তী আজনাদিন প্রান্তরে নব্বুই হাজার শত্রুসৈন্য তাঁহাদের গতিরোধ করিবার জন্য একত্রিত হইয়াছে। এই সংবাদে তাঁহারা অত্যন্ত অধীর হইলেন; কারণ তখন তাঁহারা অতি অল্পসংখ্যক ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রধান সৈন্যগণ সিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। এমত সময় বীরকেশরী হজরত আবু ওবায়দা সৈন্যগণকে শত্রুগণের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য আজনাদিন প্রান্তরে পাঠাইয়া দিলেন, বীরবর হজরত খালেদ এবনে ওলিদ ইঁহাদের চালিত করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের

যাত্রার পর হজরত আবু ওবায়দা রশদ, সৈন্যশিবির ও সামান্য সংখ্যক সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন, ইঁহার সঙ্গে বহুসংখ্যক মুসলিম মহিলা ছিলেন, বিশেষতঃ জানানাগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ইঁহার উপরেই অর্পিত ছিল।

হজরত আবু ওবায়দা কিছুদুর যাইতে না যাইতে দামেস্কের শাসনকর্ত্তা ষাট হাজার রোমক সৈন্য লইয়া তাঁহাদের উপর ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিলেন, দেখিতে দেখিতে আর একদল নূতন রোমীয় সৈন্যবাহিনী তাঁহাদিগকে পশ্চাৎদিক হইতে আক্রমণ করিল। দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। অসংখ্য রোমীয় সৈন্যের সঙ্গে মুষ্টিমেয় মুসলমান সৈন্য অদম্য সাহসের সহিত তুমুল সংগ্রামে উন্মত্ত হইলেন। তাঁহারা একটুও ভীত হইলেন না, জানানাগণও তলওয়ার সাহায্যে নিজেদের বাহুবলের পরিচয় দিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না। কিন্তু শত্রু সৈন্যগণ বহুসংখ্যক থাকায় ইঁহারা পরাজিত হইলেন, আরব মহিলাগণও শত্রু-হস্তে বন্দিনী হইলেন। এই বন্দিনীগণের মধ্যে হজরত খাওলাও ছিলেন।

আজনাদিন প্রান্তরে যখন এই তুমুল যুদ্ধ চলিতেছিল সেই সময় জনৈক অশ্বারোহী আসিয়া মুসলমানদের দুর্দ্দশার কথা হজরত খালেদের নিকট বর্ণনা করিল। মহাবীর খালেদ তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের সাহায্যের জন্য দুই হাজার সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং এক হাজার সৈন্য লইয়া তাহাদের পশ্চাৎগামী হইলেন। শত্রু সৈন্যগণ ইঁহাদের দেখিয়া রণক্ষেত্র হইতে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। কিন্তু সকলে পলাইতে পারে নাই, তাহাদের অনেকেই ইঁহাদের হস্তে বন্দী হইল। বন্দীদের মধ্যে পিটারের ভ্রাতা সেনাপতি বুলছ ও অন্যান্য বহু রোমীয় সেনাপতি ছিলেন।

বীরাঙ্গনা খাওলা বন্দিনী হইয়াছেন, এ সংবাদে তাঁহার ভ্রাতা বীরবর জরার বড় অস্থির হইয়া পড়িলেন। কি করিয়া নিজ ভগ্নীকে শত্রু-কবল হইতে রক্ষা করিবেন ও শত্রুগণকে সমুচিত শিক্ষা দিবেন, তাহারই সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। হজরত খালেদ তাঁহাকে অধীর হইতে নিষেধ করিলেন এবং বুঝাইয়া বলিলেন শত্রুগণের বহু সেনাপতি আমরা বন্দী করিয়াছি এবং তাহাদের বিনিময়ে আমরা আমাদের মহিলাগণকে উদ্ধার করিতে পারিব, যদি ইহাদ্বারা না হয় তখন বাহুবলের পরিচয় দিব।

সেনাপতি বুলদের ভ্রাতা পিটার মুসলিম মহিলাগণকে একটি তাঁবুতে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। মহিলাগণের মধ্যে প্রায় সকলেই অশ্বারোহণ ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁবুর বদ্ধ-বাতাস ইঁহাদের প্রাণে বড় আঘাত দিতে লাগিল, ইঁহাদের মধ্য হইতে হজরত খাওলা সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে রাজবংশীয় মহিলাগণ! তোমরা কি এতই হীন, এতই দুর্ব্বল যে কাফেরের তাঁবুতে আবদ্ধ রহিবে! তোমাদের প্রাণে কি শক্তি নাই! আরব বীরাঙ্গনাদের একবিন্দু রক্ত কি তোমাদের শিরায় প্রবাহিত হয় না! তোমরা নিজেদের পূর্ব্বপুরুষগণের শৌর্য্য-বীর্য্য কি একেবারেই ভুলিয়া গেলেন? তাঁহারা যুদ্ধ করিয়া সম্মুখসমরে প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তথাপি শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া জঘন্য ও ঘৃণিত জীবন যাপন করেন নাই। তোমরা বীরদর্পে জাগিয়া উঠ, শত্রু শিবির ছিন্ন করিয়া পৃথিবীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বাহির হইয়া পড়, যদি শত্রুরা বাধা দেয়, তবে যুদ্ধ কর সম্মুখ-সমরে প্রাণত্যাগ কর, কিন্তু বন্দিনী হইয়া নিজ নারীত্বের ও মনুষ্যত্বের অবমাননা করিও না।" তাঁহার এই জ্বালাময়ী বক্তৃতা আরব মহিলাদিগের প্রাণে নববলের সঞ্চার করিল, তাঁহাদের প্রাণে প্রতিহিংসার আগুন 'দাউ" দাউ' জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহারা সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন "খাওলা। তোমার কথা আমরা হৃদয়ের পরতে-পরতে অনুভব করিতেছি, শত্রুদের উপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার জন্য মন-প্রাণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা অসহায়া নারী, আমরা বন্দিনী, আমাদের না আছে বাহুবল, না আছে তলওয়ার। শত্রুদের সঙ্গে আমরা কিরূপে যুদ্ধ করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এ বিপদে তোমার বুদ্ধি ও বাহুবল আমাদের একমাত্র সম্বল। তুমি যাহা ভাল বিবেচনা করিবে তাহাই কর, আমাদের কোন আপত্তি নাই।"

খাওলা বলিলেন "আমাদের তলওয়ার, তীর, বর্শা কিছুই নাই, আছে শুধু পরমদয়ালু করুণানিধান খোদাতা'লার মর্জ্জিতে ঐকান্তিক ভক্তি। আমরা অস্ত্রহীনা, তাহাতে কিছু যায় আসে না; তাঁবুর খুঁটিই আমাদের অবলম্বন।" এই বলিয়া তিনি তাঁবুর খুঁটি খসাইয়া লইয়া প্রহরী সৈন্যদের ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার দেখা দেখি সকল মহিলা এক একটি করিয়া খুঁটি ও লাঠি-সোটা লইয়া

শত্রুগণের তলওয়ার বর্শার ভীষণ আঘাত ব্যর্থ করিয়া দিতে লাগিলেন। এই ভাবে তাঁহারা শত্রু শিবির হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িলেন। খাওলা তাঁহাদের চালিত করিতে লাগিলেন। এই সময় আফ্‌ফার কন্যা আফিয়া, ওৎবার কন্যা উম্মে আব্বান, সল্‌মা প্রভৃতি মহিলাগণও নিজেদের বীরত্বের পরিচয় দিয়া সকলকে আশ্চর্য্য করিয়াছিলেন।

আরব মহিলাদের এই খণ্ডসংগ্রাম প্রতিরোধ করিবার জন্য দলে দলে রোমীয় সৈন্য ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের সেনাপতি পিটার মহিলাদিগকে লাঠি-সোটা লইয়া তলওয়ার বর্শাধারী রোমীয় সৈন্যগণের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং নিজ সৈন্যগণকে স্ত্রীলোকদিগের উপর অস্ত্রচালনা করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু আরব মহিলাগণ পিটারের হাসিতে ভুলিলেন না। তাঁহারা জীবন-মরণ পণ করিয়া লাঠির দ্বারা শত্রুদের ভীষণ আঘাত করিতে লাগিলেন। লাঠির আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া ত্রিশ জন শত্রুসৈন্য প্রাণ হারাইয়া ভূতলশায়ী হইল। চোখের সামনে সৈন্যগণের এই অপমান দেখিয়া পিটার আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না, তিনি মহিলাদের উপর অস্ত্র প্রয়োগ করিতে আদেশ দিলেন

রোমীয় সৈন্যগণ মহোল্লাসে আরব মহিলাদের উপর অস্ত্র চালনা করিতে লাগিল। হজরত খাওলা নিজ রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে শত্রুগণকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিলেন এবং মহিলাদিগকে বলিতে লাগিলেন 'যুদ্ধে প্রাণত্যাগ কর, শহীদ হও, কিন্তু পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিওনা, খোদা আমাদের তারিফ করিবেন।' দুই দলে তুমুল সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে এমন সময় 'আল্লাহো আকবর' বলিতে বলিতে আকাশ-পাতাল কাঁপাইয়া হজরত খালেদ ও জরার এক হাজার সৈন্যসহ এইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং বিদ্যুৎবেগে শত্রুগণের উপর পতিত হইলেন। শত্রুগণ ইঁহাদের ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। এমন কি মহাবীর (?) সেনাপতি পিটারের অন্তর দুরুদুরু কাঁপিতে লাগিল। তিনিও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইতেছিলেন, এমন সময় জরারের তরবারী তাঁহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিল। জরার ও খাওলা সম্মুখে পশ্চাতে যাহাকে পাইলেন তাহাকে হত্যা করিয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদেরই জয় হইল, মহিলাগণ মুক্ত হইলেন এবং মুসলিম সৈন্যগণ মহিলাগণকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় আজনাদিন প্রান্তরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

হিজরী উনবিংশ অব্দে দামেস্কবাসীগণের সঙ্গে মুসলমানদের ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া যায়। শত্রুসৈন্য আজনাদিন প্রান্তরে একত্রিত হইয়াছিল। হজরত খালেদ পঞ্চাশ হাজার সৈন্যসহ খাওলার ভ্রাতা জরারকে আজনাদিন প্রেরণ করেন। তিনি সসৈন্য কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় হেমেসের শাসন কর্ত্তা ওরদান পরিচালিত বার হাজার সৈন্যের সহিত তাঁহাদের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ওরদানের পুত্র হামদান সৈন্যদলের একজন সেনাপতি ছিলেন। তিনি জরারকে উদ্দেশ করিয়া সুতীক্ষ্ণ বর্শা ছুড়িলেন। ইহাতে জরারের একটী হস্ত ভীষণভাবে আহত হইল, কিন্তু তিনি ভীত হইলেন না। পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং সুযোগ বুঝিয়া হামদানের লোলবক্ষে বর্শার আঘাত করিলেন। বর্শা হামদানের বক্ষভেদ করিল এবং হামদানের দেহ প্রাণশূন্য অবস্থায় ভূতলশায়ী হইল। ইহাতে শত্রুসৈন্যের মধ্যে মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল, তাহারা জরারকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে বন্দী করিল তিনি বন্দী হওয়াতে মুসলিম সৈন্যগণ হতাশ হইলেন না তাঁহারা 'আল্লাহু আকবর' শব্দে আকাশ-পাতাল কাঁপাইয়া নিজেদের শেষ শক্তির পরিচয় দিতে শত্রুদের উপর সিংহ-বিক্রমে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। হজরত খালেদ এই সংবাদ শুনিয়া এক হাজার সৈন্য লইয়া জরারকে রক্ষা করিতে বাহির হইলেন। তিনি সসৈন্য অগ্রসর হইতেছেন এমন সময় দেখিলেন যে একজন অশ্বারোহী সৈন্য দ্রুতবেগে আসিয়া তাঁহাদের অগ্রভাগ দখল করিলেন। তিনি দেখিলেন যে এই নবাগত সৈন্যের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ পোষাকে আবৃত মাত্র চক্ষু দুইটী খোলা রহিয়াছে, দেখিতে দেখিতে এই অশ্বারোহী বিদ্যুৎবেগে ধাবমান হইলেন। হজরত খালেদ সকলকে তাঁহার সম্বন্ধে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু কেহই তাঁহাকে উত্তর দিতে পারিল না। এই অশ্বারোহীকে অনুসরণ করিবার জন্য তাঁহারা অনেকেই নিজ নিজ অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিলেন না। এই অগ্রগামী অশ্বারোহী সিংহ-বিক্রমে শত্রুদের উপর লাফাইয়া পড়িলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে বর্শার আঘাতে শত শত রোমীয় সৈন্যকে ধরাশায়ী করিতে

লাগিলেন। ইনি মুহূর্ত্ত মধ্যে শত্রুদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজ বুদ্ধি-কৌশলে পরমুহূর্ত্তে বাহির হইয়া আসিতেছিলেন। ইঁহার যুদ্ধ কৌশল দেখিয়া রোমক সৈন্যগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন সময় হজরত খালেদ তাঁহার সৈন্যগণ সহ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রবল পরাক্রমে শত্রু-নিধনে তলওয়ার চালাইতে লাগিলেন। এইবার দুই দলে ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল, রোমীয় সৈন্যগণ বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত মুসলিম সৈন্যগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া শেষে পরাজিত হইল, বহু সংখ্যক শত্রু সৈন্য নিহত হইল এবং অবশিষ্ট প্রাণ লইয়া পলায়ণ করিল।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলে সেই নবাগত অশ্বারোহীবীরের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া দাঁড়াইল, তখন তাঁহার সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত ও রুধির-প্লাবিতা মুসলিম সৈন্যগণ তাঁহার বীরত্বের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ও তাঁহার চেহারা দেখিবার জন্য লালায়িত হইলেন। হজরত রাফে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া হজরত খালেদকে বলিলেন 'সম্মুখে দণ্ডায়মান এই অশ্বারোহীর পরিচয়ের জন্য আমি ধৈর্য্যহারা হইতেছি। আমি অনেক বীরের বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশল দেখিয়াছি কিন্তু আজ সম্মুখ সময়ে ইনি যেরূপ বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশলের পরিচয় দিলেন তাহা জীবনে কখনও দেখি নাই।' মহাবীর হজরত খালেদও তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য ও তাঁহার মত বীরের সহিত আলাপ করিবার জন্য বড় উৎসুক হইয়া পড়িলেন। একজন সৈন্য তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন 'হে বীরশ্রেষ্ঠ! আপনার বীরত্বে আমরা সকলে অবাক হইয়া গিয়াছি। আপনার পরিচয় জানিবার জন্য সৈন্যগণ এমন কি হজরত খালেদ ও হজরত রাফে পর্য্যন্ত অধীর হইয়াছেন। আপনাকে আমরা কখনও দেখিয়াছি কিনা বলিতে পারিনা, কারণ আপনার আপাদ মস্তক কৃষ্ণবর্ণ বোরখায় আবৃত রহিয়াছে, মাত্র চক্ষুদুটী খোলা রহিয়াছে।' সৈনিকের এই কথা শুনিয়া ইনি কিছুদূরে সরিয়া গেলেন এবং নীরব হইয়া রহিলেন। মহাবীর হজরত খালেদ এবার ধৈর্য্যহারা হইয়া স্বয়ং তাঁহার নিকটে যাইয়া তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইলেন। এই বার এই মৌনব্রতকারী অশ্বারোহী উত্তর করিলেন, "মহাবীর খালেদ! আপনারা সকলেই আমার বীরত্বের প্রশংসা করিয়া আমায় বড় সরম দিতেছেন। আমি এই প্রশংসার যোগ্য নহি। আপনারা সকলে পুরুষ, আমি সামান্য স্ত্রীলোক ভিন্ন আর কিছুই নহি, সেজন্য আপনাদের নিকটে আত্মপরিচয় দিতে অন্যমনস্কভাব দেখাইতেছিলাম। আমি জরারের ভগিনী খাওলা বিনতে আজওর। আমি শুনিলাম যে আমার একমাত্র ভ্রাতাকে বন্দী করিয়াছে। এ সংবাদে আমি ধৈর্য্যহারা হইয়া শত্রুগণের উপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিয়া আসিয়াছি, আমার ভ্রাতার সংবাদ না পাইয়া আমি বড় কষ্ট অনুভব করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার প্রিয় ভ্রাতার জন্য বালিকার ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

তাঁহার এই ব্যাকুলতা দেখিয়া সকলে মর্ম্মান্তিক দুঃখ অনুভব করিলেন এবং তাঁহার প্রিয় ভ্রাতা জরারকে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সেই সময় সকলে একদল রোমীয় সৈন্য দেখিতে পাইলেন, এবং এই খণ্ড সৈন্য-বাহিনীকে আক্রমণ করিলেন। শত্রু সৈন্যগণ মুক্তি প্রার্থনা করিল ও নিরস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হজরত খালেদ ইহাদের নিকট হইতে জরারের সংবাদ জানিয়া লইলেন। তাহারা বলিল যে, ওরদান তাঁহাকে বন্দী করিয়া হেমেস নগরে পাঠাইয়াছেন এবং সেখান হইতে তাঁহাকে সম্রাট হারকিউলিসের নিকট পাঠান হইবে।

হজরত খালেদ অনর্থক কালবিলম্ব না করিয়া হজরত রাফেকে একশত অশ্বারোহী সৈন্যসহ জরারের উদ্দেশে পাঠাইলেন। বীরাঙ্গনা খাওলাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন এবং অতি সতর্কতা অবলম্বন করিয়া জরারের বন্দীকারী সৈন্যগণের উপর হামলা করিলেন এবং জরারকে তাহাদের হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইলেন। এই খণ্ডযুদ্ধে অধিকাংশ রোমীয় সৈন্য নিহত হইল, এই সময় খাওলা যেরূপ বাহুবলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বীরের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত রহিবে।

বিড়ম্বনা

উপন্যাস

বন্দে আলী মিয়া

—অধ্যায় এক—

ভোরের সমুদ্র। উন্মত্ত শিশু ঢেউ এর দল অকারণ বিপুল আনন্দে অসীমের আহ্বানে ছুটিয়া চলিয়াছিল। দৃষ্টির শেষে আধো-কালো আধো-আলোর মাঝখানে দূরের বালুচরটীকে ঠিক মনে হইতেছিল কোন্ সোনালি রঙের তরুণী রূপোলী আঁচল মুড়ি দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ভোরের তেজা বাতাসে শীত বোধ হওয়ায় যেন বারে বারে কাঁপিয়া উঠিতেছে।

স্বাস্থ্যান্বেষী মনসুর ভোরের আলোয় বালির উপরে পাইচারি করিয়া বেড়াইতেছিল। মড়া কাটিয়া, হাড় বাছিয়া, Anatomy বিশ্লেষণ করিয়া, ঔষধের নাম এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুখস্থ করিয়া তাহার গত কয়েকটী বৎসর নিরুদ্বেগে নির্বিঘ্নে কাটিয়া গিয়াছে। ডাক্তারী জগৎ বাদেও যে বিধাতার আর একটা দিক এত সুন্দর, এত পবিত্র, এত মধুর ইহা নজরে পড়িবার অবকাশ পায় নাই। আজ তাই সুযোগ পাইয়া প্রকৃতির আনন্দময় স্নেহস্পর্শ তাহার অন্তরকে ছুঁইয়া ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। অকারণে বিরাট পরিতৃপ্তির সহিত অসীম সাগরের বুকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া মনের প্রফুল্লতায় এধার ওধার করিতে করিতে সহসা একদল তরুণীর সম্মুখীন হইয়া সে দাঁড়াইয়াতে বাধ্য হইল।

এই দলের মধ্যে তাহার সহাধ্যায়িনী মিস করুণা চট্টোপাধ্যায় হাসি হাসি মুখে তাহার পানে অর্থভরা দৃষ্টি মেলিয়া মোন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মনসুর সেদিকে একটীবার মাত্র চাহিয়া পলক মধ্যে চক্ষু নামাইয়া লইয়া অন্যদিকে স্থাপন করিল। ভাবটা, যেন সে তাহাকে দেখিতেই পায় নাই। কিন্তু এই বৈরাগ্যের লক্ষণ তাহার অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, বাধ্য হইয়া পুনরায় তাহাকে চাহিতে হইল—হাসির প্রতিদান না দিয়াও নিস্কৃতি পাইল না।

দেশে থাকিতে যাহার সহিত কোনা দিন কোন কারণে একটা কথার পর্য্যন্ত আদান-প্রদান হয় নাই, বিদেশে সে-ই যেন কত দিনের সুপরিচিত গভীর আত্মীয়রূপে দেখা দেয়। এই বাঙালী খৃষ্টানের মেয়ে করুণার সঙ্গে মনসুর কোনো উপলক্ষের সূত্র ধরিয়া ক্লাসে কোনো দিনই বাক্যালাপ করে করে নাই এবং করুণার দিক হইতেও সে উৎসাহের অনেকটা অভাব ছিল, কিন্তু আজ এই সমুদ্র তটে শতেক অচেনা লোকের মাঝে এই দুইটী তরুণ-তরুণী আপনাদিগকে পরস্পরের নিকটে সহজ না করিয়া পারিল না।

মনসুর বুঝিল সহস্র ইচ্ছা সত্ত্বেও করুণা নারী-সুলভ সঙ্কোচে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া বিলম্ব ঘটাইতেছে। সুতরাং সে-ই মুহূর্ত্তে নিজের ভিতরকার সমস্ত জড়তা এবং দুর্ব্বলতা সবেগে ঝাড়িয়া ফেলিয়া হাসিমুখে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। বলিল, আপনি এখানে কোথায়?

করুণা চোক মুখ রাঙা করিয়া প্রত্যুত্তর দিল, নমস্কার, বেড়াতে এসেছি। আপনি?

—আমার ঠিক তা নয়, Change, পূজোর ছুটীর পর থেকে শরীরটা খুলই খারাপ হয়ে পড়েছিল, তাই প্রিন্সি-

প্যালের এ্যাড্‌ভাইস নিয়ে কার্ত্তিক মাস থেকে এখানে আছি।

—Oh God, সেইজন্যে এতদিন আপনাকে কলেজে দেখিনি। তা এখন কেমন বোধ করুচেন?

—মন্দের ভালো। বড়দিনের বন্ধ বুঝি এখন?

—আজ্ঞা হাঁ। ছাত্র জীবনের স্বস্তি আর কি।

—আমার তাহলে অনেকটা দিন নষ্ট হয়ে গেল। আচ্ছা, পড়াশুনা বুঝি ঢের দূর এগিয়েচে?

—না তেমন আর কি, শরীর ভালো হলে শীগ্রি পূরণ করে নিতে পারবেন।

—হুঁ, যা মেধাবী ছেলে আমি- আর ক'দিন থাক্‌বেন?

—বেশী নয়। ছুটির ক'টাদিন মাত্র। আপনি?

—আমার কিছু ঠিকঠাক্ নেই, ইচ্ছে হলে আজো যেতে পারি—নইলে আরো দুমাস থাক্‌লে মানা করবার কেউ নেই।

করুণা জবাব শুনিয়া মুখ মুচকাইয়া মৃদু হাসিল। বলিল, চমৎকার ইচ্ছা তো আপনার। কোথায় আছেন?

মনসুর পিছন ফিরিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সমুদ্র-ধারে দূরের একটা বাড়ী দেখাইয়া দিয়া সংক্ষেপে বলিল, ওই যে ঐখানে।

—ওটা মেস বুঝি?

—না।

—তবে বুঝি আত্মীয় বাড়ী, কে আছেন?

—কেউ নেই, এমনি একটা কামরা ভাড়া নিয়ে আছি।

—ক'জনে?

—আমি একা।

—খান কোথায়?

মনসুর বেদনা-ভরা মৃদু হাসি হাসিল। জবাব দিল, ষ্টোভ আছে নিজেই পাক-শাক করে নিই দুটো।

করুণা বিস্ময়ের সুরে বলিল, নিজের হাতে রান্না করেন, ধন্যি আপনি।

—সার্টিফিকেট না দিলেও চলে, কোনো কষ্ট হয় না।

করুণা প্রতিবাদ করিয়া বলিল, মুখে অস্বীকার করলে কি হবে, পুরুষ মানুষের কি ওসব ঝামেলা পোষায়?

—সয়ে গেচে। আচ্ছা, খানসামা বাবুর্চ্চিরা তো আর আপনাদের জাতের নয়!—

—সে কথা আলাদা; তারা ব্যবসায় ক'রে পেট চালায়। করুণা একটু থামিয়া চোকের কোণে দুষ্টামীভরা হাসির আগুন চমকাইয়া বলিল, এটা বুঝি আপনার নিঃসঙ্গ জীবনের ব্রহ্মচর্য্য?

—ধরুন না হয় তাই-ই। আপনি বুঝি বন্ধুর বাসায় এসেচেন?

—উঁহু, আমরা সব্বাই—বাবা, মা, ছোড়্‌দি, মেজদি, তার ছেলেমেয়ে একেবারে একটা বাড়ী ভরা; আপনার মতন একলা নই।

—দুর্ভাগ্য আমার। আপনি প্রত্যেক দিনই আসেন তো?

—কাল রাতেই সবে এসেচি, নইলে পূর্ব্বেই আপনার সঙ্গে দেখা হোত। তবে কি জানেন, যে কটা দিন থাক্‌বো—কোনো অবসরই ফাঁক যেতে দেব না। আপনাকেও দাঁড়িয়ে রেখে কষ্ট দিলুম—অসহ্য হয়ে উঠেচে, না?

—কিছু না। সে কথা আপনাকেই আমার বলা উচিত ছিল। আসুন তাহলে, আদাব।

—নমস্কার।

মনসুর সূর্য্যোদয় দর্শন আশায় পূর্ব্বমুখে ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই তার চেতনা ফিরিল। বেলা অনেকখানি হইয়াছে এবং তপ্ত রৌদ্রে উত্তরোত্তর বালিকণা তাতিয়া উঠিতেছে। সূর্য্যোদয়ের অদর্শনে সে বিন্দু পরিমাণেও ক্ষুব্ধ হইতে পারিল না—আপনার অন্তরের অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আনমনে কোঁচার খুঁট পাকাইতে পাকাইতে ধীরপদে বাসার দিকে ফিরিয়া চলিল। কোথা দিয়া যে এই সময়টা তাহার কাটিয়া গিয়াছে কিছুই জানিতে পারে নাই। কিন্তু এই পরাজয়ই তাহার কণ্ঠে বিজয়ের গৌরবমাল্য পরাইয়া দিয়াছে।

মনসুর ছেলেটি জিতেন্দ্রিয় না হইলেও Moralist হিসাবে তাহার একটুখানি নাম ছিল। বিশেষ করিয়া স্ত্রীজাতির উপরে অটুট সম্মান থাকা সত্বেও, বরাবরই শ্রদ্ধার যেন অপ্রাচুর্য্য দেখা যাইত। আজ ঘরে ফিরিয়া অবধি খুব খানিকক্ষণ চোক রাঙাইয়া মনকে শাসাইল যে, না, আর অধিক প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না, যথেষ্ট হইয়াছে।

নারীজাতির ছায়াটাকে সে পারতপক্ষে আর মাড়াইবে না বলিয়া এক সময়ে মনে মনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপে কী তাহার সার্থকতা হইবে? সে কী এতবড় মূল্যহীন অপদার্থ !!

কিন্তু যতই সে রক্তনেত্রে মনের উপরে চাবুক কষিতে থাকুক, অন্তরের অবাধ্য বিদ্রোহী প্রেমিক-মানুষটি অবলীলাক্রমে সমস্ত উপেক্ষা করিয়া, করুণার রক্ত-ঠোঁটের দুষ্টামীভরা হাসির মাঝে—ছোটো ছোটো দুই-চারিটি কথার অন্তরালে যে সৌন্দর্য্য, যে মাধুর্য্য, নীরবে লুকাইয়াছিল তাহাই ক্ষুধা-পীড়িত ভিখারীর মত অমৃত-বোধে পান করিয়া লইতেছিল। তাহার বলিবার ভঙ্গী—কথার সুর—হাসির ফুলঝুরি—চোখের অনন্ত ভাষা অপূর্ব্ব মদিরায় মাখা। যখন এই তরুণীটির সহিত তাহার ক্লাসের সহাধ্যায়িনী হিসাবে সুধু মাত্র চোখের পরিচয় ছিল, ইহার চারিপাশে এমন স্বপনের কনক-মায়া রহিয়াছে, তাহা তো সে ঘুনাক্ষরেও জানিতে পারে নাই—বুঝিতে চাহে নাই। আজ বিরাট অচেনার মাঝখানে যে অতিবড়ো পরিচিত জনের মতো প্রচুর সহানুভূতি বহিয়া আনিয়াছে, তাহাকে আর যাহাই করা যাক, অনাদর বা উপেক্ষা করিলে যে অধর্ম্ম হইবে, ইহা সুনিশ্চিত। মনসুরের মনটা কিঞ্চিৎ দ্রব হইল, এবং যে ভাবনাকে সে প্রাণপণ বলে বিতাড়িত করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই অধিক জোরে হু হু করিয়া মগজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অবশ অন্যমনস্ক করিয়া তুলিল। কিন্তু বৈকালে সমুদ্র ধারে কিছুতেই সে যাইতে স্বীকৃত হইল না। নিজের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া কল্পনাকে রূঢ়হস্তে ভাঙিয়া ফেলিয়া, ক্ষত-বিক্ষত মনে অন্যদিকে পা বাড়াইল। ভয় ছিল—গেলে পাছে করুণার সহিত দেখা হইয়া যায়।

পরদিন সকাল বেলাটাও সে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করিয়া সিগারেট টানিয়া, হাই তুলিয়া, কাটাইয়া দিল। কিন্তু মনকে অহর্নিশ পীড়িত করিয়া ব্যথা হানিয়া আর পারিয়া উঠিল না। অপরাহ্ণের বহুপূর্ব্বেই বেশ-বিন্যাস করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। দৃঢ়মনে সঙ্কল্প আঁটিল যে, পারতপক্ষে করুণার সহিত বাক্যালাপ করিবে না। নিতান্ত দায়ে পড়িলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথা হইতেও নিজেকে প্রাণপণ বলে সম্বরণ করিয়া লইবে।

অন্যমনস্ক ভাবে পাইচারী করিতে করিতে সে জনতা হইতে একটুখানি দূরে গিয়া পড়িয়াছিল। পিছন হইতে অকস্মাৎ পরিচিত কণ্ঠের মৃদুস্বরে সে চকিত হইয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় ফিরাইল। এ দুইদিন হইতে সে যাহার ভয় করিতেছিল, সম্মুখে সে-ই সশরীরে উপস্থিত। করুণা মৃদু হাসিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। বলিল, ও-বেলা দেখ্‌লুম না যে, কাল বিকেলে এসেছিলেন?

মনসুর গম্ভীর মুখে হাত তুলিয়া নমস্কার গ্রহণ করিয়া জবাব দিল, না। কালও তো আসিনি, আজ সকালেও হয়ে উঠ্‌লো না। শরীরটা একটুখানি ইয়ে—জ্বর-জ্বর ভাব আর কি।

—সত্যি? তাইতে চোক মুখের চেহারা অমনধারা হয়েচে। ওষুদ খাচ্চেন তো?

মুহূর্ত্তে সমস্ত মুখখানি পাণ্ডুর করিয়া মনসুর লজ্জিত দৃষ্টি নিজের দেহের উপর দিয়া ঘুরাইয়া আনিল। এই দুটি দিনের সংযমের আলোড়নে তাহার চেহারায় অনেকখানি পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। করুণার অকৃত্রিম স্নেহ-সহানুভূতির কণ্ঠে মনসুরের প্রতিজ্ঞা দুলিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বলিল, না, তেমন আর ভয় কি। ডাক্তার তো আমি নিজেই, আর তেমন প্রয়োজন হলে প্রেস্‌ক্রিপসান লিখে দিতে আপনিই আছেন। কথাটা অজ্ঞাতসারে বলিয়া ফেলিয়াই সে ভয়ঙ্কর রকমে লজ্জিত হইয়া পড়িল।

করুণা কণ্ঠে প্রচুর দরদ মিশাইয়া বলিল, যান—নিজের শরীরের যত্ন আপনার নেই। এখন কি আপনার অবসর হবে?

মনসুরের ছদ্ম-গাম্ভীর্য্যের মুখোস খসিয়া পড়িতে বিলম্ব হইল না। চকিত হইয়া সদয়কণ্ঠে বলিল, কেন বলুন তো?

করুণা জোর দিয়া প্রশ্ন করিল, হবে কি না তাই বলুন? প্রয়োজন আছে।

মনসুর বুঝিতে পারিয়া মৃদু হাসিল। বলিল, হবে। বেড়াতে যাবেন, চলুন, আপত্তি নেই কিন্তু—

করুণা উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিল, কিন্তু কি, বলুন?

করুণার চার পাঁচটি মেয়ে-বন্ধু অদূরে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। মনসুর তাহা অনেক পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছিল তাই একটু ইতস্ততঃ করিয়া একটু থামিয়া বলিল, কিন্তু আপনার বন্ধুরা যে রয়েচেন।

করুণা দুষ্টামি ভরা হাসিয়া কহিল, ভয় পাচ্ছেন নাকি। আচ্ছা, ওদের বিদায় করে দিচ্চি। আপনি একটুখানি দাঁড়ান।

মনসুর বাধা দিয়া বলিল, সে কী উচিত হবে—না—সে ভারী—করুণা দুই হাতে তাহাকে থামাইয়া দিয়া দীপ্ত ভঙ্গীতে কহিল, অত সৌজন্য আর দেখাতে হবে না, আপনি চুপ করুন তো। বলিয়া কোনো প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

মনসুর এই রহস্যময়ী নারী প্রকৃতিকে কোনোদিন বুঝিবার বা জানিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রদর্শন করে নাই। ইহাদের সম্বন্ধে চিন্তা করাকে সময়ের একটা মস্তবড়ো অপব্যবহার ভাবিয়া, নিজের মনে গড়া একটা যেমন-তেমন থিওরী গড়িয়া, এতকাল সে নির্ব্বাক-নির্লিপ্ত ছিল। আজ সেই নারীর-ই একজনের মুখে তাহার জন্য সহানুভূতির দরদ দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। সে গত দুই বেলা সমুদ্র ধারে আসে নাই, সে জন্য একজন প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়াছিল, ইহা ভাবিতে সে যতখানি বিস্মিত হইল, ঠিক সেই পরিমাণে আনন্দে নাচিয়া উঠিল। এই সহস্র নরনারীর মধ্যে তাহারও সুখ-দুঃখের সন্ধান লইবার মতন একজন মানুষ—বিশেষ করিয়া নারী—সমবেদনায় সমস্ত বক্ষপূর্ণ করিয়া উৎসুক হইয়া থাকে; তাহাহইলে সে নিতান্ত অপদার্থ নয়—একেবারে মূল্যহীনও হইয়া যায় নাই। মনসুর এই কথাটি ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া যতই ভাবিতে লাগিল, তাহার সুনীতি-পূর্ণ নিষ্ঠুর হৃদয় ততই অমৃতে ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থান বাছিয়া তাহারা নীরবে একখানা বড় পাথরের উপরে আসিয়া বসিল। উভয়ের কাহারো মুখে একটা কথা পর্য্যন্ত নাই—যেন সমস্ত শব্দ-মুখের উপর কথার-পারাবার নীরবতার দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়া গিয়াছে। অনন্ত কালের কল্লোলময়ী অতল কালো নীল সাগরের উচ্ছ্বাস-ভরা তরঙ্গের উপরে আবিরের রাঙা ফাগ ছড়াইয়া সূর্য্য অস্তপারের দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছিল। তাহার রক্ত-রশ্মি বালিকণার উপরে দূরের শুভ্র বাড়ীগুলার উপরে—চঞ্চল তরু-পল্লবের উপরে ঝলমল করিয়া জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। করুণা মৌন হইয়া সেইদিকে চাহিয়া পদ্মরাগের মত লীলায়িত আঙ্গুল দিয়া হীরকের কুচির মতন বালুগুলা বাতাসে ছড়াইয়া দিতেছিল। অদূরে ছোটো ছোটো খোকা-খুকীর দল মনের আনন্দে ঝিনুক কুড়াইয়া কুড়াইয়া পকেট ভর্ত্তি করিয়া তুলিতেছিল। অশ্রান্ত তরঙ্গদল বিপুল কৌতুকে পানির পিচকারীতে তাহাদের পদপ্রান্ত জামা কাপড় ভিজাইয়া দিয়া প্রবল করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিতেছিল। মনসুর সহসা তাহার দিকে চাহিয়া চক্ষু আর ফিরাইয়া লইতে পারিল না। অনেকক্ষণ পরে মৃদুকণ্ঠে ডাকিয়া কহিল, চ্যাটার্জ্জি!

করুণা মুখ না ফিরাইয়া মিষ্ট কণ্ঠে কহিল, আজ্ঞা করুন।

—চমৎকার এই সমুদ্র, কবি হলে অনেক কিছু লিখতুম।

—আক্ষেপ করতে হবে না। আপনার বলার ঢের আগে থেকেই যথেষ্ট স্তুতিবাদ নানা কবির কলম দিয়ে হয়ে গেছে।

—সে আমি জানি, তবু মনে হয়, যে-যত করবে ততই এর গৌরব বাড়বে—কিন্তু শেষ হবে না কোনো দিন।

—ঢেউগুলো দুলচে কী অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে দেখেচেন, মানুষের মনটাও কিন্তু এই রকম চঞ্চল অস্থির কি বলেন?

—সম্ভব।

—কিন্তু আমার তো মনে হয় সবাইকার অবস্থা এক রকম নয়।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ কি জানেন; পুরুষরা তাদের মনটা নিয়ে যতখানি গর্ব্ব করে, আদতে ততখানির যোগ্য নয়, কারণ নারীর চেয়ে তাদেরটা অনেক পরিমাণে দুর্ব্বল।

ইহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রত্যুত্তর মনসুরের যুক্তিতে যোগাইল না। মিনিট দুই চুপ করিয়া থাকিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিল, সে আমি জানিনে চ্যাটার্জ্জি, চিরটা কাল পড়ার কেতাব ঘেঁটেই মলুম, আপনাদের মতন অত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করবার অবসর পাইনি, দুর্ভাগ্য আমার।

লজ্জিত করুণা সারা মুখ রক্তবর্ণ করিয়া কহিল, না আমি কি তাই বল্লুম আপনাকে। প্রত্যেকদিন বেড়াতে আসবেন তো বলুন।

মনসুর দুষ্টামি করিয়া বলিল, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে পারলুম না—চেষ্টা কোরবো।

করুণা আপনার দুর্ব্বলতাকে সযত্নে সংবরণ করিয়া লইয়া

বলিল, শুধু চেষ্টা নয়, বলুন, তার ভেতরে প্রাণ দেবেন। কাল বিকেল বেলা আপনাকে কত খুঁজলুম, আজ সকালেও যখন পেলুম না, ভাবলুম কিবা হয়েচে। মনে করেছিলুম— এ বেলা না পেলে আপনার বাসা অবধি ধাওয়া কোর্‌ব।

—পরম সৌভাগ্য, আমার কিন্তু বাসাটা চেনেন তো?

—কাল যে দেখিয়েছিলেন—ভুলে গেচেন?

—কোন তলায় থাকি সে তো আপনি জানেন না। আজ চলুন একদম দেখিয়েই দি গে। এখুনি যাবেন?

—না বাড়ী ফেরবার পথে হবে'খন আপনারও তো তাই ইচ্ছা।

—অগত্যা দেখুন, আপনি গেলে আমার আর একটু সুবিধে হয়।

করুণা তাহার মুখের পানে চোক তুলিয়া মিষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কি?

মনসুর মৃদু হাসিয়া বলিল, তা হলে পড়াশুনা গুলোও ঐ সঙ্গে দেখিয়ে নেওয়া চলবে। এক ঢিলে দু'পাখী কি বলেন?

করুণা সোৎসাহে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, যান্‌—আপনিও ভয়ঙ্কর দুষ্ট।

—অধ্যায় দুই—

বালির পথে চলিতে চলিতে করুণা সহসা মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, আমিতো আপনার ওখানে যাচ্ছি— সন্ধ্যা হয়ে এলো, আমাকে এগিয়ে রেখে আসবেন তো?

মনসুর মৃদু হাসিয়া কৌতুকের স্বরে বলিল, একা পথে যেতে ভয় পাবেন?

করুণা বলিল, ধরুন যদি তাই-ই মেনে নিই।

মনসুর বলিল, অগত্যা আপনার বাড়ীর গেট অবধি যাওয়া যাবে। কথাটা মিথ্যে নয় চ্যাটার্জ্জি দেশটা এখনও অত সভ্য হয়নি যে নিজেদের ঘরের মেয়েগুলো একা একা অবাধে চলাফেরা করবে। আপনি নব্য-তুরস্কের কথা জানেন?

করুণা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হুঁা, কাগজে কিছু কিছু পড়েছিলুম। সত্যি দেখুন—কি ছিল, কটা বছরের মধ্যে কি হয়ে গেল। অসম্ভব পরিবর্ত্তন।

মনসুর বলিল, আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, এই রকমই সম্ভব। কারণ কি জানেন? তারা একেবারে অধঃপতনের চরমে পৌঁছে গ্যাছিলো, আঘাত খেয়ে এই যে ফিরেচে— এই ফেরাটা ভয়ঙ্কর; এখন একটা কিছু অপূর্ব্ব, একটা কিছু অদ্ভুত তারা করবে। আমরা বারবার অমন করে ঘুমিয়ে পড়ি সুক্ষমাত্র নবশক্তি সঞ্চয় করে জেগে উঠ্‌বার জন্যেই না। আচ্ছা আসুন এইটে উপরে ওঠবার সিঁড়ি।

বদ্ধদ্বারের তালা খুলিয়া মনসুর সেই প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দিয়াশলাই জ্বালিল। হ্যারিকেনটা ময়লা বালি এবং চিমনীটা ধূম ও কালিতে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। করুণা বারান্দার রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মনসুর কুণ্ঠিত হইয়া একখানা ক্যাম্বিসের কেদারা দুইহাতে উঁচু করিয়া বাহিরে লইয়া আসিয়া তাহাকে বসিতে অনুরোধ জানাইল।

করুণা লজ্জিত হইয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিল না, না, আলো জ্বালুন।

—সে হচ্চে, আপনি ততক্ষণ বসুন, বলিয়া মনসুর একখানা ন্যাকড়া ও হ্যারিকেনটা তাহার সুমুখে বাহির করিয়া পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেল। করুণা কিন্তু চেয়ার স্পর্শও করিল না; প্রবল আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া মাটির উপরে তাহার সুমুখে উঁচু হইয়া বসিয়া মনসুরের দ্রুত কর্ম্মরত আঙ্গুলগুলার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল এবং আপন মনে আঁচলের খুঁট লইয়া অজ্ঞাতে পাকাইয়া পাকাইয়া ছেলে মানুষের মতন খেলা করিততে লাগিল।

মনসুর আলো জ্বালিয়া তাড়াতাড়ি ষ্টোভের উপরে চায়ের পানি চড়াইয়া দিল। করুণার স্তব্ধ মুখের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, বাঃ আপনি অবাক হয়ে গেলেন যে, ঘরের ভেতরে কি এমন বিশেষ বিশেষ জিনিস আছে যে অমন করে চেয়ে রয়েচেন?

করুণা ঘরের মধ্যে পা দিয়াই ইহার মালিকের অখণ্ড অমনোযোগিতার কথা টের পাইয়াছিল। ডাক্তারি বই, মানুষের হাড়, মাথার খুলি বেতের টেবিলের উপরে যেমন-তেমন ভাবে স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। খাতা, পেন্সিল, দোয়াত কিছুরই স্থিরতা নাই; চায়ের পেয়ালা নির্ব্বাসিত যক্ষের ন্যায় রেকাবী হইতে বহুদূরে থাকিয়া বিরহ রচনা করিতেছে। আল্‌না অভাবে খবরের কাগজের উপরে পেরেক আঁটিয়া খান-কয়েক জামা-কাপড় লটকাইয়া রাখা হইয়াছে। এক কোণে খান ছয়েক ইটের উপরে বেতের

একটা ব্যাগ স্থাপিত—এবং তাহারই অতি সন্নিকটে ছোটো তক্তপোষের উপরে অপটু-হস্তে যেমন তেমন করিয়া শয্যা বিছানো। প্যান, একটা টিনের থালা এবং ঐ ধাতুতেই তৈয়ারি একটা বাটি ও গেলাস অন্য কোণে আপনাদের আসন বাছিয়া লইয়াছে। একটা মেটে কলসীর উপরে আর একটা গেলাস উপুড় করিয়া রাখা। দগ্ধ বিড়ি-সিগারেট এবং দিয়াশলাইএর কাঠি ও খালি বাক্স চারিদিকে ছড়ান। ইহা ছাড়া ঘরে আসবাব-পত্রের বাহুল্য কিছুই নাই, তবু সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা এবং দারিদ্র্য বিরাজমান। করুণা প্রীত হইতে পারিল না। চাহিয়া চাহিয়া তাহার চোখ দুটি ব্যথায়-করুণায় ছলছল করিয়া উঠিতেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস অন্তরের মধ্যে সে নীরবে চাপিয়া লইল। প্রবাস ছাত্র-জীবনের একটা দিক এমন দুর্গতিপূর্ণ ইহা সে ভাবে নাই। অনেক দিনের একটা বদ্ধ ভুল ভাঙিয়া যাইয়া তাহার নিকটে একটা সত্য যেন আজ সজাগ হইয়া উঠিল।

মনসুরের কথার প্রত্যুত্তরে করুণা মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, দেখ্‌ছিলুম ঐ খুলিটা, হাড়গুলো। আচ্ছা, আপনি রবিবাবুর 'কঙ্কাল' গল্পটা পড়েচেন, খুব করুণ। যখনি আমি পড়বার সময় ঐ সব হাড় নিয়ে নাড়া-চাড়া করি তখনি মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে যায়। সত্যি দেখুন, জীবনটা কী! ঐ যে হাড়গুলো, মাথাটা—সব মিলে আপনার-আমার মতনই একটা আস্ত মানুষ ছিল; আনন্দে হাস্‌তো, ব্যথায় কাঁদতো, অপমানে দগ্ধ হোতো, দয়ায়, স্নেহে, প্রেমে, গলে যেতো। তার বুকে ছিল কত সাধ, কত বাসনা, কত সুখ-দুঃখের কাহিনী লুকানো—আহা বেচারী—তাকে নিয়ে ছেলেখেলা করে' আজ আমরা ডাক্তারি শিখ্‌চি। কী নিষ্ঠুর আমরা, একটা শব নিয়ে গল্প করতে করতে হেসে নিঃসঙ্কোচে তার ওপরে ধারালো ছুরি চালনা করি; আমি তার মা—আপনি তার ভাই, আমাদের কারো চোকে তার জন্যে এক ফোঁটা অশ্রু নেই। শাহারা—সকল দয়া-মায়ার অতীত—আমরা পাষাণ। বলিতে বলিতে তার চোক দুটি সজল হইয়া উঠিল।

চা নামাইয়া রাখিয়া মনসুর নির্ব্বাক-স্তব্ধ হইয়া করুণার কথা শুনিতেছিল। সে থামিতেই মোহনভোগ প্রস্তুত করিবার কথা এতক্ষণে স্মরণ হইল। প্রসঙ্গটা আরো অধিক দূর অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য দু একটা কথা বলিয়া দ্রুতহস্তে আয়োজন করিতে লাগিয়া গেল। করুণা ইহা লক্ষ্য করিল, কিন্তু বাধা দিল না।

করুণা অতিবড়ো দুঃখে বলিল, ডাক্তারি বিদ্যেটা টাকা উপার্জ্জনের যত বড়ো পন্থাই হোক—হয়তো উপকারের পুণ্যও মেলে, কিন্তু মনে যেন শান্তি পাওয়া যায় না।

মনসুর মাথা দোলাইয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, সম্ভব।

করুণা নিষ্ঠুরতার ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিল, সম্ভব নয়—সত্যিই। অন্ততঃ আমি তো বঞ্চিত থাকি।

ইহার প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে পাঁউরুটি মোহনভোগ যোগে চা পান শেষ করিয়া করুণা বাড়ী যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। মনসুর বিনীত কণ্ঠে কুণ্ঠাভরে বলিল, মাফ কর্‌বেন। দেখুন, এমন অকস্মাৎ আপনাকে নিয়ে এসেছি—কিছুই হোলো না।

করুণা কৃত্রিম ক্রোধের ভান করিয়া ভ্রূ কোঁচকাইয়া বলিল, যান্, অত সমীহ কর্‌লে কিন্তু আর আস্‌বোনা বলে রাখ্‌চি।

মনসুর তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, সে কি, আস্‌বেন না কেন—বাঃ। আচ্ছা, আর বল্‌বো না। এলে কিন্তু এই-সব রাবিশ গিল্‌তে হবে, সে আপনাকে জানিয়েই দিলুম।

করুণা বলিল, ঢের বিনয় প্রকাশ হয়েছে, নিন চলুন এখন। বলিয়া হিল-তোলা জুতার খট্ খট্ শব্দ করিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়া খানিকটা চাঁদের আলো আসিয়া বিছানার উপরে লুটাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়া মনসুর বলিল, বেশ জ্যোৎস্না, আচ্ছা চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। বলিয়া হ্যারিকেনটা ডান হাতে উঠাইয়া লইল।

করুণা বাহিরের বারান্দায় আসিয়া চাঁদের আলোয় দাঁড়াইয়াছিল। আপত্তি করিয়া বলিল, না-না, হ্যারিকেনটা রেখে দিয়ে আসুন ডাক্তার সাব। এমনি যাওয়া যাবে—কৃত্রিম আলোয় প্রকৃতিকে নষ্ট আর নাই বা কর্‌লেন—দোহাই। বলিয়া দুটি করতল একত্রে সংযুক্ত করিয়া দীন-নয়নে তাহার পানে চাহিল।

মনসুর হাসিয়া আলোর শিখা কম করিয়া একখানা ছড়ি হস্তে বারান্দায় আসিয়া দুয়ারে চাবি বন্ধ করিল এবং সিগা-

রেটে অগ্নি-সংযোগ করিয়া করুণার সহিত রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

জ্যোৎস্নার সুধালয় ক্ষীরধারা নিখিল ভুবনের উপরে শুভ্র সুন্দর যুঁই-কুঁড়ির মতন নীরবে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। স্তব্ধ-প্রকৃতি হারাইয়া-যাওয়া গানের সুরে পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছিল। আজ মাধবী রাতে দিগ্‌বধূরা দিগন্তের কোলে ধূসর আঁচলখানি বিছাইয়া দিয়া অনন্ত-যুগের 'আসি' বলে চলে যাওয়া প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছে। ইহার মাঝখান দিয়া মনসুর এবং করুণা নীরবে পাশাপাশি চলিয়াছে—ঠিক সেই আদিম যুগের আদিম দম্পতির মতো যাত্রা শুরু করিয়াছে—কোথায় গিয়া দূর-পথের বিপুল শান্তি জুড়াইবে? আজ উভয়ে উভয়ের যেন জন্ম-জন্মান্তরের পথের সাথী।

মনসুর বিস্ময়-পুলকে আজ এই মাধবী-রাতের পাত্রভরা আনন্দের কুলছাপা-মদিরা যৌবনের রাঙা-ওষ্ঠে পান করিয়া লইতেছিল। এরূপ কত জ্যোৎস্না-ধবল নিশায় নানা প্রয়োজনে অকারণে সে পথে পা বাড়াইয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া আনন্দের জোয়ার মদের ফেনার মতন কণ্ঠাবধি উছলিয়া উঠিয়া তাহাকে তো বাক্‌হীন করিয়া দেয় নাই। আজ যেন তাহাকে অনন্ত নিশা—অতল সমুদ্র—অন্তহীন পথ—অসীম নীল-আকাশ—অনন্তের পানে নীরবে হাত নাড়িয়া ডাকিতেছে। আজ তার ঘরে ফেরার অবসর নাই; সঙ্গিনীকে সাথে করিয়া পথে পথে এইরূপ করিয়া আজ ঘুরিয়া বেড়াইবে।

একটী লাল বাড়ীর সামনে আসিয়া সহসা তাহাদের চলা ব্যাঘাত পাইল। করুণা বলিয়া উঠিল, এই আমাদের বাড়ী—

—সত্যি? তবে তো পৌঁছে গেছি। আপনি যান, আমি তবে আজকের মতন—

—বেশ মানুষ, আমাকে একলা রেখে পালানো হচ্চে—গেট পর্য্যন্ত অন্ততঃ আসুন। কি এমন তাড়া, শুনি?

—আপনার সঙ্গে আর পেরে উঠ্‌লুম না, চলুন।

—তা হচ্চে না। আসুন, বাবার সঙ্গে একটুখানি দেখা করে যাবেন, নৈলে আমার ওপরে অসন্তুষ্ট হবেন—দাঁড়ান। ছোড়্‌দি—ছোড়্‌দি-ই,—মেনা, এই ছেলে দোরটা খোল্‌তো বাবা।

বাটীর ভিতর হইতে কে একজন স্ত্রীকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, এত রাত যে আজ। অনিলারা তো সন্ধ্যাতেই ফিরেচে—কোথা ছিলি?

করুণা অধীরভাবে রুদ্ধ-দরজায় করাঘাত করিয়া বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, এই নাও, বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জবাবদিহি কর্‌তে হবে নাকি। যাক্‌—তবু যে মনে পড়্‌লো, ভাগ্যিস্—। আসুন, ছোড়্‌দি আলোটা বাড়িয়ে দাও তো ভাই। বসুন, বসুন Kindly, ছোড়্‌দি—কাল যাঁর কথা বলেছিলুম, ইনিই আমার Class Friend মিষ্টার মনসুর আমেদ, ওঁর বাসায় গিয়ে চা-রুটি-মোহনভোগ ধ্বংস করে এলুম। বাবা কোথায় ভাই? ফেরেন নি? বাস্—আচ্ছা তুমি ওঁর সঙ্গে একটুখানি গপ্পো করো, আমি ততক্ষণে আসি। বলিয়া বসন্ত-বাতাসের মতন স্থানটা সচকিত করিয়া করুণা পর্দ্দা সরাইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

ছোড়্‌দি ওরফে অরুণা হাত তুলিয়া তাহাকে নমস্কার জানাইল। বলিল, কাল কুরু আপনার কথা বল্‌ছিলো। বিদেশ-বিভূঁয়ে পরিচিত জনকে পাওয়া কম আনন্দের বিষয় নয়।

মনসুর দক্ষিণ হস্ত অধরে স্পর্শ করিয়া আদাব দিল। সলজ্জ কণ্ঠে বলিল, আমি তো ক'মাস থেকে একেবারে একা একা ছিলুম, এমন সঙ্গিহীন—কথাটি বলবার কেউ ছিল না—ওঁকে পেয়ে অবধি মনে হচ্চে খুব খানিকটা বেঁচে গেলুম।

চা এবং জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিতে করিতে করুণা হাসিমাখা সুরে বলিল, এতে জয় হয়েচে আমাদেরই কি, বলো ছোড়্‌দি? আপনার মতন বন্ধুকে এমন অপ্রত্যাশিত জায়গায় পাওয়া কম সৌভাগ্য নাকি?

মনসুর ঠোট উল্টাইয়া কৃত্রিম উপেক্ষার স্বরে বলিল, ইস্ ভারী তো বন্ধু লাভ, বিষম কাঠখোট্টা, ভয়ঙ্কর বদরসিক!

করুণার মাতা সেই মুহূর্ত্তে ভেলভেটের তৈরি বার্ম্মিজ স্লিপারে ফটর ফটর শব্দ তুলিয়া ঘরে ঢুকিলেন। করুণা হাতের দ্রব্যগুলা টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া মাতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, ইনি আমার মা। আর মা, ইনি হচ্চেন আমার সেই ক্লাস ফ্রেণ্ড।

মনসুর এবং করুণার মাতার মধ্যে আর এক তরফা আদাব এবং নমস্কারের বিনিময় হইয়া গেল। করুণা চা ঢালিয়া পেয়ালাটা তাহার দিকে সরাইয়া দিল। মৃদুস্বরে বলিল, নিন, লজ্জা কর্‌বেন না।

মনসুর মাথা তুলিয়া আপত্তি করিল। বলিল, না দেখুন, চায়ের অভ্যাস আমার তেমন বেশী নেই—তা ছাড়া বাসাতে—

করুণার মাতা বাধা দিয়া বলিলেন, খাও, এক পেয়ালা বেশী খেলে আর তেমন ক্ষতিকর কিছু হবে না।

বিনা প্রতিবাদে মনসুর রুটিতে মাখন মাখাইয়া চায়ের সৎকারে লাগিয়া গেল। বিদায় দিবার সময় করুণা মিষ্ট কণ্ঠে বলিল, আপনার খুব ক্ষতি করে দিলুম, কষ্টও কম পেলেন না। কাল এক সময়ে আস্‌বেন তো?

মনসুর হাসিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। বলিল, চেষ্টা কোর্‌ব। আপনিও যেন ভুলে থাক্‌বেন না। আজ আসি তাহলে—

করুণা বলিল, আসুন; মিছি মিছি আর ট্রাবল দিতে চাইনে।

করুণার মাতা বলিলেন, এসো। ছাখো, লজ্জা-সঙ্কোচ কোরো না। নিজের ঘরের ছেলের মতন যখন ইচ্ছে হবে এসো। করুণা, তোর বন্ধুকে কাল বৈকালে চায়ের নেমন্তন্ন করে দেনা বাপু এসো।

মনসুর ঘাড় দোলাইয়া নীরবে সম্মতি দিয়া বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। করুণা বিদায় দিতে সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিল। করুণা প্রশ্ন করিল, একা এখন যেতে পার্‌বেন?

মনসুর ছদ্ম গাম্ভীর্য্যে বলিল, চলুন না; এলুম দুজনে ফির্‌বো একা—অন্যায়।

করুণা হাসিয়া বলিল, একশোবার। তাহলে কাল বিকেলে আস্‌বেন তো—আমরা আপনার প্রতীক্ষায় থাক্‌বো।

—হাঁ৷ স্বীকার যখন করেচি তখন আস্‌তে হবে বৈকি। আপনি দয়া করে মাঝে মাঝে যাবেন Au revior—Sweet dream—

মনসুর জ্যোৎস্না-ভরা ঝাপ্‌সা মায়ার মধ্যে যেদিক পানে চলিয়া গেল করুণা একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পতিত হইল। মাঠের উচ্চ চূড়াগুলা নীরবে দাঁড়াইয়া ভুবনভরা থমথমে চাঁদের আলোয় ভিজিতেছিল। বালির উপরের ঝিকিমিকি—কচি ঘাসের সবুজ প্রাণের রঙিন কথা—সুমুখের কামিনী ঝাড়ের গন্ধভরা উতল সমীরণ—এই অনন্ত ব্যথাভরা মাধবী-নিশা করুণার উচ্ছ্বসিত পরিপূর্ণ-যৌবনের উপরে মায়ার ছাপ্‌ লাগাইয়া দিয়া কোন্‌ ঘুম-পাড়ানীর দেশে টানিয়া লইয়া গেল, তাহা সে নিজেই জানিতে পারিল না।

মনসুর করুণার নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিশায় পাওয়া মানুষের মতন আনন্দে অধীর হইয়া অসমতালে পা ফেলিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে বিরাট শূন্যতাময় বালির চরের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। সমুদ্রতীরে ছোটো ছোটো ঘূর্ণি-শিশুর দল অধীর আবেগে হাতে তালি দিয়া হাল্কা হাসিয়া লাফাইয়া উঠিতেছিল। বালিকণার উপরে রশ্মিরেখা চমকিয়া ফিরিতেছে; অন্তরের অন্ধ-আবেগ গাছের পাতায় কাঁপন লাগাইয়া—ফুলের প্রাণের মধু চুরি করিয়া, তরুণীর কপোলে রাঙা ঠোঁটের মদিরাভরা তপ্ত-স্পর্শ ছোঁয়াইয়া কোথায়—কোন্‌ ঘুমন্ত রাজকন্যার শিয়রের পাশে ছুটিয়াছে—কে তাহাকে রোধ করিবে। মনসুর নিজের এই দেহ-মনের সম্পূর্ণ নূতন অবস্থা লক্ষ্য করিয়া যেন নিজেই বিস্মিত হইল। নারী—যে-নারীকে সে চিরদিন স-সঙ্কোচে এড়াইয়া আসিয়াছে—তাহাদের-ই একজনের কাছে সে আজ এমন করিয়া পরাজিত হইল, যাহার কথা কাহারও কাছে কোনো দিন প্রকাশ করিলে, শুধু যে তাহার moralist নামে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে তাহা নয়, লোকের সুমুখে তাহার গর্ব্বোদ্ধত এত বড় মাথাটা এক নিমিষে কালী-লিপ্ত হইয়া ধূলার বুকে পরিত্রাণের পথ খুঁজিবে।

আনন্দের আগলভাঙা জোয়ারের ভিতর দিয়া মনসুর যখন ঘরে ফিরিল, তখন রান্না করিয়া আহার করার মত উৎসাহ তাহার চলিয়া গিয়াছিল। একখানা ডাক্তারী মোটা পুস্তক খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিবার চেষ্টা পাইল; কিন্তু এই রসহীন নিষ্ঠুর বাক্যের ঝুরি তাহার মনের সহিত কোনো প্রকারেই আপনার সমতা রক্ষা করিতে পারিল না। মনসুর জোর করিয়া নিজের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিল,

কিন্তু শেষ অবধি তাহাকে হার মানিতে হইল। অগত্যা সশব্দে টেবিলের উপরে সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া খোলা জানালার কাছে চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। ছিন্নমালার ফুলদলের মতো সমস্ত আকাশে তারকার আনন্দ-মহোৎসব। অপূর্ব্ব সুষমামাখা, উচ্ছ্বাসময় জ্যোৎস্না-সমুদ্র—'প্রুসিয়ান ব্লুতে' ছোপান অসীম স্নিগ্ধ আকাশ, দিগন্তরে হারাইয়া-যাওয়া অতল-গভীর সমুদ্র তাহার তরুণ চিত্তকে উদ্বেল করিয়া কাহার কাছে টানিয়া লইয়া গেল, নিজেই সে ভালো করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

মনসুরের এই বাইশ বৎসরের জীবন বিপুল রহস্যভরা। যখন তাহার বয়স ষোলো তখন পিতৃবিয়োগ হয়। সেই সময় হইতে স্বচ্ছন্দতা, সুখ এবং শান্তির সমাধি হইয়াছে। দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্র্য ও অভাবের সহিত প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়া তাহাকে সংসার এবং পড়া চালাইতে হইয়াছে। কেহ সহানুভূতির স্নিগ্ধ-করস্পর্শ বুলাইয়া, সান্ত্বনা দিয়া বেদনার ভার লাঘব করিতে আসে নাই। সংসার বলিতে তাহার সুধু একটি মাত্র মাতা এবং সম্পত্তির মধ্যে ছোটো বড়ো ছয়খানা ঘর, বিঘা কয়েক জমি ছাড়া অন্য কিছুকেই বুঝাইত না।

মনসুর কলিকাতায় একটি অতি জীর্ণ খোলার ঘরের মেসে থাকিত। নিজের পড়া-শুনার ক্ষতি করিয়া একটি সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে প্রুফ-রিডারী করিয়া যাহা পাইত, তাহা দিয়া মেসের ও কলেজের খরচ চালাইত। ইহা হইতে আবার মাসে মাসে কিছু বাঁচাইয়া দেশে মাতাকে না পাঠাইয়াও তাহার কিছুমাত্র পরিত্রাণ ছিল না। দৈন্যের সহিত অহর্নিশ যুদ্ধ করিতে করিতে, তাহার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, লৌকিকতা, বিনয়, বেদনা ইত্যাদি অনুভূতির অনেক পরিমাণে অভাব হইয়াছিল। খোদার দুঃসহ অন্ধ-অভিশাপ এই দারিদ্র্য—অতল-কালো বিরাট মূর্ত্তি ধরিয়া সারা ভুবনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। সুখের দিনগুলি বৈচিত্র্যময়, নানারঙে রঙিন, সোণার মায়া-স্বপনে ভরা, কিন্তু দুঃখ-দারিদ্র্যের একটি কালো রঙের তলায় সমস্তগুলি বর্ণ চাপা পড়িয়া গিয়াছে। গরীবের জন্য বোধ করি সর্ব্বশক্তিমানের অমর লোকেও বিন্দু পরিমাণ সুখ-ভোগের বন্দোবস্ত নাই। বিধাতার এতবড় হৃদয়হীন অবিচারে অজ্ঞাতে মনসুরের বক্ষ হইতে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পতিত হইল।

মনসুর ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া ঘৃণার দৃষ্টি সারা ঘরের মধ্যে দিয়া ঘুরাইয়া আনিল। কী বিশ্রী-কদর্য্য এই ক্ষুদ্র ঘরখানি করুণা ইহারই মধ্যে আজ সন্ধ্যায় আসিয়া কতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া এই শ্রীহীনতা দেখিয়া মনে মনে ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া গিয়াছে। তাহাদের বাড়ীতেও তো সে গিয়াছিল; সেখান হইতে যাহা দেখিয়া আসিয়াছে, তাহা যেন এই সময়ে তাহাকে চাবুক কষিতে লাগিল। করুণা ইহা লক্ষ্য করিয়াই বোধ করি অমন জোর করিয়া টানিয়া তাহাদের বাড়ীতে লইয়া গেল। উদ্দেশ্য, নিজেদের ধনের পরিমাণ, সৌন্দর্য্যের রুচি তাহাকে পরোক্ষে দেখাইয়া দেওয়া। তাহার এই কদর্য্য দুষ্টামি, কুৎসিৎ অভিপ্রায়—আর যাহার কাছেই গোপন থাকুক—মনসুরের নিকট অজ্ঞাত রহিল না।

ক্রমশঃ

আরব জাতির সামরিক বিধান

মজিবর রহমান বি, এ,

বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার বিপুল জলস্রোত যেমন বহু ধন-জন-পূর্ণ সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ও নগর লতাগুল্ম সুশোভিত শস্য-শ্যামল ভূভাগ কিংবা মরুময় বিশাল প্রান্তর যাহাই সম্মুখে পায় ভাসাইয়া লইয়া যায়, কিন্তু স্রোতের প্রথম বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিলে প্লাবিত ভূখণ্ডের উর্ব্বরতা সাধনে তৎপর হয়, এবং সেই জলস্রোত অপসারিত হইলে উহার অশেষ প্রকারে কল্যাণ সাধন হয়, তেমনি আরব জাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই মরুর সন্তান নব-দীক্ষিত আরববাসিগণ নব-বলে বলিয়ান হইয়া যখন আরবের সীমা অতিক্রম করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহ আক্রমণ করিল, তখন পারশ্য ও রোমের (Byzantine Empire) বিপুল বাহিনী আরব সৈন্যের সম্মুখে কোথায় ভাসিয়া গেল। খৃষ্টীয় ৬২৪ অব্দে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মুষ্টিমেয় মদিনা বাসীর সঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য বদরের যুদ্ধে মক্কাবাসিগণের সম্মুখীন হন, আর খৃষ্টীয় ৭১২ অব্দে "পূর্ব্বে সিন্ধু হিন্দু দেশ পশ্চিমে ইস্পাহানী শেষ" পর্য্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য আরব জাতির করতলগত হয়। যেমন আরব সেনাপতিগণ রাজ্য-বিস্তারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তেমনই আরব রাজনৈতিকগণ—খলিফা ওমর, সোয়াবিয়া, আবদুল মালিক ও হিছাম প্রভৃতি খলিফাগণ রাজ্যের শাসন সংস্কার বিষয়েও তৎপর ছিলেন। উম্মীয়া বংশীয় খলিফাগণের শাসনকালে আরব সভ্যতার সূত্রপাত হয়, আব্বাস বংশীয় খলিফাগণের শাসনকালে তাহার পূর্ণ বিকাশ হয়। রোম (Byzantine) ও পারশ্যবাসীদের সংস্পর্শে আসিয়া আরববাসিগণের চির-প্রচলিত স্বাতন্ত্র্য ভাঙ্গিয়া গেল। গ্রীসের আইনতত্ত্ব ও যুদ্ধবিদ্যা এবং পারশ্যের সাহিত্য সঙ্গীত শিল্প প্রভৃতি বহু-মুখীন প্রতিভা আরব জাতিকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিল। (১) তাই আমরা দেখিতে পাই আরববাসিগণ যেমনই উত্তরোত্তর পার্শ্ববর্ত্তী জাতিগণের সংস্পর্শে আসিতে আরম্ভ করিল, তেমনই রাজ্য বিস্তৃতির লিপ্সা ত্যাগ করিয়া সভ্যতা বৃদ্ধির জন্য মনোনিবেশ করিল।

আরব জাতির ইতিহাস আলোচনা কালে একটি বিষয় আমাদিগকে বিশেষ আকৃষ্ট করে যে, আরব জাতি অনন্ত কাল হইতে প্রথম হিজরীর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আত্মকলহ ও সাম্প্রদায়িক যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। কিন্তু হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর ধর্ম্ম প্রচারের কাল হইতে তাহারা যখনই এবং যেখানেই—কি আফ্রিকার অনন্ত বালুকাময় প্রান্তরে, কি স্পেনে, এশিয়া মাইনার ও মধ্য এশিয়ার পার্ব্বত্য-অঞ্চলে, কি ইউফ্রেটিশ ও সিন্ধুনদের তটভূমে কিম্বা উত্তালতরঙ্গ-ক্ষুব্ধ বিশাল ভূমধ্য সাগরে, তাহারা যুদ্ধ পতাকা উড্ডীন করিয়াছে, সেখানেই তাহাদের সুনিশ্চিত ও সম্পূর্ণ বিজয় হইয়াছে। তাই জনৈক জার্ম্মাণ ঐতিহাসিক আরব জাতির সভ্যতা আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন "As long as the rude and simple sons of desert remained uncorrupted by foreign influence whenever and wherever the banners of Islam was unfurled its victory was complete and sure" কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য। কিন্তু এই যুদ্ধ জয়ের কারণ কি ?

আমরা প্রথমে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে কি কি কারণ আরব জাতির যুদ্ধ বিজয়ের অনুকূল হইয়াছিল এবং কি কি উপাদান তাহাদিগকে যুদ্ধকালে সাহায্য করিয়াছিল।

প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, যদিও আরব জাতি কোন কালে কোনও জাতির অধীন হয় নাই এবং কোন নেতার সম্মুখে মস্তক নত করে নাই, তবুও তাহারা যুদ্ধে অনভ্যস্ত ছিল না। তাহাদের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়—যে তাহারা জগৎবাসীর সম্মুখে আবির্ভাবের কাল হইতেই আত্মকলহ ও সাম্প্রদায়িক যুদ্ধে লিপ্ত থাকিত। বিশেষ করিয়া উত্তর আরব ও মদিনাবাসি-

(১) Prof. Hell's Arab Civilization P P 80.

গণকে বেদুইনদের অকস্মাৎ আক্রমণের জন্য সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতে হইত এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রাচীর-বেষ্টিত নগরে বাস করিত। এই জন্য তাহারা "বর্ম্মাচ্ছাদিত ও দুর্গ সংরক্ষিত জাতি" বলিয়া ইতিহাসে আখ্যায়িত হইয়াছে (১)। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর জন্মের অল্পকাল পূর্ব্বে উত্তর আরব দুইটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। উত্তর পশ্চিমাংশে ঘাশান রাজবংশীয় রাজাদের রাজ্য এবং উত্তর পূর্ব্বাংশে হিরা রাজ্য ছিল। ঐ দুইটি রাজ্য বহু দিন হইতে রোম এবং পারস্য সাম্রাজ্যের যুদ্ধ-বিগ্রহে যোগদান করিয়া উক্ত রাজাদ্বয়ের যুদ্ধনীতি আয়ত্ত করিয়াছিল। তাই আমরা ওহোদ ও খন্দকের যুদ্ধে পারস্যে প্রচলিত পরিখার প্রচলন দেখিতে পাই। আরব জাতির যুদ্ধবিদ্যা আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা ইহার (পরিখা) বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারিব। তাই আরববাসিগণ (Central Arabia) নির্দ্দিষ্ট সেনা নায়কের অধীন হইয়া কোন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিলেও, যুদ্ধ কৌশলে তাহারা অনভিজ্ঞ ছিল না।

এখন আমরা দেখিব এই বিশৃঙ্খল একতা-বিহীন জাতির মধ্যে ইসলামের দান কি ছিল। ইসলাম প্রচারের পূর্ব্বে সমগ্র আরববাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। কিন্তু হজরৎ মোহাম্মদ (দঃ) সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া সমগ্র আরববাসিকে একই ধর্ম্মের অধীন আনিয়া ভ্রাতৃত্বের শৃঙ্খলে বন্ধন করিলেন এবং পবিত্র নামাজের প্রচলন করিয়া চির-বন্ধনহীন বেদুইন জাতিকে একই 'এমামে'র অধীনে আনিয়া আরব জাতির মধ্যে একতার সৃষ্টি করিলেন। হজরৎ মোহাম্মদ (দঃ) যে আরবজাতির জন্য কি কি করিয়াছেন তাহা কোন মুসলমান পাঠকের অবিদিত নাই। সেই জন্য এস্থলে তাহার বিস্তৃত বিবরণ না দিয়া সামান্য কথায় বলিতে চাই যে, প্রথম নামাজের প্রচলন করিয়া তিনি আরবে একটি নূতন জাতির সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাদের মধ্যে সাম্য, মৈত্রি, একতা, বাধ্যশীলতা ও সুশৃঙ্খলতা স্থাপন করিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার পক্ষপাতী অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে "নামাজে আবার কি উপকার আছে,—ইহা একটা সামান্য ব্যায়াম বই আর কিছুই নয়।" কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে এই নামাজের মধ্যে অনেক কিছু শিক্ষা করিবার আছে। এই নামাজের মধ্যেই ইসলামের যে বিপুল শক্তি নিহিত ছিল ও আছে, তাহা আজ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। জার্ম্মাণ ঐতিহাসিক প্রফেসার 'হেল'এর নিম্নলিখিত মন্তব্যটি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। "Whoever has seen the Muslem assembled at prayer in rows, with astounding uniformity, order and dignity will not fail to recognise the educative value of this discipliniary prayer ....and we will recognise the importance of this form of prayer in awakening and maintaining a discipline. For this reason to be sure the prayer ground has justly been described as the first drill-ground of Islam. (২)

জার্ম্মাণ ঐতিহাসিক Von Kremer'ও সেইরূপে মত প্রকাশ করিয়াছেন "In the unquestioned and unbending discipline andin the unconditional obedience which Mohamed received from his followers lay the greatest acthievement of the Prophet and the secret of the strength of Islam. In the five daily prayers where the leader (the Imam) stands in front of the congregation who are ranged behind him in compact array, and where every movement of the leader is imitated with military prici-sion we have what is now known as the drill-ground, a school where the people assembled moved en-masse and learnt to obey the Commander, (৩) যুদ্ধে যোগদান করিবার পূর্ব্বে আরবজাতির জন্য বিশেষ কোন মিলিটারি ট্রেণিং স্কুল বা কলেজের প্রয়োজন হয় নাই; এই পাঁচ ওক্ত নামাজের মধ্যেই আরবজাতি যুদ্ধের ট্রেণিং পাইয়াছিল।

আরব জাতির মধ্যে প্রথম হইতে আরও কতকগুলি গুণ পরিলক্ষিত হইত। যুদ্ধে ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, একতা প্রভৃতি কয়েকটি গুণ তাহাদের মধ্যে

---

* (১) People of citadel and coats of mail Hell. Arab civilization P P 26.

(২) Hell Arab civilization p p 17-18.

(৩) Von kromer, geschichte der herrch. Ideeu p p 331. Translated by Khuda Bakhs in Orient under the Calipts p p 12-13

বিদ্যমান ছিল এবং এই সব গুণ থাকার জন্য তাহারা সকল দেশে সকল ঋতুতে পূর্ণ উদ্যমে ও অদম্য উৎসাহে শত্রুর সম্মুখীন হইতে পারিত। (১)

উপযুক্ত সেনানায়কের আবির্ভাব

ইস্‌লামের ইতিহাসের প্রথম হইতে দেখিতে পাওয়া যায় বদরের যুদ্ধের পর সেই নব-দীক্ষিত মুষ্টিমেয় মদিনাবাসীর উপর যেমনই ক্রমেক্রমে বিপদের পর বিপদরাশি ঘনাইয়া আসিল, তেমনই সেই বিপদরাশি দূরীকরণের জন্য ক্রমেক্রমে তাহাদের মধ্যে উপযুক্ত যোদ্ধা এবং সেনানায়কেরও আবির্ভাব হইল। বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে মল্ল যুদ্ধে যখন দেহ-শক্তির প্রয়োজন হইল, তখন হজরৎ আলী ও আমির হামজা বিপুল শক্তি ও সাহস সহকারে মক্কাবাসিদের পরাজয় সাধন করিলেন। আবার যখন পার্শ্ববর্ত্তী দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইল, তখন মহাবীর খালেদ-বিন্-ওলিদ্, আমর-বিন্ আস, আবু ওবাইদা, সোহার-বিল, উত্তর আফ্রিকা বিজয়ী বীর ওক্‌বা এবং স্পেন বিজয়ী মহাবীর তারেক ও মূসার আবির্ভাব হইল। এই সব উপযুক্ত সেনানায়কের জন্যই আরব জাতি এত অল্পকাল মধ্যে এই সুবৃহৎ রাজ্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন।

ইস্‌লামের ইতিহাসের অধিকাংশ যুদ্ধই জিহাদ বা ধর্ম্ম-যুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইত। এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে ইহ-জগতের সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পর-জীবনে স্বর্গের অনন্ত সুখের অধিকারী হওয়া যায়। এই আশায় যোদ্ধাগণ মৃত্যুকে অবজ্ঞা করিয়া যুদ্ধ করিত।

আরব ও আফ্রিকার মরুভূমি এবং সেই মরুর সন্তান উষ্ট্র যুদ্ধের সময় আরবজাতির বিশেষ সহায় হইত। যুদ্ধে ছত্রভঙ্গ হইলে আরব সৈনিকগণ মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শত্রুপক্ষের অগোচরে সেই স্থানে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পুনরায় নূতন উদ্যমে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে শত্রুকে আক্রমণ করিত। কিন্তু পারশ্য কিম্বা রোমান সৈন্যগণ মরুভূমির যুদ্ধে কোনদিনই অভ্যস্ত ছিল না। (২)

আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি যে, উষ্ট্র মরুভূমির জাহাজ। বাস্তবিকই কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য। সৈন্য, সৈন্যের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী এবং যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণ প্রেরণের জন্য সমুদ্রে যেমন জাহাজের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ মরুভূমির মধ্যে উষ্ট্রেরও প্রয়োজন হইত। রোম বা পারশ্য সাম্রাজ্যে এই সব দ্রব্যসামগ্রী প্রেরণের জন্য যেমন অশ্ব, খচ্চর, গর্দ্দভ ও গোযানের প্রয়োজন হইত, আরবে সেই সব কার্য্য উষ্ট্রের দ্বারা সাধিত হইত। কিন্তু আরবের উত্তরস্থিত প্রদেশে অশ্ব, গর্দ্দভ ও গোযানেরও প্রচলন ছিল। বিশেষ করিয়া মরুভূমির মধ্যে সৈন্য প্রেরণের জন্য উষ্ট্র নিরাপদ জনক ছিল। তাই জার্ম্মাণ ঐতিহাসিক Von kremer আরবজাতির যুদ্ধ-পদ্ধতি আলোচনা প্রসঙ্গে উষ্ট্রের উপকারিতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "I do not at all exaggerate in holding that the Arabs secured most of their victories by the help of the camels. These patient animals conquired Syria and Egypt for them.........it won indeed the victories of Islam" (৩).

আরবজাতি কেবল দেশ জয় করিয়াই ক্ষান্ত ছিল না। এই বিজিত দেশ সমূহের শাসন সংস্কার এবং অন্তর-বিদ্রোহ কিংবা বৈদেশিক আক্রমণ হইতে এসব দেশ রক্ষা করিবার জন্য স্থানে স্থানে দুর্গ ও সেনা নিবাস (military station) স্থাপন করিতেন। বিশেষ করিয়া মিসর, সিরিয়া ও মেসোপোটামিয়ায় প্রভৃতি স্থানে সেনা নিবাস নির্ম্মাণ করা হয়। ইহার বিস্তৃত বিবরণ এই অধ্যায়ের শেষাংশে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। (৪)

রোম ও পারশ্য সাম্রাজ্যের দুর্ব্বলতা

যখন এই সব উপকরণ আরব জাতির রাজ্য বিস্তারের অনুকূল হইয়া তাহাদিগকে নববলে বলীয়ান্ করে, সেই উত্তেজনায় সৈন্যদল নূতন নূতন দেশে প্রেরণ করিতেছিল, তখন পার্শ্ববর্ত্তী রোম ও পারশ্য সাম্রাজ্য অন্তর্বিদ্রোহে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল! নিপীড়িত ও অত্যাচারিত প্রজাবৃন্দ যথেচ্ছাচারী প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তাদের করালকবল হইতে মুক্তি পাইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মের

(১) Orient under the Calipths. p p 106-7 (২) Orient under the Colipts p. 106.

(৩) V. kremer's Cultur geschichte des. orient translated by Khuda Bakhs in Orient under the Caliphs. p p. 333. (৪) Hell's Arad Civilization. p p. 42.

সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। পৃথিবীতে যদি কোন জাতি দেশীয় শাসনকর্ত্তা দ্বারা নিপীড়িত হইয়া বৈদেশিক শাসনের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, তবে এই দুই জাতি তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। তাই আরবজাতির ইতিহাস লেখক সৈয়দ আমীর আলী সাহেব মুসলমানদের মিসর বিজয় প্রসঙ্গে লিখেছেন—They (the Egyptians) hailed him (Amir) as a deliverer, and not as a conqueror. (১)

যে সব কারণ ও উপাদান আরব জাতির দেশ-বিজয়ের অনুকূল হইয়াছিল এ পর্য্যন্ত তাহারই আলোচনা করিলাম। এখন আমরা দেখিব যখন আরব জাতি পৃথিবী বিজয়ে বহির্গত হইয়া পারশ্য ও রোম সৈন্যের সম্মুখীন হয়, তখন তাহাদের যুদ্ধ-পদ্ধতি কিরূপ ছিল এবং কালক্রমে দেশ ও সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের যুদ্ধ-পদ্ধতিরই কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

সেনাপতি ও তাহার কর্ত্তব্য

ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরব সম্প্রদায় বা দলের মধ্যে একজন করিয়া নায়ক থাকিত এবং তাহাদের আত্মকলহ বা সাম্প্রদায়িক যুদ্ধে সে নায়কই তাহাদিগকে চালনা করিত। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যে কয়েকটি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্বয়ং সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর প্রথম খলিফা আবুবকর (রাঃ) স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গমন না করিয়া বিভিন্ন প্রদেশের বিরুদ্ধে পৃথক্ পৃথক্ সেনা-নায়ক প্রেরণ করিলেন। প্রথমে খালেদ বিন্ ওলিদ ও মোছানাকে পারশ্যের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু পরে খালেদকে সেই দেশ হইতে সিরিয়ায় প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহার স্থানে সঈদ বিন্ আক্কাসকে নিযুক্ত করিয়া পূর্ব্ব সীমান্তের যুদ্ধে প্রেরণ করেন। সিরিয়ায় এ সময় ৪ জন মুসলমান সেনানায়ককে বিভিন্ন দিক হইতে ইয়ারমুক যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। এ যাবৎ খালেদই প্রধান সেনাপতি-পদে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু ধর্ম্ম ভীরু ওমর খালেদের নিষ্ঠুরতাকে কিছুতেই পছন্দ করিতেন না। তাই উক্ত ৪ জন সেনানায়কের মধ্যে আবু ওবাইদাকে প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিয়া অবশিষ্ট তিন জন সেনা-নায়ক ও খালেদকে তাঁহার অধীনস্থ সেনা-নায়ক পদে নিযুক্ত করিলেন।

ইহা হইতে আমরা পরিষ্কার ভাবে জানিতে পারি যে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম হইতেই দুই প্রকার সেনা নায়কের প্রচলন ছিল যথাঃ—

(১) প্রধান সেনাপতি (General with unlimited power)

(২) অধীনস্থ সেনা-নায়ক (General with limited power) (২)

প্রধান সেনাপতির কর্ত্তব্য

যখনই কোন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের প্রয়োজন হইত তখনই তিনি অধীনস্থ সেনা-নায়কগণকে ডাকিয়া সৈন্যগণকে প্রস্তুত হইতে আদেশ দিয়া এবং যুদ্ধ ঘোষণা করিতেন। প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ স্থগিত রাখিতেন ও সময় মত শত্রুপক্ষের সঙ্গে সন্ধি করিতেন। লুণ্ঠিত দ্রব্যের ⅘ অংশ সৈন্যগণের মধ্যে বিতরণ করিতেন, অবশিষ্ট ⅕ অংশ 'বাইতুল মালে' (Central treasury) প্রেরণ করিতেন, যুদ্ধ কালে সৈন্যগণকে সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিতে হইত। যুদ্ধ-ক্ষেত্রের ভারবাহী পশুগণের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইত; প্রয়োজন হইলে অধীনস্থ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিতেন এবং সৈন্যগণরে মধ্যে কোন অবিশ্বাসী লোক কিম্বা গুপ্তচর আছে কিনা তাহার সন্ধান লইতে হইত। তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল বিধর্ম্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা এবং যে পর্য্যন্ত তাহারা বশ্যতা স্বীকার না করিত কিম্বা ধার্য্য মত কর না দিত সে পর্য্যন্ত তাহাদের বিরুদ্ধে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইত। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি নামাজ কালে এমামতি করিতেন।

অধীন সেনাপতিগণের কর্ত্তব্য

অধীনস্থ সেনাপতিগণ আপন আপন সৈন্যের সঙ্গে

(১) Thus from all points of view the rise of Islam occurred at a very favourable time—Islamic civilization p p, 237. Vol. T. Khuda Bakhs.

(২) Mawardi p 59. Amir Ali P. 88. Hell's Arab civilization p. 40.
Khuda Bakhs, History of the Islamic people p. 60 Kremer p. 277,

থাকিয়া যুদ্ধাভিমুখে সৈন্য চালনা করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের পার্শ্বে থাকিয়া সৈন্যগণের গতিবিধি ও কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। সন্ধি করিবার তাহার কোনই ক্ষমতা ছিল না। (১২)

সৈন্যগণের জাতীয় বিভাগ

হজরৎ মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার জীবনে যতগুলি যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আমরা দুই শ্রেণীর সৈন্য দেখিতে পাই যথা "মুহাজিরিন" এবং "আনসার"। হজরৎ মোহাম্মদের (দঃ) সঙ্গে যে সব মক্কাবাসী হেজরৎ করিয়া মদিনায় গিয়াছিলেন তাঁহাগিদকে "মুহাজিরিন" বলা হয় এবং যে সকল ইহুদি ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন তাঁহাদিগকে "আনসার" নামে অভিহিত করা হয়।

হজরৎ আবুবকর (রাঃ) সিরিয়া বিজয়ের জন্য যে সব সৈন্য প্রেরণ করেন তাহার মধ্যে 'আনসার' ও 'মুহাজিরিন্' সৈন্যের ভাগই বেশী ছিল। আমর-বিন্-আস এই সব সম্প্রদায়ের সৈন্য লইয়া প্রথমে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন কিন্তু পরে উত্তর আরবস্থিত বেদুইন সম্প্রদায় যথা 'বানী' 'উদ্রা' 'কেদ' সম্প্রদায়ের লোকগণ তাঁহার সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হয়। ইয়ারমুকের যুদ্ধক্ষেত্রে বেতনভোগী সৈন্যের সংখ্যা ৪৬০০০ সহস্র ছিল এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবক সৈন্য প্রায় ২৫০০০ সহস্র ছিল। প্রথম খলিফাদের শাসন কালে তিন শ্রেণীর সৈন্য দৃষ্ট হয়—

(১) ইমেনাইট (Yamanite)

(২) মোধারাইট (Modharite)

(৩) স্বেচ্ছাসেবক।

উম্মীয়া রাজবংশের শাসনকালে কেবল আরববাসিগণের মধ্যে হইতেই সৈন্য সংগ্রহ করা হইত এবং প্রত্যেক আরব বাসীর যুদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। (১৩)

আব্বাস্ বংশীয় খলিফাগণের শাসনকালে যুদ্ধ-পদ্ধতিতে অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। এ পর্য্যন্ত কেবল আরববাসীদের জন্যই যুদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু আব্বাস বংশের দ্বিতীয় খলিফা মনসুর খোরাসানী সৈন্যকে তাঁহার দেহরক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন, এবং খলিফা মুতাজিম ফারগানবাসী সৈন্যগণকে তাঁহার সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করেন (১৪)। ইহারাই ইসলামের ইতিহাসে Turkish Body Guard নামে অভিহিত।

বাগদাদের ব্যবসায়ীগণ উত্তর আফ্রিকা হইতে বার্ব্বার জাতি এবং সুদান ও আবিসিনিয়া হইতে নিগ্রোগণকে দাসরূপে বাগদাদ শহরে বিক্রয় করিবার জন্য আমদানী করিতে আরম্ভ করে। উত্তর আফ্রিকাবাসী বার্ব্বারগণ ইতিহাসে মাগরিবি নামে অভিহিত। ইহাদের, দেহ সৌন্দর্য্যের জন্য, বাগদাদে বিশেষ খ্যাতি ছিল। একারণ তাহারা খলিফাদের দেহরক্ষকরূপে নিযুক্ত হয় (১৫)। আব্বাস বংশীয় খলিফাদের শাসনকালে আমরা পাঁচ সম্প্রদায়ের সৈন্য দেখিতে পাই যথা :—

(১) উত্তর আরবীয় সৈন্য (Modharites)।

(২) দক্ষিণ আরবীয় সৈন্য (Yamanites)।

(৩) খোরাসানী সৈন্য।

(৪) ফারগানী সৈন্য।

(৫) মাগরিবি বা আফ্রিকান সৈন্য।

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যের বিভাগ ব্যাপারে (division of the army in actual operation) প্রথম হইতেই আরব সৈন্যকে যুদ্ধক্ষেত্রে ৫ ভাগে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) অগ্রগামী সৈন্য (Vanguard)

(২) পশ্চাৎবর্ত্তী সৈন্য (Rear Guard)

(৩) দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সৈন্য (Right flank)

(৪) বাম পার্শ্বস্থ সৈন্য (Left flank)

(৫) মধ্যবর্ত্তী সৈন্য (Centre)

প্রত্যেক বিভাগের সৈন্যই দুই কিংবা তিন লাইনে সজ্জিত হইত, এবং মধ্যস্থলে সেনাপতি থাকিতেন। এই প্রকার সৈন্য বিভাগ রোমানদের মধ্যেও প্রচলিত। বোধ হয় আরবীয়গণ এইরূপ সৈন্য বিভাগ রোমানদের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছিল। উম্মীয়া বংশের শেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের শাসনকালে উক্ত সৈন্য বিভাগে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। যাবের যুদ্ধে উম্মীয়া বংশের সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাইনে বিভক্ত ছিল। (১৬) উম্মীয়া

(১) Mawardi pp. 59, (২) Amir Ali p. 191,
(৩) Ibn Khaldun Vol. V. 462—63, (৪) Orient under the Caliphs p. 341.
(৫) Ibn Khaldun Vol III 165, 195.

বংশের সেনাপতি সাহিব আর্জ্জাদিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করেন তাহাতে তাঁহার সৈন্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

(১) দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সৈন্য তিন লাইনে সজ্জিত।

(২) বাম পার্শ্বস্থ সৈন্য তিন লাইনে সজ্জিত।

(৩) তিনি (সেনাপতি) স্বয়ং মধ্যস্থান।

বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বের সৈন্যের প্রথম লাইনে তরবারীধারী—দ্বিতীয় লাইনে বর্শা বা বল্লমধারী তৃতীয় লাইনে ধনুর্ধরগণ ছিল।

হিজরীর ষষ্ঠ শতাব্দীতে স্পেনে অন্য এক প্রকার যুদ্ধপদ্ধতির প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। (১) প্রথমতঃ পদাতিক সৈন্যগণ একটি দীর্ঘ বর্শা মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া এক হস্তে ঢাল ও অন্য হস্তে একটি ক্ষুদ্র বর্শা লইয়া এক জানু নত করিয়া প্রথম লাইন গ্রহণ করিত। (২) প্রথম লাইনের পরে ধনুর্ধরগণ দাঁড়াইত, (৩) তাহাদের পশ্চাতে অশ্বারোহিগণ দাঁড়াইত, এমতাবস্থায় যুদ্ধকালে নত-জানু প্রথম-লাইন, দাঁড়াইতে কিংবা যুদ্ধে ছত্রভঙ্গ দিতে পারিত না। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে প্রথম লাইন বর্শা দ্বারা, দ্বিতীয় লাইন ধনুক দ্বারা, এবং তৃতীয় লাইন দীর্ঘ বর্শা দ্বারা শত্রুকে আক্রমণ করিত। (১)

সেনাপতির পদ অনুসারে সৈন্যগণের বিভাগ

ইব্‌নে খল্লদুনের ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে রোমানদের অনুকরণে প্রতি ১৫ জন সৈন্যের উপর একজন নেতা ছিল তাহার উপাধি 'আরিফ' (Decurion) প্রতি ৫০ জন সৈন্যের উপর একজন নায়ক থাকিত তাহার উপাধি 'খলিফা—' এবং প্রতি একশতের উপর একজন 'কায়েদ' থাকিত। (২)

কিন্তু মাসুদির ইতিহাসে আমরা বিভিন্ন প্রকারের সৈন্য বিভাগ দেখিতে পাই। তিনি বলেন প্রতি ১০ জনের উপর একজন আরিফ, প্রতি ১০০ শতের উপর একজন 'নকিব' প্রতি ১০ জন নকিব বা ১০০০ সৈন্যের উপর একজন কায়েদ এবং প্রতি ১০ জন কায়েদের উপর একজন "আমির" ছিল। (৩) ইব্‌নে খল্লদুন হইতে মাসুদির ইতিহাস বেশী বিশ্বাসযোগ্য। কেন না মাসুদি আব্বাস বংশীয় খলিফাদের শাসনকালের ঐতিহাসিক আর ইব্‌নে খল্লদুন চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক ও তাইমুরলঙ্গের সম-সাময়িক। অনেক ঐতিহাসিক বলেন, আরব জাতির যুদ্ধপদ্ধতি ও সৈন্যবিভাগ রোমান সৈন্যের ছাঁচেই গঠিত হইয়াছিল। নিম্নে আমরা একটি রোমান সৈন্য-গঠনের তালিকা দিলাম; তাহা দেখিলে পাঠক জানিতে পারিবেন যে, আরবীয় সৈন্যবিভাগ কতদূর রোমান সৈন্যের ছাঁচে গঠিত। কিন্তু ইহাতে জ্ঞাত থাকে যে, রোমানদের সংস্পর্শে না আসা পর্য্যন্ত আরবীয় সৈন্যের এরূপ বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

রোমা সেনা-নায়কদের সর্ব্ব নিম্ন কর্ম্মচারীর উপাধি 'ডিমার্কস্' (Demark) তাহার অধীনে ১০ জন সৈন্য থাকিত। ইহার উপরস্থ কর্ম্মচারীর নাম 'হেফ্‌টন টার্ক' ইহার অধীনে ১০০ জন সৈন্য থাকিত, প্রতি ২০০ দুশত সৈন্যের উপর একজন 'ট্রিবিউন' থাকিত, প্রতি ১০০০ এক সহস্র সৈন্যের উপর একজন 'কিলিয়ার্ক' প্রতি ৫০০০ পাঁচ সহস্র সৈন্যের উপর একজন 'টুরমার্ক' এবং প্রতি ১০০০০ দশ সহস্র সৈন্যের উপর একজন প্যাট্রিসিয়ান থাকিত।

	সৈন্য		সৈন্য
আরিফ	১০	ডিমার্ক	১০
নকিব	১০০	হেকটান টার্ক	১০০
		ট্রিবিউন	২০০
কায়েদ	১০০০	কিলমার্ক	১০০০
		টুরমার্ক	৫০০০
আমির	১০০০০	প্যাট্রিসিয়ান	১০০০০

রোমান ও আরবীয় সৈন্যবিভাগে সামান্য মাত্র প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই তালিকাদৃষ্টে পাঠক জানিতে পারিবেন যে, আরবীয় সৈন্যবিভাগ রোমানদের ছাঁচে গঠিত হইয়াছিল। (৪) [ক্রমশঃ]

---

(১) Oman's History of the Art of warfares p. 211. Orient under the Caliphs. p. 335.
(২) Ibn Khaldun III p. 299. (৩) Masudi VI 452.
(৪) Ibn Khaldun III 299. Leo's Tactica Chap. IV.
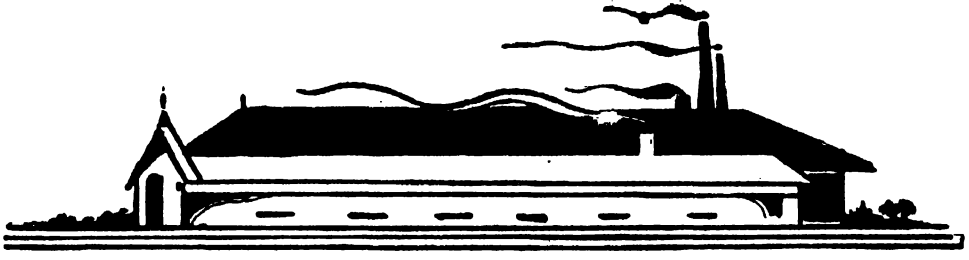
আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম

রিজাউল করিম বি, এ

যে বৎসর আমেরিকা কলম্বস কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়া ইউরোপের অপরাপর শক্তির নিকট আপনার অফুরন্ত ধন-ভাণ্ডার অনাবৃত করিয়া ধরিল, সেই বৎসর হইতেই ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের মধ্যে এপেলোর আপেল ফলের মত, আমেরিকা-রূপ আপেল ফল লাভের জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। স্পেনের উদ্যোগে আমেরিকা প্রথম আবিষ্কৃত হয়, সেই জন্য স্পেনই প্রথমে উহাতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া রত্নধনাদি লুণ্ঠন করিতে থাকে। স্পেনের এই অপ্রত্যাশিত লাভ দেখিয়া ইউরোপের প্রত্যেক জাতির লোভ হইল। তাঁহারাও বাণিজ্যের ভান করিয়া লুণ্ঠন অভিপ্রায়ে দলেদলে আমেরিকা আগমন করিতে লাগিলেন। এই সকল জাতির মধ্যে চতুর-চূড়ামণি ইংরাজ সকলকে অতিক্রম করিয়া আমেরিকায় আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। তৎকালীন ইংলণ্ডেশ্বর আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনের জন্য পুনঃপুনঃ জাহাজ প্রেরণ করিতে লাগিলেন প্রথম প্রথম ইংরাজগণ কোনই ফল লাভ করিতে পারেন নাই। তবুও ইংলণ্ডের বীরপুরুষগণ আমেরিকার ব্যবসায়-বাণিজ্য একচেটিয়া করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। এইরূপে নানাজনের নানা চেষ্টার পর, বহু ব্যক্তির বহু প্রাণ বিসর্জ্জনের পর ধীরে ধীরে আমেরিকায় ব্রিটীশ উপনিবেশ গড়িয়া উঠিল।

ইংলণ্ডে ধর্ম্ম-বিপ্লবের প্রচণ্ড অনলে যখন সহস্র সহস্র নিরপরাধ ব্যক্তি ধর্ম্মান্তর গ্রহণে অসম্মত হইয়া আপন ধর্ম্মে অচলা ভক্তি-প্রযুক্ত প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল, সেই সময় জীবন্ত দগ্ধ হইবার ভয়ে, আত্মরক্ষার্থ বহুলোক জন্মভূমির মায়া-মমতা চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়া বহু দূর দেশে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। এই পলাতক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে পিউরিটান নামক সম্প্রদায় সকলের অগ্রণী। ইংলণ্ডে অত্যাচারের মাত্রা চরম সীমায় উপনীত হইলে, অনেক পিউরিটান নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় পলায়ন করিয়া তথায় নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিয়া উহাদের দেখাদেখি ইংলণ্ডের

আমেরিকার আবিষ্কর্ত্তা কলম্বাসের সর্ব্বপ্রথম আমেরিকায় পদার্পণ

অপরাপর নিগৃহীত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রাণরক্ষার্থ দলেদলে আমেরিকায় আগমন করিতে লাগিল। এই সমুদয় নিগৃহীত ধর্ম্মসম্প্রদায় চিরকালের জন্যই স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়াছিল। এক্ষণে আপনাদের বাসোপযোগী করিয়া তথায় বসবাস আরম্ভ করিল। তাহাদের চেষ্টায় আমেরিকার সর্ব্বত্র উপনিবেশ স্থাপিত হইল। বহু অনাবিষ্কৃত অনুর্ব্বর ও বন-জঙ্গলময় দেশ সুসভ্য অধিবাসী ও ধনৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অতঃপর ১৭৫১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দেখা গেল যে আমেরিকায় ইংরাজদের সর্ব্বসমেত তেরটি প্রদেশ গঠিত হইয়াছে। এই নবগঠিত প্রদেশগুলিতে নবাগত ইংরাজগণ বসবাস আরম্ভ করিলেন। এখানকার ইংরাজ-অধিবাসিগণ ইংলণ্ডের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা স্বাধীনভাবে দেশ-শাসন করিতে লাগিলেন। নবাগত ঔপনিবেশিকগণ ইংলণ্ডের সকল আইন গ্রহণ করিলেন না। তাঁহারা আপনাদের সুবিধামত আইন প্রস্তুত করিয়া তদনুসারে দেশ-শাসন করিতে লাগিলেন। আপনাদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য দেশের নানাস্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। রাজ্যসংক্রান্ত আরও নানা বিষয়ে প্রভূত উন্নতি-সাধন করিয়া দেশের সমৃদ্ধি ও শ্রী বহুগুণে বর্দ্ধিত করিলেন। তাঁহারা এই সকল কার্য্যে ইংলণ্ডের এক কপর্দ্দক সাহায্যও গ্রহণ করেন নাই। এইরূপে আপন চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশে, নির্ব্বাসিত ইংরাজগণ কয়েক বৎসর ধরিয়া স্বাধীনভাবে বাস করিয়া সুখ-শান্তি উপভোগ করিতেছিলেন। নবগঠিত তেরটি প্রদেশের অধিবাসিগণ প্রত্যেক প্রদেশের জন্য এক-এক জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, উপনিবেশের পত্তনের সময় হইতেই তথায় স্বায়ত্ত-শাসনের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। ঔপনিবেশিকগণের চেষ্টায় তাহা পত্র-পল্লবে বিকশিত হইয়া পূর্ণ শতদলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। প্রাণ-রক্ষার্থ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া তাহারা বিদেশে গিয়া একটা বিরাট রাজ্য স্থাপন করিবে, ইহা ইংলণ্ডের রাজপুরুষগণ প্রথমেই ভাবিতে পারেন নাই। তাঁহারা ঔপনিবেশিকগণের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই, তাঁহাদের দৃষ্টির অন্তরালে নির্ব্বাসিত ইংরাজগণ ধীরে ধীরে শক্তিশালী হইয়া উঠিল।

এইরূপে নবাগত ঔপনিবেশিকগণ কয়েক বৎসরের মধ্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিল। ইহাদের এবম্প্রকার অসম্ভব ও কল্পনাতীত উন্নতি দেখিয়া ইংলণ্ড-বাসীদের মনে লোভ ও হিংসার উদয় হইল। কিরূপে তাহাদের সুখভোগের অংশভাগী হইব, কিরূপে তাহাদের সঞ্চিত ধনরাশির অংশ লইয়া আপনাদের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিব, এক্ষণে ইহাই তাঁহাদের চিন্তার বিষয় হইল। আমেরিকাকে করায়ত্তে আনিবার জন্য ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট যুক্তি খাটাইলেন, আমেরিকায় অবস্থিত ইংরাজগণ প্রকৃত প্রস্তাবে ইংলণ্ডের অধিবাসী। সুতরাং তাহাদিগকে ইংলণ্ডের আইন-কানুন মানিয়া চলিতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া কূটনীতি-বিশারদ ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট আমেরিকানদের পবিত্র স্বাধীনতা কলুষিত করিবার জন্য আপনাদের মঙ্গল-হস্ত প্রসারিত করিলেন।

আমেরিকার ইংরাজ অধিবাসিগণ আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া মনে করিত। তাহারা ইংলণ্ডের অধিবাসিগণকে বিদেশী বলিয়া ধরিয়া লইল। সুতরাং বিদেশীর শাসন মান্য করিতে কিছুতেই সম্মত হইল না। বিদেশীয় রাজপুরুষ তাহার আইন-কানুন প্রস্তুতকরিবে, বিদেশী তাহাকে যদৃচ্ছা পরিচালিত করিবে, বিদেশী তাহার ব্যবসায়-বাণিজ্য আপন আয়ত্তে আনয়ন করিবে, একবার যে জাতি স্বাধীনতার রসাস্বাদন করিয়াছে, সে কি ইহা সহ্য

ইংলণ্ড হইতে বিতাড়িত পিউরিটানগণ আমেরিকা যাত্রা উপলক্ষে আত্মীয় স্বজনদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।

করিতে পারে! ইংরাজদের ন্যায় আমেরিকানরাও যুক্তি প্রয়োগ করিতে শিখিয়াছিল। তাহারা ভাবিল, আমরা আমাদের জীবন বিপদাপন্ন করিয়া বহু চেষ্টায় যে-দেশ স্বীয় আয়ত্তে আনিয়াছি তাহাতে ইংলণ্ডের হস্তক্ষেপ করিবার কোনই অধিকার নাই, আমাদের দেশে ইংরাজ হস্তক্ষেপ করিতে গেলে আমরা শুনিব না! এইরূপে আমেরিকাও ইংরাজদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইল। ইংরাজদের কুটিল নীতির ফলে আমেরিকায় অশান্তির আগুন প্রধূমিত হইতে লাগিল।

২

১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে কস্‌বে নামক এক ব্যক্তি, ইংলণ্ড হইতে আমেরিকার নিউইয়র্কের শাসনকর্ত্তা মনোনীত হইয়া আসেন। অপর কেহ নহে স্বয়ং সম্রাট তাঁহাকে নিয়োগ-পত্র প্রদান করিয়াছেন, এই অহঙ্কারে মত্ত হইয়া তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে লাগিলেন। শাসনকর্ত্তা হওয়া অবধি তাঁহার সঙ্কল্প হইল, সর্ব্বপ্রকারে আমেরিকাকে ইংলণ্ডের কঠোর বাহুপাশে আবদ্ধ রাখিতে হইবে। এই সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য তিনি নানারূপ অন্যায় অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। আমেরিকাবাসীর অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবামাত্র তাহারা ভয়ানক কুপিত হইয়া তাঁহার কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করিল। পিটার জেঙ্গার নামক জনৈক তেজস্বী সম্পাদক উক্ত গবর্ণরের কার্য্যের নিন্দাবাদ প্রচার করিয়া একটি তীব্র প্রবন্ধ লিখিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি কস্‌বের অভিপ্রায় ও অত্যাচারের কথা প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করিয়া দেশবাসীকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। শাসনকর্ত্তা কস্‌বে ইহাতে ভয়ানক কুপিত হইয়া জেঙ্গারকে ধৃত ও বন্দী করিয়া বিনা-বিচারে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। এবং সেখানে তাঁহার উপর কঠোর ব্যবহার করিবার আদেশ দিলেন। তাঁহাকে কোনরূপ খবরের কাগজ পড়িতে দেওয়া হইল না, পত্রাদি লিখিবার জন্য কাগজ কালি পাইবার অধিকার পর্য্যন্ত অপহরণ করা হইল। তাঁহার প্রতি এইরূপ অন্যায়, অসঙ্গত ও অমানুষিক ব্যবহার করাতে সমগ্র দেশে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। হেবিয়াজ্ কর্পাস্ আইন অনুসারে দেশবাসী তাঁহার মুক্তি চাহিল। কর্ত্তৃপক্ষ প্রথম প্রথম মুক্তি সম্বন্ধে কোন কথাই কহিলেন না, কিন্তু পরিশেষে এত অসম্ভব জামিনে মুক্তি দিতে চাহিলেন যে, কেহই এত অধিক টাকার জামিন লইতে পারিল না। সুতরাং তিনি কারাগারেই পচিতে লাগিলেন। অবশেষে বিলাতের সুপ্রীম কোর্টে তাঁহার বিচার হইল, ইহাতে তিনি মুক্তি পাইলেন। মুক্তি পাইবামাত্র দেশের লোক তাঁহাকে মহাসমারোহে বরণ করিয়া লইল, তিনি দেশবাসীর ভক্তি-ভালবাসার পাত্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রতি অবিচার করিয়া তাঁহাকে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে, দেশের স্বাধীনতায় অন্যায় ভাবে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লোপের সম্ভাবনা হইয়াছে—এইরূপ নানা বিষয় চিন্তা করিয়া দেশের লোক ভয়ানক বিচলিত হইয়া উঠিল। দেশের সর্ব্বত্র উত্তেজনার তরঙ্গ বহিতে লাগিল।

বোষ্টন-হত্যার দৃশ্য। একটী প্রাচীন চিত্র হইতে।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিলে মানুষের ধৈর্য্য স্থির থাকিতে পারে না। সংবাদপত্র দেশের মধ্যে উচ্চভাব ও উচ্চ আশা প্রচার করিবার প্রধান মুখ-পত্র স্বরূপ। কেহ দেশের প্রতি অত্যাচার করিলে, সংবাদ পত্রের সাহায্যে তাহার প্রতিকার করা হয়। দেশের শাসন-পদ্ধতির মধ্যে দোষ ত্রুটি প্রবেশ করিলে সংবাদপত্রে আন্দোলন দ্বারা তাহা অনেকটা সংশোধিত হইয়া থাকে। জাতীয় জীবনের পক্ষে যাহা এতখানি প্রয়োজনীয় সেই সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা কতটা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

আমেরিকার স্বাধীন অধিবাসীদিগের উপর ইংরাজ এই প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিল! কর্ত্তৃপুরুষগণ মনে করিয়াছিলেন, ঔপনিবেশিকগণ উহার প্রতিকার স্বরূপ কিছুই করিতে পারিবে না, তজ্জন্য তাঁহারা তাহাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিবার অবসর পান নাই। কিন্তু সামান্য সামান্য অত্যাচার একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া ভীষণাকার ধারণ পূর্ব্বক অবশেষে সমগ্র ইংলণ্ডকে জর্জ্জরীভূত করিয়াছিল!

এইরূপে ইংরাজ ও আমেরিকানদের মধ্যে, সামান্য খুঁটি-নাটি বিষয় লইয়া দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের মধ্যে কিছুকাল অতিবাহিত হইল। দিন যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, আমেরিকানদের সহিত ইংরাজদের মধ্যে মনোমালিন্য ততই পাকিয়া উঠিতে লাগিল। ইত্যবসরে ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যে এক ভীষণ

পরাজিত ইংরাজ সেনাপতি জেনারেল কর্ণওয়ালিশ জর্জ্জ ওয়াশিংটনের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছেন।

যুদ্ধ বাধিয়া গেল। যুদ্ধের প্রকোপ ইউরোপেই সীমাবদ্ধ রহিল না, তাহার এক প্রচণ্ড শিখা আমেরিকায় পতিত হইয়া, তথাকার নব্য ঔপনিবেশিকগণকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিল। স্বজাতি বলিয়াই হউক, অথবা আমেরিকার উপর আপনাদের অধিকার সাব্যস্ত করিবার ছলেই হউক, এই যুদ্ধে ইংরাজগণ আমেরিকাবাসিগণকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিল, বহু সৈন্য ও রণ-সম্ভার প্রেরণ করিয়াছিল। অবশেষে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহের পর ফরাসী ও ইংরাজগণের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। এই যুদ্ধে আমেরিকানরা যে অসীম সাহস, অপূর্ব্ব রণপাণ্ডিত্য দেখাইয়াছিল, তাহাতে ইংরাজেরা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। ইংরাজেরা আমেরিকানদের প্রকৃতশক্তি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল এবং ইহাও বুঝিয়াছিল যে, আবশ্যক হইলে উহারা ঐরূপ দৃঢ়হস্তে যুদ্ধ করিবেএবং উহাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র দমন করিতে না পারিলে আমেরিকা চিরতরে ইংলণ্ডের হস্তচ্যুত হইয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহারা এইবার হইতে আমেরিকার শক্তি নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ধীরে নানারূপ বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক আমেরিকা-বাসীর দগ্ধহৃদয়ে নুনের ছিটা দিতে লাগিলেন!

৩

যখন কোন জাতির জীবনে মরণের পদধ্বনি বাজিতে থাকে, সেই সময় মধ্যে মধ্যে বিধাতা এমন বিচিত্র উপায়ে সেই জাতিকে উদ্ধার করিয়া দেন যে, তাহার বিষয় মানুষ কল্পনায়ও আনিতে পারে না। আমেরিকাবাসীর উপর ইংরাজগণ অত্যাচার ও বিভীষিকার শাসন প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময় তাহাদের সৌভাগ্যবশতঃ বেন্‌জামিন ফ্রাঙ্কলিন নামক এক মহানুভব পুরুষের আবির্ভাব হয়। তিনি অত্যদ্ভুত উপায়ে আমেরিকার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জীবনে নানারূপ দুঃখ কষ্টের মধ্যে পতিত হইয়া, উত্থান-পতনের নানারূপ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের আবর্ত্তে তিনি বহুবিষয়ে পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া এক্ষণে দুর্ভাগ্যের সময় আমেরিকা-বাসীর ভাগ্যাকাশে পূর্ণচন্দ্ররূপে প্রভা বিস্তার করিতে লাগিলেন। আমেরিকার আভ্যন্তরিণ প্রত্যেক বিষয়ে যদি ইংরাজ সতত হস্তক্ষেপ করে, তাহা হইলে আমেরিকার ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইবে—এই কথা তিনি ঔপনিবেশিকদের বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি তাহাদিগকে লইয়া একটি বিরাট সঙ্ঘ প্রস্তুত করিলেন। দেশের মধ্যে একতা, সদ্ভাব, সম্প্রীতির ভাব বিস্তার করিবার চেষ্টায় তিনি বহু পুস্তক প্রণয়ন করিলেন। তিনি একখানি উচ্চাঙ্গের সাময়িক পত্র প্রকাশ করিলেন—তাহার মূল মন্ত্র হইল, "মিলন বা মৃত্যু"। মহাত্মা বেন্‌জামিনের আপ্রাণ চেষ্টায় আমেরিকাবাসিগণ পরস্পর হিংসাবিদ্বেষ বিস্মৃত হইয়া একত্র সম্মিলিত হইয়া আপনাদিগকে এরূপভাবে প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন যে, তাহার প্রভাবের নিকট প্রবল

পরাক্রান্ত ইংরাজের প্রচণ্ড গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া গেল। জাতি আপন স্বাধীনতা রক্ষার জন্ম প্রস্তুত হইলে এইরূপ ভাবেই সকল শক্তিকেই বিচূর্ণ করিতে পারে।

মহাত্মা বেনজামিন প্রাণপণে স্বদেশ উদ্ধার ব্রতে লাগিয়া গেলেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় আমেরিকাবাসী দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া স্বদেশের মর্য্যাদা ও স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্ম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। ঔপনিবেশিকগণকে এইরূপ একত্র ও দলবদ্ধ হইতে দেখিয়া ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপুরুষ-

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল জর্জ্জ ওয়াসিংটন সর্ব্বপ্রথম আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি মনোনীত হন।

গণ বিবেচনা করিলেন, এই উপযুক্ত সময়! এই সময় উহাদিগকে দমন না করিলে উহারা ভয়ানক একটা কার্য্য করিয়া বসিবে, তাহার পরিণামে হয়ত আমেরিকা আমাদের হস্তচ্যুত হইয়া পড়িবে। এই সময় ইংলণ্ডের মন্ত্রণাসভার নেতৃত্ব করিতেছিলেন কুটিল-মতি গ্রেনভাইল! গ্রেনভাইল একজন সাম্রাজ্যবাদী দুর্দ্ধর্ষ মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার মনে খেয়াল চাপিয়া গেল যে, যে-কোন উপায়ে হউক আমেরিকায় ইংলণ্ডের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে! তিনি ইংলণ্ডবাসীকে বুঝাইলেন যে, আমেরিকায় ষ্টাম্প আইন (Stamp act) প্রবর্ত্তিত করিলেই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তদনুসারে ১৭৬৫ খৃঃ ষ্টাম্প আইন প্রবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে গৃহীত হইল। পার্লামেণ্ট স্থির করিলেন, মামলা-মোকদ্দমা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং বিবাহের কাগজ পত্রাদিতে আমেরিকাবাসীদিগকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ষ্টাম্প ব্যবহার করিতে হইবে, নতুবা ঐ সমুদয় কার্য্য আইন অনুসারে স্বীকৃত বা গ্রাহ্য হইবে না। ষ্টাম্প আইন প্রবর্ত্তিত করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইবামাত্র আমেরিকাবাসীরা উহার তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করিল। তাহারা প্রধান মন্ত্রীকে জানাইল যে, ফরাসীর সহিত যুদ্ধে তাহারা ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহারা তজ্জন্য ঘর-বাড়ী বন্ধক দিয়াছে, বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছে, এমন কি ভিক্ষা করিয়া যুদ্ধের খরচ যোগাইয়াছে। এইরূপে একেত তাহারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে. ইহার উপর আবার নূতন করিয়া কর চাপাইলে তাহাদের অস্থি চূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু অভাব-পীড়িত ঔপনিবেশকগণের করুণ আর্ত্তনাদে গ্রেনভাইলের পাষাণ হৃদয় একটুও গলিল না। তিনি কঠোর আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন, নবেম্বর মাসের প্রথম হইতেই ষ্টাম্প আইন প্রবর্ত্তিত হইবে, এ বিষয়ে কাহারও কোনও বাধা টিকিবে না। তাঁহার এই দাম্ভিকতাময় কঠোর আদেশে সমগ্র আমেরিকাবাসী ক্ষেপিয়া উঠিল—এতদিনের ধূম্রায়মান অগ্নি যেন এক ফুৎকারে ভীষণাকারে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল!

(ক্রমশঃ)
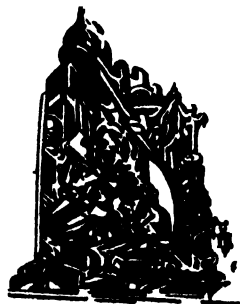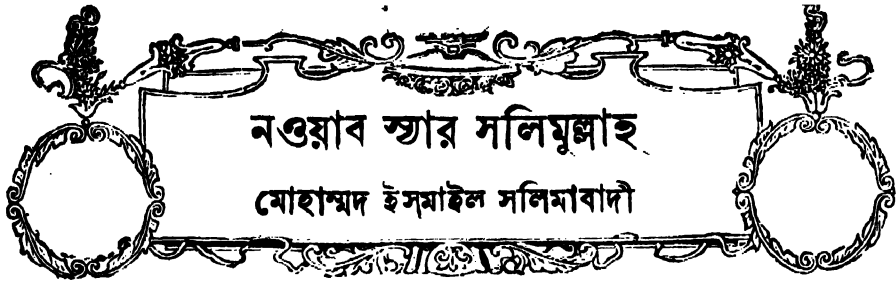
বাঙ্গলার মুকুট-মণি, ভারতের কৃতি-সন্তান ও স্বজাতি প্রেমিক নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ্ বাহাদুরের নাম ভারতে সর্ব্বজন-বিদিত। ভারতীয় মোসলেম-সমাজের স্বার্থরক্ষায় ও সর্ব্ববিধ উন্নতি-সাধনে তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা জাতির অভ্যুত্থানের ইতিহাসে চিরকাল উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

নওয়াব বাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষগণ কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম খাজা আবদুল্লাহ্ দিল্লীর সম্রাট্ মোহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে অদৃষ্ট পরীক্ষার নিমিত্ত বঙ্গদেশে আগমন করিয়া শ্রীহট্টে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইহার পুত্র খাজা হাফিজুল্লাহ্ ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। কিছুকাল পরে খাজা হাফিজুল্লাহ্র পুত্র খাজা আলিমুল্লাহ্ ব্যবসায় বিস্তৃতির দরুণ শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়া ঢাকায় আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন এবং ঢাকা, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় বহু জমিদারী ক্রয় করিয়া অত্যল্প কালের মধ্যেই বঙ্গের একজন বিখ্যাত জমিদার বলিয়া পরিগণিত হন।

ইঁহারই ঔরসে বিখ্যাত দানশীল নওয়াব খাজা আবদুল গণি ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই তারিখে (বাঙ্গলা ১২২০ সালে) ঢাকা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি স্বীয় প্রতিভাবলে জীবনে বিপুল ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ইঁহার সময় হইতেই এই বংশের খ্যাতি ও কীর্ত্তি-কথা ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়ে। বদান্যতা ও হিতৈষণা গুণে ইনি জগদ্ব্যাপী সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। দান ব্যাপারে ইঁহার নিকট জাতি, বর্ণ ও দেশ বলিয়া কোন কথা ছিল না। আফগানিস্তান, পারস্য, তুরস্ক হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর ইটালী, বুলগেরিয়া, জার্ম্মাণী, আয়র্লণ্ড প্রভৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের বিপন্ন পরিবারবর্গ পর্য্যন্ত তাঁহার দানের ফলভোগী হইয়াছিল। অদ্যাবধি বাঙ্গলার অনেক নর-নারী দান-বীর 'গণি মিঞার' নাম সভক্তি স্মরণ করিয়া থাকে। দানশীলতার গুণে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিনি নানা উপাধিতে ভূষিত হন এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে উত্তরাধিকার সূত্রে নওয়াব উপাধি লাভ করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট (বাঙ্গলা ১৩০৩ সালে) এই আদর্শ দাতা নওয়াব সাহেব পরলোক গমন করেন।

ইঁহার লোকান্তর গমনের পর তদীয় গুণসম্পন্ন পুত্র খাজা আহ্সানুল্লাহ্ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ইনিও পৈত্রিক সম্পত্তির সহিত পিতৃগুণাবলীর সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়াছিলেন। দানশীলতা ও লোক হিতৈষণায় পিতা অপেক্ষা ইনি কোন অংশে কম ছিলেন না। ইঁহারই সুযোগ্য পুত্র নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ্ বাহাদুর।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখে ঢাকার নওয়াব প্রাসাদে ইঁহার জন্ম হয়। গৃহশিক্ষকের নিকট ইনি ফারসী, উর্দ্দু ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন। সরকারী বিদ্যালয়েও কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু উচ্চশিক্ষা লাভ করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খাজা হাফিজুল্লাহ্ অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। ইনি পিতার অতিশয় স্নেহের আধার ছিলেন। এজন্য পুত্র-শোকে নওয়াব আহ্সানুল্লাহ্কে অশেষ মানসিক ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই সময় নওয়াব সলিমুল্লাহ্ই বিরাট জমিদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারী বলিয়া গণ্য হন। কিন্তু কোন বিষয়ে পিতার সহিত তাঁহার মতানৈক্য ঘটায় তিনি পিতার বিরাগভাজন হন এবং ক্ষুন্ন মনে তিনি পিতৃভবন পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে অবস্থান করিতে থাকেন।

ইহার কিছুকাল পরে তিনি ঢাকার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ জন্সনের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হন। ফলে

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদপ্রাপ্ত হইয়া ময়মনসিংহে কর্ম্মস্থলে গমন করেন এবং তথায় কিছুকাল কার্য্য করার পর মোজফ্‌ফরপুরে স্থানান্তরিত হন। কিন্তু চাকরী জীবন তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি এখানে দুই বৎসর মাত্র কার্য্য করিয়া পদত্যাগ করেন এবং অচিরেই ঢাকায় প্রত্যাবৃত্ত হন। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় তখনও তিনি পিতার সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইলেন না। ফলে অর্থা-ভাবে কতক দিন তাঁহাকে নিতান্ত শোচনীয় অবস্থায় জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল। অতঃপর ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে তিনি পিতার বিশাল জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন।

নওয়াব সলিমুল্লাহ্‌ উক্ত জমিদারীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া অপরিসীম কার্য্যদক্ষতা ও অসাধারণ প্রতিভাবলে অচিরেই জমিদারীর অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন এবং অতুলনীয় লোক-হিতৈষণা ও ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে অল্পকালের মধ্যেই ভারতব্যাপী সুনাম অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন। এই সময় হইতেই তাঁহার স্মরণীয় নামের বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি পুরুষানুক্রমে 'নওয়াব বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দিল্লীর অভিষেক দরবারে (Coronation Darbar) বড়লাট লর্ড কার্জ্জন কর্ত্তৃক তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া কে, সি, আই, ই উপাধি লাভ করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জন যখন ঢাকায় আগমন করেন, সেই সময় ঢাকায় যে সমস্ত সভা-সমিতি হইয়াছিল, ইনিই তৎসমুদয়ের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।

যখন হিন্দু সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া দেশের সর্ব্বত্র নূতন চিন্তা-ধারা প্রবাহিত করিতেছিল এবং নববলে বলীয়ান হইয়া নিজেদের সর্ব্ববিধ অভাব পূরণ করিতেছিল; সেই সময়ে মুসলমান সমাজে কোন রাজ-নৈতিক প্রতিষ্ঠান না থাকায়, মুসলমানগণ নিতান্ত অসুবিধা ভোগ করিতেছিল। এই অভাব দূরীকরণার্থ তিনি মাননীয় আগা খাঁ, নওয়াব ভিখারুল-মুল্‌ক্‌ প্রভৃতি প্রধান ব্যক্তিগণের সহযোগিতায় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে "নিখিল ভারত মোসলেম লীগের" (All India Moslem League) প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং নওয়াব বাহাদুরকে ঐ লীগের জনক বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

যাহাতে ভারতীয় মোস্‌লেম সমাজের স্বার্থ রাজদরবারে সুরক্ষিত হয়, তাহার চেষ্টায় লীগের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত হয়। ইহার পর মিণ্টোমর্লী শাসনকাল হইতে ভারতীয় মুসলমানগণ উচ্চ রাজপদ লাভের অধিকার প্রাপ্ত হন।

মিঃ সৈয়দ হোসেন বেলগ্রামী ষ্টেট্‌ সেক্রেটারীর সভার এবং জাষ্টিস সৈয়দ আমীর আলী প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন। ঐ সমস্ত উর্দ্ধতন রাজপদ প্রাপ্তির একমাত্র কারণ মোসলেম লীগ না হইলেও উহার পশ্চাতে যে লীগের অদম্য প্রচেষ্টা বিদ্যমান ছিল, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।

এই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন শক্তিধর পুরুষ কেবল রাজনৈতিক আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না; অধিকন্তু মুসলমান সমাজে যাহাতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার হয়, সেদিকেও তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রধানতঃ তাঁহারই প্রচেষ্টায় ও উদ্যোগে "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মোসলেম শিক্ষা সমিতির" (East Bengal and Assam Provincial Mohammedan Educational Conference) প্রতিষ্ঠা হয় এবং ঐ বৎসরেই এপ্রিল মাসে ঢাকা নগরীতে উক্ত সমিতির যে অধিবেশন হয়, তিনি তাহার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভাপতিরূপে শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই তাহা আজিও বিস্মৃত হইতে পারে নাই।

ইহার একমাস পরেই ঢাকা নগরীতে মাননীয় জাষ্টিস সৈয়দ শরফ্‌উদ্দীন সাহেবের সভাপতিত্বে "নিখিল ভারত মোস্‌লেম শিক্ষা সমিতির" (All India Mohammedan Educational Conference) বিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই সভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন আলোচ্য নওয়াব সলিমুল্লাহ্‌ বাহাদুর। "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম মুসলমান শিক্ষা সমিতি" স্থাপিত হইলে ঢাকা নগরীতে প্রাদেশিক ও ভারতীয় পরপর দুইটী শিক্ষা সমিতির অধিবেশন হওয়ায় শিক্ষার দিক দিয়া বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে এক অভিনব উৎসাহ, উদ্যম ও জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়—মৃতকল্প জাতির প্রাণে এক নব আশার উন্মেষ হয়। তখন হইতে নওয়াব সলিমুল্লাহ্‌ পূর্ব্ববঙ্গ মুসলমান সমাজের উন্নতিকল্পে ঢাকা নগরীতে একটী মোস্‌লেম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের

বিশেষ প্রয়াস পাইতেছিলেন। কিন্তু পরিশেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিপক্ষতার দরুণ সে উদ্দেশ্য তখন সফল হয় নাই।

নওয়াব বাহাদুরের লোক-হিতৈষণার তুলনা নাই। তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে দরিদ্র এতিমগণের শিক্ষার নিমিত্ত ঢাকা নগরীতে একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। উহা এখন "স্যার সলিমুল্লাহ্ এতিমখানা" নামে পরিচিত। উহার স্থিতি ও উন্নতিকল্পে তিনি কিছু সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে যে কেবল তাহাদের জ্ঞান-শিক্ষারই সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে এমন নহে; পরন্তু যাহাতে অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে প্রত্যেকেই স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয়, তাহারও সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর অভিষেক দরবারে নওয়াব সলিমুল্লাহ্ জি, সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত হন।

ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের সহানুভূতি পাইয়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দে গ্রীস, বুলগেরিয়া ও সার্ব্বিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধে তুরস্ক যারপরনাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তুরস্কের এই দুর্দ্দিনে নওয়াব বাহাদুর "রেড ক্রেসেণ্ট ফণ্ডে" (Red Crescent Fund) তিন সহস্র টাকা দান করেন। অতঃপর তাঁহারই উদ্যোগে উক্ত ফণ্ডে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়া তুরস্কে প্রেরিত হয়। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (Bengal Legislative Council) সদস্য মনোনীত হন। ব্যবস্থাপক সভায় জাতির হিতার্থে তিনি অনেক কাজ করেন।

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করিয়া শামসুল ওলামা মওলানা আবু নসর ওয়াহিদ ছাহেব শিক্ষা সম্বন্ধে এক নূতন শিক্ষাপদ্ধতির পরিকল্পনা করেন। তাহার ফলে দেশের সর্ব্বত্র বহুল পরিমাণে আজ জুনিয়ার ও হাই মাদ্রাসার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা শামসুল ওলামা ছাহেবের গভীর জ্ঞান ও মস্তিষ্ক পরিচালনার ফল হইলেও, ইহার সৃষ্টির মূলে নওয়ার সলিমুল্লাহ্ সাহেবের চিন্তাধারাও যে অনেকটা সহায়তা করিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

নওয়াব বাহাদুরের প্রত্যেক কার্য্যই মহৎ প্রকৃতির পরিচায়ক। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকা নগরীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মোস্‌লেম লীগের এক অধিবেশন হয়; এই অধিবেশন উপলক্ষে তাঁহার প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। তাঁহার সৌজন্য, উদারতা ও অমায়িক আচরণে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সমাজের কাজ করিতে যাইয়া কোন দিন তিনি ব্যক্তিগত সুখ-শান্তি ও স্বার্থের প্রতি দৃকপাত করেন নাই—এমনই ছিল তাঁহার উদার হৃদয়! এমনই ছিল তাঁহার স্বজাতিপ্রীতি!

নওয়াব সাহেব বহু জন-হিতকর অনুষ্ঠানের উন্নতিকল্পে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকার চৌধাড়ী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন। আলীগড় কলেজের সাহায্যকল্পেও পাঁচ হাজার টাকা দান করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু অসহায় দরিদ্র ছাত্রকে আর্থিক সাহায্য করিয়া দানশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

দীন-দরিদ্রের প্রতি তাঁহার করুণার অন্ত ছিল না। যদি কোন উপায়হীন প্রজা, পরিবারবর্গ প্রতিপালনে অক্ষম হইয়া তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইত, তাহা হইলে তাহাকে যথোচিত সাহায্য করিতেন। এমন কি এজন্য তিনি একটী ভিন্ন ধনভাণ্ডার গঠন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বহু বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে তিনি অর্থ সাহায্য করিয়া বদান্যতা-পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন! দামোদরের বন্যা-প্রপীড়িত বিপন্ন নর-নারীগণের সাহায্যকল্পে তিনি প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন।

সাধু-সুলভ দয়া, শিষ্টাচার ও সমদর্শিতার জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। জনসাধারণের জন্য তাঁহার প্রাসাদ-দ্বার চির উন্মুক্ত ছিল। যে কোন ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিঃসঙ্কোচে মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারিত। দরিদ্র নাগরিকগণের সাধারণ বিবাদ-বিসংবাদের বিচার তাঁহার দরবারেই নিষ্পত্তি হইত। ইহার ফলে দরিদ্র নাগরিকগণের প্রচুর অর্থ উকিল, মোখ্‌তারগণের কবল হইতে রক্ষা পাইত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সহানুভূতিতে বহু দরিদ্র মুসলমান গভর্ণমেণ্টের চাকরী প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রয়োজন হইলে তজ্জন্য তিনি রাজ-দরবারে উপস্থিত হইতেও কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। এরূপ অপরিসীম উদারতা, অসাধারণ মহত্ত্ব ও অমায়িক আচরণ

গুণে মুসলমান সমাজের নিকট তিনি বিপুল সম্মান ও প্রভূত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে ৫৮ বৎসর বয়সে এই স্বজাতিবৎসল মনীষী ও অসাধারণ কর্ম্মীপুরুষের কর্ম্ম-জীবনের চির-অবসান হয়। তিনি জাতির গৌরব ছিলেন। তাঁহার ন্যায় উদার, দানশীল, পর-দুঃখ-কাতর, নিরহঙ্কার, শিষ্টাচারসম্পন্ন, ধর্ম্ম-প্রাণ, জন-হিতৈষী ও স্বজাতি-প্রেমিক কর্ম্মবীর, বর্ত্তমান যুগের বড় লোকদের মধ্যে অতি বিরল।

পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি ইসলামের বিধিবদ্ধ নিয়মগুলির প্রতি অধিকতর লক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি কখন কখন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ আলেমগণের সহিত ধর্ম্ম-চর্চ্চা করিয়া ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিতেন। এমন কি এ সম্বন্ধে একবার তিনি স্বনামখ্যাত আলেম মওলানা আশরফ আলী সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার সদুপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন।

নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ্ ইসলামের শিক্ষা, সাম্য ও উদারতার সহিত যে কতটা পরিচিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার শেষ জীবনের প্রতি-কার্য্য হইতে তাহার অনেকটা প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি আজ নাই; কিন্তু তাঁহার মহান্ আদর্শ, অসীম আত্মত্যাগ চিরকাল দুনিয়ার বুকে অক্ষয়রূপেই বিরাজ করিবে।

গাহি তব গান

সনেট

খোন্দেগার মোহাম্মদ আবুবক্‌র

সুন্দরের প্রতিচ্ছবি, সুন্দর মানব,
তোমারে বন্দনা করি; তব কান্না, হাসি,
তব ভ্রান্তি, পাপ, পুণ্য বড় ভালবাসি—
ভালবাসি তব ক্ষুধা, বিফল-আহব
তব চারু জীবনের। করি তব স্তব।
—সৃষ্টিরে মন্থন করি যে সৌন্দর্য্যরাশি
পাই নাই, তব মাঝে প্রকাশ-প্রয়াসী
সেই অন্তহীন জ্যোতি ফেরেস্তা-দুর্লভ।

মাটীর মানুষ ওগো, জানোনাক তুমি,
বিধাতার মহাশক্তি তব কৃশ-করে
লীলায়িত। তব সৃষ্টি-বুভুক্ষায় ঝরে
তাঁহার সৃজন-ক্ষুধা তব হস্ত চুমি।

ফেরেস্তার 'মছ্‌জুদ' মাটীর সন্তান,
দুই বাহু উর্দ্ধে তুলি গাহি তব গান।
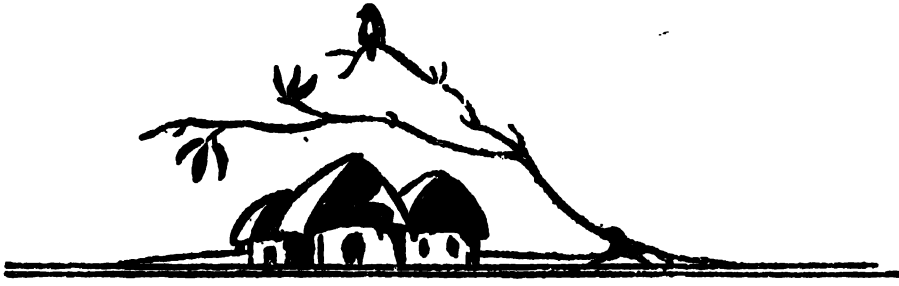
সুন্দরী ধরণী

মহীউদ্দীন

এ তো সেই পৃথিবী, সেই সুন্দরী ভোগময়ী পৃথিবী। সেই চাঁদ, সেই তারা, সেই সূর্য্য, সেই আলো, সেই আঁধার, সেই মাটী, সেই জল! আকাশে তেমনি আলোর খেলা, মাটীর বুকে তেমনি সবুজের মেলা—তেমনি হাওয়ার দোলা, জলের ধ্বনি, পাখীর সঙ্গীত! আজো আমার প্রাণ কাঁদে ওর ভালোবাসায়, আজো আমার নয়ন ভিজে উঠে ওকে না-পাওয়ার বেদনায়।

গভীর নিশিথে আমার দুই ফোঁটা চোখের জলে প্রেম নিবেদন করি,—প্রিয়া আমার! প্রিয়া আমার!

—আমি যে তোমার কাছেই রয়েছি!

—কই?…কই?…

—তোমার বুকের কাছে, তোমার মুখের কাছে—তোমার রক্তের মাঝে যে আমি জেগে আছি!

—পাগল আমি দু'হাত বাড়ায়ে ছুটে চলি'! কই… আমি তো তোমায় পাইনি?…

কোন উত্তর আসে না…

কেবল আমারি বুকের আকুল কান্না আকাশে-বাতাসে কেঁদে বেড়ায়,—ওগো পাইনি'…পাইনি…

আদি অন্তহীন এ ক্রন্দন,—ওগো পাইনি…পাইনি'…

আদম কাঁদে, ঈভ্-কাঁদে, শিঁরী কাঁদে-ফোরহাদ কাঁদে, লায়লী কাঁদে-মজ্নু কাঁদে—ওগো পাইনি'…পাইনি'…

শ্রমিক কাঁদে, ধনিক কাঁদে, পথের ধারে ভিখারী কাঁদে,—পাইনি…

এ তো সেই পৃথিবী। এ তো আমি সেই মানুষ। সেই বন-জঙ্গলের মানুষ—সেই পর্ব্বত-গহ্বরের মানুষ। চীন, মিসর, গ্রীস্, রোম, ভারতের আদিম সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা আমি—চীনের, রোমের, গ্রীসের, ভারতের প্রাচীর, পীরামিড্, মূর্ত্তি, মন্দির আজো আমার অতীত স্মৃতি জাগায়ে রেখেছে! এই জগতের অতীত কীর্ত্তির মাঝে আজো আমার রক্তের দাগ—আজো আমার বুকের ক্রন্দন। কত যুদ্ধ-কত হত্যা, কত ধ্বংস-কত সৃষ্টির মধ্য দিয়া তা'রে খুঁজেছি—পাইনি…

সেদিনও তা'রে পাইনি'—আজো পাইনি…

তাকে পাওয়ার দুর্দ্দম বাসনা সেদিনও ছিল—আজো আছে। তাকে না পাওয়ার বেদনা নিয়ে সেদিনকার মানুষ মরেছে—আমিও আজ মরবো…

ভদ্রলোকটী এসে ডাকে,—কবি!…

হাতের কলম ছেড়ে তার মুখের পানে চাই! বেদনার কাজল-আঁকা আঁখির পাতা তার—বড় করুণ—বড় কোমল তা'র কণ্ঠস্বর!

কবি, কবিতা লিখে তুমি কি সুখ পাও?

—কিছুই না!

—তবে কেন এ বৃথা শ্রম! তবে কেন এম্‌নি রাত্রি-দিন চোখের জলে কালির অক্ষর আঁকা? বল কী পেয়েছ তুমি?

—পাইনি' পাইনি'—তা'কে পাইনি'…আমার সুন্দরী ধরণীকে!

আমিও পাইনি' কবি! যা' চেয়েছিলাম তা' পাইনি'!

—কী চেয়েছিলে তুমি?

—কী চেয়েছিলাম তা' জানি না—কিসের অভাব তা'ও আমি জানি না! ভোগ-ঐশ্বর্য্য পেয়েছি—মায়ের স্নেহ, প্রিয়ার ভালোবাসা পেয়েছি—কিছুরই আমার অভাব নেই—অনেকই আমি পেয়েছি। তবুও যেন কী গভীর—তবুও যেন কী পাইনি'! ভোগের প্রাসাদ আমার হাবিয়া দোজখ হয়েছে—সুকোমল শয্যা আমার কণ্টকাকীর্ণ হ'য়ে উঠেছে—সুখাদ্য আমার কাছে বিষের ন্যায় বোধ হচ্ছে। প্রেম, কবিতা, গান সবই আমার কাছে তিক্ত! জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য দর্শন, যশ—প্রতিষ্ঠা সবই আমার কাছে বৃথা! গভীর রাত্রে পথে পথে ঘুরে বেড়াই—দেশ-দেশান্তরে ছুটে চলি' লক্ষ্যহীন—উদাস…জানি না আমি কী চাই…বুঝি না আমার কিসের অভাব! তুমি আমাকে বলে দাও আমি কী চাই!

—কী চাও? সত্যকে চাও…সুন্দরকে চাও…আনন্দকে চাও!

—সত্য কি?…

—সত্য এই জীবন—সত্য এই বসুন্ধরা।

—তা' তো আমি পেয়েছি!…

—মিথ্যা এ পাওয়া। এ মিথ্যাকে দিয়ে বাইরের মানুষটাকে বোঝান যাও—ভিতরকার আসল মানুষটা তো তা' বুঝে না!…

—সুন্দর কি? আনন্দ কি?

—সেও এই জীবন—সেও এই বসুন্ধরা!

সে চলে যায়—

রাত্রির অন্ধকার না কাটতে সে ঘুম থেকে উঠে। আমার রুদ্ধ দুয়ারে তা'র মৃদু করাঘাত জাগে,—উঠ বন্ধু উঠ…রাত্রি প্রভাত হ'য়েছে।

উন্মুক্ত খিড়কীর পথে দেখ্‌তে পাই প্রভাতের শুক তারা!

—অন্ধকার যে এখনো কাটেনি' বন্ধু!

—অন্ধকার এখনি কাটবে—পূব গগণ রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ছে!

সে চলে যায়…

এমনি করে সে দ্বারে দ্বারে করাঘাত করে বেড়ায়—উঠ, তোমরা উঠ, রাত্রি প্রভাত হয়েছে!

নিদ্রা-জড়িত দেহে সবাই সাড়া দেয়। উঠে না কেহ। সবারই মনে সন্দেহ, সবারই মনে দ্বিধা—এখনও আঁধার কাটেনি!

তবু সে দ্বারে দ্বারে করাঘাত করে ডাকে। ঘুমন্ত মানুষের হৃদয়ের দ্বারে তারই করাঘাত। ক্ষুধাবন্দী মজুরদের কাছে—সর্ব্বস্বহীন ভিখারীদের কাছে—আত্ম-চেতনহীন কৃষাণদের কাছে বঞ্চিত মানবের কাছে অভিনব জীবনের বাণী নিয়ে তার নিত্য আনা-গোনা!

এলো-মেলো লম্বা চুলগুলি কানের উপর এলিয়ে পড়েছে—ভাঙা ভাঙা দু'টো চোয়াল, খাঁদে-পড়া দুটো চোখ—লম্বা কঙ্কলসার দেহটা—কুসুমের কোমল সৌন্দর্য্য তা'তে নাই, আছে কেবল মরুভূর একটা উদাসরূপ—একটা কঠিন সৌন্দর্য্য!

রাত্রি দুপ্রহর পর্য্যন্ত তার ঘরে মানুষের ভীড়! সে তাদের দুঃখ, দুর্দ্দশা, অভাব-অভিযোগের কথা শুনে। অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে তাদের সে বুঝায়—নানা কথায়, নানা ভাবে! একটা সুন্দর, স্বাধীন জীবনের ছবি ফুটিয়ে তুলে তাদের চোখের উপর। অবিশ্রান্ত কাজ করে—প্রভাত হ'তে রাত্রি দু'প্রহর পর্য্যন্ত—লেখা, পড়া, টাইপ করা, বক্তৃতা দেওয়া—পথে, প্রান্তরে ঘুরে, কলে কারখানায় ঘুরে জীবনের বাণী প্রচার করা!

এমনি প্রত্যহ!

ওর জন্য আমার মায়া লাগে। ওর বিষণ্ণ মুখের পানে চেয়ে আমার কান্না পায়। সুন্দর মুখ যেন ওর দিন দিন কালো ছাই হ'য়ে যাচ্ছে।

—তোমার এ কিসের দুঃখ বন্ধু?

—না-পাওয়ার দুঃখ!

—কী তুমি চাও?

—অনেককিছু! অন্তহীন আমার চাওয়া!

সে হাসে! হাসি নয়, যেন ক্রন্দন-কম্প্র ঠোঁট উ'টোনো!

—জীবনে কি তুমি কিছুই পাওনি?

—পাওয়ার মত কিছুই পাইনি! তাই যা' পেয়ে-ছিলাম তা'ও ত্যাগ করে এসেছি।

—এমন কি পেয়েছিলে তুমি কীই বা ত্যাগ করলে? সেই ত্যাগ কি তোমার মহিমান্বিত হ'য়ে উঠেছে?

—ত্যাগ কি কখনও মহিমান্বিত হ'য়ে উঠে?

—উঠে না?

—না!

নীরব…

—উঃ বুকের ভিতরে আগুণের জ্বালা! এর সমাপ্তি কোথায় বল্‌তে পার বন্ধু? বড় দুঃখ, বড় ব্যথা! সর্ব্বস্বহীন শ্রমিকের বিষ-বীর্য্যে আমার জন্ম—সর্ব্বস্বহীন শ্রমিকের রক্তপাত-শ্রমে অর্জ্জিত অন্নে পুষ্ট আমার দেহ। দুঃখ-বঞ্চনা নিয়ে জন্ম লাভ করেছিলাম—দুঃখ-বঞ্চনার ভিতর দিয়েই জীবন চলেছিল। মায়ের ক্ষুধাক্লিষ্ট মুখ—আত্মীয় স্বজনদের দুঃখময় জীবন হৃদয়ে হৃদয়ে একটা মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছিল। সামান্য কামারের ছেলে একটা জাতির পরিচালক হয়। দরিদ্র কৃষাণের ছেলে একটা সাম্রাজ্যের মন্ত্রিত্ব পায়। আমিও পেয়েছিলাম একটা জমীদারী— একজন সৌভাগ্যশালী লোকের একমাত্র কন্যার স্বামীত্ব!

ধন-ঐশ্বর্য্য দিয়ে চেয়েছিলাম আমার হৃদয়ের দুর্দ্দম আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে। আমার মা, আমার দুঃখী আত্মীয়দের মধ্যে নিপীড়িত মানবের বেদনার সে রূপ দেখেছিলাম—সেই রূপকে নিয়ে একটা অভিনব জীবন গড়ে তোলাই ছিল আমার সাধনা। স্ত্রীর বুকে আমার স্থান হয়েছিল—তার ধন-ঐশ্বর্য্যে আমার দুঃখী আত্মীয়রা ভাগী হয়েছিল। কিন্তু আমার বুকের আকাঙ্ক্ষিত রূপ—আমার চোখের জলের সাধনার প্রতীক—যা'র মধ্যে আমার বঞ্চিত পিতা-প্রপিতামহের দুঃখ জড়িয়ে আছে—সেই নির্য্যাতিত মানবের স্থান আমার প্রিয়ার বুকে হ'লো না, তার ধন-ঐশ্বর্য্যের ভাগী তারা হতো না। হায় সে ভাগ্যহীন ক্ষুধিতদের রক্তে আমার জন্ম—যাদের দুঃখ, যাদের বেদনা আমার প্রাণে এক সুন্দর মহত্তম জীবন সৃজনের প্রেরণা জাগিয়েছে—তাদের স্থান সেখানে নেই—সেখানে আমার শান্তি কোথায়?

স্ত্রীর ভালবাসার গোলাম হ'য়ে থাকবো আমি? ধন-ঐশ্বর্য্যের কাছে বলি দেব আমার আমিকে? সামান্য পাওয়ার মধ্যে বন্দী করে রাখ্‌বো আমার বিপুল পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে? কত বিনিদ্র রজনী, কত হতাশ দীর্ঘশ্বাস, কত অসহায় চোখের জল। তারপর একদিন আমার বিপুল আকাঙ্ক্ষা বিজয়ী হ'লো।

স্ত্রী বল্লে,—আমি তোমায় ভালবাসি!

—সত্যিকার আমাকে নয়—আমার মিথ্যা কায়াকে! সত্যিকার আমার স্থান তোমার বুকে হ'লো কই?

মা দাঁড়ালো তার অভিশপ্ত জীবন নিয়ে। আত্মীয়-স্বজনবর্গ দাঁড়ালো তাদের এতিম পুত্র-কন্যাদের নিয়ে—তাদের অতীত দুঃখের স্মৃতি নিয়ে!—'ওগো ত্যাগ করোনা—ত্যাগ করো না আমাদের!

—আমাকে দিয়ে তোমরা যা চাও সে তো মিথ্যা। চিরদুঃখে, চিরবঞ্চনার মধ্যে ফিরে পা'বে তোমাদের সত্যিকার জীবনকে। আমি চলে যাব—আমি ত্যাগ করবো—আমার ত্যাগের মধ্য দিয়ে সে ফিরে আস্‌বে—তারি মধ্যে পাবে সত্যিকার আমাকে!

মিথ্যা কথা…ত্যাগ আমি কিছুই করিনি। শুধু মিথ্যা একটা জীবনের খোলস ছেড়ে সত্যিকার যা' ছিলাম তাই হয়েছি! তবুও আজ ঘুমের ঘোরে শুন্‌তে পাই নতুন প্রিয়র বুকে শুয়ে এক নারী দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ছে অতীত দিনের চলে-যাওয়া প্রিয়কে স্মরণ করে। আজও শুন্‌তে পাই পুত্র-বিরহিণী দুঃখিনী জননীর হারানো দিনের স্মৃতি দিয়ে বিনানো কান্না!

ত্যাগের গৌরব আমার নেই। বিশ্ব-প্রেমিক আমি নই। নিজের দুঃখের আগুণের জ্বালা নিয়ে আমি মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরি—আপন বেদনা দিয়ে আমি জগতের মানুষকে দেখি—একেলা আমারি জন্য আমি বিশ্বের জীবনকে সুন্দর-সুখময় করে তুল্‌তে চাই।

উঃ…! কোটরাগত চক্ষু হ'তে তা'র দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে।

কিন্তু, আবার হাসি—তেমনি কান্নাকম্প্র ঠোঁট ভ্যাংচানীর ন্যায়।

যাই বন্ধু…

সে চলে যায়!

বুকের কাছে নিখিল মানুষের ক্রন্দন ধ্বনি! বিরহী নিখিল হিয়া কাঁদছে তা'র প্রিয়ার গলিত-শব বুকে নিয়ে।

আকাশে-বাতাসে সেই একই কথা,—পাইনি'… পাইনি…

রুদ্ধ বেহেশ্‌তের দ্বারে ব্যথিত বিশ্ব কাঁদে—ইউসুফ কাঁদে—জোলায়খা কাঁদে—পাইনি…পাইনি'।

আমারও বুকের আকুল আকাঙ্ক্ষা কাঁদ্‌ছে—পাইনি…পাইনি…

ধরণী হাসিয়া লুটায়…সবুজের বুকে ঝল্‌মল্‌ করে তার হাসির ছটা!

এত সুন্দর—এত মধুর তুমি? এত সৌভাগ্য, এত ভোগ, এত আনন্দ, এত সুখ, এত হাসি, এত গান তোমার বুকে সঞ্চিত রয়েছে? কই আমি তো তার এক কণাও পাইনি!

বা'র বা'র দুই হাত মেলে আমি তোমার পানে ছুটেছি। বা'র বা'র তুমি দূরে সরে গেছ!

আবার শুনি কে যেন বলে,—

—এই যে আমি তোমার কাছেই রয়েছি!

—এ যে গলিত শব! সত্যিকার তুমি কোথায়?

কোন উত্তর আসে না।

মরণের অন্ধকারে হাত্‌ড়ায়ে ফিরি, আমার সুন্দরী ধরণী কোথায়? আশেপাশে কাদের, যেন কোন গোরস্থানের অভিশপ্ত কঙ্কালদের ভীত, আর্ত্তকণ্ঠ—সুন্দরী ধরণী কই? জীবনের আলো কই? আনন্দ কই? সুখ কই? সৌভাগ্য কই?…

চোখ ভিজে উঠে না-পাওয়ার বেদনায়!

আবার রাত্রি প্রভাতে আমার দোয়ারে জাগে বন্ধুর মৃদু করাঘাত—উঠ বন্ধু উঠ! রাত্রি প্রভাত হয়েছে!…

একটী প্রাচীন সঙ্গীত

রচয়িতা—পণ্ডিত গোলাম আলী

ভালবাসা উড়ে বেড়ায়—
মধু খোজে বনে বনে।
মরা গাছে পাতা জাগায়—
ফুল ফুটায় ক্ষণে ক্ষণে॥

ও তার এমনি রীতি—
ফুলের মাঝে জনম তাহার
ধুলে বসতি।
ও সে রাজা প্রজা সবার মনে
বসে আছে সিংহাসনে॥

গৌড়-পাণ্ডুয়ার মোস্‌লেম কীর্ত্তি-কাহিনী

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

মোজাম্মেল হক

শাহ্ নিয়ামতুল্লার সমাধি

ফিরোজপুরে ছোট সোণা মসজিদের উত্তরে এই বৃহৎ সমাধি-সৌধ অবস্থিত। সৌধটী সমচতুষ্কোণ; ইহাতে বারটী দরজা আছে, এজন্য ইহাকে শাহ নিয়ামতুল্লার বার-দুয়ারীও বলে। সমাধি-গাত্রে চারিখানি প্রস্তর-ফলক আছে, তাহাতে কোরাণ-শরীফের আয়েত-বিশেষ ব্যতীত অন্য কোন কথা খোদিত নাই। শাহ নিয়ামতুল্লা ওয়ালী অতি বোজর্গ দরবেশ ছিলেন। তিনি শাহাজাদা শুজার মুর্শিদ ছিলেন। তাঁহার বুজর্গীর একটী কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আরঙ্গজেব বাদশাহের একজন সেনানী এবং তাহার কতিপয় সহযোগী সৈন্য যুদ্ধে আহত ও বন্দী হইয়া শাহ শুজার নিকটে আনীত হয়। শুজা তাহাদিগের প্রাণনাশের সঙ্কল্প করেন; কিন্তু শাহ নিয়ামতুল্লার নিবারণে তাহারা রক্ষা পায় এবং তাঁহারই কৃপায় তাহারা সুস্থ হইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া যায়। শাহ সাহেব আরঙ্গজেব শাহের বিরুদ্ধাচরণ করিতে শাহ শুজাকে সর্ব্বদাই বাধা দিতেন।

আখি সিরাজীর সমাধি ও দরস-বাড়ী

আখি সিরাজউদ্দীন সাধুকুলের শিরোভূষণ ছিলেন। তাঁহার অনুপম সাধুতার জন্য তিনি সাধারণে পীরান-পীর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি কোন্ দেশের লোক, তাহা জানিবার উপায় নাই। অল্প বয়সে দিল্লীতে মহাতাপস দরবেশ সিরাজউদ্দীন আউলিয়ার নিকটে আগমন করেন। তথায় নানা সুফী-সাধুর সহবাসে ও শিক্ষায় ধর্ম্মতত্ত্বে প্রগাঢ় জ্ঞান-লাভ করিয়া তিনি গৌড়-ভূমিতে চলিয়া আসেন। তাঁহার ধার্ম্মিকতা ও বুজর্গী দেখিয়া লোকে তৎপ্রতি ভক্তিমান হইয়া পড়ে এবং স্বয়ং গৌড়-বাদশাহ্ তাঁহাকে মুর্শিদ বলিয়া গ্রহণ করেন। সাগর-দীঘির উত্তর তীরে একটী উচ্চ ভূমির উপর ইঁহার কবরগাহ্ আছে। একটী চতুষ্কোণ সৌধের ভিতর এই মহাসাধু পুরুষ চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছেন। সমাধি-সৌধটী প্রাচীর দিয়া ঘেরা। এই সৌধ ও প্রাচীর যে কোনও পীর-ভক্ত সুলতানের আদেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই কবরগাহের নিকটে আর একটী বৃহৎ সৌধের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া আছে। ইহার নাম দরস-বাড়ী বা শিক্ষার আলয়—মাদ্রাসা। মাদ্রাসার ছাত্রগণের নামাজ নির্ব্বাহের জন্য একটী মস্‌জিদও এখানে স্থাপিত হইয়াছিল। সেই মস্‌জিদ এবং মাদ্রাসার ভগ্ন স্তূপ দেখিয়া মনে হয়, না জানি পূর্ব্বকালে এইস্থানে কি জনপূর্ণ জনপদই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু কালের গতিতে সে সকল কোথায় ধুইয়া, মুছিয়া গিয়াছে।

এই সকল মস্‌জিদ-মিনার ছাড়া গুণবন্ত মস্‌জিদ, ঝন্‌ঝনিয়া মস্‌জিদ, রাজবিবি মস্‌জিদ, বেগ-মহাম্মদ মস্‌জিদ, পিঠাওয়লী মস্‌জিদ, খাজাঞ্চি-খানা, ঘড়ীখানা, হোসেন শাহের সমাধি প্রভৃতি বহু মোস্‌লেম কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ স্তূপাকারে গৌড়ের বিশাল বক্ষের স্থানে স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা এখানে সংক্ষেপে তৎসমুদয়ের পরিচয় দিব।

ঝন্‌ঝনিয়া মস্‌জিদ,—ইহার ঝন্‌ঝনিয়া নাম কেন হইল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। মস্‌জিদটী অতি সুদৃশ্য। ইহার তিনটী বৃহৎ গুম্বজ প্রস্তর স্তম্ভের উপর স্থাপিত। আবার প্রত্যেক কোণেও স্থূলাকার স্তম্ভ আছে। ইহা অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ের সৌধ, ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তার নাম জানা যায় না।

রাজবিবি মস্জিদ—ইহা কোতল দরওয়াজার নিকটে, মস্জিদটী বৃহৎ। ইহার কয়েকটী গুম্বজ ভূপতিত হইয়া ইহাকে সৌন্দর্য্যহীন করিয়া ফেলিয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণা প্রতিষ্ঠাত্রী রাজবিবি যে কে, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

ঘড়ীখানা—এই সৌধের উপরে ঘণ্টা বাজাইয়া নগর-বাসীদিগকে সময় জ্ঞাপন করা হইত। ঘণ্টার আওয়াজ এমনি উচ্চ ও গম্ভীর ছিল যে, সুবৃহৎ গৌড় নগরবাসী সকলেই সে শব্দ শুনিয়া নিজেদের কার্য্য করিবার সুবিধা পাইত ও সতর্ক হইত। এক্ষণে সে ঘড়ীখানা আর নাই, ঘড়িও কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। বেগ-মহাম্মদ মসজিদ, খাজাঞ্চিখানা, এবং ফিরোজপুর দরওয়াজাও সমদশাপন্ন। কোনটীর খানকতক ইট ও দুই একখানি পাথর, কোনটীর বা গুম্বজ ভূতলে পড়িয়া সৌধের সাক্ষী স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।

গৌড়ের সৌধাবলীর দুর্দ্দশা প্রাকৃতিক ঘটনায় যত না হইয়াছিল, অর্থ-লোলুপ বর্ব্বর লোকদের নির্ম্মম হস্তে তদপেক্ষা অধিক ঘটিয়াছে। প্রথমে পার্শ্ববর্ত্তী কোন এক পল্লীর কতিপয় বলবান লোক সাহসে বুক বাঁধিয়া অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গৌড়ের গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে এবং বেওয়ারিশ সাধারণ ভগ্নগৃহের আশে পাশের জঙ্গল কাটিয়া গৃহের পতিত ছাদ ও প্রাচীরের ইটমাটী সরাইয়া ফেলে। গৌড়-ধ্বংসের চিত্র প্রথমেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎকালে অর্থ ও অলঙ্কারাদির মমতা কাহারও মনে স্থান পায় নাই। তৎসমুদয় সিন্ধুক, বাক্স-পেটরায় এবং ভিত্তি-গাত্রের কুলঙ্গায় যেমন রাখিয়াছিল, তেমনি রাখিয়াই লোকে প্রাণ লইয়া পলাইয়াছিল, কেহবা গৃহ-মধ্যে মড়কে মরিয়া, পচিয়া, গলিয়া, খসিয়া প্রকৃতির ঋণ পরিশোধ করিয়াছিল। ঐ লোকেরা ভগ্ন-গৃহের ইট-মাটী সরাইয়া সেই সকল স্বর্ণালঙ্কার, মূল্যবান তৈজস-সামগ্রী এবং অনেক টাকাকড়ি লাভ করে। কেবল তাহারা নহে, এই সংবাদ প্রচারিত হইলে অন্যান্য পল্লীবাসীরাও দলে দলে গিয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং অনেকে অনেক অর্থ পাইয়া আপনাদের অবস্থা উন্নত করে। তাহারা ক্রমে তাহাদের কর্ত্তিত বৃক্ষাদি এবং ভগ্ন গৃহের ইষ্টক অন্যত্র গাড়ী বোঝাই করিয়া লইয়া গিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে এবং উহাই অর্থাগমের সহজ উপায় দেখিয়া তাহারা ঐ কার্য্যেই লিপ্ত থাকে। তাহারা কেবল ভগ্ন মসজিদ মিনার ও কোঠা-বালাখানার ইট-পাথর লইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। যে সকল সৌধ দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান ছিল, দুর্ব্বৃত্তেরা তাহাও ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া তাহার ইট-পাথর স্থানান্তরে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিতে ছাড়ে নাই।

নগরের পশ্চিমাংশে ভাগীরথীর তীরে গুলবস্ত নামে একটী ভগ্নদশাপন্ন সুবৃহৎ মস্জিদ আছে। ইহার অধিকাংশই প্রস্তর গঠিত, প্রতিষ্ঠাতার নাম গৌড়-রাজ জালাল উদ্দীন আবুল মুজাফর ফতেহ শাহ, নির্ম্মাণাব্দ ৮৮৯ হিজরী। ইহার ছাদ খিলান করা এবং চব্বিশটী গুম্বজ ছিল। কয়েকটী গুম্বজ বর্ষা-বাদলের বা ভূমিকম্পের বেগে ধরাশায়ী হইয়াছে। নদীতীরে নৌকাযোগে সহজেই ইট-পাথর সরান যায় দেখিয়া দুষ্টলোকেরা উহার বহু সাজ সরঞ্জাম অন্যত্র লইয়া গিয়াছিল। যাহা এখনও খাড়া আছে, একালে সেরূপ নির্ম্মাণ করাও সহজ সাধ্য নহে। আরো একটী নিরতিশয় দুঃখের বিষয় এই যে, কদমরসুল সৌধের নিকটে সুলতান হোসেন শাহের যে সুরম্য কবর ছিল, দুরাত্মারা তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখে নাই। তাহার সুরঞ্জিত ইষ্টক প্রস্তর ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়া নিজেদের স্বার্থ সাধন করিয়াছে। এক্ষণে সেই শাহী মক্‌বেরা কদলী-কাননে পরিণত হইয়াছে। এতদপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি ঘটিতে পারে? এইরূপে এই কার্য্য দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতে থাকায় গৌড়ের জঙ্গলও উজাড় হইয়া যায় এবং ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর উপদ্রব কম হয়। তখন সাঁওতাল ও মুসলমান কৃষকেরা আসিয়া স্থানে স্থানে চাষ-আবাদ করিতে আরম্ভ করে। পূর্ব্বকালের সেই প্রাচীর ও পরিখাবেষ্টিত সুবৃহৎ গৌড় নগরের অনস্থান ভূমিতে এখন নানা ফসল উৎপন্ন হইতেছে।

পরিশেষে আমি গৌড়ের ধনৈশ্বর্য্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া গৌড় কথার উপসংহার করিব। একদিন যে মহা-নগর অসংখ্য মস্জিদ-মিনার এবং অগণিত সুরম্য কোঠা-বালাখানায় সুশোভিত ছিল, যে স্থান দিবা-রজনী আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিত, যেখানে একজন পিঠা বিক্রয়কারিণী রমণীও মস্জিদ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং যে নগরের অধিবাসীরা সোনার থালে ভোজন করিত, তাহারা যে অপরিমেয় ধনৈশ্বর্য্যের

অধিকারী ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। গৌড় রাজকোষও ধন-রত্নে পূর্ণ ছিল। কথিত আছে, যখন শের শাহ গৌড় অধিকার করিয়া সিংহাসনারোহণ করেন, তখন হুমায়ুন বাদশাহ তাঁহাকে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে গৌড়ে উপস্থিত হইলে শের শাহ গৌড় রাজকোষ হইতে ছয় কোটি স্বর্ণমুদ্রা লইয়া বিহারে পলায়ন করেন। ফলতঃ গৌড়ের-রাজা প্রজা সকলেরই ভাণ্ডারভরা ধনদৌলত ছিল। সেকালে ব্যাঙ্ক বা কোম্পানির কাগজ ছিল না, সুতরাং সে ধন কোনও রূপে স্থানান্তরিত হইতে পারিত না; প্রজা-সাধারণে আপনাদের সে ধন-দওলত রক্ষার জন্য বাড়ীর নিভৃত স্থানে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিত। একালে সেই প্রোথিত টাকা অনেকে পাইয়া 'বড় লোক' হইয়াছে, ইহা আমরা অনেকের নিকট শুনিয়াছি

আমার ভাগিনেয় মোরহুম মোহাম্মদ দাউদ মিয়া মালদহ জেলার নাজিরপুর, শুজাপুর, মশিমপুর প্রভৃতি চৌদ্দ খানি মৌজার ভূস্বামী ছিলেন। এই সকল মৌজা প্রাচীন গৌড়ের আশে-পাশে অবস্থিত। তাঁহার জনৈক বিশিষ্ট প্রজা—নাম জামাল হাজী ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—"আমরা পাঁচ ছয় জন একদা গৌড়ের জঙ্গলে বুনো মুর্গী ধরিতে গিয়াছিলাম। আমরা ঘুরিতে ঘুরিতে এক স্থানে মৃত্তিকাস্তূপের পাশে একটী ক্ষুদ্র চৌবাচ্চা দেখিতে পাই; তাহা কুলের কাঁটা ও লতা পাতায় ঢাকা ছিল। তৎসমুদয় সরাইয়া ফেলিতেই চৌবাচ্চাটী টাকাপূর্ণ দেখিয়া আমরা বিস্ময়াবিষ্ট ও আনন্দিত হইলাম। তখন সকলেই গায়ের চাদর পাতিয়া ক্ষিপ্রহস্তে টাকা তুলিয়া লইতে লাগিলাম। আমাদের মধ্যে একজন অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সের লোক ছিলেন। তিনি হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিলেন—"না-হে, এ টাকা লওয়া হবে না ত—দেখ্‌ছ না, কে এ টাকা নিয়ে গিয়াছিল, বিপদ ঘটায় ফিরিয়ে এনে চৌবাচ্চায় রেখে লতা পাতা চাপা দিয়ে গিয়েছে।" ইহা বলিয়া তিনি নিজের গৃহীত টাকা চৌবাচ্চায় ঢালিয়া দিলেন। বিপদের কথা শুনিয়া আমাদের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, আমরাও গৃহীত টাকা যথাস্থানে রাখিয়া দিলাম। আমাদের মধ্যে অন্য একটী লোক নিতান্ত অনিচ্ছায় টাকা রাখিয়া দিলে আমরা পুনর্ব্বার উহার উপর কাঁটা ও লতাপাতা চাপা দিয়া ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, ঐ ব্যক্তি নিশীথ রাত্রে অতি সংগোপনে লোকজনসহ তথায় গিয়া সেই রাশীকৃত টাকা গাড়ী বোঝাই করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সে টাকা সে ভোগ করিতে পারে নাই, টাকা আনার কয়েকদিন পরে সে এবং তাহার সহগামীরা উদরাময় রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। টাকাগুলির যে কি গতি হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

বর্ষাকাল। প্রবল বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। গৌড়ের উচ্চ ভূমির বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়া জুলি বহিয়া জল-স্রোত প্রবল-বেগে নিম্নে আদিগঙ্গার খাতে নামিতেছিল। সন্ধ্যার কিছু অগ্রে একটী লোক সেই জুলি ধারে পায়খানা ফিরিতে বসিয়া স্রোতের দিকে আনমনে তাকাইয়া তামাসা দেখিতেছে। লোকটী রুগ্ন,—চিরদিন পেটের পীড়াগ্রস্ত, এজন্য কেহ তাহাকে কাজে লয় না। সে অতিকষ্টে দিন-গুজরান করে। সে দেখিল ছোট ঢোলকের মত গোলাকার কি একটা কালো পদার্থ স্রোতের বেগে গড়াইয়া গড়াইয়া নদীর দিকে নামিয়া গেল। কি ওটা? ইহা জানিবার পরক্ষণেই ঐরূপ আবার একটী দ্রব্য নামিয়া আসিতেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া জুলির জলে নামিয়া ধরিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে একে দুর্ব্বল, তাহাতে আবার পদার্থটী স্রোতের তেজে বেগে নামিয়া আসিতেছে, তাহার ধাক্কা খাইয়া সে পড়িয়া গেল—সাপটিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিল না, কিন্তু বুঝিল,—পদার্থটী অতি ভারী। সে তখনি উঠিয়া সাম্‌লাইয়া এক পাশে দাঁড়াইল এবং মনে মনে বলিল,—"মরি আর বাঁচি, এবার না ধরিয়া ছাড়িব না।" ফলে ঘটিলও তাহাই; মিনিট দশেক পরে ঠিক সেইরূপ একটী গোল পদার্থ তরতর-বেগে নামিতেছে, সে উপুঁড় হইয়া তাহার উপর পড়িয়া দুই হাতে ঝাপ্‌টাইয়া ধরিল এবং অতিকষ্টে জুলির পাশে পাশে যেখানে স্রোতের বেগ কম, সেইস্থানে টানিয়া আনিয়া ধরিয়া রাখিল। এই সময়ে তাহার স্ত্রী তাহার বিলম্ব দেখিয়া খোঁজ লইতে আসিয়াছিল। সে তাহাকে দেখিতে পাইয়া ডাকিল। স্ত্রী বলিল—"এ কি? এযে একটা লোহা!" স্বামী বলিল—"যাই হোক্, চুপ করো, দেখ্‌ছ না, এর একটা

মুখ পেরেক দিয়ে জোড়া,—নিশ্চয় এর মধ্যে কিছু আছে।” পরে উভয়ে ধরাধরি করিয়া অতিকষ্টে সেটাকে নিজেদের কুটীর মধ্যে লইয়া গেল। স্ত্রী-পুরুষের নিদ্রা নাই, যখন রাত্রি গভীর হইল, প্রতিবাসীরা ঘুমাইয়া পড়িল, তখন তাহারা দায়ের আঘাতে অতিকষ্টে প্রেক-আঁটা মুখটী খুলিয়া দেখিল, ভিতরে একটী গোলাকার কাঠের বাক্স—বাক্সের কাঠ পচিয়া গিয়াছে, সহজেই ভাঙ্গিয়া গেল—দেখিল ভিতরে মোহর ভরা। মোহর দেখিয়া উভয়ের হৃদয় আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল উভয়েই নীরব। পরে গুটিকতক মোহর বাহির করিয়া লইয়া আর সমস্তই গৃহের কোণে পুঁতিয়া ফেলিল। ইহাকেই কি বলে না বিধাতার ছাপ্পর ফুঁড়িয়া ধন দেওয়া ?

কয়েকদিন পরে এই ব্যক্তি অন্য গ্রামের তাহার জনৈক ঘনিষ্ট আত্মীয়ের দ্বারা কয়েকটী মোহর বেচিয়া আনাইয়া স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে লাগিল। সে প্রথমে সামান্য সামান্য জিনিষ বেচা কিনা আরম্ভ করিল। এইরূপ বেচা কেনা করিতে করিতে শেষে বড় কারবার ধরিল। লোকে বুঝিল—ছোট খাটো ব্যবসায় হইতেই তাহার উন্নতি, কিন্তু দৈব ধন প্রাপ্তিই যে তাহার সৌভাগ্যের মূল, তাহা তো কেহ জানে না! পরবর্ত্তী সময়ে সে একজন বেশ গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছিল। হায় একদিন যাহাকে কেহ গ্রাহ্য করিত না; রুগ্ন বলিয়া কাজে লইত না; এখন তাহার সুখের সীমা রহিল না। লাটের খাজনা দিবার সময় সে জমিদারকে দুই তিন হাজার টাকা বিনা সুদে ধার দিয়া সাহায্য করিয়াছে, ইহা আমরা জানি। এ গল্প অলীক নহে, ইহা সেই ব্যক্তি জমিদারের কোন ঘনিষ্ট আত্মীয়ের নিকট প্রকাশ করিয়াছিল।

ইহা ভিন্ন ক্ষেতের পাগার কাটিতে, বেড়া দিতে এবং চাষ দিবার সময় লাঙ্গলের ফলার মুখে অনেকেই অর্থ ও অলঙ্কারাদি পাইয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, গৌড়ের মাঠে ছোট ছোট ইটের ছড়াছড়ি! ক্ষেতে চাষ দিবার সময় কৃষক যথাসাধ্য সেই সব ইট এক কোণে জমা করিয়া রাখে। এক সময়ে একজন কৃষকের লাঙ্গলের ফলায় বাধিয়া একখানি প্রোথিত পাথর উঠিয়া পড়ে। চৌকোশ নয় বলিয়া সেখানি কেহ আর গৃহে লইয়া যায় নাই—উক্ত ইটের গাদায় তাহার স্থান হইয়াছিল। কিছু দিন পরে জনৈক কৃষকের শস্য বোঝাই গাড়ী ওলান্ অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাগে ভারী হওয়ায় সে সেই ওলানের সমতা রক্ষার জন্য এই পাথরখানি গাড়ীর সামনে চাপাইয়া দেয়। গাড়ী বাড়ীতে পৌছিলে কৃষক পাথরখানি প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে রাখিবার জন্য তুলিয়া সজোরে যেই ফেলিয়াছে, এমনি উহা ফাটিয়া গিয়া মোহর বাহির হইয়া পড়িল। কি আশ্চর্য্য কাণ্ড !! পরিণামে এ ব্যক্তিও একজন সম্ভ্রমশালী ব্যক্তি হইয়া উঠে।

এইরূপ বহু গল্প শুনিতে পাওয়া যায়, বাহুল্য ভয়ে সে সকল আর লিপিবদ্ধ করিলাম না, তবে একটী অত্যদ্ভুত বৃত্তান্ত প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। উহা আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। (ক্রমশঃ)

কুমারীর সন্তান-জনন

ডাঃ মোহাম্মদ আবুল কাসেম

পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে স্ত্রীলোকের সন্তান-সন্ততি হইতে পারে এইরূপ ধারণা আশ্চর্য্য বোধ হইলেও একেবারে অমূলক নহে। সন্তান-জননের পূর্ব্বে উভয়ের সহমিলন অত্যাবশ্যক ইহাই সাধারণ নিয়ম বলিয়া উপরোক্ত ব্যাপারটী অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে হইতে পারে। নীচ প্রাণীদের মধ্যে ইহা প্রভূত পরিমাণে দেখা যাইয়া থাকে। উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে ইহা কদাচিৎ দেখা যায় সন্দেহ নাই; কিন্তু এই প্রকার জন্ম আদৌ ঘটিয়া থাকে না বলা চলে না। কারণ দৈনন্দিন জীবনে ইহা অস্বাভাবিক হইলেও কোন কোন সময় এই প্রকার জন্ম হইয়া থাকে—ইহা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হয় মাত্র। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানবিদ্ স্যার ওন্স (Sir Ownes) বলিয়াছেন,—'Not all the progeny of the primary impregnated germ cells are required for the formation of the body in all animals; certain of the derivative germ cells may remain unchanged and become included in that body which has been composed of the metamorphoderivative germ cell or the nucleus of such may begin and repeat the same process of growth by imbibition and of propagation by Spontaneous fission as those to which itself owed its origin."

বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক এরিষ্টটল মহোদয়ের মতে মধুমক্ষিকা, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির মধ্যে এই প্রকার জন্ম নিতান্ত স্বাভাবিক। কুক্কুটীদের সম্বন্ধে অবশ্য এই প্রকার নিয়ম প্রযোজ্য নহে, কারণ ইহারা একবার সহবাস করিলে এক বৎসরাবধি এমন অসংখ্য ডিম্ব প্রসব করিতে পারে যাহাতে বহু শাবকের সৃষ্টি সম্ভব। এইরূপ হইবার কারণ বাহির করিতে অবশ্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না, কুক্কুটের বীর্য্য কুক্কুটীর জননেন্দ্রিয়ের ভিতর প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত থাকে। কীটপতঙ্গের মধ্যে বসন্তকালে এই প্রকার বহু পুংশাবকের ও হেমন্তকালে স্ত্রীশাবকের জন্ম হইতে দেখা যায়। পিপীলিকা বা মধুমক্ষিকাগণ একবার গর্ভধারণ করিলে আট বৎসরাবধি ক্রমাগত পুংসন্তান জননে সমর্থ থাকে। অন্য এক প্রকার কীট (Lipidopterons Insect) এই ভাবে অসংখ্য স্ত্রীশাবক জন্মাইতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

মনুষ্য প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে এই প্রকারে সন্তান-সন্ততির জন্ম—স্বাভাবিক না হইলেও, একেবারে অস্বাভাবিক নহে।

বৈজ্ঞানিক জে, লোএব (J Loeb) দৃঢ়তা সহকারে সভ্যজগতের কাছে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, রাসায়নিক ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে স্ত্রীজননেন্দ্রিয় অনায়াসেই গর্ভধারণের উপযোগী করা যাইতে পারে, ইহাতে বিস্মিত হইবার বিশেষ কিছু নাই। ["J. Loeb has proved that ova can be fertilised and made to segment by various mechanical and chemical stimuli, e. g., weak solutions of acids and alkalies. Some ova can be made to segment by injecting upon them sperm of a different class of animals for instance, by injecting the spermatic fluid of a dog upon frogs' eggs. But in all such cases the embryos have purely

maternal characters. Another observer has fertilised frogs' eggs by pouring a weak solution of formic acid upon them.] বিজ্ঞান বলে যে পুরুষের ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয় মিলন ব্যতিরেকে যে সন্তান-সন্ততি হওয়া সম্ভব পাঠকগণ ইহা পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা হইতে বিশদভাবে বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ হইলেও আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের কতকগুলি ব্যতিক্রম থাকে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সঙ্গমে সন্তানের জনন সম্ভব—ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম,—কিন্তু আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াও অন্যভাবে সন্তান জনন অসম্ভব নহে। স্ত্রীকোষাধার স্বকীয় প্রভাবেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে, পুরুষের বীর্য্য মাত্র তাহারই শক্তিবর্দ্ধক। বিশ্বাসযোগ্য এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আমরা জানিতে পারি, যেখানে তরুণ কুমারীদের স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপর বা কোষাধারের মধ্যে মাংসপিণ্ড স্ফোটকাকারে স্থায়ী ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। উহা দূর করিতে হইলে অস্ত্রোপচারের সাহায্য ভিন্ন গত্যন্তর নাই। পাঠকদের অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সময় কুমারী অধিকাংশই নিঃসন্দেহ পবিত্র চরিত্র। অনেক সময় এইরূপ ব্যাপারে কুমারীগণের জননী ভীতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন। কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস যে, এইরূপ মাংসপিণ্ড সহবাসের ফলে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, রোগের জন্যই এরূপ ঘটিয়া থাকে। কোষাধার সময় সময় স্ফীত হইয়া ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উঠে। সন্তান জননের ইচ্ছা হইলেই এইরূপ ঘটনা হয়। (Sometimes the fœtus adheres to the body, as is seen in cases of unequal double monsters, e. g., Lazarus Baptisa collcred born in 1776, which adhered to the breast bone). কুমারীর সন্তান হওয়া যে একটি অভাবনীয় ঘটনা—বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক যুগে আমরা উহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। ইহা যে সাধারণ নিয়মের একটু ব্যতিক্রম এই পর্য্যন্ত আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। বাল্যে বালিকাদের কোষাধারে মাংসপিণ্ড জন্মিয়া থাকে—যৌবনে ঋতুকালের পর তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সন্তান জননের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে—ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের দ্বারা কুমারীর সন্তান জননের ব্যাপার সমর্থন করা যাইতে পারে কিনা। আমরা উহা অবশ্যই ঐতিহাসিক ও শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিতে পারি। রাসায়নিক বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে কুমারীর গর্ভে শক্তিশালী সন্তান জনন সম্ভব, জগতের ইতিহাস পাঠ করিলে তাহার সত্যতা অস্বীকার করা যায় না।

আমেরিকায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্ত্রী ও পুরুষের বীর্য্য লইয়া রাসায়নিক সংমিশ্রণে কৃত্রিম জরায়ু ও গর্ভাধানে রক্ষিত হয়; ফলে ক্রমে তন্মধ্যে একটি জীবের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ছয়মাস পরে উক্ত জীবটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। [Vide —The Book of knowledge]

মনীষী সুশ্রুত বলেন, দুইটী রমণী অত্যন্ত কামাসক্তা হইয়া পরস্পর উপগতা হইয়া কোন প্রকারে শুক্র ক্ষরণ করিলে তাহাতে অনস্থি অর্থাৎ কোমলাস্থি বিশিষ্ট সন্তান উৎপাদিত হইয়া থাকে।" যথা,—

"যদা নার্য্যাবু পেয়াতাং বৃষস্যন্ত্যৌ কথঞ্চন।
মুঞ্চন্ত্যৌ শুক্র মন্যোন্যমনস্থিস্তত্র জায়তে॥"

"আয়ুর্ব্বেদে গর্ভাধিকারে স্বপ্নজাত গর্ভের উল্লেখ আছে। ঈদৃশ-গর্ভাধানে পুরুষলোকের প্রয়োজন হয় না, অর্থাৎ স্বাভাবিক সহবাসের দরকার হয় না। এরূপ অবস্থায় নারীর ঋতুস্রাব বন্ধ হইবার পর স্বপ্নযোগে সহবাস করিলে উদ্‌গত আর্ত্তব বায়ু চালিত দ্বারা জরায়ুদেশে পতিত হইয়া গর্ভসঞ্চার করিয়া দেয়। সাধারণ গর্ভের ন্যায় এই গর্ভ প্রতিমাসে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেবলমাত্র গর্ভস্থ প্রাণীর আনুসঙ্গিক গর্ভ লক্ষণও প্রকাশিত হয় এবং সেই জীবের মাত্র পিতার গুণাবলী প্রকাশ হয় না, অর্থাৎ তাহার কেশ, শ্মশ্রু, লোম, দন্ত, স্নায়ু, নখ, শিরা, ধমনী ও বী জন্মে না। শাস্ত্রে গর্ভনির্দ্দেশ যথা,—

"ঋতু স্নাতা তু যা নারী স্বপ্নে মৈথুন মাচারেৎ।
আর্ত্তবং বায়ুরাদায় কুক্ষৌ গর্ভ করোতি হি॥
মাসি মাসি প্রবর্দ্ধেত স গর্ভো গর্ভলক্ষণঃ।
কাললং জায়তে তস্যা বর্জ্জিতঃ পৈতৃকৈগুণৈঃ॥"

"স্ত্রীদিগের গর্ভাশয়—যেমন আটটী 'আশয়'। সেই প্রকার রস হইতে মজ্জা পর্য্যন্ত ছয়টী ধাতু, আর্ত্তব সপ্তম ধাতু ও শুক্র অষ্টম ধাতু; স্ত্রীলোকের আর্ত্তব ধাতুই গর্ভের

উপযোগী, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। স্ত্রীলোকের শুক্র দেহের বল, পুষ্টি ও বর্ণের উজ্জলতা সাধন করিয়া থাকে।"—'যৌবন পথে' দ্রষ্টব্য।

ডাক্তার এম্, এস্, নেওয়াজ, এম-বি ; বি-এস্ (ইণ্ডিয়া) লণ্ডনের "রিভিউ-অব-রিলিজিয়ন্স্" নামক মাসিক পত্রিকায় Virginbirth বা Parthenogenesis নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"No true case of parthenogenesis birth in human beings is so far on record, and we must waif for further researches in pathology before we can give a conclusive proof of the true nature of virgin birth. Some women possess both the active and the impressible power, and it is on this assumption that Unani Ayurvedic medicines believe in virgin birth. Probably the Suraj Bansi and Chandar Bansi dynasteis owe their origin to similar births. Such women are no doubt rare, but the fact that virgin birth is possible cannot be denied." (vide,—The Review of Religion of London).

হয়ত সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের নৃপতিদিগের জন্ম এইভাবে সংঘটিত হইয়াছিল। অবশ্য এই প্রকার নারীর সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু এই প্রকার জন্ম যে সম্ভব, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ডাক্তার ভার্ডি (Dr. Vardi), ডাক্তার টড (Dr. Tod), ও ডাক্তার কারপেণ্টার (Dr. Carpentar), প্রভৃতি বিজ্ঞানাচার্য্যগণ তাঁহাদের বহু গবেষণার পর একথা জোরগলায় প্রকাশ করিয়াছেন।

চির-মিলন

এম, ইদ্রিস বি-এ

ভালবাসো কিবা ঘৃণা করো মোরে
তবু ত আমায় করো স্মরণ—
প্রেম দাও কিবা বেদনাই দাও
হৃদয়ে করো ত অবতরণ ?

পথেতে আমার কণ্টকই দাও
কিম্বা হরষে ফুল ছড়াও—
পায়ে চলা পথে তবু ত আমার—
ও রাঙা চরণ তব বাড়াও ?

তোমার হিয়ায় গোপন কক্ষে—
জাগে যে নিত্য মম পরশ ;
শত অবহেলা উপেক্ষাতে ও
তাতেই হৃদয়ে জাগে হরষ।

অনন্তকাল বিজীত হয়েও
বন্ধু, আমার চির-বিজয়,
চির-মিলনের সঙ্গীত গাহে
শত বিরহে ও মম হৃদয়।

লায়লী-মজনু

গল্প-প্রতিযোগিতায় মনোনীত

মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, বি-এ, বি-টি,

"তারপর?"

"তারপর শুনবেন? আমাকে যুবকের দল 'মজনু' বলে ডাকত। কিন্তু আমি আমার 'লায়লী'কে জীবনে একটীবারও দেখিনি, এমন কি ভালওবাসিনি'।"

"বলেন কি! মজনু লায়লীকে ভাল না বেসে কি আর মজনু হ'তে পেরেছে? সূর্য্যকে বাদ দিয়ে সৌর-জগতের কথা যেমন, প্রেম বাদ দিয়ে "লায়লী-মজনু'র কথাও তেমন।"

"দেখুন, আজ বার বৎসর ধরে' শিক্ষা-বিভাগে কাজ করছি, এরি মধ্যে অন্ততঃ বিশবার আপনার স্কুলে আসা-যাওয়া করেছি, কখনও আপনার সঙ্গে এত কথা বলিনি।"

"আমি আজ ১৭ বৎসর এ স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, আমিও কোন দিন কারুর সাথে এত কথা বলিনি'। আজ বোধ হয় জীবনের উত্তমাংশ চ'লে গেছে। এখন অনেক সময় এই প্রশ্ন মনে আসে, আর কতদিন এ কৃত্রিমতাকে আশ্রয় করে বসে' থাকব?"

"ভালবাসি নাই—এমন কথাও বলতে পারি না—না সত্যই পারি না;—কিন্তু তা'কে তো কখনো দেখিনি'।"

"তবে কেমন ক'রে তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হ'ল?"

"পরিচয়ও হয়নি'।"

"বেশ, এ আরও আশ্চর্য্য।"

"হাঁ আশ্চর্য্যইবটে—"

"দেখুন, ইনস্পেক্টর সাহেব, প্রথম বার বৎসর তো আপনার সমক্ষে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আসিনি'। দাইয়ের মারফত কাগজ-পত্র পাঠিয়ে' কাজ চালিয়ে' নিয়েছি। তারপর একদিন দাই গয়র-হাজির, তাই বাধ্য হ'য়ে কাগজ-পত্র নিজেই আপনার কাছে নিয়ে এলুম। শেষে দেখি, আমার বা আপনার, কারুরই পর্দ্দা করবার বয়স নেই। সেই হ'তে আজ কয় বৎসর আপনি সময় মত এসে আমার স্কুলটা পরিদর্শন করে গিয়ে থাকেন এবং পরম আত্মীয়ের মত ইহার মঙ্গলার্থ উপদেশ দিয়ে থাকেন।"

"সেজন্যই শিক্ষয়িত্রী সাহেবা এখন আর আপনার সঙ্গে কথা বলতে বাঁধ বাঁধ ঠেকে না বা বড় একটা সঙ্কোচ বোধ হয় না। এখন আপনি পুরোপুরি আপনার জন হ'য়ে গেছেন। তবে প্রসঙ্গক্রমে এখন যে কথাটা উঠ্ল, জীবনে আর কখনও তাহা মুখে আনিনি।"

"শুনেছি, আপনি সাহেব-সুবার সঙ্গে দেখা করতেও এ ফকিরের বেশ পরিত্যাগ করেন না। কোন্ দিন থেকে এ ফকিরের বেশ নিয়েছেন?"

"সেই দিন থেকে যেদিন আমার বিয়েটা নিয়ে একটা ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াল এবং শেষে বিয়েটা পণ্ড হয়ে গেল।"

"যাকে আপনি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, তাকে আপনি মন-প্রাণ দিয়েই চেয়েছিলেন—তা নয় কি?"

"তা বোধ হয় নয়।"

"কি দক্ষিণদিকে চেয়ে রইলেন যে ?"

"শিক্ষয়িত্রী সাহেবা! আমাদের পূর্ব্বপুরুষের বাড়ীটাও ঠিক এইরূপ দক্ষিণ মুখ ছিল—এমনই দক্ষিণ দিকটা প্রায় দুই তিন মাইল পর্য্যন্ত খোলা ছিল। আর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে সমস্ত বাড়ীটা শীতল হ'য়ে যেত। আমাদের বাহির বাড়ীর প্রকাণ্ড পুকুরটার পাড়েও এমনি সমান সমান দূরে যত্নে ছেঁটে-কেটে দেওয়া কামিনী গাছের ঝোপ ছিল। দু'টী স্বপ্ন ঠিক একরূপ হয় না কিন্তু কল্পলোকের রম্য উপবনও দু'টী এক রকম হ'তে পারে দেখ্‌ছি। এমনি একটী পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে বসে গল্প করতে করতে কত চাঁদনীরাত আমরা ভোর ক'রে দিয়েছি।"

"কার সাথে গল্প করতে করতে?—আপনি ত বলেন—"

"না না, সেটা ছিল আমাদের বাড়ী। আমার পিতা ছিলেন একজন ছোটখাট জমীদার। বাড়ীর সকল ছেলেরা মিলে সেখানে বসে' গল্প করতাম—সেই কথাই বলছিলাম।"

"সেই বাড়ীর এখন কি হয়েছে ?"

"সে বাড়ী এখন নদীগর্ভে, এমন কি সে গ্রামেরও চিহ্ন নেই।"

"যা'ক সে কথা এখন, যে কথা বলছিলেন তাই বলুন না কেন ?"

"হাই স্কুলে ছয় কি সাত বৎসর পড়ার পর যখন আমার আর পড়াশুনা হ'ল না তখন দেশে আমার নাম রটল 'অপদার্থ।' কিন্তু তা হ'লে কি হয়? আমি যে হুশিয়ারপুরের জমীদার সাহেবের একমাত্র পুত্র—তাঁহার দশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী আমি 'গোলাম রসুল'। আমার বিয়ে ঠিক হ'ল দুই গ্রাম অন্তর বেলতলী গ্রামের মৌলবী আবদুল কাদের সাহেবের সুশিক্ষিতা কন্যার সহিত; —কি শিক্ষয়িত্রী সাহেবা, আপনি এমন হ'য়ে গেলেন কেন?—আপনার কি অসুখ করল নাকি ?"

"ইনস্পেক্টার সাহেব, ব'লে যান—বলে যান—

"শুনুন শিক্ষয়িত্রী সাহেবা, আজ আমার মস্তকের চার আনা আন্দাজ চুল সাদা হ'য়ে গেছে—যৌবনের সে কাহিনী আজ পর্য্যন্তও কারু কাছে বলিনি—"

"যার সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা হয়েছিল তা'কেতো আপনি ভালবাসতেন না—এমন কি দেখেনও নি, তবে সে ঘটনায় আপনার জীবনে এমন পরিবর্ত্তন আন্‌ল কি করে' ?"

"সব শুনলেই বুঝতে পারবেন। মৌলবী আবদুল কাদের সাহেব ছিলেন একজন জবরদস্ত 'দীনের' 'আলেম'। তিনি কন্যাকে 'দীনিয়া', তো উত্তমরূপে শিখিয়েছিলেনই —বাঙ্গালা ভাষাও মেয়েকে বেশ করে শিখিয়েছিলেন—"

"কি বলেন ইনস্পেক্টর সাহেব, দুই একটা বাঙ্গালা পরীক্ষাও কি মেয়েটী পাশ করেছিল না ?"

"হাঁ শুনেছি—সে তখনকার দিনের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাশ করে বৃত্তিও পেয়েছিল।"

"তারপর ?"

"তারপর যখন তার সাথে আমার বিয়ে ঠিক হ'ল তখন মেয়ের অপরাপর আত্মীয়বর্গ নাকি এইরূপ আলোচনা করতে লাগলেন যে এমন একটা শিক্ষিতা মেয়েকে এমন একটা অপদার্থের হস্তে দেওয়া আর তাকে জলে ফেলে দেওয়ার সমান।"

"আচ্ছা আপনাকে যে সবাই 'অপদার্থ' বলত তার মানে কি? আপনি গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগে এ চাকরী পেলেন কি করে ?"

"আমার লেখাপড়া হবে না মনে করে বাবা আমায় স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন।—তার প্রায় তিন বৎসর পর আমার জন্য এই বিবাহ স্থির হয়। তারপর কি হ'ল শুনে যান, বুঝতে পারবেন।"

"বলুন আপনার কাহিনী অদ্ভুত বটে।"

"মেয়ে যে আমাকে বিয়ে করতে একদম রাজী নয় এ সংবাদ আমাদের গ্রামেও এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু মেয়ের বাপ একজন পুরাদরের মওলানা। তিনি কোরাণে-কেতাবে পূর্ণবয়স্কা মেয়ের সম্মতি ও অসম্মতি সম্বন্ধে যাহাই পড়ে থাকুন না কেন, লোকাচার-ধর্ম্মের মূল্যই তিনি বেশী দিতেন বলিয়া মনে হয়। তিনি নাকি বলেছিলেন, 'যে মেয়ে পিতা-মাতা মুরুব্বীর নির্ব্বাচিত বরকে অস্বীকার করে সে মেয়ের মুখ তিনি দেখতে চান না।"

"মেয়ে আপনাকে চায় না একথা শু'নে আপনার মন কেমন হ'য়েছিল ?"

"আমি শুনেছিলাম মেয়ে অসাধারণ রূপবতী, আর লেখাপড়ায় সবার সেরা—যেটা আয়ত্ব করা আমার হ'য়ে উঠেনি। এজন্য আমি তা'কে পেতে বড় আগ্রহান্বিত হ'য়ে উঠেছিলাম।"

"তবেনা বল্লেন আপনি তা'কে ভালবাসেন নি ?"

"না, আমার এ ভাবকে ঠিক ভালবাসা বলে না। সে বিদ্বান্ আর বিদ্যা আয়ত্ব করা আমার ক্ষমতায় কুলায়নি'; তার উপর সে রূপবতী—আমি তার রূপ-যৌবন ভোগ করতে লালায়িত হ'য়ে উঠেছিলাম। এ একটা লালসা মাত্র। প্রেমিকার প্রতি আমার বিশেষ কোন শ্রদ্ধা ছিল না, যাহা ভালবাসার প্রাণস্বরূপ। 'সে না হ'লে আমার জীবন বৃথা' আমার এমনতর কোন অবস্থা হয়নি।"

"তারপর ?"

"তারপর নির্দ্দিষ্ট দিবসে আমি বরযাত্রী হ'য়ে কনের বাড়ীতে হাজির হ'লাম।"

"ভাল, আপনার বাবার মত ছিল কি ?"

"আমায় বিবাহ করতে মেয়ে রাজি নয় এই কথা শুনে তিনি হেসেই অস্থির হ'য়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'কালে কতই না হ'বে!' মৌলবী আবদুল কাদের সাহেব ছিলেন নামজাদা শরীফ। তাঁর সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা কন্যাকে পুত্রবধূরূপে ঘরে আনার গৌরব তাঁর পাওয়া চাই-ই। অথচ শিক্ষিত মেয়ে আনতে হ'লে শিক্ষিত ছেলে তৈরী করার দরকার, এ বিচারটা তাঁর ছিল না—"

"কিন্তু ইনস্পেক্টর সাহেব, আপনি তাঁকে অবিচার করছেন। শিক্ষিত হওয়াটা তো আপনারই করণীয় ছিল।"

"বটে, কিন্তু যখন আমি তা করিনি, তখন সে অবলা উপায়হীন কোমল বালিকাকে আমার সাথে বেঁধে কেন তার সর্ব্বনাশ করতে চাইলেন ?"

"আচ্ছা তিনি যদি এ বিবাহ বাদ দিতেন, আপনি রাজী হতেন ?"

"হাঁ, আমাকে একটু বুঝা'লেই আমি রাজি হতেম বোধ হয়। আমি বললাম না যে আমি এ বিবাহ করতে মরিয়া হয়েছিলাম—।"

"তারপর ?—"

"তৎপর বিবাহের দিন আমরা সে বাড়ীতে পৌছে শুনি চাপাসুরে ক্রন্দন হইতেছে, কি করুণ সে ক্রন্দন! আমার মনে হ'ল সে ক্রন্দনে গাছের পাতা ঝরে' পড়বে, খোদার আরশ কেঁপে উঠ্‌বে। শুন্‌লাম এ মেয়েরই ক্রন্দন! আরও শুন্‌তে লাগলাম কনের পিতার আস্ফালন। তিনি চীৎকার করে বল্‌তেছিলেন, "লানতি! তোর কেন শিশুকালে মরণ হয়নি! তোর মত কলঙ্কিনী মেয়ের বাপ হওয়ার চেয়ে যে আমার মরণও ভাল ছিল! বেয়াদব! কমবখ্‌তী! বাপ-মা যেখানে বিয়ে দেয় সেখানে তুই রাজি হবিনে!' ইত্যাদি—বুঝ্‌তে পারলাম্ মেয়ে অপদার্থকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে নারাজ! তাই তার উপর এত গর্জ্জন। সেই হ'তে আমার মনে কি একটা বেদনা ঢুকে' গেল।"

"সে'টা কি ?"

"হায়রে! কি যন্ত্রনাতেই আজ এ রমণীর মন দগ্ধ হচ্ছে! হিঁদুদের বলির পাঁঠাও বুঝি যূপকাষ্ঠের দিকে—এর চেয়ে অধিক সম্মতি নিয়ে অগ্রসর হয় যতখানি সম্মতি নিয়ে এ মেয়েকে আমায় পতিত্বে বরণ করতে হ'বে। এ সব ভেবে বিয়ের পোষাক আমার নিকট বিষাক্ত হয়ে উঠ্‌ল। একটী সুশিক্ষিত রমণীর বেদনায় আমার প্রাণ শিউরে' উঠ্‌ল। আমি ভাবতে লাগলাম ইচ্ছা করলে দুদিন পূর্ব্বে আমি অন্যায় রোধ করতে পারতাম। 'আমি এ বিবাহ করব না' একথা প্রকাশ করে' দুদিন আগে দেশ ত্যাগ করলেই পারতাম। এ জগতে সুন্দরী মেয়ের কি অভাব! একে না হলেও তো আমার চলতো! দারুণ অনুতাপে আমার হৃদয় ছেয়ে গেল।"

"তারপর বিয়ে করে কি করলেন ?"

"শুনুন না ;—আজ আমার জীবনের মধ্যাহ্ন বুঝি প্রায় শেষ ; তাই এখন যেন কতকটা সঙ্কোচশূন্য হয়ে পড়েছি। আজ পর্য্যন্ত এ কাহিনী আর কাকেও বলিনি, আজ কোন্ নিয়তি আমাকে এ গল্প বলাচ্ছে জানি না। যা' হ'ক, কনের ক্রন্দন ক্রমে থেমে গেল। শেষে আমাদের জন্য সংবাদ এল, 'মেয়ের হঠাৎ অসুখ করেছে। আজ আমাদের খাওয়া-দাওয়া করে' বিশ্রাম করতে হবে, কাল বিয়ে হবে।"

"আচ্ছা ইনস্পেক্টর সাহেব, ইউছফ ও জুলেখার নাকি বৃদ্ধ বয়সে মিলন হয়েছিল এবং তা'রা নাকি আল্লার অনুগ্রহে যৌবন ফিরে পেয়েছিলেন। এর কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে কি ?"

"সন্তোষ ও আনন্দের পরশমণি বৃদ্ধকেও যুবায় পরিণত করে। সত্যকার প্রেমে বার্দ্ধক্য ও জরা নাই!"

"আচ্ছা বলে যান,—তারপর—"

"পরের দিন বিবাহ হবে কি? পরের দিন আর মেয়েকে পাওয়া গেল না। আবদুল কাদের সাহেবের একটা আধ-পাগলা দাসী ছিল। সে নাকি বলেছিল, 'দুপুর রাত্রে লাল সাড়ী পরে' মেয়েটা গাঙের ঘাটে ডুব দিল গো! তখন কি হয়েছে কারুর বুঝতে বাকী রইল না—একি শিক্ষয়িত্রী সাহেবা! আপনি কেন থেকে থেকে এমন লাল হ'য়ে উঠ্ছেন, আপনাকে কখনো এমন দেখিনি!"

"আমার একটা ব্যারাম আছে।"

"আচ্ছা না হয় আপনি শু'তে যান।"

"না আচ্ছা বলুন, আপনি 'অপদার্থ' থেকে 'পদার্থ' হ'লেন কি ক'রে?"

"বিয়েতো আর অবশ্য হ'ল না। তারপর এ চিন্তায় আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল যে, একটা সুন্দর জীবন, একটা ফুলের ন্যায় বিকাশোন্মুখ জীবন নষ্টের কারণ হ'লেম আমি। আরও আমাকে ব্যথিত ক'রে তুলল এই কথায় যে আমি 'অপদার্থ' বলেই এত অনর্থ সংঘটিত হ'তে পারল। সে দিন কি এক আগুণ আমার প্রাণে জ্বলে উঠ্ল। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম আমার 'অপদার্থ' নাম ঘুচাতে হবে। কিন্তু এ ব্যথা আমার ঘুচলনা যে একটী কুসুম-কোমল বালিকা আমার অবহেলায় ধ্বংস হ'ল।"

" 'অপদার্থ' নাম ঘুচালেন কি ক'রে?"

"আমি আবার পড়াশুনা আরম্ভ করলাম। তারপর আমি আর কোন পরীক্ষায় ফেল হইনি'। বড় অধিক বয়সে বি-এ পাশ করলাম ব'লে শিক্ষা বিভাগ ছাড়া আর কোথায়ও চাকরী জুটল না।"

"কিন্তু এ ফকীরের বেশ নিয়েছেন কেন?"

"কিন্তু শত শত পড়াশুনার ভিতর ও শত প্রকার কার্য্যের অন্তরালে সেই বেদনাক্লিষ্ট নদীতে-পতনোন্মুখ মেয়েটির আবছায়া ছবি আমার সম্মুখে এসে হাজির হ'ত। নদীর যে ঘাটে সেই মেয়েটী জলে ঝাপ দিয়েছিল, ছুটীর দিনে আমি সেই স্থানে যেয়ে বসে' থাকতাম। আজ এই পোনর বৎসর সেই ঘাটে গিয়ে নদীর দিকে চেয়ে থাকৃতে থাকৃতে আমার চক্ষু ঘোলা হ'য়ে গেছে। শেষে যেন আমি প্রায়ই লক্ষ্য করতাম, লাল-শাড়ী-পরা একটী মেয়ে রাত্রির আঁধার ভেদ করে' ধীরে ধীরে পাকা ঘাট বেয়ে জলে নামছে; এক পা—দুই পা—শেষে অগাধ জলে—শেষে ভেসে ভেসে ডুবে চলেছে! সেই একবার ভাসা ও একবার ডুবার মধ্যে মিটি মিটি তারার আলোকে আমি তার অশ্রু সিক্ত মুখখানি যেন এক একবার দেখতে পেয়েছি! আজ পর্য্যন্তও, শিক্ষয়িত্রী সাহেবা, আমার সেই বর হবার স্মৃতি এবং আমাদের সেই লুপ্ত বসত-বাড়ীর স্মৃতি বুকে ভার হ'য়ে আছে। কলেজের বোর্ডিং এ থাকাকালীন আমি নাকি প্রায়ই ঘুমের মধ্যে চীৎকার ক'রে উঠ্তাম, "লায়লী তুই বেঁচে ওঠ—আমি আর তোকে বিয়ে করতে চাইব না!' এখন, শিক্ষয়িত্রী সাহেবা, বলুন আমি সত্যই তা'কে ভালবাসি কিনা—কিন্তু সে যে আমার স্মৃতি-রাজ্যের 'লায়লী'—এ চক্ষে তো আর তা'কে দেখব না!"

"কিন্তু যদি আজ সে আপনার সামনে এসে দাঁড়ায়—আর—"

"আপনি কাঁপছেন কেন? বলুন—বলুন—"

"আর সেও যদি এমনিতর কাহিনী বলে! যদি সে বলে যে মরণ তাকে নেয় নি। সেও এমনি তার মজনুর জন্যে আজীবন অপেক্ষা করে আছে—"

"কি বলছো—তুমি,—

"আমিই সেই হতভাগ্য নদীতে-পড়ে-যাওয়া-মেয়ে! ওরকম করছেন কেন? বসুন! চেয়ে দেখছেন কি? এই বাড়ী এ আমার নিজের তৈরী এ সমস্তই আজ থেকে আপনার—"

"বাড়ীতে যা কিছু আছে, সব নিয়ে, জীবন্ত, অজীবন্ত?"

"হাঁ, গো, হাঁ!"

ডাঃ ইক্‌বালের কাব্য-পরিচয়

খোন্দেগার মোহাম্মদ আবুবকর

ইক্‌বাল উর্দ্দু সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। Renaissance-বলিষ্ঠ পাশ্চাত্য-সাহিত্য ভারতে প্রবেশ করা মাত্র শিক্ষিত ভারতবাসীর চিন্তাজগতে ও সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি প্রাদেশিক সাহিত্যে রেণেসাঁর সূত্রপাত হইল; কিন্তু উর্দ্দু-সাহিত্য কোন প্রকারে তাহার স্থবির (Classical) ধারায় অগ্রসর হইতে লাগিল। "মীর" "সওদা" ইত্যাদি পর্য্যন্ত সকল উর্দ্দু কবিই কবিত্বকে প্রেম প্রেমিকতা ও তসওফে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। স্বনামখ্যাত কবি মির্জ্জা গালেব উর্দ্দু-সাহিত্যে এক নবযুগের সূত্রপাত করিলেন। পরে গালেবের প্রভাবে 'হালী' 'শিব্‌লী' ইত্যাদি অর্দ্ধ-আধুনিক কবিগণ অংশতঃ প্রকৃতি ও মানবের ব্যথা-বিরহ ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ইত্যাদিকে কাব্যের এক প্রধান অঙ্গরূপে গ্রহণ করিলেন। তখন হইতে আধুনিক পাশ্চাত্য-সাহিত্যের ন্যায় উর্দ্দু কাব্যেও প্রকৃতি, মানব ও সমাজ প্রবেশ লাভ করিল। উর্দ্দু-সাহিত্যের বর্ত্তমান রেণেসাঁ প্রাথমিক ভাবে মির্জ্জা গালেবের সাধনা-পুষ্ট। কবি ইক্‌বালের লোকাতীত শ্রম, সাধনা ও প্রতিভা এখন উহাকে বর্ত্তমান অবস্থায় আনয়ন করতঃ বিশ্বের জীবন্ত-সাহিত্য সমূহের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছে।

ইক্‌বালের পারসী কাব্য পারসী সাহিত্যে এক জীবন্ত দান। প্রসিদ্ধ পারস্য কবি জামীর জনৈক অনুরক্ত একদিন ভক্তিগদ্‌গদ্‌ চিত্তে—

"نوبت سخن چون بجامی رسید
بہار سخن را تمامسے رسید"

বলিয়া জামীর সহিতই পারসী কাব্যের বসন্ত শেষ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু স্বনামখ্যাত পারসী কবি কানী ও তরুণ মুসলিম-জগতের শ্রেষ্ঠতম কবি ইক্‌বাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত এই অভিমতের অসত্যতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। অধুনা দুই তিন শতাব্দীর পার্সী সাহিত্যে কোন উল্লেখযোগ্য কবির আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। কিন্তু একথা আমরা জোরের সহিতই বলিতে পারি যে, ইক্‌বাল কোন দিক দিয়া হিজরী অষ্টম শতাব্দীর পারস্য-কবিদের গৌরবময় আসনে বসিবার অযোগ্য নহেন বরং বর্ত্তমান যুগে উক্ত মৃত-সাহিত্যের প্রাণদান করিয়াছেন ইক্‌বাল।

ইক্‌বাল শুধু চিন্তায় নহে ছন্দেও যুগান্তর আনিয়াছেন। অধিকাংশ কবিতায় তিনি প্রাচীন Classical ছন্দ ব্যবহার করিলেও অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার স্বাধীন কবিত্বধারা এই প্রাচীন ইলমে-উরুযের (ছন্দবিজ্ঞানের) সঙ্কীর্ণ বাঁধকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে উর্দ্দু ও পার্সী কাব্য পুরাতন ছন্দ-বিজ্ঞানের একঘেয়েমীর কবল হইতে মুক্ত হইয়া এক অভূতপূর্ব্ব বৈচিত্র্য ও মধুরিমায় ভরিয়া উঠিয়াছে। যখন নিশা-শেষের সৈন্য শিবিরের জাগরণ-ব্যাণ্ডের নট-তালে তাঁহার

از خواب گران خراب خیز!
ازخواب گران خیز!

ইত্যাদি হৃদয়-স্পর্শী কবিতাবলী আবৃত্তি করা হয় তখন একান্ত অলস মন ও তাহার তালে তালে এক বিপুল কর্ম্মোন্মাদনায় নৃত্য করিয়া উঠে।

কবিত্বের বৈদ্যুতিক 'রুহ', রচনাভঙ্গির অনুপম সৌন্দর্য্য, ভাবের মনোহর মাধুর্য্য, বর্ণনার বিস্ময়কর প্রাঞ্জলতা, উদ্দেশ্যের উজ্জ্বল অকপটতা, ও আদর্শের প্রতি অনন্ত আসক্তিতে তিনি প্রাচ্যের কবি সমাজের অতি উর্দ্ধে নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল, ভাস্বর হইয়া রহিয়াছেন।

তাঁহার কাব্যে এতটুকু কৃত্রিমতা বা বানাওটী নাই, নিগূঢ় তত্ত্ব-কথা শুনাইবার চেষ্টা নাই, পাণ্ডিত্যের ভাণ নাই—আছে কবি-প্রাণের কতকগুলি সূক্ষ্ম অথচ আশ্চর্য্য ভাবে উদার অনুভূতি। আমরা রবীন্দ্রনাথের "নৈবেদ্য," "চৈতালী" ইত্যাদি কয়েকখানি জাতীয়-কাব্য-গ্রন্থের সহিত পাশাপাশি ভাবে ইক্‌বালের "তসবীরে দর্দ" "শিক্‌ওয়াহ" "জওয়াবে শিক্‌ওয়াহ" "পয়ামে-মাশ্‌রিক" "আশ্‌রারে খুদী" "রামুযে বেখুদী" ইত্যাদি জাতীয় কাব্য পাঠ করিয়াছি। কিন্তু মাতৃভাষায় লিখিত রবীন্দ্রনাথের কাব ও ইক্‌বালের কবিতার ন্যায় অমন বৈদ্যুতিক ভাবে প্রাণস্পর্শ

করিতে পারে নাই। এই (কওমী) কবিতাগুলির মধ্যে ইক্‌বাল যে নির্ভীক বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা অনন্যসুলভ বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

রচনাভঙ্গি ও বর্ণনা-সারল্যে বর্ত্তমান জগতে রবীন্দ্রনাথ অপ্রতিদ্বন্দ্বী; কিন্তু ইক্‌বাল তাঁহার সমগ্র উর্দ্দু রচনায় যে অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও সারল্য দেখাইয়াছেন তাহাতে তিনি কোন দিক দিয়া এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যোগ্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার অযোগ্য নহেন। তাঁহার অধিকাংশ পার্সী কবিতাও অপ্রত্যাশিত ভাবে সুন্দর ও সরল। রবীন্দ্রনাথ যেমন বাংলা সাহিত্যিকে মাইকেলী, বঙ্কিমী ভাষার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া এক অতি সরল সুন্দর রূপ দেওয়ার জন্য বিখ্যাত; ডাক্তার ইক্‌বালও তেমনই 'গালেব' 'সাওদা' ইত্যাদির বর্ণনা-কাঠিন্য হইতে উর্দ্দু-সাহিত্যকে উদ্ধার করিয়া একটি সরল, সুন্দর অথচ ভাবময় রূপ দেওয়ার জন্য প্রসিদ্ধ।

ইক্‌বালের জাতীয়-কাব্যে জগতের মঙ্গল-সাধনের এক সত্যিকার অকপট স্বপ্ন উর্দ্ধনেত্র নার্গিস কুসুমের ন্যায় জাগ্রত রহিয়াছে। তাঁহার মতে গণতান্ত্রিক খিলাফতই মুসলমানের আদর্শ শাসনপ্রণালী ছিল। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক নীতির প্রতিষ্ঠাই তাঁহার জাতীয় কাব্যের শাশ্বত-স্বপ্ন—প্রধানতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি এতই অটল ও অকপট যে, মুসলমানগণ যখন খিলাফত-প্রথা বর্জ্জন করতঃ সাম্রাজ্যবাদনীতি গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধ-পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেন; তখন ইক্‌বালের অন্তরের মানব তাহাদের ইতিহাস হইতে বেদনা-বিগলিত চিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সেই সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি বলিয়া বাগ্‌দাদ, দামেস্ক, গ্রানাডা ইত্যাদি মুস্‌লিম-জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প ও বাণিজ্যের স্বর্ণকেন্দ্র হইলেও ইক্‌বাল এই গুলির নামে অত গৌরব অনুভব করেন নাই, যত করিয়াছেন ইস্‌লামের প্রথম গণতান্ত্রিক-শহীদানের কোরবান-গাহ কারবালার নামে। মুসলিম-সভ্যতার এই সমস্ত লীলাক্ষেত্রের সহিত কারবালার তুলনা করিয়া কারবালা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন;—

"شوکت شام و فر بغداد رفت
سطوت غرناطه هم از یاد رفت
تار ما از زخمه اش لرزان هنوز
تازا از تکبیر از ایمان هنوز"

অর্থাৎ সিরিয়ার (দামেস্কের) সমৃদ্ধি ও বগ্‌দাদের বিত্ত বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, গ্রানাডার গৌরব স্মৃতি-রাজ্য ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি আমাদের হৃদ্‌তন্ত্রী (কারবালার) ঝঙ্কারভারে আন্দোলিত; অদ্যাপি (কারবালার) তক্‌বীরে আমাদের ঈমান সঞ্জীবিত।"

আদর্শে তাঁহার অচলা আসক্তি।

"اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی"

"ভ্রাতৃত্বের বিশ্ববিজয় ও প্রেমের সাম্রাজ্যবাদ"ই তাঁহার কাব্যের সত্যিকার আদর্শ। কারণ তিনি

"یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی"

"ইহাকেই প্রকৃতির উদ্দেশ্যও মুসলমানীর অন্তর্নিহিত গুপ্ত-সত্য" বলিয়া বিশ্বাস করেন। তিনি এক স্বর্গীয় ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া নিখিল বিশ্বকে হিংসা দ্বন্দ্ব মুক্ত করিয়া সুন্দর শান্তিময় করিয়া তুলিতে চাহেন, এবং অন্তরের সহিত একান্ত বিশ্বাস করেন যে রক্ত ও বর্ণের ভেদ এবং ভৌগলিক জাতীয়তা এই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের প্রধানতম অন্তরায়। একথাও এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, তিনি একমাত্র ইস্‌লামকেই মানবের স্বভাব-ধর্ম্ম ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের প্রাণশক্তি বলিয়া অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন এবং তজ্জন্যই তিনি ইসলাম ও স্বভাবকে সমর্থকরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। তাই তিনি সমস্ত বিশ্ববাসীকে "স্বাভাবিক মুসলমান" পরিকল্পনা করিয়া জ্বলন্ত ভাষায় এই বিশ্বভ্রাতৃত্বের অন্তরায়গুলি দূর করিতে আহ্বান করিতেছেন।

"بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا
نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی"

অর্থাৎ "বর্ণ ও রক্তের প্রতিমা ধ্বংস করিয়া (স্বাভাবিক ভ্রাতৃত্বের) ধর্ম্ম (ইসলামে) আত্ম-বিলোপ কর; যেন তুরাণী ইরাণী আফ্‌গানী ইত্যাদি (ভৌগলিক জাতীয়তা সূচক বিদ্বেষাত্মক) কিছু অবশিষ্ট না থাকে।" তাঁহার সমগ্র জাতীয়-কাব্য এই মহা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার আকুলতায় পরিপূর্ণ। যেখানে তিনি মুসলমানের উন্নতি-পিপাসায় আকুল, সেখানেও তিনি মুসলমান রাজশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠান চাহেন না, তিনি চাহেন মুসলমানের 'ভ্রাতৃত্বের বিশ্ব-বিজয়-প্রেমের রাজ-শক্তি'। তাই তিনি পতিত মুসলমানকে হৃত সাম্রাজ্যের জন্য শোক করিতে নিষেধ করিতেছেন;—

অর্থাৎ "তোমার ভিত্তি যদি আন্দোলিত হয়, নিরুদ্দম হইও না। কারণ হে একত্ববাদের রহস্য! সাম্রাজ্য তোমার ব্যাখ্যা নহে। তুমি সেই যোদ্ধ-পুরুষ যাহার অসি ইসলাম। বিশ্ব-অস্তিত্বের গঠন-প্রণালীতে তোমার ভাগ্য স্বতন্ত্র। এবং—

ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوع انساں کو
اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا

অর্থ, স্বার্থ মানবজাতিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়াছে; অতএব ভ্রাতৃত্বের বিবরণ ও প্রেমের রসনা হইয়া যাও।

ইক্‌বালের কাব্য সাধারণতঃ (১) দার্শনিক (২)

আধ্যাত্মিক (৩) প্রেম বিষয়ক (৪) প্রকৃতি বিষয়ক (৫) মানব ও সমাজ সম্বন্ধীয় ;—এই কয়েক ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

ডাক্তার ইক্‌বাল একজন দর্শনের খ্যাতনামা ডাক্তার। দ্রষ্টা হিসাবে ইক্‌বালের আসন নাকি রবীন্দ্রনাথেরও উচ্চে। তাঁহার একটি নিগূঢ় অন্তর্দৃষ্টি আছে, যদ্বারা তিনি বিশ্বের বহু অপ্রিয় বস্তুতেও সুন্দর সত্যের অনুসন্ধান পাইয়াছেন। এক্ষেত্রে তাঁহাকে একজন Optimist বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ Optimist বা Pessimismএর বালাই ইক্‌বালকে স্পর্শ করে নাই। ব্যথাতেও তিনি আনন্দের সন্ধান পাইয়াছেন :—

دیدۂ بینا میں داغ غم چراغ سینا ہے
روح کو سامان زینت آہ کا آئنہ ہے
حادثت غم سے ہے انسان کی فطرت کی کمال
غازہ ہے آئنہ دل کیلئے گرد ملال
طائر دل کے لئے غم شہپر پرواز ہے
راز ہے انسان کا دل غم انکشاف راز ہے

অর্থাৎ চক্ষুষ্মানের চক্ষে ব্যথার রেখা হৃদয়ের প্রদীপ ; আত্মার সুষমা "আহ্" ইত্যাদি বেদনাসূচক শব্দের দর্পণে নিহিত। বিষাদকর ঘটনায় মানব-প্রকৃতি পূর্ণতা লাভ করে ; হৃদয়-দর্পণের জন্য বিষাদের ধূলি রক্তিম প্রসাধন-চূর্ণ (Red-powder for use)। মন-বিহঙ্গের জন্য ব্যথা উড়িবার প্রধান পক্ষ ; মানুষের হৃদয় একটি রহস্য—ব্যথা তাহার ব্যাখ্যা।

غم روح کا ایک نغمۂ خاموش ہے
جو سرود بربط ہستی سے ہم آغوش ہے

অর্থাৎ ব্যথা, ব্যথা নহে বরং পরমাত্মার (রুহের) এক নীরব রাগিণী ; যাহা অস্তিত্বের চন্দন-বীণার রাগের সহিত এক ক্রোড়ে অবস্থিত।" 'তক্‌লীদ' বা অন্ধ-অনুসরণ আযাদ-বুদ্ধি মানব মাত্রেরই রুচি-বহির্ভূত, কিন্তু তাহাতেও ইক্‌বাল এক সুন্দর সত্য দেখিয়াছেন। জাতির জীবনী-শক্তি যখন হারাইয়া যায় তাঁহার মতে তখন 'তক্‌লীদ'ই শ্রেষ্ঠ পন্থা, কারণ মতভেদের ধাক্কা সে সহিতে পারে না। তাহা ছাড়া এই সময় individual বা 'ফর্‌দে'র মতও সাধারণতঃ غرض آلود বা স্বার্থ মিশ্রিত হইয়া থাকে। তিনি বলেন :—

"যখন জীবনের গঠন বিলুপ্তপ্রায় হয় জাতি যখন অন্ধ-অনুসরণে সজীব হয়। আমি নাড়ী পরীক্ষকের নিকট শুনিয়াছি যে, নাড়ীর গোলযোগ জীবনচ্ছেদ করে।" এতদ্ব্যতীত মতভেদ ও ঝগড়া ইত্যাদি সাধারণতঃ আমরা ঘৃণা করিয়া থাকি। কিন্তু ইক্‌বাল বলেন, মতভেদে জাতির জীবনী-শক্তি অনুভূত হয়। জাতি একটি মানব দেহের মত ; মতভেদ ও ঝগড়া উক্ত দেহের Heat, Temperature বা তাপের মত। দেহে তাপ থাকিলে যেমন বুঝা যায় মানব জীবিত আছে তদ্রূপ জাতিদেহে মতভেদ থাকিলে বুঝা যায় যে উহার individual বা 'ফর্দ' জীবিত আছে।

پندار বা Idealistic ভাবকে ইক্‌বাল ঘৃণা করেন। তিনি বলেন এই ভাব ভারতের Material activity কে নষ্ট করিয়াছে।

আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়াও ইকবালের কাব্য মৌলিক ও অতুলনীয়। তিনি বলেন দৃষ্টি থাকিলেই 'মহা-আলো' দেখিতে পাওয়া যায় :—

جلوہ طور تو موجود ہے موسی ھی نہیں

অর্থাৎ তুরের জ্যোতিঃ ত আছেই মুসাই নাই। তিনি সকলকে আপনার ভিতরে খোদার জ্যোতি সৃষ্টি করিতে বলিতেছেন :—

অর্থাৎ কতদিন আর মুসার মত 'তুরে' প্রতীক্ষা করিবে। স্বীয় অস্তিত্ব হইতে সিনাই পর্ব্বতের 'শিখা' প্রকাশিত কর। ইক্‌বালের আধ্যাত্মিক কবিতা কখনও Pantheistic হয় "همه اوستی" বলিয়া মনে হয় যথা :—

صحرا و دشت و در میں کسار میں وھی ہے
انسان کے دل میں تیرے رخسار میں وھی ہے

যিনি মাঠভূমি ও গৃহে পর্ব্বতে তিনিই, মানব চিত্তে তোমার কান্তিতে তিনিই।

ইক্‌বালের প্রেম-বিষয়ক কবিতা অল্প, কারণ তিনি গজল বেশী রচনা করেন নাই ; তাহা ছাড়া প্রেম বিষয়ক কবিতা উর্দ্দু-সাহিত্যে পুরাতন আবহমানকাল প্রচলিত, অতএব একঘেয়ে। কিন্তু প্রেম সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অতি উচ্চে, তিনি বলেন :—

"আমার অস্তিত্বের মূর্ত্তি ঘৃণিত অসহায় ও অকর্ম্মণ্যভাবে পড়িয়াছিল। প্রেমরূপ ভাস্কর আমাকে খোদাই করিল। আমি আদম হইলাম। বিশ্বের 'কেমন' (quality) ও 'কত' (quantity) সম্বন্ধে সুপণ্ডিত হইলাম।

ইক্‌বালের প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতাগুলি তাঁহার গভীর সৌন্দর্য্য-অনুভূতির পরিচয় দেয়। "পৃথিবীর ফল-ফুলে, কুয়াসাবৃত গিরিচূড়ায়, জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে, ছোট একটি ফুলে ক্ষীণ-প্রাণ খদ্যোতের মধ্যে কবি যেখানে যে সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাই মুক্ত-চিত্তে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত এই নিগূঢ় পরিচয় পাশ্চাত্যে আমরা ওয়ার্ডওয়ার্থ, শেলী এবং কীট্‌সের কবিতায় দেখিয়াছি ; এ দেশের রবীন্দ্রনাথও বহিঃপ্রকৃতির সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। কবি ইক্‌বালের মধ্যেও তাহাই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে।" নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য "নূতন করিয়া

দেখিবার শক্তি ইকবালের আছে।" "নির্জ্জন বনে কোন একটি নামহীন পুষ্প বা রাত্রি-অবসানের হতঃজ্যোতি কোন নক্ষত্রের পানে চাহিয়া অকস্মাৎ তাঁহার কবি-চিত্ত ব্যথায় উদাস হইয়া উঠিয়াছে—তাহাদের মধ্যে তিনি নূতন কাহিনী আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই আবিষ্কারের ফলে কবি উল্লাস বোধ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, কি এক অতিন্দ্রিয় বেদনাও অনুভব করিয়াছেন। সেই কারণেই ইক্‌বালের রচনা কেবলমাত্র হাহুতাশ বা দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হয় নাই।" তাঁহার এই সৌন্দর্য্য-দৃষ্টিতে একটি Spontaneousness আছে। তিনি যাহা দেখিয়াছেন আপনা আপনিই দেখিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইক্‌বাল সৌন্দর্য্যের ہمآہنگی বা সমগ্রতা উপলব্ধি করিয়াছেন কারণ তাঁহার দৃষ্টিতে বা 'ফিক্‌রে' একটা গভীর 'মস্তি' বা তন্ময়তা আছে। ইক্‌বালের আর একটি বিশেষত্ব এই যে তিনি তাঁহার প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাসমূহে বৈজ্ঞানিক Law ও Theory কে ও এক একটি কবিত্বপূর্ণ রূপ দিয়াছেন। সৌর-করে উদ্ভিদ-জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, উদ্ভিদ-শাস্ত্রের এই সত্যকে তিনি কবিতায় প্রকাশ করিতেছেন, পুষ্পের সৌর-কর-পানের দৃশ্য দেখুন :—

جب دکھلاتی ہے سحر عارض رنگین اپنا
کھول دیتی ہے کلی سینۂ زرین اپنا

অর্থাৎ যখন সুন্দর প্রভাত তাহার রঙীন বদন প্রকাশ করে তখন কুসুম (তাহার চুম্বন সুধা পান করিবার জন্য) স্বীয় (যৌবন-কামনা-ভরা) সুবর্ণ খচিত উরস খুলিয়া দেয়। তাহা ছাড়া সে প্রেমের আবেগে

"سامنے مہر کے دل چیر کے رکھدیتی ہے"

সূর্য্যের সম্মুখে হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া রাখে" এবং

"کسقدر سینہ شگافی کے مزے لیتی ہے"

"কেমন (প্রেম-লোভে) হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দেওয়ার মধু উপভোগ করে।" ইক্‌বালের নৈসর্গিক বিবরণগুলি ও কবিত্ব-মধুরিমায় পূর্ণ। কাল বৈশাখী সন্ধ্যার বিবরণে বলিতেছেন,—

"প্রথম প্রথম কালো কালো মেঘ উঠিল, যেন কোন হুর-কিশোরী তাহার বেণী খুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ধরণী দাবী করিতেছিল যে সে গগন। স্থান বলিতেছিল যে সে স্থিতিহীন।"

ইক্‌বালের মানব ও সমাজ সম্বন্ধীয় কবিতাসমূহ বিশ্বের এক বিস্ময়। মানব ও সমাজ সম্বন্ধে অমন সুন্দর সত্যিকার ধারণা, অমন আবেগভরা অকপট মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা এ যাবৎ আর কাহারও কাব্যে পাই নাই। তিনি এক দুর্ব্বল পরাধীন, জীবনী-শক্তিতে অবিশ্বাসী জাতিকে বলিতেছেন :—

(হে মানব) "শাশ্বত খোদার শক্তির হস্ত তুমি, রসনা তুমি। হে অসতর্ক, দৃঢ় আত্ম-বিশ্বাস সৃষ্টি কর কারণ তুমি ভ্রান্ত ভয়ের নিকট পরাজিত রহিয়াছ। গৃহ (পৃথিবী) নশ্বর কিন্তু হে গৃহবাসি, কালের অনাদি অনন্ত তোমার। খোদার শেষ সু-সমাচার তুমি, শাশ্বত তুমি।"

ইক্‌বালের মানব ও সমাজ সম্বন্ধীয় কবিতাবলীর উপর হালীর জাতীয় কাব্যের অনেকটা ছাপ পড়িয়াছে কিন্তু তাহাতে ইক্‌বালের মৌলিকতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই! এতদ্ভিন্ন 'হালীর' সমগ্র জাতীয়-কাব্য 'ভারতীয় মুসলমানের' জাগরণের বাণীতে পরিপূর্ণ; কিন্তু ইক্‌বালের 'পয়গাম' (Message) সমগ্র জগতের জন্য। তাঁহার কবি-হৃদয় প্রথমেই মাতৃভূমি ভারতবর্ষের জন্য কাঁদিয়া উঠিয়াছিল।

رلاتا ہے ترا نظارہ اے ہندوستان مجھکو
کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں

অর্থাৎ "হে হিন্দুস্থান, তোমার দৃশ্য আমায় কাঁদায় কারণ সকল কাহিনীর মধ্যে তোমার কাহিনী শিক্ষাপ্রদ (বা তিক্ত অভিজ্ঞতার বিষয়)

ভারতের অধঃপতনের কারণ সমূহ এই স্বদেশ-প্রেমিক কবির বেদনা-সজল চক্ষে যেরূপ ভাবে ভাসিয়া উঠিয়াছে, তেমন ভাবে কোন সমালোচকের দৃষ্টি অনুবীক্ষণেও ধরা পড়ে নাই। তিনি বলেন প্রাচীন ভারতের Self-negation নীতি ভারতবাসীর Individual ambitionকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া এখানে কোন অত্যাচারী রাজ-শক্তির বিরুদ্ধেও তেমন কোন উল্লেখযোগ্য Rising বা জাগরণ হয় নাই। ভারতের Individualএর একটা 'খুদি' বা আত্ম-অনুভূতিই ছিল না। প্রাচীন ভারতের নীতি "বাসনার বিসর্জ্জন" ইক্‌বাল পছন্দ করেন না :—

زندہ را نفی تمنا مردہ کرد
شعلہ را نقصان سوزا فسردہ کرد

অর্থাৎ জীবিতকে বাসনার বিসর্জ্জন মৃত করিয়া দিয়াছে। অগ্নি-শিখাকে উত্তাপের হ্রাস নির্ব্বাপিত করিয়াছে।" অগ্নিতে উত্তাপ যেমন, জীব-জীবনে বাসনা তেমন। ইক্‌বাল ভারতকে Self-affirmationএর বাণী শুনাইতেন :—

قطرہ چون حرف خودی را از بر کند
ہستی بے مایہ را گوہر کند

অর্থাৎ বিন্দু যখন 'আত্ম-অনুভূতির' 'বর্ণমালা' মুখস্থ করে তখন সে মূল্যহীন অপদার্থকেও দুর্ল্লভ রত্নে পরিণত করে।" ভারতকে তিনি বাসনা গঠনের দিকে আহ্বান করিতেছেন :—

"জীবনের স্থিতি আশা ও আকাঙ্ক্ষাতেই; জীবন-যোদ্ধার রণ-ঘণ্টা 'বাসনা'তেই। জীবন, অনুসন্ধানের মধ্যে নিহিত; এবং উহার মূল, 'আকাঙ্ক্ষা'য় আবৃত।"

ভারতের সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে পরস্পর আন্তরিক সম্প্রীতি-হীনতায় ব্যথিত হইয়া তিনি বলিতেছেন :—

"হে ভারতবাসী, আমি এ আবর্ত্তনে (যুগে) তোমার বাঁচিবার পন্থা দেখি না; কারণ প্রেমের দ্রাক্ষাসুরা তুমি পান করিতে জান না।" অপর এক জায়গায় বলিতেছেন,—

"হে ভারত, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের ভেদ-প্রবৃত্তির প্রবাহ তোমার (দাসত্বের) খোসাযুক্ত বীজের মধ্যে এক সর্ব্বনাশী বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে।"

ভেদ-নীতির তীব্র প্রতিবাদে কবি গাহিয়াছেন, "হে ভারতবাসী, যদি তুমি চিন্তা কর তবে বুঝিবে যে স্বাধীনতা প্রেমেই প্রচ্ছন্ন এবং 'আমরা' 'তোমরা' এই ভেদনীতির বন্দী থাকাই দাসত্ব। 'গোঁড়ামী' আজ আমার মাতৃভুমির পবিত্র মৃত্তিকায় ঘর বাঁধিয়াছে। আমি সেই প্লাবন যাহা উক্ত ঘর ধ্বংস করিয়া ছাড়িবে।" পতিত ভারতবাসী তাহাদের অতীত ইতিহাসের নামে সম্মোহিত। তিনি ইহায় ব্যথিত হইয়া বলিতেছেন :—

وطن کی فکر کر نادان مصیبت آنے والی ہے
تیری بربایون کے مشورے ہین آسمانون مین
ذرا دیکھ ! اسکو جو کچھ ہو رہا ہے - ہونے والا ہے
دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانون مین

অর্থাৎ 'হে মূর্খ, বিপদ আসিতেছে, মাতৃভুমির চিন্তা কর; আকাশে (ভাগ্যের ব্যবস্থাপক সভায়) তোমার ধ্বংসের যুক্তি চলিতেছে। যাহা কিছু হইতেছে ও যাহা হইবে, তাহার দিকে একটু দৃষ্টি কর। প্রাচীন যুগের কাহিনীতে কি এমন ধরা রহিয়াছে?" ভারত সম্বন্ধে আপনার একটি 'মিশন' আছে বলিয়া ইক্‌বাল মনে করেন—

جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہان سے
تیری ظلمت مین روشن چراغا کرکے چھوڑونگا

অর্থাৎ আমার প্রচ্ছন্ন 'শিখা'র (অন্তরের পোড়ানি) দ্বারা প্রত্যেকের চিত্ত-প্রদীপকে জ্বালিতে হইবে। হে ভারত, তোমার অন্ধকারে আমি প্রদীপমালা আলোকিত করিয়া ছাড়িব। ইক্‌বাল ভারতের যুবশক্তির অলসতায় দুঃখিত।—

جہان خون ہو رہا ہے کار زار زندگانی سے
مے غفلت کی ساغر چل رہا ہے نوجوانو مین

যেখানে দেশ জীবনযুদ্ধে খুন হইতেছে, সেখানে যুব-সঙ্ঘে অলসতার সুরাপাত্রের 'দৌর' চলিতেছে।" তিনি এই যুব-শক্তিকে দেশের কার্য্যে আহ্বান করিতেছেন—

خیزو جان نو بدہ ہر زندہ را
از قم خود زندہ تر کن ہر زندہ را

অর্থাৎ "উঠ, এবং প্রত্যেক জীবিতকে নবজীবন দাও; তোমার অন্তরের 'উত্তিষ্ঠিত' বাণী দ্বারা প্রত্যেক জীবিতকে জীবিততর কর।"

কাব্যে ইক্‌বাল পূর্ণ-স্বাধীনতার পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয়। কারণ ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কারে কেহ কেহ উৎফুল্ল হইয়া স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিলে তিনি বলিয়াছিলেন :—

اس شراب رنگ و بو کو گلستان سمجھا ہے تو
آہ ! اے نادان قفس کو آشیان سمجھا ہے تو
توہی نادان چند کلیون پر قناعت کر گیا
ورنہ گلشن مین علاج تنگئی داماں بھی ہے

এই বর্ণ-গন্ধের মদিরাকে পুষ্পোদ্যান ভাবিয়াছ, হা মূর্খ, পিঞ্জরকে তুমি নীড় ভাবিয়াছ। তুমি মূর্খ, তাই কয়েকটি কুঁড়িতেই পরিতৃপ্ত হইয়াছ। নচেৎ অন্তরের অপ্রশস্ততার ঔষধ উদ্যানে ছিল।" আরও বলিয়াছেন পুষ্পের পরিবর্ত্তে তোমার অন্তরে আর কতদিন শিশির থাকিবে।'

মাতৃভুমির পরেই 'বিলাদে ইসলামিয়া'র জন্য তিনি রক্তক্রন্দন করিয়াছেন। মুসলমান ও 'বিলাদে ইসলামিয়ার' (মুসলমানের দেশ সমূহ) জন্য ইক্‌বালের শোক আশা, স্বপ্ন ও মুসলমানের ভবিষ্যদ্‌গঠনে তাঁহার বাণী, তাঁহার কাব্যের সুন্দরতম ও বৃহত্তম অংশ সে সম্বন্ধে একটি সুন্দর স্বতন্ত্র আলোচনা আবশ্যক। তাঁহার সমগ্র কাব্য ইসলাম ও আরবীয় কালচারের মহিমায় ভরা। বাঙ্গলার মুসলমানী সাহিত্যে ইসলামী কালচার প্রস্ফুটিত হওয়া ত দূরের কথা অদ্যপি তাহা হিন্দু পৌত্তলিকতা-মুক্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু ইক্‌বালের কাব্যে পুত্তলিকে সম্মানের বা আদরের সহিত উপমা লওয়া হয় নাই বরং বর্জ্জনীয় বিষয় সমূহের সহিত প্রতিমা উপমিত হইয়াছে, তাহাতে এক অপূর্ব্ব তৌহিদী বা পৌত্তলিকতা-বর্জ্জিত সাহিত্য গঠিত হইয়াছে। বাংলায় কি তাহা হইবে?"

জেনেভার জাতি-সঙ্ঘের ন্যায় কোন বিশ্ব-সমিতির পরিকল্পনা হইবার অনেক পূর্ব্বেই ইক্‌বাল বিশ্বসঙ্ঘের অভাব অনুভব করিয়াছেন, যাহা সকল মানবকে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে সংযুক্ত করিবে। যথা—

قوم را ربط نظام از مرکز سے روز گارش را دوام از مرکز سے

এমন কল্পনা এ সমস্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে কয় জন করিয়াছেন? আজ তরুণ-বিশ্বের জন্য ইক্‌বালের বাণীর আবশ্যকতা আছে। যতই আমরা উহা পড়ি ততই অধিক মুগ্ধ হই, ততই আনন্দ অনুভব করি।

ইক্‌বালের (উর্দ্দু) 'বাংগেদরা' 'তস্‌বীরে দর্দ্দ' 'নালায়ে এতিম' ফরইয়াদে উম্মত, (ফার্সী) 'পয়ামে মুসরিক' 'আস্‌রারে খুদি' 'বামুজে বেখোদীন' ও 'যাবুরে আজমে'র সহিত আপাততঃ প্রত্যেক উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীর পরিচিত হওয়া দরকার। কয়েক খানার ইংরাজী-অনুবাদও হইয়াছে। *

* দিনাজপুর নিবাসী বন্ধুবর ফখরুল মুহাদ্দেসীন মৌলবী আবদুল বাকী সাহেবের কল্যাণে ডাঃ ইক্‌বালের কাব্যের সহিত আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। এই প্রবন্ধে সেই পুরাতন বন্ধুকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। লেখক

মাস-পঞ্জী

আশ্বিন

১লা আশ্বিন পর্য্যন্ত—গত ১৩ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় যতীন্দ্রদাসের মৃত্যু-স্মৃতি উৎসব দিবস পালিত হয়। ঢাকায় মিঃ সি, এস কোয়ারী নূতন পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। ঢাকা নবাবগঞ্জের বিখ্যাত কংগ্রেসকর্ম্মী চৌধুরী আছফ আলী বেগ ও চৌধুরী গোলাম কাদের স'হেবান যথাক্রমে ১৫৭ ধারা ও ৬নং অর্ডিনান্সে ধৃত হইয়াছেন। পুণার অন্যতম বিশিষ্ট মুছলমান রাষ্ট্রীয় পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য স্যার এবরাহিম হারুণ জাফর গত ১২ই সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করিয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মৌলভী আবদুর রহিম চৌধুরী সাহেবের পত্নী মোছাম্মাৎ জোবেদা খাতুন চৌধুরাণী শ্রীহট্টের মহিলা রাষ্ট্র সঙ্ঘের সভানেত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। বৃটীশ দূত মিঃ ফিলবী স্বেচ্ছায় এছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ নট শিশিরকুমার ভাদুড়ী আমন্ত্রিত হইয়া বাঙ্গলা নাটকের অভিনয়ের জন্য গত ৮ই সেপ্টেম্বর আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন। বোম্বাইএর ১০ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে সেখানে ২২ ইঞ্চি বারিপাত হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষকে মুক্তি দিয়া পুনরায় গ্রেফতার করা হইয়াছে।

২রা হইতে ৭ই—২১শে সেপ্টেম্বর বেতুল জেলার বরদেহী গ্রামে গ্রামবাসী-দের সহিত সংঘর্ষে পুলিশের লোকজন গুলী চালাইতে বাধ্য হয়। ফলে ৪ জন মারা গিয়াছে এবং ৫০ জন জখম হইয়াছে। গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকা আহ্‌ছান মঞ্জিলে নবাব ষ্টেটের একজন ভৃত্য গুলির আঘাতে আহত হইয়াছে। প্রকাশ, আততায়ী ষ্টেটেরই একজন ভৃত্য। গত ২২শে সেপ্টেম্বর বোম্বাই সমর পরিষদের মিসেস্ রমাবাঈ কামদার, কংগ্রেস বুলেটিনের সম্পাদিকা ১৯ বৎসর বয়সের মুছলমান বালিকা মিস্ ছৈয়দ ৩ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। হুগলী জেলা-কংগ্রেস কমিটীর বিশিষ্ট কর্ম্মী মৌলবী হামিদুল হককে গত ১৮ই সেপ্টেম্বর গ্রেফতার হন। মহামান্য তিলকের সহকর্ম্মী নেতা মিঃ জোসেফ ব্যাপ্টিষ্টা গত ১৮ই সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করিয়াছেন। দিল্লী জেলা ও কংগ্রেস কমিটী ও সত্যাগ্রহ আশ্রম অবৈধ ঘোষণা করায় স্থানীয় পুলিশ গত ১৭ই সেপ্টেম্বর মিঃ ফরিদুল হক আনছারী, আনওয়ারুল হক, মিঃ আছফ আলী গ্রেফতার হইয়াছেন। জমইয়াত ওলামায়ে হেন্দের সেক্রেটারী মওলানা আহ্‌মদ ছঈদ গত ২০শে সেপ্টেম্বর গ্রেফতার হইয়াছেন। গত ১৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার পুলিস কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্টের অন্যতর আক্রমণকারী দীনেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থার দরুণ, বোম্বের সরকার তিন জন মন্ত্রীর স্থলে ২জন মন্ত্রী করিয়াছেন এবং ১০০৲ টাকা ঊর্দ্ধে যাঁহাদের বেতন, তাঁহাদের বেতন কমাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৫ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে সুরাটে প্রবল বারিপাতের ফলে ভীষণ বন্যা দেখা দিয়াছে। হাজার হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে এবং প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। নোয়াখালির ১৩ই সেপ্টেম্বরএর এক সংবাদে প্রকাশ একদল লোক পুলিশকে প্রহার করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ১৪ জন মুছলমান ও ২ জন হিন্দু। মওলানা মুফতী কেফায়েতুল্লাহ্ ছাহেব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য হইয়াছেন। জার্ম্মাণীর নির্ব্বাচনে জাতীয় ফ্যাসিষ্টি দল এবার জয়লাভ করিয়াছে। যুক্তপ্রদেশ বুলন্দসর জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট তারযোগে জানাইয়াছেন যে, ১২ই তারিখে গুলাওথি গ্রামে গ্রামবাসীদের ও পুলিশের সংঘর্ষের ফলে ১জন দারোগা এবং ৩ জন গ্রামবাসী নিহত হইয়াছে। ভারত বিখ্যাত-আলেম মরহুম মওলানা কাদের এহলামাবাদী ছাহেবের পুত্র মওলানা শহিদ দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ক ধারা অনুসারে গ্রেফতার হইয়াছেন। গত ৮ই আশ্বিন মিঃ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। সিরাজগঞ্জের নেতা মৌঃ ছৈয়দ আছাদুদ্দৌলা ছিরাজী, মৌলভী সেরাজুল হক গত ১৭ই সেপ্টেম্বর ২ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় মালেক মোহাম্মদ দীন নামক এক কুম্ভকার এবং বংশী ঝাড়ুদার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী মিঃ কিরণশঙ্কর রায় এবং বোম্বের নেতা মিঃ নরীম্যান কারামুক্তি লাভ করিয়াছেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর বোম্বাই শহরে ভোট দেওয়ার স্থলে সত্যাগ্রহীদের সহিত পুলিশের এক হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। পুলিশের আক্রমণের ফলে ২৫০ জন আহত হইয়াছেন এবং ৩৮২ জন নারী এবং ১৮ জন পুরুষ গ্রেফতার হইয়াছেন।

৭ই-১৪ই—মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সভাপতিত্বে ২০শে সেপ্টেম্বর সুরমা উপত্যকা মোছলেম কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। গত ২৫শে সেপ্টেম্বর দাসপুর দারোগা হত্যার মামলার রায় প্রদত্ত হইয়াছে। ১২ জন আসামীকে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। ৫ জনের ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ জন আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের সম্পাদক ডাক্তার গৌরাঙ্গনাথ ব্যানার্জ্জী সপরিবারে ব্রহ্মপুত্র নদে নৌকাশুদ্ধ ডুবিয়া মারা গিয়াছেন। এ বৎসর আগষ্ট মাসে বোম্বে বিদেশী বাণিজ্যের ১৫ কোটী টাকা আমদানী কমিয়া গিয়াছে। পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে ৫৭০০ জন আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য দণ্ডিত হইয়াছেন। দিল্লীর বিখ্যাত নেতা মিঃ আছফ আলী ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। দেওবন্দের বিখ্যাত আলেম মওলানা হিফজুল্লাহ গ্রেফতার হইয়াছেন। পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেণ্ট মওলানা আবদুল কাদের কছুরী কারামুক্তি লাভ করিয়াছেন।

১৪ই-২১শে—গত ৫ই অক্টোবর ইংলণ্ডের সর্ব্ববৃহৎ বিমান-পোত 'আর-১০১' প্যারিসের নিকটবর্ত্তী একস্থানে রাত্রি-শেষে পুড়িয়া ধ্বংস হইয়া যায়। আরোহীদের মধ্যে ইংলণ্ডের বিমান-বিভাগের মন্ত্রী লর্ড টম্‌সন ছিলেন। তিনিও আর ৪৬ জন যাত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। গত ৪ঠা অক্টোবর লাহোরের পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট খাঁ বাহাদুর আবদুল আজিজ যখন মোটরে বাড়ী ফিরিতেছিলেন তখন কে বা

কাহারা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি চালায়। কিন্তু তিনি আহত হন নাই। কেশোরাম কটন মিলের কেসিয়ার মিঃ রামকিশোর আগরওয়ালার পুত্রী নারী সত্যাগ্রহে শ্রীমতি চামেলী দেবী ২রা অক্টোবর প্রেসিডেন্সী জেলে একটী সন্তান প্রসব করেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু মুসৌরীতে একজন হাকিম দ্বারা চিকিৎসিত হইতেছেন। উলানিয়ার বিখ্যাত স্বদেশ-প্রেমিক জমিদার হাজি অহিদুর রেজা চৌধুরী গত ২৯শে সেপ্টেম্বর গ্রেফতার হইয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব লর্ড বার্কেনহেড ৫৮ বৎসর বয়সে গত ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে লণ্ডনে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

১শে-২৮শে—দিল্লীতে ১১ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে, জমইয়তে ওলামায়ে হেন্দের সভাপতি ও ভারতীয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য মওলানা মুফতী কেফায়েতুল্লাহ্ ছাহেব দিল্লীতে ধৃত হইয়াছেন। বিচারে তাঁহার ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। জমইয়তে ওলামার সেক্রেটারী মওলানা আহমদ ছঈদেরও ৬ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। তাঁহাদের উভয়কে 'এ' শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। গত ১১ই অক্টোবর পণ্ডিত জওহরলাল কারামুক্ত হইয়াছেন এবং কংগ্রেসের সভাপতির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র য়ুরোপ ভ্রমণ করিয়া ভারতে গত ১৩ই অক্টোবর ফিরিয়া আসিয়াছেন। নাগপুর ১২ই অক্টোবরএর সংবাদে প্রকাশ যে বন-সত্যাগ্রহ সম্পর্কে ছিওনী জিলার অন্তর্গত ঝুরিয়া নামক গ্রামে পুলিসের গুলিবর্ষণের ফলে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক নিহত ও নয় জন আহত হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব বাদশাহ্ আমানুল্লাহ্ নাদের শাহের নিকট কোন ছোরা-ইয়ার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া ৮০ লক্ষ টাকার দাবী জানাইয়া আবেদন করেন। আফগানিস্তানের তাঁহার এই আবেদন অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। লণ্ডনে সেণ্টজেমস্ প্রাসাদে গোল টেবিল বৈঠক বসিবে। দীর্ঘ দশ মাস শুনানীর পর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার রায় বাহির হইয়াছে। ১৯২৯ সালের ১ই জুলাই তারিখে মামলার সূত্রপাত হয়। বিচারে ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। কিশোরীলাল, মহাবীর সিং, বিজয়কুমার সিংহ, শিববর্ম্মা, গয়াপ্রসাদ, জয়দেব ও কমলনাথ তেওয়ারীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইয়াছে। কুন্দনলাল ৭ বৎসরের ও প্রেমদত্ত ৫ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। অজয়কুমার ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ সান্যাল ও দেশরাজ মুক্তিলাভ করিয়াছেন। রাজসাক্ষী জয়গোপাল, হংসরাজ ভোরা, ললিত মুখার্জ্জী, ফনীন্দ্র ঘোষ, মনমোহন মুখার্জ্জী, এই পাঁচজন অব্যাহতি পাইয়াছেন। ভগৎ সিংএর পিতা প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করিয়াছেন। তিনি বলেন যে যেদিন সাণ্ডার্স হত্যা হয়, সেদিন ভগৎ সিং কলিকাতায় ছিলেন, তাহা তিনি প্রমাণ দিতে পারেন। ভগৎসিং প্রভৃতির প্রাণদণ্ডাজ্ঞার প্রতিবাদে লাহোর, দিল্লী, অমৃতসর, বোম্বে প্রভৃতি স্থানে হরতাল হয়। উক্ত দিন লাহোর কলেজের সম্মুখে হরতাল করায় গুরুণ লাহোরের ছাত্রী ভগিনীদ্বয় ৩৩ জন মহিলা সমেত প্রত্যেকে একমাস কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও ২ সপ্তাহ বিনাশ্রম কারাদণ্ড। সিমলা ১০ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে বড়লাট লর্ড আরউইন অবৈধ সমিতি অর্ডিন্যান্সের আর একটী নূতন অর্ডিন্যান্স প্রচার করিয়াছেন। এইটীকে-পাইকারী সর্ব্বশুদ্ধ সপ্তম অর্ডিন্যান্স জারী করা হইল। এই অর্ডিন্যান্স প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রাদেশিক সরকার সমূহ অবৈধ বলিয়া ঘোষিত যে কোন সমিতির স্থাবর সম্পত্তি দখল করিতে পারেন এবং যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন। ১০ই অক্টোবর বোম্বের গ্রাণ্টমিংটন থানার সার্জেণ্ট ও তাঁহার স্ত্রী যখন মোটর হইতে নামিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহারা গুলির দ্বারা আহত হন। আততায়ীরা পলাইয়া গিয়াছে। পাটনার ৯ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে বিহারের অন্যতম নেতা ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য ও মুঙ্গের জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ্ মোহাম্মদ জুবায়ের পরলোক গমন করিয়াছেন। কেশোরাম কটন মিলের বাবু রামকিশোর গুপ্তের পত্নী কারারুদ্ধা শ্রীমতি চামেলী দেবী ১লা অক্টোবর কারাগারে একটী পুত্র সন্তান প্রসব করেন। শিশু পুত্রটী ৭ই অক্টোবর দেহত্যাগ করে। অসুস্থ হইয়া পড়ায় শ্রীমতী চামেলী দেবীকে কারামুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ঢাকা ৯ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, জগদীশচন্দ্র চৌধুরী নামক এক যুবক পুলিসের সংবাদদাতা ছিলেন বলিয়া আততায়ী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। আক্রান্ত হইবার অল্পক্ষণ পরেই তিনি মারা যান। নয়াদিল্লীর ৭ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে, জামেয়া মিল্লিয়ার অধ্যাপক শফীকুর রহমান ছাহেব এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। মিঃ নরীম্যান ও মিঃ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বোম্বেতে জাতীয় সালিশী বোর্ড স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। বঙ্গীয় মোছলেম যুবক সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট মৌলভী গয়াছউদ্দীন ছাহেব ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। নূতন বে-আইন-সমিতি অর্ডিন্যান্সে গুজরাট, আহমদাবাদ, ব্রোচ, সুরাট ও কচরা জেলার ৭৫টী কংগ্রেস বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে এবং পুলিস সেই সমস্ত গৃহের দরজায় তালা লাগাইয়া দিয়াছেন। পণ্ডিত মতিলাল পুনরায় রক্তবমন করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। দিল্লীর তিব্বিয়া কলেজের ইউনানী ও আয়ুর্ব্বেদীয় উভয় বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ একযোগে ধর্ম্মঘট করিয়াছেন। লাহোর ১৩ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে, পাঞ্জাব পুলিসের সার্জেণ্ট স্মিথকে লক্ষ্য করিয়া ২ জন যুবক গুলী ছোঁড়ে। গুলী কিন্তু সার্জেণ্ট স্মিথের গায়ে লাগে নাই। মাহমুদাবাদের মহারাজা অসুস্থতা নিবন্ধন গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে পারেন নাই।

গোলটেবিল বৈঠকে মোছলেম-ভারতের প্রতিনিধি

নেজাম-রাজ্যের প্রতিনিধি

নওয়াব স্যার মোহাম্মদ আকবর হায়দারী

বিহার-প্রদেশের প্রতিনিধি

সৈয়দ স্যার সোলতান আহমদ

সর্ব্ব-ভারতীয় প্রতিনিধি

মহামান্য আগা খাঁ

যুক্তপ্রদেশের প্রতিনিধি

ছত্তরীর নওয়াব

যুক্ত প্রদেশের প্রতিনিধি

মওলানা মোহাম্মদ আলী

বোম্বের প্রতিনিধি

মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্

পঞ্জাবের প্রতিনিধি

স্যার মোহাম্মদ শফী

বোম্বের প্রতিনিধি

স্যার এব্রাহিম রহিমতুল্লাহ্

বাঙ্গলার প্রতিনিধি

মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক

বাঙ্গলার প্রতিনিধি

মিঃ আবদুল হালিম গজনবী

ভুপাল রাজ্যের প্রতিনিধি

ভূপালের মহামান্য নওয়াব

ভারত-নারীর প্রতিনিধি

স্যার শফীর কন্যা

বেগম শাহ নওয়াজ

মাদ্রাজের প্রধান-মন্ত্রীর পত্নী

মিসেস সুব্রহ্মনায়ন্

হিন্দুরাজ্যের মোছলেম প্রতিনিধি

মহীশূর-রাজ্যের

সার মির্জ্জা মোহাম্মদ এসমাইল

মোসলেম ন্যাশানালিষ্ট পার্টি অব্ ইণ্ডিয়ার সভাপতি

আমেরিকা-প্রবাসী
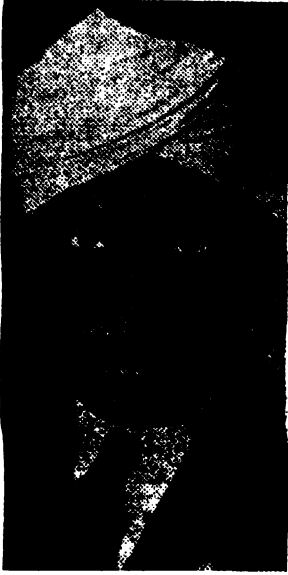
ডাঃ নূর মালেক

মহাত্মা গান্ধীর কারাগমনে আমেরিকা প্রবাসী-মোছলেমগণ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হন। উক্ত বিক্ষোভ-প্রদর্শনের জন্য আমেরিকায় স্থাপিত ইয়ং মোসলেম ন্যাশনালিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়ার পক্ষ হইতে একটা শোভা-যাত্রা বাহির করিবার আয়োজন করা হয়। কিন্তু ডিট্রয়টের পুলিস-কমিশনার তাহা বন্ধ করিয়া দেন। উক্ত পার্টীর সভাপতি ডাঃ নুর মালেক এই লইয়া উচ্চতর আদালতে আবেদন করেন এবং ইহা লইয়া আমেরিকার কাগজে আন্দোলন চলে।

পরলোকে

পুণার অন্যতম বিশিষ্ট মুছলমান, রাষ্ট্রীয় পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য সার এবরাহিম জাফর গত ১২ই সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করিয়াছেন। সার এবরাহিম ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৯ সালে তিনি নিখিল ভারত মোছলেম কন্ফারেন্সের সেক্রেটারী হন। ১৯২০ সালে তিনি নিখিল ভারত মোছলেম শিক্ষা সম্মিলনের সভাপতি হন। তিনি হজ-তদন্ত কমিটীর একজন সদস্য ছিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সার উপাধি পান

সার এব্রাহিম জাফর

আফগান-সংবাদ

বর্ত্তমান আফগান যুবরাজ

জহীর
মোহাম্মদ [illegible]কির খাঁন

ইনি প্যারিসে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। সম্প্রতি ইনি কাবুলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

নাদের শাহের সাহায্যকারী

ডাঃ গোলাম মোহাম্মদ

পেশাওরের ডাঃ গোলাম মোহাম্মদ গত বিপ্লবের সময় বিশেষভাবে নাদের শাহ্‌কে সাহায্য করেন। সেই জন্য নাদের শাহ্ তাঁহাকে ও তাঁহার বংশকে চিরকালের জন্য মাসিক ২১০০ কাবুলী টাকার জায়গীর উপহার দিয়াছেন।

অর্থ সঙ্কটে

ভূতপূর্ব্ব বাদশাহ্ আমানুল্লাহ্

ভূতপূর্ব্ব বাদশাহ্ দারুণ অর্থ-সঙ্কটে পড়িয়াছেন জানাইয়া বর্ত্তমান আফগান সরকারের নিকট রাণী ঠোরাইয়ার ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দাবী করেন। কিন্তু আফগান-জীর্গায় উক্ত আবেদন বাতিল হইয়া গিয়াছে। জীর্গার মতে আমানুল্লাহ্‌র নিকট যথেষ্ট টাকা আছে।

অডিন্যান্স-কর্ত্তার উত্তরাধিকারী কে হইবেন?

স্যার হার্ব্বাট স্যামুয়েল

লর্ড রোনাল্ডসে

লর্ড আরউইনের পর স্যার হার্ব্বাট স্যামুয়েল ও লর্ড রোণাল্ডসের নামই ভারতের বড়লাটরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

মিঃ মইনুদ্দীন

মিঃ মঈনউদ্দীন লাহোর কলেজের একজন কৃতীছাত্র। সম্প্রতি ইনি আই, সি, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন গত ১০ বৎসর ধরিয়া লণ্ডনে যে আই সি, এস পরীক্ষা হইতেছে, তাহাতে তিনিই সর্ব্বপ্রথম পরীক্ষোত্তীর্ণ মোছলেম ছাত্র।

নানা-কথা
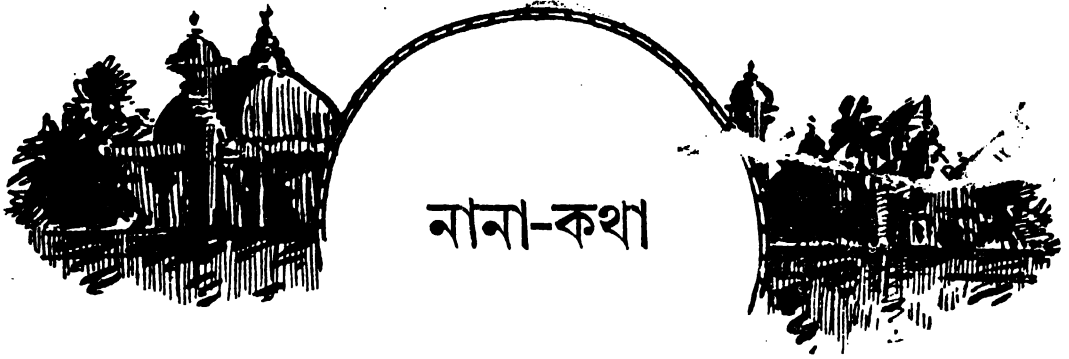
"আর-১০১"

ইংলণ্ডের সর্ব্ব-বৃহৎ বিমান-পোত "আর-১০১" যখন জগৎ-পরিক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের দিকে আসিতেছিল, সেই সময় ফ্রান্সে, প্যারী হইতে ৪০ মাইল দূরে বোভাই নামক গ্রামে, ৫ই অক্টোবর রাত্রি-শেষে ঝড়ের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে সহসা এক পাহাড়ের শৃঙ্গে আহত হয়। আহত হইবা মাত্র, এঞ্জিন ফাটিয়া গিয়া সমস্ত বিমান-পোতটীতে আগুণ ধরিয়া যায়। ৫৪ জন যাত্রীর মধ্যে মাত্র ৭ জন বাঁচিয়াছেন। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ এরূপভাবে অগ্নি-দগ্ধ হইয়াছেন যে, তাহাদের মাথার খুলী ও দাঁত দেখিয়া তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব নির্দ্ধারণ করিতে হইয়াছিল। টাইটানিক জল-মগ্ন হওয়ার পর এত বড় শোচনীয় দুর্ঘটনা ইদানীং আর ঘটে নাই। প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনিবার জন্য বিজ্ঞানের সাধনায় মানুষকে অনেক আত্মবলি দিতে হইয়াছে। "আর-১০১" এর নিদারুণ দুর্বিপাক সেই আত্ম-বলির তালিকায় আরও ৪৭টী নাম জুড়িয়া দিল।

ধ্বংস-প্রাপ্ত বৃটিশ বিমানপোত "আর-১০১"

ইহা ব্যতীত জাতিগত দিক দিয়া, ইংলণ্ডের দুইটী বিষম আঘাত লাগিয়াছে। কারণ প্রথমতঃ এই ৪৭ জনের মধ্যে ইংলণ্ডের বিমান-বিভাগের মন্ত্রী লর্ড টমসন এবং ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিমান-পোত চালক মেজর স্কট হইতে

.রিয়া বিমান-পোত-অভিজ্ঞ লোকগুলিই বিনষ্ট লেন। জাতির পক্ষে এই ক্ষতি পরিপুরণ করা দ্বিতীয়তঃ বহুদিন হইতে জার্ম্মাণী ও ইংলণ্ডের মধ্যে ব্যতীত "উড়োজাহাজ" তৈয়ারী করিবার একটা প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। জার্ম্মাণীর কাউন্ট জেপলিনই প্রথম এই ধরণের উড়ো-জাহাজ তৈয়ারী করেন, সেইজন্য উড়ো-জাহাজকে জেপলিন বলা হয়। সম্প্রতি জার্ম্মাণী "গ্রাফ জেপলিন" নামক একখানি সুবৃহৎ উড়ো-জাহাজ তৈয়ারী করেন এবং উক্ত জেপলিন যাত্রীসমেত সগৌরবে পৃথিবী পরিক্রমণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে জার্ম্মাণীতে ফিরিয়া আসে।

ইংলণ্ডও বহুদিন হইতে উড়ো-জাহাজ নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতেছিল। প্রথমে হয়, "আর-৩৮"। কিন্তু তাহার ভাগ্যেও এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটে। উহা নর্থ সি'তে (উত্তর সাগরে) পড়িয়া যায় এবং মাত্র তিনজন যাত্রী সেবার রক্ষা পান। তাহার পর হয় "আর-১০০"। "আর-১০০" ধরণের জগতের সর্ব্ব-বৃহৎ বিমান-পোত নির্ম্মাণ করিবার জন্য "আর-১০১"এর সৃষ্টি। "আর-১০১" গড়িতে ইংলণ্ডের প্রভুত অর্থ-ব্যয় হইয়াছিল এবং এই বিষয়ে ইংলণ্ডের বিশেষজ্ঞ-গণ মাসের পর মাস অধ্যবসায় স্বীকার করিয়াছিলেন। আজ এক অতর্কিত মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। অনেক সমালোচক বলিতেছেন যে, এ বিষয়ে জার্ম্মাণগণই বিশেষ দক্ষ; সুতরাং জার্ম্মাণদের আদর্শ গ্রহণ ব্যতীত উড়ো-জাহাজ সৃষ্টির সম্ভাবনা নাই। জগতের এক-চতুর্থাংশ ভূমির মালিক যে জাতি, তাহার পক্ষে এই সত্যকে স্বীকার করা বড়ই কষ্টসাধ্য!

ইংলণ্ডের বিমান-বিভাগের মন্ত্রী লর্ড টমসন

মৃত্যু-পথ-যাত্রীর পত্র

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ভগৎসিংহ, রাজগুরু ও শুকদেব তিন জনে প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

সণ্ডার্স হত্যার দিন ভগৎ সিং যে লাহোরে ছিলেন না তাহাই প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য প্রভৃতি উপস্থিত করিবার জন্য লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার ট্রাইবিউনালের বিচার পতি-গণের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া ভগৎসিংএর পিতা কিষণ সিং যে আবেদন করিয়াছিলেন, তৎসম্পর্কে ভগৎ সিং তাঁহার পিতাকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছেন:—

"পূজনীয় পিতা,—

আমার পক্ষ সমর্থনের জন্য আপনি স্পেশ্যাল ট্রাই-বিউনালের বিচারপতিদের নিকট আবেদন পত্র দাখিল করিয়াছেন শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। আপনার এই কাজ আমাকে এমন কঠোরভাবে আঘাত করিয়াছে যে, তাহা স্থিরভাবে সহ্য করা সম্ভব নয়। উহার ফলে আমার মানসিক শান্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে। এতদিন পরে এবং এই অবস্থায় ঐরূপ আবেদন দাখিল করা আপনি কিসের জন্য সমুচিত বিবেচনা করিলেন, আমি তাহা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আপনার পিতৃহৃদয়ে স্নেহ ও ব্যাকুলতা যতই প্রবল হউক না কেন, আমার-পরামর্শ না লইয়া সে কাজ করিবার অধিকার আপনার ছিল না।

আপনি জানেন, রাজনৈতিক বিষয়ে আপনার সহিত আমার চিরকাল মতভেদ হইয়াছে। আপনার সম্মতি অসম্মতির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আমি সকল সময়েই স্বাধীনভাবে কাজ করিয়াছি।

আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে, প্রথম হইতেই আপনি আমাকে মামলা-চালান এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে সম্মত করিতে বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে ইহাও আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে, আমি বরাবরই উহার বিরোধী ছিলাম, কোন কালেই আমার নিজ পক্ষ সমর্থনের ইচ্ছা ছিল না এবং সে সম্বন্ধে আমি কখনও বিশেষ কিছু চিন্তাও করি নাই। ইহা আমার ভ্রান্ত বিশ্বাস, কি এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন কারণ আছে, তাহা স্বতন্ত্র কথা; এখানে তাহার আলোচনা করা চলে না।

আপনি জানেন, বর্ত্তমান মামলার বিচারে আমরা একটা বিশেষ নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি। সে কারণে

আমার প্রত্যেক আচরণের সহিত আমার উদ্দেশ্য, নীতি এবং কার্য্য-পদ্ধতির : সঙ্গতি থাকা আবশ্যক। উপস্থিত অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহা যদি নাই হইত, তবুও আমি আত্মপক্ষ সমর্থনে সম্মত হইতাম না।

সমস্ত বিচারকালের মধ্যে আমার মনে একটী মাত্র ধারণা জাগরুক ছিল যে, আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যতই গুরুতর হউক না কেন, আমরা তাহার প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিব। আমি সর্ব্বদাই এইরূপ মত পোষণ করিয়া আসিয়াছি যে, রাজনৈতিক কর্ম্মিগণ কখনও আমাদের বিচার সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করিবেন না এবং দণ্ডাদেশ মত কঠিনই হউক না কেন, তাহা নির্ভীক চিত্তে সহ্য করিবেন। তাঁহারা আত্মপক্ষ সমর্থনও করিতে পারেন, কিন্তু কেবল রাজনৈতিক কারণে, ব্যক্তিগত কারণে কখনই নিজপক্ষ সমর্থন তাঁহাদের উচিত নহে। এই মামলার বিচারের মধ্যে আমাদের আচরণে মূলনীতির সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতি রাখিয়া চলিয়াছে। আমরা সফল মনোরথ হইয়াছি কি না, তাহা বিচারের ভার আমার নহে। আমরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছি।

প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত ভগৎসিং

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অর্ডিন্যান্স ঘোষণা করিবার পক্ষে বড়লাট যে বিবৃতি দিয়াছিলেন' তাহাতে বলা হইয়াছিল যে, এই মামলার আসামীগণ আইন ও ন্যায় বিচারকে লোকচক্ষে হীন করিতে প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু এখন যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হইতে জনসাধারণ বুঝিবার সুযোগ পাইবেন, আমরা কিম্বা অপর কাহারা আইনের অমর্য্যাদা করিয়াছে। অবশ্য এই বিষয়ে আমাদের সহিত জনসাধারণের মতভেদ থাকিতে পারে। হয়ত আপনিও তাহাদেরই একজন। কিন্তু তাহা হইলেও যে আমাকে না জানাইয়া, আমার অনুমতি না লইয়া ঐরূপ কার্য্য করিবেন, ইহা কোন কারণেই সঙ্গত নহে।

আপনি আমার জীবনকে যতখানি মূল্যবান বলিয়া বিবেচনা করেন, উহা ততখানি মূল্যবান নহে। বস্তুতঃ আমার নিকট নহে। আমার আদর্শকে বলি দিয়া উহা রক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। আমার আরও সহকর্ম্মীর অবস্থাও আজ ঠিক আমার মতই গুরুতর। আমরা সকলে এই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং অতকাল পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আসিয়াছি; শেষ পর্য্যন্তও আমরা ঠিক সেই ভাবেই থাকিব—তাহাতে আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষতি যত গুরুতরই হউক না কেন, ক্ষতি নাই।

পিতা! আমি সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হইয়া গিয়াছি। ভয় হয়, আমি বুঝি আপনার অমর্য্যাদা করিয়া ফেলিব, আমার ভাষা তীব্র হইয়া উঠিবে। তবুও সরলভাবেই আমি মনোভাব প্রকাশ করিব। আমার মনে হইতেছে, কে যেন পিছনে লুকাইয়া আমার পৃষ্ঠদেশে ছুরি মারিয়াছে। যদি আর কেহ এই কাজ করিত, আমি সেটাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া মনে করিতাম। আপনার বেলায় আমার মনে হয়, উহা আপনার দুর্ব্বলতা—একটা জঘন্য রকমের দুর্ব্বলতা।

আজ সকলের শক্তি-পরীক্ষার সময়। কিন্তু পিতা, আমার মতে আপনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমি জানি, মানুষ যতদূর দেশ-প্রেমিক হইতে পারে, আপনিও ঠিক তত বড়ই দেশহিতকামী। আমি জানি, ভারতের স্বাধীনতার জন্য আপনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; কিন্তু আজিকার মত মুহূর্ত্তে আপনি কেন এই দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিলেন? আমি তাহা বুঝিতে পারি না।

অবশেষে আমার অন্যান্য বন্ধু এবং অন্য যাঁহারা আমার মামলা সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত, তাঁহাদের এবং আপনাকে আমি জানাইয়া দিতে চাই যে, আপনার কার্য্যে আমি মত দিই নাই। আজও আমি আত্মপক্ষ সমর্থনের আদৌ পক্ষপাতী নহি। আমার সহিত অভিযুক্ত কয়েকজন আসামী আত্ম-পক্ষ সমর্থনের জন্য আদালতে যে আবেদন করিয়াছেন, তাহা গৃহীত হইলেও—আমি নিজ পক্ষ সমর্থন করিতাম না। প্রায়োপবেশনের সময় সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে ট্রাইবিউনালের নিকট আমি যে আবেদন করিয়াছিলাম,

তাহার ভুল অর্থ করা হইয়াছিল; বলা হইয়াছিল যে, আমি নিজপক্ষ সমর্থনে উদ্যত হইয়াছি। কিন্তু আমার পূর্ব্বে যে অভিমত ছিল, আজও তাহা স্থির আছে। আত্মপক্ষ সমর্থন করিলে বোরষ্টাল কারাগারে আমার যে বন্ধুগণ বন্দী হইয়া আছেন, তাঁহাদের প্রতি আমার বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে। তাঁহাদের নিকট দোষ-স্খালনের জন্য আমার একটি কথা বলিবার উপায় পর্য্যন্ত থাকিবে না।

আমার ইচ্ছা, এই সমস্ত জটীল বিষয় সম্বন্ধে জনসাধারণ যেন সকল কথা জানিতে পারেন। সেই জন্য আমার অনুরোধ,—পত্রখানি আপনি সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবেন। —'ট্রিবিউন'

নাহাছ পাশার মাল-ক্রোক

কায়রোর ২৩শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে নাহাছ পাশার নেতৃত্বে মিছরে কর-বন্ধ আন্দোলন শুরু হইয়া গিয়াছে। স্বয়ং নাহাছ পাশা প্রথম তাঁহার দেয় কর দিতে অস্বীকার করেন। ফলে তাঁহার বাড়ীর আসবাব-পত্রাদি ক্রোক করিয়া নীলামে চড়ান হয়।

কিন্তু এই নীলাম লইয়া একটা মজার ব্যাপার হইয়াছে, তাহাতে বোঝা যায় যে মিছরের জনসাধারণ আজ কি চায়।

প্রথমতঃ কেহই এই নীলামের জিনিষ কিনিতে রাজী হয় না। এমন কি নীলামের কোনই ডাক উঠে না। নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষা করিবার নিমিত্ত অবশেষে সরকার পক্ষ হইতে কয়েকজন গোয়েন্দা কর্ম্মচারীকে নীলাম ডাকিবার জন্য পাঠান হয়। তাহারা গিয়া নীলাম ডাকিতে থাকে।

সেই সময় ভীড়ের মধ্যে একজন ব্যবসাদার এত অল্প মূল্যে সমস্ত জিনিষ যাইতেছে দেখিয়া লোভে পড়িয়া নীলাম ডাকে এবং ক্রোকী মাল সেই পায়।

কিন্তু বিপদ হইল, মাল লইয়া যাইবার সময়। সেখানে যত তাহার বন্ধু-বান্ধব ছিল, তাহারা সকলে আসিয়া অপমানে অপমানে তাহাকে নাজেহাল করিয়া তুলিল। অবস্থা এরূপ হইল যে, অবশেষে তাহাকে মাল রাখিয়া আলেকজান্দ্রিয়াতে পালাইয়া যাইতে হইল।

সেখানে গিয়া তাহার মনে তীব্র অনুশোচনা জাগে এবং নাহাছ পাশাকে একখানি পত্র লিখে। পত্রে সে বলে যে, নাহাছ পাশা যদি তাহাকে ক্ষমা না করেন, তাহা হইলে সে আত্মহত্যা করিবে।

সেই সময় একটী সভা উপলক্ষে নাহাছ পাশা আলেক-জান্দ্রিয়াতে উপস্থিত হন। লোকটী সংবাদ পাইয়া, সভায়

নাহাছ পাশা

উপস্থিত হইয়া হাতজোড় করিয়া নাহাছ পাশার ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং কাঁদিয়া বলে যে, বাড়ী ফিরিয়া যাইতে তাহার বড় ভয় হইতেছে। তাহার আহার-নিদ্রা পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

এই অনুনয়ের উত্তরে নাহাছ পাশা বলেন যে, তিনি কিছুই করিতে পারেন না। স্থানীয় ওয়াফদ কমিটীর নিকট অবশ্য তিনি তাহার আবেদন উপস্থিত করিবেন।

এই ঘটনা হইতে মিছরের ভিতরের অবস্থার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না কি?

পরলোকে লর্ড বার্কেনহেড

ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব লর্ড বার্কেনহেড পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর ছিল। ১৯২৮ সালে তিনি ভারত-সচিবের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

তাঁহার বংশে তিনিই প্রথম লর্ড। তাঁহার পিতামহ

একজন সামান্য ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার পিতা ব্যারিষ্টার হইলেও বিশেষ কিছুই উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই। লর্ড বার্কেনহেড স্বীয় প্রতিভা ও শক্তির বলে ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার হন এবং পরে ইংলণ্ডের এটর্ণী-জেনারেল ও লর্ড চ্যান্সেলর হন। পাঁচ বৎসর তিনি ভারত-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিখ্যাত আইরিশ-বিপ্লবী রোগার কেসমেণ্টের বিচারে লড বার্কেনহেড সরকার পক্ষ সমর্থন করেন। বিচারে রোগার কেসমেণ্টের ফাঁসী হয়।

লর্ড বার্কেনহেডের কোনও বন্ধু তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "At times it seemed that a devil possesed him and his tongue gave out such venoms

লর্ড বার্কেনহেড

as were quite out of proportion to the occassion." "সময় সময় তাঁহাকে যেন শয়তানে পাইত এবং তাঁহার জিহ্বা হইতে গরল বহির্গত হইত।"

মৃত্যুর শেষ সময় পর্য্যন্ত লর্ড বার্কেনহেড শেষোক্ত-রূপে ভারতবর্ষ, ভারতবাসী ও তাঁহাদের মহামান্য ব্যক্তিদের উপর গরল বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের নূতন আবিষ্কার

আচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু জেনেভায় লিগ্ অব্ নেশন্সের সহিত সংশ্লিষ্ট "কমিটী অব ইণ্টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন" নামে আন্তর্জ্জাতিক সুধীবৃন্দের সভায় যোগদান করিয়া এবং ইউরোপের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার নূতনতম আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া পুনরায় স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার এই নূতন গবেষণা চিকিৎসাজগতে যুগান্তর আনিবে বলিয়া প্রকাশ।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে তিনি যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার একটী প্রধান কথা হইতেছে এই যে, জীব-দেহের ও উদ্ভিদদেহের জীবকোষের প্রতিক্রিয়া মূল একই। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে উদ্ভিদদেহে রোগ জীবাণু ইন্‌জেকসন্ করিয়া বাঁচাইয়া রাখিলে, উদ্ভিদ শরীরে ঐ বীজাণুগুলির বিপরীত গুণসম্পন্ন নানারূপ রস জন্মে। জন্তু শরীরে এই রস সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারিলে বহু

সংক্রামক রোগের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারিবে।

ইটালীর মিলান্ নগরের সিরাম থেরাপিউটীক্ ইন্ষ্টিটিউটে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের এই যুগান্তকারী আবিষ্কারটীকে কার্য্যে পরিণত করা হইতেছে। সেখানে উদ্ভিদ্-দেহকে রোগমুক্ত করিবার সম্বন্ধে বিশেষভাবে গবেষণা চলিতেছে। মিলানিজ ইন্ষ্টিটিউট যে সকল বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার শীর্ষদেশে বাঙ্গলা অক্ষরে জগদীশচন্দ্র জীবদের মূলগত ঐক্যের ঘোষণা করিয়া যে কথা বলিয়াছেন, তাহার মুদ্রিত আছে।

তাঁহার এই নূতন আবিষ্কার সুধীসমাজের এরূপ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে যে, তাঁহার আরও দুইখানি নূতন পুস্তক জার্ম্মাণ ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান-পুস্তক প্রকাশক গথিয়ে মিলার্ তাঁহার ছয়খানি পুস্তক ফারসী ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরিয়া আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রাচীন রাজগৃহের উষ্ণ প্রস্রবণগুলি লইয়া বৈজ্ঞানিক অনুশীলন করিতেছেন। তাঁহার মতে ঐ প্রস্রবণগুলির জলে কতকগুলি বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন দ্রব্য রহিয়াছে। গত বৎসরের শেষভাগে অধ্যাপক নাগের সহিত তিনি এ স্থান আবার পরিদর্শন করেন এবং অতি সূক্ষ্ম পরিমাপ-সক্ষম যন্ত্র-সাহায্যে ঐ প্রস্রবণগুলি হইতে কতকগুলি রেডিয়ম ঘটিত বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার সাহায্যে বহু প্রয়োজনীয় গবেষণা করেন। এই সম্পর্কে তিনি জার্ম্মাণীর অন্তঃপাতী বেডেন বেডেনের বৈদ্যুতিক ক্রিয়াশীল উষ্ণ প্রস্রবণগুলি লইয়া তাঁহার গবেষণা দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক নূতন আলোকপাত করিবে বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন।

রেজা শাহ্ পাহ্লবী

পারস্যের বর্ত্তমান শাহ্ রেজা পাহ্লবীর জীবন-কীর্ত্তি বিংশ-শতাব্দীর ইতিহাসে এক অদ্ভুত ব্যাপার। গত যুগে পারস্যে নিঃশব্দে যে রক্তহীন বিপ্লব সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, তাহার তুলনা জগতের ইতিহাসে নাই। সিংহাসন-পরিবর্ত্তন হইল, নীতি-পরিবর্ত্তন হইল, সামান্য একজন সৈনিক সিংহাসনে বসিল, রুষ বিতাড়িত হইল, ইংরাজকে লোভ-সম্বরণ করিয়া সরিয়া আসিতে হইল, অথচ কোথাও একটী প্রাণীরও জীবন-নাশ হইল না। যুগ-পরিবর্ত্তন হইল অথচ মানুষের রক্ত মাটিতে পড়িল না, ইহা বড়ই অদ্ভুত ঘটনা।

কিন্তু গত যুগে পারস্যে তাহাই সম্ভব হইয়াছে এবং সম্ভব হইয়াছে শুধু রেজা পাহ্লবীর অসামান্য ব্যক্তিত্বের

রেজা শাহ্ পাহ্লবী

প্রভাবে। সিংহাসন-চ্যুত আহমদ শাহের আমলে পারস্যের এরূপ দশা হইয়াছিল যে, একদিকে রুষিয়া অপরদিকে ইংলণ্ড, তাহাকে তাহাদের ক্রীড়নক করিয়া তুলিয়াছিল এবং রেজা পাহ্লবীর আগমন না হইলে হয়ত আজ পারস্য জগতের পরাধীন জাতিদের তালিকাভুক্ত হইত। কিন্তু আজ পারস্য যে কোনও শক্তিশালী স্বাধীন জাতির সমকক্ষ। রেজা শাহ্র শাসন-নীতির গুণে পারস্য সকল দিক দিয়া আজ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

রেজা শাহ্‌র জীবন হইতে দুইটী শিক্ষণীয় বিষয় আছে। একটী হইতেছে, অধ্যবসায় ও সাধনার বলে মানুষ কি করিয়া জগতে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। আর একটী হইতেছে যে, জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য জাতির স্বাধীনতা অগ্রে প্রয়োজন।

রেজা খাঁ অতি দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। মেষ-চরাইয়া তাঁহার দিন কাটিত। একদিন এই মেষ-পালকের বাসনা হইয়াছিল, যে সে সৈনিক হইবে। কখনও পথের কুলী হইয়া, কখনও দিনে বারো ঘণ্টা মজুরী করিয়া, পাথেয় অর্জ্জন করতঃ সেদিন যুবককে রাজধানীতে পৌঁছাইতে হইয়াছিল। পোড়া রুটী ও খেজুর ব্যতীত অন্য আহার্য্য সেদিন তাহার জোটে নাই।

তারপর ধীরে ধীরে সামান্য সৈনিক হইতে তিনি আপনার অসামান্য অধ্যবসায় ও প্রতিভার বলে পারস্যের স[illegible]বিভাগের মন্ত্রী হন।

সমর-মন্ত্রী হিসাবে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও কর্ম্মগুণে তিনি পারস্যের সকলের হৃদয় জয় করেন। পারস্যকে বিদেশীর প্রভাব-মুক্ত করিবার জন্য তিনি সেইদিন হইতে জীবন উৎসর্গ করেন। জার-বংশ ধ্বংসের পর রুষ পারস্যের উপর তাহার অধিকার বিস্তার আপনা হইতেই বন্ধ করিয়া দেয়। রেজা খাঁর অভ্যুত্থানে ইংরাজকে পারস্য হইতে বাধ্য হইয়া সরিয়া আসিতে হয়। ১৯২৬ সালে আহ্‌মদ শাহ্‌ গণ-অভ্যুত্থানে সিংহাসন ত্যাগ করেন। পরবর্ত্তী বৎসরে রেজা শাহ্‌ পাহ্‌লবী সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী; সেই জন্য তিনি শাহ্‌ উপাধি লইতে চাহেন নাই। কিন্তু তিনি একজন অতি চতুর রাজনৈতিক ছিলেন। জাতির মনস্তত্ব তিনি বিশেষ-ভাবে জানিতেন। যে নাম ও যে সিংহাসনকে জাতি সংস্কারবশতঃ মানিয়া আসিয়াছে, তাহারই সুবিধা লইয়া তিনি সংস্কার-মূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। বাহ্যতঃ শাহ্‌ হইলেও, তিনি সেইজন্য পারস্য গণতন্ত্রের সভাপতি।

বাহিরে রেজা শাহ্‌ সম্রাট, অন্তরে তিনি একজন সামান্য নাগরিক। সম্রাটত্ব ও নাগরিকত্বের সুন্দর সামঞ্জস্য হইয়াছে, তাঁহার অপূর্ব্ব চরিত্র।

একবার বিখ্যাত লর্ড ইঞ্চকেপ যখন তাঁহার জাহাজে পারস্যোপসাগরের উপকূলে এক বন্দরে দিন কাটাইতে-ছিলেন, তখন তিনি শুনিলেন যে উক্ত নগরে রেজা শাহ্‌ পাহ্‌লবী আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গ পাইবার জন্য লর্ড ইঞ্চকেপ তাঁহার জাহাজে পদার্পণ করিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক অনুরোধ পত্র পাইলেন। কিন্তু পার-স্যের সম্রাট রাজকীয় আমন্ত্রণ ব্যতীত অপর জাতির দেশে পা দিতে অসম্মত হইলেন। (পাঠকবর্গ হয়ত জানেন যে, প্রত্যেক জাতির জাহাজকে সেই জাতির দেশের অংশ বলিয়াই বিবেচনা করা হয়।)

কিন্তু তাহার পরের দিনের ঘটনা। সেই নগরের এক শ্রমজীবিদের সভা। পারস্যের সম্রাট আজ সাধারণ নাগরি-কের বেশে পথে নামিয়া আসিয়া ভ্রাতৃ-বোধে তাহাদের সহিত আলাপ করিতেছেন। একদিন তিনিও যে তাহাদের মত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া শ্রম করিয়াছেন, সেই কাহিনীই বলিতেছেন এবং তাহাই তাঁহার জীবনের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ গর্ব্ব। আপনার কথার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি বলিলেন, সেই দিনকে স্মরণ করিবার জন্য আজ আমি তোমাদের মধ্যে থাকিব। তোমাদের মত পোড়া রুটী ও খেজুর খাইব।

সেইখানকার বাজার হইতে খেজুর ও রুটী কিনিয়া সেদিনকার মত আহারের সংস্থান করিলেন।

মোহাম্মদী পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য মোহাম্মদীতে পুরস্কার ঘোষিত হয়,

(১) মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস
(২) কালাম শাস্ত্রের ক্রম-বিকাশ
(৩) সাহিত্যের আদর্শ
(৪) মোছলেম বঙ্গের বর্ত্তমান-চিন্তাধারা।

এই সঙ্গে ছোট গল্পের জন্যও একটী পুরস্কার ঘোষিত হয়। এই পুরস্কার ঘোষণার ফলে আমরা ২৯টী গল্প পাই। কালাম-শাস্ত্রের ক্রম-বিকাশ বিষয়ক একটী প্রবন্ধও আসে নাই। প্রথম বিষয়ের উপর মাত্র ৫টী, তৃতীয় বিষয়ের উপর মাত্র ৬টী এবং চতুর্থ বিষয়ের উপর মাত্র সাতটী প্রবন্ধ আসিয়াছে। উপযুক্ত পুরস্কার ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও এইরূপ লেখকের দৈন্যের জন্য সত্যই মনঃকষ্ট হয়। ইহা হইতে আর একটী বিষয় দেখা যায় যে, চিন্তামূলক প্রবন্ধ অপেক্ষা গল্পের দিকেই বর্ত্তমান লেখকদের বেশী ঝোঁক।

প্রতিযোগিতার বিচারকগণের মতে যে সমস্ত প্রবন্ধ ও গল্প হস্তগত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই লেখার আদর্শের দিক দিয়া পুরস্কারের অনুপযুক্ত। সাহিত্যের আদর্শের সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবন্ধ আসিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে বিচারকগণ মৌলবী আমীন উদ্দীন আহমদ ছাহেবের লেখাকে মনোনীত করিয়াছেন এবং উক্ত প্রবন্ধের জন্য ১৫৲ পুরস্কার দেওয়া হইল।

অন্যান্য যে দুইটী বিষয়ের উপর প্রবন্ধ আসিয়াছে, সেগুলি সংখ্যায়ও যেরূপ অল্প, দুঃখের বিষয় সেগুলি লেখাও সেইরূপ কাঁচা। সুতরাং উক্ত দুই প্রবন্ধের জন্য কোনও পুরস্কার দেওয়া গেল না।

গল্পের মধ্যে ২৯টী গল্প আসিয়াছে, কিন্তু বিচারকগণের মতে সেগুলির অধিকাংশই পুরস্কার পাইবার অযোগ্য। তন্মধ্য হইতে বিচারকগণ মৌলবী মোহাম্মদ আবদুর রশীদ বি, এ, বি, টী মহাশয়ের "লায়লী-মজনু" নামক গল্পটাকে মনোনীত করিয়াছেন এবং উক্ত প্রবন্ধের জন্য ১৫৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইল।

পরিশেষে বক্তব্য যে, যে সমস্ত লেখকগণ লেখা পাঠাইয়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছেন, তাঁহাদের শ্রমের জন্য আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

খাদেম—ম্যানেজার, মাসিক মোহাম্মদী

Printed and Published by Md. Khairul Anam Khan from the "Mohammadi Press
91, Upper Circular Road, Calcutta.

বহু প্রদর্শনীতে সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত

"স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরী"

ফোন নম্বর ৩৫৫২ বড়বাজার।

জুয়েলার্স ও হস্তী দন্তের জিনিষ এবং স্বর্ণ অলঙ্কার নির্ম্মাতা। ২১৩, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কংগ্রেস চুড়ি (টালি প্যাটার্ণ)

স্বর্ণবর্ণের মেটেলের ফ্রেমে গিনি স্বর্ণের এনগ্রেভ পাতে মোড়া, ঠিক নিরেট সোণার চুড়ির ন্যায়। মূল্য প্রমাণ প্রতি জোড়া ১৮৷৷০

ললনা সোহাগ রুলী

হস্তী দন্তের লাইন মোড়া রুলীর উপর গিনি স্বর্ণের পাতে মোড়া। মূল্য প্রমাণ ১০৸০, ছোট ৭৷৷০।

তার প্যাচ রুলী (সরু)

হস্তী দন্তের সরু প্যাচকাটা রুলীর উপর গিনি স্বর্ণের সরু পাতে মোড়া। মূল্যপ্রমাণ ১২৷৷০ ছোট ৮৷৷৵০ আনা।

পাতাযালা ইয়ারিং

১২৷৷০—১৫৲

করগেট মাকড়ী

১২৷৷০—২০৲

ঘোড়ার ক্ষুর আংটী

১৫৲—৩০৲

কাণফুল

১০৲—১৫৲

প্লেন কুমারী মাকড়ী

৬৷৷০

ইহা ব্যতীত জড়োয়া গহনা ও গিনি স্বর্ণের যাবতীয় অলঙ্কার সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। মফঃস্বলের অর্ডার ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। খাঁটী গিনি সোনার গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। সচিত্রক্যাটালগের জন্য ৵০ ষ্ট্যাম্প পাঠান। মওলানা মোহাম্মদ আলী লিখিয়াছেন, আমি "স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরীর" সুসজ্জিত দোকান দেখিয়াছি ইহাদের কাজ সুন্দর এবং কারুকার্য্য সমন্বিত। আমি এই দোকানের ক্রমোন্নতির কামনা করি। ১৩ই জানুয়ারী ১৯২৫।

বিশুদ্ধ

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

ড্রাম /৫ ও /১০ পয়সা

বি, সি, ধর এণ্ড ব্রাদার্স

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স সহ পুস্তক ও ড্রপার সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ১০৪ শিশি মূল্য যথাক্রমে ২৲, ৩৲, ৩৷৷০ ৫৷০, ৬৸৴ ১০৸৵০ আনা ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। যাবতীয় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, সরঞ্জাম ও পুস্তকাদি সুলভে বিক্রয় করিয়া থাকি। বাইওকেমিক ঔষধ বাক্স, পুস্তক ও স্পুন সহ ১২টী এক ড্রাম, ২ ড্রাম ও ৪ ড্রাম শিশি মূল্য যথাক্রমে ২৷৷০, ৩৸০ ও ৬৷৷০ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

বি, সি, ধর এণ্ড ব্রাদার্স

৮১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিঃ।

"মীরা" টুথ্ ব্রুস। "MIRA" REGD

মীরা টুথ ব্রুস এমন সুচারুরূপে দাঁতের ময়লা পরিষ্কার করে যে ইহা দ্বারা দাঁত মাজিলে দাঁত অকালে নষ্ট হওয়ার কোনই আশঙ্কা থাকে না। ইহা এমন বিশেষ ভাবে প্রস্তুত যে ইহা অতি সহজেই দাঁতের ফাঁক হইতে ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যকণা বাহির করিয়া দন্ত পংক্তি নির্ম্মল করে দন্ত চিকিৎসকগণ এই ব্রুসই ব্যবহার করিতে বলেন।

ইহাই উচিত মূল্যে সর্ব্বোত্তম ব্রুস

ইহা শক্ত—মাঝারো ও কোমল—তিন রকমই পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক:—মেসার্স মায়ার হফ্ এণ্ড সাই, এ, জি; ক্যাসাল জার্ম্মাণী।

ভারত ও বর্ম্মের সোল এজেন্টস্—

টি, এম, ঠাকর এণ্ড কোং,

৪নং চার্চ্চগেট ষ্ট্রীট, ফোর্ট, বোম্বাই।

ব্রাঞ্চ:—	কলিকাতা	....	মাদ্রাজ	....	করাচি	....	লাহোর
পোঃ বকস নং—	২১১১	....	২৪৯	....	১১৪	....	১৩৪

দেশের পয়সার

যদি প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিতে চান এবং খাঁটী স্বদেশী বিড়ি ও চুরুট পান করিতে ইচ্ছা করেন বা বিড়ি তৈয়ারির জন্য পাতা, গুখা ও আর আর সরঞ্জাম ন্যায্য মূল্যে পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে আজই পত্র লিখুন। বিনামূল্যে, বিনামাশুলে দর সহ নমুনা পাঠান হয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র চন্দ্র,
৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

আমেরিকার চিকিৎসা বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য শক্তি

এসেন্স ফস্ফরিণ পিল

রেজিষ্টার্ড, সাবধান, বিকৃত নামে জাল হয়েছে

ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগে—অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্রক্ষয় হেতু রোগ ও উপসর্গ: বিবিধ উপসর্গ, মেহ, প্রমেহ, গণোরিয়া, স্বপ্নদোষ, পুরুষত্বহানী বা ঐ উপক্রম, বহুমূত্র, শুক্রতারল্য, অনিচ্ছায় সামান্য উত্তেজনায় বা অসময়ে স্খলনে আশাতীত উপকার হয়। শুক্রের ধারণাশক্তি বর্দ্ধনে ইহার তুল্য ঔষধ আর নাই। স্খলনকারী স্নায়ুর উপর প্রত্যক্ষ ক্রিয়া এই যে, মাত্রা বিশেষে সেবন করিলে ইহা অব্যর্থ ইনহিবিটারী নার্ভের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া বিনা দৌর্ব্বল্যে উক্তপ্রধান দেশেও ধাতুস্তম্ভন ঘণ্টা স্থায়ী করে। ঐ সময়ে অম্লসেবন নিষেধ। মূল্য শিশি ১৷৹, ৩শিশি ৪৷৹ মাঃ ৷৵৹। ঠিকানা এজেন্ট:—পি, ডেভিড কোং, পোঃ হাটখোলা (০), কলিকাতা। খুচরাবিক্রেতা—বটকৃষ্ট পালকোং, বোসকোং, হোয়াইটহল, বেঙ্গলরিনিস্ক

প্রোঃ ডাঃ সরকার কৃত

আশ্চর্য্য হোমিওপ্যাথিক ইনজেকসন।

৬টী এম্পুলস সহ পূর্ণ বাক্স

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

হাঁপানি, গণোরিয়া, সিফিলিস, প্যারালিস, থাইসিস্ ইত্যাদি যাবতীয় কঠিন ব্যাধি, উক্ত ইনজেকসন্ দ্বারা চির জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া আরোগ্য করা হইতেছে।

মফঃস্বলবাসী চিকিৎসকগণের সুবিধার্থ "**বিশুদ্ধ আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক** ঔষধ" (ড্রাম /৫ ও /১০) বিশেষ যত্ন সহকারে সাপ্লাই করা হয়। **হোমিও লিভার স্প্লীন সিরেট**:—যাবতীয় লিভার স্প্লীনের অব্যর্থ ঔষধ। মূল্য ৷৹ আনা। **হোমিও ল্যানসেট ও এণ্টিফ্লোজিন**:—বিনাঅস্ত্রে সার্জ্জারির কার্য্য সম্পন্ন হইবে। মূল্য ৷৹ আনা। **হোমিওপ্যাথিক লাকসন।** মূল্য ৷৹ আনা। এই জোলাপ খাইতে সুমিষ্ট। আহারান্তে সেবন করিলে ২।১ টী সরল দাস্ত হইবে।

ক্যাটালগের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

প্রোঃ ডাঃ কে, সরকার,
১১নং মদন পাল লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা।

কেশরঞ্জনের

শারদীয় উপহার

"হত্যাকারী কে?"

"উপন্যাস"

কেশরঞ্জনের

শারদীয় উপহার

"হত্যাকারী কে?"

"উপন্যাস"

চতুর্থ বর্ষ, ১৩৩৭ — ২য় সংখ্যা

মোহাম্মদী

অগ্রহায়ণ

বার্ষিক মূল্য সডাক তিন টাকা ছয় আনা — সম্পাদক—মোহাম্মদ আকরম খাঁ — প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা

PURE
বুর্ণভিলে কোকো
হওয়া চাই-ই
যদি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এবং সব চেয়ে বিশুদ্ধ কোকো ব্যবহার করিতে চান, তাহা হইলে বুর্ণভিলের কোকোই ক্রয় করিবেন। বুর্ণভিলের কোকো পান করিতে যেমন সুস্বাদু, তৈয়ারী করিতেও সেইরূপ কোনও হাঙ্গামা নাই। ইহাতে খাদ্য-গুণ বিশেষভাবে আছে এবং সহজেই হজম হয়, সেই জন্য ইহা শরীরে নব-শক্তি আনিতে পারে। আপনি প্রত্যহ বুর্ণভিলে কোকো পান করুন—ছেলেমেয়েদেরও নিয়মিতভাবে পান করান। সস্তায় এবং সন্দেহাতীতভাবে স্বাস্থ্য ও শক্তিলাভের ইহা অপেক্ষা আর কোনও সহজ পন্থা নাই।
বুর্ণভিলের কোকো আদর্শ পানীয় খাদ্য। ইহাতে জান্তব চর্ব্বি নাই এবং প্রস্তুতকালীন কোনও প্রকারে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা হয় না।
BOURNVILLE
COCOA
স্বাস্থ্য ও শান্তির জন্য
জান্তব চর্ব্বি বর্জ্জিত এবং
প্রস্তুত কালীন হস্তদ্বারা স্পৃষ্ট হয় নাই।
ক্যাডবেরীর দ্বারা প্রস্তুত, বুর্ণভিলে, ইংলণ্ড

সূচীপত্র—অগ্রহায়ণ ১৩৩৭

সূচীপত্র—অগ্রহায়ণ ১৩৩৭

সূচীপত্র—অগ্রহায়ণ ১৩৩৭

সন্ন্যাসী প্রদত্ত দৈব শক্তি সম্পন্ন

সাবধান! মহাত্মাজীর আদেশ

দেশ বন্ধু তৈল।

মানুষ, গরু ও মহিষাদির সমান উপকার দর্শিবে।

দেশী গাছ গাছড়া ও বীজানু নাশক উদ্ভিজ হইতে এই তৈল প্রস্তুত। ইহাতে বিষাক্ত বা বিলাতি কোন ঔষধের লেশ মাত্র নাই। যাঁহারা বহুদিবস যাবত নিম্নলিখিত রোগে ভুগিতেছেন এবং নানাবিধ চিকিৎসায় হতাশ হইয়াছেন তাঁহারা আমাদের এই সন্ন্যাসী প্রদত্ত তৈল ব্যবহারে ঈশ্বরের কৃপায় আরোগ্য লাভ করিবেন। এই অত্যাশ্চর্য্য গুণবিশিষ্ট দেশী ঔষধ ব্যবহার করিয়া ইহার গুণাগুণ পরীক্ষা করুন ও দেশবাসীকে উৎসাহিত করুন। সাধারণ ঘা, শোষ ঘা, পশ্চিমে ঘা, কাঁকবিড়ালী, উরুস্তম্ভ, কার্ব্বাংকেল (পৃষ্ঠব্রণ) উপদংশ, নারেঙ্গা, ফোঁড়া, বাগী, স্তনের ঘা, নালী ঘা, কানের পুঁজ, ভগন্দর, আঙ্গুলহাড়া, পোড়া ঘা, কাটা ঘা, হাজা (পাকুই), গরল, চুলকানি, খোস (পাচড়া), নখকুনি ইত্যাদি যে কোন প্রকারের দূষিত পচা গলিত দুর্গন্ধযুক্ত পোকা পড়া জ্বালা যন্ত্রণাযুক্ত ভীষণ দুরারোগ্য ক্ষত হউক না কেন, অতি অল্পদিনে বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় ঈশ্বরের কৃপায় নিশ্চয় আরোগ্য হয়। একজিমা জাতীয় কাউর ঘা, (বীজ ঘা) অতি দুঃসাধ্য রোগ কিন্তু অতি অল্প সময়ে নির্দ্দোষরূপে সারাইয়া এই "দেশবন্ধু তৈল" চিকিৎসা জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। গুহ্যদ্বার, পুরুষাঙ্গ, পোতা, স্ত্রীযোনি কপট ইত্যাদি স্থানে একজিমা জাতীয় এক প্রকার চুলকানি হয় যে চুলকানির যন্ত্রণায় নিদ্রা হয় না, শান্তি থাকে না, দিবারাত্রি চুলকানির যন্ত্রণায় কেহ কেহ আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারা আমাদের তৈল ব্যবহারে ঈশ্বরের কৃপায় আরোগ্য লাভ করিবেন। শরীরের কোন স্থান পুড়িয়া গেলে এই তৈল ব্যবহারে জ্বালার উপশম হয় ও ঘা কিম্বা পুঁজ হইতে পারে না। ফোঁড়া, বাগী ও আঙ্গুলহাড়া উঠিবার প্রথমাবস্থায় এই তৈল লাগাইলে বিনা যন্ত্রণায় বসিয়া যায় ও পাকিবার উপক্রমে লাগাইলে পাকিয়া ফাটিয়া যায়। শরীরের কোন স্থান কাটিয়া গেলে এই তৈল ব্যবহারে তৎক্ষণাৎ রক্ত পড়া বন্ধ হয় ও বেদনা কিম্বা পুঁজ হইতে পারে না। এইরূপ সর্ব্বগুণ সম্পন্ন দেশী ঔষধ গৃহস্থের এক শিশি রাখা বিশেষ আবশ্যক। আরোগ্যান্তে অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্রের দ্বারা জানাইলে বাধিত হইব। মফঃস্বলের এজেন্ট ও হকারদিগকে উচ্চ কমিশন দেওয়া হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ৸৹ বার আনা ছোট শিশি ।৶১০ সাড়ে ছয় আনা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

সোল এজেন্ট—এ, কে, এণ্ড সন্স, ১৫নং সিমলা রোড, মাণিকতলা, কলিকাতা।

সাবধান! শিশির কর্কের গালার উপর ইংরাজিতে এ, কে এণ্ড সন্সের শীল মোহর দেখিয়া লইবেন।

মৃগনাভি কস্তুরী সংযুক্ত জর্দ্দা

যে মৃগনাভি জর্দ্দা পূর্ব্বে বাদশাহগণ পানে ব্যবহার করিতেন, আমরা সেই মহাসুগন্ধি জর্দ্দা বহু কষ্টে প্রস্তুত করিয়াছি। পানে ব্যবহার করুন, প্রায় ২ ঘণ্টা মুখে সুগন্ধি থাকিবে। বিশেষ গুণ এই যে বহু মূল্যবান মশলাদি মিশ্রিত থাকায় বৃদ্ধকে যুবার ন্যায় শক্তিশালী করতঃ ধারণা শক্তি বৃদ্ধি করে। রমণীগণ পানে ব্যবহার করিলে তাহাদের ওষ্ঠাধরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইবে। সকলেই ইহা এক আশ্চর্য্য বস্তু বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন। মূল্য রূপালী জর্দ্দা সের—৪৲, ৬৲, ৮৲, ১২৲, ১৬৲, ৩২৲। কাল মুস্কি জর্দ্দা সের—২৲, ৪৲, ৬৲, ৮৲। রূপালী জর্দ্দা তোলা—৶৹, ।৹, ॥৹, ১৲, কাল মুস্কি তোলা ৴৹, ৶৹, ।৹, ॥৹। এক টাকার কমে V. P. হয় না। মাশুল স্বতন্ত্র।

পাঞ্জাব জর্দ্দা ফ্যাক্টরী,

(দক্ষিণ গেট) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,

কলিকাতা।

জয় কর অনিদ্রা ব্যাধি

স্নায়ুবিক দৌর্ব্বল্যই নিদ্রাহীনতার প্রধান কারণ—সুতরাং সুনিদ্রার সুখ উপভোগ করিতে হইলে অগ্রে স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতারূপ ব্যাধির আরাম করা উচিত।

স্যানাটোজেন সেবন করুন, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতার অবসান হইবে। কারণ—স্যানাটোজেনে এরূপ উপাদান যথেষ্ট পরিমাণেই আছে যাহাতে স্নায়ু পুষ্টি হয়—দেহ গঠিত হয়—এবং প্রচুর বল হয়।

লণ্ডনের একজন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার লিখিতেছেন :—

“আমার একজন রোগী বহু দিন যাবত অনিদ্রা রোগে কষ্ট পান। সুনিদ্রা হইবার জন্য বহু ঔষধ তাঁহাকে সেবন করান হয়—কিন্তু কোন ফল দর্শে নাই। অবশেষে স্যানাটোজেন সেবন করাইয়া—মাত্র এক পক্ষকাল ব্যবহার করিয়াই—তাঁহার স্বাস্থ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়—এবং শেষে সুনিদ্রাও হইতে থাকে।”

মাত্র কয়েক সপ্তাহ স্যানাটোজেন ব্যবহার করিলেই যাবতীয় স্নায়ুবিক দৌর্ব্বল্য দূর হয়—স্বাস্থ্যেরও বেশ উন্নতি হয় এবং রাত্রেও বেশ সুনিদ্রা হয়।

আজই এক বোলত স্যানাটোজেন কিনুন।

SANATOGEN

আদর্শ টনিক খাদ্য।

সকল ঔষধালয়ে ও বাজারে প্রাপ্তব্য।

স্যানাটোজেন প্রস্তুত বা প্যাক করিবার সময় হস্তদ্বারা স্পর্শ করা হয় না
এবং জাতি বা ধর্ম্মনাশক কোনরূপ পদার্থ ইহাতে নাই।

ইলিয়াশ কোংর

ভারতে প্রশংসনীয় উৎকৃষ্ট চা পান করুন।

বিশুদ্ধ, সুগন্ধি ও স্নিগ্ধকর।

অতি অল্প পরিমাণে দিলেই সুস্বাদু ও সুগন্ধি পানীয় দান করে।

অথচ দামে সস্তা।

আমরা ভারতের শিল্পোন্নতি সাধনের উদ্দেশে সর্ব্বপ্রকার ভারতীয় দ্রব্য নানা প্রকার চা, বিস্কুট, সাবান, দিয়াশলাই, কাগজ ইত্যাদি ইত্যাদি সুলভে মফঃস্বলে সরবরাহ করিয়া থাকি।

ইলিয়াশ কোং,

১০৪নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চশমা! চশমা!!

সকল রকম চশমা সুলভে পাইতে হইলে একমাত্র **টি, সি, দাস** এণ্ড ব্রাদার্সের দোকানে পদার্পণ করুন। এখানে সকল রকম সোণা রূপার চশমা নিজ কারখানায় প্রস্তুত করিয়া আপনাদের মনোমত করিয়া দেওয়া হয়। অপছন্দ হইলে ১ মাসের মধ্যে পাথর বদলাইয়া দিই।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

টি, সি, দাস এণ্ড ব্রাদার্স,

১২৮।৫৩এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, (শ্যামবাজার দক্ষিণ) ক্যালঃ।

আপনার
নিজের চেহারাই হৌক
আর
নিজের তোলা ছবিই হোক

ছবিখানি সুন্দর করিতে

কার না ইচ্ছা হয়?

আবার যদি

রাজার

রোল ফীল্ম ও ফীল্ম প্যাকের দ্বারা

ছবি তোলেন

তাহা হইলে ছবি সুন্দর অতি সুন্দর

হইবেই।

RAJAR

Roll Film Film Pack

আপনার সরবরাহকারীর নিকট সন্ধান লউন

"রাজার"

রাজার মত শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট

মার্টিন এণ্ড হ্যারিস লিমিটেড,

কলিকাতা, বোম্বাই, রেঙ্গুণ।

সাতদিন মাত্র এই অমৃতবিন্দু সালসা সেবনের পরে হস্তপদের অঙ্গুলি টিপিয়া দেখিবেন শরীরে সত্য সত্যই তরল আলতার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বিশুদ্ধ রক্তের সঞ্চার হইতেছে কিনা। অমৃতবিন্দু সালসা রক্তপরিষ্কারক, বলকারক, গরমি, পারাদোষ, প্রমেহ, খোষ, পাঁচড়া চর্ম্মরোগ, নানাবিধ দৌর্ব্বল্য, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, অনিয়মিত ঋতু প্রভৃতি সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়। ১ শিশি ১৲ এক টাকা মাশুল ।৵০ আনা, ৩ শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা মাশুল ৸৵০ আনা, ৬ শিশি ৪।০ চারি টাকা চারি আনা মাশুল ১।০ **বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ** (স্বর্ণসিন্দুর) তোলা ৪৲ টাকা। উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসা গন্ধকদ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ। **চ্যবণ-প্রাশ**—উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশোলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণমাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ্ কাসি, সর্দ্দি, যক্ষা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ। ৩৲ সের।

কবিরাজ—শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত কবিরত্ন।

নবশক্তি ঔষধালয়, ২৯৭নং অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার, কলিকাতা।

টাকের অব্যর্থ মহৌষধ।

ডাঃ এন্, সি, বসু এম, বি, আবিষ্কৃত।

দশ পনের বৎসরের পুরাতন টাক চুলে পরিপূর্ণ হইবে। বহু পরীক্ষিত। মূল্য ১৲ টাকা। কতদিনের পুরাতন টাক বা কতদিন হইতে চুল উঠিতেছে। বয়স কত, স্ত্রী কি পুরুষ, অন্য কোন রোগ আছে কিনা ইত্যাদি বিবরণ সহ পত্র লিখিয়া ব্যবহার বিধি লইলে নিশ্চয়ই উপকার পাইবেন।

ডাক্তার এন্, সি, বসু

স্কিন ক্লিনিক বা চর্ম্মরোগ চিকিৎসালয়

১২০নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

মূল্য ৪।০ টাকা

মূল্য ৪।০ টাকা

বাজারের মধ্যে সস্তা অথচ উৎকৃষ্ট রিষ্ট ওয়াচ।

উৎকৃষ্ট রোল্ডগোল্ডেন রিষ্ট ওয়াচ মজবুত কলকব্জা দেখিতে সুন্দর আয়তনে ছোট এবং হাল ফ্যাসানের, দেখিলেই ঠিক ৫০৲ টাকা মূল্যের ঘড়ীর ন্যায় বোধ হয়। মার্চ্চেণ্টগণের অর্ডার গ্রাহ্য করা হইবে না। তিন বৎসর গ্যারাণ্টি। সুন্দর সিল্কের ব্যাণ্ড সহ মূল্য মাত্র ৪।০ টাকা।

কিংষ্টন ওয়াচ এজেন্সী, ১৯৫।১নং হ্যারিসন রোড, (ডেপ্ট নং ৭), কলিকাতা।

৫ মিনিটের কাজ—
মুখ ধোয়া,
জামা পরা,
কামান !
“এভার রেডী” ক্ষুরেই
এরূপ তাড়াতাড়ি কামান সম্ভব
“এভার রেডী”
ব্লেডগুলিরও
বিশেষত্ব আছে।
C. B. সেট ১ ব্লেডযুক্ত
“ট্রায়েল আউট ‘ফিট”
মূল্য ।৵০ আনা
দুই ব্লেডযুক্ত গোল্ড প্লেটেড
সেট (লাল বাক্সে)
মূল্য ॥৵০ আনা
দুই ব্লেডযুক্ত “পপুলার”
সেট মূল্য ৸০ আনা
পোঃ বক্স
আমেরিকান সেফ্‌টী রেজর কর্পোঃ লিঃ, ৯৮, কলিকাতা
Ever-Ready
Safety Razor
PUBLICITY STUDIO

লক্ষ মুদ্রা বিতরণ !! **লক্ষ মুদ্রা বিতরণ !!**

ব্যবসারাজ্যে যুগান্তর !!

সুগন্ধি তৈলের শিরোমণি

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকর ও শিরঃপীড়ানাশক

লক্ষ মুদ্রার বিরাট বিতরণ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া বিশ্ববাসীকে উহা লুটিয়া লইতে সাদরে আহ্বান করিতেছে। এই উপলক্ষে হেয়ারলিনের দাম কমিল।

বিতরণের নিয়মাবলী ও বিস্তারিত বিবরণের জন্য অদ্যই

ম্যানেজার—ক্লাইভ মেডিকেল হল

৭১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় পত্র লিখুন।

টেলিফোন—৯৭৫ কলিঃ টেলিগ্রাম—দেবেন রস কলিঃ

মৃগনাভি কস্তুরী সংযুক্ত

বাদশাহী জর্দ্দা

যে মৃগনাভী জর্দ্দা পূর্ব্বে বাদশাহগণ পানে ব্যবহার করিতেন, আমরা সেই মহাসুগন্ধি জর্দ্দা প্রস্তুত করিয়াছি। পানে ব্যবহার করুন, প্রায় দু'ঘণ্টা মুখে সুগন্ধি থাকিবে বিশেষ গুণ এই যে, বহু মূল্যবান মসলাদী মিশ্রিত থাকায় বৃদ্ধকে যুবার ন্যায় শক্তিশালী করতঃ ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি করে। রমণীগণ পানে ব্যবহার করিলে তাঁহাদের ওষ্ঠাধরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইবে। সকলেই ইহা এক আশ্চর্য্য বস্তু বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন। মূল্য ৬ শিশি ১।০, এক ডজন ২৲

সের ১৬৲। ২নং বাদশাহী জর্দ্দা ডজন ১।।০, গ্রোস ১৫৲ টাকা, সের ৮৲ টাকা। মৃগনাভী রূপালী জর্দ্দা সের ৪৲, ৫৲, ৬৲, ৮৲ হইতে২৩৲ পর্য্যন্ত। মহাসুগন্ধি কা'ন মুক্তি জর্দ্দা সের ১।।০, ২৲ ৩৲, ৪৲ হইতে ৮৲ টাকা পর্য্যন্ত।

ইস্তাজ আহমদ এণ্ড কোং,
১০৪নং মুর্গীহাটা, কলিকাতা।

তুলাকেনৈবতত্তৈলং স্তনস্তপরিধারয়েৎ
পতিতাবুত্থিতৌ স্তম্ভপিনোন্নত পয়োধরম্।
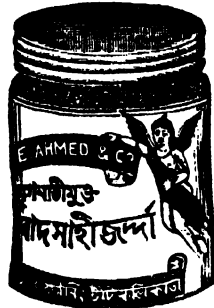
পীনোন্নত পয়োধরই যুবতীর শোভা এবং গৌরব। এই তৈল রমণীর বক্ষে ব্যবহার করিলে অল্পদিনের মধ্যে বহু পুত্রবতী যুবতীকেও ষোড়শী করে। এই ঔষধ মালিস করিতে হয় না। কেবলমাত্র প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার অল্প পরিমাণে পাতলা করিয়া মাখাইয়া দিতে হয়। পরিধেয় বস্ত্রে দাগ লাগিবার সম্ভাবনা নাই। ১০।১২ দিনের মধ্যে এই ঔষধের ফল বুঝিতে পারিবেন। ঋতুস্নানের পর হইতে সাধারণতঃ ৮ দিন ব্যবহার করিতে হয়। ইহা আমাদের বহু পরীক্ষিত ও অব্যর্থ ফলপ্রদ মহাসুগন্ধযুক্ত মহৌষধ। মূল্য শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা।

ইণ্ডিয়ান হারবল হোম,
২৪নং রাধামাধব সাহার লেন,
পোঃ বড়বাজার, কলিকাতা।

সুলভে পেটেণ্ট ও ট্রেডমার্ক রেজেষ্ট্রী

করিতে হইলে আমাদের উপর ভার দিয়া
নিশ্চিন্ত হউন। আপনার মনোমত
ও সময় মত কাজ পাইবেন।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রিলায়েবল কোং

পোষ্ট বক্স নং ৬৭৩৯ কলিকাতা।

পাকা খেজাব

ইহার রং যথার্থই পাকা। পরেও বিবর্ণ হয় না, চামড়ায়ও দাগ পড়ে না। পাকা চুল ঠিক্ই যৌবনের কাঁচা চুলে পরিণত হয়। ১ শিশিতে প্রায় ৩ মাস চলে। ব্যবহার প্রণালীও অতি সহজ। ব্রুশ সহ প্রতি শিশি ১৷০ পাঁচ সিকা।

লোমনাশক আরক ইহাতে ২।৩ মিনিটেই অতি আরামে লোম নির্ম্মূল হয়। প্রতি শিশি ৷০ আনা মাঃ ।৵০

টাউন এজেন্সী,
২০নং হলওয়েল লেন, মৃজাপুর, কলিকাতা।

শ্রীকেমিক্যালের

মহাভৃঙ্গরাজ তেল

চুলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে ও মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে অতুলনীয়। মাথা ধরা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি সকল রকমের শিরোরোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় এবং মাথা অত্যন্ত ঠাণ্ডা থাকে। অনিদ্রা একদিনে দূর হয়। চুলউঠা ও টাকপড়া বন্ধ হয় এবং চুল ঘন কালো, নরম ও কোঁকড়া হয়।
ভিঃপিঃতে ১ শিশি ১৲, ৩শিশি ২৸৴০, ডজন ৯৷০।

শুক্র তারল্য ও পুরুষত্বহানির মহৌষধ

* বানরিকা *

(আলকুশীবীজ, অশ্বগন্ধা, শিমুল মূল, শালম মিছরি, মুক্তাভস্ম)
রক্ত, শুক্র ও মেধা বিশেষ পুষ্ট হয় এবং নিয়মিত ব্যবহার করিলে জরাজীর্ণ বৃদ্ধও যুবকের বল ও তেজ লাভ করেন। আর বেশী বলা বাহুল্য।
১মাসের উপযোগী ভিঃপিঃতে (ডাকমাশুল সমেত) ৫৲।

শ্রীকেমিক্যাল ওয়ার্কস্
৩৩নং কাঁসারিপাড়া রোড, ভবনীপুর,
কলিকাতা।

“মীরা” টুথ্ ব্রুস। “MIRA” REGD

মীরা টুথ ব্রুস এমন সুচারুরূপে দাঁতের ময়লা পরিষ্কার করে যে ইহা দ্বারা দাঁত মাজিলে দাঁত অকালে নষ্ট হওয়ার কোনই আশঙ্কা থাকে না। ইহা এমন বিশেষ ভাবে প্রস্তুত যে ইহা অতি সহজেই দাঁতের ফাঁক হইতে ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যকণা বাহির করিয়া দন্ত পংক্তি নির্ম্মল করে। দন্ত চিকিৎসকগণ এই ব্রুসই ব্যবহার করিতে বলেন।

ইহাই উচিত মুল্যে সর্ব্বোত্তম ব্রুস

ইহা শক্ত—মাঝারি ও কোমল—তিন রকমই পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক :—মেসার্স মায়ার হফ্ এণ্ড সাই, এ, জি ; ক্যাসাল জার্ম্মাণী।

ভারত ও বর্ম্মের সোল এজেন্টস্—

টি, এম, ঠাকর এণ্ড কোং,

৪নং চার্চ্চগেট ষ্ট্রীট, ফোর্ট, বোম্বাই।

ব্রাঞ্চ :—	কলিকাতা	মাদ্রাজ	করাচি	লাহোর
পোঃ বকস নং—	২১১১	২৪৯	১১৪	১৩৪

দেশের পয়সার

যদি প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিতে চান এবং খাঁটী স্বদেশী বিড়ি ও চুরুট পান করিতে ইচ্ছা করেন বা বিড়ি তৈয়ারির জন্য পাতা, শুখা ও আর আর সরঞ্জাম ন্যায্য মুল্যে পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে আজই পত্র লিখুন। বিনামূল্যে, বিনামাশুলে দর সহ নমূনা পাঠান হয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র চন্দ্র,
৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

আমেরিকার চিকিৎসা বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য শক্তি

এসেন্স ফস্ফরিণ পিল

রেজিষ্টার্ড, সাবধান, বিকৃত নামে জাল হয়েছে

ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগে—অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্রক্ষয় হেতু রোগ ও তদ্দ্বারা বিবিধ উপসর্গ, মেহ, প্রমেহ, গণোরিয়া, স্বপ্নদোষ, পুরুষত্বহানী বা ঐ উপক্রম, বহুমূত্র, শুক্রতারল্য, অনিচ্ছায় সামান্য উত্তেজনায় বা অসময়ে স্খলনে আশাতীত উপকার হয়। শুক্রের ধারণাশক্তি বর্দ্ধনে ইহার তুল্য ঔষধ আর নাই। স্খলনকারী স্নায়ুর উপর প্রত্যক্ষ ক্রিয়া এই যে, মাত্রা বিশেষে সেবন করিলে ইহা অন্যত্র ইনহিবিটারী নার্ভের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া বিনা দৌর্ব্বল্যে উষ্ণপ্রধান দেশেও ধাতুস্তম্ভন ঘণ্টা স্থায়ী করে। ঐ সময়ে অম্লসেবন নিষেধ। মূল্য শিশি ১।০, ৩শিশি ৪।০ মাঃ ।৵০। ঠিকানা এজেন্ট :—পি, ডেভিস কোং, পোঃ হাটখোলা ( ), কলিকাতা। খুচরাবিক্রেতা—বটকৃষ্ট পালকোং, বোসকোং, হোয়াইটহল, বেঙ্গলক্লিনিক্স

প্রোঃ ডাঃ সরকার কৃত

আশ্চর্য্য হোমিওপ্যাথিক ইনজেকসন।

৬টী এম্পুলস সহ পূর্ণ বাক্স

মুল্য ২৲ টাকা মাত্র।

হাঁপানি, গণোরিয়া, সিফিলিস্ প্যারালিস, থাইসিস্ ইত্যাদি যাবতীয় কঠিন ব্যাধি, উক্ত ইনজেকসন্ দ্বারা চির জীবনের গ্যারান্টি দিয়া আরোগ্য করা হইতেছে।

মফঃস্বলবাসী চিকিৎসকগণের সুবিধার্থ “বিশুদ্ধ আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ঔষধ” (ড্রাম /৫ ও /১০) বিশেষ যত্ন সহকারে সাপ্লাই করা হয়। **হোমিও লিভার স্প্লীন সিরেট** :—যাবতীয় লিভার স্প্লীনের অব্যর্থ ঔষধ। মূল্য ॥০ আনা। **হোমিও ল্যানসেট ও এণ্টিফ্লোজিন** :—বিনাঅস্ত্রে সার্জ্জারির কার্য্য সম্পন্ন হইবে। মূল্য ॥০ আনা।

হোমিওপ্যাথিক লাকসন। মূল্য ॥০ আনা। এই জোলাপ খাইতে সুমিষ্ট। আহারান্তে সেবন করিলে ২।১ টী সরল দাস্ত হইবে।

ক্যাটালগের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

প্রোঃ ডাঃ কে, সরকার,
১১নং মদন পাল লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা।

সৎ-সাহিত্য প্রচারের বিজয় অভিযান !!!

কাচ বিনিময়ে কাঞ্চন লাভ **ধূলামুষ্টির পরিবর্ত্তে স্বর্ণমুষ্টি**

ওজন দরে কাগজের দামে বিক্রয়

শুধু কার্য্যে নয়, কথায় নয়, এমন কি কল্পনায়ও যাহা এতদিন অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইত, সমাজের অকৃত্রিম সেবক

এর কল্যাণে আজ তাহা সম্ভবে এবং বাস্তবে পরিণত হইল

'সৎ-সাহিত্যের চর্চ্চা না হইলে জাতির উন্নতি সুদূর পরাহত' শুধু এই অতি খাঁটি সত্যটিকে উপলব্ধি করিয়াই আজ আমরা এই অসম্ভব কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছি। আমাদের এই যাত্রার সাফল্য নির্ভর করিতেছে দেশবাসীর আন্তরিক চেষ্টা ও সহানুভূতির উপর।

নিম্নে কয়েকখানি সৎ-সাহিত্যের নাম ও দাম দেওয়া হইল।

উপন্যাস

রিক্তা—শাহাদাৎ হোসেন প্রণীত মূল্য ১।০
যুগের আলো— „ „ ।।০
মাটীর মানুষ—আকবর উদ্দীন প্রণীত ৸০
অনাথিনী—খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন „ ৸৵০
দুটি ভগ্নী—শফিউদ্দীন আহমদ প্রণীত ১।০
কনোজ কুমারী— „ ৸০
মোমেনা— ১৲
আপন হারা—মোহাম্মদ শাহজাহান প্রণীত ১৲

সাহিত্য ও ধর্ম্ম-গ্রন্থ

আমপারার বঙ্গানুবাদ— ২।০
এসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য—১৲
মানব জীবন— ১৲

নাটক ও কাব্য-গ্রন্থ

মৃদঙ্গ—কবি শাহাদাৎ হোসেন প্রণীত ১৲
সিন্ধু বিজয়—আকবর উদ্দীন প্রণীত ৸০

ইতিহাস

ফারুক-চরিত— ২৲
মোসলেম বিক্রম— ২৲
আফগানিস্থান— ১।০

শিশু পাঠ্য

মোহন ভোগ— ৸০
মুসলমানী কথা— ১।০
ফাতেমা-জোহরা— ৸০
জেন-পরী—শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন ১৲

উপহার ! উপহার !! উপহার !!!

প্রত্যেক ৩৲ টাকার উপরের ক্রেতাকে একখানি "জেন পরী", প্রত্যেক ৫৲ টাকার উপরের ক্রেতাকে একখানি "বার্ষিক মোহাম্মদী", প্রত্যেক ১০৲ টাকার উপরের ক্রেতাকে একখানি "মোসলেম বিক্রম" উপহার দেওয়া যাইবে।

এ মহাসুযোগ আর আসিবে বলিয়া মনে হয় না।

মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ৯১নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

The air is full of music—"YOU NEED A—RADIO"
রেডিও — সুধু খোকাকে ভোলায়না— খোকার বাপকেও ভোলায়।

WITHOUT INJECTION

MOST RATIONAL & UNFAILING TREATMENT

Of all Chronic & Acute Diseases

AT

Schussler Institute

16, Royd Street, Calcutta.

BY

Dr. Premen Ray,
F. C. S. (Lon), M. D.
BIOCHEMIST.

WITHOUT OPERATION

Annual Contract Rate—
Annas Eight Per Line

Minimum Four lines
Rupees Two only.

TRY ONCE
Day's Pure Darjeeling Tea.
The Himalayan Tea Syndicate
15, Shama Charan Dey St, Cal.

মেরামত!

রেডিও, লাউড্ স্পিকার, হেড্‌ফোন ইলেকট্রিক বাতি পাখা, ইত্যাদি ইলেকট্রিকের কাজ সমস্তই করিয়া থাকি ; দর সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। টাইপ রাইটার গ্রামোফন, সেলাইয়ের কল, ইত্যাদি যাবতীয় কল-কব্জার কাজ

অটোমেটিক ওয়ার্কস,
১০৪, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

Darjeeling Tea House.
25, Harrison Road, Cal.
(Mofussil orders delivered freight free)

The East Bengal Laundry.
4, Wellesly Street, Calcutta.
Art Dyers High Class Cleaners and Bleachers.

Drink HALDER'S Darjeeling Tea.
Be satisfied with the best Tea of the said firm write its good Liquor, Taste and flavour. Price cheap.
126/B, Amherst St, Cal.

CHATTERJEE & CO. Dealers in West End & Zenith Watches.
151, Radhabazar Street, Calcutta.

Dr. K. K. Roy, M. D. (California, U.S.A)
Specialist in Chronic Diseases.
Hours: 1 to 2 P. M. & 7 to 8 P. M,
10/A, Madge Lane, off Lindsay St, Cal

Rebuild Typewriter Co,
Repairers, Dealers and Stockists of all Sorts of Second-hand Rebuilt Standard and Portable Typewriters,
85/A, Clive Street CALCUTTA.

Bumpkeybunn [illegible]

শাহী তামাক

পানদান গোলাপ পাশ গড়গড়া ইত্যাদি মোরাদাবাদি ফ্যান্সি জিনিষ সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে।

সুগন্ধি মশলায় প্রস্তুত ; একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
একপোয়া টিন ।০ আনা মাত্র

আমাদের ১৪নং স্পেশাল স্প্রিং টিউব ব্যবহার করুন

মোহাম্মদ ইব্রাহিম হামিদুল্লাহ
৭২, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

Spectacles of all Sorts
At a Cheap price but of dear quality Tooth binding one Rupee each to be had at J. DASS & CO, *108, Cornwallis Street Calcutta.*

Anti T. B. Specific. (যক্ষ্মার)
Subodh Dass & Co.,
65-2 Harrison Road, Calcutta.
(For particular see advt. within.)

হাজি মোহাম্মদ জাফর তুর্কি
প্রসিদ্ধ তুর্কি ও পাহলবী টুপী বিক্রেতা
আমরা আসল ইস্তাম্বুল টুপী আমদানী করিয়া থাকি।
১৪২ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

সেখ আবদুল ওহাব এণ্ড কোং,
(স্থাপিত ১২৮৩)
সাবান, এসেন্স আতর, স্নো জরদা, নস্য, হেয়ার ওয়েল, গোলাপ জল ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য তৈয়ারকারক ও বিক্রেতা। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ১৭নং করপোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Aluminium & Enamel-Ware
A. M. Dadabhoy
56-7, Canning Street, Cal.

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ একমাত্র অকৃত্রিম ঔষধ এখানেই পাওয়া যায়। বাজারের সস্তা ঔষধ যাঁহারা ব্যবহার করিয়া হতাশ হইয়াছেন তাঁহারা একবার পরীক্ষা করুন। বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। শতকরা ১২॥০ কমিশন।
লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৩৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্পেশাল "এক্সমাস" রিডাকশন

নূতন চশমা বিক্রয় ঘড়ি ও চশমা মেরামত হয়।

দুই বৎসরের গ্যারাণ্টি

পকেট ওয়াচ	প্রত্যেকটি	১॥৶০
রিষ্ট ওয়াচ	,,	২৸০
এলার্ম টাইমপিস	,,	১৸৶০
সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্লক	,,	৮।০

এ্যারেবিয়ান ওয়াচ কোং, ১১৩ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

FIT WELL

Tailors & Outfitters.

To Fashionable Gentlemen. Silk Shirts Specialists. always stocks suitings, see their new Winter stocks. Suits made to order. Well noted for cheap charges and prompts delivery. Inspections invited, Trials Solicited.

26-2, Wellesley Street, Calcutta.

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ দ্বিতীয় সংখ্যা

চতুর্থ বর্ষ

বাংলা দেশের গান

গোলাম মোস্তফা

'প্রাণ খুলে আজ গাওরে মুস্‌লিম, বাংলা দেশের গাওরে গান।
এই আমাদের জন্মভূমি—ভক্তি-অর্ঘ্য দাওরে দান ॥
এ দেশ মোদের নয় আপনার
ভুল কথা এ—অলীক অসার,
বাংলা মোদের, ভারত মোদের,—আপন মোদের সব জাহান ॥

হেথায় মোরা নই বিদেশী,—এ যে মোদের আপন দেশই
মোরাই খাঁটী খাশ বাঙালী—দেশের দাবী মোদের বেশী।
বাংলা দেশের ভারতে ভাই
নূতন যুগের আর্য্য মোরাই,
বীর-কেশরী বখ্‌তিয়ারের উড়্‌ছে হেথায় জয়-নিশান ॥'

এই দেশেরি জলে-স্থলে, লতায়-পাতায় ফুলে-ফলে
জীবন মোদের জড়িয়ে গেছে দিনে দিনে পলে পলে।
এই দেশেরি মিষ্ট বুলি
জন্ম হ'তে কণ্ঠে তুলি,
এই দেশেরি পীযূষ-ধারা নিত্য মোরা কর্‌ছি পান ॥

হেথায় মোরা মুক্ত প্রাণে, বাস করি ভাই সকল খানে,
আকাশ-বাতাস পূর্ণ মোদের তৌহিদেরি বাঁশীর তানে।
লক্ষ মস্‌জিদ-মিনার-চূড়ে
ইস্‌লামের লাল ঝাণ্ডা উড়ে
মুক্ত-কণ্ঠে দিগ্‌দিগন্তে মুয়াজ্জিন্‌ রোজ দেয় আজান॥

এই দেশেরি কুঞ্জ-ছায়ায় মোদের বুল্‌বুল্‌ গান গেয়ে যায়,
গোলাব-হাস্নাহেনার গন্ধে দিল্‌ জুড়ায় ভাই সকাল-সন্ধ্যায়।
মেহ্‌দী পাতার রংয়ের আভায়,
বাংলা-মা তার হাত-পা ছোপায়,
গুল্‌-বাগিচার পরশ পেয়ে হাস্‌ছে দেখ্‌ ওই ফুল-বাগান॥

মুক্ত মাঠের আঙ্গিনাতে মোদের কৃষক আপন হাতে
'সোনার বাংলা'র মূর্ত্তি গড়ে লাঙল-তুলির পরশ-পাতে।
ধানের ক্ষেতের আলো-ছায়ায়
মন ভুলে যায় রূপের মায়ায়
দূর বেহেশ্‌তের রূপ মাধুরী মর্ত্ত্যে নামে মূর্ত্তিমান॥

এ দেশ মোদের চিরতরে ঠাঁই দিয়েছে স্নেহভরে
বাঁচ্‌লে মোরা রই বুকে তার, ম'রলে রই তার গোরের ঘরে।
মৃত্যু শেষে পুড়ে পুড়ে
ভস্ম হ'য়ে যাইনা উড়ে
'রোজ-হাশর'-তক্‌ এম্‌নি ক'রে এই খানেই ভাই ধ'রব প্রাণ॥

এমন আপন দেশকে ভুলে ভাস্‌বি কোথায় কোন্‌ অকূলে ?
জন্মভূমির পুণ্য-ধূলি নে'রে ও ভাই মাথায় তুলে।
দেশ-জননী উঠুক হাসি'
টুটুক রে তোর দুঃখ-রাশি
খোদার আশীষ নামুক শিরে, হোক্‌ সকল্‌ মুশ্‌কিল-আসান॥

মোহাম্মদ তোগলক

মোহাম্মদ আকরম খাঁ

(১)

মোছলেম-শাসিত ভারতের বিভিন্ন অংশের ইতিহাস সম্বন্ধে ইংরাজ লেখকগণ দীর্ঘকাল হইতে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। আমাদের প্রতিবেশীরা এতদিন ইংরাজ লেখকগণের এইসব আলোচনা ও সিদ্ধান্তের অন্ধ অনুকরণ করিয়াই এযাবৎ নিজেদের কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া আসিতেছিলেন। হিন্দু ও ইংরাজ উভয়ের সহিত মুছলমানের বিজেতা ও বিজিতের সম্বন্ধ। সুতরাং মুছলমানের ইতিহাসকে কলঙ্কলিপ্ত করিতে বা দেখিতে তাঁহাদের একটা রাজনৈতিক স্বার্থ ও স্বাভাবিক আগ্রহ থাকা আদৌ বিচিত্র নহে। এই স্বার্থ ও আগ্রহের সংঘর্ষে পড়িয়া, ছোলতান মাহমুদ হইতে নওয়াব ছেরাজুদ্দাওলা পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত বাদশাহ-নওয়াব মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, সঙ্কীর্ণচেতা, ধর্ম্মান্ধ, বিকৃত-মস্তিষ্ক ও মহাপাতকী নরপিশাচরূপে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিত্রিত হইয়া আছেন। ইংরাজ লেখকগণের "স্বাধীন বিচার" এবং তাঁহাদের "গভীর গবেষণা"গুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বপ্রথমে নিম্নলিখিত তথ্য কয়টা মুছলমান পাঠককে স্তম্ভিত করিয়া তুলিবে :—

(১) যে সকল বাদশাহ, নওয়াব, শাসনকর্ত্তা শরিয়তের পা-বন্দ ছিলেন—অর্থাৎ জীবনে যাঁহারা নামাজ রোজা পরিত্যাগ করেন নাই, মাদক ও ব্যভিচারের ত্রিসীমায় পদার্পণ করেন নাই, এছলামের বিধিবিধানকে মান্য করা যাঁহারা নিজেদের এবং সমস্ত মুছলমানের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন—সেই শ্রেণীর সমস্ত সাধু-চরিত্রের ব্যক্তিকেই তাঁহারা অতি কুৎসিৎ বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন।

(২) দেশের শাসন-পালনে যে সব বাদশাহ, নওয়াব বা শাসনকর্ত্তা নিজেদের অযোগ্যতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, ইংরাজ লেখকগণ তাঁহাদিগকে প্রথমে এছলামের আদর্শ ভক্ত ও স্বধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান। তাহার পর নিজেদের যথেষ্ট প্রতিভা ব্যয় করিয়া তাঁহারা পাঠকের মনে, হয়ত তাহার অজ্ঞাতসারে, এই ধারণাটী বদ্ধমূল করিয়া দিতে চান যে, এই ধর্ম্মপরায়ণতাই তাঁহাদের পতনের বা অযোগ্যতার মূলীভূত কারণ।

(৩) যে সমস্ত বাদশাহ, নওয়াব ও শাসনকর্ত্তা স্ব-ধর্ম্মে আস্থাহীন ছিলেন, অথবা অন্য কোন কারণে যাঁহারা এছলামের শক্তি-ক্ষয় বা অবমাননা করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, ইংরাজ লেখকগণ তাঁহাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তিনি ব্যভিচারী হউন, মদ্যপায়ী হউন, লম্পটের শিরোমণি হউন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই!

আমাদের দেশের হিন্দু-লেখকগণও, সম্ভবতঃ মানসিকতার অভিন্নতা হেতু, দীর্ঘকাল যাবৎ গুরুমহাশয়দিগের এই আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিয়া আসিতেছেন। ফলতঃ মোছলেম ভারতের ইতিহাসের নামে বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষার মধ্যবর্ত্তিতায়, যে সব পুস্তক, প্রবন্ধ ও আলোচনা আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, বিপক্ষ-উকিলের প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় তাহাতে পাওয়া গেলেও, সূক্ষ্মদর্শী নিরপেক্ষ বিচারকের ন্যায়-নিষ্ঠার প্রমাণ তাহাতে প্রায়ই পাওয়া যায় না। একটা পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত প্রতিপাদ্যের ব্যাকুল সঙ্কল্প, একটা পূর্ব্ব-সঞ্চিত ধারণার তীব্র প্রভাব এবং একটা রাজনৈতিক 'প্রোপ্যাগেণ্ডার' অসাধু অভিসন্ধি, তাঁহাদের আলোচনার প্রত্যেক স্তরে আত্মগোপন করিয়া বিরাজ

করিতেছে। এই সমস্ত লেখকগণের অবাধ চেষ্টার ফলে মোছলেম-শাসিত ভারতের ইতিহাস আজ এরূপ বিকৃত আকার ধারণ করিয়া আছে।

(২)

হিংসা বিদ্বেষ, সংস্কার ও দুরভিসন্ধির এই সব আবর্জ্জনাকে অবসারিত করিয়া, ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধারের জন্য যে সমস্ত হিন্দু-মুছলমান লেখক আন্তরিক ভাবে সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রত্যেক সত্যাশ্রয়ী ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন। কিন্তু অতিশয় পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। তাহার পর, বিচার আলোচনার যে ধারা তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন, বহু ক্ষেত্রে নানা কারণে তাহা তাঁহাদের উদ্দেশ্যানুযায়ী সুফল প্রদান করিতে পারিতেছে না। বরং স্থানে স্থানে হিতে বিপরীত ঘটিয়া এক একটা স্পষ্ট মিথ্যা, তাঁহাদের হাত দিয়াই সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইতেছে। এই কারণগুলির সামান্য একটু আভাষ দেওয়ার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

মোছলেম-ভারতের ইতিহাস-আলোচনা করার সুযোগ এযাবৎ আমার ঘটিয়া উঠে নাই। এ সকল বিষয় লইয়া আমাকেও আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে, এ ধারণাও আমার ছিল না। গত বৎসরের মাসিক মোহাম্মদীতে "মোহাম্মদ তোগলক" সম্বন্ধে কএকটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ সকল প্রবন্ধের লেখক-বন্ধুরা আমাকেও এই আলোচনায় শরিক হইতে অনুরোধ করেন। "আজ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে" আমি "নিজে লেখনী ধারণ" না করায় কোন কোন পাঠক এবং কএকজন শিক্ষক বন্ধু বিশেষ অনুযোগ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। বন্ধুদের এই অনুগ্রহের ফলে, নিতান্ত দায়ে ঠেকিয়া, আমি প্রথমে ছোলতান মোহাম্মদ তোগলকের জীবনী সম্বন্ধে, সময় ও সুযোগ মত, এক আধটুকু আলোচনা করিতে আরম্ভ করি। আমার এই আলোচনা এখনও শেষ হয় নাই, এবং আমার নিজের সন্তোষজনকভাবে শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ছোলতান মোহাম্মদ তোগলক সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। তবে এই আলোচনা প্রসঙ্গে মোছলেম-শাসিত ভারতের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে যে কএকটা বিশেষ তথ্য আমার নজরে পড়িয়াছে, তাহারই একটা অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ আভাষ আজ পাঠকগণের খেদমতে উপস্থিত করিব। ভবিষ্যতে মোহাম্মদ তোগলকের জীবনীর ভূমিকা স্বরূপ ইহা হইতে কিছু উপকার পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করি।

(৩)

আমাদের নিরপেক্ষ লেখকগণও মোছলেম ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে বহু স্থানে ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কারে সমর্থ হন নাই। বরং অনেক ক্ষেত্রে সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রকাশ করিয়া তাঁহারা নানা অঘটনের সৃষ্টি করিয়াছেন। "নিরপেক্ষ ও সত্যানুসন্ধিৎসু" সমাজে তাঁহাদের যে যশ আছে, তাহার ফলে এই বিভ্রাটগুলিকেই সমাজ ইতিহাসের চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছে। এই বিভ্রাটের কএকটা কারণ নিম্নে অতি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

(১) এই শ্রেণীর লেখকগণ প্রথমতঃ নির্ভর করিতে চান—পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকগণের দ্বারা লিখিত বা সঙ্কলিত ইতিহাস পুস্তক গুলির উপর। সেই লেখক যদি সমসাময়িক হন, তাহা হইলে ত আর কথা নাই। এই জন্য তাঁহারা original authority বা মূল দলিলের সন্ধান লওয়ার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু এই মূল দলিল গুলির প্রায় সমস্তই উচ্চপদের পার্শি ভাষায় লিখিত এবং সে ভাষা আয়ত্ত করা বহু কষ্ট-সাপেক্ষ। কাজেই অনেকেই "মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ"—নীতি অনুসারে তাহার ইংরাজি অনুবাদের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হন। ইঁহারা মনে করেন, ইংরাজ লেখকের ব্যক্তিগত মতামত যাহাই হউক না কেন, তাহার অনুবাদ সম্বন্ধে আপত্তি করার কোনই কারণ নাই। কিন্তু অতিশয় পরিতাপের বিষয় এই যে, মুছলমানের ধর্ম্ম, সভ্যতা ও ইতিহাস সম্বন্ধে ইংরাজ লেখকগণের যতগুলি অনুবাদ আমার হস্তগত হইয়াছে, তাহার বহু স্থানে অতি গুরুতর, এমন কি স্বেচ্ছাকৃত বিকারের স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়া আমাকে স্তম্ভিত হইতে হইয়াছে। মুছলমানদিগের রচিত ইতিহাস পুস্তকগুলির অনুবাদেও এইরূপ বহু বিকারের প্রমাণ পাওয়া যায়। ছোলতান মোহাম্মদ তোগলকের কএকটা জঘন্য কলঙ্কও এই শ্রেণীর ইংরাজ অনুবাদকদিগের স্বেচ্ছাকৃত বিকারেরই

ফল। অতি সংক্ষেপে একটা উদাহরণ দিয়া বলিতেছি, তাহা হইলে বিষয়টা সহজ বোধ্য হইয়া যাইবে।

পার্শি সাহিত্যের আদব কায়দার এবং মুছলমান ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা প্রণালীর একটা সাধারণ ধারা এই যে, বাদশাহ যখন নিজের সমতুল্য কোন রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে বহির্গত হন, তখন তাহাকে 'সমর-অভিযান' বা 'যুদ্ধ যাত্রা' প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কিন্তু পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের কোন ব্যক্তির, অথবা কোন স্থানের বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে কিম্বা দস্যুদিগকে দমন করার উদ্দেশ্যে সম্রাট সৈন্য লইয়া অভিযান করিলে, তাহাকে যুদ্ধ যাত্রা, সমর-অভিযান বা এই শ্রেণীর কোন কথার দ্বারা প্রকাশ করা হয় না। বরং এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ বলা হয় ঃ—

"سلطان بر سم شکار روان شد"
"بادشاه بر سم شکار بیرون رفت"
"بر سم شکار کوکبهٔ خسروی در حرکت آمد"

বাঙ্গলার ইহার শাব্দিক অনুবাদ হইবেঃ—"সম্রাট শিকার পদ্ধতিক্রমে বহির্গমন করিলেন।" সম্রাট মোহাম্মদ তোগলক "বার্ণের" বিদ্রোহ দমন করার জন্য যাত্রা করেন এবং ঐতিহাসিক এই পরিভাষা অনুসারে তাহাকে "শিকার পদ্ধতিতে করা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "ফিরোজ শাহী" নামক ইতিহাসেও প্রচলিত ও সর্ব্ববিদিত সাধারণ পরিভাষা অনুসারে এই ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে। আমাদের বিখ্যাত ঐতিহাসিক এলফিনষ্টোন সাহেব ফিরোজ শাহীর অনুবাদ করিয়াছেন। এই সহজ ও সরল ঘটনাটা অনুবাদকের হাতে এমন জঘন্য ও ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে যে, তাহা পাঠ করার পর মোহাম্মদ তোগলককে নর-পিশাচ ব্যতীত অন্য কোন আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। তিনি অনুবাদের নামে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই যে—বিদ্রোহ দমন কল্পে এবং প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এবার মোহাম্মদ তোগলক যে নির্ম্মম উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা জগতের সমস্ত পাষণ্ডতা ও পাশবতা কে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। বড় লোকেরা শিকার খেলার জন্য জঙ্গলে যেরূপ খেদা বা ঘেরা দিয়া পশুদিগকে হত্যা করিতে করিতে কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়, এবং যেখানে উপস্থিত হইয়া নিরুপায় পশুপালদিগকে হত্যা করিয়া আনন্দলাভ করিয়া থাকে, এলফিনষ্টোন সাহেবের "অনুবাদ" মতে, "বরণ" প্রদেশের অধিবাসীদিগকে অপরাধী নিরপরাধ এবং নরনারী বালক-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে এইরূপে হত্যা করিয়া ফেলার জন্য ছোলতান মোহাম্মদ সৈন্য লইয়া বহির্গত হইলেন এবং পরিণামে ভারতের এক বিশাল জন পদের সমস্ত অধিবাসীকে ঐ প্রকারের শিকারের খেদার মধ্যে ফেলিয়া নিঃশেষে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। এক "শিকার" শব্দ লইয়া এই বিভ্রাটের সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইংরাজ লেখকদিগের অনুবাদের উপর নির্ভর করা যে কত-দূর বিপদ-জনক, এই উদাহরণ হইতে তাহার আভাষ পাওয়া যাইতে পারে।

এই শ্রেণীর বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের দেশের কএকজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বহু আয়াস স্বীকার করিয়া পার্শি ভাষায় লিখিত মূল ইতিহাস-পুস্তক গুলির আলোচনা করিতেছেন এবং তাহা হইতে বহু ঐতিহাসিক তথ্য-উদ্ধার করিয়া সমাজকে উপহার দিতেছেন। তাঁহাদের উদ্যম ও অধ্যবসায় যে বিশেষভাবে প্রশংসার্হ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, কঠোর সাধনা ও আন্তরিক সত্যলিপ্সা সত্বেও তাঁহাদের এই পরিশ্রম আশানুরূপ ফল প্রসব করিতে পারিতেছেনা। ইহার প্রধান কারণ এই যে, এই শ্রেণীর লেখকগণ ঐ ইতি-হাস পুস্তকগুলিকে সর্ব্বতঃভাবে বিশ্বাস্য ও চরম প্রমাণ বলিয়া মনে করিয়া লইয়াই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিশেষতঃ কোন বাদশাহ, নওয়াব বা মুছলমান শাসন কর্ত্তার কোন প্রকার কলঙ্কের কথা এই সকল ইতিহাসে পাওয়া গেলে, তাহাকে চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ ও প্রচার করা হয়। মুছলমান লেখকগণ এই সব কলঙ্ক-স্খালনের জন্য যথেষ্ট আকুলি-ব্যাকুলি প্রদর্শন করেন। কিন্তু যুক্তির হিসাবে কোন কথা বলা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠেনা। কারণ, ঐতিহাসিক—মুছলমান, এবং বহু ক্ষেত্রে সম-সাময়িক। তাই, অবশেষে হিন্দু-লেখকদিগের উদ্দেশ্যে কএকটা কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হইয়া বসেন। অথচ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, এই সকল কলঙ্কের অধিকাংশই মুছলমান ঐতিহাসিক ও অন্যান্য লেখকগণের নিজেদেরই সৃষ্টি।

আমাদের এই শ্রেণীর ইতিহাস পুস্তকগুলির মধ্যে বহু ক্ষেত্রে নানা কারণে এই সব বিভ্রাটের সৃষ্টি হইয়াছে। একটু চেষ্টা করিলে, তৎকালীন অন্যান্য সমসাময়িক সাহিত্যে এই সব বিকার ও বিভ্রাটের মূল কারণগুলির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। ছোলতান মোহাম্মাদ তোগলকের জীবন-চরিত অবগত হওয়ার প্রধানতম সূত্র হইতেছে—জিয়াউদ্দিন বার্ণিকৃত "তারিখে ফিরোজশাহী।" জিয়াউদ্দিন মুছলমান এবং মোহাম্মাদ তোগলকের সমসাময়িক। কোন কোন ইংরাজ লেখক ইঁহাকে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ খাঁটি মুছলমান বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। মোহাম্মাদ তোগলকের জীবনী দুনয়ায় এমন মসি-মলিনরূপে অঙ্কিত হইয়াছে, মূলতঃ এই জিয়া-উদ্দিনেরই লেখনী-প্রভাবে। অমুছলমান লেখকগণ তাঁহার "তারিখ" হইতে মোহাম্মাদ তোগলকের নানাপ্রকার খামখেয়ালী ও অনাচার-অত্যাচারের কথা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছেন, এবং আমরাও অনর্থক আঁকুবাকু করিয়া নীরবে তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য হইতেছি। কিন্তু একটু শ্রম স্বীকার করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, কএকটা বিশেষ কারণে জিয়াউদ্দিন বার্ণি ছোলতান মোহাম্মাদ তোগলকের প্রতি অশেষ ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করিতেন—ছোলতানকে তিনি স্বধর্ম্মের ও স্ববংশের পরম শত্রু বলিয়া মনে করিতেন, এবং এইজন্য তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক নিতান্ত অন্যায় ভাবে ছোলতানের নামে বহু মিথ্যা দোষারোপের সৃষ্টি করিয়াছেন, অনেক ঘটনাকে অতিশয় নিপুণতার সহিত বিকৃত করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন। নমুনাস্বরূপ লেখকের এই বিদ্বেষ ও শত্রুতার কএকটা কারণ ও প্রমাণ নিম্নে অতি সংক্ষেপে উদ্ধার করিয়া দিতেছি :—

(ক) সে সময় নানাপ্রকার শের্ক-বেদআৎ, অনাচার ও কুসংস্কার ভারতের মুছলমান সমাজকে সাধারণভাবে আচ্ছাদিত ও সম্মোহিত করিয়া ফেলিয়াছিল আল্লার কোরআন ও তাঁহার রছুলের হাদিছকে মৌলবী নামধারী ব্যক্তিরাও বিস্মৃত হইয়া বসিয়াছিল। কেহ প্রমাণস্থলে কোরআন-হাদিছের উল্লেখ করিলে তাহাকে প্রকাশ্যভাবে তিরস্কৃত হইতে হইত। পক্ষান্তরে মধ্য এশিয়া হইতে বিতাড়িত মুছলমানরূপী এছলামের গুপ্ত শত্রুগণও দলে দলে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদের চেষ্টা-চরিত্রের ফলে মুছলমানদিগের এই শোচনীয় চিত্র শোচনীয়তর হইয়া দাঁড়ায়। এই সময়, তখনকার মোজাদ্দেদ হজরত শেখুল-এছলাম এমাম এবনে তাইমিয়া দেমশকের কারাগার হইতে নিজের মন্ত্রশিষ্য কএকজন বিশিষ্ট আলেমকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন, কএকশত হাদিছের পুস্তকও এই সময় সম্রাটের নিকট প্রেরিত হয়। ছোলতান মোহাম্মাদ এই সব আলেমের বিশেষ ভক্ত ছিলেন, তাঁহাদের কএকজনকে রাজদরবারে রাখিয়াছিলেন, অবশিষ্ট আলেম-দিগের প্রতি অন্য প্রকারে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। ফলতঃ মোহাম্মাদ তোগলক ছিলেন সংস্কারের পক্ষপাতী, এবং এমাম এবনে তাইমিয়ার শিষ্যগণ তাঁহার সহায়তায় ভারতে প্রকৃত এছলামকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতে থাকেন। পক্ষান্তরে জিয়াউদ্দিন বার্ণি ছিলেন পূর্ব্বোক্ত মতের অর্থাৎ গোরপূজা ও অন্ধবিশ্বাস প্রভৃতির ঘোর পক্ষপাতী। "নামাজ-রোজার এবং শরিয়তের অন্যান্য বিধিবিধানের পাক্কা পা-বন্দ হইলেও, এবং জীবনে কোন প্রকার মাদক দ্রব্য বা ব্যভিচারের ত্রিসীমায় পদার্পণ না করিলে" (বার্ণির স্বীকা-রোক্তি) "ছোলতান মোহাম্মাদ তোগলক ধর্ম্মভ্রষ্ট ও বে-দিন ছিলেন, ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ সাধন করার জন্য অহরহ চেষ্টা করিতেন।" ইহার প্রমাণস্বরূপে তিনি মোহাম্মদ তোগ-লকের দার্শনিক মনোভাবের যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। কথায় কথায় তিনি قال العلماء বা আলেমদিগের উক্তির বিরুদ্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রের যুক্তি উপস্থিত করিতে চান, ইহা তাঁহার নাস্তিকতার একটা বড় প্রমাণ! তাহার পর, মোহাম্মাদ তোগলকের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অপরাধ এই যে, তিনি উপরোক্ত "ধর্ম্মদ্রোহী বে-দিন মৌলবী" দিগকে নিজের দরবারে আশ্রয় দিয়াছেন এবং তাহাদের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। জিয়াউদ্দিন স্বয়ংই এই সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং অতঃপর তাঁহাদিগকে নাম ধরিয়া জঘন্য ভাষায় গালিগালাজ করিয়াছেন। অথচ অন্যান্য সূত্রে আমরা জানিতে পারিতেছি—এই সব মহানুভব আলেমগণ সর্ব্বস্বত্যাগী হইয়া ভারতের মুছলমানদিগকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করার একমাত্র উদ্দেশ্যে এদেশে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে এমাম এবনে তাইমিয়ার মন্ত্রশিষ্য, তাহাও আমরা অন্যান্য বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইতে পারিতেছি।

এই শ্রেণীর বিদ্বেষবিষ-কলুষিত ঘোর বে-দআতী ঐতিহাসিকের পক্ষে, এমাম এবনে তাইমিয়ার শিষ্য ও সহায় মোহাম্মাদ তোগলকের চিত্র যে কখনই যথার্থরূপে অঙ্কিত হইতে পারে না, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। মনে করুন, আজ যদি আহমদ রেজা খাঁ ছাহেবের পুস্তক হইতে মাওলানা মাহমুদল হাছন ছাহেবের জীবনী সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়, অথবা বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠতম পীর ছাহেবের নিকট হইতে সার ছৈয়দ আহমদ সম্বন্ধে ফৎওয়া তলব করা হয়, কিম্বা এদেশের সম্পাদক বিশেষ যদি হাকিম আজমল খাঁ, মিঃ এ, রছুল প্রভৃতির জীবন-চরিত রচনা করেন, "সমসাময়িক এবং মুছলমান" হওয়া সত্ত্বেও কোন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিই তাহাকে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(খ) জিয়াউদ্দিনের আত্মীয়স্বজনগণ যে মোহাম্মাদ তোগলক কর্ত্তৃক উপেক্ষিত, ছোলতান যে তাঁহাদের যথেষ্ট কদর-সমাদর করেন না—লেখক নিজেই পুনঃ পুনঃ এই আর্ত্তনাদ করিয়াছেন। পূর্ব্বে বরণের যে বিদ্রোহ দমনের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা জিয়াউদ্দিনের নিজ অধিবাস বরণের লোকদিগের, বিশেষতঃ তাঁহারই স্বজনগণের প্ররোচনা ও ষড়যন্ত্রের ফল। এই জন্য জিয়াউদ্দিন, মোহাম্মাদ তোগলকের প্রতি চরম শক্রতার ভাব পোষণ করিতেন। এহেন ঐতিহাসিকের মতামতকে ছোলতান মোহাম্মাদ তোগলক সম্বন্ধে চরম কথা বলিয়া ধরিয়া লওয়া কখনও সঙ্গত হইতে পারে না।

(গ) জিয়াউদ্দিন বার্ণি যে, ইচ্ছাপূর্ব্বক মোহাম্মাদ তোগলকের জীবন-ইতিহাসকে বিকৃত করিয়াছেন, তাঁহার তারিখের রচনাধারা হইতেই তাহার কতকটা প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তিনি মোহাম্মাদ তোগলকের পূর্ব্বকার সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিতেছেন—পর্য্যায়ক্রমে ও সন তারিখ দিয়া। কিন্তু মোহাম্মাদ তোগলকের বেলায় তিনি ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক পরম্পরার মর্য্যাদা আদৌ রক্ষা করেন নাই এবং সেগুলির সন তারিখেরও উল্লেখ করেন নাই। অনুসন্ধিৎসু পাঠক মাত্রকেই এখানে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িতে হইবে। যে ঐতিহাসিক তাঁহার পুস্তকে, গিয়াছুদ্দিন বলবন হইতে আরম্ভ করিয়া গিয়াছুদ্দিন তোগলক পর্য্যন্ত, প্রত্যেক বাদশার এবং তাঁহার শাসনকালের সমস্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনার সন তারিখের উল্লেখ করিতেছেন এবং সে সমস্তকে ঐতিহাসিক পর্য্যায়ক্রমে সাজাইয়া দিতেছেন, মোহাম্মাদ তোগলকের বেলায় তিনিই আবার নিজের চিরাচরিত পদ্ধতির সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম করিতেছেন, সন তারিখ না দিয়া কেবল বিষয়ের হিসাবে এক একটা অসংলগ্ন ও স্বতন্ত্র অধ্যায়ে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির উল্লেখ করিতেছেন, ইহার কারণ কি? জিয়াউদ্দিন নিজেই ইহার কৈফিয়ৎ দিয়া বলিতেছেন :—

من درین تاریخ کلیات مصالح جها نداری و
امہات امور ملک رانی سلطان محمد نبشتہ و در
تقدیم و تاخیر ہر فتحے و اول و آخر ہر سکہ گذشتے و فتنہ
و حادثہ نظر نینداختہ و ترتیب نسق مراعات ننمودہ
- کہ اہل دانش را از مطالعۂ کلیات جہا نداری و
امہات امور ملک رانی اعتبار و استبصار حاصل شد
نیست -

মর্ম্মার্থ :—"আমি এই ইতিহাসে ছোলতান মোহাম্মাদের শাসন ও রাজ্য পরিচালন সম্বন্ধে কেবল মূলনীতি ও সার সিদ্ধান্তগুলির উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার সময়কার প্রত্যেক বিজয়, প্রত্যেক ঘটনা এবং বিপ্লব-বিদ্রোহ প্রভৃতির তরতিব রক্ষা করার এবং তাহার আদি-অন্তের ও কার্য্য-কারণ পরম্পরার উল্লেখ করার প্রতি আমি লক্ষ্য করি নাই। কারণ, জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে চান—তাহার মৌলিক তথ্য ও সার সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করিয়া।" জিয়াউদ্দিন অন্যত্র বলিতেছেন :—

اگرچہ حوادث وفتن و بغی وشطط کہ در ملک
سلطان محمد زاد بر حسب ترتیب و تعیین تاریخ
در قلم نیا مد است و تشریح تام نشدہ - فاما
جملۂ کردار کہ محصل غرض مطالعہ کنندہ بود
نوشتہ ام -

মর্ম্মার্থ :—"ছোলতান মোহাম্মাদের শাসনকালে যে সমস্ত ঘটনা, বিপ্লব-বিদ্রোহ প্রভৃতি উপস্থিত হইয়াছিল, আমি যদিও তাহার তরতিব রক্ষা করি নাই বা তাহার সন তারিখের উল্লেখ করি নাই, কিন্তু তবুও যে কর্ম্মগুলি ঐতি-

হাসিক গবেষণা কারীর সার উদ্দেশ্য, আমি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি।"

মোহাম্মাদ তোগলকের বেলায় ঐতিহাসিকের এই হঠাৎ মতিবর্ত্তনের হেতু কি, তাহা সহজে বোঝা যাইতে পারে। প্রকৃত কথা এই যে, এই প্রকারে সন তারিখের হজম না করিলে এবং ঘটনার আদি-অন্ত ও কার্য্যকারণ পরম্পরা লোপ করিয়া ফেলিতে না পারিলে, মোহাম্মাদ তোগলকের জীবনীকে এরূপ অন্যায়ভাবে মসিলিপ্ত করিয়া এত সহজে পার পাইয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইত না।

ফলতঃ ঐতিহাসিক "মুছলমান ও সমসাময়িক" বলিয়াই যে, তাঁহার কথাকে মুছলমান বাদশাহ নওয়াব ও শাসন কর্ত্তাদিগের সম্বন্ধে চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অত্যন্ত ভ্রান্তধারণা। ইহার আরও অনেক কারণ আছে, প্রসঙ্গক্রমে আজ বার্ণির ইতিহাসের একটু পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

(২) আমাদের সত্যানুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকগণও অনেক সময় বিদেশাগত লেখক ও পর্য্যটকগণের মতামত-গুলিকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়া থাকেন। ইহাও বিকারের একটা প্রধান কারণ। এই শ্রেণীর লেখক ও পর্য্যটকগণ মুছলমান অমুছলমান নির্ব্বিশেষে নানা কারণে বহুবিধ ভ্রম-প্রমাদের বশীভূত হইয়া নিতান্ত অপকৃত ও অসঙ্গত মতামত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের এই ভ্রম-প্রমাদের অনেকগুলি কারণ আছে। একটু শ্রমস্বীকার করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, আমরা সেই কারণগুলির সন্ধান পাইতে পারি। অমুছলমান লেখক ও পর্য্যটকগণ আবার অনেক সময়, বিদ্বেষ ও দুরভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া মুছলমান প্রধানদিগের চরিত্রগুলিকে কলঙ্ক কলুষিত করার চেষ্টা পাইয়াছেন। তাহাদের সাক্ষ্য বা অভিমতগুলিকে ঐতিহাসিক প্রমাণরূপে ব্যবহার করার সময়, যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কিন্তু অশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, মোছলেম-শাসিত ভারতের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে এই সতর্কতার যথেষ্ট অভাবই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এবং ইহাও বিকারের একটা অন্যতম কারণ। লর্ড ম্যাকলে দুনয়াকে বাঙ্গালী জাতির মানসিকতার যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, অথবা মিস মেও "দীর্ঘকাল" ভারতে অবস্থান করিয়া এবং নিজে তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত অবস্থা পরিদর্শন করিয়া "হিন্দু ভারতের" যে চিত্র-অঙ্কন করিয়াছেন, কোন ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যাশ্রয়ী ঐতিহাসিকই সেগুলিকে প্রমাণ-রূপে ব্যবহার করিতে পারেন না।

আজ এই অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ আভাষ দিয়া রাখিলাম। মোছলেম ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে ভবিষ্যতে "মাসিক মোহাম্মাদীতে" বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

ভাবি

আমীনউদ্দীন আহমদ্

খলিলপুরের বাজার হইতে যে "দোপায়ে" রাস্তাটী ডাইনে একটী মরা-দীঘি রাখিয়া এবং গুরানন্দীর বিরাট বাঁশবনের মধ্যদিয়া সরাসরি পূর্ব্বদিকে গিয়াছে,—তাহা মহিষমারার শেখদের বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়া শেষ হইয়াছে। লোকে বলে, এই আধা-সড়কের মত ছোট্ট রাস্তাটী শেখদের ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকদের বাজারে আসা-যাওয়ার জন্য শেখদের দ্বারাই বাঁধা হইয়াছিল। তাহাদের সু-দিনের দিনে বাজারে দাঁড়াইয়া কোন অচেনা-লোক মহিষ-মারার শেখদের বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বাজারের যে কেহ এই পথটী দেখাইয়া বলিবে—"এই পথে যান,—যেখানে পথ শেষ--সেখানেই জান্‌বেন শেখদের বাড়ী।"

একঘর শেখ আজ একশ ঘর। নাম ডাক বলিতে এখন আর বিশেষ কিছু নাই। তবু মিএাজান শেখ বাঁচিয়া থাকিতে লোকেরা অনেকটা হিসাব করিয়া কথা কহিত, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরদিগকেই খুব হিসাব করিয়া কথা কহিতে হয়।

মিএাজানের বড়ছেলে জসীম সংসার বুঝিবার মত লেখাপড়া জানে। গ্রামের দশজনের সঙ্গে বসিয়া দুইটা আলাপ করিতে পারে। কাহারও বিবাহে বরযাত্রী হইলে "কাবীন"-নামার সাক্ষী হইতে পারে। ইহাতে দিন চলে—বাধে না। তাহার ছোট ভাই নসীম—ছোট্ট-বেলায় বাপ মারা যাওয়ায় পাঁচ বছরের আগে কোল হইতেই নামে নাই। আর নামিতে চাহিলেও পারে নাই। আর যেদিন কোল-ছাড়া হইয়াছে—সেদিনই ঘর-ছাড়া হইয়াছে। লেখা-পড়া বলিতে আম-পারার পাতা তিনেক তিন বছরে খতম করিয়াছে। আর এই তিন পাতা খতম করিতে তাহাকে কম্‌সে-কম্ অর্দ্ধ-ডজন খানিক "পারা"র জান-খতম করিতে হইয়াছে। অল্পদিনের মধ্যে মায়ের "আহ্লাদে" ছেলের আর মক্তবের পথে পা চলিল না। গ্রামের ছেলেদের সঙ্গলাভ একান্ত হইয়া উঠিল। জসীম জানিতে পারিয়া একদিন খুব ধমক দিতেছিল—এমন সময় মা আসিয়া হাজীর—। "আমরা বাবা গরীব-মানুষ—গেরস্ত লোক,—বেশী পড়ারই বা এত দরকার কি? নামাজ রোজাটা ভাল করে জান্‌লে, আর খোদার কালাম কোরাণ-শরীফ ভাল করিয়া পড়তে পারলেই ত চলে!" কিন্তু তিনি কি জানিতেন যে তাঁহার নসীম এখনও তিন বছরের এলেম দিয়া—নামাজের পাল্লা ভরিতে পারিবে না! হয়তঃ তিনি জানিতেন দুলাল তাঁহার মুন্‌শী "ধর্-ধর্" হইয়াছে।

নসীম কোন অন্যায় করিলে—"এবার মাফ্ করো বাবা,—ছেলে মানুষ,—আচ্ছা আর এরূপ করবে না" এই সব কথা দিয়া বিচার-প্রার্থীকে বিদায় দেওয়া হয়। জসীম তাহার মায়ের এই দুর্ব্বলতা দেখিয়া মাকে ডাকিয়া একদিন কহিল,- দেখ মা, এই ভাবে কি মান-ইজ্জত বাচ্‌বে? একটু ভাল করে শাসন করো, নাহয় মক্তবের মাষ্টারের কাছে বলে একটু শাসন করিয়ে নি',—তুমিত একটু হাত তুলতেও দিবে না।"

মা-গো-মা! কি কস্‌রে জসীম! বাপ-মরা ছেলে! তাকে আমি কি কষ্টেই না পাল্‌ছিলাম! তুই কি জান্‌বি

এসব! জসীম আর অগ্রসর হওয়া ভাল বিবেচনা করিল না। কারণ যদিও তাহার মা সব দিকেই ঠিক ছিলেন,— কিন্তু নসীমের ব্যাপারে তিনি ঠিক থাকিতে পারিতেন না। নসীম এই সুযোগে গ্রামের ছেলেদের সর্দ্দার হইয়া উঠিল। শ্লোক বলা, ছড়া বলা, পুঁথি পড়া—এই সব দিকে তাহার মন এতই ডুবিল যে বাংলা-শেখার অভাবে শুনিয়া শুনিয়া শোনাভান অর্দ্ধেক খানি মুখস্থ করিয়া ফেলিল। জসীম ও তাহার বিষয় চিন্তাকরা ছাড়িয়া দিল। ভাবিলেও যে করিবার কোন উপায় নাই! লোকে বলে, "মিঞাজানের ঘরে এমন দুষ্ট-নচ্ছার হলো কি করে।" মা বলেন—"বড় হলেই সব কিছু যাবে গিয়া বাছা আমার, সোনামনি আমার ভাল হয়ে যাবে।"

মাস চারেক আগে জসীমের বিবাহকর্ম্ম সমাধা হইয়াছে। 'জলুস' মন্দ হয় নাই, তবে গ্রাম্য-বিবাহের যে বড় জলুস বাজী-পোড়ানো, তাহাই করিতে পারে নাই বলিয়া নসীমের বুকে যে শেল বিঁধিয়াছে, এই কথা সে একাধিক বার তাহার বালক-বন্ধু জমিরের কাছে বলিয়াছে। বাজী পুড়াইতে হয়ত জসীমেরও অনেকটা সাধ ছিল, কিন্তু গ্রামের খেলাফৎ-ভলান্টিয়ার আশরফ আসিয়া যখন বুঝাইয়া দিল যে বাজী পুড়ানোটা নিছক নষ্টামী ও অপব্যয়, তখন জসীম আপাতত অপব্যয়ের হাত হইতে বাঁচিতে ও বাজীর টাকা দিয়া নববধূর জন্য মজবুত করিয়া আরেক পদ অলঙ্কার তৈয়ার করিতে মনস্থ করিল। এদিকে নসীম ফন্দি আঁটিল—আশরফকে রাত্রিতে তাহাদের বাড়ীর উত্তরদিকের বট গাছটার তলায় পাইলেই হয়। কিন্তু আশরফ, রাত্রেত দূরে থাক দিনের বেলাও কোনদিন সেই বটগাছের তলা দিয়া যায় না। তাহার কাজ গ্রামে গ্রামে খেলাফৎ-সাহায্যে ভিক্ষা করা।

নব-বধূ লইয়া অনেক বাক্-বিতণ্ডা হইয়াছে। গ্রাম-দেশে অনেকটা হইয়াই থাকে। কালাই সরকার কহিল,— "আমি বল্‌ছিলাম, মিরপুরের বিয়াটা হোক, মেয়ে যেমন সাফা, তেমন সুন্দরী, আবার লেখাপড়াও নাকি জানে! আমার কথাই যখন শুন্‌লো না তখন দেখব না কোত্থেকে ভাল মেয়েটা আনে!" যে যেমন জানে—সে-তেমন মন্তব্য করিল। মেয়ের দোষ—সে কাল,—গায়ের রং দেখিয়া তাহার এক দফা বিচার হইয়া গেল—মেয়ে বড়-বেশী ভাল হইবে না।

এই সব শুনিয়া শুনিয়া নসীম ক্ষেপিয়া গেল। সে আর তার ভাবীকে দেখিতেই গেল না। মা ডাকিলেন,— সে কিছু না বলিয়া জমিরকে লইয়া কোন দিকে সে বাহির হইয়া গেল তাহা কেহ বলিতে পারিল না। মা—বধূকে নীরবে, হাসি মুখে বরণ করিয়া লইয়াছেন। বলিয়াছেন— "শুভ দিনে মুখ বেজার করিতে নাই—তা'হলে খোদা বেজার হইবে—আমার বাছার ভাল হইবে না! কালা কি খোদার বান্দা নয়?"

জসীম এই সম্বন্ধে চুপ চাপ। দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিবার যখন তেমন কোন সুবিধা নাই, তখন ঘটকের উপর, বিশেষ করিয়া নিজের অদৃষ্টের উপর বিশ্বাস করা ব্যতীত আর উপায় কি? নসীবের যা লিখা, তা খণ্ডাইবে কে? গ্রামের বয়স্কা অবিবাহিতা মেয়েরা নবীন বধূর বয়স দেখিয়া নিজেদের শরীরের প্রতি বার বার চাহিয়া দেখিয়াছে; আর বিবাহিতা মেয়েরা বলিয়াছে—ওহ—! ইত্যাদি রকমের আরও অনেক কিছুই বলা কওয়া হইয়াছে এবং হইয়াও থাকে। এই সব ইঙ্গিত ও কথার ঘায়ে ঘোমটার তলে যে—লজ্জানত মাথাটী এতক্ষণ নীরব ছিল—তাহা যে আরো এলাইয়া পড়িল!

মাসেকের মধ্যেই নবীন বধূ সালেহার পরিচয় পাওয়া গেল। জসীমের মা খোদার শোকর আদায় করিলেন। বউয়ের তারিফ করিতে তাঁহার ভাষায় কুলায় না। মাসেকে বাড়ীর গেরস্তালী কাজের এত "সিজিল-মিছিল" দেখা গেল যে, যাহারা এবাড়ীতে নূতন বেড়াইতে আসিল তাহারা বলিল, "এ-বাড়ীতে লক্ষ্মী আসিয়াছে।" কিন্তু নসীম পনর দিন তক্ ভাবির কাছ্ ঘেঁষে নাই। "ভাবি"কে কাল দেখিয়া সে আগে যে 'মান' করিয়াছিল তাহা অবশ্য এক মাসও টিকাইতে পারে নাই! মাসেকেই সে কেমন করিয়া যে—সালেহার কাছে ধরা পড়িয়া গেল তাহা সে নিজেই ভাবিয়া পাইতেছিল না! গ্রামের ছেলেরা আজকাল তাহার প্রতি বিরূপ। সে আগের মত সব সময় খেলা-ধূলায়, দুষ্টামী মারামারি ইত্যাদিতে দলপতি সাজে না বলিয়া তাহাদের এই সবে আর তেমন "আসর জমেনা।" দিনের প্রায় অর্দ্ধেকটাই কাটে তাহার ভাবি-সাহেবার সঙ্গে বহুৎ-কিছুর আলাপ করিয়া। আগে যেমন পাশে ঘেঁষিতে নসীমের ঘৃণা হইত আজকাল ভাবিকে

ফেলিয়া,—তাঁহার কথা না শুনিয়া মাঠে মাঠে দৌড়াইতে তাহার লজ্জা হইত।

* * * *

একদিন সকালে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া জসীম কোর-আন তেলাওয়াৎ শেষ করিয়া মোনাজাত করিতেছে—এমন সময় নসীম গিয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইল। 'রেহালের' উপর কোর-আন্ শরীফ,—তাহার দিকে নসীমের দৃষ্টি নিবদ্ধ। মোনাজাত শেষ করিয়া জসীম দাঁড়াইতেই দেখে নসীম তাহার পিছে দাঁড়াইয়া।

জসীম একটু তাজ্জব বোধ করিল। নসীম যে এত সকালে বিছানা ত্যাগ করিতে পারে তাহা জসীমের জানা ছিল না। তাহার বিছানা ত্যাগ লইয়া কুরুক্ষেত্র বাঁধিত যদি মা ইহাতে বাধা দিতেন। বেলা দুই চার "ঘড়ি" না হইলে—অথবা জসীম সারা গ্রাম বেড়াইয়া না ফিরিলে নসীমের ঘুমভাঙা মানা ছিল।

এত সকালে কি মনে করে রে—নসীম! কোন দরকার আছে? কথাগুলি একটু তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। নসীম কি যে বলিবে হঠাৎ ঠাহর করিতে পারিল না। থামিয়া রহিল,—জসীম আবার জিজ্ঞাসা করিল। সে এবার একটু ধীরে আস্তে কহিল—"আমি পড়তে যাব।"

কি! পড়তে যাবি? কে বল্লো রে তুই পড়তে যাবি?

নসীম আবার চুপ করিয়া রহিল। মিয়া ভাইয়ের এই প্রকার তাজ্জব হওয়া অসম্ভব না হইলেও নসীমের কাছে যেন তাহা কেমন কেমন লাগিল। আবার জসীম জিজ্ঞাসা করিল—পড়তে যাবি এদ্দিন পর,—এ-ই বয়সে! এবুদ্ধি দিল কে তোরে? নসীম যেন আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না।—সে হঠাৎ করিয়া বলিয়া ফেলিল—"ভাবি-জান।" জসীম একটু হাসিল বই আর কিছু বলিল না। পরদিন নসীম নূতন লুঙ্গী পরিয়া আবার মক্তবে গেল। এতদিনে হয়ত তাহার সহপাঠী বন্ধুদের কেহ কেহ নিম্-মৌলভী হইয়া গিয়াছে। তাহার এই বুদ্ধি-বিভ্রম দর্শনে হাসে নাই—মন্তব্য করে নাই এমন ছেলেবুড়া মহিষ-মায়ায় নাই বলিলেও চলে। পড়াশোনায় তাহার মন সতের-আনা ডুবিল বলিয়া মনে হইল। বয়স-বাড়্তি ছেলেদের যেমন পড়া-শুনায় "গর্দ্দা" হওয়ার দোষ আছে তেমন ভাল হওয়ারও দোষ আছে। পড়া না পারিলে বলা হয়,—একবারে বোকা; আর পারিলে বলা হয়—এত বড় বয়স্ক ছেলে—পারবে না কেন? গায়ে বাধে কি? নসীমের অদৃষ্টে দ্বিতীয় দোষটাই বর্ত্তিল।

জসীমদের পরিবারে ছেলেমেয়ের তেমন কোন হা-হা-ঝা-ঝা নাই, তাহার উপর নসীমের 'আগের-জামানায়' যে "দুঁদ্রামী" ছিল তাহাও না থাকায় পরিবারটী একবারে বেশ শান্তিময় হইয়া উঠিয়াছে। নসীমও মুন্সী-য়ানা ধরণে চলিতে শুরু করিয়াছে বলিয়া সবাই তাহাকে 'মুন্শী-সাব্' বলিয়া ডাকে। অবশ্য অনেকে ইহার মধ্য দিয়া একটু তামাশাও যে করে না তাহাও নহে। তবে লোকের ধারণা আগে হইতে অনেক বদ্‌লাইয়াছে, কেহ কেহ বলে—লোহা যেমন পরশ পাথরের ছোঁওয়ায় সোনা হয়, নসীমও তেম্‌নি এলেমের পরশে হেদায়েৎ হইয়াছে।

ননদ-জা কেহই ছিল না বলিয়া, শেষ বেলার অবসর সময়টুকু শাশুড়ী বউয়ে মিলিয়া ঘর গেরস্তালীর বাপের বাড়ীর ও অতীত জীবনের আলাপ কাহিনীতে, কখন কখন বা চুল বাঁধায়, উপভোগ্য করিয়া তুলিত। একদিন বেলা পড়িয়াছে। গাঁয়ের বাঁশবনে, বেতবনে এবং বুনোঝোঁপে শত রকমের, শত রংয়ের পাখীরা মেলা বসাইয়াছে। ইহাদের আনন্দ দেখিলে মনে হয়—ইহাদের বুঝি "হাকিম-মহাজন" নাই। রান্নাঘরের সাম্‌নের আঙিনায় বসিয়া শাশুড়ী, বউয়ের চুল বাঁধিয়া দিতেছিলেন। কথায় কথায় শাশুড়ী কহিলেন,—নসীম আমার লায়েক হইয়াছে,—তাইত আজমপুরার কাজী বাড়ী থেকে একটা 'বিয়া' এসেছে। তারা আর কিছু চায় না—চায় কেবল আমাদের এরাদা আছে কিনা? আমি গতরাত্রে জসীমকে বল্লাম—সে কিছু কইলো না কেবল তোমার কথা কইলো—

আচ্ছা আম্মা, আর ক'টা দিন সবুর কর না! নসু ত' এবার-মাত্র গাঁয়ের মক্তবটা পাশ দিল। আর ক'টা দিন, তাইলেইত, আল্লা-চাহে পরীর মত মেয়ে আন্‌তে পারবে! আচ্ছা, আমি থাক্‌তে কি তোমার খেদমতের কষ্ট হবে' মা?

না-না, তাকি বল্‌ছি মা! তোমার মত খেদমত কি

আমার কেউ এ দুনিয়ায় কর্‌বে? না-না, তা নয়! এই দেখ না—গেল শীতটা গেল কি করে! তুমি না থাক্‌লে কি এবার বাঁচন ছিল?—নসীমের মা থামিয়া আবার শুরু করিলেন—আমার পেটে কি খোদায় মেয়ে দিছিল না! কিন্তু খোদার চিজ্‌ খোদায়…আর বলিতে পারিলেন না—মেয়ের শোক যেন তাঁহার উথলিয়া উঠিল। চুল-বাঁধা তিনি ভুলিয়াই গেলেন। সালেহা উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখে "আম্মায়" দুই চক্ষু বাহিয়া পানি গড়াইতেছে। হঠাৎ এই প্রকার অস্বাভাবিক শোক-প্রকাশের কারণটার দিকে সে চিন্তা করিয়া দেখিল। ভাবিল, শাশুড়ীর মনেত সে কোন প্রকার আঘাত দেয় নাই?

অঞ্চল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে কহিল—তুমি কি মা আমাকে সালেমার মত দেখ না! আমি কি তোমার সালেমার মত সেবা কর্‌তে পারব না!— বউকে আবেগ ভরে বুকে টানিয়া শাশুড়ী কহিলেন—"তুই-ইত মা আমার সালেমা। সালেমা থাক্‌লেত আজ থাক্‌ত জামাইর বাড়ীতে, তুই-ইত মা আমার সাথে থাক্‌বি, আমাকে মর্‌তে পানি দিবি! এই বলিয়া তাহার শোকাবেগ আরও বাড়িয়া উঠিল। সালেহার সান্ত্বনা যেন তাহার দ্বিগুণ শোক বর্দ্ধিত করিয়া দিল।

সালেহার মা যে কবে মারা গিয়াছে তাহা সে জানে না। মনেও নাই। মায়ের অভাবটা যে কি তাহাও জানে না, তবু যেন শাশুড়ীর অপত্য-স্নেহে থাকিয়া থাকিয়া মনে হইত শাশুড়ী-ই তাহার মা। শাশুড়ীর এই শোক দেখিয়া তাহারও চোখ কাটিয়া পানি আসিল। সেও হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—

পশ্চিমাকাশ অস্ত-রবির খুনী রঙে রঙিন। মনে হয় যেন কোন্ দরদী-শিল্পী ব্যথা-নীল চেহারায় হাসির ফাগ মাখাইয়া চিত্র আঁকিতে বসিয়াছে!

রাত্রে সালেহার ইশারায় জসীম মাকে জিজ্ঞাসা করিল —নসীমের বিবাহ সম্বন্ধে বউ কি বলিয়াছে। তিনি কহিলেন—আর বছর খানিক যাক্‌ না, এইত মাত্র গাঁয়ের মক্তব পাশ দিল। বিয়ের জন্ম কি আসে যায়! কথাগুলি ধীর স্থির। কিন্তু ইহাদের নিরুদ্বেগ প্রকাশের মধ্যেও যে কোন খানে অভিমান অথবা চাপা ব্যথা লুকানো রহিয়াছে তাহা সালেহাকেই বাজিল। সে চুপ থাকিল।

মাসেক কি দেড় মাস পরে নসীমের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের সবকিছু করিয়াছে সালেহা। আজমপুরার কাজী বাড়ীর বিবাহ হয় নাই। মেয়ে তেমন সুন্দরী নহে। অবশেষে মুড়াপাড়া খোন্দকার বাড়ীতে সম্বন্ধ করা হইয়াছে। তাহাদের অবস্থা আগে যেমন ছিল এখনও তেমনি। আগে যেই কবজ-লেখা, পানি-পড়া দেওয়া, দুই গ্রামে "ফতেহা" দেওয়া, তাহা এখনও আছে—এবং আশা করা যায় থাকিবেও, কারণ এই সম্পত্তিতে হাত দিবার অথবা নীলাম চড়াই করিবার কেহই নাই। মেয়ে সম্বন্ধে বলিতে গেলে এই বলা যায়, মেয়ে সুন্দরী,—ইহার উপর লেখা পড়াও জানে—অর্থাৎ হেজ্জে করিয়া কোর্‌আন শরীফ পড়িতে পারে। তবে বোধ হয় এতদিনে অর্থাৎ বিবাহের বয়স হইতে হইতে তাও ভুলিয়া গিয়াছে।

খোপা বাঁধিতে গিয়া একদিন সালেহার সহিত নসীমের নববধূ আয়েশার একটু কথা কাটাকাটি হইল। সালেহা কহিল—তুমি কি বোন্ কোরআন শরীফ পড় না? আয়েশা জওয়াব দিল না। লাজ অনুভব করিল বলিয়াও মনে হইল না। অবশেষে অনেক জিজ্ঞাসা বাদের পর জানা গেল যে সে কোন দিন কোরআন পড়া শুরু করিয়াছিল কিন্তু তাহা শেষ না করিতেই যেইভাবে চারি দেওয়ালে বন্দী হইয়াছে—আর বিবাহের পর বিবাহের সংবাদ শুনিতে শুরু করিয়াছে তাহাতে সে এক দিনও কোরআন লইয়া বসিতে অবসর এবং সাহস পায় নাই। সালেহার অনেক অনুরোধ উপরোধে সে পড়িতে স্বীকার করিলেও পরদিন সে কথামত আর পড়িল না। সালেহা জোর করিল না। তাহার "নাইয়র" যাওয়া বাদে মুড়াপাড়ায় সংবাদ রটিল যে গেরস্তের মেয়ে চাহে, খোন্‌কারের মেয়ের ওস্তাদ হইতে, কি আস্পর্দ্ধা! সালেহা শুনিয়া কেবল হাসিল!

জসীম সংসার দেখে, দশজনের সঙ্গে সামাজিক আইন কানুন ও আদব কায়দা মাফিক চলিতে চেষ্টা করে। নসীম এখন এক "খারিজা" মাদ্রাসায় কোরআনের তরজমা, তফসীর ও মাসলার কেতাব ইত্যাদি পড়ে। গ্রামের লোকেরা বলা কওয়া করে নসীম দুই এক বছরে আধা মৌলবী হইবে; আত্মীয়া বলেন, আরে লোক বুড়া হলেও কি এলেম বুড়া হয়?

একদিন সন্ধ্যার একটু খানিক আগে জসীম কি জানি

সাজ-গোজ করিতে ছিল। সালেহা ঘরে ঢুকিয়া দেখে— নসীম ভারী ব্যস্ত। কি—নসু, ব্যাপার খানা কি? কোন্‌দিকে মরজী হবে! এই মাত্র বাড়ী আসা হলো আবার এই মাত্রই দে-ছুট্—! নসীম একটু লাঞ্ছিত হইল। পরমুহূর্ত্তে গম্ভীর মুখে একটু হাসির রেখা টানিয়া আড় নয়নে অন্যদিকে চাহিয়া কহিল,

রাখনা ভাবিজান তোমার এসব.........

"হায়রে নসী এতটাই পেয়ে বস্‌লো! ও-কালা মাসিটা......!" এই রুষ্টবিদ্রুপের ইঙ্গিতটা কোন্‌দিকে তাহা নসীমের বুঝিতে বাকি রহিল না। বিবাহের দিন—এবং বিবাহের বাসরে বসিয়া সালেহা নসীমের মুখে এই "কালা-মাসী" শব্দটা বার বার শুনিয়াছে। এই জন্যই সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিতে সে এতটা কারসাজী করিয়াছিল। নসীম এই কথার পর থামিতে পারিল না। চাহিল, দৌড়িয়া বাহির হইয়া যায় কিন্তু তাহাও পারিল না। সে ভাবি-জানের দিকে চাহিল। দেখে—সালেহার মুখে উষার মত স্নিগ্ধ হাসি-রেখা এখনো লাগিয়াই আছে। নসীম মাথা নত করিল—"মাফ ক'রো ভাবিজান,—আমি জান্‌লে তোমাকে এমন.........." এই বলিয়া সে তাহার ভাবিজানের কদমবুছি করিতে গেল। সালেহা তিন চার কদম পিছে হাটিয়া গেল—। "একি পাগ্‌লামি—! বল্‌ছি, এযে, আয়েষা এমনি পেয়ে বস্‌লো যে বাড়ী এসে আমাদের কাছে একদিন থাক্‌তেও মন চাহেনা?"

"না ভাবিজান, তা নয়; আজ সকালে খাশুড়ী আম্মা লোক পাঠিয়েছিলেন। তাঁহাদের ওখানে নাকি অনেক খানের মেহমান আস্‌বে।"

আচ্ছা যাও, দেখো যেন একবারে মজে না যাও—...। পোষাকের বোচকাটা বগলে দাবাইয়া নসীম সজল-নয়নে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

* * * * * * *

দুই বছর পরে। নসীম ভিন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষে,—বিশেষ করিয়া এই বাংলা দেশে ভিন্ন হইয়া যাওয়া যেমন আশ্চর্য্যজনক—বিলাতে এবং ইউরোপে নাকি—ভিন্ন না হওয়াটাই তেমন আশ্চর্য্যজনক। যাহা হউক এই দেশের লোকেরা বলে—, "হইতে" যখন ভিন্ন হয়—মরিতে তখন ভিন্ন মরে, আর মধ্য যুগে ভিন্ন হইলে, তাজ্জব কি আবার?"

নসীমের বলিবার আগে জসীম একে একে সব কিছু ভাগ বাটোয়ারা করিয়া দিয়াছে। দেয় নাই কেবল একটী পুরাণো কাঠের সিন্দুক। কেহ বলে এই সিন্দুকে পুরাণো আমলের টাকা পয়সা জমা আছে। কিন্তু ইহাতে যাহা কিছু ছিল, বাটোয়ারার দিন সবকিছুই বাট হইয়াছে। সিন্দুকটীর প্রতি জসীমের একটু টান ছিল। এই জন্য সে ইহা নসীমের কাছ হইতে চাহিয়া রাখিয়াছে। সিন্দুকটী খুব বড় থাকায় মাঝে মাঝে তাহার বাবা ইহার উপর শুইতেন; সে মনে করিয়াছিল, অন্যের হাতে গেলে তাহা হয়ত না-ও থাকিতে পারে!

নসীমের মা নসীমকে যে একটু বেশী "পিয়ারের" চোখে দেখিতেন তাহা না বলিলেও চলে; তবু তিনি জসীমের সঙ্গেই গেলেন। বোধ হয় সালেহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে তাহার মন চাহিত না। তাহাদের ভিন্ন হইবার মাস কয়েক বাদেই তিনি ইহলীলা সাঙ্গ করেন। তিনি মৃত্যুকালে জসীমকে বলিয়া গিয়াছেন,—"বাবা তোরা ভাইয়ে-ভাইয়ে যত পারিস, খুব বুঝাবুঝি করিস্, কিন্তু আমার মা সালেহার সঙ্গে কোনো গোলমাল করিসনে! তুই জানিস—এ তোর বড় বুবু সে তোকে আমার চাইতে কম করে নি। বরং বেশী করেছে, মানুষ করেছে!

জসীম "গেরস্তালী" খুব ভাল জানে—ইহাই যে তাহার ব্যবসায়! নসীম কোন্‌খানে কোন্ ক্ষেত, কোন্ খানে কোন্ ধান বুনিতে হয়, তাহার কিছুই জানে না। প্রথম বারের গৃহস্তি করা হইল চাকর দিয়া। ইহার যাহা ফল তাহা ফলিয়া গেল। নসীম ভাবিল মিঞা ভাই আমাকে বাটোয়ারায় নিশ্চয়ই ঠকাইয়াছে। "জমিন গুলো আবার ভাগ করা হোক" বলিয়া সে জসীমের কাছে আপত্তি উত্থাপিত করিল। জসীম কহিল—এসব ত তুমিই নিয়েছ।" (এলেম শিখিয়া মুন্‌শী হইবার পর জসীম ছোট ভাইকে আর তুই বলিয়া ডাকে না)।

আমি নিলে কি—জমিনের খবর আমি আর জানি?

"জান নাই বলেই ত গৃহস্তি এরূপ হয়েছে।" "না—জমিগুলোর ভাগ উল্‌টান হক্।" জসীম রাগিয়া উঠিল, "কি? সারাটা বছর খেটে খুটে পাইট্ করা হয়েছে কি না! এখন সে বলে জমির ভাগ বদ্‌লাতে!"

সালেহা কহিল, "দাও না, সে ছোট্ট ভাই, খোদার

জমিন ত সবই সমান; নসীবে থাকলে ত ডুবা-ক্ষেতেও সোনা ফলে।" অবশেষে ভাগ বদলান হইল। কিন্তু এইবারও নসীমের গিরস্তি বড় 'যুত' হইল না। লোকেরা অনেকে অনেক কিছু বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। আয়েষাও যে কিছু বলিল কি না তাহা বলা কঠিন,—তবে অসম্ভব নহে, যখন এমন দুইটী ভাই বিবাহের অল্প ক'বছর পরেই ভিন্ন এবং চিরতরে "ভিন্ন" হইয়া গেল। জসীমের মন ভাঙিয়া পড়িল। যাহার মঙ্গলের জন্য সে এত করিল, আজ কিনা সে এতটা বিপরীত করিল!

ভাইয়ে ভাইয়ে আলাপ, আলোচনা, দেখা-শোনা, এমনকি একপথে চলা পর্য্যন্ত বন্ধ। জুমার মসজিদে ডান দিকে যদি বসে জসীম, নসীম বসে একেবারে বামে। এসকল কাজে নসীম চেয়ে জসীমই বাড়াবাড়ি করিল একটু বেশী। নসীমকে দেখিলেই যেন তাহার লজ্জা হইত; ভাই কি ভাইকে এমন অপমান, এমন বে-ইজ্জত করিতে পারে। সাধারণত সরল ও সোজা চরিত্রের লোকদের এরূপ না হওয়াটাই অস্বাভাবিক।

অবশেষে নসীম বাড়ীর "রোখ" পর্য্যন্ত বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছে। এই ব্যয় সঙ্কুলান-কার্য্যে হাত দিয়া তাহার এক বিঘা জমি পর্য্যন্ত গিয়াছে, এজন্য সে কোন পরোয়া করে না। যে-সালেহার হাতে না খাইলে তাহার পেট ভরিত না সে-সালেহাকে দেখিবে বলিয়া, সে বাড়ীর আন্দর পর্য্যন্ত দূরে সরাইয়া দিয়াছে। সালেহার কোনো পুত্রসন্তান এখনো জন্মে নাই। কিন্তু নসীমের এক বছরের 'দুলাল'কে কোলে করিতে সালেহার "পাঁচ-পরাণ" কাঁদিয়া মরিলেই বা কি? নসীম কি আয়েষাকে সেই-বাড়ী মুখো হইতে দিবে?

* * * *

ঈদের দিন। ঈদ্‌গাহে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরাও জমায়েৎ করিয়া নামাজ পড়িতে আসিয়াছে। সকলের মুখে একটা স্নিগ্ধ-মধুর হাসি। বর্ত্তমানের পাড়া-গাঁয়ের দারিদ্র্য-পীড়িত ও দুঃখ-জর্জ্জরিত মানুষদের বুকেও যেন এই সুখের ও মিলনের দিনে কি একটা অব্যক্ত আনন্দ আপ্‌নি আপ্‌নি ছুটিয়া বেড়ায়। সকলেই ইমামের খোৎবা পাঠ শুনিতেছে; তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয় যেন তাহারা কান দিয়া নহে, প্রাণ দিয়া, প্রাণের চেয়েও গভীর প্রাণ দিয়া শুনিতেছে। তাহারা বুঝে না কি পড়া হয়। তবু তাহারা যুগ যুগ ধরিয়া মোহমুগ্ধের মত, স্বপ্নাবিষ্টের মত শুনিতেই থাকে। তাহাদের এইরূপ মন দিয়া খোৎবা শুনিবার অবস্থা দর্শনে এই কথা মনে পড়ে—দিয়ালী উৎসবের আলোক-মালা যেন মাথা বাড়াইয়া অনন্ত আকাশের তারকার দিকে নির্নিমেখ নেত্রে চাহিয়া আছে।

মোনাজাত শেষ হইয়াছে। সকলেই আপন ভুলিয়া ছোট বড়র ভেদাভেদ ভুলিয়া আলিঙ্গন প্রদান করিতেছে। নসীম বসিয়াছিল প্রথম "কাতারের" বামে আর জসীম বসিয়াছিল ডাহিনে। তাহারা কোলাকোলি দিতে দিতে ইমামের দিকে আসিতেছিল। জসীম কোলাকোলি শেষ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; নসীম একটু পিছনে পড়িয়া গেল। আরও দুইজনের সঙ্গে "মোয়ানেকা" শেষ করিয়া ইমাম সাহেব নসীমের সঙ্গে 'মোয়ানেকা' করিলেন। নসীম আলিঙ্গন মুক্ত হইলে—জসীম অগ্রসর হইয়া হাত বাড়াইল। কিন্তু নসীম তাহা পারিল না। সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। চাহিয়া দেখিল জসীমের চেহারা উজ্জ্বল রেখাহীন হাস্যময়; সে চাহিতে পারিল না। মাথা নত করিয়া জসীমের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার বুক দুলিয়া উঠিল। জসীম শান্তকণ্ঠে সংযত স্বরে—ভাইয়ের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "ছিঃ লাজ কিসের, আজ খুসীর দিন। ভাইকে ছেড়ে ভাই ক'দিন থাক্‌তে পারে?"

নসীম আলিঙ্গন মুক্ত হইয়া বহুদিন পরে মনের পরিপূর্ণতা লইয়া নত-মস্তকে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। জসীম গ্রামের দোস্ত রহমানকে দাওয়াত করিতে চলিল।

"ভাবি-জান ঘরে আছ—ও-ভাবি—ভাবি!" বহুদিন বাদে এই আবেগভরা পরিচিত ডাকে সালেহা একটু দ্বিধা করিতেছিল। পরমুহূর্ত্তেই সে সন্ত্রস্তভাবে রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আঙিনায় আসিয়া দাঁড়াইতেই নসীম খোকাকে সালেহার কোলে ঠেলিয়া দিয়া তাহার কদমবুছি করিতে করিতে বলিল—"আজ্‌কে তোমার এখানে আমাদের ঈদের দাওয়াৎ—।" সালেহা খোকাকে কোলে পাইয়া তাহার কচি ঠোঁটে কেবল অসংখ্য চুমা খাইতে লাগিল।

প্রত্যুত্তর

শামসুল হুদা

এত, এত ভালো তুমি !—চিঠি লেখ প্রতি, প্রতি ডাকে।
অবসর নাই, জানি, তবুও কাজের ভিঁড়ের ফাঁকে
আমারে লিখেছ চিঠি !—এতটুকু ক্লান্তি নাই, নাই অবসাদ, অবহেলা !
এত ভালো তুমি—(কী আর বলিব)—এত ভালো এ চিঠির খেলা !

মোরা দুই জনা থাকি দুই দেশে—দূর, অতিদূর, আরো, আরো দূর
তুমি এক সাগরের তীরে
আমি এক মরু প্রান্তে—(মরু মোর জীবনের বালুচর)
দিবা কাটে রাত কাটে ধীরে।
আঁসুর ঝালর ঝলে' দুই চোখে তারি আড়ে হেরি' মরীচিকা
আশা নিরাশার কিম্বা দুরাশার উজল স্বপন অথবা আলেয়া সে
মনেরই আগুনে শিখা !
দুই জনা দুই দেশে, মধ্যে কাঁদে মহা-ব্যবধান—
হোথায় সৃষ্টির ছায়া, হেথায় মনের মায়া আর পোড়া প্রাণ !!

দূত নাই আমাদের ;—দূতী সেও নাই !
আষাঢ়ের মেঘ হবে দূত ?—সেই দুরাশাও নাই।
তোমার অলকা-পুরী সেথা হতে রোজ আনে দু'লাইন লেখা
ডাকের পিয়াদা হেথা—বসে বসে পড়ি একা-একা !
মাটির মানুষ মোরা, মাটির মানুষে চলে কাজ
কী হবে আকাশে চেয়ে ? মেঘেরে বিশ্বাস কিসে ?—
সে যে হানিতে ও পারে বাজ !

দখিনের মৃদু বায় বয়ে যায় দ্বার পাশে—
সকালে, সন্ধ্যায়, দু'পহরে
তারি কাছে সঙ্গোপনে বলিব দু'চার কথা—বড় ইচ্ছে করে !
সাধ যায় বলি, বলি—'ওরে সখা, নিয়ে যারে' মনের দুরাশা
আমার বঁধুর দেশে, নে রে মোর বুক-ভরা ব্যথা ভালবাসা।
সমীরণ উড়ে যায়—হয়ত বহিয়া নেয় পক্ষে ঢাকি না-বলা-সে কথার আভাস,
তোমার দুয়ার পাশে, তুমি নাহি বোলো তারে, নাহি ফেলো শ্বাস !

অভিমানী ফিরে আসে ঝড় হয়ে—সাথে আনে ভাঙার মর্ম্মর
দেহ-ভাঙে, মন ভাঙে, ভাঙে আশা, ভাঙে মন, ভাঙে সে অন্তর !!

ডাকের পিয়াদা ভালো—দুজনায় বুঝি তারে, চিনি তারে—
সে যে আনে আর নেয় দু'জনার চিঠি—
গোট গোট সারি সারি তোমার হাতের লেখা—
সে ভারী সুন্দর !
হৃদয়ের ভাষা খানি ভরা তব প্রতিটি ছতর !
কলমে কালিতে লেখা কত শত গোপন বাসনা
কত সে তৃপ্তির প্রিয় !—(আরে, আরে, হেসোনা, হোসেনা
চিঠি কত ভালো লাগে—বুঝিবে কি ? অ'ত বুঝিবেনা ।)

আজিকার চিঠি খানি—দূর' দূর ! কী লিখেছ ?—তব মুণ্ডু, মাথা
খালি দু'টি কথা—'ভালো আছি, ভালো চাই ?—লিখেছ যা'তা'—
কেবলি যে দু'টি কথা !—'চাই' না ছাই' ?—
বুঝিনা কিছুই ।
'ভালে'ার পরেতে দু' আখর 'বা'—'সা'
জুড়ে' দিলে চিঠিখানি হ'ত নাকি খাসা ?
কিছুই জানোনা তুমি শুধুই যে বলে' দিতে হয়—
জানো নাকি বলিয়া বলাতে গেলে প্রেম কভু প্রেম নাহি রয় !—
মনে হয় বড় তুমি বোকা
পুরুষ মানুষ কিনা—খোলেনা মনের কথা—তার' পর বড় এক-রোখা !
যত বলি, বলাইতে চাহি যত—কভু নাহি বলে
নারী নিয়ে করে খেলা, নারীরে ভাসায় শুধু বৃথা নয়নের জলে !

আচ্ছা ? বল'ত ? এ তোমার কেমন স্বভাব ?
বড়-টড় চিঠি লিখিতে পার না ? কথার কি হয়েছে অভাব ?
একটা কথাই লিখো বারে বারে ফিরায়ে ফিরায়ে
তবু লিখো বড় চিঠি—অবসাদ লাগে যদি, জিরায়ে, জিরায়ে
লিখো—তবু, লিখো প্রিয়,—এ আমার অনুরোধ জেনো !—
আর মোরে ভালোবাস—একা মোরে, মোরে শুধু—
এ'কথাটি লিখিবারে ভুলিয়োনা যেন !!

সাহিত্যের আদর্শ

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

আমীনউদ্দীন আহ্‌মদ

সাহিত্যের উদ্দেশ্য

যাহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অথবা খরচের উপরৃতি—তাহাকে বলি আমরা লাভ অথবা অর্থশাস্ত্রের পরিভাষায় Surplus ;—এই Surplusটার জন্য আমরা অনুরাগ বা বিরাগ যতটুকু উপলব্ধি করি—আসলটার জন্য তাহার চেয়ে খুব কমই করি। কারণ প্রয়োজনের অনুরোধে আসল আসিবে-ই,—চাই আমরা তাহার প্রতি টান রাখি বা না-ই রাখি। আসল আমাদিগকে আনন্দও দেয় না, অস্বস্তিও প্রদান করে না। যাহা প্রয়োজন, তাহা প্রয়োজনের অনুরোধেই সাধিত হয়। আর যদি বলি যে প্রয়োজনাতিরিক্তের চেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষের প্রতিই আমাদের অনুরাগ বেশী, তবে বলিতে হয়—ইহা আমাদের টান বা অনুরাগ নহে,—তাহা অনুরাগের বিকৃতরূপ—আসক্তি! দৈহিক ক্ষুধা মিটাইবার দিকেও যে আমাদের প্রবৃত্তির আকর্ষণ অনুভব করি, তাহাকে আমরা কোন্ সাহসে অনুরাগ বলিয়া অভিহিত করিব? ইহার ক্ষুধা হয়তঃ ক্ষণিকের জন্য মিটে,—তাহাতে তৃপ্তি আসে কি? সকালে সুন্দররূপে ভোজনান্তেও যখন বৈকালে আমার পেটের দায়ে আমাদের কিছু গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় তখন একথা অতি সহজ যে আমাদের দৈহিক ক্ষুধা এবং ইন্দ্রিয়-ভোগ্য ক্ষুধা ভোগের আচারে তৃপ্ত হইবার নহে।

সাহিত্য আমাদিগকে, এই ক্ষুধার উপরে যে আনন্দ, তাহাই দান করে। মানব-জীবনের যাহা লাভ Surplus তাহাই আমাদিগকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আনন্দ দান করে। জীবনে সাহিত্য দিতে পারে রস, ছন্দ, তাহা দিতে পারে জীবনের তাল, সামঞ্জস্য, দিতে পারে শান্তি এবং তৃপ্তি। অতি-কুৎসিৎ মানুষও তাহার প্রিয়ার কাছে আপনার মনকে মুক্ত করিয়া খুলিয়া ধরে, প্রাণের সহিত প্রাণের বিনিময় করিতে কী যেন একটা আকুলতা প্রকাশ করে এবং আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে মনে মনে একটা গাঢ় সান্ত্বনা, নিবিড় আনন্দ ও অপূর্ব্ব তৃপ্তি অনুভব করে;—এই তৃপ্তি-উপভোগটুকুই তাহার বাস্তব জীবনের কাব্য, নিরেট জীবনের সাহিত্য। মোটাজীবনে, যাহা-কিছু সে এইস্থানে পায়,—তাহাই জীবনের সবকিছু নহে, সত্য; তবু তাহার এই আনন্দটুকুই যে জীবনের বড় সত্য নহে,—একথাও কোন কবি অথবা সাহিত্যিক জোর করিয়া অস্বীকার করিতে সাহস করিবেন না। সাহিত্য এবম্প্রকারে ব্যষ্টি হইতে সমষ্টির, সমাজ হইতে জাতির এবং জাতি হইতে বিশ্বের আনন্দ-লোকে উপনীত হয়।

"প্রাচুর্য্যে মানুষের যথার্থ প্রকাশ"। কাব্য বা সাহিত্য মানুষের জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় যে-লাভ, যাহাকে আমরা আনন্দ বলি, তাহাই প্রদান করিয়া এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে লাভ, তাহাকেও সম্ভাবিত করিয়া তুলিয়া, প্রাণের বিপুলতাকে, প্রাণের প্রাচুর্য্যকেই প্রমাণিত করিতেছে। আমাদের নিত্য জীবনের কর্ম্মে যাহাকে হয়ত শেষ করিয়া উঠিতে পারি না, তাহাকে সাহিত্যে

নিঃশেষ করিতে পারি না পারি তাহার রূপটুকু অন্ততঃ প্রদান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবার সুযোগ পাই।

রক্তমাংসে গঠিত স-সীম মানুষের সঙ্কীর্ণ ভাবনায় বৃহত্তরকে ফুটাইয়া তোলা এবং সাধারণ জীবনের সকল প্রকার দ্বন্দ্ব ও খণ্ডতার উর্দ্ধলোকে যে একটা অনাবিল শান্তির প্রতিষ্ঠান ও পূর্ণতা রহিয়াছে—তাহাকে গোচরিভূত করাই সাহিত্যের সাধনা ও উদ্দেশ্যের সার্থকতা। মানুষের বুকে একটা দিব্য-চেতনা, মনে একটা অনাবিল আনন্দ-স্রোত, হৃদয়ে একটা শান্তি ও সুখের সুষমা উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে—ইহাই হইল সাহিত্যের উদ্দেশ্য। আমরা যদি বেদনাময় জীবনে একবারও এই সাহিত্যের পক্ষ হইতে সান্ত্বনার করুণ বাণী ও আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত ভরসা প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে সাহিত্যের রূপ-রস-আনন্দ ও অমৃত-সৃষ্টির প্রয়োজন এবং স্বার্থকতা কি?

প্রকৃতির প্রসাদে, মানব জীবনে যে দুঃখ, দ্বন্দ্ব, ও ক্লেশ সব কিছুরই প্রাচুর্য্য আছে এবং থাকিবে তাহাদিগকে হুবহু নকল করিয়া, অথবা তাইাদেরই রূপ প্রদান করিয়া। বাহ্য দৃষ্টির স্থূলতায় যাহার রং ধরা পড়ে, তাহাতে রং ধরাইয়া জীবনকে আরো ক্লেদময়, বিষাক্ত এবং বিড়ম্বনাময় করিবার কোন সার্থকতা আছে কি? তাহাদের অন্তরের নিগূঢ় সত্যকে দিব্য-দৃষ্টির আলোক-সম্পাতে যদি মহনীয় ও মধুর, করুণ ও কান্তিময় করিয়া তোলা না হয়—তবে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা কি? সাহিত্য যে মানব-সমাজকে আনন্দের নির্ঝরে ও রসের সাগরে "সিনান" করাইবে বলিয়া বলা হয়—তাহা সাধিত হইবে কি করিয়া?

অবশ্য সাহিত্যের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য শুধু ধর্ম্মের মহনীয়তা, কর্ম্মের মার্জ্জিত-রুচিতা ও সৃষ্টিতে শোভন-শুচিতার পরিচয় প্রদান করাই নহে। ধর্ম্মের মহনীয়তাকে একান্ত করিয়া প্রচার করিতে, সাধু এবং সংস্কারক বা ভাববাদীই যথেষ্ট। কর্ম্মের মহিমা ও মার্জ্জিতরুচিতা ইত্যাদি দর্শন করাইয়া বিশ্বাসবান করিয়া তুলিতে মানব-প্রাণ কর্ম্মী, দেশ-প্রাণ মহাপুরুষই যথেষ্ট। সাহিত্য-স্রষ্টার কর্ত্তব্য আরও একটু সূক্ষ্ম। সাহিত্য-স্রষ্টার মূল উদ্দেশ্য--বহু মানবের জন্য চিরকল্যাণময় ও চির-সুন্দরের অভিব্যক্তি দেওয়া সত্য, কিন্তু বহু মানবের ও অনাদি কালের জন্য যাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তাহাতে কল্যাণময়ত্ব ব্যতীত এমন একটা অনির্ব্বচনীয় রস-প্রকাশ থাকা চাই, যাহাতে তাহার প্রয়োজনীয়তা এক যুগেই বা বাহ্য-জগতের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তনেই নিঃশেষিত না হইয়া যায়।

যাহা সাধারণের চক্ষে নিষ্প্রয়োজন, অকেজো, অথবা কুৎসিৎ, তাহারও অন্তরের অন্তস্থলের যে একটা সত্য নিহিত রহিয়াছে—, তাহারও বিকাশ-ধারায় যে একটা মৌলিক সুর রহিয়াছে—তাহা অস্বীকার করিবার সাহস বোধ হয় আমাদের কাহারও নাই। সত্যকারের স্রষ্টা যিনি, তিনি আপনার সূক্ষ্ম অনুভূতি ও দিব্যদৃষ্টির আলোকে সেই অন্তর্নিহিত সত্যটুকু আমাদের সকলের গোচর করিতে পারেন। ইহাতে তাঁহার প্রকাশের ভঙ্গীতে অথবা মূল সত্যে যদি কোন বিরোধ না থাকিল তবে, সাহিত্য-স্রষ্টার তেমন অপরাধ কি?

অন্তরের অন্তরতমকে ধরিয়া দেখানোতেই শিল্পীর মাহাত্ম্য এবং বৈশিষ্ট্য! এই জন্যই আমরা শিল্পীর তুলিতে—কামুকের কামোন্মাদনা, কর্ম্মীর কর্ম্ম-স্পৃহা, প্রেমিকের প্রেম-নিবেদন সমানে সমানে দেখিতে পাই। শুধু এই কারণেই শিল্প যে কোন দিক দিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, এই কথা বলা চলে না। আমরা অসুন্দর, অসত্য ও অসংযত বলিব তাহাকে—যাহার অনুভূতির মধ্যে আছে মাত্র বস্তুর বাহিরের দিক—স্থূলতার আবরণ। শরীর যেখানে শরীর, তাহার পশ্চাতে যেখানে প্রাণ নাই,—গভীরতর সত্যের কোন প্রকাশ, কোন বিভূতি নাই—সাহিত্যিক সেই স্থূল-স্থাবরকে যদি গ্রহণ করেন তাহা হইলে, সেই সাহিত্যের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

সংস্কারক এবং কর্ম্মী যদি নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের মধ্যদিয়া সুন্দর জীবন গঠন করিতে চাহেন, আর শিল্পী যদি ইন্দ্রিয়ের বিভূতির মধ্যদিয়া অতিন্দ্রিয়কে উপলব্ধি করিতে প্রয়াস পান,—তবে উভয়ের এই বিভিন্নতায় বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না; কারণ উভয়ের উদ্দেশ্য এক—উভয়েই জীবনকে সুন্দর করিতে চাহেন,—কেবল প্রকাশ ধারাতেই যাহা উভয়ের বিভিন্নতা।

কালচার ও সাহিত্য

যে-জাতি-যে পারিপার্শ্বিকতার আবেষ্টনে থাকিয়া পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়, সে-জাতির অন্তরে অন্তরে সেই

প্রকারের কালচার বা কর্ষণাই মিশিয়া রহিয়াছে। Environment দ্বারা কোন জাতি প্রভাবান্বিত হয় নাই, এমন কথা জগতের ইতিহাসে বলে না, বলিতে পারেও না। বিশাল মরুভূমির দিগন্ত-প্রসারিতায় বাস করিয়া, ধুধুময় বালু-সাগরে নিমজ্জিত থাকিয়া আরবের বেদুঈন কোন দিন বা কোন যুগে—সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা, পুষ্পকুন্তলা এই নদী-মেখলা বঙ্গ-ভূমির কোমল-প্রাণ বাঙ্গালী সন্তানের মত হইতে পারে না এবং বাঙ্গালী ও কোনদিন আরবীর মত দুর্দ্দম, দুর্দ্দান্ত ও শক্তিশালী হইতে পারে না।

বিকাশের বৈচিত্র্য প্রত্যেক জাতিকে অপর জাতি হইতে বিভিন্নতা প্রদান করে। এই জন্যই প্রত্যেক জাতির Culture এবং সাহিত্য অন্য জাতির culture ও সাহিত্য হইতে বিভিন্ন। এই প্রকাশ ভঙ্গী অথবা বিকাশ ভঙ্গীতে বিভিন্নতা থাকা তেমন বিচিত্র নহে। সাহিত্যে সেই জাতিগত বিভিন্নতা প্রত্যেক জাতির সাহিত্যের বিশেষ রূপ। এই জাতীয়তার ছাপ থাকিলেই সাহিত্য যে বিশ্বের সাহিত্য সভা হইতে বহিষ্কৃত হইবে—তেমন কথা ঠিক নয়। কারণ বিশ্বসাহিত্যে সাহিত্য যে-কারণে আসন পাতিয়া লয়—যাহার গুণে সাহিত্য অমরতা লাভ করে—জাতিগত বিকাশ-ভঙ্গীর উর্দ্ধে সেই গুণগুলিই তাহার সবকিছু।

জাতীয়-সাহিত্য

সাহিত্যিক, কবি ও শিল্পী আমাদের মতই মানুষ। মানুষ হিসাবে তাঁহাদের জাতিগত বিশেষত্ব ও ভাষাগত বিশিষ্ট ভঙ্গী না থাকিয়াই পারে না। বিশ্বজাতি, বিশ্বসমাজ এবং বিশ্বভাষা বলিয়া যখন কোন জাতি, সমাজ অথবা ভাষার অস্তিত্ব নাই, তখন কবি আপনার সমাজের ভাষায় ভাবে ও প্রকাশের বৈচিত্র্য লইয়াই শিল্প-সৃষ্টিতে নামিবেন। আপনার দেশগত বৈশিষ্ট্যে থাকিয়াও তিনি সর্ব্বজনের হইতে পারেন—যদি তাঁহার ভাবের অপূর্ব্ব সম্ভাবনা থাকে অথবা তাহা বিশ্বতোমুখী প্রতিভাশালী হয়। এই ভাবে প্রত্যেক জাতির বিভিন্ন শিল্পী ও সাহিত্যিক মিলিয়া এক বিরাট বিশ্ব-জনীন ভাবের সৃষ্টির সহায়তা করিতেছেন।

কবির সৃষ্টিও তেমনি, সাহিত্যিকের আর্টও তেমনি—; যাহা নিত্যকালের বিত্ত, যাহা চিরন্তন সৃষ্টি, যাহার মধ্যে সর্ব্বযুগের মানবের আত্মার খোরাক সঞ্চিত, প্রেমের বীজ লুক্কায়িত, তাহা যেখানেই হউক, চাই তাহা বাঙ্গালীর ভাবুকতায়—ইংরাজের বলার ভঙ্গীতে, আরবীয়ের ছন্দে, ফরাসীর ভাষায় এবং জার্ম্মেণীর অলঙ্কারে—অর্থাৎ যেকোন দেশের ভাষার বাহনেই যে কোনও ছন্দে সে আমাদের নিকট গোচরিভূত হউক না কেন, তাহার মধ্যে যাহা নিত্যকালের চিত্ত-বিজয়ী বিত্ত রহিয়াছে, তাহা যুগ-যুগান্তরের মানব-বুকে ধ্বনিত ও রণিত হইবেই। ইহাই জাতিয়তার মাটীতে প্রস্ফুটিত বিশ্ব-মানবের অম্লান কুসুম।

কবি যদি আপনার জাতিকে আশ্রয় করিয়া আপনার ভাষার সাহায্য লইয়া, আপনার কোন বন্ধুর জন্যই কাঁদেন—আর সেই কান্নাতেই যদি আমরা লাঞ্ছিত-মানবতায় দরদের সূত্র এতটুকু মাত্র পাই, সেই অশ্রুতে যদি বেদনাহত মানবতার প্রতি এতটুকু সহানুভূতির সুর খুঁজিয়া পাই, তাহা হইলে কবির কান্না শুধু—তাঁহার বন্ধুবিশেষের জন্য থাকে না। সেই কান্না বিশ্ব-মানবের বুকে গুমরিয়া উঠে।

Shakespeare এর হ্যামলেট, হোমরের "ইলিয়াড" ইমরুল কয়েসের "মোয়াল্লাকা" শত যুগের অতীতে থাকিয়া ও আজ বর্ত্তমান যুগের এবং ভবিষ্যত যুগের মানুষের বুকেও যেই ভাবনা, উন্মাদনা, যেই রসাস্বাদ ও সৌন্দর্য্যানুভূতি প্রদান করিবে—,রবীন্দ্রনাথের "গোরা", আইভেন টুর্গেনিভের "Virgin Soil" তেমনি বর্ত্তমানের বুকে জানা-অজানার নবীন পরিচয়ে এবং লাঞ্ছিত মানবতার বেদনার শোকে যে দাগটুকু প্রদান করিবে—তাহা ভবিষ্যতের বুকেও অঙ্কিত থাকিবে।

সাহিত্যের ভাষা

ভাষা সাহিত্য রচনার উপলক্ষ। বাহিরের কোন নিয়ম-নির্দ্দিষ্ট ভাষা দিয়া সাহিত্য গঠন করা সম্ভবপর নহে! অন্তরের ভাব ও ভাবের প্রেরণাই সাহিত্যের ভাষাকে গঠন করিয়া তোলে। ভাব যেখানে রস-ঘন, সেখানে ভাষা আপনিই গম্ভীর অথচ গতিমান হইয়া উঠে। চলিতভাষা ও সাধু-ভাষার প্রয়োগ লইয়া সাহিত্যে অনেক সময় বাদানুবাদ দেখিতে পাই; অনেক মহাকবি, অথবা সাহিত্য-বিশারদ ও চলিত ভাষার কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া আপনার ভাবকে

রূপ দিয়াছেন। এই সুযোগে অনেকে চলিত ভাষাকেই সাহিত্যের বাহন করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন—আবার কেহ তাহার বিপরীতটাই করিতে ভালবাসেন।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য শুধু ভাবকে 'প্রকাশ' করাই নহে। তাহাকে সুন্দর ও মহিয়ান্ করিয়া তোলা-ও! শব্দ ও ভাষার নিজস্ব গুণ আছে বলিয়াই তাহাকে অনুরঞ্জনের উপযোগী করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

চলিত ভাষায় সাহিত্য Simple ও Natural হয়। কিন্তু Mathew Arnold এর কথায়—Simple ও Natural হওয়াই সাহিত্যের সবকিছু নহে; তাহার Grand ও Noble হওয়ারও প্রয়োজন আছে।" চলিত ভাষায় মনোহারিত্ব এবং সহজ বোধ্যতা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে ধ্যানের গাম্ভীর্য্য, রসাস্বাদনের শান্ত উদার মহনীয়ত্ব খুবই কম পাওয়া যায়! সহজ-সুলভ-অনুভূতির দোহাই দিয়া যদি আমরা চলিত বা কথিত ভাষাকে সাহিত্যে অবাধ গতিতে গ্রহণ করি, তবে পরিবর্ত্তনের চাকায় ধাক্কা খাইয়া তাহারা কোন ভবিষ্যত যুগের চলা-পথে দাঁড়াইতে পারিবেনা! এইখানে সাহিত্যকে ক্ষুণ্ণ করা হইল—তাহার ভাষার ঐশ্বর্য্য হইতে; কিন্তু সাধু ভাষা এই পরিবর্ত্তনের ধাক্কায় এতটা চঞ্চল হইবে না, কারণ তাহার মূল চলিতের চেয়ে শক্ত এবং তাহা সকলে স্বীকার ও করেন।

আবার চলিত ভাষাকে মহনীয়ত্ব প্রদান করিতে genius এর প্রয়োজন। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। Shakespeare এর ন্যায় বিরাট প্রতিভা না থাকিলে, বিশাল personality না থাকিলে কি, এমন অবাধ গতিতে ভাষার প্রয়োগ করিয়া সাহিত্যকে বাঁচাইয়া রাখিবার অধিকারী হয়?

সাহিত্যের উচ্ছৃঙ্খলতা-দোষ ও শুচিতা-বাতিক—এই উভয়টাকে এক পর্য্যায়ে ফেলা যায়। যাঁহারা যথেচ্ছরকমের খেয়াল-ভাবনার আশ্রয় লইয়া, তাহা যদৃচ্ছভাবে প্রকাশ করিতে শক্তি ব্যয় করেন,—অথবা যাঁহারা শুচিতার দোহাই প্রদান করিয়া আভিজাত্যের 'ঘাট'—বজায় রাখিতে, আপ্রাণ চেষ্টা করেন,—তাঁহাদের উভয়েই সীমার বাহিরে চলিয়াগিয়াছেন, সুন্দরের প্রতিষ্ঠাকল্পে উচ্ছৃঙ্খলতা যেমন দোষের--শুচিতার বাতিকও তেমন অপরাধের। এই বিষয়ে বিগত শতাব্দীর ঋষি শিল্পী টলষ্টয় বিশেষ কড়া নজর রাখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার Classic soul লইয়া Classic Manner এর উপর তাঁহার দিগন্ত-প্রসারী ভাবধারাকে প্রবাহিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি কল্যাণের দিকটাতেই বেশী জোর দিয়াছেন—এবং বলিয়াছেন—"ভাষায় নহে শুধু, ভাবেও যাহার কিঞ্চিৎ অসংযম, অসংযত প্রকাশ ও চঞ্চলতা থাকে তাহার শিল্প আপাতঃ-মধুর, মোহনীয় ও হৃদয়-স্পর্শী হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা কল্যাণের উৎস, মঙ্গলের আদর্শ হইতে পারে না।" এই জন্য তিনি Shakespeare হইতে শুরু করিয়া Byron, Milton পর্য্যন্ত যাঁহারা সুন্দরকে নিখুঁত তুলিকায় আঁকিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের সৃষ্টিকে অসংযমের দোষে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া "কিছু নয়" বলিতে সাহস করিয়াছেন।

কিন্তু আমরা এতদূর যাইতে চাহি না। আমরা বলিতে চাহি—Clasic এর আত্মস্থ-গাম্ভীর্য্য, Romantic এর উচ্ছ্বসিত প্রাণ-ধারা, প্রাকৃত-জনের দোলাচল-চিত্তবৃত্তি ও তদনুরূপ কথা-ভঙ্গী, সুলভ-মার্জ্জিত বাক্য বিন্যাস, ধীর-চিন্তাশীলতা—ইত্যাদি সকলের মিলিত-মোহনায়-ই সাহিত্য-নদীর সাগর-সঙ্গম!

গ্রীকের সৌন্দর্য্যবোধ--ল্যাটিনের ঋজু ভাব, আরবীর সহজ দৃষ্টি—বিশ্ব-সাহিত্যে বিভিন্নরূপ লইয়া বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে। আঁধার আরবে যে Romance উচ্ছ্বসিত ভাষায় জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছিল, আলোক-আরবে দেখি—তাহার সুর বদলাইয়া গেল,—শুধু ভাবে নহে—ভাষাতেও। তাই "ইমরুল কায়েসের" স্থলে আবুল আতাহিয়া আসিলেন, "লবীদের স্থলে—হাসান বিন্ সাবেৎ আসিলেন। তখন আরব Romanticism এর ভাবনা ত্যাগ করিয়া Classicism এর ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল, সে বীরত্ব ও বিজয়ের মহিমায় জয় গান আরম্ভ করিল। আগে হইতে তাহার ভাষা সহজ সরল অথচ গভীর হইয়া উঠিল। সে চাহিয়াছিল—বিশ্বের সমগ্র জাতিকে একমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এক ভাবে, এক অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিতে, এক মহাজাতিরূপে গঠন করিয়া তুলিতে, এই জন্য তাহার ভাষা ঘন-গম্ভীর উদাত্ত-উদার অথচ সহজ-সরল হইয়া আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল।

উপসংহার

ধর্ম্ম যে মানুষকে মানবতার পথে, সুন্দরের ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করে, তাহা সম্পন্ন হয়—তাহার কর্ম্ম প্রেরণা ও অনুষ্ঠান-আবর্ত্তনা ইত্যাদির মধ্য দিয়া।

আর সাহিত্য যে মানুষকে মঙ্গলের পথে, মানবতার পথে পরিচালিত করে তাহা সে ভাবের দ্যোতনা, আত্মার অনুভূতি ও বিকাশের মধ্য দিয়া। সে তাহার আপনার সুনিপুণ তুলির সাহায্যে মানব-জগতকে মানস-জগতে লইয়া যায় এবং সেখানে এক বিচিত্র মহিমায় মানুষকে সুন্দর করিয়া তোলে। উভয়ের লক্ষ্য এক হইলেও উভয়ের প্রয়োগ-ক্ষেত্র ও বিকাশ-পদ্ধতি বিভিন্ন।

যে নদীর স্রোতধারা যত চঞ্চল, যত প্রবাহমান, যত গতিবেগ-সম্পন্ন ও অতলস্পর্শী, সে নদী তত দ্রুত শৈল-বন্ধনের বেদনা হইতে মুক্ত হইয়া, তত সকালে সাগর-সঙ্গমে গমন করে। আর যে নদী ক্ষীণ-ধারায় প্রবাহিত হয়—সঙ্কীর্ণ খাতে যাহার স্রোত আবদ্ধ, তাহা হয়ত সাগর-সঙ্গমের সুযোগ লাভ করে না।

সাহিত্য-জগতে যাঁহার ভাবপ্রকাশের আদর্শ উদার ও উদাত্ত, যাঁহার মন বিশ্বভাবগ্রাহী, সার্ব্বজনীন—তাঁহার সৃষ্টিই সার্থক। যাঁহার চিন্তা-জগত অন্তহীন, অসীম অনন্ত ভাবনায় সমৃদ্ধ—তাঁহার প্রকাশই অপূর্ব্ব, অনবদ্য এবং অভাবনীয় মহিমায় মহিমান্বিত।

আর যাঁহার আদর্শ সঙ্কীর্ণ ও সাময়িক অথবা সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক কিংবা ব্যক্তি-বিশেষের, স্বার্থে সংশ্লিষ্ট যাঁহার আদর্শ স্থূল জগতের ইন্দ্রিয়-বিক্ষোভ সমুদ্ভূত—হয়ত তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টি একবারে নিরর্থক না হইলেও চিরন্তন এবং শাশ্বত নহে। শাশ্বত তাহাই, যাহাতে সত্যের প্রতিষ্ঠা, সুন্দর তাহাই, যাহাতে আত্মার আসন!

সত্য, সুন্দর ও শাশ্বত-সৃষ্টিই সাহিত্যের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ, ইহাই সাহিত্যের প্রাণ!

বল দাও মনে

খোন্দেগার মোহাম্মদ আবুবকর

হে আনন্দ, তুমি আজ লয়েছ বিদায়,—
ছুটিয়াছি, ম্লান-মুখ ব্যর্থ নিরাশায়
তিমির মরণ-রাজ্যে। জীবন বাহন,
তোমা সনে হারিয়েছি জীবন্ত-জীবন।
কে যেন লেপিয়া দেছে আমাদের মুখে
দীনতার কৃষ্ণ মসী; প্রাণ নাই বুকে।
দৃষ্টি আজ অধোমুখী, শিথিল চরণ,
দেহ আজ বল শূন্য, নিষ্প্রভ নয়ন।......

যুগ-মছি, পুনঃ তব প্রয়োজন যবে
ঢালিবারে প্রাণ ধারা এ-সমাজ শবে
এস ত্বরা তব পূর্ণ পান-পাত্র ভরি'
ধর সব শুষ্ক ওষ্ঠে; দাও পান করি
আকণ্ঠ তোমার সুরা। ফুটাও আননে
জগজ্জীগিষু কান্তি; বল দাও মনে।......

আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

রিজাউল করিম বি, এ

ষ্টাম্প আইন ব্যতীত আমেরিকানেরা আরও কয়েকটি যুক্তি-সঙ্গত কারণে ইংরাজদের উপর পূর্ব্ব হইতেই বিরক্ত হইয়াছিল। তাহাদের অবাধ ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর ইংরাজেরা বহুদিন হইতে হস্তক্ষেপ করিয়া আসিতেছিলেন, ইহাতে তাহাদের ভীষণ ক্ষতি হইতেছিল।

ইংলণ্ড ব্যতীত অপরাপর দেশের সহিত বাণিজ্য বিষয়ে ইংরাজগণ তাহাদিগকে স্বাধীনতা দেয় নাই। Navigation Act অনুসারে আমেরিকার বৈদেশিক বাণিজ্য ব্রিটিশ-পোতেই নির্ব্বাহ হইত। ইহাতে আমেরিকানদের অনেক ক্ষতি হইত। আর তাহাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া ইংরাজেরা প্রভূত লাভবান হইত। তৎপরে ১৭৬১ খৃঃ আমদানী শুল্ক ধার্য্য হয়। উক্ত শুল্ক ধার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই চিনি, গুড় ও মদ্যের উপর কর আদায়ের উদ্যোগ চলিতে থাকে। যাহাতে আমেরিকায় লোহার কারখানা-আদি প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে ১৭৬৩ খৃঃ আর একটি ভীষণ আইন প্রবর্ত্তিত হয়। এই আইনগুলি কিন্তু নামে মাত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। নীতি-বিগর্হিত ও অত্যাচার-মূলক বলিয়া আমেরিকানরা এইগুলি কোন দিনও মান্য করে নাই, কখনও কর দেয় নাই। আমদানী শুল্ক আদায়ের জন্য ইংলণ্ডের তৎকালীন রাজা তৃতীয় জর্জ্জ কঠোর বিধান অবলম্বন করিলেন। তিনি উপনিবেশের বিচারালয়গুলিকে নূতন শক্তি প্রদান করিয়া, কঠোর ভাবে কর আদায় করিবার ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন। বিচারকগণ সার্চ্চওয়ারেণ্ট বা অনুসন্ধানী পরওয়ানা প্রচার করিলেন। এই পরওয়ানা বলে ইংলণ্ডের অন্নপুষ্ট কর্ম্মচারিগণ ইতর-ভদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলের বাড়ী অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কথায় বলে গুরুর চেয়ে শিষ্য বড়। এই শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণ স্বভাবতঃ অত্যাচার-প্রিয়। তাহাদের অত্যাচারে ভদ্র-সন্তানগণের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠিল—উহার প্রতিকারার্থ দেশের সর্ব্বত্র তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ হইল—বিশেষতঃ সালেম ও বোষ্টন নগরে তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল।

জেম্‌স্‌ ওটিশ নামক একজন এইরূপে অপমানিত হওয়ায় তিনি ঘোর প্রতিবাদ করিয়া দেশবাসীকে বুঝাইলেন, আমাদের স্বাধীনতায়, আমাদের স্বত্বাধিকারে ইংলণ্ডের হস্তক্ষেপ করিবার কোনই অধিকার নাই! ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে আমাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অধিকার না দিলে আমরা কোনও বিষয়ে ইংলণ্ডকে কর দিব না, তাহার আইন মানিয়া চলিব না (No representation, no taxation)। ইংরাজেরা সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন, তাঁহারা আমেরিকান বন্দর সমূহে, অচিরে কোন বিপৎপাতের আশঙ্কায় যুদ্ধ-জাহাজ নিযুক্ত রাখিলেন। ঔপনিবেশিকগণের চিনি গুড়, ও মদ্য-পূর্ণ বহু জাহাজ তাঁহারা আক্রমণ করিলেন। ইহাতে আমেরিকানদের বহু ক্ষতি সাধিত হইল, এমনকি কিছুদিনের জন্য তাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য একেবারেই ধ্বংস পাইল।

এইরূপ নানাবিধ কারণে তুমুল উত্তেজনায় দেশের অধিবাসিগণ ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। ঠিক সেই সময় কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত তাহাদের উপর ষ্টাম্প আইন প্রবর্ত্তিত হইল। এই আইনের বার্ত্তা আমেরিকায়

পঁহুছিবা মাত্র, দেশব্যাপী দারুণ উত্তেজনা, ক্ষোভ ও বিদ্বেষের ভাব জাগিয়া উঠিল। দেশের সর্ব্বত্র বক্তৃতার পর বক্তৃতা হইতে লাগিল, সংবাদপত্র সমূহের কলেবর উহার প্রতিবাদ-পূর্ণ প্রবন্ধে বোঝাই হইয়া উঠিল। এমনকি সুফল লাভের আশায় ইংলণ্ডের রাজার নিকট প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করিল এবং উহার তদ্বিরের জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইল।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইলনা। ঔপনিবেশিকগণের শত চেষ্টা ও তদ্বিরের কোন ফল-লাভ হইল না। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট সভা কিছুতেই ষ্টাম্প আইন প্রত্যাহার করিলনা। গভীর দুঃখ ও দারুণ মনোবেদনার সহিত আমেরিকাবাসিগণ শুনিল যে তাহাদিগকে এইবার হইতে ইংরাজকে নূতন কর দিতে হইবে, কর দিয়া ইংলণ্ডের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইতে হইবে। এই নিদারুণ হৃদয়-বিদারক কথা যে শুনিল সেই প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তৎপরে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া অধর দংশন করিতে করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল, আমরা কিছুতেই ইংলণ্ডের অধীনতা স্বীকার করিব না, তাহাকে কর দিয়া আমাদের স্বাধীনতা নষ্ট হইতে দিব না। নগরে-লোকালয়ে, হাটে-ঘাটে, প্রান্তরে সর্ব্বত্রই উত্তেজনার প্রবল বন্যা বহিতে লাগিল। সমাধি সমূহে শোক-সূচক ঘণ্টাধ্বনি বাজিতে লাগিল, তাহা শুনিয়া লোকে আক্ষেপ করিয়া বলিল, আমাদের স্বাধীনতার মরণ-ঘণ্টা বাজিতেছে। স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভায় ইহার প্রচণ্ড প্রতিবাদ আরম্ভ হইল, বক্তাগণ অনলবর্ষী ভাষায় উক্ত আইনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। পেটিক্‌হেনরী নামক একজন তেজস্বী সদস্য সভায় ঘোর বাগ-বিতণ্ডা উপস্থিত করিলেন। ইংলণ্ডের এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া বক্তৃতা করিতে করিতে তিনি উত্তেজনাবশে বলিয়া ফেলিলেন, সিজারের নিধনের জন্য ব্রুটাশের জন্ম হইয়াছিল, অত্যাচারী প্রথম চার্লসের সংহারের জন্য ক্রমওয়েলের জন্ম হইয়াছিল, বর্ত্তমান অত্যাচারী রাজা তৃতীয় জর্জ্জ তাঁহাদের দশাপ্রাপ্ত হইবেন, তাঁহার নিধন-কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য যে লোকের প্রয়োজন, আমরা প্রত্যেকেই সেই অভাব পূরণ করিব। তৎপরে তিনি স্বীয় দেশবাসীকে স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। ষ্ট্যাম্প আইনের প্রতিবাদপূর্ণ কয়েকটি প্রস্তাব পাশ করিয়া সেদিনকার মত সভার কার্য্য স্থগিত হইল। আমেরিকার অপরাপর প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রকার প্রস্তাব গৃহীত হইল। অবশেষে আমেরিকার সকল প্রদেশের প্রতিনিধি-বর্গ একত্র মিলিত হইয়া ১৭৬৫ খৃঃ অক্টোবর মাসে নিউইয়র্ক শহরে এক কংগ্রেস সভা আহ্বান করিলেন। ঐ কংগ্রেসই আমেরিকার স্বাধীনতার মূলভিত্তি। উক্ত কংগ্রেস সভা হইতে একটি প্রতিবাদপত্র ইংলণ্ডের রাজার নিকট প্রেরিত হইল, সেই কংগ্রেস-সভা আরও ঘোষণা করিল যে আমেরিকার উপর কর-নির্দ্ধারণ করিবার ইংলণ্ডের কোনই অধিকার নাই।

কিন্তু আমেরিকানদের এত আন্দোলন আলোচনা ও প্রতিবাদপূর্ণ আবেদনে ইংলণ্ডের কর্তৃপুরুষগণের পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হইল না। তাঁহারা দৃঢ়ভাবে স্থির করিয়া লইলেন যে, যাহা আইনে পরিণত করিয়াছি তাহার আর প্রত্যাহার হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহারা ঘোষণা করিয়া দিলেন যে ১লা নবেম্বর হইতে ষ্টাম্প আইন অনুযায়ী কার্য্য চলিতে থাকিবে। আমেরিকানরা এই নিদারুণ অনুজ্ঞা শ্রবণমাত্র শোকে দুঃখে ও ক্রোধে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। আমেরিকার সর্ব্বত্র শোকের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। দেশবাসী উহার প্রতিবাদ স্বরূপ বিরাট হরতাল করিল, সেদিন সমস্ত কার্য্য বন্ধ রহিল—স্কুল-কলেজ বন্ধ হইল, দোকান-পাট, হাট-বাজার সব নিস্তব্ধ! শত শত নরনারীর কোলাহলে মুখরিত নগরী নীরব মূর্ত্তি ধারণ করিল—নিদারুণ ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করিয়া দেশের অধিবাসিগণ নিরন্তর শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। এই বিষাদময় অবসন্নতার মধ্যেও ঔপনিবেশিকগণ আত্ম-কর্ত্তব্যবিস্মৃত হইল না, কেবলমাত্র হুজুগেই মাতিয়া থাকিল না। ঐদিন যাহাতে ষ্টাম্প কাগজ একখানি বিক্রয় হইতে না পারে তার প্রচেষ্টা হইতে লাগিল। কতক স্থানে ষ্টাম্প কাগজ জোর করিয়া পুড়াইয়া দেওয়া হইল। ইত্যবসরে নিউইয়র্ক বোষ্টন ও ফিলাডেলফিয়ার বহুস্থানে নানারূপ সমিতি গঠিত হইয়া উঠিল, উক্ত সমিতির সদস্যগণ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ষ্টাম্প আইন প্রত্যাহৃত না হইলে তাঁহারা হাতছাড়া হইয়া যাইবে, সুতরাং ইহাদিগকে যে প্রকারেই হউক ইংলণ্ডের আয়ত্তে রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

ব্রিটিশ-জাত পণ্যদ্রব্য কিছুতেই গ্রহণ করিবেন না। আমেরিকার বহু ব্যবসায়ী এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইল যে, দেশ যাহাতে স্বাবলম্বী ও আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিতে ও বিদেশীর সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে তৎপ্রতি ও বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়াছিল।

ইতিমধ্যে হঠাৎ ইংলণ্ডের মন্ত্রণা-সভার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, আমেরিকার ভাগ্যাকাশের ধূম-কেতুস্বরূপ মন্ত্রীবর গ্রেণভাইল পদত্যাগ করিলেন। তাঁহার পদে পিট অভিষিক্ত হইলেন। পিটের হৃদয় অত্যন্ত উদার ছিল, তিনি স্পষ্টবাদী স্বাধীনচেতা ও দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। মন্ত্রী হইবার পূর্ব্বেই তিনি ষ্টাম্প আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; এক্ষণে মন্ত্রী-পদে অভিষিক্ত হইয়া উক্ত আইন প্রত্যাহার করিবার জন্য আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আন্দোলনের ফলে ১৭৬৬ খৃঃ ১৮ই মার্চ্চ ষ্টাম্প আইন প্রত্যাহৃত হইল—ঘোর বিষাদাচ্ছন্ন আমেরিকা পুনরায় হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল!

কিন্তু এ হর্ষকোলাহল অধিক দিন রহিল না, এ যেন পুঞ্জীভূত মেঘরাশি ভেদ করিয়া নিমেষের তরে বিদ্যুদ্বিকাশ মাত্র! কারণ পর বৎসর আবার নূতন গণ্ডগোল আসিয়া উপস্থিত হইল। পিট অবসর লইলে পর লর্ড নর্থ সেই পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি গ্রেণভাইলের মত সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতি-বিশারদ মন্ত্রী ছিলেন। তিনি মন্ত্রী হইয়াই আবার আমেরিকার উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। চা, গ্লাশ, রাং, শিশি, কাগজ প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য আমেরিকায় আমদানী হইত, তাঁহার প্ররোচনায় ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তাহার উপর কর আদায় করিতে চাহিলেন এবং অবিলম্বে এক নূতন আইন পাশ করিয়া তাহা আমেরিকায় জারী করিতে চাহিলেন। একবার আন্দোলন করিয়া ফল লাভ হইয়াছে বুঝিয়া আমেরিকাবাসীরা আরও উত্তেজিত হইয়া ইংলণ্ডকে কোন প্রকার কর দিতে স্বীকার করিল না। মন্ত্রীবর লর্ড নর্থ বুঝিলেন, আমেরিকানদের আন্দোলনে কর্ণপাত করিলে চলিবে না, তদনুসারে কার্য্য করিলে আমেরিকা একেবারেই ইংলণ্ডের স্বুতরাং তাহারা যদি নূতন কর প্রদানে অস্বীকার করে, তাহা হইলে বাহুবল প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিতে হইবে।

এদিকে আমেরিকাবাসীরা পুনরায় নূতন করের নাম শুনিয়া জলিয়া উঠিল, তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল যে, ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, তাহারা ইংলণ্ডকে কোন কর দিবে না। তাহাদের এইরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া লর্ড নর্থ বুঝিলেন সহজে কর আদায় করা সম্ভব নহে। তখন তিনিও স্থির করিয়া লইলেন এইবার হইতে আমেরিকায় বল প্রয়োগ করিতে হইবে। এইখানে লর্ড নর্থ একটা মহাভ্রমে পতিত হইলেন—তিনি বুঝিলেন না যে, বাহুবলে কোন জাতির উপর আধিপত্য বজায় রাখা যায় না।

ইংলণ্ড আপনার বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া আমেরিকাকে জব্দ করিতে চাহিল। সুতরাং ১৭৬৮ খৃঃ ৫০টি কামান সহ একখানি যুদ্ধজাহাজ বোষ্টন নগরে প্রেরিত হইল। সৈন্যদল বোষ্টন নগরে পদার্পণ করিয়াই নানাস্থানে অত্যাচার উপদ্রব আরম্ভ করিল, তাহারা হংকক নামক এক ব্যক্তির একখানা নৌকা লুণ্ঠন করিয়া লইল। ইহাতে দেশবাসীর উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পাইল। তাহারা পুনরায় এক সভায় মিলিত হইয়া এই বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিল। সেই সভায় সকল প্রতিনিধি একবাক্যে প্রতিজ্ঞা করিল, প্রাণ যায় সেও স্বীকার দেশের স্বাধীনতা কিছুতেই বিদেশী কর্ত্তৃক কলঙ্কিত হইতে দিবে না।

৪

ইংলণ্ডের মন্ত্রী-সমাজ আমেরিকানদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বিষয় শুনিলেন, কিন্তু উহার যে কোন গুরুত্ব আছে, তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন না। সুতরাং তাঁহারা আমেরিকানদের দমন করিবার জন্য পুনরায় নূতন সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই সৈন্যদল আমেরিকায় উপনীত হইয়া অকথ্যভাবে অধিবাসিগণের উপর নির্য্যাতন আরম্ভ করিল। তাহাদের অত্যাচারে আমেরিকায় অশান্তির আগুণ দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিল।

এইরূপ নূতন সৈন্য আমদানী হওয়ায় একেত অধিবাসিগণের হৃদয় দুঃখের আগুনে দগ্ধ হইতেছিল, ইহার উপর তাহারা আবার ভীম মূর্ত্তি ধরিয়া নিরীহ অধিবাসিগণের উপর অসহ্য অত্যাচার আরম্ভ করিল। ইহাদের অত্যাচারে বোষ্টন নগরে হাহাকার ধ্বনি উঠিতে লাগিল। ১৭৭০ খৃঃ ২২শে ফেব্রুয়ারী কতকগুলি স্কুলের বালক বোষ্টন নগরের

পথে জটলা করিতেছিল। একজন সৈনিক পুরুষ ক্রোধান্ধ হইয়া হঠাৎ তাহাদের উপর গুলি চালাইয়াছিল, ইহাতে কতকগুলি বালক আহত ও একটি নিহত হইল। জনসাধারণ ইহার জন্য কর্ত্তৃপুরুষের নিকট প্রতিবাদ করিল, কিন্তু কোনও ফল হইল না। সৈনিকবর রিচার্ডশন্ পরমানন্দে অত্যাচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার কোনই শাস্তি বিধান হইলনা। উৎপীড়িত জনসাধারণ বলাবলি করিতে লাগিল, ইংরাজদের প্রেরিত সৈন্যেরা আমাদের ধন প্রাণ বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে, অথচ কর্ত্তৃপক্ষ ইহার কোন প্রতিকার করিতেছে না, একদিন নয়, দুই দিন নয়, এই প্রকার অত্যাচার ও লুঠতরাজ সৈনিকদের দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিল। এইরূপে অন্য এক দিন বোষ্টন নগরে আর একটা ভীষণ হত্যা কাণ্ড সাধিত হইয়া গেল, আত্ম-গর্ব্বী সৈনিকগণ কতকগুলি পথিককে বিনাকারণে নির্ম্মম রূপে বধ করিয়া ফেলিল। এই শোচনীয় দুর্ঘটনায় লোকের প্রাণ আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই কাণ্ডজ্ঞান-হীন সৈনিকদিগের অত্যাচারে যখন আমেরিকানেরা জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল এবং ইহাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াও যখন কোনই ফল লাভ হইল না, তখন তাহারা তাহাদিগকে অপসারিত করিবার জন্য নিজেরাই প্রস্তুত হইতে লাগিল। তদনুসারে তাহারা সৈন্যসংগ্রহে মনোনিবেশ করিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আপনাদের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল—তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল ইংলণ্ডের সহিত সকল সংস্রব ছিন্ন করিয়া আমেরিকাকে স্বাধীন করিবে! আমেরিকাকে অটল ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ দেখিয়া সমগ্র ইংরাজজাতি চঞ্চল হইয়া উঠিল। কর-আদায় করিবার নানা উপায় অবলম্বন করিয়াও তাঁহারা কিছুতেই তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করিতে পারিলেন না। আমেরিকানেরা প্রাণ দিবে, ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে সেও স্বীকার, কিন্তু ইংলণ্ডকে কর-প্রদান করিয়া তাহার অধীনতা স্বীকার করিবে না। সমগ্র অধিবাসীর এইরূপ একতা ও দৃঢ় চিত্ততা দেখিয়া অগত্যা ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তাহার করভার লাঘব করিবার জন্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। নানা আলোচনার পর স্থির হইল, আমেরিকানদের উপর ইংরাজ যে সমুদয় করভার চাপাইয়াছিল, তাহা সকলই উঠিয়া যাইবে। তবে ইংলণ্ড যে আমেরিকার সর্ব্বোচ্চ প্রভু ও আমেরিকার উপর তাহার যে একটা অধিকার আছে তাহারই নিদর্শন স্বরূপ আমেরিকাকে চায়ের উপর প্রতি পাউণ্ডে তিন পেন্স হিসাবে সামান্য কর বহন করিতে হইবে!

ইংলণ্ডকে কর দিতে হইবে, ইংলণ্ডের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে, আমেরিকার স্বাধীন অধিবাসীর উপর ইংলণ্ড সাগর-পার হইতে ধমকি দিয়া আপনার আদেশ প্রচার করিবে—একথা চিন্তা করিতেও আমেরিকানেরা শিহরিয়া উঠিল। কর-সামান্য হউক, অধিক হউক, কর দেওয়া অর্থে-ই ইংলণ্ডের অধীনতা স্বীকার করিয়া লওয়া। আমেরিকানেরা তাহা করিতে রাজী হইল না, তাহারা এক বাক্যে বলিয়া উঠিল, আমরা করস্বরূপ এক কপর্দ্দকও ইংলণ্ডকে দিব না। যদি চা পরিত্যাগ করিতে হয় সেও স্বীকার তথাপি চা'কর দিয়া স্বাধীনতা নষ্ট করিব না। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট আমেরিকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে অন্যায় আব্দার বলিয়া উড়াইয়া দিলেন সুতরাং তাঁহারা চা-কর রহিত করিতে রাজী হইলেন না। আমেরিকানেরা আপনাদের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কার্য্য করিল, তাহারা এক যোগে চা-পান বন্ধ করিয়াদিল, দেশে চায়ের আমদানী একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল, চায়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ পণ্য দ্রব্যের বয়কট আরম্ভ হইল।

আমেরিকার ঔপনিবেশকগণ ইংলণ্ডের অবিমৃষ্যকারিতা ও অত্যাচারের প্রতিকার স্বরূপ, যেদিন প্রতিজ্ঞা করিল আর বৃটিশের কোন দ্রব্য গ্রহণ করিবে না, সেই দিন হইতে তাহারা তদনুসারে কার্য্য করিতে লাগিল। একটি দেশের সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে এরূপ একতা, এক প্রাণতা ও দৃঢ়-চিত্ততার উদাহরণ অন্য কোথায়ও বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। যেমন প্রতিজ্ঞা তেমন কায, সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ-পণ্য দ্রব্যের আমদানী একবারেই কমিয়া গেল। এক বৎসরের মধ্যেই আমেরিকায় ইংরাজদের লক্ষ লক্ষ টাকার পণ্যের আমদানী কমিয়া গেল। ইংরাজেরা বুঝিল আমেরিকানেরা প্রতিজ্ঞা-পালনে পশ্চাৎপদ নহে।

ইংরাজেরাও সহজে ভয় পাইবার পাত্র নহে। তাঁহারা ১৭৭৩ খৃঃ শেষভাগে বোষ্টন নগরের বন্দরে চা বোঝাই জাহাজ প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে আমেরিকানেরা এক সভা করিয়া স্থির করিয়া লইল যে চা'কর রহিত না

হইলে ঐ চা কিছুতেই নামিতে দেওয়া হইবে না। যদি ইংরাজ অধিক বাড়াবাড়ি করে, বাহুবলের আশ্রয়ে আমেরিকানদের দমন করিতে উদ্যত হয়, তাহারা তাহা অম্লান বদনে সহ্য করিবে—তবুও আমেরিকায় চা নামিতে দিবে না। তাহারা সমস্ত বিপদ-আপদ বরণ করিয়া লইয়া জাহাজের সমস্ত চা জলে ফেলিয়া দিবে। ইংরাজেরাও আপন জিদে অটল রহিলেন, তাঁহারাও দৃঢ়তার সহিত স্থির করিলেন, কিছুতেই আমেরিকানদের আব্দারে কর্ণপাত করা হইবে না—আর এদিকে আমেরিকানেরা চা জলে ভাসাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইল!

একদিন হঠাৎ প্রায় ৫০ জন ভদ্রলোক ছদ্মবেশে জাহাজের উপর উঠিয়া পড়িলেন, জাহাজের পার্শ্বে তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য বহুলোক প্রস্তুত ছিল। এমন সময় হঠাৎ চায়ের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বস্তা সমুদ্রবক্ষে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। এ কার্য্য কে করিল প্রথমে তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না, বাক্সের পর বাক্স সমুদ্রগর্ভে পতিত হইতে লাগিল, চা ভাসিতে ভাসিতে সমুদ্রের অনন্ত বুদ্বুদের মধ্যে মিশিয়া গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে দর্শকগণের আনন্দ পূর্ণ করতালিতে গগন-পবন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সে সময় ইংরাজেরা মোটেই প্রস্তুত ছিল না, সেই জন্য তাহারা তখন বেশী কিছু করিতে পারে নাই। তৎপর দিন সমগ্র দেশে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল। এই বার হইতে এই দৃষ্টান্ত প্রত্যেক বন্দরে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। অকালে বিনষ্ট হইবার ভয়ে অনেক বন্দর হইতে চা বোঝাই জাহাজ পুনরায় ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। দেশময় একটা হৈ হৈ রৈ রৈ চীৎকার ধ্বনি উত্থিত হইল!

আমেরিকাবাসীর এই প্রকার এক-প্রাণতা ও নির্ব্বন্ধাতিশয়ের বিষয় জ্ঞাত হইয়া পূর্ব্ব হইতেই ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপুরুষ তাহাদের উপর ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে চা ভাসাইয়া দেওয়া ও জাহাজ প্রত্যাগমণের সংবাদে তাঁহাদের ক্রোধাগ্নি ঘৃতাহুতি পাইয়া প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া স্থির করিলেন, আমেরিকাকে জব্দ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিব না। তাঁহারা পুনরায় আমেরিকানদের উপর কঠোরতর বিধি প্রবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। লর্ড নর্থের পরামর্শ অনুসারে তাহাদের বিরুদ্ধে কতকগুলি কঠোর আইন বিধিবদ্ধ হইল। একটি আইনানুযায়ী বোষ্টন নগরের সমুদয় বন্দর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। উক্ত আইন অনুসারে তাঁহারা ঘোষণা করিলেন যে চা'র ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংলণ্ডের অধীনতা স্বীকার না করিলে ঐ বন্দরে কোন জাহাজ আসিতে দেওয়া হইবে না। আর একটা আইন পাশ করিয়া তাহাদের সমুদয় অধিকার প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। তথাকার প্রধান সেনাপতিকে গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া তাঁহার অধীনে আরও চারি দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। উক্ত গবর্ণরকে যদৃচ্ছা ক্ষমতা পরিচালন করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। এই প্রকারে কঠোর আইন পাশ করিয়া আমেরিকাকে অধীন রাখিবার চেষ্টা করা হইল। ইংরাজেরা আশা করিলেন তাঁহারা বালির বাঁধ দিয়া প্রবল বন্যার পথ রোধ করিবেন।

১৭৭৪ খৃঃ ৫ই সেপ্‌টাম্বর তারিখে ফিলাডেলফিয়া নগরে এক বিরাট কংগ্রেস সভার অধিবেশন হইল। কেবল জর্জ্জিয়া ব্যতীত সকল প্রদেশের লোক ঐ কংগ্রেসে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিল। সেই কংগ্রেস সভায় নানা বিষয় আলোচনার পর ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে, যে প্রকারেই হউক আমেরিকার স্বাধীনতা অব্যাহত ও অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে। তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, আমরা ইংলণ্ডের প্রবর্ত্তিত আইন মানিব না, ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে আমাদের প্রতিনিধি না থাকিলে ইংলণ্ডকে আমরা কোন কর দিব না, উহার কোনরূপ অন্যায় আব্দার সহ্য করিব না, ইহার জন্য যুদ্ধ করিতে হয়, তাহাতেও আমরা প্রস্তুত রহিলাম।

এই সময় আমেরিকাবাসীর সৌভাগ্যক্রমে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, তাঁহারই কল্যাণে, তাঁহারই অসম-সাহসিকতায় ও দুর্জ্জয় বীরত্ব-প্রভাবে আমেরিকার ভাগ্যাকাশ হইতে আশুবিপদের কাল-মেঘ বিদূরিত হইয়া স্বাধীনতার প্রোজ্জ্বল সৌরকর সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মহাবীর পুরুষ-সিংহের নাম—জর্জ্জ ওয়াশিংটন। ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার বিবাদের সূত্রপাত হইতে তিনি স্বদেশের মঙ্গলের জন্য মনঃ প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

এক্ষণে যুদ্ধের সম্ভাবনা বুঝিয়া অসীম বিক্রমের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

যাহাতে ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার বিবাদ মিটিয়া যায় তজ্জন্য বেনজামিন ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। বিবাদ মিটাইয়া দিবার জন্য ইংরাজদের নিকট বহু অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কাতরতাপূর্ণ অথচ সারগর্ভ উপদেশ বাক্যে কেহই কর্ণপাত করে নাই, বরং ইংরাজেরা যেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার বোধ হইয়াছিল, তাঁহারা আমেরিকাকে বাহুবলে নিবৃত্ত করিতে চাহেন। সুতরাং সন্ধির আশা জলাঞ্জলী দিয়া তিনি স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সৈন্য সংগ্রহে মনোযোগ দিলেন। বেনজামিন, ওয়াশিংটন প্রভৃতি মহারথীগণ বহু চেষ্টায় ইংরাজের হস্ত হইতে স্বদেশের পবিত্রতা ও মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য অত্যল্পদিবসের মধ্যে বহুসৈন্য সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন।

এদিকে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন না। তাঁহারা কিন্তু আমেরিকার উদ্যোগ আয়োজনকে ব্যর্থ করিবার জন্য তুমুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। সেনাপতি গেজের উপর আমেরিকানদিগকে দমন করিবার ভার অর্পণ করা হইল। তাঁহাকে দশ সহস্র সৈন্য ও তৎসহ কয়েকটি উৎকৃষ্ট রণতরী দিয়া আমেরিকায় প্রেরণ করা হইল। আমেরিকানেরা পূর্ব্ব হইতেই কনকার্ড নামক স্থানে সৈন্যের প্রধান আড্ডা স্থাপন করিয়াছিলেন। নূতন নূতন সৈন্য সেইখানে আসিয়া উহাদিগের সহিত মিলিত হইল। আমেরিকানদের সৈন্য-সংগ্রহ-প্রণালী অতি অদ্ভুত! দেশের লোক যে যার কার্য্যে নিযুক্ত আছে, কেহ লাঙ্গল বহিতেছে, কে গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহ সুখে নিদ্রা যাইতেছে. এইরূপে প্রত্যেকে কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত আছে, এমন সময় দূরে অতিদূরে সমরক্ষেত্রে যোগদান করিবার সাঙ্কেতিক ডঙ্কা নিনাদ শুনিতে পাওয়া গেল আর অমনি সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পলকের মধ্যে সামরিক বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া মানুষ ছুটিল সমরক্ষেত্রের দিকে—বুকের রক্ত ঢালিয়া স্বদেশের মানমর্য্যাদা রক্ষা করিতে! আমেরিকানেরা এইরূপে প্রস্তুত হইতে পারিয়াছিল বলিয়া এত শীঘ্র স্বদেশ উদ্ধার করিয়াছিল।

কনকার্ডে আমেরিকানদের সৈন্য-সমাবেশের কথা শ্রবণমাত্র ইংরাজপক্ষীয় সেনাপতিগণ উক্তস্থান হস্তগত করিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ইংরাজ সেনা কনকার্ডে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে অপর একদল আমেরিকান সৈন্য কর্ত্তৃক ভীষণ বাধা প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের কনকার্ডে পঁহুছিতে বিলম্ব হইল। কনকার্ডে অবস্থিত আমেরিকানেরা ইংরাজদের আগমন বার্ত্তা শ্রবণমাত্র তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য অধিকতর প্রস্তুত হইয়া উঠিল। আর ইংরাজেরা মনে করিলেন কনকার্ডে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া শত্রুদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিবে। কিন্তু তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া অতীব বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন, ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তথায় আমেরিকানেরা সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হইয়া শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। উভয়দলের সৈন্য পরস্পর মিলিত হইবামাত্র ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে আমেরিকানেরা যেরূপ বীরত্ব দেখাইয়াছিল তাহাতে ইংরাজদের চক্ষুস্থির হইয়া গেল। তাহারা ভীম পরাক্রমে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল—প্রকৃত প্রস্তাবে কনকার্ডের এই যুদ্ধই প্রথম যুদ্ধ, আর এই প্রথম যুদ্ধে ঔপনিবেশিকগণ ইংরাজদিগকে শোচনীয় ভাবে পরাস্ত করিয়া মহাবিজয় লাভ করিল—বিজয় উল্লাসে আমেরিকানেরা মেদিনী কাঁপাইয়া দিল!

তৎপরে আরও কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধের পর ঔপনিবেশকগণ বোষ্টনের নিকটবর্ত্তী বাঙ্কার্স হিল নামক একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়া পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এই যুদ্ধে কয়েক জন সুদক্ষ সেনা-নায়ক ইংরাজ-সৈন্য পরিচালনা করিতেছিলেন। ইংরাজদের সৈন্য-সংখ্যা আমেরিকানদের অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। কিন্তু তৎসত্বেও আমেরিকানেরা যেরূপ সাহস, পরাক্রম ও দক্ষতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া ইংরাজ সেনাপতিগণ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে যদিও পরিশেষে ঔপনিবেশকগণ পরাজিত হইয়াছিল, তথাপি তাহাদের উৎসাহ ভঙ্গ হয় নাই. এবং পরবর্ত্তী যুদ্ধে দ্বিগুণ উৎসাহ-প্রদর্শন পূর্ব্বক জয়লাভ করিয়াছিল! তৎপরে ফিলাডেলফিয়া নগরে পুনরায় কংগ্রেসের এক সভার অধিবেশন হইল। ঐ সভায় আমেরি-

কানেরা একমতে মহাবীর ওয়াশিংটনকে আপনাদের সেনাপতি পদে বরিত করিলেন। প্রধান সেনাপতির পদলাভ করিয়া বীরবর ওয়াশিংটন সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া বোষ্টন নগর অবরোধ করিয়া বসিলেন। ইংরাজগণ বহুচেষ্টা করিয়া ও বোষ্টন নগর রক্ষা করিতে পারিলেন না, অতি সঙ্গোপনে নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। ওয়াশিংটন নির্ব্বিঘ্নে ও মহোল্লাসে বোষ্টন নগর অধিকার করিলেন।

বহুদিন হইতে অত্যাচার লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া এতদিন যাহারা দারুণ মর্ম্মপীড়া ভোগ করিতেছিল, বীর কেশরী ওয়াশিংটনের বোষ্টন অধিকার করায় আজ তাহাদের আনন্দের অবধি রহিল না।

বোষ্টনের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আমেরিকানদের সাহস ও স্পর্দ্ধা শতগুণে বাড়িয়া উঠিল। তৎপরে তাহারা স্থির করিল যে আর কিছুতেই ইংলণ্ডের অধীনতা স্বীকার করিয়া দাসভাবে আমেরিকায় বসবাস করিব না, অবিলম্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ইংলণ্ডের সহিত সকল সংস্রব ছিন্ন করিবে। প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া দেশের স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিবে। তদনুসারে জুলাই মাসে পুনরায় কংগ্রেস-সভা আহুত হইল। উক্ত সভায় আমেরিকার ১৩টি প্রদেশের প্রতিনিধিবর্গ একত্র মিলিত হইয়া এক স্বাধীনতার ঘোষণা-পত্র প্রচার করিয়া জগদ্বাসীকে শুনাইয়া দিল যে অদ্য হইতে আমেরিকা স্বাধীন! এই ঘোষণাপত্রের মূলমর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—We the representatives of the United States of America in congress assembled, appealing to supreme judge of the world for the rectitude of our intentions, solemnly publish and declare that these United colonies are and of right, ought to be, free anb independent states. এই নব প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন দেশই আমেরিকার যুক্তরাজ্য নামে অভিহিত!

আমেরিকানদের স্বাধীনতা-ঘোষণার সংবাদ শ্রবণমাত্র সমগ্র ইংরাজ-সমাজ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। ইহাদের এই অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতার পুরস্কার দিবার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে অধিকতর সৈন্য ও রসদ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধে ইংরাজেরা যেরূপ আয়োজন করিয়াছিল তাহাতে আমেরিকানেরা প্রথম প্রথম পরাজিত হইয়াছিল। নিউইয়র্ক ও লঙদ্বীপে ওয়াশিংটনের বহু সৈন্য অবরুদ্ধ হইল। পুনরায় "পুটনাম" নামক স্থানে ওয়াশিংটনের সৈন্যদল ইংরাজের হস্তে ভীষণ পরাজয় লাভ করিল। এইবার ওয়াশিংটন জয়ের আশায় বিসর্জ্জন দিয়া এদিকে ওদিকে পলায়ন করিতে করিতে অতিকষ্টে নিউইয়র্কে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানেও ইংরাজগণ তাঁহাকে তাড়া দিল, তিনি তথা হইতে পলায়ন করিয়া হারলেম পর্ব্বতে আশ্রয় লইলেন। তথা হইতে নর্থক্যাসল নামক স্থানে পলায়ন করিলেন। এইরূপে পলায়ন করিতে করিতে তিনি ফিলাডেলফিয়ায় আসিয়া উপনীত হইলেন, সেখানেও ইংরাজে তাহাকে তাড়া দিল। ফিলাডেলফিয়ায় নিরাপদ নহে বিবেচনা করিয়া সেখান হইতে কংগ্রেস সভা উঠাইয়া "বালিটমরে" লইয়া যাওয়া হইল। ওয়াশিংটনের এইরূপ পুনঃপুনঃ পরাজয়ে ও পলায়নে অনেক লোক হতাশ হইয়া পড়িল, অনেকে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া ব্রিটিশের আশ্রয় লইল। প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিকদের জন্য অগ্নিপরীক্ষার এক দারুণ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল। ঘনঘন পরাজয়েও স্বদেশভক্ত বীরগণ ওয়াশিংটনকে পরিত্যাগ করিলেন না। স্বদেশের অধীনতার কথা স্মরণ করিয়া যাঁহাদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়াছিল তাঁহারা দৃঢ়প্রাণে ওয়াশিংটনের পতাকার আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন, মাত্র এই আশা বুকে যে স্বাধীনতার সংগ্রামের শেষ ফল—মহা বিজয়!

ওয়াশিংটন কোনও মতে নিরুৎসাহ না হইয়া নূতন সৈন্যদল লইয়া আবার আক্রমণ করিলেন এবং একে একে আবার যুদ্ধে জয়লাভ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশের ইয়র্ক-টাউন নগরে ইংরাজ সেনাপতি লর্ড কর্ণওয়ালিশ জর্জ্জ ওয়াশিংটনের নিকট আত্মসমর্পন করেন এবং সন্ধির চুক্তি অনুযায়ী ইংরাজ-সৈন্য যুক্ত-প্রদেশের মাটী ত্যাগ করিয়া যায়। জর্জ্জ ওয়াশিংটনের সভাপতিত্বে স্বাধীনতার পূর্ণ-গৌরবে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল।

বিড়ম্বনা

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

বন্দে আলী মিয়া

অধ্যায় তিন

পরের দিন দুপুরে মনসুর ঘরখানিকে বেশ একটু মনের মতো করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতেছিল। চঞ্চলা গিরিঝর্ণার কলহাস্যে মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল করুণা দরজার পাশে দাঁড়াইয়া। মনসুর লজ্জায়-সঙ্কোচে মুখ লাল করিয়া মৃদু হাসিয়া তাহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া এক-খানা অপেক্ষাকৃত ভালো বেতের চেয়ার আগাইয়া দিল। নিজের দরিদ্রতার দরুণ বিধাতাকে মনে মনে সহস্র প্রকার অভিশাপ দিয়া বাহিরে জোর করিয়া স্বাচ্ছন্দ্যের ছদ্ম অভিনয় করিতে যতখানি চেষ্টা করিতে লাগিল, মুখখানি তাহার ততখানি দৃঢ় ও কঠিন হইতে লাগিল। করুণা তাহার ভাব লক্ষ্য করিয়া অন্তরে ব্যথা অনুভব করিল। স-পরিহাসে তাহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, রাখুন, ওসব কাজ আপনাদের নয়, আপনি চুপটি করে বসুন দিকি, আমি সব করে দিচ্চি।

মনসুর আপত্তি-সূচক মাথা দোলাইয়া বলিল, উঁহু, আপনি-ই দয়া করে বসুন, আমি করে যাই দেখ্‌তে থাকুন। সে কী হয়?

—হবে না কেন শুনি? যান্—অত সৌজন্য দেখাতে হবে না—স্থির হয়ে বসুন এখন। বলিয়া—করুণা জোর করিয়া মনসুরের এলোমেলো কাজগুলা আপনার দখলে আনিবার প্রবল চেষ্টায় বসিয়া পড়িয়া দুই হাত মেলিয়া দিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস পাইল। কিন্তু মনসুর অত সহজে ছুটি লইতে চাহিল না। তাহার দুঃখ-দৈন্যের বিরাট ইতিহাস বাহিরের অনাত্মীয় কেহ আসিয়া জানিয়া যাইবে, ইহার চিন্তা তাহার চিত্তকে ক্ষুব্ধ, ব্যথিত এবং পীড়িত করে। তাহার এই ভাঙা চেয়ার, রঙচটা ট্রাঙ্ক, মরিচাধরা ষ্টোভ, ক্যাম্বিসের ছেঁড়া খাট, বেতের বাঁধনমুক্ত টেবিল, অল্প দামের আসবাব-পত্র লইয়া সে মনের আনন্দে এই ক্ষুদ্র ঘরটির মধ্যে রাজ্য-বিস্তার করিয়া আছে, ক্লাসের সহাধ্যায়িনী এই ধনীর দুলালী করুণা আসিয়া তাহা একটির পর একটি দেখিয়া মনের মধ্যে আকাশ-প্রমাণ অহঙ্কার জমা করিবে, ঠোঁটের বাঁকে চোকের কোণে বিদ্রূপের হাসি হাসিবে, ইহা তাহার অসহনীয়। সে যে গরীব তাহা তো করুণার অজ্ঞাত নয়, তথাপি তাহার দীনতার মধ্যে সে অমন করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে লজ্জিত-কুণ্ঠিত করিয়া তোলে কেন, ইহা তো সে কোনো ক্রমেই ভাবিয়া পায় না। এ ব্যথার গৌরব তাহার নিজেরই থাক, ইহাকে ভাঙিয়া-চুরিয়া নগ্নমূর্ত্তিতে কাহারো চোখের সুমুখে তুলিয়া ধরিতে করুণার সাহায্য প্রার্থনা সে কোনো দিন করে নাই। এই অনাহূত মেয়েটি এমন ঝড়ের মতো আসিয়া সকল গোপন কদর্য্যতা, দীনতার মধ্যে আপনার সত্বাকে বিলাইয়া দিবার আগ্রহ কেন যে প্রদর্শন করে, ইহার আকাঙ্ক্ষা কি এবং তাহার সার্থকতা কোথায় মনসুর সে সম্বন্ধে চিন্তা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছে, তাই ইহার এই অদ্ভুত আচরণে সে বিস্মিত হইল না সত্য কিন্তু বিরক্ত হইল। তাই করুণার কথার প্রত্যুত্তরে সে মুখটা আরো গম্ভীর করিয়া ভারী গলায় জবাব দিল, তা হয় না চ্যাটার্জ্জী। আপনি আমার

অতিথি, বন্ধু। আপনার ঠাঁই, ঐ চেয়ার, কি, অমনি একটা সম্মানের জায়গাতেই, সেখান থেকে নেমে এলে আমি যে খুব প্রীত হয়ে উঠ্‌বো তা মনে করা ভুল। আপনার সহস্র দাবী—শতেক আব্দার আমি মুখ বুজে সহ্য কোর্‌বো, মাথায় পেতে পালন কোর্‌বো কিন্তু এটা থেকে আমাকে আজ মাফ করুন।

করুণা ইহার প্রতিবাদ করিল না, তাহার কণ্ঠস্বর এবং মুখ দেখিয়া সাহসও পাইল না। ফুলের মতো ঢল ঢল কচি মুখখানি অন্ধকার করিয়া সে আড়ষ্ট হইয়া নীরবে উঠিয়া পড়িল এবং ধীরে ধীরে যাইয়া মনসুরের নির্দ্দেশিত চেয়ারখানায় কোনোমতে নিজের আসন স্থাপনা করিল। সে গিয়াছিল তরুণ প্রাণের সরল আনন্দে, বন্ধুর কাজের সহায়তা করিয়া উপকৃত করিতে। সে জানিত এই কাজগুলা পুরুষের দ্বারা যত সুচারু করিয়াই সুসম্পাদিত হউক না, তাহার মধ্যে কেমন কোথায় যেন একটা অভাব মাথা ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। সংসার-অনভিজ্ঞ মনসুর একে পুরুষ, তায় ছাত্র, তাহার হাতে ইহা যেমন বে-মানান তেমনি নিতান্ত অশোভন। তাহার অপটু হস্তের বিশৃঙ্খলা সমস্ত ঘরটার মধ্যে বিদ্যমান, ইহা কেহ ঢাক পিটিয়া বলিয়া না দিলেও তাহার তো কিছুই অবিদিত নাই। সে নারীত্বের স্বাভাবিক-সরল আনন্দের প্রেরণায় গিয়াছিল এইখানে একটা কিছু নূতন সৃষ্টি করিতে। সেই আনন্দকে এই যুবকটি যখন কদর্য্যভাবে গ্রহণ করিয়া রূঢ়হস্তে ভাঙিয়া দিল তখন তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার তাহার কিছুই রহিল না। তাই সে ক্ষুব্ধ-ব্যথিত মনে বিরাট অভিমান লইয়া ছল ছল চোখে আপনার সম্মানের সর্ব্বোচ্চ আসনে গিয়া ঠাঁই গ্রহণ করিল।

মনসুর মুখ না তুলিয়াই বুঝিতে পারিল, করুণা কতখানি বেদনা আপনার মধ্যে প্রাণপণে চাপিয়া লইতেছে। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া এটা-সেটা দু একবার ঝাড়িয়া সদয় কণ্ঠে ডাকিল, চ্যাটার্জ্জী।

করুণার মনের কোণে অভিমানের লেলিহান শিখা তখন দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল, তাই সে সাড়া দিল না। মনসুর পুনরায় পূর্ব্ব আহ্বানের পুনরাবৃত্তি করিতেই সে আস্তে আস্তে জবাব দিল, আজ্ঞা করুন।

মনসুর গোপনে একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। বলিল, ক্ষমা চাওয়ার অধিকার কি আমার আছে?

করুণা প্রশ্ন করিল, কিসের?

মনসুরের নিকটে এই ন্যাকামিটা যেন ভালো লাগিল না। বলিল, সে তো আপনি জানেন। এই কিছুক্ষণ আগে যে রূঢ় ব্যবহারটা আপনার সঙ্গে করেচি সে যে দুজনকেই দগ্ধ করচে। কি বলেন—ক্ষমা কি তার পেতে পারি?

করুণা প্রস্তর মূর্ত্তির মতো স্থির নির্ব্বাক হইয়া নীরবে অধোমুখে বসিয়া রহিল; কথাটা শুনিতে পাইয়াছে কিনা তাহা তাহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইল না। সে তখন ভাবিতেছিল এখানে এমন করিয়া আসাটা শুধু অন্যায় নয় অনধিকার প্রবেশ হইয়াছে। যে তাহাকে এমন করিয়া এড়াইয়া চলিতে চাহে, প্রাণের সরল দাবীকে অম্লানবদনে অবলীলাক্রমে অগ্রাহ্য করে, তাহাকে সে বন্ধু বলিয়া জড়াইয়া ধরিতে যায় কিসের অধিকারে। চিরদিনের অভিমানিনী আদুরী সে, আজ এই অনাত্মীয় যুবকের নিকটে পরাজিত হইয়া মাথা হেঁট করা তাহার দ্বারা অসম্ভব। সমস্ত দোষ-ত্রুটির গ্লানি যাইয়া পড়িল নিজের উপরেই। কেন যে সে এই দ্বিপ্রহরের তপ্ত বালিকণা, অনলবর্ষী রৌদ্রকে উপেক্ষা করিয়া ইহার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল, সে মনের নিকটে প্রশ্ন করিয়া ইহার সন্তোষজনক কোনো জবাব পাইল না। করুণা সহসা তড়াক করিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; দুটি হস্ত একত্রে যুক্ত করিয়া বলিল, দোষ আপনার নয় ডাক্তার, আমার। আমি-ই আপনার ঘরে অনধিকার প্রবেশ করে শান্তিভঙ্গ করেচি। ক্ষমা কর্‌বেন আমাকে—আর আস্‌বো না—চল্লুম।

মনসুর বিহ্বল হইয়া মুহূর্ত্ত খানেক চাহিয়া রহিল। ইহা যে ঘটিবে তাহা তো সে আশা করে নাই, তাই চক্ষের পলকে প্রস্থানোদ্যতা করুণার শাড়ীর আঁচল ব্যাকুল হস্তে চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস পাইল। অধীর কণ্ঠে বলিল, সে কী, কোথায় যাচ্চেন?

করুণা বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলিল, আঁচল ছাড়ুন—বাসায় যাচ্চি।

মনসুর নিজের দুর্ব্বলতায় লজ্জিত হইয়া আঁচল ছাড়িয়া দিল। আড়ষ্ট কণ্ঠে বলিল, মাফ করুন চ্যাটার্জ্জী, দেখুন,

একটু বুদ্ধি-সুদ্ধিও আমার নেই। আপনি এসেচেন, কোথায় আপনার আদর-যত্ন কোর্‌বো, গল্প-সল্প হবে, তা নয় এমনি স্বার্থপর যে নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত আছি। বসুন আপনি, আমার হয়ে গেচে।

করুণা বসিল না। কিন্তু মনটা তাহার দ্রব হইয়া আসিল। বলিল, আপনার হয়ে যেতে পারে কিন্তু আমার যে পড়ে রয়েচে। কিছু মনে কর্‌বেন না, আসি তবে। আপনি বিকেলে যাবেন। বলিয়া দরজার দিকে পা বাড়াইল। মনসুর দুহাতে দরজা রোধ করিয়া দাঁড়াইল। মিনতির সুরে বলিল, সেটি হচ্চে না। আপনি রাগ নিয়ে যাবেন, সে আমি সইবো কি করে। বসুন।

—না, বস্‌তে আমি পার্‌বো না, আপনি পথ ছেড়ে দিন।

—তা হয় না চ্যাটার্জ্জী। ইচ্ছে না হয় আর আস্‌তে বলিনে, কিন্তু এখন আমাকে দয়া কর্‌তেই হবে। অন্ততঃ একটিবার বসে যান।

—ছি, অমন করে দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন না; কেউ যদি দেখ্‌তে পায় কি ভাব্‌বে—যান্।

মনসুর নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিল কিন্তু পরাজয় স্বীকার করিল না। দুষ্টু ঘোড়া যেমন চাবুকের উপর চাবুক খাইয়া নিজের জিদ বজায় রাখিতে ঘাড় সোজা করিয়াই থাকে মনসুরও তেমনি কবাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শুষ্ককণ্ঠে বলিল, কি করেচি, দেখ্‌লে তো বয়ে গেল।

মনসুর মাথা দোলাইয়া বলিল, তা আপনার যেতে পারে—আপনি পুরুষ। কিন্তু আমি? আমি যে মেয়ে; গ্লানির বোঝা আমার-ই মাথায় চাপ্‌বে।

মনসুর সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। সুতরাং ধৃষ্টতাকে আর অধিক দূর অগ্রসর করিয়া দিতে সাহস পাইল না; ছাড়িয়া দিয়া এককোণে সরিয়া দাঁড়াইল। আয়ত চোখের করুণদৃষ্টি তাহার মুখের উপরে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, তাহলে প্রার্থনা কি ব্যর্থ হয়েই যাবে চ্যাটার্জ্জী?

মনসুরের দিকে চাহিয়া করুণার মনটা নরম হইয়া আসিল। বলিল, বস্‌তে আমার বাধা নেই ডাক্তার সাব, কিন্তু একটা শর্ত্ত কর্‌তে হবে। এমন কিছু বিরাট ত্যাগ স্বীকার তার মধ্যে নেই যা আপনার দ্বারা অসম্ভব।

মনসুর একটু প্রফুল্ল হইয়া বলিল, বলুন।

করুণা বলিল, যে কাজগুলো নিয়ে আপনি বিব্রত হয়ে পড়েছেন, সে সব আমার হাতে ছেড়ে দিতে হবে, আপনার duty শুধু লক্ষ্মীছেলের মতো তাই দেখা আর গল্প করা। কেমন, রাজী আছেন?

প্রত্যুত্তরে মনসুর বিবর্ণ হইয়া বলিল, অগত্যা—

করুণা প্রীত হইয়া আনন্দপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, বসুন তবে। সে-ই হোলো—বেশ একতরফা—যা হোক। বলিয়া একটা উর্দ্দু গজলে মৃদুকণ্ঠে গুঞ্জরণ করিতে করিতে পটু হস্তে সাজাইতে গুছাইতে লাগিয়া গেল। এবং মনসুর কাছেই একখানা খবরের কাগজ পাতিয়া বসিয়া অখণ্ড মনোযোগে তাহার দ্রুত ভঙ্গীর দিকে পিপাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

বিক্ষিপ্ত বহিগুলা ঝাড়িয়া একের পর একটি সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে এক সময়ে মুখ তুলিয়া চাহিতেই মনসুরের সহিত চোখোচোখি হইয়া গেল। মৃদু হাসিয়া মিষ্ট কণ্ঠে বলিল, আমি কিন্তু এসেছিলুম আপনাকে নিয়ে যেতে।

মনসুর সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, তবে যে ভারী রাগ করে একাই চলে যাওয়া হচ্ছিলো?

করুণা বলিল, যাবো না কেন শুনি। যার কাজ তার সাজে অন্য লোকের লাঠি বাজে আচ্ছা, এই কাজগুলো কি আপনাদের শোভা পায়?

মনসুর সহাস্যে বলিল, দুর্ভাগ্য আমার। কিন্তু তা-ও বলি মিস্, এত কাল তো আর আপনি ছিলেন না।

—ছিলুম না সত্যি, না থাকায় যা ছিরি হয়েচে, যা কষ্ট আপনি পেয়েচেন, পাচ্চেন, তার প্রমাণ সংগ্রহ কর্‌তে এই ঘরের বাইরেও তো যেতে হবে না। রাগ কর্‌বেন না, এমন নোংরা হয়ে কোনো ভদ্রলোকে থাক্‌তে পারে, সে আমি কোনো দিন চিন্তাও করিনি।

—অসম্ভব নয়, আজকে প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পেলেন তো। আপনি বেজায় অভিমানিনী।

—হয় তো হবে। মা আজ সকালে বল্‌ছিলেন কি জানেন, তোর বন্ধুটি খুব লাজুক।

—সত্যি, আমার কথা নিয়ে তা হলে আলোচনাও হয়?

—হাঁ গো হাঁ, আপনি-ই ভুলে থাকেন, কিন্তু আমরা তো আর পুরুষ নই যে বিস্মৃত হয়ে যাবো।

—দেখুন, ও সব দোষগুলো পুরুষদের ঘাড়ে আপনারাই একচেটিয়া করে চাপিয়ে দিয়েচেন—অন্যায় কিন্তু।

—কিছুতে না। সাধ করে কেউ দোষ দেয় না; যুগ যুগ থেকে প্রমাণ আপনারা নিজেরাই জমা করে যাচ্ছেন। জান্‌লাটা বাতাসে খুলে গেল, জলদি বন্ধ করুন তো, ইস্, রোদটা চোখে লাগচে। না, না ঘুরে বসি, রোদটা যা মিষ্টি।

—আপনি ভয়ঙ্কর খেয়ালী। এমন লোকগুলো শুধু বিরক্তি উৎপাদন করে, কিন্তু তাদের ভালো না বেসেও পারিনে।

—আপনি ভালোবাস্‌তে জানেন, তা হলে বলুন, বইয়ের শুক্‌নো পাতার মতন নিতান্ত মরুভূমি নন। এত অনুগ্রহের কারণটা কি জানতে পারি?

—কারণ? সেটি হচ্চে আপনি ওই দলের একজন বলে।

করুণা দুষ্টুমি করিয়া বলিল, মিছে বল্‌চেন ডাক্তার, তা কি করে হবে?

মনসুরের হৃদয়ে আবেগ আসিয়া পড়িয়াছিল। তাই সে ঝোঁকের মাথায় বলিয়া ফেলিল, হবে না কেন শুনি। আপনি যতটা শুক্‌নো আমাকে ভেবেচেন আমি ঠিক ততটা নই। পাথরের ফাটলের মধ্যে ফুল ফোটে, বিজ্‌লী চম্‌কানোতেই দুর্যোগ রাত আলোর সাড়া পায়—সে তো আপনার অজানা নেই।

—বা, থাম্‌লেন কেন। কবি—কবি একেবারে মহাকবি হয়ে উঠেচেন যে দেখ্‌চি।

করুণার বিদ্রূপের আঘাতে মনসুর লজ্জিত হইয়া চুপ করিল। একি দুর্ব্বলতা সে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। চিরদিনের সংযমী পুরুষ সে, বড় গর্ব্ব ছিল তার, আজিকার একটা অলস-মুহূর্ত্তে ক্ষণিকের উত্তেজনায় নিজের সম্মানটা এমন করিয়া করুণার নিকটে খোয়াইয়া বসিল। করুণাকে সে ভালবাসিতে যাইবে কিসের জন্য—কি অপরাধে! একবার বলিয়া ফেলিলে তাহা কি ফিরাইয়া লওয়া চলে না, কিছুতেই না—? মিনিট কয়েক মৌন থাকিয়া আত্মরক্ষা করিবার জন্য বিদ্রূপের ভঙ্গীতে অস্বাভাবিক সুরে টানিয়া টানিয়া বলিল, ভালোবাসা? যারা ভালোবাসার কথা বলে তারা মিথ্যা বলে, নিজেকে বঞ্চিত করে, যাকে বলে তাকেও কিছু গৌরবান্বিত করে না। সত্যিকারের ওসব কিছু নেই, অন্ততঃ আমার ধারণায় তো আসে না, কি বলেন?

করুণা উজ্জ্বলদৃষ্টি মনসুরের মুখের উপরে তুলিয়া ধরিয়া হাসিমাখা সুরে বলিল, ঠিক বলেচেন, আমিও ওর অর্থ কিছু বুঝিনে। তা হলে এতক্ষণ কেবল নিছক ঠাট্টা—অর্থাৎ কাব্যি করছিলেন কেমন ডাক্তার সাব?

মনসুর চোখ মুখ অস্বাভাবিক করিয়া বলিল, নিশ্চয়, নেহায়েৎ একঘেয়ে নীরস কথাবার্ত্তা তো সব সময়ে ভালো লাগে না, মাঝে মাঝে চাট্‌নীরও প্রয়োজন।

করুণা রসিকতা করিয়া বলিল, এ চাট্‌নীটা খুব স্বাদু হয়েচে বল্‌তে হবে না?

এবার মনসুর সহজ কণ্ঠে জবাব দিল, সে তো আপনিই চেখেচেন। বলিয়া সরল উচ্চহাস্যে স্তব্ধ ঘরখানি ভরিয়া ফেলিল।

ঘণ্টা খানেক পরে নিপুণ হস্তের নিষ্ঠাপূর্ণ সেবা-যত্নে জিনিসপত্রগুলা সাজাইয়া-গুছাইয়া করুণা স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল দৃষ্টিটা ঘরের চারিপাশ দিয়া ঘুরাইয়া আনিল। বলিল, দেখুন দিকি এবার, আপনার বুঝি তেমন পছন্দ মতোন হয়নি?

মনসুর প্রশংসামান দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কৃত্রিম নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, কিছু না—মিস্—কিছু না। এর মজুরী আপনাকে একটি পয়সাও দেওয়া হবে না, দেওয়া অন্ততঃ অন্যায়।

করুণা প্রত্যুত্তরে ঠোঁট মুচ্‌কাইয়া হাসিয়া বলিল, বা, বা, কাজ করিয়ে ফাঁকি দেবার চেষ্টা, আপনার বিরুদ্ধে ৫০৭ ধারায় prosicute কোর্‌বো।

মনসুর হাসিয়া বাম হাতের তালুতে দক্ষিণ হস্ত দিয়া সশব্দে চপেটাঘাত করিয়া বলিল, স্বচ্ছন্দে। গোড়াতেই একটা ভুল আছে আপনার, তার মানে একটা সাক্ষীও এখানে নেই।

করুণা প্রতিবাদ করিয়া বলিল, নেই? কেন, আপনি যে রয়েচেন।

মনসুর আত্মবিস্মৃত হইয়া করুণার একখানি হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, দুষ্টু। সত্যি, মেয়েরা যেন সাক্ষাৎ সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী—কি অপূর্ব্ব শ্রী এনে দিলেন আপনি, মনে হয় এই ঘরে আপনাকে চিরদিন বন্দী করে রাখি। কোথাও এক টুকরো মুক্তির আলো দেখাবো না, যার ফাঁকে পালাতে পারেন।

করুণা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, মন্দ সখ নয়তো আপনার। case করার point ক্রমেই বেশী হচ্চে, ইস্ দেখুন চারটা বেজে গেল, চলুন এবার।

মনসুর পাঞ্জাবীটা শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিয়া বোতাম

আঁটিতে আঁটিতে বলিল, সত্যিই তবে যেতে হবে, না গেলে হয় না ?

করুণা তাড়া দিয়া অধীর কণ্ঠে বলিল, নিন ঢঙ করতে হবে না—জল্‌দি।

ছোট টেবিলের সম্মুখে মনসুর লজ্জিত আড়ষ্ট মুখে মাথা নীচু করিয়া কোনো মতে চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। কন্যাকার পরিচয়প্রাপ্তা করুণার মাতা এবং ছোটোদিদি অরুণা ছাড়া অন্য কেহ ছিল না, তবু তার মনের জড়তা কাটিয়া স্বাচ্ছন্দ্য আসিতে বাধা পাইতেছিল। তাহার চা-পানের নিমন্ত্রণ ইতিপূর্ব্বে কোনোখান হইতেই আসে নাই, তাই গত রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া শুইয়া মাথা ঘামাইয়া ইহার সম্বন্ধে কল্পনায় একটা অভূতপূর্ব্ব কিছু সে গড়িয়া রাখিয়াছিল। হয় তো একটা বড় টেবিলের চারিপাশে কয়েকজন তরুণ-তরুণী বসিয়াছে, সবাই অপরিচিতা। করুণা সকলকে চা ঢালিয়া দিতেছে। বন্ধু-হিসাবে সমাদরটা অধিক মাত্রায় তাহাকেই দান করা হইতেছে, তাই সে মাঝে মাঝে মৃদু আপত্তি এবং অনুযোগ করিতেছে। হাসি-গল্পের তুফান ছুটিয়াছে। পেয়ালার ঝন্‌ঝন্, সোণার চুড়ির ঠুংঠুং, চুমুকের স্থপ্‌সাপ্, প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাবাদের ছোটো ছোটো দু চারিটি কথা, মাঝে মাঝে অকারণ কৌতুক, চাপা হাসি সকল মিলিয়া যেন মায়ালোকের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু আজ বাস্তবের কঠোরতা তাহার কোমল কল্পনাকে রূঢ় হস্তে ভাঙিয়া দিল। সে নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল।

করুণার মাতার নাম রমা দেবী। তিনি একটু প্রাচীন পন্থী এবং রক্ষণশীল ধরণের। দেবী উঠাইয়া চট্টোপাধ্যায় করিতে মেয়েদের মতের বিপক্ষে অনেক তর্ক যুক্তি পেশ করিয়াছিলেন এবং ভর্ৎসনা করিতেও বিরত হন নাই, কিন্তু ফল যাহা হইয়াছে তাহা মেয়েদের ব্যবহারেই প্রকাশমান। এক্ষণে অপারগ হইয়া মেয়েদের মতটা তাহা যত বিশ্রী বেমান-ই হোক না, অম্লান বদনে সায় দিয়া চলেন।

নীরবতার মায়া কাটাইয়া রমাদেবীই প্রথমে কথা কহিলেন। বলিলেন, এসেচো যে এই আমাদের সৌভাগ্য, দেরী দেখে অরু তো কত কি বল্‌ছিল।

মনসুর কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, আমি তো আস্‌বার জন্যে প্রস্তুতই হচ্ছিলুম, উনি শুধু শুধু খানিকটা কষ্ট করলেন। বলিয়া মুখ তুলিয়া করুণার পানে চাহিয়াই মাথা নীচু করিল।

করুণা হাসির সুরে ঘর ভরিয়া ফেলিয়া বলিল, দেখ্‌লে, একেই বলে ভালোছেলে—আর ভদ্রতার চরম। ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম, সেটা যে কষ্ট করে করেচি, বুঝতে দেরী হয়নি।

অরুণা মনসুরের লজ্জারক্ত মুখের পানে চাহিয়া করুণাকে ধমক দিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, যা, জ্যাঠামো করতে হবে না, থাম্।

অধ্যায় চার

আকাশের কোলে কোলে গাছের মাথায় তরলের শুভ্র ফেন রাশির উপরে সাঁঝের ম্লান আলো জমা হইয়া উঠিতেছিল। ঘরেফেরা ঘুঘু, শালিক, খঞ্জন রাঙা আবির পালকে মাখিয়া অচেনা অস্ত-পারাবারের দিকে উড়িয়া চলিয়াছিল। করুণা বালির পথে চলিতে চলিতে অতল কালো বারিধির দিকে চাহিয়া আনমনে সহসা থামিয়া গেল। মনসুর এবং অরুণা গল্পের ঝোঁকে দু চারি পা আগাইয়া গিয়া পিছনে চাহিয়া দেখিল করুণা মাঝপথে অচল হইয়া গেছে। অরুণা মনসুরের মুখের পানে অর্থভরা মৌন দৃষ্টিতে চাহিয়া ঠোঁট টিপিয়া হাসিল। চাপা গলায় বলিল, দেখলেন ওর রোগ। ভয়ঙ্কর Sentimental.

প্রত্যুত্তরে কোমল হাসির আভাস মনসুরের উভয় অধরের প্রান্তকে ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া দিল। করুণার দু চোখে স্বপ্ন ভাসিতেছিল, যৌবনের প্রথম পরশ-পাওয়া সমগ্র প্রাণখানি থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। মনসুর তাহারই প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মুহূর্ত্তে বিস্ময়ে স্তব্ধ-নির্ব্বাক হইয়া গেল।

অরুণা ডাকিয়া করুণার নিমেষের মায়া ভাঙিয়া দিল। বলিল, ইস্, ভারী কবি হয়ে উঠেচেন দেখ্‌ছি। আয়, মেয়ের সব তাতেই বাড়াবাড়ি।

করুণা লজ্জিত হইয়া অগ্রসর হইল। বলিল, তোমরা যাওনা বাবু—

অরুণা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দূরের একটা নির্জ্জন চর দেখাইয়া মনসুরকে বলিল, যাবেন ডাক্তার সাব ওখানে ?

মনসুর সানন্দে ঘাড় দোলাইয়া সম্মতি দিয়া জানাইল, যে এ প্রস্তাবে তাহার বিন্দু পরিমাণেও আপত্তি নাই।

স্থানটি দূর হইতে মনোরম দেখাইতেছিল, সেই আনন্দের

উৎসাহে নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহারা প্রীত হইতে পারিল না; বালু, পাথরের কুচি এবং ঝিনুক মনের সুখে জড়াজড়ি করিয়া নিদ্রা দিতেছে। করুণা আনন্দোজ্জ্বল দীপ্ত দৃষ্টিতে সেগুলার পানে চাহিয়া কাহারো অপেক্ষামাত্র না করিয়া ধপাস করিয়া সেই বালুর উপরেই ঠাসিয়া বসিয়া পড়িল। অরুণা তাড়া দিয়া বলিল, অতটা ঢং আর নাই কর্‌লি কুরু। বস্‌বি এখানে, তা রুমালখানা বিছিয়ে নিলেই তো দামী কাপড়খানা নোঙ্‌রা হতে পায় না, কি বলেন ডাক্তার সাব?

ডাক্তার সাহেব করুণার মুখের দিকে সস্নেহে মমতার দৃষ্টিতে চাহিল। রক্তহীণ বিবর্ণ মুখে অস্পষ্ট স্বরে কি একটা জবাব দিল তাহার অর্থ দু বোনের কেহই গ্রহণ করিতে পারিল না।

অরুণা অপ্রফুল্লমনে রুমাল বাহির করিয়া সন্তর্পণে বালির উপরে বিছাইতে গেল, কিন্তু চঞ্চল বাতাসের দৌরাত্ম্যে ব্যতিব্যস্ত হইয়া অগত্যা যেমন তেমন করিয়া বসিয়া পড়িল। মনসুর একটু ইতস্ততঃ করিল, একটা ছোট্ট ঢোঁক গিলিল। বলিল, দয়া করে আপত্তি না করেন তো এইখানে বসুন। বলিয়া গলা হইতে খদ্দরের মোটা চাদরটা খসাইয়া ভাঁজ করিয়া বিছাইয়া দিল। অরুণা অসম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, না ডাক্তার সাব, ওকি হচ্চে—এখানেই বেশ আছি।

করুণা দুচোখের তিরস্কার-পূর্ণ দৃষ্টি তাহার মুখের উপরে তুলিয়া ধরিয়া গভীর বিরক্তিতে বলিল, অত সৌজন্য না দেখালেও আপনার ভদ্রনামে কলঙ্ক স্পর্শ কোর্‌তো না;—ইচ্ছে হয় আপনিই বসুন না

মনসুরের আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাস আঘাত পাইয়া সঙ্কুচিত হইয়া গেল। ম্লান মুখে চাদরটা গুটাইতেই করুণা ডান হাতে তাহার একখানি হাত সহসা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, রাগ কর্‌লেন ডাক্তার, আচ্ছা, তুল্‌তে হবে না বস্‌চি—এসো ছোড়্‌দি।

করুণা এই কয়টি দিনের সহজ মেলা মেশায় মনসুরের প্রাণের গোপন মানুষটিকে চিনিয়া ফেলিয়াছিল। নারীরা পুরুষের মনের অলি গলির সন্ধান করিয়া তাহার সত্য রূপটিকে যেমন অনায়াসে ধরিতে পারে, পুরুষেরা নারীদের বেলায় তেমনি অপটু। মনসুরের একান্ত আগ্রহান্বিত তরুণ কামনাকে অরুণা যখন সৌজন্যের বর্শায় আঘাত করিয়া ক্ষুব্ধ-লজ্জিত করিয়াছিল, তখন করুণা বুঝিল যে, কাজটা কোনো ক্রমেই ভালো হয় নাই। তাই সে শিষ্টতা রক্ষা না করিয়া খপ্‌ করিয়া অতি বড়ো আপনার জনের মতো হাত ধরিয়া নিবৃত্ত করিল; যাহাতে মনসুরের মনের কোথায়ো একটু খচ্‌ খচ্‌ করিবারও অবসর রহিল না।

করুণা সমুদ্রের কলকল ছলছল উচ্ছল জলধারার পানে কয়েক মুহূর্ত্ত মৌন হইয়া চাহিয়া থাকিয়া সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, ছোড়্‌দি, ঝিনুক কুড়ুবে ভাই—আমি চল্লুম। বলিয়া তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মনসুর অনুযোগ-ভরা দৃষ্টি তাহার চঞ্চল মুখের উপরে তুলিয়া ধরিল। বলিল, বেশ, আমাদের একলা ফেলে চলে যাওয়া হচ্চে, খুব ভদ্রতা।

করুণা ব্যথার ধ্বনি শুনিয়া থমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, ছোড়্‌দি থাক্‌লো যে, আপনারা তবু দুজনে—একলা চল্লুম আমি-ই।

অরুণা ধমক দিয়া কর্ত্তৃত্বের সুরে বলিল, সব সময়ে ছেলেমি ভালো লাগে না কুরু, বোস্‌তো বাবু চুপটি করে।

করুণার সহজ আনন্দে আঘাত লাগিল। কষ্টে হাসিবার চেষ্টা করিয়া পূর্ব্ব স্থানটিতে কোনো রকমে নিজের আসন স্থাপন করিল।

মনসুর খানিকক্ষণ করুণার ব্যথা-লিপ্ত করুণ মুখখানির প্রতি চাহিয়া থাকিয়া আস্তে বলিল, চমৎকার জায়গা। কলকাতার ধূলো বালি খেয়ে এখানে এসে প্রথমটা আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই Change এর উপযুক্ত জায়গা বটে।

অরুণা বলিল, এর আগে আসেন নি বুঝি, কুরু আমরা সেই সেবার কোণারক গেছ্‌লুম, মনে আছে?

করুণার গুমোট ভাবটা চক্ষের পলকে কাটিয়া গেল। উৎসাহিত হইয়া বলিল, সত্যি ছোড়্‌দি যাবে,—আ, কী জায়গা—প্রকৃতির স্নেহের ঠাঁই। ডাক্তার সাব, আপনার আপত্তি আছে?

ডাক্তার সাহেব ঘাড় দোলাইয়া বলিল, আগ্রহ ষোলো আনা, কতটা দূর হবে?

করুণার জবাবের পূর্ব্বে অরুণা বেহিসাবে তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিল, বিশেষ আর কি, এই পঁচিশ ত্রিশ মাইল পথ; গাড়ীতে বেশ সুবিধে আছে। যদি একবার যেতেন ডাক্তার সাব দেখ্‌তেন কী অপূর্ব্ব!

মনসুর উৎসাহের স্বরে বলিল, বেশ ছোড়্‌দি, আমি তো আগা-গোড়াই স্বীকৃত, আপনারাই যাবেন কিনা সেইখানেই সন্দেহ। আচ্ছা চ্যাটার্জ্জি, এক্সমাসের ছুটিটা পর্য্যন্ত তো আপনার এখানকার মেয়াদ, তবে দেরী না করে কাল-পরশুর মধ্যেই যা হয় করে ফেলুন না।

করুণা অসহিষ্ণু ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, উঁহু পরশু নয় কালই চলুন না বৈকালের দিকে Start করা যাক— গিয়েই চলে এলে তো হয় না, একটু বিশ্রাম চাই, চারদিক ঘুরে দেখ্‌তেও হবে ছোড়্‌দি ?

অরুণা অত উৎসাহে সায় দিল না। নিজের গুরুত্ব বজায় রাখিয়া ঔদাস্যপূর্ণ গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, নাচিস্‌নে কুরু। মা'রা মত দিলে তো, কে কে যাবো বল্‌তো।

—কে, কে ? আমি ডাক্তার সাব তুমি ব্যাস্ এই তিন জন, বেশী লোকজন আমার পছন্দই হয় না।

—Journeyতে বেশী মানুষই ভালো, তুই ছেলে মানুষ, কখন কি বিপদ-আপদ হয়, বিদেশ বিভুঁই তা-ও আবার পথে ; দেখুন ডাক্তার সাব, মাত্তর তিন জনে কি যাওয়া যায়, না, ভালোই দেখায় !

মনসুরের প্রত্যুত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া করুণা অধীর ভাবে বলিল, আমি বাপু সাপ্‌ কথার লোক, কাকে নেবে মনের মধ্যে গুম্‌রে রেখে আর কি হবে,—বলেই ফ্যালো না।

অরুণা চিন্তিত মুখে আস্তে আস্তে বলিল, তুই আমি ইনি এ তিনজন তো আছিই তা ছাড়া মা বাবাকেও নিতে হবে ; আমি তো বলি—

—তুমিতো বলো কিন্তু তাঁরা যদি না যান কি কর্‌বে শুনি ?

—সে ভার আমার ওপর, তুই চুপ কর্‌তো এখন।

মনসুর হাঁফ ছাড়িল। বলিল, হ্যাঁ ছোড়্‌দি, আপনিই কাজের লোক। যেমন করেই হোক তাঁদের মত করে সঙ্গে নিতেই হবে। আপনারা দুজনে কেবল মেয়ে ; পুরুষের মধ্যে আমি একা—পথ ঘাট সবইতো আমার অজানা। বলিয়া হর্ষোজ্জ্বল চক্ষে করুণার রাঙা মুখের পানে চাহিল, কিন্তু সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে তাহার পরিবর্ত্তন বুঝা না গেলেও, মনসুর অনুমান করিয়া লইল যে, সে এ ব্যবহারে কখনো প্রীত হইয়া উঠে নাই।

করুণা অপলক নেত্রে স্তব্ধ ধূসর আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মৌন হইয়া বসিয়াছিল। মনসুর একটু ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, রাগ করলেন চ্যাটার্জ্জি ?

করুণা মুখ ফিরাইয়া হাসির ছদ্ম অভিনয় করিয়া বলিল, বারে, রাগ করতে যাবো কেন মিছিমিছি, আপনিও ছেলেমানুষী কিছু কম করেন না দেখ্‌চি।

অরুণা বলিল, চলুন ডাক্তার সাব এবার গা তোলা যাক্

করুণা প্রতিবাদ করিল। বলিল, এক্ষুনি ? সন্ধ্যে তো কেবল হোলো, বোসোই না বাবু আর একটু— এত তাড়া কিসের ?

—রাত হয়ে যাবে যেতে যেতে, সে কথা মনে আছে ?

—আছে। হতে দাওনা একটু রাত, ক্ষতি তো নেই।

অবগুণ্ঠিতা সন্ধ্যার তিমির-ওড়না সারা ধরণীর বুকের উপরে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। কুয়াশার ধূসর মশারি দিয়া তারি চারি পাশ ঘেরা। গহন আঁধারের মাঝখানে আদি জননীর মহা-উৎসবের কল-কোলাহল-ধ্বনি শোনাইতেছিল, ধরণীর বুকচাপা রুদ্ধ ক্রন্দনের মতো। আকাশের অন্ধকার বুকে যে ফুলের ছেঁড়ামালা অচঞ্চল চোখে হাসিতেছিল, করুণা চাহিয়া দেখিল সাগরের বুকে তাহাই পলাতকা কিশোরীর বেণীর মতন দুলিতেছে। তন্দ্রাহারা চোখে চাহিয়া আছে দূরের বালুচর কোন্ অভিশপ্তের অনির্দ্দেশ্য ইঙ্গিতের মতো।

মনসুর সহসা করুণার আঙুর-আঙুলের স্পর্শসুখ অনুভব করিল। মুখের-উপরে-উড়িয়া-আসা চুলগুছি আল্‌গোছে সরাইয়া করুণা তাহার হাতের উপরে হাত রাখিয়া নীরব হইয়া পুনরায় বসিয়া রহিল। দুইটি তরুণ-তরুণীর অঙ্গে যে তড়িতের আগুন-শিখা সবার অলক্ষ্যে গোপনে গোপনে প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহার ভিতরে প্রাণের প্রাচুর্য্য এত বেশী ছিল যে, ইচ্ছা করিলেও কেহ হাতটা টানিয়া সরাইয়া লইতে পারিত না।

বালিতে পা দিয়াই করুণা বলিল, ছোড়্‌দি এসো হাত ধরাধরি করে Left-right কর্‌তে কর্‌তে যাই।

মনসুর হাসিয়া বলিল, আপনি বুদ্ধিতে একেবারে শিশুর মতন তায় খেয়ালী। অত সখ থাকে সৈন্যের দলে নাম

লিখিয়েই দেখুন ত্রাহি, ত্রাহি ডাক ছাড়তে কত দেরী লাগে।

করুণা এবং অরুণা হি হি করিয়া একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। মনসুর চলিল মধ্যে। করুণা দিদির নিকট হইতে মনসুরের ডানদিকে আসিল। সুমুখের আলোকোজ্জল নগরী বিচিত্র ভূষায় অন্ধকারের কোলে দাঁড়াইয়া, শত শত অগ্নি-শিখা গবাক্ষে, স্তম্ভে, দরজায় ফুলের মতো ফুটিয়া পথিকের চোখে ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিতেছিল। নীরবে চলিতে চলিতে সেই দিকে সহসা নজর পড়িতেই মনসুর অকারণে অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, কী সুন্দর আজ আঁধার রাত। করুণা গুণ গুণ করিয়া গান ধরিল,

In such a night as this
When the sweet wind did gently kiss the trees,
And they did make no noise in such a night…,

খানিক পরে বলিল, আজ চাঁদ উঠ্‌বে না, কালতো দিব্যি জোস্না গেচে। অরুণা প্রত্যুত্তরে বলিল, উঠ্‌বে একটু পরে, এটা যে কৃষ্ণপক্ষ জানেন নাকি? মনসুর ঘাড় দোলাইয়া সম্মতি দিয়া সঙ্ক্ষেপে বলিল, হুঁ।

—এই পর্য্যন্তই তবে, আজ তাহলে আসি ডাক্তার সাব। বলিয়া তেমাথার উপরে অরুণা থামিয়া গেল।

করুণা ভাবে নাই এত শীঘ্র বিদায়ের পালা আসিবে। তাই সে একটু চমকিয়া উঠিল এবং দিদিকে অনুযোগ করিয়া বলিল, চলো না ছোড়্‌দি আর একটুখানি এগিয়ে দিয়ে যাই, আমরা দুজনে—উনি একা।

মনসুর আপত্তি তুলিয়া বলিল, হলুম-ই বা। এগোনোর কোনো দরকার নেই ছোড়্‌দি, আপনারা যান।

অন্ধকারের মধ্যে দুজনে দুইদিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। অন্ধকারের তারার দিকে চাহিয়া দুজনার মনে হয়, তাহাদেরই বুকের কাঁপন বুঝি আজ তারায় তারায় কাঁপিতেছে। ক্রমশঃ

একটী প্রাচীন সঙ্গীত

লালন শাহ্‌র গান

চাতক মেঘের আশে—
ওরে মেঘ বর্ষিল অন্য দেশে
চাতক বাঁচে কিসে?
"আমি জল খাব, জল খাব" বলে রে—
ওই আমার চাতকিনী ম'ল
মনে বড় আশা ছিল।
চাতক মেঘের আশায় ছিল,
"জল খাব, জল খাব" বলে রে—
বৃক্ষের মূল ভাঙ্গিয়া গেল।

আরব জাতির সামরিক বিধান

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

মজিবর রহমান বি, এ,

যুদ্ধাস্ত্র

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফাগণের শাসনকালে সৈন্য প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল :—

(১) হারাবিয়া বা আরবীয় পদাতিক সৈন্য

(২) জন্দ বা বৈদেশিক অশ্বারোহী ও পদাতিক

পদাতিক সৈন্য সাধারণতঃ আত্মরক্ষার জন্য ঢাল ও নিকটস্থ শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য বর্শা ও তরবারি ব্যবহার করিত কিন্তু দূরবর্ত্তী শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য ধনুক অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর নিক্ষেপ করিবার জন্য এক প্রকার অস্ত্র ব্যবহার করিত।

অশ্বারোহীদের প্রধান অস্ত্র বর্শা বা বল্লম ও আত্মরক্ষার জন্য ঢাল। অশ্বারোহীগণের বর্শা প্রায় ১০ হস্ত পরিমিত লম্বা ছিল। এই সব বর্শা আরব দেশের বাহ্‌রাণ প্রদেশে ভারতবর্ষ হইতে প্রেরিত সরু বংশখণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত হইত। ইহার একপ্রান্তে সুতীক্ষ্ণ লৌহ-ফলাকাযুক্ত থাকিত, অন্য প্রান্ত ধরিবার উপযুক্ত করিয়া লওয়া হইত। এই অস্ত্রের দ্বারা 'ওয়াছি' ওহোদের যুদ্ধে "আমির হাম্‌জা"কে নিহত করে। তরবারিও আরবের ইমান প্রদেশে এবং উত্তর প্রদেশস্থিত 'মুতা' ও দামেস্ক নগরে প্রচুর পরিমাণে নির্ম্মিত হইত। কিন্তু দামেস্কের তরবারিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল। এই সব তরবারি কাষ্ঠ বা চর্ম্ম নির্ম্মিত খাপে বদ্ধ থাকিত। ধনুক ও বর্শাই আরববাসিগণের প্রধান জাতীয় অস্ত্র ছিল এবং কোন কোন সম্প্রদায় ধনুর্ব্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। সরু কাষ্ঠখণ্ডের একপ্রান্তে তীক্ষ্ণ লৌহ শলাকা ও অন্য প্রান্তে পালক যুক্ত করিয়া তীর ও লৌহ কিংবা বংশ খণ্ড দ্বারা ধনুক নির্ম্মিত হইত।

দুর্গ আক্রমণের যন্ত্র বা ইঞ্জিন

এসলামের অভ্যুত্থানকালে পারস্য, বিশেষ করিয়া রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত-দেশ দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল এবং এই দুর্গ-আক্রমণ করিবার ইঞ্জিনেরও তৎকালে চরম উন্নতি হয়। শত্রুর দুর্গ-মধ্যে বা দুর্গের প্রাচীর ভাঙ্গিবার জন্য দূর হইতে "ব্যালিষ্টা" (Ballista Arabic Manjaniq) "ক্যাটাপাল্ট" (Catapult Arabic Arradah) দ্বারা বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইত। এই সব প্রস্তর এমনই বেগে নিক্ষিপ্ত হইত যে ইহার আঘাতে দুর্গ-প্রাচীর বিদীর্ণ হইয়া যাইত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দিতে এই সব যন্ত্রের এমনই উন্নতি হয় যে মুসলমানগণ এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া Rovelloর দুর্গ-প্রাচীর ভূমিসাৎ করিয়া ফেলে এবং স্যালোনিকা স্যালার্ণো ও সাইরা কিউজ আক্রমণ কালে (877 A. D.) মুসলমানগণ গ্রীকদের মনে ভীতির উদ্রেক করিয়াছিল। দুর্গ প্রাচীর হইতে প্রস্তরখণ্ড টানিয়া লইবার ছিদ্র করিবার জন্য অন্য এক যন্ত্র (Battering Ram) আবিষ্কৃত হয়।

যুদ্ধ-ঘোষণা

এসলামের বিধানমতে প্রধানতঃ তিন প্রকার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নিয়ম ছিল,

(১) বিধর্ম্মী—

(২) বিদ্রোহী বা রাজদ্রোহী।

(৩) ধর্ম্মদ্রোহী। এসলাম গ্রহণ করিয়া যে পরে ঈমান পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তরে যায়।

এখন আমরা দেখিব যে বিধর্ম্মীদের বিরুদ্ধে কি ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইত এবং যুদ্ধকালে তাহাদের প্রতি কিরূপ আচরণ করা হইত। প্রথমতঃ বিধর্ম্মী পক্ষকে এসলাম গ্রহণ করিতে বা এসলামের বশ্যতা স্বীকার করিতে সংবাদ প্রেরণ করা হইত। যদি শত্রুপক্ষ উল্লিখিত শর্ত্ত পূরণ করিত, তবে যুদ্ধ ঘোষণার প্রয়োজন হইত না; অন্যথায় যুদ্ধ ঘোষণা করা হইত। এমনকি যুদ্ধ-ঘোষণার পরেও যদি বিধর্ম্মীপক্ষ এসলাম গ্রহণ বা বশ্যতা স্বীকার করিত বা করিতে প্রতিশ্রুত হইত, তবে তাহার সঙ্গে সন্ধি করা হইত।

শত্রুকে আক্রমণ করিবার নিয়ম

এবণে খলদুনের ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, দুই প্রকারে শত্রুকে আক্রমণ করা হইত।

(১) প্রথমতঃ শত্রুকে আক্রমণ করিয়া নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করা।

(২) দ্বিতীয়তঃ সম্মুখ-যুদ্ধে শত্রুকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজয় না করা পর্য্যন্ত যুদ্ধ করা।

যাহারা প্রথম প্রথা অনুসারে যুদ্ধ করিত তাহারা পশ্চাতে প্রাচীর সংরক্ষিত দুর্গাকারে একটি স্থান নির্ম্মাণ করিয়া শত্রুকে আক্রমণ করিত এবং প্রয়োজন মত সেই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নূতন ভাবে শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইত। এই প্রকার যুদ্ধ-প্রথা বেদুইনদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয় প্রথা অনুসারে আরবীয় সৈন্যগণ পারশ্য বা রোমের সম্মুখীন হইত।

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের কর্ত্তব্য

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের প্রধান কর্ত্তব্য, বিধর্ম্মী শত্রুপক্ষকে নিহত করা। বৃদ্ধ, পুরোহিত ও ধর্ম্মযাজকদের প্রতি এই প্রথা প্রয়োগ সম্বন্ধে আইন-তত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে মতভেদ আছে। কাহার মতে তাহাদিগকে হত্যা করা যাইতে পারে, কাহার মতে পারা যায় না। স্ত্রীলোক, শিশু ও দাস শ্রেণীর লোককে হত্যা করিতে পারা যাইত না কিন্তু যুদ্ধে যোগদান করিলে স্ত্রীলোককে হত্যা করিতে পারা যাইত। লুণ্ঠিত দ্রব্যের কণামাত্রও তাহারা আত্মসাৎ করিতে পারিত না। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষীয় কোন লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করিতে কিংবা অকারণে কোন গ্রাম দগ্ধ করা বা লুণ্ঠন করিতে পারা যাইত না। সর্ব্ব-প্রকার যুদ্ধাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া যে কোন উপায়ে শত্রুকে দুর্ব্বল করিতে পারা যাইত কিন্তু কোন ফলবান বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করিবার নিয়ম ছিল না। শত্রুকে আয়ত্বাধীনে আনিবার জন্য জলের উৎস নষ্ট করিতে পারা যাইত কিন্তু আক্রান্ত দেশ বা নগর হইতে খাদ্য ভিন্ন কোন পোষাক, ভারবাহী পশু বা অন্য কোন বস্তু ব্যবহার করিবার নিয়ম ছিল না। এরূপভাবে কোন বস্তু ব্যবহার করিলে তাহার লুণ্ঠিত দ্রব্যের প্রাপ্য অংশ হইতে বাদ দেওয়া হইত। সন্ধির শর্ত্ত অনুসারে বিজিত শত্রুপক্ষের নিকট হইতে যে দ্রব্য-সামগ্রী পাওয়া যাইত তাহাই লুণ্ঠিত দ্রব্য।

পরাজিত বিধর্ম্মী শত্রুর প্রতি আচরণ

যদি বিধর্ম্মী শত্রু নিয়মিত:যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইত, তবে তাহাকে তাহার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সহ দাসরূপে বিক্রয় করিতে, কিংবা প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষ লোককে হত্যা বা মুসলমান বন্দীর বদলে পরিবর্ত্তন করিতে পারা যাইত। কোন কোন সময়ে তাহাকে মুক্তি দেওয়াও হইত। যদি বিধর্ম্মী শত্রুপক্ষ আত্মসমর্পণ করিত, তবে তাহার নিকট হইতে এককালীন কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থ ও বাৎসরিক নির্দ্দিষ্ট কর-প্রাপ্তির চুক্তিতে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইত। শত্রুপক্ষ সন্ধিশর্ত্ত ভঙ্গ করিলে সন্ধি-রক্ষার্থ প্রদত্ত ব্যক্তিগণকে (Hostages) হত্যা করা হইত না; যুদ্ধ আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা মুক্তি পাইত না; কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি পাইত। ইত্যবসরে যদি কোন স্ত্রীলোক এসলাম গ্রহণ করিত, তবে তাহাকে তাহার বিধর্ম্মী স্বামীর নিকট যাইতে দেওয়া হইত না। কিন্তু বিবাহকালীন প্রদত্ত যৌতুকে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার থাকিত।

ধর্ম্মদ্রোহিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও যুদ্ধকালে তাহাদের প্রতি আচরণ

যদি কোন সম্প্রদায় এসলাম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া রাজ্যে প্রচলিত অন্য কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করিত, তবে তাহাদিগকে (সম্প্রদায়ের নেতা ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ লোক) হত্যা করিবার বিধান ছিল এবং তাহাদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সরকার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইত। আবু হানিফা বলেন যে, সে এসলাম ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যে সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহা তাহার উত্তরাধিকারী পাইত। যুদ্ধে পরাজিত হইলে তাহাদের সঙ্গে কোন সন্ধি করা হইত না, কিন্তু তাহাদের পরিবারের কোন লোককে দাসরূপে বিক্রয় করা যাইত না। তাহাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত হইত না। তাহা হয় সরকারী সম্পত্তির অন্তর্ভূক্ত হইত, না হয় তাহাদের উত্তরাধিকারী পাইত।

সৈন্যগণের বেতন

আরবজাতির ইতিহাসে আমরা প্রথম হইতেই দুই শ্রেণীর সৈন্য দেখিতে পাই :—

(১) বেতনভোগী সৈন্য।

(২) স্বেচ্ছাসেবক সৈন্য।

স্বেচ্ছাসেবক সৈন্য আবার কয়েক প্রকারে বিভক্ত ছিল। কেহ স্বদেশ-প্রীতির জন্য, কেহ ধর্ম্মের জন্য, কেহ বা লুণ্ঠিত দ্রব্যের প্রলোভনে যুদ্ধে যোগদান করিত। এই জাতীয় সৈন্যের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট বেতন ছিল না। যুদ্ধকালে তাহারা সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইত, এবং যুদ্ধ শেষ হইলে লুণ্ঠিত দ্রব্যের প্রাপ্য অংশ পাইয়া দেশে ফিরিয়া যাইত।

বেতনভোগী সৈন্যদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বেতন ছিল, তাহাদিগকে সদাসর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত। প্রথম খলিফাদের শাসনকালে প্রত্যেক সৈন্য বাৎসরিক ৫০০ শত হইতে ৬০০ শত দেরহেম বেতন পাইত। ১ দেরহেমের মূল্য বর্ত্তমানে ৷৵০ দশ আনার সমান বা তাহা চেয়ে কিছু কম বেশী (১ দেরহেম = ১ ফ্র্যাঙ্ক = ১০ পেন্স = ৷৵০ দশ আনা) তাহাহইলে প্রত্যেক সৈন্যের বাৎসরিক বেতন বর্ত্তমানের ৩৫০৲।৩৬০৲ টাকা।

উম্মীয়া বংশের প্রথম খলিফার শাসনকালে দামেস্ক নগরে ৬০,০০০ সৈন্য ছিল। এই সৈন্যের জন্য বাৎসরিক ৬ কোটি দেরহেম খরচ হইত। ইহাতে বোঝা যাইতেছে যে প্রত্যেক সৈন্যের বাৎসরিক বেতন ১০০০ এক সহস্র দেরহেম (বর্ত্তমানের ৭০০৲ টাকার সমান) আব্বাস বংশীয় খলিফাদের শাসনকালে তাহাদের অনেক কম বেতন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম খলিফার শাসনকালে প্রত্যেক পদাতিক সৈন্যের জন্য বাৎসরিক ৯৬০ দেরহেম ও অশ্বারোহীর জন্য ১৯২০ দেরহেম বেতন ধার্য্য ছিল। মামুনের শাসনকালে প্রত্যেক পদাতিক সৈন্য বাৎসরিক ২৪০ দেরহেম, প্রত্যেক অশ্বারোহী ৪৮০ দেরহেম পাইত। কিন্তু দামেস্কের প্রত্যেক অশ্বারোহী সৈন্য বাৎসরিক ১২০০ ও পদাতিক সৈন্য ৪৮০ দেরহেম পাইত। হারুনর রশিদ ও মামুনের শাসনকালে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধিবশতঃ সৈন্যের বেতন কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

আরবজাতির নৌ-শক্তি

আরবজাতির নৌ-শক্তি কথাটি শুনিয়া পাঠক ভাবিতে পারেন যে, যে জাতির কোন কালে অনন্ত বালুকাময় প্রান্তর ব্যতীত কোন হ্রদ, নদী বা জলাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই, তাহাদের আবার নৌ-শক্তি? এই নৌ-শক্তি আরবজাতির ইতিহাসে এক অভিনব সৃষ্টি। এস্‌লামের পূর্ব্বে যে আরবজাতি নৌ বিদ্যায় একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিল, তাহা নয়। পশ্চিমে লোহিত সাগর, পূর্ব্বে পারস্য উপকূলস্থ আরবীয়গণ সামুদ্রিক বাণিজ্যে এই বিদ্যায় অনেকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু আরববাসিগণ কোন কালেই কোন নৌ-যুদ্ধে যোগদান করে নাই। কিন্তু সিরিয়া ও মিসর বিজয়ের পর আরববাসিগণের উপর এক নূতন বিপদ আসিয়া পড়িল। এই সময়ে রোমানগণ ভূমধ্য সাগরের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারী ছিল। স্থলযুদ্ধে পরাজিত হইলেও জলযুদ্ধে তাহাদের অপ্রতিহত-বেগ। ইচ্ছা করিলে তাহারা আরববাসিগণকে ভূমধ্য-সাগরের জলস্পর্শ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিত। সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, মিসর ও আফ্রিকার উত্তর তীর-ভূমির দেশসমূহ বিশেষ উর্ব্বরা, বাণিজ্যশালী ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই অপহৃত দেশসমূহ পুনরুদ্ধারের জন্য রোমানগণ প্রাণপণ চেষ্টা করে এবং তাহা অধিকারে রাখিবার জন্য আরববাসিগণকে এক অশ্রুতপূর্ব্ব নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইল। এই নূতন উদ্ভাবিত উপায় হইতেছে নৌ-বহরের সৃষ্টি। সিরিয়া আরববাসিদের অধিকারে আসায় নৌ-বহর নির্ম্মাণে আরববাসীদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। কেননা এই সব দেশ অতি প্রাচীন কাল হইতে এমনকি খৃষ্টের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মিসরের ফেরাউনগণ সিরিয়া প্রদেশস্থিত লেবানন পর্ব্বতের কাষ্ঠদ্বারা নৌকা নির্ম্মাণ করিতেন।

বাইবেল গ্রন্থেও এই সব কাষ্ঠের উল্লেখ পাওয়া যায়— (Book of Isaiah)। ফিনিসিয়াবাসিগণ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাবিকরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। উপযুক্ত নাবিক ও জাহাজ নির্ম্মাণের উপযুক্ত কাষ্ঠ পাওয়ায় জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে আরবীয়গণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে মোয়াবিয়া সিরিয়ার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তাঁহার শাসনকালে রোমীয় নৌ-বহর পুনঃ পুনঃ সিরিয়া ও

আফ্রিকার উপকূল আক্রমণ করিতে থাকে। উক্ত দেশদ্বয় রোমাণদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য মোয়াবিয়া একটি নৌ-বহর নির্ম্মাণ করিয়া "ফিনিক্স" এর জলযুদ্ধে রোমাণগণকে প্রথম পরাজিত করেন।

প্রথমে আরববাসিগণ যে নৌকা নির্ম্মাণ করে, তাহা বেশী দ্রুতগামী ছিল না ও আকৃতিও কদাকার ছিল। কিন্তু আফ্রিকায় ও স্পেনে নৌ-বহরের বিশেষ উন্নতি হয়। নৌ-বহর নির্ম্মাণ কেবল রাজশক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সমৃদ্ধিশালী বণিক ও ব্যবসায়ীদেরও নৌকা-নির্ম্মাণ করিতে হইত। জাহাজের দুই পার্শ্বে দুই লাইন দাঁড়ী থাকিত। প্রত্যেক লাইনে ২৫টি করিয়া আসন থাকিত এবং প্রত্যেক আসনে দুই জন করিয়া দাঁড়ী বসিত। সর্ব্বসমেত প্রত্যেক নৌকায় ১০০ একশত দাঁড়ী থাকিত। জাহাজের সম্মুখভাগে শত্রুপক্ষের জাহাজে অগ্নি (Greek Fire) নিক্ষেপ করিবার জন্য একটি অস্ত্র থাকিত এবং পার্শ্বেই একটি উচ্চ সুরক্ষিত কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রকোষ্ঠ থাকিত, তাহা হইতে সৈন্যগণ বিপক্ষের জাহাজে অস্ত্র নিক্ষেপ করিত। যুদ্ধ করিবার জন্য যে সব জাহাজ তাহা ক্ষুদ্রকায় ও দ্রুত-গামী এবং সৈন্য ও যুদ্ধ সামগ্রী প্রেরণের জাহাজ অপেক্ষা-কৃত ধীরগামী ও বৃহদাকার ছিল।

প্রত্যেক যুদ্ধ জাহাজে একজন করিয়া কাপ্‌টেন থাকিত, তাহাকে আরবী ভাষায় 'কায়েদ' বা 'মুকাদ্দাম' বলা হয়। শত্রুর বিরুদ্ধে জাহাজ চালনা করিতে ও শত্রুর জাহাজে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে তিনি প্রথমে আদেশ দিতেন। তাঁহার অধীনে জাহাজ চালাইবার জন্য একজন কর্ম্মচারী থাকিত তাহাকে আরবী ভাষায় 'রইস' বলা হইত এবং সমগ্র নৌ-বহর একজন নৌ-সেনাপতির অধীনে থাকিত তাঁহাকে আরবী ভাষায় 'আমিরুল মা' বা 'আমিরুল-বাহ্‌র বলা হইত।

নৌ-শক্তি দ্বারা বিজিত দেশ সমূহ

সিরিয়ার উপকূলে Phœnix এর জলযুদ্ধে আরব জাতির ও রোমাণদের যুদ্ধ-জাহাজের প্রথম সংঘর্ষ হয়, এই যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হয়। তৎপর মিসরের শাসনকর্ত্তা ২০০ দুই শত যুদ্ধাসহ রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং হিজরী ৩০ অব্দে মাস্তের জলযুদ্ধে (Battle of Mast) ৬০০ ছয় শত রোমান যুদ্ধ-জাহাজকে পরাজিত করে। এই নৌ-বহরের সাহায্যে আরবজাতি ভূমধ্য-সাগরের মধ্যস্থ ও উপকূলস্থ যে সব স্থান জয় করে নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল :—

(১)	রোডস	৩০	হিজরি
(২)	সাইপ্রাস	৩৪	"
(৩)	স্পেন	৯২	"
(৪)	সিসিলি	২০৪	"
(৫)	ক্রিট	২১০	"

ইহা ভিন্ন আরো অনেক দেশ জয় করা হইয়াছিল। তাহার বিস্তৃত বিবরণ ইসলামের বিজিত দেশের তালিকায় পাওয়া যায়। তবে এই স্থানে একটু পূর্ব্বাভাস দেওয়া যাইতেছে যে আরব জাতি এই সময় এসিয়া মাইনার, কনষ্টান্টিনোপল, গ্রীক ও ইটালি আক্রমন করিয়াছিল।

আরবীয়গণের এই নৌ শক্তি ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থ ইউরোপীয় দেশসমূহের নৌ-শক্তির উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা আমরা দক্ষিণ ইউরোপীয় ভাষা হইতে বেশ অনুমান করিতে পারি। আরব জাতির সভ্যতা আলোচনা প্রসঙ্গে জার্ম্মাণ ঐতিহাসিক Von Kremer লিখিতেছেন "That the Arabian fleet of the earliest period was a model in many ways to those of the Christian Countries, is patent from the fact that many Arab nautical terms have been preserved in the languages of Southern Europe, Such as Cable, Arabic hable, arsenal (Euglish), Italian Darsenal. Arabic Dar-us-sanah, Co vrette which comes from Ghurub i e: raven.

আরব জাতির শাসন-কালে অনেক বাণিজ্য-জাহাজ নির্ম্মিত হয়, কিন্তু বাণিজ্য-জাহাজের বর্ণনা এস্থলে না দিয়া আরব জাতির বাণিজ্য-প্রসঙ্গে বলিলে ভাল হইবে বিবেচনা করিয়া সেই ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গের জন্যই রাখিয়া দিলাম।
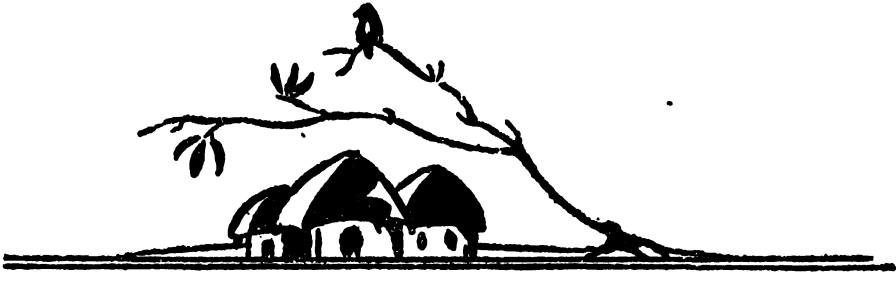
'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী'

শ্রীমনীন্দ্রনাথ ভৌমিক

১

সন্ধ্যার অন্ধকার পৃথিবীর বুকে নামিতেছে। এক নির্জ্জন বন-পথে বাদশাহ্ আকবর একা। তিনি আসিয়াছিলেন, শিকারে। সঙ্গে লোক-লস্কর যথেষ্টই ছিল, শিকারের খোঁজে বাদশাহ্ দূরে আসিয়া পড়ায়, তিনি সঙ্গী দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন—এখন তিনি বন পথ ধরিয়া চলিয়াছেন সঙ্গীর সন্ধানে। বনভূমি নীরব। শুধু মাঝে মাঝে বাতাসে বৃক্ষ-পত্রের মর্ম্মর শব্দ। সহসা বাদশাহের কানে আসিল, অপূর্ব্ব সঙ্গীত-ধ্বনি। এই বিজন-বনে কে গায়! বাদশাহ্ উৎকর্ণ:হইয়া শুনিলেন ও ধীর পথে চলিলেন সেই স্বর লক্ষ্য করিয়া।

গান অস্পষ্ট, শুধু সুরের ঝঙ্কারই বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। গায়কই বোঝে কি গান, কিন্তু তার সুরের মূর্চ্ছনা যেন স্পর্শ করিতেছে বাদশার প্রত্যেক হৃদয়-তন্ত্রী। এ গান যেন শুধু গায়কেরই নয়, তাঁরই বুকের ভিতর হইতে উঠিয়া প্রাণে তাহা অপূর্ব্ব পুলক সৃষ্টি করিতেছে।

"সালাম হে অজানা পিক-কণ্ঠ! আজ ভারতের অধীশ্বর তোমাকে সালাম জানাচ্ছে।" গান থামিলে, বাদশা এই কথা বলিয়া সালাম করিলেন সেই গায়ককে। গায়ক উঠিয়া শ্রদ্ধায় মস্তক নত করিলেন। বলিলেন, "দীনের সৌভাগ্য! সারা ভারতবর্ষ যাঁর করতলে, সেই শক্তিমানকে যদি এতটুকুও আনন্দ দিয়া থাকি, তবে আমি কৃতার্থ। কিন্তু জনাব! আমি কিই বা গাই, আর কিই বা জানি, আমার গুরুর গান যদি শুন্‌তেন্—"

'তোমাকেই তার ব্যবস্থা করতে হবে আজই। তুমি আমায় যা শোনালে তোমার ওস্তাদের গান যদি এর চেয়েও ভাল হয়, তবে তাঁর স্থান হবে ভারত-সম্রাটের পার্শ্বে, এই বনে-জঙ্গলে সে প্রতিভা আমি নষ্ট হতে দেব না।'

'আজত আর হবে না।'

'তবে?'

'আর একদিন আপনাকে নিয়ে যাব।'

'একবার দেখাও হবে না?'

'চলুন আপনাকে পথ দেখিয়ে দেই।'

'গুণীর নামটা শুনতে পারি কি?'

'অধীনের নাম তানসেন।'

বাদশাহ্ চমকিয়া উঠিলেন ও পুনরায় সালাম করিলেন।

২

সূর্য্য অস্ত যায় যায়,—তার সোণালী আভায় বৃক্ষশীর্ষ রঞ্জিত। ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী অবিরাম কল্ কল্ নাদে চলিয়াছে। তীরে বসিয়া এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ, পাশে একখানা সেতার পড়িয়া। অদূরে লতায় পাতায় ঘেরা কুটির—বৃদ্ধের আস্তানা।

আকবর ও তানসেন ধীরে সেইখানে আসিলেন। আকবর কিছু বলিবেন, তানসেন ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন। বৃদ্ধ উভয়ের দিকে চাহিলেন, সে দৃষ্টিতে করুণা উছলিয়া পড়িতেছে। জীবনের হিসাব-নিকাশ শেষ করিয়া, পৃথিবীর সুখ দুঃখ হইতে দূরে বৃদ্ধ যেন কি এক গভীর সাধনায়

মগ্ন। তানসেন প্রণাম করিলেন, বলিলেন—গুরুজি! আকবর বাদশাহ্‌কে আপনার গান শুনাইতে আনিয়াছি।

বৃদ্ধ স্নিগ্ধ হাসিয়া, আকবরকে এক উপলখণ্ডে বসিতে বলিলেন।

বৃদ্ধ সেতারে ঝঙ্কার দিলেন। আক্‌বর মুগ্ধ হইয়া শুনিলেন, সেই আবেশময়, মোহময় ঝঙ্কার। সেতারের গান থামিল, আকবরের মনে হইল, যেন সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর আনন্দ-কোলাহলও স্তব্ধ হইয়া গেল।

বাদশা নিজ কণ্ঠ হইতে বহুমূল্য মণিময়-হার বৃদ্ধের পদতলে রাখিলেন, বলিলেন—'হে সুরের যাদুকর! এই তোমার যন্ত্র-সঙ্গীতের প্রথম পুরস্কার। তোমার কণ্ঠ-সঙ্গীতের পুরস্কার দিল্লীর রাজসভায়।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া, বৃদ্ধ সেতার তুলিয়া লইলেন। নিজের কণ্ঠ মিলাইয়া বৃদ্ধ সেতারে ঝঙ্কার দিলেন। বাদশার বোধ হইল, পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ যেন তাহাতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। বিশ্ব ব্যাপিয়া একি গভীর শোক-সঙ্গীত! পদতলে নদীর কল্ কল্ শব্দে, আকাশে বাতাসে সেই একই গান, এতো বৃদ্ধের কণ্ঠ নহে, এ যেন পৃথিবীর বহু শতাব্দীর দুঃখের কান্না, আকবর মুগ্ধ হইলেন।

বৃদ্ধ গাহিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রাণে যেন আজ আনন্দের উৎস বহিতেছে। শুধু তাঁর প্রাণে নয়, পৃথিবীর বুকেও যেন আজ উৎসব চলিয়াছে অবিরাম। এ পৃথিবীতে দুঃখ নাই, দৈন্য নাই,—বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাস নাই। উপরে কোটি কোটি নক্ষত্রগুলিও যেন শিহরিয়া উঠিতেছে, পুলকে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ যেন সেই মহাসঙ্গীত অনুভব করিতেছে সমস্ত প্রাণ দিয়া।

নদীর মর্ম্মর-ধ্বনি স্তব্ধ হইয়াছে। বাতাস নীরব। নিখিল বিশ্বের আত্মা কি এক গভীর আনন্দে মগ্ন। বৃদ্ধের সুর উঠিতেছে, পড়িতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে দ্যুলোক ভূলোক সবই যেন থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। এ আনন্দের জ্বালা দুঃসহ!

আকবরের পায়ের নীচের মাটী যেন কাঁপিয়া উঠিল,—তাঁর সমগ্র চেতনা লুপ্তপ্রায়। তিনি শুধু অনুভব করিলেন তাঁর চারিপার্শ্বে অগণ্য আলোক শিখা, রাশি রাশি মণিমুক্তা পৃথিবীর অতল হইতে তাঁর পায়ের তলায় বিক্ষিপ্ত হইতেছে,—এ যেন সমগ্র বিশ্বের শ্রদ্ধার অবদান। আকবর চেতনা হারাইলেন।

* * * *

আকবর যখন জাগিলেন, তখন সবে প্রভাত হইয়াছে, পার্শ্বে তানসেন বসিয়া মৃদু হাসিতেছে, আর সেই নদী তেমনই বহিয়া চলিয়াছে। তরুণ অরুণের রক্তিম আভা বুকে করিয়া।

ঐতিহাসিক এব্‌নে খালদূন *

গিয়াসুদ্দিন আহ্‌মদ
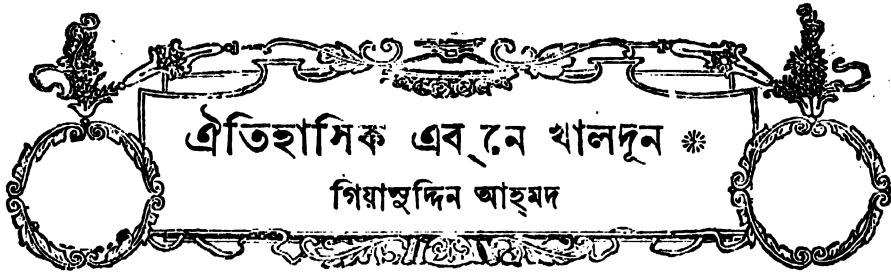
আরব জাতির বিরাট জ্ঞান-সাধনা যখন মৃদুগতি হইয়া আসিল এবং তাহাদের গৌরব মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রখরতম কিরণ বিকীর্ণ করিয়া যখন ম্লানপ্রভ হইয়া আসিতেছিল, তখন তাহাদের মধ্যে এক স্বাধীন, নির্ভীক, চিন্তাশীল ব্যক্তির উদয়, সভ্যতার ধারা-বিশ্লেষণে তাঁহার মৌলিকতা ও ইতিহাসকে এক মহীয়ান রূপদান, বিস্ময়ের বিষয়ই বলিতে হইবে।

প্রাচ্যের ঐতিহাসিকদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হইলেন ইব্‌নে খালদূন। মোস্‌লেম জাতির ইতিহাস প্রণয়নে, তিনি যে শুধু এক অভিনব ও স্বাধীন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা নয়, তিনি উক্ত ইতিহাসের cultureএর দিকেও সবিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

যে যুগে তিনি জীবিত ছিলেন, তাহা মোস্‌লেম ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ বলিতে হইবে। মূর জাতির ইউরোপ হইতে বিদায় লইবার সময় ঘনাইয়া আসিতেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে বারুদের মত উৎক্ষিপ্ত হইবার জন্য, তুর্কি জাতির শক্তি-ধারা এসিয়া মাইনরে সঞ্চিত হইতেছিল। তৈমুর-চালিত প্রভঞ্জনের জন্য মধ্য-এসিয়া মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল;—আর উত্তর-আফ্রিকা-খণ্ডে নূতন নূতন রাজবংশের উদয় ও বিলয় সূর্য্যাস্তে বর্ণ পরিবর্ত্তনশীল মেঘ-মালার মত দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল।

সেভিলের এক অতি প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী বংশে, ১৩৩২ সালে ঐতিহাসিক-প্রবরের জন্ম হয়। বিংশতি বর্ষ বয়সে, টিউনিসের সুলতান, দ্বিতীয় আবু ইসহাকের সেক্রেটারী পদে তিনি বরিত হন। কোন অজ্ঞাত কারণে, শীঘ্রই এই পদত্যাগ করিয়া, তিনি ফেজ সহরে গমন করিলেন। এইখানে মরক্কোর সুলতান আবু ইনানের সেক্রেটারী বিভাগে তিনি একটি পদ পাইলেন, কিন্তু অপ্রীতিভাজন হওয়ায়, পদচ্যুত ও বন্দী হইলেন এবং ১৩৫৮ সালে উক্ত সুলতানের মৃত্যু হইলে মুক্তিলাভ করেন। রাজনৈতিক কোন গুরুতর কর্ম্ম সম্পন্ন করায়, তিনি নবীন সুলতানের প্রিয়পাত্র হইলেন এবং তাঁহার সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু শীঘ্র বিদ্রোহ উপস্থিত হইল এবং নবীন সুলতানকে অপসারিত করিয়া, এক ব্যক্তি সিংহাসন অধিকার করিলেন। ইঁহার অধীনে তিনি সুবিধা করিতে না পারিয়া, ১৩৬২ সালে গ্রানাডা-রাজ ইব্‌ন্ আহমারের সমীপে গমন করিলেন। ইব্‌নে আহ্‌মারের দৌত্য-কর্ম্মে, তিনি ক্যাষ্টিল-রাজ "নিষ্ঠুর পিটারের" (Peter the Cruel) দরবারে প্রেরিত হইয়া, তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষের আবাস-স্থান সেভিল-নগরীতে উপনীত হইলেন। তাঁহার দরবারে খালদূন যেন বরাবর থাকেন, পিটার এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং সেভিলে তাঁহার পারিবারিক সম্পত্তি ও ফিরাইয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি সম্মত হইলেন না, দৌত্য-কর্ম্ম শেষ হইলে, তিনি গ্রানাডাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইখানে কতদিন সুখ-শান্তিতে থাকিবার পর, উজির ইব্‌নে খতিবের অপ্রীতিকর ব্যবহারের দরুণ আফ্রিকাতে চলিয়াছেন। হাফেসীয় রাজের আমন্ত্রণে তিনি বেজায়াতে বাস-স্থাপন করিলেন, কিন্তু দীর্ঘকাল শান্তিভোগ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিল না। প্রতিবেশী কনষ্টান্টাইনরাজ বেজায়া সহর অধিকার করিলেন। তিনি তেলমেসানে উপস্থিত হইলে, আবু-ওয়াদ বংশীয় সুলতান আবু হানিন, তাঁহাকে সেক্রেটারী পদ প্রদান করিলেন। কিছুদিনের মধ্যে আবু হানিনের সঙ্গে মরক্কোর সুলতানের বিবাদ বাধিবার উপক্রম হইলে, তিনি স্পেনে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু জাহাজে আরোহণ করিবার সময়, আজিজের অনুচরগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া, তাঁহার সম্মুখে

---

* এই প্রবন্ধের উপকরণাদি ইসলাম সম্বন্ধে জার্ম্মাণ লেখকগণের গ্রন্থাদি হইতে ও ব্যারিষ্টার এস, খোদাবক্স সাহেবের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। লেখক

নীত হইলেন। সুলতান আবদুল আজিজ জানিতেন যে যাযাবর আরব জাতিদের উপর ইবনে খালদুনের কি বিরাট প্রভাব। তাঁহাকে হস্তগত করিতে পারিলে, তাঁহার রাজনৈতিক সুবিধা হইবে—এই আশায় ইবনে খালদুনের বন্দীত্ব মোচন করিয়া, তাঁহার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আবদুল আজিজের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র আবুবকর সা'ইদের মন্ত্রী-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া, ইবনে খালদুন মহাযোগ্যতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। গ্রানাডা-রাজ মরক্কোর আভ্যন্তরীণ বিষয় সমূহে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে তিনি আবুবকরের প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করাইয়া, তাঁহাকেই সমর্থন করিলেন। ইহাতে আবুবকর গ্রানাডা রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন; কিন্তু তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইলেন এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। নবীন সুলতান ইব্‌নে খালদুনকে মরোক্ক হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। ইব্‌নে খালদুন স্পেনে উপনীত হইলে, গ্রানাডা রাজ কর্ত্তৃকও বহিস্কৃত হইলেন। উপায়ান্তরবিহীন হইয়া, যখন তিনি আনজিরিয়ার উপকূলে বিচরণ করিতেছিলেন. তখন তেলমেসাম-রাজ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার রাজ্যে বসবাস করিতে বলিলেন। ইব্‌নে খালদুন রাজ্যের জনবহুল অংশ ত্যাগ করিয়া, দরবেশদের আশ্রমে সপরিবারে বসতি স্থাপন করিয়া, স্বস্তির শ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার নূতন আবাস-স্থল বর্ত্তমান ওরান প্রদেশের অন্তর্গত কালা-আত্-ইব্‌ন্ সালাম নামক এক ক্ষুদ্র সহরে অবস্থিত ছিল। এই সহরের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়।

এইখানে ৪ বৎসর একাদিক্রমে পরিশ্রম করিয়া, তিনি "মুস্লিম সভ্যতার ইতিহাস" প্রণয়ন করিলেন। ১৩৭৮ সালের শেষাংশে তিনি তাঁহার "সাধারণ ইতিহাসের" উপকরণাদি সংগ্রহ-বাসনায় টিউনিসে গমন করিলেন। টিউনিসে হাফেসীয় সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞানানুশীলন সুন্দর চলিতেছিল এবং মস্‌জিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পুস্তক সংগ্রহ বেশ হইতেছিল। এইখানে ইব্‌নে খালদুন বারবদ ও জেনেতা গোত্রের উম্মিয়া ও আব্বাসীয় বংশের ইতিবৃত্ত এবং প্রাগৈস্‌লামিক যুগের ইতিহাস সমাপ্ত করিলেন এবং সুলতানের লাইব্রেরীতে উহার এক কপি উপহার প্রদান করিলেন। সুলতান আবুল আব্বাস তাঁহার ইতিহাসের সফলতার জন্য স্বয়ং চেষ্টিত ছিলেন। টিউনিসে চারি বৎসর থাকিবার পর সুলতানের অনুগ্রহ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে এক হীন চক্রান্ত সংঘটিত হইলে, তিনি টিউনিস ত্যাগে বাধ্য হইলেন। পরিবারকে টিউনিসে রাখিয়া তিনি হজ্জব্রত উদযাপনের জন্যও আলেক-জান্দ্রিয়াগামী পোতে আরোহণ করিলেন (১৩৮২)। আলেক-জান্দ্রিয়া হইতে কায়রোতে উপনীত হইলে, মালেকীয় আইনানুসারে বিচারকার্য্য সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে, কায়রোর প্রধান বিচারপতি-পদে নিযুক্ত হইলেন (১৩৮৪)। আদালতের দুর্নীতি ও উৎকোচাদি দুরীকরনোদ্দেশ্যে তিনি যথেষ্ট দৃঢ়তা প্রদর্শন করিলেন। দেওয়ানী বিভাগে, জুরীদের বিরুদ্ধে, পার্থিব ব্যাপারে হস্তক্ষেপকারী ভণ্ড দরবেশের বিরুদ্ধে, তিনি কঠোর ব্যবস্থা করিলেন। এই সকল কারণে, বিস্তর লোক তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সত্য-মিথ্যা বলিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে সুলতানের মন বিষাক্ত করিয়া তুলিল। অধিকন্তু আর এক অপ্রত্যাশিত বিপদ ঘটিল।

তাঁহার পরিজনবর্গ টিউনিস হইতে জাহাজে আরোহণ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে বাত্যা-বিক্ষুব্ধ সাগরে জাহাজ আরোহীগণসহ নিমজ্জিত হইল। এই সর্ব্বনাশকর সংবাদ-শ্রবণে ইব্‌নে খালদুনের মনে সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণার উদয় হইল। তিনি পদত্যাগ করিয়া জ্ঞানানুশীলনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন—মাঝে একবার হজ করিয়া আসিয়াছিলেন। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে তৈমুরের বিরুদ্ধে অভিযানে, তিনি মিশরের সুলতানের সমভিব্যাহারে সিরিয়ায় গমন করিয়াছিলেন। মিশরীয় বাহিনী তৈমুর কর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হইলে, তিনিও সৈন্যগণের সঙ্গে বন্দী হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মিশরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, বিচারকের পদ পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইল। তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া আসিতেছিল, অবশেষে ১৪০৬ সালের ১৫ই মার্চ্চ তাঁহার বিরাট কর্ম্মময় জীবনের অবসান হইল।

উপরি উক্ত বিবরণ পাঠে স্বতঃই ইহা প্রতীত হইবে যে জগতের অপরাপর সুধীবৃন্দের মত তিনি অপেক্ষাকৃত

নির্জ্জনে, শান্তিতে আপন কুটীরে থাকিয়া জ্ঞানানুশীলন করিবার সুযোগ পান নাই, পরন্তু রাজনৈতিক তরঙ্গ-ভঙ্গময় বিচিত্র ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে, দেশান্তর ভ্রমণের পথে, এক আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইয়া অপর আশ্রয়ের সন্ধানে থাকিয়া ভাগ্যের সঙ্গে নিরন্তর কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত রহিয়া, তিনি বিদ্যানুশীলন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন রাজনীতির সঙ্গে যেমন ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত, জগতের অপর কোন ঐতিহাসিকের জীবন তদ্রূপ ছিল কিনা, সন্দেহের বিষয়। রাজনীতির সঙ্গে নিগূঢ় সম্পর্ক, উচ্চতম রাজকর্ম্মে অধিষ্ঠান, বিভিন্ন রাজ-পরিবারের সহিত পরিচয় প্রভৃতি থাকায়, তিনি সাক্ষাৎ ভাবে বহু জিনিষ পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহার জন্য তাঁহার রচিত ইতিহাস নজীরের দিক দিয়া মূল্যবান। কল্পনাকে তিনি কখনও আমল দেন নাই। প্রাচ্য-সুলভ ভাব-প্রবণতাও তাঁহার ছিল না। প্রত্যেক ঘটনাকে মানুষের-দেওয়া বাহ্যিক খোলস হইতে মুক্ত করিবার পর, সত্যের মাপকাঠিতে তাহার মূল্য নির্ণীত করিয়া, তিনি ইতিহাসে তাহার স্থান দিতেন। কল্পনা-বর্জ্জিত, নিছক সত্যের আলোতে উদ্ভাসিত, নিরপেক্ষ সমালোচনা-পূর্ণ এই ইতিহাস যে প্রতীচ্য-লেখকগণকে আকৃষ্ট করিয়াছে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

তিনি ইতিহাসকে শুধু রাজনৈতিক-ঘটনা-পুঞ্জের সমষ্টি বা রাজবংশসমূহের উপাখ্যানের আধার স্বরূপ মনে করিতেন না, পরন্তু জনগণের নৈতিক ও মানসিক উন্নতির একটা প্রতিকৃতি জ্ঞান করিতেন। ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কি, তাহা তাঁহার নিজের কথায় বিবৃত হইল :—

"মানুষের সঙ্ঘ বা সমাজকে এবং সেই সঙ্ঘ বা সমাজ যে সকল প্রাকৃতিক ঘটনা-চক্রের ভিতর দিয়া এবং যে সকল ধাপ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, সেগুলিকে পরিস্ফুট করিয়া তোলাই ইতিহাসের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এতদ্ব্যতীত আর কতকগুলি জিনিষ বিবৃত করা উহার উদ্দেশ্য যেমন, বর্ব্বর হইতে উন্নত, উন্নত হইতে উন্নততর রুচি ও রীতি-নীতির ক্রম-পরিবর্ত্তন, পরিবার ও গোত্রের একমুখী স্বার্থ উপলব্ধি, সেই সকল উপায় যদ্দারা এক জাতি অপর জাতির উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, যাহার ফলে রাষ্ট্র ও রাজবংশের উদয় সম্ভবপর হইয়াছে এবং পরিশেষে সেই সকল পরিবর্ত্তন, যেগুলি প্রাকৃতিক ঘটনা-চক্রের ভিতর দিয়া, সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে"...

ইবনে খালদূন অন্যত্র লিখিয়াছেন, "যে সকল ভ্রম-প্রমাদের দরুণ ঐতিহাসিকগণ অভিযুক্ত হইয়া থাকেন, তাঁহার মূলে রহিয়াছে, ইতিহাসের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ধারণা-হীনতা বা ভুল-ধারণা-পোষণ। সমাজ সম্বন্ধে লিখিতে গেলে ঐতিহাসিকদের একটী নিয়ম পালন করিয়া চলা দরকার—মিথ্যা হইতে সত্যকে বাছিয়া লওয়া, কোনটী সম্ভবপর এবং কোনটী অসম্ভব তাহা উপলব্ধি করা, কোনটী অত্যাবশ্যক এবং কোনটী নিরর্থক তাহা নির্ণয় করা, এবং পরিশেষে কোনটীকে গোড়া হইতে বাদ দিতে হইবে, তাহা স্থির করা। যখনই মানব-সমাজের কোন ঘটনা আমাদের কর্ণগোচর হয়, তখন উহার কতটা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং কতটা মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করিয়া লওয়া আমাদের অসম্ভব নহে।" আরব-রাজনীতিকের প্রবর্ত্তিত নিয়ম পালন করা যতই কষ্টকর হউক না কেন, ইতিহাসের ধারা নির্ণয়ে তাঁহার উদ্যমের ভিতর দিয়া অপূর্ব্ব সত্যানুসন্ধিৎসা, ও স্বাধীন চিন্তাশীলতা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। সেই জন্য মধ্যযুগের দার্শনিক ভাবাপন্ন ঐতিহাসিকদের মধ্যে তিনি গরীয়ান আসন-লাভ করিয়াছেন। উপরি-উক্ত উদ্ধৃত বচনে, Deductive Method দৃষ্ট হইলেও, ইব্‌নে খালদূন স্বকীয় সিদ্ধান্তের পক্ষে নজীর উপস্থাপিত করিতে কখনও কসুর করেন নাই। তিনি যে অসামান্যরূপে Inductive, ইহা এই কথা হইতে প্রমাণিত হয় যে ইতিহাসের দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার সাধারণ মতের পোষনার্থ তিনি বিরাট গবেষণা করিয়া গিয়াছেন—এবং ঐ গবেষণার ফলগুলি তাঁহার "সাধারণ ইতিহাসে" স্থান পাইয়া আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। সভ্যতার মর্ম্মের সহিত নিগূঢ় ও মুখ্যভাবে সম্পর্কিত কতকগুলি কথা বোধগম্য করিবার জন্য এবং কতকগুলি জটিল প্রশ্নের সমাধানার্থ ঐ গ্রন্থের কতক অংশ লিখিত হইয়াছিল। ইবনে খালদূন বলেন যে কতকগুলি গুণদ্বারা মানুষকে সৃষ্টির অবশিষ্টাংশ হইতে চেনা যায়, এবং সেগুলি বিশেষ করিয়া মানবের স্বধর্ম্ম; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি যথা :—

(১) কলা ও বিজ্ঞান দ্বারা মানুষকে পশু হইতে

পৃথক করা যাইতে পারে এবং সেগুলি মানুষের চিন্তা-প্রসূত।

(২) কর্ত্তৃত্বের আবশ্যকতা—প্রাণী-জগতে একমাত্র মানুষই ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে, যেহেতু উক্ত কর্ত্তৃত্ব ব্যতিরেকে সে জীবন ধারণ করিতে পারে না। মধুমক্ষিকা ও পঙ্গপালের মধ্যে শাসন-তন্ত্রের একটা রূপ দৃষ্ট হইলেও, উহা তাহাদের ধর্ম্মজ, চিন্তাপ্রসূত নহে।

(৩) কাজ ও লাভ করিবার ক্ষমতা তাহার ভরণ-পোষণের উপায়।

(৪) সঙ্ঘবদ্ধ হইবার আগ্রহ—ইহার ফলে সমাজ গতিশীল হয়। অভাবের তাড়নায় জীবিকানির্ব্বাহের নূতন নূতন পথ পরস্পরের সাহায্যে আবিষ্কৃত হয়—ইহার ফলে শিল্পের জন্ম হয়।

সঙ্ঘের দ্বিবিধ-রূপ দৃষ্ট হয় (১) যাযাবর-জীবনে এবং (২) উপনিবিষ্ট জীবনে। এই প্ল্যান অনুযায়ী ইবনে খালদুন তাঁহার প্রথম গ্রন্থে ছয়টী বিভাগ করিয়াছেন।

(ক) মানুষের সঙ্ঘ এবং জাতিসমূহে ও দেশবর্গে পার্থক্য।

(খ) যাযাবরদের, বিশেষতঃ অর্দ্ধ-সভ্য গোত্র ও জাতিদের সঙ্ঘ।

(গ) শাসন-তন্ত্রের রূপ—খিলাফৎ, রাজতন্ত্র, এবং প্রত্যেক শাসনতন্ত্রের অধীনে প্রয়োজনীয় পদ।

(ঘ) উপবিষ্ট জনগণের সভ্যতার বিশিষ্টরূপ এবং নগর ও প্রদেশের প্রয়োজনীয়তা।

(ঙ) বাণিজ্য, শিল্প ও জীবিকা-নির্ব্বাহের অপরাপর পন্থা।

(চ) বিজ্ঞান সমূহ এবং সেগুলি হইতে জ্ঞানলাভের উপায়।

তাঁহার গ্রন্থের এই প্ল্যান দর্শনে ইহা প্রতীয়মান হয় যে সভ্যতার ইতিহাস অর্থে তিনি বুঝিয়াছেন জাতির মানসিক অগ্রগতির বিবরণ—আধুনিক য়ুরোপবাসীদের ইতিহাসের বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা হইতে ইবনে খালদুনের ধারণা বিসদৃশ নহে।

ইবনে খালদুনের মতে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উপর খাদ্য ও আবহাওয়ার প্রভাব বিদ্যমান দেখা যায়। আরব ইতিহাস-বেত্তা বলেন যে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা ও উন্নতি জীবনযাত্রার পথে পারিপার্শ্বিকের মুখাপেক্ষী। ইবনে খালদুন ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে যে সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাই গত শতাব্দীতে ইউরোপ-খণ্ডে বহুলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। আরব ভৌগোলিকের মত, তিনিও বিষুব-রেখা হইতে সুমেরু পর্য্যন্ত ভুভাগকে সপ্ত অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। বিষুব-রেখার অব্যবহিত উত্তরে অবস্থিত প্রথম দুই অংশে প্রখর সূর্য্য-রশ্মি ও প্রচণ্ডতাপের প্রভাব রহিয়াছে। তিনি বলেন এই অংশের অধিবাসীদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য—কৃষ্ণচর্ম্ম এবং মানসিক বৈশিষ্ট্য, যত্নহীনতা, চিন্তাশীলতার অভাব, এবং ভবিষ্যতের ভাবনা শূন্যতা। শেষ দুই অংশে তাপ অতি অল্প অনুভূত হয় এবং শীতের দারুণ প্রকোপ। এখানকার অধিবাসীদের বৈশিষ্ট্য শ্বেত-চর্ম্ম ইহাদের এবং প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর যুঝিতে হয়—সেইজন্য ধৈর্য্য, সাহস, শ্রমশীলতা ইহাদের প্রকৃতির অঙ্গ। মানসিক গুণ ইহাদের অল্প মাত্রায় আছে,...যেহেতু মানসিক গুণ কর্ষণ করিবার অবকাশ ইহাদের অত্যল্প। অল্প ও অধিক তাপের অংশগুলি মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম অংশ। এইখানের অধিবাসীগণ কি শারীরিক, কি মানসিক সকল প্রকার গুণ-মণ্ডিত। ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহাদের সভ্যতায়, জীবন-যাপনের প্রণালীতে, সুকুমার কলাশিল্প এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা-প্রণয়নে। তাহারা পয়গম্বর পাইয়াছে, সাম্রাজ্য গড়িয়াছে, রাজ-বংশের সৃষ্টি করিয়াছে, আইন-প্রণয়ন করিয়াছে, জ্ঞান-প্রসারে ও গ্রহণে সচেষ্ট রহিয়াছে। যে-সকল জাতি এই মধ্য অংশগুলির অধিবাসী, তাহারা আরব, রোমান, গ্রীক, পারসিক, বাবিলোনিয়ান, আসিরিয়ান, মিশরী, হিন্দু, চীনা ইত্যাদি।

"মেষপালের দুগ্ধ ও মাংসের উপর নির্ভরশীল যাযাবর জাতিরা," প্রাচুর্য্য ও বিলাসিতার মধ্যে প্রতিপালিত নাগরিকদের চেয়ে শারীরিক ও মানসিক গুণে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু প্রথমোক্তরা উত্তম ও স্বাস্থ্যজনক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বর্দ্ধিত। নৈতিক গুণরাজির বিকাশের উপরও খাদ্যের প্রভাব রহিয়াছে। ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতার অঙ্কে যাহারা কালাতিপাত করে, তাহাদের চেয়ে ক্ষুধার প্রকোপ সহনশীল, বিলাসিতা-বিরত লোকদের মধ্যে নৈতিক জ্ঞান অধিক প্রবল, ধর্ম্মবুদ্ধি অধিক জাগ্রত।" গ্রাম্য-জীবনের সারল্য ও নাগরিক

জীবনের চাকচিক্যের মধ্যে যে বৈলক্ষণ দৃষ্ট হয়, উহাই ইবনে খালদুনের মতে মানবজাতির ইতিহাস-গঠনে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবের বিশেষ উদাহরণ। ইবনে খালদুনের মতে রণ-পিপাসা ও বীরত্ব-রঞ্জিত অত্যদ্ভুত কার্য্য-সাধনে আগ্রহ এই দুইএর ভিত্তি হইতেছে মেষপালকের সরল-জীবন।

জাতীয় জীবনের আদর্শ ভিত্তি

গোত্র-গঠনকে ভিত্তি করিয়া, জাতি ও সাম্রাজ্যের উদয়, উন্নতি ও বিলয় সম্বন্ধে ইবনে খালদুন নিজের মত গঠিত করিয়াছেন।

"জাতির ভিত্তির সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় জিনিষ হইতেছে সাম্প্রদায়িক-ভাব বা বর্ত্তমান মতানুসারে জাতীয়তা-বাদ। সম্প্রদায়ের সাহায্য ব্যতিরেকে কেহ কোন সাম্রাজ্য গড়িতে পারে নাই—কোন রাজবংশ স্থাপন করিতে পারে নাই। এবং রাজবংশের স্থিতি ও জীবনীশক্তি ঐ সাম্প্রদায়িক বা জাতীয়ভাবের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

দ্বিতীয় জিনিষ হইতেছে ধর্ম্ম।—ধর্ম্মই একমাত্র জিনিষ যাহা ব্যক্তিগত কলহানল নির্ব্বাপিত করিতে সক্ষম, যাহার অনুপ্রেরণায় মানুষ স্বার্থ-বিসর্জ্জন দেয় এবং যাহার প্রেরণায় মানুষ ঐক্য-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ধর্ম্মের এইরূপ অসামান্য শক্তি থাকায়, উহা জাতীয় জীবনের মূলে রস সঞ্চারিত করে। যখন কোন জাতি জ্বলন্ত ধর্ম্ম-বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়, তখন যে কোন দিকে সামান্য প্রেরণা পাইলে, উহা যে ভীম গতিতে অগ্রসর হয়, তাহা বাস্তবিকই কল্পনা-তীত। যে সকল নৈতিক গুণের প্রভাবে চিত্ত উদ্বোধিত হয় এবং কল্পনা অনুরঞ্জিত হয়, সেইগুলির উপরই সংগ্রাম-সাফল্য নির্ভর করে। হইতে পরে কখনও কখনও সংখ্যাধিক্যে, অস্ত্র-শস্ত্রের উৎকর্ষে, আক্রমণের প্রাবল্যে বিজয়লাভ সম্ভবপর হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক নৈতিকগুণের তুলনায় ঐগুলি অতি অল্পই ফলপ্রদ।"

রাষ্ট্রের উদয় ও বিলয়

ইবনে খালদুন বলেন, "সম্প্রদায়বহুল দেশে রাজ্য-স্থাপন দুষ্কর। সেখানে বিভিন্নমুখী চিন্তা ও স্বার্থের সংঘর্ষে দেশের উন্নতি প্রতিহত হয়। আন্দালুসিয়ায় মোসলেম সিংহাসন সর্ব্বদা টলটলায়মান—যেহেতু সেখানকার আরবগণ বিভিন্ন দলভুক্ত। পক্ষে রোমকেরা সম্প্রদায়গত বৈষম্য তরবারি-বলে তিরোহিত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এখনও জাতি-গঠনে সমর্থ হইয়াছেন। আরবে অসংখ্য সঙ্ঘ থাকায়, কোন একটী শক্তিশালী রাজ্য-সৃষ্টি আদিম যুগ হইতে এ পর্য্যন্ত গঠিত হইতে পারে নাই। জার্ম্মানীতে অতি প্রাচীন সম্প্রদায় সমূহের উপস্থিতি সাম্রাজ্য গঠনের পরিপন্থী।" [সামরিক ও রাজনৈতিক সাফল্যের দরুণ ইদানীং জার্ম্মানীতে জাতীয়-ভাব জাগরিত হইয়াছে।]

ইব্‌নে খালদুনের মতে নিম্নলিখিত চক্রে ইতিহাস-সৃষ্টি হয়।

(১) মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার প্রবৃত্তি, সমাজের উদয়, গোত্র গঠন, এক সম্প্রদায়ের উপর অপর সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব বিস্তার, রাজবংশের উদয়, রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধি।

(২) যাযাবর (গ্রাম্য) জীবন হইতে উপনিবিষ্ট (নাগরিক) জীবন।

(৩) সভ্যতা-বিস্তার, বিলাসিতা-বৃদ্ধি, রাজশক্তির হীনদশা, অন্তর্বিপ্লব, নবীন রাজশক্তির উদয়।

ইবনে খালদুনের মতে সাধারণতঃ তিন পুরুষ ধরিয়া রাজবংশ স্থায়ী থাকে।

"স্থাপয়িতার সময়—গ্রাম্যজীবনের সরল রীতি-নীতি, অপকট আচার-ব্যবহার, যৎকিঞ্চিৎ বিলাসিতা, লুণ্ঠনপ্রিয়তা প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। তরবারিতে মরিচা ধরে না, প্রতি-বেশীরা সন্ত্রস্ত থাকে, বৈদেশিকেরা আনুগত্য জ্ঞাপন করে।"

"দ্বিতীয় পুরুষের সময়—প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ততা দৃষ্ট হয়, উপনিবিষ্ট জীবনের আচার ব্যবহার প্রচলিত হয়—সমস্ত কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা একে ন্যস্ত হয়—পূর্ব্বের তীব্র সাম্প্র-দায়িক-ভাব হ্রাস পাইতে থাকে।"

"তৃতীয় পুরুষের সময়—সরল জীবন-যাপনের কথা বিস্মৃতি-গর্ভে স্থান পায়—যশের মুকুট পরিবার আকাঙ্ক্ষা আর উদ্দীপিত হয় না—সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত শক্তি লুপ্ত হয়, জনগণ বিলাস-ব্যসনে নিমগ্ন হয়, শৌর্য্য-বীর্য্য হারায়—তাহাদের আত্মরক্ষার্থ সাহসটুকুও চলিয়া যায়—তাহারা বাহিক আড়ম্বর অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টিত হয় এবং প্রত্যেক বিষয়ে বাহাদুরী দেখায়। উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত সমারোহ ও বিলাসিতার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ও রাজস্ব রক্ষার

জন্য রাজাকে বাধ্য হইয়া বৈদেশিক পরাক্রান্ত শক্তির নিকট অধমর্ণ সাজিতে হয়।

"৪র্থ পুরুষের সময়—গৌরব ও প্রতাপ-সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হয়।"

"তিন পুরুষের রাজত্বের স্থায়িত্বকাল প্রায় ১২০ বৎসর, এবং ইহাই রাজবংশের মোটামুটি আয়ু। যদি রাজবংশ আরও কয়েকদিন টিকে, তবে সেই স্থিতি বাহির হইতে আক্রমণের অভাবের দরুণ। ইহা সৌভাগ্যের কথাই ভাবিতে হইবে। যদি বাহিরের শত্রু মোটেই দেখা না দেয়, তবুও রাষ্ট্র হীনদশায় উপনীত হয়। সৈন্য-বিভাগে দৌর্ব্বল্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা, রাজস্ব-বিভাগে অনটন অনাচার ধ্বংসের অগ্রদূতরূপে দেখা দেয়।"

"সভ্যতার চূড়ান্ত-কালের মধ্যে ধ্বংসের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত নিহিত থাকে—তারপরেই চক্রের অধোগমন—তারপরেই দিকে দিকে ধ্বংসের বিষাণ বাজিয়া উঠে।"

* * * *

"তবে কি বিরাট সভ্যতা-গঠন সম্ভাবনাতীত? মোটেই অসম্ভব নহে। কিন্তু সে সভ্যতার পিছনে সুদৃঢ়, অপ্রতিহত-প্রভাব রাজশক্তি, এবং দেশের শান্তি ও সুস্থিতি থাকা চাই-ই চাই।" এইখানেই ইবনে খালদুন মোসলেম ইতিহাসের মর্ম্ম-স্থল স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, "রাজনীতি-সাগর বীচি-বিক্ষুব্ধ থাকায়, প্রাচ্য-সভ্যতার তরণী গন্তব্য-স্থলে উপনীত হইতে পারে নাই। সিংহাসনের উত্তরাধিকারিতা সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট প্রথা থাকিলে, ইস্‌লামিক সভ্যতার ভিত্তি আরও দৃঢ় হইত, এতদিনে তার মিনার নভোচুম্বী হইত।"

* * * *

সুলতান ১ম মোহম্মদের সময়, ইব্‌নে খালদুনের গ্রন্থ তুর্কী-ভাষায় অনূদিত হয়, এবং তদবধি রাজনৈতিক বিজ্ঞতা-লাভের পক্ষে উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক বলিয়া বিবেচিত হইত—সমুদায় তুর্কী-রাজনীতিবিদের উহা অপরিহার্য্য ছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তুর্কীগণ গ্রন্থের কথা হৃদয় দিয়া গ্রহণ করে নাই, কেননা ইব্‌নে খালদুনের বর্ণিত রাষ্ট্রের পতনের বর্ণনা—শেষ তুর্কী-সুলতানদের সরকারের অবস্থার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যায়।

কিন্তু সকলই বৃথা। কেননা মহাগ্রন্থ কোরাণ বলিতেছেন, "তাহারা সেই ব্যক্তির মত যে অগ্নি প্রজ্বালিত করে, এবং যখন তাহা তাহার চারিধারে আলোক-সম্পাত করে, আল্লাহ্ সেই আলোক অপসারিত করেন—তাহাদিগকে অন্ধকারে রাখিয়া দেন—তাহারা দেখিতে পায় না! মূক, বধির, অন্ধ তাহারা ভ্রমের পথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে না।"

রূপ-হীনা

রাজিয়া খাতুন

কলিকাতা মহানগরীর একপ্রান্তে সুসজ্জিত আরামবাগ। শোনা যায় এ অঞ্চলের অধিবাসীরা অতীত যুগের কোন এক বাদশাহের অধস্তন একাদশ বা দ্বাদশ পুরুষের দাবী করেন। হয়ত তাই, কিন্তু ভালো জিনিষ কাজে লাগার পরে অবশিষ্ট যেমন অ-কেজোর চেয়েও বেশী কিছু হয় এও সেই রকম। অধিকাংশ অর্থাৎ শতকরা নিরানব্বই জন গুণধরই মদ, জুয়া ও বাইজির চরণে সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়া খোলার ঘরে বাসা বাঁধিয়াছেন, তবু চাল চলনে বড় কম যান না, যাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁহারা সমস্ত দিন চালের ছায়ায় বসিয়া মাটিয়া গুড়গুড়িতে তামাক টানেন ও সম-অবস্থাপন্নের সহিত ফরক্কাবাদী বাইজী ও বত্রিশ টাকা ভরির তামাকের বর্ণনা করেন, সে তামাকের কাছে কোথায় লাগে আতরের খোশবু?—পরক্ষণেই হয়ত নাতনিকে ডাকিয়া তামাক দিতে বলিলে সে ছিন্ন মলিন আঁচল ও তৈলহীন রুক্ষ চুল দুলাইয়া বলে, "এক পয়সার তামাকে আট চিলিমের বেশীতো হয় না দাদা?" বৃদ্ধ কিছুক্ষণ গুম হইয়া থাকে।

মাসের প্রথমে সরকারি তলব আসে পঞ্চমুদ্রা; বিজিতের প্রতি বিজেতার অনুগ্রহ, দুই একবেলা ছেলে বুড়ো সকলেই কলরব করিয়া পোলাও কোর্ম্মা খায়, তারপরে যুবকেরা তেড়ি কাটিয়া উগ্রগন্ধি বিড়ি মুখে দিয়া, রাত্রে ফিরে দ্বিগুণ উগ্রগন্ধ ও চতুর্গুণ কড়া মেজাজ লইয়া, খুব বে-এখতেয়ার হইয়া না পড়িলে পত্নীর কষ্টার্জ্জিত দুই চারি আনা পয়সা লইয়া আবার বাহির হয়। তরুণী-বধূ নৈশ-আকাশের দিকে চাহিয়া কাঁদে ও কতগুলি ঠোঙ্গা বিক্রয় করিয়া পয়সাগুলি জমাইয়াছিল তাহাই ভাবে। শিশু ও বৃদ্ধদের সারামাসের অন্ন-সংস্থান এই নারীরাই করে, তারা কাগজের ঠোঙ্গা তৈয়ার করে, কোর্ত্তা সেলাই করে, কসিদার কাজ করে, পাইকার আসিয়া নামমাত্র মূল্যে কিনিয়া নেয়, এছাড়া উপায় কি? ছেলেরাও তো কোন কাজে লাগে না, সমস্তদিন পথে পথে ঘুড়ি উড়ায়, বন্ধু-বান্ধবদের পয়সায় চা-খায়, সুযোগ মত পকেটও মারে, নেহায়েৎ না জুটিলে ঘরে আসিয়া উৎপীড়ন করে। আরও কত উপসর্গ আছে, নগরের কোলাহল না থাকিলেও "কাপড়া ওয়ালা" "মালাই বরফ" "বেলফুল" "গরম চা" "চুড়ি চাই" "হরেক রকম খেলনা" ইত্যাদির তো অভাব নাই। অভাব, উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা-জর্জ্জরিত তরুণ মনগুলিও কাঁচের চুড়ি, ফুলের মালা ও এক পয়সার রঙে রঙিন কাপড় পরিয়া কাহিনীর-মত-শোনা সেই অতীতের হীরা-পান্নার গহনা ও মণি-মুক্তাখচিত পোষাকের অভাব মিটায়, ভাঙ্গা-ঘরে সহস্র দীপাবলী-উজ্জ্বলিত রঙ্গমহলের স্মৃতি ফিরাইয়া আনে।

এই মরণোন্মুখ বস্তিরই মাঝখানে আরামবাগ, ঠিক যেন পড়ো-বাগানের অযত্ন-বর্দ্ধিত রৌদ্রদগ্ধ আগাছার মধ্যে ফুটন্ত গোলাপ। ইহার বর্ত্তমান মালিক পিতার একমাত্র পুত্র। পিতা ছিলেন খামখেয়ালী, মা'টি ছিলেন ইরাণী, তাই এঁর মাথারও ঠিক ছিল না, রূপেরও সীমা ছিল না, অথচ বংশানুক্রমিক অন্য কোন দোষ তাহার মধ্যে মোটেই দেখা যাইত না, সুতরাং চতুর্দ্দিকের সমান ঘরের কুমারী-কন্যার জননীরা যে পরিমাণে তাহাকে জামাতারূপে কামনা করিত তার চেয়ে অনেক বেশী করিত নিন্দা, কেননা সে কোন জালেই ধরা দিতে চাহিত না। বিবাহ সম্বন্ধে তাহার ধারণা ছিল একটু অদ্ভুত রকমের, সে বলিত, "বিয়ে করা মানে একটি খেয়ালী জীবের অধীনতা স্বীকার করা, সে হাসাতে, কাঁদাতে বা নাচাতে সবই পারে, কাজাক অমন গোলাম হ'য়ে?"

মা, বোন না থাকিলেও অন্দর মহলে মানুষের অভাব নাই। দূরসম্পর্কীয়া এক চাচি-আম্মা চারি কন্যারত্ন সহ বিরাজ করিতেছেন। বড়টি বিশ বছরের, অন্য তিনটি আঠার, ষোল ও চৌদ্দ বছরের, নাম মাহবুব জাহাঁ, মাহতাব জাহাঁ, হাশমৎ আরা ও মমতাজ আরা, বড় তিনটি প্রখরা ও সুন্দরী। ছোটটি শিশির-ভেজা কচি ঘাসের মত করুণ লাবণ্যমাখা ও শ্যামা, এক বাঙ্গালী খিলাই তাকে মানুষ করিয়াছে তারই দেওয়া ডাকনাম "নীলা"।

থাকে এরা প্রাচীর ও পর্দ্দার আড়ালে বুঝিবা চন্দ্র সূর্য্যেও দেখে না। বড় তিন বোন নয়টার আগে ওঠে না, ওঠা বোধ হয় শাহাজাদীদের নিয়মও নয়। বিছানায় বসিয়াই চা পান করা চলে, তারপরে মুখ ধুইয়া, চুল বাঁধিয়া কাপড় ছাড়িয়া বারটায় নাশতা-পর্ব্ব ও চারিটায় খানার আয়োজন হয়। মমতাজের এতটা সহিত না, সে ভোরেই উঠিয়া পড়িত, পুরাতন মহলের সম্মুখ ভাগটা নূতন ধরণে সংস্কার করিলেও পেছনে সেই সাবেক প্রাচীর-লতার মত সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উঠিয়া মমতাজ ছায়াটির মত সেখানে ঘুরিত। ভাঙ্গা ফোয়ারা, জীর্ণ হাম্মাম, পুরাতন প্রকোষ্ঠ পূর্ব্বপুরুষদের স্মৃতি-জড়িত—এসব স্থানে কি যেন অজানা রহস্য সুপ্ত রহিয়াছে। পূর্ব্বে যাহারা এখানে বাস করিত তাহাদেরও সুখ দুঃখ ছিল, হাসি গানে রূপে গন্ধে সুরে ঝঙ্কারে যেস্থান মুখরিত ছিল, আজ তা গোরস্থানের মত নীরব, চাহিয়া চাহিয়া মমতাজের চোখের পলক পড়িত না। একধারে ছোট্ট একটু বাগান ছিল তার, বাহির মহলের বিচিত্র সুন্দর প্রজাপতির মত বাগানের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। কুমারীর অম্লান হিয়ার মতই যুঁই, বেলা, রজনীগন্ধা, হাস্নহানা ও কামিনী বাগান আলো করিয়া ফুটিত। মাঝে মাঝে নব অনুরাগের মত রঙিন বসোরা গোলাপও ফুটিত। সকাল বিকাল মমতাজের অনেকটা সময় এই বাগানের পরিচর্য্যায়ই কাটিত, বোনেরা সুন্দর মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটাইয়া বলিত, "মালিকে ডেকে বললে অমন কত বাগান হয়! তা নয় নিজের হাতে করা! করুক, যেমন রূপের বাহার; কার ঘরে পড়বে কে জানে? কাজ করেই তো খেতে হ'বে।"

তাদের মা'র মনে আশা ছিল জাহাঁগীর যদি তাঁর কোন মেয়েকে বিবাহ করে তবে তিনি জীবনের বাকী দিন কয়টা সুখ শান্তিতে কাটাইয়া দিতেন, কিন্তু বেয়াড়া ছেলে তাঁহার পরবর্ত্তি নাম যে ঘুচাইবে সেরূপ সম্ভাবনা আছে বলিয়া তো বোধ হয় না। সে নিজে বা তাহার কোন দাসদাসী পরের ঘর বলিয়া তাঁহাকে বুঝিতে না দিলেও ঈর্ষান্বিত আত্মীয় কুটুম্বেরা, নানা কথাই বলিত। একদিন তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া বৈকালের নাশতার সময় একথা সেকথার পর বলিলেন, "বাবা! তোমার বোনেরা সেয়ানা হ'য়েছে ওদের বিয়ের তো একটু চেষ্টা করতে হয়, বড় তিনটির জন্য দু'এক জায়গা হতে কথাও এসেছে। নীলা দেখতে তেমন ভাল নয়, এত ছাপাই তবু কি ক'রে যে লোকে জানতে পারে আল্লাই জানেন, এক পয়গাম পাঠিয়েছিল বুড়ো বাহাদুর খাঁ, আমি বলি কি বয়স পঞ্চাশ হ'লে কি হয়, টাকা পয়সা আছে বেশ সুখে থাকবে দিলেও মন্দ হয় না,—তুমি কি বল? ওকে বাদ দিলে আমার মেয়েরা রূপে গুণে কারো চেয়ে কম নয়। তুমি যদি কোন একজনকে বিয়ে কর সে তো সবদিক দিয়েই ভাল হয়।"

জাহাঁগীর নীরবে শুনিল, খাওয়ার পর হাত ধুইতে ধুইতে বলিল—"মাফ করবেন চাচি আম্মা আমি বিয়ে করব না। তবে ওদের যাতে ভাল বিয়ে হয় সে চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না।"

কৌতূহলাক্রান্তা চাকরাণীদের কৃপায় ব্যাপারটা মেয়েদের কাছেও গোপন রহিল না, রূপসী কুমারী তিনটি প্রত্যেকেই এ বাড়ীর ভবিষ্যৎ গৃহিণী হওয়ার আশা রাখিত। তাই তাহারা এতবড় অপমানে জাহাঁগীরের মুণ্ডু চিবাইয়া খাওয়ার উদ্যোগ করিল। নীরব রহিল শুধু রূপহীনা মমতাজ।

মায়ের মত স্নেহময়ী চাচি-আম্মাকে আশাভঙ্গের বেদনা দিয়া জাহাঁগীরের মনেও শান্তি ছিল না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সে খোলা ছাদে পায়চারি করিতে করিতে ভাবিল কি করা কর্ত্তব্য, তাঁর প্রস্তাবে স্বীকৃত হওয়া যায় কি? জীবনটা এমন ছন্নছাড়ার মতই কি সে কাটাইবে? একটি নারীকে যদি সুখে সুখী, ব্যথার দরদীরূপে পাওয়া যায় তো মন্দ কি? কিন্তু এই শাহজাদীদের মধ্যে কি তেমন কেহ আছে? বিড়ালের গায়ে কেরোসিন তেল মাখিয়া আগুন ধরাইয়া যাহারা তামাসা দেখে- না কিছুতেই নয়!

দ্বিপ্রহরে এক কাপড়ওয়ালী নানা রকমের কাপড় লইয়া আসিয়াছে। চারিদিকে রঙের পশরা সাজাইয়া সে বসিল, সকলেই কাপড় বাছিতেছে, মাহবুব জাহাঁ একখানা রূপালি বুটিতোলা গাঢ় নীল রঙের ঢাকাই সাড়ি গায়ের উপর ফেলিয়া দেখিতেছিল, উজ্জ্বল গৌরবর্ণে কেমন মানাইয়াছিল। কাপড়ওয়ালী বলিল, "ওখানা নিতেই হ'বে বেগম সাহেবা, দাম কাপড়ের তুলনায় কিছু নয়, মোটে ত্রিশ টাকা, বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।"

একটু হাসিয়া মাহবুব জাহাঁ কাপড়খানা তুলিয়া

লইল, মমতাজ একটু দূরে বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিল, সকলের কাপড় লওয়া হইলে মা ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি কাপড় নিলেনা যে নীলা ?"

সে ঘাড় নাড়িয়া নিষেধ করিল, বোনেরা কৌতুক-হাস্যে গৃহ মুখরিত করিয়া বলিল "ও নেবে কেন আম্মা ? দু'দিন পরে রাজা বাদশার সঙ্গে বিয়ে হ'বে, দশ বিশ হাজার টাকার এক এক শাড়ি পরবে, ওর কি এসব চোখে লাগে ? বাহাদুর শা-ই বা রাজার চেয়ে কম কি ? ঢের টাকা আছে।"

মমতাজ রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "লজ্জা থাকলে আর একথা বলতে না, পরের টাকায় শাড়ি পরতে খুব আরাম, না ? এইতো সেদিন অতটাকার কাপড় নেওয়া হলো, কেন আমরা ওর টাকা খরচ করব ?

সকলেই কিছুক্ষণ অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, একটু পরে তীক্ষ্ণকণ্ঠ আরও শানাইয়া মাহবুব জাহাঁ বলিল "এত দরদ কেনগো ? তোমার স্বামীর পয়সা নাকি ? তবু যদি সকল গুষ্টির কপালে কালি না দিত।" ব্যথা-ভরা সুরে মমতাজ বলিল "স্বামীর পয়সা হ'লে আপত্তি ছিল না—গুষ্টির কপালে লাথি দিয়েছে বলেই তো ওর পয়সা খরচ করতে ঘৃণা হয়, শক্তি থাকলে এ বাড়ীর ভাত খাওয়াও ছাড়তুম।"

মাহবুব জাহাঁ উত্তর দিল, "ঠিক তাই, যে পেত্নীর ছুরত, এবাড়ীর ভাত খেতে হবে না, ঐ তো টাকাওয়ালা বুড়ো পয়গাম পাঠিয়েছে, খুব খেতে পরতে পারবি"—এবার মমতাজের চোখে শ্রাবণের ধারা নামিল।

একটু আগে কি কাজে চাচি আম্মার খোঁজে আসিয়া সেখানে মেয়েদের উপস্থিতিতে বাহিরে দাঁড়াইয়া জাহাঁগীর ইতস্ততঃ করিতেছিল, সমস্ত কথাই সে শুনিল। মাহবুব জাহাঁ চুপ করিলে অগ্রসর হইয়া দেখিল দুটি কাজল চোখে সন্ধ্যার আঁধার ও বর্ষার বারি একই সঙ্গে নামিয়া আসিয়াছে, কি ব্যথা ও লজ্জা সেই চোখে! ওই লজ্জা মুছাইতে ও ব্যথা ঘুচাইতে কি সে পারে না ? জাহাঁগীর দুনিয়া ভুলিল, একটু আগে তাকে যে ঘৃণা করে বলিয়াছে তাও ভুলিল। যে কোমল তেজস্বিতা ও সতেজ তরুণ মন সে তার মানসীর মাঝে কল্পনা করিয়াছে এইতো সে, কোনদিকে না চাহিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া চাচি-আম্মাকে সালাম করিয়া বলিল "আম্মা! আপনি যদি খুশী হয়ে দেন তবে মমতাজকে আমি চাই।"

এই সংবাদ অন্দর-মহলে যখন গিয়া পৌঁছিল, তখন সেই পুরাণো বাড়ীর সুন্দরী কিশোরীদের মধ্যে এক নিরুদ্ধ রাগ ও ঈর্ষ্যার প্রবাহ বহিয়া গেল। তাহারা সকলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, আর ভাবিল, সে-কাল আর নাই রূপের মর্য্যাদা দিবে কে ?

গৌড়-পাণ্ডুয়ার মোস্‌লেম কীর্ত্তি-কাহিনী

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

মোজাম্মেল হক

বহু দিবস পূর্ব্বে—তখনও গৌড় গভীর জঙ্গলাবৃত—একজন সাহেব হস্তী—আরোহণে তথায় শিকার করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে লাঠী ও বর্শাধারী কতকগুলি কুলীও ছিল। তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে এক স্থানে গিয়া দেখেন, একটা মোটা লোহার শিকল জঙ্গলের মধ্যে লম্বভাবে পড়িয়া আছে। তাহার অগ্রভাগটী একখানি বৃহৎ পাথরে বাঁধা। শিকলটী এ ভাবে পতিত কেন? এবং ইহা কোথায় গিয়া শেষ হইয়াছে, ইহা জানিবার জন্য সাহেবের অতীব আগ্রহ জন্মিল। তিনি প্রথমে শিকল যে দিকে পড়িয়া আছে, সেই দিকের বনমধ্যে একটী বন্দুক আওয়াজ করিলেন; তৎপরে শিকলের আশে পাশের জঙ্গল কুলীদের দ্বারা কাটিতে কাটিতে কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া এক স্থানে ইট দিয়া গাঁথা একটি অর্দ্ধ বৃত্তাকারের ভিত্তি দেখিতে পাইলেন। শিকলটী এই ভিত্তির উপর দিয়া গিয়া উহার গায়ে লাগিয়া নিম্নভাগে জলে ডুবিয়া আছে। সাহেব চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন, নিম্নের এই জলভাগটী ভাগীরথীর খাড়ী; যখন ভাগীরথী গৌড়ের পার্শ্ব দিয়া প্রবল প্রবাহে প্রবাহিত হইত, তখন এই খাড়ীও জলে ভরপূর ছিল, এখন তাহার সঙ্কীর্ণ খাত বিদ্যমান খাতের জলভাগও নিতান্ত কম। আর বোধ হয়, এই ভিত্তির কোলে জাহাজ বা নৌকা আসিয়া ভিড়িত এবং এই শিকলে তাহা বাঁধিয়া রাখিয়া মালপত্র নামাইত এবং বোঝাই দিত। সাহেব এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া শেষে কুলীদিগকে শিকল টানিতে বলিলেন। চারিজন কুলী শিকল টানিয়া ডেঙ্গায় তুলিতে লাগিল। কিন্তু যত টানে, ততই উঠে, শিকলের আর শেষ হয় না, চারিজন কুলী ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তাহাদিগকে বিশ্রাম করিতে দিয়া অন্য চারিজন শিকল টানিতে সুরু করিল। এইরূপ পালাক্রমে চারি চারিজন শিকল টানিয়া শেষে সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িল, শিকলও রাশীকৃত জমা হইল, কিন্তু শিকলের প্রান্তভাগ মিলিল না। ব্যাপার কি! কি অত্যাশ্চর্য্য তামাসা!! সাহেব অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন—"আর অধিক বেলা নাই, আজ এই পর্য্যন্ত থাকুক, কাল প্রভাতে আসিয়া আবার দেখা যাইবে। ইহা বলিয়া সাহেব সদলবলে জঙ্গল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পরদিন প্রভাতে সাহেব আসিয়া দেখেন—সে রাশীকৃত শিকল মাটীতে আর নাই, সমস্তই সেই জলমধ্যে নামিয়া গিয়াছে। তিনি কুলীদিগকে অনেক বকাবকি করিলেন বলিলেন "তোদেরই অনাবধানতায় শিকল জলে গিয়া পড়িয়াছে; যাহা হউক, কুলীরা আবার শিকল টানিয়া তুলিতে আরম্ভ করিল। সারাদিন টানিয়া শিকলের একটা মস্ত গাদা হইল। এবার সাহেবের হুকুমে শিকল আট দশ পাক একটা বৃহৎ বৃক্ষের গুঁড়ীতে জড়াইয়া দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া সাহেব অপরাহ্নকালে সদলবলে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, এবার শিকল আর কোনক্রমেই সরিয়া যাইতে পারিবে না। কিন্তু পর দিবস যথাকালে লোকজনসহ আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দেখিলেন বৃক্ষটী সমূলে উৎপাটিত হইয়া কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে, এবং উত্তোলিত তাবত শিকলই জলমধ্যে নামিয়া গিয়াছে। এ কি ভৌতিক কাণ্ড! না ইন্দ্রজালিক ব্যাপার! মানুষের কাজ তো এ নয়? মানুষ তো রাত্রিতে এখানে আসে না—আসিতে পারেও না। তবে কিরূপে এ কাজ ঘটিল?"

একজন কুলী বলিল "হুজুর, এ জেন-পরীর কাজ। মানুষের ক্ষ্যামতা কি এ কাজ করে। জেন-পরীরা রাতের বেলায় এসে গাছটী উপড়ে ফেলে শিকল টেনে পানিতে

ফেলে দিয়েছে।” সাহেব বলিলেন,—‘আচ্ছা আজ ফিরে চলো, কাল এসে জ্বেন-পরী দেখা যাবে।’

সাহেব পরদিবস দুইটী তাম্বু এবং বেশী লোকজন লইয়া আবার সেইস্থানে আসিলেন। এবার আর এক উদ্যমশীল-কর্ম্মী সাহেবও তাঁহার সঙ্গে আগমণ করিলেন। অদূরে তাম্বু খাটান হইল, একটি তাম্বুতে সাহেবদের খাদ্যসামগ্রী সজ্জিত হইল। এই নবাগত সাহেব সেই অর্দ্ধ গোলাকার ভিত্তির নিকটে গিয়া শিকলটী নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন, তৎপরে একগাছি বৃহৎ রসির অগ্রভাগে একখণ্ড ইষ্টক বাঁধিয়া নিম্নের পানিমধ্যে নামাইয়া দিলেন, ইট তরতর করিয়া নামিতে লাগিল। এ কি! রসি যত ছাড়ে, ততই নামে, নামার তো বিরাম হয় না! রসি ফুরাইয়া গেল, তখন অন্য এক গাছি রসি উহাতে বাঁধিয়া ছাড়িতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তল যে মেলে না! তবে কি এ অতল-স্পর্শ? এ রসিও যে শেষ হইয়া গেল!!! তখন সাহেব ক্রোধভরে একজন কুলীকে বলিলেন—“ওঠাও এ রসি, ওঠাও ঐ শিকল, আজ দেখা যাবে শিকলের শেষ কোথায়। আজ খুব শ্রম ও যত্নের সহিত কাজ করতে হবে। প্রথমে দুই জন শিকল টানিয়া লইয়া গিয়া তফাতে জমা করো, পরে আর দুই জন উহাদের শিকল ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ভিতের কোনে গিয়া শিকল টানিয়া লইয়া আইস। যাহারা প্রথমে টানিয়া লইয়া যাইবে, তাহারা শিকল ফেলিয়াই ভিতের কাছে গিয়া আবার শিকল টানিয়া আনিবে। এই চারিজন ক্লান্ত হইলে অন্য চারিজন গিয়া তাহাদের মত কার্য্য করিবে। আজ আর বিরাম দেওয়া হইবে না অবিশ্রান্ত কার্য্য চলিবে।”

কার্য্য চলিতে লাগিল। সাহেবদ্বয় কয়েকজন কুলী সঙ্গে লইয়া হস্তী আরোহণে শিকারে বাহির হইলেন। শিকলের মুড়ো যে কোথায়, ইহা জানিবার জন্য কুলীদেরও খুব আগ্রহ জন্মিয়াছিল, তাই তাহারা প্রাণপণ শক্তিতে শিকল টানিতে সুরু করিল।

গৌড়ে তখন নানাজাতীয় পক্ষীর অভাব ছিল না। সাহেবদ্বয় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কতকগুলি হাঁসজাতীয় পক্ষী শিকার করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। এবং স্তূপাকার শিকল দেখিয়া খুব খুসী হইলেন। সাহেবেরা নিজেদের মনোমত কয়েকটী পক্ষী রাখিয়া বাকীগুলি কুলীদিগকে দিলেন। সে দিন সকলের বড়ই আনন্দে আহারাদি হইল। অনন্তর সাহেবদ্বয় কয়েকজন কুলীকে জঙ্গলের শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্রের চারি দিকে পাঁচ ছয়টী যায়গায় গাদা করিতে আজ্ঞা দিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ব্যাঘ্র ভল্লুকের আক্রমণ নিবারনার্থ ঐ সকল রাশীকৃত কাষ্ঠে আগুণ ধরাইয়া দেওয়া হইল। তদ্ভিন্ন সাহেবরা তাম্বুতে কয়েকটী উজ্জ্বল আলোকও জ্বালিয়া দিলেন। এই উজ্জ্বল আলোকময় গণ্ডীর মধ্যে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কার্য্য চলিল। এই সময়ে কুলীরা বলিল —“হুজুর! আর শিকল টানিতে পারিতেছি না, এখন আর সহজে শিকল উঠিতেছে না—বহুত জোর দিতে হইতেছে।”

সাহেবরা বলিলেন —“বুঝা গিয়েছে, তোরা সারাদিন শিকল টেনে টেনে হালাক হয়ে পড়েছিস্, গায়ের বল কমেছে, তাই বোধ হচ্ছে, আগের চেয়ে বেশী জোর লাগ্‌ছে। কিন্তু তা নয়। আচ্ছা, আজ এই পর্য্যন্ত থাকুক, তোরা খাওয়া দাওয়া করে আরাম কর। কাল সকালে আবার দেখা যাবে।”

চারিদিকে আগুন দব্‌দব্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। আলোকের তেজে বনভূমি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সাহেবদ্বয় ক্যাম্প খাটে কাৎ হইয়া শুইয়া আছেন। কুলীরা আহারাদি সাঙ্গ করিয়া তাম্বুর সামনে শুইয়া পড়িয়াছে, কেবল কয়েকজন সজাগ থাকিয়া চতুর্দ্দিকের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। রাত্রি গভীর নিস্তব্ধ! ক্বচিৎ নিশাচর পশু-পক্ষীর আওয়াজ কাণে পৌছিতেছে। হঠাৎ শড়-শড়, শড়-শড়! এ কি শব্দ! কোথা হইতে এ শব্দ আসিতেছে? একজন সাহেব তাড়াতাড়ি তাম্বুর বাহিরে আসিয়া বন্দুক তুলিয়া বনের দিকে একটী আওয়াজ করিলেন। তবুও তো সে শব্দ থামিল না! বরং বেশীই বোধ হইতে লাগিল। জন কয়েক কুলী তাকাইয়া দেখে, শিকল সরিয়া যাইতেছে। যেন একটা বৃহৎ কালো সাপ তরতর বেগে পানির দিকে ছুটিতেছে। ‘আরে শিকলী ভাগিতেছে, জল্‌দী পাকড়াও,’ বলিয়া তিন চারিজন কুলী ছুটিয়া গিয়া শিকল চাপিয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকজন গিয়া টান ধরিল। কিন্তু শিকলের সে বিষম বেগের গতিরোধ করিতে তাহাদের সাধ্য হইল না। প্রথমের কুলী কয়েকজন শিকলের টানে

গাঁথনীর কোলে গিয়া জলের ভিতর পড়ে আর কি, এমন সময় একজন সাহেব উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"আরে পানিমে গির্ যায়েগা, ছোড় দেও, ছোড় দেও, জল্‌দী ছোড় দেও।" তখনই তাবত কুলীই শিকল ছাড়িয়া তফাতে আসিয়া দাঁড়াইল। সমগ্র উত্তোলিত শিকল অবাধ গতিতে তরতর শব্দে জলমধ্যে ডুবিয়া গেল। সাহেবদ্বয় আলো লইয়া গিয়া দেখিলেন, শিকল-নিমজ্জনের ঠিক নিম্নস্থান হইতে জল ঘূর্ণীপাক মারিয়া চারি পাঁচ হাত উঁচু হইয়া উঠিয়া যেন টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে লাগিল।

কি তাজ্জব তামাসা! সকলে দেখিয়া অবাক্। একজন সাহেব বলিলেন—"এমন কোন্ অদৃশ্য-শক্তি জলের ভিতর আছে যে, তাহার আকর্ষণে শিকল নীচে নামিয়া গেল? নিশ্চয় এ জেনেরই কার্য্য বটে।" দ্বিতীয় সাহেব বলিলেন – "তা নয়, এই জলভাগের সুদূর নিম্নে নিশ্চয় চুম্বক-পাহাড় আছে, তাহারই আকর্ষণে একাণ্ড ঘটিয়াছে। মাটী কাটিয়া সে পাহাড় বাহির করা সহজসাধ্য নহে। কোন অনুসন্ধান-বিশারদ বাদশাহ এখানে চুম্বক-পাহাড়ের অস্তিত্ব জানিতে পারিয়া তাহাতে শিকল সংলগ্ন করিয়া থাকিবেন; কিন্তু কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিকল সংলগ্ন করিয়াছিলেন, তাহা কে বলিবে?"

এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি প্রভাত হইল। সাহেবরা বিরক্ত হইয়া শিকলের গোড়া কাটিয়া দিয়া তাম্বু তুলিয়া লইয়া লোকজন সহ স্বস্থানে যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য, গোড়া কাটিবামাত্র শিকলটুকু শড়াৎ করিয়া পানির ভিতর নামিয়া গেল।

ইহা কপোলকল্পিত গল্প, কি সত্য কথা, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কোন ইতিহাসে ইহার উল্লেখ আছে কি না, তাহাও জানি না। ফলতঃ ইহা একেবারে যে অলীক তাহাও মনে হয় না। পাঠকগণ ইহার মীমাংসা করিবেন। এই তক্ আমাদের গৌড়ের কথা খতম হইল। অতঃপর আল্লাহ্‌তায়ালার মর্জ্জি হইলে পাণ্ডুয়া কাহিনী সকলের গোচর করিতে চেষ্টা করিব।

হজরত ঈসা (আঃ)

ইব্‌নুল্‌ আব্বাস বি, এ

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সল্‌'অম) জন্মের পূর্ব্ব হইতেই ইসলামই যে আল্লাহ্‌র একমাত্র মনোনীত ধর্ম্ম, পূর্ব্ব পূর্ব্ব নবী ও রসুলগণ যে এই ইসলামই প্রচার করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন, এবং এই ইসলাম হইতে পথভ্রষ্ট হইয়াই যে তাঁহাদের উম্মতগণের ভীষণ দুর্দ্দশা হইয়াছিল; এই সমস্ত কথা বিষদভাবে বুঝাইবার জন্য, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব নবী রসুল সম্বন্ধে তাঁহাদের অনুসারিগণ যে সকল ভুল ও মিথ্যা ধারণা পোষণ করিত বা এখনও করিয়া থাকে তার প্রতিবাদ করিয়া তৎস্থলে প্রকৃত তত্ব অবগত করিয়া সত্যের প্রচার করিবার জন্য বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্‌ তাআলা হজরত আদম হইতে হজরত 'ঈসা (আঃ) পর্য্যন্ত অনেক রসুল ও নবীর বিবরণ তাঁহার চরমবাণী পবিত্র কোরআনে দিয়াছেন। সেই সমস্ত বিবরণের আয়তগুলি একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে সহজেই জানা যাইবে যে, কোন নবী বিশেষের "মোজেজা" প্রচারের জন্য তাহা কোরআনে স্থান পায় নাই। বরং সেই আয়তগুলির উপক্রম ও উপসংহার, এবং তাহার ভাষা ও শব্দবিন্যাস, এই সমস্ত একত্রে আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃ মনে হয় যে, যাহাদের জন্য কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাদের সুশিক্ষার জন্যই ঐ বিবরণ সকল অবতীর্ণ হইয়াছে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা কেবল অনুমান বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু কোরআন নিজেই সে বিষয়ের সাক্ষী। যথা—

لقد كان في قصصهم عبرة لاولى الالباب (يوسف ع ١٢)

"তাঁহাদের বিবরণে জ্ঞানীগণের জন্য শিক্ষা নিশ্চয় রহিয়াছে।" (সুরা য়ুসুফ ১২ রুকু)

সুরা শোআরার ৪র্থ হইতে ১০ম রুকু পর্য্যন্ত প্রত্যেক রুকুর শেষে, নবীগণের বর্ণনার পরে বলা হইতেছে—

ان في ذلك لاية

নিশ্চয় ইহাতে অভিজ্ঞান রহিয়াছে।

সুরা عنكبوت এ বলা হইয়াছে—

تلك الامثال نضربها للناس

এই সমস্ত দৃষ্টান্ত মানবগণের জন্য আমরা বর্ণনা করিতেছি।

অন্যান্য নবী রসুলের ন্যায় হজরত ঈসার (আঃ) বিবরণও কোরআনের সুরাতে আছে। সেগুলি তাঁহার ধারাবাহিক ইতিহাস নয়। সেই বিবরণগুলি স্থিরভাবে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে সেগুলি, অন্ততঃ তার অধিকাংশই কেরেস্তান ও ইহুদিগণের মধ্যে প্রচলিত ও তাহাদের দ্বারা প্রচারিত মতকে প্রতিবাদ করিতেছে; এবং তাহাই তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য—তাকে সমর্থন করা কখনই আয়তের লক্ষ্য নহে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে যে মাননীয় মুফসসির মহোদয়গণ ও অন্যান্য "শেকন্দিসীন ও সলফে সালেহীন"গণ কেরেস্তান-দের মধ্যে প্রচলিত বিবরণগুলিকে একটু বদল সদল করিয়া লইয়া তাহারই সমর্থন কল্পে কোরআনের আয়তের বিকৃত মনগড়া ব্যাখ্যা করিয়া হজরত ঈসাকে (আঃ) বাড়াইতে বাড়াইতে এতই বাড়াইয়া ফেলিলেন যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার অপেক্ষাও তাঁহার মো'জেজা অধিক ও শ্রেষ্ঠতর হইয়া পড়িল। হজরত ঈসা জীবন্ত অবস্থায় স্থান পাইলেন, "চৌথা আসমানকে উপর", আর হজরত মোস্তফা মৃত অবস্থায় রহিলেন এই জমীনের তলেই! তাই তাল ঠিক রাখিবার জন্য অনেকে হজরত মোস্তফা সম্বন্ধেও এমন অলীক মো'জেজার সৃষ্টি করিলেন, যাহার কোন প্রমাণ নাই। কারণ, তাঁহারা মনে করিলেন, ঐরূপে হজরত ঈসার উপর তাঁহার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইবে এবং নিকৃষ্টতার ক্ষতিপূরণও হইবে। মো'জেজার উত্তরে মোস্তফাকে

(সল্‌অম) আল্লাহ বজ্রনির্ঘোষে বলিতে আদেশ করিতেছেন,

هل كنت الا بشر رسولا ؟ (بنى اسرا ئيل ع ١٠)

"আমি ত প্রেরিত মানুষ মাত্র" বনি ইসরাঈল ১০ রুকু)

সুরা অনকবুতে মোস্তফার মো'জেজা সম্বন্ধে বলা হইতেছে—

او لم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ط (عنكبوت ع ٥)

ইহা কি তাহাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে আমরা তোমাকে এই মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি যাহা তাহাদের সম্মুখে পাঠ করা হইতেছে ?

বে-বাপে জন্মও নাই, জীবন্ত আসমানে উত্থিত হওয়াও নাই। সুতরাং হজরত ঈসা (অম) মোস্তফা (সল'অম) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেছেন না কি ?

জনাব মওলবী সাহেবগণ না পারেন, জগতে বোধ হয় এমন কিছুই নাই। ওদিকে হজরত ঈসাকে মাতৃগর্ভে স্থান দেওয়াইতেছেন হজরত জিবরীল দ্বারা হজরত মরিয়মের যোনিপ্রদেশে ফুৎকার দেওয়াইয়া, কারণ আল্লাহ বলিতেছেন,—

و نفخنا فيه من روحنا

"তাহার মধ্যে আমাদের আত্মা হইতে ফুৎকার দিলাম"; আর এদিকে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা, যিনি সারা বিশ্বের আদত কল্যাণ, তাঁহার বক্ষস্থলে শয়তানী অংশ এতই বদ্ধমূল হওয়াইতেছেন যে তাহা কাটিয়া ফেলিবার জন্য হজরত জিবরীলকে বেহেশত হইতে "অপারেশন কেস" লইয়া আসিতে হইতেছে! ওদিকে হজরত ঈসাকে কথা কহাইতেছেন মাতৃক্রোড়েই স্তন্য পান করিতে করিতেই, কেননা

اكلم الناس فى المهد

আর এদিকে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার ন্যায় মহিমান্বিত রসুলের মনে শয়তান প্রবেশ করিয়া দেবীগণের প্রাধান্য জ্ঞাপক জাল আয়তকে আল্লাহের বাণী বলিয়া প্রচার করাইতেছেন—

نعوذ با لله من هذه الشطيحات

ইঁহাকে ত মরিতে হইল, আর উনি জীবন্ত স্থান পাইলেন চৌথা আসমানে! শুধু তাই নয়, উনি আবার আসিবেন, আর ইনি যেস্থানে আছেন সেই স্থানেই থাকিবেন। আর কত বলিব ?

যাক, এখন সময় আসিয়াছে কোরআনকে তাক হইতে নামাইবার, তাহাকে বুঝিবার, বুঝাইবার, তদনুসারে কাজ করিবার, এবং তাহার বিপরীত যাহা তার প্রতিবাদ করিবার। অবশ্য কোরআনকে বুঝিতে হইবে মূলতঃ কোরআন দিয়াই, তারপর অকৃত্রিম, বিশ্বস্ত ছহি হাদিসের সাহায্যও গ্রহণ করিতে হইবে।

তাই আমরা এই প্রবন্ধে, পবিত্র কোরআনে হজরত ঈসা সম্বন্ধে যে সমস্ত আয়ত আছে তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হইয়াছিল কি না, তিনি প্রকৃতির বিপরীত কোন কার্য্য করিয়াছিলেন কি না, এইসব বিষয় বুঝিতে চেষ্টা করিব।

আলোচনার সুবিধার জন্য হজরত ঈসার মৃত্যুর কথাটা প্রথমে গ্রহণ করিব। তিনি মরিয়াছেন, না, জীবিত আছেন ? জীবিত থাকিলে কোন আসমানে বা জমীনের কোথায় অবস্থান করিতেছেন—এই সমস্ত বিষয়ে কোরআন কি বলে তাহাই দেখা যাক।

প্রবন্ধের প্রথমদিকে উদ্ধৃত আয়ত হইতে জানা গিয়াছে যে পূর্ব্বগামী নবী রসুলগণের বিবরণ কোরআনে স্থান পাইয়াছে আমাদের সুশিক্ষার জন্য; সেই নবীগণের মো'জেজা প্রচারের জন্য মোটেই নহে। কিন্তু মুফসসির মহোদয়গণ আমাদিগকে বুঝাইতে চাহেন যে নবী বা রসুল হইলেই নানারূপ অস্বাভাবিক ঘটনা তাঁহার দ্বারা ঘটাইতেই হইবে। যিনি যত বড় নবী হইবেন, তাঁহার জীবনীও তত অধিক অস্বাভাবিক হইবে। সেই জন্য নবীগণের যে সমস্ত বিবরণ কোরআনে আছে তার প্রত্যেকটীতেই তাঁহারা বনি-ইস্রাইলগণের নিকট ধার করিয়া নানারূপ অলীক অস্বাভাবিক ঘটনা সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন অথচ নবী রসুলগণের বিবরণ কোরআনে কেন দেওয়া হইয়াছে আল্লাহ তাহা স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছেন—

و كلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك و جاءك فى هذه الحق و موعظة و ذكرى للمؤمنين ٥ (هود ع ١٠)

আমরা রসুলগণের সংবাদসমূহ তোমাকে বর্ণনা করিয়াছি, যাহার দ্বারা তোমার মনকে সুদৃঢ় করিব; আর ইহাতে সত্য আগমন করিয়াছে আর মোমেনগণের জন্য উপদেশ ও স্মরণযোগ্য বিষয়। (হুদ—১০ রুকু)।

নবীগণের বিবরণ আমাদের জন্য সদুপদেশ হইতে হইলে তাঁহাদিগকে আমাদের ন্যায় মানুষ হইতে হইবে—ফেরেস্তা হইলে চলিবে না। আর তাঁহারা মানুষ বটেও। আল্লাহ বলিতেছেন,—

وما ارسلنله قبلك الا رجالا نوحى اليهم فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ○ وما جعلنهم جسدا لا يا كلون الطعام وما كانوا خلدين (انبيا—٧،٨)

"আমরা তোমার পূর্ব্বে যত রসুল পাঠাইয়াছি তাঁরা মানুষ মাত্র; তাঁহাকে প্রত্যাদেশ দিয়াছি......আর তাঁদের এমন শরীর করি নাই যে তাঁরা খাদ্য খান না, আর তাঁরা চিরস্থায়ী ছিলেন না" (অন্‌বিয়া ৭, ৮)।

নবী রসুলগণ মানুষ ছিলেন, মানুষের মত জন্ম ও মৃত্যু এ তাঁহাদের হইয়াছিল মানুষের অন্যান্য দুর্ব্বলতাও তাঁহাদিগতে ছিল। কোন মানুষ চিরস্থায়ী বা অমর নহে, বা হয় নাই।

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ط افان مت فهم الخلدون (انبيا ٣٤)

তোমার পূর্ব্বে কোন মানুষকেই আমরা অমর করি নাই; অতএব তুমি যদি মর, তাহলে তারা কি অমর ছিল? (অবিয়া ৩৪)

كل نفس ذائقة الموت সকল আত্মাই মৃত্যু আস্বাদনকারী (ঐ ৩৫)।

উপরোক্ত আয়তগুলি সাধারণভাবে সকল নবী রসুলগণের জন্যই বলা হইয়াছে; তাহা হইতে হজরত ঈসার বাদ পড়িবার কোনই কারণ নাই। হজরত ঈসার ঈশ্বরত্ব এবং খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদ ইত্যাদির প্রতিবাদ করিয়া আল্লাহ বলিতেছেন,—

ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل ط و امه صديقة ط كانا يا كلان الطعام ط انظر كيف نبين لهم الايت ثم انظرانى يؤفكون (مائده ع ١٠)

মরিয়ম তনয় মসীহ ছিলেন মানুষ মাত্র; তাঁহার পূর্ব্বে রসুলগণ গত হইয়াছেন; আর তাঁর মা ছিলেন সত্যবিশ্বাসকারিণী; উভয়েই খাদ্য খাইতেন; দেখ দেখি তাঁদের জন্য চিহ্নগুলিকে কিরূপভাবে আমরা সুপ্রকাশিত করিতেছি, পরে দেখ দেখি কোথা হইতে তারা মিথ্যা সৃষ্টি করিতেছে? (মাএদা ১০ রুকু)।

ওহোদের অগ্নি পরীক্ষার সময় কাফেরগণ হজরতের হত্যার কথা প্রচার করায় কোন কোন দুর্ব্বল চিত্ত মোসলমান যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইলে আল্লাহ তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিলেন মোহাম্মদের অমরত্ব ঘোষণা করিয়া নহে; বরং পূর্ব্ব পূর্ব্ব নবী রসুলগণের বাঁচিয়া না থাকার সংবাদ (এবং কাহারও কাহারও হত হওয়ারও সংবাদ) দিয়া আল্লাহ বলিতেছেন,—

وما محمد الا رسول ج قد خلت من قبله الرسل ط افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ... (ال عمران ع ١٥)

আর মোহাম্মদ একজন রছুল ভিন্ন নহেন, নিশ্চয় তাঁর পূর্ব্বে রসুলগণ গত হইয়াছেন; সুতরাং যদি তিনি মারা পড়েন বা নিহত হন তাহা হইলে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে? (আল-ইমরান ১৫ রুকু)।

হজরত ঈসাকে তাঁহার উপাসকগণ যাহাই মনে করুক, এবং মুফস্‌সির মহোদয়গণ তাঁহাকে যেমন ভাবেই চিত্রিত করুন না কেন হজরত ঈসা নিজেকে মানুষ ভিন্ন অন্য কিছু মনে করিতেন না। হজরত ঈসাকে তাঁহার উপাসকগণ খোদার বেটা বলিয়া থাকে আবার ইহুদীগণ জারজ বলিয়া নিন্দা করে; উভয় মতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া তিনি যে রসুল মাত্র তাহাই প্রচার করার পর আল্লাহ বলিতেছেন,—

لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ... (النساء ع ٢٤)

নিশ্চয় ঈসা ইহাতে লজ্জা বা অপমান অনুভব করিবেন না যে তিনি আল্লাহের জনৈক দাস ছিলেন.........

(নেসা—২৪ রুকু)

হজরত ঈসার মৃত্যু সম্বন্ধে উপরোক্ত আয়তগুলিই যথেষ্ট। তাঁহার মৃত্যুর কথা যদি স্বতন্ত্রভাবে না থাকিত, তাহা হইলেও কেবল ঐ আয়তগুলি হইতেই তাঁহার মৃত্যু

অনায়াসেই প্রমাণিত হইত। কিন্তু কোরআন এ বিষয়ে আরও সুস্পষ্ট। হজরত ঈসাকে যে অমর হইয়া, (অন্ততঃ অসম্ভবরূপ দীর্ঘজীবী হইয়া) "চৌথা আসমানে" থাকিতে হইবে, তাহা মওলবী সাহেবগণ কোন উপায়ে জানিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাহা জানিতেন না। তিনি নিজ জাতির সম্মুখে নিজের পরিচয়াদি দেওয়ার সময় বলিতেছেন,—

و اوصٰنی بالصلوة و الزكوة ما دمت ... .. و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا
(مریم ع ٢)

আর আমাকে সালাত ও জাকাত বিষয়ে আদেশ দিয়াছেন যতদিন আমি বাঁচিয়া থাকিব……আর আমার উপর শান্তি যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আর যেদিন আমি মরিব, আর যেদিন আমি জীবিত উত্থিত হইব।

(মরয়ম—২ রুকু)

কেয়ামতের দিনে আল্লাহ যখন সকল রসুলকে একত্রিত করিয়া তাঁহাদের "সওয়াল জবাব" করিবেন তখন হজরত ঈসার সহিত কিরূপ কথোপকথন হইবে, তাহা সুরা মাএদায় শেষ (১৬) রুকুতে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহকে ছাড়িয়া হজরত ঈসা নিজকে ও নিজ মাতাকে উপাস্য গ্রহণ করিতে জনসাধারণকে বলিয়াছিলেন কিনা, আল্লাহতাআলার এই প্রশ্নের উত্তরে, সে কথা অস্বীকার করিয়া তিনি বলিবেন, (অন্যান্য কথার সহিত),—

و كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ج فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم ط ... (المائدة ع ١٦)

আর আমি যতদিন তাহাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন তাহাদের উপর সাক্ষী ছিলাম; কিন্তু যখন তুমি আমার জান কবজ করিলে তখন তুমিইত তাহাদের রক্ষক ছিলে।

হজরত ঈসার মৃত্যু সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা আর কি প্রমাণের আবশ্যক? কিন্তু মুফসসির মহোদয়গণ এই আয়তগুলিকে বাদ দিয়া ত আর তফসীর লিখিতে পারেন না! সুতরাং তাঁহারা বলিতেছেন, এই দুই আয়তে যে মৃত্যুর কথা আছে সে মৃত্যু মরিবার জন্য তাঁহাকে চৌথা আসমান হইতে জমীনে আসিতে হইবে (১)। চৌথা আসমানে থাকার কথাটাকে মৃত্যুর আয়তের সহিত নিজেদের মনমত ভাবে খাপ খাওয়াইয়া দেওয়া হইল; কিন্তু মওলবী সাহেবগণের কথা জানিতে গেলে একটি মহা সমস্যা অসমাহিত থাকিয়া যাইতেছে। সুরা মরয়মে বলা হইতেছে, "আমি যতদিন বাঁচিব, ততদিন সালাত ও জাকাতের উপদেশ দিব।" যদি তিনি এখনও জীবিত অবস্থায় থাকেন, তাহা হইলে এখনও তিনি সালাত ও জাকাতের হুকুম দিতেছেন, মওলবী সাহেবগণ তাহা জানিতে রাজী আছেন কি? যতদিন তিনি বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন হুকুম দিয়াছিলেন, এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ইহা না মানিবার উপায় নাই যে, যতদিন হুকুম দিয়াছিলেন, কেবল ততদিনই বাঁচিয়াছিলেন। কারণ নবীগণের পার্থিব জীবন থাকিতে থাকিতে নবীত্ব শেষ হইয়া যাওয়া, অর্থাৎ রেসালত শেষ হওয়ার পরও রসুলের বাঁচিয়া থাকা কল্পনাতীত ব্যাপার।

চৌথা (বা অন্য কোন) আসমানে জীবন্ত থাকা, পুনর্ব্বার নামিয়া আসা ইত্যাদি কোন কথা কোরআনের কুত্রাপি নাই বরং তাহা কোরআনের বিপরীত কথা। কোরআন বলিতেছে,

لن تجد لسنة الله تبديلا و لن تجد لسنة الله تحويلا

আল্লাহের নিয়মে কোন পরিবর্ত্তন পাইবে না নিশ্চয়।

আগামী মাসে সমাপ্য

(১) কেহ পঞ্চম, কেহ বা ষষ্ঠ আসমানের কথাও বলেন।

পাটের কথা

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ

[শ্রী নির্ম্মল চন্দ্র ঘোষ মহাশয় ধারাবাহিক ভাবে সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতে পাট চাষ ও তাহার ব্যবসায় সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয় লইয়া প্রবন্ধ লিখেন। সম্প্রতি পাটের কথা নাম দিয়া উক্ত মুল্যবান ও তথ্য পূর্ণ প্রবন্ধগুলি মোহাম্মদী বুক এজেন্সী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। পাট সমস্যা আজ বাঙ্গলার সমগ্র জীবনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিতেছে। পাটের ব্যবসায় সংক্রান্ত নানা জটীল ব্যাপারের সহিত জন সাধারণ নিতান্তই অজ্ঞ। এই সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় একখানিও ভাল পুস্তক নাই। নির্ম্মল বাবু এই একান্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থের দ্বারা সে অভাব পরিপুরণ করিয়াছেন। সঃ মোহাম্মদী]

পাট বাংলা দেশের অমূল্য সম্পদ। পৃথিবীর প্রায় সকল প্রকার ব্যবসায় ও বাণিজ্য চালাইবার ইহা অত্যন্ত আবশ্যকীয় বস্তু। যেরূপ আমেরিকা হইতে ইউরোপে গম চালান দিতে হইলে চটের বস্তা আবশ্যক, সেইরূপ জাভা হইতে চীন দেশে চিনি চালান দিতে হইলেও বস্তা আবশ্যক হয়। সর্ব্বপ্রকার মালপত্র চালান দিবার জন্য সমস্ত দেশেই প্রত্যহ পাটের বস্তা এবং চটের আবশ্যক হয়। থলে এবং চট ব্যতীতও পাট আরও নানাবিধ কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুটি বাংলা দেশ ভিন্ন পৃথিবীর আর কোথাও জন্মে না। ব্রেজিল, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি দেশে পাট জন্মাইবার জন্য অনেকবার অনেক রকম চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু সে চেষ্টা এখনও ফলবতী হয় নাই। মনে হয় যে, এই হতভাগ্য বাঙ্গালী জাতি ব্যতীত পাট উৎপাদন করার কষ্ট ভোগ করিবার মত সহিষ্ণুতা পৃথিবীর আর কোন জাতির নাই। সে জন্যই ব্রেজিল দেশের মাটি ও জল বাংলার ন্যায় হওয়া সত্বেও সেখানকার কৃষক এবং বৈজ্ঞানিকগণ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে পাট চাষে সফলকাম হন নাই। প্রতি বৎসর বাংলা দেশ হইতে ৭০।৭৫ কোটী টাকার পাট, থলে, চট প্রভৃতি ভারতবর্ষের বাহিরে রফ্‌তানি হয়। ভারতবর্ষ হইতে মোট যত টাকার মাল বিদেশে রফ্‌তানি হয় তাহার এক চতুর্থাংশ টাকা আমরা পাট হইতে পাইয়া থাকি। কলিকাতা বন্দর হইতেই প্রায় সমস্ত পাট রফ্‌তানি হয় বলিয়া কলিকাতা সহরও এত সমৃদ্ধিশালী। বাংলা দেশের পাট কলিকাতা সহরকে এত সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে যে, ইহাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ নগরী নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

দেশীয় প্রথায় পাট হইতে সুতা প্রস্তুত

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের পাঁচ ছ'তলাযুক্ত বিরাট সৌধশ্রেণী, লালদিঘীর চতুষ্পার্শ্বের মোটর-গাড়ীর হুঙ্কার, চৌরঙ্গী ও পার্ক ষ্ট্রীটে ইউরোপীয়গণের আনন্দ কোলাহল সমস্তই এই পাটের ব্যবসায়ের জন্য সম্ভবপর হইয়াছে।

কলিকাতার সহিত আমরা ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নগরী বোম্বাই সহরের তুলনা করিয়া কি দেখিতে পাই? বোম্বাই সহরে হিন্দু, মুসলমান ও পার্শিরা ইউরোপীয়গণের সহিত সমানে কারবার চালাইতেছে। সেখানে ইউরোপীয় এবং ভারতীয়গণ ব্যবসায়ী হিসাবে একই পর্য্যায়ভুক্ত—কেহ বড় কেহ ছোট নহে।

ভারতবর্ষের মধ্যে সব চেয়ে ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠান। এমন কি ভারত গবর্ণমেণ্টও অনেক স্থলে 'বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সে'র পরামর্শ ও হুকুম মত চলিতে বাধ্য হয়।

কাপড়ের ব্যবসায়ের ন্যায় পাটের ব্যবসায়ও এক সময়ে বাঙ্গালীর হাতেই ছিল। আমাদের দেশে ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে কোন পাটের কল ছিল না। কিন্তু তখনকার দিনে বাঙ্গালী স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা পাটের থলে, চট প্রভৃতি তৈয়ার করিত এবং তাহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র চালান হইত। বিলাতী মিলের কাপড় যেরূপভাবে আমাদের দেশের তাঁতীদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, ইউরোপীয় চট-কলগুলিও
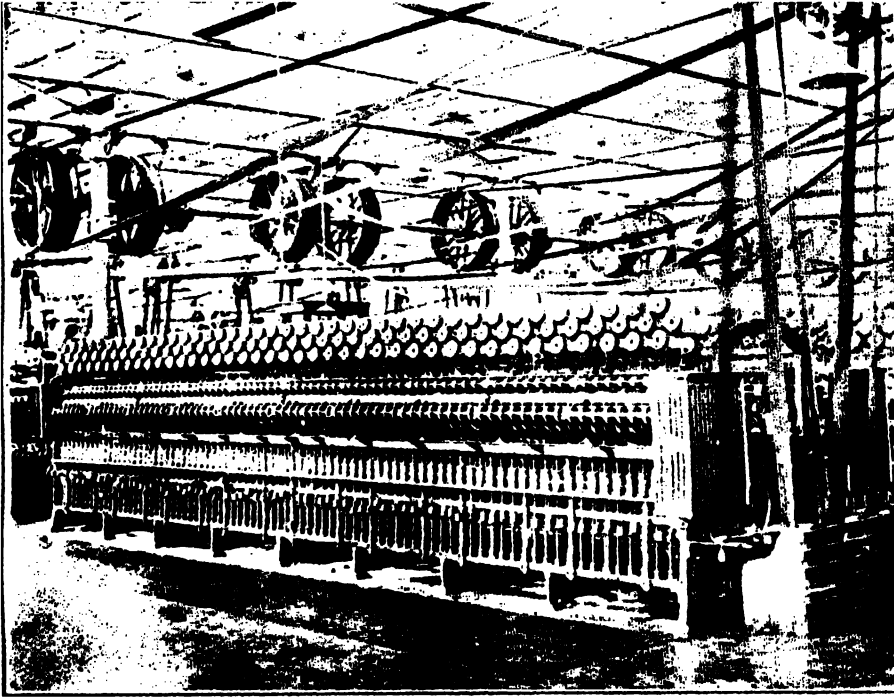
জুটমিলে পাট হইতে সুতা প্রস্তুত

কলিকাতায় কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরূপ; কলিকাতার ইউ-রোপীয়গণ সাহেব—দেবতা। এ পার্থক্য কিসের জন্য? কলিকাতার ইউরোপীয়দের মর্য্যাদা এবং অহঙ্কার এত বেশী কেন? ইহার কারণ যে, পাটের ব্যবসায়টিকে তাহারা সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া ইহার দ্বারা তাহারা এত বেশী ধনী ও ক্ষমতাশালী হইয়াছে যে তাহা ধারণা করা যায় না। পাটের দৌলতে আজ কলিকাতার ইউরোপীয়-বণিকদিগের সভা (বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স)

সেইরূপ আমাদের দেশের পাট-ব্যবসায় ধ্বংস করিয়াছে। ডাক্তার রয়েল (Dr, Forbes Royle) ১৮৫৫ সালে লিখিয়া গিয়াছেন,—"The great trade and principal employment of jute for the manufacture of gunny chuts or chutees in length suitable for making bags, This industry forms the grand domestic manufacture of all the populous Eastern districts of Lower Bengal, It pervades all classes, and penetrates into

every household. Men, women and children find occupation therein. Everybody passes his leisure moments distaff in hand, spinning gunny twist, Amongst these causes will be discerned the very low prices at which gunny manufactures are produced in Bengal, and which have attracted the demand of the whole commercial world. There is perhaps no other article so universally diffused over the world as the Indian gunny bag" অর্থাৎ—"পাট হইতে সাধারণতঃ চট তৈয়ারী করা হয় এবং তদ্দ্বারা থলে প্রস্তুত হয়। ইহা বঙ্গদেশের একটী বৃহৎ কুটীর-শিল্প এবং নিম্নবঙ্গের জনবহুল পূর্ব্বভাগে ইহার প্রচলন বেশী। সমস্ত গৃহেই স্ত্রী-পুরুষ এবং বালক-বালিকাগণ এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। প্রত্যেক লোকই অবসর সময়ে টেকো হাতে করিয়া পাটের সূতা তৈয়ারী করে। এই জন্য চট, থলে প্রভৃতি বঙ্গদেশে এত কম মূল্যে পাওয়া সম্ভবপর হয়। এই সব জিনিষ বঙ্গদেশ হইতে পৃথিবীর সমস্ত দেশে বাণিজ্যের নিমিত্ত রফ্‌তানি হয়। পাটের থলের ন্যায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র-ব্যবহৃত এরূপ কোন সামগ্রী বোধ হয় আর নাই।"

উপরোক্ত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, ১৫ বৎসর পূর্ব্বেও পাট-ব্যবসায় বাঙ্গালীদের হাতেই ছিল এবং পাট বিক্রয়ের লাভ সমস্ত টাকাই বাঙ্গালীরা পাইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কি দেখি, পাটের ব্যবসায় সমস্তই পরহস্তগত! পাট উৎপন্ন করিয়া কৃষকগণ যৎসামান্য মূল্য মাত্র পায়। চটের কল ও পাটের ব্যবসায় সমস্তই ইউরোপীয় ধনীদের একচেটিয়া সম্পত্তি! পাট, চট এবং থলে বিক্রয়ের দালালী ইত্যাদি মাড়োয়ারী, ভাটিয়া প্রভৃতিরা ভোগ দখল করিতেছে। এমন কি পাট-কলের কুলী-মজুরও অ-বাঙ্গালী।

পাটের বিষয় আলোচনা করা প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য। কারণ পাট চাষের উন্নতি এবং পাট-ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির দ্বারা বাঙ্গালীর আর্থিক উন্নতি বহু পরিমাণে হওয়া সম্ভবপর। সরকারী চাকুরীর জন্য মারামারি করিয়া এবং তাহার ভাগ বাটোয়ারা করিয়া সময় এবং উদ্যম নষ্ট করিলে দেশের আর্থিক উন্নতি হইবে না। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় কর্ম্মী যদি বোম্বাই প্রদেশে জন্মগ্রহণ না করিয়া বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তিনি পাটের চাষ এবং পাটের কুটীর-শিল্পের বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইতেন। বোম্বাই প্রদেশে তুলার চাষ এবং বস্ত্র-শিল্পের গুরুত্ব যেরূপ, বঙ্গদেশে পাটের কুটীর-শিল্প প্রভৃতি প্রচলনের আবশ্যকতা এবং গুরুত্বও সেইরূপ বেশী।

দেশীয় প্রথায় হেসিয়ান প্রস্তুত

নিম্নলিখিত তালিকায় কোন্ বৎসরে মোট কত পরিমাণ

জমিতে পাট চাষ করা হইয়াছে এবং কি পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইয়াছে তাহা দেখান হইল।

সাল	একর	বেল
১৯১৯	২৮,৩৮,৯০০	৮৪,৮১,৩০০
১৯২০	২৫,০৯,০০০	৫৯,১৫,০০০
১৯২১	১৫,১৮,০০০	৩৯,৮৫,০০০
১৯২২	১৮,০০,০০০	৫৪,০৮,০০০

সাল	একর	বেল
১৯২৮	৩১,৪৪,০০০	৯৭,৬৭,০০০
১৯২৯	৩২,১৫,০০০	১,০৪,০০,০০০
১৯৩০	৩৪,৫০,০০০	১,১২,০০,০০০

আনুমানিক ৩ বিঘা জমিতে এক একর হয় (১৮´ ইঞ্চি হাতের ৮০ হাত প্রস্থ জমির পরিমাণ এক বিঘা)।
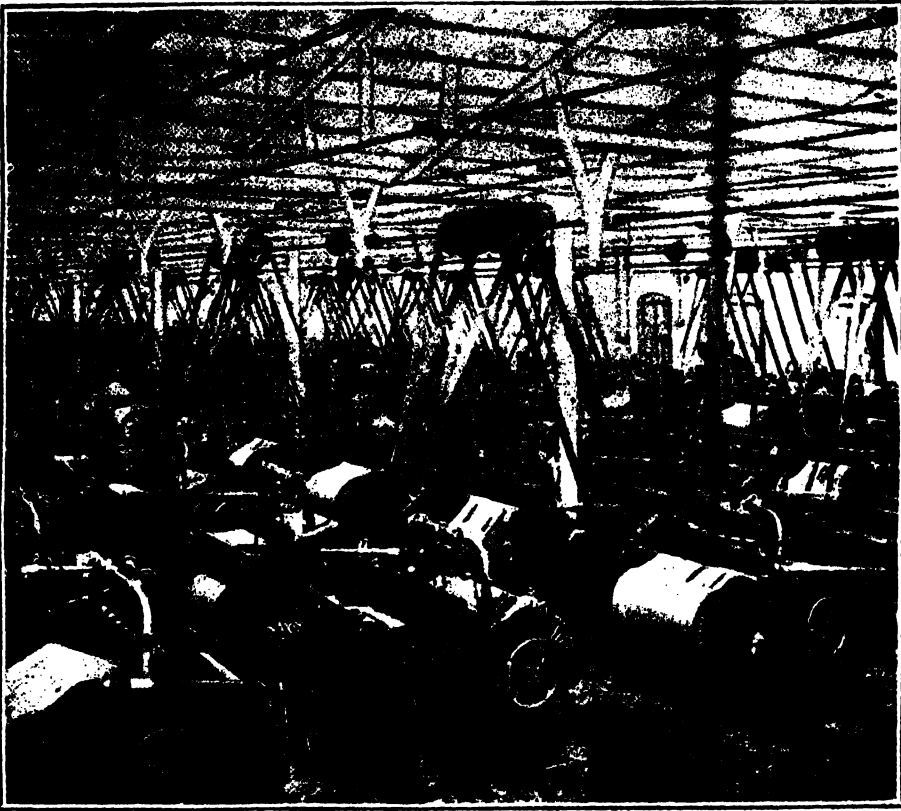
জুটমিলে হেসিয়ান প্রস্তুত

সাল	একর	বেল
১৯২৩	২৭,৮৮,০০০	৮৪,[illegible]৩,০০০
১৯২৪	২৭,৭০,০০০	৮১,২০,০০০
১৯২৫	২৯,২৫,০০০	৯০,০০,০০০
১৯২৬	৩৪,০০,০০০	১,২১,০০,০০০
১৯২৭	৩২,০০,০০০	১,০২,০০,০০০

৮০ তোলা সের হিসাবে ওজনের ৫ মণ পাটে এক বেল হয়। ১৯২১ এবং ১৯২২ সালের কম চাষের ফলে ১৯২৩ সালের শেষ ভাগে পাটের দর প্রতি মণ ২৫৲।৩০৲ টাকা হইয়াছিল। ১৯২৬ হইতে ১৯৩০ পর্য্যন্ত ক্রমাগত বেশী চাষের ফলে পাটের দর মণ প্রতি ২৲।২৷৷০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

মাস-পঞ্জী

কার্ত্তিক

৫ই পর্য্যন্ত—মওলানা কেফায়াতুল্লাহ্‌র কারাদণ্ডে দেওবন্দের দারুল ওলুমের ছদরে মোদররেছ জনাব মওলানা হোছেন আহ্‌মদ ছাহেব জমায়াতে ওলামায়ে হিন্দের সভাপতি হইয়াছেন। দিল্লী সমর পরিষদের দ্বিতীয় ডিরেক্টর এবং ডাঃ আনছারীর অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র ব্যারিষ্টার মিঃ ফরিদুল হক আনছারী গত ১৮ই অক্টোবর পাঁচ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। গত ১৯শে অক্টোবর জমায়াতে ওলামায়ে হিন্দের সেক্রেটারী মওলানা আতাউল্লা শাহ্‌ বোখারী ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ১৮ই অক্টোবর পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু কারামুক্ত হন; ১৯শে পুনরায় তিনি গ্রেফতার হন। ২১শে অক্টোবর তিনি দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ছয়শত টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও চার মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। রেঙ্গুণের বিখ্যাত ব্যবসায়ী মৌলভী আবদুল বারি মিয়া গত ১৮ই অক্টোবর জান্নাতবাসী হইয়াছেন। গত ১৪ই অক্টোবর লর্ড আরউইন বে-আইনী সমিতি বলিয়া নবম অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। উক্ত অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ১৫ই তারিখে বোম্বের ৩৮টী সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। বে-আইনী সমিতির সদস্য বলিয়া মিঃ নরীম্যান, মিঃ ছোভানী, মিঃ নূর মোহাম্মদ আহমদ ও ২৫০ জন সদস্য গ্রেফ্‌তার হন। মিঃ নরীম্যানের ৬ মাস ও মিঃ ছোভানীর ৯ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। ১৭ই অক্টোবর যুক্ত-প্রদেশের জমায়তে ওলামার সভাপতি ফখরুদ্দীন এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ১৫ই অক্টোবর ঢাকা সেন্ট্রাল জেল হইতে অধ্যাপক নৃপেন ব্যানার্জ্জী কারামুক্ত হইয়াছেন। ১৭ই অক্টোবর মিরাট জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি কাজী নাজীমুদ্দীন মুক্ত হইয়া পুনরায় গ্রেফতার হইয়াছেন। কর না দেওয়ার জন্য মিছরে নাহাছ পাশার মাল ক্রোক করা হইয়াছে। খুলনার ভূতপূর্ব্ব এম-এল-সি মৌলবী আবদুল কাদের, বি, এল, গত ১৭ই অক্টোবর গ্রেফ্‌তার হইয়াছেন।

৫ই-১২ই—২৫শে অক্টোবর ১৪৪ ধারা অমান্য করার অপরাধে জালিয়ান-ওয়ালাবাগে মিঃ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত পুনরায় গ্রেফতার হইয়াছেন। গত ২৪শে অক্টোবর বোম্বাইএ জাতীয় পতাকা-অভিবাদন ব্যাপারে পুলিশের লাঠীর আঘাতে ২৩৫ জন লোক আহত হইয়াছেন। ২৫শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে ডালহাউসী স্কোয়ার বোমার মামলার বিচারের জন্য একটী স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল গঠিত হইয়াছে। এই মামলায় ১৩ জন ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়াছে। ২৬শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে অবিশ্রান্ত বারি-পাতের জন্য মাদ্রাজে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়াছে। ২০শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে, বোম্বে সমর পরিষদের প্রেসিডেণ্ট মিঃ নূর মোহাম্মদ আহমদ গ্রেফ্‌তার হইলে মিস্‌ ছোফিয়া তাঁহার স্থলে সভাপতি নিযুক্ত হন। মিঃ নূর আহ্‌মদের ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। ২১শে তারিখের বোম্বের এক সভায় পুলিস চারবার গুলীচালনা করে। ২০শে অক্টোবর বাঙ্গলা সরকারের গেজেটে প্রথম শ্রেণীর সকল ম্যাজিষ্ট্রেট সাব-ইন্‌সপেক্টর ও তদূর্দ্ধের যে কোনও পুলিস কর্ম্মচারীকে সন্দেহক্রমে যে কোনও ব্যক্তিকে বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেফ্‌তার করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ২১শে অক্টোবর ঢাকা নবাবপুরের এক বাড়ী হইতে পুলিশ চারটী বোমা ও বোমা প্রস্তুত করিবার সাজসরঞ্জাম পাইয়াছে। পণ্ডিত জওহরলালের কারাগমনে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। ২১শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে বিশেষ কোনও আড়ম্বর না করিয়া নাদের শাহের রাজ্যাভিষেক পর্ব্ব সমাধা হইয়াছে। গত ২৪শে আগষ্ট পাঞ্জাব কংগ্রেস নেতা লালা দুনীচাঁদ কারামুক্ত হইয়াছেন। মিস্‌ সোফিয়ার গ্রেফ্‌তারের পর মিসেস্‌ অবন্তিকাবাঈ গোখেল বোম্বে সমর-পরিষদের পরবর্ত্তী অধিনায়ক হন। গত এপ্রিল মাসে বিলাতের রফ্‌তানি বাণিজ্যের মূল ৪৬, ৮৬১, ৪৬১ পাঃ অর্থাৎ ইহা মার্চ্চ মাসের তুলনায় ৬,০৮৪, ৩৪৮ পাঃ এবং ১৯২৯ সনের এপ্রিল মাসের তুলনায় ১৩, ৩৮২, ৯৪৪ পাঃ হ্রাস পাইয়াছে। আমদানী বাণিজ্য দাঁড়াইয়াছে এই মাসে ৮৩,৯২২,৪০১ পাঃ উহা মার্চ্চ মাসের তুলনায় ৯,৪৯৮,০৮১ পাঃ এবং ১৯২৯ সনের এপ্রিল মাসের তুলনায় ২০,২০৬, ৩৩০ পাঃ কম। ২৩শে অক্টোবর বগুড়ার বিখ্যাত দেশকর্ম্মী মৌলভী আরেফুর সুধারামী ১৪৪ ধারা অমান্য করার অপরাধে ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। কংগ্রেসের বর্ত্তমান সেক্রেটারী পণ্ডিত গোবিন্দ মোহন মালবা গত ২৪শে অক্টোবর এলাহাবাদে গ্রেফ্‌তার হইয়াছেন। খুলনার মৌলভী আবদুল কাদেরের গত ২০শে অক্টোবর ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। চীনের জাতীয় সরকারের সভাপতি চ্যাং কাইশেখ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। স্মার্ণায় জলপ্লাবনে ৪০ জন লোক মারা গিয়াছে। ২৭শে অক্টোবর বোম্বে সমর-পরিষদের সভাপতি মিসেস্‌ অবন্তিকাবাঈ গ্রেফ্‌তার হওয়ায় মিসেস্‌ সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা এবং কমলাদেবীর স্বামী শ্রীযুক্ত হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। ২৬শে অক্টোবর সিরাজগঞ্জের বিখ্যাত নেতা মওলবী এছমাইল হোছেন সিরাজী দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ২৭শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে দেওবন্দের ভারতখ্যাত দারুল-ওলুমের অধ্যক্ষ মওলানা সঈদ দিলদার আলী গ্রেফ্‌তার হইয়াছেন। রাজসাহী ২৬শে অক্টোবরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, অনশনের ভয়ে জনৈক কৃষক আত্মহত্যা করিয়াছে। নয়াদিল্লীর ২৭শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, গত ২৭শে এপ্রিল তারিখের বিঘোষিত প্রেস অর্ডিন্যান্সের মেয়াদ শেষ হইয়া গিয়াছে।

১২ই-১৯শে—দিল্লীতে ৩১শে অক্টোবর ও ১লা নভেম্বর দুইটী গুলী-মারা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রথম স্থলে একজন বিপ্লবীর গুলীতে একজন পুলিসের লোক আহত হইয়াছে। দ্বিতীয় দিনও পুলিসের সহিত সংঘর্ষ হয়। একজন কনষ্টবল আহত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের ২৮শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, ৩ জন দেশ-সেবিকা সার্জ্জেণ্ট ম্যাকেঞ্জি ও কনেষ্টবল ভিকারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনিয়াছেন। অভিযোগ মধ্য রাত্রির পর তাহারা দেশ-সেবিকাদের সেলে প্রবেশ করিয়া কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়াছিল। নয়াদিল্লী, ২৯শে অক্টোবর আজ প্রত্যুষে পুলিস বাজার সীতারামের এক গৃহে হানা দেয় এবং প্রায়

সাত ঘণ্টাকাল খানাতল্লাশ করিয়া চারটি খালি বোমা, একশত কার্তুজ, গুলীভরা পাঁচ নালা একটি পিস্তল, একটী রিভলভার, পঞ্চাশটি এসিড্ ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের বোতল, এবং কতকগুলি রাজদ্রোহজনক পুস্তক ও কাগজপত্র পাইয়াছে। গত ২:শে অক্টোবর কলিকাতা পুলিস উত্তর কলিকাতার বিভিন্ন স্থান, হাওড়া, আলমবাজার ও সাত্রাগাছিতে খানাতল্লাশ করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ১৮০ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেফ্‌তার করিয়াছে। দিল্লী ৩০শে অক্টোবর নিখিল ভারত কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি এবং কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র মিঃ যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্তের সহধর্ম্মিণী মিসেস্ নেলী সেনগুপ্তা, স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর ডিক্‌টেটার মিসেস্ ভেদী এবং মিঃ শিবনারায়ণকে কুইন্স গার্ডেনের অবৈধ জনতায় যোগদানের অপরাধে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছে। ময়মনসিংহের ২০শে অক্টোবরের খবরে প্রকাশ, জেল আইন ভঙ্গ করার অপরাধে ৫৯ জন বিচারাধীন কয়েদীর কারাদণ্ড হইয়াছে। নয়া দিল্লীর ৩রা নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, কলিকাতার ভূতপুর্ব্ব মেয়র ও কংগ্রেসের বর্ত্তমান অস্থায়ী সভাপতি মিঃ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত অদ্য পূর্ব্বাহ্নে দিল্লীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক রাজদ্রোহের অপরাধে এক বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, ভীতি-প্রদর্শন অর্ডিনান্সে ৬ মাসের ও সংশোধিত ফৌজদারী আইনে ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তবে এই তিন ধারার দণ্ড একসঙ্গেই ভোগ করিতে হইবে। এলাহাবাদ, ৩রা নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর জেনারেল সেক্রেটারী পণ্ডিত গোবিন্দকান্ত মালব্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাঁহাকে আরও ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। পণ্ডিতজীকে "বি" শ্রেণীভুক্ত কয়েদী করা হইয়াছে। নয়া দিল্লী, ২৯শে অক্টোবর দিল্লীর তৃতীয় 'ডিক্‌টেটরে'র পত্নী মিসেস্ আছফ আলীকে এক বৎসর সদ্ভাবে থাকিবার জন্য মুচলেকা দিতে বলা হয়। অন্যথায় তাঁহাকে এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তাঁহাকে 'এ' শ্রেণীর কয়েদীভুক্ত করা হইয়াছে। সুরাট, ৩০শে অক্টোবর। বার্দ্দোলী তালুক হইতে যাহারা বরোদা রাজ্যে গিয়া বাস করিয়াছে, তাহাদিগকে তথা হইতে উঠাইয়া দিতে বা তাহাদের অস্থাবর সম্পত্তি সমূহ বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিতে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ বরোদা গবর্ণমেন্টের নিকট অনুরোধ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

২০শে—সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল গত ৫ই নবেম্বর কারামুক্ত হইয়াছেন। গত ৫ই নবেম্বর দিল্লীর কপুর্রচাঁদ জৈন নামক এক ব্যক্তির গৃহ হইতে ৫ শত বোমা আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ডাঃ হার্দ্দিকর, জয়রামদাস, দৌলতরাম, ডাঃ জে, এম, দাশগুপ্ত গত ৫ই নবেম্বর কারামুক্ত হইয়াছেন। পুলিশ আইন অমান্য করার অপরাধে বোম্বাই সমর পরিষদের চতুর্দ্দশ সভাপতি শ্রীযুক্ত হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। কর-প্রদান বন্ধ অর্ডিনান্স অনুসারে টাঙ্গাইল মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়া মৌলভী আবু মিঞা ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসীর দণ্ড ৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

২১শে—৫ই নভেম্বর বোম্বের এক জনসভায় পুলিসের লাঠীতে প্রায় ২০০ লোক জখম হইয়াছে। বারদৌলী তালুকের প্রায় ৫০ হাজার কৃষক ভূমির মায়া ত্যাগ করিয়া বরোদা রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। বারদৌলীর খ্যাতনামা "ছোট কমিশনার" মিঃ মোহনলাল সাহা নরহত্যার অভিযোগে বরোদা পুলিস কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছে। কলতা বাজারের জমিদার পরলোকগত হরিদাস বসাকের বিধবা পত্নী শ্রীমতী রাধারাণী চৌধুরাণী ও অপর ৬ জন লোকের পক্ষ হইতে উকীল শ্রীযুত অক্ষয়কুমার বসাক, ঢাকার নবাব খাজা হবিবুল্লা, মহম্মদ সিদ্দিক, মিষ্টার ডবলিউ, এ লিউকাস মিষ্টার এ, ডবলিউ, বেবী, মিষ্টার আবদুল গণি, মিষ্টার সাজাহান ও সুত্রগড় পুলিস থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মিষ্টার হবিবর রহমান প্রভৃতি প্রত্যেকের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৫ হাজার ১ শত টাকা দাবী করিয়া একটি মামলা উপস্থিত করিয়াছেন। প্রলয়-শিখা নামক একখানি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার সম্পর্কে কাজী নজরুল ইসলাম ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে রাজদ্রোহের অভিযোগে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার রক্সবার্গের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ৫ শত টাকা জামীনে মুক্তিদানের আদেশ দিয়াছেন। মামলা মুলতুবি আছে।

২২শে—এইরূপ প্রকাশ, বঙ্গীয় অর্ডিনান্স অনুসারে আটক এবং হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটীর বিশিষ্ট কর্ম্মী মৌলবী হামিদলাল হক হুগলী জেলে আছেন। তাঁহাকে তাঁহার প্রয়োজন মত দ্রব্যাদি দেওয়া হয় নাই বলিয়া প্রতিবাদস্বরূপ তিনি প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতাকে কোন বৃত্তি দিবার ব্যবস্থাও করা হয় নাই।

২৩শে—৭ই নভেম্বর রাত্রে বোম্বাইয়ে সেখ মেমন ষ্ট্রীটে পুলিস ও জনতার মধ্যে একটা সংঘর্ষ হওয়াতে পুলিস পক্ষ হইতে গুলীবর্ষণ করা হয়। ফলে এক ব্যক্তির গলদেশে গুলী বিদ্ধ হইয়াছে। অন্নাভাবে রাজসাহী জেলার চারঘাটের অন্তর্গত বেনোয়ারী নামক গ্রামে চারজন কৃষক শোচনীয় ভাবে আত্মহত্যা দ্বারা ইহলীলা সাঙ্গ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আলী ভ্রাতৃদ্বয় লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন।

২৪শে—ঝরিয়ায় এক খনি ধ্বসিয়া যাওয়ায় গত ১ই নভেম্বর ৪০টী বাড়ী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আফ্রিদীরা পুনরায় জীর্গার অধিবেশনে সম্মত হইয়াছে।

বৃহৎ কারাগার হইতে ক্ষুদ্র কারাগারে

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

পণ্ডিত জওহরলালের বিদায়-বাণী

"ভারতীয় জনসাধারণ আমার প্রতি যে ভালবাসা ও যে বিশ্বাস দেখাইয়াছেন. তাহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত কৃতজ্ঞতা দেখাইতে আমি অপারগ। এই গৌরবমণ্ডিত সংগ্রামের সময় দেশের সেবা করিতে পারা, দশের মঙ্গলার্থ আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োজিত করিতে সমর্থ হওয়া আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক বিষয়। যে পর্য্যন্ত আমার চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত না হয়, আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু আমরা না পাই, আমি আশা করি, আমার দেশবাসী পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ সে পর্য্যন্ত অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া যাইবেন। স্বাধীন ভারত দীর্ঘস্থায়ী হউক!"

১১ই অক্টোবর পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু নৈনী জেল হইতে মুক্তি লাভ করেন। পুলিশ আইন অমান্য করিয়া বক্তৃতা দিবার অপরাধে ১২ই রাত্রিকালে তিনি পুনরায় গ্রেফ্‌তার হন। ২১শে তারিখে এলাহাবাদ সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে মোট ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৬ শত টাকা অর্থদণ্ডে অনাদায়ে আরও ৪ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। অপরাধ—রাজদ্রোহ, লবণ আইন ভঙ্গে সাহায্য, করবন্ধে প্ররোচনা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিযোগের দণ্ড এক সঙ্গে ভোগ করিতে হইবে। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, তাঁহার পরিবারের লোকজন ও কতিপয় বন্ধুসহ এই দণ্ডাজ্ঞা প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন। জওহরলালজী ধীরভাবে এই দণ্ডাদেশ গ্রহণ করেন।

এক বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ

দেশপ্রিয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

পণ্ডিত জওহর লালের কারাগমনে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি হন। গত ২৫শে অক্টোবর জালিয়ানওয়ালাবাগে তিনি পুলিশ আইন অমান্যে পুনরায় ধৃত হন। বিচারে তাঁহার এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

স্বামীর পদাঙ্কবর্ত্তিনী

মিসেস্ নেলী সেনগুপ্তা

গত ৩০শে অক্টোবর দিল্লীতে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের সহধর্ম্মিনী মিসেস্ নেলী সেনগুপ্তা গ্রেফ্তার হন। ৪ঠা নভেম্বর বিচারে তাঁহার চার মাস কারাদণ্ড হইয়াছে।

শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা আদালতে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "আমাকে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করা হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমাকে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয় নাই। সবেমাত্র কাল আমি মিঃ পুলকে সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাই। অতঃপর তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "আপনি কি করিয়া জানেন আমি জামীন চাই না কিম্বা আত্মপক্ষ সমর্থন করব না? ইহাকে প্রকাশ্য আদালতের বিচার বলে না। ইংরাজ ভারতবর্ষে আসিলে তাঁহার যে কি পরিবর্ত্তন হয় ইহারই দ্বারা তাহাই মাত্র প্রমাণ হয়।"

পরলোকে

গত ৯ই অক্টোবর পাটনার বিখ্যাত নেতা শাহ্ মোহাম্মদ জুবেয়ার এন্তেকাল করিয়াছেন। বিহারের সুপ্রসিদ্ধ জননেতা শাহ মোহাম্মদ জোবের ত্যাগী পাশ্চাত্য শিক্ষিত দলের অন্যতম। গত অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়া তিনি এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করেন। মুক্তির পর কংগ্রেসের অনুমতি অনুসারে বিহার প্রদেশের মুছলমানদিগের পক্ষ হইতে তিনি কাউন্সিল অব্-ষ্টেটের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। অতঃপর লাহোর কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে পদ তিনি হেলায় ত্যাগ করেন। জমিদার, ব্যবহারাজীব এবং জননেতা হিসাবে তিনি অখণ্ড বিহারের অন্তরের শ্রদ্ধার ও অতি সম্মানের পাত্র ছিলেন।

শাহ্ জুবেয়ার

মোসলেম যুবকের কৃতিত্ব

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তরণ বীর

মিঃ শফী আহমদ

লণ্ডনের ওথিং স্নানাগারে শফী আহ্মদ একাধিক্রমে ৬৯ ঘণ্টা সন্তরণ করিয়া দীর্ঘ সন্তরণের রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ সন্তরণ বীরের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন। সন্তরণের সময় উক্ত নগরের মেয়র স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার শ্রান্তি বিনোদনের জন্য মেয়র সঙ্গীতের ব্যবস্থা করেন। এত অধিক জনতা হইয়াছিল যে পুলিশ বহুকষ্টে জনতাকে দমন করিয়া রাখে। উক্তদিন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তার জন্য মিঃ শফী আহমদের ছবি হাজারে হাজারে বিক্রয় হয়।

ভারতের প্রথম মোছলেম বৈমানিক

মিঃ এ, এম, মুরাদ

ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, এম রাশেদের পুত্র মিঃ এ, এম মুরাদ উড়ো জাহাজে এই মাসের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকায় রওনা হইবেন। তিনি হিজ হাইনেস দি আগা খাঁর প্রস্তাবিত ৫০০ পাউণ্ড পুরস্কারের সম্মানপ্রত্যাশী। তিনি ১৯২৭ কলিকাতায় আলিয়া মাদ্রাছা হইতে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ইহার পর তিনি আলিগড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আই, এস, সি, পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। তিনি ১৯২৯ সালে কলিকাতার ওয়েজ ইয়ার কোর্সে যোগ দিয়া ১ম শ্রেণীর পাইলট্ সার্টিফিকেট পাইয়াছেন। ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম মুছলমান বৈমানিক।

সাগর-পারের মেলা

গোল টেবিল মেলার অধিবেশন স্থল

সেণ্ট জেম্‌স্‌ প্যালেস

এই প্রাসাদে গোলটেবিল মেলা বসিবে

উদ্বোধনকারী

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ

বৈঠকের সভাপতি

প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোন্যাল্ড

বারদৌলী কৃষকদের হিজরৎ

বৃটীশ শ্রমিক সদস্য
মিঃ ব্রেলস্‌ফোর্ড

স্বরাজ না পাইলে ট্যাক্স দিব না—এই নীতি অবলম্বন করিয়া বারদৌলী তালুকের একশত পাঁচটী গ্রামের সমস্ত অধিবাসী বাপ পিতামহের ভিটার মায়া পরিত্যাগ করিয়া হিজরৎ ব্রত অবলম্বন করিয়াছে। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্ত বৃটিশ পার্লামেণ্টের বিশিষ্ট শ্রমিক-সদস্য মিঃ ব্রেল্‌সফোর্ড ভারতে আগমন করিয়া বারদৌলী তালুক পরিদর্শনে যান। সম্প্রতি তিনি সমস্ত কৃষকদের ব্যাপার স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া ফ্রী প্রেসের প্রতিনিধির নিকট এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "আমি যাহা দেখিতেছি, তাহা কেবল রূপকথাতেই পড়িয়াছি। সমস্ত কৃষক সম্প্রদায় অসীম দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াও অহিংসভাবে সরকারের সহিত রণ-অভিযানে দৃঢ় সঙ্কল্প রহিয়াছে। শত শত কৃষক পরিবার তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ-নির্ম্মিত বসতবাটি, বৎসরের পর বৎসর তাহাদের নিজেদেরই দ্বারা কর্ষিত ভূমিগুলি এবং মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে সকল শস্য তাহারা উৎপাদন করিয়াছিল সে সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। যে সমস্ত জমি ও স্থাবর সম্পত্তি গ্রামবাসীরা ফেলিয়া গিয়াছে তাহার মূল্য প্রায় দশকোটী টাকা হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। তাহাদের এই যে দেশ ছাড়িয়া নিকটবর্ত্তী বরোদা রাজ্যে যাইয়া বসবাস-স্থাপন—ইহা চিরকালের জন্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হইয়া থাকিবে।"

বার্দ্দৌলী তালুক হইতে যাহারা বরোদা রাজ্যে গিয়া বাস করিয়াছে, তাহাদিগকে তথা হইতে উঠাইয়া দিতে বা তাহাদের অস্থাবর সম্পত্তি-সমূহ বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিতে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ বরোদা গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

গ্রামান্তর-যাত্রী

বারদৌলীর কৃষক পরিবার

গোলটেবিল বৈঠকের সদস্য

ডাঃ শফ আঃ আহ্মদ

যুক্ত প্রদেশের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে ডাঃ শফ্ আৎ আহমদও গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিয়াছেন।

জমায়াতে ওলমায়ের

মিঃ মোহাম্মদ এসহাক

ইনি জমায়াতে ওলামায়ে হিন্দের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর নায়ক। সম্প্রতি ইনি ৪ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

আফগানিস্থানে

নাদের শাহের রাজ্যাভিষেক

বিশেষ কোনও আড়ম্বর না করিয়া আফগানিস্থানে নাদের শাহের রাজ্যাভিষেক পর্ব্ব সমাধা হইয়া গিয়াছে। উপরের ছবিতে মঞ্চের উপরে দাঁড়াইয়া নাদের শাহ্ উক্ত উৎসব উপলক্ষে সমবেত জনতার সম্মুখে বক্তৃতা দিতেছেন।

মদ্য-নিবারণ সমস্যায়

যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি

মিঃ হুভার

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রতিনিধি পরিষদের সাধারণ নির্ব্বাচন, সিনেটের এক তৃতীয়াংশ সদস্যদের নির্ব্বাচন এবং ৩৩টি রাজ্য বা ষ্টেটের গবর্ণরের পদ নির্ব্বাচন আরম্ভ হইয়াছে। মদ্যপান নিবারণ আইনই এই নির্ব্বাচনের মূলনীতি এবং ইহাতে ডেমোক্রাট দলেরই জয় জয়কার হইয়াছে। এই দল মদ্যপান নিবারণ আইনের বিরোধী। ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ডেমোক্রাটদিগের নেতা হইয়াছেন। তিনি নিউইয়র্কের গবর্ণরের পদপ্রার্থীও হইয়াছেন এবং এতৎসম্পর্কিত নির্ব্বাচনে তিনি ৭ লক্ষ ভোট বেশী পাইয়া জয়লাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ভূতপূর্ব্ব এটর্নী জেনারেল মিঃ টাট্ল। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের আগামী প্রেসীডেন্ট পদ নির্ব্বাচনে মিঃ রুজভেল্ট দাঁড়াইবেন বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে—ডেমোক্রাট দলের পক্ষ হইতেই তিনি ঐ পদপ্রার্থী হইবেন। মিঃ হুভারকে এই মদ্যপান নিবারণ আইন বিরোধী দলের প্রভাব হইতে আমেরিকাকে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন।

জার্ম্মাণীতে ডিক্‌টেটরবাদ

মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মাণীতে গণতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জেনারল হিণ্ডেনবার্গ এই গণতন্ত্রের সভাপতি। তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে চান্সেলার ডাঃ ব্রুহেনিং এখন জার্ম্মাণীর শাসনতন্ত্র পরিচালনা করিতেছেন। অল্পদিন হইল, জার্ম্মাণ পার্লামেণ্টের সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়াছে। এই নির্ব্বাচনে ফ্যাসিষ্ট মতবাদীর দল অধিক সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই দলের নাম "নেজি"—কেহ কেহ ইহাদিগকে "ন্যাশনেল সোসিয়ালিষ্টও" বলিয়া থাকেন হিটলার হইয়াছেন এই দলের নায়ক। ইহারা বর্ত্তমান জার্ম্মাণ মন্ত্রীসভার কার্য্যে সন্তুষ্ট নহেন প্রধানতঃ অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা লইয়াই মতভেদ হইয়াছে। অধিকন্তু হিণ্ডেন-বার্গের আমলে যে সমস্ত অন্তর্জ্জাতিক সন্ধিশর্ত্ত মানিয়া লওয়া হইয়াছে, সেগুলির প্রতিও ইহাদের আক্রোশ আছে, ইহারা মোটের উপর উপরোক্ত সন্ধিগুলি অগ্রাহ্য করিবারই পক্ষপাতী। এই সমস্ত কারণে জার্ম্মাণীর

জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্টদলের নেতা

মিঃ হিটলার

সোসিয়ালিষ্ট দলের সহিত হিটলারের দলের মতভেদ দেখা দিয়াছে। ফলে ইহারা সোসিয়ালিষ্ট দলের বর্ত্তমান মন্ত্রী সভাকে বিতাড়িত করিয়া "ন্যাশন্যাল সোসিয়ালিষ্ট" দলে কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইহাতেই বর্ত্তমান চান্সেলার ডাঃ ব্রুহেনিং বিচলিত হইয়াছেন। সভাপতি জেনারেল হিণ্ডেনবার্গ বার্লিনে ছিলেন না—তিনি তাঁহার বাগান বাড়ীতে ছিলেন। জরুরী সংবাদ দিয়া তাঁহাকে বার্লিনে আনয়ন করা হয়। অতঃপর স্থির হয় যে, প্রয়োজন হইলে প্রেসিডেণ্ট তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন এবং পার্লামেণ্টের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া শাসনকার্য্য চালাইবার জন্য চান্সেলার ডাঃ ব্রুহেনিংকে নিযুক্ত করিবেন। এই ব্যবস্থা যদি কখনও করা হয়, তাহা হইলে প্রকারান্তরে জার্ম্মাণীতে "ডিক্টেটরী" শাসনই বর্ত্তিত হইবে।

রবীন্দ্রনাথ ও সোভিয়েট রুশিয়া

বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুদিন পূর্ব্বে রুশিয়ার মস্কো শহরে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে "ইজভেষ্টা" পত্রিকার প্রতিনিধির নিকট তিনি মস্কো সম্বন্ধে তাঁহার মতামত প্রকাশ করেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন :—

"আপনারা যে বিপুল উৎসাহ ও শক্তিমত্তা লইয়া লক্ষ লক্ষ চাষীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতেছেন, যেরূপ সুচিন্তিত পথে এই কর্ম্ম সাধন করিতেছেন এবং তাহাদের শরীর, মন, ইন্দ্রিয় সকল-গুলিকেই উন্নততর করিবার জন্য যে সকল বিভিন্ন পথের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা দর্শন করিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। আমার যে দেশ, সেখানেও এম্নি কোটী কোটী লোক শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়া আছে—এইজন্যই আপনাদের চেষ্টা দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। মানুষের আর যত কল্যাণ আছে, তাহা বহির্ম্মুখী—তাহা মুখে রং-এর প্রলেপের মত রক্তহীন চর্ম্মকে গোপন করিয়া রাখে মাত্র—স্বাস্থ্যের পরিচয় তাহা নয়, শরীরে তাহা নবরক্তের সঞ্চার করিয়া দিতে পারে না। সমাজের অমঙ্গলকে দূর করিতে হইলে একেবারে গভীর স্তরে মূলদেশে গিয়া পৌঁছিতে হইবে। একমাত্র শিক্ষার মধ্য দিয়া তাহা সম্ভবপর করিয়া তোলা যায়। পুলিশের লাঠি বা সৈন্যদলের ভীতি-প্রদর্শনে কখনও সমাজের অমঙ্গল দূর করা যায় না।

সোভিয়েট রুশিয়ার কর্ত্তা ষ্টালিন

কিন্তু আপনারা যে মহান্ কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি অসঙ্গতি আমি দেখিতে পাইতেছি। এমন কতকগুলি মনোভাব বিস্তৃতিলাভ করিতেছে, যাহা সমাজের মূলগত উন্নতির আদর্শের প্রতিকূল। যাহাদিগকে আপনারা শত্রু বলিয়া মনে করেন তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার ভাব ও শ্রেণীবিদ্বেষ জাগাইয়া দিয়া আপনারা কি ভাল কাজ করিতেছেন? যাঁহারা আপনাদের আদর্শের বিরোধীতা করেন, আপনারা হয়ত তাঁহাদিগকে বিপথগামী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু রুশিয়ার কৃষকদের মতই তাঁহাদিগকে আপনার জন মনে করিয়া সহানুভূতি ও স্নেহের বলে তাঁহাদিগকে আপনাদের আদর্শে দীক্ষিত করাই তো আপনাদের উচিত।

এক মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আপনারা কাজ করিতেছেন। তাই চিন্তায়, দয়ায়, অনুভূতিতে এবং ধৈর্য্যে আপনাদিগকে মহৎ হইতে হইবে। চিন্তা স্বাধীন হইলে মতভেদ তো হইবেই। সকলের মতই যদি জোর করিয়া এক ছাঁচে ঢালাই করা হইত, তবে পৃথিবীর বৈচিত্র্য নষ্ট হইয়া তাহা নিরানন্দময় হইয়া যাইত। অত্যাচারের ফলে অত্যাচারেরই সৃষ্টি হয়. সত্যের উপলব্ধির জন্য মনের স্বাধীনতা প্রয়োজন; ভয় তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া ফেলে

সাধারণের স্বাস্থ্যের জন্য ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য আপনারা যে সকল কাজ করিয়াছেন, আমি তাহা শুনিয়াছি। শিক্ষার জন্য আপনাদের দেশে যাহা করা হইতেছে, তাহা যে অন্যান্য দেশের প্রভূত উপকার সাধন করিবে, ইহাও নিশ্চিত। অন্য দেশের শিক্ষার মধ্যে বহু অবাস্তব, অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার জড়িত রহিয়াছে; আপনাদের শিক্ষাপ্রণালী তাহাদের তুলনায় অনেক বেশী কার্য্যকরী, নীতিসম্মত এবং জীবনের বৈচিত্র্য-প্রকাশের সহিত সম্পৃক্ত।"

মস্কোর "ডম্ সয়ুবফ"-এ প্রদত্ত আর একটী বক্তৃতায় তিনি বলেন :—

"আমি বিশ্বাস করি যে, শিক্ষার মধ্য দিয়াই মানবের সকল সমস্যার মূলগত সমাধান হইবে। আমার নিজস্ব কাজ ছাড়া আমি যতদূর পারি, আমার দেশবাসীকে শিক্ষা রহিয়াছে অজ্ঞতা। আপনারা সকলেই জানেন যে, ভারতবর্ষের অবস্থা বহু পরিমাণে আপনাদেরই মত। দেশের জনসাধারণ কৃষিজীবি হইলে শিক্ষার অভাবে তাহাদের যে কি দৈন্য হয়, তাহা আপনারা জানেন।

আমাদের জাতি একটা চিরন্তন দুর্ভিক্ষের ছায়ার তলে বাঁচিয়া আছে। নিজেদের মনুষ্যত্বে তাহারা আস্থাহীন, তাই কেমন করিয়া নিজেদের সাহায্য করিতে হয়, তাহা তাহারা জানে না। ত্রিশকোটীর অধিক নরনারী গভীর অজ্ঞতা, রুদ্ধদৃষ্টি ও শক্তিহীন হইয়া আছি, ইহা কি কম দুঃখের কথা?

তাই আপনারা কেমন করিয়া অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং ঔদাসীন্যের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন, তাহা দেখিতে আমি এই দেশে আসিয়াছিলাম। যেটুকু আমি দেখিয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, আপনারা অসম্ভ-

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

দিবার কাজেই নিজের শক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছি। আমি জানি, আমার দেশ আজ যে সকল দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহার প্রায় সবটুকুর মূলেই শিক্ষার অভাব রহিয়াছে।

দারিদ্র্য, রোগ-যন্ত্রণা, সাম্প্রদায়িক বিরোধ এবং শিল্প-কুশলতার অভাব যে আজ আমাদের জীবনের পথকে সংকীর্ণ ও বিপদ-সঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে, তাহার মূলে বকে সম্ভব করিয়াছেন আমরা ব্যর্থতা ও অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া মনেই করিতে পারি না, এই অল্প সময়ের মধ্যে কেমন করিয়া একটা সমগ্র জাতির মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যাহারা যথার্থভাবে জাতির জীবনকে বাঁচাইয়া রাখে, সভ্যতার ভার বহন করে, তাহারা যে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় নাই, তাহারা যে উন্নতিশীল সমাজের সকল সুবিধাই সমানভাবে ভোগ করে, ইহা জানিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছি

আইনষ্টাইন ও বার্ণার্ড শ'

আইনষ্টাইন জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ বৈজ্ঞানিক এবং বার্ণার্ড শ' জগতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। আইনষ্টাইনের Theory of Relativity অর্থাৎ আপেক্ষিক তত্ত্ব বিজ্ঞানের জগতে যুগান্তর আনিয়াছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডের এক সমিতির পক্ষ হইতে জগতের এই দুই বিরাট প্রতিভার মিলনের ব্যবস্থা হয়। বার্ণার্ড শ' বড় একটা কাহাকেও প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করেন না—তাঁহার সাহিত্যে যেমন তিনি এক ধ্বংসশীল ভাবের দ্বারা বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার প্রিয় জিনিষগুলিকে আক্রমণ

আইনষ্টাইন

করিয়াছেন—সেই নির্ম্মম লেখনীর মুখ হইতে কেহ অব্যাহতি পায় নাই—তেমনি সামাজিক দিক দিয়াও তিনি আত্মগোপন করিয়া থাকিবারই চেষ্টা করেন। কিন্তু আত্মগোপন করিয়া থাকিলেও মিঃ শ'র কথা কাগজে যত প্রকাশিত হয়, এ রকম প্রচার আর কোনও সাহিত্যিকের ভাগ্যে হয় নাই। আইনষ্টাইন আপনার সাধনা লইয়া আপনি এমনি মগ্ন থাকেন যে, বাহিরের লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করা তাঁহার সম্ভব হয় না। জার্ম্মানীতে তাঁহার বিজ্ঞানাগারের উপরে এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে এই বৈজ্ঞানিক একান্ত নির্জ্জনতার মধ্যে দিনের পর দিন অতিবাহিত করেন। তাঁহার স্ত্রী ব্যতীত সেখানে আর কাহারও যাইবার অধিকার নাই। কোনও রকম সভা-সমিতিতে যোগদান করা তাঁহার অভ্যাসের বিরুদ্ধে।

বর্ত্তমান প্যালেষ্টাইন-হাঙ্গামায় য়িহুদীরা অত্যন্ত সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে এবং আইনষ্টাইন ও শ'র এ মিলনের মধ্যে য়িহুদীদের স্বার্থের একটু সম্বন্ধ আছে। যে সমিতির পক্ষ হইতে আইনষ্টাইনকে অভ্যর্থনা দেওয়া হইয়াছে, সেটী একটি য়িহুদী প্রতিষ্ঠান।

এই সভায় বার্ণার্ড শ'ও আইনষ্টাইনের মধ্যে যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হয়, তাহা স-বাক্-ছায়াচিত্রে তোলা হইয়াছে। বার্ণার্ড শ' আইনষ্টাইনকে প্রশংসা করিবার সময় বলেন, নিউটনের পর, নিউটনের প্রতিভার প্রতিদ্বন্দ্বী যদি কেহ জন্মিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আইনষ্টাইন।

বার্ণার্ড শ'
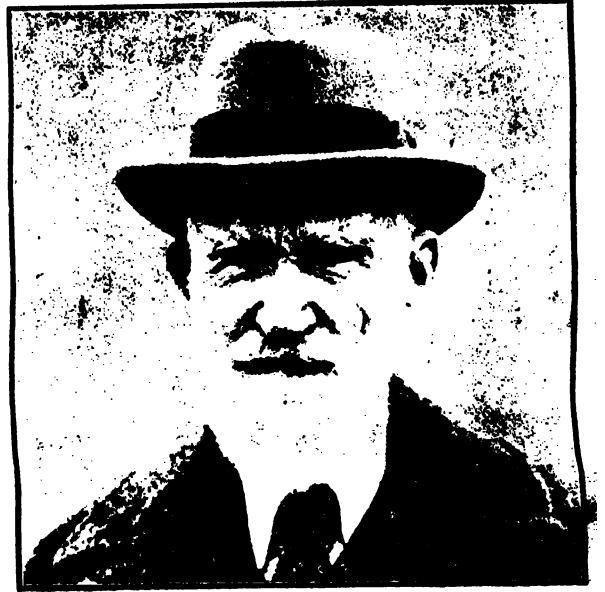
স্যার অলিভার লজ ও প্রেত-তত্ত্ব

আমাদের এই দৃষ্টিশক্তির বাহিরে মানুষ ছাড়া পরী, স্বর্গীয় দূত অথবা উক্ত প্রকারের কোনও অদৃশ্য জীব আছে কিনা, এই সম্বন্ধে বহু দিন ধরিয়া বহু তর্ক-বিতর্ক হইয়া আসিতেছে। এই সম্পর্কে জগতের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার অলিভার লজের নাম সকলের নিকট পরিচিত। তিনি পরলোকতত্ত্বে বিশ্বাস করেন এবং তাঁহার অবশিষ্ট জীবন উক্ত গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সম্প্রতি

ইংলণ্ডের চ্যান্সেলার অফ একস্‌চেকারের সরকারী ভবনে অর্থাৎ বিখ্যাত ১১নং ডাউনীং ষ্ট্রীটে এক সরকারী সভায় স্যার অলিভার লজ ঘোষণা করিয়াছেন যে, "আমার বিশ্বাস যে আকাশ-মণ্ডল জীবন ও মনন-শক্তি-সম্পন্ন প্রাণীতে পরিপূর্ণ। আমাদের এই দেহেতে বাস করিয়া যে সমস্ত আত্মা ইহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতিরেকে আরও বহু প্রাণী শূন্যমণ্ডলে বিচরণ করিতেছেন, যাঁহারা এখনও এই পৃথিবীতে আসেন নাই। "স্বর্গীয় দূত" বা উচ্চ-শ্রেণীর প্রাণী শূন্যমণ্ডলে আছে। আমরা

স্যার অলিভার লজ

এক অদৃশ্য ছায়ামণ্ডলের মধ্যে বাস করিতেছি এবং আমাদের যদি সত্য দৃষ্টি-শক্তি থাকিত, তাহা হইলে এই ঘরে বসিয়া যে দৃশ্য আমাদের সম্মুখে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, তাহাতে সহসা আমাদের চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইত।

আমার বিশ্বাস এই শূন্যমণ্ডল শূন্য হয়। মানুষ একদিন এই শূন্যমণ্ডলকে দেখিবার শক্তি নিশ্চয়ই আয়ত্ত করিবে, যেমন করিয়া আজ সে শূন্যমণ্ডল হইতে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ আবিষ্কার করিতে শিখিয়াছে।

আবিসিনিয়ার রাজা রাস তাফারি

আফ্রিকার একমাত্র স্বাধীন নরপতি রাস তাফারির সিংহাসনারোহণ ব্যাপারে য়ুরোপের বহু জাতি, বিশেষ করিয়া ইংরাজ বিশেষ আগ্রহ লইয়াছেন। আফ্রিকার এই সুদূর রাজ্যের বাদশাহের ছবি ইংরাজী অধিকাংশ কাগজেই প্রকাশিত হইয়াছে।

আফ্রিকা আজ য়ুরোপের সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের মধ্যে একরকম ভাগ বাটোয়ারা হইয়া গিয়াছে; শুধু আবিসিনিয়া

রাস তাফারি

এখনও মাথা সোজা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তিন হাজার বছর ধরিয়া, য়ুরোপীয় জাতিদের বহুপূর্ব্ব হইতে, ইহারা স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছে।

বর্ত্তমান নৃপতি রাস তাফারির অভিষেকে ইংলণ্ডের সম্রাট-পক্ষ হইতে ডিউক অফ গ্লাউসেষ্টার সম্মানিত অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। স্বর্ণ-নির্ম্মিত বহু উপঢৌকন তিনি ইংলণ্ড হইতে লইয়া যান। যে বহুমূল্য রাজ-শকট জার্ম্মানীর ভূতপূর্ব্ব কাইজার ব্যবহার করিতেন, বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সরকার এই উপলক্ষে তাহা আবিসিনিয়ার সম্রাটকে উপহার দিয়াছেন।

অন্নাভাবে মৃত্যু

এক মুঠা অন্ন না পাইয়া মানুষকে প্রাণত্যাগ করিতে হয়, ইহার অপেক্ষা শোচনীয় দুর্ঘটনা মানুষের ভাগ্যে ঘটিতে পারে না। এই বিংশ-শতাব্দী, এই তাহার বিরাট সভ্যতা, বিশ্বব্যাপী এই তাহার বাণিজ্য ব্যবসায়, এই রেডিও, এই এরোপ্লেন, মানুষের গর্ব্বের ও গৌরবের এই শত শত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, বিশ্বব্যাপী এই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে এক মুঠা অন্নের অভাবে যদি একটী প্রাণীকেও দেহত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে সভ্যতার গর্ব্ব করিবার কি থাকে?

অথচ এই চির-শ্যামলা বাঙ্গলা দেশে, যেখানে একহাত মাটী খুঁড়িলে জল পাওয়া যায়, যেখানকার মাটীর প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে শস্য-জনন-শক্তি অপূর্ব্বভাবে সঞ্চিত, সেখানে যুগের পর যুগ ধরিয়া দুর্ভিক্ষ নির্ম্মমহস্তে তাহার রাজকর আদায় করিয়া লইয়া যাইতেছে। এক চির-দুর্ভিক্ষের ছায়া আমাদের দেশকে যেন আকাশের মত আচ্ছন্ন করিয়া আছে। যে কৃষক শস্য উৎপাদন করিয়া দেশের ধন-বৃদ্ধি করে এবং শাসন-যন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য কাঁচা মাল বুকের রক্ত ফেলিয়া যোগান দেয়, প্রত্যেক সভ্য শাসন-তন্ত্রের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য সেই কৃষক সম্প্রদায়ের সুখ, সুবিধা ও সমৃদ্ধির সকল প্রকার ব্যবস্থা করা। কিন্তু চরম দুঃখের বিষয় যে, বাঙ্গলার কৃষকসম্প্রদায় বহু শ্রেণী ও বহু লোকের কেবল সহানুভূতির অশ্রুই পাইয়া আসিতেছে, আজও পর্য্যন্ত তাহাদের সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য কেহই কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিল না। এমনি অসহায় অবস্থায় বাঙ্গলার কৃষক সম্প্রদায়কে অনশন, অর্দ্ধাহার ও অপমৃত্যুর মধ্যে ফেলিয়া রাখায় এক অদূরবর্ত্তী বিপ্লবকেই পরিপুষ্ট করা হইতেছে, একথা শাসকসম্প্রদায় হইতে সকলের চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

পাটের দর পড়িয়া যাওয়ায় এবার বাঙ্গলার কৃষকদের মধ্যে আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। অন্নাভাবে আত্মহত্যা, সন্তান-বিক্রয়ের ঘটনা নিয়তই বাড়িয়া চলিয়াছে। সম্প্রতি রাজশাহী হইতে অন্নাভাবে এক পরিবারের মধ্যে পর পর চার জনের যে শোচনীয় অপমৃত্যুর সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে সমগ্র দেশ মর্ম্মাহত হইয়া উঠিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কোনও মুছলমান পরিবারের দুই ভ্রাতা পারিবারিক কলহের জন্য পাশাপাশি পৃথক বাড়ীতে বাস করিত। কনিষ্ঠ ভ্রাতার অবস্থা খুব খারাপ ছিল। গত ৬ মাস কাল সে প্রত্যহ এক বেলা খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছিল। স্ত্রী পুত্রাদির সহিত ৪৮ ঘণ্টা অনাহারে আছে জানিতে পারিয়া, ঘটনার দিন তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পত্নীর অজ্ঞাতসারে তাহাকে এক সের চাউল প্রদান করে। কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী যখন উহা রান্না করিতেছিল, তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী ঐ বিষয় জানিতে পারে এবং তাহার স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে যে পাত্রে ভাত রান্না হইতেছিল উহা ভাঙ্গিয়া ফেলে।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাড়ীতে আসিয়া তাহার স্ত্রী-পুত্রাদিকে কাঁদিতে দেখে। সে উহার কারণ জানিয়া লইয়া নিঃশব্দে পার্শ্ববর্ত্তী এক ঘরে প্রবেশ করে এবং স্বীয় দুর্দ্দশার অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে। কিছুক্ষণ পরে তাহার পত্নী উহা জানিতে পারিয়া সেও তাহার স্বামীর পন্থা অনুসরণ করে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাড়ীতে না থাকায় সে ঘটনার বিষয় কিছুই জানিতে পারে নাই। প্রায় এক

ঘণ্টা পরে বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর মৃতদেহ দেখিতে পায় এবং তাহার পত্নীর কার্য্যের বিষয় জানিতে পারে। সে তৎক্ষণাৎ নিজ বাটীতে প্রবেশ করিয়া একটী তীক্ষ্ণ কাটারী দ্বারা তাহার পত্নীকে হত্যা করিবার পর নিজেও আত্ম-হত্যা করে।

এই ঘটনায় স্বতঃই প্রশ্ন জাগে, এই মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? যে সমস্ত ঘটনা সংবাদ-পত্রের মারফতে আমাদের নিকটে আসিয়া পৌঁছায়, তাহার বাহিরে এমনি কত শোচনীয় ঘটনা নিত্য ঘটিতেছে, তাহার খবর কে রাখে? বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর স্যার চার্লস্ ইলিয়ট একদিন বলিয়াছিলেন, ভারতের কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্দ্ধেক, বৎসরের মধ্যে একদিনও পরিপূর্ণ আহার পায় না। সেকথা সেদিনও যেমন সত্য ছিল, আজ লর্ড আরউইনের আমলেও ঠিক তেমনই আছে। স্যার চার্লস্ ইলিয়ট ও লর্ড আর-উইনের শাসনকালের মধ্যে বহু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, শাসনকর্ত্তার পর শাসনকর্ত্তা আসিয়াছেন, সংস্কারের পর সংস্কারের প্রস্তাব হইয়াছে, স্বদেশের মুক্তির জন্য সহস্র সহস্র লোক কারাগমন করিয়াছে, শাসন-অব্যাহত রাখিবার জন্য আইন অর্ডিন্যান্সে পরিণত হইয়াছে,—সমগ্র জগতেরই আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গলার কৃষক সেদিনও যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে, তেমনি অসহায়, তেমনি সকলের কৃপাপ্রার্থী, তেমনি দুর্ভিক্ষের ও অনাহারের কশাঘাতে জর্জ্জরিত, তেমনি অন্নপুষ্ট লোকের সহানুভূতির অশ্রুতে কৃতার্থ!

কৃষকের অবস্থার দুর্দ্দশার সঙ্গে, কোনও কোন শ্রেণীর সাময়িক সুবিধা হইলেও, এই অবস্থা যদি স্থায়ী হয়, তাহা হইলে সমাজের সমস্ত স্তর সমানভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং তখন যে ভয়াবহ সমস্যার উৎপত্তি হইবে, তাহাতে শত সহস্র দেশ-কর্ম্মী কারাবরণ করিলেও, তাহার সমাধান ঘটিবে না। অর্দ্ধেক জাতিকে অনাহারে রাখিয়া স্বাধীনতারও স্বাদ গ্রহণ করা তখন বিষাক্ত হইয়া উঠিবে।

—— ——

খান বাহাদুরের ফৎওয়া

ঢাকার জমিদার, খান বাহাদুর মৌলবী কাজেমুদ্দিন আহমদ ছিদ্দিকী ছাহেব একখানা মুদ্রিত উর্দ্দু পুস্তক আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। পুস্তক খানা "মাস্তাফাকা ফৎওয়া" নামে প্রচারিত, হাজী মোহাম্মদ ইউছফ নামক দিল্লীর আর এক খান-বাহাদুর ইহার সঙ্কলক। খান বাহাদুর ছাহেব এই পুস্তকে খুব বড় বড় অক্ষরে জনাব মাওলানা মোহাম্মাদ আশরফ আলি ছাহেবের নাম লিখিয়া তাঁহার একটী ফৎওয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শেষভাগে দিল্লীর আরও কয়জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির নামে আর দুইটী ফৎওয়া প্রশ্নোত্তর হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই ফৎওয়া খানা পাঠাইবার জন্য আমরা খান বাহাদুর ছিদ্দিকী ছাহেবকে ধন্যবাদ জানাইতেছি এবং সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যগুলি নিম্নে অতি সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।

খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইউছফ ছাহেব, মাওলানা আশরফ আলি ছাহেবের নামকরণে যে ফৎওয়াখানা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মন্তব্যগুলি সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত হয় নাই। গত 'ছফর' মাসে নিজের মনমত কএকটা প্রশ্ন রচনা করিয়া জনৈক রাজভক্ত মুছলমান উত্তরের জন্য মাওলানা ছাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। মাওলানা ছাহেব

معا ملة المسلمين فى مجادلة غير المسلمين

নামক একখানা পুস্তিকায় তাহার উত্তর প্রদান করেন। কিন্তু এই উত্তরের উপসংহারে সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুইটী আবশ্যকীয় মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং এই মন্তব্য দুইটীও তাঁহার ঐ পুস্তিকায় মুদ্রিত হইয়া আছে। খান বাহাদুর ছাহেব ঐ মন্তব্য দুইটী বেমালুম হজম করিয়া ফৎওয়ার বাকী অংশটুকু প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। এই মন্তব্যে মাওলানা ছাহেব স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন—"আমি প্রশ্নের হিসাবে উত্তর দিতে বাধ্য, কিন্তু প্রশ্নগুলিতে যে অবস্থার বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা সত্য কিনা, তাহা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়ার কোন সুযোগ আমার ঘটে নাই।" অর্থাৎ প্রশ্নগুলি প্রকৃত হইলে তাহার এই উত্তর এবং প্রশ্নগুলিতে অপ্রকৃত কথা লেখা হইয়া থাকিলে, এই উত্তরও সঙ্গত হইবে না। তাহার পর মাওলানা আরও বলিয়াছেন—

حالت و واقعات کے تبدل سے همیشه جواب
بدل جا تا ھے' جس کا احتمال آینده بهی ھے -

অর্থাৎ—"অবস্থা ও ঘটনার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে—যে পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা ভবিষ্যতেও আছে—উত্তরও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।" কংগ্রেসে যোগদানকারী মুছলমানদের বিরুদ্ধে "ক্রুসেড" ঘোষণা করার সময় দূরদর্শী খান বাহাদুর ছাহেব মাওলানার এই মন্তব্যগুলি সম্পূর্ণ ভাবে বাদ দিয়াছেন।

জনাব খান বাহাদুর ছাহেব ফৎওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে দীর্ঘ ভূমিকা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিজের সমস্ত যোগ্যতা ব্যয় করিয়া ইহাই সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, ভারতবাসীদিগের পক্ষে স্বাধীনতা লাভের ন্যায়, অন্যায় ও মারাত্মক সর্ব্বনাশ আর কিছুই হইতে পারে না। এমন কি, ভারতবর্ষ যদি কেবল মুছলমানদিগের দ্বারা অধ্যুষিত হইত, তাহা হইলেও তাহাদের পক্ষে মুক্ত ও স্বাধীন হওয়া একেবারে সর্ব্বনাশকর হইত। কারণ, তাহারা শীয়া ছুন্নী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এই প্রকারে, যে দেশের মুছলমানগণের মধ্যে এই প্রকার মতভেদ বিদ্যমান, খান বাহাদুর ছাহেব اصول বা Principle এর হিসাবে প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন যে :—

"ایسی قوم کے لئے آزادی سم قاتل ہے - جس کا علاج سوائے طوق غلامی کے دنیا میں اور کچھ نہیں"

"এ হেন জাতির পক্ষে স্বাধীনতা মারাত্মক বিষ, গোলামী ব্যতীত যাহার আর কোন চিকিৎসাই হইতে পারে না।"

এই শ্রেণীর ভদ্রলোকদিগের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার কোনই সার্থকতা নাই। হীনতা ও নীচতার পূজা করিতে করিতে আমাদের লক্ষ্য, আদর্শ ও চিন্তাধারা ক্রমে ক্রমে কতদূর অধঃগামী হইয়া চলিয়াছে এবং তাহা আমাদিগকে কোন পরিণতির দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, পাঠকগণ এখানে তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বাধিত হইব।

নোবেল প্রাইজ ও ভারতবর্ষ

সংবাদে প্রকাশ যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত বিজ্ঞান অধ্যাপক ডাঃ স্যার সি, ভি রমন পদার্থ-বিদ্যার জন্য জগৎবিখ্যাত নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। ইহা লইয়া দুইবার ভারতের ভাগ্যে এই মহাসম্মান ঘটিল। একবার ১৯১৩ সালে সাহিত্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ এই পুরস্কার পান, এবৎসর বিজ্ঞানের জন্য পাইলেন ডাঃ রমন। একটা পরাধীন জাতির পক্ষ হইতে দুইবার এই সম্মান-পাওয়ার ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়, পরাধীনতা এখনও ইহার মূলশক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই।

এখানে এই জগৎ-খ্যাত পুরস্কার ও তাহার প্রবর্ত্তকের বিষয় আলোচনা করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১৮৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর য়ুরোপের অন্তর্ভুক্ত সুইডেন প্রদেশের রাজধানী ষ্টকহলম্ শহরে আলফ্রেড বার্ণার্ড নোবেল জন্মগ্রহণ করেন। রসায়নশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগবশতঃ তিনি যৌবনে উক্ত বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন এবং কালে তিনি বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধে ব্যবহৃত ভীষণতম অস্ত্র ডিনামাইট আবিষ্কার করেন।

ডিনামাইট বিক্রী করিয়া এবং তৈলখনির ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে নোবেল দেহত্যাগ করেন, এবং তাঁহার বিরাট সম্পত্তি সমস্ত জগতের প্রতিভার পুরস্কারের জন্য দান করিয়া যান। তাঁহার ইচ্ছা অনুযায়ী উক্ত বিরাট সম্পত্তির আয় হইতে প্রতিবৎসর সমগ্র জগৎ হইতে জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে পাঁচটী বিভিন্ন বিষয়ের জন্য পাঁচটী পুরস্কার দেওয়া হয়। ইহাই নোবেল প্রাইজ নামে খ্যাত। প্রত্যেক পুরস্কারের মূল্য প্রায় লক্ষ টাকা। প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান বলিয়া ইহা বিবেচিত হয়। পাঁচটী বিষয়ের মধ্যে তিনটী বিজ্ঞানবিষয়ক, একটী সাহিত্য এবং একটী জগতের আন্তর্জ্জাতিক শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য।

পঞ্চম পুরস্কারটীর কথা প্রসঙ্গে ইহা বড়ই বিচিত্র লাগে যে, যে-ব্যক্তি জগতের ভীষণতম যুদ্ধাস্ত্র তৈয়ারী করিলেন এবং যাহা বিক্রয় করিয়া বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন, সেই ব্যক্তিই পুনরায় আন্তর্জ্জাতিক শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য মরণ কালে পুরস্কার ঘোষণা করিয়া গেলেন। গত মহাযুদ্ধের খবর যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, সেই ভয়াবহ যুদ্ধে "ডিনামাইট" কি ভীষণ কাণ্ডই না করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বলা কর্ত্তব্য যে, এবৎসরের সাহিত্যের জন্য নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন আমেরিকার বিখ্যাত উপন্যাসিক

সিন্ ক্লেয়ার লুইস। যে অর্থনীতি-সর্ব্বস্ব সভ্যতার মধ্যে আমেরিকা আজ নিমজ্জিত, মিঃ লুইস সেই সভ্যতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। তাঁহার সাহিত্য বিদ্রুপাত্মক এবং তিনি কঠোর বাস্তবতার সাহায্যে আমেরিকার অন্তরের দৈন্যের কথা এবং তাহার অন্তঃসারশূন্যতার কথা গল্পচ্ছলে জগতের সম্মুখে নির্ম্মমভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

আন্তর্জ্জাতিক শান্তি-প্রচেষ্টার অসারতা

"লীগ অফ নেশন্স্" হইতে আরম্ভ করিয়া আজ য়ুরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে, যুদ্ধ বন্ধ করিবার সুমহান্ উদ্দেশ্য লইয়া বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। আমরা ভারতবর্ষে বসিয়া প্রায়ই খবরের কাগজের মারফৎ সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নাম শুনি। যুদ্ধাস্ত্র কমাইয়া দেওয়া, জাতিতে জাতিতে মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় করা, ইত্যাদি প্রকারের নানাবিধ মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া এই সমস্ত সমিতি গঠিত হইতেছে। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখিতেছি, তাহার কোনও প্রভাব কোথাও নাই। প্রত্যেক জাতি আজ অস্ত্র শানাইতেছে, আর সেইসব জাতির কয়েকজন আদর্শবাদী ব্যক্তি শুধু কতকগুলি মহৎ কথার সৃষ্টিদ্বারা সেই সমস্ত সামরিক আয়োজনকেই যেন ঢাকা দিয়া রাখিতেছেন, সুন্দর মখমলের খাপের ভিতর যেমন তীক্ষ্ণ ধার তরবারী থাকে। সম্প্রতি জগতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মিঃ এইচ, জি, ওয়েল্স্ এই প্রসঙ্গে এক শান্তি সমিতিতে একটী বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন, "আমার বিশ্বাস যে অদূর-প্রাচ্যে কয়েক বৎসরের মধ্যেই একটি ভয়াবহ যুদ্ধ হইবে এবং নানাজাতি তাহারই জন্য আয়োজন করিতেছে। যখন সেই সময় নিকটবর্ত্তী হইবে, তখন দেখিবেন যে, আপনাদের (শান্তি সমিতি প্রতিষ্ঠানের) কোনও হাত নাই। বিভিন্ন জাতির সামরিক অফিস যথারীতি সাজগোজ করিতেছে—আপনারা শুধু বক্তৃতা করেন, আর বড় বড় কথা লইয়া নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন।"

মিঃ ওয়েলসের কথা যে কতদূর সত্য, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

Printed and Published by Md. Khairul Anam Khan from the "Mohammadi Press,"
91, Upper Circular Road, Calcutta.

এতদিনে একটি
অভাবের
অভাব
হইল !
কোরআনে মজিদ
ফোরকানে হামিদ
এর
বিস্তৃত তফছির
আড়াই পারায়
প্রথমখণ্ড সমাপ্ত
ছুরা ফাতেহা ও ছুরা
বকরাহএর বঙ্গানুবাদ
প্রকাশিত ইহয়াছে
হাদিয়া
সাড়ে চারিটাকা মাত্র

Printed at The "Mohammadi Press" 91 Upper Cricular Road, Calcutta.

পৌষ

বার্ষিক মূল্য সডাক তিন টাকা ছয় আনা

সম্পাদক—মোহাম্মদ আকরম খাঁ

প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা

সূচীপত্র—পৌষ ১৩৩৭

সুচীপত্র—পৌষ ১৩৩৭

BEAUTY FOAM

সুবাসিত
নারিকেল তৈল
রূপে গুণে গন্ধে অতুলনীয়
সুবাসিত
তিল তৈল
রূপে গুণে গন্ধে অতুলনীয়
বেঙ্গল ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্
৩৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সূচীপত্র—পৌষ ১৩৩৭

"কি বিপদ !"

অকারণ এ যন্ত্রণা কেন? আজই "এভার-রেডী" সেফ্‌টী ক্ষুর কিনুন। অল্প সময়ে আরামে অথচ বিনা খরচায় কামাইতে পারিবেন।

C. B. সেট ১ ব্লেডযুক্ত "ট্রায়েল আউট্ ফিট" — মূল্য ।৵০ আনা।

দুই ব্লেডযুক্ত গোল্ড প্লেটেড সেট (লাল বাক্সে) — মূল্য ৷৷৵০ আনা।

দুই ব্লেডযুক্ত "পপুলার" সেট মূল্য ৸০ আনা।

আমেরিকান
সেফটী রেজর কর্পোঃ লিঃ,
পোঃ বক্স ৯৮, কলিকাতা।

PUBLICITY STUDIO.

সাতদিন মাত্র এই অমৃতবিন্দু সালসা সেবনের পরে হস্তপদের অঙ্গুলি টিপিয়া দেখিবেন শরীরে সত্য সত্যই তরল আলতার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বিশুদ্ধ রক্তের সঞ্চার হইতেছে কিনা। অমৃতবিন্দু সালসা রক্তপরিষ্কারক, বলকারক, গরমি, পারাদোষ, প্রমেহ, খোষ, পাঁচড়া চর্ম্মরোগ, নানাবিধ দৌর্ব্বল্য, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, অনিয়মিত ঋতু প্রভৃতি সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়। ১ শিশি ১৲ এক টাকা মাশুল ।৵০ আনা, ৩ শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা মাশুল ৸৵০ আনা, ৬ শিশি ৪।০ চারি টাকা চারি আনা মাশুল ১।০ **বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ** (স্বর্ণসিন্দুর) তোলা ৪৲ টাকা। উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসা গন্ধকদ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ। **চ্যবণ-প্রাশ**—উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণমাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ। ৩৲ সের।

কবিরাজ—শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত কবিরত্ন।

নবশক্তি ঔষধালয়, ২৯৭নং অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার, কলিকাতা।

টাকের অব্যর্থ মহৌষধ।

ডাঃ এন্, সি, বসু এম, বি, আবিষ্কৃত।

দশ পনের বৎসরের পুরাতন টাক চুলে পরিপূর্ণ হইবে। বহু পরীক্ষিত। মূল্য ১৲ টাকা। কতদিনের পুরাতন টাক বা কতদিন হইতে চুল উঠিতেছে। বয়স কত, স্ত্রী কি পুরুষ, অন্য কোন রোগ আছে কিনা ইত্যাদি বিবরণ সহ পত্র লিখিয়া ব্যবহার বিধি লইলে নিশ্চয়ই উপকার পাইবেন।

ডাক্তার এন্, সি, বসু

স্কিন ক্লিনিক বা চর্ম্মরোগ চিকিৎসালয়

১২০নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

মূল্য ৪।৹ টাকা

মূল্য ৪।৹ টাকা

বাজারের মধ্যে সস্তা অথচ উৎকৃষ্ট রিষ্ট ওয়াচ।

উৎকৃষ্ট রোল্ডগোল্ডেন রিষ্ট ওয়াচ মজবুত কলকজা দেখিতে সুন্দর আয়তনে ছোট এবং হাফ ক্যাসানের, দেখিলেই ঠিক ৫০৲ টাকা মূল্যের ঘড়ীর ন্যায় বোধ হয়। মার্চ্চেন্টগণের অর্ডার গ্রাহ্য করা হইবে না। তিন বৎসর গ্যারান্টি। সুন্দর সিল্কের ব্যাণ্ড সহ মূল্য মাত্র ৪।৹ টাকা।

কিংষ্টন ওয়াচ এজেন্সী, ১৯৫।১নং হ্যারিসন রোড, (ডেপ্ট নং ৭), কলিকাতা।

এই যে দুধ দেখছেন!

ইহাই আজকাল অন্যান্য দুধের চেয়ে ভারতবর্ষে শিশুগণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

ভারতের জননীগণ তাঁহাদের নিজ নিজ শিশু সন্তানদের আজকাল এই দুধই খাওয়াইয়া থাকেন, তাই তাঁহাদের মুখে আজ প্রসন্নের হাসি ফুটিয়া উঠে, আপনার সন্তানকেও এই প্রবিদ্ধ খাদ্য খেতে দিন, দেখবেন কেমন প্রসন্ন-চিত্তে সে এই লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য হজম করে। ইহাও লক্ষ্য করবেন যে কত শীঘ্র শিশুর দেহে মাস গজায় ও হাড় পুষ্ট হয়। এই খাদ্যে স্বাভাবিক ভিটামিন ও অন্যান্য উপাদান এরূপ পরিমাণে সংমিশ্রিত আছে, যাহা শিশুদিগের দেহ বর্দ্ধণ ও হৃষ্টপুষ্ট করিতে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

ইংলণ্ডের স্বভাবজাত শ্যামল তৃণপূর্ণ প্রদেশ হইতে এই দুধ টাটকা আমদানী—এবং বিশদরূপে প্যাক করা। প্রস্তুত কালীন হস্ত দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না।

এজেণ্টস্—কার এণ্ড কোং লিমিটেড, ওল্ড কোর্ট হাউস করণার, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং করাচি। জননীগণ স্বয়ং কাউ এণ্ড গেট চকোলেট ব্যবহার করুন।

ডোঙ্গরের বালামৃত

—অরোরা—

শিশুদের পক্ষে ইহা

ঔষধ ও পথ্য।

ইহাতে শিশুদিগের দন্তরোগের সহায়তা করে, দেহের অস্থিসমূহ সুগঠিত ও বলিষ্ঠ করে, হজমশক্তি বর্দ্ধিত করে, শরীরে শক্তি সঞ্চয় করে। ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক; পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাশি আরোগ্য করে। অধিকন্তু ইহা সুমিষ্ট। বর্দ্ধনশীল শিশুদের পক্ষে ইহা পরম উপকারী। প্রতি বোতলের মূল্য এক টাকা মাত্র।

বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

—কলিকাতার ষ্টকিষ্টস্—

এস, কুশালচাঁদ এণ্ড কোং,

৫৫নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মৃগনাভি কস্তুরী সংযুক্ত

বাদশাহী জর্দ্দা

যে মৃগনাভী জর্দ্দা পূর্ব্বে বাদশাহগণ পানে ব্যবহার করিতেন, আমরা সেই মহাসুগন্ধি জর্দ্দা প্রস্তুত করিয়াছি। পানে ব্যবহার করুন, প্রায় দু'ঘণ্টা মুখে সুগন্ধি থাকিবে বিশেষ গুণ এই যে, বহু মূল্যবান মসলাদী মিশ্রিত থাকায় বৃদ্ধকে যুবার ন্যায় শক্তিশালী করতঃ ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি করে। রমণীগণ পানে ব্যবহার করিলে তাঁহাদের ওষ্ঠাধরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইবে। সকলেই ইহা এক আশ্চর্য্য বস্তু বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন। মূল্য ৬ শিশি ১৷৹, এক ডজন ২৲

সের ১৬৲। ২নং বাদশাহী জর্দ্দা ডজন ১৷৷৹, গ্রোস ১৫৲ টাকা, সের ৮৲ টাকা। মৃগনাভী রূপালী জর্দ্দা সের ৪৲, ৫৲, ৬৲, ৮৲ হইতে২৩৲ পর্য্যন্ত। মহাসুগন্ধি কাল মুক্তি জর্দ্দা সের ১৷৷৹, ২৲ ৩৲, ৪৲ হইতে ৮৲ টাকা পর্য্যন্ত।
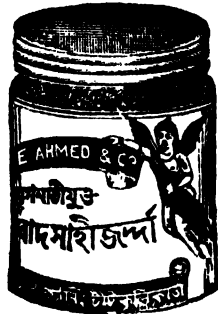
ইস্তাজ আহমদ এণ্ড কোং,

১০৪নং মুর্গীহাটা, কলিকাতা।

শ্রীকেমিক্যালের

মহাভৃঙ্গরাজ তেল

চুলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে ও মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে অতুলনীয়। মাথা ধরা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি সকল রকমের শিরোরোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় এবং মাথা অত্যন্ত ঠাণ্ডা থাকে। অনিদ্রা একদিনে দূর হয়। চুলউঠা ও টাকপড়া বন্ধ হয় এবং চুল ঘন কালো, নরম ও কোঁকড়া ২ হয়।

ভিঃপিঃতে ১ শিশি ১৲, ৩শিশি ২৷৷৶৹, ডজন ৯৷৷৹।

শুক্র তারল্য ও পুরুষত্বহানির মহৌষধ

✻ বানরিকা ✻

(আলকুশীবীজ, অশ্বগন্ধা, শিমুল মূল, শালম মিছরি, মুক্তাভস্ম)

রক্ত, শুক্র ও মেধা বিশেষ পুষ্ট হয় এবং নিয়মিত ব্যবহার করিলে জরাজীর্ণ বৃদ্ধও যুবকের বল ও তেজ লাভ করেন। আর বেশী বলা বাহুল্য।

১মাসের উপযোগী ভিঃপিঃতে (ডাকমাশুল সমেত) ৫৲।

শ্রীকেমিক্যাল ওয়ার্কস্

৩৩নং কাঁসারিপাড়া রোড, ভবনীপুর,

কলিকাতা।

অমৃতাঞ্জন

প্রত্যেক মাতা ও গৃহিণীর ঘরে এক কৌটা
অমৃতাঞ্জন সর্ব্বদা রাখা উচিত॥

মাথাধরা, বাত, সর্দ্দি কাশিতে বুকে বেদনা, দন্তশূল, কাটা ও পোড়া ঘায়ে "অমৃতাঞ্জন" প্রয়োগ করিলে অচিরে শুভ ফল প্রদান করে। বিশুদ্ধ ভারতীয় উপাদানে প্রস্তুত।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

মূল্য প্রতি কৌটা দশ আনা

স্থানীয় এজেন্ট :—সি, মণিলাল এণ্ড কোং
E.P.S. ৫৫।৮৮ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অমৃতাঞ্জন ডিপো,
পোষ্ট বক্স নং ৬৮২৫ কলিকাতা

পাকা খেজাব

ইহার রং যথার্থই পাকা। পরেও বিবর্ণ হয় না, চামড়ায়ও দাগ পড়ে না। পাকা চুল ঠিকই যৌবনের কাঁচা চুলে পরিণত হয়। ১ শিশিতে প্রায় ৩ মাস চলে। ব্যবহার প্রণালীও অতি সহজ। ব্রুশ সহ প্রতি শিশি ১।০ পাঁচ সিকা।

লোমনাশক আরক ইহাতে ২।৩ মিনিটেই অতি আরামে লোম নির্ম্মূল হয়। প্রতি শিশি ।০ আনা মা; ।৵০

টাউন এজেন্সী,
২০নং হলওয়েল লেন, মৃজাপুর, কলিকাতা।

প্রোঃ ডাঃ সরকার কৃত

আশ্চর্য্য হোমিওপ্যাথিক ইনজেকসন।

৬টী এম্পূলস সহ পূর্ণ বাক্স
মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

হাঁপানি, গণোরিয়া, সিফিলিস্, প্যারালিস, থাইসিস্ ইত্যাদি যাবতীয় কঠিন ব্যাধি, উক্ত ইনজেকসন্ দ্বারা চির জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া আরোগ্য করা হইতেছে।

মফঃস্বলবাসী চিকিৎসকগণের সুবিধার্থ "**বিশুদ্ধ আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ঔষধ**" (ড্রাম /৫ ও /১০) বিশেষ যত্ন সহকারে সাপ্লাই করা হয়। **হোমিও লিভার স্প্লীলিন সিরেপ** ঃ—যাবতীয় লিভার স্প্লীনের অব্যর্থ ঔষধ। মূল্য ॥০ আনা। **হোমিও ল্যানসেট ও এণ্টিফ্লোজিষ্ন** ঃ—বিনাঅস্ত্রে সার্জ্জারির কার্য্য সম্পন্ন হইবে। মূল্য ॥০ আনা।

হোমিওপ্যাথিক লাকসন। মূল্য ॥০ আনা। এই জোলাপ খাইতে সুমিষ্ট। আহারান্তে সেবন করিলে ২।১ টী সরল দাস্ত হইবে।

ক্যাটালগের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

প্রোঃ ডাঃ কে, সরকার,
১১১নং মদন পাল লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা।

জহরলাল পান্নালাল এণ্ড কোং

৬৮নং সুতাপটী—ফোন বড়বাজার ১১০৮
(বড়বাজার)
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট „ „ ১১০৯
(পটল ডাঙ্গা)

কলিকাতা

৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড
(জহর হাউস) ভবানীপুর, ফোন সাউথ ১২৩
১৩৪নং ক্যানিং ষ্ট্রীট „ কলিকাতা
(মুর্গীহাটা) ৪৩৮২

ব্রাঞ্চ—২২৭নং দশাশ্বমেধ রোড, বেনারস সিটি * ব্রাঞ্চ—কাট্‌রা আলুওলা, অমৃতসহর।

শীতের জন্য খাঁটী দেশী পশমী কাপড়

অমৃতসহর, লাহোর, লুধিয়ানা, জালালপুর, গাড়োয়াল প্রভৃতি স্থানের শাল, আলোয়ান, তাপ্তা, মলিদা, র‍্যাগ, ধোসা প্রভৃতি এবং খদ্দরের নানাবিধ নূতন নূতন ফ্যাসানের শাল, চাদর, দেশী হোসিয়ারী এবং পোষাকের বিস্তৃত আয়োজন করিয়াছি ও বাজার অপেক্ষা সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেছি।

এতদ্ভিন্ন বিবাহোপযোগী ভারতীয় সিল্কের বেনারসী শাড়ী, তসর, গরদ, মট্‌কা, সুন্দর সুন্দর সিল্কের ছাপাশাড়ী প্রভৃতি প্রচুর ষ্টক করিয়াছি। **পরীক্ষা প্রার্থনীয়।**

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আমাদের সব দোকানেই ভিঃ পিঃর সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। অপরিচিত স্থানে অর্ডারের সিকি টাকা পাইলে বাকী টাকা ভিঃ পিঃ করিয়া লওয়া হয়।

মন্মথ কুকার

কুকারের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। কেবলমাত্র এই কুকারেই ভাজা ও রান্না এক সঙ্গে হয়। সুন্দর কারু- কার্য্য মূল্য সুলভ। যে জিনিষের মূল্য সুলভ অথচ উৎকৃষ্ট তাহাই ব্যবহার করা উচিত।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।

৯৫নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

দেশের পয়সার

যদি প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিতে চান এবং খাঁটী স্বদেশী বিড়ি ও চুরুট পান করিতে ইচ্ছা করেন বা বিড়ি তৈয়ারির জন্য পাতা, শুখা ও আর আর সরঞ্জাম ন্যায্য মূল্যে পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে আজই পত্র লিখুন। বিনামূল্যে, বিনামাশুলে দর সহ নমুনা পাঠান হয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র চন্দ্র,
৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

এতদিনে একটি
অভাবের
অভাব
হইল !
কোরআনেমজিদ
ফোরকানে হামিদ
এর
বিস্তৃত তফছির
আড়াই পারায়
প্রথমখণ্ড সমাপ্ত
ছূরা ফাতেহা ও ছূরা
বকরাহএর বঙ্গানুবাদ
প্রকাশিত হইয়াছে
হাদিয়া
সাড়ে চারিটাকা মাত্র

ইংরাজী, হিন্দি ও বাঙ্গালা ভাষায় পকেট প্রেস।

এই প্রেসের সমস্ত অক্ষর পাকা সীসার তৈয়ারী। ইহার দ্বারা সকলেই অনায়াসে ঘরে বসিয়া সকল প্রকার বাঙ্গালা ভাষার ছাপার কার্য্য যথা:—চেক, দাখিলা, চিটি পত্রাদি, বিবাহের ও আমোদজনক উৎসবের নিমন্ত্রণপত্র, প্রীতিউপহার ইত্যাদি করিতে পারিবেন। ইহাতে সমস্ত রকম যুক্তাক্ষর, হিসাব নিকাসের জন্য ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত সাংকেতিক চিহ্ন /০, ৵০, ৶০ ইত্যাদি সমস্তই আছে। ব্যবহার প্রণালী পুস্তক ও অপরাপর সরঞ্জাম সহ মূল্য—৩×৬ ইঞ্চি (১০০ অক্ষর সহ) ২।০, ৩×৭ ইঞ্চি (২০০ অক্ষর সহ) ৩।০, ৩×৬ ইঞ্চি (৩০০ অক্ষর সহ) ৪৲, ৪×৭ ইঞ্চি (৪০০ অক্ষর সহ) ৫৲ টাকা, ৫×৭ ইঞ্চি (৫০০ অক্ষর সহ) ৬৲ টাকা, ৬×৯ ইঞ্চি (৭০০ অক্ষর সহ) ১২৲, ৯×৬ ইঞ্চি (১০০০ অক্ষর সহ) ১৫৲, ১২×১০ ইঞ্চি (১২০০ অক্ষর যুক্ত) ২৪৲, ১২×১৮ ইঞ্চি (১৬০০ অক্ষর সহ) ৩৬৲। সীসার অক্ষর প্রতি শত মূল্য ৸০, অগ্রিম ২৲ টাকা না পাঠাইলে মাল পাঠান হয় না। মাশুলাদি স্বতন্ত্র পড়িবে।

রবারের ইংরাজী পকেট প্রেস—আমাদের এই পকেট প্রেস নূতন আমদানী হইয়াছে, ইহার একটি সংগ্রহ করুন। ইহাতে "এ" হইতে "জেড্" পর্য্যন্ত সলিড রবারের অক্ষর আছে, এবং সেলফ ইঙ্কিং প্যাড, অক্ষর উঠাইবার চিমটা, কম্পোজ করিবার ২টী লাইন ও একটী হোলডার আছে। ঘরে বসিয়া ইহা দ্বারা সকল রকম ছোট খাট ছাপার কার্য্য করিতে পারিবেন। ইহা খেলার জিনিষ নহে, প্রকৃত কাজের জিনিষ। ১১৭ নং ১৬৬টা অক্ষরযুক্ত ৸০ আনা। মাঃ ।৵০ ১১৮নং ২১৬টা অক্ষরযুক্ত ১৲ মাঃ ।৵০ ১২১নং ৩৫০ অক্ষর ১ লাইন ২ লাইন ও ৪ লাইন পৃথক ভাবে ছাপিতে পারিবেন ও তিনটী নম্বরযুক্ত রুল সমেত ২৲ মাঃ ||/০ আনা পড়িবে।

ডেটিং ষ্ট্যাম্প—বিল বই, চেক বই, চালান বই প্রভৃতিতে তারিখ দিবার জন্য বার, মাস, বৎসরযুক্ত ১টী সংগ্রহ করুন। ১নং ৸০, ২নং ১৲, ৩নং ১।০ মাশুল।/০

ফিগার সেট FIGURE SET ফিগার সেট
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

এই জিনিষটী নমুনা অপেক্ষা অনেক বড় ইহাতে ইংরাজী ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত ১০টী নম্বর একটী বাক্সে স্বতন্ত্রভাবে আছে, সমূহ জিনিষে ইচ্ছামত নম্বর দিতে পারিবেন। মূল্য এক বাক্স ৸০ আনা, মাশুলাদি ।/০ পাঁচ আনা। অক্ষরগুলি ½ সাইজে তৈয়ারী। সুন্দর কারুকার্য্য বাক্সতে বার রকমের বারটি রবার ষ্ট্যাম্পের মূল্য ১৲, মাঃ ।/০ মাত্র।

Answered	Original.	Book-post.	Paid.
Cancelled.	Registered.	Copied.	Refused.
Duplicate.	Stamped.	Filed.	Urgent.
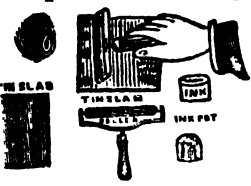
থাম্বইম্প্রেশন বা টিপ সহির সরঞ্জাম

ইহা প্রত্যেক ব্যবসায়ীর অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, রেজেষ্টারী অফিস, জমিদার কাছারী প্রভৃতিতেও ব্যবহৃত হয়, মূল্য এক কৌটা কালি, রোলার, প্লেট প্রভৃতি সরঞ্জাম সহ, ১নং ১৲, ২নং ২৲ টাকা মাশুলাদি ।/০ আনা।

পত্র। লিখিলে বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে সুবৃহৎ ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি, অদ্যই পত্র লিখুন।

স্বরাজ রবার ষ্ট্যাম্প ওয়ার্কস,
প্রোপ্রাইটর:—বি, বি, শীল
৩৩১নং আপার চিৎপুর রোড, পোঃ আঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

দশহাজার টাকা পুরস্কার

ওজস স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য, অবসন্নতা ও পুরুষত্বহীনতা-নাশক রসায়ন। শুক্রকে গাঢ় করিয়া ধাতু ও স্নায়ুকে সবল, সতেজ ও কর্মঠ করিতে ইহা অদ্বিতীয়। মূল্য ১।০ টাকা।

পাচক ১ মাত্রায় অম্ল ও শূলের অসহ্য কষ্টের উপশম; নিয়মিত সেবনে অম্ল, অজীর্ণ, শূল, অনিদ্রা, মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য, বায়ুবৃদ্ধি, অগ্নিমান্দ্য ও যকৃৎ-বিকৃতি আরোগ্য হয়। শিশি ১৲ টাকা। ঔষধদ্বয়ে বিজ্ঞাপিত গুণ নাই প্রমাণিত হইলে উক্ত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। পত্র দিলে ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

কবিরাজ—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মল্লিক
(অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান)
কালনা (বেঙ্গল)।

দুইটী দুরারোগ্য রোগের দৈবপ্রাপ্ত অব্যর্থ মহৌষধ।

১ম—নবজীবন বটীকা—

ধাতুদৌর্ব্বল্য ও পুরুষত্বহীনতায় একমাত্র মহৌষধ

সেবনে শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, ধারণাশক্তি হ্রাস, সামান্য উত্তেজনায় চিন্তায় বা মলমূত্র ত্যাগ কালে সামান্য কুন্থনে রেতঃপাত প্রসাবের পূর্ব্বে বা পরে সূতার ন্যায় শুক্র ক্ষরণ প্রভৃতি শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় উপসর্গ দূর করিয়া শিথিল দেহ বা দেহাংশ সবল করে, নষ্ট যৌবন ফিরাইয়া আনে এবং জীর্ণদেহে **নবজীবন** দান করে। ১ সপ্তাহের মূল্য ২৲ টাকা, (ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র) ডজন ২২৲ টাকা।

২য়—ক্ষতশান্তি মলম—

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা নাই এবং সামান্য খোষ পাচড়া হইতে যে কোন প্রকার দোষনীয় ঘা হউক ২ সপ্তাহে নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। ইহাতে পারা বা অন্য কোন দোষনীয় পদার্থ নাই। ১ শিশি মূল্য ৸০ আনা ডজন ৮৲ টাকা ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

সোঃ এঃ—জি, ডি, বর্ম্মণ এণ্ড কোং,
২৭।১ তারক চাটার্জ্জির লেন, কলিকাতা।

চশমা! চশমা!!

সকল রকম চশমা সুলভে পাইতে হইলে একমাত্র **টি, সি, দাস** এণ্ড ব্রাদার্সের দোকানে পদার্পণ করুন। এখানে সকল রকম সোণা রূপার চশমা নিজ কারখানায় প্রস্তুত করিয়া আপনাদের মনোমত করিয়া দেওয়া হয়। অপছন্দ হইলে ১ মাসের মধ্যে পাথর বদলাইয়া দিই।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

টি, সি, দাস এণ্ড ব্রাদার্স,
১২৮।৫৩এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, (শ্যামবাজার দক্ষিণ) ক্যালঃ।

কার এণ্ড মহলানবিশ
সর্ব্বপ্রধান
খেলার সরঞ্জাম বিক্রেতা
সচিত্র ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন
৩ নং চৌরঙ্গী কলিকাতা

স্বদেশী ফুটবল ব্যাডমিণ্টন টেনিস ইত্যাদি

আমাদের দোকান সুগোল সুঠাম টেকসই ফুটবলের জন্য বিখ্যাত।

ফুটবল (ব্লাডার সহ)

৫নং রামমূর্ত্তি ১৩৲, সিল্ডউইনার ৫নং ১১৲, ৪নং ৮৲, গোবর ৫নং ৯৲, ৪নং ৬॥০, বাঙ্গালী পল্টন ৫নং ৭।০, ৪নং ৫০, খোকন ৪নং ৪৻০, ৩নং ৩৻০ ও ৩।০, ২নং ২৻০ ও ২।০, ১নং ২৲

ব্লাডার—৫নং ১৻০, ৪নং ১॥৵০, ৩নং ১।৵০, ২নং ১৵০ ১নং ৸৵০

ইনফ্লাটার—১।০, ১৻০, ২॥০ ও ৩॥০

ব্যাডমিণ্টন (সেট)—

৪ খানা ব্যাট, ১টী জাল ও ৩টী ফুল সহ ৭॥০, ৮॥০, ১০০, ১২॥০ ও তদূর্দ্ধ।

র‍্যাকেট—১।০, ১৻০, ২৲, ২॥০ ও ৩৲

জাল—১।০, ১॥০ ও ২৲

সাটেলকক (ডজন) ৩৲, ৪॥০, ৬৲, ৭॥০ ও ৯৲

টেনিস র‍্যাকেট—৩॥০, ৫৲, ৮॥০, ১২৲, ১৫৲ ও তদূর্দ্ধ

ক্যারাম বোর্ড (সেট) ১০৲, ১৪৲, ২২৲ ও ২৬৲

অন্যান্য যাবতীয় খেলার ও ব্যায়ামের সাজ সরঞ্জামের সচিত্র মনোরম ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

ভিঃ পিঃ মাল পাইবেন।

মোহনতোষ ব্রাদার্স,

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ

রওগনে তেলা—২৫ বৎসরের পরীক্ষিত ও পুরাতন। মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবহারেই সর্ব্বপ্রকার পুরুষত্ব-হীনতা ও ধাতুদৌর্ব্বল্য দূর করিয়া সুস্বাস্থ্য প্রদান করে। ঔষধের গুণ না হইলে মূল্য গ্রহণ করি না। যে সমস্ত যুবক যৌবন প্রারম্ভে নানাপ্রকার কুসঙ্গ দোষজনিত আক্রান্ত হইয়া নিজের স্বাস্থ্য ও যৌবন হারাইয়া ফেলিয়াছেন, এই ঔষধ তাঁহাদেরই পক্ষে পরম উপকারী। ইহা ছাড়া গর্ম্মী সুজাক প্রভৃতির ফলপ্রদ ঔষধ আমাদের এখানে পাওয়া যায়।

সুফুফ মুকব্বী—সর্ব্বপ্রকার ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। ইহা বৃদ্ধকে নবযুবায় পরিণত করে, তাহার লুপ্ত যৌবন ফিরাইয়া আনে। যুবকের দেহে নবশক্তি আনয়ন করে। সাত দিনের উপযোগী ২॥০ টাকা।

সুফুফে রাহাত—যে সমস্ত স্ত্রীলোক সন্তানের জননী হইতে পারেন নাই তাঁহাদের দুঃখ অপরিসীম। আমাদেরই এই ঔষধ সেবনে তাঁহাদের দুঃখ দূর হইবে। তাঁহারা সন্তানের মা হইতে পারিবেন। মূল্য ২১ দিনের উপযোগী ১।০ আনা।

প্রত্যেক ঔষধের ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—ম্যানেজার **ইউনানী দাওয়াখানা**
কর্পোরেশন প্লেস, ঘাস বস্তী, (দমকলের সম্মুখে) কলিকাতা

খদ্দর! খদ্দর!! খদ্দর!!!

এবার খদ্দরের দর আশাতীত সস্তা হইল

আমরা সকল রকমের খদ্দরের হাল ফ্যাসান মাফিক্ দ্রব্য আশাতীত সুলভ মূল্যে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করিয়া থাকি।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ভারতলক্ষ্মী খদ্দর ভাণ্ডার,

৪০নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

WITHOUT INJECTION

MOST RATIONAL & UNFAILING TREATMENT

Of All Chronic & Acute Diseases

AT

Schussler Institute

16, Royd Street, Calcutta.

BY

Dr. Premen Ray,
F. C. S. (Lon), M. D.
BIOCHEMIST.

WITHOUT OPERATION

Annual Contract Rate—
Annas Eight Per Line

Buyers' Guide.

Minimum Four lines
Rupees Two only.

TRY ONCE
Day's Pure Darjeeling Tea.
The Himalayan Tea Syndicate.
15, Shama Charan Dey St, Cal

মেরামত!

রেডিও, লাউড, স্পিকার, হেড্‌ফোন ইলেক্‌ট্রিক বাতি পাখা, ইত্যাদি ইলেক্‌ট্রিকের কাজ
টাইপ রাইটার গ্রামোফন, সেলাইয়ের কল, ইত্যাদি যাবতীয় কল-কব্জার কাজ
সমস্তই করিয়া থাকি ; দর সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ।

অটোমেটিক ওয়ার্কস,
১০৪, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

Darjeeling Tea House.
25, Harrison Road, Cal.
(Mofussil orders delivered freight free)

The East Bengal Laundry
4, Wellesly Street, Calcutta.
Art Dyers High, Class Cleaners and Bleachers.

The Cleaning House,
Management under European Ladies.
121, Dhurramtolla, Street,
Art Dyers, High Class Cleaners & Bleachers.
Have a trial and satisfy yourself.

EGG HOUSE
10, Corporation Place.
৭০।৭৫ বৎসরের অতি পুরাণা বিশ্বস্ত ফারম উত্তম ডিমের জন্য প্রসিদ্ধ। মফঃস্বল অর্ডার অতি যত্নের সহিত সরবরাহ করা হয়।
TRIAL SOLICITED.

Dr K. K. Roy, M. D. (California, U.S.A)
Specialist in Chronic Diseases.
Hours: 1 to 2 P. M. & 7 to 8 P. M,
10/A, Madge Lane, off Lindsay St, Cal.

T. C. DASS.
Sole Selling Agent—
Swadeshi Cigarettes.
Head Office :—
Chandney Chawk, Delhi,
Calcutta Branch :—
132/1, Harrison Road, Calcutta.
Agents Wanted.

কাটিং শিক্ষার উৎকৃষ্টপুস্তক—
ওস্তাগর
পুস্তকালয়ে বা ৭ আশু বাবু লেন, খিদিরপুর, কলিকাতা।

Spectacles of all Sorts
At a Cheap price but of dear quality Tooth binding one Rupee each to be had at J, DASS & CO, *108, Cornwallis Street, Calcutta.*

Anti T. B. Specific. (যক্ষ্মার)
Subodh Dass & Co.,
65-2 Harrison Road, Calcutta.
(For particular see advt. within.

হাজি মোহাম্মদ জাফর তুর্কি
প্রসিদ্ধ তুর্কি ও পাহলবী টুপী বিক্রেতা আমরা আসল ইস্তাম্বুল টুপী আমদানী করিয়া থাকি।
১৪২ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

সেখ আবদুল ওহাব এণ্ড কোং,
(স্থাপিত ১২৮৩)
সাবান, এসেন্স আতর, স্নো, জরদা, নস্য, হেয়ার ওয়েল, গোলাপ জল ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য তৈয়ারকারক ও বিক্রেতা। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ১৭নং করপোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Chatterjee & Co.,
Dealers in west End & Zenith Watches.
151, Radhabazar Street, Calcutta.

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ একমাত্র অকৃত্রিম ঔষধ এখানেই পাওয়া যায় বাজারের সস্তা ঔষধ যাঁহারা ব্যবহার করিয়া হতাশ হইয়াছেন তাঁহারা একবার পরীক্ষা করুন। বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। শতকরা ১২৷৷০ কমিশন।
লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৩৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্পেশাল "এক্সমাস" রিডাকশন

নূতন চশমা বিক্রয় ঘড়ি ও চশমা মেরামত হয়।

দুই বৎসরের গ্যারাণ্টি

পকেট ওয়াচ	প্রত্যেকটি	১৷৷৵০
রিষ্ট ওয়াচ	"	২৸০
এলার্ম টাইমপিস	"	১৸৶০
সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্লক	"	৮৷০

এ্যারেবিয়ান ওয়াচ কোং, ১১৩ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

FIT WELL
Tailors & Outfitters.
To Fashionable Gentlemen. Silk Shirts Specialists. always stocks suitings, see their new Winter stocks. Suits made to order. Well noted for cheap charges and prompt delivery. Inspections invited, Trial Solicited.
26-2, Wellesley Street, Calcutta.

শরীর সুস্থ ও সবল করুন

দুর্ব্বলতা দমনের প্রকৃষ্ট উপায়

দুর্ব্বলতা যে কেবলমাত্র ব্যাধির আশু উৎপাদক তাহাই নহে ইহা পুরুষত্বহানি ঘটাইবার প্রথম সোপান। বিবাহিত জীবনের ন্যায্য সুখ সম্ভোগ ও বলবান সন্তানসন্ততি লাভ হইতে ইহা স্ত্রী পুরুষকে বঞ্চিত করে। পুত্র সন্তান কামনা করিয়াও শারীরিক বলবীর্য্য হীনতা হেতু নিজ বাসনা চরিতার্থ করিতে না পারা অপেক্ষা অধিক ভীষণতর আর কি ধারণা করা সম্ভব হইতে পারে ?

অধুনা বিশ্ব-বিশ্রুত বলকারক "স্যানাটোজেন" ইহার একমাত্র অব্যর্থ প্রতিকারক। চতুর্বিংশ সহস্রাধিক চিকিৎসকগণ ইহার প্রশংসাপত্র লিখিয়া গিয়াছেন। শরীর ও স্নায়ুর উপর 'স্যানাটোজেনের' অধিক উপকারী শক্তির হেতু অতি সহজেই উপলব্ধি হয়। স্নায়ু, পেশী ও অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় সমূহের স্বাস্থ্য ও শক্তি যে যে উপকরণের উপর নির্ভর করে, 'স্যানাটোজেন' ঠিক সেই প্রকার উপাদানে প্রস্তুত। 'এলবুমেন' ও 'ফস্‌ফোরস্‌' শরীর গঠনের প্রধান উপাদান, ইহা ব্যতিরেকে জীবনী-শক্তি সম্ভব হইতে পারে না। জীবনী-শক্তির এই দুই উপাদান 'স্যানাটোজেনে' একীভূত করিয়া এক সুপাচ্য নব দ্রব্যে পরিণত করা হইয়াছে, তাহার প্রতি কণাই বলবীর্য্যের
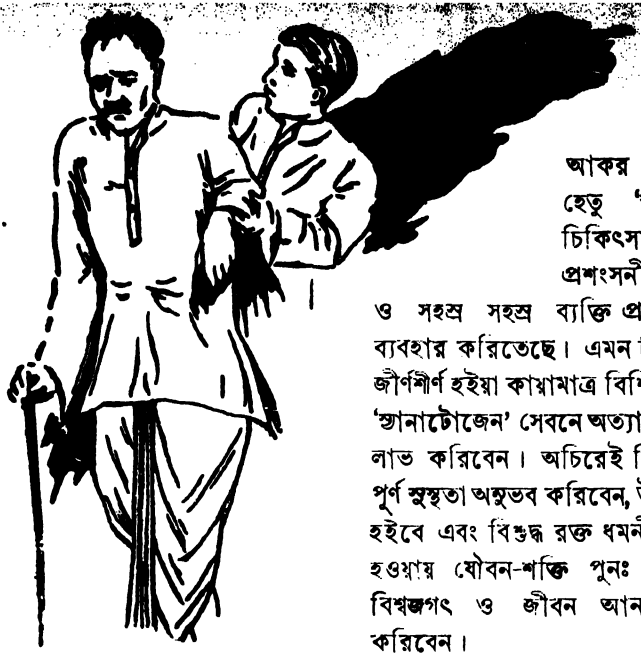
আকর। এবং সেই হেতু 'স্যানাটোজেন' চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এত প্রশংসনীয় হইয়াছে ও সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রতিদিনই ইহা ব্যবহার করিতেছে। এমন কি, যে ব্যক্তি জীর্ণশীর্ণ হইয়া কায়ামাত্র বিশিষ্ট হইয়াছেন, 'স্যানাটোজেন' সেবনে অত্যাশ্চর্য্য উপকার লাভ করিবেন। অচিরেই তিনি পুনরায় পূর্ণ সুস্থতা অনুভব করিবেন, উৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে এবং বিশুদ্ধ রক্ত ধমনীতে সঞ্চারিত হওয়ায় যৌবন-শক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বজগৎ ও জীবন আনন্দময় জ্ঞান করিবেন।

ইন্দ্রিয়শৈথিল্য

স্বাভাবিক ইচ্ছা হ্রাস হওয়া এই উৎকট ব্যাধির প্রথম নিদর্শন। এই অবস্থায় রোগী অবসন্নতা, নিদ্রাহীনতা, ও ঐ জাতীয় বহুবিধ ভীতিপ্রদ উপসর্গ হইতে কষ্ট পাইয়া অবশেষে প্রকৃতই উন্মাদগ্রস্ত হন।

স্নায়ুমণ্ডলীতে 'এলবুমেন' ও 'ফস্‌ফোরসের' অভাবই এই রোগের হেতু বলিয়া অধুনা চিকিৎসকগণ সকলেই একমত হইয়াছেন।

এই ব্যাধির উপরোক্ত অবস্থার অনুরূপে 'এলবুমেন' ও 'ফস্‌ফোরস্‌' 'স্যানাটোজেনে' মিশ্রিত থাকায়, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য রোগে 'স্যানাটোজেন' ব্যবহার করিতে বিশেষ করিয়া বলা অনাবশ্যক। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে 'স্যানাটোজেন' এই দুর্ব্বলতা আরোগ্য করিতেই প্রস্তুত হইয়াছে। সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়াছে এরূপ সহস্র সহস্র রোগে 'স্যানাটোজেন' প্রদান করিয়া যে ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। এই রোগে বিশেষজ্ঞ বিখ্যাত জার্ম্মান চিকিৎসক, ডাঃ মিশ্‌নার, যে

সমস্ত রোগ আরোগ্য করিয়াছেন তাহা আদর্শ-স্থানীয়। এই ব্যাধিগ্রস্ত তাঁহার কতকগুলি রোগী মনের ভীষণ অবসন্নতা অনুভব করিতে করিতে একরূপ উন্মাদ হইয়াছিলেন। একটী বিখ্যাত চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সংবাদপত্রে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন "সকল রোগীকেই 'স্যানাটোজেন' ব্যবহার করিতে দিয়া অতি শীঘ্র ফল পাওয়া গিয়াছিল

এবং কয়েক মাসের মধ্যেই প্রত্যেক রোগীই নিরাময় হইয়াছিল। এরূপ ফল আশাতীত।"

একবার 'স্যানাটোজেন' পরীক্ষা করিয়া দেখুন, দেখিলে বুঝিতে পারিবেন আপনার ইন্দ্রিয় শক্তি কত আশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

বার্দ্ধক্যে 'স্যানাটোজেন'

'স্যানাটোজেন' সেবনে বার্দ্ধক্য হইবে না, এ কথা না বলিলেও আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে নিয়মিত 'স্যানাটোজেন' সেবন করিলে আপনি জরাক্রান্ত হইয়াছেন বুঝিতে পারিবেন না। কারণ, দৈনিক 'স্যানাটোজেন' সেবন অভ্যাস করিলে, ক্ষয়গ্রস্ত শরীর যে অতিরিক্ত পুষ্টিকারক দ্রব্য আবশ্যক করে, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক উপায়ে পূর্ণ হওয়ায়, বার্দ্ধক্যের অপ্রীতিকর উপসর্গগুলি সরলতা প্রাপ্ত হয় ও বহু বিলম্বে উপস্থিত হয়। নিয়মিত 'স্যানাটোজেন' ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্য অটুট থাকায় বলবীর্য্য হানি হয় না এবং বার্দ্ধক্যেও বিবাহিত জীবনের নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগ করিতে পারা যায়।

স্নায়বিক দুর্ব্বলতা

স্নায়বিক দুর্ব্বলতাগ্রস্ত রোগীদিগের স্বাস্থ্য প্রত্যানয়ন করিতে হইলে স্নায়ুকোষগুলিকে সমভাবে ফস্‌ফোরস্‌যুক্ত খাদ্য দ্বারা পোষণ করা কর্ত্তব্য। 'স্যানাটোজেন' এই বিষয়ে আদর্শ ঔষধ। দুর্ব্বল স্নায়ুগুলিকে এতদ্বারা বলপূর্ব্বক কর্ম্মঠ না করিয়া ক্রমশঃ তাহাদের বল বৃদ্ধি করা হয় এবং যে ব্যক্তি 'স্যানাটোজেন' ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন অচিরেই তিনি শান্ত ও সুস্থ হ'ন।
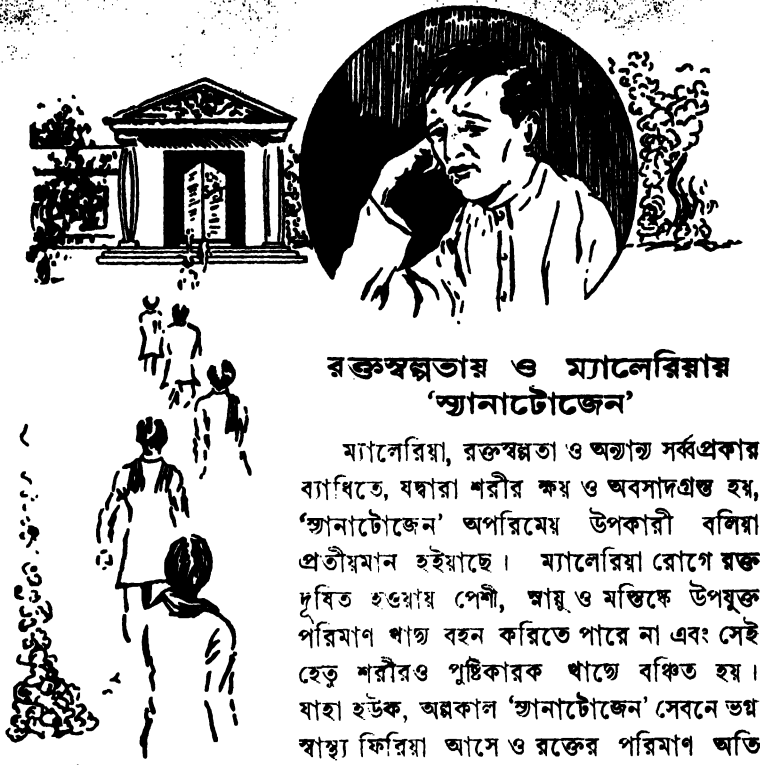
রক্তস্বল্পতায় ও ম্যালেরিয়ায় 'স্যানাটোজেন'

ম্যালেরিয়া, রক্তস্বল্পতা ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিতে, যদ্দারা শরীর ক্ষয় ও অবসাদগ্রস্ত হয়, 'স্যানাটোজেন' অপরিমেয় উপকারী বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। ম্যালেরিয়া রোগে রক্ত দূষিত হওয়ায় পেশী, স্নায়ু ও মস্তিষ্কে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য বহন করিতে পারে না এবং সেই হেতু শরীরও পুষ্টিকারক খাদ্যে বঞ্চিত হয়। যাহা হউক, অল্পকাল 'স্যানাটোজেন' সেবনে ভগ্ন স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে ও রক্তের পরিমাণ অতি দ্রুত বর্দ্ধিত হওয়ায় রোগীর পুষ্টিসাধন হয় এবং জীবনে নবশক্তির সঞ্চার হয়।

উদরাময় ও রক্তামাশয়ে

সকল প্রকার আমাশয় রোগে বল ও পুষ্টিকারক অথচ সুপাচ্য খাদ্য অবশ্য প্রয়োজনীয় দেখা যায়। 'স্যানাটোজেন' এরূপ লঘু যে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ, উদরাময় ও আমাশয় রোগের কঠিন অবস্থাতেও ইহা প্রদান করিয়া এই ফল পাইয়াছেন যে রোগী নিস্তেজ না হইয়া নিজ ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখিতে ও অচিরে সাধারণ খাদ্য পরিপাক করিতে সমর্থ হইয়াছে।

'স্যানাটোজেন' সেবনবিধি

'স্যানাটোজেন' এক প্রকার শুভ্র চূর্ণ, ইহা যৎসামান্য জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবসে যে কোন সময়ে সেবন করা যাইতে পারে। ধর্ম্মবিরুদ্ধ কোন পদার্থ 'স্যানাটোজেনে' মিশ্রিত নাই। যে কোন চিকিৎসকের নিয়মাধীনে থাকিয়া অথবা যে কোন ঔষধ সেবনকালীন, সেবন করিতে বাধা নাই।

প্রস্তুত ও বোতলে বন্ধ করিবার কালীন কোন সময়েও 'স্যানাটোজেন' হস্তদ্বারা স্পর্শ করা হয় না।

সকল ঔষধ বিক্রেতার নিকট 'স্যানাটোজেন' পাওয়া যায়।

স্যানাটোজেন

৭৯-৯, লোয়ার সারকুলার রোডস্থিত দি কলিকাতা ট্রেডিং কোম্পানী, প্রিণ্টার্স কর্ত্তৃক রচিত ও মুদ্রিত।

মরহুম মোহাম্মদ নায়েক চৌধুরী

[বিবরণ ভিতরের প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য]

"Mohammadi Press"

পৌষ, ১৩৩৭ চতুর্থ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

মাওলানা রূমীকৃত মছনভীর ভূমিকা

(শাব্দিক অনুবাদ)

নজির আহ্‌মদ চৌধুরী

বাঁশির কাছে শ্রবণ কর—কি কাহিনী সে বর্ণনা করিতেছে—
আর দীর্ঘ বিচ্ছেদের কোন্ অভিযোগ সে উপস্থিত করিয়াছে।
(সে বলিতেছে)—
নলের বন হইতে আমাকে তাহারা কাটিয়া লইয়াছে যে দিন
সেই হইতে আমার আর্ত্তনাদে নিখিল নরনারী ক্রন্দন করিতেছে।
বিচ্ছেদের ব্যথায় দীর্ণ-বিদীর্ণ যে হৃদয়—আমার কাম্য তাহাই—
অনুরাগের বেদনা-বাণীগুলিকে যেন স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পারি।
নিজের মূল হইতে দূরে অবস্থিত হইয়াছে যে কেহ
নিজেদের মিলন-মুহূর্ত্তের সন্ধান সে আবার করিতে থাকিবে।
সকল দলের নিকটই আমি আর্ত্তনাদ করিয়াছি।
ভাগ্যবান ও হতভাগ্য সকলের সঙ্গেই মিশ্রিত হইয়াছি।
নিজ নিজ খেয়ালমতে, সকলেই আমার বন্ধু হইল
কিন্তু আমার অন্তরের মর্ম্মকথাগুলির সন্ধান কেহই করিল না।
আমার রহস্য আমার বিলাপ হইতে পৃথক নহে
কিন্তু চোখগুলি নূরশূন্য, কর্ণগুলি শক্তিহীন।
আত্মা দেহ হইতে এবং দেহ হইতে আত্মা লুকাইয়া রহে না
কিন্তু আত্মাকে দর্শন করার রীতি কাহারও নাই।

বাঁশির সুর, ইহা বাতাস নহে, অনল প্রবাহ—
এই আগুনের অভাব ঘটিবে যাহার, তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হউক।
প্রেমের আগুন—বাঁশির বুকে তাই—
প্রেমের তরঙ্গ—মদিরার মধ্যে তাই।
আপন জন হইতে দূরে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে যে
বাঁশি তাহারই প্রতিযোগী।
তাহার সুরের 'পর্দ্দা'গুলি
আমাদের সব পর্দ্দা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল।
বিপদসঙ্কুল পথের কথা— বাঁশি বর্ণনা করিতেছে
উদ্ভ্রান্ত প্রেমের কাহিনীগুলি ব্যক্ত করিয়া দিতেছে।
দু'টী মুখ তাহার—
এক মুখ চাপিয়া আছে 'তাহার' ঠোঁট দু'খানি,
অন্য মুখ দিয়া আমাদের সম্মুখে বিলাপের সুর বাজিয়া উঠিতেছে—
যাহার ফলে আকাশে বাতাসে আর্ত্তনাদ।
কিন্তু চক্ষুষ্মান যে সে নিশ্চয় বুঝিয়া থাকে
এ মুখের বিলাপ বস্তুতঃ ঐ মুখ হইতেই সমাগত।
এ মুখের সব সুর ঝঙ্কার ঐ মুখেরই ফুৎকারেরই ফল—
আত্মার সমস্ত হাহুতাশ তাহারই প্রযোজনার পরিণাম।

* * * *

* * * *

হে প্রেম—হে আমাদের সুখের উন্মাদ!
হে আমাদের সকল ব্যাধির চিকিৎসক!
হে সকল অহমিকার সকল যশলিপ্সার ঔষধ!
হে আমাদের আফলাতুন ও জালিনুস—তোমার কল্যাণ হউক!
মাটির দেহ প্রেমের বলে আকাশে বিহার করিল,
অচল পর্ব্বত সচল হইল, নৃত্য করিয়া উঠিল,
তূর পর্ব্বতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া দিল—এই প্রেমই!
তূর মাতওয়ারা আর মূর্ছা মূর্চ্ছিত, ভূপতিত!
তবলার ডায়না-বাঁয়ার শূন্য বুকে অনেক গুপ্ত রহস্য লুকাইয়া আছে
সে রহস্য ব্যক্ত হইলে দুনয়া ওলট পালট হইয়া যাইবে।

প্রাণ-প্রতিমের ওষ্ঠের স্পর্শ যদি লাভ করিতে পারিতাম
তাহা হইলে, বাঁশির ন্যায়, আমিও অনেক কাহিনী প্রকাশ করিয়া দিতে সমর্থ হইতাম।
কিন্তু আপন জনের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে যাহার
বুকে শত প্রভঞ্জন গুমরিয়া মরিলেও, তাহার মুখ দিয়া সুর বাহির হয় না।

দিল্লীর নবগৌরব

অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ

মরহুম হাকিম আজমল খাঁর মহাপ্রয়াণে সাধারণতঃ এই কথাই খবরের কাগজে জোরে ঘোষিত হইয়াছে যে, তিনি কংগ্রেসের সভাপতি, হিন্দু-মুছলমানের মিলন-প্রয়াসী ও খিলাফত আন্দোলনের একজন প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার যে বিরাট সাধনার জন্য তাঁহার নাম আধুনিক ভারতের শিক্ষা ও সভ্যতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে, তাহার তেমন উল্লেখ হয় নাই। তাঁহার দেশপ্রীতি, ধর্ম্মপ্রীতি, মিলনপ্রীতি, সমাজপ্রীতি অতি গভীর হইলে ও ভারতের ইতিহাসে অতুলনীয় নহে, কিন্তু তাঁহার আয়ুর্ব্বেদীয় ও হাকিমী চিকিৎসালয় স্থাপন ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ও অতুলনীয়।

গত আশ্বিনের আগের আশ্বিনে দিল্লী গিয়াছিলাম। দিল্লীর বর্ণনা কাগজে লিখিতে অনেক আত্মীয়-বন্ধু অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু যে-কলিজা-ছেঁচা লহুর হরফে হৃদয়-দ্রাবী অশ্রুময়ী ভাষায় সে বর্ণনা লিখিতে হয়, তাহা আমার নাই, সে চেষ্টা করি নাই, আজও করিব না। শুধু এই বলিব যে, সেই সমাধির শহরে দিনের পর দিন অগণিত সমাধি দেখিলাম। মোগল-দিল্লী হইতে পাঠান-দিল্লীর সুদীর্ঘ পথের দুই পার্শ্বে পাঠানদের কবরের সারি চলিয়াছে। পাঠানদিল্লীর বুকে কবরের পর কবর, তাহার পর কবর—কবরের অবধি নাই; পাথরের বাঁধা সমাধি কতক আংশিক বিনষ্ট হইয়াছে, কোনটাই নিশ্চিহ্ন হয় নাই। পাঠানদের কেল্লা, মছজিদ, ইমারত!—ভগ্ন, বিরান:—ঐ সমাধিরই মত নিস্তব্ধ! কৌতূহলী দর্শকের কোলাহল, বিষন্ন পথিকের দীর্ঘশ্বাস—পরিত্যক্ত প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠে পেচকের চীৎকার মাত্র! আর মোগল-দিল্লী? একদিন এই গরবিনী নগরী ভূতলে বেহেশতকে আহ্বান করিয়াছিল। আজ তাহারও বুকে শুধু সমাধির অস্থি, কীর্ত্তির কঙ্কাল, গতগৌরবের মর্ম্মরময়ী স্মৃতিচিহ্ন। পাঠান-দিল্লী বিরান; মোগল-দিল্লী হিন্দুপ্রধান—এখানে বহু-মুছলিম-মহল্লা উঠিয়া গিয়াছে; তথায় হিন্দু মহল্লার পত্তন হইয়াছে। জেবুন্নিছা মছজিদের চারিদিকে হিন্দুর বসতি; বিদূষী দিল্লীশ্বর-দুহিতার এই বিরাট সুন্দর মছজিদে আজ মুছল্লি সমাগম নাই। নগরে মুছলিম বাসিন্দা, বাজারে মুছলিম দোকানদার, বিদ্যালয়ে মুছলিম ছাত্র, ময়দানে মুছলিম খেলোয়ার কোথাও সন্তোষজনক সংখ্যায় দেখিলাম না।

এই নিশ্চল নৈরাশ্যের মধ্যে শুধু একটী আশার রশ্মি দেখিলাম—মরহুম হাকিম আজমল খাঁর সাধনার দীপ হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে—তাঁহার তিব্বিয়া-আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজ।

তিনি মোগল বাদশাহ্‌দের খাছ গৃহচিকিৎসকের বংশধর, শহরের রইছ, হাফেজ ও আলেম, প্রথিত-যশা চিকিৎসক, অগাধ রোজগারের অধিকারী, দেশ ও ধর্ম্মের সেবক, অক্লান্তকর্ম্মী, সবই ছিলেন; কিন্তু কোন মোহ বা আকর্ষণই কোন সময় তাঁহাকে তাঁহার প্রিয়তম সাধনা হাকিমী শাস্ত্রের উন্নতি-বিধান-প্রচেষ্টা হইতে বিরত করিতে পারে নাই।

জগতে মুছলিম শক্তি ও সভ্যতার পতনের সঙ্গে সঙ্গে হাকিমী-শাস্ত্রের উন্নতির দুয়ার অনেকাংশে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কর্ডোভা, কায়রো, দামেস্ক, বাগদাদ, ইস্পাহান, নিশাপুর যেখানেই হাকিমী শাস্ত্রের চর্চ্চা ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকুক, তাহা ভারতের বাহিরে। একই বীজের গাছে শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের মাটীতে বিভিন্ন আস্বাদের কমলা লেবু জন্মে; একই খেজুরের বীজের গাছে মক্কা ও মেদিনীপুরে বিভিন্ন ফল পাওয়া যায়; একই গাছ-গাছড়ার রাসায়নিক গুণ বোখারা ও বাঁকীপুরে, কায়রো ও কলিকাতায় এক নহে। হাকিমী শাস্ত্রে ঔষধের উপকরণ স্বরূপ যে সব গাছ গাছড়ার উল্লেখ হইয়াছে, তাহা সাধারণতঃ ভারতের

বাহিরের কোন না কোন প্রদেশের গাছ-গাছড়ার রাসায়নিক গুণকে অবলম্বন করিয়াই উল্লেখ হইয়াছে। ঐ গাছ-গাছড়ার সবগুলি ভারতের মাটীতে জন্মে না; যেগুলি জন্মে ভারতের বিশিষ্ট আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত বলিয়া তাহা সাধারণতঃ ভারতের বাহিরের ঐ জাতীয় গাছ-গাছড়ার সমগুণ বিশিষ্ট নহে। সুতরাং হিন্দুস্থানী হাকিম-গণকে ঔষধ তৈয়ার করিতে গিয়া, সাধারণতঃ দুইটী বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়—কোন কোন গাছ গাছড়া এদেশে পাওয়া যায় না; যাহা পাওয়া যায়, তাহার রাসায়নিক গুণ শাস্ত্রে উল্লিখিত গাছ-গাছড়ার সমগুণ যুক্ত নয়। সুতরাং উভয় কারণেই তাঁহাদিগকে প্রায়শঃ ভারতের বাহির হইতে ঐ সব গাছ-গাছড়া আমদানী করিতে হয়, তাহাতে অনেক সময় সস্ত গাছ-গাছড়া পাওয়া যায় না; আবার সস্ত-অসস্ত যাহা পাওয়া যায়, তাহার খরচ বেশী পড়ে। ফলে ঔষধের দামের ভয়ে লোকে হাকিমগণকে ছাড়িয়া ডাক্তারদের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে, অথবা বাজারের বাজে পেটেন্ট ঔষধ খাইয়া মরিতেছে। এমতাবস্থায় ভারতে হাকিমী শাস্ত্রের উন্নতি দূরে থাকুক, স্থায়ীত্ব বজায় রাখা দুরূহ। ইহার কি প্রতিকার নাই?—মরহুম মনীষী ভাবিতে লাগিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন—(ক) যে সব হাকিমী গাছ-গাছড়া ভারতে জন্মে, তাহা পূরাপূরি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে। (খ) উপযুক্ত রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা ঐ সব গাছ-গাছড়ার যথার্থ গুণাগুণ নির্ণয় করিতে হইবে (গ) যে সব হাকিমী গাছ-গাছড়া ভারতে আদৌ জন্মে না, সে সবের বদলী (substitute) গাছ-গাছড়া ভারত হইতে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে। (ঘ) ভারতের লোকের ধাত পরীক্ষা করিয়া প্রযোজ্য ঔষধের ক্রম নির্ণয় করিতে হইবে। এ প্রচেষ্টা সফল হইলে, ভারতে প্রস্তুত হাকিমী ঔষধ যথাসম্ভব ফলপ্রদ ও সুলভ হইবে, লোকের নিকট হাকিমী চিকিৎসার কদর বাড়িবে, হাকিমী চিকিৎসা ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিবে। চিকিৎসা উপলক্ষে এক্ষণে যে ধন বিদেশে যাইতেছে, ধীরে ধীরে তাহার পথ রুদ্ধ হইয়া আসিবে।

শুধু তাহাই নহে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় অস্ত্র চিকিৎসার অপূর্ব্ব উন্নতি সাধন হইয়াছে; রসায়ন, উদ্ভিদ ও শরীর শাস্ত্র অত্যধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ ও তেব (হাকিমী) প্রাচ্য মনিষীগণের চিকিৎসা-সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল; ইহার সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ফল ও উল্লিখিত শাস্ত্রত্রয় ও অস্ত্র-চিকিৎসার যোগ ও সামঞ্জস্য সাধন করিয়া নব আয়ুর্ব্বেদ ও নব-তেব শাস্ত্রের সৃষ্টি করিতে হইবে, ইহাই ছিল মরহুম মনিষীর সাধনার চরম লক্ষ্য।

প্রাচীন কালের মুছলিম ভূপতিগণের উৎসাহ ও আনু-কূল্যে, মনিষীগণের গবেষণা ও সাধনায় গ্রীক চিকিৎসা শাস্ত্রের সঙ্গে প্রাচ্য চিকিৎসা শাস্ত্রের মিলন হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রসমূহ হইতে মাল-মসলা লইয়া মুছলিম শাস্ত্র-বিশারদগণ নূতন সাধনায় প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহাদের চিন্তা ও আবিষ্কার-সাহায্যে অনতিকাল মধ্যেই এক নূতন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন; ইহাই তেব বা হাকিমী চিকিৎসা-শাস্ত্র। আধুনিক সভ্যতার অভ্যুদয় ও মুছলিম সভ্যতার পতনের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা-রাজ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। এ যুগে সেই মিলনসূত্র পুনঃ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন মনস্বী আজমল খাঁ। তিনি রাজ্যাধিপতি ছিলেন না; তাঁহার অঙ্গুলি-হেলনে শত শত শাস্ত্র-বিশারদ পরিচালিত হন নাই; তাঁহার ধন-ভাণ্ডারে অফুরন্ত মণিমুক্তা ছিল না, তিনি পরাধীন দেশে জন্মিয়া ছিলেন এবং পরাধীন দেশের আবহাওয়াতেই বর্দ্ধিত হইয়া ছিলেন। বৈদেশিক কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ তাঁহার হয় নাই, তথাপি তাঁহার পক্ষে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলন-সাধনের এই সংকল্প কত বড় দুর্জ্জয় সাহসের পরিচায়ক, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

কিন্তু কেবল সংকল্প-সুখেই তিনি পরিতুষ্ট রহেন নাই; পাশ্চাত্য দেশের হাসপাতাল ও চিকিৎসা বিদ্যালয় নিজ চোখে দেখিতে গিয়াছেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে এই উদ্দেশ্যে তিনি ভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। তৎপর দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দিল্লীতে তিব্বিয়া ও আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজ স্থাপন করতঃ তাহাতে উপযুক্ত অধ্যাপনা ও উপরোক্ত গাছ-গাছড়ার গুণাগুণ নির্ণয়-মূলক রাসায়নিক পরীক্ষার গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠা করেন।

দিল্লীতে থাকা কালে এই কলেজে পঠনীয় বিষয় সম্বন্ধে কলেজের জনৈক ছাত্রের নিকট যাহা শুনিয়াছি, সংক্ষেপতঃ এবং যতদূর মনে পড়ে, তাহা এই:—

আরবী, ফারছী বা উর্দ্দু মারফত তেবের পুস্তক পড়ান হয়; প্রধানতঃ ইংরেজী মারফৎ Chemistry, Botany ও Physiology পড়ান হয়। Surgery শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল স্থাপনের সংকল্প হাকীম ছাহেবের ছিল; তাহা তিনি কাজে পরিণত করিয়া গিয়াছেন কিনা মনে পড়িতেছে না। কলেজের ছাত্রটীর সঙ্গে যখন আলাপ হয়, তখন সুবিখ্যাত ডাক্তার আনছারী তিব্বিয়া কলেজে পড়াইতেন; সম্ভবত এখনও পড়ান। Chemistry কি Botanyর অধ্যাপক একজন বাঙ্গালী হিন্দু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের M. Sc। যাঁহারা ইংরেজী না জানেন, উর্দ্দু মারফত তাঁহাদিগকে এই সব শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। হায়দরাবাদ ওছমানিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে উর্দ্দু ভাষায় পাশ্চাত্য ভাষার আধুনিক বিভিন্ন শাস্ত্রের যেরূপ দ্রুত অনুবাদ হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, ভবিষ্যতে উর্দ্দু মারফৎ সমস্ত শাস্ত্রই শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হইয়া উঠিবে। কলেজের পুরা কোর্স শেষ করিতে ৪ বৎসরের প্রয়োজন। কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশী ছাত্র আয়ুর্ব্বেদীয় বিভাগে—ইঁহারা হিন্দু, অবশিষ্ট ছাত্র তেব বা হাকিমী বিভাগে, ইঁহারা অধিকাংশই মুছলমান। ম্যাট্রিক পাশ, পুরাতন নেছাবের ৩য়, ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়ুয়া বা হাই মাদ্রাছা পাশ প্রার্থিগণকে ভর্ত্তি করা হয়। এক আনার টিকেটসহ কলেজের মুদ্রিত বিবরণী পত্র (Prospectus) পাওয়া যায়।

দিল্লীতে জাতীয় সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আছে, হাদীছ তফছীর পড়াইবার মাদ্রাছা আছে, কেল্লা, দোকান, হোটেল ইত্যাদি নানা জিনিষ আছে, কিন্তু তাহা দিল্লীর বাহিরে ভারতের অন্যান্য স্থানেও আছে, শুধু আজমল খাঁর স্থাপিত তিব্বী ও আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজের মত কলেজ ভারতের আর কোথাও নাই, বোধ হয় পৃথিবীর অন্যত্রও নাই। দিল্লীর প্রাচীন গৌরব দেওয়ানে আম, দেওয়ানে খাছ, মতি মছজিদ, জামে মছজিদ ইত্যাদি দেখিতে দূর দেশ হইতে লোক আসিয়া থাকে, বহির্দ্দেশীয় লোকের পক্ষে যদি দিল্লীর আধুনিক কোন নিজস্ব গৌরব দেখিবার থাকে, তাহা এই তিব্বী কলেজ। আফগানিস্থান, মধ্য এসিয়া, আরব, পারস্য, মিছর, তুরস্ক প্রভৃতি স্থান হইতেও কখন কখন ছাত্র এ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য আসিয়া থাকে। ইহাই দিল্লীর নব গৌরব।

হাকিমী শাস্ত্রের উন্নতি ও প্রচারের জন্য মনস্বী আজমল খাঁ তিব্বী কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহাই আমরা শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের সঙ্গে বর্ত্তমান ভারতীয় মুছলিম সমাজের আরও একটী বড় কল্যাণ যে জড়িত আছে, তাহা তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল কিনা, জানি না।

প্রাচীন-কালে বহু মুছলিম মনীষী একাধারে পণ্ডিত ও চিকিৎসা শাস্ত্রবিৎ ছিলেন। দিল্লীতে বর্ত্তমানে হাকিমগণের অধিকাংশই আলেম। স্বয়ং আজমল খাঁ ভাল আলেম ছিলেন। ডাক্তার আনছারীর জ্যেষ্ঠ সহোদর একজন আলেম এবং ভাল হাকিম। তিব্বী কলেজে দেশের আলেমগণের অধিকাংশ যদি শিক্ষা লাভ করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তবে বহু আলেমের স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের পথ হয়। বর্ত্তমান সময়ে ইহার মূল্য বড় কম নয়।

সমাজে যাঁহারা আলেম বলিয়া পরিচিত, আমরা অহরহ তাঁহাদের অনেককে মোল্লা বলিয়া নিন্দা করি, তাঁহাদের দোষকীর্ত্তন করি, হয়ত উৎসাহের মুখে কখনও বা তাঁহাদের নিপাত কামনা করি।

অথচ সমাজে প্রকৃত আলেমের প্রয়োজন অতীতে ছিল, বর্ত্তমানে আছে, ভবিষ্যতে থাকিবে—শুধু মৃত দেহকে মাটী দেওয়ার জন্য নয়, সজীব দেহকে প্রাণময় মনুষ্যত্বের নিবাসভূমি করিয়া রাখিবার জন্য। উষার ধূসর আকাশতলে দাঁড়াইয়া প্রথম জাগ্রত পাখীর কাকলীরও আগে মুক্ত উদার কণ্ঠে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর আলেমগণ নিদ্রাপরায়ণ নরনারীকে আল্লার নামে কর্ত্তব্যপথে আহ্বান করেন বলিয়াই সেই নরনারী যখন জীবন-সায়াহ্নে কর্ম্মের বোঝা নামাইয়া অনন্ত নিদ্রায় ঢলিয়া পড়ে, তখন তাহাদিগকে তাহাদের শেষ বাসস্থানে পুনরায় আল্লার নামে সংস্থাপন করার অধিকার আলেমেরই।

শুধু তাহাই নহে। আধুনিক ভারতের কল্যাণকল্পে যাঁহারা স্বেচ্ছায় জীবন-দান, নির্ব্বাসন-বরণ বা রাজদণ্ড ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সঠিক ফিরিস্তি যদি কখনও

তৈরী হয়, তবে তাহাতে দেখা যাইবে, প্রথম শহীদ, প্রথম মোহাজের, প্রথম নির্ব্বাসিত, প্রথম কারারুদ্ধ ব্যক্তি আলেম-সমাজ হইতেই বাহির হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান মুছলিম ভারতের অধিকাংশ সংবাদপত্রের পরিচালক, প্রতিষ্ঠাতা বা পৃষ্ঠপোষক আলেম। নিজাম, খেদীভ, শরীফ, আমীর, জমিদার ছওদাগরের সাহায্যপুষ্ট হইয়া খাজা কামালুদ্দীন মহোদয় প্রতিবৎসর যতটী নরনারীকে এছলামে দীক্ষিত করিতেছেন, তাহার চেয়ে বহুগুণে অধিক সংখ্যক নর-নারীকে প্রতিবৎসর ইছলামে আহ্বান করিয়া আনিতেছেন ভারতের নিরন্ন আলেম-সমাজ—গাঁয়ে গাঁয়ে পায়ে হাটিয়া ওয়াজ করিয়া; তাঁহাদের ফটো কাগজে উঠে না, তাঁহাদের সুযশঃ সুধী-সমাজে পরিকীর্ত্তিত হয় না।

সমাজে আলেমের প্রয়োজন আছে, অথচ আলেম রক্ষার ব্যবস্থা নাই। ফলে আলেম-সমাজ মরিতে বসিয়াছেন এবং মরিবার আগে মারিতে বসিয়াছেন। রাজ-সরকারে তাঁহাদের চাকুরী নাই, বিদ্যালয়ে তাঁহাদের কার্য্যকরী ব্যবসায়-মূলক শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, সমাজে তাঁহাদের পোষণের বন্দোবস্ত নাই। বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে দারিদ্র্য অবলম্বন করিতে হইতেছে। কিন্তু বাধ্যকরী দারিদ্র্য আর যাহাই হউক, মনুষ্যত্বের পোষক নয়। অভাবে অনেকের স্বভাব নষ্ট হইতেছে, পরের নিকট হাত বাড়াইয়া তাঁহারা আত্মমর্য্যাদা হারাইতেছেন। আত্মপোষণের জন্য পরশোষণ শুরু করিয়াছেন। সমাজের কর্ণধাররা তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিয়া, গালি দিয়া আপন কর্ত্তব্য সমাধা করিতেছেন।

এই মৃত্যুমুখী আলেম সমাজকে বাঁচাইবার, আত্ম-মর্য্যাদাশীল, আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাসী বলিষ্ঠ করিবার একমাত্র পথ তাঁহাদিগকে অভাব-মুক্ত করা, তাঁহাদের দেহে মনে নিজ পায়ে দাঁড়াইবার শক্তি সঞ্চার করা। আজ ভিক্ষার অন্নের অপমানে যাঁহাদের মনুষ্যত্বকে হত্যা করা হইতেছে, স্বাধীন অর্জ্জন-মূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদিগকে সমাজের প্রকৃত পথ-প্রদর্শক হাদী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

মরহুম আজমল খাঁ তিব্বীয়া কলেজ স্থাপন করিয়া আলেমগণকে আত্মনির্ভরশীল করিবার অন্যতম পথ মুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

আজ যাঁহারা আজমল খাঁর জন্য শোকসভা করিয়া প্রস্তাব পাস করিতেছেন, তাঁহারা তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি তিব্বীয়া কলেজটীর দিকে দৃষ্টিদান করুন। বাংলায় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সংখ্যা অল্প নহে এবং কোন ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডেই আজমল খাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান সভ্যের অভাব নাই। তাঁহারা নিজ নিজ বোর্ড হইতে প্রতিবৎসর দুইজন ছাত্রকে তিব্বীয়া কলেজে পাঠাইবার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করুন, তবেই তাঁহার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হইবে।

আমাদের 'বড়' 'বড়' নেতার নিকট একটি নিবেদন :—তাঁহাদের অনেকে প্রত্যেক কাউন্সিল ইলেকশনের সময় যে বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। কাউন্সিলে গিয়া দেশের দশের উপকার করিবেন, এই মহান প্রেরণার প্রাবল্যে তাঁহারা যে অকাতরে ব্যয় করিতে বিন্দুমাত্র ব্যথা বোধ করেন না, ইহাও শুনিয়াছি এবং Provisionally বিশ্বাস করিতেও রাজী আছি। এক্ষণে একটী ইলেকশন-খরচের টাকা তাঁহারা কলিকাতা বা ঢাকায় একটী তিব্বীয়া বিদ্যালয় স্থাপনে ব্যয় করুন; অথবা দিল্লী তিব্বীয়া কলেজে অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি সৃষ্টি করুন; আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি, ভবিষ্যতে বিনা খরচে তাঁহারা কাউন্সিলে যাইতে পারিবেন এবং কাউন্সিলে গিয়া তাঁহারা বাস্তবিক দেশের যে উপকারটুকু করিতে পারেন, তাহার চেয়ে বহুগুণে বেশী উপকার করা হইবে, ঐ বিদ্যালয় বা বৃত্তি দ্বারা।

কলিকাতা, হুগলী ও ঢাকা মাদ্রাছার উপরের শ্রেণী-গুলিতে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Islamicstudies বিভাগে Optional Subject হিসাবে তিব্বীয়া Class খোলা যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। এজন্য আমাদের নেতাদের সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। দেশের অ-আলেমদের জন্য কত শিল্প-বিদ্যালয় কৃষি-বিদ্যালয় বাণিজ্য-বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে, আর এই আলেম সমাজের অর্জ্জনমূলক শিক্ষার জন্য কি বাংলার মুছলিম সমাজ কোন চেষ্টাই করিবে না? যাঁহারা বাংলার অধঃপতিত মুছলিম সমাজকে তুলিবার জন্য চিন্তা ও চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা কি মুছলিম বাংলার ন্যূনাধিক অর্দ্ধসংখ্যক ছাত্রের ভবিষ্যতের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া সমাজকে বাঁচাইতে পারিবেন?—মনস্বী আজমল খাঁর আত্মা আজ সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। *

* মরহুম আজমল খাঁর মৃত্যুর পরেই লিখিত। —লেখক।

সন্ধ্যায়

জসীমউদ্‌দীন

সৌধ-শিখরে ধীরে থেমে যায় ঘুমে ঢুলু ঢুলু বেলা,
মেঘের সঙ্গে করিছে মেঘেরা সিঁদুর লইয়া খেলা।
নীচে নগরীর জন-কোলাহল, কল-কল্লোল-পারা,
ঘটনা-সাগরে হেলিছে দুলিছে ছুটিছে বাধন-ছাড়া।
সেথায় কর্ম্ম, সেথা কোলাহল, স্বার্থের সংঘাত ;
জমা-খরচের হিসাব কসিয়া জীবন হইছে পাত।
উপরে গগণ অনন্তনীল, হেথায় সেথায় তার,
ছোট মেঘ তরী কারো আগে ধায় পিছনে বা ভাসে কার।
তারি পালে পালে সন্ধ্যা সে খেলে বরণের লুকোচুরি,
কভু লাল নায়, কভু কালো নায়, কভু নীল নায় ঘুরি।
নিম্নে নগর পাষাণ-হৃদয়, জানে না কবির হিয়া
রঙ-রঙিলার বাসর যে ঢাকে কালো ধূম উগারিয়া।
সৌধ-জঠর ধরে বিস্তারি, তারি আবরণ পারে,
সন্ধ্যার আলো মানুষেরে চাহি ঘুরে মরে বারে বারে।

হে সাঁঝ রূপসী, তুমি চলে যাও আমাদের ছোট গাঁয়,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু শিথীল অঙ্গ নামাইও বনছায়।
সেথায় বধুরা বাজাইয়া শাঁখ সন্ধ্যা-প্রদীপ ধরি,
দাঁড়াবে যে পথে সেই পথ তুমি দিও কুঙ্কুমে ভরি।
সেথায় যোগিনী তটিনী গায়েতে জড়ায়ে গৈরী-বাস
তোমার সঙ্গে করিতে আলাপ দোলাবে ঢেউএর রাশ।
সেইখানে তুমি ক্ষণেক দাঁড়িও, কলাবন-বিথীছায়,
গেঁয়ো ঘরখানি মায়া মমতায় মাটিতে মিশিতে চায়।
সেথায় হয়ত দু'হাত বাড়ায়ে একজন বারেবার,
শুধাবে তোমারে, কেমন আছে বা পরদেশী ছেলে তার।
তুমি তারে কোন কহিও না কথা, হেথাকার মত করে,
এমনি রঙের রঙীন লহরী দোলাইও বুকে ধ'রে।
হয়ত সে চাহি তব মুখপানে, আমার হৃদয় খানি,
আজিকে কেমন করিতেছে তাহা সকলি লইবে জানি।

বৃহত্তর প্রাণী-জগৎ

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

গত ১লা ডিসেম্বর ৯৩নং আপার সারকুলার রোডের বসু বিজ্ঞান মন্দিরে সাম্বাৎসরিক বিজ্ঞান-সভায় সার জগদীশচন্দ্র বসু এক বক্তৃতা করেন। তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ :—

বিদ্যুৎ-তরঙ্গ লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে এক সময়ে আমার নজরে পড়িয়া যায় যে, জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত জড় বস্তুও (ধাতু প্রভৃতি) উত্তেজক পদার্থের (যথা, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ) আঘাতে সাড়া দেয়। জীবের অঙ্গ যেমন কিছুকাল প্রবল বেগে সাড়া দিয়া ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং কিছুকাল বিশ্রামের পরে আবার পূর্ব্বের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পায়, তেমনি ধাতুও প্রবল প্রতিক্রিয়া ও নিস্তেজতার মধ্য দিয়া আবার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। জীব ও জড়ের ভেদরেখা এমনি করিয়া আমার কাছে মুছিয়া যাইতে থাকে।

১৯০০ সালে প্যারিসের আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কংগ্রেসে এই আবিষ্কারের সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার পর ইংলণ্ডে আমি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ি। যে ঘরে আমি শয্যাশায়ী ছিলাম, তাহার জানালা দিয়া একটা বাদাম গাছ দেখা যাইত। তাহার দিকে চাহিতে চাহিতে একদিন সহসা আমার মনে হইল, ঐ গাছের জীবন-যাত্রার উপায় ও কৌশল জীবের বাঁচিয়া থাকিবার উপায় ও কৌশলেরই অনুরূপ। আরোগ্যলাভ করিয়াই আমি এমন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিতে লাগিয়া গেলাম, যাহার সাহায্যে মূক, ভাষাহীন এই উদ্ভিদেরা তাহাদের জীবনের রহস্য লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারে।

জীবনের সংখ্যাহীন সুর ও চাঞ্চল্যের কতটুকুই বা দেখা যায়? কিন্তু মানুষ স্রষ্টা—তাই যখন কোন কিছু তাহার ইন্দ্রিয়ের সীমাকে এড়াইয়া যায়, তখনই এমন কোন যন্ত্রের সৃষ্টি করে, যাহাকে এড়ানো চলে না। আমার এই সকল অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র কোনও জিনিষকে এক কোটী গুণের চেয়েও বড় করিয়া দেখায়; ইহার সাহায্যে যে জগৎ প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহার বিস্ময়কর অস্তিত্বের কথা কল্পনায়ও আনা যায় না।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র আরও বলেন যে, জীব ও উদ্ভিদ—এই উভয়ের দেহ-যন্ত্র পৃথক বলিয়া যে একটা ভুল ধারণা এতদিন চলিয়া আসিতেছিল, তাহা জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানকে যতটা আবৃত করিয়াছে, ততটা আর কিছুই করে নাই। বস্তুতঃ প্রাণী-দেহের কোষ ও গঠন প্রণালী উদ্ভিদ-দেহেরই অনুরূপ। প্রাণীর পেশীতে যেমন উত্তেজনার ফলে সঙ্কোচ ও প্রসারণ হইয়া থাকে, প্রাণী-দেহের এক স্থানে আঘাত লাগিলে তাহার বেদনা যেমন অপর স্থানে পৌঁছায়, উদ্ভিদ-দেহেও তেমনি পৌঁছায়। কাজেই প্রাণীদের মত উদ্ভিদের দেহেও যে মাংসপেশী ও স্নায়ু আছে, তাহাতে সন্দেহ কি?

প্রাণীর হৃৎপিণ্ডে যেরূপ নিয়মিত ছন্দে স্পন্দিত হইয়া থাকে, উদ্ভিদের তেমন কোনও নাড়ীর স্পন্দন নাই বলিয়াই লোকে মনে করে। কিন্তু যন্ত্রের সাহায্য উদ্ভিদের বাস্তবিক নাড়ীর স্পন্দনের যেরূপ ছন্দ ধরা পড়িয়াছে, তাহার সঙ্গে প্রাণীর হৃৎস্পন্দনের আশ্চর্য্য মিল আছে। সাধারণভাবে, ঔষধে উদ্ভিদ ও প্রাণীর একই অবস্থা-ব্যতিক্রম ঘটে। কোন উদ্ভিদকে ক্লোরোফর্ম্ম প্রয়োগে অজ্ঞান করিলে, তাহার যে আকুঞ্চন ও ছট্‌ফটানি যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিভাত হয়, তাহাকে দর্শক সহজেই মৃত্যু-বেদনাহত জীবের ছট্‌ফটানির সহিত তুলনা করিতে পারেন।

ভূগর্ভ হইতে উদ্ভিদ-শরীরে রস-সঞ্চালনের রহস্য উদ্ভিদ-দেহের এই নাড়ীস্পন্দনের সাহায্যে অনাবৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে মনে করা হইত যে, শিকড়ের চাপে ও বৃক্ষপত্রের মধ্য দিয়া বাষ্প-নির্গমনের ফলে, টানের জন্য ভূগর্ভ হইতে উদ্ভিদের মাথায় রস সঞ্চালিত হয়। কিন্তু বৃক্ষের শিকড় কাটিয়া ফেলিয়া এবং পাতাগুলিকে ছিদ্রহীন বার্নিসের আবরণে আবৃত করিয়াও দেখা গিয়াছে যে, রস-সঞ্চালন অব্যাহতভাবে চলিতেছে। কাজেই একটা স্বতন্ত্র পরিচালনা শক্তি উদ্ভিদ-শরীরে আছে বলিয়া প্রমাণিত হয়। এইরূপে মৃতকল্প ও নির্জীব বৃক্ষপত্রের কর্ত্তিত অংশে গরম জল লাগাইলে, তাহার দ্রুত জীবনীশক্তি লাভ দেখা যায়। আবার, ঊর্দ্ধ অংশে গরম জল প্রয়োগ করিয়া, ইহাও দেখা যায় যে, ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নদিকে রসের সঞ্চালন হইতেছে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন-ধারা আলোচনা করিয়া এইরূপে আমরা জীবনের ঊর্দ্ধগতির দীর্ঘ-সোপান-পথটীকে প্রত্যক্ষ করি। যে বাধা এই দুই সমপ্রাকৃতিক ঘটনাকে পরস্পর বিভক্ত করিয়া রাখিত, তাহা দূর হওয়ায় আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি, উদ্ভিদ ও প্রাণী-জীবন জীবনের এক মহাসমুদ্রেরই বিচিত্র তরঙ্গ। এই কথার উপলব্ধি করিয়া কি জগতের অসীম রহস্যে আমাদের বিস্ময় কমিয়া যায়, না বাড়ে? বিজ্ঞান আমাদের মনে বিস্ময়ের ভাবটিকে আরও গভীরতর করিয়া দেয় এবং তাহার প্রতি নব পাদক্ষেপই আমাদিগকে সেই আধ্যাত্মিকতার পর্ব্বত-শীর্ষের নিকটে লইয়া যায়, যেখান হইতে সত্যের মোহনভূমিতে দৃষ্টিপাত করা সহজ হইয়া পড়ে।

নিরুদ্দেশ নায়িকা

জাহিদুল হুসাঈন

এক

যমজ বলেই মনে হয়—তবু তা' নয়, পিঠাপিঠি দুই ভাই—ছোটটিকেই লোকে বড় বলে ঠাওরায়। বয়স বাইশ উৎরে গেছে—ত্রিশ ধর্‌-ধর্‌।

যৌবন ত গেল—বিয়ে তবু হয়নি। বিয়ে যারা করে স্বাদ পেয়েছে অথবা পস্তায়েছে যারা, তারাও দুঃখ করে, কিন্তু ওদের পর্‌ওয়াই নেই সে সম্বন্ধে।

ওদের ভাব্‌না-হীন চেহারা দেখ্‌লে মনে হয়, ওরা যেন মনে করে আছে, যৌবন যাবারই নয়—সাদা পাটের মত ধবল দাড়ির খোঁচাও না।

সারকুলার রোডের উপর একতলা বাড়িটি—তিন দিকের তিন তলা অট্টালিকার মাঝখানে যেন একটা অভিশাপ। চুণ বালি শেওলার তলদেশে ডুব দিয়েছে—হয়ত হস্তান্তরিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্তই।

বড় ভাইটী একখানা শাদা পা-জামা পরে দশ পয়সা গজের একখানা শাদা পাঞ্জাবী গায় রাস্তায় এসে দাঁড়ায়! তিন বছর থেকে ওগুলোই পরণে। রাস্তায় হয়ত দু' মিনিট এসে দাঁড়ায়—তারপর ফিতে-ওলা খড়মগুলো টেনে টেনে চটের পর্দ্দা সরিয়ে ঘরে এসে ঢুকে। এতটুকু আঙ্গিনাও নেই। তিন মিনিটও ঘরে তিষ্ঠে না, আবার রাস্তায় এসে দাঁড়ায়!

এম্‌নি ভোর আট্‌টা থেকে রাত বারটা—

ঘর থেকে রাস্তা পর্য্যন্ত নিষ্ক্রিয় মানসিক সূতো-গুলো দিয়ে তাঁতির মত তানা দেয়। রাস্তার চঞ্চল জনস্রোত, না, ঘরের ভিতরকার পচা বদ্ধ জীবন-প্রবাহ ওর মনে সাড়া জাগায়।

ছোটটি সকালে উঠেই গোছল্‌ করে চোখে সুর্ম্মা আঁকে। একখানা "মারসিডাইজড্‌' সিল্কের (অর্থাৎ রঙ করা পাটের) লুঙ্গি, তাই পরে একখানা রবারের বেল্ট দিয়ে গেঞ্জিটার উপর। এর উপর একখানা কোট। চটি জুতোই পায় দেয়। বাবুয়ানা বই কি?

তারপর ডাকে—"হাসান-হুসেন! আও! আও!!"

দরজার উপরে কার্ণিস ঘেঁসে পায়রার খোপ একটা—তাই থেকে দুটো কবুতর বেরিয়ে আসে।

দুটো কবুতরই শাদা, স্রষ্টার খেয়ালে। ও কিন্তু আবার নিজের খেয়ালে নতুন করে সৃষ্টি করেচে মনোরম রঙের আল্‌পনায়। মাথায় আস্‌মানী, গলায় গোলাবী, বুকে জাফরানী, লেজে সবুজ,—পিঠে কিন্তু খোদার উপর খোদকিরী করা হয় নি, তার কারণ ও এই ফর্‌মায়, আল্লাতালা নাকি ঐ শাদাটুকু না রাখ্‌লে রাগ করবেন।

প্রসারিত বাঁ হাতের তালুর উপর পায়রা দুটো বসে জড়াজড়ি করে'। গাল দুটো পর্য্যায়ক্রমে ওদের গায় ছোঁয়ায়,—

তারপর হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়। পত্‌পত্‌ করে অতি ধীরে পাখা নেড়ে, চিলে ঘুড়ির মত অকস্মাৎ নীচের দিকে পড়তে গিয়ে থেমে, ওঠে, নেবে, ঘুরে ফিরে হাততালির সঙ্গে সঙ্গে পাখীদ্বয় মনিবের হাতে ফিরে আসে।

পাখীর এই খেলার মধ্যেই জীবনের খেলা সীমাবদ্ধ।

বড়টীও মাঝে মাঝে খেলা দেখ্‌তে দাঁড়ায়।

ছোটটী বলে, ডাকত ওদের, আসে কিনা তোমার হাতে।

পাখীরা আসেনা, মাথার উপর শোঁ-শোঁ ঘুরে।

ছোটটি বড়টিকে অবজ্ঞা করে পাখীদের ডাকে—"হাসান-হুসেন আও ! my dear pegions,—আও !"

ইংরেজী বোলও ছাড়ে।

খেলা খতম করে ডাকে, হাসিনা !

এগার বছরের একটা কিশোরী চট্ সরিয়ে এসে দাঁড়ায়। পায়ে খড়ম, ধানী রঙের একখানা ধুতী পরণে, চুলগুলো পিঠের উপর ছড়ানো। এটা ওর 'মর্ণিং ড্রেস্।' বিকেলে পরে একখানা পা-জামা, পায়ে ফুলদার চটি একজোড়া,—পিরাণ গায় একখান। চুলগুলো বিউনি করে পিঠের উপর ফেলে রাখে—চোখের পাতায় ঘন অঞ্জন, মুখে হাল্কা পাউডারও !

মেয়েটী যেন এই পরিবারের হৃৎপিণ্ড।

বলে—হাসিনা, হাসান-হুসেনকে দানা খাওয়া খুব করে, আজ পাল্লা আছে একটা।

দানা পাব কোথায় ? পয়সা দাও ত—

এই নে—ছুটো—এক পয়সার লেড়ুয়া তুই খাস, নয় খাস্তা বিস্কুট। আর এক পয়সার চনা নিস, ওদের জন্যে। ঘর থেকে চালও দিস্ এক মোট্—

বড়টি সুযোগ পেয়ে বলে,—চাল দেবে, তুমি কামাই করে আন কিনা।

ছোটটি উর্দ্দু বলে—তুম্ ত খুব কামাতা হায়।

শীষ দিতে দিতে হোটেলে গিয়ে ওঠে। আগেই একটা পয়সা টেবিলে এক ঝাঁক মাছিকে উড়িয়ে দিয়ে ফেলে বলে—আধ্ কুপ্ চা'।

আগে পয়সা দেয়, মানে, নগদ পয়সা দিয়ে খাবার সঙ্গতিও যে রফিকের আছে সেটা তস্দীক করবার জন্যে।

ওধারে একদল কাবুলী—কাবুলী রুটি পায়ার সুরুয়ে ভিজিয়ে ভক্ষণ করচে। কাবুলী রুটির মত গায়ের রঙ্, কাপড়গুলোও গায়ের শরুয়ায় স্যাঁৎসেতে হয়ে ঐ রঙই নিয়েচে—দাঁতগুলোও তাই।

বেহেশ্তে পাঠাবার আগে অন্ততঃ একটি বচ্ছর স্বর্গের ধোপার গাম্লায় ওদের ফেলে রাখ্তে হবে।

ওধারে বাঁকারির মত বাঁকা একটা বুড়ো—কল্কাতিয়াই। দাঁড়ি চাঁছা কিনা। খুক্খুক্ কাশে আর চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয় ! কফ্ও ফেলে মেঝেতে—চাকা-চাকা গাঢ় কফের মধ্যে রক্তের আঁচ্। যক্ষা থেকেই হয়ত।

রফীকের পাশেই বসে প্রৌঢ় কিসিমের একটা লোক। ডান হাতের তর্জ্জনীর আঙুলটার নখ খেয়ে হাড়ে ধরেচে ঘা—কুষ্ঠের ঘা-ই। ওই আঙুলেই গ্লাসের জলটা নেড়ে একটা জগে রেখে আরেকটা জগ থেকে জল ঢেলে নিলে। এক পয়সার একটা খাজুর খেয়ে গ্লাসের পানি খেয়ে উঠ্লে। চা' খেতে পারলে না—পয়সা নেই আক্সার।

একুশ-বাইশ বছরের একটা ছেলে চা এনে রাখ্লে রফীকের সমুখে।

আঙুলে-ঘা লোকটা যে-চেয়ারটায় বসেছিল, সেটাতেই এসে বস্লে একটা তরুণ। সুন্দর, পরিচ্ছন্ন। পায়ে গ্লেজ্ কিডের সেলিম সু, ট্রপিকেলের কোটের কলারের উপর সদ্য পরা সিল্ক টুইলের সাদা কলার উল্টানো। পরণে দিশী তাঁতের দামী ধুতি। হংস মধ্যে বক যেন। কলেজের ছাত্র হবে।

বয় একটা অর্ডার মাফিক আটার একটা পরেটা আর এক-শিক্ কাবাব্ পরিচ্ছন্ন ছেলেটার সমুখে রেখেই সর্দ্দির কাশির বেগ থামাতে পারলে না—কফের ছিটে-ফুটা পরেটার গায়েই মিলিয়ে গেল।

কলেজের ছেলেটি বল্লে, ও, নিয়ে যাও। কফ্ পড়েচে—খাব না।

বয় বল্লে—বল্গম্ নেহি গিরা !

বাংলা-উর্দ্দুর খিচুড়ী উরুসের মধ্যে যেন ছড়াছড়ি হল কতক্ষণ—

বাঙালীন্ আদ্মী আখেরে পরাজিত হল ; দাম দিতে হবে—খাক, না খাক।

রফীককে যে-ছেলেটা 'সার্ভ্' করেছিল, সে এগিয়ে এসে পরেটায় বর্ত্তনটা উঠিয়ে নিয়ে একটা তাকে রাখ্লে আলাদা। অরেকটা বর্ত্তনে আরেক-শিক কাবাব এনে ডান হাতের দুই আঙুলের কাণের পেছনের ঘা-চোঁয়ানো পূঁজটা দেয়ালে মুছে ফেলে সেই-দুই আঙুলেই পরেটা তুলে এনে কলেজের ছাত্রটিকে দিলে। বিশেষ সাংঘাতিক ঘা ওটা নয় ;—টায়ফয়েড্ হয়ে কাণের পেছনের টিলে হাড়্টা ঝাঁঝ্রা হয়ে গেছে মাত্র।

এবার আর ওজর কি ? ছাত্র খেলে,—জলও সে-জগ থেকে, যে-জগে আঙুল-চুবোনো পানি রেখেছিল কুষ্ঠরোগী। এর পরে এক পেয়ালা চা—যক্ষা রোগী যে-কাপে পান করেছিল।

ছোক্‌রাটা কফ-ঘেরা পরেটা নাবিয়ে একধারে বসে খেতে শুরু করে দিলে—

রফীক চা খেতে খেতে মনে-মনে পরিচ্ছন্ন ছেলেটাকে টিটকারী দিতে লাগল। ঘোলাটে জীবনের তীব্র প্রবাহে সেও হারিয়ে গেছে, তাই।

বেরিয়ে তারপর টুঁটুঁ করে ঘুরে আসে এক দুফুর।

আরেক দুফুর কোনো রকমে কাটে,—খেলায়, হেলায়।

সন্ধ্যার পর সেজেগুজে পচা গলিটা ঘুরে আসে—কোনোদিন বা টেঁপু পাড়াটা। অথবা নিউ মার্কেট। আর মেয়েলোকের সঙ্গে কথা কইবার ভারী বাসনা জাগে যেদিন, সেদিন টালিগঞ্জ। সেখানে একটি মামাতো বোন আছে, "শিরীণ শিরীণ বোল!" তারি সঙ্গে গপ্‌প করে, পুরো তিন ঘণ্টা।

তাইতেই কত দেমাগ। বড় ভাইকে বলে- আওরত লোকের সঙ্গে কথা কইবার কায়দা শেখনি, তুমি টালিগঞ্জ যাও কেন? মেয়েদের সঙ্গে কথা কইতে পারে, এই রফীক। বলে বুক চাপ্‌ড়ায়।

বড়টি কথাটা সত্য বলেই মেনে নেয়, তবু মামাতো বোনটিকে দেখতে যায় মাঝে-মাঝে। আহা বেচারী—

উভয়ের জীবনে ওটাই মস্ত adventure.

রাত্রে উভয়েই দুটো দড়ির খাটে শোয় ফুট-পাথে। নেহায়েৎ পানি আসে যেদিন সেদিন একই কোঠায় মা-বাপ ভাইবোন সব অগত্যা বস্তাবন্দী হয়ে না থেকে উপায় কি?

পিতার গোঁফ-জোড়াটাই সার, নইলে বাদুড়ে-চোষা কলার মত মুখখানা।

পেশা—কাবুলী আর মাড়োয়ারী থেকে কর্জ্জগ্রহণ।

এই করেই ত দিন কাট্‌চে।...

মা'টি-ও বছর বছর পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিচ্চেন—আনন্দও। এক একটী সোনার চাঁদ সন্তান সওগাত দিয়ে।

তার উপর 'এপিডেমিক্ ড্রপ্‌সি!' (বেরিবেরি) বেচারী বাঙালী মেয়ের হৃৎপিণ্ড মৃত্যুর পেয়ালা পান করবার জন্য পিয়াসে এতবড় হা করেচে—আজরাইলের আসতে সাহস হলে হয়।

হঠাৎ একদিন মগ্‌রীবের ওয়াক্তে বৈঠকখানা বাজারের সুমুখে এক মেওয়ার দোকানের সাম্‌নে—

বোর্কার সমুখদিক তুলে একটী মেয়ে ফল-ওয়ালার সঙ্গে আলাপ করচে। মাথায় এক বোচ্‌কা ঠোঙা, খবরের কাগজের।

ফল্‌-ওয়ালার মুখ কামনার ভূমিকায় আঁধার রাতে দলিত কেঁচোর মত হয়ে উঠেচে,—

রফীকের ইচ্ছে হচ্চিল, ফল-ওয়ালার মুখটায় ঘুঁসি মারে একটা। যদিও সেও পাশের বিড়ির দোকানের রশি থেকে বিড়ি ধরাবার অছিলায় মেয়েটিকে দেখে নিলে।

সুন্দরী। টালিগঞ্জের মামাতো বোনটির চেয়ে। হাসীনার চেহারাটা এর চেয়ে একটু ভালো, যদিও রঙ্‌টা এরই ফর্সা। ঢাকুরিয়া হ্রদের পারে একটি মেয়ে দেখেছিল—মনে হয় এই মেয়েটিই যেন।

যে-দোকানের সাম্‌নেই যায়, কেন্‌বে বলে ডাকে, দর কষাকষি হয় অনেকক্ষণ, ইয়ার্কিও। কেনে না কিন্তু কেউ।

একটি ঠোঙাও বিক্রি হয় না—এম্‌নি ফেরে, বাড়ীর দিকে।

রফীকের ইচ্ছা হয় কিনে নেয় সবগুলো ঠোঙা, কিন্তু পারে না, দোকান নেই যে! রাস্তার লোক কে কবে ঠোঙা কিনে?

হ্যারিসন রোড থেকে মির্জ্জাপুরে এসে গলিটা পড়েচে—দুটো লোক পাশাপাশি চল্‌তে পারে না এত সরু। এরই মধ্যে একটা ডাষ্টবিন। সেখানে এ-পাশে একদল লোক ঘড়ি সমুখে রেখে বিড়ি বানায়—লালসুতো, শাদাসুতো। একটা চা-দানীতে অনেকগুলো খালি চায়ের পেয়ালা। আর কাগজে এক বস্তা পান। আর ও-পাশে মেয়েটি ঢুক্‌লো কোঠায়—সদর-অন্দর-সর্ব্বস্ব ছ'হাত দৈর্ঘ্যে আর চার হাত প্রস্থে এক অন্ধকার কোঠা। একটি মাত্র দরজা গলিটাতে ডাষ্টবিন বরাবর। পায়খানা আর কল-তলা বাইরে সরকারী।

রফীক দেখে ফিরে এল—

জীবনের রঙ্গমঞ্চে এ-কোন্ গুলে-বকৌলী?

রাত্রে দড়ির খাটে উপুড় হয়ে পড়ে চোখ বুঁজে ভাবে তাই।

দুই

খালি গজল—ফুর্ত্তি অনাহূত গজলে ফেটে যায় ক্ষণে-ক্ষণে! "হামারি নবী আজ দুলা বনি হ্যায়!"—

সব গানে—সবে ছন্দে আজ আশেক-মাশুকের ইশ্‌কের কথা—

নিজেকে মনে-মনে দুলা কল্পনা করে। চারি-ঘোড়ার গাড়ীতে চলেচে—ফুলে-পাতায় সজ্জিত গাড়ী। সমুখে-পেছনে এক মাইল-ব্যাপী মিছিল—গাড়ীর, আলোর, বাদ্যের। কত পথিক সাথে চলেচে—কত গাড়ী গেছে থেমে। উপরে তলায় তলায় তরুণ-তরুণী দাঁড়িয়েছে কত সার বেঁধে। সমস্ত দর্শকের নয়ন ওর অঙ্গ-কারা-মুখী।...

"কেয়া—আঁখ্ নেহি হ্যায়? দেখ্‌তা নেহি?"

পায়ে আহত পথিক গলির মুখে ফণা মেলে দাঁড়ায়!

হঠাৎ ক্ষেপে উঠে কিন্তু অকস্মাৎ নরম হয়ে পথিকের একেবারে গায় হাত বুলিয়ে বলে—মাফ্ কিজিয়ে ভাইয়া, দেখ্‌খা নেহি!

রফীক ঢুকে সেই গলিটায়। আজকাল কতবারই না যেতে হয়, নোংরা গলিটা দিয়ে।

বিকেল। নির্জ্জন। পাড়ার লোক দু' একজন যা আসে যায়, নয় দূরের লোক কেউ চিনেও না।

দূর থেকে দেখা যায়, মেয়েটি দরজায় দাঁড়িয়ে। দাঁড়ানোর ভঙ্গী যেন সুন্দর একখানি খণ্ড কাব্য!...

হাসেও ত।...চোখে অমন বিশ্রী ভ্রুকুটি কেন?... এ্যা, বিড়ি-ওলাদের সঙ্গে ইয়ারকি করচে? ওপাশের বিড়ি-ওলাদের সঙ্গে?...

পাশ কেটে যেতে মেয়েটি নিজেকে দরজার একটা পাল্লার আড়ালে লুকোলে। ও-ছেলেটা এতবার এখান দিয়ে কেন যায়, কেন?—মেয়েটি ভাবে।

রফীক দেখে একটা বিড়ি-ওয়ালার চোখে কামনার সরীসৃপের নৃত্য!

অ, তাই!...

সেদিনই সন্ধ্যার পরে—

মির্জ্জাপুরের মোড়ে একটা পান-দোকানে মফঃস্বলের একটা ছেলে হোটেল থেকে খেয়ে পান কিন্‌বার জন্যে দাঁড়িয়েচে। পানটা মুখে গুঁজে ঠোঁটের এক কোণে সিগারেটটা চেপে ধরে মনি-বেগ থেকে দুটো পয়সা তুলে ফেলে দিলে। খানকয় ভাঁজ করা নোটের সামান্য অংশ-বিশেষ মেঘের পুরু পর্দ্দার এক ফুটো দিয়ে যেন এক ফালি জোৎস্না!—দোকানের ধারে দাঁড়ানো রফীকের চির-বঞ্চিত দুটো চোখে আগুন জ্বলিয়া উঠে।

"সোভান!"...

তিনটে লোক এসে হাজির!

চারজনে ফিস্‌ফিস্ করে পরামর্শ চলে।...

বাবু, আমাকে কুকুরে কামড় দিয়েচে, যশোর থেকে এসেচি, সরকারী হাসপাতালে কোন্ দিক দিয়ে যাবো? এগিয়ে এসে রফিক বাঙালী ছেলেটিকে বলে। পাছে আরো একটি লোক।

ছেলেটি তখন চল্‌তে শুরু করেচে মির্জ্জাপুর দিয়ে পশ্চিম দিকে। বল্ল—ট্রপিকেল ইস্কুলে যাবে? হ্যাঁ, এই-ই রাস্তা?

বাবু, রাত্রে সেখানে থাকা যাবে ত?

না, সেখানে বাইরের লোক রাত্রে থাক্‌তে পারে না।

ত' কোথায় যাই বাবু?...আপনি কোথায় যাবেন?

এই, এখানেই যাব। বুদ্ধু ওস্তাগর লেইনে একটা মেস্—সেখানে।

হলওয়েল লেইন ভুলে ছক্কু খানসামা লেইনে ঢুকে—রাতের কল্‌কাতার বুকের অন্ধকার! হাত মেলে দিলে হাত দেখা যায় না স্পষ্ট!...

দুটো লোক ফস্ করে পাশ কেটে চলে গেল—

আর দুটো লোক পেছন দিক থেকে টেনে ধর্‌লে দুটো হাত! অবাক! সমুখের দুটো লোকও ফিরে এসে ধর্‌লে—

চীৎকার দেবার সময়ই পেলে না, ফস্‌ফস্ নোটগুলো খসে গেল।

টাকার মায়া। প্রতিবাদ কর্‌তে চাইলে—চারখানা চাকু ঝিলিক মেরে উঠ্‌ল;—বুকের কাছে, মুখের কাছে।

তারপর এক টুক্‌রো রঙ-করা শিশে দিয়ে বল্লে—নে, নিয়ে যা ওটা। সোনা।

যুবকটি ভাবে হবেও বা! আসল না হোক অন্ততঃ নকল! ওরা ভাবে, একটা কিছুর বদলে ত নিচ্চি,

গোনার দায় থেকে ত মুক্তি পেলাম! অনন্ত গোনা অনেক কম হবে।

প্রেমের দেরী সয়, কামনার নয়। তাই টাকা ছিনিয়ে আনা।

অনেক রাত্রে দরজা ও চৌকাঠ সংলগ্ন ফাঁকে রফীক দুটো কাঁচা টাকা রেখে এল।

সকালে রফীক সেজে গুজে তিন দফা ও রাস্তা দিয়ে যায় আজকের পোষাক সব নতুন। পায়ে চামড়া-ব্যবসায়ীদের মত লম্বা চোখা আগা-আলা ডার্বি, গায়ে কাশী সিল্কের চুড়িদার পাঞ্জাবী, পরনে অদ্ভুত একখানা লুঙ্গী—আলোক-পাতে বিচিত্র রঙ প্রকাশ করে।

মেয়েটি আজ দুই চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে যেন চাইলে, আহ! আহ!! সমরখন্দ ও বোখারা নয়, সারা হিন্দুস্তান আরেকখানি দৃষ্টির বদলে!...

পরদিন রাত্রেও দরজায় একখানা জামা—

এর পরদিন রাত্রে এক শিশি তেল, সাবান দুটো, চুল বাঁধ্‌বার লাল ফিতে, কাঁটা, ক্লিপ—

পনের দিনেও কোনো হিল্লে হয় না—

সন্দেহ বাড়ে। এক দিন সারা রাত গা ঢাকা দিয়ে ওধারে আঁধারে লুকিয়ে থাকে মেয়েটির সন্দেহ-প্রযুক্ত অভিসার আবিষ্কার কর্‌বার জন্য! ঐ বুঝি দরজা খুলে তরুণী বেরিয়ে আসে—ঐ বুঝি আসে!...কৈ' না!...

শেষ রাত্রে শিয়ালদর লম্বা হুইসেলে চেতনা জাগে, বাড়ী ফেরে।

তবে কি মেয়েটি—সদ্যস্ফুট গোলাবের মত? সে যে সন্দেহ করেছিল, ভুল?...

কখন কামনার অন্ধকার পথে প্রেমের ক্ষীণ আলো এসে পড়ে। দস্যু হয় সাধু, কামুক হয় সন্ন্যাসী!

কামনার আঁধার পথ ছাড়ে—প্রেমের অরুণিমা জাগে।

লাইলী-মজনু, শিঁরি ফরহাদ, যুসুফ-জুলেখা...

দুঃখের পথ—অতৃপ্তির অথচ আনন্দের।

প্রিয়াকে দেখ্‌তে যে পায়, ওই যথেষ্ট!

কামনা বহির্মুখী। প্রেম অন্তর্মুখী।

সন্ধ্যার পর ফুটপাথে দড়ির খাটে শুয়ে খালি ভাবে। হোক গরীব, তবু কি মানুষ থেকে আলাদা একটা জীব? না, এক্ষুনি মাকে গিয়ে বল্‌ব, ওকে না হলে বিয়ে কর্‌ব না।...ওঠে। পাত্রী নিয়ে ওকে যেন সাধাসাধি করা হচ্চে!

মনে পড়ে গেল, বড় ভাই এখনো নওশার সাজ নেয়নি! ধপ্‌ করে শুয়ে পড়ে।...

আচ্ছা, বড় ভাইটিকে যদি টালিগঞ্জের মামাতো বোন-টিকে বিয়ে করানো যায়, তবে কথাবার্তা ত ওর সম্বন্ধেই হবে! তখন সে সুযোগে বল্‌বে, এ মেয়েটি ওর চাই-ই।...

হঠাৎ অপরূপ ঘটনা—

ওরই সাম্‌নে দিয়ে যেতে একটি ছেলে পাশের ছেলেটী বল্‌লে, ওহাব, ভাই, আমার গা কাঁপ্‌চে, আমি শোব।

রাস্তায় শোবি কিরে? ঐত বাড়ী,—চল গাড়ী করি। সাফ্‌ জামাশুদ্ধ ছেলেটি ফুটপাথে শুয়ে পড়্‌লে,—পা আছ্‌ড়াতে লাগ্‌লে। সঙ্গের বন্ধু অবাক।

রফীক ওঠে আসে। বলে, জল এনে দোবো?

শায়িত ছেলেটি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, হাঁ, আনুন। রফীক পানি আন্‌তে যায়।

বন্ধু পানি দেয় মাথায়—খাস গঙ্গার ঘোলাটে পানি, রাস্তায় জল দেবার বাক্স থেকে।

রফীক পানি এনে খাইয়ে দিয়ে ধরাধরি করে এনে নিজের খাটে শুয়ায়, পাখা করে।...ভাবে, আহা বেচারী হয়ত আমার মত জখম হয়েচে আঁতে, তাই এমন।

বন্ধু রিক্‌শা ডাক্‌তে যায়। রফীক সেবা কর্‌তে কর্‌তে মেয়েটির কথা ভাবে। খোদার কসম, কোনো বদ-খেয়াল নয়, একটি ঘণ্টার জন্যেও যদি জীবনে মেয়েটিকে এম্‌নি সেবা কর্‌তে পেত।...

তিন

বসন্তের আভাস—পরিবারের উপর।

দূর সম্পর্কীয় এক আত্মীয় জাপানী মালের একটা এজেন্সী নিয়ে ধনে ফুট্‌কার মত ফুলে ওঠেচেন। রিপন ষ্ট্রীটে তিন তলা একটা বাড়ী—নিজে থাক্‌বার জন্যে। শহরে আরো তিন চার্‌টে বাড়ী আছে ভাড়া দেবার। দু'খানা মোটর। পিতার একখান, ছেলের একখান।

ছেলেটির নাম আফ্‌জাল—বড় দিল্‌-দরিয়া।

আফ্‌জাল বৃষ্টির দিন ছাড়া হর্‌রোজ মোটর নিয়ে রফিকদের বাড়ীর সাম্‌নে বিকেলে এসে দাঁড়ায়। হর্ণের

সুর ও ভঙ্গিটি এই পরিবারের সকলের চেনা। আওয়াজ্ শুন্‌লেই হাসিনা ছুটে আসে। দস্তুর।

আফ্‌জাল হররোজ আসে। বাড়ীর সকলের সঙ্গে তার আলাপ। কিন্তু মোটরেই বসে থাকে। আজ ঘরে যেতে হল। হাসিনা এক পেয়ালা চা এনে দেয়।

এক পেয়ালা চা খেতে যে সময়টুকু লাগ্‌ল তাতে কম্‌সে কম দশটা পেয়ালা ঘাম আফজালের গা থেকে বেরিয়ে গেল—

সিল্কের রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বাইরে মোটরে এসে বস্‌ল,—হাসিনা এল, রফীক, তার বড় ভাইএর সঙ্গে পিতাও।

ভূমিকা ত সাঙ্গ হয়েচে, এইবার কেতাব শুরু—

এই সময়টাতে ট্রাম কোম্পানীর সঙ্গে টক্কর দিয়ে অনেকগুলো 'বাস্' কোম্পানী গড়ে উঠেচে—তারাও একটা গড়্‌তে চায়—"Hasina Motor Service."

দেশের লোক সব দিকে বিলিতি বর্জ্জনে মন দিয়েচে—'বাস্' চালিয়ে ঢের মুনাফা হবে ইত্যাদি। এই সুযোগের সুব্যবহারে যদিও অত্যন্ত উৎসুক, তবু ওদের পরণের সামান্য নেক্‌ড়াটুকু পর্য্যন্ত খাস বিলিতি।

আফ্‌জাল তার বাপের কারবার থেকে আলাদা স্বাধীন ভাবে দালালী ত' করে, আর বীমা কোম্পানীর বীমাকারী যোগাড় করে দিয়ে, হাজার ত্রিশেক টাকা ব্যাঙ্কে জমিয়েচে। তারই থেকে হাজার কয়েক টাকা দিয়ে একটা বাস কিনে দিতে স্বীকার করলে।

বড় ভাই বাস্ চালায়, ছোট ভাই টিকিট বেচে।… সারা দিনের মেহ্‌নতের পরের অন্ন,—আহ, খেতে কি লজ্জৎই না লাগে। খাওয়াও যায় এত! হজমও হয় এত ভাল! রাত্রে কি ঘুমটাই না হয়!…দুনিয়া এত মিষ্টি।… বড়টির মুখের আব্‌ছায়া কেটে গিয়ে সত্যিকার সৌন্দর্য্য ফুটে বেরোয়—শরতের জ্যোৎস্নার মত। ছোটটির ভাঙা গাল-চোখ চিক্‌নাইএ ভরে ওঠে—তার উপর রক্তের খেলা।

কাজ না করে মানুষ কি করে সময় কাটায়!…

বাপের মুখখানা হাসি-হাসি। বদ্-মেজাজী নাম ঘুচ্‌ল বলে'।

সকালে ওঠে বাড়ীর সুমুখে একখানে চেয়ারে বসে—পাশের বাড়ীর ভাড়া-করা ঘরটা থেকে বাস্‌খানা বেরিয়ে যাবার সময় কমাণ্ডারের মত হুকুম করে—'সাম্‌নে'—'পিছে'—'ঠার্‌কে'—'জরাসে বাঁ তরফ'—'আদমী লোক হটো।'

হাসিনাও সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয় আনন্দে। কি খুশী!…

মা জীবনে আলোর মুখ ইচ্ছে করে দেখেনি,—চট একটুখানি সরিয়ে আজ বাস্‌খানি দেখে। পেটের বেহেশ্‌তে খাস্ত-মুমীন পাঠাবারও যেন একটী তাজী বোর্‌রাক।…

গাড়ীটি চলে, থামে, চলে—যন্ত্রটী যেন ড্রাইবারের হাতে খেলানা। ও মনে করে, সারা দুনিয়ার লোক ওর হাতের মুন্‌শীয়ানার দিকে চেয়ে আছে।

কণ্ডাকটারটী দু'হাত ছেড়ে লাফ দিয়ে নামে, হেণ্ডেল না ধরেই লাফ দিয়ে ওঠে চলন্ত গাড়িতে—এম্‌নি কায়দা।…

জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাও এত রসে ভরা, এত আনন্দ।

টালিগঞ্জের মামাতো ভাইরা অনেক দিন বেড়াতে আসেনি—আজকাল প্রায়ই আসে। সে দিন মামিও এসেছিলো গাড়ী করে মেয়েকে নিয়ে। হাসিনার সঙ্গে মামাতো বোনটীর গলাগলি।

পলাওকুর্ম্মা জর্দ্দা, সোণালী তবকে ঢাকা ফির্‌নী তস্‌তরীতে। আরো কত কি। নামও মনে রাখা যায় না, এত—খেয়ে মামী আনন্দে ঘরে ফিরে।

মেয়েকে দোবো বিয়ে এখানেই, ভাবে।

অনেক দিন পরে, হয়ত জীবনে এই পয়লা পিতা-পুত্রে এক সঙ্গে খেতে বসে।

রফীক বলে, টালিগঞ্জের বিয়ের প্রস্তাব কর্‌লে হয়, ভাইয়ের জন্যে। পিতা চুপ।

বড় ভাই কয়, আরেকখানা 'বাস' করি ত আগে। Instalment-এ কেনা যাবে।

আরেকখানা 'বাস্'ও হয়।

পিতা বলে, ছোট একখানা টম্‌টম্ করব বিকেলে বেড়াবার জন্যে।

বড় ছেলে বাধা দেয়, বলে, ঘোড়া গাড়ীর দামত আছে, এ-ছাড়া একটা লোক রাখতে হবে। আস্তাবলও ভাড়া কর্‌তে হবে·· ঘোড়ার দানা-পানির খরচটাও ত কম নয়। তাহলে Instalmentএর টাকা দেওয়া অসম্ভব হবে। এ ছাড়া আফ্‌জালের টাকাটা কিছু কিছু করে দেওয়া দরকার।

ওকি টাকা চাইচে ?

না চাক—দেওয়াত উচিত।

কথা শুনে না। এতদিন বড় ছেলের কাছে বাক্সের চাবি ছিল—হিসাব-নিকাশও। পিতা বাক্সের চাবি নিয়ে যায়।

টম্‌টম্‌ করে ;—বিকেলে হাঁকায়, সকালেও।

খোলা মাঠে টম্‌টম্‌ চড়ে বেড়ালে সর্দ্দি হয়—গলি রাস্তায়ই ভাল।

একদিন কর্ম্মহীন সন্ধ্যায় যে গলি দিয়ে রফীক বেড়াত, সে রাস্তায় পিতা টম্‌টম্‌ হাঁকায়।

এমন সুন্দর কচি মেয়ে এখানে!

বড় ভাইএর কাছে চাবি থাকতে পান-বিড়ি-নাশ্‌তার পয়সা পেত রফীক,—ছোটখাট বিলাসিতার পয়সাও। এখন পায় না, তাই ব্যাগ থেকে পয়সা ছেঁটে রাখে।

পিতার গতিবিধি বড় ছেলের মনে আগুণ ধরায়,—সেও বেগ থেকে পয়সা রেখে সেভিং বেঙ্কে রাখে।

হঠাৎ একদিন পচা গলির এক ঘরের সিঁড়ির উপর পিতা-পুত্রে সাক্ষাৎ—তারপর থেকে সাক্ষাৎ নেই দু'জনায়।

মোটর কোম্পানী থেকে তাগাদায় আসে দারোয়ান,—বেহুদা। তিন instalment যায়—একটি পয়সা না।

উকিল আসে টালিগঞ্জের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। এত ছোট ঘরে হালে বিয়ে করানো যায় না—পিতা জবাব দেয়।

আফ্‌জাল হঠাৎ একটা মাল সেলে খরীদ করে, দু'শ' টাকা হাওলাত চাইতে এসে ফিরে যায়। দুটো বাস চালিয়ে দু'শ টাকা দিতে পারে না। সন্দেহ বাড়ে।

রফীক রোজ রোজ কত মেয়ের সঙ্গে মনে মনে প্রেমে পড়ে।

গাড়ীতে কোনোদিন বা চলন্ত নওরোজের মেলা বসে। কোন সময় বা "বাহানা করিয়া ছুঁয়গো পিরান জাহান-আরার।" মনে হয় নিখিল তরুণীর মাঝে ওর মানসী, ওর নায়িকা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

চারি

মোটর কোম্পানী নিলাম করে ওদের গাড়ীখানা নিয়ে গেল।

আরেক মাড়োয়ারী আদালতে নালিস রুজু করে।

তাই শুনে আফজালও নালিস করে। ওর আগেই ডিক্রি পেয়ে মাড়োয়ারী আফজাল-এর কিনে-দেওয়া বাসখানা নিলাম করে' নিয়ে যায়। টমটমখানাও ঘোড়া সুদ্ধ।

আফ্‌জাল ডিক্রি করে person-এর উপর ক্রোক দিল,—টাকার বদলে ফাটক খাটাবে। "জুয়াচোর সব, টাকা লুকিয়ে রেখে দেয় না।"

আফজালের পিতা শুনে পুত্রকে তম্বি করে।

পাঁচ

পরদিন সকালে একখানা লাঠি হাতে এক কাবুলি বসে দরজা চেপে।...

বড়টি বেরয়,—বলে, আব্বা ওঠে এই আস্‌চে।

তারপর ফুটপাথে তাঁতির মত তানা দেয়—শিয়ালদা থেকে মীর্জ্জাপুর।

ছোটটিও বেরিয়ে আসে, বলে, আব্বা চা খেয়ে আস্‌চে।

চেনা বাসে চড়ে' একেবারে টালিগঞ্জ। মামাতো বোনটি শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেচে। দু'জনা এক ঘরে বসে কত কথা বলেচে আগে—আজ কথাই বল্ল না। মামি খাবার জন্যে সাধা ত দূরের কথা—

অনেকদিন পরে এল সেই গলিটায়। অনামিকা যে-বাড়ীতে থাকৃত, তার দরজার সামনে একটী ছোট ছেলে খেলা করে—রফীককে দেখে শিশুটী ভয়ে মাকে ডাকে।

বাড়ীর ভিতর হইতে রফীক দেখে একটী মেয়ে—ছেলেটীকে কোলে তুলে নেয়। তারপর তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দেয়।

মাথার উপর দুপুরে সূর্য্য আগুণ ঢালে। সে চলে। পথ থেকে পথে। ক্ষুধা নেই তার—তৃষ্ণা নেই তার।

মাঝে মাঝে কোথাও জানলায় একটু চুড়ির আভাস সূর্য্যকরে ঝক্‌মক্‌ করে উঠে—কখনও বা চলন্ত মোটরে নীলাম্বরীর সাড়ী রামধনুর মত দেখা দেয়—

রফীক আপনার মনে হাসে—আর চলে।

কাগজ বিক্রি

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

হাঁকে ফিরিওলা, কাগজ বিক্রি
পুরাণো কাগজ চাই !
ঘরের কোণেতে সঞ্চিত যত
তাড়া গুলি হাতড়াই।
পুরাণো কাগজ চাই ;
বহুদিন ধরে জঞ্জাল বাড়ে
সের দরে বেচি তাই।

নিরুদ্দেশ কে সন্তান লাগি
ঘোষিছে পুরস্কার ;
মৃত্যুঞ্জয় অমৃত কারা
করিছে আবিষ্কার।
ঘোষিছে পুরস্কার,
পলাতক খুনে লুকায়ে কোথায়
চাই যে হদিস্ তার।

কেমন করিয়া একটি তাহার
হঠাৎ নজরে পড়ে ;
দেখি সমুদ্রে যাত্রী-জাহাজ
কোথায় ডুবিল ঝড়ে।
হঠাৎ নজরে পড়ে,
আবার কোথায় মানুষের মাথা
বিকায় খুলির দরে।

কোন সে বধূর বুকের আগুন
ভিতর করিয়া খাক্,
অবশেষে লাগে বসনে তাহার,
পুড়ে গেল সাত পাক।
ভিতর করিয়া খাক্,
কোন সে গিরির গরল অনল
ঘটাল দুর্বিপাক।

হারানো তারিখ ফিরে আসে ফের
পুরাণো কাগজ পড়ি ;
আমার নয়নে সহসা পোহায়
সেদিনের বিভাবরী।
পুরাণো কাগজ পড়ি ;
রাখিল ধরণী সেই দিনটির
পায়ের চিহ্ন ধরি।

রক্তে ছোপান, অশ্রুতে ভেজা
পুরাতন যত পাতা,
সব জঞ্জাল আজিকে,—হলেও
রঙীন সুতায় গাঁথা।
পুরাতন যত পাতা,
তাতে কোন্‌দিন কি দাগ লাগিল
কে বৃথা ঘামায় মাথা।

সে পদচিহ্ন কোথায় মিলাল
তার পরে নাহি খোঁজ !
মানুষের ঘরে সকলের বড়
উৎসব নওরোজ।
তার পরে নাহি খোঁজ ;
যাত্রী-জাহাজে ডুবিল যে, বুঝি,
তারো ঘরে আজি ভোজ।

হাঁকে ফিরিওলা, কাগজ বিক্রি,
পুরাণো কাগজ চাই !
ঘর ভরি যত মিছে জঞ্জাল
জমাবার নাহি ঠাঁই।
পুরাণো কাগজ চাই ;
আদর যাহার ফুরাল তাহারে
সের দরে বেচ ভাই।

—উত্তরা

ইংলণ্ডের রাষ্ট্রবিপ্লব

রিজাউল করীম বি, এ

১

ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌সের মৃত্যুর পর তৎপুত্র প্রথম চার্লস্ ১৬২৫ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। জেম্‌স্ স্বীয় রাজত্বকালে প্রজাদের সহিত প্রতিনিয়ত কলহ করিতেন, এবং সুযোগ ও ক্ষমতা পাইলে প্রজাগণকে মতের ঘোর সমর্থক ছিলেন। বরং এই মতটিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিয়া তিনি পিতা হইতে একস্তর উর্দ্ধেই উঠিয়াছিলেন। পিতা-পুত্রের উভয়ের বিশ্বাস ছিল যে, রাজা পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ, রাজা ঐশ্বরিক

আর্ল অফ ষ্ট্রাফোর্ড ও আর্কবিশপ লড্ দুইজনে অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। প্রথম চার্লসের আদেশে রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁহাদের দুইজনের মৃত্যুদণ্ড হয়। তাঁহাদের দুইজনকে একই সঙ্গে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ষ্ট্রাফোর্ডকে যখন বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন তিনি বন্ধু লডের কারা-বাতায়নের সম্মুখে আসিয়া নতজানু হইয়া বন্ধুকে শেষ অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। লড্ও কারা-বাতায়ন হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্ত বাহির করিয়া ইংলণ্ডের আর্কবিশপরূপে শেষ আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন। এই চিত্রে উক্ত দৃশ্যই দেখান হইতেছে।

উত্যক্ত করিতে ছাড়েন নাই। চার্লস্ উত্তরাধিকারী সূত্রে পিতার দোষগুণেরও অংশ পাইয়াছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের অল্পকাল পরেই তিনি আপন পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। পিতার ন্যায় তিনিও "divine right" শক্তিসম্পন্ন—রাজবংশে জন্মগ্রহণ করা, বিশেষ ভাগ্যবান ব্যক্তি না হইলে অপর কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। রাজার তুলনায় প্রজা তৃণাদপি তুচ্ছ। Divine right মতটি নিম্নলিখিত ৬য় ধারায় বিশ্লেষণ করা যায়:—

(১) উত্তরাধিকারীসূত্রে সম্রাট হওয়ার পদ্ধতি বিধাতার নিকট বিশেষ মনোনীত।

(২) বিধাতার অভিপ্রায় এই যে, বর্ত্তমান রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই সর্ব্বদা পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবে—তাঁহার অন্যান্য সন্তান শত যোগ্যতা সত্ত্বেও—সিংহাসন লাভে বঞ্চিত হইবে।

(৩) রাজাকে তাঁহার এই বিধাতৃদত্ত পদ হইতে বঞ্চিত করে, এমন ক্ষমতা কি প্রজাসাধারণের, কি পার্লামেন্টের কাহারও নাই।

ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চালস

(৪) বিধাতা রাজপদ সৃষ্ট করিবার সময়, রাজাকে অপ্রতিহত ক্ষমতা দিয়াছেন, সেই ক্ষমতার বলে রাজা যদৃচ্ছভাবে রাজ্যশাসন করিতে পাবে না।

(৫) রাজার এই অপ্রতিহত ক্ষমতার উপর যে সকল সীমা (Acts Parliament) নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা তিনি প্রজাদের হিতার্থ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন। প্রজাদের জন্য তিনি দয়া করিয়া সেরূপ সীমানির্দ্দেশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। যেদিন রাজার ইচ্ছা হইবে, সেই দিনই তিনি উহার সীমা লঙ্ঘন পূর্ব্বক যদৃচ্ছা কার্য্য করিতে পারিবেন।

(৬) তিনি প্রজাদের সঙ্গে যে সমুদয় শর্ত্তে আবদ্ধ হন, তাহা পালন করিতে বাধ্য নহেন।

সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া চার্লস্ এই সর্ব্বনাশকর মতের ঘোর পৃষ্ঠপোষক হইয়া উঠিলেন। ইংলণ্ডবাসী বহুকাল হইতে ধীরে ধীরে রাজার ক্ষমতার উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিতেছিল, চার্লস এই মতের সমর্থক হইয়া সেই অধিকারের মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু যে জাতি একবার স্বাধীনতার রসাস্বাদন করিয়াছে সে কিছুতেই স্বাধীনতানাশী কোনও প্রস্তাবে সম্মত হয় না। ইংরাজগণও তাহা সহ্য করিতে পারিল না। সুতরাং চার্লসের রাজ্যপ্রাপ্তির পর হইতেই তাঁহার সহিত পার্লামেন্টের তথা, প্রজাবৃন্দের সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিল। রাজা প্রজাদের মতামতের প্রতি মোটেই লক্ষ্য করিতেন না, তিনি পদে পদে তাহাদের মতকে পদদলিত করিয়া আপন ইচ্ছায় রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রজাদিগকে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক বলিয়া মনে করিতেন। যখন আবশ্যক বোধ করিতেন, উহাদের সাহায্য গ্রহণ করিতেন, আর কার্য্যসিদ্ধি হইলেই উহাদিগকে অপমানিত করিয়া বিতাড়িত করিয়া দিতেন।

রাজপদ লাভ করিয়াই চার্লস্ দেখিলেন, রাজকোষ অর্থশূন্য। কিন্তু সে সময় স্পেনের সহিত যুদ্ধ আসন্ন। যুদ্ধ করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং অর্থের জন্য তিনি পার্লামেন্টের আশ্রয়-প্রার্থী হইলেন। তিনি তিন লক্ষ পাউণ্ডের দাবী করিয়া পার্লামেন্টের নিকট আবেদন করিলেন। কিন্তু পার্লামেণ্ট মনুষ্যোচিত দৃঢ়তার সহিত তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে সাময়িক প্রয়োজনের জন্য মাত্র ১ লক্ষ ৪০ হাজার পাউণ্ড দিতে স্বীকৃত হইল। ইহাতে চার্লসের অভাব পূর্ণ হইল না। তিনি পার্লামেন্টের অপেক্ষা না করিয়া জোর করিয়া নূতন কর দ্বারা অবশিষ্ট অর্থ তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এবং পার্লামেন্টের বিনা সাহায্যে অবৈধ উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিয়া স্পেনের বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করিলেন। এই সৈন্যদল কেডিজ উপসাগরে উপনীত হইতে না হইতেই, ইহাদের মধ্যে খাদ্যাভাব অনুভূত হইল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ করিল, কিন্তু পরিশেষে শোচনীয়রূপে পরাজিত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল। স্পেনের বিরুদ্ধে এই অভিযানে ইংলণ্ডের কোন লাভ হইল না, বরং রাজকোষ শূন্য হইল, ও রাজ্য অধিকতর ঋণভারে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। রাজার এই প্রকার নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া প্রজারা তাঁহার উপর চটিয়া উঠিল—ধূমায়িত অগ্নিতে অপর একটি ইন্ধন প্রদান করা হইল।

অলিভার ক্রমওয়েল

চার্লস্ প্রায় ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘকালের ইতিহাস, রাজা-প্রজায় সংঘর্ষের ইতিহাস

ভিন্ন আর কিছুই নহে। চার্লসের নিকট জনমতের কোনই মূল্য ছিল না, স্বার্থসিদ্ধির জন্য জনমতকে পদদলিত করিতে তিনি কখনই কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। রাজ্যশাসন করিতে গিয়া তিনি প্রত্যেক বিষয়ে পার্লামেণ্টকে অবহেলা করিয়া কেবলই প্রজাপীড়ন করিয়াছেন। তাহাদের উপর অযথা কর-ভার চাপাইয়া কঠোর অত্যাচারে তাহা আদায় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রজাদের ঘোর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও, অযোগ্য ও নিষ্ঠুর-প্রকৃতির লোকের হস্তে রাজ্য-ভার অর্পণ করিয়া প্রজাদিগকে অশেষভাবে নিপীড়ন করিয়াছেন।

আর্কবিশপ লড্

ইংলণ্ডের প্রজাসাধারণ কখনই রাজার যথেচ্ছাচার সহ্য করিতে শিখে নাই। যাহারা বহুকালাবধি পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া আসিতেছিল—অনেকদিন হইতে রাজাকে আপনাদের জনমত দ্বারা পরিচালিত করিয়া আসিতেছিল, আর যাহারা এক সময় রাজার অপ্রতিহত ক্ষমতা দমন করিবার জন্য রাজাকে বাধ্য করিয়া তাঁহার নিকট হইতে 'ম্যাগনা কার্টা'র ত সন্ধিপত্র আদায় করিয়াছে, তাহাদেরই বংশধরগণ চার্লসের এই ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া উঠিল—ইংলণ্ডের লোক সবই সহ্য করিতে পারে, কিন্তু রাজার যে বে-আইনী শাসনে তাহাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়; তাহারা কিছুতেই তাহা সহ্য করিতে পারে না। রাজাকে যে সমুদয় অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, যে মুহূর্ত্তে তিনি তাহার সীমা অতিক্রম করিয়াছেন, তদ্দণ্ডেই প্রজাসাধারণ দলবদ্ধভাবে সেই রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। টিউডার বংশীয় রাজন্যবর্গের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ সাধারণতঃ প্রজার প্রতিনিধিদের মত লইয়াই রাজ্যশাসন করিতেন। কিন্তু প্রবল প্রতাপশালী টিউডারগণ রাজ্য শাসনে যথেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা রাজোচিত অপরাপর সদ্গুণে বিভূষিত ছিলেন। তাঁহারা মহত্ব দেখাইয়া প্রজাদের ভক্তি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেন। সেই জন্য লোকে তাঁহাদের কার্য্যের বড় একটা প্রতিবাদ করিত না—মহত্ত্বের মহিমায় অত্যাচারগুলি ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা করিত।

যুবরাজ রুপার্ট

এমন সময় ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, উদ্ধত, দাম্ভিক ষ্টুয়ার্টগণ। তাঁহারা অপরাপর রাজা অপেক্ষা একেবারে বিপরীত ধরণের লোক ছিলেন। রাজোচিত কোন গুণই তাঁহাদের ছিল না—অথচ অন্যায় ও অত্যাচার করিবার সময় সকল সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন। প্রজা শাসন করিবার কোনও কৌশল তাঁহাদের জানা ছিল না। তাঁহাদের এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, জোর-জুলুম করিতে পারিলেই প্রজা বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিরীহ মেষ-শাবকের মত রাজার পদতলে আত্মসমর্পণ করিবে। রাজ্য-শাসনে প্রজার সাহায্য ও প্রীতি যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা তাঁহারা একেবারেই স্বীকার করিতেন না। সুতরাং এমন সর্ব্বগুণময় (?) রাজা ও স্বাধীনতার উপাসক প্রজাদের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন যে অধিকদিন থাকিতে পারে না, তাহা সহজেই অনুমেয়। পার্লামেণ্টকে বিতাড়িত করিয়া চার্লস্ আপনার বলে নূতনভাবে কর আদায় করিবার শত চেষ্টা করিয়াও যখন কোনও ফল লাভ করিতে পারিলেন না, তখন অগত্যা ১৬২৬ খৃঃ ২য় বার পার্লামেণ্ট আহ্বান করিয়া আপনার অর্থাভাবের কথা উত্থাপন করিলেন। কিন্তু পার্লামেণ্টের সভাগণ একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন। তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে রাজার যথেচ্ছাচারিতায় নিতান্ত মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতেছিলেন। এক্ষণে সময় ও অবসর বুঝিয়া নূতনভাবে কর নির্দ্ধারণ করিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। আরজন ইলিয়ট সভার কার্য্য আরম্ভ হইবা মাত্র তীব্র ভাষায় রাজার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "আমরা কিছুতেই নূতন কর নির্দ্ধারণে সম্মতি দিব না, বাকিংহাম (ইনি রাজার একজন মন্ত্রীস্থানীয় কর্ম্মচারী) রাজাকে কুপরামর্শ দিয়া

ক্যারে

এলিয়ট

দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন, রাজার অত্যাচারে দেশ জর্জ্জরিত হইতেছে। বাকিংহামের গুরুতর দণ্ড না হইলে আমরা রাজার কোন কথাই শুনিব না। কোনও প্রার্থনায় সম্মতি দিব না।" ডিগস্ নামক অপর একজন সদস্য ইলিয়টের বক্তৃতার প্রতিধ্বনি তুলিয়া বক্তৃতা প্রদান করিলেন। কিন্তু পার্লামেন্টের সদস্যদিগের স্পষ্ট উক্তিতে ও রাজার চৈতন্যোদয় হইল না। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া সদস্যদ্বয়কে হঠাৎ বন্দী করিয়া ফেলিলেন। অবশিষ্ট সদস্যগণ রাজার এইরূপ গর্হিত কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া সদস্যদ্বয়কে মুক্তি দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। রাজা অবশেষে তাঁহাদিগকে মুক্তি দিলেন বটে, কিন্তু ক্রোধবশে পার্লামেন্ট সভা ভাঙ্গিয়া দিলেন। ইহাতে অশান্তির অগ্নিকণা দেশময় ছড়াইয়া পড়িল।

আর্ল অফ ষ্ট্রাফোর্ড

এতাবৎ ফরাসীর সহিত চার্লস্ সখ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু নানাকারণে ফরাসীরাজের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। ফরাসী রাজ্যে লারচেলে নামক স্থানের প্রটেস্টান্টদিগের উপর ফরাসীরাজ অত্যাচার করিতেছিলেন, এই জন্য তথাকার প্রটেস্টান্টদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য চার্লস্ ফরাসীরাজের বিরুদ্ধে সমরোদ্যোগ করিয়া ইংলণ্ডে আর এক অশান্তি ডাকিয়া আনিলেন। একে অর্থাভাবে দেশে মহা-দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার উপর এই সমরোদ্যোগ—ইহাতে দেশ আরও দৈন্য-পীড়িত হইয়া পড়িল। দেশ উৎসন্নে যাক্—দেশের লোক দুঃখের কষাঘাতে জর্জ্জরিত হইতে থাকুক,—তাহাতে প্রাসাদবাসী রাজার কিছু আসিয়া যায় না। রাজার ইচ্ছানুরূপ কর সংগ্রহ হইলে ও ইচ্ছানুযায়ী তাহা ব্যয়িত হইলেই রাজার কর্ত্তব্য পালিত হইল! সুতরাং প্রজাদিগের প্রতি একটুকুও দৃকপাত না করিয়া রাজা অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

পীম

পূর্ব্বে "টনেজ্" ও "পাউণ্ডেজ্" নামক দুই প্রকার কর আদায় করা হইত; কিন্তু বিশেষ কড়াকড়ি ছিল না। কিন্তু এক্ষণে রাজা এ করগুলি আদায় করিবার জন্য কঠোর আদেশ জারি করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার অভাব দূর হইল না। তৎপর তিনি দেশবাসীর নিকট উপঢৌকন প্রার্থী হইয়া অর্থ আদায় করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজার ব্যবহারে কেহই সন্তুষ্ট ছিল না, রাজমন্ত্রী বাকিংহামের উপর দেশের লোক হাড়ে হাড়ে চটিয়াছিল। সেই জন্য উপঢৌকন বাবদেও রাজা বেশী কিছু পাইলেন না। অতঃপর তিনি জোর করিয়া ঋণ গ্রহণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ধনী-নির্ধন সকলেরই নিকট এই উপায়ে বহু অর্থ সংগৃহীত হইল। যাহারা টাকা দিতে অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদের বাড়ী-ঘরের নিকট সৈন্য নিযুক্ত রহিল। জোর করিয়া ও ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক অর্থ আদায় করিবার জন্য সকল রকম উপায় অবলম্বন করিলেন। কিন্তু ইলিয়ট প্রমুখ কতকগুলি লোক রাজাকে ঋণ দিতে স্বীকৃত হইলেন না, তাহাতে রাজা তাঁহাদিগকে যত অনিষ্টের মূল বিবেচনা করিয়া হঠাৎ বন্দী করিয়া ফেলিলেন।

নানাবিধ অবৈধ উপায় দ্বারা রাজা কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিলেন। এবং তাহারই বলে তিনি লারচেলির প্রটেস্টান্টদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য বাকিংহামকে সসৈন্যে তথায় প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ইহাতে ইংলণ্ডের কোন লাভ হইল না। লারচেলি পঁহুছিবার পূর্ব্বেই পোর্টস্ মাউথে এক গুপ্ত ঘাতকের হস্তে বাকিংহামের ভবলীলা সাঙ্গ হইল। চার্লসের অত্যাচারের প্রশ্রয়দাতা বাকিংহামের মৃত্যুতে ইংলণ্ডবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। ইহার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত চার্লস্ যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে পরাজিত হইয়া দারুণ মনস্তাপে ১৬২৯ খৃঃ ফরাসীর সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। রাজাকে ঋণ দিতে অসম্মত হওয়ায় যাঁহারা কারাগৃহে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, দেশ-প্রচলিত হেবিয়াজকর্পাস আইন অনুসারে তাঁহাদের মুক্তির জন্য আবেদন করা হইল। উক্ত আইনের সার মর্ম্ম এই যে বিনা বিচারে কাহাকেও কারারুদ্ধ করা হইবে না। বিচারপতিগণ রাজরোষে পতিত হইবার ভয়ে

আয়ারটন্

উক্ত আইন অনুসারে তাঁহাদিগকে মুক্তি দিতে পারিলেন না। এই সময় ১৬২৮ খৃঃ তৃতীয় পার্লামেণ্টের অধিবেশন হইল। সভার কার্য্য আরম্ভ হইবা মাত্র সভ্যগণ একযোগে রাজার কার্য্যের নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। টমাস ওয়েণ্ট অর্থ নামক এক ব্যক্তি প্রজাপক্ষের নেতৃত্ব লইয়া রাজার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি রাজার নিকট প্রজাদের পক্ষ হইতে কয়েকটি অধিকার আদায় করিলেন। ইহাই Petition of the Rights নামে বিখ্যাত। এই প্রতিশ্রুতি পত্রে চারিটি বিষয় স্বীকৃত হইল:—(১) পার্লামেণ্টের সম্মতি ব্যতিরেকে রাজা প্রজার নিকট হইতে অর্থ আদায় করিতে পারিবেন না। (২) বিনা বিচারে কাহাকেও কোনও প্রকার দণ্ড দিতে পারিবেন না। (৩) কাহারও গৃহে কখনও সৈন্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। (৪) সামরিক আইন প্রয়োগ করিয়া কাহাকেও কোনোরূপ শাস্তি দিতে পারিবেন না।

হাম্‌ডেন্

প্রথম প্রথম রাজা ইহাতে ঘোর আপত্তি তুলিয়াছিলেন। ঈশ্বরের প্রতিনিধি যে রাজা, তাঁহাকে প্রজাদের সম্মতি লইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে হইবে! এরূপ চিন্তা করাও যে মহাপাপ! কিন্তু বে-আদব প্রজা-সাধারণ যখন সেই পাপ কথাকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল, তখন রাজার চক্ষু স্থির হইয়া গেল! যাহা হউক তিনি গত্যন্তর না দেখিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও উক্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। যে দিন এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, সেদিন ইংরাজদের কি আনন্দের দিন! সর্ব্বত্র আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল!

মন্‌ট্রোস্

দাম্ভিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতার সাক্ষাৎ অবতার চালস্‌কে দমন করিবার জন্য প্রজাগণ কত কৌশল অবলম্বন করিলেন। কিন্তু দুর্ম্মতি রাজা কিছুতেই সৎপথ অবলম্বন করিলেন না। "পিটিশন অফ রাইট্‌স্" স্বাক্ষর করিবার অত্যল্পকাল পরেই তিনি আবার স্বেচ্ছাচার আর করিলেন। পুনরায় ১৬২৯ খৃঃ পার্লামেণ্টের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। কতকগুলি নিরপরাধ বণিকের পণ্যদ্রব্য রাজাদেশে লুণ্ঠিত হইলে পার্লামেণ্টের সদস্যগণ তাহার প্রতিবাদ করিলেন। ইহাতে রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া সভা ভাঙ্গিয়া দিলেন। সদস্যগণ তথাপি সভার কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। এবং রাজার স্বেচ্ছাচারিতার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বহু প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন। ইহাতে রাজা আরও কুপিত হইয়া সৈন্যদ্বারা সভা ভাঙ্গিবার আদেশ দিলেন। সভায় যাঁহারা রাজার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অনেককে বন্দী করিলেন। ইলিয়ট পুনরায় বন্দী হইলেন। বন্দী অবস্থায় কারাগারেই তাঁহার লোকান্তর ঘটে। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য এইরূপে একজন বীরপুরুষ অম্লানে কারাগারে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। কারাগার তাঁহার সু-উজ্জল বিভা ম্লান করিতে পারে নাই—বরং শত ঔজ্জ্বল্যে তাহা বিকশিত হইয়া রহিয়াছে।

ব্রাড্‌শ

[আগামী বারে সমাপ্য]

আল্‌হাজ্জ্ব মোহাম্মদ লায়েক চৌধুরী

[ডাঃ মোহাম্মদ আবুল কাসেম]

ঢাকা জিলার অন্তর্গত 'বন্দরখোলা' গ্রামে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ চৌধুরী বংশে মোহাম্মদ লায়েক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মরহুম গোলাম রসুল সাহেব একজন প্রজাবৎসল ও স্বনামধন্য জমিদার ছিলেন।

দৈবের লিখনে তাঁহার বিস্তৃত জমিদারী দুরন্ত পদ্মার কালগ্রাসে পতিত হয়। ফলে তিনি সপরিবারে ফরিদপুর জিলার অধীন 'নূরপুর' গ্রামে উঠিয়া গিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন; কিন্তু দারিদ্র্য তাঁহার সঙ্গী হইল।

মরহুম মোহাম্মদ লায়েক চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত জুবিলী ইনষ্টিটিউশন্

অতি শৈশব হইতে মোহাম্মদ লায়েক সাহেবের সমাজের প্রতি আন্তরিক টান ও দীন-দুঃখীর প্রতি দয়া ছিল। আর্থিক দৈন্যের দরুণ তিনি বাংলা ভাষায় তেমন ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে না পারিলেও সুন্দর আরবী-ফার্সী জানিতেন।

তিনি দারিদ্র্যের দুর্বিসহ নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া ১৮ বৎসর বয়সে অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত কলিকাতায় আসেন; কিন্তু ব্যবসায়ে কোনরূপ সুবিধা করিতে না পারিয়া বহু সাধ্য-সাধনার পর আদালতে একটি অতি অল্প বেতনের কর্ম্ম গ্রহণে সক্ষম হন। নানা অভাব-অভিযোগের সহিত অহর্নিশ সংগ্রাম করিয়া দীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল এই চাকরী করার পর তিনি এই কার্য্যে ইস্তফা দেন। এবং কিছু মূলধন লইয়া স্বাধীনভাবে ঘি ও লঙ্কার ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় 'শাকপাল্‌দিয়া' নিবাসী মৌলবী এনায়েত উল্লা সাহেবের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহকার্য্য সম্পাদিত হয়।

বিবাহের তিন বৎসর পর তিনি ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া বার্ড কোম্পানীর শ্রমিক সরবরাহের ছোট একটী কন্‌ট্রাক্ট গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ তাঁহার মাথার উপর হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে তিনি বার্ড কোম্পানীর সমস্ত বড় বড় বন্দোবস্তী পাইলেন,—ফলে আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল হইয়া উঠিল।

নিজে নানারকম দুঃখ-দৈন্যের ভিতর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন বলিয়া আর্ত্ত-দুস্থের বেদনা যে কি বিভীষিকাময় ও বীভৎস, তাহা তিনি ভাল ভাবেই বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝিয়া-

ছিলেন বলিয়াই পীড়িতের সেবা ও তাঁহাদের দুরবস্থা মোচন তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ও মহান্‌ সাধনায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

সমাজের উন্নতিকল্পে তিনি ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন কলিকাতার বুকে জুবিলি স্কুল নামে একটী বিদ্যালয় গড়িয়া তোলেন। বিশেষভাবে—শিক্ষক ও ছাত্রদের নামাজের নিমিত্ত একটী মস্‌জিদও প্রতিষ্ঠিত করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সমাজের কল্যাণার্থে ও বিবিধ সদনুষ্ঠানে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি বহু অভাব-গ্রস্ত ছাত্রকে স্বীয় বাড়ীতে রাখিয়া ও সাহায্য দিয়া পড়াইতেন।

মোস্‌লেম সমাজের গৌরব-সম্পদ জুবিলি স্কুল প্রথমতঃ হ্যারিসন রোডে অবস্থিত, বর্ত্তমান আলফ্রেড থিয়েটার গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী একটী ছোট ভাড়াটিয়া বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয়; তথায় কার্য্যের সূচনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র সংখ্যা আশাতীতরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। তখন বিদ্যালয় অন্যত্র স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন হইয়া পড়ায়, লায়েক সাহেব ২৯নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে জমি ক্রয় করিয়া তথায় ছাত্রাবাস ও মস্‌জিদ সংলগ্ন দ্বিতল অট্টালিকা তৈয়ার করেন। এই বিরাট গৃহের এক অংশ এবং অপরাংশ হোষ্টেলের জন্য অদ্যাপি ব্যবহৃত হইতেছে।

গোলাম গফুর চৌধুরী, বি-এ
মরহুম লায়েক চৌধুরীর পৌত্র

এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান তিনি জাতির হিতার্থে ওয়াকফ করিয়া দেন। অধিকন্তু উত্তরকালে যাহাতে অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে ইহাদের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে তজ্জন্য তাঁহার নিজস্ব আরো কয়েকটী মূল্যবান সম্পত্তি এই সম্পর্কে ওয়াকফ করিয়া দেন।

তিনি নিজের জাতির হিতৈষণার জন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠানটী রিজার্ভ রাখেন নাই, পক্ষান্তরে যাহাতে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল জাতির ও সকল শ্রেণীর বালকগণ লেখাপড়া শিখিতে পারে তাহারও উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ইহা চৌধুরী সাহেবের আদর্শ স্বদেশ-প্রীতি ও উদার হৃদয়ের প্রতীক্—তাহা বলাই বাহুল্য।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আরবের পুণ্যভূমি, তথা সারা মোস্‌লেম জাহানের তীর্থ, মক্কা শরীফে যাইয়া "হাজী" উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে এই দানবীর, মনীষী দেহত্যাগ করেন।

মানুষ মহাপুরুষ হইয়া উঠে জ্ঞান, মনের বল, অর্থ, দয়া ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার উপযুক্ত বিকাশে ও তাহার সদ্ব্যবহারে। প্রকৃতপক্ষে চৌধুরী সাহেবের মধ্যে উপরোক্ত প্রত্যেক গুণ বিরাজমান ছিল। তিনি তাই সম্পদশালী হইয়াও নিঃস্বের ন্যায় বাস করিতেন। আত্মসুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কাহাকে বলে, তাহা তিনি কদাপি জানিতেন না বা উপভোগও করেন নাই। এক কথায়, পরার্থপরতা ও বাৎসল্যের তিনি ছিলেন মূর্ত্ত আদর্শ। তিনি জিন্নাতবাসী হইয়াছেন, তাঁহার অমর কীর্ত্তি ও তাঁহার অসাধারণ বদান্যতার মহিমা সর্ব্বত্র সগৌরবে ঘোষণা করিতেছে। আজিও কত ছাত্র তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসে থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতেছে,—মানুষের মত মানুষ হইয়া ঘরে ফিরিতেছে। সাহিত্য সভা হইতে আরম্ভ করিয়া কত সাধু-সমিতি এই বিদ্যালয়গৃহে প্রায়শঃ সুসম্পন্ন হইতেছে; দেশ-বিদেশের কত ধর্ম্ম-প্রাণ মোসলমান এই স্কুল সংলগ্ন মস্‌জিদে দৈনন্দিন উপাসনা শেষে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

হাজী সাহেব মক্কা নগর হইতে ফিরিয়া স্বীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় হিসাবপত্র তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মুন্‌শী মেন্‌হাজ উদ্দিন চৌধুরী সাহেবের হস্তে সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত করেন। তাঁহার এন্তেকালের পর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্কুলটী পরিচালনা করেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই স্কুলের কর্ত্তৃত্বভার তাঁহার ভাগিনেয় মৌলবী এছহাক চৌধুরী সাহেবের হস্তে ন্যস্ত হয়। মরহুম মেন্‌হাজ উদ্দিন চৌধুরী সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মৌলবী গোলাম গফুর চৌধুরী, বি-এ, সাহেব একজন উদীয়মান যুবক। তাঁহার পিতামহের স্থাপিত প্রতিষ্ঠানটির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে আমরা সুখী হইব।

আঁধারেতে দাও নয়ন ঢাকি

বন্দে আলি মিয়া

রুধির-লেখায় ভিজিতেছে ধরা
বেদনায় ঝরে অশ্রুবারি
আহা বলিবার নাই কেহ মোর
এসেচি হেথায় আপনা ছাড়ি।
নির্ব্বাসনের দণ্ড আমার
ক্ষণিকের ভুলে শাস্তি গুরু
অকরুণ পথে চরণ মেলিতে
কঙ্কর লেগে যাতনা সুরু।

গোপন বুকের মিনতি জানাই
প্রাণ হোতে তোমা আশীষ করি
বন্ধু আমার এই ঠিক তব
পাই যেন এরে জনম ভরি।
একটি সুধুই নিবেদন প্রিয়
আঁখি দুটি মোর অন্ধ করো
জীবনের ব্যথা সহিবো কেমনে
আঁধারে আমার জগৎ গড়ো।

ভোরের ধরণী রাঙা হবে ফের
আলোর উৎস ঝরিবে বুকে
সুনীল আকাশ ডাকিবে আমায়
প্রাণ-ভরা তার গভীর সুখে।
কেমনে কী করে সহিবো সে ব্যথা
দেবতা আমার বলিবে নাকি—
মিনতি আমার শোনো এতটুকু
আঁধারেতে দাও নয়ন ঢাকি।

ইসলাম ও সঙ্গীত

গোলাম মোস্তফা বি-এ, বি-টি,

ইস্‌লামে সঙ্গীত যে বিল্‌কুল্‌ হারাম—এতকাল এই কথাই শুনে আস্‌ছি। অনেক স্থলে হাতে-কলমেও এর পরিচয় পেয়েছি। আপনাদের এখানে গান গাইলে আমি সমাদর লাভ করি বটে, কিন্তু তাই ব'লে মনে করবেন না যে, সর্ব্বত্রই একরকম। অনেক স্থলে গান গেয়ে আমাকে বেশ অপ্রস্তুতও হ'তে হ'য়েছে। তাই ঠেকে শিখে আত্মরক্ষার জন্য একটু প্রস্তুত হ'য়েছি। কোন্‌ অস্ত্র দিয়ে নিজেকে রক্ষা করব, তাই আজ আপনাদিগকে খুলে বল্‌ছি।

শাস্ত্রের দোহাই দিয়েই যখন সঙ্গীতকে নিষিদ্ধ বলা হয়, তখন সেই শাস্ত্র সম্বন্ধেই প্রথমে আলোচনা করা যা'ক্‌।

কোরাণ ও হাদিস (অবশ্য সহী হাদিস) আমাদের মাথার মণি। তাদের বিধি-নিষেধকে উল্লঙ্ঘন করবার ঔদ্ধত্য আমার নাই। কোরাণ ও হাদিছে বাস্তবিকই যদি থাকে যে, সঙ্গীত একেবারেই হারাম, তবে তাহা হারামই। সে সম্বন্ধে আর কোন দ্বিরুক্তি নাই। কিন্তু আমরা পরিষ্কার ক'রে জান্‌তে চাই—কোরাণ-হাদিসে সেরূপ নিষেধাজ্ঞা আছে কিনা। যাঁরা সঙ্গীতকে হারাম বলে ফতোয়া দেন, এ প্রমাণ-ভার তাঁদের উপর। পরিষ্কার করে তাঁরা দেখিয়ে দিন যে, কোরাণের অমুক আয়তে, বা অমুক হাদিসে সঙ্গীতকে হারাম বলে সিদ্ধান্ত করা হ'য়েছে। তা হ'লেই সব গণ্ডগোল চুকে গেল। হজরত মোহাম্মদের আবির্ভাব-কালে লাম্পট্য, মদ্যপান প্রভৃতি দুর্নীতির সঙ্গে সঙ্গীতও ত জড়িয়ে ছিল। সুতরাং সঙ্গীত সর্ব্ব অবস্থায় নিষিদ্ধ হ'লে, সে সম্বন্ধে কোরাণ শরীফে কোনও আয়ত থাকা খুবই স্বাভাবিক—যেমন নাকি অন্যান্য দুর্নীতি সম্বন্ধে আছে। আমরা চাই সেই আয়ত ও সেই হাদিস।

কোরাণ হাদিস সম্বন্ধে আমার যে সামান্য জ্ঞান আছে, তাতে ত মনে হয়—কোরাণ-হাদিসে ওরূপ কোন নিষেধাজ্ঞা নাই। কোরাণ শরীফে ত নাই-ই, তবে কোন আয়ত বিশেষকে আনুমানিক ও দূরাগত একটা অর্থ দিয়ে বিপক্ষ-পক্ষ তাঁদের উদ্দেশ্য হাসিল ক'রে থাকেন। হাদিস থেকেও তাঁরা ২।১টা হাদিস উদ্ধৃত করেন বটে, কিন্তু তাও তত সুস্পষ্ট নয়। সঙ্গীতের বিপক্ষে তাঁরা যেরূপ ২।১টা হাদিস দেখিয়ে থাকেন, আমরাও স্বপক্ষে সেরূপ দু' একটা হাদিস দেখাতে পারি। দৃষ্টান্তস্বরূপ দু'টী হাদিসের উল্লেখ এখানে করছি :—

একটী হাবশী বালিকা একদিন বিবি আয়েষার গৃহে গান গাচ্ছিল, হজরৎ রসুলে করিম বিবি আয়েষার সঙ্গে সেই গান শুন্‌ছিলেন। এমন সময় হজরত ওমর এসে গৃহ-প্রবেশের এজাজত চেয়ে দ্বারে দাঁড়িয়ে রইলেন। হজরত ওমর ছিলেন 'বাগরেশে' পুরুষ। তাঁর নামে সকলের প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হ'ত। হাবশী-বালিকা ওমরের কথা শুনেই পালিয়ে গেল। ইত্যবসরে হজরত ওমর গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি দেখলেন হজরৎ রসুল ও বিবি আয়েষা হজরৎ ওমরকে লক্ষ্য করে মৃদুমৃদু হাস্‌ছেন। তা দেখে হজরৎ ওমর তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন হজরৎ রসুল বল্‌লেন—একটা হাবশী বালিকা গান ক'রছিল, আমরা শুন্‌ছিলাম। কিন্তু তোমার আসার কথা শুনেই সে পালিয়েছে।" তা শুনে হজরৎ ওমর বল্‌লেন—"রসুলোল্লাহ্‌, আপনি যা শুনতে পারছেন, আমি তা পা'রব না? কই? মেয়েটী কোথায়? ডাকুন তাকে, সে গান করুক।" তখন মেয়েটীকে আবার ডাকা হ'ল এবং তিন-জনে বসে তার গান শুন্‌লেন।

আর একবার একটী আনছার জাতীয়া মেয়ের বিয়ে হচ্ছিল। হজরৎ রসুল সেখানে উপস্থিত হ'য়ে সকলকে

উদ্দেশ করে বল্লেন—"বিবাহে তোমরা কোন আমোদ ক'রছ না? বাজাও, দফ্ বাজাও; আনছারগণ দফ্ বাজানো খুব ভালবাসে।"

এরকম আরও দু-একটা হাদিসের কথা উল্লেখ করা যায়।

এর থেকেই পরিষ্কার বুঝা যায়—সঙ্গীতে—অন্ততঃ বিশুদ্ধ সঙ্গীতে হজরত মোহাম্মদের কোনই আপত্তি ছিল না।

সঙ্গীত যে হজরত মোহাম্মদের পূর্ব্ববর্ত্তী পয়গম্বরদিগের সময়েও প্রচলিত ছিল, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। হজরৎ দাউদ তাঁর সুমধুর কণ্ঠ-সঙ্গীতের জন্য (লেহানে দাউদী) চির-প্রসিদ্ধ হ'য়ে আছেন। হজরৎ মুছা যখন বনিইস্রাইল-দিগকে সঙ্গে নিয়ে নীলনদ পার হয়ে যান, তখন বনি-ইস্রাইল রমণীরা ওপারের তীরে উঠে আনন্দে অধীর হ'য়ে দফ্ বাজিয়ে গান ক'রতে থাকে। হজরতের সমসময়েও আরবে সঙ্গীতের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। তাঁর মৃত্যুর পরও সঙ্গীতের উৎস কখনো নিরুদ্ধ হ'য়ে যায়নি। খলিফা হজরৎ ওমর নিজে সঙ্গীত রচনা করতেন। তিনিই সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ 'ইব্‌নে সুরঈদের' উৎসাহদাতা ছিলেন। খলিফা হজরৎ আলি ও হজরৎ মাবিয়া উভয়েই সঙ্গীতের আলোচনা করতেন। খলিফা অলিদ একজন প্রসিদ্ধ বীণা-বাদক ছিলেন। খলিফা আবু আব্বাছ এবং মনসুর সঙ্গীত ও অন্যান্য ললিত-কলার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ হ'য়ে আছেন। খলিফা হারুণ-অর্-রশিদের নাম না বল্লেও চল্‌তে পারে। বস্তুতঃ খলিফাদের সময়ে বাগ্‌দাদ, পারশ্য, কর্ডোভা, ও গ্রানাডাতে সঙ্গীতের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হ'য়েছে। ইতিহাস তার সাক্ষ্য।

অন্যপরের ত কথাই নাই। যাঁরা খলিফাতুল্ মু'মেনিন্, তাঁদের সম্বন্ধেই এই কথা!

তারপর ভারতবর্ষ। সুদীর্ঘ মুসলিম শাসনে ভারতীয় সঙ্গীত মুসলমানদিগের হাতে নবজীবন লাভ ক'রেছে। যদি বলি যে ভারতীয় সঙ্গীতের অর্থ মুস্লিম-সঙ্গীত, তাতেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতীয় সঙ্গীতের ৪টী বড় বিভাগ আছে:—(১) ধ্রুপদ, (২) খেয়াল, (৩) ঠুংরি, (৪) টপ্পা। আপনারা শুনে হয়ত স্তম্ভিত হবেন যে, একমাত্র ধ্রুপদ ছাড়া অন্য ৩টী বিভাগই মুসলমানদিগের সৃষ্টি। মুসল-মানেরাই ভারতীয় সঙ্গীতের মুক্তি-সাধন করেছে। আর্য্য-ঋষিরা সঙ্গীতকে ধ্রুপদের কারাকক্ষে বন্ধ ক'রে তাকে দম আটকে মেরে ফেল্‌বার কায়দা ক'রেছিলেন, এমন সময় মুসলমান এসে সেই কারার দুয়ার ভেঙে সঙ্গীতকে বাইরে নিয়ে এসে আল্‌কিমিয়ার যাদুস্পর্শ তার অসাড় অঙ্গে বুলিয়ে দিলে! অমনি খেয়াল-রূপিণী এক বিচিত্র মূর্ত্তির আবির্ভাব হ'ল। সম্ভবতঃ এটা ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা। সম্রাট আলাউদ্দিন খিল্‌জীর সভাকবি ও সভাগায়ক আমির খসরুই খেয়াল গানের স্রষ্টা। (১) খেয়াল গানের উৎকর্ষ যখন চরমে পৌছায়, তখন পাঞ্জাবের শোরি মিয়া টপ্পা গানের প্রচলন করেন। কিছুকাল পরে লক্ষ্ণৌএর সনদ ও কদর ঠুংরি গানের সৃষ্টি করেন।

মুসলমান আমলে আমির খসরু, তানসেন, ধোঁধি খাঁ, সুরয খাঁ, চাঁদ খাঁ, শোভন খাঁ, শোটী, হম্‌দম্, মৌলাদাদ, ইলিয়াস, গোলাম নবী, সনদ, কদর, খুশাল খাঁ, নবাব ওয়াজেদ আলি প্রভৃতি অসংখ্য ক্ষণজন্মা সঙ্গীত-স্রষ্টা জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় মুসলমানের এই অধঃপতনের যুগেও আর কিছুতে না হো'ক—অন্ততঃ সঙ্গীতে মুসলমান সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। আলাবন্দে খাঁ, নাসিরুদ্দিন খাঁ, আবদুল করিম খাঁ, হাফিজ আলি খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ (বাঙ্গালী) প্রভৃতি অসংখ্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুর-শিল্পী এখনো সগৌরবে ভারতে বিদ্যমান।

শুধু গায়ক হিসাবে নয়,—রাগ-রাগিণী হিসাবেও সঙ্গীতে মুসলমানের দান অপরিসীম। বহু রাগ-রাগিণী মুসলমান সুর-শিল্পীরা সৃষ্টি করে গেছেন। আড়ানা, মিয়া সারঙ্গ্, মিয়াঁ মল্লার, মিয়াঁকি জয়জয়ন্তী, হোসেনী কানাড়া, দরবারী কানাড়া, দরবারী তোড়ী, বাহাদুরী তোড়ী, জৌনপুরী তোড়ী, বাহার, ইত্যাদি বহু নুতন রাগ-রাগিণী মুসলমান-দিগের হাতে জন্মলাভ করেছে।

সুতরাং স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন—সঙ্গীতকে এক শ্রেণীর মৌলবী সাহেবরা নিষিদ্ধ ব'লে ফতোয়া দিলেও ইসলাম কিন্তু সঙ্গীতের সঙ্গে চির-বিজড়িত। মুসলমানের কোরাণ হাদিস এবং সুদীর্ঘ ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতিহাসই তার প্রমাণ। আশ্চর্য্যের বিষয়—খোদা যেখানে নীরব, রসুল যেখানে

(১) কাহারও কাহারও মতে সদারঙ্গই খেয়াল গানের স্রষ্টা। অবশ্য ইনিও মুসলমান।

নীরব, খলিফাতুল মু'মেনিনরা যেখানে প্রশ্রয়দাতা, সেখানে আজ তেরো শ' বছর পরে এতদ্দেশীয় একশ্রেণীর মৌলবীরা পঞ্চমুখ হ'য়ে ফতোয়া দিচ্ছেন যে-গান বিলকুল হারাম। যেন সঙ্গীতের এই সমস্যা স্বয়ং আল্লা, রসুল বা খলিফাদিগের জানা ছিল না। যেন মুসলমান আমলের শরিয়ৎ-পন্থী বড় বড় বাদশা, কাজী, মুফ্‌তি প্রভৃতি কাহারও মনেই এ সমস্যার উদয় হয়নি, অথবা তাঁরা যেন কেউ-ই এ সমস্যা সমাধান করবার যোগ্যতা রাখতেন না!

উক্ত মৌলবী সাহেবেরা সঙ্গীত সম্বন্ধে যে আপত্তি উত্থাপন করেন, তা এক হাস্যস্কর ব্যাপার। কেউ আমাকে বলেছিলেন—আপনারা যে গলা কাঁপিয়ে রাগ-রাগিনী বার করেন, তার জন্যই সঙ্গীত হারাম হয়ে যায়। নতুবা কোরাণ শরিফের মত সুর করে কোন কিছু পড়লে কিছুই দোষ হয় না।' এ কথার কোনই মূল্য নাই।—রাগ-রাগিণী, আর যাকে বলে "খোশ এলহান্"—এরা উভয়েই একই মার পেটের সন্তান,—গলা জড়াজড়ি করে আছে। ওদের মধ্যে কোন সীমা-রেখা নেই। তা ছাড়া রাগ-রাগিণীই বলুন আর 'এল্‌হানই' বলুন—কোন ধ্বনিই সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি—এই সুর-সপ্তকের—বাইরে নয়। শুধু permutation ও combination এর যা তফাৎ! রাগরাগিণীও যেমন হারমোনিয়ামে বাজিয়ে দেওয়া যায়, কোরাণ পাঠও তেমনি হারমোনিয়ামে বাজানো যায়। মানবকণ্ঠের যে-সুর বাঁধা আছে, তার বাইরে কোন কথা নাই। আর এক মৌলবী সাহেব আমাকে বলিছিলেন—

"আপনারা যে তাল দিয়ে গান করেন, সেই তালই হচ্ছে হারাম। ঐ কথাও মূল্যহীন। তাল ত অন্য কিছু নয়, শুধু সময়ের সমতা রক্ষা করা মাত্র।

গান যদি জায়েজ হয়, তবে তাল হারাম হবে কেন! তাল ত মানুষের বহু কার্য্যের মধ্যেই বিদ্যমান। প্রতিদিন যে দরুদ শরীফ পাঠ করা হয়, তার মধ্যেও ত তাল আছে। মানুষ যে স্বাভাবিক ভাবে হেঁটে যায়, তারও মধ্যে সে তাল রাখে। বিশ্ব-প্রকৃতিই ত ছন্দ-তালে পরিপূর্ণ। ঋতু চক্রের আবর্ত্তনের নৃত্যে কোনদিন ত তাল কাটে না। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত—সবাইত তালে তালে নেচে যায়! গাছে গাছে ফুল ফুটে, ফল ধরে—সবই তালে তালে। আগে-পিছে হয়ে কেউ তারা আসে না। চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র তালে তালেই আসে, তালে তালেই চলে যায়। আমাদের এই দেহের মধ্যেও ত তালের লীলা-খেলা চলেছে! ধমনীতে যে রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, তার মধ্যে চমৎকার তাল রয়েছে। কি সুন্দর তালে তালেই না, নাড়ি আমাদের স্পন্দিত হ'চ্ছে! কি সুন্দর ছন্দ-তালেই না ফুসফুস নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছে! বস্তুতঃ এই তাল রক্ষা করে চলাই হচ্ছে স্বভাব-ধর্ম্ম। তাল যখন কেটে যায়, তখনই বিপদ ঘটে। নাড়ীর গতি অসম হয়। তখনই বুঝতে হ'বে—একটা কিছু বিমার হ'য়েছে। বস্তুতঃ তাল কেটে গেলে সৃষ্টির সব কিছু বেসুরো ঠেক্‌ত, সৃষ্টি অচল হ'ত।

এইবার সাধারণ ভাবে একটু আলোচনা করা যাক্। সঙ্গীত মানুষের এত প্রিয় কেন? হাজার হাজার মৌলবীর লক্ষ লক্ষ ফতোয়াও মানুষকে সঙ্গীত থেকে বিরত রাখতে পারে না কেন? তার কারণ—সঙ্গীতের সঙ্গে মানব-মনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। এই নিখিল সৃষ্টির মূলে আমি শুধু দুটী উপাদানই লক্ষ্য করি—সে হচ্ছে সুর আর রূপ। সুর আর রূপের ভিতরেই সৃষ্টি ডুবে আছে। আকাশে তাকাও, পাতালে তাকাও—সর্ব্বত্র রূপের লীলা-খেলা। পথে-প্রান্তরে, অন্তরে-বাহিরে—যেদিকে যখনি কান দাও,—সর্ব্বত্র সুরের লীলা-তরঙ্গ। বিশ্ব-বীণার তারে তারে নিশিদিন সুর ধ্বনিত হ'চ্ছে। সেই Music of the Spheres যাঁদের কান আছে, তাঁরাই শুন্‌তে পান।

এই যে সুর আর রূপের কথা বল্‌ছি, তার উপাদান সৃষ্টির মধ্যে যেমন লুকিয়ে আছে, মানুষের মনের মধ্যেও তেমনি লুকিয়ে আছে। খোদাতালা মানুষকে সুর আর রূপ দিয়েই সৃষ্টি ক'রেছেন। সুর আর রূপে তাই মানব-হৃদয় এমন ক'রে সাড়া দেয়। কাজেই ফতোয়া যদি দিতে হয়, তবে সে ফতোয়া মানুষের উপর নয়—খোদাতালার উপর দিতে হবে। খোদা তালাকে বল্‌তে হবে—হে খোদা, তুমি মানুষকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি কর, সে ভাল, কিন্তু দোহাই তোমার,—সেই মাটির ভিতর তোমার সুরের সুধা আর রূপের রং মিশিয়ে দিও না! এ না হলে এই দুনিয়ায় ফতোয়া দিয়ে মানুষকে আমরা কাবু করতে পারি না!

মানব-মনে সুর আর রূপের উপাদান যে আছে, তা একটা প্রবাদ বাক্যেও পরিষ্কার বুঝা যায়। আদমের দেহাভ্যন্তরে (কল্‌বের মধ্যে) যখন খোদাতালা রুহ্‌ (আত্মা) প্রবিষ্ট করান, তখন রুহ্‌ সেখানে থাক্‌তে চাইল না,—ছট্‌ফট্‌ করে বেরিয়ে এল। তখন খোদাতালা ফেরেশতাদিগকে বল্‌লেন—সেই কল্‌বের কুঠারিতে আলো দিতে। অপূর্ব্ব রূপচ্ছটায় কল্‌ব আলোকিত হ'য়ে গেল। তখন রুহ্‌কে পুনঃপ্রবিষ্ট করান হ'ল। এবারও রুহ থাক্‌তে চাইল না। তখন খোদাতালার হুকুম হ'ল—কল্‌বের চারিদিকে সুমধুর বাদ্যধ্বনি কর। এই বার রুহ্‌ শান্ত হ'য়ে আদমের দেহে র'য়ে গেল।

এই উপাখ্যানের মূলে গভীর সত্য নিহিত আছে। বাস্তবিকই সুর আর নূর ছাড়া সৃষ্টি অচল হ'ত। এই যে বিশ্ব-প্রকৃতি নিতি নবভাবে এমন রূপ-সুষমায় প্রকাশ পাচ্ছে, এই যে ফুল ফুটছে চাঁদ হাস্‌ছে—দিকে-দিকে, লোকে-লোকে এই যে সুমধুর সঙ্গীত-ধ্বনি উত্থিত হ'চ্ছে, এ একেবারে নিরর্থক নয়। বিরাট বিশ্বের সমবেত আত্মাকে (রুহ) মশ্‌গুল্‌ করে রাখ্‌বার জন্যই খোদা তালার এই বিপুল আয়োজন; বিশ্বের বিরহী আত্মা (রুহ্‌) এই পরের ঘরে থাক্‌তে চায় না, বিচ্ছেদ-বেদনায় বেরিয়ে যেতে চায়, তাই খোদাতালা তাঁর রূপ ও তাঁর সুর দিয়ে তাকে শান্ত করলেন। সুর আর রূপের মধ্যে আমাদের আত্মা তার পরমাত্মীয়ের পুলক-পরশ অনুভব করে বলেই যা-কিছু সান্ত্বনা। বিরহী আত্মা তার প্রিয়তমের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কত দূরে এসে পড়েছে; এ যে অ-জানা অ-চেনা দেশ; এখানে সে নিতান্ত নিঃসঙ্গ, তাই সে তার প্রিয়তমের খোঁজে ব্যাকুল। প্রিয়তমের দেখা সে পায় না, শুধু পায় একটু আভাষ—একটু চরণ-ধ্বনি। শুধু দেখে তার রূপের ছটা, শুধু শুনে তার নুপুর-গুঞ্জন! এই রূপের ছটা আর গুঞ্জন-গীতিই তাকে যেন পথের সন্ধান বলে দেয়, যেন বলে—"এই পথ দিয়ে উঠে এস, আমার সন্ধান পাবে।" যে মানুষের অন্তর এই দুটী পথের ইঙ্গিতকেই অস্বীকার করে, তার আবার কিসের বিরহ, কিসের কান্না, কিসের ব্যাকুলতা, প্রিয়তমের সন্ধান পাবার তার কোন ভরসা নাই। Shakespeare এই রকম লোক সম্বন্ধেই বলেছেন—তারা fit for treason and murder খোদাতালার এই সঙ্গীত জলসা আর এই রূপের মেলা তাদের কাছেই শুধু ব্যর্থ।

মানুষের জীবনে ললিত-কলার প্রয়োজন আছে। যে জাতীয় উন্নতির দোহাই দিয়ে সঙ্গীত ও অন্যান্য কলা-বিদ্যাকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়, সেই জাতীয় উন্নতির জন্যও এর অপরিহার্য্য দরকার। সৌন্দর্য্য-পিপাসা মানুষের মনকে সুন্দর করে, অসুন্দরকে ঘৃণা করতে শিখায়। যার মনে সৌন্দর্য্য বোধ জন্মেছে, সে ভিতরে-বাহিরে কোনদিক দিয়েই অসুন্দরের সঙ্গে মিতালি করতে পারে না। তাজমহলের সৌন্দর্য্য যদি আমায় পাগল করে তুলে, তবে কুঁড়ে ঘরে নোংরা জীবন যাপন করতে আমার সাধ যায় না। একটা অভাবের তীব্র অনুভূতি সারা চিত্তকে চঞ্চল ক'রে তুলে। আজ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রতিকার্য্যে আমরা অসুন্দরকে নিয়ে ঘর করছি। আমাদের যা আছে, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট হ'তে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। সৌন্দর্য্য-বোধের অভাবই ইহার মূল কারণ। অসুন্দরকে জয় ক'রে আমরা সুন্দর হব—এই আগ্রহ আজ আমাদের নেই। আমাদের জীবনে সৌন্দর্য্য ও সুর নেই—উচ্ছৃঙ্খল, এলো-মেলো জীবন আমরা যাপন করছি, তার মধ্যে কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা বা তাল নেই। কাজেই সুর আর রূপের আমাদের এত দরকার। আজ যদি আমরা ললিত কলার অনুরাগী হই, তবে আমরা ধর্ম্মে-কর্ম্মে, ভিতরে-বাহিরে—সব দিক দেয়েই সুন্দর হ'তে পারব।

অবশ্য একটা কথা আছে। মৌলবী সাহেবরা সঙ্গীতকে যে দু'চোখ পেতে দেখ্‌তে পারেন না, তার যে একেবারে কোনই কারণ নেই, তাও মনে করবেন না। সঙ্গীত ব'লেই যে সঙ্গীত হারাম, তাও যেমন নয়, আবার সঙ্গীত বলেই যে সঙ্গীত হালাল, তাও তেম্‌নি নয়। প্রত্যেক জিনিষেরই ভাল মন্দ আছে। দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে সব জিনিষেরই বিচার করতে হয়। সঙ্গীত একটা তলোয়ার বিশেষ। যার হাতে যখন থাকে, তার ইঙ্গিতেই চলে। ভাল লোকের হাতে থাকলে ভাল ফল হয়, মন্দ লোকের হাতে থাকলে মন্দ ফল হয়। সঙ্গীত একদিকে যেমন মানবাত্মাকে সান্তের সকল সীমা-রেখা অতিক্রম করে অনন্ত ভাব-রাজ্যে নিয়ে যেতে পারে, তেমনি আবার সে তাকে ধ্বংসের মুখেও ফেলে দিতে

পারে। অবশ্য এ সঙ্গীতের দোষ নয়, এ সেই ব্যবহারকারীর দোষ। এমন যে হালাল জিনিষ ভাত, তাও বিকৃত করে ফেলে হারাম হ'য়ে যায়। কাজেই সর্ব্বত্র আমাদের বিচার-বুদ্ধির দরকার। যে সঙ্গীত আমাদিগকে সুন্দর করতে পারে, আত্মাকে উন্নীত ক'রতে পারে, সেই সঙ্গীতই আমরা চাই। পবিত্র অন্তর দিয়ে সঙ্গীতের সাধনা করতে হ'বে, তা হলেই সঙ্গীত ইস্‌লামের বাহন হবে। ইস্‌লাম অশরীরী ভাবেরই ধর্ম্ম, জড়ত্বকে সে স্বীকার করে না। মানবাত্মার সূক্ষ্ম অনুভূতিকে সে সারা প্রাণ দিয়া উপলব্ধি করে। কাজেই এই অশরীরী ভাবকে মনের মধ্যে মূর্ত্ত ক'রে তুল্‌তে সঙ্গীতই হ'বে একটা বড় সহায়, কেননা অনন্তকে সান্তের মধ্যে রূপ দেওয়াই হ'চ্ছে সঙ্গীতের চরম সার্থকতা। অবশ্য এ উদ্দেশ্য সফল করে তুল্‌তে হ'লে, আমাদের আদর্শানুযায়ী নূতন নূতন সঙ্গীত রচনা করতেও হবে—যা সহজ ভাবেই আমরা প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে পারি। "এমন দিন কি হবে মা তারা" এ রকম গান গাইলে আপনারা মৌলবীদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এঁটে উঠ্‌বেন না।

আমার মনে হয়, সঙ্গীতে যে মুসলমান চিরদিনই শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে আস্‌ছে, তার প্রধান কারণই হচ্ছে—সে মুসলমান। ইস্‌লামই সঙ্গীতের উপযুক্ত ক্ষেত্র। সঙ্গীতের যে সাধনা, ইস্‌লাম তার থেকে দূরে নয়। মুসলমানের মনে কোন স্থূলত্ব বা জড়ত্ব বোধ নাই, নিরাকারের ধেয়ানী সে, অনন্তের রাজ্যে সে যাওয়া আসা করে, তাই একান্ত ও তন্ময় হয়ে সে গান ক'রতে পারে, তাই তার সুরের মুকুরে অসীমের ছায়া পড়ে, তাই তার কণ্ঠ-সঙ্গীত এত প্রাণবন্ত, এত জীবন্ত হ'য়ে ওঠে। কোন পীর সাহেবের মুখে যদি কখনো গান শুন্‌তে পেতাম, তবে তার চেয়ে সুন্দর জিনিস বোধ হয় আর কিছু হ'ত না।

পরিশেষে বল্‌তে চাই সঙ্গীত সম্বন্ধে মৌলবী সাহেবদের সঙ্গে আমাদের একটা আপোষ হওয়া নিতান্ত দরকার। সঙ্গীতের খারাব দিক (dark side) সম্বন্ধে আমাদিগকেও যেমন হুঁশিয়ার হ'তে হ'বে, মৌলবী সাহেবদিগকেও তেমনি সঙ্গীতকে জীবনের মধ্যে গ্রহণ করতে হ'বে। খোদাতালার এই যে সুন্দর আকাশ, পৃথিবী, এই যে রূপের আলো, এইযে বিচিত্র সুরের খেলা,—তাঁর অস্তিত্বের এই যে পুলক-পরশ,—এ যেন তাঁদের জীবনে ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে না যায়। *

* কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজের সাহিত্য সভায় লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

ফুলকুমারী

এ, কে, এম, শামসুল হক, বি, এ

পাশাপাশি বাড়ী। অহরহ দেখা-শোনার বাধা নাই। মাঠে কাজ ফেলিয়া মান্নু যখন পুকুর পাড়ে আসিয়া দাঁড়ায়, দেখে ময়নামতী-কাপড়ের লাল অঞ্চল কোমরে জড়াইয়া ঘরের পাশে রাবি সুপুরি কাটে!

অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া আবার সে নিজের কাজে চলিয়া যায়! মাঠে পিতা গালি দেয়। উত্তরে বলে, পানি খেতে গেছিলাম!

ঝট্ পট্ রান্না সারিয়া উঠান ঝাঁট দিয়া সাঁঝের পরেই রাবি রহিমের বৌকে বলে, চল্ না বু, কিচ্ছা শুনে আসি। ফিক্ করিয়া হাসিয়া বু বলে, একটু ও বুঝি দের সয় না! ডুব দিয়ে পানি খাওয়া।

রাবি রাগত স্বরে বলে, কী? বুঝি আমি? এমন মিছা কথা। তুই না বল্লি কিচ্ছা শুনতে যাবি। ইস্ কী বেহায়া! ভাই আস্লে আজ দেখ্বি!

যেন ভয়ে অস্থির এই ভাবে ননদের কাঁধে হাত দিয়া আদর করিয়া বু বলে, না ভাই। রাগ্ করিস্ নে এখন চল!

উভয়ে গলাগলি করিয়া পাশের বাড়ী যায়,—যেন দু বোন। বাগানের ভিতর দিয়া মান্নুদের ঘরে প্রবেশ করে। মান্নুর দাদীকে তারাও দাদী বলে!

দাদী সস্নেহে উভয়কে বসিতে দিয়া গল্প শুরু করে!

সেই রাজকন্যার কথা! সেই রাজ পুত্রের কথা! প্রবাল পালঙ্কে বিরাট শূন্য প্রাসাদে—রাজকন্যা ফুলকুমারী একাকী, কাল ভোমরা মারিয়া সেই রাজকুমার আসিয়া দৈত্যের মৃত্যু ঘটাইল! তারপর মালা বদল ও বিবাহ।

অনেকবার শুনিয়াছে—কিন্তু সেই ফুলকুমারীর সোনার কাঠির পরশে নূতন করিয়া জাগিয়া ওঠার গল্প তাহার নিত্যই ভাল লাগে। নূতনত্ব যায় না!

বেড়ার ওপাশে মান্নুও থাকে। শুধু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আর ভাবে—কবে তার ফুলকুমারীর ঘুম সে ভাঙ্গাবে!

সেখান থেকেই সে বলে, এ মিথ্যা গল্প আর বলোনা, দাদি। সত্যি গল্প পাবো কোথায়—দাদী সুধায়!

চেষ্টা করলেই পেতে পার—বলিয়া হঠাৎ বাহিরে চলিয়া যায়, যেন একটা বিষাদের ছায়া মিলাইয়া গেল!

রাবির মুখ অকারণে রাঙ্গা হইয়া উঠে। দাদী সব বুঝে। কি বলিবে ভাবিয়া পায় না!

রহিমের বৌ তার আঁচল ধরিয়া টানে। বলে, চল না এবার, ভাত খাবিনে?

রাবি যেন অকুল পাথারে কুল পায়। আবার উভয়ে গলাগলি করিয়া চলিয়া যায়!

সাঁঝের একটু পরে বাসন মাজিতে রাবি যায় ঘাটে। গুন্‌গুন্ করিয়া গান গায়—মধু না পাইয়া মৌমাছি যেমন আপনমনে কাঁদে। অদূরে ঝড়ো হাওয়া ফুলশাখায় দোল দেয়!

চুপে চুপে মান্নু আসিয়া পিছনে দাঁড়ায়, কিন্তু গান থামে না। আস্তে আস্তে পাশে আসিয়া বসে। দুহাত দিয়া তাহাকে ধরে! রাবি চমকে পিছন ফিরিয়া চায়। পুরুষের প্রথম স্পর্শে সমস্ত শরীরে শিহরণ দেখা দেয়। বলে, "ছাড়, ছিঃ।

রাবি জোর করিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লয়। বলে এখান থেকে যাও। নইলে চীৎকার করে উঠবো।

মান্নু চলিয়া যায়—যেমন করিয়া দূর প্রবাসের যাত্রী শেষ-বিদায় নেয়!

অনেকদিন আর দেখা হয় না। মান্নু গেছে দূর প্রবাসে, যেখানে পাওয়া যায় বিরহ-যাতনা-ক্লিষ্ট হিয়ার শান্তি!

রাবি দাদীর কাছে আসে, কিন্তু গল্প শুনিতে চায় না। বলে, ভাল লাগে না!

সত্যি গল্প বানাতে পারিনি বলে বুঝি রাগ করিস্।

মুখ রাঙ্গা করিয়া নীচের দিকে চাহিয়া থাকে, জবাব দেয় না।

হাত দিয়া কাছে টানিয়া দাদী তাহাকে সান্ত্বনা দেয়। বলে, সামনের চৈতে মিথ্যা গল্প সত্যি হয়ে উঠবে। কিন্তু পাণ্ডুর চোখে দু'ফোটা অশ্রু দেখা দেয় অকারণে!

সে না ব'লে কোথায় গেল? ব্যথা-ভরা কণ্ঠে রাবী জিজ্ঞাসা করে।

না ব'লে কিরে? সেত গেছে পরবাসে। পৌষের শেষেই ত আসবে।

ছাই আস্‌বে—কারো সর্ব্বনাশ কারো পৌষ মাস।

দূর পাগলি, সে যে বড় গরীব, তার নিজেই যে উপার্জ্জন করতে হয়।

অভিমানে মুখ নীচু করিয়া বসিয়া থাকে। দু'ফোটা অশ্রু গড়াইয়া পড়ে, মুক্তার মত স্বচ্ছ।

জ্যোৎস্না রাত্রি। লাঠি ভর দিয়া দাদী ধীরে ধীরে আসিয়া বসে রাবীদের উঠানে। আরো অনেকেই আসে। ক্রমে মহফিল জমিয়া উঠে।

নানা কথাবার্ত্তার পর দাদী বলে—একটা কথা বলি।

কি কথা—রাবির বাপ ভ্রুকুঞ্চিত করে।

দুটো পাখী দু ডালে বড় হয়েছে, এখন তাদের বাসা বাঁধবার সময় হয়েছে। তাদের এ মিলনাশায় বাধা দিও না!

রাবীর বাপ চাহিয়া থাকে যেন কিছু বুঝে নাই!

দাদী বলিয়া যায়,—বুড়ো বয়সে এ নিয়ে বেশী কিছু বলবো না। মান্নু আর রাবির কথাই বলছি। এক বোঁটার ফুল তারা—চিরজীবন এক বোঁটাতেই থাকতে চায়!— মিনতিভরা চোখে বৃদ্ধা রাবীর পানে চাহিয়া থাকে।

রাবীর বাপ বলে—অন্য ভাল জায়গা থেকে সম্বন্ধ আসছে!

দাদীর মুখ মলিন হইয়া যায়।

অন্তরালে রাবীর বক্ষের স্পন্দন দ্রুত হয়।

সম্বন্ধ ভাল হলে কি হবে, রাবীর মত বোধ হয় অন্য কোথাও হবে না—রহিমের বৌ আড়াল থেকে আস্তে আস্তে বলে। রাগিয়া রাবীর বাপ বলে, ইস্—তার আবার অমত। তোমরা ওসব কিছু বুঝবে না। দুনিয়া বড় কঠিন ঠাঁই!—

ক্রমে মহফিল ভাঙ্গিয়া যায়। দাদী মলিন মুখে চলিয়া আসে!......কিন্তু দিন যায়। তেমনি চাঁদ উঠে, তেমনি ফুল ফোটে, তেমনি ফোটা ফুলের পাশে শুকনো কুঁড়ি ঝরিয়া পড়ে।

উদাস কণ্ঠে মান্নু ডাকে—দাদি—

কিরে, দাদা—মুখ না তুলিয়াই দাদী জবাব দেয়!

গরীব বলে কি কেবল আমাদের অপমান সইতেই হবে!

কিসের অপমানরে?—

হুঁ, আমি যদি থাকতাম দেখিয়ে দিতাম আমার বাপ দাদা ছোট জাতের, না তারা ছোট জাতের।

অতীত কথা ভাবতে নাইরে পাগল! আমায় অপমান করলোই বা! টাকা পয়সা থাকলে ওরূপ কথা সবাইর মুখে মানায়। আজকাল জাতের দিকে কেউ চায় না; চায় কেবল টাকা!

তা চাক; কিন্তু কাকেও অপমান করবার কি অধিকার আছে তাদের?

দাদী জবাব দেয় না। কেবল তাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া স্নেহ-পরশে সব যাতনা দূর করিয়া দিতে চায়।

সাঁঝের পরে আবার ঘাটে দেখা হয়।

আজ আমাদের শেষ দেখা। আমি আজ কোল্‌কাতায় যাব—মান্নু কাতর-প্রাণে বলে।

অকস্মাৎ রাবীর মুখ চোখ আঁধার হইয়া যায়। মিনতি ভরা চোখে তার দিকে চাহিয়া বলে তুমি যেয়ো না!

না, না, তুমি মানা ক'রো না। সেখানে ভাল কাজ পাওয়া যায়। ঐ বাড়ীর হোসেনও ত গেছে। তার মাইনে এখন পঁয়ত্রিশ টাকা! ভাগ্যে থাকলে আমারও একটা মিলে যেতে পারে!

না, তুমি যেয়ো না। টাকার কি দরকার?—চোখ তার অশ্রু-সজল!

অতি-বেদনায় মান্নুর মুখে হাসি দেখা দেয়!—বলে, দরকার সবার না থাকতে পারে, কিন্তু তোমার বাপ যে তাই চায়!

রাবী লজ্জায় রাঙ্গামুখে নীচের দিকে চাহিয়া থাকে।

মান্নু বলে—একটা কথা রাখবে?

কি?

একটী স্মরণচিহ্ন দাও।

কিসের আশঙ্কায় রাবীর বুক কাঁপে। বলে, আমি কি দেব?

ঐ হাতে তুমি একটা বুনো ফুল, যা কিছু আমাকে ছিঁড়ে দাও—

চোখের জলে রাবি কিছুই দেখিতে পায় না। অবশের মত হাত বাড়াইয়া সামনের বুনো গাছ হইতে একটা কিছু ছিঁড়িতে যায়। কাঁটা লাগিয়া হাত দিয়া রক্ত বাহির হয়।

আনন্দে মান্নু বলে, অমনি রক্ত ঝরে আমার বুকে।

বিহ্বলের মত রাবী চীৎকার করিয়া উঠে। বলে, আমি পারি না—তুমি যাও, তুমি যাও—

বলিতে বলিতে সে চলিয়া যায়। ধূলায় রক্তের বিন্দু পড়িয়া থাকে। মান্নু তাহাই কুড়াইয়া লয়।

সে রাতে রাবীর চোখে ঘুম আসে না, তাদেরই বাড়ীর সম্মুখ দিয়া পাকা রাস্তা শহর পর্য্যন্ত গিয়াছে। নিষ্ঠুর পাষাণের দেশ!

নিঝুম চাঁদিমা রাত।

দূরে গরুর গাড়ীর ক্যাতরানী শুনা যায়।

মাঝে মাঝে কি একটা পাখী ডাকিয়া উঠে। রাবী চাহিয়া থাকে। তাহার মনে হয়—তাহার চোখের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে শুধু এক প্রান্তর, আর তাহার মধ্য দিয়া কে একজন চলিয়াছে। পাগল সে—পথ হইতে ধূলা বালি যাহা পাইতেছে, তাহাই কুড়াইয়া লইতেছে—পথের স্মৃতিচিহ্ন!

বোশেখের শেষ। সামনের শুক্রবারে বিবাহ।

আম, কাঁঠাল, দুধ।—কিছু ভাল লাগে না। রাবী উঠিয়া যায় রহিমের বৌও সঙ্গে সঙ্গে উঠে। এঁটো বাসন পড়িয়া থাকে। মার মন সবইতো বোঝে!

বলে, কিরে খেলিনে রাবি!

না। মাথা ধরেছে!

তোমারও মাথা ধরেছে বৌ?—রাগে রাবীর বাপ গর্জ্জায়।

জি, রহিমের বৌ বলে!

মায়ের চোখের জল গড়াইয়া পড়ে!

কর্ত্তা কিন্তু রাগে ফুলে বলে, বিয়ে দেবই

কাল বিবাহ। মেহদী পরাইতে পাড়ার মেয়েরা জটলা করিয়া সুর ধরিয়া পাঁচ ছয় জনে গান গায়।

রহিমের বৌ আড়ালে কাঁদে।

রাবী কোথায়? মা সুধায়।

ঘরে শুয়ে রয়েছে।

মান্নুর দাদীও এক কোনে আসিয়া বসে।

রাবীর জ্বর হয়েছে। দেখবে? এস! রহিমের বৌ কাঁদিয়া দাদীর হাত ধরে!

ওমা, সে কি কথা' কই দেখি। দাদি ত্রস্তে উঠিয়া যায়। রোদের তাপে ঝরাফুল শুকায়।

ইস্ গা যে আগুন! কি হবে? দাদী কাঁদিয়া ফেলে!

রহিমের বৌ আঁচলে মুখ ঢাকে, জবাব দেয় না!

দেখি দেখি। তোর নাকি জ্বর উঠেছে?—কোথ হইতে আসিয়া রাবীর বাপ তার কপালে হাত দেয় হঠাৎ শিউরে উঠে! একিরে? গায়ে ধান দিলে যে খৈ ফুটে!

চিঠি এসেছে, চাকরি পেয়েছে, বিকারে রাবী আপনার মনে বলে।

কি চিঠিরে? কার চাকুরি?

রাবি রাগ করিয়া পাশ ফিরিয়া শোয়। বলে মা গো—একটা ফুল পাঠিয়ে দেনা—চেয়েছিল যে,—

বাপ কাঁদে, মা কাঁদে, বুড়ো দাদী কাঁদে!

বাপ কাঁদিয়া বলে, তুই ভাল হয়ে ওঠ, এবিয়ে হবে না।

নিরর্থক দৃষ্টি লইয়া রাবী বলে, দাদি, দাদি, দরজা খুলে দাও, সে এসেছে—অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করছে—

সকলেই একবার চমকাইয়া উঠে।

সস্নেহে দাদী বলে, দিদি আমার সেরে ওঠ—সে তোর জন্যেই আছে—

প্রতিপদের চাঁদের ক্ষীণ আভার মত রাবীর ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠে।

দাদি গায়ে হাত দিয়া দেখে, সমস্ত হিম! সাড়া নাই, স্পন্দন নাই!

ফুলকুমারী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।
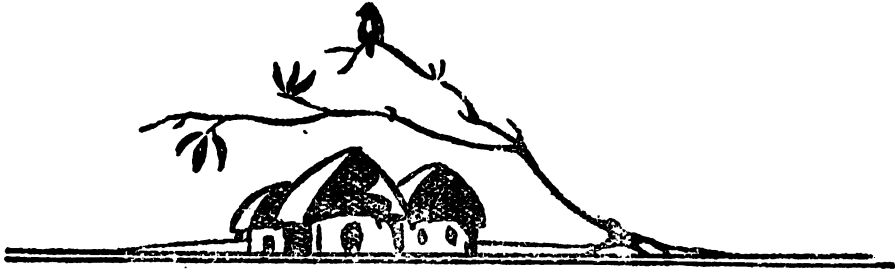
বিশ্ব-সভ্যতায় আরবের দান

আবদুল কাদের

মানব-শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যে অভিনব ভাব-প্রবাহে সমগ্র জগতে নূতন জীবনের জোয়ার আনিয়া দিলেন, তাহার অপেক্ষা রোমাঞ্চকর কাহিনী জগতের ইতিহাসে বিরল। প্রায় তিন শতাব্দী পর্য্যন্ত আরবেরা শিক্ষা ও সভ্যতাক্ষেত্রে সমগ্র জগতের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। এশিয়ায় ভারতবর্ষ, আফগানিস্তান, পারস্য, তুর্কিস্তান, আর্ম্মেনিয়া, কুর্দ্দিস্তান, আজর বাইজান, সিরিয়া, মেসোপতেমিয়া, ফেলেস্তিন, এশিয়ামাইনর ও আরবদেশ; আফ্রিকায় মিসর, নিউবিয়া, সুদান, ত্রিপোলী, মরক্কো, বার্কা, আলজিরিয়া ও তিউনিস এবং ইউরোপে গ্রীস, তুরস্ক, রুমেনিয়া, বুলগেরিয়া, মন্টেনিগ্রো, সার্ভিয়া, হাঙ্গেরী, দক্ষিণ রুশিয়া, স্পেন ও পর্ত্তুগাল হজরত মোহাম্মদের (দঃ) শিষ্যবৃন্দের পদানত হইয়াছিল; ভূমধ্য-সাগর, ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের বহু দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জে—এমন কি ফ্রান্স, ইতালী এবং সুইজারল্যাণ্ডের কিয়দংশেও তাঁহারা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। গ্রীক, রোমাণ, পারসিক, কার্থেজেনিয়ান প্রভৃতি জগতের কোন প্রাচীনতর সভ্যজাতি এত অল্প সময়ে এত বৃহৎ সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিতে পারে নাই। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) শিক্ষার শক্তি এতই প্রবল ছিল।

খৃষ্টান-ইউরোপে যখন পরমত-সহিষ্ণুতা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল—'ক্যাথলিক'রা যখন য়িহুদী ও 'প্রটেষ্ট্যান্ট'দিগকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিত, মোসলমানরা তাহার বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই হজরতের দৃষ্টান্ত অনুসরণে 'জিজ্‌য়া' নামক কর গ্রহণ করিয়া য়িহুদী, খৃষ্টান, পারসিক ও বার্ব্বারদিগকে ধর্ম্মগত স্বাধীনতা এবং বাধ্যতা-মূলক সামরিক কার্য্য হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কর-গ্রহণ-পদ্ধতি উৎকৃষ্ট ছিল। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকেই 'খেরাজ' (ভূমিকর) দিতে হইত; মোসলমান প্রজারা তাহা বা'দ পাইত না। তাঁহারা পুরাতন রাজপথ-সমূহ সংস্কার এবং নূতন রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়া সাম্রাজ্যের সর্ব্বাংশের সংযোগ সাধন করেন। তাঁহাদের মধ্যে ডাক-প্রথাও গড়িয়া উঠিয়াছিল; মানুষের ডাক ব্যতীত ঘোড়ার ডাক এবং কবুতরের ডাক ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাঁহারা এক অভিনব স্থাপত্য-পদ্ধতির সৃষ্টি করেন; গোলাকার অশ্বপদাকৃতি খিলান, গুম্বজ, দীর্ঘ ও সুদর্শন মিনার এবং অন্তর্ভাগের সৌন্দর্য্যাধিক্যই ইহার বৈশিষ্ট্য। তাঁহাদের প্রাসাদরাজির সহিত সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ব্যাপারেই অত্যধিক মার্জ্জিত রুচি ও সৌন্দর্য্য-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদের ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকাদি—আল্‌হামরা, কুতুব মিনার, তাজমহল এবং দিল্লী, দামেস্ক ও কর্দোভার বড় মস্‌জেদ আজও জগতের বিস্ময় ও ঈর্ষ্যার উদ্রেক করিতেছে। আজও ভূমণ্ডলের বিভিন্ন অংশ হইতে শত সহস্র পর্য্যটক দীর্ঘ পথ অতিবাহন ও বিপুল অর্থব্যয় করিয়া ইস্‌লাম-সন্তানদের অতীত কীর্ত্তিরাজি দর্শনের জন্য আগমন করিতেছে।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেই মোসলমানরা আরব ও বিজিত প্রদেশ সমূহে সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার্থ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অথচ গ্রীক, রোম, কার্থেজ, পারস্য বা প্রাথমিক খৃষ্টান জগৎ এ বিষয়ে কোনই কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতে পারে নাই। ইউরোপে যখন গির্জ্জা ও মঠ ব্যতীত অপর কোন শিক্ষাগার ছিল না, তাহার শত শত বৎসর পূর্ব্বে মোসলমানরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত

ঐগুলি ইউরোপের বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিল। সাধারণতঃ মসজেদেই বিশ্ব-বিদ্যালয় বা বিদ্বন্মণ্ডলীর অধিবেশন হইত; স্বাধীনভাবে তথায় সর্ব্বপ্রকার প্রশ্নের আলোচনা চলিত। ইহাদের মধ্যে কার্দোভা, কায়রো ও বাগদাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিখ্যাত ছিল। প্রাচীনকালে কায়রো বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অন্ততঃপক্ষে দ্বাদশ সহস্র বিদ্যার্থী তাহাদের জ্ঞান-তৃষ্ণা নিবারণ করিত। ইহা অদ্যাপি আল্ আজ্হার মসজেদে বিদ্যমান আছে এবং অষ্টাদশ সহস্র ছাত্র তথায় বিনাব্যয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। মোসলমানরা 'লাইব্রেরী' বা পুস্তকাগার গঠন করেন; তন্মধ্যে কয়েকটীতে কতিপয় লক্ষ গ্রন্থ ছিল বলিয়া কথিত আছে। কেবল রাজন্যবৃন্দই যে পুস্তক সংগ্রহে উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন তাহা নহে; বড় বড় 'আমীর'রাও ও তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতেন। উদাহরণ-স্থলে স্পেনের অন্তর্গত আলমেরিয়ার উজির ইব্নে-আব্বাসের নাম করা যাইতে পারে। অসংখ্য পুস্তিকা ব্যতীত তাঁহার লাইব্রেরীতে চারি লক্ষ পুস্তক ছিল। তাঁহাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে—বিশেষতঃ স্পেনের বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহে খৃষ্টান ছাত্রদের আগমন হইত; তাহারা এইরূপে মোস্লেম শিক্ষা ও সভ্যতায় শিক্ষিত হইয়া খৃষ্টান ইউরোপে উহা প্রচার করিত। আইন, দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র ও ভাষাতত্ত্ব অতি উৎসাহের সহিত অধীত হইত। অভিধান প্রস্তুত ও কোর-আনের ভাষ্য লিখিত হইয়াছিল। মোসলমানরা আরিষ্টটলের গ্রন্থ অবগত ছিলেন এবং তাঁহার দার্শনিক মতের উপর আপনাদের দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ইতিহাস ও ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে তাঁহাদের রচিত বহু গ্রন্থ এবং কতিপয় জীবন-চরিত এখনও বর্ত্তমান আছে।

গ্রীকদের আবিষ্ক্রিয়া তাঁহাদের গণিতশাস্ত্রের মূল; কিন্তু তথা-কথিত 'আরবী-সংখ্যা'র (Arabic numerals) উৎপত্তির বিবরণ অস্পষ্ট। মহামতি থিওডরিকের সময় বুথিয়াস কয়েকটী চিহ্নের ব্যবহার করেন; বর্ত্তমানে আমরা যে নয়টী অঙ্কের ব্যবহার করিতেছি, ইহাদের সহিত ঐগুলির আংশিক সাদৃশ্য ছিল। গারবার্টের জনৈক শিষ্য কর্ত্তৃক যে সমুদয় চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, সে সমুদয় আমাদের ব্যবহৃত অঙ্কের আরও অধিকতর অনুরূপ। কিন্তু আরবদের পূর্ব্বে 'শূন্য' (zero) সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল; খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত মোস্লেম গণিতবিদ্ মোহাম্মদ ইব্নে-মুসা কর্ত্তৃক ইহা আবিষ্কৃত হয়। ইঁনিই জগতে সর্ব্বপ্রথম দশমিক বিন্দু (decimal notation) ব্যবহার করেন এবং সংখ্যার স্থানীয় মান (value of position) নির্দ্দেশ করেন। আরবেরা ইউক্লিডের জ্যামিতির বিশেষ পরিপুষ্টি সাধন করেন নাই; কিন্তু বীজগণিত প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের-ই সৃষ্টি। ইহা অদ্যাপি স্বনাম-খ্যাত মোস্লেম গণিতজ্ঞ আল্-জবরের নামানুসারে 'এল্জেব্রা' (Algebra) বলিয়া পরিচিত। খারেজমী প্রণীত এল্জেব্রা (৮২০ খৃষ্টাব্দ) লাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়া ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত খৃষ্টান পণ্ডিতদের (scholar) দ্বারা ব্যবহৃত হয়। শিঞ্জিনী (sine), স্পর্শ-জ্যা (tangent) ও প্রতি-স্পৃর্শ-জ্যা (co-tangent) আবিষ্কার করিয়া তাঁহারা বর্ত্তুলাকার ত্রিকোণমিতির (Spherical Trigonometry) প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে (Physics তাঁহারা দোলকের (pendulum) আবিষ্কার করেন এবং আলোক-বিজ্ঞান (Optics) সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। এ বিষয়ে অল্-হাজানের আবিষ্ক্রিয়া (focus নির্ণয় প্রভৃতি) পাশ্চাত্যে আমদানী করিয়া রগার বেকন নিজেই আবিষ্কারকের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছেন। অল্-হাজানের গ্রন্থ লাটিন ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়; ঐ অনুবাদ-ই গবেষণা কার্য্যে কেপলারের (Kepler) বিশ্বস্ত পথ-প্রদর্শক ছিল। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় (Astronomy) আরবদের অগাধ জ্ঞান ছিল। তাঁহারা কতিপয় মান-মন্দির (observatory) নির্ম্মাণ করেন। তাঁহাদের প্রস্তুত জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ক বহু যন্ত্র অদ্যাপি আমাদের মধ্যে ব্যবহৃত হইতেছে। তাঁহারাই গণনা-দ্বারা রাশি-চক্রের কোণ (angle of the ecliptic) ও সম-রাত্রিদিনের প্রাগয়ণ (precission of the equinoxes) স্থিরীকৃত করেন। Almanac (পঞ্জিকা), Azimuth (দিগন্তবৃত্ত), Zenith (মস্তকোর্দ্ধ নভোবিন্দু), Nadir (অধঃস্থিত নভোবিন্দু), প্রভৃতি জ্যোতিষ শাস্ত্রের অসংখ্য শব্দ আরবী ভাষা হইতে গৃহীত। দুইজন প্রাচীনতম মোস্লেম জ্যোতির্ব্বিদ—অল্-ফরেগানী ও অল্-বাত্তানী ইউরোপের শিক্ষাগুরু; অল্-ফ্রেগ্নাস্ ও অলবেটেনিয়াস নামে ইঁহারা তথায় বিপুল উচ্চ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। বস্তুতঃ জ্যোতিষশাস্ত্র উহার বর্ত্তমান উন্নতির

জন্য আরবদের নিকট যে বহুল পরিমাণে ঋণী, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আরবেরাই চিকিৎসা-শাস্ত্রকে সর্ব্বপ্রথম প্রকৃত বিজ্ঞানে পরিণত করেন। তাঁহারা অভিনিবেশ সহকারে স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীর-স্থান-বিদ্যা (Physiology) অধ্যয়ন করিতেন। আরবেরা যে ভৈষজ্য-বিজ্ঞান (Materia Medica) ব্যবহার করিতেন, প্রকৃতপক্ষে আমরা এখন তাহাই ব্যবহার করিতেছি। তাঁহাদের বহু চিকিৎসা-পদ্ধতির ব্যবহার অদ্যাপি আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তাঁহারা 'ক্লোরোফর্ম্ম' প্রভৃতি সংজ্ঞানাশক পদার্থাবলীর ব্যবহার জানিতেন এবং কতিপয় কঠিনতম অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করিতেন। ইউরোপে খৃষ্টান ধর্ম্মধ্বজগণ যখন ঔষধের ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া পাদ্রীদের সম্পাদিত ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা রোগারোগ্যের ব্যবস্থা দিতে ছিলেন, আরবেরা তখন প্রকৃত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ভিষগ্-প্রবর রাজীর 'আয়ুর্ব্বেদ বিশ্বকোষ' দশ খণ্ডে সমাপ্ত হয়। উহার নবম খণ্ড এবং আবুসেনার 'ব্যবস্থা' ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপের বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহে আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ক বক্তৃতার ভিত্তি ছিল। তাঁহাদের উদ্ভাবনের ফলে রসায়ন-শাস্ত্রের (Chemistry) যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। তাঁহারা সুরাসার (Alcohol), কাষ্ঠ-ভস্ম-ক্ষারের ধাতবিক মূল (Potassium), corrosive sublimate (পারদ বিশেষ), কাষ্টিক (Nitrate of silver), যবক্ষার দ্রাবক (Nitric acid) ও গন্ধক (sulphuric acid) আবিষ্কার করেন। বস্তুতঃ খৃষ্টান ইউরোপে যখন নিবিড়তম অজ্ঞানান্ধকারের পূর্ণ রাজত্ব—উচ্চ শ্রেণীর পাদ্রী ব্যতীত অপর সকলেই যখন গণ্ডমূর্খ, মোসলমানরা তাহার বহু পূর্ব্বেই যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন।

সাহিত্য ক্ষেত্রেও আরবদের দান সামান্য নহে। আরব্য উপন্যাস আজও অনুকরণের অতীত। কবিতা-চর্চ্চায় তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। তাঁহাদের কবিতা সম্পূর্ণ মৌলিক; উহা আরব-প্রতিভার সুন্দর ও স্বাভাবিক বিকাশ। পাশ্চাত্য জগৎ যখন প্রেমের কবিতা কাহাকে বলে তাহাও জানিত না, আরবে তখন উহার চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ভূগোল শাস্ত্র তাঁহাদের নিকট চির-ঋণী। খৃষ্টানেরা যখন পৃথিবী সমতল বলিয়া ঘোষণা করিতেছিল, বাগ্দাদে তখন উহার পরিধি নির্ণীত হইয়াছিল। চন্দ্র যে সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হয়, তাঁহারা তাহা অবগত ছিলেন; তাঁহারা চন্দ্র, সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহের কক্ষ নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। ইউরোপ তাঁহাদের নিকট হইতেই দিগ্দর্শন (compass) যন্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা করে; এতদভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীর বড় বড় ভৌগলিক আবিষ্ক্রিয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত। কারিগরিতে নক্শার বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্যে এবং শিল্প-কৌশলের পূর্ণতায় তাঁহারা বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁহারা স্বর্ণ রৌপ্য, তাম্র, পিত্তল, লৌহ, ইস্পাত প্রভৃতি যাবতীয় ধাতুর কাজ করিতেন। বস্ত্রবয়নে অদ্যাপি কেহ তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। বহুবিধ অস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য অদ্যাপি মোস্লেম নগরের নামে পরিচিত হইয়া রহিয়াছে; মোসেল হইতে 'মস্লিন', দামেস্ক হইতে 'দামস্ক্' (বুটিদার বস্ত্র) এবং গাজা হইতে 'গজে'র (Gauge — মানদণ্ড) উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহারা অত্যুত্তম কাচ ও মৃন্ময় পাত্র প্রস্তুত করিতেন। তাঁহারা রং করিবার কৌশল অবগত ছিলেন এবং কাগজ প্রস্তুত করিতেন। তাঁহারা চর্ম্ম-সংস্কারের বহুবিধ পদ্ধতি পরিজ্ঞাত ছিলেন; তাঁহাদের কাজ সমগ্র ইউরোপে বিখ্যাত ছিল। তাঁহারা সিরাপ (Syrup), সুগন্ধিদ্রব্য (Essence) এবং বস্তুর সারাংশ মিশ্রিত সুরাদি (Tinctures) প্রস্তুত করিতেন। তাঁহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করিতেন। তাঁহাদের জলসেচন-পদ্ধতি অতি উৎকৃষ্ট ছিল। তাঁহারা সারের প্রয়োজনীয়তা জানিতেন এবং মৃত্তিকার গুণানুসারে ফসল বপন করিতেন। উদ্যান-কর্ষণ বিদ্যায় তাঁহারা সকলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিরূপে 'কলম' করিতে হয় এবং কি কৌশলেই বা বিভিন্ন প্রকারের নূতন নূতন ফল ফুল উৎপন্ন করিতে হয়, তাঁহারা তাহা প্রকৃষ্টরূপে অবগত ছিলেন। তাঁহারা প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্যে বহু বৃক্ষ ও চারার আমদানী করেন এবং কৃষি-বিষয়ে বিজ্ঞান-সম্মত গ্রন্থাদি রচনা করেন।

হিজ্রী প্রথম শতাব্দীর (৬২২-৭১৮ খৃষ্টাব্দ) শেষভাগে খলিফারা ভূমণ্ডলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। দামেস্কের রাজপ্রাসাদ হইতে যে আদেশ বাহির হইত, সিন্ধু, নীল, জাক্সার্টেস (শির দরিয়া) ও টেগান নদীর তটে তাহা

সমভাবে প্রতিপালিত হইত। নবম শতাব্দী বাগদাদের খেলাফতের স্বর্ণ-যুগ। তৎপরে কায়রো ও কর্দোভা বাগদাদের স্থান অধিকার করে। এই নগর চতুষ্টয়ের খলিফাদের দরবারের মার্জ্জিতাচার, জ্ঞান-চর্চ্চা, আড়ম্বর ও বিলাস-দ্রব্য-সম্ভারের সহিত পাশ্চাত্যের খৃষ্টান ভূপতি-গণের অসভ্য ও বর্ব্বরোচিত দরবারের কোন তুলনাই চলিত না। তাঁহাদের সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান নগরাবলীর রাজপথগুলি উৎকৃষ্টরূপে পাকা ছিল; অথচ শত শত বৎসর পরেও প্যারিসে কেহ বৃষ্টিপাতের পর গৃহদ্বারে পদার্পণ করিলে, তাহার পদগ্রন্থি কর্দ্দমে নিমগ্ন হইয়া যাইত। প্রতিপালন, ন্যায়-বিচার, শীলতা, সদাশয়তা, আতিথেয়তা প্রভৃতি গুণেও আরবেরা তদানিন্তন জগতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিলেন।

বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত মোসলমানরা বাণিজ্য-জগতের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। তাঁহাদের বণিকদল সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইত—তাঁহাদের অর্ণবপোত-বহর সমুদ্র-বক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। খৃষ্টানরা যখন ঈশ্বরের দোহাই দিয়া পরস্পরের গলায় ছুরি বসাইতে ব্যস্ত ছিল, ইস্লাম-সন্তানরা তখন ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্বন্ধে গভীর গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহাদের বাণিজ্যপোত লোহিত সাগর ও ভারতমহাসাগরে যাতায়াত করিত। তাঁহারা বহুস্থানে বিরাট বাজার ও মেলা বসাইতেন; এশিয়া ও ইউরোপের সর্ব্বাংশ হইতে বণিকদল তথায় আগমন করিত। চীন, ভারতবর্ষ, পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, রুশিয়া এবং বাল্টিক সাগরের চতুষ্পার্শ্ব-বর্ত্তী সমুদয় দেশের সহিত মোসলমান বণিকরা বাণিজ্য চালাইতেন! আফ্রিকার বক্ষ ভেদ করিয়া এমন কি তাঁহারা চাঁদ হ্রদ পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতেন। নৌযুদ্ধে মোসল-মানদের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। নৌবহরের সাহায্যে তাঁহারা সাইপ্রাস, রোড্স্, সিসিলী, সার্ডিনিয়া কর্সিকা, ক্রীট, বেলিরিক দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি ভূমধ্য সাগরের প্রধান প্রধান দ্বীপাবলী অধিকার করেন। নৌবহরের সাহায্যেই তাঁহারা স্পেন ও ইতালীতে অবতরণ করেন এবং কনষ্টান্টি-নোপল জয় করেন। "প্রাথমিকতম আরব নৌবহর বহু বিষয়ে খৃষ্টানদের আদর্শ ছিল। ক্যাবল (Cable—রজ্জু), আর্সেনাল (Arsenal, ইতালীয় Darsonal—অস্ত্রাগার) কর্ভেট (Corvette—ক্ষুদ্র রণপোত) প্রভৃতি আরবী ভাষা হইতে উৎপন্ন যে সকল নৌবিদ্যা বিষয়ক শব্দ দক্ষিণ ইউরোপের ভাষাগুলিতে বিদ্যমান আছে, তাহা হইতেই ইহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়।"

মোসলমানদের বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহে যে সকল খৃষ্টান ছাত্র অধ্যয়ন করিত, তাহাদের—বিশেষতঃ 'ক্রুসেডার' বা খৃষ্টান ধর্ম্ম-যোদ্ধাদের সাহায্যে মোস্লেম সভ্যতার অধিকাংশই খৃষ্টান ইউরোপে নীত হইয়াছিল। মূরদের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া চার্ল্স্ মার্টেল শত্রুপক্ষের অশ্বা-রোহী সৈন্যের সহিত আঁটিতে না পারিয়া, তাঁহাদের দৃষ্টান্তে যে অশ্বারোহী সৈন্যদল গঠন করেন, তাহা হইতেই 'শিভা-লরী' (Chivalry) প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি। ফ্রান্স হইতে ইহা সমগ্র ইউরোপে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং অনতিকাল পরেই অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ অতি প্রাচীনকালেই মোসলমানরা প্রকৃত শিভালরীর নীতিমালা অবগত ছিলেন এবং কার্য্যক্ষেত্রে ঐগুলি প্রয়োগ করিতেন। পরবর্ত্তী কালীন ঐতিহাসিকেরা খৃষ্টানদিগকে যে উন্নত শৌর্য্যগুণে (Chivalry) বিভূষিত করিয়া গিয়াছেন আরব বিজয়ের শত শত বৎসর পরেও সে সম্বন্ধে তাহাদের কোন ধারণাই জন্মে নাই

শিভালরীর ন্যায় উদ্ভিদবিদ্যা এবং ব্যবহারিক কৃষি-বিজ্ঞানেও ইউরোপ আরবদের শিষ্য; তাঁহারাই ইউরোপকে উৎকৃষ্ট জলসেচন পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। যে বায়ুচালিত যন্ত্র এক্ষণে "ওলন্দাজ" (The "Dutch" windmill) বলিয়া পরিচিত, উহা আরবদের-ই আবিষ্কার! প্রাচ্যে উহা শস্যচূর্ণ ও জল উত্তোলন করিতে ব্যবহৃত হইত; অবশেষে ক্রুসেডারদের দ্বারা ইউরোপে উহার আমদানী হয়। আয়ুর্ব্বেদ ও রসায়ণ শাস্ত্রে খৃষ্টানরা মোসলমানদের নিকট হইতে সিরাপ, জুলাপ (Julep), অন্তঃসার (Elixer), কর্পূর (Camphor), সোণামুখী (Senna) রেউচিনি (Rhubarb) ও অন্যান্য সমজাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার শিক্ষা করে। Alembic. Alcohol, Alkali (ক্ষার) Amalgum (মিশ্রণ), Borax (সোহাগা) প্রভৃতি রসায়ণ শাস্ত্রের বহু শব্দ—এমন কি খোদ Chemis-try পর্য্যন্ত আরবী ভাষা হইতে উৎপন্ন। বস্তুতঃ "আরবদের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞানচর্চ্চা, সভ্যতা, সামাজিক ও মানসিক সমৃদ্ধি এবং অভ্রান্ত শিক্ষা-প্রথা বিদ্যমান না থাকিলে ইউরোপকে আজিও অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন থাকিতে হইত।"

হজরত ঈসা (আঃ)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

এব্‌নুল্‌ আব্বাস বি-এ

গতবারের আলোচনা হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে হজরত ঈসার স্বাভাবিক মৃত্যুই ঘটিয়াছিল। তবে তিনি কোথায় আছেন সে সম্বন্ধে কোরআন কি বলে দেখা যাক। জীবিত অবস্থাতে তো তাঁহার আসমানে যাওয়ার বা থাকার, ও পুনরায় ধরাপৃষ্ঠে অবতরণ করার কথা কোরআনের কুত্রাপি নাই-ই,—অধিকন্তু মৃত অবস্থাতেও তিনি আসমানে অবস্থান করিতেছেন না, কারণ আল্লাহ তা'আলা সুরা মোমেনুনের ৩য় রুকুতে পূর্ব্ব নবীগণের বিরুদ্ধাচারী জাতির ধ্বংসলীলা বর্ণনা করিয়া হজরত মুসার অবিশ্বাসকারীগণের জলমগ্ন হওয়ার কথা বলিলেন। সমস্ত রুকুটার প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে নবীগণের অবিশ্বাসকারীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু আল্লাহ নিজ নবীগণকে ও বিশ্বাসীগণকে রক্ষা করিয়াছেন। আলোচ্য রুকুতে মুসার পর হজরত ঈসার সম্বন্ধে কেবল এইটুকু বলিতেছেন,—

و جعلنا ابن مريم و امه اية و اونهما الى ربوة ذات
قرار و معين ع (المومنون ع ٣)

আর মরিয়মতনয় ঈসাকে ও তাঁর মাকে আমরা চিহ্ন স্বরূপ করিয়াছি, আর উভয়কে আমরা আশ্রয় দিয়াছি একটি স্থির ও স্রোতময় উচ্চস্থানে (মোমেনুন ৩ রুকু)।

এই রাজ্য কোথায় অবস্থিত সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে। কেহ বলেন ফলসতীন, কেহ দিমশক ইত্যাদি। কিন্তু ইহা যে আসমান তাহা কাহারও বলিবার শক্তি নাই। মওলানা মোহাম্মদ আলী সাহেব এই রাজ্যকে কাশ্মীরের শ্রীনগরে স্থির করিয়াছেন। আয়তের বর্ণনার সঙ্গে শ্রীনগর বেশ খাপও খায় বটে। তবে সেটা যদি কেহ মানিতে না চাহেন তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু মওলবী সাহেবগণ হার মানিবার পাত্র নহেন। তাঁহারা বলিতেছেন, এই আশ্রয়দান আসমানে উত্থিত হইবার পূর্ব্বেকার ঘটনা। গায়ের জোরে যদি কেহ কোন কথা বাড়াইতে চাহেন তাহলে আমি নিরুপায় কেন না গায়ে জোর আমার নাই। তাঁহারাই বলিতেছেন য়িহুদগণের নিকট হইতে অব্যাহতি পাইয়া আবার তাহাদিগের নিকট আসিবার (আসমানে উত্থিত হইবার জন্য) কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। পরন্তু আলোচ্য রুকুতে নবীগণের শেষ উদ্ধার ও তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদীগণের চরম ধ্বংসের কথাই বলা হইতেছে। হজরত ঈসারও শত্রুকবল হইতে শেষ-উদ্ধার বর্ণনাই আয়তে করা হইতেছে, অস্থায়ী রক্ষার কথা নয়। সুতরাং এই আশ্রয়স্থল মাতাপুত্রের কবরের কথাই সূচনা করিতেছে। শ্রীনগরেই হউক বা জগতের অন্য যেখানেই হউক কিন্তু আসমানে নিশ্চয় নহে।

এইবার মুফসসির মহোদয়গণের শেষ সম্বল رفع এর কথা আলোচনা করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

হজরত ঈসার رفع এর কথা কোরআনে দুই বার আছে, সুরা আল-এমরানে ও সুরা নেসায়। সুরা আল-এমরানের পঞ্চম রুকুতে হজরত ঈসার জন্মকথা, নবী জীবনের কথা, পুরোহিতগণের কথা ও য়িহুদগণের ষড়যন্ত্রের কথা বর্ণনা করার পর আল্লাহ বলিতেছেন, -

اذ قال الله يعيسى انى متوفيك و رافعك الى و
مطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك
فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ثم الى مرجعكم فا
حكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون (ال عمران ع ٦)

আল্লাহ যখন বলিলেন, "হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমার জান কবজ করিব আর তোমাকে আমার নিকট

বর্ত্তী (অর্থাৎ সম্মানিত) করিব; আর কাফেরদিগের দিন হইতে তোমাকে পবিত্র করিব (অর্থাৎ তাহাদের অপবাদ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব), আর তোমার অনুসারিগণকে কাফেরগণের উপর কেয়ামত পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠতা দিব; তারপর আমারই দিকে তোমাদিগের প্রত্যাবর্ত্তন হইবে; তখন তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ কর সেই বিষয়ের মীমাংসা করিব। (আল-ইমরান - ৬ রুকু)।

সুরা মরয়ম ও সুরা মাএদায় হজরত ঈসার মৃত্যু সম্বন্ধে যে স্পষ্ট উক্তি আছে তাহাকে উড়াইয়া মওলবী সাহেবগণ বলেন যে, স্বাভাবিক মৃত্যু মরিবার জন্য তিনি পৃথিবীতে নামিয়া আসিবেন, যদিও এমন কোন কথা কোরআনে নাই। এই আয়তের توفى এর ব্যাখ্যাতেও যে তাঁহারা ঐরূপ কথা না বলিবেন তাহার কোন কারণ নাই। কিন্তু একটি কথা তাঁহাদিগের সমীপে আমি সসম্মানে আরজ করিতে চাই। যে توفى এর কথা এই আয়তে বলা হইল সেটা যদি নামিয়া আসিবার পর হইতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, সে ওফাতের পর আবার رفع হইবে। কিন্তু দুইবার رفع র কথা কেহ অনুমান করিতেও পারেন নাই। তাঁহাদের কথা মানাইতে হইলে আয়তকে অন্ততঃ رفع ও توفى এর শব্দ দুইটিকে এইরূপে সাজাইতে হইত, যথা, انى رفعك ثم متوفيك। কিন্তু ভূত ভবিষ্যৎ সকল জ্ঞানের আধার মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাআলা বলিতেছেন, প্রথমে متوفيك তোমার জান কবজ করিব; তারপর বলিতেছেন رفعك انى "তোমাকে আমার দিকে তুলিয়া লইব।" অবশ্য رفع মানে মওলবী সাহেবগণের মত গ্রহণ করিলেও এইরূপ দাঁড়াইতেছে। কিন্তু الى র সহিত সংযুক্ত হইলে رفع এর মানে হইবে নিকটবর্ত্তী করা, যথা, رفعه الى السلطان তাকে রাজার নিকটবর্ত্তী করিয়া দিয়াছি (১)। তাহা হইলে رفعك الى মানে হইবে তোমাকে আমার নিকটবর্ত্তী অর্থাৎ সম্মানিত করিব। তার পর আর এক কথা এই توفى দুই প্রকার আল্লাহ বলিতেছেন,

الله يتوفى الانفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت و يرسل الاخرى الى اجل مسمى ط (الزمر ع ٥)

আত্মা সকলের মৃত্যুকালে আল্লাহ তাহাদিগকে توفى (অর্থাৎ জানকবচ করেন, তবে যে না মরে তার নিদ্রায়; তার পর যার উপর মৃত্যুর আদেশ দিয়াছেন তাহাকে ধরিয়া রাখেন আর বাকীগুলিকে নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দেন (জুমর—৫ রুকু)!

৩য় কোন প্রকার توفى যখন নাই তখন হজরত ঈসার توفى কোন্ প্রকারের হইতে পারে? অবশ্যই প্রথম প্রকারের। তাহা হইলে তিনি আটকাও আছেন, আর আসিতে পাইবেন না। মনে রাখিতে হইবে, এই এই আটকাইয়া থাকা হজরত ঈসার জন্য مخصوص নহে—সকল আত্মারই এইরূপ হইয়া থাকে। তাহা হইলে কথা দাঁড়াইল যে অন্যান্য আত্মাও যেমন মৃত্যু আস্বাদন করিয়াছে হজরত ঈসাও তেমনি মারা গিয়াছেন।

সুরা নেসার ২২ রুকুতে হজরত ঈসার ও তৎপূর্ব্ব-কালের য়ুহুদগণের কদাচারের কথা, তাহাদের প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের কথা এবং তজ্জন্য তাহাদের শাস্তির কথা, তারপর হজরত ঈসার প্রতি ও তাঁর মার প্রতি তারা যে সমস্ত মিথ্যা দোষারপ করিয়াছিল, তাহা এবং সর্ব্বশেষে তাহারা হজরত ঈসাকে হত্যা করিয়াছে, তাহাদের এই দাবীর কঠোর প্রতিবাদ করিয়া আল্লাহ বলিতেছেন,—

وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ط وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه مالهم به من علم الا اتباع الظن ج وما قتلوه يقينا لا بل رفعه الله اليه ط وكان الله عزيزا حكيما ○ (النساء ع ٢٢)

আর তারা তাঁকে হত্যাও করে নাই ক্রুশ বিদ্ধও করে নাই, তবে তিনি তাহাদের নিকট অনুরূপ বিবেচিত, অথবা সন্দেহযুক্ত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ অন্যকে (যথা য়হুদাকে) (২) তাঁহার অনুরূপ মনে করিয়াছিল, (অথবা তাঁহার সম্বন্ধে তাহারা সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছিল); আর নিশ্চয় যাহারা তাঁহার সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিল তাহারা সে বিষয়ে (অর্থাৎ তাঁহার হত্যার বা ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে)

---

(১) সোরা ২ (২) কিম্বা "ফিতয়ানূসকে"

সন্দেহেই ছিল; সেই হত্যা সম্বন্ধে তাহাদের কোনই জ্ঞান ছিল না, তাহারা কেবল অনুসন্ধানের উপরই নির্ভর করিতেছিল মাত্র; আর তারা তাঁকে সঠিক চিনিতেই পারে নাই, বরং আল্লাহ তাঁহাকে নিজের নিকটবর্ত্তী করিয়া লইয়াছিলেন; আর আল্লাহ ত অসীম ক্ষমতাবান ও অশেষ জ্ঞানবান। (নেসা—২২ রুকু)

"য়হুদগণ যে হজরত ঈসাকে হত্যার দাবী করিতেছিল, তাহার প্রতিবাদ করাই এই আয়ত দুইটীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে হজরত সেই হত্যা হইতে কিরূপ ভাবে অব্যাহতি পাইলেন সেটাও বলা হইয়াছে। সেই অব্যাহতি আসমানে উঠিয়া গিয়াও হইতে পারে কিম্বা সশরীরে পলায়ন করিয়াও হইতে পারে। মওলবী সাহেবগণ বলেন, "হজরত ঈসাকে একটী ঘরে আবদ্ধ রাখিয়া য়হুদগণ ক্রুশের ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিতেছিল। তারপর তাদের সর্দ্দার (য়হুদা) তাঁহাকে আনিতে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে যে ঘরে ঈসা নাই—তাঁহাকে আল্লাহ জীবন্ত উঠাইয়া লইয়াছেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে য়হুদার আকৃতি ঈসার মত হইয়া গেল। সে তাহা জানিল না; যখন সে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার প্রতিবাদ সত্ত্বেও দলের লোকরা তাঁহাকে ঈসা মনে করিয়া ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। তারপর যখন য়হুদার তল্লাস হইল তখন তাহাকে পাওয়া না যাওয়ায় তাহারা জানিল যে নিজেদের নেতাকেই তাহারা হত্যা করিয়াছে।" মুফসসির মহোদয়গণ رفع এর মানে উঠাইয়া লওয়া করায় আয়তের অন্যান্য বাক্যগুলিকে সেই মোতাবেকে ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। তাহা না হইলে, অর্থাৎ رفع র প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিলে অন্যান্য বাক্যগুলিতে শেষোক্ত প্রকারের অব্যাহতির কথাই সূচনা করিবে। الی র সহিত সংযুক্ত হইলে رفع র কি মানে হয় তা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী করা। মুফসসির মহোদয়গণ আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চাহেন যে আল্লাহ আসমানে বসবাস করেন সুতরাং الی বা الیه বলিতেই الی السماء বুঝিতে হয়। সেই জন্য হজরত ঈসাকে আসমানেই উঠিতে হইল।

رفع মানে "উপরে চড়ান" (১) ধরাতেই এমন হইয়াছে। رفع الیه দ্বারা আসমানে উঠাইয়াছিলেন বুঝা সঙ্গত হইতে পারে না। আল্লাহ্ কাহাকেও নিজের নিকটবর্ত্তী করিলে ধরাতে থাকিয়াও হইতে পারে। প্রায় প্রত্যেক মুসল্লীই প্রার্থনা করে।

اللهم اغفرلی و ارحمن و اهدنی وارزقنی و ارفعنی و اجبرنی

হে আমাদের আল্লাহ্ তুমি আমার পাপ ক্ষমা কর, ও আমাকে দয়া কর, ও আমাকে সৎপথে চালাও, ও আমাকে উপজীবিকা দাও, ও আমাকে **সম্মানিত কর,** ও আমার অবস্থা ভাল কর।

বলা বাহুল্য এই দোয়াতে কেহ আসমানে উঠিতে চাহে না। এখন দেখা যাক, আর কোন নবীর ভাগে رفع ঘটিয়াছে কিনা। সুরা বকরার ৩৩ রুকুতে আল্লাহ্ বলিতেছেন

تلك الرسل فضلنا بعضهم علے بعض م منهم من كلم الله و رفع بعضهم درجت

আমরা এই রসুলগণের কতকজনকে অন্য কতকজনের উপর শ্রেষ্ঠতা দিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও সহিত আল্লাহ্ কথা কহিয়াছিলেন এবং কতকজনের মর্য্যাদা উন্নীত করিয়াছিলেন। সুরা মরয়মের ৪র্থ রুকুতে আল্লাহ বলিতেছেন (হজরত ইদ্রীস সম্বন্ধে)

و رفعنه مكانا عليا......

আর আমরা তাঁহাকে উচ্চ মর্য্যাদায় সম্মানিত করিয়াছি তাহা হইলে بل رفعه الله الیه বাক্য দ্বারা জানা যাইতেছে যে আল্লাহ্ হজরত ঈসাকে য়হুদগণের হীন ও অপমান জনক ষড়যন্ত্র হইতে মুক্তি দিয়া, তাঁহাকে নিজের নিকটবর্ত্তী করিয়া লইয়াছিলেন, যে নিকটবর্ত্তী হওয়ার কথা সুরা আল-ইমরানে বলা হইয়াছে—

وجیها فی الدنیا و الاخرة و من المقربین

(তিনি) দুনিয়াতে ও আখেরাতে সম্মানিত ও নিকটবর্ত্তীগণের মধ্যে একজন!

একটী কথা এখানে উঠিতে পারে। সুরা আল-এমরানে رفع র কথা বলা হইয়াছে وفاة এর পর; এখানে

(১) صراح—الرفع خلاف الوضع

কিন্তু وفاة এর কথা না বলিয়া কেবল رفع র কথা হইতেছে কেন? ইহার সহজ উত্তর এই যে শেষোক্ত رفع যখন হইয়াছিল তখন وفاة হয় নাই, তখন তিনি য়হূদগণের কবল হইতে মুক্তি পাইয়া (খুব সম্ভব মাতা পুত্রে) স্থানান্তরে (الی ربوة) হিজরত করিয়াছিলেন। এই অব্যাহতির কথা লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ বলিতেছেন

ان كففت بنى اسرائيل عنك (المائدة ع ١٥)

...... যখন বনি ইস্‌রাঈলগণের (ষড়যন্ত্র (১) তোমা হইতে প্রতিহত করিয়াছিলাম ... (মাএদা), ১৫ রুকু)

উপরের আলোচনার সার এইরূপ দাঁড়াইতেছে।—

হজরত ঈসা নবী অন্যান্য রসুলগণের ন্যায় মানুষ ছিলেন অন্যান্য রসুলগণের স্বজাতিরা যেমন অবিশ্বাস করিয়াছিল, তাঁহার স্বজাতিরাও তদ্রূপ করিয়াছিল এবং তাঁহাকে হত্যার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে তাহারা ত্রুটী করে নাই। অবশ্য তাহাদের সে ষড়যন্ত্র ফলবান হয় নাই—আল্লাহ্ তাঁহাকে তাহাদিগের কবল হইতে রক্ষা করিয়া আরামদায়ক নিরাপদ স্থানে আশ্রয় দিয়াছিলেন। সেইস্থানে তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং মাতার সহিত সমাধিস্থ হন।

মাননীয় মুফসসির মহোদয়গণের আর একটী ব্যাখ্যার আলোচনা করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্ হজরত ঈসাকে বলিবেন

تكلم الناس فى المهد و كهلا (المائدة ١٥)

... তুমি দোলনায় (অর্থাৎ অল্প বয়সে) এবং প্রৌঢ়াবস্থায় মানবগণের সহিত কথা কহিতেছিল......

এই আয়ত হইতে বুঝা যাইতেছে যে হজরত ঈসা প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত নবীত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু মুফসসিরগণ (অন্ততঃ কেহ কেহ) বলিতেছেন, তিনিত প্রৌঢ়াবস্থায় পূর্ব্বেই আসমানে উঠিয়া গিয়াছেন, সুতরাং প্রৌঢ়াবস্থার কথা কহিবার জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন, বহু দূরের পথ, তাই আসিতে আসিতেই প্রৌঢ়বয়স্ক হইয়া পড়িবেন। অথচ এই কথা বলাটা, কেতাব, হিকমত, তওরেত, ইঞ্জীল শিক্ষা দিবার পূর্ব্বের ঘটনা, আল্লাহ্ তাহা বলিতেছেন! সুতরাং ইহার উপর টিপ্পনী অনাবশ্যক!

(১) মাএদা—১৫ রুকু

বিড়ম্বনা

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

বন্দে আলি মিয়া

অধ্যায় পাঁচ

ছুটি শেষ হইবার পূর্ব্বেই করুণারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। একই সঙ্গে আসিবার জন্য করুণা মনসুরকে নিবেদন জানাইল, মিনতি করিল, কিন্তু মনসুর তাহাতে রাজী হইল না।

কলেজ খুলিবার দিন। করুণা ট্রাম হইতে নামিয়া নতমুখে কলেজে ঢুকিতেই কণ্ঠস্বরে চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল মনসুর গেটের পাশে ফুটপাথের উপর বহি বগলে দাঁড়াইয়া আর একটি ছাত্রের সহিত সিগারেট ফুঁকিয়া গল্প করিতেছে। করুণা তাহার নিশ্চেষ্ট নির্ব্বিকার লক্ষণ দেখিয়া বুঝিল, সে তখন তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞান। মনে করিল, নিজেই একটিবার সুমুখে ঘুরিয়া আসিয়া চৈতন্যকে সজাগ করিয়া দেয় অথবা আলাপ করিয়া আসে; কিন্তু দুষমনের মতো ঐ ছাত্রটির উপস্থিতিতে সঙ্কোচে-দ্বিধায় গতি যেন তাহার অচল হইয়া আসিল। খানিকক্ষণ ছল করিয়া বারাণ্ডার এধার-ওধার পায়চারী করিয়া বেড়াইল, কিন্তু কোনোই ফলোদয় হইল না। অগত্যা বার দুই কাসিয়া করুণ-চোখে ফুটপাথের দিকে তাকাইয়া ক্লাসে ঢুকিয়া পড়িল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মনসুর দৃষ্টি ফিরাইতেই করুণার পিছন দিকটার গতিভঙ্গী দেখিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিল। সে এতক্ষণ গেটের সুমুখে দাঁড়াইয়া যাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল সে-ই যে এমন ভাবে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়াও না দেখিয়া, অমন অবহেলা-ভরে চলিয়া যাইতে পারে, তাহা সে মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা করিতে পারে নাই। যাহাকে ভালোবাসা যায় তাহার অতি সামান্য আঘাতও যেন গভীর হইয়া বাজে। মনসুরের আনন্দ-দীপ্তি হাসি-উল্লাস চক্ষের পলকে ম্লান হইয়া গেল। সে আর পূর্ব্বের মতো প্রাণ খুলিয়া সঙ্গীর আলাপে যোগ দিতে পারিল না। দু একটা কথায় ছাড়া ছাড়া জবাব দিয়া বারে বারে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতে লাগিল। বুকের মধ্যে তখন তাহার পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতেছিল। বন্ধুটি তাহার এই আকস্মিক ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া মনে মনে বিস্মিত হইল, কিন্তু বাহিরে কিছুই প্রকাশ করিল না। বলিল, কলেজের বেলা হয়ে যাচ্ছে বুঝি, চলো যাই।

মনসুর সম্মতি দিয়া নীরবে ম্লানমুখে আসিয়া ক্লাসে ঢুকিল।

করুণা তখন বেঞ্চির একপাশে বসিয়া মুখ ফিরাইয়া সহাধ্যায়িনী একটি মেয়ের সহিত আলাপ জমাইয়া তুলিয়াছিল। মনসুরকে ঢুকিতে দেখিয়া তাহার বুকের উচ্ছল খুনধারা রুদ্রতালে নাচিয়া উঠিল। সারামুখ রাঙা হইয়া গেল, কিন্তু বাহিরে কোনো চাঞ্চল্য বা আগ্রহ দেখাইল না। যাহার সহিত সে বাক্যালাপে ব্যস্ত তাহাকে সে বেশ ভালো করিয়াই জানে, সহসা ইহাকে বাদ দিয়া সে যদি পুরুষ-প্রীতি দেখায়, তবে তাহার ভাগ্যে কিরূপ লাঞ্ছনা অবশ্যম্ভাবী এবং এমন কি কলেজ-সুদ্ধ মেয়ের বিদ্রূপ-টিট্‌কারি যে কি করিয়া গোপনে-প্রকাশ্যে তাহার

উপর বর্ষিত হইতে থাকিবে, তাহা নিমেষে কল্পনা করিতে তাহাকে আটকাইল না। মনে করিল মনসুরকে সুযোগ মতো ফাঁকে একলা পাইলে অথবা ছুটি হইলে সমস্ত বলিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। সাময়িক উত্তেজনা প্রকাশ করিয়া চিরদিনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং শান্তিকে সে কোনোক্রমেই বিদায় দিতে পারিবে না। তাই সে নিরুদ্বিগ্নে নিশ্চিন্তে বসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ধীরভাবে আলাপ জমাইয়া তুলিতে লাগিল।

ক্লাসে প্রবেশ করিয়া মনসুর অধিকতর ম্লান হইয়া সারামুখ কালীবর্ণ করিয়া একপাশে একাকী চুপটি করিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার মনে আশার যে অতি ক্ষীণ শিখা মৃদুভাবে জ্বলিতেছিল, তাহা কে যেন প্রবল ফুৎকারে মুহূর্ত্তে নিবাইয়া দিল। মনসুর মনে ভাবিয়াছিল করুণা ব্যস্ততায় হয়তো তাহাকে লক্ষ্য করে নাই, দেখিলে নিশ্চয় তাহাকে হাসিয়া সম্বর্দ্ধনা জানাইবে, ছুটিয়া আসিয়া আলাপ করিবে, কুশল জিজ্ঞাসাবাদের পর এত শীঘ্র চলিয়া আসার কৈফিয়ৎ চাহিবে। সে সারারাস্তা মনে মনে নিজেই প্রশ্ন করিয়া জবাব গুছাইয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে যে, ইহার উত্তরে ইহা বলিবে, তাহা গোপন করিয়া ঠোঁট টিপিয়া হাসিবে, করুণা বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া অনুযোগ করিবে ইত্যাদি কত কথাই না সে মনে মনে ভাঙাগড়া করিয়াছে। কিন্তু সেই উষ্ণ কল্পনাকে করুণা যে এমন রূঢ়হস্তে ভাঙিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিবে ইহা তো সে জানিত না। তাহাকে চোখের সুমুখে রাখিয়াই সে তখন চলিয়া যদি না আসিবে, তবে এখন ক্লাসের মধ্যেও বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাইল না যে কেন, তাহা সে সহজেই অনুমান করিয়া লইল।

করুণা ভাবিয়া রাখিয়াছিল 'ডিসেক্‌সান হলে' যাইবার ফুরসুতে মনসুরের সহিত দেখা করিয়া, তাহার মনের গুমট দূর করিবার চেষ্টা পাইবে। কিন্তু রুম হইতে বাহির হইবার সময় মনসুর যেরূপ দ্রুতবেগে বিরূপ-ম্লান মুখ হেট করিয়া সহপাঠী ছাত্রদের সহিত তাড়াহুড়া করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল, করুণা ইহা লক্ষ্য করিয়া কিছুতেই সম্মুখীন হইতে সাহস পাইল না। একপাশে বিবর্ণ মুখে স্থির দৃষ্টি মেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ছুটি হইলে চঞ্চল দৃষ্টিতে ইতস্ততঃ খুঁজিয়া সে শ্রান্ত এবং নিরাশ হইয়া পড়িল। এধর সেধর সন্ধান করিয়া গেটের কাছে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কোনোক্রমেই মনসুরের দেখা পাইল না, অগত্যা বিষণ্ণ মুখে ট্রাম ধরিয়া বাসায় আসিয়া পৌঁছিলো। তিক্তঅবসাদ গ্রস্ত চিন্তায় তাহার ক্ষুব্ধ তরুণ মন আচ্ছন্ন হইয়া সমস্ত কাজের উপরে ভয়ঙ্কর একটা বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া ছিল। ঘরে ঢুকিয়া অলস ভাবে বহির বোঝা টেবিলের উপরে ফেলিয়া দিয়া দ্রুতহস্তে জামা কাপড় বদলাইয়া ফেলিল। সারা দিনের এই কর্ত্তব্য-অবহেলার ত্রুটি তাহার একান্ত নিজস্ব গুরু অপরাধ হইয়া, তাহার পিঠে চাবুক বসাইতে কসুর করিতেছিল না। এক একবার তাহার বুক ঠেলিয়া কান্না বাহিরে আসিবার পথ খুঁজিতেছিল, কিন্তু অতিবড়ো সংযমে আপনার মধ্যে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া প্রশান্ত হইয়া বসিয়া থাকিতেও তাহার কোনোরূপ বিপর্য্যয় দেখা গেল না। ইচ্ছা করিল, নিজেই একবার তাহার মেসে যাইয়া সকল দোষ-ত্রুটির ক্ষমা চাহিয়া আসিবে, কিন্তু অনতি-বিলম্বে ভয়ঙ্কর রূপে নিরাশায়-ব্যথায় সারামুখ অন্ধকার করিয়া মাতালের মতো টলিয়া বিছানার উপরে পড়িয়া গেল। এখানকার বাসার খবর নম্বর সবই তাহার অবিদিত; কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার উপায় নাই, কি করিয়া চিনিবে, জানিবে, তাহাও তাহার ধারণায় আসিল না। চুপ করিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া—হৃদয়ের অসহ্য যন্ত্রণাকে দমন করিয়া লইতে লাগিল।

ছুটির ঘণ্টা দুই পূর্ব্বেই মনসুর সারা বুকময়—আগুন লইয়া মেসের শূন্য বাসার কুলুপ খুলিল। অকরুণ জগতের উপরে কোনো দিনই তাহার শ্রদ্ধা ছিলো না, আজিকার অবহেলায় তাহার যে টুকুও ছিলো, তাহাও ধুইয়া, পুঁছিয়া গেল সেইদিন বেড়াইতে বাহির হইয়া মনসুরের কিছুই ভাল লাগিতেছিল না।

বহুক্ষণ একাকী বেড়াইয়া ধর্ম্মতলার মোড় হইতে শ্যামবাজার-গামী একখানা 'বাসে' উঠিয়া পড়িল। কিন্তু উঠিয়াই বজ্র-স্তম্ভিত এবং বিস্মিত হইয়া বুঝিল এই গাড়ীখানায় না চড়িলেই হয় তো তাহার ছিল ভালো। ইচ্ছা সত্ত্বেও নামিতে পারিল না, হেঁট হইয়া রক্তহীন পাণ্ডুর মুখে চুপটি করিয়া বসিয়া পড়িয়া আপনার অতি-বড়ো নির্ব্বুদ্ধিতাকে গোপনে ধিক্কার দিতে লাগিল। ডান দিকের

বেঞ্চির কোণ ঘেঁসিয়া করুণা একটি অপরিচিত যুবকের সহিত গা ঘেঁসা ঘেঁসি করিয়া পাশাপাশি বসিয়া অর্থহীন প্রচুর গল্পের সহিত প্রাণখোলা অপর্য্যাপ্ত হাসিয়া চলিয়াছিল। সহসা মনসুরের উপরে নজর পড়িতেই করুণা আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াই মুহূর্ত্তে মরার মতো ফ্যাকাসে ও বিবর্ণ হইয়া গেল। সে জাগ্রত আছে বলিয়া আচম্‌কা যেন ধারণা করিয়া লইতে পারিল না। করুণার প্রবল ইচ্ছা হইল, মনসুরকে আদর করিয়া টানিয়া বসায় এবং যাহা লইয়া সে আজ কয়দিন হইতে গুমরিয়া ফিরিতেছে, তাহার আঁধার দূর করিয়া দেয়; কিন্তু 'বাস'-ভরা লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে সে চেষ্টার গোড়াতেই তাহাকে ক্ষান্ত হইতে হইল। বিশেষ সঙ্গের এই যুবকটির উপস্থিতি তাহাকে জোর করিয়া নিবৃত্ত করিল। সে যদি রাস্তায় পথে যেখানে সেখানে অনাত্মীয় যুবকের সহিত তাহাকে আলাপ করিতে দেখে, তাহা হইলে কখনো বোধ করি ক্ষমা করিতে পারিবে না। ইহা লইয়া সত্য-মিথ্যায় দশজনের নিকট যাহা বলিয়া বেড়াইবে এবং তাহা নিঃসন্দেহে তাহাদের যে মুখরোচক আলোচনার বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা সে মুহূর্ত্তে অনুমান করিয়া লইল। সে তবুও ভাবিল, মনসুর যদি নিতান্তই কথা কহে তো সে চুপ করিয়া কখনো থাকিবে না নিশ্চয়, থাকিলেই বা তাহার সঙ্গী অবসরমতো তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেই হয়তো পরে চলিবে। এই ভাবিয়া সে প্রস্তুত হইয়া উৎসুক দৃষ্টিতে মনসুরের মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু মনসুরের রক্তহীন নত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই অন্তর ব্যথায় ভরিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল। ভুল বুঝিয়া সে যে কী নিদারুণভাবে দগ্ধ হইতেছে, তাহা তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, কিন্তু উপায়হীন হইয়া মনে মনে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

'বাস' ওয়েলেস্‌লি স্কোয়ারের মোড় ঘুরিতেই মনসুর অস্বাভাবিক ব্যস্ততায় নামিয়া, যে রাস্তাটা সম্মুখে পাইল, তাহাই ধরিয়া চলা শুরু করিয়া দিল। তাহার নব-জাগ্রত স্নেহ-প্রেম-পিপাসিত তরুণ অন্তরে নারীর এই নিষ্ঠুর কৌতুক তুষের আগুন জ্বালাইয়া দিয়া তিলে তিলে দগ্ধ করিতে লাগিল। চলিতে চলিতে একটা মেম তাহার গা ঘেঁষিয়া গেল, মনসুর ঘৃণায় ভ্রু কোঁচ্‌কাইয়া বিষদৃষ্টিতে তাহার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, পুনরায় আপন মনে পথ চলিতে লাগিল। সমগ্র নারী জাতিটার উপরে করুণা আজ তাহার বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দিয়াছে, সেই জাতিরই একজনের অঙ্গস্পর্শ তাহার সারা দেহে সূঁচ ফুটাইয়া দিল। বিশেষ ভালো ছেলে এবং Moralist হিসাবে মনের কোণে তাহার একটা নিজস্ব গর্ব্ব বরাবরই ছিল, বাহিরে বন্ধু মহলে সে হিসাবে নাম-ডাকেরও অভাব ছিল না। আজো একথা অপ্রকাশের জন্য সে শ্রদ্ধাটা অবশ্য কমিয়া যায় নাই, কিন্তু সে মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল যে, সে নামের অযোগ্য তাহাকে অনেকদিন হইল হইতে হইয়াছে। তাহার অধঃ-পতন আর দুর্দ্দশা যাহা ঘটিয়াছে চেষ্টা করিলে হয়তো এখনো প্রতিকারের পথ পাওয়া যাইতে পারে। মনসুর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, অপমান যাহা ভাগ্যে লেখা ছিল, তাহা কেহ রোধ করিতে পারে নাই; এখন হইতে নিজের কর্ত্তব্য যথারীতি পালন করিয়া চলিবে, ইহার অন্যথা সে কখনই কিছুতে হইতে দিবে না। দুঃখিনী জননী তার সুদূর পল্লী-গৃহ-কোনে প্রবাসী পুত্রের মঙ্গল এবং তাহার সফলতার কামনায় সমস্ত শুভাশীষ প্রেরণ করিয়া আশান্বিত হইয়া বসিয়া আছেন, আর সে আজ মরীচিকার পিছনে মাতালের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! গরীবের ছেলের হাতী কেনার সখ দেখিয়া হয়তো ডাক্তার মাত্রই তাহার ঔষধ সেবনের এবং হেকিম মাথায় মালিশের ব্যবস্থা প্রদান না করিয়া পারিবেন না। যে দরিদ্র, তাহার ক্ষুদ্র মন লইয়াই চিরকাল ক্ষুদ্র জিনিষেই সন্তুষ্ট থাকা একান্ত বিধেয়, অন্যথায় অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। সে ভাবিল, অতীত কাহিনীকে একটা দুঃস্বপ্ন বলিয়াই উড়াইয়া দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।

নানা পথ-বিপথ ঘুরিয়া তিক্ত চিন্তার বোঝা মাথায় লইয়া শ্রান্ত দেহে মনসুর রাত এগারোটায় মেসে ফিরিল। আলো জ্বালাইয়া জামা-কাপড় ছাড়িয়া হাত মুখ ধুইয়া বিছানায় ক্লান্ত অঙ্গ এলাইয়া দিল। ততরাত্রে মেসের ঝি-চাকর চলিয়া গিয়াছে, হয়তো তাহার খাবার নীচের ঘরে ঢাকা দিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া আহার যোগাড় করিবার মতো মনের উৎসাহ তখন তাহার ছিল না। হারিকেন নিবাইয়া একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া সে পাশ ফিরিল। নারীকে সে সাধ্যমত এড়াইয়া চলিত, শ্রদ্ধা করিত, ভয় করিত এবং দূর হইতে নমস্কার জানাইয়াই ক্ষান্ত

ছিল, কাছে ঘেঁসিবার মতন ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তি একদিনের জন্য এতটুকু তাহার মনে জাগে নাই। এক অশুভক্ষণে এই ভয়াবহ জাতি তাহার সংস্পর্শে আসিয়া তাহার অন্তরে একি ভয়াবহ অশান্তির দাবানল জ্বলিয়া উঠিল।

মনসুর কিন্তু ভুল বুঝিয়াছিল। সেই দিন হইতে করুণার যেন কোনো ক্রমেই স্বস্তি ছিল না। গত পরশু দিন দেশ হইতে সম্পর্কে তাহার এক মাসতুতো দাদা তাহাদের বাসায় আসিয়া উঠিয়াছিল, সেই হিসাবে তাহার অল্প অবসর এবং পড়াশুনার সময়েরও অনেকখানি তাহার জন্য সে নিয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আজ দুপুর বেলা কি একটা কাজে তাহারা দুইজনে ভবানীপুরে গিয়াছিল, সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিতে মনসুরের সহিত সহসা দেখা হইয়া গেল।

অধ্যায় ছয়

পরদিন রবিবার। কলেজ বন্ধ ছিল। কাহারও দেখাশুনা হইবার সুযোগ ঘটিল না। মনসুর ইহার মধ্যে তাহার মনকে চাবুক কষিয়া আর একটু শায়েস্তা করিবার অবসর পাইল। সোমবারে মনসুর আপন মনে ক্লাসে ঢুকিতেই পিছন দিকের কণ্ঠস্বরে বাধা পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় ফিরাইয়া চাহিল। করুণা কুণ্ঠিত হইয়া ধীরগলায় বলিল, একটা কথা তোমাকে শুনতে হবে, এদিকে এসো।

মনসুরের বুকটা ধুকধুক করিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে নিজেকে প্রাণপণ বলে সম্বরণ করিয়া লইয়া বলিল, কথা? তা আমাকে কেন, ক্লাসে মানুষের তো অভাব নেই। শব্দগুলি কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাহির হইল; করুণা লক্ষ্য করিল তাহা বিপুল অভিমানে ভরা।

করুণা তাড়াতাড়ি বলিল, সে আমি জানি। তবু তোমাকেই প্রয়োজন;—এখন আসবে না?

মনসুর উদাসীন ভাবে ঘাড় ফিরাইয়া জবাব দিল, না। তা ছাড়া এখন অবসর তো নেই। নিতান্ত প্রয়োজন হলে ছুটির পর দেখা হতে পারে, বলিয়া ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

প্রত্যাখ্যানের দুঃসহ অপমানে করুণার মুখ ছাইয়ের মতন পাণ্ডুর হইয়া চক্ষের পলকে গোলাবের মতো রাঙা হইয়া উঠিল। সে অতি কষ্টে চোখের ফোঁটা কয়েক অশ্রুকে সযতনে চাপিয়া লইয়া চারিদিক চকিত দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া নিজের বেঞ্চে আসিয়া বসিল।

মনসুরের বুকের মধ্যে তোলপাড় শুরু হইয়া গেল। এই মায়াবিনীর কবল হইতে বহুকষ্টে নিজেকে সে উদ্ধার করিয়া লইতেছে, এখনো সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করে নাই, সহসা আবার তাহার এ আহ্বান আসিল কেন?

করুণা সজল চোখের ব্যথিত দৃষ্টি মনসুরের মুখের উপরে তুলিয়া ধরিতেই চারি চোখে চোকোচোকি হইয়া গেল। কিছু ভাব-বিপর্য্যয় বুঝিতে না পারিয়া অন্যদিকে দৃষ্টিটাকে টানিয়া লইয়া চুপ করিয়া রহিল।

কলেজের শেষে করুণা খানিকক্ষণ এদিক সেদিক খোঁজাখুঁজি করিয়াছিল, কিন্তু শেষ অবধি নিরাশ হইয়া দুঃখিত চিত্তে ফুটপাতে আসিয়া ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়াইল। মনসুর পিছন দিক হইতে আসিয়া তাহাকে সচকিত করিয়া বলিল, আপনি এখানে, আমি ওদিকে দেখ্‌ছিলুম।

করুণা মুখ রাঙা করিয়া মৃদু হাসিল। কোমল কণ্ঠে বলিল, আমিও তো খুঁজে এলুম তোমাকে আমাকে আবার 'আপনি' কেন?

মনসুর মনকে দৃঢ় করিল। এই অতি পরিচয় এবং আত্মীয়তার ছোঁয়াচে তাহার কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না। বলিল, সে যাক্। কিসের দরকারটা ছিল শুনতে পারি?

করুণা বলিল, নিশ্চয়। না শুনতে চাইলেও আমি তো বলবো। নির্জ্জন স্থান না পেলে তোমার সঙ্কোচ আসবে, আমিও সুবিধে বোধ কোর্‌বো না, এসো ট্রামে ওঠা যাক্।

মনসুর বিতর্ক করিয়া বাধা দিয়া বলিল, ট্রাম তো Solitary নয়।

করুণা শাসনের ভঙ্গীতে চাপাকণ্ঠে বলিল, সে আমি জানি, ওঠোনা জল্‌দি।

মনসুর অমান্য করিতে সাহস পাইল না। তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া চলন্ত ট্রামের রড্ চাপিয়া ধরিল। পথে মনসুর করুণাকে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, হেদোয় চল্লে?

জবাব না পাইয়া মনসুর অনুযোগ করিয়া বলিল, কেন গোলদীঘিতে কী হয়েছিল? করুণা ধমক দিয়া বলিল, চুপ করোনা বাপু, কলকাতার পথঘাট তো চেনো, আর

তুমি নিজেও কচি খোকা নও, অস্থানে, কুস্থানে যদি নিয়েই যাই, চলে আস্‌তে হয়তো পারবে—ভয় পেয়ো না।

মনসুর ঢিল ছুঁড়িয়া পাট্‌কেল খাইয়া চুপ করিল, দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ করিতে সাহস পাইল না।

করুণা বাড়ীর সুমুখে আসিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, এসো ওপরে।

মনসুর বিনা প্রতিবাদে তাহাকে অনুসরণ করিয়া দোতালায় উঠিতে উঠিতে প্রশ্ন করিল, চাটার্জ্জী, এইটে বুঝি বাসা?

করুণা মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া মিষ্টকণ্ঠে জবাব দিল, অনুমান নির্ভুল।

মনসুর সাথে সাথে তাহার ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। করুণা বলিল, বোসো। বলিয়া একখানা চেয়ার তাহার দিকে আগাইয়া দিয়া দ্রুতপদে বাহিরে যাইয়া গাড়ু ও তোয়ালে আনিয়া ডাকিল, বইগুলো ওখানে রেখে শুনে যাও তো ডাক্তার।

মনসুর আসিলে করুণা হাতের গাড়ু দেখাইয়া বলিল, এই জল, হাত মুখ ধুয়ে ফ্যালো—দেরী কোরো না—গামছা এযে। বলিয়া তাহার হাতের মধ্যে তোয়ালেটা গুঁজিয়া দিতে গেল।

মনসুর প্রত্যাখ্যান করিয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিল। বলিল, প্রয়োজন নেই। আমাকে শীগ্‌গি ছুটি দাও—বাসায় কাজ আছে।

করুণা ব্যাকুল হইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিল, নাও, ডাক্তার আপত্তি কোরো না, আমার মাথা খাও।

মনসুরের মাথার শিরা উপশিরা দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; সারামুখ কালীবর্ণ হইয়া গেল। মৃদু আপত্তি জানাইয়া দেখিল, কোনো ফলোদয় হইবার তেমন আশা নাই। অগত্যা তাহার অনুরোধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া ঘরের সেই পূর্ব্ব চেয়ারখানায় আসিয়া নীরব হইয়া বসিল।

করুণা একটা চীনা মাটীর থালায় মিষ্টান্ন আনিয়া তাহার সুমুখে টেবিলের উপরে রাখিল। মনসুরকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া তাহার ডান হাতটী থালার উপরে চাপিয়া ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিল, কোনো আপত্তি শুনবো না ডাক্তার, এগুলো তোমাকে খেতেই হবে।

মনসুর বিপদ গণিল। মনে মনে বিব্রত হইয়া সবলে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, না চাটার্জ্জি সে হয় না, আমি গরীব কিন্তু ভিক্ষে করিনে—দান নেবার লোকের তো অভাব নেই, আমাকে কেন?

বিষের তীক্ষ্ণ শায়ক করুণার বুকে যাইয়া বিঁধিল। কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া ছল ছল চোখ দুইটি তাহার মুখের উপরে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, অতবড় নিষ্ঠুর কথা তোমার কাছে আশা করিনি। এ দান নয়, তুমি বন্ধু,—অতিথি, সামান্য ভদ্রতাও কি সইতে পারবে না?

মনসুর নিজের ঔদ্ধত্যে মনে মনে মহা লজ্জিত হইয়া পড়িল। মুখে বলিল, যদিই বলি 'না'—তুমি তো একটী দিনও আমার বাসা-মুখো হওনি।

প্রত্যুত্তরে একটা রূঢ় কথা করুণার মুখে আসিয়া ঠোঁটের গোড়ায় আটকাইয়া গেল। বলিল, যাবো। ভয় পাচ্চো কেন—সময় তো আর গেল না, তা ছাড়া তোমার ওটা তো বোধ করি, বাসা নয় মেস্।

মনসুর দেখিল আজ তাহার প্রতি পদে পরাজয় ঘটিতেছে। তাই সে ম্লান মুখের মৌন দৃষ্টি নত করিয়া নীরব হইল। করুণা একটা সন্দেশ তুলিয়া মনসুরের প্রসারিত মুঠের উপরে রাখিয়া বলিল, নাও আগে, ঢের কথা আছে। চা নিয়ে আসি। বলিয়া প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে ষ্টোভের দিকে সরিয়া গেল।

মনসুরের চিত্ত অনেকটা দ্রব হইয়া আসিল। সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া করুণার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া ডাকিয়া বলিল, চাটার্জ্জি শোনো, তুমি সাথে না বস্‌লে আমি খাবো না বলে রাখচি।

করুণা মৃদু হাসিয়া ঘরের কোণ হইতে জবাব দিল, তুমি আরম্ভ করো আমি আস্‌চি।

মনসুর প্রতিবাদ করিয়া বলিল, না। আমি অপেক্ষায় রইলুম তাহলে।

করুণা দুই পেয়ালা চা আনিয়া টেবিলের উপরে রাখিল। বলিল, খাও। মনসুর বলিল, তুমি সঙ্গে না খেলে আমি তো ছোঁবো না বলেচি।

করুণা কৌতুক করিয়া বলিল, আচ্ছা, ক্রীশ্চানের এঁটো খেলে জাত যাবে না তো তোমার?

মনসুর বলিল, জাত যাবে? আমার সে জিনিষটা হিন্দুদের মতন অতো ঠুনকো নয় যে ছোঁয়াছুঁয়ির একটু আঘাতেই ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে। তুমি নির্ভাবনায় বসতে পারো চ্যাটার্জি।

করুণা সদয় চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখটা নিরীক্ষণ করিয়া টেবিলের সুমুখে চেয়ার টানিয়া বসিল।

নিঃশব্দে খাইতে খাইতে মনসুরের মনে সেই যুবকের সহিত পাশাপাশি বসার ছবি জাগিয়া উঠিল। এই সম্মুখোপবিষ্টা মায়াবিনী নারীর ইহা আরেক প্রকার মায়াজাল বিস্তারের দুশ্চেষ্টা। মন তাহার বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। খাবার ফেলিয়া তখনই ছুটিয়া চলিয়া যাইয়া, ইহার কবল হইতে ত্রাণ পাইয়া হাঁফ ছাড়িতে ইচ্ছা হইতে লাগিল; কিন্তু আহারের মাঝখানে সেরূপ রূঢ় ব্যবহার নিশ্চয়ই ভদ্রজনোচিত হইবে না ভাবিয়া কঠিন হইয়া অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখে রসগোল্লা গালে পুরিল। করুণা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঠোঁট টিপিয়া নিঃশব্দে হাসিল, অন্তর্য্যামী ভিন্ন এ অভিনয় আর কাহারো চোখে পড়িল না।

মনসুর ভিতরে ভিতরে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, চা পান শেষ করিয়া পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া আগুন ধরাইল। বলিল, তোমার কথা হতে এখন আর কোনো বাধা নেই তো?

করুণা বলিল, না, চলো ছাতে যাই—সেখানে হবে এখন।

মনসুরের মুখে এক ঝলক রক্ত আসিয়া পড়িল, দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই সময় ঝি আসিয়া দরজার সুমুখ হইতে এবেলায় কি কি রন্ধন হইবে, তাহারই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া প্রত্যুত্তরের আশায় চুপ করিয়া দাঁড়াইল। করুণা মনসুরকে বলিল, বসো ডাক্তার, আমি ব্যবস্থাটা করে দিয়ে আসচি। বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

ছাতের উপরে লোহার একখানা হেলনা বেঞ্চি ছিল, করুণা হাতে ধরিয়া মনসুরকে তাহার উপরে বসাইয়া দিয়া নিজে তাহার পাশে ঠাঁই করিয়া লইল। খানিকক্ষণ চুপ চাপ্ কাটিবার পর, করুণা মনসুরের মুখের মৃদু দিকে কণ্ঠে বলিল, তুমি রাগ করেচো ডাক্তার?

মনসুর চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া বলিল, রাগ কোথা? কেন, কিসের অপরাধে শুনি?

—সে আমি কিছু অনুমান করতে পেরেচি। সে সন্দেহ কিন্তু একদম ভুল, রাগ করো না ডাক্তার—আমি তোমাকে প্রতারিত করিনি।

—বা, তুমি যে পেয়ে গেলে দেখ্‌চি। তোমার ওপর রাগ হতে যাবে কেন, তুমি আমার কে—সম্পর্কই বা কতটুকু, class-fellow বইতো নও। যার তার ওপরে রাগ-অভিমান করে নিজেকে অহর্নিশি পুড়িয়ে লাভ কি, তেমন আহম্মক আমি নই।

মনসুরের চোখা চোখা কথাগুলি তীরের মতন করুণাকে বিঁধিতে লাগিল। সে নীরবে পাণ্ডুর মুখে তাহা হজম করিয়া লইয়া আস্তে আস্তে বলিল, সে আমার অজানা নেই ডাক্তার, পুরী থেকে কি মনের চেহ্ন নিয়ে এসেচো জিজ্ঞেসা করি—বাপ্‌রে বাপ্! আমি চলে এলুম তুমি থাক্‌লে—ট্রেণে সে রাত কি কান্নাটা আমি কেঁদেছিলুম, তা তুমি হয় তো শুনে হাস্‌তে পারো; কিন্তু ভগবান যিশুর তো অজানা নেই। তোমাকে তার পর দিন কলেজের সুমুখে দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলুম, সেণ্টএণ্টুনি পল্‌কে ধন্যবাদ জানিয়ে মনে করলুম তোমার কাছে ছুটে যাই, কিন্তু তোমার ফ্রেণ্ডটা থাকায় বাধ্য হয়ে চুপ করে থাক্‌তে হোলো, বারাণ্ডায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলুম—পাইচারী করলুম, দু চার বার কেসেও ছিলুম—তুমি যখন কিছুতেই তাকালে না অগত্যা ক্লাসে এসে বসলুম! ভাবলুম, ছুটি হলে দেখা কোরব—ক্লাসে কি বাধা সে তো তুমি জানো, ছুটির পরে কত যে খোঁজা-খুঁজি কর্লুম, কিন্তু সব বৃথা। তার পর সে ক'দিন কলেজে গেলে না কেন বলো তো, তোমার বাসাটা বা কোথায় আর তার নম্বরই কি ছাই জানি যে গিয়ে খবরটা নিয়ে আসবো। কি ভাবনাটাই না বুকে চেপে দিয়েছিলে। ছাখো, অদেখা প্রিয়-জনের অমঙ্গল আশঙ্কাই কিন্তু বেশী করে মানুষকে পেয়ে বসে। মনে ভাবলুম—তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌চি যদি মিছে বলি—কি বা শক্ত অসুখ-বিসুখ হয়ে পড়লো, তার আবার বিদেশ, বিভুঁই দেখবার শুনবার একটা

লোকজনও নেই যার ভরসায় একটু চুপ করে থাকতে পারি, মনে মনে ছটফট্ করতে লাগলুম— একদম নিরুপায়—

মনসুর অভিমান-ভরা কণ্ঠে কথার মাঝখানে বলিয়া উঠিল, তাইতো দরদ দেখিয়ে সেদিন 'বাসে'ও একটা কথা পর্য্যন্ত বল্‌লে না !

করুণা তাহাকে দুই হাতে থামাইয়া দিয়া বলিল, সে-ই তো বলতে যাচ্ছিলুম, সে আমার অমার্জ্জনীয় অপরাধ ; যে শাস্তি তার দিতে চাও দিয়ো—মাথা পেতে নেবো। সেদিন 'বাসে' দেখে উল্লসিত হয়ে উঠ্‌লুম, কিন্তু 'বাস'-ভরা অত লোকের মধ্যে আত্মীয়তাটা গোপন করাই ভালো জান্‌লে, তা ছাড়া আমার সাথেও একটা লোক ছিল—ত্যাখো, তুমিই কি নিষ্কৃতি পাবে মনে ভাবচো? কেন, একটা কথা বলতে তোমাকেই বা কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল বলো তো ? তোমার অবহেলা এত আগুন জ্বালাতে পারে, সে আমার আগে জানা ছিল না, কিন্তু তবু শান্তি পেয়েছিলুম তোমাকে সুস্থ দেখে। তোমরা পুরুষরা বড়ো নিষ্ঠুর· নারীর বুকের ব্যথা যদি বুঝতে, তাহলে অমন নির্ব্বিকার থাক্‌তে পার্‌তে না গো। করুণা উদ্গত অশ্রুধারাকে রোধ করিতে পারিল না, শত শাসন-সংযমের বেড়া ভাঙিয়া মনসুরের সুমুখেই ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বর্ণনা শুনিয়া এবং অশ্রু দেখিয়া মনসুরের প্রতিজ্ঞা দুলিয়া উঠিল, সে কষ্টে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, অপ্রিয় সত্যি বলা অবিশ্যি নীতিবিরুদ্ধ। শোনো চ্যাটার্জ্জি, পুরুষেরা নিষ্ঠুর, কিন্তু তারা এক জনকেই ভালো বাস্‌তে জানে, তোমাদের মতন অমন দশজনের কাছে প্রেমের একই অভিনয় কর্‌তে শেখেনি।

করুণা চমকিয়া দৃঢ়হস্তে আঁচলে চোখ মুছিয়া তাহার মুখের পানে বিস্ময়ঘন দৃষ্টি মেলিয়া ধরিল। বলিল, দশ জনের কাছে প্রেমের একই অভিনয় কি রকম? এ কী বল্‌চো তুমি ?

কঠোর বাক্য একবার সঙ্কোচের বাঁধন কাটিয়া বাহিরে আসিতে শুরু করিলে অতি নির্দ্দয় হইয়া উঠে। মনসুরের মাথায় খুন চাপিয়া গিয়াছিল ; মরিয়া হইয়া বলিল, 'বাসে' সেদিন যাকে দেখ্‌লুম সে বড়লোক—তার প্রচুর টাকা, আমাকে পুরীতেই তো পরখ করেচো করুণা, বেশী কিছু আশা নেই, আবার ফাঁদে জড়ানোর ফন্দি কেন--ঠক্‌চো, অন্যদিকে দেখো।

করুণা চাবুক খাইয়া বিদ্যুতের মতন উঠিয়া দাঁড়াইল। বিষদৃষ্টিতে চাহিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল, ত্যাখো, আমাকে অতটা নীচ মনে কোরোনা, সে রকম বংশেও আমার জন্ম নয়। কী করেচি তোমার, যাতে এত বড়ো অপমানটা কর্‌তে আমাকে সাহস পেলে ! মানুষ ভুলানো কী আমার ব্যবসা—তুমি জানো ? না জেনে শুনে দোষ দিলে যে দোষারোপ করে, তারই মনের উচ্চতা জান্‌তে দেরী হয় না। যাকে সেদিন সঙ্গে দেখেছিলে সে আমার মাসীর ছেলে—দাদা।··· ছি ছি এতবড়ো কথাটা তুমি উচ্চারণ কর্‌তে পার্‌লে ?

মনসুরের মুখে কে যেন কালীর উপর কালী ঢালিয়া দিতে লাগিল। লজ্জায় মাথাটা মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইবার উপক্রম করিল, সে আর মুখ তুলিয়া চাহিতে পর্য্যন্ত পারিল না। নতমুখে বলিল, দা-দা, সে তো তুমি আগে বলোনি করুণা। শোনো, অপরাধ যত বড় গুরুতরই হোক না বিচার না করে মাফ কর্‌লে সবই করা যায়—সে দাবী কি আমার আছে ?

করুণা কথা বলিল না, মনসুরের মুখের পানে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মনসুর মুখ তুলিয়া চাহিতেই তাহার আগুনঝরা চাহনীর সহিত চোকোচোকি হইয়া গেল। বেদনাহত বিবর্ণ মুখে আড়ষ্ট কণ্ঠে জোর করিয়া বলিল, না জেনে যে দোষ-ত্রুটি করে তার অজ্ঞতাই কি অনুকম্পার যোগ্য নয়! তুমি হয়তো আর আমার মতো নীচমনা লোকের সঙ্গে ঘৃণাতেও কথা কইবে না, সে আমি অনুমান করতে পারচি ; কিন্তু তোমার মনে যে আঘাত দিয়েচি, তুমি হয়তো অবিশ্বাস কর্‌বে করুণা— সে আমাকে বজ্র হেনেচে। তোমারও বক্তব্য শেষ হয়েচে আমিও ছুটি চাচ্চি, এই দেখাই বুঝি আমাদের শেষ। কিন্তু যাবার বেলায় তোমার মনে আগুন রেখে চিরজীবন তার অভিশাপ কুড়াতে পারবো না। তুমি সব গ্লানি ধুয়ে, মুছে ফেলে আমাকে মুহূর্ত্তের জন্যে সরল মনে ক্ষমা করো। বলিয়া মনসুর দাঁড়াইয়া উঠিল।

করুণা আস্তে আস্তে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। কোমল কণ্ঠে বলিল, উঠো না, বোসো। ক্ষমা না নিয়ে তো আর যেতে পারবে না, দু একটা কথা শুন্‌তে আপত্তি

হয়তো না-ও থাকতে পারে, বসো। বলিয়া হাতে ধরিয়া করুণা তাহাকে বেঞ্চির উপরে বসাইয়া দিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া নিজেও তাহার গা ঘেঁসিয়া বসিল। খানিকক্ষণ মৌন হইয়া থাকিয়া মনসুরের লজ্জারক্ত মুখের পানে চাহিয়া দৃষ্টি অবনত করিল। বলিল, তুমি কি সত্যি কোনো সম্বন্ধ রাখ্‌তে চাও না ডাক্তার?

মনসুর কষ্টে জবাব দিল, রেখে কী হবে, আমার সংস্পর্শে এলে তোমার মনও যে খাটো হয়ে যাবার আশঙ্কা করুণা।

—আমি যদি বিদায় না দিই, তোমাকে আঁকড়ে ধরে থাকি।

—কিন্তু আমার তো বিবেক-বুদ্ধি বলে কিছু আছে। অধঃপতনের পথ থেকে তোমাকে রক্ষা করা তো কর্ত্তব্য।

—কর্ত্তব্য বনাম পলায়ন তো নয়?

প্রত্যুত্তরের আশায় কয়েক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া করুণা পুনরায় বলিল, যেতে চাও বাধা দেবো না, কিন্তু আমার কি উপায় করে যাবে শুনি? স্বর তাহার বিকৃত এবং অশ্রুপূর্ণ।

মনসুর চমকিয়া ঘাড় ফিরাইয়া করুণার ব্যথালিপ্ত করুণ মুখের পানে চাহিল। বলিল, তোমার উপায় কি রকম! যেমন আগে ছিলে, তেমনি। করুণা অসহিষ্ণু ভাবে ঘাড় দোলাইয়া বাধা দিয়া বলিল, তা হয় না ডাক্তার। আগের মতো থাকবোই যদি তাহলে তোমাকে আর মিনতি করতে যেতুম না। ডাক্তারী পড়ে আর মড়া কেটে প্রাণটা কী বিসর্জ্জন দিয়েচো তুমি, মায়া-মমতা কি একটুও নেই? ভালোবাসা কাকে বলে সে আমার জানা ছিল না, তুমি এমন করে' হাতে ধরে শিখিয়ে দিলে যে, একটা দিন যদি তোমাকে না দেখি, মনে হয় কত যুগ দেখিনি। দুনিয়ার সব হাসি-আনন্দ চোখের সুমুখ থেকে নিবে যায়। আমার এ হোলো কেন বলো তো। সত্যিকারের যাদুকর তুমি। আমার সব কিছু নিয়ে এমন অবহেলা হান্‌লে ত চল্‌বে না। উদ্‌গত জমাট-বাষ্পে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। করুণা মনসুরের কোলের উপর মাথা গুঁজিয়া শিশুর মতো ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মনসুর সময়োপযোগী সান্ত্বনা দিবার মতন উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাইল না। ম্লান-বিবর্ণমুখে করুণার চুলের উপরে ডান হাতখানি রাখিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল, করুণা তোমাকে অন্যায় সন্দেহ করেছিলুম—সে কী ভুলে গেলে?

প্রত্যুত্তরে করুণা সংযত হইয়া আস্তে আস্তে বলিল, ভুলিনি, সেই জন্যেই তো এত দুঃখ-বেদনার মধ্যেও আনন্দ আমি রাখ্‌তে পার্‌চিনে। কেন, জানো? তুমি যে আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেচ, এ তারই জ্বলন্ত প্রমাণ। আমাদের কলেজের লীলা আর প্রফুল্লের প্রণয়-কাহিনী তোমার অজানা না থাকবার-ই কথা, কেন সেই লীলার ওপরে একটি দিনের জন্যও তো মুখভার করোনি, তার কাছে অভিযোগ আনোনি। আমাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেছিলে, অভিমান করেছিলে, সে যে আমার সৌভাগ্য। যার ওপরে সত্যিকারের প্রাণের দাবী আছে, তাকেই আঘাত করে' ব্যথার সঙ্গে একরকম দুঃখ-জড়ানো সুখও অনুভব করা যায়। করুণা একটু থামিয়া সহসা তাহার একখানি পা চাপিয়া ধরিল। বলিল, এমনি করে তুমি আমাকে সন্দেহ কোরো, ব্যথা হেনো, আমি সব অকাতরে সহ্য কোরবো। দেবতা তুমি, যোগ্য আসনেই থেকো, হৃদয়হীনের মতো ভালোবাসার বস্তুকে পায়ে দলে সে আসন থেকে ধরার ধূলা মলিনতার মধ্যে নেমে এসো না।

মনসুর সবলে তাহার হাত টানিয়া লইয়া আনন্দোজ্জ্বল মুখে বসিয়া রহিল, কিন্তু চোখের কোণে তার অশ্রু দেখা দিয়াছিল।

অনেকক্ষণ পরে মনসুর দাঁড়াইয়া উঠিল। করুণা বলিল, চল্লে? মনসুর ঘাড় দোলাইয়া সম্মতি দিয়া বলিল, হুঁ।

করুণা তাহার পিছনে সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বলিল, কাল আসবে? মনে থাক্‌বে তো?

মনসুর সহসা দাঁড়াইয়া ঘাড় ফিরাইয়া তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। বলিল, তুমি স্মরণ করিয়ে না দিলেও আমি ভুলতুম না। থামিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া তাহার চুড়িসুদ্ধ হাতটা চাপিয়া ধরিয়া টানিয়া আনিয়া দুই গালে চুমুর উপর চুমু দিয়া মুখখানা রাঙা করিয়া তুলিল। করুণা বাধা দিল না, প্রতিদানও দিল না।

নীচে দরজার সম্মুখে আসিতেই করুণার সহিত তাহার দাদা দেবেন্দ্র কুমারের দেখা হইয়া গেল। তিনি শশব্যস্তে উপরে উঠিতেছিলেন। তাঁহাকে প্রশ্ন করিবার অবসর না দিয়াই বলিল, দাদা এসো, তোমার অপেক্ষাতেই এঁকে বসিয়ে রেখেছিলুম, তুমি চিনবে না—এঁর নাম মনসুর আহমদ—আমার ক্লাস ফ্রেণ্ড। পুরীতে সমুদ্রধারে বিশেষ করে আলাপ। ছোড়্‌দি, মা, বাবা সবাই চেনেন, আমরাও মাঝে মাঝে ওঁর বাসায় যেতুম।

দেবেন্দ্র প্রফুল্ল ভাব দেখাইয়া বলিলেন, নমস্কার, আপনার কথা শুনেছিলুম, পরিচয় পেয়ে সুখী হলুম।

করুণা মনসুরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, ইনি আমার দাদা শ্রীদেবেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়।

মনসুর বলিল, আদাব, আপনার কথা এঁর কাছ থেকে আগেই জেনেচি, আজকে দেখে আনন্দিত হলুম। আচ্ছা আসি, আপনার অবসর সময়ে দেখা হবে।

ক্রমশঃ

অধ্যাপক রমণের নূতন আবিষ্কার

এবার বিজ্ঞানের জন্য জগৎ-বিখ্যাত নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কটা রমণ। ১৯১৩ সালে সাহিত্যের জন্য এই ভারতবর্ষ হইতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই পুরস্কার পান। এইবার লইয়া ভারতবর্ষের ভাগ্যে দুইবার এই সম্মান ঘটিল।

নোবেল-পুরস্কারের উৎপত্তির বিবরণ গত সংখ্যা এই কাগজে বাহির হইয়া গিয়াছে সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখের আর প্রয়োজন নাই।

স্যার রমণ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর মাদ্রাজের অন্তর্ভুক্ত ত্রিচিনাপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। বালক কাল হইতেই তিনি অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। শুনিতে আশ্চর্য্য লাগে যে, ১৪ বৎসর বয়সে বালক রমণ এফ, এ পরীক্ষা পাশ করেন এবং তাহার পর ১৮ বৎসরে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি, এ এবং এম, এ উভয় পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন

কিন্তু তাঁহার জীবনী আরম্ভ হয় বিজ্ঞানাগার হইতে দূরে ভারতীয় সরকারের "ফাইনান্সের" দফতর খানায়। আফিসের কাজের মধ্য হইতেই তিনি বিজ্ঞানানুশীলনে ব্যাপৃত হন এবং আলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। এই সময় তাঁহার প্রতিভা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তদানীন্তন কর্ত্তা স্যার আশুতোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি স্যার রমণকে সরকারী দফতর হইতে তুলিয়া আনিয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক করিয়া দেন। সেই সময় হইতে তিনি গবেষণা কার্য্যে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন এবং অল্পকালের মধ্যে আলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা য়ুরোপীয় মনীষিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ১৯২৪ সালে তিনি ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটীর ফেলো মনোনীত হইলেন। ১৯২৮ সালে ভারত-সরকার তাঁহাকে "নাইট" উপাধিতে ভূষিত করেন। য়ুরোপের বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্মান-সূচক ডাক্তার উপাধি দেওয়া হয়। ইতালীর সরকার তাঁহাকে ম্যাতুইচি পদক দিয়া সম্মানিত করেন এবং সম্প্রতি ইংলণ্ডের রাজা তাঁহাকে হিউস্ মেডেল দিয়া ভূষিত করিয়াছেন।

অধ্যাপক চন্দ্রশেখর বেঙ্কটা রমণ

পদার্থ-বিজ্ঞানের জন্য বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত যে পনেরো জন মনীষি এই পুরস্কার পাইয়াছেন,

তাঁহাদের মধ্যে রন্‌জেন (১৯০১), ম্যাদাম কুরী (১৯০৩), মার্কনী (১৯০৯), আইনষ্টাইন (১৯২২) এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের প্রত্যেকেই তাঁহাদের জ্ঞান-সাধনায় যুগান্তর আনিয়াছেন। ডাঃ রন্‌জেন বিখ্যাত X-rayর আবিষ্কার করেন। ম্যাদাম কুরী 'রেডিয়াম' আবিষ্কার করেন। X-ray এবং রেডিয়াম আজ চিকিৎসা-শাস্ত্রে যুগান্তর আনিয়াছে। বর্ত্তমান জগতের অন্যতম বিস্ময় বেতার বার্ত্তার আবিষ্কারক হইলেন মার্কনী এবং আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকবাদ বৈজ্ঞানিক দর্শনবাদের আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। আজ এই সমস্ত যুগান্তরকারী প্রতিভাদের সহিত ডাঃ রমণের নামও সংযুক্ত হইল। নিম্নে "প্রকৃতির" ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা হইতে অধ্যাপক রমণের আবিষ্কার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটী উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল,—

আপেক্ষিক তত্ত্বের আবিষ্কারক আইনষ্টাইন

অধ্যাপক স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কাটরাম রমণের নূতন মৌলিক গবেষণায় পদার্থ-বিজ্ঞান-জগতে নূতন সাড়া আসিয়াছে।...এই বিষয় কিছু বলিতে গেলে, ১৯০০ সালে মনীষি প্লাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত আলোকের কণাবাদ (Quantum Theory) হইতে আরম্ভ করিতে হয়। তাঁহার মতে, আলোক যখন একস্থান হইতে অন্যস্থানে পড়ে, তখন কতকগুলি সূক্ষ্ম বিকম্পমান কণা (oscillator) তাপকে ছোট ছোট কণাপরিমাণে এক স্থান হইতে আর এক স্থানে লইয়া যায়। প্লাঙ্কের তাপপ্রবাহের এই কণাবাদ অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয় সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দেয় বটে, কিন্তু উপরোক্ত বিকম্পমান কণার অস্তিত্ব লইয়া এখনও অনেক মতভেদ আছে। প্লাঙ্কের বিকীরণধারা (Radiation formula) নির্ণয় করিতে হইলে এই বিকম্পমান কণার শক্তি নিরূপণ করিতে হয়, এবং নিরূপণকালে র‍্যালেজিন্‌সের প্রাচীন ধারার (Classical formula) সাহায্য লইতে হয়। কিন্তু প্রাচীন মতে পদার্থ-বিজ্ঞানের যে সকল তত্ত্বের ব্যাখ্যা হয় না, তাহা বুঝাইবার জন্যই প্লাঙ্ক তাপপ্রবাহের কণাবাদ প্রচার করেন। তাপপ্রবাহের প্রাচীন ব্যাখ্যা অনেকেই বোধ হয় জানেন। ইহা প্রথমে ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল প্রচার করেন। ম্যাক্সওয়েলের মতে আলোকপ্রবাহ গোলাকার তরঙ্গরূপে চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়।

জগদ্বিখ্যাত মনীষী আইনষ্টাইন আলোকপ্রবাহের আণবিক তত্ত্বের এক সুন্দর সমাধান করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, পণ্ডিতপ্রবর বোর (Bohr) পরমাণুর প্রকৃতির যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা হইতে প্লাঙ্কের বিকম্পমান কণার কোনরূপ সাহায্য না লইয়াও তাঁহার বিকীরণ-ধারার নির্ণয় করা যায়। আইনষ্টাইনের যুক্তি এইরূপ—

বোরের মতে একটি পরমাণুর মধ্যে একটা ভারী অংশকে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি ইলেক্‌ট্রন বা তাড়িত-কণা বৃত্তাকার পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একটি পরমাণুর মধ্যে এইরূপ বৃত্তাকার পথের সংখ্যা অনেক। বোরের মতে যখন একটি পরমাণু উত্তেজিত হয়, তখন একটি ইলেক্‌ট্রন্ কাছের বৃত্তাকার পথ হইতে দূরের বৃত্তের মধ্যে পড়ে। তখন এই ইলেক্‌ট্রন তাপশক্তি শোষণ করে। অনেক সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে একটি ইলেক্‌ট্রন দূরের বৃত্তাকার পথ হইতে কাছের বৃত্তাকার পথে বিক্ষিপ্ত হয়। এই সময়ে ইলেক্‌ট্রন হইতে তাপ নির্গত হইয়া থাকে।

বোরের পরমাণুর এই ব্যাখ্যা হইতে প্লাঙ্কের বিকীরণ-ধারা নির্ণয় করিতে গিয়া আইনষ্টাইন দুইটি বিষয় অনুমান করেন। তিনি স্বীকার করেন যে, পরমাণুর মধ্যে যখন একটি ইলেক্‌ট্রন ছোট বৃত্তাকার পথ হইতে বড় বৃত্তাকার পথে নিপতিত হয়, তখন খানিকটা উত্তাপ শোষণ করে। কিন্তু বড় বৃত্তাকার পথ হইতে ইলেক্‌ট্রন ছোট বৃত্তাকার পথে পতিত হইলে তাপ দ্বিধা নির্গত হয়। একটিকে স্বতোনির্গম (spontaneous emission) আর একটিকে বিপরীতার্থক শোষণ (negative absorption) বলে।

প্রথমতঃ যখন বড় বৃত্তাকার পথে ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা বেশী হয়, তখন ভারসাম্যের (equilibrium) জন্য আপনা-আপনিই কিছু কিছু ইলেক্‌ট্রন ছোট বৃত্তাকার পথে পড়ে। ইহাকে স্বতোনির্গম বলে। দ্বিতীয়তঃ পতিত আলোক-রশ্মির প্রাখর্য্য অনুসারে বড় বৃত্তাকার পথ হইতে ছোট বৃত্তাকার পথে পড়ে। ইহাকে বিপরীতার্থক শোষণ বলে। ইহাকেও তাদের এক রকম নির্গম বলা যায়। কাজেই মোটামুটি ব্যাপার দাঁড়াইল এই যে, পরমাণু উত্তেজিত হয়। এই আবিষ্কারের জন্য কম্‌টন্ নোবেল্ পুরস্কার পান। কম্‌টনের মতে রণ্টগেন রশ্মি ঠিক পরমাণুকে ধাক্কা দেয় না, তাহার পারিপার্শ্বিক ইলেক্‌ট্রনগুলিকে ধাক্কা দেয় মাত্র। রমণের আবিষ্কারের তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে এই কথাটি মনে রাখা আবশ্যক।...

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্মেকল (Smekal) বলিয়াছিলেন যে, আইনষ্টাইনের মতানুসারে সাধারণ আলোকরশ্মি একটি অণু বা পরমাণুর উপর পড়িলে দুইভাবে প্রতিক্ষিপ্ত হইতে

X-Ray র আবিষ্কারক ডাঃ রণজেন

রেডিয়ামের আবিষ্কারক ম্যাদাম কুরী

হইলে ইলেক্‌ট্রন ছোট বৃত্তাকার পথ হইতে বড় বৃত্তাকার পথে আসিবার সময় তাদের শোষণ হয়, এবং বড় বৃত্তাকার পথে বিক্ষিপ্ত হইবার সময় দুইভাগে শক্তিনির্গম হয়। শীঘ্রই এই শোষণ ও নির্গমের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপিত হয়। এই কল্পনা হইতেই আইনষ্টাইন প্লাঙ্কের বিকীরণধারা নির্ণয় করেন।

পণ্ডিতপ্রবর কম্‌টন্ ইহার পরে এক বিচিত্র গবেষণা করিয়া বিজ্ঞানজগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তিনি দেখাইলেন যে, রণ্টগেন্ রশ্মি বা এক্স-রে একটি পরমাণুর উপর পড়িলে পরমাণুর ইলেক্‌ট্রনগুলিকে ধাক্কা দিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার কম্পন-শক্তিরও অনেকটা হ্রাস পারে। প্রথমতঃ—পরমাণুর মধ্যে উপরের একটি বৃত্তাকার পথ হইতে ইলেক্‌ট্রন নীচের কোন বৃত্তাকার পথে পড়িতে পারে। তখন ইলেক্‌ট্রন তাপ নির্গত করে। কাজেই প্রতিক্ষিপ্ত আলোকরশ্মির তেজ বেশী হয়। দ্বিতীয়তঃ—নীচের একটি বৃত্তাকার পথ হইতে আলোক-রশ্মি উপরের একটি বৃত্তাকার পথে পড়িতে পারে। তখন ইলেক্‌ট্রন তাপ শোষণ করে; কাজেই প্রতিক্ষিপ্ত আলোকরশ্মির তেজ কমে। স্মেকলের এই ভবিষ্যদ্বাণী এযাবৎ কেহ কার্য্যতঃ দেখাইতে পারেন নাই। এতদিন সকলে গ্যাস লইয়া কাজ করিয়াছিলেন। গ্যাসের মধ্যে অণু ও পরমাণুগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও কম সংখ্যায় থাকে।

কিন্তু তরল পদার্থ-মধ্যে অণু ও পরমাণুগুলি জমাট বাঁধিয়া থাকার জন্য আলোকরশ্মি তন্মধ্যস্থ যে কোন অণু বা পরমাণুর ইলেক্‌ট্রনগুলিকে ধাক্কা দিবার অনেক বেশী সুযোগ পায়। কাজেই সেই সময়ে দুইপ্রকারের—একটি কম তেজের ও একটি বেশী তেজের—আলোকরশ্মি প্রতিক্ষিপ্ত হইতে পারে এবং উহাদিগকে ফটোগ্রাফীর বোরের পরমাণুর প্রকৃতির এবং আলোকপ্রবাহের কণাবাদেরও সুন্দর মীমাংসা হইয়াছে। প্রিংসহাইম্ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা অধ্যাপক রমণের এই আবিষ্কার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহারা রমণের এই আবিষ্কারকে "রমণ-এফেক্ট" নামে অভিহিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, একজন ভারতবাসীর এইরূপ
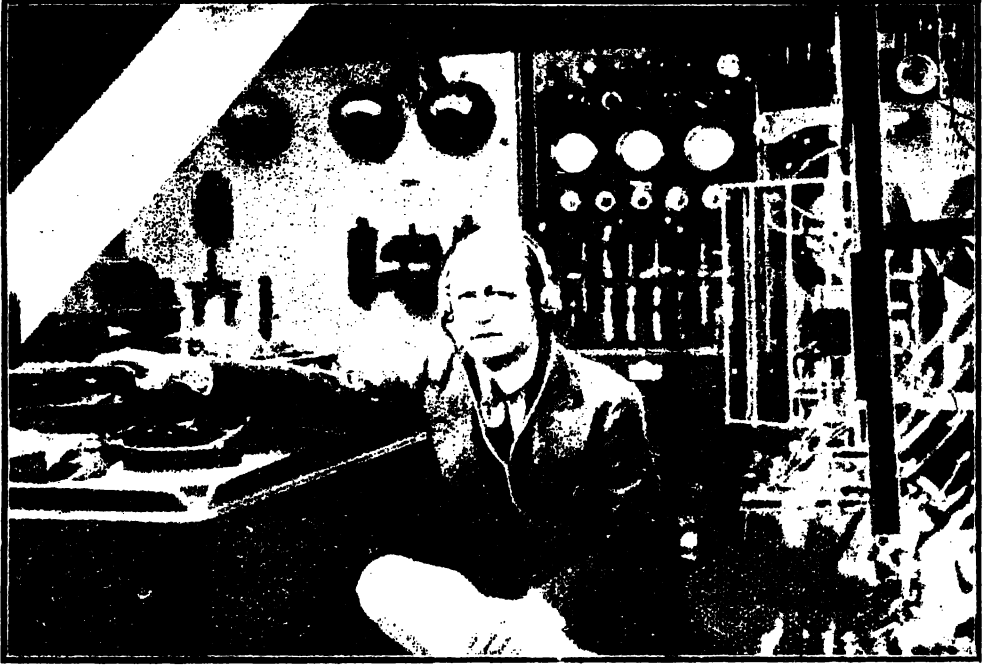
বেতারের আবিষ্কর্ত্তা সিনোর মার্কনী

সাহায্যে ধরা যাইতে পারে। অধ্যাপক স্যার সি, ভি, রমণ তরল পদার্থ লইয়া পরীক্ষা দ্বারা উহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই বিচিত্র আবিষ্কারের ফলে আইনষ্টাইনের অনুমানগুলির—অর্থাৎ পরমাণুর উপর আলোকরশ্মির সংঘর্ষণের ফলে তাপের বিকীরণ ও শোষণ এবং তৎসঙ্গে স্বতোনির্গম ও বিপরীতার্থক শোষণের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে। সাফল্যে ও যশঃপ্রাপ্তিতে আমরা সকলেই গৌরবান্বিত হইয়াছি। "রমণ-এফেক্ট" ও "কম্‌টন্-এফেক্ট"-এর মধ্যে অনেকটা সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু "রমণ-এফেক্ট" আলোক-রশ্মি পরমাণুর মধ্যস্থিত ইলেক্‌ট্রনের উপর পড়িয়া প্রতিক্ষিপ্ত হয়; কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, "কম্‌টন্-এফেক্ট" আলোকরশ্মি পরমাণুর পারিপার্শ্বিক ইলেক্‌ট্রনের উপর পড়িয়া প্রতিক্ষিপ্ত হয়।

দেশ-বিদেশে নারী

ইতালীতে

সিগারেট-মুখে যে মহিলাটীর চিত্র পার্শ্বে দেখান হইতেছে, তাঁহার নাম মেরিয়া আলেসান্দ্রী। ইনি বর্ত্তমান ইতালীর একজন বিশিষ্ট অভিনেত্রী। মুসোলিনী পাশ্চাত্য নারীর অবাধ স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে কতকগুলি আইন প্রণয়ন করেন। তাহার মধ্যে একটী যে, সাধারণতঃ নারীরা প্রকাশ্যভাবে সিগারেট খাইতে পারিবেন না। এই নারী সেই আইনের অমর্য্যাদা করার দরুণ মুসোলিনী কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়াছেন।

আমেরিকায়

মহিলাটীর নাম মিসেস্ মার্থা ষ্টাকী। দেশ আমেরিকায়। বয়স নব্বুই। মাথার উপর যে বিচিত্র বস্তু দেখিতেছেন, তাহার কার্য্য হইতেছে চুল কোঁকড়ান। মিসেস্ মার্থা বলেন যে, নব্বুই বছরেও নারীকে সুন্দর হইবার সাধনা করার প্রয়োজন।

মিস্ মেয়োর দেশে

মেয়েটীর নাম মিসেস্ সারা কোহেন। বাড়ী যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগো প্রদেশে। মিস্ মেয়োর দেশে। এগারো বৎসরে ইহার বিবাহ হয়, বারো বৎসরে ইনি জননী হন এবং বর্ত্তমানে ১৫ বৎসর বয়সে ইনি স্বামী দ্বারা ডাইভোর্স্‌ড অর্থাৎ আইনতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছেন। মিস্ মেয়োর দেশেও এই সব সম্ভব হয়?

ফ্রান্সে

রমণী দুটীর নাম অ্যামি পানের এবং পিয়ারেতে বুয়ার। দেশ অবশ্যই ফ্রান্সে। ইঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য ইংলিস্ চ্যানাল পার হওয়া। এইজন্য এক রকমের নূতন নৌকো ধরণের বাইসিকেল তৈরী করান হইয়াছে এবং তাঁহারা দুইজনে উক্ত যন্ত্র চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন। সাঁতার না কাটিয়া, নৌকা না চড়িয়া জলের উপর দিয়া এই যন্ত্রের সাহায্যে যাওয়া যায়।

রুশিয়ায়

বোলশেভিক গভর্ণমেণ্ট নারীদের সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিয়াছেন। ছবিতে দণ্ডায়মানা সৈন্যদল রুষনারী সৈন্যের এক অংশ। রুশিয়ার এই ব্যবহারে য়ুরোপের অন্যান্য দেশের সরকার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া জানাইয়াছেন যে নারীকে হত্যার কার্য্যে শিক্ষা দেওয়া অন্যায়। কিন্তু রুশিয়াকে উপদেশ দিবার বেলায় উক্ত জাতিরা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, মহা-যুদ্ধের সময় তাঁহারাই বোমা তৈরীর জন্য কারখানায় নারীদেরই নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ভারতে

ভারতে আজ কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীরা যাঁহাদের সূর্য্যকরও কোনও দিন দেখিতে পায় নাই,— নারী-স্বাধীনতার আহ্বানে নয়, আহত স্বামীর, আহত ভ্রাতার, আহত পুত্রের পাশে দাঁড়াইবার জন্য মৃত্যু-ভয়কে উপেক্ষা করিয়া পুরুষের সংগ্রামের সহযাত্রীরূপে দাঁড়াইয়াছেন।

বেচা-কেনা

জালালউদ্দিন রুমির ভাব অবলম্বনে

আহ্‌মদ নওয়াজ, বি-এ, বি-টি

ছুটিছে জনৈক যুবা মসজিদের পানে,
হেনকালে দেখিল সে পথে মধ্যখানে,
ফিরিছে মুসল্লিগণ দলে দলে ঘরে।
জিজ্ঞাসিল যুবা, "কেন যাও ভাই ফিরে,
তবে কি তোমরা সবে জামায়েত সারি,
ফিরিতেছ গৃহপানে এবে সারি সারি?"

মুসল্লির মাঝে হতে কহে একজন,
মসজিদের পানে তব যাওয়া অকারণ,
এবাদৎ সাঙ্গ করি খোদ পয়গম্বর,
বিদায় দিলেন তাই ফিরিতেছি ঘর!
কেন কর মিছামিছি ছুটাছুটি আর,
আরত নামাজ নাহি পাবে পুনর্ব্বার

যুবক কহিল "হায়কার মুখ হেরি,
উঠেছিনু প্রাতে আজ হলো তাই দেরি!"
রহিল চাহিয়া যুবা নেত্র ছল ছল,
দুচোখ ফাটিয়া তার বাহিরিল জল।
মাঝে মাঝে বুক ফাটা পড়িল নিশ্বাস,
করিল কতই যুবা হায়, হা হুতাশ।

যুবকের এই দশা হেরিয়া নয়নে,
কহেন মুসল্লি এক বিনম্র বচনে;—
"আমার নামাজ তোমা দিতে পারি ভাই,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস তব যদি শুধু পাই।"
যুবক নিশ্বাস তার করিয়া প্রদান,
নামাজ কিনিয়া সুখে করিল প্রস্থান।
পুণ্যাত্মা মুসল্লি করি নামাজ বিক্রয়,
যুবকের দীর্ঘশ্বাস করিলেন ক্রয়।

আসিল আওয়াজ রাতে পুণ্যাত্মার সনে,
শুনিলেন এই নেদা মুদ্রিত নয়নে—
তুমি যা কিনেছ নাহি তুলনা তাহার,
খরিদ করেছ তুমি জীবনের সার।
তোমার চরিত্র গুণে আজ সবাকার,
নামাজ কবুল হলো দরগায় খোদার।

বিয়ে-পাগলা বুড়ো *

মিসেস্ আর, এস্ হোসেন

শুনিয়াছি, সারদা বিল পাশের সঙ্গে সঙ্গে "কচি মেয়ের সহিত বুড়ো বরের বিবাহ নিষিদ্ধ" বলিয়া আর একটা বিল পাশ হইবার কথা ছিল। ব্যবস্থাপক সভায় এই বিল পাশ হইলে শরিয়তের নামে তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা হইত কিনা, তাহা অনুমান করা সহজ নহে। অত্র দুই তিন জন বিয়ে-পাগলা বৃদ্ধের বিবাহের ইতিহাস পাঠিকা ভগিনীদের উপহার দিব। আশা করি, ইহা পাঠে তাঁহারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিবেন না।

১

পূর্ব্ব বঙ্গের একটী পল্লী-গ্রামে একজন সত্তর বর্ষীয় বর ক্রমে সাত জন বিবীকে নিরাপদে জান্নতে পৌঁছাইয়া দিয়া অষ্টম বার বিবাহ করিতে চাহিলেন। গ্রামের দুষ্ট লোকেরা বেচারার দুর্ণাম রটনা করিয়াছিল যে বুড়াটা বউ-খেকো; কাজেই আর কেহ তাঁহাকে কন্যাদানে সম্মত হয় না। মাতব্বর সাহেব বৃদ্ধ হইলেও বিবিধ খেজাবের কল্যাণে তাঁহার মাথার চুল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল; দাড়ী গোঁফ ও কলপ রঞ্জিত করিয়া ভ্রমর-কৃষ্ণ মুখশ্রী বেশ সুন্দর করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার নগদ টাকাও যথেষ্ট আছে। বাক্স ভরা রূপার গয়না, একটা সোণার সিঁথী এবং এহুদী মাকড়ী; সিন্দুক ভরা কাপড়—তবু কোন হতভাগা তাঁহাকে কন্যাদানে সম্মত নয়।

অবশেষে পাড়ার কতিপয় যুবকের মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তাহারা বহু কষ্টে একটী পাত্রী ঠিক করিয়া মাতব্বর সাহেবকে জানাইল যে, কুমারী মেয়ে পাওয়া গেল না, একটী বাল-বিধবা আছে। বয়স একটু বেশী,—২২।২৩ বৎসর, আর একটু হৃষ্ট-পুষ্ট লম্বা গোছের মেয়ে। তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তা ভালই, কুমারী যখন পাওয়া যায় না, তা আর কি করা।"

ঘটকেরা বলিল, বিধবা বটে,—তবে পাঁচ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, ছয়মাস পরেই বিধবা হইয়াছে। তদবধি পিতামাতার অন্ন ধ্বংস করিতেছে; এখন মুরুব্বিরা তাহাকে পাত্রস্থা করিতে চায়। যদি আপনি পছন্দ না করেন, তবে এ সম্বন্ধ ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি সোৎসাহে বলিলেন, "না, না,—এ সম্বন্ধ ছাড়া হইবে না,—বয়স একটু বেশী হওয়ায় সুবিধাই হইবে—ভালমতে ঘর গেরস্তি করিতে পারিবে"।

যথাকালে মাতব্বর সাহেব বরবেশে বিবাহ সভায় উপস্থিত হইলেন। বিবাহ বেশ ঘটা করিয়া হইতেছে; ঘটকেরা তাঁহার নিকট হইতে অনেক টাকা লইয়া খুব ধুমধামের সহিত আয়োজন করিয়াছে।

ক'নের সম্পর্কের এক নানী এবং পাড়ার ছেলের দল বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকিয়া আচার-পদ্ধতি পালন করিতেছে,—এ নিয়ম, সে নিয়ম—নিয়ম আর শেষ হয় না। ছোকরাগুলি মুখ টিপিয়া হাসে—আর ফিস্ ফিস্ করিয়া নানীবিবীর সহিত কথা কহিয়া সেই উপদেশ মত কাজ

* অবিকল সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

করে। বরের সম্মুখে বড় মোটা খেরুয়ার পর্দ্দা—সেই পর্দ্দার অপর পার্শ্ব হইতে স্ত্রীলোকদের চাপা হাসি শোনা যাইতেছে বর অধীর ভাবে শুভ-দৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; বিলম্বের জন্য মনে মনে গ্রাম্য আচার-পদ্ধতির মুণ্ডপাত করিতেছেন। তিনি পার্শ্বোপবিষ্ট ক'নের অলঙ্কারের মৃদু ঝনঝনি শুনিতেছেন, আর সতৃষ্ণ নয়নে ক'নের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। পাত্রীর হাত-পা সব মোটা বানারসী সাড়ীতে ঢাকা, কিছুই দেখা যায় না; কেবল ক্রেপের ওড়নার ভিতর হইতে বাদল জড়ানো স্থূল ও সুদীর্ঘ চুলের বেণী দেখা যাইতেছে। চুলের বেণীটা ক'নের পিঠ বহিয়া ফরশের উপর পড়িয়াছে। বৃদ্ধ মনে মনে ভারী সন্তুষ্ট যে আর কিছু না হইলে ও আমার বউ যেন কেশের রাণী। এ গ্রামে এমন ঘন লম্বা চুল আর কার আছে?

অনেকক্ষণ প্রাণঘাতী ধৈর্য্যের পর দর্পণ আসিল,—এখন শুভ দৃষ্টি। অবগুণ্ঠন তুলিবার সময় পর্দ্দার অপর পার্শ্বস্থিত চাপা হাসি কলহাস্যে পরিণত হইল, এ দিকে বৃদ্ধ চমকাইয়া উঠিলেন,—বউএর মুখে ইয়া দাড়ী, ইয়া গোঁফ! বউ খিল খিল করিয়া হাসিয়া এক টানে মাথার পরচুলাটা খুলিয়া বরের সম্মুখে রাখিল। হতভম্ব বর তখন দাড়ী-গোঁফশোভিত ক'নেকে চিনিলেন যে, সে তাঁহার সম্পর্কের নাতী কালুমিয়াঁ! সে দন্ত বিকাশ করিয়া বলিল,—"নানা ভাই! শ্যাষে আপ্‌নে আমাইরে বিয়া করলেন?" মাতব্বর সাহেব অতি ক্রোধে কি বলিবেন, ঠিক করিতে না পারিয়া কেবল বলিলেন, "তোমরা যে এমন নাদান, তা জানতাম না!" আর সক্রোধে সেই বাদলা জড়ানো সুন্দর বেণীটাকে তুলিয়া এক আছাড় দিলেন। পরে যথা সম্ভব দ্রুতগতিতে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

২

পাটনায় এক ৬৫।৭০ বৎসরের কাজী সাহেব ক্রমাগত কয়েকটী স্ত্রী বিয়োগের পর পুনরায় বিবাহ করিতে চেষ্টা করিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ও "জরু খাওকা" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া সহজে আর জরু ধরিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার মেহদী-রঞ্জিত দাড়ীর জালে কোন সুন্দরীই ধরা পড়িল না।

অবশেষে কয়েক জন প্রৌঢ় ভদ্রলোক উপরোক্ত কাজী সাহেবের জন্য ঘটকালী করিবার নিমিত্ত আসরে নামিলেন। কন্যা সহজে পাওয়া যায় না, কারণ শহরে যে কয়টী বিবাহ-যোগ্যা পাত্রী ছিল, তাহাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বহু অর্থব্যয়ে একজনের ১০ম বর্ষীয়া কন্যা সংগ্রহ করা গিয়াছে। কন্যা পক্ষকে ছয়, সাত মাস পর্য্যন্ত অনেক পর্ব্বী, তেহারী দিতে হইল,—চাকরদের বখশিশ দিতে হইল।

এই প্রকার অনেক খরচ-পত্র, কাণ্ডকারখানার পর কোন এক শুভ দিনে বিবাহের তারিখ ধার্য্য হইল। যথাকালে বর প্রাঙ্গনে শামিয়ানার নীচে আনীত হইলেন। এ বিবাহ সভায়ও এ রছম, সে রছম,—নানাবিধ মেয়েলী রছম (অর্থাৎ স্ত্রী আচার) শেষ হইলে পর বর-ক'নের শুভ-দৃষ্টি হইবার সময় প্রভাত হইয়া গেল। বর সানন্দে দেখিলেন, বালিকা বধূর কপালে নানাবিধ রঙ্গের চাঁদ, তারা, চুম্‌কি আঁটা হইয়াছে; গাল দুটী আফ্‌শাঁ জড়িত হইয়া ঝক্‌মক্ করিতেছে; সে কি সুন্দর বধূর সৌন্দর্য্য উথলিয়া পড়িতেছে। পাটনার নিয়ম অনুসারে ক'নেকে একজন মিরিয়াসিন * কোলে তুলিয়া লইয়া বাসর ঘরে চলিল; বরের আচকনের সম্মুখের দামনের সহিত ক'নের বানারসী দোপাট্টার এক কোণ বাঁধিয়া দেওয়া হইল। বর সেই গ্রন্থি ধরিয়া ধীরে ধীরে পাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সহসা পাত্রী মিরিয়াসিনের কোল হইতে লাফাইয়া নামিয়া দিল দৌড়! বেচারা কাজী সাহেবের হাতে ক'নের ওড়নার কোণের গ্রন্থি ছিল, সুতরাং অগত্যা তাঁহাকেও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতে হইল! দৌড়াইবার নির্দ্দিষ্ট পথ পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করা ছিল,—তদনুসারে পায়ের অলঙ্কারসমূহ—ছড়া, মল, ঘুঙুর, পরিছম, পা-জেব ইত্যাদি ছুমুর ছুমুর, ঝুমুর ঝুমুর শব্দে বাজাইতে বাজাইতে পাত্রী চলিল, বাহিরের পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া,—সেখানে রাখাল ছোকরাগুলি করতালি দিয়া তাহাদের পিছু পিছু ছুটিল। পরে বাগানে দৌড়াইতে গেল, সেখানে মালীরা হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিল। অতঃপর পাত্রী

---

* মিরিয়াসিন এক প্রকার গায়িকা বিশেষ; ইহারা পুরুষের মজলিশে গীত বাদ্য করে না। কেবল মেয়ে মহলে বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া নাচ গান করে এবং বিবাহ ইত্যাদি উৎসবে স্ত্রী-আচার পালন করে।

গেল নহবৎখানায়,—সেখানে বাজনদারেরা তবলা সারেঙ্গী বাজাইয়া গান করিতেছিল। তাহারা করতালি দিয়া গলা ছাড়িয়া গাহিল,—"বাঃ বেটি বাঃ! দৌড়তি হুয়ী ডুলহিন্ তোম্হেঁ মোবারক বড়ে মিয়াঁ!—আজী ভাগ্‌তী হুয়ী ডুলহিন্ তোম্হেঁ মোবারক বড়ে মিয়াঁ!!—"

চারিদিকে খুব খানিকটা চক্কর দিয়া ক'নে গিয়া উঠিল, কর্ত্তার বৈঠকখানায়। সেখানে অনেক সাহেব, সুবো অভ্যাগত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা হাসিয়া আকুল—লুটাপুটি! তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পাত্রী একে একে তাহার সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিল। বানারসী সাড়ী দোপাট্টা—সব খুলিয়া ফেলিলে দেখা গেল, সে একটী দিব্য-কান্তি বালক!! আহা বেচারা কাজী সাহেব!

৩

ভাগলপুরের এক ষ্টেশনমাষ্টার বয়োপ্রাপ্ত পৌত্র ইত্যাদি বর্ত্তমানেও পঞ্চমবার বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি এখন ষ্টেশন মাষ্টারের কাজ হইতে অবসর লইয়াছেন। তিনি মুজফ্‌ফরপুরের অধিবাসী। বহুকাল ভাগলপুরে ছিলেন বলিয়া সেখানকার লোকেরা তাঁহাকে বিলক্ষণ চিনে এবং তাঁহাকে ষ্টেশন মাষ্টার বলিয়া ডাকিতেই ভালবাসে।

মুজফ্‌ফরপুরে খাঁ সাহেবের পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি যথেষ্ট আছে। স্ত্রী পুত্র সেইখানেই থাকে। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী বিয়োগ হওয়ার সময় ছেলেমেয়েরা সব ছোট ছিল। সুতরাং তাহাদের প্রতিপালনের নিমিত্ত তাঁহাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে হইল।

খাঁ সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর সময় মেয়েরা বিবাহিতা ছিল, কিন্তু ছেলেদের বিবাহ হয় নাই, সুতরাং ছেলেদের বিয়ে-থা দিবার সময় কুটুম্ব সাক্ষাতের সমাদর অভ্যর্থনা ইত্যাদি করিবার জন্য নিতান্ত বাধ্য হইয়া তাঁহাকে তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করিতে হইল।

খাঁ সাহেবের গৃহ যখন বধূ, জামাতা, বয়োপ্রাপ্ত পৌত্র, দৌহিত্র ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ সেই সময় তাঁহার তৃতীয়া খানম দেহত্যাগ করিলেন। এবার তাঁহার বন্ধুরা বলিলেন, দুই চারি বৎসর পরে পৌত্রের বিবাহ দিয়া বধূ আনিবেন, নিজে আর বিবাহ করিবেন না। কিন্তু খাঁ সাহেব বলিলেন, ঘর সামলাইবে কে? বড় বউ, মেজ, সেজ এবং ছোট বউ এরা তিন চারি বা ততোধিক সন্তানের মাতা হইয়াছে, সত্য, কিন্তু হাজার হউক তবু তাহারা ছেলে-মানুষ বই ত নয়। এত বড় সংসার দেখিবে কে? বন্ধুদের সহানুভূতি না পাইয়া শেষে তিনি অতি গোপনে এক দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকাকে পত্নীরূপে ঘরে আনিলেন। বউয়েরা সে সময় পিত্রালয়ে গিয়াছিল, বাড়ীতে কেহ ছিল না।

বউএরা বাড়ী আসিয়া জানিতে পারিল যে, তাহাদের নূতন শাশুড়ী আসিয়াছেন। তাহাদের দেখিয়া শাশুড়ী তাড়াতাড়ি কামরার দ্বারে অর্গল দিলেন। বউয়েরাও আড়ি পাতিয়া রহিল। যেই একবার দ্বার খুলিল, অমনি সেজবউ একেবারে শাশুড়ীকে কোলে তুলিয়া আনিয়া বারাণ্ডায় তক্তপোষের উপর বসাইয়া দিল। ছেলেমেয়ের দল ডুলহিন দেখিবার জন্য ঘেরিয়া দাঁড়াইল, এবলে "ডুলহিন দাদী", ও বলে, "ডুলহিন নানী!"

ফল কথা, চতুর্থী খানম মোটেই ঘর সংসার দেখেন না, কেবল পৌত্রী দৌহিত্রীদের সঙ্গে তাশ খেলে আর গল্প করে। এই জন্য খাঁ সাহেবকে পঞ্চমবার বিবাহ করিতে হইতেছে। পোড়া মুজফ্‌ফরপুরে বিবাহের সুবিধা না হওয়ায় তিনি ভাগলপুরে তশরীফ আনিয়াছেন। এখানে তিনি সহানুভূতি ও সহৃদয়তা,—দুইই পাইলেন।

যথাসময় খাঁ সাহেবের বিবাহ হইয়া গেল, শুভদৃষ্টিও হইল। বাসর ঘরে পাত্রীকে লইয়া যাওয়া মাত্র তাহার মূর্চ্ছা হইল। সেবা-শুশ্রূষার জন্য স্ত্রীলোকেরা আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিল, কাজেই খাঁ সাহেবকে বাহিরে যাইতে হইল।

খাঁ সাহেব কয়েকদিন শ্বশুর বাড়ীতে অবস্থান করিয়া শেষে অন্যত্র বাসা লইলেন। ইতোমধ্যে তিনি আর এক-বারও নববধূকে দেখিতে পান নাই, কারণ সর্ব্বক্ষণ হাকীম, ডাক্তার ও স্ত্রীলোকদের ভীড় থাকিত।

অবশেষে স্থির হইল যে ডুলাহিনের পারিবারিক হাকীমের চিকিৎসা হইবে। সেজন্য প্রতিদিন সকালে হাকীম সাহেবের নিকট বধূর কারুরা * পাঠাইতে হইবে।

* কারুরা—মূত্র। আর যে কাচের পাত্রে এ জিনিষটা পরীক্ষার নিমিত্ত রাখা হয়, তাহাকেও কারুরা বলে।

চাকর-বাকর ঠিকমত কথা শুনে না, কারুরা নিয়ম মত হাকীমের নিকট প্রেরিত না হওয়ায় রোগ বাড়িয়াই চলিয়াছে। অগত্যা খাঁ সাহেব নিজেই প্রতিদিন সকালে আসিয়া কারুরা লইয়া হাকীম সাহেবের নিকট যাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে হইতেছে।

হাকীম সাহেব প্রত্যহ স্মিতমুখে ৫৲ দর্শনী লইয়া কারুরা দেখিতেন। আর দুলাহিনের আরোগ্য বিষয়ে খাঁ সাহেবকে আশ্বাস দিয়া নানাবিধ দুর্মূল্য ফল—যথা আঙ্গুর, বেদানা, বিহী—বিশেষতঃ যে সকল ফল তখন ভাগলপুরে পাওয়া যাইত না, তাহারই ব্যবস্থা করিতেন। খাঁ সাহেব জগৎ ছানিয়া সেই সব ফল পথ্য আনাইয়া শ্বশুর বাড়ীতে হাজির করিতেন।

এইরূপে প্রায় দুই মাস অতীত হইলে একজন চাকর একটু রুক্ষভাবে খাঁ সাহেবকে বলিল, "কি আপনি রোজ রোজ কারুরা লইতে আসেন? এখানে আর কারুরা নাই—আমাদের সকলেরই কারুরা পরীক্ষা করা হইয়া গিয়াছে। আর দরকার নাই।" তিনি তখন একবার অন্দরে গিয়া দুলহিনকে দেখিতে চাহিলে সে বলিল, "তাঁহার দুলহিন বলিয়া কোন পদার্থ এ বাড়ীতে নাই।

একথা শুনিয়া খাঁ সাহেব যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি আত্মসংযম করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে যে গোন্দম রঙের ভোলী ভোলী পেয়ারী সুরত দেখিয়াছি, সে কে—?" উত্তর হইল, "সে বাজারের অমুক নর্ত্তকী ছিল, সেদিন সে ভাড়ায় আসিয়াছিল—চলিয়া গিয়াছে।"

খাঁ সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া জনৈক উকিলের নিকট পরামর্শ লইতে গেলেন যে, এই সব বেইমান দাগাবাজদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা করা যায় কি না। উকিল সাহেব সমস্ত শুনিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে, "আপনার লাঞ্ছনা যথেষ্ট হইয়াছে, এখন আদালতে নালিশ করিয়া আরও খানিকটা লাঞ্ছনা কিনিয়া অর্থ নষ্ট করিতে চাহেন কি? আপনি বরং ভালয় ভালয় দেশে ফিরিয়া যান।"

বৃদ্ধ ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "জরা খেয়াল করনে কি বাত—মেরা চার হাজার রুপেয়া বরবাদ হুয়া—কোয়ী হাতভী না আয়ী আওর মালাউন বদ বখ্‌তোঁনে মুঝ্‌সে নওকরোঁকা কারুরা তক ঢোলায়া!—হু—হু—হু!!
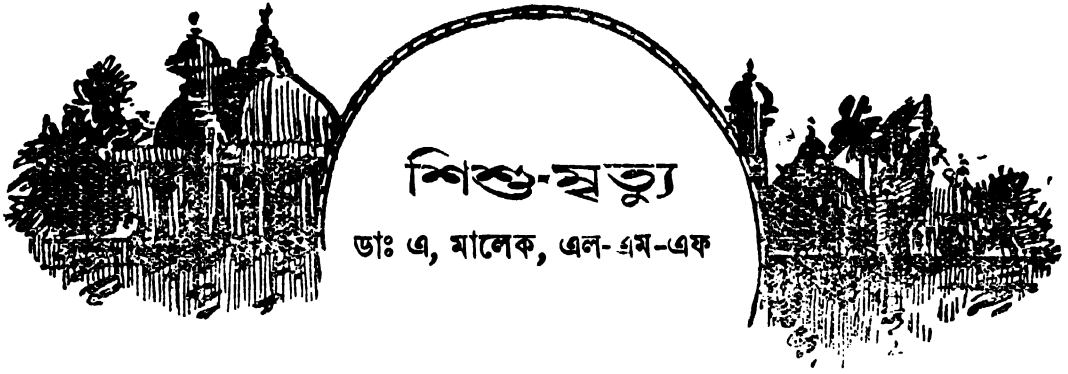
ইংরেজিতে একটা কথা আছে—"Child is the father of a nation" শিশুরাই জাতির পিতা অর্থাৎ জাতির ভবিষ্যৎ শিশুদের উপরেই নির্ভর করে। কাজেই জাতি গঠনের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে শিশুর জীবন রক্ষার নিমিত্ত সাধারণের প্রাণপণ চেষ্টা করা। এক্ষণে দেখা যাউক, কি কি কারণে শিশুর জীবন নষ্ট হইতে পারে।

শিশু-জীবনের দুইটী অধ্যায় আছে। তন্মধ্যে একটী হইতেছে, মাতৃগর্ভে যতদিন থাকে ততদিন এবং অপরটী হইতেছে জন্মের পর হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত। গর্ভে থাকা কালীন শিশুদের জীবন অনেকাংশে প্রসূতির জীবনের উপরেই নির্ভর করে। অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোক মারা গেলে, সন্তানও বিনষ্ট হয় এবং রোগ ভোগ করিলে সন্তানের শরীরও পরিপুষ্ট হয় না। ফলে হয়ত সন্তান গর্ভে বিনাশ হয় কিম্বা জন্মের অব্যবহিত পরেই মারা যায়। সুতরাং গর্ভাবস্থায় কি কি কারণে প্রসূতির জীবন নষ্ট হইতে পারে সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাউক।

একজন গর্ভবতী স্ত্রীলোকের রক্তে দুইটী জীবন পরিপুষ্ট হয়। এবং সেই জন্যই প্রসূতি মাত্রেরই অল্প-বিস্তর রক্ত-স্বল্পতা (Anaemia) রোগ দেখা দেয়। অতঃপর উপযুক্ত খাদ্যাভাব অথবা অন্য কোন কারণে রক্তের তেজ (Vitality) কম হইলে, দেশে সচরাচর যে সমস্ত ব্যাধি পরিলক্ষিত হয়, তাহার যে কোন একটী দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

একজন প্রসূতির একার রক্তে যেমন দুইটী শরীর পরিপুষ্ট হয়, তেমনি তাহার বাহ্যি, প্রস্রাব ও ঘামের সঙ্গে দুইটী শরীরের দূষিত পদার্থও বাহির হইয়া যায়। সুতরাং এসব বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রসূতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রসূতির পক্ষে এটা যে একটা কঠিন কাজ তা নয়। একটু চেষ্টা করিলেই একাজ সাধিত হইতে পারে। যেমন :—

(১) কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে কোন মৃদু-বিরেচক দ্রব্য সেবন করা।

(২) প্রচুর পরিমাণে জল ও অন্যান্য পানীয় দ্রব্য পান করিলে প্রস্রাব নিয়ম মত হয়। এবং

(৩) প্রত্যহ স্নান করিয়া শরীর পরিষ্কার রাখিলে লোমকূপ দিয়া যথেষ্ট ঘাম বাহির হইতে পারে। অথচ এই তিনটী বিষয়ে ব্যতিক্রম ঘটিলে দুইটী শরীরের দূষিত পদার্থ জমাট হইয়া "একলামসিয়া" (Eclamsia) নামক মারাত্মক ব্যধির সৃষ্টি করে।

যদিও সহজেই এই রোগের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, তথাপি লোকের অজ্ঞতা বশতঃ শতকরা প্রায় ৩০ জন গর্ভবতী স্ত্রীলোক (অধিকাংশ প্রথম প্রসূতি) ইহার কবলে পতিত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করে। কেননা, এই রোগ সহজ-প্রতিষেধক (Easily preventable) হইলেও এক রকম দুরারোগ্য (almost incurable). এই রোগের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া বোধ হয় নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

গর্ভাবস্থায় সাধারণতঃ তিন সময়ে এই রোগ দেখা দিয়া থাকে। যথা :—

(১) প্রসব-বেদনা আরম্ভ হওয়ার কিছু পূর্ব্বে।

(২) প্রসব-বেদনা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিম্বা একটু পরে।

(৩) প্রসব হওয়ার পরে।

ইহার মধ্যে প্রথম দুইটীই বেশী মারাত্মক। এমন কি, যদি সঙ্গে সঙ্গে গর্ভ খালাস না করা যায়, তবে প্রসূতির মৃত্যু অনিবার্য্য। তৃতীয়টী ততদূর মারাত্মক নহে। কেন

না, উপযুক্ত চিকিৎসা হইলে অধিকাংশ রোগীই আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে।

রোগের কয়েকটী প্রধান লক্ষণ :—

(১) প্রথমে মুখের আক্ষেপ বা খিচুনি (convulsion) শুরু হয়, তার পর হাতের এবং ক্রমে সমস্ত শরীরে প্রসারিত হয়। এই আক্ষেপ বা খিচুনি দুই এক মিনিট স্থায়ী হয়। এই সময় রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় থাকে, দাঁত লাগে এবং মুখ দিয়া ফেনা বাহির হয়।

(২) যখন আক্ষেপ না থাকে তখনও রোগী অর্দ্ধ চেতনা অবস্থায় থাকে।

(৩) নাক ডাকা নিঃশ্বাস (Stertorous Breathing) আরম্ভ হয়।

(৪) রোগীকে দেখিলে তাহার বয়স অপেক্ষা অনেক বেশী বয়সের বলিয়া মনে হয়।

রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ :—

(১) গর্ভাবস্থায় ঘন ঘন বমি হওয়া ও বুকের গোড়ায় ব্যথা করা।

(২) অসহ্য মাথার যন্ত্রণা হওয়া।

(৩) চক্ষু হরিদ্রা বর্ণ হওয়া এবং চোখে ঝাপ্‌সা দেখা।

(৪) হাত পা ফোলা বা হাতে পায়ে রসের সঞ্চার হওয়া।

(৫) প্রস্রাব কম হওয়া এবং তাহার সঙ্গে "এ্যালবিউমিন" (Albumen) নামক এক প্রকার সাদা জিনিষ নির্গত হওয়া।

তবে সুখের বিষয় এই যে, লক্ষণগুলি অনেক আগে থেকে প্রকাশ পায় বলিয়া প্রতিকারের যথেষ্ট সময় থাকে। তখন উপযুক্ত চিকিৎসা হইলে এই দারুণ ব্যাধির হাত হইতে সহজেই নিস্তার পাওয়া যায়।

গর্ভাবস্থায়, আঘাত পাওয়া, ভয় পাওয়া কিম্বা অন্য কোন কারণে অসময়ে গর্ভস্রাব (Abortion) হওয়াও শিশু-মৃত্যুর অন্যতম কারণ। আবার গর্ভবতী স্ত্রীলোকের মন যাহাতে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, তাহারও চেষ্টা করা উচিৎ। কেননা, ঐ সময় স্ত্রীলোকের মানসিক দুশ্চিন্তা থাকিলে সন্তানের চেহারা কদাকার হইয়া থাকে।

প্রসবের সময় কতকগুলি কারণে সন্তানের মৃত্যু হইতে পারে। যথা :—

(১) জরায়ুর সঙ্কোচন শক্তি হ্রাস হওয়া অথবা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হওয়া।

(২) প্রসব-দ্বারের সঙ্কীর্ণতা অথবা কোন মাংস পিণ্ড দ্বারা প্রসব-দ্বার অবরুদ্ধ হওয়া। এতদ্ব্যতীত ফুল (Placenta) জরায়ুর মুখের কাছে অবস্থিত থাকিলেও প্রসব-দ্বার রুদ্ধ হইতে পারে।

(৩) সন্তানের মাথা অতিরিক্ত পরিমাণে বড় হওয়া কিম্বা সন্তানের অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকা। যেমন— আড় হইয়া যাওয়া ইত্যাদি।

(৪) যমজ-সন্তান একটী অপরটীর সঙ্গে আটকাইয়া যাওয়া।

(৫) ফুলের নাড়ি অর্থাৎ নাভি নাড়ি সন্তানের গলায় জড়াইয়া যাওয়া।

জন্মের পরমুহূর্ত্ত হইতেই জীবন-ধারণের জন্য প্রকৃতির সহিত শিশুর সংগ্রাম চলিতে থাকে। কেননা, প্রকৃতির-দত্ত কোন জিনিষের সঙ্গেই ইতিপূর্ব্বে তাহার কোন সংশ্রব ছিল না। সমস্তই একে একে তাহাকে সহ্য করিয়া লইতে হয়। এই সময় উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইলে সহজেই শিশুর জীবন বিনষ্ট হইতে পারে। সুতরাং এই প্রসঙ্গে শিশুর খাদ্য সম্বন্ধেও দুই একটী কথা বলা দরকার।

মাতৃদুগ্ধই হইতেছে শিশুর পক্ষে একমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য। তবে যদি মায়ের দুধ এত অল্প হয় যে, তদ্দ্বারা শিশুর জীবন বাঁচানো অসম্ভব হইয়া পড়ে কিম্বা কোন কারণে যদি মায়ের দুধ পান করা সন্তানের পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচিত হয় (যমন, "থাইসিস" বা "সিফিলিস" রোগগ্রস্ত জননীর দুগ্ধ) তাহা হইলে গরুর দুধ পান করানোই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু গরুর দুধ আর মানুষের দুধের মধ্যে অনেক জিনিষের তারতম্য আছে। যথা :—

প্রোটিন বা শ্বেতসার
(Protin)

	(১) গরুর দুধ—	(২) মায়ের দুধ—
শতকরা	৪ ভাগ	২ ভাগ
ফ্যাট বা চর্ব্বি	৪ ভাগ	২ „
কার্ব্বোহাইড্রেট বা চিনি	৪½ ভাগ	৫ „

(১) Das's Midwifery—p. p. 178 (1921 Edtn.)

(২) Das's Hygiene—p. p. 226 (1928 Edtn.)

উপরের হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, গরুর দুধে প্রোটিন ও ফ্যাট দ্বিগুণ মাত্রায় এবং চিনি প্রায় সমান পরিমাণে আছে। এমতাবস্থায় গরুর দুধকে মায়ের দুধের সমকক্ষ করিতে হইলে গরুর দুধ জ্বাল দিয়া তাহার সর তুলিয়া লইতে হইবে। অতঃপর যতটুকু দুধ ততটুকু বিশুদ্ধ জল একত্র মিশ্রিত করিলেই প্রোটিন ও ফ্যাটের ভাগ মায়ের দুধের সমান হইল। কিন্তু চিনির ভাগ কম হইয়া যাওয়ায়, একটু সাদা চিনি সেই দুধের সঙ্গে মিশাইয়া দিতে হয়। বিষয়টা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া দেখানো যাউক :—

সরতোলা দুধ—	১ ছটাক
বিশুদ্ধ জল—	১ ছটাক
সাদা চিনি—	১ চামচ (চা খাওয়া চামচের)

এই জিনিষগুলি একত্র মিশ্রিত করিলে মোটামুটিভাবে মায়ের দুধের সমতুল্য দুধ প্রস্তুত হয়। এখন বোধ হয় বিষয়টা কাহারও নিকট কষ্টকর বলিয়া বোধ হইবে না। তবে কষ্টের বিষয় এই যে, যতবার শিশুকে দুধ খাওয়াইতে হইবে, ততবারই এইভাবে তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। একবার তৈয়ার করিয়া সেই দুধ বারে বারে খাওয়ানো কোনমতেই উচিত নহে। আর একটী কথা হইতেছে এই যে, একটু সাইট্রিক এ্যাসিড (Citric Acid) অথবা চুণের জল দুধের সঙ্গে মিশাইয়া দিলে সহজেই দুধ হজম হইয়া থাকে। নচেৎ শিশুর পাকস্থলীতে দুধ জমাট হইয়া যাওয়ায় অধিকাংশই পরিপাক হইতে পারে না—বাহ্যি কিম্বা বমির সঙ্গে বাহির হইয়া যায়।

শিশুর পক্ষে এমন সহজ-সাধ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য দেশে থাকিতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকেই বাজারের পেটেণ্ট (Patent) দুধ খাওয়াইয়া তাহাদের সন্তানদিগকে চির-রুগ্ন করিয়া তুলিতেছেন। ইহার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে।

এক্ষণে দেখা যাউক জন্মের পর এক বৎসরের মধ্যে কি কি কারণে সচরাচর শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে।

সূতিকাগারে মৃত্যু

শিশু-মৃত্যুর অধিকাংশই জন্মের পর এক মাসের মধ্যে অর্থাৎ যতদিন সূতিকাগারে থাকে, ততদিনের মধ্যেই হইয়া থাকে। কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা পাঠককে একবার এদেশের পাড়াগেঁয়ে সূতিকাগারে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি।

ধাত্রী-বিদ্যা অনুসারে যে ঘর বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং যাহার ভিতর মুক্ত আলো-বাতাস অবাধে প্রবেশ করিতে পারে, এই রকম কোন ঘরকে সূতিকাগারে পরিণত করা উচিত। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, বাড়ীর মধ্যে যে ঘরখানি সব চেয়ে নোংরা, পূতিগন্ধময়, মেজে সর্ব্বদাই স্যাঁৎসেতে এবং যাহার ভিতরে কখনও আলো-বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না; এক কথায় বলিতে গেলে—কোন বন্য জন্তুও যে ঘরে থাকিতে চায় না, সেই রকম একখানি ঘরকেই সচরাচর সূতিকাগারে পরিণত করা হয়। ইহার ফলে প্রসূতি এবং নবজাত-শিশু উভয়ই নানাবিধ রোগ-বীজাণুদ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

এইবার সূতিকাগারে মৃত্যুর কারণগুলি একে একে আলোচনা করা যাউক।

(১) প্রসব করাইবার সময় পাড়াগেঁয়ে দাইদের অজ্ঞতা বশতঃ তাহাদের হাতের সঙ্গে নানা রকম রোগের বীজাণু প্রসূতির শরীরে প্রবেশ করে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কারণে প্রসবের পর হঠাৎ স্রাবের মাত্রা খুব কম হইলে বা একেবারে বন্ধ হইয়া গেলে অধিকাংশ প্রসূতিই সূতিকা-পূয়জ জ্বরে (Puerperal Septicaemia) আক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করে। তখন শিশু-পালনে অনভিজ্ঞ লোকের হাতে শিশুর ভার ন্যস্ত হওয়ায়, উপযুক্ত যত্নাভাবে শিশুও অচিরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

(২) প্রসূতির অসাবধানতার জন্য ঘুমঘোরে চাপা পড়িয়াও অনেক শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে।

(৩) প্রসব হইতে অত্যধিক পরিমাণে বিলম্ব হইলে (Delayed Labour) অধিকাংশ সময় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় শিশুর জন্ম হইয়া থাকে (Asphyxia Neonatorum) এবং অবিলম্বে ইহার প্রতিকার না করিলে শিশুর প্রাণ রক্ষা করা যায় না। (১)

---

(১) ডাক্তারী মতে ইহার যে সমস্ত উপায় আছে, তাহা অবলম্বন করিতে হইলে, প্রসবের সময় কোন উপযুক্ত চিকিৎসকের উপস্থিত থাকা দরকার।———লেখক।

(৪) প্রসূতির যদি "গনোরিয়া" বা কোন রকম ধাতুরোগ (Discharge with urine) থাকে, তাহা হইলে প্রসবের সময় সেই রোগের বীজাণু সন্তানের চোখে প্রবিষ্ট হওয়ায় অচিরেই তাহার চক্ষু-উঠা-রোগ (ophthalmia Neouatorum) দেখা দেয়। ইহার হাত হইতে নিস্তার পাইতে হইলে, প্রসব কালে অন্ততঃ পক্ষে একজন শিক্ষিতা ধাত্রীর (Trained Dai) উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন।

(৫) শিশুর নাড়ি কাটিবার জন্য পাড়াগাঁয়ে সচরাচর বাঁশের চোচা-ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গে নানা রকম দূষিত জিনিষ লাগিয়া থাকায় অনেক সময় সন্তানের ধনুষ্টঙ্কার রোগ (Tetanus Neouatorum) হইয়া থাকে। নাড়ি কাটিবার পূর্ব্বে যদি এই বাঁশের চোচা জলে সিদ্ধ করিয়া লওয়া যায় এবং যে ব্যক্তি নাড়ি কাটে তাহার হাত গরম জল ও সাবান দ্বারা ধৌত করিয়া; শিশুর নাড়ি একটু স্পিরিট (Spirit) দ্বারা মুছিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে এই রোগের হাত হইতে একরকম নিস্তার পাওয়া যায়।

অতঃপর জন্মের দ্বিতীয় মাস হইতে কি কি কারণে শিশুর মৃত্যু হইতে পারে তাহাই বলা যাউক।

(১) খাদ্যাভাব (Deficiency of Food) :— উপযুক্ত এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব হইলে শিশুরা সচরাচর বালাস্থি বিকৃতি (Rickets), শীতাঙ্গ (Scurvy) প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে (২) খাদ্যাতিশয্য (Indulgence of Food) বশতঃ অনেক সময় শিশুরা নানাবিধ উদরাময় রোগে (Infantile Diarrhoea) আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহার কারণ, শিশুর প্রতি অত্যধিক আদর দেখানো অর্থাৎ অনিয়মিত ভাবে অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়ানো। আবার শিশু যদি আলালের ঘরের দুলাল হয়, তবে ত আর কথাই নাই—যে দেখে, সেই আদর করিয়া তাকে খাওয়ায়। শিশুর উদর পরিপূর্ণ আছে, তবুও আর একজন হয়ত বলিল— আহা! বাছা আমার একেবারেই রোগা হ'য়ে গেছে, একটু মিষ্টি খাওয়ানো যাক্।

আর একটী মারাত্মক বিষয় হইতেছে এই যে, শিশু কাঁদিলেই তাহাকে খাইতে দেওয়া। এই বদ অভ্যাসটী প্রায়ই পাড়াগাঁয়ে পরিলক্ষিত হয়। লোকের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই এই রকম হইয়া থাকে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক—

অতিরিক্ত খাওয়ার জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, একটী শিশুর পেটে অসুখ হওয়ায় পেট বেদনা করার জন্য সে কাঁদিতেছে। এমন সময় একজন বলিয়া বসিল, —ছেলেটা যে কেঁদে কেঁদে সারা হল, কিছু খেতে দাও না? জননী হয়ত তখন কোন কাজে ব্যস্ত আছে, তাই তাড়াতাড়ি এসেই দুধ বা অন্য কোন জিনিষ খোকাকে খেতে দিল। খোকা যদি খাইতে না চায়, তাহা হইলে জননী হয়ত বলিয়া উঠিল—"হতচ্ছাড়াটা খাবিনে তবে কাঁদছিস্ কেন? তোর জন্য কি সংসার ছেড়ে দিতে হবে? খা শীগ্‌গীর?" এই বলে রাগের বশে হয়ত জোর করেই তাকে খাওয়ানো হইল। অথচ কারও উর্ব্বর মস্তিষ্কে এ কথাটা একবারও উদয় হইল না যে, হয়ত শিশুর পেটে অসুখ হইয়াছে এবং পেট বেদনার জন্যই সে কাঁদিতেছে আর খাইতে দিলেও খাইতেছে না। ইহার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

শিশুর এই উদরাময় রোগ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে চাই।

খাদ্যদ্রব্য নাড়িভুঁড়ির ভিতর দিয়া হজম হইয়া লিভারে (Liver) যায় এবং লিভারের দ্বারা সংশোধিত ও শরীরের ব্যবহারোপযোগী হইয়া রক্তে প্রবেশ করে। কিন্তু এই অতিরিক্ত খাদ্যের চাপে লিভারের ক্রিয়া ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকে। এই ভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে শিশুর যকৃত-সঙ্কোচন রোগ (Infantile cirrhosis of Liver) দেখা দেয় এবং শিশুর নানারঙের পায়খানা হইতে থাকে। পাড়াগাঁয়ের পরিভাষায় ইহাকে "পেচোয় পাওয়া" রোগ বলে। তখন এই রোগের ধন্বন্তরি চিকিৎসক—ফকির এবং ওঝার ডাক পড়ে এবং তাহাদের হাতেই শিশু জীবনের যবনিকাপাত হইয়া থাকে।

(৩) শিশুদের জীবনী-শক্তি (Power of Rasistance) খুব কম বলিয়া, দেশ-প্রচলিত যে কোন রোগেই তাহারা সহজে আক্রান্ত হইতে পারে।

শিশুকে খাওয়ানোর জন্য, ঘুম পাড়ানোর জন্য কিম্বা কান্না হইতে নিরস্ত করাইবার জন্য অনেক সময় ভয় দেখানো হইয়া থাকে। শিশু-জীবনের পক্ষে ইহাও একটী গুরুতর অন্যায়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এমন জটিল বিষয় সাধারণের সমক্ষে বাঙ্গলা ভাষায় যথাযথ ব্যক্ত করা এক দুরূহ ব্যাপার। যাঁহারা এবিষয়ে আরও বেশী জানিতে চান, তাঁহাদিগকে অন্ততঃপক্ষে ডাক্তার বামনদাস মুখার্জ্জি কৃত "প্রসূতি পরিচর্য্যা" বইখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

স্বাধীন মিছর
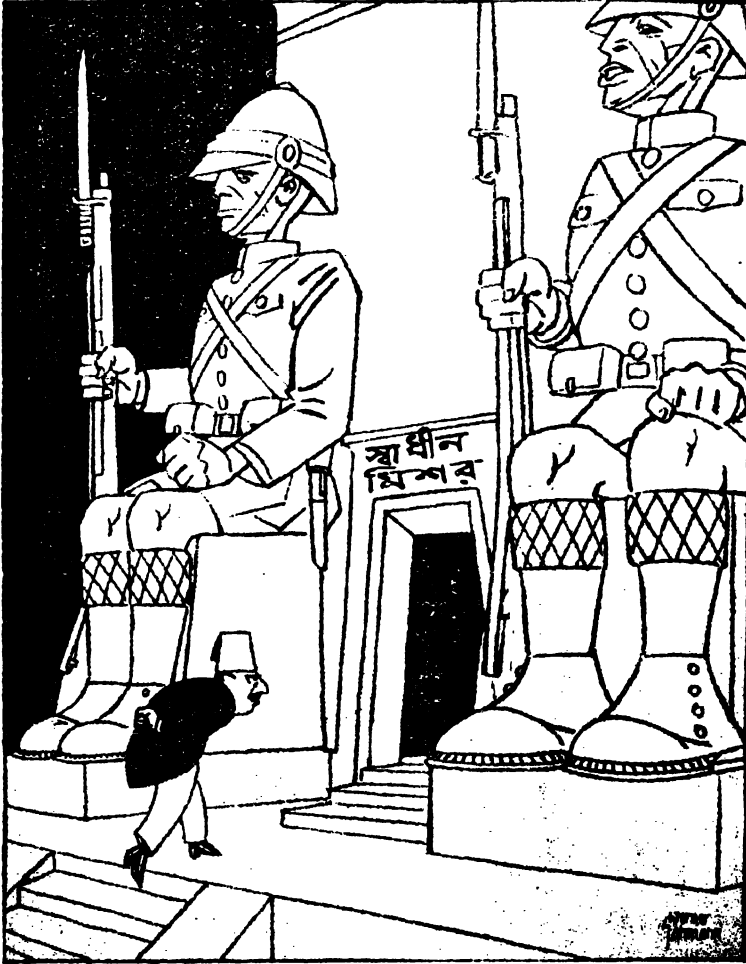
দুইধারে দুই কড়া বৃটিশ-সৈন্য কড়া পাহারায় রহিয়াছে। তাহার সম্মুখে নতমস্তকে "স্বাধীন মিছরে"র রাজা ফোয়াদ স্বাধীন মিছরের মন্ত্রণা-গৃহে চোরের মত সন্ত্রস্তভাবে প্রবেশ করিতেছেন।

ঢাকা ছলিমুল্লাহ এতিমখানা
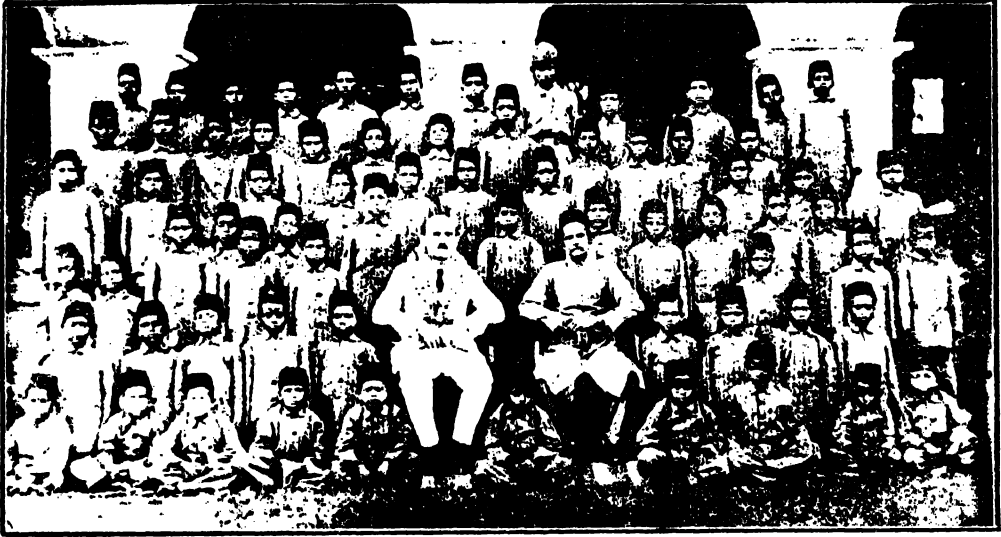
এতিমখানার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক মিঃ এ, এইচ, ক্লেটন, ঢাকা বিভাগের কমিশনারের বিদায়-সম্বর্দ্ধনা সভা। এতিম বালকগণের মধ্যস্থলে চেয়ারে বাঁদিকে মিঃ ক্লেটন উপবিষ্ট তাঁহার পার্শ্বে এতিমখানার সেক্রেটারী মৌলভী চৌধুরী ফরিদ্উদ্দীন আহ্মদ্ ছিদ্দিকী।

মিঃ মির্জ্জা মোহাম্মদ বার-এট-ল

রেঙ্গুণ মিউনিসিপ্যালিটির দ্বিতীয়বার চেয়ারম্যান মনোনীত হইয়াছেন।

কাজী-কনফারেন্সের

সভাপতি

স্যার হাজী আবু আহম্মদ আবদুল করিম গজনবী।

১৩ই ডিসেম্বর কলিকাতায় যে কাজী-কনফারেন্স হইয়া গিয়াছে, স্যার গজনবী তাহার সভাপতিত্ব করেন।

বেলফুর-নীতির পরিণাম

উভয়-সঙ্কটে 'জনবুল'

লর্ড বেলফুর যখন য়িহুদীদের প্রেমে গদগদ হইয়া প্যালেষ্টাইনকে তাহাদের জাতীয় ভবন গড়িয়া তুলিবার অধিকারের আশ্বাস দিয়াছিলেন, হয়ত তিনি তখন ভাবিয়াছিলেন যে, নিঃশব্দে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়া যাইবে। কিন্তু এই ঘোষণার ফলে, যে-সমস্ত রাজ-নৈতিক, অর্থ-নৈতিক, এবং সমাজ-নৈতিক সমস্যা আজ মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে—তাহাতে জনবুল ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কখনও য়িহুদীদের সন্তুষ্ট করিতে যাইতেছেন—আরবরা চটিতেছে; আবার কখনও আরবদের সন্তুষ্ট করিতে গিয়া য়িহুদীদের বিরাগভাজন হইতেছেন। বেলফুর-নীতি লইয়া এখন তাঁহারা উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছেন।

'প্রভাত-ফেরী'

মিসেস্ ছবল বেন

ভারত এলুমিনাম ওয়ার্কসের স্বত্বাধিকারী মিঃ ফুলচাঁদ পুরুষোত্তম মহাশয়ের পত্নী মিসেস্ ছবল বেন অন্যান্য কয়েকজন মহিলার সহিত গত ১০ই নভেম্বর কলিকাতার রাজপথে প্রভাত-বেলা গান গাহিবার অপরাধে গ্রেফ্‌তার ও দণ্ডিত হন। কলিকাতায় "প্রভাত-ফেরী" দলের ইঁহারাই প্রথম অভিযুক্ত। সম্প্রতি প্রধান বিচারপতির বিচারে ইঁহারা অব্যাহতি পাইয়াছেন এবং বিচারপতি ইঁহাদের গ্রেফ্‌তার আইন-বিরুদ্ধ বলিয়া রায় দিয়াছেন।

গবর্ণরের পদে

ভারতের হাই কমিশনার স্যার অতুল চ্যাটার্জ্জী সম্প্রতি উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্থলে স্যার বি, এন, মিত্র ভারতের হাই কমিশনার হইয়াছেন। জোর গুজব যে, স্যার অতুল চ্যাটার্জ্জী বিহারের গবর্ণররূপে ভারতে আসিতে পারেন।

স্যার অতুল চ্যাটার্জ্জী

কৃতী-ছাত্র

মিঃ এম, শামছুজ্জোহা

মিঃ এম, শামছুজ্জোহা খাঁ বাহাদুর মৌলভী আহ্ছানউল্লা সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সম্প্রতি তিনি সগৌরবে ইংলণ্ডে আইন-অধ্যয়ন শেষ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া ১৯২৬ সালে আইন-অধ্যয়নের জন্য ইংলণ্ড গমন করেন এবং উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের বেলফাষ্টের কুইন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তিন বৎসর অধ্যয়ন কালের বদলে তিনি এক বৎসরের মধ্যে যোগ্যতার সহিত এল, এল, বি উপাধি অর্জ্জন করেন এবং লণ্ডনের বিখ্যাত সলিসিটর কোম্পানী মেসার্স ওয়াণ্টন এণ্ড হাণ্টারে যোগদান করেন এবং উক্ত কোম্পানীর অধীনে তিন বৎসর যোগ্যতার সহিত কাজ করেন।

কৃতী-ছাত্র

কবি হুমায়ুন কবির

লণ্ডন ২৪শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, বাঙ্গলা দেশের কৃতী-ছাত্র ও কবি মিঃ হুমায়ুন কবির অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ কবির কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন কৃতী-ছাত্র। বি-এ এবং এম-এ উভয় পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সরকারী বৃত্তি লইয়া ইনি এখন অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন।

জেলবিভাগের ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল

নিহত
কর্ণেল সিম্‌সন্

গত ৮ই ডিসেম্বর দ্বিপ্রহরে ডালহাউসী স্কোয়ারস্থ লাট সাহেবের দফতের ভিতর সাহেবী পোষাক পরিয়া তিনজন বাঙালী যুবক জেল বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল কর্ণেল সিমসনের ঘরে ঢুকিয়া গুলীর আঘাতে তাঁহাকে হত্যা করেন। অতঃপর তাহারা সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া সরকারের অন্যান্য য়ুরোপীয় উচ্চকর্মচারীদের আক্রমণ করে। জুডিশিয়াল সেক্রেটারী মিঃ নেল্‌সন উরুতে আহত হইয়াছেন। ফাইন্যান্স মেম্বর মিঃ ম্যারকে লক্ষ্য করিয়া যে গুলী ছোঁড়া হয়, তাহা তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করে নাই। অতঃপর তিনজন যুবকই আত্মহত্যার চেষ্টা করে। একজন বিষগ্রহণ করে এবং দুইজন গুলীদ্বারা আত্মহত্যার চেষ্টা করে। যে যুবকটী বিষগ্রহণ করে, সে সেইখানেই দেহত্যাগ করে। অপর দুইজন সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়া পড়ে। তাহাদের মধ্যে একজন নাকি ঢাকায় লোম্যানের হত্যাকারী বিনয় বসু। যুবক দুইজনই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় কলিকাতা মেডিকেল কলেজে রহিয়াছে। অপর যুবকটীর নাম নাকি দীনেশ গুপ্ত। এবং বিষ-পানকারী মৃত যুবকটীর নাম নাকি বি, এন দে।

সীমান্তে বৃটীশ দুর্গ
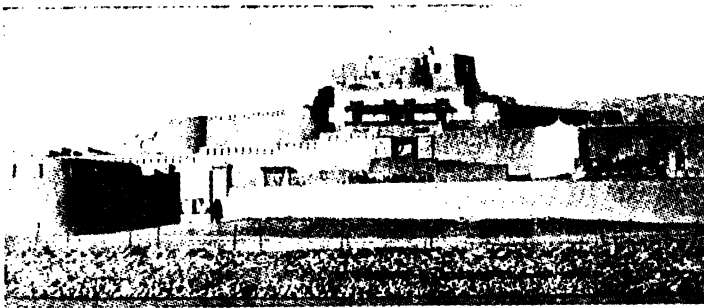
সীমান্তে আফ্রিদীরা আবার মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। গত ৩রা ডিসেম্বর আফ্রিদী দলের সহিত বৃটীশ ভারতের সৈনিকদের এক খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। উক্ত ব্যাপারে এডজুটান্ট ক্যাপ্টেন সি, ও, উইল, গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছেন।

মিছরের বর্ত্তমান প্রধান-মন্ত্রী

ছিদকী পাশা

ছিদকী পাশার সহিত ওয়াফদ দলের সংঘর্ষ মিছরে ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতেছে। ওয়াফদ-দল জগলুল পাশার মৃত্যু-বার্ষিকীর এক বিরাট আয়োজন করেন, কিন্তু সরকারী আদেশে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ১২ই নবেম্বর, রাজা ফোয়াদ যেদিন কাইরোতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেদিন তাঁহাকে নিরাপদে রাখিবার জন্ত পুলিস ও সৈন্তদল যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা বিস্ময়জনক। শুনা যায় যে, প্রায় সমস্ত সৈন্তই রেলপথ চৌকী দিয়াছিল। মরহুম ছাদ জগলুল পাশা'র বিধবা পত্নীর আলেক্‌জান্দ্রিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন ও তথা হইতে কাইরো গমনের উপলক্ষে এক অবর্ণনীয় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। নাহাছ পাশা ও অপর ওয়াফদ নেতারা ষ্টেশনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। শত শত সৈন্ত ও সশস্ত্র পুলিস সঙ্গীন উঁচু করিয়া জাহাজঘাট, রাস্তা ও যে হোটেলে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করা হয় সেখানে পাইচারী করিতে থাকে।

পুলিস-পাহারায়

আগামী জানুয়ারী মাসে লণ্ডনে পারস্য-শিল্পের একটী বিরাট প্রদর্শনী খোলা হইবে। ইংলণ্ডের এবং পারস্যের সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় এই প্রদর্শনী খোলা হইতেছে। এই প্রদর্শনীতে খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত পারস্যের বহুমূল্য শিল্পের বহু নিদর্শন আছে। পারস্য হইতে যে জাহাজে উক্ত শিল্প-নিদর্শনগুলি লণ্ডনে আসে, তাহা সর্ব্বদাই পুলিস-পাহারায় ছিল।

পারস্যের অতীতের শিল্প-ভাণ্ডার

ভিজিয়ানগরমের মহারাজ কুমারের

ভারত-খ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়ের দল

ইংলণ্ডের তথা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় মিঃ হবস্ ও সাটক্লিপকে এবং ভারতের বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়দের লইয়া ভিজিয়ানগরমের মহারাজ কুমার একটী দল গঠন করেন। এই দল ভারত পরিভ্রমণ করিয়া নানাস্থানে খেলিয়া বেড়াইতেছেন। চিত্রে বাঁদিক হইতে ভিজিয়ানগরমের মহারাজ কুমার; সি, কে, নাইডো; ডি, বি, দিওধর; সি, আর, গোদাম্বে; রামরাও; গোপালদাস; মরতাব আলি; সি, আর, নাইডু; শাহাবুদ্দীন।

বিশ্ব-জয়ী ক্রিকেট খেলোয়াড়

মিঃ হবস্ ও সাটক্লিপ (বাঁদিকে) মধ্যস্থলে মিঃ হবসের পত্নী।

জেরো আগার প্রতিদ্বন্দ্বী

নিগ্রো-রমণী জিপ্পো

এই রমণী বলেন তাঁহার বয়স ১৮০ বৎসর।

মায়া

সেখ ফজলুল করিম সাহিত্য বিশারদ

(১)

জীবনের রঙ্গমঞ্চে মায়ার মাধুর্য্য কত অপরূপ হ'য়ে ফুটতে পারে, আসল-রঙ্গমঞ্চে না গিয়েও একটি সর্বহারা নারীর কাতর মুখে সেদিন তা' দেখ্‌তে পেয়েছিলেম। শুন্‌বে তোমরা সেই ব্যথাতুরার করুণ কাহিনী?

সে আজ দশ বার বছর আগেকার কথা। আমি তখন ঢাকার একটি মেসে থেকে ডাক্তারী পড়ি।

একদিন সকাল বেলা খোলা ছাদে ব'সে আমরা তিন-চারটী বন্ধু দাঁত মাজ্‌ছি, এমন সময় এক বৃদ্ধা রমণী এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। বৃদ্ধার মলিন মুখ, কোটরগত চক্ষু দেখে' মনে হ'ল, না-জানি সে কত দিন থেকে পেট পূরে' এক সন্ধ্যা খেতে পায় নি'। শোক এবং দারিদ্র্য যেন গালাগলি ক'রেই তার দেহে বাসা বেঁধেছে। আমরা বিস্মিত নয়নে বুড়ীর দিকে তাকাতেই দেখ্‌লেম, তার বুকে দু'টি অল্পবয়স্ক সাদা ধবধবে মোরগ। মোরগ দু'টিকে সে-যে অতি যত্নে লালন-পালন ক'রেছে, তা' তাদের চেহারা দে'খেই অনুমান করতে পারা যায়। পা চারখানি হলুদ বরণ, কোথাও এতটু ধুলো-ময়লা নেই। বড় আদরের জিনিসের মতই লোভনীয় চেহারা বটে!

ইচ্ছে হ'ল মোরগ দু'টি কিনে নি'। কিন্তু মুখ ফুটে' সে কথাটা বল্‌তে পারলেম না। কি-জানি, বুড়ী কিছু মনে করে!

এমন সময় বুড়ীই আমাদের লক্ষ্য ক'রে জিজ্ঞেস্ করলে "মোরগ নেবে বাবা!—মোরগ!"

বৃদ্ধার গলার স্বর কেঁপে উঠ্‌ল।

আমি আগ্রহ ভরে জিজ্ঞেস্ করলেম—"বুড়ী, কত দাম চাও?"

বুড়ী কুণ্ঠিত ভাবে বল্লে—"বাবা! দু' টাকা দিও।"

আমি হেসে ফেল্লেম—উপেক্ষার হাসি। যে বন্ধুটী পাশে বসেছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস্ করলেম—"দু, টাকা খুব বেশী নয় কি?"

বন্ধু আমার কথায় সায় দিয়ে বল্লেন—"বেশী বৈ কি! একটাকা হ'লেই ঠিক হয়।"

আমি বুড়ীকে সম্বোধন ক'রে বল্লেম—"ও বুড়ী, দেখ্‌ছ না সবাই এক টাকার বেশী পছন্দ করছেন না। এক টাকায় দেবে?"

আমার কথায় বুড়ীর মলিন মুখে কে-যেন এক-পোঁছ কালী মাখিয়ে দিলে। সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মোরগ দু'টিকে অসীম আগ্রহে বুকে চেপে ধরে' হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠ্‌ল!

আমরা অবাক্।

ব্যাপার বুঝ্‌তে না পেরে আমি বুড়ীকে কোমল স্বরে বল্লেম—"বুড়ী, আমরা তো তোমায় গালমন্দ কিছু করি নি'; শুধু তুমি যা চেয়েছ, তার চেয়ে কিছু কম দাম ব'লেছি। এতে কাঁদ্‌ছ কেন? যদি না দেবার হয় বাছা, স্বচ্ছন্দে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পার।"

বড় ব্যথার জায়গাটিতেই বুঝি আঘাত দিলেম। আবেগে তার ঠোঁট দু'টি নড়ে' উঠ্‌ল, শীর্ণ দেহখানায় একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলে গেল, তারপর কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ধপ্ ক'রে সে সেইখানেই ব'সে পড়্‌ল। বাঁধন হারা—উচ্ছ্বসিত অশ্রু তখন তার দুই গণ্ড ছেপে ঝরে পড়্‌ছে!

(২)

নীরব বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে আছি। অনেকক্ষণ পরে বুড়ী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যেন কতকটা সংযত ক'রে নিল। তারপর বল্‌তে লাগ্‌ল "বাবা, আজ আমি পোড়াকপালী বটে; কিন্তু আমিও একদিন সুখী ছিলেম; সংসারে আমার কোন অভাব ছিল না। স্বামী যা রোজ-গার করতেন, তাতেই আমাদের দিন কেটে যেত। তারপর একটী ছেলে ও একটী মেয়ে রেখে স্বামী আমার বেহেশ্‌তে চলে গেলেন;—আমিও দুঃখের দরিয়ার ভাস্‌লেম। ক্রমে ছেলে মেয়ে দু'টিকে মানুষ করতে আমার ঘর-দুয়ার সব বিক্রয় হ'য়ে গেল। হায়রে কপাল! আজ

যদি তা'রা বেঁচে থাক্‌ত, তা'হলে কি আর আমার মোরগ বেচে খেতে হত? বসন্ত রোগে আমার সোনার যাদুকে নিয়ে গেল। ভাব্‌লেম, মেয়েটিকেই বুকে ধরে সকল জ্বালা জুড়াব; কিন্তু মালেক-উল-মওত বোধ হয় আমার মনের কথা শুনে অলক্ষ্যে হেসেছিলেন। জলহীন মরু-প্রান্তরে ফুলের কুঁড়ি ফুট্‌ল না। আমার মা'ও এক বছর যেতে না যেতে আমাকে ফেলে চ'লে গেল! থাক্‌লেম আমি একা,—শ্মশানের পোড়া কাঠের মতোই নিঃস্ব, শ্রীহীন। ঘর-দুয়ারের কথা আগেই তোমাদের ব'লেছি। পেটের দায়ে শেষে সমস্তই বেচে খেলেম। যখন তাতেও কুলালো না, তখন পরের বাড়ী গতর খাটিয়ে কোনরূপে নিজের জীবন রক্ষা করতে লাগ্‌লেম। এখন একটি খোলার ঘরে আমার বাস। মুর্গী পুষবার বড়ই সাধ হ'য়েছিল; কিন্তু পয়সার অভাবে নিজে কিন্‌তে পারিনি'। অন্যের একটি মুর্গী এনে কিছুদিন পুষেছিলেম, তার চারটি মাত্র ছানা বেঁচেছে। মুর্গীর মালিককে দিয়েছি দু'টি আর মজুরী হিসেবে আমি পেয়েছি দু'টি,—এই সে মোরগ। মোরগ দু'টি যে আমার ছেলের পোড়া তা' বোধ হয় বুঝ্‌তে পেরেছ। বড় যত্নে আমি এদের পালন করেছি। যখুনি মনে অশান্তির আগুণ জ্বলেছে, তখুনি মনকে প্রবোধ দিয়ে ব'লেছি,—এইতো তোর হারানো মানিক রে! কে বলে তা'রা মরেছে? একি মোরগ মনে কর বাবা!—এরা আমার সেই বুকের রক্ত, নয়নের মণি দু' ভাইবোন! এক দণ্ড এদের না দেখ্‌লে আমি স্থির থাক্‌তে পারি নে'। তবু এদের কত দুঃখে আজ বেচ্‌তে এনেছি, তা' জানেন আল্লাহ্‌। যে খোলার ঘরখানিতে আমি আছি, মাসে তার ভাড়া লাগে আট আনা পয়সা। তা'ও চার মাস দিতে পারিনি,—দু'টাকা বাকী পড়েছে। বাড়ীওয়ালা কা'ল শাসিয়ে ব'লে গেছে, আজ যদি তার ভাড়া চুকিয়ে দিতে না পারি, তবে সে আমায় অপমান ক'রে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। কোথায় দাঁড়াব বাবা! তাই বড় দুঃখে আজ বুকের ধন নিয়ে বেরিয়েছি,—যদি ছেলে বেচেও নিজের মান রাখ্‌তে পারি।"

এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা ব'লে বুড়ীর মন যেন অনেকখানি হাল্কা হ'ল।

বুড়ীর কথা শেষ হলে আমি বল্লেম—"বুড়ী, কেউ যদি এখন তোমায় দু'টি টাকা দেয়, আর মোরগ দু'টিও তোমার থাকে, তা'হলে কি তুমি খুসী হও না?"

বুড়ীর আত্মসম্মানে বোধ করি আঘাত লাগ্‌ল। সে তিক্তস্বরে বল্লে "আর বিদ্রূপ করোনা বাবা, অনেক দুঃখু সয়েছি; কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে কি লাভ?"

আমি তাকে ভরসা দিয়ে বল্লেম "বিদ্রূপ নয় বাছা, সত্য কথাই বল্‌ছি।"

সে তবু মাথা নেড়ে বল্লে—"না না বাবা, যদি মোরগ নিতে হয় নাও। আর যদি......

তার দু'চোখে টস্‌ টস করে জল গড়াতে লাগ্‌ল। মোরগ দু'টিকে পরম আদরে আর একবার সে বুকে জড়িয়ে ধর্‌ল।

(৩)

আমি তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে বাক্স থেকে দু'টি টাকা এনে বুড়ীর হাতে দিয়ে বল্লেম—"এই নাও মা, তোমার ভাড়ার টাকা। মোরগ দু'টি তুমি ঘরে নিয়ে যাও। যদি আবার কখনও মোরগ বেচার মত দুর্দ্দিন তোমার আসে, তা'হ'লে তুমি বরাবর আমাদের কাছে চ'লে এসো,—কোন দ্বিধা করোনা। এক ছেলে, এক মেয়ে গেছে তোমার, তার বদলে আজ অনেক ছেলে পেলে মা! যতদিন আমরা এখানে আছি, ততদিন তোমায় আর মোরগ বেচ্‌তে দেবো না।"

গভীর ব্যথায় যার বুকটা ভেঙে পড়্‌ছিল, তার ওষ্ঠাধরে একটু হাসি ফুট্‌ল। এ-কি মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ফাঁকে একটু'খানি রৌদ্রচ্ছটা?

সে নীরবে হাত পেতে টাকা দু'টি গ্রহণ করল। কি-যেন বল্‌তে যাচ্ছিল, পার্‌লে না। শুধু চোখের কোণে বড় বড় দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়্‌ল।

তারপর দু'বছর আমরা সেই মেসে কাটিয়ে এসেছি, কোনদিন আর বুড়ীকে ফির্‌তে দেখি নি'। এখনো দিনের শেষে মনে পড়ে, মা'র বুকভরা স্নেহে পুষ্ট সেই সাদা মোরগ দু'টির ধব্‌ধবে চেহারা আর সেই বুড়ীকে। ছেলে হারিয়ে যে মোরগ নিয়ে বেঁচেছিল, মোরগ হারিয়ে তার শেষ নিশ্বাসটী কিভাবে পড়েছে, কে বল্‌তে পারে!

মাস-পঞ্জী

অগ্রহায়ণ

৩রা পর্য্যন্ত—১৪ই নভেম্বর ষ্টকহলমের সংবাদে প্রকাশ যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অধ্যাপক স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কটা রমণ ১৩৩০ সালের পদার্থ-বিজ্ঞানের জন্য নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। গত ১৬ই নভেম্বর ভারতের নানাস্থানে জওহর দিবস প্রতিপালিত হইয়া গিয়াছে। উক্ত দিনের জন্য একটী বিজ্ঞাপন বাহির করার অপরাধে মিঃ মাখনলাল সেন গ্রেফ্‌তার হন। দিল্লীতে এক সভায় ২২৮ জন গ্রেফ্‌তার হন। বোম্বাই ও পাটনায় পুলিশ লাঠী চালায়। উক্ত দিন পাটনায় ১৭ জন, সুরাটে ৫০ জন, লাহোরে ১২ জন গ্রেফ্‌তার হয়। উক্ত দিবস উপলক্ষে লাহোরে পণ্ডিত মতিলালের কন্যা কুমারী কৃষ্ণা নেহরু গ্রেফ্‌তার হন। বিচারে তাঁহার ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড হয়। কোনও অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি আদালতে উক্ত টাকা জমা দেওয়ায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ১২ই নভেম্বর লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকের কার্য্যারম্ভ হয়। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ উহার উদ্বোধন করেন। উক্ত তারিখে গোল টেবিল বৈঠকের প্রতিবাদে ভারতের সর্ব্বত্র হরতাল হয়। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য লেপ্টেনাণ্ট বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়কে বাঙ্গালার গবর্ণর মন্ত্রী নিয়োগ করিলেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আইরিশ-মহিলা মিসেস্ মার্গারেট কাজিন্‌স্ তামিলনাড়ু কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্য হইয়াছেন। মওলানা বরকতুল্লাহ্ ৮ই অক্টোবর কংগ্রেসের শোভাযাত্রায় জমিয়তে ওলামায়ের স্বেচ্ছা-সেবকদল পরিচালিত করিবার অপরাধে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। নাগপুরের বিখ্যাত পরলোকগত ধনী ডি, লক্ষ্মী-নারায়ণ নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৩৩ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। 'প্রলয়শিখা' নামক রাজদ্রোহজনক পুস্তকের প্রকাশক ও মুদ্রাকর হওয়ার অপরাধে উক্ত পুস্তকের লেখক কবি কাজী নজরুল ইসলাম অভিযুক্ত হইয়াছেন। ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে করাচীতে সদ্য কারামুক্ত মিঃ জয়রাম দাস দৌলত-রাম পুনরায় গ্রেফ্‌তার হইয়াছেন। গত ১৮ই নভেম্বর পণ্ডিত মতি-লাল চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। গত ১৫ই নভেম্বর লক্ষ্ণৌতে মীরাটের নওয়াব মোহাম্মদ এছমাইল খানের সভাপতিত্বে মোছলেম কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। বৈঠকে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন ও জিন্নার ১৪ দফার অপরিহার্য্যতার বিষয় আলোচনা হয়। ১৭ই নভেম্বর গোল টেবিল বৈঠকের প্রাথমিক অধিবেশন বসে।

১০ই পর্য্যন্ত—গত ১২ই ও ১৫ই নবেম্বর মৈমনসিং জেলার মধুপুর থানার অন্তর্গত এছলামপুর ও সিঙ্গার বাড়ী গ্রামে যথাক্রমে একজন স্ত্রীলোক ও একজন পুরুষ অন্নাভাবে আত্মহত্যা করিয়াছে। গত বৎসর অক্টোবর মাসে ৪০১৪৮টী প্যাকেজ বিলাতী বস্ত্র আমদানী হইয়াছিল, এবৎসর অক্টোবর মাসে মাত্র ২০৬৫০ প্যাকেজ আমদানী হইয়াছে। বেণারস কংগ্রেসের ডিক্‌টেটর ডাঃ আবদুল করিম গত ২২শে নভেম্বর ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং একশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। রংপুর জেলার কামালের পাড়া য়ুনিয়নের অধীন শিমূলবাড়ী গ্রামের মোঃ কেমতুল্লাহ্ শেখ কয়েকদিন অনাহারে থাকিয়া বিগত ২৫শে কার্ত্তিক এক পুত্র সন্তান ৭৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছে। বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য আসাম গভর্ণমেণ্ট এ বৎসর বন আবগারী ও ষ্ট্যাম্প হইতে প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকা রাজস্ব হ্রাসের আশঙ্কা করিতেছেন। গত ৬ই ও ৯ই আগষ্ট তারিখের 'এ্যাডভান্স' পত্রিকায় বাবু অমরকৃষ্ণ ঘোষকে গুণ্ডাদের মধ্যে টাকা বিতরণের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তাহার বিরুদ্ধে মিঃ ঘোষ উক্ত পত্রিকার বিরুদ্ধে এক মানহানির মামলা আনয়ন করেন। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে, মামলা আপোষে মিটমাট হইয়া গিয়াছে। আফগানিস্থানের তাসখন্দ-স্থিত রাজদূত হাছিম খাঁ রাসিয়ান তুর্কীস্তানের আসকবাদ নামক স্থানের নিকট গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইয়াছেন। আফ্রিদীদের লইয়া পুনরায় যে জীর্গার অধিবেশন হইয়াছিল, ১৭ই নভেম্বর তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গত ২১শে নভেম্বর যশোরে রাত্রি ২টার সময় সদর পুলিস থানাতে ২টী বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে আর ৪টী বোমা সি, আই, ডি, ইন্‌স্‌পেক্টরের বাড়ীতেও পড়ে। কেহ আহত হয় নাই। লুধিয়ানার দায়রা জজ আতা মোহাম্মদ নামক এক জনকে বোমা রাখার অপরাধে ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষী গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছেন। মিঃ ফ্রাঙ্ক, এম এস্‌মাইলের অধিনায়কত্বে পুনরায় হিমালয় অভিযানের চেষ্টা হইতেছে। ১৮ই নভেম্বর কে বা কাহারা লাহোর সিটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে অগ্নি-প্রদান করিবার চেষ্টা করে। বোম্বাই ক্রনিকেলের সম্পাদক মিঃ ব্রেলভী গত ২৪শে নভেম্বর জওহর-দিবসের কার্য্যক্রম প্রকাশ করার অপরাধে গ্রেফ্‌তার হইয়াছেন। গত ১৯শে নভেম্বর শচীনের নওয়াব হিজ হাইনেস্ নওয়াব ছৈয়দী এব্রাহিম মোহাম্মদ এয়াকুব খান পরলোক গমন করিয়াছেন। আগামী জানুয়ারী মাসের ১৯—২৫শে তারিখে লাহোরে নিখিল এশিয়া নারী সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। ১৮ই নভেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভূতপূর্ব্ব সদস্য ও ত্রিপুরার কংগ্রেস নেতা মৌলবী অছিমুদ্দীন আহমদ এবং বড়ুয়া কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক হাকিম ওমর আহমদ গতকল্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৭ ধারা অনুযায়ী ধৃত হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করায় ১৪৭ ধারা অনুযায়ী তাঁহাদের আরও ২ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। মিরাট জমইয়তে ওলমার সম্পাদক মওলবী এরশাদুল্লাহ খাঁ ছাহেব গ্রেফ্‌তার হইয়াছেন। সিয়ালকোটের হাকিম আবদুল লতিফ আরেফ কাঃ বিঃ ১০৮ ধারা অনুসারে এক বৎসর কালের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। দ্বারভাঙ্গা এমদাদীয়া মাদ্রাছার মোদর্‌রেছ জনাব মওলানা আবদুল অদুদ গ্রেফ্‌তার হইয়াছেন। মওলানা মোহাম্মদ এছহাক ছাহেবের প্রতি আট মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ইঁহাদের গ্রেফ্‌তার ও কারাদণ্ডে সমগ্র বিহারে বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে।

১৭ই পর্য্যন্ত—বিগত ২৭শে নবেম্বর আলিপুরের স্পেশাল ট্রাইবুনালে কলিকাতা বোমা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলার ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায় প্রমুখ ১২ জন বাঙ্গালী যুবক ষড়যন্ত্র, হত্যার চেষ্টা, বিস্ফোরক দ্রব্য রাখা প্রভৃতি অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বিচারের জন্য যে স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয়, মিঃ টর্ককে তাহার প্রেসিডেণ্ট এবং অবসর প্রাপ্ত জিলা ও দায়রা জজ মিঃ এ, টি, ঘোষ ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আদিলুজ্জমানকে কমিশনার নিযুক্ত করা হইয়াছিল। গত ২৭শে নবেম্বর তাঁহারা এই মামলার বিচার শেষ করিয়া রায় দিয়াছেন। তাঁহারা ডাঃ নারায়ণচন্দ্রের প্রতি ২০ বৎসর, ডাঃ ভূপালচন্দ্র বসুর প্রতি ২০ বৎসর, মিঃ সুরেন্দ্র দত্ত ও মিঃ রসিক দাস প্রত্যেকের প্রতি ১৫ বৎসর, মিঃ অদ্বৈত দত্ত, মিঃ জ্যোতিষ ভৌমিক ও মিঃ অম্বিকা রায় ওরফে নন্দ তাঁহাদিগের প্রত্যেকের প্রতি ১২ বৎসর ও মিঃ রোহিণী অধিকারীর প্রতি ১০ বৎসর দ্বীপান্তর বাসের হুকুম দিয়াছেন। মিঃ অতুল গাঙ্গুলী ও মিঃ শরৎ দত্ত অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। করাচির ২৫শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, সকাল বেলা ৪০০ শত সত্যাগ্রহী নিম্ন আদালতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তথায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, তাঁহারা টেবিলের উপর কালি ঢালিয়া দেন এবং সমস্ত জিনিষপত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া রাখেন—তাঁহারা চলিয়া যাওয়ার পরই পুলিস আসিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং কাহাকেও গ্রেফ্তার করা হয় নাই। বিগত ৩রা অগ্রহায়ণ হইতে ৩ দিন স্থায়ী বর্ষার পর ৫ই অগ্রহায়ণ তারিখে বর্দ্ধমান জেলার দামোদর নদে বন্যা আসে। ফলে নদী-খাল উচ্ছ্বসিত হয়। লাহোরের "জমিদার" পত্রে প্রকাশ,—রাওলপিণ্ডি জেলে গিয়া মিঃ আবদুর রহমান সম্প্রতি ডাঃ কিচ্লুর সহিত দেখা করিয়াছিলেন। তথাকার "সি শ্রেণীর কয়েদিগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য ডাঃ কিচ্লু "এ" শ্রেণীর সমস্ত সুবিধা ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং "সি" শ্রেণীর খাদ্য গ্রহণ করিতেছেন। গত মে মাসে শোলাপুরে যে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, সেই দাঙ্গা সম্পর্কে ধনশেঠী, সর্দ্দা, সিদ্ধী ও ডারীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। এই আসামীরা মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিয়াছিল। প্রিভি কাউন্সিল আপীলের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ঢাকার বিগত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে পুলিস ১৫০টি মামলার চালান দাখিল করিয়াছে। এই সব মামলার মধ্যে প্রায় ৪০টি হিন্দুদের বিরুদ্ধে অবশিষ্ট মুছলমানদের বিরুদ্ধে। আগামী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা—ফি দিবার শেষ তারিখ—২৬ জানুয়ারী ১৯৩১। পরীক্ষা—২২শে মার্চ্চ হইতে, আই, এ ও আই, এস্-সি পরীক্ষা—ফি দিবার শেষ তারিখ—৯ই জানুয়ারী ১৯৩১, পরীক্ষা—৮ই এপ্রিল হইতে। বি, এ ও বি, এস্-সি পরীক্ষা—ফি দিবার শেষ তারিখ ২৩এ ফেব্রুয়ারী ১৯৩১, পরীক্ষা—২১ এপ্রিল হইতে। লণ্ডন, ২৪শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, বাঙ্গলা দেশের কৃতীছাত্র ও কবি মিঃ হুমায়ুন কবির অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। চাঁদপুরের ১লা ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, অদ্য ভোর ৪টার সময় চাঁদপুর ষ্টেশনে চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতা-গামী মেল ট্রেণ আসিয়া পৌঁছিলে, দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানা কামরা হইতে দুইজন যুবক বাহির হইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত পুলিস ইন্সপেক্টর বাবু তারিণী মুখোপাধ্যায়কে গুলী করে। ফলে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। মিঃ ব্রেলভির প্রতি ৫ মাস কারাদণ্ড এবং ২৫০্ টাকা জরিমানা, জরিমানার টাকা অনাদায়ে আরও ছয় সপ্তাহ কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

২৫শে পর্য্যন্ত—গত ৮ই ডিসেম্বর দ্বিপ্রহরে ডালহাউসী স্কোয়ারস্থ লাট সাহেবের দফতরের ভিতর সাহেবী পোষাক পরিয়া তিনজন বাঙালী যুবক জেল বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল কর্ণেল সিমসনের ঘরে ঢুকিয়া গুলীর আঘাতে তাঁহাকে হত্যা করেন। অতঃপর তাহারা সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া সরকারের অন্যান্য য়ুরোপীয় উচ্চকর্ম্মচারীদের আক্রমণ করে। জুডিশিয়াল সেক্রেটারী মিঃ নেলসন উরুতে আহত হইয়াছেন। ফাইন্যান্স মেম্বর মিঃ ম্যারকে লক্ষ্য করিয়া যে গুলী ছোঁড়া হয়, তাহা তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করে নাই। অতঃপর তিনজন যুবকই আত্মহত্যার চেষ্টা করে। যে যুবকটী বিষগ্রহণ করে, সে সেইখানেই দেহত্যাগ করে। অপর দুইজন সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়া পড়ে। তাহাদের মধ্যে একজন নাকি ঢাকায় লোমানের হত্যাকারী বিনয় বসু। যুবক দুইজনই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় কলিকাতা মেডিকেল কলেজে রহিয়াছে। অপর যুবকটীর নাম নাকি দীনেশ গুপ্ত। এবং বিষপানকারী মৃত যুবকটীর নাম নাকি বি, এন দে। লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকের কমিটীতে হিন্দু-মুছলমান সমস্যা লইয়া মতদ্বৈধ দেখা দিয়াছে। তাহার ফলে সাধারণ সভার কার্য্য অগ্রসর হইতেছে না। ৯ই ডিসেম্বর ভারতের বড়লাট লর্ড আরউইন কলিকাতায় পঁহুছিলে শহরে হরতাল প্রতিপালিত হয়। গত ১লা ডিসেম্বর মাদ্রাজের নানাস্থানে প্রবল ঝড় ও ঝঞ্ঝা হইয়া গিয়াছে। গত ৩রা ডিসেম্বর আকাখেল উপত্যকায় আফ্রিদীদের সহিত সংঘর্ষে একজন বৃটীশ অফিসার নিহত হইয়াছেন। গত ৩রা ডিসেম্বর বর্ম্মার অন্তর্ভুক্ত পিণ্ডনামক স্থানে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। এই ভয়াবহ ব্যাপারে ৩৬ জন নিহত এবং ৫০ জন আহত হইয়াছে। রংপুর জেলার অন্তর্গত জুমারবাড়ী ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন পৈকরের পাড়া গ্রামের মোঃ কনিশেখ কয়েকদিন অনাহারে থাকিয়া বিগত ২০শে কার্ত্তিক এক মেয়ে সন্তান ১্ এক টাকা মূল্যের এক ছাগলের বিনিময়ে বিক্রী করিয়াছে। অধ্যাপক আব্দর রহিম ১৪৪ ধারা অমান্য করিবার অপরাধে ২ সপ্তাহ বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া- ৩রা ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে ভিক্টোরিয়া কলেজের গেটের সম্মুখে একটী তাজা বোমা পাওয়া যায়। দিল্লী চাঁদনীচকে একজন শ্বেতাঙ্গের উপর একটী বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। শ্রীহট্ট জেলে আজান বন্ধ হওয়ার আদেশে আসামের ডেপুটি কমিশনার মিঃ জে এ, ডসন নাকচ করিয়া দিয়াছেন। শুনা যায় মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের আগামী বৎসরের বাজেটে প্রায় এক কোটী টাকার রাজস্ব ঘাটতি হইয়াছে। বোম্বাই ৯ই ডিসেম্বর। ফ্রী প্রেস জার্ণাল জানিতে পারিয়াছেন যে, গত শুক্রবার ই, ডি, সেসুন এণ্ড কোম্পানী, কিলিক নিক্সন মিল কংগ্রেসের শর্ত্ত মানিয়া লইয়া কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। মিঃ কোটম্যান পদত্যাগ করায় মিঃ আর, এস, বাজপেয়ী ডিরেক্টর অফ্ পাব্লিক ইনফরমেশনের পদে কায়েম হইলেন। ভূতপূর্ব্ব বাদশাহ্ আমানুল্লার সরকারের বিশিষ্ট সদস্য মাহমুদওয়ালী খাঁ, আবদুল করিম খাঁ, ও আবদুল আজিজ খাঁ রাজদ্রোহের অভিযোগে ধৃত হইয়া কারাগারে অবস্থান করিতেছিলেন। সম্প্রতি তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

২৬শে-২৭শে প্রত্যুষে বিনয় বসু হাসপাতালে দেহত্যাগ করিয়াছে। বড়বাজারে নূতন উদ্যমে মহিলারা পিকেটিং আরম্ভ করিয়াছেন। উক্তদিন পিকেটিং অপরাধে সাতজন মহিলা গ্রেফতার হইয়াছেন।

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মা

কোরআন শরীফের তফছিরে আল্লাহ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম :—"প্রচলিত ভাষা সমূহে আল্লাহ শব্দের ঠিক প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ... ধাতুগত অর্থ ও বৈদিক যুগের ব্যবহার হিসাবে সংস্কৃত ব্রহ্ম পদ এই অভাবটা বহুলাংশে পূরণ করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু পৌরাণিক ব্যবহারে এবং হিন্দু সমাজের সাধারণ সাহিত্যে বেদের এই পরম, বিরাট, এক অনাদি এবং অনন্ত অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে চতুরানন ব্রহ্মার সহিত মিশাইয়া দেওয়ায় এ সুবিধাটাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

দৈনিক বসুমতীর মাননীয় সম্পাদক মহাশয় এই মন্তব্যকে "বিষম ভ্রম" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইহাকে অমূলক ধারণা বলিয়া বর্ণনা করিয়া আমার নিকট এই মন্তব্যের অনুকুল প্রমাণ জানিতেও চাহিয়াছেন। তাই আজ নিজের কৈফিয়ৎ স্বরূপ দুই একটা কথা নিবেদন করিতে বাধ্য হইতেছি।

আমার এখনও বিশ্বাস, এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আমি কোন প্রকার ভ্রমে পতিত হই নাই। সমস্ত হিন্দু সাহিত্য এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গলা অভিধান এ সম্বন্ধে আমার সহিত এক মত। এই কথাটী আমার নুতন আবিষ্কার নহে, বস্তুতঃ উহা হিন্দু কোষকারদিগের সমবেত অভিমতের সংক্ষিপ্ত প্রতিধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই নহে। উদাহরণ স্বরূপ দুই একটী প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

শব্দ-কল্পদ্রুমে বর্ণিত হইয়াছে :—

"ব্রহ্ম চতুর্ব্বিধং যথা। বিরাটঃ ১ হিরণ্যগর্ভ ২ ঈশ্বরঃ ৩ তুরীয় ৪। ইতি বেদান্তসারঃ॥" অতঃপর ব্রহ্ম শব্দের বিভিন্ন ব্যবহারিক তাৎপর্য্য প্রদান প্রসঙ্গে এই কোষকার পুনরায় বলিতেছেন—"**পিতামহ** ইতি পৌরাণিকাঃ। ৭॥" ব্রহ্মা শব্দের 'তৎপর্য্যায়ঃ' বর্ণনা প্রসঙ্গে ঐ কোষকার পিতামহঃ হিরণ্যগর্ভঃ চতুরাননঃ প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন।

সুতরাং শব্দ কল্পদ্রুমের এই বর্ণনা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে :—ব্রহ্ম শব্দ চারিটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে যথা—বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর ও তুরীয়। হিন্দু দর্শনে বিরাট অর্থে—"সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে সমষ্টিভাবে উপস্থিত চৈতন্য"কে বুঝাইয়া থাকে। হিরণ্যগর্ভ শব্দের অর্থ যে চতুরানন ব্রহ্মা, তাহাতে কোন মতভেদ নাই। শব্দ কল্পদ্রুমের প্রদত্ত তাৎপর্য্য হইতেও তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে। সুতরাং হিন্দু সমাজের সাধারণ সাহিত্যে বেদের সেই বিরাট ব্রহ্মকে যে চতুরানন ব্রহ্মার সহিত মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহা ধ্রুব সত্য। পৌরাণিক ব্যবহারে ব্রহ্ম শব্দ যে "পিতামহ" অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কোষকার তাহাও স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। এই "পিতামহ" শব্দের অর্থ যে চতুরানন ব্রহ্মা, তাহাও তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছেন (দ্রষ্টব্য ১—৬৪৯ পৃষ্ঠা) সমস্ত অভিধান ও পৌরাণিক ব্যবহার এক বাক্যে ইহার সমর্থন করিতেছে। সুতরাং পৌরাণিক ব্যবহারে যে বেদের সেই বিরাট অনাদি ও অনন্ত ব্রহ্ম চতুরানন ব্রহ্মার সহিত বেমালুমভাবে মিশিয়া গিয়াছেন, একথাও ধ্রুব সত্য।

অভিধানে ব্রহ্ম-শব্দের একটী অর্থ দেওয়া হইয়াছে "ঈশ্বর" বলিয়া। পৌরাণিক ব্যবহারে এই ঈশ্বরে ও পরমেশ্বরে অনেক তফাৎ। বায়ুপুরাণ অনুসারে চতুরানন ব্রহ্মার ললাট হইতে সৃষ্ট যে রুদ্র বালকমূর্ত্তি, তাঁহারই

একাদশ প্রকাশরূপের একরূপের নাম ঈশ্বর। তাহা হইলে পৌরাণিক ব্যবহারে "ব্রহ্ম"-শব্দ যে চতুরানন ব্রহ্মার আরও একস্তর নিম্নে নামিয়া যাইতেছে, ইহাও আমরা দেখিতে পাইতেছি। অন্যান্য পুরাণে শিব, ব্রহ্মা ও কন্দর্পকেও "ঈশ্বর" বলা হইয়াছে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, এই সব পৌরাণিক ব্যবহার অনুসারে—

ব্রহ্ম=ব্রহ্মা
" =শিব
" =কন্দর্প
" =রুদ্র

অতএব "পৌরাণিক ব্যবহারে এবং হিন্দু সমাজের সাধারণ সাহিত্যে" ব্রহ্ম-শব্দের ধাতুগত অর্থ এবং মূল বৈদিক তাৎপর্য্য যে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে এবং চতুরানন ব্রহ্মা প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতাদিগের সম্বন্ধেও ঐ শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার যে হিন্দু সাহিত্যে প্রচুর ভাবে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা আমার পক্ষে অন্যায় হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই মন্তব্যটী আমার সৃষ্টিও নহে, আবিষ্কারও নহে। বসুমতীর মাননীয় সম্পাদক মহাশয় একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া সন্ধান লইলে প্রচলিত বাঙ্গলা অভিধানগুলিতেও আমার এই উক্তির যথেষ্ট সমর্থন দেখিতে পাইবেন। নমুনাস্বরূপ একখানা অভিধানের মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"ব্রহ্ম...(বেদে) পরম পুরুষ; বিরাট পুরুষ; এক অদ্বিতীয় অনাদি, অনন্ত পুরুষ; পরমেশ্বর; পরব্রহ্ম। ২ (পুরাণে) পুং, ব্রহ্মা; চতুরানন। [দ্রঃ—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মার অর্থে সাধারণ সাহিত্যে কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্বের পরিভাষায় ব্রহ্ম বিশ্ব-আত্মা, আদিকারণ, নিরালম্ব, নির্ব্বিকার; কিন্তু ব্রহ্মাদির উৎপত্তি লয় বা জন্মমরণ দুই আছে।" দ্রষ্টব্য—জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস কৃত 'বাঙ্গলা ভাষার অভিধান' ১১৬৪ পৃষ্ঠা।]

কোরআনের তফছিরে আমিও ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলাম।

———

গোল মেজে গোলমাল

ভারতের ভাবী শাসন অধিকার লইয়া সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে ভারতবাসী ও বৃটিশ জাতির মধ্যে। এই সংঘর্ষের কার্য্য করণাদির অনুসন্ধান এবং তাহার বিচার ও মীমাংসার জন্য বিলাতে এক পঞ্চায়েৎ বসান হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এক্ষেত্রে ভারতবাসীরা বাদী, আর বৃটিশ জাতি হইতেছে প্রতিবাদী। ভারতবাসীরা বলিতেছে—আমাদিগকে শাসন শোষণ করার কোন স্বত্বাধিকার ইংরাজের নাই। ভারতবাসীদের এই দাবীর বিচার মীমাংসার জন্যই গোল টেবিল বৈঠকের অনুষ্ঠান। কিন্তু সব চাইতে মজার কথা এই যে, এই বৈঠকে বাদী পক্ষের দাবী দাওয়া পেশ করার ও প্রতিবাদী পক্ষের যুক্তি তর্কের উত্তর দেওয়ার জন্য যে সব ভারতবাসী বিলাতে গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন প্রতিবাদী পক্ষ নিজেরাই।

এই ব্যবস্থার একটা সুফল হাতে হাতে ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরাজ আমাদের দেশটার উপর যে এই অধিকার বিস্তার করিয়া আছেন এবং তাঁহারা যে সে অধিকার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন, ইহার অনুকূলে তাহাদের প্রধান বক্তব্য এই যে, ভারতবর্ষ নানাবিধ সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও সংঘর্ষে জর্জ্জরিত। তাঁহারা আছেন বলিয়াই এ দেশের লোকগুলি এখনও বাঁচিয়া আছে। অন্যথায় পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া তাহারা এতদিন ধ্বংস হইয়া যাইত! বিলাতের গোল টেবিল পঞ্চায়তেও এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথা তুলিয়া বিষম গণ্ডগোলের সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং এই "ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গ"কে সর্ব্বপ্রথমে সেই সমস্যাগুলির সমাধান করিয়া লইতে আহ্বান করা হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, আজ এই সমস্যার সমাধান করার জন্য যে মহাভাগ ব্যক্তিবর্গকে আহ্বান করা হইতেছে, বস্তুতঃ দেশের আসল সমস্যা হইতেছেন তাঁহারাই—অন্ততঃ তাঁহাদের অধিকাংশই। আর আমাদের মনে হয়, এই সমস্যাটাকে আরও জটিলরূপে পাকাইয়া তোলার জন্যই সাম্প্রদায়িকতার প্রধান প্রধান প্রতীকদিগকেই বাছিয়া বাছিয়া "প্রতিনিধি" নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে। নচেৎ সহযোগী মুছলমানদিগের সমবেত প্রার্থনাকে অগ্রাহ্য করিয়া সার আবদুর রহিমের স্থলে মিঃ আবদুল হালিম গজনভীর ন্যায় লোককে নির্ব্বাচিত করা কখনই সম্ভবপর হইত না।

মৌঃ ফজলুল হকের পত্র

আমাদের মাননীয় বন্ধু মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক ছাহেব সম্প্রতি লণ্ডন হইতে যে পত্র লিখিয়াছেন, সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। মৌলবী ছাহেব জানাইতেছেন—তিনি বাঙ্গলার মুছলমানদিগের প্রতিনিধিত্ব লইয়া "উভয় সঙ্কটে" উপনীত হইয়াছেন। মোছলেম বঙ্গের একদল লোক তাঁহাকে তারযোগে অনুরোধ করিতেছেন, at all cost যে কোন মূল্য দিয়া হউক, স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনকে আঁকড়াইয়া ধরিতে। অন্যেরা জানাইতেছেন—মুছলমান বাঙ্গলা কাউন্সিলে যাহাতে সংখ্যাগুরু হইয়া থাকিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করার দরকার। এজন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তে যদি মিশ্র নির্ব্বাচনও স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে ক্ষতি নাই।

স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন লইতে হইলে বাঙ্গলার মুছলমানকে তাহার পরিবর্ত্তে কি ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে, মৌলবী ফজলুল হক ছাহেব তাহাও স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গলায় মুছলমান অধিবাসীদিগের আনুপাতিক সংখ্যা শতকরা ৫৪ জন। বর্ত্তমানে বাঙ্গলা কাউন্সিলে মুছলমান মেম্বরদিগের আনুপাতিক সংখ্যা কিন্তু শতকরা ২৭ জন মাত্র। সাইমন কমিশনের 'কৎলে আমের' পর ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট পার্লামেণ্টের নিকট যে 'ডেস্প্যাচ' পাঠাইয়াছেন, তাহা গৃহীত হইলে মুছলমান প্রতিনিধিদিগের সংখ্যা দাঁড়াইবে শতকরা ৩২ জন। তবে যদি সরকারী মেম্বর ভবিষ্যতে না থাকে, আর সেই ১৭ জনকে যদি হিন্দু মুছলমান প্রভৃতির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়, এবং তাহার ৯টী আসন যদি মুছলমানদিগকে প্রদান করা হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলা কাউন্সিলে মুছলমান প্রতিনিধিদিগের সংখ্যা জোর ৩৯ জন পর্য্যন্ত হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এই ৯টীর আসনের আশা যে একটা অনুমান মাত্র, এবং তাহার যে কোন নিশ্চয়তা নাই, মৌলবী ছাহেব সে কথাও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক মুছলমানগণ যেমন চোখ বুঁজিয়া স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের জন্য আর্ত্তনাদ করিতেছেন, সাম্প্রদায়িক হিন্দুরাও সেইরূপে মুছলমানের সমস্ত ন্যায্য দাবী দাওয়া ও স্বত্বাধিকারকে পদদলিত করার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয়, লণ্ডনের ভাবগতিক দেখিয়া কতিপয় হিন্দু-মুছলমান 'প্রতিনিধির' চৈতন্যোদয় হইয়াছে, তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন—মুছলমানগণ স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের স্থলে মিশ্র নির্ব্বাচনকে মঞ্জুর করিয়া লউন। তৎপরিবর্ত্তে হিন্দুরা তাঁহাদিগকে মোট কাউন্সিলের শতকরা ৫১ জন প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার দিতে প্রস্তুত হইবেন। মৌলবী ফজলুল হক ছাহেবের "উভয় সঙ্কট" এইখানে। স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন রক্ষা করিতে হইলে সংখ্যাগুরু হইয়া চিরস্থায়ী ভাবে সংখ্যালঘু হইয়া থাকিতে বা শতকরা ৫৪ স্থলে শতকরা ৩২টী আসন লইয়া সন্তুষ্ট হইতে হইবে। আর সংখ্যাগুরু হইয়া থাকিতে হইলে হিন্দুদের সহিত মীমাংসা করিতে এবং স্বতন্ত্র স্থলে মিশ্র নির্ব্বাচন গ্রহণ করিতে হইবে।

আমাদের মতে বাঙ্গলার মুছলমানদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য মিশ্র নির্ব্বাচনেরও কোন দরকার নাই। পক্ষান্তরে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনকে আমরা মুছলমানের অগ্রগতির পক্ষে সর্ব্বপ্রধান বাধা বলিয়া মনে করি। আমাদের মতে সাধারণ নির্ব্বাচনে বাঙ্গলার মুছলমানদিগের আশঙ্কা করার কোনই কারণ নাই। বরং কিছুকাল সাধারণ নির্ব্বাচন প্রচলিত থাকিলে হিন্দুরাই নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইবেন। এখানে আসল দরকার মুছলমান ভোটদাতাদের সংখ্যাবৃদ্ধির ব্যবস্থা করার। তাহা হইলেই ইউনিয়ন বোর্ড, লোকাল বোর্ড ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ন্যায় বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভাতেও মুছলমান ক্রমে ক্রমে নিজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে পারিবে। তবে মীমাংসার হিসাবে মুছলমান যদি উপস্থিতের মত মিশ্র নির্ব্বাচন স্বীকার করিয়া লয়, তাহাতে আমরা আপত্তি করিব না। কারণ, অন্য দিক দিয়া ইহাদ্বারা দেশের একটা স্থায়ী কল্যাণের আশা করা যাইতে পারে।

চীনের মুছলমান

নাজির আহ্‌মদ চৌধুরী

মহা চীনে কত মুছলমানের বাস, তাহা সঠিক বলা চলে না। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ফরাসী ঐতিহাসিক মসিয়ো থর্সে‍ণ্ট বলেন,—"চীন দেশে আড়াই কোটী মুছলমান বাস করে।" মসিয়ো রেক্লুস লিখিয়াছেন, "চীনে দুই কোটী মুছলমানের বাস। দেশের শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে, তাহারা বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে।" কিন্তু আমরা ইংরাজ ও ফরাসী ঐতিহাসিকগণের কথায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছি না। কেননা, বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, তাঁহারা খৃষ্টান পাদ্রীদিগের প্ররোচনায় মুছলমানের সংখ্যা কম করিয়া দেখাইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া রাজনৈতিক কারণেও তাঁহারা এরূপ করিয়া থাকেন। অধিকন্তু অন্যান্য সূত্রেও জানা গিয়াছে যে, মহাচীনে মুছলমানের সংখ্যা ইহার অনেক বেশী। (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে) চীনের একজন বিশিষ্ট মুছলমান জনাব ছৈয়দ ছোলেমান ছাহেব মোছলেম জগৎ ভ্রমণে বাহির হন। মিছরে উপনীত হইয়া "ছমরাতুল ফনুন" এর প্রতিনিধিকে তিনি বলিয়াছিলেন যে,—"চীনের মোছলেম জন সংখ্যা সাত কোটীর উপর। এমন বহু স্থান, (জেলা) আছে, যাহা শুধু মুছলমানের দ্বারা অধ্যুসিত। উত্তর চীনের প্রান্তদেশে মুছলমান ভিন্ন অন্য জাতির বাস নাই। নেকাহু প্রভৃতি এলাকাও মুছলমান প্রধান।"

ইংরাজ ও ফরাসী ঐতিহাসিকগণের প্রদত্ত বিবরণ কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহা মিঃ আর্ণল্ডের "প্রিচিং-অব এছলাম" পাঠ করিলে অনায়াসে বুঝা যায়। তিনি বিভিন্ন পণ্ডিতের বরাৎ দিয়া বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কোন ইংরাজ ঐতিহাসিকের মতে চীনের মোছলেম জন সংখ্যা দেড় কোটী, কাহারও মতে ৪০ লক্ষ, আবার কাহারও মতে মাত্র ২৩ লক্ষ। মিঃ আর্ণল্ড যথেষ্ট শক্তি ব্যয় করিয়া ইহাও প্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াছেন যে, সমগ্র এশিয়া মহাদেশে মোট তিন কোটী মুছলমানের বাস। মওলানা ফারুকেলিৎ দেহ্‌লবী ছাহেব বলেন, এ সকল বিবরণ দেখিয়া জনাব ছৈয়দ ছোলেমান ছাহেবের বিবরণই সত্য বলিয়া মনে হয়। 'কেননা ঘরের খবর ঘরের লোকেই ভাল জানে'—

صاحب البيت ادرى بمافيه

চীন দেশে বহুসংখ্যক নূতন ও পুরাতন মছজেদ আছে। মছজেদের সহিত মক্তব-মাদ্রাছাও বিদ্যমান। নিউকেয়াই ও কেনকেয়াবু এলাকার মাদ্রাছা সমূহে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। নিউকেয়াই মাদ্রাছার' অধ্যাপনা কার্য্যের জন্য খলিফা ছোলতান আবদুল হামিদ খাঁ হাছান হাফেজ ও রেজা আলী নামক দুই জন বিখ্যাত শিক্ষক প্রেরণ করিয়াছিলেন। এ সকল মাদ্রাছায় দূর দূরান্তর হইতে বিদ্যার্থী মোছলেম যুবকগণ আসিয়া জ্ঞান চর্চ্চা করে। এতদ্ভিন্ন শনসী, য়্যাবান প্রভৃতি অঞ্চলেও বহুসংখ্যক মক্তব আছে। এ সকল মক্তবে প্রধানতঃ কোরআনের মতন এবং তাহার তর্জ্জমা শিক্ষা দেওয়া হয়।

চীনের বৌদ্ধেরা সাধারণতঃ অহিফেন সেবন করে। এই বদভ্যাস ত্যাগের জন্য গত কিছু কাল ধরিয়া বিশেষ চেষ্টা ও আন্দোলন চলিতেছে। ইহা অনেকাংশে সফলও হইয়াছে। কিন্তু এখনও তুলনায় মুছলমান অপেক্ষা অমুছলমান অহিফেন সেবীর সংখ্যা অনেক অধিক। মুছলমানদিগের মধ্যে মদ ও অহিফেন ইত্যাদির ব্যবহার বিরল—নাই বলিলেও চলে। চীন দেশে, বৌদ্ধ, কনফিউসীক, খৃষ্টান ও মুছলমান এই চার সম্প্রদায়ের বাস। চরিত্রের দিক দিয়া মুছলমানেরা সবচেয়ে উন্নত। শিল্প এবং বাণিজ্য-ব্যবসায়েও মুছলমানেরা সমধিক উন্নত। সুতরাং তাহাদের আর্থিক অবস্থাও স্বচ্ছল।

স্বাধীন চিনে পরাধীন ভারতের ন্যায় "তঞ্জিম কমিটী" নাই, কিন্তু তঞ্জিমের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা সম্পূর্ণ না হইলেও অনেকটা সন্তোষজনক। সেখানকার মুছলমানেরা জাকা'ৎ আদায়ে কার্পণ্য করে না। ধনীর জাকা'ৎ ও কৃষকগণের 'ওশরের' অর্থে 'বয়তুল-মাল' পূর্ণ হয়। মছজেদে মছজেদে একটি করিয়া সিন্দুক রক্ষিত হয় এবং তাহাতে 'বয়তুল-মালের' অর্থ সঞ্চিত থাকে। ইহার পরিদর্শন ও আয় ব্যয়ের হিসাব রক্ষার জন্য একটি সমিতি আছে। সমিতির সদস্যবর্গের বিবেচনা অনুসারে এছলামী কার্য্যে বয়তুল-মালের অর্থ ব্যয় করা হয়। চীনের মুছলমানেরা সাধারণতঃ 'কৈয়াওমন' নামে অভিহিত হয়। ইহার অর্থ 'ধার্ম্মিক' বা 'আহ্‌লেদীন'। তাহাদের মধ্যে পরস্পর মিলন ও ভ্রাতৃভাব খুব দৃঢ়। এসকল কারণে তাহারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের অসদ্ভাব নাই। কিন্তু তাহারা বিবাহ এবং অন্যান্য সামাজিক ব্যাপারে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলে। অমুছলমানের সহিত তাহারা কখনও বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অল্পবয়স্কা বালিকা বিক্রয়ের প্রথা আছে। অমুছলমানদিগের নিকট হইতে কোন কোন মুছলমানও অর্থ দিয়া এ সকল বালিকা খরিদ করিয়া লয় এবং তাহাদিগকে এছলামী শিক্ষা দিয়া মুছলমানের সহিত বিবাহ দিয়া থাকে। মসিয়ো ওলাই চীনের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন,—"চীনের সীমায় প্রবেশ করিয়া এক অবাক কাণ্ড দেখিতে পাইলাম। লোকেরা নিজেদের সন্তান-সন্ততি বিক্রয় করিতেছে। মুছলমানেরা তাহাদিগকে খরিদ করিতেছে।" বক্সার যুদ্ধের সময়েও এরূপ কথা শোনা গিয়াছিল।

নেকাহ্‌, তালাক, মিরাছ প্রভৃতি শরিয়ৎ সংক্রান্ত বিষয়ের বিচারের নিমিত্ত সরকারী ভাবে কাজী নিযুক্ত আছেন। এ ব্যবস্থা নূতন বা আধুনিক নহে। এবনে বতুতার ভ্রমণ-বৃত্তান্তেই ইহার উল্লেখ আছে। নমাজ, রোজা ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালনেও চীনের মুছলমানেরা উদাসীন নহে। নমাজ তাহারা আরবী ভাষায় আদায় করে। জুমআর খোৎবায় চীনরাজের মঙ্গল প্রার্থনা করা হয়। স্বদেশ প্রেমে অমুছলমানের তুলনায় মুছলমানেরা আদৌ পশ্চাৎপদ নহে। সমরনিপুণ বলিয়া সৈন্য বিভাগে মুছলমানেরাই সংখ্যায় অধিক। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চীনের কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি মিছরে আসিয়াছিলেন। 'আল্-মোক্তেফ' প্রভৃতি পত্রিকার প্রতিনিধিগণের নিকট তাঁহারা যে বিবৃতি দিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায়,—চীনের নব-জাগরণে মুছলমানদিগের যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে। তদানীন্তন মন্ত্রী মণ্ডলে ৪ জন মুছলমান ছিলেন। জেনারেল মোহাম্মদ কাণ্ড সৈন্য বিভাগের এবং জেনারেল মোহাম্মস শিসা যাতায়াত ও বাণিজ্য (Trade aud Transport) বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। অপর দুই জনের একজন কৃষি বিভাগের আর একজন শরিয়ৎ সংক্রান্ত ব্যাপারের মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

চীনের ও চীনের মুছলমান সম্বন্ধে জানিবার আরও বহু বিষয় আছে। দুঃখের বিষয়, চীনবাসী মুছলমান ভ্রাতাগণের সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ আমাদের খুবই কম। সুদূর ইংলণ্ডে বা চিকাগোতে কোন একজন খৃষ্টান এছলাম গ্রহণ করিলে আমরা আনন্দে স্ফীত হইয়া যাই। ইহা অবশ্য প্রশংসনীয়। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, আমাদের প্রতিবেশী চীনের মুছলমান ভ্রাতাগণের খোঁজ-খবর লওয়া আমরা আদৌ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি না। নানা কারণে ভারতীয় মুছলমানের পক্ষে ইহা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। ইহার প্রায়শ্চিত্ত করার মত মহাপ্রাণ মুছলমানের আবির্ভাব কি এ ভারতবর্ষে হইবে না ?

Printed and Published by Md. Khairul Anam Khan from the "Mohammadi Press,"
91, Upper Circular Road, Calcutta.

বঙ্গ প্রদর্শনীতে স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত

"স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরী"

ফোন নম্বর ৩৫৫২ বড়বাজার।

জুয়েলার্স ও হস্তী দন্তের জিনিষ এবং স্বর্ণ অলঙ্কার নির্ম্মাতা। ২১৩, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কংগ্রেস চুড়ি (টালি প্যাটার্ণ) **ললনা সোহাগ রুলী** **তার প্যাচ রুলী** (সরু)

স্বর্ণবর্ণের মেটেলের ফ্রেমে গিনি স্বর্ণের এনগ্রেভ পাতে মোড়া, ঠিক নিরেট সোণার চুড়ির ন্যায়। মূল্য প্রমাণ প্রতি জোড়া ১৮॥০

হস্তী দন্তের লাইন মোড়া রুলীর উপর গিনি স্বর্ণের পাতে মোড়া। মূল্য প্রমাণ ১০৸০, ছোট ৭॥০।

হস্তী দন্তের সরু প্যাচকাটা রুলীর উপর গিনি স্বর্ণের সরু পাতে মোড়া। মূল্যপ্রমাণ ১২॥০ ছোট ৮৷৵০ আনা।

পাতাওয়ালা ইয়ারিং

১২॥০—১৫৲

কম্বগেট মাকড়ী

১২॥০—২০৲

ঘোড়ার ক্ষুর আংটী

১৫৲—৩০৲

কাণফুল

১০৲—১৫৲

প্লেন কুমারী মাকড়ী

৬।০

ইহা ব্যতীত জড়োয়া গহনা ও গিনি স্বর্ণের যাবতীয় অলঙ্কার সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। মফঃস্বলের অর্ডার ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। খাঁটী গিনি সোনার গ্যারান্টি দেওয়া হয়। সচিত্রক্যাটালগের জন্য ৵০ ষ্টাম্প পাঠান। মওলানা মোহাম্মদ আলী লিখিয়াছেন, আমি "স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরীর" সুসজ্জিত দোকান দেখিয়াছি ইহাদের কাজ সুন্দর এবং কারুকার্য্য সমন্বিত। আমি এই দোকানের ক্রমোন্নতির কামনা করি। ১৩ই জানুয়ারী ১৯২৫।

ডাঃ গেভিন সাহেবের আবিষ্কৃত !

গণোরিয়া রোগের বজ্র বাণ !

ভারতবর্ষ গ্রীষ্ম প্রধান দেশ বলিয়াই এতদ্দেশবাসিগণের অত্যল্প বয়সেই ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং তাহার অপরিমিত অহিতাচরণের বিষময় ফলে সহস্র সহস্র ব্যক্তি মেহ-প্রমেহ সম্বন্ধীয় নানা রোগে প্রপীড়িত হইয়া দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করতঃ এক ঔষধ হইতে অন্য ঔষধ, এক চিকিৎসক হইতে অন্য চিকিৎসকের আশ্রয় লইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে

রোগ সারে কৈ ?

গণোডাইনে—বিংশতি প্রকার মেহ, জননেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তর হইতে স্রাব নিঃসরণ, প্রস্রাবের অগ্রে বা পশ্চাতে সূতার ন্যায় বা সপূঁজ ধাতু নির্গমন, মূত্রনালীতে ক্ষত, কাপড়ে দাগ লাগা, প্রস্রাব কালে জ্বালা, মুহুর্মুহু প্রস্রাব, লাল বা ঘোলা প্রস্রাব হওয়া, তলপেটে বেদনা, শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা, হাত পা চক্ষু জ্বালা, ঝাপসা দেখা, দাঁড়াইলে মাথা ঘোরা অথবা অন্ধকারবৎ দৃষ্টি, সামান্য পরিশ্রমে কাতর, বুক ধড়ফড় করা, আলস্য বোধ, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, শিরঃপীড়া, মানসিক স্ফূর্ত্তিহানি উদ্যমহীনতা, স্বপ্নদোষ, অকাল বার্দ্ধক্য, প্রভৃতি আরোগ্য হইয়া সুস্থ দেহের আনন্দ লাভ করিবেন।

—মেহ রোগের তীব্র মূত্র যন্ত্রণা—

একদিনেই অর্দ্ধেক কমিবে। ৪র্থ দিনে সম্পূর্ণ সারিয়া যাইবে, কিন্তু রোগের মূলোচ্ছেদ ও শরীর স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় আনিতে হইলে রোগোপশমের পরও কয়েক দিন গণোডাইন সেবন করা একান্ত বিধেয়।

মূল্য প্রতি শিশি ২৲, ৩ শিশি ৫॥০, ডজন ২০৲ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—জারমলীন লিঃ, ৪২ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একদিনে জ্বর ছাড়ে!

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্রপ্রাপ্তব্য

পথ্যের বিচার নাই

Printed at The "Mohammadi Prees" 91 Upper Cricular Road, Calcutta.

মোহাম্মদী

মাঘ

বার্ষিক মূল্য সডাক তিন টাকা ছয় আনা সম্পাদক—মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা

সূচীপত্র—মাঘ ১৩৩৭

সূচীপত্র—মাঘ ১৩৩৭

সূচীপত্র—মাঘ ১৩৩৭

বিলাতী সিগারেট যখন পরিহার্য্য

মফঃস্বল গ্রাহকদিগের অর্ডারী মাল অতি যত্ন সহকারে সরবরাহ করিয়া থাকি।

আমরা অনেক প্রকার নেপালী তামাক ও বিড়ীর পাতা পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের জন্য মজুত রাখি।

"চাঁদ টুপি" মার্কা "মহল"

বিড়ী

আপনাদের ব্রতপালনে সম্যক সহায়তা করিবে। নিজেদের কারখানায় ১নং নেপালী তামাকে প্রস্তুত।

Abdul Rahman Haji Hamed
16-2B, Armenian St,
Calcutta.

আবদুল রহমান
হাজি হামেদ,
১৬।২ বি আরমিনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জুবিলী চা

পান করুন

বিশুদ্ধ দার্জ্জিলিং

এবং

আসাম চা ব্যবসায়ী।

চা'তে যেমন গন্ধ, তেমনি সুন্দর রং হয়,

গুণে অতুলনীয়

অথচ মূল্য সস্তা।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

১নং ওল্ডকোর্ট হাউস লেন,
রাধাবাজার, কলিকাতা।

ডাক্তার কর্ণেল সাহেবের

'গয়টার কিওর'

গলগণ্ড বা ঘ্যাগ রোগের একমাত্র মহৌষধ।

ঔষধ ব্যবহারের পূর্ব্বে। ঔষধব্যবহারের পরে।

গলগণ্ড বা ঘ্যাগ অতি ভীষণ রোগ। ইহার একমাত্র প্রতিকার "গয়টার কিওর"। যে কোন প্রকার গলগণ্ড বা ঘ্যাগ হউক না কেন ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহাতে কোন প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা বা ঘা হইবার আশঙ্কা নাই। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা মাশুল স্বতন্ত্র।

ডাক্তার কর্ণেল এণ্ড কোং
৯ নং আণ্টনী বাগান লেন, কলিকাতা

সমগ্র ভারতে আদৃত

ভারতবর্ষে যেখানে শিশুরা বদহজমজনিত উদরপীড়ায় ভুগিয়া থাকে সে অবস্থায় শিশুদিগের পক্ষে "কাউ এণ্ড গেট" আদর্শ খাদ্য।

এই "কাউ এণ্ড গেট" শিশুদের খাইতে দিয়া আজ সহস্র সহস্র পিতামাতা সুখী। আপনিও সেই বিখ্যাত খাদ্য শিশুদিগকে সেবন করাইয়া তাহার ফল প্রত্যক্ষ করুন।

দেখবেন কত আনন্দে ও কত সহজে সে ইহা পরিপাক করছে এবং কত সত্বর হাড় শক্ত হয় ও শরীর সুগঠিত ও বৃদ্ধিলাভ করে।

"কাউ এণ্ড.গেট" একাধারে দুগ্ধ এবং খাদ্য, ইহাতে ভিটামিন স্বভাবতঃই বেশী আছে।

এজেন্টস্—কার এণ্ড কোং লিঃ করাচী এবং বোম্বে, কলিকাতা ও মাদ্রাজ।

প্রস্তুতকালীন হস্তদ্বারা পৃষ্ঠ হয় না।

স্থানীয় এজেণ্ট :—সি, মণিলাল এণ্ড কোং
E.P.S. ৫৫।৮৮ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অমৃতাঞ্জন ডিপো,
পোষ্ট বক্স নং ৬৮২৫ কলিকাতা

লেডিজ বাম

অর্থাৎ অবলাগণের একমাত্র সহায়

এই মহৌষধ চিকিৎসা-জগতে যুগান্তর আনিয়াছে। কষ্টরজঃ বাধক ও তৎসংলগ্ন যাবতীয় স্ত্রীরোগের অব্যর্থ ঔষধ। আর নীরবে ক্রন্দনের আবশ্যক নাই। ইহা সেবনে বন্ধ্যা, গুল্মরোগ, ঋতুকালে পেটের যন্ত্রণা, অপরিমিত রজঃ, অনিয়মিত ঋতু, কোমরে যন্ত্রণা, খারাপ রক্তের রক্তস্রাব, দুর্ব্বলতা, হাত পা ও মাথা জ্বালা, অরুচি, মাথাঘোরা, মূর্চ্ছা, চক্ষে ঝাপসা দেখা, আক্ষেপ, কার্য্যে অনিচ্ছা প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাধি আরোগ্য হয়। ইহাতে কোনও বিষাক্ত দ্রব্য নাই ও সেবনে কোনও কষ্ট বা ধরাকাট নিয়মাদি নাই। ৬০ ট্যাবলেট ৩৲। লেডিজ বাম নং ২ সর্ব্বপ্রকার প্রদরের অমোঘ মহৌষধ মূল্য ৬০ ট্যাবলেট ৪৲, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। মিঃ রামকৃষ্ণ জৈন, লাহোর :—লেডিজ বাম আমার টাকা সার্থক করিয়াছে। মিঃ লছমিপ্রসাদ সিংহ, উকীল, আরা :—স্বাস্থ্য খুবই উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়া অন্তঃস্বত্বা হইয়াছেন।

একমাত্র প্রস্তুতকারক :—

বেহার কেমিক্যাল ওয়ার্কস,
শ্রীগৌরাঙ্গ ভবন, ভাগলপুর। ব্রাঞ্চ মিহিজাম।
তারের ঠিকানা—কেমিষ্টস, ভাগলপুর।

দশহাজার টাকা পুরস্কার

ওজস দুঃস্বপ্ন, শুক্রতারল্য, অবসন্নতা ও পুরুষত্ব-হীনতা-নাশক রসায়ন। শুক্রকে গাঢ় করিয়া ধাতু ও স্নায়ুকে সবল, সতেজ ও কর্ম্মঠ করিতে ইহা অদ্বিতীয়। মূল্য ১৷০ টাকা।

পাচক ১ মাত্রায় অম্ল ও শূলের অসহ্য কষ্টের উপশম; নিয়মিত সেবনে অম্ল, অজীর্ণ, শূল, অনিদ্রা, মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য, বায়ুবৃদ্ধি, অগ্নিমান্দ্য ও যকৃৎ-বিকৃতি আরোগ্য হয়। শিশি ১৲ টাকা। ঔষধদ্বয়ে বিজ্ঞাপিত গুণ নাই প্রমাণিত হইলে উক্ত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। পত্র দিলে ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

কবিরাজ—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মল্লিক
(অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান)
কালনা (বেঙ্গল)।

চশমা! চশমা!!

সকল রকম চশমা সুলভে পাইতে চইলে একমাত্র **টি, সি, দাস** এণ্ড ব্রাদার্সের দোকানে পদার্পণ করুন। এখানে সকল রকম সোণা রূপার চশমা নিজ কারখানায় প্রস্তুত করিয়া আপনাদের মনোমত করিয়া দেওয়া হয়। অপছন্দ হইলে ১ মাসের মধ্যে পাথর বদলাইয়া দিই।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

টি, সি, দাস এণ্ড ব্রাদার্স,
১২৮।৫৩এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, (শ্যামবাজার দক্ষিণ) ক্যালঃ।

পর পৃষ্ঠা হইতে উপহারের বিস্তৃত বিবরণ দেখুন।

'চমৎকার'!
"এভার-রেডী"
ক্ষুরে
কামিয়ে আরাম আছে। ইহাতে যেমন পরিস্কার তেমনি শীঘ্র কামান যায়। যিনি একবার এ ক্ষুরে কামিয়েছেন তাঁকে আর অন্য ক্ষুর ব্যবহার কর্ত্তে হ'বে না।
C. B. সেট ১ ব্লেডযুক্ত "ট্রায়েল আউট কিট" মূল্য ।৵০ আনা।
দুই ব্লেডযুক্ত গোল্ড প্লেটেড সেট (লাল বাক্সে) মূল্য ॥৵০ আনা।
দুই ব্লেডযুক্ত "পপুলার" সেট মূল্য ৸০ আনা।
এভার-রেডী ব্লেডগুলিরও বিশেষত্ব আছে খুব ধারাল অথচ মজবুত।
Ever Ready Razor
আমেরিকান সেফ্‌টী রেজর কর্পোঃ লিঃ, পোঃ বক্স ৯৮, কলিকাতা।
PUBLICITY STUDIO.

কবি জসীম উদ্‌দীনের কবিতার বই

১। বালুচর—প্রেমের কবিতা—রঙীন প্রচ্ছদপট ঝকঝকে বাঁধাই

২। রাখালী (শোভন সংস্করণ। সম্পূর্ণ নতুন কলেবরে রঙীন প্রচ্ছদপট সহ)

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাবলী সংগ্রহ

৩। নকসী কাঁথার মাঠ (রঙীন প্রচ্ছদপট সহ)

এই ধরণের বই বাংলা ভাষায় এই প্রথম। মুসলমান চাষী জীবনের সহজ প্রেম-কাহিনী। পড়িতে পড়িতে চোখে জল আসে। **মূল্য প্রত্যেকখানা এক টাকা মাত্র।**

মৌলানা আকরম খাঁ সাহেব এই কবি সমন্ধে বলেন—"আমার মতে জসীম একটা নিজস্ব বৈশিষ্টের অধিকারী। জসীমের বাঁশীর সুরে বুকের মধ্যে একটা বেদনার মাদকতা জাগিয়া উঠে। তাহা উপভোগ করিয়া যথেষ্ট আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ ক'র।"

ইহা ছাড়া বিচিত্রা, মোহাম্মদী, সওগাত প্রভৃতি বাংলার সমস্ত কাগজে এই পুস্তকগুলি উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। বাংলা-সাহিত্যে কবি জসীম উদ্‌দীন একটা নতুন দিক খুলিয়া দিয়াছেন। তাহার উপমা, শব্দ যোজনা সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব। সহর হইতে বহু দূরে পল্লীর নির্জ্জন ক্রোড়ে হাজার হাজার মুসলমান চাষী তাহাদের অভিনব সুখ-দুঃখ লইয়া জীবন্ত কবরখানায় ঘুমাইয়া আছে। তাহাদের কথা লইয়া ইতিপূর্ব্বে কোন কবিই কাব্য লেখেন নাই। কবি জসীম উদ্‌দীন আজীবন গ্রামে থাকিয়া, গ্রামের মাটির মানুষগুলির সাথে মিশিয়া তাহাদের সুখ-দুঃখের সাথী হইয়া তাহাদের ব্যথার কথা লিখিয়াছেন। তাহার কাছে গ্রামের উৎসব কোলাহল, কাইজা মারামারি কুসংস্কার ধর্ম্মান্ধতা সবই কবিত্বময়। যাঁরা দেশকে ভালবাসেন দেশের দীন দরিদ্র চাষী জীবনের প্রতি যাদের সত্যকার দরদ আছে যারা গ্রামের ছায়ায়-ঢাকা মায়ায়-ঘেরা পল্লী-রূপকে ভালবাসেন তাঁরা আজই এই বইগুলি কিনিয়া পড়ুন।

প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম লাইব্রেরী, ৬১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ও মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ৯১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

দি চিপ্ মেডিকেল ডেণ্টাল হল

২।৩নং সাউথ রোড, ইণ্টালি, কলিঃ

এই ডিস্‌পেন্সারীতে সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসারই ব্যবস্থা আছে বিশেষতঃ দন্ত-চিকিৎসা বিশেষ যত্নের সহিত করা হয়।

ছাত্রগণের সুবর্ণ সুযোগ !!

স্কুল বা কলেজের হেড মাষ্টার এবং প্রিন্সিপালের পরিচয়-পত্র লইয়া আসিলে নামমাত্র পারিশ্রমিক লইয়া দন্ত-চিকিৎসা করা হয়।

দন্ত রোগ এবং অপরাপর রোগ খ্যাতনামা চিকিৎসক দ্বারা আধুনিক উন্নত প্রনালী মতে বিনামূল্যে পরীক্ষা করান হয় ও ব্যবস্থা দেওয়া হয়। সময় প্রাতে ৮টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত।

বিশেষত্ব ঃ—দাঁত পরিষ্কার কালীন রোগীর কোনরূপ যন্ত্রণা হয় না। দাঁত সুন্দর ভাবে সোনার তার দিয়া বাঁধাই করা হয় এবং প্লেটের কার্য্য সুচারুরূপে হয়। খরচও সামান্য।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ডাঃ এস, এম, ইসাক

এম, এম, বি, (ডি, এম, সি) ও বি, এস।

দন্ত-বিভাগের চিকিৎসক ও সার্জ্জেন।

শেরে হিন্দ

মওলানা মোহাম্মদ আলী মরহুমের

ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ছবি

প্রত্যেকখানির মূল্য ।০

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

ম্যানেজার—মোহাম্মদী প্রেস,

৯১নং আপার সারকুলার রোড,

কলিকাতা।

সস্তার চা কোথায়?

এজেন্ট ক্যানভ্যাসার
এবং পাইকারী ক্রেতাগণকে
উচ্চহারে কমিশান
দেওয়া হয়
কোথায়?

ভারত টি কোং,

১৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সস্তার জুতা কোথায়?

স্বদেশী সৌখীন
এবং স্থায়ী পাদুকা
মনোমত করিয়া
তৈয়ারী হয়
কোথায়?

ভারত ট্যান্যারি,

২৮, ষ্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা বৈদ্যবাটী॥

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত॥

মেহবজ্রাম্বৃত॥

হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার অবশ্যম্ভাবী॥

মেহ রোগের ধন্বন্তরী

একদিনে জালা যন্ত্রণা যায়। সাত দিনে নূতন রোগ নিরাময় হয়। সপূঁজ ধাতু নির্গম, রক্তস্রাব বার বার অল্প অল্প প্রস্রাব মুত্র মালির ক্ষত ইত্যাদি অচিরে বিনাশ হয়। ইহা মেহ ও প্রমেহ নাশক অব্যর্থ মহৌষধ। ইহাদ্বারা গণোরিয়া, মেহ, প্রমেহ, শুক্রমেহ, শুক্রতারল্য, রক্তমেহ, এমন কি বিংশতি প্রকার প্রমেহ অচিরে আরোগ্য হয় মেহবজ্রাম্বৃতে চলিত ধাতু বদ্ধ করিয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করতঃ শরীর হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। ইহাতে কোন প্রকার দূষিত পদার্থ নাই। ইহা বক যন্ত্রেই প্রস্তুত। পরীক্ষা প্রার্থনীয়॥ মূল্য ১ শিশি ৩।৹ টাকা মাত্র ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

১। আমাদের ঔষধালয়ে যাবতীয় আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ পাওয়া যায়।

চ্যবনপ্রাশ	প্রতি সের ৬৲	শ্রীমদনানন্দ মোদক প্রতি সের	১২৲
ব্রাহ্মি ঘৃত	" ৮৲	অশোক ঘৃত "	১২৲
অমৃতপ্রাশ ঘৃত	" ২৪৲	মকরধ্বজ ওরি	তোলা ৮৲
ষড়্গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ ওরি তোলা	১৬৲	সিদ্ধ মকরধ্বজ "	৩২৲

আসব, আরিষ্ট, বটীকা, মোদক, ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

বিনীত কবিরাজ শ্রীক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন
৩৪ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ক্যালকাটা হোমিও ষ্টোর।

প্রসিদ্ধ আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়

৯৩।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রসিদ্ধ চিকিৎসগণ আমাদের ঔষধের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। অনুগ্রহ করিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। গৃহ চিকিৎসার বাক্স—১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ৮৪, ১০৪, যথাক্রমে মূল্য ২৲, ৩৲, ৩।৹, ৫।৹, ৬।৶৹, ৯৲, ১০৸৶৹ মাত্র।

ফিমো সুইট।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। অনিয়মিত রজঃ, রজঃরোধ, অতিরজঃ, অসহ্য বাধক বেদনা, রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর রোগের একমাত্র ঔষধ। যে সকল স্ত্রীলোক ঋতুর ২ ১ দিন পূর্ব্বে ও পরে অসহ্য বাধক বেদনায় কষ্ট পান তাঁহারা যথাক্রমে ১ মাস ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন। এবং যে সমস্ত স্ত্রীলোক রক্ত প্রদরে ও শ্বেত প্রদরে ভুগিয়া শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহাদের উপর এই ঔষধ অমৃতবৎ কাজ করিবে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ১।৹ টাকা। পত্র লিখিলে বিনা মাশুলে মূল্য তালিকা পাঠান হয়।

Annual Contract Rate— Buyers' Guide. **Annas Eight Per Line.**

মোহাম্মদী

মোহাম্মদী প্রেস

আধুনিক ডিজাইনের সর্ব্ববিধ সোনার অলঙ্কার, বিবিধ প্রকার কারকার্য্য-সমন্বিত জড়োয়া গহনা, মনোমুগ্ধকর রৌপ্য নির্ম্মিত দ্রব্যসম্ভার, দেশ কাল ও পাত্রোপযোগী বিবিধ প্রকারের ও নানা রংয়ের সুবর্ণ নির্ম্মিত এনামেল করা আংটী, ব্রুচ, লকেট্ ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা মজুত রাখি।
সততার সহিত সর্ব্বশ্রেণীর নর-নারীর তৃপ্তি ও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া ধন্য হইবার আকাঙ্ক্ষায় এই বিপুল ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার খুলিয়া রাখিয়াছি।
টেলিগ্রাম— "করচুণ" কলিকাতা।
ঠাকুরলাল হীরালাল এণ্ড কোং,
জুয়েলার্স্
১২নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন— ক্যালকাটা, ৪০০

মাঘ, ১৩৩৭ চতুর্থ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা

"প্রাচী'র সূর্য্য ডুবে গেল হায়! প্রতীচী-সিন্ধু-কূলে!"

শাহাদাৎ হোসেন

ওঠে হাহাকার ক্রন্দন-রোল অস্ত-তোরণ-মূলে
প্রাচী'র সূর্য্য ডুবে গেল হায়! প্রতীচী-সিন্ধু-কূলে।
শ্বেত-দ্বীপের জমাট তুষার
গলে' গেছে আজি—অশ্রু-পাথার
দুলিয়া উঠেছে টেম্‌সের বুকে—মাতম জেগেছে কূলে;
বেদন-বিধুরা কাঁদে বৃটানিকা গুমরিয়া ফুলে ফুলে।

মন্থিত-ব্যথা অতলান্তিক দোলে—কূলহারা পারাবার,
রুদ্ধ কাঁদনে ফুঁসিছে ঊর্ম্মি—দুর্জ্জয় হাহাকার।
অধীর বেদনে কভু দিশাহারা
আছাড়ি' লুটিছে উন্মাদ-পারা
দিগন্তরের অসীমায় দূরে—নামহারা উপকূলে
হারাণো মাণিক খুঁজে পাবে বুঝি—গিয়াছে যে পথ ভুলে।

হেথা বন্দিনী দুখিনী জননী দিনে দিনে পলে পলে
ভাগ্যের লিপি লিখিতেছে রাঙা বেদনার শতদলে ;
সহসা কারার রুদ্ধ-দুয়ারে
আর্ত্ত জলধি আছাড়ি' ফুকারে ···
ওরে অভাগিনী। কপাল ভেঙেছে—নিয়তি হেনেছে বাজ,
আশার প্রদীপ নিভে গেছে তোর পারের তিমিরে আজ।

লুটে কাঙালিনী মূরছি' বিবশা ধাত্রী ধরণী-কোলে
গল-শৃঙ্খল বেজে ওঠে ঝন ঝন্-ঝন্ ঘন রোলে।
পারের মাতম জাগিল এপারে
'আহাজারি' মুখে কাতারে কাতারে
চলে নরনারী বন্দিনী মা'র রুদ্ধ দুয়ার খুলে
মূর্চ্ছিতা সে যে সন্ধ্যা-কমল আলোর সমাধি কূলে।

বেদনার রঙে মরমের খুনে রেঙেছে অসীমাকাশ,
ব্যথার বারিধি মথিয়া উঠিছে করুণ হাহাশ্বাস।
শুধু "নাই" "নাই" আকাশে বাতাসে
নিঠুর নিয়তি নির্ম্মম হাসে,
আলোর আড়ালে অকরুণ করে ললাট-লিপির লেখা
শোণিত আখরে লিখিতেছে বসি' তিমিরের কূলে একা।

বৃথা রে নিয়তি! তোর এ বিধান দলে' গেছে পদতলে
মরু-বেদুঈন ফিরিবে না আর—ছিঁড়ে গেছে শৃঙ্খলে।
ঊষর-বালুর অগ্নি-গরিমা
অনাদি যুগের রুদ্র-মহিমা
সে যে 'সাইমুম' ঘূর্ণী-দোলায় এসেছিল পথ ভুলে
শত-ঝঞ্ঝার দুর্ব্বার বেগে ভারতের উপকূলে।

দেখেছিল সে যে শত নিপীড়ন জুলুমের জিঞ্জিরে
কাঁদে অধোমুখী ভারত-লক্ষ্মী প্রাচী'র তিমির-তীরে,
এসেছিল তাই হুঙ্কারি' রোষে
বজ্র-বিষাণ ঘন-নির্ঘোষে
বন্দিনী মা'র শৃঙ্খল-ভার ছিঁড়িতে এ দাস-ভূমে
উদ্‌যাপনের শুভ 'খণে তারে ঘেরিল অকাল ঘুমে।

* * *

যাও তবে যাও হে যুগ-মানব, স্মৃতির সমাধি-পারে।
ধরার ধূলায় বসিয়া আজিকে স্মরি তোমা বারে বারে।
উল্কার মত এসেছিলে তুমি
মর-ধরণীর ধূলিমুখ চুমি'
জাতির জীবনে ঝঞ্ঝা-তড়িৎ—আলোড়ি' উজলি' দিশি
চির-আলোকের সন্ধানী গেলে চির-অসীমায় মিশি।

কাঙালিনী মা'র সন্তান তুমি কাঙাল ছিলেনা তবু,
বিত্তের দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি পাতিতে শেখ'নি কভু।
অপৌরুষের জাগ্রত অরি
চির-পৌরুষে নিয়েছিলে বরি
কম্বুকণ্ঠে পুরুষকারের ঘোষিয়াছ চিরজয়,
উন্নত শির নোয়াওনি কভু জানিতে না পরাজয়।

সত্য-ন্যায়ের দরদী পূজারী—মরমী ইসলামের,
মুসলমানের শিরোমণি ওগো মুক্তি-দিশারী শের!
আজিকে স্মরণে পারাবার-পারে
সে-বাণী তোমার জাগে বারে বারে—
দাস-ভূমে আর ফিরিব না কভু এ মোর জীবন-পণ
তুষারের কূল করিব কবুল—এই মোর শেষ রণ।

সার্থক রণ—মহা-ভারতের হে মহাযুগের ঋষি!
প্রাচী'র জলধি বিধুনি' সে-পণ ধ্বনিছে তিমির দিশি।
পারাপারে ঢেউ মন্দ্রিছে আজি
মহা-অসীমায় উঠিয়াছে বাজি—
অমর তোমার বজ্র-ঘোষণা;—এশিয়ায় জাগে প্রাণ
ঘন-নির্ঘোষে অযুত-কণ্ঠে এ নব আত্মদান।

'হেলালে-ঝাণ্ডা' তোমার স্মৃতির আজি শুধু অবশেষ
তা'রি মাঝে তুমি হে নর-কেশরী! দেখেছিলে জাতি-দেশ।
সেই মহাস্মৃতি-পতাকার মূলে
নব-ভারতের মানবতা-কূলে
স্মৃতির পূজারী রচে দীন কবি শেষের স্মৃতির গান—
বিরাটের বুকে স্বরাটের মহা সুমহিম অবসান।

নানার বাড়ী

এস, ওয়াজেদ আলী, বি-এ (ক্যাণ্টাব), বার-এট-ল

ছেলেবেলা থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে নদী কিম্বা রাস্তা এদুটোর একটা না একটাকে আমি খুঁজেছি। যে দৃশ্যের মধ্যে এদুটোর কোনটাই নাই, সে দৃশ্য আমার মনকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে পূর্ণতা দানের জন্য এ দুটোর অন্ততঃ একটা অপরিহার্য্য উপকরণ বলেই আমার মনে হয়েছে।

বাগান যত সুন্দরই হোক, আর বাগান বাড়ী যত সুরম্যই হোক, সামনে তাদের নদী আর নদীর পারে মাঠ না থাকলে আমার তাতে তৃপ্তি হয় না। পক্ষান্তরে নদী আর মাঠ এদুটো পেলে, বাগান বাড়ি যদি কুঁড়ে ঘরও হয়, আর বাগান বলতে যদি দুচারটে নারকেল আর সুপারি গাছ ছাড়া আর কিছু না থাকে, তাতেও আমি সন্তুষ্ট!

যতগুলি প্রাকৃত্রিক দৃশ্য, তা সে ছবিতেই হোক, আর জীবনেই হোক, আমার মনের মধ্যে চিরতরে রেখাপাত করে গেছে। তাদের সবের মধ্যেই নদী কিম্বা রাস্তা, এদুটোর মধ্যে একটানা একটা, আর কোন কোনটার মধ্যে দুটোই আছে। একটী বিশেষ দৃশ্যের কথা আজ পাঠককে বলবো। এত স্পষ্ট হয়ে সে দৃশ্যটী আমার মনে আঁকা রয়েছে, আর তার স্মৃতি আমার অন্তরের সঙ্গে এমন নিবিড় ভাবে জড়িত আছে যে, এমন একদিন প্রায় যায় না, যেদিন সে দৃশ্য আমার মনে ভেসে উঠে না। আমার নানার বাড়ির দৃশ্যের কথাই এখানে বলছি।

পৃথিবীর তিনটে মহাদেশ আমি দেখেছি। ভারতবর্ষ এবং ইউরোপের বিখ্যাত প্রাকৃত্রিক দৃশ্যের অনেক আমি স্বচক্ষে দেখেছি, আর অনেকের বর্ণনা পড়েছি, ছবি দেখেছি, গল্প শুনেছি। কোন দৃশ্যই কিন্তু, আমার মনে, ভাবের সে গভীর হিল্লোল তুলতে পারেনি, যা বাঙ্গলার একটী অজ্ঞাত পল্লীর সেই অখ্যাত দৃশ্যটী তুলেছে। আমার স্থির বিশ্বাস, কোন দিন যদি কোন কারণে, আমার স্মৃতিশক্তি লোপ পায়, আর জীবনে যে সব দেশ দেখেছি, সে সবের কথা আমার মন থেকে বিলুপ্ত হয়, তা হলেও নানাদের দেশের ছবিটী ঠিক এখনকার মতই আমার মনে জেগে থাকবে। সে ছবি কখনও বিস্মৃতির সাগরে তলিয়ে যাবে না।

যারা সুন্দর সুন্দর দেশের সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখে এসেছেন, তাঁরা হয়তো আমার প্রিয় দৃশ্যের বর্ণনা শুনে অবজ্ঞার হাসি সম্বরণ করতে পারবেন না। তাতে বড় কিছু আসে যায় না। যা থেকে আমি অমন নিবিড় আনন্দ পেয়েছি, তার গৌরব ঘোষণায় লজ্জিত হবার কোন কারণ নাই। অন্যে যদি সে দৃশ্য দেখে, কিম্বা তার বর্ণনা শুনে, আমার মত আনন্দ না পান, সেটা তাঁদের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলবো?

বাড়ি বলতে নানাদের ছিল ছোট্ট একটী কোটা, কয়েকখানি খড়ো ঘর, আর সদরে খড় দিয়ে ছাওয়া মাটির একটী দহলিজ। সে বাড়িকে প্রাসাদ বলে ভুল করবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। দহলিজের সামনে খানিকটা জমি ছিল বেড়া দিয়ে ঘেরা, নানাজি তাতে ফুলের আর পাতাবাহারের গাছ বসিয়ে ছিলেন। তা ছাড়া শাক শব্জির গাছও ছিল। বেড়ার বাহিরে চৌকো আকারের মাঝারি রকমের একটী আমের বাগান, মাঝখানে তার একটী পুকুর, আর বাগানের অপর প্রান্তে একটী ইদগাহ্।

সবই মামুলী ধরণের জিনিষ। কোন বিশেষত্ব এ সবের মধ্যে ছিল না। এসবকে বিশেষত্ব দিয়েছিল এদের Setting। বাগানের পুব দিক দিয়ে এঁকে বেঁকে ছোট্ট একটী নদী চলেছিল অসীম সমুদ্রের পথে। নদীর অপর পারে পায়ে-হাঁটা একটী পল্লীপথ,—সে পথও চলেছিল পৃথিবীর অন্তহীন পথের জালের সঙ্গে মেলবার জন্যে। পথের পাশে লোকেদের বাড়ি। তারপর বিস্তীর্ণ মাঠ। বাগানের পশ্চিম দিকে পায়ে-হাঁটা একটী পথ, তারপর মাঠ। মাঠের প্রান্তে একটী মোস্‌লেম পল্লীর ঘর, বাড়ি, বাঁশবন, আমবাগান প্রভৃতি ঝাঁপসা হয়ে দেখা দিচ্ছিল, আর তাদের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া ফুটে উঠেছিল সাদা ধপধপে একটী গোম্বজ বিশিষ্ট মসজিদ—মোসলেম পল্লীর জীবন কেন্দ্র।

দক্ষিণ অর্থাৎ ইদগার দিকে কতকটা পথ গিয়ে নদী বাঁক ফিরেছিল। বাঁকের মুখে নদীটা খুব চওড়া। বাঁকের এক দিকে নৌকার ঘাট, সেখানে অনেকগুলি নৌকা বাঁধা থাকতো; আর অপর দিকে ছিল প্রকাণ্ড একটী অশ্বথ গাছ, এক পাল রাজহাঁস তার তলায় খেলা করতো। নদীটা বাঁক ফিরে পুবদিকের গাছ পালার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

নানাদের বাগান থেকে একঠা বাঁশের সাঁকো নদী অতিক্রম করেছিল, তাই দিয়েই লোক এপার ওপার যাওয়া আসা করতো। নানাদের পারে নদীর পাড়ে একটা বাঁশ-বন ছিল। আমি সেই বাঁশবনে দাঁড়িয়ে অনেক সময় নদীর উপর দিয়ে নৌকার যাওয়া আসা দেখতুম আর কত কি ভাবতুম!

দৃশ্যটী যে সুন্দর তা অবশ্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সে সৌন্দর্য্য আমি যে দৃশ্যের মধ্যে অনুভব করেছি লেখায় তা ব্যক্ত করা কঠিন। যদি আমি চিত্রকর হতুম, তুলিকার সাহায্যে তাহলে আমার অনুভূতিকে রূপায়িত করতে চেষ্টা করতুম। দৃশ্যটীর বিশেষত: এই যে বঙ্গ প্রকৃতির মধ্যে যতগুলি সুন্দর এবং রমনীয় উপকরণ আছে, সকলেরই এখানে এক অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছিল। প্রান্তর পল্লী, বাঁশবন, গ্রাম্যপথ, ইদগাহ্, পুকুর, আমের বাগান, পল্লী-গৃহস্থের বাড়ী, নদী, নদীর বাঁক, সাঁকো, অশ্বথ গাছ, রাজহাঁস প্রভৃতি পল্লী দৃশ্য বা Landscape-এর বিভিন্ন উপকরণকে এমন সুন্দর এবং সুবিন্যস্তভাবে রাখা হইয়াছিল যে কোন দক্ষ আর্টিষ্ট চেষ্টা করেও তার চেয়ে বেশী সুন্দর করে তাদের রাখতে পারতেন না।

আমার শিশু-মন সবে মাত্র তখন বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে এইরূপ রং আর রসে-ভরা পৃথিবীর দিকে চাইতে আরম্ভ করেছে। সুন্দর জিনিষ সেই মনের কাছে তখনও অভিনবত্ব হারায়নি, প্রকৃতি তখনও অচিন্তনীয় রহস্যে ভরা, কল্পনার চঞ্চল পক্ষ বিস্তার করে যেমন তখন বিচিত্র মায়া রাজ্যের সফরে নিত্য নিয়ত ব্যস্ত! সেই অনুকূল অবস্থায় এই মনোরম দৃশ্যটী যে আমার মানসপটে গভীর রেখাপাত করেছে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। তবে আমার সেই অনুভূতির কথা বলবার জন্যই আমি লেখনী ধরিনি, অনুভূতিকে উপলক্ষ্য করে আমাদের সৌন্দর্য্য-পিপাসু মনের (asthetic sense-এর) দু' একটি বিশেষত্বের আলোচনা আজ আমি করতে চাই।

নদীর উপর, পথের উপর, সীমাহীন কিছুর উপর আমাদের স্বাভাবিক একটা টান আছে। প্রান্তরের উদারতা আমাদের মনকে পুলকিত করে। প্রান্তর অন্তেস্থিত কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন পল্লীর বিচিত্র শোভা আমাদের মনে asthetic ভাব জাগিয়ে তোলে। বাঙ্গলার পল্লী সৌন্দর্য্যে মসজেদের বিশিষ্ট একটী স্থান আছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করবার জন্য দৃশ্যের মধ্যে পশু পক্ষীর প্রয়োজন আমরা অন্তরের সঙ্গে অনুভব করি।

নদীর উপর, গতিশীল পানির উপর মানুষের মনের টান সব দেশের এবং সব জাতের সাহিত্যেই দেখতে পাওয়া যায়। মানবীয় সাহিত্যের কথা ছেড়ে দিন, খোদার গ্রন্থ কোরানেও বেহেস্তের বর্ণনায় নদীর উল্লেখ করা হয়েছে—"তাজ্‌রি মেন-তাহ্‌তেহাল আনহার"—বেহেস্তের নীচে দিয়ে নদী প্রবাহিত হচ্চে।

পথ যে কতদূর কাম্য তা এক ইংরাজি সাহিত্যে পথের বিষয় কত কবিতা কত রচনা তা দেখলেই বুঝতে পারবেন। পথের আকর্ষণ কবি John Masefield অতি সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন :—

My Road calls me, lures me
West, East, south and North;
My Road leads me forth
To add more miles to the tally

নানাজি এবং নানিজান উভয়েই পরলোক চলে গেছেন। মামুরাও সকলে অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। নানার বাড়ী যাওয়া আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর থেকে আমাদের বন্ধ আছে। নানার দেশের ছবিটী কিন্তু এখনও কালকে-আঁকা ছবির মতই আমার মনের চিত্রালয়ে জলজ্বল করছে। আর যতদিন এই পৃথিবীতে থাকবো, ততদিন যে সে ছবি ম্লান হবে না, সে কথা আমি খুব জোরের সঙ্গেই বলতে পারি, সে ছবিতে বাঙ্গলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রাণ-বস্তুটী চিরকালের তরে আমার চোখে ধরা দিয়েছে।

মরণ-পিপাসা

আবদুল কাদের

ফাল্গুনে দেখিয়াছিনু স্বপ্নশীলা সখিরে আমার—
তনুলতা লীলাইয়া চলিয়াছে মন্দার চয়নে,
শুভ্র-বুকে পদ্মকলি শিহরায় গন্ধের শয়নে,
অপাঙ্গে ভ্রূভঙ্গে খেলে অনঙ্গের বাঁকা তরবার,—
স্তনতটে লোটে মালা, শ্রোণীমূলে মেখলা-ঝঙ্কার,
ওষ্ঠাধরে স্ফূর্ত্ত হাসি, রূপ-নেশা স-লীল-নয়নে,
স্নায়ুতে শিরায় নৃত্য, রক্তরেণু পুষ্প-প্রসাধনে,
চরণে অলক্ত-রেখা—লেখা দূর দীর্ঘ অভিসার।

*

আজিকে হেমন্ত-সন্ধ্যা, নাহি সেই বাসন্তী স্বপন,—
কুহেলি-আঁধার মাঝে কাঁদে প্রিয়া অনবগুণ্ঠিতা।
মুখ তার নাহি হেরি, নাহি হেরি সে দেহ শোভন ;
তুষার-ভূষিত কেশ পৃষ্ঠে দোলে আগুল্ফ-লুণ্ঠিতা—
শীতশীর্ণ মৃত্যুমায়া সে-ছায়ায় করে সঞ্চরণ
করপদ্মে পূর্ণ পাত্র।—তাই পি'ব, কুহেলি-কুণ্ঠিতা!

অপরাধী

আক্‌বরউদ্‌দীন বি-এ

১

বিপরীত চরিত্র ও ভাবসম্পন্ন করিম ও হবিব যেদিন একসঙ্গে ব্যবসা আরম্ভ করে তখন সকলেই মনে করিয়াছিল, দুর্দ্দান্ত মাতাল ও বদমায়েশ করিম নেহায়েৎ গোবেচারা হবিবের সর্ব্বনাশ করিবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যখন দুই বন্ধুতে একসঙ্গে বিপুল উদ্যমে কারবার চালাইয়া বছর পাঁচেকের মধ্যেই শহরের ব্যবসাদারদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠিল ও বিশেষ করিয়া করিম মদ্য ও অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিল, তখন সকলেই বলিল—হাঁ পরশপাথরের গুণ আছে বটে।

কিন্তু আবার বৎসর দুই পরে যখন সকলে দেখিল করিম ভালই রহিয়াছে, অথচ হবিব মদ ধরিয়াছে, তখন অনেকেই অনেক কথা বলিল; কেহবা বলিল—টাকার গরম; কেহবা বলিল—এসব করিমের বজ্জাতি, সব ব্যবসায়টা নিজে মেরে নেবার মতলব।

করিম এই সকল মন্তব্য শুনিয়া আপন মনে হাসিত। একবার শুধু আপন মনেই বলিল—আমি এককালে মাতাল হ'য়ে মিউনিসিপালিটীর ড্রেণে প'ড়ে থাকতাম, তখন লোকে কত দোষই না আমাকে দিত, আর আজকে সকলের চক্ষে সাধুপুরুষ হবিব যে মাতাল হ'য়েছে, তাতেও তা'র দোষ না দিয়ে আমারই দোষ দিচ্ছে।

করিমের স্ত্রী রাত্রে তাহাকে কহিল—দেখ, হবিব সাহেব দিন দিন নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছেন, তুমি ইচ্ছা করলেই তাকে ভাল কর্ত্তে পার

করিম হাসিয়া কহিল—আমি যে এককালে মন্দ হয়েছিলাম, কৈ কেউ ত' আমাকে ভাল করেনি। একটু সহানুভূতিও ত' ক'রেনি।

স্ত্রী কহিল—কিছু যদি মনে না কর তবে একটা কথা বলি।

করিম কহিল—কি বল।

স্ত্রী কহিল—সবাই বলছে তুমিই নাকি ওঁকে নষ্ট ক'রছ।

করিমের চক্ষু একবার জ্বলিয়া উঠিল; তাহার পরই শান্তস্বরে সে কহিল—আমি? তা হ'তে পারে।

স্ত্রী কহিল—রাগ ক'র না।

করিম কহিল—রাগ? না, রাগ আর আমার নাই। আমার অপরাধ হয়ত' এই পর্য্যন্ত যে আমি তাকে বাধা দিইনি। কেন দেব? সে আর আমি একসঙ্গে প'ড়তাম; ক্লাসে সে ছিল সকলের নীচের ছাত্র আর আমি ছিলাম, সকলের উপরের; সেও এন্‌ট্রান্স পাশ কর্ত্তে পারেনি, আমিও না। সে পারেনি গাধা ব'লে, আর আমি পারিনি যৌবনের প্রথমে বাপের অজস্র অর্থ হাতে পেয়ে বিপথে চলে গিয়েছিলাম বলে। তারপর দেশে নাম হ'ল তার, আর বদনাম হ'ল আমার। আমি বাধা দেব না, আমি দেখ্‌তে চাই, অবস্থার পরিবর্ত্তনে মানুষের মনের পরিবর্ত্তন হয় কিনা। আজকেত বদ হ'চ্ছে সে, অথচ দোষ হ'চ্ছে আমার।

এমন সময় এত রাত্রে বাহিরে কে ডাক দিল। করিম কহিল—হবিব এসেছে; এত রাত্রে কেন?

স্ত্রী কহিল—গলা শুনে মনে হ'চ্ছে মাতাল হ'য়ে এসেছে।

করিম কহিল—হ'বেও বা। যাই দেখি।

বাহিরে আসিয়া দেখিল হবিব তাহার এক কর্ম্মচারীকে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। নেশায় সে টলিয়া পড়িতেছিল, কর্ম্মচারী কোন প্রকারে তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে।

করিম আসিতেই হবিব তাহাকে কহিল—দেখ, ঐ পুলিন কুণ্ডুর বিধবা শালীটা ভারি সুন্দরী; তাকে জোগাড় কর্ত্তে হ'বে।

করিম একবার চমকিয়া উঠিল। শেষে কহিল—তা আমি কি ক'রব?

হবিব কহিল—তুমি সব পার। আমাকে ঐটে জোগাড় ক'রে দাও। তোমার এসব অভ্যাস আছে।

করিম কহিল—এককালে অনেক করেছি; আর নয়।

হবিব উত্তেজিত স্বরে কহিল—আর সাধু হ'তে হ'বে না। ওটা আমাকে ঠিক ক'রে দাও—আজকেই।

করিম কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অবশেষে কহিল—দেখ হবিব, করিমের অসাধ্য কিছু নাই। তবে কি জান, তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, তুমি যথেষ্ট নীচে নেমেছ, আর নয়। তুমি এমন ক'রে কিছুদিন চল্‌লে, সব ধ্বংস হ'য়ে যাবে।

হবিব ক্রোধকম্পিত স্বরে কহিল—নাও রাখ তোমার বক্তৃতা। তোমার মুখে ওসব ভাল শোনায় না।

করিম কহিল—কেন? এককালে আমি খারাপ ছিলাম, কিন্তু আজও কি তাই? এই ক'বছর মদ ছুঁইনি বলত'। সবত' তুমি জান?

হবিব কহিল—রেখে দাও তোমার সাধুগীরি। পয়সা না থাকলে সবাই অমন সাধু হয়।

করিম জ্বলিয়া উঠিল; তাহার মনের কোণে বহুদিন-কার লুকানো বিষ আজ আবার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

সে কহিল—বেশ, তাই হ'ক। আজ আর নয়, কাল তুমি তাকে পাবে।

হবিব কহিল—ঠিক ত'?

করিম কহিল—করিম মিথ্যা কথা বলে না।

হবিব চলিয়া গেল।

করিম একদৃষ্টে তাহার যাত্রাপথের দিকে চাহিয়া রহিল; যখন সে অদৃশ্য হইল তখন কহিল—হবিব, তুমি তোমার নিজের সর্ব্বনাশ করছ, অথচ দোষ আমার। আজও তুমি ভাল আর আমি মন্দ।

৯

তাহার পর হবিবকে আর প্রায়ই পাওয়া যাইত না। করিমই কারবার দেখে, হবিব পূর্ব্বকথিত স্ত্রীলোক লইয়া মত্ত হইয়া আছে।

হবিবের স্ত্রী একদিন দ্বিপ্রহরে করিমের নিকট আসিয়া একমাত্র পুত্রকে বুকে লইয়া কাঁদিয়া পড়িল। কহিল—আপনি আমাদের বাঁচান।

করিম কহিল—আমি কি করব মা। এখন আমার হাতের বাহিরে।

হবিবের স্ত্রী কহিল—আপনি তাঁর একমাত্র বন্ধু; কোন প্রকারে তাঁকে রক্ষা করুন, আমাকে বাঁচান।

করিম স্তব্ধ হইয়া রহিল।

হবিবের স্ত্রী তাহার পায়ের নিকট উপুড় হইয়া পড়িয়া কহিল—আমাকে না হয়, আমার এই একমাত্র শিশু সন্তানকে দয়া করুন।

করিম তথাপি নিরুত্তর।

হবিবের স্ত্রী আবার কহিল—আপনারও ত' একটা ছেলে আছে। তা'র কথা ভাবুন, আর আমার ছেলেটার কথা ভাবুন। দু'দিন পরে যে এই দুধের বাছা পথের ভিখিরি হ'বে, না খেতে পেয়ে মারা যাবে, এটা কি ভাল?

করিম চকিতে তাহার নিজের ছেলের দিকে চাহিয়া কাঁপিয়া উঠিল। অবশেষে কহিল—মা, আমারও এই ছেলে একদিন অনাহারে মর্ত্তে চলেছিল, আমি সেই দিন ফিরে দাঁড়িয়েছিলাম। বেশ আজ আমি চেষ্টা ক'রব যাতে তোমার স্বামীকে ফেরাতে পারি।

হবিবের স্ত্রী চলিয়া গেল।

করিম আহার ও দিবানিদ্রা ত্যাগ করিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। তাহার স্ত্রী কহিল—এত কি ভাব্‌ছ।

করিম কহিল—যা ভাবছিলাম, তা আর হ'ল না।

ছেলেটার মুখ চেয়ে আমাকে চেষ্টা কর্ত্তে হ'বে। কিন্তু তবু সবাই ব'লবে আমি অপরাধী।

তাহার স্ত্রী কহিল—তা বলুক, তবু তুমি চেষ্টা কর, যাতে হবিব সাহেব ভাল হ'ন।

সন্ধ্যার পর করিম হিসাব দেখিতেছিল, হবিব আসিয়া খাজাঞ্চিকে কহিল—আমার তহবিল থেকে দু'শ টাকা দাও ত'।

খাতা হইতে মুখ তুলিয়া করিম কহিল—হবিব, তোমার সঙ্গে দু'ট কথা আছে।

হবিব বলিল—তাড়াতাড়ি বল, আমার সময় নেই।

করিম বলিল—তুমি যে অনবরত টাকা নিচ্ছ, এই এক মাস দেড় মাসের মধ্যে প্রায় তিন হাজার টাকা নিয়েছ, এত টাকা নিলে কারবার চালান শক্ত হ'বে।

হবিব কহিল—আমার নামে হিসাব লিখে রাখ।

করিম কহিল—তা না হয় লিখ্‌লাম, কিন্তু ভেবে দেখ, তুমি যে এমন ক'রে টাকা খরচ কচ্ছ, এতে কারবার বন্ধ হ'য়ে যাবে। টাকাগুলো ত' সব বদখেয়ালিতে উড়িয়ে দিচ্ছ।

হবিব চটিয়া কহিল—বেশ কচ্ছি, আমার টাকা আমি খরচ কচ্ছি।

করিম শান্ত স্বরে কহিল—ধ'রে নাও টাকা তোমারই তবু উড়িয়ে দেবার অধিকার তোমার নাই।

হবিব চীৎকার করিয়া কহিল—আমার টাকা ব্যয় ক'রবার অধিকার আমার নাই?

করিম কহিল—না; এ আমাদের ব্যবসার টাকা, ব্যবসার মূলধন নষ্ট ক'রবার অধিকার তোমারও নাই, আমারও নাই।

হবিব কহিল—আলবৎ আছে।

করিম কহিল—তোমার বাড়ীতে আজকে সবাই হয়ত' না খেয়ে রয়েছে, আর তুমি স্ফূর্ত্তি ক'রে টাকা ওড়াচ্ছ!

হবিব কহিল—ওহে সাধুপুরুষ, তুমিও এককালে উড়িয়েছ।

করিম কহিল—আমার যথেষ্ট শিক্ষা হ'য়েছে, আর তা' থেকে তোমারও শিক্ষা হওয়া উচিত।

হবিব রাগিয়া কহিল—টাকা দেবে কি না?

করিম কহিল—না।

হবিব কহিল—খাজাঞ্চি টাকা দাও।

করিম কহিল—খবরদার!

খাজাঞ্চি বেচারী দুই আগুনের মধ্যে পড়িয়া নাচার হইয়া বসিয়া রহিল।

হবিব বাক্স টান দিয়া কহিল—চাবী কই?

করিম উঠিয়া আসিয়া খাজাঞ্চির নিকট হইতে চাবী কাড়িয়া লইয়া কহিল—টাকা দেব না যাও।

হবিব উন্মাদের মত লাফাইয়া উঠিয়া কহিল—ছোট-লোক, নেমকহারাম কোথাকার, আমি তোকে এত বড় করেছি, আজকে আমার টাকার দরকার, তুই দিবি নে?

করিম দৃঢ়স্বরে কহিল—তোমার যদি সত্যিকারের আবশ্যক হ'ত, নিশ্চয় সব দিতাম; কিন্তু আর বাজে খরচ কর্ত্তে এক পয়সাও তোমাকে দেব না।

হবিব বাক্স ফেলিয়া দিয়া জোরে জোরে পা ফেলিয়া যাইতে যাইতে কহিল—আচ্ছা, তোমাকেও দেখে নেব আমি।

করিম হাসিয়া কহিল—হবিব, মানুষ তুমি আমাকে ক'র নি; তুমি আমাকে কি দেখ্‌বে।

৩

পরদিন সন্ধ্যার সময় হবিব ঝড়ের মত অতি সত্বরে প্রবেশ করিয়া করিমকে কহিল—তোমার জ্বালায় একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'স্‌বার যো নাই, আজ আবার আস্‌তে ব'লেছ কেন?

করিম কহিল—কবেই বা আস; থাক, সব কথা শোনবার মত মতিস্থির তোমার আছে কি?

হবিব কহিল—খুব।

করিম কহিল—দেখ, তুমি এই ব্যবসার প্রধান অংশীদার।

হবিব বাধা দিয়া কহিল—ব্যবসা সম্বন্ধে? সে তুমি যা' ভাল হয় কর, আমার বড্ড কাজ আছে।

করিম কতকটা আদেশের স্বরে কহিল—একটু ব'স। সামনে হালখাতা; মহাজন পাওনাদারদের টাকা দিতে হ'বে তহবিলে টাকা নাই।

হবিব কহিল—তা আমি কি কি ক'রব? আদায় ক'রে দাও।

করিম কহিল—আদায় ক'রেই বা কি করব। গত চার মাসের মধ্যে তুমি প্রায় সাত হাজার টাকা নিজের নামে খরচ লিখে নিয়েছ, তা'র উপর এই সেদিন কলেজের কাজের বাবদ যে আট হাজার টাকা পাওয়া গেল, তা তহবিলে জমা দাওনি; আরও খুচরো কাজের আদায় বাবদ সাড়ে তিন হাজার টাকার হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না।

হবিব উগ্রস্বরে কহিল—তুমি কি ব'লছ আমি এসব টাকা নিয়েছি?

করিম কহিল—তুমিই বুঝে দেখ, সমস্ত অবস্থা অনুমান করে কি আর ধারণা করা যেতে পারে।

হবিব কহিল—তোমার মত নীচমনা লোক ত' আমি দেখিনি।

করিম বাধা দিয়া কহিল—গালাগালি দিও পরে, এখন সোজা উত্তর দাও; তুমি তোমার মূলধনের অংশের চাইতে বেশী টাকা নিয়েছ, লাভত' দূরের কথা। এত বড় কারবারটা আজ তোমার দোষে ডুবে।

হবিব নিতান্ত ভালমানুষের মত কহিল—আমি ত' প্রায় বছরখানেক কোন কিছুই করিনি; তুমিই যা কর্চ্ছ।

করিম কহিল—নিজেকে বাঁচাবার জন্য আর নীচে নেম না। আমি দেখছি সত্য, কিন্তু তুমি টাকা নিয়েছ, এটাও সত্যি।

হবিব রাগিয়া উঠিয়া কহিল—আমি নিইনি।

করিম একটু হাসিয়া কহিল—হবিব, আজ তুমি কত নীচে নেমেছ ভেবে দেখ; একদিন সবাই তোমাকে প্রশংসা কর্ত্ত, এই জন্য যে, তুমি প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা ব'লতে পার না। আর আজ সামান্য টাকার জন্য এই ক'রছ। আমি একদিন নিজের হাতে লাখ টাকা উড়িয়েছি, অত টাকা তুমি কোন দিন চ'খেও দেখনি। আজও আমি হেলায় টাকা ছেড়ে দিতে পারি!

হবিব চীৎকার করিয়া কহিল—তোমার বক্তৃতা থামাও, ওসব ময়দানে গে' দাওগে।

করিম কহিল—বেশ বুঝ্‌ছি, তুমি নিজে মনে মনে অপমানিত বোধ করছ। কিন্তু শুন হবিব, এখনও রক্ষার উপায় আছে, তুমি মদ আর মেয়েমানুষ ছেড়ে আবার ভাল হও, এক বছরে সব লোকসান পূরণ ক'রে নেব।

হবিব আরও রাগিয়া কহিল—নিজে পার্চ্ছ না ব্যবসা চালাতে, টাকাগুলো মেরে নিয়ে এখন দোষ দিচ্ছ আমার।

করিম একটু বিরক্ত হইয়া কহিল—ওসব কথা বাদ দাও, মনকে ফাঁকি দিয়ে লাভ নাই। আমার অনুরোধ, তুমি ভাল হও।

হবিব কহিল—কি মন্দটা কর্চ্ছি?

করিম কহিল—তা যদি তোমাকে এখনও বুঝিয়ে দিতে হয়, তাহ'লে তোমার উদ্ধারের আশা অনেক দূরে।

হবিব কহিল—তুমি ত' খুব সতীপণা দেখাচ্ছ।

করিম আবার বাধা দিয়া কহিল—শোন হবিব, আর মিথ্যে ব'লে বোঝা বাড়িও না। তুমি বেশ জান, আমি যা বলছি, তা সব সত্যি। আমার শেষ কথা শোন; তুমি তহবিল থেকে আর এক পয়সাও পাবে না; ঐ মেয়েলোকটাকে ছাড়তে হ'বে, মদ ত্যাগ কর্ত্তে হ'বে. আগেকার মত ব্যবসায় মন দিতে হ'বে তোমাকে, নইলে আর তুমি গদীতে আস্‌তে পাবে না। তোমার স্ত্রী-পুত্রের জন্য যা আবশ্যক তা আমি দিব।

হবিব গালাগালি দিয়া বিশ্রী গর্জ্জন করিয়া কহিল—ওরে আমার তুমি রে; তোমার একার কারবার? দেখি কোন শা—আমাকে তাড়ায়। খাজাঞ্চি, হিসাব তহবিল দেখি।

করিম কঠোর স্বরে কহিল—এটা মাতলামির জায়গা নয়; বেরিয়ে যাও এখান থেকে; যদি কখনও ভাল হও আবার এস।

হবিব জোর করিয়া বাক্স লইতে গেল; করিম তাহার গলা ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিল।

হবিব বাহিরে গিয়া হিংস্র পশুর গর্জ্জনে কহিল—এর শোধ নেব, তোকে খুন ক'রব, দেখে নেব তোর কত বড় বুকের পাটা।

করিম কোন উত্তর করিল না; একদৃষ্টে বাহিরের অন্ধকারের পানে চাহিয়া রহিল।

অনেক রাত্রিতে হঠাৎ মাথা তুলিয়া কর্ম্মচারীদের কহিল—তোমরা একটা কাজে আমাকে সাহায্য কর্ত্তে পার?

তাহারা কহিল—কি বলুন!

করিম কহিল—আমার সঙ্গে তোমরা গিয়া সেই

মাগীটার বাড়ীর বাহিরে দাঁড়াবে ; আমি আজ জোর ক'রে তা'কে এখান থেকে তাড়াব।

কর্ম্মচারীরা কহিল—তা পারব।

কর্ম্মচারীদের লইয়া করিম তখনই একগাছা পাকা লাঠি হাতে করিয়া সেই বাড়ীতে গিয়া প্রাচীর টপকাইয়া ভিতরে পড়িয়া সোরগোল তুলিল। হবিব কক্ষে শুইয়াছিল; বাহিরে আসিয়া কহিল—কে? এখানে কি চাও?

করিম কহিল—আমি করিম। তোমার মেয়েমানুষকে দেখতে চাই।

স্ত্রীলোকটী পিছনে দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। করিম তাহ'কে দেখিয়া কহিল—শোন, আমি এসেছি, তোমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে; যাতে তুমি আর কোনদিন হবিবের সংস্পর্শে না আসতে পার।

হবিব কহিল—তুমি তাড়াবার কে? জান তুমি আমার বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করেছ।

করিম কহিল—সে ভয় আর কাউকে দেখাও গে।

স্ত্রীলোকটীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—তুমি ত' জান আমার নাম করিম; আমি কাউকে ছাড়বার পাত্র নই। আমি তোমাকে বলছি, তুমি এখনই হবিবকে পিতা সম্বোধন কর, আর এই রাত্রেই এখান থেকে চলে যাও।

হবিব কি বলিতে যাইতেছিল, করিম বাধা দিয়া কহিল—চুপ কর।

স্ত্রীলোকটী ভয়ে কহিল—আমি এখনই আমার সব ফেলে কোথায় যাব?

হবিব কহিল—কোথায় যাবে তুমি আবার? ওর ক্ষমতা কি কিছু কর্ত্তে পারে!

করিম কহিল—লাঠির আগায় যদি তোমাদের তফাৎ কর্ত্তে হয় তাও ক'রব।

হবিব ঘরের ভিতর হইতে একগাছি ছড়ি আনিয়া করিমের সম্মুখীন হইয়া কহিল—বেতের ঘায়ে তোর চামড়া তুলে দেব।

বলিয়া বেত্রাঘাত করিল।

করিম কেবল কহিল—ইচ্ছা ক'রলে এই লাঠির ঘায়ে তোমার মাথা ভেঙ্গে দিতে পার্ত্তাম, কিন্তু তা ক'রব না।

দুই পা অগ্রসর হইয়া রুক্ষ আদেশের স্বরে স্ত্রীলোকটীকে কহিল—যাবে কিনা?

স্ত্রীলোকটী কহিল—কোথায়?

করিম কহিল—যেখানে আমি নে' যাব।

হবিব পিছন হইতে আবার বেত মারিয়া কহিল—ও, আমার কাছ থেকে ওকে কেড়ে নেবার মতলবে এসেছিস?

করিম কহিল—ইচ্ছা থাকলে অনেক আগে নিতে পার্ত্তাম।

হবিব আবার আঘাত করিল। করিম এবার ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—কি বারবার বেত মারছ?

হবিব কহিল—জুতিয়ে তোর মুখ ভেঙ্গে দেব।

বলিয়া চটী খুলিয়া প্রহার করিতে গেল। করিম আর স্থির থাকিতে না পারিয়া হাতের লাঠি দিয়া হবিবকে আঘাত করিল, সে পড়িয়া গেল।

করিম একবার তাহার দিকে চাহিয়া পরমুহূর্ত্তে স্ত্রীলোকটীর ঘাড় ধরিয়া বাটীর বাহিরে লইয়া গেল। হবিব পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

পরদিন আর সে স্ত্রীলোকের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

দ্বিপ্রহরের পর হবিব করিমকে বলিল—তাকে এনে হাজির কর্ নইলে তোকে খুন ক'রব।

করিম কহিল—সে অনেকেই করে। তুমি কালকের মধ্যে তহবিল ভেঙ্গে যে টাকা নিয়েছ এনে দাও, নইলে তোমাকে জেল খাটাব।

হবিব কহিল—তাহ'লে, তাকে এনে দেবে না?

করিম কহিল—না।

হবিব কহিল—দেখে নেব।

করিম কহিল—যাও তুমি।

শহরে রাষ্ট্র হইল, করিম হবিবকে গদী হইতে বিতাড়িত করিয়াছে ও তাহার রক্ষিতা স্ত্রীলোকটীকে রাত্রে মারামারি করিয়া কাড়িয়া আনিয়া কোথায় সরাইয়া দিয়াছে।

৪

দুইদিন পর হবিব উকীলের চিঠি পাইল যে, যদি তিন দিনের মধ্যে হিসাব-নিকাশ করিয়া না দেয়, তাহা হইলে তাহাকে ফৌজদারি সোপর্দ্দ করা হইবে।

হবিবের স্ত্রী কহিল—হ্যাগা, তুমি গিয়ে ওঁকে বলে এর একটা মিটমাট ক'র না কেন?

হবিব রাগিয়া কহিল—তোমরা সব একদিকে। এর আবার মিটমাট কি? ব্যবসা থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিল, আমাকে মারল, সকলের সামনে অপমান করল, এ বুঝি কিছু নয়?

তাহার স্ত্রী কহিল—তুমি মন্দসংসর্গে মিশে খারাপ হ'য়ে যাচ্ছিলে, তাইত' তিনি এমন কঠোর ব্যবহার করেছেন—

হবিব বাধা দিয়া কহিল—থাম, থাম, সব বুঝি আমি। আমাকে ফাঁকি দেবার মতলবে এই সব—এ আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা আমিও দেখে নেব কি ক'রে সে আমাকে ফাঁকি দেয়।

তাহার স্ত্রী আবার কহিল—কিন্তু বোঝ, তুমি কি হ'য়ে পড়েছ,—

হবিব লাফাইয়া উঠিয়া কহিল—ওঃ তোমরা সব এক জোট, এখন বুঝতে পাচ্ছি, আমাকে তাড়িয়ে দিয়েও কেন —তোমাদের খেতে দিতে চাচ্ছিল।

তাহার স্ত্রী এই কথা শুনিয়া একবার করুণ নয়নে স্বামীর মুখপানে চাহিল, তাহার পর মাথা নীচু করিয়া কহিল—ওঃ তুমি এত ভাবতে পার?

হবিব উন্মাদের মত কহিল—তোমরা কর্ত্তে পার আর আমি বলতে পারি না। সব বুঝেছি। বেশ।

বলিয়া সে সোজা বাহির হইয়া গেল।

পথে চলিবার সময় তাহার মনে হইল, আজ সবাই তাহাকে বিদ্রূপ করিতেছে। এই মনে করিয়া যে সে এত অপদার্থ, তাহাকে ফাঁকি দিয়া করিম তাহার ব্যবসা, তাহার রক্ষিতা, শেষে তাহার স্ত্রীকে পর্য্যন্ত—অধিকার করিয়া বসিয়াছে; লোক-চক্ষুর সম্মুখে তাহাকে হেয়, ঘৃণ্য করিয়া তুলিয়াছে। তাহার মনে হইল, এত অপমান সহ্য করা তাহার পক্ষে অসম্ভব; এর প্রতিশোধ লইতেই হইবে।

হিসাব-নিকাশের মেয়াদের শেষ দিনে করিম তাহাকে রাস্তায় ধরিয়া কহিল- আমি অনেক খোঁজ কচ্ছি তোমায়।

হিংস্র পশুর ন্যায় দুই চক্ষুতে জ্বালা হানিয়া হবিব কহিল—কেন?

করিম কহিল—আমি জানি তুমি হিসাব-নিকাশ কর্ত্তে আসবে না। তুমি বেশ জান যে দোষ তোমার। অথচ তুমি লোকের কাছে বলছ, আমি তোমাকে ফাঁকি দিয়েছি।

হবিব কহিল—তা-ত তোমার মুখের উপরই বলছি।

করিম কহিল,—আজ শেষ দিন; আজকের মধ্যে হিসেব-নিকেশ না করলে, এই দেখ আমি সব ঠিক করে রেখেছি, কাল তোমার নামে আদালতে নালিশ করব।

—বলিয়া কাগজপত্র দেখাইয়া চলিয়া গেল।

হবিব তাহার যাত্রাপথের দিকে চাহিয়া আপন মনেই কহিল—হুঁ, নালিশ করবার আগে তোমাকেও দুনিয়ায় রাখ্‌ব না।

সমস্ত দিন সে লোক সাহচার্য্য ত্যাগ করিয়া বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইল; সারা রাত ছাদের উপর কখনও শুইয়া কখনও বসিয়া কাটাইল। প্রভাতে যখন নীচে নামিল, তখন তাহার মুখের উপর কে যেন এক পোঁচ গাঢ় কালী মাখাইয়া দিয়াছে; দুই চক্ষু যেন দূরের কি একটা লক্ষ্য করিতেছিল। প্রভাতের শুভ্র পৃথিবীতে চারিদিকে যেন শিশুর আনন্দ উছলিয়া পড়িতেছিল। সেদিকে তাহার কোন লক্ষ্য ছিল না।

নীচে আসিয়া মৃদুস্বরে—যেন বহু দূর হইতে সে স্বর আসিতেছে—চাকরকে কহিল—তোর বিবি সাহেবার নাম ক'রে করিম সাহেবকে ডেকে দে। চাকর চলিয়া গেল।

হবিব ঘরের মধ্যে গিয়া আলমারি খুলিয়া দুইটা কার্ত্তুজ লইয়া অন্যমনস্কভাবে নাড়াচড়া করিল; বন্দুকটা লইয়া একবার দেখিল, একবার লক্ষ্য ঠিক করিল। আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বাহিরের কক্ষে গিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। একটা উন্মত্ত শয়তান যেন তাহাকে পশ্চাৎ হইতে ঠেলিয়া দিয়া বলিতেছিল, করিম তাহাকে যে অপমান করিয়াছে ও করিবে, তাহার প্রতিশোধ লইতেই হইবে এবং তাহার একমাত্র উপায় তাহাকে হত্যা করা।

একটু পরে করিম আসিলে হবিব তাহাকে বসাইয়া বাড়ীর মধ্যে গেল। স্ত্রীকে কহিল—করিম আসিয়াছে।

তাহার স্ত্রী তৎক্ষণাৎ চা প্রস্তুত করিয়া বাহিরে পাঠাইয়া দিল। হবিব ততক্ষণ দ্বিতলের রেলিং ধরিয়া দূর আকাশে পানে চাহিয়াছিল। স্ত্রী নীচে নামিয়া গেলে, কে যেন তাহাকে পিছন হইতে ঠেলিয়া দিল; সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া বন্দুক লইয়া অন্যমনস্কভাবে একটু নাড়াচাড়া করিয়া পরে গুলী পুরিল; তাহার পর বাহিরে আসিয়া করিম যেখানে বসিয়া চা পান করিতেছিল, সেইখানে তাহাকে পশ্চাৎ হইতে উপর্য্যুপরি দুই গুলী করিল।

করিম শুধু কহিল—হবিব, তুই—পরমুহূর্ত্তে করিমের রক্তাক্ত দেহ ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।

হবিব বাহিরের রাস্তায় বন্দুক ফেলিয়া দিয়া পাগলের মত টলিতে টলিতে নীচে নামিয়া গেল। যাহার সঙ্গে দেখা হইল তাহাকেই বলিল—হারামজাদাকে সাবাড় দিয়েছি।

তাহার সেই উন্মাদের মত চলন রক্তচক্ষু ও বিভীষিকা-ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে সরিয়া দাঁড়াইল।

হবিব একবার কহিল—আর একটা গুলী পেলাম না।

তাহার পর অনেকে মিলিয়া তাহাকে ধরিয়া বাড়ী লইয়া আসিল। যেখানে করিম পড়িয়াছিল, সেখান দিয়া যাইবার সময় দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া হিংস্রদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল—কেমন বন্ধু, হ'য়েছে ত'!

বাড়ীতে তখন কান্নার রোল উঠিয়াছে।

* * * *

বিচারে হবিবের দ্বীপান্তরের আদেশ হইল।

সকলে কহিল—যেমন করিম, ঠিক শাস্তি হ'য়েছে; সে যদি হবিবের সঙ্গে বে-ইমানি না ক'রবে, তাহ'লে ওর মত ভাল লোক কখনও এমন কাজ করে!

বন্ধুরা সব বিদায়—বিদায়

আকেল মণ্ডল

বন্ধুরা সব বিদায়—বিদায়—আজি আমি যাই চলে'
তোমাদের কাছে তোমাদের মাঝে এসেছিনু পথ ভুলে।
তোমাদের কথা—তোমাদের হাসি—তোমাদের কলগান
কানে এসেছিল, সুর বেজেছিল মোহে' ছিল মোর প্রাণ।
তাই এসেছিনু—তাই বেসেছিনু—ক্ষমা মোরে কর ভাই,
দু'দিনের তরে আলো পেয়েছিনু আবার আঁধারে যাই।
ওগো নীল পাখী! ওগো নীল ফুল! ওগো নীল নভতল
জানি আমি জানি মোর তরে নহ—বৃথা তবে কেন ছল!
ওগো বিরহিণী তন্বী তরুণী ওগো ও কিশোরী বালা,
জানিয়াছি আমি মোর তরে নহে তব ও ব্যাকুল মালা।
দরদী আমার নিদয় হ'ল যে ব্যথা জাগে তাই প্রাণে,
হাসি হেসেছিল কাছে ডেকেছিল অজানা সে কোন গানে।
বন্ধ সে গান বন্ধ সে ডাক হাসিখানি নাই তা'র
হাসি-খুসী ভরা আনন্দ-ময় মুখখানি বড় ভার।
আশা নাহি মনে কথা কার সনে ভাল নাহি লাগে আর,
নহে মোর তরে হাসি আনন্দ নহে সুখ-সংসার।
মোর লাগি' হায় জমাট আঁধারে অদূরে দাঁড়ায়ে আছে,
দুঃখ-তাপ-গ্লানি একত্রে আজি ডাকিতেছে সবে কাছে।
মৃত্যু আমার হাত দু'টি ধরে' নিয়ে যাবে গোরপানে,
চির-সাথী সাথে তাই চলে যা'ব ফিরিব না কোন গানে।
বন্ধুরা তাই বিদায়-বিদায় চাহি আমি আরবার
যারা দুঃখ দিয়েছ আঘাত হেনেছ তাদেরও নমস্কার।
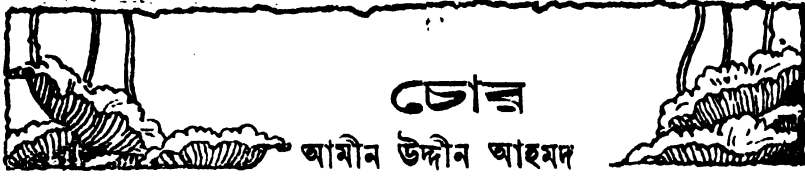
চোর

আমীন উদ্দীন আহমদ

মস্‌জিদের দুয়ারে দাঁড়াইতেই শুনি—ইমাম রুকুতে যাইবার তক্‌বীর হাঁকিতেছেন। এই-মাত্র-কেনা জরির সেলিম-সু'র কথা আর মনে রহিল না। ফস্ করিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম। নামাজ শেষ হইয়াছে মাত্র। আমার নফল বাকী—এমন সময় দরজার সামনে শুনিতে পাইলাম বিরাট চীৎকার। চীৎকারে মসজিদের অর্দ্ধেক লোক ভাঙিয়া পড়িল। আমি নফল ত্যাগ করিলাম। করিতাম না, যদি মুসল্লিরা আমার সম্মুখকে সদর-রাস্তায় পরিণত না করিয়া তুলিত।

দেখি একটা বুড়ো লোককে দুইটা জওয়ান আদ্‌মী কসিয়া ধরিয়া মারিতে শুরু করিয়াছে—আর বলিতেছে, "কেয়া, জুতি চুরি করোগি ছালা?" এই কাজটা রাস্তার উপর হইতেছিল। মুসল্লিদের প্রায় সকলেই চোর বেচারার উপর,—এমনকি তাহার দশ পুরুষের বাপ-দাদার উপরেও গালির-বোঝা চাপাইতেছিল। ভাবিলাম--বটে!

চোর কেবল বলিতেছে,—বাবু আমি চোর না—আমি চোর না—হারামজাদা, চোর না' বলিয়া আরেক জওয়ান আরেকটা ঘুসা লাগাইতে গেল। বুড়া ঘুসার বহর দেখিয়া উচ্চৈস্বরে হা-হা-করিয়া উঠিল। আমি আর দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিতে পারিলাম না। জুতা পায়ে দিতে নীচে নজর করিয়া দেখি জুতা নাই! বুঝিলাম!

নামিয়া আসিয়া কহিলাম—একে ছেড়ে দাও। জওয়ান লোকটী ছাড়িতে ছাড়িতে কহিল,—দেখিয়ে হুজুর—ছালা, ক্যায়ছা, বদ্‌মায়েস্! ইয়ে জুতি জোড়া বগল-দাবাকে লে চলা থা—" এই বলিয়া সে-তাহার পায়ের কাছ হইতে জুতা জোড়া তুলিয়া ধরিল। সকলেই জুতা-জোড়ার দিকে চাহিয়া কহিল,—ইঃ—কি দামী জুতা!

বুড়া চাহিয়া রহিয়াছে, যেন সে নিজেকে লুকাইবার স্থান পাইতেছে না। আমার দিকে চাহিল—একবার। কৃতজ্ঞতায় যেন মাথা তাহার নত হইল। আমার হুকুমেই এই যমদূতেরা তাহাকে একটু দম লইতে অবসর দিয়াছে!

আমি বুড়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—তোমার এই দশা কেন! বুড়া হ'য়েছ—আর ক'দিন বাকী?—

আমার কথায় তাহার যেন চোখ কাটিয়া পড়িতেছিল। কথা কহিবার ভাষা যেন তাহার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—, ভাঙা-স্বরে কহিল—হুজুর, আজ দুইদিনের উপোস; কারো কাছে এক পয়সাও পাইনি। না কাজ, না সাহায্য—কিছু না হুজুর—এই পেট্‌টাতো মানেনা হুজুর-আর-দুইটা লাড়কাও হুজুর.........

পেটে হাত দিয়া সে দেখাইল, আর কিছু মাত্র বলিতে পারিল না।

* * *

হাত বাড়াইয়া জুতা জোড়া জওয়ান ব্যক্তিটীর নিকট হইতে চাহিলাম। বৃদ্ধকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম, এ জুতা আমি তোমাকে দিয়া দিলাম-তোমার কোন ভয় নাই—

আমার কথা শুনিয়া জোওয়ান ব্যক্তিটী জুতোটী পিছনের আর এক ব্যক্তির হাতে দিয়া বলিল, তাজ্জব কি বাত হ্যায়-হুজুর, আপকো জুতি কিধার হ্যায় আপ দেখিয়ে-এ হামকো জুতি-আপ ক্যেয়সে দেলা দেতা—

আমারই ভুল হইতে পারে ভাবিয়া আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া খুঁজিতে গেলাম। কিন্তু জুতা মিলিল না। ফিরিয়া আসিয়াই দেখি জোওয়ান ব্যক্তিটীও নাই।

বুড়ো লোকটী তখনও দাঁড়াইয়া প্রহারের বেদনায় কাঁপিতেছে।

কে একজন তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিল, বুড়ো হয়েছ কত্তা, এ সব ছেড়ে দেও—

বুড়োর হাত ধরিয়া আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তায় তেমনি লোক চলিয়াছে; চারিদিকে তেমনি মানুষের ভিড়, আমি ভাবিতেছি, চোর কি বলিয়া অপর চোরকে চুরি করার অপরাধে শাস্তি দেয়?

স্মরণে

ডাঃ মোহাম্মদ আবুল কাসেম

(১)

আগা মঈদুল ইস্‌লাম

মরহুম আগা মঈদুল ইস্‌লাম

মাননীয় আগা মঈদুল ইস্‌লাম ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে পারশ্য দেশের অন্তর্গত 'কাশান' শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম—সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা কাশানি। তিনি পারশ্যের বিখ্যাত মুজতাহিদ অর্থাৎ ধর্ম্মগুরু ছিলেন। ত্যাগ

৪—৩

ও ধর্ম্মই তাঁহাদের বংশের প্রধান গৌরব ছিল। মুজতাহিদের পুত্র হইয়াও তিনি বিশেষ যত্ন ও চেষ্টার সহিত আইন, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। 'কাশান' শহরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধাস্পদ পিতার মৃত্যুর পর তিনি উচ্চতর শিক্ষা-লাভের জন্য 'ইস্পাহান' নগরে যাত্রা করেন।
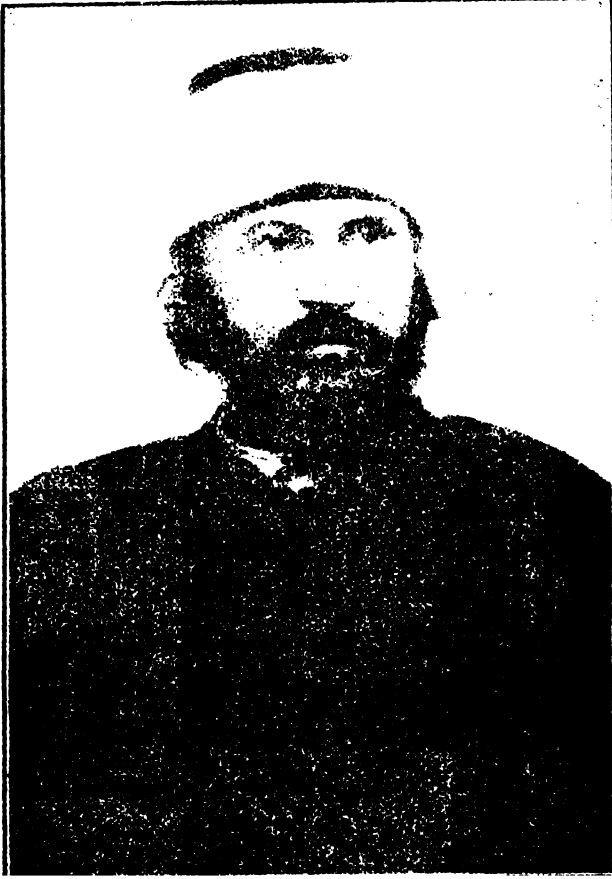
জামাল উদ্দীন আফগানী

তখনকার সময়ে 'ইস্পাহান' নগর সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা-শিক্ষার কেন্দ্রস্থল ছিল। সেখানে পাঁচ বৎসরকাল কঠোর পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত পাঠাভ্যাস সমাপন করিয়া সর্ব্ববিধ এসলামিক শাস্ত্রে অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করতঃ পুনরায় জন্মভূমি 'কাশান' শহরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এইরূপে শাস্ত্রকলায় জ্ঞান ভূষিত হইয়া তিনি পারস্যের অমর কবি শেখ্ সা'দীর ন্যায় দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হন। এবং যথাক্রমে পারস্য, তেহরাণ, খোরাসান, আস্তারাবাদ, হামাদান ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ-নগর ভ্রমণ করিয়া তিনি 'মেসোপোটামিয়ায়' গমন করেন। তথাকার প্রধান ধর্ম্ম-যাজক মির্জ্জা হাসান শিরাজী সাহেবের নিকট কিছুকাল থাকিয়া ইস্‌লামে 'ঐশী-তত্ত্ব' সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন, এবং তাঁহারই অনুমতি লইয়া তিনি 'বান্দার আব্বাস্' নগর হইয়া আবার পারস্যদেশে ফিরিয়া আসেন।

এখানেই জনাব সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফ্‌গানির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কিছুকাল তাঁহার সহিত অতিবাহিত করিয়া আগা মঈদুল ইস্‌লাম পারস্য উপসাগরের কূলে 'উম্মন' শহরে পদার্পণ করেন। তথায় মির্জ্জা আলি আস্‌গর খান সাহেবের কাছে সেখানকার রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে এক পত্র লেখেন। এই সময় হইতে তাঁহার রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হয়। এখানেও কিছুকাল অবস্থিতি করিবার পর তিনি পারস্য গবর্ণমেণ্টের কোপ নজরে পড়িয়া ভারতবর্ষে নির্ব্বাসিত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় 'বোম্বাই' নগরে আসিয়া উপনীত হন। বোম্বাই হইতে মাদ্রাজ, রেঙ্গুন, পেনাং, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে কলিকাতা নগরে আসিয়া তাঁহার জীবন-সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইখানে বসবাস স্থির করিয়াছিলেন।

প্রথমতঃ বক্তৃতা দান ও পরে ব্যবসা এবং অবশেষে সাংবাদিকের কার্য্যই তিনি জীবনের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পারস্য ভাষায় লিখিত 'হাব্‌লুল্ মতীন' নামক সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের পূর্ব্বে তিনি প্রাগুক্ত সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফ্‌গানী ও ইংলণ্ডে পারস্য দূত মাল্‌কোলম্ খান সাহেবের সহিত পারস্যের রাষ্ট্রগৌরব প্রচার করণার্থ এবং জাতীয়-জীবনে নবশক্তি দান করিবার উদ্দেশ্যে লেখনী চালনা করেন।

তিনি ইহা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, নির্ভীক ও স্বাধীন ছাপাখানাই জাতীয় জীবন গঠনের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে একই সময়ে লণ্ডন হইতে 'কা'নাম' ও কলিকাতা হইতে 'হাব্‌লুল্ মতীন' প্রকাশিত হয়। প্রথমটীর সম্পাদক প্রিন্স মালকোলম্ খান এবং দ্বিতীয়টীর সম্পাদক মনীষী আগা মঈদুল ইস্‌লাম ছিলেন

প্রিন্স মালকোলম্ খান সাহেবের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই 'কা'নাম' সংবাদ পত্রটী বন্ধ হইয়া যায়; কিন্তু 'হাব্লুল্ মতীন' শত বিপদ-ঝঞ্ঝার মাঝে আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম হয়। গত আটচল্লিশ বৎসর ধরিয়া এই সংবাদপত্রখানি পারস্য ভাষায়—তথা পারস্য সন্তানের বুকে জাতীয়তার মশাল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছে।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে 'মিফ্তাহুজ্জাফর' নামে তিনি আর একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন এবং ভারতবাসীদের উপকারার্থে তিনি উল্লিখিত দুইটী খবরের কাগজের ইংরাজী ও উর্দ্দু সংখ্যা বাহির করেন।

যখন পারস্য দেশ রুশিয়দের আক্রমণ ও অত্যাচারে প্রপীড়িত হইতেছিল—তখন 'হাব্লুল্ মতীন'ই পারসিয়ানদিগকে জীবন্ত ও সতেজ রাখিয়াছিল। এবং এই জন্যই ইহার সম্পাদনকারীকে পারস্যের 'বিস্মার্ক' বলা যাইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত গত ত্রিপলী যুদ্ধের সময় তিনি একখানি দৈনিক উর্দ্দু এবং একখানি দৈনিক বাঙ্গলা সংবাদপত্রও প্রচার করেন। পারস্য ভাষায় লিখিত 'হাব্লুল্ মতীন' প্রচার—পারস্য, আফ্গানিস্তান প্রভৃতি দেশেই বেশীর ভাগ। পারস্যের রাজনীতির উপর ইহার বিস্তার প্রভূত পরিমাণে। এই প্রভাবের বলে পারস্যের প্রাক্তন শাহ্ কর্ত্তৃক তিনি 'মঈদুল ইস্লাম' বা ইস্লাম সহায়ক (مؤيد الاسلام) উপাধিতে ভূষিত হন। ভারতের রাজনীতিতেও তাঁহার দান কম নয়। ভারতবর্ষের বহু বিশিষ্ট রাজনীতিক—যথা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, মওলানা মোহাম্মদ আলি প্রভৃতি মহাশয় ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট যাইয়া নানা বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিতেন। রাজনীতি মহলে তিনি 'রাজনীতিক ভবিষ্যদ্বক্তা' নামেই পরিচিত ছিলেন। গত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধ এবং ইংরাজ ও ফরাসী কর্ত্তৃক রুশিয়ার বল্শেভিক দমনের ফলাফল সম্বন্ধে তিনি যেসকল মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন,—কার্য্যতঃ তাহা যথার্থ বিবেচিত হইয়া গিয়াছে। তিনি প্রকৃতই ইস্লামের শক্তিসম্পন্ন খুঁটি স্বরূপ ছিলেন। তিনি জীবন-ব্যাপী প্রাচ্যের মুক্তি কামনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রায়শঃ বলিতেন,—"ইস্লামের মুক্তি অর্থে প্রাচ্যের মুক্তি এবং প্রাচ্যের মুক্তি অর্থে ইস্লামের মুক্তি।"

এই মহাপ্রাণ প্রতিভা সম্পন্ন ও ইস্লামের একনিষ্ঠ সেবক, রাজনীতিক এবং সাংবাদিক জালাল উদ্দীন

মরহুম আগা সাহেবের পুত্র জামালুদ্দীন হোসায়নী

হোসেনী-আগা মঈদুল ইস্লাম গত ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩০ কলিকাতায় তাঁহার 'ম্যাকলিয়ড ষ্ট্রীট'স্থ বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। আগা সাহেব অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য তাঁহাকে অকালে দুইটী অমূল্য সম্পদ আঁখি-রত্ন হারাইতে হইয়াছিল। অন্ধ হওয়ার সাথে সাথে তাঁহার জ্ঞান-গরিমা আশ্চর্য্যরূপে বিকশিত হইতেছিল। পার্থিব সুখ-সম্ভোগে তাঁহার স্পৃহা ছিল

না। সাহস ও বীর হৃদয় লইয়া তিনি কখনো কোনরূপ বিপদকে বিপদ বলিয়া মনে করিতেন না। একাধারে তিনি দেশপ্রেমিক, দার্শনিক পণ্ডিত ও সূক্ষ্ম রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার অভাবে ইস্‌লাম—তথা প্রাচ্য-দেশের যে ক্ষতি হইল তাহা সত্যসত্যই অপূরণীয়। বোধ হয়, ইনিই পূরবের গৌরব মহাত্মা জামাল উদ্‌দীন আফগানির সর্ব্বশেষ সাক্ষাৎ শিষ্য।

জগতের মনীষীবৃন্দের জীবনীর মধ্যে তাঁহার জীবন-কাহিনী সম্পূর্ণ অভিনব। সাংবাদিক ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ শক্তিদান করিয়া গিয়াছেন এবং পারস্য, তুরস্ক ও আফ্‌গানিস্তান প্রভৃতি দেশে জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি ও উন্নতি করণার্থ তিনি যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এবং ইস্‌লাম জগতের ভাগ্য গঠনে তাঁহার মহামূল্য জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের মাঝে স্বদেশ ও ইস্‌লামের কল্যাণের জন্য তাঁহার অসামান্য ত্যাগ-ধর্ম্মের অমর আদর্শ দৃপ্ত-উজ্জ্বল হইয়া ধরণীর সম্মুখে সাক্ষ্য দিতেছে। তদীয় দীক্ষাগুরু, আলেমশ্রেষ্ঠ জনাব হজরত জামাল উদ্‌দীন আল্ আস্‌তারাবাদী মরহুম সাহেবের ন্যায় তিনিও ইস্‌লামের সর্ব্বব্যাপিত্বে (Pan-Islamism) বিশ্বাসবান ছিলেন।

তিনি অতি ধীর, সূক্ষ্ম ও পরিণামদর্শী রাজনীতিবিদ্ ছিলেন এবং তাঁহার রাজনৈতিক গবেষণা অতি সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী ছিল। তাঁহার দেশহিতৈষণা তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ ছিল। দেশের সেবাই খোদার ধ্যানের নামান্তর এবং ইহাই তাঁহার জীবনের ব্রত ও ধর্ম্ম ছিল। তাঁহার মার্জ্জিত বিবেক বুদ্ধির নিক্তিতে ওজন করিয়া যে কাজটীকে অটল কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি মনে করিতেন তাহার সম্পাদনার্থ কদাপি ভীত ও পশ্চাৎপদ হইতেন না।

আগা সাহেবের তিন কন্যা বর্ত্তমান। তাঁহারা প্রত্যেকেই গ্রাজুয়েট। ফারুখ সাকিনা সোল্‌তানা মোয়াজ্জাদা, এম-এ, বি-এল, তাঁহার প্রথমা কন্যা। তিনি কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট মোস্‌লেম জানানা ট্রেণিং ইনষ্টিটিউশনের অনারারী শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। গত ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চাকুরী ইস্তফা দেন। পরলোকগতা রেজিয়া খাতুন ঐ স্কুলে তাঁহার অন্যতম ছাত্রী ছিলেন। তখন ঐ সম্পর্কে তাঁহাকে চিনিবার সৌভাগ্য আমারও হইয়াছিল। তাঁহার অন্ধ পিতার সংবাদপত্র পরিচালনা কার্য্যে তিনি সর্ব্বদাই সাহায্য করিতেন এবং নিজেও ভাল লেখিকা ও সাংবাদিকা। অন্যতম মুস্‌লিম সিবিলিয়ান মিঃ নুরন্নবী, আই-সি-এস, এর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে।

আজ আগা মইদুল ইসলামের তিরোভাবে সমগ্র এশিয়ার ভাগ্যাকাশ হইতে একটা উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িল। এশিয়া আজ নানা কারণে নির্জ্জীব বলিয়া য়ুরোপের করুণাপ্রার্থী হইয়া আছে, তাই তাহার অন্তরের কথা, তাহার সন্তানদের পরিপূর্ণ মর্য্যাদা আজও আমরা সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। কোনও এক দিবসে সুদূর অথবা অদূর ভবিষ্যতে, যেদিন নূতন করিয়া এশিয়ার এই পুরাতন প্রাসাদ গড়িয়া তোলা হইবে, সেদিন দেখা যাইবে যে, পুরাণো ভিত্তি এখনও যে টলে নাই, তাহার কারণ, তাহার মূলে আছে কতকগুলি লোকের জীবন-অস্থিদান; পুরাণো প্রাসাদের ইটগুলি যে এখনও লাল হইয়া আছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তখন দেখা যাইবে যে, কতকগুলি লোকের বুকের খুনে তাহা রঙীন হইয়া আছে। তখন পুরাতন স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়াইয়া নূতন আলোকে এই কয়েকটী লোকের অপরূপ জীবনী এক অভিনব মূর্ত্তিতে দেখা দিবে। এশিয়ার যেদিন চোখ খুলিবে, সেদিন এশিয়াবাসী দেখিবে যে, তাহারই জন্য একজন দিনে দিনে, পলে পলে আপনার চক্ষুর জ্যোতিঃ দান করিয়া গিয়াছে—সেদিন গুরু জামালউদ্দীন এবং শিষ্য জালালউদ্দীনের জীবনী নূতন জাতির বুকে নূতন প্রেরণা আনিয়া দিবে।

(২)

পীর মোহাম্মদ আলি শাহ

যশোহর জিলার অন্তর্গত 'নওয়াপাড়া'র তাপস-কুল-শ্রেষ্ঠ, বাঙ্গলার গৌরব, লক্ষ লক্ষ লোকের পীর-মুর্শিদ, আলহজ্জ মোহাম্মদ আলি শাহ এখন হইতে প্রায় নব্বুই বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ পারস্যের অন্তর্গত ফিরোজাবাদ-এ

প্রসিদ্ধ শাহ্ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা দুই ভ্রাতা,—ইনি জ্যেষ্ঠ।

দেশে বাল্য-শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি যৌবনে উচ্চ শিক্ষার জন্য হিন্দুস্থানে আসেন এবং 'করাচী' তাঁহার শিক্ষা-ক্ষেত্র নির্ব্বাচিত করিয়া লন। তিনি পাঁচ বৎসর কাল তথায় অবস্থিতি করিয়া কঠোর সাধনার ফলে উর্দ্দু ও ফার্সী ভাষায় অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর তাঁহার অন্তরে ধর্ম্মভাব অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় তিনি উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে নিশিদিন পথে মাঠে, প্রান্তরে, জঙ্গলে ও শহরে ভ্রমণ করিতে থাকেন।

এইরূপে দিনের পর দিন কাটিয়া যায় তাঁহার শ্রমের অবসান নাই অহর্নিশি কিসের অভাবে তিনি যেন ম্রিয়মান। অবশেষে, তাঁহার ভীষণ সাধনার শেষ হইল,—ভক্তের আরাধনা বিশ্বপতির কাণে পৌঁছিল। অসাধারণ মনের বল ও প্রগাঢ় বিশ্বাস লইয়া তিনি যাহা খুঁজিয়াছিলেন, দয়াময় স্রষ্টা তাহা মিলাইয়া দিলেন। তিনি 'ইরাক' দেশীয় এক কামেল দরবেশের সাক্ষাৎ পাইলেন,—সিদ্ধ গুরুরও উপযুক্ত সাগ্‌রেদ জুটিল।

মরহুম পীর মোহাম্মদ আলি শাহ

তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া একান্ত যত্ন ও মনোযোগের সহিত তিনি আধ্যাত্ম-তত্ত্ব শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু-ধর্ম্মচক্ষু উন্মিলীত ও জ্যোতিষ্মান হইল,—তিনি ধর্ম্ম ও নীতি-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেন। অতঃপর ভক্ত-বীরের জীবন-সংগ্রামে আর এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল।

তাঁহার হৃদয়ে ভ্রমণেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় একাধিক্রমে তিনি আফ্রিকা, আরব, লিভারপুল, চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, আফগানিস্তান, মধ্যভারত প্রভৃতি ভূমণ্ডলের বিভিন্ন দেশ ও নগর পর্য্যটন করিয়া অগাধ জ্ঞান ও বহুদর্শিতা অর্জ্জন করেন।

দেশ ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া গাজী শাহ্ সাহেব বাঙ্গলা দেশে আসিয়া 'নওয়াপাড়া'য় পাকাপাকি ভাবে স্থিতি করিয়া অল্প সময়ের ব্যবধানে চলনসই বাঙ্গলা ভাষায় কথা বলিতে শিক্ষা করেন। তিনি এতদ্দেশে আগমন করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, অপূর্ব্ব ধর্ম্মপরায়ণতা, অসামান্য প্রেম ও বদান্যতার দ্বারা দেশবাসীর হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হন; এবং অচিরকাল মধ্যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে তিনি "ইরাণের পীর সাহেব" বলিয়া পরিচিত হন।

তাঁহার বহু অলোকিক ক্ষমতা বা মাজেজা'র (Miracles) কথা অতি দ্রুতভাবে তখন দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তন্মধ্য হইতে আমরা কয়েকটী ঐশী-ক্ষমতা-কাহিনী পাঠক-পাঠিকার চিত্ত-বিনোদনের জন্য নিম্নে প্রকাশ করিলাম। একটি প্রবাদ এইরূপ,—একদিন পীর সাহেব কেব্‌লা বোটে (ভাওয়ালিয়া) আরোহণ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার মানসে সফরে যাইতেছিলেন। তাঁহার নৌকায় কতকগুলি মুর্গীর বাচ্চা ছিল, তাহার ভিতর হইতে চিলে একটি বাচ্চাকে লইয়া উড়িয়া যায়। পীর সাহেব এই সংবাদ শুনিয়া বলিলেন,—"খেলা কর্‌তে নিয়ে গেছে, সময় মত আবার রেখে যাবে।" বাস্তবিক একটু পরে চিলটী নৌকার ছাদের উপরে বাচ্চাটী রাখিয়া যায়।

আর একটি জনশ্রুতি এইরূপ,—একদিন পীর সাহেব

সমাগত রোগিদিগকে পানী পড়িয়া ও তাবিজ লিখিয়া দিতেছিলেন। একজন একটু দূরে থাকায় সে কাতরভাবে বলিল,—"হুজুর! আপনি দূর থেকে ফু দেওয়ায় আমার পানিতে ফু লাগেনি।" তখন পীর সাহেব একটু বিরক্ত হইয়া তাহার দিকে মুখ করিয়া আর একটি দীর্ঘ ফুৎকার দিলেন, তাহাতে পাত্রটি দ্বিখণ্ডিত হইয়া পানী ঘাসের উপর পতিত হইল। কয়েকদিন পরে দেখা গেল—তথাকার ঘাসগুলি পুড়িয়া নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।

অপর একটি ঘটনা,—একদা পীর সাহেবের গাড়ীতে স্থানান্তরে ধর্ম্মোপদেশ ও মুরিদ বা দীক্ষিত করিতে যাইবার কথা ছিল। গাড়ী ষ্টেশনে পৌছিতে বিলম্ব নাই দেখিয়া তিনি অনতিবিলম্বে ষ্টেশনে টিকিট কিনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু পীর সাহেব ষ্টেশনে পৌছিবার পূর্ব্বে ট্রেণ প্লাটফরম ছাড়িয়া চলিল। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনায় অনন্যপায় হইয়া তিনি চকিতে তাঁহার হস্তস্থিত যষ্ঠি মৃত্তিকা নিম্নে প্রোথিত করিলেন। অব্যর্থ-দৈবী-শক্তি প্রভাবে চলন্ত বাষ্পীয় যান মুহূর্ত্তে থামিয়া গেল,—তিনি ট্রেণ ধরিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বহু বিস্ময়কর অদ্ভুত অদ্ভুত কেরামতির উপখ্যান হিন্দু-মুস্‌লিম নর-নারীর মুখে প্রায়ই শ্রুত হওয়া যায়।

এইরূপ কিংবদন্তী,—ভৈরব ভাঙ্গন (The Bhairab Erosion) বন্ধ করিয়া মাড়োয়ারীর পাটগুদাম রক্ষা করেন বলিয়া গুদামের মালিক শ্রীযুত রাম প্রসাদ মাড়োয়ারী শ্রদ্ধায় গদগদ হইয়া পীর সাহেবকে যথেষ্ট অর্থ দান করেন।

পীর সাহেবের পরার্থপরতা ও মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমান তাঁহার পরম ভক্ত হইয়া পড়েন। তিনি এদেশে নিঃসম্বল আসিয়া উত্তরকালে প্রভূত ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি জীবন-সায়াহ্ন পর্য্যন্ত লোককে অযাচিত ভাবে দান করিয়াছেন ব্যতীত কদাপি কাহারো কাছে দান চাহেন নাই। ধনের প্রতি তাঁহার মোহ কোন দিনই ছিল না। দান-ধর্ম্মে তিনি চির মুক্ত হস্ত ছিলেন। এইরূপ উদারপন্থী, স্বাধীন চেতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, অথচ আদর্শ প্রেমিক, প্রিয়দর্শন মনীষী বস্তুতঃ জগতে অতীব বিরল—তাহা বলিলে অতিশয়োক্তি হইবে না।

সত্যকথা বলিতে কি,—এত ধনের অধিপতি হইয়া ও ঈদৃশ ঐশী-শক্তি সম্পন্ন থাকিয়াও তিনি নিরহঙ্কার, শিশুর ন্যায় সরল এবং কর্ত্তব্যে পাষাণ হইতেও কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন। একদেশদর্শিতা, গোঁড়ামী ও সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী কখনো তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারিত না। কিন্তু আজ এই বাঙ্গলার মুকুট—সাধক প্রবরের অনেক চরিত-কথা অজ্ঞাত ও অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন এবং তাহা তাঁহার ইচ্ছাকৃত।

সাহিত্য, শিল্প ও হাকিমী শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। "শাফা খানায়ে হামিদিয়া" নাম দিয়া তিনি একটী হাকিমী ঔষধালয়, তথা আর একটী বস্ত্রালয় ও স্থাপন করেন। সেখানে বিবিধ রোগের তাঁহার বিপুল গবেষণায় আবিষ্কৃত হাকিমী শাস্ত্রীয় অমোঘ ঔষধ সর্ব্বদা মওজুদ থাকে, এবং বস্ত্রালয়ে বিবিধ কাপড় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। তাঁহার প্রাধান উদ্দেশ্য ছিল—হাকিমী ঔষধের বহুল প্রচার করিয়া লুপ্ত প্রায় শাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধন করা এবং ব্যবসাক্ষেত্রে মুসলমানদিগকে চরম আদর্শ দেখানো। বাণিজ্যে মানুষ বড় হয়, কায়িক পরিশ্রমে উপার্জ্জন করিয়া সম্পদশালী হওয়ার উপায় কিরূপ তাহা হজরত পীর সাহেব জাতিকে উজ্জ্বলভাবে শিক্ষা দিয়াছেন।

তিনি প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে 'নওয়াপাড়া'য় এক সভা আহ্বান করিতেন। ঐ সভায় (ওরস্) বহুস্থান হইতে হাজার হাজার আলেম ও ধর্ম্মপ্রাণ শিষ্যগণ একত্র সমবেত হইয়া মানাস্পদ পীর সন্দর্শন করিতেন এবং সাধু সঙ্গলাভ ও ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া-তৃপ্তি-সহকারে আহার করতঃ স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। ইসলামের সাম্য-মৈত্রীর এইরূপ জীবন্ত দৃষ্টান্ত ও পবিত্র কোরআন-হাদিসের খাঁটি সেবক পীর সাহেব জীবনে বহুবার দেখাইয়াছেন।

প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে পীর সাহেব খুলনা জিলার অন্তর্গত উন্নতিশীল 'দৌলতপুর' বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হন। এবং সেই সঙ্কল্পে দৃঢ় হইয়া তিনি তদানীন্তন বিশিষ্ট ভক্ত মদীয় পিতা, জনপ্রিয় মৌলবী গোলাম রহমান সাহেবের সহিত পরামর্শ করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য শুনিয়া তিনি অতীব খুসী হন এবং জমি ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। নিজের কিছু সম্পত্তিও তাঁহাকে বিনামূল্যে দান করেন। অবিলম্বে এই জমির উপর একটী পুষ্করিণী ও কূপ খনিত হয় এবং কয়েকখানি ঘর ও নির্ম্মিত হয়। কিন্তু

নানাকারণে পীর সাহেবের মত পরিবর্ত্তন হওয়ায় বাসস্থান স্থানান্তরিত করিবার মতলব তিনি স্থগিত রাখেন। "পীর-সাহেবের পুকুর" নামে এখন জলাশয়টী সাধারণে পরিচিত এবং তাহা সর্ব্বজাতির জন্য উন্মুক্ত। সকলেই তাহার জলপান করে ও প্রয়োজন মত মাছ ধরিয়া লয়। তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান করা মহাপুণ্য—তাহার প্রকৃষ্ট উপমাও তিনি দেখাইয়াছেন।

দৌলতপুর মাদ্রাসা ও মস্‌জিদ প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসা-মস্‌জিদ স্থাপনার প্রস্তাবনার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত গোলাম রহমান সাহেবের সহযোগিতায় অবিলম্বে 'দৌলতপুরে' এক বিরাট সভা আহুত হয়। তথায় মাদ্রাসা ও মস্‌জিদের আবশ্যকতা সম্বন্ধে ঐ সভায় এক দীর্ঘ, অথচ ওজস্বিনী বক্তৃতা প্রদান করতঃ চাঁদা সংগ্রহ করিতে থাকেন। অতঃপর ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে পীর সাহেব স্বহস্তে মাদ্রাসার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং উহার কল্যাণের জন্য স্বীয় তহবিল হইতেও অজস্র অর্থ ব্যয় করেন, তাহা বলাই বাহুল্য। এখন উহাতে গবর্ণমেণ্ট, ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ড ও সৈয়দপুর ট্রাষ্ট ষ্টেট হইতে মাসিক ৭৫৲ টাকা সাহায্য আছে। নানা কাজে ব্যস্ততা নিবন্ধন শেষ জীবনে তিনি মাদ্রাসার সংস্পর্শ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মস্‌জিদটী এইবার পাকা হইবে। পীর সাহেবের সুযোগ্য পুত্র মৌলবী খাজা আবদুল মজিদ সাহেব সেদিন তাহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। 'নওয়াপাড়া'র মাদ্রাসাও পীর সাহেবের অর্থ ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি 'নওয়াপাড়া'য় এক বিরাট মস্‌জিদের কার্য্য আরম্ভ করেন। তাহাতে প্রায় দুই হাজার মুসল্লি একত্র অর্চ্চনা করিতে সক্ষম হন। মস্‌জিদ নির্ম্মাণে অনুন পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তিনি জীবিতাবস্থায় তাহার বাকির কাজ শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। আমরা তাঁহার উপযুক্ত পুত্র খাজা সাহেব ও জামাতা মৌলবী আজিজর রহমান, বি-এ, বি-টি, সাহেবের নিকট হইতে উহার সমাপ্তি আশা করি। তাঁহারা চেষ্টা করিয়া পীর সাহেবের আরব্ধ কাজ শেষ করিলে একটী বিরাট ও স্থায়ী কীর্ত্তি তাঁহার ত্যাগ-ধর্ম্মের মহিমা চিরকাল স্বগৌরবে ঘোষণা করিবে—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পীর সাহেবের শেষ জীবনে আর একটী প্রকাণ্ড আবাস বাটী ও 'আল্‌বেদা' নামে একটী ভাওয়ালিয়া তৈয়ার করেন এবং বহু অর্থ ব্যয়ে একখানি মোটর গাড়ী ক্রয় করেন। তিনি জীবনে কোন কুসংস্কার মানিতেন না। এক কথায় তিনি রাজসিক পীর, সমাজ সেবক এবং খোদার খাঁটি উপাসক ছিলেন।

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি আমেরিকা ভ্রমণে যাইতে মনস্থ করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি গৃহ শিক্ষকের নিকট বৃদ্ধকালে অসীম উৎসাহে ও অধ্যবসায়ের সহিত ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু দুরন্ত কাল শমন তাঁহার সে ভ্রমণ জনিত জ্ঞান আহরণের স্পৃহা সাফল্য মণ্ডিত হইতে দেয় নাই। গৌরবময় চিন্তা এবং পাণ্ডিত্য অর্জ্জনের এইরূপ চমকপ্রদ আগ্রহ প্রকৃতপক্ষে অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য। তিনি বাঙ্গলা দেশে আসিয়া কাজ চালাইবার মত বাঙ্গলা ভাষাও অল্প বিস্তর শিখিয়া লইয়াছিলেন। শত কর্ম্মের মাঝে, শ্রমার্জ্জিত অবসরে অব্যাহতি লইয়া তিনি পিঞ্জর-মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া আসিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি জীবনে অনেক বিরল-প্রাপ্ত ও অমূল্য পুস্তকরাজি সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার সাহিত্যের প্রতি অপূর্ব্ব টান ছিল—ইহা তাহারই প্রতীক্,—তাহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

এই ইস্‌লামের একনিষ্ঠ সেবক, নিভৃত সাধক, স্বনামধন্য মহাত্মা গত ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩০, মোতাবেক ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭, সোমবার, রাত্রি ১১টার সময় তাঁহার অন্যতম শিষ্য, যশোহর জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, মৌলবী সৈয়দ নওশের আলি, বি-এ, বি-এল, এম-এল-সি, সাহেবের কলিকাতা-ভবনে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে...)

পরদিন কলিকাতায় জানাজা কার্য্য সম্পাদন করিবার পর তাঁহার পুণ্য শব দেহ বরিশাল এক্স্‌প্রেসে নওয়াপাড়া'য় প্রেরিত হয়। এই নিদারুণ সংবাদ তীরের মত নিমেষে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। ফলে, দূর-দূরান্তর হইতে হিন্দু-মুস্‌লিম-খ্রীষ্টান হাজার হাজার লোক 'নওয়াপাড়া'য় একত্রিত হইয়া পুনরায় তাঁহার জানাজা কার্য্য শেষ করিয়া দেহ সমাহিত করা হয়।

যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, পুলিশ সাহেব,

ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, চেম্বারম্যান মৌলবী সৈয়দ নওশের আলি, হেড মৌলবী কাসেম সাহেব, শিক্ষক কাজী আবদুর রব, বি-এ, মৌলবী গোলাম রহমান, হাফেজ ছায়েম উদ্দিন, মুন্সী হাতেম আলি, প্রমুখ উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ও ভক্তগণ তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও পূত আত্মার উদ্দেশ্যে শেষ প্রার্থনার সময় উপস্থিত ছিলেন। অনন্তর সকলে মিলিয়া পীর সাহেবের যোগ্য পুত্র মৌলবী খাজা আবদুল মজিদ সাহেবকে খেলাফতি দান করিয়া তাঁহাকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করতঃ সকলে আপন আপন আলয়ে প্রস্থান করেন।

তুমি আছ নাই কিন্তু আসক্তি আমার

মাহ্‌বুব উল আলম

মিলিল দরশ যদি কে হরিল বাণী !
তপস্যার অবসানে—ভাগ্য বলে মানি,
বাঞ্ছিতের পাইনু সন্ধান ; স্মিতানন,
হাতে বরাভয়, করে সুধা বরিষণ
ইন্দিবর জিনি দুটি আঁখি ; সাথে রাঙা
সুন্দর ললাট, এ যে মোর ধ্যানে আঁকা
জীবন-দেবতা—চিনে নিতে নাহি দেরী
হয়। কিন্তু, চির-আপনার জনে হেরি
কে জানিত হৃদয়ের থেমে যাবে গান,
স্তব্ধ হবে যৌবনের বৃত্তি অফুরান ?
ছিল যারা আজিকার শুভক্ষণ মাগি—
এইক্ষণ লাগি

দীর্ঘ-সাধনার শেষে—হে দেবতা আজি
সিদ্ধিরে সম্মুখে রাখি হরে নিলে বুঝি
মোর সাধনার যত উপাচার, শত
ক্ষুদ্র আয়োজন, মরমের গান যত !—
আজি তার যোগ্য পুরস্কার—
তুমি আছ, নাই কিন্তু আসক্তি আমার !

হে বাঞ্ছিত ! আজি আসিয়াছ যদি
ফিরে যাও, ফিরাইয়া দাও হারা-নিধি
মোর কণ্ঠ, গান, সুর, রূপ, রস, ভাষা,
নিশীথের ধ্যান-মৌন অন্তরের আশা,
আমার রিক্ততা লয়ে গাব আমি গান—
দিতে চাও দিও শুধু এইটুকু দান।

"ছাপ্পান্ন সেকেণ্ড গতে"

মতিন উদ্দীন আহমদ বি, এল

১

আমাদের গ্রামের আসল নামটি গোপন করিয়া একটা নূতন নাম রাখিলাম "শঙ্করগঞ্জ"। জগত জুড়িয়া গালভরা নাম থাকিতে শঙ্করগঞ্জ কেন পছন্দ করিলাম, তাহার একটু সন্তোষজনক কারণ আছে। আমাদের গ্রামে হিন্দু মুসলমানে বিনা 'প্যাক্টে' সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করিয়া আসিতেছে। বাজ্না বাজাইয়া মিছিল নিয়া বাহির হইলে হিন্দুরা মসজিদের কাছে গিয়া যদি দেখে একজন মুসলমানও নামাজ পড়িতেছে বা তেলাওত করিতেছে, তখনই তাহারা আপনা-আপনি বাজ্না বন্ধ করিয়া দেয়; এদিকে মুসলমানরা কোরবাণীর দিন যার যার বাড়ীর সামনে গরু কোরবাণী দেয়, গরীব-দুঃখীকে গোশ্ত বিলাইয়া দেয়, হিন্দুরা কোন আপত্তি করে না, মুসলমানেরা কোরবাণীর গরুকে 'দেবতা' সাজাইয়া মিছিল বাহির করে না; বরং ইদের নামাজের পর গ্রামের যুবকেরা নানা রকম খেলা—প্রতিযোগিতার আয়োজন করে, গ্রামের হিন্দু-মুসলমান বয়স্ক সকলে সে আমোদ-উৎসবে যোগদান করে। তরুণের দল ইদে এবং পূজায়, সাহেবদের বড়দিনের অনুকরণে, এক অন্যকে 'প্রেজেণ্ট' পাঠায়—হিন্দুরা দেয় ইদের দিনে, ইদের উপহার আর মুসলমানরা দেয় পূজার সময়, পূজার উপহার। বিবাহাদি সামাজিক ব্যাপারেও দস্তুরমত দাওত ও সিউলির রেওয়াজ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আছে। মোট কথায় য়াকনি-পোলাওয়ের মত, আমরা হিন্দু-মুসলমান বেশ সুখে সোয়াস্তিতে আছি—নিরামিষপ্রিয় হিন্দুদের প্রতীক চাউল, আর আমিষপ্রিয় মুসলমানদের প্রতীক গোশ্ত—উভয়ে মিলিয়া বেশ মুখরোচক য়াকনি-পোলাও—কি বলেন!

২

পূজার ছুটির সময় বাড়ীতে আসিয়াছি। বিদেশে যাহারা চাকরী করি, সকলে এই সময় আসিয়া গ্রামে জড় হই, অনেক দিন পরে দেখা সাক্ষাৎ হয়; দেখিতে দেখিতে ছুটি ফুরাইয়া আসে, আবার যার যার কর্ম্মস্থলে ছড়াইয়া পড়ি।

সেদিন কি বার ছিল ঠিক মনে নাই, বোধ হয় শনির ঊষা ছিল। ব্রাহ্মণপাড়ার 'পণ্ডিতদা' আসিয়া আমার বাড়ীতে উপস্থিত। ব্রাহ্মণের হুকায় তামাক দিতে চাকরকে বলিয়া পণ্ডিতদা'কে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলাম। তাঁহার বগলে এক তাড়া কাগজ, পুরাতন এক টুকরা নেকড়ায় বাঁধা এবং তাঁহার মুখখানা পুরাতন নেকড়ার মলিনত্বকে হার মানাইয়া বিমর্ষ। ব্যাপার মনে মনে আন্দাজ করিয়া একটু রহস্য করিবার উদ্দেশ্যে বলিলাম। কি দাদা, বৌদি'র সঙ্গে কি একটা ভায়ালেণ্ট নন্-কো হয়েছে নাকি? আকাশ যে বড় মেঘ্লা?" দাদা গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "না ভায়া, সে রকম কিছু নয়, একটা জরুরী কাজে তোমার কাছে এসেছি।"

এমন সময় চাকর "শাদা-হুকায়" অর্থাৎ জলবিহীন হুকায় তামাক লইয়া আসিল, দাদা তাহার হাত হইতে হুকাটি লইয়া নিজের হাতে জল ভরিয়া (আমার চাকর "জল-চল" নহে বলিয়া), পকেট হইতে ছোট একটি বাঁশের নল—টেলিফোন গার্ল যেমন এক্সচেঞ্জে কনেকশন

দেয়—হুকার ছিদ্রে এবং নিজের মুখে কানেক্‌ট্‌ করিয়া টান দিলেন, "হ্যা-লো-লো-লো…"

৩

দাদা তামাক খাইতে থাকুন, এই অবসরে তাঁর পরিচয় দিয়া ফেলি। দাদার নাম শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাভূতুম-গুড়ুক বারিক-জ্যোতিষভাণ্ড-তর্কচঞ্চু, হাইলা শহর স্কুলের হেড্‌ পণ্ডিত। বারবার তিনবার বিবাহের বৎসারান্তে স্ত্রীবিয়োগ হওয়ায়, দাদা এবার নিজে কন্যার কোষ্ঠি ও কররেখা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া পাত্রী ঠিক করিয়াছেন। প্রত্যেকবারই দাদা কন্যার কোষ্ঠি এবং নিজের কোষ্ঠি মিলাইয়া পাত্রী পছন্দ করিয়াছেন। কিন্তু যমবেটা একান্ত হিষ্ট্রীর ছাত্রের মত, অঙ্কের হিসাবকে বেপরোয়াভাবে পায়ে মাড়াইয়া, তিন তিনবার দাদাকে স্ত্রীবিয়োগ ব্যথায় কাতর করিয়াছে। দাদাও নাছোড়বান্দা—একবারে না পারিলে দেখ শতবার—Try Try Again! এইবার কন্যার কর এবং কোষ্ঠি খুব ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দাদা বলিলেন, "দুই আর দুইয়ে সাড়ে পাঁচ হইতে পারে, পুবের সূর্য্য পশ্চিমে কেন উত্তরে উঠিতে পারে, স্ত্রৈণ ব্যক্তি তার স্ত্রীর সামনে বসিয়া, 'তরকারীতে নুন নাই', এই কথা বুক ঠুকিয়া বলিতে পারে, কিন্তু এবার আমার ভাগ্যে স্ত্রীবিয়োগ হইতেই পারে না।" দাদা বাছিয়া বাছিয়া যে মেয়েটার ভাগ্যে বৈধব্য যোগ লিখা আছে, তাহাকেই পছন্দ করিয়াছেন। এই দোষের জন্যই বৌদি'র মত এমন অপরূপ সুন্দরীর বিবাহ এতদিন আটকাইয়া ছিল। অরক্ষণীয়া বলিয়া আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে দাদার ঘর আলো করিয়া রূপসী ষোড়শী বৌদি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাদার তখন একাদশে বৃহস্পতি, আমরা দেখাই পাই না। যম মহারাজও বোধ হয় আঁচল হইতে দাদাকে তখন খসাইতে পারিতেন না। দাদার তখন বৌদি-অন্তপ্রাণ—শুধু এক হারাই-হারাই-ভাব, মাথায় রাখিলে উকুনে খায়, মাটিতে রাখিলে পিপড়ায় খায়—দাদা ব্যস্ত, অস্থির!

যাক্, এহেন অবস্থায়ও দাদাকে বৌদি ছাড়িয়া চাকরী স্থানে যাইতে হইত। তবে দাদা জীবন-মধ্যাহ্নে আসিয়া weekly passenger শনিবারের যাত্রী না হইয়া পারিলেন না। ঝড় হউক, বৃষ্টি হউক, দাদা শনিবারের হাফ স্কুল করিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে বাড়ী আসিতেন, আবার ভাবী-বিরহে কাতর হইয়া সোমবারের সকালের গাড়ীতে হাইলা শহর চলিয়া যাইতেন। দাদার আগমন ও প্রত্যা-গমন দেখিয়া আমরা নিঃসন্দেহে বার নিরূপণ করিতে পারিতাম।

৪

কথায় বলে, বাদুড়ে চুষা সুপারী, বামুনের টানা হুকা, বাঙালের চষা বলদ আর সাহেবের চড়া ঘোড়া—এই চারে সার থাকে না। দাদা "আখেরী" একটানে তামাক ছিলিমকে সারহীন করিয়া দেয়ালের কোনায় রাখিয়া দিলেন। তারপর নেকড়া জড়িত কাগজের বাণ্ডিল খুলিয়া আমার সামনে ধরিলেন। দেখিলাম সেগুলি তুলট কাগজের উপর দাদার কোষ্ঠি। দুনিয়ায় এত লোক থাকিতে দাদা তাঁহার কোষ্ঠি লইয়া আমার কাছে আসিবার কারণ ছিল; আমাদের গ্রামে একটা কথা প্রায় সকলেই জানিত যে, আমি হাত দেখিতে জানি এবং যাহা বলিয়া দেই, তাহা নাকি প্রায়ই হুবহু ফলিয়া যায়, যদি না, সে ব্যক্তির কর্ম্মফলের দরুণ তার ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হয়। দাদা নিজে জ্যোতিষভাণ্ড হইয়াও আমার কাছে মাঝে মাঝে হাত দেখাইতে আসিতেন, কারণ আমি তাঁহাদের মতে হাত দেখিতাম না। তাঁহারা ভারতীয় পদ্ধতিতে দেখিতেন আর আমি সিরোর পদ্ধতিতে দেখিতাম। ভারতীয় শিল্প-পদ্ধতিতে আঁকা ছবিগুলির আঙ্গুল যেমন অনাবশ্যক ভাবে লম্বা, ঠোট আর চোখ অনাবশ্যক ভাবে বাঁকা, ভারতীয় জ্যোতিষ পদ্ধতিতেও তেমনি অনাবশ্যক অনেক জটিলতার দরুণ আমি ঐদিকে বড় একটা ঘেষিতাম না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা যে রেখাকে Line of heart হৃদয়রেখা বলিয়া হিসাব করি, ভারতীয় স্কুলের জ্যোতিষিরা সেই রেখাকে আয়ুরেখা বলিয়া হিসাব করিয়া যে ফল পান, আমাদের মতে অন্য রেখাকে আয়ু-রেখা ধরিয়া হিসাব করিলে সেই একই ফল পাওয়া যায়। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ থিওরী-ই বলুন আর আইনষ্টাইনের থিওরী-অব্-রিলেটিভিটি-ই বলুন—উভয় মতেই গাছের ডালে আতা পাকিলে মাটিতেই পড়িয়া যায়, আকাশে

উড়িয়া যায় না এবং উপর দিকে মুখ করিয়া থুতু ফেলিলে পাশের বাড়ীর বুড়ার মুখে না পড়িয়া, নিজের মুখেই পড়ে। ভারতীয় পদ্ধতি ও সিরোর পদ্ধতি, বাহ্যতঃ দুই রকম হইলেও একই ফল পাওয়া যায়। যাক্ সে কথা।

দাদা আমার কাছে সিরোর পদ্ধতিতে একবার হাত দেখাইতে আসিয়াছেন। তাঁহার হাতখানা টানিয়া নিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "দাদা, আপনি নিজে এত বড় জ্যোতিষি, আমি ছাই কিছুই জানি না, তবুও আপনি আমার কাছে হাত দেখাতে এসেছেন, তার মানে কি ?"

দাদা বলিলেন, "দেখ ভায়া তোমার কাছে বলেই ফেলি। অনেক দিন অবধি কোষ্টিখানা দেখি নাই, সেদিন তোমার রাঙ্গা বৌদি ('রাঙ্গা' খেতাবটা আমাদের দেওয়া নহে, দাদারই দেওয়া) বলে বস্‌লেন 'এত যে আদর সোহাগ কর, সে কয়দিনের জন্যে ?'

ভাবলাম কোষ্টিখানা খুলে একবার দেখিয়ে দেই যে, বুড়ো সহজে মরবে না, এখনো ঝাড়া পনর বছর, তখন শ্রীমতী কুড়ি পার হ'য়ে বুড়ি হয়ে যাবেন, এবং সজ্ঞানে সুস্থির বুদ্ধিতে স্বচ্ছন্দে বৈধব্য ব্রত গ্রহণ করে, অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করতে পারবেন। তারপর ভায়া কুষ্টিখানা বের করে আনা গেল ; রাঙ্গা বউকে আমার বয়সখানা হিসেব করে দেখাতে গিয়ে দেখি যে আর মাত্র বারো দিন বাকী—তারপর আমার ভবলীলা শেষ। হঠাৎ মাথা ঘুরে গেল, মনে হল যেন মগজে বুদ্‌বুদ উঠ্‌ছে, চোখ অন্ধকার হয়ে এলো, ক্রমে রাঙা বৌয়ের মুখখানা ও অস্তোন্মুখ সূর্য্যের মত লাল হ'তে হ'তে অদৃশ্য হ'য়ে গেল—আমি অজ্ঞান হ'য়ে পড়্‌লাম। যখন জ্ঞান হ'লো, চেয়ে দেখি রাঙা বউ উদ্বিগ্ন হ'য়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে, আমার মাথায় জলপটি, তালুর চুল ভিজা। তারপর একটু সুস্থ হ'য়েই আবার হিসেব করে দেখ্‌লাম কোথাও কোন ভুল আছে কি না, কিন্তু কোন ভুল-ই ধরা পড়ল না। সেই বারো দিনের পাঁচ দিন চলে গিয়েছে, আর মাত্র সাত দিন বাকী। এই পাঁচ দিনে কম হ'লেও পাঁচ শত বার হিসাব করে দেখেছি, "৮ই কার্ত্তিক অপরাহ্ণ ৪টা ২২ মিঃ ৫৬ সেঃ গতে"—কি হ'বে দাদা, আজ পয়লা, আর সাতটা দিন, তারপরে এই সুন্দর ধরিত্রী আমার সোণার সংসার, আমার বড় সাধের রাঙা-বৌ—সব ফেলে—" দাদা আর বলিতে পারিলেন না, চোখের জলে মুখের কথা ধুইয়া লইয়া গেল।

আমি নির্ব্বিবাদে দাদার ডান হাতখানা টানিয়া নিলাম, তার উপর নিজের হাতখানা বেশ একটু জোরে ঘসিয়া দিলাম, যাহাতে হাত গরম হইয়া, রেখাগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠে। তারপর, যা' বিদ্যাবুদ্ধি ছিল, খাটাইয়া দাদার হাত দেখিতে লাগিলাম। পাশের ঘরে একমাত্র পুত্রের সাংঘাতিক অপারেশন করিবার সময় যদি রোগীর মারা যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে অপারেশনের সময়, রোগীর মায়ের মন যেমন ডাক্তারের মুখের কথা শুনিবার জন্য উদ্বিগ্ন থাকে, দাদা ও তেমনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, যেন আমি তাহার ফাঁসির কি খালাসের রায় দিব এবং আমার রায় শুনিয়াই জীবন মৃত্যুর মালিক তাহার ৮ই কার্ত্তিকের ওয়ারেণ্ট মুলতবী করিয়া রাখিবেন। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, যতদূর হয় হিসাব করিয়া দেখিলাম, দাদার মৃত্যুভয় অমূলক, কারণ তখনো তাহার আয়ুরেখায় এমন কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না ; আমার হিসাবে দাদা তখনো আরো পনর বছর নির্ব্বিঘ্নে বৌদির সাহচর্য্য ভোগ করিতে পারিবেন। আমি মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার আগেই দাদা আমার মুখের ভাব দেখিয়াই বিষয় বুঝিতে পারিয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন "কি ভায়া, কি দেখ্‌লে বলে ফেলো, বলে ফেলো।" দাদার তখনকার অবস্থা অত্যন্ত উপভোগ্য হইলেও আর উদ্বিগ্ন না রাখিয়া বলিলাম "না দাদা, আপনি মিথ্যা ভয় কচ্ছেন, আর বৌদিকে কষ্ট দিচ্ছেন, কই পনরো বছর পার না হ'লে ত আপনার 'মৃত্যু' দেখতে পাচ্ছিনা—এই দেখুন না—"এই বলিয়া তাঁহার হাতখানা ধরিয়া আয়ুরেখা দেখাইতে চাহিলাম, কিন্তু দাদা মুখখানা ছোট করিয়া, হাত টানিয়া নিলেন। ভাবে বুঝিলাম, দাদা আমার কথায় নির্ভর করিতে পারিতেছেন না, অথচ এর পাল্টা কথাটা বলিলে, তাঁহার স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী হইলেও তাহাই বিশ্বাস করিতেন। মানুষের ধর্ম্ম-ই এই, যখন নিজের স্বার্থের পক্ষে রায় পাওয়া যায়, তখন মনে সাময়িক পুলক সঞ্চার হইলেও তাহাকে বেশী আস্থা স্থাপন করা যায় না, অথচ বিপরীত কথাটাও সহ্য করিতে পারা যায় না।

অনেক করিয়া দাদাকে সাহস দিলাম, কিন্তু বিশেষ

ফললাভ হইল না। বিমর্ষ মুখে দাদা তাহার কোষ্টিখানা নিয়া চলিয়া গেলেন।

আমি "৮ই কার্ত্তিক অপরাহ্ণ ৪টা ২২মিঃ ৫৬সেঃ গতে"র জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

৫

আজ ৮ই কার্ত্তিক, দাদার দেহত্যাগের দিন। দাদা মহা-সমারোহে তাহার আয়োজন করিয়াছেন। হাজার হিসাব করিয়া বলিলেও দাদার মত পণ্ডিতের কাছে জ্যোতিষের বাহাদুরি করিতে মনে সাহস হইতেছিল না, আমিই কোথায় ভুল করিয়াছি, তাহাই মনে হইতেছিল। কিন্তু এদিকে জলজ্যান্ত সুস্থ মানুষটি শুধু কোষ্ঠীর হিসাবের সত্যতা প্রমাণের জন্য আজ অপরাহ্ণ ৪টা ২২মিঃ ৫৬ সেঃ গতে মরিয়া যাইবে তাহা ও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। যা হউক, নিরুপিত তারিখের ২১ দিবস পূর্ব্বে যেমন বিবাহে উপস্থিত হইবার নিমন্ত্রণ থাকে, সেইরূপ দাদার দেহত্যাগের নিরুপিত সময়ের ২১ ঘণ্টা পূর্ব্বে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে গিয়া দেখি, বিরাট ব্যাপার। লোকজন বসিবার জন্য নৌকার পাল খাটাইয়া এবং নিকটবর্ত্তী পাঠশালা হইতে বেঞ্চি আনাইয়া বেশ সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে; অদূরে এক বিড়িওয়ালা, পান বিড়ির দোকান খুলিয়া বসিয়াছে; সমস্ত গ্রামটা ব্যাপিয়া দাদার দেহত্যাগের সংবাদ গত বারোদিন হইতে প্রচার হওয়ায়, অনেক লোকজন আসিয়া জড় হইয়াছে। দৃশ্য দেখিয়া মনে পড়িল, ছোট বেলার যাত্রাগান দেখার কথা। আঙ্গিনার এক কোনায়, তুলসী তলায় দাদা দেহত্যাগের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কাঁচা গোবরের দুর্গন্ধ এবং ধুপ ধুনা ও ফুলের সুগন্ধে মিলিয়া একটা অভিনব মিকচারের সৃষ্টি হইয়াছে, তার মাঝখানে দাদা তুলসী মালা হাতে নিয়া নাম জপ করিতেছেন; রাস্তার পাশে টেলীগ্রাফের খুটি গুনিতে গুনিতে মুসাফের যেমন রাস্তার দৈর্ঘ্য কমাইতে কমাইতে তাহার গন্তব্য স্থানের দিকে চলিতে থাকে, দাদা ও তেমনি মালার গুটি গুনিতে গুনিতে যমালয়ের রাস্তা অতিক্রম করিতেছেন। মনে হইল, তাঁহার নাকে, মুখে, কপালে, বুকে চন্দনের ছাপ,—ডেড্‌লেটার আফিসের ফেরত দেওয়া চিঠির মত। ভক্তিমানের দল দাদার পদধুলি নিতে নিতে এমন অবস্থা করিয়াছেন যে পদে ধুলির নাম গন্ধ ও নাই, এমন কি আল্‌কাত্‌রা লাগিয়া থাকিলে ও তাহা পর্য্যন্ত উঠিয়া আসিত এবং ঘষিতে ঘষিতে প্রস্তরও যেমন ক্ষয় হইয়া যায়, এই পদ যুগল ও আজ সেইরূপ ক্ষয় হইয়া যাইত। কিন্তু দাদার পদদ্বয় নেহাৎ রক্তমাংশের, পাথরের নয়, বলিয়া এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে।

ছোট বেলার, যাত্রার দল যেখানে লালদড়ি দিয়া দিয়া তাহাদের আসরের সীমা ঠিক করিয়া রাখিত, তাহার কাছে বসিবার একটু খানি যায়গার জন্য ছেলে মহলে যে রকম হুলুস্থুল পড়িয়া যাইত, অদ্য ৮ই কার্ত্তিকের ব্যাপারেও সেই রকম ছেলে বুড়ো সকলেই দাদা যেখানে শেষ শয্যায় শায়িত আছেন, সেদিকে যাইবার জন্য বিষম কাণ্ড বাধাইয়া তুলিয়াছে; কারণ অদ্যকার ব্যাপারে দাদাই যাত্রাদলের একমাত্র প্রতীক। আমি অনেক কষ্টে, দাদার শয্যার কাছে উপস্থিত হইয়া ফুল-গোবরের, ধুপ-ধুনার-গন্ধে-মোহিত ছাপমারা দাদাকে দেখিতে পাইলাম; তাঁহার মাথার দুই পাশে দুই জন লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাদের একজনের হাতে কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল এবং অন্য জনের হাতে একটা এলার্ম টাইম পিস। এতদিনে বুঝিলাম আমাদের গ্রামের নাম শঙ্কর গ্রাম রাখা স্বার্থক হইয়াছে। মুসলমান-রা রমজান মাসে সেহেরী খওয়ার সময় ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিবার জন্য এলার্ম টাইমপিস ব্যবহার করিতেন, আমাদের গ্রামের হিন্দু ভাইয়েরা ও তাই সৌহার্দ্যের জন্য মৃত্যু-শয্যায় তাহার ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মনে মনে তখনি প্রতিজ্ঞা করিলাম কাল হইতে নামাবলী দিয়া লুঙ্গি পরিতে থাকিব ও ফুলের সাজি টুপির পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিব এবং আগামী পূজার সময় হিন্দু বন্ধুগণকে বদনা উপহার দিব কমণ্ডলু করিবার জন্য।

এমন সময় একজন আমার কাছে দাঁড়াইয়া আর একজনকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে শেষশয্যায় বিধর্ম্মীর প্রস্তুত ঘড়ি কেন বলতে পার?" সে তীক্ষ্ণ অথচ ক্ষীণস্বরে জবাব দিল, "দেখ্‌বেন্ না মশায় ঘড়িতে এলার্মের দম দেওয়া আছে। ঠিক ৪টা ২২ মিনিটের সময় অলার্ম বেজে উঠ্‌বে, তখনো হাতে থাকবে ৫৬ সেকেণ্ড, পণ্ডিত ম'শায় ততক্ষণে দম-টম ফেলে বেশ প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌বেন

এবং ওদিকে যারা তামাক টামাক খাচ্ছে তা'রা ও হুক্কা রেখে হরিনাম শুনাতে শুরু করে দিবে।"

৬

ছোট বয়সের অঙ্ক কষার মত যখন "হাতে রইল" ৫৬ সেকেণ্ড তখন এলার্ম বাজিয়া উঠিল। কোষ্ঠি ভুল হইতে পারে, মানুষের মুখের কথার খেলাফ হইতে পারে, কিন্তু এলাম টাইমপিস নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাজিয়া উঠিবে, ইহাতে ভুল হইতে পারে না। কল-কব্জার রোদ-বৃষ্টি নাই, সুখ-দুঃখ নাই—বেদরদীর দল।

এলার্ম বাজিয়া উঠিল, হাতে আছে তখনো ৫৬ সেকেণ্ড। দাদা ২।৩ বার জোরে জোরে শ্বাস ফেলিলেন, মনে হইল যেন ফুস্‌ফুস্‌ হইতে বকায়া সব বাতাস বাহির করিয়া দিলেন। যাহাতে যমদূতের কর্ত্তব্য-কার্য্যে কোন অসুবিধা না ঘটে। বোধ হয় মৃত্যুর দূতকে এমন ধুমধামে কেহ কোন দিন অভ্যর্থনা করে নাই। এত লোকজন, এত কাঁচা গোবর, ধুপ-ধুনার গন্ধ, এলার্ম টাইমপিস, কাসর, ঘণ্টা, খোল, করতাল! বাপ্‌রে বাপ—যমদূত অবস্থা দেখিয়া হয়ত মনে করিলেন ভুল করিয়া তিনি বিবাহ বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন না ত! এলার্ম বাজিয়া উঠিতেই কয়েকটী ছেলে চীৎকার করিয়া উঠিল "আর ৫৬ সেকেণ্ড", ডেলী পেসেঞ্জার বাবুর দল তখন যার যার ঘড়ি খুলিয়া একবার দেখিয়া লইলেন; (কেহ কেহ হয়ত তখন নিজের ঘড়ির টাইম ঠিক করিয়া লইলেন—কলিকাতায় যেমন তোপ পড়ার সময় করে) যাহারা দাদার কাছে ছিল, তাহারা মুখের দিকে ঝুকিয়া পড়িল। টাটকা অবস্থায় মৃত্যুকে দেখিবে বলিয়া যাহারা দূরে ছিল, তাহারা হাঁকিতে লাগিল, "হয়ে গেছে", "হয়ে গেছে"! এক সঙ্গে চারিদিক হইতে "হরি বোল" "হরি বোল" ধ্বনি উঠিতে লাগিল এবং কাসর ঘণ্টা খোল-করতাল ভীষণ শব্দে একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল। সেই শব্দ-গন্ধের এক বিরাট ব্যাপার, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে, উপভোগের জিনিষ; তবে আফসোসের কথা হেলির ধূমকেতুর মত এই রকম ব্যাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে জীবনে একবারে বেশী দেখা যায় না।

সাধারণতঃ আমরা সেকেণ্ড মিনিটকে অতি অল্প সময় বলিয়া ধরিয়া লই, কিন্তু কোন কাজের বেলায় ঘড়ি হাতে নিয়া এক মিনিট সময় কাটাইতে হইলে, নেংটী ইঁদুরের মত সেকেণ্ডের কাটাও এক পাক ঘুরিয়া আসিতে নবাবী মেজাজ দেখাইতেছে বলিয়া বোধ হয়। এলার্ম বাজিয়া উঠিল, শব্দ ও গন্ধের বিরাট ব্যাপার ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিল কিন্তু ৫৬ সেকেণ্ড আর শেষ হয় না। দাদা ক্রমাগত ফুস্‌ফুস্‌ উজাড় করিতেছেন আর মিটমিট করিয়া টাইমপিস-ওয়ালার দিকে তাকাইতেছেন, ওদিকে মালা জপও হরদম চলিতেছে, কাপড়ওয়ালা কাবুলী যেমন খরিদ্দারের সঙ্গে দর দস্তরও করে, তসবিও চালায় একসঙ্গে। তারপর দুঃখের নিশি, সুখের নিশি, সকল নিশির-ই শেষ আছে, ৫৬ সেকেণ্ডেরও শেষ দেখা গেল। টাইমপিস ওয়ালা যারপরনাই উঁচু গলায় চীৎকার করিয়া বলিল, "ছা-পা-ন্ন—সে—কে—ণ্ড্ ... ..." তার সেকেণ্ডের "ণ্ড" অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল কিন্তু সেই বিরাট সমারোহের ভিতর তাহা বেশী কার্য্যকরী হইতে পারিল না; কাছের জন কয়েক ছাড়া তাহা আর কেউ শুনিতে পাইল না। তবে যাহার জন্য এই যজ্ঞ, আমাদের শ্রদ্ধেয় "পণ্ডিত দা"—তিনি তাহা শুনিতে পাইলেন—তাঁহার বত্রিশ শিরা চৌষট্টি নাড়ি তাহা শুনিবার জন্য ভয়ঙ্কর উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছিল! শেষ "ণ্ড"-এর সঙ্গে সঙ্গে দাদা বলিলেন, "তা হ'লে আমি চ'লাম", সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু বুঝিলেন। আমি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, দাদার বুক তখনো ঠিক আগের মতই নড়িতেছে, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া ঠিক পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। কিন্তু একদিকে মাত্র এইটুকু, অপর দিকে এই বিরাট আয়োজন। মহা-সমারোহ, ভয়ঙ্কর শব্দ-গন্ধের ব্যাপার সুতরাং ভোট দিতে গেলে—ওজন দরে হিসাব করিয়া দিতে হইবে—দাদার মৃত্যুর দিকেই দিতে হয়; কিন্তু কোনমতেই মন যেন তাহাতে রাজী হইল না; চোখের সামনে জ্যান্ত মানুষটীকে মৃত বলিয়া কি করিয়া চালাইয়া দিব। এই সব ভাবনা-চিন্তায় কয়েক মিনিট চলিয়া গিয়াছে, তারপর মরিয়া হইয়া ডাক দিলাম, "পণ্ডিত দা, ও পণ্ডিত দা।" ভয়ে ও আশঙ্কায় আমার গলা প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছিল। গলার স্বর পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে আমার ডাক বৃথা হইল না। পণ্ডিত দা চোখ খুলিয়া আমার দিকে চাহিলেন, অমনি কমণ্ডুলধারী কয়েক ফোটা গঙ্গাজল নিয়া দাদার মুখে ঝাপটা দিল।

দাদা ভাল করিয়া চাহিয়া বলিলেন, "কেন আর ডাকছ ভাই, আমি ত আর তোমাদের মধ্যে নাই, অপরাহ্ন ৪টা ২২ মিঃ ৫৬ সেঃ গতে তোমাদের ছেড়ে আমি চলে এসেছি।" দাদার প্রতি যাহাদের স্নেহের চেয়ে ভক্তির মাত্রা বেশী অর্থাৎ যাহারা তাঁহাকে না চাহিয়া তাঁহার কথাকেই বেশী বিশ্বাস করে, তাহারা দাদার মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিল, তাহারা দাদার তখনকার কথা শুনিয়া ভাবিল প্রেতের আবির্ভাব হইয়াছে। কারণ দাদার পুণ্যাত্মা ধরাধাম ছাড়িয়া স্বর্গের ডিস্‌টেণ্ট সিগন্যালের কাছাকাছি পৌছিয়া গিয়াছে। দাদার কথা শুনিয়াই তাহারা আত্ম-রক্ষার্থে ঘর-মুখী হইবার চেষ্টা করিল। তখনকার যা' কাণ্ড—যে পাছে পড়িয়া যাইবে, তাহাকে যেন দাদার প্রেত কাঁচা চিবাইয়া খাইবে—এইভাবে সকলে পলাইয়া যাইবার জন্য যারপর নাই চেষ্টা করিতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে "নিলরে" "গেলামরে" ইত্যাদি নানা রকম বিপদ-জ্ঞাপক চিৎকার। দেখিতে দেখিতে দাদার কাছে আমরা জন-দশেক ছাড়া সকলেই সরিয়া পড়িল, তখন দেখিতে পাইলাম অদূরে সধবা-বিধবা বা বিধবা-সধবা বৌদি বসিয়া নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছেন। আমি তখন বলিলাম, "পণ্ডিত দা আপনি বেঁচে আছেন, এই চেয়ে দেখুন, আমি আপনার সঙ্গে কথা কইচি।"

পণ্ডিত দা এইবার আগের চেয়ে জোর গলায় বলিলেন, "না হে ৪টা ২২মিঃ ৫৬সেঃ গতে আমি মরে গেছি; কোষ্টি কি ভুল হ'তে পারে, না আমি ব্রাহ্মণ হ'য়ে তা'তে অনাস্থা করতে পারি!"

আমি বলিলাম, "দাদা কোষ্টি মানুষের তৈরী, এবং ভুল মানুষেরই হ'য়ে থাকে, তা' না হ'লে মানুষ, হয় দেবতা না হয় শয়তান হ'য়ে যেত।" তারপর বৌদিকে ইসারা করিয়া কাছে আসিতে ইঙ্গিত করিলাম; বৌদি আসিলে পর বলিলাম, "এই চেয়ে দেখুন বৌদি আপনার জন্য কাঁদতে কাঁদতে সারা হয়ে যাচ্ছেন, আর আপনি কি হিসাব করতে কি করে এই কাণ্ড বাঁধিয়ে তুলেছেন।"

হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ঠিক লক্ষণ ধরিতে পারিলে তার এতটুকুন একটি বড়িতে বা এই এক কৌটা ঔষধে রোগকে কাহিল করিয়া দেয়। আমিও বৌদিকে সাম্‌নে ধরিয়া দাদার বিকারের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন লক্ষণের উপর গুলি ছুড়িলাম। আমার প্রয়াস ব্যর্থ হইল না। "সুন্দর ধরিণী" "সোণার সংসার" ছাড়িয়া যাওয়ার পরেও দাদা "সাধের রাঙা বউ"য়ের জন্য পস্তাইতেছিলেন, তাই অনন্যো পায় হইয়া শেষে রাঙা বউকে দিয়াই টোপ ফেলিতে হইল, নইলে দাদার মত পণ্ডিত কাতলকে কিছুতেই এই কূপ হইতে তোলা যাইত না। চতুর্থ পক্ষের 'সাধের রাঙা বউ'—দাদা আর সামলাইতে পারিলেন না, এবার তাঁহার টনক নড়িল। বলিলেন, "তা' হ'লে কি সত্যিই ৪টা ২২ মিঃ ৫৬ সেঃ গতে আমি মরি নাই, কোষ্টি মিথ্যা, জ্যোতিষ মিথ্যা এখনো চন্দ্র-সূর্য্য আকাশে উঠ্‌ছে?" বুঝিলাম কোষ্টির উপর বিশ্বাস হারাইলেও একবারে নিঃসংশয় হইতে পারিতেছেন না, তামাদীর বহু উর্দ্ধকাল যাবতের এই বিশ্বাস সহজে দূর হওয়াও সম্ভবপর নহে। বলিলাম "দাদা, এখনো চন্দ্র-সূর্য্য আকাশে উঠ্‌ছে, এবং আপনি এখনো মরেন নাই, এই আমি, বৌদি যেমন বেঁচে আছে, আপনিও তেমন বেঁচে আছেন, যদি প্রমাণ চা'ন তবে তা'ও দিতে পারি।"

দাদা বলিলেন, "আচ্ছা আমি যে বেঁচে আছি, তার কি প্রমাণ আছে?"

আমি বলিলাম "আপনি জানেন, আপনি মরিলে আপনার আত্মা এতক্ষণে ভূতযোনী প্রাপ্ত হইয়াছে; ভূতেরা রাম নাম করিতে পারে না; আপনি একবার এই আমার দিকে আর একবার বৌদির দিকে তাকাইয়া বলুন দিকিন 'রাম রাম'।"

দাদা অতি সহজেই বলিলেন। তখন দেখিলাম ঔষধ ধরিয়াছে। তবে তখনো ঘোর বিকার। আবার বলিলাম "আপনি জানেন ভূতেরা বড় চন্দ্র-বিন্দু প্রিয়, তাহারা সব কথাই অনুনাসিক সুরে উচ্চারণ করে, আপনি বলুন দেখি "লেবুতলা"—

দাদা বলিলেন, "লেবুতলা।"

বলুন দেখি "আম—আঁব বল্‌বেন না কিন্তু—"দাদা বলিলেন, আম।"

বলুন দেখি "মামা—'ম' স্থানে 'ব' আদেশ করবেন না কিন্তু" দাদা বলিলেন "মামা।"

দাদা এতক্ষণে খানিকটা উঠিয়া বসিয়াছেন। আমি আবার বলিলাম, "আপনি জানেন, মানুষ মর্‌লে পর

তার আত্মা অন্য মানুষের ভিতর দিয়ে অবলীলা ক্রমে পার হ'য়ে চলে যেতে পারে ; এই ত সে' দিন আপনাকে পড়িয়ে শুনিয়েছি, আমেরিকার চলচ্চিত্রের অভিনেতা রুডল্‌ফ্‌ ভেলেনটিনো মর্‌লে পরে কি করে একদিন সদর্‌ রাস্তায় তার আত্মা এক মহিলার ভিতর দিয়ে পার হ'য়ে চলে গিয়েছিল, সেই মহিলা শুধু তাঁর সঙ্গিনীকে বলেছিলেন যে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া তার গায়ে লাগল ; আপনি যদি সত্য সত্যই মরে গিয়ে থাকেন, তবে আমার ভিতর দিয়ে পাস্‌ করে চলে যেতে পারবেন। দেখুন দিকিণ পারেন কি না।"

দাদা কোমরে কাপড় কসিয়া আমার পেটে মস্ত এক ঢুষ মারিলেন। আমি "বাপ্‌রে" বলিয়া একটু পিছাইয়া গেলাম, দাদা আমার ভিতর দিয়া পার হইতে পারিলেন না। তখন বলিলাম, "আচ্ছা এখন দেখুন দিকিন বৌদির ভিতর দিয়ে আপনার আত্মা পাস্‌ করে যেতে পারে কিনা ?" জোরে ঢুষ দেওয়ায় আমি ব্যথা পাইয়াছি দেখিয়া, দাদা 'সাধের রাঙা বউয়ের' উপর সেরূপ ব্যবস্থা করিলেন না ; বুদ্ধিমতী বৌদিও তাঁহাকে সে সুযোগ দিলেন না। দাদা তাঁহার কাছে যাইতেই তিনি দুই হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। দাদার পণ্ডিতাত্মা সেখানেই ধরা পড়িল—পাস্‌ করিয়া যাইতে পারিল না। আর দাঁড়াইবার দরকার নাই মনে করিয়া, আমরাও সরিয়া পড়িলাম।

মরণ-ঘুম

এম, এ, এফ, দীন মোহাম্মদ

উন্মাদ করেছে মোরে ধরণীর গান।
ঋতু গন্ধ বর্ণ ছায়া মুগ্ধ পুষ্পোদ্যান ।।
মৃত্তিকার শান্ত মৌন স্তব্ধ ঘন মায়া।
বহিয়া এনেছে সাথে আকাশের ছায়া ।।
নিত্য নব গ্রহ সূর্য্য জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী।
অন্তরের স্বপ্নরাজ্যে করে ঢলাঢলি ॥
প্রাণময় রূপময় মহাশূন্য ছেয়ে।
জ্যোতির সুতীব্র সুরা নিত্য আসে বেয়ে ॥
জরাজীর্ণ শীর্ণ প্রাণ করিয়া সরস।
ধরণীর মৃৎ-পাত্রে ভরি উঠে রস ।।
সুখের মরণ ঘুমে আঁখি আসে ঢুলে।
জন্ম মৃত্যু হাসি কান্না সব যাই ভুলে ।।

নওয়াব শামস্সুল হুদা

মোহাম্মদ এসমাইল সলিমাবাদী

নওয়াব শামস্সুল হুদা ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত গোকর্ণ গ্রামের সম্রান্ত সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ চট্টগ্রাম আদালতের বিচার বিভাগে অতি সম্মানিত পদে নিযুক্ত ছিলেন। সে সময়ে চট্টগ্রামের উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

নওয়াব শামস্সুল হুদার পিতার নাম শাহ্ সৈয়দ রেয়াজতুল্লাহ্। আরবী-ফারসী ভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। পরলোকগত নওয়াব আবদুল লতিফ "দূরবীণ" নামে ফারসী ভাষায় একখানা সংবাদপত্র প্রকাশ করিলে, তিনি তাহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। তিনি উক্ত কাগজখানার সম্পাদকরূপে বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

নওয়াব শামস্সুল হুদা পিতার যোগ্যপুত্ররূপেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় ধীশক্তি প্রভাবে অল্প বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত কলেজ হইতে সম্মানের সহিত বি-এ, পাশ করেন এবং যথাক্রমে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বি-এল ও ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এম-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মওলানা ওবায়দুল্লাহ্ অল্-ওবায়দী পরলোকগমন করিলে, কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক মৌলভী এ, কে, মোহাম্মদ সিদ্দিক, তদানীন্তন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়া তথায় যোগদান করেন। তাঁহার স্থলে শামস্সুল হুদা আলিয়া মাদ্রাসার আরবী-ফারসী বিভাগের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এখানে কিছুকাল অধ্যাপনার পর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। অতঃপর অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি আইন ব্যবসায়ে বিশেষ যশ ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া হাইকোর্টের মুসলমান উকিলদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেন।

লোকশিক্ষার প্রধান অবলম্বন সংবাদ-পত্রের প্রসার ও প্রচার। এই উদ্দেশ্যে মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত "সুধাকর" পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। নওয়াব সেরাজুল-ইসলাম সুধাকরের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলে, শামস্সুল হুদা তাহার পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে উক্ত পত্রিকা তখন দেশের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। অধিকন্তু খান বাহাদুর মৌলভী কবিরুদ্দীন পরলোক গমন করিলে তিনি তাঁহার উর্দ্দু গাইড প্রেস ক্রয় করেন এবং ইংরেজী সংবাদ-পত্র "মোহামেডান অবজার্ভার" (Mohammedan observer) এর পরিচালনা ভারও গ্রহণ করেন। ঐ সংবাদ-পত্র দুইখানা বঙ্গীয় মুসলিম-সম্প্রদায়ের জাতীয় জীবন গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে শামস্সুল হুদা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নির্ব্বাচিত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনে যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ঠাকুর আইনের অধ্যাপক (Togore Law Lecturer) নিযুক্ত হন। অধ্যাপকরূপে দণ্ডবিধি আইন সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা পরে 'ব্রিটিশ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন' (Principles of crimes in British India) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া খ্যাতনামা আইন ব্যবসায়ীগণের লাইব্রেরী অলঙ্কৃত করে। এই সময় হইতে তাঁহার গভীর আইনজ্ঞতার কথা দেশময় ছড়াইয়া পড়ে।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি পূর্ব্ববঙ্গের মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিরূপে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হন। এই সভায় তিনি স্বীয় অসাধারণ বাগ্মীতার পরিচয় প্রদান

করেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বিলাতের "ম্যানচেষ্টার গার্ড্জেন" (Manchester Guardian) তাঁহার বক্তৃতার প্রশংসা করিয়া বলেন,—"মিঃ শামসুল হুদা মুসলিম সমাজের একজন যোগ্য প্রতিনিধি। তাঁহার ইংরেজী বক্তৃতা সুমধুর ও মার্জ্জিত। তিনি বাক্যাড়ম্বর না করিয়া অল্প কথাতেই যে সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা প্রায়ই বিফল হয় না।"

নওয়াব শামসুল হুদা মুসলিম লীগের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগের' (All India Muslim League) সভাপতিপদে নির্ব্বাচিত হন। মুসলিম সমাজের মধ্যে রাজ-ভক্তি প্রচার ও সমাজের স্বার্থ সংরক্ষণ, ইহাই ছিল তখন মুসলিম লীগের প্রধান উদ্দেশ্য। ফলতঃ কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতীয় মুসলিম-সমাজের অভাব-অভিযোগের প্রতীকারের জন্য লীগ অকৃত্রিম সাধনায় সফলতা লাভ করিয়াছিল। ভারতের বহু মহাপ্রাণ দেশ-হিতৈষী ব্যক্তি লীগের ভিতর দিয়া দেশ ও জাতিকে সুগঠিত করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু যখন কংগ্রেস মতালম্বিগণ লীগের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিল, তখন লীগের কর্ম্মিগণ ধীরে ধীরে উহার সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে থাকেন। নওয়াব শামসুল হুদাও তখন লীগের প্রেসিডেন্টের পদ পরিত্যাগ করেন।

অতঃপর তিনি বঙ্গীয় শাসন পরিষদের সদস্য পদে নিযুক্ত হন। ভারতীয়গণের মধ্যে তিনিই শাসন পরিষদের প্রথম সদস্য। পাঁচ বৎসরকাল তিনি উক্ত পদের সভ্য-রূপে থাকিয়া স্বীয় অসাধারণ কার্য্যদক্ষতাগুণে গভর্ণমেণ্টের নিকট বিপুল খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি 'নওয়াব' এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে কে, সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত হন

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে নওয়াব শামসুল হুদা কলিকাতা হাই-কোর্টের বিচারপতি পদে অভিষিক্ত হন। তিনি উক্ত পদে মাত্র চারি বৎসরকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন; ইহারই মধ্যে তিনি আইনজ্ঞতা ও বিচার-নৈপুণ্যে প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শাসন সংস্কারের ফলে নূতন ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে, তিনি উক্ত সভার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম উক্ত পদ অলঙ্কৃত করেন।

নওয়াব শামসুল হুদা যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই জাতীয় কল্যাণ সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য থাকা কালীন মুসলিম সমাজের প্রভূত হিতসাধন করিয়াছিলেন। শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদে মুসলমান নিয়োগ তাঁহারই আপ্রাণ চেষ্টার ফল তিনি মুসলিম-সমাজের শিক্ষার সৌকর্য্যার্থে একজন সহকারী ডিরেক্টর এবং প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত করেন। সে নিয়ম অদ্যাবধি যথাসম্ভব প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে গভর্ণমেণ্ট চাকুরীতে অন্ততঃ শতকরা ৩৩ জন মুসলমান নিয়োগ করিবার সারকুলার জারি হয়; এবং উহা যাহাতে সম্যকরূপে কার্য্যে পরিণত হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক বিভাগে কড়া হুকুম জারি করেন। কেবল তাহাই নহে, পক্ষান্তরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া মাদ্রাসায় বিখ্যাত আলেম মওলানা আবদুল হক হক্কানীকে তৎপরে মওলানা আবদুল্লাহ্ টোকীকে ৫০০৲ টাকা বেতনে হেড মৌলভীর পদে নিযুক্ত করেন।

নওয়াব শামসুল হুদা একজন ন্যায়-পরায়ণ ও সত্য-সন্ধ তেজস্বী মনীষী ছিলেন। বিশাল ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহার ন্যায় শক্তিধর পুরুষ অতিঅল্পই দেখা যায়। ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার বাগ্মিতা, সুযুক্তি পরায়ণতা ও নির্ভীকতা দেখিয়া স-কাউন্সিল গভর্ণর অতিশয় বিস্মিত হইতেন। তিনি স্বাধীন ও নির্ভীক ভাবে ব্যবস্থাপক সভায় স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিতেন, এজন্য তিনি সিভিলিয়ান সদস্যগণের ভীতি স্বরূপ ছিলেন। কখন কখন চীফ সেক্রেটারী ও সেক্রেটারীগণের সহিত তাঁহার বিস্তর মতভেদ সৃষ্টি হইত; কিন্তু সে জন্য তিনি মুহূর্ত্তের জন্য ও বিচলিত হইতেন না। অধিকন্তু স্বীয় দক্ষতা ও ন্যায় পরায়ণতা গুণে সকল কার্য্যে প্রায়ই তিনি জয় লাভ করিতেন। তাঁহার গুণ-গরিমার পরিচয় পাইয়া তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কারমাইকেল তাঁহাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন এবং প্রায়ই তাঁহার কার্য্যে ক্ষমতার প্রশংশা করিতেন।

নওয়াব শামসুল হুদার সমাজ হিতৈষণার তুলনা নাই।

বৈঠকখানা রোডে অবস্থিত কারমাইকেল হোষ্টেল তাঁহার তাঁহার জীবণের এক অক্ষয় কীর্ত্তি। পূর্ব্বে কলেজের ছাত্রবৃন্দ উপযুক্ত ছাত্রবাস অভাবে নিতান্ত অসুবিধা ভোগ করিত। প্রধানতঃ তাঁহারই অবিশ্রান্ত সাধনার ফলে উপরিউক্ত হোষ্টেল প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি বেকার হোষ্টেলেরও বিশেষ উন্নতিসাধন করেন। "মুসলিম অনাথ আশ্রম" (Mohammedan Orphanage) নামে কলিকাতায় ৮নং সৈয়দ সালেহ্ লেনে যে প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান আছে, তিনিই তাহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

বঙ্গীয় মুসলিম-সমাজ একটি জাতীয় কলেজের অভাব বহুকাল হইতেই তীব্ররূপে উপলব্ধি করিয়া আসিতেছিলেন। এই অভাব দূরীকরণার্থে কলিকাতায় জাতীয় কলেজ স্থাপন কল্পে যে সকল কর্ম্মিপুরুষ অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নওয়াব শামসুল হুদা তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। বর্ত্তমান ইসলামিয়া কলেজ সেই সাধনা ও প্রচেষ্টার সুধাময় ফল। এই কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি যেরূপ কঠোর সাধনা ও যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, সুধীমণ্ডলীর তাহা অবিদিত নাই। তিনি স্বীয় অসাধারণ কার্য্যদক্ষতা গুণে গভর্ণমেণ্ট হইতে ৯ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়া লন এবং ওয়েলেসী ষ্ট্রীটে বর্ত্তমান কলেজ কম্পাউণ্ডের জন্য ভূমি ক্রয় করেন। কিন্তু ইউরোপীয় মহা সমরের বিভ্রাটে তাঁহার জীবিত কালে অর্থাভাবে উহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়া যাইতে সমর্থ হয়েন নাই। এই কলেজের সৃষ্টির মূলে নওয়াব শামসুল হুদার সাধনা বিদ্যমান না থাকিলে আজিও কলিকাতার বক্ষে ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইত কিনা নিশ্চয় করিয়া তাহা বলা যায় না। ফলতঃ শিক্ষার দিক দিয়া বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের উন্নতি বিধানে তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, জাতীয় উন্নতির ইতিহাসে তাহা চিরকাল উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

নওয়াব শামসুল হুদা কেবল উচ্চশিক্ষা বিস্তার করিয়াই স্বীয় কর্ত্তব্য শেষ করিয়া যান নাই। পরন্তু, দরিদ্র মুসলিম ছাত্রবৃন্দও যাহাতে সুশিক্ষিত হইতে পারে, তাহারও সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা "কড়েয়া মুসলিম-বয়েজ স্কুল" তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই বিদ্যালয়ে বহু দরিদ্র ছাত্র বিনাবেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। অধিকন্তু যে সমস্ত টাকা মুসলমান শিক্ষকগণের বেতনের জন্য নিরূপিত ছিল, তাহাও শামসুল হুদার প্রচেষ্টায় এখন মুসলিম ছাত্রবৃন্দের বৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে। উক্ত বিদ্যালয় দরিদ্র ছাত্রবৃন্দের জ্ঞানলাভের পক্ষে যে কতখানি সহায়তা করিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বিশেষতঃ কলিকাতা মহানগরীতে এরূপ দরিদ্র সহায়ক একটী বিদ্যালয়ের যে নিতান্ত আবশ্যকতা ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

মুসলিম-সমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন শামসুল হুদার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। কলিকাতার এমন জাতীয় প্রতিষ্ঠান অতি অল্পই দৃষ্ট হয়, যাহার সহায়তা কল্পে তিনি উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু করিয়া যান নাই। তিনি মুসলিম বালিকাদের শিক্ষার উন্নতি বিধানার্থ ৮৬নং লোয়ার সার্কুলার রোডে অবস্থিত "শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের" মাসিক সাহায্য ৭০৲ টাকা হইতে ৪৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া দেন এবং ৫৭ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ "শহর-ওয়ার্দ্দী বালিকা বিদ্যালয়ের" জন্যও তিনি মাসিক ২৫০৲ টাকা করিয়া সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। অধিকন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকল্পেও তিনি কম পরিশ্রম করেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে যে ছয়জন Life-members নিযুক্ত হন, নওয়াব শামসুল হুদা তাঁহাদের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি।

নওয়াব শামসুল হুদা দেশের ও জাতির গৌরব। ইংরেজীতে তাঁহার ন্যায় বক্তার উদ্ভব এদেশে অধিক হয় নাই। তিনি যখন বক্তৃতা করিতেন, তখন মনে হইত যেন, প্রাণের গভীরতম প্রদেশ হইতে বাক্যস্রোত অনর্গল বহির্গত হইতেছে। আলীগড় শিক্ষা সমিতির ও নদ্ওয়াতুল্ ওলামার বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রোতৃমণ্ডলী স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল।

নওয়াব শামসুল হুদা লেখকরূপেও জনসমাজে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ইংরেজী পত্রে বহু প্রবন্ধ লিখিতেন। কিন্তু ইংলণ্ডের "ম্যানচেষ্টার গার্জ্জেনের" লেখকরূপেই তিনি তিনি বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে স্যার এডওয়ার্ড ক্লার্ক (Sir Edward Clarke) লিখিয়াছেন,—"মিঃ শামসুল হুদা "ম্যানচেষ্টার গার্জ্জেনে" যে সমস্ত ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার

গভীর চিন্তা-শক্তি, স্থির বিচার-বুদ্ধি ও অসাধারণ ভাষা-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।"

"ইংরেজীতে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল, এবং ইংরেজীতে তাঁহার উচ্চারণ প্রণালীও অত্যন্ত শ্রুতি-মধুর ছিল। আমি তাঁহার নিকট যে দুইটী শব্দের উচ্চারণ শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহা আজিও আমার স্মরণ আছে।"

নওয়াব সাহেবের মত ন্যায়পরায়ণ ও চরিত্রবান ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। তিনি স্বীয় যোগ্যতা ও কার্য্য-গুণে গভর্ণমেন্টের নিকট যেরূপ বিপুল খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ইচ্ছা করিলে স্বীয় অনুপযুক্ত বহু আত্মীয়-স্বজনকে নানারূপে চাকুরী দিতে পারিতেন। কিন্তু ন্যায়ের অমর্য্যাদা করিয়া এরূপ অন্যায় পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দেওয়া তিনি আদৌ সঙ্গত মনে করেন নাই। তিনি যোগ্য মুসলমানকে চাকরী দিতে যথেষ্ট সহায়তা ও শ্রম স্বীকার করিতেন। এজন্য আপন-অপর বলিয়া তাঁহার নিকট কোন ভেদ-নীতি ছিল না; এমন কি এসম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমান জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলকেই তিনি সমচক্ষে সন্দর্শন করিতেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এই বিখ্যাত কর্ম্মি-পুরুষ ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

নওয়াব শামসুল হুদা সর্ব্বগুণের আধার ছিলেন, তিনি নানা বিষয়ে এত সংবাদ ও খোঁজ রাখিতেন যে, স্যার এডওয়ার্ড তাঁহাকে "মানব সমাজের ম্যাগাজিন" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় ঔদার্য্য ও আচারণ গুণে কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেরই নিকট প্রভূত সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে এমনই একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, যে-কেহ তাঁহার সহিত ক্ষণকাল বাক্যালাপ করিতেন, তিনি অল্প কথার মধ্যেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেন। বস্তুতঃ যে উদার বিপুল অন্তর দিয়া তিনি সমগ্র জাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আমাদের মধ্যে,—আমাদের নেতাদের মধ্যে, তাহা সঞ্চারিত হউক, আমরা ইহাই প্রার্থনা করি।

সঙ্গীত সম্বন্ধে আরবী পাণ্ডুলিপির আবিষ্কার

মঈনউদ্দীন হোসায়ন বি-এ

ইসলামের গৌরব-যুগে আরবী ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু মূল্যবান পুস্তক লিখিত হইয়াছিল। তাহার অনেকগুলি ভাগ্য বিপর্য্যয়ের সময় নানা কারণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে যেগুলি কোন রকমে রক্ষা পাইয়াছিল তাহাও আবার মুসলমানদের হস্তচ্যুৎ হইয়া ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের কবলে পতিত হয়। এই ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণ একের পর এক মোস্‌লেম রাজ্যগুলি গ্রাস করতঃ মোসলমানের সহিত কঠোর নির্ম্মম ব্যবহার করিলেও মুসলমানের নিকট হইতে প্রাপ্ত অযুত সহস্র গ্রন্থের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছেন তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার না করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। তাই আজ ইউরোপের প্রত্যেক প্রদেশের জনাকীর্ণ নগরীতে বিভিন্ন লাইব্রেরী বা পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়া ঐ সকল দুষ্প্রাপ্য আরবী ফারসী পুস্তক সাদরে ও সযত্নে সুরক্ষিত রহিয়াছে। এইসব ব্যাপারে বর্ত্তমান ইউরোপ যেরূপ অকাতরে জলের মত অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। জ্ঞান-পিপাসা মিটাইবার জন্য তাঁহাদের কি অনন্যসাধারণ প্রয়াস। পৃথিবীর কোন সুদূর প্রান্তে কখনও যদি কোন প্রাচীন পুস্তক সংগ্রহের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে অমনি শত কাজ ফেলিয়াও খৃষ্টান মনীষী ও পণ্ডিতবর্গ সেইস্থানে অগৌণে দৌড়িবেন, এবং সেই পুস্তকটি সংগ্রহ করিবেন তবেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তা সে কাজে যত টাকাই ব্যয় হউক না কেন সেজন্য তাঁহাদের আদৌ ভ্রূক্ষেপ নাই। হায়! আবার কবে মুসলমানদের মধ্যে ঐরূপ জ্ঞানপিপাসা জাগিয়া উঠিবে!

রাজ্য-হারার পর হইতে মোসলমানগণ সাধারণতঃ সঙ্গীত সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা সোৎসাহের সহিত পোষণ করিয়া আসিতেছেন তাহার অপনোদন করিয়াছেন এ যুগের এমাম্ গাজ্জালী—হাজীউল্ হারমায়েন ওয়াশ্‌শরীফায়েন মহামনীষি ও সত্যের একনিষ্ঠ সাধক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব। তিনি তাঁহার অশেষ গবেষণাপূর্ণ ধারাবাহিক প্রবন্ধরাজিতে অকাট্য যুক্তি দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সঙ্গীত ইসলামে হারাম ত নহে বরং জায়েজ (সিদ্ধ), এমন কি হানাফী সম্প্রদায়ের শিরোমণি এমাম আবু হানিফাও সঙ্গীত অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। যে স্বাধীন চিন্তার অসীম প্রভাবে একদা মোসলমান উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং যাহার অভাবে তাঁহাদের উন্নতির গতি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের অশেষ সাধনার ফলে (বিশেষ করিয়া তাঁহার যুগপ্রবর্ত্তক গ্রন্থ "মোস্তফা চরিত" ও "কোর-আনের তফসির" ফলে) আজ বাঙ্গালী মোসলমান রূপকথার সেই 'জাদু-কাঠির' মতই স্বাধীন চিন্তার রস আস্বাদন করিতে কথঞ্চিৎ সক্ষম হইয়াছে। আমার মতে বাঙ্গালী মোসলমানের নিকট মওলানা সাহেবের ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। কিন্তু একদল লোক রাজনৈতিক কারণে মওলানা সাহেবের বিশেষ করিয়া সঙ্গীত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের অনর্থক বিরুদ্ধাচরণ করিয়া নিজেদের সঙ্কীর্ণতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। ইঁহাদের লেখাগুলি আমি ধীরভাবে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। কারণ তাহাতে যুক্তিতর্ক আদৌ নাই,—আছে কেবল বৃথা আস্ফালন ও বিদ্যার বড়াই। কূট তর্কের কথা বাদ দিয়া ইহাই কেবল আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, যদি সঙ্গীত ইস্‌লামে যথার্থই নিষিদ্ধ হইত, তাহা হইলে ইস্‌লামের গৌরবমণ্ডিত যুগে (যাহার গর্ব্ব করিতে সঙ্গীত

বিরোধীদল সদাই তৎপর) মোসলমান মনীষীবৃন্দ ঐরূপ একটি তথাকথিত নিষিদ্ধ বিষয় যথা, সঙ্গীত, সম্বন্ধে রাশি রাশি গ্রন্থ রচনা করিতে আদৌ অগ্রসর হইতেন না। অন্ততঃ তাঁহারা নীরব থাকিলেই সব ল্যাঠা চুকিয়া যাইত, এবং তাহা হইলে বিরুদ্ধবাদীদের অপরকে পরাস্ত করিবার খুবই সুবিধা হইত। কিন্তু এই স্থলে আমরা কি দেখিতে পাই? সেই গৌরব যুগের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে অতি সহজে আমরা দেখিতে পাই যে, মোসলেম মনীষীবৃন্দ সঙ্গীত বিদ্যাকে তুচ্ছ বা অবহেলার বস্তু বলিয়া মনে তো করেন নাই, বরং যাহাতে পরবর্ত্তী কালের মোসলমানগণ সঙ্গীতকে হারাম বা নাজায়েজ মনে না করে, তাহার জন্য তাঁহারা আরবী ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে সঙ্গীত সম্বন্ধে বহু পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার পরেও যাহারা সঙ্গীতকে হারাম বা নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবে তাহাদের জন্য পবিত্র গ্রন্থ কোর-আনের নিম্নলিখিত আয়তই যথেষ্ট :—

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم

সে যাহা হউক, সম্প্রতি ইংলণ্ডের বডলে (Bodley) লাইব্রেরীতে রক্ষিত আরবী ভাষায় লিখিত সঙ্গীত সম্বন্ধে সে সব পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা মিঃ হেন্‌রী জর্জ ফারমার এম, এ, মহোদয় "Journal of the Royal Asiatic Society" পত্রে প্রদান করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তিনি এক প্রবন্ধ লিখিয়া বলিতেছেন :—সঙ্গীত সম্বন্ধে আরবীতে বহু পুস্তক বিদ্যমান আছে। তাহার মধ্যে সে সব হস্তলিপি ইংলণ্ডের বড্‌লে (Bodley) লাইব্রেরীতে সংগৃহীত আছে তাহার তালিকা এইরূপ :—

১। সঙ্গীত সম্বন্ধে "এখ্‌ওয়ান্‌-উস্ সফার" 'রেসলা'—(আল্ মাজ্‌রিতি অনুসারে ইহা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর রচনা)।

২। এবনে সিনার "আশ্‌শেফা" পুস্তকে সঙ্গীত সম্বন্ধে 'মাকালা (একদশ শতাব্দীর রচনা)

৩। এবনে সিনার "নজাত" পুস্তকে সঙ্গীত সম্বন্ধে অধ্যায়।

৪। সফিউদ্দীন আবদুল মো'মেনের "শারফিয়া" এবং "কেতাবুল্ আদওয়ার" (ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনা)

৫। শমস্ উদ্দীন আল্ সাইদাবী আল্ জাহাবীর "কেতাব য়্যাসতখরাজ মিনহু আল্ আনগাম" (ষোড়শ শতাব্দীর রচনা)

এই সকল আরবী পাণ্ডুলিপির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১ Uri. CMIV. Hunt 296.

শিরোনামা :—

رسالة الاربعة من القسم الاول من الرياضيات و الموسيقى [من] رسائل اخوان الصفا (للمعارف المجريطى)

ইহার মূল আরবী এবারতের (Text) কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে; এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ Dieterici *Propaedeutik der Araber* (Berlin) নাম দিয়া উহার অনুবাদ জার্ম্মাণ ভাষায় বাহির করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে টীকা টিপ্পনি সহ উক্ত পুস্তকের একটা নূতন সংস্করণের একান্তই আবশ্যক। ইহার জন্য বডলে লাইব্রেরীতে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিটি বিশেষ সহায়তা করিবে। কারণ আল্-মাজরিতির উক্ত পাণ্ডুলিপিটি মোসলেম স্পেন হইতে প্রাপ্ত, এবং অন্যান্য সংস্করণগুলি এসিয়া অঞ্চলের পাণ্ডুলিপি হইতে প্রকাশিত। পত্রাঙ্ক ২৪ হইতে ইহা আরম্ভ হইয়াছে; এবং পত্রাঙ্ক ৩৪শে শেষ হইয়াছে।

প্রথম ভাগ :—পত্রাঙ্ক ২৪ :—

فى ان اصل صناعة الموسيقا للحكماء

অর্থাৎ সঙ্গীত সম্বন্ধে বিজ্ঞলোকের অভিমত।

২য় ভাগ :—পত্রাঙ্ক ২৫ :—

فى كيفية ادراك القوة السامعة للصوات

অর্থাৎ—স্বর সম্বন্ধে আলোচনা।

৩য় ভাগ :—পত্রাঙ্ক ২৫ :—

فى امتزاج الاصوات و تنافرها

অর্থাৎ—ঐকতানিক ও বে-মিল বা কর্কশ স্বর সম্বন্ধে আলোচনা।

৪র্থ ভাগ :—পত্রাঙ্ক ২৬ :—

فى تاثر الامزجة بالاصوات

অর্থাৎ শব্দের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা।

৫ম ভাগ :—পত্রাঙ্ক ২৬ :—

فى اصول الالحان و قوانينها

অর্থাৎ রাগিনীর উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা।

৬ষ্ঠ ভাগ :—পত্রাঙ্ক ২৮ :—

فی کیفیة صناعة الالات و اصلا حها

অর্থাৎ সঙ্গীত ও বাগ্যযন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা।

৭ম ভাগ :—পত্রাঙ্ক ২৯ :—

فی ان لحرکات الا فلاك نغمات كنغمات العيدان

অর্থাৎ গ্রহগণের গতিজনিত শব্দের মেল বা সামঞ্জস্য সম্বন্ধে আলোচনা।

৮ম ভাগ :- পত্রাঙ্ক ৩২ :—

فی ان احکام الکلام صنعة من الصنائع

অর্থাৎ বাক্যের অংশ বা পদ সম্বন্ধে আলোচনা।

৯ম ভাগ :—পত্রাঙ্ক ৩৩ :—

فی تناسب الا عضاء علی الا صول الموسيقية

অর্থাৎ সঙ্গীতের প্রধান অংশ সম্বন্ধে আলোচনা।

১০ম ভাগ :- পত্রাঙ্ক ৩৪ :—

فی حقیقة نغمات الافلاك

অর্থাৎ গ্রহগণের গতিজনিত ছন্দ-তরঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা।

১১শ ভাগ :—পত্রাঙ্ক ৩৪ :—

فی ذکر المربعات

অর্থাৎ ক্ষিত্যপ্‌ তেজোমরুৎ সম্বন্ধে আলোচনা।

১২শ ভাগ—পত্রাঙ্ক ৩৫ :—

فی الانتقال من طبقات الالحان

অর্থাৎ মধুর স্বর সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা।

১৩শ ভাগ : -পত্রাঙ্ক ৩৬ :—

فی نوادر الفلاسفة فی الموسيقی

অর্থাৎ সঙ্গীত সম্বন্ধে দার্শনিকদের অভিমত।

১৪শ ভাগ :—পত্রাঙ্ক ৩৭ :—

فی تلون تاثیرات الانغام

অর্থাৎ ধ্বনির প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা।

২ Uri. CMLXXXIX Marsh 189.

শিরোনামা :—

الكتاب الرابع فی الموسیقا (من) رسائل اخوان الصفا للعارف المجریطی

উপরোক্ত পাণ্ডুলিপির অনুরূপ। পত্রাঙ্ক ২৫ হইতে আরম্ভ ও পত্রাঙ্ক ৪১শে শেষ হইয়াছে। ইহা উল্লেখযোগ্য পাণ্ডুলিপি।

৩ Uri. CCCCLXXVI. Pocock 109.

শিরোনামা :—

الفن الثامن من کتاب الشفاء و هو الموسيقی

এই পাণ্ডুলিপির ৬টি অধ্যায় (مقالات) আছে, যাহা আবার বহু পরিচ্ছেদে (فصول) বিভক্ত।

পত্রাঙ্ক ৭৪ হইতে আরম্ভ এবং পত্রাঙ্ক ১০৮এ শেষ হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায় :—পত্রাঙ্ক ৭৪ :—صوت—স্বর সম্বন্ধে।

২য় অধ্যায় :—পত্রাঙ্ক ১০৫ :--ابعاد—অন্তরাল বা বিরাম সম্বন্ধে।

৩য় অধ্যায় :—পত্রাঙ্ক ১১৭ :--اجناس و انواع—জাতি ও গোত্রাদি সম্বন্ধে।

৪র্থ অধ্যায় : —পত্রাঙ্ক ১২২ :—جموع و الانتقال—মধুর স্বর সৃষ্টি সম্বন্ধে। (নকলকারী তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমার্দ্ধ ও চতুর্থ অধ্যায়ের শেষার্দ্ধ এই স্থানে সন্নিবেশিত করেন নাই; তবে পুস্তকের শেষের দিকে উহা জুড়িয়া দিয়াছেন।

৫ম অধ্যায় :—পত্রাঙ্ক ১৩২ :—ایقاع—ছন্দ প্রকরণ।

৬ষ্ঠ অধ্যায় :—পত্রাঙ্ক ১৮৭ :—تالیف— রচনা প্রকরণ। এই পাণ্ডুলিপির একটি মুদ্রিত সংস্করণ আছে, যাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয়।

৪ Uri. CCCCXXXXVI. Pocock. 250.

শিরোনামা :—

الفن الثالث فی الجملة الثالثة فی کتاب الشفاء فی الموسيقی

উপরোক্ত পাণ্ডুলিপির অনুরূপ। পত্রাঙ্ক ৭৪ হইতে আরম্ভ ও পত্রাঙ্ক ৯৩এ শেষ হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায় :—পত্রাঙ্ক ৭৪ – ২য় অধ্যায় :—পত্রাঙ্ক ৭৮

৩য় অধ্যায় :—পত্রাঙ্ক ৮০—৪র্থ অধ্যায় :—পত্রাঙ্ক ৮২

৫ম অধ্যায় :—পত্রাঙ্ক ৮৪—৬ষ্ঠ অধ্যায় : পত্রাঙ্ক ৯২

৫ Uri. MXXVI 4 Marsh. 321.

শিরোনামা :—

کتاب الموسیقی للشیخ الرئیس ابی علی بن سینا ... من جملة کتاب النجاة

পত্রাঙ্ক ১৫৯ হইতে আরম্ভ ও পত্রাঙ্ক ১৭০এ শেষ হইয়াছে।

১। পত্রাঙ্ক ১৫৯ —صوت و ابعاد— স্বর ও বিরাম।

২। পত্রাঙ্ক ১৬৩ —اجناس— জাতি সম্বন্ধে।

৩। পত্রাঙ্ক ১৬৪ :—جموع— সঙ্গীত পদ্ধতি।

৪। পত্রাঙ্ক ১৬৪ :—ایقاع— ছন্দ প্রকরণ।

৫। পত্রাঙ্ক ১৬৭ :—الانتقال— স্বর সৃষ্টি।

৬। পত্রাঙ্ক ১৬৮ —বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র যথা, সঞ্জ (صنج) শাহ্রুদ (شاهرود), তম্বুর (طنبور), মিজমার (مزمر)

৭। পত্রাঙ্ক ১৬৮ —بربط— সারঙ্গ সম্বন্ধে।

৮। পত্রাঙ্ক ১৬৯ —تاليف الالحان— স্বর রচনা।

১৭০ পত্রাঙ্কের ৮ম লাইন হইতে ১৬ লাইন পর্য্যন্ত স্থানে অপর হস্তের লিখিত কিছু অংশ যোগ করা আছে; এবং ১৭১ পত্রাঙ্কে ১২টি রূপ, (شدود) ৬টি উপরূপ (اوازات) ও শাখা (شعب) রূপ আছে,—যাহা এবনে সিনার যুগে নিরূপিত হয় নাই।

৬ Uri. CMLXXXV. 1 Marsh. 161.

শিরোনামা :—

كتاب الموسيقى للشيخ الرئيس ابى على بن سينا...من جملة كتاب النجاة

সংগ্রহকারক বলেন :—*Avicennae de Musica Liber, quindecim sectionibus, quadra ginta foliis Constans.*" ইহা কিন্তু ভুল। এবনে সিনার পাণ্ডুলিপি ৪০ পত্রাঙ্কতে শেষ হয় নাই, মাত্র ১ হইতে ৯. পত্রাঙ্ক পর্য্যন্ত আছে। ১০ পত্রাঙ্ক হইতে ৪২ পত্রাঙ্ক পর্য্যন্ত অংশের জন্য অন্য একটি গ্রন্থকারকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। (Addenda et Emendanda, 605 পৃষ্ঠা দেখুন)

৭ Uri. CMXXII Marsh 115.

শিরোনামা : —

كتاب الرسالة الشرفية فى النسب التاليفية لصفى الدين عبد المومن البغدادى -

ইহাতে পাঁচটি অধ্যায় (مقالات) আছে, যাহা আবার বহু পরিচ্ছেদে (فصول) বিভক্ত।

পত্রাঙ্ক ২ হইতে আরম্ভ হইয়া পত্রাঙ্ক ৫৫এ শেষ হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায় :—পত্রাঙ্ক ২ :—

فى الكلام على الصوت و لواحقه و فى شكوك واردة على ما قيل فيه -

—স্বর সম্বন্ধে আলোচনা।

২য় অধ্যায় :—পত্রাঙ্ক ৬ :—

فى حصر نسب الاعداد [الابعاد] بعضها الى بعض و استخراج الابعاد و نسبها المستخرجة من نسب مقاديرها و مراتبها فى التلائم و التنافر اسماء ها الموضوعة لها -

—অন্তরাল বা অবিরাম সম্বন্ধে আলোচনা।

৩য় অধ্যায় :—পত্রাঙ্ক ১১ :—

فى اضافات الابعاد بعضها الى بعض و فصل بعضها عن بعض و استخراج الاجناس من الابعاد الوسطى -

৪র্থ অধ্যায় :—পত্রাঙ্ক ২৬ :—

في ترتيب الاجناس فى طبقات الابعاد [العظمى] وذكر نسبها و اعدا [دها] -

রূপ ও শ্রুতিমধুর গঠন সম্বন্ধে আলোচনা।

৫ম অধ্যায় :—

فى الايقاع و نسب ادواره و الارشاد الى كيفية استخراج الالحان بالصناعة العملية

—ছন্দ ও স্বরগ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা।

ইহা উল্লেখযোগ্য পাণ্ডুলিপি। ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানী যথা, বার্লিন (৫৫০৬), পেরিস (২৭৪৯) ও ভিয়েনা (১৫১৫) প্রভৃতিতে ইহার নকল আছে। Mr. Caara de Vaux ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ Journal Asiatique-এ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত করিয়াছেন।

৮ Uri. MXXVI 2 Marsh 521

শিরোনামা নাই। তবে Uri লিখিয়াছেন :—"Tractatus de musica ex græcorum libris excerptus. Antoris noman abest." কিন্তু এই পাণ্ডুলিপির প্রথম পত্রাঙ্কে এই পুস্তিকাকে এইভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে :—

كتاب الشرفية فى معرفة النسب التاليفية -

পূর্ব্বোক্ত পুস্তকের অনুরূপ

পত্রাঙ্ক ৩৪ হইতে আরম্ভ এবং পত্রাঙ্ক ১১৬এ শেষ হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ৩৫। ২য় অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ৩৮।

৩য় অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ৩৮। ৪র্থ অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ৬৭।

৫ম অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ৬৭

পত্রাঙ্ক ১১৬ হইতে ১১৭ পর্য্যন্ত অংশে অতিরিক্ত বিষয় আছে যাহা الشرفية-এর অন্তর্গত নহে।

৯ Uri. MXXVI 3 Marsh 521

শিরোনামা—

كتاب الادوار فى الموسيقى ... صفى الدين عبد المؤمن الا رموى -

ইহা ১৫টি অধ্যায়ে (فصول) বিভক্ত। পত্রাঙ্ক ১১৮ হইতে আরম্ভ ও পত্রাঙ্ক ১৫৮এ শেষ হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায় :—পত্রাঙ্ক ১১৯—

فى تعريف الا نغام و بيان الحدة و الثقل -

অর্থাৎ সুর সম্বন্ধে আলোচনা

২য় অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ১২০— في اقسام الدساتين

অর্থাৎ নকাশি করা কাজের বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা।

৩য় অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ১২২ — فى نسب الا بعاد

অর্থাৎ অন্তরাল সম্বন্ধে আলোচনা।

৪র্থ অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ১২৫—

فى الاسباب الموجبة للتنافر -

অর্থাৎ বিরাম সম্বন্ধে আলোচনা।

৫ম অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ১২৬— فى التاليف الملائم

অর্থাৎ রচনা সম্বন্ধে আলোচনা।

৬ষ্ঠ অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ১২৮— فى الادوار و نسبها

অর্থাৎ প্রকার সম্বন্ধে আলোচনা

৭ম অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ১৩৮— فى حكم الوترين

অর্থাৎ তার জড়ান যন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা।

৮ম অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ১৩৮—

فى ذكر العود و تسوية اوتار و استخراج الا دوار منه

অর্থাৎ সারঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা।

৯ম অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ১৩৯—

فى اسماء الادوار المشهورة -

অর্থাৎ বিভিন্ন রীতির নাম সম্বন্ধে আলোচনা।

১০ম অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ১৪৭— فى تشارك نغم الا دوار

অর্থাৎ—সঙ্গীত চিহ্নের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে আলোচনা।

১১শ অধ্যায় :—পত্রাঙ্ক ১৪৮ :— فى طبقات الا دوار

অর্থাৎ স্বরগ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা।

১২শ অধ্যায় :—পত্রাঙ্ক ১৪৯ :—

فى الا صطحاب الغير المعهود -

অর্থাৎ ঐকতান সম্বন্ধে আলোচনা।

১৩শ অধ্যায় :—পত্রাঙ্ক ১৪৯ :— فى ادوار الايقاع

অর্থাৎ ছন্দ প্রকরণ সম্বন্ধে আলোচনা।

১৪শ অধ্যায় :—পত্রাঙ্ক ১৫৫ :— فى تاثير النغم

অর্থাৎ সুরের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা।

১৫শ অধ্যায় :—পত্রাঙ্ক ১৫৬ :— فى مباشرة العمل

অর্থাৎ সঙ্গীত সম্পাদন সম্বন্ধে আলোচনা। ১৫৭ পত্রাঙ্কে সারঙ্গের (عود) একটি নকশা আছে। ১৫৮ পত্রাঙ্কে সমকোণ বিশিষ্ট Zither—নুজ্‌হের (نزهة)-এর নকশা আছে। كنزالطحاف গ্রন্থকারের মতে (*Brit. Mus.* or 2361, fol. 263 দ্রষ্টব্য) এই 'নুজহ' যন্ত্র উপরোক্ত পুস্তকের লেখক সফীউদ্দীন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

كتاب الادوار এর পাণ্ডুলিপিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহা আরবী, ফারসী, ও ভারতীয় সঙ্গীত বিদ্যার বিশিষ্ট পাঠ্য-পুস্তক ছিল। পরবর্ত্তী সঙ্গীত বিশারদগণের সকলেই এই পুস্তকের বরাত দিয়াছেন এবং ইহার বহু ভাষ্য বিদ্যমান আছে। Bodley লাইব্রেরীতে উহার যে সব পাণ্ডুলিপি আছে তাহা ব্যতীত ঐ পাণ্ডুলিপির অন্যান্য কপি ব্রিটিশ মিউজিয়মে ও অপর লাইব্রেরীতে পরিদৃষ্ট হইবে (or. 136, বা 236)। ব্রিটিশ মিউজিয়মে যে পাণ্ডুলিপি আছে তাহাতে বিভিন্ন সুরের বহু গান সন্নিবেশিত আছে; কিন্তু অপর পাণ্ডুলিপিতে তাহা নাই।

১০ Uri. MXXVI. I, Marsh 521.

শিরোনামা :—

كتاب فى علم الموسيقى الموسوم بالادوار

ইহা পূর্ব্বোক্ত পাণ্ডুলিপির অনুরূপ; কিন্তু ইহাতে যন্ত্রগুলির কোন নকশা নাই। পত্রাঙ্ক ১ হইতে আরম্ভ হইয়া পত্রাঙ্ক ৩২এ শেষ হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ২
২য় অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ২
৩য় অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ৪
৪র্থ অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ৬
৫ম অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ৭
৬ষ্ঠ অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ৯
৭ম অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ১৪
৮ম অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ১৪
৯ম অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ১৫
১০ম অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ১৭
১১ম অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ১৮
১২শ অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ২৪
১৩শ অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ২৫
১৪শ অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ৩০
১৫শ অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ৩২

১১ Uri. CMLXXXV. Marsh 161

শিরোনামা নাই।

ইহা পূর্ব্বোক্ত পাণ্ডুলিপির অনুরূপ। Uri-এর মতে এই পাণ্ডুলিপিখানি, এবনে সিনার كتاب النجاة-এর অংশ বিশেষ। কিন্তু তাহা নহে। কারণ ইহার পরেই এবনে সিনার পুস্তকটি সন্নিবেশিত আছে।

ইহা পত্রাঙ্ক ১০ হইতে আরম্ভ হইয়া পত্রাঙ্ক ৪২ এ শেষ হইয়াছে। ইহাতেও যন্ত্রগুলির কোন নকশা নাই।

১২ Uri. CMLXXXV. Marsh 161.

শিরোনামা :—

كتاب الادوار فى الموسيقى صفى الدين عبد المؤمن الا رموى

ইহা ৯ নম্বর পাণ্ডুলিপির অনুরূপ। পত্রাঙ্ক ৪৩ হইতে আরম্ভ হইয়া পত্রাঙ্ক ৮৩এ শেষ হইয়াছে। ৯ নম্বরের মত ৮২ ও ৮৩ পত্রাঙ্কে সারঙ্গের নকশা আছে।

১৩ Uri. XLII. 2 Marsh 82.

শিরোনামা :—

كتاب يستخرج منه الانغام تاليف الشيخ شمس الدين الصيداوى الذهبى -

ইহা পত্রাঙ্ক ৫৯ হইতে আরম্ভ ও পত্রাঙ্ক ৭৯এ শেষ হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই পদ্যে লিখিত, এবং বহু অধ্যায়ে বিভক্ত, যথা :—প্রথম অধ্যায় পত্রাঙ্ক ৫৯ :—ছন্দোবিশিষ্ট পদাবলী (مزدوج) ও ৪টি মূল স্বর (اصول), মূল হইতে প্রাপ্ত ৮টি স্বর (فروع) ও উপস্বর (اوازات) ও তাল (بحور)।

২য় অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ৬৯ :—دوار الاصول و الفروع অর্থাৎ মূল স্বরেরও মূল হইতে প্রাপ্ত স্বরের চিহ্নাবলী।

৩য় অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ৭১ :—دوائر الاوازات অর্থাৎ উপস্বরের চিহ্নাবলী।

৪র্থ অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ৭২ :—دوائر البحور অর্থাৎ তাল।

৫ম অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ৭৩ :—دائرة الجمع অর্থাৎ কটিবন্ধ।

৬ষ্ঠ অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ৭৩ :—ابعاد অর্থাৎ অন্তরাল।

৭ম অধ্যায় :—পত্রাঙ্ক ৭৪ :—جدول الطبقات অর্থাৎ স্বরগ্রামের পরিবর্ত্তন।

৮ম অধ্যায় :—পত্রাঙ্ক ৭৫ :—نغمات অর্থাৎ চিহ্নাবলী।

৯ম অধ্যায় :—পত্রাঙ্ক ৭৫ :—مخالفات

অর্থাৎ 'মোখালেফাতের' তালিকা।

ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য পাণ্ডুলিপি। কত পদাবলী আছে তাহার সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য প্রত্যেক ৮ লাইন অন্তর রঙিন কালিতে ইহা লেখা। ইহার অনুরূপ পাণ্ডুলিপি পেরিস লাইব্রেরীতে আছে (Arabe 2480)—যাহার গ্রন্থকারের নাম শামসউদ্দীন আল-সাইদাবী আল-দামাশকী। Bodley লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপির ৬৯ পত্রাঙ্কে ৪টি কবিতা নাই।

১৪ Ms Arab. c 40

শিরোনামা নাই। হস্তলিখিত ক্যাটলগে ইহাকে Circuli Musici Arabica" বলা হইয়াছে। ইহা শমসউদ্দীন আল সাইদাবীর লিখিত পাণ্ডুলিপির অংশ বিশেষ। কিন্তু কপিটির অবস্থা ভাল নহে। পত্রাঙ্ক ১ হইতে আরম্ভ হইয়া পত্রাঙ্ক ৬ এ শেষ হইয়াছে। ইহার ৯ম অধ্যায়টি হারাইয়া গিয়াছে।

Dr. Lee-এর *Catalogue of Oriental Mss*-এ (যাহা তিনি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক দেশে ক্রয় করিয়াছিলেন, এবং যাহার ১ম খণ্ড লণ্ডনের R. Watts কর্ত্তৃক ১৮৩১ অব্দে ও ২য় খণ্ড ১৮৪০ অব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল) উপরোক্ত শমসউদ্দীনের ২টি গ্রন্থের নাম উল্লিখিত আছে, যথা—

NO 51. A Metrical Essay on the Science of el Nugham (Modulation by Shamsuddin E-S Saidawi.

(2) *Menzumeti Shaikh Shamsuddin.* A poem on the same subject by the same author.

ডাক্তার লি কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৫০ নম্বর পাণ্ডুলিপি—*A Tract on Musical Composition* by Ali ibn Said el Andalusi ও উপরোক্ত পাণ্ডুলিপিগুলি বর্ত্তমানে কোথায় আছে তাহার সন্ধান কেহ দয়া করিয়া মিঃ ফার্ম্মারকে জানাইলে তিনি উপকৃত হইবেন।

১৫ Ouseley. 106.

শিরোনামা :—

كتاب كنز الطرب و غاية الارب

১৩ নম্বরের অনুরূপ হইলেও ইহা অসম্পূর্ণ কপি। ইহার ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ৯ অধ্যায়গুলি হারাইয়া গিয়াছে। ইহার ১০ম অধ্যায়ে রীতির ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। অথচ অন্যান্য কপিতে ইহা সন্নিবেশিত হয় নাই। এই শেষ অধ্যায়ে ব্যুৎপত্তি তালিকা যেভাবে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা স্পেনের রাজধানী ম্যাড্রিডের লাইব্রেরীতে রক্ষিত আরবী পাণ্ডুলিপি معرفة النغمة ثمان (No 334)-এর অনুরূপ।

১৬ Ouseley. 102.

শিরোনামা :—পত্রাঙ্ক ১ :—

كتاب فى علم الموسيقى و معرفة انغام

অর্থাৎ সঙ্গীত বিজ্ঞান ও সুর পরিচয়ের পুস্তক।

শিরোনামা :—পত্রাঙ্ক ২ :—

ابواب نهاية الطلاب و المطلوب

অর্থাৎ অন্বেষণ ও অন্বেষকের তোরণ-দ্বার।

ইহার মূল পদ্যে ও ভাষ্য গদ্যে লিখিত। গ্রন্থকারের নাম :—মোহাম্মদ ইবন মোহাম্মদ ইবন আহমদ আল-জাহাবী,—ইঁহার অপর নাম আল জাজিরী ইবনুস্ সাবাহ।

পত্রাঙ্ক ১ হইতে আরম্ভ হইয়া পত্রাঙ্ক ১১এ শেষ হইয়াছে।

১৭ Ouseley 102. 2.

শিরোনামা :—

كتاب الميزان فى علم الادوار و الاوزان

ইহাতে গ্রন্থকারের নাম নাই। তবে সইফ-উদ্দীন আবদুল মোমেনের كتاب الادوار ও শরীফউদ্দীন ইবনুল্ আলাই-উলবী আল-হোসায়নী আল-বাগদাদীর قراة الا زمان فى علم الالحان নামক পুস্তকদ্বয়কে ভিত্তি করিয়া উহা লিখিত।

পত্রাঙ্ক ১১ হইতে আরম্ভ হইয়া পত্রাঙ্ক ৩৬এ শেষ হইয়াছে। ইহা ৬ খণ্ডে (ابواب) বিভক্ত হইয়াছে। যথা—

ভূমিকা—পত্রাঙ্ক ১১ :—

প্রথম অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ১৩ :—فى مهية الموسيقى

অর্থাৎ সঙ্গীতের মূল সূত্র সম্বন্ধে আলোচনা।

২য় অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ২০ :—فى ماهية النغم المطلق

অর্থাৎ অবারিত সুর সম্বন্ধে আলোচনা।

৩য় অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ২২ :—فى الاوتار و الموجب

অর্থাৎ তার সম্বন্ধে আলোচনা।

৪র্থ অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ২৪ :—

فى معرفة الشدود و الا وازات

অর্থাৎ রীতি সম্বন্ধে আলোচনা।

৫ম অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ২৮ :—فى اسماء الدساتين

অর্থাৎ নকাশি করা কাজ সম্বন্ধে আলোচনা।

৬ষ্ঠ অধ্যায়—পত্রাঙ্ক ৩১ :—فى الا يقاع

অর্থাৎ তরঙ্গ প্রবাহ সম্বন্ধে আলোচনা।

১৫, ১৬, ও ১৭ নম্বর পাণ্ডুলিপিগুলি Ethe's Ms Catalogue of Arabic Manuscripts-এ সন্নিবেশিত আছে।

বিড়ম্বনা

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

বন্দে আলী মিয়া

অধ্যায় সাত

মনসুর রাস্তায় পা দিয়াই বুঝিল এইখানে তাহার একটা গোপন মাণিক সে যেন লুকাইয়া রাখিয়া গেল, সারা কলিকাতা শহরের মধ্যে এই স্থানটাই তাহার অতি বড়ো আপনার—অতি বড়ো সত্যকার। ইহার আকর্ষণ যেন তাহাকে জন্ম জন্ম টানিতেছে; নিষ্কৃতি তাহার কিছুতেই নাই—সে তাহা আকাঙ্ক্ষাও করে না। সে রঙিণ কল্পনার ছবি আঁকিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মতো অসম তালে পা ফেলিয়া চলিতে লাগিল। দুপুর বেলার মনসুরের সহিত এই সন্ধ্যা বেলার মনসুরের যেন কোনো সম্পর্ক নাই, তখনকার মানুষকে এখন যেন সহসা চিনিতেই পারা যায় না। যৌবনের চাঞ্চল্য উদ্যম উৎসাহ শক্তি এবং প্রেরণার সহিত অকাল-বার্দ্ধক্যের মৌন বিসদৃশ গাম্ভীর্য্য, জ্ঞান-সঞ্চয়ের প্রাণপণ দুশ্চেষ্টা একদম বদল হইয়া গিয়াছে। করুণাকে কলঙ্কিনী সাজাইয়া তাহার চরিত্রে দোষারোপ করিয়া সে ভিতরে ভিতরে ব্যথিত এবং ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল এবং মনে করিয়াছিল সুযোগ মতো তাহার মুখের উপরে তীক্ষ্ণ কথার শায়ক হানিয়া লজ্জিত, অনুতপ্ত এবং অপমানিত করিয়া, তাহাকে নিজের স্বরূপ বুঝাইয়া দিবে এবং আর কোনো দিন একটি কথা পর্য্যন্ত কহিবে না। সেই করুণাই তাহাকে যখন নিজের অক্ষত চরিত্রের চরম সাক্ষ্য দিয়া পরোক্ষভাবে তাহাকে আঘাত করিল, তখন সে আনন্দিতও হইল, অপমানও বোধ করিল। তাহার চরিত্রের নির্ম্মলতা এবং তাহার উপর প্রগাঢ় নির্ভরতা ও ভালোবাসা দেখিয়া সে আনন্দিত হইল এবং সেই সঙ্গে তাহার সন্দিগ্ধ মনের মিথ্যা অনুমান তাহাকে অপমানিত করিয়া তুলিল।

মন গুমরাইয়া থাকিয়া দুইজনে ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হওয়ার চেয়ে একটা কিছু কলহের আকারে বাহির হইয়া গেলে, সেও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে, অন্যকেও নিষ্কৃতি দেওয়ার আনন্দ কম নহে। করুণা কয়দিন হইতে ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল, মনসুর চলিয়া গেলে সে অন্যমনস্ক ভাবে আগাগোড়া ব্যাপারটার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া যাইতে লাগিল। কোথায় কোন্ কথায় সে ব্যথা অনুভব করিয়াছিল, কিসে তাহার মুখ বিবর্ণ দেখাইয়াছিল—কেমন করিয়া কঠিন মুখে তীক্ষ্ণ কথায় সে বিঁধিতে আরম্ভ করিল, সেই সব ছবিগুলি উজ্জ্বল হইয়া তাহাকে উন্মনা করিয়া তুলিল। মনসুর যে তাহাকে সত্য সত্যই ভালোবাসিয়াছে, সেই কথাটাই সে আজ একটি মাত্র বক্র-ইঙ্গিতে জানাইয়া দিয়া গেল। এমন অনাড়ম্বর স্পষ্ট সঙ্কেত ইতিপূর্ব্বে তো সে জানিতে পারে নাই, আজ আঘাত পাইয়া সচেতন হইতেই তাহার বুক আনন্দে-গর্ব্বে ভরিয়া উঠিল। সেই অবধি মনে হইতে লাগিল, সে রিক্ত নহে, ব্যর্থতার তিক্ততায় তাহার সাধনা, তাহার কামনা ভরিয়া উঠে নাই।

পরদিন দুপুরে করুণা ফিমেল ওয়ার্ডের দিকে চাহিয়াছিল, মনসুর সুমুখের একটা ঘর হইতে বাহির হইতেই তাহার সামনে পড়িয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল। করুণার একখানি হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল, "ডিউটিতে চল্লে নাকি?"

করুণা চারিদিকে চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া হাসিমুখে জবাব দিল, "হ্যাঁ, ডিউটি তো ছিলো, তুমি কি ক্লাশে যাচ্চো?

মনসুর অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিল। বলিল, উঁহু, বাসায় যাচ্ছি, বৈকালে দেখা করো।"

করুণা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "তা কোর্‌ব নিশ্চয়, হ্যাঁ-ভ্যাখো, তুমি যদি আমার ওখানে আসো তবে সুবিধে হয়, চারটে পনেরো মিনিট, না, ঠিক পাঁচটায় যেয়ো।"

বন্য হরিণীর মতো একপাল চঞ্চল তরুণী ছুটাছুটির সহিত হাস্যকলরব করিতে করিতে অনতিদূরে তাহাদের পিছনদিকে বারাণ্ডায় আসিয়া পড়িল। করুণা চক্ষের পলকে হাত ছাড়াইয়া লইয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সহাধ্যায়িনী দু'-একটা মেয়ের চোককে সে একেবারে ফাঁকি দিতে পারিল না। তাহারাও ডিউটিতে চলিয়াছিল। পাশ দিয়া যাইতে যাইতে করুণার আঁচল ধরিয়া অনীতা ডাক দিল, চ, যাবিনে?

করুণা আঁচল টানিয়া জবাব দিল, "যা আস্‌চি। মনসুরকে বলিল, আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকবো কিন্তু, এসো—ভুলোনা বুঝলে?"

মনসুর ঘাড় দোলাইয়া সম্মতি দিয়া সিঁড়ি বহিয়া নীচে নামিয়া বাসার দিকে চলিল।

এদিকে করুণাকে ফাঁকে পাইয়া মাধুরী প্রশ্ন করিল, "কে ভাই উনি?" জবাবের অপেক্ষা না করিয়া অনীতা বলিল, "চিন্‌লিনে, আমাদের ক্লাসেই তো পড়ে।" ভ্রু কোঁচ্‌কাইয়া প্রভা বলিল, "তা তো চিন্‌লুম। কুরু, তোর কে হয়, আত্মীয় বুঝি, না?"

করুণা ইহাদের প্রশ্নে বিব্রত হইয়া রাঙামুখে বলিল, "আমার যা তোমাদেরো তো তাই—Class fellow"—

অনীতা কথার মাঝখানে অসহিষ্ণু হইয়া বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার সঙ্গে তার একটু উর্দ্ধে মনে হয়, হাত ধরে ছিলো যে"—

মাধুরী বলিল, "দোষটা তার মধ্যে কি দেখতে পেলে শুনি? একটু বেশী রকম Friend-ship হলে ওসব অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না।"

প্রভা বলিল, "নাও বাপু, এই সমালোচনা ছাড়া অন্য কোনো কাজকর্ম্ম নেই নাকি!" প্রভা সকলের হইয়া ক্ষমা চাহিয়া করুণাকে বলিল, "কিছু মনে কোরো না ভাই লক্ষিটি, এম্‌নি জানতে চাইলুম যে তোমার কোনো আত্মীয় কিনা।" দুঃসহ লজ্জায় করুণা ভয়ঙ্কর রকমে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, কি জবাব দিবে—কি বলিয়া ইহাদের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবে ভাবিয়া পাইতেছিল না; প্রভার কথায় সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সদয় কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া করুণা কোনো গ্লানি-ক্ষোভ মনে রাখিতে পারিল না। হাসি কৌতুকের সহজ-সরল আনন্দে চক্ষের পলকে এই অপ্রীতিকর আলোচনার গুমট ভাবের কালো মেঘটা কাটিয়া যাইতেই সকলে পূর্ব্বের মতো আনন্দ-দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মনসুর দুহাতে সময়ের সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিয়া যখন করুণার বাসায় আসিয়া পৌঁছিল, তখন মাত্র সাড়ে চারিটা। সদর দরজা ভেজানো দেখিয়া মনসুর দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া অগত্যা কড়া ধরিয়া জোরে জোরে বার কয়েক ঝাঁকানি দিল।

করুণা দুই কবাটের মাঝখানে মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "ও তুমি, এসো এসো ভেতরে এসো, আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে কিন্তু Expect করছিলুম।"

করুণার পিছনে মনসুর উপরে উঠিতে উঠিতে বলিল, "হঠাৎ আমার এত সৌভাগ্যের কারণটা কি জানতে পারি? আমার আস্‌বার কথা তো পাঁচটায়, এখন তো মাত্তর সাড়ে চার।"

করুণা মুখ না ফিরাইয়া জবাব দিল, তা কি জানি, মন তো বিধি-নিষেধ, নিয়ম-অনিয়ম ভেবে কিছু চিন্তা করে না—যা ইচ্ছে করে, তাই ভেবে চলে।"

করুণা কলেজ হইতে ফিরিয়া সবে মাত্র হাত মুখ ধুইবার আয়োজন করিতেছিল; সেই সময়ে নীচে শব্দ পাইয়া তাড়াতাড়িতে হাতের সিক্ত স্থানগুলা মুছিতে পারে নাই, তোয়ালেখানা তখন অবধি কাঁধের উপরে ঝুলিতেছিল।

মনসুর দুষ্টামি করিয়া বলিল, "কি, গামছা নিয়ে অসময়ের অত্যাচারীকে বাঁধিতে গিয়েছিলে নাকি?"

করুণা কৌতুককণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল, "যা অনুমান

করো;—অন্য কেউ হ'লে, তার কপালে কি ছিল বলা যায় না। তুমি যে আগেই বাঁধা পড়ে গেছ, তাই নিষ্কৃতি পেলে;" বলিয়া ঠোঁট টিপিয়া হাসিয়া মনসুরের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিল।

করুণা একখানা চেয়ার মনসুরের দিকে আগাইয়া দিয়া বসিতে অনুরোধ জানাইয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। এক থালা মিষ্টান্ন আনিয়া টেবিলের উপরে রাখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে ষ্টোভ জ্বালাইয়া চায়ের পানি চড়াইয়া দিল। চেয়ারের উপরে একটুখানি ঝুঁকিয়া পড়িয়া কোমলকণ্ঠে বলিল, "খাওনা, বসে র'লে যে বড়ো।"

মনসুর ঘাড় ফিরাইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাসিল। জবাব না দিয়া ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল, কি জন্যে এক্সপেক্ট করছিলে, বল্‌বে না?

করুণা থালার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "খাও তো আগে—নাও জলদি—দেরী কোরো না।"

মনসুর প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "এমন অত্যাচার যদি নিত্যি করো, আর আস্‌বো না বলে রাখ্‌ছি।"

—"না এলে, আজকে তো খাও।" বলিয়া করুণা আরো একটুখানি ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার গালে আঙুল দিয়া টোকা মারিয়া হাসিল—বলিল "Old boy, কেবল আপত্তি।"

মনসুরের সর্ব্বদেহ শিহরিয়া উঠিল, অঙ্গে অঙ্গে আগুন ছুটিল। খোলা জানালার দিকে একবার চাতকদৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া—দুহাতে মুখখানি ধরিয়া রাঙা-তপ্ত ওষ্ঠে নিজের ওষ্ঠ স্পর্শ করাইল। করুণাও লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না, সারা মুখ রক্তবর্ণ করিয়া একটা ছোট্ট চুমো দিয়া চক্ষের পলকে সোজা লইয়া দাঁড়াইল। মনসুরের দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিতেই দুঃসহ লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া দ্রুতপদে ষ্টোভের কাছে সরিয়া যাইয়া তাহার দিকে মনোযোগ দিবার ভাণ করিয়া আপনাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইল।

মনসুরের দিকে চায়ের পেয়ালা সরাইয়া দিয়া করুণা নিজের জন্য আর এক কাপ ঢালিয়া লইল। স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার আনত মুখখানি নিরীক্ষণ করিয়া মিষ্টান্নের থালার উপরে তাহার ডান হাতটা টানিয়া আনিয়া বলিল, "সে আমি বুঝেছি, তুমি কিছুতেই খাবে না যদি আমি না বসি। নাও বোসো, এখন তো আর আপত্তি চলবে না।"

মনসুর তাহার হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া বিনা প্রতিবাদে একটির পর একটি মুখে পুরিয়া দিতে লাগিল।

খাইতে খাইতে মুখ তুলিয়া করুণা বলিল, "দাদা আজ অসুস্থ হয়ে বসায় পড়ে রয়েচেন, বোধ করি ঘুমুচ্ছেন, আজ আর তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার সুবিধে হবে না—চলো একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।"

বেড়ানোর নামে মনসুর ভয়ঙ্কর রকমে উৎসাহিত হইয়া সায় দিয়া বলিয়া উঠিল, "তা চলো না—কোথায় যাবে।"

করুণা বলিল, "কি জন্যে তোমাকে তাড়াতাড়ি চাচ্ছিলুম জানো, আজ ম্যাডানে একটা বেশ ভালো ফিল্ম আছে The Thief of Bagdad, দেখবে?"

মনসুর চিন্তিত মুখে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, "মন্দ নয়, তবে আজকের কাগজেই দেখেছি বোধ হয়, পিকচার প্যালেসে The Girl of my heart হচ্ছে, সেইটেই ভালো কারণ, You—the right girl of my hidden heart."

করুণা চোখ তুলিয়া লজ্জায় হাসিল বলিল, "যাও—অতো বাড়াবাড়ি ভালো নয়।"

করুণা বেশ-পরিবর্ত্তনের জন্য অন্য ঘরে চলিয়া গেলে মনসুর এবার অবসর পাইল। তাহার পকেটে অর্থের প্রাচুর্য্য না থাকায় আপনার দারিদ্র্যকে সহস্র প্রকারে মনে মনে অভিসম্পাত দিয়া সে চিন্তিত ম্লানমুখে প্রস্তর মূর্ত্তির মতো চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল যে, করুণার সহিত সে যাইবে কি না। কিন্তু যখন সে মনের উত্তেজনায় বুদ্ধিহীনের মতো কথা দিয়া ফেলিয়াছে, অস্বীকার করিয়া এখন উৎসাহ-আনন্দকে বাধা দিবে কোন্ মুখে। নিজে যে অসমর্থ, তাহার তো সক্ষম লোকের সহিত মেলামেশা করা সুধু যে এক হিসাবে অন্যায় এবং অপমানকর তাহা নহে—একটুখানি পাপেরও বটে। প্রিয়জনের আবদার যাহার কাছে অপূর্ণ থাকে, সে কোথায় যাইয়া শান্তি পাইবে। এখন যদি সে শরীর অসুখের অছিলা করে, তবে তাহার ছলনা যে ব্যর্থ হইবে এবং করুণা তাহার সম্বন্ধে কি একটা ভয়ঙ্কর অপ্রীতিকর ধারণা মনে স্থান

দিয়া তাহার জুয়াচুরির প্রতি কটাক্ষ হানিয়া হাসিবে এ যেন সে চোকের সম্মুখে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল। নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া পলায়নে পরিত্রাণের পথ আবিষ্কার করিলে, কাল ক্লাসে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া। অবশ্যম্ভাবী অপমানের দুঃসহ লজ্জা হইতে মুক্তি পাইতে মনসুর কি যে করিবে, তাহা কোনো প্রকারেই ভাবিয়া উঠিতে না পারিয়া আপনাকে নিতান্ত নিরুপায় অসহায় মনে করিয়া যখন বিব্রত হইয়া পড়িতেছিল—সেই সময়ে করুণা বাহিরে যাইবার উপযোগী বিশেষ সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া বারাণ্ডায় আসিয়া মৃদু কণ্ঠে ডাক দিল, "এসো।"

মনসুর চকিত হইয়া উদাস দৃষ্টিটা তাহার সারা অঙ্গের বেশভূষার উপরে ছাড়িয়া দিয়া খানিকক্ষণ বিস্মিত এবং নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া উঠিয়া একটা সিগারেটে আগুন ধরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া তাহার পিছু পিছু নীচে নামিয়া আসিল। করুণা বলিল, "এখন পাঁচটা দশ, ছ'টায় আরম্ভ—কিসে যাই বলো তো?"

মনসুর ভাসা ভাসা স্বরে জবাব দিল, "যাতে খুসি।"

করুণা এতক্ষণ নিজের আনন্দেই মশ্‌গুল ছিল, মনসুরের সুখ-দুঃখের দিকে পলকমাত্রও চাহিয়া দেখে নাই। মনসুরের নির্ব্বিকার প্রত্যুত্তর শুনিয়া তাহার বিবর্ণ, পাংশু মুখের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া সে প্রকৃত ব্যাপারটা সহজেই অনুমান করিয়া লইয়া অন্তরে দুঃসহ ব্যথা অনুভব করিল। কিন্তু বাহিরে সেই দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া মনসুরকে আরো খানিকটা অক্ষমতার ব্যথা হানিবার মতো দুরভিসন্ধি তাহার ছিল না। তাই প্রফুল্লতার ভান করিয়া অধিক জোরে হাসিতে এবং গল্প করিতে শুরু করিল। সুমুখ দিয়া একখানা সেকেণ্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়ী চাইতে করুণা ডাকিয়া ম্যাডেনে চালাইবার হুকুম দিয়া দুইজনে পাশাপাশি বসিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া করুণা যখন নিজের মনিব্যাগ খুলিয়া ভাড়া দিয়া গাড়োয়ানকে বিদায় করিল—তখন দীনতার গ্লানি মনসুরের মুখে সপাং করিয়া একঘা চাবুক বসাইয়া দিল।......

......জন্মের-শেষ প্রিয় বেহালাটি একবার সস্নেহদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া বুকের উপরে তুলিয়া 'ছড়্' চালাইতে চালাইতে একটি যুবক আপনার মনে একাকীই মুগ্ধ হইয়া গেল। বাহিরে তখন ঝড় বৃষ্টির তাণ্ডবলীলা শুরু হইয়া গিয়াছে। খৃষ্টের জন্মদিনে বেড়াইতে বাহির হইয়া একটি কিশোরী পথ হারাইয়া তখন সেই উদ্দাম ঝঞ্ঝার প্রবল বারিধারায় একান্ত বিব্রত হইয়া আশ্রয়ের সন্ধান করিয়া মরিতেছিল। সে অবশেষে দিগ্-বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া যুবকটি যে ঘরের মধ্যে একমনে বেহালা বাজাইতেছিল, তাহার বারাণ্ডায় আসিয়া ভেজানো দরজা দিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি দিল কিন্তু প্রবেশ করিতে সাহস পাইল না। যুবকটি শেষ বারের মতো বেহালাটি সযত্নে নামাইয়া রাখিয়া একটা গুলীভরা রিভলভার তুলিয়া লইয়া একটু পরীক্ষা করিল, খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া যখন আপনার বুক লক্ষ্যে গুলী ছুড়িতে যাইবে, অমনি কিশোরীটি ব্যাকুল আগ্রহে ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিল......

করুণা এবং মনসুর পাশাপাশি বসিয়াছিল, সম্মুখে ছায়াচিত্রে আর এক দেশের আর দুই তৃষিত-আত্মার কাহিনী রূপের পর রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। করুণা সেই সময়ে মনসুরের কানে কানে বলিল, "তোমাকে তো আমি উদ্ধার করিনি কোনো দিন।"

মনসুর বলিল, "সে আমি জানি। আমি প্রাণ থাকতেও চিরকাল কোণঘেঁসা এবং সেই সঙ্গে শুক্‌নো ডাক্তারি পড়ে আরো নির্জ্জীব আরো নিশ্চল হয়ে পড়্‌বার যোগাড় হয়েছিলুম। তুমি-ই তো আমাকে সেখান থেকে হাত ধরে উদ্ধার করে এনেচো।"

......কিশোরীটির মাথার উপর দিয়া পর্ব্বত প্রমাণ বিপদের তরঙ্গ চলিয়া যাইতে লাগিল, যুবকটির দুরবস্থারও অবধি রহিল না, তবু তাহারা তাহার মধ্যে স্থির হইয়া ভগবানকে স্মরণ করিয়া পরস্পরের প্রতি মিলনেচ্ছায় ব্যাকুল।...তারপর কত বাধা-বিপত্তির ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে তাহারা সেই মিলনের শুভ দিনটি পাইয়া উভয়ে উভয়কে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অজস্র চুম্বনের সুধায় মাতিয়া উঠিল; তখন করুণা অজ্ঞাতে মনসুরের কাঁধের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া নিজেকে সম্বরণ করিতে লাগিল।

ফিরিবার সময় নীরবে গাড়ীতে চলিতে ভালো লাগিতে-ছিল না, তাই মনসুর করুণাকে সচকিত করিয়া বলিল,

"ত্মাখো কোনো কিছু অবিশ্রান্ত শুধু চলেই যেতে পারে না, এই তো দেখ্‌লে এরা দুজনে কত কি বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে শেষে এসে মিলিত হলো। তাই প্রত্যেক কাজেরই একটা কোথাও শেষ আছে। কিন্তু আমি তো ভেবে পাইনে আমাদের এই ভালোবাসার সমাপ্তি কোন্‌খানে।"

করুণা সহসা ইহার জবাব দিতে না পারিয়া অন্ধকারে তাহার মুখের দিকে চাহিল। চিন্তিত মুখে বলিল, "আমিও সময়ে সময়ে ঐ কথাই ভাবি, কিন্তু কোনো কুল-কিনারা পাইনে।"

মনসুরের মগজের ভিতরে করুণার কথাগুলি বোধ করি ধ্বনিত হইতে লাগিল সে জন্য উত্তর দিতে পারিল না। বহুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলিল, "বিধির কী লীলা, তুমি কোথাকার কে—আমিই বা কে—ক্লাসে অমন কত ষ্টুডেণ্ট তো রয়েচে, কারো দিকেই তো চাইতে ইচ্ছা করেনি—এখনো করে না আমার নিখিল বিশ্ব ব্যেপে কেবল তুমি—যে দিকেই চাই তোমাকেই দেখি। বই নিয়ে পড়তে বসেচি—খানিক পরে দেখি পড়াশুনা কোন্ চুলোয় গেছে—তোমার কথাই শুধু ভেবে চলেচি। লিখ্‌তে লিখ্‌তে তোমার কথা মনে পড়েচে—নিজের অজ্ঞাতে কখন যে থেমে গেচি মনে থাকে না, বড়ো দুষ্টু তুমি।" বলিয়া মনসুর সোহাগে-আদরে করুণার গাল দুইটি টিপিয়া দিল।

করুণা আনন্দে গলিয়া গেল। বলিল, "বারে মজা; আমার মনের কথাগুলো চমৎকার করে তুমিই যে বলে গেলে। ত্মাখো, ক'মাস আগে কেউ কাউকে ভালো করে চিন্‌তুমও না, জান্‌তুমও না, আজ কিন্তু একটা মিনিট ছেড়ে থাকতে ইচ্ছা করে না।"

মনসুর সিগারেটে একটা টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া ঘাড় দোলাইয়া জবাব দিল, "সত্যি করুণা, একটা মিনিট যেন যুগ প্রমাণ বোধ হয়।...আচ্ছা, আমাদের এই অনন্ত ভালোবাসা সীমাহারা প্রেম কী কেবল ব্যর্থ হবার জন্যেই হয়েছিল, এর কি পরিণতির সন্ধান একান্তই অসম্ভব?"

করুণা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া প্রত্যুত্তর করিল, "অসম্ভব হয় তো না-ও হতে পারে —"

মনসুর তাহার মুখের কথা লুফিয়া লইয়া বলিল, "তাহলে হতে পারে কেমন করে শুনি?" বলিয়া অন্ধকারে করুণার মুখের পানে ব্যাকুল আগ্রহে দৃষ্টিপাত করিল।

করুণা কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না, ধীরকণ্ঠে বলিল, একমাত্র উপায় আছে সেটা বিয়ের বাঁধন। তা ছাড়া তো দ্বিতীয় পথ চোকে পড়ে না।

প্রত্যুত্তর না দিয়া মনসুর অনেকটা পথ নীরবে অতি-বাহিত করিল। একটা সিগারেট বাহির করিয়া আগুন ধরাইল। বলিল, "সে তোমার যা খুসি তাই করো, আমার উপদেশ কি বাধা দেবার কিছু নেই। সত্যি বলিতে কি, নিজের বুদ্ধি-সুদ্ধির উপরে আমি একেবারে আস্থাহীন। আমার নিজেকে এত অসহায় শিশুর মতো বোধ হয় যে, সে তুমি শুন্‌লে হেসে উঠ্‌বে।" বলিয়া মনসুর আপনিই আপন মনে খানিকটা হাসিয়া লইল।

এমন সময় কোচম্যান উপর হইতে হাঁকিল, "কোন্ বাসা?"

করুণা গাড়ীর দরজা দিয়া মুখ বাহির করিয়া বলিল, "ওই সামনে হলদে রঙের দোতালা দেখচো, ওর পাশেরটাই ... ...।

মনসুর দরজার সুমুখে গাড়ী হইতে নামিয়াই প্রবল আপত্তি তুলিল, "না করু, এত রাতে আর না-ই বা গেলুম, কাল দেখা হবে।"

করুণা অনুযোগ করিয়া বলিল, "সেটী হচ্চে না, এক কাপ চা ছাড়া অন্য কিছু বলি তো হাঁ; দাঁড়িয়ে থেকোনা বাপু।"

দুইজনে নিঃশব্দে উপরে উঠিতেই সহসা করুণা এক কোণে মনসুকে ডাকিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিল, "যাও, দাদার সঙ্গে দেখা করে এসো—তাঁর অসুখ করেচে কিনা, যাও।"

মনসুর বলিল, "আমিও খানিক আগে ঐ কথাই ভাবছিলুম—না খোঁজ নিয়ে যাওয়াটা ভয়ঙ্কর অন্যায় হবে।"

করুণার পিছনে পিছনে মনসুর বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। করুণা আলোকোজ্জ্বল ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দেখিল, দেবেন্দ্র চুপ করিয়া শুইয়া আছে। তাড়াতাড়ি তাহার মাথায় গায়ে হাত দিয়া উত্তাপ অনুভব করিয়া বলিল, "জ্বর আর আসেনি বুঝি দাদা?"

দেবেন গম্ভীর মুখে নীরব হইয়া রহিল—কথা কহিল না।

করুণা মনসুরকে ডাকিয়া বলিল, "আসুন ঘরের ভেতরে আসুন, দাদা, উনি তোমার অসুখের কথা শুনে

অবধি ভয়ঙ্কর রকম ব্যস্ত নিজেও হয়েছেন—আমাকেও করেচেন, কি অসুখ—কেমন—কখন হয়েচে—এই যে দাদা জেগেই আছেন।

মনসুর কুণ্ঠিত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া আদাব দিল। দু' একটা প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া নতমুখে আড়ষ্ট ভঙ্গীতে বসিয়া রহিল।

চা পানান্তর বিদায় দিবার বেলায় করুণা বলিল, "একটা অনুরোধ রাখবে তো ?"

মনসুর ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, "কি ?"

—চাট্টি খেয়ে যাও।

মনসুর হাসিল। বলিল, "আমাকে খাইয়ে নিজে ওপষ করবে তো ?"

করুণা চোখে মুখে অদ্ভুত ভঙ্গী আনিয়া জবাব দিল, "ইস্. তা আর হয় না। দেখবে—চলো ভাতের হাঁড়ি দেখিয়ে দিই।"

—না তেমন আগ্রহ নেই। অনর্থক আর মেসের ভাতগুলো নষ্ট করে কি হবে; আচ্ছা আসি তা হলে, গুড নাইট।" বলিয়া পথে আসিয়া পড়িল।

করুণা কোনোরূপে উচ্চারণ করিল, Au revior ...।

সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া করুণা শুইতে যাইবার পূর্ব্বে দেবেনকে একবার দেখিতে আসিল। দু'একটা কথাবার্ত্তার পরে ঘরে যাইবার জন্য দাঁড়াইয়া উঠিলে দেবেন গম্ভীর মুখে বলিলেন, কুরু, বোস্ কথা আছে।

করুণা বসিল। দেবেন খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই কাজের কথা পাড়িল। বলিল, "আমি ওসব পছন্দ করিনে কুরু, ক্লাস ফ্রেণ্ড—ব্যস্ ঐ পর্য্যন্তই—পড়াশুনা করবে, কলেজ যাবে বাড়ী আসবে—পুরুষ ছেলেদের সঙ্গে আলাপ কেন, আর যদি একটু-আধটু কথাবার্ত্তা হয়—কলেজেই তার সঙ্গে সম্পর্ক, বাসা পর্য্যন্তই বা টানা কেন, আর তার সঙ্গে বাইরে বাইরে এত রাত পর্য্যন্তই বা থাকা কেন, তোমাকে এ সম্বন্ধে যেন আর বলতে না হয়—নিজের তো বুদ্ধি-সুদ্ধি হয়েচে।"

করুণা কথা শুনিয়া বিস্মিত এবং বজ্রস্তম্ভিত হইয়া গেল। ইহা সে আশা করে নাই। কঠোর হইয়া বলিল, "বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছু হয়েচে বলে নিজের উপরে আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে দাদা। আমাকে তুমি দুর্ব্বল মনে কোরো না, রাত্তিরে তার সঙ্গে কোনো খারাপ জায়গায় যাইনি, সে আমার বন্ধু। তাকে বাড়ীতে এনে অন্যায় যে কি কর্লু'ম তাও তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।"

করুণার নির্ভীক উত্তরে দেবেন মনে মনে থতমত খাইয়া গেল। মুহূর্ত্তে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া আরো ভারী গলায় বলিল, "কুরু, উত্তেজিত হোসনে—ভাখ্ তোর নিজের মতো সরল, উদার—সকলেই নয়। বন্ধুত্ব করবি, তা কলেজে মেয়ের তো আর অভাব নেই, পুরুষের সঙ্গটাই বা এত মধুর কেন শুনি ?

করুণা দুঃসহ ক্রোধে সারামুখ রক্তবর্ণ করিয়া অগ্নি-চোখের বিষ-দৃষ্টি দেবেনের মুখের উপরে তুলিয়া ধরিল। বলিল, "দাদা, অতো নীচ হলে কবে থেকে, অমন ইতরের ভাষা তুমি উচ্চারণ করতে পারো, সে আমার জানা ছিল না ছি-ছি! তুমি দাদা, আমি বোন, যে অপমানটা তুমি করলে......" বলিয়া ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্ষোভে করুণা কাঁদিয়া ফেলিল। চোক মুছিয়া বলিল, "তোমাদের সমাজের ছেলে-বুড়োর সঙ্গে মিশলে তো কিছু বলে না — ।"

দেবেন নিজের অপরাধ বুঝিয়া অনেকখানি নরম হইয়া আসিয়াছিল। গলা নামাইয়া বলিল, "সেই তো বলি, মিশবে, বন্ধুত্ব করবে—নিজেদের এত বড় সমাজ রয়েচে—কেউ বাধা দেবার নেই। ভিন্ন সমাজের যার তার সঙ্গে কি রকম—লোকেই বা কি বলে—দেখতেও বিশ্রী।"

করুণা মুখ বিকৃত করিয়া কান্নার সুরে বলিল, "থামো তুমি—সুশ্রী বিশ্রী কাকে বলে সে জ্ঞান তোমার হয় নি—যা ভুল তা পঞ্চাশ কোটি লোকে মিলে বল্লেও ভুল। তোমার এ ক্রীশ্চান সমাজের অনেকের সঙ্গেই তো আমার পরিচয় আছে, আলাপও হয়েছিল, কিন্তু সত্যি জেনো দাদা, তাদের একজনও যদি এঁর মতো হোতো তবে তোমরা সুদ্ধ ধন্য হয়ে যেতে। একজন নির্দ্দোষ নিরপরাধ ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে যা-তা উচ্চারণ করলে, যাকে বলা হয় তার কিছু হয় না ; কিন্তু যে বলে' তারই প্রকৃত পরিচয় পেতে দেরী হয় না।" বলিয়া প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা মাত্র না করিয়া করুণা ঝড়ের বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিছানার উপরে আসিয়া করুণা লুটাইয়া পড়িয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।......অগ্রজের এ কি কঠোর আদেশ—অন্যায় সন্দেহ। পৃথিবী যদি একদিক হইয়া তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, তবু তাহাকে সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না ইহা সুনিশ্চয়। সে আজ বাগদত্তা—স্বামীর নিন্দা, স্বামীর গ্লানি কিছুতে কাহারো মুখ দিয়াই সে সহ্য করিতে পারিবে না।

(ক্রমশঃ)
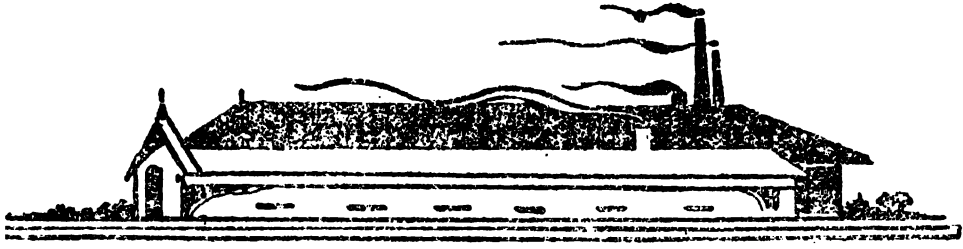
ইংলণ্ডের রাষ্ট্র-বিপ্লব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রিজাউল করিম বি, এ

২

তৃতীয় পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া চার্লস্ প্রায় একাদশ বৎসর প্রজার পরামর্শ না লইয়া চরম স্বেচ্ছাচারিতার সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তিনি একটিবারও পার্লামেণ্ট সভা আহ্বান করেন নাই। আপনার দায়িত্বে ও কুচক্রী লোকের সাহায্যে কঠোর ভাবে দেশ শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা কখনও ঘটে নাই। বাকিংহামের শোচনীয় মৃত্যুর পর, তিন জন লোক শনির মত রাজার সহায়ক হইয়া তাঁহার অত্যাচার সমর্থন করিতে লাগিলেন। রাজার নামে ইঁহারাই দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। এই তিন জন মহারথীর নাম ওসেণ্ট অর্থ, লাড, ওয়েষ্টেনো। পার্লামেণ্টকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জিত করিয়া চার্লস্ মনে করিলেন, এইবার নিষ্কণ্টক হইলাম। এইবার হইতে আমার কার্য্যে বাধা দিতে আর কেহ নাই। রাজপদ লাভ করিয়াই অর্থাভাব অনুভব করিয়াছিলেন, নানা গর্হিত উপায়ে ঐ অভাব দূরীকৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পার্লামেণ্ট প্রতি পদে পদে তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল। এক্ষণে পার্লামেণ্টকে বিদায় দিয়া তিনি মনে করিলেন, আর জুজুর ভয় নাই, এখন সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থাভাব পূর্ণ করিবেন।

এবার হইতে চার্লসের অত্যাচার সকল সীমা অতিক্রম করিয়া চরমে আসিয়া উপনীত হইল। কর্ত্তব্যবুদ্ধিবিবর্জ্জিত হইয়া প্রকাশ্যভাবে পিটিসন অব রাইট্স্ ভঙ্গ করিয়া রাজা কঠোর হস্তে দেশের অর্থ শোষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই উদগ্র মূর্ত্তি দেখিয়া দেশের সর্ব্বসাধারণ লোক আতঙ্কে বিচলিত হইয়া উঠিল।

দেশের নিয়মানুসারে প্রত্যেক বিত্তশালী ভদ্রলোককে 'নাইট' উপাধি গ্রহণ করিতে হইত। ইহাতে প্রচুর অর্থব্যয় হইত বলিয়া অনেকে উহা গ্রহণ করিতেন না। পূর্ব্বেও উক্ত আইনটি সম্বন্ধে বিশেষ কোন কড়াকড়ি ছিল না। কিন্তু ছিদ্রান্বেষী চার্লস্ অর্থ আদায়ের এমন সুন্দর ও সহজ উপায় অবহেলা করিতে পারিলেন না। যাহারা এতাবৎ 'নাইট' উপাধি গ্রহণ করে নাই, তাহাদিগকে উপাধি গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন এবং তাহাদের নিকট হইতে দণ্ডস্বরূপ প্রচুর অর্থ আদায় করিলেন। এই উপায়ে বহু অর্থ সংগৃহীত হইত। রাজকীয় অরণ্যসমূহেও রাজার দৃষ্টিপাত হইল, তাহা হইতে প্রচুর অর্থলাভ করিলেন এবং বহু জমিদারের জমিও খাস করিয়া লইলেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে চার্লস্ স্বপক্ষীয় লোক লইয়া একটি কমিশন গঠিত করিলেন এবং তাহার সিদ্ধান্ত অনুসারে বহু পতিত জমি অধিকার করিয়া লইলেন। যাহারা এতাবৎ রাজার বিরুদ্ধাচরণ করে নাই, এবার তাহারাও রাজার উপর ভয়ানক খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। কেহ নূতন ইমারত নির্ম্মাণ করিলে, অথবা পুরাতন ইমারত ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, তাহার নিকট অর্থদণ্ড আদায় করিতেন। কিছু কাল পূর্ব্বে ব্যক্তিবিশেষের একচেটিয়া ব্যবসায় রহিত হইয়াছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও চার্লস্ কতকগুলি ব্যবসায়ীর নিকট হইতে প্রভূত অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে ঐ সুবিধা প্রদান করিলেন। ইহাতে সকল প্রজাই ভয়ানক অসুবিধা ভোগ করিতে লাগিল। ক্রেতা ও ব্যবসায়ীগণ রাজার উপর ভয়ানক রাগান্বিত হইয়া উঠিল। অনেক ব্যবসাদার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ভয়ে ব্যবসায় উঠাইয়া দিল।

নানাবিধ গর্হিত উপায়ে অর্থ আদায় করিয়াও সর্ব্বগ্রাসী রাজার অনটন ঘুচিল না। প্রজাপক্ষের বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া বে-আইনিভাবে কর আদায় করিতে করিতে তাঁহার সাহস বাড়িয়া উঠিয়াছিল। বিগত কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়া তাঁহার এই অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল যে, কঠোর হস্তে কর আদায় করিলে প্রজার কোন আপত্তি টিকে না। প্রজাদের একটু ভ্রূকুটি দেখাইলেই তাহারা রাজার বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারিবে না। এই ভ্রম-বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কর আদায়ের জন্য একটি নূতন ফন্দী আবিষ্কার করিলেন—তাহা আর কিছু নহে সিপমনী বা নৌ-কর।

বহুপূর্ব্বে রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ডের উপকূল প্রদেশ-রক্ষার জন্য সমুদ্রতীরবর্ত্তী অধিবাসিগণের উপর নৌ-কর নামক একপ্রকার অস্থায়ী কর স্থাপিত হইয়াছিল। তৎপরে বহুদিন ঐ কর আদায় না হওয়ায় লোকে উহার বিষয় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। রাজা চার্ল্‌স্ বহু গবেষণা দ্বারা ঐ কর ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র সর্ব্বসাধারণ লোকের উপর পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুর্ম্মনা কুপরামর্শদাতাদিগের কুপরামর্শে তিনি দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া হঠাৎ ঐ শিপমনী প্রত্যেক লোকের উপর প্রবর্ত্তিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। দেশের লোকের মস্তকে যেন হঠাৎ বজ্রাঘাত হইল। তাহারা রাজার ব্যবহারে চঞ্চল ও অধীর হইয়া পড়িল। প্রত্যেক প্রজা স্থির করিয়া লইল যে, আমরা কিছুতেই ঐ কর দিব না—যত বিপদপাত হয়, সব নীরবে সহ্য করিব কিন্তু রাজাকে শিপমনী দিব না। অপরাপর ব্যক্তির মত জন হাম্পডেন নামক একজন তেজস্বী ব্যক্তি, অন্যায় ও অসঙ্গত বলিয়া ঐ কর দিতে অস্বীকার করিলেন এবং তুমুল আন্দোলন তুলিয়া ঐ করের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া হাম্পডেনকে গ্রেফ্‌তার করিয়া বিচারার্থ দ্বাদশজন জজের নিকট তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন। ঐ জজগণ রাজারই অনুগৃহীত জীব সুতরাং বিচারে হাম্পডেন দোষী সাব্যস্ত হইলেন ও সঙ্গে সঙ্গে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। হাম্পডেনের সাহস ও তেজস্বিতা দেখিয়া সমগ্র ইংলণ্ড তাঁহার জয়ধ্বনি করিয়া আকাশ-ভুবন কাঁপাইয়া তুলিল।

এইরূপে চতুর্দ্দিকে অত্যাচার লুণ্ঠন ও শোষণের বিভীষিকা বিস্তার করিয়া চার্ল্‌স কয়েক বৎসর পূর্ণ-প্রতাপে রাজত্ব করিলেন। কিন্তু এত অত্যাচারে অর্থ আদায় করিয়াও তাঁহার লালসা চরিতার্থ হইল না, বরং আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৬৪০ খৃঃ তিনি সর্ব্বশেষে পার্লামেণ্ট আহ্বান করিলেন, ইতিহাসে ইহাই লং পার্লামেণ্ট বলিয়া পরিচিত। পিম্ ও হ্যাম্পডেন এই পার্লামেণ্টের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ওয়েণ্ট ওয়ার্থ ও চার্লসের কার্য্যের নানারূপ প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। ওয়েণ্ট ওয়ার্থ দেশবাসীর অস্থি চুষিয়া খাইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার নামে নিন্দা প্রচার হইবা মাত্র দেশের অধিবাসীবৃন্দ তাঁহার বিরুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, তাঁহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য সকলেই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। ওয়েণ্ট ওয়ার্থ অযথা নর-হত্যায় দেশ কলুষিত করিয়াছেন, ইংলণ্ডবাসীর স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা করিয়াছেন, এইরূপ নানা অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত হইল। পার্লামেণ্টের সভাগণ তাঁহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা দিলেন এবং অবিলম্বে ঐ মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া রাজাকে তাহা স্বাক্ষর করিতে বলিলেন। রাজা ঐ প্রস্তাব দেখিয়া প্রথমতঃ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, কিছুতেই উহা স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু সদস্যগণের নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া এবং উহা স্বাক্ষর না করিলে তাঁহাকে কিছুতেই অর্থ দিবে না, এই আশঙ্কায় পরিশেষে তাঁহাকে উহাতে স্বাক্ষর করিতে হইল। রাজার স্বাক্ষর করার সঙ্গে সঙ্গে ১৬৪১ খৃঃ ওয়েণ্ট ওয়ার্থের মস্তকচ্ছেদ হইল। ইহার কিছুদিন পরে লাডকে সেই পন্থা অনুসরণ করিতে হইল। এইরূপে দুইজন অন্তরঙ্গ বন্ধু স্থানীয় লোকের অন্তর্দ্ধানে রাজা ভয়ানক মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন, তিনি এখন একা, সঙ্গী-হীন। সহস্র সহস্র বিদ্রোহোন্মুখ প্রজার মধ্যে ঐ দুইজন প্রিয়বন্ধু তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য করিয়া তাঁহার রাজ-ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের অকাল-পতনে চার্ল্‌স্ হতাশ হইয়া পড়িলেন। যাহারা তাঁহার শত্রু, তিনি তাহাদের কোনই শাস্তি বিধান করিতে পারিলেন না, অথচ শত্রুগণ তাঁহার দুইজন অতি প্রিয় পাত্রকে হনন করিল—ইহাতে তিনি আরও মর্ম্ম-পীড়া অনুভব করিতে লাগিলেন।

এই সময় পার্লামেন্টের সভ্যগণ দেখিলেন যে, রাজা এখন চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা রাজাকে দোষ সংশোধন করিয়া লইবার জন্য বাধ্য করিতে লাগিল। তিনি যে সব বেআইনি কার্য্য করিয়াছিলেন, পুনরপি তাহার অভিনয় করিব না বলিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন। রাজা এখন অর্থহীন, সঙ্গীহীন ও অসহায়, সেই জন্য বাধ্য হইয়া প্রজার কথায় সায় দিলেন বটে কিন্তু প্রজাদের এবম্প্রকার ঔদ্ধত্যের প্রতিশোধ লইবার জন্য মনে মনে জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলেন। এমন কি প্রজাকে শায়েস্তা করিবার জন্য তিনি গোপনে গোপনে সৈন্যদল গঠন করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রজাদের প্রতিনিধিবর্গ ও নীরবে বসিয়া থাকিলেন না, তাঁহারাও ভিতরে ভিতরে দল পাকাইয়া রাজার উদ্যমকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

১৬৪২ খৃঃ মধ্যে দেখা গেল যে, দেশের মধ্যে রীতিমত দুইটি বিরোধী ভাবাপন্ন শক্তিশালী দল পাকিয়া উঠিয়াছে। সাধারণ লোকের এক তৃতীয়াংশ এবং লর্ড পরিবারের অধিকাংশ ব্যক্তি রাজার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ইঁহারা রয়ালিষ্ট বা ক্যাভেলিয়ার্স নামে পরিচিত। এতদ্ব্যতীত দেশের অবশিষ্ট লোক পার্লামেন্টের পক্ষ অবলম্বন করিলেন, ইঁহারা "রাউণ্ডহেড" বা মুণ্ডিতমুণ্ড নামে অভিহিত।

বহুদিনের সঞ্চিত চিতা হইতে এতদিন যে ধূম্র উদ্গীরণ হইতেছিল, এক্ষণে রাজার হঠকারিতা ও ঔদ্ধত্যের কারণে তাহা দাউ দাউ করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। রাজা ও প্রজার মধ্যে যুদ্ধ ভীষণাকারে আত্ম-প্রকাশ করিল। রাজপক্ষীয় সৈন্যগণ অতি সুশিক্ষিত ও রণদক্ষ। কিন্তু প্রজাপক্ষের সৈন্যগণ যুদ্ধবিদ্যা একেবারেই জানিত না। ইতঃপূর্ব্বে তাহাদের অধিকাংশ লোক কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে পদার্পণ করে নাই। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাহারা কৃষি ছাড়িয়া, ব্যবসায় ছাড়িয়া, সংসারের কার্য্যাদি ছাড়িয়া অস্ত্র ধারণ করিয়াছে; সুতরাং প্রথম প্রথম তাহাদের পরাজয় হইতে লাগিল। প্রজাপক্ষের সৈন্যগণের, যুদ্ধোপযোগী অন্য কোন উপাদান যথেষ্টরূপে না থাকিলেও ঐকান্তিকতা ও প্রাণের উৎসাহে তাহাদের হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। সেইজন্য বহু পরাজয়ের পর অবশেষে তাহারা রাজাকে পরাস্ত করিয়াছিল। রাজা পরাজিত হইয়া ওয়েল্সে পলায়ন পূর্ব্বক পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, কিন্তু হায় পুনরায় যুদ্ধ করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে ৩০শে জানুয়ারী পার্লামেন্টের ঘোষিত ৪ লক্ষ পাউণ্ডের পুরস্কারের লোভে কতকগুলি স্কচসৈন্য তাঁহাকে ধরিয়া পার্লামেন্টের হস্তে অর্পণ করিল। ইংলণ্ডের অসীম প্রতাপশালী অধীশ্বর আত্ম-দোষে আজ বন্দী অবস্থায় প্রজার করে সমর্পিত হইলেন। ইতিমধ্যে যে সময় ক্রমওয়েল, প্রেষ্টনে স্কচসৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন সেই সময় চার্লস গোপনে পলাইয়া গিয়া স্কচদিগের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহার এই পলায়ন ব্যাপারে সমগ্র ইংরাজ-জাতি তাঁহার বিরুদ্ধে এতই উত্তেজিত হইয়া উঠিল যে, সকলেই তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে চাহিল। যাহা হউক তিনি অবিলম্বে ধৃত হইয়া পুনরায় প্রজাদের করে সমর্পিত হইলেন। রাজার নিষ্ঠুরতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও শঠতায় এতদিন যাহারা ঘোর মর্ম্মপীড়া অনুভব করিয়া আসিতেছিল, তাহারা এক্ষণে তাঁহার প্রাণহননের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

যে মহারথীর আপ্রাণ চেষ্টায় ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রের অবসান হইয়া তথায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল তাঁহার নাম ওলিভার ক্রমওয়েল। ক্রমওয়েল একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, তিনি মানবের স্বাধীনতার অগ্রগামী পুরোহিত। রোম গ্রীসের পতনের পর বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত মানুষ পরাধীনতা ও স্বৈরশাসনের প্রবল পীড়নে অত্যাচার ভোগ করিয়া আসিতেছিল। পরস্বাপহারী অত্যাচারী রাজন্যবর্গ সাধারণ প্রজাবর্গের সুখ-সুবিধার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বেচ্ছায় রাজ্যশাসন করিতেন। এইরূপ অধীনতা, পরবশতা ও বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকিয়া মানুষের আত্ম-মর্য্যাদা অতি শোচনীয় ভাবে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। স্বাধীনতার এইরূপ অবসাদের সময় মহাপ্রাণ ক্রমওয়েল ধরাবক্ষে অবতীর্ণ হইয়া সিংহনাদে মানুষের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করিয়া ইংলণ্ডে মহাবিপ্লব আনয়ন করিলেন।

রাজা চার্লসের স্বেচ্ছাচারিতা দেখিয়া তিনি প্রথমাবধি উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছিলেন। রাজার কয়েকটি কার্য্যের প্রতিবন্ধক হওয়ায় তিনি সাধারণ লোকের বিশ্বাসভাজন হয়েন। অতঃপর রাজার সহিত প্রজাবর্গের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইলে তিনি প্রজার পক্ষ

অবলম্বন করিয়া যুদ্ধায়োজন করিতে লাগিলেন। ক্রমওয়েল দেখিলেন রাজা সুশিক্ষিত সৈন্য ও অফুরন্ত রণসম্ভার লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন—আর প্রজাপক্ষের সৈন্যেরা একেবারেই অশিক্ষিত—তাহারা কোনরূপ যুদ্ধকৌশল জানে না, এবং যুদ্ধোপযোগী কোন রণসম্ভার তাহাদের নাই। এই অশিক্ষিত অপটু ও গৃহস্থিত নিভৃত কন্দর হইতে সদ্য আনীত জনসাধারণকে লইয়া উপযুক্ত সৈন্যদল গঠন করিবার জন্য তিনি প্রাণমন ঢালিয়া দিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন—আমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিব না, যিনি যে মতাবলম্বী হউন না কেন, তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিবেন—জনসাধারণের ন্যায্য অধিকার লাভের জন্য যুদ্ধ করিবেন—ইহার জন্য কাহারও ধর্ম্মকর্ম্মে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইবে না। তাঁহার এই উদার ঘোষণা বাণীতে লোকে দলে দলে তাঁহার পতাকার তলে আসিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। ক্রমওয়েল এইরূপ অসংবদ্ধ ও অশিক্ষিত জনসাধারণকে লইয়া এমন এক বিরাট বাহিনী গঠন করিলেন, যাহার বীরনাদে সমগ্র ইউরোপ কাঁপিয়া উঠিল !!

চার্লস্ নানারূপ গর্হিত উপায়ে কর প্রবর্ত্তন করিয়া যদি ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার শেষ জীবন লাঞ্ছনায় পরিসমাপ্ত হইত না। কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার সুমতি হইল না। তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ কয়েকটি উদ্ভট ধারণা তাঁহার মনে এমনভাবে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে তিনি যেমন কাহারও মতামত গ্রহণ করিতেন না, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন, ধর্ম্ম ব্যাপারেও তিনি তাহাই করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি নিজেই "চার্চ্চ অব ইংলণ্ড" অনুসারে চলিতেন এবং অপর মতাবলম্বীগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে পিউরিটান ও রোমান ক্যাথলিকগণ তাঁহার উপর ভয়ানক বিরক্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের এই বিরক্তি, অবশেষে ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় পরিণত হইল, যখন তিনি বিশপ লাডকে লণ্ডনের প্রধান ধর্ম্মযাজকের পদে, ও তৎপরে ক্যাণ্টারবারির আর্কবিশপের গৌরবান্বিত পদে উন্নীত করিলেন।

রাজার সাহায্যে সামান্য অবস্থা হইতে উচ্চপদ লাভ করিয়া লাড ধরাকে সরাজ্ঞান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে রাজা এই লাডকে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করিয়া তাঁহার মর্য্যাদা আরও বাড়াইয়া দিলেন। মানুষ ক্ষমতা পাইয়া সব সময় তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে না, মহামন্ত্রী লাড অসীম ক্ষমতার অধিকারী হইয়া সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে লাগিলেন। চার্লসের অনুমতি লইয়া, তিনি ধর্ম্মের নামে লোকের উপর ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। চার্লস গর্হিত উপায়ে কর আদায় করিয়া সাধারণকে যতটা বিরক্ত করিতে পারেন নাই, এক্ষণে লাডের অভিনব ব্যবস্থায় প্রজাদের ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ হওয়ায় তাহাদের অসন্তোষ ভয়ানকভাবে বৃদ্ধি পাইল। স্কটলণ্ড ও আয়রলণ্ডে অশান্তির বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। আপনার পৈতৃক রাজ্য বলিয়া চার্লস্ স্কটলণ্ডে আপন ধর্ম্মমত জারী করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না বরং রাজা লোকের ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতেছেন বলিয়া লোকে চীৎকার করিতে লাগিল। এমন কি বহু ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করিল যে, যদি রাজা এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। রাজার জানিয়া রাখা উচিত ছিল, যে বল প্রয়োগে প্রহার দ্বারা ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। চার্লস্ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া এই অসম্ভব কার্য্য সাধনে অগ্রসর হইলেন।

আয়রলণ্ড হইতে চিরকালই ইংলণ্ডের রাজন্যবর্গের বিভীষিকার আলয় বলিয়া পরিচিত। আয়রলণ্ড ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন জাতির আবাসস্থান, স্বদেশ প্রেমিক ও স্বার্থপর ইংরাজের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার কোন উপাদানই আয়রলণ্ডে নাই। সেইজন্য বহুকালাবধি ইংরাজগণ নানা কৌশলে উহাকে পিষ্ট ও নিপীড়িত করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের পন্থা হইতে চার্লসের এক কেশ পরিমাণ স্থানও পদস্খলন হইল না। ইংলণ্ডে ও স্কটলণ্ডে কোনও উপায়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিয়া পরাজয়ের অভিমানে তিনি আয়রলণ্ডের উপর পূর্ণমাত্রায় অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। যে ওয়েণ্ট ওয়ার্থ প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক এক সময় চার্লসের নিকট

পিটিশন অব দি রাইট্‌স আদায় করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে রাজার পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক রাজার প্রজা পীড়নের প্রধান সহায়ক হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি এক সময় রাজার প্রতিদ্বন্দ্বীদলের নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বধর্ম্মত্যাগী পাষণ্ডেরা প্রথম পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পক্ষে যোগদান করিলে, তাহার প্রতি যে বিদ্বেষ ও জিঘাংসার ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে, এক্ষণে ওয়েন্ট ওয়ার্থ সেইরূপ ভাবে রাজার বিপক্ষ দলকে দলন করিতে লাগিলেন। রাজা স্বীয় মতে নবদীক্ষিত ওয়েন্ট ওয়ার্থকে অসীম ক্ষমতা প্রদান পূর্ব্বক আয়রলণ্ডের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি তথায় চরম অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। ১৬৩১ খৃঃ তিনি সেখানকার ক্যাথেলিক অধিবাসীদিগকে যেরূপ নৃশংসভাবে হত্যা করাইয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার তুলনা অতি অল্প। সেই বর্ষের ২৩শে অক্টোবর আয়রলণ্ডের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্ব্বিশেষে বহু নিরপরাধ ও অসহায় ক্যাথেলিককে বধ করা হইয়াছিল। অনেককে জলে ডুবাইয়া মারা হইয়াছিল, স্ত্রীর সম্মুখে স্বামীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হইয়াছিল, মাতার সম্মুখে তাহার নয়নের মণি স্বরূপ পুত্র কন্যার মস্তক বিচূর্ণ করা হইয়াছিল, বয়স্থা কন্যার প্রতি পাশবিক অত্যাচার সাধিত হইয়াছিল, অনেককে ইচ্ছা করিয়া পুড়াইয়া মারা হইয়াছিল, ক্রীড়াচ্ছলে অনেক লোককে জলে নিক্ষেপ করিয়া ডুবাইয়া মারা হইয়াছিল, তন্মধ্যে যাহারা সাঁতরাইয়া উপরে উঠিতে চাহিয়াছিল, তাহাদের উপর গুলি চালান হইয়াছিল, আবার অনেককে জীবিত অবস্থায় মৃত্তিকায় প্রোথিত করা হইয়াছিল। এইরূপে এক মাসের মধ্যে আয়রলণ্ডের প্রায় ৫০ সহস্র অধিবাসী নিহত হইয়াছিল। যে মহাত্মার শাসনে এতগুলি নিরপরাধ লোক অকারণে নিহত হয়, তাঁহার পরিণাম কি শুভ হয়?

ক্রমওয়েলের পতাকাতলে আসিয়া অশিক্ষিত ও বিশৃঙ্খল প্রজাবৃন্দ অতি অল্পদিনের মধ্যে সমর-বিদ্যার সমুদয় কৌশল শিখিয়া ফেলিল। রাজার অত্যাচারে যাহারা মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতেছিল, অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করিয়া তাহারাই আজ সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য বীরদর্পে মেদিনী কাঁপাইয়া তুলিল। তাহাদের স্বাধীন ও মুক্ত হৃদয়ের উচ্চরোলের সমন্বিত হুঙ্কারে রাজার সিংহাসন টলিয়া গেল—স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বর প্রজাদের নিকট বন্দী হইয়া তাহাদের কৃপাধীনে পতিত হইল।

বন্দী হওয়া অবধি রাজা দারুণ দুশ্চিন্তায় কাল হরণ করিতে লাগিলেন—তাঁহার মনে স্থিরতা নাই—চতুর্দ্দিকে শত্রু পরিবেষ্টিত—আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি কাহাকেও পাইলেন না। এদিকে প্রজাবৃন্দ একযোগে এক কণ্ঠে রাজার কলঙ্ক-কথা প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু অধিকাংশ লোক চীৎকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল, প্রকাশ্য স্থানে বিচার করিয়া রাজাকে তৎকৃত অন্যায় কার্য্যের জন্য শাস্তি দিতে হইবে, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবীর রাজন্য মণ্ডলী ভয়-কম্পিত হৃদয়ে দেখিবে প্রজাপীড়ক রাজার কিরূপ শাস্তি হওয়া উচিত।

সুতরাং ঐ প্রস্তাব সকলেই অনুমোদন করিলেন। তদনুসারে তাঁহার বিচার কার্য্য আরম্ভ হইল। কয়েক দিন ধরিয়া বিচার কার্য্য অতি যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন হইল। বহুলোকের সাক্ষী গ্রহণের পর প্রেসিডেন্ট ব্রাডশ রাজাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া রায় দিলেন। ২৭শে জানুয়ারী এই দণ্ডাজ্ঞা এইরূপে পঠিত হইল—"রাজার প্রতি বিচারালয়ের দণ্ডাজ্ঞা এই যে, দেহ হইতে তাঁহার মস্তক বিচ্ছিন্ন করা হইবে।"

তারপর ৩০শে জানুয়ারীর এক দারুণ প্রভাতে ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আয়রলণ্ডের একছত্রাধিপতি চার্লসের মস্তকচ্ছেদন হইয়া গেল। সমগ্র জাতির অনুরোধে অলিভার ক্রময়েল রাজ্য-শাসনের ভার গ্রহণ করিলেন—ইংলণ্ডে অরাজকতা প্রশমিত হইল।

পুস্তকের নেশা

এ, জেড, নূর আহমদ

সুদখোর যেমন টাকার পর টাকা জমাইয়া সঞ্চয়ের স্বপ্নই দেখিতে থাকে, সেই টাকার সদ্ব্যয় করিবার হুঁশ্ তাহার থাকে না—সেরূপ অনেক লোক শুধু সঞ্চয়ের নেশায়ই পুস্তক জমাইতে থাকে, মানবের জ্ঞান-বৃদ্ধির পথে সে পুস্তক কখনও সাহায্য করে না। দশের উপকারে যে টাকা খরচ হয় না তাহার যেমন মূল্য নাই, শিক্ষার্থীদের সাহায্যে যে পুস্তক ব্যবহৃত হয় না তাহারও কোন মূল্য নাই।

বর্ত্তমান সময় আমাদের দেশে প্রাইভেট লাইব্রেরী ত নাই বলিলেও চলে, তবে সরকারের প্রচেষ্টায় যে দুচার খানি পাব্লিক্ লাইব্রেরী আছে তাহাও যে এত জটিল কায়দা-কানুনের অধীন, সকল লোক সেই সব লাইব্রেরী হইতে জ্ঞান-তৃষ্ণা মিটাইতে পারে না।

বস্তুতঃ লাইব্রেরীর মত প্রিয় ও প্রয়োজনীয় বস্তু মানুষের জীবনে আর একটিও নাই। মধু-মক্ষিকা যেমন দূরদূরান্ত হইতে, বিন্দুর পর বিন্দু করিয়া পুষ্পমধুতে মৌচাক পরিপূর্ণ করে সেরূপ লাইব্রেরীয়ানও জীবনের সর্ব্বশক্তি ব্যয় করিয়া জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ সম্পদ পুস্তকরাজি সঞ্চিত করিয়া সেই জ্ঞান-মৌচাকের দিকে মানবকে আমন্ত্রণ দেন। যক্ষের ধনের মত দুর্ভেদ্য হইয়া থাকা লাইব্রেরীর কাজ নয়, বরং প্রিয়জনের মত সাদর-আহ্বান করাই প্রকৃত লাইব্রেরীর কাজ।

এই সম্বন্ধে সম্প্রতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের যে দুইটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লাইব্রেরী সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আরবীয় লাইব্রেরী সম্বন্ধে আমি দুই চারিটী কথা বলিব। তাহাতে সহৃদয় পাঠক বুঝিতে পারিবেন, অতি পূর্ব্বকালে সারা দুনিয়া যখন অজ্ঞানতার আঁধার-গহ্বরে ঘুমাইয়াছিল, তখনও আরববাসী বহু লাইব্রেরী স্থাপন করতঃ দিকে দিকে জ্ঞান-বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া দিয়াছিল।

লাইব্রেরীর ইতিহাস লেখকগণ অতি নির্দ্দয়ভাবে আরব যুগের লাইব্রেরীও পুস্তকগুলির নাম বাদ দিয়াছেন। এমন কি পরবর্ত্তী লেখক পেটিট্ রেডেল (Petit-Radel) এড্ওয়ার্ডস, এক্সন (Axon) এবং (Hessel) কেহই অনুগ্রহপূর্ব্বক আরবীয় কালচারের (Culture) জননী আরবীয় লাইব্রেরীর দিকে মুখ তুলিয়া দেখেন নাই। শুধু লেলেন (Lalanne) তাঁহার পুস্তকের সংক্ষিপ্ত তালিকায় কায়রো এবং সিরিয়ার লাইব্রেরী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন।

দুর্নিবার প্রাণশক্তি বলে যখন আরবের মরু-সন্তানগণ বিজয়ের উল্লাসে দিক্‌বিদিকে উধাও হইয়া ছুটিয়াছিল, তখন তাহাদের সামনে ছিল প্রথম ও প্রধান পুস্তক "কোরাণ",—সারা দুনিয়ার ভাবধারাই ইহাতে অন্তর্নিহিত ছিল। ইহাই ছিল নব-মুসলিমের অন্তর প্রদেশের ফল্গুধারা।

দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের সময় আলেকজেন্দ্রিয়ার প্রসিদ্ধ লাইব্রেরী আরবগণ কর্ত্তৃক ধ্বংস হওয়ার যে মিথ্যা খবর প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে, যদিও তর্কের খাতিরে তাহা মানিয়া লওয়া যায়, তথাপি তীব্র সমালোচককেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে মহামাননীয় ওমরের সময় অজ্ঞানতার আঁধার-প্রদেশ হইতে সদ্য-জাগা আরবগণের

সবেমাত্র অক্ষর পরিচয়, কেমন করিয়া তখন তাহারা পুস্তক ও লাইব্রেরীর কদর বুঝিবে? *

কিন্তু ইহার একশত বৎসর পরেই আমরা দেখিতে পাই—রাজধানী বোগদাদে সর্ব্বপ্রথম মুসলিম লাইব্রেরী স্থাপিত হইল, এবং রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই আরবীয় সভ্যতা ও 'কালচারে' সমস্ত দেশকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল

লাইব্রেরী ও পুস্তক যে আরবদের অতিপ্রিয় বস্তু তাহার আভাস আমরা আরবীয় সাহিত্যে দেখিতে পাই :—

নিঃসঙ্গ জীবনে পুস্তক অকৃত্রিম সহচর। বিশ্বাসঘাতক বন্ধুদের বিশ্বাসঘাতকতার পরও পুস্তক তোমায় সান্ত্বনা দিতে পারে।

ইহা কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে না, বরং জ্ঞান ও সত্যের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। (১)

পুস্তক এমন এক বন্ধু যাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিলেও বিশ্বাসঘাতকতা করে না, বিরক্তি প্রকাশ করে না, এবং গালিবর্ষণ করে না। (২)

পৃথিবীতে সব চেয়ে সম্মানিত আসন অশ্বপৃষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সঙ্গী পুস্তক। (৩)

আলমোহ্‌লবী তাঁহার পুত্রকে বলেন :—

প্রিয় বৎস! যখন বাজারে যাইয়া তোমাকে কোথায়ও দাঁড়াইতে হয়, তবে ঐ স্থানে যাইয়া দাঁড়াইও যেখানে অস্ত্রশস্ত্র বা পুস্তক বিক্রী হয়।—(আল্‌ফখ্‌রী)

পুস্তক সংক্রান্ত সব বিষয়েই আরবগণ আন্তরিক যত্ন লইত। তাহারা কঠোর পরিশ্রম সহকারে পুস্তক নকল করিত, সুন্দর মনোজ্ঞভাবে তাহা বাঁধাইত—অতি যত্নের সহিত সেই পুস্তক রক্ষা করিত, এবং দূরস্থ প্রিয়জনকে তাহা উপহার দিয়া তৃপ্তি অনুভব করিত। লিপিশিল্পেও (Caligraphy) তাহাদের সুনিপুণ দক্ষতা ছিল। এই শ্রেণীর লোক হইতেই প্রসিদ্ধ শিল্পী 'বনুমোক্‌লা' এবং 'ইব্‌নুল্‌বাওয়াবেরের' উদ্ভব হইয়াছিল। সুবিখ্যাত অভিধান 'আস্‌-ছাহা' প্রণেতা আল্‌জওহরী, খ্যাতনামা টীকাকার আল্‌হাওজী,—ইস্‌পাহানের সুগায়ক আবদুল্‌ মোমেন, প্রভৃতিও উচ্চশ্রেণীর 'কেলিগ্রাফার' ছিলেন।

চতুর্থ হিজরী সন পর্য্যন্ত যদিও কাগজের অভাবে আরবগণ পুস্তক প্রণয়ন ব্যাপারে বহু অসুবিধা ভোগ করিতেছিল, কিন্তু চতুর্থ হিজরী শেষ না হইতেই যখন সমরকন্দের রাস্তা দিয়া চীনদেশ হইতে কাগজ আমদানী হইতে লাগিল, তখন তাহাদের বহু দিনের অসুবিধা দূর হইয়া গেল; এবং মুস্‌লিম রাজ্যের দিকে কাগজের আড়ত (Paper factory) স্থাপিত হইল। অতঃপর আমরা দেখিতে পাই ৫ম হিজরী সন হইতে সমস্ত ইয়োরোপের কাগজ যোগাইত আরবীয় বণিকগণ।

কাগজ আমদানীর সঙ্গে সঙ্গেই আরবীয় দুনিয়ায় নূতন যুগের সূচনা হইল। যাতায়াতের সুবিধা ও কাগজের প্রাচুর্য্যে এই পুস্তকের মূল্য যথাসম্ভব সস্তা হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে প্রত্যেক আরব সহরেই বইয়ের দোকান খোলা হইল। ইহাতে জ্ঞানী, শিক্ষক, ছাত্র কাহারও আনন্দের সীমা রহিল না; কেননা এই সকল কিতাবের দোকানে তাঁহারা সম্মিলিত হইয়া ভাবের আদান-প্রদান ও পুস্তকালোচনার সময় অতিবাহিত করিবার সুযোগ পাইতেন।

এই প্রসঙ্গে বোগদাদের কথাই প্রথম বলা যাইতে পারে। তৃতীয় হিজরীতেই তথায় প্রায় একশত পুস্তকের দোকান ছিল। এই দোকানগুলি আকারে খুবই ছোট ছিল, এবং মসজিদের পাশেপাশেই স্থাপিত ছিল। বিক্রয়ের জন্য যে সব বই মওজুদ ছিল তাহাদের উপরে লেবেলে স্পষ্টাক্ষরে দাম লেখা থাকিত সুতরাং বইয়ের প্রকৃত মূল্য লইয়া কাহাকেও কথা কাটাকাটি করিতে হইত না।

---

* Cf. Specially L. Caetani, Annali dell' Islam Vol VII, page 119—125.—where previous notes on the subject are given (the earliest mention of the destruction of the Alexandrian Library as far as I know is made by Bar Hebraens, Mukhtasar adDuwal, an author who lived six Centuries after the event, and could hardly have possessed any reliable information —F. Krenkow.)

(১) ইব্‌নে আব্‌দ রবীয়া কৃত—'ইক্‌দ' পৃষ্ঠা ১, ১৯৯—বলাপে প্রকাশিত—১২৯৩।

(২) ইব্‌নে তিক্‌তিকা কৃত 'আল্‌ফখ্‌রী'—তৃতীয় পৃষ্ঠা।

(৩) মোতানব্বী প্রণীত 'দিওয়ান'—৬৮৩ পৃষ্ঠা—বারলীনে প্রকাশিত ১৮৬১ সন।

এই সমস্ত দোকানের প্রতিষ্ঠাতা এবং এজেন্টগণ প্রত্যেকেই উচ্চশিক্ষিত "স্কলার" (Scholar) এবং সুপণ্ডিত ছিলেন। কবি 'আল্‌হাজিরি' সাধারণতঃ তাঁহার ব্যবসায়ের জন্য 'দাল্লালুল্-কুতুব' নামে অভিহিত হইতেন। *

—'আবুহাতীমশাল' সাজিস্তানী, ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক ইয়াকুত পুস্তক বিক্রেতা ছিলেন।

কাগজের আমদানীতে বইয়ের মূল্য অনেকাংশে সস্তা হওয়া সত্বেও সর্ব্বসাধারণ পাঠাগারের (Public Library) অভাবে বহু বিদ্যার্থী অসুবিধা ভোগ করিতেছিলেন। পঞ্চম হিজরীতে ইব্‌নে দুরাইদের 'আল জামহারা' অভিধান খানির মূল্যই ছিল ৬০ দিনার বা ১৮০ টাকা। ১ আত্-তাবারির মূল্যই ছিল একশত দিনার। ২ আব্‌খলীলের 'কিতাবুল্-আইনের' দাম ছিল পঞ্চাশ দিনার। ৩ কবি জরীরের 'ওমাইদ' কবিতার এক কপির দামই ছিল দশ দিনার। ৪ বা ৩০৲ টাকা কর্ডোভার খলিফা 'আল্‌হাকম' কিতাবুল্-আজানী সঙ্কলনের জন্য ইহার প্রণেতাকে এক হাজার দিনার পারিশ্রমিক স্বরূপ দিয়াছিলেন। ৫ প্রাগুক্ত সাহিত্যিক ইয়াকুতের লেখা হইতে বুঝা যায় সপ্তম হিজরীতে পুস্তকের দাম পূর্ব্বের চাইতে অনেকাংশে কমিয়া আসিয়াছিল। মারো সহরের দামিরিয়া লাইব্রেরী হইতে তিনি ধার করিয়া যেই বই আনিতেন তাহা সম্বন্ধে তিনি বলেন :—"ধার করা প্রায় দুই শত পুস্তকে সর্ব্বদা আমার ঘর পূর্ণ থাকিত। তাহাদের মূল্য যদিও দুইশত দিনারের কম ছিল না, তথাপি তাহার জন্য লাইব্রেরীতে আমাকে কিছুই জমা দিতে হইত না।"—ইহাতে বোধ হয় তখন মোটামোটি ভাবে প্রতি পুস্তকের মূল্য এক দিনার ছিল।

বহু অসুবিধা সত্বেও আরবগণ পুস্তক সঞ্চয়ে ও জ্ঞানের সাধনায় মশগুল ছিল। সেই কষ্ট সহিষ্ণু মনীষিদের মধ্যে 'আল্‌জাহিজ' ও 'ফতেহ্-বিন্ খাকানের' নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আল্‌জাহিজ পুস্তকের প্রতি এতই আকৃষ্ট ছিলেন যে খলিফা মোতাওয়াকীলের রাজদরবারে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন তাহাই পুস্তক ক্রয়ে ব্যয় করিয়া দিতেন।—তাহাতে ও তাঁহার জ্ঞান-তৃষ্ণা যখন মিটিত না, তখন টাকা জমা দিয়া বহু লাইব্রেরীর এজেন্ট হইতেন, এবং তাহাতে পুস্তক পাঠের সুযোগ করিয়া লইতেন। তাঁহার হাত দিয়া এমন কোন পুস্তক অতিক্রম করিত না, যাহা তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত না পড়িয়া ছাড়িয়া দিতেন। পরম দুঃখের বিষয় যে এই তাঁহার জীবনের সব চেয়ে প্রিয় ছিল, তাহাই পরিশেষে তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। তাঁহার পাঠাগারে স্তূপাকারে চারিদিকে বই সাজাইয়া রাখিয়া তিনি মধ্যস্থলে বসিয়া তন্ময় ভাবে পুস্তক পাঠ করিতেন। একদিন একটী ভারি পুস্তকের স্তূপ তাঁহার অবশ ঘাড়ে চাপিয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধ সাধক শত চেষ্টায়ও তাহা সরাইতে পারিলেন না। পরিশেষে সেই প্রিয় পুস্তকগুলি তাঁহার শেষ সমাধি রচনা করিল।

ইসমাইল-বিন ইসহাক,—আর একজন জ্ঞানের সাধক ছিলেন ;—তাঁহার সমসাময়িক এক বন্ধু বলেন—"আমি যে কোনও সময় তাঁহার সহিত দর্শন করিতে গিয়াছি, তখনই দেখিয়াছি তিনি কোনও একটী বই লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন।" ৬

বোগদাদে 'আল্‌ফত্‌হি বিন্ খাকানের' এক বিরাট লাইব্রেরী ছিল। পুস্তকের সংখ্যা ও সৌন্দর্য্য হিসাবে এই লাইব্রেরীটি অদ্বিতীয় ছিল। কুফা এবং বছরার বেদুইন ও দার্শনিকদের জন্য এই লাইব্রেরী সতত উন্মুক্ত থাকিত। তিনি সর্ব্বদা আস্তিনের ভিতর বা বুটের চামড়ার ভিতর একখানি পুস্তক রাখিয়া দিতেন। যে স্থানে বসিয়া একটু খানি সময় পাইতেন, তখনই বইখানি বাহির করিয়া পড়া আরম্ভ করিতেন। ৭

বোগদাদের নিকটবর্ত্তী 'করকর' গ্রামে আলী বিন্ এহীয়া তাঁহার রাজপ্রাসাদে প্রকাণ্ড লাইব্রেরী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই লাইব্রেরীর নাম ছিল 'খাজিনাতুল্-হিক্‌মা' বা জ্ঞান ভাণ্ডার। লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠাতা আলী-বিন্

* ইব্‌নে খালকান—১ম খণ্ড ২৮৬ পৃষ্ঠা।
(১) আমাদের দেশীয় মুদ্রায় এক দিনার তিন টাকার সমান।
(২) মাক্‌রিজী—১ম খণ্ড—৪০৮ পৃষ্ঠা।
(৩) ফেরিস্ত—৪২ পৃষ্ঠা।
(৪) ইব্‌নে খালকান্—২য় খণ্ড ৫২২ পৃষ্ঠা।
(৫) ইবনে খলদুন্—(বৈরুত প্রকাশিত ১২৮৪) ৪র্থ খণ্ড ১৪৬ পৃষ্ঠা ; নফ্‌হেত্‌তিব (কাইরো প্রকাশিত—১৩০২) প্রথম খণ্ড ১৮০ পৃষ্ঠা।
(৬) ফিরিস্তি—১১৬—১১৭ পৃষ্ঠা।
(৭) ইয়াকুত প্রণীত 'ইশরাদ' ৬ষ্ঠ খণ্ড ৭৯—৮০ পৃষ্ঠা।

এহীয়ার খরচেই বিদ্যার্থীগণ দেশ বিদেশ হইতে আসিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিতেন। সমস্ত আরবস্তানে এই লাইব্রেরীর নাম এমনই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ 'আবুমা'শর' খোরাসান হইতে মক্কাতীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া, এই লাইব্রেরী দর্শনে আসিয়া বাকী জীবন, এখানেই কাটাইয়া দেন। এই লাইব্রেরী ছাড়িয়া তিনি আর হজ্জ করিতে যাইতে পারেন নাই। ১

আর একজন পুস্তক-প্রণেতা 'আবুদাউদ সিজিস্তানী'র কথা বলা যাইতে পারে—তিনিও আস্তিনের ভিতর পুস্তক রাখিয়া ভ্রমণ করিতেন। পুস্তক সঙ্গে রাখার সুবিধার্থে তিনি কামিছের আস্তিন খুবই বড় করিয়া সেলাই করাইতেন। তাঁহার প্রণীত 'সননে আবুদাউদ' মুসলিম জগতে প্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ। ২

৫ম হিজরীতে সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, 'আস্‌নবী' সম্প্রদায়ের গারসুন্‌নিমা চারিশত পুস্তক পূর্ণ একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এক নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র প্রতিদিন এই লাইব্রেরীতে পুস্তকালোচনা করিবার অনুমতি পাইত। অতঃপর বিজামীয়া লাইব্রেরী স্থাপন কালে, এই লাইব্রেরী বিক্রীত হইয়া তাহার পুষ্টি সাধন করিয়াছিল। ৩

ফাতেমীয় বংশের প্রসিদ্ধ খলিফা 'আজিজ বিল্লার' একটী প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল; সম্ভবতঃ তাঁহার পুস্তক প্রিয় মন্ত্রী 'ইয়াকুব্-বিন্ কিলিসের' সাহায্যেই তিনি এই প্রাইভেট লাইব্রেরী স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখনকার লাইব্রেরীয়ান, আবুল্‌হাসান বলেন "এই লাইব্রেরীর চল্লিশটী কক্ষ ভরিয়া শুধু পাণ্ডুলিপি বই-ই ছিল। একমাত্র ফেকাহ্‌শাস্ত্র সম্বন্ধেই ১৮০০০ বই ছিল। প্রসিদ্ধ লেখক দ্বারা লিখিত ২৪০০ কপি কোরানের বিভিন্ন নকল ছিল। এই কিতাবগুলি সোণা ও রূপার কাজে সুশোভিত ছিল। ইহা ছাড়া অসংখ্য লেখকের পাণ্ডুলিপি পুস্তকে এই লাইব্রেরী পরিপূর্ণ ছিল

'হাকীম বিন্ আমীর আল্লার' সময় ইহা পৃথিবীর পাব্লিক লাইব্রেরীর অন্যতম হইয়া 'দারুল্-ইল্‌ম' বা 'জ্ঞান মন্দির' নামে সুপরিচিত ছিল। সুলতান ছালাহ্‌উদ্দীনের মিশর আক্রমণের কালে এই লাইব্রেরী হইতে তাঁহাকে ৬৮০০০ হাজার পুস্তক উপহার দেওয়া হইয়াছিল। 'আমীর আল্লার অন্যতম উজীর 'আবুল হাসান্ কিফতীর' হলব সহরে নিজস্ব যে লাইব্রেরী ছিল—তাহাতেও প্রায় ৫০০০০ হাজার পুস্তক ছিল।

ইহা ছাড়া আরবের পশ্চিমাংশে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরই নিজস্ব প্রাইভেট লাইব্রেরী ছিল; তাহাতে দূরদেশের ছাত্রগণ আসিয়া অনায়াসেই শিক্ষা লাভ করিতে পারিত।

পারস্যের সুলতানগণ যখন খলিফার হাত হইতে শাসন ভার ছিনাইয়া লন, তখন তাঁহারা অনেকেই রাজ দরবারকে বিজ্ঞানের আশ্রয়স্থান করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া সুলতান 'আদ্দুদদৌলার', 'মাইজউদদৌলা', 'আব্দুল ফজল ইব্‌নুল আমীদ', 'আস্‌সাহিব বিন্ আব্বাদ'— প্রভৃতি মনীষিদের প্রত্যেকেরই প্রাইভেট লাইব্রেরী ছিল। 'সাহিব বিন্ আব্বাদ' লাইব্রেরীর কাজে পূর্ণ মনোনিবেশ দেওয়ার জন্য সমনাইদ রাজবংশের মন্ত্রীত্ব পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার লাইব্রেরীর শুধু ফেকাহ্ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় বইগুলি স্থানান্তরিত করিতে হইলে ৪০০ শত উটের প্রয়োজন হইত। ৪

মন্ত্রী প্রবর 'ইব্‌নুল আমীদ' সম্বন্ধে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান ও ঐতিহাসিক 'ইব্‌নে মিস্‌কাওয়াই বলেন—"এক সময় খোরাসানের সৈন্যগণ কর্ত্তৃক তাঁহার বাড়ী এমনই লুণ্ঠিত হইয়াছিল যে জলপানের একটী বাটী বা বসিবার একখানি আসনও অবশিষ্ট ছিল না। ইহাতে তাঁহাকে অনুমাত্রও দুঃখিত হইতে দেখি নাই। লাইব্রেরীর কাজে তিনি এমনই ব্যস্ত ছিলেন যে এসব লুট তরাজের বিষয় তিনি যেন জানিতেনও না। পৃথিবীতে সেই লাইব্রেরীর মত প্রিয় বস্তু তাঁহার আর কিছুই ছিল না। ইহাতে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে শত উটের বোঝাই পরিমাণ পুস্তক ছিল। বাড়ী লুঠের পর তিনি লাইব্রেরীতে বইগুলি সম্পূর্ণভাবে মজুদ দেখিয়া পরম আনন্দের সহিত আমাকে বলিলেন "দেখ বন্ধু, আজ আমার আনন্দ ধরিতেছে না। সৈন্যগণ আমার যাহা কিছু নিয়াছে

১ আবুল মহসীন প্রণীত—'নুজুম্'—২য় খণ্ড ৭১ পৃষ্ঠা।

২ 'ইরশাদ'—৫ম খণ্ড—৪৬৭ পৃষ্ঠা।

৩ হাক্‌দী প্রণীত- ওয়াকী।—(Safdi also records that the dishonesty of the Librarian accounted for this Library falling into decay.)—

৪ ইয়াকুত প্রণীত—ইরশাদ—২য় খণ্ড ৩১৫ পৃষ্ঠা।

সে সমস্ত পুনরায় পাওয়া যাইবে। আমার লাইব্রেরী বিনষ্ট হইলে তাহা আর পুনঃ স্থাপিত হইত না।* বস্তুতঃ আমি লক্ষ্য করিতেছিলাম যে কথাগুলি বলিতে বলিতে তাহার বদন নগুণ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। *

নবম শতাব্দীতে আরবের পূর্ব্বাংশে 'সামানাইদ' বংশীয় সুলতানগণের শাসন কালে তাঁহাদের রাজ দরবারে বিদ্যা-চর্চ্চার সবিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। সুলতান 'নুহ্‌বিন্ মনসুরের'—এক বিরাট প্রাইভেট লাইব্রেরী ছিল। এই লাইব্রেরী সম্বন্ধে খ্যাতনামা 'ইব্‌নেসিনা' উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি এই লাইব্রেরীতে পুস্তক পাঠ করিতে আসিয়া বহুদিন লাইব্রেরীয়ানের পদে চাকুরী করিয়াছিলেন। ইব্‌নে সিনাই, পরিশেষে অগ্নি জ্বালাইয়া এই লাইব্রেরী ধ্বংস করিয়াছেন, বলিয়া যে প্রবাদ আছে তাহার মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য নাই।

স্পেনে সমৃদ্ধশালী বড় বড় লাইব্রেরী ছাড়া পুস্তক-প্রিয় বহু দরিদ্র লোকও যথা সর্ব্বস্ব ব্যয়ে লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছিলেন। মোহাম্মদ হাজেম নামক জনৈক শিক্ষক দিনে দিনে পুস্তক সংগ্রহ করিতে করিতে কার্ডোভা সহরে এমন এক বিরাট লাইব্রেরীর মালীক হইয়াছিলেন যে শুধু ইহারই জন্য পরে তিনি বহু 'স্কলারের' ঈর্ষার পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন।

স্পেনের অপর একজন পুস্তক-প্রিয় মনীষি ছিলেন 'আবু মোত্‌রীফ'। কার্ডোভায় তিনি যে লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে ছয়জন কর্ম্মচারী অহোরাত্র কাজ করিতেন। তাঁহার লাইব্রেরীর প্রকৃত মূল্য এক প্রকার গুপ্তই ছিল কিন্তু পারিবারিক আর্থিক অনটনে পড়িয়া যে দিন তিনি আপন প্রিয় লাইব্রেরীটি ৪০০০০ হাজার দিনার বা এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা নিলামে বিক্রয় করিলেন, সেই দিন কর্ডোভার লোক এই লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা দেখিয়া বিস্ময়াবিভূত হইয়াছিল।

বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদের ভিতরও এই জ্ঞান স্পৃহা সংক্রমিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে 'আফ্‌তাসি-দুল্ মুজ্ঞাফফর', বানুহুদ্ গ্রানাডার শাসন কর্ত্তা 'বনুল্ আহমদ' এবং 'বনুহুদুনু' প্রভৃতির নাম সসম্মানে উল্লেখ যোগ্য।

আরব রাজ্যে বহু ধনী বিলাসী লোকও ছিলেন, যাঁহারা শিল্পনৈপুণ্যে জাঁকাল পুস্তকও মনোরম সুসজ্জিত শেল্‌ফে গৃহের শোভা বৃদ্ধি করিয়া তুলিতেন। বস্তুতঃ পক্ষে হয়তঃ শুধু ধূলি বালি দূর করিবার জন্যই সেই সব বই বৎসরান্তে স্থানান্তরিত হইত। এ সম্বন্ধে কর্ডোভার এক নিলামে একটি আমোদজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পুস্তক-প্রিয় 'আল্‌হাদরামীর' এই অভ্যাস ছিল যে, যে কোনও দূর স্থানে পুস্তক বা লাইব্রেরী নিলামে বিক্রীত হউক না কেন শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও তিনি তথায় উপস্থিত থাকিতেন। কর্ডোভার সেই নিলাম দিবসে তাঁহার ও অপর এক ব্যক্তির ভিতর খুবই প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। পরিশেষে উভয়ের দ্বন্দ্বে পুস্তকের মূল্য এতই বাড়িয়া গেল যে, 'আলহাদরামী' তাহার অতিরিক্ত মূল্যে বই ক্রয়ে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি যখন অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শুধু পুস্তকের বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই প্রতিযোগিতা করিতেছেন অথচ বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার অক্ষর পরিচয়ও নাই, তখন তাঁহার দুঃখের ও ক্ষোভের অবধি রহিল না।

বোগদাদ সহরেই প্রথম 'পাব্লিক লাইব্রেরী' স্থাপিত হইয়াছিল। বিশ্ববিশ্রুত খলিফা 'আল্‌মামুনের' প্রচেষ্টায় তৃতীয় হিজরীতে 'দারুল-ইলমের' সংলগ্নে আর একটী লাই-ব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার দেখাদেখি সহরে গ্রামে সর্ব্বত্র 'পাব্লিক লাইব্রেরী' স্থাপনের ধুম পড়িয়া গেল; এবং তাহাতে বিশ্ববাসীর প্রশংসা-দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। এই লাইব্রেরীর সৌন্দর্য্য ও প্রাচুর্য্যই বোধ হয় ফ্রান্সের সম্রাট একদশ লুইকেও (Louis XI) লাইব্রেরী স্থাপনে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। ইহারই ফলে তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ প্যারীস নগরীতে প্রথম লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছিলেন।

বোগদাদের পর সিরিয়া, মেসেপোটেমিয়া, ও মিশরে আরবীয় 'কাল্‌চার' ও আরবীয় লাইব্রেরী স্থাপনের প্রচেষ্টা চলিতে লাগিল। অতঃপর রাজ্য-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুদূর স্পেনে আরবীয় সভ্যতা ও শিক্ষা প্রবেশ লাভ করতঃ এক অভিনব শক্তিতে সারা দেশকে সজীব করিয়া তুলিল,—এবং চারিদিকে লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়া সেই শিক্ষা ও সভ্যতাকে বাঁচাইয়া রাখিল।

* ইব্‌নে মিস্‌কাবাই প্রণীত—'তাজারীব'—৬ষ্ঠ খণ্ড ২৮৬ পৃষ্ঠা।

সে কালে সাধারণতঃ প্রাথমিক হইতে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা মসজিদেই ছিল। এই সমস্ত মসজিদে সম্রাট ও খলিফাগণ প্রদত্ত ফেকাহ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় বহু পুস্তক-পূর্ণ লাইব্রেরী থাকিত। পরে যখন—তৃতীয় শতাব্দী হইতে চতুর্দ্দিকে লাইব্রেরী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে—বিদ্যা চর্চ্চার প্রতি মানুষের মন প্রবল ভাবে ঝুঁকিয়া পড়িল, তখন মসজিদের বিদ্যায় আর ছাত্রদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিল না। তাই দিকে দিকে মাদ্রাসা সৃষ্টির সূত্রপাত হইল।

ইহার পর বোগদাদ ও দামেশ্‌কের মাদ্রাসাসমূহে ফেকাহ্-শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস, ব্যাকরণ, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ও শিক্ষার বন্দোবস্ত হইল। কাইরো শহরে খলিফা 'আল্-হাকীম্' যে মাদ্রাসা বা প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাহাতে অঙ্ক, জ্যোতিঃশাস্ত্র (Astronomy) চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও মনো-বিজ্ঞান (Metaphysics) শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। * এই সমস্ত মাদ্রাসাতে যে সব লাইব্রেরী ছিল তাহা শুধু ছাত্র ও অধ্যাপকদের একচেটিয়া ব্যবহারের নিমিত্ত ছিল না—দেশ-বিদেশের বিদ্যা-শিক্ষার্থীগণও সে সমস্ত লাইব্রেরী হইতে বিদ্যা অর্জ্জন করিতে পারিত।

ইতিহাস-আলোচনায় দেখা যায় আরবীয় লাইব্রেরী অতি দ্রুতভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বস্তুতঃ ইহার মূলে ছিল—আব্বাসীয় খলিফাদের প্রগাঢ় প্রচেষ্টা ও খণ্ড রাজ্যসমূহের রাজন্যবর্গের আন্তরিক সহানুভূতি ও সাহায্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য সৃষ্টির ফলে 'ইটালীয় রিনাইসেন্সে' (Italian Renaisance) আমরা যাহা দেখিতে পাই, আরবীয় সভ্যতার মূলেও তাহাই পরিলক্ষিত হয়। কারণ প্রত্যেক রাজাই 'কাল্‌চারের' প্রতিযোগিতায় পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য হইতে অগ্রণী হওয়ার প্রচেষ্টায় থাকে, ইহারই জ্বলন্ত উদাহরণ আমরা পাই হামদান্ বংশীয় রাজাদের সময়, বিশেষভাবে 'সাইফুদ্দৌলার' সময় (Aleppo) হলবে—'বনু আমর' বংশীয়দের সময় (Tripoli) ট্রিপলীতে। সমানীয় এবং গজনভীয় বংশীদের সময় পারস্যে—'বনু হুদ্‌-হুন্'দের সময় টলেডোতে—'বপুল আহমর'দের সময় কার্ডোভাতে।

রাজকীয় কর্ম্মচারীদের উপদেশ সম্বন্ধীয় (Encyclopœdia) বিশ্বকোষ প্রণেতা 'আল্‌কাল্‌কাশানদি' তখনকার লাইব্রেরী সমূহের কথা স্মরণ করতঃ বলেন :—

"সে কালের খলিফা ও বাদশাহ্‌গণ লাইব্রেরীর প্রতি বড়ই অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহারা লাইব্রেরীর প্রতি বিশেষ যত্ন প্রয়োগ করিতেন বলিয়াই অতি সুন্দর সুন্দর ও বহুমূল্য পুস্তকে লাইব্রেরীগুলি ভরিয়া উঠিত। মুসলিম জগতের তিনটী লাইব্রেরী সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। প্রথমটী বোগদাদের লাইব্রেরী, ইহাতে অগণিত মূল্যের অসংখ্য পুস্তক ছিল। তাতার বংশীয় 'হালাকু' কর্ত্তৃক বোগদাদের খলিফা 'মোতাশীম' নিহত হওয়া পর্য্যন্ত এই লাইব্রেরী সগৌরবে বিশ্বজনের জ্ঞান-পিপাসা মিটাইতেছিল।... বিজেতাগণ কর্ত্তৃক অন্যান্য বস্তুর সহিত এই লাব্রেরীর বই পুস্তকও বিলুণ্ঠিত হইল তদবধি আর এই লাইব্রেরীর নাম নিশানও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় লইব্রেরী ফাতেমীয় খলিফাদের রাজত্ব কালে 'কাইরো' সহরে অবস্থিত ছিল। ইহা পৃথিবীর বৃহত্তর লাইব্রেরীর অন্যতম ছিল, এবং বিজ্ঞান (Science) সম্বন্ধীয় বহু পুস্তকে পরিপূর্ণ ছিল। 'ছালাহউদ্দীন আইউবীর' সিংহাসনারোহণ পর্যান্ত এই লাইব্রেরীটী বিদ্যমান ছিল।

তৃতীয় লাইব্রেরী—'উম্মীয়া' বংশীয়দের রাজত্বকালে স্পেনে ছিল। 'বনুউম্মীয়া'দের শেষ রাজার রাজত্বকাল পর্য্যন্ত এই লাইব্রেরাটি বিদ্যার্থীদের আত্মার খোরাক যোগাইতেছিল। অতঃপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজশক্তি যখন স্পেনকে বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ করিয়া লইল, সেই সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ লাইব্রেরীটিও নানাভাবে বিভক্ত হইয়া কালের আঁধার গহ্বরে বিলীন হইয়া গেল।

---

* 'জুর্‌জিযায়দান প্রণীত 'তমদ্দুন'—তৃতীয় খণ্ড ১৯৯—২০৪ পৃষ্ঠা সইউতী প্রণীত—'হুসনুল মোহাদ্দেরা' ১৮৪, ১৯০, ১৯১ পৃষ্ঠা।

পোষ্ট-কার্ডের আত্ম-কথা

মোহাম্মদ আবদুল বারি

পোষ্ট-কার্ডের আত্মকথা! আপনাদের নিশ্চয়ই হাসি পাইতেছে। ৮×৫ আঙ্গুল পরিমাণের একখানি কার্ড, তার আবার আত্মকথা। দুঃসাহস ত কম নয়!

গবর্ণমেণ্টের খাস দপ্তরে আমার জন্ম। মহা ধুমধামের মধ্যে আমরা একসঙ্গে অনেকগুলি ভাই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে আমরা কয়েকজন যমজরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়াই টেবিলস্থ হইয়াছিলাম। জন্মগ্রহণের পরেই আমাদের বিধাতা-পুরুষ কপালে রাজটিকা পরাইয়া দিলেন এবং কি লিখিয়া গেলেন। শুনিলাম, ইহা আমাদের বিধিলিপি—দৌত্য আমাদের কাজ। ইহার পর আমরা ষোলজন করিয়া এক এক পরিবার-ভুক্ত হইলাম। এইরূপ কয়েক পরিবারকে একখানি বড় কাগজে মুড়িয়া একটি বাক্সে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। দুনিয়ার আলো বাতাস হইতে আমরা বঞ্চিত হইলাম। বড় দুঃখ হইল। কি করিব? মনের দুঃখ মনে চাপিয়া সেই অন্ধকূপে পড়িয়া রহিলাম।

ইহার কিছুদিন পরেই আমাদিগকে বাহির করা হইল। আশা হইল, আবার বোধ হয় দুনিয়ার মুখ দেখিতে পাইব। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে ভ্রম দূর হইল। আমাদিগকে সেই বদ্ধ অবস্থাতেই কোথায় চালান দেওয়া হইল। কি করিয়া যে কোথায় আমাদিগকে পাঠান হইতেছে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তবে একথা বেশ বুঝিলাম যে, আমরা কোথাও চলিয়াছি। কারণ পথে নিষ্ঠুর মানুষগুলি আছড়াইয়া-পিছড়াইয়া আমাদিগকে একথাটা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে। বহুক্ষণ পরে আমাদের চলার শেষ হইল। আমরা আবার একটি অন্ধকূপে আবদ্ধ হইলাম। এখানে বেশীদিন ছিলাম না—আবার অন্যত্র বদ্‌লি হইলাম। এখানেও কিছুদিন একটি অন্ধকূপে থাকিতে হইয়াছিল।

সে দিন আমাদের জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। একটা বাবু আমাদিগকে বাক্সের অন্ধকার গর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া মোড়ক খুলিয়া একটা ছোট টিনের বাক্সে রাখিলেন। বহুদিন পরে দুনিয়ার মুখ দেখিলাম।

একদিনের ঘটনা। শুনিতে পাইলাম কে বলিতেছে, "একখানি কার্ড দেন"—চাহিয়া দেখিলাম, একটি লোক দুইটি পয়সা টেবিলের উপর ফেলিয়া দিল। বাবুটি একেবারে জন্মের মত আমাদের যমজত্ব ঘুচাইয়া আমার ভাইটিকে ঐ ব্যক্তির হাতে সঁপিয়া দিলেন। হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল। কিন্তু উপায় নাই। দূত হইয়া জন্মিয়াছি না জানি অদৃষ্টে কত দুঃখ আছে।

শুনিয়াছি আমাদের আদি-পুরুষেরা আমাদের মত এত বড় আকারে জন্মিতেন না। তাহাদের কয়েদ ছোট ছিল। অনেক দিন পরে আমাদের এই Evolution হইয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের দক্ষিণা ছিল এক পয়সা। তোমরা যাহা দেও তাহা মূল্য মনে করিও না। ইহা আমরা দক্ষিণা হিসাবেই গ্রহণ করি। কারণ আমাদের মূল্য দিবার ক্ষমতা তোমাদের নাই। আমাদের দৌত্য কাজটির গুরুত্ব যে কত বেশী, তাহা তোমরা যে না বুঝ, তাহা নয়। কিন্তু তোমরা জ্ঞান-পাপী। তোমাদিগকে আমি আর কি বুঝাইব। বিরহী যক্ষ যখন গুরু বিরহে ছটফট্ করিতেছিল প্রিয়ার সংবাদ জানিবার জন্য, নিজের একটি কথা জানাইবার জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করিয়া মরিতেছিল—তখন যদি আকাশের মেঘমালা তাহার প্রতি অনুগ্রহ না করিত, তবে হয়ত সে বিরহের জ্বালায় দক্ষিণ মরুতেই যক্ষ-জীবন সমাপ্ত করিত। কবি কালিদাস তাঁহার অমর-লেখনী সাহায্যে মেঘদূতে সেই দৌত্য-কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। একটি রাজ-হংসীর দৌত্যে নল-দময়ন্তীর মিলন ঘটিয়াছিল। মহাভারতে তোমরা সে খবর পাইয়াছ। এহেন কাজ আজ আমরা অযাচিতভাবে বংশানুক্রমে গ্রহণ করিয়াছি। তোমরা দুইটা মাত্র পয়সা দিয়া মনে কর আমাদের মূল্য দিয়া কিনিয়া ফেলিয়াছ। তোমাদের বাতুলতা দেখিয়া আমরা হাসিয়া বাঁচি না।

"একখানা কার্ড"—শুনিয়া বুকটা দুরু দুরু করিয়া উঠিল। হয়ত বা আমার ডাক পড়িয়াছে। চাহিয়া দেখি একটা ছেলে পূর্ব্ববৎ দুইটা পয়সা টেবিলে ফেলিয়া দিয়াছে।

অব্যবহিত পরেই সেই বাবু মহাশয় কাণ ধরিয়া আমাকে বালকের হাতে পৌছাইয়া দিলেন। বালকের কোমল হস্তে পৌছিতেই আমার কাণের জ্বালা জুড়াইয়া গেল। সে আমাকে সার্টের উপরের পকেটে রাখিয়া চলিতে লাগিল। আমি উঁকি দিয়া চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিলাম। রাজ পথ দিয়া বালকটি চলিয়াছে। দুই ধারে সারি সারি দোকান। বালকটি রাস্তার পাশের একটা দোকান হইতে এক পয়সার লজঞ্চুস কিনিয়া আমার সঙ্গে উপরের পকেটে রাখিল এবং একটি একটি করিয়া খাইতে খাইতে চলিল। দুর্ভাগ্য আমার চাটিয়া চাটিয়াও লজঞ্চুসের স্বাদটা কেমন বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ পরেই আমি বালকের সহিত তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তাহাকে দেখিয়া একটা তরুণী জিজ্ঞাসা করিল—"কিরে জ্যোতি কার্ড এনেছিস্"। বালকটি বলিল—"হাঁ দিদি"। বলিয়াই সে আমার ঝুটি ধরিয়া তাহার দিদির হাতে তুলিয়া দিল।

মেয়েটী সুন্দরী। তাহার কোমল হস্তের স্পর্শে আমার মত নিরেট অচেতন পদার্থের শরীরেও এক আনন্দের শিহরণ খেলিয়া গেল। সে আমাকে বিছানার নীচে এক কোণায় রাখিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মেয়েটী আমাকে বাহির করিয়া আমার বুকের উপর তাহার মনের কথা আঁকিয়া দিল। কথা অতি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এতেই তাহার মনের সমস্ত কথা বুঝিয়া ফেলিলাম। নাম ধাম লিখিয়া সে আমাকে আবার তাহার বিছানার নীচে রাখিয়া দিল। আমি এখানে থাকিয়া বুঝিতে পারিলাম মেয়েটি বিছানায় শুইয়া শুইয়া কি ভাবিতেছে। তাহার মন কোথায় পড়িয়া আছে।

বৈকালে চাকর বাজারে যাইবার সময় মেয়েটি আমাকে তাহার হাতে সঁপিয়া দিয়া বলিল—"এখানা ডাকে দিয়া যাস্"। যে পথে আসিয়াছিলাম, চাকরের ময়লা সার্টের পকেটে চড়িয়া আমি আবার সেই পথেই চলিলাম। সেই সুন্দরী তরুণীর নিকট হইতে চলিয়া আসায় আমার বাস্তবিকই দুঃখ হইয়াছে। কিন্তু এই ভাবিয়া আমি ধন্য হইয়া গেলাম যে, আমি তাহার দূতের পদে বৃত হইয়া চলিয়াছি। দময়ন্তীর রাজ-হংসীর কথা মনে পড়িল। চাকরটী আমার পূর্ব্ব বাসস্থানের সম্মুখে পৌছিয়া আমাকে একটি খোপের মুখে ছাড়িয়া দিল। আমি উপর হইতে গড়াইতে গড়াইতে এক গভীর গহ্বরে নিপতিত হইলাম। ঘোর অন্ধকারে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। অল্পক্ষণ পরেই আমি স্থিতি-লাভ করিলাম। অনুমানে বুঝিলাম, আমারই মত কতকগুলি হতভাগ্যের ঘাড়ের উপর আমি দাঁড়াইয়া আছি। এ আবার কোথায় আসিলাম? ভাবিলাম এখানেই হয়ত পড়িয়া থাকিয়া দূত জীবনের উপসংহার করিতে হইবে। এমন সময় হঠাৎ অন্ধকূপের একটি দ্বার খুলিয়া গেল। দেখিলাম আমাদের বাহন শ্রেণীর একজন আমাদিগকে জড় করিয়া এক টেবিলের উপর লইয়া গেল।

দুই তিন খানি কার্ডের নীচ হইতে উঁকি ঝুঁকি দিয়া আমি একবার চতুর্দ্দিক চাহিয়া লইলাম। আমার সকালের বাবুটি ঘাড় গুজিয়া পূর্ব্ববৎ কাজ করিয়াই চলিয়াছেন। হঠাৎ ঘট্ ঘট্ শব্দে চাহিয়া দেখি জনৈক পিওন নির্দ্দয়ভাবে আমার সঙ্গী বন্ধুদের রাজটীকার উপর বিরাশী দশ আনা ওজনে এক একটী মোহর ছাপাইয়া চলিয়াছে। ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। কিন্তু ভাবিবার আর অবসর হইল না। ঘট্ করিয়া অমনি আমার কপালেও একটি পড়িয়া গেল। আমি দূতের পদে যথারীতি অভিষিক্ত হইলাম।...হয়ত আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে পারে, সুতরাং পথের কথা কিছু বলিব না।

এবার আমি যেখানে পৌছিয়াছিলাম, সেখানে দেখিলাম একটি মাত্র বাবু। তিনিই পিওনের সাহায্যে আমাদিগকে বস্তার পেট হইতে উদ্ধার করিলেন। পিওন মহাশয় আমাদের ঘাড়ে আর এক একটি মোহর দাগিয়া দিলেন। যথাসময়ে আমি অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের সহিত বাহন মহাশয়ের বগল দাবা হইয়া চলিলাম। আমার পূর্ব্ব বাসস্থানাদির মত গাড়ী-জুড়ী, দালান-কোটার ছড়া-ছড়ি এখানে দেখিতে পাইলাম না। গাছপালা-ঢাকা শান্ত নির্জ্জন এ স্থানটি দেখিয়া আমার প্রাণ জুড়াইয়া গেল। বাহন মহাশয় নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। একে একে আমার বন্ধুগণ বিদায় হইতে লাগিলেন। অবশেষে আমাকে বগলদাবা হইতে মুক্ত করিয়া একটি লোকের হাতে দিয়া পিওন চলিয়া গেল। আমিও নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। লোকটি

চাকর শ্রেণীর হইবে,—সে আমাকে একজন বাবুর নিকট পৌঁছাইয়া দিল। বাবু তখন চিৎ হইয়া শুইয়া একখানি বই পড়িতেছিলেন। বয়স আন্দাজ ২৫ হইবে। তিনি আগ্রহের সহিত আমাকে চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। পড়িতে পড়িতে তাহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আমার দৌত্য শেষ হইল। বাবু আমাকে বইএর গর্ভে রাখিয়া দিলেন। সমস্ত দিন আমি বইখানার ভিতরে ছিলাম।

সন্ধ্যার পর অনুমানে বুঝিলাম বাবু বইখানা লইয়া কোথায় চলিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে একটি ঘরে উপস্থিত হইতে শুনিলাম,—কে একজন বলিয়া উঠিলেন—"কি সুরেশ বাবু বইখানা কেমন লাগিল? আপনি ত রবিঠাকুরের একজন পরম ভক্ত।" সুরেশবাবু অর্থাৎ আমি যাঁহার কাছে আসিয়াছি বলিলেন—"ভক্ত ত বটেই। কিন্তু আজকাল রবিঠাকুরের ভাষাটা যেন কেমন হেঁয়ালীপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ চারুবাবুর একখানা বই দেন ত!" বলিতে বলিতে তিনি বইখানা টেবিলের উপর রাখিলেন। ঘরে আরোও লোক আছেন বোধ হইল। অনুমান করিলাম এ ক্লাব-গৃহ। একটু পরেই বইখানা আলমিরাস্থ হইল। আমি পুঁথির গর্ভে হাঁপাইতে লাগিলাম।

দিন দুই পরে কে একজন পুস্তকখানা পড়িতে নিলেন। পুস্তকখানির পাতা উল্টাইতেই আমি লাফ দিয়া ভদ্রলোকটির বুকের উপর গিয়া পড়িলাম। ভদ্রলোকটির বয়স আন্দাজ ২৬।২৭। তিনি শুইয়া শুইয়া পড়িতেছিলেন। একটু চমকিতের মত হইয়া কৌতুহলাবিষ্ট যুবক তাড়াতাড়ি আমার বুকের কথাগুলি পাঠ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। পড়া শেষ হইল, আমিও অনাদৃত ভাবে বিছানার এক কোণে পড়িয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরেই দেখি ভদ্রলোকটি সাজিয়া-গুজিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন।

একটু পরেই আমার প্রতি গৃহিণীর কৃপাদৃষ্টি পতিত হইল। তিনি আমাকে তুলিয়া লইলেন। ইনি যে গৃহিণী তাহা আমি পূর্ব্বেই টের পাইয়াছিলাম। আসা অবধি আমি ইঁহাকে আরো ২।৩ বার দেখিয়াছি। ইহার বয়স আন্দাজ ১৫।১৬ হইবে। বেশ সুন্দর মেয়েটি। স্বামী-স্ত্রীতে খুব ভাব। এই অল্প বয়সের মধ্যে আমি তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। তাহাদের আদর-সোহাগ কথা-বার্ত্তা দেখিয়া-শুনিয়া আমার মত নীরস জড়পদার্থেরও হাসি সামলান দায় হইয়া পড়িয়াছিল।

যাক্ মেয়েটি অপলক দৃষ্টিতে আমার বুকের কথাগুলি পাঠ করিয়া গেল। পড়িতে পড়িতে তাহার মুখ মলিন হইয়া গেল। চোখ ছল ছল করিতে লাগিল। পড়া শেষ হইলে, সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধপ্ করিয়া বিছানায় বসিয়া পড়িল। দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু আমার বুকে আসিয়া পড়িল। আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম, হঠাৎ তার এ পরিবর্ত্তন দেখিয়া। এর হইল কি? চাঁদের মত সুন্দর মুখখানি কোন্ নিদারুণ দুঃখের রাহু আসিয়া হঠাৎ এমনি গ্রাস করিয়া ফেলিল? আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তপ্ত অশ্রুবিন্দু আমার বুকে শেলের মত আসিয়া বিঁধিল। কতক্ষণ পরে মেয়েটি কিসের শব্দে যেন সংবিৎ ফিরিয়া পাইল। উঠিয়া গিয়া আমাকে একটি ছোট বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিল। সেটি ছিল গহনার বাক্স।

পরদিন একেবারে চুপচাপ। যেন বাড়ীতে মানুষ আছে কি নাই। মধ্যে মধ্যে চাকর ছোক্‌রাটীর দুই একটি কথা কাণে আসিল মাত্র। তৃতীয় দিন বুঝিলাম বাবু বাড়ী ফিরিয়াছেন। আসিয়াই তিনি হাসি মুখে স্ত্রীকে সম্ভাষণ করিলেন, অনেক আদর-সোহাগ দেখাইলেন। কিন্তু এক তরফা। এ পক্ষের কোন সাড়া-শব্দ পাইলাম না। ভদ্রলোকটি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—একি তরু, তুমি কথা বলছনা কেন? তোমার কি কোন অসুখ করিয়াছে? মুখ তোমার এত মলিন কেন? এক সঙ্গে তিনি এক ঝুড়ি প্রশ্ন করিয়া ফেলিলেন। স্ত্রী ওরফে তরু অথবা তরুলতা নীরব। ইহার পর বহুক্ষণ কিছুই শুনিতে বা বুঝিতে পারিলাম না।

তখন বোধ হয় রাত্রি কাল। স্বামী শয্যায় শয়ন করিয়া স্ত্রীকে ডাকিলেন। স্ত্রীর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ভদ্রলোকটি আর কি করিবেন? অগত্যা শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া স্ত্রীকে আদর করিয়া লইতে গেলেন। এবার তরুর কণ্ঠ শুনিলাম—"থাক্, থাক্! আর আমাকে সোহাগ দেখাইবার দরকার নাই। বিমলাকে দেখাও গিয়া।" কথাগুলিকে অন্তরের জমাট-বাঁধা অভিমান-রাশি যেন মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশ পাইল।

স্বামী আকাশ হইতে পড়িলেন—বিমলা? বিমলা কে? তুমি একি বলছ, তরু?

তরু—"তুমিই জান বিমলা কে? মনে কর আমি বুঝি কিছু জানি না। আমি সব টের পেয়েছি। কথা নেই, বার্ত্তা নেই, তুমি কোথায় গিয়েছিলে? আর আজ কিছুদিন হতে প্রায়ই তুমি কোথায় যাও? তলে তলে তুমি এত"— সে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বাস্তবিক তরুর জন্য আমার বড় দুঃখ হইল। স্বামীর ব্যবহারে নিশ্চয়ই সে আঘাত পাইয়াছে। কিন্তু আমার সঙ্গে এদুঃখের যে কি সম্পর্ক বুঝিতে পারিলাম না। কারণ আমার আগমনেই তাদের সুখের সংসারে শনি ঢুকিয়াছে।

স্বামী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাহার ব্যগ্র-কাতর কণ্ঠ কাণে আসিল—"তুমি একি বলছ তরু? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। কি হয়েছে খুলে বল!"

হঠাৎ বাক্স খোলার শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে গহনার বাক্সের ডালা উঠিল। তরু আমাকে তাহার স্বামীর সম্মুখে ছুড়িয়া দিয়া বলিল—"এখানা কি?"

তরুর স্বামী আমাকে উঠাইয়া লইলেন—মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, কৌতুক হাস্যে তাহার সমস্ত মুখমণ্ডল ভরিয়া উঠিয়াছে। তিনি আর সামলাইতে পারিলেন না। উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া একেবারে গড়াইয়া পড়িলেন। চকিতে চাহিয়া দেখিলাম, তরু হতভম্বের মত একই ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। রহস্য আরো গভীর হইয়া উঠিল।

হাসির বেগ থামিলে স্বামী বলিলেন—যাক্ মজাটা মন্দ হয় নাই। বেশ একটা ফার্স্ হয়ে গেল। এস এস মানিনী, মানের কারণ এতক্ষণে বুঝা গেল। এই এস, সি, দত্ত তোমার স্বামী শ্রীমান সতীশ চন্দ্রদত্ত নন। ইনি আমাদের সবরেজীষ্ট্রী অফিসের ক্লার্ক সুরেশচন্দ্র দত্ত। বিমলা তাঁরই স্ত্রী। তোমারই মত নতুন স্বামীর ঘর আলো করিতে আসিয়াছেন। বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। বিরহের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া স্বামীকে পত্র লিখিয়াছেন। এই দেখ ঠিকানা।"—বলিয়া সতীশ বাবু আলোর নিকট আমাকে আগাইয়া ধরিলেন।

তরু বোধ হয় খুবই লজ্জা পাইয়াছিল। ঠিকানা দেখিতে তত আগ্রহ প্রকাশ করিল না। কিন্তু কটাক্ষে চাহিয়া সে যে সন্দেহটুকু ভঞ্জন করিয়া লইল। তাহা আমার দৃষ্টি এড়াইল না। তারপর হাসিতে হাসিতে বলিল—কি লেখার ঢং, এতে কার না ভুল হয়। এই যে—

"প্রিয়তম!

তুমি প্রত্যেক সপ্তাহে আসিবে কথা দিয়াছ। তবে গত সপ্তাহে আসিলে না কেন? আগামী শনিবারে না আসিলে তোমার সঙ্গে কথাই বলিব না। আমি পথের দিকে চাহিয়া থাকিব। আসিলে দুই এক রাত্রির বেশী ত তোমাকে রাখা যায় না,—সেখানে যে আমার সতীন বিদ্যমান। আমা অপেক্ষা তার দিকেই টান বেশী। এখানকার সব ভাল। শ্রীচরণে প্রণাম জানিও। ইতি—

শ্রীচরণাশ্রিতা—

বিমলা।"

সতীশবাবু হাসিয়া বলিলেন—বাস্তবিক চিঠিখানা পড়িয়া সন্দেহ হওয়া তোমার অন্যায় হয় নাই। পরশু ত ঠিক শনিবার গিয়াছে—আমি সেদিন বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছিলাম। এর পূর্ব্বেও একটা বিশেষ কাজে আমাকে প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই একবার করিয়া শহরে যাইতে হইয়াছিল।

তরু বলিল—হাঁ সেইজন্যই ও সন্দেহটা আর দৃঢ় হইল। ঘন ঘন বাড়ী হইতে চলিয়া যাও। কোথায় যাও, কেন যাও—জিজ্ঞাসা করিলে শুধু উত্তর দেও বিশেষ কাজে। এতে কোন মেয়ে মানুষের না সন্দেহ হয়।

সতীশবাবু বলিলেন—"একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে বিষয়টা তোমার নিকট গোপন রাখিয়াছিলাম। কিন্তু এখন না বলিলে হয়ত তোমার মনের খুঁৎখুঁতি মিটিবে না। বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন।

তরু লজ্জিত হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—না গো না, আমার সন্দেহ দুর হইয়াছে। বিশেষতঃ তোমাকে অনর্থক সন্দেহ করিয়া আমি পাপ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর।

সতীশবাবু স্ত্রীকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন—"এতে ক্ষমার কিছুই নাই। আমি বরং এতে সুখী হইয়াছি। নিজের ভালবাসার জিনিষের উপর অন্যের ভাগ বসানোর আশঙ্কা জন্মিলে কার না দুঃখ হয়? বিশেষতঃ জিনিষটা যা তা নয়, একেবারে স্বামীরত্ন কি বল? বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

তরু হাসিয়া বলিল -"স্বামীরত্ন নয়, তবে সাহিত্যরত্ন বটে।"

সতীশবাবু হাসিয়া বলিলেন—দাম্পত্য প্রেমের উপাদেয়

ভোজে মধ্যে মধ্যে এরূপ চাট্‌নীর মত হইলে—একঘেয়ে না হইয়া—রসটা জমে ভাল। যাক্ বিষয়টা বলিয়াই ফেলি। আমার লিখিত গল্পের বইখানা ছাপাইবার জন্য তুমি খুব পীড়াপীড়ি করিতে ছিলে না? আমার ঘাড়ে দুষ্ট বুদ্ধি চাপিল। মনে করিলাম গোপনে ছাপাইয়া তোমার নামে উৎসর্গ করিয়া হঠাৎ একেবারে তোমাকে Surprise করিয়া দিব। তাই ছাপার বন্দোবস্ত করা প্রুফ দেখা প্রভৃতির জন্য আমাকে প্রত্যেক সপ্তাহেই এক একবার সহরে যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হইল না।"

তরু—"ওহ তাই নাকি? বইখানির কতদূর ছাপা হইয়াছে?"

সতীশ বাবু—"ছাপা শেষ হইয়া গিয়াছে। পরশু দপ্তরীর ঘরে দিয়া আসিলাম। তারপর হাসিয়া বলিলেন—দেখ, লুকাইয়া পরের চিঠি পড়ার ফল এই।"

তরু সহাস্তে বলিলেন—"তুমি শুধু পড় নাই, পরের চিঠি বাড়ী বহিয়া আনিয়াছ। আর আমি ত তোমার জানিয়াই পড়িয়াছি। দোষটা কার হইল?"

সতীশ বাবু—দোষটা আমারই ষোল আনা স্বীকার করিলাম। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া আনি নাই। সেদিন যে বইখানা পড়িতে আনিয়াছিলাম, চিঠিখানা তারই ভিতরে ছিল। সুরেশ বাবু বোধ হয় এর পূর্ব্বে এখানা পড়িতে নিয়াছিলেন। ভুলক্রমে হয়ত চিঠিখানা বইএর ভিতর রহিয়া গিয়াছিল। ইনি আমাদের পল্লীমঙ্গল পাঠাগারের একজন মেম্বর। আমার সঙ্গে তার খুবই ভাব।"

তরু—"আচ্ছা, সুরেশ বাবু কি এখানে আর একটি বিবাহ করিয়াছেন?"

সতীশবাবু—আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"নাঃ কেন?"

তরু—এই যে তাঁর স্ত্রী লিখিয়াছেন, সতীনের কথা!

সতীশবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন বলিলেন—"সে এক মজার কথা। অফিসে কাজের খুব চাপ। তাই সর্ব্বদা উনি দলিল-পত্র লইয়াই থাকেন। অনেক সময় ছুটিতে বাড়ীতে যাওয়া তাঁর ঘটিয়া উঠে না। তাই তাঁর স্ত্রী দলিল-দস্তাবিজকে সতীন নামে অভিহিত করেন। সুরেশ বাবু একদিন আমাকে একথা বলিয়া খুব হাসাইয়াছিলেন।"

শুনিয়া তরু হাসিয়া কহিল—"স্বামীর কাছে এভাবে পোষ্টকার্ডে চিঠি লেখা লজ্জাও করে না। কার হাতে পড়িবে কে জানে।"

সতীশবাবু বলিলেন—"সুরেশ বাবু নিজেই ডাক রিসিভ্ করেন কি না? তাই অন্য হাতে পড়িবার ভয় নাই। আর যেরূপ ঘন ঘন চিঠি আসে--ব্যয়ের দিকটাও ত দেখিতে হইবে? কিন্তু আমি ভাবিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি যে, ঠিকানাটার প্রতি কি তোমার একটুও নজর পড়ে নাই?"

তরু বলিল—চিঠি পাইলাম তোমার বিছানার উপর। পড়িয়া ত মাথা গেল পনর আনা ঘোলা হইয়া। উল্টাইয়া দেখিলাম স্পষ্ট লেখা আছে এস, সি, দত্ত। আর যায় কোথায়? যে টুকু সন্দেহ ছিল, মিটিয়া গেল। ঠিকানা দেখিবার অবসর কোথায় রহিল?"

সতীশ বাবু হাসিয়া বলিলেন—"তা বটে"।

আমি এক পাশে থাকিয়া সব শুনিলাম। রহস্য যখন প্রকাশ পাইল, তখন আমিও না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার হাসি শীঘ্রই ফুরাইল।

"এই চিঠিখানিই না আমাকে এত কাঁদাইয়াছে,"—বলিয়া কপট ক্রোধে তরু আমাকে জানালা লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া মারিল। জানালার কপাটে আহত হইয়া আমি মেঝেতে গড়াইয়া পড়িলাম। পরদিন চাকর ঘর ঝাড়ু দিয়া আবর্জ্জনার সহিত আমাকে ফেলিয়া দিল। এখনো আমি এই আস্তাকুড়ে পড়িয়া আছি। একদিন আলো বাতাসের জন্য পাগল হইয়া উঠিয়া ছিলাম। এখন তাহা এত বেশী পাইতেছি যে, পাওয়ার চোটে প্রাণ যায় যায় আর কি? বৃষ্টিতে ভিজি—রৌদ্রে শুকাই। জানি না ভবিষ্যতে অদৃষ্টে আরও কি আছে?

মোহাম্মদ আলী

মোহাম্মদ আকরম খাঁ

মাওলানা মোহাম্মদ আলীর কর্ম্মময়, সংগ্রামময় জীবনের অবসান হইয়াছে। দুই যুগের সব যশ-অপযশকে অতিক্রম করিয়া, সব সাধনা ও সংঘর্ষকে পশ্চাতে রাখিয়া, দূর প্রবাসে তাঁহার পার্থিব জীবনের অবসান হইয়াছে। এই নিদারুণ সংবাদ ভারতবর্ষের দিকে দিকে যে গভীর মর্ম্মবেদনার সৃষ্টি করিয়াছে এবং মোহাম্মদ আলীর স্বজাতীয় ও স্বদেশবাসীরা যেরূপ আন্তরিক আবেগ সহকারে সমবেত কণ্ঠে এই বেদনার অভিব্যক্তি করিয়াছেন, মানুষের ইতিহাসে তাহা অতি বিরল, অতি দুর্লভ। বস্তুতঃ জ্ঞানে-প্রতিভায়, ত্যাগে-সাধনায়, সংঘর্ষে-সংঘাতে, জয়ে-পরাজয়ে মোহাম্মদ আলির জীবন যেমন অপ্রতীম, আদর্শের মহিমায় এবং শেষবাণীর সার্থকতায় তাঁহার মরণও সেইরূপ অসাধারণ, অতুলনীয়।

মোহাম্মদ আলীকে তাঁহার সত্যরূপে বুঝিবার, বৈশিষ্ট্যগুলিকে সম্যকরূপে অনুভব করিবার এবং নিজেদের সেই অনুভূতিগুলিকে ভাষার মধ্যদিয়া প্রকাশ করার চেষ্টা তাঁহার সহকর্ম্মী এবং তাঁহার গুণগ্রাহী বন্ধু বান্ধবদিগের মধ্যে অনেকেই করিতেছেন। এই প্রচেষ্টা যে সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত হইতেছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃই মোহাম্মদ আলীর জীবন একটা সাধারণ ব্যাপার ছিলনা—তাঁহার মৃত্যুকেও কোন মতে একটা সাধারণ ব্যাপার বলা যাইতে পারে না। বিলাত-প্রত্যাগত যুবক মোহাম্মদ আলি, বরদা পরিত্যাগ করিয়া যে দিন প্রথম "কমরেড" বাহির করেন, সেই হইতে মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, বিভিন্নমুখী সাধনা ও সংঘর্ষের মধ্যদিয়া, স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি কর্ম্মকেন্দ্রে তিনি যে চেতনার উদ্রেক করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার গুরুত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

মোহাম্মদ আলির কর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভ হইতেই তাঁহার সহিত পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। ভাবের, চিন্তার, সাধনার ও আদর্শের অভিন্নতা হেতু এই পরিচয় ক্রমে ক্রমে গভীর আত্মীয়তায় পরিণত হয়। এই দীর্ঘকালের নিবিড় পরিচয়ের মধ্য দিয়া আমিও কতকটা মোহাম্মদ আলিকে চিনিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। পাশ্চাত্যের শিক্ষা-সভ্যতার মোহে মশগুল মিঃ মোহাম্মদ আলিকে দেখিয়াছি, আলিগড়ের ভাবধারায় তন্ময় সংস্কারবাদী মোহাম্মদ আলীর মুখে কত নির্ম্মম মন্তব্য শ্রবণ করিয়াছি—আবার সেই মোহাম্মদ আলিকে মাওলানা মাহমুদুল হাছান ও মাওলানা আবদুলবারীর নিকট নতজানু হইয়া দীক্ষাগ্রহণ করিতে দেখিয়াছি, পাশ্চাত্যের সভ্যতা ও আদর্শের প্রধানতম বৈরীরূপে তাঁহার সেই জ্বলন্ত বাণীগুলিও শ্রবণ করিয়াছি। প্রথম জীবনে মোছলেম লিগ প্রতিষ্ঠার একজন প্রধানতম অগ্রণী তিনি, লিগের তৎকালীন নীতি সমর্থনের প্রবলতম নায়ক তিনি, মাওলানা মজহারুল হক, মিঃ রছুল প্রভৃতির ভীষণতম পরিপন্থী তিনি। অল্পদিনের অভিজ্ঞতার পর তিনিই আবার মোছলেম লিগকে সেই হীননীতি হইতে মুক্ত করার জন্য কঠোর কণ্ঠে সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন, লিগকে মুক্ত করিয়া তবে ক্ষান্ত হইলেন! ক্রমে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করিলেন, কংগ্রেসের সভাপতি হইলেন। শেষ জীবনে কোন কোন বিষয়ে মতভেদ হওয়া সত্বেও, তিনি কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে যোগদান করিতে বিরত হইলেন না। এই সমস্ত ব্যাপার একদিনে, এক কথায় বা অল্প চেষ্টায় সমাধিত হয় নাই। এজন্য তাঁহাকে তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে, বহু ঝড়-ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করিতে এবং তাহাতে পড়িয়া বিপন্ন হইতে হইয়াছে। মুছলমান সমাজের যে সব মহাজন আজ গুরু-গম্ভীর শব্দ-সমাস প্রয়োগ করিয়া মোহাম্মদ আলির অকাল মৃত্যুতে শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই মোহাম্মদ আলিকে আজীবন নানাভাবে, নানাপ্রকারে, অতি জঘন্য ভাষায় আক্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। বিধর্ম্মীর দেওয়া কারাযন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে স্বধর্ম্মীদের নিক্ষিপ্ত এই বিষবাণগুলিই ছিল মোহাম্মদ আলির জীবনের সর্ব্বপ্রধান বিপদ, সর্ব্বপ্রধান পরীক্ষা এবং সর্ব্বপ্রধান বিভীষিকা। এই সব

বিপদ ও বিভীষিকাকে অতিক্রম করিয়া বীর মোহাম্মদ আলির কর্ম্মময় জীবন কি উপায়ে এবং কোন কোন উপকরণের সহায়তায় অসাধারণ বিজয়-গৌরবে মণ্ডিত হইয়াছিল, তাহার সুগভীর ও সবিস্তার আলোচনা হওয়া একান্ত আবশ্যক। মোহাম্মদ আলির জীবনের সত্যকার আদর্শকে, তাহার প্রকৃতরূপে গ্রহণ করিতে না পারিলে এবং সে আদর্শকে জাতির সম্মুখে উজ্জলরূপে তুলিয়া ধরিতে না পারিলে, আমাদের পক্ষে তাহা অতীব দুর্ভাগ্যের কারণ হইবে। কারণ, একটা জাতির মধ্যে মোহাম্মদ আলীর ন্যায় ব্যক্তিত্বের খুব কচিতই আবির্ভাব হয়। বাঙ্গলার চিন্তাশীল ও শক্তিমান লেখকগণ এদিকে মনোযোগ দিলে, বিশেষ আনন্দের কারণ হইবে।

মোহাম্মদ আলির জীবন শতগুণে উজ্জল এবং শতগুণে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার এই অসাধারণ, অভূতপূর্ব্ব 'ঐতিহাসিক' মরণে। মৃত্যুর কএক সপ্তাহ মাত্র পূর্ব্বে, লণ্ডন কনফারেন্সের প্রাথমিক অধিবেশনে, মোহাম্মদ আলির সিদ্ধ-বাক-কণ্ঠ যে ভীষণ ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করিয়াছিল, তাহা অতি নিদারুণ ভাবে অক্ষরে অক্ষরে সার্থক হইয়াছে। মোহাম্মদ আলির আত্মার আকাঙ্ক্ষা সফল হইয়াছে—আল্লাহ আর তাঁহাকে এই গোলামের দেশে ফিরিতে দেন নাই। আত্মার তেজ দিয়া, ঈমানের শক্তি দিয়া, নিজের মরণকে এমন ভাবে জীবন্ত করিয়া রাখিয়া যাইতে পারে, এরূপ সৌভাগ্য দুনয়ার কয়জন মানুষের অদৃষ্টে সম্ভব হইয়াছে? লক্ষ কণ্ঠে কোটি কোটি বার সে অগ্নিবাণী আবৃত্ত হইয়াছে, অযুত প্রাণে তাহা নূতন চেতনার উদ্রেক করিয়াছে। আজ তাঁর স্বধর্ম্মীদিগকে বিশেষ করিয়া বলিতেছি—ঐ বাণীকে সার্থকভাবে শ্রবণ করিতে, তাহার তেজকে সত্যকারভাবে গ্রহণ করিতে। ঐ শোন তোমার মরণ-উন্মুখ নেতা, দাস-জীবনের তীব্রযাতনায় অস্থির হইয়া ঘোষণা করিতেছেন:—"To-day the one purpose for which I come is this—that I want to go back to my country only if I can go back with the substance of freedom in my hand. other wise I will not go back to a slave country. I would even prefer to die in a foreign country so long as it is a free country. If you do not give us freedom in India, you will have to give me a grave here." "আজ একমাত্র যে উদ্দেশ্য লইয়া আমি আসিয়াছি, তাহা হইতেছে যে, ভারতের জন্য স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার অর্জ্জন। একমাত্র সেই অধিকার লইয়াই স্বদেশে ফিরিব। তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে আমি আর দাস-ভারতে ফিরিয়া যাইব না। এই বিদেশে, যেখানে এখনও স্বাধীনতা আছে, সেইখানেই দেহত্যাগ করিব। ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীনতা না দেওয়া হয়, তাহা হইলে আপনাদের আমাকে এইখানে কবর দিতে হইবে।"

কি তীব্র জ্বালা! কি প্রাণান্তক মুমুক্ষা। এই জ্বালার অংশ ভাগী যে নয়, এই মুমুক্ষার সম্মান করার শক্তি যাহার নাই—মোহাম্মদ আলির জয়জয়কারের হট্ট রোল তুলিয়া সে যেন তাঁহার সাধনাকে, তাঁহার স্মৃতিকে এবং তাঁহার অমর অগ্নিবাণীকে অপমানিত না করে। দাসভারতের গোলামীর অভিশাপই যাহাদের মানব জীবনের পরম কাম্য, চরম সার্থকতা, এই দাসত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও জয়যুক্ত করিয়া রাখাই যাহাদের মোছলেম জীবনের চরম সার্থকতা—মোহাম্মদ আলির প্রতি শ্রদ্ধাতর্পনের অধিকার তাহাদের নাই। আশা করি, প্রার্থনা করি, এই শ্রেণীর ভণ্ড-ভক্তের সংখ্যা মুছলমান সমাজে দিন দিনই কমিয়া যাইবে। মোহাম্মদ আলি মুক্তির জন্য মরিয়াছেন, স্বাধীনতার জন্য স্বেচ্ছায় আত্মদান করিয়াছেন—এই মুক্তির সাধনাই তাঁহার আত্মার প্রতি সত্যকার শ্রদ্ধাতর্পন।

প্রাণত্যাগের কএক ঘণ্টা পূর্ব্বে, যখন তাঁহার সর্ব্বশরীর মৃত্যুর আবেশে অবশ হইয়া আসিতেছে, তখনও তাঁহার মুমুক্ষু আত্মা পূর্ণতেজে জাগ্রত, তখনও তিনি স্বদেশের স্বাধীনতার চিন্তায় তন্ময়-তদ্গত। সেই সময় তিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাই তাঁহার জীবন-ইতিহাসের উপসংহার, তাহাই তাঁহার অমর জীবনের শুভ সূচনা। লণ্ডনের এক বেতার বার্ত্তায় প্রকাশ—The letter is written with the usual force of Moulana. কোন মহান উদ্দাম দুর্দ্দম আত্মা-শক্তি মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাহার ভাষার এই অসাধারণ তেজকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ভাবিবার বিষয়। এই পত্রে মোহাম্মদ আলি বলিতেছেন—"We want to go back not just with seperate electorates or with weitage but with freedom for India including freedom for Mussalmans and unless we secure that I can assure the Premier that the Mussalmans will join the Civil Dis-obedience movement with the least hesitation."

"মাত্র স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন অথবা কিছু অধিক আসন লইয়া ফিরিয়া যাইতে চাহি না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, ভারতের মুছলমানদের স্বাধীনতা যাহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, একমাত্র তাহা লইয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারি। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে আমি প্রধান-মন্ত্রীকে আমার স্থির বিশ্বাস জানাইতেছি যে, ভারতের মুছলমানগণ বিনা দ্বিধায় আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিবে।"

তোমারে স্মরণ করি

স্মরণাতীত হে বীর-কেশরী

কলিকাতা গড়ের মাঠে
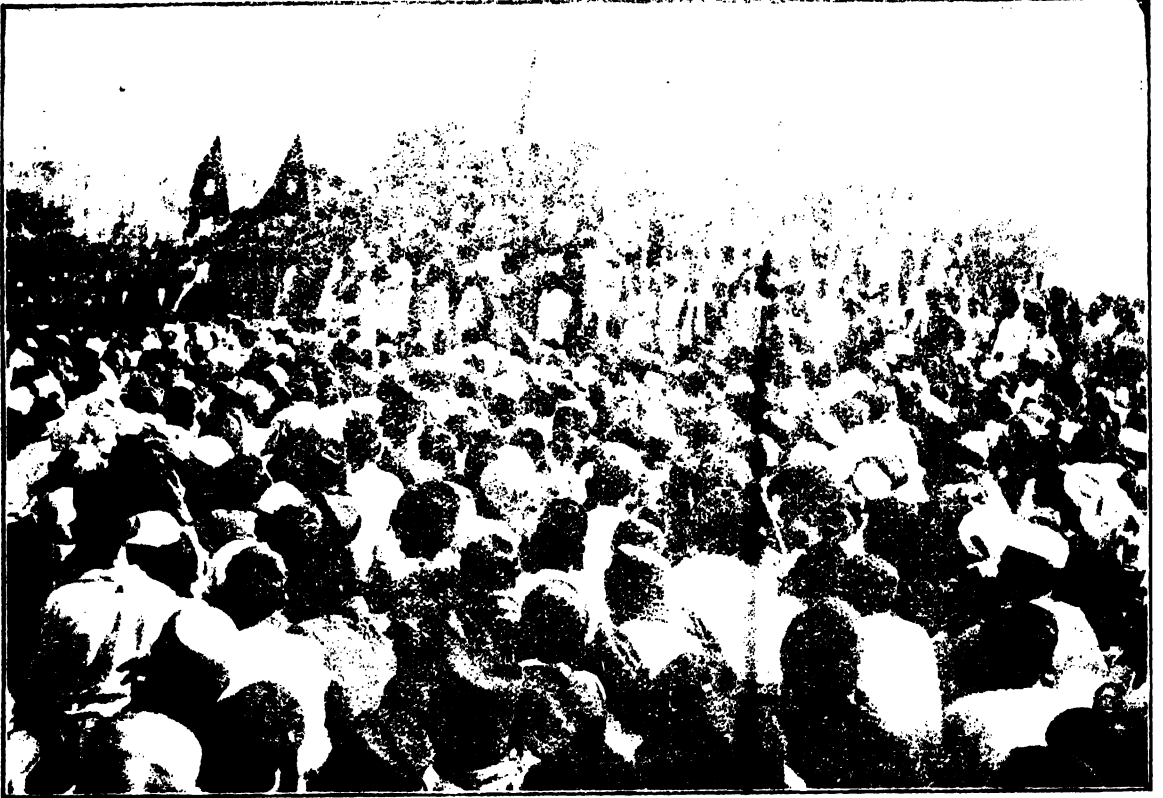
মরহুম মওলানার স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিরাট শোক-সভার এক অংশ—৫ই জানুয়ারী

"মৃত্যুকেই যদি ভয় করিতে হয়'
তবে জীবন নিরর্থক।
শুধু বাঁচিয়া থাকিবার এই উদগ্র লোভ
এই তো মৃত্যু।
প্রেমের মরণ-আকুল তরঙ্গে ঝাপাইয়া পড়!
তাহাতেও আছে লাভ, আছে শান্তি!
যদি ডুবিয়া যাও, তাহাতেই বা কি?
হে 'জওহর', ভাবিতেছ কি?
ভাণ্ডারে নগদ যাহা কিছু জমা হইয়াছে,
আজ সব দাও সম্পূর্ণ ভাবে।"

—কবি মওলানা মোহাম্মদ আলী

"আজ এই দূর প্রবাসে স্বদেশের
সুবাস আসে কৈ?
কাননের কণ্টক-বেড়'র ওপারে
কি কুসুমের সুবাস যায় না?
কুসুমের আছে সৌরভ।
হে আমার স্বদেশ, তোমার
স্মৃতিই তোমার সুবাস।
যতদূরে থাকি, পাখীর মত
আমারও মন,
তোমার গন্ধের ফাঁদে
ধরা পড়িবেই।"

—কবি মওলানা মোহাম্মদ আলী
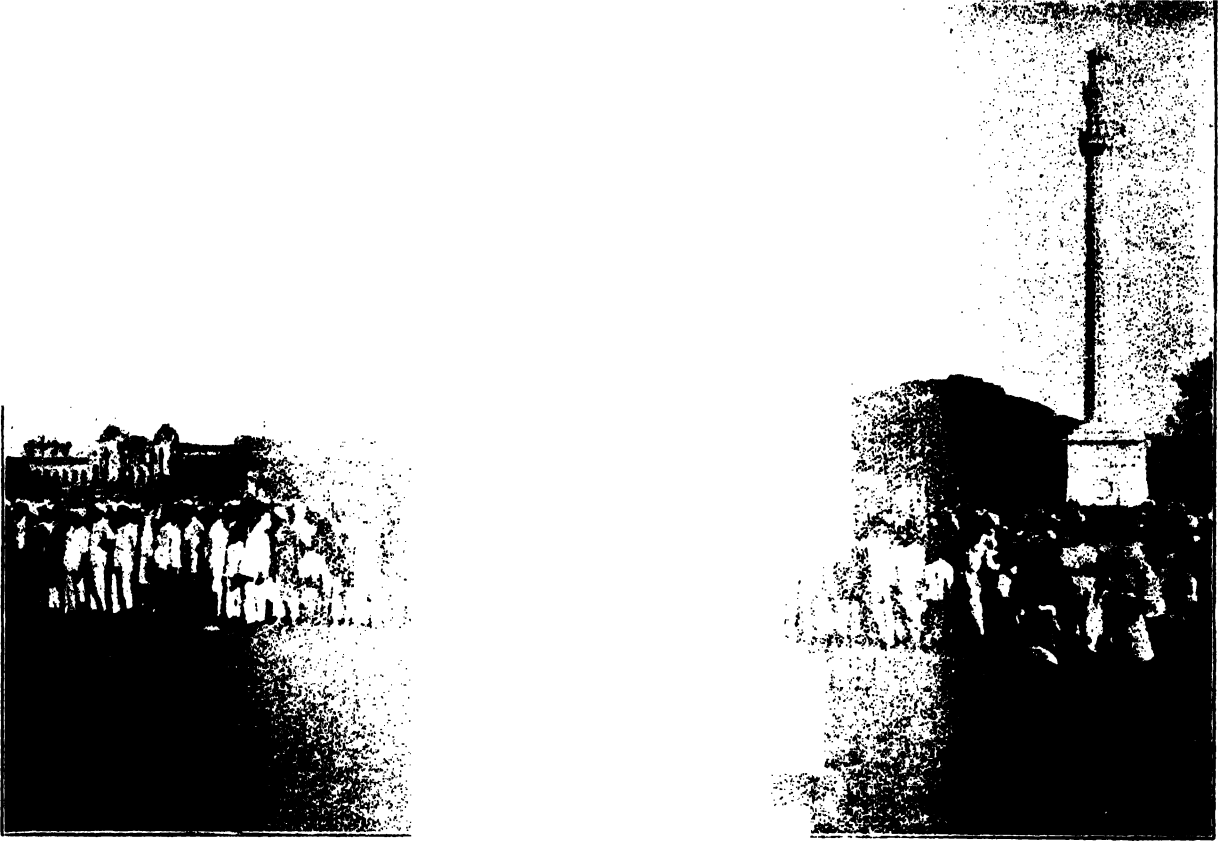
কলিকাতা-কেল্লার ময়দানে জানাজার নমাজের দৃশ্য —৫ই জানুয়ারী।

জনতার আহ্বানে লণ্ডনে মরহুম মওলানা
হস্তোত্তলন দ্বারা অভিবাদন জানাইতেছেন।

জানাজায় যোগদান করিবার জন্ত শহর ও শহর-তলীর বিভিন্ন দিক হইতে দলে দলে লোক কালো পতাকা সহ আসিতেছে (৫ই জানুয়ারী)

ভারত হইতে চির-বিদায়ের কালে

দুই বীর-পুত্রসহ বীর-জননী বি-আম্মা বেগম

অন্তরীণের পূর্ব্বে অভেদ-আত্মা দুই ভাই
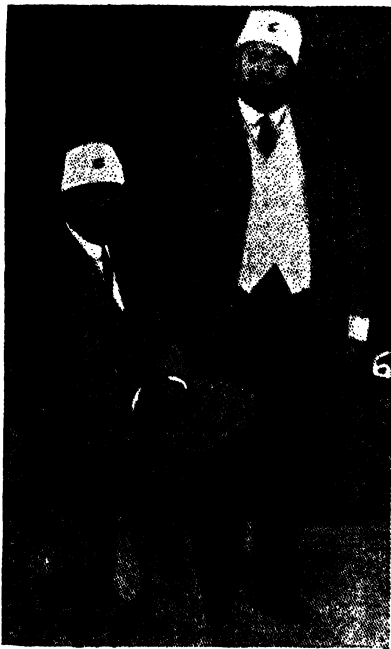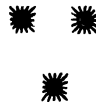
অন্তরীণ হইতে মুক্ত দুই পুরুষ-সিংহ

সঙ্গীহীন 'শেরে-হিন্দ্' শওকৎ আলী

মরহুম মওলানার ইংরাজী হস্তাক্ষর

Stand upright, speak thy thought, declare
The truth thou hast that all may share
Be bold, proclaim it everywhere
They only live who dare — Mohamed Ali
29. 10. 27

[অনুবাদ]

"চির-উন্নত-শীর্ষ হও। নির্ভয়ে ঘোষণা কর তোমার অন্তরের কথা। সত্য বলিয়া অন্তরে যাহা উপলব্ধি করিয়াছ, অন্তরে তাহা গোপন করিয়া রাখিও না— তোমার অন্তরের সত্যের ভাণ্ডারে সকলকেই শরীক করিয়া লও। নির্ভীক হও। চিত্ত যার ভয়স্পর্শহীন, তারই একমাত্র অধিকার বাঁচিয়া থাকিবার।"

—২৯।১০।২৭

মছজেদে ভূমা। যেখানে সংগ্রাম-অন্তে
চির-বীর-সৈনিক বিশ্রাম লাভ করিবে।
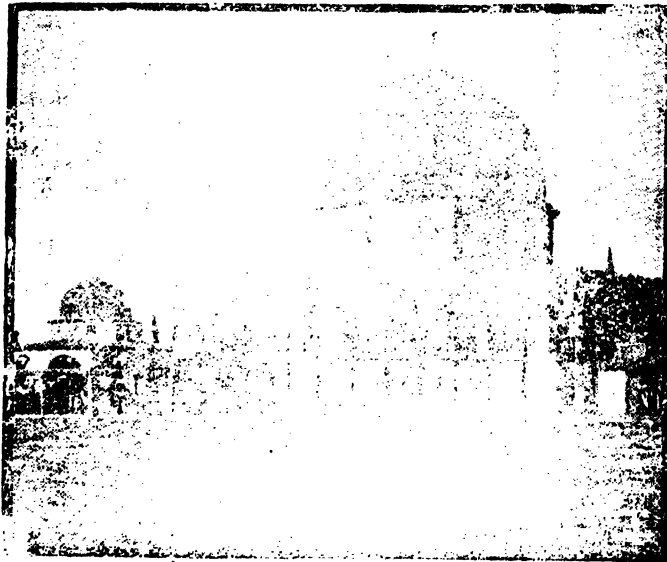
ভারতের নূতন বড়লাট

লর্ড ওয়েলিংডন

আগামী মার্চ্চ মাসে লর্ড আরউইনের কার্য্যকাল শেষ হইলে লর্ড ওয়েলিংডন আগামী ১লা এপ্রিল হইতে বড়লাটের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। ইনি অলিভার ক্রমওয়েলের বংশধর। ১৯১৩ সালে ইনি বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণর হইয়া ভারতে আসেন। ১৯১৯ সাল হইতে ইনি পুনর্ব্বার মাদ্রাজের গভর্ণর রূপে নিযুক্ত হন। তৎপরে ইনি কানাডার গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হন। বর্ত্তমানে ইঁহার বয়স ৬৪ বৎসর।

ভারতের নব হাই-কমিশনার

স্যার বি, এন, মিত্র

ভারতের হাই কমিশনার স্যার অতুল চ্যাটার্জ্জীর কার্যকাল অবসানে স্যার ভুপেন্দ্রনাথ মিত্র উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইহার পুর্ব্বে ইনি ভারত সরকারের অর্থ-বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। লণ্ডনে তাঁহার অফিসের টেবিলে কার্য্যরত অবস্থায় এই ফটো গ্রহণ করা হয়।

কলিকাতার নূতন শেরিফ

মিঃ প্রফুল্লনাথ ঠাকুর

কলিকাতার অন্যতম বিশিষ্ট নাগরিক, বিখ্যাত ঠাকুর-বংশের শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় কলিকাতার নূতন শেরিফ হইয়াছেন। গত ২০শে ডিসেম্বর হইতে এক বৎসরের জন্য ইনি শেরিফের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যেক বৎসর-অন্তে কলিকাতায় পর্য্যায়ক্রমে একজন য়ুরোপীয় এবং ভারতীয় শেরিফের পদে নিযুক্ত হন। কলিকাতা হাই-কোর্টের মধ্যেই শেরিফের কার্য্যালয় এবং শেরিফকে তাঁহার কার্য্যালয়ের খরচ স্বয়ং বহন করিতে হয়। প্রফুল্লবাবু স্বনামখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পৌত্র। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীটের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গের বিশিষ্ট ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রফুল্লবাবু অন্যতম।

পরলোকে
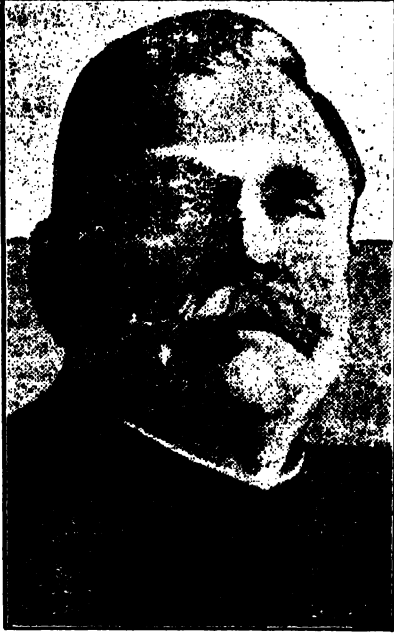
গত মহাযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি
ফিল্ড মার্শাল জোফার

বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের অন্যতম প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল জোফার গত ৩রা জানুয়ারী ফ্রান্সের রাজধানীতে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। গত মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মাণ বাহিনী যখন প্যারীর দিকে অগ্রসর উদ্দেশ্যে ফ্রান্সকে প্রবল পরাক্রমে আক্রমণ করে, তখন ফরাসী সেনাপতি জোফার মার্ণের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে জার্ম্মাণদের প্রথম প্রতিহত করেন। সেই হইতে তাঁহাকে 'মার্ণে বিজয়ী বীর' হিসাবেই উল্লেখ করা হয়। গত মহাযুদ্ধের সময় যে সমস্ত ব্যক্তি জগতের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ফিল্ড মার্শাল জোফার ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৯ বৎসর ছিল।

নোবেল-প্রাইজধারী

পাঠকবর্গ হয়ত অবগত আছেন যে এ বৎসরের সাহিত্যের জন্য জগৎ-খ্যাত নোবেল প্রাইজ পান, আমেরিকার বিখ্যাত সাহিত্যিক মিঃ সিন্‌ক্লেয়ার লুইস্। সম্প্রতি অধ্যাপক রমণ এবং অন্যান্য নোবেল প্রাইজধারীর সহিত ইনিও নরওয়ের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া এই সম্মান গ্রহণ করিয়াছেন।

মিঃ সিন্‌ক্লেয়ার লুইস

স্থাপত্য-শিল্পের অপরূপ সৃষ্টি

নাখোদা মছজেদ

প্রারম্ভিক অবস্থায়
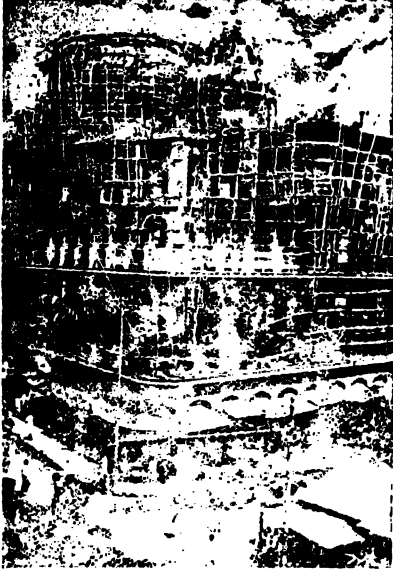
সমাপ্ত-প্রায় অবস্থায়
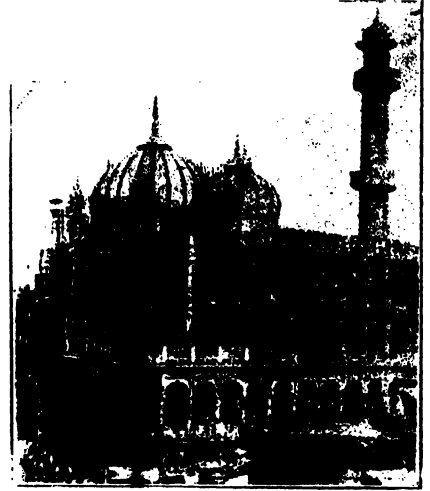
কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কলিকাতার বিখ্যাত নাখোদা মছজেদের নব-নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে। নির্ম্মাণ-সৌষ্ঠবের দিক দিয়া এই মছজেদকে ভারতে অতুলনীয় করিয়া গড়া হইয়াছে। ইহাতে পনেরো লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে এবং ইহাতে এক সঙ্গে ১৮ হাজার নামাজীর স্থান সঙ্কুলান হইবে। প্রধান গুম্বজটী ১১৭ ফিট এবং এই মছজেদে সর্ব্বশুদ্ধ ২৫টী মিনার আছে। কলিকাতা প্রবাসী কাচ্ছিমেমন মুছলমানদিগের বদান্যতাই এই নব-নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য দায়ী।

পাঞ্জাবের লাট

স্যার জিওফ্রে মণ্টমরেন্সী

লাহোর, ২৩শে ডিসেম্বর অপরাহ্নকালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন উৎসবে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার পাঞ্জাবের গবর্ণর স্যার জিওফ্রে ডি মণ্টমোরেন্সীর উপর ঘৃণিত আক্রমণ হয়। লাট বাহাদুরের গায়ে দুইটী গুলী লাগে। একজন সাব-ইনস্পেক্টর গুলীর আঘাতে নিহত হয় এবং আরও দুইজন আহত হন। আততায়ী হরিকিষণ সেই স্থানেই গ্রেপ্তার হয়।

প্রাচ্যে নারী-প্রগতি

পারস্যের নারী-আন্দোলনের নেত্রী

জোহ্‌রা হানুম হায়দারী

বর্ত্তমানে য়ুরোপের আদর্শানুসরণে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে নারী-স্বাধীনতার যে প্রবাহ আসিয়া পড়িয়াছে, বর্ত্তমান পারস্যেও তাহা দেখা দিয়াছে। জোহ্‌রা হানুম হায়দারী পারস্যের এই নারী-স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন প্রধানতম নেত্রী। ইনি একবার বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া মার্কিণ যাত্রা করেন। এ বৎসরও পারস্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য ইনি মার্কিণ যাত্রা করিয়াছেন।

ভোট-আন্দোলনে

বর্ত্তমান তুরস্কে নারীর ভোটাধিকার প্রাপ্তির সঙ্গে তুরস্ক রাজনীতিতে এক নূতন যুগ দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমান চিত্রে দেখা যাইতেছে যে দলবদ্ধ হইয়া নারীরা ভোট দিবার জন্য যাইতেছেন।

তুরস্ক রমণী

পূর্ব্ব বগুড়ায় দুর্ভিক্ষ

পূর্ব্ব বগুড়া রিলিফ কন্‌ফারেন্স

পূর্ব্ব বগুড়া রিলিফ কনফারেন্সে দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারী বগুড়া জেলা রিলিফ কমিটীর সেক্রেটারী মওলবী রজিবুদ্দিন তরফদার ছাহেবের নিকট চাল ও কাপড় ভিক্ষা লইবার জন্ত দলে দলে কুতুবপুর ডাকবাংলা প্রাঙ্গণে সমবেত হইতেছে।

বগুড়া জেলা রিলিফ কমিটীর কর্ম্মীগণ

বগুড়া জেলা রিলিফ কমিটীর কর্ম্মিগণ। মধ্যস্থলে সেক্রেটারী মৌলবী রজিবুদ্দীন তরফদার উপবিষ্ট।

ভাইস-চ্যান্‌সেলর

স্যার আবদুর রহমান

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্‌সেলর স্যার মতি সাগরের আকস্মিক মৃত্যুতে স্যার আবদুর রহমান উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যানসেলর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

কামাল পাশা

তুরস্কের অন্তর্গত মেনেমেন এবং মেঙ্গেসিয়া জেলার প্রাচীনপন্থী দলের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহারা আবার কোরআনের অনুশাসন অনুসারে মোল্লাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশ শাসনের বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা করেন। কোরআনের উক্তিলিখিত বড় বড় পতাকা সহ একটা মিছিল স্মার্ণার পথে বাহির হইয়াছিল। পুলিসের সহিত ইহাদের সংঘর্ষ হয়। কামাল পাশার আদেশ অনুযায়ী বিভিন্ন স্থান হইতে হাজার লোককে গ্রেফতার করা হইয়াছে। ধৃতব্যক্তিদের মধ্যে মওলবী, মওলানা, শেখ, দরবেশ, ইমাম এবং স্ত্রীলোকগণ রহিয়াছেন।

বৈমানিক

মিঃ মোরাদ

আগা খাঁর পুরস্কারের জন্য গত ২৮শে ডিসেম্বর করাচী হইতে কেপটাউন অভিমুখে যাত্রা করেন। বোসরার সংবাদে প্রকাশ যে দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার পোত সহিবার নিকট অবতরণের সময় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মিঃ মোরাদ অক্ষতদেহে রক্ষা পাইয়াছেন।

গোল টেবিল বৈঠক

লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের দৃশ্য। প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতেছেন। সম্মুখে অলোয়ারের মহারাজা।

মিলন-প্রয়াসী

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

সংবাদে প্রকাশ যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ গোলটেবিল বৈঠকে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা আলোচনায় যোগদান করিয়াছেন।

নিখিল ভারত
মোছলেম শিক্ষা সম্মেলনের

সভাপতি
ডাঃ রাছ মাহ্‌মুদ

Printed and Published by Md. Khairul Anam Khan from the "Mohammadi Press,
91, Upper Circular Road, Calcutta.

স্বদেশী মূলধনে
গঠিত ও দেশীয়
লোকের পরিচালিত
কারখানায় প্রস্তুত
সকল প্রকারের

লিলি বিস্কুট

বিশুদ্ধ মুখরোচক ও স্বাস্থ্যকর।

তেজিটেবেল ঘি ও চর্ব্ব-বর্জ্জিত, আধুনিক রুচি অনুযায়ী সকল প্রকারের বিস্কুট প্রস্তুত হয়।

দি লিলি বিস্কুট কোং

কলিকাতা।

চির বাঞ্ছিত
গৌরবোজ্জ্বল
সৌন্দর্য্যের
অনন্ত উৎসব

"সুষমা"

সুরভি কেশ তৈল

চূর্ণ কুন্তলে রেশমী আভা,
তাতেই বাড়ে মুখের শোভা।

পি, সেন্ এণ্ড কোং,

কলিকাতা।

"আনন্দেরই সাগর থেকে
এসেছে আজ বান"

তালিকার জন্য আজই লিখুন।

এম.এল.সাহা লিঃ

সর্ব্বপ্রধান রেডিয়োযন্ত্র বিক্রেতা

৫৩, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭সি, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট,

ঢাকা (কারখানা ও হেড্ আফিস), কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৫২।১ বিডন ষ্ট্রীট, ২২৭ হ্যারিসন রোড, ১৩৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ১০৯ আশুতোষ মুখার্জি রোড, শ্যামবাজার গোলাবাড়ীতে নূতন ব্রাঞ্চ। অন্যান্য ব্রাঞ্চ—ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, মাদারীপুর, কুষ্টিয়া, চট্টগ্রাম, রঙ্গপুর, শ্রীহট্ট, গৌহাটী, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, সিরাজগঞ্জ, মেদিনীপুর, বহরমপুর, রাজসাহী, ভাগলপুর, পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, গোরক্ষপুর, দিল্লী, মান্দ্রাজ ও রেঙ্গুন প্রভৃতি।

ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অকৃত্রিম ও সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

(১৩০৮ সনে স্থাপিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ জগতে যুগান্তর আনিয়াছে)

চ্যবনপ্রাস—৩৲ সের। সর্দ্দি, কাসি, স্নায়বিকদুর্ব্বলতায় মহোপকারী।

সারিবাদ্যরিষ্ট — ৩৲ সের। সর্ব্ববিধ রক্তদুষ্টি, সর্ব্ববিধ বাতের বেদনা, স্নায়ুশূল, গেঁটেবাত, ঝিঁঝিবাত প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় প্রশমিত করে।

অমৃতারিষ্ট—ম্যালেরিয়া এবং পুরাতন জ্বরের মহৌষধ ৸০ শিশি।

বসন্তকুসুমাকর রস—৩৲ সপ্তাহ। বহুমূত্রের অব্যর্থ মহৌষধ।

চতুর্গুণ স্বর্ণঘটিত ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত।

সিদ্ধ মকরধ্বজ—২০৲ টাকা তোলা। সকল প্রকার ক্ষয়রোগ, স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্য প্রভৃতির শক্তিশালী অব্যর্থ মহৌষধ।

নেত্রামৃতং—যাবতীয় চক্ষুরোগের মহৌষধ। ৷৷০ শিশি।

কলেরান্তক—বহু পরীক্ষিত কলেরার আশ্চর্য্য মহৌষধ ৷৷০ শিশি।

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর ঢাকা শক্তি ঔষধালয় পরিদর্শন করিয়া হরিদ্বারের কুম্ভমেলার অধিনায়ক মহাত্মা শ্রীমৎ **ভোলানন্দ গিরি** মহারাজ অধ্যক্ষকে বলিয়াছিলেন,—"এছাকাম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলিমে কোʼই নেই কিয়া, আপতো রাজ চক্রবর্ত্তী হ্যায়।

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী গবর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় ও বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর **লর্ড লীটন** বাহাদুর—এরূপ বিপুল পরিমাণে দেশীয় উপাদানে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতকরণ নিশ্চয়ই অসাধারণ কৃতিত্ব (a very great achievement)।" বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর **লর্ড রোনাল্ডসে** বাহাদুর—এই কারখানায় এত বহুল পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত হয় দেখিতে পাইয়া আমি **বিস্ময়াবিষ্ট** (astonished) হইয়াছি ইত্যাদি ইত্যাদি।"

বিহার ও উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব **গভর্ণর স্যার হেনরী হুইলার** বাহাদুর—"আমার এরূপ ধারণাই ছিল না যে, দেশীয় ঔষধ এরূপ বিপুল আয়োজনে ও পরিমাণে কোথাও প্রস্তুত (manufactured) হয়।"

দেশবন্ধু সি, আর, দাস—শক্তি ঔষধালয়ের কারখানায় ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আশা করা যায় না।" ইত্যাদি—

(ষড়গুণবলিজারিত স্বর্ণঘটিত)
মকরধ্বজ—৮৲ তোলা

(স্বর্ণঘটিত)
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল—৬৲ সের। সর্ব্বজন প্রশংসিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত মহোপকারী কেশ তৈল।

অশোক ঘৃত—৬৲ সের। স্ত্রীরোগ, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর ও বাধক বেদনার মহৌষধ।

দশনসংস্কার চূর্ণ—৵০ আনা কৌটা। যাবতীয় দন্তরোগের মহৌষধ। সকল বড় দোকানেই পাওয়া যায়।

বৃহৎ খদির বটিকা—৵০ আনা কৌটা (কণ্ঠশোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, আয়ুর্ব্বেদোক্ত তাম্বূলবিলাস)

দাদমার—৵০ আনা কৌটা। দাদ ও বিখাজের অব্যর্থ মহৌষধ।

মরিচাদি মলম—৵০ কৌটা এই চারিটি ঔষধে পাইকারদের **উচ্চহারে কমিশন** দেওয়া হয়। নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন।

চিঠি, পত্র, অর্ডার, টাকাকড়ি প্রভৃতি পাঠাইতে সর্ব্বদাই প্রোপ্রাইটারের নাম উল্লেখ করিবেন।

নানাপ্রকার রোগের বিবরণ ও তাহার চিকিৎসা আমাদের ক্যাটালগে পাইবেন, ইহা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়, আজই পত্র লিখুন

N. B. কবিরাজ মহোদয়গণের জন্য উচ্চহারে কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

প্রোপ্রাইটার—মথুরামোহন মুখোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তী, বি, এ, (রিসিভার)

Printed at The "Mohammadi Press" 91 Upper Cricular Road, Calcutta.

সম্পাদক—মোহাম্মদ আকরম খাঁ

বর্ন্‌ভিলে কোকো
হওয়া চাই-ই
যদি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এবং সব চেয়ে বিশুদ্ধ কোকো ব্যবহার করিতে চান, তাহা হইলে বর্ন্‌ভিলের কোকোই ক্রয় করিবেন। বর্ন্‌ভিলের কোকো পান করিতে যেমন সুস্বাদু, তৈয়ারী করিতেও সেইরূপ কোনও হাঙ্গামা নাই। ইহাতে খাদ্য-গুণ বিশেষভাবে আছে এবং সহজেই হজম হয়, সেই জন্য ইহা শরীরে নব-শক্তি আনিতে পারে। আপনি প্রত্যহ বর্ন্‌ভিলে কোকো পান করুন—ছেলেমেয়েদেরও নিয়মিতভাবে পান করান। সস্তায় এবং সন্দেহাতীতভাবে স্বাস্থ্য ও শক্তিলাভের ইহা অপেক্ষা আর কোনও সহজ পন্থা নাই।
বর্ন্‌ভিলের কোকো আদর্শ পানীয় খাদ্য। ইহাতে জান্তব চর্ব্বি নাই এবং প্রস্তুতকালীন কোনও প্রকারে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা হয় না।
PURE SOLUBLE COCOA
BOURNVILLE COCOA
স্বাস্থ্য ও শক্তির জন্য
জান্তব চর্ব্বি বর্জ্জিত এবং
প্রস্তুত কালীন হস্তদ্বারা স্পৃষ্ট হয় নাই।
ক্যাডবেরীর দ্বারা প্রস্তুত, বর্ন্‌ভিলে, ইংলণ্ড

সূচীপত্র—ফাল্গুন ১৩৩৭

সূচীপত্র—ফাল্গুন ১৩৩৭

সূচীপত্র—ফাল্গুন ১৩৩৭

মওলানা মোহাম্মদ আলী মরহুমের

ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ফটো

ফ্রেমে বাঁধাইবার উপযোগী

মূল্য /০ আনা, ডজন ॥০ আনা।

ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—পাঁচখানির কম ভিঃ পিঃ করা হয় না। অর্ডারের সঙ্গে ১ খানির জন্য—/১০, ২ খানির জন্য—৶১০, ৩ খানির জন্য—।০, ৪ খামির জন্য—।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

ম্যানেজার—মোহাম্মদী প্রেস,

৯১নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

= সেবনে =

এক দিনে গণোরিয়ার জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ করে—দ্বিতীয় দিনে রক্ত পুঁয বন্ধ করে—তৃতীয় দিনে রোগমুক্তি করে। মূল্য প্রতি শিশি ১॥০ টাকা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—ইলি ব্রাদার্স এণ্ড কোং,

পোঃ বায়রা, ঢাকা।

ব্রাঞ্চ :—মঙ্গলদই, আসাম।

ম্যালেরিয়ায় ভুগিবার পর

দুর্ব্বলতার অবসান করুন।

যদিও কুইনাইন রক্ত মধ্যস্থ ম্যালেরিয়া বিষ ধ্বংস ক'রে থাকে—তথাপি রোগীর দুর্ব্বলতার অবসান ক'রে সাবেক স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়া পাইতে বহু দিন লাগে।

কিন্তু যদি নিয়মিতভাবে স্যানাটোজেন সেবন করেন, তবে অতি সত্বর দুর্ব্বলতার অবসান হয় এবং পূর্ণ স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ করা যায়। কারণ স্যানাটোজেনে এরূপ উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে আছে—যাহা শক্তি স্বাস্থ্য এবং দেহে প্রচুর তাজা রক্ত দান করিতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিষ।

কলিকাতার কোন একজন সুবিখ্যাত চিকিৎসক লিখিতেছেন—"দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর আমি যখন বিশেষ দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ি, সেই সময় অধিক মাত্রায় স্যানাটোজেন সেবন করিতে থাকি এবং অতি সত্বর দেহে প্রচুর শক্তি লাভ করি। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতায় স্যানাটোজেন সুন্দর কাজ করে।"

ম্যালেরিয়ায় ভুগিবার পর স্বাভাবিক ভাবে দেহে কবে বল পাইবেন, এই আশায় না থেকে, আপনিও কেন স্যানাটোজেন সেবন করিয়া পূর্ণ স্বাস্থ্য ও শক্তি সত্বর লাভ করুন না? আজই স্যানাটোজেন সেবন করুন।

স্যানাটোজেন প্রস্তুত বা প্যাক করিবার সময় হস্তদ্বারা স্পর্শ করা হয় না।

SANATOGEN

আদর্শ টনিক খাদ্য

সকল ঔষধালয়ে ও বাজারে প্রাপ্তব্য।

হারমোনিয়ম কিনিতে হইলে ডোয়ার্কিনেরই কিনিবেন

ডোয়ার্কিনের বাড়ীতেই হাত হারমোনিয়মের প্রথম আবিষ্কার ও ডোয়ার্কিনের বাড়ীতেই উহার ক্রমোন্নতি। বাজারে এক্ষণে নানাপ্রকারের যন্ত্র বিক্রয় হইতেছে—আকৃতিতে ডোয়ার্কিনের মত কিন্তু সুরেতেই ধরা পড়িয়া যায়—ডোয়ার্কিনের সুর কিছুতেই নকল করা যায় না।

আপনার গৃহ প্রফুল্ল রাখিতে হইলে গৃহে একটী ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম প্রতিষ্ঠা করুন, গুণে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম অন্যাপেক্ষা সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ কিন্তু দামে যৎ সামান্য বেশী। সচিত্র মূল্যতালিকার জন্য পত্র লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন,

ভারতের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান বাদ্য যন্ত্রালয়

৮নং ডালহাউসি স্কোয়ার ও ১২নং এসপ্ল্যানেড, কলিঃ।

বিনামূল্যে

১২৮পৃষ্ঠাসম্বলীত
স্বাস্থ্য তত্ত্ব পুস্তক বৈদ্যাবিদ
ইহা একাধারে যুবকের শিক্ষক,
নারীর ধাত্রী ও রোগীর বন্ধু।
রাজবৈদ্য শ্রীনারায়ণজী কেশবজী
১৭৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কবিরাজ

দাশরথি কবিরত্নের
— স্বর্ণ ঘটিত —

অমৃত কুণ্ড সালসা

রক্তদোষ ও দুর্ব্বলতায় অব্যর্থ
২ নং দাঁ লেন, হাটখোলা, কলিকাতা।

১ শিশি ১৲, তিন শিশি ২।।০, মাশুল স্বতন্ত্র।

মৃগনাভি কস্তুরী সংযুক্ত

বাদশাহী জর্দ্দা

যে মৃগনাভী জর্দ্দা পূর্ব্বে বাদশাহগণ পানে ব্যবহার করিতেন, আমরা সেই মহাসুগন্ধি জর্দ্দা প্রস্তুত করিয়াছি। পানে ব্যবহার করুন, প্রায় দু'ঘণ্টা মুখে সুগন্ধি থাকিবে বিশেষ গুণ এই যে, বহু মূল্যবান মসলাদী মিশ্রিত থাকায় বৃদ্ধকে যুবার ন্যায় শক্তিশালী করতঃ ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি করে। রমণীগণ পানে ব্যবহার করিলে তাঁহাদের ওষ্ঠাধরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইবে। সকলেই ইহা এক আশ্চর্য্য বস্তু বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন। মূল্য ৬ শিশি ১।০, এক ডজন ২৲
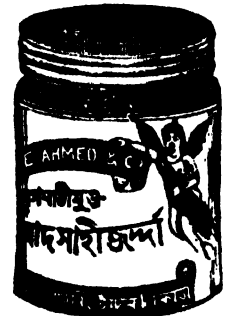
সের ১৬৲। ২নং বাদশাহী জর্দ্দা ডজন ১।।০, গ্রোস ১৫৲ টাকা, সের ৮৲ টাকা। মৃগনাভী রূপালী জর্দ্দা সের ৪৲, ৫৲, ৬৲, ৮৲ হইতে২৩৲ পর্য্যন্ত। মহাসুগন্ধি কাল মুক্তি জর্দ্দা সের ১।।০, ২৲ ৩৲, ৪৲ হইতে ৮৲ টাকা পর্য্যন্ত।

ইস্তাজ আহম্মদ এণ্ড কোং,
১০৪নং মুর্গীহাটা, কলিকাতা।

উত্তম স্বাস্থ্য ও
সুখের অধিকারী

সমগ্র ভারতের হর্ষোৎফুল্ল জননীগণের দৃষ্টান্ত দেখে আপনার শিশুসন্তানদিগকে এই সুপ্রসিদ্ধ খাদ্য সেবন করান।

দেখবেন—কেমন স্ফূর্ত্তির সহিত সে এই লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য হজম করে, ইহাও লক্ষ্য করবেন কত শীঘ্র হাড় শক্ত ও মাংস গজায় ও শরীর বৃদ্ধি হয়।

এই খাদ্যে স্বাভাবিক ভিটামিন ও শিশুর দেহ পুষ্ট ও বৃদ্ধির উপযোগী উপাদান প্রচুর পরিমাণে আছে।

প্রস্তুতকালীন হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা হয় না।

জননীগণ স্বয়ং উপাদেয় কাউ এণ্ড গেট চকোলেট মিল্ক ব্যবহার করুন।

এজেন্ট :—কার এণ্ড কোং লিঃ, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, কলিকাতা
এবং বোম্বে, মাদ্রাজ ও করাচী

ভারতে সঞ্জীবন শিল্পের মহান্ আদর্শ।

ই, এ, রহিমের

জগদ্বিখ্যাত আসল দরবার হাতীমার্কা পাবনা ফিনিস ও তলোয়ার সিংহ-মার্কা বেলেঘাটা ফিনিস স্বদেশী গেঞ্জী, সুতি ও পশমী সোয়েটার, সোয়েটার কোট, জার্সি, ছেলেদের জার্সি, টুপি, লেডী সোয়েটার, কম্ফর্টার, মাফলার ইত্যাদি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

একমাত্র প্রস্তুতকারক—

এব্রাহিম আল্লারখ্যা রহিম—৩৯নং আরমেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শো-রুম ১নং বলাইদত্তের ষ্ট্রীট, কলুটোলা, কলিকাতা।

ডাক্তার কর্ণেল সাহেবের

‘গয়টার কিওর’

গলগণ্ড বা ঘ্যাগ রোগের একমাত্র মহৌষধ।

ঔষধ ব্যবহারের পূর্ব্বে। ঔষধব্যবহারের পরে।

গলগণ্ড বা ঘ্যাগ অতি ভীষণ রোগ। ইহার একমাত্র প্রতিকার "গয়টার কিওর"। যে কোন প্রকার গলগণ্ড বা ঘ্যাগ হউক না কেন ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহাতে কোন প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা বা ঘা হইবার আশঙ্কা নাই। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা মাশুল স্বতন্ত্র।

ডাক্তার কর্ণেল এণ্ড কোং

১ নং আন্তনী বাগান লেন, কলিকাতা

মৃগনাভি কস্তুরী সংযুক্ত জর্দ্দা

যে মৃগনাভি জর্দ্দা পূর্ব্বে বাদশাহগণ পানে ব্যবহার করিতেন, আমরা সেই মহাসুগন্ধি জর্দ্দা বহু কষ্টে প্রস্তুত করিয়াছি। পানে ব্যবহার করুন, প্রায় ২ ঘণ্টা মুখে সুগন্ধি থাকিবে। বিশেষ গুণ এই যে বহু মূল্যবান মশলাদি মিশ্রিত থাকায় বৃদ্ধকে যুবার ন্যায় শক্তিশালী করতঃ ধারণা শক্তি বৃদ্ধি করে। রমণীগণ পানে ব্যবহার করিলে তাহাদের ওষ্ঠাধরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইবে। সকলেই ইহা এক আশ্চর্য্য বস্তু বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন। মূল্য রূপালী জর্দ্দা সের—৪৲, ৬৲, ৮৲, ১২৲, ১৬৲, ৩২৲। কাল মুস্কি জর্দ্দা সের—২৲, ৪৲, ৬৲, ৮৲। রূপালী জর্দ্দা তোলা—৵০, ।০, ॥০, ১৲, কাল মুস্কি তোলা /০, ৶০, ।০, ॥০। এক টাকার কমে V. P. হয় না। মাশুল স্বতন্ত্র।

পাঞ্জাব জর্দ্দা ফ্যাক্টরী,

(দক্ষিণ গেট) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,

কলিকাতা।

❁ ❁ দীর্ঘকাল অভিজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ❁ ❁

✻ লেফটেনাণ্ট এ, শুকুর ✻

এল, আর, সি, পি, এল, আর, সি, এস, (এডিনবার্গ) এল, আর, এফ, পি, এস (গ্লাস-গো)

ডাক্তারখানা—১৭নং হগ ষ্ট্রীট,

(এলফিন্‌ষ্টোন বায়স্কোপের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত)

সকাল ৯টা হইতে ১১টা এবং বিকাল ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত ডিস্পেন্সারীতে উপস্থিত থাকেন।

পূর্ব্বাহ্ন ৮টা হইতে ১২॥০টা এবং অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৮॥০টা পর্য্যন্ত ঔষধালয় খোলা থাকে।

দীর্ঘকাল যাবত চিকিৎসা কার্য্যে রত থাকিয়া ডাক্তার সাহেব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। দুই বৎসরকাল ইংলণ্ডে থাকিয়া তিনি লক্ষ লক্ষ রোগীকে রোগমুক্ত করিয়াছেন।

তিনি ধ্বজভঙ্গ ও ধাতু সম্বন্ধায় যাবতীয় রোগে অদ্বিতীয়। তিনি নিজে সবিশেষ যত্ন সহকারে রোগীদিগকে দেখিয়া থাকেন।

একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাসস্থান ঃ—৭।১সি নং লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, হগ মার্কেটের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

সাক্ষাতের সময় ঃ—লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে বিকাল ৩টা হইতে সন্ধ্যা ৫টা।

তাঁহার ডাক্তারখানায় যে সকল রোগী চিকিৎসার্থ আগমন করিয়া থাকেন, তিনি তাঁহাদিগকে বিনাফিসে ব্যবস্থা দেন।

অন্যত্র তিনি ১৬৲ টাকা ফিসে রোগীর চিকিৎসা করেন।

বিনামূল্যে বিনামাশুলে

শিল্প রত্নমালা, টোটকা চিকিৎসা, পশু চিকিৎসা, দম্পতি বিজ্ঞান, ভাগ্য পরীক্ষা ইত্যাদি প্রায় সহস্র প্রকার মূল্যবান ও নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত "স্বাস্থ্য ও শিল্প" এই পত্র লিখিলেই পাঠাই।

বেঙ্গল লেবরেটারী,

১নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

MORE BETTER

Drink Indian Special Darjeeling Tea.

Fresh & Pure. Airtight.

The

East India Tea Agency & Co.

35, Harrison Road, Calcutta.

Phone. B B, 4289.

Ask for free Sample Packet.

পাকা খেজাব

ইহার রং যথার্থই পাকা। পরেও বিবর্ণ হয় না, চামড়ায়ও দাগ পড়ে না। পাকা চুল ঠিক্ই যৌবনের কাঁচা চুলে পরিণত হয়। ১ শিশিতে প্রায় ৩ মাস চলে। ব্যবহার প্রণালীও অতি সহজ। ব্রুশ সহ প্রতি শিশি ১।০ পাঁচ সিকা।

লোমনাশক আরক ইহাতে ২।৩ মিনিটেই অতি আরামে লোম নির্ম্মূল হয়। প্রতি শিশি ।০ আনা মাঃ ।৵০

টাউন এজেন্সী,

২০নং ডলওয়েল লেন, মুজাপুর, কলিকাতা।

VICTORY OVER AGEING—

REJUVENATION !

পুনর্যৌবন অবশ্যম্ভাবী !

বার্লিনের খ্যাতনামা চিকিৎসক

ফার্টিলীন
স্ত্রীলোকদিগের
—জন্য—

ডাক্তার রিচার্ড উইস্‌

পি, এইচ, ডি ; এম, এ ; এফ, সি, এস,
(বার্লিন) মহাশয়ের

অদ্ভুত আবিষ্কার !

ভিরিলীন
পুরুষদিগের
—জন্য—

পত্রের নম্বর
৭৮৫৬।

"আমি আপনাদের ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি।"

—এস, ডীন,—
এড্‌ভার্টিজমেন্ট ডাইরেক্টর
"মোহাম্মদী"

আবেদন করিলে এই চিঠির আসলখানা দেখান যাইতে পারে।

একত্রে ৩ শিশি
বিনামাশুলে

বর্ত্তমান যুগের চিকিৎসকগণ পরীক্ষা দ্বারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, আভ্যন্তরীন রসগ্রন্থির (internal glands) বার্দ্ধক্যই দৈহিক বার্দ্ধক্যের কারণ। তাই এই ঔষধ উক্ত গ্রন্থির সাহায্যে প্রস্তুত হইয়া ইহাতে ধাতব পদার্থ ও ভাইটামিন মিশ্রিত করিয়া (Ultra-Violet)এর দ্বারা ইহার শক্তি বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। মানব দেহের রসগ্রন্থির পরিপুষ্টিই এই ঔষধের একমাত্র ক্রিয়া।

মূল্য ৪০ বটীকা পূর্ণ শিশি ৩৲ টাকা ;
ঐ ১০০ বটীকা পূর্ণ শিশি ৬৲ টাকা।

ইহা ব্যবহারে পুরুষদিগের ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য, উৎসাহহীনতা, অনুপযোগী চর্ব্বি, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, প্রভৃতি দূর করিয়া মাংসপেশীর গঠন, দেহে নব উদ্যম ও নব শক্তি সঞ্চার হইবে।

স্ত্রীলোকদিগের অনিয়মিত ঋতু, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি দূর করিয়া চর্ম্ম মসৃণ, গণ্ডদেশ রক্তাভ এবং অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করে।

ডাক মাশুল
স্বতন্ত্র।

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সোল এজেন্টস,

আমিন এণ্ড ইস্‌মাইল,

৭৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

SOLE AGENTS FOR : :
BENGAL, ASSAM, BEHAR & ORISSA.

AMIN & ISMAIL,
79, Colutola St. CALCUTTA

সুবাসিত
নারিকেল তৈল
রূপে গুণে গন্ধে অতুলনীয়

বেঙ্গল ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্
৩৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে লজেনজুস প্রস্তুতকারক

দারুণ গ্রীষ্মে ও বর্ষায় আমাদের লজেনজুস জমিয়া বা রসিয়া যায় না।

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান **বিখ্যাত মধু লজেনজুস** একমাত্র প্রাপ্তিস্থান

এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকার চুরুট ও সুগন্ধি "হাইকোর্ট" চুরুট প্রস্তুতকারক।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জগবন্ধু লোজেঞ্জ ফ্যাক্টরী,

৩নং হ্যারিসন রোড, শিয়ালদহ, কলিঃ।

খোদার কালামের বরকত
(ফকিরের দোওয়া)

দৈত্য-দানব, ভূত-প্রেত, জেন-পরীর কুদৃষ্টি যদি আপনার উপর পতিত হইয়া থাকে, যদি আপনি কাহারও যাদু-মন্ত্রে নিপতিত হইয়া থাকেন, সারা জীবনব্যাপী রোগ-শোক ভোগ করিয়া জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য যদি আপনার নিকট হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে নিম্ন ঠিকানায় আসিয়া খোদার কালামের ফজিলত দেখুন ও ফকিরের দোওয়া সংগ্রহ করুন। খোদার ফজলে সব বিপদ কাটিয়া যাইবে।

খাদেম—ফকীর

৭৫নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(মওলালী দরগার ঠিক সম্মুখে)

অর্শ রোগে
একমাত্র অব্যর্থ ও পরীক্ষিত মহৌষধ
হেডেন্সা

ব্যবহার করুন।

সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহাই ব্যবস্থা করেন এবং সমস্বরে ইহার অশেষ প্রশংসা করেন।

পৃথিবীর ৯৮টী দেশের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

Annual Contract Rate— **Buyers' Guide.** Annas Eight Per Line.

"আমি অবাক হয়ে শুনি"

বসন্তে

বিশ্ব যখন স

হয়ে ওঠে—আপনার

গৃহ আনন্দময় করতে

রেডিও

যন্ত্রই সর্ব্বোৎকৃষ্ট=

সকল রকম আধুনিক রেডিও যন্ত্র ও সরঞ্জাম আমরা সকল সময়ে মজুত রাখি। অর্ডার দিলে যন্ত্র ঘরে বসাইয়া দিবার ভার নিয়া থাকি

পত্র লিখিলেই মূল্য তালিকা
পাঠান হয়

সাইকেল, হারমোনিয়ম, রেডিও

ও

সকল রকম বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা

মল্লিক ব্রাদার্স

Telephone :— Cal :—2877	১৮-২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	Telegrams :— "Phonograph"

বিধবার ঈদ

— বঙ্গ —
বীহার উড়িষ্যা
ও
আসামের
জননায়কগণ ও মাতৃজাতি আজ কোটীকণ্ঠে আমাদের বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছেন।
কারণ ?
আমাদের জহরতের গহনা, সুবর্ণ অলঙ্কার ও রজত-দ্রব্য-সম্ভার, নিত্য নব বিধানে তাঁহাদের আনন্দ দান করিতেছে।
ঠাকুরলাল হীরালাল এণ্ড কোং,
ডায়মণ্ড মারচেণ্টস, গোল্ড এণ্ড সিলভার স্মীথ স,
১২নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফাল্গুন, ১৩৩৭ চতুর্থ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা

ধরার ধূলায় মোরে করিয়াছি দান

সৈয়দ উদ্দীন

গাহি তারি গান, যে আমারে ভুলায়েছে
রাত্রিদিন, পথে পথে নিদ্রাহীন গেছে
সংখ্যাহীন বর্ষ মাস যার তরে মোর
প্রাবৃট গগনে তবু কাটে নাই ঘোর।
মেঘাবৃত আকাশের কৃষ্ণ-যবনিকা
সরাইয়া জাগে নাই দিবালোক-শিখা।
এখনো নয়নে পূর্ণ-রহস্তের ছায়া
বর্ণে বর্ণে নবরূপে, মরীচিকা-মায়া
সৃজন করিছে নিত্য। উন্মত্ত কামনা
বঞ্চিত হ'য়েছে তবু কভু জানিল না
বঞ্চনার ব্যথা বুকে। কাদিয়াছে প্রাণ
রহস্যের মাঝে শুধু লভিতে নির্ব্বাণ।

আজি কিন্তু মন মোর কহে এই বাণী,
যে রহস্য পুষ্প-পত্রে আছে মোরা জানি
নিত্য ধরণীতে, তাহা নহে ধরণীর,
আমারি বাসনা শুধু করিতেছে ভিড়
আকাশ বাতাস ব্যাপি।
দিক-দিগন্তরে
আমার সুগন্ধ বুঝি চলে বায়ুভরে।
সিন্ধুর তরঙ্গতালে জল-কণা মাঝে
হেরি মোরে চেয়ে থাকি কিছু বুঝি না যে।
ওকি ছায়া ? ওকি মায়া ? ওকি সুর মোর ?
আমার বুকের ভাষা করেছে বিভোর
উহার সঙ্গীতখানা ? দুরন্ত কল্লোলে
গরবে দুলিছে যেন তাই কল রোলে।
উন্মত্ত হয়েছে সিন্ধু বক্ষে - নাকি জলে ?
ঢেউ নহে মোরি ভাষা দুলে দুলে চলে।
বীচিভঙ্গে, কলোচ্ছ্বাসে উত্থানে পতনে
ভাঙ্গি কূল লঙ্ঘি বেলা চলে মোর সনে।

গাহি তার গান, যেথা রাত্রের তিমির
স্নেহের আচল টানি ঢাকি পৃথিবীর
উদ্ধত উলঙ্গ মূর্ত্তি মাতৃ-বক্ষে তার,
পাড়াইছে নিদ্রা যেন শিশু আপনার।
রাত্রির মতন মনে জাগে অন্ধকার,—
এই কৃষ্ণ-অমারাত্রে, ভাবি বার বার,
মনের অতল তলে কোথা যেন ছিল,
হঠাৎ আজিকা রজনীতে দেখা দিল।
যুগের জমাট-বাধা ঘুমন্ত দুয়ার
খুলিয়া বাহির হ'ল রাজার কুমার।
দলে দলে এল তারা, এল চন্দ্র জ্যোতি,
ওরা বুঝি মোর কামনার মুক্তা-মতি ?
মাধবী-নিকুঞ্জে আজি মধু যামিনীতে,
কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া সুমধুর গীতে,

বনানী কি গাহে গান বিহঙ্গের সুরে ?
ব্যাকুল উচ্ছ্বাস তার ভেসে যায় দূরে—
অতিদূরে কাশবনে, বালুচরে কোন্
তারি সাথে ভেসে যায় যেন মোর মন
ডাহুকের ডানা মেলি, নাহি মানে বাধা,
পৃথিবীর সব সুরে মোর সুর সাধা।
আমার কামনা এই পৃথিবীর ধূলি,
পুষ্প, গান, আলো সাথে করি কোলাকুলি
ফিরিতেছে কুঞ্জে কুঞ্জে, বন-বীথি তলে,
স্খলিত-মুকুল-গন্ধে, শ্যাম-তৃণ-দলে।
সরসীতে পদ্ম-পত্রে, কদম্ব-তমালে,
মোরি গান সুপ্ত আছে অশ্রু-বাষ্প জালে।
দুর্ব্বা ঘাসে, শিশিরেতে টলমল করে
আমার নয়ন-জল মুক্তা-সম ভোরে।

মোর গান, মোর কথা, ভেসে ভেসে যায়
স্রোত-জলে, বাতাসেতে দুরন্ত-দোলায়।
কামনা বাসনা মোর, হে দেবী আমার।
পৃথিবীর ধূলি-বিন্দু নহে কিছু আর।
আমার কণ্ঠের গান,—শুধু মোর গান,
আজি আমি ধরণীরে করে যাব দান।
কণ্ঠ হতে ফেলে যাব, পুষ্পমাল্য মোর
পথের ধূলির মাঝে। রহস্যের ঘোর
আমারি বক্ষের মাঝে ঘন-অন্ধকারে
ঘুরিয়া ফিরিছে নিত্য, বৃথা খুঁজি তারে
বন বনান্তরে মাঠে, আকাশের কোণে,
নাহি গান সিন্ধু-জলে, আছে মোর মনে।
এই কথা বলি যদি পৃথিবীর কানে,
স্ফীত-বক্ষ নত হবে তার অভিমানে।
হয়ত নীরব হবে হেথা চির-তরে
বিহঙ্গের গান। আসিবে না বায়ু-ভরে
বনানীর মর-মর, জল-কল রোল
শুনিব না কর্ণে কভু। শিশিরের জল

অনাদরে শুকাইবে পত্রে দুর্ব্বাঘাসে ;
মধুশূন্য হবে পুষ্প শুক্লা মধুমাসে।
কিন্তু হায় যে কথা ঘুরিছে বক্ষতলে
অব্যক্ত বেদনা-ভরে নিত্য অশ্রু-জলে,
যে-কথা প্রকাশ হয়ে উড়িবারে চায়,
সন্ধ্যার গগন-প্রান্তে পাখীর ডানায় ;
আধ-আধ ভাষা-ভরে সঙ্কোচে সরমে,
যে-কথা অঙ্কিত ছিল শুধুই মরমে—
আজি তার হয়ে যাক উলঙ্গ প্রকাশ,
সত্য নিত্য অনাবৃত, কবি তার দাস।
ধন্য হল ধন্য হল, ধরাতল আজি
আমার চোখের জলে। বনপুষ্পরাজি
কাননে কান্তারে ধন্য, মাখি মোর হাসি
সর্ব্ব-গাত্রে রমণীর ফুটে ফুল-রাশি।
সন্ধ্যা ছিল ছায়া-মগ্ন অন্ধকার-তলে,
চাহিয়া থাকিত শুধু মৃত নদী-জলে।
কণ্ঠে তার দিনু গান, দিনু রঙ তুলি,
ধন্য হল সন্ধ্যা নদী নড়ে ওঠে দুলি'।

কালো জল সেই হতে রঙেরঙে ভরি,
চলিয়াছে সন্ধ্যা যেন অভিসার করি',
কোথা হতে কোন্ তটে, যেন কোন্ দুর,—
আকাশ চাহিয়া আছে হারায়ে মুকুর
নদী-জলে। ক্লান্ত-বায়ু ধীরে গায় গান,
আমারি সঙ্গীত ওরে করিয়াছি দান।
তাই আজি বিহঙ্গের কণ্ঠ মাঝে মোরে
হারায়ে এসেছি, মুহূর্ত্তের ভুল করে।
শুনো-মাঠে, আস্‌মানে বেনুবনে হায়,
আমার কণ্ঠের গান জাগে মুর্চ্ছনায়।
বালুচরে বসে থাকি বলাকার ভিড়ে,
পুঞ্জীভুত ছায়া নামে কাশবনে ধীরে।
ভিড়ে যাই, ঝাউবনে বসে গাছি গান,
ধরার ধূলায় মোরে করিয়াছি দান।

নরওয়ের বর্ত্তমান সাহিত্য

শ্রীপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায়

নরওয়ের বর্ত্তমান সাহিত্যের সঙ্গে এ দেশীয় পাঠক-দিগের কিছু পরিচয় করিয়ে দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

নরওয়ে সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা ইবসেন ও বিয়র্ণসন নরওয়ের সমাজ ও সাহিত্যে কাল-বৈশাখীর ঝড় এনেছিলেন। নরওয়ের সাহিত্যের জীর্ণ সৌধ তাঁরা ভূমিসাৎ করে নূতন ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন। তারই উপর নরওয়ের বর্ত্তমান সাহিত্য গড়ে উঠেছে। এই সাহিত্যের যে দিকটা আমাদের সকলের চেয়ে বেশী পরিচিত, সেদিক হল তার উপন্যাস বা কথা-সাহিত্য। এরই পরিচয় আমরা বেশীরকম পেয়েছি এবং এই দিক নিয়েই নরওয়ের সাহিত্য আলোচনা করছি। যে তিনজন সাহিত্যিক এই সাহিত্যকে বর্ত্তমানে এত উচ্চে স্থান পাইয়ে দিয়েছেন, যোহান বোয়ার তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বিশ্ববিশ্রুত ঔপন্যাসিক। তাঁর এক একটী উপন্যাস এক একটী চিন্তালোকের সৃষ্টি করেছে। তাঁর লেখা আধ্যাত্মিক অথচ একেবারেই স্বপ্নময় নয়। সেখানে কোন তত্ত্বের বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেই। মানুষ যতই সাংসারিক দিক দিয়ে সুখী হউক না, তার অন্তরের মধ্যে শাশ্বত আত্মার সঙ্গে মিলনের জন্য একটা বুভুক্ষা চিরদিনই থাকে। সে কথা তিনি তাঁর যুগান্তকারী উপন্যাস "Great Hunger"এ অতুলনীয় ভাবসম্পদে ফুটিয়ে তুলেছেন। Peer Holm সংসারের দিক দিয়ে দেখতে গেলে যথেষ্ট সমৃদ্ধ লাভ করেছিল। সে Engineer। সমাজেও বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ কর্ত্তে পারত। কিন্তু তার মনে এই আত্মার বুভুক্ষা জাগ্রত হয়ে উঠ্‌ল। সেই সুদূরের সঙ্গে মিলনের যে আকাঙ্ক্ষা, তা তাকে আর সুস্থির থাকতে দিল না। তার বন্ধু-বান্ধবরা তার ভাবগতিক বুঝতে পারলে না। সে তার পথ বেছে নিলে, শতরকম দ্বিধা ও অসুবিধার মধ্য দিয়েও। বোয়ার নিজে এই সুদূরের ডাক শুনতে পেয়েছেন এবং একটা আধ্যাত্মিক প্রেরণা প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছেন, তাই Peer Holm এতটা সজীব চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। কি সুন্দর এই উপন্যাস! কোন তত্ত্ব একে কলঙ্কিত করেনি, কোন মতবাদ এর মধ্যে স্থান পায়নি, অথচ এমন আধ্যাত্মিক মনোবৃত্তির পরিচায়ক! সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই, এই কথা বোয়ার উপলব্ধি করেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলিও সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাঁহার উপন্যাসে কোনরূপ রোমাঞ্চকর বলতে সাধারণতঃ যা বোঝায় এমন ঘটনা বড় বেশী স্থান পাইনি। প্রত্যেকটি বইএর উদ্দেশ্য হল মানুষের একটা উচ্চ প্রবৃত্তিকে সাধারণ ঘটনার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা। Power of Lie উপন্যাসে ছেলে দেখছে তার বাবা মিথ্যা কথা সাজিয়ে আর একজনের সর্ব্বনাশ করতে চলেছে। সে বাপের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হল। স্নেহের বন্ধন তার মনুষ্যত্ব বিকাশের অন্তরায় হতে পারলে না। বাপের অতি আদরের ছেলে। সেও বাপের মিথ্যাকে সমর্থন করতে পারে না! নীরবও থাকতে পারলে না। ঔপন্যাসিক আদালতে তাকে দাঁড় করালেন, কিন্তু ছেলের সেখানে বাকরোধ হল। সে সাক্ষ্য দিতে পারলে না। বাপের অবস্থা তার সাক্ষ্যের ফলে এমন ভীষণ হয়ে দাঁড়াবে যে, কল্পনা করা মাত্র তার আর সাক্ষ্য দেওয়া শক্তিতে কুলাল না। বোয়ার পুত্রকে আদালতে দাঁড় করিয়েই তাঁর উদ্দেশ্য সফল করেছেন। সাক্ষ্য দেওয়ালেন না, কারণ তিনি তাঁর মতবাদ প্রচার করার জন্য তাঁর গল্পটাকে মাটি করতে পারেন না। বোয়ার যা প্রচার করতে চাইলেন তা বেশ

পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌ল, অথচ গল্পও স্বাভাবিক পরিণতি প্রাপ্ত হল। এমনি তাঁর Pilgrimage নামক উপন্যাসে মা দারিদ্র্যের চাপে তার ছেলেটীকে একটা বড় লোকের কাছে বিলিয়ে দিতে বাধ্য হল। তার বদলে সে পেলে টাকা, কিন্তু তার মনে রইল সেই ছেলেটীর কথা। সে কিছুতেই শান্তি পেল না। সব সময়েই সেই ছেলেটীর মুখ মনে পড়ে। কিছুদিন পরে এক ধনীর সঙ্গে তার পুনর্ব্বার বিবাহ হয়। ছেলেটীকে ফিরে পাবার আশা তার মনে জেগে উঠ্‌ল। সে স্বামীকে ভালভাবে ভালবাসতে পারে না। তার স্বামীর মৃত্যুর পর—তার অনাদরই এই মৃত্যুর জন্য বেশী পরিমাণে দায়ী—সে তার হারানো ছেলেটীকে খুঁজে পাওয়ার জন্য তার সমস্ত সম্পত্তি পণ করে বস্‌ল। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুতে লাগলো। কিন্তু ছেলেটীর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। মাতৃহৃদয় কতবার উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌ল কিন্তু নিরাশা তার ভাগ্যে লেখা রইল। পুত্রহারা মাতা আজও হয়ত এই ধরণীর বিবর্ত্তনের সঙ্গে তার পুত্রকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। গল্প ঠিক সমানতালে চলতে লাগলো এবং সমাপ্তিতেও বেশ বাস্তবের সঙ্গে খাপ খেয়ে গেল। বোয়ারও মাতৃত্বকে সম্যক্‌ভাবে ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যকে সফল করলেন। Johan Bojerএর সমস্ত philosophy তাঁর নিজের কথায় বলা যাক্। Great Hungerএর এক জায়গায় তিনি বলছেন "Therefore turn back into thyself lift high thy head and meet proudly the evil that comes to thee. Adversity can crush thee, death can blot thee out, yet art thou still unconquerable and eternal. যিনি মানুষের অন্তরের সৌন্দর্য্য এমনভাবে উপলব্ধি করেছেন, তিনি যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে অতি আপনার করে দেখাবেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? জ্যোৎস্নার বর্ণনা তাঁর একটি বিশেষত্ব। চাঁদের আলো তাঁর মনে কিরূপ ভাবের উদ্রেক করেছে, সেটা তাঁরই লেখা থেকে কিয়ৎ অংশ উদ্ধৃত করলেই পরিস্ফুট হবে এবং তাই করেই তাঁর সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করছি। মাধবী রাত্রের বর্ণনা করতে এক স্থানে লিখেছেন, "A world of white, a frozen white tranquility—woods, plains, lakes all in white, a fairy-tale in moonlight, a dreamland at night under the great bright moon.

মুট হামসন আর একজন ঔপন্যাসিক। তাঁর Hunger, Growth of the Soil, Pan প্রভৃতি উপন্যাস বিশ্ববিখ্যাত। তিনি ১৯২০ সালে নবেল প্রাইজ পান। তাঁর লেখার বিশেষত্ব হল সরলতা। ভাষা সরল ঠিক আমাদের শরৎবাবুর মত। গল্পের plotও সরল। কোন ধনীলোককে বিষয় করে তাঁর কোন গল্প গড়ে ওঠে নি। সব গল্পগুলিই অতি সামান্য লোকের কথা। কোনরূপ আড়ম্বর নেই। যাদের লোকে উপেক্ষা করে চলে, তাদেরই সাধারণ সুখ-দুঃখের কথা। পড়লেই মনে হয় যেন আমাদের কত কাছে, বুঝি বা আমাদের পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে চরিত্রগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁর একটী বিশেষত্ব হল মানুষের মনে যে অর্দ্ধসুপ্তবৃত্তিগুলি সুপরিস্ফুট নয়, তাদের সন্ধান নেওয়া। হামসেনের সাহিত্য সাধারণের জন্য। তাদেরই কথায় বোঝাই। শরৎচন্দ্রের মত নিবিড় সহানুভূতির সঙ্গে লেখা। Hunger নামক উপন্যাসে দেখি একজন ক্ষুধার জ্বালায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারিদিকেই তার অন্ধকার। সবাই হাসছে, খেলছে, কিন্তু তার মনে সেই সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার চিন্তা। তার দুঃখের কাহিনী পড়লে আমাদের চোখ জলে ভরে ওঠে। হামসন এমন স্বাভাবিক ভাবে এই চরিত্র এঁকেছেন যে আমরা মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারি না। ক্ষুধার্ত্ত এই মানুষটীকে আমরা অবজ্ঞা করতে পারি না। কেন না—সে ত সাধারণ ভিখারী বা আতুর নয়। তার মধ্যে শিক্ষা আছে। সংবাদপত্রে তার লেখা সাধারণে পড়ে। ক্ষুধা তাকে কোন রকমেই মতিস্থির থাকতে দেয় না। সে সাধারণ লোকের মত হাসতে বা গল্প করতে চেষ্টা করে এবং মুহূর্ত্তের জন্য পারে ও কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আবার এই বিশ্বগ্রাসী চিন্তা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে! এরূপ লোকও আবার প্রেমে পড়ছে। এইখানে হামসেনের ক্ষমতাশালী লেখনীর পরিচয় পাওয়া যায়। মানব মনে কামনার প্রবৃত্তি চিরন্তন। সকলের মধ্যেই আছে। এই ক্ষুধার্ত্ত মানুষটীর মনে এই প্রবৃত্তি সুপ্ত অবস্থায় ছিল। কিন্তু রূপের নেশা এই কামনাকে জাগ্রত করে তুললো। তাই সে দেখলো, "A maddening pyre of rays flames up before my eyes, a heaven and earth in conflagration, men and beasts of fire, mountains of fire, devils of fire, an abyss, a wilderness, a hurricane, a universe in brazen ignition, a

smoking, smouldering day of doom. And I saw and heard no more." তার কামনা চরিতার্থ হল না; শুধু কামনার আগুন তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিল। সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচবার জন্য দেশ ছেড়ে তাকে বিদেশে যেতে হল।

হ্যামসন পল্লীজীবন বড়ই পছন্দ করেন। শহরের প্রাণহীন জীবন থেকে পল্লীর পূর্ণ শান্তি তাঁর কাছে অধিকতর প্রিয়। তিনি কোন দিনই পল্লী-জীবন বৈচিত্র্য-হীন মনে করেন না। তাঁর Growth of the Soil এ Isak তার সারাটা জীবন নির্জ্জন পল্লীতে কাটিয়ে দিল। একদিনের জন্যও নূতনত্বের অভাব বোধ করেনি। কিন্তু Geisslar পয়সার দিক দিয়ে বড় হলেও বার বার শহরের দিকে আকৃষ্ট হয়, আর নূতন নূতন চিন্তার ও অশান্তির বোঝা নিয়ে নিয়ে আসে। Isak-এর বড় ছেলে শহরের দিকে আকৃষ্ট হয়ে কিরূপ শোচনীয় পরিণতি লাভ করলে; কিন্তু তার ছোটছেলে বাপের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কেমন শান্তিতে জীবন কাটাতে লাগলো। এখানে শহর ও পল্লীতে হ্যামসন Contrast টেনে দিয়েছেন। হ্যামসন শান্তির জন্যই যে শুধু পল্লীকে ভালবাসেন তা নয়। পল্লীর সরলতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও এই ভালবাসার মূলে আছে। যখন "দিনের তরণী পূর্ব্ব সাগরে ভুলে উঠে রাঙা পালে," যখন "জ্যোৎস্না শেফালী পুষ্পের মত পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঝরে পড়ে" তখন পল্লীর সে সুষমা হ্যামসনকে মুগ্ধ করে তোলে। তাই পল্লীজীবনকে এত চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। নুট হ্যামসন শান্তির বড়ই পক্ষপাতী। তাঁর মতে যে মানুষের প্রাণে প্রেম আছে, খাওয়া-পরার কোন অভাব থাকলেও সে মানুষ অন্তরের ঐশ্বর্য্যের বলে মাথা তুলে থাকতে পারে। প্রাচ্যের আদর্শও অনেকটা তাই এবং নরওয়ের এই সাহিত্যিক প্রতীচ্যের সকল আদর্শকেই ইহার নিম্নে স্থান দিয়েছেন।

হ্যামসন আসলে একজন প্রেমিক। তাই তাঁর বিরাট প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাই, তিনি প্রেমের যে নিখুঁত ছবিগুলি এঁকেছেন তাদের মধ্যে। তিনি যেন ইচ্ছামত কতকগুলি রেখা টেনে দিয়েছেন, আর সেগুলি মিলে এক একটা অতুলনীয় ছবি গড়ে উঠেছে। কি মাধ্যাত্মিকার বৈচিত্র্যে, কি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা-ভঙ্গীতে, কি প্রেমের বিভিন্ন রকম রূপ-প্রকাশ করার শক্তিতে বর্ত্তমান জগতের সাহিত্যে তাহাদের তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। "Growth of the Soil" এ প্রেম তাহার সাধারণ রূপ প্রকাশ করতে পেরেছে। পুরুষ স্ত্রীলোকের জন্য যে সাধারণ অভাব বোধ করে, Isak তাই বোধ করেছিল। Hungerএ প্রেম সাধারণ অবস্থা থেকে এক ধাপ ওপরে উঠেছে। এ যেন মেঘেভরা আকাশে ঘন ঘন বিজুলী-চমক। চোখ ঝলসে যায়। চমক মিলিয়ে যাওয়াতেই যে বিজুলীর অস্তিত্ব লোপ পেল তাত নয়। মেঘের মধ্যে তা লুকিয়ে থাকলো। Hungerএ প্রেম ক্ষুধার্ত্ত মানুষটার হৃদয় ঝলসে দিচ্ছে, অথচ তার বিকাশ সর্ব্বক্ষণ স্থায়ী নয়। জঠর-জ্বালায় যখন লোকটা ঘুরে বেড়ায়, তখন সে প্রেম মেঘে-ঢাকা বিদ্যুতের মত তার মধ্যে চাপা থাকে। এ দুটো উপন্যাস শুধু প্রেমকে বিষয়-বস্তু করে গড়ে ওঠেনি। কিন্তু Pan ও Victoria নামক দুইটা উপন্যাস নিছক প্রেমের কাহিনী এবং হ্যামসন তাদের মধ্যে নিজের লেখনী-শক্তিকে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। প্রকৃত প্রেমের মূলে থাকা চাই আত্ম-বিস্মৃতি। সেইটারই অভাবের কাহিনীতে Pan পরিপূর্ণ। নির্জ্জনতা-প্রিয় শিকারী Glahn Edvardaর প্রেমে পড়ে। প্রথমে সে নিজের মনের ভাব বুঝতে পারেনি। কিন্তু দুই একদিন যেতে না যেতেই Edvardaর প্রতি আসক্তিতে তার মন ভরে উঠে। Edvarda ও তাকে প্রাণের সঙ্গে ভাল-বাসে। Glahn সেই পুরাকালের গ্রীক দেবতা Panএর মতই সমাজের কোনরূপ ধারই ধারে না। সমাজে কিরূপ ভাবে লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে বা আচরণ করতে হয়, সে তা জানে না। Edvarda তাকে দুই একটা পার্টিতে নিমন্ত্রণ করে। সে নিজে নিমন্ত্রণকারিণী সুতরাং সকলের সঙ্গে তার আলাপ করা চাই। শুধু Glahnকে নিয়ে পড়ে থাকলে তার সামাজিক কর্ত্তব্য সমাধা করা হয় না। কিন্তু Glahn সব সময়েই দেখতে চায়, সে Edvardaর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আছে। তার মনে মনে একটা আত্মম্ভরিতা বরাবরই বর্ত্তমান। তাই Edvardaকে অন্যের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত দেখলেই Glahn মনে করে সে বুঝি তাকে ভালবাসে না। এই-রকম একটা পার্টিতে Glahn এমন একটা খামখেয়ালী

করে বসে, যেটা পাঁচজনের চোখে বিসদৃশ ঠেকে ও পাঁচ-জনকে যাতে একটু ব্যতিব্যস্ত হতে হয়। Edvarda তার পর থেকে তার সঙ্গে সমঝে চলে; কিন্তু তার প্রেম অটুট থাকে। Glahnএর সঙ্গে পরিচয় হবার আগে থেকেই এক ডাক্তারের সঙ্গে Edvardaর বিশেষ পরিচয় থাকে। Glahn সন্দেহ করে Edvarda এই ডাক্তারকে বেশী ভালবাসে। Edvarda সন্দেহ খণ্ডন করার অনেক চেষ্টা করে। পরে রাগে ও ক্ষোভে বলে ফেলে, ডাক্তারের সঙ্গে তার কোন তুলনাই হয় না! Glahn আর তাকে বিশ্বাস করে না, কিন্তু সে ডাক্তারের সঙ্গে নিজেকে তুলনায় সমান করে দাঁড় করাতে চায়। ডাক্তার খোঁড়া। তাই সে বন্দুকের গুলীতে নিজের এক পা আহত করে। সেও খোঁড়া হবে, দেখি কেমন করে ডাক্তারের সঙ্গে তুলনা হয় না। Edvarda তাকে দেখতে এসে বলে সে শুধু তাকেই ভালবাসে। সে যে মাঝে মাঝে শৈথিল্য প্রকাশ করে, সেটা আন্তরিক নয়, শুধু মানসিক অন্যমনস্কতা এজন্য দায়ী। তার কথাটা আরও পরিস্ফুট করবার জন্য জানালে, "Some give a little, but it is much for them to give; others can give much, and it costs them nothing—and which has given more?" আগের দেওয়াই যে তার দেওয়া। কিন্তু Glahn অত কথা চায় না। সে শুধু উপভোগ করতে চায়। এই উপভোগের মাঝে যে আর কিছু এসে দাঁড়াবে, সে তা সহ্য করতে পারে না। তাই Edvardaকে ছেড়ে সে Eva নামে একটা বিবাহিতা নারীর প্রতি আসক্ত হ'ল। এই নারী তাকে কোনরূপ বাধা দেয় না। নিজেকে তার কাছে একেবারে বিকিয়ে দেয়। তবু ত সে Edvardaকে ভুলতে পারে না। কতবার Evaর কাছে তার অখ্যাতি করতে যায় কিন্তু Eva একটা কথায় সায় দিলেই একেবারে রেগে ওঠে। Edvardaর পিতা বিদেশ থেকে এক ধনী লোককে সঙ্গে করে নিয়ে আসে যদি Edvardaর পছন্দ হয়। Edvarda তাকে উপেক্ষা করে। শেষবারের মত সে Glahnকে তার ভালবাসা জানাতে ও আত্মসমর্পণ করতে আসে। Glahn তাকে প্রত্যাখ্যান করে। তার মনে সেই আত্মম্ভরিতা। ইহার পরেও Edvarda তাকে ভালবাসতে থাকে। তার পিতা যে-ধনী লোকটাকে সঙ্গে করে এনেছিল, সেও বোধ করি হতাশ হয়ে চলে যেতে প্রস্তুত হয়। তাকে বিদায় দেওয়ার আয়োজন Glahn বেশ ভালভাবেই করে। সে একটা পাহাড়ে খানিকটা অংশ খনির লোকের সাহায্যে আলগা করে রাখে। জাহাজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সেটাকে ভেঙ্গে দেয় ও বন্দুকের আওয়াজ করে। এগুলি হল বিদায়-সম্ভাষণ। সে ঈর্ষার আনন্দে যে কাজ করে, তার বিপরীত ফল হয়। Eva নীচে কাজ করে। পাহাড় ভেঙ্গে তারই মাথায় পড়ে। তার পরে Glahn এই পল্লী ছেড়ে তার দেশে যাবার মন করে। যাবার বেলায় Edvardaকে স্পর্দ্ধা করে তার বিদায় জানায়। Edvarda তার স্মৃতি হিসাবে তার কুকুরটা চায়। Glahu তার হাতে বিশ্বাস করে জ্যান্ত কুকুর দিতে পারলে না, যদি অযত্ন হয়। কুকুরটাকে নিজের হাতে বধ করে তার মৃতদেহটা Edvardaকে উপহার দেয়। ইহার কিছু মাস পরে Glahnএর মৃত্যু এমন একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে হয়, যেটা তার মত বন্য-প্রকৃতির পক্ষেই সম্ভব। এই মৃত্যু ভারতবর্ষে এক তামিলকন্যার প্রেম নিয়ে। উপন্যাসের ঘটনাগুলি বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং Glahnকে Panএর বর্ত্তমান যুগের প্রতিকৃতি করে তোলা হ্যামসেনের অদ্ভুত প্রতিভার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। হ্যামসেন কতবড় একজন প্রেমিক এবং সে প্রেমের মূলে যে বিরাট কবি-হৃদয় রয়েছে তার পরিচয় পাই Victoria নামক উপন্যাসে। এটাকে উপন্যাস বল্লে বোধ করি এর সম্মান রক্ষা হয় না। এ একটা কাব্য, গদ্যের আকারে পদ্য যেন আত্মপ্রকাশ করছে। স্থায়ী ও অস্থায়ী প্রেম কিরূপ হ্যামসন এই উপন্যাসে তাদের রূপ দিয়েছেন। কল্পনা বাস্তবকে রঙীন করে তুলেছে। পুস্তকটা এক মুহূর্ত্তে আমাদের সাধারণ জীবন থেকে অনেক দূরে ভাবের পাহাড়-ঘেরা কল্পনার দেশে নিয়ে হাজির করে। গল্পটা একটা Tragedy। Victoria ধনীর মেয়ে। টাকা পয়সার লোভে তার পিতা আর একজন ধনীর সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়া স্থির করে। কিন্তু সে অর্থ-সম্পদে অপেক্ষাকৃত হীন Johannesকে ভালবাসে। Victoria বোঝে Johannesকে সে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসলেও তার বাপ মা বিবাহ কর্ত্তে দেবে না। তাই সে নিজেকে ভাগ্যের

হাতে সঁপে দেয়। তার বিবাহের আগেই পাত্র শিকারে গিয়ে নিহত হয় এবং Johannesএর প্রতি Victoriaর প্রেম দেখে মনের দুঃখে আত্মহত্যা করে। Victoria বিবাহপাশ থেকে মুক্ত হল। Johannesকে প্রাণ সঁপে দিতে এল। কিন্তু Johannes তখন Victoriaর আশা ছেড়ে আর একজনকে বিবাহ করবে বলে কথা দিয়েছে। তখন দিন দিন সে শুকিয়ে যেতে লাগলো মনের দুঃখে। Johannes ও যাকে বিবাহ করবে বলেছে, সেও অন্য লোকের প্রতি আসক্ত হয়। দুইজনই—Victoria ও Johannes—ভগ্নহৃদয় হয়ে রইল। Victoria Johannes এর সঙ্গে শেষ দেখা করার অনেক কিছু চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। তাই সে যে শুধু Johannesকেই ভালবাসে এই কথা জানিয়ে এক বিদায় চিঠি রেখে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হল। তার মৃত্যুর পর সেই চিঠি Johannesএর হাতে পড়ে। প্রেম কি নুট হ্যামসন তা বর্ণনা করেছেন। কবিত্বময় বর্ণনা বলে তার থেকে কিছু উদ্ধৃত করলুম। কেন এই উপন্যাসকে গদ্যকাব্য বলেছি তাও সুপরিস্ফুট হবে। "Ah, what was Love ? A breeze whispering in the roses ; no, a yellow phosphorocence in the blood. * * * It was iike the daisy that opens wide to the coming of night and it was like the anemone that closes at a breath and dies at a touch. * * * Love is a summer night with stars in the sky and fragrance on the earth. * * * Love is the first word of God, the first thought that sailed through his brain." নুট হ্যামসেনের বিষয় যা লিখেছি তার উপসংহারে এক ইউরোপীয় সমালোচকের মত উদ্ধৃত করছি। "Hamsun has proved himself a master at probing into the unexproved cramines in the human soul, the mysterious territory of uncontrollable half conscious impulses."

নরওয়ের আর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক হলেন Sigrid Undset। এই প্রতিভাময়ী লেখিকা ১৯২৮ সালে নোবেল প্রাইজ পান। তিনি শান্তিময় পারিবারিক জীবনকে আদর্শ করে সাহিত্যের দরবারে হাজির হয়েছেন। এই আদর্শকে সর্ব্বসমক্ষে উঁচু করে ধরবার জন্যে তিনি যথেষ্ট যুক্তি দেখিয়েছেন এবং তাঁর উপন্যাসগুলিতে ঘটনা-বিন্যাস ও এই আদর্শের সহায়তা করে তুলেছেন। Free love অর্থাৎ যার সঙ্গে যার খুসী মিলনের যে theory ইউরোপে খুব বেশী রকম প্রিয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধারণ করেছেন। একাধারে কত ইউরোপীয় সাহিত্যিক প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, নূতন প্রেমের আকর্ষণে পূর্ব্বকার বন্ধন ছিন্ন করে আসা কোন রকমেই অন্যায় নয়। এই theoryর ফলে divorce এর সংখ্যা ভয়ানক ভাবে বেড়ে চলেছে, পারিবারিক অশান্তি কি রকমে লোককে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, তাই দেখিয়েই আণ্ডসেট ক্ষান্ত হন নি। তিনি আর এক পদ এগিয়ে গেছেন ও ইহার মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছেন। Love at first Sight অর্থাৎ প্রথম দর্শনে প্রেমের বিকাশ—ইহার চারিপাশে কবি ও ঔপন্যাসিকেরা কত romance গড়ে তুলেছেন। অধিকাংশ সাহিত্যিকই একমত যে এই Love at first sight পরে প্রকৃত ভালবাসায় পরিণত হয়। কিন্তু Jenny নামক উপন্যাসে আণ্ডসেট প্রমাণ করেছেন যে, Love at first Sight যে সব সময়েই প্রকৃত প্রেমে পরিণত হবে তা ত নয়ই বরং অধিকাংশ সময়েই তার বিপরীত হয়। জেনি দুইজনের সঙ্গে পর পর এই ভাবে প্রেমে পড়েছিল এবং প্রত্যেক-বারেই ভেবেছিল যে তার প্রেম প্রকৃত। কিন্তু সে সম্বন্ধে সন্দিহান হতে তার বেশীদিন যায় নি। আর একজন জেনীকে ভালবেসে চলেছিল, কিন্তু জেনী তাকে কোনদিনই প্রতিদান দিতে পারে নি। সে জেনীর মতই একজন আর্টিষ্ট। তার এইটুকু আনন্দ ছিল যে জেনীর কিছু প্রয়োজনের বেলাই তার দরকার হত। জেনীর শান্তির জন্য সে তার হৃদয়ের ব্যথা চাপা দিয়ে জেনীর প্রণয়ীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিত। তারা আসত স্বার্থ নিয়ে কিন্তু এই আর্টিষ্ট নিঃস্বার্থ ভাবে জেনীকে ভালবেসেছিল। এ প্রেম ত Love at first Sight এর ক্ষণিক উত্তেজনা থেকে উৎপন্ন নয়। এ প্রেম গভীর পরিচয় থেকে উৎপন্ন। এই আর্টিষ্ট জেনীকে বুঝে নিয়েছিল, তার আত্মার সঙ্গে ঘনিষ্টতা স্থাপন করতে পেরেছিল, তাই দৈহিক মিলনের অভাব তাকে বিচলিত করতে পারে নি। জেনী উপর্য্যুপরি দুইবার দুইজনের সঙ্গে প্রেমে পড়্‌ল অথচ কাহাকেও প্রাণ দিতে পারলে না। তার জীবনটা একটা tragedy-তে শেষ হয়ে গেল। জলন্ত বহ্নির মত প্রেম তাকে দহন করতে লাগলো। সে মৃত্যুর ক্রোড়ে

আশ্রয় নিল। নিজের হাতের এক শিরা নিজেই কেটে ফেল্লে। এই মৃত্যু-উষার পূর্ব্বক্ষণে নিজের জীবন পথে স্মৃতির পাথেয় জোগাড় করবার জন্য জেনীর পাশে এসে দাঁড়াল সেই আর্টিষ্ট। শান্তিপূর্ণ পারিবারিক জীবনের প্রতি জেনী কোনদিনই দৃষ্টিপাত করে নি। তাই তার জীবন এই tragedy-তে পর্য্যবসিত হল। কিন্তু তারই একজন সঙ্গী প্রণয়িনীর দোষগুণ জেনে বিবাহ করলো এবং শান্তিময় পারিবারিক জীবন অবলম্বন করে কেমন সুখে দিন কাটিয়ে দিলে। Love at first sight এর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিল বলেই, ভাগ্যে তার এই সুখ ছিল। Garland or kristen Lavrawsdatter নামক উপন্যাসেও আণ্ডসেট এই শান্তিময় পারিবারিক জীবনের জন্য লেখনী ধারণ করেছেন। আণ্ডসেট পারিবারিক জীবন নিজেও যাপন করছেন এবং এই জীবনের প্রতি যে তাঁর আকর্ষণ তাহা অন্ধ আকর্ষণ নয়। পারিবারিক জীবনের সকল দিকই তিনি মনোযোগের সঙ্গে দেখেছেন। তাঁর close observation এর পরিচয়ও আমরা অনেক স্থানেই পাই। মাতা ও পিতার স্নেহের মধ্যে তুলনা করে একস্থানে বলেছেন, "A father's affection is more understanding, more a matter of reflection and less instinctive than a mother's." তাঁর প্রাকৃতিক বর্ণনা romanticism এর পর্য্যায়ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথ ও Keatsএর মত অনেকটা। বাহুল্য ভয়ে একটী মাত্র নিদর্শন দিচ্ছি। " 'Twas as though the gleams of light had a voice of their own, and joined in the river's song, for when the evening twilight fell, the waters seemed to go by with a duller roar."

নরওয়ে চিরদিন শান্তিপ্রিয়। গত বিশ্বব্যাপী যুদ্ধেও সে নিরপেক্ষ ছিল। যদিও সে বিশ্বের চোখে এদিক দিয়ে কোনদিন উজ্জ্বল হয়ে উঠতে চায় নি, তাহলেও সে শান্তির মধ্যে যা গড়ে তুলতে পেরেছে, তা বিশ্বে একটা অপূর্ব্ব জিনিষ। তার সাহিত্য তাকে এক অপূর্ব্ব আভায় মণ্ডিত করে তুলেছে, তার শান্তিময় পারিবারিক জীবন তার সন্তানদিগের প্রাণে চির-শ্যামলতা এনে দিয়েছে। সাহিত্যও এই শান্তিকে প্রতিফলিত করে তুলেছে। নরওয়ে সাহিত্য কোন রোমাঞ্চকর ঘটনা পাঠের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পড়তে গেলে হতাশ হতে হবে। বায়স্কোপ জগতে যেরূপ ঘটনার বেশী প্রাদুর্ভাব তার কিছুই নাই। যুদ্ধের বর্ণনা ত দূরের কথা, সাধারণ সৈনিকের কীর্ত্তিকাহিনীও নরওয়ের বর্ত্তমান সাহিত্যে দুর্ল্লভ। এটা হল এই সাহিত্যের একটী প্রধান বিশেষত্ব। বিশ্বের কোনও সাহিত্যে এ জিনিষটী চোখে পড়ে না। নরওয়ের সাহিত্যের আর একটী বিশেষত্ব হ'ল তার সরলতা। প্রত্যেক সাহিত্যিকের ভাষাই অত্যন্ত সোজা। কোনরূপ আড়ম্বর নেই। অথচ সাহিত্যিক যা প্রকাশ কত্তে চেয়েছেন, প্রত্যেক ছত্রে যেন তা ফুটে বেরুচ্ছে। এই সরল ভাষায় লেখার একটা কারণও আছে। মানুষের জীবনের মধ্যে সরলতার আদর্শ উঁচু করে ধরাই নরওয়ের বর্ত্তমান সাহিত্যের উদ্দেশ্য। এই আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার অর্থাৎ কথায় ও কাজে মিল রাখবার জন্য ভাষার সরলতা বোধ হয় নরওয়ে সাহিত্যে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। নরওয়ের সাহিত্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের যে বর্ণনা আছে, তাও এই সরলতার দিক দিয়ে অপূর্ব্ব। নরওয়ের সাহিত্য কোন জায়গারই প্রকৃতিকে আমাদের আয়ত্তের বাহিরে দাঁড় করিয়ে তাকে একটা অলৌকিক রূপযুক্তা করে তোলে নি। তাই তার বর্ণনায় মনে হয়, চাঁদের আলো আমাদের কত আপনার। নদী, পাহাড়, সন্ধ্যাকাশের রক্তিমছটা যেগুলি পটে আঁকা ছবির মত দেখায়, তারা যেন কত আদরে আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাক দিচ্ছে। নরওয়ের বর্ত্তমান সাহিত্য তাই আমাদের এমন একটা আনন্দের অনুভূতি জুগিয়ে দেয়, যাতে অতি বড় জীর্ণ প্রাণেও শ্যামলতা আসে। নরওয়ে জগতকে আজকে তার সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বলছে, "ব্যষ্টিগত (বা Individual) জীবনে শান্তি আন, পরিবারিক জীবনকে শান্তিময় করে তোল, প্রেমের বিকৃতি দূর করে তাকে পবিত্রতার আলোকে মূর্ত্ত করে তোল, শত ক্রটি সত্ত্বেও মানুষকে মানুষ বলে জান, তাহলে জগত স্বর্গ-সুষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠবে।" আমরা শুধু সেই শুভদিনের অপেক্ষায় রইলুম, যেদিন জগত এই বাণী কান পেতে শুনবে।

শিক্ষক ও ছাত্রের সম্বন্ধ

মোহাম্মদ গোলাম জিলানী বি-এ, বি-টি

আজ সমগ্রজগতে সব বিষয়ের এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। প্রত্যেক বিষয়কে আধুনিক আলোকে যাচাই করিয়া দেখিবার একটা খেয়াল এবং পুরাতনকে পরিত্যাগ করিবার একটা ঝোঁক আমরা প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক সমাজে দেখিতে পাইতেছি। এই পরিবর্ত্তনের ভিতর একটা খুব বড় সত্য প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কাইত আছে। সেটা হইতেছে প্রত্যেক জিনিসকে তার সত্যকার আলোকে দেখা। জগতের এই আধুনিক ভাবধারার স্বাভাবিক গতিরোধ করা অসম্ভব এবং তাহা উচিৎও নয়। শিক্ষক ও ছাত্রের সম্বন্ধকেও আমাদিগকে এই আলোকে যাচাই করিয়া লইতে হইবে। পুরাতন চর্ব্বিত-চর্ব্বণ প্রণালী সন্তোষজনক নয়, তাহাকে ত্যাগ করিবার শুভ-ইচ্ছা যখন জগতের প্রত্যেক সমাজের প্রত্যেক স্তরে দেখা দিয়াছে, তখন আমরাই বা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিব কেন? আমাদের শিক্ষার প্রণালীর ভিতর আমাদের গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধের মধ্যে যদি বাস্তবিকই কোন গলৎ থাকে, তবে তাহা যত শীঘ্র পরিবর্ত্তন হয় ততই মঙ্গল।

আমি এই স্থানে আমাদের পুরাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুমহাশয়দিগের রক্তরাগ মুখশ্রী সকলকে মানসচক্ষে একবার দেখিয়া লইতে অনুরোধ করিতেছি। বেত্রহস্তে, শিক্ষকের ক্রোধ-মুখভঙ্গী ও ছাত্রের হৃদকম্পন, শিক্ষককে হিংস্র জন্তু বিশেষ মনে করা এবং ছাত্রগণের বলির পাঁঠার ন্যায় তার সম্মুখে উপস্থিত ইহা প্রত্যেকেই দেখিয়া থাকিবেন। এই অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিন্তু সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আজও হয় নাই। সেইজন্যই এই বিষয়টীর আলোচনার জন্ম আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

বালক-মনস্তত্ব বা child psychology সম্বন্ধে প্রত্যেক শিক্ষকের কিছু না কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। বালকগণ স্বভাবতঃই চঞ্চল ও অনুসন্ধিৎসু, তাহারা নূতন কিছু দেখিলেই তৎসম্বন্ধে কিছু না কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া পারে না। তাহাদের অনুসন্ধিৎসু মন সব সময়ে তাহাদিগকে এমন অস্থির করিয়া রাখে যে, স্থবিরের ন্যায় চুপ থাকা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। নূতন কিছু দেখিলেই তৎসম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে তাহারা আগ্রহ দেখাইবেই। যদি কেহ কখনও কোন শিশুকে লইয়া পথে বাহির হইয়া থাকেন, তবে তিনি আমার কথার যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। একবার জনৈক বৃদ্ধকে তাহার পৌত্র সহিত গঙ্গার ধারে বেড়াইতে দেখিয়াছিলাম। গঙ্গাবক্ষে জাহাজ বা যাহাই দেখিতেছিল, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বালক বৃদ্ধকে এমন অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল যে, বৃদ্ধ "না তোর জ্বালায় আর স্বস্তি নেই" বলিয়া গঙ্গাতীর ত্যাগ করিলেন।

বাস্তবিকই নূতন কিছু জানিবার জন্য শিশুরা এত বেশী আগ্রহ প্রকাশ করে এবং তাহাতে তাহারা এত আনন্দ পায় যে, তজ্জন্য প্রহার বেদনা পর্য্যন্ত তাহারা অম্লান বদনে সহ্য করে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই কৌতুহল ও অনুসন্ধিৎসু মন লইয়া বিদ্যালয়ের ত্রিসীমানায় পদার্পণ করিলে, তাহাদের সমস্ত আনন্দ ও অনুসন্ধিৎসা একেবারে লোপ পায়। তাহারা নির্জ্জীব উৎসাহ শূণ্য ও স্ফূর্ত্তিহীন জীবে পরিণত হয়। ইহার কারণ কি? নূতন কিছু জানিবার জন্য যখন তাহাদের এত আগ্রহ এবং সেই আগ্রহ লইয়া যখন তাহারা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, তখন বিদ্যালয়ের

প্রতি টান হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা না হইয়া তাহার বিপরীত হইয়া থাকে। স্কুলকে সকল ছাত্রই অতীব অপ্রীতিকর স্থান বলিয়া মনে করে এবং তাহাকে যথাসাধ্য বর্জ্জন করিতে পারিলেই তাহারা খুসী হয়। ইহার হেতু কি ?

সন্ধ্যাকালে পিসি বা ঠাকুর মার গল্পের মজলিসের কথা অনেকেই জানেন। সেই মজলিসে উপস্থিত হইবার জন্য বালকদের কি আগ্রহ! গল্প জিনিষটা যেমন প্রীতিকর, শিক্ষণীয় বিষয় সেরূপ হয় না কেন? গল্পে যেমন নূতন বিষয়, যুদ্ধ-মারামারি, নূতন দেশ জীব-জন্তুর বিষয় থাকে, ইতিহাস-ভুগোল, সাহিত্য-বিজ্ঞান এমন কি গণিতে তেমন প্রীতিকর কি কিছু নাই? নিশ্চয় আছে। আমাদের মনে হয়, গল্প শুনিতে ছেলেদের যেরূপ আগ্রহ, শিক্ষা গ্রহণেও তাহারা সেইরূপ আগ্রহ প্রদর্শন করে, যদি স্কুলের পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহাদের অনুকূল হয়। আমাদের বিদ্যালয়গুলিকেও সান্ধ্যকালীন উপকথার মজলিসে পরিণত করা যাইতে পারে, যদি আমরা শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে ঠাকুরমা ও নাতীর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি। একটা প্রীতির বন্ধন, একটু আত্মীয়তা বা স্নেহের আকর্ষণ আমাদের শিক্ষাদান ও গ্রহণ কার্য্যে অনেক পরিবর্ত্তন আনিতে পারে। আমরা আমাদের বিদ্যাপীঠ হইতে আনন্দকে বিসর্জ্জন দিয়া, সেই স্থানে স্থাপন করিয়াছি একটা অপ্রীতিকর বাধ্য-বাধকতার সম্বন্ধ। ছেলেদিগকে আনন্দ দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য তাহাদিগকে স্ফূর্ত্তিহীন, নির্ব্বাক, সুসভ্য জীবে পরিণত করা। গল্প বলিবার সময় বক্তা এবং শ্রোতার যে আনন্দ সেই আনন্দ হইতে আমরা গুরু-শিষ্য উভয়েই বঞ্চিত। সে প্রীতির বন্ধন আমাদের মধ্যে নাই; সে উদারতা, চক্ষের সে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি, দুই পক্ষের কোন পক্ষেই দৃষ্ট হয় না এবং সর্ব্বোপরি সে স্বাধীন, নির্ভীক পরস্পর নির্ভরশীল গতিবিধি ও সম্বন্ধ গুরুছাত্রের মধ্যে নাই

বাধ্যতা বা Compulsion অনেক ক্ষেত্রে ফলপ্রদ হইলেও প্রাণের সম্বন্ধ স্থাপনে ইহা ভয়ানক অন্তরায়। ঠাকুরমার গল্পগুলি অত প্রিয় হওয়ার একমাত্র কারণ এই যে সেখানে বাধ্য-বাধকতার কোন সম্বন্ধ নাই। সেখানে না আছে জোর করিয়া শুনাইবার জিদ—না আছে বাধ্য হইয়া শুনবার আশঙ্কা! গল্প-বলা না-বলা যেমন বক্তার স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, সেইরূপ শ্রবণ-করা না করাও শ্রোতার স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ঠিক এমনটী না হইয়া যদি একপক্ষকে বাধ্য হইয়া বলিবার এবং অপর পক্ষকে তদপেক্ষাও অধিক বাধ্য হইয়া শুনিবার ব্যবস্থা দেখিতাম, তবে আমাদের ঠাকুরমার গল্পের আসর-গুলি ওরূপ হাস্যকোলাহল পূর্ণ আনন্দের উৎসরূপে না দেখিয়া ঠিক আমাদের বর্ত্তমান বিদ্যালয়ের মত দেখিতাম।

বাস্তবিকই বাধ্যতা জিনিসটী অত্যন্ত বিশ্রী। যতক্ষণ বাধ্যতা বা Compulsion না থাকে, ততক্ষণ সবই সুন্দর। যেই মাত্র Compulsion আসিয়া হাজির হয়, যখন অপর কাহারও ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছাকে সংহত ও সংযত করে বা যখন আমরা করা না করার স্বাধীনতা হারাই, তখন আমাদের মন বিগড়াইয়া যায়। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে কার্য্য করা যায় তাহা আনন্দেরই বহি-প্রকাশ। শিশু সমস্ত দিন খেলিতেছে, তাহাতে তাহার ক্লান্তি নাই, কিন্তু যেই মাত্র তাহাকে খেলিতে বাধ্য করিবে, অমনি দেখিবে তাহার খেলিবার সমস্ত উৎসাহ কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অনেক সময় দেখা যায় বালকেরা বাজে পুস্তক পাঠে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু সেই পুস্তকই যদি তাহার অবশ্য পাঠ্য পুস্তকরূপে পরিণত হয় তবে তাহারা তাহা পড়িতে আর মোটেই আগ্রহ দেখাইবে না।

আসল কথা শিশু-চিত্ত বাধ্যতাকে মোটেই পছন্দ করে না। তাহারা চায় স্বাধীনতা। আমাদের শিক্ষক ও ছাত্রের সম্বন্ধ নিরুপণ করিতে হইলে এই কথাটী প্রত্যেক শিক্ষককে মনে রাখিতে হইবে। যে গুরু ছাত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া নিজের উদ্দেশ্য যত বেশী সিদ্ধ করিতে পারিবেন, তিনিই তত বেশী কৃতী! গুরুর সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইবে, গুরু-শিষ্য উভয়ের মধ্যে এমন একটা মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করা, যাহার মধ্যে জোর-জবরদস্তি থাকিবে না। কেহ কাহার উপর প্রভুত্ব করিবার প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিবে না। দুইটী সম্পূর্ণ স্বাধীন জীবনের ভাব সম্পদের যে আদান-প্রদান তাহা কত মধুর। বালকগণ স্ব-ইচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষায় গুরুর নিকট আগমন করিবে। গুরু জ্ঞান-বিতরণের আনন্দে শিষ্যকে শিক্ষা দিবেন। শিষ্য আসিবে তাহার আকাঙ্ক্ষা

চরিতার্থ করিতে, জ্ঞান-পিপাসা সার্থক করিতে; আর গুরু লাভ করিবেন জ্ঞানদানের আনন্দ। ইহাই তাহাদের বাহিরকার সম্বন্ধ।

আসল কথা—শিক্ষক ছাত্রকে দিবেন মুক্তির আনন্দ-অবসর। একেবারে সম্পূর্ণ অনাবৃত স্বাধীনতা তাহাদিগকে দিবেন। মুক্তির আনন্দ, স্বাধীনতার দাবী এবং ত্যাগের মাহাত্ম্য যেন আমাদের শিশুগণ জীবনের প্রথম হইতে বুঝিতে পারে। জীবনকে বঞ্চিত করাই জীবনের পরম সার্থকতা ও ভোগের অতৃপ্তিই সুখের চরম সোপান, এই সমস্ত অন্তঃসারশূন্য কথা দিয়া আমরা যেন তাহাদিগকে ভুলাইয়া না রাখি। আমরা শিশুদিগকে বাঁধিতে যাইয়া যুগে যুগে যে অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছি, সেই পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত হইতে হইবে। তাহাদের জীবনকে নীরস করিবার জন্য, তাহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিকে খর্ব্ব করিবার জন্য, এক কথায় তাহাদিগকে পিষিবার জন্য তাহাদের চারিপাশে যে অভেদ্য প্রাচীর খাড়া করিয়া তুলিয়াছি—তাহা ভাঙ্গিতে হইবে। রূপে-রসে-গন্ধে তাহাদিগকে বড় হইতে দিতে হইবে। তাহাদের কলহাস্য, তাহাদের আনন্দ-দুষ্টামী এবং তাহাদের ছেলেমী এর কোনটী হইতেই যেন আমরা তাহাদিগকে বঞ্চিত না করি। আনন্দ তাহাদের চির সহচর, প্রকৃতি তাহাদের পথ-প্রদর্শক এবং জ্ঞান তাহাদের খাদ্য ইহা যেন তাহারা বুঝিতে পারে।

প্রকৃতি তাহার শ্যামল বক্ষ বিছাইয়া দিয়া বালকগণকে ডাকিতেছে—এস চির-স্বাধীন, চির চঞ্চল-উচ্ছৃঙ্খল বালক-গণ—তোমরা আমার বক্ষের উপর তাণ্ডব লীলার অভিনয় কর আমি তাহাতে একটুও অসন্তুষ্ট হইব না। বৃক্ষ তাহার সহস্র-বাহু বিস্তার করিয়া ডাকিতেছে—এস অত্যাচারী নিষ্ঠুর চির-উদ্দাম ও চঞ্চল মানব সন্তান—তোমার যাহা ইচ্ছা আমার সহিত ব্যবহার করিতে পার, আমি তোমার স্বাধীনতায় এতটুকুও হস্তক্ষেপ করিব না! এমন উদার প্রেম লইয়া প্রকৃতি বালকদিগকে তাহার বক্ষে স্থান দিতে পারে বলিয়াই প্রকৃতির সহিত আমাদের বালকগণের এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। আর আমরা প্রকৃতি হইতে এত বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বলিয়াই আমাদের প্রতি তাহাদের এত বিরাগ।

আমাদের এই বিদ্যালয়ের দেওয়ালগুলি বালকদিগকে প্রকৃতির সহিত যোগ ছিন্ন করিয়াছে। বাহিরের উদার উন্মুক্ত প্রান্তর এবং ভিতরের আবদ্ধ মানব শিশু, এই দুইএর মধ্যে যে অভেদ্য প্রাচীর মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে ইহাই ত শিশুকে আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। বাহিরের যে আনন্দময় ভুবন হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে, তাহার সেই ডাকে শিশুর বিদ্রোহী মন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে—তাই ছুটীর নামে তাহাদের মন এত উন্মাদ হইয়া উঠে।

বাস্তবিকই প্রকৃতির সহিত—স্বাধীনতার সহিত আমা-দের শিক্ষার কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া, আমাদের শিক্ষাদান কার্য্য এত অপ্রীতিকর। আমাদের শিক্ষকগণ ও অতি মাত্রায় অত্যাচারী প্রভুত্বপ্রিয় এবং স্থবির। শিশুর সহিত মিশিতে হইলে আমাদিগকে ঠিক তাহাদের মত হইয়াই মিশিতে হইবে। আমাদিগকে ৪০।৫০ এর কোটা হইতে নামিয়া একেবারে ৮।১০।১২ এর কোটায় নামিতে হইবে। তবেই ত তাহারা আমাদের সহিত মিশিয়া আনন্দ পাইবে। আমাদের অন্তঃকরণকে শিশুর উপযোগী করিয়া রাখিতে হইবে। শিক্ষক, ছাত্রের গুরু, পিতা ও সখা। যখন তিনি জ্ঞান দান করিবেন তখন তিনি গুরু, ছাত্রের জন্য তাঁহার অন্তরের পুঞ্জীকৃত স্নেহ-ভাণ্ডারের জন্য তিনি পিতা, এবং তাহার প্রতি সদয় ও অমায়িক ব্যবহারের জন্যই তিনি তাহার বন্ধু। গুরু শিষ্যের মধ্যে যাহাতে কোন দূরত্বের সৃষ্টি না হইতে পারে, তজ্জন্য শিক্ষক চেষ্টিত থাকি-বেন। তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় তাহাদের বিশ্বাসভাজন হইবার চেষ্টা করিবেন।

শিক্ষকের স্বভাবের মধ্যে এমন কোন অত্যাচার থাকিবে না যাহার জন্য ছাত্রকে তাহার সঙ্গ পরিহার করিয়া চলিতে হয়। ডাক্তার যদি রোগীর সম্পূর্ণ বিবরণ না জানিতে পারেন, তবে ঠিক ঔষধ প্রয়োগ করাও তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। তেমনি শিক্ষক ও ছাত্রের সম্বন্ধ এমন হওয়া উচিৎ, যাহাতে ছাত্রকে কোন বিষয়ে গুরুর নিকট লুকাইয়া না চলিতে হয়। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে স্নেহের সম্বন্ধ না হইয়া যদি তাহাদের মধ্যে কেবল ভয় ও শাসনের সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে গুরু কোনদিনই ছাত্রের প্রকৃত স্বভাব ধরিতে পারিবেন না। ছাত্র সব সময়ে তাহার প্রকৃত স্বভাবটী গুরুর নিকটে লুকাইয়া রাখিবে। কোন্ ছাত্র কিরূপ, কাহার চরিত্রে কি কি

দুর্ব্বলতা আছে, গুরু যতদিন তাহা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিবেন, ততদিন কোন্ শিক্ষা ছাত্রের উপর কিরূপ কার্য্যকরী হইবে তাহা তিনি কিরূপে বুঝিবেন? প্রকৃতি যেমন বালকের পরিচালক শিক্ষকও সেইরূপ তাহার পথ-প্রদর্শক। গুরু যদি প্রকৃতিকে তাহার আদর্শ ধরিয়া লন, তাহা হইলে শিক্ষাদান কার্য্যে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। গুরুর কর্ত্তব্য ছাত্রকে তাহার নিজের রূপে বাড়িতে দেওয়া তাহার আমিত্বের পরিস্ফুটনে সাহায্য করা। ছাত্রের চরিত্র গঠনে গুরু Passive Part গ্রহণ করিবেন। তাহার কার্য্যপটুতা তত বেশী দরকার নয় যত তাহাকে দূর হইতে পর্য্যবেক্ষণ করা ও প্রকৃত পথের ইঙ্গিত করা। ছাত্রের স্বভাবদত্ত গুণরাশির পরিপুষ্টি ও পরিবৃদ্ধির সাহায্য করাই গুরুর কাজ। বাগানের মালী বৃক্ষের জীবন গঠনে যে অংশ গ্রহণ করে শিক্ষকের পক্ষেও ততটুকু ছাড়া বেশী কিছু করা প্রশংসনীয় বা ছাত্রের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। বৃক্ষের পরিবর্দ্ধনে বাহিরের কোন সাহায্যই যেমন কার্য্যকরী হয় না, শিক্ষকও তেমনি জোর করিয়া কোন বালককে অতি-বিদ্বান করিতে পারেন না। এই অতি-বিদ্বান করিবার ঝোঁক আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। জোর করিয়া আকর্ষণ দ্বারা যেমন কোন ক্ষুদ্র বৃক্ষকে বড় করা যায় না, বৃক্ষকে বড় করিতে হইলে, যেমন তাহার অন্তর্নিহিত বৃদ্ধি-শক্তির সাহায্য করা দরকার, সেইরূপ ছাত্রদিগকেও বড় করিতে হইলে, সে যাহাতে আপনা হইতেই বড় হইতে পারে তাহাই করিতে হইবে।

শিক্ষকগণ নিষেধের গণ্ডীদ্বারা ঘিরিয়া রাখিয়া শিশুর মানবতার প্রসারের পথে যে অন্তরায় হইয়াছেন, সেই গণ্ডী তুলিতে হইবে। বৃক্ষের সার্ব্বাঙ্গীন development বা পরিবর্দ্ধন সম্ভবপর হয় যদি তাহার চারিপাশে কোন আবেষ্টনী না থাকে। বৃক্ষ যে দিকে কোন বাধা না পায় সেই দিকেই বাড়িয়া উঠে, যদি তার সর্বদিকই খোলা থাকে, তবে সে প্রকৃতি-প্রদত্ত স্বাভাবিক বৃদ্ধি লইয়া সুন্দর ও সৌষ্ঠব আকার ধারণ করে। আমাদের বালকদের পক্ষেও এই নিয়ম প্রযুজ্য। তাহার বৃদ্ধির যে দিকেই আমরা কাঁটা দিব সেই দিক হইতেই সে মুশড়িয়া পড়িবে। যদি শিশুর মানসিক বৃত্তিগুলি (harmoniously) যুগবৎ বাড়িতে না পারে, তবে তাহার পক্ষে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করা সম্ভবপর হয় না। বালকের চিত্তের প্রসারের পথে যদি কোন অন্তরায় থাকে, তবে শিক্ষকের কর্ত্তব্য সেগুলি সযত্নে দূর করা। বাহিরের কোন চাপ যেন তার জীবন-বৃক্ষের সর্ব্বতোমুখীন বৃদ্ধির ক্ষতি না করে। তার সমস্ত সদ্‌বৃত্তির উৎকর্ষসাধণ আবশ্যক।

আনন্দই জীবন। আনন্দকে বিসর্জ্জন দিয়া যে শিক্ষা, সে শিক্ষা কোন ক্রমেই বালকের মঙ্গলদায়ক হয় না! যে শিক্ষকের মুখাকৃতি দেখিয়া বালকের অন্তরাত্মা শুকাইয়া যায়, শিক্ষা-ক্ষেত্র হইতে বিদায় লওয়াই তাঁহার পক্ষে বাঞ্ছনীয়। শিক্ষককে সহানুভূতি-সম্পন্ন ও স্নেহ-প্রবণ হওয়াই সবচেয়ে বেশী দরকার, বিশেষতঃ যেখানে কোমল মতি শিশুটাকে লইয়া চলিতে হইবে। বিদ্যালয় ও তাহার পারিপার্শ্বিক বা তৎসংলগ্ন সমস্ত জিনিষের এমন একটা আকর্ষণ বা মোহ থাকা দরকার, যাহার জন্য বালকগণ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। অন্ততঃ শিক্ষকের স্বভাব এমন হওয়া দরকার যাহাতে ছাত্রগণ তাহার সহিত আলাপ বা কথা বলিয়া আনন্দ পায়।

শিক্ষক হইয়া যদি কাহারও বাহাদুরী লইবার ঝোঁক থাকে, নিজের প্রভুত্ব, ক্ষমতা ও বিদ্যাবত্তা দেখাইতে প্রয়াসী হন, তবে তাঁহার শিক্ষক হওয়া উচিত নয়। মানুষ কখনও পূর্ণ বা সর্ব্ববিষয়ে চরম গুণবান হইতে পারে না একথা মনে রাখিয়া শিক্ষককে ছাত্রের সহিত মিশিতে হইবে। নিজের দুর্ব্বলতাগুলি ঢাকিয়া রাখিয়া দেবতা সাজিবার কোন আবশ্যকতা নাই। ছাত্রগণ যেন শিক্ষককে তাহাদেরই মত একজন লোক বলিয়া বুঝিতে পারে এবং শিক্ষক কোন্ কোন্ গুণে শ্রেষ্ঠ এবং সেগুলি অনুকরণ-যোগ্য কিনা, তাহা ছাত্রের অবগত হওয়া উচিৎ। এক কথায় বলিতে গেলে, শিক্ষককে ছাত্রের নিকট ধরা দিতে হইবে। ছাত্রগণ যাহাতে তাঁহাকে সম্যকরূপে অবগত হইতে পারে, সে সুযোগ তাহাদিগকে দিতে হইবে। ভয় দেখাইয়া বা শাসন করিয়া তাহাদিগকে দূরে রাখা এবং তদ্দারা নিজের দুর্ব্বলতা তাহাদের নিকটে গোপন করা শিক্ষকের দুর্ব্বলতারই পরিচায়ক। শিক্ষক যদি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ছাত্রদিগের নিকট হইতে গোপন রাখেন, তবে ছাত্রদিগকেও তিনি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইতে পারিবেন না।

আপনত্বের দাবী যেখানে সত্যের উপর স্থাপিত সেখানে পরস্পর পরস্পরের নিগূঢ়তম সংবাদ জানিবার অধিকারী। ইহার দ্বারা প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয় এবং পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। গুরুর অকপট ব্যবহারে, ছাত্র নিজের চরিত্র সংশোধনের সুযোগ পায় এবং নিজের কপটতার জন্য লজ্জিত হয়।

ছাত্র নির্ব্বোধ, অজ্ঞ, বিবেচনা-শূন্য এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন এ বিশ্বাস যেন শিক্ষকের না হয়। তাহারা মানুষ, বিশ্বাসযোগ্য ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ইহা অন্তর হইতে মানিয়া লইতে হইবে এবং তাহাদের সহিত মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিতে হইবে। তৎকৃত অপরাধের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা না করিয়া তাহার বিবেকের নিকট বিচারপ্রার্থী হওয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। ছাত্রের অসদ্ব্যবহারে রাগান্বিত না হইয়া দুঃখিত হইয়াছি, এই ভাব তাহাকে অধিকতর বিচলিত করিবে। রাগ বা প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া গুরু যদি ছাত্রের শাস্তির ব্যবস্থা করেন, তবে শিষ্য গুরুর সদ্বিচারের প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িবে এবং তৎপ্রদত্ত কোন শাস্তিই আর তাহাকে সংশোধনের দিকে অগ্রসর করিবে না। ছাত্রকৃত অপরাধের শাস্তিদানের ভার গুরু নিজে গ্রহণ না করিয়া অন্য কোন যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন।

ক্লাসে শান্তি ও শৃঙ্খলা নামে বালকদিগের প্রতি যে অত্যাচার হইয়া আসিতেছে, তাহা দেখিলে বাস্তবিকই দুঃখ হয়। যখন দেখি ৩০।৪০ জন চঞ্চলমতি বালক কেবল শিক্ষকের চোখ রাঙানির ভয়ে চুপ হইয়া বসিয়া আছে, তখন আমার আক্ষেপ হয়। প্রাণের অনাবিল আনন্দোচ্ছ্বাস যাহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে, জীবনের সাড়া যাহাদের প্রতি অঙ্গে ফাটিয়া বাহির হইতেছে, অস্থিরতা, দুষ্টামী ও ছেলেমী যাহাদের স্বভাব, তাহারা যদি বৃদ্ধের ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়, তবে তার চেয়ে অবিচার আর কি হইতে পারে? প্রাণ যাদের মুক্তিকামী, আশা যাদের রঙিন কল্পনায় বভোর উচ্ছল-ছল-নৃত্যপাগল হিন্দোল-দোলে যারা মাতোয়ারা, অনন্ত শ্যামল প্রকৃতির বক্ষ যাদের ক্রীড়াক্ষেত্র, তাহারা যদি পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গমের ন্যায় গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকিয়া ছটফট করিতে থাকে, তবে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করিবে কে? শিক্ষার নামে এই অত্যাচার জাতীয় প্রাণ-শক্তিকে নষ্ট করিতেছে। জীবনের প্রভাত হইতেই আনন্দকে দূরে রাখিয়া আমরা শিশুদিগের শিক্ষার যে ব্যবস্থা করিতেছি, তাহার পরিণাম মঙ্গলের হইতে পারে না। শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে আনন্দ ও স্বাধীন গতিভঙ্গী অত্যন্ত দরকার, সে কথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

হয়ত অনেকের মনে এই ভাবের উদয় হইতে পারে যে, আমি শাসন ও শৃঙ্খলাকে উঠাইয়া দিবার যে প্রস্তাব করিতেছি, তাহাতে শিক্ষালয়ে উচ্ছৃঙ্খলতাই বাড়িয়া যাইবে এবং শিক্ষাদান কার্য্য একেবারে অসম্ভব হইবে। তা নয়, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং পেষ্টলটজে, ফ্রোবেল, মনটেসরী প্রভৃতি মনীষীবৃন্দের শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনার দ্বারা যাহা বুঝিয়াছি তাহাই আপনাদিগকে বলিবার চেষ্টা করিলাম। মহামতি পেষ্টলটজীর বিদ্যালয়ে কোন ছেলে প্রথম ভর্ত্তি হইতে গমন করিলে তিনি তাহাকে কোলে তুলিয়া তাহার মুখচুম্বন করিতেন। তাঁহার স্নেহে ছেলেরা এতদূর বশীভূত হইয়া পড়িত যে, তাহাকে স্কুল ত্যাগ করান অভিভাবকের পক্ষেও কঠিন হইয়া পড়িত। এমন কি লোকে বিশ্বাস করিত যে, তিনি যাদু দ্বারা ছাত্রদিগকে বশীভূত করেন। আমার পাঁচ বৎসরের ছোট কন্যা প্রত্যেক দিন একখানা পুস্তক লইয়া আমার নিকট আসিয়া জিদ করিত যে, তাহাকে পড়াইতেই হইবে। কিন্তু যেদিন হইতে আমার গরজে তাহাকে জিদ দেখাইলাম সেইদিন হইতেই তাহাকে আর আমাদের ঘরে দর্শন করা দুরূহ হইয়া পড়িল।

শিক্ষক যদি ছাত্রদিগের মনে এই ভাব বদ্ধমূল করিয়া দিতে পারেন যে, শিক্ষা গ্রহণ করা না করা ছাত্রের ইচ্ছা এবং তিনি তাহাকে সাহায্য করিতে না পারিলে আনন্দিতই হইবেন, তাহা হইলে আপনা হইতেই ছাত্রের মনে একটা দায়িত্ব-জ্ঞানের সৃষ্টি হইবে। সে যেন সব সময়ে মনে রাখে যে শিক্ষা গ্রহণ তাহারই কার্য্য—তাহার অভিভাবক বা শিক্ষকের কার্য্য নয়। সে নিজের কার্য্যদ্বারা সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে—শিক্ষক বা অভিভাবক হইবে না। কোন সময় আমার এক নিকট-আত্মীয় শিশুর শিক্ষার ভার আমার উপর পতিত হয়। বালকটি অমনোযোগী ও কর্ম্ম-বিমুখ বলিয়াই সকলে জানিতেন। তাহাকে জোর

করিয়া পড়িতে বসাইতে হইত এবং খোশামোদ করিয়া পড়াইতে হইত। আমার স্নেহ তাহাকে অভিভূত করিল বটে, কিন্তু তাহার পড়াশুনার প্রতি আমার উপেক্ষায় সে বিস্মিত হইল। আমি তাহাকে স্পষ্টই বলিয়া দিলাম যে পড়াশুনা সম্বন্ধে যদি সে আমার সাহায্য চায়, তবে আমি খুব আনন্দিতই হইব, আর সে যদি আমার সাহায্য না লয়, তবে সে আমার স্নেহের অযোগ্য বলিয়াই প্রমাণিত হইবে, এবং ভবিষ্যতে তাহার প্রতি আমার ব্যবহারও তদ্রূপ হইবে কেন না মূর্খে ও পণ্ডিতে কখনও বন্ধুত্ব হইতে পারে না। ইহার পরে দেখা গেল, সে আমার সাহায্য-প্রার্থী হইতেছে। আমার সাহায্যকালীন সে নিজেকে অনুগৃহীত মনে করে। অধঃপাত চরমে পৌছিলে, তাহার যে তিক্ততা তাহাও দরকার মত শিশুদিগকে আস্বাদ করিতে দিতে হইবে নয়ত তাহার মোহ হয়ত চিরকালই তাহাকে চঞ্চল করিয়া রাখিবে। নিষিদ্ধ ফলের মোহ বেশী, যতদিন বালকেরা তাহা ভক্ষণ না করে ততদিন হয়ত তাহার সে মোহ ঘুচিবে না। দরকার মত বালকদিগকে সে দুর্ভোগও ভোগ করিতে দিয়া, স্নেহদ্বারা জীবনের তিক্ততা তাহাকে অনুভব করিতে দিতে হইবে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ অবস্থা তাহার হইবে না। শিক্ষক যদি নিজের কর্ম্মদক্ষতা ও বিচক্ষণতার দ্বারা শিশুর মনে উপরোক্ত ভাবের উদ্রেক করিতে পারেন, তবে শিশু পূর্ব্ব হইতেই সজাগ হইবে। এই স্থানেই শিক্ষকের কৃতিত্ব নির্ভর করিতেছে। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ আলোচনায় এসব কথা আলোচনার আমার উদ্দেশ্য এই যে একমাত্র গুরুর স্নেহই ছাত্রের মনের দায়িত্ব-জ্ঞান ও আত্ম-মর্য্যাদার ভাব জাগ্রত করিতে সক্ষম। গুরুর সহবাসে আসিলে তিনি তাহার প্রত্যেক মুহূর্ত্তের ব্যবহারে ছাত্রের মনে এই ভাবটী বদ্ধমূল করিবেন।

আমার মনে হয় আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর সবচেয়ে দুর্ব্বলতা এই স্থানেই। ছাত্রকে ক্লাসে রাখা, তাহার উপস্থিতি, মনোযোগ ইহার প্রত্যেকটীকে ছাত্র মনে করে শিক্ষকের প্রয়োজন। ছাত্র সে তার নিজের প্রয়োজনে ক্লাসে আসে, পড়া শুনে এমন কি গুরুর বাধ্য থাকে, একথা কবে তাহাকে বুঝিবার সুযোগ দেওয়া হইবে? ক্লাসের অমনোযোগী ছাত্রকে শিক্ষক যদি অবহেলা করেন বা তাহাকে অনুনয় করিয়া বলেন— বাপু তুমি এখান হইতে চলিয়া যাইয়া আমাদের সকলকে রেহাই দাও তবে স্কুলের কি ক্ষতি হয়? কিন্তু আমাদের শিক্ষা-প্রণালীর আইন-কানুনে বলিবে, একজন ছাত্রের বেশী এক সময়ে ছুটি দিও না, ছাত্র অনুপস্থিত হইলে তাহাকে জরিমানা কর, এই সমস্ত আইনের যে কি সার্থকতা আছে তাত আমি বুঝি না বরং উহার দ্বারা ফল হইতেছে উল্টা। ইহার দ্বারা আমরা এই বুঝিব নাকি যে ছাত্রদিগকে বশে রাখিবার আমাদের ইহা ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র নাই।

আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতে একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ কিরূপ হওয়া উচিৎ এই আলোচনার দ্বারা যদি তৎসম্বন্ধে চিন্তার কিছু সাহায্য হয় তবেই আমি আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।
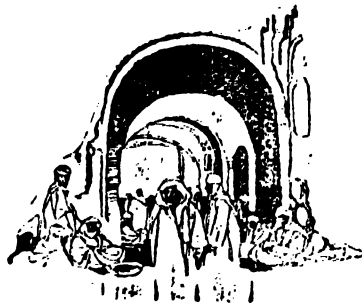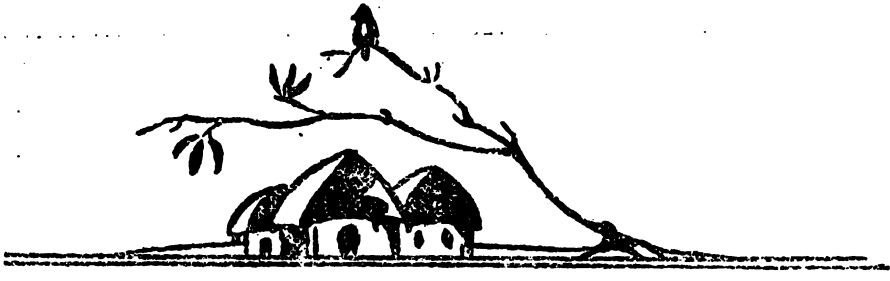
গণিত ও গণতন্ত্র

মোহাম্মদ আকরম খাঁ

১

সাইমন কমিশনের সম্মুখে ও গোল-টেবিল-সম্মিলনে বাঙ্গলার মুছলমানগণ তাঁহাদের জন-সংখ্যার অনুপাত অনুসারে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় আসন লাভ করার দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। নির্ব্বাচন-প্রণালী সম্বন্ধে মুছলমান নেতাদিগের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও, বাঙ্গলার ও ভারতের সমস্ত মুছলমান নেতার সমবেত অভিমত এই যে, কোন ক্রমে বা কোন পদ্ধতিতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মুছলমান মেম্বরদিগের সংখ্যা নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক হইলে, সেই সংখ্যা বাঙ্গালী মুছলমানের জনসংখ্যার অনুপাতের কম কোন প্রকারে হইতে পারিবে না। হইলে মুছলমান তাহা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতে কোন মতেই প্রস্তুত হইতে পারিবে না।

অন্যদিকে হিন্দু-সমাজের এক শ্রেণীর নেতা এবং প্রায় সমস্ত সংবাদপত্র মুছলমানদিগের এই দাবীর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—বাঙ্গলার মুছলমান মোটের উপর হিন্দুর মোকাবেলায় কিছু সংখ্যাধিক হইলেও, বাস্তবে তাহাদের এই সংখ্যাধিক্য একেবারেই নগণ্য। কারণ, তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্ত নর-নারীর সংখ্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হিন্দু নর-নারীর সংখ্যার তুলনায় কম। কেহ কেহ বলিয়াছেন, বয়ঃপ্রাপ্ত হিন্দু-পুরুষ অপেক্ষা বয়ঃপ্রাপ্ত মুছলমান-পুরুষের সংখ্যা অধিক নহে। কিন্তু প্রকাশ্য বিচার-আলোচনায় এইসব দাবী ও উক্তির অসারতা প্রতিপন্ন হইয়া যাওয়ার পর ইদানিং তাঁহাদের একদল লোক নূতন প্রতিজ্ঞা আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—শুধু হিন্দুর পক্ষে তুলনা করিলে চলিবে না। মুছলমান ও অমুছলমানের সংখ্যার তারতম্য লইয়া বিচার করাই এ ক্ষেত্রে সঙ্গত হইবে। এই হিসাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, বস্তুতঃ বয়ঃপ্রাপ্ত মুছলমানের সংখ্যা বা বয়ঃপ্রাপ্ত মুছলমান-পুরুষের সংখ্যা—বয়ঃপ্রাপ্ত অমুছলমানের—বা অমুছলমান-পুরুষের সংখ্যা হইতে কখনই অধিক নহে। হিন্দু-সভার ব্রাহ্ম সভাপতি, প্রবাসীর প্রবীন সম্পাদক, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অবশেষে আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং এই সমস্ত প্রতিজ্ঞার উপর finishing touch দিয়া বলিতেছেন—মুছলমান ও অমুছলমানের সংখ্যা-তারতম্য লইয়া আলোচনা করার সময় শুধু সাবালগের সংখ্যা লইয়া বিচার করিলে চলিবে না। তিনি নিজে ব্রাহ্ম হইলেও, তাঁহার ভিতর হইতে কথা কহিয়াছেন, হিন্দু-সভার সভাপতি। তাই এই বিচারের সময় তিনি সর্ব্বপ্রথমে বয়ঃপ্রাপ্ত নারীদিগকে বাদ দিয়াছেন। তাহার পর বলিতেছেন—"একুশ ও তাহার অধিক বয়সের লোকেরা সাবালক"—এবং এই বলিয়াই তিনি "একুশ ও তদধিক বয়সের পুরুষ"দিগের একটা আশ্চর্য্য রকমের হিসাব দিয়া দেখাইতেছেন যে, সাবালক অমুছলমান পুরুষ অপেক্ষা সাবালক মুছলমান-পুরুষ "কেবলমাত্র ৯৪৭৯ জন বেশী।" ফলতঃ ন্যায়শাস্ত্র ও ন্যাশানালিজম এবং গণিত-শাস্ত্র ও গণতন্ত্রের নানা সূক্ষ্ম ও অভিনব যন্ত্র-প্রয়োগে তাঁহারা সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, বস্তুতঃ মুছলমানরাই বাঙ্গলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ইহার উপর, জনৈক কাদিয়ানী ধর্ম্মাবলম্বী ভদ্রলোকের একখানা পুস্তক হইতে শিক্ষা, চাকরি, ইত্যাদি সম্বন্ধে মুছলমান ও অমুছলমানের তুলনামূলক কতকগুলি ছবি এবং সংখ্যাও প্রবন্ধের মাঝে মাঝে ছাপিয়া দিয়া নিজের বক্তব্যের গুরুত্ব বর্দ্ধন করিতে

চাহিয়াছেন। এই পুস্তকখানি কোন্ সালে প্রকাশিত, তাহা রামানন্দ বাবু বলিয়া দেন নাই। তবে তাহা যে, "সৎ উদ্দেশ্যে লিখিত"—এ সার্টিফিকেট দিতে তিনি বিস্মৃত হন নাই।

হিন্দু নেতারা মুছলমানদিগের স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের দাবীকেও কঠোরভাবে অস্বীকার করিতেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা যে-সব যুক্তি-প্রমাণ দিতেছেন, তাহার মধ্যকার বড় কথা এই যে, স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন জিনিষটা ন্যাশনালিজ্‌মের স্পিরিটের ঘোর পরিপন্থী। দেশে যত সাম্প্রদায়িক কোন্দল-কোলাহল উপস্থিত হয়, তাহার প্রধান কারণই হইতেছে এই স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন প্রথা। তাঁহাদের কথা শুনিলে মনে হয়, আজ সন্ধ্যার সময় যদি স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন প্রথা রহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে কাল সকাল হইতেই বাঙ্গলার হিন্দু-মুছলমান গলায় গলায় মিলিয়া একেবারে "হরিহরাত্মা" হইয়া যাইবে।

মুছলমান-সমাজের প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহাদের নাম আজ পর্য্যন্ত এই প্রসঙ্গে জানিতে পারা গিয়াছে, নির্ব্বাচন-প্রথা সম্বন্ধে তাঁহারা একমত নহেন। তাঁহাদের মধ্যকার অধিকাংশ ব্যক্তিই স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের ঘোর পক্ষপাতী। তবে কএক বৎসর পূর্ব্বে এই দলের প্রধান নায়কত্ব করিয়াছিলেন যাঁহারা, তাঁহাদের কএকজন প্রধান পুরুষ ইতিমধ্যে নিজেদের পূর্ব্বমত পরিত্যাগ করিয়াছেন। উদাহরণ স্থলে সার আবদুর রহিম, মৌলবী মুজীবর রহমান, মৌলবী আবদুল করিম প্রমুখ নেতার নাম করা যাইতে পারে।

মুছলমান নেতাদিগের মধ্যকার কতিপয় প্রধান ব্যক্তি এ সম্বন্ধে হিন্দু-মুছলমানের মধ্যে একটা স্থায়ী সন্ধি-স্থাপন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের গত কএক বৎসরের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। তাঁহারা স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন ছাড়িয়া মিশ্র-নির্ব্বাচন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—ব্যবস্থাপক সভায় আমাদের সংখ্যার অনুপাত অনুসারে আসন নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে হইবে। হিন্দুসভা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। গোল-টেবিলের আলোচনার সময় মুছলমান-পক্ষ বিশেষ ত্যাগ স্বীকার করিয়া প্রস্তাব করিলেন—মিশ্র-নির্ব্বাচনের মধ্য দিয়া আমাদিগকে মাত্র শতকরা ৫১টা আসন রিজার্ভকরার অধিকার দেওয়া হউক। মিলন-কামী মুছলমান নেতাদের আন্তরিক ও অক্লান্ত চেষ্টার ফলে, সকল মতের ও সকল দলের মুছলমান নেতারা ইহাতে সম্মতি দিলেন—মিশ্র-নির্ব্বাচনের ঘোর বিরোধী নেতারাও সন্ধির খাতিরে এই প্রস্তাবটা গ্রহণ করিলেন। এক শ্রেণীর হিন্দুনেতা এবং প্রায় সমস্ত হিন্দু-সংবাদ-পত্র মোছলেম বঙ্গের এই ত্যাগ-স্বীকারের এবং এই সমবেত অভিমতের যে তীব্র অবমাননা করিয়াছেন, তাহাতে বস্তুতঃ ভবিষ্যতে সন্ধির আলোচনাও এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নানাদিকের অবস্থা আলোচনা করিয়া এ সম্বন্ধে আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, মিশ্রনির্ব্বাচন ও ন্যাশনালিজ্‌ম বলিয়া হিন্দুনেতাদের বিশেষ কোন শিরঃপীড়া উপস্থিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা চান সকল প্রদেশে মুছলমানকে সংখ্যালঘু বা রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিতে। এই জন্য কংগ্রেস ও হিন্দুসভা গত ১৯১৬ সালে একযোগে মুছলমানদিগের স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের সমর্থন করিয়াছিলেন। এবং এই কারণেই তাঁহারা মিশ্র-নির্ব্বাচনের এই প্রস্তাবকেও "হিন্দুর আসন্ন বিপদ" বলিয়া সমবেত কণ্ঠে নিন্দা করিতেছেন।

বাঙ্গলার মুছলমান সমাজের একদল নেতা ও সেবক এরূপও আছেন—যাঁহারা স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন এবং আসন নির্দ্ধারণপূর্ব্বক মিশ্র-নির্ব্বাচন, এই উভয়েরই ঘোর বিরোধী। তাঁহারা মনে করেন, সাধারণ নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তিত হইলে হিন্দু-মুছলমানের সাম্প্রদায়িক সংঘাত-সংঘর্ষ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, এ আশা করা যেমন ভুল—ঠিক সেইরূপ, তাহাদ্বারা বাঙ্গলার মুছলমান সমাজ যে কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, এ আশঙ্কা ও সেইরূপ একটা ভিত্তিহীন ত্রাস মাত্র। তাঁহাদের মতে, স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন দ্বারাই মুছলমান সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং ইহা উঠিয়া গেলে বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভায়, তথা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মধ্যবর্ত্তিতায় ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে বাঙ্গলার মুছলমান নিজের প্রাধান্য, প্রভাব ও গুরুত্বকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে। তাঁহারা আরও বলেন—যদি স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের কল্যাণে মুছলমানকে বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যালঘু হইয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে ঐ নির্ব্বাচন-প্রথা ভবিষ্যতে তাহাদের পক্ষে একটা মারাত্মক অভিশাপ হইয়া দাঁড়াইবে।

উভয় পক্ষের এই সব অভিমত ও যুক্তিপ্রমাণের সূক্ষ্ম, নিরপেক্ষ ও বিস্তারিত আলোচনা করার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। হিন্দু নেতারা বিশেষতঃ রামানন্দ বাবু হিন্দু-মুছলমানের এবং মুছলমান-অমুছলমানের সংখ্যার তারতম্য সম্বন্ধে যে সব যুক্তি-প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রথমে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি। স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন ও সাধারণ নির্ব্বাচনের মধ্যে কোন্‌টা ভবিষ্যতে বাঙ্গলার মুছলমানের পক্ষে কি পরিমাণে হিতকর বা অহিতজনক হইতে পারে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা পরে করিব।'

২

এই প্রসঙ্গে কতিপয় হিন্দু নেতা যে সব মিথ্যা উক্তি প্রচার করিতেছেন, প্রথমে সেগুলির আলোচনা করিতেছি। রামানন্দ বাবুর অদ্ভুত গণিত ও গণতন্ত্রের অসারতা তাহার পরে প্রদর্শিত হইবে।

'হিন্দু নেতা ও হিন্দু সাংবাদিকগণ এ সম্বন্ধে তার-স্বরে যে সব মন্তব্য প্রচার করিয়াছেন 'এবং যে মন্তব্যগুলির দ্বারা ভারত হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত তেল্কি লাগাইয়া দেওয়ার চেষ্টা পাইয়াছেন,'তাহার সার এই যে ঃ—

(১) সাবালগ মুছলমানের সংখ্যা সাবালগ হিন্দুর সংখ্যা হইতে অধিক নহে।

(২) সাবালগ পুরুষ-মুছলমানের সংখ্যা, সাবালগ পুরুষ-হিন্দুর সংখ্যা হইতে অধিক নহে।

(৩) নাবালগ ও ৫০ বৎসরের অধিক বয়স্ক ব্যক্তি-দিগকে বাদ দিলে হিন্দুর সংখ্যা মুছলমান অপেক্ষা অধিক হয়।

(৪) নাবালগ এবং ৫০ এর অধিক বয়স্ক পুরুষদিগকে বাদ দিয়া কেবল তাহার মধ্যকার পুরুষদিগকে লইয়া হিসাবে ধরিলে, হিন্দুর তুলনায় মুছলমানের সংখ্যা অধিক হইতে পারে না।

(৫) মুছলমানদিগের মধ্যে বালক-বালিকা ও অধিক বয়স্ক বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সংখ্যাই অধিক।' অতএব মোটের উপর সংখ্যাগুরু হইলেও, এই মহাপাতকের জন্য তাহারা বাঙ্গলা দেশে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কোন অধিকার পাইতে পারে না।

ফলতঃ এইরূপে নানাপ্রকার "যুক্তি প্রমাণ" দিয়া তাঁহারা এক সঙ্গে গণিত ও গণতন্ত্রের এবং ন্যায় ও সত্যের শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অবলম্বিত ১৯২১ সনের আদম-শুমারীর রিপোর্টই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে যে, তাহাদের উক্তিগুলি একেবারে নির্জ্জলা মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নহে। এই সব সংখ্যাও তাহার বিস্তারিত হিসাবগুলি আমরা যথাক্রমে নিয়ে উল্লেখ করিতেছি।

' ১৯২১ সালের রিপোর্ট অনুসারে বাঙ্গলা দেশে 'পুরুষ ও নারী ০ হইতে ৫ বৎসর বয়সের—হিন্দু ২৩৯৩৪৩৭
ঐ, ৫ " ১০ ... ... ২৯০৪৯৭১
" ১০ " ১৫ ... ... ২২৪১৯১৮
" ১৫ " ২০ ... ... ২০৩৭৫০৮

২০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের হিন্দু নর-নারী ৯৫, ৭৭, ৮৩৪

বাঙ্গলা দেশে হিন্দু নরনারীর মোট সংখ্যা ঃ—
২০৮০৯১৪৮
বাদ ০—২০ ... ... ৯৫৭৭৮৩৪

২১ ও তদধিক বয়সের হিন্দু নরনারী ১১২৩১৩১৪

পক্ষান্তরে বাঙ্গলা দেশে মোছলেম নরনারীর মোট সংখ্যা ঃ—
০ হইতে ৫ ... ... ৩৫৫৫৬৮৫
৫ " ১০ ... ... ৪৩৭৮১৬৩
১০ " ১৫ ... ... ৩০৪২৫৭৯
১৫ " ২০ ... ... ২৪৩০৭৬২

২০ বৎসর পর্য্যন্ত মোছলেম নরনারী ১৩৪০৭১৮৯

বাঙ্গলার মুছলমান নরনারীর মোট সংখ্যা ঃ—
২৫৪৮৬১২৪
বাদ ০—২০ ... ... ১৩৪০৭১৮৯

২১ ও তদধিক বয়সের মুঃ নরনারী ১২০৭৮৯৩৫

রামানন্দ বাবুর নূতন সংহিতা অনুসারে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের সমস্ত নরনারীকে নাবালগ বলিয়া ধরিয়া লইলেও, মোট সাবালগ হিন্দু ও মুছলমানের সংখ্যা দাঁড়াইতেছে ঃ—

' মোট সাবালগ মুছলমান ১২০৭৮৯৩৫
" " হিন্দু ১১২৩১৩১৪

৮৪৭৬২১

অতএব সাবালগ মুছলমান নরনারী সাবালগ

হিন্দু নরনারীর অপেক্ষা ৮ লাখ ৪৭ হাজার ৬২১ জন অধিক। সুতরাং"—সাবালগ মুছলমানের সংখ্যা সাবালগ হিন্দুর সংখ্যা হইতে অধিক নহে" এই উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা।'

৩

"সাবালগ মুছলমান-পুরুষের সংখ্যা, সাবালগ হিন্দু-পুরুষের সংখ্যা হইতে অধিক নহে"—হিন্দু নেতাদিগের এই দাবীটাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং স্পষ্ট সত্যের বিপরীত একটা কল্পিত কথা। সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে বাঙ্গলা দেশে মুছলমান পুরুষের সংখ্যা :—

০—৫ ... ১৭২৫১২৬
৫—১০ ... ২২২৩৩১৫
১০—১৫ ... ১৭১৬১২৭
০—১৫ ৫৬৬৪৫৬৮ (মুঃ পুঃ)

মোট মুছলমান পুরুষের সংখ্যা :—
১৩১০৪৩০৭
বাদ মুঃ পুরুষ ০—১৫ ৫৬৬৪৫৬৮
১৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক মুঃ পুরুষ ৭৪, ৩৬, ৭৩৯

পক্ষান্তরে হিন্দু পুরুষের সংখ্যা :—

০—৫ ... ১১৬৫৮২৩
৫—১০ ... ১৪৭৫৫৫৭
১০—১৫ ... ১২৭৩৪৫৭
০—১৫ ... ৩৯১৪৮৩৭ (হিঃ পুঃ)

মোট হিন্দু পুরুষের সংখ্যা :—
১০৮৫৮৩২৩
বাদ হিন্দু পুরুষ ০—১৫ ৩৯১৪৮৩৭
১৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক হিন্দু পুরুষ ৬৯, ৪৩, ৪৮৬

অতএব ১৬ ও তদধিক বৎসর বয়সের মোট হিন্দু পুরুষের সংখ্যার সহিত ঐ বয়সের মোট মুছলমান পুরুষের সংখ্যার তুলনা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে :—

ঐ বয়সের মোট মুছলমান ··· ৭৪৩৬৭৩৯
বাদ " " হিন্দু ··· ৬৯৪৩৪৮৬
মুছলমান অধিক ৪, ৯৬, ২৫৩ জন

এইরূপে হিসাব করিয়া দেখিলে ২০ বৎসরের অধিক বয়স্ক মুছলমান পুরুষের সংখ্যা দাঁড়াইবে —

০—১৫ ... ৫৬৬৪৫৬৮
১৫—২০ ... ১১৪৩৯৯৬
০—২০ ৬৮০৮৫৬৪ (মুঃ পুঃ

মোট মুছলমান পুরুষের সংখ্যা :—
১৩১০৪৩০৭
বাদ মুঃ পুঃ ০—২০ ৬৮০৮৫৬৪
২১ ও তদধিক বয়সের মুছলমান পুরুষ ৬২৯৫৭৪৩

পক্ষান্তরে ঐ বয়সের মোট হিন্দু পুরুষের সংখ্যা দাঁড়াইবে :—

০—১৫ ... ৩৯১৪৮৩৭
১৫—২০ ... ১০০৫৮৮৭
০—২০ হিঃ পুঃ ... ৪৯২০৭২৪
মোট হিন্দু পুরুষ ... ১০৮৫৮৩২৩
বাদ ০—২০ হিঃ পুঃ ... ৪৯২০৭২৪
২১ ও তদধিক বৎসর বয়সের হিন্দু পুঃ ৫৯৩৭৫৯৯

২১ ও তদধিক বৎসর বয়সের :—
মোট মুছলমানের সংখ্যা··· ৬২৯৫৭৪৩
" হিন্দু " ৫৯৩৭৫৯৯
৩, ৫৮, ১১৪

অতএব ২১ ও তদধিক বৎসর বয়সের মোট হিন্দু পুরুষ অপেক্ষা ঐ বয়সের মোট মুছলমান পুরুষের সংখ্যা ৩ লাখ ৫৮ হাজার ১১৪ জন অধিক। সুতরাং হিন্দু নেতাদের ২য় দাবীটাও সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে।

৪

"নাবালগ ও ৫০ বৎসরের অধিক বয়স্ক লোকদিগকে বাদ দিয়া হিসাব করিলে, ঐ বয়সের হিন্দুর সংখ্যা মুছলমান অপেক্ষা কম হইবে না"—এই দাবীটাও পূর্ব্বের দাবীগুলির ন্যায় অসত্য ও ভিত্তিহীন। গত আদম শুমারীর রিপোর্ট হইতে নিম্নের হিসাবটা উদ্ধার করিয়া দিতেছি। আমাদের কথার সত্যতা ইহা হইতেই প্রতিপাদিত হইবে।

বয়সের হিসাবে বাঙ্গলার মুছলমানের সংখ্যা :—

৫০—৫৫	...	৮২৭৫৩০
৫৫—৬০	...	৩৩৯৪৫৩
৬০—৬৫	...	৪৯২৯০৪
৬৫—৭০	...	১৩৫৬১৩
৭০ ও তদূর্দ্ধ	...	৩১৩৬৮৪
		২১০৯১৮৪
+ ০—২০		১৩৪০৭১৯৯
		১৫৫১৬৩৮৩

(২১ বৎসরের নিম্ন ও ৫০ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক মুছলমানদের মোট সংখ্যা)

বাঙ্গলায় মুছলমানের মোট সংখ্যা :—

		২৫৪৮৬১২৪
বাদ	...	১৫৫১৬৩৮৩
		৯৯,৬৯,৭৪১

(২১ বৎসরের নিম্ন ও ৫০ বৎসরের অধিক বয়সের মুছলমানদিগকে বাদ দিয়া মধ্য বয়সের মুছলমানের সংখ্যা)

এইরূপে বয়সের হিসাবে বাঙ্গলার হিন্দুর সংখ্যা :—

৫০—৫৫	...	৭৮৪৭৬৯
৫৫—৬০	...	৩৯২৪২১
৬০—৬৫	...	৪৮৭৩১৮
৬৫—৭০	...	১৬৬০৭৬
৭০ ও তদূর্দ্ধ	...	৩৩১৩৬৩
৫০ ও তদূর্দ্ধ	...	২১৬৭৯৩৭
+ ০—২০		৯৫৭৭৮৩৪
		১১৭৪৫৭৭১

(২১ বৎসরের নিম্ন ও ৫০ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক হিন্দুদের মোট সংখ্যা)

বাঙ্গলার হিন্দুর মোট সংখ্যা :—

		২০৮০৯১৪৮
বাদ	...	১১৭৪৫৭৭১
		৯০৬৩৩৭৭

(২১ বৎসরের কম ও ৫০ বৎসরের অধিক বয়সের হিন্দুদিগকে বাদ দিয়া মধ্য-বয়স্ক হিন্দুদের মোট সংখ্যা)

এই হিসাবে মধ্য বয়সের

মোট মুছলমান	...	৯৯৬৯৭৪১
„ হিন্দু	...	৯০৬৩৩৭৭
		৯০৬৩৬৪

অতএব ২০ বৎসরের কম ও ৫০ বৎসরের অধিক বয়সের হিন্দুদিগকে বাদ দিয়া কেবল ২১ হইতে ৫০ বৎসর বয়সের মুছলমানের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা ৯ লাখ ৬ হাজার ৩৬৪ জন অধিক। সুতরাং—"নাবালগ ও অধিক বয়সের লোক বাদ দিয়া হিসাব করিলে মুছলমানের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা অধিক থাকে না"—হিন্দু নেতাদের এই দাবীটাও একটা অমূলক মিথ্যা কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

৫

আর একদল হিন্দু নেতা অভিনব গণিত ও গণতন্ত্রের সমবায়ে যে অপরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার সার এই যে, স্ত্রীলোকগুলিকে এ ক্ষেত্রে গণনার গণ্ডীর বাহিরে দূর করিয়া দিয়া কেবল পুরুষের সংখ্যা লইয়া হিসাব ধরিতে হইবে। অবশ্য পুরুষ হইলেই চলিবে না। এক হইতে কুড়ি বৎসর বয়সের এবং ৫০ হইতে তদূর্দ্ধ বয়সের মানুষগুলি ব্যাকরণের হিসাবে পুংলিঙ্গবাচক জীবরূপে কথিত হইলেও, "বস্তুতঃ ন্যায়তঃ কেবল ২০ হইতে ৫০ বৎসর বয়সের পুরুষদিগকে ধরিয়া হিসাব করিতে হইবে।" তাহার পর তুলনা করিতে হইবে—"মুছলমান ও অমুছলমানকে ধরিয়া। শুধু হিন্দু ও মুছলমানকে ধরিয়া হিসাব করা সঙ্গত হইবে না।"

আমরা এখানে আলোচনা করিতেছি, হিন্দু-প্রধানদের উক্তির কেবল গণিতের দিকটা লইয়া। সুতরাং তাঁহাদের এই সব উক্তিতে, ন্যায় ও নীতিশাস্ত্রের এবং বহু বিক্রত গণতন্ত্রবাদের মূল সূত্রগুলির যেরূপ "পিণ্ড চটকান" হইয়াছে উপস্থিতের মত তাহার আলোচনা করা সম্ভব হইতেছে না। সে যাহা হউক, হিন্দু নেতাদের এই উক্তিটাও সম্পূর্ণ ভিত্তি-হীন অসত্য দাবী মাত্র। বস্তুতঃ বাঙ্গলা দেশে অমুছলমান মধ্য-বয়স্ক পুরুষ অপেক্ষা মুছলমান মধ্য-বয়স্ক পুরুষদের সংখ্যা কম নহে। নিম্নের হিসাবে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে :—

২০ হইতে ৫০ বৎসর বয়স্ক পুরুষের সংখ্যা :—

সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী

২০—২৫	...	১৯৫১৩৩৮
২৫—৩০	...	২৩৩১১৯৯
৩০—৩৫	...	১৯৮০২৬৪
৩৫—৪০	...	১৬৭৭৪৯৯
৪০—৪৫	...	১৪২১৭৪৬
৪৫—৫০	...	৯৪৫৫৯৮
২০—৫০	...	১০৩০৭৬৪৪

মুছলমান পুরুষের সংখ্যা

২০—২৫	...	৯৬৬৭৭৪
২৫—৩০	...	১১৯২৬৮৩
৩০—৩৫	...	১০০২৩৫৩
৩৫—৪০	...	৮৫০২৩৮
৪০—৪৫	...	৬৯৫১৬৪
৪৫—৫০	...	৪৬৫২৮২
২০—৫০	...	৫১৭২৪৯৪

এখন, সর্ব্ব-ধর্ম্মাবলম্বী ২০—৫০ বয়স্ক পুরুষের মোট সংখ্যা হইতে, ঐ বয়সের মুছলমান পুরুষের মোট সংখ্যা বাদ দিলে, ২০—৫০ বৎসর বয়সের অমুছলমানের সংখ্যা পাওয়া যাইবে। যথা :—

ঐ বয়সের সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী পুরুষ	১০৩০৭৬৪৪
বাদ ঐ বয়সের মুছলমান পুরুষ	৫১৭২৪৯৪
২০—৫০ অমুছলমান পুরুষ	৫১৩৫১৫০

ফলতঃ ঐ বয়সের পুরুষ :—

মুছলমান	...	৫১৭২৪৯৪
অমুছলমান	...	৫১৩৫১৫০
মুছলমান বেশী		৩৭,৩৪৪

অতএব এই অন্যায় দাবী অনুসারে, কেবল ২০—৫০ বৎসর বয়স্ক পুরুষের হিসাব ধরিলেও, অমুছলমান অপেক্ষা মুছলমানের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৩৪৪ জন অধিক থাকিয়া যায়।

৬

হিন্দু সভার সভাপতি শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, সম্প্রতি গণিতের যে সব অভিনব তথ্য এবং গণতন্ত্রের যে সমস্ত অপরূপ নীতি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমি বস্তুতঃই স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছি। এতদিন নারী স্বাধীনতা, নারী প্রগতি এবং নারীর অধিকার আন্দোলনের একজন প্রধান নায়ক ও পৃষ্ট পোষক ছিলেন রামানন্দ বাবু। কিন্তু মুছলমানদিগের সংখ্যা কম করিয়া দেখাইবার আগ্রহাতিশয্যে, এখন তিনি সেই নারীদিগকে সর্ব্বপ্রথমে গননার গণ্ডীর বাহিরে দূর করিয়া দিতেছেন। রামানন্দ বাবু নিজে ব্রাহ্ম হইলেও, এখন তিনি হিন্দুসভার সভাপতির কল্যাণজনক পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। কাজেই, নারীর অধিকার অস্বীকার করাতে এ হিসাবে তাঁহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। তবে অন্যান্য হিন্দু নেতার ন্যায় তিনি "পঞ্চাশোর্দ্ধ" পুরুষদিগকে বনে পাঠাইবার অথবা ডামিস মালের গুদামজাত করিয়া রাখার আদেশ দিতে প্রস্তুত হন নাই। আত্মরক্ষার জন্য সময় বিশেষে আপদ্ধর্ম্মের আশ্রয় লওয়ার ব্যবস্থাও'ত এদেশের মুনি-ঋষিরা দিয়া গিয়াছেন।

রামানন্দ বাবু এই প্রবন্ধে যে সব যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা অন্যায় ও অসঙ্গত। সুতরাং উহার সহায়তায় তিনি যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটাই অসত্য। প্রবন্ধের আকার বড় হইয়া যাওয়ায়, এবার আমি তাঁহার অধিকাংশ সিদ্ধান্তের আলোচনা করিতে সমর্থ হইলাম না। আগামী সংখ্যায় তাঁহার প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ও সবিস্তার বিচারে প্রবৃত্ত হইব। এই শ্রেণীর হিন্দু নেতারা সেনসস্ রিপোর্ট আলোচনায় সময় যে সব ছল-চাতুরীর আশ্রয় লইয়া দুনয়ার চোখে ধাধা লাগাইতে চান, আগামী সংখ্যায় তাহারও স্পষ্টভাবে রহস্য ভেদ করিয়া দেওয়া হইবে। প্রবন্ধের শেষভাগে পাগল ভিক্ষুক ও সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের সংখ্যা লইয়া আলোচনা করিয়া, মুছলমানের কাঁধে কিরূপ তিনি যে অন্যায় দোষারোপ করিয়াছেন, তাহারই একটু নমুনা দিয়া আজকার মত এই আলোচনার উপসংহার করিব। রামানন্দ বাবু বলিতেছেনঃ—..."মোট কয়েদী প্রভৃতির সংখ্যা ১৩৮৮৭, তন্মধ্যে অধিকাংশ ৮০৮২, মুসলমান। মোট ৪৩৮৭২৪ ভিক্ষুক যাযাবর প্রভৃতির মধ্যে অধিকাংশ, ২২০১৩২, মুসলমান। ক্ষিপ্ত পাগল প্রভৃতির মধ্যেও মুছলমানদের সংখ্যা বেশী মনে করিবার কারণ আছে; সেন্সস রিপোর্টে এই সব ব্যাধিগ্রস্ত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সব জাতের লোকদের সংখ্যা আলাদা করিয়া দেওয়া নাই বলিয়া তাহার উল্লেখ

করিলাম না।” আমরা রামানন্দ বাবুর কথার উত্তর একে একে দিতেছি।

বাঙ্গলা দেশে শহর ও মফস্বল মিলাইয়া মুছলমান অধিবাসীদের সংখ্যার অনুপাত হইতেছে ৫৩·৫৫। রামানন্দ বাবু ১৯২১ সালের সেন্সস রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন যে, মোট ১৩৮৮৭ জন কয়দীর মধ্যে “অধিকাংশ, ৮০৮২, মুছলমান।” এই হিসাবে মুছলমান কয়দীর সংখ্যা, তাহাদের মোট সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা ৩।৪ জন অধিক দাঁড়াইতেছে। জেলের কয়দীরা বর্ত্তমান অবস্থাতেও কাউন্সিলের মেম্বর করপোরেশনের অল্ডারম্যান ও মেয়র নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, আর দেশে প্রত্যাশিত শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হওয়ার পরও তাহাদের কেহই ভোটাধিকার লাভ করিতে পারিবে না, এ কেমন গণতন্ত্র! অবশ্য নৈতিক অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত করাই সঙ্গত হইবে। এই হিসাবে বিচার করিতে হইবে—অপরাধের স্বরূপ লইয়া, সংখ্যা লইয়া নহে। রামানন্দ বাবুকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি, তিনি বিভিন্ন জাতির এই সব নৈতিক অপরাধের ক্রম নির্দ্ধারণে যত্নবান হউন, তাহা হইলে অনেক গুপ্ত রহস্য ব্যক্ত হইয়া পড়িবে।

মুছলমানের সংখ্যা অধিক, সে হিসাবে তাহাদের কয়দীর সংখ্যা অন্য জাতির তুলনায় অধিক হওয়া অস্বাভাবিক নহে। তাহার পর অপরাধে লিপ্ত হইয়া আইনের চোখে ধূলি দেওয়ার সুযোগ ও যোগ্যতাও তাহাদের কম। অনেক সময় গ্রামের দুর্দ্দান্ত জমিদার মহাজন ও মণ্ডলদিগের ক্রোধভাজন হইয়া তাহাদিগকে বিনা কারণে কারাভোগ করিতে হয়। তদবির করার শক্তির অভাবেও বহু নিরপরাধ মুছলমানকে কারাগারে পচিতে হয়। সকলের উপরে, মুছলমান ক্ষাত্রতেজ সম্পন্ন জাতি। আত্মসম্মানে আঘাত লাগিলে অনেক সময় তাহারা ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়ে। এই সব কারণে মুছলমান কয়দীর সংখ্যা তাহাদের আনুপাতিক ক্রম অপেক্ষা শতকরা ৩।৪ জন হিসাবে বাড়িয়া যায়। কিন্তু নীতি ও চরিত্র সংক্রান্ত অপরাধে দণ্ডিত মুছলমানের সংখ্যা যে অমুছলমান অপেক্ষা, বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দু অপেক্ষা অধিক, একথা একেবারে অসত্য। একটা হিসাবে, এই ব্যাপারের কতকটা অনুমান করা যাইতে পারিবে।

স্ত্রীলোকেরা খুন, দাঙ্গা, চুরি ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধে খুব কমই দণ্ডিত হয়। তাহাদের অধিকাংশই নৈতিক চরিত্র সংক্রান্ত অপরাধে দণ্ডিত হইয়া থাকে। ১৯২৯ সালের জেল রিপোর্ট দেখিলে জানা যাইবে—মোট ৪০২ জন নারী কয়দীর মধ্যে মুছলমান ১০৪ জন, খৃষ্টান ২১ জন, অন্যান্য ১৭ জন অর্থাৎ সর্ব্বসাকুল্যে মোট অহিন্দু নারী কয়দীর সংখ্যা ১৪২ জন; আর একা হিন্দু নারী কয়দীর সংখ্যা ২৬০ জন। প্রকৃত রহস্যের কতকটা আভাস এই সংখ্যা হইতে জানিতে পারা যাইতেছে।

৭

রামানন্দ বাবু বলিতেছেন:—“মোট ৪৩,৮৭২৪ ভিক্ষুক যাযাবর প্রভৃতির মধ্যে অধিকাংশ, ২২,০১৩২, মুছলমান।” বাঙ্গলা দেশে মোট মুছলমানের সংখ্যা, ১৯২১ সালের রিপোর্ট অনুসারেই, ৫২·৫৫ বা শতকরা ৫৩।০ জন। এই হিসাবে মুছলমান ভিক্ষুক প্রভৃতির অপেক্ষা অমুছলমানের সংখ্যাই অধিক দাঁড়াইতেছে। আনুপাতিক হিসাবের তুলনা মূলক সংখ্যা নিম্নে কসিয়া দিতেছি:—

মোট সংখ্যা:— ৪৩,৮,৭২৪

ইহার মধ্যে		অনুপাত
মোট মুছলমান	২,২০,১৩২	৫০·১৭৫...
” হিন্দু	২,১৬,০৭৯	৪৯·২৫২
” অমুছলমান	২,১৮,৫৯২	৪৯·৮২৫

অথচ অধিবাসীদের মোট সংখ্যার হিসাবে, মুছলমান হিন্দু ও অমুছলমানের সংখ্যার হিসাবে তাহাদের প্রত্যেকের অনুপাত হইতেছে—

মুছলমান...৫৩·৫৫, হিন্দু...৪৩·৭২ অমুছলমান...৪৬·৪৫

পাঠক এখন ভিক্ষুকদের মোট সংখ্যা, প্রত্যেক জাতির হিসাবে তাহার অনুপাত এবং হিন্দু মুছলমান প্রভৃতির মোট সংখ্যার অনুপাত একত্রে খতাইয়া দেখুন:—

	মোট অধিবাসীর হিসাবে শতকরা	ভিক্ষুকাদির শতকরা
মুছলমান ...	৫৩·৫৫	৫০·১৭৫ ...
অমুছলমান ...	৪৬·৩৫	৪৯·৮২৫
হিন্দু ...	৪৩·৭২	৪৯·২৫২

অতএব ভিক্ষুকাদির সংখ্যা, মোটের অনুপাত অপেক্ষা

অমুছলমানদিগের মধ্যে প্রায় ৪ জন ও হিন্দুদের মধ্যে প্রায় ৬॥০ জন অধিক ; এবং মুছলমানদিগের মধ্যে ৩ জন কম।

রামানন্দ বাবু "ভিক্ষু যাযাবর প্রভৃতির" মোট সংখ্যাটাই তুলিয়া দিয়াছেন। মূল ইংরাজীতে আছে—"Beggars, Vagrants and Prostitutes" এই Prostitute বা বেশ্যার প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য রামানন্দ বাবু এখানে "প্রভৃতি" দ্বারা আত্ম রক্ষার চেষ্টা পাইয়াছেন। অথচ রিপোর্টে তাহার অব্যবহিত পরে ভিক্ষুক ও যাযাবর-দিগের এবং বেশ্যাদিগের সংখ্যা স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে জানা যায়, বেশ্যা ও কুটনীদের মোট সংখ্যা—৪৩,৩৩৩ জন। ইহার মধ্যে

হিন্দু ৩১,২১৪ }
অন্যান্য ১৮৩ } —অমুছলমান ৩১,৩৯৭

মুছলমান ১১,৯৩৬

রামানন্দ বাবুর এই "প্রভৃতি" শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহাই দেখাইবার জন্য এই বিশ্লেষণের দরকার হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিতে চাই না। পাঠকগণ নিজেরাই অনুপাতটা কসিয়া লইবেন।

৮

ভিক্ষুক ও কয়দীর সংখ্যা উদ্ধৃত করার পর, রামানন্দ বাবু ক্ষেপা পাগল ও ব্যাধিগ্রস্ত লোকদিগের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, "সেন্সস রিপোর্টে এই সব ব্যাধিগ্রস্ত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সব জাতের লোকদের সংখ্যা আলাদা করিয়া দেওয়া নাই বলিয়া" তাহাদের সংখ্যা বা অনুপাতের উল্লেখ তিনি করেন নাই।

সেন্সস রিপোর্ট লইয়া নাড়াচাড়া করার সুযোগ যাঁহাদের ঘটে নাই, রামানন্দ বাবুর কৈফিয়তটী তাঁহাদের পক্ষে হয়ত সন্তোষজনক হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা ঐ রিপোর্টগুলি সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করার সুযোগ পাইয়াছেন, রামানন্দ বাবুর এই মন্তব্যের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করিতে তাঁহাদের কোন বেগ পাইতে হইবে না।

'ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সব জাতের সংখ্যা আলাদা আলাদা' করিয়া বুঝিবার জন্য রামানন্দ বাবু এখন এতটা আগ্রহশীল হইয়া পড়িতেছেন কেন? সেন্সস রিপোর্টে ৩৯৭টী বিভিন্ন বর্ণ জাতি ও সম্প্রদায়ের সন্ধান পাওয়া যায়, ইহাদের মধ্যে জোর ১৭টী মুছলমান। রামানন্দ বাবু অবশিষ্ট ৩৮০টী বিভিন্ন বর্ণ জাতি ও সম্প্রদায়কে লইয়া সর্ব্বত্রই এক অমুছলমান জাতি গঠন করিয়াছেন, এবং এই অমুছলমান জাতির শিক্ষা সম্পদ ও সংখ্যা লইয়া মুছলমানের সহিত টক্কর দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন।

এখানেও সেই মুছলমান ও অমুছলমান হিসাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, পাগল ও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হিন্দুর তথা অমুছলমানের সংখ্যা তাহাদের অনুপাত অপেক্ষা বহুগুণ অধিক, পক্ষান্তরে মুছলমানের সংখ্যা বহুগুণ কম। এই ব্যাপারটা ধামাচাপা দিবার জন্যই এখানে রামানন্দ বাবু এরূপ সতর্কতার সহিত পাশ কাটাইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া 'বিশ্বাস করার কারণ আছে।' সে যাহা হউক, আমি ১৯২১ সালের সেন্সস রিপোর্ট (Vol V, Part II, P 163) হইতে এই সমস্ত সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। আসল ব্যাপারখানা ইহা হইতে পরিষ্কার হইয়া যাইবে। আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথমে মুছলমানের সংখ্যা এবং তাহাদের মধ্যে পাগল, অন্ধ কালা বোবা, ও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকদের সমষ্টি প্রথমে উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

জাতি ও তাহার সংখ্যা	পাগল	কালা বোবা	অন্ধ	কুষ্ঠ
ছৈয়দ ... ১৪০৪০৯	১২১	১৮৭	১৬৭	৬৭
শেখ ...২৪৪১৪৬৬৬	৬৭৭	১৮৭৭৭	১৪৪১৮	৪৮৫৮
২,৪৫,৫৫,১৬৫	৬৯৮	১৪,৯৬৪	১৪৫৮৫	৪৯২৫

বাঙ্গলায় মোট মুছলমানের সংখ্যা হইতেছে—

২, ৫৪, ৮৬, ১২৪ জন

তাহার মধ্যে ছৈয়দ ও শেখ হইতেছে—

২ ৪৫ ৫৫ ১৬৫ „

৯, ৩০, ৯৫৯ „

অতএব সেন্সাস রিপোর্টে মাত্র ৯ লাখ ৩০ হাজার ৯৫৯ জন মুছলমানের মধ্যকার পাগল, কালা বোবা প্রভৃতির হিসাব তাহাতে দেওয়া হয় নাই। মোটামুটি হিসাবে ২৫৫ লাখের মধ্যে ১০ লাখ মুছলমানের হিসাব বাদ পড়িয়াছে।

ইহার মোকাবেলায় বাগ্দী, বৈষ্ণব, ধোবা, ডোম, গোয়ালা, চাষীকৈবর্ত্ত কায়স্থ প্রভৃতি মাত্র ১৩টী হিন্দু বংশের বিস্তারিত পরিচয় সেন্সস রিপোর্টে দেওয়া হইয়াছে। এই ১৩টী বংশের মোট সমষ্টি দাঁড়াইতেছে ১ কোটি ২৪ লক্ষ ৬১ হাজার ৩১৩ জন। এই ১।০ কোটি মাত্র হিন্দুর মধ্যে পাগলের সংখ্যা হইতেছে ৪২৮৬ জন, আর কুষ্ঠব্যাধি গ্রস্তের সংখ্যা হইতেছে ৪৮১০ জন। যথা :—

২॥০ কোটি মুছলমানে ৭৯৮ পাগল, ৪৯২৫ কুষ্ঠব্যাধীগ্রস্থ
১।০ „ হিন্দুতে ৪২৮৬ „ ৪৮১০ „

অন্যান্য হিসাব, সংখ্যা ও অনুপাতে আগামী সংখ্যায় বিস্তারিত ভাবে দেখান হইবে; স্থানাভাব বশতঃ আজ নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এখানে ইতি করিতে হইতেছে।

ক্রমশঃ

বিড়ম্বনা

পূর্ব প্রকাশিতের পর

বন্দে আলী মিয়া

অধ্যায় আট

পর দিন একটু সকাল সকাল করুণা ক্লাসে যাইয়া মনসুরের খোঁজ করিল, কিন্তু দেখিল তখনো আসে নাই। অগত্যা বারাণ্ডায় আসিয়া দেয়াল ঘেঁসিয়া এককোণে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে গেটের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেই দেখিতে পাইল মনসুর বহি বগলে আস্তে আস্তে আসিতেছে। করুণার দুঃখ লজ্জা-সরমের অতীতে যাইয়া পৌঁছিয়াছিল, চুপ করিয়া থাকিবার, লজ্জা করিয়া থাকিবার তাহার কিছু ছিল না—কারণ সে যে বাগদত্তা। করুণা দ্রুতপদে আসিয়া মনসুরের সম্মুখীন হইতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। হাসিয়া প্রশ্ন করিল, কী ভালো তো? দাদা কেমন আছেন—ভালো।

করুণা মৃদু কণ্ঠে বলিল, হাঁ। আজকে আমার ক্লাসে যাবার ইচ্ছে নেই।

মনসুর উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, কেন, অসুখ করেচে।

করুণা হাসিয়া বলিল, শরীরের নয়—মনের। তুমি আমার সঙ্গে একটু যেতে পারবে?

মনসুর বলিল, এখনি?

হাঁ।

কোথায়?

বোটানিকেল গার্ডেন।

বোটানিকেলে? তা—তা চলো। কিন্তু বইয়ের কি করব—তোমার বই কোথায়?

আমার গুলো আনি নি। দাও, লাইব্রেরীতে কারো কাছে রেখে আস্‌চি। বলিয়া করুণা হাত বাড়াইয়া মনসুরের নিকট হইতে খাতা-পুস্তক গ্রহণ করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। মনসুর সেইখানে পাইচারী করিতে করিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

উভয়ে হ্যারিসন রোড এবং কলেজ ষ্ট্রীটের মোড় হইতে হাইকোর্ট-গামী ট্রামে উঠিয়া পড়িল। 'চাঁদ পাল' ঘাটে নামিয়া সন্ধান লইয়া জানিল ষ্টীমার আসিতে তখনো প্রায় ৪৫ মিনিট দেরী। ষ্টেসনে গঙ্গার পারে দাঁড়াইয়া কয়লার ধূঁয়া হজম করার চেয়ে ততক্ষণে ইডেন গার্ডেন হইতে বেড়াইয়া আসিবার প্রলোভন মনসুর ত্যাগ করিতে পারিল না। করুণার কাছে প্রস্তাব করিতেই সে আনন্দে সম্মতি দিয়া তাহার অনুসরণ করিল।

একটা নাম-না-জানা গাছ ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছিল; উভয়ে আসিয়া তাহার তলে সবুজ ঘাসের উপরে বসিল। বামে ডাহিনে চারা গাছ—কুঞ্জবীথি, সম্মুখের কৃত্রিম দীঘির পানি দেখা যাইতেছে না, ঘাসের পাতাগুলি গা ঘেঁসা-ঘেঁসী করিয়া একটার উপরে একটা দাঁড়াইয়া আছে, দূরে একটা শিশুপদ্ম প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোর মতো সরল, পাশে তাহার একটা কিশোরী পদ্ম। একটা আধফোটা পদ্মের দিকে চাহিয়া করুণা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, কী সুন্দর!

মনসুর মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আনন্দের আতিশয্যে সায় দিয়া বলিল, সত্যিই কী সুন্দর, ঠিক তোমার মুখের মতো।

করুণা আনন্দে-গৌরবে লজ্জায় বাতাস-লাগা লতার

মতো তাহার কোলের উপরে ভাঙ্গিয়া পড়িল। রাঙ্গা মুখে বলিল, যা, কি যে বলে ………।

মনসুর সোহাগে তাহার তুলতুলে শুভ্র সুন্দর গাল দুইটি টিপিয়া দিয়া বলিল, মিছে বলিনি তো। বিশ্বাস না হয় আয়না এনে দিই, মুখের দিকে আর পদ্মের দিকে তাকাও, প্রমাণ পাবে।

করুণা বলিল, বা কি মিষ্টি হাওয়া, ঘুমুতে ইচ্ছে করচে।

—তা শোও না আমি চাদর পেতে দিচ্ছি, বালিস করো আমার হাঁটুটাকে কিন্তু ছাখো মিনতি করচি ঘুমুতে পাবে না—তিন সত্যি করো।

দাও, বসে থাকতে ভালো লাগচে না। বলিয়া মনসুরের দানের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই চাদরখানা বিছাইয়া লইয়া করুণা কোলের উপরে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

ঘন পাতার ফাঁক দিয়া সূর্য্যের তপ্ত কিরণ ঘাসের উপরে হীরক চূর্ণের মতো ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, করুণার চোখে মুখে তাহার দু'একটার আঁচ আসিয়া লাগিতেই সে বলিল—পথ হারানো পথিক এই beautiful rayগুলো তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী জান্লে—কথা নেই, প্রণয় নেই—খামাখা আমার মুখে চুমো দিতে লেগে গেছে। বলিয়া মনসুরের মুখের দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

মনসুর অচপল দৃষ্টিতে কৌতুকের ঢেউ-লাগা করুণার ছলছল চোখের পানে চাহিল, লাবণ্যভরা মুখের পানে চাহিল। উঁচু হইয়া আঙ্গুল দিয়া তাহার গালে মৃদু একটা ঠোনা দিয়া বলিল, তুমি সত্যিকারের সুন্দর, কোনো দিন কোনো কিছুকে বিশ্রী বলতে শুনলুম না, দুনিয়ার যা কিছু সব মায়াভরা—আনন্দময়। আমি কী সৌভাগ্যবান যে তোমাকে স্ত্রীরূপে পাবো।

করুণা পানে-রাঙা ঠোঁট দুইখানি কাঁপাইয়া বলিল, আচ্ছা, সত্যি তুমি আমাকে ভালোবাসো, রাগ করোনা, বারে বারে শুনতে মধুর লাগে তাই বলি।

মনসুর বলিল, সে মুখে বল্লে তোমার আত্মগৌরবের আর অবধি থাকবে না আমি জানি। দেখি। বলিয়া করুণার বাম হাতের রিষ্ট ওয়াচটা টানিয়া লইয়া এক ঝলক দৃষ্টি দিয়া বলিল, ও মোটে আধঘণ্টা—এখনো পনেরো মিনিট।

করুণা ক্লান্ত কণ্ঠে বলিল, কিসের কথা বলচো—ষ্টিমারের? তার আশা ছেড়ে দাও—ওখানে যেতে আর উৎসাহ নেই—এখানটা কি মন্দ লাগচে? নির্জ্জনতা চাচ্ছিলুম পেয়েচি। দুঃখিত হোয়োনা, আজ আর না-ই গেলে, এখন দেড়টা—যেতে আড়াইটে বাজবে - ফিরতে কোন্ রাত না হয়—সন্ধ্যা তো লাগবেই।

মনসুর সিগারেট বাহির করিয়া দিয়াশলাই জ্বালাইল। খানিকটা ধোঁয়া নাক মুখ দিয়া বাহির করিয়া দিয়া বলিল, আমাকে কৈফিয়ৎ কেন। তোমার একান্ত আগ্রহেই তো আমি যেতে চাচ্ছিলুম এখানে হয়ত অসুবিধে হচ্চে না—সেখানে গেলে যে কী সুখের আস্বাদ পেতুম সে তুমি-ই জানো—আমার আগ্রহ কেনোটাতেই নেই।

করুণা মুখ টিপিয়া হাসিয়া জবাব দিল, তবে আমার অতোখানি বক্তৃতা দেখচি মাঠেই মারা গেল। তুমি সবদিকেই নির্ব্বিকার—পরনির্ভরশীল। কেউ উস্কে দিলে চকিত হয়ে জ্বলে ওঠো, উদাসীন থাকলে নিবে যাও, তোমাকে একা নিরুপায় ফেলে রাখতেও মায়া হয়।

মনসুর হাসিল। বলিল, সেই জন্যেই তো আমার সকল ভার তোমার ওপরে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েচি, বোঝা তো তুলে নিয়েচ, বরের হবে কবে?

করুণা চিন্তিত মুখে বলিল, সে তো আমিও ভাবচি, বিয়ে যদি হয় তবে সবাইকার সম্মতি নিয়ে করাই ভালো; কেউ খুসি হবে—কেউ মুখ ভার করে থাকবে সে বাপু আমি পছন্দ করিনে।

মনসুর বলিল, শোনো কথা—একি একটা কথা হোলো। তবে কতদিনের ভেতরে হলে সুবিধে হয় সেইটেই যা বিবেচনা সাপেক্ষ।

করুণা বলিল, আমি একটা মনে মনে ঠিক করে রেখেচি কি জানো, এক্জামিনের তো আর বিশেষ দেরি নেই—মাত্র মাস দুয়েক, এক্জামিন শেষ হলে তারপর হবে, কি বলো?

মনসুর অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটটা ঘাসের উপরে রাখিয়া দিল। বলিল, এ যুক্তি মন্দ নয়, তবে কথা কি জানো, মাস দু—য়ে—ক বাপ্রে মনে করতেও বুকটা কেমন করে ওঠে, বিরহে দম আটকে আসে ………।

করুণা নিশ্চেষ্টতার ম্লান কণ্ঠে বলিল, কি কোরবো

বলো। সে অনুভূতি থেকে আমিও তো বাদ পড়বো না, মুখের হাসিকথা ছেলেমি তো আর নয়—বিয়ে। যোগাড়-যন্ত্র একটু সময়-সাপেক্ষ, এখন করতে গেলে এক্‌জামিনের অনেকটা বাধা হতে পারে, তাতে হয় তো ফল ভালো না হবারই অনেকটা সম্ভাবনা।

মনসুর চুরুটটা তুলিয়া লইয়া গোটা তিনেক টান দিল। বলিল, তা তো বটে, সে আমি না ভেবেচি তা নয়, আচ্ছা এই কথাই ঠিক রইলো—পরীক্ষার পরেই সব কিছু হবে। এখন কিছু দিন মন-প্রাণ দিয়ে পড়াশুনা করা যাক।

করুণা খানিক নীরব থাকিয়া মনসুরের মুখের পানে চাহিয়া সহসা হাসিল। মনসুর তাহার মুখের উপরে মুখ নোয়াইয়া প্রশ্ন করিল, কী?

করুণা বলিল, পরিচিত কেউ যদি হঠাৎ এখন এসে পড়ে, আর আমাদের এই অবস্থায় দেখতে পায়—কি ভাব্‌বে বলো তো?

মনসুর প্রত্যুত্তরে সারা মুখ পাণ্ডুর করিয়া জবাব দিল, যা বলবে তা উভয়ের কারুই প্রীতিকর নয়। কিন্তু অ-প্রীতিকর যা-ই বলুক তা বলতে বাধা দেবার সাধ্যও এখন আমাদের নেই করুণা। আহা বেচারী সে তো জানে না—এই মেলা-মেশা যে আমাদের অনন্ত কালের শুভ আশীর্ব্বাদপূত, ভাগ্যের অমৃত-দান।

শাখা কাঁপাইয়া পাতা দোলাইয়া বাতাস বহিয়া গেল। উপর হইতে ঝুর ঝুর করিয়া কয়েকটা ফুল অপূর্ব্ব সুরভি লইয়া করুণাও মনসুরের গায়ের উপরে ঝরিয়া পড়িল। করুণা একটা ফুল সস্নেহে তুলিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিল, এই দেখ্‌লে প্রকৃতি ওপর থেকে ভাবী দম্পতিকে ফুলের আশীর্ব্বাদ পাঠিয়ে মঙ্গল কামনা করচেন। আ, কী মধুর এর গন্ধ—চমৎকার ফুলটি।

দেখি। বলিয়া মনসুর তাহার হাত হইতে ফুলটি লইতে গেল। করুণা কৃত্রিম কোপে তাহার হাতখানাকে একপাশে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, সখ ছাখো, পরের ধনে লোভ কিসের জন্যে, আরো তো রয়েচে, পরিশ্রম করে কুড়িয়ে নাও না।

মনসুর ছেলে-মানুষের মতন অভিমানে ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, না দিলে যাও, ভারি তো একটা চেয়েছিলুম। আমি যখন গণ্ডায় গণ্ডায় পকেট ভোরবো তখন এসো একবার দেখিয়ে দেবো।

করুণা হাসিয়া বলিল, দেখবো তো নিশ্চয়। সে ফুলে মালা গেঁথে আমারি গলায় পরিয়ে দেবে তখন কী চোক বুজে থাকবো আমি?

মনসুর সোহাগে আঙুল দিয়া তাহার কপোলে একটা টোকা মারিয়া হাসিয়া বলিল, দুষ্টু।

করুণা সুর করিয়া বলিল, বঁধু তোমায় কোর্‌ব রাজা তরুতলে—

মনসুর বলিল, বা, থামলে কেন, চলুক না।

করুণা ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, উঁহু সেটি হচ্ছে না। ঐতো নমুনা শুনিয়ে দিলুম।

মনসুর প্রাণের আবেগে তাহার হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, গাও একটা। তুমি এমন চমৎকার গাইতে জানো অথচ আমার কাছেই ঠোঁট খোলো না।

করুণা হাসিয়া ওষ্ঠাধর ফুলাইয়া বলিল, তোমাদের বহর ছাখো, এমনি একটা লাইন যা তা বল্লুম অমনি কিনা চমৎকার গাওয়া হোলো। সত্যি জানিনে।

মনসুর চোখে মুখে অদ্ভুত ভঙ্গী আনিয়া বলিল, গায়িকারা অমনি করেই বিনয় প্রকাশ করে কিন্তু।

করুণা বলিল, মাফ করো। যে যা-নয় তাকে সেই উপাধি দিলে অপমান করা হয়। নিদেন না ছাড়ো গাচ্চি, শেষে বিরক্ত হয়ে তাড়িয়ে দিতে পারবে না বলে রাখ্‌চি।

মনসুর অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, বিচারে যা মীমাংসা হয় তাই হবে, নাও গান ধরো।

করুণা প্রতিবাদ না করিয়া আরম্ভ করিল,—

মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী
সখি জাগো
মেলি রাগ অলস আঁখি
সখি জাগো—

জাগো চঞ্চল এ নিশীথে
জাগো ফাল্গুন-গুণ-গীতে
অয়ি প্রথম-প্রণয়-ভীতে
জাগো নন্দন-অটবীতে
সখি জাগো!

করুণা দু-তিনবার গাহিয়া অভিভূত মনসুরকে প্রশ্ন করিল, কেমন শুনলে ?

মনসুর স্বপ্নাবিষ্টের মতো উদাসদৃষ্টি মেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সহসা চকিত হইয়া বলিল,—আর একখানা হোক না কুরু—।

করুণার বুকের মাঝে গানের রঙ লাগিয়া গিয়াছিল;—সুরের মত্ততার আবেশে তার চোক দুটি, সারা দেহখান পুলকে কাঁপিয়া উঠিতেছিল,— গাহিল,—

তোমার আসন পাতবো কোথায়
হে অতিথি ?
ছেয়ে গেছে শুক্‌নো পাতায় কানন-বীথি।

* * * *

মাতবে আকাশ নবীন রঙের তানে তানে,
পলাশ বকুল ব্যাকুল হবে আত্মদানে,
জাগ্‌বে বনের মুগ্ধ মনে
মধুর স্মৃতি,
হে অতিথি ॥

মনসুর মুগ্ধ হৃদয় লইয়া অপলক দৃষ্টিতে করুণার অনিন্দ্য সুন্দর অরুণ মুখের পানে চাহিয়া সঙ্গীতের অমৃত ধারা পান করিয়া লইতে ছিল। গানের সুরে যেন প্রাণের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়, সেই দ্বারপথে সুরবালা প্রবেশ করিয়া প্রাণের শূন্য সিংহাসন খানি ছাড়িয়া বসে। মনসুর স্থির চোখে চাহিয়া দেখিল কল্পনাময়ী আজ মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া ক্রেপ রঙের শাড়ীতে বক্ষ অবধি ঢাকিয়া তাহারি কোলের উপরে শুইয়া। করুণার আয়ত চোখের সহিত তাহার চোখ মিলিতেই দৃষ্টি আটকাইয়া গেল, সে বিশ্ব ভুলিয়া গেল আত্মবিস্মৃত হইয়া সুধু ক্ষুধিত মনে তাহার যৌবনের অপরূপ রূপ-লাবণ্য চির-তৃষ্ণার্ত্তের মত নিঃশেষে পান করিয়া লইতে লাগিল।

গান শেষ করিয়া করুণা বলিল, শুনেচো, বিরক্ত হওনি তো ? মনসুর জবাব দিল না; অদূরে দীঘির কোলে প্রস্ফুটিত একটি তরুণী-পদ্মের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলিয়া মৌন হইয়া বসিয়া রহিল। মনে তখন তাহার তারুণ্যের অতৃপ্ত কামনার আগুন জলিতেছিল; নৈরাশ্যের এবং সাফল্যের প্রচণ্ড ঝড় বহিতেছিল। জীবনের ২২।২৩টা বসন্ত যাহার নিতান্ত সঙ্গীহারা বৈচিত্র্যহীন অবস্থায় একান্ত নীরবে সবার অলক্ষ্যে কাটিয়া গিয়াছে তাহার বুকের মাঝে আজ নিখিলগ্রাসী দুর্জ্জয় দুঃসহ ক্ষুধা জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে রোধ করিবে আজ কী দিয়া সে ? তরুণীর মুখে, বুকে—সর্ব্বাঙ্গে অসীম রহস্যের অন্তরাল দিয়া যে অনাস্বাদিত মধু এবং অমৃতের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, তাহা সে আজ জন্ম-জন্মান্তরের পিপাসিত প্রাণে উপভোগ সম্ভোগ করিয়া লইবে। জীবনটাকে কর্ত্তব্যের নিষ্পেষণে শুক্‌নো কাঠ করিয়া ব্যর্থ হইতে কিছুতে দিবে না।

প্রায় সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরার পথে উভয়ে গল্প করিতে করিতে চলিতেছিল। করুণা বলিল, তোমার সঙ্গে দেখা-শুনা কলেজে যেমন হচ্চে তেমনি প্রত্যেক দিনই হবে, কিন্তু কথা কি জানো, হাঁ—ভালোকথা, আমি ক'দিন থেকে মনে মনে ভাব্‌চি—তুমি কিছু মনে যদি না করো একটা অনুরোধ আমার—বলিয়া সকরুণ দৃষ্টিতে করুণা মনসুরের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার অন্তরের ভাব বুঝিতে প্রয়াস পাইল।

মনসুর বলিল, কুণ্ঠিত হোচ্চ কেন—ভেঙে বলো না।

করুণা চলিতে চলিতে একটু দ্বিধাগ্রস্থ হইয়া তাহার বাম হাতখানা চাপিয়া ধরিল। বলিল, তিন সত্যি করো আগে, বলো কথা রাখবে, পায়ে ঠেলবে না।

মনসুর বিব্রত হইয়া বলিল, মহাবিপদে ফেল্‌লে তুমি ! খুব খানিক যে হলফ করিয়ে নিচ্ছো—মতলব কি রকম ?

করুণা হাসিল। বলিল, ভয়ঙ্কর খারাপ। কি বলো, অমান্য কর্‌বে না তো ?

মনসুর কণ্ঠে প্রচুর আগ্রহ ঢালিয়া বলিল, সত্যি সত্যি সত্যি—বিশ্বাস হোলো ? এবার প্রহেলিকা থেকে মুক্তি দাও।

করুণা আস্তে আস্তে বলিল, তোমার বাসা বদল করো।

ও, এই কথা। তাই বলতে এত আড়ম্বর হচ্চিল। পর্ব্বতের মূষিক প্রসবের গল্পটা জানো—ঠিক তারই মতো আর কি।

করুণা লজ্জিত মুখে মৃদু হাসিয়া বলিল, কতকটা বটে। বাসা বদল মানে কি জানো, তুমি এখন বর্ত্তমানে থাকো মেসে—সেখানে কেবলি পুরুষ, আমি যে যাওয়া-আসা

করতে পারিনে। তুমি একটা প্রাইভেট বাড়ীতে একটা কামরা ভাড়া নাও, জান্‌লে।

মনসুর চিন্তিত মুখে বলিল, সে একটা কথা, বটে কিন্তু মেয়েছেলে সঙ্গে না থাক্‌লে যে কেউ ভাড়া দেবে না, সে জানো।

করুণা বলিল, জানি। তা আমিই না হয় চেষ্টা করে খুঁজে দিচ্ছি, অতিরিক্ত ভাড়ার জন্যে কিচ্ছু ভেবো না, আমার হাত খরচের টাকা মাসে মাসে তো অনেক বেঁচেই যায়—কি বলো ?

মনসুর ঘাড় ঝাঁকাইয়া বলিল, না, সে হয় না করুণা। তোমার দান আমি নিতে পার্‌বো না, মাফ করো।

করুণা ইহাই আশঙ্কা করিতেছিল। বলিল, এতো দান নয়। আমার কর্ত্তব্য যে তোমাকে অসুবিধে থেকে উদ্ধার করা।

মনসুর হাসিল। বলিল, আমার তো কোনো অসুবিধে হয়নি। বেশ স্বচ্ছন্দেই তো দিন কেটে যাচ্ছে।

প্রত্যুত্তরে করুণা বলিল, দ্যাখো, মনের প্রকৃত কথাটি বোলো। আর দান হিসেবেই যদি তোমার আপত্তি থাকে তবে বলচি, তোমার আমার বলতে কি দুটো পৃথক না আলাদা। যদি আমার জিনিসকে তুমি ভিন্ন করে ভাবো, আর তোমারটাকে আমি পৃথক করে দেখি, তবে আর আমাদের মিলন হোলো কোথায় বুঝিয়ে দাও তো।

মনসুর বিভ্রাটে পড়িল। পাণ্ডুর মুখে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া জবাব দিল, না—সে তুমি বোলো না করুণা, বিভিন্ন করে তো আমি ভাব্‌চিনে। আমার জন্যে তুমি ভোগ পোহাতে যাবে......।

করুণা ম্লান ব্যথিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। মনসুর সে চাহনীর অর্থ বুঝিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, রাগ কোরোনা করুণা, তুমি যাতে আনন্দ পাও, সুখী হও তা আমি কোর্‌বো।

করুণা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। উজ্জ্বল চোকে তাহার মুখটা নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, তোমার কাছে আমি তাই আশা করি; আজ থিয়েটারে যাবে ? চলো কিছু টিফিন্‌ করা যাক।

—আজ থাক, আরেক দিন হবে। এখন এসো বাসায় ফিরি, ক্লান্ত হয়েচি বড্ডো।

—তুমি দুনিয়ার কুঁড়ে, 'গৃহপ্রবেশ' হেন প্লে কি আরেক দিনের ওপরে বরাত দিয়ে রাখা চলে। তবে কথা কি জানো, আগে থেকে তো টিকিট করা হয়নি—শেষে ফিরে না আসতে হয়, তা আবার আর্ট থিয়েটার যদি কাছে।

—সেই তো বল্‌ছিলুম। ক্ষুণ্ণ হোয়োনা, সাম্‌নের সপ্তাহে যাওয়া যাবে।

ট্রাম গোলদীঘির কাছে আসিতেই মনসুর চুপে চুপে করুণাকে বলিল, আজ আসি তা হলে।

করুণা চকিত হইয়া ভাষা-ভরা ম্লান দৃষ্টিতে তাহার পানে তাকাইল। আজ আর সে বাধা দিতে পারিল না। কষ্টে একটু হাসিয়া বলিল, ট্রাবল দিতে চাইনে, আচ্ছা এসো।

অধ্যায় নয়

ইহার কয়েকদিন পরে একখানা জরুরি চিঠি পাইয়া মনসুর ক্ষুণ্ণমনে বাড়ী রওনা হইল। এখন অসময়ে কলেজ কামাই করিবার ইচ্ছা তাহার আদৌ ছিল না, কিন্তু জননীর আদেশও সে অমান্য করিতে পারিল না। বাড়ী আসিয়া সে যেন বিভ্রাটে পড়িল। সে নিঃসন্দেহে জানিত তাহাদের উপার্জ্জন করিয়া দিবার দ্বিতীয় লোক নাই, পুরুষের মধ্যে সে-ই কেবল একা, তথাপি সমবয়সী বন্ধুদের পানে চাহিয়া তাহার মনটা বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। তাহার বন্ধুরা কেহ বিবাহ করিয়াছে—কেহ করে নাই, কেহ পড়িতেছে, কেহ ছাড়িয়া দিয়া ছাত্রজীবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকেই উপার্জ্জনহীন, বেকার বসিয়া বাপ-ভাইয়ের টাকায় স্ফূর্ত্তি করিতেছে। এই মনসুরের মতন হতভাগ্য ইহাদের মধ্যে একজনও নাই। বিশ্বসংসারের কোথায়ও তাহার নজরে পড়ে নাই যে, যে নিজের সামর্থ্যে কলিকাতায় খরচ চালাইয়া পড়িতেছে, তাহার ঘাড়ে আবার বাড়ীরও আয় ব্যয়ের হিসাবটা এমন নির্ম্মমভাবে চাপিয়া বসিয়াছে যে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিবার কোনোই পথ নাই। জীবন যখন স্বপ্নে ভরিয়া আসে তখন অভাব দুঃখ দৈন্যের শিলা নিক্ষেপ করিয়া যে বিধাতা তাহাকে সাহারা মরুভূমির মাঝখানে টানিয়া আনে, তাহার দয়াবান নামটা

লোকে ভক্তিভরে যত ইচ্ছা মানিয়া লউক—মনসুর নিঃসন্দেহে তাহাকে মনে মনে অভিসম্পাত না দিয়া থাকিতে পারে না।

মনসুর সকালবেলা ঘুম হইতে জাগিয়া গভীর বিরক্তিতে পার্শ্ব-পরিবর্তন করিয়া রাত-জাগা ক্লান্ত চোখ ছুটি পুনরায় মুদিয়া নীরবে পড়িয়া রহিল। ট্রাম, গাড়ী, মোটর এবং অসংখ্য জনসমুদ্রের উচ্চ কোলাহলের পরিবর্তে আজিকার প্রাতঃকাল দোয়েলের শীষ, ঘুঘুর কাতর মিনতি, চড়ায়ের অফুরন্ত প্রেমলীলার আকুল আহ্বান, বুলবুলি টুনি ও ছাতিনার লাফাইয়া-চলার ছন্দ, শালিক ও হাড়িচাঁচার ঘরবাঁধার আয়োজনের ব্যস্ততার সাড়া তাহার কানে অমৃত বর্ষণ করিল। আজ তাহার কোনো কাজের তাড়া নাই, কলেজও নাই—যেখানে গেলে সে পড়াশুনার চেয়ে কল্পনার লোভনীয় মধুর সঙ্গলাভ করিবে, যাহার আশায় সে তাড়াতাড়ি সবকাজ শেষ করিয়া কলেজের জন্ত প্রস্তুত হইবে। মনসুর নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল, কয়েকবার উঠিবার জন্ত মনে মনে সঙ্কল্পও করিল কিন্তু শ্রান্ত অবশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাহার প্রস্তাবে সায় দিল না। আরো খানিকক্ষণ পড়িয়া থাকিয়া হাই তুলিয়া গোটা দুই তুড়ি দিয়া শিয়রের জানালাটা ছাড়িয়া দিতেই এক ঝলক তপ্ত রৌদ্র ঘরে ঢুকিয়া তাহার সমস্ত দেহকে একযোগে দগ্ধ করিয়া দিল। তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া বালিশের তলদেশে হাত ঢুকাইয়া কেস্ খুলিয়া সিগারেট বাহির করিল। বারকয়েক ধোঁয়া ছাড়িয়া বার্মি স্লিপার জোরা পায়ে দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া দরজা খুলিয়া বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল।

মাতা তখন নামাজ শেষ করিয়া কোর্‌আন শরিফ খুলিয়া গভীর মনোযোগে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়িয়া উল্টাইয়া চলিয়াছিলেন। স্লিপারএর শব্দে চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া পুত্রকে দেখিতে পাইয়া উপুড় হইয়া কোরাণ শরীফ বন্ধ করিয়া বার কয়েক কপাল ঠেকাইয়া সেলাম করিলেন, তারপর 'জুজ্‌দানি' সুদ্ধ তাহা সযত্নে সসম্ভ্রমে আলমারির মধ্যে রাখিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

বারাণ্ডার খানিকটা জায়গায় সুমুখের আমগাছের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল, মনসুর আস্তে আস্তে আসিয়া ক্লান্ত মনে, অবশ দেহে সেইখানে নীরবে বসিয়া সিগারেট টানিতে লাগিল। মাতা কাছে আসিতেই মনসুর চোখ তুলিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিল। বলিল মা, "মুখ ধোবার পানি।"

মাতা পুত্রের নিকটে বসিয়া পড়িয়া সস্নেহে তাহার গায়ে মাথায়—হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "পানি তো রেখেচি বাবা, তাড়াতাড়ি মুখটাধুয়ে নাও—আমি 'নাশ্‌তা' নিয়ে আসি।"

মনসুর জোরে জোরে বার কয়েক টান দিয়া চুরুটটা আছড়াইয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁতের উপরে ব্রাস ঘসিতে ঘসিতে পিছন ফিরিয়া মাতাকে বলিল, "চোকে ঘুম ভেঙে পড়্‌চে মা, যা দেবে চারটি জলদি দাও—কাঁচা ঘুমে ডাক দিয়োনা মানা করলুম।"

মাতা হাসিয়া পুত্রের চিবুক ছুঁইয়া চুম্বন গ্রহণ করিলেন। বলিলেন "সে ভয় করিস্‌নে বাবা, আমি আস্‌চি।"

মনসুর তক্ত পোষের উপরে বসিয়া সিক্ত মুখ চোখ গামছা দিয়া মুছিতেছিল, এমনি সময়ে মাতা এক ডালা মুড়ির উপরে খান কয়েক বাতাসা ও ছাঁচে গড়া গোটা কয়েক চিনির মিষ্টি লইয়া ঘরে ঢুকিয়া পুত্রের সুমুখে বিছানার উপরেই রাখিয়া দিলেন। তাহার দিকে চাহিয়া সস্নেহে, কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "এসব তুই খেতে পারবি তো বাবা?"

মনসুর চমকিয়া উঠিল। চক্ষের পলকে রাঙা মুখে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া হাসির ভঙ্গী করিয়া জবাব দিল, "কি বল্‌চো মা তুমি, তোমার কোলে জন্মে অবধি আমি এই সব খেতে অভ্যস্ত, আজ আমাকে নতুন করে, পর করে' দেখ্‌লে তুমি কি করে তাই বলো তো? আচ্ছা, তোমাদের বুঝি সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়—কলকাতা গেলেই মানুষে বদ্‌লে যায়, তা যেতে পারে, ধনীলোকের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু আমি গরীব—ভিখারী। বিলাস-ব্যসনের পয়সা কোথায় পাবো, বিনা দামে তো কেউই দেবে না, মা, জানো তো—ঢেঁকি যদি স্বর্গে যায়, সেখানেও তার বিরাম নেই সম্মান—ধান ভানতেই হবে।"

মাতা চিল ছুঁড়িয়া পাটকেলের গুরু আঘাত নীরবে সহ্য করিতে লাগিলেন। ব্যথিত দৃষ্টি প্রবাসী পুত্রের মুখের উপরে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "সে আমার অজানা নেই মুনা, তোকে আমি তোর নিজের চেয়েও ভালো জানি।"

মনসুর আধমুঠো মুড়ি গালে ফেলিয়া কামড় দিয়া অর্দ্ধেক বাতাসা ভাঙিয়া চিবাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। সহসা মুখ তুলিয়া মায়ের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, মা, তুমি হঠাৎ এমন করে চিঠিখানা লিখ্‌লে ভাবলুম কী বা হয়েছে, ট্রেনে বসে সারাটা রাস্তা ঐ চিন্তাই করেচি।

প্রত্যুত্তরে মিয়াগৃহিণী বলিলেন, খুব নিরাশ হয়েচিস্ নয়? একটা সাংঘাতিক রকম হয়ে গেলে সন্তুষ্ট হতিস্ কেমন?

মনসুর লজ্জিত হইয়া জবাব দিল, বা রে, তা কেন হতে যাব শুনি। তবে চিঠিখানা খুব জরুরি ছিলো কিনা—প্রিয়জনের অকল্যাণ চিন্তা মনে আসা স্বাভাবিক। তা কি জন্যে—এখন আমার না এলেই কি হোতো না?

পুত্রের প্রশ্নে মাতা বিব্রত হইয়া পড়িলেন, সহসা কি জবাব দিবেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। মিনিট খানেক নীরব থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, না, হোতো না বাবা। সত্যি বিদেশে গেলে তুই কি আমাদের সব একেবারে ভুলে যাস্ রে?

মনসুর কথার ধরণ দেখিয়া লক্ষ্য করিল মাতা তাহার নিকটে কি একটা চাপিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। মাথা তুলিয়া বলিল, ভুলে যাবো তোমাকে? বিশ্বাস হয়? আমার সারা বিশ্ব জুড়ে আছো তুমি মা, তোমাকে ভুল্‌বো? খানিকক্ষণ থামিয়া পুনরায় বলিল, সত্যি করে বলো তো মা কি কথা তুমি আমার কাছে থেকে গোপন করলে?

মিয়া গৃহিণী মধুর হাসিলেন। বলিলেন, তুই দুষ্ট ছেলে বাবা কিছু লুকোবার জোটি নেই। আচ্ছা এখন নয়, দুপুর বেলা ঘুমথেকে উঠ্‌লে বলবো' খন।

মনসুর করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, মা্‌দিয়া, দেখ্‌লে কেমন ধর্‌তে পেরেচি। বোলো কিন্তু মা নৈলে ভয়ঙ্কর রাগ কোরবো বলে রাখ্‌চি।

মাতা তাহার মুখের পানে চাহিয়া সস্নেহে হাসিলেন। মনে মনে বোধ করি বা বুঝিয়া লইলেন সেই পাঁচ বছরের শিশু মনসুর বুদ্ধি এবং আব্দারে আজো ঠিক তাই-ই আছে।

বৈকালের দিকে মনসুর চোখ মেলিয়া জাগিয়া চেয়ারের উপরে উঠিয়া বসিতেই একখানা ভারী মোটা বহি সশব্দে মেঝের বুকে লুটাইয়া পড়িল। ম্লান এবং ত্যক্ত মনে উবু হইয়া সেখানি উঠাইয়া সামনের টেবিলের উপরে রাখিতে তাহার স্মরণ হইল যে, অনেকক্ষণ আগে পড়িতে পড়িতে গভীর আলস্যে চেয়ারের কোলেই সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, উঠিয়া বিছানায় যাইয়া শুইতে তার এতটুকুও ধৈর্য্য ছিল না।

রাত্রি দশটায় মনসুর সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিল। হাতে তাহার এক গোছা মাসিক পত্রিকা ও খান দুই উপন্যাস। মিয়া গৃহিণী একটা প্রদীপ হস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন?

মনসুর বারান্দায় উঠিতে উঠিতে বলিল, হ্যারিকেনটা জলদি জ্বেলে দাওতো মা, কাজ নেই তোমার বিশ্রী ল্যাম্পটাতে—যা ধোঁয়া উঠ্‌চে বাপ্‌রে।.........মুখে তাহার গভীর বিরক্তির ছাপ আঁকা।

মিয়া গৃহিনী চিমনী মুছিয়া আলো জ্বালাইয়া দিতেই ঘরখানি অপরূপ শ্রীতে মুহূর্ত্তে আগাগোড়া বদ্‌লাইয়া গেল। মনসুর জামা ছাড়িয়া, কাপড় পরিবর্ত্তন করিয়া ঘরের মধ্যে যে চেয়ারখানা ছিল তাহাই টানিয়া লইয়া দরজার সম্মুখে বসিল। মাতা বলিলেন, আর দেরী করিস্‌নে বাবা—রাত ঢের হয়ে গেছে—চারটি খেয়ে নে।

মনসুর দ্বিরুক্তি করিল না। হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া একটা মাদুর পাতিয়া নিজের ঘরের মেঝেতেই আহারের ঠাঁই করিয়া লইল। মাতা রান্নাঘর হইতে ভাত-ব্যঞ্জন আনিয়া তাহার সুমুখে রাখিতেই মনসুর সেগুলার শুষ্ক আয়োজনের দিকে এক ঝলক দৃষ্টি দিয়া জননীর মুখের পানে ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিল। সে জানিত তাহারা কত গরীব, কত দীন। সামান্য খাদ্যের সংস্থান করা যাহাদের সাধ্যে কুলায় না, সেই অতি তুচ্ছ অবস্থার ভিতর হইতে মাতা যে কতখানি কষ্ট এবং আয়াস স্বীকার করিয়া প্রবাসী পুত্রের জন্য এগুলির যোগাড় করিয়াছেন, তাহা সে চক্ষের পলকে বুঝিয়া লইল। চোকের কোনে অশ্রু ছলছল করিয়া উঠিয়াছিল—অতি সহজেই তাহার অশ্রু আসিত। মুহূর্ত্তে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া অতি কষ্টে ঠোঁটের কোণে একটুখানি বিকৃত হাসি টানিয়া আনিল। বলিল, ভারি যে ঘটা দেখ্‌চি মা, ও-বেলা তো কই এত খেতে দাওনি?

মাতা সস্নেহে পুত্রের মুখের পানে চাহিলেন। মিনিট খানেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, দিইনি তার কারণ যোগাড়

করতে পারলুম না। আর কি-ই-বা দিয়েচি, এখন খা—মুখ বুজে চুপটী করে খা।

মনসুর এক গ্রাস ভাত গালে পুরিয়া দিল। ভারীগলায় বলিল, কি দিয়েচ? বাপ্—রে—এ—ত—।

মাতা মাঝখানে তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, জ্যাঠামো করিস্‌নে বাবা চুপ কর্। বিদেশে কোথায় কি খাস্ আমিতো দেখতে যাইনে, আমার সাম্‌নে যে দুটো দিন থাকবি তাও তুই অমনি করবি। সেখানে না হয় তুই রাজভোগ খাস, এখানে যা ক্ষুদ কুঁড়া আমার জুটেচে তাই খা—বলিয়া নির্দ্দয়-দৃষ্টি আহার-রত পুত্রের পাণ্ডুর মুখের উপরে তুলিয়া ধরিলেন।

জননীর অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছিল, নির্ম্মম তীক্ষ্ণ কথার শায়ক মনসুরের বুকের অন্তস্থলে যাইয়া বিঁধিয়াছিল। ছায়ের মতন সাদা মুখ তুলিয়া সম্মুখোপবিষ্ঠা মাতার পানে সে চাহিয়া দৃষ্টিতে তিরস্কার হানিতে লাগিল। বলিল, রাজভোগ খাই সেখানে, আর এখানে ক্ষুদ-কুঁড়া——গোখা-চোখা এত ঝাল মিশাতে পারো তুমি মা? চিরকাল কি খাইয়ে তুমি মানুষ করে তুলেচো সেতো আমার চেয়ে তুমিই ভালো জানো। অভিমানে তাহার ঠোঁট দুইটা ফুলিতেছিল একটু থামিয়া পুনরায় কি একটা বলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু তাহা ঠোঁট হইতে বাহিরে আসিবার শক্তি পাইল না—অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া গেল।

মিয়া গৃহিণী তাড়াতাড়ি মনসুরের দিকে সরিয়া আসিয়া পরম আদরে তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সস্নেহে বলিলেন, রাগ কর্‌লি তুই? তোর ছেলেবুদ্ধি এখনো যায়নি তো বাবা, তুচ্ছ কথায় এমন ধারা করিস্—?

অভিমানে মনসুরের চোখের পাতা ভিজিয়া আসিয়াছিল। কচি শিশুর মতন ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, মাস কয়েক থেকে তোমাকে তো কিছু পাঠাইনি, সাধ্যেও অকুলান হয়েছিল। এসব করতে পয়সা নিশ্চয় লেগেচে, সে তুমি পেলে কোথায় আমাকে বলতে হবে—মাথার দিব্যি।

মিয়া গৃহিণী ভয়ঙ্কর বিব্রত হইয়া পড়িলেন। সে সুগোপন কাহিনী যদি তিনি অকপটে সমস্ত বিবৃত করেন তবে হয় তো তাহার আহার সেইখানেই শেষ হইয়া যাইবে। শেষের কথাটা তিনি যেন শুনিতে পান নাই, এইরূপ ভাব দেখাইয়া বলিলেন, পাঠাস্‌নি বেশ করেচিস্ তুই পাবি কোথায় বল্‌তো? খা, ও-টুকুন খা, তুই যে খুব ভালো বাসতিস্—খারে বাবা—।

মুহূর্ত্তে বদলাইয়া মনসুর হাসিয়া উঠিল। বলিল, শাক মাছ ঢাকবার চেষ্টায় আছো—পয়সা কোথায় পেলে সে কথা যে বল্লে না। না বল্লে বেশ থাকগে—আমিও আর খাব না, উঠ্‌লুম এ যে। বলিয়া মনসুর সত্য সত্যই হাত গুটাইয়া মাদুরের উপরে সোজা হইয়া বসিল।

মিয়াগৃহিণী বেগতিক দেখিয়া কঠিন হইলেন। ধমক দিয়া বলিলেন, শোনো কথা, আর খাবো না—সে কী? খেয়ে দেয়ে নে বল্‌চি; পাগ্‌লা, তোকে বলবো না তো বলবো কাকে শুনি?

আহার শেষে মনসুর যখন এক পয়সায় আটটা পাওয়ার একটা বিড়ি ধরাইয়া টানিতে টানিতে নাছোড় হইয়া ধরিলো। তখন মাতা অগত্যা তাহার সুমুখে বসিয়া প্রমাদ গণিলেন। কয়েক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, সত্যি ছাড়্‌বিনে তুই। পুরী যাবার আগে ক'টা টাকা আমাকে পাঠাইয়াছিলি মনে আছে, তা আমার খরচ হয়নি—বুঝ্‌লি?

মনসুর চমকিয়া উঠিল। বলিল, সে—ই টাকা? অবাক করলে মা, তা এতদিনও আছে?

—না থাকলে চল্‌বে কেন বাবা, তুই বাড়ী এলে কি খাওয়াবো সে ভাবনা আমার নেই না কি! তুই যে আমার দুঃখিনীর ধন, বিদেশে কার কাছে কোথায় কি খাস;—নিজে হাতে সুমুখে বসে না খাওয়ালে কি তৃপ্তি হয় মুনা? চোখ দুইটা তাঁর ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল।

মনসুর বেদনা-ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তৃপ্তি হয় না সে আমি মানলুম, কিন্তু এতকাল তোমার কি করে চলেচে বলো তো মা?

—চলেচে? মুখ দিয়েচেন যিনি আহারও তিনিই জুটিয়ে দিয়েচেন। আমার নিজের চেয়ে তাঁর ভাবনাটাই যে বেশী বাবা………।

—ও সব তো গেল আধ্যাত্মিক কথা, ওতে তো আর সত্যি সত্যিই পেট ভরে না মা। আসল কথাটা বলো না।

—সত্যিই বল্‌চি বাবা। আমাদের কিছু জমি আছে সে তো জানিস্, আমি একলা মানুষ—ওতেই বেশ চলে যায়।

মনসুর বিশ্বাস করিল না। সে জানিত যে সামান্য ভূসম্পত্তি তাহাদের আছে, তাহা একটা মানুষের স্বচ্ছল ভাবে চলিবার পক্ষেও পর্য্যাপ্ত নহে। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, মিছে বোলো না মা, তোমার গয়নাগুলো কাল সকালে একবার দেখিয়ো তো।

জননী একথায় চমকিয়া উঠিলেন। নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন, এই নাও ছেলের কথা শোনো, গয়না কেন তুই দেখতে যাবি বল্‌তো?

মনসুর রাগে পাইয়া কণ্ঠে জোর দিয়া বলিল, যে জন্যেই হোক, না হয় আজ-ই দেখিয়ে দাওনা মা, দেখি কি কি আছে আর কি তুমি বিক্রী করেচো?

মিয়াগৃহিণী জিব কাটিয়া বলিলেন, পাগল, বিক্রী কর্‌তে যাবো কেন। তোকে এসব কথা কে বল্লে শুনি?

মনসুর জানিত তাঁহার মাতা অর্থের প্রয়োজন অনুভব করিলে গহনা বন্ধক দিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেন, প্রাণান্তেও কখনো বিক্রয় করিয়া দ্রব্যটা একদম খোয়াইয়া বসিতেন না। পুনরায় হাতে টাকা লইলে সুযোগ মতো ছাড়াইয়া লইতেন। সেই বিশ্বাসে বিড়িটা মুখ হইতে সজোরে ফেলিয়া দিয়া বলিল, যে-ই বলুক, বিক্রী করোনি সে আমি জানি কিন্তু কত টাকায় বন্ধক রেখেচো তাই আমাকে বলো।

মিয়া গৃহিণী দেখিলেন তিনি ধরা পড়িয়া গেছেন। এই স্থূলদৃষ্টি সন্তানটির সহসা এই সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের শক্তি হইতে আপনার চাতুরী আর অধিকক্ষণ ঢাকিয়া ছাপিয়া রাখিতে পারিবেন না। বলিলেন, বড় দুষ্টু ছেলে তুই, কিচ্ছুটি লুকোবার জো নেই দেখ্‌চি। টাকা তেমন বিশেষ নয় বাবা, ডানহাতের অনন্তগাছি রেখে পনেরোটা টাকা নিয়েচি তুই ভাবিস্‌নে—আমি নিজেই সে পরিশোধ করে দেবো।

মনসুরের মাথায় কে যেন সজোরে লোহার লাঠি দ্বারা আঘাত করিল। মহাঅপরাধীর মতো মুখ চুণ করিয়া অতি কষ্টে একটু হাসিল। বলিল, বেশ ভালই করেছো, তা—তা—কি জানো—মা ভ্যাখো—হ্যাঁ—। দুর্ভাবনার আলোড়নে নিজের ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্য মাঝ পথেই মিলাইয়া গেল। সহসা চুপ করিয়া বোধ করি বা দুঃখ ও দারিদ্র্যের পরিমাণ মনে মনে ওজন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ

প্রেম

("বোর্ডিলন" হইতে)

জোয়াদুল করিম

নিশার সহস্র আঁখি দেয় আলো থাকি থাকি—
দিবসের শুধু এক রবি;
সংখ্যায় সহস্র জ্বলে; রবি গেলে অস্তাচলে
অন্ধকারে ঢেকে যায় সবি!

মনের নয়ন শত প্রভাময় অবিরত;
হৃদয়ের একমাত্র ধন—
সমস্ত জীবন হায় আঁধার হইয়া যায়
প্রেম যদি করে পলায়ন!
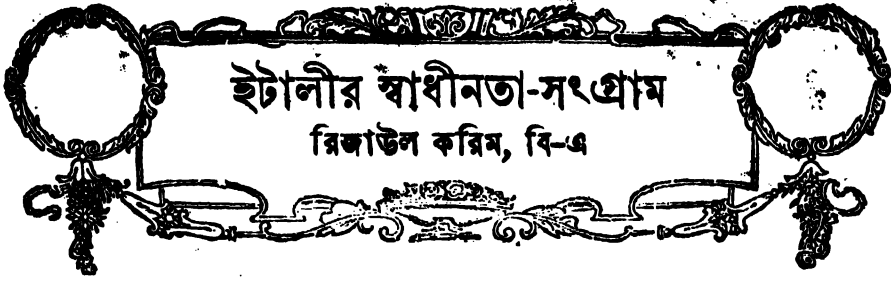
ইটালীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম

রিজাউল করিম, বি-এ

১

রোম !!

মহানগরী রোমের নাম করিবা মাত্র সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠে—পুলকে, বিস্ময়ে, দুঃখে, বিষাদে! এই সে রোম স্মরণাতীত কালে যেখানে একদিন মানুষ সভ্যতার বিরাট সৌধ গড়িয়াছিল—এই সে রোম, যথাকার উৎসারিত আলো একদিন সমস্ত ইউরোপকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল! এই রোমের বীর অধিবাসিগণ একদিন অত্যাচারী রাজাকে পদচ্যুত করিয়া প্রজাতন্ত্র-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। রোমের এই প্রজাতন্ত্র যুগ যুগ ধরিয়া ইটালীর বক্ষে বিরাজমান থাকিয়া মানুষের স্বাধীনতার জয় ঘোষণা করিয়াছিল। রোমের বিজয়-বাহিনী, রোমের অজেয় 'লিজন' (legion), রোমের শোভা-যাত্রা (Triumph) সবই আজ যেন চোখের সামনে ভাসিতেছে! রোমের সে গৌরবের দিনে, সে কি না করিয়াছিল! সভ্যতা, জ্ঞান, গরিমা, আইন, ব্যবস্থা, সাহিত্য, দর্শন, শাসন-প্রণালী সব কিছুরই উন্নতি এই রোম করিয়াছিল। বর্ত্তমান ইউরোপ বহুলাংশে রোমেরই শিষ্য! কিন্তু সে অতীত কীর্ত্তি আজ শুধু ভগ্ন-স্তূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে।

তারপর আসিল রোমের উপর এক কঠোর অগ্নি-পরীক্ষা! হুন, গথ, ভিসিগথ, ভ্যাণ্ডাল, একে একে যুগ যুগ সঞ্চিত ধন রত্নাদির লোভে রোমের উপর আসিয়া পড়িল। ভীষণ সে আক্রমণ—সে প্রচণ্ডতার বেগ রোম সহ্য করিতে পারিল না! আক্রমণকারীরা রোমকে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করিয়া দিল! লুটপাট করিয়া রোমের গৌরব মহিমা নষ্ট করিয়া দিল! হৃত-শ্রী নষ্ট-গৌরব রোম দর্শকের প্রাণে হাহাকার জাগাইবার জন্তই যেন ইউরোপের এক প্রান্তে অনাদৃত ভাবে পড়িয়া রহিল!

রোমের "Eternal city" নামটি বজায় রাখিবার জন্তই বুঝি রোমের উপর আসর জাঁকিয়া বসিলেন ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রধান-গুরু পোপ!

বিধাতার কি বিচিত্র লীলা! এদিকে রোমের পতন! আর ও দিকে সেই রোমেরই দাসানুদাস ইউরোপের অন্যান্ত জাতি সমূহের কি অপূর্ব্ব অভ্যুত্থান! কি মহা জাগরণ! রোমের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া রোমকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া ইউরোপ জাগিয়া উঠিল—শক্তি সঞ্চয় করিল! আর তাহাদেরই শিক্ষাগুরু রোম ক্রমে ক্রমে অধঃপতনের নিম্ন-স্তরে যাইতে লাগিল!

এই রোম যে দেশের রাজধানী তাহার নাম ইটালী! রোমকে কেন্দ্র করিয়া একদিন সমগ্র ইটালী একই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল! কিন্তু পুনঃ পুনঃ বহির্শত্রু আক্রমণে ইটালীর অখণ্ডতা ভঙ্গ হইয়া পড়িল,—এক অখণ্ড প্রদেশ নানা ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইল। মধ্যযুগের শেষ ভাগে আমরা দেখিতে পাই, ইটালী একতা হারাইয়া, বৈদেশিক শক্রর আক্রমণের জন্তই যেন উন্মুক্ত হইয়া আছে। এই সময় ফ্রান্স ও স্পেন সুযোগ বুঝিয়া ইটালীর বহু প্রদেশ অধিকার করিয়া বসিল। রোম ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশের উপর প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন অত্যাচারী পোপ। কিন্তু ইটালীর বিরাট অখণ্ডতা নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল! তন্মধ্যে এই কয়েকটি প্রধান—মিলান, ভিনিস, ফ্লোরেন্স, পোপের রাজ্য ও নেপল্‌স্!

দেশের গৌরব, শ্রীবৃদ্ধি, ঋদ্ধি, প্রভৃতি স্বাধীনতারই অমৃতময় ফল! স্বাধীনতা হারাইলে কোনও দেশ উন্নত অবস্থায় থাকিতে পারে না। তখন সে দেশের ও সে দেশবাসীর দুর্দ্দশার অবধি থাকে না। স্বাধীনতা হারাইয়া ইটালীরও সেইরূপ অবস্থা হইল! তাহার অধিবাসিগণের মনোবৃত্তি দুর্ব্বল ও নীচ ভাবাপন্ন হইয়া পড়িল। ইটালীর বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে কোনও রূপ একতা ছিল না। বরং একে অপরের শক্রতাচরণ করিতে ছাড়িত না। কখনও

বা কোন প্রবলতম বিদেশী শত্রুকে নিমন্ত্রণ করিয়া, অন্যকে দমন করিবার চেষ্টা করিত! এই রূপে ইটালীর রাজনৈতিক গুরুত্ব একেবারেই লোপ পাইল। বহুদিন পর্য্যন্ত ইটালী ক্ষমতা-হীন হইয়া পড়িয়া রহিল।

স্বাধীনতা হারাইয়া ইটালীর বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণ এরূপ নির্জ্জীব ও একতা-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল যে বহুকাল পর্য্যন্ত তাহারা স্বাধীনতা বা একতার কথা ভাবিবারই অবসর পায় নাই। কিন্তু যেদিন ফরাসী জাতি মহা-বিপ্লবের মধ্য দিয়া সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী তূর্য্য নিনাদে ঘোষণা করিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিগৃহীত জাতিকে মুক্তির পথে আহ্বান করিতে লাগিল, সেদিন ফরাসীর সে আহ্বান ব্যর্থ যায় নাই। বিপ্লবের আহ্বানে ইটালী নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহে নাই। ইটালীবাসীর মরা প্রাণে জোয়ারের বাণ ডাকিয়া উঠিল! তন্দ্রালস ইটালি মহোদ্যোগে গাত্রোত্থান করিয়া সময়োপযোগী রণসজ্জা করিতে লাগিল। ফলে ফরাসী-বীর নেপোলিয়ন যখন ইটালীর প্রধান শত্রু অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, সেই সময় ইটালীবাসী তাঁহাকে উদ্ধার-কর্ত্তা বলিয়া বরণ করিয়া লইল। অষ্ট্রিয়াকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য ইটালীবাসী নেপোলিয়নকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। নেপোলিয়ন, অষ্ট্রীয়াকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু আরব্য উপন্যাসের সিন্দেবাদ বর্ণিত দ্বীপবাসী লোকটীর মত তিনি ইটালির স্কন্ধদেশে বসিয়া রহিলেন। ইটালী এক অত্যাচারীর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া অন্য একটি প্রবলতর শত্রুর কবলে পতিত হইল।

ইটালী নেপোলিয়নের নিকট যে আশা করিয়াছিল, তাহা পাইল না। নেপোলিয়ন ইটালীর বুকে চাপিয়া বসিলেন। তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিলেন না। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে উপকার না পাইলেও, পরোক্ষভাবে, ইটালী নেপোলিয়ন দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের অগ্রগামী পুরোহিতের ইটালী আগমণের সঙ্গে সঙ্গে, বিপ্লবের অগ্নি-কণা ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহার আক্রমণের পর হইতে দেশবাসী স্পষ্ট বুঝিল যে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একতার একান্ত প্রয়োজন। "জাতির জাগরণ" বলিতে যাহা বুঝায়, ইটালীর নেতৃবৃন্দ সেই ভাবেই সমগ্র জাতিকে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। দেশের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার জন্য ক্ষুদ্রতর স্বার্থগুলিকে বলিদান করিবার জন্য তাঁহারা প্রচার আরম্ভ করিলেন। এতাবৎ দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে যে হিংসা বিদ্বেষ ছিল, তাহা দূর হইল, অনেক ক্ষুদ্রতম রাজ্য স্বেচ্ছায় বৃহত্তম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িল।

ফরাসী বিপ্লবের শেষ সাফল্য নির্ভর করিতেছিল ওয়াটারলু-প্রান্তরে নেপোলিয়ন ও ওয়েলিংটনের যুদ্ধের ফলাফলের উপর। সেই যুগান্তকারী দারুণ যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় হইল। তাঁহার পরাজয়ের পর বিপ্লববাদিদের সব আশা ভরসা কিছুদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। মিত্রপক্ষের বিজয়ী সেনানী বীরবেশে প্যারিস প্রবেশ করিয়া ফরাসীর শক্তি বিচূর্ণ করিয়া দিল।

তৎপর ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ, ভিয়েনা নগরীতে মিলিত হইয়া এক কংগ্রেস সভার আহ্বান করিলেন। ফরাসীর অধিকৃত কোন কোন প্রদেশ বিজেতাগণ অধিকার করিবেন, তাহাই এই সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল। ফলে ইটালীর অধিকাংশ প্রদেশ অষ্ট্রীয়ার অংশে পড়িল।

ভিয়েনা কংগ্রেসের পর হইতে অষ্ট্রীয়া, ইটালীকে করকবলিত করিয়া অতি কঠোরভাবে শাসন করিতে লাগিল। অতি ভীষণভাবে উহার অধিবাসীদিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। যাহাতে এই সমুদয় অত্যাচারের প্রতিবাদ না হইতে পায়, তজ্জন্য অষ্ট্রীয়া এমন কতকগুলি কঠোর বিধান প্রবর্ত্তন করিল যে, তাহাতে দেশবাসী হতাশ হইয়া পড়িল। মাথা তুলিয়া শাসকগণের বিরুদ্ধে কোনও কথা কহিবার সামর্থ্যই রহিল না!

ইউরোপের কোনও স্থানে যাহাতে স্বাধীনতার আন্দোলন না হইতে পায় তজ্জন্য প্রুশিয়া, অষ্ট্রীয়া ও রুশিয়ার সহযোগিতায় "Holy alliance" বা পবিত্র সম্মিলনী নাম দিয়া একটি লিগ গঠিত হইয়াছিল! এই লিগের প্রধান উদ্দেশ্য—স্বাধীনতার আন্দোলন দমন করা। ইউরোপের কোনও স্থানে প্রচলিত শাসন-প্রথার বিরুদ্ধে সামান্য একটু আন্দোলন হইলে লিগের উদ্যোক্তাগণ কঠোর হস্তে তাহা দমন করিতেন! সুতরাং এই লিগ অধীন-দেশের প্রজাবৃন্দের জন্য মহা শঙ্কার কারণ হইয়া উঠিল! এই সম্মিলনীর অত্যাচার পরিশেষে এরূপ চরমে উঠিয়াছিল যে লোকে

উহাকে "স্বাধীনতা-নাশিনী" আন্দোলন বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিল!

বিদেশী শাসন সাধারণত কোনও দেশের জন্য কল্যাণকর হয় নাই। বিদেশী শাসন বলিতে অত্যাচার ও প্রজাপীড়নের কথা স্বতঃই মনের মধ্যে উদিত হয়। এই বিদেশী শাসনের কঠোর নিষ্পেষণে ইটালীর অধিবাসিগণ জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। অষ্ট্রীয়ার অত্যাচার ইটালীর মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিবার উপক্রম করিল। এবং কয়েক বৎসরের দারুণ পরাধীনতায় ইটালী নির্জ্জীব ও ক্লীব হইয়া পড়িল। দেশবাসীর হৃদয় হইতে উচ্চ আশা ও মহৎ ভাব একেবারেই তিরোহিত হইল! দেশবাসী যাহাতে উচ্চ শিক্ষা না পায় বরং কলুষিত ভাবেই জীবন যাপন করিতে থাকে, কর্তৃপক্ষ সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। দেশের স্থানে স্থানে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া প্রতিদিন শত শত নিরপরাধ লোককে দেশ-হিতৈষণার অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হইতে লাগিল। সামান্য অপরাধে অনেককে জীবন্ত দগ্ধ করা হইয়াছিল। আবার কাহাকে কাহাকে দেশ হইতে চির-নির্ব্বাসনেরও আদেশ দেওয়া হইয়াছিল!

সংবাদপত্র ও প্রকাশ্য বক্তৃতা দেশের মধ্যে উচ্চভাব প্রকাশের জন্য শ্রেষ্ঠ উপায়। বিদেশী রাজ-পুরুষ এই দুইটি প্রধান অস্ত্রের উপর আইনের ধারা প্রয়োগ করিয়া ইটালীর অধিবাসীকে বধির করিয়া দিতে চেষ্টিত হইলেন। বিদেশীর আইনের প্রয়োগে দেশের বহু সংবাদপত্র বিলুপ্ত হইয়া গেল। অনেক স্পষ্টবাদী বক্তা দেশের জন্য বক্তৃতা করার অপরাধে যূপকাষ্ঠে প্রাণ বলিদান করিলেন। কিন্তু ইহাতেও রাজপুরুষগণের অত্যাচারের মাত্রা কমিল না, বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল।

অত্যাচার, নিষ্পেষণ কখনও কোনও জাতির অন্তরের আগ্নেয় শক্তি বিনষ্ট করিতে পারে না। প্রতিপক্ষ যতই অত্যাচার করিতে থাকুক, নিপীড়িত জাতির মধ্যে যদি স্বাধীন হইবার বাসনা প্রবলভাবে জাগিয়া থাকে, তাহা হইলে কেহ তাহাকে দমন করিতে পারে না। অষ্ট্রীয়া রাজের প্রবল শক্তিও এই ভাবে ব্যর্থ হইতে চলিল। ইটালীয়ানগণ, অষ্ট্রীয়ার সমস্ত অত্যাচার অগ্রাহ্য করিয়া, তাহার সমস্ত সতর্কতা ব্যর্থ করিয়া ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল।

ইটালীয়ানগণের জাগরণের ইতিহাস অতি অদ্ভুত। ইহার প্রথম যুগে কতকগুলি বিধিসঙ্গত আন্দোলন হইয়াছিল। অত্যাচারিত দেশবাসী রাজার নিকট দয়ার দান চাহিয়াছিল। নিবেদন আবেদন ব্যর্থ হইলে, দ্বিতীয় অস্ত্র-স্বরূপ প্রতিবাদ ও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া সভা-সমিতি হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে প্রবল প্রতিপক্ষের চৈতন্যোদয় হয় নাই। তারপর যে যুগ আরম্ভ হইল, তাহা বড়ই ভয়ঙ্কর। বিধিসঙ্গত উপায় ব্যর্থ হইলে, ইটালীয়ানগণ অবৈধ উপায় অবলম্বন করিল। গুপ্তহত্যা, গুপ্তসভা-সমিতি প্রভৃতি ভয়ঙ্কর পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক, তাহারা অষ্ট্রীয়াকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

প্রকাশ্য সভা-সমিতি বা বক্তৃতা নিষিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া, দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে নানা প্রকার গুপ্ত সমিতি গঠিত হইল। ইহাদের মধ্যে "কারবোনারী" নামক একটি সমিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগদান করিয়া যাহারা এতদিন নির্য্যাতন ভোগ করিয়া আসিতেছিল, তাহারা এক্ষণে দলে দলে তুমুল উৎসাহে এই সমিতিতে যোগদান করিয়া, দেশময় শাখা সমিতি খুলিয়া সকলকে বিদ্রোহের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। কয়েক বৎসরের আন্দোলনের ফলে এই সমিতি দেশের জনসাধারণের চিন্তাহীন জড় অন্তরে এক নূতন ভাবের প্রবাহ আনিয়া দিল। নিগৃহীত ও হতাশার অন্ধকূপে নিপতিত মানুষ জানিল যে তাহাদের আর অধিক দিন অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে না,—তাহাদের উদ্ধারের আর বিলম্ব নাই।

এই গুপ্ত-সমিতির আন্দোলনের ফলে একবার নেপল্‌সের রাজা বাধ্য হইয়া তাঁহার প্রজাগণকে রাজনৈতিক সুবিধা প্রদান করিয়াছিলেন! নেপল্‌সে আন্দোলন-কারীদের সাফল্য দেখিয়া অষ্ট্রীয়া-রাজ ভয়ানক ক্রোধান্ধ হইয়া স্বীয় রাজ্যে আন্দোলন দমন করিতে লাগিলেন। দুই তিনটা বিপ্লব তিনি নৃশংস হত্যা-কাণ্ড দ্বারা দমন করেন! ফলে কিছুদিনের তরে ইটালীর সকল আন্দোলন বন্ধ হইয়া গেল!

জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, যখন কোন দেশে অত্যাচার ও উৎপীড়ন রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ

করিয়া তথাকার নর-নারীকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হয়, সে সময় সেই দেশে পরম করুণাময় বিধাতৃপুরুষ এমন কতকগুলি মহাপুরুষ প্রেরণ করেন, যাঁহারা মরণ-প্রায় জাতিকে আসন্ন ধ্বংসের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া উন্নতির উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করাইয়া দেন। ইটালীর এই দারুণ দুর্য্যোগের দিনে দুইজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া সমগ্র দেশে এমন ভাবের বন্যা প্রবাহিত করিয়া দিলেন যে, তাহার প্রভাবে ইটালী অতি সত্বর বিদেশীর অধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বাধীন ত হইল, বরং ইউরোপের অন্যতম প্রধান শক্তির মধ্যে পরিগণিত হইল। এই দুই মহাপুরুষের নাম, ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্ডি।

ইটালীর মুক্তি-যুদ্ধের কাহিনীর সহিত চারিজন মহাপুরুষের নাম অবিচ্ছেদ ভাবে জড়িত রহিবে। গ্যারিবল্ডি ও ম্যাজিনী ব্যতীত আরও দুইজনের নাম ইটালী কখনও বিস্মৃত হইবেনা,—কাভুর, ও ইমানুয়েল! কিন্তু সাধারণতঃ প্রথমোক্ত দুইজন মহাপুরুষকেই ইটালীর স্বাধীনতা প্রাপ্তির মূলীভূত কারণ বলিয়া বর্ণণা করা হইয়া থাকে।

মহাপ্রাণ ম্যাজিনী ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে জেনোওয়া নগরে এক চিকিৎসা ব্যবসায়ীর গৃহে ভূমিষ্ট হন। অতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়ে স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। বয়োঃবৃদ্ধি ও অধিকতর জ্ঞান-লাভের সঙ্গে সঙ্গে সেই বীজ পত্র-পল্লবে সুশোভিত হইতে লাগিল। স্বদেশের ও বিদেশের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেশের দুর্দ্দশার কথা তিনি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলেন। সেই সময় হইতে দেশের দুর্দ্দশা মোচন করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। কি প্রকারে দেশকে স্বাধীন করিবেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। সুতরাং তিনি কোনওরূপ চাকরী গ্রহণ না করিয়া, আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া অনেকে সখের দেশ-সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু ম্যাজিনির সখের দেশ-সেবা ছিল না। তাই তিনি দেখিলেন আইন ব্যবসায়ের দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না, বরং ইহা তাঁহার পথের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিল। তিনি অবিলম্বে আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সাহিত্য ও রাজনীতি চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি বুঝিলেন, দেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে উচ্চ চিন্তা ও উচ্চ আশার ভাব আদৌ জাগে নাই। পরাধীনতার মধ্যে তাহারা পশুর অধম জীবন যাপন করিতেছে। যাহাতে তাহাদের প্রাণ উচ্চ আশায় পূর্ণ হয়, যাহাতে তাহারা নিজেদের ঘৃণিত জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উন্নত হইতে চেষ্টা করে, এবং বিদেশীর অত্যাচার সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া তৎপ্রতি বিধানে মনোযোগী হয়,—দেশবাসীকে সেই সকল বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য তিনি আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন।

তিনি দেশের সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন যে, উচ্চ চিন্তা ও উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত না হইলে কোনও জাতি শ্রেষ্ট হইতে পারে না। ইটালীর প্রত্যেক অধিবাসীকে এই ভাবে মানুষ হইতে হইবে, তবেই ইটালী স্বাধীন হইবে,—তাহার সুদিন আসিবে। তিনি দেশের বহু পত্রিকায় এই ভাবের নানা প্রবন্ধ লিখিয়া অনেকের মনের মধ্যে মহৎ ভাবের বীজ বপণ করিলেন। তাঁহার মূল্যবান প্রবন্ধরাজি প্রচারে দেশের সর্ব্বত্র বেশ একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। তাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বত্র আদৃত হইতে লাগিল। অত্যাচারী রাজ-পুরুষগণ ম্যাজিনির প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখিলেন, এবং তাঁহার প্রচারিত কয়েকটা পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করিয়া দিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, ইহাতেই ইটালী হইতে স্বাধীন ভাবের বন্যা বন্ধ হইয়া যাইবে।

উচ্চ-ভাব পূর্ণ নানা বিষয়ের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেকেই তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ যে সকল স্বদেশপ্রাণ যুবক এতাবৎ কোন কুল কিনারা খুঁজিয়া পাইতেছিল না, তাহারা এক্ষণে ম্যাজিনীকে পাইয়া ইটালীর উদ্ধার সাধনে তাঁহাকেই গুরু বলিয়া মানিয়া লইল। এই সকল উৎসাহী ও স্বদেশগতপ্রাণ যুবকবৃন্দকে লইয়া ম্যাজিনী জেনোয়া নগরে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইটালীকে স্বাধীন করাই এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইল। দেশের লোকের মধ্যে উচ্চ-ভাব প্রচারের জন্য এই সমিতির মুখপত্র স্বরূপ একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইল—এই পত্রিকা অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মত, উচ্চ-ভাবের বন্যায় সমগ্র দেশ ভাসাইয়া দিল।

ম্যাজিনীর এই সাধু উদ্দেশ্যে বাধা দিবার জন্য বিদেশী শাসক সর্ব্বত্র গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিল। এইরূপ এক গুপ্তচর তাঁহাকে 'কার্ব্বনারী' নামক গুপ্ত সভার সভ্য

ধরিয়া ধরাইয়া দেয়। তিনি ধৃত ও বন্দী হইয়া ইটালী হইতে চির-নির্ব্বাসিত হইলেন। নব্য-ইটালীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা ম্যাজিনী জীবনে আর ইটালীর মুখ দেখিতে পাইলেন না!

ইটালী হইতে তিনি নির্ব্বাসিত হইলেন বটে, কিন্তু ইটালীর চিন্তা তিনি অন্তর হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারিলেন না। নির্ব্বাসিত হইয়া তিনি সর্ব্ব-প্রথম ফরাসী রাজ্যের অন্তর্গত মার্শেল্ নগরে আশ্রয় লইলেন। সুগন্ধ কুসুম আপনার সন্ধান কাহাকে বলিয়া দেয় না। দিগ্বিদিক হইতে দলে দলে মৌমাছি আসিয়া তাহার সন্ধান করিয়া লয়। ঋষিকল্প ম্যাজিনীর নাম মার্শেল্ হইতে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহার সন্ধান পাইয়া ইটালী হইতে উৎসাহী যুবকবৃন্দ দলে দলে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে লাগিল। ম্যাজিনীও এই সকল যুবককে লইয়া ইটালীর উদ্ধার সাধনের জন্য একটি নূতন সমিতি স্থাপন করিলেন। এই সমিতির নাম হইল "তরুণ ইটালী" (Young Italy)। তৎপর তিনি আর একখানি নূতন সংবাদপত্র প্রচার করিলেন। উহার সাহায্যে উচ্চ ভাব ও চিন্তা ধারায় তিনি সমগ্র ইটালী প্লাবিত করিয়া তুলিলেন। এতদিন যাহারা তাঁহাকে উন্মাদ বা আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন-দর্শক বলিয়া উপহাস করিয়া আসিতেছিল, তাঁহারা এক্ষণে ম্যাজিনীর যথার্থ মূল্য অনুভব করিল। আনন্দে ও আশায় উৎফুল্ল হইয়া অনেকেই ইটালীর উদ্ধার মানসে তাঁহার সহিত যোগদান করিল। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া সাধ্যমত তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিল।

মহাপ্রাণ ম্যাজিনী আপনার কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার "তরুণ ইটালী" সমিতির মূল মন্ত্র হইল—"সাম্য, মনুষ্যত্ব ও স্বাধীনতা।" তিনি সমিতির সদস্যবর্গকে লইয়া একটি বিপ্লবী দল সৃষ্টি করিলেন। ইঁহারা প্রথমে দেশের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও রাজদ্রোহ প্রচারে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহারা সুকৌশলে ইটালীর সর্ব্বত্র নিষিদ্ধ পত্রিকা প্রচার করিতে লাগিলেন। ইউরোপের বিভিন্ন অংশেও তরুণ ইটালীর বহু শাখা সমিতি স্থাপিত হইল। এইরূপে ম্যাজিনির প্রচেষ্টায় ইটালীর কথা লইয়া সমগ্র ইউরোপে প্রবল জনমত গড়িয়া উঠিতে লাগিল। ইটালীর ব্যাপার লইয়া চারিদিকে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কিন্তু খোদ ইটালীর অভ্যন্তরে পূর্ব্বাবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন হইল না। দেশের অধিবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশার অবধি রহিল না। ম্যাজিনীর আন্দোলনের চিহ্ন পর্য্যন্ত যাহাতে ইটালীর মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, কর্ত্তৃপক্ষ তাহার জন্য কঠোর বিধান প্রবর্ত্তন করিলেন। প্রকাশ্যভাবে ম্যাজিনীর নাম গ্রহণ করিলে অথবা তাঁহার প্রশংসা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধৃত করা হইত। তাঁহার প্রচারিত পত্রিকা ইতঃপূর্ব্বেই দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু তৎসত্বেও গোপনে অনেকেই তাহা পাঠ করিত বা সযত্নে গৃহে রাখিয়া দিত। এক্ষণে ঐ পত্রিকা যাহার নিকট পাওয়া যাইত, তাহার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান হইল। "তরুণ ইটালী" পাঠ করিতেছে এই অপরাধে দেশের বহু গণ্যমান্য লোককে গুলী করিয়া মারা হইয়াছিল। একবার কয়েকজন ভদ্রলোকের শয্যাপার্শ্বে কয়েক খণ্ড "তরুণ ইটালী" লুক্কায়িত ছিল। তাঁহারা গুপ্তচর কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন। শুদ্ধ পুলিশের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদিগের প্রাণদণ্ড হইয়া গেল। এইরূপ নিষ্ঠুর অত্যাচারে সমগ্র দেশ জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। কিন্তু এত অত্যাচারেও যখন ইটালী হইতে আন্দোলন দমন হইল না, তখন কর্ত্তৃপক্ষ সকল আপদের মূল ম্যাজিনীর ধ্বংস সাধনে উদ্যত হইলেন। তাঁহাদের পরামর্শে ফরাসী-রাজ ফিলিপ ম্যাজিনীর বিরুদ্ধে নর-হত্যার এক মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিলেন। তিনি সেখানে আর থাকিতে পারিলেন না। বহু কষ্টে গোপনে পলায়ন করিয়া সুইজারল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এবং সেখানে বসিয়া তিনি পুনরায় উদ্দীপনার অনল প্রবাহে সমগ্র দেশ প্লাবিত করিতে লাগিলেন।

৩

সুইজারল্যাণ্ডে বসিয়া ম্যাজিনী যখন স্বদেশ-উদ্ধারের চেষ্টায় বিভোর, সেই সময় আর একজন মহাপুরুষ আসিয়া তাঁহার কার্য্যে যোগ দেওয়ায় দেশোদ্ধারের উদ্যম অধিকতর সহজ হইয়া উঠিল। তাঁহার নাম গ্যারিবল্ডি।

মহাপ্রাণ গ্যারিবল্ডি নীস নগরে এক নাবিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন নাবিক ছিলেন।

তিনি স্বাধীনভাবে সমুদ্র-পথে বাণিজ্যপোত পরিচালনা করিতেন। পিতার সহিত অনন্ত বারিধি মধ্যে মুক্ত আকাশে ভ্রমণ করিতে করিতে অতি বাল্যকাল হইতেই গ্যারিবল্ডির প্রাণে স্বাধীনতার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। ইটালীর দুর্দ্দশা দেখিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিত। মর্ম্মান্তিক যাতনায় তিনি অস্থির হইয়া কাঁদিয়া ফেলিতেন। অবশেষে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অন্য কোন কার্য্যে আত্মনিয়োগ না করিয়া নাবিকের ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক, সমুদ্রের অনন্ত বিশালতার মত আপনার হৃদয়ের প্রসারতা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

নাবিক-বৃত্তির কল্যাণে তিনি ইটালীর বহু প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিলেন। তীক্ষ্ণ-প্রতিভা ও অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নতার গুণে তিনি অতি অল্প দিনের মধ্যেই নৌ-বিদ্যায় বিশেষ পরিদর্শিতা লাভ করিয়া ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এক জাহাজের প্রধান পরিচালকের পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই পদে নিযুক্ত থাকার কারণে ইটালীর বহু স্বদেশ-ভক্ত আরোহীর সহিত তাঁহার কথা কহিবার সুযোগ হইয়াছিল। তিনি তাহাদের প্রমুখাৎ স্বদেশের দুর্দ্দশার কাহিনী শ্রবণ করিয়া দেশোদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ইহার কিছুদিনের পর ম্যাজিনির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে স্বদেশ সম্পর্কিত অনেক বিষয় লইয়া ভাবের আদান প্রদান হইল। ঋষিকল্প ম্যাজিনির প্রভাবে তাঁহার প্রাণে আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। সেই দিন হইতে তিনি দেশোদ্ধারকে স্বীয় জীবনের ব্রত বলিয়া মনে করিলেন।

এইরূপে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইল। তৎপর গ্যারিবল্ডি সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ম্যাজিনির সহিত মিলিত হইলেন। ম্যাজিনি স্বদেশ উদ্ধারের জন্য পূর্ব্ব হইতেই সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন,—এক্ষণে উভয়ে মিলিত হইয়া ইটালী আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এবং ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা সত্য সত্যই যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তাঁহাদের দলস্থ কতকগুলি লোক বিশ্বাসঘাতকতা করায় তাঁহারা শোচনীয় রূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। গ্যারিবল্ডি ও ম্যাজিনির উপর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল, কিন্তু তাঁহারা বহু কষ্টে আত্ম-রক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

গ্যারিবল্ডি পুনরায় নাবিকের পদ গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ আমেরিকা গমন করিলেন। সেই সময় আমেরিকায় আর্জ্জেন্টাইন প্রদেশের সহিত উরুগয়ে সাধারণ-তন্ত্রের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ চলিতেছিল। গ্যারিবল্ডি সুযোগ বুঝিয়া উরুগয়ে সাধারণ-তন্ত্রের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক আর্জ্জেন্টাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধে গ্যারিবল্ডির অসাধারণ বীরত্ব ও রণ-কৌশল দেখিয়া উরুগয়ে দেশবাসী তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িল। তাহারা তাঁহাকে সামরিক উচ্চপদ প্রদান করিয়া তাঁহার যথোচিত সম্মান করিল; এবং তাঁহার স্বদেশের পরাধীনতার কথা শুনিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যথেচ্ছভাবে সৈন্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। এদিকে ইটালীতে অত্যাচারের মাত্রা অতি ভয়ানক ভাবে বাড়িয়া উঠিল! হতভাগ্য প্রজাগণ রাজপুরুষের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িল। ফলে তাহারা ভয়ানক উত্তেজিত হইল এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ইটালীর শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। মহাতেজা গ্যারিবল্ডি এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি আমেরিকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক মহা উৎসাহে বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করিলেন। কয়েকস্থানে খণ্ড যুদ্ধ হইল। ইহাতে গ্যারিবল্ডি যে অত্যদ্ভুত রণ-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া বিপক্ষ স্তম্ভিত হইয়া গেল। গ্যারিবল্ডি যে দুর্ব্বল-হস্তে অসি-ধারণ করেন নাই তাহা তাহারা বেশ বুঝিল। যে জঘন্য কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক বিপক্ষ লোককে সপক্ষে আনয়ন করা হয় অষ্ট্রীয়ার রাজপুরুষগণ সেইরূপ কৌশল দ্বারা গ্যারিবল্ডির পক্ষীয় বহু লোককে স্বপক্ষে টানিয়া আনিলেন। ইহাতে গ্যারিবল্ডি হতোদ্যম হইলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার শক্তি অনেকাংশে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। ইহার পর ভেলেট্রির যুদ্ধ। এই যুদ্ধে তিনি গুরুতররূপে আহত হইলেন। তথাপি তিনি মাসাধিক কাল বিপক্ষের সৈন্যের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দলে দলে অষ্ট্রীয়া ও ফরাসী সৈন্য উপস্থিত হইয়া তাঁহার উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিল। সুতরাং তিনি আর টিকিতে পারিলেন না, অবিলম্বে ইটালী পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় আমেরিকা গমন করিলেন। স্বদেশ পরিত্যাগের সময় তাঁহার একান্ত অনুরক্ত তিনসহস্র

সৈন্য কিছুতেই তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না, তাহারা তাঁহার সঙ্গে গমন করিল। তিনি তাহাদিগকে লইয়া পেরু রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তথাকার গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সৈন্য দলের অধিনায়ক নিযুক্ত করিলেন।

উক্ত যুদ্ধের অবসানের পর অত্যাচার-নিগ্রহ মূর্ত্তিমান হইয়া ইটালীর অধিবাসীদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। প্রজাগণ যদি অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে মস্তকোত্তোলন করিয়া কৃতকার্য্য না হইতে পারে, তাহা হইলে তাঁহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। ইটালীর অধিবাসী এই প্রকার অত্যাচারের পীড়নে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। সেই অত্যাচারের ফলে সম্ভ্রান্ত বংশীয় বহু ব্যক্তি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে গমন পূর্ব্বক, হীন বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। কত ভদ্রসন্তান মুটের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ ক্ষৌরকার হইলেন। কেহ মাথায় করিয়া তরিতরকারি অথবা অপরাপর দ্রব্যাদি লইয়া রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করিয়া জীবিকার সংস্থান করিতেন। তাঁহারা পরাধীনতার স্বর্ণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকার চেয়ে মুটেগিরিকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

এইরূপে আরও কিছুদিন অতিবাহিত হইল। ইটালীর উপর আরও দশ বৎসরের প্রবল ঝঞ্ঝা অতি নির্ম্মম ভাবে বহিয়া গেল। এই কয়েক বৎসর ইটালীবাসী কি কষ্টে অতিবাহিত করিয়াছে তাহা বর্ণনা করিলে বুঝিবা পাষাণও বিগলিত হইয়া যায়। কিন্তু তাহাদের সুদিন আসিতেও আর দেরী হইল না। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ইটালীর অধিবাসিগণ পুনরায় রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে মস্তকোত্তোলন করিল। কিন্তু উপযুক্ত নেতার অভাবে তাহারা বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। এই সময় ক্যাপ্রে দ্বীপে মহাপ্রাণ গ্যারিবল্ডি কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবন যাপন করিতেছিলেন। বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া প্রজাদের কতিপয় প্রতিনিধি তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক আপনাদের দুরবস্থার বিবর জ্ঞাপন করিল এবং অতি কাতর ভাবে কহিল, "আপনি ফিরিয়া আসিয়া আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন, নতুবা আমাদের পরিত্রাণ নাই।" স্বদেশপ্রাণ গ্যারিবল্ডি স্বদেশের দুঃখের কথা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, যুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার বীর প্রাণ নাচিয়া উঠিল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া একটি বিরাট সৈন্যদল গঠন পূর্ব্বক সিসিলিতে উপস্থিত হইয়া ইটালীর বিদেশী শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলেন।

পুনঃ পুনঃ পরাজিত, লাঞ্ছিত ও গৃহতাড়িত হইয়াও গ্যারিবল্ডির হৃদয় যে ভাঙ্গিয়া যায় নাই, তাহা এই যুদ্ধে বেশ বুঝা গেল। তিনি যেন আসরিক শক্তি সংগ্রহ করিয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। সর্ব্বত্র বিজয়ের চিহ্নসূচিত হইল। শত্রুপক্ষ তাঁহার দুর্ব্বার আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া সর্ব্বত্র পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। "কালটাফিসি" নামক স্থানে যে একটা খণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে গ্যারিবল্ডির মুষ্টিমেয় সৈন্যের নিকট শত্রুপক্ষীয় বহু সৈন্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। "মেলাৎসরে" পুনরায় যুদ্ধ হইল। ইহাতেও বিপক্ষের সাত হাজার সৈন্য ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল। এতদিন যে সকল সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি প্রাণ-ভয়ে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতে পারে নাই, এক্ষণে তাহারা তাঁহার এইরূপ অসম্ভাবিত বিজয় দেখিয়া নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার সহিত যোগদান করিল। এইরূপে প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য তাঁহার পতাকার তলে সমবেত হইল। এই অগণিত সৈন্য লইয়া শত্রু বিতাড়িত করিতে করিতে গ্যারিবল্ডি মহোল্লাসে নেপল্‌স্ নগরে প্রবেশ করিলেন।

নেপল্‌স্ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ইটালীর উদ্ধার সূচিত হইয়া গেল। নেপল্‌স্ জয়ের পর ইটালীর সর্ব্বত্র গ্যারিবল্ডির প্রতি সহানুভূতি ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। মহা উৎসাহে মত্ত হইয়া দেশের শত শত স্বেচ্ছাসেবক প্রত্যহ তাঁহার সহিত মিলিত হইতে লাগিল। তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য কেপুয়া নামক স্থানে শত্রু পক্ষ তাঁহাকে পুনরায় প্রবল বিক্রমে আক্রমণ করিল। কিন্তু গ্যারিবল্ডি অসাধারণ রণ-কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক শত্রুর অগণিত সৈন্য পরাস্ত করিয়া তাহাদের সকল আশা চূর্ণ করিয়া দিলেন। কেপুয়ার এই যুদ্ধ ইটালীর ভাগ্য নির্ণয় করিল। অষ্ট্রীয়া পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল,—ইটালীর উপর নূতন ভাবে আর আক্রমণ করে নাই। এই যুদ্ধের পর ইটালী অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিল।

৪

স্বদেশের উদ্ধার-সাধন করিয়া গ্যারিবল্ডী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে

সার্ডিনিয়ার রাজাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইঁহারই নাম ভিক্টর ইমানুয়েল। ইনি ইটালীর ভূতপূর্ব্ব রাজবংশেরই একজন। ইঁহারই হস্তে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং দূরপল্লীতে গমন পূর্ব্বক কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ইটালীর সম্রাট নির্ব্বাচনের সময় গ্যারিবল্ডি ও ম্যাজিনীর মধ্যে একটু মতবিরোধ ঘটিয়াছিল। ম্যাজিনী গণ-তন্ত্রের পক্ষপাতী— তাঁহার আশা ছিল, তাঁহার আবাল্যপোষিত সাধারণ-তন্ত্র ইটালীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগৎকে গণ-তন্ত্রের প্রকৃত আদর্শ দেখাইবেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডি রাজ-তন্ত্রীর পক্ষপাতী ছিলেন। সেই জন্য তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে ইমানুয়েলকে রাজপদ প্রদান করা হইল। গ্যারিবল্ডির এই অপূর্ব্ব ত্যাগ জগতের ইতিহাসে দুর্লভ।

ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্ডি স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া অনেকদিন হইল ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আজিও সহস্র সহস্র কণ্ঠ হইতে তাঁহাদের যশোগানে গগন পবন মুখরিত হইতেছে। পৃথিবীতে যতদিন স্বাধীনতার সমাদার থাকিবে, অত্যাচারিত মানবকে যতদিন স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হইবে ততদিন তাঁহাদের নাম জগৎ বিস্মৃত হইবে না। তাঁহারা যে ভাবে, যে আদর্শে ও যেরূপ ত্যাগ স্বীকার দ্বারা স্বদেশের স্বাধীনতা আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যেক জাতির অনুকরণ করিবার যোগ্য।

ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্ডি উভয়েই ইটালীর জাতীয় জীবনের ধ্রুবতারা স্বরূপ ছিলেন। সমালোচকগণ তাঁহাদের উভয়ের চরিত্র এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

তাঁহারা দুইজনে দুই উপাদানে গঠিত। দুইজনে দুই প্রকার শক্তিতে শক্তিমান! একজন জ্ঞানবীর, অন্যজন কর্ম্মবীর। ম্যাজিনি মানুষকে মনুষ্যত্ব দিতে চাহিয়াছিলেন, আর গ্যারিবল্ডি সেই মনুষ্যত্বের কার্য্যকারিতা দেখাইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের সংযোগে ইটালী অতি আশ্চর্য্যভাবে স্বাধীন হইয়া গেল। ইটালীকে উদ্ধার করিতে হইবে এই ভাব যেদিন সর্ব্বপ্রথম ম্যাজিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেদিন অনেকেই তাঁহার কথায় হাসিয়াছিল! এত অত্যাচার, এত নিষ্পেষণ ও এত কঠোরতার মধ্যে ইটালী কিরূপে যে স্বাধীন হইবে, তাহা কেহই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই। কিন্তু এই পরাধীন ইটালী যখন স্বাধীন হইল, তখন সমগ্র জগৎ চমকিত হইয়া দেখিল, শত বাধা সত্ত্বেও স্বাধীনতা-প্রয়াসী জাতিকে কেহ পদানত রাখিতে পারে না। স্বাধীনতা লাভের পর ইটালীর অবস্থার কত দূর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমানের ক্ষমতাদৃপ্ত ইটালীর প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে। অষ্ট্রীয়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইয়া ইটালী হইতে স্বেচ্ছাচারিতা একেবারেই দূর হইল। রাজা প্রজাদের লইয়া শাসন পরিষদ গঠন করিলেন। প্রজার ইচ্ছায় রাজ্য-শাসন হইতে লাগিল। রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে প্রজারা অনেক অধিকার পাইল। শাসন কার্য্যে প্রজার অধিকার হইলেই দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয়। তাই অমৃতোপম স্বাধীনতার ফলে ইটালী আজ ইউরোপের মধ্যে অন্যতম প্রধান শক্তি! ইটালীর প্রধান নেতা মুসোলিনির নাম আজ লোকের মুখে মুখে কীর্ত্তিত হইতেছে!

আমারে করো'না ক্ষমা

শামসুলহুদা

আমারে করোনা ক্ষমা যদি কোনদিন
তোমার চলার পথে হেনে থাকি' বাধা ;
কামনা-পঙ্কিল পথে চলি দ্বিধাহীন
তোমার সুবাস মাঝে ছিঁটায়েছি কাদা।—

সুখী তুমি, সুখ নিত্য তোমাতে বিরাজে,—
আমি দুঃখী, কভু যদি মোর দুঃখ দিয়া
কণ্টক রচিয়া থাকি তব পথমাঝে,
করুণা করোনা মোরে, ক্ষমিয়োনা, প্রিয়া।

আমি জানি কিছু নাই মোর অপরাধ ;
তোমারে যে ভালোবাসি অতি প্রাণ-পণ—
তব প্রেম ফিরে পাব ছিলো মনে সাধ
সে হেতু কেঁদেছি তব দ্বারে অনুক্ষণ।

তাতে যদি হয়ে থাকে কোন অকল্যাণ—
প্রেম যদি করে' থাকে মোরে অপরাধী,
ধন্য হবে ভালোবাসা-দুঃখ-দগ্ধ-প্রাণ
ধন্য হবে এজীবন তোমা লাগি কাঁদি।

সন্ধি

শাহাদাৎ হোসেন

১

আকাশস্পর্শী আরাবল্লীর পাদমূলে ঝরণার পাশে দাঁড়াইয়া দুইটী বালক বালিকা। বালকের বয়স দশের অনধিক, বালিকা ত্রয়োদশী—কিশোরী।

দীপ্ত দ্বিপ্রহর। খর রৌদ্রে ঝলসিতা প্রকৃতি অগ্নিশ্বাসে ধুঁকিয়া মরিতেছে। আকাশে বাতাসে তরল জ্বালা. তীব্র দাহে দিগ্বধূর কম্র মুখে তাম্র দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বালক, বালিকাকে গৃহে ফিরিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তাহার কাপড় ধরিয়া টানিল, হাত ধরিয়া হেঁচকা দিল। বালিকা তবু নড়িল না। কিন্তু বালক নিরস্ত হইবার নয়। তাহার পীড়াপীড়ি উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। বালিকা বিরক্ত হইয়া ধমক দিল। অভিমানে বালকের মুখখানি ভার হইল, চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে বালিকার অন্তরের বিরক্তি গলিয়া জল হইয়া গেল। সস্নেহে বালককে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল, লক্ষ্মীটী আমার—কেঁদোনা—একটুখানি দাঁড়াও। এক্ষুণি তোমায় নিয়ে যাব' এখন।

অভিমানী বালক চোখ মুছিতে মুছিতে অনুযোগের সুরে বলিল, আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি!

বালিকার সারা মুখখানি সহসা ব্যথায় করুণ হইয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত্ত মুখে কথা ফুটিল না। একটু পরে যেন জোর করিয়া নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, আমাকে একটু জল খেতে দেবে না ভাই! একটু দাঁড়াও—এক ঢোঁক জল খেয়ে নিই।

সে এক পদ অগ্রসর হইয়া অঞ্জলি ভরিয়া ঝরণার জল পান করিল, কিন্তু এক ঢোঁক নয়,—যতক্ষণ পারিল, অঞ্জলির পর অঞ্জলি ভরিয়া আকণ্ঠ জল পান করিল। তাহার পর বেশ যেন একটু সবল হইয়া প্রফুল্ল মুখে বালকের হাত ধরিয়া বলিল, চলো।

উভয়ে পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

২

মোগল-সম্রাট আকবর চিতোর অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। পরাজিত হৃতরাজ্য রাণা প্রতাপ আরাবল্লীর দুর্গম পাদমূলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সঙ্গে স্ত্রী রাণী, কন্যা অশ্রুমতী, পুত্র অমরসিংহ এবং চল্লিশজন বিশ্বস্ত প্রভুভক্ত অনুচর। উদ্দেশ্য—সংগোপনে শক্তি-সঞ্চয় করিয়া প্রাণাধিক জন্মভূমি চিতোরের পুনরুদ্ধার সাধন করিবেন। এই মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি সর্ব্বস্ব—স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এমন কি নিজের জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া বসিয়াছেন। সংসারে এমন কোন কঠোরতা বা ত্যাগ তপস্যা নাই—এই অভীপ্সিত মহাকার্য্যের জন্য যাহা তিনি বরণ করিতে না পারেন। অনাহারে অনিদ্রায় দুর্ব্বিসহ শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ সহ্য করিয়া তিনি এই কঠোর ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। চোখের সম্মুখে প্রাণের প্রাণ পুত্র অন্নাভাবে মূর্চ্ছিত, নয়ন-পুত্তলী কন্যা অর্দ্ধমৃত, রাজরাজেশ্বরী সহধর্ম্মিণী অসহ কঠোর ব্রতের কঙ্কাল প্রতিচ্ছবি,—তথাপি সঙ্কল্পে অটল, কৃচ্ছ্র সাধনার

মহাযোগী তিনি, জীবনের মহাব্রতকে দৃঢ়রূপে আঁকড়িয়া ধরিয়া মহা-সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছেন।

সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ঈষৎ ঢলিয়া পড়িয়াছে। পরিশ্রান্ত ক্লান্ত মহারাণা কুটীর সম্মুখে ফিরিয়া অজিনাসনে স্তব্ধ হইয়া বসিলেন। স্বভাব-গম্ভীর শৌর্য্যদীপ্ত মুখমণ্ডল বিষাদের গাঢ়চ্ছায়ায় পরিম্লান। উৎকণ্ঠিত স্বরে রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সংবাদ!

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া রাণা উত্তর করিলেন, সংবাদ বড়ই অশুভ।—মোগল আমাদের সন্ধান পেয়েছে। শীঘ্রই তারা আরাবল্লীমুখে অভিযান কোরবে বোলে প্রস্তুত হোচ্ছে।

রাণীর উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহোলে এখন কি কোর্‌বে?

—তা-ই ভাব্‌ছি। নিকটে আশ্রয়ের উপযুক্ত স্থানও নেই। অথচ এখানে থেকে মোগলের সম্মুখীন হওয়ার মত শক্তিও নেই।

রাণী স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহারও মুখে চিন্তার গভীর ছায়া ঘনাইয়া আসিল। ঠিক সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত বালক-বালিকা ক্লান্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সেই খানে আসিয়া দেখা দিল। ইহারা অমরসিংহ ও অশ্রুমতী।

রাণা ও রাণী উভয়েই মুখ তুলিয়া চাহিলেন। পুত্র-কন্যার মুখের পানে চাহিয়া তাঁহাদের হারানো বাহ্যজ্ঞান যেন আবার ফিরিয়া আসিল।

অমর দুই বাহুতে জননীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল, খেতে দাওনা মা, ক্ষিদে পেয়েছে যে!

রাণী পুত্রের মুখের পানে চাহিলেন। রাণাও চাহিলেন। উভয়েরই দৃষ্টি করুণ বেদনায় ছল-ছল।

অশ্রুমতী সে-দৃষ্টির অর্থ বুঝিল। অমরের বাহু-বেষ্টন হইতে জননীকে মুক্ত করিয়া বলিল, চল খাবে—চল।

বালক উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অশ্রুমতী তাহার হাত ধরিয়া কুটীর-মধ্যে প্রবেশ করিল।

ঘরে আহার্য্য নাই, কাজেই কোন বন্দোবস্তও হয় নাই। অমরের কথায় পিতার মাতার মনে যে দুঃখ-বেদনার অতল সিন্ধু দুলিয়া উঠিয়াছে, অশ্রুমতী তাহা বুঝিয়াছিল, তাই আর সেখানে নূতন করিয়া ঝড়ের সৃষ্টি না করিয়া সে অমরকে দূরে সরাইয়া লইয়া গেল।

কন্যার মনোভাব বুঝিতে পিতামাতারও বাকী রহিল না। অসহ বেদনায় তাঁহাদের চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত দুইজনেই নীরব। অবশেষে রাণা গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন, রাণি!

রাণী বিস্ফারিত দৃষ্টি তুলিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিলেন। রাণা আবার বলিলেন, রাণি! আমি সন্ধি কোর্‌বো।

রাণী উত্তর দিলেন না, বুঝি দিতে পারিলেন না। পূর্ব্ববৎ রাণার মুখের পানে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। এমন কথা আর কোনদিনই তিনি স্বামীর মুখে শুনেন নাই। বুঝি শুনিবার কল্পনাও কখনো করেন নাই। কাজেই তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। অবশ্য কেন যে এই অসঙ্গত বাণী রাণার মুখ হইতে নির্গত হইল, তাহা বুঝিতে তাঁহার আদৌ বিলম্ব হইল না। কিন্তু আজ ত নূতন করিয়া এ-'কেন'র উদ্ভব হয় নাই, রাজ্য হারাইয়া পথচারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ত এ-ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক হইয়াছে। এমন দিনও ত গিয়াছে—যেদিন ক্ষুধার তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া অমর মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলায় লুটাইয়াছে, 'অশ্রু' উত্থানশক্তি রহিত হইয়া এলাইয়া পড়িয়াছে; সেদিনও ত রাণার মুখ দিয়া এমন কথা বাহির হয় নাই। কিন্তু আজ?—তবে সত্যই কি এতদিন পরে হিমালয় টলিল? কথাটা তাঁহার নিকট একটা দুর্ব্বোধ রহস্য বলিয়া মনে হইল।

কিন্তু রহস্যের মায়াবরণ শীঘ্রই অপসারিত হইল। রাণা বলিতে লাগিলেন, আমি অনেক সহ্য কোরেছি রাণি, কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে। আর পারি না। অদম্য উদ্যম, দুর্ব্বার অধ্যবসায় নিয়ে সারা জীবন আমি লড়ে' এসেছি—কারণ, তখন আশা ছিল, ভরসা ছিল—চিতোরের যাহোক একটা কিনারা কোর্‌বো। কিন্তু এখন সে-আশা, সে-ভরসা আকাশ-কুসুমের মত মিলিয়ে গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সে উদ্যম, অধ্যবসায়ও অন্তর্হিত হোয়েছে, তবে আর সহ্য কোর্‌বো কিসের বলে? সহ্য করবার সে প্রেরণা আর আমার মধ্যে নেই, আমি পার্‌বো না, আমি সন্ধি কোর্‌বো।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া রাণী কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় চঞ্চল আনন্দ-নৃত্যে কুটীর

হইতে বাহির হইয়া অমর তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। মুখের উপর মুখ রাখিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, দিদি আজ খুব কোরে পেট ভরে' খাইয়ে দিয়েছে। রাত্তিরে আর কিচ্ছু খেতে হবে না। হ্যাঁমা, এত খাবার দিদি কোথায় পেলে ?

অবোধ শিশু বুঝিল না, এ-রহস্য তাহারই মত মাতারও অজ্ঞাত।

অমরের কথায় মাতা-পিতা উভয়েই বিস্মিত হইয়া তাহার মুখপানে চাহিলেন। আহার্য্য যাহা কিছু ছিল, রাত্রিতে সমস্তই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, তবে কেমন করিয়া অশ্রু ইহাকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দিল। ঘটনাটা তাঁহাদের কাছে একটা মস্ত হেঁয়ালীর মত বোধ হইল। পুত্রের কথার কোন উত্তরই তাঁহারা দিতে পারিলেন না।

কিন্তু উত্তর পাওয়া না পাওয়ার জন্য অমরের অত মাথা ব্যথা ছিল না। উপস্থিত প্রয়োজন শেষ হইয়াছে, অনর্থক বোবার মত বসিয়া থাকা তাহার আর সহ্য হইল না। তাই জননীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া নাচিতে নাচিতে সে কুটীর সীমান্ত ছাড়াইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

রাণা গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিলেন, রাণি !

—কি !

—'অশ্রু'কে একবার ডাক ত'।

—কেন ?

—আমার বোধ হয় কাল রাত্রি থেকে সে অনাহারে আছে। আজকের উপবাস অনিবার্য্য জেনে নিজে অনাহারে থেকে বোধ হয় সে অমরের জন্য এই খাবার লুকিয়ে রেখেছিল।

একাজ অশ্রুমতীর পক্ষে যে আদৌ অসম্ভব নয়, রাণী তাহা বুঝিলেন। তাঁহার মনটা সন্দেহ-দোলায় দুলিয়া উঠিল। ডাকিলেন, 'অশ্রু' !

কিন্তু উত্তর আসিল না। আবার ডাকিলেন। উত্তরের প্রত্যাশায় কিছুক্ষণ অপেক্ষাও করিলেন। তথাপি উত্তর মিলিল না। উদ্বিগ্ন চিত্তে রাণী কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

রাণা যাহা সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক। রাত্রি হইতেই অশ্রুমতী অনাহারে আছে। তাহাকে যে আহার্য্য দেওয়া হইয়াছিল, তাহা না খাইয়া সত্যই সে অমরের জন্য সযত্নে রক্ষা করিয়াছিল। কারণ, সে নিশ্চিত বুঝিয়াছিল, কাল সপরিবারে উপবাস ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু অমর ত উপবাসের ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবে না, ক্ষুদ্র বালক ক্ষুধায় কাতর হইয়া সর্ব্বাগ্রে তাহারই কাছে আসিয়া যে খাইতে চাহিবে। তাহার সেই ম্লান মুখ, কাতর কণ্ঠস্বর কল্পনা করিয়া ভ্রাতৃগতপ্রাণা ভগিনীর প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, আহার্য্য মুখে তুলিতে গিয়াও পারে নাই। তাই দুঃসহ ক্ষুধার ক্লেশ সহ্য করিয়াও সমস্ত খাদ্যই সে অমরের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিল। পাছে পিতা-মাতা তাহার এই অনাহারের কথা জানিতে পারেন, এই ভয়ে তাঁহাদের সম্মুখে সে কিছুমাত্র ব্যাকুলতা প্রকাশ করে নাই বা গৃহে একবিন্দু জলও গ্রহণ করে নাই। দ্বিপ্রহরে ক্ষুধার তাড়না একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই সে ঝরণার জলে পেট ভরিয়া আসিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, ইহাতেই কোনও প্রকারে আজিকার দিনটা কাটাইয়া দিবে।

রাণী কুটীর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন 'অশ্রু' নির্জ্জীবের মত ভূমিতে লুটাইয়া আছে। তাঁহার বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ডাকিলেন, 'অশ্রু' !

অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকণ্ঠে অশ্রুমতী উত্তর দিল, মা !

রাণী কন্যার শিয়রে বসিয়া তাহার মাথাটা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া মুখের উপর মুখ রাখিয়া পুনরায় ডাকিলেন 'অশ্রু'—মা !

অশ্রুমতী চক্ষু মেলিয়া চাহিল।

রাণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, বড় কি ক্ষিদে পেয়েছে মা !

কন্যার মুখে শুষ্ক হাসির একটা ম্লান দীপ্তি ক্ষণিকের জন্য ফুটিয়া উঠিল। সে উত্তর দিল, না মা, আমার একটুও ক্ষিদে পায়নি।

—তবে অমন কোরে আছ কেন মা !

—আমার অসুখ কোরছে।

রাণী নীরবে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, অমর কি খেয়ে গেল ?

অশ্রুমতী চুপ করিয়া রহিল। রাণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, বল মা, তাকে কি খেতে দিলে ?

একটু যেন ভয়ে-ভয়ে অশ্রুমতী বলিল, কাল থেকে

আমার অসুখ-অসুখ কোর্‌ছিল, তাই কিছু খেতে পারিনি, সেই খাবার ছিল, তাই অমরকে খাইয়ে দিয়েছি।

রাণীর দুই চক্ষু বাহিয়া দরদর ধারে অশ্রু নামিয়া আসিল।

এদিকে রাণীর বিলম্ব দেখিয়া রাণা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। স্থির থাকিতে না পারিয়া প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য তিনি কুটীর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনতিবিলম্বে সমস্ত রহস্যই প্রকাশ হইয়া পড়িল। একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া রাণা বলিলেন, সাধে কি সন্ধির কথা তুলেছিলাম রাণী! এ দৃশ্য যে আর—

বলিতে বলিতে সহসা যেন রাণার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিনি অর্দ্ধপথেই থামিয়া গেলেন।

রাণী কোন কথা না বলিয়া নীরবে কন্যার চোখে মুখে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া রাণা হঠাৎ যেন উন্মাদের মত বলিয়া উঠিলেন, আমি চল্লুম রাণী, যতক্ষণ না ফিরি একে ধোরে রেখো—মোর্‌তে দিও না। আমি খাবার আন্‌তে চোল্লুম—খাবার আন্‌তে চোল্লুম।

রাণা দ্রুতবেগে কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। রাণী অর্দ্ধোন্মাদ স্বামীর গন্তব্য পথের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হইল না।

৩

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে অশ্রুমতী একটু যেন সুস্থ হইয়া উঠিল। অবসন্নতা কাটিয়া যাওয়ায় সে উঠিয়া বসিল। রাণীরও বুকের উপর হইতে যেন একটা গুরুতর পাষাণ-ভার নামিয়া গেল। তিনি শোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

এতক্ষণ অনন্যচিত্তা হইয়া তিনি কন্যার শিয়রে বসিয়া তাহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। স্বামী কোথায় গেলেন, কি করিলেন, ফিরিয়া আসিলেন কিনা, এ চিন্তার অবসর তাঁহার আদৌ হয় নাই। এখন কন্যাকে একটু সুস্থ দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার স্বামীর কথা মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু কি করিবেন, কেমন করিয়া খোঁজ লইবেন, নিকটে তেমন কেহ নাই যে, তাহাকে ডাকিয়া খোঁজ করিতে বলিবেন। এক উদ্বেগ না যাইতে দ্বিতীয় উদ্বেগ আসিয়া তাঁহার মনকে অস্থির করিয়া তুলিল।

এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, মা!

রাণী উৎকর্ণ হইলেন।

আবার সেই কণ্ঠস্বর!

'ব্যস্ত-সমস্ত' ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইতেই রাণী দেখিলেন, সম্মুখে বলবন্ত সিংহ। তাহার হাতে ভূর্জ্জপত্রে খাদ্য-সামগ্রী। বিনীত স্বরে বলিল, মা, খুকুমণির খাবার।

আনন্দে কৃতজ্ঞতায় রাণীর সমগ্র অন্তর্দ্দেশ ভরিয়া উঠিল। কয়েকমুহূর্ত্ত তাঁহার মুখে কথা ফুটিল না। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাণা কোথায়?

—তা'ত জানি না মা! তবে মনে হয় তিনিও আহার্য্য সংগ্রহে বেরিয়েছেন।

—তুমি যে আহার্য্য এনেছ, তা' কি তিনি জানেন না?

—না মা, তা কেমন কোরে জান্‌বেন। দেখ্‌লুম পাগলের মত তিনি অ-পথ বি-পথ ভেঙে চোলেছেন। জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লুম, খুকুমণি দু'দিন অনাহারে, কথা কইবার শক্তি নাই, তাই তাঁর জন্য আহার্য্য সংগ্রহে চোলেছেন।

—তুমি তাঁকে ফিরালে না কেন?

—কেমন কোরে ফিরাব মা! আমার কাছে ত আহার্য্য মজুদ ছিল না। তা' যদি থাক্‌তো, তা হোলে আর আমি তাঁকে যেতে দিতুম না। তিনি চোলে যেতে ভাব্‌লুম, কি জানি তিনি সংগ্রহ কোর্‌তে পারেন কি না পারেন তার ত ঠিক নাই, যদি বিফল হ'ন, তা হোলে ত সর্ব্বনাশ হবে। সাত পাঁচ ভেবে তখন নিজেই বেরিয়ে পোড়লুম। শেষ পর্য্যন্ত ভগবান মুখ রেখেছেন মা! ভীল-পাড়ার ভিতর থেকে তিনি এই খাবারটুকু মিলিয়ে দিয়েছেন।

—বলবন্ত! তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবার ভাষা আমার নেই। এ সুকৃতির পুরস্কার স্বয়ং ভগবানই তোমায় দেবেন। এখন যাও বাপ, এতই যদি কোরেছ, তবে আর শেষটুকু বাকী থাকে কেন? তোমার রাণাকে খুঁজে এনে দাও। মেয়ের অবস্থা দেখে তিনি পাগলের মত ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছেন। লক্ষ্যহারা দিক্-ভ্রান্তের মত এতক্ষণ কোথায় কি কোর্‌ছেন, কার দ্বারে গিয়ে হাত পাতছেন,—কিছুই বুঝতে পার্‌ছি না। চার-দিকে শত্রু, এর ভিতর—

বাধা দিয়া বলবন্ত বলিল, আর বোল্‌তে হবে না মা, আমি এখুনি যাচ্ছি। যেখান থেকে পারি, তাঁকে খুঁজে আন্‌ছি।

দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা না করিয়া বলবন্ত দ্রুতবেগে কুটীর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাণী কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহার মন নিরতিশয় উচাটন হইয়া উঠিল। চারিদিকে শত্রুর চর ঘুরিতেছে। নিঃসহায় একক স্বামী উন্মাদের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। যদি কোনও প্রকারে—

অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাঁহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি পত্রসমেত খাদ্যসামগ্রী অশ্রুমতীর সম্মুখে ধরিয়া দিয়া তিনি নিজেও ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

অসহ্য ক্ষুধার ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া অশ্রুমতীর সর্ব্বশরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। মাঝে মাঝে চক্ষু আঁধার হইয়া আসিতেছিল। অতি কষ্টে সোজা হইয়া বসিয়া সে আহার্য্যগুলি কোলের কাছে টানিয়া লইল।

ঠিক সেই সময়ে বাহিরে অপরিচিত কণ্ঠের স্বর শোনা গেল। অশ্রুমতী উৎকর্ণ হইল। আবার সেই স্বর। অশ্রুমতী বুঝিল, অতিথি। তাহার আর আহার হইল না। কোন প্রকারে উঠিয়া অজিন আসনখানি হাতে লইয়া বাহিরে আসিল। এবং যথারীতি অতিথির সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাহাকে বসিতে দিল।

অতিথি আসন গ্রহণ করিয়া দুই একটা প্রশ্নে অশ্রুমতীর পরিচয় জানিয়া লইল। উপস্থিত তাহার পিতামাতা যে গৃহে নাই, ইহাও জানিতে তাহার বাকী রহিল না।

প্রশ্নোত্তর শেষ হইলে অতিথি জানাইল, সে ক্ষুধার্ত্ত। সমস্ত দিন তাহার আহার হয় নাই।

অশ্রুমতী টলিতে টলিতে কুটীর মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিল এবং তাহার জীবন রক্ষার একমাত্র উপায় আহার্য্য সামগ্রীগুলি আনিয়া অতিথির সম্মুখে ধরিয়া দিল।

অতিথি আহারে বসিল। অশ্রুমতী গৃহের ভিতর যাইবার জন্য এক পা' এক পা' করিয়া অগ্রসর হইল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পারিয়া উঠিল না। দরজা পর্য্যন্ত যাইয়াই অতি-শ্রান্তিতে সে বসিয়া পড়িল এবং পরক্ষণে সেইখানেই লুটাইয়া পড়িল।

অতিথি আহারে বসিলেও এদিকে তাহার লক্ষ্য ছিল। হঠাৎ অশ্রুমতীকে লুটাইয়া পড়িতে দেখিয়া সে আহার ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

—'অশ্রু'!

সহসা উদাত্ত আকুল কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল—'অশ্রু'!

বিস্মিত অতিথি বিস্ফারিত দৃষ্টি তুলিয়া সম্মুখে চাহিল। দেখিল, দীর্ঘ গুম্ফশ্মশ্রুশোভিত এক বিরাট পুরুষ। হস্তে ভূর্জ্জপাত্রে আহার্য্য বস্তু। প্রথম দৃষ্টিতেই অতিথি মহারাণা প্রতাপকে চিনিল। শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে তাহার মনটা যেন নত হইয়া আসিল।

রাণা কিন্তু অতিথিকে লক্ষ্য করিলেন না। দ্রুতপদে কুটীরের দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়াই তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। এ কি! অশ্রু! এখানে! এমন অবস্থায়! তাঁহার বুক ফাটিয়া কান্না জাগিল। গভীর আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিলেন, অশ্রু—মা আমার!—

কোথায় অশ্রু? কে উত্তর দিবে? শৈল প্রকৃতির পাষাণ-বুকে যে আর্ত্তস্বর প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

* * * *

সন্ধ্যার ছায়া তখন নিবিড় হইয়া আসিয়াছে। স্তব্ধ শোকাহত মহারাণা কন্যার শব-পার্শ্বে বসিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। অতিথি কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া পশ্চাৎ হইতে আর্দ্র গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিল, মহারাণা!

মহারাণা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। দৃষ্টি করুণ—সজল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার দুই চক্ষু অস্বাভাবিকরূপে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। অতিমাত্র বিস্ময়ে তিনি অভিভূতের মত বলিয়া উঠিলেন, সম্রাট!

উত্তর হইল, আর সম্রাট নই—অতিথি। মহারাণা, এ দৈবের নির্ব্বন্ধ—খণ্ডন করবার উপায় নাই। অতিথির ছদ্মবেশ ধোরে আমিই এই সোনার প্রতিমাকে অকালে মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়েছি, বুঝ্‌তে পারিনি যে এ অভুক্ত ছিল। মহারাণা, আমার প্রায়শ্চিত্ত?

মহারাণার বক্ষ ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস উঠিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি গভীর কণ্ঠে ডাকিলেন, সম্রাট!—

বাধা দিয়া সম্রাট বলিলেন, বোলেছি ত ভাই, আর আমি সম্রাট নই—অতিথি। ও সম্বোধনে আর আমায় লজ্জা দেবেন না।

মহারাণা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, উত্তম—আসন গ্রহণ করুন।

—কোরবো, কিন্তু তার পূর্ব্বে আমি একটা প্রতিশ্রুতি চাই।

আর একবার মহারাণা প্রতাপের বিস্মিত-দৃষ্টি সম্রাট আকবরের মুখের উপর নিবদ্ধ হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, কি প্রতিশ্রুতি?

—প্রতিশ্রুতি চাই যে—আপনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কোর্‌বেন।

প্রার্থনা! রাণার প্রদীপ্ত ললাটে চিন্তার রেখা ফুটিয়া। কিছুক্ষণ নীরবে কি চিন্তা করিয়া অবশেষে বলিয়া উঠিলেন, উত্তম, কি প্রার্থনা বলুন।

—প্রার্থনা আপনার বন্ধুত্ব—আপনার হৃদয়।

মুহূর্ত্তের মধ্যে কি যেন একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল। মহারাণা ডাকিয়া উঠিলেন, সম্রাট!

—আর সম্রাট নই—ভাই। মহারাণা! প্রতাপসিংহ!

বলিতে বলিতে সম্রাট বাহু-বেষ্টনে রাণাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। রাণাও প্রতি-আলিঙ্গন দিয়া তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালন করিলেন। নির্জ্জন শৈলের পাষাণ-ক্রোড়ে চিতোর-কুললক্ষ্মীর শবপার্শ্বে ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ শক্তির আকস্মিক সম্মিলন। অপূর্ব্ব—অভিনব—কল্পনাতীত। আকাশে সন্ধ্যাতারা হাসিল। তাহার মৌন আশীর্ব্বাদ আলিঙ্গনবদ্ধ সেই যুগল বিরাট পুরুষের মাথার উপর নীরব ধারে নামিয়া আসিল।

বৃথা

("সেক্সপীয়র" হইতে)

জোয়াদুল করিম

ফিরে লও, ফিরে লও ও রাঙা অধর
ওযে শুধু প্রবঞ্চনাময়;
ঐ আঁখি, কে জানিত, স্নিগ্ধ সুমধুর
প্রভাতের রবিরশ্মি নয়?

ফিরে দাও, দাও ফিরে মোর সে চুম্বন
রাশি রাশি এঁকেছিনু যায়;
বৃথাই আঁকিয়াছিনু পীরিতির রং
অবিশ্বাসী রাঙা ঠোঁটে হায়!

লোকান্তরিত

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু

"পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ভারতের আধ্যাত্মিক জয়লাভের মুহূর্ত্তে আমাদিগকে অপরাজিত আত্মিক শক্তির উত্তরাধিকার দিয়া গেলেন।"

—রবীন্দ্রনাথ

প্রধান-মন্ত্রী

মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড

গোল-টেবিল বৈঠক

গত ১৯শে জানুয়ারী লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠক শেষ হইয়া গিয়াছে। ২৬শে জানুয়ারী গোলটেবিল বৈঠকে গৃহীত নীতি পার্লামেণ্টের সদস্যদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, ভারতের প্রতিনিধিগণ এবং শাসনতন্ত্র বিশেষজ্ঞগণ যে প্রস্তাব করিয়াছেন, যদি আমরা তাহা গ্রহণ না করি, তবে ভবিষ্যতের জন্য আমাদের একমাত্র সম্বল হইবে নিপীড়ন এবং এই নিপীড়ন অত্যন্ত অপ্রীতিকর ধরণের হইবে। ইহাতে আমরা কৃতিত্বও পাইব না এবং সাফল্যও হইবে না। এই নিপীড়ন-নীতির ফলে স্ত্রীলোক এবং শিশুগণসহ ভারতের সমগ্র জনসাধারণ পীড়িত হইয়া উঠিবে। যদি হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে আমরা এই দমননীতি চালাইতে প্রস্তুত হইয়া থাকি, তবে আপনারা সেই দমননীতি চালাইবার জন্য আমাদিগকে যেন আহ্বান না করেন।"

ভারতের বড়লাট

লর্ড আরউইন

বড়লাটের ঘোষণা

গত ১৯শে জানুয়ারী প্রধান মন্ত্রী মহোদয় যে ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে লর্ড আরউইন নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যগণ এবং যাঁহারা গত বৎসর ১লা জানুয়ারীর পর হইতে সদস্যপদে কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিনাসর্ত্তে মুক্তি দিয়াছেন। এতৎ-সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীকে পূর্ব্বে বে-আইনী সমিতি বলিয়া যে ঘোষণা করা হইয়াছিল, তাহাও প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর নেতাগণের মুক্তি

কারামুক্ত সবরমতীর ঋষি

মহাত্মা গান্ধী

কারামুক্ত হওয়ার পর মহাত্মা গান্ধী এক বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমরা সকলেই একমত যে সরকার কর্ত্তৃক সংগ্রাম-বিরতি ঘোষিত না হইলে আন্দোলন প্রত্যাহার বা শেষ করিতে পারা যায় না। শেষ মীমাংসার সঙ্গত আশা ব্যতীত বর্ত্তমানের ন্যায় ব্যাপক আন্দোলন হঠাৎ বন্ধ করা যায় না। এইরূপ তীব্র আকারে দমননীতি যতদিন চলিতে থাকিবে, ততদিন মীমাংসার সম্ভব নয়। আমি প্রত্যহ চরিত্রবান নরনারীগণের নিকট হইতে দমনের বিস্তৃত বিবরণ পাইতেছি। আমার মনে হয়, ঐ সকল অভিযোগ সমূহের তন্ন তন্ন ভাবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ তদন্ত ব্যতীত জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইতে পারে না বা সুবিচার সম্ভব নয়। দমননীতি প্রতিমুহূর্ত্ত আবহাওয়াকে কলুষিত করিতেছে ; এরূপ ক্ষেত্রে শান্তির কথাবার্ত্তা পরিচালন কিরূপে সম্ভবপর আমি বুঝি না।

নৈনী জেল হইতে মুক্ত

কংগ্রেসের সভাপতি

পণ্ডিত জওহরলাল

গুজরাট জেল হইতে মুক্ত

ডাঃ আনসারী

দিল্লী জেল হইতে মুক্ত

মওলানা আবুল কালাম আজাদ

যারবাদা কারাগার হইতে

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

দিল্লীজেল হইতে মুক্ত

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন

আগামী করাচী কংগ্রেসের

সভাপতি
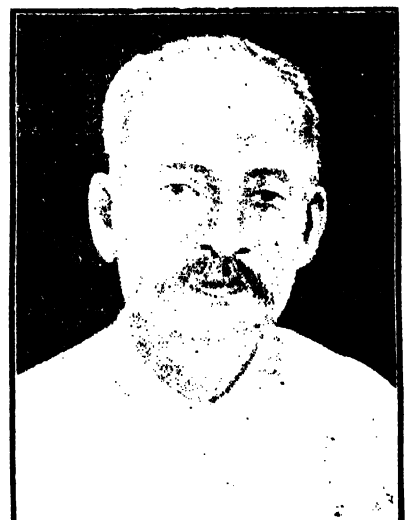
কারামুক্ত সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল

আলিপুর জেল হইতে মুক্ত
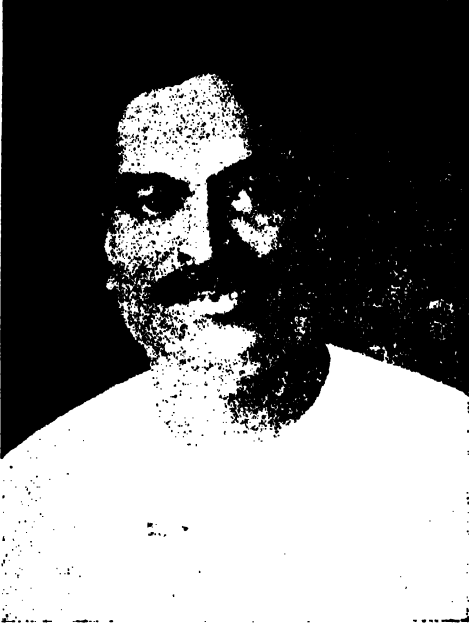
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের চতুর্থ অধিবেশনের
সভাপতি

স্যার এব্রাহিম রহিমতুল্লাহ্

স্বাধীনতা দিবসে
পুলিশ-আইন অমান্যে কারারুদ্ধ মেয়র
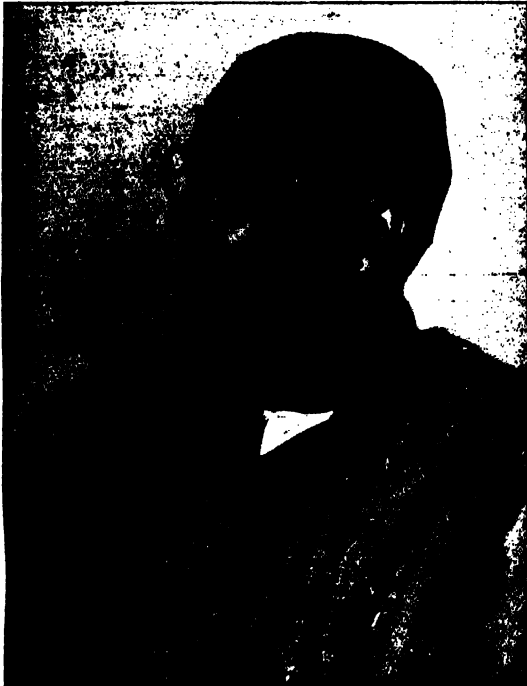
শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

পার্লামেণ্টে সদস্যপদকামী

মিঃ জিন্নাহ্

মিঃ জিন্নাহ্ পার্লামেণ্টের সদস্য হইবার মানসে ইংলণ্ডেই বসবাস করিবেন, স্থির করিয়াছেন।

থারওয়াড়ি বিপ্লবের চিত্র

বর্ম্মায় থারওয়াড়ি অঞ্চলে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে তাহা এখনও প্রশমিত হয় নাই। (চিত্রে) ধৃত বিপ্লবীকে কারাগারে লইয়া যাওয়া হইতেছে। সম্প্রতি লর্ড আরউইন এই বিপ্লব দমনের জন্য দ্বাদশ অর্ডিন্যান্স স্বরূপ বর্ম্মা অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন।
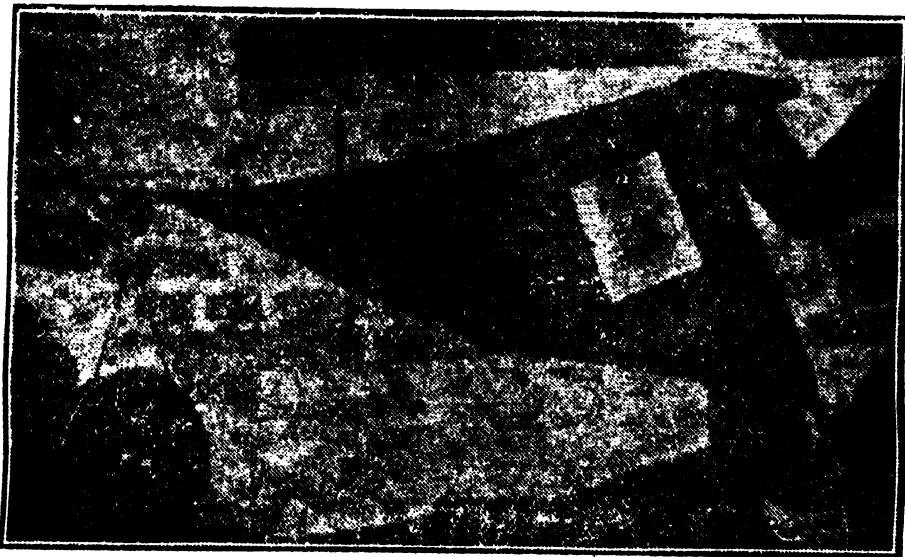
সরকারী এশতেহারে প্রকাশ যে বিপ্লবীরা বর্ম্মার সিংহাসন অধিকার করিবার বাসনায় উদ্বুদ্ধ হয়। সরকারী সৈন্যকর্ত্তৃক প্রাপ্ত বিপ্লবীদের ব্যবহৃত পতাকা।

কাথিওয়াড়ের বিখ্যাত শামিশাহ্ মছজেদ
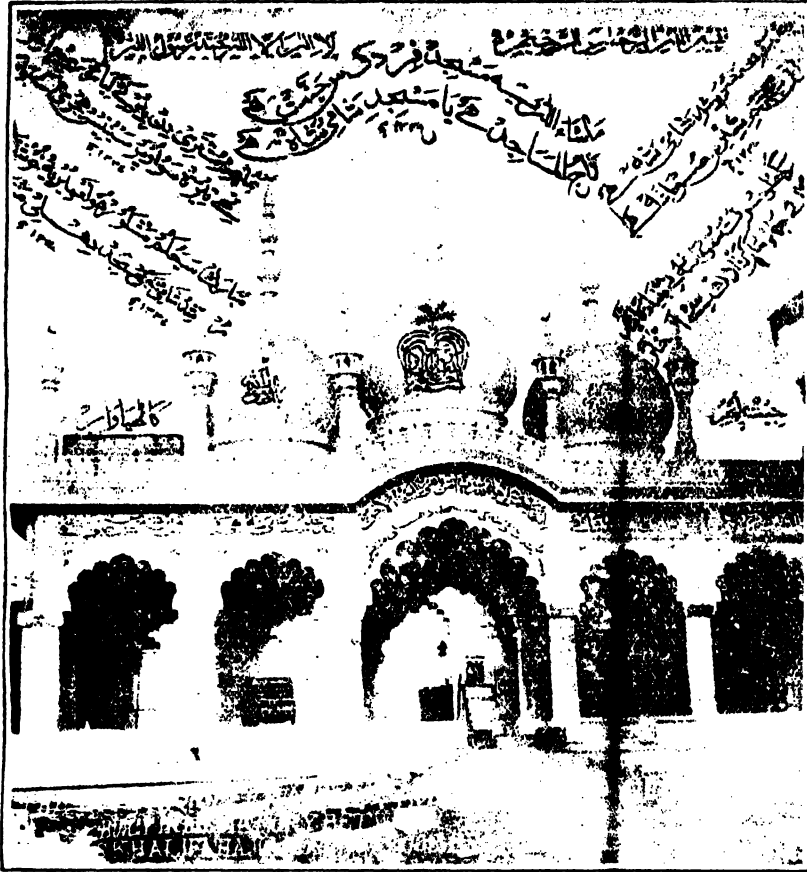
দ্বীপান্তরিত

হেজাজে বেতার-বার্ত্তা প্রবর্ত্তন

হেজাজে বেতার-বার্ত্তা ষ্টেশন স্থাপিত হইয়াছে। য়ুরোপীয় বিশেষজ্ঞ দ্বারা বেতার শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র মজুমদার

ভারত দ্বীপ-পুঞ্জের মুছলমান

সিঙ্গাপুর

সিঙ্গাপুর ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বহু ভারতীয় মুছলমান এই বন্দরে আসিয়া বাণিজ্য করিতেছেন এবং ইহার উন্নতি তাঁহাদের অধ্যবসায় ও সাধনার উপর নির্ভর করে সিঙ্গাপুর জগতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর এবং বাণিজ্যকেন্দ্র। নিম্নে সিঙ্গাপুরের অধিবাসী বিশিষ্ট মুছলমান ব্যক্তিবৃন্দের চিত্র ও পরিচয় দেওয়া হইল।—

সৈয়দ আবদুর রহমান আলকাফ

মালয়, জাভা ও সিঙ্গাপুরে বহু ধনী ব্যবসায়ী বাস করেন। তন্মধ্যে সৈয়দ আবদুর রহমান আলকাফ সাহেব সর্ব্বাপেক্ষা ধনী বলিয়া খ্যাত। সিঙ্গাপুরের বহু বৃহৎ ব্যবসায় ও বাণিজ্যের সহিত ইনি সংযুক্ত।

সমাজ-নেতা

ইনি সিঙ্গাপুরের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। নানা সামাজিক কার্য্যে ইনি ব্যক্তিগত ভাবে এবং অর্থ সাহায্য দ্বারা প্রভূত সহায়তা করেন। যখন ভূতপূর্ব্ব ছোলতান মোহাম্মদ ওহিদ্‌উদ্দীনের বিধবা বেগম সিঙ্গাপুরে আসেন, তখন ইঁনি অর্থ ও অন্যান্য উপায়ে প্রভূত সাহায্য করেন।

শেখ এহিয়া বিন আহমদ্‌ আফিফী

ইনি আমেরিকা ও য়ুরোপের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নানা উপাধি অর্জ্জন করিয়া আসেন। সিঙ্গাপুরের শিক্ষিত-মহলে ইঁহার নাম ও প্রতিষ্ঠার তুলনা নাই। সাক্ষাৎ জীবনে কিন্তু ইনি নানাবিধ ক্ষুদ্র সামাজিক কর্ত্তব্যের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। য়ুরোপের শিক্ষা-কেন্দ্রগুলির সহিত ইঁহার বিশেষ যোগ আছে। তাই প্রায়ই ইনি য়ুরোপ পরিভ্রমণে বহির্গত হন।

সৈয়দ আহমদ বিন মোহাম্মদ

প্রসিদ্ধ ডাক্তার

ডাক্তার এব্রাহিম

ডাক্তার এব্রাহিম সিঙ্গাপুরের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। অমায়িক ব্যবহার ও ডাক্তারী শাস্ত্রে কৃতিত্বের দরুণ ইনি ভারত দ্বীপপুঞ্জের সকলের হৃদয় জয় করিয়াছেন।

ডাক্তার জুনের

ইনি সম্প্রতি লণ্ডন হইতে ডাক্তারী উপাধি অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। ইতিমধ্যে ইঁহার বেশ প্রসার হইয়াছে

সাহিত্যিক ও আর্টিষ্ট

মোহাম্মদ বিন ওমর সাক্কাফ

ইনি সিঙ্গাপুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার খ্যাতির দরুণ ইনি সিঙ্গাপুরে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। সম্প্রতি ইনি সিঙ্গাপুরের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হইয়াছেন।

মিঃ হামিদুল আকবর

মিঃ হামিদুল আকবর প্রবাসী ভারতীয় মুছলমান। চিত্রকর হিসাবে ইনি সিঙ্গাপুরে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক ও ধার্ম্মিক

মোহসেন উল করিম সৈয়দ উল হাসান

ইঁহার ধর্ম্মপ্রবণতা সমগ্র ভারত দ্বীপপুঞ্জে খ্যাত। অমায়িকতা ও ভদ্রতার ইনি জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। নিজব্যয়ে ইনি সিঙ্গাপুরে তিনটী মাদ্রাসা স্থাপিত করিয়াছেন। জহরে ও ইনি নিজব্যয়ে অনেক মসজেদ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ইহা ব্যতীত লোক হিতকর বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত ইনি সাক্ষাৎভাবে জড়িত।

সৈয়দ ওমর এবনে শেখ উল কাফ

গণিত-শাস্ত্রে ইনি একজন বিশেষজ্ঞ। ইঁহার গবেষণা সিঙ্গাপুরের বাহিরে য়ুরোপের নানাস্থানে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে নিজব্যয়ে তিনি একটী মাদ্রাসা স্থাপনকরিতেছেন।

কান্‌সাদ্বীপের সুলতান

ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত কানসাদ্বীপের সোলতান। বৃটিশ তত্ত্বাবধানে থাকিলেও ইঁহার ক্ষমতা স্বরাষ্ট্রের মধ্যে অপ্রতিহত।

জাভার ওলেমাবৃন্দ

মধ্যস্থলে জাভার বিশিষ্ট ওলেমা ওস্তাদ আবদুল হামিদ; ডানপার্শ্বে আল-সামারৎ-পত্রিকার সম্পাদক ওস্তাদ মাহ্‌মুদ বশীর; বামদিকে জাভার আর একজন বিশিষ্ট ওলেমা ওস্তাদ আব্বাস্ রফি।

কালান্তানের অধিপতি

সোলতান এসমাইল

কালান্তান মলয় প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত। ইহা বৃটীশ কর্ত্তৃত্বাধীন। ইহার আয়তন প্রায় ৯ হাজার বর্গ মাইল।

কালান্তানের প্রধান-মন্ত্রী
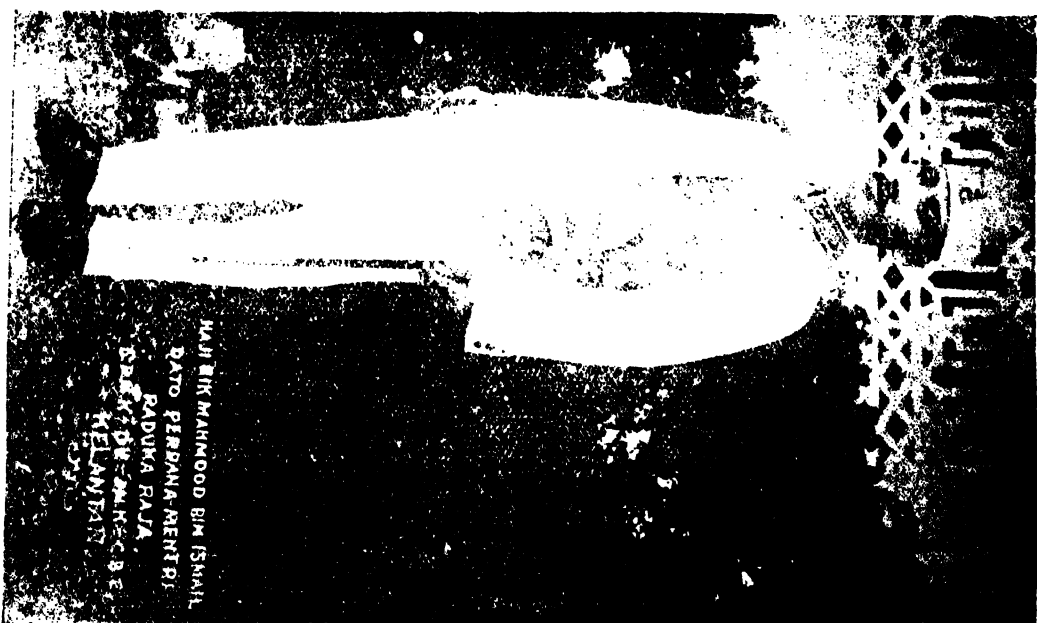
হাজী মাহ্‌মুদ এবনে হাজী এসমাইল, সি, বি, ই

জহুরের অধিপতি

সোলতান এব্রাহিম

জহুর মলয় প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত একটী দ্বীপ। এই দ্বীপ বৃটীশ ফেডারেশনের বাহিরে। ইঁহার সোলতান স্বাধীন-নৃপতির ক্ষমতা এখনও ভোগ করেন। সম্প্রতি ইনি য়ুরোপ পরিভ্রমণ কালে একজন শ্বেতাঙ্গ রমণী বিবাহ করিয়াছেন। চীন সাগরে ইঁহার অধিকৃত কয়েকটী দ্বীপ আছে।

হাজী আম্বাসোলো

ইনি জহুরের একজন বিখ্যাত ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি।

চিত্রে :: মোহাম্মদ আলী

আলিগড়ের ছাত্ররূপে

[ভূমিতে উপবিষ্ট বামদিক হইতে ডানদিকে ক্রশ-চিহ্নিত যুবকই আলীগড়ের ছাত্ররূপে মোহাম্মদ আলী]

মওলানা মোহাম্মদ আলীর আত্ম-জীবনী হইতে একটী ঘটনা জানা যায়। একবার রামপুরে এক প্রতিবেশী পাঠানের নিকট ইংরাজীতে একটী টেলিগ্রাম আসে। সে-সময় রামপুরে কেহই ইংরাজী জানিত না বলিলেই হয় এবং ইংরাজী-জানা তখন হারাম বলিয়া গণ্য ছিল। এমন অবস্থায় উক্ত টেলিগ্রামের পাঠোদ্ধার লইয়া মহা-সমস্যা উপস্থিত হইল। অনেক ভাবনা চিন্তার পর উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন মোহাম্মদ আলীদের পরিবারের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "শুনিয়াছি, তাঁদের ছেলেপুলেরা নাকি ইংরাজী পড়িতে শিখিয়েছে।" উক্ত ভদ্রলোকের এই বাক্যস্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন "আছ্তাগ ফেরুল্লাহ! কার সম্বন্ধে এমন কথা বলিতেছেন? জানেন, তাঁরা ভদ্রলোক?" ইংরাজী-শিক্ষার প্রতি ইহাই ছিল রামপুরের সাধারণ মনোভাব। এহেন রামপুরে বি-আম্মা বেগম তাঁহার চার পুত্রকে উচ্চতর ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হন। এবং আপনার গহনা বন্ধক রাখিয়া পুত্রদের শিক্ষার খরচ জোগাইয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে ছাত্ররূপে

১৮৯৮-১৯০২

অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে মোহাম্মদ আলী এক জন বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ক্রিকেট খেলোয়াড়ের ষ্ট্রাইপ দেওয়া জামা গায়ে চিত্রের ডানদিকে তিনি উপবিষ্ট।

রামপুর ষ্টেটে

মোহাম্মদ আলী কিছুদিন রামপুর ষ্টেটে শিক্ষা-বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। পাগড়ী মাথায় চিত্রের ডানদিকে তিনি রামপুরী পোষাকে দাঁড়াইয়া আছেন।

"কমরেডের" সম্পাদকীয় বিভাগে

[ডানদিক হইতে সর্ব্বপ্রথম উপবিষ্ট "কমরেডে"র সম্পাদক মোহাম্মদ আলী]

'কমরেড যখন সেকালে 'প্রেস এ্যাক্টে' পড়ে—জষ্টিস জেঙ্কিন্সের নিকট যখন ইহার আপীল শুনানী হয়, তখন মোহাম্মদ আলী তাঁহাকে বলাইয়া ছাড়িয়াছিলেন, তাৎকালীন 'প্রেস এ্যাক্টে' বাইবেল, কোরান বেদ পর্য্যন্ত পড়িতে পারে। ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রকৃত রিপোর্টারের তখন একান্ত অভাব। কিন্তু মোহাম্মদ আলী তদানীন্তন 'বেঙ্গলী'তে এই 'কমরেডে'র মামলা এমনভাবে রিপোর্ট করিয়াছিলেন যে, সেরূপ সম্পূর্ণ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ঘটনা সম্বলিত সুলিখিত রিপোর্ট অদ্যাপি কোন প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্রের অঙ্গে স্থান পায় নাই। লোকটা যাহাতেই হাত দিত, তাহারই চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িত। মোহাম্মদ আলী একাধারে সম্পাদক, প্রবন্ধকার, রিপোর্টার, ইহাই আমরাই দেখিয়াছি। তাঁহার ইংরাজী লেখায় সৎ-সাহিত্য পাঠের পিপাসা মিটিত। 'কমরেডের' প্রবন্ধাবলী ইংরাজী-সাহিত্যের সৌষ্টব সাধন করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মওলানা মোহাম্মদ আলী ভারতবর্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাংবাদিক ছিলেন।' —পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী

তুরস্কের বন্ধুরূপে

১৯১২ খৃষ্টাব্দে বিপন্ন তুরস্কের জন্য যখন মওলানা মোহাম্মদ আলী রেড ক্রিসেণ্ট সোসাইটী গঠন করেন, তখনকার গৃহীত চিত্র।

বিশ্ব-মোছলেমের সেবকরূপে
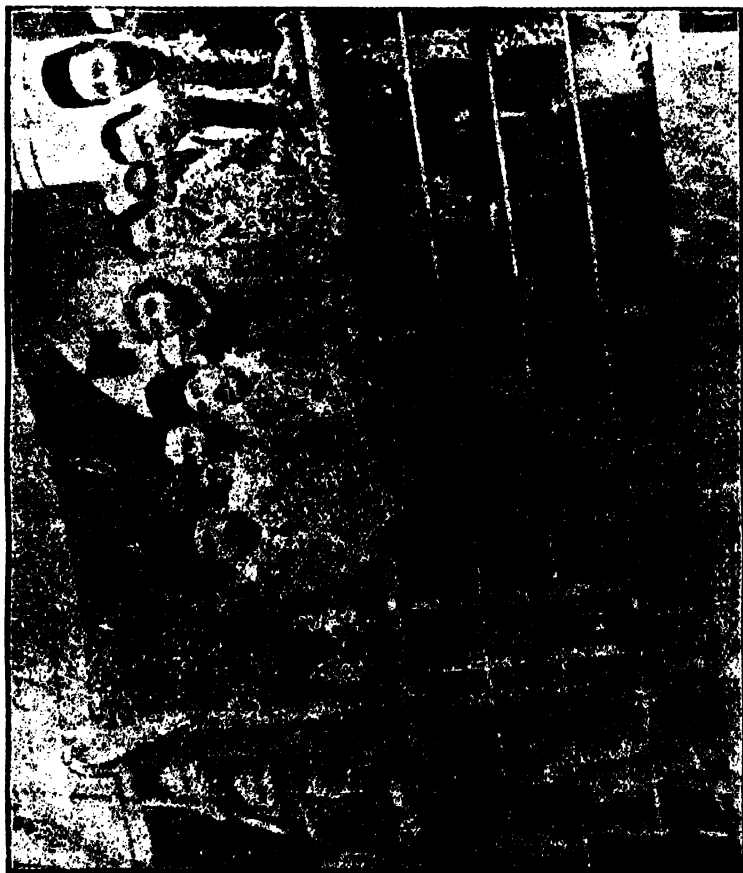
১৯১৯ সালে খিলাফৎ ডেপুটেশনের প্রেসিডেণ্টরূপে জাহাজে বিদায়-দৃশ্য। ক্রশচিহ্নিত ব্যক্তি মওলানা মোহাম্মদ আলী।

গোল-টেবিলের জন্য ভারত-ত্যাগের পূর্ব্বে

অসুস্থ অবস্থায় বোম্বাইএ গৃহীত চিত্র—ভারতের শেষ-স্মৃতি

তিরোধানের কয়েকদিন পূর্ব্বে লণ্ডনে

চিরনিদ্রায় শায়িত
সংগ্রাম-শ্রান্ত সৈনিক

লণ্ডনে জানাজার দৃশ্য

ওকিং মসজেদের ইমাম জানাজার নামাজ পড়াইতেছেন।

জেরুসালেম ষ্টেশনে
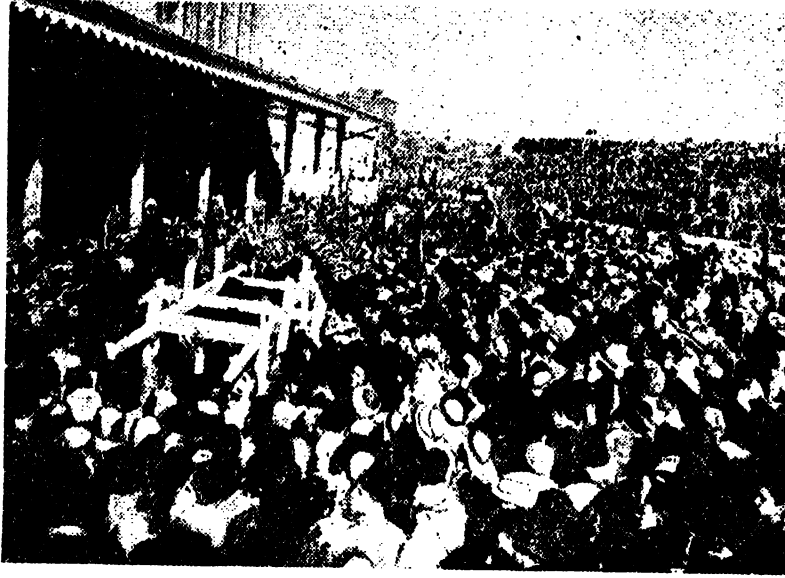
জেরুসালেম ষ্টেশনের বাহিরে শোকার্ত্ত উৎসুক জনতা পুণ্যশবদেহের আগমনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

ওমর-মসজেদের-চিত্র-সম্বলিত যে পবিত্র গেলাফ দ্বারা মোহাম্মদ আলীর লাশ আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহারই চিত্র। মওলানা শওকৎ আলীর বামপাশে জেরুসালেমের প্রধান-মুফতী দণ্ডায়মান।

ওমর-মসজেদের পথে
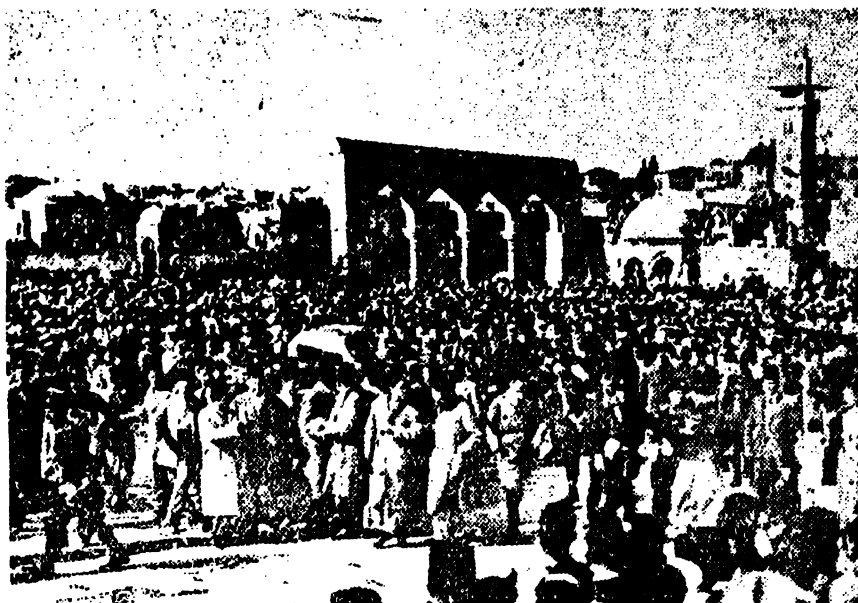
বিরাট শব-শোভা-যাত্রা

ওমর-মসজেদের প্রাঙ্গণে

দফনের সময়ে সমাগত জনতা

চিত্রে
নিখিল-এশিয়া নারী-সম্মেলন

এবারে লাহোরে নিখিল এশিয়া নারী-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বসম্মতিক্রমে কারাবাসিনী সরোজিনী নাইডুই অধিবেশনের সভানেত্রী মনোনীত হন। এশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। চিত্রে দণ্ডায়মান অবস্থায় বামদিক হইতে ডানদিকে মিস্ মি ওয়াং (বর্ম্মা) মিস্ ফোজদার (পারস্য) মিস্ হোসি (জাপান)। উপবিষ্ট বামদিক হইতে ডানদিকে মিসেস্ কামালউদ্দীন (আফগানিস্থান) ডাক্তার রেড্ডী (ভারতবর্ষ) লেডী নন্দনায়িকা (সিংহল) মিসেস্ হামিদ আলী (ভারতবর্ষ)।

উপবিষ্টা বামদিক হইতে ডাইনে মিসেস্ সানটাসো। চীন। মিসেস্ যুগনছো (:লয়) পশ্চাতে মিসেস্ সুইনারাইতি (জাভা)

নিখিল এশিয়া নারী সম্মেলনের সেক্রেটারী

মিসেস্ হামিদ আলী

মিসরের খ্যাতনামা সংবাদিকা

আদিবা হানম্

মিছরে সম্প্রতি ইনি একটী বৃহৎ সংবাদপত্র সঙ্ঘ-ঘটনের চেষ্টা করিতেছেন।

ভারতের প্রথম নারী প্রিভি কাউন্সিলর—বেগম ফারুকী

গৃহস্থ-বিদ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত

জার্ম্মাণ-নারীমণ্ডল

য়ুরোপের মধ্যে জার্ম্মাণ নারীগণ সাংসারিক বিদ্যায় সকলের চেয়ে পারদর্শী বলিয়া খ্যাত। সেখানে নারী-বিদ্যালয়ে রীতিমত ভাবে গার্হস্থ্য-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তাহার জন্য রীতিমত উপাধি আছে। এই পাঁচজন মহিলা সম্প্রতি গার্হস্থ্য-বিদ্যায় বি, এ উপাধি অর্জ্জন করিয়াছেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারত-নারী

বোম্বের স্বেচ্ছাসেবিকাগণ

বোম্বের স্বেচ্ছাসেবিকাগণ কুচকাওয়াজের জন্য শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। সম্মুখে পুরুষ স্বেচ্ছাসেবকগণ।

যক্ষ্মা ও ক্ষয় রোগ

ম্যালেরিয়া রোগে কলিকাতার মুছলমান-প্রধান বস্তিগুলি বহুদিন হইতে উজাড় হইয়া আসিতেছিল। কিছুকাল হইতে মুছলমান অধিবাসীদের মধ্যে যক্ষ্মা ও ক্ষয় রোগের ও তাহাতে মৃত্যুর সংখ্যা বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। কোনদিক হইতে ইহা প্রতিকারের সন্তোষজনক ব্যবস্থা না হওয়ায়, এই মারাত্মক ব্যাধিটী শহরতলীর মুছলমান নর-নারীদিগের মধ্যে গুরুতর রূপে সংক্রমিত হইয়া পড়িতেছে। "মুছলমান মৃত্যু-বিজয়ী হইয়াই জন্মগ্রহণ করে," সুতরাং মরণকে ভয় করার কাপুরুষতা তাহাদের জনসাধারণের মধ্যে নাই। কারণ, মৃত্যু ও স্বর্গের সীমা পরস্পর সংলগ্ন। আমাদের যে-সব মুছলমান "নগরপাল" স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের দ্বারা কলিকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলর নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা বড় বড় কর্ম্মে সদাই ব্যতিব্যস্ত। তাঁহারা সুভাষ বাবুর দলে মিশিবেন না সেনগুপ্তের সঙ্গে সন্ধি করিবেন, তাঁহাদের কোন্ ভাগ্যবান্ মেম্বর ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচিত হইবেন, কে কোন্ কমিটির মেম্বর হইতে পারিবেন না-পারিবেন, এই শ্রেণীর নানা গুরুতর দায়িত্বের দুর্ভাবনায় তাঁহারা এমনই তন্ময় হইয়া থাকেন যে, এসব সামান্য ও নগণ্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার অবসরই তাঁহাদের ঘটিয়া উঠে না।

অন্যদিকের অবস্থা আরও গুরুতর। এই সকল প্রসঙ্গের অবতারণা হইলে, আমাদের আরবী-মোকাল্লেদ ও ইংরাজী-মোকাল্লেদগণ যে সব উত্তর প্রদান করেন, তাহা শুনিয়া কপালে করাঘাত করিতে হয়। রোগ যে সংক্রামক হয় এবং সাবধানতা দ্বারা সেই সংক্রমণের গতি রোধ করা যে মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়, প্রথম দলের অনেকেই তাহা স্বীকার করেন না। এই প্রকার আলোচনা প্রসঙ্গে একবার একজন খুব বোজর্গ ব্যক্তি, ভক্তদিগকে সম্বোধন করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"তকদিরের কলম শুকিয়ে গিয়েছে, সব আল্লার মর্জ্জি। যারা যক্ষ্মা রোগে মরবে বলে রোজে আজলে লেখা হয়েছে, তাদের রক্ষা করে কার সাধ্য?" আর ইংরাজী-মোকাল্লেদদিগের নিকট এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে, তাঁহারা অবিলম্বে চীৎকার করিয়া উঠেন—"Down with purdah system" এসব ক্ষয়রোগের আধিক্যের একমাত্র কারণ হইতেছে, মুছলমানের পর্দ্দাপ্রথা। কিন্তু, পর্দ্দাপ্রথা যে এই সব রোগের একমাত্র কারণ নহে, কলিকাতা করপোরেশনের স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন :—

"The causes of tuberculosis in Calcutta may be briefly summarised as (1) Poverty, under-feeding, the struggle for existence under adverse conditions etc (2) Ignorance and carelessness resulting in sputum loaded with the bacilli being expectorated all over the place, (3) Bad housing, a dark damp ill-ventilated hut in an open suburb is evidently just as deadly as a badly lighted and ventilated room in the heart of the city (4) the purdah system."

"কলিকাতায় ক্ষয়-রোগের প্রসারের কারণ সংক্ষেপত বলা যাইতে পারে, (১) দারিদ্র্য, অপর্য্যাপ্ত আহার, প্রতিকূল ঘটনার বিরুদ্ধে নিত্য জীবন-সংগ্রাম, ইত্যাদি (২) অজ্ঞতা ও অসতর্কতার দরুণ চতুর্দ্দিকে বীজাণুমিশ্রিত থুথু

ছড়ান (৩) অস্বাস্থ্যকর আবাস গৃহ ; মফস্বলের অন্ধকার, স্যাঁৎসেতে, বায়ু-চলাচলহীন কুটীরগুলি শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত অপরিসর আলো-হীন বায়ু-চলাচলহীন ঘরগুলির মতই মারাত্মক। (৪) পর্দ্দা-প্রথা।*

উপরোক্ত চারিটী কারণের মধ্যে প্রথম তিনটী সম্বন্ধে কোন মতভেদই হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের মতে পর্দ্দাপ্রথার সহিত কলিকাতার যক্ষ্মারোগ সংক্রমণের খুব একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক নাই। মুছলমানদের মধ্যে যক্ষ্মা ও ক্ষয়রোগ সংক্রমণের আরও কএকটা গুরুতর কারণ আছে। পর্দ্দা পর্দ্দা করিয়া আমাদের চোখে তকলিদের পর্দ্দা পড়িয়া যাওয়াতে সে বিষয়গুলি সহজে আমাদের নজরে পড়ে না।

করপোরেশনের স্বাস্থ্যবিভাগ, অর্দ্ধভোজন বা যথেষ্ট খাদ্য গ্রহণের অভাবকে ইহার প্রথম কারণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মতে, অর্দ্ধভোজন অপেক্ষা অখাদ্য ভোজনই মুছলমানদিগের মধ্যে ক্ষয়রোগ সংক্রমণের জন্য অধিক দায়ী। কলিকাতার রাস্তায় বাহির হইলে দেখা যাইবে—মুছলমানের খাবারের দোকান ও হোটেল-গুলি সর্ব্বদাই মুক্তদ্বার। খাদ্যগুলি অনাবৃত অবস্থায় পথের ধারে কাঁড়ি মারিয়া রাখা হইয়াছে। বাতাসে ধুলা উড়িতেছে, আর সেই খাদ্যগুলিকে আবৃত করিয়া দিতেছে। পক্ষান্তরে হিন্দু-দোকানের খাদ্যগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং কাচের আলমারির মধ্যে রক্ষিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ মুছলমান অনেক সময় পয়সা দিয়া এই সব খাদ্য খরিদ করে, এবং বহুসময় তাহাই খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

পক্ষান্তরে, এই সব দোকানে বা হোটেলে যে সব উপকরণে খাদ্যগুলি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, তাহাই হইতেছে এই শ্রেণীর মারাত্মক রোগের প্রধান উপাদান। অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর গোমাংস, ভেজাল তেল, পচা চর্ব্বি মিশ্রিত ভেজিটেবেল ঘি, ভেজাল আটা ময়দা, স্যাকরিন প্রভৃতিই এই দোকানদারদের প্রধান সম্বল। শহরতলীর মুছলমানদিগের অধিকাংশ লোকই অনেক সময় কোন না কোন প্রকারে এই সব দোকানের বা হোটেলের কোন না কোন খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত, মাংসের জন্য কলিকাতায় যে সব গরু জবাই করা হয়, তাহার অধিকাংশই শৃগাল-কুকুরেরও অখাদ্য। রুগ্ন, জরাজীর্ণ এবং ক্ষয় রোগের মারাত্মক বীজাণুর এই আকরগুলি, স্লটর হাউসের কর্ত্তৃপক্ষের কৃপায় সুস্থ সবল ও নিরোগ বলিয়া পার হইয়া যায়, এবং এই মাংস—অনেক সময় বাসি ও আধপচা অবস্থায় কসাইদের মারফত গরীব মুছলমানদের রান্নাঘরে প্রবেশ করে। এই মাংসগুলিও সারাদিন অনাবৃতভাবে লটকাইয়া রাখা হয়, এবং রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া ও পথের ধূলায় ধুসরিত হইয়া মুছলমান খরিদারের অপেক্ষা করিতে থাকে।

ইহাই অধিকাংশ মুছলমানের প্রধান খাদ্য। কিন্তু অতিশয় পরিতাপের বিষয় এই যে, করপোরেশন মুছলমান-দিগের এই সব দোকান হোটেল এবং এই শ্রেণীর খাদ্যগুলি সম্বন্ধে প্রতিকারের কোন বিশেষ ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত করেন নাই। বরং এদিকে কর্ত্তৃপক্ষ যে বিশেষ অবহেলা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আলোচ্য রিপোর্টে দেখা যাইতেছে, ১৯২৯ সালে প্রায় সকল প্রকার খাদ্যের ৫৮৬২টা নমুনা লইয়া তাহার রাসায়নিক পরীক্ষা করা হইয়াছিল। কিন্তু মাংসের সম্বন্ধে এই প্রকার পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা যে হইয়াছে, তাহার উল্লেখ রিপোর্টের কুত্রাপি পাওয়া যায় না। খাদ্য পরীক্ষকদের নামের যে তালিকা ১২৭ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে একজন মুছলমানের নামও দেখিতে পাইলাম না। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ ইনস্পেক্টারগণের পক্ষে মুছলমানদের হোটেলে ও গোমাংসের দোকানে প্রবেশ করা এবং সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা যে কতদূর স্বাভাবিক, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ফলতঃ করপোরেশনের এই অবহেলাই মুছলমানদিগের মধ্যে ক্ষয়-রোগ-বৃদ্ধির প্রধান কারণ।

কলিকাতা করপোরেশনের অধীন কসাইখানাগুলিতে গত বৎসর ৪,৩৯,৫৩৩টী পশু মাংসের জন্য বধ করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে গরু ৭৮,৪০৫টি ; মহিষ ৬২৬০টি ; বাছুর ৩৪৯৩টি ; ভেড়া ১,৫৭,৬২৩টি ; ছাগল ১,৮৪,৬৪০টি, * এই প্রায় ৪॥০ লক্ষ পশুর মাংস পরীক্ষার জন্য, সমেত মাটিয়াবুরুজ সমগ্র কলিকাতায় মাত্র ৪ জন পরীক্ষক নিযুক্ত আছেন। ইঁহারা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী, রিপোর্ট পাঠে তাহা

* অবশিষ্ট ৯১১২টি শূকর।

অবগত হওয়ার উপায় নাই। সম্ভবতঃ ইঁহারা সকলে বা ইঁহাদের অধিকাংশ হিন্দু। সে যাহা হউক, এই চারিজন লোকে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার পশুর মাংস পরীক্ষা করিয়া থাকেন। ১৯২৮ সালে এই ইনস্পেক্টরগণের চেষ্টায়, খাদ্যের অযোগ্য মাংস বিক্রয় করার জন্য ৪৫২ জনের ২৯৮০ টাকা জরিমানা হইয়াছিল। কিন্তু যে কোন কারণে হউক, গত বৎসর তাঁহাদের চেষ্টায় মাত্র ২০৬ জন মাংস-বিক্রেতা দণ্ডিত এবং তাহাদের নিকট হইতে মাত্র ১০৪৬ টাকা জরিমানা আদায় হইয়াছে। কিন্তু এই সংখ্যাহ্রাসের কারণ অনুসন্ধান করার কোন আবশ্যকতা করপোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ বা তাহার মুছলমান মেম্বরগণ একবারও অনুভব করেন না। রুগ্ন, জরাজীর্ণ গরুর এই সব বাসি ও পচা মাংসের ব্যবহারের ফলেই মুছলমানদিগের মধ্যে ক্ষয় রোগের সৃষ্টি এত অধিক হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পর্দ্দা প্রথার সহিত ক্ষয় রোগের সংশ্রব বিশেষ ঘনিষ্ঠ বলিয়া মনে হয় না। তাহার একটা বড় প্রমাণ এই যে, দেশী খৃষ্টানদিগের মধ্যে যক্ষা ও ক্ষয় রোগের অনুপাত মুছলমানদের অপেক্ষাও অধিক। অথচ তাহারা শিক্ষায় মুছলমানের তুলনায় অনেক উন্নত। পর্দ্দা প্রথার কোন ধারও তাহারা ধারে না। আলোচ্য রিপোর্ট অনুসারে হিন্দু, মুছলমান ও দেশী খৃষ্টানদিগের মধ্যে এই রোগে মৃত ব্যক্তিদের আনুপাতিক হার যথাক্রমে ২'৪,৩'০,৫'৮ জন। ইংরাজী মোকাল্লেদদিগকে এই কথাটা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ

হীন মোছলেম-বিদ্বেষের দিক দিয়া মাঘ মাসের "প্রবাসী" চরম সম্পন্নরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। রামানন্দ বাবুর "বঙ্গে মুসলমান ও অমুসলমান" প্রবন্ধের পাশে স্থান পাইয়াছে, শ্রীযুক্ত মোতাহের হোসেন বি-এ সাহেবের "প্রকৃতি ও মুসলমান।" এই প্রবন্ধে উক্ত লেখকও মুছলমান সমাজকে নানাভাবে ধিক্কার দিয়াছেন, তাহাদের গ্লানি রটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুছলমান সমাজকে কতকগুলি মূল্যবান উপদেশও দিয়াছেন। তার মধ্যকার সব চাইতে বড় উপদেশ এই যে, মুছলমানের সামাজিক জীবনকে সরস করিতে হইবে, আর এজন্ত তাহাদের নীরস তাওহীদের সঙ্গে এদেশের পৌত্তলিকতার রস কতকটা মিশাইয়া দিতে হইবে। এইটাই নাকি স্বাভাবিক। কারণ, "পারিপার্শ্বিককে বঞ্চনা করে চলতে পারে এক মৃত যে সেই, জীবন্ত ব্যক্তি তার চারিদিককার আবহাওয়া থেকে রস গ্রহণ করেই জীবন্ত।" হিন্দুর কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া বাহবা নিবার জন্ত আমাদের একদল লেখক অনেক সময়ই অনেক রকম অপকর্ম্ম করিয়া থাকেন এবং সেই অপকীর্ত্তির জন্তই হিন্দু সম্পাদকগণ এই লেখকদিগকে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত হইয়া থাকেন, ইহা সকলেই বোধ হয় জানেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, শ্রীযুক্ত মোতাহের হোসেন সাহেব এবার আর সকলকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁর যুক্তি ও প্রমাণগুলি পাঠ করিয়া বস্তুতঃ অনেক সময় আমরা হাসি সম্বরণ করিতে পারি নাই।

তিনি বলিতেছেন—"পারিপার্শ্বিককে বঞ্চনা করে চলতে পারে এক মৃত যে সেই।" কথাটা কি ঠিক? আমরা জানি, পারিপার্শ্বিকের যাহা মন্দ, যাহা পচা ও বিষাক্ত, যাহা জীবন-স্ফূর্ত্তির পরিপন্থী, তাহাকে সাবধানে বর্জ্জন করিয়া চলাই সত্যকার জীবন ধর্ম্মের অপরিবর্জ্জনীয় বিধান। তরুলতাগুলি কি অসাধারণ আগ্রহের সহিত পারিপার্শ্বিক অন্ধকারকে বঞ্চনা করার চেষ্টা করিয়া থাকে—প্রকৃতির প্রত্যেক স্তরে 'কু'কে বর্জ্জন করিয়া, আশপাশের মারাত্মক বস্তুগুলির সংশ্রব হইতে দূরে সরিয়া গিয়া, 'সু'কে গ্রহণ করার যে অবিরাম সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া থাকে, "প্রকৃতি ও মুছলমানের" লেখক সাহেব কি জীবনে কখন সেদিকে লক্ষ্য করেন নাই? বস্তুতঃ চারিদিককার সব বস্তু হইতে রস সংগ্রহ করা জীবনের লক্ষণ নহে, বরং এই নির্ব্বিচার রস-সংগ্রহের প্রবৃত্তি, আশু ধ্বংসেরই পূর্ব্ব লক্ষণ।

প্রকৃতির পূজা করে ভগবানের স্পর্শলাভ করার, অর্থাৎ অসভ্যযুগের জড়পূজার অনুকূলে যে সব দার্শনিক যুক্তি এযাবৎ পৌত্তলিক-দার্শনিকেরা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, লেখক তাহার কএকটীর পুনরুক্তি করিয়া মুছলমানকে জড়পূজক হইতে উপদেশ দিয়াছেন, এছলামের "ভীষণ তাওহীদের দুর্দ্ধর্ষতা"কে এইভাবে মধুর করিয়া লওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে "দার্শনিক

লেখক বরকতউল্লাহ সাহেবের প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ 'সুফীমত ও বেদান্ত' হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করিয়া "স্বমত সমর্থনের" চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার উত্তরে মোতাহের হোসেন সাহেবকে জানাইয়া দিতে চাই যে, পার্সি সাহিত্য ও সুফী মতবাদ সম্বন্ধে মিঃ বরকতউল্লাহ আজ পর্য্যন্ত যে সব প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে মৌলিকতা কিছুই নাই। প্রকৃতপক্ষে সেগুলি হইতেছে ইংরাজী পুস্তকের এবং ইংরাজ লেখকদের সিদ্ধান্ত ও মতবাদের চর্ব্বিত চর্ব্বণ মাত্র। সুফী মতবাদ সম্বন্ধে তিনি যখন প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তখন পর্য্যন্ত ইংরাজ লেখকগণ সাধারণভাবে এই কথাই প্রকাশ করিতেছিলেন যে, সুফী মতবাদটা হিন্দুর বেদান্ত হইতে গৃহীত। অগত্যা বরকতুল্লাহ সাহেব তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কিন্তু ইদানীং কএক বৎসর হইতে সুফী মতবাদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত-পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহাদের শক্তিমান লেখকগণ এখন নিজেরাই নিজেদের পূর্ব্বমতের খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন—"সুফী মতবাদ এছলামেরই মৌলিক সৃষ্টি। হিন্দু বা পার্সিকদের নিকট হইতে উহা গৃহীত হইয়াছে বলিলে মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে।" সুফী মতবাদ হিন্দুর নিকট হইতে গৃহীত বলিয়া পূর্ব্বে যাঁহারা মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, নিজেদের মতের সমর্থনের জন্য, বেদান্তের অদ্বৈতবাদকে লইয়া তাহারা নিতান্ত অন্যায় ভাবে সুফীদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন। আমাদের দার্শনিক লেখক বরকতুল্লাহ সাহেবও অগত্যা তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি যদি অতঃপর তাঁহার প্রবন্ধটী পুনরায় মুদ্রিত করিতে ইচ্ছুক হন এবং অন্ততঃ অধুনা-প্রকাশিত ইংরাজী পুস্তকগুলি সংগ্রহ করার কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাকেও হয়ত আবার অন্য প্রকার প্রতিধ্বনি তুলিতে হইবে।

বেদ ব্যাখ্যা

মাঘের প্রবর্ত্তকে একটী রচনা হইতে—

কুটীরে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিতেছে। ভক্ত নরেশ তার সাম গান শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"এই সব কিসের মন্ত্র?"

সন্ন্যাসী—"সামবেদ।"

নরেশ—"বেদ না হিন্দুর ধর্ম্ম!"

সন্ন্যাসী—"হাঁ। ইসলামের এই বেদই কোরান, খৃষ্টানের বাইবেল। বেদের সঙ্গে পার্থক্য শুধু, বেদ অপৌরুষেয়, কোরান ও বাইবেলের রচনা কর্ত্তা মানুষই, তবে তাঁরা মহাপুরুষ ঈশ্বর-প্রেমিক।"

নরেশের কিন্তু এসব কথা হিয়ালী বলিয়া মনে হয়, "কারণ বেদেরও ঋষি আছে। সুতরাং বেদের রচনাও মানুষের, অতএব তাকেও অপৌরুষেয় বলা যাইতে পারে না। নরেশের এই প্রশ্নের উত্তরে সন্ন্যাসী ঠাকুর একসঙ্গে অভিজ্ঞতা ও দার্শনিকতার পরিচয় দিয়া বলিতেছেন:—

"দেখ নরেশ, মানুষে ও ভগবানে যে ভেদ, ঋষিদের জীবনে তা' ছিল না।

তাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়েছিলেন, তাঁদের···কণ্ঠে ভাগবত বাণীই নিঃসৃত হতো। এইজন্য বেদের বাণী ঋষির কণ্ঠ-নিঃসৃত হলেও ইহা ঈশ্বর বাণী।" কিন্তু নরেশ নাছোড়বান্দা। সে প্রশ্ন করিল, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও'ত এইরূপ দাবী করিতে পারেন। এই প্রশ্নের উত্তরে সন্ন্যাসী ঠাকুরের অকাট্য যুক্তি এই যে, হিন্দু যেমন নিজের বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া দাবী করে, খৃষ্টান মুছলমান প্রভৃতি অন্য কোন ধর্ম্মের লোক নিজেদের ধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধে সে প্রকার কোন দাবী করে না। হিন্দুর দেখাদেখি, এখন যদি তাহারা কেহ এরূপ দাবী উপস্থিত করে, তাহা হইলে সেটা 'অশোভনীয় জেদ' ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সন্ন্যাসী ঠাকুরের চরণ-দর্শনের সৌভাগ্য ঘটিলে আমরা তাঁহাকে বিনীতভাবে বলিতাম—হিন্দুর বেদ সম্বন্ধে তিনি যাহা ইচ্ছা বলুন, মুছলমান ও তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধে এই প্রকার অনধিকার চর্চ্চা ও অপ্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রচার করা তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক ব্যক্তির পক্ষে আদৌ শোভা পায় না। তিনি একটু সন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন, মুছলমান, খৃষ্টান, এহুদী প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীরা সকলেই ঠিক হিন্দুর মত নিজ নিজ ধর্ম্মগ্রন্থকে অপৌরুষেয় ও ভাগবতবাণী বলিয়া প্রথম দিন হইতেই দাবী করিয়া আসিতেছে। মুছলমানের ধর্ম্মগ্রন্থের নামই "কালামুল্লাহ" বা 'ভাগবত বাণী'। বেদের সঙ্গে পার্থক্য এই যে, বেদ নিজেকে কুত্রাপি ভাগবৎ বাণী বলিয়া দাবী করে নাই, শুধু হিন্দুরাই এদাবী করিতেছেন।

পক্ষান্তরে কোরআণ নিজে পুনঃ পুনঃ এই দাবী করিয়াছে। আর একটা পার্থক্য এই যে, বেদের শিক্ষা অনুসারে হিন্দুরা বেদব্যতীত জগতের আর সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থকে মানুষের রচনা সুতরাং ভ্রান্তি-প্রমাদ পূর্ণ বলিয়া বিশ্বাস ও প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু কোরআন জগতের সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থকেই আল্লার শাশ্বত-বাণী বলিয়া বিশ্বাস ও স্বীকার করিয়া থাকে। বেদ যদি আল্লার বাণী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহাতে মুছলমানের আনন্দিত হওয়ারই কথা। কারণ, পৃথিবীর সকল জনপদে আল্লাহ তাঁহার কালাম প্রেরণ করিয়াছেন—ইহা ত একমাত্র কোরআনেরই শিক্ষা।

হে ভিখারিণী আর কত চাও?

স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। গঙ্গার তীরে শীত-সন্ধ্যায় নিরাভরণা এক জীর্ণবাসা নারী উদভ্রান্তের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চির-ভিখারিণী – ভিক্ষা-পাত্র ভরা তার নর-কঙ্কালে! রাক্ষসী তবু ভিক্ষা চায়।

বলে, দাও, আরও দাও, কোটী মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছ, দাও—আমাকে দাও।

বিমুগ্ধ ধনী তাই দেয়। ভিখারিণী করতালি দিয়া হাসিয়া উঠে আর বলে, আরও দাও, ঐ তোমার রূপ, সুখ-সমৃদ্ধি, বিলাসিতার শত-সহস্র উপকরণ—

রিক্ত-ধন রাজর্ষি তাই দেয়।

তবু তার সাধ মেটেনা—বলে, দাও, আরও দাও, তোমার সমস্ত অতীতের স্মৃতি, তোমার বর্ত্তমানের সমস্ত ভাবনা, তোমার ভবিষ্যতের সমস্ত চিন্তা, তোমার শান্তি, তোমার তৃপ্তি, তোমার হাসি!

হাসিয়া তপস্বী বলে তাই দিলাম!

রাক্ষসীর তবু তৃপ্তি নাই। বলে তোমাকে দাও, তোমার পুত্র দাও, তোমার পরিজনকে—তোমার পুত্র-পরিজনের সমস্ত শান্তি আমাকে দাও!

মায়া-বন্ধন-মুক্ত উদাসী বলে, যখন চাহিয়াছ, কোন কৃপণতা করিব না। তাও দিলাম।

অট্টহাস্যে ভিখারিণী বলে, কিন্তু তোমার হৃদয়?

দানের উদগ্র নেশায় আত্মভোলা উন্মাদ বলে, তাও তোমাকে দিলাম। এই হৃদয় নিঙ্গাড়িয়া তাজা রক্ত তোমার চরণে ঢালিয়া দিলাম – বল ভিখারিণী তুমি তৃপ্ত?

রাক্ষসীর অট্টহাস্যের সহিত শীত-রাত্রির গঙ্গার মর্ম্মর ধ্বনি মিশিয়া গেল। জাগিয়া দেখি, প্রভাত আকাশকে রক্ত-বর্ণে রঞ্জিত করিয়া সূর্য্য উঠিয়াছে। রক্ত-ঝরা কিরণে গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-নর্ম্মদার স্রোত রঞ্জিত!

দেখি, আমার স্বপ্নে-দেখা ভিখারিণী কেশ এলাইয়া তেমনি দাঁড়াইয়া আছে—হিমালয়ের শৃঙ্গচূড়ায় তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়াছে, তাহার লুণ্ঠিত-অঞ্চল বিন্ধ্য-গিরির মেখলা ছাড়াইয়া মদ্র-দ্রাবিড়ে লুটাইয়া পড়িয়াছে,—এক হস্ত প্রসারিত গুজরাট-সিন্ধু-পাঞ্জাবে—আর হস্ত প্রসারিত বঙ্গ-বিহারে! আর শুনি, কোটী লোক কাঁদিতেছে, আত্ম-ভোলা উদাসী আজ হৃদয়-রক্ত দিয়া জীবনের সর্ব্বশেষ দান ভিখারিণীর চরণে ঢালিয়া দিয়াছে!

কোটী লোক কাঁদিতেছে, কিন্তু রাক্ষসীর চোখে অশ্রু নাই! প্রস্তর-দৃষ্টি লইয়া সে মহাকালের আগমন-পথের দিকে চাহিয়া আছে! চক্ষু তার নিষ্পলক, ওষ্ঠাধর সম্বদ্ধ!

হে ভিখারিণী আর কত চাও? জীবনের প্রতিসন্ধিক্ষণে এইরূপ আর কত অর্ঘ্য তুমি চাও? তিলক নাই, মারাঠা আর তোমাকে কি দিবে? চিত্তরঞ্জন নাই—বাঙ্গলা তোমাকে আর কি দিবে? আজমল খাঁ নাই—দিল্লী তোমাকে আর কি দিবে? লজপৎরায় নাই পাঞ্জাব আর কি দিবে? মজহারুল হক নাই বিহার আর কি দিবে? মোহাম্মদ আলী নাই আমরা তোমাকে আর কি দিব? মতিলাল নাই—নিরানন্দ এ ভারত-ভবনে বল আর কি চাও? কবে তোমার প্রস্তর দৃষ্টিতে আবার প্রাণ-স্পন্দন জাগিয়া উঠিবে? কবে তোমার এই চীরবাস আবার মণিমুক্তা-খচিত নীলাম্বরীতে পরিবর্ত্তিত হইবে? যাহারা আজ তোমার ভিক্ষার ঝুলি ভরিবার জন্য নিঃশেষে আত্মদান করিয়া গেল—কবে বল সেই সব মহা-আত্ম-বলিদান কোহিনুর হইয়া তোমার শির-ভূষায় শোভা পাইবে? সে কবে? —সাপ্তাহিক মোহাম্মদী

Printed and Published by Md. Khairul Anam Khan from the "Mohammadi Press,"
91, Upper Circular Road, Calcutta.

বহু প্রদর্শনীতে
স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত

"স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরী"

ফোন নম্বর
৩৫৫২ বড়বাজার।

জুয়েলার্স ও হস্তী দন্তের জিনিষ এবং স্বর্ণ অলঙ্কার নির্ম্মাতা। ২১৩, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কংগ্রেস চুড়ি (টালি প্যাটার্ণ)

স্বর্ণবর্ণের মেটেলের ফ্রেমে গিনি স্বর্ণের এনগ্রেভ পাতে মোড়া, ঠিক নিরেট সোণার চুড়ির ন্যায়। মূল্য প্রমাণ প্রতি জোড়া ১৮॥০

ললনা সোহাগ রুলী

হস্তী দন্তের লাইন মোড়া রুলীর উপর গিনি স্বর্ণের পাতে মোড়া। মূল্য প্রমাণ ১০৸০, ছোট ৭॥০।

তার প্যাচ রুলী (সরু)

হস্তী দন্তের সরু প্যাচকাটা রুলীর উপর গিনি স্বর্ণের সরু পাতে মোড়া। মূল্যপ্রমাণ ১২॥০ ছোট ৮৷৵০ আনা।

পাতাওয়ালা ইয়ারিং

১২॥০—১৫৲

কলগেট মাকড়ী

১২॥০—২০৲

ঘোড়ার ক্ষুর আংটী

১৫৲—৩০৲

কাণফুল

১০৲—১৫৲

প্লেন কুমারী মাকড়ী

৬।০

ইহা ব্যতীত জড়োয়া গহনা ও গিনি স্বর্ণের যাবতীয় অলঙ্কার সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। মফঃস্বলের অর্ডার ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। খাঁটী গিনি সোনার গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। সচিত্রক্যাটালগের জন্য ৵০ ষ্ট্যাম্প পাঠান। মওলানা মোহাম্মদ আলী লিখিয়াছেন, আমি "স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরীর" সুসজ্জিত দোকান দেখিয়াছি ইহাদের কাজ সুন্দর এবং কারুকার্য্য সমন্বিত। আমি এই দোকানের ক্রমোন্নতির কামনা করি। ১৩ই জানুয়ারী ১৯২৫।

ডাক্তারের সুনাম কিসে হয় ?

যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে ডাক্তারের সুনাম বাড়ে কিসে, কিসে চিকিৎসকগণ সুচিকিৎসক বলিয়া প্রতিপন্ন হন, তাহা হইলে সে প্রশ্নের উত্তরে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই বলিবে

ডাক্তারের সুনাম ও সুযশ হয় বিশুদ্ধ ঔষধে

যমের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন এমন কোন চিকিৎসকও যদি বিশুদ্ধ ঔষধ না পান, তাহা হইলে তিনি এমন কি সামান্য অসুখও ভাল করিতে পারেন না, ইহা অতি খাঁটি কথা। বিশুদ্ধ ঔষধ কোথায় পাওয়া যায়, এই কথা যদি আপনি জানিতে চান, তবে আপনার পরিচিত সমস্ত প্রসিদ্ধ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করুন। তাঁহারা বলিবেন

গুড লাক হোমিও ষ্টোরস

এর ঔষধ বাজারের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। তাঁহাদের প্রস্তুত ঔষধে কোন কৃত্রিমতা নাই। মফঃস্বলে অর্ডার সমূহও অতি যত্নের সহিত বার বার চেক করিয়া সত্বর পাঠাইয়া থাকেন। সুতরাং আপনি যদি বিশুদ্ধ ঔষধ ব্যবহার করিতে চান তবে আজই পত্র লিখুন। দামও খুব সস্তা প্রতি ড্রাম ৴৩, ৴১০

জে, বলড়ুইন—ম্যানেজার গুড লাক হোমিও ষ্টোরস,

পোষ্ট বক্স নং ১০৮২২, কলিকাতা।

জি, রায় এণ্ড কোং,

সম্পূর্ণ স্বদেশী উপাদানে, স্বদেশী পরিশ্রমে ও স্বদেশী মূলধনে পরিচালিত।
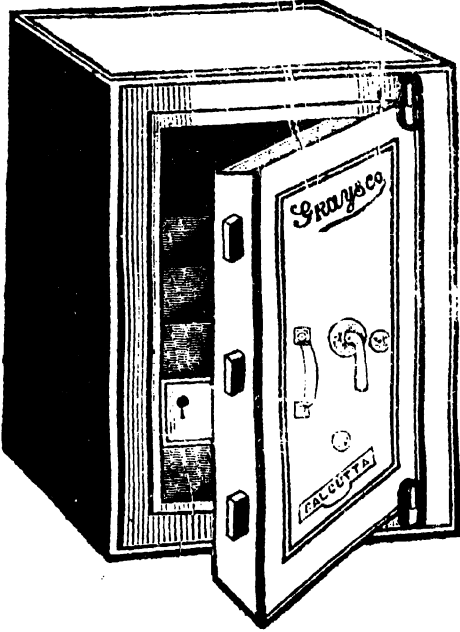
আগুন, চোর, ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়—জি, রায় এণ্ড কোম্পানীর লোহার সিন্দুক, আলমারী ও তালা। গভর্ণমেণ্ট আফিস, ব্যাঙ্ক, লোন আফিস, মার্চ্চেণ্ট আফিস সমস্ত জায়গাতেই উক্ত কোম্পানীর সিন্দুক, আলমারী ও তালা আদরে গৃহীত হইতেছে।

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৭০।১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন নং ১৮৩২ কলিকাতা

The Kohinoor Footwear Co.

31/8, Lower Chitpur Road, Calcutta.

দি কোহিনুর ফুটওয়ার কোং,

সর্ব্বপ্রকার স্বদেশী

—উচ্চ-শ্রেণীর জুতা প্রস্তুত কারক—

এইখানে সর্ব্বপ্রকার জুতা পাইকারী ও খুচরা সুলভ দরে বিক্রয় হয়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দেশের ও দশের নিকট সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

প্রতারিত হইবার ভয় নাই।

হেড আফিস :—রেঙ্গুন।

শাখা :—আগরা।

বিনামূল্যে

হিষ্টিরিয়ার মাদুলি। ডাঃ মাঃ বাবদ ।/০ আনার টিকেট পাঠাইলে পাঠান হয়।

প্রমেহ বিন্দু।

প্রমেহ রোগের (গণোরিয়ার) অব্যর্থ ঔষধ। ২ দাগে জ্বালা যন্ত্রণা আরোগ্য হইয়া রোগ উপশম হয়। মূল্য ।।০ টাকা

স্বপ্ন বিনোদ বটী।

সকল প্রকার স্বপ্নদোষের মহৌষধ। মূল্য ১ টাকা। ডাঃ মাঃ ।/০ আনা।

ঢাকা আর্য্য-শক্তি ঔষধালয়।

কবিরাজ—শ্রীহেমন্তকুমার দাস শর্ম্মা

এল, এ, এম, এস, ; ভিষগরত্ন

১৫৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা।

একদিকে মূল আরবী তাহারই পার্শ্বে শাব্দিক অনুবাদ পরে বিস্তৃত ভাবার্থ

তফছিরের বিশেষত্ব

সিদ্ধ হাতের অনুপম অনুবাদ পাঠককে মোহিত করিয়া তুলিবে। মূলের ধারা, গাম্ভীর্য্য ও ঝঙ্কারকে সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়া বাঙ্গলা ভাষায় কোরআনের এমন সরল ও সুন্দর অনুবাদ কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

উহার টীকা ও ব্যাখ্যায় বর্ত্তমান যুগের সব জিজ্ঞাসার উত্তর এবং সব সমস্যার সমাধান পাঠকগণ পাইবেন। অধিকন্তু তাঁহারা উহাতে খুঁজিয়া পাইবেন এছলামের সেই বিস্মৃতপূর্ব্ব প্রাণশক্তির সন্ধান—যাহার অভাবে জীবন-যাত্রার সকল দিকেই মুছলমানের মন ও মস্তিষ্ক আজ পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে।

কোরআনের শিক্ষাকে এবং তাহার সত্যকে, নিজের দীর্ঘকালের গভীর সাধনার দ্বারা সত্যকার জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা শাস্ত্র ও সাহিত্যের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা এই তফছিরে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। যে সকল অন্ধ বিশ্বাস ও আজগুবী কেচ্ছা-কাহিনী তফছিররূপে উপস্থিত হইতে ছিল—অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা তাহা খণ্ডন করা হইয়াছে।

ভিতরের গুণের ন্যায় বাহিরের সৌন্দর্য্য-সৌষ্ঠবেও তফছির খানা সত্য সত্যই অনুপম হইয়াছে। তেলাওতের সুবিধার জন্য জর্ম্মানী হইতে যে নূতন টাইপ আনান হইয়াছে, তাহাতে ছাপার দরুণ মতনটা উচ্চ শ্রেণীর পাথরের ছাপার মতনই দেখাইতেছে।

ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই মনোরম

প্রকাশক :—মোহাম্মদী বুক এজেন্সী,
৯১নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

Printed at The "Mohammadi Press" 91 Uppe Circular Road, Calcutta.

চৈত্র

বার্ষিক মূল্য সডাক তিন টাকা ছয় আনা সম্পাদক—মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা

বর্ত্তমান এই বিংশ শতাব্দীর বস্তু তান্ত্রিক উন্নতির যুগে

এছলামকে অচল এবং তামাদী প্রতিপন্ন

করিবার জন্য কয়েকজন নব্য শিক্ষাভিমানী মোছলমান এবং অ-মোছলমান কিছুদিন হইতে যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করিতেছিলেন তাহার প্রত্যেকটীর অকাট্য শাস্ত্রীয় যুক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ভাবে উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

—আবার অন্যদিকে—

এছলামের সত্য, সুন্দর এবং সনাতন রূপকে প্রাচীন-পন্থী আলেমগণের বহুকালের সংস্কারের আবর্জ্জনা হইতে মুক্ত করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে আর এই জন্য এই পুস্তকের নাম রাখা হইয়াছে—

সমস্যার বিষয়ঃ—

১। এছলামে নারীর মর্য্যাদা ও অধিকার
(বর্ত্তমান নারীর প্রগতির যুগে)

২। সুদ-সমস্যা
(বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সমস্যার দিনে)

৩। সঙ্গীত-সমস্যা
(বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খলতা এবং ব্যভিচারের দিনে)

৪। চিত্রকলা ও এছলাম।
(বর্ত্তমান প্রচারের প্রোপাগাণ্ডার এবং অর্থের উন্নতির কালে)

সমস্যা ও সমাধান

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রণীত

বহু শিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া জোনাব মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের বহুদিনের সাধনা এবং গবেষণার ফলে যে সমস্ত প্রবন্ধগুলি "মাসিক মোহাম্মদীতে" ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলি বহুস্থানে প্রচারের উদ্দেশ্যে পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হইল।

যে সমস্ত প্রশ্নগুলি এ পর্য্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষিত বিশ্বাসী মোমেন-মোছলমানের হৃদয়-দুয়ারে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিত, আর তাহার সন্তোষজনক উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না এবং যে সমস্ত বিষয়ের সুযোগ লইয়া প্রতিপক্ষ শক্তি সঞ্চয় করিত, তাহার প্রত্যেকটীর সমাপ্তি হইয়াছে।

ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর

দাম এক টাকা চারি আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থানঃ—মোহাম্মদী বুক এজেন্সী,
৯১নং আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা

বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন

সূচীপত্র—চৈত্র ১৩৩৭

ঘোষ ব্রাদার্স—ম্যানুফ্যাক্‌চারিং জুয়েলার্স

ফোন বড়বাজার—২২৫৯ টেলিগ্রাম—"GOSEVRATA" Calcutta.

জুয়েলারিম্যান্‌সন, ১১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা
স্বর্ণ অলঙ্কার গ্রাহকদিগের
একমাত্র বিশ্বাস্য স্থান।
আমরা স্বর্ণ অলঙ্কার প্রস্তুত ব্যবসায়ে
যুগান্তর আনয়ন করিয়াছি।
কারণ আমাদের প্রস্তুত অলঙ্কার ব্যবহারান্তে
আমাদের নিকট বিক্রয় করিলে আমরা পানমরা
বাদ না দিয়াই গিনি সোনার মূল্যে খরিদ করি।

ইহাই কি আমাদের সততার অগ্নিপরীক্ষা নয়?

আমাদের প্রস্তুত গহনা যেমন সুন্দর তেমনি খাঁটি
৵০ আনার ষ্টাম্প পাঠাইলে আমাদের ক্যাটালগ পাঠাই।

শ্রীঅমূল্যধন পালের

বেঙ্গল শটী ফুড

আজ বেঙ্গল শটী ফুডের এত নাম ও আদর কেন? বেঙ্গল শটীফুড আদি অকৃত্রিম ও সম্পূর্ণ দেশীয় উদ্ভিজ্জ উপাদানে প্রস্তুত। ইহা যেমন লঘু ও পুষ্টিকর তেমনি শিশু ও রোগীর একমাত্র খাদ্য ও পথ্য। ইহা গুণে ও উপকারিতায় বিলাতি ও দেশী সর্ব্বপ্রকার বার্লি, এরারুট ও কর্ণফ্লাওয়ার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সব কারণে বেঙ্গল শটী ফুডের আদর ও সুনাম। প্রত্যেকের নিকট ইহা ব্যবহারে সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবেন। বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে মুগ্ধ না হইয়া ব্যবহার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

বেঙ্গল শটী ফুডের জন্য সহর ও মফঃস্বলের প্রত্যেক ডাক্তারখানায়, সকল দোকানে ও নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

শ্রীঅমূল্যধন পাল

প্রসিদ্ধ বেনিতি মসলা বিক্রেতা, ম্যানুফাকচারার অর্ডার সাপ্লায়ার ও কমিশন এজেণ্ট
১১৩।১১৪নং খোঙ্গরাপটী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীপত্র—চৈত্র ১৩৩৭

সূচীপত্র—চৈত্র ১৩৩৭

জয় কর অনিদ্রা ব্যাধি

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যই নিদ্রাহীনতার প্রধান কারণ—সুতরাং সুনিদ্রার সুখ উপভোগ করিতে হইলে অগ্রে স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতারূপ ব্যাধির আরাম করা উচিত।

স্যানাটোজেন সেবন করুন, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতার অবসান হইবে। কারণ—স্যানাটোজেনে এরূপ উপাদান যথেষ্ট পরিমাণেই আছে যাহাতে স্নায়ু পুষ্ট হয়—দেহ গঠিত হয়—এবং প্রচুর বল হয়।

লণ্ডনের একজন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার লিখিতেছেন :—

"আমার একজন রোগী বহু দিন যাবত অনিদ্রা রোগে কষ্ট পান। সুনিদ্রা হইবার জন্য বহু ঔষধ তাঁহাকে সেবন করান হয়—কিন্তু কোন ফল দর্শে নাই। অবশেষে স্যানাটোজেন সেবন করাইয়া—মাত্র এক পক্ষকাল ব্যবহার করিয়াই—তাঁহার স্বাস্থ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়—এবং শেষে সুনিদ্রাও হইতে থাকে।"

মাত্র কয়েক সপ্তাহ স্যানাটোজেন ব্যবহার করিলেই যাবতীয় স্নায়ুবিক দৌর্ব্বল্য দূর হয়—স্বাস্থ্যেরও বেশ উন্নতি হয় এবং রাত্রেও বেশ সুনিদ্রা হয়।

আজই এক বোতল স্যানাটোজেন কিনুন।

SANATOGEN

আদর্শ টনিক খাদ্য।

সকল ঔষধালয়ে ও বাজারে প্রাপ্তব্য।

স্যানাটোজেন প্রস্তুত বা প্যাক করিবার সময় হস্তদ্বারা স্পর্শ করা হয় না এবং জাতি বা ধর্ম্মনাশক কোনরূপ পদার্থ ইহাতে নাই।

মার্কোজোন কেন চাই ?

কারণ—

"মার্কোজোন" হাইড্রোজেন পারোক্সাইড (১২ ভাগ) লেবেলের উপর যেমন লিখিত আছে "মার্ক" ঠিক তেমনই বিশুদ্ধ, স্থায়ী ও শক্তিশালী।

কারণ—

যাহার গুণ ও পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে এমন কোন নিকৃষ্ট বস্তু দ্বারা আপনাকে যাহাতে প্রতারিত করিতে না পারে এজন্য ঐ নামটী ব্যবহার করা হইয়াছে।

সুতরাং

হাইড্রোজেন পারোক্সাইড না চাহিয়া "মার্কোজোনই চাহিবেন—এবং তাহাই পাইলেন কি না দেখিয়া লইবেন। এবং ইহা ডার্মষ্টাড, হেসী, জার্ম্মানীতে ই, মার্ক কর্ত্তৃক প্রস্তুত।

"মার্কোজোন না হইলে গৃহস্থালী চলে না।

হাজার হাজার কাজে এই জিনিষের ব্যবহার হয়।

MERCKOZONE

৪, ১০ ও ২০ আউন্সের পেটেন্ট বোতলে পাওয়া যায়।

সর্ব্বত্রই বিক্রয় হয়।

ড্রাম /৫ এস্, কে, রায় এণ্ড কোং ড্রাম /১০

এমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী

৯, বনফিল্ডস্ লেন।

হেড অপিস ৯নং বনফিল্ডস লেন, ব্রাঞ্চ ২১৬ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বিশুদ্ধ ও টাট্কা আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ড্রাম /৫ ও /১০ পয়সা। কলেরা ও গৃহচিকিৎসার ঔষধ একখানি চিকিৎসা পুস্তক ও ১টা কৌটা ফেলিবার যন্ত্রসহ বাক্স ১২. ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ৮৪, ১০৪ শিশি পূর্ণ যথাক্রমে—২৲, ৩৲ ৩৷০, ৫৷০, ৬৸/০ ৯৲, ১০৸/০—বাইওকেমিক ঔষধ পূর্ণ বাক্স, পুস্তক ও স্পুনসহ ১২টি এক ড্রাম কিংবা দুই ড্রাম ঔষধ পূর্ণ শিশিসহ যথাক্রমে ২৷০ ও ৩৸০, ঐ ৪ ড্রাম বাক্স সাড়ে ৬৷০, মাশুলাদি স্বতন্ত্র। সুগার অফ মিল্ক, গ্লোবিউল, পিলিউল, কার্ডবোর্ডের কেস, থার্ম্মোমিটার, ষ্টিথিস্কোপ টিউব শিশি, সিরিঞ্জ, হাইপো-সিরিঞ্জ, ভেলভেট কর্ক, ডিসপেন্সিং, কর্ক নানাবিধ শিশি, পুস্তক, যন্ত্রাদি এবং চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়। প্রত্যেক অর্ডার অতি যত্ন সহকারে যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে সরবরাহ করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আমাদের জিনিষ সর্ব্বাংশে উচ্চাঙ্গের ও সুলভ, আমাদের খরিদ্দার বিশিষ্ট ক্লাব, কলেজ, স্কুল, মাদ্রাসা, মক্তব প্রভৃতি—আজই সচিত্র ক্যাটালগের জন্য "মোহাম্মদী" পত্রিকার নাম উল্লেখ করিয়া পত্র লিখুন।

বি, রায় এণ্ড কোং,

৪৯নং হ্যারিসন রোড,

কলিকাতা।

* * দীর্ঘকাল অভিজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার * *

* লেফটেনাণ্ট এ, শুকুর *

এল, আর, সি, পি, এল, আর, সি, এস, (এডিনবার্গ) এল, আর, এফ, পি, এস (গ্লাস-গো)

ডাক্তারখানা—১৭নং হগ ষ্ট্রীট,

(এলফিন্‌ষ্টোন বায়স্কোপের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত)

সকাল ৯টা হইতে ১১টা এবং বিকাল ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত ডিস্পেন্সারীতে উপস্থিত থাকেন। পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা হইতে ১২॥০টা এবং অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৮॥০টা পর্য্যন্ত ঔষধালয় খোলা থাকে।

দীর্ঘকাল যাবত চিকিৎসা কার্য্যে রত থাকিয়া ডাক্তার সাহেব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। দুই বৎসরকাল ইংলণ্ডে থাকিয়া তিনি লক্ষ লক্ষ রোগীকে রোগমুক্ত করিয়াছেন। তিনি ধ্বজভঙ্গ ও ধাতু সম্বন্ধায় যাবতীয় রোগে অদ্বিতীয়। তিনি নিজে সবিশেষ যত্ন সহকারে রোগীদিগকে দেখিয়া থাকেন।

একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাসস্থান ঃ—৭।১সি নং লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, হগ মার্কেটের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

সাক্ষাতের সময় ঃ—লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে বিকাল ৩টা হইতে সন্ধ্যা ৫টা।

তাঁহার ডাক্তারখানায় যে সকল রোগী চিকিৎসার্থ আগমন করিয়া থাকেন, তিনি তাঁহাদিগকে বিনাফিসে ব্যবস্থা দেন।

অন্যত্র তিনি ১৬৲ টাকা ফিসে রোগীর চিকিৎসা করেন।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে লজেনজুস প্রস্তুতকারক

দারুণ গ্রীষ্মে ও বর্ষায় আমাদের লজেনজুস জমিয়া বা রসিয়া যায় না।

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান **বিখ্যাত মধু লজেনজুস** একমাত্র প্রাপ্তিস্থান

এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকার চুরুট ও সুগন্ধি "হাইকোর্ট" চুরুট প্রস্তুতকারক।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জগবন্ধু লোজেঞ্জ ফ্যাক্টরী,

৬নং হ্যারিসন রোড, শিয়ালদহ, কলিঃ।

MORE BETTER

Drink Indian Special Darjeeling Tea.

Fresh & Pure. Airtight.

The

East India Tea Agency & Co.

35, Harrison Road, Calcutta.

Phone. B B, 4289.

Ask for free Sample Packet.

পাকা খেজাব

ইহার রং যথার্থই পাকা। পরেও বিবর্ণ হয় না, চামড়ায়ও দাগ পড়ে না। পাকা চুল ঠিকই যৌবনের কাঁচা চুলে পরিণত হয়। ১ শিশিতে প্রায় ৩ মাস চলে। ব্যবহার প্রণালীও অতি সহজ। ব্রুশ সহ প্রতি শিশি ১৷০ পাঁচ সিকা।

লোমনাশক আরক ইহাতে ২।৩ মিনিটেই অতি আরামে লোম নির্ম্মূল হয়। প্রতি শিশি ।০ আনা মাঃ ৴০

টাউন এজেন্সী,

২০নং হলওয়েল লেন, মৃজাপুর, কলিকাতা।

মোস্লেম স্পোর্ট'স্ এজেন্সী,

৪২নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বহুদিন যাবৎ মুসলমান ভ্রাতৃগণের জন্ত বিশেষ ভাবে খেলার সরঞ্জাম সাপ্লাই করার কোন বিশিষ্ট কার্য্য না থাকায় আমরা বিশেষ চেষ্টার ফলে এই অভাব দুরীকররণে সমর্থ হইয়াছি। একমাত্র আমাদের নিকট হইতে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র প্রতরণার ভয় নাই। পরীক্ষা করিলেই বুঝিবেন আমাদের দর বাজার অপেক্ষা সুলভ এবং অপছন্দ হইলে মাল ফেরৎ লইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকি।

স্বদেশী ফুটবল।

৫নং ব্লাডার সহ সুলতান

	(১৮ পেনেল)	১১৲
৫নং " "	" ক্রোম লেদার	১৪৲
ঐ "	" আফগান (১২ পেনেল)	১০৲
ঐ "	" মোগল (১০ পেনেল)	৮৲
ঐ "	" পাঠান (৮ পেনেল)	৬৲
৪নং "	" আফগান (১২ পেনেল)	৭৲
৪নং "	" মোগল (১০ পেনেল)	৬৲
ঐ "	" পাঠান (৮ পেনেল)	৪৲
৩নং "	" আফগান (১২ পেনেল)	৪৲
৩নং "	" পাঠান (৮ পেনেল)	৩৲
২নং "	" পাঠান (৮ পেনেল)	২৲

ব্লাডার।

৫নং লায়ন ব্রাণ্ড	২॥০
৫নং উৎকৃষ্ট	১৸০
৪নং "	১৷০
৩নং "	১৷০
২নং "	১৲

ইনফ্লাটার।

নিকেল বড় ২৲, নিকেল মাঝারী ১॥০ ও

নিকেল ছোট ১৲

লেসিংঅল ।৵০ ও ।৵০

হুইসল ॥৵০ ও ।৵০

সলুসন ।৵০ ও ।০

ক্লপবুক ।০ লেস ৸০ ডজন

দ্রষ্টব্য ঃ—হিন্দুদিগের অর্ডারও যত্ন সহকারে সাপ্লাই করা হয়।

Imperial Art Cottage.,

High Class Lithographers & Fashion Printers.

1, Tagore Castle Street,

CALCUTTA.

PHONE B. B. 1924

৫০০৲ টাকা পুরস্কার

মহাত্মা প্রদত্ত শ্বেতকুষ্টের অদ্ভুত বনৌষধি একদিনে অর্দ্ধেক ও অল্পদিনে সম্পূর্ণ আগোরা হয়। যাঁহারা ডাক্তার, বৈদ্য ও হাকিমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই দৈব প্রদত্ত ঔষধ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। গুণহীন প্রমাণিত হইলে উপরোক্ত ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। মূল্য দুই টাকা। শ্রীঅখিলকিশোর রাম, নং ৭৪, পোষ্ট কাটরী সরাই (গয়া)

মনোমত —!
"বাঃ বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে
তো! রোজই তো কামাও
কিন্তু কৈ কোনও দিনই
এমন পরিষ্কার হয় না কেন?"
Ever-Ready
Safety Razor
এভার রেডী ক্ষুরে
যেমন সহজে ও সুন্দররূপে কামান যায়
এমন আর অন্য কোনও ক্ষুরে সম্ভবপর নয়।
'এভার রেডী'
ব্লেডগুলিরও
বিশেষত্ব আছে।
C. B. সেট ১ ব্লেডযুক্ত
"ট্রায়েল আউট ফিট"
মূল্য ।৶০ আনা
দুই ব্লেডযুক্ত গোল্ড প্লেটেড
সেট (লাল বাক্সে)
মূল্য ॥৶০ আনা
দুই ব্লেডযুক্ত "পপুলার"
সেট মূল্য ৸০ আনা
আমেরিকান সেফ্‌টী রেজর কর্পোঃ লিঃ
পোষ্ট বক্স নং ৯৮
কলিকাতা
PUBLICITY STUDIO
২

Annual Contract Rate— **Buyers' Guide.** Annas Eight Per Line.

TRY ONCE
Day's Pure Darjeeling Tea.
The Himalayan Tea Syndicate.
15, Shama Charan Dey St, Cal.

Darjeeling Tea House.
25 Harrison Road, Cal.
(Mofussil orders delivered freight free)

S. C. Karmaker.
Musical Instruments Maker.
68, Upper Chitpore Road, Calcutta.

The House of Fashion.
We guarantee our cut and fit to suit of all Taste ; specialist in Breaches.
Md. Ibrahim & Bros,
162/1, Dharamtolla St, Calcutta.

Spectacles of all Sorts
At a Cheap price but of dear quality Tooth binding one Rupee each to be had at J. DASS & CO, *108, Cornwallis Street, Calcutta.*

মেরামত!
রেডিও, লাউড্, টাইপ রাইটার
স্পিকার, হেড্‌ফোন গ্রামোফন, সেলাইয়ের
ইলেক্‌ট্রিক বাতি কল, ইত্যাদি
পাখা, ইত্যাদি যাবতীয় কল-
ইলেক্‌ট্রিকের কাজ কব্জার কাজ
সমস্তই করিয়া থাকি ; দর সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ।
অটোমেটিক ওয়ার্কস্‌,
১০৪, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

Haripada Nandan & Co.
Gold & Silvers Smiths Electro-platers Engravers. Cups, Medals, etc
28, Sambhu Nath Pandit St, Cal.

Dass Brothers & Co.
Estd 1920.
Fountain Pen Repairing Specialty.
49, Harrison Road, Calcutta.

Messrs. M S. Chadda & Co,
Cheapest & Best Sports Dealers in the East.
30, Elliot Lane, Calcutta.

কবিরাজ শ্রীযতীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তীর দদ্রু বিজয়, ক্ষতারি মলম, ক্ষতান্তক ঘৃত—ইত্যাদি ব্যবহার করিলে ২৪ ঘণ্টার নিশ্চয় ফল পাইবেন পরীক্ষা প্রার্থনীয়। বিশেশ্বর আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় ২৫ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

The East Bengal Laundry
4, Wellesly Street, Calcutta.
Art Dyers High Class Cleaners and Bleachers.

Bengal Engineering Co.
Electrical Engineers & Contractors.
8/2, Hastings Street, Calcutta.

DULIA TYPEWRITER CO.,
Dealers in rebuilt Typewriters all makes. Repairers & Accessories.
12, Clive Street, Calcutta.

Dental-Home.
159/A, Lower Circular Rd,
(Near Entaliy Market.)
Treats all Dental cases scientificalls.

হাজি মোহাম্মদ জাফর তুর্কি
প্রসিদ্ধ তুর্কি ও পাহলবী টুপী বিক্রেতা আমরা আসল ইস্তাম্বুল টুপী আমদানী করিয়া থাকি।
১৪২ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

ধবল ও কুষ্ঠের ঔষধ
রোগ বিবরণ সহ পত্র লিখুন। পণ্ডিত এস শর্ম্মা, দেশবন্ধু আয়ুর্ব্বেদ ভবন, ২৬।৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

The Basanti Insurance Co. Ltd.
31, Ashutosh Mukherji Road,
Calcutta.
Particulars on application

যদি পয়সা দিয়ে ঠকতে না চান, ভারত সোপ ওয়ার্কসের সাবান ব্যবহার করুন। ভারত সোপ ওয়ার্কস B. S. W. & B. K. G. মার্কা দেখিয়া ল'বেন। Chief Agent—শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র গাঙ্গুলী B. S. B. ইটালী মার্কেট।

Canvas & Paulins Manufacturers.
30, Clive Street, Calcutta.

Dr. K.K. Roy, M. D. (California, U.S.A)
Specialist in Chronic Diseases.
Hours : 1 to 2 P. M. & 7 to 8 P. M.
10/A. Madge Lane, off Lindsay St, Cal.

Anundo Chunder Ghose, Esd, 1850.
Jeweller. Clock & Watch Manufacturer.
128, Radha Bazar Street, Calcutta.
(Orders Promptly Served)

K. Abdul Aziz.
Wholesale and Retail Dealers Of
Darjeeling Tea.
102, Princep St., Cal.

কাটিং শিক্ষার উৎকৃষ্টপুস্তক—
ওস্তাগর
পুস্তকালয়ে বা ৭, আশু বাবু লেন, খিদিরপুর, কলিকাতা।

FITWELL
Tailors & Outfitters
26-2, Wellesley St, Calcutta.
Specialist in Silk Shirts, Stock materials for suiting & make suits to order. Charges Cheap, delivery prompt.
Come & Inspect

Popular Engraving Co.,
"Brass-Door-plate Engravers"
Rubber-Stamp Manufacturer.
8/A, Lall Bazar St, Cal.

মওঃ মোহাম্মদ আলী মরহুমের
ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ফটো
ফ্রেমে বাঁধাইয়া ঘরে রাখিবার উপযোগী
মূল্য /০ আনা, ডজন ।০ আনা, মাঃ স্বতন্ত্র। বিঃ দ্রঃ—পাঁচখানির কম ভিঃ পিঃ করা হয় না। অর্ডারের সঙ্গে ১ খানির জন্য—৴১০, ২ খানির জন্য—৶১০, ৩ খানির জন্য—।০, ৪ খানির জন্য—।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।
ম্যানেজার—**মোহাম্মদী প্রেস,**
১১নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

It's the Shortest Way to success!

ঝড়ের দোলায় আসিছে চৈত্র আজ

মোহাম্মদী প্রেস

BECOME YOUNG AGAIN!

Regain your Vanished Age, Elasticity, Vigour and Energy

—BY—

"NERVI GOL"

Price Rs. 5/- A really Sensational discovery. **per Set.**
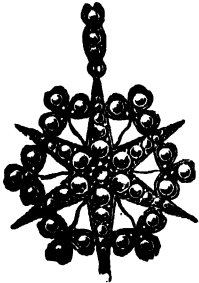
FORWARD LABORATORY.

Post Box No 2047 **CALCUTTA.**

স্থাপিত ১৮৩৩

আধুনিক ডিজাইনের অলঙ্কার ও ঘড়ি

আমাদের নিকট জিনিস লইলে শতকরা ১৫৲ টাকা কমিশন পাইবেন।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং,

১৪নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সোল এজেন্টস্ :—বেনলোমণ্ড ওয়াচ কোং ও দি, পি, ওয়াচ কোং,

Post Box No. 337 Cal. Phone :—5580 CAL.

বিখ্যাত জুতা প্রস্তুতকারক

বাহিরের অর্ডারী কাজের সুবন্দোবস্ত আছে।

ঘোষ ব্রাদার্স,

৩০, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলিঃ

CALCUTTA PAINTING WORKS

Prop. A. Mukherjee. **69B, Mirzapur Street, Calcutta.**

Scene, Sign-board & Wall Painters

Engravers & Rubber Stamp Makers

রিবিল্ট টাইপরাইটার কোং,

সর্ব্বপ্রকার নূতন, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ও রিবিল্ট টাইপরাইটার ও রিবন কারবণ পেপার, ইরেজার কপি রাখিবার ইত্যাদি সরঞ্জাম বিক্রেতা।

৮৩।এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন নং ৯০৩ কলিকাতা।

বিশুদ্ধ ঔষধের উপরই রোগ মুক্তি ও চিকিৎসকের যশ নির্ভর করে।

ড্রাম /৫ দি ড্রাম /১০

ন্যাশনাল হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী

যে কোন ঔষধালয়ের সহিত আমাদের ঔষধ তুলনায় পরীক্ষা করুন। উৎকৃষ্ট কর্ক ও ইংলিশ শিশিতে প্রতি ড্রাম /৫, /১০ পয়সা বাইওকেমিক ঔষধও আমাদের নিকট পাওয়া যায়।

পরিচালক—টী, সি, চক্রবর্ত্তী, এম, এ,
২০৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কলেরা ও গৃহ চিকিৎসার ঔষধপূর্ণ বাক্স, পুস্তক, কৌটা কেস্, যন্ত্র এবং এক শিশি ক্যাম্ফার সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ৮৪ ও ১০৪ শিশি বাক্সের মূল্য যথাক্রমে—২৲, ৩৲, ৩।০, ৫।০, ৬৷৹০, ৯৲ ও ১০৷৵০ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

It's the Shortest Way to success!

পঞ্চাশ বৎসরের স্থাপিত

বাঙ্গালী জহরীর দোকান

আমাদের নিকট নূতন ফ্যাসানের জহরতের অলঙ্কার উচিৎ মূল্যে খরিদ করুন

সাচ্চা জিনিষের গ্যারাণ্টি পাইবেন।

অন্যত্র বিদেশীয় দোকানদারের নিকট খরিদ করিবার পূর্ব্বে আমাদের সততার পরীক্ষা করুন।

দেশের দশের নিকট সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

এলাহাবাদ একজিবিসনে সুবর্ণপদক প্রাপ্ত—

ভারতের রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষিত।

বিনোদবিহারী দত্ত,—ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার

একমাত্র ঠিকানা :—

১-এ বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, মারকেণ্টাইল বিল্ডিং, কলিকাতা।

ফোন—৫৭৪, কলিকাতা।

চৈত্র, ১৩৩৭ চতুর্থ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা

গণিত ও গণতন্ত্র

মোহাম্মদ আকরম খাঁ

(৮)

আদম শুমারীর রিপোর্ট লইয়া একটু গভীর ভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে কএকটা সত্য প্রথমে অতি জটিল সমস্যারূপে আমাদের সম্মুখে প্রকট হইয়া উঠে। আমরা সেখানে দেখিতে পাইব যে, বাঙ্গলাদেশে মোট মুছলমান নারী অপেক্ষা মুছলমান পুরুষের সংখ্যা ৭, ২২, ৪৯০ জন অধিক। হিসাবটা নিম্নে উদ্ধার করিয়া দিতেছি :—

মোট মুছলমান পুরুষ	...	১৩১০৪৩০৭
" নারী	...	১২৩৮১৮১৭
		৭, ২২, ৪৯০

এই সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও দেখিতে পাইব যে, শিশু বয়সের হিন্দু ও খৃষ্টান পুরুষের তুলনায় ঐ দুই সম্প্রদায়ের নারীর সংখ্যাই অধিক। নিম্নের হিসাবে উদাহরণ স্বরূপে ০—৫ বৎসর বয়সের হিন্দু ও খৃষ্টান নরনারীর সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

হিন্দু নারী	...	১২২৭৬১৪
" পুরুষ	...	১১৬৫৮২৩
		৬১,৭৯১

অতএব আমরা দেখিতেছি যে, ঐ বয়সের মোট হিন্দু পুরুষ অপেক্ষা হিন্দু নারীর সংখ্যা ৬১ হাজার ৭৯১ জন অধিক। এইরূপে ঐ বয়সের মোট

খৃষ্টান নারী	...	৮৮৪৮
" পুরুষ	...	৮৬৪৬
		২০২

এইরূপে হিসাব করিয়া দেখিলে আরও জানা যাইবে যে, ২০ বৎসরের অনধিক বয়স্ক মুছলমান পুরুষের সংখ্যা, ঐ বয়সের অমুছলমানের সংখ্যা হইতে অনেক অধিক। এই বয়সের মোট

মুছলমান পুরুষ	...	৬৮০৮৫৬৪
অমুছলমান "	...	৫২৪৬২৩৬
		১৫,৬২,৩২৮

অতএব ২০ বৎসরের অনধিক বয়সের অমুছলমানের

সংখ্যা অপেক্ষা, ঐ বয়সের মুছলমানের সংখ্যা ১৫ লাখ ৬২ হাজার ৩২৮ জন অধিক।

এই সব সত্য একদিকে। অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও দেখিতে পাইব যে, কুড়ির কোঠা পার হওয়ার পর হইতে মুছলমান পুরুষের ও অমুছলমান নারীর সংখ্যা যুগপৎভাবে ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। সাইমন কমিশনের উপক্রম হইতে আরম্ভ করিয়া গোল টেবিলের প্রথম পালার উপসংহার পর্য্যন্ত, এই ব্যাপার লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। সার প্রভাসচন্দ্র হইতে শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পর্য্যন্ত বহু সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতা, সেন্সাস রিপোর্টের এই "fact" গুলিকে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গলার মুছলমানদিগের সংখ্যাধিক্যের দাবীকে ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন করার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের এই প্রোপ্যাগেণ্ডার ফলে, ইংলণ্ডের রাজনীতিক মহলেও এরূপ একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, বস্তুতঃ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকাদিগকে লইয়াই বাঙ্গলার মুছলমানদের সংখ্যাধিক্য। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীও প্রকাশ্যভাবে ইহা স্বীকার করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। কিন্তু অশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, যে দুইজন ভাগ্যবান মুছলমান, মোছলেম বঙ্গের মুখপাত্ররূপে গোল টেবিলে যোগ দেওয়ার জন্য আহূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহার প্রতিবাদ করা সম্ভব হয় নাই। মুছলমান সাংবাদিক বা রাজনীতিকগণের মধ্যে অন্য কেহ এই প্রশ্নটা সম্বন্ধে সন্তোষজনক আলোচনা করিয়াছেন বলিয়াও আমার জানা নাই। সে যাহা হউক, হিন্দু নেতাদিগের এই দাবীটি, আমার মতে, উভয় গণিত ও গণতন্ত্রের হিসাবে একদম ভুয়া-ভেল্কিবাজী ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাই বিষয়টী লইয়া একটু বিস্তারিত ভাবে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি।

প্রথমে গণিতের হিসাবটারই বিচার করা হউক।

রামানন্দ বাবু দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, একুশ ও তদধিক বৎসর বয়সের অমুছলমান অপেক্ষা, ঐ বয়সের মুছলমানের সংখ্যা মাত্র ৯৪৭৯ জন অধিক। বিচারের জন্য সব গুরুতর দিক হইতে আপাততঃ চোখ বন্ধ করিয়া, এবং রামানন্দ বাবুর যুক্তি-ধারার সমস্ত নীতি স্বীকার করিয়া লইয়া, অঙ্ক কষিয়া দেখিলে স্পষ্টতঃ জানা যাইবে যে, তাঁহার এই সিদ্ধান্তটী অভ্রান্ত নহে। যে কোন কারণে হউক, রামানন্দ বাবুর হিসাবের গোড়ায় একটা গুরুতর গলৎ রহিয়া গিয়াছে। তিনি যে হিসাব ধরিয়াছেন, তাহাতে ২০ বৎসর বয়স্ক মুছলমান পুরুষের সংখ্যা দুইবার বাদ দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে একবার তিনি মুছলমান পুরুষের মোট সংখ্যা হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের মুছলমান পুরুষের মোট সংখ্যা বাদ দিয়া ধরিতেছেন, আবার "২০—২৫" বৎসর বয়সের মুছলমান পুরুষের মোট সংখ্যা হইতে, (২০ বৎসর বয়স্ক বলিয়া) ২ বাদ দিয়া হিসাব ধরিতেছেন। কিন্তু সেন্সাস রিপোর্টে যেখানে "১৫—২০", বা "২০—২৫" প্রভৃতি বলিয়া সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, সেখানে ১৫ বা ২০ প্রভৃতিকে exclude করিয়াই হিসাব ধরিতে হইবে। কারণ, প্রথম সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে "০—১" "১—২" প্রভৃতি বলিয়া। "১—২" অর্থে যদি প্রথম বৎসর হয়, তাহা হইলে "০—১" বলিয়া যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা একেবারে অনর্থক হইয়া যায়। ফলতঃ রামানন্দ বাবু এইরূপে ভুল হিসাব ধরিয়া বয়োপ্রাপ্ত মুছলমানের সংখ্যা কমাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার হিসাব অনুসারে, একুশ ও তদধিক বৎসর বয়সের অমুছলমান অপেক্ষা, ঐ বয়সের মুছলমান পুরুষের সংখ্যা মাত্র ৯৪৭৯ জন অধিক। কিন্তু এই ভ্রান্তধারা পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গতভাবে হিসাব করিয়া দেখিলে, ইহার প্রকৃত সংখ্যা হইবে—১৭, ৯২১ জন।

খোলাসা হিসাব নিম্নে প্রদান করিতেছি :—

১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে বাঙ্গলা দেশে মুছলমান পুরুষের মোট সংখ্যা হইতেছে—১, ৩১, ০৪, ৩০৭ জন। ইহার মধ্যে, বয়সের তারতম্য অনুসারে তাহাদের সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ :—

০—৫	...	১৭, ২৫, ১২৬
৫—১০	...	২২, ২৩, ৩১৫
১০—১৫	...	১৭, ১৬, ১২৭
১৫—২০	...	১১, ৪৩, ৯৯৬
০—২০		৬৮, ০৮, ৫৬৪
মোট মুছলমান পুরুষ	...	১৩১০৪৩০৭
বাদ ০—২০	...	৬৮০৮৫৬৪
২১ ও তদধিক বয়সের মুছলমান পুরুষ		৬২৯৫৭৪৩

পক্ষান্তরে বাঙ্গলায় ০—২০ বৎসর বয়সের মোট সর্ব্ব ধর্ম্মী পুরুষের সংখ্যা :—

০—৫	...	২৯৭৬৫৩৮
৫—১০	...	৩৮০১৫৪২
১০—১৫	...	৩০৭০৪৩৪
১৫—২০	...	২২০৬২৮৬
		১২০৫৪৮০০

মোট সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী পুরুষের সংখ্যা :—

	২৪৬২৮৩৬৫
বাদ ০—২০ পুরুষ	১২০৫৪৮০০
২১ ও তদধিক বয়সের সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী পুরুষের সংখ্যা	১২৫৭৩৫৬৫

২১ ও তদধিক বয়সের সর্ব্ব ধর্ম্মের মোট পুরুষ সংখ্যা

	১২৫৭৩৫৬৫
বাদ ঐ বয়সের মুছলমান পুরুষ	৬২৯৫৭৪৩
২১ ও তদধিক বয়সের মোট অমুছলমান পুরুষ	৬২,৭৭,৮২২
২১ ও তদধিক বয়সের মোট মুঃ পুরুষ	৬২৯৫৭৪৩
বাদ ঐ বয়সের মোট অমুছলমান "	৬২৭৭৮২২
	১৭৯২১

অতএব অমুছলমান অপেক্ষা ২১ ও তদধিক বৎসর বয়সের মুছলমান মোট ১৭,৯২১ জন অধিক।

(৯)

সেনসাস রিপোর্ট সম্বন্ধে কেবল ভাসাভাসা আলোচনা করিলে, অথবা বিচারের পরিবর্ত্তে ওকালতী-প্রবৃত্তি দ্বারা প্রযোজিত হইলে, ইহা দেখা ও দেখান সম্ভব হইবে যে, যৌবন সীমায় পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে অমুছলমান নারীদিগের সংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে কমিয়া যাইতেছে এবং পক্ষান্তরে অমুছলমান পুরুষের সংখ্যা অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলতঃ মুছলমান ও অমুছলমান নরনারীদিগের মোট সংখ্যার আপেক্ষিক অনুপাতেও আশ্চর্য্যজনক পার্থক্য ঘটিয়া যাইতেছে—ঐ বয়সের মুছলমান পুরুষের অনুপাত অস্বাভাবিক ভাবে কমিয়া আসিতেছে। সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতারা এই অস্বাভাবিক হ্রাস-বৃদ্ধির গোড়ার গলৎটার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, যে-কোন কারণে হউক, আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। বরং তাহার বিপরীত, এই গলৎগুলির দ্বারা তাঁহারা অন্যায় উপকার লাভের চেষ্টা পাইয়াছেন, বিচার-বৃত্তির স্থলে উকিল-মনোভাবের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, তাঁহারা দুনিয়ার চোখে ধাঁধাঁ লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং প্রোপ্যাগণ্ডার ফলে তাঁহাদের এই চেষ্টা কতকটা সফলও হইয়াছে। কিন্তু একটু গভীর ও সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টতঃ জানা যাইবে যে, হিন্দু নেতাদের এই দাবীর মূলে কোন সত্য নাই। কতকগুলি ভুয়া, অবাস্তব ও "illusory" সংখ্যার অসঙ্গত সঙ্কলন ফলেই এই উল্টা উৎপত্তির সৃষ্টি করা হইয়াছে মাত্র।

কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলায় এবং বঙ্গের অন্যান্য বহু নগর-বন্দরে, নানাপ্রকার কাজকর্ম্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে, এমন কি ভারতের বাহির হইতেও, বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এই প্রবাসীদিগের অধিকাংশই বয়োঃপ্রাপ্ত, পুরুষ ও অমুছলমান। ইহারা বাঙ্গালায় আগমন করে অর্থ উপার্জ্জন করার একমাত্র উদ্দেশ্যে, এবং কিছুকাল এই উপলক্ষে এদেশে অবস্থান করিয়া আবার স্বদেশে ফিরিয়া যায়। ইহারা বাঙ্গালী নহে—বাঙ্গলার স্থায়ী অধিবাসী নহে। লোক গণনার সময় এই বিদেশাগত অবাঙ্গালীদিগকেও গণিয়া লওয়া হয় এবং স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের কল্যাণে, ইহারাই বয়োপ্রাপ্ত "অমুছলমান" পুরুষদিগের দলপুষ্টি করিয়া থাকে। নচেৎ ইহাদিগকে বাদ দিয়া, সঙ্গতভাবে কেবল দেশের স্থায়ী অধিবাসীদিগকে লইয়া হিসাব করিলে, বয়োপ্রাপ্ত মুছলমান পুরুষের সংখ্যার অনুপাত, তাহার মোট সংখ্যার অনুপাত হইতে কখনই কম হইবে না, বরং অধিকই হইবে। কিন্তু অতিশয় পরিতাপের বিষয় এই যে, লোক গণনার কর্ত্তৃপক্ষ অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এই প্রবাসী অবাঙ্গালীদিগকে ধর্ম্মের হিসাবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া প্রদর্শন করেন নাই। ১৯১১ সালের আদম শুমারীর রিপোর্ট, এইরূপ গোঁজামিল বে-মালুমভাবে চলিয়া গিয়াছে। ১৯২১ সালে এই ব্যাপারটা অতিবিলম্বে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু তখন আর প্রতিকারের সময় ছিল না, আর প্রকৃত কথা এই যে, কর্ত্তাদের ইচ্ছাও ছিল না। তাই তাঁহারা বলিতেছেন :—

If statistics of immigrants and emigrants had been prepared by age and religion, an adjustment could have been made with exactness, but this was n t done and merely for the purpose of this adjustment it would not have been worth while to undertake their preparation (Vol. 5, Part 1, P. 187—1921).

ইহার সারমর্ম্ম এই যে, "বাঙ্গলার প্রবাসী ও প্রবাসগত লোকদিগের সম্বন্ধে বয়স ও ধর্ম্মের হিসাবে স্বতন্ত্রভাবে সংখ্যা সংগ্রহ করা হইলে (হিন্দু ও মুছলমান নারীদিগের এবং তাহাদের বয়োপ্রাপ্ত পুরুষদিগের সংখ্যা-সমস্যার) একটা সমাধান সম্ভবপর হইত। কিন্তু সেরূপ স্বতন্ত্র হিসাব প্রস্তুত করা হয় নাই, আর কেবলমাত্র এই সমাধানের জন্য তাহার দরকারও কিছু নাই।" কিন্তু পাঠক দেখিতেছেন, সেন্‌সাসের কর্ত্তৃপক্ষ দশ বৎসর পূর্ব্বে যে প্রশ্নটীর প্রতি এইরূপে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাকেই আজ সর্ব্বপ্রধান অস্ত্ররূপে মুছলমানের প্রতি নিতান্ত অন্যায় ভাবে প্রয়োগ করা হইতেছে। আশা করি, বর্ত্তমানের এই কঠোর অভিজ্ঞতার পর, কর্ত্তৃপক্ষ এখন ঐ প্রকার হিসাব প্রস্তুত করাকে আর "not worth while" বলিয়া মনে করিবেন না।

যাহা হউক, এই ব্যাপারটা এতদূর গুরুতর যে, এই অন্যায় উপেক্ষার পরও কর্ত্তৃপক্ষ তাহার আলোচনা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। উপরোক্ত মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা উপদেশ দিতেছেন :—

Two adjustments are necessary before these differences can be applied to the graduated numbers for Muhammadan and Hindu males for 1921 to deduce the corresponding numbers for females. The first and less important adjustment is to be made on account of fact that during the war the proportion of male births to female births rose very distinctly in Bengal......The second is necessary on account of the fact that the Hindu population of Bengal is much more affected by migration than the Muhammadan. ...The number of male Hindus in Bengal per 100000 females is 109129 and the number of male Muhammadans per 100000 females 105830. The predominance of males per 100000 females is greates by 3299 in the case of Hindus than in the case of Muhammadans. The difference is due to the greater excess of immigrants over emigrants in the case of Hindus than of Muhammadans. These immigrants are people who have left their women folk at home, and we may take it that the ages of practically all of them were between 20 and about 45.

ইহার সার মর্ম্ম এই যে :—বাঙ্গলার হিন্দু ও মুছলমান সমাজের পুরুষদিগের সংখ্যাগত তারতম্য সম্বন্ধে প্রথমে দুইটী বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে তাহাদের সংখ্যা বাদ দিয়া উভয় সম্প্রদায়ের নারীদের সংখ্যা বাহির করা যাইতে পারিবে। ইহার মধ্যে প্রথম ও কম দরকারী বিষয়টী এই যে, মহাযুদ্ধের সময়, বঙ্গদেশে নারী জন্মহার অপেক্ষা পুরুষের জন্মহার যে বাড়িয়া গিয়াছিল, তাহা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।...দ্বিতীয় বিষয়টীর বিবেচনা এই সত্যের জন্য আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইতেছে যে, প্রবাস-যাতায়াতের ফলে, বাঙ্গলার মুছলমানদের জনসংখ্যার তুলনায় হিন্দুদের জনসংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে হইয়াছে। বাঙ্গলায় প্রতি লক্ষ হিন্দু-নারীর অনুপাতে ১০৯১২৯ জন হিন্দু পুরুষ আছে এবং প্রতি লক্ষ মুছলমান নারীর অনুপাতে ১০৫৮৩০ মুছলমান পুরুষ আছে। সুতরাং লক্ষ হিসাবে যদি নারীর অনুপাত গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে মুছলমান পুরুষ অপেক্ষা হিন্দু পুরুষের সংখ্যা নারীর উক্ত অনুপাত হিসাবে ৩২৯৯ জন বেশী। কারণ, মুছলমানদের তুলনায় হিন্দুদের বিদেশ-গামী অপেক্ষা বিদেশ হইতে আগত লোকদের সংখ্যা অনেক বেশী। এই সমস্ত আগন্তুক বিদেশী তাহাদের পরিবারস্থ নারীদের স্বদেশে রাখিয়া আসে এবং আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, তাহাদের অধিকাংশের বয়স ২০ হইতে ৪৫ বৎসর পর্য্যন্ত।

প্রকৃত অবস্থা বুঝাইবার জন্য ১৯১১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্ট (Vol 5, Part 1) হইতে প্রথমে কএকটা মন্তব্য উদ্ধার করিয়া দিতেছি। কর্ত্তৃপক্ষ বলিতেছেন :—

Bengal gains no less than 10,87000 persons by balance of migration between it and Bihar and Orissa.......The immigrants to Bengal from Bihar and Orissa were nearly 8 times as may, amounting to 12,52,000 or one thirtieth of the told population, among whom *there were 8 males to every female.* (167—68)

সারমর্ম এই যে:—"বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে যত লোক বাঙ্গলায় আসিয়াছে এবং বাঙ্গলা হইতে যতলোক ঐ প্রদেশে গমন করিয়াছে, তাহাদের জমা-খরচ করার পরও ১০ লাখ ৮৭ হাজার প্রবাসী বাঙ্গলায় অতিরিক্ত থাকিয়া যায়। বিহার ও উড়িষ্যা হইতে বাঙ্গলায় যত প্রবাসীর আগমন হইয়াছে, তাহারা ৮ গুণ অধিক এবং তাহাদের সংখ্যা হইতেছে ১২ লাখ ৫২ হাজার জন। অর্থাৎ বাঙ্গালার অধিবাসীদের ১০ অংশ ঐ প্রদেশ হইতে সমাগত প্রবাসী। এই প্রবাসীদের মধ্যে প্রতি ৮ জন পুরুষের মুকাবেলায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা একজন মাত্র।

আরও দেখুন :—

The actual number of immigrants enumerated in Bengal is nearly 2 millions, among whom there is, roughly, only one female to every two males. In the actual population, therefore, *the real proportion of the sexes is partially obscured* by migration. (297).

অর্থাৎ—বাঙ্গলাদেশে বিদেশাগত প্রবাসীদিগের প্রকৃত সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। ইহাদের মধ্যে প্রতি দুইজন পুরুষের মুকাবেলায় একজন মাত্র স্ত্রীলোক। সুতরাং বাঙ্গলার বাস্তব অধিবাসীদের মধ্যে নরনারীর প্রকৃত অনুপাত যে কত, প্রবাসীদের এই সংখ্যার গোলযোগে তাহা দুর্ব্বোধ্য হইয়া আছে।

In central Bengal they (Musalmans) represent 48 per cent. of the population, but Calcutta is excluded, 50 per cent. in this city the population is mainly composed of immigrants from outside, *among whom Hindus predominate.* Islam prevails over Hinduism in three of the four districts of the Division, the exception being the 24 pargans, where, however, *282761, or nearly one-eighth of the inhabitants, are Hindu emmigrants from outside.* Both in Calcutta and in the metropolitan districts (24 pargans, Howra and Hoogly) The *Hindu community is largly recruited by immigration, there being 1009772 Hindus, but only 346899 Musalman immigrants :* In other words, there are approximately three Hindus to every one Musalman in the immigrant population. (202—1911).

অর্থাৎ--মধ্য বাঙ্গলায় সমস্ত অধিবাসীদের তুলনায় মুছলমানদিগের সংখ্যার অনুপাত শতকরা ৪৮ জন। কিন্তু কলিকাতা বাদ দিয়া হিসাব ধরিলে তাহাদের সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ৫০ জন। কলিকাতার লোক সংখ্যা প্রধানতঃ বাহির হইতে সমাগত বিদেশীদের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। এই বিভাগের ৪টী জেলার মধ্যে ৩টীতে হিন্দু অপেক্ষা মুছলমানের সংখ্যা অধিক। কেবল ২৪ পরগণায় হিন্দুর সংখ্যা বেশী। একমাত্র এই ২৪ পরগণা জেলার ২, ৮২, ৭৬১ জন অথবা জেলার মোট অধিবাসীদিগের প্রায় অষ্টমাংশ হইতেছে, বাহির হইতে সমাগত হিন্দু প্রবাসী। কলিকাতায় এবং হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণা জেলায়, প্রধানতঃ এই বিদেশাগত প্রবাসীদিগের দ্বারাই হিন্দু সমাজের সংখ্যাপুষ্টি হইয়াছে,—কারণ এই সব অঞ্চলে মুছলমান-প্রবাসীদের সংখ্যা মাত্র ৩ লাখ ৪৬ হাজার ৮৯৯ জন, কিন্তু পক্ষান্তরে হিন্দু প্রবাসীদের সংখ্যা হইতেছে ১০০৯৭৭২ জন। অর্থাৎ অন্য কথায়, মোটামুটিভাবে ৩ জন হিন্দুর মোকাবেলায় একজন মাত্র মুছলমান।

অতঃপর কর্ত্তৃপক্ষ আরও স্বীকার করিতেছেন :—

The only area in which the Hindus are increasing more rapidly than the Musalmans is Central Bengal, where the balance is turned in their favour by the immigration of Hindus from up-country to Calcutta and the 24 parganas. (203).

অর্থাৎ—একমাত্র যে অঞ্চলে মুছলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা অধিক দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা হইতেছে মধ্যবঙ্গ। পশ্চিমা হিন্দুরা কলিকাতা ও ২৪ পরগণায় সমাগত হইয়াই এই অঞ্চলের হিন্দুদের সংখ্যা বাড়াইয়া দিতেছে।

এখন আমরা ১৯২১ সালের আদম শুমারীর রিপোর্ট (Vol 5, Bengal, Part I) হইতে কএকটা মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা দ্বারা বিষয়টা আরও পরিষ্কার হইয়া যাইবে। রিপোর্টে বলা হইয়াছে :—

The up-country mill hands are Hindu almost to a man. (117).

অর্থাৎ—"কদাচিৎ দুই একজন ব্যতীত, কলকারখানার পশ্চিমা মজুরগুলি সমস্তই হিন্দু।" আরও দেখুন :—

The total number of immigrants to Bengal from Bihar and Orissa and the United Provinces, found in 1921 ......are as follows :

from B. & O......12, 20, 426
„ U. P...... 3, 42, 810
15,63,236

(p 144)

অর্থাৎ—বিহার ও উড়িষ্যা এবং যুক্তপ্রদেশ সমাগত প্রবাসীদিগের সংখ্যা, ১৯২১ সালের গণনায় যেরূপ পাওয়া যায়, নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া হইতেছে :—

বিহার ও উড়িষ্যা হইতে ১২, ২০, ৪২৬
যুক্তপ্রদেশ হইতে ৩, ৪২, ৮১০
মোট : ১৫, ৬৩, ২৩৬

কর্তৃপক্ষের নিম্নলিখিত মন্তব্যে, রামানন্দ বাবুর "২১ ও তদধিক বৎসর বয়সের" হিন্দু নারীর ও মুছলমান পুরুষের সংখ্যা হ্রাসের প্রকৃত রহস্যটা খুব স্পষ্টরূপে ধরা পড়িয়া যাইতেছে :—

The number of immigrants to Bengal in 1911 was 19,73,778 ; in 1921,—19,29,640...... It is known that the immigrants to the province include an abnormally large proportion of persons between 20 and 40, and specially a large proportion of adult males. (39).

অর্থাৎ—"বাঙ্গালাদেশে প্রবাসীদিগের সংখ্যা ১৯১১ সালে ছিল ১৯, ৭৩, ৭৭৮ জন, ১৯২১ সালে ১৯, ২৯, ৬৪০ জন। বাঙ্গলার এই প্রবাসীদের মধ্যে, ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের বয়োপ্রাপ্তদের একটা অসাধারণ বৃহৎ সংখ্যা যে শামিল হইয়া আছে, বিশেষতঃ বয়োপ্রাপ্ত পুরুষদের একটা বৃহৎ সংখ্যা যে ইহার অন্তর্ভুক্ত, তাহা সর্ববিদিত।"

কলিকাতার আদম শুমারীর স্বতন্ত্র রিপোর্টে (Vol. 6 part 1) দেখান হইয়াছে যে, খাস কলিকাতার অধিবাসীদিগের শতকরা ৭২ জনের জন্ম, বাঙ্গালার অন্যান্য প্রদেশে (১৮ পৃঃ)। শহর ও শহরতলীর এই প্রকার হিসাব দেওয়ার পরে, রিপোর্টে বলা হইতেছে যে, The figures are striking evidence of the fact that Calcutta is not the metropolis of Bengal alone অর্থাৎ এই সব সংখ্যার দ্বারা এই সত্যটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, কলিকাতা কেবল বাঙ্গলারই রাজধানী নহে (১৯)।

ব্যাপারটা কিরূপ গুরুতর দেখুন :—

The province of Bihar and Orissa supplies nearly one in five of the Calcutta population......The bulk of these immigrants are engaged in some form of manual labour, and females are fewer than one to every five males,

The United provinces supplies nearly one in ten of the Calcutta population......The proportion of women is...one to three men. As many as 23 per mile in Calcutta were born in Rajputana. These are the Marwaris... who absorb so much of the piece goods trade.

অর্থাৎ—কলিকাতার অধিবাসীদের পঞ্চমাংশ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। ইহাদের অধিকাংশই কোন না কোন প্রকারের শ্রমিক। ইহাদের ৫জন পুরুষের মোকাবেলায় একজন মাত্র স্ত্রীলোক। কলিকাতার অধিবাসীদের প্রতি দশ জনের মধ্যে একজনের জন্ম যুক্তপ্রদেশ। ইহাদের তিন জন পুরুষের মোকাবেলায় একজন স্ত্রীলোক। কলিকাতার প্রতি মাইলের ২৩ জন অধিবাসীর জন্ম রাজপুতানায়, (বিলাতী বস্ত্র ব্যবসায়ের অধিকাংশই এই মাড়ওয়ারীদের মুষ্টিগত)।

কত প্রবাসীকে লইয়া যে সেনসাস রিপোর্টে কলিকাতার অধিবাসী সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে, তাহার একটা অসম্পূর্ণ তালিকা, রিপোর্টের ২১ পৃষ্ঠা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

গয়া	...	৪৮, ১১৪
পাটনা	...	২৮, ০৩৪
শাহবাদ	...	২৬, ৭৪১
মুজফ্ফরপুর	...	২১, ০৫৩
মুঙ্গের	...	২০, ৬৯০
সারণ	...	১৭, ১৭৪
দারভাঙ্গা	...	১০, ০৭৫
হাজারীবাগ	...	৬, ৯৭৭
কটক	...	৪৫, ৮৭৪
বালেশ্বর	...	১৬, ৪৯৯

পুরী	...	৫, ২০৫
বেণারস	...	১৬, ৬১৫
গাজীপুর	...	১৫, ৩৯৯
বালিয়া	...	১৪, ০৯২
আজমগড়	...	১১, ৫৬২
জৌনপুর	...	১২, ৩৪১
মিরজাপুর	...	৮, ২১৮
ফয়জাবাদ	...	৬, ৫৪৪
ছোলতানপুর	...	৫, ৮৭০
এলাহবাদ	...	৫, ৪৮৩
বিকানির	...	১২, ৫৯৬
জয়পুর	..	১১, ৭১৪
		৩,৬৭,৩৯০

মুছলমানের তুলনায়, বয়োপ্রাপ্ত অমুছলমান পুরুষের সংখ্যা কিরূপে বাড়িয়া যায়, নিম্নের মন্তব্যে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে :—

The Oriya is the man who most readily separates himself from his family. Only 79 dependents per 1000 workers come to Calcutta with them and only 62 females per 1000 males.

উড়িয়ারাই সহজে পরিজনবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে অধিক অভ্যস্ত। তাহাদের এক হাজার জন কারিগরের সঙ্গে গড়ে মাত্র ৭৯টী পোষ্য কলিকাতায় আসিয়া থাকে। উড়িয়া প্রবাসীদিগের প্রতি হাজার পুরুষের মোকাবেলায় মাত্র ৬২ জন স্ত্রীলোক কলিকাতায় অবস্থান করিয়া থাকে।

কেবল ভারতের অন্যান্য প্রদেশের প্রবাসী পুরুষদিগকে লইয়া, বাঙ্গলার অমুছলমানদিগের, তথা বয়োপ্রাপ্ত অমুছলমান পুরুষদিগের, সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় নাই। ভারতের বাহির হইতে সমাগত প্রবাসীদের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এবং ইহাদের সমষ্টিও বাঙ্গলার বয়োপ্রাপ্ত মুছলমান পুরুষদিগের আপেক্ষিক অনুপাত ক্রমশঃই কমাইয়া দিতেছে। সেন্‌সাস কর্ত্তৃপক্ষ বলিতেছেন :—

The Chinese continue to come in larger and larger numbers......The number born in Europe according to the last census is 47 per cent. greater than it was according to the census of 1891.

অর্থাৎ—চীনাদের আগমন ক্রমশঃ অধিকতর সংখ্যায় পূর্ব্বের ন্যায় চলিয়া আসিতেছে।......ইউরোপে জন্ম লোকদের সংখ্যা ১৮৯১ সালের আদম শুমারীতে যাহা ছিল, গত আদম শুমারীতে তাহা শতকরা ৪৭ জন হিসাবে বাড়িয়া গিয়াছে।

১৯২৩ সালের ৮ই আগষ্ট তারিখে, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট (Revenue department, Resolution—No. 624 Jur.) সেন্‌সাস রিপোর্ট সম্বন্ধে একটী মন্তব্য প্রকাশ করেন। ঐ মন্তব্যের পঞ্চম প্যারায় প্রবাসীদের সংখ্যা দেওয়ার পর বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টও স্বীকার করিতেছেন,—

These figures are, however, somewhat illusory, for on the whole the majority of the immigrants do not come to settle and make their homes permenently in Bengal. They come to Bengal, take up the lions share of the employment which industrial devlopment has thrown open, earn a little money and then go home again.

অর্থাৎ—"এই সংখ্যাগুলি কতকটা ধোকাজনক। কারন, মোটের উপর এই প্রবাসীদের অধিকাংশ স্থায়ীভাবে বসবাস করার অথবা বাঙ্গলাকে নিজেদের দেশরূপে গ্রহণ করার ইচ্ছায় এখানে আসে না। তাহারা বাঙ্গলায় আসে, শিল্পের উৎকর্ষ-ফলে যে সব কাজ-কর্ম্মের সুযোগ হইয়াছে—তাহাতে সিংহের ভাগ বসাইবার জন্য। ইহাদ্বারা তাহারা কিছু টাকা উপার্জ্জন করিয়া লয় এবং পুনরায় নিজেদের দেশে ফিরিয়া যায়।"

আজিকার আলোচনার প্রধান প্রতিপাদ্য এই যে, আমাদের প্রতিপক্ষ এ যাবৎ সেন্সাস রিপোর্ট লইয়া যে সব বাদ-বিতণ্ডা উপস্থিত করিয়াছেন, সে সমস্তের মূল ভিত্তি একমাত্র এই illusory figures বা ধোকাজনক সংখ্যাগুলির উপরই স্থাপিত হইয়াছে। উপরের মন্তব্যগুলি হইতে এই সত্যটী অকাট্যভাবে প্রতিপন্ন হইলেও, গণিতের অঙ্কের হিসাবে এই সংখ্যা-বিভ্রমের ফলাফল স্বতন্ত্রভাবে কষিয়া দেখান এখনও বাকি আছে। এখন আমরা, ঐ

মন্তব্যগুলির ইঙ্গিত ও নির্দ্দেশ অনুসারে, হিসাব করিয়া দেখাইব যে, সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতাদের দাবী সত্য নহে, বরং সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত, একটা অন্যায় ও অবাস্তব ধাঁধাঁ ব্যতীত, তাহা আর কিছুই নহে। কিন্তু, এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে পাঠকগণকে জানাইয়া রাখিতে চাই যে, নিম্নে প্রবাসীদিগের যে হিসাব দেওয়া হইবে, তাহা অসম্পূর্ণ। কারণ, এদেশে অবস্থান করার সময় immigrant দিগের যে সব সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে আদম শুমারীতে "বাঙ্গলায় জন্ম" বলিয়া প্রবাসী বলিয়া গণনা করা হয় নাই। * পক্ষান্তরে, এই প্রকার "বাঙ্গলায় জন্ম" লোকেরা স্ব-স্ব প্রদেশে চলিয়া যাওয়ার পর, সেখানে তাহাদিগকে "প্রবাসী-বাঙ্গালী" বলিয়া গণনা করা হয় এবং immigrant দের খাতা হইতে তাহাদিগকে emigrants বলিয়া বাদ দিয়া balance নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে। ফলতঃ এই অন্যায় জমা খরচের ঘাত-প্রতিঘাতেও বাঙ্গলার মুছলমান-দিগের সংখ্যার—বিশেষতঃ তাহাদের বয়োঃপ্রাপ্ত পুরুষ-দিগের আপেক্ষিক অনুপাতের বিশেষ ক্ষতি সাধন করা হইয়াছে।

(১০)

এখন আমাদিগকে বাঙ্গলার বয়োপ্রাপ্ত মুছলমান ও অমুছলমানদের প্রকৃত সংখ্যার হিসাব বাহির করিতে হইবে। ১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে বাঙ্গলার সকল প্রকার স্থায়ী ও অস্থায়ী অধিবাসীদের মোট সংখ্যা হইতেছে—৪, ৭৫, ৯২, ৪৬২ জন। ইহার মধ্যে "ভারতে জন্ম" ৪, ৭৪, ৮০, ৫৯৭ জন। সুতরাং মোট সংখ্যা হইতে ভারতজাতদের সংখ্যা বাদ দিলে, 'ভারতে বাহিরে জন্ম'-দের সংখ্যা পাওয়া যাইবে। যথা :—

মোট	৪ ৭৫ ৯২ ৪৬২
বাদ ভারতে জন্ম	৪ ৭৪ ৮০ ৫৯৭
...	১, ১১, ৮৬৫

এখন, ভারতজাতদের মোট সংখ্যা হইতে, বাঙ্গলায় জন্ম লোকদের সংখ্যা বাদ দিলে, বাঙ্গলার বাহিরে ও 'ভারতের অন্যান্য প্রদেশে জন্ম' লোকদের সংখ্যা পাওয়া যাইবে। যথা :—

মোট ভারতে জন্ম ...	৪ ৭ ৪ ৮ ০ ৫ ৯ ৭
বাদ বাঙ্গালায় জন্ম ...	৪ ৫ ৬ ৬ ২ ৮ ২ ২
ভারতের অন্যান্য প্রদেশে জন্ম ...	১ ৮ ১ ৭ ৭ ৫

সুতরাং বাঙ্গলা দেশে অবাঙ্গালী ভারতীয় এবং অবাঙ্গালী অভারতীয়দের মোট সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ হইতেছে :—

অবাঙ্গালী ভারতীয় ...	১ ৮ ১ ৭ ৭ ৭ ৫
অবাঙ্গালী অভারতীয় ...	১ ১ ১ ৮ ৬ ৫
মোট প্রবাসী ...	১৯, ২৯, ৬৪০

এই ১৯ লাখ ২৯ হাজার ৬৪০ জন প্রবাসী অবাঙ্গালী নরনারীকে, গত আদম শুমারীতে বাঙ্গলার অধিবাসী বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। আমরা উপরে যে মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেও immigrants বা প্রবাসীদের ঠিক এই সংখ্যাই দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং আমাদের এই হিসাবটা যে সম্পূর্ণ নির্ভুল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এখন আমাদিগকে স্ত্রীলোক ও পুরুষের হিসাবে, এই প্রবাসীদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সংখ্যা বাহির করিতে হইবে। এই হিসাবে দেখা যাইবে—বাঙ্গলায় যত নারীর গণনা হইয়াছে, তাহাদের মোট সংখ্যা হইতেছে ২, ২৯, ৬৪, ০৯৭ জন। ইহা হইতে মোট 'ভারতে জন্ম' নারীদের সংখ্যা বাদ দিলে, অভারতীয় নারীদের সংখ্যা পাওয়া যাইবে। যথা :—

মোট নারী ...	২ ২ ৯ ৬ ৪ ০ ৯ ৭
বাদ ভারত জাত	২ ২ ৯ ১ ৮ ৯ ৭ ৮
অভারতীয় নারী	৪ ৫, ১ ১ ৯

এখন এই ভারতজাত স্ত্রীলোকের মোট সংখ্যা হইতে, বঙ্গজাত স্ত্রীলোকের সংখ্যা বাদ দিলে, ভারতের অন্যান্য

* ..."But if children were born to them, they were born in Bengal and are not counted among the immigrants—Vol, 5, part 1, p, 39, 1921.

প্রদেশ হইতে সমাগত প্রবাসী অবাঙ্গালী নারীদের সংখ্যা পাওয়া যাইবে। যথা :—

মোট ভারতে জন্ম	…	২২৯১৮৯৭৮
বাদ বঙ্গে জন্ম	…	২২৩৭০০৩১
প্রবাসী ভারতীয় নারী		৫,৪৮,৯৪৭

অতএব, বাঙ্গলা দেশে প্রবাসী অবাঙ্গালী স্ত্রীলোকদের মোট সংখ্যা হইতেছে :—

ভারতের অন্যান্য প্রদেশে জন্ম	…	৫৪৮৯৪৭
" বাহিরে জন্ম	…	৪৫১১৯
মোট	…	৫,৯৪,০৬৬

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, বাঙ্গলায় সকল শ্রেণীর প্রবাসীদের মোট সংখ্যা হইতেছে ১৯, ২৯, ৬৪০ জন। এখন, ইহা হইতে প্রবাসী স্ত্রীলোকদের সংখ্যা বাদ দিলে, প্রবাসী পুরুষদের সংখ্যা পাওয়া যাইবে। যথা :—

মোট প্রবাসী	…	১৯২৯৬৪০
বাদ প্রবাসী নারী	…	৫৯৪০৬৬
মোট পুরুষ প্রবাসী		১৩,৩৫,৫৭৪

এই হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, প্রবাসী নারীদিগের সংখ্যা, প্রবাসীদের মোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের কম। অর্থাৎ (একজন মাত্রের ভগ্নাংশ বাদ দিয়া) প্রতি ৬৯ জন পুরুষ প্রবাসীর মোকাবেলায় নারী প্রবাসীর সংখ্যা হইতেছে—৩০ জন মাত্র।

ভারতীয় ও অভারতীয় হিসাবে প্রবাসী পুরুষদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সংখ্যাও নিম্নে উদ্ধার করিয়া দিতেছি :—

ভারতীয়	…	১২৬৮৮২৮
অভারতীয়	…	৬৬৭৪৬
		১৩,৩৫,৫৭৪

সেন্সাস রিপোর্টের মন্তব্য উদ্ধার করিয়া পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, বয়স ও ধর্ম্মের হিসাবে প্রবাসীদের স্বতন্ত্র করা কর্ত্তৃপক্ষ আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। কিন্তু তত্রাচ তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মোটামুটিভাবে মুছলমান প্রবাসীদের সংখ্যা মোট প্রবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আমাদের মতে, এই সিদ্ধান্তটা নানা কারণে অসঙ্গত। প্রকৃত পক্ষে মুছলমান প্রবাসীদের সংখ্যা ⅓ এরও অনেক কম। কিন্তু আলোচনা সংক্ষেপ করার জন্য আমরা উপস্থিতের মত এই অনুপাতই স্বীকার করিয়া লইতেছি।

এখন, উপরে বর্ণিত formula অনুসারে মোট মুছলমান প্রবাসীর, এবং প্রবাসী মুছলমান পুরুষের সংখ্যা আবিষ্কারের চেষ্টা করা যাউক !

মোট প্রবাসী পুরুষ :— ১৩,৩৫,৫৭৪ ÷ ৩
= ৪,৪৫,১৯১ ;

সুতরাং এই ৪ লাখ ৪৫ হাজার ১৯১ জন হইতেছে বাঙ্গলায় গণিত প্রবাসী মুছলমান পুরুষদিগের সংখ্যা। এখন আমাদের একমাত্র কাজ থাকিয়া যাইতেছে—অপ্রাপ্ত বয়স্কদের সংখ্যা বাহির করিয়া, প্রবাসী মুছলমান ও অমুছলমান পুরুষের মোট সংখ্যা হইতে তাহা বাদ দিয়া, "২১ ও তদধিক বৎসর বয়সের" মুছলমান ও অমুছলমান প্রবাসী পুরুষদের সংখ্যা বাহির করা। মুছলমান ও অমুছলমান বয়োঃপ্রাপ্ত পুরুষদের মোট সংখ্যা হইতে, বয়োঃপ্রাপ্ত মুছলমান অমুছলমান প্রবাসী পুরুষদের এই সংখ্যা বাদ দিলে, বয়োঃপ্রাপ্ত মুছলমান ও অমুছলমান বাঙ্গালী পুরুষের প্রকৃত সংখ্যা পাওয়া যাইতে পারিবে।

সেন্সাস-রিপোর্টের যে সব মন্তব্য উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেগুলির সমবেত সিদ্ধান্ত এই যে, প্রবাসীরা প্রায় সকলেই বয়োঃপ্রাপ্ত, তাহাদের মধ্যে নাবালগের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। কিন্তু তত্রাচ আমরা ধরিয়া লইতেছি যে, এই প্রবাসী পুরুষদের দশমাংশই নাবালগ।

পাঠক, এখন শেষ হিসাবটা দেখুন :—

বাঙ্গালায় মোট প্রবাসী

সর্ব্ব ধর্ম্মের পুরুষ	১৩৩৫৫৭৪
বাদ মুছলমান পুরুষ	৪৪৫১৯১ *
অমুছলমান পুরুষ	৮৯০৩৮৩

এখন মুছলমান ও অমুছলমান প্রবাসী পুরুষদের এই

* মাত্র একজনের ভগ্নাংশ বাদ দিয়া হিসাব করা হইয়াছে।

সংখ্যা হইতে $\frac{1}{10}$ অংশ বাদ দিলে তাহাদের প্রত্যেকের সাবালগের সংখ্যা পাওয়া যাইবে। যথা :—

প্রবাসী মুছলমান পুরুষ ৪৪৫১৯১ ÷ ১০
= ৪৪৫১৯

এখন মোট প্রবাসী মুছলমান পুরষ	৪৪৫১৯১
বাদ $\frac{1}{10}$ নাবালগ	৪৪৫১৯
	৪০০৬৭২

ইহাই হইতেছে সাবালগ মুছলমান পুরুষের সংখ্যা। পক্ষান্তরে :—

মোট প্রবাসী পুরুষ ...	১৩৩৫৫৭৪
বাদ „ মুছলমান „ ...	৪৪৫১৯১
প্রবাসী অমুছলমান পুরুষ...	৮,৯০,৩৮৩

মোট প্রবাসী অমুছলমান পুরুষ ৮৯০৩৮৩ ÷ ১০
= ৮৯০৩৮ *

মোট প্রবাসী অমুছলমান পুরুষ	৮৯০৩৮৩
বাদ $\frac{1}{10}$ নাবালগ ...	৮৯০৩৮
	৮,০১,৩৪৫

ইহাই হইতেছে সাবালগ অমুছলমান পুরুষ প্রবাসীদিগের সংখ্যা।

এখন, রামানন্দ বাবুর হিসাব মতে, ২১ ও তদধিক বয়সের লোকদিগকে মাত্র সাবালগ ধরিয়া হিসাব করিলে দেখা যাইবে :—

(ক) বাঙ্গলায় প্রবাসী-অপ্রবাসী-নির্বিশেষে, ঐ বয়সের মোট মুছলমান পুরুষের সংখ্যা ৬২ লাখ ৯৫ হাজার ৭৪৩ জন। আর সাবালগ মুছলমান প্রবাসী পুরুষের সংখ্যা ৪ লাখ ৬৭২ জন। শেষের সংখ্যাটী প্রথমের সংখ্যা হইতে বাদ দিলে বয়োপ্রাপ্ত বাঙ্গালী মুছলমান পুরুষের প্রকৃত সংখ্যা জানা যাইবে। যথা :—

	৬২৯৫৭৪৩
বাদ ...	৪০০৬৭২
	৫৮,৯৫,০৭১

পক্ষান্তরে, এই হিসাবে বয়োপ্রাপ্ত অমুছলমান পুরুষের মোট সংখ্যা হইতে, বয়োপ্রাপ্ত অমুছলমান প্রবাসী পুরুষের মোট সংখ্যা বাদ দিলে, বাঙ্গলার সাবালগ অমুছলমান পুরুষের প্রকৃত সংখ্যা পাওয়া যাইতে পারিবে। যথা :—

বাঙ্গলায় ঐ বয়সের মোট অমুছলমান পুরুষের সংখ্যা—

	৬২৭৭৮২২
বাদ ...	৮০১৩৪৫
	৫৪,৭৬,৪৭৭

ইহাই হইতেছে বাঙ্গলার সাবালগ অমুছলমান পুরুষের প্রকৃত সংখ্যা।

এখন এই হিসাবে সাবালগ বাঙ্গালী পুরুষের সংখ্যা, মুছলমান ও অমুছলমান হিসাবে স্বতন্ত্রভাবে তুলনা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে :—

সাবালগ মুছলমান পুরুষের সংখ্যা ...	৫৮৯৫০৭১
সাবালগ অমুছলমান পুরুষের সংখ্যা ...	৫৪৭৬৪৭৭
	৪,১৮,৫৯৫

সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহরূপে দেখিতে পাইতেছি যে, প্রকৃত অধিবাসীদিগের হিসাবে, বাঙ্গলার সাবালগ অমুছলমান পুরুষ অপেক্ষা, সাবালগ মুছলমান পুরুষের সংখ্যা—৪ লাখ ১৮ হাজার ৫৯৫ জন অধিক। রামানন্দ বাবু, ইহাকে নিতান্ত অন্যায়ভাবে ৯৪৭৯তে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন।

গণিতের আলোচনাটা উপস্থিতের মত এইখানেই শেষ করিতেছি। অন্যপক্ষ আপত্তি করিলে এসকল বিষয় লইয়া আরও বিশদরূপে বিচার করা যাইতে পারিবে। সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতাদের দাবীর গণতন্ত্রের দিক সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

উপসংহারে মুছলমান সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গের খেদমতে আমাদের বিনীত নিবেদন, ১৯৩১ সালের সেন্সাস সম্বন্ধে তাঁহারা এখন হইতে সাবধান হউন—এবার যাহাতে বয়স, Sex ও ধর্ম্মের হিসাবে প্রবাসীদের স্বতন্ত্র হিসাব প্রস্তুত করা হয়, তাহার উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হউন!

---

* তিন জনের ভগ্নাংশ বাদ আছে।

গরু চোর

ফরাসী হইতে অনূদিত

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

এক বছর ধ'রে হতভাগা জ্যাক জেলখানার একটা ছোট কুঠ্‌রীতে বাস করছে। কুঠ্‌রীটি পাহাড়ের গর্ত্তের মতন আঁধার। সেখানে ইঁদুর আর পাহারাদার ছাড়া কোন জ্যান্ত জীবের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় নি। পাহারাদার কিন্তু কখনো তার সঙ্গে কথাটি পর্য্যন্ত বল্‌ত না। তার নামে নালিশ হয়েছে কিনা, যদি বা হ'য়ে থাকে, তবে তার কসুর কি সে তার কিছুই জান্‌ত না; জানাবারও কোনো উপায় ছিল না।

সে প্রায়ই নিজে নিজে বল্‌ত "আশ্চর্য্যি। এরা আমাকে এখানে আট্‌কে রেখেছে—কেউত বলেনা কেন? এক এক বছর ধ'রে মোকদ্দমার অনিশ্চিত ভয়ে বাস করছি, কিন্তু মোকদ্দমাটা যে কি তাও ত বুঝি না। আমি যে একটা বড় রকম খারাপ কাজ ক'রে ফেলেছি তার আর সন্দেহ কি? কিন্তু সে কাজটি কি? আমি ত তন্ন তন্ন করে খুঁজ্‌লাম, আমার জীবনের পাতা উল্টে দেখ্‌লাম, সর্ব্ব রকমে আমার কাজগুলি ভেবে দেখ্‌লাম—কিন্তু কই কিছুইত পেলাম না।......সত্যিইত, আমি একটা গরীব মানুষ, বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই, কারুর উপর কোনো আড়ি ও নেই। ... ... হতে পারে আমি যা মনে করি ভাল কাজ কিম্বা কোন অন্যায় কাজ নয় সেগুলিই মস্ত বড় খারাপ কাজ। ... ..."

তার মনে এল একদিন সে একটা ছোট্ট ছেলেকে নদী থেকে ডুবতে বাঁচিয়েছিল; আর একদিন তার নিজের খুব ক্ষিধে থাক্‌তেও সে পথের ধারের ক্ষিধেয় মর-মর এক হতভাগাকে তার সমস্ত রুটিগুলি দিয়ে দিয়েছিল।

সে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লে "হয়ত তাই! হয়ত এগুলিই ভয়ানক অন্যায় কাজ!......কারণ, খুব ভয়ানক অন্যায় কিছু না করলে আমি কেন এ কুঠ্‌রীতে আটকে আছি!......"

এই রকম চিন্তা তাকে কিছু সান্ত্বনা দিত; কারণ তাতে অনিশ্চয়তার মধ্যে সে কিছু আলো পেত। তার বিশ্বাস, তার সম্বন্ধে আদালত বা হাকিমদের কোন ভুল হ'তে পারে না। তাঁরা যা' করেন, ঠিকই করেন।

যখন নূতন ক'রে তার কষ্ট মনে জেগে উঠ্‌ত সে নিজে নিজে আওড়াত "এ তাই! এ তাই!......সত্যিই এ তাই। ......হ'তে পারে আরো কিছু যা' আমি জানিনে!...... কারণ, আমিত কিছুই জানিনে, অন্য কেউ না, আমি ও না। আমি নেহাৎ গরীব, আমার কিছুই নেই; আমি কি করে জানব কি ভাল কি মন্দ!......আমার মত গরীব লোকে যা করে সবই অন্যায়!......"

একদিন সকালে মনটাকে শক্ত ক'রে সাহসে বেঁধে তার পাহারাদারকে সে জিজ্ঞেস করলে।......পাহারাদারের চেহারাটি ছিল ভীষণ, কিন্তু সে লোকটি ছিল ভাল। সে জওয়াব দিলে, "খোদার কসম! আমার মনে হয় তারা তো'কে ভুলে গেছে।......"

বল্‌তে গিয়ে সে এক প্রচণ্ড হাসি হেসে উঠ্‌ল। হাসির

চোটে তার প্রকাণ্ড গোঁফজোড়া উঁচু হ'য়ে উঠ্‌ল, যেমন দম্‌কা হাওয়া আধ ভেজানো জান্‌লার পর্দা উঁচু হ'য়ে উঠে।

"আছে একজন," সে আবার বলতে লাগ্‌ল "তার নম্বর ৮১৪; সে বাইস বৎসর এখানে হাজ তে আছে!"

পাহারাদার বাড্‌সায়ের পাইপ রীতিমত পুরে দেশ্‌লাই ধরিয়ে আবার বল্‌তে লাগ্‌ল, "তুমি আর চাওকি? এখন রাজ্যের লোকে জেল ভরে গেছে। হাকিমদেরই মাথা ঘুরে গিয়েছে, তাঁরা কি করবেন ঠিক করতে পারছেন না।......জেলখানায় এবার বন্যা এসেছে!......"

জ্যাক জিজ্ঞেস করলে, "ব্যাপারখানা কি বলত! কোনো 'গদর' (বিপ্লব) হয়েছে নাকি?"

"বিপ্লবের চেয়ে সাঙ্ঘাতিক।......একদল বেহায়া ডাকাতে ছোক্‌রা বেরিয়েছে, তারা রাস্তায় রাস্তায় সত্য ঘোষণা করে বেড়ায়! তাদের যতই তাড়াতাড়ি বিচার কর আর যতই তাড়াতাড়ি জেলে পোরো সবই মিছে। এমন ব্যাপার রোজই হচ্ছে! কেউ জানেনা কোত্থেকে এরা সব বেরুচ্ছে।......"

এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে সে আবার বল্‌লে "আঃ! এসবের আখের বড়ই খারাপ!......"

কয়েদীর মনে একটা সন্দেহ এল। সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে "তবে আমিও কি না-জেনে না-শুনে রাস্তায় রাস্তায় সত্য ঘোষণা করেছি।"

পাহারাদার মাথা নেড়ে উত্তর দিলে "সে সম্ভব নয়। তোর ত, সে রকম ডাকাতে চেহারা নয়। তুই হয় ত' একটা খুনে নয় একটা জালিয়াত, নয় একটা চোর।... সে ত কিছুই নয়। সত্যি কি, সে ভালই কিন্তু তুই যা বল্‌লি সত্যিই যদি তা' করে থাকিস্‌, তবে এদ্দিনে তোর বিচার হ'য়ে ফাঁসি কাঠে ঝুলতিস্‌। ... ..."

"তবে যারা সত্য ঘোষণা করে, তাদের ফাঁসি কাঠেই ঝুলতে হয়?"

"আঃ ... সত্যিই ... তা' সে মন্ত্রীই হ'ক আর বড় পাদ্রিই হ'ক ..... কিম্বা লড়'য়ে বাহাদুরীর জন্য তগমাই পাক তাদেরও তাই ঘটবে। ... ... হাঁ, ভাই! ... যাবি কোথায়?"

জ্যাক একটু আশ্বস্ত হ'য়ে গুন গুন্ ক'রে বলতে লাগল। ভাগ্যি ত'!...আমি ত, কিছু সত্য ঘোষণা করিনি।...সেটা দরকার।" "দাঁড়া দেখি, তোর ত' কোন রাঙা গরু নেই? ...আজকালকার দিনে এটাও একটা অন্যায় জিনিস।"

পাহারাদার চ'লে গেল। জ্যাক ভাবতে লাগল। "আমার তবে অস্থির হ'বার দরকার নেই।...আমি কখনো সত্য ঘোষণা করিনি।...কখ্‌খনো আমার রাঙা গরু ছিল না।...তবে আমার ভাবনা কি?"

সে রাত্রে সে আরামে ঘুমুল।

জ্যাকের গেরেফ্‌তারের এক বছর সতের দিন পরে দুইজন সেপাই তাকে নিয়ে আদালতে হাজির হ'ল। সেখানকার আলোয় সে বেহুঁশ হ'য়ে মূর্চ্ছা গেল। ব্যাপারটা বড়ই সঙ্গীন হ'ল। হতভাগা অস্পষ্ট শুনতে পেলে কতগুলো লোক আস্তে আস্তে বল্‌ছে—"এ একটা বড় বদমায়েস হ'বে।"

"এ একজন সত্য ঘোষণা ক'রেছে।"

"এর চেহারা দেখে মনে হয় এর একটা রাঙা গরু আছে।"

"লোকের বিচারে একে ছেড়ে দিলেই ছিল ভাল।"

"দ্যাখো, লোকটা কেমন ফ্যাকাসে হ'য়ে গিয়েছে।"

"ফাঁসি,...ফাঁসি,...ফাঁসি...।"

যখন জ্যাকের হুঁশ হ'ল সে শুনলে একটি যুবক বল্‌ছে, "কেন তোমরা তার বিরুদ্ধে চীৎকার করছ; তাকে গরীব আর কাতর দেখাচ্ছে।"

জ্যাক দেখ্‌লে রাগে কয়েকটা মুখ বিকৃত হ'ল, কয়েকটা ঘুষি উঠল।...একটি মারের চোটে বেদম হ'য়ে রক্তাক্ত শরীরে দৌড়ে আদালতের কামরা থেকে বাইরে চল্‌ল। তার পিছে পিছে এক খুনে দলও ছুটল।

ফাঁসি,...ফাঁসি,...ফাঁসি.........

আদালত ঘরে একটা টেবিলের সামনে কয়েকজন লোক বসে আছেন। তাঁদের পিছনে একখানি প্রকাণ্ড রক্তাক্ত যীশু খ্রীষ্টের ছবি। তাঁদের পরনে লাল পোষাক, মাথায় সোনালি টোপর।

সোনালি টোপরের নীচু থেকে একটা নাকি ভাঙা সুর এল। "জ্যাক, তোমার নামে নালিশ হয়েছে যে তোমার একটা রাঙা গরু আছে। তোমার কি বলবার আছে?"

জ্যাক কিছুমাত্র চঞ্চল না হ'য়ে ধীরে ধীরে উত্তর দিলে—"হুজুর, আমার রাঙা গরু কি অ রাঙা গরু, কোথা থেকে

থাক্‌বে? আমার না আছে গরুর গোয়াল, না আছে গরু-চরানোর মাঠ।”

বিচারক কড়া ধমক দিয়ে বল্‌লেন, “তুই জওয়াব এড়াচ্ছিস। তুই যে একটা নেহাৎ পাজি এবং জঘন্য প্রকৃতির লোক তা’ তোর ভাবে বোঝা যাচ্ছে।...... তোর নামে নালিশ হয়নি যে তোর গোয়াল আছে, কি তোর গরু-চরানোর মাঠ আছে। সত্য বল্‌তে কি সেগুলি মস্ত অপরাধের বিষয় হলেও আদালত দয়া করে তোর বিরুদ্ধে সে সব নালিশ নিচ্ছেন না।......তোর নামে কেবল এই নালিশ হ’য়েছে যে তোর একটা রাঙা গরু আছে।......বল্, তোর কি জওয়াব।”

হতভাগাটা আপত্তি ক’রে বল্‌লে—“হায়! আমার লাল রংয়ের গরু নেই, অন্য রংয়েরও কোন গরু নেই।...... দুনিয়ার ওপর আমার নিজের বল্‌তে কিছুই নেই।...... বাড়ার ভাগে আমি হলফ্ ক’রে বলছি আমার জীবনের কোন সময় আমি কোন সত্য ঘোষণা করিনি।”......

“বেশ!” বিচারক এমন ক’রে দাঁতে দাঁত পিষে বল্‌লেন যে, জ্যাকের মনে হ’ল যেন তার জন্যে সারা জীবন কয়েদের হুকুম হ’য়ে জেলখানার দোর বন্ধ হয়ে গেল। “তোর ব্যাপার পরিষ্কার; তুই বল্‌তে পারিস।”

সাঁঝের পরে কতকগুলো লোক যাদের জ্যাক কোন কালে চিন্‌ত না, তাদের ভিতর অনেক কথা কাটাকাটি হ’ল। কথার মধ্যে গালাগালির সঙ্গে সঙ্গে তার নাম ও রাঙা গরু বার বার সে শুন্‌তে পেল। তারপর রায় হ’ল, তার যা’ নেই সেই রাঙা গরু থাকার গুরুতর ও ভীষণ অপরাধের জন্য তার পঞ্চাশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

লোকের ভিড় দণ্ড শুনে নিরাশ হ’ল—এত গুরুপাপে এই লঘু দণ্ড!

ফাঁসি ··· ফাঁসি ··· ফাঁসি ··· ···

সেপাইরা অতি কষ্টে হতভাগাকে ভিড়ের হাত থেকে বাঁচালে। তাদের চীৎকার আর ভয় দেখানোর ভিতর থেকে সেপাইরা তাকে উদ্ধার করে জেলখানায় তার কুঠরীতে নিয়ে এল। সেখানে পাহারাদার তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

জ্যাক একান্ত মুষড়ে প’ড়ে বল্‌লে—“আমাকে খুন করে ফেলেছে। ··· ··· আমিও কিছুই জানিনে। দুনিয়ায় আমার কিছুই নেই, তবে কেমন ক’রে আমার একটা রাঙা গরু হ’ল। ··· ··· ”

পাহারাদার রাত্রের মত শেষ পাইপ সাজ্‌তে সাজ্‌তে বল্‌লে—“কেউ কখ্‌খনো জান্‌তে পারে না। ··· ··· তুই জানিস্‌নে কি ক’রে তোর একটা রাঙা গরু হ’ল। ··· ··· আমি জানিনা কি ক’রে আমি জেলখানার পাহারাদার হ’লাম। লোকের ভিড়ও জানেনা কেন তারা ফাঁসি ফাঁসি ব’লে চেঁচায়! ···দুনিয়া যে ঘোরে তা’ কি দুনিয়া জানে?···

তারপর সে চুপ্‌টী ক’রে তার পাইপ টান্‌তে লাগল। ··· ··· *

* Octave Mirbeau-র La vache Tachetée গল্পের ভাব-অনুবাদ।

আলোচনার প্রতিবাদ

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ এম-এ

গত ফাল্গুন সংখ্যা মোহাম্মদীর আলোচনা-বিভাগে "যোগ্যেন যোজয়েৎ" হেডিং দিয়া অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন সাহেবের "প্রকৃতি ও মুসলমান" প্রবন্ধের যে সমালোচনা বাহির করিয়াছেন তাহাতে আমার সম্বন্ধেও কয়েকটি মন্তব্য দৃষ্ট হইল। যথা—(ক) "পার্সি সাহিত্য ও সুফী মতবাদ সম্বন্ধে মিঃ বরকতুল্লাহ আজ পর্য্যন্ত যেসব প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে মৌলিকতা কিছুই নাই। প্রকৃতপক্ষে সেগুলি হইতেছে ইংরাজী পুস্তকের এবং ইংরাজ লেখকদের সিদ্ধান্ত ও মতবাদের চর্ব্বিত চর্ব্বণ মাত্র। (খ) সুফী মতবাদ সম্বন্ধে তিনি যখন প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তখন পর্য্যন্ত ইংরাজ লেখকগণ সাধারণভাবে এই কথাই প্রকাশ করিতেছিলেন যে, সুফী মতবাদটা হিন্দুর মতবাদ হইতে গৃহীত। অগত্যা বরকতুল্লাহ সাহেব তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কিন্তু ইদানীং কএক বৎসর হইতে সুফী মতবাদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহাদের শক্তিমান লেখকগণ এখন নিজেরাই নিজেদের পূর্ব্বমতের খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন—"সুফী মতবাদ এছলামেরই মৌলিক সৃষ্টি। হিন্দু বা পার্শিকদের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিলে মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে"। (গ) সুফী মতবাদ হিন্দুর নিকট হইতে গৃহীত বলিয়া পূর্ব্বে যাহারা মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, নিজেদের মতের সমর্থনের জন্য, বেদান্তের অদ্বৈতবাদকে লইয়া তাঁহারা নিতান্ত অন্যায় ভাবে সুফীদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন। আমাদের দার্শনিক লেখক বরকতুল্লাহ সাহেবও অগত্যা তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। (ঘ) তিনি যদি অতঃপর তাঁহার প্রবন্ধটী পুনরায় মুদ্রিত করিতে ইচ্ছুক হন এবং অন্ততঃ অধুনা প্রকাশিত ইংরাজী পুস্তকগুলি সংগ্রহ করার কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাকেও হয়তঃ আবার অন্য প্রকার প্রতিধ্বনি তুলিতে হইবে।

সমালোচনার প্রত্যুত্তর দেওয়া আমার কখনও অভ্যাস নাই। আমার প্রবন্ধে মৌলিকতা নাই উহা চর্ব্বিত চর্ব্বণ বা "কিচ্ছু—না"—ইত্যাদি যাই বলুন, সম্পাদক সাহেবের সে সব ব্যক্তিগত মত লইয়া তাঁহার সহিত আমার কোনও ঝগড়া নাই। কারণ প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত মত প্রকাশের অধিকার আছে। কিন্তু তিনি, (খ) ও (গ) অংশে আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন, সেই সম্পর্কে দুই একটী কথা না বলিয়া পারিলাম না। একটা চলতি কথা আছে, "উল্টা বুঝিলি রাম"। আলোচ্য "সুফী মত ও বেদান্ত" প্রবন্ধে আমার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল ইহাই প্রতিপন্ন করা যে, সুফীমত বেদান্ত হইতে স্বতন্ত্র এবং ইসলামের স্বাধীন সৃষ্টি, উহা উপনিষদের অদ্বৈতবাদ বা বুদ্ধের নির্ব্বাণবাদের অনুকরণ নহে। আর আমার ভাগ্য দোষে সমালোচক সাহেব ঘোষণা করিলেন, আমি সুফী মতকে বেদান্ত হইতে গৃহীত বলিবার জন্য ইংরাজ লোকগণের প্রতিধ্বনি তুলিয়াছি এবং অদ্বৈতবাদকে নিতান্ত অন্যায় ভাবে সুফীদের উপর চাপাইয়া দিয়াছি।

আমি প্রবন্ধের ভূমিকার প্রথম প্যারাতেই বলিয়াছি—"জীবনরহস্য ও পরলোক সম্বন্ধে জানিবার এই যে আগ্রহ, ইহা প্রত্যেক জাতির ভিতরই বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রত্যেক জাতিই নিজ নিজ সামর্থ্য মত এ সকলের এক-একটা সমাধানও করিয়া বসিয়া আছে। মানবের এ ক্ষুধা চিরন্তন

ও চির-নূতন। কেন না আজ পর্য্যন্ত মানব এ সকলের কোন অবিসংবাদিত মীমাংসায় উপনীত হইতে পারে নাই। এই প্রকার অনুসন্ধিৎসা ও সমাধান প্রচেষ্টায় যদি একের মীমাংসা অপরের সহিত মিলিয়াই গিয়া থাকে, তাহাতেই এ কথা মনে করা যায় না যে, উহাদের একপক্ষ অপরের নিকট হইতে উহা হুবহু অনুকরণ করিয়াছে।" ইহার সমর্থনে ঐ প্যারাই পাদটীকার বিখ্যাত সুফী সাহিত্যবিদ লেখকগণের নিম্নোদ্ধৃত বাক্য-যোজনা করিয়াছি "Similarity of two doctrines does not prove that one is derived from the other. Both may be independent from this and results of a like cause."

যাঁহারা সুফী মতকে বেদান্ত হইতে গৃহীত বলিয়া মনে মনে করেন, তাঁহাদের মত যে ভ্রান্ত তাহাই গ্রহণের জন্য ঐ ভূমিকারই দ্বিতীয় প্যারা এই ভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে—

"বেদান্ত ও সুফী মতের মীমাংসার ভিতর গভীর ঐক্য রহিয়াছে। এতদুভয়ের মধ্যে বেদান্ত প্রাচীনতর। অতএব সুফীমত বেদান্ত হইতে গৃহীত, ইহাই এক শ্রেণীর লোকের অভিমত। তাঁহাদের কাহারও কাহারও বিশ্বাস, প্রাচীন আর্য্যদিগের প্রকৃতি ছিল ব্রাহ্মণ্য ভাবাপন্ন এবং তাঁহাদের ভিতর এক শ্রেণীর লোক সর্ব্বদা চিন্তানুশীলনেই ব্যাপৃত থাকিতেন। পক্ষান্তরে প্রাথমিক মুসলমানেরা ছাত্র ভাবাপন্ন ছিলেন ও দিগ্বিজয় ও রাষ্ট্রশ্রীর দিকেই সমধিক মনোযোগী ছিলেন; কাজে কাজেই চিন্তারাজ্যে তাঁহাদের অধিকদূর অগ্রসর না হওয়ারই সম্ভাবনা। কিন্তু ইতিহাস বলে, যে জাতি যখন উন্নত হয়, তখন তাহার সকল দিকেই উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। শুধু ক্ষাত্র শক্তি দ্বারা কোনও জাতি জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না।"

যাঁহারা বলেন, সুফীমত বুদ্ধের "নির্ব্বাণ" মত হইতে গৃহীত তাঁহারাও যে ভ্রান্ত এই কথার সূচনা করিয়াছি তৃতীয় প্যারায় যথা :—

"সুফীমত যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত উহা মূলতঃ অনৈসলামিক ও ভিন্ন জাতির ভাণ্ডার হইতে গৃহীত। ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্ম আরও নানা শ্রেণীর লেখকের নানা দিক্ হইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কাহারও কাহারও মত সুফীমত বুদ্ধের নির্ব্বাণ-বাদেরই অভিনব সংস্করণ। বুদ্ধের নির্ব্বাণবাদে মানুষকে সর্ব্বতোভাবে কামনাহীন হইতে বলা হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার কামনা বিনাশই বুদ্ধের মতে নির্ব্বাণ। সুফীরাও কামনাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করেন। কিন্তু বুদ্ধের নিকট নির্ব্বাণই জীবনের শেষ পরিণাম বা মোক্ষলাভ। আর সুফীর নিকট উহা তাহার সাধন পথের প্রথম স্তর মাত্র। বুদ্ধের নির্ব্বাণ ধ্বংসোন্মুখ; নিঃশেষ ধ্বংসই তাহার সমাপ্তি। সুফীর নির্ব্বাণ জীবনোন্মুখ, নির্ব্বাণ দ্বারা সে আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে।" এইরূপে ক্রমশঃ উভয় জাতির পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

অতঃপর প্রবন্ধের আসল ভাগ আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমে বেদান্ত ও পরে সুফীমতের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতেও দেখান হইয়াছে যে উভয়ের সংমিশ্রণ ঘটে নাই। ইতিহাস ভাগের পঞ্চম প্যারায় দেখান হইয়াছে।

"সুফী তাঁহার ইতিহাসের জন্য কোরাণের বাহিরে যান না। তাঁহারা বলেন কোরাণেই সুফী ধর্ম্মের বীজমন্ত্র নিহিত রহিয়াছে এবং হজরৎ মহম্মদ (দঃ) হইতেই এই আধ্যাত্মিকতার আরম্ভ হইয়াছে।"

তৎপর পবিত্র কোরাণ হইতে বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইহার পোষকতায় এবং সপ্তম প্যারায় বলা হইয়াছে—

"কোরাণের এই সকল আয়েত ও হজরতের বচনাবলী হইতে এইরূপে সুফী শাস্ত্রের সমস্ত কলেবর বিকাশ লাভ করিয়াছে, যেমন কয়েকটী মাত্র স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্য হইতে জ্যামিতির সমগ্র প্রতিজ্ঞার উৎপত্তি হইয়াছে। এই নিমিত্তই হজরৎ মহম্মদ (দঃ) আধ্যাত্মিক জগতের একচ্ছত্র গুরুরূপে আবহমানকাল অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছেন। কোরাণ ঐশীবাণী; আর কোরাণের প্রবক্তা হজরৎ মহম্মদ (দঃ) ছিলেন নিরক্ষর। নিরক্ষর হজরৎ যে কখনও উপনিষদ পাঠ বা ঋষি বদবারণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নাই, এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।" তারপর ক্রমশঃ সুফীমতের কিরূপে দিকে দিকে প্রসার ও পরিপুষ্টি ঘটিয়াছে তাহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

ইতিহাস ভাগের শেষ তিন প্যারায় দেখান হইয়াছে যে খৃষ্টীয় ৭ম হইতে ১০ম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতে ধর্ম্ম-বিপ্লব চলিতেছিল। সেই বিপ্লবের সময়ের অমীমাংসিত অবস্থায় যে অপর জাতি ভারতের নিকট জ্ঞান ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল, ইহা স্বাভাবিক মনে হয় না। এই বিপ্লবের যখন অবসান হইল এবং যখন শঙ্করাচার্য্য ইত্যাদি আবির্ভূত হন, তাহার বহু পূর্ব্বেই সুফীমতের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল। কাজেই বেদান্ত ও সুফীমত পরস্পরের অসাপেক্ষ। এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক ব্রাউনের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছি যে, যে সময় পশ্চিম দেশীয় মুসলমানেরা সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন আরম্ভ করেন, তাহার বহু পূর্ব্বেই সুফীবাদ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। এই সম্পর্কে পাদটীকায় ইহাও উল্লেখ করিয়াছি যে, তাসাউফ নামের সহিতও বেদান্তিক কোনও শব্দ বা ধাতুর মিল নাই।

তারপর প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদে উভয় মতের আভ্যন্তরিণ আলোচনা দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, উভয়ের বাহিক সাদৃশ্যের অন্তরালে ঘোর স্বাতন্ত্র্য বিরাজ করিতেছে।

এইরূপে Historyর দিক দিয়া, Philologyর দিক দিয়া, Internal Comparisou দ্বারা, বিভিন্ন ভাবে উভয় মতের স্বাতন্ত্র্য দেখান হইয়াছে এবং এই স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শনই ছিল আমার উক্ত প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য। সমালোচক সাহেব যদি অনুগ্রহ করিয়া একটু তক্‌লিফ্‌ স্বীকার করতঃ আমার প্রবন্ধটীর অন্ততঃ প্রথম পৃষ্ঠাটীও পাঠ করিতেন, তবে কখনই উদ্ধৃত (খ), (গ) মন্তব্য তাঁহার কলমে আসিত না। প্রবন্ধ মোটেই না পড়িয়া তৎসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশের অদ্ভুত উদ্যম, এই বোধ হয় প্রথম দেখিলাম।

শৈলখণ্ডে চন্দ্রাস্ত

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

ঢেউ খেলে যায় নীল সায়রে
শ্যামল শত শৈল,
কুজ্ঝটিকার শুভ্র ফেণা
মাথায় ভাঙে ঐলো।
উর্ম্মি-শিরে চন্দ্র-তরী
কোরছে টলমল,
নাইক নাবিক, এই বুঝিরে
গড়ায় রসাতল।
উচ্চকিত তারকারা
খুলি বাতায়ন
দেখ্‌ছে চেয়ে ভাঙা তরীর
নৈশ নিমজ্জন।

তরী

হুমায়ুন কবির

হৃদয় আমার অকূল সাগর-জলে
দিশাহারা তরী দিবস রজনী চলে।
নাহি তার হাল, তবু পাল থাক্ তোলা
উনপঞ্চাশী দেয় তারে দিক্ দোলা,
লক্ষ্য না থাকে আছে তো আকাশ খোলা,
আছে তো সাগরে সীমাহীন পরিসার
কোথা হ'তে কোথা চিরদিন অভিসার!

সে তরণী মাঝে কভু জ্বালি দীপখানি
হৃদয়ের আশা সঙ্গীতে খোঁজে বাণী!
সাজাইয়া ডালা সযতনে মালা গাঁথি
কার পথ চাহি বসে থাকি সারারাতি,
নিশি কেটে যায়, নাইবা মিলিল সাথী,
প্রভাত আলোকে তরণী ভাসিয়া চলে
অলক্ষ্যপানে অকূল সাগর জলে।

সোনার প্রভাতে আকাশ কিরণে ভরা
চঞ্চল জলে কানাকানি জাগে ত্বরা।
কুজ্ঝটিকার যবনিকা খানি হরি
দূরদিগন্ত আলোকে উঠিল ভরি,
অকারণ সুখে ওঠে হিয়া গুঞ্জরি'
মৃত্যুর পথে জীবনের অভিযান!
—তরুণ হিয়ার চিরবিজয়ের গান।

সেপথ চলায় কতবার কতদেশে
নিমিষের লাগি' তরণী ভিড়িল এসে।

কোথাও চলিছে হৃদয়ের বেচাকেনা,
উছল হাসিতে যাব সাথে হ'ল চেনা
অশ্রুতে হবে শুধিতে তাহার দেনা,
—তবু ঘাটে হায় বিরামের বেলা নাহি
দিবস রজনী চলি তাই তরী বাহি।

মধ্যদিনের প্রখর কিরণতলে
তুরাশা জ্বলিছে দীপ্ত-সাগর-জলে।
সিন্ধুর বুকে বিছায় সন্ধ্যারাণী
দিবসের শেষে সোনার শয়ন খানি,
লজ্জা-অরুণ-হিয়ার গোপন বাণী
বর্ণলীলায় খোঁজে মূক পরকাশ,
স্নিগ্ধনয়নে চেয়ে থাকে নীলাকাশ।

অচেনা সাগরে মায়াবী শশীর করে
মরকত দ্বীপ ভাসে নয়নের পরে।
সাগর ভরিয়া জোয়ারের সাড়া জাগে,
দখিন বায়ুর নিশ্বাস পালে লাগে,
সফেদ সফেন পথে ছুটে চলে আগে
ঊর্ম্মি লঙ্ঘি' লক্ষ্যবিহীন তরী
জীবনের বেগে মৃত্যুরে উত্তরি'।

ডাক্তার এম, খান

ডাঃ মোহাম্মদ আবুল-কাসেম

খুলনা জিলার অন্তর্গত 'শ্রীরামপুর' গ্রামে প্রসিদ্ধ খান বংশে ১২৭৯ বঙ্গাব্দে মাহ্‌তাব উদ্দীন খান (এম, খান) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা দুই সহোদর ভাই ও এক ভগিনী; জ্যেষ্ঠ আফ্‌তাব উদ্দীন এবং কনিষ্ঠ মাহ্‌তাব উদ্দীন। তাঁহার পিতা পরলোকগত মুনশী জাহির উদ্দীন খান সাতক্ষীরার জমিদারের অধীন একজন অভিজ্ঞ পুত্র। তিনি স্বীয় অসাধারণ অধ্যবসায় গুণে জীবনে যে সব অক্ষয়কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়।

পাঁচ বৎসর বয়সে মাহ্‌তাব উদ্দীন গ্রামের অপর পারে অবস্থিত 'গুরুগ্রাম' মধ্য বাঙ্গলা স্কুলে ভর্ত্তি হন। দুই গ্রামের মাঝে ইছামতী নদী শ্রীপুরের দক্ষিণ উপকূল বিধৌত
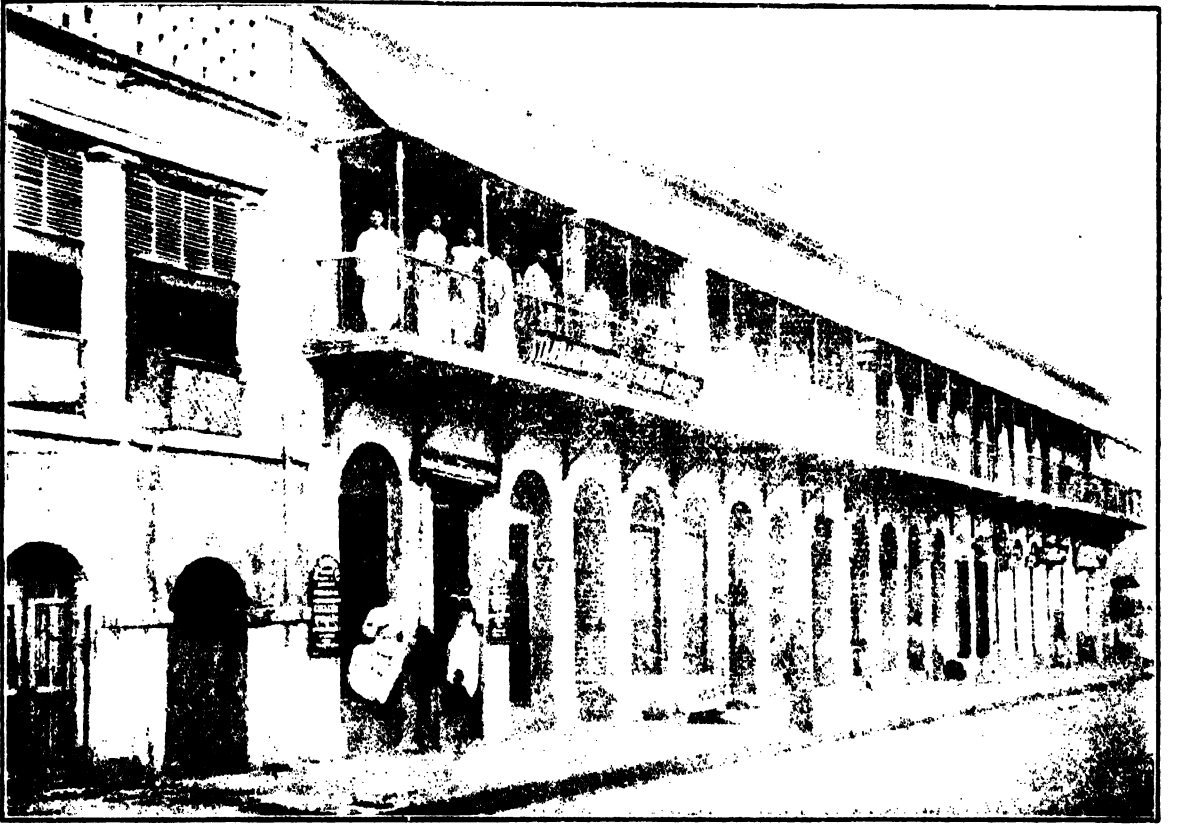
ডাক্তার এম, খান প্রতিষ্ঠিত "ষ্ট্যাণ্ডার্ড" হোমিও কলেজ

নায়েব ছিলেন। চাক্‌রী জীবনে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং তাঁহার শ্রমার্জ্জিত ধন-সম্পদের অধিকাংশ তিনি পরহিত-ব্রতে ব্যয় করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন স্বামীগতপ্রাণা, বুদ্ধিমতী ও দানশীলা।

মাহ্‌তাব উদ্দীন খান উপযুক্ত পিতা-মাতার উপযুক্ত করিয়া আপনার মনে আপনার বেগে প্রবাহিতা। এই স্রোতস্বিনী নদীতে খেয়া-মাঝি অনেক সময় অনুপস্থিত থাকায় অপরিণত বয়স্ক মাহ্‌তাবকেই নৌকার হা'ল ধরিয়া পরপারে স্কুলে পৌঁছিতে হইত।

বালক মাহ্‌তাবের বয়স যখন সবেমাত্র সাত বৎসর

তখন তাঁহার পিতা দেহত্যাগ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আফ্‌তাব উদ্দীন খান তখন সাতক্ষীরা ফৌজদারী আদালতে কেরাণীর চাক্‌রী করিতেন। জীবিতকালে পিতা যদিও প্রচুর অর্থ রোজগার করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ জীবনে তিনি বিশেষ কিছু সঞ্চিত রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। পিতৃবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃহৎ সংসার পরিচালনার ভার আফ্‌তাব উদ্দীন সাহেবের স্কন্ধে পড়িল।

মাহ্‌তাব উদ্দীন প্রত্যহ স্কুলে গিয়া রীতিমত ভাবে পড়াশুনা করিতেন। তখন দীন মোহাম্মদ নামে তাঁহার একজন সহতীর্থ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং শেষ জীবন পর্য্যন্ত উভয়ে উভয়ের সহিত অচ্ছেদ্য প্রীতির ডোরে আবদ্ধ ছিলেন। বারো বৎসর বয়ঃক্রমকালে দুই বন্ধু মধ্য বাঙ্গলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সাতক্ষীরা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। ক্রমে উভয়ে উক্ত স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন পাইলেন; এই সময় দীন মোহাম্মদ-এর পিতা মহাপ্রয়াণ করায় তিনি পড়াশুনা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

কিছুকাল পরে আফ্‌তাব উদ্দীন খুলনা সদরে বদলী হওয়ায় মাহ্‌তাবকে বাধ্য হইয়া খুলনা জিলা স্কুলে ভর্ত্তি হইতে হইল। আবার তিনি সাতক্ষীরায় স্থানান্তরিত হওয়ায় ছাত্র মাহ্‌তাবকেও তথায় ফিরিতে হইল। পুনঃ পুনঃ স্কুল পরিবর্ত্তন করায় যদিও মাহ্‌তাবের নানাপ্রকার ক্ষতি হইতেছিল—তত্রাচ তিনি মুহূর্ত্তের জন্য ভগ্নোদ্যম হন নাই।

ইহার পর আফ্‌তাব উদ্দীন ফৌজদারী আদালতে নাজীর পদে উন্নীত হইলেন, ফলে সাংসারিক অস্বচ্ছলতা অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল। তরুণ যুবক মাহ্‌তাব উদ্দীন সেই বৎসর সাতক্ষীরা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ও নানা অসুবিধা নিবন্ধন পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

পরীক্ষায় পাস করিতে না পারিয়া নিশীথে মাহ্‌তাব গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কয়েকদিন পরে তিনি নিঃসম্বল বরিশাল উপস্থিত হইয়া স্বনামধন্য সমাজপতি মৌলবী এ, কে, ফজলুল্ হক, এম-এ, বি-এল মহোদয়ের পিতার স্মরণাগত হইলেন। তিনি বরিশাল তখন সদরে ওকালতি করিতেন। তাঁহার ন্যায় সদাশয় ও পরোপকারী ব্যক্তি বরিশাল অঞ্চলে তখন আর কেহ ছিলেন না। মাহ্‌তাব তাঁহার অধীনে থাকিয়া মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে তিনি বরিশাল হইতে কলিকাতায় আসিয়া বড়ই বিপদে পড়িলেন; কাজেই বাধ্য হইয়া তিনি নারিকেলডাঙ্গায় জনৈক স্বজাতীয় চামড়া-ব্যবসায়ীর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বহু চেষ্টার পর কতিপয় দপ্তরীকে ইংরাজী পড়াইবার নিমিত্ত তাঁহার মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে একটী চাক্‌রী মিলিল। তখনকার দিনে সমস্ত জিনিস-পত্র সস্তা থাকায় চারি-পাঁচ টাকায় একজনের মাসিক খরচপত্র গরীবানা ভাবে চলিয়া যাইত।

ইহার পর তিনি কিছুকাল অস্থায়ীভাবে কেরাণীর কার্য্য করার পর মালদহ জিলায় আবকারী বিভাগে তাঁহার একটি অপেক্ষাকৃত ভাল চাক্‌রী মিলিল। তিনি কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া চাক্‌রীস্থলে চলিয়া গেলেন এবং ক্রমশঃ তাঁহার দুর্ব্বিসহ অভাবের তাড়না শিথিল হইয়া আসিল।

এই সময় তিনি আত্মীয় স্বজনের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বিবাহ করিলেন এবং কয়েকদিন বাড়ীতে অবস্থিতি করার পর সস্ত্রীক কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন। বস্তুতঃ দাম্পত্য জীবনে তিনি সুখী হইলেন।

মানুষ ভাবে এক—হয় অন্য। দুই বৎসর নির্ব্বিঘ্নে কাটিবার পর তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা পত্নী স্বামীর প্রেমপাশ ছিন্ন করিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। এই নিদারুণ শোকে মুহ্যমান মাহ্‌তাব উদ্দীন চাক্‌রী ইস্তফা দিয়া দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। দীর্ঘ দিবস ধরিয়া দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন দেশ ও নগর ভ্রমণ করিয়াও যখন তিনি অন্তরে অনাবিল শান্তি পাইলেন না তখন বাধ্য হইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মাহ্‌তাব উদ্দীন মালদহে অবস্থানকালে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সুলতান আহ্‌মদ খানকে কাছে রাখিয়া স্থানীয় জিলা স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। সেখানে তাঁহার ভয়ানক জ্বর হইল। বড় বড় ডাক্তাররা শেষটা একমত হইয়া ব্যাধি দুরারোগ্য বলিয়া জবাব দিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, আজ রাত বারোটার পর জ্বর বিচ্ছেদ হইবে সত্য, কিন্তু

সঙ্গে সঙ্গে রোগীর শেষ নিঃশ্বাসও বাহির হইবে। ডাক্তারের ঈদৃশ ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া মাহ্‌তাব উদ্দীন অত্যন্ত মুষড়িয়া পড়িলেন।

তাঁহার গৃহে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পূর্ণ একটী ছোট পারিবারিক বাক্স ছিল। তিনি তাহা হইতে একটী ঔষধ বাছিয়া অন্তিম শয্যায় শায়িত রোগীর উপর পরীক্ষা করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, রোগী ক্রমশঃ সুস্থ হইতে লাগিল এবং কয়েকদিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইল। এই ঘটনার পর মাহ্‌তাব উদ্দীন-এর হোমিওপ্যাথির উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া গেল। তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। দীর্ঘ চারি বৎসর পরে কোর্স সমাপ্ত করিয়া ফাইনাল পরীক্ষা দিলেন এবং কলেজ হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া তিনি হোমিওপ্যাথিকে 'এম-ডি' উপাধি পাইলেন।

তাঁহার পরীক্ষার ফল এত সন্তোষজনক ও সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল যে, কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহাকে ঐ কলেজের অধ্যাপকের পদ দিয়া গুণের সম্যক মর্য্যাদা রাখিলেন। এই সময় হইতে মাহ্‌তাব উদ্দীন সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ডাক্তার এম, খান নামেই সমধিক পরিচিত হইলেন। সুতরাং আমরা এখন হইতে তাঁহাকে এম, খান বলিয়াই অভিহিত করিব।

ডাক্তার এম, খান তাঁহার ভ্রাতার সাহায্যে বাঙ্গলা ১৩১৬ সালে কলিকাতা ৩৭নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট-এ ডাক্তারী ব্যবসায় আরম্ভ করেন; কিন্তু তিনি ব্যবসায়ে তখন আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। বলিতে কি, তাঁহার প্রথম মাসের আয় মাত্র তিন টাকা। এই নাম মাত্র আয়েও ডাক্তার এম, খান ভগ্নোদ্যম হন নাই। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনেরা অসময়ে তাঁহাকে টিট্‌কারী করিতে আরম্ভ করিল। জন-সমাজে এমনও বলিত,—"মাহ্‌তাবের ঔষধ যে খাবে তার স্থান হবে হয়তো গোব্‌রায়—নয়তো মানিকতলায়।" এইরূপ কঠোর জীবন-সংগ্রামে ডাক্তার এম, খান এর দুইটী বৎসর কাটিয়া গেল।

১৩১৮ সালে তিনি ৩৯।২, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট-এ ডিস্পেন্সারী স্থানান্তরিত করিলেন। এইখানে আসিয়া ডাক্তার খান এর কর্ম্মময় জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হইল। তাঁহার অবস্থার দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল; তিনি বেশ পশার-প্রতিপত্তি করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সুল্‌তান আহ্‌মদ খানকে স্বীয় ব্যবসায়ে সহকারীরূপে আনিলেন; এবং তাঁহাকে স্বহস্তে আদর্শ ডাক্তাররূপে গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার সে সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। এই সময় এম, খান মাতার মিনতিতে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন।

অবশেষে, ১৩২৬ সালে তিনি ৪৭।২, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট-এ ডাক্তারখানা পুনরায় স্থানান্তরিত করিয়া পরিবারবর্গসহ তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

১৩৩০ সালে, অধ্যবসায়ের জ্বলন্ত আদর্শ ডাক্তার এম, খান "ষ্ট্যাণ্ডার্ড হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ" নাম দিয়া একটী কলেজ স্থাপন করেন এবং কলিকাতা নগরীতে অবস্থিত অনূন ২৮টী বিজাতীয় হোমিওপ্যাথিক কলেজের মধ্যে ইহাই একমাত্র মুসলমান পরিচালিত কলেজ। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ডাক্তার এম, খান এই কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। ইহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেজিষ্ট্রীকৃত এবং এখানে রীতিমত ভাবে শব-ব্যবচ্ছেদও হইয়া থাকে।

১৩৩৩ সালে তাঁহার সারাজীবনের সাধনার ফল "সারসংগ্রহ" নামক চিকিৎসা পুস্তক বাহির হয় এবং পরে "মেটিরিয়া মেডিকা", "প্রাক্‌টিস্-অব-মেডিসিন", "অর্গানন্" প্রভৃতি উপাদেয় গ্রন্থরাজি বাহির করেন। শরীরতত্ত্ব, (Anatomy), ফিজিওলজি বা জীবনবিদ্যা (Physiology) ও তিনি খণ্ডাকারে প্রকাশিত করিতে মনস্থ করেন।

তাঁহার অ-বর্ত্তমানে যাহাতে 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ' সুচারুরূপে চলিতে পারে—তজ্জন্য তিনি বন্ধুবর মিঃ সুল্‌তান আহ্‌মদ খানকে ১৩৩৪ সালের প্রান্তভাগে আমেরিকায় প্রেরণ করেন।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল, ডাক্তার সাহেব কলেজে রীতিমত অধ্যাপনা করিলেন। রাত্রি ৯টার পর হইতে তাঁহার দাস্ত ও বমি হইতে লাগিল। ক্রমে তাহা ভীষণ আকার ধারণ করিয়া দুরন্ত কলেরায় পরিণত হইল। ১লা আগষ্ট, এই কর্ম্মবীর ডাক্তার সাহেব একমাত্র নাবালক পুত্র ও বিধবা-পত্নীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অমরধামে মহাযাত্রা করিলেন।

তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার সুল্‌তান আহ্‌মদ খান, এম-ডি, আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন

এবং শ্রদ্ধাস্পদ খুল্লতাত'র পরিত্যাক্ত ডিস্পেন্সারী ও কলেজ সুন্দরভাবে পরিচালনা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত ডাক্তার এম, খানের ভাগিনেয়, ডাক্তার দিদার বখ্‌ত খান, এম-বি, মামার কলেজ হইতে শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তার সুল্‌তান আহ্‌মদ-এর খিদিরপুরস্থিত প্রাক্তন ডিস্পেন্সারীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। অল্প দিনের ভিতর তিনিও তথায় বেশ সুনাম অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

ডাক্তার এম, খান আর্ত্তের বন্ধু ছিলেন। পরের দুঃখ দেখিলে নিমিষে তাঁহার হৃদয় আর্দ্র-দ্রবীভূত হইয়া যাইত। নিজে দুঃখ-দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি গরীবের প্রকৃত অবস্থা অনুভব করিতেন। তিনি কর্ম্মময় জীবনে বহু ছাত্র, আগন্তুক, বিদেশী অসহায়কে আপন তত্ত্বাবধানে রাখিয়া চিকিৎসা করিয়াছেন ও লেখা পড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছেন। তাঁহার বাল্য-সুহৃদ্‌ দীন মোহাম্মদ-এর মৃত্যুর পর তাঁহার অসাহায়া পত্নী ও পুত্রকন্যার যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি গ্রহণ করেন। তিনি জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলকে ভালবাসিতেন। ধর্ম্মে তাঁহার অটল ভক্তি ছিল। নামাজের সময় উপস্থিত হইলে তিনি শত কাজ ফেলিয়া জামা'তে খাড়া হইতেন।

জীবিতকালে তিনি বহু দরিদ্র শিক্ষার্থীকে পুস্তক কিনিয়া দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। বিশ্রাম কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। কেহ বিশ্রামের কথা বলিলে তিনি উত্তর করিতেন—"বিশ্রামের স্থান কবরে—এ দুনিয়ায় নহে। বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে আমরণ কর্ম্ম করিবার স্থান। অকর্ম্মণ্য, ধৈর্য্যহীন ব্যক্তিরা জীবন-যুদ্ধে বিশ্রাম করিতে চাহে।" তিনি আরো বলিতেন,- "If you run after the money, the money will not come; the money comes itself." অর্থাৎ "টাকা আপনা হইতেই আসে, টাকার পিছনে দৌড়াইলে টাকা আসে না—মানুষ টাকা প্রস্তুত করে, টাকা মানুষ প্রস্তুত করে না। টাকার সাধনা করিলে টাকা আপনা হইতে হাঁটিয়া ঘরে আসে।"

ডাক্তার এম, খান শেষ-জীবনে প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রত্যহ নিয়মিত ব্যায়াম করিতেন। তারপর নামাজ আদায় করিয়া কর্ম্মের স্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। ইহা তাঁহার দৈনন্দিন রুটিন ছিল। এই সমস্ত কারণে তাঁহার অটুট স্বাস্থ্য ও প্রগাঢ় কর্ম্মশক্তি বরাবর বিদ্যমান ছিল। এই আদর্শ মনীষী চিকিৎসকের মৃত্যুতে আজ সকলেই ব্যথিত।

হেনরি ফোর্ড

এম, আবদুর রহমান

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই মাসের এক শুভ লগ্নে আমেরিকার "মিচিগান" নামক পল্লীতে জনৈক কৃষককুলে বর্ত্তমান যুগের অন্যতম সর্ব্বপ্রধান ধনী ব্যক্তি হেনরী ফোর্ড জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বিশেষ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন না। কাজেই বাল্যজীবন হইতে পিতার সহকারী-রূপে তাঁহাকে মাঠের কাজ করিতে হইত। সাধারণ কৃষক বালকদের সহিত হেনরি ফোর্ড গ্রাম্য পাঠশালায় নিজের অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। এই পাঠ্যজীবনে, গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে কর্ম্মনিষ্ঠ কিশোর হেনরি ফোর্ড পিতার সঙ্গে ক্ষেত্রের কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন।

আমাদের দেশে পাড়াগাঁয়ে যেমন ছোট ছোট দোকান থাকে, তাঁহার পিতার সেরূপ ছোট্ট একটা দোকান ছিল। আপন খুশিতে অবসর সময়ে বালক হেনরি সেই স্থানে ছুতোর মিস্ত্রির কাজে ব্যাপৃত থাকিতেন। এইরূপ নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যের মধ্যে তাঁহার বাল্যজীবন গঠিত ও পরিস্ফুট হয়।

ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে হেনরি ফোর্ড মিস্ত্রির কাজ শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে প্রিয় জন্মভূমির মায়া-মমতা পরিত্যাগ করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হন এবং দূরবর্ত্তী কোন শহরে ঘড়ী মেরামতের দোকানে কার্য্যগ্রহণ করেন।

বিরাম-বিশ্রামহীন পরিশ্রম করিয়া তিনি এইখানে কার্য্য শিক্ষা করেন। তাঁহার আট বৎসরব্যাপী এই নিরবচ্ছিন্ন ও গভীর কর্ম্মসাধনা ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য-সৌধের সুদৃঢ় সোপান এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রথম ভিত্তি।

চতুর্ব্বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে হেনরি ফোর্ড পিতার আদেশে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে তাঁহার স্নেহময় পিতা তাঁহাকে চল্লিশ একর পরিমিত বিটপী সুশোভিত একটী উদ্যান প্রদান করেন। ফোর্ড এখানে কলের করাত প্রতিষ্ঠা করিয়া ছুতোর মিস্ত্রির ব্যবসায় গ্রহণ ইঞ্জিনীয়ারের পদ গ্রহণ করেন। এই চাকুরী গ্রহণ করিবার সময় তাঁহাকে আমাদের দেশের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি দেখাইতে হয় নাই। তাঁহার এই কর্ম্মচারী জীবনে তিনি এত কার্য্যকুশলতা ও দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন যে, উক্ত কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বেতন ৮০ ডলার পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়া দেন। এই স্থান হইতে তাঁহার ক্রমোন্নতি আরম্ভ হয়।

সাত বৎসর কারখানার কার্য্য করিয়া তিনি তাঁহার উদ্যান সন্নিধানে একটী পাকাগৃহ নির্ম্মাণ করেন। এই
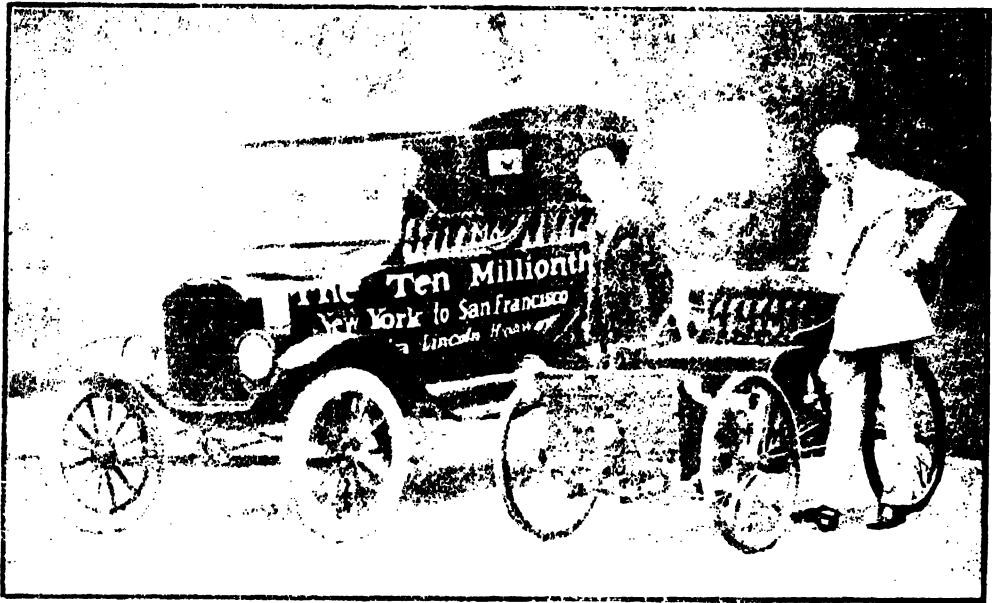
প্রথম নির্ম্মিত গাড়ীর নিকট স্বয়ং মিঃ ফোর্ড দাঁড়াইয়া। অপর গাড়ীটী তাঁহার সেই সময়কার কারখানার শেষ নির্ম্মিত গাড়ী; উহার নিকট তাঁহার পুত্র দাঁড়াইয়া।

করিলেন। নিজের কারখানা হইতে তক্তা লইয়া এই বাগান বাটীতেই আপনার বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন। এই গৃহ নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে তিনি দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের সাবেক দোকানটী তিনি এইখানে স্থানান্তরিত করেন। এই সময় হইতে তিনি একটী মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ করিতে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। তাঁহার জীবনের সাধনা ও প্রাণের আশা ব্যর্থ হইয়া গেল। কাজেই তিনি আপাততঃ এ সকল কার্য্য ত্যাগ করিয়া নিকটস্থ কোন শহরের বাতির কারখানায় মাসিক ৪৫ ডলার বেতনে জনৈক গৃহে তিনি একটী নিজস্ব কারখানা স্থাপন করেন। অবসর সময়ে তিনি এই কারখানার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। প্রত্যহ তিনি তাঁহার প্রভুর কারখানার ডিউটীতে (Duty) যাইবার পূর্ব্বে আপনার কারখানায় কিছুক্ষণ কার্য্য করিয়া যাইতেন। এইরূপে তিল তিল সাধনা ও অসীম অধ্যবসায়ের ফলে তাঁহার নব আবিষ্কৃত দুই সিলিণ্ডারযুক্ত ঘণ্টায় ৩০ মাইল দ্রুতগামী প্রথম পেট্রোল গাড়ী নির্ম্মিত হয়। ঐ মোটর গাড়ীটী অদ্যাপি অটুট অবস্থায় বর্ত্তমান আছে।

কিছুদিন পরে হেনরি ফোর্ড ও অন্যান্য অংশীদারগণের সমবায়ে একটী কোম্পানী গঠিত হইলে, হেনরি ফোর্ড

তাহার প্রধান ইঞ্জিনীয়ারের পদপ্রাপ্ত হইলেন। এই কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে কয়েকটী গাড়ী নির্ম্মিত হইল। কিন্তু এই কোম্পানীর কার্য্যপ্রণালী তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায় ১৯০১ খৃঃ ঐ কোম্পানীর সংশ্রব ত্যাগ করেন। এবং পরে স্বতন্ত্রভাবে নিজের তত্ত্বাবধানে একটী গাড়ী তৈয়ার করিতে আরম্ভ করেন। পূর্ণ দুই বৎসরের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি এই গাড়ীখানি তৈয়ার করিতে সমর্থ হন। ইহার পরবৎসর তিনি "ফোর্ড মোটর কোম্পানী" গঠনে আত্মনিয়োগ করেন এবং অচিরেই এই নব প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর এক চতুর্থাংশের মালিক হইয়া দাঁড়ান। পরে তিনি নিজের কার্য্যকুশলতার গুণে ভাইস প্রেসিডেণ্ট ও ম্যানেজারের পদে উন্নীত হন। কিন্তু তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষী হৃদয় ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। কাজেই কোম্পানীর পূর্ণ ক্ষমতা ও অধিকার গ্রহণ করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসরের চেষ্টার ফলে তাঁহার আশা কতক পরিমাণে সফল হইল; তিনি এই কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ারের সত্ত্বাধিকারী হইয়া দাঁড়াইলেন।

কুবের-শ্রেষ্ঠ হেনরি ফোর্ডের এক মাত্র পুত্র ডসেল ফোর্ড পিতার যোগ্য পুত্র। তিনি ১৯১২ খৃষ্টাব্দে সাধারণ স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করিলে, তাঁহার পিতা তাঁহার নিকট কলেজে পড়িবেন কিনা তাহা জানিতে চাহেন। ইহাতে ডসেল তাঁহার পিতাকে জ্ঞাপন করেন যে, কলেজের অধ্যয়নের পরিবর্ত্তে তিনি কোন কারখানায় কার্য্য শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক। ইহাতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে তাঁহার কারখানায় নিকৃষ্টতম কোন শ্রমিকের পদে নিয়োগ করেন। অল্পদিনের মধ্যে ডসেল নিজের অধ্যবসায় ও কর্ম্মকুশলতার দ্বারা উক্ত কারখানার সমস্ত বিভাগের কার্য্য শিক্ষা করিতে সমর্থ হন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পূর্ব্বোক্ত কোম্পানীর বাকী অংশগুলি কিনিয়া তাঁহার পিতাকে চমৎকৃত করিয়া ফেলেন। বর্ত্তমানে নিজগুণে তিনি ফোর্ড কোম্পানীর প্রেসিডেন্সির পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সারা ধরণীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী হেনরি ফোর্ডের একমাত্র পুত্র নিকৃষ্টতম শ্রমিকের কার্য্য গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। বরঞ্চ শ্রমিকের কার্য্য স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া সেই কার্য্যের ভিতর দিয়া নিজেকে গড়িয়া তুলিতে সর্ব্বতোভাবে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তাঁহার বেশ ভূষা এত সাদাসিধা ধরণের যে, তাঁহাকে দেখিয়া সাধারণ গৃহস্থ ঘরের যুবক বলিয়া প্রতীতি জন্মে। স্বাধীন দেশের আবহাওয়ার কার্য্যকরিতা শক্তি এমনিই বটে!

ফোর্ড মোটর কোম্পানী ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে গঠিত হয় এবং সেই বৎসর জুলাই মাস হইতে কার্য্য আরম্ভ হয়। কোম্পানীর গঠন কার্য্য সম্পূর্ণভাবে সমাধা করিয়া হেনরি ফোর্ড রেসের গাড়ী তৈরী করিতে যত্নবান হন। তিনি স্বয়ং তাঁহার 'রেসিং কার' (Racing Car) পরিচালনা করিয়া ক্রমে ক্রমে দেশ-বিদেশের অসংখ্য রেস জয় করেন। ইহাতে একদিকে যেমন তাঁহার সুনাম—অপরদিকে তেমনি তাঁহার গাড়ীর কাট্‌তি অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যায়।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মিনিটে এক মাইল গতিতে বাল্‌টিমুরের হিমানীতুষার পথদিয়া মোটর চালাইতে তিনি সর্ব্বপ্রথমে সমর্থ হন।

অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন কর্ম্মবীর হেনরি ফোর্ড সাহেবের কারখানায় দৈনিক অর্দ্ধলক্ষাধিক লোক কার্য্য করিয়া থাকে। আজ তিনি কোটী কোটী পাউণ্ডের অধিপতি। সারা পৃথিবীর শিক্ষিত সমাজে এমন কেহ নাই যিনি মহামান্য হেনরি ফোর্ডের নাম শুনেন নাই। একদিন যে ব্যক্তি সামান্য মিস্ত্রির পদে কার্য্য করিয়া নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন আজ তাঁহারই কারখানায় কাজ করিয়া অর্দ্ধ লক্ষাধিক লোক দিনাতিপাত করিতেছে। বিজ্ঞানকে তিনি আজ সহজ-সরল রূপ দান করিতে চলিয়াছেন, ইহা কি সোজা কথা? হেনরি ফোর্ড নাকি বলিয়াছিলেন যে, যেদিন তিনি পৃথিবীর ঘরে ঘরে তাঁহার গাড়ীর "গ্যারেজ" করাইতে পারিবেন, সে দিন তাঁহার বাসনা সফল হইবে। আজ তাঁর সেই বাসনা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে বলিলে বেশী কিছু বলা হয় না।

এই কর্ম্মসাধনা, অধ্যবসায় এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবিকই অনুকরণীয়।

প্রথম আবদুর রহমান

মজিবর রহমান, বি-এ

স্পেনের মুসলমান-রাজত্ব জগতের ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগ। রোমীয় সভ্যতা যখন ইউরোপের বুকে নিবিড় অন্ধকার ঢালিয়া দিয়া ইউরোপ খণ্ড হইতে বিদায় গ্রহণ করিল, তখন মরু-সন্তান এই আরববাসিগণ অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে সভ্যতার এক জ্যোতির্ম্ময় প্রদীপ লইয়া ইউরোপে উপস্থিত হইল। তাহারই আলোকে শুধু স্পেন নয়, সমগ্র ইউরোপ আটশত বৎসর ধরিয়া আলোকিত হইয়া রহিল। কিন্তু এই মুসলমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম আবদুর রহমানের অপূর্ব্ব রহস্যময় দুঃসাহসিক কার্য্যপূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত আজ বিস্মৃতির মহাজালে আচ্ছাদিত।

খৃষ্টীয় ৭৫০ অব্দে, ২৫শে জানুয়ারী তারিখে (হিজরী ১৩২, ১১ই দ্বিতীয় জামাদি) আব্বাস বংশের প্রথম খলিফা আস্সাফা জাবের মহাযুদ্ধে উম্মীয়া বংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া আব্বাসীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কেবল উম্মীয়া বংশের পরাজয় সাধন করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না; হতভাগ্য উম্মীয়া বংশের রক্তস্রোত যুদ্ধক্ষেত্রে শুষ্ক হইবার পূর্ব্বেই শোণিত-লোলুপ আস্সাফার (আস্সাফার বাঙ্গালা অর্থ শোণিত-লোলুপ, অথবা রক্তপাতের জন্যই তিনি এই উপাধি পাইয়াছিলেন) আদেশক্রমে উম্মীয়া বংশের রাজধানী দামেস্ক নগরী তাহাদের রক্তে প্লাবিত হইল। বৃদ্ধ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান (745-750 A. C.) দামেস্ক হইতে পলায়নপূর্ব্বক বহু দেশ পর্য্যটনের পর মিসরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন কিন্তু স্পেনেও তিনি অব্যাহতি পাইলেন না। আস্সাফার অনুচর কর্ত্তৃক সেখানে ধৃত ও নিহত হন। এবং সেই অভিশপ্ত ('doomed') বংশের যে কোন ব্যক্তি তাহাদের করতলগত হইল তাহাকেই আস্সাফার করাল-কবলে নিপতিত হইতে হইল। পরিশেষে যখন বহু অনুসন্ধানের পরও কোন জীবিত ব্যক্তি দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িল, তখন দামেস্কের সমাধি স্থান হইতে বহুকাল প্রোথিত হতভাগ্য উম্মীয়া বংশের অস্থিরাশি উত্তোলনপূর্ব্বক ভস্মে পরিণত করিয়া বাতাসে উড়াইয়া দেওয়া হইল।

এই নিদারুণ নির্য্যাতন ও হত্যাকাণ্ড হইতে আবদুর রহমান নামক এক বিংশতি বর্ষীয় যুবক তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহ অব্যাহতি পাইল। আস্সাফার আদেশানুসারে যখন তাঁহার অনুচরবৃন্দ এই পরিবারের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল তখন আবদুর রহমান কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ শিকার উদ্দেশ্যে গৃহের বহির্গত হইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু রাত্রিযোগে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার শিশু-সন্তান সোলেমান ও তাঁহার দুই ভগ্নি ভিন্ন সকলেই নিহত হইয়াছে, তখন তিনি তাঁহার ব্যয়-নির্ব্বাহ নিমিত্ত কিছু অর্থ লইয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভগ্নী ও শিশুসন্তানকে ইউফ্রেটিশ নদীর তীরে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া নীরবে রজনীর অন্ধকারযোগে অজ্ঞাত জীবন যাপনে বহির্গত হইলেন।

তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত হইলে, অনতিবিলম্বে তাঁহার পরিবারবর্গও তাঁহার সহিত মিলিত হইল; কিন্তু এস্থান বিশেষ নিরাপদ নয় বলিয়া আফ্রিকায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে কোন কোন স্থানে তাঁহার সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা হইতে পারে, তাহা তাহাদিগকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন। [illegible] চক্ষু রোগাক্রান্ত হওয়ায় সেই স্থান হঠাৎ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। এই অবস্থায় তিনি একদিন এক অন্ধকার কক্ষে শুইয়া আছেন এমন সময় তাঁহার চারি বৎসরের

পুত্র সোলেমান বিছানা ছাড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পিতার বক্ষে লুটিয়া পড়িল। আবদুর রহমান বিরক্তি সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বাপু কাঁদিস কেন, তুই কি জানিস না যে আমি রুগ্ন অবস্থায় আছি, তোর কি হয়েছে বল্‌না।" রোরুদ্যমান সোলেমান কিছুই বলে না, শুধু দর-বিগলিত নেত্রে পিতার বক্ষে লুকাইবার চেষ্টা করে। আবদুর রহমান ভাবিলেন ইহার কারণ কি; তিনি স্বয়ং দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া অদূরে কৃষ্ণপতাকা দেখিতে পাইলেন। (আব্বাসবংশীয় সৈন্যগণ কৃষ্ণপতাকা ও কৃষ্ণ পোষাক ব্যবহার করিতেন।) এই কৃষ্ণ পতাকাধারী কৃষ্ণ পোষাক পরিহিত সৈনিকগণকে সে ভাল করিয়াই চিনিত। ইহারাই একদিন তাহার সম্মুখে তাহার পরিবারের সকল লোকের হত্যাসাধন করিয়াছিল। সেই দিন হইতে জগতের প্রত্যেক কৃষ্ণ-পোষাক-পরিহিত ব্যক্তি মাত্রই শিশু সোলেমানের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিত এবং আজও করিল। তাই আজ কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পিতার জীবন রক্ষার জন্য স্বর্গীয় দূতের মত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। সেই কৃষ্ণ পতাকা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইবামাত্রই আবদুর রহমান, প্রয়োজনীয় কিছু অর্থ সহ, গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পলায়ন করিলেন। বিদায়কালে মাত্র বলিয়া গেলেন "আমি অবশ্য চলিলাম কিন্তু আমার সহচর বদরকে প্রয়োজনীয় অর্থ সহ আমাকে অনুসরণ করিতে বলিও— অমুক অমুক স্থানে আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা আছে।" আব্বাস বংশীয় সৈন্যগণ আবদুর রহমানের গৃহে আসিয়া দেখে যে দুইজন স্ত্রীলোক ও একটি শিশু সন্তান ভিন্ন অন্য সকলেই সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছে; তখন তাহারা সেই স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আবদুর রহমান তাঁহার ত্রয়োদশ বর্ষীয় ভ্রাতাসহ পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বদর প্রয়োজনীয় অর্থসহ তাহাদের সহিত মিলিত হইলে পর তাঁহারা তিন জনে ইউফ্রেটিশ নদীর তীরস্থ কোন একটি গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই স্থানে অনাহারক্লিষ্ট অবস্থায় কোন একটী লোককে কিছু আহার্য্য দ্রব্য ও ও পোষাক সরবরাহের জন্য অনুরোধ করিয়া বদরকে তাহার সঙ্গে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোন একটী ক্রীতদাস অগোচরে থাকিয়া তাহা শুনিবামাত্র পুরস্কার লাভের আশায় নিকটস্থ, আব্বাসবংশীয় কোন সেনানায়কের কর্ণগোচর করিল।

কিছুক্ষণ পরে অশ্ব-ক্ষুর-ধ্বনি-শ্রবণ করিয়া বৃক্ষের অন্তরালে কৃষ্ণ-পতাকাধারী কৃষ্ণ-পোষাক পরিহিত আব্বাস বংশীয় অনুচরগণকে দেখিতে পাইলেন আশ্রয় গ্রহণের জন্য যেমনই তাঁহারা স্থানান্তরে যাইতেছিলেন অমনই সেই পাষণ্ডগণ তাঁহাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিল। মৃত্যু আসন্ন ভাবিয়া আবদুর রহমান এখন শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া বীরের মত মৃত্যুকে বরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তিনি এখন সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। এমতবস্থায় তাহার জন্য দুইটি পথ উন্মুক্ত ছিল। হয় বিনাযুদ্ধে শত্রুর নিকট আত্ম-সমর্পণ করা, না হয় সন্তরণপূর্ব্বক নদী অতিক্রম করিয়া জীবন রক্ষা করা। আত্মসমর্পণ করিলে শত্রুহস্তে মৃত্যু নিশ্চিত কিন্তু সন্তরণ করিতে পারিলে জীবন রক্ষার সম্পূর্ণ আশা। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ ইউফ্রেটিশ নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। অর্দ্ধ নদী অতিক্রম করিয়া গেলে সেই নর-পিশাচ, বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচরগণ তাঁহার জীবন রক্ষার দোহাই দিয়া ফিরিয়া আসিবার জন্য অনেক প্রলোভন দেখাইল। সেই প্রলোভনের পরিণাম ফল কি তাহা আবদুর রহমান ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সন্তরণ শক্তি হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল; শরীর অসাড় ও শিথিল হইয়া আসিল। তাই সেই অর্ব্বাচীন যুবা তাহাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কূলে ফিরিতে উদ্যত হইল। আবদুর রহমান তাহাকে ফিরিতে উদ্যত দেখিয়া অনেক নিষেধ করিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সেই রিক্ত হস্ত, সিক্ত বসন, শ্রান্ত দেহ আবদুর রহমান কূলে আসিয়া কনিষ্ঠের অবস্থা অবলোকন করিবার জন্য চক্ষু ফিরাইবা মাত্র দেখিতে পাইলেন, তাহার শিরশ্ছেদ হইয়াছে।

এই হৃদয়-বিদারক মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখিবার তাহার আর সময় ছিল না। নিমিষেই তাঁহাকে ইউফ্রেটিশের তটস্থ বনমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। এখন হইতে তাঁহার দুঃখ দৈন্যের সীমা ছিল না। যাহা কিছু অর্থ লইয়া ইউফ্রেটিশ নদীর তীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়া রিক্তহস্তে আজ তাঁহাকে বেদুইন জাতির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। বেদুইন জাতির

সহিত বসবাস কালে তাঁহাকে প্রায়ই আত্ম-গোপন করিয়াই থাকিতে হইত কিন্তু খোদা তাঁহাকে আত্ম-গোপনের আকৃতি দান করেন নাই। তাঁহার অনন্ত যৌবন, অতুলনীয় রূপ, রাজোচিত অঙ্গ-বিন্যাস অমায়িক আচার-ব্যবহার প্রভৃতি গুণরাশি তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। যে কোনও বেদুইন সম্প্রদায়ের নিকট তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিতে গিয়াছেন, তখনই তাহারা তাঁহাকে কোন রাজ-বংশোদ্ভব ব্যক্তি বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন। কিন্তু বেদুইন সম্প্রদায়ের এক মহাগুণ এই ছিল যে অতিথি শত্রু হউক আর মিত্রই হউক তাহাকে তাহারা কখনই শত্রু-হস্তে সমর্পণ করিবে না। এই জন্যই আবদুর রহমান সেই মরু-নিবাসী বেদুইন সম্প্রদায়ের নিকট নিরাপদে কালাতিপাত করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এক সম্প্রদায়ের নিকট বহুদিন যাবত না থাকিয়া শীঘ্র শীঘ্র সম্প্রদায় পরিবর্ত্তন করিয়া অপরিচিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসবাস করিতেন। অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া মেষ কিম্বা ছাগপাল লইয়া কোন পর্ব্বত, উপত্যকা বা অরণ্যে যাইয়া লুকাইয়া থাকিতেন, কখনও বা উহাদিগকে জল পান করাইতেন, কখনও বা খেজুর আহরণ-মানসে খেজুর বৃক্ষে আরোহণ করিয়া থাকিতেন, কখনও কাষ্ঠাহরণ মানসে বনমধ্যে লুক্কাইত থাকিতেন এবং দিবা অবসান হইলে রাত্রির অন্ধকার যোগে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আহার সমাপনান্তে শয্যা গ্রহণ করিতেন। কিন্তু সেখানেও শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইবার ভয়ে সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইতেন এবং এই অনিদ্রার জন্যই তিনি একবার চক্ষু রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের পূর্ব্ব সঞ্চিত কোন অর্থও ছিল না। এই জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্ত্র ভিন্ন দিনের প্রচণ্ড সূর্য্যতাপ ও রাত্রির তীব্র শীত নিবারণের জন্য অন্য কোন বস্ত্র ছিল না। এই অবস্থায় কালাতিপাত করিয়া তিনি গোপনে নিরাপদে প্যালেষ্টাইনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভগ্নীর ক্রিতদাস অতীতের সহচর বিশ্বস্ত সেলিম ও বদরের সাক্ষাৎ পাইলেন। পূর্ব্ব কথামত তাঁহার ভগ্নি তাঁহার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও বস্ত্র পাঠাইয়া দিলেন। প্যালেষ্টাইনে নিরাপদে কালাতিপাত করিবার সম্ভাবনা না থাকায় তাঁহারা তিন জনে আফ্রিকা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই সময় উত্তর আফ্রিকা নামে মাত্র আব্বাসবংশের শাসনাধীন ছিল। উম্মীয়া বংশের পতন কালে তাহাদের শাসন প্রায় শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ সামান্য কিছু করদান করিয়া আপনার ইচ্ছানুক্রমে শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিতেন। উম্মীয়া বংশের পতনের পর আব্বাস বংশ এই সব প্রদেশকে সম্পূর্ণরূপে শাসনাধীনে আনিতে পারেন নাই। এ কারণ উম্মীয়া বংশের যে কোন ব্যক্তি আসসাফার তরবারী হইতে জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছিল তাহারা প্রায় সকলেই উত্তর আফ্রিকায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আবদুর রহমানও সেই সংকল্প স্থির করিয়া দুইজন অনুচর সহ সেই স্থানে পৌঁছিলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি এই স্থানে নিরাপদেই জীবন যাপন করিতে পারিতেন, কিন্তু এই নীচ জঘন্য গোপনীয় জীবন যাপন করিবার পাত্র তিনি ছিলেন না। সুখ-সৌভাগ্যের চরম সীমা হইতে দুর্ভাগ্যের নিম্নতম স্তরে যাইয়াও তিনি শৈশবাবধি এক অতি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং এই উচ্চ আশাই তাঁহাকে শত বাধা-বিপত্তি ও দুঃখ-দৈন্যের মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনের কর্ম্মস্থানে চালিত করিতেছিল। অনন্ত ধনরাশি, জনরাশি ও অনুপম কারুকার্য্যখচিত প্রাসাদ-পূর্ণ তাঁহার শৈশবের ক্রীড়া-ভূমি দামেস্ক মহানগরী, যাহার প্রত্যেক ইষ্টক খণ্ডের সঙ্গে তাঁহার বাল্যস্মৃতি বিজড়িত, যেখানে অসীম সুখ-সম্ভোগ ও বিলাসের মধ্যে আপন ভ্রাতা-ভগিনী আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে লালিতপালিত হইয়াছেন, যে স্থান হইতে প্রায় শত বর্ষকাল তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ অপ্রতিহত প্রভাবে মোসলেম সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, সেই দামেস্কনগরী শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি কিছুতেই তাহা ভুলিতে পারে নাই। যদিও তিনি আজ পথের নিঃসহায় ভিক্ষুক-প্রায়, তবুও আপনার জন্মভূমি হইতে শত্রু কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইবার পর মুহূর্ত্ত হইতেই রাজ্য ও রাজ-সিংহাসনের স্বপ্নে বিভোর থাকিতেন। এই প্রকার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিবার বিশেষ কারণ ছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁহার বাল্য জীবনের একটি ঘটনা বিবৃত করিতে হইল। তাঁহার বাল্যজীবন সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ বিশেষ কিছু লিখিয়া যান নাই। ঐতিহাসিক এব্নে আল—আতহির ও আল মাক্কারী যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। তৎকালে আরব জাতির

মধ্য একটি সাধারণ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, মানুষের ভাগ্যলিপি তাহার ললাটে ও হস্ততালুতে লিখিত থাকে। আবদুর রহমান ও ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। শৈশবে পিতৃহীন হইয়া বৃদ্ধ পিতামহ খলিফা হেশামের (৭২৪—৭৪৩ খৃঃ অঃ) স্নেহ যত্নেই তাঁহার কিনিসিরিন প্রদেশ স্থিত রুশাফার প্রমোদ-ভবনেই আবদুর রহমান লালিত পালিত হইয়াছিলেন। দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আবদুর রহমান একদিন তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতা ও ভগ্নী সহ রূসাফার (Rusafa) প্রাসাদে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় তাঁহার খুল্লতাত মাস্‌লামা সেই স্থানে উপনীত হ'ন এবং তাঁহারা যে মৃত মোয়াবিয়ার সন্তান তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার চক্ষুদ্বয় অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল এবং তাঁহাদিগকে দুই জন দুই জন করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে বলিলেন। যখন আবদুর রহমান তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন, তখন খলিফা হেশাম সেই স্থানে আসিয়া মাস্‌লামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বালকের ভাগ্যগণনা করছ না কি?" মাস্‌লামা অন্যের অশ্রুত স্বরে তাঁহার কানে কানে বলিয়া দিলেন যে "অচিরে এক মহা-ঘটনা সংঘটিত হইবার সম্ভবনা এবং তাহাতে এই বালকের ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিবে।" হেশাম এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হইবার জন্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি (মাস্‌লামা) তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "আমি এ বিষয়ে সুনিশ্চিত ভাবে বলিতেছি এই করতলে ও এই ললাটে তাহার ভাগ্যলিপি লেখা আছে।"

আবদুর রহমান ইহা বিশেষ ভাবে স্মরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং সেই অবধি তাঁহার পিতামাতা তাঁহার আহার-বিহার বেশ-ভূষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন লইতেন। সকল লোকের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করিতে না দিয়া তাহার লেখাপড়ার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এই এই আশার বশবর্ত্তী হইয়াই এত দুঃখ দৈন্যের মধ্যেও এক মুহূর্তের জন্য রাজ্য ও রাজসিংহাসনের স্বপ্ন ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি কোন রাজ্য স্থাপন করিবেন, কিন্তু পৃথিবীর কোন্ দেশের মুকুট তাঁহার শিরোদেশে শোভা পাইবে, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না।

এই সময় ইব্‌নে হাবিব নামক একব্যক্তি উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সেইস্থানে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে উহার স্বাধীন সুলতান করিবার ইচ্ছা থাকায় উম্মীয়া বংশের পতনের পর আর আব্বাস বংশের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে নাই। কিন্তু সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হইতে না পারিয়া অনেক জ্যোতিষীর নিকট তাহার বংশের ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া লইতেন। আবদুর রহমান সেই দেশে পৌছিবার কিছুদিন পূর্ব্বে একজন ইহুদী ইব্‌নে হাবিবকে বলিয়াছিল যে "আবদুর রহমান নামক কোন রাজবংশোদ্ভব একব্যক্তি এই রাজ্যের রাজা হইবে।" ইব্‌নে হাবিব ইহাতে উত্তর করিয়াছিল "আমার নামইত আবদুর রহমান ইব্‌নে হাবিব"। ইহুদী বলিয়াছিল "রাজবংশোদ্ভব হওয়া চাই" ইহাতে ইব্‌নে হাবিব বিশেষ সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন এবং আবদুর রহমান তাহার রাজ্যে উপনীত হইলে ইব্‌নে হাবিব ইহুদীকে বলিল "নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি আফ্রিকার শাসনকর্ত্তা হইবে, কেননা তোমার উল্লিখিত প্রত্যেক লক্ষণই ইহাতে বিদ্যমান আছে।" একারণ ইব্‌নে হাবিব তাহাকে বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখিত। তাঁহার মত উম্মীয়া বংশের আরও অনেক পলাতকই সেই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। একদিন খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের (৭৪৩—৭৪৪ খৃঃ অঃ) দুই পলাতক পুত্র তাহাদের আশ্রয়দাতার গৃহে মদ্যপান কালে জ্ঞানশূন্য অবস্থায় বলিয়া ফেলে যে "কি আমরা এখানে অসহায় ও অনশনে দিনপাত করিব আর ইব্‌নে হাবিব আমাদের রাজ্যভোগ করিবে।" এই কথা ইব্‌নে হাবিব স্বয়ং শুনিয়াছিল বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ও উম্মীয়া বংশের অন্যান্য পলাতক ব্যক্তিকে হত্যা করিতে আদেশ দেয়।

সৌভাগ্যক্রমে আবদুর রহমান সেদিন সেগৃহে উপস্থিত ছিলেন না এবং সেই কথা শুনিবামাত্র তিনি সেস্থান হইতে পলায়ন পূর্ব্বক উত্তর আফ্রিকাস্থিত বার্‌বার জাতির আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী হইলেন কিন্তু ইব্‌নে হাবিবের ভয়ে কোন সম্প্রদায় তাঁহাকে আশ্রয় দান করিতে সাহস করিল না। এই ভাবে তিনি আশ্রয়হীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন, বন্ধু-বান্ধব, পুত্র-পরিবার সহায়-সম্পদশূন্য অবস্থায়—কখন বা মনুষ্য সমাগম বিরহিত অরণ্য মধ্যে কখনও নিবিড় অন্ধকারপূর্ণ বন্য জন্তুর গহ্বরে, কখনও বা সাহারার সর্ব্বগ্রাসী প্রচণ্ড

বাত্যাতেজ বরণ করিয়া এবং কখনও বা সাগরকূলস্থ শীত-রাত্রির তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করিয়া সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে তাঁহার মাতার পূর্ব্ব পুরুষগণের আবাস ভূমি জিব্রাল্টারের নিকটস্থ "সিউটা" নগরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এই অজ্ঞাত বাসের ইতিহাস আলোচনা কালে এমনও জানা গিয়াছে যে, রাত্রি-ভ্রমণকালে তিনি অনেক সময় সিংহের সম্মুখে পতিত হইয়াছেন। ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি বন্য পশুরত কথাই নাই। (Conde. Vol. I. P. 165.) এই নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কিছুকাল কালাতিপাত করিবার পরও তাঁহার ভাগ্য পরিবর্ত্তনের কোনও লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। এই 'সিউটা' নগর স্পেনের অতি নিকটবর্ত্তী। এইস্থানে বসবাস কালে তিনি প্রায়ই সমুদ্রের ধারে একাকী বসিয়া থাকিতেন এবং স্পেনের লতাগুল্ম সুশোভিত শ্যামল-সুন্দর তীরভূমির প্রতি দৃক্‌পাত করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস না ফেলিয়া থাকিতে পারিতেন না। এই স্পেন রাজ্যই যে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ কর্ত্তৃক একদা বিজিত ও শাসিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন এবং কেমন করিয়া যে ইহা পুনরুদ্ধার করিবেন সেই চিন্তায় বিভোর থাকিতেন।

এই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহা তাঁহাকে বিশেষ মর্ম্মাহত করিয়া দিল। তাঁহার সুখ-দুঃখের চির-সহচর বদর ও সেলিম এ পর্য্যন্ত ছায়ার মত তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এতদিনে একজন লক্ষ্যহীন পলাতকের সঙ্গে জীবন-বিপন্ন করিয়া অনাহার ও অনশনে দিবারাত্রি অরণ্য, মরু ও পর্ব্বত-কন্দরের অজ্ঞাত-বাস সেলিমের অসহ্য হইয়া পড়িল। একদিন নিদ্রিতাবস্থায় থাকিয়া তাহার প্রভুর কথা না শুনার অপরাধে আবদুর রহমান তাহার শরীরে এক ঘটি জল ঢালিয়া দিলেন। ইহাতে সেলিম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল "যেহেতু আপনি আমার সহিত একজন সাধারণ ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করেন—আমি কোন প্রকারেই আপনার নিকট ঋণী নই। আপনার যে ভগ্নী আমাকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দান করিয়াছিলেন, আমি তাঁহারই নিকট চলিলাম।" এই বলিয়া সে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করিল আর বিশ্বস্ত বদর তাহার প্রভুর সুখ-দুঃখের সমভোগী হইয়া সিউটা নগরেই কালাতিপাত করিতে লাগিল।

'সিউটা'য় অবস্থান কালে আবদুর রহমান স্পেনের বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সেখানে আরবীয় সম্প্রদায় ইমানিয়া ও মোধারিয়া নামে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়া এক সম্প্রদায় অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। ইমানিয়া সম্প্রদায়ের বিশেষ সুদক্ষ নেতা না থাকায় মোধারিয়াগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ নির্য্যাতিত হইতে থাকে। আবদুর রহমান অতি গোপনে তাঁহার একখানি হস্ত লিখিত পত্র সহ বদরকে নির্য্যাতিত ইমানিয়া সম্প্রদায়ের নিকট এই বলিয়া সংবাদ পাঠাইলেন যে, তাহাদের আদেশ পাইলে তিনি স্বয়ং তাহাদের পক্ষ সমর্থণ করিয়া মোধারিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত আছেন। ইমানিয়া সম্প্রদায়ের শক্তি ছিল কিন্তু উপযুক্ত নেতা ছিল না। তাই ইমানিয়াগণ আবদুর রহমানের মত একজন সুদক্ষ সেনা-নায়ককে সাদরে গ্রহণ করিল। সমগ্র স্পেন রাজ্য এই সময় নামে মাত্র আব্বাস বংশের শাসনাধীন ছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ শাসনকর্ত্তা ইউসফই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। দুর্দ্দম আরব সম্প্রদায়কে শাসনাধীনে আনিতে না পারায় Divide et Impera policy অবলম্বন করিলেন। এইরূপ বিভিন্ন আরব সম্প্রদায় আত্মকলহে লিপ্ত থাকিয়া যেমনই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তখনই সময় আবদুর রহমান ইমানিয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ সমর্পণ করিয়া মোধারিয়াগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। (রাবিওস্‌সানি, ১৩৮ হিজরী) শাসনকর্ত্তা ইউসফ কিন্তু এই গৃহ বিবাদে যে কোন বহির্শক্তি হস্তক্ষেপ করিবে তাহা দেখিতে পারিলেন না। আবদুর রহমান ইমানিয়াগণের সঙ্গে যোগ দান করিয়াছেন জানিয়া তিনি মোধারিয়াগণের পক্ষ সমর্থণ করিয়া আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। খৃষ্টির ৭৫৬ অব্দে ১৩ই মে তারিখে মাসারার যুদ্ধে ইউসফকে পরাজিত করিয়া স্পেন রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন। জ্যোতিষী মাছলামার ভবিষ্যৎ-বাণী পূর্ণ হইল। বৃদ্ধ পিতামহ হিশামের আদর ও যত্নের শিক্ষাদান সফল হইল, আর ইউরোপের ইতিহাসের এক গৌরবময় যুগ আরম্ভ হইল। এই সময় তিনি তাঁহার পুত্র ও ভগ্নীগণকে স্পেনে আনয়ন করেন।

স্পেন তাঁহার করতল-গত হইল বটে, কিন্তু সুখ-শান্তিতে কালাতিপাত করিবার কোন উপায় দেখিতে পাইলেন

না। পৃথক পৃথক আরব সম্প্রদায় পুনর্ব্বার বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। ফ্রান্সের কার্লোভিঞ্জিয়ান রাজবংশের রাজা পেপিন (Pepin) ও তাহার পুত্র সার্লেম্যান ওরফে প্রথম চার্লস (Charles the great or I) তাহাদের বিদ্রোহানলে গোপনে ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন। পার্শ্বে একটি বৈদেশিক রাজ্য স্থাপিত হইল দেখিয়া খিষ্টিয়ান প্রদেশসমূহ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যে অসাধারণ শক্তিশালী ব্যক্তি পথের ভিখারীর ন্যায় নিঃসহায় অবস্থায় থাকিয়া একদিন আপনার অসীম ক্ষমতাবলে সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করিয়া একটি দেশ জয় করিতে পারিয়াছে, বিজিত রাজ্যকে কেমন করিয়া সুশাসনে আনিতে হয় সে বিষয়েও সে অনভিজ্ঞ ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে স্পেনের আরবীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন একতা ছিল না, সেইজন্য এ বিদ্রোহ দমন করিতে তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। অল্পকাল মধ্যে দেশে শান্তি ও সুশাসন স্থাপিত হইল।

এ পর্য্যন্ত ফ্রান্সের রাজা প্রথম চার্লস গোপন ভাবেই বিদ্রোহীগণকে সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহ দমনের পর তিনি স্বয়ং স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কিন্তু সেকালের ইউরোপের বর্ব্বর জাতির মত স্পেনীয় মুসলমানদের যুদ্ধ পদ্ধতি ছিল না। জার্ম্মাণীর অশিক্ষিত বন্যসম্প্রদায় বিজেতা মধ্যযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর প্রথম চার্লস সর্ব্বপ্রথম আরব সৈন্যের সম্মুখীন হ'ন এবং সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ফ্রান্সে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হ'ন। পিরেনিজ পর্ব্বত অতিক্রম কালে তাঁহার সমস্ত পশ্চাৎবর্ত্তী সৈন্য আরবীয়দের হস্তে নিহত হন (Ibul-Athir Vol VI. P 8.)। প্রথমে চার্লসের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হইলে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইয়া আবদুর রহমান স্পেনের শান্তি, সুশাসন ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। ৩১ বৎসর রাজত্ব করার পর তিনি হিজরী ১৭০ অব্দে পরলোক গমন করেন।

আবদুর রহমান মনুষ্য জীবনের সকল আস্বাদই গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অনন্ত ভোগ বিলাসের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। শৈশবে পিতৃহীন হইলেও রাজোচিত শিক্ষা-দীক্ষার কোন ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু কালচক্রের মহা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভাগ্যেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল এবং পূর্ণ পাঁচ বৎসর ধরিয়া কঠোর সাধনার পর স্পেনের সিংহাসন লাভ করিলেন। সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল সময় তাঁহাকে যাহা দীক্ষা দিয়াছিল তাহা স্পেন জয় করিতে ও সুশাসনে আনিতে যতটা সহায় হইয়াছিল, দামেস্কের অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও অসীম সুখ-বিলাসের মধ্যে থাকিলে বোধ হয় এই গুরুভার কার্য্যের উপযুক্ত হইতে পারিতেন না। যেমন ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লব না হইলে নেপোলিয়ান বোনাপার্টির অভ্যুদয় হইত কিনা সন্দেহ, তেমনি যাবযুদ্ধ না হইলে স্পেনের সিংহাসন আবদুর রহমানের ভাগ্যে ছিল কিনা তাহাও সন্দেহযুক্ত। ইব্‌নে আল্-আতহিরএর ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি, তাঁহার দীর্ঘাকৃতি ও বলিষ্ঠ দেহ, আজানুলম্বিত বাহু, কুঞ্চিত কেশ-কলাপ, দেবতুল্য তীক্ষ্ণ কটাক্ষ, সুমার্জ্জিত অঙ্গ-ভঙ্গিমা, বিনম্র ব্যবহার, সরল প্রকৃতি, উদার হৃদয়, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিশক্তি ও দূরদর্শিতা, অদম্য উৎসাহ অক্লান্ত অধ্যবসায়, দুর্দ্দম কর্ম্মস্পৃহা দয়ার্দ্রচিত্ত ও ধর্ম্মভীরুতা প্রভৃতি সকল সৎগুণে বিভূষিত ছিলেন। বিপদে ধীর ও স্থির এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য চালনায় অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিতেন। তিনি শিল্পকলা বিদ্যানুশীলনে যেমন যত্নবান ছিলেন, তেমনই শান্তি, শাসন ও সংস্কার কার্য্যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। স্পেনরাজ্য বহুদিন পূর্ব্বে আরব জাতির করতলগত হয়, কিন্তু যুদ্ধপ্রিয় আরব জাতি সাম্প্রদায়িক কলহে লিপ্ত থাকায় কোন শিল্প-বাণিজ্য, কৃষি ও বিদ্যানুশীলনের সুব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারে নাই। আবদুর রহমানও তাঁহার বংশধরের সুশাসনের ফলে কৃষি বাণিজ্য, শিল্পকলা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান চর্চ্চায় সকল প্রকার উন্নতি সাধিত হয়। কর্ডোভা নগরে তিনি অনেক বৃহৎ সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন এবং কর্ডোভার প্রধান মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন।

মনজয়

এ, ওয়াই, এম্, ওবায়েদ্-উল্-হক্

কৃতী গায়িকারা গাহিবে আজিকে রাজদরবারে গান,
আয়োজন তা'র চলিছে সবার আমোদে নাচিছে প্রাণ।
গান গেয়ে সবে ভুলাতে যে পারে
মুকুতার হার দিবে রাজা তারে
গায়িকারা তাই বেশভূষা সারে
লভিবারে সেই দান।
রাজ-দরবারে কৃতী গায়িকারা গাহিবে আজিকে গান॥

কত গায়িকারা আসিল সাজিয়া মহারাজ দরবারে
কেহ কেহ তার বক্রচাহনি ফেলিতেছে চারিধারে;
অঙ্গভঙ্গী করিয়া সবায়
সবার পরাণ কেড়ে' নিতে চায়
বীণা তুলে পরে সুর দিল তায়
যেই মত যা'রা পারে।
কত গায়িকারা গাহিল আসিয়া মহারাজ দরবারে॥

সহসা আসিল বিরস-বদনা মলিন-বসনা নারী
মুদিত-কমল ঢুলিয়া পড়েছে নয়নে করুণা-ঝারি।
সে গাহিল গান সুর নাই তা'র
ক্ষীণ স্বর ভয়ে কাঁপে বারবার
বীণা রাখি' ধীরে চলিল আবার
নয়নে পুরিয়া বারি।
কাঁদিল আসিয়া বিরস-বদনা মলিন-বসনা নারী॥

সকলি রহিল, শুধু সেই নারী চলিয়া গিয়াছে ত্বরিতে।
বুঝিল রাজন আসে নাই সেত মুকুতার হার বরিতে।
"পেয়েছ তোমরা" কহিল ডাকিয়া
"মুকুতার হার; যাও তাহা নিয়া
সে' নারী নিয়াছে পরাণ জিনিয়া,
এসেছিল মন হরিতে।
আসে নাই চার মুকুতার হার ক্ষণিকের তরে বরিতে॥"

বিড়ম্বনা

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

বন্দে আলী মিয়া

অধ্যায় দশ

ইহার কয়েক দিন পরে মনসুর আহারান্তে নীরব ক্লান্ত দুপুর বেলা টেবিলের উপরে উবু হইয়া কাব্যরস উপভোগ করিবার দুশ্চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল।

বিক্ষিপ্ত মনকে ইহা সান্ত্বনা যোগাইতে পারিল না। আজ সকাল হইতে তার মনটা ভালো ছিল না। কাব্যগ্রন্থখানি একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া মনসুর দুই হাতে মাথাটা চাপিয়া চুপ করিয়া বোধ করি বা দুর্ণিবার দুঃসহ যন্ত্রণাকে নিজের মধ্যে নীরবে গোপনে সম্বরণ করিয়া লইতে লাগিল।

মনসুর বাড়ীতে কোনো ক্রমেই টিকিতে পারিল না। পল্লীর জীবন-যাত্রার সহিত শহরের আবহাওয়াকে খাপ খাওয়ানো প্রায় অসম্ভব। দেশের বাড়ীতে মনসুর প্রতি নিয়ত অভাবের কশাঘাত সহ্য করিতে বাধ্য হইত, গর্ভধারিণীর একটানা সংগ্রাম, সময় কাটানোরূপ ভীষণ সমস্যা তাহাকে নিরন্তর পীড়িত করিত। শহরে আসিয়া তার জীবন নবশ্রী, নবজন্ম লাভ করিয়াছিল। সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া ভাবিতে হয় না যে কিরূপে আজিকার সারা দিনটি তার কাটিবে। দীর্ঘ প্রাতঃকাল, দীর্ঘতর দুপুর—দীর্ঘতম সন্ধ্যা এবং রাত্রিকে দেখিয়া সে মনে মনে ভয়ে শিহরিয়া উঠিত, কিন্তু এখানে কোথা দিয়া যে সন্ধ্যা আসিত তাহা সে নিজেই অনেক সময় বুঝিয়া উঠিতে পারিত না।

কলিকাতার মেসে পা দিয়াই মনসুর মনে করিল তখনই একটিবার করুণার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসে। এই চিন্তাটা তার চিত্তকে অতখানি কঠোরতা এবং দীনতার মধ্যেও অমৃতের স্বাদ দিতে কুণ্ঠিত হইল না। সারা কলিকাতা এমন কি সমগ্র বাঙলার লক্ষ কোটি নর-নারীর মধ্যে ঐ একমাত্র করুণাকেই সে যেমন অতি আপনার বলিয়া আজ ভাবিতে পারিল এমন কোনোদিন পারে নাই। যে-কয়টা নারীর সহিত সে জীবনে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হইয়াছে—তার জননী হইয়া কেহ স্নেহ দিয়াছেন, ধর্ম্মমা হইয়া ভালোবাসিয়াছেন কিন্তু বাহির জগতের দুঃখে বন্ধু ভাবে সান্ত্বনা দিতে, সুখে সহচরী হইতে, বিপদের দিনে পরামর্শ দিয়া অর্দ্ধেক ভার লইতে ঐ একমাত্র করুণা ছাড়া কেহ নাই।

মনসুর ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল নয়টা কয়েক মিনিট হইয়া গিয়াছে। রাত্রি-জাগরণ-ক্লিষ্ট মনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তেল মাখিয়া গামছা লইয়া তাড়াতাড়ি কলতলায় নামিয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে যতবার সে কলিকাতায় আসিয়াছে কোনোবারই সেই পৌঁছানর দিনটিতে কলেজে যায় নাই; আজ সাড়ে দশটা' বাজিতে না বাজিতে কাপড়-চোপড় পরিয়া কলেজের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল।

মনসুর কলেজের গেটের কাছে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিল, তারপর বার দুই ঘুরিয়া অন্য ফুটপাথে পানের দোকানের কাছে আসিয়া সিগারেট ধরাইয়া অনু-সন্ধিৎসু দৃষ্টি কলেজের বারাণ্ডায় প্রেরণ করিল কিন্তু আশ্রয়

না পাইয়া ম্লান হইয়া ফিরিয়া আসিল। সহসা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল করুণা তার একটি মেয়ে বন্ধুর সহিত গল্প করিতে করিতে গেট পার হইয়া গেল। মনসুর অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটটা তাড়াতাড়ি ফেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে তাহাদের কাছে আসিয়া পড়িল। সঙ্গিনী নীলিমা পদশব্দে চকিতে পিছনে ফিরিয়া চাহিয়া পূর্ব্ব কথায় নিমগ্ন হইয়া গেল; করুণা তার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া তাকাইয়া মনসুরকে দেখিতে পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। চোকে-মুখে আনন্দের দীপ্তি ফুটাইয়া স-হর্ষ কণ্ঠে বলিল, My God তুমি? এমন অতর্কিতে কখন আস্‌লে?

মনসুর হাসিমুখে আরো নিকটে সরিয়া আসিল। বলিল ভোরের ট্রেনে। ভালো ছিলে তো?

নীলিমা ইহাদের এই আত্মীয়তায় বিস্মিত হইয়া মনে করিল দাঁড়াইয়া থাকিয়া আলাপে বাধা জন্মানো উচিত হইতেছে না, তাই অস্পষ্ট কণ্ঠে অল্প কথায় করুণার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

করুণা নীলিমার গতি-ভঙ্গীর দিকে পলকমাত্র দৃষ্টি দিয়া বলিল, চলো ফেরা যাক্, আজ আর কলেজে গিয়ে কাজ নেই। গেলেও তো লেক্‌চার কিছু কাণে ঢুকবে না।

মনসুর মৃদু হাসিল। বলিল, অনুমান মিছে নয়—চলো, কিন্তু কোথায়?

করুণা বলিল, তোমার জন্যে একটা বাসা ঠিক করেচি, আমি দেখে এসেচি, এখন তুমি পছন্দ করলেই হয়, চলো সেখানেই যাওয়া যাক।

মনসুরের মনে পুরানো দিনের একটা বিস্মৃত কথা জাগিয়া উঠিল। মিনিট দুই তিন স্তব্ধ হইয়া কি যেন ভাবিয়া লইয়া আস্তে আস্তে শুধু বলিল, আচ্ছা।

ঘর দেখিয়া মনসুর কেবল প্রশংসা করিল না, একটু বিস্মিতও হইল। এত বড় এবং এত জাঁকজমকের কোনো প্রয়োজনই ছিল না, কিন্তু করুণা যখন নিজে পছন্দ করিয়া দিয়াছে, তখন আর আপত্তি-সূচক কোনো কথা উচ্চারণ করিতেই যেন মাথা কাটা যাইবার উপক্রম হইল। নারীর দান,—তাহাও তাকে এমন নিঃশব্দে বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিতে হইল। ইহা হইতে দুর্ভাগ্যের কথা আর দ্বিতীয় কিছু নাই।

করুণা বলিল, যাও, মেসে তোমার—যা কিছু জিনিষপত্র আছে আজকেই এনে ফ্যালো। প্রত্যেকদিন তো কলেজ কামাই করবার সুবিধে হবে না, আর সাজানো গুছানো তোমার পুরুষ মানুষের কম্মো নয়। আমিই সব ঠিক ঠাক করে দেবো খন। যাও, দেরী কোরোনা। এসো আগে—তারপরে গল্প-সল্প হবে।

মনসুর করুণার দিকে সদয় কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে চাহিল। অপরের সুখ-সুবিধার জন্য যুগে যুগে আপনার স্বার্থকে বলি দিয়া আসিয়াছে একমাত্র নারী, এইটিই তার চরিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্টতা এবং গৌরব। মনসুরের গোপন অন্তর এই মহিয়সী তরুণীকে সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় মনে মনে বার কয়েক নমস্কার না করিয়া পারিল না। সে বাহিরে মৃদু আপত্তি জানাইল, এখন আর না-ই গেলুম তোমাকে ছেড়ে; মেস্ থেকে জিনিষপত্র আনতে সময় কম লাগবে না। হিসাব পত্র করে মিটমাট করতে সে ঢের দেরী হয়ে যাবে, তার চেয়ে এসো এখন বিশ্রাম করা যাক।

করুণা ভাবিয়া দেখিল মনসুরের কথাটা অযৌক্তিক নহে। অগত্যা মনসুরের বিনানুমতিতে তার কাঁধ হইতে চাদরখানা টান দিয়া লইয়া মেঝের উপরে বিছাইয়া বসিয়া পড়িল।

মনসুর তার পাশ ঘেঁসিয়া একটু সামনের দিকে বসিয়া হাতের বই খাতাগুলা একপাশে যেমন তেমন করিয়া রাখিয়া দিল। বলিল, করুণা, সেদিনের কথা মনে আছে?

করুণা চকিত হইয়া প্রশ্ন করিল, কি? কোন্‌দিনের? মনসুর সকৌতুকে হাসিয়া বলিল, সেই ইডেন গার্ডেনের। যেদিন তুমি আমার কোলের ওপরে মাথা রেখে শুয়েছিলে, আর আমি বসে বসে কষ্টভোগ করেছিলুম। আজ সেই ঋণটা শোধ দেবার সুযোগ এসেচে, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতন এসে বসো তো, যাও।

করুণা সুপ্রচুর আনন্দে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল, বাপ্‌রে—কী দুষ্টু ছেলে, এখনি প্রতিদান নিতে শিখেচো, দিন তো আরো আসেই নি-ই-ই! বলিয়া করুণা উঠিয়া যাইয়া দরজাটা রুদ্ধ করিয়া পুনরায় বিছানায় আসিয়া বসিল।

মনসুর করুণার কোলের উপরে মাথা রাখিয়া শুইয়া তার আঁচল লইয়া দুইহাতে অন্যমনস্কভাবে পাকাইতে

পাকাইতে বলিল, একজামিনের তো মাত্র মাসখানেক দেরি, কিন্তু এদিকে পড়াশুনা তো কিছুই হোলো না।

মনসুরের চোকের উপর করুণা দৃষ্টিনত করিল—বলিল, সেকথা আর আমাকে বোলো না, রাতদিন তোমাকে ভাবতেই গেছে। হ্যাঁ ভালোকথা, আচ্ছা, তুমি বাড়ীতে গেলে আমার কথা কি ভুলে যাও?

প্রত্যুত্তরে মনসুর ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, না গো কিছু না। তোমার পত্রের জবাব দিতে যা একটুখানি দেরি হোত এইতেই এত!

করুণা তার চিবুক ধরিয়া নাড়া দিয়া মাথা দোলাইতে দোলাইতে উত্তর দিল, হাঁ হাঁ এইতেই বোঝা যায় কার ভালোবাসা কত গভীর। তুমি লিখ্‌তে নিদেন কর্ত্তব্য বোধে, আর আমি? চিঠি এলে একটা মিনিটও দেরি করিনি সে তো তুমি জানোই। চিঠি ডাকে ফেলে আবার দিন গুনতে শুরু করেচি। ভাখো, বিদেশে যাদের অতি প্রিয়জন থাকে তাদের অশুভ কথাই যেন সারা বেলা মনে হয়। কেবল ডাকের প্রতীক্ষায় থাকতুম। পিয়ন এলেই মনে করতুম এই বুঝি তোমার চিঠি এসেচে। নিরাশ হয়ে সত্যি বল্‌চি ভাবতুম কি জানো, তোমার কিবা হয়েচে তাই পত্র লিখ্‌তে পারচো না।

মনসুর অস্বাভাবিক সুরে হাসিল। জোর করিয়া টানিয়া টানিয়া বলিল, চিঠি না লিখ্‌লেই বা কী, প্রাণের সত্যিকার টানের অভাব না হলেই হোলো।

করুণা মুখ ভার করিয়া বলিল, শোনো কথা একবার। বিদেশে থাক্‌লে ঐ গিয়ে চিঠির ভেতর দিয়েই তো অর্দ্ধেক দেখাশুনা। সেটাকে বাদ দিলে প্রাণের টান আল্‌গা হওয়া তো বিচিত্র নয়ই বরং ভুলে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব।

মনসুর দুষ্টামি করিয়া তার চুলের সঙ্গে যে ব্রোচটা কাপড়কে আটকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা দুই আঙুলের চাপে খুলিয়া দিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, তোমার চুলটা আল্‌গা হয়ে গেল।

করুণা শঙ্কা এবং লজ্জাকুল দৃষ্টি চকিতে সেদিকে ফিরাইয়া লইয়া মুখটা হাসির মতন করিয়া বলিল, যাও, ওসব কি ছেলেমি, নিজে কিনা খুলে দিয়ে—এখন—হাঁ।

মনসুর অকারণ পুলকে করুণার নত মুখখানি দুইহাতে আরো একটু নামাইয়া লইয়া চুমো দিল। করুণাকেও রাঙা মুখে প্রতিশোধ লইতে উদাসীন দেখা গেল না।

অধ্যায় এগারো

পরদিন উভয়ে একত্রে কলেজে ঢুকিতেই সকলে কৌতূহল-মাখা দৃষ্টি দিয়া তাহাদের সম্বর্দ্ধনা করিল। তখন প্রফেসার ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন তবুও সহাধ্যায়ী ছাত্র ছাত্রীদের চাপা হাসি—অর্থভরা-নয়নের গোপন ইঙ্গিত করুণা এবং মনসুর উভয়ের চিত্তকেই ভারাক্রান্ত ব্যথিত এবং ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। কেহ-ই মাথা তুলিয়া চাহিতে পর্য্যন্ত পারিল না, নতমস্তকে ঘাড় গুঁজিয়া আপন আপন জায়গায় যাইয়া বসিয়া ক্লাসের পড়ায় মনোযোগ প্রদান করিল।

অবসর বুঝিয়া প্রভা কলেজের একটা নিভৃত কোণে করুণাকে ডাকিয়া লইয়া অযাচিতভাবে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিল। বলিল, ছি ছি কুরু, এতকাল তো তোকে সবাই ভালো বলেই জান্‌তো। ক্লাসের মেল ষ্টুডেন্টদের সঙ্গে এ কি ঢলাঢলি লাগিয়েচিস্‌ বল্‌ তো?

করুণা জবাব দিবার জন্য মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল অনীতা এবং মাধুরী হাত ধরাধরি করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। অনীতা ঝঙ্কার দিয়া বলিল, প্রেম করিস্‌ তুই আর আমরা পারিনে লজ্জায় মুখ দেখাতে। ক্লাসের আর সব ছেলেরা কী মনে কর্‌চে শুনি, ভাব্‌চে, মেয়েদের সবাইকার চরিত্রই বুঝি এইরকম…।

করুণা অগ্নিদৃষ্টি তার মুখের উপরে তুলিয়া ধরিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, ভদ্র হয়ে কথা বল্‌। চরিত্রহীন আমি? মিছে কথা বল্‌তে একটুও তোমার আট্‌কালো না।

অনীতাও গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, মিছে কথা? চোকের ওপরে ধুলি দিয়ে টেক্কা মারা। তোমাকে আমাদের চেনা আছে জানো?

মাধুরী তাহার সুরে সুর মিশাইয়া বলিল, তাও বলি কুরু, আমরাও তো আছি, কৈ কোনোদিন কেউ কারু সাথে কথাটা বলতে দেখেচে! তুমি তাকে সঙ্গে করে কাল গেছিলে কোথায়, ক্লাসে না আস্‌ছিলে!

দুঃখে ক্রোধে করুণার ঠোঁট দুইটা গোলাপ পাপড়ির মতন কাঁপিয়া উঠিল। কোনোমতে প্রত্যুত্তর করিল,

যেখানেই যাই সে খোঁজে তোমাদের কী শুনি? তোমাদের ইচ্ছা হয় যাও না। মানুষের বন্ধুত্ব কী এই নতুন, না, কিছু অস্বাভাবিক যার জন্যে এত কথা বল্‌চিস্? যার মন যত ছোটো সে তো তাই ভাব্‌বে।

প্রভা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, কী আমার যোগিনী ব্রহ্মচারিণীরে……। কেন, বন্ধুত্ব কী পুরুষ মানুষ ছাড়া করা যায় না, আমরা মানুষ নই?

অনীতা ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, হবে না কেন; তুমি আমি তো আর বুকে ধরে প্রেমের কথা বলতে পার্‌বো না, বল্‌লেও যে ভালো শুনাবে না।

করুণা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, ইতর যে মানুষে কতখানি হতে পারে তোরা তার এক একটা জীবন্ত উদাহরণ। ছি ছি ভদ্রলোকে যে এই সব উচ্চারণ করতে পারে তোদের মুখে না শুন্‌লে প্রত্যয় হোত না।

অনীতা ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি ফুটাইয়া বলিল, তুমি practically করতে পারো আর আমাদের বলাটাই যত দোষের। প্রভা চ……।

মাধুরী প্রস্থানোদ্যতা হইয়া বলিল, না থাক্‌তে পারো বিয়ে করো না বাপু, unnatural (অবৈধ) প্রেম কেন—ছি—লজ্জা করে না?

করুণা সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মতো স্তব্ধ হইয়া একা একা দাঁড়াইয়া আপনার মনে গর্জ্জিতে লাগিল। তার কাণের দুয়ারে মাধুরীর শেষ কথা কয়টা বারে বারে আসিয়া আঘাত করিয়া তাকে অত্যধিক গম্ভীর এবং অন্যমনস্ক করিয়া তুলিল। সত্যই তো, তারা দুজনে মনে প্রাণে যত পবিত্র এবং সংযমীই থাকুক, বাহিরের লোকে এই অবধি মেলামেশাটাকে প্রীতির চক্ষে কখনো বরণ করিয়া লইবে না ইহা সুনিশ্চয়। এতকাল যে এই মুখরোচক সমালোচনা হইতে দশজনে বিরত ছিল, ইহা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি অস্বাভাবিক। ইহাদের ঈর্ষা চোক-টাটানি এবং কথার তীক্ষ্ণ শায়ক হইতে একমাত্র পরিত্রাণের পথ কেবল বিবাহ করা, তাহা ছাড়া দ্বিতীয় উপায় কোনো ক্রমেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ক্লাসের ছুটি হইলে ছেলের দল ছুটাছুটি করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইল। মনসুরের পিঠের উপরে জোরে চড় দিয়া তার বন্ধু বিনয় একগাল হাসিয়া বলিল, কি হে, দিনগুলো কাট্‌চে কেমন!

প্রত্যুত্তরে অজিত মনসুরের হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিল, চমৎকার। তোর সৌভাগ্য দেখে হিংসা হয় রে। এত ফুর্‌তি করে টেরি বাগিয়ে আসি, মাইরি—কেউ যদি একটু পছন্দ কর্‌লে। তোর বরাত ভালো।

আজিজ পিছন হইতে টিপ্পনি কাটিল, সবাইকার কি আর হয় রে, ও সব ফাটা কপাল বাবা—ফাটা কপাল। আচ্ছা মনসুর কি করে বাগে ফেল্‌লি বল্‌তো। তুই বশীকরণের মন্তর-তন্তর জানিস্ নাকি?

নির্ম্মল মনসুরের চিবুক ধরিয়া মুখটা উঁচু করিয়া তুলিল। বলিল, ছেলেখানা কী একবার ছাখ্‌না। সুর করিয়া বলিল, এই শ্যামরূপে তোর রাই মজেচে সইরে……।

বজলর রহমান মনসুরের মাথায় একটা টোকা মারিয়া বলিল, তোর কালোবরণ—ভালোবাসি; কলেজে তাই নিত্যি আসি—নিত্যি আসি। শালা মারিতো হাতি লুটিতো ভাণ্ডার। এমন সোণার চাঁদ হাত কর্‌লি তুই, একটা খাওয়া দিয়ে দে। আমরা তো বাবা কেবল দূর থেকেই পাঁইতারা করে মলুম। কাছ ঘেঁস্‌তে আর পার্‌লুম কোথায়?

রজব আলী বলিল, সেই মিনমিনে ভিজে বেড়াল মনসুর—সাতচড়ে রা করতে জানতো না, তার মনে এত বিদ্যে এত শয়তানী। কিছু টাকাকড়ি নে তো বাবা, ক্লাসের দু চারটেকে ছিচরণের প্রেসাদ বলে অভাগাদের দিকে কৃপা করে ফেলে দিস্। এক্‌লা এক্‌লা ভোগ করলে ধর্ম্মে সইবে না বাবা হ্যাঁ—হ্যাঁ।

মনসুর দুঃখে-ক্ষোভে-বেদনায়-অপমানে প্রস্তর মূর্ত্তির মতন নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া ইহাদের বাক্য-বাণের তীক্ষ্ণ-দুঃসহ আঘাতগুলা একটির পর একটি বুক পাতিয়া গ্রহণ করিয়া নীরবে নিঃশব্দে হজম করিতেছিল। একটা কথারও প্রত্যুত্তর দেওয়া সে প্রয়োজন বোধ করে নাই এবং কী বলিয়া যে ইহাদের চক্রব্যূহ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে তাহাও সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। তাকে তদবস্থায় দেখিয়া নির্ম্মল রসিকতা করিয়া বলিল, কিরে প্রিয়ার স্বপন দেখ্‌চিস, না রাগে ফুলচিস্?

আজিজ বলিল, উহু, রাগ্‌লে তো বয়েই গেল। আরে শা—আমরাও জিতেন্দ্রিয় নই হে—লজ্জার কিছু নেই। অমন দু-একটা পেলে আমরা…বুঝ্‌লি নে—যাক্, যোগাড় করলি কি করে বল্‌তো ভাই!

মনসুর আর সহ্য করিতে না পারিয়া এইবার কথা বলিল, সে আমি জানিনে যা। তোদের ইচ্ছা হয় যোগাড় কর্‌না দেখি কেমন, আমার কাছে কেন।

অজিত তার চিবুক ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিল, ন্যাকা যেন, কিচ্ছুটি জানে না। ইচ্ছা হলেই যদি পারা যায় তবে আর তোর খোশামোদ কেন বাবা।

মনসুর রাগিয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়া বলিল, তোদের মতন ছেলের সঙ্গে কথা বলাও অন্যায়। বলিয়া সিঁড়ি দিয়া বারান্দা হইতে নামিয়া চলা শুরু করিয়া দিল। রজবআলী পিছনে আসিতে আসিতে বলিল, হাঁা, আমাদের মতন ছেলেদের সঙ্গে কথা বলা অন্যায়—আর করুণার মতন মেয়েদের সঙ্গে অবৈধ প্রেম করা বুঝি নীতি সঙ্গত, কেমন হে?

ছেলের দল করতালি দিয়া হা হা হো হো নানা সুরে হাসিতে লাগিল।

বাসায় ফিরিয়া ষ্টোভের উপরে চায়ের পানি চড়াইয়া দিয়া মনসুর গম্ভীর মুখে দরজার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। এতখানি জীবনের মধ্যে সে কোনোদিন এরূপভাবে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হয় নাই। তাই আজ সেই অবধি সে নিরুপায় হইয়া আপনার প্রত্যেক দোষ অপরাধগুলা খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিবার চেষ্টা পাইতেছিল। একে অন্যের সহিত শুধু মাত্র একটা মুখের কথার বিনিময় করিবে, একটু বেড়াইবে তাহার মধ্যে এত বিদ্রূপের কি থাকিতে পারে, সে তো তার অবিদিত। করুণা যদি তাহার না হইয়া তার বন্ধুদের যে কাহারো প্রেমাস্পদ হইত, তাহা হইলে তার কখনো এরূপ চিত্তদাহ উপস্থিত হইত না, তাকে সে কখনো অভদ্র ভাষা শুনাইয়া দিতে পারিত না। যে যাহার সহিত ভালোবাসার সূত্রে একত্র গ্রথিত হয় তাহাদের কাছে তাহা অমৃত-লোকের সন্ধান দিলেও বাহিরের দশজনের কাছে সব দিক দিয়া যেন অসহ্য হইয়া দাঁড়ায়। মনসুরের মন এই হিংসুকদের উপরে অনুকম্পায় ভরিয়া উঠিল। ইহারা বোঝে না যে, একজন নারী একটা পুরুষকেই প্রাণ ভরিয়া ভালোবাসিতে পারে, একের নিকটেই তার প্রাণের সকল সাধনা কামনা গোপন কথা—তার আপনার বলিতে যত কিছু সব উৎসর্গ করিতে পারে। দুজনকে পারা যেমন অসম্ভব, তেমনি অস্বাভাবিক। করুণা যদি আজ মনসুরকে ভালো না বাসিয়া ঐ আজিজ, নির্মল, অজিত, রজব, বিনয়, বজলর যাহাকে হয় একজনকে পছন্দ করিত, তবে ঐ অবশিষ্ট দলের এ ক্ষেত্রে যেরূপ লাভ হইয়াছে, তাহা হইতে তো কিছুমাত্র পৃথক হইত না।

যদি করুণার সহিত সকল প্রকারের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে তার ছায়া মাড়ানো হইতে প্রাণপণে রক্ষা করিয়া চলে, তবেই সকলের এই প্রচণ্ড চিত্তদাহের নিবৃত্তি হয়। কিন্তু এতদূর অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া যাওয়া যে ভয়ঙ্কর অসম্ভব। যে-করুণাকে একটা দিন মাত্র না দেখিলে তার কোটি যুগের ব্যবধান বলিয়া মনে হয়, আহার-বিহার, শয়ন-পঠন সমস্ত একযোগে একেবারে তিক্ততা এবং বিস্বাদে ভরিয়া উঠে তাহাকে সে কেবলমাত্র দশজন বন্ধু-বান্ধবের হাসি-বিদ্রূপের জন্য ভীরু, কাপুরুষের মতন নিজের জীবন হইতে বাদ দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া সহজ হইয়া চলিবে কি করিয়া। পৃথিবীর সকল ভালোবাসার বস্তুকে সে বিনাক্লেশে বিলাইয়া দিতে সম্মত, কিন্তু ঐ একটি মাত্র জিনিষের দাবী সে হয়তো গোরের মধ্যেও পরের হাতে তুলিয়া দিবে না। করুণার জন্য সে বুক পাতিয়া নিন্দা-গ্লানির কামানের সম্মুখে নির্ভীক মনে দাঁড়াইতে পারে, সমাজের আকাশ-প্রমাণ ঘূর্ণাবর্ত্ত—উত্তাল তরঙ্গময় স্বজনের স্নেহের পারাবারের নির্দ্দয় আঘাতকে সে নিঃসঙ্কোচে পরাজিত করিতে পারে। তার নিখিল বিশ্ব ছাইয়া আছে করুণার স্নেহমায়া—প্রেমের দুর্ভেদ্য দুর্গ, ইহার আশ্রয় হইতে সে স্বর্গে যাইয়াও নিজের মুক্তি কামনা করে না।

পদশব্দ পাইয়া দরজার দিকে চাহিয়া দেখিল করুণা ঘরে ঢুকিতেছে। মনসুর পাণ্ডুর মুখে ক্ষীণ হাসির আভাস ফুটাইয়া সম্বর্দ্ধনা করিল, বসো। আজকে এতো বেলা গেল যে, প্রতি momentই তোমাকে আশা কর্‌ছিলুম।

করুণা প্রত্যুত্তর করিল, সে আমি জানতুম, তোমাকেও আমার বিশেষ দরকার।

মনসুর ষ্টোভের উপর হইতে কেট্‌লিটা আস্তে আস্তে নামাইয়া সযত্নে চা ঢালিয়া দুধ এবং চিনি মিশাইয়া করুণার দিকে এক কাপ সরাইয়া দিয়া নিজের জন্য আর এক পেয়ালা নীরবে ঢালিয়া লইল। করুণা জেলী মাখানো রুটিতে কামড় দিয়া ঘরের দুঃসহ মৌনতার মায়া এড়াইয়া বলিল, জানুনে, আজকে কলেজে সে একদফা বেশ হয়ে গেছে……

মনসুর উৎসুক হইয়া মুখ তুলিয়া অর্দ্ধপথেই প্রশ্ন করিল, কী হোলো, কার সঙ্গে ?

করুণা পেয়ালা মুখের কাছে উঠাইয়া লইয়াছিল, বলিল, রোসো, সব বল্‌চি। তারপর গোটা দুই চুমুক দিয়া পেয়ালাটা পিরিচের উপরে নামাইয়া রাখিল। বলিল, ক্লাসে বসে রয়েচি, প্রভা ডেকে নিয়ে তো বহুত উপদেশ বিতরণ কর্‌লে। মাধুরী, অনীতা ওরা সব বল্লে কী জানো, বল্লে যে ছি ছি কুরু তোকে তো আমরা ভালো বলেই জানতুম, এসব কি ঢলাঢলি শুরু করেচিস্ বল্‌তো বাপু।

মনসুর ইহারই ভয় করিতেছিল। সে যে কলেজে সহপাঠিদের নিকটে অশ্রাব্য কথা শুনিয়া আসিয়াছে, মনে করিয়াছিল, করুণার কাছে তাহা যথাসাধ্য গোপন করিয়া নিজের চিত্ত-বেদনা দূর করিবে ; কিন্তু ক্লাসেব মেয়েগুলো যে ওই পুরুষদের মতনই নিতান্ত নির্লজ্জতার উদাহরণ দিবে ইহা তার ধারণার অতীত ছিল। তাই করুণার নিকট খানিকক্ষণ সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, প্রত্যুত্তরে কি বলিবে তাহা যেন সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। মিনিট পাঁচ সাত পরে মুখ তুলিয়া আস্তে আস্তে জবাব দিল, তাহলে তুমিও আমার চেয়ে কিছু কম বিরক্ত হওনি দেখচি। ক্লাসের ছুটি হলে অজিতরা ঠাট্টা করে আমাকে যে সব কথা বল্লে তা কোনো ভদ্রলোকে উচ্চারণ করতে পারে কি না, না শুনলে আমি কক্ষনো বিশ্বাস করতুম না সে তোমাকে বলে দিচ্চি। এখন কর্ত্তব্য কি সে তো আমি ভেবে পাচ্চিনে করুণা।

করুণা চা টুকু একেবারে নিঃশেষ করিয়া পেয়ালাটা শেষবারের মতন প্লেটের উপরে নামাইয়া রাখিল। চিন্তিত মুখে উদাসীনভাবে জবাব দিল, আমিও না। আচ্ছা ছাখো আমরা কারো অনিষ্ট করিনি, কারো সুখে বাধা জন্মাইনি, অপরাধের মধ্যে শুধু দুজনে একত্রে বেড়িয়েচি মাত্র—গল্প করেচি। তুমি আমি তো জানি, আমাদের এ স্নেহ ভালোবাসাটা কত গভীর, কত পবিত্র। আমি জোর করে বলতে পারি জানো যে, যে-প্রকৃতির সে ঠিক আপনার জ্ঞান-বুদ্ধির মাপ-কাঠি নিয়ে অন্যের সম্বন্ধে বিচার করবে। ভগবান যিশু তাদের অজ্ঞতাকে ক্ষমা করুন, তারা জানে না যে, যে-দুটি তরুণ-তরুণী অবাধ মেলা-মেশা করে তাদের চরিত্র কখনো অক্ষত থাকা সম্ভব কি না।

মনসুর জামা গায়ে দিয়া বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া তক্তপোষের এক ধারে বসিয়া চাদরটা পাট করিয়া বগলের নীচে দিয়া কাঁধের উপরে আনিয়া ফেলিল। একটা সিগারেট বাহির করিয়া দিয়াশলাই জ্বালিল, এক গাল ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, চলো, এবারে বের হওয়া যাক্। পথে বেড়াতে বেড়াতে হবে।

করুণা সম্মতি দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। রাস্তায় বাহির হইয়া মনসুর প্রস্তাব করিল বায়স্কোপ দেখা হইতে সে অনেকদিন বঞ্চিত। প্রলোভনকে কিছুতেই সে সম্বরণ করিতে পারিতেছে না। করুণার যদি আপত্তি না থাকে তবে তাহা ব্যক্ত করিলে সে সেই অনুযায়ী কার্য্য করিবে। করুণা দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া তার প্রস্তাবকে নিজের অন্তরের অভিলাস বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করিল।

দুইজনে বৌবাজারের মোড় হইতে ধর্ম্মতলাগামী ট্রামের প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। উঠিয়াই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিল যে এ গাড়ীতে সহসা উঠিয়া তারা নিজেদের বদ্‌নামের বিস্তৃতি লাভ করিতে সহায়তা করিয়াছে। অজিত এবং বিনয় ইহার এক অংশে বসিয়া গল্প করিতেছিল, মনসুর এবং করুণা দুজনকে এক সঙ্গে দেখিয়া তারা চমকিয়া পরস্পরের প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। মনসুর উঠিয়া পড়িয়াই যেন ভয়ঙ্কর অপরাধ করিয়াছে, তার পাণ্ডুর মুখখানির দিকে চাহিলে তাহা ছাড়া অন্যকিছু মনে হইত না ; সে না পারিল নামিতে—না পারিল স্বচ্ছন্দ চিত্তে বসিতে। না-দেখার ছদ্ম-অভিনয় করিয়া মনসুর সামনের একখানা খালি বেঞ্চিতে বসিতে যাইতেই অজিত কৌতুক হাসিয়া ডাক দিল, এই, এদিকে এসো।

কথাগুলা মনসুরের কানে গিয়াছে কিনা এরূপ কোনো লক্ষণ তার ব্যবহারে প্রকাশ পাইল না। মনের জোরে নিজের ব্যবহারে স-লীল গতি ফুটাইবার ব্যর্থ চেষ্টায় সম্মুখোপবিষ্টা করুণার সহিত বাজে কথায় আলাপ শুরু করিয়া দিল।

বায়স্কোপের ছবিতে করুণা অথবা মনসুর কাহারো মন বসিতেছিল না। তাই Interval এর সময় করুণা বিরক্তি প্রকাশ করিলে মনসুর আপত্তি করিল না। এবার তারা ট্রামে উঠিল না, গাড়ীও করিল না, হাঁটিয়াই চলা শুরু করিয়া দিল।

করুণা বলিল, কাল কলেজে ওরা কী যে লাগিয়ে দেবে সে দেখে নিয়ো। এই তিলকে কি করে যে তাল করে— আশ্চর্য্য মিথ্যে বলার ক্ষমতা।

মনসুর মুখ হইতে সিগারেটটা খসাইয়া লইয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, সে গুণে ওদের ঘাট নেই তা আমি জানি। কিন্তু এরকম ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ করে ক'দিনই বা চলতে পারে করুণা। এতে আমরা অপমানিত হয়ে তাদের সমালোচনার খোরাক যোগানো ছাড়া তো কিছু করতে পারচিনে।

করুণা ব্যথিত কণ্ঠে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া খানিক পথ নীরবে চলিয়া বলিল, সে আমারো অজানা নেই কিন্তু উপায় তো আপাততঃ এমন কিছু দেখিনে, যা করলে তারাও শান্ত হয় আমরাও অন্ততঃ কয়েকটা দিনের জন্যে বেঁচে যাই।

মনসুর তীক্ষ্ণ চোখের তীব্রদৃষ্টি তার মুখের উপরে তুলিয়া ধরিল। বলিল, আচ্ছা, আমাদের Seperationটা কি এখন কোনো কার্য্যকরী হবে বলে মনে করো?

করুণা শান্ত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিল, হয় তো হবে, কিন্তু সেটা কোন্ দিক্ দিয়ে তা জানো। তাদের মনে এখন এই যে ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠেচে, তাতে বোধ করি ইন্ধন যোগানো ছাড়া অন্য কিছু হবে না। তুমি আছো তাই তারা আমাকে নাড়া দিতে সাহস পায়নি। তুমি যদি সরে যাও, চাই কি আমাকে একলা পেয়ে ওরা হয় তো অপমান পর্য্যন্তও করতে পারে।

মনসুর কথা শুনিয়া আপন মনেই বার কয়েক শিহরিয়া উঠিল। জবাব দিল, তা ওরা পারে, অসাধ্য নেই— অসম্ভবও নয়। হাঁ ভাখো, আমার কল্‌কাতা না ছাড়া অবধি হয় তো এমনি চলবে।

করুণা বলিল, তা বাদেও এমন একটা পথ আছে যাতে তারা এমন জব্দ হবে, যা দেখলে তুমি বিস্মিত না হয়ে পারবে না।

মনসুর কিছুমাত্র উৎসুক না হইয়া বলিল, সে বিয়ে— আমি জানি, কিন্তু তাও তো নিরাপদ নয় করুণা। তুমি বিয়ের কথা ভাব্‌তে যতটা সুখ কল্পনা কোরচো, যতখানি উল্লসিত হয়ে উঠ্‌চো, আমি ঠিক সেই পরিমাণে না দমে গিয়ে পারচি নে। কারণ কি জানো, আমাদের এই অদ্ভুত বিয়েতে হয় তো তোমার বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন কেউই রাজী হবেন না, আমিও যে আমার সকলকে প্রীত করতে পারবো সে দুরাশা নেই। এই পর্ব্বত-প্রমাণ প্রচণ্ড বাধার কথা ভাবতেই প্রাণটা আপনি কেঁপে ওঠে। তবু করতে হবে। সেই ধাক্কা সাম্‌লানোটা এত কষ্টবহ, দুঃসহ, যার তুলনায় এটা তেমন কিছু নয়।

করুণা কণ্ঠে সুপ্রচুর শক্তি ঢালিয়া দিয়া বলিল, ভুল বুঝেচো এটা। তুমি যার ভয় করচো সেটাকে আমি অভিনন্দিত করচি, আর যাকে তুমি গ্রহণ করতে সম্মত আছো, তাকে দেখে আমার আতঙ্ক না হয়ে যাচ্ছে না। কলেজের ছেলে-মেয়ে বা বাইরের দশজনের কথার খোঁচা, ব্যঙ্গ-কৌতুকই চিরকাল আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায়। বাপ-মার কথা বল্‌চো, তাঁরা এ বিয়েতে হয় তো সম্মতি দেবেন না—অসন্তুষ্ট হবেন, এমন কি বাধা দেবারও চেষ্টা করতে পারেন; কিন্তু আজ যদি তাঁদের রাগ হয়, সে কথাটা কী তাঁরা চিরকাল মনে করে থাকতে পারবেন? আমি জানি, আজ হোক্, কাল হোক্ সন্তানকে ক্ষমা একদিন করতেই হবে।

মনসুর দ্বিধা-পূর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, গ্রাহ্য না করার মতন অতখানি মনের জোর বুকের সাহস কী তোমার আছে করুণা? এক্‌জামিনের আর মাত্র কয়টি দিন আছে, এখন যদি তুমি তাদের অবাধ্যতা করো, খরচ যদি তাঁরা না দেন তোমাকে—তবে কি উপায় করবে বলো?

করুণা হাসিল। প্রত্যুত্তরে বলিল, ও, সেই কথা ভাব্‌চো, তা ভাব্‌তে পারো, আমি কিন্তু মোটেই কেয়ার করিনে।

—কেয়ার না করে তো উপায় নেই। বিশেষজ্ঞরা বলেন, একটা কাজ অনেক ভেবে চিন্তে করতে হয়, করার পর ভেবে তো কোনো লাভ নেই। আমি এখনো পাশ করিনি যে প্রাকটিস্ শুরু করে দেবো। তোমারও যখন সেই দশা তখন অন্ততঃ যে পর্য্যন্ত কোথায়ও না বসতে পারচি, সব সহ্য করাই শ্রেয়ঃ।

করুণা প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকাইয়া কথাটাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কক্ষনো না, মুখ বুজে অন্যায় সহ্য করা আমার প্রকৃতির বাইরে। টাকার জন্যে যদি এর মুখ্য আপত্তি হয় তবে বলচি ভেবো না, আমার গার্জ্জেন

খরচ বন্ধ করবেন সে জন্যে আমি চিন্তিত নই। আমার নামে পঁচিশ হাজার টাকার কাগজ ব্যাঙ্কে জমা আছে। যতদিন প্রাক্‌টিস্ শুরু না করতে পারছি, ততদিন তা থেকেই হয়তো আমাদের দুজনের বেশ চলবে কি বলো?

মনসুর সহসা ইহার জবাব দিতে পারিল না। খানিকক্ষণ গম্ভীর মুখে চিন্তা করিয়া বলিল, তা হয় তো চলতে পারে। কিন্তু কথা কি জানো, বিয়ের পর তো তাঁরা তোমাকে বাড়ীতে না-ও রাখতে পারেন।

—শোনো কথা, সে কি আমি না ভেবেই কথা বলছি মনে করো? তুমি যেখানে থাকবে, আমার ঘরও তো তা থেকে পৃথক হবে না।

সেই মুহূর্ত্তে মনসুরের ইচ্ছা হইল করুণাকে বুকের সহিত সাপটিয়া ধরিয়া মুখে চোখে সর্ব্বাঙ্গে চুমায় চুমায় ভরিয়া দিয়া কৃতজ্ঞতা এবং অন্তরের গভীর ভালোবাসা জানায়, কিন্তু নিতান্ত লোকারণ্য রাজপথ বলিয়া আগ্রহটাকে প্রাণপণে দমন করিতে হইল। করুণার মুখের উপরে সদয় চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তুমি আমার জন্যে এত কষ্ট সইবে করুণা?

করুণা মুখ তুলিয়া তার চোখে চোখে চাহিয়া মৃদু হাসিল। প্রত্যুত্তর দিল, বিলক্ষণ, তোমার জন্যে কে মাথা ঘামাচ্চে শুনি? আমার নিজের জন্যেই তো আসতে চাচ্চি, বাড়ীতে একা একা থাকতে কষ্ট হয়, তোমার কাছে এলে হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই সুখ-শান্তি পাবো, সে কী আমার কম সৌভাগ্য মনে করো তুমি!

মনসুর নীরব-প্রীতিতে হৃদয় পূর্ণ করিয়া লইয়া নত মুখে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের উপরে দৃষ্টি বুলাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। কলেজষ্ট্রীটের মোড়ে আসিতেই করুণা দাঁড়াইল। বলিল, তুমি এখন এসো। আমি কাল সকালের দিকে তোমার ওখানে যাবো।

মনসুর যেন চমকিয়া মুখ তুলিল। বলিল, এত শীঘ্রি ছেড়ে যাচ্চো, আর একটু থাকো না।

করুণা হাসিল। বলিল, না, দেখ্‌চো না কত রাত হয়েচে। তা হলে আসি Au revior.

মনসুর সিগারেট ধরাইয়া বলিল, কাল সকালে তবে এসো।

করুণা চলিতে চলিতে মুখ ফিরাইয়া জবাব দিল, নিশ্চয়।

মনসুর এক দৃষ্টে তার গতি ভঙ্গীর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতে লাগিল। —ক্রমশঃ

আলোর তৃষ্ণা

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

শুক্‌নো ডালে শুক্‌নো পাতা
ঝরতে শুধু বাকী,
বাদল রাতের ঝোড়ো হাওয়ায়
কাঁপছে থাকি থাকি।
জান্‌ছে মনে—আলোর কণা
লাগবে না আর কাজে।
ভোরের বেলা মাগে মরণ
তবু আলোর মাঝে।

অতীত দিনের কাহিনী

আহ্ছান উল্লাহ্

অবিচার বিক্রয়

শাম হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তনের পথ। হজরৎ উমর লোক লশ্‌কর হইতে সরিয়া গিয়া ছদ্মবেশে নিকটবর্ত্তী পল্লীতে প্রবেশ করিলেন এবং প্রজাবর্গের অবস্থা পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলেন, সম্মুখে একটি জীর্ণ কুটীর, তন্মধ্যে ততোধিক জীর্ণ একটা বৃদ্ধা বসিয়া আছে। উমর সম্মুখীন হইবামাত্র বৃদ্ধা তাঁহাকে বলিল, "হাঁ, বাবা, তুমি জান কি, উমর এখন কি করছে?" উমর বলিল, "কেন?" বৃদ্ধা বলিল, "উমর মুছলমানদের খলীফা হওয়া অবধি তার হাত হ'তে একটা কাণা কড়িও সাহায্য পেলাম না।" উমর বলিলেন, "তুমি, মা, এই দূর পাড়াগাঁয়ের এক কোণে প'ড়ে আছ, উমর কি ক'রে জানবেন তোমার কি অবস্থা?" বৃদ্ধা সবিস্ময়ে কহিল, "রাজা হ'য়ে রাজ্যের প্রজার খবর রাখতে পারবে না, এই কি একটা কথা হ'ল, বাবা?"

উমরের চোখের কোণ ভিজিয়া উঠিল, তিনি মুখ ফিরাইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "হায় উমর, এই জরাজীর্ণ গ্রাম্য নারীও তোমার চেয়ে বুদ্ধিমতী।"

বৃদ্ধার দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "মা, উমরকে দিয়ে তোমার প্রতি যে অবিচার হ'য়েছে, আমি তা কিনে নিয়ে উমরকে দায়মুক্ত করতে চাই; তুমি কত মূল্যে তা আমায় বিক্রী করতে পার?"

বৃদ্ধ ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "আমি অসহায়া বৃদ্ধা নারী, আমায় ঠাট্টা ক'রে তোমার কি ফায়দা, বাবা?" উমর বলিলেন, "না, মা, ঠাট্টা নয়, সত্যই আমি খরিদ করব।"

অবশেষে বৃদ্ধা সম্মত হইল; হজরৎ উমর ২৫টা মোহর দিয়া সেই অবিচার দায় ক্রয় করিলেন।

এমন সময় হজরৎ আলী ও ইবনে মছউদ সেখানে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করতঃ বলিলেন, "আমীরুল মুমিনীন, আপনি এখানে! আমরা আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ!"

বৃদ্ধার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে প্রথমে নির্ব্বাক-বিস্ময়ে উমরের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পরে ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "হায়! আমি আমীরুল মুমিনীনকে তাঁর মুখের উপর কি গালিই না দিয়েছি!"

উমর বৃদ্ধাকে অভয় দিয়া শান্ত করিলেন!

অতঃপর উমর কাগজ খুঁজিতে লাগিলেন। কাগজ পাওয়া গেল না। তখন তিনি নিজ গায়ের জামা হইতে এক টুকরা কাপড় কাটিয়া লইয়া তাহাতে লিখিলেন, "আমি শাসন ভার গ্রহণ করা অবধি আজ পর্য্যন্ত অমুক বৃদ্ধার প্রতি অত্যাচার হইয়াছে; উমর সে অত্যাচার বৃদ্ধার নিকট হইতে কিনিয়া লইল।" তাহাতে তিনি বৃদ্ধার স্বাক্ষর লইলেন, আলী ও ইবনে মছউদ সাক্ষী হইলেন; দলিল তাঁহার পুত্রের নিকট রক্ষিত হইল।

রাজধানীতে ফিরিয়া উমর, রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের শাসন কর্ত্তাদের নিকট ফরমান পাঠাইলেন।

"অবিলম্বে রাজ্যস্থ অসহায় গরীব দুঃখীদের তালিকা তৈরী কর এবং তাদের মধ্যে যারা খেটে খেতে পারে, তাদের ছাড়া আর সবের জন্য ছাদকা, জাকাত ও সাধারণ ধনভাণ্ডার হ'তে সাহায্য দানের ব্যবস্থা কর।"

(হায়াতুল্ হায়ওয়ান)

প্রচার ও অত্যাচার

আরবের সমস্ত শত্রুদল হজরত মোহাম্মদের (আঃ) নিকট মস্তক নত করিয়াছে; হজরত মদীনা হইতে

নির্ব্বিরোধে মক্কা প্রবেশ করিয়াছেন, দুশ্‌মনগণের বহুবর্ষব্যাপী অমানুষিক অত্যাচারের পর আজ দিকে দিকে ইছলামের বিজয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে।

হজরৎ চারিদিকে প্রচারক দল পাঠাইতে লাগিলেন। খালেদের অধীনায়কতায় এক দল প্রেরিত হইল।

খালেদ প্রচারক দল সহ জোজায়মা কওমের নিকটবর্ত্তী হইলেন; জোজায়মা কওম প্রচারক দল দেখিয়া অস্ত্র ধারণ করিল।

খালেদ তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ, দেশের সবই মুছলমান হয়ে গেল, শুধু তোমরাই কি এমন ক'রে ল'ড়ে মরবে? অস্ত্র রেখে দাও, সত্য-ধর্ম্ম কবুল কর"।

তাহারা অস্ত্র ত্যাগ করিল, কিন্তু সরলতা অবলম্বন করিল না; খালেদের উত্তরে শুধু বলিল, "আমরা পিতৃধর্ম্ম ত্যাগ করলাম।"

অ-সরল উত্তরে খালেদ রুষ্ট হইলেন; অনুচরগণকে হুকুম করিলেন, "তলোয়ার খোল।"

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর ও কতিপয় সহচর খালেদের আদেশের ঘোর প্রতিবাদ করিলেন; কিন্তু তাহা টিকিলনা। জোজায়মা কওমের কেহ নিহত হইল, কেহ বন্দী হইল, কাহার ও বা ধনসম্পত্তি লুন্ঠিত হইল।

এসংবাদ হজরতের নিকট পৌঁছিতে দেরী হইল না। তিনি ইহা শুনিবা মাত্র সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "হে আল্লা, আমি খালেদের আচরণের জন্য দায়ী নই!—আমি তাকে এ কাজের জন্য পাঠাই নাই!!"

তখনই তিনি আলীকে ডাকিয়া বলিলেন; "আমার ধন মাল সহ তুমি জোজায়মা কওমের নিকট যাও; আমার পক্ষ হ'তে তাদের সমস্ত খুন, সমস্ত ধন মালের ক্ষতিপূরণ ক'রে এস।"

বহু ধন মাল ও পশুপাল সহ আলী রওনা হইয়া গেলেন। জোজায়মা কওমের চাহিদা মত তাহাদের সর্ব্বপ্রকার ক্ষতি পূরণ করা হইল। তাহাদের নিহত কুকুরটীর ক্ষতিপূরণও বাকী রহিল না। ইহার পরও কিছু ধন আলীর হাতে রহিয়া গেল; তিনি তাহা তাহাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন।

আলী ফিরিলেন; হজরৎ সব শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, বলিলেন, "বেশ করেছ।"

অতঃপর ফের তিনি দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে আল্লা, তুমি জান, আমি খালেদের আচরণের জন্য দায়ী নই।" — (ইবনে হিশাম)

প্রচার ও প্রবঞ্চনা

পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ। দুনিয়া অন্ধকার, দিন দুপুরে আকাশে তারা ফুটিয়াছে। সমস্ত মদিনায় কোলাহল।—এমন ব্যাপার আরবে আর কখনও ঘটে নাই; কেহ কখনও দেখে নাই, পূর্ব্বপুরুষদের কাছে শুনে নাই!!

মুছলমান অমুছলমান সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল—"আজ দুনিয়ায় নিশ্চয়ই কোন মহাকাণ্ড ঘটেছে; কিম্বা আল্লার কোন প্রিয়পাত্রের জীবন লীলা সাঙ্গ হ'য়েছে; নইলে এমন অঘটন তিনি ঘটাবেন কেন?"

অপর একদল অগ্রসর হইয়া বলিল; "ওগো, তোমরা বুঝি এখনো শোন নাই যে মুহম্মদের শিশুপুত্র ইব্রাহিম মারা গিয়াছে!"

তখন তাহাদের সকলের নিকট এই অদ্ভুত সূর্য্যগ্রহণের কারণ দিনের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল; "হজরৎ মুহম্মদ কি আর যেমন তেমন পাত্র! তিনি খোদার রছুল ও প্রিয়পাত্র না হ'লে কি আর তাঁর একটুখানি পুত্রের মৃত্যুর জন্য খোদা এমন ব্যাপার ঘটান!"

হজরৎ শুনিয়া তখনই তাহাদের সকলকে মছজিদে ডাকাইলেন এবং নমাজ অন্তে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;

"বন্ধুগণ! চন্দ্র-সূর্য্য খোদার নিদর্শন মাত্র; তাঁরই আদেশে এরা আসে, তাঁরই আদেশে যায়, কারো জীবন মরণের সঙ্গে চন্দ্র, সূর্য্যগ্রহণের সম্পর্ক নাই। তোমরা এমন ব্যাপার দেখলে খোদাকে স্মরণ করো, নমাজ পড়ো।" (বোখারী)

বন্দী অতিথি

দুর্দ্ধর্ষ হোনায়ফিয়া কওমের ছরদার দুর্দ্ধর্ষ ছামামা—হজরৎ মুহম্মদের বহুসংখ্যক অনুচরকে হত্যা করিয়া আজ হজরতের সম্মুখে বন্দীরূপে আনীত।

ছামামাকে দেখিয়াই হজরৎ উপস্থিত সকলকে বলিলেন "বন্ধুগণ, তোমরা সকলে এর সঙ্গে সদ্ব্যবহার ক'রো।"

ছামামার ঔদরিকতার কথা কাহারও অবিদিত ছিল না, সে একা দশজনের খোরাক নিঃশেষে ভোজন করিতে পারিত।

হজরৎ নিজ ঘরে গিয়া বলিলেন; "আজ একটী ভোজন-পটু মেহ্‌মান আছে। তোমাদের জন্য যা কিছু খাবার তৈরী হ'য়েছে, সব একত্র ক'রে দাও, ঐ বেশী-দুধ-দেওয়া উটটা দোহন ক'রে সমস্ত দুধ নিয়ে এস।"

ছামামা অম্লান বদনে সমস্ত খাদ্য নিঃশেষ করিয়া উঠিল; হজরৎ সপরিবার অভুক্ত রহিলেন।

এমনই ভাবে কয়েক দিন চলিল।

ছামামা যখনই হজরৎকে দেখিত, তখনই বলিত; "আমি তোমার অনেক লোককে হত্যা করেছি, মুহাম্মদ; সেজন্য যদি তুমি আমায় হত্যা করতে চাও, তবে হত্যা কর; আর যদি তার বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ চাও, তবে তুমি যত অর্থ চাবে, আমি তাই দিতে রাজী। তুমি যা করবে, সত্বর কর।"

ছামামার কথা হজরৎ শুধু শুনিয়া যাইতেন, কোন উত্তর দিতেন না।

কয়েক দিন পর ছামামাকে হজরৎ মুক্ত করিয়া দিলেন, ছামামা বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইল।

কিছুদূর গিয়া ছামামা এক গাছের তলায় দাঁড়াইল; দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল; ভাবিতে ভাবিতে বসিয়া পড়িল, বসিয়া বসিয়া নত মস্তকে আবার ভাবিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পর ছামামা উঠিয়া গোছল করিল; তৎপর ওজু করিল, তাহার পর হজরতের গৃহাভিমুখে পুনঃ যাত্রা করিল।

হজরতের নিকট গিয়া ছালাম ইছলাম গ্রহণ করিল।

(২)

কয়েক দিন হজরতের নিকট অবস্থান করিয়া ছামামা কাবা জিয়ারতের জন্য মক্কায় গমন করিল। এবং উচ্চৈঃস্বরে তকবীর বলিতে বলিতে কাবায় প্রবেশ করিল।

তখনও মক্কা কোরেশদের করতলগত; তাহারা পঙ্গপালের মত আসিয়া ছামামাকে ঘিরিয়া ধরিল এবং কহিল, ধর্ম্মদ্রোহী পাপাত্মা, এইবার তোমার স্পর্দ্ধার পুরস্কার নাও।" ছামামার মস্তকের উপর তাহাদের উদ্যত তলোয়ার ঝলসিয়া উঠিল।

দুশমনদের মধ্যে কেহ কেহ বাধা দিয়া বলিল, "এ ব্যক্তি ইমামা নিবাসী—হোনায়ফিয়া কওমের ছরদার। ইমামা আমাদের সারা বৎসরের খোরাক জোগায়। খবরদার, একে হত্যা করলে আমাদিগকে না খেয়ে মরতে হবে।"

ছামামা বলিল, "আমি অধার্ম্মিক হই নাই; বাপ দাদার ধর্ম্ম ছেড়ে তার চেয়ে ভাল ধর্ম্ম গ্রহণ করেছি। আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ব'লে দিচ্ছি, তোমরা খোদার রছুলকে দেশ ছাড়া করেছ, তাঁকে বহু যাতনা দিয়েছ; শীঘ্র তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও; তাঁর সঙ্গে আপোষ কর; নইলে তাঁর অনুমতি ছাড়া আর এক গোটা শস্যও তোমরা ইমামা হ'তে পাবে না।"

ছামামা দেশে ফিরিয়া মক্কায় শস্য রফতানী সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিল। খাদ্য অভাবে মক্কায় হাহাকার উঠিল।

ক্ষুধার জ্বালায় মক্কাবাসীদের অভিমান বেশীদিন টিকিল না। তাহারা হজরতকে লিখিল, "মুহাম্মদ, তুমি আত্মীয়ের প্রতি সদ্ব্যবহারের উপদেশ দিয়ে থাক। আমরা তোমার আত্মীয়; আর আমাদিগকে তুমি এমনিভাবে হত্যা করতে বসেছ!"

পত্র পাইয়া হজরৎ শস্য রফতানীর পথ মুক্ত করিয়া দিতে ছামামাকে লিখিলেন।

ইমামার শস্য মক্কায় আসিয়া হাজির হইল। মক্কাবাসীরা তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করিয়া হজরতের বিরুদ্ধে পুনরায় আয়োজনে লাগিয়া গেল।

বোখারী ও ইবনে হিশাম)
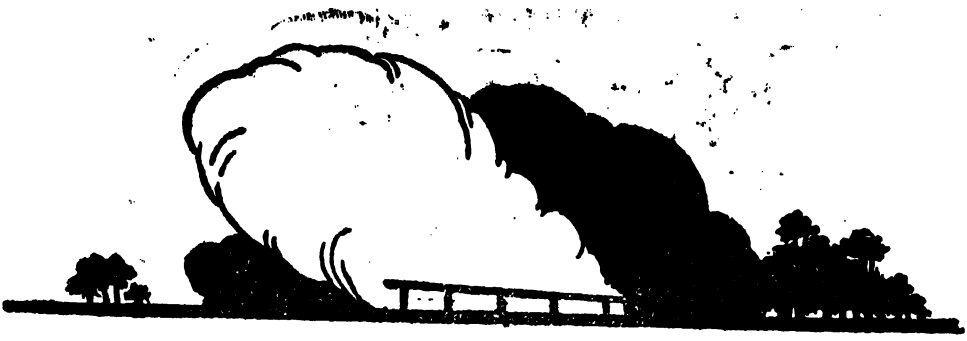
রসায়ন-বিজ্ঞানের রহস্য

শ্রীগুরুগোবিন্দ পাট্টাদার, বি-এ, বি-এল

মনুষ্যের দৈনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে কেমিষ্টগণের অর্থাৎ রসায়ন-বিজ্ঞানবিদ্‌গণের সংস্রব বর্জ্জিত হইলে ঔষধের বাক্সে ঔষধ থাকিত না; রঙ্গিন বস্ত্রে অতি অল্প সংখ্যক রং-ই ব্যবহৃত হইত; গৃহে রং দেওয়া হইত না; এবং দৈনিক আবশ্যকীয় অন্যান্য অনেক দ্রব্যেরই অভাব হইত। সীন্থেটিক্ কর্পূরের (কৃত্রিম কর্পূর) ইতিহাস, এ্যালুমিনিয়াম্ ধাতু নির্ম্মিত পাকশালার বাসন-পত্রের এবং আমেরিকার রাসায়নিক রং সকলের আধুনিক শিল্পজাত বাণিজ্য পণ্যের ইতিহাস,—শুনা যাইত না। বস্তুতঃ আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, স্পর্শ করি, শ্রবণ করি, কিম্বা যাহা কিছুর আঘ্রাণ লই ও স্বাদ গ্রহণ করি, তৎসকলের প্রত্যেকটিরই কোন না কোনও প্রকারে কেমিষ্ট্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ আছে এবং তাহা মনুষ্যকৃত হইলে, কেমিষ্ট্রীর প্রসাদেই হয়। অধুনা শত্রুর আক্রমণ ও রোগাক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার্থ কেমিষ্টগণের এবং রাসায়নিক দ্রব্য সকলের উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হয়।

আমাদের গৃহকর্ম্মের সঙ্গে রসায়ন বিজ্ঞানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সেই সম্বন্ধ অন্যান্য বিজ্ঞান অপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্টভাবে—আমাদের দৈনিক জীবন-যাত্রার সঙ্গে সংস্পৃষ্ট আছে।

কর্পূর, পূর্ব্বে কেবল মাথা-ধরা, মূর্চ্ছা, সর্দ্দি, প্রভৃতি অসুস্থতায় ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উইলমিংটন্ নগরে যে "ডু পন্ট লেবরেটারী (Do Pont Laboratories) আছে, উক্ত দেশের নানাবিধ রাসায়নিক গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত লেবরেটারীদের মধ্যে উহা সর্ব্বপ্রধান। ডাক্তার চার্লস এম, ষ্টাইন্, উক্ত লেবরেটারীর পরিচালক। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকার শ্রম-শিল্প ঘটিত রাসায়নিক বিজ্ঞানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গবেষণাকারী "কেমিষ্ট" বলিয়া গণ্য। ব্যবহারিক কেমিষ্ট্রীতে তিনি যে সকল আবিষ্কার করিয়াছেন, তৎসকল অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। এই সকল আবিষ্কারের মধ্যে কৃত্রিম কর্পূর আবিষ্কার প্রধান উল্লেখযোগ্য।

কর্পূর বৃক্ষ বক্-যন্ত্রে চোয়াইয়া সাধারণ কর্পূর প্রস্তুত করা হয়। এই সকল বৃক্ষ ফর্ম্মোজা, বর্ণিও ও জাপানের দ্বীপে জন্মে। বহুকাল যাবত ঐ সমস্ত দ্বীপের লোকেরা পুরুষানুক্রমে এই সকল বৃক্ষের আবাদ করিয়া আসিতেছে। অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমেরিকাবাসিকে ঐ সকল স্থানের কর্পূর ব্যবহার করিতে হইত। কারণ, কর্পূর প্রস্তুতকরণ ও বিক্রয়করণ ঐ সকল দ্বীপবাসীর একচেটিয়া ব্যবসায় ছিল।

যুক্ত-রাষ্ট্রের যে দুইটী "ফারম" সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ কর্পূর খরিদ করিত, তাহারা কর্পূর বৃক্ষ আবাদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, ফ্লোরিডা রাজ্যের মৃত্তিকা কর্পূর বৃক্ষ আবাদের উপযোগী বিবেচনায় তথায় তাহা পরীক্ষার্থ আবাদ করে। তাহাদের এক "ফারম" "ফ্লোরিডায় পাঁচ হাজার "একর (acre=৩/॥ কাঠা) জমি খরিদ করিয়া চারা গাছ জন্মাইয়া তাহাতে সেই সকল চারা রোপন করে।

ঐ চারাগুলি বড় হইতে দীর্ঘ সময় লাগে এবং ইতিমধ্যে কর্পূরের মূল্য বৃদ্ধি হয়। কর্পূর বৃক্ষ আবাদে এই ফারম্ বহু অর্থ ব্যয় করে; পঞ্চম বর্ষে যে কর্পূর পাওয়া যায় তাহা পরিমাণে অতি সামান্য। কারণ এখন প্রতিবৎসর বহু কোটী মুদ্রার কর্পূর শিল্প কর্ম্মে ব্যবহৃত হয়।

কর্পূর, ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার সম্বন্ধে উপরে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত নাইট্রো-সেলুলজ (nitro-cellulose) সঙ্গে কর্পূর যোগ করিয়া বেশ-ভূষার নানা প্রকার দ্রব্য, সখের বোতাম, চিরুণী, টুপীর ঝালর রেডিওপ্যানেল্ (radio-pannel আলোক স্বাচ্ছ শার্সী) ফটোগ্রাফ ফিল্ম্, রঞ্জিন "লেকার" (lacquer = আল্কোহল্ মধ্যে গলান লাক্ষার বার্নিশ) কৃত্রিম কাচ, কৃত্রিম হস্তিদন্ত এবং অন্যান্য বহু শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়।

তজ্জন্য ফর্মোজা দ্বীপের কর্পূর পণ্যের প্রতিকূলে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় বিশেষতঃ অল্পব্যয়ে কর্পূর প্রস্তুতকরণ সম্বন্ধে দিন দিন সন্দেহ বৃদ্ধি পাওয়ায়, "ডু পন্ট কোম্পানী" স্থির করেন যে, এখন এই বিষয়ে না-ছোড় হইয়া চেষ্টা করা হইয়াছে। তদনুসারে তাহারা কর্পূর বৃক্ষ রোপণ না করিয়া সীন্থেটিক্ অর্থাৎ কৃত্রিম রাসায়নিক উপায়ে কর্পূর প্রস্তুত করা সম্ভবপর কি না, তৎসম্বন্ধে গবেষণা ও পরীক্ষা পরিচালন জন্য তাঁহাদের কেমিষ্ট্রী ডিপার্টমেন্টের উপর আদেশ দেন। কিন্তু এই ব্যাপারটী তত সহজ নয়; কারণ, তৎপূর্ব্বে ত্রিশ বৎসর-ব্যাপী বৈজ্ঞানিকগণ বহু চেষ্টা করিয়াও বাণিজ্য-পণ্য স্বরূপ কারখানায় অধিক পরিমাণ কর্পূর প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন নাই। অবশ্য তাহার বহু পূর্ব্বে রাসায়নিক প্রণালীতে লেবরেটারীতে কর্পূর প্রস্তুত করণের উপায় উদ্ভাবিত হয়। কিন্তু তখনও বিরাট আয়োজনে কারখানায় কর্পূর প্রস্তুত করার প্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই। সংশ্লেষণ (synthesis = ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক উপাদান সকল একত্র মিলিত করণ) প্রণালী ক্রমে কর্পূর প্রস্তুত করণে প্রথমতঃ কর্পূরের অণুসকলকে (molecules) রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা বিশ্লিষ্ট করিয়া পরমাণুতে পরিণত করিতে হয়। কিন্তু এই সকল অণু ও পরমাণুতে বহু শক্তিমান মাইক্রোস্কোপ অর্থাৎ আধুনিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

দীর্ঘ তিন বৎসর কালের অসাধ্য সাধনের পর বহু ব্যয় প্রতিষ্ঠিত একটী সুবৃহৎ কারখানায় এই কোম্পানী বৃহৎ ভাবে কৃত্রিম কর্পূর প্রস্তুত করণে সক্ষম হন।

সাধারণ লোকের নিকট ইহা বিস্ময়ের ব্যাপার যে, মানুষ বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঘরে বসিয়া প্রকৃতি-দত্ত জিনিষও সৃষ্টি করিতে পারে।

যাঁহারা কেমিষ্ট্রী জানেন না তাঁহাদের ইহা ধারণা হইতে পারে না যে, কেমিষ্ট্রীর সাহায্যে ঝিনুকের খোল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। মনুষ্যের নিঃশ্বাস পরিত্যক্ত বায়ু দ্বারাও সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী স্থানের ঝিনুকের খোল গঠনের সাহায্য হয়। তদ্রূপ, মনুষ্যের নিঃশ্বাস পরিত্যক্ত বায়ু দ্বারা, কিম্বা উনুনের অগ্নি-আলোড়ন দ্বারা কিম্বা প্রাঙ্গণের সোরাসাপ্টা আবর্জ্জনা দগ্ধ করিয়া, কিম্বা চুরুট ধূম পান করিয়া,—স্নানাগার হইতে বহির্গত জলের কষ-দোষ (hardress of water) উৎপাদনে; গৃহের মেঝে নির্ম্মাণে, চূণ, সুর্কি ও বালি মিশ্রিত আস্তর (mortar মর্টার) কঠিন আকারে পরিণত করণে; সর্ব্বক্ষণ, ঘুটিং পাথর মার্ব্বল গঠনে; বৃক্ষ, গুল্ম, পুষ্প সকলের বৃদ্ধি সহায়তায়;—অতি সামান্য মাত্রায় হইলেও সাহায্য করা হয় এবং শেষোক্ত বৃক্ষ, গুল্ম প্রভৃতি উদ্ভিদ্‌সকল এখন হইতে বহুযুগের পর কোন এক সময়ে পাথুরিয়া কয়লায় এবং এমন কি হীরকেও পরিণত হইতে পারে।

মনুষ্যের শ্বাসক্রিয়া দ্বারা আনুসঙ্গিকভাবে পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করণেও সাহায্য করা হয়। মনুষ্য ও ইতর প্রাণীর নিঃশ্বাস বায়ু সহ যে কার্ব্বণ ডায়অক্সাইড্ বহির্গত হয় তাহা, সমস্ত বৃক্ষ, গুল্ম প্রভৃতির ন্যায় কার্পাস গাছও প্রশ্বাসে গ্রহণ করিয়া তাহার শরীরের পুষ্টি সাধন করে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপে, একটী সার্টের (shirt) বিষয় আলোচনা করা যাউক। ইহাকে রেশমের ন্যায় দেখায়; প্রকৃত পক্ষে ইহা, রেশমে পরিণত কার্পাস তুলা (mercerised cotton) সাধারণ কষ্টিক সোডা গলান জলের ভিতর দিয়া কার্পাস তুলা চালিত করিয়া কেমিষ্ট ইহাকে রেশমের ন্যায় করিয়াছেন। তৎপর, তিনি, পাথুরিয়া আল্কাতরা কয়লার (coaltar) হইতে প্রাপ্ত রঙ্ দ্বারা ঐ বস্ত্রকে রঞ্জিল করিয়াছেন। এই আল্কাতরাই নগরের রাজপথ সকলের "সিমেণ্ট (cement) করা কাটা স্থান ও সন্ধিস্থান সকল যোড়া লাগান কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। আবার এই একই "কোল্-টার" (আল্কাতরা), বিস্ফোরক দ্রব্য সকল (explosives) প্রস্তুত করণে ব্যবহৃত হয়। তদ্রূপ "ডিনামাইট" (dynamite) কি কাগজ এবং "সান্‌পারলার ফার্নিচার" (sunparlar furniture = সূর্য্যালোক সেবিত বৈঠকখানা আসবাব

পত্রাদি) হইতে শর্করা পর্য্যন্ত অন্যান্য সহস্র দ্রব্য প্রস্তুত করণে কার্পাস তুলা ব্যবহৃত হয়।

এ্যালুমিনিয়াম্ নির্ম্মিত পাকপাত্র সকল এখন এত সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয় যে, ইহা প্রত্যেক পরিবারের পাকশালায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮২৭ খৃঃ অব্দে জার্ম্মানির এক জন কেমিষ্ট এ্যালুমিনিয়াম্ ধাতু পৃথক্ করেন। ইহা পাতলা এবং সহজে বিবর্ণ বা মলিন হয় না; তজ্জন্য বাজারে ইহার সমাদর অধিক; কিন্তু ইহার আবিষ্কারক, শিল্প পণ্যস্বরূপ বাণিজ্যোপযোগী অধিক পরিমাণে ইহা প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন নাই।

পূর্ব্বে, ১ পাউণ্ড (1 lb = প্রায় অর্দ্ধ সের) ওজনের এ্যালুমিনিয়ামের মূল্য ১৪০ ডলার (১ ডলার = dollar = ৩৷৵০) ছিল। ইহা এরূপ একটী বিরল ধাতু ছিল যে, ইণ্টারন্যাশন্যাল্ ইক্জিবিশন (International Exhibition = আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী) সকলে ইহার যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "বার" সকল প্রদর্শিত হইত তৎসকলের উপরস্থ লেবেলে "কর্দ্দম হইতে প্রস্তুত রৌপ্য" কথাগুলি লিখিত থাকিত। অল্প ব্যয়ে এ্যালুমিনিয়াম্ ধাতু বাহির করার প্রণালী আবিষ্কার করার জন্য কেমিষ্টগণ প্রায় ৫০ বৎসর কাল পর্য্যন্ত বহু চেষ্টা করেন। তৎপর, "ওহিও ষ্টেটের" "ওবার্লিন কলেজের" (Oberlin College) এক জন প্রফেসার একদা তাঁহার জুনিয়ার ক্লাসের ছাত্রদের নিকট এ্যালুমিনিয়াম্ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। ২২ বৎসর বয়সের একটী ছাত্র বিশেষ মনোযোগসহকারে সেই বক্তৃতা শ্রবণ করেন। এই ছাত্রটী, ক্ষুদ্র একটী ক্রুসিবল্ (crucible = মুছি), তাহা উত্তপ্ত করার জন্য একটী "গ্যাসোলীন্ বার্ণার" (gasolene burner) এবং তাড়িত শক্তি উৎপাদনের জন্য একটী "ব্যাটারী" (Battery) ব্যতীত অন্য কোনও যন্ত্রের সাহায্য না লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি ঐ মুছি মধ্যে কর্দ্দম রাখিয়া তাহার সঙ্গে গ্রীণ্ল্যাণ্ড দেশ হইতে প্রাপ্ত "ক্রায়োলাইট্" (cryolite) নামক খনিজ পদার্থ যোগ করেন এবং এই দুইটীকে উত্তাপে গলাইয়া ঐ দ্রবীভূত মিশ্রণের ভিতর দিয়া তাড়িত প্রবাহ চালিত করেন। পৃথিবীর কেমিষ্টমণ্ডলী, যে প্রণালীটির জন্য এতদিন প্রাণপণ্ চেষ্টা করিতেছিলেন, অবশেষে তাহা আবিষ্কৃত হইল। এ্যালুমিনিয়াম্ ধাতু, কর্দ্দম (Clay) হইতে আলাদা হইয়া ব্যাটারীর "পোল"-এ (pole) সঞ্চিত হয়।

কৃত্রিম রবার রসায়নবিদের শক্তির আর একটী উদাহরণ রাসায়নিকগণ সহজেই রবারকে (Rubber) অণুতে (molecules) বিশ্লিষ্ট করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার মৌলিক উপাদান পরমাণু সকলের (atoms) সংযোগ-বিন্যাস দ্বারা তাহা প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিতে ৬০ বৎসর ব্যাপিয়া তাঁহাদিগকে বহু চেষ্টা করিতে হইয়াছে, এখনও প্রণালীটী সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হয় নাই। ৩০ বৎসরের অধিককাল গত হইল, একজন কেমিষ্ট, "লেবরেটারী"তে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পান, তিনি তথায় যে বর্ণহীন তরল পদার্থটী একটী বোতলের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা একটী গাঢ় সরবতের (Syrup) আকারে পরিণত হইয়াছে এবং তাহার উপর অনেকগুলি পীতাভ বৃহৎ খণ্ড ভাসমান রহিয়াছে। এই খণ্ডগুলিতে রবার পাওয়া যায়। এই দৈবঘটনামূলক ব্যাপারটীকে পুনরুদ্ভব করিতে এই কেমিষ্ট কি অন্য কোনও কেমিষ্ট সক্ষম হন না। তথাপি এই দৈব ঘটনা দ্বারা, তাঁহাদের পক্ষে ঐ সমস্যা উদ্ঘাটনের সূত্রপাত পাওয়া গেল এবং পৃথিবীস্থ লেবরেটারীতে উক্ত প্রণালী অনুসরণে ঐ ঈপ্সিত পদার্থ আবিষ্কারের চেষ্টা চলিল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এক ইংরাজ কেমিষ্ট কর্ত্তৃক কৃত্রিম রবার প্রস্তুতকরণের শেষ প্রণালী আবিষ্কারও দৈব ঘটনামূলক। যাহা হউক এই প্রণালীতে রবার প্রস্তুতকরণের "ইসোপ্রিন্ (isoprene) নামক মূল উপাদানটীও (Basic material) পূর্ব্বোক্ত তার্পিন্ (Turpentine) হইতে প্রস্তুত হয়। এই "সীন্থেটিক্ মেথড্" রবার প্রস্তুত করিতে রবার বৃক্ষের বন সকল ধ্বংস না করিয়া "পাইন্" (Pine) বৃক্ষের বন সকল ধ্বংস করিতে হয়। তাহার পর, রাবার প্রস্তুত করার জন্য কেমিষ্টগণ, গোল-আলুর (potato = পোটাটো) প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন এবং তাহার ফলে তাঁহারা জানিতে পারেন যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, রবার বৃক্ষ রোপণ করার ভূমি অপেক্ষা গোলআলু আবাদের ভূমি অধিকতর মূল্যবান। এইরূপে গবেষণার কার্য্য চলিতে থাকে; তৎপর এখন লোকে তার্পিন্, গোল-আলু, করাতের গুঁড়ো (Sawdust), "পিচ" (pitch = আলকাতরা

হইতে প্রাপ্ত একপ্রকার ঘন ধূমবৎ পদার্থ), পেট্রোলিয়াম (Patroleum = কেরোসিন্ তৈল) এবং পাথুরিয়া কয়লা ও চুণ দ্বারা কৃত্রিম রাবার প্রস্তুত করে। কিন্তু এখনও রবার বৃক্ষ আবাদ করিয়া রবার প্রস্তুত করার যত অল্প ব্যয় পড়ে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃত্রিম রবার প্রস্তুত করিতে অধিক ব্যয় পড়ায় সহজ-সুলভ প্রণালী আবিষ্কার সমস্যা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে।

১৯২৮ এর কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে, একজন কেমিষ্ট এক জিঙ্ক-অক্সাইড্ কারখানায় পদার্থ পরীক্ষা করিবার সময়ে জানিতে পায়েন যে, তাহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ জার্ম্মেনিয়াম্ (germanium) নামে একটী নূতন ধাতু আছে। ইহা একটী প্রধান আবিষ্কার; কারণ, যদিও জার্ম্মেনিয়াম্ ধাতুর বিষয় কেমিষ্টগণ পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন, তথাপি তাহা ইতিপূর্ব্বে কখনও এত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় নাই। তিনি, জিঙ্ক বা দস্তা হইতে জার্ম্মেনিয়াম্ পৃথক করিয়া অন্য এক কেমিষ্টের নিকট তাহার নমুনা প্রেরণ করেন। এই শেষোক্ত কেমিষ্ট, জার্ম্মেনিয়াম্ ও আর্সেনিকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা জানিতেন; তাহাতে, জার্ম্মেনিয়াম্ অক্সাইডের ভৈষজ্যগুণ থাকার ধারণা তাঁহার মনে উদয় হয়। এই আবিষ্কার, উত্তরকালে কোনও একদিন "এনিমিয়া" (রক্তাল্পতা) রোগের চিকিৎসায় বিশেষ কার্য্যকরী হইতে পারে।

জার্ম্মান্ মহাসমরের পর, যুদ্ধকার্য্যে ব্যবহৃত "এক্সপ্লোসিভ্" (বিস্ফোরক দ্রব্য) সকল বহুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত থাকে। সেইগুলি কেমিষ্টগণ বহু চেষ্টার পর বাণিজ্য-পণ্যোপযোগী শিল্পকর্ম্মে ব্যবহৃত বিস্ফোরক দ্রব্য সমূহে পরিণত করিয়াছেন। যথা,—"স্মোক্‌লেস্ পাউডার"কে (ধূমশূন্য বারুদ) কেমিষ্টগণ তাহার ৪০০ প্রকার মিশ্রণের পরীক্ষার পর,—অবশেষে "ডুমোরাইট্" (dumorite) নামক নূতন যে একটী বিস্ফোরক দ্রব্যে পরিণত করিয়াছেন তাহা কৃষিকার্য্যে, রাস্তা নির্ম্মাণে, খনি খননে, এবং তদ্রূপ অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এখানেও তাঁহাদের শ্রম শেষ হয় না; এই নূতন "এক্সপ্লোসিভ্" বাজারে প্রেরণ করার পূর্ব্বে, তাঁহাদিগকে, তাহার ব্যবহারের উপযোগিতা সম্বন্ধে ১৫০০০ হাজার পরীক্ষা পরিচালনা করিতে হইয়াছে।

করাতের গুড়া হইতে এ্যাল্‌কোহল্ (সুরাসার) প্রস্তুতকরণ আর একটী বিস্ময়কর আবিষ্কারের উদাহরণ। কার্পাস তুলা মধ্যে "সেলুলোজ্" (আঁশ) যেরূপ একটী প্রধান উপাদান, করাতের গুড়ার মধ্যেও তাহা তদ্রূপভাবে বিদ্যমান আছে। ইহা বহুপূর্ব্ব হইতে জানা ছিল যে, করাতের গুড়াকে অন্য কোনও রাসায়নিক যৌগিকসহ মিশ্রিত করিয়া একপ্রকার শর্করায় (Sugar) পরিণত করা যাইতে পারে। যদিও তাহা ইক্ষুচিনি না হউক, তথাপি তাহা শর্করাবর্গভুক্ত একটী মিষ্ট দ্রব্য। ইহা একটী সুপরিচিত বিষয় যে, বৃক্ষের কাষ্ঠভাগ অর্থাৎ কঠিন অংশ বৃদ্ধি করার জন্য তাহার শরীর মধ্যে একপ্রকার শর্করা জন্মে, তৎপর সেই শর্করা সেলুলোজে (আঁশ) পরিণত হয় এবং এই কাষ্ঠভাগ হইতেই করাতের গুড়া পাওয়া যায়। "মেপল্ সিরাপ্" (Mayple Syrup), বৃক্ষের শরীর নিঃসৃত মিষ্ট একটী রস। তক্তা ফাড়াই করার করাত-কলের (Saw mill) নিকট পর্ব্বত প্রমাণ রাশিকৃত করাতের গুড়া সঞ্চিত থাকায় তাহা স্থানান্তরিত করিবার উপায় উদ্ভাবন করা একটী সমস্যা মধ্যে দাঁড়ায়; তৎপর তথায় করাতের গুড়া হইতে এ্যাল্‌কোহল্ প্রস্তুত করণের কলকারখানা স্থাপিত করিয়া তাহার সঙ্গে পাতলা (dilute = ডাইলিউট্) এ্যাসিড্ (Acid) মিশ্রিত করায় যে কতকগুলি মিশ্রিত পদার্থ পাওয়া যায় তাহারা কোনও কাজে লাগে না; কিন্তু তাহাদের সঙ্গে এক প্রকার শর্করা পাওয়া যায়। ইহা অনেকেরই জানা আছে যে, কোনও কোনও জাতীয় শর্করাকে এ্যাল্‌কোহলে পরিণত করা যায়। তখন এই পরিজ্ঞাত প্রণালী অবলম্বনে "সেলুলোজ" (cellulose) কি শর্করাকে এ্যাল্‌কোহলে পরিণত করিয়া বাণিজ্যপণ্য স্বরূপ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করা হয়।

আমেরিকার কেমিষ্টগণ, ব্যবহারিক কেমিষ্ট্রীতে যে সকল আধুনিক আবিষ্কার করিয়াছেন তৎসকলের মধ্যে রঙ্ প্রস্তুত-করণ-শিল্প সর্ব্বপ্রধান। জার্ম্মাণ মহাসমরের পূর্ব্বে, অধিকাংশ রঙ্ জার্ম্মাণী হইতে আমেরিকায় আমদানী করা হইত। অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল ব্যাপী বহু শ্রমজনিত গবেষণা দ্বারা ইংল্যাণ্ডে, কারখানায় রঙ্ প্রস্তুত হয়; কিন্তু জার্ম্মানির লোকেরা সেই আবিষ্কারের ফলে, কারখানায় অধিক পরিমাণ রঙ প্রস্তুত করতঃ বিক্রয় করার কারবার

তাহাদের একচেটিয়া করিয়া ফেলে। তাহারা প্রচার করে যে, আমেরিকায় রঙ্ প্রস্তুত হইতে পারে না।

পাথুরিয়া কয়লার আল্কাতরা হইতে রঙ্ প্রস্তুত করা, "সীন্থেটিক্ ক্যাম্ফর" (Synthetic Camphor বৈজ্ঞানিক কর্পূর) প্রস্তুত-করণ-প্রণালী অপেক্ষা অন্ততঃ নয়শত গুণ অধিকতর জটিল। তথাপি জার্ম্মাণ সমরের অবসান না হইতেই আমেরিকায় রঙ্ প্রস্তুত করণ শিল্প জার্ম্মানির সমকক্ষ হইয়া উঠে। আমেরিকায় ২০ লক্ষের অধিক সংখ্যক স্ত্রীলোক ও পুরুষ শ্রমজীবী যে তিন "বিলিয়ান্" মুল্যের শিল্পজাত পণ্য উৎপন্ন করে ; সেই সকল পণ্য নানা প্রকার রঙ্ ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ বয়ন শিল্পজাত দ্রব্য সকলে, অর্দ্ধেকের অধিক পরিমাণ রঙ্ ব্যবহৃত হয় ; তাহার পর পাকা চর্ম্ম, কাগজ, "পেণ্ট্" (piant) এবং কালীতে (ink) রঙ্ ব্যবহৃত হয়। শুভ্র বর্ণ কাগজ ও রঙ্ ব্যবহার বিনা শুভ্র হয় না, এবং আধুনিক সামরিক কার্য্যে দেশ রক্ষা এবং সংক্রামক পীড়া হইতে স্বাস্থ্য রক্ষা, কেমিষ্টদের ও তাঁহাদের প্রস্তুত রাসায়নিক দ্রব্য সকলের উপর অনেক পরিমাণ নির্ভর করে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে, জার্ম্মাণী রঙ্ রপ্তানী বন্ধ করে ; তখন যুক্ত রাজ্য সকলে ৪ মাসের আবশ্যকীয় রঙ্ মজুদ থাকে। রঙ্ ব্যয় করার পরিমাণ হ্রাস করা হয় ; তখন বয়ন শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষা পাওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়, কারখানায় রঙ্ প্রস্তুত করার জটিল প্রণালী ইহাতেই বুঝা যাইতে পারে যে, কেবলমাত্র এক "কোল্-টার" (coaltar = আল্কাত্রা) হইতে পাঁচ হাজার প্রকার রঙ্ প্রস্তুত করা সম্ভবপর ; তন্মধ্যে প্রায় নয় শত প্রকার রঙ্ ব্যবহার প্রচলিত আছে।

মৃত্তিকা-নির্ম্মিত চোঙ্গ (clay pipe = ক্লে পাইপ) মধ্যে একখণ্ড পাথুরিয়া কয়লা রাখিয়া, কর্দ্দম দ্বারা ঐ চোঙ্গের প্রান্ত মুখ বন্ধ করতঃ গ্যাস্-শিখার উপর তাহাকে উত্তপ্ত করিতে হয়। তখন চোঙ্গ হইতে যে গ্যাস্ বাহির হয় তাহা পীতাভ ধূমায়মান শিখা সহকারে জ্বলে এবং চোঙ্গের ভিতরে কয়েক ফোটা ময়লা জল এবং কতকটা আটাল কালো দ্রব্য সঞ্চিত হয়। এই কাল দ্রব্যটিই "কোল্টার"। ইহা আধুনিক লোক-সমাজে পরিচিত একটী বিস্ময়কর পদার্থ। ইহা হইতে ঔষধ, যুদ্ধের বারুদ পুষ্পের অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধি দ্রব্য (Perfumes), গৃহের ছাদ (roofing), মৌমাছির মধু অপেক্ষা পাঁচশত গুণ অধিক মিষ্ট একটী দ্রব্য (sacharine = স্যাকারিণ = সংস্কৃত "শর্করা" শব্দ হইতে ল্যাটিন্ "স্যাকারিণ" শব্দ) এবং শত শত প্রকার রঙ্ প্রস্তুত হয়।

ফরাসী-বিপ্লব

রিজাউল করিম, বি-এ,

প্রথম পর্ব্ব

ইউরোপ মহাদেশে যেদিন সভ্যতার আলোক সর্ব্বপ্রথম প্রবেশ লাভ করে, সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত যে কয়েকটি প্রধান প্রধান ঘটনা সংঘটিত হইয়া তথাকার ভাগ্যনির্ণয় করিয়াছে,—ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে ও সমাজে নূতন ভাবধারার সমাবেশ আনিয়া সর্ব্বত্র মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া মানব জীবনের প্রত্যেক স্তরে নানা বিষয়ে পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়াছে, তন্মধ্যে তিনটি ঘটনাকেই ঐতিহাসিকগণ সর্ব্বপ্রধান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন:—'রিনেসঁ,' 'রিফরমেশন' এবং ফরাসী বিপ্লব!! রোম-গ্রীসের গৌরব-মহিমা খর্ব্ব হইলে বহুকাল যাবৎ ইউরোপ তাহাদের কোনও সংবাদ রাখিত না, রোম-গ্রীসের যুগ-যুগব্যাপী সাধনার অমৃতময় ফলস্বরূপ তাহাদের অমূল্য গ্রন্থরাজি কনস্টান্টিনোপলের একপ্রান্তে বহুদিন অবধি অনাদৃত ও অবহেলিত অবস্থায় পড়িয়াছিল। কিন্তু যেদিন সেই স্তূপীকৃত পুস্তক-রাশি ইউরোপে নীত হইল—অন্ধ ইউরোপের সম্মুখে যেদিন প্লেটো, আরিষ্টটলের অগাধ জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত হইল, সেদিন ইউরোপের কি আনন্দের দিন—জাগরণের কি বিপুল আন্দোলন, জ্ঞানালোচনার কি পুলক-উচ্ছ্বাস! সেই দিন হইতে ইউরোপে "রিনেসঁ" বা জাগরণের সূচনা আরম্ভ হইল। আরব্যোপন্যাস-বর্ণিত মায়াপুরীর রাজকন্যার মত জ্ঞানের যাদুকাটি-স্পর্শে ইউরোপ শিহরণ দিয়া জাগিয়া উঠিল। জ্ঞানের পুণ্য-পরশে জাগরিত হইয়া ইউরোপ শিহরিয়া উঠিয়া দেখিল, 'গ্লাস-খোকসের' মত এক অতিকায় দৈত্য ধর্ম্মের নামে এতদিন তাহাকে মোহাচ্ছন্ন ও মূর্চ্ছাহত করিয়া পূতিগন্ধময় অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রাখিয়া দিয়াছিল। জ্ঞানের পুণ্যস্পর্শে জাগরিত হইয়া ইউরোপ দেখিল তাহারই বক্ষে তাহাকেই মুক্ত করিবার জন্য স্নিগ্ধ-মধুর হাস্যে দিগ্বিদিক আলোকিত করিয়া রাজপুত্রের মত দাঁড়াইয়া আছেন—মার্টিন লুথার! মহাত্মা মার্টিন লুথার ইউরোপের প্রাচীন ধর্ম্মসংস্কার ভাঙ্গিয়া দিয়া দেশময় যে একটা মহা বিপ্লব আনয়ন করিলেন, তাহাই "রিফরমেশন" নামে পরিচিত! 'রিনেসঁ' ও 'রিফরমেশন' সমগ্র ইউরোপকে এমনভাবে আলোড়িত, বিক্ষুব্ধ ও তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিল, এবং মানুষের জীবন ধারাকে দৃঢ় উপলখণ্ডের মধ্য দিয়া আছড়াইতে আছড়াইতে এমন পথে লইয়া গেল যে, মনে হইয়াছিল, বুঝিবা ইউরোপের মধ্যে প্রাচীন সংস্কারের চিহ্ন মাত্র থাকিবে না, পুরাতন যা কিছু সব ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ইউরোপকে নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিবে। কিন্তু এই নূতনের বিরুদ্ধে ভীমবলে মস্তকোত্তলন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ইউরোপের রাজশক্তি। প্রাচীন মোহ, প্রাচীন সংস্কার ও প্রাচীন ধর্ম্ম কিছুই ভাঙ্গিতে দিব না বলিয়া রাজশক্তি গিরি-নিঃসৃত বারিধারার মধ্যপথে, পর্ব্বতের দৃঢ়তা লইয়া দাঁড়াইয়া উহার দুর্ব্বার স্রোত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিল। এই নূতন ভাবধারার পথে রাজশক্তিরূপ যে বাধা আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে সামান্য তৃণখণ্ডের মত অনন্ত সমুদ্রে ভাসাইয়া দিবার জন্য নূতন বেগে ও প্রবল শক্তিতে যে খরস্রোত আসিয়া যোগ দিল, তাহাই ফরাসী-বিপ্লব।

ফরাসী-বিপ্লব শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব নহে—ইহার সহিত সকলবিধ বিপ্লব বিজড়িত। কয়েক যুগ হইতে ইউরোপের অধিবাসীদের মধ্যে সাহিত্যে, ধর্ম্মে

ও রাজনীতিতে ধীরে ধীরে যে পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব হইয়া আসিতেছিল এবং 'রিনেস্'ও 'রিফরমেশন' যে বিপ্লবকে ক্রমে ক্রমে সাফল্যের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছিল, তাহাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সর্ব্বাবয়বে পূর্ণ-পরিণতি লাভ করিয়া উৎকটভাবে আত্ম-প্রকাশ করিল—ফরাসী বিপ্লবে। এই বিপ্লব মৃতপ্রায় সাহিত্যের চিরাচরিত পন্থা, ধীরতা, সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া উহার মধ্যে জীবনের জোয়ার ডাকাইয়া দিল। মার্টিন লুথারের সংস্কারিত ধর্ম্মকে জ্ঞানের নিক্তিতে ওজন করিয়া যখন দেখা গেল যে, উহার মধ্যেও সার সত্য নাই, তখন এই বিপ্লবই ভিত্তিসহ খৃষ্টান ধর্ম্মকে উৎপাটিত করিয়া দেশের মধ্যে বিবেকের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিল। আর যে রাজশক্তি এতদিন অত্যাচারের কুলিশ-কঠোর বজ্র করে মানুষের চিন্তাশক্তির ও সুখ-সুবিধার প্রধান অন্তরায় ছিল, এই বিপ্লব সেই শক্তির প্রধান প্রতিনিধিকে প্রকাশ্য পথে যূপকাষ্ঠে বধ করিয়া সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার জয় ঘোষণা করিল। এই বিপ্লবের সহিত সাহিত্য, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র ও সমাজনীতি এরূপ ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত যে উহাকে "বর্ত্তমান ইউরোপের" সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলেও, অত্যুক্তি হয় না। আজ আমরা ইউরোপের যে মূর্ত্তি দেখিতেছি, তাহাতে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবই সব চেয়ে অধিক। সেই জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা একটি প্রধান অংশ অধিকার করিয়া আছে।

ফরাসী বিপ্লব, সমগ্র ইউরোপের জন্য একটি মহা উপপ্লব। ইহার আরম্ভের অল্প দিনের মধ্যে কিছু কালের জন্য সমগ্র ইউরোপের ইতিহাস, একটি মাত্র ঘটনা, একটি মাত্র জাতি ও একটি মাত্র ব্যক্তির ইতিহাসে পরিণত হয়। সে ঘটনা হইতেছে ফরাসী বিপ্লব, সে জাতি হইতেছে ফরাসী আর সেই পুরুষ সিংহ ব্যক্তিটি হইতেছেন মহাবীর নেপোলিয়ান। ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্স বলিয়া যে একটি দেশ আছে, সেই দেশের কতকগুলির ঘটনা-পরম্পরার সংমিশ্রণে এমন একটি ভীষণ প্রজাবিদ্রোহ সংগঠিত হইয়া গেল যে, তাহা অধিক কাল পর্য্যন্ত প্রাদেশিক ব্যাপার রহিল না, বরং অল্প সময়ের মধ্যে তাহার ক্রমবর্দ্ধনশীল বেগ সমগ্র ইউরোপকে ধাক্কা মারিয়া ভিত্তিসহ তথাকার সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্মীয় সকল বিধানকে বিচলিত করিয়া দিল।

ফরাসী বিপ্লব কেবলমাত্র রাজনৈতিক বিপ্লব নহে। রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক ও সাহিত্যিক—সর্ব্বপ্রকার বিপ্লবই নানা খাতে প্রবাহিত হইয়া এই মহা বিপ্লবে আসিয়া মিশিয়া ইহাকে এরূপ ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে! এই মহা বিপ্লবের অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য যে সকল যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছে—অস্ত্র, তোপ-গোলা ও সঙ্গীন-খোঁচাই তাহার একমাত্র অস্ত্র ছিল না। উহাকে সাফল্যে মণ্ডিত করিবার জন্য আর একটা প্রধান অস্ত্র ছিল পথ-গিরি-নিঃসৃত স্রোতাধারার ন্যায় বন্ধনমুক্ত বাধাহীন চিন্তাধারা! বহু মনীষী মহা পুরুষের যুগ-যুগ-সঞ্চিত ভাবগুলি যখন হঠাৎ উৎসারিত হইয়া দেশময় ছড়াইয়া পড়িল, তখন তাহার সম্মুখে, স্রোতোমুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় সব কিছু ভাসিয়া গেল—রাজা, রাজ্য, অভিজাত, ধর্ম্ম-যাজক! ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাধারা মুক্তিলাভ করিয়া ইউরোপময় যে মহাপ্লাবন আনিল, তাহা নুহের প্লাবনের ন্যায় পুরাতন ইউরোপকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একেবারে নূতন করিয়া গড়িতে লাগিল!!

ফরাসী বিপ্লব ইউরোপময় যে ভাবধারা প্রচার করিল, তাহা সে যুগের লোকের নিকট অত্যন্ত উৎকট বলিয়া মনে হইয়াছিল। পুরাতন শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিতে হইবে—গণতন্ত্র-প্রথা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—অভিজাত তন্ত্রের বিলোপ সাধন করিতে হইবে, গতানুগতি বা তার পথ হইতে সাহিত্যের গতি ফিরাইতে হইবে—পৃথিবীর মধ্যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানুষকে তাহার জন্মগত ন্যায্য অধিকার দিতে হইবে—এই সকল বিষয় গভীর ভাবে আলোচনা করিবার জন্য, ফরাসী বিপ্লব মানুষের চিন্তা-শক্তিকে প্রসারিত করিয়া দিল। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে এই সকল বিষয় কখনও গুরুতর ভাবে আলোচিত হয় নাই। ফরাসী বিপ্লব এই সমস্ত বিষয় উত্থাপিত করিয়া সমগ্র ইউরোপকে বিশুদ্ধ আলোড়িত করিল। ইউরোপের পুরাতন সামাজিক প্রথা ও শাসন-পদ্ধতি কতকগুলি অত্যাচার মূলক অবৈজ্ঞানিক প্রথার উপর নির্ভর করিতে-ছিল—নির্ব্বিচারে পার্থিব ক্ষমতার নিকট আত্ম-সমর্পণ—ধর্ম্মের নামে বিবেকহত্যা, স্বৈরশাসন ও আভিজাততন্ত্র—এই ছিল ইউরোপের জঘন্যতম পাপ। এইবার হইতে এই সকলের উপর ফরাসী বিপ্লব এমন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিল যে, সে আঘাতে সব বিচূর্ণ হইয়া গেল এবং তৎস্থলে এক

গৌরবময় নব যুগের সূচনা হইল। ফরাসী জাতি যদি অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া ইউরোপময় বিপ্লব ঘোষণা করিয়া বেড়াইত, তাহা হইলে হয় ত ইউরোপের মিলিত শক্তি বিপ্লবের প্রারম্ভেই উহাকে সমূলে বিনষ্ট করিত, কিন্তু ফরাসীর প্রধান অস্ত্র ছিল মুক্ত-চিন্তা ধারা! সশস্ত্র আক্রমণ সহজেই প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারা যায়, কিন্তু মুক্ত চিন্তা ও স্বাধীন হৃদয় যে বিপ্লবের প্রধান অস্ত্র তাহা পৃথিবীর কোন শক্তিই দমন করিতে পারে না। সেই জন্য ফরাসী বিপ্লব অত্যল্প কালের মধ্যে সমগ্র ইউরোপকে প্রকম্পিত করিয়া দিল! উহার প্রবল বেগ কেহই সহ্য করিতে পারিল না—কয়েক বৎসর ধরিয়া সারা ইউরোপে ধ্বংস ও হত্যা লীলার ভীষণ অভিনয় চলিল !!

ফরাসীদেশ হইতে উদ্ভূত যে মহাবিপ্লবের প্রচণ্ড আঘাতে সমগ্র ইউরোপ থরহরি প্রকম্পিত হইয়াছিল, তাহা একদিনের বিশেষ কোনও একটা ঘটনার দ্বারা সম্ভব হয় নাই। তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে ইউরোপের বিগত দুই শত বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিতে হয়। সমগ্র ইউরোপে দুইশত বৎসর ধরিয়া মানুষের উপর যে অত্যাচার-অবিচার হইতেছিল, যেরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রজার রক্ত-মোক্ষণ হইতেছিল তাহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, ভূগর্ভস্থিত অগ্ন্যুদ্গারের ন্যায় হঠাৎ বিস্ফোরিত হইয়া যে মহাবিপ্লবের সৃষ্টি হইল তাহাই ফরাসী-বিপ্লব বলিয়া অভিহিত। কিপ্রকারে ফরাসী বিপ্লব সংগঠিত হইল, তাহা জানিতে হইলে, সেই বিপ্লব যুগেরও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থাগুলি ধীরভাবে আলোচনা করিতে হইবে। সে যুগে ইউরোপে যে শাসন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহা রাজতন্ত্র নামে অভিহিত হইলেও প্রকৃতি পক্ষে তাহা ছিল অভিজাত-তন্ত্র। যখন রাজ্যশাসনের ভার থাকে কয়েকজন লোকের সমষ্টির উপর, তখনই সেই শাসন-পদ্ধতিকে অভিজাত-তন্ত্র বলা হয়। একজন রাজা যতই অত্যাচারী হউক, তাহার একজনের অত্যাচার সহ্য করা একেবারেই কষ্টকর নহে। কিন্তু যখন আমির ওমরাহ, পারিষদ ও জমিদার শ্রেণীর লোক রাজাকে পুত্তলিকাবৎ সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার নামে দেশ শাসন করিতে থাকেন তখনই তাহা অসহ্য হইয়া থাকে। সে যুগে সর্ব্বত্র অভিজাত-তন্ত্র এরূপভাবে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল, যে তাহার প্রভাবে স্বয়ং রাজা বা সম্রাটের ক্ষমতা মলিন হইয়া গিয়াছিল। অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ পূর্ণশাসনভার পাইয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজাদিগকে কেবলই লুণ্ঠন করিত। প্রজাদের রক্তশোষণ দ্বারা ইহারা আপনাদের ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিত। ইংলণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, ভিনিস, জারমণী অষ্ট্রীয়া, এশিয়া, স্পেন, সুইডেন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে কোথাও রাজতন্ত্র এবং কোথাও অভিজাততন্ত্র প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু শাসন ব্যাপারে সর্ব্বত্র একই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। স্বৈরাচারও অভিজাততন্ত্র যেন ভাগাভাগি করিয়া প্রজা লুণ্ঠন করিত। এই সকল অত্যাচারী শাসক-বর্গের অধীনে সাধারণ প্রজার কোনই অধিকার ছিল না। শাসনকার্য্যের জটিলতাময় রহস্যজালের মধ্যে তাহাদের প্রবেশ করিবার কোনও উপায় ছিল না। যাহাতে প্রজারা, শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে কোনওরূপ উচ্চবাচ্য করিতে না পারে, তৎপ্রতি সর্ব্বদা সতর্কতাপূর্ণ দৃষ্টি রাখা হইত। প্রজাদের ধনরত্ন বিলুণ্ঠিত তাহাদের কণ্ঠরুদ্ধ—তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপহৃত—এইরূপ অবস্থায় ইউরোপের সাধারণ অধিবাসী দিনপাত করিত। দেশের শাসকবর্গ প্রজাপীড়নও করিতেনই, তাহারা দেশের ও প্রজার হিতের প্রতি একটুও দৃষ্টিপাত করিতেন না। আপনাদের সুখ-সুবিধা ও বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহারা কত প্রজাকেই না উৎসন্নে পাঠাইয়াছেন। আর নিজেদের জিঘাংসা-প্রবৃত্তি পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহারা কতবারই না দেশকে যুদ্ধে লিপ্ত করিয়াছেন। এক রাজার সহিত অন্যরাজার সামান্য বিষয়ে মনোবিবাদ হইলেই, প্রত্যেকে তাহা লোক-ক্ষয়কর যুদ্ধদ্বারা মীমাংসা করিয়া লইতেন। এই সকল অনর্থক যুদ্ধে দেশের ত' কোন উপকার হইত না, মধ্যে পড়িয়া বিনষ্ট হইত কতকগুলি অসহায় প্রজা। রাজাদের এই সকল অত্যাচারে দেশের প্রজারা অনেকদিন হইতেই বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া ছিল, কিন্তু বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার সাহস ও সুযোগ তাহারা এযাবৎ পায় নাই। কিন্তু যেদিন তাহারা সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী শ্রবণ করিল, সেইদিন তাহাদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেল, তাহারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া ফরাসী বিপ্লবের মহা আহ্বানে সাড়া দিল।

সমগ্র ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্সের অবস্থা, সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ছিল। অত্যাচার ও নিষ্পেষণে ফ্রান্সের অধিবাসী ভীষণভাবে জর্জ্জরিত হইতেছিল। ফরাসী বিপ্লবের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই ফ্রান্সের রাজপুরুষগণ অত্যাচারের উদ্দাম স্রোতে সমগ্রদেশ প্লাবিত করিয়া আসিতেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে যিনি ফ্রান্সের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন তাঁহার নাম চতুর্দ্দশ লুই। তিনি অত্যন্ত সৌখিন ও আড়ম্বরপ্রিয় লোক ছিলেন। স্বীয় বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্ত তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া রাজভাণ্ডার শূন্ত করিতেন এবং নানারূপ গর্হিত উপায়ে অর্থ আদায় করিয়া শূন্ত ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেন, ইহাতে প্রজারই রক্তশোষিত হইত মাত্র। তাঁহার উত্তরাধিকারী পঞ্চদশ লুই প্রজাদের সুখ-সুবিধার প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করিতেন না, তিনি তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া স্বকীয় ইন্দ্রিয়-লালসা চরিতার্থ করিতেন। জর্জ্জরিত ও নিপীড়িত প্রজার প্রতি কে দৃষ্টিপাত করে ?

এইরূপে কয়েক যুগ ধরিয়া অত্যাচারী রাজার কবলে পতিত হইয়া সমগ্র ফ্রান্স ভীষণ আকার ধারণ করিল, রাজকোষ শূন্ত, প্রজারা প্রপীড়িত, দুর্ভিক্ষ আসন্ন। দেশের যখন এই অবস্থা তখন অল্পবয়স্ক ষোড়শ লুই সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। কিন্তু সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া তিনি দেশের দুর্দ্দিন দূর করিবার বিশেষ কোনও চেষ্টা করিলেন না। তিনি একে ত তরুণ যুবক, তার উপর তাঁহার ঘাড়ের উপর আসিয়া জুটিল একদল দুরভিসন্ধি-পরায়ণ চাটুকার। তোষামোদ-প্রিয় রাজা সর্ব্বদাই তাহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। এই সকল চাটুকার রাজাকে নানাছলে ভুলাইয়া দেশের কথা ভাবিবার অবসর মাত্র দিত না। রাজার কত কাজ, দেশের দুর্দ্দিনের কথা ভাবিবার তাঁহার অবসরইবা কোথায়? আজ শিকারে যাইতেছেন, কাল বনবিহারে, কোনদিন বা বাদ্যগীত দ্বারা চিত্ত-বিনোদন করিতেছেন। এত যার কাজ তিনি কি জাতির বিষয় ভাবিবার অবসর পান? এই সকল বিলাসব্যসন ও আমোদ-প্রমোদে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া রাজকোষ যখন আরও শূন্ত হইল, তখন অবশ্য একবার প্রজাদিগের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিবার অবসর হইল, কারণ তাহারাই ত অর্থদাতা। যাহারা এতদিন ধরিয়া রাজকোষে অর্থ জোগাইয়া আসিতেছে, এবারও সেই প্রজাদিগকেই আদেশ হইল, রাজার অর্থাভাব তাঁহাকে অর্থ দাও! মূল কথা এই যে, রাজকোষ শূন্ত থাকায়, স্বীয় বিলাস-বাসনা পূর্ণ হইতেছে না বলিয়া রাজা নিত্য-নূতন কর দ্বারা প্রজাপীড়ন করিতে লাগিলেন। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টিপাত না করায় সমগ্রদেশে ঘোর বিশৃঙ্খলা আসিয়া উপস্থিত হইল।

এই সময় সমগ্র ইউরোপের এবং বিশেষতঃ ফরাসী দেশের সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ইউরোপীয় সমাজে তখন অভিজাতবর্গের এত অধিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল যে, জনসাধারণের যে স্বতন্ত্র স্বত্ব আছে, ইহা কেহই স্বীকার করিত না। অবশ্য ফিউডাল-প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া, দেশের রাজার সহিত প্রজা-সাধারণের সাক্ষাৎ কোনও সম্বন্ধ ছিল না। মধ্যস্বত্বভোগী অভিজাতবর্গই প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের রাজা ছিলেন। ইঁহারা রাজ-দরবারেই জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করিয়া প্রজার লুণ্ঠিত অর্থে জীবনযাপন করিতেন। ইঁহাদের অত্যাচারে দরিদ্র ও অজ্ঞজন-সাধারণের দুর্দ্দশার অবধি ছিল না। বিত্তশালী অভিজাতেরা তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করিত না। তাহারা সর্ব্বপ্রকার কর হইতে মুক্ত ছিল, আর যত কর, তাহার ভার সবই বহন করিতে হইত দরিদ্র প্রজাদিগকে। রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করা কিরূপ ব্যয়বহুল তাহা সকলেরই জানা আছে, কিন্তু এই বিরাট ব্যয়ের এক কপর্দ্দক অংশ অভিজাত বর্গ দিত না, দিতে হইত প্রজাদিগকে। আপনাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত কর দিয়া প্রজারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দেশের সমুদয় ভূসম্পত্তির মধ্যে ⅔ অংশ অভিজাত ও ধর্ম্মযাজকগণ নিষ্করভাবে উপভোগ করিতেন। ইঁহারা যে সম্পত্তি উপভোগ করিতেন, তাহা দেশের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান বলিয়া পরিচিত ছিল। আর অবশিষ্ট ⅓ নিকৃষ্ট সম্পত্তি প্রজাদের জন্ত ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। অভিজাত ও ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা মাত্র কয়েক লক্ষ, আর প্রজারা ছিল কোটি কোটি। এই অকর্ম্মণ্য ও অলস প্রকৃতির অভিজাতবর্গের কয়েক লক্ষ লোক দেশের কোটি কোটি লোকের মুখের

গ্রাস কাড়িয়া লইয়া পরমানন্দে দিনপাত করিত, আর তাহাদেরই সম্মুখে অন্নাভাবে কাতর হইয়া প্রজাগণ হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া মরিত। অপকৃষ্ট ও জলময় ভূমির উৎপন্ন শস্যে দিনপাত হইত না বলিয়া প্রজারা উদরান্নের জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু অভিজাত বর্গ, তাহাদিগকে এত অধিক বেগার খাটাইতেন যে, তাহারা নিজেদের কাজ করিবার অবসরই পাইত না। এই সকল কারণে দরিদ্র ও অভিজাতবর্গের মধ্যে অনেক দিন হইতে একটা মনোবিবাদ চলিয়া আসিতেছিল। অসহায় ও নিরবলম্ব বলিয়া দরিদ্রগণ কোনদিনই এই সব অত্যাচারের প্রতিকার করিতে সাহসী হয় নাই।

এই সময় ফরাসীদের সৌভাগ্যবশতঃ আর এক শ্রেণীর লোক ফ্রান্সের মধ্যে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। উহাদিগকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। অনেক দিন হইতে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পকার্য্যদ্বারা এই শ্রেণী প্রভূত অর্থশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার দ্রুতবেগে চলিতেছিল। পরবর্ত্তী যুগে, রুশো ভলটেয়ারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, এই মধ্যশ্রেণীর মনিষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণই ফরাসী বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

দেশবাসী যখন দুঃখ-দুর্দ্দশা ও অত্যাচার-অবিচারের কশাঘাতে নিপীড়িত, সেই সময় "মরার উপর খাঁড়ার ঘা"র ন্যায় আর এক নূতন বিপদ আসিয়া দেখা দিল। উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর ভাল শস্য না হওয়ায়, করাল দুর্ভিক্ষ ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমগ্র দেশ গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। একদিকে অমরাবতী তুল্য অট্টালিকায় বসিয়া রাজপুরুষগণ নৃত্যগীতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতেছেন, প্রত্যহ সুপেয় খাদ্যে উদর পূর্ত্তি করিয়া পরমানন্দে দিন যাপন করিতেছেন, আর তাঁহাদেরই অট্টালিকার আর এক প্রান্তে পথের উপর অস্থি-কঙ্কালসার বুভুক্ষিত জনসাধারণ এক মুষ্টি অন্নের জন্য হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছে! কিন্তু এ দৃশ্য দেখিয়া কাহারও প্রাণ কাঁদে নাই—উহাদের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য কেহই অগ্রসর হয় নাই।

সর্ব্ব দেশে সকল সময় সাহিত্য মানব সমাজের উপর এক অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। অবনতির গভীর কূপে নিপতিত জাতি সাহিত্যের সম্মোহন-শক্তি এভাবে বিপুল পুলকে জাগিয়া উঠে। অত্যাচারী শাসকবর্গ সেই জন্য সাহিত্যরথীদের শক্তি বিনষ্ট করিবার জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। প্রেস আইন, সিডিশন আইন, প্রভৃতি বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়া ভাবোচ্ছ্বাসের উচ্ছল স্রোত বন্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। কিন্তু পেনাল কোডের ধারা স্বভাবের গতি রোধ করিতে পারে না।

ফ্রান্সের দারুণ দুর্য্যোগের দিনে কয়েক জন অদ্ভুত-কর্ম্মা সাহিত্যিক আবির্ভূত হইয়া এক বিচিত্র উপায়ে, সমগ্র দেশবাসীকে জাগাইয়া তুলিলেন। রুসো ভলটিয়ার, মনটেস্কি প্রভৃতি দার্শনিক সাহিত্যিকগণ সেই সময় বিধাতা-প্রেরিত মহা-পুরুষের মত ফরাসী জাতিকে অজ্ঞতার অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়া স্বাধীনতার শুভ্রালোকের পথে পরিচালিত করিতেছিলেন। তাঁহারা যে সকল উচ্চ-ভাব-পূর্ণ সারগর্ভ উপদেশ প্রচার করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া ফরাসীদের প্রাণ উৎসাহে ও আনন্দে নাচিয়া উঠিল। চির-নিগৃহীত ফরাসী জাতি, সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে জাগিয়া উঠিল। তাঁহাদের মধ্যে রুসোর বাণীই দেশের মধ্যে অশান্তির অগ্নিকণা ছড়াইয়া দিল। তাঁহার প্রচারিত শিক্ষার সার মর্ম্ম এই যে, রাজ্য কোন ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। উহা সমগ্র প্রজার সাধারণ সম্পত্তি। একজন উচ্চপদ-বিশিষ্ট মর্য্যাদাশালী ব্যক্তির উহাতে যতটুকু অধিকার আছে, একজন দাসানুদাস কৃষকেরও তাহাতে সেইটুকু অধিকার আছে। সুতরাং একজন লোক বংশ-পরম্পরাক্রমে রাজ্যের একমাত্র প্রভু হইয়া থাকিবে, উহার সকল সুবিধা ভোগ করিতে থাকিবে, আর কোটি কোটি লোক তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রভু-শ্রেণীর দাসানুদাস হইয়া থাকিবে, ইহা কখনও বিধাতার অভিপ্রেত নহে। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার, মানুষকে এ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে স্বভাবের বিরুদ্ধাচারণ করা হয়।

—ক্রমশঃ

সৃষ্টির কথা

মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, বি-এ, বি-টি

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বপ্রকার অস্তিত্বের মূলেই স্রষ্টার অবিশ্রান্ত সৃষ্টিলীলা। সতত সৃষ্টি-নিরত বলিয়াই স্রষ্টা অমর, মুহূর্ত্তের জন্য সৃষ্টি-কার্য্যের বিরতি মানুষ কল্পনা করিতে পারে না। বিশ্ব-স্রষ্টার সৃষ্টির এক একটা সামান্য দিক লইয়া মানুষ জন্ম-জন্ম গবেষণা করিতেছে; সৃষ্টির নূতন নূতন আবিষ্কৃত রহস্য মানুষের বোধ-শক্তিকে স্তম্ভিত করিয়া দিতেছে।

মানুষ নিজে যেমন স্রষ্টার একটা অসাধারণ সৃষ্টি, সে স্বয়ং সেরূপ স্রষ্টার ইঙ্গিতে এবং তাঁহার বিশেষ নিয়মাধীন সৃষ্টি করিয়া আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছে, মানবজাতির যে গোষ্ঠীর সৃষ্টি-শক্তি অব্যাহত থাকে তাহারাই আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে। সৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ বা নিস্তেজ হইতে থাকিলে বুঝিতে হইবে জাতির মেরুদণ্ড অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে—সে-জাতির ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

জগতের নূতন পুরাতন সকল জাতিই বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে কিছু কিছু মৌলিক দান করিয়াছেন।

প্রাচীন হিন্দুগণ জগতে নয়টী অঙ্ক ও একটী শূন্যের সাহায্যে অঙ্ক লিখিবার প্রণালী দিয়াছিলেন। প্রাচীন মিসর হইতে কাগজ-প্রস্তুত প্রণালী বাহির হইয়াছিল। জ্যামিতিবেত্তা ইউক্লিড গ্রীক জাতীয় ছিলেন। আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের nitric acid, sulphuric acid, alcohol, neuriate of ammonia, potassa, bichloride of mercury, nitrate of silver এবং phosphorus প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য আরবেরাই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বারুদ প্রস্তুত প্রণালী সর্ব্বপ্রথমে চীনদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

মোটের উপর যে-জাতি আপনার বাঁচিয়া থাকার উপকরণ প্রকৃতি হইতে যত অধিক সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে, সে-জাতি তত শ্রেষ্ঠতার সহিত জগতের বুকে বাঁচিয়া থাকিতে পারিয়াছে, যে-জাতি যত সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে সে-জাতি আপনার পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থাকে তত আয়ত্ত করিয়া টিকিয়া রাখিয়াছে।

ফেরেডে, ডেভি, ওয়াট্, নিউটন, প্রিসট্‌লী, হাক্সলী এবং অলিভার লজ্ প্রভৃতির মত লোক সর্ব্বদাই জন্মিতেছে ও তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়িয়া উঠিতেছে বলিয়াই যুগে যুগে বিভিন্ন সংঘর্ষে ইংরাজ জাতি আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। লোডেসিয়ার, ডিলেসেপ, লাপ্লেস এবং পাস্তুরের ন্যায় অসংখ্য লোক জন্মাইয়া এবং ম্যাদাম কুরির মত প্রতিভাকে পোষণ করিয়া ও বাঁচাইয়া রাখিয়া ফরাসী জাতি জগতে আজিও একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

জেপেলিন, রণ্‌জেন, হফ্‌মেন, লাইবিগ, উইলার, লাউ প্রভৃতির মত অসংখ্য লোক জার্ম্মাণীর বিজ্ঞানাগারে অহর্নিশি গবেষণা বা সাধনা করিয়াছেন এবং করিতেছেন বলিয়া জার্ম্মাণজাতি কতবার মরিতে যাইয়াও মরে নাই। গেলিলিও হইতে মার্কনী পর্য্যন্ত বহু বৈজ্ঞানিককে জন্মদান করিতে পারিয়াছে বলিয়া ইটালী আবার নূতন ভিত্তিমূলের উপর গড়িয়া উঠিতেছে। গত তিন চারিশত বৎসরের মধ্যে বেঞ্জামিন ফ্রেঙ্কলীন হইতে আরম্ভ করিয়া এল্‌ভা এডিসন পর্য্যন্ত কত মনীষীই না আমেরিকার যুক্তরাজ্য সৃষ্টি করিল। পরাধীন ভারতের হিন্দু জাতির মধ্য হইতেও অন্ততঃ কয়েকজন মৌলিক সৃষ্টি দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেন।

কিন্তু বর্ত্তমান জগতের এই যুগান্তরকারী শক্তিকগণের তালিকায় আধুনিক মুসলমানের নাম একটীও নাই!

আজ মানুষ একটা নূতনতর জীবনের সন্ধান পাইয়াছে। এই জীবনকে সৌষ্ঠবময় করিয়া তুলিতে হইলে প্রতি শোণিতবিন্দুতে কর্ম্মের উত্তেজনা অনুভব করা চাই। সত্য যাহা তাহা সনাতন ; কিন্তু সত্য মানুষের অবস্থানুসারে তাহার পক্ষে অমোঘ হয়। অনেক সময় মানুষ সত্যকে দূরে রাখিয়া তাহার ছায়া লইয়া কলহ করিয়া মরে। গ্রামে গ্রামে মসজেদের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। বঙ্গদেশ হইতে মক্কা-যাত্রীর সংখ্যাও কম নহে। কিন্তু সত্যিকার ধর্ম্মপ্রাণতা মুসলমানদের মধ্যে আছে কিনা তাহা এই কথা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে, মুসলমানের কোন প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সকলের অগ্রে খোদ মুসলমানেরাই অধিক সন্দেহ করিয়া থাকেন। মুসলমানের জাতিগত চরিত্রের উপর খোদ মুসলমানেরই আস্থা নাই—অন্য জাতি আমাদিগকে কি মনে করেন তাহা বলাই বাহুল্য। অথচ ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ ধারণার পক্ষপাতী বলিয়া মুসলমান প্রাণ খুলিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে সমর্থ হইতেছে না।

ইয়ুরোপের লোকদিগকে আমরা আজকাল ভয়ানক জড়বাদী বা অনাধ্যাত্মিক জাতি বলিয়া মনে করিয়া থাকি। যে কর্ম্মপরায়ণতা পারত্রিকভাব-বর্জ্জিত তাহাও এক প্রকার 'কুফরী' বটে ; কিন্তু যে ধর্ম্মপরায়ণতা কতগুলি বিশেষ নিয়মের অলস অনুকরণ মাত্র, তদ্দ্বারা আত্মার যে বিশেষ কোন উন্নতি সাধিত হয়, একথাও বিশ্বাস করা দুষ্কর। গভর্ণমেণ্টের দণ্ডনীয় অপরাধে বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিলে এবং সর্ব্বস্তরের মুসলমানের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিলে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হইয়া পড়ে যে, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি নিষ্ঠা ও ধর্ম্মশাস্ত্রের নিয়ম প্রতিপালন এই দুইয়ের মধ্যে যেন বিশেষ সম্পর্ক নাই। অথচ ধর্ম্মের নিয়ম পালন দ্বারাই সত্যের প্রতি মানুষের ন্যায়ের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হইবার কথা।

ইউরোপের কর্ম্ম-সাধনার একটা দিক আছে, যাহা প্রকৃত পক্ষে মোটেই আধ্যাত্মিকভাব-বর্জ্জিত নহে। কোন একটা বিশেষ সত্য বা তথ্যের অনুসন্ধান বা গবেষণা করিতে যাইয়া তাহারা অনাহার, দারিদ্র্য, লোকগঞ্জনা, উৎপীড়ন এমন কি মরণ পর্য্যন্ত অম্লানচিত্তে বরণ করিবে। এই গবেষণায় কৃতকার্য্য হইলে হয়তো তাহাদের ব্যক্তিগত লাভ বিশেষ কিছুই থাকিবে না, কিন্তু সেদিকে তাহাদের লক্ষ্য নাই। হয়তো রথ্যা-পথে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ; তবুও তাহাদের ত্যাগ ও সাধনার বিরাম নাই। সত্য ও কল্যাণকে নিঃসন্দেহরূপে পাইবার এই আকাঙ্ক্ষার সহিত আধ্যাত্মিকতার যথেষ্ট যোগ আছে। অন্য দিকে 'এলাহিয়ত' বা পরমার্থিক জ্ঞান লাভ করিতে যাইয়াও বহু দুর্ব্বলচেতা অনুসন্ধিৎসু 'গোমরাহই' হইয়া পড়েন।

বিজ্ঞান ও বস্তুশিল্প ছাড়া আমরা যদি কেবল ইংরাজ জাতির সাহিত্য সাধনার দিকে লক্ষ্য করি, তবে কি দেখিতে পাই? কত অনাহার, কত অনিদ্রা, কত অভাবের তাড়না, কত লাঞ্ছণা, কত সামাজিক অত্যাচার সহ্য করিয়া ইংরেজ সাহিত্যিকগণ মাতৃভাষাকে পুষ্ট করিয়াছেন। আইরিশ কবি গোল্ড স্মিথকে কিছুদিন পেশাদারী ভিক্ষুকগণের সহিতও বাস করিতে হইয়াছিল। ইংরেজ বালক কবি 'চেটারটন্' (১৭৫২—১৭৭০ খৃঃ) কিশোর বয়সে ক্ষুধার তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। তৎকালীন কোনও সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁহাকে আহার দিতে চাহিলেও আত্মসম্মানে আঘাত লাগে বলিয়া তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। ডাক্তার জনসন্ একটা বিশেষ যুগকে (অষ্টাদশ শতাব্দী) যেমন সর্ব্বতোভাবে প্রভাবান্বিত করিতে পারিয়াছিলেন, ইংরেজী সাহিত্যের আর কোন বিশেষ যুগকে আর কোন বিশেষ লেখক তেমন প্রভাবান্বিত করিতে পারেন নাই। আর্থিক দৈন্যকে তিনি যে অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও সাহসের সহিত বরদাস্ত করিয়া সমভাবে সাহিত্য সাধনা চালাইয়াছিলেন তাহার প্রতি ইংরেজ জাতির পরম শত্রুও মাথা নত না করিয়া থাকিতে পারে না। আদি কালের কেইড্‌মন (Caedmon 637—680) চসার (Chaucer 1340—1400) প্রভৃতি কবি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বার্ণার্ড-শ পর্য্যন্ত তাহাদের সৃষ্টি-সাধনা অপ্রতিহত গতিতে চলিয়াছে। যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সাধনা নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে ; কারণ সকল যুগের প্রয়োজন জগতে কখনও এক রকম নহে। মাত্র দুই শতাব্দী পূর্ব্বে জগতের লোক সংখ্যা যত ছিল, এখন তাহার দ্বিগুণেরও বেশী হইয়াছে। কত শূন্য বিজন প্রান্তর প্রকাণ্ড নগরে পরিণত হইয়াছে। বহু পতিত স্থান আবাদ

হইয়াছে। জগতের সকল উৎকৃষ্ট ও উপযুক্ত স্থানেই শ্বেত জাতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ফেলিয়াছে। এখন উপনিবেশ স্থাপনের জন্ত স্থানের অভাব হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং সকল জাতিরই বাঁচিয়া থাকার সমস্যা প্রবল ভাবে দেখা দিয়াছে। নূতন অর্থনৈতিক সমস্যা, নূতন আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সমস্যা, ফসল উৎপাদন সমস্যা নূতন ভাবে দেখা দিয়াছে। এই বিপুল আন্তর্জ্জাতিক দ্বন্দ্বে যে জাতির মস্তিষ্ক শক্তি সকলের চেয়ে প্রখর এবং বর্দ্ধনশীল সে জাতিই আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিবার বা শক্তিশালী করিয়া তুলিবার পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিবে।

ইয়ুরোপবাসীর সাধনার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই সর্ব্বত্রই তাহাদের একটা মৌলিক সৃষ্টির প্রচেষ্টা বিদ্যমান। যে সৃষ্টির দ্বারা মানুষ প্রকৃত পক্ষে লাভবান হয়, যে আদর্শ চরিত্র এত মহান অথচ এত মানবীয় যে, যাহার নৈকট্য লাভ করিতে স্বতঃই আমাদের বিপুল আগ্রহ জন্মে, তেমন সৃষ্টির সাধনাই ইঁহারা যুগ যুগ ধরিয়া করিয়া আসিতেছেন। সেকস্‌পিয়ারের 'ওথেলা' 'হেমলেট' 'সাইলক' ভিক্টর হোগোর 'জাঁ-ভালজিয়ান' ও 'বিশপ' প্রভৃতির অভিনবত্ব কখনও ঘুচিবে না। ডিকেন্সের 'মিকাওবার' চরিত্র জগতের অন্যতম অমর সৃষ্টি। তাঁহার অন্যতম পুস্তকের দুষ্ট-নায়ক 'উরিয়া-হিপ' তেমনই জগতের একজন জবরদস্ত জালেম বা অন্যায়ের প্রতীক। এইরূপ অসংখ্য সৃষ্টি দ্বারা জাতির প্রাণ ও সৃষ্টি বাঁচিয়া থাকে। প্রকৃত শিল্পীর হস্তের চরিত্র বিশ্লেষণ বাস্তবিকই উপাদেয় জিনিস হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের অক্ষমতার প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে হইলে প্রকৃত নৈপুণ্য ও অনুপ্রেরণার প্রয়োজন। যে দুঃখের চিত্র অঙ্কন করিয়া প্রকৃত মানব-সেবক ও কর্ম্মীর প্রাণে সাড়া দেওয়া যাইতে পারে সেইরূপ চিত্রকরের সাধনা সমাজের জন্য অমূল্য বটে। নীচতা ও ভণ্ডামীকে উন্মুক্ত করিয়া কল্যাণের দিকে মানুষকে আকর্ষণ করিতে হইলে প্রতিভা ও সাধনার প্রয়োজন। সে শ্রেণীর সাধক আমাদের সমাজে জন্মিতেছে না কেন?

কতকগুলি বিশেষ ধারণায় মুসলমানের সৃষ্টির উদ্যম অনবরত প্রতিহত হইতেছে। সে কিছু নূতন সৃষ্টির জন্ত সাধনা আরম্ভ করিলেই ভীত হইতে থাকে, পাছে বিশ্বস্রষ্টার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা তেমন একটা কিছু করিবার প্রগল্‌ভতা তাহার আসিয়া পড়ে। সার সৈয়দ আহমদ মুসলমানের এ ধারণা দূর করিবার জন্ত আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন; আজ পর্য্যন্ত ও মুসলমানের সে ধারণা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নাই।

আমাদের শিক্ষাপ্রণালী এতখানি বিজ্ঞান-সম্মত হওয়া চাই, যাহা হইতে সার জগদীশ, সার রমন, সার আশুতোষ, সার রবীন্দ্রনাথের ন্যায় লোক আমাদের সমাজে তৈয়ার হইতে পারে। জগতের এই নূতন আত্মপ্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বে আমাদের জন্ত লড়াই করিবার জন্ত, আমাদের জীবন-তরুকে রস যোগাইবার জন্ত ইহাদের মত বহু লোকেরই দরকার। আমাদের পাঠ্য তালিকা, আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি নির্ণয় করিবার কালে কি আমরা এ কথা একবার-ভাবিয়া দেখিয়াছি?

কোন একস্থানে একটী মুসলমান প্রতিষ্ঠিত হাইস্কুল ছিল। কিছুদিন পরে তাহার নিকটে একটী নূতন স্কীমের মাদ্রাসা স্থাপিত হইল। দুই বৎসরের মধ্যে হাইস্কুলটা শূন্য হইয়া মাদ্রাসাটী পূর্ণ হইয়া গেল। আমরা অনুসন্ধান করিয়া ঐ সকল ছাত্রের অভিভাবকদের মত জানিতে পারিয়াছি—তাহা এই:—আজকাল বি-এ, এম-এ, পাশ করিয়া তো চাকরী পাওয়া যাইবেই না—তবে আর ইংরেজী পড়িয়া কি লাভ হইবে; আরবী পড়িলে তবুও পরলৌকিক মঙ্গলের পথ খোলাসা হইবে!

ইহার উত্তরে আমরা বলিতে চাই হিন্দু সমাজে এত বি-এ, এম-এ, পাশ করা সত্ত্বেও তো তাঁহারা ভাতে মরিতেছেন না। বরং শিক্ষা-দীক্ষার অগ্রগণ্য বলিয়াই তাঁহারা উন্নত চিন্তাশক্তি দ্বারা বেকার সমস্যা বেশ সুন্দর মীমাংসা করিতে পারিতেছেন। ভারতে প্রায় শতাধিক কাপড়ের কল তাঁহাদের স্থাপিত এবং তাঁহাদের মূলধনে পরিচালিত। তাঁহাদের জীবন বীমা কোম্পানীর সংখ্যাও প্রায় ঐ রকম হইবে। অন্যান্য শিল্প-কলার কথা আর কত বলিব।

অন্যপক্ষে জ্ঞানের সাধনা যে প্রকারেই হউক না কেন তাহা কখনও ধর্ম্মবিরোধী নহে। হাই স্কুলে পড়িলে আমরা ধর্ম্মরাজ্য হইতে সরিয়া পড়িব, এ ধারণা মারাত্মক। সত্যকে জানিবার ও লাভ করিবার সাধনা দ্বারাই আমরা

ইসলামের নৈকট্য লাভ করিব। মানুষের কল্যাণের পথ আবিষ্কারের জন্য যে সাধনা ও ত্যাগের আবশ্যক তাহা কখনও আধ্যাত্মিকতা হইতে ভিন্ন জিনিস নহে।

অন্য পক্ষে জীবনে ধর্ম্মজ্ঞানেরও প্রয়োজন আছে। তজ্জন্য যাবতীয় ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তকই মাতৃভাষায় অনূদিত হওয়া আবশ্যক। আবার মূল পুস্তকের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য কিছু কিছু আরবী ভাষার জ্ঞানও আবশ্যক। কিন্তু সর্ব্বশ্রেণীর লোকই মাদ্রাসা শিক্ষার দিকে ঝুকিলে সমাজের পক্ষে তাহা কল্যাণকর হইবে না। বরং উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মশাস্ত্র আয়ত্ত করিবার জন্য কতক নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মেধাবী ও সচ্চরিত্র লোক বিশেষ ব্যবস্থানুসারে সেদিকে যাওয়া প্রয়োজন। তাঁহারা হইবেন সমাজের "ধর্ম্ম স্পেসিয়েলিষ্ট" বা ধর্ম্ম বিশেষজ্ঞ। কিন্তু তাঁহাদেরও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত যথেষ্ট পরিচয় থাকা প্রয়োজন। সর্ব্বসাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে কিছু আরবী-জ্ঞান এবং মাতৃভাষার সাহায্যে ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়া আধুনিক উন্নত ধরণের শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্য আয়ত্ত করিতে নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক। এই জন্য বঙ্গে বহুসংখ্যক মুসলমান অর্থে পরিচালিত হাইস্কুল ও কয়েকটী কলেজ স্থাপিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

হিন্দুর স্থাপিত স্কুল ও কলেজে লেখাপড়া শিখিলে কোন অপরাধ হয় বা লেখাপড়া অসম্পূর্ণ হয়, আমার এরূপ মত নহে। তবে কথা এই যে নিজের উদ্যোগে জগতে যাহা দাঁড় করান যায়, তাহাতে কাজের উদ্দীপনা বহু পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। একজন উদ্যোগী পুরুষ একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিলে আরও অনেকের মধ্যে উদ্যোগ ও উৎসাহের সৃষ্টি হয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালাভ করিবার জন্য পাঠার্থীরও আগ্রহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই সঙ্গে মুসলমান লেখক ও মুসলমান গ্রন্থকারের সৃষ্টি হইতে থাকে। কিন্তু এই সকল স্কুল "কেবলমাত্র মুসলমান ছাত্রের জন্যই উন্মুক্ত" এইরূপ হওয়া উচিৎ নহে। আমাদের সমদেশবাসী উন্নত হিন্দুজাতির সহিত আমাদের সমান ক্ষেত্রে তত্রোচিত প্রতিদ্বন্দ্বীতে করিতে শিক্ষা করাও দরকার। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সহিত সমক্ষেত্রে প্রতিযোগীতা করিলে শক্তি বৃদ্ধি হয়।

একজন আমেরিকান লেখক (Luthrope Stoddard) বলিতে চাহিতেছেন, জগতের কতক জাতি পৃথিবীর ইতিহাসে কোন নূতন সভ্যতা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তাহাদের মধ্যে স্বাভাবিক বা স্বতঃবর্দ্ধনশীল শক্তির উৎস নাই—তাহারা হইতেছে নিগ্রোজাতি। আবার মধ্য আমেরিকায়, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে 'মায়া' জাতি এবং দক্ষিণ আমেরিকার 'পেরুভিয়ান' জাতি এবং 'ইনকা' জাতি মধ্যযুগে আপন পরিবেষ্টনের মধ্যে একটা সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছিল বটে কিন্তু তাহারা ক্রমবর্দ্ধনশীল চিরস্থায়ী সভ্যতা সৃষ্টি করিতে পারে নাই, যদ্দারা তাহারা নব-আগত কোন শক্তির সহিত যুঝিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। এই কারণেই তাহারা য়ুরোপ হইতে আগত স্পেনীয়গণের দ্বারা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এখন আর তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। মুসলমানেরও উন্মেষ শক্তির উৎস ঐরূপ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে নাকি?
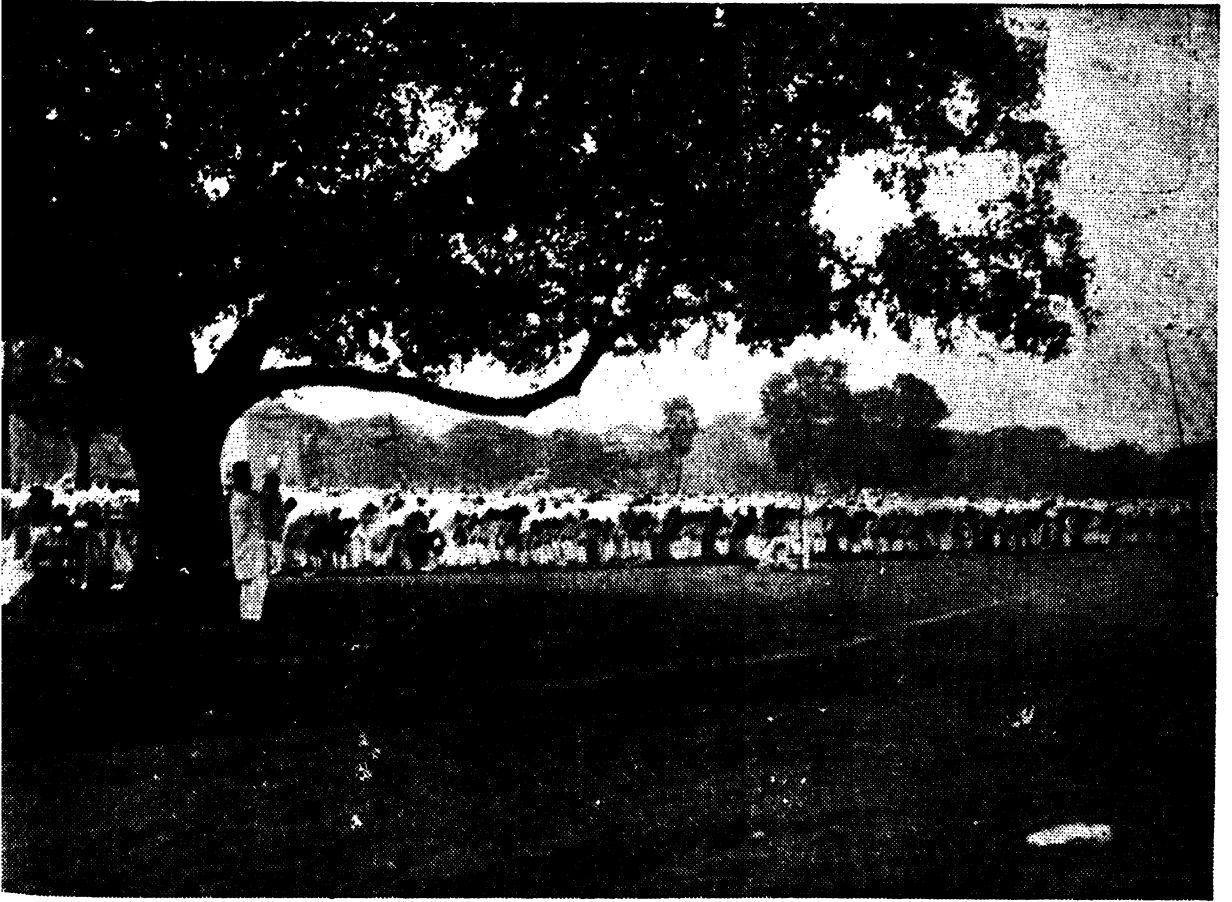
গড়ের মাঠে ঈদের নমাজ

ঈদ-সংবাদ

লণ্ডনে

হাফেজ ওহাবা

ইনি ওকিং মসজেদে ঈদের নমাজের ইমাম হইয়াছিলেন

লাহোরে
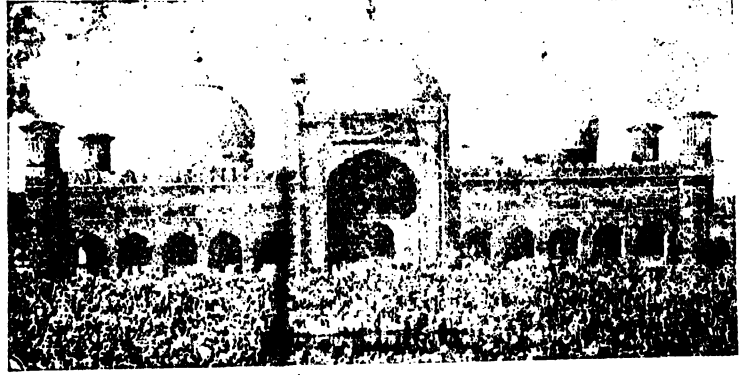
শাহী মছজেদে ঈদের নমাজের দৃশ্য

বোম্বাইএ

এ বৎসর বোম্বাই ঈদের নমাজের সহিত বেতার-সংযোগ হইয়াছিল

গান্ধী-আরউইন সন্ধি আলোচনায় সমবেত

কারামুক্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যবৃন্দ

স্বাধীনতা দিবসে
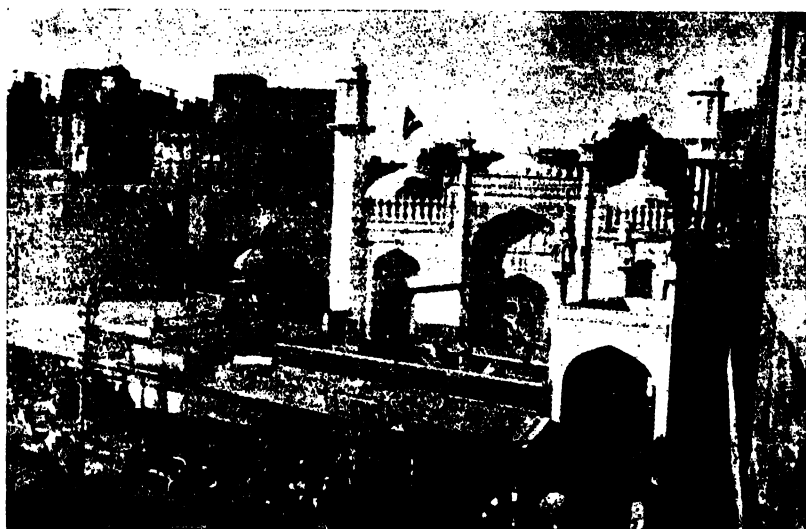
পেশাওর মস্‌জেদে জাতীয় পতাকা

বামদিক হইতে পঞ্চম ব্যক্তি লর্ড আরউইন, তৃতীয় ব্যক্তি বাঙ্গলার গভর্ণর স্যার ষ্টানলী জ্যাকসন

গান্ধী-আরউইন সন্ধি আলোচনায় সমবেত সপারিষদ বড়লাট ও প্রাদেশিক গভর্ণরগণ

নব-নির্ম্মিত
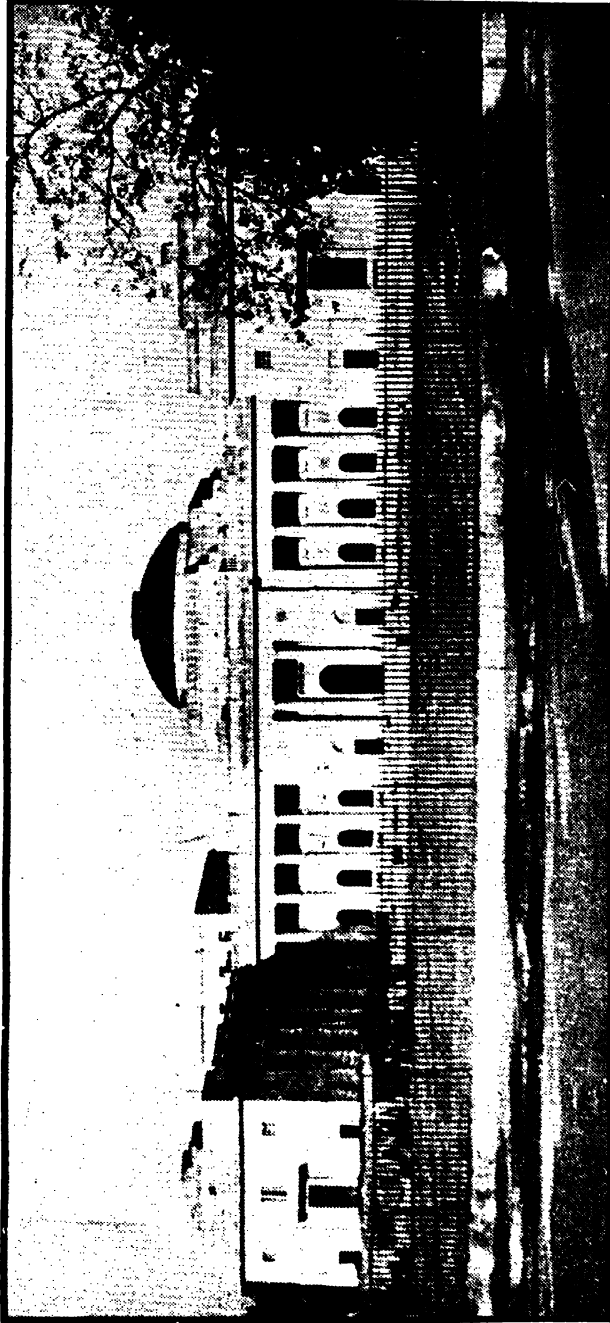
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

এই ভবন তৈয়ারী করিতে সর্ব্বশুদ্ধ ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই নূতন ভবনের পরিকল্পনা করিয়াছেন স্থাপত্য বিশারদ মিঃ জন গ্রিভ্‌স, এফ, আর, আই, বি, এ। মেসার্স মার্টিন এণ্ড কোম্পানীর (কলিকাতা) উপর নির্ম্মাণ কার্য্যের ভার অর্পিত হয়। ১৯২৮ সালের প্রথম ভাগে নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। উক্ত সনের ৯ই জুলাই বাঙ্গালার গবর্ণর ভিত্তি স্থাপন করেন। পরিষদ কক্ষে ১৬০ জন সদস্যের বসিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। তবে প্রয়োজন হইলে ৩০০ শত সদস্যও বসিতে পারিবেন। কক্ষের অভ্যন্তরে সারা বৎসর যাহাতে তাপ সমান আরামপ্রদ থাকে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বায়ু চলাচলের জন্য অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে। এজন্য কক্ষের কিয়দ্দূরে এক গৃহের মধ্যে কল বসান হইয়াছে। সেখান হইতে কক্ষের মধ্যে শীতল এবং নির্ম্মল বায়ু সরবরাহ করা হইবে।

নব-নির্ম্মিত
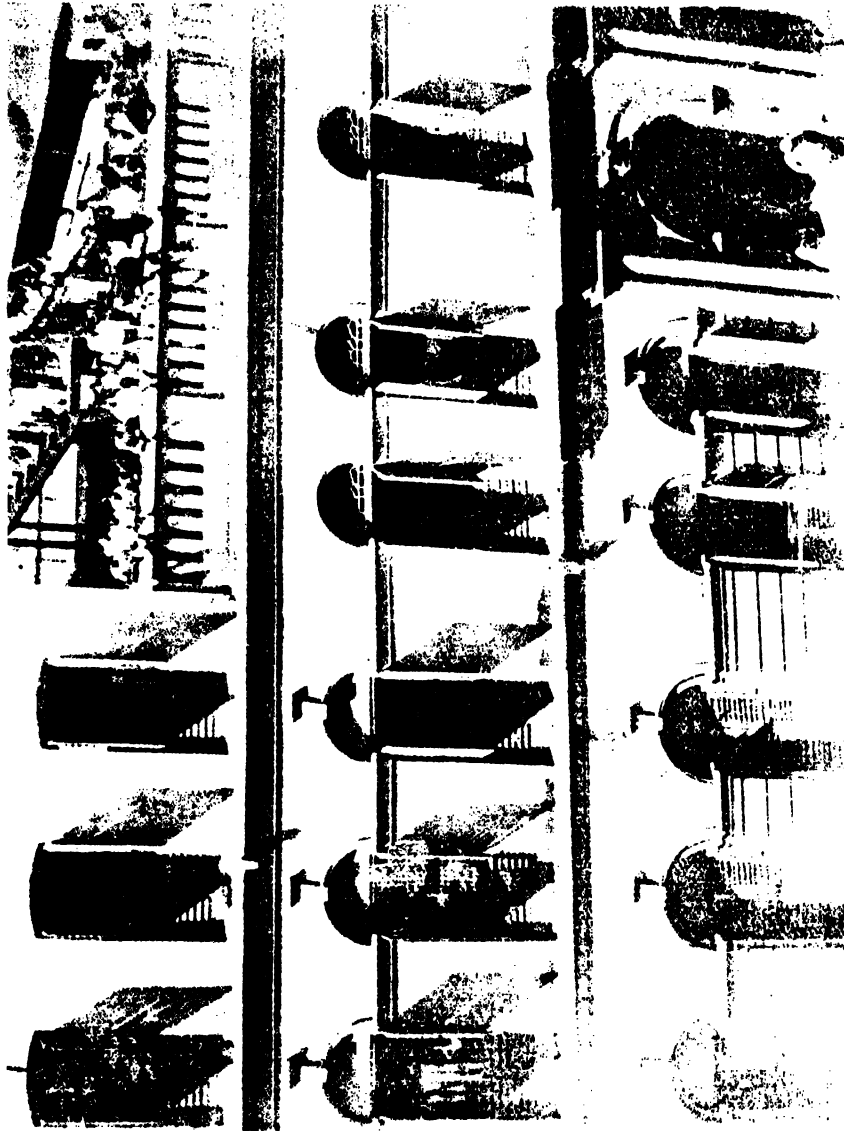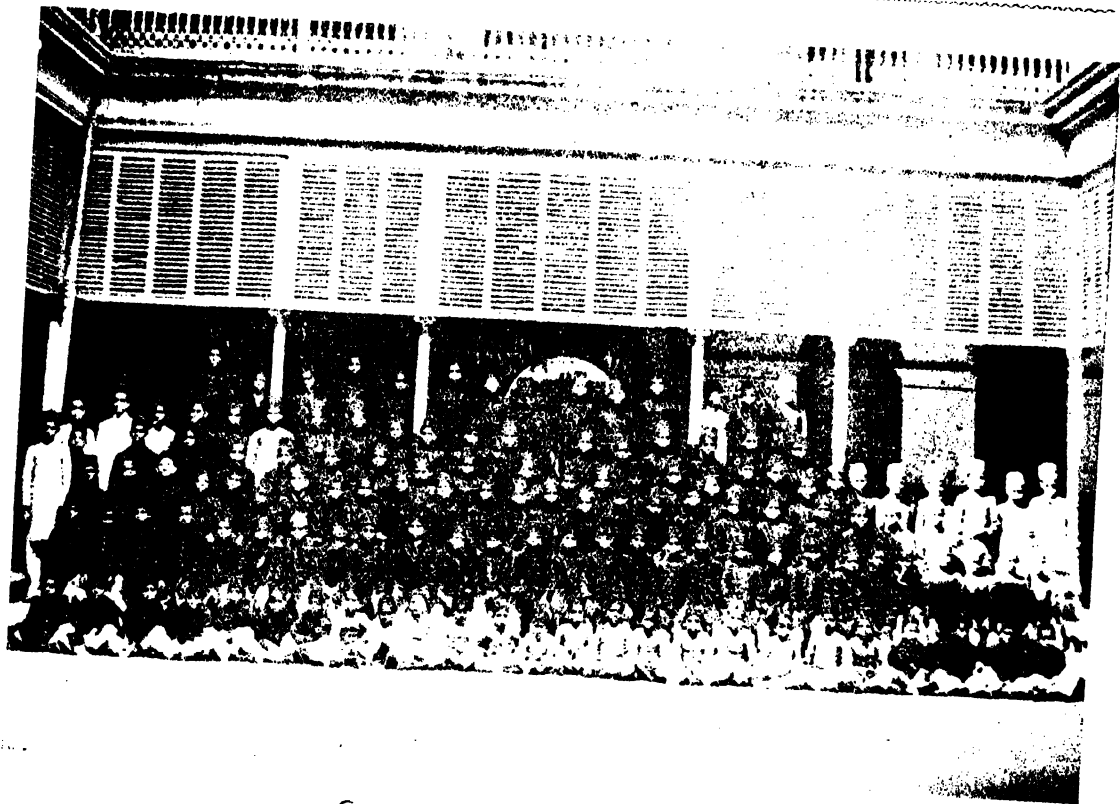
কলিকাতা মোছলেম এতিমখানা

কলিকাতা মোছলেম এতিমখানা বালক-বৃন্দ

মোছলেম লীগের সভায় মহাত্মা গান্ধী। সঙ্গে স্যার মোহাম্মদ শফী

কওমের কৃতী-সন্তান

বিখ্যাত নাট্যকার আগা হাশ্‌র

স্যার আলী মোহাম্মদ খাঁ দেহ্‌লভী

স্যার আলী মোহাম্মদ খাঁ দেহ্‌লভী বোম্বে ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ক্রমান্বয়ে এই তিনবার তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

চির-নগরী দিল্লী

(১)

পুরাতন দিল্লী

হে চির-নগরী রূপ-বিলাসিনী
প্রসাধন তব কবে হবে শেষ,
মহাকাল শুধু নীরবে দাঁড়ায়ে
দেখিছে তোমার নিতি নব বেশ।...
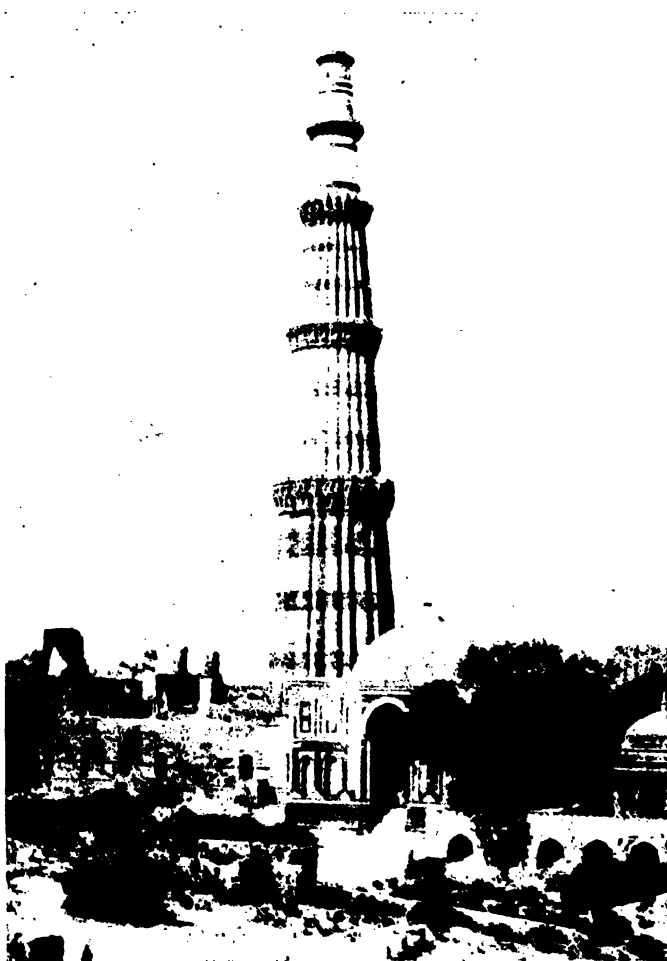
কুতুব মিনার

পড়ে আছে শুধু দেওয়ানে-খাস
কোথা বাদশাহ্‌, কোথা বাদশাহী—
কোথায় আমীর কোথা ওমরাহ
শ্মশানে হেথায় কেহ নাহি নাহি।...
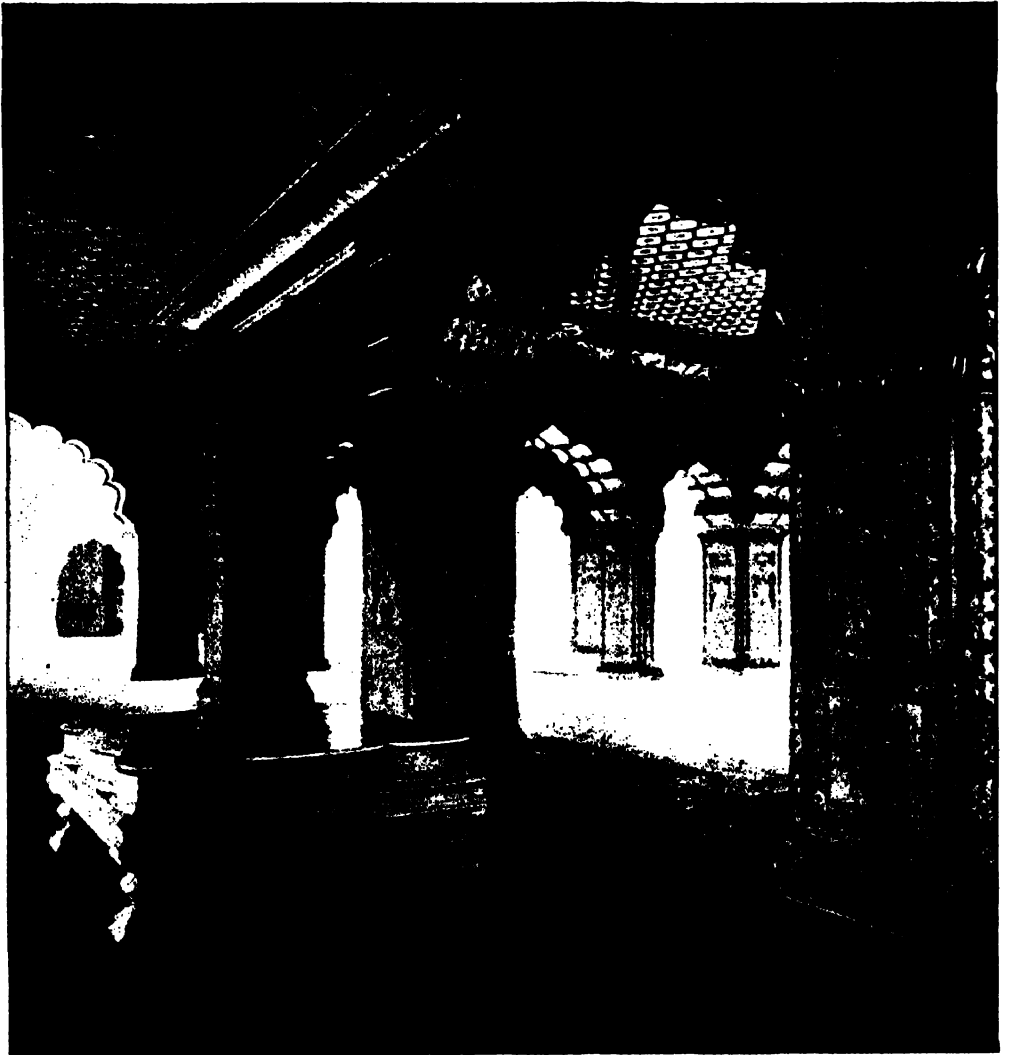
দেওয়ানে-খাস
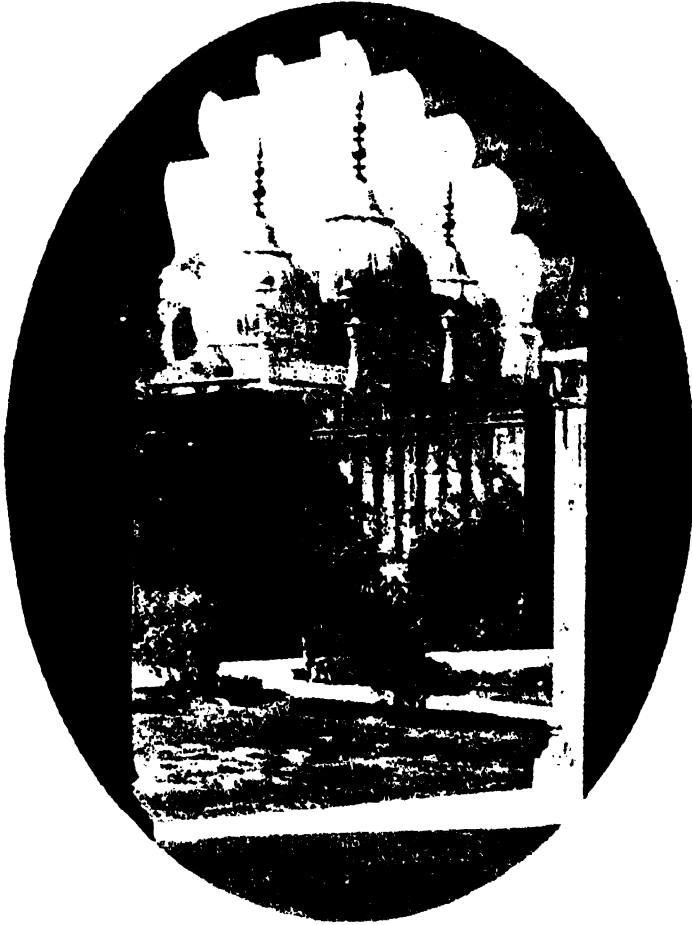
মতি মসজেদ

মিনারে তোমার তেমনি পড়িছে
প্রভাত-কিরণ-ধারা,
সেদিন যাহারা তুলিত আজান
আজ শুধু নেই তারা।...

জামে' মসজেদ

মোগল-সম্রাটের শূন্য-সিংহাসন
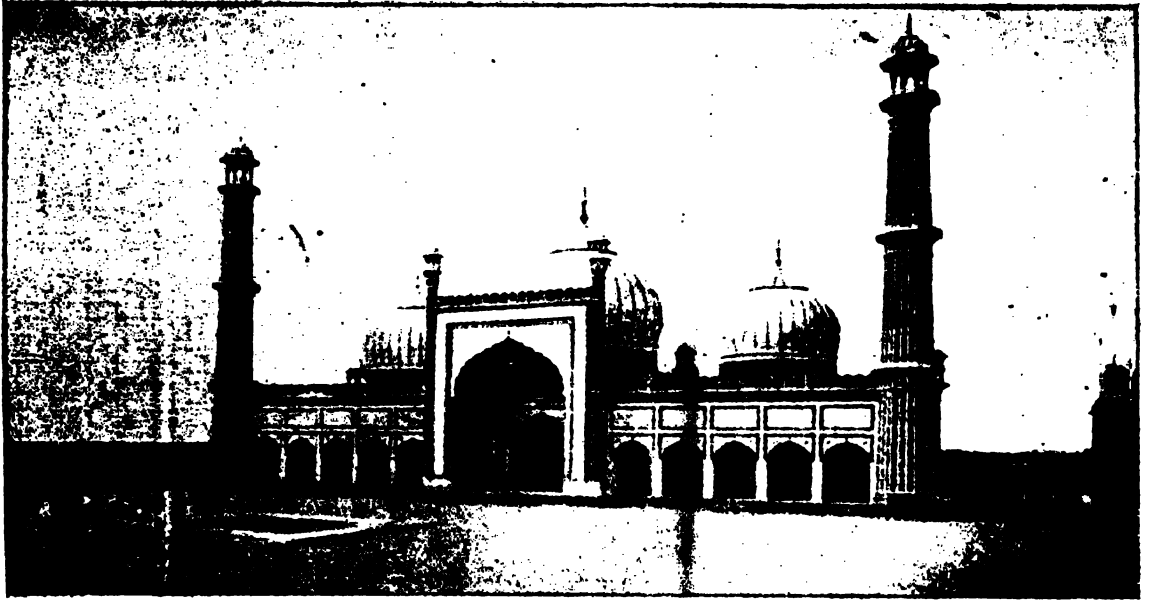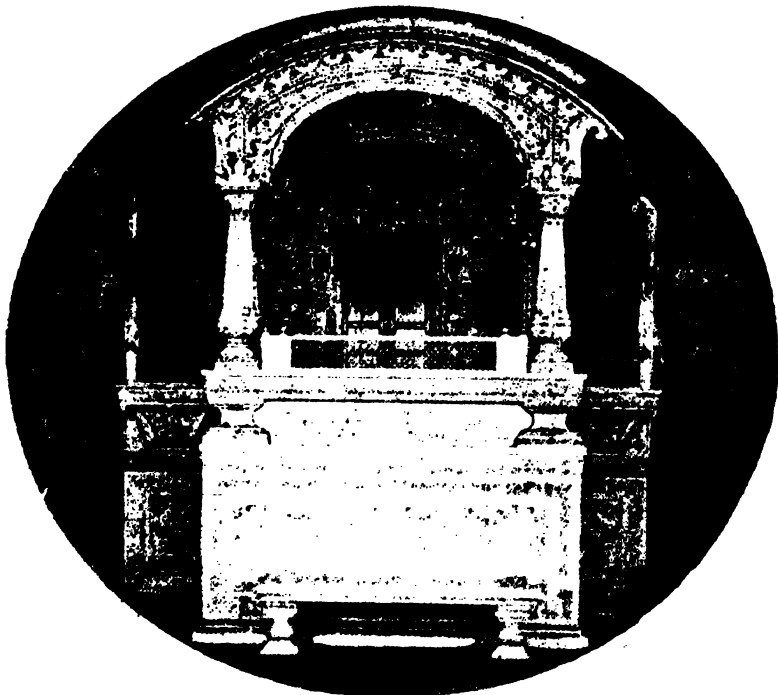
নয়া-দিল্লী

শ্মশানের মাঝে ফুটেচিস্ তুই
চারিদিকে তোর কবর-স্থান,
আজকে যখন জাগলিরে তুই
ঘুমোচ্ছে ওই মোগল-পাঠান
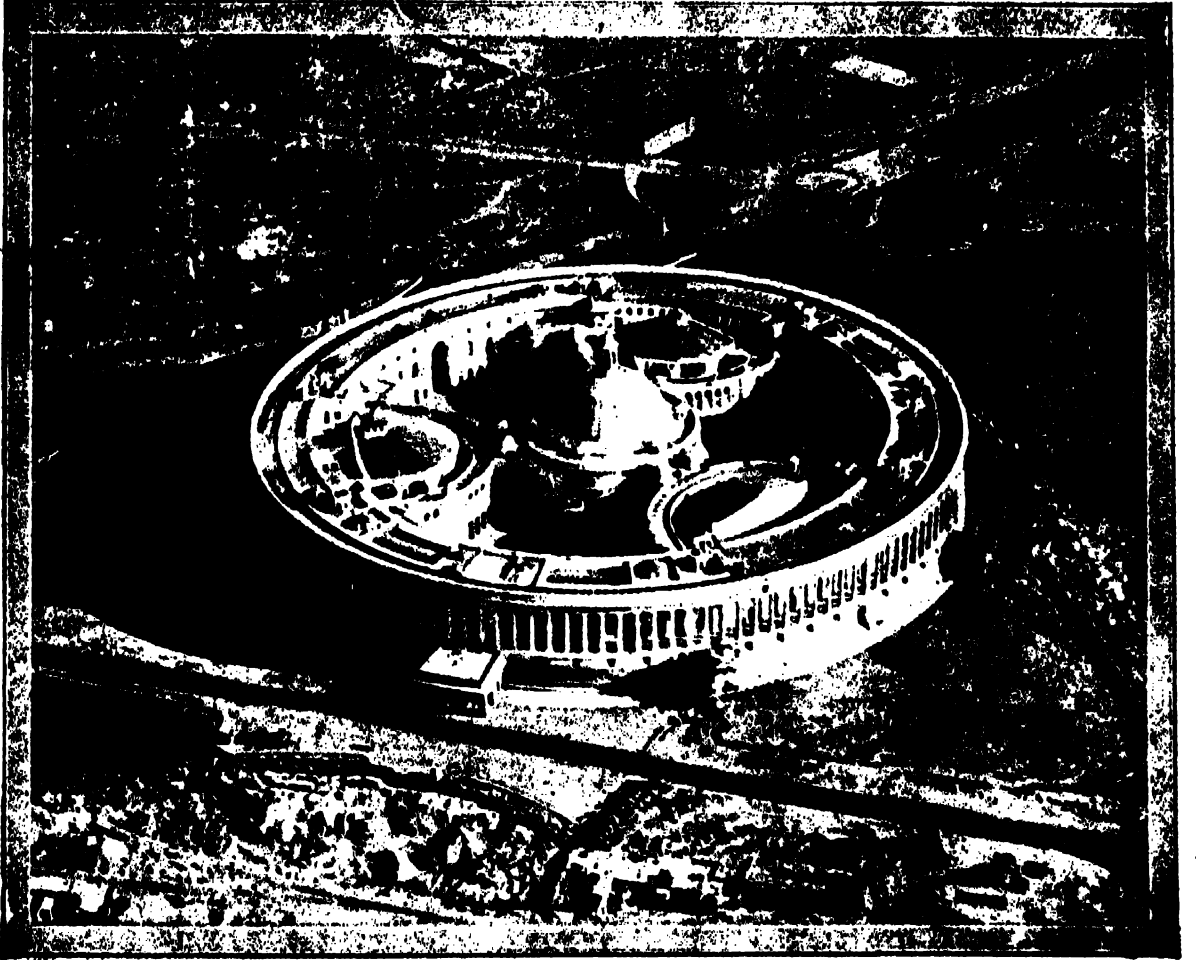
নয়া-দিল্লী

নূতন যুগের দেওয়ানে-খাস
কোটী স্বর্ণের রচিত হর্ম্ম্য,
নিরন্ন নর বিস্ময়ে ভাবে
কিসেতে রচিত তোমার মর্ম্ম !...
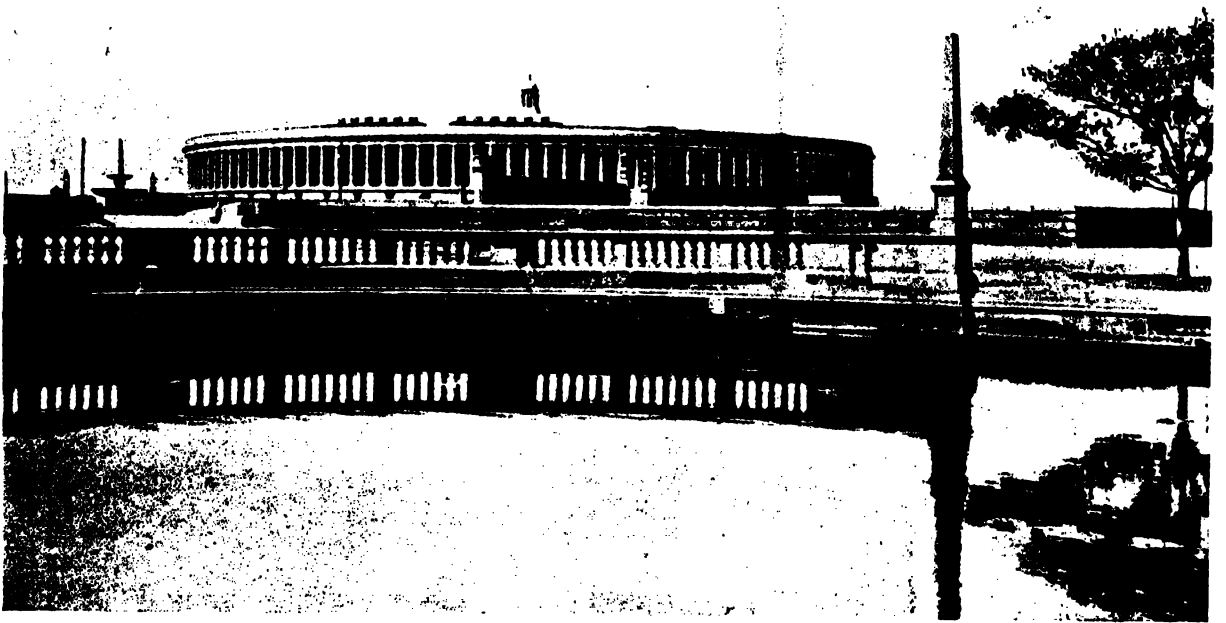
কাউন্সিল চেম্বার

ইহারই মধ্যে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ, কাউন্সিল অব ষ্টেট এবং প্রিন্স চেম্বার অবস্থিত।
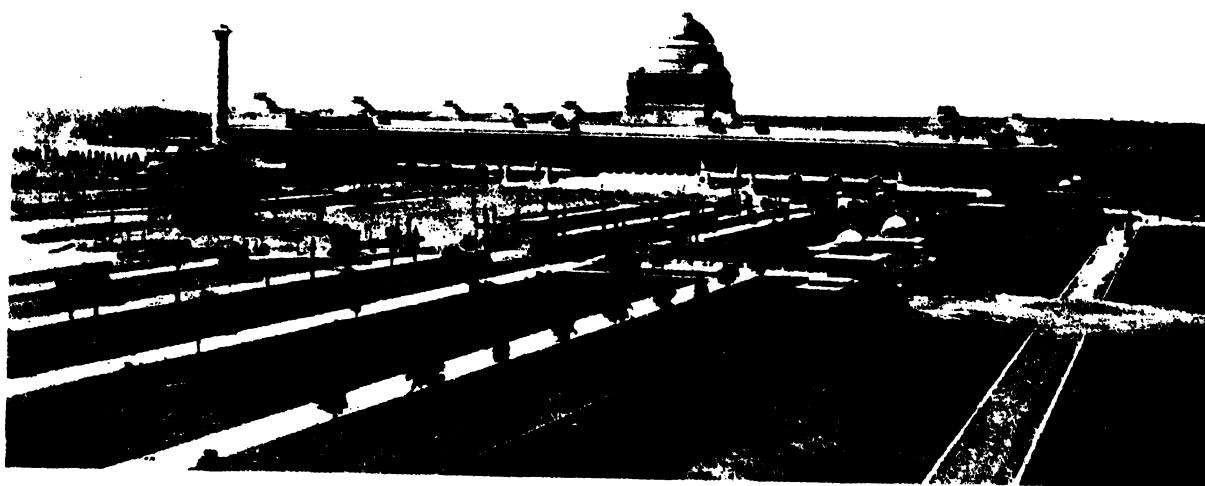
রাজ-প্রতিনিধির প্রাসাদ

দেখিতেছি চেয়ে এই পথ বেয়ে
চলেছে শীর্ণ নাঙ্গা ফকীর—
হেথা অলক্ষ্যে কোটী কোটী প্রাণ
মুক্তি-আশায় করে আছে ভিড়।

নূতন পাথরে গড়া হল ফের
ভারত-রাজের দফতরখানা—
নূতন মানব নব আশা লয়ে
দুয়ারে তাহার দেয় আজ হানা।……

রাজধানীর সরকারী দফতর-খানা

অলকা

(কথানাট্য)

আকেল মণ্ডল
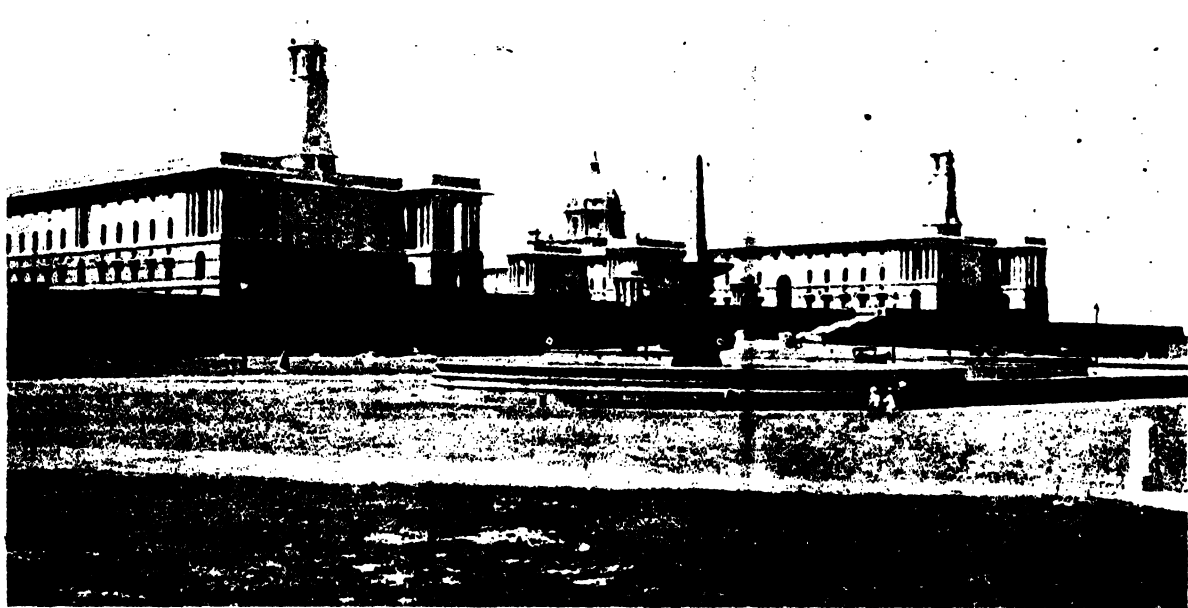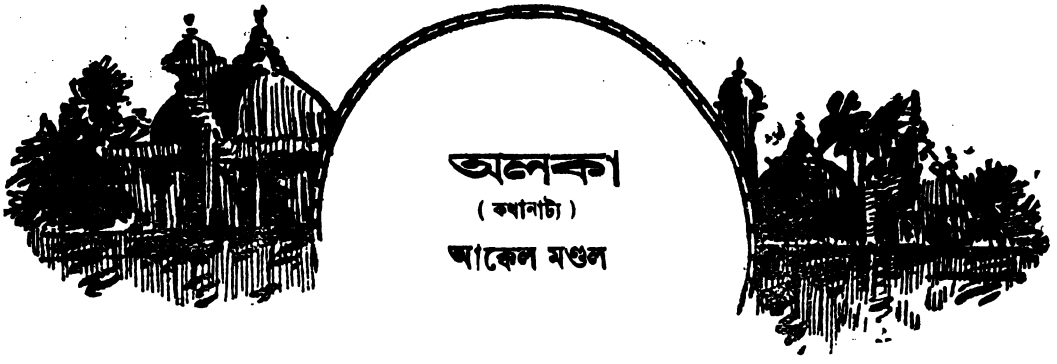
[শ্রাবন্তী নগরীর এক প্রান্তে একখানি গৃহ···গৃহমধ্যে আসনে উপবিষ্ট এক সুশ্রী যুবক। যুবক চিন্তাকুল ও বিষণ্ণ···যুবকের আসনের পার্শ্বে একটা বাঁশী অনাদরে গড়াগড়ি যাইতেছে।···গৃহের আসবাব ইত্যাদি দারিদ্র্যেরই পরিচয় দিতেছে। কাল—দুর্য্যোগময়ী নিশীথ-রাত্রি··· আকাশে মেঘের ঘনঘটা···বৃষ্টি পড়িতেছে···বাতাসও জোর বহিতেছে···থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ চমকিত হইতেছে। এমন সময় দ্বারে করাঘাত হইল। চমকিত যুবক প্রশ্ন করিল, কে? বীণা-বিনিন্দিত স্বরে উত্তর আসিল—দ্বার খোল। ঝড়-বাদলের মাতামাতি ও স্বরের কম্পন সত্ত্বেও সেই স্বর চিনিতে পারিয়া যুবক বিস্মিত ও অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু না চিনিবার ভাণ করিয়া আবার প্রশ্ন করিল···]

যুবক। এমন দুর্য্যোগময়ী নিশীথ রাতি···কে তুমি দ্বারে আমার আঘাত করছ পান্থ? পথ হারিয়েছ?

বাহিরে। দ্বার খোল সুনন্দ···বাহিরে আমার সর্ব্ব অঙ্গ সিক্ত হ'য়ে যাচ্ছে···আর দাঁড়াতে পারছিনে···পান্থই আমি তবে পথ-হারা নই···ঠিক পথে···ঠিক জায়গায়ই এসে পৌচেছি আমি।

সুনন্দ। কে তুমি? দয়া ক'রে তোমার পরিচয় আমায় জানতে দাও···তুমিত দেখছি আমার পরিচয় আগে থেকেই জেনে রেখেছ।

বাহিরে। আমি অলকা।

যুবক। কোন্ অলকা?···শ্রেষ্ঠীকন্যা অলকা?

অলকা। হাঁ আমি অলকা।

যুবক। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি···শ্রাবন্তীর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী-কন্যা অলকা···অসামান্যা-রূপ লাবণ্যময়ী···ঐশ্বর্য্যময়ী···পুষ্পিত-যৌবনা অলকা তুমি···এই ঝড়ের রাতে আমার এই দরিদ্রের কুটীর-দ্বারে কেন তুমি বারে বারে কর হানা? আলেয়ার-আলো ত তোমায় গৃহ-হারা করেনি? আর আজ না তোমার রতন শ্রেষ্ঠীর বধূবেশে বাসরঘরে প্রবেশ করবার কথা ছিল।

অলকা। আজকের এই ঝড়ের রাতকে ধন্যবাদ দাও···এই দুর্য্যোগময়ী রজনী···এই ঘুরঘুট্টি অন্ধকার এই সব কিছুকে আজ ধন্যবাদ দাও আর প্রাণ খুলে ধন্যবাদ দাও সুনন্দ, সেই খেয়ালী বিধাতাকে যার অপূর্ব্ব খেয়ালে ধরণীর বুকে আজকের এই কালরাত্রি নেমে এসেছে।

সুনন্দ। কেন ধন্যবাদ দিব অলকা···এই কালরাত্রিকে? আমারই দুর্ভাগ্যের মতন এযে কালো···দুর্ভাগ্যকে কে কবে ধন্যবাদ দিয়েছে···? কিন্তু যাক সে কথা আমি ভাবছি···এই বাদল রাতে কার অভিসারে বেরিয়েছ তুমি? বিবাহের লগ্ন হয়ত তোমার অতীত হয়ে গেছে আর তুমি আমার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়ে আছ?

অলকা। তোমারই অভিসারে আজ বেরিয়েছি, প্রিয়তম হাঁ, প্রাণখুলে ধন্যবাদ দাও আজকের এই কাল রাতকে···উঃ! আজকের এই ঘনঘটা যদি সারা আকাশে ঘনিয়ে না আসতো তবে হয়তো এতক্ষণ রতন শ্রেষ্ঠীর বন্দিনী হ'য়ে অভিশপ্ত জীবনের সূচনা করাতে হত [কাতর স্বরে] সুনন্দ প্রিয়তম দ্বার খোল!

যুবক। [একটু কঠোর স্বরে] আজকে তুমি আমাকে দ্বার খুলতে বলছ অলকা! কিন্তু যেদিন তোমাকে প্রার্থনা করতে যেয়ে তোমার বাবার কাছে অপমানিত হয়ে ফিরে এলুম সেদিন তুমি ছিলে কোথায়···?

অলকা। সে অপমান কি আমার বাজেনি সুনন্দ! আমার সমস্ত প্রাণ যাকে চায়—সে যখন আমাকে প্রার্থনা করে' প্রত্যাখ্যাত হয়ে' ফিরে এল—তখন যে আমায় কি

হয়েছিল তা' যদি জানতে! সেদিন থেকে উপবাসের পর উপবাসে শরীর আমার ভেঙ্গে পড়-পড়...চোখের জল মুছে মুছে শাড়ীর আঁচল ভিজে গেছে। আর বাবা ত তোমাকে তেমন কিছু বলেন নি—শুধু বলেছিলেন রতন শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে সে তা'র মেয়ের বিয়ে দেবে।

সুনন্দ। হাঁ, সেই হয়েছিল আমার অপমান...আমার দারিদ্র্যের অপমান। রতন শ্রেষ্ঠীর ধনরত্ন যদি আমার ভাণ্ডারে পূর্ণ থাকত, তবে তোমার বাবাই প্রস্তাব করতেন। আর তুমি জাননা—তিনি শুধু অপমানই করেন নি ভয়ও দেখিয়েছিলেন। যদি আমি আবার তাঁকে বিরক্ত করি, তবে রাজার সাহায্যে তিনি আমাকে নির্ব্বাসিত করবেন।

অলকা। সে অপমান কি তুমি ভুলে যেতে পার না—সুনন্দ? এইত আমি সেই শ্রেষ্ঠীরই কন্যা...দীন-দুঃখিনী ভিখারিনীর মতন তোমাকে দুয়ারে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছি।

সুনন্দ। কিন্তু তোমার বাবার ইচ্ছা রতনই হোক তোমার স্বামী।

অলকা। শুধু বাবার ইচ্ছাইত সব নয় সুনন্দ আমারও ত' একটা ইচ্ছা বলে' কিছু আছে। আমি যাকে ভালবেসেছি, তাকে আমি কেমন করে' চিরদিনের মতন ছেড়ে থাকব? পারিনি আমি তাইনা তোমার কাছে চলে এসেছি।

সুনন্দ। [কোমল স্বরে] সত্যিই আমাকে ভালবাস অলকা?

অলকা। তাই তুমি জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ? হায়রে আমার অদৃষ্ট! মায়ের স্নেহ...ভায়ের ভালবাসা সবছেড়ে... রাজপুরীর মতন প্রাসাদ...দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যা...ভোগ-বিলাসের সহস্র উপকরণ ছেড়ে, এই কাল-নিশীথে তোমার দুয়ারে দাঁড়িয়ে সহস্র ধারায় সিক্ত হচ্ছি...কি জন্য...কার জন্য সুনন্দ? যেদিন থেকে তোমাকে দেখেছি...যেদিন থেকে তোমার বাঁশী শুনেছি সেদিন থেকেই সমস্ত প্রাণ দিয়েই তোমাকে ভালবেসেছি।

সুনন্দ। [বাঁশীর কথা শুনিয়াই অনাদৃত বাঁশীটি তুলিয়া লইল] বাঁশীর সুরে তোমাকে ভুলিয়েছি অলকা [গর্ব্বের সঙ্গে] সমস্ত শ্রাবস্তীকে ভুলাতে পারি [আপন মনে] আমার বাঁশী...আমার বাঁশী...সার্থক হয়েছে একে আমার হাতে নেওয়া...শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠা সুন্দরী শ্রেষ্ঠী-কন্যা অলকাকে ভুলিয়েছে এরই সুরের রেশ...[আবেগে বাঁশীকে চুম্বন করিল...পরে অলকার উদ্দেশ্যে] অলকা আবার আমার বাঁশী বাজাই...এবার ঝড়ের সুর বাজবে আমার বাঁশীতে। অলকা! প্রকৃতির বুকে ঝড়... আমার বুকের ঝড় ওকে আরও দুরন্ত করেছে...তোমার বুকেও ঝড়...বুকের ঝড়ে তোমাকে ঘর ছাড়া করেছে।

অলকা। বাঁশী তুমি বাজিও...যাত্রার বাঁশী...ঝড়ত উঠেছেই...প্রকৃতির বুকে ঝড়...তোমার বুকে ঝড়... আমার বুকে ঝড়...ঝড়ের কামনা আরও দুরন্ত হবে তোমার ঐ বাঁশী শুনে, কিন্তু আমি যে আর দাঁড়াতে পারি না সুনন্দ...সব যে আমার অসাড় হ'য়ে এল।

সুনন্দ। [অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া] তাইত অলকা তোমাকে বাইরে রেখেছি...এই যে দ্বার খুলি [দ্বার খুলিতে উদ্যত হইয়া হঠাৎ থামিয়া গেল] না অলকা দ্বার আমি খুলব না। তোমার বাবা আমাকে অপমান করেছে... তোমাকে আমি ভালবাসি না ... শ্রেষ্ঠী-কন্যাকে আমি ঘৃণা করি। দরিদ্র আমি—আমার দারিদ্র্য নিয়েই থাকব।

অলকা। [আর্ত্তকণ্ঠে] ভুলে যাও প্রিয়তম আমি শ্রেষ্ঠী-কন্যা...শুধু মনে কর ভিখারিণী আমি...তোমার প্রেমের ভিখারিণী...তোমার ভালবাসার ভিখারিণী... খোল সখা খোল...দ্বার খোল।

সুনন্দ। না—না—না।

[বাহিরে অস্ফুট আর্ত্তনাদ ও সঙ্গে সঙ্গে কিছু পতনের শব্দে সুনন্দ দ্বার খুলিল। বিদ্যুতালোকে দেখিল সুন্দরী অলকা মাটীতে লুটাইতেছে। যুবক অতি যত্নে মূর্চ্ছিত দেহ গৃহে আনিল। পরম অনুরাগে কপোলে একটি চুম্বন প্রদান করিল—ক্রমে অলকার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। মূর্চ্ছাঅন্তে সম্মুখে সুনন্দকে দেখিয়া আকুল আগ্রহে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। ব্যাকুল কণ্ঠে বলিতে লাগিল—সুনন্দ! প্রিয়তম দ্বার খোল দ্বার খোল। সুনন্দ তাহার অধরে আরও একটী চুম্বন দিয়া বলিল—দ্বার খুলিয়াছি অলকা এইত তুমি—আমার গৃহে...]

অলকা। [সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইয়া] দ্বার খুলিয়াছ? কিন্তু তুমিই না বলেছিলে দ্বার তুমি খুলবে না...আমাকে ভালবাস না তুমি...এইত দ্বার খুললে—এইত আমি তোমার বুকে...তাহলে আমাকে ভালবাস তুমি?

সুনন্দ। বাসি অলকা বাসি…সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালবাসি…তোমাকে না পেলে যে আমার কি হ'ত?

অলকা। [অভিমানে] কেন তবে তুমি বলেছিলে আমাকে ভালবাস না?

সুনন্দ। ওটা আমার একটা খেয়াল…তোমার ভালবাসা যে কত গভীর তাইত আজ তা দেখলুম।

অলকা। [খুসী হইয়া] বেশ…এবার তবে প্রস্তুত হও…তোমার বাঁশীতে যাত্রার সুর ধ্বনিত হোক।

সুনন্দ। কেন অলকা কোথায় যাত্রা করতে হবে আমাদের?

অলকা। যাত্রা আমাদের করতেই হবে। এখনই…এই রাত্রেই…নইলে সকাল হ'তে না হ'তে রাজার লোক এসে আমাদের ধরে নিয়ে যাবে। আমাকে করবে বন্দিনী আর তোমাকে করবে [বলিতে পারিল না, ভয়ে শিহরিয়া উঠিল] জানত রাজার দরবারে বাবার কি খাতির! আমিও তার কাছে ক্ষমা পাব না।

সুনন্দ। কোথায় যাব অলকা। আকাশে এমন ঘনঘটা…বাহিরে ঝড়-বাদলের মাতামাতি…ঘন ঘন বিজলী চমকাচ্ছে…চরাচর সব ভীত…প্রলয়ের ধ্বংস-লীলায় সৃষ্টি মেতে উঠেছে এর মধ্যে কোথায় যাত্রা করব?

অলকা। কোথায় তা' জানিনে…দুর্য্যোগের কথা বলছ তুমি…দুর্য্যোগইত আমাদের সুযোগ…আকাশে এমনি ঘনঘটা না থাকলে রাজার অনুচর তোমার দ্বার পর্য্যন্ত এসে যেত…আমার পরিচারিকার দৃষ্টি এড়িয়ে আমিও হয়ত আসতে পারতুম না এখানে। চল সুনন্দ নাও তোমার বাঁশী…ঝড়ের সুরে যাত্রার সুর মিলিত হোক—সুনন্দ! ঐ—ঐ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে…বিদ্যুৎ দেখে ভয় পাব না আমরা…ঐত আমাদের পথের আলো…পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

সুনন্দ। কোথায়…কোথায় অলকা?

অলকা। কোথায় তা জানিনে তবে এখানে নয়—দূরে…অনেক দূরে…শ্রাবস্তী ছাড়িয়ে…পারিত এই পৃথিবীর অপরপ্রান্তে যেখানে রাজা নেই…নিষ্ঠুর পিতা নেই…আমাদের অবাধ মিলনে বাধা দিতে কেউ নেই। দূর প্রান্তে কোথাও আমাদের একান্তের নীড় রচনা কর্ব…যেখানে প্রকৃতি তার ভালবাসায় ভালবাসায় নীল-সবুজের চিরমেলা বসিয়ে রেখেছে…আনন্দে পাখী গায়…নির্ভয়ে হরিণ-হরিণী বিচরণ করে…পদ্মভরা দীঘিতে ভ্রমর-ভ্রমরার সারাদিন ধরে চলে অফুরান গুঞ্জরণ!!

সুনন্দ। [অলকার কবিতায় মুগ্ধ-বিস্ময়ে] চল অলকা তাই চল…তোমার কল্পনার অলকপুরী আমাকে লোভাতুর করে তুলছে…সেই ভাল…রাজা নেই…পিতা নেই…তোমাকে কেড়ে নিতে রতনচাঁদ নেই…শুধু তুমি আর আমি … পৃথিবীর কোন সে একপ্রান্তে … একলা … একান্তে…

অলকা। চল…চল প্রিয়তম।

[বাঁশী বাজিয়া উঠিল…বিদ্যুৎ চমকিত হইল; সেই বিদ্যুতালোকে দেখা গেল—অলকা ও সুনন্দ পথ-চলা শুরু করিয়াছে…সুনন্দের মুখে জয়ের দীপ্তি…অলকার মুখে সাথীর উপর একান্ত নির্ভরতা…পরম নিশ্চিন্ততা—]

*　　*　　*　　*

[বেণুবন…বেণুবনে বুদ্ধদেব স-শিষ্য অবস্থান করিতেছেন। শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেছেন। এমন সময় এক নারী হাহাকার করিয়া তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইল। শশব্যস্তে বুদ্ধদেব সেই নারীকে ধরিয়া তুলিলেন। নারীর শ্রীহীন মলিন বেশ…ব্যথাতুর মুখমণ্ডল। বুদ্ধদেব নারীকে প্রশ্ন করিলেন]

বুদ্ধদেব। কে তুমি নারী? কেন তুমি এমন আলুথালু বেশে অমন বুকফাটা কান্না কাঁদছ?

নারী। প্রভু!

বুদ্ধদেব। বল বল নারী তুমি কে? কি ব্যথা তোমার বুকে বাজে?

নারী। [কাঁদিতে কাঁদিতে] প্রভু আমি অলকা।

বুদ্ধদেব। অলকা! কোন্ অলকা? শ্রেষ্ঠীকন্যা অলকা?

অলকা। হাঁ প্রভু।

বুদ্ধদেব। আমি তোমার কথা শুনেছি। কিন্তু তার পরের কথা জানিনে। কেন তোমার এমন বেশ…কই সে তোমার সে সেই সুনন্দ।

অলকা। আশ্রয় দাও প্রভু…শান্তি দাও প্রভু…দুঃখের দহনে প্রাণ আমার হাহাকার করছে।

বুদ্ধদেব। বল নারী…তোমার কাহিনী।

অলকা। প্রভু! শ্রাবস্তী ছাড়িয়ে সে এক বিজন প্রান্তে আমাদের নীড় রচনা করেছিলুম…শান্তির সে নীড়…ভালবাসার সে নীড়। সুনন্দ বনে বনে ঘুরে ফল মূল নিয়ে আসত…সমস্ত সংসার গুছিয়ে তারই প্রতিক্ষায় বসে থাকতুম আমি। দিনান্তে ফিরে এসে সুনন্দ তার বাঁশী নিয়ে বসত…তার সেই বাঁশীর সুরের রেশ নিয়ে যেত আমাদের এই পৃথিবী ছাড়িয়ে অনেক উর্দ্ধে…সেখানে পাপ নেই তাপ নেই…শুধু শান্তি…শুধু শান্তি। ক্রমে আমাদের সেই সংসারে ছুটি শিশু অতিথি এল। তাদের আধো আধো কথায়…কলহাসিতে আমাদের ঘরে আনন্দের জোয়ার এল…—কিন্তু এত সুখ আমার কপালে সইল না। যেন ক্রুদ্ধ বিধাতার অভিশাপের কালোছায়া আমাদের সংসারে নেমে এল…ফল সংগ্রহ করতে যেয়ে স্বামী আমার কাল-সর্পের দংশনে প্রাণ দিলে। সেই কালসাপের বিষে সংসার আমার জলে গেল—ছোট ছোট শিশুদুটোর করুণ ক্রন্দন…আমার হাহাকারে সেই বনের পশুর চোখেও জল এল…বনের সেই ঘুঘুগুলো…তাদের আমি নিজের হাতে খাওয়াতুম তারা হয়ত আজও তেম্নি আমাদের ঘরের আশে পাশে ঘু-ঘু-ঘু করে আর্ত্তনাদ ক'রে ফিরছে। শিশুর ক্রন্দন আমাকে আবার ঘরছাড়া করলে। শ্রাবস্তীর পথে…ওরাও যেন কেমন নেতিয়ে পড়ল তারপর আমাকে ছেড়ে চলে গেল…পথে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলুম…শ্রাবস্তীতে ফিরে এসে দেখি সেই কালসাপের নিশ্বাস এখানেও এসে নেমেছে। মা নেই…ভাই নেই…বুকের জ্বালা জুড়াবার কিছু নেই…কেউ নেউ…প্রভু! প্রভু!! আশ্রয় দাও…শান্তি দাও।

বুদ্ধদেব। নারী! জগতে সমস্ত ব্যথা বেদনার মুলই হচ্ছে মানুষের অতৃপ্ত বাসনা। এই বাসনাকে যে জয় কর্বে সে এই ধরণীর অনন্ত দুঃখকে জয় কর্বে—ভোগ-বিলাসের মোহকে যে জয় করেছে "মার" আর তার কোন অনিষ্ট কর্ত্তে পারে না। নারী! তোমার ভোগের আকাঙ্ক্ষায় মৃত্যুর হানা পড়েছে, তাইত তোমার এত দুঃখ। যে পথ তুমি নিয়েছিলে সে পথে শান্তি নয়…ভোগে শান্তি নেই—শান্তি আছে তৃপ্তি আছে ত্যাগে। বাসনাকে তোমার নিবৃত্ত কর। আমি আশীর্ব্বাদ করছি তুমি প্রাণে শান্তি পাবে…সত্যকার শরণ নাও। তোমার ঐ মস্তকের চূর্ণকুন্তল…মুণ্ডিত কর…চির পরিধান কর…শ্রমণীর আশ্রম গ্রহণ কর…ধর্ম্মের শরণ নাও—

[তথাগত নারীর মস্তকে হস্ত রাখিয়া আশীর্ব্বচণ উচ্চারণ করিলেন—

বাহিরে শিষ্যগণ গাহিয়া উঠিল]

[সকলে একত্রে]

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামী
সংঘং শরণং গচ্ছামী
ধম্মং শরণং গচ্ছামী"

[যবনিকা]

"সৃষ্টির কথা"

মৌলবী মোহাম্মদ আবদুর রশীদ বি-এ, বি-টি, ছাহেবের "সৃষ্টির কথা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ এই সংখ্যার মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এবং বক্তব্যগুলির সহিত আমাদের বিশেষ কোন মতভেদ নাই। কিন্তু লেখক স্থানে স্থানে এরূপ দুই-একটা ধারণাকে সিদ্ধান্তরূপে উপস্থিত করিয়াছেন, যাহার সঙ্গতি স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। বর্ত্তমান যুগের যুগান্তকারী মনীষীদের মধ্যে মুছলমানের নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, ইহার কারণ নির্ণয় করার সময় লেখক বলিতেছেন—"ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ ধারণার পক্ষপাতী বলিয়া মুসলমান প্রাণ খুলিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে সমর্থ হইতেছে না।" অন্যত্র এই বিশেষ ধারণার পরিচয় দিয়া তিনি বলিতেছেন—"কতকগুলি বিশেষ ধারণায় মুছলমানের সৃষ্টির উদ্যম অনবরত প্রতিহত হইতেছে। সে কিছু নূতন সৃষ্টির জন্য সাধনা আরম্ভ করিলেই ভীত হইয়া থাকে, পাছে বিশ্বস্রষ্টার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা তেমন একটা কিছু করিবার প্রগলভতা তাহার আসিয়া পড়ে।" এই ধারণা যে মুছলমান সমাজে বিদ্যমান আছে অথবা এই ধারণার জন্য যে মুছলমানের সৃষ্টি-উদ্যম প্রতিহত হইতেছে, ইহা আমাদের জানা নাই। আমরা যতদূর জানি, সঙ্কীর্ণ চিন্তার কোন অতি কাঠ-মোল্লাও কস্মিনকালে এইরূপ ধারণার অভিব্যক্তি করে নাই। গত কএক শতাব্দী হইতে সকল দিক দিয়া মুছলমানের পতন আরম্ভ হইয়াছে এবং এই পতনের অবশ্যম্ভাবী অবসাদ তাহার জাতীয় জীবনের সকল স্তরে সমানভাবে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, অন্যান্য উদ্যমের ন্যায় তাহার সৃষ্টি-উদ্যমও ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছে। অন্ততঃ আমাদের ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজ যে এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী কখনই নহেন, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু তত্রাচ সৃষ্টি-উদ্যমের কোন প্রমাণ তাঁহাদের মধ্যেও'ত পাওয়া যাইতেছে না। আবার অন্যদিকে আমরা ইহাও দেখিতে পাইতেছি যে, "শাস্ত্রের নিয়মানুবর্ত্তীতা" যখন মোছলেম-জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইত, তখনকার—এবং একমাত্র তখনকার—মুছলমানই সৃষ্টির নব-নব উদ্যমে দুনিয়াকে স্তম্ভিত করিয়াছিল।

বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে প্রাচীন হিন্দু, গ্রীক, মিছর ও চীনের দানের কথা লেখক উল্লেখ করিয়াছেন। আরবদের দান বর্ণনার সময় তিনি মাত্র কএকটা রাসায়নিক দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহাদের দান ইহা অপেক্ষা বহু বহু গুণে অধিক। ন্যায়, দর্শন, জ্যোতিষ, রসায়ন, ভূগোল ও খগোল প্রভৃতি সংক্রান্ত সৃষ্টি ও দানগুলির কথা বাদ দিয়া, যন্ত্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এমন বহু উদাহরণ উপস্থিত করা যাইতে পারে, যাহা শুনিয়া এখনকার মুছলমানরাও বোধ হয় আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। Phonography-কে বর্ত্তমান যুগের একটা আশ্চর্য্য আবিষ্কার বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু Thomas Young ও T.E. Edison-এর বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, স্পেনের মুছলমানরাই যে প্রথম ফনোগ্রাফ-যন্ত্র আবিষ্কার ও ব্যবহার করিয়াছিল, একথা বিশ্বাস করান আজ সহজ হইবে না। Thomas Young ফনোগ্রাফের মৌলিক সূত্র আবিষ্কার করেন ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে, এডিসন ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখান ১৮৭৭ সালে। কিন্তু মুছলমান মনীষী পরিপূর্ণ আকারে ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন, হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। ইতিহাসে

দেখিতে পাওয়া যাইবে—স্পেনের খলিফা আবদুর রহমান নাছেরের অঙ্গে একবার অস্ত্রোপচার করার আবশ্যক হয়। চিকিৎসক বসিয়া খলিফার নাড়ী পরীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় দেখা গেল, পার্শ্বে রূপার পাত্রে একটা ধাতু নির্ম্মিত পাখী। প্রথমে সেদিকে কেহ বড় একটা লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু চিকিৎসক অস্ত্র-ব্যবহারের উদ্যম করার অব্যবহিত পূর্ব্বে, ঐ পাখীটা ঠিক মানুষের মত কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল :—

ايها الفاصد ! رفقا   با مير المومنينا
انما تفصد عرقا   فيه محيا العالمينا

"ধীরে, হে চিকিৎসক ! আমিরুল মোমেনীন সম্বন্ধে
করুণভাবে"
"জানিও, তুমি এমন একটা শিরার উপর অস্ত্র
চালাইতেছ—
জগতের জীবন যাহার মধ্যে নিহিত।"

খলিফার প্রশ্নে জানা গেল—যুবরাজের জননী এই সময় খলিফার চিত্ত-বিনোদনের জন্য যন্ত্রটী প্রস্তুত করাইয়াছেন। খলিফা তখনই ৩০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার স্বরূপ বেগমের নিকট প্রেরণ করেন। এইরূপে ছোলতান ابوحمو آل يغمر এর সময় "তলমছান" নগরে "মিকানিকাল" মানুষ সৃষ্টির স্পষ্ট সন্ধান পাওয়া যায়। রাজ-দরবারে ইহাকে خزانة المنجانه বলিয়া অভিহিত করা হইত। যন্ত্রটী একটা বড় আলমারির আকারে গঠিত হইয়াছিল। রাত্রে এক এক ঘণ্টা শেষ হওয়ার পর, একটী কিশোরী স্ত্রীলোক সেই আলমারির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিত, তাহার হাতের কাগজে সময় ও সময়োপযোগী কবিতা লিখিত থাকিত। পার্সি সাহিত্যের সহিত যাহাদের সামান্য কিছু পরিচয় আছে, তাঁহাদের অনেকেই ماه نخشب "মাহে নাখ্শাবের" নাম অবগত আছেন। হাকিম এবনে-মোকান্না নাখ্শাব নগরে চাঁদের আকারে একটী বৈদ্যুতিক দীপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দীপকটী শহরের পার্শ্বস্থ বৃহৎ গুহায় স্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার পর এই চাঁদটী গুহা হইতে বাহির হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইত এবং চারি ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত স্থান এই আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। এই প্রকার আরও অনেক নজির ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এখানে বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এগুলি কবির কল্পনা নহে, কাহারও খেয়ালপ্রসূত উপন্যাস নহে, এবং প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগের গল্প-গুজবও নহে।

জ্ঞানের সাধনায় এবং জ্ঞানলব্ধ সত্যের মর্য্যাদা রক্ষায় মুছলমান মহাজনগণ যে সকল কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহার নজির দুনয়ার ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আর একদিন এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিব।

লেখক আর এক স্থানে বলিয়াছেন—"গবর্ণমেণ্টের দণ্ডনীয় অপরাধের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিলে এবং সর্ব্ব স্তরের মুছলমানের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিলে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হইয়া পড়ে যে, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি নিষ্ঠা ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের নিয়ম প্রতিপালন এই দুয়ের মধ্যে যেন বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই।" এই মন্তব্যটী সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। গবর্ণমেণ্টের দণ্ডনীয় অপরাধের কোন বার্ষিক বিবরণী হইতে ইহা প্রতিপন্ন হয় না যে, "ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নিয়ম পালন" যাহারা করিয়া থাকে, মিথ্যা ও অন্যায়ের জন্য তাহারাই অধিক দণ্ডিত। বরং প্রকৃত পক্ষে অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, শরা-শরিয়তের পাবন্দ লোকেরা রাজদণ্ডে খুব কমই দণ্ডিত হইয়া থাকে। তাহার পর, "ধর্ম্মশাস্ত্রের নিয়ম পালন"—কথাটার অর্থ অতি সঙ্কীর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াই লেখক তাহার উপর নিজের বক্তব্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। অন্যায়, অসত্য ও দুর্নীতি মাত্রকে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করাও ধর্ম্মশাস্ত্রের নিয়ম। লেখক আরও বলিয়াছেন—অনেক সময় মানুষ সত্যকে দূরে রাখিয়া তাহার ছায়া লইয়া কলহ করিয়া থাকে।" কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে, ছায়াকে বর্জ্জন করার আগ্রহাতিশয্যে অনেক সময় মানুষ কায়াকে পর্য্যন্ত ধ্বংস করিতে উদ্যত হয়।

———

অস্থায়ী সন্ধি

১৯৩০ সালের ৩রা মার্চ্চ তারিখে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বিশেষ দূতের মারফতে রাজপ্রতিনিধি লর্ড আরউইনকে

চরমপত্র প্রেরণ করেন—কবে, কোন সময়ে, কোনস্থানে তিনি আইন অমান্য আরম্ভ করিবেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দেন। এক বৎসরের নানাবিধ সংঘাত-সংঘর্ষের পর, ১৯৩১ সালের ঠিক ৩রা মার্চ্চ তারিখে মহাত্মা গান্ধী ও লর্ড আরউইন অস্থায়ী সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, উভয় পক্ষ সংগ্রাম স্থগিত রাখিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

এই সন্ধির ফলে একদিকে ভারত গবর্ণমেণ্ট দলননীতি মূলক কর্ম্মাণগুলির প্রায় সমস্তই প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের প্রায় সকলকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে স্বীকার করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, অতঃপর সমুদ্র-উপকূলবাসী ব্যক্তিরা যদি নিজেদের ব্যবহারের জন্য লবণ প্রস্তুত বা সংগ্রহ করে, তাহাহইলে তাহাদিগকে আর দণ্ডিত হইতে হইবে না। মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্তবর্গ পক্ষান্তরে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, গোলটেবিলের আগামী অধিবেশনে যোগ দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

কংগ্রেস-পন্থী রাজনীতিকদের মধ্যকার কএকজন ভদ্রলোক এই সন্ধির বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এমনকি, যে সব মুছলমান পরিচালিত সংবাদপত্র এযাবৎ কংগ্রেসের ও আইন অমান্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীব্রতর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন, গান্ধীজীর এই অন্যায় আত্মসমর্পণে তাঁহাদের দুই-একজনকেও বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করিতে দেখা যাইতেছে। এইরূপ দুই একজন ব্যক্তি ব্যতীত দেশবাসী মহাত্মা গান্ধীর এই সন্ধিতে বিশেষ সন্তোষ ও গৌরব অনুভব করিয়াছেন, সকলে মহাত্মা গান্ধী ও লর্ড আরউইন উভয়কে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন।

আইন অমান্য আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল, গবর্ণমেণ্টকে সন্ধি করিতে বাধ্য করা। নচেৎ, এই "অহিংস-সংগ্রামের" ফলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে, কএক মাসের মধ্যে ভারতের রাজপাট ছাড়িয়া দিয়া স্বদেশে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন—এ আশা বোধ হয় আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে কেহই করেন নাই। আন্দোলন আরম্ভ করার পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী এই সন্ধির প্রস্তাব লইয়াই বড়লাটের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু অভিমান ও প্রেষ্টিজের মোহে তখন তাঁহারা এমনই আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ভারত সরকার বা লর্ড আরউইন তখন গান্ধীজীর কথাগুলিকে অতি তুচ্ছভাবেই অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছিলেন। অন্য দিকে, কতকগুলি কারণ দেখাইয়া কংগ্রেস সাইমন কমিশন ও গোলটেবিলকে বয়কট করিয়াছিলেন। ভারত সরকার ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের এই অভিযোগগুলির প্রতিকার ত' করেনই নাই, বরং কংগ্রেসের অভিযোগগুলির প্রতি ইচ্ছাপূর্ব্বক অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কংগ্রেসকে অগ্রাহ্য করিয়া গোলমেজ কন্‌ফারেন্সকে সফল করার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আজ আমরা দেখিতেছি—আমলাতন্ত্রের সেই অভিমান মহাত্মা গান্ধীর সাধনার নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছে। অপরাধী বিদ্রোহী বলিয়া দুইদিন পূর্ব্বে যাহাদিগকে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছিল, যে ওয়ার্কিং কমিটীকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাহার মেম্বারদিগকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহারাই আজ সন্ধির এক পক্ষ। দুনিয়া দেখিল—ভারত সরকার ও বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে,—সাইমন কমিশন ও গোল-মেজ একটা অনর্থক পণ্ডশ্রমে পরিণত হইয়াছে। তাই আজ আবার তাঁহাদিগকে কংগ্রেসের নিকট মস্তক অবনত করিতে হইয়াছে, কংগ্রেসের অভিযোগের প্রতিকার করিয়া তাঁহাকে লইয়া আবার ভারতে নূতন গোলমেজ কনফারেন্স বসান হইতেছে। আর ভারত-সরকারকে সন্ধি করিতে হইল—সেই বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত ওয়ার্কিং কমিটীর সহিত। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন—একদিকে "ন্যাংটি-ওয়ালা" গান্ধী, অন্যদিকে ভারতের বড়লাট ও রাজপ্রতিনিধি লর্ড আরউইন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এ যাবৎ একদিনের তরেও ভারতের জনমতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। সেইজন্য ভারতের "প্রতিনিধি" নির্ব্বাচিত করিয়াছেন তাঁহারা নিজেরাই। এই জনমতের গুরুত্বকে তাঁহাদের দ্বারা স্বীকার করানই হইতেছে এদেশের সব রাজনৈতিক আন্দোলনের গোড়ার কথা। আমাদের মতে, গত অর্দ্ধ শতাব্দীর আন্দোলনের পর মহাত্মা গান্ধী আজ প্রথম বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে এবং এদেশের উষ্ণ মস্তিষ্ক আমলাতন্ত্রকে তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছেন। ভারতের রাজনৈতিক সাধনার ইহাই প্রথম সফলতা, পরপদদলিত

ভারতবাসীর ইহাই প্রথম বিজয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতের দাবী-দাওয়ার বিচার-আলোচনা হইবে গোলমেজ কনফারেন্সে। বর্ত্তমানের ব্যাপারটা হইতেছে একটা অস্থায়ী সন্ধি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সন্ধির ফলে, কংগ্রেস গোল টেবিলে যোগ দিয়া ভারতের সেই দাবীগুলি উপস্থাপিত করিবেন। ভবিষ্যতের সন্ধি বা সংগ্রাম এই কনফারেন্সের ফলাফলের উপর নির্ভর করিবে।

---

৫ শত শহীদ

গত বৎসর ৭ম সংখ্যা মাসিক মোহাম্মদীতে দেশের মুক্তি-সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা মুছলমান সমাজকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলাম :—

"এই সকল কারণে উপরোক্ত নেতাদিগের মধ্যে কাহারও প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া, বহু মুছলমান মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনে যোগদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশে মোটের উপর মোছলেম-সত্যাগ্রহীর সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা কম নহে, বরং স্থানে স্থানে অধিক। মোছলেম-বঙ্গের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতেও মধ্যে মধ্যে বেশ একটু সাড়া পাওয়া যাইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে এই উদ্দীপনা ব্যাপক রূপ ধারণ করাও বিচিত্র নহে। ফলে বাস্তবে অবস্থা এই দাঁড়াইতেছে যে, বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া আমাদের একদল ছুটিয়াছে গান্ধীর পতাকাপানে, অন্যদল তাহার বিরাট অকর্ম্মণ্যতা লইয়া বিরাম লাভের চেষ্টা পাইতেছে—অথবা অন্যমতের মুছলমানকে ইতর ভাষায় গালি দিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছে। ফলে যাহাকে বলে 'ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ'—একেবারে সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।"

আমাদের কথাগুলি আজ বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়া যাইতেছে। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর জেনেরাল সেক্রেটারী ছাহেব সম্প্রতি যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিতেছেন—"প্রত্যেক প্রদেশের সম্পূর্ণ ও নির্ভুল হিসাব প্রস্তুত করা হইতেছে, তাহা পরে প্রকাশ করা হইবে। বর্ত্তমানে মোটামুটি ভাবে যতটা সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহার সার এই যে, ১৯৩০ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ১২ হাজারের অধিক মুছলমান কারাগমন করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, প্রায় ৪।৫ শত মুছলমান এই মুক্তি সংগ্রামে নিজেদের প্রাণ দান করিয়াছেন। সীমান্তের অপর দিকের যে সব মুছলমানকে উড়ো জাহাজ হইতে বোমা ফেলিয়া বা অন্য প্রকারে নিহত করা হইয়াছে, তাহাদিগকে এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।" অথচ, প্রধানতঃ একদল মুছলমানেরই প্রচার ফলে, সকলেই মনে করিতেছে যে, মুছলমান সমাজ এই আন্দোলনে যোগদান করে নাই!

"বিজয়-অভিযান"

শাদি-বিবাহ উপলক্ষে বর-কন্যার বন্ধু-বান্ধব ও সখী-সহেলীর আমোদ-আহ্লাদ রং-তামাসা করিবেন, ইহাতে অন্যায় ও অস্বাভাবিক কিছুই নাই। তবে, সব জিনিষের ন্যায় ইহারও একটা সীমা আছে। এই সীমা অতিক্রান্ত হইলে ব্যাপারটা অপ্রীতিকর হইয়া পড়ে এবং তাহার প্রতিকার করাও আবশ্যক হইয়া দাঁড়ায়।

সম্প্রতি কলিকাতার এক অলিমার দাওয়াতে শামিল হওয়ার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়াছিল। বর ও তাঁহার পিতা উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, কন্যা একজন উচ্চ শিক্ষিতা সম্ভ্রান্ত মহিলা। শহরের বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। এই সময়, জনৈক যুবক "বিজয়-অভিযান" শীর্ষক যে বাঙ্গলা রচনাটী সভায় পাঠ করিয়াছিলেন, বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, তাহা অনেকের পক্ষেই অপ্রীতিকর হইয়াছিল। নব-বধূর নামকে লইয়া এইরূপ প্রকাশ্য সভায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা, সুরুচিসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তাহার পর, এই "বিজয়-অভিযানের" ফিল্ড মার্শাল সাহেব পরাজিতা, আত্ম-সমর্পিতা নব-বধুকে অবিলম্বে নিয়ে-যাওয়ার আদেশ দেওয়ার সময় যে সব ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাও সুরুচি বিগর্হিত। বিশেষতঃ, বর যেখানে পিতা, পিতৃব্য এবং অন্যান্য বহু গুরুজন ও সম্ভ্রান্ত অতিথির দ্বারা বেষ্টিত, সেখানে এই সব ইঙ্গিত আরও অন্যায়।

সভায় কএকজন হিন্দু-ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের একজনকে রচনার সাহিত্যিক দিক সম্বন্ধে কটাক্ষ করিতে দেখিলাম। হইবারই কথা, কাননের "কোল্-মণি" লুণ্ঠন করার অদ্ভুত কবিত্বটা হৃদয়ঙ্গম করা অনেকের পক্ষেই বোধ হয় সহজ-সাধ্য হইবে না। তাহার পর, "আবেশে আকুল-হৃদি বাণাহতা ভরা-নদী"র এবং সঙ্গে সঙ্গেই "গাও গান মিলনের বান গেছে কাটিয়া।" একেত "বান কাটিয়া যাওয়া" এবং তাহাও আবার "বানাহতা ভরা নদীতে"! কাজেই হিন্দু-মেহমানের ঐ কটাক্ষটাকে নিতান্ত সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না।"

বিচার-বর্জ্জিত অন্ধ অনুকরণের ফলে, এই শ্রেণীর একটা রুচি-বিকার মুছলমান সমাজে সংক্রামক হইয়া চলিয়াছে। এই বিকার-স্রোতের গতিরোধ হওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করি। তাই এই সামান্য বিষয়টা লইয়া পাঠকগণের এতটা সময় নষ্ট করিতে সাহসী হইলাম।

Printed and Published by Md. Khairul Anam Khan from the "Mohammadi Press,"
91, Upper Circular Road, Calcutta.

জি, রায় এণ্ড কোং,

সম্পূর্ণ স্বদেশী উপাদানে, স্বদেশী পরিশ্রমে ও স্বদেশী মূলধনে পরিচালিত।

আগুন, চোর, ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়—জি, রায় এণ্ড কোম্পানীর লোহার সিন্দুক, আলমারী ও তালা। গভর্ণমেন্ট আফিস, ব্যাঙ্ক, লোন আফিস, মার্চেন্ট আফিস সমস্ত জায়গাতেই উক্ত কোম্পানীর সিন্দুক, আলমারী ও তালা আদরে গৃহীত হইতেছে।

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

পরীক্ষা প্রার্থণীয়।

৭০।১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন নং ১৮৩২ কলিকাতা

বিনামূল্যে

হিষ্টিরিয়ার মাদুলি। ডাঃ মাঃ বাবদ ।৵০ আনার টিকেট পাঠাইলে পাঠান হয়।

প্রমেহ বিন্দু।

প্রমেহ রোগের (গণোরিয়ার) অব্যর্থ ঔষধ। ২ দাগে জ্বালা যন্ত্রণা আরোগ্য হইয়া রোগ উপশম হয়। মূল্য ১।০ টাকা

স্বপ্ন বিনোদ বটী।

সকল প্রকার স্বপ্নদোষের মহৌষধ। মূল্য ১৲ টাকা। ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা।

ঢাকা আর্য্য-শক্তি ঔষধালয়।

কবিরাজ—শ্রীহেমন্তকুমার দাস শর্ম্মা

এল, এ, এম, এস, ; ভিষগরত্ন

১৫৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা।

Extremely cheapest and Best house for :—

New, Rebuilt, Second-hand Typewriter and spare parts, Ribbon, Carbon paper, Printing & Everything in office supplies etc.

Directly imported from America No. 12 Remington & Underwood Typewriter @ Rs. 170/- only. We Guarantee the said machines in appearance and service, as equal as new, which is priced at Rs. 450/-

Repairs :—a speciality. Guaranteed in every way.

Pleass try. Compare & be convinced.

THE
Asiatic Typewriter Co.,

9/1, Old post Office Street, CALCUTTA.

Estd. 1903. Phone 2892 Calcutta.

পুরুষ মাত্রেই

রূপের মোহে অন্ধ

কিন্তু স্ত্রীলোকেরা এরূপ সহজে প্রতারিত হ'ন না। নারীগণের মধ্যে এখন অনেকেই জানেন যে ওটীনের সাহায্যে কিরূপে প্রত্যেক অঙ্গের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা যায়।

যাঁহারা নিয়মিতভাবে প্রতি রাত্রে ৫ মিনিটকাল ওটীন ক্রীম দ্বারা নিজ গাত্র মার্জ্জনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে কালের অক্ষুন্ন প্রভাবও নষ্ট হয়! প্রতি রাত্রে ওটীন ব্যবহারে যে সময় অতিবাহিত হয় তাহা কখনও সময়ের অপব্যবহার বলিয়া মনে করিবেন না। কারণ, ওটীন ক্রীম গাত্রচর্ম্মকে পরিষ্কার, কোমল ও সতেজ করে এবং প্রত্যেক দিনের স্বাভাবিক ক্ষতিপূরণ করিয়া থাকে। দিবাভাগে ওটীন স্নো ব্যবহার করিলে গ্রীষ্মের উত্তাপ, ধূলা ও ঘর্ম্ম গাত্র চর্ম্মের মসৃণতা বা শ্রী নষ্ট করিতে পারে না।

ওটীন ক্রীম রাত্রে এবং ওটীন স্নো দিবসে, এই দুইটিই ব্যবহার করা উচিত কিম্বা আপনি ইচ্ছা করিলে নিম্নলিখিত কুপনটী পাঠাইতে পারেন।

কুপন——নমুনাস্বরূপ আমাকে ওটীন ক্রীম, ওটীন স্নো, ওটীন সাবান, ওটীন ফেস পাউডার, ১টী বড় ওটীন স্যাম্পু এবং ওটীন সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি বিষয়ক পুস্তিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ৮ আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প এই সঙ্গে প্রেরিত হইল।

নাম ....

ধাম

দি ওটীন কোম্পানী।

১৭, প্রিনসেপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

M. M. 1

Printed at The "Mohammadi Prees" 91 Uppe Circular Road, Calcutta

৭ম সংখ্যা

বার্ষিক মূল্য সডাক তিন টাকা ছয় আনা

সম্পাদক — মোহাম্মদ আকরম খাঁ

প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা

স্নানের আনন্দ
হিমানী সাবান
হিমানী সাবান
আধুনিক উপায়ে চর্ম্মের স্বাভাবিক
কোমলতা বজায় রাখিবার উপযোগী
করিয়া প্রস্তুত—ব্যবহারে ইহা আরামপ্রদ
গন্ধ মনোরম—গরম দিনে শ্রেষ্ঠ প্রসাধন
হিমানী সাবান
হিমানী চন্দন, চম্পক, যূথিকা
খসখস, হেনা, ল্যাভেণ্ডার
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন গন্ধযুক্ত ও
সকলের রুচি মত পাওয়া যায়
শ্রেষ্ঠ সাবান ও সুগন্ধি প্রস্তুতকারক
হিমানী ওয়ার্কস্
৫৯ বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা
সোল এজেণ্টস্ঃ—
শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং
৪৩, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

সুপেয়
এবং
শক্তিবর্দ্ধক

বনভিলের কোকো কেবল যে সুপেয় এবং চকলেট গন্ধযুক্ত খাদ্য এমত নহে পরন্তু ইহা শক্তিবর্দ্ধক এবং স্নায়ু পুষ্টিকারক পানীয়। ইহা একাধারে বিশুদ্ধ খাদ্য এবং উৎকৃষ্ট পানীয়।

বনভিলে কোকো বিশুদ্ধ উদ্ভিজ্জ খাদ্য—স্বাভাবিক পুষ্টিকর উপাদানে প্রস্তুত। ইহা প্রস্তুতকালীন এবং প্যাক করিবার সময় একেবারেই হস্তদ্বারা স্পর্শ করা হয় না। এই কোকোই কিনবেন।

BOURNVILLE COCOA

জান্তব চর্ব্বি বর্জ্জিত প্রস্তুতকালীন
একেবারে হস্তদ্বারা স্পর্শিত নহে।

ক্যাডবেরী কর্ত্তৃক প্রস্তুত, বনভিলে, ইংলণ্ড।

সূচীপত্র—বৈশাখ, ১৩৩৮

সূচীপত্র—বৈশাখ, ১৩৩৮

সূচীপত্র—বৈশাখ, ১৩৩৮

গুণে ও বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

"কৃষ্ট্যাল" যেখানে একবার যায়, অপর কোন কেশ তৈল সেখানে স্থান পায় না।

"কৃষ্ট্যাল" মাথা ঠাণ্ডা রাখে, কেশ বৃদ্ধি ও কালো করে, কার্য্যে উৎসাহ জন্মায়।

বাজারে কৃষ্ট্যালের অসংখ্য জঘন্য অনুকরণ আরম্ভ হইয়াছে।

ক্রেতাগণ আমাদের লেবেল ভাল করিয়া দেখিয়া লইবেন।

বিহার মিসেলেনী,

২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

ফোন নং বি, বি ৩৭৭০

আমাদের জিনিষ সর্ব্বাংশে উচ্চাঙ্গের ও সুলভ, আমাদের খরিদ্দার বিশিষ্ট ক্লাব, কলেজ, স্কুল, মাদ্রাসা, মক্তব প্রভৃতি—আজই সচিত্র ক্যাটালগের জন্য "মোহাম্মদী" পত্রিকার নাম উল্লেখ করিয়া পত্র লিখুন।

বি, রায় এণ্ড কোং,

৪৯নং হ্যারিসন রোড,

কলিকাতা।

বোরিক এণ্ড ট্যাফেলের

বিশুদ্ধ হোমিও ও বাইও কেমিক ঔষধ গ্লবিউল, পিল, সুগার অফ্ মিল্ক, কর্ক, শিশি, পুস্তক ও বাক্স প্রভৃতি সস্তায় পাওয়া যায়

ড্রম /৫ ড্রম /১০

এন, এল, পাল এণ্ড সন্স

দি ইউনিক হোমিও হল

৩৬ নং, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফটো সুন্দররূপে না উঠিলে মূল্য ফেরৎ

ভারতীয়া ক্যামেরা মাত্র ২॥০ টাকা

এই স্বদেশী ক্যামেরার লেন্স এরূপ সুন্দর ও শক্তিশালী যে একটি শিশুও অক্লেশে ৩॥″×২॥″ ইঞ্চি প্লেটে সুন্দররূপে যে কোন ফটোগ্রাফারের মত চিরস্থায়ী ফটো তুলিতে সক্ষম। প্রত্যেক ক্যামেরার সহিত একটি প্লেট, কাগজ, মসলা এবং ব্যবহার বিধি বিনামূল্যে দেওয়া হয়। মূল্য ৩॥″×২॥″—২॥০ টাকা, ডাঃ মাঃ ।০ আনা। ৩॥০″×৪॥০″—৩ ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা।

BHARATIYA CAMERA HOUSE. 27, ALIGARH.

৫ মিনিটের কাজ—
মুখ ধোয়া,
জামা পরা,
কামান!
"এভার রেডী" ক্ষুরেই
এরূপ তাড়াতাড়ি কামান সম্ভব
"এভার রেডী"
ব্লেডগুলিরও
বিশেষত্ব আছে।
Ever Ready
Safety Razor
C. B. সেট ১ ব্লেডযুক্ত
"ট্রাভেল আউট ফিট"
মূল্য ।৵০ আনা
দুই ব্লেডযুক্ত গোল্ড প্লেটেড
সেট (লাল বাক্সে)
মূল্য ॥৵০ আনা
দুই ব্লেডযুক্ত "পপুলার"
সেট মূল্য ৸০ আনা
পোঃ বক্স
৯৮, কলিকাতা
আমেরিকান সেফটী রেজর কর্পোঃ লিঃ,
PUBLICITY STUDIO

জে, এম, রায় এণ্ড কোং জুয়েলার্স ৩৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমাত্র গিনি সোনা ও চাঁদি রূপার গহনা প্রস্তুতকারক।

সতী শাঁখা | এনগ্রেভ্‌ সতী শাঁখা | টাব | মাকড়ী

তামার ফ্রেমের উপর গিনি সোনার পালিস পাতে মোড়া।
প্রমাণ ৬।০, মাঝারী ৫।৵০, ছোট ৪৸৵০

তামার ফ্রেমের উপর গিনি সোনার এনগ্রেভ পাতে মোড়া।
প্রমাণ ১১৲, মাঝারী ১০।৵০, ছোট ৮৸০

প্রতি জোড়া ১০৲ ২৲ হইতে উর্দ্ধ

চিত্তরঞ্জন চুড়ী

মাকড়ী

ইয়োলো ব্রোঞ্জের ফ্রেমের উপর গিনি সোনার এনগ্রেভ পাতে মোড়া, ফ্রেমের রং ব্যবহারে সোনার মত থাকে, হাতে দাগ লাগে না।
প্রমাণ ১৫।০, মাঝারী ১৩৸০, ছোট ১১।০

মূল্য প্রতি জোড়া ২০৲ হইতে উর্দ্ধ।

প্রতি জোড়া ৬৲

সমস্ত অলঙ্কারই গিনি সোনায় প্রস্তুত।

তাগা, বালা, চুড়ী, হার, নেকলেস ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা মজুত থাকে, অন্যান্য জিনিসের অর্ডার দিলে নিয়মিত সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়, পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

একমাত্র অকৃত্রিম ঔষধ এখানেই পাওয়া যায়।

বাজারের সস্তা ঔষধ যাঁহারা ব্যবহার করিয়া হতাশ হইয়াছেন তাঁহারা একবার পরীক্ষা করুন।

বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

শতকরা সাড়ে বার টাকা কমিশন।

লাহিড় এণ্ড কোং,

৩৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অর্শ রোগে

একমাত্র অব্যর্থ ও পরীক্ষিত মহৌষধ

হেডেন্‌সা

ব্যবহার করুন।

সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহাই ব্যবস্থা করেন এবং সমস্বরে ইহার অশেষ প্রশংসা করেন।

পৃথিবীর ৯৮টী দেশের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

একজিবিশন-চুড়ী

ইয়লো ব্রোঞ্জের ফ্রেমের উপর গিনিসোনার সুন্দর সুদৃশ্য পাতে মোড়া

ইহা আমাদের দুই বৎসরব্যাপী বিলাতে শিক্ষ লাভের ফল।
ইহা যেমন মা-বোনদের আদরণীয় স্বর্ণাভরণ হইয়াছে, তেমনই দেশকে অলঙ্কারের ব্যয়বাহুল্য হইতে রক্ষা করিতেছে।
ইহা অনুকরণকারিগণের শত আক্রমণকেও হেলায় পরাজিত করিয়া দেশ-বিদেশে সর্ব্বত্র প্রসারলাভ করিতেছে।

—আরও আনন্দের কথা—

বর্ত্তমানে ইহা বিশেষ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া বাহির হইল। এখনকার একজিবিশন-চুড়ী ও একজিবিশন-শাঁখা সর্ব্বাংশে নিরেট (solid) সোনায় প্রস্তুতের মতই হইল।

—ততোধিক আনন্দের কথা—

আমাদের কার্য্যের আরও প্রসার-মানসে মজুরী প্রভৃতি পূর্ব্বাপেক্ষা কম করিয়া নিম্নলিখিত মত ধার্য্য করা গেল—

একজিবিশন-চুড়ী

প্রতি জোড়া	সোনার ওজন	সোনার মূল্য	ইঃ ব্রোঃ ফ্রেম	মজুরী ও এনগ্রেভ	মোট মূল্য
প্রমাণ সাইজ	।৵০	৭৷০	২৷০	৫৲	১৫৲
বালিকা "	।/০	৬।০	২৷০	৪৲	১২৷০
শিশু "	।০	৫৲	২৲	৩৲	১০৲

[তিন জোড়া বা চারি জোড়ার এক সেট্ চুড়ী লইলে প্রতি টাকায় অর্দ্ধ আনা হিসাবে কমিশন দেওয়া হইবে।]

একজিবিশন-শাঁখা

প্রতি জোড়া	সোনার ওজন	সোনার মূল্য	ইঃ ব্রোঃ ফ্রেম	মজুরী ও এনগ্রেভ	মোট মূল্য
প্রমাণ সাইজ	৷০	১০৲	৪৲	৫৲	১৯৲
বালিক "	৷৵০	৮৸০	২৸০	৪৲	১৫৷০
শিশু "	।৵০	৭৷০	২৷০	৩৲	১৩৲

[এই শাঁখা বা চুড়ী বিনা এনগ্রেভ হইলে প্রমাণ সাইজে ১৷০ টাকা এবং বালিকা ও শিশু সাইজে ১৲ প্রতি জোড়ায় কম হইবে।]

প্লেন একজিবিশন-শাঁখা

প্রমাণ	প্রতি জোড়া	১৲ টাকা
বালিকাদের	"	৮৲ "
শিশুদের	"	৭৲ "
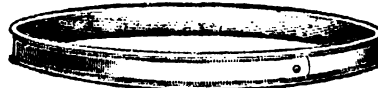
সর্ব্বদা ব্যবহারে একজোড়া শাঁখা চারি পাঁচ বৎসর চলিবে।

প্লেন সরু একজিবিশন-শাঁখা

প্রমাণ	প্রতি জোড়া	৮৲ টাকা
বালিকাদের	"	৭৲ "
শিশুদের	"	৬৲ "

আমাদের প্রত্যেক অলঙ্কারেই গিনি সোনা ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারের পর ফেরৎ দিলে উহার সোনা গিনি সোনার দরে এবং ইয়লো ব্রোঞ্জের ফ্রেম চাঁদি রূপার দরে ক্রয় করা হয়। অন্যান্য অলঙ্কারের ক্যাটালগ চাহিলেই পাঠান হয়।

ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক—শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী প্রণীত [মূল্য দুই টাকা]

ভূমিকায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালী একাল পর্য্যন্ত বিলাতে টাকা ঢেলেই আসছে, কিন্তু অক্ষয়বাবু বাংলার শিল্প দিয়ে তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসেছেন, এটা বাঙ্গালীর পক্ষে নূতন আদর্শ বটে! এইটাই আমাদের দেশের আজকালকার বড় আদর্শ হোক। দেশের হাওয়া ফিরেচে—এই বই-এর আদর হবে।"

ECONOMIC JEWELLERY WORKS

ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস

200, Cornwallis St. ২০০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডোঙ্গরের বালামৃত

—অরোরা—

শিশুদের পক্ষে ইহা ঔষধ ও পথ্য।

ইহাতে শিশুদিগের দন্তরোগের সহায়তা করে, দেহের অস্থিসমূহ সুগঠিত ও বলিষ্ঠ করে, হজমশক্তি বর্দ্ধিত করে, শরীরে শক্তি সঞ্চয় করে। ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক; পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাশি আরোগ্য করে। অধিকন্তু ইহা সুমিষ্ট। বর্দ্ধনশীল শিশুদের পক্ষে ইহা পরম উপকারী। প্রতি বোতলের মূল্য এক টাকা মাত্র।

বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

—কলিকাতার ষ্টকিষ্টস্—

এস, কুশালচাঁদ এণ্ড কোং,

৩৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ধনী ও গরীব সকলের উপযোগী

হাতে বাঁধা **ঘড়ি** (রিষ্ট ওয়াচ) দেখিতে সৌখীন ও সাইজে ছোট ; এক দমে ৩৬ ঘণ্টা চলে গ্যারাণ্টি কলকব্জা মজবুত ঠিক সময় রাখে : চামড়া অথবা সিল্ক ব্যাণ্ড সহ পুরুষ অথবা মহিলাদিগের ব্যবহারোপযোগী নিকেল কেস ৫৲, নকল সোনা ৯ ক্যাঃ গিল্ট কেস্ ৫৷৹, ঐ ১৪ ক্যাঃ গিল্ট ৬৲, ঐ ১৮ ক্যাঃ ৬৷০, ঝিণুকের (Mother of Pearl) কেস ৭৲, আসল চাদি রূপার কেস্ ৭৷০, আসল ৯ ক্যারেট খাঁটি সোণার কেস্ ১৫৲, আসল ১4 ক্যারেট খাঁটি সোনার কেস্ ২০৲, আসল ১৮ ক্যারেট খাঁটি সোণার কেস্ ২৫৲

সস্তার সুন্দর **পকেট** ঘড়ি রেলওয়ে রেগুলেটর শেপ মাঝারি সাইজ ১ দমে ৩৬ ঘণ্টা চলে গ্যারাণ্টি কলকব্জা মজবুত ঠিক সময় রাখে, বাক্স সহ নিকেল কেস্ ২৸৶৹ ; সোণার গিল্ট কেস্ ৩৸৶৹ ; রূপার কেস্ ৪৸৶৹ ; এই ঘড়িগুলির দাম কম বলিয়া যখন তখন যেখানে সেখানে ব্যবহার করিবার বড়ই সুবিধা। ইহার মধ্যে জুয়াচুরি নাই।

আসল পকেট **রেলওয়ে** রেগুলেটার ঘড়ি ভদ্রলোকের ব্যবহারোপযোগী ছোট সাইজ দেখিতে সুদৃশ্য ও মজবুত-স্থপুরুষ ক্রমান্বয়ে ব্যবহার করিতে পারিবেন খারাপ হইবে না, গ্যারাণ্টি ১ দমে ৩৬ ঘণ্টা ঠিক সময় রাখে; বাক্স সহ (Heavily Nickelled) নিকেল কেস্ মূল্য ৫৲ মাত্র।

প্রত্যেক ঘড়ির ডাঃ মাঃ খরচা।৵০ ও২টী ঘড়ির ডাঃ মাঃ খরচা ।০ আলাদা

দি ষ্ম্যাংলো ইণ্ডিয়ান ওয়াচ কোং,
পোষ্ট বক্স নম্বর ৪৬৪, কলিকাতা।

চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং

৬২।৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা (পোঃ বক্স ১১৪৩৪)

সর্ব্বাপেক্ষা সুলভে খেলার সরঞ্জাম বিক্রেতা

ফুটবল !

(T Shape) লিগ ফাইনাল ৫নং (Complete)	১১৲
ঐ ঐ ৪নং ঐ	৮৷৹
সিল্ড ফাইনাল ৫নং ঐ	১১৲
ঐ (১৮ প্যানাল) ৪নং ঐ	৯৲
মিলিটারী ম্যাচ (Macgregor) ৫নং	১১৷৹
ঐ ৪নং	৯৲

ব্লাডার—

১নং	২নং	৩নং	৪নং	৫নং
৸৹	১৲	১।০	১৷৵৹	১৷৷৵৹

লিগ চাম্পিয়ন ৫নং ৯৷৹ · লিগ চাম্পিয়ন ৪নং ৭৲
স্কুল ম্যাচ ৫নং ৮৲ · স্কুল ম্যাচ ৪নং ৬৲
রয়াল ম্যাচ ৫নং ৬৲ · রয়াল ম্যাচ ৪নং ৪৸৹

জুনিয়ার ম্যাচ ১নং ১৷৹, ২নং ২৷৹, ৩নং ৩৷০, ৪নং ৪৷৹

WHISLE—৷৵৹, ৷৹, ৸৹, ১।০

ইনফ্লেটার—১৲, ১।৹, ১৷৹, ২৲, ২৷৹

দেশের দশের নিকট পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

PATRONISE.

Indian Products.

Cigarettes - - - - - - - Cigars.

Matches
Toilet & Washing Soap
and
Chemicals.

WRITE FOR
PRICES &
AGENCY
ARRANGEMENT TO :—

Distributors for India :—

J. C. Dass & Co.,

132/1, HARRISON ROAD,
CALCUTTA.

কলিকাতা বৈদ্যবাটী ॥ আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত ॥

মেহবজ্রামৃত ॥

হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার অবশ্যম্ভাবী ॥

মেহ রোগের ধন্বন্তরী

একদিনে জ্বালা যন্ত্রণা যায়। সাত দিনে নূতন রোগ নিরাময় হয়। স্বপ্নে ধাতু নির্গম, রক্তস্রাব বার বার অল্প অল্প প্রস্রাব মূত্র নালির ক্ষত ইত্যাদি অচিরে বিনাশ হয়। ইহা মেহ ও প্রমেহ নাশক অব্যর্থ মহৌষধ। ইহাদ্বারা গণোরিয়া, মেহ, প্রমেহ, শুক্রমেহ, শুক্রতারল্য, রক্তমেহ, এমন কি বিংশতি প্রকার প্রমেহ অচিরে আরোগ্য হয়। মেহবজ্রামৃতে চলিত ধাতু বদ্ধ করিয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করতঃ শরীর হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। ইহাতে কোন প্রকার দূষিত পদার্থ নাই। ইহা বক যন্ত্রেই প্রস্তুত। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ১ শিশি ৩॥৹ টাকা মাত্র ডাক মাশুল স্বতন্ত্র ॥

১। আমাদের ঔষধালয়ে যাবতীয় আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ পাওয়া যায়।

চ্যবনপ্রাশ	প্রতি সের ৬৲	শ্রীমদনানন্দ মোদক প্রতি সের	১২৲
ব্রাহ্মি ঘৃত	" ৮৲	অশোক ঘৃত "	১২৲
অমৃতপ্রাশ ঘৃত	" ২৪৲	মকরধ্বজ	তোলা ৮৲
ষড়্গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ	তোলা ১৬৲	সিদ্ধ মকরধ্বজ	" ৩২৲

আসব, আরিষ্ট, বটীকা, মোদক, ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

বিনীত কবিরাজ শ্রীক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন
৩৪ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫০০৲ টাকা

পর্য্যন্ত পাওয়া যায়
মাসিক ১৲ ও ২৲
টাকা চাঁদা দিয়া।
১০, ১৫, ২০ বৎসর
অন্তে জীবিতাবস্থায়
টাকা দেওয়া হয়।

উচ্চহারে কমিশনে
সর্ব্বত্র এজেণ্ট
আবশ্যক

এসিয়াটিক ইন্সিওরেন্স

কোম্পানি লিমিটেড,

৩নং কর্মাসিয়েল বিল্ডিংস, কলিকাতা।

স্বদেশী ফুটবল ব্যাডমিণ্টন টেনিস ইত্যাদি

আমাদের দোকান সুগোল সুঠাম টেকসই ফুটবলের জন্য বিখ্যাত।

ফুটবল (ব্লাডার সহ)

৫নং রামমূর্ত্তি ১২৲, সিল্ড উইনার ৫নং ১১৲, ৪নং ৮৲, গোবর ৫নং ৯৲, ৪নং ৬॥০, বাঙ্গালী পণ্টন ৫নং ৭।০, ৪নং ৫।০, খোকন ৪নং ৪৸০, ৩নং ৩৸০ ও ৩।০, ২নং ২৸০ ও ২।০, ১নং ২৲

ব্লাডার—৫নং ১৸০, ৪নং ১॥৵০, ৩নং ১।৵০, ২নং ১৵০ ১নং ৸৵০

ইনফ্লাটার—১।০, ১৸০, ২॥০ ও ৩॥০

ব্যাডমিণ্টন (সেট)—
৪ খানা ব্যাট, ১টী জাল ও ৩টী ফুল সহ ৬॥০, ৮॥০, ১০॥০, ১২॥০ ও তদূর্দ্ধ।

র‍্যাকেট—১।০, ১৸০, ২৲, ২॥০ ও ৩৲

জাল—১।০, ১॥০ ও ২৲

সাটেলকক (ডজন) ৩৲, ৪॥০, ৬৲, ৭॥০ ও ৯৲

টেনিস র‍্যাকেট—৩॥০, ৫৲, ৮॥০, ১২৲, ১৫৲ ও তদূর্দ্ধ

ক্যারাম বোর্ড (সেট) ১০৲, ১৪৲, ২২৲ ও ২৬৲

অন্যান্য যাবতীয় খেলার ও ব্যায়ামের সাজ সরঞ্জামের সচিত্র মনোরম ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

ভিঃ পিঃতে মাল পাইবেন।

মোহনতোষ ব্রাদার্স,

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

Bhola Nath Dutta & Sons.

Paper Merchants & Stationers.

ভারতের শ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত কাগজ বিক্রেতা

আমরা ভারতের সমস্ত দেশীয় রাজ্যে, রেলওয়ে কোম্পানীতে, মিউনিসিপ্যালিটিতে, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সংবাদপত্রের আফিসে সুলভে সকল রকম কাগজ সরবরাহ করিয়া থাকি। আপনার কাগজ এবং কালির আবশ্যক হইলে সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে স্মরণ করিবেন।

হেড্ অফিস—১৩৪-৩৫, পুরাতন চিনাবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—
৬৪, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।
১, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ।
চক, বেনারস সিটি।
পটুয়াটুলী, ঢাকা।

ত্রিশান্তি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

৯নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা।

"ত্রিশান্তি রসায়ন"

(গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী করা)

এই মহৌষধ সেবনে মেহ, প্রমেহ, সিফিলিস্, গণোরিয়া, ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয় শৈথিল্য, ধ্বজভঙ্গ, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, হৃদরোগ, বহুমূত্র, অম্ল, অজীর্ণ, ডিসপেপ্‌সিয়া প্রভৃতি জটিল রোগ সমূলে বিনষ্ট হইবে। রক্তদুষ্টি এবং বাত রোগে এই রসায়নের ক্রিয়া তাড়িৎ শক্তিবৎ। ব্যাধি যতই কঠিন এবং পুরাতন হউক না কেন, আমরা গ্যারাণ্টি দিয়া চিকিৎসা করি। ঔষধে উপকার না পাইলে ঔষধের মূল্য ফেরৎ। শারীরিক ত্রি-দোষ, বায়ু, পিত্ত ও কফ্—ইহাদের সমতা রক্ষা করিতে একমাত্র ত্রিশান্তি রসায়নই সমর্থ; ইহা বিজ্ঞাপনের কথা নয়, পরীক্ষার ফল। মূল্য এক শিশি ১॥০ টাকা। মাশুলাদি ।৶০ আনা। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—শ্রীসুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা আরবী, পার্শী, বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায়—

প্রশ্নপত্র

নির্ভুল ও সুন্দররূপে ছাপিয়া যথা সময়ে সরবরাহ করিয়া থাকি।

বিনীত—
ম্যানেজার—"মোহাম্মদী প্রেস"
৯১নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

জাগো আমার প্রাণের বঁধু! নিদ্‌-মহলে নেইকো রাতি
পুব-দুয়ারে অরুণ এসে দেয় নিবিয়ে তারার বাতি।
কোন্ কিরাতের কিরণ-তীরে রঙের আলো ঝলকে পড়ে
রাজার-পুরীর হাজার চুড়ো সেই আলোকে গুমরে মরে।

মোহাম্মদী প্রেস ওমর খৈয়াম

চতুর্থ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৩৮ | ৭ম সংখ্যা

আমাদের সাহিত্য ও সমাজ

ছৈয়দ এমদাদ আলী

ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত কথা যে, সমাজের রূপ সাহিত্যে ফুটিয়া উঠে। অর্থাৎ সাহিত্য ও সমাজ একে অপরের প্রতিচ্ছবি। একটিকে বুঝিতে পারিলে আর একটিকে কেবল বুঝিতে পারা নয়, চিনিতেও পারা যায়।

সকল দেশে, সকল সমাজেই একটা আদর্শকে অবলম্বন করিয়া সাহিত্যের নবজন্ম লাভ হয়। শক্ত ভিতের উপরেই সাহিত্যের সৌধ গড়িতে হয়। ভিত ঠিক করিয়া সাহিত্য গড়িতে না পারিলে কিছুই হয় না। এই ভিত গড়িতে ইট-পাথর, মাল-মশলার প্রচুর আয়োজন করিতে হয়, না করিতে পারিলে কেবল বাতাসে আপনা হইতে প্রাসাদ গড়িয়া উঠে না। সমাজকে উন্নত করিবার ইচ্ছা থাকিলে সাহিত্যের রাজ-মজুরী হইতেই কাজ আরম্ভ করার প্রয়োজন। এতদিন আমরা তাহা করিতে পারি নাই বলিয়াই বাংলার মাটিতে মুসলমানের খাঁটি সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই।

পোষাকে-পরিচ্ছদে যেমন বাংলার তরুণ মুসলিমকে মুসলিম বলিয়া চেনা যায় না, সেইরূপ তাহাদের সাহিত্যকেও চেনা যায় না। এ লক্ষণ অশুভ, এ পরাজয় ও অপঘাত মৃত্যুর লক্ষণ। ইহা হইতে এই অপ্রিয় সার-কথাটুকু বুঝা যায় যে, মুসলমানের কাল্‌চার—শিক্ষা ও সভ্যতা, হিন্দু কাল্‌চার ও খৃষ্টীয় কাল্‌চারের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে বা করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই দুই কাল্‌চারের শ্রেষ্ঠ অংশ আমরা গ্রহণ করিতেছি না, আমরা গ্রহণ করিতেছি তাহাই, যাহা খেলো ও অপকৃষ্ট; তাই আমাদের পরাজয় কুৎসিৎ আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

নিজেদের কাল্‌চারকে সংস্কার করিতে হইলে, তাহার মধ্যে নূতন জীবন ও নবশক্তির সঞ্চার করিতে হইলে, নানাদেশ ও জাতির কাল্‌চারের ভাল অংশ বাছিয়া লইয়া কাজে লাগাইতে হয়। এই ঋণ দোষের কারণ নয়, ইহা চিরমঙ্গলপ্রসূ। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের সাহিত্য ও কাল্‌চারের পতনের সহিত আমাদের সামাজিক পতনের ইতিহাস ওতপ্রোত হইয়া আছে।

কাল্‌চারের সংস্কার হয় সাহিত্যের ভিতর দিয়া। অর্থাৎ সাহিত্যের যাঁহারা সারথী, তাঁহারাই এই সংস্কারের কাজ করিয়া থাকেন। এই কাজ খুবই শক্ত, অনেক সাধনা ও চিন্তা খরচ করিয়া সংস্কারের এক-একটা পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। এই কাজ আরামের নয়,

কষ্টের কাজ। আমাদের সাধনা নাই, আদর্শের দিক দিয়াও আমরা হীন হইয়া পড়িয়াছি, তাই আমাদের সাহিত্যের যেরূপ হীন অবস্থা, আমাদের সমাজেরও সেইরূপ হীন অবস্থা। উচ্চ আশা এবং উচ্চ আদর্শই মানুষকে, জাতি বা সমাজকে বড় করিয়া থাকে, যদি তাহাদের সহিত হয় সাধনার সংযোগ। ইহার কিছুই আমাদের নাই।

গঠন কার্য্য আরম্ভ না হইতেই আমাদের সাহিত্যের আদর্শ, সমাজের আদর্শ, জীবনের আদর্শ কত হীন হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের যে দুইখানা মাসিক পত্রিকা আছে, তাহার পৃষ্ঠা হইতেই তাহার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া দেওয়া যায়। কেহ হয়ত নিরাশ-প্রেমিক নায়ককে গত্যন্তর না দেখিয়া নিজের জীবিকার্জ্জনের জন্য কয়লার খনিতে পাঠান এবং পরে তাহাকে ঘোর মাতাল ও অবৈধ উপায়ে যৌনধর্ম্ম পালনে প্রমত্ত পশু করিয়া ছাড়িয়া দেন। কেহ হয়ত মনে করেন—মদ না খাইলে সভ্যতার আদর্শ ফুটিয়া উঠে না। পরস্ত্রীর প্রতি কামনা-লোলুপ হইয়া তাহাকে বিপথগামী করাও কাহারও কাহারও মতে সাহিত্যের আদর্শ। আমার এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, আমি সাহিত্য হইতে ভালবাসাকে বিদায় করিয়া দিতে চাই। ভালবাসা আছে এবং ভালবাসা থাকিবেই। একটা সমাজ বা একটা জাতি ভালাবাসাহীন হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। নিরাশ-প্রেমের নিদর্শনও সাহিত্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিবে, কিন্তু তাহা হইবে ভালবাসার স্বর্গীয়ভাবে প্রোজ্জ্বল—কাম-কলুষতা হইতে মুক্ত। জীবনের পথে কেমন করিয়া মানুষের পদস্খলন হয়, তাহা দেখাইতে হইলে সংযত ভাবেই দেখাইতে হইবে। বড় করিয়া দেখাইতে গেলে সাহিত্যের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে। সাহিত্যের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইলে সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়—সমাজের দাঁড়াইবার শক্তি নষ্ট হয়। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হইল সমাজের মেরুদণ্ডকে সুদৃঢ় করা, মানুষ তৈরী করা, সমাজকে ভাঙ্গা নয়। শ্রেয় ও প্রেয়ের সন্ধান দেওয়াই সাহিত্যের বড় কাজ।

একথা আমাদের ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, আমাদের সাহিত্যের সৃষ্টিমূলে হীন ও জঘন্য আদর্শকে স্থান দিলে আমাদের সাহিত্য কখনও সবল হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারিবে না—আমাদের কাল্‌চারের অপমৃত্যু ঘটিবে, আমাদের সমাজের নবজীবন লাভ হইবে না। ইহার ফলে আমাদের দৈন্য ও হীন অবস্থা আরও বৃদ্ধি পাইবে।

সাহিত্যের সৃষ্টিমূলে থাকা চাই জাতি ও সমাজকে বড় করিবার একটা অদম্য আকাঙ্খা। কিন্তু সে আকাঙ্খার সৃষ্টি অসৎ সাহিত্যের প্রচার দ্বারা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। তাই ক্ষুণ্ণ মনে দেখিতেছি, সেই অদম্য আকাঙ্খা আমাদের মধ্যে এখনও জন্মলাভ করে নাই।

যৌনধর্ম্মমূলক উপন্যাস লেখা দোষাবহ নয়, সমাজে উহার প্রচারেরও প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজন সমাজে মাতাল, বেশ্যাসক্ত বা অসৎচরিত্র সৃষ্টির জন্য নয়, চরিত্র গঠনের জন্য। বিভিন্ন অবস্থার সংঘাতে পড়িয়া নর ও নারী কিরূপে পথ হারাইয়া ফেলে—নিজেদের জীবনকে বিপন্ন ও দুঃখপূর্ণ করে, তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখানোই এই শ্রেণীর উপন্যাসের একদিকের কাজ। আর একদিকের কাজ হইল—সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া যে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে মনের দিক দিয়া পার্থক্য থাকিলে, তাহাদের মধ্যে আদর্শের বিভিন্নতা বর্ত্তমান থাকিলে প্রকৃত মিলন অসম্ভব। শুধু এই কারণেই নর ও নারীর নিজেদের জীবন যাত্রার পথ এমন করিয়া গড়িয়া তোলা উচিত, যাহাতে উভয়ের আদর্শ ও আকাঙ্খা সমতা প্রাপ্ত হয়। ইহা করিতে পারিলেই নরের সহিত নারীর মিল সার্থক ও গৌরব পূর্ণ হইয়া দাঁড়ায়।

সাহিত্যের ভিতর দিয়া যৌনধর্ম্মের উদ্দাম, সঙ্কোচহীন চরিতার্থতার ছবি ফুটাইয়া তুলিলে জাতি বা সমাজের কোনো মঙ্গল হইতে পারে না—Culture বা Civilisation ও প্রগতির পথে চলিবার সুযোগ পায় না, বরং সুযোগ হারাইয়া ফেলে। সাহিত্যের সৃষ্টির পথে খেলো ও অকেজো জিনিষ লইয়া যত বেশী নাড়া-চাড়া করা যাইবে, সাহিত্য ততই খেলো ও অকেজো হইয়া পড়িবে—জাতীয় জীবন গড়িবার সহায় না হইয়া উহা ভাঙ্গিবারই সহায় হইবে।

ইউরোপের মনীষাসম্পন্ন বিশ্ববিখ্যাত লেখকগণ যৌনধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা-সাহিত্যের ভিতর দিয়া যে সকল রচনা জগৎকে উপহার দিয়াছেন, তাহা সমাজ বা জাতিকে ভাঙ্গিবার জন্য নয়, নূতন করিয়া গড়িবার জন্য—তাহার সকল গ্লানি দূর করিয়া তাহাকে উজ্জ্বল ও দৃঢ় করিয়া তুলিবার জন্য। কিন্তু আমাদের সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ হইতে না হইতেই বিখ্যাত

হইতে চাহেন যৌনধর্ম্মের আলোচনামূলক উপন্যাস রচনা করিয়া—উহা করিতে যে সাধনা ও প্রতিভার দরকার, লোকচরিত্রে অসীম জ্ঞান থাকা দরকার, সেই কথাটি তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া যান।

যৌনধর্ম্ম সম্বন্ধীয় রচনা স্বভাবতঃই তরুণের তাজা ও কচি মনকে আকৃষ্ট করে এবং তরুণের কাছে প্রশংসা পাওয়ার জন্য অমন জিনিষ আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু উহাতে তরুণের মনকে সবল না করিয়া দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। তাহার ফলে সাহিত্যের ভিতর দিয়া পতিত সমাজের উদ্ধারের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়।

জীবন যুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য মনকে যখন দৃঢ় ও বলিষ্ঠ করার দরকার, তখনই এইরূপ সাহিত্য তাহার সকল শক্তি হরণ করিয়া লয়—বাহিরের তরুণ ভিতরে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। তরুণের এই যে অসাময়িক পরিবর্ত্তন—ইহার জন্য দায়ী লঘু, হীন রুচির সাহিত্য। আমাদের দেশেরই এক সমাজের তরুণ যখন আনন্দে, উচ্ছ্বাসে, কলহাস্যে নাচিয়া ছুটিয়া চলে জীবনকে জয়যুক্ত করিবার জন্য যৌবনের প্রতীকরূপে, আমাদের তরুণগণ তখন বসিয়া থাকে ঘরের অন্ধকার কোণে বদ্ধ হাওয়ার মধ্যে। তাহাদের জীবনে কোনো রূপ নাই, কোনো বৈচিত্র্য নাই, প্রাণে কোনো মহৎ উদার আকাঙ্খা নাই—বৃহৎ কোনো কাজ করিবার শক্তি তাহাদের নাই, তাহারা যেন রক্তহীন মৃত্যু-পথের যাত্রী!

সমাজের অবস্থার মাপকাটি হইল সাহিত্য। নানা সুগভীর চিন্তাধারা, নানা উজ্জ্বল ও মহৎ কল্পনাকে রূপ দিয়া যদি সাহিত্য গড়িয়া না উঠে, তবে তাহার মূলে গলৎ রহিয়া যায়। দাঁড়াইবার শক্তি তাহার জন্মে না,—চিরদিন তাহাকে হীনতার পঙ্ক গায়ে মাখিয়াই চলিতে হয়। তাহার ফলে সাহিত্য হইতে রস ও শক্তি সঞ্চয় করিয়া সমাজ শক্তিশালী হইতে পারে না।

আজ যে বাংলার হিন্দু-সমাজ নানাদিক দিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, হেম, নবীন, রমেশচন্দ্র প্রভৃতির সাহিত্য-সাধনা। সেই সাধনাকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন বহুল পরিমাণে রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র। কেমন করিয়া নিজের সমাজকে বড় করিতে হয়, নিজেদের জীবনব্যাপী সাধনা দ্বারা ইঁহারা তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের কবি ও লেখকগণ যাহা করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাহা সমাজকে নূতন করিয়া শক্তিশালীরূপে গড়িবার পক্ষে যে কিছু নয়, তাহা না বলিলেও চলে। তাঁহাদের রচনার মূলে সাধনা নাই, সাধনা উদ্দীপিত করিবার মত ভাব নাই, আছে কেবল বহ্বাড়ম্বর। উহার ভিতর দিয়া নব-জীবন বা নূতন কাল্‌চারের আগমনী গান শোনা যায় না।

কই সে শক্তিশালী সাহিত্যিক আমাদের, যিনি সমাজের জন্য তপস্যা করিয়া এমন কিছু নূতন জিনিষ দান করিয়াছেন, যাহার ফলে সমাজ যুগ-যুগ সঞ্চিত জড়তা ও হীনতা ত্যাগ করিয়া উন্নতির পথের সন্ধান পাইয়াছে? কই সে কবি আমাদের, যিনি সমাজের প্রাণে কর্ম্মের প্রেরণা জাগাইয়া দিয়াছেন—অজ্ঞ সমাজে শিক্ষার প্রতি একটা অকৃত্রিম উৎসাহ, নিত্য নব নব জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য একটা আকাঙ্খা জাগাইয়া দিতে পারিয়াছেন? কিছু গড়া না হইতেই ইঁহারা ভাঙ্গিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন—যেন উহাই শ্রেষ্ঠ কাজ, উহাই তাঁহাদের চরম ও পরম ধ্যান-ধারণার বিষয়! গড়িবার চেষ্টা, বড় হইবার আকাঙ্খা যতদিন আমাদের মধ্যে আন্তরিক হইয়া দেখা না দিবে, ততদিন আমাদের পরাজয় সুনিশ্চিত, উহা রোধ করিবার কোনো উপায়ই আমাদের হাতের কাছে উপস্থিত নাই।

বাংলার মুসলমান তাহাদের পরাজিত জাতি বলিয়া ধরিয়াই বসিয়া আছে, তাই তাহাদের জন্য উন্নতির কোনো দ্বারই খুলিয়া যায় নাই, সকল দ্বারই রুদ্ধ হইয়া আছে। পরাজয়ের ভাব মনে লইয়া চলার মত একটা সমাজের পক্ষে দুর্দ্দশা আর কিছু নাই, ইহা নিতান্তই নিদারুণ ও সাংঘাতিক। ইহা দুঃখ-দৈন্যই বাড়াইয়া তোলে, তাহাদের কমাইতে পারে না—শিক্ষার স্রোত রুদ্ধ করিয়া দেয়, তাহাকে গতিশীল করিতে পারে না।

নিরাশ হইবার কোনো কথা নাই। দুঃখ ও কষ্টের ভিতর দিয়াই আনন্দ ও জয়ের আগমন হয়। আমাদের এই দুঃখ-নিশার অবসান হইবেই হইবে, যদি আমরা সাধনার কষ্টকে ভয় না করি। সেই সাধনার সঙ্গে আসিবে প্রেরণা। তাহার পিছনে আসিবে সুনিশ্চিত সিদ্ধি। আমাদের সাহিত্যিকদের কয়েকজনের প্রেরণা আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়, কারণ সমাজের ভবিষ্যত উন্নতির জন্য তাহাদের আকুলতা যে অপরিসীম ও অকৃত্রিম, তাহা তাঁহাদের রচনার

ভিতরে প্রস্ফুট দেখা যায়। তাঁহারা চাহেন—বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ইস্‌লামী ভাবধারাপুতঃ নব কাল্‌চারের জন্ম দিতে। তাঁহারা বুঝিয়াছেন—কাল্‌চারের জন্ম হয় সাহিত্যের বুকে। এই কাল্‌চার ভাঙ্গনের পথ ধরিয়া আসিবে না, সব ওলট-পালট করিয়া দিয়া আসিবে না, উহা আসিবে পুরাতন কাল্‌চারকে নূতন রূপ ও নবজীবন দেওয়ার কাজ করিতে করিতে।

সকল দেশের, সকল জাতির উন্নতির ইতিহাস হইতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সেই দেশ বা জাতির উন্নতির মূলে রহিয়াছে তাহার সাহিত্য। সেই সাহিত্য সৃষ্টি করিতে কেবল যে মনীষার দরকার হইয়াছে তাহা নয়, দীর্ঘকাল ব্যাপী সাধনারও দরকার হইয়াছে।

ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যের দুই বৃহৎ যুগ—এলিজাবেথের যুগ ও ভিক্টোরিয়ার যুগই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। এই দুই যুগের সাহিত্য-সাধনা ও মনীষাই ইংরাজ জাতিকে বড় করিয়াছে। সাধনা-লব্ধ ফল বলিয়াই তাহা জাতি ও দেশকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, উদ্যম-উৎসাহ, সাহস, শক্তি, অধ্যবসায় ও আকাঙ্খা লইয়া জ্ঞানের নব-নব রাজ্য জয় করিবার জন্য। আমরা যদি আমাদের সাহিত্যের মধ্যে সেই ভাব জাগাইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সামাজিক জীবনের উন্নতি অপরিহার্য্য, উহাকে কেহ রোধ করিয়া রাখিতে পারিবে না।

আমাদের সাহিত্য অনুন্নত বলিয়াই আমাদের সামাজিক জীবনও অনুন্নত। আর সেইজন্যই আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের অবহেলা করে—বিশ্ব-সংসারে আমরা অধম বলিয়া গণ্য হই। আমাদের সাহিত্যে প্রাণশক্তি-ক্রীড়া দেখা যায় না বলিয়াই আমাদের সমাজেও জীবনের লক্ষণ বর্ত্তমান নাই। আমাদের সমাজকে বড় করিতে হইলে আমাদের সাহিত্যের এই অচলায়তন অবস্থা দূর করিতে হইবে—তাহাকে গতিশীল, চঞ্চল, মুখর ও বেগবান করিতে হইবে। এই গতি, এই চঞ্চলতা, এই মুখরতা, এই বেগ আসিবে সাধনার ভিতর দিয়া—উজ্জ্বল ও মহৎ চিন্তার ভিতর দিয়া, কিন্তু খেলো সাহিত্যের ভিতর দিয়া নয়, আবর্জ্জনার ভিতর দিয়া নয়।

ইস্‌লামী আদর্শের ভিতর দিয়াই আমাদের সাধনা করিতে হইবে মুসলমান রূপে, খাঁটি মুসলমানের প্রাণ লইয়া, হিন্দু বা খৃষ্টান ভাবাপন্ন হইয়া নয়,—ইস্‌লাম বা মুসলমান সমাজকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া নয়। এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমি তথাকথিত শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে এমন লোকেরও সাক্ষাৎ পাইয়াছি, যাঁহারা অবলীলাক্রমে বলেন, "মুসলমানের কিছুই ভাল নাই, উহাদের শেষ হইয়া যাওয়াই ভাল।" আর একদল দেখিয়াছি, যাঁহারা মুসলমানের সামাজিক জীবনকে এত ঘৃণা করেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের বাড়ীতে "দাদা, দিদি, বউদি" প্রভৃতি বলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, কারণ মুসলমানী সম্বোধনগুলি নাকি সভ্যতার পরিপন্থী! অলক্ষ্যে আমাদের সামাজিক জীবনে এই যে আশঙ্কাজনক রূপান্তর আসিতেছে, ইহার জন্য দায়ী আমাদের শিক্ষিত সমাজ ও আমাদের সাহিত্য। এই রূপান্তরকে বাধা দিতে না পারিলে আমাদের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটিবে

জীবনযুদ্ধের কঠোরতা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই যুদ্ধে জয়ী হইতে হইলে সাহিত্য ও সমাজকে সবল ও উন্নত করিতে হইবে কঠোরতম সাধনা দ্বারা। মনে রাখিতে হইবে, ভয় পাইয়া পশ্চাৎপদ হইলে বাংলাদেশের এই সংখ্যা-গরিষ্ঠ মুসলমানদের নাম ও নেশানা পর্য্যন্ত লোপ পাইবে।

আমাদের ইস্‌লামী আদর্শের মূলে কোনো গোঁড়ামী থাকিবে না—খাঁটি ইস্‌লামী আদর্শের মূলে কোনো প্রকারের গোঁড়ামী বা ক্ষুদ্রতা থাকিতে পারে না। যদি থাকিত, তাহা হইলে ইস্‌লামের অবদান বিশ্বব্যাপী হইয়া তাহার কাল্‌চার ও সভ্যতার ভিতর দিয়া নানাভাবে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিত না। আমাদের সেই অতীত গৌরবের মধ্যে আমরা পাইব আমাদের আদর্শ, সেই আদর্শকে বর্ত্তমানের আলোক দিয়া যদি আমরা মন্ত্রপুতঃ করিয়া লই, তাহা হইলেই আমাদের সকল দিক সার্থক হইয়া উঠিবে।

বাংলার তরুণ মুস্‌লিম! তোমরা এই মহাসাধনায় প্রবৃত্ত হও। তোমাদের সুগভীর চিন্তা ও উচ্চ আদর্শের ভিতর দিয়া যে সাহিত্যের জন্ম হইবে, আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তাহা তোমাদের সমাজের সকল অবসাদ দূর করিয়া দিবে, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে সবল ও সক্ষম করিবে। সকল দ্বন্দ্ব ও কলহের উচ্চ চীৎকারকে কর্ম্মের কোলাহলের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া তোমরা দৃঢ় চিত্তে অগ্রসর হও নির্ভীক বীরের মত জ্ঞানানুসরণের পথে, তোমাদের সাফল্য সুনিশ্চিত।

সত্যমেব জয়তে

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্য পৃথিবীর সনাতন ধর্ম্ম। এই সত্য যুগে-যুগে প্রস্ফুটিত হইয়া জগতে নীতি, ধর্ম্ম, শিক্ষা, সভ্যতা, সমাজ ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ভৌতিক জগতের ক্রম-বিকাশের ন্যায় মানব-সমাজও উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তাহা একদিনের সৃষ্টি নহে। যুগ-যুগান্তরের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া আমরা বর্ত্তমান পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের শরীরও প্রতি-ক্ষণে রূপ পরিবর্ত্তন করিতেছে। প্রতি মূহুর্ত্তে শরীরের পুরাতন উপাদান (tissue) গুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে এবং নূতন উপাদান (tissue) গুলি তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। ভৌতিক জগতের ক্রিয়াগুলি এমন নিঃশব্দে রূপ পরিবর্ত্তন করিতেছে, এমন অনাড়ম্বরে আপনার নিয়তির শাসন রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতেছে যে, আমাদের দৃষ্টি আদৌ সে দিকে আকৃষ্ট হয় না। ভৌতিক জগতের ন্যায় আত্মিক জগতের সত্যগুলিও ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে। আত্মিক জীবনও কালের আবহমান গতি অতিক্রম করিয়া নূতন জন্ম গ্রহণ করিতেছে। ভৌতিক জগতের ন্যায় আত্মিক জগতের ক্রিয়াগুলি সকল সময়ে বা সকল অবস্থায় নিঃশব্দে প্রস্ফুটিত হয় না। দেশ-কাল নির্ব্বিশেষে যেখানে আত্মিক সত্য আত্ম-বিকাশ করিয়াছে এবং যখনই জনসাধারণ সেই সত্যকে জীবনে গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, তখনই মানব-সমাজে একটা প্রলয় সৃষ্টি হইয়াছে। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দান করে। অবশ্য ভৌতিক জগতও এই প্রলয়ের অধীন। প্রলয়ের মধ্য দিয়াই আমাদের বর্ত্তমান জগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে। নূতন সৃষ্টির ইহাই সনাতন বিধি। তবে ভৌতিক জগতের প্রলয়ের সহিত ভৌতিক সৃষ্টির সম্পর্কটা এত উজ্জ্বলভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না বলিয়া, আমরা এবিষয়ে একপ্রকার উদাসীন। কিন্তু যখন কোন আত্মিক বা সামাজিক সত্য মানব গ্রহণ করিবার জন্য উদ্যত হয়, তখন সমাজে যে-প্রকার বিপ্লব সৃষ্টি হয়, তাহা সাধারণ নর নারীর বোধগম্য। ভৌতিক জগতে যখন কোন একটী বিরুদ্ধ-বস্তু বা উপাদান নূতন সৃষ্টি গড়িবার পক্ষে বাধা উৎপাদন করে, তখন সেই বিরুদ্ধ শক্তিকে প্রকৃতি হয় চূর্ণ করিয়া ফেলে, নতুবা জগৎ-শরীর হইতে তাহাকে হয় বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, নতুবা তাহার সহিত এরূপ সমবায় প্রতিষ্ঠা করে, যদ্দারা প্রকৃতি সৃষ্টির পথে অনায়াসে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তির সংঘর্ষণের নামই প্রলয়। দুইটী বিরুদ্ধ শক্তির যেটীকে আশ্রয় করিয়া, অথবা দুইটী বিরুদ্ধ শক্তির সমবায় প্রকৃতি শক্তিসম্পন্ন হইয়া যখন নিজ নিয়তির দিকে অগ্রসর হয়, তখন তাহা সৃষ্টিশক্তি নামে অভিহিত হইতে পারে। এই সৃষ্টিশক্তিই বিধাতার সনাতন বিধি। এই সনাতন বিধিই জগতের চিরন্তন সত্য।

ভৌতিক জগতের সত্যগুলি যেমন কখন ধীরে ধীরে কখন দ্রুতগতিতে সৃষ্টির পথে অগ্রসর হয়, কখন প্রলয় সংঘটন করে, কখন প্রলয়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে নূতন সৃষ্টি রচনা করে; আত্মিক-জগতের সত্যগুলিও কখন ধীরে ধীরে কখন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া মানব সমাজকে একবার ভাঙ্গিতেছে, আবার তাহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া

শোভা-সৌন্দর্য্য পূর্ণ করিতেছে। যখন একটা প্রবল পাপ সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়া তার জীবনী শক্তিকে নষ্ট করে, সমাজকে কঙ্কালসার করে, তাহার বৃদ্ধির পথে প্রবল অন্তরায়রূপে দণ্ডায়মান হয়, তখন সেই পাপ দূর করিবার জন্য, কুসংস্কার শূন্য করিয়া সমাজকে সত্যের পথে আকৃষ্ট করিবার জন্য ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সেই সংঘর্ষ বা দেবাসুরের যুদ্ধকে আমরা সমাজ-বিপ্লব নাম দিয়া থাকি।

সত্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে মহাকুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। মিথ্যার ব্যূহ ভেদ করিতে হইলে উদ্যত বজ্রের মত ভীষণ আঘাতের প্রয়োজন হয়। ইহাই বিপ্লব। এই আঘাতে মিথ্যার অট্টালিকাকে ভূমিসাৎ করে, অন্যদিকে সত্যের সৃজনীশক্তি সমাজকে ধীরে ধীরে নূতন করিয়া গড়িতে থাকে। এই ভাঙ্গা ও গড়ার মধ্যবর্ত্তী অবস্থা অতিশয় ভয়াবহ। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের নৃশংস নির্য্যাতনে আমাদের শারীরিক জীবন যেমন বিপন্ন হয়, সমাজবিপ্লব বা ধর্ম্মবিপ্লবের সময়ও সেইরূপ একটা প্রবল আঘাত মানুষকে সহ্য করিতে হয়। এই আঘাত এড়াইবার জন্য মানুষ প্রাণপণ যত্ন করে। কোন প্রবল বিপদের সম্মুখীন না হইয়া সমাজের প্রচলিত অবস্থার ভিতর জীবন যাপন করাই মানবের স্বাভাবিক ইচ্ছা।

এই স্বাভাবিক ইচ্ছা পালন করিতে গিয়া মানবের ভিতর যে প্রবৃত্তি সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই রক্ষণশীলতা। এই রক্ষণশীলতা যেমন একদিকে নূতন সত্য বরণ করিয়া লইতে অশেষ অন্তরায় উপস্থিত করে, অন্যদিকে কুসংস্কার ও আবর্জ্জনার মধ্যে যে প্রাচীন সত্যগুলি নিহিত থাকিয়া সমাজের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেছে, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকে। মানুষের অপূর্ণ জ্ঞান ও অপূর্ণ শক্তি যখনই সংস্কারের পথে অগ্রসর হইয়াছে, তখনই মিথ্যাকে চূর্ণ করিতে গিয়া অনেক সত্যকে পদদলিত করিয়াছে। এজন্য সাবধানে আমাদের পদক্ষেপ করিতে হইবে। বিজাতীয় আদর্শগুলি, বিদেশী শিক্ষার ভিতর দিয়া আমরা যখন বরণ করিয়া লই, তখন সেই আদর্শকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিবার জন্য, জাতির সম্মুখে সেই আদর্শকে বড় করিয়া ধরিবার জন্য, আমরা অনেক জাতীয় অনুষ্ঠান বা প্রথার বক্ষে পদাঘাত করিয়াছি। কুসংস্কার ভাঙ্গিতে গিয়া প্রাচীন সত্যকে হারাইয়াছি। দেশের আত্মার ভিতর বিদেশের মন রোপণ করিয়া জাতীয় সাধনার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছি। রাজপুতনার মরুভূমিতে বাঙ্গলার নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করিলে তাহার বৃদ্ধি বা পরিপুষ্টি যেমন অসম্ভব, সেইরূপ বিদেশের সভ্যতাও এদেশের উন্নতির পরিপন্থী। এদেশের জলবায়ু, প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য্য, প্রবল সূর্য্যরশ্মি প্রখরতা, নদনদীর কল-কল ধ্বনি, শস্য-শ্যামলা ধরণী, শিশির স্নাত কুসুমের স্নিগ্ধ সৌরভ, শরতের পূর্ণচন্দ্র প্রভৃতি প্রকৃতির অজস্র সম্পদের ভিতর ভারতবাসীর চিত্তের ঐশ্বর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির বিধি (laws) গুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া অথবা প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আমরা কোন দিন জীবনের পথে অগ্রসর হইতে পারিব না, অর্থাৎ অন্য জাতির বৈশিষ্ট্যের অনুকরণ করিয়া ভারতের আত্ম-বিকাশ হওয়া অসম্ভব। এদেশের সভ্যতা আত্মিক সভ্যতা, আর য়ুরোপের সভ্যতা জড় সভ্যতা। এই আত্মিক সভ্যতার মধ্য দিয়া আমরা উন্নতি পথে অগ্রসর হইব—ইহাই প্রকৃতির বিধান। যে শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্বকে উদ্বুদ্ধ করে না, নৈতিক জীবনকে জাগ্রত করে না, সত্য চিন্তা করিতে, সত্য বাক্য উচ্চারণ করিতে, অথবা সত্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে মানুষের প্রাণকে শক্তি সম্পন্ন করে না, সে শিক্ষা কুশিক্ষা। বাহ্য সভ্যতার রাজ-মুকুট পরিধান করিয়া, রাজ সভ্যতার চাক-চিক্যে আত্মহারা হইয়া আমরা ভারতের আত্মাকে হারাইয়াছি। আমরা দাঁড়-কাকের পালকে ময়ূরের পুচ্ছ ধারণ করিয়া আত্ম-প্রবঞ্চিত হইয়াছি। এখন আমাদের সত্যের অনুসরণ করিতে হইবে। ভারতের আত্মাকে আবার জাতির ভিতর পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রাচীন যুগ হইতে এ পর্য্যন্ত যত মহাপুরুষ, ধর্ম্ম বা নীতি প্রবর্ত্তকগণ এশিয়া মহাদেশে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা সত্যকে জীবনে জয়যুক্ত করিয়াছেন। সত্যের অনুভূতি হয় আত্মায়, বাহিরে উপলব্ধি অসম্ভব। যিশুখৃষ্ট, হজরত মোহাম্মদ, কবির, দাদু প্রভৃতি মহাপুরুষগণ পৃথিবীর হিসাবে অধিক শিক্ষিত ছিলেন না কিন্তু তাঁহাদের আত্মা পৃথিবীকে প্রতিভা সম্পন্ন করিয়াছেন। এখনও দেখা যায় যে, ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর সত্য ভাবিবার বা সত্য বলিবার যে শক্তি নাই, নিরক্ষর কোল-ভিল-সাঁওতালদিগের তাহা

আছে। আমরা অনেক স্থলে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি। একটী মহাপুরুষের ভিতর একটী সত্যের উপলব্ধি হইতে এক-একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে, এক-একটী সভ্যতা আত্ম-বিকাশ করিয়াছে। সত্য অনুভূতি করিবার শক্তি মানবের স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতি। শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানী-মূর্খ নির্ব্বিশেষে জনসাধারণের স্বতঃসিদ্ধ প্রকৃতিকে জাগাইয়া তুলিতে পারিলে জাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। জগতে মনুষ্যত্বের আস্বাদন লাভ করিতে পারিবে ও সত্যের মহাবলে বলীয়ান হইয়া ধন্য হইবে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র একবার নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে,—"Every inch of this man is real, tremendously real." আত্মার ঘুণাক্ষরে মিথ্যার অন্ধকার থাকিলে সত্যের প্রতিভা ফুটিয়া উঠিবে না। মহাত্মা গান্ধী বলিলেন যে, "God is truth." ঈশ্বর সত্য স্বরূপ তাই সকল চিন্তায় ও কর্ম্মে, সকল শিক্ষা ও নীতিতে, সকল ব্যবসায় ও বাণিজ্যে, সকল রাজ্য ও সাম্রাজ্যে তিনি সত্যকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন।

যুগ-যুগান্তর হইতে ঠিক আলোক ও অন্ধকারের মত সত্য ও মিথ্যা পাশাপাশি দাঁড়াইয়া কার্য্য করিতেছে। সত্যের যেমন রাজ্য আছে, মিথ্যারও সেইরূপ একটী রাজ্য আছে। মানব-জীবনের প্রত্যেক স্তরে মিথ্যা পাষাণের দুর্ভেদ্য বূহ্য নির্ম্মাণ করিয়া জন-সমাজকে শাসন করিতেছে। কাহার সাধ্য তাহাকে ভেদ করে? যেখানে আংশিক সত্য বা অর্দ্ধ সত্য মিথ্যার পাষাণ-দুর্গ ভাঙ্গিতে গিয়াছে, সেইখানেই সপ্ত-রথীর হস্তে নিহত অভিমন্যুর মত মিথ্যার হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছে। আর যেখানে সত্য পূর্ণ প্রতিজ্ঞা লইয়া মিথ্যার পাষাণ দুর্গে আঘাত করিয়াছে, সেখানে সত্য জয়যুক্ত হইয়াছে। সত্য রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা যেদিন উদ্যত বজ্রের ন্যায় মিথ্যার পাষাণ মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিল, সেই দিন ভারতে কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি হইল। মহাপ্রলয়ের অগ্নিধারা ঝলকে ঝলকে নামিয়া আসিয়া গৃহে গৃহে শ্মশানের চিতা প্রজ্বলিত করিল। কত রাজ্য ধ্বংস হইল, কত সাম্রাজ্য ধরা পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গেল, কত বীর-কীর্ত্তি অতীতের কাহিনী হইয়া কেবল পুঁথিতে লেখা রহিল। কিন্তু প্রকৃতির বিধানই এই যে, প্রলয়ের পরেই নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হয়। কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানের ভস্ম হইতেই শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতার নবজন্ম আরম্ভ হইল, শরতের পূর্ণ চন্দ্রের মত তাহা শোভা-সৌন্দর্য্যে বিকসিত হইল। যোগ-ভক্তি-কর্ম্ম-জ্ঞানের স্নিগ্ধ সমীরণে ভারতের উত্তপ্ত প্রাণ সুশীতল হইল। ধর্ম্ম সমন্বয়ের অদ্ভুত প্রতিভা মৃত্যুঞ্জয়ের অমর প্রতিমা লইয়া ভারতের বক্ষে শিবরাত্রির সলিতার মত চিরদিন জাগিয়া রহিল।

প্রকৃতির মধ্যে যে বিধি কার্য্য করিতেছে, সমাজ ও রাষ্ট্রও সেই বিধির শাসনে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সমাজে, ধর্ম্মে, মানবজাতির নানা প্রকার সম্বন্ধ ও ক্রিয়া-কলাপের ভিতরে পাপের আধিক্য হইলেই সেখানে বিপ্লব উপস্থিত হয়। একশত বৎসরের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ব্রাহ্ম সমাজ দেশের প্রচলিত বিশ্বাস ও সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে যখন দণ্ডায়মান হইল, প্রতিমা পূজা ও জাতিভেদের মূলে যখন কুঠারাঘাত করিল, তখন দেশের মধ্যে সমাজ-বিপ্লব সৃষ্টি হইল। কত লোক গৃহহীন হইল, কত লোক বিত্তহীন হইল, কত লোক পিতামাতার বুকভরা স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইল, নির্য্যাতনের তীক্ষ্ণ শর কত লোকের বক্ষঃ বিদারণ করিয়া চলিয়া গেল, কত ধনীর পুত্র ভিখারী হইল। দেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে এ সকল কথা লেখা রহিল। ব্রাহ্মসমাজ যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল, তাহার শিখা এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই, সেই শিখা সহস্রমুখী হইয়া দেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। সমাজে, শিক্ষায় ও রাষ্ট্রে জাতির ভিতর সেই সত্য নিজ আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছে। রাজা প্রজার অধিকার ও আন্তর্জাতিক সম্বন্ধকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য দেশের মনীষিগণ প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন। আমরা বিধাতার মঙ্গলময় শক্তিতে বিশ্বাস করি, দেশের বর্ত্তমান অবস্থা যতই শঙ্কটাপন্ন হউক না কেন, আমরা যদি সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকি, তবে সত্যই মিথ্যার সুবর্ণ অট্টালিকা ভূমিসাৎ করিয়া ভারতে নূতন জাতি গঠন করিবে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতির প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাসের সমন্বয়ে ভারতে নূতন নীতি ও নূতন সমাজ ফুটিয়া উঠিবে। ভবিষ্যতের ভারত পৃথিবীতে তাহার গৌরবময় স্থান লাভ করিবে—ইহা আমরা দিব্য-চক্ষে দর্শন করিতেছি। সত্যের জয় হইবেই হইবে।

—প্রতিম—

এম, নাসির আলী

-এক-

কল্পনায় মানুষ তার জীবনে অনেক কিছুরই সম্ভাবনা করে' রাখে, কিন্তু কঠোর বাস্তব তার অঙ্গুলী হেলনে সবই ওলট-পালট করে দেয় দেখা যায়।

আমলাপাড়ার প্রসিদ্ধ মীর আলী আমজাদ সাহেবের জীবনেও তাই ঘটল। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে পৈতৃক ভিটার মায়া ত্যাগ করে, দুটী শিশু পুত্রকে নিয়ে তিনি এসেছিলেন শহরে স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপনের আশায়; কিন্তু অস্বচ্ছলতা কিছুতেই রেহাই দিল না তাঁকে।

তাতেও কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি দমে যান নি। অর্থাভাবে পাছে পুত্রদের উপযুক্ত শিক্ষা-বিধানে কোন ব্যাঘাত ঘটে, এ আশঙ্কায় দূরদর্শী পিতা কোন ধনী বন্ধুর মাতৃহারা একমাত্র কন্যাকে শিশুকালেই পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করলেন।

কিন্তু বিধির বিধান কে খণ্ডায়? এমনি করে জীবন-সায়াহ্নে তিনি যখন দারিদ্র্যের কবল থেকে কতকটা মুক্তিলাভ করেছিলেন, তখন এই মুক্তির আনন্দ উপভোগ করবার অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াল—পুত্রবধূর প্রতি জ্যেষ্ঠপুত্র বজলুর অহেতুক অনাদর ও নির্ম্মম ঔদাসীন্য। এর প্রতিকারের কোন সুগম পথ খুঁজে না পেয়ে এই অশেষ মর্ম্মপীড়া সম্বল করেই তাঁকে জান্নাতবাসী হতে হ'ল।

কিন্তু এর চেয়েও তীব্রতর মর্ম্মপীড়ার দাহনে ছট্‌ফট্ করছিলেন আর একজন; তিনি শিরীর পিতা। অনন্যোপায় হ'য়ে, তিনি মৃত্যুকালে সমস্ত সম্পত্তি কন্যার নামেই উইল ক'রে যান। কিন্তু স্নেহাতুর পিতার এ ব্যবস্থাটাই যেন কন্যার আরব্ধ জীবন-নাট্যে মিলনাঙ্ক শুরু হবার আগেই একটা কালো যবনিকা টেনে দিল। বজলু প্রতিজ্ঞা করলে—স্ত্রীর সম্পত্তির কাণাকড়িতেও আমি আর হাত দেবো না। যদি পারি, একদিন যা' স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলাম, জীবনে তাই পরিশোধের চেষ্টা করব। তার সে অটল প্রতিজ্ঞা একটা অটল পাষাণ স্তূপের মতই নিরপরাধ শিরীর বুকে চেপে বসল। বজলু একদিন বন্ধু-বান্ধবের সকল অনুরোধ-উপরোধ অগ্রাহ্য করে' ষ্টেট স্কলারশিপ নিয়ে বিলাত যাত্রা করেন। জীবনের একদিকের একটা মস্ত বড় শূন্য গহ্বরকে পূর্ণ করে' তুলবার প্রয়াসই হয়তো সে করেছিল, তাই শিরীর কাজলে-আঁকা চোখের সজল-করুণ চাউনি তাকে ঘরে বেঁধে রাখতে পারল না।

জীবন যখন এমনি করে' এগিয়ে চলেছে সংসারের হাসি-অশ্রুর মধ্যে দোল খেয়ে খেয়ে, তখন একদিন শিরী হঠাৎ আবিষ্কার করল,—তার এ ব্যর্থ-প্রায় জীবনে এগার বৎসর বয়স্ক দেবর হারুণ ছাড়া আর কোন অবলম্বনই নেই। সমস্ত অতীতকে ধুয়ে-মুছে দেবার চেষ্টা করে' সে তাকেই বুকের কাছে টেনে নিয়ে গভীর স্নেহে তার শিরচুম্বন করল।

জীবনের প্রারম্ভেই যখন ভবিষ্যতটা পরিস্ফুট হ'য়ে উঠল শিরীর মনশ্চক্ষের সামনে, তখন থেকেই সে শহরের সহস্র বিলাস-বাসনা থেকে নিজকে যথাসাধ্য সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করত দূরে দূরে। কর্ম্ম-চঞ্চল শহরের

জন-কোলাহল আর ভাল লাগ্‌ছিল না তার কাছে। তাই হারুণের হাত ধরে একদিন সে গিয়ে উঠ্‌ল তার শ্বশুরের পরিত্যক্ত পল্লী-ভিটায়।

— দুই —

ইটের পাজ্‌রা বের করা জীর্ণ একমাত্র অট্টালিকা। আমলাপাড়ার মির পরিবারের কোন অধঃস্তন পূর্ব্বপুরুষের আমলে যে এমারৎ গড়বার ক্ষমতা ছিল, কেবল সে কথাটার নীরব সাক্ষ্য দেবার জন্যই যেন ওটা সর্ব্বগ্রাসী কালের দৃষ্টি এড়ায়ে আজো দাঁড়িয়ে আছে।

শিরীর কিন্তু এখানে পা দিয়ে মনে হ'ল, সে যেন বহু দিনের ঈপ্সিত কোন এক শান্তি-পুরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। যে দিকে চোখ যায়, কেবলই চেয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়। মনে পড়ে তার বইয়ে-পড়া কথা।—সেই পুরাণো দীঘির কালো জল ... র বুকে হংস-হংসীর মেলা, নিবিড় বাঁশ-বন, তার ভেতরে ছায়া-ঢাকা আঁকা-বাঁকা পথের রেখা, কলকণ্ঠ বিহগের কাকলী, আমবাগের ফাঁকে ফাঁকে সোণালী সূর্য্যের লুকোচুরি সবই এখানে সত্য, চোখের সম্মুখে ভেসে বেড়ায়।

গ্রামের বৃদ্ধদের মধ্যে যাঁরা ম্যালেরিয়ার প্রকোপকে অগ্রাহ্য করে আজও বেঁচে আছেন, তাঁরা একে একে এসে এই নবাগত ক্ষুদ্র পরিবারটীর কুশলাদি জিজ্ঞেস করে' যথারীতি সহানুভূতি দেখিয়ে গেলেন। সকলের চেয়ে বেশী আত্মীয়তা দেখালেন মোমেন মোল্লা—গাঁয়ের মোড়ল। মীর পরিবার যে, কোন-দিনই তাঁর অনাত্মীয় ছিল না, এ কথাটাই তিনি বারবার বলে গেলেন আকারে-ইঙ্গিতে।

কলকাতা থেকে আসবার সময়ে শিরী সঙ্গে এনেছিল নিত্য-প্রয়োজনীয় হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কয়েকটি শিশি। হঠাৎ একদিন একজনকে এক ফোঁটা ঔষধ দেবার পরে প্রয়োজন মত গ্রামের সবাই এসে তার কাছ থেকে 'বিনি-পয়সার' ঔষধ চেয়ে নিতে লাগল।

নতুন জায়গায় এসে এমনি করে' শিরীর দিনগুলো বেশ কেটে যাচ্ছিল।

সেদিন দুপুরবেলা।

পাতার আড়ালে বসে' একটা ঘুঘু দুপুরের অলস নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে অবিশ্রান্ত ভাবে ডেকে চলছিল। গাছের কোন্ অদৃশ্য স্থানটায় বসে বিরহী ঘুঘু তার দয়িতের উদ্দেশ্যে ডেকে ডেকে সারা হ'ল, শিরী মুক্ত জানালার পাশে দাঁড়িয়ে একমনে তারই সন্ধান করছিল। এমন সময়ে পেছন থেকে তার আঁচল টান্‌তে টান্‌তে হারুণ এসে বল্‌ল,—একটা বুড়ী—ছলিমের মা তোমায় ডাক্‌ছে দাদী।

হারুণ শৈশব থেকেই তাকে দাদী বল্‌তে শিখেছিল।

শিরী পেছন ফিরে বল্‌ল,—একটা বুড়ী, আবার ছলিমের মা। ছলিমের মা কে, হারু?

—এসো না তুমি দেখবে'খন। ঐযে আমরা সেদিন ষ্টেশন থেকে আসলুম গাড়ীতে ওইতো ছলিম।

শিরী হারুণের পেছনে বেরিয়ে দেখ্‌ল, অদূরে সে লোকটী নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছে, সেই ছলিম। তার সঙ্গের বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী সকাতরে জানা'ল,—তার পুত্রবধূ প্রসব-ব্যথার কষ্টে আজ দু'দিন দু'রাত থেকে মরণাপন্ন। উপযুক্ত ঔষধ দিয়ে তাকে বাঁচাতে হবে।

শিরী ক্ষণকাল নতমস্তকে থেকে ঈষৎ ভর্ৎসনার সঙ্গে বলে উঠ্‌ল,—দু'দিন দু'রাত্তির চলে গেছে আর অষুধের খোঁজে বুঝি বেরিয়েছ এখোন?

উত্তরে ছলিমের মা বল্‌ল,—আপনি বউবিবি যে এতো দাওয়াই জানো মা, তাতো আমরা আগে জানি নে। এই মাত্তর গাজন শেখের পরিবার বলে' গেল, তাই না হেথায় ছুটে আইনু মা।

—এসেছ বেশ করেছ কিন্তু আমি যে ও-অষুধ জানি নে। তোমাদের এদিকে ভাল ডাক্তার পাওয়া যাবে?

একথায় ছলিম দু'পা এগিয়ে এসে বল্‌ল,—হুজুর ভাল ডাক্তার থাক্‌লি কি হবি? চড়ুই ডাঙ্গার বাবুদের বাড়ী এক বড় ডাক্তার আছেন, তা এহান্‌থে চার কোশের রাস্তা। তাকে আন্‌লি পরে দু'গণ্ডা আড়াই গুণ্ডা টাহার কমে বাড়ী ছাড়বি না। গরীব মানুষ অত টাহা কোহানথে পাবো হুজুর? বলেই একবার সে করুণদৃষ্টি তুলে শিরীর মুখের দিকে চেয়ে মুখ নত করল।

—তা' দু'গণ্ডা হ'ক্, আড়াই গণ্ডা হ'ক মানুষ তো বাঁচাতে হবে। আমি একটু কাগজে লিখে দিচ্ছি, তুমি এখ্‌খুনি দৌড়ে গিয়ে ডাক্তার নিয়ে এস। বলেই শিরী পুনরায় ঘরে প্রবেশ করল।

—তিন—

হারুণদের অবর্ত্তমানে তাদের বাড়ীর তত্ত্বাবধান করতেন হারুণের এক দূরসম্পর্কীয় পিতৃব্য—জলিল মিঞা। স্ত্রী এবং দু'টা চিররুগ্ন ছেলেমেয়ে নিয়ে তার সংসার। চার পাঁচ ক্রোশ দূরের একটা হাটে একখানা গোলদানী দোকানের মালিক তিনি। সপ্তাহের বেশীর ভাগই কাটাতে হয় জলিল মিঞাকে তাঁর দোকানে—মধ্যে মধ্যে দু'একদিন বাড়ীতে কাটান। আজ তিনি বাড়ী এসেছেন। তাই জ্যোৎস্নারাতে উঠানে একখানা মাদুর পেতে বাড়ীর সবাই গল্প করছিলেন একত্র বসে। এমন সময়ে ছলিম এসে হাজির। তাকে দেখেই জলিল বল্লেন,—কিরে ছলিম, খবর কি বল্। ডাক্তার পেয়েছিস্ তো?

ছলিম অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দিল—ডাক্তার তো এয়েছে হুজুর, কিন্তু গাঁয়ের মোড়ল কয়ে পাঠিয়েছে ও-ডাক্তার দেখালি নাকি সবাই মোকে 'একঘরে' করবি।

শিরী বিস্মিত হয়ে বল্ল,—একঘরে করবে? কারণ?—ওরা বলছে আওরত লোককে হিঁদু ডাক্তার দেখানো বে-শরা।

শিরী প্রথমে ছলিমের কথা কিছুই বুঝতে পারল না। পরে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে ঈষৎ উত্তেজিত হয়েই বল্ল,—ওদের বিবেচনায় পুরুষের চেয়ে একটা মেয়ে মানুষের জীবনের দাম কি এতই কম? হ'লেই বে-শরা, তুমি এখ্খুনি গিয়ে ডাক্তার দেখাও। 'একঘরে' করা কারো ঘরের কথা নয়। বলেই সে উঠে গিয়ে ছলিমের হাতে কয়েকটা টাকা গুণে' দিয়ে আবার বল্ল,—ভাল-মন্দ যখন যা' হবে আমাদের খবর দিও ছলিম।

ছলিম অস্ফুট স্বরে আচ্ছা বলে' ধীরে ধীরে প্রস্থান করল।

শিরী পুনরায় স্বস্থানে উপবেশন করে' আপন মনেই যেন বলে' উঠ্ল,—কী তাজ্জব! এমন কু-সংস্কারাচ্ছন্ন লোক দুনিয়ায় এখনও আছে!

জলিল মিঞা নিরীহ প্রকৃতির প্রবীন লোক। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ক্ষীণ হাসির সঙ্গে বলে' উঠ্লেন,—অভাব নেই মা, সেরকম লোকের অভাব নেই। কেবল এসে গাঁয়ে পা দিয়েছ বই তো নয়, আরো থাক দু'দিন কত কি চোখের সামনে নিত্য দেখ্তে পাবে। ওই যে ও-বেলা এসে ভাল মানুষটী সেজে মোমেন মোল্লা তোমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে গেল, ও-কে কি কম্ বজ্জাৎ ঠাউরেছ মা? ওর মত বুড়ো ঘুঘু এ তল্লাটে দু'টী মেলা ভার। গাঁয়ের যত নষ্টামীর গোড়ায় দেখ্বে ওকে।

—কিন্তু কথাবার্ত্তায় তো তেমন মনে হয় না ওকে, চাচাজান?

—ঐ তো বল্লুম মা! দু'দিন থাক সব বুঝবে তখন। এই যে তুমি ছলিমকে আশা-ভরসা দিয়ে দিলে, এর জন্য আবার একটা হেস্ত-নেস্ত না-বেঁধে যায়—আমি সে ভয়ই করছি।

এর থেকে কি যে হেস্ত-নেস্ত বাধতে পারে শিরী তা' অনেক চিন্তা করেও বুঝতে পারল না।

— —

এদিকে ডাক্তারের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ছলিমের স্ত্রী একটা মৃত সন্তান প্রসব করে' ঠিক তার তিনদিন পরেই মরে বাঁচ্ল কিন্তু তাতেও ছলিম রেহাই পেল না। তার বৃদ্ধা মা কাঁদতে কাঁদতে এসে শিরীকে খবর দিল,—গাঁয়ের সবাই সত্যি-সত্যিই তাদের 'একঘরে' করেছে এবং তার ফলে মৃতব্যক্তির দাফন করতে কেউ তারা রাজী নয়।

এ অপ্রত্যাশিত প্রমাদে শিরীর মাথা ঘুরে গেল। কতক্ষণ একমনে চিন্তা করে' সে ছলিমের মায়ের সঙ্গে পুনরায় হারুণকে পাঠিয়ে দিল গাঁয়ের প্রত্যেকের কাছে নিজের অনুরোধ জানিয়ে। কিন্তু কোনই ফল হল না তাতে। গ্রামবাসী সবাই নিজ নিজ গুরুতর কাজের অছিলায় বেরিয়ে গেছে। যারা এখনও বা'র হতে পারে নি তারা নানারকম ছলছুতা দেখা'তে লাগল। হারুণ শুষ্ক মুখে ফিরে এসে বল্ল,—একটা লোকও যাবে না, দাদী।

গ্রামের একটী বিধবা স্ত্রীলোক সেখানে উপস্থিত ছিল। সে শিরীকে লক্ষ্য করে' ফিস্ ফিস্ করে' বল্ল,—মা, লোকে যেতে রাজী হচ্ছে না ভয়ে। মান ইজ্জতের ভয় কা'র না আছে?

শিরী বিস্মিত হ'য়ে বল্ল,—কার ভয়? কিসের—?

স্ত্রীলোকটী তেমনি অনাবশ্যক অনুচ্চ কণ্ঠে বলে যেতে লাগল,—ওমা, তাও জান না বুঝি? ভয় ঐ মোমেন

মোল্লার। ঐ বুড়োটাই মা মস্ত শয়তান। সেই কোন্ সক্কালে ফজরের আজান নেই দিতে বুড়ো এসে হাজির। বলে গেল—তোমরা কেউ ছলিমের বৌর কবর দিতে যেও না। হারামজাদাকে না-ফরমানী কাজ করবার মজাটা এবার টের পাইয়ে দেব।

—সত্যি বলছো তা'হলে?

বিধবা স্ত্রীলোকটী দাঁতে জিভ্ কেটে সুর আরো এক পর্দ্দা নামিয়ে বল্‌ল,—আল্লার কিরে মা, এর এক বর্ণো যদি মিথ্যে হয়।

সহসা সে শিরীর হাত দু'টো চেপে ধরে আবার বল্‌ল,—তাই বলে মা আমার কথা কিন্তু কারো কাছে বলে' দিও না। তা'হলে গাঁয়ে বাস করা আমার মুস্কিল হবে।

ছলিমের স্ত্রীকে ডাক্তার দেখানোর পর হ'তেই গ্রামে যে একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠ্‌ছিল, এতক্ষণে শিরী তা' বুঝতে পারল; এবং এর গোড়াতে যে সত্যি মোমেন মোল্লার হাত আছে তাও বুঝতে দেরী হ'ল না। সে হারুনকে ডেকে বল্‌ল,—তোমাকে আর একটা কাজ করতে হবে ভাই হারু। তুমি গিয়ে আমার কথা বলে সেদিনের সেই বুড়োকে ডেকে আন্‌বে। বল্‌বে, এখ্‌খুনি যেতে হবে।

কতকক্ষণ পরেই মোমেন মোল্লা এসে হাজির। এসেই তিনি কৃত্রিম কাষ্ঠ হাসির সহিত শিরীকে বল্‌লেন, কি গো মা, তোমার বুড়ো ছেলেকে এত জরুরী তলপ করেছ কি মনে করে?

শিরীর মনে হ'ল ও-রকম হাসি বুঝি শয়তানের মুখকেও অশোভন করে' তোলে। সেও বিনিময়ে ওষ্ঠাগ্রে একটু হাসি এনে বল্‌ল,—গাঁয়ে এসব কি হচ্ছে খোঁজ রাখেন তো?

—হাঁ মা তাতো দেখ্‌লুম।

—আপনি তো প্রাচীন লোক, এসবের কারণ কি বল্‌তে পারেন?

এ সব সামাজিক ব্যাপার মা, দশজনের মত নিয়ে কথা। গাঁয়ের ষোল-আনা মিলে দীন্-দুনিয়ার ভালাইর জন্য যা' করবে, তার বিপক্ষে টু শব্দটী করবার কারো সাধ্যি নেই।

—এসব করে কি সমাজের মঙ্গল হয় বলে আপনি বিশ্বাস করেন?

—সে কথা যদি জিজ্ঞেস করো মা, তা' হলে আমি বল্‌ব, আলবৎ মঙ্গল হবে। দীন ইছলামের সরা-সরিয়ৎ যারা মেনে চল্‌বে না, তাদের সাজা হওয়া নেহায়েৎ দরকার।

—তা' আমিও মানি মোল্লাজী। কিন্তু আজ আপনারা সবাই মিলে যে অন্যায় কাজটা করতে বসেছেন তা' কি পবিত্র ইছলাম কখনো সমর্থন করেছে? কখ্‌খনো না, এতবড় পৈশাচিকতার স্থান ইছলামের কোন সরা শরিয়তে নেই

মোমেন মোল্লাজী কোন উত্তর দিলেন না। শিরী পুনরায় বলল,—আমি শুন্‌লুম, আপনিই নাকি এ ব্যাপারে গ্রামকে গ্রাম উত্তেজিত করে তুলেছেন। এ কথা যদি সত্যি হয়, তা'হলে ইচ্ছে করলে আমি আপনার বিরুদ্ধে পুলিস-কেস্ করাতে পারি মোল্লাজী। আর আপনি যে এর ভেতর আছেন একথা অবিশ্বাস করারও কোন কারণ নেই? আপনার কথাতেই তা' স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে।

পুলিসের কথায় বৃদ্ধ মোমেন ক্ষণেকের জন্য উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌লেন। বল্‌লেন,—গাঁয়ে যাকে দশজনে মোড়ল বলে মানে, ভালমন্দ একটা কিছু ঘট্‌লে সব দোষ তার ঘাড়েই চাপ্‌বে। পুলিস তুমি আনাতে পার তা' আমি বিশ্বাস করি। বল্‌লে কথা রাগ করবে—একটা ফ্যাঁসাদ বাঁধানোর বেলা মেয়েমানুষ শয়তানের দোসর এ কথা কেতাবে পড়েছি। কিন্তু তা' বলে আমাকে দোষী করা কেন? বরং বলতে পারো যে, আপনি হেঁটে-খেটে এর যাতে একটা বিধি-ব্যবস্থা হতে পারে তাই করুন।

—আমি তাই বল্‌ছি মোল্লাজী, আপনি মেহেরবাণী করে' আজকের এই বিপদ থেকে ছলিমকে রেহাই দিন্‌গে'। আহা, কি সঙ্কটেই বেচারা প'ড়েছে।

এবার মোমেন সেই পূর্ব্বের মত হাসি হেসে বল্‌লেন,—এই এতক্ষণে পথে এলে মা। ঐ পুলিস-টুলিস্ না বলে যদি আগেই এ সোজা কথাটা বল্‌তে তা'হলেই সব চুকে যেত—বলেই তিনি আরেকবার হেসে বললেন—আর এ কথাও জেনে রাখ মা, তোমার এ বুড়ো ছেলে চেষ্টা করলে সবই করতে পারে। আবার সেই হাসি।

প্রত্যুত্তরে শিরী তার কথায় সায় দিল।

—পাঁচ—

একদিকে পল্লীর শোভা-সম্পদ শিরীকে যেমন একটু শান্তির সন্ধান দিয়েছিল, অপর দিকে তেমনি পর-পর কতকগুলি ব্যাপার মিলে তাকে ভিতরে ভিতরে অতিষ্ঠ করে' তুলছিল। প্রথমতঃ এই গ্রাম্য বর্ব্বরগুলো দু'দিন আগে যেমনি করে' একটা পৈশাচিকতার অভিনয় করল, তাতেই শিরীর মন ত্যক্ত-বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিল, তদুপরি যেদিন সে প্রথম জানতে পারল যে, তার ব্যর্থ বিবাহিত জীবনকে কেন্দ্র করে' এরই মধ্যে কতকগুলো বিশ্রী কথা সারা গ্রামময় রটে গেছে, সে-দিন তার মনে হ'ল—সে যেন কোন এক অন্ধ কারাকূপে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। যুগসঞ্চিত একটা ঝঞ্ঝা যেন তার সমস্ত অন্তরাত্মাকে এক সঙ্গে আলোড়িত করে' তুলল। মনে পড়ল—কৈশোরের কল্পনায় একদিন কী সুন্দর করেই না সে তার ভবিষ্যৎ জীবন-চিত্রটী এঁকে তুলেছিল, কিন্তু আজ যৌবনের সীমায় পা দিতেই বাস্তবের নির্ম্মম আঘাতে তা' ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'তে বসেছে।

জলভরা চোখের উদাস-দৃষ্টি দিগন্তে মিলিয়ে এমনি কত কি র'য়ে র'য়ে ভাবছিল সে। এমন সময় হারুণ তার চিন্তায় বাধা দিয়ে পেছন থেকে ব'লে উঠল—আজ আমি একটা মতলব ঠিক করেছি দাদী। কিন্তু কাছে এসে শিরীর মুখ-চোখের ভাব দেখেই তার মুখ শুকিয়ে গেল। সে একান্ত সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞেস করল,—তুমি কাঁদছিলে বুঝি দাদী ?

নিজকে যথাসাধ্য গোপন করে' ক্ষীণ হাস্তের সহিত শিরী উত্তর দিল—না, কাঁদবো কি দু'খে ভাই ? তুমি থাকতে আমার কিসের দুঃখ ? সে স্নেহভরে হারুণের মুখচুম্বন করে' আবার বলল,—আমি বসে বসে তোমার কথাই ভাবছিলাম।

—কি ভাবছিলে দাদী ?

—বললে রাগ করবে না তো ? ভাবছিলাম, আমার ভাইটীকে একটী বউ এবার এনে দিতে পারলেই আমার একেবারে ছুটী।

—হুঁ-উ-উস্…! যাও, আমি বিয়ে করবো না।

শিরী দুষ্টামীর হাসি হেসে বলল,—বালাই, বিয়ে কেন করবে না, তোমার দাদুর মত হবে বলে ?—তা' আর হ'তে দেবো না আমি। আগে থেকেই দুধে-আলতায় বর্ণ দেখে হারুর বৌটী পছন্দ করব। একটু থেমে কি যেন ভেবে শিরী আবার বলল,—আচ্ছা ভাই হারু, তোমার বউও যদি দেখতে আমার মত কালো হয়, তবে কি তুমিও দাদুর মত বিলেত চলে যাবে বউকে ফেলে ?

শিরীর এ হাল্কা কথাটায় কতখানি ব্যথা লুকিয়েছিল, তা' অন্তর দিয়ে অনুভব করবার বয়স হারুণের হয়েছে। রেগে উঠে সে বলল,—ওসব বললে আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা বলব না বলে' রাখছি দাদী—হ্যাঁ।

—আচ্ছা বেশ, ও-কথা আর বলছি নে। আজ আমি কি এক স্বপ্ন দেখেছি জান ? দেখেছি, তোমার দাদু বিলেত থেকে মেম বিয়ে করে' এনে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

অভিমানী হারুণের চোখ একথায় একেবারেই ছল্ ছল্ করে' উঠল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলল,—আবার বলা হচ্ছে বুঝি ? তা'হলে আমি এই চললুম, বলেই সে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল।

—এই দিব্যি করছি হারু আর কখখনো বলব না ও-কথা। যেও না, আমার মাথা খাও, বলে শিরী তার পেছনে পেছনে ছুটে গেল কিন্তু হারুণ ফিরেও তাকা'ল না।

এমন কি সারাটা বিকেল যে তার কোথায় কোথায় কি করে' কাটল সে সন্ধানই কেউ দিতে পারল না। সন্ধ্যার পর উদ্বিগ্নচিত্তে শিরী বা'র-বাড়ীর ঘরে গিয়ে দেখল, সে ঘরের একপাশে একখানা তক্তপোষের উপর মুখ ভার করে' বসে আছে হারুণ। শিরীও আস্তে আস্তে তার পাশে গিয়ে বসল। বলল,—সারাটা বিকেল আমায় একলা ফেলে কোথায় ছিলে হারু ? দেখতো আমার কেমন মাথা ধরেছে—কপালে হাত দিয়ে দেখ একবার।

শিরীর অসুখ বিসুখ হলে হারুণের দুর্জ্জয় অভিমানও জল হয়ে যায় নিমেষে। সে শিরীর কপালে হাত রেখে বলল,—সত্যি বড্ড গরম তো দাদী—টিপে দেবো ? কন্ কন্ করছে না মাথা ?

—না ভাই, টিপতে হবে না ; গায়ে হাত দিয়ে তো দেখলে না ?

—ওঃ তাই তো, তোমার কি জ্বর হয়েছে দাদী ?

—হয়েছে বেশী নয়—একরত্তি-খানেক। ও সেরে

যাবেখন। কিন্তু তুমি দুপুর বেলা কি মতলবটা ঠাউরে আমার কাছে গিছলে তাতো আর বললে না হারু? আমার উপর বুঝি রাগ করেছো—না?

—আমি রাগ করলুম কই? তুমিই তো বলতে দিলে না তখন।

তা' হলে এখন বল কি বলতে চেয়েছিলে।

—আমরা একদিন জসীমদের ওই আমবাগে বনভোজন করতে যাবো।

ও' এই মতলব? বেশ তো যেও, আমি সব কিছু যোগাড়-যন্তর করে দেবো'খন।

—আর তুমি? তুমি বুঝি যাবে না দাদা?

—পাগল! আমি কি অত দূরে যেতে পারি? লোকে যে তোমার নিন্দে রটা'বে। পাড়ার ছেলে-পিলেদের ডেকে দেবো'খন তোমার সঙ্গে। কেমন হবে তো তাতে?

অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে হারুণ উত্তর দিলে—তা'লে আমিও যাবো না। তোমায় ছেড়ে বুঝি আমি থাকতে পারি?

শিরী হেসে ফেললে। পরে হারুণকে বুকের কাছে টেনে এনে বললে—কেন থাকতে পার না হারু? তুমি কি আমায় অতখানি ভালবেসে ফেলেছ?

—যাও তুমি, বলব না, বলে লজ্জিত হারু শিরীর বুকে মুখ লুকা'ল।

অগত্যা শিরীকে মত দিতে হ'ল। সে বলল—কাল যদি শরীর ভাল থাকে তবে নিশ্চয় যাবো।

—ছয়—

হারুণ বনভোজনের জন্য যে জায়গাটা ঠিক করেছিল তা' একটা নির্জ্জন আমবাগান। তাদের বাড়ী থেকে আন্দাজ তিনশো গজ দূরে। শিরীর শরীর মোটেই ভাল ছিল না। পাছে না-গেলে হারুণের মনে কষ্ট হয়, এই ভেবে সে নিজের অবস্থা গোপন রেখে যেতে স্বীকৃত হ'ল।

সেখানে গিয়ে সব-কিছু করতেই প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। তারপরে পাড়ার সমস্ত ছেলেমেয়েগুলোকে একত্র জড়ো করে ভোজন পর্ব্বের শেষে বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যা উৎরে গেল। শিরীর অসুস্থ শরীর কিছু খাবে না ভেবেছিল, কিন্তু হারুর দৃষ্টি এড়া'তে না-পেরে যা' কিছু সে মুখে দিয়েছিল, তার তিনগুণ বমি হ'য়ে গেল বাড়ী এসে। অল্প অল্প জ্বর এবং অসহ্য মাথাব্যথা তাকে অস্থির করে' তুলল।

সেই দিনই সে যে শয্যা গ্রহণ করল, দেখতে দেখতে তারপরে দু'দিন কেটে গেল কিন্তু শিরীর শরীর ক্রমশঃ খারাপ হ'য়েই চলল। ছেলে মানুষ হারুণ সারাদিন শুষ্ক মুখে চুপটী করে' তার শয্যাপার্শ্বে বসে' থাকে, শিরীর তা' ভাল লাগে না। তাই সেদিন সে একপ্রকার জোর করে হারুণকে বাইরে পাঠিয়ে দিল একটু ঘুরে' আসতে।

কিন্তু কতক্ষণ পরে কাঁদ-কাঁদ-মুখে হারুণ যখন ফিরে এল তখন তার চোখ মুখের ছল্ ছল্ ভাব দেখে শিরী অনুমান করল, নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘ'টেছে। সে বিস্মিত সুরে জিজ্ঞেস করল,—কি হয়েছে হারু বল্ তো?

ভিতরের রুদ্ধ আবেগ চেপে রাখতে গিয়ে হারুণের আর কিছুই বলা হ'ল না, সে কেঁদে ফেলল। শিরী সস্নেহে তার মাথায় হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগল। কতক্ষণ পরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে হারুণ বলল,—আমরা আর এখানে থাকবো না দাদা। কলকাতায় গিয়েই থাকবো।

সহসা এ মনোভাব পরিবর্ত্তনের সঠিক কারণ কিছুই খুঁজে পেল না শিরী। পরে হারুণের থেকে অতি কষ্টে যা' জানা গেল তা' একদিকে যেমনি স্বাভাবিক অপরদিকে তেমনি অপ্রত্যাশিত। নিজের সম্বন্ধে যে অপ্রীতিকর কথাটা শিরী এতদিন প্রাণপণ চেষ্টায় কোমলমতি বালকের কাছে গোপন রেখে এসেছে, আজ এক খেলার সাথীর মুখে তার চেয়ে শতগুণে বিশ্রী কতকগুলো কথা শুনে এসেছে সে নিজেই। কে নাকি বলেছে হারুণকে—তোর দাদার চরিত্র খারাপ বলেই তোর দাদু তোদের ছেড়ে বিলেত চলে গেছেন। আরো কত কী।

হারুণের চোখের জল আজ আর কিছুতেই বাধ্ মানছিল না। অবশেষে সে আবার সেই কলকাতায় ফিরে যাবার কথাই তুলল।

শিরী সান্ত্বনা দিয়ে বলল,—ছিঃ কাঁদতে নেই। আমার শরীরটে একবার ভাল হলেই তোমায় নিয়ে কল্‌কাতায় চলে' যাব।

হারুণ বায়না ধরল,—না, পরে তুমি যাবে না ভাল হয়ে। আমার গা' ছুঁয়ে বল তবে বিশ্বাস করব।

এত দুঃখেও শিরীর হাসি পেল। বলল,—পাগল

কোথাকার, গা ছুঁয়ে বল্লেই বুঝি হল? আচ্ছা বেশ, তোমার শরীরের চেয়ে আমার চোখ দু'টো তো বেশী আদরের জিনিষ—না? এই চোখ্ ছুঁয়ে বল্ছি, যেদিন ভাল হব ঠিক সে দিনই আমার হারু ভাইটাকে নিয়ে চলে যাবো কলকাতায়। হলো তো এবার?

হারুণ কথঞ্চিৎ শান্ত হ'ল।

—সাত—

সে হারুণের কাছে প্রতিজ্ঞা করল সত্য কিন্তু তার অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হয়েই চল্ল।

গত রাত থেকে তার শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ। ছলিম দু'দিন আগে গাড়ী নিয়ে কোথায় যে বেরিয়ে গেছে তা' কেউ জানে না। জলিল মিঞাও আর এ ক'দিন বাড়ী আসেন নি। জলিল মিঞার স্ত্রী সারাদিন চেষ্টা করলেন, কিন্তু ডাক্তারকে একটু খবর দেওয়াতে একটা লোকও খুঁজে পেলেন না তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে' পড়লেন।

এদিকে হারুণ নানা দুশ্চিন্তায় অর্দ্ধেকটা হয়ে গেছে। তাকে দেখে আর আগের নধর কান্তি হারুণ বলে চেনা যায় না। অন্যান্য দিন শিরী চোখ্ তুলে তার দিকে চায়, দু'টা একটা কথাও বলে কিন্তু আজ সে সারাদিনের ভেতর একটা বারও তার দিকে চোখ্ তুলে তাকায় নি। শিরীর এই ঔদাসিন্য বিশেষ করে' তার এই নির্জ্জীবতা দেখে ভবিষ্যতের কোন একটা অজানা আশঙ্কায় হারুর প্রাণমন যেন ক্ষণেক্ষণে আলোড়িত হয়ে উঠ্ছিল।

বিকেলের দিকে কিন্তু শিরীর অবস্থা একটু ভাল দেখা গেল। সে প্রথমে চোখ্ মেলেই দেখ্তে পেল হারু সজল চোখের ঝাপ্সা দৃষ্টি দিয়ে একদৃষ্টে তারই মুখপানে চেয়ে আছে।

এই নিতান্ত অবোধ অনাথ ছেলেটা বয়সের দিক দিয়ে দশ পার হয়ে গিয়েছে সত্য, কিন্তু ও-যে কায়মনোবাক্যে আজো কত ছোটটাই রয়ে গেছে তা' শিরীর চেয়ে ভাল করে কেউ জান্ত না। নিজে সে মরতে বসেছে তাতে শিরীর এতটুকুও দুঃখ নেই—যে স্রোতস্বিনী মরুপথে গিয়ে তার সুললিত ধারা অকালে হারাতে বসেছে, বিধির ইচ্ছায় যদি তার চিহ্ন একেবারে লুপ্ত হ'য়েই যায় তবে যাক্। কিন্তু এই অনাথ বালক যে তার দাদীকে ছাড়া দুনিয়ায় আর কাউকে চিন্বার সুযোগ পায় নি, তার দশা কি হবে দয়াময়?

শিরী তার রোগজীর্ণ হাতখানা তুলে হারুণকে ইসারা দিয়ে বল্ল,—হারু আমার গা ঘেসে বসো ভাই। মন কেমন করছে?

হারুণ বাইরের দিকে চেয়ে অশ্রু গোপন করবার চেষ্টা করল। শিরী স্নেহভরে তার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে শুষ্ক অধরে ততোধিক শুষ্ক একটু হাসির রেখা টেনে বল্ল,—আমি মরব না হারু, তুমি অতো ভেবো না। কি যেন একটু চিন্তা করে' আবার বল্ল,—আর সত্যি যদি একদিন মরতে হয় আমাকে তবে কিন্তু তুমি আমার জন্য কেঁদো না ভাই। তা' হলে আমার বড্ড কষ্ট হবে।

হারুণের ঠোঁট দু'খানা ঈষৎ ফুলে ফুলে উঠ্ছিল। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কেবল বল্ল,—আমি...?

—তুমি, তোমার কিছুটী ভাব্তে হবে না। তোমার এক নতুন ভাবী এসে আমার চেয়েও অনেক বেশী করে' ভালবাসবেন তোমাকে। কিন্তু তুমি যদি আমার জন্য এমনি করে' কাঁদো—

শিরীর কথা শেষ হবার আগেই হারুণ সহসা একেবারে কেঁদে ফেলল। রুগ্না শিরী অগত্যা ক্রন্দনরত হারুণের মাথাটা নিজের বুকের উপর সস্নেহে চেপে ধরল।

তার নিজের অশ্রুই আজ বাঁধ ভেঙ্গে ছুটে চল্ল।

—আট—

আজ আর শিরীর জীবনের আশা নেই। বাড়ীময় সবাই সশঙ্কিত হ'য়ে আছে কখন কি হয়। জলিল মিঞা আজ বাড়ী এসেছেন। এসেই তৎক্ষণাৎ তিনি বেরিয়ে পড়লেন ডাক্তারের খোঁজে।

এদিকে হারুণ অনেক রাত পর্য্যন্ত শিরীর শিয়রে বসে কাটিয়ে শয্যার এককোণে এক সময় হঠাৎ ঘুমিয়ে প'ড়েছিল। ভোর রাত্রের দিকে কে যেন সহসা তাকে ঝাঁকানী দিয়ে তুলেই শিরীর কাছে এনে বসা'ল। বাড়ীময় কিসের যেন একটা কোলাহল প'ড়ে গেছে। সে কিছুই বুঝ্তে পারল না।

শিরীর তখন অন্তিমকাল উপস্থিত। সে তার ব্যাকুল চোখের দৃষ্টি দিয়ে এদিক-ওদিক কি যেন খুঁজ্‌ছিল। সহসা দু'ফোঁটা অশ্রু ঝ'রে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সে আয়ত চোখের দুটী তারা অনন্ত কালের জন্য স্থির হ'য়ে গেল।

প্রভাতী আজানধ্বনি তখন সবে মাত্র আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

ভীতি-বিহ্বল হারুণ নিদ্রাজড়িত চোখে চেয়ে দেখছিল তার স্নেহময়ী দাদী পুতুলের মত স্পন্দনহারা চোখ দুটী দিয়ে এখনো একদৃষ্টে তারই দিকে চেয়ে আছে......

*   *   *   *

দুদিনেই হারুণ বুঝ্‌তে পারল, দাদীর সঙ্গে কত বড় দরদীকে সে বিদায় করে' দিয়েছে চিরজন্মের মত। থেকে থেকে আকুল কান্নার আবেগ ঝঞ্ঝার মত তার ছোট্ট বুকখানাকে যেন চুরমার করে' বেরিয়ে আস্‌তে চায়। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই মনে পড়ে দাদীর সেই অন্তিমবাণী,—তুমি কিন্তু আমার জন্য কেঁদো না ভাই, তা'হলে আমি যে বড্ড কষ্ট পাবো। মনে হতেই আগুনের হল্‌কার মত একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বক্ষপঞ্জর ভেদ করে'।

ছলিমের মৃত স্ত্রীর গলিত দেহটা একদল শৃগাল সেদিন কবর থেকে টেনে তুলে যে দুর্দ্দশাটা ক'রেছে হারুণ তা' স্বচক্ষে দেখে এসেছে।

গভীর নিশীথে দূরাগত শৃগালের মিলিত কণ্ঠের চীৎকার শুনে' সহসা তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ব্যাকুল দৃষ্টি দিয়ে একবার হারুণ বাইরের দিকে চায়—সেখানে জমাট বাঁধা আঁধার। ভয়ে চোখের পাতা তার আপ্‌না-আপ্‌নি বুজে' আসে। কিন্তু আবার চায়, আবার ও...।

এমনি করেই কাটে বাকি রাতটুকু। তারপরে ভোরের আব্‌ছা আঁধারেই সে গিয়ে তার দাদীর সমাধির চারপাশটা একবার করে' ঘুরে' ঘুরে' দেখে। পরে নিষ্পলক করুণদৃষ্টি দিয়ে কিসের প্রতীক্ষা করে' কে জানে?

...অবাধ্য চোখের তপ্ত-অশ্রু সর্ব্বহারা বালকের দু'গাল ভাসা'য়ে অঝোরে ঝরতে থাকে ঝুর্‌-ঝুর্‌-ঝুর্‌...!

লিপিকা

খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন

তোমার লিপিকাখানি আসিয়াছে প্রাতে,
হে প্রেয়সি! সাথে নিয়ে বসন্ত বাতাস,
প্রভাতের রাঙা ঊষা—উন্মুক্ত আকাশ,
পুলকে উঠিল দুলি' সব এক সাথে।

লিখিয়াছ—দখিনের দোর খুলি প্রিয়া,
বসেছিলে রাত জাগি মোর প্রতীক্ষায়,
অভিমানে ঠোঁট দু'টী উঠেছিল ফুলি,
দরশ-পরশ মোর পাও নি বলিয়া।

চাঁদের জ্যোছনা সখি! করি নিত্য পান,
বাঁচিয়া রয়েছ তুমি মোর লাগি শুধু,
চকোরীর প্রায় প্রিয়া, বিরহ কাতরা,
রচিয়াছ মোর লাগি শত শত গান।

হে প্রিয়া, তোমার সাথে মোর হবে দেখা,
সেদিন—যেদিন তব শেষ হবে লেখা।
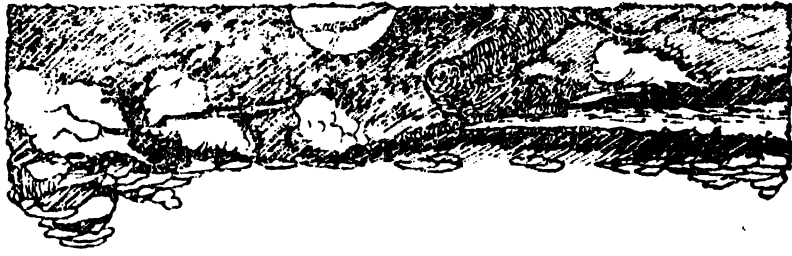
হজরত মোহাম্মদের (দঃ) ব্যক্তিত্ব

এ, জেড্, নুর আহমদ

জন্ম ও মৃত্যু দিন স্মরণ করিয়া মহাত্মাদের আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করার প্রথা সকল দেশেই চলিয়া আসিতেছে। যতদিন মানুষ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবান থাকিবে, যতদিন প্রকৃত প্রতিভার ও গুণের আদর মানুষ করিতে জানিবে—ততদিন এই মঙ্গল-প্রথার প্রচলন চলিবে। আমাদের সব ত্রুটী-বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা লইয়া যে মহাপুরুষের জীবন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, যদিও তাঁহার যোগ্য অনুষ্ঠান আমাদের দ্বারা হইবে না—তথাপি সেই মহাপুরুষের আদর্শ-জীবনের দুই-চারিটী কথা শুনিয়া যদি সমাজের একটুখানি শিক্ষালাভ ঘটে, তাহাতেইবা ক্ষতি কি? ভক্তি ও প্রশংসা দ্বারা শিষ্য গুরুর সম্মান বাড়াইতে পারে না সত্য, কিন্তু সেই ভক্তি নিবেদন করিয়া শিষ্য যে তৃপ্তি অনুভব করে, তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করা যায় না।

মানব-শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আজ আমি দুই-চারিটি কথা বলিতে চাই। জাগতিক নিয়মে আমরা দেখিতে পাই—চমকপ্রদ আশ্চর্য্য অনুষ্ঠানে, অভিনব ধর্ম্মোপদেশে, চিন্তা ও বুদ্ধির প্রাখর্য্যে মানুষের মহত্বের পরিচয় ফুটিয়া উঠে না, বরঞ্চ বিরাট ব্যক্তিত্বেই মানুষের মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীর ব্যক্তিত্ব এক অব্যক্ত আশ্চর্য্য বস্তু, শুধু ইহারই সাহায্যে ধরণীতে অসাধ্য সাধন করা যায়। জগৎ সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের সম্মুখে পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে অবনত মস্তক হয়, আর সকল যুগের সকল মানুষ সেই ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করিয়া অনুপ্রাণিত হয়। সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের সম্মুখে আসিয়া মানবের দৃষ্টি অবনমিত হইয়া পড়ে, কৌতূহলী মানব সেই ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাইয়া নিজের অজ্ঞাতেই যেন তাঁহার অনুগামী হইয়া পড়ে; আর পলে-পলে মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে আপনার ব্যক্তিত্ব, স্বাধীন-সত্বা হারাইয়া সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের রঙে আপন জীবনকে অনুরঞ্জিত করিয়া তোলে। এক কথায় বলিতে গেলে অন্য মানবের বুদ্ধি, চিন্তা, প্রতীতি সব উলট-পালট হইয়া যায় সেই মহা ব্যক্তিত্বের প্রভাবে। ইহা তাঁহার সমগ্র জীবনকে একটা নূতন স্বর্গে পরিণত করিয়া দেয়।

এই বিরাট ব্যক্তিত্ব লাভের সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, হজরত মোহাম্মদ তাঁহাদের অন্যতম। এই ব্যক্তিত্বের হিসাবে তাঁহাকে যদি সকলের অগ্রণী ও অদ্বিতীয় বলা হয়, তবে ইহাতে অতিরঞ্জনের একটুকুও আভাস পাওয়া যাইবে না। পৃথিবীতে বহু ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষের জন্ম হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহাদের ব্যক্তিত্বকে অনুবর্ত্তিগণ অন্ধ ভক্তি ও পূজা দ্বারা এতই উর্দ্ধে তুলিয়া দিয়াছে যে, মানবের সীমা-রেখা ডিঙাইয়া তাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তা ও মহামানবের শামীল হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব এত বেশী স্তুতি-ভক্তিতে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে যে, সন্ধানী-আলোর খোঁজ আমরা তাহাতে পাই না। পক্ষান্তরে ব্যক্তিত্ব সূর্য্য-রশ্মির ন্যায় দীপ্তিমান—আপনার কিরণে আপনি প্রোজ্জ্বল! বিরাট ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন লোক সম্বন্ধে তাঁহার পারিপার্শ্বিক জগৎ যাহা বলে, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া আমরা সেই ব্যক্তিত্বের বিচার অনেকখানি করিতে পারি। সেই হিসাবে হজরত মোহাম্মদ সম্বন্ধে ১৯২৫ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের "ডেলী এক্সপ্রেস" পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এ স্থানে উল্লেখ করা যায়।—"নিশ্চয়ই মোহাম্মদকে শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের শ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে। কেন না নব-দীক্ষিত মুসলমানগণ দীর্ঘ বার-বৎসর ধরিয়া

মূর্ত্তি-পূজকদের হাতে ভীষণ অত্যাচার ভোগ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছিল। সমাজ খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া পড়িয়াছিল,—বহু মানবকে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল, তথাপি ইস্‌লামের অনুবর্ত্তীর সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছিল। যদিও বহু নব মুসলমান নির্য্যাতিত হইয়াছিল, তবু স্বধর্ম্ম-ত্যাগকারীদের সংখ্যা মোটেই কম ছিল না; এবং খোদার ধর্ম্মে অনেকেই দীক্ষিত হইয়াছিল। সেই নির্য্যাতনের ভিতর দিয়া ধীরে ও সহিষ্ণুভাবে ধর্ম্মের বৃদ্ধি প্রাপ্তি মোহাম্মদের মনোমুগ্ধকারী অসীম ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক নহে কি?"

বাস্তবিক পক্ষে হজরত মোহাম্মদ ব্যক্তিত্ব হিসাবে সেই সম্মানের মালিক। অন্য কোন নবী বা অবতার তাঁহাদের অনুবর্ত্তীগণ হইতে এত ভক্তি, এত শ্রদ্ধা পান নাই। তাঁহার সেই আদর্শ ব্যক্তিত্ব তাঁহার স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-কুটুম্বদের প্রাণে গভীর ভক্তি জাগাইয়া তুলিয়াছিল, ইহারই ফলে যাঁহারা আশৈশব তাঁহার ভিতর-বাহিরের খবর রাখিতেন, তাঁহারাও তাঁহার অনুগামী হইয়া পড়িলেন।

হজরতের এই ব্যক্তিত্বে বিমুগ্ধ হইয়াই নবদীক্ষিত মুসলমানগণ সহাস্য-বদনে অমানুষিক অত্যাচারের সম্মুখীন হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ কোনও নেতার ব্যক্তিত্বের উপর ঐকান্তিকী ভক্তি ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা না থাকিলে তাঁহার উপদেশকে কয়জন সমস্ত প্রাণ-মন দিয়া গ্রহণ করিতে পারে? সেই নেতার উপর বিশ্বাস, তাঁহার কথার প্রতি সম্মান ও তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাই সেই উপদেশকে সজীব ও জীবন্ত করিয়া তোলে। এই সত্যটি কেমন সুন্দরভাবে একজন প্রপীড়িত মানুষের জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছে; যখন তাঁহাকে পীড়িত করিতে করিতে নির্য্যাতক বিধর্ম্মীগণ বলিল—"কি হে, তোমার কি এখন ইচ্ছা হয় না যে, যাঁর ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তোমার এত অত্যাচার হইতেছে, সেই মোহাম্মদ তোমার স্থানে এই অত্যাচার ভোগ করুক?"

দুর্ব্বিসহ অত্যাচারের মধ্য হইতে সেই ব্যক্তি বলিল—"আমি, আমার প্রিয়জন, ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততির পরিবর্ত্তেও ইচ্ছা করি না যে, হজরতের শরীরে একটি কাঁটা বিদ্ধ হউক।"—* * * ইহাই ব্যক্তিগত ভক্তির সুমহান নিদর্শন। স্রেফ্ নবীর আদেশ এবং রাজার ভয় মানুষকে এমনভাবে জীবন বিসর্জ্জন দিতে অনুপ্রাণিত করিতে পারে না।

হজরত মোহাম্মদ তাঁহার আশ্চর্য্য ব্যক্তিত্বগুণে আপনার জীবদ্দশায় অনুবর্ত্তী বন্ধুদের জীবন প্রগতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া, তাঁহাদের ভাবধারাকে সংস্কৃত করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াই শুধু ক্ষান্ত হন নাই, বরং উত্তরোত্তর তাঁহাদিগকে পবিত্র হইতে পবিত্রতর—উন্নত হইতে উন্নততর জীবনের দিকে টানিয়া নিয়াছিলেন।

নাস্তিকতা, ব্যাভিচার, অত্যাচার, শিশুহত্যা ও অধর্ম্মের ঘোর অন্ধকারের ভিতর জন্মলাভ করতঃ গোড়া ধর্ম্ম-বিশ্বাসী, মূর্খ ও অসভ্য লোকদের মানুষ করিবার যে মহা-কর্ত্তব্য লইয়া তাঁহাকে চলিতে হইয়াছিল, তাহা কল্পনা করিতেও হৃদয় শিহরিয়া উঠে। তবু সেই ঘোর দুর্দ্দিনে প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূল আবহাওয়ার গতিরোধ করিয়া মোহাম্মদ স্বকীয় অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্ব ও সত্তা লইয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার কথায় ও কার্য্যে মিল ছিল। মুখের বাণীকে তিনি কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইতেন। "He felt the force of his convictions and had the courage to act up to them. He was never influenced by expediency, neither did he ever care for diplomacy. He was always direct, whether in reply, advice or reproof.

আরবের ইহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণ যখন একে অপর ধর্ম্মের নিন্দাবাদে সময় কাটাইতেছিল—তখন কোরাণের কথায় হজরত জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন—"আমরা খোদাকে বিশ্বাস করি, তাঁহার নিকট হইতে আমাদের নিকট যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, হজরত ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, * * * মুসা, হজরত ঈসা প্রভৃতি নবীগণ তাঁহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে যাহা পাইয়াছেন, আমরা সে সব বিশ্বাস করি, তাঁহাদের কাহাকেও আমরা পৃথক চক্ষে দেখি না। অবনত মস্তকে আমরা খোদার আদেশ মানিয়া লইতেছি।"—

জুয়াখেলা, শরাব পান আর শিশুহত্যা আরবদের শরীরের অণুপরমাণুতে মিশিয়া গিয়াছিল—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে প্রথাকে আরববাসী একান্ত সম্মানের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছিল,—হজরত সেই মন্দ প্রথার প্রতি

একটুখানি দরদ ও একটুখানি সম্মানও না দেখাইয়া তাহা সমূলে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এই অসম্ভব সাধন শুধু তাঁহার কঠোর চরিত্রবল ও অসীম ব্যক্তিত্বের গুণেই হইয়াছিল। তিনি নিজে কখনও শরাব স্পর্শ করেন নাই বরং কঠোরতার সহিত বলিয়াছিলেন—"ইহা শয়তানের কাজ। বুদ্ধিমান মানুষ কি করিয়া এমন কুৎসিত কাজ করিতে পারে?" আর শিশু হত্যাকারীদিগকে যখন বুঝাইয়া বলিলেন,—"বন্ধুগণ! কি দোষে এই নির্দ্দোষ শিশুদিগকে তোমরা হত্যা করিতেছ?"—তখন সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের সাম্নে তাহাদের প্রতিবাদ বন্ধ হইয়া গেল। দিনে দিনে বেদুঈন আরব সুসভ্য হইয়া উঠিল।

মোজেজা বা "মিরাকেল"—তিনি বহুবার দেখাইয়াছেন সত্য,—কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি কখনও তাহা করেন নাই। কেন না, সরল ভাবেই তিনি বলিয়া দিতেন—"আমি তোমাদের মতই মানুষ, আমার নিকট ধনাগার নাই,—আমি ভবিষ্যতের খবর জানি না—খোদার অনুগ্রহ ছাড়া আমার নিজের আত্মার ভাল মন্দের উপরও আমার কোন হাত নাই। আর আমি যদি অদৃশ্য বস্তু দেখিতে পাইতাম, তবে আমি বহু সম্পদের মালিক হইতে পারিতাম। কোনও বিপদ আমায় স্পর্শ করিতে পারিত না। আমি শুধু বিশ্বাসীগণের প্রতি শুভ সংবাদ-বাহক ও সতর্ককারী।—"

সাধারণতঃ মূর্খ আরবজাতি কুসংস্কারপ্রিয়। হজরতের জীবদ্দশায় এমন বহু ঘটনা ঘটিয়াছিল, তিনি ইচ্ছা করিলে সহজেই সেই সুযোগে "মিরাকেল" দ্বারা নিজের সুনাম ও প্রতিপত্তি বাড়াইয়া তুলিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা পরিবর্জ্জন করতঃ কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরব বাসীর হৃদয়কে সত্যের আলোতে অনেকখানি স্বচ্ছ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয়পুত্র কাসেমের মৃত্যুদিন সূর্য্যগ্রহণে সমস্ত আরব-গগন যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আসিল, তখন আরববাসী নিঃসন্দেহে বলিল—"ইহা মোহাম্মদের পুত্র শোকের ফল। চল আরববাসী, তাঁহার নিকট যাইয়া ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করি।"—হজরতের নিকট আসিয়া যখন তাহারা সহানুভূতি সূচক অন্তঃকরণে তাহাদের মনোভাব জানাইল—তখন তিনি বলিলেন, "ইহা তোমাদের ভুল ধারণা, কেননা চন্দ্রসূর্য্য সৃষ্টিকর্ত্তার দুইটি চিহ্ন মাত্র। তাহারা কাহারও মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থে বা কাহারও জীবনের জন্য সহানুভূতি প্রকাশার্থে রাহুর কবলে পতিত হয় না।"...

এস্থানে আমরা তাঁহাকে প্রকৃত মানুষ, সংস্কারক নবীরূপে পাই। সর্ব্বপ্রকার সহানুভূতি, স্তুতিবাণী ও 'মিরাকেলের' মায়া কাটাইয়া তিনি মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যে সব উপায়ে তাঁহার চলার পথ সুগম হইত, তাহা বর্জ্জন করিয়াছিলেন। নিজেকে কখনো বড় করিতে চাহেন নাই। অলৌকিকত্ব তিনি বর্জ্জন করিয়াছেন—কিন্তু এরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া শত শত শত্রুর বিরুদ্ধে যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা 'মিরাকেল' অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ "মিরাকেল।" যাহারা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া এমনতর মহাকাজ করিতে চায়, হজরত তাহাদের জন্য object lesson, তাহাদের জন্য আলোক-স্তম্ভ।

হজরত মূসা তাঁহার অনুগামীগণকে অলৌকিকত্বের সাহায্যে ফেরাউনের অত্যাচার হইতে বাঁচাইয়াছেন, কিন্তু হজরত মোহাম্মদ প্রকৃত বীরের মত কতিপয় বিশ্বাসী মুসলিম সহ দশসহস্র বিধর্ম্মীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া মদিনা সহর রক্ষা করিয়াছেন। হজরত ঈসার উম্মতগণ সর্ব্বদা তাঁহাদের নবী হইতে অলৌকিক কার্য্য দেখিয়াও তাঁহার উপর পূর্ণ আস্থাবান হইতে পারিত না, পক্ষান্তরে শুধু হজরতের মুখের কথায় বিশ্বাস করিয়া শত সহস্র মুসলমান প্রাণ দিতেও দ্বিধা বোধ করিত না। ইহা শুধু মুখের কথা নয়, ইহাও তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব।

শিশুবৎ সারল্যে তাঁহার অন্তর-বাহির পরিপূর্ণ ছিল। মক্কাবিজয়ের পর সমস্ত আরব ভূমির একচ্ছত্র অধীশ্বর হইয়াও তিনি শৈশবের দুঃখের দিন ভুলিতে পারেন নাই। যুদ্ধ বিজয়, সাম্রাজ্য প্রাপ্তি তাঁহার হৃদয়ে একটুখানিও অহঙ্কারের ভাব জাগাইয়া দেয় নাই। রাজার সম্মানকে তিনি কখনও গ্রহণ করেন নাই। এমন কি কোনও ঘরে প্রবেশ কালে কেহ অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করিলে হজরত একান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িতেন। বস্তুতঃ তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহারে বুঝা যায়, তিনি যে বিশ্ব সাম্রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন, তাহা শুধু ধর্ম্মের রাজ্য।

ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেকের সহিত তাঁহার মতের বিরোধ ছিল

বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত শত্রু তাঁহার কেহই ছিল না। আরবের সম্রাট হইয়াও শত্রুদের সাথে ভ্রাতৃভাব রক্ষা করিয়াছেন,—দেহরক্ষী ছাড়া ভ্রাতা, শান্তিস্থাপক, অকৃত্রিম বন্ধু হিসাবে আরবের রাস্তা দিয়া তিনি সাধারণ মানুষের মতই চলিতেন। ঘরে বাতি জ্বালিয়া দিতেন, মেজে ঝাড় দিতেন, মেষের দুগ্ধ দোহন করিতেন, আপনার ছেঁড়াজুতা সেলাই করিতেন, বড় বড় উৎসবের দিন বন্ধুদিগকে উত্তম খাদ্যে পরিতুষ্ট করিতেন, পক্ষান্তরে এই বদান্যতার ফলে অনেক সময়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া তাঁহার রন্ধনশালায় অগ্নি জ্বলিত না। ইহাই ছিল মহান ব্যক্তিত্বশালী মোহাম্মদের জীবন যাত্রা। যখন সমস্ত আরব তাঁহার পদতলে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল, হজরতের পরবর্ত্তী জীবনে প্রচুর স্বর্ণ রৌপ্যে মক্কানগরী সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি তাঁহার প্রিয় কন্যা ফাতেমার গৃহে ধন দৌলতের, বা আরাম আয়াসের চিহ্ন মাত্র দেখা যায় নাই।

বস্তুতঃ নির্দ্ধারিত কর, স্থায়ী সৈন্য, প্রহরী, রাজপ্রাসাদ ও আড়ম্বর ছাড়া সুশৃঙ্খলার সহিত যদি কেহ রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবে একমাত্র মোহাম্মদ। এ সমস্ত বস্তু রাজবংশীয় লোকদের জীবনের একটি বিশেষ অঙ্গ, পরন্তু যে সমস্ত রাজা আপন চেষ্টায় রাজত্বলাভের অধিকারী হইয়াছেন, যেমন—ক্রমওয়েল, নেপোলিয়ান, তাঁহারাও পরবর্ত্তী জীবনে রাজকীয় বিলাসিতার, রাজকীয় আড়ম্বরের মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। বাহ্যিক আড়ম্বর হজরত মোহাম্মদকে কখনো স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি প্রত্যেক বস্তুর Reality লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। ক্ষমতার বাহ্যিক আড়ম্বরকে তিনি উপেক্ষা করিয়াই চলিতেন। "The simplicity of his private life was in keeping with his public life."

ওহদের যুদ্ধে হজরতের দন্দান শহীদ হওয়ার পর তিনি যখন ছাহাবীগণ বেষ্টিত হইয়া বসিয়াছিলেন, তখন এক বিধর্ম্মী সেই স্থান দিয়া খোরমা চিবাইতে চিবাইতে যাইতেছিল; সে ব্যক্তি হজরতকে দেখিতে পাইয়া যেন মায়া মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াই তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল—"আমি যদি এখন আপনার ধর্ম্মগ্রহণ করি, তবে আমার কি অবস্থা হইবে?" হজরত উত্তরে বলিলেন—"তুমি স্বর্গবাসী হইবে।" —ইহা শুনিয়া ঐ মুহূর্ত্তেই সেই ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম্মগ্রহণ করতঃ তাহাদের যুদ্ধে যোগ দিয়া আপন আশৈশবের আত্মীয় বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িলেন। * * *

ওহদের যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে হজরত এই নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে, ষোল বৎসরের কম বয়স্ক বালককে যুদ্ধে নেওয়া হইবে না। ইহাতে 'খাদেজ' ও 'আবুবাকে' নামক দুই বালক হজরতের সহিত যুদ্ধে যাইবার জন্য এমনই অস্থির হইয়া পড়িল যে, তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পড়িল। পরিশেষে খাদেজ, সৈন্যদের ভিড়ের মধ্যে যাইয়া পায়ের নীচে বালি স্তূপ করতঃ উঁচু হইয়া দাঁড়াইল। হজরত সেই সৈন্যদলকে মনোনীত করিলেন—তখন খাদেজও কৌশলে তাহাদের সহিত মনোনীত হইয়া গেল। ইহাতে আবুবাকে ব্যথিত হইয়া হজরতের নিকট আসিয়া বলিল—"হুজুর খাদেজ যখন মনোনীত হইয়াছে, আমি কেন হইব না?—তিনি কোন গুণে আমা হইতে শ্রেষ্ঠ?"—ইহা শুনিয়া হজরত বলিলেন—"তুমি আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে পারিলে তোমাকেও যুদ্ধে লইয়া যাইব।" ইহার পর আবুবাকে খাদেজের সহিত কুস্তী করিয়া তাঁহাকে পরাজয় করতঃ যুদ্ধে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিলেন। বস্তুতঃ ইহাকেই বলে ব্যক্তিত্বের যাদু-পরশ। তাহা না হইলে শুধু মুখের কথায়, শুধু ধর্ম্মের আদেশে, কোন্ দূর ভবিষ্যতের স্বর্গের লোভে মানুষ এমন করিয়া মরণের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে?

হজরতের বিরাট ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করিয়া একদিন আরব কবি বলিয়াছিলেন :—

كَأَنَّهُ وَهُوَ فَرْدٌ فِي جَلَالَتِهِ
فِي عَسْكَرٍ حِيْنَ تَلْقَاهُ وَفِي حَشَمِ
كَأَنَّمَا اللُّؤْلُؤُ الْمَكْنُوْنُ فِي صَدَفٍ
مِنْ مَعْدِنَيْ مَنْطِقٍ مِنْهُ وَمُبْتَسَمِ

"সম্মুখ সমর বা ছাহাবীগণ বেষ্টিত যে অবস্থায়ই হোক না কেন আপন মহত্বে তিনি অদ্বিতীয়। কথায় ও হাসিতে ঝিনুকাবদ্ধ মুক্তার মত।" *

* ২৩।৮।৩০ ইং—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—'মুসলিম হল' বাৎসরিক মিলাদ-মহফিলে পঠিত।

বিড়ম্বনা

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

বন্দে আলী মিয়া

অধ্যায় বারো

ইহার কয়েকদিন পরে করুণার সহিত মনসুরের শুভ-বিবাহ বিনা বাধা-বিপত্তিতে সমাধা হইয়া গেল। অজিত, বিনয়, রজব, বজলর, প্রভা, মাধুরী, অনীতা প্রভৃতি যাহারা ঈর্ষ্যার আগুনে জ্বলিতেছিল, তাহারা নিমন্ত্রিত হইয়া এই উৎসব ব্যাপারে ম্লান হাসিয়া, স্বচ্ছন্দতা এবং প্রফুল্লতার ছন্দ অভিনয় করিয়া, বাধ্য হইয়া সুর বদলাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। মনসুর এবং করুণা গোপনে অর্থভরা দৃষ্টি বিনিময় করিয়া লুকাইয়া ঠোঁট মুচকাইয়া একটুখানি না হাসিয়া পারে নাই।

তরুণ তরুণীর প্রথম মিলনের দিনগুলি যেন স্বপ্নের রাঙা নেশায় রঙিন। নিখিল বিশ্বের চারিপাশে যেন অনাহত বীণা বাজিতেছে, আকাশ হইতে অমৃতের উৎস ঝরিতেছে, বাতাসে মধু ক্ষরিতেছে। মায়ালোকের অফুরন্ত আনন্দের ফোয়ারা হাসির মাধুরী দিয়া দিবস রজনীর প্রতি পলটি ঘেরা। করুণা এবং মনসুর পরস্পর পরস্পরের মধ্যে একেবারে নিঃশেষে হারাইয়া যাইয়াও কেহ যেন কাহাকেও ঠিক সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তাই নব নব রহস্যের সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল। একে অন্যের নিকটে দুর্জ্ঞেয় মায়ালোকের অফুরন্ত বিস্ময়কর জীব। বিবাহের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই সমস্যা জটিল হইয়া কাহাকেও বিব্রত করে নাই, ব্যগ্র বা উৎকণ্ঠিতও করিতে পারে নাই। আজ নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে অটুট বিশ্বাসে আপনাকে যাচাই করিতে যাইয়া যেন উভয়ে সহসা ধরা পড়িয়া গেল। এই লজ্জা, বেদনা, সুখতৃপ্তি এবং আনন্দ তাহাদের মুখে-চোখে, ভাবে-ইঙ্গিতে সর্ব্বদার জন্য যেন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। একজামিনের পড়া; সুতরাং বাধ্য হইয়াই পরস্পরকে সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়া ঘরের দুই কোণে সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইত, ঘণ্টা খানেক দেড়েক হয়তো চিত্ত নিবিষ্ট থাকিত, তাহাতে পড়াও অগ্রসর না হইয়া পারিত না, কিন্তু আচম্বিতে কি কথা বলিতে কি উঠিয়া পড়িত, কোনোদিন করুণা আনমনে যাইয়া মনসুরের কাছে বসিত—কোনোদিন বা মনসুর হয়তো উঠিয়া আসিয়া করুণার গা ঘেঁসিয়া বসিত। সহসা এক সময়ে উভয়ে চকিত হইয়া দেখিত—গত অনেকটা সময় তাদের নিছক বৃথায় ব্যয় হইয়া গিয়াছে। সেজন্য অনুতাপ করিত, চোখে-চোখে চাহিয়া হাসিত, বিপুল সমারোহের আয়োজন করিয়া পুনরায় পড়িতে বসিত। এমনি করিয়া এই দুইটি তরুণ তরুণীর নব দাম্পত্যজীবন কাটিয়া যাইতেছিল।

মেডিকেল কলেজের সর্ব্বশেষ পরীক্ষারূপ বৈতরণী পার হইয়া প্রায় ছাত্রই একটা প্রচণ্ড মুক্তির নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল; তাহাদের সহিত এই দম্পতির মিলিত নিশ্বাস এক হইয়া মিশিয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল। করুণা মনে করিল—এই ফাঁকে জীবন-বসন্তের স্বপ্নমাখা মধুময় দিনগুলি মধুপুরে কাটাইয়া আসা প্রয়োজন। তাই একদিন সে স্ব-স্বামীক সেখানকার একটা ভাড়াটে বাসায় নিজেদের সংসার গুছাইয়া লইল।

মধুপুরের এই অচেনা জায়গায় অনেকক্ষণ বেড়াইয়া সন্ধ্যার পর নির্জ্জন প্রায় অন্ধকার ঘরের মধ্যে মনসুর এবং করুণা হাতে হাত দিয়া পাশাপাশি দু'খানা চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। হাতে-হাতে, শিরায়-শিরায় তড়িৎ ছুটিতেছিল। তাই ছোট্ট পাখীর রাঙা পালক, মিষ্টি শীষ, মধুমত্ত মধুপের মৃদু গুঞ্জরণ, কুণ্ঠিত কোরক-কিশোরীর সরম মিনতি, নাম-না-জানা ফুলের হঠাৎ আসা একটু গন্ধ, সবুজ ঘাসের কচি প্রাণের রঙিন কথা, মাধবী রাতের সলাজ চাহনী তাহাদের কাছে নব নব সৌন্দর্য্য লোকের বারতা বহিয়া আনে ; উভয়ে তাই দিনে দিনে পঞ্চশরের পুষ্প-আঘাতে মাতাল হইয়া উঠে।

মনসুর করুণার বেণীবদ্ধ চুলের উপরে স্নেহের-স্পর্শ বুলাইয়া দিতে দিতে কোমল কণ্ঠে বলিল,—একখানা গান এই ভরা সন্ধ্যায় বেশ লাগবে, গাও।

কাশিয়া গলাটা পরিস্কার করিয়া লইয়া করুণা জবাব দিল, তুমিও তো কতদিন থেকে শিখ্‌চো, এক্‌জামিনটা আজ হোক না।

মনসুর মৃদু হাসিল। বলিল, যাও, কেবল জব্দ কর্‌বার চেষ্টা। আমি যদি গাইতে যাই তবে পাড়ার লোকে লাঠি নিয়ে আস্‌বে যখন ঠেকাবে তুমি ?

করুণা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। বলিল, সে ভয় কোরো না, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে তবে ...

সুধু...শোনাবে গান একলা
আমার কানে
ঢেউয়ের মতন ভাষা বাঁধনহারা
আমি সেই রাগিণী শুনবো
নীরব হেসে।

মনসুর টেবিলের উপর হইতে কেস্‌টা উঠাইয়া লইয়া একটা সিগারেট বাহির করিয়া দিয়াশলাই জ্বালিল। বলিল, আদর বাড়ানো হচ্চে বুঝি, যাও, না গাইলে, আমিও শুনতে চাইনে। বলিয়া ক্রোধে মুখ গম্ভীর করিল।

করুণা আদরে সোহাগে মনসুরের মুখটা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিল, ইস্‌ রাগ ছাখো। আচ্ছা আমি গাচ্ছি শোনো বলিয়া উঠিয়া যাইয়া ঘরের কোণে পিয়ানোর কাছে বসিয়া সুর মিলাইয়া গাহিল,—

.........এই জোস্না রাতে জাগে আমার প্রাণ
পাশে তোমার হবে কী আজ স্থান.........।

সুরের মূর্চ্ছনা সারা ঘরের মধ্যে কাঁপিয়া কাঁপিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইয়া ফিরিতে লাগিল, মনসুর অভিভূতের মতন স্তব্ধ নির্ব্বাক হইয়া শুনিতেছিল, হাতের চুরুটটা যে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছিল, সে দিকে তাহার আদপে খেয়াল ছিল না।

বাহিরে জ্যোৎস্নার অথই সমুদ্রে বান আসিয়াছিল। তারই কূলছাপা খানিকটা ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস জানালা গলাইয়া কচি শিশুর মতন অকারণ কৌতুকে লুটোপুটি করিতে করিতে মেজের শুভ্র বিছানার উপরে লুটাইয়া যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। করুণা সে দিক পানে চাহিয়া চকিতে উঠিয়া বসিল। বলিল, চলো বারাণ্ডায় যাই।

মনসুর আপত্তি করিতে পারিল না, হাসিয়া শ্লিপার জোড়া পায়ে দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। বারাণ্ডার পাশে দেয়াল এবং থাম বাহিয়া লতানো গোলাব, মধু-মঞ্জরী এবং হাস্নোহেনার ঝাড়। লক্ষ কোটি হেনার সকৌতুক চাহনী, গোলাব কুড়ির কিশোর লাবণ্য এবং মধু-মঞ্জরীর অফুরন্ত সৌন্দর্য্যকে যেন প্রশংসার বেদনায় ভরাইয়া দিতেছিল। পরিপূর্ণ চাঁদের রূপোলী জ্যোৎস্নাধারা গোলাব পাতার উপরে, হেনার ঝাড়ের উপরে মাতাল বাতাসের ব্যাকুল সাড়ায় বারে বারে চমকিয়া উঠিতেছিল। পাশাপাশি দুই-খানা ইজি-চেয়ার পাতা ছিল, উভয়ে আসিয়া গা ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া বসিল। মনসুর করুণার ডান হাতখানি আপনার দুই হাতের মধ্যে টানিয়া আনিয়া মৃদু চাপ দিল। বলিল, একটা কথা ভাব্‌ছিলুম।

করুণা জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি তার মুখের উপরে তুলিয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিল, কী ?

মনসুর মিনিট দুই নীরব থাকিয়া বলিল, ভাবছিলুম কি জানো করুণা, ভাবছিলুম আমার সেই পুরীবাসের কথা, তোমার সাথে দেখা হওয়ার কথা, আলাপ পরিচয়ের বিস্তৃত ব্যাপারটা। তুমি যদি আমাদের ক্লাশে না পড়তে, তবে কথা বলতুম কী করে, আর আমি তো পুরীতে ছিলুম—তুমি সেখানে না গিয়ে যদি অন্য কোথায়ো যেতে তবে পরিচয় হওয়ার সৌভাগ্যও তো ঘট্‌তো না। তা ছাড়া তুমি ক্রীশ্চান আমি মুসলমান। প্রথম পরিচয়ের সময়ে আমি

তো স্বপ্নেও ভুল করে ভাব্‌তে পারিনি তোমার সাথে আমার বিয়ে হবে তাও আবার এমনি ধারা হয়ে। তোমাকে যদি আমি না পেতুম তবে—।

করুণা ঈষৎ হেলিয়া তার বুকে মাথা রাখিয়া মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, তবে কী হোত বলো

মনসুর বলিল, তবে জীবনের বাকি সবটা যেন মরু হয়ে যেত। তোমাকে ভাগ্যবতী কল্যাণময়ী স্ত্রীরূপে পেয়ে আমি যেন নতুন জন্ম—নতুন মানুষ হয়ে গেচি, উঃ, অতীত জীবনটা আমার কী দুঃখ বেদনাতেই না ভরা। আচ্ছা হ্যাগো করুণা, মায়াবিনী বলে সত্যিকারের কিছু থাকে তো সে তুমি; তোমরা যেমন পৃথিবীর সমস্ত আকর্ষণকে শিথিল করে নিজেদের দিকে টানতে পারো, সব কিছুকে বেবাক ভুলিয়ে দিতে পারো; এমন যাদুকরী তো কেউ আর নেই। চির দুঃখিনী জননীর কথা মনে পড়িয়া বেদনায় ক্ষোভে আত্ম-ঘৃণায় বুকটা তার কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, স্বরটা ভেজা-ভেজা শুনাইতেই করুণা সচকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, জ্যোৎস্নার আলোয় তার চোক দুইটা চক্‌চক্‌ করিতেছে। করুণা ভিতরে ভিতরে ব্যাকুল হইয়া উঠিল কিন্তু মনের খাতায় এই অশ্রুর উপযুক্ত কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া সান্ত্বনা দিবার ভাষার নাগাল পাইল না।

মনসুর নিজের দুর্ব্বলতাকে সযত্নে প্রাণপণে সংবরণ করিয়া লইয়া বলিল, আজকের রাতটা কী সুন্দর!

করুণা আপনার মুগ্ধ দৃষ্টিকে সম্মুখের উদার প্রান্তরের মধ্যখানে ছাড়িয়া দিল। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার অজস্র অমৃত ঢেউ অসহ্য যৌবনে মাতাল হইয়া নাচিয়া বেড়াইতেছিল, কোন্ অজানা ফুলের আকুল সুরভি তারি সাথে সাথে ভাসিয়া আসিতেছিল, দূরে কাছে দুই একটা তারকা দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল ছিন্ন মালিকার ভ্রষ্ট কুসুমের মতো। পাশের গোলাব-কুঞ্জ দুলিয়া উঠিতে করুণা অসহ্য পুলকে মনসুরের ডান হাতখানা নিজের অতৃপ্ত তরুণ বুকের উপরে নিবিড় করিয়া চাপিয়া ধরিল। গাহিল,

তোমার লাগিয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগ সম।

মনসুর করুণার পদ্মের মতন লাবণ্য ভরা মুখের দিকে পলক মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া উদার প্রান্তরের দিকে উদাস আঁখি মেলিয়া ধরিল। মনে হইল, তার অন্তরের লক্ষ্মী সুরের স্বরীতে মূর্ত্তিমতী হইয়া আজ তার সম্মুখে—কোলের উপরে আসিয়া বসিয়াছে। অনেকক্ষণ পরে গান থামিল, কিন্তু মধু ঢালা সুরের ঝঙ্কার গন্ধ আকুল উতল হাওয়ায় সেই বারাণ্ডার চারিপাশে যেন কাঁপিতে লাগিল। ঘরের বড় ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজিয়া গেল। করুণা বলিল, চলো ঘরে যাই, ভাত-টাত খেয়ে আবার আসা যাবে।

মনসুর আপত্তি সূচক ঘাড় দোলাইয়া জবাব দিল, উঁহু, আর একটু পরে।

করুণা বলিল, নাগো, শেষে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেলে বিশ্রী লাগ্‌বে।

অগত্যা মনসুর দাঁড়াইয়া উঠিয়া খসিয়া যাওয়া কাপড়খানি গুছাইয়া পুনরায় পরিতে আরম্ভ করিল।

অনেক রাতে মনসুর জাগিয়া দেখিল, পাশে করুণা নাই; ঘরে আলো জ্বলিতেছে। গভীর বিরক্তিতে পাশ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিতে পাইল, মেঝের উপরে মাদুর বিছাইয়া করুণা উপুড় হইয়া বুকের তলে বালিস দিয়া একখানা ভারী মোটা কেতাব গভীর মনোযোগে নীরবে পড়িয়া পাতা উল্টাইয়া চলিয়াছে। মনসুর মিনিট পাঁচেক নিঃশব্দে অসাড় হইয়া শুইয়া থাকিয়া ভাবিয়া বুঝিতে পারিল যে, ধ্যানটা সহজে ভাঙিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তাহাকেই শেষ অবধি অগত্যা চেষ্টা পাইতে হইল। নিদ্রা জড়িত অলস গম্ভীর কণ্ঠে ডাক দিল, ওগো শুনেচো?

করুণা চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া তাহার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিল। জবাব দিল, কি—জাগ্‌লে কখন?

মনসুর সিগারেট ধরাইল। প্রত্যুত্তরে বলিল, এক্ষুণি। উঠে এসো, এত রাতে আবার পড়া কেন?

যাও, বলিয়া আরক্তিম মুখে সশব্দে বহিখানি বন্ধ করিয়া করুণা দুষ্টামিভরা চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার মুখের উপরে তুলিয়া ধরিল। সেল্‌ফের উপরে রাখিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে পানে-রাঙা ঠোঁট দুইখানি কাঁপাইয়া অস্ফুটস্বরে কি যেন বলিল, যাহার ধ্বনি কানে আসিলেও একটা বর্ণও মনসুর হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। হ্যারিকেনটা নিবাইয়া ত্বরিৎপদে আসিয়া বিছানার শূন্য স্থান মুহূর্ত্তে পূর্ণ করিয়া ফেলিল।

করুণা আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল—চাঁদটা দূরে পশ্চিমদিকে অনেকখানি হেলিয়া পড়িয়াছে। তাহারি রশ্মিরেখা অদূরের ঝাউগাছের ছায়াকে অসম্ভব রকমে দীর্ঘ করিয়া তাহাদের জানালায় আনিয়া মায়াজালের রচনা করিয়াছিল। পাতার ফাঁকে-ফাঁকে এই পথ হারানো জ্যোৎস্না-রেখা যেন স্বর্গের দেব শিশুর দল, নিশুতি মাধবী-রাতে ভুবন ভরিয়া অকারণ কৌতুকে নাচিয়া খেলিয়া বোধ করি বা গভীর শ্রান্তিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সুমুখের দেবদারু গাছটা ত্রিযুগের সাক্ষীস্বরূপ দৈত্যের মতন বিরাট দেহ লইয়া নীরবে অঙ্গুলি তুলিয়া দাঁড়াইয়া যেন পাহারা দিতেছে। মাঠের বুকে ওপারের গাছগুলোর সুদীর্ঘ ছায়া শাড়ীর আঁচলের মতন লুটাইয়া পড়িয়াছে, সারা প্রান্তর ব্যাপিয়া শুভ্র ক্ষীরের বন্যা, যেন রৌদ্রময়ী রাত্রি। সুমুখের গোলাব ঝাড়ের ভিতর হইতে একটি গোলাব অস্পষ্ট আলোয় দেখা যাইতেছিল বিরহিণীর করুণ আঁখির মতন বেদনায় ভরা। সে দিকে দৃষ্টি পড়িতেই করুণা চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া মনসুরকে কোমল-কণ্ঠে বলিল, চলো বাইরে যাই।

মনসুর বিস্মিত হইয়া বলিল, এত রাতে? না থাক্—শুয়েই গল্প করি এসো

পরের দিন সকাল বেলা চা-পান শেষ করিয়া মনসুর ডিকেন্সের একখানি কেতাব খুলিয়া সিগারেটের ধোঁয়ার সহিত পাঠের আনন্দ ও রসটুকু হজম করিবার দুশ্চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল, ঠিক তেমনি সময়ে করুণা দরজা ঠেলিয়া লঘু চরণে ঘরে ঢুকিল। মনসুর মুখ তুলিয়া চুরুটে টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িল। বলিল, কী খবর?

করুণা তার পাশের শূন্য চেয়ারখানায় বসিতে বসিতে বলিল, ধোবা বৌ এসেচে, কাপড়-চোপড় কি দেবে দাও। আল্‌নার দিকে পলকমাত্র দৃষ্টি দিয়াই মনসুরের দিকে চাহিয়া পুনরায় বলিল, যাও না, কাপড়গুলো পেড়ে এক জায়গায় জড়ো করো। ঐ সার্ট তিনটে, আমার ব্লাউজ দুটো, জ্যাকেটটাও দেবে? আচ্ছা ঐ কোট দুটো, গেঞ্জিও তিনটা—হাঁ, রুমাল ক'টা, কাপড় দশখানা তার মধ্যে শাড়ী কখানা—চারখানা? জরিপাড় একটা আছে সেটা, সব দাও। পন্টুর মা অ—পন্টুর মা, এইখানে এই বারাণ্ডার ওপরে এসো তো কাপড়গুলো নিয়ে যাও, ছ্যাখো হাঁ বিছানার চাদর বালিশের ওয়ারগুলো বুঝি দেওয়া হোলো না সবই তো ময়লা ময়লা ঠেকচে। জান্‌লে বৌ, কাপড় যেন দিতে দেরী কোরো না—ছ্যাখোতো কখানা মোট হোলো?...... ঐ রে দুধটা বুঝি বিড়েলে খেয়ে গেল। তুমি দেখে দাও। বলিয়া তড়িৎবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া রান্না ঘরের দিকে সে চলিয়া গেল।

মনসুর পন্টুর মাকে বিদায় দিয়া ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নার সমুখে আসিয়া দাড়ি কামাইতে সুরু করিল। করুণা বসন্ত বাতাসের মতন চঞ্চল চরণে তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেই মনসুর সোভিংষ্টিকটা সাবানের শুভ্র ফেণা সহ টেবিলের উপরে রাখিয়া দিয়া মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিল, ভাত হয়েচে?

করুণা দেরাজ খুলিয়া কি যেন খুঁজিতে যাইতেছিল; অন্যমনস্ক ভাবে মুখ তুলিয়া চাহিয়া ভাসা-ভাসা কণ্ঠে জবাব দিল, হুঁ। ভাত মাছ ডাল সবই হয়েচে, ডালনাটা সবে চড়িয়ে এসেচি।

মনসুর ক্ষুর হইতে সাবানের ফেনা এবং দাড়ির কর্ত্তিত অংশটুকু একখানা বাজে-কাগজে মুছিয়া রাখিয়া বলিল, তবে গোসল করে আসি কি বল, পানি দেওয়া হয়েচে?

করুণা মুহূর্ত্তে থামিয়া দেরাজ হইতে মুখ তুলিয়া বিপন্ন কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল, নাগো, এক্ষুনি চান করবে কি—সময় পেলুম কোথা যে জল তুলতে যাবো। দেখচো না, সকাল থেকে দম দেওয়া এঞ্জিনের মতন কেবল লেটেই চলেছি। একটু সবুর করো।

মনসুর হাসিয়া স্নিগ্ধ সদয় দৃষ্টিতে করুণার আর্ত্তমুখের পানে চাহিয়া সস্নেহে একটু হাসিল। বলিল, তথাস্তু মহারাণী, আমি তব মালঞ্চের হবো মালাকর।

করুণা মুখ মুচকাইয়া হাসিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, থামো, 'চয়নিকা'টা মুখস্থ না থাকলে যে কি করতে তাই ভাবি।

বৈকালের দিকে মনসুর ঘরে ঢুকিয়া দেখিল করুণা মুখের উপর একমনে রুজ ঘষিতেছে, স্বামীর আগমন সে টের পায় নাই, মনসুর পলকমাত্র তার পানে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া সেখানেই নিঃশব্দে থামিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সহস্রবার সে তাকে ঐরূপ অবস্থাতেই দেখিয়াছে, কিন্তু ঐ লীলায়িত ভঙ্গিটী যেন তার

কাছে বলিয়া ধ হইল। আকাশের মত প্রুসিয়ান ব্লু রঙের শাড়ীর রক্তের মতন লাল পাড়টি বুকের উপর দিয়া নীচের দিকে নামিয়া গেছে, কোঁকড়ানো কুচকুচে কালো চুলের খোঁপাটি মাথার উপরে ক্ষুদ্র পাহাড়ের মতন চমৎকার মানাইয়া গেছে, পদ্মের মতন হাতে কয়গাছি সোণার চুড়ি আলোছায়ায় জ্বলিতেছে—ঠুণ ঠুণ শব্দে বাজিতেছে, পায়ে বার্মি শ্লিপার জোড়ার ফাঁক দিয়া রক্তরেখার মতন আল্‌তার দাগটা অশোক গুচ্ছের মতন হাসিতেছে। মনসুর নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া একটা উদ্ধত-বেগ এবং নিশ্বাসকে আপনার মধ্যে একান্ত নীরবে চাপিয়া লইল।

করুণা এক সময়ে সহসা ঘাড় ফিরাইয়া চাহিতেই মনসুর ধরা পড়িয়া গেল। করুণার সারা মুখ লাল হইয়া উঠিল। চোখে মুখে হাসির আগুণ ঠিক্‌রাইয়া বলিল, কিগো চোর, নীরবে এসে আমার রূপ চুরি কোর্‌চো, prosicute কোর্‌বো।

মনসুর লজ্জিত মুখে আড়ষ্ট কণ্ঠে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া জবাব দিতে দিতে তাহার দিকে অগ্রসর হইল, নাগো এক্ষুণি তো এলুম। বেড়াতে যাবে না?

—যাবো। তোমারি এদিকে খোঁজ নেই। চা বুঝি ঠাণ্ডা হয়ে গেল, ঘ্যাখোতো কেট্‌লিটা, আর ওইযে টেবিলের ওপরে খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েচে—জল্‌দি খেয়ে নাও।

স্বামী-স্ত্রীতে সন্ধ্যার পর বেড়াইয়া ঘরে ফিরিতেছিল। চতুর্দ্দশীর প্রায় ভরা চাঁদখানি ঝাউ ডালের ফাঁক দিয়া রূপোর থালার মতন নীল আকাশের বুকের দিকে মাথা উঁচু করিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছিল। করুণার উদাস দৃষ্টিটা পলকের জন্য সেদিক পানে পড়িতেই হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বিস্ময়ের সুরে কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, How lovely.

পরশমণির সাহচর্য্যে আসিয়া মনসুরের লোহার মতন কঠিন নীরস ডাক্তারী মনটা প্রায় সোনার মতন হইয়া আসিয়াছিল। সে-ও প্রকৃতির এই মায়ায় ঘেরা নগ্ন সৌন্দর্য্যকে উপেক্ষা করিতে পারিল না; তার গোপন অন্তরের রঙ এবং আনন্দ দিয়া যে ভাবুক শিল্পী এই ছবিখানা নিত্য নব নব ভাবে আঁকিয়া চলিয়াছে, তার পায়ে গর্ব্বোদ্ধত মাথাটা আপনা আপনি নত করিয়া দিল।

মনসুর সস্নেহে করুণার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল; সে জানিত এই নারীটি যেন একটা মূর্ত্তিমতী কবিতা। চাঁদটা যেমন দূর হইতে শুধু কবির চোখে দেখিলে অন্তরে অসীম উল্লাস কুলছাপা কল্পনা এবং আনন্দের অবধি থাকে না,—আকাশ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তার কিছু জ্ঞান ছিল, পৃথিবীর বিবর্ত্তন ধারার কেতাবগুলাও তার অপাঠ্য ছিল না—চাঁদকে সেই বৈজ্ঞানিকের চোখে নিরীক্ষণ করিলে তার উপরের পাহাড় আলোকহীন গভীর কালো খাদ, অনুর্ব্বরতা এবং মরুত্বই নজরে ভাসিয়া উঠে। দুনিয়ার কবিগুলাকে ইহার সহিত একত্রে ওজন করিতে পারা যায়, দূর হইতে তাদের সম্বন্ধে কল্পনায় কত রঙ-বেরঙের ছায়াবাজিরই না কথা মনে পড়ে, কিন্তু প্রকৃত ভাবে যারা তাদের জীবনটা অধ্যয়ন করিয়াছে, তারা জানে কী সকরুণ! চাঁদকে দূরে দেখিতেই মায়াময়, সেখানে বাড়ী-ঘর বাঁধিয়া বাস করা চলে না। কবি-হৃদয় করুণাও তেমনি সংসার সম্বন্ধে নিতান্ত অপটু।

ক্রমশঃ

গণি গণতন্ত্র

মোহাম্মদ আকরম খাঁ

(১১)

"মুছলমান বং অমুছলমান"

মুছলমানদের দাবীর প্রতিবাদ করার সময়ে গণিতের হিসাব লইয়া যে-সব কথা সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে, তাহার প্রত্যেকটার অসারতা ইতঃপূর্ব্বে যথেষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। বহুকণ্ঠে বহুভাবে বিঘোষিত "গণতান্ত্রিক নীতি" সম্বন্ধে আজ দুই-একটা কথার আলোচনা করিব। রামানন্দ বাবু তাঁহার প্রবন্ধের প্রথম ভাগে বলিতেছেন :—"আলোচনায় সাধারণতঃ বা কেবলমাত্র বা প্রধানতঃ হিন্দু ও মুছলমানদের কথাই বিবেচিত হয়। তাহা ঠিক নহে, কারণ দেশে তাঁহারা ছাড়া অন্য লোকও আছেন। মুছলমানরাই প্রথমে, লর্ড মিণ্টোর আমলে, সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের কথা তুলেন এবং এ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত তাঁহারাই, বিশেষতঃ বঙ্গে, সকলের চেয়ে নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিতেছেন। অতএব প্রতিনিধি নির্ব্বাচন বিষয়ের আলোচনায় দেশের লোকদিগকে মুছলমান ও অমুছলমান এই দুই-ভাগে বিভক্ত করা অসঙ্গত হইবে না।"

মর্লি-মিণ্টোর শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হওয়ার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত মোছলেম-ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গের, রাজনৈতিক ভাবধারার সহিত আমার কতকটা ঘনিষ্ঠ সংশ্রবই আছে। কিন্তু, মুছলমানেরা যে কখন 'সাধারণতঃ বা প্রধানতঃ' কেবল হিন্দু ও মুছলমানের কথা লইয়া বিচার বিবেচনা করিয়াছেন, ইহা আমার জানা নাই। মুছলমানেরা প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার চান—নিজেদের সংখ্যার অনুপাতে এবং অমুছলমানের অনুপাত বাদ দিয়া। বাঙ্গালা দেশে তাঁহারা শতকরা ৫৪টী আসন পাওয়ার দাবী করিতেছেন, অমুছলমানের মোকাবেলায় ইহাই তাঁহাদের সংখ্যাগত অনুপাত। কেবল হিন্দু ও মুছলমানকে ধরিয়া হিসাব করিলে মুছলমানের এই অনুপাত আরও বাড়িয়া যাইত।

যাহা হউক, রামানন্দ বাবুর উপরি-উদ্ধৃত মন্তব্যটী বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনকেই তিনি এই বিভাগের প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। অর্থাৎ, তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, বাঙ্গলার অধিবাসীদের মধ্যে যে-সব সমাজ বা সম্প্রদায় নির্ব্বাচনের অধিকার ভোগ করিতেছে বা তাহার দাবী করিতেছে, তাহাদিগকে একদলভুক্ত করিতে হইবে ; এবং পক্ষান্তরে, যে-সব সমাজ বা সম্প্রদায় স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের অধিকার লাভ করে নাই অথবা তাহার দাবী করে নাই, তাহাদের সকলকে আর এক দলভুক্ত করিতে হইবে। প্রথমে এই প্রকার বিভাগ করার পর, উভয় দলের সংখ্যা, শিক্ষা ও ট্যাক্স দানের সামর্থ্য লইয়া তুলনায় সমালোচনা করা সঙ্গত হইবে। ন্যায্যভাবে বিচার করিতে হইলে এই নীতি অনুসারে বিভাগ করাই যে সঙ্গত হইবে, তাহা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি সসম্ভ্রমে ইহা নিবেদন করিতে বাধ্য হইতেছি যে, পরবর্ত্তী বিচারে রামানন্দবাবু নিজেই এই নীতির অনুসরণ করিতে সমর্থ হন নাই, বরং তাহার বিরুদ্ধাচরণই করিয়াছেন। কারণ, বিচারকালে এমন-সব সম্প্রদায়কে তিনি নিজেদের দলে টানিয়া লইয়াছেন, যাঁহারা অমুছলমান হইলেও স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের অধিকার ভোগ করিতেছেন, অথবা তাহা লাভ করার চেষ্টা পাইতেছেন।

উদাহরণ স্বরূপে বাঙ্গলার ইউরোপীয়ান ও য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি সমাজের নাম করা যাইতে পারে। বাঙ্গলার ইউরোপীয়ান ভদ্রলোকেরা, বণিক সমিতি, চা-কর সমিতি, পাট ব্যবসায়ী সমিতি প্রভৃতি বিশেষ নির্ব্বাচন কেন্দ্রগুলির মধ্য দিয়া দশজন প্রতিনিধি পাঠাইবার সুযোগ পাইয়াছেন। সরকারী ও সরকার-মনোনীত আরও বার জন ইউরোপীয়ান-সদস্য বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক-সভায় স্থান লাভ করিয়া থাকেন। ইহা সত্ত্বেও, তাঁহারা আবার স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের মারফতে আরও পাঁচজন মেম্বর পাঠাইবার অধিকার ভোগ করিতেছেন। এইরূপে, বাঙ্গলার য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরাও স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের অধিকার লাভ করিয়াছেন, এইভাবে দুইজন মেম্বর তাঁহারাও ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাইয়া থাকেন। ভারতীয় খৃষ্টানরাও কোন-কোন প্রদেশে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের অধিকার ভোগ করিতেছেন; আর সংখ্যার অল্পতা হেতু স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন-কেন্দ্র গঠনের অসুবিধার জন্য কতিপয় প্রদেশে সরকারী মনোনয়ন দ্বারা তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ফলতঃ নির্ব্বাচনের দ্বারা হউক, আর মনোনয়নের দ্বারা হউক, Communal representationএর অধিকার তাঁহারাও ভোগ করিতেছেন। শিখরাও অমুছলমান, কিন্তু স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন তাঁহারাও ভোগ করিয়া আসিতেছেন। শুধু ইহাই নহে, স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তাঁহাদের নির্ব্বন্ধ যে কিরূপ গুরুতর, দেশের রাজনীতিকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। সুতরাং ইউরোপীয়ান, য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান, দেশী খৃষ্টান ও শিখদিগকে বাহিরে রাখিয়া হিসাব ধরাই রামানন্দবাবুর পক্ষে—তাঁহার নিজের নির্দ্ধারিত নীতি অনুসারেই উচিত ছিল। এইরূপে, এই সব সম্প্রদায়কে অমুছলমানের খাতা হইতে বাদ দিয়া হিসাব ধরিলে দেখা যাইত যে, প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন লইয়া বিরোধ হইতেছে হিন্দু ও অহিন্দুর মধ্যে, মুছলমান ও অমুছলমানের মধ্যে নহে। কিন্তু ইহাই এ সম্বন্ধে শেষ কথা নহে।

আমরা দেখিতেছি, ভদ্রলোক শ্রেণীর হিন্দুরা ব্যতীত, Depressed class বা অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুরা সকলেই একবাক্যে নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের দাবী উপস্থিত করিতেছেন এবং এজন্য তাঁহাদের পক্ষ হইতে চেষ্টার কোনই ত্রুটি হইতেছে না। সাইমন কমিশনের রিপোর্টে দেখা যাইবে:—Most of the depressed class associations which appeared before us favoured separate electorates, with seats allocated on the basis of population, though one or two still wished to retain momination. অর্থাৎ—"অনুন্নত সম্প্রদায়ের যত সভাসমিতির প্রতিনিধি আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন দ্বারা নিজেদের জন-সংখ্যার অনুপাত অনুসারে প্রতিনিধি পাঠাইবার দাবী করিয়াছেন। যদিও একটী বা দুইটী মাত্র সমিতি এখনও মনোনয়নের পক্ষপাতী আছেন।" অতএব একমাত্র 'ভদ্রলোক-ক্লাস'—হিন্দুরা ছাড়া বাঙ্গলার উল্লেখযোগ্য প্রত্যেক অমুছলমান সমাজই নিজেদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের অধিকার লাভের চেষ্টা করিতেছেন, অনেকে সে অধিকার বর্ত্তমানেও ভোগ করিতেছেন। কাজেই রামানন্দবাবুর অবলম্বিত নীতি অনুসারে বিভাগ করিতে হইলে, ন্যায়তঃ কেবল 'ভদ্রলোক ক্লাসের' ২৭ লাখ হিন্দুকে এক দলভুক্ত করিতে হইবে, এবং তাঁহারা ব্যতীত অন্য সমস্ত হিন্দুকে তাহা ছাড়া যাবতীয় অমুছলমানকে অন্যদলভুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

(১২)

গণতন্ত্র না আভিজাত তন্ত্র?

আমার মনে হয়, 'গণতন্ত্র' কথাটা আমাদের রাজনৈতিক পরিভাষার নূতন সৃষ্টি—বিদেশী Democracy শব্দের অনুবাদ। ইহার মোকাবেলায়, ইউরোপের রাজনৈতিক পরিভাষায় aristocracy ও oligarchy বলিয়া আর-দুইটী শব্দ প্রচলিত আছে। এই দুইটী শব্দের অর্থে ও ইতিহাসে মূলতঃ অল্পবিস্তর পার্থক্য থাকিলেও, বর্ত্তমানে শব্দ দুইটী প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। অধিকাংশ অধিবাসীর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা দেশ শাসিত হইলে, একমাত্র সেই শাসন পদ্ধতিকে Democracy বা গণতন্ত্র বলা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে দেশের অধিকাংশ অধিবাসী যদি অল্পসংখ্যক আভিজাত বা অবস্থাপন্ন লোকদের দ্বারা শাসিত হইতে থাকে, তাহা হইলে এই শাসন পদ্ধতিকে অবস্থাভেদে aristocracy ও oligarchy বা আভিজাত-তন্ত্র ও ধনিকতন্ত্র বলা হইয়া থাকে।

এই অল্পসংখ্যক বংশগত আভিজাত বা ধনগত আভিজাতের শাসন চিরকালই নানা অনাচার-অত্যাচারে পূর্ণ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে এই স্বদেশী আভিজাত তন্ত্রই এযাবৎ বিদেশী আমলাতন্ত্রের সকল প্রকার শাসন-শোষণের সহায়তা করিয়া আসিয়াছে। দেশবাসীর হাতে কিছু ক্ষমতা আসার উপক্রম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সেই ক্ষমতাটুকু নিঃশেষে হস্তগত করার জন্য, এই দলের মণ্ডলেরা এখন নানাসূত্রে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন বলা আবশ্যক যে, হিন্দু-মুছলমান ভেদে এই আভিজাত তন্ত্রের মানসিকতার কোনই তারতম্য হইতে পারে না। আভিজাত-তন্ত্রী হিন্দু যেমন শিক্ষা, সম্পদ বা উদারতা প্রভৃতির নামে, কৃষক প্রভৃতি নিম্নস্তরের হিন্দুদিগকেও শাসন ও শোষণ করার জন্য লালায়িত—আভিজাততন্ত্রী মুছলমানও এইরূপ মুছলমানের স্বার্থসংরক্ষণের অজুহাতে, কৃষকাদি মুছলমানকে শাসন ও শোষণ করার জন্য সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত। সর্ব্বাবস্থায় স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের প্রতি তাঁহাদের অসাধারণ আগ্রহাতিশয্যের প্রধান রহস্য এইখানেই লুকাইয়া আছে। সে স্বতন্ত্র কথা, পরে তাহার আলোচনা করিব। রামানন্দবাবু ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতারা দেশে যে শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন, তাহার আলোচনা করাই আজকার প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

রামানন্দ বাবু বলিতেছেন—"মুছলমানেরা যে অধিকাংশ প্রতিনিধির দাবী করিতেছেন, তাহার ভিত্তি এই যে, তাঁহারা অমুছলমানদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী। তাহা সত্য হইলেও, শিক্ষায় ও ট্যাক্‌স প্রদান সামর্থ্যে তাঁহারা অমুছলমানদের চেয়ে নিম্নস্থানীয়।" দুনয়ার ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, ইহাই হইতেছে আভিজাত-তন্ত্রীদের প্রথম কথা, প্রধান কথা এবং বোধ হয় একমাত্র কথা। এই নীতির সার ইহাই দাঁড়ায় যে, দেশবাসীদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষায় ও সম্পদে উচ্চস্থানীয়, নিজেদের শিক্ষা ও সম্পদের আপেক্ষিক-ক্রম অনুসারে তাঁহারাই দেশ শাসনের অধিকার লাভ করার হকদার। এই নীতি স্বীকৃত হইলে, হিন্দু-মুছলমান নির্ব্বিশেষে অধিকাংশ দেশবাসীকে মুষ্টিমেয় আভিজাততন্ত্রীর পদতলে কিরূপে স্থায়ীভাবে দলিত-মথিত হইতে হইবে, তাহা কল্পনা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। অধিকাংশ দেশবাসী যে নীতিদ্বারা মুষ্টিমেয় অবস্থাপন্ন আভিজাত কর্ত্তৃক নির্ম্মমভাবে শাসিত হইতে থাকিবে, আমাদের বন্ধুদের পরিভাষায় তাহাই যদি গণতন্ত্র বলিয়া কথিত হয়, তাহা হইলে, বাঙ্গালী জাতির স্বার্থের নামে, সেই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করাই প্রকৃত দেশহিতৈষী হিন্দু-মুছলমান-জননায়কদের আশুকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। নিম্নে কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি:—

রামানন্দ বাবু বাঙ্গলার মুছলমান ও অমুছলমান কৃষকদের ছবি, সংখ্যা ও অনুপাত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে জানা যায়, বাঙ্গলাদেশে মোট কৃষকের সংখ্যা:—

মুছলমান	...	২২৪১৯৮৮৭
অমুছলমান	...	১৩৯৮৪৯১৪
		৩,৬৪,০৪,৮০১

অতএব, বাঙ্গলাদেশে মোট কৃষকের সংখ্যা হইতেছে—৩ কোটি ৬৪ লাখ ৪ হাজার ৮০১ জন। এই প্রায় ৩৬০ কোটি অধিবাসীকে, এবং ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষায় ও সম্পদে নিম্নস্থানীয় অন্যান্য অধিবাসীদিগকে শাসন করিবেন এদেশের মুষ্টিমেয় ইংরাজী শিক্ষিত বড়লোক। ইহাই কি গণতন্ত্রের নীতি? ইহাই কি বর্ত্তমান রাজনৈতিক সাধনার লক্ষ্য? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে, অতীত ইতিহাসের সমবেত শিক্ষা অনুসারে, বলিতে হইবে যে, দেশে শ্রেণী-সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ার আর অধিক বিলম্ব নাই, এবং সে সংঘর্ষ শোচনীয় হইলেও অভিপ্রেত। অশেষ অনুতাপের বিষয় এই যে, এই আভিজাত-তন্ত্রীরা বাঙ্গলার হিন্দু-মুছলমান জনসাধারণকে নিজেদের মুরুব্বীদিগের ইঙ্গিত অনুসারে—সাম্প্রদায়িকতার মোহমন্ত্রদ্বারা এমনই সাংঘাতিক-ভাবে আবিষ্ট ও অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছেন যে, ইহাদের কুহকে পড়িয়া তাহারা আজ নিজহাতে নিজের পায়ে কুড়াল মারিতেও একবিন্দু দ্বিধা বোধ করিতেছে না। আশা করি, এ মোহ আর অধিক কাল স্থায়ী হইবে না।

গণতন্ত্রবাদের আদর্শ হইতেছে, দেশের প্রত্যেক অধিবাসীকে—নর-নারী নির্ব্বিশেষে দেশ-শাসনের অধিকার দান। কিন্তু নানাকারণে এইরূপে দেশের সকল অধিবাসীকে প্রত্যক্ষভাবে এই অধিকার দান করা সঙ্গত বা সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় না। তাই নাবালগদিগকে বাদ দেওয়া হয় এবং অধিকাংশ দেশে এই-সব অজুহাতে

lower property qualification অনুসারেই ভোটের অধিকার সাব্যস্ত করা হয়। No taxation without representation গণতন্ত্রের একটা প্রাচীন-নীতি। এই নীতি অনুসারে যে-কোন ব্যক্তি, সেস, রেট, ট্যাক্স ও রাজস্বাদি যে-কোন প্রকারে কোন কর প্রদান করে, অন্ততঃপক্ষে তাহাকে ভোটদানের অধিকার দিতে হইবে, অন্যথায় গণতন্ত্রের মূল-ভিত্তির উপর কুঠারাঘাত করা হইবে। সুতরাং এই হিসাবেও বিচার্য্য কেবল ইহাই যে, কোন্ সমাজে এইরূপ করদাতা কত লোক আছে? কোন্ সমাজ গড়ে কত পরিমাণ কর প্রদান করিয়া থাকে, তাহা এক্ষেত্রে বিচার্য্য হইতে পারে না। অন্যথায় Democracy গড়িতে গিয়া প্রকৃত পক্ষে গড়া হইবে Oligarchy, বিদেশী আমলাতন্ত্র শাসনের তুলনায়ও যাহা অনেক সময়ে দেশবাসীর পক্ষে অধিক ক্ষতিজনক হইয়া থাকে। রামানন্দ বাবুর ও তাঁহার সমমতাবলম্বী হিন্দু নেতাদের নির্দ্দেশমত ভোটাধিকার নির্দ্ধারিত হইলে দেশে সেই ধনিক স্বেচ্ছাতন্ত্রেরই প্রতিষ্ঠা হইবে। এই জন্য দুনিয়ার প্রায় সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশে কোন-একটা নিয়তম হারের কর বা ট্যাক্স প্রদানকে ভোটদানের যোগ্যতার কারণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। যে দুই-একটা ষ্টেটে Adult suffrage বা manhood suffrage প্রচলিত আছে, তাহার কথাই স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে তাহা প্রচলিত হওয়ার আশু কোন আশা নাই, হইলে এই সব তর্ক-বিতর্ক আপনা-আপনিই শেষ হইয়া যাইত।

সে যাহা হউক, নিম্ন পরিমাণের কোন কর, ট্যাক্স বা সেস্‌কে এইরূপে আমাদের দেশেও ভোটদানের যোগ্যতার হেতু বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলে, মুছলমান ভোটারদের সংখ্যা অমুছলমানদের তুলনায় যে কখনই কম হইবেন না, তাহা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি।

বর্ত্তমানে ২ টাকা চৌকিদারী ট্যাক্স দিলে তাহাকে প্রাদেশিক কাউন্সিলের ভোটার বলিয়া গণ্য করা হয়। এক টাকা চৌকিদারী ট্যাক্স দিলে ইউনিয়ন বোর্ডের ভোটার হওয়া যায়। সাইমন কমিশন হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন (২—৯৩) যে, এই হার ব্যবস্থাপক সভার ভোটারের জন্য গৃহীত হইলে বাঙ্গলার মফস্বলে, একমাত্র এই যোগ্যতার জন্য, ভোটারের মোট সংখ্যা দাঁড়াইবে—৯ লাখ ৬৮ হাজার; ইহার মধ্যে মুছলমানের সংখ্যা হইবে-৬ লাখ ৮ হাজার।

সুতরাং বাঙ্গলার মফস্বলে অমুছলমান ভোটার হইবে ৩ লাখ ৬০ হাজার, আর মুছলমান ভোটার হইবে ৬ লাখ ৮ হাজার। অতএব, কেবল এই হিসাবে মুছলমান ভোটার অমুছলমানের তুলনায় ২ লাখ ৪৮ হাজার জন বাড়িয়া যাইবে। অর্থাৎ তখন মুছলমান ভোটারের গড় সংখ্যা দাঁড়াইবে শতকরা ৫৭·৭ জন। সুতরাং 'ট্যাক্স প্রদান সামর্থ্য' অমুছলমানের তুলনায় মুছলমানের সংখ্যা অনেক বেশী, তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতেছে না।

পাঠক স্মরণ রাখিবেন, ইহা কেবল বৃদ্ধির হিসাব। অর্থাৎ দুই টাকার স্থলে একটাকা চৌকিদারী ট্যাক্সকে ব্যবস্থাপক-সভার ভোট দেওয়ার যোগ্যতার হার বলিয়া নির্দ্ধারিত করিলে বর্ত্তমানের তুলনায় ভোটারের সংখ্যা কি পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে এবং তাহার ফলে মুছলমানের অনুপাত কি দাঁড়াইবে, এই সংখ্যায় কেবল তাহাই দেখান হইয়াছে। একটাকার হার গৃহীত হইলে, বাঙ্গলার মফস্বলবাসী কৃষক, (প্রায়) ৬০ লাখ ভোটের মালিক হইবেন, কেবল চৌকিদারী ট্যাক্সের হিসাবে। ইহা আমি "স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন" সংক্রান্ত প্রবন্ধে সরকারী কাগজ-পত্র হইতে সপ্রমাণ করিয়া দেখাইব। আজ আমাকে বাধ্য হইয়া কেবল সাম্প্রদায়িক গুরু-লঘু লইয়া জমা-খরচ করিতে হইতেছে। এই হিসাবে দেখা যাইবে—এই ৬০ লাখ কৃষক ভোটারের মধ্যে ৩৭৷৷০ লাখ হইবে মুছলমান, আর সকল শ্রেণীর অমুছলমানকে মিলাইয়া হইবে ২২৷৷০ লাখ মাত্র। কারণ, রামানন্দ বাবু নিজেই দেখাইয়াছেন যে, প্রতি ৮ জন কৃষকের মধ্যে ৩ জন অমুছলমান ও ৫ জন মুছলমান।

চৌকিদারী ট্যাক্স ও ইউনিয়ন রেটের কথা এই হইল। রোড্ সেস, পাবলিক ওয়ার্ক সেস, ও রি-ভ্যালুয়েশন সেস হিসাবে মুছলমানরাই অধিক টাকা সরকারী তহবিলে আদায় দিয়া থাকে; এবং গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে ইহার একটা নিম্নপরিমাণকে যোগ্যতার ক্রম বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলে মুছলমান ভোটারের সংখ্যাই অধিক হইয়া দাঁড়াইবে।

বাঙ্গলার শহর ও মফস্বলের মোট অধিবাসী ৪,৬৬,৯৫,৫৩৮ জন। ইহার মধ্যে টাউনগুলিতে বাস করে মাত্র

৩১,৮৬,৩০১ জন; অবশিষ্ট ৪,৩৫,০৯,২৩৫ জন মফস্বলের অধিবাসী। এই (প্রায়) ৪ কোটি ৩৫ লাখের মধ্যে, ৩ কোটি ৬২ লাখ ৪ হাজার ৯৯৪ জন হইতেছে কৃষক বা কৃষিজীবী। অতএব :—

মফস্বলবাসী ··· ৪ ৩ ৫ ০ ৯ ২ ৩ ৫
বাদ কৃষক ··· ৩ ৬ ২ ০ ৪ ৯ ৯ ৪

৭ ৩, ০ ৪, ২ ৪ ১ অকৃষক মফস্বলবাসী

প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটী, বিশেষ তদন্ত ও আলোচনার পর প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মোটে বাঙ্গলার কৃষক প্রজারা ৫৯,১৮,২৪০টী রায়তী-জমা ভোগ করে, এবং এই রায়তদের সংখ্যাও তাহাই। অর্থাৎ এই (প্রায়) ৬০ লাখ হোল্ডিংএর রায়তের সংখ্যায়ও ৬০ লাখ। গড়-পড়তা হিসাবে এই ৬০ লাখ প্রজার প্রত্যেকেই নিজের কর্ষিত জমির দরুণ ২৫ টাকা খাজনা দিয়া থাকে, ইহাও কমিটী দেখাইয়াছেন। এই প্রজাদের প্রত্যেকে ১/০ আনা হিসাবে গড়ে ইউনিয়ন রেট দিয়া থাকে, ইহাও তাঁহারা দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের হিসাব এইরূপ :—

খাজনা	২৫৲
সেস্	৸০
তহুরী	১৷৷/০
রেট	১/০
	২৮৷৵০

এই হিসাবের উপর নির্ভর করিলে আমাদের চলিবে না। কারণ, তহুরীর টাকা এক্ষেত্রে বাদ দিয়া ধরিতে হইবে। পক্ষান্তরে রি-ভ্যালুয়েশন সেস্‌টা কমিটী তখন গণনা করেন নাই। এই "ভ্যালুয়েশন সেস্" যে কিরূপ চির-বর্দ্ধমান অভিশাপ, তাহা বাঙ্গলার জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে কাহারও জানিতে বাকি নাই। বাঙ্গলার সকল জেলার মাপ-জরিপের কাজ এখনও শেষ হয় নাই, সুতরাং পরিমাণ ও অনুপাত সম্বন্ধে শেষ-কথা বলা সম্ভব হইতেছে না।

বাঙ্গলার কৃষক-প্রজাদের বৎসরে মোটামুটি হিসাবে ১৫ কোটি টাকা কর দিতে হয়,—১৯২৮ সালের ৩০শে মার্চ্চ তারিখে ছিল—১৫,১৯,২৭,৩৬৪ টাকা। ১৯২৮-২৯ সালের বাঙ্গলা সরকারের Land Revenew Administration Report অনুসারে, ঐ সরকারী বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত মোট যত টাকা খাজনা প্রজার নিকট হইতে আদায় হইয়াছে, তাহার শতকরা ১৯·৮ টাকা হিসাবে রি-ভ্যালুয়েশন সেস্ আদায় হইয়াছে। হিসাবের সুবিধার জন্য আমরা ইহাকে শতকরা ২০ টাকা বলিয়া ধরিব।

দেয় খাজানার শতকরা ২০ ভ্যালুয়েশন সেস্ হইলে, ২৫ টাকা খাজানার উপর ভ্যালুয়েশন সেস্ বর্ত্তাইবে ৪৸০ আনা হিসাবে। এইরূপে গড়ে প্রত্যেক প্রজার দেয় সেস—

রোড্ সেস্	।৵৫
পাবলিক সেস্	।৵৫
রি-ভ্যালুয়েশন সেস্	৪৸০
মোট সেস্	৫৷৷১০

অতএব সর্ব্ব-সাকুল্যে সাড়ে পাঁচ টাকা সেস্ দেয়, এরূপ কৃষকের সংখ্যা, ৫০।৬০ লাখের কম হইবে না। ইহার মধ্যে, রামানন্দ বাবুর অনুপাত অনুসারে, মুছলমান হইবে ৫/৮ ভাগ এবং অমুছলমান হইবে ৩/৮ ভাগ—অর্থাৎ শতকরা ৩৭·৫০ জন অমুছলমান এবং ৬২·৫০ জন মুছলমান।

সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়—১৯২৬ সালে পাট বাবতে গবর্ণমেন্টের আয় হইয়াছে, ৩,৭৫,৬৩,৯২০ টাকা। ১৯২৮-২৯ সালে ভারতের সকল প্রদেশে মোট পাট জন্মিয়াছে ৯৭ লাখ গাঁইট, ইহার মধ্যে ৮৮ লাখ গাঁইট বাঙ্গলায় উৎপন্ন। এই হিসাবে মোটামুটি ভাবে জানা যাইতেছে যে, পাটের ৯৭ ভাগের ৮৬ ভাগ বাঙ্গলায় ও অবশিষ্ট ১১ ভাগ অন্যান্য প্রদেশে উৎপন্ন। এই হারে ভাগ করিলে জানা যাইবে যে, পাটখাতে মোট সরকারী আমদানীর মধ্যে ৪২,৫৯,৯৩৭ টাকা মাত্র অন্যান্য প্রদেশের এবং তাহা বাদে অবশিষ্ট ৩,৩৩,০৩,৯৮৩ টাকা বাঙ্গলার কৃষকদের পাটের উপর ট্যাক্স বসাইয়া আয় করা হইয়াছে। সকলে স্বীকার করিবেন, বাঙ্গলার যে-সব জেলাতে অধিকাংশ পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেগুলিতে মুছলমান কৃষকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগে অমুছলমান কৃষকের সংখ্যা খুবই কম। অপেক্ষাকৃত কম হইলেও, মধ্যবঙ্গেও অনেক পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। কলিকাতাকে বাদ দিয়া হিসাব ধরিলে, এখানেও মুছলমান অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা ৫০ জন। অধিকন্তু এই শতকরা ৫০ জন মুছলমান অধিবাসীর মধ্যে কৃষকের হার যেমন অধিক, পক্ষান্তরে শতকরা ৫০ জন অমুছলমানের মধ্যে ভদ্রলোক ক্লাসের সংখ্যাই অধিক এবং কৃষকের সংখ্যা কম।

অমুছলমানের (= হিন্দু) কৃষকের অধিকাংশই পশ্চিম-বঙ্গে বা প্রধানতঃ বর্দ্ধমান বিভাগে অবস্থান করিয়া থাকে; কিন্তু এ অঞ্চলে পাট খুবই কম উৎপন্ন হয়। কাজেই বুঝিতে হইবে যে, বঙ্গে মুছলমান-অমুছলমান ভেদে মোট কৃষকদের অনুপাত যথাক্রমে ৫/৮ ও ৩/৮ হইলেও, পাট উৎপন্নকারী মুছলমান কৃষকদের সংখ্যা অমুছলমানের তুলনায় ৬/৮ অংশের কম কোনক্রমেই হইতে পারে না। সুতরাং বাঙ্গলার পাট-করের শতকরা ৭৫ টাকাই যে মুছলমান কৃষকের নিকট হইতে আদায় হইয়া থাকে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আমরা দেখিতেছি যে, এই পাটের শুল্ক দেয়—

মুছলমান	...	২,৪৯,৭৭,৯৮৭
অমুছলমান	...	৮৩,২৫,৯৯৬
		১,৬৬,৫১,৯৯১

সুতরাং পাটের হিসাবে মুছলমানেরা অমুছলমানদের অপেক্ষা ১ কোটি ৬৬॥০ লাখ টাকা অধিক দিয়া থাকে। অতএব মুছলমানকে "ট্যাক্স প্রদান সামর্থ্যে" অমুছলমানের তুলনায় "নিম্নস্থানীয়", একথা বলা কোন প্রকারেই সঙ্গত হইতে পারে না।

প্রতি বৎসর বাঙ্গলা সরকার বনকর বলিয়া ৩১।৩২ লাখ টাকা আদায় করিয়া থাকেন। এই করের অধিকাংশই মুছলমানদিগের নিকট হইতে আদায় হইয়া থাকে। ন্যায্য ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে আরও জানা যাইবে যে, বাঙ্গলা সরকারের রেভিনিউ, লবণ কর, ষ্ট্যাম্প ও কোর্ট ফি প্রভৃতির আয়ও প্রধানতঃ মুছলমানদের নিকটই হইতেই প্রত্যক্ষ-ভাবে আদায় হইয়া থাকে।

একমাত্র আয়কর এবং আমদানী-রপ্তানীর শুল্ক মুছলমান অপেক্ষা অমুছলমানেরাই অধিক দিয়া থাকেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটু হিসাব করিয়া দেখিলেই জানা যাইবে যে, ইহারও অধিকাংশ পরোক্ষভাবে দেশের জনসাধারণের—সুতরাং প্রধানতঃ মুছলমানের—নিকট হইতে আদায় হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, প্রত্যক্ষ ভাবে হিসাব ধরিলে এই দুই বাবতের প্রধান অংশ বিদেশীদের নিকট হইতে সঞ্চিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালী হিন্দুদের এ বিষয় বড়াই করার বিশেষ কিছুই নাই।

ফলতঃ এই আলোচনার দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 'ট্যাক্স প্রদান সামর্থ্যে'র হিসাবে বাঙ্গলার মুছলমান সমাজ অমুছলমানদের তুলনায় "নিম্নস্থানীয়" কখনই নহে।

(১৩)
শিক্ষার হিসাব

শিক্ষাকে ভোট-দানের যোগ্যতা বলিয়া নির্দ্ধারণ করা কোনমতেই সঙ্গত হইতে পারে না। তাহা হইলে, অধিকাংশ হিন্দুও ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবেন। ইউরোপের কোন কোন দেশে শিক্ষাকে ভোট দানের একটা অতিরিক্ত শর্ত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সত্য। কিন্তু এই প্রকার শর্ত্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে বহু কালের স্বায়ত্ত শাসন ভোগ করার পর। ইহা ছাড়া সেই সকল দেশে Adult suffrage বা Manhood suffrage (বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা পুরুষ মাত্রকে ভোটাধিকার) দেওয়ার পর বর্ণজ্ঞানকে শর্ত্ত বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

শিক্ষা সম্বন্ধে বাঙ্গালার মুছলমান বাঙ্গালী হিন্দুর তুলনায় মোটের উপর অনেকটা পশ্চাৎপদ, ইহা ঠিক কথা। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগকে রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা সঙ্গত হইবে না। বরং এই কারণেই তাহাদিগকে আরও বেশী করিয়া অধিকার দিতে হইবে। কারণ যথেষ্ট পরিমাণ রাজনৈতিক অধিকার লাভের অভাবে, এ দেশের আমলাতন্ত্র এবং তাহাদের আশ্রিত ভদ্রলোক ক্লাস হিন্দুরা মিলিয়া, জনসাধারণের শিক্ষার প্রগতিকে বাধা দিবার ব্যবস্থাই এযাবৎ করিয়া আসিয়াছেন। এক বিহার ও উড়িষ্যা ছাড়া ভারতের অন্য সমস্ত প্রদেশের মোট শিক্ষা ব্যয়ের শতকরা ৫০ হইতে ৬৬ ভাগ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টই বহন করিয়া থাকেন। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার বহন করিয়া থাকেন—মোট শিক্ষা ব্যয়ের শতকরা ৩৫ টাকা মাত্র। এই ৩৫ টাকার কতটুকু ভগ্নাংশ হিন্দু-মুছলমান জনসাধারণের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়, আর ভদ্রলোক ক্লাসের পুত্রদের শিক্ষার জন্য কি পরিমাণ ব্যয় করা হয়, তাহাও দেখিবার বিষয়। সংস্কৃত কলেজের হিন্দু ছাত্রদের জন্য যেখানে কর্ত্তৃপক্ষ মাথা-প্রতি বার্ষিক ৫৬৪ টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না, সেখানে বাঙ্গলার মফস্বলবাসী-জনসাধারণের জন্য তাঁহারা মাথা-প্রতি ব্যয় করিয়া থাকেন বার্ষিক ৩৵১০ আনা মাত্র। রাজনৈতিক অধিকার না পাইলে জনসাধারণের—তথা মুছলমানের পক্ষে এই শ্রেণীর অনাচারের প্রতিকার করিয়া লওয়া কখনই সম্ভবপর হইবে না।

হিন্দু-মুসলমান

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী

ইতঃপূর্ব্বে কলিকাতা মহানগরীতে হিন্দু-মুসলমানে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল এবং যাহার প্রতিক্রিয়ায় আজ সারা-বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা কি হিন্দু-মুসলমানের আপন-আপন ধর্ম্মের অনুকূল? যাঁহারা দাঙ্গা করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা ইহার পোষকতা করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই বলিবেন—হাঁ, ইহা আমাদের স্বধর্ম্মের অনুকূল। যে আমার ধর্ম্মের কোন-কিছুতে বাধা দেয়, আমি ধর্ম্ম রক্ষার্থে তাহার বিরুদ্ধে অবশ্যই দাঁড়াইব—অবশ্যই তাহার প্রতিবিধান করিব, ইহা না করিলে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হয়।

কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিকেরা ইহার উত্তর করিবেন—দেশবাসী ভ্রাতার সহিত বিরোধ করিয়া তুমি তোমার মানব-ধর্ম্মের গৌরব নষ্ট করিতেছ, বিশ্বপতির বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া পাপ সঞ্চয় করিতেছ।

কেহ কেহ বলিতেছেন,—এই বিরোধ প্রকৃত হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ নহে, ইহা গুণ্ডাদের কাজ। কেহ বলিতেছেন,—ইহা দেশবাসী কাহারও চেষ্টায় হইতেছে না, ইহা ইংরাজ শাসনকর্ত্তাদের শাসন-নীতির একটি গুপ্ত অভিসন্ধির ফল। আমরা কিন্তু তাহা বলি না। আমরা বলিব—ইহার জন্ত আমরা দেশবাসী হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেকেই অপরাধী।

আজ জিজ্ঞাসার দিন আসিয়াছে—হিন্দু ভ্রাতা ভগিনীগণ, আপনারা কি মুসলমান ভ্রাতাদিগকে এ পর্য্যন্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন নাই? মুসলমান ভ্রাতা ভগিনীগণ, আপনারাও কি হিন্দুদিগকে ভালবাসিতে পারিয়াছেন? হিন্দু মুসলমানকে ঘৃণা করেন, মুসলমান ধর্ম্মের দিক্ দিয়া নহে, তাঁহাদের বাহ্যিক আচরণের দিক্ দিয়া। মুসলমানও হিন্দুকে ঘৃণা করেন তাঁহাদের সামাজিক রীতি-নীতির দিক্ দিয়া। উভয়ের ধর্ম্ম ও সমাজনীতির মধ্যকার মিলনের দিকগুলি বাদ দিয়া আমরা বিরোধ-গুলিই প্রবল করিয়া তুলিতেছি।

মুসলমান সমাজ হিন্দুর চক্ষে যতই ছোট হউক, মুসলমানের শ্রেষ্ঠতার একটা দাবী আছে—তাঁহারা সারা জগতের মানব-ধর্ম্মের সহিত একতা-সূত্রে গ্রথিত। হিন্দু ইহা অন্তরে বুঝিয়াও বাহিরে স্বীকার করিতেছেন না। এক বিশ্বপতির উপাসনা, জগতের মানবমাত্রকেই ভ্রাতৃতুল্য জ্ঞান, আহার-বিহার কোন-কিছুতেই কাহাকেও পরিত্যাগ না করা—এ সকল জগতের সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য।

হিন্দুর বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তাহা জগতের সার্ব্বজনীন ধর্ম্মেরই অনুকূল, কিন্তু বর্ত্তমানে হিন্দু-সমাজ ঐ সকল শাস্ত্রের বিধান হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। হিন্দুর সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারে এমন অনেক ভ্রমপূর্ণ বিষয় আসিয়া পড়িয়াছে, যাহাতে দিন-দিন এই সম্প্রদায় ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে; অথচ সেইগুলি সংশোধন করা দূরের কথা, তাহাকেই হিন্দুর বৈশিষ্ট্য বলিয়া গর্ব্ব করা হইতেছে। বলিতে কি হিন্দুর সমাজ যেন এখন বহু প্রাচীন হইয়া জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

হিন্দুর বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে বহু মতবাদ আসিয়া পড়িয়াছে, এইজন্ত অহিন্দুগণ ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া, ইহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না। বর্ত্তমানকালে সমগ্র পৃথিবীর মানবের মধ্যে পরস্পর অধিকতর ঘনিষ্ঠতা হইতেছে; এ অবস্থায় ধর্ম্মের মূল সূত্রগুলি নিকট-সম্বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বহু দেব উপাসনা পদ্ধতি, কঠোর জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতির দ্বারা হিন্দুজাতি সমগ্র পৃথিবীর মানবের সহিত ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। মুসলমানগণ যে হিন্দুকে ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, তাহাও ইহারই ফল। ভারতের হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতির একত্রে বসবাস করিতে হইবেই। এ অবস্থায় পরস্পর বিরোধ না করিয়া সদ্ভাবে চলাই কর্ত্তব্য। বরং ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয় যে, সর্ব্বধর্ম্মের ভক্ত সন্তানের বসবাস একমাত্র ভারত মাতার ক্রোড়েই সম্ভব হইয়াছে। ভারত সন্তান-গণের ভিতরেই যেমন জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির অনুশীলন হইয়া থাকে, জগতের আর কোন দেশে এমন সম্ভব হয় নাই। ভারতের এই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতাগণের মিলনের অভাবেই ভারত আজ এত হীনবল। এর পর বিদেশী শাসন-শক্তির প্রভাবে আমরা দিন দিন অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি।

বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত একত্রে বসবাসের অনুকূলে আমরা "মিলন-মন্দিরের নৈবেদ্য" নামে কয়েকটী ধারা প্রকাশ করিলাম, দেশবাসীকে এ বিষয় চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

—মিলন-মন্দিরের নৈবেদ্য—

১। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ করিয়া সেই ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে অন্ততঃ এক-এক জনের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে হইবে এবং সেই সেই বন্ধুর সহিত গতিবিধির মধ্য দিয়া তাহাদের সমাজ ও ধর্ম্মনীতি বুঝিতে হইবে।

৩। মিলনমন্ত্র প্রচারার্থে বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সার্ব্বজনীন ধর্ম্মনীতি সংগ্রহ করিয়া বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদিগের মধ্যে শিক্ষা দিতে হইবে।

৪। যাহা ধর্ম্ম এবং সমাজনীতির অনুকূল তাহা যথাসম্ভব পালন করিতে হইবে।

৫। জগতের ঐক্য সংস্থাপনার্থ বসন-ভূষণ, আহার-বিহার প্রভৃতির নিয়মের যতটুকু পরিবর্ত্তন করিলে, আমার স্বধর্ম্মের ব্যাঘাতকর না হইয়াও জগতের সাধারণ ধারার অনুকূল হয়, সে বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

৬। আমরা এই বিশ্বপতির সন্তান হিসাবে পরস্পর ভ্রাতা-ভগিনী তুল্য। কাহাকেও ঘৃণা করিলে বিশ্বপতির বিচারে অপরাধ হইবে।

৭। স্বধর্ম্মী-পরধর্ম্মী উভয়ের সেবাই বিশ্বপতির সেবার অঙ্গ।

৮। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত বিরুদ্ধাচরণে পাপ, সদ্ভাবে পুণ্য; পাপের ধ্বংস এবং পুণ্যের স্থিতি ইহা বিধাতারই বিধান।

৯। আমরা নীতিধর্ম্মের গর্ব্ব না করিয়া প্রেমধর্ম্মের অনুসরণ করিব। পরধর্ম্মাবলম্বী কাহারও প্রতি ক্রোধের সত্য কারণ উপস্থিত হইলেও ক্রোধ করিব না, ভ্রাতা বলিয়া ক্ষমা করিব।

১০। আমার দান যেন স্বধর্ম্মী-বিধর্ম্মী বিচার না করে।

১১। পরধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি আমাদের আন্তরিক ভালবাসা আমরা যেন কর্ম্মের দ্বারা দেখাইতে পারি।

১২। আমরা জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর কাছে ঋণী; কারণ প্রত্যেক ধর্ম্মের নীতি সম্মিলিত হইয়া জাতীয় জীবনের পুষ্টিসাধন করে।

১৩। পরধর্ম্মের ক্ষতিকর অথবা তাঁহাদের মনোক্লেশদায়ক কোন কর্ম্ম যেন আমাদের কাহারও দ্বারা সংঘটিত না হয়।

১৪। সকলের প্রতিই আমাদের বিচার নিরপেক্ষ হইবে।

১৫। এই সকল কার্য্যের মধ্য দিয়া আমাদিগকে অনেক দুঃখ-কষ্টে পড়িতে হইবে, তখন সেই সকল দুঃখ-কষ্টকে যেন আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লইতে পারি।

১৬। পরধর্ম্মীর প্রতি আমাদের ব্যবহার বিচার বুদ্ধিযুক্ত না হইতেও পারে, কিন্তু সরলতা যেন আমাদের মিলন-মন্দিরের ভিত্তি হয়।

১৭। যেখানে মিলন, সেখানে স্বাধীনতা—সেখানে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। মিলনের ফল প্রেম, আনন্দ, মাধুর্য্য, শান্তি।

১৮। আমি যদি পরের কল্যাণ কামনা করি, তবে সেই পরও কি আমার কল্যাণ কামনা না করিয়া থাকিতে পারে?

১৯। আমরা বিচ্ছিন্নতায় যেন কত হীন হইয়া পড়িয়াছি; অথচ সম্মিলিত-শক্তিতে আমরা কত অসাধ্য সাধন করিতে পারি। মিলিত শক্তির সাহায্যে আমাদের মধ্যে ভরসা আসিবে, ভারতবাসী আমরা জগতের একটা বরণীয় জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারিব।

২০। যিনি সারা বিশ্বমানবের প্রাণে একইভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন, সেই সর্ব্বশক্তিমান বিচারপতির নিকট আমাদের প্রাণের নিবেদন জানাইতেছি। তিনি আমাদের সকল ধর্ম্মের ও সকল সম্প্রদায়ের নর-নারীকে প্রেমের বন্ধনে মিলিত করিয়া এই মিলন-মন্দিরের প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করুন।

—মাতৃমন্দির

অর্ঘ্য

শ্রীশৈলবালা মুখোপাধ্যায়

দিনান্তের শেষে যবে সন্ধ্যা নেমে আসে
ধূসর আঁধারে ঘেরি' গোধূলির মাঝে,
তারি সাথে জেগে' ওঠে হৃদয়ের পাশে
তোমারি মুরতিখানি নবারুণ-সাজে।
প্রেমের বারতাখানি পাঠায়েছ যবে
মোর প্রাণে সেই সুর পশেছে আসিয়া,
তোমারে হেরেছি প্রিয়, জানিনাকো কবে
তনুমন তবু মোর ওঠে উচ্ছ্বসিয়া।
কবে সেই কোন্ এক যুগ-যুগান্তরে
ছিলে তুমি একমাত্র জীবনের সাথী,
আজি তাই ম্লান এই গোধূলি-আঁধারে
হৃদয়ের অর্ঘ্য-পুষ্প রাখিয়াছি গাঁথি।
লহ লহ হৃদয়ের প্রীতি-উপহার
পূর্ণ-অর্ঘ্য লহ তুমি, হে বন্ধু, আমার!

হায়দ্রাবাদ

শ্রীঅসিত মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলির বিষয় কিছু বলিতে গেলেই সর্ব্বপ্রথমে আমাদের মনে পড়ে দাক্ষিণাত্যের নিজাম-রাজ্য হায়দ্রাবাদের কথা। এই নামে আরও একটি স্থানের অস্তিত্ব ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুঁজিয়া পাওয়া যায়। প্রধান কার্য্যালয় ছিল; কিন্তু ইংরেজেরা উহা স্থানান্তরিত করিয়া করাচী সহরে স্থাপন করেন। হায়দ্রাবাদ সহরের যে-স্থানে বর্ত্তমান দুর্গ সেই স্থানে "নেরানকোট" নামক প্রাচীন সহর ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম-শতাব্দীতে এই সহর

হায়দ্রাবাদের মহামান্য নিজাম নবাব স্যার আসফ্‌জাহ্‌ ওসমান আলী খাঁ বাহাদুর।

সেটি সিন্ধু-প্রদেশের একটী ক্ষুদ্র সহর ও জেলা। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুর মুসলমান-নরপতি গোলাম শাহ্‌ কাল্লোরা এই সহরের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত মিয়ানীর যুদ্ধে সহরটী ইংরেজের অধিকারভুক্ত হয়। মুসলমান নরপতিগণের আমলে কিছুদিনের জন্য এই স্থানে সিন্ধু-প্রদেশের মোহাম্মদ বিন্‌-কাসেম অধিকার করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র সহরটীর মোটামুটী ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি এই পর্য্যন্ত। আর যাহা-কিছু খুটি-নাটি আছে, অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া এখানে তাহার আলোচনা করিতে চাই না।

নিজামরাজ্য হায়দ্রাবাদ ধনে-মানে, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে,

জ্ঞান-বিজ্ঞানে দেশীয় রাজ্যগুলির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এই রাজ্যের রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্ম্মে, সাহিত্যে এমন সব সুনিয়ন্ত্রিত বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যে, যাহা আমরা অন্য কোন দেশীয়রাজ্যে দেখিতে পাই না। এই সুনিয়ন্ত্রিত বিধি-ব্যবস্থাই দিন-দিন হায়দ্রাবাদকে ক্রমোন্নতির পথে চালাইয়া লইয়া যাইতেছে।

নিজাম বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবাব আসফ জাহ্ মির হেমায়েৎ আলী খাঁ বাহাদুর।

সমুদ্রমগ্ন ব্যক্তি তৃণ-মাত্র অবলম্বন পাইলেও যেমন কতকটা সোয়াস্তির হাফ্ ছাড়িয়া বাঁচে, সবহারা আমরা—"দেশীয়-রাজ্য" এই নামটা উচ্চারণ করিলেও একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি। এই ছায়া কবে প্রকৃত কায়া পরিগ্রহ করিয়া আমাদিগকে মুখ ভরিয়া ও বুক ভরিয়া "দেশীয় রাজ্য" বলিবার মত অধিকার দান করিবে, তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন।

যাহার পরিচয় দেওয়ার মত কিছুই নাই, তাহার অপরিচয়ের সামান্য কিছুতেই পরিতৃপ্ত থাকিতে হয়। এই সামান্য কিছুর ভিতরে একটুখানি আলোকের রেখা দেখিতে পাইলেও সবহারাদের মনের কোণে সামান্য একটু শান্তির আভা ঝিক্-মিক্ করিয়া উঠে। সেইরূপ হায়দ্রাবাদের বর্ত্তমান উন্নততর অবস্থার কথা মনে করিলে আমাদের মনের কোণেও একটুখানি আনন্দ এবং একটুখানি গৌরব যুগপৎ ফুটিয়া উঠে। নিম্নে এই হায়দ্রাবাদ-রাজ্য সম্পর্কে দুই-একটি কথা বলিবার প্রয়াস পাইতেছি :—

১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে গোলকুণ্ডাধিপতি কুতবসাহী বংশের নরপতি মোহাম্মদ কুলী এই সহরের প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তরকালে সহর সমেত জেলাটি মোগল-সম্রাটের অধিকারভুক্ত হয়। তৎপর এখানে নিজাম-উল্ মুল্কের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কুতব সাহী বংশের রাজগণের রাজত্বকালে এই সহরে অনেকগুলি বৃহদাকার সুদৃশ্য মস্‌জিদ, উদ্যান,

সেতু ও অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। নিম্নে সেগুলির নাম করিতেছি :—

(১) খোদাদাদ মহল (২) জান্নাৎ মহল (৩) মোহাম্মদ শাহী উদ্যান (৪) চার মিনার (৫) জামে মস্‌জিদ (৬) মুসা নদীর সেতু (৭) চারসু হাউস (৮) চিকিৎসালয় (৯) মোসাফির খানা (১০) বিরাট রাজ-প্রাসাদ (১১) দাদ মহল (১২) নদী মহল (১৩) চার কামান (১৪) কোহতুর মহল (১৫) মক্কা মসজিদ।

দিল্লীর মোগল-সম্রাট আওরঙ্গজেবের সেনাপতি আসফ্‌জাহ্‌ নিজাম-উল্‌-মুলক উপাধি প্রাপ্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যের সুবাদার পদে নিযুক্ত হন। এই পদ গ্রহণের কিছুদিন পরে তিনি মোগল-সম্রাটের দুর্ব্বলতা দেখিয়া দিল্লীর অধীনতা পাশ ছিন্ন করতঃ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে নিজাম-উল্‌-মুলকের মৃত্যু হইলে হায়দ্রাবাদের সিংহাসন লইয়া তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। এই সুযোগ পাইয়া ইংরেজ ও ফরাসীগণ পরস্পর বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন করেন। ইংরেজের সাহায্যে নিজাম আলী দ্বিতীয় আসফ্‌জাহ্‌ উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসন প্রাপ্ত হন এবং ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কৃতিত্বের সহিত রাজ্য শাসন করেন।

দ্বিতীয় আসফজাহ্‌ নিজাম আলী কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ইংরেজকে উত্তর সরকার প্রদেশ ছাড়িয়া দেন এবং টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে ইংরেজের পক্ষে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে তিনি যে সমস্ত স্থান দখল করেন, রাজ্য রক্ষার্থে নিযুক্ত সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সেই সমস্ত ভূখণ্ড ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজকে প্রদান করেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ ও নিজামের মধ্যে যে সন্ধি

নিজাম পুত্রগণের উদ্যান-সম্মিলনে হায়দ্রাবাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। উপবিষ্ট লাইনের বামদিক হইতে চতুর্থ ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ পুত্র, ষষ্ঠ ব্যক্তি মধ্যম পুত্র এবং মাটিতে উপবিষ্ট কনিষ্ঠ পুত্র।

হয়, তদনুসারে নিজাম "হায়দ্রাবাদ কন্টিঞ্জেন্ট" নামক সৈন্যদলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ইংরাজের হস্তে বেরার প্রদেশ প্রদান করেন। ব্যয়ের পর উদ্বৃত্ত টাকা নবাবকে দেওয়া হইত। এইভাবে "কৌশলে পশিল কলি নলের শরীরে।"

নিজাম বাহাদুরের অতিথিরূপে বড়লাট লর্ড আরউইন। নিজাম বাহাদুরের পার্শ্বে লর্ড আরউইন উপবিষ্ট আছেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে ভারতের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জন এই প্রদেশ চিরকালের জন্য পাট্টাসূত্রে ইংরেজের পক্ষে গ্রহণ করেন এবং "হায়দ্রাবাদ কন্টিঞ্জেন্ট" সৈন্যদল ইংরেজ সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া যায়। এই সহরটি মুসানদীর তীরে অবস্থিত।

ইহার পর ক্রমান্বয় তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ
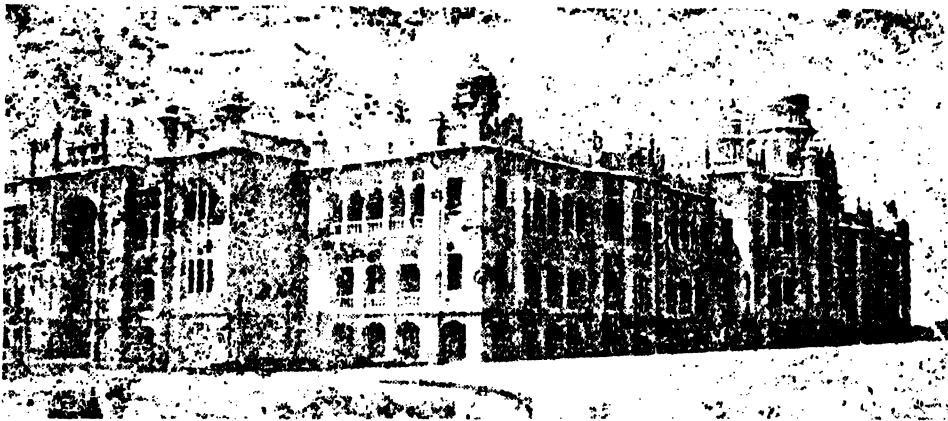
হায়দ্রাবাদ সিটি কলেজ।

আসফ্‌জাহ্‌ রাজত্ব করেন। ষষ্ঠ আসফ্‌জাহের উত্তরাধিকারী সপ্তম আসফ্‌জাহ্‌ নিজাম-উল্‌-মুল্‌ক স্যার ওস্‌মান আলী খাঁ বাহাদুর নিজাম রাজ্যের বর্ত্তমান সুযোগ্য অধিপতি। ইহার সুশাসন, প্রজাপালন এবং রাজ্যের সার্ব্বজনীন উন্নতির প্রচেষ্টা সমগ্র সভ্য-দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। নিজাম বাহাদুরের শাসনগুণে সমাজে, রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে, শিল্পে, বাণিজ্যে এবং সাহিত্যে অতি অল্প দিনের মধ্যে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইনি ১৯১১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই প্রজা সাধারণের কল্যাণজনক বহু কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং করিতেছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) শাসনবিভাগের সংস্কার (২) আইন সভার প্রতিষ্ঠা (৩) ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (৪) অনুবাদ বিভাগ গঠন।

অনুবাদ বিভাগে পৃথিবীর উন্নত এবং সভ্য দেশসমূহের সাহিত্য, দর্শন, ন্যায়, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, ব্যবহারিক শাস্ত্র, শিল্প-বাণিজ্য, আইন, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসা, স্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ের

মূল্যবান গ্রন্থসমূহের ভাষান্তরিত করিয়া উর্দ্দু ভাষায় অনূদিত করা হয়।

এই রাজ্যের শিক্ষা বিভাগে যে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা নিম্নের তুলনামূলক হিসাবটুকু হইতে পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারিবেন :—

	১৯১৯ সাল	১৯২৮ সাল	ছাত্র সংখ্যা
কলেজ	২	৭	৩১৪৩
উচ্চ-বিদ্যালয়	২২	৪৩	১৬১০৪
মধ্য-বিদ্যালয়	৮৭	১০৮	২৫৮০২
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১২৩	৩৯৭৯	৩৮২৫
বিশেষ বিদ্যালয়	২০	৪৯	২৭১৮৫৭

অধ্যয়নরত ছাত্রগণকে বহু টাকা সাহায্য করা হইয়া থাকে।

রাজ্যের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার জন্য মোট ৭০৬টি বিদ্যালয় আছে। ঐ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ৩৫০৬৬ জন, ইহার মধ্যে কলেজ ৫, উচ্চ বিদ্যালয় ১৩, মধ্য ও প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৮৮, শিল্প বিদ্যালয় ২, ট্রেনিং স্কুল ৪টি। স্ত্রীশিক্ষার জন্য বার্ষিক ৬৯১৬৮৮৲ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

সিটি কলেজ ও চাদরঘাট হাইস্কুলে ব্যবসায়-বাণিজ্য শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। মোট ৪৭৩টী ছাত্র ব্যবসায়-বাণিজ্য শিক্ষা করিতেছে।
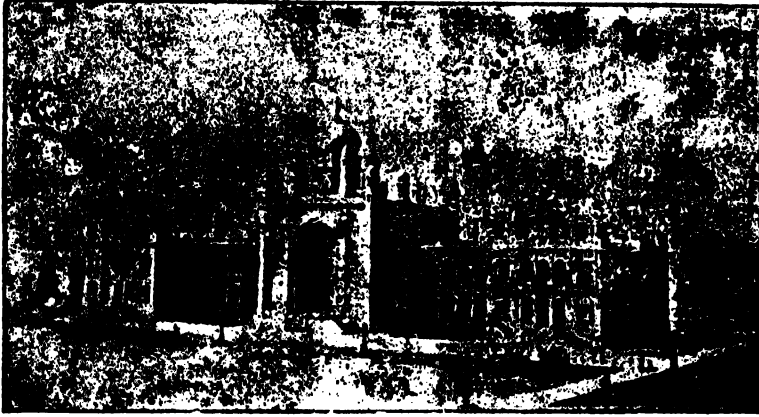
ওসমানিয়া হাইকোর্ট

বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রের সংখ্যা

মুসলমান	৯৩২৮৭
ব্রাহ্মণ	১৯৯৫৪
ব্রাহ্মণেতর জাতি	১৪৬৮৪২
খৃষ্টান	৪২৯৫
পারসিক	২৩৯
নিম্ন হিন্দু	৫০৬৮

এই রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগ হইতে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য বার্ষিক যে পরিমাণ ব্যয়ের বরাদ্দ আছে, তাহার হিসাব :—

কলেজে পড়া	৪৫৯৲ টাকা
উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়া	৬০৲ টাকা
মধ্য বিদ্যালয়ে পড়া	৩১৲ টাকা
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া	১০৲ টাকা

এতদ্ব্যতীত মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি, দরিদ্র ছাত্রদের বিশেষ সাহায্য, ইউরোপ, আমেরিকা, মিশর প্রভৃতি স্থানে

হায়দ্রাবাদ স্কুল ও কলেজে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার্থী ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা :—

	ছাত্র	ছাত্রী
ইংরাজী	১০৪০৯	১৪৬৫
ল্যাটিন	১০৬	২১
ফরাসী	+	৫৪
আরবী	১৫১১	১১
ফারসী	৫৭৪৪	৭২
সংস্কৃত	১৮৬	•
উর্দ্দু	২৪৪৯৮	২৮৩৪
তেলেগু	৩২৭	৩৩৭
দেশীয় ভাষা	৪৩৭৩	৬৪
মহারাষ্ট্র	১৭৬২৫	৫৩৯
গুজরাটী	৭১	•
হিন্দী	২০	:
গুরুমুখী	১৭	•

রাজ্যের উন্নতি-কল্পে নিজাম বাহাদুরের আরও কয়েকটি সদনুষ্ঠানের নাম নিম্নে বিবৃত করা হইল :—

১। মুসা নদীর তীরে সরোবর খনন
২। জল সরবরাহের জন্য খাল খনন
৩। নলের সাহায্যে সহরময় জল সরবরাহ
৪। নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ ও পুরাতন রাস্তা সংস্কার
৫। সহরের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সাধন
৬। স্বাস্থ্য-রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা
৭। হাইকোর্ট স্থাপন

মোহাম্মদ আকবর হায়দারী, ইনি নিজাম রাজ্যের প্রতিনিধি হইয়া রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে গিয়াছিলেন।

৮। সিটি স্কুলের প্রতিষ্ঠা
৯। স্ত্রী-চিকিৎসালয় স্থাপন
১০। টাউন হল ও পার্ক প্রতিষ্ঠা
১১। কৃষি-সমবায় সমিতি স্থাপন
১২। প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণ

স্বীয় রাজ্যে এবং রাজ্যের বাহিরে বহু সদনুষ্ঠানে অর্থ সাহায্য ব্যাপারে নিজাম বাহাদুর সর্ব্বদা মুক্ত হস্ত। এই অর্থ সাহায্য তিনি জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষেই করিয়া থাকেন। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতাস্থ ইসলামিয়া কলেজে এক কালীন এক লক্ষ টাকা এবং গত ১৪ই মার্চ্চ নিখিল ভারতীয় মহিলা-শিক্ষা-সমিতির দিল্লী-অধিবেশনে সর্ব্বশ্রেণীর মহিলা-দের শিক্ষার সৌকর্য্যার্থে দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

হায়দ্রাবাদের (-একটী ধর্ম্ম-: নিজাম বাহাদুর হঠাৎ উপস্থিত হন। সভায় তখন রীতিমত-ভাবে ওয়াজ ও নছিহত চলিতেছিল, নিজাম বাহাদুরকে দেখিবামাত্র ধর্ম্ম-গুরু পর্য্যন্ত সকলেই শশব্যস্তে আসন ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করেন। ইহাতে নিজাম বাহাদুর যৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্ম-গুরুকে লক্ষ্য

এই গ্রাজুয়েট মোস্লেম মহিলা হায়দ্রাবাদ ষ্টেট্ স্কলারসিপ লইয়া উচ্চশিক্ষার জন্য ইউরোপে গিয়াছেন।

করিয়া বলিলেন—"আপনি যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে আপনাকে বন্দী করিয়া আমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারি। আমাকে সম্মান দেখাইতে যাইয়া আপনি ধর্ম্ম-সভার মর্য্যাদা হানি করিয়াছেন। জগতের শ্রেষ্ঠ ধনিক, কোটি কোটি নর-নারীর শাসনকর্ত্তা নিজাম বাহাদুরের মুখের এই মহাবাণীই তাঁহার উদারতা, মহানুভবতা, সরলতা এবং ধর্ম্ম-প্রাণতার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

আমরা খোদাতালার নিকট প্রার্থনা করিতেছি—মহামান্য নিজাম বাহাদুর সুস্থ দেহে দীর্ঘকাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার দ্বারা তদীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের এবং ভারতের মুখোজ্জ্বল করুন।

জসীমউদ্দীন

নদীর কূলে কেয়ার বন, তাহার নীচে ঘাট,
সেই ঘাটেতে ডুব দিয়েছে দিঘল গেঁয়ো বাট।
সেখান দিয়ে জলকে যেতে পল্লী-বধূর দল,
দোলায় ঘড়া, এলায় চুল, বাজায় পায়ে মল!
সারি সারি কাঁখের ঘটে কাকণ বাজে র'য়ে,
দেবারতির প্রদীপ-মালা চলছে যেন ব'য়ে।
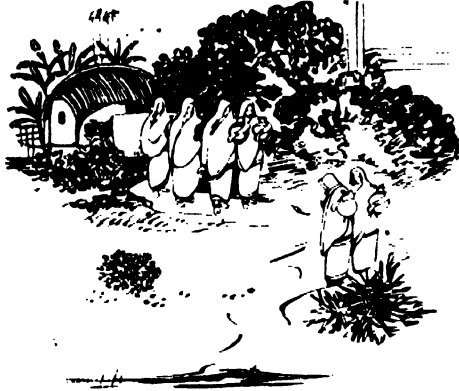
কারো পরণ হলুদ শাড়ী, কারো পরণ লাল
কারো শাড়ী নীলাম্বরী, কারো বা 'মেঘ-জাল'—
রঙের রঙের শাড়ীর লহর দুলছে রঙের বায়
মেঘের বহর দুলছে যেন রঙিন সাঁঝের গায়।
দু'ধারে মাঠ সুদূর-ছাওয়া—সবুজ পারাবার
—সেই সাগরে ওরাই যেন করছে পারাপার।

রঙের রঙের শাড়ী ত নয়, শতেক রঙের পালে,
বিদেশী কোন্ হাওয়া-কুমার জড়িয়ে রঙের জালে।
চলছে তারা এ-ওর সাথে নানান কথা ক'য়ে
গ্রাম্য কবির কাব্য যেন চলছে সাথে বয়ে।
শুনতে তাহা হয়ত মিঠে, চুড়ীর গীতির মত
হয়ত তাহা অমনি রঙিন, রঙিন শাড়ী যত।

নদীর ঘাটে এসে তারা ঘট ভরিয়া জলে
সারাটি গাঙ ওলট-পালট করে সানের ছলে।
করো খোপার ফুল খ'সে যায়, কারো গলার মালা
মাটির ঘড়া জড়িয়ে বুকে ভাসে বা কেউ বালা।
আলতা-রাঙা চরণখানি ঘসে বা কেউ তীরে,
কেউ বা গায়ে হলুদ-বাটা মাখায় ধীরে ধীরে।

'ভেসাল' মেলে জেলের ছেলে ঢুলছে ঘুমে হায়
জাল ছিঁড়ে তার মাছ পালাল খেয়াল নাহি তায়।
ওই মেয়েদের জল-ভরণে যে ঢেউ জলে ভাঙে
হয় ত আরেক কুল ঘেসে তা কুলের বাঁধন মাঙে।
হয় ত ওদের রঙিন পায়ের আলতা-গোলা জল
কখন কখন এপার কারো মন করে চঞ্চল।
হয় ত কেহ চলতে পথে ওদের নয়ন হ'তে
বিনা-তারের তার পেয়ে যায় অমনি কোন মতে।

এই ঘাটেতে নিতুই ওরা জলের খেলা সেরে
ভরা কলস কাখে নিয়ে ঘরের পানে ফেরে।
পথের পরে রাঙা পায়ের আখর এঁকে যায়
আঁচল-ভেজা জলের ধারা ছিটায় তারি গায়!
তারি শীতল পরশ পেয়ে মাঠের ধূলো বুঝি
রাঙা পায়ের ঘুমলি স্বপন দেখছে নয়ন বুঁজি।

এই ঘাটেরি একটি ধারে কুমার গাঙের কূলে,
কদম্ব গাছ এলিয়ে শাখা দুলছে ফুলে ফুলে।
পাতায় পাতায় বুনিয়ে যেন সবুজ রঙের জাল,
কোন বাতাসে বাঁধবে বলে বাড়িয়ে আছে ডাল।
তাহার ফাঁকে যায় যে দেখা খণ্ড-নীলের মায়া,
সেখান দিয়ে টুকরো রোদের ঝরে সোণার কায়া।
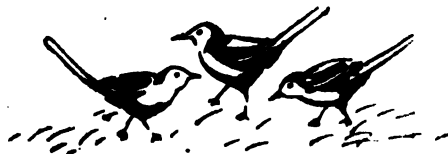
বাতাস দোলায় গাছের শাখা তাহার সুরে সুরে,
ছোট ছোট রোদের গুঁড়ো তলায় নাচে ঘুরে।
এই গাছেরি হেলান দিয়ে বিগান গাঁয়ের ছেলে,
উদাসী তার বাঁশীর সুরে বুকখানি হায় মেলে।

গাঁর মেয়েরা চলতে ঘরে ভেবে না কুল পায়,
জল ভরিতে কার কথা ও বাঁশীর সুরে গায়।
কেউ বা ভাবে সুরখানি তার বাঁধবে বাহুর ডোরে,
কেউ ভাবে তার গানখানিরে চুমোয় দেবে ভরে।

কারো কারো হয় বা মনে তাহার রাঙা মুখে
যে রঙ ঝরে ওই বাঁশী তা গাইছে মন সুখে।
রাখাল সে'ত বাঁশীই বাজায় আপন মনে একা ;
ওই মেয়েদের বুকে সে সুর আঁকে নানান রেখা।
কোন্ নারী সে ভাগ্যবতী যাহার কথা লয়ে
ওই বিদেশীর বাঁশী আজি ফিরছে ভুবন বয়ে !
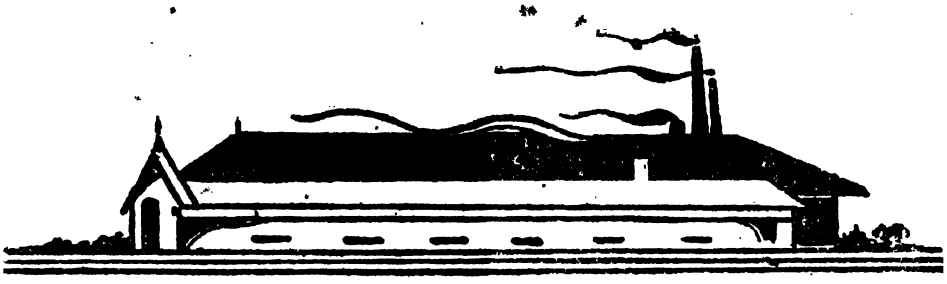
ফরাসী-বিপ্লব

রিজাউল করিম বি, এ

দ্বিতীয় পর্ব্ব

অনেক দিন হইতেই ফ্রান্স বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। অত্যাচারী রাজা, রক্ত-শোষক আভিজাত-বর্গ, নিগৃহীত প্রজা, উন্মত্ত মধ্যশ্রেণী—আর করাল দুর্ভিক্ষ আসন্ন—অথচ রাজা, বা ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণের সেদিকে লক্ষ্যই নাই। উহাদের মধ্যে যে-কোনও একটা কারণ একটা মহাবিপ্লব সংঘটন করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এতগুলি কারণ একসঙ্গে মিলিত হইলে সামান্য বিপ্লবও কিরূপ ভীষণাকার ধারণ করিতে পারে, তাহা কল্পনা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। অত্যাচার, নিপীড়ন ও কুশাসনের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া প্রজাগণ ক্ষিপ্ত হইয়া যে বিপ্লব সৃষ্টি করিল, বিভীষিকায় তাহার নিকট পূর্ব্বাপর সকল প্রকার বিপ্লবই হার মানিল।

যে কয়েকটি মুখ্য-কারণ ফ্রান্সকে অতি দ্রুত বিপ্লবের পথে পরিচালিত করিতেছিল, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইতেছে, ফ্রান্সের সরকারী তহবিলের অর্থসঙ্কট।

রাজা যদি প্রজার দেওয়া করকে, আপনার ন্যায্য পাওনা বলিয়া মনে করেন, এবং প্রজার সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সেই অর্থকে কেবল ভোগ-বিলাসে ব্যয় করেন, আর তহবিলে অনাটন হইলেই, ঋণদ্বারা বা অতিরিক্ত কর দ্বারা সেই অভাব পূরণের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সরকারী তহবিলের যেরূপ অবস্থা হওয়া উচিত, সে সময়ে ফ্রান্সে তাহাই হইয়াছিল। ফ্রান্সের সরকারী তহবিল অর্থশূন্য, ঋণের দায়ে সমগ্র রাজ্যটি আবদ্ধ, কিন্তু তবুও ব্যয়সঙ্কোচ নাই। প্রজার রক্ত-শোষা অর্থ হুড়-হুড় করিয়া রাজকোষে আসিতেছে, আর রাজা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অকাতরে সেই অর্থ অপব্যয় করিয়া যাইতেছেন—বিপ্লবের পূর্ব্বে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা ঠিক এইরূপ।

বিপ্লব আরম্ভ হইবার বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই ফ্রান্সের রাজস্বের অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন ছিল। ৪র্থ হেনরী ও তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী সালীর (sully) সময় হইতেই দেশ গুরুতর ঋণভারে প্রপীড়িত ছিল। আয় অপেক্ষা ব্যয় এত অধিক ছিল যে, কোনও বৎসরই অতিরিক্ত আয় দ্বারা ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হইত না। সেই যুগে সরকারী ঋণই ছিল প্রায় ৩৪ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। বৎসর বৎসর এই ঋণ বাড়িয়াই চলিল। অথচ ব্যয় একটু-মাত্র কমিল না; এবং নূতন আয়ের পথও আবিষ্কৃত হইল না। পরবর্ত্তী যুগে, রিশ্‌লু, মাজারীণ, কোলবেয়ার প্রমুখ সংস্কারকগণ রাজস্বের দুরবস্থা মোচন করিবার বহু-চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই অর্থাভাবের মূল কারণ ছিল, 'ফিউডাল প্রথা'। ঐ প্রথা প্রচলিত থাকাতে দেশের ⅔ ভূমি সর্ব্বপ্রকার কর হইতে মুক্ত ছিল, কোটিপতি আভিজাত ও গীর্জ্জার অধীনস্থ বড় বড় বিশপগণ সর্ব্বপ্রকার কর হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। বক্রী ⅓ অংশের উপরই রাজকর নির্দ্ধারিত ছিল, প্রয়োজনীয় সমুদয় কর উহা হইতে আদায় করা হইত। প্রজারা করভারে এতই পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহাদের নিকট আর এক কপর্দ্দক আদায় করিবার উপায় ছিল না। ফ্রান্সের সম্রাট্‌গণ দেশের এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ইচ্ছামত অপব্যয় করিয়া যাইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দশ লুই পর্য্যন্ত অবস্থা এইরূপ ভাবে চলিল।

কিন্তু ১৪শ লুইএর সময়ে রাজস্বের অবস্থা আরও ভীষণাকার ধারণ করিল। তিনি বিলাসিতা, আড়ম্বর ও জাঁকজমক দ্বারা অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক রাজত্ব করিয়া বাহ্যিক শোভা-সৌন্দর্য্যে ফ্রান্সকে বিভূষিত করিয়া তুলিলেন বটে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে দেশ যে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছিল, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখেন নাই। প্যারিস হইতে কয়েক মাইল দূরে ভারসেল নগরে তাঁহার যে সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইল, তাহাতে এত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল যে, সেই অর্থে ফ্রান্সের জাতীয় ঋণ অনেকটা পরিশোধ হইতে পারিত। কিন্তু রাজার দৃষ্টি সেদিকে পতিত হইল না। তাঁহার ব্যয়বহুল রাজত্বকালে, রাজস্বের অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়া পড়িল যে, তাহা আর সংশোধনের পন্থা রহিল না। তৎপর ১৫শ লুইএর সময়ে দেশের অর্থসঙ্কট আরও ভীষণ হইয়া পড়িল। পর-পর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, তিনি ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। নিরর্থক যুদ্ধ ও আমীর ওমরাহ-বৃন্দ লইয়া মহাধুমধামের সহিত পানভোজন ও তাহার আনুসঙ্গিক পাপকার্য্যে জীবনপাত করিয়া তিনি দেশকে দেউলিয়া করিয়া দিলেন। রাজকোষ অর্থশূন্য করিয়া তিনি যে মহাভ্রম করিয়াছিলেন, তাহা শেষ বয়সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া যান যে—"আমার মৃত্যুর পর এক মহাপ্লাবন আসিয়া ফ্রান্সকে ভাসাইয়া দিবে।"

তৎপর যে হতভাগ্য মানুষটি সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তাঁহার স্কন্ধে পূর্ব্বপুরুষগণের কৃত-পাপের সমস্ত বোঝা পতিত হইল। ষোড়শ লুই তখন মাত্র বিংশতি বৎসরের যুবক। তরুণ যুবক—হৃদয়ে অদম্য আশা—কল্পনার রঙিন নেশায় বিভোর—দেশের একছত্র অধিপতি—লুই ভাবিলেন, আমি খুব যোগ্যতার সহিতই দেশ শাসন করিব। কিন্তু আভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন তাঁহার জানা ছিল না। যখন জানিলেন, ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। দেশের ঠিক সেই সঙ্গীন মুহূর্ত্তে তিনি সিংহাসন আরোহণ করিলেন, যখন দেশবাসী বিদ্রোহোন্মুখ ও রাজকোষ কপর্দ্দকশূন্য। যুবক সম্রাট লোক হিসাবে মন্দ ছিলেন না, তিনি প্রজা-বৎসলও ছিলেন, এবং প্রজার মঙ্গল সাধনে মনোযোগীও ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রধান দোষ এই ছিল যে, তিনি বড় দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক, ওমরাহ ও সভাসদগণের পরামর্শে পরিচালিত হইতেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীর এত বশ্য ছিলেন যে, রাজকার্য্যের প্রত্যেক ব্যাপারে তাঁহার পরামর্শ ব্যতিরেকে এক-পাও অগ্রসর হইতেন না। রাজকার্য্যে অনভিজ্ঞ এই সকল অকর্ম্মণ্য লোকের প্রভাবে তিনি অভীষ্ট কার্য্য করিতে পারিতেন না, বরং অনেক সময়ে অপকর্ম্মই করিয়া বসিতেন।

রাজ্যের অর্থসঙ্কট দূর করিবার জন্য লুই কোনওরূপ চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু, রাণী, সভাসদ ও দেশের আভিজাতবর্গ তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সাধু প্রয়াসকে ব্যর্থ করিয়া দিল। দেশের রাজস্বের একটা সুব্যবস্থা করিবার জন্য রাজা টুরগো নামক এক অর্থনীতিবিদ্ দার্শনিক পণ্ডিতকে রাজস্ব সচিব নিযুক্ত করিলেন। টুরগো তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন যে, ব্যয়সঙ্কোচ না করিলে কিছুতেই এ দুরবস্থা দূর হইবে না। প্রজারা করভারে প্রপীড়িত, তাহাদের নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও আদায় করা যাইতে পারে না। আভিজাত ও যাজকবর্গ কিছুতেই কর দিবে না, সুতরাং এমতাবস্থায় ব্যয়সঙ্কোচ না করিলে কিছুতেই উদ্ধার নাই। তিনি আরও প্রস্তাব করিলেন যে, দেশের দারিদ্র্য মোচন করিবার জন্য আভিজাতবর্গকে স্বেচ্ছায় করস্বরূপই হউক, আর চাঁদা স্বরূপই হউক কিছু কিছু করিয়া রাজকোষে দিতে হইবে। ব্যয়সঙ্কোচের জন্য তিনি অনেক-গুলি অপ্রয়োজনীয় চাকরী উঠাইয়া দিলেন। অনেক অনেক সভাসদ ও তোষামোদপ্রিয় চাটুকার রাজসরকার হইতে বহু বৃত্তি পাইতেন, তিনি সে সব বৃত্তি রহিত করিয়া দিলেন। ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিলেন। যে-সব কঠোর আইন থাকাতে দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি হইতেছিল না, তিনি তাহা উঠাইয়া দিয়া ব্যবসায় সংক্রান্ত আইনগুলিকে এত সহজ ও উদার করিয়া দিলেন যে, দেশময় ব্যবসায়-বাণিজ্য চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল। দেশে ব্যবসায়ের উন্নতি হইলেই রাজস্বও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। টুরগোর নির্দ্দেশিত পথ অবলম্বন করিয়া রাজা যদি কিছুকাল চলিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় অর্থসঙ্কট দূর হইত, রাজাও প্রাণে বাঁচিয়া যাইতেন। কিন্তু যে আমীর ওমরাহ ও অমাত্যবর্গ দুষ্ট গ্রহের ন্যায় তাঁহার অদৃষ্টচক্রে নিত্য ঘুরিতেছিলেন, তাঁহারা রাজাকে টুরগোর কোনও পরামর্শ গ্রহণ করিতে দিলেন না।

টুরগো যখন ব্যয়সঙ্কোচের পরামর্শ দিলেন, অনেকেই তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। রাজা উহাতে সম্মত হইলেন না, রাণী টুরগোকে বরখাস্ত করিতে উপদেশ দিলেন, আর যে-সকল অমাত্য ও সভাসদ্ এতদিন রাজদরবারে পরম আনন্দে দিনাতিপাত করিতেছিলেন, তাঁহারা টুরগোর নামে ক্ষেপিয়া উঠিলেন। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ রাণীকে বলিয়া টুরগোর বিরুদ্ধে রাজার নিকট নানাবিধ অভিযোগ আনয়ন করিলেন। রাজা আর কি করিবেন,—রাণী তাঁহাকে চায় না, একা রাজা তাঁহাকে লইয়া কি করিবেন? অনিচ্ছা সত্বেও রাজা তাঁহাকে বিদায় দিলেন। কিন্তু টুরগোকে বিদায় দিবার কালে তিনি স্পষ্টভাবে বুঝিলেন যে, তিনি রাজ্যের এই দুঃসময়ে এমন একজন লোককে বিদায় দিতেছেন, যিনি তাঁহার নব প্রস্তাবিত সংস্কার দ্বারা রাজাকে ও ফ্রান্সকে আসন্ন ধ্বংসের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্ম একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি।

তারপর ডাক পড়িল নেকারের। নেকার একজন বিখ্যাত মহাজন, দেশের রাজস্ব বিষয়ে তিনি অনেক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি রাজাকে যে পরামর্শ দিলেন, রাজা যদি তদনুসারে কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে ফ্রান্সের অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইত। কিন্তু দুর্মতি রাজা তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। নেকার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই পরামর্শ দিলেন—ব্যয়সঙ্কোচ কর। বহু বিষয়ে অনর্থক ব্যয় হইতেছে, অথচ তদনুরূপ আয় নাই—ব্যয়-সঙ্কোচ না হইলে রাজ্য-ভার পরিচালনা করা অসম্ভব। অতঃপর নেকার দেশের প্রকৃত আয় ও ব্যয় কত, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্ম একটা বাজেট প্রস্তুত করিলেন। তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি সেই আয়-ব্যয়ের হিসাবটা সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন। রাজ্যের আয় ব্যয় সংক্রান্ত গোপনীয় বিষয়গুলি ইতঃপূর্ব্বে কখনও সাধারণের গোচরীভূত করা হয় নাই। আজ সর্ব্বপ্রথম তাহারা সেই অতি গোপনীয় বিষয়টা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখিয়া ফেলিল। তাহারা দেখিল যে, দেশের আয় অপেক্ষা ব্যয় এত অধিক যে, দেশের শাসন কার্য্য চলিতেই পারে না। প্রজাদের শোণিত-ঢালা অর্থ কি বাবতে ব্যয়িত হয় তাহারাও তাহা দেখিল, আর শিহরিয়া উঠিল। রাজদরবারের গভীর দুর্জ্ঞের রহস্যটি সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া নেকার এক মহাদুঃসাহসিক কার্য্য করিলেন। তাই এই রহস্য-জাল ভেদ করাতে রাজা ও রাজদরবারের প্রত্যেকেই নেকারের উপর ভয়ানক কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। নেকার রাজার বিরাগভাজন হইলেও সাধারণের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন, তিনি প্রজাপক্ষে যোগদান করিলেন।

নেকার পদত্যাগ করিলে, পর-পর দুইজন অকর্ম্মণ্যলোক রাজস্বমন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। তন্মধ্যে কালোঁর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কালোঁ রাণীর প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি কাহাকেও অসন্তুষ্ট না করিয়া দেশের অর্থসমস্যা সমাধান করিবার জন্ম এক অদ্ভুত পন্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি কোনওরূপ সংস্কার করিলেন না, ব্যয় সঙ্কোচের নামও মুখে আনিলেন না। তাঁহার অভিনব পন্থা এই যে, তিনি প্রচুর পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিয়া অর্থের ঘাট্‌তি পুরাইতে লাগিলেন। অর্থের প্রয়োজন হইলেই প্রচুর অর্থ ঋণ করিয়া তিনি সর্ব্বদা রাজ তহবিলে উদ্বৃত্ত অর্থ রাখিতে প্রয়াস পাইতেন। প্রথম প্রথম এইভাবে কিছু দিন বেশ চলিল। কিন্তু ঋণের উপর নির্ভর করিয়া দীর্ঘকালব্যাপী কোনও রাজ্য টিকিতে পারে না। অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণের যাহা শেষ পরিণাম, কালোঁ ফ্রান্সকে সেই পথে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। তিনি ঋণ করিয়া যান, কিন্তু পরিশোধের নামও করেন না। ১৭৮৪ খৃঃ ঋণের টাকার সুদ পর্য্যন্ত দিতে পারিলেন না। সুতরাং মহাজনেরাও আর টাকা ধার দিতে সম্মত হইল না। পাবলিক ক্রেডিট একেবারেই নষ্ট হইয়া গেল সুতরাং ঋণের পথ চিরতরে বন্ধ হইল। রাজকোষ একেবারেই অর্থশূন্য—রাজ্য চালান অসম্ভব। সুতরাং কালোঁকে বাধ্য হইয়া টুরগো ও নেকারের পন্থাই অবলম্বন করিতে হইল। ব্যয় সঙ্কোচ ত করিতেই হইবে, তদুপরি আভিজাতবর্গের নিকট হইতে কর আদায় করিতে হইবে—এই পথ অবলম্বন না করিলে রাজকোষে চিরকালই অর্থের ঘাট্‌তি পড়িবে।

কিন্তু রাজস্বসচিবের পরামর্শ শূন্যগর্ভ উপদেশ ভিন্ন আর কিছুই নয়। নূতন কর বসাইতে হইলে রাজার বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন। বিশেষতঃ যে সকল আভিজাত এতাবৎ সর্ব্বপ্রকার কর হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন, তাহাদের উপর নূতন কর বসাইতে হইলে রাজার বিশেষ

শক্তি থাকা প্রয়োজন। কালোঁর পরামর্শে রাজা Assembly of Notables নামক সভা আহ্বান করিলেন। সেই সভায় নূতন করের প্রস্তাব উত্থাপন করিবামাত্র প্রত্যেক সভ্য বাধা দিয়া বলিলেন,—আমরা কিছুতেই কর দিতে সম্মত হইব না। রাজা নিরুপায় হইয়া কালোঁকে বিদায় দিয়া ব্রাইন নামক আর এক ব্যক্তিকে রাজস্ব সচিব নিযুক্ত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকেও পরিশেষে করস্থাপনে প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হইল। তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিলেন যে, আভিজাতবর্গের উপর নূতন কর স্থাপন না করিলে কিছুতেই অর্থাভাব দূর হইবে না। তৎপর নূতন কর সমর্থন করিবার জন্য Parliament of Paris সভায় আহ্বান করিতে হইল। ঐ সভা তীব্রভাবে নূতন নূতন করের প্রতিবাদ করিল। তখন রাজা বাধ্য হইয়া বিচারকের আসনে উপবিষ্ট হইয়া, ব্রাইনের করের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া স্বীয় স্বাক্ষরিত এক রাজাজ্ঞা (Edict) প্রচার করিলেন। তাঁহার এই ঘোষণা বাণী যদি দেশবাসী অম্লান বদনে মানিয়া লইত, তাহা হইলে সকল গোল সেইখানেই মিটিয়া যাইত। কারণ রাজার স্বাক্ষরিত ঘোষণা-বাণীর পর অনেকেই কর দিতে সম্মত হইয়াছিল, কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই আদেশ-বাণী অগ্রাহ্য করিয়া প্যারিসের পার্লামেণ্ট ঘোষণা করিল যে, রাজার নূতন কর স্থাপন করিবার কোনও ক্ষমতা নাই; নূতন কর স্থাপনের একমাত্র কর্ত্তা ষ্টেট্‌স্ জেনেরাল-সভা (States General)। এই ষ্টেট্‌স্ জেনেরাল-সভা আহ্বান না করিলে নূতন কর সমর্থিত হইতেই পারে না। রাজা দু'একবার পার্লামেণ্টকে ভয় দেখাইয়া কর প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে পার্লামেণ্ট বিচলিত হইল না। বরং আরও উত্তেজিত হইয়া ষ্টেট্‌স্ জেনেরাল সভা আহ্বান করিবার জন্য রাজাকে বিরক্ত করিতে লাগিল। ষ্টেট্‌স্ জেনেরালের নাম শুনিয়া সমগ্র জাতি ক্ষেপিয়া উঠিল—সকলেই উক্ত সভা আহ্বানের জন্য রাজাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, এবং সেই জন্য দু'একস্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হইয়া গেল। রাজা সমগ্রজাতির দাবী আর অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত সভা আহ্বান করিবার জন্য আদেশ প্রচার করিয়া দিলেন। যেদিন রাজা ষ্টেট্‌স্ জেনেরাল সভা আহ্বান করিবার জন্য আদেশ-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন, সেই দিন হইতেই ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হইল। সভা আহ্বানের আদেশ পত্রে স্বাক্ষর করিয়া প্রকারান্তরে রাজা স্বীকার করিয়া লইলেন যে, রাজা একাকী দেশ শাসন করিতে অসমর্থ—দেশের দুর্দ্দশা, আর্থিক অসচ্ছলতা দূর করিতে হইলে দেশের লোকের সহানুভূতির প্রয়োজন। যে দেশে স্বৈর শাসন ও স্বেচ্ছাচারী শাসন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, সেখানে ঐরূপ স্বীকারোক্তির অর্থ এই যে, স্বৈর শাসন ব্যর্থ হইয়াছে, উহা আর টিকিতে পারে না; ইহাই রাজা স্বীকার করিয়া লইলেন।

দেশে যখন অর্থসঙ্কট উপস্থিত—সেই সময়ে রাজা নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিলেন। অর্থের অভাবে দেশের শাসনকার্য্য পরিচালন করা অসম্ভব, আর এই দুর্যোগে রাজা দেশের অর্থ ও লোকবল লইয়া আমেরিকাকে রক্ষা করিতে গেলেন। ইহার ফল এই দাঁড়াইল যে, ফরাসীর সাহায্যে আমেরিকা স্বাধীন হইল—আর অধিকতর ঋণভারে ফ্রান্সের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল। আমেরিকান সমরে যোগদান করিয়া যে সকল সৈন্য যুদ্ধাবসানে দেশে প্রত্যাগমন করিল, তাহারা স্বাধীন দেশের আবহাওয়া থাকিয়া স্বাধীনতার ভাবে এমনি অনুপ্রাণিত হইয়াছিল যে, ফ্রান্সের সর্ব্বত্র তাহারা সেই ভাব ছড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। স্বাধীন হইবার জন্য, রাজার কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য ফ্রান্সের সাধারণ অধিবাসী উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ঠিক সেই সময়ে ষ্টেট্‌স্ জেনেরাল সভার আহ্বান যেন উত্তপ্ত বারুদে অগ্নি সংযোগ। স্বাধীনতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া জাতি ষ্টেট্‌স্ জেনেরালকে সর্ব্ব বিষয়ে সার্থক করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, এই বিপ্লবের জন্য মূলতঃ দায়ী কাহারা? উহার জন্য সাধারণ প্রজাকে কখনই দায়ী করা যাইতে পারে না, কারণ তাহারা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত শান্ত ও নিরীহ ভাবেই ছিল—রাজ্যসংক্রান্ত কোনও ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করে নাই—দু'মুঠা অন্ন পাইলেই তাহারা সন্তুষ্ট—দেশময় মহাবিপ্লবের কল্পনাও তাহাদের মনে উদিত হয় নাই। বিপ্লবের জন্য রাজা বা রাণীও ততটা দায়ী নহেন। প্রথমাবধি রাজার হিত করিবার ইচ্ছা ছিল, বাধা না পাইলে হয়ত তিনি প্রজাদের জন্য অনেক কিছু করিতে পারিতেন। ফরাসী বিপ্লবের জন্য মূলতঃ দায়ী স্বার্থপর, অর্থগৃধ্নু নরপিশাচ আভিজাতবর্গ। উহারা প্রায় সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতার অন্তরায় স্বরূপ। ফ্রান্সেও উহারাই সংস্কারের প্রত্যেক ধারাকে বাধা দিয়া, দেশকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করিয়াছিল। টুরগো হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাইন পর্য্যন্ত যে সকল সংস্কারক অর্থ সমস্যার সমাধান করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এই আভিজাতবর্গ পদে-পদে তাহাতে বাধা দিয়া সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড করিয়াছে; সুতরাং বিপ্লবের জন্য ইহারাই মূলতঃ দায়ী।

—ক্রমশঃ
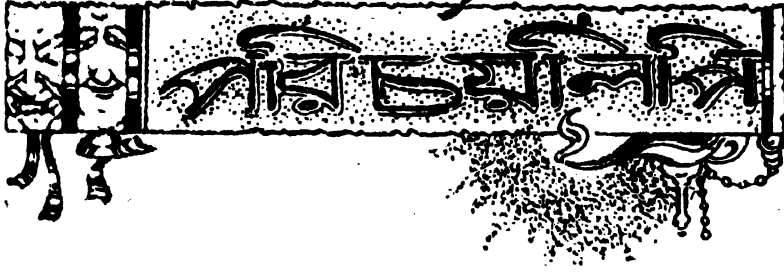
বিলাত-ভ্রমণ—মাতৃমন্দির সম্পাদক শ্রীঅক্ষয় কুমার নন্দী প্রণীত, মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র। ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস, ২০০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীঅতুলচন্দ্র নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তখানি যে, যোগ্য-লোকের লেখা তাহা গ্রন্থের ভূমিকায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ব্যক্ত করিয়াছেন। বিলাতে অক্ষয়বাবুর বহুমুখী-কৃতিত্ব দেখিয়া আচার্য্য রায় বলিয়াছেন—"বাঙ্গালী যুবকের এই রকম বিলাত-যাত্রাকে আমি বিশেষ রকম জয়যাত্রা বলতে চাই।"

দেশকর্ম্মীদের লেখার একটা বিশিষ্ট-ধারা এই যে, তাঁহারা যাহা কিছু লেখেন, তাহার সবই দেশের কল্যাণের চিন্তা নিয়াই লেখেন। গ্রন্থের প্রথমেই অক্ষয়বাবু বলিয়াছেন—"তথাকার (বিলাতের) মানুষের উন্নতি-স্পৃহা এবং কার্য্য তৎপরতার চিন্তা আমার ইউরোপ-ভ্রমণের তৃপ্তিকে জ্বালা দেয়।"

এই চিন্তা নিয়া গ্রন্থকার স্বাধীনদেশের যাহা-কিছু দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন, যাহা-কিছু আমাদের দেশকে শুনাইবার মত পাইয়াছেন, সে-সকলকেই এই গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন। গ্রন্থখানি আগাগোড়া গল্পের মত সরল ভাষায় লেখা—একটির পর একটি নূতন-নূতন বিষয়—প্রত্যেক বিষয়টি চিন্তাকর্ষক, প্রত্যেক বিষয়টি শিক্ষাপ্রদ।

গ্রন্থে ভারতীয় ছাত্রদের সম্বন্ধে একস্থানে বলা হইয়াছে—"বিলাতে ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে দেখা-শুনা করে যতখানি তাঁদের কাছ থেকে পাবো আশা করেছিলাম, ততখানি কিন্তু পাই নি। দেখলাম—তাঁরা তাঁদের শিক্ষনীয় বিষয় নিয়েই ব্যস্ত, আর যেটুকু তাঁদের বাকি-সময়, সেটুকু কেবল বিলাতিপনা নিয়েই কাটিয়ে দেন। আমি বেশী সুখী হতাম' যদি তাঁদের কাছে বিলাতের ভাল-ভাল বিষয়ের আলোচনা শুনতে পেতাম, আর সেই সকল বিষয় দিয়ে আমাদের দেশ-গঠনের কিছু কিছু উপাদান পেতাম।"

'লণ্ডনের বিবরণ' নামক ত্রিশ-পৃষ্ঠা-পূর্ণ অংশটী এমন সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, পড়িবার সময়ে মনে হয় যেন, সেই বিশালায়তন ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সহরটি নিজ চক্ষে দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি।

'স্কটলণ্ড ও আয়ার্লণ্ড ভ্রমণ' অংশগুলির মধ্যে পর-পর বিভিন্ন স্থানে, হোটেলে, পরিবারে বাসকালে তথাকার যথাযথ বর্ণনাগুলি অতি মনোরম হইয়াছে। বিলাতের লোকের রীতিনীতি বিশেষতঃ মেয়েদের চরিত্র সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু গ্রন্থকার ভাগ্যবান তাই কোন দুর্নীতি তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই, অথবা তিনি সে দিকে মন দিতে অবকাশ পান নাই। সে দেশের লোক-চরিত্রের যাহা কিছু ভাল দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন, পর-পর সুন্দর প্রণালীতে সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়টি অতি চমৎকার হইয়াছে।

ওদেশের 'সাধারণ অবস্থা', 'পারিবারিক রীতি-নীতি' 'দৈনন্দিন জীবন' প্রভৃতি অংশগুলির ভিতর আবশ্যকীয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে। উহা পাঠে আমাদের দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাণে স্বাধীন জাতির স্বরূপ প্রতিফলিত হইবে এবং প্রাণে স্বাধীনতার চিন্তা জাগিয়া উঠিবে।

শিক্ষা সম্বন্ধে এক স্থানে লিখিত হইয়াছে—"আমাদের দেশে যেমন সকলেই উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ব্যস্ত, বিলাতে তেমন নয়। অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে মোটামুটি শিক্ষা শেষ করেই কোন একটা কাজে যোগ দেয় এবং ক্রমে সেই কাজের উন্নতির জন্যই জীবনব্যাপী সাধনা করে। তারপর কাজের অবকাশের ভিতরে জ্ঞান-লাভের

চেষ্টায় সারাদিনই নানাপ্রকার গ্রন্থাদি পাঠ করে। দৈনিক সংবাদপত্র পড়া সকলের চাই-ই। জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ধনী, নির্ধন, কৃষক, মজুর, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সংবাদপত্র পাঠ করে, দেশের যখনকার যে ঘটনা, তার খবর রাখে।"

'সাধারণ অবস্থা' হইতে কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল—

"ঐ যে সারা-জগতের নানাদেশে রাজ্য বিস্তার করেছে ওঁরা, ও কেবল নিজ দেশকে পুষ্ট করবার জন্য। আপন জাতির উন্নতির জন্য ওঁরা অসংখ্য রকম বিধান রেখেছে। বেশীর ভাগ লোকই আপন উপার্জ্জিত ধন-সম্পদ সাধারণের কল্যাণকর এক-একটা বিশেষ-কার্য্যে দান করে। এই দানের পরিমাণ এতই বেশী যে, দেশের গরীব-দুঃখীরা এই দানের উপর নির্ভর করেই মানুষ হয়ে উঠে। * * * * কৃষক, শ্রমিক, শিল্পী, ব্যবসায়ী প্রভৃতিদের সহিত উচ্চতর রাজ-কর্ম্মচারীদের সম্মানের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। যারা রাস্তা পরিষ্কার করে, যারা ধোপা নাপিতের কাজ করে, যারা লোকের জুতা সাফ্ করে দেয়, তাদের কাজও কোন অসম্মানের বলে গণ্য নয়। এদের এই স্বজাতি-প্রীতিকে আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি।"

"বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশন" নামক অংশটি পাঠ করিলে সারা-জগতের শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি পরিষ্কার ভাবে জানিতে পারা যায়। গ্রন্থশেষে (সহধর্ম্মিণীকে লিখিত) পত্রাবলীর মধ্য দিয়া গ্রন্থকারের প্রাণবন্ত লেখনী বিলাতের ভিতরের খবর সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

গ্রন্থকার নিজে শিল্পী ও ব্যবসায়ী, এজন্য ও দেশের শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা যাহা-যাহা এ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, তাহা আমাদের দেশের পক্ষে বিশেষ কার্য্যকরী হইবে।

বহুসংখ্যক ছবিতে গ্রন্থখানি আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ছাপা কাগজ এবং বাঁধা উৎকৃষ্ট। বর্ত্তমানে দেশাত্ম-বোধের দিনে আমরা এই গ্রন্থখানি প্রত্যেক ব্যক্তিকে একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

—

কাচ ও মণি—মৌলভী একরামদ্দিন প্রণীত, মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র। মোহ্সিন এণ্ড কোং, ৬৬।১এ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

মৌলভী একরামদ্দিনের প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছি আমরা সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার "রবীন্দ্র প্রতিভা"য়। "রবীন্দ্র প্রতিভা"র ভাব-ভাষা বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ভাবের সঙ্গে ভাষার এমন সামঞ্জস্য সাধারণ লেখকের লেখায় আমরা কচিৎ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়।

আজকাল উপন্যাস লেখা অধিকাংশ শিক্ষিত যুবকদের একটা সংক্রামক ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাতে না আছে ভাষা—না আছে ভাব—কেবল উৎকট অশ্লীলতা। শিক্ষিত যুবকদের সাহিত্যের উপর এই যে ব্যভিচার—ইহাতে আমরা দুঃখিত এবং ব্যথিত হই। কিন্তু উপায় নাই, দেশের মনোবৃত্তি এবং অভিরুচি যখন বিষাক্ত হইয়া উঠে, তখন এইরূপ নকল জিনিষই আসলের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসে।

আমরা মৌলভী একরামদ্দিনের লিখিত "কাচ ও মণি" পড়িয়া সুখী হইয়াছি। মৌলভী সাহেবের উপন্যাস লেখার এই প্রচেষ্টাকে ব্যাধি না বলিয়া সাধনা বলিব। তিনি অদূর ভবিষ্যতে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবেন, আমরা তাহার আভাস এই "কাচ ও মণির" ভিতরে পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি।

অসংযমী যুবক যুবতীর প্রেম উশৃঙ্খল পথে ছুটিয়া তাহাদের জীবন কিরূপ ভয়াবহ করিয়া তোলে—চিন্তাশীল লেখক অপূর্ব্ব ভাষার ভঙ্গীতে এই গ্রন্থে তাহা সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ভাষায় ও বর্ণনায় অশ্লীলতা নাই, অস্বাভাবিকতা নাই, উৎকট উচ্ছ্বাস নাই, কষ্ট-কল্পনা নাই। "কাচ ও মণির" চরিত্রগুলি অঙ্কন ও বিশ্লেষণ সর্ব্বথা প্রশংসনীয়, আর প্রশংসনীয় তাহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদার ভাব।

সুশীলার চরিত্রাঙ্কনে লেখক তাঁহার শিল্প ও রুচি-জ্ঞানের অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়াছেন। অতটুকু ছোট্ট বালিকা সুশীলা অতখানি প্রেম, প্রতিভা ও অভিমানকে কেমন করিয়া তাহার ছোট্ট বুকটুকুর ভিতরে চাপিয়া রাখিয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই চিন্তার বিষয়। প্রভাবতী ও সুশীলা বিভিন্নমুখী দুইটি নারী-চরিত্র। উভয়ের ভিতরেই প্রেমের সপ্তসমুদ্রের সমাবেশ। বিভিন্নতা এইটুকু মাত্র—

প্রভাবতীর সমুদ্র তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ ব সুশীলার সমুদ্র নির্ব্বাত-নিষ্কম্প। আমরা সুশীলাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি, বোধ হয় শীঘ্র ভুলিতে পারিব না।

স্থানে স্থানে আমাদের সঙ্গে একটু মতভেদ থাকিলেও আমরা লেখকের "কাচ ও মণির" ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না। খোদার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি—লেখকের এই সাহিত্য-সাধনা জয়-যুক্ত হউক।

ঈশা খাঁ স্বর্ণময়ী—ডাঃ মোহাম্মদ আবুল কাসেম প্রণীত ও ফজিলতুননেছা এম, এ, ভূমিকা সংবলিত, মূল্য ৷৵০ আনা মাত্র। মখদুমী লাইব্রেরী, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে মোহাম্মদ মোবারক আলী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

রাজ-নন্দিনী স্বর্ণময়ী মুসলমান বীর ঈশা খাঁর প্রেমপাশে আবদ্ধ হন। ঈশা খাঁ চাঁদ রায়ের রাজ্য জয় করিয়া তাঁহার শিক্ষিতা বিধবা কন্যা স্বর্ণময়ীকে বিবাহ করেন। এই ঐতিহাসিক সত্য অবলম্বন করিয়া উপন্যাসখানি লেখা হইয়াছে। জাতি বিদ্বেষের সংক্রামক রোগ এই পুস্তকখানিকে স্পর্শ করিতে পারে নাই দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, প্রেম ও বীরত্ব এই তিনটি রসের সমবায় পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও বেশ সরস হইয়া উঠিয়াছে। লেখক উৎসাহী সাহিত্য-সেবক। তাঁহার লেখার ভিতরে প্রাণ আছে।

পুস্তকের ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সবই উৎকৃষ্ট। ইহাতে দুইখানি চিত্তাকর্ষক ছবিও আছে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রান্ত

শ্রী ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

চরণ-তলে এই যে ধরা
মুখর শত করম-ভরা
চলিয়া গেছে যেন রে বহুদূরে ;
মন-ভুলানো প্রাণ-উদাসী
ঐ যে পরলোকের বাঁশী
পশিছে যেন শ্রবণে ঘুরে ঘুরে।

পারশে যারা সুপরিচিত
লাগিছে যেন অপরিচিত
তাদের ভাষা অজানা যেন লাগে ;
যেন রে পরলোকের কূলে
ডাকিছে কারা দু'হাত তুলে,
সেই ইসারা পরাণে মোর জাগে।

শিথিল-দল ক্লান্ত প্রাণ
কে গায় ঘুম-পাড়ানি গান
করুণ মরি কোমল লঘু সুরে ;
শ্রান্ত দু'টী আঁখির পাতা
এলিয়ে পড়ে, লুটায় মাথা
মরণাতীত স্বপন-মায়াপুরে।

বিশ্বাস না হয় হিসাব করো

মতিন উদ্দীন আহ্‌মদ

১

নবীন খুড়ার পূর্ব্বপুরুষ কেহ না কেহ হয় নিক্তি, না হয় মোনসেফ্ ছিলেন, একথা হলফ্ করিয়া বলা চলে; তাহা না হইলে সকল কাজে খুড়া লাভ লোকসানের এমন সূক্ষ্ম হিসাব করিয়া চলিতে পারিতেন না।

গ্রামে "খুড়ার বাণী"—message——বলিয়া কয়েকটি কথা প্রচলিত ছিল। সেই সব বাণী শুনিতে যে রকমই হউক না কেন, অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই, কারণ সব কয়টির শেষেই নবীন খুড়ার পেটেণ্ট "বিশ্বাস না হয় হিসাব করো"—কথাটি জোড়া আছে এবং কেহ হিসাব করিয়া দেখিতে চাহিলে খুড়া হিসাব করিয়া দেখাইয়া দিতেন যে, তাঁহার ভুল হয় নাই। ধরুন খুড়ার একটা বাণী—"একটি ডিট্‌জ্ ল্যাণ্টার্ণ রোজ কম জ্বালাইতে পারিলে, নগদ মঃ ৩৫০০৲ টাকা পুঁজি এক বছরে বাঁচে—"বিশ্বাস না হয় হিসাব করো।"

একজন সিপাহী দুইজন মানুষের সমান—গায়ের জোরে নয়, মনুষ্যত্বে নয়, বা অন্য কিছুতে নয়—শুধু রেল গাড়ীতে বসিবার সময়—এই কথাটি আমরা গাড়ীর দেওয়ালে লিখা কোম্পানীর "To seat 16 or 8 soldiers" দেখিয়া অথবা সিপাহীর চেহারা দেখিয়া বিনা বাক্য ব্যয়ে যেমন মানিয়া নেই, তেমনি একটা জুনিয়ার অর্থাৎ ছোট তরফের ডিট্‌জ্ ল্যাণ্টার্ণ, যাহার বাক্সে লিখা থাকে ছয় বাতীর জোরাল (6 candle power) মাস দু'য়েক দেয় চার-বাতির আলো, তারপর বাকী জীবন দুই-বাতির আলো, চার-বাতির ধুঁয়া দিতে দিতে, অবশেষে বহুমূত্র রোগীর মত, সর্ব্বদা তেল চুয়াইয়া চুয়াইয়া হাড়-নড়া বুড়ার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ল্যাণ্টার্ণ লীলা সম্বরণ করে, তাহাকে ৩৫০০৲ টাকা পুঁজির সমান ধরিয়া নিতে বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত করি না, কারণ সঙ্গে রহিয়াছে খুড়ার রেজিষ্টার্ড ধুয়া "বিশ্বাস না হয় হিসাব করো।"

একদিন এক ব্যক্তি হিসাব করিয়া দেখিতে চাহিয়াছিলেন, খুড়া তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে হিসাব করিয়া দেখাইয়া দিলেন—ইহার জন্য কাগজ-কলম-কালী খরচ করিবেন, খুড়া এমন বাপের ছেলে নহেন। "ধরুন, সারা রাত্রি যদি একটা ছোট তরফের ডিট্‌জ্ ল্যাণ্টার্ণ জ্বালান যায়, তবে কম পক্ষে চার পয়সার তেল জ্বলে অর্থাৎ মাসে ১৸৴০, বৎসরে জ্বলে ২২॥০; তার মাঝে যোগ করুন আরো পাঁচ আনা যদি (সে বৎসর লিপ-ইয়ার হয় তবে ছয় আনা) মোট দাঁড়াইল গিয়া ২২৸৴০, তার উপর একটা ল্যাণ্টার্ণ চার বৎসরের বেশী টিক্‌বে না, তাহা হইলে ২২৸৴০ আনায় সঙ্গে ঘসা-মাজার wear and tearএর জন্য যোগ করুন তিন টাকার এক চতুর্থাংশ, অর্থাৎ তিন সিকা; আর ফিতা জ্বলবে এক আনার; তাহা হইলে সর্ব্বমোট বাৎসরিক ব্যয় একটা জুনিয়ার ল্যাণ্টার্ণের পড়ে ২৩॥৴০।

এই ত গেল এক দিক, এখন এই ২৩॥৴০ খাজনা আদায় করিতে হইলে দেখা যাউক কয় হাল জমির আবশ্যক হয়। প্রজার নিকট হইতে যদি হাল প্রতি ৬৸০ হিসাবে খাজনা আদায় হয়, তবে ২৩॥৴০ আনার জন্য সাড়ে তিন হাল জমির আবশ্যক হইবে। জমির দাম একেবারে কম করিয়া ধরিলেও হাল প্রতি এক হাজার টাকা হিসাবে সাড়ে তিন হাজার টাকা, অতএব একটি জুনিয়ার ল্যাণ্টার্ণ এক বৎসর কম

জ্বালাইতে পারিলে সাড়ে তিন হাজার টাকা মূলধনের কারবারের মুনাফা হয়। এখন বিশ্বাস হইল ত!"

২

নবীন খুড়ার আর একটী বাণী হইল এই—"এক পয়সা দিয়া পকেট পঞ্জিকা কিনিয়া এবং তৎসঙ্গে একটু কাণ খাড়া রাখিলে, বৎসরে ৬৩৸৴১ পাই মূলধন বাঁচিয়া যায়। ৬৮৲ হাল প্রতি খাজনা হইলে ।৴১৫ খাজনা আদায়ের জন্য ৴৷৷৩৮৴৫ আধ কেয়ার, তিন যষ্টি, তের পণ, পাঁচ গণ্ডা জমির আবশ্যক এবং তার দাম ১০০০৲ হাল হিং মং ৬৩৸৴১ পাই। এক পয়সার পকেট পঞ্জিকায় ।৶০ দামের ডাইরেক্টরীর মত পূজা পার্ব্বণের রকমারী ফর্দ্দ থাকে না, সুতরাং ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে অসুবিধা হয়; কিন্তু "কাণ খাড়া" রাখিলে সে অসুবিধা আর থাকে না।
ঘোড়া লাথি মারার সময়ে যেভাবে উভয় কাণকে খাড়া করিয়া পাশাপাশি দাঁড় করায় অথবা কোন কোন মানুষ নিজের কাণকে খরগোসের কাণের মত নাড়া-চাড়া করিয়া একটু খাড়া করে, "কাণ খাড়া" বলিতে খুড়া সে রকম কিছু মনে করেন না। খুড়া ইহাই বলিতে চান যে, এক পয়সার পকেট পঞ্জিকা কিনিয়া পড়াপড়শীর বাড়ীর দিকে একটু বিশেষ খেয়াল রাখিলেই কোন্ পূজা কোন্ পার্ব্বণ কোন্ দিন আসিতেছে, তাহা জানা যায়, আর যদি ভুল চুকে একটা বাদও পড়ে তাহা হইলেও চিন্তার কারণ নাই—বার মাসে তেরটি আছে—বরং যৎকিঞ্চিৎ বাঁচিয়া যাইবে।

৩

খুড়া শীতের জন্য গরম কাপড় কিনেন চৈত্র মাসে এবং গরমের জন্য ঠাণ্ডা কাপড় কিনেন অগ্রহায়ণ মাসে; কারণ মরশুম চলিয়া যায় বলিয়া তখন এই সব কাপড়ের খরিদ্দার কম থাকে এবং দোকানে এক বৎসর পড়িয়া থাকিলে পোকায় নষ্ট করিয়া ফেলিবে বলিয়া দোকানদারেরা সস্তায় বিক্রি করে। খুড়া অশেষ অভিজ্ঞতায় দুনিয়াদারীর এই সব সহজ-সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন; পাঠকবর্গের কাহারো হাতে যদি কোন খেতাব বিতরণের ভার থাকে, তবে আগামী শুভ ১লা বৈশাখে খুড়াকে স্মরণ করিবেন।

৪

খুড়া চুল কাটাইবার পনর দিন আগে হইতে মাথায় তেল মাখা বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার কারণ তিনি বলেন—"দু'দিন পরে যে চুল আমার থাকবে না, তার জন্য আমার দুঃখের কড়ির তেল খরচ করে লাভ কি?" আমরাও খুড়ার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলি—ছেলেকে বি-এ এম-এ, পাশ করাইবার জন্য যত ইচ্ছা খরচ কর কিন্তু যে মেয়ে দু'দিন পরে পরের ঘরে চলিয়া যাইবে, তার শিক্ষার জন্য পয়সা খরচ করা বৃথা। নাপিত কিম্বা জামাই যদি ইচ্ছা করেন, তবে চুল ছাটার পর বা বিয়ের পর যত খুসী তেল মাখান বা লেখাপড়া শিখান, আমাদের আপত্তি নাই।

৫

নবীন খুড়া গাড়ীতে চড়িলে তৃতীয় শ্রেণী (III) ছাড়া অন্য কোন গাড়ীতে উঠিতেন না। তাহার কোষ্টিতে গাড়ীচড়ার কলমের অঙ্ক যেন ১১১ নম্বরের নীচে আর নামে নাই। খুড়ার মতে সব শ্রেণীর গাড়ীই যখন এক সময় ছাড়ে এবং গন্তব্যস্থানে এক সময়ে পৌঁছে, তখন মিছামিছি বেশী ভাড়ার গাড়ীতে গিয়া নিজের পয়সার শ্রাদ্ধ করা ছাড়া আর কিছু হয় না—একখানা কম্বল পাতিলেই সব সমান—কারণ ঐযে গদী, পাখা আর জানালার কাচ ইত্যাদি ছাই-পাশ ঐ গুলি ত শিকার ধরার ফাঁদ, এই সব টোপ গিলিয়া ফেলিলে মানুষে আর মাছে প্রভেদ রইল কোথায়? বুদ্ধিমান পাঠক, এখন নিজের পয়সায় যদি জানালার কাচের টবের মাছ হইতে চান, তবে আমাদের আপত্তি নাই।

৬

"হাতীরও পিছলে পা, সুজনেরও ভুবে না" এবং বানরেও আছাড় খায়। বড় বড় মাথাবাজ রাজনৈতিক পণ্ডিত হইতে সুরু করিয়া বিশ্ববিখ্যাত দাবা খেলোয়াড় জেস্তুইস্কিরও চাল ভুল হয়; আর যিনি যত বড় হিসাবী বা যত বড় খেলোয়াড়, তাঁর ভুল তত মারাত্মক হয়। যথা, বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য-পলিসি।

নবীন খুড়াও এত হিসাব করিয়া চলিতে চলিতে একদিন একটা ভুল করিয়া ফেলিলেন। হিসাব ঠিকই করিয়াছিলেন কিন্তু অকপাতে গোলমাল হইয়া গেল—ফল হইল অখণ্ডিত। সেই কাহিনীই এখানে বলিব।

৭

খুড়া অনেকদিন সস্তা ভাড়ার অপেক্ষা করিয়া করিয়া বড়দিনের ফেড়া-ভাড়ায় দোহারা-ভ্রমণের Single fare double journey কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, সঙ্গে আড়াই বৎসর বয়স্ক ছেলে খোকা। মাঝে এক ষ্টেশনে এক "বাবু" খুড়ার গাড়ীতে উঠিলেন। পঞ্জিকায় উল্লিখিত "ইংরেজী পর্ব্বোপলক্ষে আফিসাদি বন্ধ" থাকায় তখন গাড়ীতে ভিড় কম, সুতরাং "বাবু" খুড়ার কাছাকাছি বসিতে কোন ওজর-আপত্তি হইল না। বাবু গাড়ীতে উঠিয়াই খুড়াকে বলিলেন—"মশায়, আপনি?" খুড়া বলিলেন—"ব্রাহ্মণ।" বাবু প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া বলিলেন—"গো-ব্রাহ্মণে আমার সমান ভক্তি। গো-মাতার কৃপায় ইহকালের আর ব্রহ্মপিতার কৃপায় পরকালের সংস্থান কর্চ্ছি।" খুড়া অনামিকায় গোঁড়ায় আশীর্ব্বাদ শুনিয়া ভালমন্দ নানাকথার পর নিজের পরিচয় দিতে গিয়া বলিলেন—তাহার নিজের কিছু জমি জমা আছে, বাড়ীতে থাকেন আর তা দেখেন শুনেন। সেই বাবু বলিলেন যে, কলিকাতার অশ্ব-ভ্যালেস কোম্পানীর তিনি একজন এজেণ্ট, দেশে দেশে কোম্পানীর জন্য গোবর কিনিয়া বেড়ান। কোম্পানী প্রায়শ্চিত্তের ব্যবসায় করেন না, জমির সারের ব্যবসায় করেন, নতুবা কোম্পানীর হাজার হাজার টাকার মাহিনাওয়ালা এত বড় বড় সাহেব আছেন যে, গোবর দিয়া তাহাদিগকে মুড়িয়া রাখিলেও সাহেবত্ব দোষ স্খালন হইবে না।

কথা শেষ করিয়া "বাবু" নিজের রসিকতায় উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। তারপর বলিলেন "ওরা গোবর বেচুক আর পৈতে বেচুক, আমাদের কি আসে যায় তা'তে। ছা'পোষা মানুষ, পেটের দায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি, দু'পয়সা রোজগার করতে পারলেই হয়।" কথাটা খুড়ার খুব পছন্দ হইল, "বাবুকে" তাহার ভাল লাগিতে সুরু হইল। "বাবু" বলিতে লাগিলেন—"এই ত দেখুন, কোম্পানী দেয় ইণ্টারের ভাড়া, আমি চড়ি 'রয়েল' ক্লাসে, ক্ষতিটা কি হলো বলুন দিকিন, মাঝখান থেকে দু' পয়সা মেরে নিলাম। আর দেখুন রাজা অশোক থেকে সুরু করে গান্ধীজী পর্য্যন্ত সকলেরই নজর এই রকম। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে রেলগাড়ী থাকলে, আর সব তারেরা স্পেশেলে বা সেলুনে গেলেও অশোক বাবাজী ১১১ নম্বরের উপরে উঠ্‌তেন না মশায়, কথখনো উঠ্‌তেন না—হা-হা-হা আপনি কি বলেন?" খুড়া দেখিলেন লোকটা জানে বেশ এবং দুনিয়ার হাল-চালও বুঝে ভাল। তাহাকে খুড়ার আর একটু বেশী ভাল লাগিল। তখন খুড়া তাহাকে তাহার সব কয়টী বাণী শুনাইয়া দিলেন এবং "বিশ্বাস না হয় হিসাব করো" কথাটিও যোগ করিয়া দিলেন—ওটা খুড়ার অজ্ঞাতে মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিত।

৮

গাড়ী মধ্যবর্ত্তী এক জংশনে থামিলে বারান্দাওয়ালা টুপি পরিয়া এক রেলবাই-বাবু টিকিট পরীক্ষা করিতে খুড়ার গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ীর একদিক হইতে যাত্রীদের টিকিট চাহিয়া হাতে নিয়া, একবার পরীক্ষা করিয়া, তাহার হাতের চিমটি দিয়া টিকিটের গায়ে এক কামড় বসাইয়া দিতে লাগিলেন—কামড়ের দাগ টিকিটের উপর পড়িলেও তাহার অঙ্গহানি হইল না—জন্তু বিশেষে মানুষের গায়ে কামড়াইয়া দাঁত ফুটাইলে শিলং বা কসৌলি যাইতে হয়, কিন্তু টিকিটের বেলায় তাহা না হইলেও চলে।

রেলবাই-বাবু খুড়ার কাছে আসিয়া টিকিট দেখিতে চাহিবা মাত্র তিনি নিজের টিকিট বাহির করিয়া ভীতস্বরে বলিলেন—"ও ছেলেটার ত টিকিট করি নাই—" তার পর ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে রেলবাই-বাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন—যেন তিনি ইচ্ছা করিলেই খুড়াকে চলন্ত গাড়ীর-তলায় ফেলিয়া দিতে পারেন অথবা রেভার্স গিয়ারের (Reverse Gear) ইচ্ছা করিলে এ যাত্রা রক্ষাও করিয়া দিতে পারেন।

রেলবাই-বাবু বলিলেন "ওর বয়স কত?"

খুড়া বলিলেন "আড়াই বৎসর।"

রেলবাই-বাবু খোকার দাঁত দেখিয়া বয়স পরীক্ষা করিলেন না, নজর আন্দাজে পরীক্ষা করিয়া খুড়ার কথা

বিশ্বাস করিলেন। তারপর বলিলেন—"তা' হ'লে ওর ভাড়া লাগবে না।"

খুড়ার গলার রস আসিল—মুখখানার অবস্থা 'পেথেটিক' (Pathatic) হইতে একটু ভাল করিয়া বলিলেন—"তবু যখন ও আপনাদের বেঞ্চে বসে আছে, তার জন্য কি কিছু দিতে হবে না ?"

রেলবাই-বাবু বরাবর দেখিয়া আসিতেছেন, বাড়ীতে যে ছেলে সাবালক থাকে, লোকে গাড়ীতে আসিলে তাহাকে নাবালক বলিয়া চালাইয়া দিতে চেষ্টা করে, সুতরাং আড়াই বৎসরের ছেলের ভাড়া দেওয়ার জন্য খুড়ার আগ্রহ দেখিয়া তিনি একটু আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। তারপর বলিলেন,—"না মশায়, অতটুকুন ছেলে, বসে কেন শুয়ে গেলেও কোম্পানী ওর ভাড়া নেবে না ; ও ফ্রী।"

খুড়া মুখখানা আগের চেয়ে আর একটু ভাল করিয়া বলিলেন —"এ'ত খুবই ভাল কথা ! আপনাদের কোম্পানী বাহাদুর এত বড়লোক, আমরা গরীব মানুষ কতই না প্রত্যাশা করি ; ভগবান যেন জন্মে জন্মে তাঁকে কোম্পানী করেন।" তার পরে আশীর্ব্বাদের সুরের সঙ্গে একটু সাহসের রস ঢালিয়া অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার গলায় বলিলেন—"আচ্ছা মশায়, আমি যদি ফ্রি খোকাকে আমার কোলে নিয়ে বসি তা' হ'লে ত কোম্পানীর উচিত আমার ভাড়া কিছু কম আদায় করা। আপনি একটু দয়া করে যদি আমার টিকিটের চৌৎ ফেরৎ দিয়ে দেন, তা'হ'লে বড় ভাল হয়। আপনি ত কোম্পানীর মানুষ, দেখুন না মশায় যদি কিছু সুবিধা করে দিতে পারেন। আমি খোকাকে এখনই কোলে নিচ্ছি।" কথা শেষ করিয়াই সত্য সত্য তিনি খোকাকে কোলে তুলিয়া নিলেন। অশ্ব-ত্যালেসের বাবু আর রেলবাই-বাবু অবাক হইয়া এ দৃশ্য দেখিলেন, মুখে কিছুই বলিলেন না, বোধ হয় ইচ্ছা করিলেও বলিতে পারিতেন না।

৯

গাড়ী আবার চলিতে সুরু করিয়াছে।

দেবদেবীকে শুধু নামে উৎসর্গ করিয়া শেষে মানুষে যেমন আহার্য্যগুলি নিজেই আত্মসাৎ করে, খুড়াও তেমনি তামাক সাজিয়া, অনেক-খানি-ভাল-লাগা বাবুটিকে হুঁকা শুধু নামে উৎসর্গ করিয়া নিজে ভোগ করিবেন বলিয়া তাহার দিকে হুঁকাটি একটু বাড়াইয়া বলিলেন—"নিন মশায়" এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের দিকে হুঁকাটিকে সরাইয়া আনিলেন, কিন্তু অশ্ব…বাবুটি ততোধিক ক্ষীপ্রগতিতে আলগোছে ছিলিমটী তুলিয়া নিয়া বেহুসের মত টানিতে লাগিলেন—শীতের রাত্রে, জেলে নদীতে জাল ফেলার আগে, শেষবার তামাক খাওয়ার সময়ে, অনেকক্ষণ আর খাইতে পারিবে না বলিয়া, একসঙ্গে যেমন অনেকটা টান দিয়া রেলওয়ে ইঞ্জিনের মত হুস্ হুস্ করিয়া ধুয়া ছাড়িয়া শরীর গরম করিয়া নেয়।

কাণ্ড দেখিয়া খুড়ার চক্ষু স্থির। কোথায় তাহার মতলব ছিল—এক ডোজ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বড়ির মত তামাক—নিজে প্রথমে কয়েক টান দিয়া, ভদ্রতার খাতিরে সঙ্গের ভদ্রলোককে গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মতন—গুড় ও তামাকের ধ্বংসাবশেষটুকু দিয়া আপ্যায়িত করিবেন—আর এ বেটা যেন তার চৌদ্দপুরুষের—তামাক-না খাওয়ার ঋণ পরিশোধ করার মত এমন জাহান্নমী টান সুরু করিল—ডাকাতে যেন খুড়ার চোখের সামনে তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইতে লাগিল—খুড়া রুই মাছে খাবি খাওয়ার সময়ে যে রকম মুখ করে, সেই রকম হা করিয়া অশ্ব…বাবুর গাল চাপিয়া ছিলিম-চুষা-ধুয়া বাহির করা দেখিতে লাগিলেন—পরিত্যক্ত ধুয়াঁর সঙ্গে সঙ্গে যেন খুড়ার পঞ্চাত্মাও ভুতযোনি প্রাপ্ত হইয়া হাওয়ায় উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

ছিলিমটা দাহ্য নহে বলিয়া যখন আর ধুয়াঁ বাহির হওয়া বন্ধ হইয়া গেল, তখন অশ্ব…বাবু খুড়ার ছিলিম ফেরত দিলেন। পুতুলের মুখের মত ভাববিহীন মুখ করিয়া খুড়া ছিলিমটা হাতে নিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন—অত্যধিক স্নেহপ্রবণ মাতা, আদুরে ছেলে স্কুলে পণ্ডিতের কাছে মার খাইয়া সন্ধ্যার সময়ে বাড়ী আসিলে যেভাবে তাহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মারের দাগ দেখেন। ছিলিমের অবস্থা এদিকে হাতীতে খাওয়া বেলের মত সারহীন।

খুড়া অতি সযত্নে হুঁকা ও ছিলিম ক্যানভিসের ব্যাগের ভিতর রাখিয়া দিলেন এবং কি পরিমাণ ক্ষতি হইল তাহার মানসাঙ্ক করিতে লাগিলেন ; তারপর কি

করিয়া এ ক্ষতিপূরণ করা যায়, তাহা ভাবিতে লাগিলেন। যতবার ক্ষতির কথা মনে হইল, ততবার তাহার যেন পুত্রশোক উপস্থিত হইতে লাগিল এবং শেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন—"আপনার সঙ্গে কি আছে মশায়, বের করুন।" অশ্ব·· বাবু যার ঘাটে জল খাইয়া বেড়ান, সুতরাং খুড়াকে চিনিতে আর তাহার বাকী ছিল না। তিনি শার্টের বুক-পকেট হইতে কাগজে মোড়া একটি আস্ত ও একটি আধখান পোড়া সস্তা দামের সিগার বাহির করিলেন। কাগজের মোড়ক খুলিতে না খুলিতেই খুড়া খপ্‌ করিয়া আস্ত সিগারটি হস্তগত করিলেন এবং তামাক ছিলিমের শোধ লইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে কিছু শান্তিলাভ করিলেন।

সিগারটি হাতে পাইয়া খুড়া এমন ভাবে নাড়িতে চাড়িতে লাগিলেন, যেন উহা একটা খুব মূল্যবান জিনিষ—জহুরী যেমন চুনি-পান্না নাড়াচাড়া করে; তারপরে ক্যানভিসের ব্যাগ খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে কাপড়ের ছোট একটি থলে বাহির করিয়া, সিগারটি সেই থলেতে পুরিয়া ক্যানভিসের ব্যাগের ভিতরে অর্থাৎ 'ডবল লকে' (Double Lock) রাখিয়া দিলেন। খুড়ার বদন তখন প্রসন্ন—মুখে বিজয়ের হাসি। অশ্ব…বাবু বলিলেন—"তুলে রাখলেন যে, ধরাবেন না?" খুড়া বলিলেন—"না মশায়, বাড়ী গিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে খাবো, ওসব মূল্যবান জিনিষ, রাস্তাঘাটে খেতে গেলে আঙ্গুলে চেপে ধরে খেতে হ'বে, আর পু'ড়ে পু'ড়ে আঙ্গুলে গরম লাগলেই ফেলে দিতে হ'বে। বাড়ী গিয়ে বাঁশের একটা চিমটা করে নেব, তা দিয়ে ধরে একবারে শেষ পর্য্যন্ত টান্‌তে পারব।" এর উপর আর কোন কথা চল্‌তে পারে না, সুতরাং অশ্ব…বাবু চুপ করিয়া খুড়াকে জব্দ করিবার ফন্দী আঁটিতে লাগিলেন।

১০

অনেকক্ষণ উভয়ে চুপচাপ কাটাইলেন। অশ্ব···বাবু শেষে এক উপায় ঠিক করিলেন। খুড়া ব্রাহ্মণ বলিয়া, তিনি গো-বীজে-টিকা-দান-নীতি অবলম্বন করিয়া, খুড়ার নিজের মন্ত্রেই তাহাকে আক্রমণ করিবেন ঠিক করিলেন—যে দেবতা যে ফুলে তুষ্ট, তা'কে সেই ফুলেই পূজা করিতে হয়। অশ্ব…বাবু বলিলেন "মশায়, আপনি বলছিলেন না যে, আপনার কিছু জমি আছে, আচ্ছা আমি যদি সেই জমি এক বছরের জন্ত গোবর-জমা নেই, তা' হ'লে আপনি কি দরে দিতে পারেন?"

খুড়া 'গোবর জমা" কস্মিনকালেও শুনেন নাই, দর দস্তুর ত দূরের কথা! তিনি তড়িতে ভাবিয়া নিলেন যে হঠাৎ একটা দর বলিয়া ফেলিলে যদি বাজার দরের চেয়ে কম হয়, তবে বে-অকুফ বনিতে হইবে, তাই বুদ্ধি করিয়া বলিলেন—"আপনি-ই বলুন কি দর পর্য্যন্ত দিতে পারেন, আমার কাছে আরো অন্ত কোম্পানীর লোকও হাঁটাহাঁটি করছে।

উনি ফিরেন ডালে ডালে, ইনি ফিরেন পাতায় পাতায়। অশ্ব…বাবু বলিলেন—"দেখুন মশায়, আমি সোজা লোক, আমার সোজা কথা। যদি আপনার পছন্দ হয় দেবেন, পছন্দ না হয় দেবেন না। আপনার যা' জমি আছে তা আমাকে এক বছরের জন্ত 'গোবর জমা' দেবেন; এই এক বছর জমিতে কেউ কোন ফসল ফলাতে পারবে না, তবু গরু চরাতে পারবে; আর সেই গরুর গোবর আমার লোক কুড়িয়ে নিয়ে আসবে। এক বছর পরে আপনার জমি আমাকে দিগর বন্দোবস্ত দিতে পারেন, না-ও দিতে পারেন, সে আপনার ইচ্ছা। আমি এই এক বছরের জন্ত আপনাকে হাল প্রতি ৫০৲ খাজানা দিব। বলুন রাজি আছেন?"

খুড়ার ত চক্ষু স্থির! হাল প্রতি এখন পান ৬৷৹ আর এই পাগলটা বলে কি না দিবে ৫০৲ হিসাবে। কিন্তু তাই বলিয়া খুড়া মাছ নহেন যে, এত সহজে টোপ গিলিবেন; একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—যেন এই অবসরে অন্ত কোম্পানীর এজেণ্টের দরের সঙ্গে এই দর তুলনা করিয়া নিলেন—"আচ্ছা মশায়, আপনাকে দেব কি দেব না তা' পরে বলছি! আমাকে বুঝিয়ে বলুন ত এই দরে বন্দোবস্ত নিয়ে কোম্পানী কি গোবর দিয়ে সারের ব্যবসায় করে, না হালুয়া তৈরী করে টিনে পুরে বিক্রি করে?

অশ্ব……বাবু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কোম্পানীর লাভ আছে মশায়, লাভ আছে। কোম্পানী গোবর দিয়ে সারের-ই ব্যবসায় করে, হালুয়া-পমেটম বা ক্রীম-স্নো'র ব্যবসায় করে না। আপনার বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না, আচ্ছা হিসেব করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই ধরুন,

দৈনিক এক কেয়ার পতিত জমির উপর নিদেনপক্ষে পাঁচটি গরুতে ঘাস খায়,—খায় ত?—হাঁ, খায়! পাঁচটি গরুতে গড়পড়তা দৈনিক গোবর দেয়, প্রত্যেকে তিন পাউণ্ড হিসাবে পনর পাউণ্ড, মাসে দিল ৪৫০ পাউণ্ড, বৎসরে দিল ৫৪০০ পাউণ্ড। এখন ধরুন দাম। আমাদের দর হচ্ছে সবচেয়ে কম। আমরা পাউণ্ড এক পয়সা করে বিক্রী করি, আর এইজন্য সব বড় বড় খদ্দের আমাদের ঘরে বাঁধা আছে। ধরুন, এক পয়সা করে পাউণ্ড হ'লে ৫৪০০ পাউণ্ডে হলো আপনার ৮৪৸/০, এটা হ'লো আপনার কেয়ারের কথা, একে বারো দিয়ে পূরণ দিন, কত হ'লো? ১০১২৷৷০ ত! ব্যস্, তা' থেকে আপনাকে দিলাম ৫০৲; যারা কুড়াবে তাদের মাইনে, আমার মাইনে আফিসের বাবুদের, সাহেবদের মাইনে—দিন্ না যত দিতে চান, তবু অনেক থাকবে। কি মশায় এখন হিসেব করে দেখিয়ে দিলুম, বিশ্বাস হ'লো ত! বলুন দেবেন কিনা; হাল প্রতি ৫০৲ খাজানা দেব।"

টোপের মত টোপ দিতে পারিলে সব মাছই টোপ গিলেন—ছুনিয়ার বড় কেউ বাকী থাকেন না—নবীন খুড়া ত কোন্ ছাড়! খুড়াও অবশেষে টোপ গিলিলেন, তবে দর ৫০৲ টাকা হইতে ৫৫৲ টাকায় উঠিল। গাড়ীতে বসিয়াই লেখাপড়া হইয়া গেল; খুড়া বায়না স্বরূপ নগদ মবলগ ৫৲ সমঝিয়া পাইয়া স্বজ্ঞানে সুস্থির বুদ্ধিতে অপরের বিনা অনুরোধে করারনামা এবং করার ফেল করিলে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবার প্রতিজ্ঞায় খেসারতনামা সম্পাদন করিয়া দিলেন। অশ্বত্যালেস কোম্পানীর এজেন্ট ৫৫৲ হাল প্রতি খাজনা দিবার সর্ত্তে খুড়ার সমস্ত রায়তি জমি এক বছরের জন্য গোবর জমা লইলেন।

১১

খুড়া বাড়ী আসিয়াই সব প্রজাদের নিষেধ করিয়া দিলেন যেন তাহারা কেউ এক বৎসরের জন্য ঐ জমিতে গরু চরাণ ছাড়া অন্য কিছু চাষ না করে। গরীব প্রজা মুনিবের হুকুম না মানিয়া কি করে? মুখে কিছু না বলিলেও মনে মনে অভিসম্পাত দেয়। খুড়া খুব খুসি—অতিরিক্ত আয়ের টাকা কিভাবে খরচ করিবেন—তাহার বজেট করেন। দেখিতে দেখিতে বৎসর ঘুরিয়া আসিল। এই এক বৎসর ব্যাপী গ্রামের সব গরু এই মাঠে চরিয়াছে, অনেক গোবর জমিয়াছিল, কিন্তু শুকাইয়া মাটী হইয়াছে, কিছু বৃষ্টির জলে ধুইয়া গিয়াছে, কিন্তু অশ্ব-ঢ্যালেসের কোন লোক গোবর কুড়াইতে আসে নাই।

বৎসর পুরিলে পর যখন সকলে খুড়াকে জিজ্ঞাসা করিত—"কি খুড়া কোন দিকে লাভ? ধান ফলানে লাভ না গোবর কুড়ানে লাভ?" খুড়া আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন—"আসবে হে, আসবে, নইলে মিছামিছি কি কেউ বায়না করে ৫৲ টাকা জলে ফেলে যায়।" আরও তিন মাস চলিয়া গেল কিন্তু কেউ আর আসিল না। এদিকে প্রজারা মরিয়া হইয়া খুড়ার কাছে আসিয়া পড়িল—এক বৎসর তাহাদের অতি কষ্টে গিয়াছে, যদি এই বৎসরও তাহারা জমি চাষ না করে তবে স্ত্রীপুত্র সহ মারা যাইবে। অগত্যা খুড়া আবার আগের মত তাহাদিগকে জমি চাষ করিতে অনুমতি দিলেন, তবে এক বৎসর পতিত পড়িয়া থাকায় জমিতে অনেক আগাছা জন্মিয়াছিল বলিয়া এক বছরের খাজানা তাহাদিগকে ছাড়িয়া আবাদ করাইতে হইল।

গ্রামের একজন খুড়াকে বলিল—"খুড়া, আপনার সঙ্গে যখন ওর লেখা-পড়া হয়েছিল, তখন কি আপনাকে কোন কাগজ পত্র দিয়ে যায় নি? দিন্ না এক কেস্ করে?" খুড়া বলিলেন—"না হে কিচ্ছু দিয়ে যায় নি, পাঁচ টাকা পেয়ে যে রসিদখানা দিয়েছিলুম, সেখানা পর্য্যন্ত সে নিয়ে গেছে।"

এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া খুড়াকে ক্ষেপাইলে তিনি বলিতেন—"বিশ্বাস না হয় হিসাব করো—এক কেয়ারে দৈনিক পাঁচটি গরু—প্রত্যেক গরুতে তিন পাউণ্ড গোবর —তিন পাঁচে পনর পাউণ্ড—"ইত্যাদি ইত্যাদি—তারপর বলিতেন—"তোমরা ত হিসাব করো না, শুধু মিছামিছি বকো। আমার হিসাবে কি ভুল ছিল, সে বিশ্বাসঘাতকতা করল, তা' না হ'লে কি এমন হয়—যাক বেটার পাঁচ টাকা মুফ্‌ত্ পেয়ে গেলাম। বিশ্বাস না হয়—"

মাস-পঞ্জী

চৈত্র—১৩৩৭

৪ঠা চৈত্র পর্য্যন্ত—গত ১৩ই মার্চ্চ বিনা গোলমালে ও বিন্দুমাত্র ভয় প্রদর্শন না করিয়া বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন ও ইংরেজদিগকে বর্জ্জন করার জন্য মহাত্মা গান্ধীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে আরবের একটি সমিতি দেশবাসীকে উপদেশ দিয়াছেন। কিশোরগঞ্জ মহকুমার ইট্‌না থানার অন্তর্গত উদিয়ার চাঁদ গ্রামের মুসলমানদের সহিত পুলিশের এক ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। নারী সত্যাগ্রহ সমিতির বিশিষ্ট মহিলাকর্ম্মী সদ্য কারামুক্ত শ্রীমতী চামেলী দেবী তাঁহার কলিকাতার বাস-ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। গত ১৪ই মার্চ্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে পাঞ্জাব হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যরিষ্টার ডাঃ মোহাম্মদ আলম এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগের পর মুক্তিলাভ করিয়াছেন। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসমিতির জেনারেল সেক্রেটারী ডাঃ সৈয়দ মাহ্‌মুদ এক লিখিত বিবৃতি প্রসঙ্গে গান্ধী-আরউইন চুক্তি পালনে প্রাদেশিক গভর্ণরগণের শৈথিল্যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। স্যর ফজ্‌লি হোছেনের সভাপতিত্বে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নবম বার্ষিক কনভোকেশন হইয়া গিয়াছে। আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কিত ১৬০০ রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি পাইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী ও বল্লভভাই প্যাটেল বরোদা রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছেন। গত ১৫ই মার্চ্চ কলিকাতার ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসন হলে সংবাদপত্র সেবিগণের এক বৈঠক বসে। এই বৈঠকে "সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও সংবাদপত্রের কর্ত্তব্য" বিষয়ের আলোচনা হয়। বোম্বাই আজাদ ময়দানে পণ্ডিত জহরলালের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। এই সভায় পণ্ডিতজী বলেন,—"দেশের সৈন্য বিভাগ, শাসন ব্যবস্থা এবং রাজস্বের উপর ভারতবাসীর পূর্ণ কর্ত্তৃত্বই স্বরাজ। উহার কমে আমরা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইব'না।" ছায়া-চিত্রের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মিঃ ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস্ রেঙ্গুন হইতে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। "শান্তি কোথায়" শীর্ষক এক লাল ইস্তাহার কুমিল্লা ও কুমিল্লার বাহিরে নানা-স্থানে দেখা গিয়াছে। পুলিশ এই সম্পর্কে কয়েকজন ছাত্র গ্রেপ্তার করিয়াছে। অবজার্ভার পত্রিকায় মিঃ গার্ভিন দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠক জুন মাসের মধ্যে বসাইবার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। গত ১৬ই মার্চ্চ কে বা কাহারা চট্টগ্রাম বিভাগের গোয়েন্দা বিভাগের সহকারী দারোগা শশাঙ্ক ভট্টাচার্য্যকে গুলী করিয়াছে। নাসিকস্থ কালারাম মন্দিরে প্রবেশ সম্পর্কে তথাকার অস্পৃশ্যগণ এক বিরাট সত্যাগ্রহবাহিনী গঠন করিয়াছেন। মির্জ্জাপুরে হিন্দু-মুসলমানের এক দাঙ্গায় ১১ জন মুসলমান নিহত ও ২ জন আহত হইয়াছেন। গত ১৭ই মার্চ্চ হায়দ্রাবাদের মহামান্য নিজাম বাহাদুর দিল্লীতে একটি মহিলা-কলেজ স্থাপনের জন্য ২ লক্ষ টাকা, তার ভিতর ৫০ হাজার টাকা এবং নাম প্রকাশে অসম্মত জনৈক ভদ্রলোক ৮ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। রাজস্বের কতকাংশ দিতে না পারায় কালা কাকড়ের রাজার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছে।

৮ই চৈত্র পর্য্যন্ত—গত ১৯শে মার্চ্চ মহাত্মা গান্ধী পুনরায় বড়লাট ও হোম সেক্রেটারীর সহিত দেখা করিয়াছেন। পেশাওয়র খাজুরি উপত্যকায় আফ্রিদিদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ১ জন ইংরাজ ও ৩ জন ভারতীয় সৈন্য নিহত হইয়াছে। গত ২০শে মার্চ্চ মহাত্মা গান্ধী দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার জন্য ভূপালের নবাব বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করিয়াছেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভার একটী প্রতিনিধি মণ্ডলী ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন পদ্ধতি ও হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে হিন্দুদের অভিমত জ্ঞাপন করিবার জন্য মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে শিখ লীগের কয়েকজন সদস্য এবং গাইকোয়াড় ও কপূ‌র্‌রতলীর মহারাজার সঙ্গে দেখা করিয়াছেন। গত ২১শে মার্চ্চ মুসলমান নেতারা আলোচনা করিয়া তিন দলের মধ্যে দুইদল যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। মিশ্র নির্ব্বাচন সম্পর্কে ডাঃ আনসারি নেহেরু রিপোর্টের উপর জোর দিয়াছেন এবং শওকৎ আলী আসন রিজার্ভ রাখিবার পক্ষপাতী। দিল্লীর লাটভবনে গোল টেবিলের ৩৩ জন সদস্য ও মহাত্মা গান্ধী একত্রে বসিয়া বড়লাটের সঙ্গে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে পরামর্শ করিয়াছেন।

১২ই চৈত্র পর্য্যন্ত—গত ২৩শে মার্চ্চ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাজধানী দর্শনের উদ্দেশ্যে টরেণ্টোর মিস্ এ, ওয়াকার কলম্বো হইতে মাদ্রাজে পৌঁছিয়াছেন। রাত্রি পৌনে সাতটার সময়ে লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে ষড়যন্ত্র মামলায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। গত ২৪শে মার্চ্চ কানপুরে ভীষণ দাঙ্গা আরম্ভ হয়। দাঙ্গার বিবরণ এইরূপ—ভগৎ সিং ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের ফাঁসির সংবাদে উত্তেজিত জনতা কারেন্সী অফিসের সম্মুখে সমবেত হইয়া বিপ্লবাত্মক ধ্বনি করিতে থাকে। অবিলম্বে একদল রিজার্ভ ফৌজ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। জনতায় ইট পাটকেলের প্রত্যুত্তরে সৈন্যগণ গুলী চালায়। এই হাঙ্গামা ২৮শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রবলভাবে চলে। ফলে প্রায় ১৫ শত লোক আহত এবং ৪০০ লোক নিহত হইয়াছে। গত ২৬শে মার্চ্চ থারাবন্দির বিদ্রোহীদল পুনরায় উত্তেজিত হইয়া পুলিশ পেট্রোল পোষ্ট আক্রমণ করিয়াছে। সিন্ধু হায়দ্রাবাদের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা ডাঃ চৈৎরাম বিষণদাস কংগ্রেস নগরে ভিড়ের মধ্যে পড়িয়া মারা গিয়াছেন। চেমসফোর্ড ক্লাবের পক্ষ হইতে লর্ড আরউইনের সম্মানার্থে দিল্লীর মেডেল হোটেলে এক ভোজ-সভার অনুষ্ঠান হইয়াছে। কাণপুর দাঙ্গার বিপন্ন হিন্দু-মুসলমানদিগকে উদ্ধার করিতে যাইয়া যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী দাঙ্গাকারীদের হস্তে নিহত হইয়াছেন।

১৬ই চৈত্র পর্য্যন্ত—গত ২৭শে মার্চ্চ করাচী কংগ্রেসের বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ইনসিন্ জেলায় একদল বেসামরিক

পুলিশ বিদ্রোহীদের সহিত সংঘর্ষ বাধায়, ফলে বিদ্রোহীদের ৮ জন নিহত ও ৭ জন আহত হইয়াছে। বাংলার কারা-বিভাগের ইনসপেক্টর জেনারেলএর হত্যাপরাধে শ্রীমান দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির আদেশ হইয়াছে। গত ২৮শে মার্চ্চ এসেম্ব্লী ও কাউন্সিল অব্ ষ্টেটের যুক্ত অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া লর্ড আরউইন প্রত্যেক সদস্যের কর মর্দ্দন করিয়াছেন। কংগ্রেসের বিষয় নির্ব্বাচনী সভায় বার্ষিক রিপোর্ট সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা হইয়াছে। গত ২৯শে মার্চ্চ তারিখে করাচী কংগ্রেসের প্রথম দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই দিনে সাধারণ সভাপতি শ্রীযুক্ত বল্লভ ভাই প্যাটেল ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ চৈৎরাম গিদওয়ানীর অভিভাষণ পঠিত হইয়াছে। তৎপর মৃত ও নিগৃহীত দেশসেবকগণের জন্য শোক প্রকাশের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

২০শে চৈত্র পর্য্যন্ত—৩০শে মার্চ্চ কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হইয়াছে। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আর এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে আমদানী লবণ শুল্ক বৃদ্ধির বিল পাশ হইয়াছে। ৩১শে মার্চ্চ কংগ্রেসের তৃতীয় দিনের অধিবেশন বসে। আমেরিকার মেনাগুয়া প্রদেশ ভূমিকম্পে একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। ১লা এপ্রিল শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন দার্জ্জিলিং জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি বরিশাল প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছে। বাবুল এছলাম নগরে নিখিল ভারত জময়ইতে ওলমার দশম বার্ষিক অধিবেশন বসিয়াছে। ঢাকার জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে মিশ্র-নির্ব্বাচন সমর্থন করিয়াছেন। বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মিঃ নরীম্যানকে রাজনৈতিক অভিযোগ হইতে মুক্তিদান করিয়াছেন। আমেদাবাদের অন্তর্গত মান্কার রাজ্যের প্রজাগণ করবন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে। গত ২রা এপ্রিল পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য আগামী গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য বড়লাটের নিকট হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন। মহারাষ্ট্র কাগজের সম্পাদক মিঃ গোপাল রাজদ্রোহের অভিযোগে ১ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। অমৃতসর শিখ লিগে যোগদান করিবার জন্য সীমান্তের গান্ধী খান আবদুল গফ্ফর খাঁ সদলবলে বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ডাঃ রমণ লাহোরে পৌছিয়াছেন। লাহোর মিউনিসিপ্যালিটি তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আগরা সহরে এবং সহরের উপপ্রান্তে ১৪৪ ধারা জারি করিয়া কোন প্রকারের সভা সমিতি করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

২৪শে চৈত্র পর্য্যন্ত—গত ৪ঠা এপ্রিল মহাত্মা গান্ধী দিল্লীতে পৌছিয়াছেন। রাজমহিন্দ্রীতে রথ-যাত্রা উপলক্ষে পুলিশ রথে দেশনেতাদের ছবি ঝুলাইতে বাধা দেয়; ফলে জনতা ও পুলিশের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ ঘটে। এই সংঘর্ষে রথযাত্রা-মিছিলের ১৫ জন আহত এবং ৩ জন নিহত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের পার্শী সম্প্রদায় সীমান্তের গান্ধী খান আবদুল গফ্ফর খাঁকে এক অভিনন্দন পত্র দিয়াছেন। দীনেশ গুপ্তের পক্ষ হইতে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করার জন্য যে সমস্ত কাগজ পত্রের বিশেষ দরকার, তাহা বিমান-ডাকে লণ্ডনে প্রেরিত হইয়াছে। গত ৫ই এপ্রিল দিল্লীতে নিখিল ভারত মোসলেম লিগের ১ম দিনের অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। ছাত্র সম্মিলনীর নির্ব্বাচিত সভানেত্রী ডাঃ প্রভাবতী দাশগুপ্তা এম-এ, পি-এইচ্-ডি অদ্য তারিখে বরিশালে পৌছিয়াছেন। গত ৬ই এপ্রিল শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দাশ এম-এ পি-এইচ-ডির সভাপতিত্বে বরিশাল ছাত্র সম্মিলনীর অধিবেশন বসিয়াছে। শ্রীযুক্তা দাশ তাঁহার অভিভাষণে বর্ত্তমান আন্দোলনে ছাত্রদের কর্ত্তব্য সম্পর্কে সুচিন্তিত মত ও পথ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বীমানবীর ফেয়ারবের্ণ ও শীলষ্টোম অদ্য রেঙ্গুনে উপস্থিত হইয়াছেন। ভারতের সর্ব্বত্র জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস প্রতিপালিত হইয়াছে। নিখিল ভারত মোসলেম লীগের ২য় দিনের অধিবেশনে মুসলমানগণ পৃথক নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী বলিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। দিল্লী এক্সপ্রেসের কয়েকখানি গাড়ী লাক্সর ষ্টেশনে লাইনচ্যুত হইয়াছে। ফলে কয়েকজন আরোহী আহত হইয়াছে। বড়লাট লর্ড আরউইনের সহিত ৯ জন বিশিষ্ট মুসলমান নেতা বর্ত্তমানের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শেঠ যমুনালাল বাজাজ, দেবদাস গান্ধী, স্বামী আনন্দানন্দ, পণ্ডিত সুন্দরলাল এবং পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন অদ্য কাণপুরে পৌছিয়াছেন। কাণপুরের অবস্থা পরিদর্শনই ইঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য। মহাত্মা গান্ধী পুনরায় আসন্ন গোল-টেবিল বৈঠক সম্পর্কে বড়লাট আরউইনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। ত্রিবান্দ্রামে গণিত কন্ফারেন্সের অধিবেশন শেষ হইয়াছে। মাদ্রাজের উকিল-সভা এড্ভোকেট কন্ফারেন্সের যে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অদ্য তাহার কার্য্য শেষ হইয়াছে। ভারতে একটি সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠাই কন্ফারেন্সের মুখ্য প্রস্তাব ছিল। ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস্ বোম্বাই পৌছিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"ভারতবাসীর ন্যায় অতিথি-বৎসল পৃথিবীর আর কোথাও নাই।" কুমারী মীরা বাঈ বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া করাচীর মিউনিসিপ্যাল হস্পিটালে শয্যাশায়ী আছেন। জামনগর রাজ্যের আটকট্ গ্রামে রাজকোটের একদল ছাত্র খদ্দর ও স্বদেশী প্রচারের জন্য পৌছিয়াছেন। পুলিশ তাঁহাদিগকে রাজ্য হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছে। টাটা কয়লার খনির বহু শ্রমিক ভগৎ সিং প্রভৃতির চিত্র লইয়া কৃষ্ণবর্ণের পতাকা হস্তে এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছে।

চিত্রে করাচী কংগ্রেস
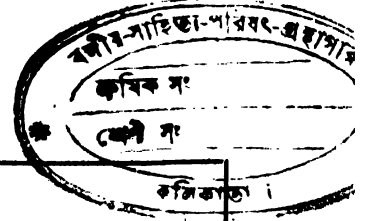
৪৫ তম কংগ্রেসের সভাপতি
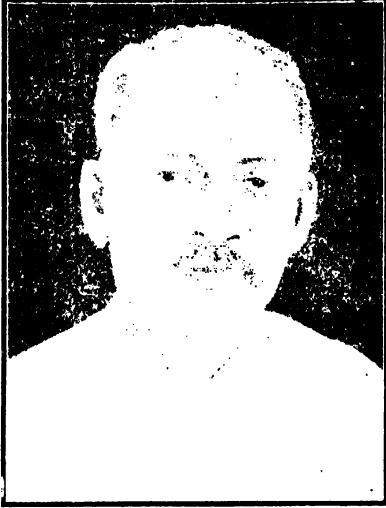
সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি

ডাঃ চৈৎরাম গিদওয়ানী

"আমি চাকুরী বা ব্যবস্থাপক সভায় সম্মানের কোন আশা রাখি না। মহাত্মাজী যে ১১টি সর্ত্ত দিয়াছেন, তাহা পাইলেই স্বরাজের মূল পাওয়া যাইবে, না পাওয়া গেলে সেই শাসন-তন্ত্রকে স্বরাজ বলা যাইবে না। দেশের জমিদার, রাজা, মহারাজা ও অন্যান্য যদি দেশের দন্ধমাংস কলেবর কোটি কোটি লোকের স্বার্থে আঘাত না করেন, তবে তাঁহাদের অধিকার আমি মানিয়া চলিব। যাঁহারা অবনত, তাঁহাদের সাহায্যই আমার জীবনের মহাব্রত। * * * যে শাসন-সংস্কারে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান থাকিবে না, তাহার সহিত কংগ্রেসের কোন সংশ্রব নাই। হিন্দু হিসাবে আমি সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়দিগকে স্বদেশী ফাউন্টেন পেন ও স্বদেশী কাগজ উপহার দিয়া বলিব, আপনারা আপনাদের দাবীগুলি লিপিবদ্ধ করুন, আমি সেগুলি মানিয়া লইতেছি।" * * *

—সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল।
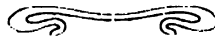
"আমরা অবিলম্বেই স্বাধীনতা লাভের যে স্বপ্ন দেখিতেছি, তাহা একটা বাজে কল্পনার মধ্যেই শেষ হইবে—যদি আমরা আগামী বারের আলোচনায় সম্মিলিত ভাবে এবং ঐক্যবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইতে না পারি। সাম্প্রদায়িক সমস্যা মীমাংসার উপরই আমাদের গৃহগত সমস্যার শেষ প্রতিকার নির্ভর করিতেছে। সুতরাং ঐ বিষয়ের জন্য আমাদিগকে আর বিলম্ব করিলে চলিবে না এবং এই ব্যাপারের মীমাংসার জন্য বৃটিশ সরকারের নিকট নিশ্চয়ই আমরা যাইব না। সালিশী নির্দ্দেশেই আমরা এই বিষয়ের মীমাংসা করিয়া ফেলিতে পারিব।"

—ডাঃ চৈৎরাম গিদওয়ানী।

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী

কংগ্রেস্-মঞ্চোপরি উপবেশন করিয়া লাউড্-স্পীকারের সম্মুখে বক্তৃতা করিতেছেন।

"আমরা গরীব ও অর্দ্ধভুক্তের জন্য স্বরাজ চাই। আমাদের সভাপতির মত ভাইস্রয়ের কোন বেতন থাকিবে না। আমরা ভাইস্রয়ের বর্ত্তমান প্রাসাদে দরিদ্রের জন্য হাসপাতাল খুলিব। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন আমার নিকট কিছুই নহে ;—আমরা ইংরাজের সহিত অংশীদার ভাবে থাকিতে পারি বা বন্ধু হিসাবে থাকিতে পারি, তাঁহারা আর আমরা যে এক—এই আমি করিতে চাই। আমি চাই না যে, তাঁহারা প্রভু হইয়া আমাদিগকে শাসন করুন,—ইহাই আমার স্বরাজ।"

—মহাত্মা গান্ধী।

সর্দ্দারজী এবং ডাঃ গিদওয়ানী

প্রেসিডেন্টের ক্যাম্পে উভয় আলাপ-আলোচনা করিতেছেন।

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক

শ্রীযুক্ত শান্তদাস ইদনমল

হরচাঁদ রায় বিষণ দাস

ইঁহার নামানুসারে কংগ্রেস-মণ্ডপের নাম হরচাঁদনগর রাখা হয়

কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু

অভ্যর্থনা-সমিতির সেক্রেটারী

শ্রীযুক্ত আসুদামল টেকচাঁদ গিদওয়ানী

কংগ্রেস প্যাণ্ডালের সিংহদ্বার
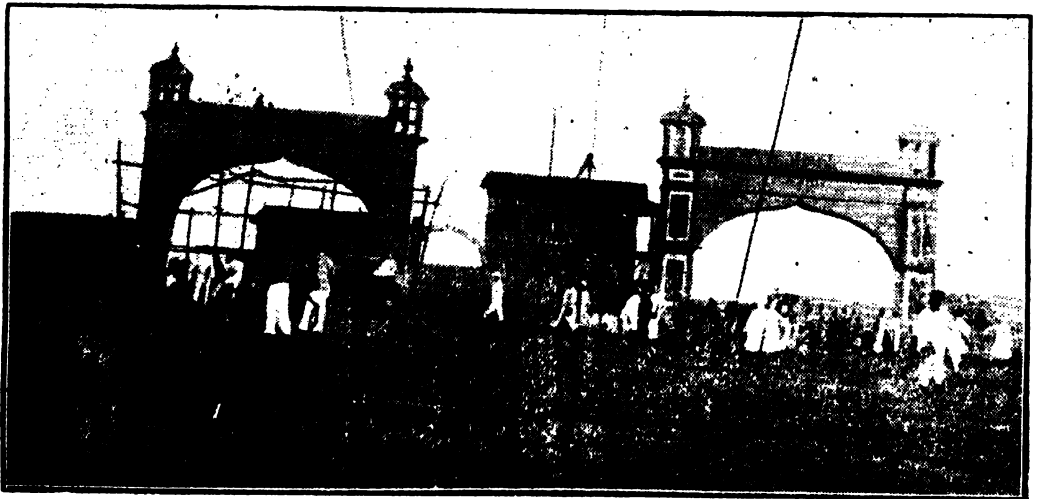
শহীদী গেট

করাচীতে সত্যাগ্রহী নেতাদের বিচারের সময়ে পুলিস জনতার উপর গুলী চালায়, তাহাতে মেঘরাজ ও দত্তাত্রেয় নামক দুইজন সত্যাগ্রহী মারা যান, তাঁহাদেরই নামানুসারে ফটক দুইটার নাম মেঘরাজ গেট, দত্তাত্রেয় গেট রাখা হইয়াছে।

কংগ্রেসে জাতীয়-পতাকা উত্তোলন উৎসব
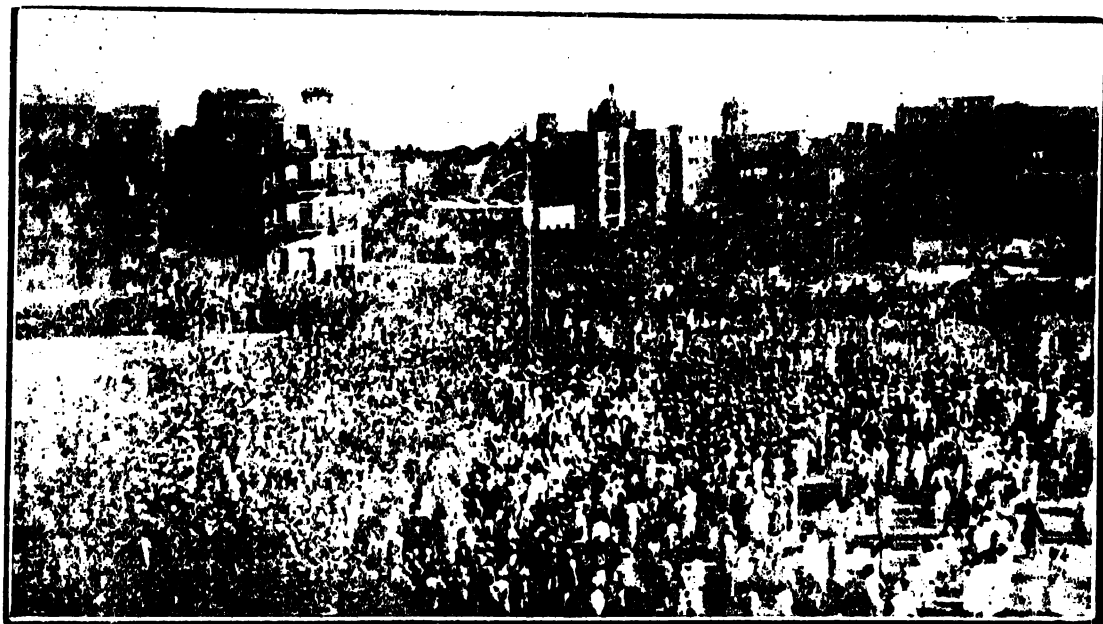
প্রেসিডেণ্ট সর্দ্দার প্যাটেল কংগ্রেস-প্রাঙ্গণে জাতীয়-পতাকা উত্তোলন করিতেছেন।

কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির কার্য্যালয়।

নব-জীবন ভারতসভার প্রেসিডেণ্ট

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

অভ্যর্থনা-সমিতির প্রেসিডেণ্ট

স্বামী গোবিন্দানন্দ

নব-জীবন ভারত-সভার প্রেসিডেণ্টের অভ্যর্থনা মিছিল

জমইয়তে-ওলামার প্রেসিডেণ্ট

মওলানা আবুল কালাম আজাদ

কারামুক্ত ডাঃ মোহাম্মদ আলম

আগামী বৎসরের জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম মেম্বর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত

সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তির প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

গান্ধী হাসপাতালের সেক্রেটারী

শ্রীমতী জেঠী সিপাহী মওলানী

অধিনায়িকা

শ্রীমতী মেহেরবাই কাদগার

কংগ্রেসের প্রসিদ্ধ মহিলাকর্ম্মী

শ্রীমতী কাশীবেন কোটক

সীমান্তের গান্ধী

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক

জি, ও, সির পোষাকে সজ্জিত
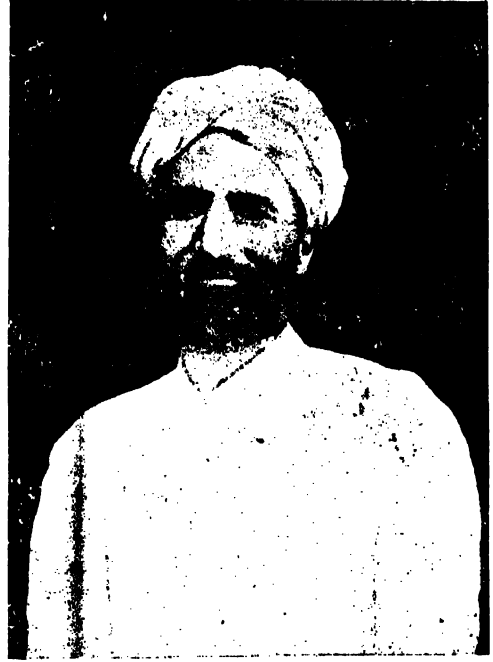
খান আবদুল গফ্ফার খাঁ

"আমি রাজনীতিক নহি, সাধারণ সৈনিক মাত্র। সেনাপতির আদেশ পাইলে যুদ্ধ করিব ইহাই আমার লক্ষ্য।" —খান আবদুল গফ্ফার খাঁ।

সৈয়দ লাল বাদশাহ্

পেশাওর খেলাফৎ কমিটির প্রেসিডেণ্ট ও সীমান্তের গান্ধীর প্রধান সহকর্ম্মী

আলাউদ্দীন হুসেন শাহের জুম্মা-মস্‌জিদ—তোরণ-লিপি
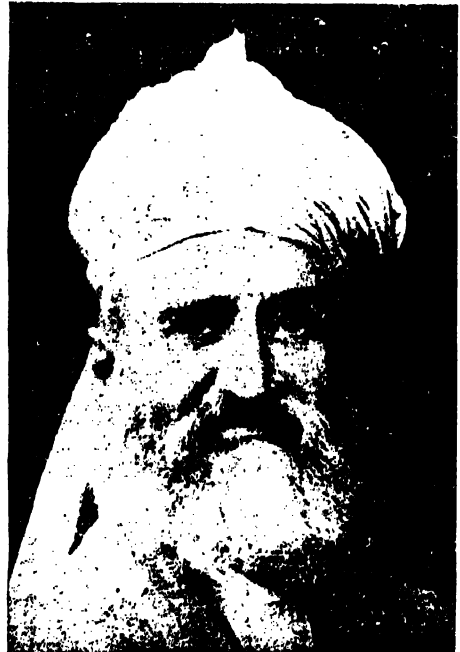
হিজরী ৯১১ (খৃঃ ১৫০৫) বর্ষে উৎকীর্ণ এই শিলা-লিপি দ্বারা ঐ বর্ষে বাঙ্গলার সুলতান আলাউদ্দীন আবুল মোজাফ্‌ফর হুসেন শাহ্‌ (৮৯৯—৯২৫ হিজরী) জুম্মা মস্‌জিদের (সম্ভবতঃ গৌড়ের) তোরণ নির্ম্মাণ করেন, ইহা প্রমাণিত হয়। এই রাজা বাঙ্গলার বিখ্যাত হুসেন শাহী রাজবংশের (৮৯৯—৯৪৪ হিজরী) সংস্থাপক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রাম কমল সিংহ মহাশয় ১৩৩৬ বাং বৈশাখ মাসে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দী মহকুমার খড়গ্রাম থানার অধীন ঝিল্লীগ্রামে ইহা আবিষ্কার করেন। এই লিপি এক্ষণে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কলাশালায় শিলালিপি সংগ্রহে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। শিলা-লিপিটি "ক্লোরাইট" প্রস্তরে খোদিত। ফলকের পরিমাপ ৩″×১″—৬½″। ফলকটি দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গেলেও উহার লিপি সম্পূর্ণ এবং রক্ষিত। লিপির প্রতিরূপ এই সংখ্যায় প্রদত্ত হইল। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মৌলবী শামসুদ্দীন আহ্‌মদ এম, এ, সাহেবের সাহায্যে লিপির পাঠোদ্ধার করা হইয়াছে। —"জুম্মা মস্‌জিদের এই তোরণ হুসেন বংশের সৈয়দ আশ্‌রাফের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ ও গৌরবান্বিত সুলতান আলাউ-দ্‌-দুন্‌য়া-র-দ্‌-দীন আবুল মুজাফ্‌ফর হুসেন শাহ্‌ নির্ম্মাণ করেন। আল্লা তাঁহার রাজত্ব ও রাজপদ চিরস্থায়ী করুন। ৯১১ হিজরী।

—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সৌজন্যে।

দিল্লীর লাট-ভবন

(সম্মুখভাগের দৃশ্য)

(পশ্চাদ্ভাগের দৃশ্য)
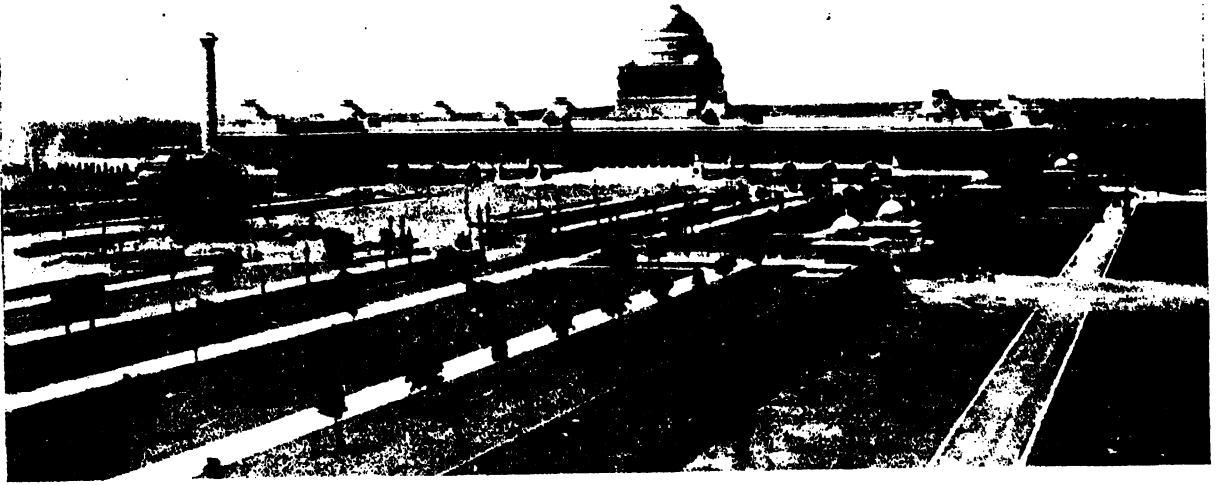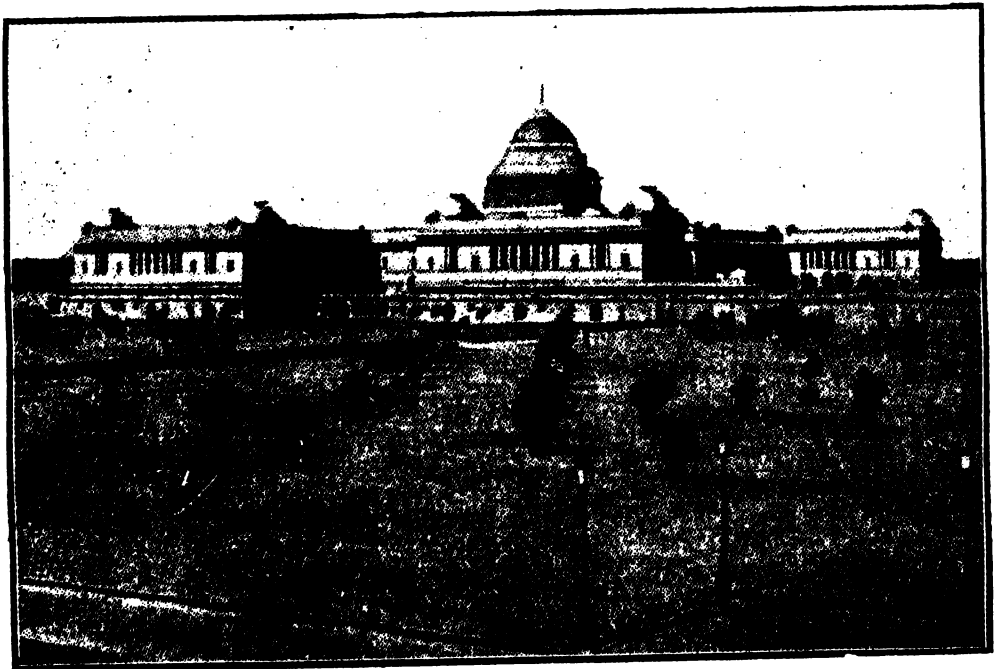
পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এরোপ্লেন "আর ১০১"

এই বিরাট এরোপ্লেন ১৯৩০ খৃঃ অব্দের ৫ই অক্টোবর ফ্রান্সের অন্তর্গত একটী নগরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। মোট ৫৪ জন আরোহীর মধ্যে ৪৬ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এবং বাকী ৮ জনের কোনক্রমে জীবন রক্ষা পাইয়াছে

মিঃ ই, ডবলিউ, বিটি।

২১,০০০ মাইল বিস্তৃত একটী রেলওয়ে, আটলাণ্টিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী ষ্টীমার লাইন ও ১০০,০০০ মাইল বিস্তৃত টেলিগ্রাম লাইনের সত্বাধিকারী। এতদ্ব্যতীত ইঁহার বহু সহস্র হোটেল ও অন্যান্য ব্যবসায় আছে। যাঁহারা বেশী কাজ দেখিয়া ভয় পান, তাঁহারা মিঃ বটির বিষয় চিন্তা করিয়া দেখুন।

ভূপালের মহামান্য নবাব

ইনি সম্প্রতি ভারতীয় রাজন্যবর্গের সভায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বিশ্ব-মোস্‌লেম মিলন-কেন্দ্র মক্কার পথে—

বেগম সুরাইয়া

বাদ্‌শাহ আমানুল্লাহ্‌

চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার

খান বাহাদুর আবদুল মোমেন

চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণের পূর্বে ৪ মাসের ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়া হজ-যাত্রা করিয়াছেন।

স্যার আবদুল করিম গজনভী

বাংলা সরকারের একজিকিউটিভ মেম্বর শীঘ্রই হজ্জে গমন করিবেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বিলাত প্রত্যাগত

সঙ্গীহীন মওলানা শওকৎ আলী

হিন্দু-মোস্‌লেম সমস্যা সমাধানের জন্য মওলানা শওকৎ আলী মহাত্মা গান্ধী এবং লর্ড আরউইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। ইনি অল্‌ ইণ্ডিয়া মোস্‌লেম কনফারেন্সের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

নাহাছ পাশা

মিশরের ওয়াফ্‌ দলের নেতা। পূর্ব্বে ইউরোপীয় পোষাক পরিধান করিতেন, কিন্তু বর্ত্তমানে নেক্‌টাই প্রভৃতি ছিড়িয়া স্বদেশী-শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য দেশীয় পোষাক পরিধান করিতেছেন।

স্যার সোলতান আহ্‌মদ আট বৎসর যাবৎ পাটনা ইউনিভার্সিটির ভাইস্‌ চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ইনি ইউনিভার্সিটির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি যেমন স্যার আশুতোষের নিকট ঋণী, পাটনা ইউনিভার্সিটিও তদ্রূপ সর্ব্ববিষয়ে স্যার সোলতান আহ্‌মদের নিকট ঋণপাশে আবদ্ধ। 'হার্টগ কমিটি'র মেম্বর হিসাবে ইনি যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সুযশঃ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। লণ্ডনের গত 'রাউণ্ড টেবেল কনফারেন্সে' ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার হিসাবে একমাত্র স্যার সোলতান আহ্‌মদই ভারতীয় সমস্যা মীমাংসার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। গত ২৮শে মার্চ্চ পাটনা ইউনিভার্সিটির স্পেশাল কনভোকেশনে বিহার-উড়িষ্যার গভর্ণর বাহাদুর অশেষ গুণের পুরস্কার স্বরূপ স্যার সোলতান আহ্‌মদকে "ডক্টর অব ল" উপাধি দান করিয়াছেন।

স্যার সোলতান আহ্‌মদ

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি হইতে "লিগ্ অব্ নেশান" এর ডেলিগেট রূপে

বামদিক হইতে—এ, ই, জিমার্ণ—মিঃ জে, এ, বয়েড্ কার্পেণ্টার—স্যার অতুল চাটার্জ্জি—মিঃ জে, সি, স্মাটস্—মিঃ হুমায়ুন কবির—মিঃ জে, সি, গাউল্ড্।

বাঙ্গলার কৃতি-ছাত্র

আবদুল মোতালেব্ বি-এস্-সি

ইনি গত ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য বিলাত-যাত্রা করেন, এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত Civil Engineering পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর (Messrs Dorman, Long and Co) প্রায় দেড় বৎসর practical Training লাভ করিয়া গত ১৯৩০ সালের ২০শে ডিসেম্বর স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইনি উক্ত কোম্পানীর কলিকাতা-শাখায় কার্য্য করিতেছেন।

ভগৎ সিং

বটুকেশ্বর দত্ত

গত ১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বোমা ফেলিবার সম্পর্কে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের প্রতি যাবজ্জীবন দীপান্তরের আদেশ হয়। তৎপর তাঁহাদিগকে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। শুকদেব ও রাজগুরুও এই মামলা-সম্পর্কে ধৃত হন। এই মামলায় বটুকেশ্বর দত্ত ব্যতীত অবশিষ্ট তিন জনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। গত ২৩শে মার্চ্চ সন্ধ্যা পৌনে সাতটার সময়ে লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে ষড়যন্ত্র মামলায় প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।

দীনেশ গুপ্ত
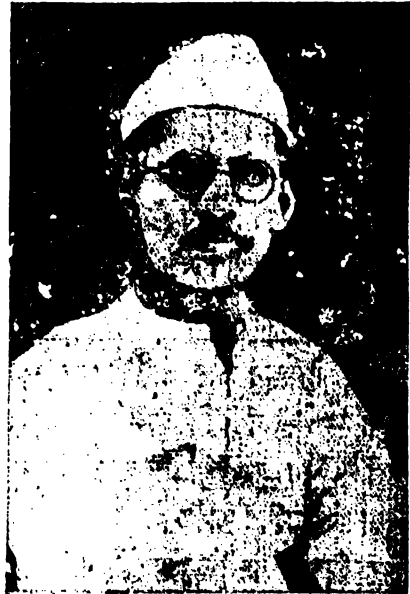
কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংএ বাংলার কারা-বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল কর্ণেল সিম্‌সনের হত্যাপরাধে প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পণ্ডিত গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী

যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট। গত কাণপুর দাঙ্গায় বিপন্ন হিন্দু-মুসলমানগণকে উদ্ধার করিতে যাইয়া দাঙ্গাকারীদের হস্তে নিহত হইয়াছেন।

বিলাত-প্রত্যাগত শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী
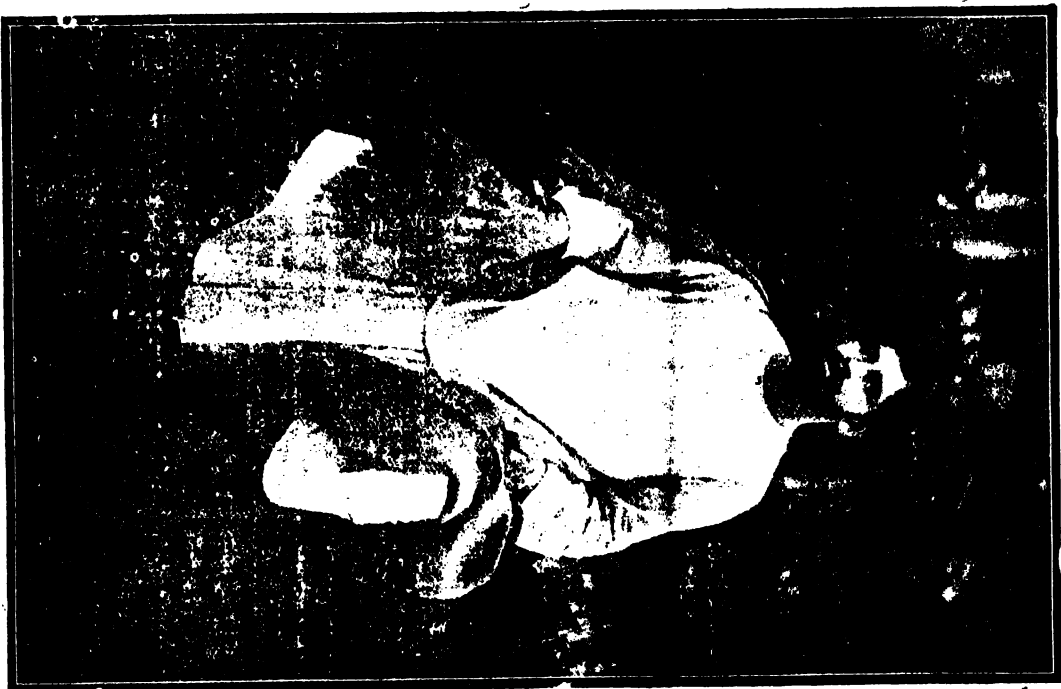
কলিকাতাস্থ ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের সত্বাধিকারী এবং মাতৃমন্দির-সম্পাদক।
বর্ত্তমানে কন্যাসহ পৃথিবী ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র নন্দী

১৯২৫ সালে লণ্ডনের ওয়েম্ব্লীস্থিত বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশনে ভারতীয়
অলঙ্কার শিল্পিগণের অন্যতম প্রতিনিধি।

লোন-কোম্পানী—

কুসীদ-জীবী মহাজনেরা এতদিন দেশে সুদের কারবার চালাইয়া আসিতেছিলেন ব্যক্তিগতভাবে। এখন তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দেশের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলিতে লোন আফিস খুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং তদন্ত-কমিটীর রিপোর্টে এই প্রকার ৩৮০টী লোন আফিসের সন্ধান পাওয়া যায়। এই লোন-কোম্পানীগুলি অংশীদার-দিগকে তাঁহাদের মূলধনের জন্ম শতকরা কত টাকা হিসাবে dividend বা মুনাফা দিয়া থাকেন, কমিশন ইহা জানিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহাদের অনেকেই কমিশনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই। অল্প সংখ্যক যাঁহারা উত্তর দিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবরণ হইতে নিম্নে কয়েকটা লোন-কোম্পানীর মুনাফার হিসাব সঙ্কলন করিয়া দিতেছি। পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, সকল প্রকার খরচ-খরচা ও রিজার্ভ তহবিলে গচ্ছিত টাকা বাদে, লোন-কোম্পানীর মহাজনরা নিজেদের গচ্ছিত প্রতি একশত টাকার জন্ম মোট কত টাকা করিয়া মুনাফা পাইয়াছেন, ইহাতে কেবল সেই হিসাব দেওয়া হইয়াছে। খাতকদের নিকট হইতে সুদের পরিমাণ ইহা হইতেও অধিক।

নাম	শতকরা মুনাফা
জলপাইগুড়ি ব্যাঙ্ক	৫০
বগুড়া লোন-আফিস	৬০
কিশোরগঞ্জ „	৬০
ব্রাহ্মণ বাড়িয়া „	১২৫
জামালপুর ব্যাঙ্ক	৫০
জামালপুর লোন-কোং	১৫০
খাদালী ব্যাঙ্ক, পাবনা	১২২

হিসাব করিয়া দেখিলে জানা যায়—কেবল উপরোক্ত ৩৮১টী লোন-আফিসে ১০,১১,৫১০ টাকার মূলধন খাটিতেছে। এই লোন-আফিসগুলির সংখ্যা ও শক্তি দিন-দিন কিরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে, মফস্বলের পাঠকবর্গকে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। সাধারণ সুদখোর-দিগের তুলনায়, এই শিক্ষিত ভদ্র ও আইনজ্ঞ কুসীদ ব্যবসায়ীদের সঙ্ঘবদ্ধ কবল যে অধিক কঠোর ও অধিক করাল হইয়া থাকে, তাহা সকলেরই বিদিত।

শিক্ষায় হিন্দু-মুছলমান—

সরকারী শিক্ষা-রিপোর্টের একটী বিবৃতিতে জানা যায়, সমগ্র ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্ম-সমাজের লোকদের মোট সমষ্টির শতকরা কতজন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করিতেছে। হারটী এইরূপ :—

ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী	১৮·৫
ভারতীয় খৃষ্টান	১৩·৭
মুছলমান	৫·২
হিন্দু	৪·৭
বৌদ্ধ	৫·৪
পার্সী	২২·৭
শিখ	৭·১

চৈত্রের প্রবাসীতে এই হিসাবটী প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় "হিন্দু শিক্ষায় অনগ্রসর" বলিয়া একটী মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন মুছলমান সংবাদপত্রেও এই হিসাবটা উদ্ধৃত হইয়াছে। আমাদের মতে ইহার জন্ম বিমর্ষ বা উৎফুল্ল হওয়ার কারণ কোন

পক্ষেরই নাই। "যাহারা বিদ্যালয়ে পড়ে" বলিতে প্রাইমারী পাঠশালা ও মক্তবগুলির ছাত্রদিগকেও বুঝাইয়া থাকে। ইহাদিগকে ধরিয়া গড় হিসাব করিলে বাঙ্গলা দেশের ফলও প্রায় এইরূপই দাঁড়াইবে। এখানে হিন্দু পুরুষের শতকরা ৬·৬ জন ও মুছলমান পুরুষের শতকরা ৬·৫ জন ছাত্র ১৯২৮ সালে শিক্ষালয়ে পড়িয়াছিল। মোটের উপর ঐ বৎসর অনুপাত ছিল—হিন্দু ৪৫·৫ আর মুছলমান ৫৪·৪ জন হিসাবে। সকল স্তরের শিক্ষাগারের মুছলমান ছাত্রদের গড় দাঁড়ায় ৪৯·৯ জন হিসাবে। কিন্তু কলেজে যাইতে না যাইতে তাহাদের অনুপাত হইয়া দাঁড়ায় ১২ হইতে ১৫ জন মাত্র। সুতরাং এই প্রকার গড়-পড়তা হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া কোন সমাজকে অগ্রসর বা অনগ্রসর বলিয়া মনে করা উচিত হইবে না।

হরে-দরে হাঁটু জল—

শ্রেণী বিশেষের ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের ন্যায় আমরাও অনেক সময়ে এইরূপে "হরে-দরে হাঁটু জল"—সিদ্ধান্ত করিয়া বসি। উপরের উদাহরণটী তাহার একটা নজীর। আর দুইটা উদাহরণ দিতেছি। শিক্ষার দিক্ দিয়া মুছলমানের অবস্থা অত্যন্ত হীন, এই কথা প্রমাণ করার জন্য মুছলমান ও অমুছলমানের শিক্ষার অনুপাত লইয়া আলোচনা করা হয়। কিন্তু অমুছলমানের মধ্যে ইংরাজদের পার্সীদের ও দেশী খৃষ্টানদের গড় হইতেছে—যথাক্রমে শতকরা ১৮·৫, ২২·৭ ও ১৩·৭ জন। পক্ষান্তরে হিন্দুর পড়তা, হইতেছে—শতকরা ৪·৭ জন। এখন এই সংখ্যা সমষ্টির গড়-পড়তা হিসাবে "হরে-দরে হাঁটু জল" হইতেছে—মুছলমান ৫·২ আর অমুছলমান ১৪·৩১ হিসাবে।

আর একটা উদাহরণ দিতেছি। পণ্ডিতেরা খড়ি পাতিয়া হিসাব করিয়া দিতেছেন যে, বাঙ্গলার সৈন্যের সংখ্যা—অমুছলমান ৫৬৩১ আর মুছলমান মাত্র ৪৮৩ জন। হরে-দরে কাদি করিয়া অনুপাত বাহির করা হইতেছে, প্রতি ১৩ জন সৈনিকের ১২ জন অমুছলমান আর একজন মাত্র মুছলমান। ইহা লইয়াও পক্ষদের যথেষ্ট হর্ষ-বিষাদের অভিব্যক্তি করিতে দেখা যাইতেছে। অথচ এই সৈনিকদের মধ্যে ইউরোপীয়ান কতজন, অবাঙ্গালী ভারতীয় কতজন আর বাঙ্গালী হিন্দু মুছলমান কতজন, সে বিষয় হিসাব করিয়া দেখা কেহই আবশ্যক মনে করেন না। কিন্তু এই সব বিষয় লইয়া সম্যক আলোচনা করিয়া দেখিলে যে, রহস্যটা বাহির হইয়া পড়ে, তাহা বাঙ্গলার হিন্দু-মুছলমান উভয়ের পক্ষেই শিক্ষা-প্রদ হইতে পারে।

অদৃষ্টের পরিহাস—

এপ্রিল মাসের প্রথমভাগে করাচী নগরে নিখিল ভারতীয় জমিয়তে ওলামার বার্ষিক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে সভাপতির পদে বরিত হইয়াছিলেন স্বনাম খ্যাত আল্লামা আবুল-কালাম আজাদ ছাহেব। তারের সংবাদে প্রকাশ—মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ দেশনায়কগণ আহুত হইয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং মহাত্মাজী সেখানে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও হিন্দু মুছলমান সমস্যা সম্বন্ধে অনেকগুলি আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। এই আহুত মেহমানবর্গকে ধন্যবাদ দেওয়ার সময়ে মওলানা আজাদ ছাহেব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যকার একটী কথা সম্বন্ধে বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্নভাবে আলোচনা হইতেছে। মাওলানা ছাহেব বলেন—"অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস বলিতে হইবে যে, যাহাদিগকে গোঁড়া, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আধুনিকতার ভাবধারা সম্বন্ধে অজ্ঞ ও রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী বলিয়া অভিহিত করা হয়, পরীক্ষার অগ্নিকুণ্ডে একমাত্র তাঁহারাই ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিয়াছে। পক্ষান্তরে আধুনিক শিক্ষায় তন্ময়-তদ্গত যাঁহারা, আজিকার পরীক্ষার তাঁহাদের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।"

ইংরাজী শিক্ষিত মুছলমানদিগের মধ্যে কেহই যে, আন্দোলনে যোগদান করেন নাই, এরূপ কথা বলিলে খুবই অন্যায় করা হইবে। ডাঃ আনছারী, ডাঃ মাহমুদ, ডাঃ কিচলু, ডাঃ আলম, মিঃ শেরওয়ানী, মৌঃ জফর আলি খাঁ প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সকলেই ইংরাজী শিক্ষিত। তবে কথা এই যে, আলেমগণের তুলনায় ইহাদের সংখ্যা খুবই কম। পক্ষান্তরে ইংরাজী শিক্ষিতরা যোগ দিয়াছেন ব্যক্তিগত হিসাবে, তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠানই বর্ত্তমান আন্দোলনে যোগদান করে নাই, কোন কোনটা বরং কঠোরভাবে বিরুদ্ধাচারণই করিয়াছে। আর

আলেমগণ যোগ দিয়াছেন সঙ্ঘের হিসাবে, নিজেদের সমবেত শক্তি সহকারে। আর একটী বিবেচ্য বিষয় এই যে, গণতন্ত্রের স্বরূপ ও অধিকার, দুনয়ার বিপ্লব-বিবর্ত্তনের ইতিহাস অথবা বর্ত্তমান সময়ের রাজনৈতিক ন্যায়-দর্শনের বিশেষ কোন জ্ঞান এই আলেমদিগের নাই। পক্ষান্তরে আরস্তু (Aristotle) হইতে আরম্ভ করিয়া, জন অষ্টিন, হিউম, বেনথাম, জন ষ্টুয়ার্ট মিল, নানাদেশের রাষ্ট্র বিপ্লবের ইতিবৃত্ত এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি যাঁহারা অবিরত গলাধঃ করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহারাই এ আন্দোলনে অধিক পশ্চাৎপদ। বস্তুতঃই ইহা অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস নহে কি ?

তারের সংবাদে আরও জানা যাইতেছে যে, বহু সংখ্যক মুছলমান মহিলারা জমিয়তের অধিবশনে যোগ দিয়াছিলেন, এবং মহাত্মা প্রভৃতিকে বিদায় দেওয়ার সময়ে তাঁহারা—অবগুণ্ঠন মুক্ত-অবস্থায় মিছিল করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। এই সংবাদে কোন প্রকার ত্রুটি বা অতিরঞ্জিত আছে কিনা, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা আলেম সমাজের সভা। অতএব খবরটা আংশিকভাবে সত্য হইলেও তাহার গুরুত্ব অনেক অধিক।

এক দিকের এই দৃশ্য, অন্য দিকের আর একটা দৃশ্য পাঠকগণের সম্মুখে পেশ করিতেছি। বাঙ্গালা দেশের একজন বিখ্যাত মুছলমান নেতা একবার এক তরুণ-সভায় সভাপতি হইয়া পর্দ্দা-প্রথার বিরুদ্ধে 'অনল-উদ্গীরণী' বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার ফলে Down with purdah system, down with Mullaism প্রভৃতি বলিয়া সভার চারিদিক হইতে চীৎকার হইতে লাগিল এবং সত্য সত্যই জনৈক ভদ্র মহিলা উত্তেজিত ভাবে পর্দ্দার আড়াল হইতে বহির্গত হইয়া প্রকাশ্য সভায় পুরুষদের পাশে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। সভাপতি ছাহেব তখন শতমুখে এই ভদ্র মহিলার আদর্শ সৎসাহসের প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই নেতা ছাহেব পূর্ব্বে বলিতেন—হিন্দুরা Adult suffrage বা প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত নরনারীকে বিনা শর্ত্তে ভোট দানের অধিকার দিতে স্বীকার করুক, আমরা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন চাই না। কিন্তু হিন্দুরা যখন ইহা স্বীকার করিলেন, তখন তিনিই আবার পবিত্র এছলামের সনাতন পর্দ্দা প্রথা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। তাই এখন তিনি Adult suffrage-এর কঠোর প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। আর যে তরুণবাদীরা তখন তাঁহাকে শতকণ্ঠে বাহবা দিয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার এই মতবাদের জন্য এখনও তাঁহাকে সহস্র-ভাবে মোবারকবাদ দিতেছেন।

কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত

মহাত্মা গান্ধীর সহিত লর্ড আরউইনের অথবা কংগ্রেসের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সহিত ভারত-সরকারের অস্থায়ী সন্ধি হইয়া যাওয়াতে দেশের সকল সমাজের প্রায় সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তি আনন্দিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সন্ধির শর্ত্তগুলি সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু দেশের কতিপয় রাজনৈতিক নেতা ও কর্ম্মী ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। 'কমিউনিষ্ট' দলের লোকেরা চিরকালই মহাত্মাজীর অবলম্বিত নীতি ও কার্য্যপদ্ধতির নিন্দা করিয়া থাকেন এবং যাহাতে কংগ্রেসের শক্তি ও প্রভাব খর্ব্ব হইয়া যায়, যথাসাধ্য সে চেষ্টাও তাঁহারা বরাবর করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারাও দিল্লী-সন্ধি লইয়া হৈ-চৈ, এমন কি স্থানে-স্থানে ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। কংগ্রেস-নেতারা যখন এই দুই দলের বিরোধপ্রশমিত করার চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে কর্তৃপক্ষ ভগৎ সিং প্রমুখ আসামীদিগকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিয়া শান্তি-প্রয়াসী কংগ্রেস-নেতাদিগের সফলতার পথকে ভীষণভাবে কণ্টকিত করিয়া তুলিলেন। ফলতঃ এই সমস্ত অবস্থার সমবায়ে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অতিশয় জটিল ও আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছিল। সুখের বিষয়, জাতীয় মহাসমিতির করাচী-অধিবেশনে এই আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। জগদ্বাসী আজ স্তব্ধ হইয়া দেখিয়াছে যে, যে "ন্যাংটো ওয়ালা ফকিরের" কটাক্ষ-সঙ্কেতে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী মুক্তি-সাধনার অগ্নি-পরীক্ষায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহারই একটী অঙ্গুলির ইঙ্গিতে তাহারা আবার দ্বিধাশূন্য চিত্তে যুদ্ধ স্থগিত করিতেও প্রস্তুত হইয়াছে। এইরূপে নেতার প্রতি সর্ব্বতোভাবে আনুগত্য প্রকাশ করিয়া ভারতবাসী এবার দুনয়ার সম্মুখে নিজেদের গুরুত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে, সুনিয়ন্ত্রিত সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয় জীবনের পূর্ণ পরিণতির পরিচয় দিয়াছে।

আমরা করাচীর এই সিদ্ধান্তে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। তাহার একটা বিশেষ কারণ এই যে, সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া গেলে, হিন্দু-মুছলমান সমস্যার সমাধান-চেষ্টা সুদূর পরাহত হইয়া যাইত। কারণ, কংগ্রেস ইতিপূর্ব্বে স্থির করিয়াছেন—গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া না হওয়া পর্য্যন্ত এ চেষ্টা স্থগিত থাকিবে। অথচ প্রতিপক্ষের সহিত সন্ধি হউক আর সংগ্রাম হউক, উভয় অবস্থাতেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান করিয়া লওয়া বিশেষ আবশ্যক। করাচী-কংগ্রেস দিল্লীর ছোলেনামার সমর্থন করায় এখন কংগ্রেস-নেতাদিগের, বিশেষতঃ মহাত্মা গান্ধীর সমস্ত শক্তি এই কার্য্যে ব্যয়িত হইতে পারিবে। সুখের বিষয়, সে চেষ্টা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য এই সাধু প্রচেষ্টার ফলাফল কি হইবে, তাহা বলা এখন কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না। কারণ, হিন্দু-মুছলমান নেতাদের উভয়দলে এরূপ অনেক লোক আছেন, যাঁহাদের সমস্ত বিশেষত্ব, সমস্ত গুরুত্ব এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ সাম্প্রদায়িক কোন্দল-কোলাহলের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। সাম্প্রদায়িক কলহ-বিবাদের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নেতৃ-জীবনের অবসান হওয়াও সুনিশ্চিত। ইঁহারা এযাবৎ যথাসাধ্য মিটমাটের কাজে বাধা দিয়া আসিতেছেন এবং বোধ হয় এখনও দিবেন।

কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেল মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে হিন্দু-মুছলমান সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ :—"আমি একজন হিন্দু হিসাবে এ সম্বন্ধে এক মীমাংসা করিতে পারিব। আমি একটা স্বদেশী ফাউণ্টেন্ পেন ও কাগজ মুছলমানের হাতে দিয়া বলিতে চাই—তোমার দাবী দাওয়া যাহা-কিছু থাকে, সমস্তই এই কাগজে লিখিয়া ফেল ; এবং লেখা শেষ হইলে আমি তাহার উপর 'মনজুর' বলিয়া স্বাক্ষর করিয়া দেই। এখন শুধু দরকার—হিন্দুরা একটু সাহস দেখাইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হউন।"

মিটমাটের জন্য সাহস ও উদারতা এবং ত্যাগ ও তিতিক্ষা সকল সমাজেরই দেখান উচিত। কলহ-বিবাদ যেমন কেবল এক পক্ষের দোষে স্থায়ী হয় না, সেইরূপ কেবল এক পক্ষের সদ্ভাব ও সাধুতার দ্বারা তাহার তিরোধান হওয়াও সম্ভবপর নহে। তবে হিন্দুর দায়িত্ব যে এক্ষেত্রে মুছলমানের অপেক্ষা অনেক অধিক, এবং হিন্দুর ভীরুতা অনুদারতা যে মুছলমানের ভীরুতা ও অনুদারতার তুলনায় অধিক নিন্দনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, মুছলমান সংখ্যায় হিসাবে দেশবাসীদের এক-চতুর্থাংশ মাত্র। তাহার পর, অদৃষ্ট দোষে হউক, নিজেদের কর্ম্মফলে হউক আর আমলাতন্ত্রের শাসন-যন্ত্রের কঠোর নিষ্পেষণে হউক—মুছলমান আজ শিক্ষায় ও সম্পদেও হিন্দু হইতে অনেক পশ্চাতে অবস্থিত। এ অবস্থায়, সর্ব্বদা সশঙ্ক ও সন্ত্রস্ত হইয়া থাকা তাহাদের পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নহে। কোন যুক্তি-তর্ক, জোর-জবরদস্তি বা সন্ধিপত্রের ধারা-উপধারা এই আতঙ্কের প্রতিকার করিতে পারে না। ইহার প্রতিকার একমাত্র সম্ভবপর হইতে পারে—অন্তরের সহানুভূতি ও সত্যকার সদাশয়তার দ্বারা। সংখ্যা গুরু জাতির লোকেরা কার্য্যক্ষেত্রে এই সদাশয়তার প্রমাণ দিতে পারিলে—এই আতঙ্কের ও সন্দেহের ভাব আপনা-আপনিই তিরোহিত হইয়া যাইতে পারে,—মিসরের সংখ্যা গুরু মুছলমান যেরূপ কিব্‌তীদিগকে একেবারে আপনার করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন।

এ সম্বন্ধে মুছলমানদেরও যে-সব গুরুতর দোষ-ত্রুটি আছে, তাহাও আমাদের অবিদিত নাই। আমাদের মতে তাহার মধ্যকার সব চাইতে বড় অপরাধ এই যে, গত অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে মুছলমান নেতারা স্বসমাজকে বিদেশী আমলা-তন্ত্রের উপর সম্পূর্ণ আস্থা ও নির্ভর করিতে এবং নিজের ও নিজ প্রতিবেশীদের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাহীন হইতে অবিরাম ভাবে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন। এই অন্যায় আস্থা ও অনাস্থার পরিণামের একটা প্রকাশ-রূপ হইতেছে—তাহার অনর্থক হিন্দু-ভীতি; এবং তাহারও আর একটা দিক হইতেছে—দেশের সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি বিরূপতা। এই বিরূপতার দ্বারা অনেক সময়ে মুছলমান নিজেদের প্রতি হিন্দু-সমাজের বিরাগভাবটা নিজেরাই সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। ফলতঃ নিরপরাধ কোন পক্ষই নহেন। এখন মহাত্মা গান্ধীর পুণ্যফলে উভয়-পক্ষের মিলনকামী নেতাদের এই সাধু-প্রচেষ্টা আল্লার আশীর্ব্বাদে জয়যুক্ত হউক, ইহাই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা।

মাদক ও মুছলমান—

অন্য কোন কারণে সম্প্রতি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের কয়েক বৎসরের শাসন বিবরণী লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এই সময়ে একটী বিষয় বিশেষ ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কয়েক বৎসরের রিপোর্ট আলোচনা করিয়া দেখিলাম—মোটের উপর বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি হিন্দু-প্রধান জেলাগুলিতে আবকারীর আয় ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে এবং পক্ষান্তরে বাকরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি মুছলমান প্রধান জেলাগুলিতে ঐ বিভাগের আয় ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। অর্থাৎ হিন্দু-প্রধান জেলাগুলিতে মাদক-দ্রব্যের ব্যবহার কমিতেছে এবং মুছলমান-প্রধান জেলাগুলিতে তাহার প্রচলন বাড়িয়া যাইতেছে। আবকারী বিভাগের কর্তৃপক্ষ এই হ্রাস-বৃদ্ধির যে সব কৈফিয়ত দিয়াছেন, তাহা সরকারী পরিভাষার নিতান্ত মামুলি ধরণের বাঁধাগৎ। তাঁহাদের নিকট সন্তোষজনক কৈফিয়ত পাওয়ার আশা করাও এ ক্ষেত্রে অন্যায়। তবে, রিপোর্টের কয়েকস্থানে তাঁহারা এইটুকু স্বীকার করিয়াছেন যে, পশ্চিম বঙ্গের নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে, মাদক-নিবারণের আন্দোলন খুব ব্যাপক ও স্থায়ীভাবে কাজ করিয়া চলিয়াছে, এবং ইহাতেও ঐ সব অঞ্চলে আবকারীর আয় পূর্ব্বের তুলনায় কমিয়া যাইতেছে।

আমাদের মতে ইহাই একমাত্র না হইলেও প্রধান কারণ। গত দশ বৎসর হইতে কংগ্রেসের নেতা, কর্ম্মী ও সেবকগণ বাঙ্গলার পল্লীতে-পল্লীতে উপস্থিত হইয়া মাদক দ্রব্যের অনিষ্টকারিতা জন-সাধারণকে নানাসূত্রে নানা-ভাবে বুঝাইয়া আসিতেছেন। হিন্দু পল্লীর জন-সাধারণ বিস্মিত হইয়া দেখিতেছে—যে ব্রাহ্মণের চরণ স্পর্শ করাও এতদিন তাহাদের সাধ্যাতীত ছিল, তাঁহাদের ও দেশের অন্যান্য উচ্চ বর্ণের হিন্দু যুবক ও বালকরা আজ তাহাদের পা ধরিয়া মিনতি করিতেছে, মদ, গাঁজা, আফিম প্রভৃতির ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ জানাইতেছে। আজ এই যুবক ও বালকগণ পুলিশ কর্ত্তৃক নির্ম্মমভাবে প্রহৃত হইতেছে, কারাযন্ত্রণা বরণ করিয়া লইতেছে—তাহাদেরই মঙ্গলের জন্য। এই জিনিষগুলি ধীরে ধীরে হিন্দু জন-সাধারণের মানসিকতার উপর একটা গভীর ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। অন্যদিকে মুছলমান-জনসাধারণকে ক্রমাগত ভাবে এই কথাই বোঝান হইতেছে যে, হিন্দুদের আন্দোলন মাত্রকে ব্যর্থ করিয়া দেওয়াই তাহাদের মোছলেম জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। সুতরাং আবকারী দোকানের সম্মুখে দণ্ডায়মান সেবকদিগকেও তাহারা ঘৃণা ও বিদ্বেষের চোখে দেখিতে লাগিল, তাহাদের কাজে বাধা দিবার চেষ্টা করিল। এমন কি স্বেচ্ছাসেবকদিগকে ঠেঙ্গাইয়া মারিয়া ফেলিতেও তাহারা স্থান বিশেষে পশ্চাৎপদ হইল না। শুনিয়াছি, এই সময়ে "আল্লাহো আকবর" নিনাদ করিতেও নাকি তাহারা কুণ্ঠিত হয় নাই।

পাপ মাত্রেরই প্রতিফল আছে। মুছলমানের এই পাপের প্রতিফলও তাহারা হাতে হাতে পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কারণ, হিন্দুর বিরুদ্ধাচরণ করিতে গিয়া বাস্তবে তাহারা মাদকতারই সমর্থন করিয়া চলিয়াছে। ফলে মাদক-দ্রব্যের প্রতি মোছলেম-জনসাধারণের ঘৃণা ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে এবং তাহাদের মানসিকতার উপর পরোক্ষভাবে ইহার এমনই একটা প্রভাব ধীরে ধীরে জমিয়া আসিতেছে যে, তাহার ফলে তাহাদের মধ্যে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার দিন দিন বাড়িয়া যাওয়াই স্বাভাবিক।

মিশ্র না স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন?—

'বাঙ্গলার মুছলমানদিগের জন্য ভবিষ্যতে মিশ্র ও স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের মধ্যে কোন্‌টী কি পরিমাণে উপকারী বা অপকারী হইতে পারে, এ সম্বন্ধে গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখা সকল দলের মুছলমান নেতার পক্ষে একান্ত আবশ্যক।' কিন্তু অশেষ পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এই প্রকার গভীর চিন্তা বা সূক্ষ্ম বিচারের বিশেষ কোন পরিচয় তাঁহাদের কাজ ও কথার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। একদল অন্য দলের মতের নিন্দা করিতেছেন, কিন্তু যুক্তি প্রমাণের হিসাবে তাহা খণ্ডন করার চেষ্টা পাওয়া প্রায় কেহই আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছেন না। অথচ এই আঁকুবাকু ও আত্মকলহের মধ্যে সে বিবেচনার সময়ও অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে।

আমাদের মত পাঠকগণের অবিদিত নাই। 'আমরা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন পদ্ধতিকে মুছলমানের স্বার্থেরও ঘোর পরিপন্থী বলিয়া মনে করি। অতীতের অবস্থা যাহাই থাকুক না কেন, দেশের শাসন ধারার যে পরিবর্ত্তন শীঘ্রই আরম্ভ হইয়া যাইবে, তাহাতে ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন প্রথা মুছলমানের জাতীয়-জীবনের পক্ষে চরম সর্ব্বনাশকর হইবে, ইহা আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।' প্রথমে বহু লোকের অপ্রীতিকর হইলেও, আমরা নিজেদের এই বিশ্বাসের কথা সমাজকে অবগত করিতে কখনও কুণ্ঠাবোধ করি নাই। খোদার ফজলে এখন সমাজের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি আমাদের মতের সমর্থন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন মুছলমানদের পক্ষে কেন সর্ব্বনাশকর হইবে, চিন্তাশীল পাঠকবর্গের বিচারের জন্য সে সম্বন্ধে কয়েকটা কথা অতি সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি :—

১(১) অদূর-ভবিষ্যতে ভারতবাসী দেশ শাসন সম্বন্ধে অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হইবে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রদেশগুলিকে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হইবে, ইহাও কর্ত্তৃপক্ষ স্বীকার ও প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং বাঙ্গলার প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভাকে এই প্রদেশের শাসন কার্য্য পরিচালনা করার ভার দেওয়া হইবে, ইহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

(২) এতদিন ব্যবস্থাপক-সভা মোটামুটিভাবে তিন দলে বিভক্ত ছিল—সরকারী, বেসরকারী হিন্দু ও বেসরকারী মুছলমান। মোট ১৪০ জন মেম্বরের মধ্যে ইহাদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে (মোটামুটি হিসাবে) ৩৩, ৪০ ও ৬৭। মুছলমানেরা প্রথম হইতে এই সরকারী হলকার সহায়তার উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছেন। ১৯০৯ সালের ২৭শে জানুয়ারী তারিখে মিঃ আমীর আলীর নেতৃত্বে যে ডেপুটেশন ভারত সচিবের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার প্রার্থনাপত্রে এই নির্ভরের কথা খুব স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছিল। এতদিন মুছলমান মেম্বরগণ সরকারী মেম্বরদের সঙ্গে যোগ দিয়া, নিজেদের বিশেষ কোন ইষ্ট সাধন করিতে পারুন বা না পারুন, হিন্দুদের অর্থবিত্তর ক্ষতি সকল সময়ই করিতে পারিতেন। ইদানীং মন্ত্রী বিতাড়নের গরজের সময়ে তাঁহারা দুই-পক্ষের নিকট হইতে যথেষ্ট খাতির ও খোশামোদ আদায় করিতে পারিয়াছিলেন। ফলতঃ হিন্দু মেম্বর ও সরকারী মেম্বরদের মধ্যে অনৈক্য ঘটিলে তাহাদেরই মত অনুসারে কোন একটা ইস্যুর মীমাংসা হইত। কাজেই তাঁহারা ১৪০ জনের মধ্যে ৪০ জন বা শতকরা ২৭ মাত্র থাকিলেও, সময় ও সুযোগ মতে তাঁহারাই অনেক সময় Deciding factor এর সুবিধা ভোগ করিতেন। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এ অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হওয়া সুনিশ্চিত। কারণ, সরকারী হলকা নিশ্চিহ্নভাবে উঠিয়া যাইবে।

(৩) নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের অধিকাংশ ক্ষমতাই ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত হিন্দু ও মুছলমান মেম্বররাই ব্যবহার করিবেন। স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনবাদীরা চরমভাবে প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, কোন হিন্দু মেম্বরের নিকট কস্মিনকালে কোন প্রকার ন্যায় বা সদয় ব্যবহারের আশা করা মুছলমানের পক্ষে অন্যায়। অন্যদিকে হিন্দু-ভারত স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে একমত। সুতরাং ধরিয়া লইতে হইবে যে, ব্যবস্থাপক সভার হিন্দু মেম্বরদিগকে পরাজিত করিতে না পারিলে মুছলমানের কোনও স্বার্থ রক্ষা হওয়া আদৌ সম্ভবপর হইবে না।

(৪) ব্যবস্থাপক সভার জয়পরাজয় হইবে—ভোটের দ্বারা। অর্থাৎ হিন্দু ও মুছলমানের মধ্যে যাহাদের সংখ্যা সেখানে অধিক হইবে, তাহারাই জয়ী হইবে এবং যাহাদের সংখ্যা কম, তাহারা পরাজিত হইয়া যাইবে। সুতরাং আমরা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইতেছি যে, নির্ব্বাচনের প্রথা আমাদের প্রধান লক্ষ্য এক্ষেত্রে হইতে পারে না। বরং কোন প্রথার দ্বারা কত অধিক মুছলমান বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভায় আসন লাভ করিতে পারিবে, তাহাই আমাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। নির্ব্বাচন পদ্ধতি মিশ্র হউক, আর স্বতন্ত্র হউক, তাহাতে কিছুই যাইবে আসিবে না।

(৫) এখন সর্ব্বপ্রথমে বিচার করিয়া দেখা দরকার যে, মিশ্র ও স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের মধ্যে কোনটার দ্বারা কি পরিমাণ মুছলমান মেম্বর প্রেরণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। যে পদ্ধতির দ্বারা অধিক সংখ্যক মেম্বর প্রেরণের আশা থাকে, তাহাই মুছলমানের গ্রহণীয় এবং

যেটীর দ্বারা কম মেম্বর প্রেরণের আশঙ্কা হয়, তাহা অবশ্য বর্জ্জনীয়।

(৬) গবর্ণমেণ্ট যে এখন মুছলমানদের মতামত ও দাবীদাওয়াকে পদদলিত করিতে এক বিন্দুও কুণ্ঠিত হইতেছেন না, সাইমন কমিশন ও গোল-টেবিলের তীব্রতর অভিজ্ঞতার পর আর কেহই সেকথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে হিন্দু-ভারতের সহযোগ লাভ করার জন্য সমগ্র বৃটিশ জাতি যে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, গান্ধী-আরউইনের সন্ধির পর তাহাও বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

(৭) সাইমন কমিশন দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন—বাঙ্গলার মুছলমানরা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন বহাল রাখিতে চাহিলে তাহাদিগকে হয় বর্ত্তমান অনুপাত স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, না হয় হিন্দুদের সঙ্গে মিটমাট করিয়া তাহাদের সম্মতিক্রমে সংখ্যা বাড়াইয়া লইতে হইবে। বর্ত্তমান অনুপাত হইতেছে শতকরা ২৭ জন মুছলমান। বৃটিশ পার্লামেণ্ট সম্মত হইলে, ভারত গবর্ণমেণ্টের শেষ সুপারিশ অনুসারে মুছলমানরা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের দ্বারা বড় জোর ৩৩টী আসন অধিকার করিতে পারেন। কাঁদিয়া কাটিয়া না হয় ৩৩এর স্থলে আমরা ৩৫টী আসন লাভের অধিকার পাইলাম। কিন্তু তাহা হইলেও হিন্দু আসিবে ৬৫ জন। যেখানে কেবল হিন্দু-মুছলমান মেম্বরদের ভোট গণনা দ্বারা জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হইবে, সেখানে ৩৫ জন যে কোন অবস্থায় ৬৫ জনের মোকাবেলা করিতে পারিবে না, সুতরাং মুছলমানদিগকে যে পদে-পদে পরাজিত হইতে হইবে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতেছে না। অতএব স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন যে ভবিষ্যতে মুছলমানের পক্ষে বাস্তবিকই সর্ব্বনাশকর হইবে, তাহা আমরা নিঃসন্দেহরূপে দেখিতে পাইতেছি।

(৮) পক্ষান্তরে সাধারণ নির্ব্বাচনের দ্বারা, এবং কেবল মুছলমানের ভোটে, আমরা পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের তিনটী বিভাগ হইতে, অন্ততঃ পক্ষে শতকরা ৫৩টী আসন অধিকার করিতে পারি। কলিকাতাকে বাদ দিয়া ধরিলে, মধ্যবঙ্গে হিন্দু ও মুছলমানের সংখ্যা সমান সমান। মধ্যবঙ্গের অধিকাংশ স্থলে সামান্য চেষ্টার ফলে ইউনিয়ন বোর্ডগুলিতে মুছলমানরাই সংখ্যাগুরু হইয়া আছে। সুতরাং মধ্যবঙ্গের জেলাগুলি হইতেও আমরা যথেষ্ট সংখ্যক মেম্বর খুব সহজেই পাঠাইতে পারিব। প্রকৃত অবস্থা সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, বর্দ্ধমান বিভাগ সম্বন্ধেও আমাদের সম্পূর্ণ নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নাই। ফলতঃ সাধারণ নির্ব্বাচনের দ্বারা এবং কেবল মুছলমানের ভোটে আমরা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার খুব কম করিয়া ৬০টা আসন অধিকার করিতে পারিব। নেতারা যদি Reservation এর মোহে আবিষ্ট না হইয়া পড়েন, তাহা হইলে কোন অবস্থায় কোনক্রমে মুছলমানের সংখ্যা ইহার কম হইতে পারে না। এখানে বিশেষরূপে স্মরণ রাখা দরকার যে, ভবিষ্যতে ভোট-দানের যোগ্যতা বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক কমিয়া যাইবে। সাইমন কমিশন দেখাইয়াছেন * ইউনিয়ন বোর্ডের নিয়ম অনুসারে, এক টাকা চৌকিদারী ট্যাক্সদাতাকে ব্যবস্থাপক সভার ভোটার করিয়া দিলে, কেবল এই হিসাবে মুছলমান ভোটারদিগের অনুপাত শতকরা ৪৮ হইতে শতকরা ৫৭ হইয়া দাঁড়াইবে, এবং এই প্রকারে যে ৯ লাখ ৬৮ হাজার নূতন ভোটারের সৃষ্টি হইবে, তাহার মধ্যে ৬ লাখ ৮ হাজার হইবে মুছলমান। ভোটদানের যোগ্যতা কমিয়া গেলে এই প্রকারে অন্যান্য হিসাবেও মুছলমান ভোটারদের সংখ্যা ও অনুপাত বহু পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং ভাবী ব্যবস্থাপক সভায়, কেবল মুছলমানদের ভোটে, অন্ততঃ শতকরা ৬০ জন মুছলমান যে সহজে প্রেরিত হইতে পারিবেন, ইহা আমরা সঙ্গতভাবে ও দৃঢ়তার সহিত আশা করিতে পারি।'

এখন পাঠকগণ নিজেরাই বিচার করিয়া দেখুন যে, ব্যবস্থাপক-সভা অদূর-ভবিষ্যতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিবে এবং যে ব্যবস্থাপক সভায় ক্ষুদ্রবৃহৎ সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা হইবে হিন্দু ও মুছলমান মেম্বরদের ভোট-সংখ্যার তারতম্য অনুসারে, সেখানে মেম্বর প্রেরণের জন্য কোন নির্ব্বাচন পদ্ধতি মুছলমানের পক্ষে অর্জ্জনীয়, আর কোনটী বর্জ্জনীয়।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলিয়া রাখিতেছি—আমরা

* ২—৯৩।

Reservation এর ঘোর বিরোধী। সংক্ষেপে ইহার দুইটী প্রধান কারণ নিম্নে নিবেদন করিতেছি :—

(ক) Reservation গ্রহণ করিলে মুছলমান মেম্বরদের সংখ্যা শতকরা ৫০ বা ৫১ এর অধিক কোন ক্রমেই হইতে পারিবে না। বরং ইহা অপেক্ষা কম হওয়ার আশঙ্কাই অধিক। কারণ, সংখ্যার বড়াই করিয়া একটা দেশ শাসন করার অধিকার হস্তগত করার দাবী করিব, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের অযোগ্যতা ও অপদার্থতার দোহাই দিয়া Reservation চাহিব, যুক্তির হিসাবে এই দুইটী কথার মধ্যে কোনই সামঞ্জস্য নাই।

(খ) Reservation না লইলে আমরা কেবল মুছলমান ভোটারের দ্বারা অভিপ্সিত সংখ্যা ও প্রকারের মুছলমান মেম্বর পাঠাইতে পারিব। কিন্তু Reservation লইলে মুছলমান মেম্বরদের ভাগ্য নির্দ্ধারণে হিন্দু-ভোটারদেরও যথেষ্ট হাত থাকিবে। ফলে এই শ্রেণীর মেম্বরদের পক্ষে হিন্দু-প্রভাব এড়াইয়া কাজ করা অনেক সময়ই সম্ভবপর হইবে না।'

আজকার আলোচনা সংক্ষিপ্ত, সুতরাং এখানে ক্ষান্ত হইতেছি। সময় ও আবশ্যক হইলে, আগামীতে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতে পারিবে।

———

অহিংস-নীতি—

দেশে এরূপ কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-নীতির সমর্থন করেন না। ইঁহাদের মধ্যে অনেককে আবার গান্ধীজীর ও তাঁহার নীতির যথেষ্ট নিন্দা করিতেও শোনা যায়। এই শ্রেণীর লোকেরা রক্ত-বিপ্লবের পক্ষপাতী, এবং সময় ও সুযোগ পাইলে রাজনৈতিক ডাকাতি ও খুন-খারাবি করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না। ভগৎ সিং প্রভৃতি বীরবর্গ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। পক্ষান্তরে কংগ্রেসপন্থী রাজনৈতিকগণ সকলেই অহিংস-নীতির সমর্থক। কংগ্রেসের মেম্বর হওয়ার জন্য ইহা একটা অপরিহার্য্য শর্ত্ত, সকল মেম্বরকেই ইহার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হয়। গত দশ বৎসর হইতে কংগ্রেসের সমস্ত আন্দোলন এই অহিংসার ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়া আসিতেছে।

এই দুইটী নীতির মধ্যকার কোনটী সঙ্গত আর কোনটী অসঙ্গত, সে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এই দুই মতবাদের সংঘর্ষে দেশে যে একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে দুই-একটা কথা আজ বলিতে চাহিতেছি মাত্র। বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা কংগ্রেসের মেম্বর বা নেতা স্বরূপে অহিংস-নীতির সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া আসিতেছেন, রাজনৈতিক নরহত্যার আসামীদিগের প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রকাশ করিতেও তাঁহাদের একদল কুণ্ঠিত হইতেছেন না। ইহা যে কিরূপ অহিংস-নীতি, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। অহিংসা যদি আমাদের 'নীতি' হয়, তাহা হইলে তাহার বিপরীত কাজ মাত্রের প্রতিবাদ করা, এবং যাহাতে এই শ্রেণীর খুন-খারাবী আর না ঘটিতে পারে, দেশবাসীকে সে শিক্ষা দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য হইবে। কারণ 'নীতির' লঙ্ঘন কোন অবস্থাতেই করা যাইতে পারে না। এজন্য মহাত্মাজী বলিয়া থাকেন যে—"অহিংসা আমার নীতি, এই নীতির কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা হইলে আমি ইহার জন্য দেশের স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত আছি।" ইহাকে বলে নীতি, এবং এই নীতির দৃঢ়তাই গান্ধীজীকে আজ মহাত্মা করিয়া দিয়াছে। "দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় হিংসা নীতির দ্বারা আমাদের লাভ অপেক্ষা লোকসানই অধিক হইবে"—এই প্রকার যুক্তিও আবার অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সত্য কথা এই যে, রাজনৈতিক শাঠ্যের হিসাবে এই যুক্তির মূল্য যতটা থাক বা নাই থাক, ইহা নীতি কখনই নহে। অন্ততঃপক্ষে গান্ধীজীর মতবাদের মধ্যে এই শ্রেণীর কৌটিল্যের কোন স্থান নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। উপরে যাহা বলিলাম তাহা যদি অসঙ্গত না হয়, তাহা হইলে দ্বিধাশূন্য হইয়া বলা যাইতে পারে যে, কোন প্রকারের রাজনৈতিক নরহত্যার সমর্থন করা, অথবা প্রকারান্তরে ঐ শ্রেণীর কাজে উৎসাহ প্রদান করা কংগ্রেস-পন্থী ব্যক্তিদের পক্ষে কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।

Printed and Published by Md. Khairul Anam Khan from the "Mohammadi Press,"
91, Upper Circular Road, Calcutta.

(রেজিষ্টার্ড) বধিরতার জন্য (রেজিষ্টার্ড)

এবং সর্ব্বপ্রকার কর্ণরোগের অব্যর্থ ফলপ্রদ নির্দ্দোষ আরোগ্যকারী গ্যারাণ্টিযুক্ত মহৌষধ

কেরামত তৈল

মূল্য প্রতি শিশি ১।০ টাকা, ডাকমাশুল সমেত ১৷৷০ টাকা। একত্রে তিন শিশি লইলে ডাক খরচ লাগে না।

হিমাদ্রি রসায়ন

সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা, সর্দ্দি, কাশি, হাঁপানি, ঊর্দ্ধশ্লেষ্মা প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ। মূল্য প্রতি কৌটা ২।০ টাকা।

কর্ণবিন্দু

কাণের ময়লা পুঁয প্রভৃতি পরিষ্কার করিয়া কাণপাকা আরাম করিতে সুন্দর ঔষধ; মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান :—বল্লভ এণ্ড সন্স,
পিলিভিত ইউ, পি,

Apply to :—**Ballabh & Sons.**
Pilibhit U. P. (India).

কমল ব্রাদার্স

৮৮নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা।

আমরা হাল ফ্যাসানের নানা প্রকার বুট এবং জুতা নিজ কারখানায় প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছি। অর্ডার ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সরবরাহ করা হয় এবং অভিপ্রায় মত জুতা তৈয়ারী ক'রে দেওয়া হয়। আমাদের জুতা আপনার কথনও অছপন্দ হইবে না।

"THE MONTHLY MOHAMMADI" April 1931. Regd. No. C. 1615

Printed at The "Mohammadi Press," 91, Upper Circular Road, Calcutta

বার্ষিক মূল্য সডাক তিন টাকা ছয় আনা - সম্পাদক — মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা

স্নানের আনন্দ
হিমানী সাবান
হিমানী সাবান
আধুনিক উপায়ে চর্ম্মের স্বাভাবিক
কোমলতা বজায় রাখিবার উপযোগী
করিয়া প্রস্তুত—ব্যবহারে ইহা আরামপ্রদ
গন্ধ মনোরম—গরম দিনে শ্রেষ্ঠ প্রসাধন
হিমানী সাবান
হিমানী চন্দন, চম্পক, যূথিকা
খসখস, হেনা, ল্যাভেণ্ডার
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন গন্ধযুক্ত ও
সকলের রুচি মত পাওয়া যায়
শ্রেষ্ঠ সাবান ও সুগন্ধি প্রস্তুতকারক
সোল এজেণ্টস্ঃ—
শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং
৪৩, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা
হিমানী ওয়ার্কস্
৫৯ বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা

BOURNVILLE
COCOA
PURE
SOLUBLE COCOA

সূচীপত্র—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

ঘোষ ব্রাদার্স—ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

ফোন বড়বাজার—২২৫৯ টেলিগ্রাম—"GOSEVRATA" Calcutta.

জুয়েলারিম্যান্‌সন, ১১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা।
স্বর্ণ অলঙ্কার গ্রাহকদিগের
একমাত্র বিশ্বাস্য স্থান।
আমরা স্বর্ণ অলঙ্কার প্রস্তুত ব্যবসায়ে
যুগান্তর আনয়ন করিয়াছি।
কারণ আমাদের প্রস্তুত অলঙ্কার ব্যবহারান্তে
আমাদের নিকট বিক্রয় করিলে আমরা পানমরা
বাদ না দিয়াই গিনি সোনার মূল্যে খরিদ করি।

ইহাই কি আমাদের সততার অগ্নিপরীক্ষা নয়?

আমাদের প্রস্তুত গহনা যেমন সুন্দর তেমনি খাঁটি
৵০ আনার ষ্টাম্প পাঠাইলে আমাদের ক্যাটালগ পাঠাই।

শ্রীঅমূল্যধন পালের

বেঙ্গল শটী ফুড

আজ বেঙ্গল শটী ফুডের এত নাম ও আদর কেন? বেঙ্গল শটীফুড আদি অকৃত্রিম ও সম্পূর্ণ দেশীয় উদ্ভিজ্জ উপাদানে প্রস্তুত। ইহা যেমন লঘু ও পুষ্টিকর তেমনি শিশু ও রোগীর একমাত্র খাদ্য ও পথ্য। ইহা গুণে ও উপকারিতায় বিলাতি ও দেশী সর্ব্বপ্রকার বার্লি, এরারুট ও কর্ণফ্লাওয়ার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সব কারণে বেঙ্গল শটী ফুডের আদর ও সুনাম। প্রত্যেকের নিকট ইহা ব্যবহারে সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবেন। বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে মুগ্ধ না হইয়া ব্যবহার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

বেঙ্গল শটী ফুডের জন্য সহর ও মফঃস্বলের প্রত্যেক ডাক্তারখানায়, সকল দোকানে ও নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

শ্রীঅমূল্যধন পাল

প্রসিদ্ধ বেনিত মসলা বিক্রেতা, ম্যানুফাকচারার্স অর্ডার সাপ্লায়ার ও কমিশন এজেন্ট
১১৩।১১৪নং খোঙরাপটী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীপত্র—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

সূচীপত্র—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

জুয়েলার্স **সুর ব্রাদার্স এণ্ড কোং** জুয়েলার্স

একমাত্র গিনি সোনার অলঙ্কার নির্ম্মাতা—২০২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিদ্যুৎ চুড়ি

মূল্য প্রতি জোড়া ১৫৷৷০
৩ গাছার সেট ৪৩৷৷০

স্বর্ণ-শিল্পে আমাদের তিন-পুরুষের অভিজ্ঞতার সুফল এই বিদ্যুৎ-চুড়ি। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিল্পি এবং বৈজ্ঞানিকগণের মস্তিষ্কের অপূর্ব্ব সমাবেশে এই বিদ্যুৎ-চুড়ি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমরা নবাবিষ্কৃত স্বর্ণ-বর্ণের ব্রোঞ্জ-ধাতু ডিরেক্ট ইউরোপ হইতে আমদানি করিয়া উহার উপরিভাগে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এনগ্রেভ্‌ড্ গিনি স্বর্ণের পাত সংযোজন করিয়া এই সুদৃশ্য অলঙ্কার আবিষ্কার করিয়াছি। হাতে পরিলে ইহা যে সলিড্ গিনি স্বর্ণের নয়, তাহা সুদক্ষ স্বর্ণকারগণও ধরিতে পারিবে না। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং মিতব্যয়িতার প্রতীক এই বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিতা এবং সুরুচি-সম্পন্না মা-ভগ্নিগণের ইহাই চরমোৎকর্ষ সম্পন্ন এবং সাফল্য গৌরব মণ্ডিত হস্তাভরণ।

এন্‌গ্রেভ শাঁখা

হস্তী-দন্তের শাঁখায় গিনি-সোনার এনগ্রেভড্ পাত মোড়া। মূল্য বঃ ১৫৲, মাঃ ১৩৵০, ছোঃ ১১৲, ঐ প্লেন ১০৲, ৮৷৷০, ৭৵০ ঐ তামার উপর প্লেন ৮৷৷০, ৭৷০, ৬৵০

টালি শাঁখা

হস্তী-দন্তের পলওয়ালা শাঁখায় গিনি সোনার এনগ্রেভড্ মনোরম পাত মোড়া। মূল্য ১৭৷৷০, ১৬৷৷০, ১৪৲ টাকা

লাইন মোড় রুলি

হস্তী-দন্তের রুলিতে সোনা জড়ান, বেশ ফ্যান্সি। মূল্য ১০৸০, ৯৵০, ৭৲ টাকা

সোনার মুখ তার প্যাঁচ বালা

হস্তী দন্তের বালার প্যাঁচে প্যাঁচে সোনার পাত জড়ান ও সোনার হাঙ্গর মুখ বিশিষ্ট। মূল্য ২৫৲ সরু হইলে ২২৲

তার প্যাঁচ বালা খুর আংটি মূল্য ১০৲

হস্তী দন্তের প্যাঁচ বালার প্যাঁচে প্যাঁচে সোনার তার জড়ান, সোনার বকলেস দেওয়া অতি মনোজ্ঞ। মূল্য ১৫৷৷০, ঐ রুলি ১১৲

ফ্যান্সি লেস্ পিন

মূল্যবান পাথর সেটিং উৎকৃষ্ট লেস পিন।
টেকসই ও মনোরম ডিজাইন।
মূল্য ৩৫৲ টাকা হইতে ঊর্দ্ধ।

আড়াই প্যাঁচ সাপ তাগা

এই তাগা (অনন্ত) যেমন ফ্যান্সি তেমন মজবুত। বর্ত্তমানে সুরুচি সম্পন্ন রমণীগণ এই ডিজাইনের তাগাই পছন্দ করিয়া থাকেন। মূল্য ২১০৲ হইতে ঊর্দ্ধ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আমরা নিজ কারখানায় তাগা, বালা, হার, হীরা মুক্তা সেট জড়োয়া গহনা ও অন্যান্য অলঙ্কার প্রস্তুত করি ও মজুত রাখি। বিবাহের গহনা ২৪ ঘণ্টায়ও দিয়া থাকি। পান কম দেওয়া আমাদের বিশেষত্ব। ব্যবহার অন্তে পানমরা বাদ না দিয়াই আমাদের জিনিষ গিনি সোনার বাজার দরে ক্রয় করিয়া থাকি। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃতে মাল পাঠাই। প্রত্যেক জিনিষের সঙ্গে গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি। আমাদের সুবৃহৎ নূতন ক্যাটালগের জন্য ৵০ দুই আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইয়া দিন।

বহু প্রদর্শনীতে
সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত

"স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরী"

ফোন নম্বর
৩৫৫২ বড়বাজার।

জুয়েলার্স ও হস্তী দন্তের জিনিষ এবং স্বর্ণ অলঙ্কার নির্ম্মাতা। ২১৩, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কংগ্রেস চুড়ি (টাদি প্যাটার্ণ) | ললনা সোহাগ রুলী | তার প্যাচ রুলী (সরু)

স্বর্ণবর্ণের মেটেলের ফ্রেমে গিনি স্বর্ণের এনগ্রেভ পাতে মোড়া, ঠিক নিরেট সোণার চুড়ির ন্যায়। মূল্য প্রমাণ প্রতি জোড়া ১৮৷৷০

হস্তী দন্তের লাইন মোড়া রুলীর উপর গিনি স্বর্ণের পাতে মোড়া। মূল্য প্রমাণ ১০৷৵০, ছোট ৭৷৷০।

হস্তী দন্তের সরু প্যাচকাটা রুলীর উপর গিনি স্বর্ণের সরু পাতে মোড়া। মূল্যপ্রমাণ ১২৷৷০ ছোট ৮৷৷৵০ আনা।

পাতাওয়ালা ইয়ারিং

১২৷৷০—১৫৲

কয়গেট মাকড়ী

১২৷৷০—২০৲

ঘোড়ার ক্ষুর আংটী

১৫৲—৩০৲

কাণফুল

১০৲—১৫৲

প্লেন কুমারী মাকড়ী

৬৷৷০

ইহা ব্যতীত জড়োয়া গহনা ও গিনি স্বর্ণের যাবতীয় অলঙ্কার সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। মফঃস্বলের অর্ডার ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। খাঁটী গিনি সোনার গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। সচিত্রক্যাটালগের জন্য ৵০ ষ্ট্যাম্প পাঠান। মওলানা মোহাম্মদ আলী লিখিয়াছেন, আমি "স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরীর" সুসজ্জিত দোকান দেখিয়াছি ইহাদের কাজ সুন্দর এবং কারুকার্য্য সমন্বিত। আমি এই দোকানের ক্রমোন্নতির কামনা করি। ১০ই জানুয়ারী ১৯২৫।

Extremely cheapest and Best house for :—

New, Rebuilt, Second-hand Typewriter and spare parts, Ribbon, Carbon paper, Printing & Everything in office supplies etc.

Directly imported from America No. 12 Remington & Underwood Typewriter @ Rs. 170/- only. We Guarantee the said machines, in appearance and Service, as equal as new, which is priced at Rs. 450/-

Repairs :—a speciality. Guaranteed in every way.

Pleass try. Compare & be convinced.

THE
Asiatic Typewriter Co.,

9/1, Old post Office Street, CALCUTTA.

Estd. 1903. Phone 2892 Calcutta.

৫০০৲ টাকা

পর্য্যন্ত পাওয়া যায় মাসিক ১৲ ও ২৲ টাকা চাঁদা দিয়া। ১০, ১৫, ২০ বৎসর অন্তে জীবিতাবস্থায় টাকা দেওয়া হয়।

উচ্চহারে কমিশনে সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক

এসিয়াটিক ইন্সিওরেন্স
কোম্পানি লিমিটেড,

৩নং কমার্সিয়েল বিল্ডিংস, কলিকাতা।

মাসিক মোহাম্মদী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়

১। মাসিক মোহাম্মদী প্রতি বাংলা মাসের ১লা তারিখের মধ্যেই কলিকাতায় প্রকাশিত হয় এবং সেই দিনই মফঃস্বলে গ্রাহকদিগের নামে প্রেরিত হয়।

২। প্রত্যেক মাসের ৫ই তারিখের মধ্যে সেই মাসের 'মোহাম্মদী' না পাইলে, স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন। আমাদিগকে ডাকঘরের উত্তর সহ ১০ই তারিখের মধ্যে জানাইবেন; ডাকঘরের গোলযোগে কাগজ না পাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বর্ত্তমান সময়ে আমাদের পক্ষে অসম্ভব। যাঁহারা সর্ব্বদা নিয়মিত ভাবে কাগজ পান না, তাঁহাদের পক্ষে রেজেষ্টারী খরচা বহন করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট সহ পত্র না লিখিলে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

৩। চিঠি-পত্র বা টাকা-কড়ি পাঠাইবার সময় পুরাতন গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর (কাগজের মোড়কের উপর থাকে) এবং নূতন গ্রাহকগণ "নূতন" এই দুইটি বিষয় স্পষ্ট ও নির্ভুল করিয়া লিখিবেন। অন্যথায় অভিযোগ অনুযায়ী কাজ করা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

৪। কার্ত্তিক মাস হইতে মাসিক মোহাম্মদীর বৎসর আরম্ভ হয়। যিনি যে কোন মাস গ্রাহক হউন না কেন তাঁহাকে কার্ত্তিক মাস হইতে কাগজ দেওয়া হয়।

৫। ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণকে কার্ত্তিক হইতে চৈত্র কিংবা বৈশাখ হইতে আশ্বিন এই ছয় সংখ্যা করিয়া কাগজ দেওয়া হয়।

৬। মাসিক মোহাম্মদীর বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক মূল্য যথাক্রমে ভারতে সডাক ৩।৵০ আনা ২৲ ভি, পি, ৩৸৵০ ও ২।০ আনা। বিদেশে ৬৲ টাকা।

৭। পূর্ব্বে ভি, পি, পার্শ্বেল স্থানীয় পোষ্টাফিসে পৌছিলে ১২ দিন জমা থাকিত, তাহার জন্য কোন খরচা দিতে হইত না। কিন্তু নূতন নিয়ম হইয়াছে যে, এখন বিনা খরচায় মাত্র তিন দিন জমা থাকিবে, এবং তিন দিনের উপর ঐ বার দিন পর্য্যন্ত যে কয়দিন জমা রাখিতে হইবে প্রত্যেক দিনের জন্য ৵০ করিয়া টিকিট দিয়া দরখাস্ত করিতে হইবে। সেই জন্য অনেক পার্শ্বেল গ্রাহকগণের অগোচরেই আমাদের নিকট ফেরৎ আসে। এ-কারণ গ্রাহকগণের নিকট অনুরোধ তাঁহারা টাকার যোগাড় করিয়া ভি, পি,র অর্ডার দিবেন। মণিঅর্ডারে টাকা পাঠানই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, কারণ তাহাতে ৵০ কম খরচ পড়ে এবং কোন গোলমালের আশঙ্কা থাকে না।

৮। বিনামূল্যে কাহাকেও নমুনা দেওয়া হয় না। নমুনার জন্য সাড়ে পাঁচ আনার টিকিট পাঠাইতে হয়।

১০। তিন মাসের কমে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করা হয় না। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের চিঠি পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া চাই। তাহার কম সময়ের জন্য স্থান ত্যাগ করিলে স্থানীয় পোষ্টাফিসে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করাই শ্রেয়ঃ।

এজেণ্টগণের প্রতি—

১। এজেণ্টদিগকে শতকরা ২০৲ হিসাবে কমিশন দেওয়া হয়। কাগজ পাঠনর খরচা আমরাই বহন করিয়া থাকি।

২। অবিক্রীত সংখ্যা ফেরৎ লওয়া হয় কিন্তু তাহা ফেরৎ পাঠানর খরচা এজেণ্টগণের।

৩। ২৫ খানির কমে কাহাকেও এজেণ্ট করা হয় না।

৪। এজেন্সী লইবার সময় নিম্নলিখিত হারে টাকা জমা দিতে হয়:—

২৫ খানির জন্য	৮৲	৫০ খানি পর্য্যন্ত	১৫৲
৭৫ খানি পর্য্যন্ত	২২৲	১০০ খানি পর্য্যন্ত	৩০৲
তদূর্দ্ধ প্রতি শত	৩০৲ টাকা হিসাবে।		

৫। এজেণ্টগণের বিক্রীত মূল্য ও অবিক্রীত কাগজ মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া চাই। অন্যথায় পরবর্ত্তী মাস হইতে আর কাগজ পাঠান হয় না।

লেখকগণের প্রতি

১। লেখকগণ দয়া করিয়া প্রবন্ধের নকল রাখিয়া পাঠাইবেন।

২। প্রবন্ধ সকল সম্পাদকের নিকট প্রেরিতব্য।

৩। প্রবন্ধের সঙ্গে ঠিকানা লেখা না থাকিলে বড় অসুবিধা হয়। প্রবন্ধ লেকখগণ দয়া করিয়া প্রত্যেক লেখার সঙ্গে ঠিকানা লিখিয়া দিবেন এবং অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ লইতে হইলে ডাক খরচা দিতে হইবে।

৪। কবিতার নকল রাখিয়া পাঠাইবেন, অমনোনীত কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। প্রবন্ধ-আদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার ও ফাঁক ফাঁক করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। কোন কবিতা বা প্রবন্ধ কেন ছাপা হইল না, সম্পাদক সে কৈফিয়ৎ দিতে রাজি নহেন।

অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন:—

ম্যানেজার—মাসিক মোহাম্মদী, ১১নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

Annual Contract Rate— **Buyers' Guide.** Annas Eight Per Line.

TRY ONCE
Day's Pure Darjeeling Tea.
The Himalayan Tea Syndicate.
15, Shama Charan Dey St, Cal.

Darjeeling Tea House.
25 Harrison Road, Cal.
(Mofussil orders delivered freight free)

Bengal Engineering Co.
Electrical Engineers & Contractors.
8/2, Hastings Street, Calcutta.

The House of Fashion.
We guarantee our cut and fit to suit of all Taste ; specialist in Breaches.
Md. Ibrahim & Bros,
162/1, Dharamtolla St, Calcutta.

এম, এ হাকিম ব্রাদার্স
কণ্ট্রাক্টর ও শয্যাদ্রব্য বিক্রেতা
ছোবড়া ও তুলার গদী, চাদর, পর্দ্দা, মশারী, ওয়েল ক্লথ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জিনিষ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে মফঃস্বলের অর্ডারও ভি-পিতে হয়। ১৬৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, ১-২, চাঁদনীচক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

S. C. Dass, Artist
High class Pictures and Sign painter
62, Dharamtolla Street, Calcutta.

The East Bengal Laundry
4, Wellesly Street Calcutta.
Art Dyers High Class Cleaners and Bleachers.

DULIA TYPEWRITER CO.,
Dealers in rebuilt Typewriters all makes. Repairers & Accessories.
12, Clive Street, Calcutta.

Dental-Home.
159/A, Lower Circular Rd,
(Near Entaly Market.)
Treats all Dental cases scientifically.

Spectacles of all Sorts
At a Cheap price but of dear quality Tooth binding one Rupee each to be had at J. DASS & CO. *108, Cornwallis Street, Calcutta.*

Canvas & Paulins Manufacturers.
30, Clive Street, Calcutta,

Dr. K.K. Roy, M.D. (California, U.S. A.)
Specialist in Chronic Diseases.
Hours : 1 to 2 P. M. & 7 to 8 P. M,
10/A, Madge Lane, off Lindsay St, Cal.

হাজি মোহাম্মদ জাফর তুর্কি
প্রসিদ্ধ তুর্কি ও পাহলবী টুপী বিক্রেতা
আমরা আসল ইস্তাম্বুল টুপী আমদানী করিয়া থাকি।
১৪২ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

যদি পয়সা দিয়ে ঠকতে না চান, ভারত সোপ ওয়ার্কসের সাবান ব্যবহার করুন। ভারত সোপ ওয়ার্কস B. S. W. & B. K. G. মার্কা দেখিয়া লইবেন। Chief Agent—শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র গাঙ্গুলী 13. S. B. ইটালী মার্কেট।

Popular Engraving Co.
"Brass-Door-plate Engravers"
Rubber-Stamp Manufacturers.
8/A, Lall Bazar St, Cal.

বিখ্যাত জুতা প্রস্তুতকারক
বাহিরের অর্ডারী কাজের সুবন্দোবস্ত আছে।
ঘোষ ব্রাদার্স,
৩০, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলিঃ

মোহাম্মদ আলী এলবাম
ভারতের ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, অসামান্য কর্ম্মবীর, অগ্রণী মুক্তি-সৈনিক মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আলী ছাহেবের গৌরবময় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের চিত্র।
দাম মাত্র পাঁচ আনা।

মোহাম্মদ আলীর ছবি
শতাব্দীর সূর্য্য, ভারতের মুক্তি নায়ক মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আলীর যৌবনের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত প্রতিকৃতি ফ্রেমে বাঁধাইয়া ঘরে রাখিবার উপযোগী।
প্রতি খানি এক আনা মাত্র।

ম্যানেজার—মোহাম্মদী, ৯১নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

বিশুদ্ধ ঔষধের উপরই রোগ মুক্তি ও চিকিৎসকের যশ নির্ভর করে।

যে কোন ঔষধালয়ের সহিত আমাদের ঔষধ পরীক্ষা করুন। উৎকৃষ্ট কর্ক ও ইংলিশ

কলেরা ও গৃহ চিকিৎসার ঔষধ পূর্ণ বাক্স, পুস্তক, কৌটা কেস, যন্ত্র এবং

শিশিতে প্রতি ড্রাম /৫, /১০ পয়সা বাইওকেমিক ঔষধও আমাদের নিকট পাওয়া যায়।

পরিচালক—টী, সি, চক্রবর্ত্তী, এম, এ, ২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এক শিশি ক্যাম্ফার সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ৮৪ ও ১০৪ শিশি বাক্সের মূল্য যথাক্রমে—২৲, ৩৲, ৩॥০, ৫॥০, ৬৷৵০, ৯৲ ও ১০৸৵০ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

It's the Shortest Way to success!

ছায়া-ভীতি

শিল্পী—মিঃ জনসন্ উড্

মোহাম্মদী প্রেস

চতুর্থ বর্ষ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ ৮ম সংখ্যা

দানিয়ুব

— হুমায়ুন কবির

সন্ধ্যা আকাশে মুছিল দিনের জ্বালা
শান্ত আকাশে জ্বলিছে তারার মালা।
পূর্ব্ব গগন প্রান্তে সোণার ভাতি
আশার প্রদীপ জ্বালায়ে রেখেছে রাতি।
স্বপন নিমেষ মুক্তা-মালায় গাঁথি'
রাখিল নীরবে দিবসের উপহার
স্নেহের মতন স্নিগ্ধ অন্ধকার।

দানাওর বুকে তরণী ভাসিয়া চলে
তীরে দূরে দূরে বাসগৃহে দীপ জ্বলে।
আকাশ পটের উদার প্রসার পরে
ছায়ার রেখায় গিরিমালা থরে থরে
ছবির মতন আঁকিল সন্ধ্যা করে।
তারি পানে চাহি মুগ্ধ নয়ন মেলি'
স্মৃতিতে আশায় হিয়া ওঠে উদ্বেলি'।

ক্ষুদ্র তরণী মাঝে নর-নারী দল
আলাপে জাগায় গুঞ্জন কোলাহল।
কথা থেমে যায় সহসা নিমেষ শেষে।
গভীর শান্ত নীরবতা ঘিরে এসে,
নয়ন মেলিয়া দূর দিগন্ত দেশে
দিবস রাতির সোণার মিলন পথে
সবে চেয়ে থাকি স্বপন-মুগ্ধ প্রাণে।

প্রশস্ত নদী—জলে মৃদু কল্লোল
চঞ্চল বায়ে হরষণ হিল্লোল।
পূর্ণ সুখের দিবসের অবসানে
ক্লান্ত হৃদয়ে সুখের কোমল গানে
বিষাদের ছোঁওয়া স্বপ্নের মত আনে
কত অজানার কত অনাগত স্মৃতি
কত পথে কত হৃদয়ের স্নেহপ্রীতি।

আলোক মুছিল পূর্ণ অন্ধকারে
গিরিমালা ছবি মিলালো গগন পারে।
ক্ষীণ দ্বিতীয়ার বঙ্কিম শশি-রেখা
জলের ওপারে গিরি-শিরে দিল দেখা।
আকাশের পথে পথিক চলেছে একা
তারা ফুলদলে অপরূপ মালা গাঁথি'।
সে পথের শেষে সে কি খুঁজে ফিরে সাথী?

আমার পথিক হৃদয় আমারে টানে
কত দেশে কত নতুনের সন্ধানে।
বন্ধু যেখানে মিলিয়াছে যত বারে,
স্নেহের ভিখারী আসিয়াছি যত দ্বারে,
ভিক্ষা লভিয়া আবার হারানু তারে।
আবার নতুন সঞ্চয় ফিরি খুঁজি'—
যতনে প্রয়াসে তবু থাকে না যে পুঁজি'!

অনেক পেয়েছি অনেক জনার কাছে
কেন মোর হিয়া এত করে তবু যাচে?
এ যেন আমার হৃদয়ে মরুর মত
নির্ঝর ধারা নিঃশেষ হ'ল যত।
ফুল ফুটে হায় ঝরে' পড়ে অবিরত।
নাহি পূর্ণতা নাহি কোথা অবসান
—সেই ক্ষুধা তাই হৃদয়ে জাগায় গান

কিমিয়া *

—প্রবন্ধ—

— এম্, এ, আজম, বি-এস-সি

কিমিয়া অতি প্রাচীন শাস্ত্র; কতিপয় গ্রন্থে হজরত আদম (আঃ) কে প্রথম কিমিয়াগর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, হজরৎ মুসা (আঃ) হইতেই কিমিয়া-শাস্ত্র জন্মলাভ করে। কিমিয়াগরগণের মধ্যে হারমিস ট্রিস মেগিসটস্, জাবের, রাজি, আবুসিনা, আলফারাবি, পেরাসেলসুস ও রোজার বেকন সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

হারমিস ট্রিস মেগিসটস (Hermes Tris megistos) মিশরবাসী। তাঁহাকে হজরৎ মুসা (আঃ) এর সমসাময়িক বলিয়া মনে করা হয়। কেহ কেহ তাঁহাকে 'কিমিয়া'র জনক রূপে আখ্যায়িত করেন। (মতান্তরে তাঁহার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ কাল্পনিক—অপর কেহ তাঁহার নামে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন) কথিত আছে, শেকেন্দর শাহ্ হেব্রন (Hebron) নামক স্থানের সন্নিকট গুহাভ্যন্তরে একটী কবর দর্শন করেন; উহাতে সংলগ্ন মরকত-ফলকে (Emerald table) নিম্নলিখিত ত্রয়োদশটি বাক্য ফিনিসিয়ান ভাষায় লিখিত ছিল:—

১। আমি কাল্পনিক কথা বলি না বরং যাহা সত্য এবং নিশ্চিত তাহাই প্রকাশ করি।

২। যাহা নিম্নে অবস্থান করে, তাহা উপরিস্থিতের ন্যায়, আর যাহা উর্দ্ধে অবস্থান করে, তাহাও নিম্নস্থিতের অনুরূপ; ইহাতেই এককের আশ্চর্য্য গুণ সম্পন্ন হয়।

৩। একমাত্র আল্লাহ্‌র পরিকল্পনায় একটী মাত্র পদার্থই বিভিন্নরূপে বিভিন্ন পদার্থে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

৪। উহার পিতা সূর্য্য, মাতা চন্দ্র—আর বায়ু উহাকে স্বীয় উদরে বহন করে।

৫। বিশ্ব ব্যাপিয়া উহাই একমাত্র পূর্ণত্বের কারণ।

৬। মৃত্তিকায় পরিণত হইলেই উহার শক্তির পূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়।

৭। বুদ্ধি এবং বিচার সহকারে অগ্নি হইতে মৃত্তিকাকে পৃথক কর। সমগ্র হইতে সূক্ষ্ম অংশটীকে মুক্ত কর।

৮। তীক্ষ্ণতম বুদ্ধি-কৌশলে পৃথিবী হইতে আকাশে আরোহণ কর—পুনরায় পৃথিবী পৃষ্ঠে অবতরণ করতঃ উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট বস্তু নিচয়ের শক্তি একীভূত কর; ইহাতে তোমার নিখিল-বিশ্ব-গৌরব লাভ হইবে এবং তোমা হইতে সমস্ত দুর্ব্বোধ্যতা অপসারিত হইবে।

৯। ইহা সমস্ত শক্তির শক্তি, কারণ উহা সমস্ত সূক্ষ্ম পদার্থকে অভিভূত করে এবং প্রত্যেক কঠিন দ্রব্যকে ছেদ করে।

১০। ইহাই সৃষ্টির প্রক্রিয়া।

১১। ইহা হইতেই এইভাবে দ্রব্যাদি বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

১২। এইজন্যই আমার নাম হারমিস ট্রিস মেগিসটস। সমগ্র বিশ্ব-দর্শনের তিনটী ভাগই আমার অধিকারে আছে।

১৩। সূর্য্যের ক্রিয়া সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য ছিল, তাহা শেষ করিলাম।

* এই প্রবন্ধ প্রণয়নে আমি Stanley Red Grove's "Alchemy ancient and modern" হইতে বিশেষ সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছি।

সপ্তম খৃষ্টাব্দে আরবগণ কর্ত্তৃক মিশর অধিকৃত হয়। তাঁহাদের দ্বারাই কিমিয়া-শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে কিমিয়া-শাস্ত্রের সঙ্গে জাবেরের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত হয়।

There can be no dispute that with the name Geber was propagated the memory of a personality with which the Chemical knowledge of the time was bound up—(Ernst Von Meyer : A History of Chemistry, translated by Dr. Mc. Gowan. p 31)

জাবেরের রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ন্যূনাধিক পাঁচশত। হোফার (Hoefer) বলেন যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার অভ্যুদয় হয়। তিনি মেসোপটেমিয়ার অধিবাসী—জাবের-আল-কোনুফি তাঁহার নাম। ওয়েট (Waite) এর মতে তাঁহার নাম আবু মুসা জাফর-আল- । কেহ কেহ তাঁহাকে ভারতের নৃপতি (King of India) কেহবা পারস্যের যুবরাজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে ক্রটী করেন নাই। আরবের অধিকাংশ কিমিয়াগর জাবেরকে স্বীয় গুরু (Master) বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহার হস্ত-লিখিত গ্রন্থ-সমূহের অধিকাংশই ল্যাটিন ভাষায়, কিন্তু লিডেন (Leyden) পুস্তকাগারে আরবীতে তাঁহার কয়েকখানা হস্ত-লিখিত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আবুসিনা এবং রাজি জাবেরের সমসাময়িক ছিলেন।

আরবীয় কিমিয়াগরগণের শিক্ষাদীক্ষা কালক্রমে ইউরোপে সংক্রামিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে রোজার বেকন (Roger Bacon) কিমিয়া-শাস্ত্রে অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

বেছিল ভেলেনটাইন (Basil valentine) নামক অপর একজন ইউরোপীয় কিমিয়াগরের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার Triumph-wagen des Antimonii কিমিয়া-শাস্ত্রে এক অতি মূল্যবান গ্রন্থ।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে পেরাসেলসুস (Paracelsus) কিমিয়া-শাস্ত্রকে এক অভিনব পথে চালিত করেন। তিনি Iatroy Chemistry (চিকিৎসা রসায়ন) এর উদ্ভাবন কর্ত্তা। তাঁহার মতে কিমিয়ার উদ্দেশ্য স্বর্ণ প্রস্তুত নহে—বরং ঔষধ প্রস্তুত।

জন ডী (John Dee) নামক একব্যক্তি এডওয়ার্ড কেলি (Edward Kelley) নামক এক কিমিয়াগর হইতে 'গুপ্তশাস্ত্র' রহস্য অবগত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৫৮৯ খৃঃ সম্রাট রডলফ্ (Rudalph) কেলিকে বন্দী করেন। ডী এর মতে কেলিকে সম্রাট হত্যা করিয়াছিলেন। জন ডী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, কেলি হইতেই তিনি কিমিয়া-প্রক্রিয়া শিক্ষা করেন। Edward Kelley did open the great secret to me, God be thanked—(The Private Diary of Dr. John Dee. P. 27)

লোহা বা সীসাকে 'স্পর্শমণি'র সাহায্যে স্বর্ণে পরিণত করিবার কৌশলই সাধারণতঃ 'কিমিয়া' (Alchemy) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিমিয়া একাধারে দর্শন এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞান—ধাতুর রূপান্তর পরিগ্রহণ কিমিয়া-দর্শনের সত্যতা পরীক্ষার উপায় মাত্র।

কোন কোন কিমিয়াগর মনে করিয়া থাকেন যে, কিমিয়া জড়-প্রকৃতির সঙ্গে আদৌ সংশ্লিষ্ট নহে, সুতরাং উহাকে ব্যবহারিক বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে না। ইঁহারা কিমিয়াকে সুফী-মতবাদ (Mysticism) এর একটা শাখা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিমিয়া-গ্রন্থের ভাষাকে সাধারণ শাব্দিক অর্থে না লইয়া উপমামূলক বুঝিতে হইবে—ইহাই তাঁহাদের উপদেশ। তাঁহাদের মতে নিকৃষ্ট ধাতুর উৎকৃষ্টাবস্থা প্রাপ্তি 'আত্মার মুক্তি'র প্রতি ইঙ্গিত করে—করুণাময়ের কৃপায় পুণ্যের উৎকর্ষ-সাধনে কলুষিত আত্মার সমস্ত কলঙ্ক স্খলিত হইয়া উহা আধ্যাত্মিক স্বর্ণে পরিণত হয়। এই 'মুক্তি' বা আধ্যাত্মিক রূপান্তরকে কেহ কেহ নূতন জন্ম বা 'পরম-পুরুষের সহিত চরম-মিলন' রূপে আখ্যায়িত করিয়া থাকেন। যদি এই মত সত্য হয়, তবে প্রকৃত কিমিয়াগরগণ খাঁটী সুফী-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং কিমিয়া হইতে পরবর্ত্তী রসায়ন-শাস্ত্রের জন্ম এবং উন্নতি তাঁহাদের যত্ন-চেষ্টা সম্ভূত নহে; বরং যে সমস্ত নকল কিমিয়াগর শাব্দিকভাবে কিমিয়া-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরীক্ষাগারই আধুনিক রাসায়নিক বিজ্ঞানের সূতিকাগৃহ।

আর্থার এডওয়ার্ড ওয়েট (Mr. Arthur Edward Waite) এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রকৃত

কিমিয়াগরগণের জীবনীই ইহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মূলতঃ যেভাবেই হউক না কেন অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা বিভিন্ন জড়-পদার্থ লইয়া নিভৃতে স্বীয় পরীক্ষাগারে নিকৃষ্ট ধাতুকে প্রকৃত স্বর্ণে পরিণত করিবার উপায় উদ্ভাবন মানসে অক্লান্তভাবে বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রত ছিলেন। বস্তুতঃ ইঁহারাই যে রসায়ন-শাস্ত্রের জনক—এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। There is not the slightest doubt that Chemistry owes its origin to the direct labours of the Alchemists themselves and not to any who misread their meanings—(Alchemy, ancient and modern—Red Grove)

এতৎসঙ্গে ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, কিমিয়াগরগণের কর্ম্ম এবং ভাবধারার সঙ্গে সুফীমত বাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে। যাঁহারা খাঁটী ব্যবহারিক বিজ্ঞান মনে করিয়া কিমিয়া-শাস্ত্রের সমীপস্থ হইয়াছেন, তাঁহারা এই সুফী-মতবাদ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু কয়েকটী বিষয় লক্ষ্য করিলে প্রকৃতই উহার অপরিহার্য্য সুফী-প্রভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। প্রথমতঃ কিমিয়াগরগণ তাঁহাদের এ শাস্ত্রকে দিব্য (divine) বলিয়া মনে করেন—ইহার গূঢ় রহস্য কোন পুস্তকলব্ধ জ্ঞান হইতে সম্ভূত নহে। আল্লাহ্‌র উপর দৃঢ় বিশ্বাস এবং নির্ভরতাই সফলতার প্রথম এবং প্রধান সূত্র।

In the first place let every devout and God-fearing chemist and student of this Art consider that this aracanum should be regarded not only as a truly great, but as a most holy Art (Seeing that it typifies and shadows out the highest heavenly good) Therefore, if any man desire to reach this great and unspeakable Mystery, he must remember that it is obtained *not by the might of man but by the grace of God, and that not our will or desire, but only the mercy of the most High can bestow it upon us.* For this reason you must first of all cleanse your heart, lift it up to Him alone, ask of Him the gift in true, earnest, and undoubting prayer. He alone can give and bestow it—(The Sophic Hydrolith.)

"First, there should be the invocation of God, flowing from the depth of a pure and sincere heart and a conscience which should be free from all ambition, hypocrisy and vice, as also from all cognate faults, such as arrogance, boldness, pride, luxury, wordly vanity, oppression of the poor, and similar iniquities which, should all be rooted up out of the heart—that when a man appears before the Throne of Grace, to regain the health of his body ? he may come with a consience weeded of all tares, and be changed into a pure temple of God cleansed of all that defiles—The Triumphal Chariat of Antimony (Mr. A. E. Waites translation, P. 13.)

কিমিয়াগরগণের শাস্ত্র-ভাষ্য অতি মাত্রায় রহস্যাবৃত, রূপক এবং অনেক স্থলে শাব্দিক অর্থেও সম্পূর্ণ অবোধগম্য, বস্তুতঃ কিমিয়াগরগণও নিজেদের ভাষার এই অস্বচ্ছন্দতার জন্য বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের এই অমূল্য গূঢ়তত্ত্বগুলির জন্য তাদৃশ সংযত ভাষাই নিরাপদ এবং সর্ব্বতোভাবে সমীচীন।

ইহাতে কিমিয়াগরগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে একটী নূতন অনর্থেরও সূত্রপাত হইল। অনেক নকল কিমিয়াগর তাহাদের ইচ্ছামত উচ্ছৃঙ্খল ভাষায় শাস্ত্র প্রণয়ন করিতে লাগিল, কারণ, তাহারা মনে করিত যে, কতগুলি উদ্ভট রূপক বর্ণনাই কিমিয়া-ভাষার প্রকৃতি এবং প্রমাণ। প্রকৃত কিমিয়াগরগণের ভাষা যদিও সমপরিমাণে উদ্ভট পরিকল্পনার বাহন, তত্রাচ উহা যে, তাঁহাদের নিকট একান্তই খাঁটী এবং প্রয়োজনীয় একথা বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয় ; কারণ, প্রকাশ করিবার লোভে প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা কিমিয়া-প্রক্রিয়া-পুস্তিকার সংরক্ষণ করিতেন না, বরং স্বীয় স্মরণশক্তির সহায়তার জন্যই সযত্নে লিপিবদ্ধ করিতেন।

কিমিয়াগরগণের এই 'রূপক' মোহ তাঁহাদের লিখিত পুস্তক সমূহে সযত্ন-অঙ্কিত বহুবিধ চিত্রের মধ্য দিয়াও একান্ত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি হয়। তাঁহাদের পরীক্ষাগারে বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির চিত্র ব্যতীত এমন কতকগুলি চিত্রও আছে, যাহার অভ্যন্তরে এক-একটা গূঢ় তথ্য নিহিত।

কিমিয়াগরগণ ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানকে একান্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিশিষ্ট মনে করিতেন। সৃষ্টিতত্ত্ব-বিষয়ক কতগুলি দার্শনিক তত্ত্ব বস্তু-জগতে জড় পদার্থের সাহায্যে সপ্রমাণ করিবার প্রয়াসেই কিমিয়া-শাস্ত্রের উৎপত্তি। পরন্তু 'সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক দার্শনিক তত্ত্ব' সুফীত্ববাদ বই আর কিছুই নহে; সুতরাং কিমিয়া-শাস্ত্র একাধারে যেমন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান, তদ্রূপ বস্তু বা জড় বিজ্ঞানও বটে। পেটিসন মূর (Mr. M. M. Pattison Muir) বলেন,—"জড় এবং জীব-প্রকৃতি সম্বন্ধে একটী বিশেষ তত্ত্ব সপ্রমাণ করাই 'কিমিয়া'র উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহাদের এ প্রচেষ্টা তিনটী বিভিন্নরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে—(১) তাঁহারা পরশমণির সন্ধানে তৎপর ছিলেন, কারণ, তাহাতে অত্যধিক ধনাগম হইবে; (২) তাঁহারা যাবতীয় রোগের একটীমাত্র মহৌষধ আবিষ্কারে নিয়োজিত ছিলেন, কারণ, তাহা হইলেই ধন এবং জীবন সম্ভোগ সম্ভব; (৩) তাঁহারা নিখিল বিশ্বের 'আত্মার' উদ্ধার সাধন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, কারণ, তাহাতেই পারত্রিক অস্তিত্বের সহিত সংযোগ সাধিত হইবে এবং আধ্যাত্মিক জীবনের ফলভোগ করিতে সক্ষম করিবে। ফলতঃ এ অনুসন্ধানের মূলে তাঁহাদের দৈহিক, নৈতিক এবং অধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি প্রচেষ্টা বিরাজমান। উন্নতমনা কিমিয়াগরগণ শেষ দুইটীকেই মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করিতেন।"—The story of Alchemy.

"যাহা নিম্নে অবস্থান করে, তাহা উপরিস্থিতের ন্যায়; আর যাহা উর্দ্ধে অবস্থান করে, তাহাও নিম্নস্থিতের অনুরূপ। (What is above is as that which is below, and what is below is as that which is above) প্রত্যেক কিমিয়াগরের এই প্রিয় স্বতঃসিদ্ধটী (axiom) কিমিয়ার মূলসূত্র। সেনডিভগিয়াস (Sendivogins) বলেন,—"বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টি-বিকাশ এবং ধ্বংসের মধ্যে কিমিয়াগরগণ একটা গভীর সামঞ্জস্য ও একত্বের ছাপ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, এই জড়-জগত আধ্যাত্মিক জগতের বাস্তব প্রতিকৃতি। প্রকৃতিতে তাঁহারা স্বর্গের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইয়াছিলেন। স্বর্ণ বা রৌপ্যের লালসায় তাঁহারা কিমিয়া-শাস্ত্র অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন নাই, বরং জ্ঞানার্জ্জনের জন্যই জীবনপণ করিয়াছিলেন এবং সেই পবিত্র জ্ঞান দুষ্কৃতদের পাপ-কলুষ-কটাক্ষ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন।"—The New Chemical light.

কিমিয়াগরগণ মনে করিয়া থাকেন যে, সমস্ত ধাতুই মূলতঃ এক—প্রকৃতির গর্ভে একই উপাদানে গঠিত; কিন্তু বিভিন্ন ধাতু ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে ছিল বলিয়া সমপরিমাণে পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে নাই। কেবলমাত্র স্বর্ণই পূর্ণ ধাতু—প্রকৃতির অমর অবদান। স্বর্ণের মধ্যে আবার কিমিয়াগরগণ নূতন জন্ম-প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক বিজয়, দীপ্তিমান জীতেন্দ্রিয় মানুষের স্বরূপ লক্ষ্য করিয়াছেন, আর সীসা—সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ধাতু, তাঁহাদের মতে পাপাত্মা নর কুলাঙ্গারেরই পূর্ণ প্রতীক। একোয়া রেজিয়া (Aqua regia) ব্যতীত প্রায় অপর সমস্ত দ্রাবক এবং অগ্নির উপদ্রব ব্যর্থ করিয়া স্বর্ণ যেরূপ স্বীয় গরিমা অক্ষুন্ন রাখিতে পারে, সীসা সেরূপ সক্ষম নহে। তদ্রূপ লোভ মোহে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সাত্বিক মানুষ দেবত্ব-মহিমায় পরম পরিতোষ লাভ করেন। আর পাপী?—ইন্দ্রিয়ের দাস,—প্রতি মুহূর্ত্তেই পদস্খলিত—সামান্য প্রলোভনেই বিচলিত হইয়া উঠে।

কিমিয়াগরগণ আরও বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের এই শাস্ত্র সাহায্যে যে কেবল বিশ্ব-প্রকৃতির স্বরূপ অবগত হওয়া যায় তাহা নহে, সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টারও সত্য স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। নূতন জীবন প্রাপ্ত হইতে হইলে পৃথিবীর শোক-দুঃখ তাপ সহ্য করিয়া কেন মানুষকে মরিতে হয়, এই শাস্ত্রে নাকি তাহার যথাযথ উত্তর পাওয়া যাইবে।

খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী কিমিয়াগরগণের অনেকেই পরশ-মণিকে 'যীশুর আত্মা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং কিমিয়া-শাস্ত্র খৃষ্ট-ধর্ম্মের মূলনীতিগুলিকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে বলিয়া দাবী করেন। I am firmly persuaded that any unbeliever who got truely to know this Art, would straightway Confess the truth of our Blessed Religion and believe in the Trinity of our Lord jesus Christ—Peter Bonus, The New Pearl of great price. (Mr. A. E. Waites Translation P. 275)

মানুষের ন্যায় ধাতু-নিচয়কেও কিমিয়াগরগণ শরীর, মন এবং আত্মা (Body, Soul and Spirit) সম্পন্ন বলিয়া

বিশ্বাস করিতেন। আলোক-পন্থী (Mystical) দার্শনিকগণ মনে করিয়া থাকেন যে, মানুষের শরীর তাহার বাহিক আকৃতি, 'আত্মা' তাহার ব্যক্তিগত প্রকৃতি (individual Spirit) আর Spirit বা শক্তি সেই পরম শক্তির (universal Spirit) অংশ—যাহা প্রত্যেকের মধ্যেই নিহিত আছে। তদ্রূপ কিমিয়াগরদের মতে ধাতুর শরীর উহার আকৃতি, 'আত্মা' উহার বিশিষ্ট গুণাবলীর সমষ্টি এবং শক্তি, (Spirit) যাহা প্রত্যেক ধাতুর প্রাথমিক মূল উপাদান।

কিমিয়ার ব্যবহারিক (experimental) দিক্ দিয়া যদিও সীসা বা অপর কোন নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিবর্তিত করা চরম এবং পরম রহস্য, তথাচ এক ধাতু বা এক বস্তুকে স্বর্ণ বা রৌপ্য ভিন্ন অপর বস্তুতে রূপান্তরিত করা অতি সাধারণ ঘটনা বলিয়াই তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন।

একটী পাত্রে পুষ্করিণী বা নদীর-জল ফুটাইলে বাষ্পাকারে সমস্ত জল অদৃশ্যভাবে নিঃশেষ হইয়া যায় এবং পাত্রে ধূলা বালি ইত্যাদির তলানি পড়িয়া থাকে। ইহাতে কিমিয়াগরগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, জল ফুটাইলে উহা মৃত্তিকায় পরিবর্তিত হয়। জলের মধ্যে তুঁতে (Copper Sulphate) গুলিয়া যদি তাহাতে এক খণ্ড পরিষ্কার লৌহ ডুবাইয়া রাখা যায়, তবে কিছুক্ষণ পরে উহা অতি পাতলা তাম্র-পাতে আবৃত হয়, ইহাতে তাঁহারা মনে করিলেন যে, লৌহ তাম্রে রূপান্তরিত হইল।

ঈদৃশ অনেক বিষয় লক্ষ্য করিয়া কিমিয়াগরগণ নিকৃষ্ট ধাতু হইতে স্বর্ণ প্রাপ্তির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখিতেছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেক ধাতুকেই যৌগিক (Compound) বলিয়া মনে করিতেন, কারণ, তাহা না হইলে তাঁহাদের রূপান্তর মতবাদ ভিত্তি শূন্য হইয়া পড়ে। জাবেরের মতে প্রত্যেক ধাতু 'গন্ধক' এবং 'পারদ' (Sulphur and Mercury) এই দুইটী মৌলিক উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত। গন্ধকের অনুপাত-আধিক্য ধাতুর নিকৃষ্টাবস্থার কারণ, আর 'পারদই' ধাতুকে পূর্ণত্ব প্রদান করে। স্বর্ণের চাক্‌চিক্য এই পারদ সম্ভূত। স্পর্শমণি পাইতে হইলে প্রথমতঃ এই পারদ অত্যন্ত বিশুদ্ধাবস্থায় নিষ্কাশিত করিতে হইবে। সাধারণ পারদ (quick silver) হইতে পরিশোধন প্রণালীতে দূষিত গন্ধকের অংশ দূরীভূত করিয়া স্পর্শ-পারদ (Philosophical Murcury) প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পরবর্ত্তী যুগের কিমিয়াগরগণ এই পারদ-গন্ধক মতবাদ একটু পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করেন। তাঁহারা পারদ আর গন্ধকের সঙ্গে লবণ (Salt) নামক আর একটী মৌলিক উপাদানের অবতারণা করিয়াছেন। ধাতুর কঠিনত্ব এবং অগ্নিতাপ সহনশীলতা উক্ত লবণাংশের নিমিত্তই হইয়া থাকে। তাঁহাদের মতে তাম্রের মধ্যে গন্ধকের আধিক্য এবং লৌহে লবণাধিক্য আছে। পেরাসেলসুস বিশেষভাবে এই মতের পোষকতা করিয়াছেন।

কিমিয়াগরগণ তাঁহাদের এই মতবাদের সঙ্গে আরিষ্টলের (Aristotle) মতের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আরিষ্টলের মৌলিক-বিভাগ (তাঁহাদের মতে) অপেক্ষাকৃত প্রাথমিক (Primary) সেনডিভগিয়াস বলেন,—"কিমিয়াগরগণের তিনটী উপাদান (গন্ধক, পারদ এবং লবণ) আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় প্রকৃতির সাহায্যে আরিষ্টলের নির্দ্দেশিত অগ্নি, বায়ু, জল এবং মৃত্তিকার পরস্পর সংমিশ্রণে উৎপত্তি লাভ করে। অগ্নির সহিত বায়ুর, বায়ুর সহিত জলের এবং জলের সহিত মৃত্তিকার বিশিষ্ট রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যথাক্রমে গন্ধক, পারদ এবং লবণ গঠিত হয়। পালাক্রমে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার জন্য মৃত্তিকার ভাগে আর কিছুই রহিল না; সুতরাং উহা অপর তিনটী উপাদানের সংরক্ষক, পরিপোষক এবং পরিবর্দ্ধক নিয়োজিত হইল।—The New Chemical Light. Part II.

কিমিয়াগরগণ মৃত্তিকাকে সজীব এবং সঞ্জীবনী-শক্তি-সম্পন্ন মনে করিতেন। এই সঞ্জীবনী-শক্তি হইতেই উদ্ভিদগণ 'প্রাণ' পায় এবং ধাতুসমূহ গড়িয়া উঠে। তাঁহাদের মতে আবার এক-একটী ধাতুর ক্রমবিকাশ এক-একটী জ্যোতিষ্কের প্রভাবে সাধিত হইয়া থাকে। স্বর্ণ সূর্য্যের প্রভাবে, রৌপ্য চন্দ্রের প্রভাবে, পারদ বুধের প্রভাবে, তাম্র শুক্রের প্রভাবে, লৌহ মঙ্গলের প্রভাবে, রাঙ্গ বৃহস্পতির এবং সীসা শনির প্রভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। কোন কোন কিমিয়াগর এতৎসঙ্গে ইহাও মনে করিতেন যে, কিমিয়া-প্রক্রিয়া পরিচালনে সিদ্ধহস্ত হইতে হইলে উক্ত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ অত্যাবশ্যক।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, কিমিয়াগরগণ স্বর্ণকে পূর্ণ (perfect) ধাতু মনে করিতেন। তন্নিমিত্তই

রৌপ্যের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তের কারণ অনুসন্ধান করিতে অধিক দূর যাইতে হয় না। অগ্নি, গন্ধক এবং বিভিন্ন দ্রাবকের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া স্বর্ণ স্বীয় ঔজ্জ্বল্য অক্ষুন্ন রাখিতে পারে—আর রৌপ্যের মধ্যেও সে শক্তির বহুলাংশ বিদ্যমান আছে। তাঁহাদের মতে প্রকৃতি অন্যান্য ধাতুর রূপ ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া একমাত্র স্বর্ণ নির্ম্মাণেই ব্যাপৃত আছে। অন্যান্য ধাতু স্বর্ণের অপরিণত অবস্থা—কোন বিশেষ কারণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া উহারা তদবস্থ হইয়া আছে;—হয়ত বা সহস্র সহস্র বৎসর পর প্রকৃতির কোলে স্বর্ণকান্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। All metallic seed is the seed of gold; for gold is the intention of Nature in regard to all metals. If the base metals are not gold, it is only through some accidental hindrance; they are all patentially gold—Eirenaeus Philalethes: The Metamorphosis of Metals.

এই ক্রমবিকাশের ধারাকে কিমিয়াগরগণ আরও ব্যাপকভাবে দেখিয়াছেন। উদ্ভিদ এবং জীবজগতেও তাঁহারা এ ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি পূর্ণত্ব প্রয়াসী—ক্রমে উহা চরম উৎকর্ষতার পথে অগ্রসর হইতেছে। Nature seeks and demands a gradual attainment of perfection, and gradual approximation to the highest purity and excellence—The Golden Tract Concerning The Stone of The Philosophers.

স্বর্ণ প্রস্তুত ব্যাপারে কিমিয়াগরগণ মূলতঃ প্রকৃতিকেই সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রায়ই বলিতেন যে, "প্রকৃতিকে অনুসরণ কর, তাহা হইলে পথভ্রষ্ট হইবে না। ঐ পথ সারল্য এবং সাদৃশ্য বই আর কিছু নহে"—The story of Alchemy by M. M. Pattison Muir, M. A.

কিমিয়াগরগণকে কোন পথ অনুসরণ করিতে হইবে, এই প্রশ্নের উত্তরে পেরাসেলসুস বলেন,—"কেবল মাত্র সেই পথ যাহা বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারে আল্লাহ অনুসরণ করিয়াছিলেন।—A Catechism of Alchemy.

নিকৃষ্ট ধাতু যে-সমস্ত বিশেষ বাধা প্রাপ্ত হইয়া স্বর্ণ হইতে পারে নাই, সে সমস্ত বাধা-বিঘ্নের নিরাকরণ করিতে কিংবা প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে উহাদের স্বর্ণে পরিণত হইতে যে সহস্রাধিক বৎসরের প্রয়োজন, তাহা মুহূর্ত্তে সম্পাদন করিবার জন্য কিমিয়াগরগণ স্পর্শমণির উদ্ভাবন করেন। জাবের বলেন যে, ঔষধ (medicines) প্রয়োগে নিকৃষ্ট ধাতুকে উৎকৃষ্টাবস্থায় পরিণত করা যায়। এই ঔষধ ত্রিবিধ। প্রথম ঔষধে একটী অস্থায়ী পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়—দ্বিতীয় ঔষধে যদিও স্থায়ী পরিবর্ত্তন আনয়ন করে, তথাপি উহা আংশিক (imperfect) একমাত্র তৃতীয় ঔষধই স্থায়ী এবং পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধনে সক্ষম, ইহাই স্পর্শমণি। A Medicine of the third order, I call every Preparation, which, when it comes to Bodies, with its projection, takes away all Corruption, and perfects them with the Difference of all complement, but this is one only—Of the sum of perfection (The works of Geber, translated by Richard Russel)

কেহ কেহ আবার দুই প্রকারের স্পর্শমণির উল্লেখ করিয়াছেন। এক জাতীয় মণি শুভ্র—ইহাতে নিকৃষ্ট ধাতু রৌপ্যে পরিণত হয়—অপর জাতীয় মণি লোহিত (কাহারো মতে হরিদ্রাভ) যাহা স্বর্ণ প্রস্তুত কার্য্যে প্রয়োগ করা হয়।

যে সমস্ত কিমিয়াগর স্পর্শমণি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা উহা প্রস্তুত প্রণালী অত্যন্ত গোপন রাখিয়াছেন—কিংবা এমন ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার অধিকাংশ শব্দই নিরর্থক কিংবা অবোধগম্য। তাই বলিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে কেহই যে উক্ত জ্ঞান লাভ করেন নাই তাহা নহে; তবে উহা শিক্ষাদান ব্যাপারে তাঁহারা যৎপরোনাস্তি সতর্কতা অবলম্বন করিতেন।

পেরাসেলসুস তাঁহার Tincture of Philosopher গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, স্পর্শমণি পাইতে হইলে আমাদিগকে শুধু সিংহের গোলাব বর্ণ রক্ত (Rose coloured blood from the Lion) এবং ঈগল পক্ষীর আঠা (Gluten) মিশ্রিত করিয়া ঘনীভূত করিতে হইবে (mix and coagulate) হয়ত বা তিনি ইহা দ্বারা স্পর্শ গন্ধক (Philosophical sulphur এবং স্পর্শ পারদ

(Philosophical mercury) এর প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

বিখ্যাত আবুসিনা বলেন,—"শত শত লোক এই স্পর্শমণির অনুসন্ধানে রত। কিন্তু মাত্র দুই-এক জনের ভাগ্যে উহার দর্শন লাভ ঘটিয়া থাকে। যদিও উহা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা একান্ত সুদূর-পরাহত বলিয়া মনে হয়—বস্তুতঃ উহা অতি সন্নিকটেই রহিয়াছে। কারণ, উহা সকল সময়ে, সকল স্থানে, সকল পদার্থেই বিদ্যমান। ইহাতে সমস্ত জীবের শক্তি নিহিত, সর্ব্বভূতে ইহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ এবং বস্তু-সমূহের যাবতীয় গুণ চরম উৎকৃষ্টাবস্থায় ইহাতে প্রচ্ছন্ন আছে। অন্য কোন প্রকার ঔষধের সাহায্য ব্যতিরেকে ইহা সমস্ত মৃত (?) ও জীবিতের আরোগ্য সাধন করে। প্রত্যেক ধাতব পদার্থকে উহা স্বর্ণে পরিণত করে। পৃথিবীতে ইহার সঙ্গে কোন বস্তুই তুলিত হইতে পারে না। ইহাই পৃথিবীর 'আত্মা'। (Soul) Benedictus Figulus: A Golden and Blessed Casket of Natures Marvels. (Translated by A. E. Waite)

সুফী-সম্প্রদায়ের মতে আত্মার শক্তিতে বলীয়ান হইয়া আধ্যাত্মিকতার উচ্চতম শিখরে উন্নীত হইতে হইলে মানুষকে যেরূপ স্বীয় সত্বার বিলোপ সাধন করিয়া আপনাকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র মধ্যে লয় করিতে হয়—আবুসিনার মতে এই স্পর্শমণি পাইতে হইলেও প্রথমতঃ বস্তুর বাহ্যিক স্বরূপ সম্পূর্ণ ধ্বংস করিতে হইবে।—The Secret of Alchemy is the destruction of the body, which enables the Artist to get at, and utilize for his purposes, the living soul—T. F. Helveties: The Golden Calf.

কিমিয়াগরগণ মনে করিতেন যে, তিলমাত্র স্পর্শমণির সাহায্যে এক স্তূপ নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা যায়। তাঁহারা এ বিষয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সমস্ত যুক্তি-তর্ক প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বহুলাংশে হাস্যাস্পদ, কিন্তু এবংবিধ প্রক্রিয়ার (রাসায়নিক পরিভাষায় যাহাকে Catalytic reaction বলে) যে অভাব নাই, তাহা প্রত্যেক আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রবিৎ স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

কিমিয়াগরগণের মতে স্পর্শমণি সুরায় গুলিয়া পান করিলে (Elixir of life) বৃদ্ধও যুবকত্ব প্রাপ্ত হয়। কাহারও মতে তাহাতে চিরস্থায়ী যৌবন লাভ করিয়া অমরত্ব সম্ভোগ হইতে পারে; পেরাসেলসুস্ শেষোক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে,—নশ্বর শরীরকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষার কোন কৌশল নাই, কিন্তু একটা উপায় আছে, যাহা দ্বারা মৃত্যুকে সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখিয়া নব-যৌবন ও দীর্ঘায়ু লাভ করা যাইতে পারে। There is nothing which might deliver the mortal body from death; but there is One thing which may postpone decay, renew youth, and prolong short human lives—The Book of the Revelation of Hermes, interpreted by Theo phrastus paracelsus, concerning the Supreme Secret of the World.

আধুনিক রাসায়নিকদিগের ন্যায় কিমিয়াগরগণ অতি সামান্য পরিমাণ পদার্থ লইয়া পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতেন না। তাঁহারা অত্যধিক পরিমাণ দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিতেন। যত অধিক সময় একটী দ্রব্যে উত্তাপ প্রদান করা যায়, ততই উহা ক্রমে বিভিন্ন পরিবর্ত্তনের পর্য্যায়ে আসিয়া অবশেষে চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কিমিয়াগরগণ দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া কাটাইতেন। তাঁহাদের মধ্যে একটী প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, বিবাহিত লোক কিমিয়া-কার্য্যের অযোগ্য; কারণ, তাহারা সহজেই অন্যমনস্ক এবং ক্লান্ত হইয়া পড়ে—Never engage married men; for they soon give in and pretend they are tired out—Norton.

বর্ণ পরিবর্ত্তন দ্রব্যের রূপান্তর গ্রহণের প্রথম এবং প্রধান সাক্ষ্য বলিয়া কিমিয়াগরগণ মনে করিতেন। স্পর্শমণি প্রস্তুত ব্যাপারেও তাঁহারা এ বর্ণ-ক্রমের উল্লেখ করিয়াছেন।

গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের অভ্যুদয়ে পরিবর্ত্তনের প্রথম স্তর সূচিত হয়। এই পরিবর্ত্তিত অবস্থা-বিশিষ্ট দ্রব্যকে তাঁহারা কাক মস্তক (crow's head) বলিয়া অভিহিত করেন। অধিকতর উত্তাপ সংস্পর্শে কৃষ্ণবর্ণ বিলীন হইয়া শুভ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। এ শুভ্র পদার্থ তাঁহাদের পরিভাষায় পুণ্যমণি (Blessed stone) নামে পরিচিত—তৎপর ক্রমে উহা লোহিত বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া স্পর্শমণিতে পরিণত হয়।—Colleotanea Hermetica, edited by W. Wynn west cott, vol 1893, P. 28 and 29.

কিন্তু প্রকৃতই কি কিমিয়াগরগণ স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে

পারিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে 'না' বলা যাইতে পারে না, কারণ আধুনিক রাসায়নিক বিজ্ঞান আমাদিগকে পরিষ্কার বলিয়া দিতেছে যে, সীসা কিংবা বিছমাৎ (Bismuth) কে স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করা সম্ভব। যে প্রক্রিয়ায় এই পরিবর্ত্তন সম্ভব, কিমিয়াগরগণ কর্ত্তৃক তাহা সম্পাদিত হয় নাই, ইহা জোর করিয়া কেহই বলিতে পারেন না। অবশ্য তাঁহাদের মধ্যে অনেক প্রতারকও স্থান করিয়া নিয়াছিল, তাই বলিয়া স্বর্ণ প্রস্তুত প্রচেষ্টায় খাঁটী কিমিয়াগরগণের অক্লান্ত পরিশ্রম যে একেবারে নিরর্থক হইয়াছে, ইহা বলিবার কাহারও সাধ্য নাই। আমরা সে রহস্য অবগত নাই বলিয়াই যে তাহার অস্তিত্ব ছিল না—এ যুক্তি তিষ্টিতে পারে না। We must not assume that, because we know not the method now, real transmutation have never taken place—Alchemy ancient and modern by Red Grove.

এতৎ সঙ্গে ইহাও মানিয়া লইতে হইবে যে, আধুনিক রেডিয়াম রশ্মীতে (Radium emanations) রূপান্তর প্রক্রিয়া (Transmutation) তৎকালীন কিমিয়াগরদের জ্ঞাত ছিল না, আর তাহা তাঁহাদের দ্বারা দৈবাৎ অনুষ্ঠিত হইবারও সম্ভাবনা ছিল না, আর দৈবাৎ হইলেও তাহাতে উৎপন্ন স্বর্ণের পরিমাণ এতই নগণ্য হইত যে, উহার অস্তিত্ব প্রমাণ করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত ছিল।

কিন্তু তাই বলিয়া প্রকৃত কিমিয়াগরদের স্বর্ণ-প্রস্তুত ব্যাপার হেলমণ্ট (Helmont) এবং হেলভিটিয়াস (Helvetius) প্রমুখ স্বনামখ্যাত ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য অবহেলা করিয়া অস্বীকার করা যায় না।

হেলমণ্ট স্পর্শমণি সাহায্যে নিজে অনেকবার স্বর্ণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তবে স্পর্শমণির উপকরণ সম্বন্ধে নিজে কিছুই জানিতেন না। তিনি বলিয়াছেন,—"আমি বহুবার এ স্পর্শমণি দেখিয়াছি এবং নিজ হাতে উহা ব্যবহার করিয়াছি। উহার বর্ণ জাফরাণের ন্যায়—উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব অত্যধিক। উহা কাচ চূর্ণের ন্যায় চাকচিক্যময়। একবার আমাকে এক গ্রেনের এক চতুর্থাংশ দেওয়া হয়—আমার হিসাবে এক গ্রেন কিন্তু এক আউন্সের ৬০০ ভাগের একভাগ—এই স্পর্শমণিটুকু আমি কাগজে পুরিয়া উত্তপ্ত পারদের উপর নিক্ষেপ করিতেই সমস্ত পারদ সশব্দে জমাট বাঁধিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্ণে পরিণত হইল। একভাগ স্পর্শমণি চূর্ণে ১৯১৫৬ ভাগ পারদ খাঁটী স্বর্ণে পরিণত হইল।—J. B. Van Helmont: Life Eternel (See Oriatrike, translated by J. C. 1662.

(John Frederick Helvetius) হেলভেটিয়াস ১৬৬৭ খৃঃ নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশ করেন—"১৬৬৬ খৃঃ ২৭শে ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্নে আমার গৃহে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আকার প্রকার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, সাধুত্ব এবং দৃঢ়তাব্যঞ্জক। তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদে কোন প্রকার জাঁকজমক ছিল না। আমাদের পরস্পরের মধ্যে অভিবাদনের আদান-প্রদান হইলে, তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন।......কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এমন কোন ঔষধের অস্তিত্বের উপর আমি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি কিনা, যাহাদ্বারা মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করা যাইতে পারে। আমি উত্তর করিলাম যে, একজন চিকিৎসকের পক্ষে উহা সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের সামগ্রী। (হেলভেটিয়াস নিজেও চিকিৎসক ছিলেন) প্রকৃতির কোলে কত রহস্য যে আত্মগোপন করিয়া আছে, কেহই তাহার সংখ্যা করিতে পারে না। তবে যদিও আমি উক্ত ঔষধের সত্যতা সম্বন্ধে অনেক পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একজন খাঁটী কিমিয়াগরের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই। আরো কিয়ৎকাল বাক্যালাপের পর ইলিয়স আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যেহেতু আপনি কিমিয়া গ্রন্থে স্পর্শমণির প্রকৃতি, বর্ণ এবং গুণ সম্বন্ধে এতই অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু আপনি নিজে উহা প্রস্তুত করিয়াছেন কিনা? আমি তাঁহাকে জানাইলাম যে, নিজে কোন দিন উহা প্রস্তুত বা ব্যবহার করি নাই। অনন্তর তিনি তাঁহার ব্যাগ হইতে একটী হস্তীদন্ত নির্ম্মিত কারুকার্য্যময় ক্ষুদ্র বাক্স বাহির করিয়া উহার মধ্যস্থিত কাচের ন্যায় স্বচ্ছ এবং গন্ধকের ন্যায় ঈষৎ হরিদ্রাভ তিন খণ্ড দ্রব্যের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—"এই স্পর্শমণির সাহায্যে ২০ হন্দর (প্রায় ২৮ মণ) স্বর্ণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। আমি প্রায় ১৫ মিনিট কাল উহা নিজ হাতে লইয়া দেখিলাম—তৎপর একান্ত অনিচ্ছা স্বত্বে মালিকের হাতে প্রত্যার্পণ করিতে বাধ্য হইলাম। ইত্যবসরে ইলিয়স

স্পর্শমণির অদ্ভুতপূর্ব্ব গুণাবলী অনর্গল কহিয়া যাইতে লাগিলেন।

এ সহৃদয়তার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া কহিলাম যে, এই স্পর্শমণি চুণি (Ruby) রং বিশিষ্ট নহে কেন? অথচ চুণি-রঙই স্পর্শমণির প্রকৃত রঙ বলিয়া গ্রন্থাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি কহিলেন যে, বর্ণ-বৈষম্যে কিছু আসে যায় না।

অতঃপর আমি তাঁহার নিকট রতি পরিমাণ স্পর্শমণি প্রার্থনা করিলে তিনি প্রথম রূঢ়কণ্ঠে প্রত্যাখ্যান করিয়া পরে মৃদুস্বরে কহিলেন যে, আমার সমস্ত ধনসম্পত্তির বিনিময়েও তিনি আমায় তাহা দিতে পারেন না। পৃথিবী পৃষ্ঠে উহা যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান পদার্থ এই জন্য নহে, বরং তাহার অন্য গূঢ় কারণ আছে, যাহা প্রকাশ করিবার তাঁহার অধিকার নাই।......তিনি যখন তাঁহার কথা শেষ করিলেন, আমি তাঁহাকে শুধু তাঁহার কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য আমার সম্মুখে স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করিলাম। তদুত্তরে তিনি জানাইলেন যে, তিন সপ্তাহ পর তিনি যখন পুনরায় আসিবেন, তখন এ বিষয় বিবেচনা করিবেন।

প্রতিজ্ঞা অনুসারে তিনি তিন সপ্তাহ পর উপস্থিত হইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। অন্য সব অবান্তর কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া তিনি কিমিয়া-জ্ঞান লুকাইবার প্রয়াস পাইতেছিলেন, কিন্তু আমি পরিষ্কার ভাবে তাঁহাকে বলিলাম যে, আমাকে স্বর্ণ প্রস্তুত করিয়া দেখাইতে হইবে—অন্য কোন বিষয় শুনিবার প্রয়াসী নহি। রাত্রে একসঙ্গে আহার করিয়া আমার সঙ্গে অবস্থান করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম—অনুনয় করিলাম,—কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল; তিনি টলিলেন না। আমি তাঁহাকে অনন্তর তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিলাম, কিন্তু তিনি বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন যে, তিনি কেবলমাত্র বিবেচনা করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছিলেন।......যাহা হউক অবশেষে তিনি আমাকে এক সরিষা বীজ পরিমিত স্পর্শমণি দিবার জন্য স্বীকৃত হইয়া উহা আমার হস্তে এমন ভাবে অর্পণ করিলেন যেন উহা এক মহারাজকীয় উপঢৌকন। আমি ইতস্ততঃ করিয়া কহিলাম যে, উহাতে হয়ত বা মাত্র চারি গ্রেন সীসাকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। ইহাতে তিনি ব্যস্তভরে মণিটুকু ফিরিয়া চাহিলেন। তৎপরিবর্ত্তে একটী বৃহত্তর খণ্ড পাইব এই আশায় আমিও উহা প্রত্যার্পণ করিতে দ্বিধা করিলাম না। কিন্তু হায়! তিনি উহা বৃদ্ধাঙ্গুলী সাহায্যে দুই ভাগ করিয়া একটী ভাগ দূরে নিক্ষেপ করিলেন, আর অবশিষ্ট আমাকে দিয়া কহিলেন যে, ইহাও আপনার জন্য যথেষ্ট হইবে। আমি অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম। কারণ, এত সামান্য পরিমাণ দ্রব্যে যে কোন পরিবর্ত্তন সম্ভব হইতে পারে, তাহাই বিশ্বাস হইতেছিল না। তিনি আমাকে কহিলেন যে, এই সামান্য পরিমাণে অর্দ্ধ আউন্স (১।০ তোলা) গলিত সীসা স্বর্ণে রূপান্তরিত হইবে। অগত্যা উহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল; কিন্তু কি ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা জানিতাম না। আমি তাঁহার নিকট স্বীকার করিলাম যে, প্রথম দিবসে (১৫ দিন পূর্ব্বে) আমি যখন তাঁহার হস্তীদন্ত নির্ম্মিত বাক্সটী হাতে লইয়াছিলাম, তখন অঙ্গুলী সাহায্যে যৎসামান্য আত্মসাৎ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে আমার সীসা স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত না হইয়া 'কাচে' পরিণত হইয়াছে। তিনি হাসিয়া কহিলেন যে, স্পর্শমণি প্রয়োগ অপেক্ষা চুরি বিদ্যাতেই নাকি আমি অধিক পটুত্ব লাভ করিয়াছি। (I was more expert at theft than at the application of the Tincture.) তিনি আরও কহিলেন, আপনার লুণ্ঠিত দ্রব্যটুকু পীতবর্ণ মোমে সংরক্ষণ করা উচিত ছিল—তাহা হইলে উহা সীসার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া উহাকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করিতে পারিত।...আগামী কল্য রাত্রি ৯টার সময় আসিবার কথা দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তিনি আসিলেন না। কয়েক ঘণ্টার পর এক অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া কহিলেন যে, ইলিয়াস তাঁহার বন্ধু—বিশেষ কারণে তিনি স্থানান্তরে বিলম্ব করিতে বাধ্য হইয়াছেন—কল্য অপরাহ্নে ৩ ঘটিকার সময় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।...সন্ধ্যা ৭।০ সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও তাঁহার দর্শন মিলিল না। আমি নিজেই স্পর্শমণির সাহায্যে স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার জন্য আমার স্ত্রী আমাকে প্রলুব্ধ করিতে লাগিলেন। কল্য প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া নিজে আরম্ভ করিব—এই সঙ্কল্প

করিয়া আমার পুত্রকে অগ্নি জ্বালিবার জন্য আদেশ করিলাম। লোকটী হয়ত বা আমাকে নেহায়েৎ প্রতারণা করিয়াছেন—ইহাই আমার ধারণা হইতেছিল। কল্য প্রাতে তাঁহার উপদেশ অনুসরণ করিয়াও যদি কৃতকার্য্য হইতে না পারি, তবে উনি যে একজন নকল কিমিয়াগর ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিবে না। মণিখণ্ডটুকু মোমে রাখিয়া দিবার জন্য আমার স্ত্রীকে অনুরোধ করিলাম। ইতিমধ্যে আমি প্রায় দুই আউন্স (৫ তোলা) সীসা গালিয়া উহাতে মোম জড়িত স্পর্শমণি নিক্ষেপ করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা হিস্ হিস্ শব্দ উত্থিত হইয়া প্রায় ১৫ মিনিট কাল পরে সমস্ত সীসা সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্ণে পরিণত হইল। স্বর্ণ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে প্রথম উহা গাঢ় সবুজ বর্ণ ধারণ করিয়াছিল; পরে রক্তবর্ণ—ক্রমে শীতল হইয়া স্বর্ণের চাকচিক্যে উদ্ভাসিত হইল।

দাবানলের ন্যায় সমস্ত সহরে এই সংবাদ পরিব্যাপ্ত হইল। অপরাহ্নে অনেক বিখ্যাত কিমিয়াগর আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। টাকশালের অধ্যক্ষ আমাকে আহ্বান করিয়া রাসায়নিক পরীক্ষার নিমিত্ত উহার একখণ্ড স্বর্ণ চাহিলেন। অনন্তর ব্রেটিল (Brechtil) নামক এক রৌপ্যকারের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। উভয়ে আমার স্বর্ণ পরীক্ষা করিয়া নিঃসন্দেহে অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, ঐ স্বর্ণ অত্যুৎকৃষ্ট, উহাতে অন্য ধাতুর তিলমাত্র মিশ্র নাই বরং এ স্বর্ণ সাহায্যে প্রত্যেকবারে দুই স্ক্রুপল (Scruple) রৌপ্য স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়।……

আমি আমার এ কাহিনী আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিলাম। স্বর্ণটুকু এখনও আমার নিকট আছে, কিন্তু ইলিয়সের কি হইল বলিতে পারি না; তবে শেষ দিন আমার নিকট হইতে বিদায় হইবার সময় বলিয়াছিলেন যে, তিনি পুণ্য-তীর্থে (Holy Land) যাইবার মনস্থ করিয়াছেন। তিনি সেখানেই থাকুন, আল্লাহ্‌র পবিত্র ফেরেস্তাগণ যেন তাঁহাকে রক্ষা করেন·· ···এই আমার প্রার্থনা।—I. F. Helvetius: The Golden calf.

তা'রি প্রতীক্ষায়

—সনেট্—

— খলিল মিয়া

এখনো উঠে নি রবি :—এখনো আকাশ
কৃষ্ণ-আঁখি মেলে আছে :—প্রভাতী-বাতাস
বহে নি এখনো ওরে! নিশার-কুসুম
ফোটে নি' এখনো তোর!—এখনো ভ্রমর
ফুল-আশে পশে নাই নব গুঞ্জনছায়;
—এখনো টুটে নি ঘুম চোখের পাতায়!
ঘুমন্ত কলির বুকে আলোর খবর
পশে নাই!—স্পর্শে নাই বিনিদ্র নয়নে
জাগ্রত আলোর ধারা;—তাই ফোটে নাই।

তাই বলে মিথ্যা নয়;—আসিবে প্রভাত
আলোর পরশ নিয়া!—আসিবে ভ্রমর!
—জাগিবে আনন্দ-রাশি,—ফুটিবে কুসুম
হিমানীর হাসি নিয়া নবীন ভূষায়
চেয়ে থাক্ ওরে ব্যর্থ! তা'রি প্রতীক্ষায়।

স্ত্রী-চরিত্র

— গল্প

—জাহিদুল হুসাঈন

বাইরে জোর হাওয়ার সাথে বৃষ্টি এসেচে চেপে! বড় বড় ফোঁটা!

এই তুমুল তুফানের নাগর-দোলায় আম কুড়ায় দুটো ছেলে-মেয়ে দৌড়ে' দৌড়ে'। বাতাসে উড়িয়ে নিতে চায় ওদের, পা দিয়ে বাদুড়ের ছা'এর মত আঁকড়ে ধরে বসুমতীর বুক।

মা ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে ডাকে,—অ আবু, অ মুঞ্জু, আমে আমার কাজ নেই। ঘরে আয়, বিষ্টিতে ভিজলে জ্বর হবে। ওরে, জলদী আয়।

খুব লম্বা একটা তলোয়ার চিকমিকিয়ে ওঠে আসমানে! তারপর গুলী-খাওয়া বাঘ যেন গোঙায়,—আকাশের এ-ধার থেকে ও-ধার পর্য্যন্ত!

চিন্তায় মার মন অস্থির হয়ে ওঠে।...আমে কোঁচড় ভরে উঠে ভাই-বোনের।...শীতে গা কাঁপে, আনন্দে মন নাচে।

মা চেঁচিয়ে ডাকে, ও-ঘরে নজু আছ, ও নজু!

আছি চাচি, কি? নজু জবাব দেয়। ও কলকাতায় পড়ে, জ্যৈষ্ঠের বন্ধে বাড়ী এসেচে। এ-ঘরটা বাইরে, বেশ হাওয়া খেলে বলে গরমের দিনে বেশ আরামের। দিনে এ-ঘরেই ও-থাকে, রাত্রে বাড়ীর ভিতরে।

চাচি বলে, দেখ ত বাপ, ওরা আমার কথা শোনে না, একটা ডাক দাও ত। জলে ভিজলে—

গণতান্ত্রিক লেখক সিনক্লেয়ারের 'অয়েল'খানা পড়ছিল সে মশগুল হয়ে, ঝড়কে উপেক্ষা করে—ওদের দেখে নি তাই। ডাকলে এখন—মুঞ্জু, আবু!...

থামে, দাঁড়ায়—উভয়ে। বজ্রকে উপেক্ষা করা চলে, কিন্তু ওরা নজুর ডাককে উপেক্ষা করতে পারে না।

নজুর সুমুখ দিয়েই ওদের বাড়ীর ভিতর যেতে হয়। নজু ডাকে, এখানে আয়, দেখি, কে কত আম কুড়ুলি।

ঘরের দোরে কচি-পায়ের ভিজা রেখা এঁকে ভরা কোঁচড় দেখায়—গর্ব্বে, আনন্দে! তারপর কার আম কত বেশী, কার আম কেমন মিষ্টি—সে-সব নিয়ে তর্ক চলে কাঁপতে কাঁপতে।...

কাপড় ভিজে; আবুকে দেয় একটা ধুতী, মুঞ্জুকে একটা তোয়ালে।

বিছানার চাদরটা তুলে দরজা বরাবর বসে নজু—এক ধারে আবু, আরেক ধারে মুঞ্জু!...তিন জনের গায়ে এক চাদর!...বাইরে ঝমঝম্ বৃষ্টি!...মার ডাকে স্বচ্ছন্দে জবাব দেয়—নজু ভাইজানের কাছে, দু'জনই।

মুঞ্জুর বয়স আট, আবুর দশ। বড় ভাই আছে—রমীজ। বনে শণ কাটতে গেছে, বয়স বাইশ—বাপ নাই। নজু ওদের চাচাতো ভাই, সাক্ষাৎ!

পৃথকান্ন—যুদা। এ ঘরটা মুঞ্জুদেরই।

আবু পা নাচায় আর গুণ্-গুণ্ করে গান গায়। মেয়েলী গান, গেঁয়ো সুর!...সুরটুকু মিহিন। শব্দ বুঝা যায় না।

নজু আশ্চর্য্যান্বিত হল দেখে, আবুর কচি-গাল দুটোর উপর দিয়ে বয়ে চলেছে দুটো জল-রেখা! এতটুকু মেয়ের কি ব্যথা, নজু বোঝে না।...

জিগ্‌গেস করে। কিছু বলে না, খালি কাঁদে। এ যেন

ঝর্ণা থেকে সহজ ছন্দে জল উৎসারিত হওয়া! মূলে চেষ্টা নাই, এক বিন্দু না।

আবার জিগ্‌গেস করে, কৌতুহল ভিড় করে নজুর মনে ঐ জলটুকুর ইতিহাসের জন্যে।...

বলে প্রৌঢ়া বুদ্ধিমতী পাকা মেয়ে-লোকের মত— আমার দুঃখের সীমা নেই। কপালে খোদা আমার এত দুঃখ লেখেছে!...বর্ণাড্‌শ'র বইয়ের ভূমিকা যেন!—ভূমিকা গভীর।

নজু হাসি চাপেই বুঝি বা!...কয়, তোর আবার দুঃখ কি, একটু খানেক মানুষ? দুঃখের তুই কি বুঝিস্?...

তোমরা পুরুষ মানুষ, মেয়ে-লোকের দুঃখ কি বুঝবে? পরের ঘর করতে হয় না।...

বড়ো পাকা কথা শিখেছিস্‌ ত? ক'দিনই বা হল তোর বিয়ে হয়েছে, ক'দিনই বা শ্বশুর-বাড়ী ছিলি?

দশ বছরের মেয়ে সঙ্কোচ নেই। শাশুড়ীর ঠোনা, ননদীর গাল-টেপা, স্বামীর কিল—সব বলে আর কাঁদে।...

ছোট্ট মেয়ের ছোট্ট ঘর-কন্নার অশ্রুময়ী অধ্যায়িকা!...

নজু ভাবে, শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে হলে হয়ত ভাব্‌ত, বলত, জিগ্‌গেস করত—গান্ধী সম্বন্ধে অথবা মুসোলিনী। অথবা আব্‌দার করত দু'খানা ছবির বইর জন্যে।...আর ওর ভল্পনা-কল্পনা কেন্দ্র করে আছে শ্বশুর-বাড়ীর কয়েকটা পুরাণ হাঁড়ি আর কয়েকটা নয়া কলসী। ক্ষুদ্র চিত্ত, ক্ষুদ্র কল্পনা, পঙ্গু জীবন-ভূমিকা!...লক্ষ গেঁয়ো বাঙালী মেয়ের প্রতিনিধি—ছবি। কান্নাও ওদের কত নিঃসহায়, নিস্ফল!

তবু আবুর মাথায় হাত বুলোয়; কিছু জানে না, তবু কর-রেখা জ্যোতিষীর মত দেখে' বলে—তুই সুখী হবি। ধন হবে খুব, জনও এক রকম মন্দ না!...পিঠে সস্নেহে হাত বুলোয়—এ কিরে, কিসের দাগ? পীড়াপীড়ির পর জবাব দেয়, নজু বাধা দিয়ে বলে, থাক্‌, আর বলিস্‌ নে!......

এতটুকু মেয়ের কিই বা বুদ্ধি হয়েছে? তার কাছ থেকে শাশুড়ীর বুদ্ধির তাগিদ। কাজের ওয়াশিলী।... পিঠে পোড়া কাঠের দাগ!—কালো, থ্যাৎলানো!

উচ্চ চিন্তা ক্ষণেকের তরে স্তব্ধ হয়!—ভারতের মুক্তি, চাষীদের ঋণসমস্যা, শ্রমিকের উচ্চাশা!......

মেয়েটির অশ্রু-লেখা যেন নয়া এক বইয়ের পাতা খোলে!—সম্পূর্ণ নতুন পুস্তক,—ব্যথাভরা, হৃদয়দ্রাবী, স্নেহাকর্ষক!......

রাত্রি। নজু তার স্ত্রীকে বল্লে, কাপড়টা আজ তোমাকে বেশ মানিয়েছে।

তরুণীর লাবণ্য ফেটে পড়ে। টুকটুকে সুন্দর। চোখে ভ্রূকুটি হেনে নিঃশব্দে ঈসারা কর্‌লে ঘরের আঁধার কোণের দিকে।......

নজু বোঝে না। এগিয়ে যায়,—স্ত্রীর মানা ঠাওরে আসে না। দেখে একটা কাপড়ের পুটুলি যেন। পায়ে ঠেক্‌তেই নড়ে ওঠে। বলে, কে? পুঁটুলি নড়ে, লুকোয় আঁধারে—জবাব দেয় না।

স্ত্রী এগিয়ে এসে কাণে-কাণে বলে—আবু, ওর সোয়ামী এসেছে কিনা তাই।......

সোয়ামী এসেচে ত এখানে কেন?

দেখ না ওর ঢং। আল্লাতালা মেয়ে-পুরুষে বেঁধে দিয়েছে সংসার শুদ্ধ। প্রত্যেক যাত্রা ওর সোয়ামী আসে আর এই ঘরে এসে পালায়! দেখ্‌বো লো দেখ্‌বো, ঘরের ধার দিয়ে হাঁটলেও কইবি একদিন, আঁড়ি পাতে। কতই দেখ্‌লাম এই বয়সে—

যদিও বয়স পনরর বেশী নয়!......

তারপর আবুর মা আসে। বউকে ডেকে ফিস্‌ফিস্ করে কি কয়। বউ পুঁটুলিটা টেনে ঘর থেকে বাইরে নেয়। পুঁটিলি ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদে!

কতক্ষণ পরে স্ত্রী ফিরে এসে বলে, দিয়ে এলাম ঘরে।......বাপ্‌রে বাপ। ওর সোয়ামীর চোখ দুটো বাঘের চোখের মতন! আঁধারে চক্‌মক্ করে জ্বলে!... কালোও যেন অমাবস্যা!...যা-ই বল, মানায় নি! এমন বে-ঢক!...কি, ঘুমিয়েছ? কথা কও না যে আজ?... ঘুমে ধরেছে জবর!...নজু পাশ ফিরে শোয়!......

নৈশ-বিদ্যালয়ের মাষ্টার,—নজুর বন্ধু,—বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকে;—হাতে হারিকেন, পেছনে গুটি কয়েক জোয়ান, ছাত্র। নৈশ-বিদ্যালয়টা দুই বন্ধুর কীর্তি,—একটা বালিকা বিদ্যালয়ও! ছোট খাট লাইব্রেরী একটা ফাউ!......

নজু বন্ধুর ডাকে জবাব দেয়, আজ যাব না ভাই, ভাল লাগে না মনটা; শরীরটাও একটু খারাপ।......তুই যা।

রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখে, নিশ্চিন্ত-নির্ভরতায় তরুণীর গোল একখানা হাত পড়ে আছে বুকে!—কি নরম, কি ঠাণ্ডা!……নিশ্বাস পড়্‌চে তালে-তালে,—স্পন্দন তার কোমল বুকের ভিতর দিয়ে পেলব-পরশ বুলায় গায়!—কি সুখদ, মোহময়!……তরুণীর' গায়ের গন্ধে, নিশ্বাসের খুশবুঁ'এ ইন্দ্রিয় আবেশে ঝিমায়, লুটায়!……মনোমত সুন্দরী স্ত্রী!—স্বর্গ, ফিরদৌস!……

তবু মনে পড়ে ঐ জল-লেখা!……প্রেমের দ্বীপের সন্নিকটে একটি অজ্ঞাত দ্বীপের অকস্মাৎ আবিস্কার!…… ছোট ভাইবোন নাই, তাই?……

আবিষ্ট প্রেমের বলিষ্ঠ প্রকাশের পাশে এক কণা কুঁড়ি!—স্নেহের, আহ্লাদের!……

ঐ এক ফোঁটা মেয়েটির আঁখি-নীরে নজু কি যে দেখলে, কি যে কুড়িয়ে পেলে!……ঐ জল-লেখা তাকে নতুন করে চিনালে এক মানস-লোক।

পরদিন দিবালোকে সব সুম্‌সাম্‌!…কিছু নেই!… রাত্রের গুড়ি-গুড়ি চিন্তার মেঘে ইন্দ্রধনুচ্ছটা!—ক্ষণিকা!…

আবুর মা এসে বলে, বাপধন, আমার পাগ্‌লী মেয়েটা কাপড়টা ছিঁড়ে ফেলেছে, সেলাই ক'রে দিতে পার? রিপু ক'রে দিতে?

ভাল সেলাই জানি না কিন্তু।

এক রকম হলেই হল।

ভাল না হলে দোষ দিতে পার্‌বে না।…আবু যা'ত, গুটি সূতাটা চেয়ে নিয়ে আয়—সুঁচ্‌টাও।…

কার কাছে চাইব? কার কাছে? আবু হাসে।

দেখ্‌চেন চাচি, ও বোন হয়ে আমায় ঠাট্টা করে!

আবু শাসনকে এড়িয়ে হেসে দৌড়ায়!—চঞ্চল, উদ্দাম!…

চাচি পা ছড়িয়ে দরজার ধারে মাটিতে বসে! কাঁচা আম ভর্তা বানায়! গ্রীষ্মের উত্তাপে সুস্বাদু খেতে।

আবু খাটের এক কোণে বসে কাপড় ধরে আর নজু সেলাই করে!…

গপ্‌প চলে,—মেয়েলী গপ্‌প! কে কুমড়ার ডগা চুরি কর্‌তে ওস্তাদ! কার পেটে কথা হজম হয় না। স্বামীর হাতের মার খায় নি এমন মেয়ে-লোক যে নেই তার হিসাব নিকাশ!…একঘেয়ে পান্‌সে গপপ!

নজুর মন্‌ আচম্‌কা চঞ্চল হয়ে ওঠে বইএর জন্য!… মনে পড়ে রোঁমা-রোঁলার 'জন ক্রিষ্টফার,' টমাস ম্যানের 'মেজিক মাউণ্টেন।'

ভর্তায় ভাগ বসায় মফীজ এসে। লম্বা, হারগিলে, কাঁক্‌লাস। দারিদ্র্য পেত্নী গাল দুটো ঢুকিয়ে দিয়েছে ভিতরে ঘুষো মেরে। চোখ দুটো ভিতর থেকে জিন লাগিয়ে টেনে রেখেচে যেন—সেই মুখে হাসি!

আবুর মা ঘোম্‌টা টেনে দেয়,—বড় মেয়ে বিয়ে দিয়েছিল ওর কাছে, মারা গেছে। পাকা চুলে খেজাব লাগিয়ে নিজেই বিয়ের প্রস্তাব করেছিল—খাশুড়ীর কাছে। মতও হয়েছিল ওঁর। গোলমালটা লাগালে নজু;—এতটুকু অবুঝ আবুকে আধ-বুড়োর কাছে বিয়ে দেওয়া চলে না, হল না বিয়ে তাই।

স্ত্রী নেই, তবু ত শালী। মশ্‌কারী করে।…ওর হাতে তামাক সাজিয়ে এক ছিলিম খায়,—পানও একটা।…

দুপুর বেলা ভেজা কাপড়ে আবু সাবান চায় এসে, বড়ো ব্যস্ত। বই থেকে মুখ না তুলেই বলে, নিয়ে যা ওখান থেকে।

গোছল করে এসে তেলের রাঙা শিশিটা নেড়ে-চেড়ে কয়, খুব দামী বুঝি তেলটা? কুড়ি পয়সা? ভারী খুশবুঁ!

কেন, দিবি নাকি?

আমরা কি এত দামী তেলের মানুষ? চোখ দিয়ে যেন লোভে পানি আসে!

কেন, তোকে এনে দেয় না? তেল, সাবান?

আবু শরমে মুখ লুকায়, নজুর মুখ রাঙা হয়ে ওঠে।

শেষে তেল নিজ হাতে ঢেলে মেখে দেয় ওর রুক্ষ চুলে। কি ঘন সূক্ষ্ম কুঞ্চিত কেশ! হাজারে হয়ত হয় এমন একটা অথচ এত অনাদর!

আঁচড়ে দেব? সুন্দর করে?

আবু মার চোখের দিকে চায়!…মা বলে, বোস্‌ না ভাল করে। দিক আঁচ্‌ড়ে। চাচাতো ভাই কি, আপন ভাই কি?—এক!…

চাচি দরজা একটু টেনে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়! নজু সস্নেহে চুল আঁচ্‌ড়ায়!…

'কাচ লইবা গো, কাচ? রেশমী চুড়ি? জামদানা, মোগা?' হেঁকে যায় ফিরিওয়ালা।

চঞ্চল আবু চুল আঁচড়ানো অসমাপ্ত রেখেই দরজায় এসে দাঁড়ায়, বলে, রাখ্‌ব, নামাও।

তরুণ ফিরিওয়ালা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। এতটুকু মেয়ের এত রূপ, বয়সের কালে কি জানি হবে। চুলগুলো নিয়ে মুশ্‌কিলে পড়েচে ভারী—এদিক দিয়ে তুলে দেয়, ওদিক দিয়ে মুখে এসে পড়ে! ওদিক উঠায় এদিক গড়ায়!…

তোমার মাকে ডাক না, রাখ্‌তে হলে, ফিরি-ওয়ালা বলে।

নামাওই না।

নামায়, গাছ-তলায়—ঘরের সুমুখে।

চাচি আসে পান চিবোতে চিবোতে, ডান হাতের তর্জ্জনীর ডগায় এক খাব্‌লা চুণ।

ফিরি-ওয়ালা চুড়ি বার করে বিচিত্র রঙের,—বার করতে না করতেই ফিরি-ওয়ালার হাত থেকে আবু ছিনিয়ে আনে চুড়িগুলো, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে, গায়ের রঙের সঙ্গে মিশিয়ে যাচাই করে। চোখে কি ক্ষুধার দ্যুতি খেলে—গয়না পরবার ক্ষুধা।

আয়না-ওয়ালা চুড়ি আছে? মুখ দেখা যে যায়? আবু জিগ্‌গেস করে।

সেই চুড়ি রাখবার মানুষ কই? জোড়া বারো আনা।

দেখাদেখিতে সময় কাটে, তবু আপত্তি নেই। এই মেয়েটির সুমুখে সারাদিন না খেয়ে কাট্‌লেই বা কি? চুড়ি হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে স্পর্শটুকু যে লাগে, অমূল্য!

রেশমী চুড়ি পয়সা-পয়সাতেই দেয়, কেনা দামে। আবু বসে ফিরি-ওয়ালার কাছে মুখোমুখি—ও পরিয়ে দেয়। দু'মিনিট লাগে না পরাতে—লাগায় দশ-পনের মিনিট। বাঁ হাতে আবুর হাতের কব্জি ও আঙুলগুলো টেপে, ডান হাতে চুড়ি পরায়। মাঝে-মাঝে এমন টিপে দেয় যে, আবু 'উঃ উঃ' করে ওঠে! ও মনে করে এত চাপ লাগেই বুঝিবা!…

ওকে বিয়ে দিয়েছ বুঝি?

হ্যাঁ দিয়েছি, এবারই, পচিম পাড়া। নসরদ্দি সরকার—তারই ভাইপোর কাছে।

আমি ত ও-বাড়ীতেও যাই, দেখি না ত।

শ্বশুর-বাড়ী বেশীদিন ছিল না।…

কইগো, তোমাকে ত কেনা দামেই দিলাম, এক ছিলিম তামাক খাওয়াও না, ফিরি-ওয়ালা আবুর চোখে লালসাতুর দৃষ্টি ফেলে বলে।

আবু তামাক সেজে এনে ওর হাতে দেয়।…

নজু নীরবে ঘরে বসে ফিরি-ওয়ালার কথাবার্ত্তা শোনে,—'পিকউইকিয়ান'দের মতো জীবনের বিভিন্ন প্রকাশকে 'ষ্টাডী' করছে বুঝি, খুঁটিনাটিও। বল্‌লে, রাখ্‌না দাম করে। বাহারের চুড়ি ত! ওহে ফিরি-ওয়ালা ঠিক দাম কত?

ফিরি-ওয়ালা আস্তে জিগ্‌গেস করে আবুর মাকে লোকটা কে? শুনে ভড়কে যায়, বলে, ঠিক চার-আনা, এক পয়সা লাভ নেই।

রাখ্‌, কল্‌কাতায় এ-রকম দামই হবে।

এত পয়সা পাব কোথা? এত পয়সা?

পয়সা? দেখ্‌তো ঐ খদ্দরের পাঞ্জাবীটায় একটা আধুলী আছে কিনা—যা লাগে নে'—

আধুলীটাই ফুরিয়ে যায়!…

চুড়িগুলো পরে সারাটা বাড়ী একবার ঘুরে আসে রঙীন ঝুল্‌কি তালে। অনাবৃত হাতদুটো নড়ে—ঝুণ্‌ ঝুণ্‌ মিঠে আওয়াজ!…

তারপর বসে এসে নজুর পাশে—

নজু পাটিতে বুক পেতে হিসাব করে—সারা বাংলা দেশের চাষীদের ঋণের হিসাব। ওদের নিজের গাঁয়ে ঋণ হচ্চে ৩৬০ ঘর চাষীর মধ্যে দু'লাখ উনত্রিশ হাজার। সারা বাংলা দেশে হচ্চে—। অঙ্ক দেখে মাথা ঘুরে যায়।… আপনা-আপনি বলে—উপায় নেই, ঋণ থেকে মুক্তি অসম্ভব। অস্বীকার করা যায় কি?…ধর্ম্ম অনুমোদন করে না, রাজার আইনেরও বিরুদ্ধে!… কিন্তু ধর্ম্মের চেয়ে, আইনের চেয়ে মানুষ যে বড়! নয়, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘনিয়ে এসেচে ফের—

কি কও এই সব ভাইজান, পাগলের মত?…রেশমী চুড়ির বাজনার মত হাসি। তুই, আবু? কোন্ সময় এলি? তোর হাসিটা ভারী মিষ্টি। এইবার আমার মাথাটা নষ্টই হয়ে যেত তোকে না চিন্‌লে—

দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই হাসির সঙ্গে চুড়ির বাজনা।

আমার সব কথা তুই বুঝবি না—বোঝার কাজও

নেই।...তুই যদি আমার বোন হতিস্ নিজ বোন, তা'হলে তোকে বিয়ে দিতাম না, সঙ্গে-সঙ্গে রাখ্তাম। আচ্ছা, এখন খুব জোরে হেসে ওঠ তো যদ্দূর জোরে পারিস্।

অনর্থক হাসা যায় নাকি? এমনি? বলে হেসে উঠে।

নজু্ও হাসে—ফুস্ফুসের প্রত্যেকটা সূক্ষ্ম কোষে হাওয়ার খেলা।...

বন্ধু এল,—পাঠশালার পণ্ডিত। টেন্ পর্য্যন্ত পড়েছিল।—তারপর প্রেমে পড়ে বাংলা ভাষার উপন্যাস কাবার্ করলে, পাশ করা হল না। বন্ধুর নাম বশীর। নন্-কো-অপারেশনের আমলে ভলানটিয়ারী করেছিল—সবাই ভলানটিয়ার ডাকে তাই। জেলও খেটেচে ন'মাস, গরম বক্তৃতা দিয়ে।—

একটা মতলব্ ঠিক করেচি, নতুন, নজু বল্লে।

কি, কি রকম? শুয়ে পড়ে ওর পেটের উপর পা' ফেলে নাচাতে লাগ্ল।

ভেবে দেখেচি, বাংলা দেশের গভীর মনে কোনো একটা নয়া সত্য পৌঁছাতে হলে চাই দুটো বস্তু—ধন ও ধর্ম্ম। ধর্ম্মের হাওয়া যে দিক থেকে বইচে—এর মধ্যে আছে আদেশ, অর্থাৎ যাঁরা এ-ধর্ম্মকে ঘরে ঘরে পৌঁছাবার জন্যে জান্ দিয়েছেন, স্বার্থত্যাগের অনশনে, সেবার লাঞ্ছনায়, তাঁরা বুঝেছিলেন, শাস্ত্র অক্ষয় থাকাটাই সব চেয়ে বড় কথা নয়,—বড় কথা হচ্চে ব্যক্তির অভাব বা সাধকের দারিদ্র্য যেন না ঘটে। তাই যদি না হত কোর্আন্খানা আসমান থেকে ধপ্ করে ফেলে দিলেই হত, মোহাম্মদ মোস্তফার মত অত বড় একজন সাধকের প্রয়োজন হত না। সেটা ভুলে গেছে বলেই ওরা শাস্ত্রকে ব্যাখ্যা করে—শাস্ত্রকারের জীবনের ভিতর দিয়ে যে একটা বিপ্লব এসেছিল, সেটার সঙ্গে সংযোগ না রেখে।

কার্য্যকরী পন্থাটাকে ভুলে হেফ্জ্ করছি—থিওরী-গুলো—যা মনে স্থায়ী দাগ্ ফেলে না সহজে, কর্ম্মেও উদ্বুদ্ধ করে না কাজের সময়ে। ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, সমাজে যে-ধর্ম্ম চলচে, সেটা কেতাবী ধর্ম্ম থেকে এত ফারাক যে, দুটো এক বলে' মনেই হয় না—যদিও মুখে প্রচার করা হয় এক। এই মেকী ধর্ম্মটাকে নষ্ট করে সত্য ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, সেই কার্য্যকরী পথে আসতে হবে সমাজের দ্বারে—সমাজের ব্যথার দরদী হয়ে। শক্তিমানের কাছে যেতে হবে স্নেহের দুর্ব্বলতা নিয়ে, সেবার কাতরতা নিয়ে। মুরব্বিয়ানা সেখানে ক্ষণস্থায়ী—সেখানে স্থায়ী হবে স্নেহের একটু পরশ, মায়া-মাখা একটা দৃষ্টি।...

নজু চুপ করলে। চোখে স্নেহের ছায়ার প্রলেপ।

বশীর বলে—এই বুঝি তোর মতলব?

দূর—শোন্ই না।

এই যাঃ, বক্তৃতা সুরু হল। কথা সংক্ষেপে বল্তে পারাও যে একটা আর্ট, জানিস্ না?

জানি। সবার কাছে এই সব কথা এত করে বলি মনে করিস নাকি তুই? পাগল! কে বুঝবে আমার এই কথা! তুই বুঝিস্ বলেই না।

আচ্ছা, স্তাবকতা ছেড়ে আসল কথাটা বলে ফেল্ ত জলদী।

শোন—তারপর ধনের কথা। ক্ষুধার চেয়ে বড় সত্য নেই মানিস্ ত? সেই ক্ষুধা নিবৃত্তিরও জোগাড় করে দিতে হবে সমাজের। সমাজের মানে চাষীদের। সমাজ বল্তে আমি চাষীই বুঝি—হাজার করা এক-আধ জন ধনী যে আছে, তাদের ছেড়ে দিলেও পারি। চাষীদের কাছে হালে এই সত্যটা জানানো দরকার হয়ে পড়েচে যে, মাটির নীচে অন্ন নেই—আজকের দিনের অন্ন পুষ্ট মগজে, বলিষ্ঠ বাহুতে, আর অনুসন্ধিৎসু অন্তরে। জমির দিকে নয়—জমি থেকে বাহিরের দিকে ("Away from the land")। মাটি যে ওদের মৃত্যুর ডোরে বেঁধেচে, তার থেকে ওদের মুক্ত করতে হলে, ওদের সুমুখে—ওদের পাড়ায় ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। কাঁপড়ের তাঁত—খদ্দরে সুতো ওদের অলস ঝগড়াটে মেয়েদের দিয়ে কাটিয়ে। বলতে হবে নদীর বাঁকে-বাঁকে পয়সা হাঁটে, গহীন বনে বাঘের থাবার নীচে কোহিনুর। সাগরের বুক থেকে ধরে আন্তে হয় শিশুর খেলনা। ঘর থেকে বাইরের দিকে; চিন্তা থেকে প্রয়াসের দিকে; কাহিল জীবনের কোল থেকে আজরাইলের ঠোঁটের উপরে—

থাম—থাম, কি বলছিস্ ওসব।

কাজের কথা ভাই, কাজের কথা। শোন—

থাক—আমার কাজ আছে। যাই—ইস্কুল থেকে ফিরছি, ক্ষুধা লেগেছে ভারী।

তা' চল, খাবি। খেতে খেতে বলা যাবে।

এক লোক্মা মুখে পুরে বশীর বল্লে, তারপর?

তারপর আমাদের মতলব হাসিল্ করবার সময় হবে।

অ খোদা! এতক্ষণ যা বলেছিস, সে সব মতলব নয় বুঝি তা'হলে?

তবে কি ছাই শুনেছিস? ভাতের হাড়িতে মন্ পড়েছিল, না?

একেবারে মিথ্যে নয়! পেটে আজকাল ভুক যা লাগে! নাড়ী ভুঁড়ি হজম হয়ে যাবে যেন!

মতলবটা এই—ওদের ভিতরে স্বাধীনতার আস্বাদ তাহলে ঢুকানো যাবে। দেশের স্বাধীনতা, ব্যক্তিত্বের, সম্পত্তির।

হুঁ। মাথায় ক্রিমি ঢুকেচে—ওসব যা বল্লি তারই বিকার। শোন্ নজু একটা কথা। সত্যকে পাওয়া আর তাকে জীবনের ভিতর ফুটিয়ে তোলা দুটো আলাদা বস্তু। পেয়ে হয় জ্ঞানী—জীবন তার শান্তির; জীবনে ফুটিয়ে তুলে হয় কর্ম্মী—জীবন তার দুঃখময়। মৃত্যু তাকে ডাকে প্রতি মুহূর্ত্তে। আমরা সত্যকে পেতে চাই, জীবনে ফুটাতে চাই না। এই নিরক্ষর সমাজের অতলে জান দিয়ে লাভ নেই।

এই দুনিয়ায় অন্তহীন মানুষ বেঁচে আছে বাপু, না হয় দু'একজন মর্লামই। একটা 'এক্সপেরিমেণ্ট।' সৃষ্টি ত খেয়ালে কত মানুষ তলিয়ে দেয় সাগরের বুকে, ভূমিকম্পে ভূমির তলে—নয়, নিজের খেয়ালে দু'তিন্‌টে জীবন দিলামই, ক্ষতি কি?

জীবন দেওয়া সোজা ভাই। কিন্তু কাজ তো চাই। লড়াইএর ময়দানে কত লোকেই জান দেয়—রক্ত দেওয়া-নেওয়ার লেনা-দেনা। চোখের আড়ালে বিপ্লবী হওয়ার মাঝেও আমোদ আছে—গোপন ধ্বংস-লীলা! কম্যুনিষ্ট হয়ে এক জায়গায় কতগুলো শ্রমিককে ধর্ম্মঘটে মাতিয়ে তোলাও কঠিন নয় ভাই,—ধনিকের বিরুদ্ধে স্রষ্টার বিরুদ্ধে অভিযান! কিন্তু গেঁয়ো চাষীদের না পার্‌বি রাজার বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে, না পার্‌বি ধনিকের বিপক্ষে বিদ্রোহী করে তুল্‌তে। আর খোদা নেই বল্লে ত সব শেষ!...ওরে, এখানে জান্ দেওয়া চলে না—নিজেকে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা থেকে বঞ্চিত করে তিলে-তিলে নিজ হাতে পিষে ফেল্‌তে হয়, সব চেয়ে কঠিন কাজ!

তাই, কঠিনের মধ্যেই আমোদ। নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যেই শ্লাঘা! সঞ্চয় করে কৃপণ—দান করে ধনী, ধনেও মনেও যে ধনী। বুঝ্‌লি?...

হ্যাঁ। কুলি করে' হাতটা ধুতীর খোঁটে মুছে বল্লে, পান নেই বুঝি? মুখ দেখি শাদা?

নেই ভাই। ভাবচি, ছেড়ে দোবো। যেটা উৎপাদন করতে পারি না, দু'হাতে তুলে মুখে দিতেও সেটা লজ্জা করে—

দিন কয় পর। বশীর স্মিতমুখে এসে বল্লে, সর্ব্বনাশ! প্রেমে পড়েছিস?

দূর—

দূর কিরে? গাঁয়ে যেখানে দু'একজন বসে, সেখানেই তোদের কথা। এম্‌নি গাঙ্ নড়ে বাতাস ছাড়া?

তার মানে? বুঝতে পারছি নে। খুলে' বল্ ত?

খুলে বল্, ত? ন্যাকা! আবুকে ভালবাসিস্ নি?

তা' বাসি, কি হয়েছে?

বাসি, এ-দুটো শব্দ শুধু নয়—আরো অনেকটা বেশী। নিজের বেলায় সহজে বুঝা যায় না,—খুলে না বল্‌লে? নেও, সাধুগিরি ফলাবার জন্য বোকার মত চেয়ে থাক্‌তে হবে না আর।

সত্যিই বুঝতে পারি নি ভাই, বল্ না কি হয়েছে?

কি হয়েছে?...তারপর একটা চোখের ভঙ্গি—অশ্লীল, দুঃসহ!

এতটুকু মেয়ে, লোকে বিশ্বাস করে?

চোখে দেখলে বিশ্বাস করবে না? এতটুকু—আহা রে দরদী—ওর স্বামীকে কেয়ার করে না ও!

চোখেও দেখেচে? শুনি লোকটা কে? চোখ দুটো জ্বলে উঠল—মানব জাতির ফণা-বিস্তার!

হ্যাঁ, নামটা বলে' একটা ফ্যাসাদ্ লাগাই! মোটের উপর তোদেরই লোক!......থাক্ সে সব কথা, এখন চল্‌লাম।

রাত্রি। নজু বল্লে, তুমি পাগল নাকি? কে বলেছে শুনি? দেখি, এদিকে মুখ ফিরাও।

যেই বলুক,—মিছে নয় ত, সত্যি। থাক্ থাক্, টেনো না, ছাড়। ছুঁয়ো না বলচি, বলে একটা বালিস আঁকড়ে ধরে ওদিকে স্ত্রী মুখ ফিরিয়ে রাখ্‌লে।

মিছে কথা—ওসব ধারণা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। শোন রাজু—শিক্ষিত সমাজের প্রেমের আধুনিক আহ্বান!

রাজু! আহ্লাদের ডাক! ছোট বোন যেন আমি! শরমও লাগে না।

শরম লাগ্‌বে কেন? স্ত্রী ত ছোট বোনই। হদিসে মানা নাকি নাম ধরে ডাকা?

হাদিস্ জানি না এত! এখানে এসেছ কেন? আহ্লাদের বোনের কাছে যাও—কলিজার টুক্‌রার কাছে! বলে, ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কান্না!

গা থেকে হাত তুলে এনে বুকের উপর দু'হাতের দশ আঙুল জড়িয়ে রেখে নজু আপন মনে বল্‌তে লাগ্‌ল—বুঝেচি, তোমার মনে গোল ঢুকেচে। এখন কোনো কথায় কাজ দেবে না বুঝি, তবু বলি। এই কথাটা বুঝতে চেষ্টা করো, শুধু এক রকমের খাদ্যে যেমন মানুষের শরীর টেকে না, তেম্‌নি শুধু নিছক ভালবাসাতে মন বাঁচে না। স্নেহ চাই, ভক্তি চাই—প্রেম, কামনাও। যেখানে শুধু একটা বাড়ে অন্যগুলোর রস টেনে এনে', সেখানেই ঘটে বিকৃতি। ধর না, লায়লী-মজনু, শিঁরি-ফর্‌হাদের কথা। ওঁদের জীবনে শুধু ভালবাসাটাই ফুটেচে বলে জীবন ওঁদের ফেটে বিকৃত হয়েচে। বিকৃত? হ্যাঁ, বিকৃত বই কি? ওঁরা দুনিয়ার সব চাইতে বড়ো প্রেমিক-প্রেমিকা হতে পারেন; কিন্তু আদর্শ হতে পারেন না। যদি তাই হয় সমাজ বাঁচে না—মানুষের জীবন হয় গুরস্তান! আবুকে যে আমি স্নেহ করি, তাতে তোমার প্রতি ভালবাসা উঠিয়ে নিয়ে নয়—রেখেই!...

ওকে তুমি চুমো দাও নি, ওর মুখে?

আমি? ওকে? কি জানি মনে ত পড়ে না—

মনে ত পড়ে না—

এত রাগ হয়ো না—শুনো, স্নেহের উগ্রতায় ছোট্ট বোনটিকে যদি—

তুমি আমার কাণের কাছে কথা কয়ো না আর। যদি কও, হারাম—শুয়রের গোশ্‌ত!...

নজু বিস্ময়ে বিমূঢ়! তবু বল্লে, এত বড় কথাটা বলে ফেল্লে? না, এই জিদ্ এখনই ভাঙতে হবে, নইলে খারাপ হবে ভয়ানক, বলে বুকে টেনে আন্‌লে। অভিমানের আকাশ থেকে পরাজয়ের পাতালে!

এত কি পড়েন বসে' বসে'? আবার লেখেনও? গরমও লাগে না আপনার? এই যা—ঢেউ বইচে দেখি ঘামের, সারা গা দিয়ে? মফীজ দরজায় দাঁড়িয়ে নজুকে বল্লে।

নজু তোয়ালে দিয়ে গাটা মুছে বল্লে, একটা কাজ কর্‌তে চাই। সে জন্যেই খান কয়েক বই পড়া দরকার হয়ে পড়েচে। বিশেষ সুবিধা হচ্চে না—তবু পড়ি।

কি কাজ কর্‌তে চান?

নজু মুচ্‌কি হেসে বল্লে—কি কাজ? শুন্‌লে হাস্‌বেন আপনি। বল্‌ব?

বলেন না শুনি—আপনাদের দু'একটা কথা শুন্‌লেও ত ওয়াকিব্ হওয়া যায়, বলে' ছোট একটা কৌটো খোঁট থেকে খুলে আধটা পান আর এতটা শাদাপাতা মুখে গুঁজে' ছুঁড়ে ছুঁড়ে সুপারি ফেল্‌তে লাগলে। দাঁতগুলো যা দেখা যায়—তওবাস্‌তাগ্ ফারুল্লাহ্। পি, সি, রায়ও বল্‌তে পার্‌বেন না, কি-কি উপাদানে দাঁতগুলো সত্যি তৈরী হয়েছিল!

নজু বল্লে, অনেক বড় ভূমিকার পর—আমি আনুমাণিক একটা হিসাব করে দেখেচি, আর দশ বছর যদি এই ঋণের তলে বাংলার চাষীরা থাকে তা হলে—আর নতুন ঋণ যদি না-ও করে, তবে, এক কড়া জমিও ওদের হাতে থাক্‌বে না, সব মহাজনদের হাতে চলে যাবে। এখন দেড় টাকা দু'টাকা খাজানা দিয়ে জমি চষে খোরাক যোগাড় করে উঠতে পারচে না—তখন বেশী দরে পত্তন নিয়ে কি করে ওদের চল্‌বে? তাই এখনই প্রতিকার করার শেষ সময়। মনে করেচি, একটা আন্দোলন শুরু করব—নাম হবে "ঋণ-মুক্তি আন্দোলন।" তাতে পয়লা খান দশেক গাঁ নিয়ে কাজ আরম্ভ হবে। যদি সফল হতে পারি, তবে আস্তে-আস্তে কাজের জায়গা বেশী করে নেব।

কিন্তু কর্‌বেন কি বুঝতে পার্‌লাম না।

বুঝতে পার্‌লেন না? এখন যার যত কর্জ্জ সব শুধু আসল টাকা নিতে বলা হবে মহাজনদের—সুদ পাবে না। যদি না নিয়ে মোকদ্দমা করে, সব টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে। ডিক্রি কর্‌লে কেউ নীলাম খরিদ কর্‌তে পাবে না—যদি করে তার বিশেষ শাস্তির বন্দোবস্ত করা

হবে। ধরুন, কারো এমন হয়েচে যে, আসল টাকা দিলেই সে ফতুর হয়ে যায়। তবে আমাদের ঋণ-মুক্তি সমিতির মেম্বরেরা ঠিক করবেন, কত টাকা ওর দিতে হবে। আর এখন থেকে একটা রেট করে দেওয়া হবে, কোনো মহাজন এর বেশী সুদে টাকা লাগাতে পারবে না—যদি লাগায় তবে তাকে জব্দ করা হবে। কোনো মহাজন যদি এই সব দেখে টাকা আর ধার না দেয়, তবে যেখানে যত টাকা ওর লাগায়েৎ আছে, সব দেওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। এই রকম। সব গুছিয়ে বলা যায় না এখন—সব ঠিক করে নেব। আবার অন্য দিক দিয়ে আয়ের পথও খুলে দিতে হবে—চাষের উন্নতি করতে হবে নানা রকমে। কুটীর-শিল্পেরও। শুধু ঋণ থেকে বাঁচালে ত হবে না, আর ঋণ যেন না করতে হয় সে-ই হচ্চে আসল কাজ। এই সব আর কি? বুঝলেন না?

বুঝ্‌ব না কেন, বুঝেচি? তবে আপনাদের মত শিক্ষিত লোকের মধ্যে হলে সুবিধা হত।

নজু হো-হো করে হেসে ওঠে বল্লে, শিক্ষিত হলে এমন আহ্‌মকী ঋণ কেউ করে নাকি? শিক্ষিতের মধ্যে হলে ত উপায়ই ছিল না—শিক্ষিত নয় বলেই ত প্রতিকারের আশা আছে।…কে, আবু নাকি, এক ছিলিম তামাক আন্‌ ত মাথাটা সাফ্‌ করে নেই।

তামাকে আবার মাথা সাফ করে' কি করে?… নাপিতেই না ক'রে। হ্যাঁ, একটু আগুন দিয়েও পারা যায়, বলে আবু খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে উঠ্‌লে।

আহ্লাদ করে' করে' তোমার মাথাটা বিগ্‌ড়ে দিয়েছি, না? কিছু তম্বি না করলে হচ্চে না। এদিকে আয় ত, শোন—

না—তুমি মারবে।

মারবার জন্যই ত ডাক্‌চি—আয়।

না যাই—তামাক সেজে আনি।

না দরকার নেই—আয়।

বেশী রাগ হলে নয় দুটা হুঁকায়ই সেজে আনব, বলে আবু বেরিয়ে গেল।

তুই তামাক সেজে আনলে আমি খাব না। বলে দিচ্ছি—আনিস্‌ নে।

আমি এনে ত হাজির করি।

মফীজ মুখখানা কাঁচুমাচু করে বেরিয়ে গেল।

আবু তামাক সেজে নিয়ে এল—নজু তখন বইএ ডুবে গেছে—গর্কীর "মাদার"এ। পড়ছিল—"We will con quer—we cultivators (মূলে working men থাকলেও বদলে সে পড়লে cultivators.) Your society is not at all so powerful as it thinks itself. That very property for the production and preservation of which it sacrifices millions of people enslaved by it—that very force which gives it the power over us—stirs up discard within its ranks (এ স্থানটায় অনাবশ্যক দিলে) destroys them physically and morally· you can not withdraw from under the weight of your prejudices and habits, the weight which deadens you spiritually; nothing hinders us from being inwardly free. The poisons with which you poison us are weaker than the antidote you unwittingly administer to our conscience."

উঁ, হুঁকা? আবু এমন কায়দায় দাঁড়িয়ে বল্লে ধরতে চেষ্টা করলে যেন পালানো যায়

হুঁকা? রাখ, দাঁড়া—একটা কথা দেখি, বলে—বইএর পেছন দিকের পাতা উল্টিয়ে পড়লে—"I know one country officer who compelled the peasants to salute his horse when it was led through the village; and he arrested every one who failed to salute it. Now what need had he of that? It's impossible to understand. After a pause she sighed; "The poor people are stupid from poverty, and the rich from greed."

দে হুঁকা—বোস।

না, তুমি মারবে।

মারব কেন? অ, সে কথাটা তোর এখনো মনে রয়েচে? দূর—পাগলী! অন্যকে শুনিয়ে এমন দু'একটা কথা না কইলে বদনাম করে যে! আয়, মারবো না, বোস।

বালিসে বুকটা ঠেসে বইখানা সুমুখে রেখে বাঁ হাতে হুঁকাটা ধরে ডান হাত আবুর মাথায় বুলোচ্ছিল। আবু মাটীতে হাঁটু গেড়ে বসেছিল নিশ্চুপ! দু'জনার মুখ কাছাকাছি।

রাজু উত্তপ্ত একটা গোলার মত এসে হাজির।

ভাজের চোখে চোখ পড়তেই আবু অকস্মাৎ উঠে পালালে—

নজু বই থেকে চোখ তুলে দেখে—স্ত্রীর চোখ দু'টো থেকে যেন আতস বাজির তরল আগুন ফিন্‌কি দিয়ে বয়ে চে—গালে অস্বাভাবিক রক্ত!

বুঝ্‌লে, তবু জিগ্‌গেস করলে—কি চাই।

আমার মাথা, বলে রাজু সবেগে বেরিয়ে গেল।

নজু চুপ করে একটু, আপন মনে হেসে শেষে পড়্‌তে লাগ্‌ল—"Everything you do is criminal, for it is directed toward the enslavement of the people. Our work frees the world from delusions—"...

নজু সোপ-কেস্‌টা হাতে নিয়ে ডান হাতে মাথায় তেলটা মাখ্‌তে মাখ্‌তে পুকুরের দিকে যাচ্ছিল। যদিও মুসোলিনীর আদর্শের সঙ্গে তার আদর্শ খাপ খায় না; কিন্তু দেশের মুক্তির জন্য জনসাধারণকে পাগল করতে হলে, যে ধর্ম্ম-উন্মাদনাময় ভালবাসার আদর্শ ওদের সুমুখে ধরতে হবে—সে বিষয়ে একমত। তাই ত!—যাকে মনে প্রাণে একান্তভাবে ভালবাসা না যায়, তার জন্যে মানুষ কি করে' প্রাণ দেবে?...সে বিষয় ভাব্‌ছিল।

বশীর বল্লে, ভারী যে কাহিল লাগচে। কি ভাবচিস?

ভাবচি অনেক কথা, ভাই! বোস এই চেয়ারটায়। আচ্ছা, কি খেয়ে মানুষ বাঁচে ভাই? ভাত দুটো? যাতে মাংসস্তূপ রক্ষা পায়? আর কিছু না?...আচ্ছা, এই মানুষগুলো কি কোনো-দিন মাংসস্তূপ ডিঙিয়ে মানবতার পথে ভিড় করবে না? এরাই কি মোস্তফার ওম্মত? খোদার বান্দা? পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ে?...

নজুর চোখ দুটো ছল্‌ছল্‌ করে উঠ্‌ল।

বশীর বল্লে, বিয়ে কর্‌চি ভাই। সোমবারে তারিখ, যাবি কিন্তু। তুই না গেলে কিছু ভাল লাগে না।

বিয়ে কর্‌চিস্‌? খাওয়াবি কি? শুন্‌চি, তোদের এক কড়া জমিও থাকবে না ঋণ দিলে? কি হবে?

হবে আর কি? ওমর-খৈয়ামের শিষ্য আমি—দুনিয়ার এই জাহান্নামের মধ্যে দু'এক চুমুক শরাব যা মিলে খেয়ে নেই ভাই, থাম, বাধা দিস্‌নে। জীবনের সঙ্গে নয়, মৃত্যুর সঙ্গে মিতালি—যমের প্রতিক্ষায় যেন অভিসারে এসে বসে আছি। কি হবে উচ্চ আশা দিয়ে?...যাই বলিস, আমার ছোট মা-টি বেশ! আমার ভাবী স্ত্রীর চেয়েও নাকি কচি!

বলিস কি? বাপ কি তোর আবার বিয়ে করেচে? এই পয়ষট্টি বছর বয়সে?

তুই কি এই গাঁয়ে থাকিস্‌নে? হুজ্‌রা থেকে বেরিয়ে এই দুনিয়ার খবরটাও একটু রাখিস্‌। কাল বিয়ে ছিল। জানিস্‌, এই বিয়ের দরুণই ঘরবাড়ী নিলামে উঠবে। গত পাঁচ বছরে বাবা কত যে ওদের দিয়েচে ঠিক নেই—দরমা-তেজারতীর মূলধন হাজার কয় টাকার তবীল ভেঙে ওদের গহ্বরই ভরেচে, মহাজনদের দেয়নি। চাঁড়ালদের দাদন যা দিয়েছিল, তাও উঠাবার সময়ই হয়নি—ওদের বাড়ীতে গপ্‌প করে সময় কাটিয়েছে। এই মেয়েটি সম্বন্ধে ইয়ার্কী করে চাঁড়াল তরুণীরাই কি কম আদায় করেছে? কেউ ঠাকুর্দ্দা ডেকে, কেউ দাদা।...

এর পরদিন সকালে উঠে পুকুর-ঘাটে আবুর সঙ্গে নজুর দেখা। নজু জিগ্‌গেস করলে, তোর গালে কি? লাল টক্‌টকে হয়ে উঠেছে আগুনের তাত্‌ লেগেচে যেন। চোখদুটোও ফুলো-ফুলো।

আবু কোনো কথা না কয়ে ভেজা কাপড়ে গম্ভীর মুখে চলে গেল।

বুকের ভিতরটা নজুর কে যেন ভেঙে দিলে।

প্রহরেক বেলায় আবুর মা নজুকে হাত ঈসারা করে ডাক্‌লে। বল্লে, রাত্রে জামাই এসেছিল এসব শুনে'। আমারই বাড়ীতে গালমুখ ওর টিপেচে পাকা আমের মত! গালমুখ দেখেচে ওর আক্‌সার!

দেখেছি, চাচিজান!

জামাই বলেচে, ওর সুমুখে দু'টো কথা বল্‌তে, তুমি আবুর কোনো অনিষ্ট করনি। নয় তালাক দিয়ে ফেল্‌বে। যদি না বল, বলেচে, তোমাকে অপমান দেবে—জানই ত ওরা যেই জহুদ! আফছরদ্দিকে ওর বাপ-চাচারা খুন করেছিল।

আচ্ছা, বলে দাঁতে নীচের ঠোঁট কাম্‌ড়ে নজু চলে এল।

নজু তবু আবুকে ডেকে বল্লে, একটা কথা। মুখে হাসির নিমন্ত্রণ!

আবু পরিষ্কার একটা কাপড় পরে ওদিকে যাচ্ছিল—কথা বল্ল না।

এম্নি প্রত্যাখানে গেল ক'রোজ !…

নজুর চিত্ত ধুমিয়ে ধুমিয়ে জ্বলে ওঠে। অত্যাগ্রহে কথা কইতে যায়, কয় না কথা আবু।…নজুর চিত্ত উতলা !

মানুষের মায়ায় একবার যে মজেচে সেই জানে মানুষ ছাড়া মানুষ কত নিঃসহায় ! মানুষ মানুষের কত আপন ! মানুষের ঐ বুকে কি পরশমণি লুকিয়ে আছে ! কি চুম্বক !

যে-বাঘ মানুষের খুণ একবার চেকেচে, সেই জানে ঐ লাল পানিটুকু কত মিষ্টি ! কি মিঠে !…চোয়ানো আঙুরের রঙীন রস !…

প্রেম মানুষকে উন্মনা করে, স্নেহ সজ্ঞানে কাঁদায়।

প্রেম দিতে চায়, পেতেও চায় কিন্তু স্নেহ কিচ্ছুটি চায় না—আপনারে শুধু নিঃশেষে রিক্ত করে বিলিয়ে দিতে চায়, উজাড় করে' ! দানের যে স্রোত সেটাই স্নেহের প্রাণ—সেই স্রোত বন্ধ হয়ে গেলে জীবন বিষিয়ে ওঠে, দাতার জীবন ! কেন না গ্রহীতা এ-ক্ষেত্রে সমদুঃখী নয় যে !

নজুর চোখে জল আপনা থেকেই জমে ওঠে !—দু'চার ফোঁটা পড়েও হয়ত। কিন্তু সে জল নয়—রক্ত !

আবুর এই অবেহেলায় নজুর মাথা বিগড়ে গেল। দিন-দুপুরে একদিন ঘরে ঢুকে আবুর হাত চেপে ধরে বলে—বল্ কি করেছি তোকে, কথা বলিস্ নে যে ! বল্—

ঘরে কেউ ছিল না, আবু কথা বল্লে না—চেঁচিয়ে উঠ্লে, প্রাণপণে কেঁদে !

সকলে এসে নজুকে দু'চারটা ঘা মেরে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলে !…আবুর স্বামী শুনে এলো রেগে…

বলৎকারের নালিশও হল !…তিন বছরের জেল !… মফীজ সাক্ষীও দিলে।

জব্দ ! সকলে বলে। এও বলে—বাপরে, এত বদ্ লেখাপড়া শিখেও !

জেল থেকে বেরিয়ে যখন বাড়ী এসে পৌছল, তখন কজর ! আবু চীৎকার করে এসে নজুর গলা জড়িয়ে ধর্লে—কি কান্না ! ওর দুটো ছেলেও কান্নার কোরাসে সুর মিলালে ! বেজায় হট্টগোল !

নজু ভাব্লে আত্মঘাতী অনুতাপের অসম্বরণীয় অশ্রু ! ওর চোখেও জম্ল সাঁতার পানি !

আবুর মা চীৎকার করে' এসে বল্লে, বাপ ! যা হয়েছে, হয়েছে ! এখন আমায় বাঁচাও ! আমার মুণ্ডুকে ফাঁকি দিয়ে বঁড়্শী পাত্তে নিয়ে খুন করে রেল সড়কে ফেলে রাখ্লে জামাই—জামাই না, মফীজ খোদার কাটা ! মরেচেও এম্নি রোগে যে, ডাক্তার কবিরাজ বেমারটাই চিন্তে পারলে না। আজ আবার আমার রমীজকে বশীরদের বাড়ীতে চোর বলে রাত্রে ধরে মেরে নাকি চালান দিচ্চে। বাপ ! বশুর সঙ্গে ত তোর এত খাতির ! রমীজকে এ-যাত্রা বাঁচা—

চুরি করেছে, চুরি ? নজু ঠোঁট কাম্ড়ে মাথা দোলাতে লাগ্লে আচ্ছা, যাই, দেখি।

বশীরদের বাড়ীর বৈঠকে লোকের জটলা,—তা' এড়িয়ে একেবারে বশীরের শোবার ঘরে গিয়ে উঠ্ল নজু। উঠেই দেখে, বশীর রাজুর ক্ষীণ কাঁকাল বেষ্টন করে বাঁ হাতে—ডান হাত দিয়ে ওর বিন্যস্ত চুলের এক গোছা নাড়্চে ! নজু বল্লে—একি বশীর ? একি রাজু ?

সন্ত্রস্ত রাজু পালাতেই নজু হাত ধরে ফেলে বল্লে, অসৎ, দাঁড়া। খুন করব তোকে।

বশীর বল্লে, হুসিয়ার ! ওর উপর হাত তোল না। আমার স্ত্রী।

তোর স্ত্রী ! স্ত্রী দেখাচ্ছি !

আবার ফাটকে যেতে ইচ্ছা হয়েছে না ?

ওকে এখান থেকে যেতে বলে দাও, রাজু বল্লে।

নজু হাত ছেড়ে দিয়ে বল্লে, ও বুঝেচি পঞ্চশরা.. কাবিনের বলে নিজের উপর তালাক বর্ত্তিয়ে সাদী বসেচে, না ? তা বেশ। তোর আগের স্ত্রী কি করলি ? মারা গেছে বুঝি ?

না মরে নি—মারবার বন্দোবস্ত করচি। দু'শ দিতে বলেচে—আর এক শ' হলে তালাক দিই। মেয়েটা একেবারে দুধের কিনা—একটু বড় হোক--মেয়েও হয়েচে তোর ?—

হ্যাঁ।

আচ্ছা, আমার একটা কথা রাখ্তে পারিস্ ? রমীজকে ছাড়িয়ে দিতে পারিস ?

দেখি, তুই ও সবকে বল্‌বি আর না।

না—তোর কথাতেই হবে, বলে বেরিয়ে গেল নজু।

রাত্রে নজু মুন্সুদের ঘরেই শয্যা পাত্‌লে। পিতা তাকে ও বিষয়-আশয় থেকে বঞ্চিত করেচে—ত্যাজ্য পুত্র।

পিতার ভিটেয় আর পা' দেয়নি তাই।

আবুর মা কাছে এসে বস্‌লে, বল্‌লে, অনেক দুঃখের কথা।

মেয়েটার কপালও ভেঙেচে—জামাতা আরেক বিয়ে করেচে, এক তালাক দেওয়া রাণ্ডা কচি ছুক্‌রী—ওকে নেয় না, আবুকে। বলে, একশ' টাকা দাও, তালাক দিই—আরেক জা'গায় বিয়ে দাও।

একশ' টাকা জোগাড় করাই মুশকীল!

নজু বল্লে, আচ্ছা, আমি জোগাড় করব।

আবু, বোস তোর ভাইয়ের কাছে, শুনে আসি ওরা কি কি সব কথা কয়, বলে আবুর মা বেরিয়ে গেল

আবু বল্লে, মার কথা শোনো না। ও তোমাকে জালে আট্‌কাতে চায়—পুরুষ মানুষ তুমি, একদিকে বেরিয়ে পড় রোজগারে। কত মূর্খ মানুষ সংসারে ওঠে আর তুমি পার্‌বে না?

হয়ত পারব কিন্তু তোমাকে দুঃখ থেকে না বাঁচিয়ে উপায় নেই। তোমার ভগ্ন-স্বাস্থ্য আজ আমাকে ধন্য করে দিয়েচে—তুমি আমার।

না, সে হতেই পারে না। যে-দিন দেবার ছিল দেই নাই, আজ আর নয়। মাফ্ চাই।

পরদিন উঠে নজু শুন্‌লে—রমীজ নিরুদ্দেশ, বশীরের বোনও।

দিন কয়েক পর শোনার শোনা শুন্‌লে—বশীরের বোন কুঠীর হাটে ঘর করেচে।

নজু এসে এখানে একটা মেয়েকে জিগ্‌গেস কর্‌লে, করীমা বলে একটা মেয়ে এসেচে এখানে? দু'একদিনের মধ্যে?

এসেচে ত একজন, নাম জানি না—ডাকি, আমরা রাণু! ঐ ঘর—টিনের ঘরটা।

আসুন মশায়—বলে' মেয়েটি মেঝেতে বসে পড়্‌ল, বল্‌ল, তুমি নজু?

হাঁ, আর নাম ধরে ডেকো না,—ডাক্‌লেও পার, আজকাল ফ্যাশন হয়ে উঠ্‌চে, বলে খাটে বসে খুঁট থেকে একটা পুট্‌লী মেঝেতে রাণুর সুমুখে ফেলে বল্লে, মা পাঁচশ' টাকা লুকিয়ে দিয়েচে। না নিয়ে পার্‌লাম না। এই নিয়েই আমাদের জীবন-যাত্রা শুরু হবে। ওঠ—হুঁ, অজুর পানি দাও।

রমীজ ঘরে ঢুক্‌তে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়ালে। নজু বল্লে, রমীজ নাকি রে? বাড়ী যা'—তোর বিয়ে ঠিক করে এসেচি।

রমীজ পালাল। নজু রাণুর হাত ধরে টেনে ঠোঁট দুটো অধরে রাখ্‌লে।

শিউরে ওঠে রাণু চোখ দু'টো বুজ্‌লে—নিশ্চুপ! ক্ষণপরে উঠ্‌তে চেষ্টা করে বল্লে—যাই, ওজুর পানি আনি।...

পল্লী-ব্যথা

—শ্রীপ্রভাস প্রামাণিক

আজি পল্লীর দুর্দ্দশা দেখি কাটিল না কারো ঘোর,
পল্লী-ব্যথা বুঝে না কেহই, ঝরে না নয়নে লোর !
'আমার পল্লী' ব'লে ত সবাই বক্তৃতা পার দিতে,
তুচ্ছ স্বার্থ কে পার ছাড়িতে পল্লীবাসীর হিতে ?

জলের অভাবে মাঠের শস্য মাঠেতে রহিল প'ড়ে,
কৃষক কুলের দুর্দ্দশা হেরি প্রাণ যে আকুল করে।
পেটেতে তাদের অন্ন নাহিক' পরণে কাপড় নাই,
দৈন্য-জ্বালায় ছেলে-পিলে নিয়ে করে শুধু আই-ঢাই।

তাহার উপর 'ম্যালেরিয়া' আর 'ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা' রাণী—
কঙ্কাল শুধু করিল যে সার বুকের রক্ত টানি !
রোগের ওষুধ, দু'টো সাগু-দানা জুটে নাক' কারো হায় !
এক ঘরে ম'রে বাপ বেটা ভাই ভুমে গড়াগড়ি যায় !

কোথা গো দেশের তরুণ তনয়, ত্যজ' ঘুম-ঘোর আজি,
ভাই-এর মুখেতে দু'টো ভাত দিতে কে হ'তে চাও গো রাজি ?
দেশের কর্ম্ম, দশের কর্ম্ম, সেবার ধর্ম্ম তরে,—
কে আজি আসিবে শহর ছাড়িয়া দীনদের কুঁড়ে ঘরে ?

শত বিপদ আগে-পিছে আছে, আসিতে হইবে দলি ;—
অটল সাহসে এ শ্মশান-ভূমে কে আসিবে বীর চলি ?
তোমরা যখন রয়েছ জীবিত, ভাবনার কথা নাই,
ভাই-এর দুঃখ ভাই না বুঝিলে আর কে বুঝিবে ভাই ?

মহর্ষি শাহ্‌জালাল

— জীবনী —

ডাঃ মোহাম্মদ আবুল কাসেম

হজরত শাহ্‌জালাল গুরুপরম্পরায় মহানবী মোহাম্মদ মোস্তফার অধস্তন অষ্টাদশ পুরুষ। তাঁহার পিতা কোরেশ বংশোদ্ভূত এবং মাতা সৈয়দ বংশজাতা ছিলেন।

শৈশবকাল হইতেই শাহ্‌জালাল চিন্তাশীল—সংযমী। ধর্ম্মজীবনে মাতুলের কাছেই তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং উত্তরকালে গুরুর সমকক্ষ—অসাধারণ শক্তিমান পুরুষ হইয়া উঠেন। তাঁহার মানসিক সাহস, আত্মোন্নতি ও

মহাত্মা শাহ্‌জালাল এ'মন প্রদেশের 'কাণয়া' গ্রামের প্রসিদ্ধ শেখ্‌ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম-পল্লী পুণ্য-তীর্থ 'হেজাজ'-এর অধীন। জালাল শৈশবেই পিতৃ-মাতৃহীন হন। তাঁহার পিতা ইস্‌লাম ধর্ম্মের আদর্শ সাম্য-মৈত্রী প্রচার করিয়া বেড়াইতেন এবং শেষ জীবনে তিনি ধর্ম্মদ্রোহীর সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।
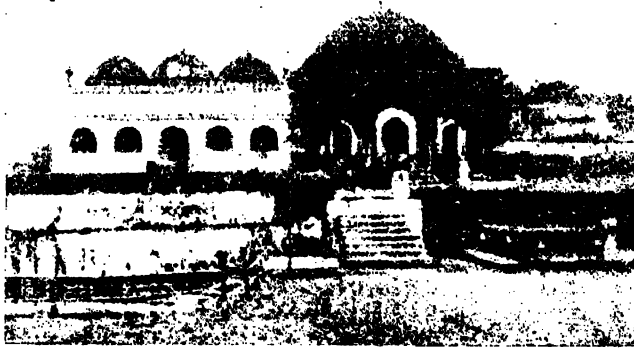
পিতৃ-মাতৃহারা বালক তাঁহার মাতুল সৈয়দ আহ্‌মদ কবীর সোহ্‌রাওয়াদ্দির গৃহে লালিত-পালিত হইতে লাগিলেন।

শাহ্‌জালালের দরগাহ্‌

তখনকার দিনে কবীর সাহেব মক্কা নগরীর বিশিষ্ট জননায়ক ও ধর্ম্ম-প্রচারক বলিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। বালক জালাল মাতুলের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া বাল্য-শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি শিশুকাল হইতেই নির্জ্জনতাপ্রিয় এবং চির-কুমার বলিয়া অনেকে তাঁহাকে "এ'মনি মোজার্‌রদ" নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। যেহেতু শাহ্‌জালাল বোখারী, শাহ্‌জালাল তবরেজী ও শাহ্‌জালাল গঞ্জোয়া নামধেয় যথাক্রমে আরো তিনজন তাপসের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইচ্ছাশক্তি এত আশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধি পায় যে, একদা একটী হরিণ বাঘের তাড়া খাইয়া সাধকপ্রবর আহ্‌মদ কবীর-এর কুটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়। হরিণটিকে বিপদগ্রস্ত দেখিয়া জালালের হৃদয়ে অত্যন্ত করুণার উদ্রেক হইল। তিনি নিমিষে আসন হইতে উঠিয়া আক্রমণকারী শার্দ্দূলকে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাতে দূর করিয়া দিলেন।

তিনি ত্রিশ বৎসর-ব্যাপী দিবারাত্র শাস্ত্রালোচনা ও কঠোর তপস্যার পর বারোজন সঙ্গীসহ গুরুর আদেশে পদব্রজে দামস্কস্‌, পারস্য, গজনী, বেলুচিস্তান প্রভৃতি দেশ-নগরের মধ্য দিয়া হিন্দুস্তানে উপনীত হন। তাঁহার সহচর-দের ভিতর একজনের নাম চন্নী পীর। দিল্লীনগরে

পৌঁছিলে বিখ্যাত নিজাম উদ্‌দীন আওলিয়ার সহিত শাহ্‌-জালাল-এর দর্শন হয় এবং পরস্পরে বহু আলাপ-আবেদন-নিবেদনের পর আওলিয়া তাঁহাকে দুই জোড়া নীল রংয়ের কপোত উপহার দেন। তিনি স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ এই পায়রা চারিটী সাথে করিয়া শ্রীহট্টে আসেন, আজিও তাঁহাদের বংশধরেরা বহুল পরিমাণে তথায় বিচরণ করিতেছে। সেখানে সেই চমৎকার কপোত-কপোতীর বংশধরদের জালালী কবুতর কহে। হিন্দু-মুস্‌লিম কেহই কবুতরগুলিকে হত্যা করে না; পক্ষান্তরে ভাগ্য-লক্ষ্মী ও জয়শ্রীর চিহ্ন বলিয়া তাহাদের আহার্য্য এবং থাকিবার জায়গাও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া থাকে।

শাহ্‌জালালের সমাধি

১৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দে, তথা ৫৭০ হিজ্‌রীতে গৌড়, লাউড়, ও জয়ন্তিয়া এই তিনভাগে শ্রীহট্ট বিভক্ত ছিল। বর্ত্তমান সুনামগঞ্জ মহকুমার কতকাংশ তখন গৌড়-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই রাজ্যের তদানীন্তন রাজা ছিলেন—কূট রাজনীতিবিদ্‌ গৌড়গোবিন্দ। তিনিই শ্রীহট্ট বা সীল্‌হটের শেষ শাসনকর্ত্তা। ঐ রাজ্য তৎকালে মুস্‌লিম অধিবাসীর সংখ্যা অতীব বিরল ছিল।

এই সময়ে বুর্‌হান উদ্দীন নামে এক মধ্যবিত্ত-ধর্ম্মপ্রাণ মুস্‌লিম পরিবার সীল্‌হটে বাস করিতেন। তিনি অপুত্রক থাকায় খোদার কাছে সন্তান কামনা করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে একটি গো-কোরবানীর মানস করেন। দয়াময়ের অসীম কৃপায় তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল,—উপযুক্ত সময়ে তাঁহার পত্নী একটি পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। তখন স্বীয় প্রতিশ্রুতি পালনার্থ বুরহান একটি গরু-কোর্‌বানী দেন। এই সংবাদ শ্রবণে রাজাধিপতি গৌড়-গোবিন্দ ভয়ানক চটিয়া গিয়া শাস্তি স্বরূপ বুরহান উদ্‌দীনের এক হাত কাটিয়া, পিতার সম্মুখে শিশুপুত্রকে বলি দিলেন।

নিরুপায় বুরহান উদ্‌দীন এই বীভৎস নৃশংসতার প্রতিশোধ লইবার জন্য তদানীন্তন বাঙ্গলার নবাব শামসুদ্দিন ইলিয়াসের কাছে তাঁহার ব্যথা নিবেদন করিলেন। নবাব ঈদৃশ জঘন্য নিষ্ঠুরতায় যারপরনাই দুঃখিত হইলেন এবং গৌড়রাজের দর্প খর্ব্ব করিবার জন্য স্বীয় পুত্র সুল্‌তান সিকন্দর শাহ্‌কে সসৈন্যে সীল্‌হটে পাঠাইলেন। কিন্তু যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ গোবিন্দের সেনাদলের কাছে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলেন।

তখন বুর্‌হানউদ্‌দীন বাধ্য হইয়া দিল্লীতে গমন করিলেন এবং ফিরোজশাহ্‌ আলাউদ্‌দীন-সমীপে আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বিবৃত করিলেন। সম্রাট এতদ্‌-শ্রবণে গোঁড়া-অত্যাচারী রাজাকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য তদীয় ভাগিনেয় গাজী সিকন্দরকে এক বিরাট সৈন্যবাহিনীর কর্ণধার করিয়া সীল্‌হটে পাঠাইলেন। তিনিও গৌড়-রাজের কাছে পরাভূত ও বিধ্বস্ত হইয়া লজ্জায় অপমানে আর দিল্লীতে না ফিরিয়া ব্রহ্মপুত্রতটে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বাস করিতে লাগিলেন।

এবার প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিন্নহস্ত বুর্‌হান উদ্‌দীন নিরাশ হইয়া আল্লার কাছে বিচার চাহিয়া মক্‌কার পথে রওনা দিলেন। পথিমধ্যে শাহ্‌জালাল-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। তিনি সমস্ত কথা তাঁহার কাছে নিবেদন করিলেন। শাহ্‌জালাল পাষণ্ড গোবিন্দকে অচিরে দমন করিবেন বলিয়া বুর্‌হানকে আশ্বাস দিলেন এবং আর অধিক দিন দেরী না করিয়া উভয়ে সীলহট অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহারা এলাহাবাদ শহরে পৌঁছিলে সৈয়দ নাসির উদ্‌দীন নামক আর একজন শক্তি-সম্পন্ন রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর সহিত দেখা হয়। সিকন্দর গাজীর পরাজয়ের পর নাসির উদ্‌দীন সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া ফিরোজশাহ্‌ আলাউদ্‌দীন কর্ত্তৃক গোবিন্দকে শায়েস্তা করণার্থ প্রেরিত হন। যাত্রাপথে অদ্ভুত উপায়ে ইঁহাদের সহিত পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহারা একযোগে গোবিন্দকে উপযুক্ত সাজা দিবার জন্য সীলহট অঞ্চলে অভিযান করেন।

পথিমধ্যে মনীষী শাহ্ জালালের শিষ্য সংখ্যা বাড়িয়া ৩৬০ জনে পরিণত হয়। তন্মধ্যে আল্‌হজ্ব ইউছুফ ও খলিল-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কারণে সীল্‌হটের অন্য নাম 'তিনশ'ষাট আওলিয়ার দেশ'।

ইহারপর ব্রহ্মপুত্র তীরে আসিয়া পরান্ত সিকন্দর গাজীকে সহ ত্রি-শক্তির অপূর্ব্ব মিলন হওয়ায় আবার প্রবল শক্তি-সম্পন্ন সেনাদল গড়িয়া উঠিল। তাঁহারা বজ্রনির্ঘোষে প্রকাশ করিলেন,—"প্রত্যেক দেশের – প্রত্যেক জাতির শাসকের মধ্যে ভাল-মন্দ আছে। যে অত্যাচারী, সে যে জাতিরই প্রভু হউক না কেন, সে অভিশপ্ত—শাসন দণ্ড ধারণের সে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সকলেরই কর্ত্তব্য—তাহাকে শাস্তি দেওয়া। গোবিন্দ হিন্দু জাতির কলঙ্ক, সে উৎপীড়ক, প্রজার রক্ত-শোষক; সুতরাং তাহার পাপের শাস্তি দেওয়াই প্রয়োজন। ব্যক্তিগত বা জাতিগত ভাবে তাহার উপর আমাদের কোনরূপ বিদ্বেষ নাই—নির্ম্মম কর্ম্মের উপরই আমাদের যাবতীয় বিদ্বেষ। তাহার ঘৃণিত অপকর্ম্মের প্রতিশোধ লওয়া সমীচীন; এবং তাহা যেমন করিয়া হউক লইতে-ই হইবে।"

অনন্তর তাঁহারা একযোগে সুরক্ষিত সুরমা ও ব্রহ্মপুত্র নদী পার হইয়া রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের পর শেষটা মুসলমানদেরই জয় হইল। গোবিন্দ নিরুপায় হইয়া রাজসিক সাধু শাহ্ জালাল-এর কাছে আত্মসমর্পণ করায় তিনি তাঁহাকে অম্লানবদনে ক্ষমা করিলেন। জীবন দান পাইয়া গোবিন্দ দুঃখ-ক্ষোভে পেঁচাগড় গিরি-দুর্গে নির্জ্জন-বাস আরম্ভ করিলেন।

বিজয়ী শাহ্ জালাল, রাজপুত্র শেখ্ আলি প্রভৃতি ভক্ত অনুচর সহ যে ঘাট হইতে সুরমা নদী পার হইয়াছিলেন—আজিও 'শেখ্ঘাট' নামে তাহা পরিচিত।

রাজ্য অধিকার করিয়া হজরত শাহ্ জালাল সিকন্দর গাজীর উপর সীল্‌হটের শাসনভার অর্পণ করিলেন,—তিনি সুশাসক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে শিল্প, বাণিজ্য ও রাজনীতির বিপুল উন্নতি হয়। প্রজারঞ্জক থাকিয়া জাতি নির্ব্বিশেষে তিনি রাজ্য-শাসন করিতেন। ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, রংপুর, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে ইস্‌লামের একত্ববাদ প্রচারার্থ তিনি লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বধর্ম্ম বিস্তারের চেষ্টা করিলেও অন্য ধর্ম্মকে নিন্দা করিতেন না, তাই অন্য জাতির সহিত কদাপি ধর্ম্মান্ধতা বা কুসংস্কার লইয়া কলহের সুর বাজিয়া উঠিত না। কিন্তু অধিককাল রাজ কার্য্য পরিচালনা করা তাঁহার জীবনী শক্তিতে কুলায় নাই। এই দূরদর্শী রাজর্ষির মৃত্যুর পর হয়দার গাজী রাজা হন। তিনি সিংহাসনে আরোহণের পর শাহ্ জালাল এর আদেশমতে এক পরমা সুন্দরী যুবতীকে বিবাহ করেন এবং তাঁহারই বংশধরেরা পুরুষানুক্রমে

ঈদ্‌গাহ্
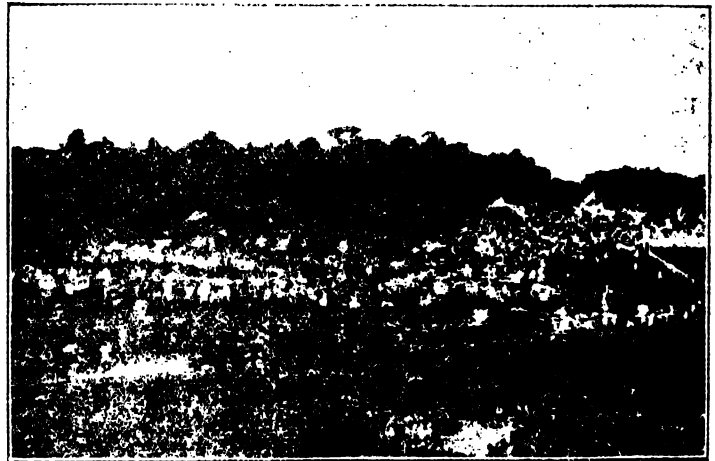
এক্ষণে শাহ্ জালাল-এর সমাধি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন।

ইহার পর বিচক্ষণ শাহ্ জালাল সীল্‌হটের অন্তঃপাতী 'তরফ' রাজ্যের রাজা, দুরন্ত আচকনারায়ণকে জব্দ করিবার নিমিত্ত বারো জন কূট-বুদ্ধি শিষ্যকে বিভিন্ন সেনাদলের অধিনায়ক করিয়া পাঠাইলেন। অচিরকাল মধ্যে ঐ রাজ্য মুস্‌লিম জাতির করতলগত হইল।

তাঁহার শিষ্য নাসির উদ্‌দীন এই রাজ্যের ইস্‌লাম প্রচারক নিযুক্ত হইয়া পাপের শাস্তি-স্বরূপ পূর্ব্বতন বিধর্ম্মী অত্যাচারী রাজাকে মথুরাতীর্থে নির্ব্বাসিত করিলেন। তরফ-নগরের অন্য নাম "বারো আওলিয়ার মুলুক।"

শাহ্ জালাল ও তদীয় অন্যান্য ভক্ত শিষ্যদের নামের

সহিত মিল রাখিয়া লাংলা, কানিহাটী, চৌকি, সুলতানপুর, দিনারপুর, দাউদপুর প্রভৃতি অনেক গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। এখানকার বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান শাহ্ জালাল-এর এবং তাঁহার সেবক আওলিয়াদের বংশধর।

এই মহাত্মা ত্রিশ বৎসর কাল বিপুল উৎসাহে রাজকার্য্যে সুপরামর্শ দিবার পর ১৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। শহরের অনতিদূরে অপেক্ষাকৃত একটী নির্জ্জন পাহাড়ের উপর অদ্যাপি বিশাল গম্বুজ-বিশিষ্ট মস্জিদ ও তাঁহার সমাধি বিদ্যমান। প্রতি বৎসর "শবে-কদর" (সম্মানিত রজনী) ও "শবে-বরাত" (অদৃষ্ট-রজনী) এর সময়ে তথায় বহু হিন্দু মুস্লিম নর-নারী উপস্থিত হইয়া সসম্ভ্রমে মাজার দর্শন করে। কবরের কতকটা শ্বেত মার্ব্বল পাথরে মণ্ডিত এবং সর্ব্বদাই একখানা কাপড় দ্বারা তাহা আবৃত থাকে। পাদুকাসহ তথায় উঠা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ।

মহাজন শাহ্ জালাল আজীবন কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, তিনি ইচ্ছা করিয়াই রমণী-মুখ অবলোকন করেন নাই বলিয়া তথায় স্ত্রীলোকদের উঠা মানা আছে। এই পর্ব্ব ব্যতীত "লক্কড় তোড়া" ও "ওর্সের মেলা" নামে আরো দুইটি উৎসব প্রতি বৎসর নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তখনো বহুস্থান হইতে অগণিত লোক তথায় জড় হয়। দরগাহের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্ট মাসিক একশত টাকা বৃত্তি দেয়। উৎসবের সময়ে মহাত্মার সম্মানার্থ স্থানীয় স্কুল, মাদ্রাসা প্রভৃতি সাধারণ প্রতিষ্ঠান সমূহ বন্ধ থাকে। অগণিত উজ্জ্বল আলোক-মালায় তখন সমগ্র শহর উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সে অতি অনুপম দৃশ্য!

চিরস্মরণীয় শাহ্ জালাল-এর মস্জিদ ও সমাধির গাত্র হইতে এ পর্য্যন্ত সাতখানি শিলা-লিপি পাওয়া গিয়াছে। উহাতে আরবী তোগ্রা অক্ষরে উহার নির্ম্মাণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ও তারিখ লিখিত আছে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের পূর্ব্বতন গবর্ণর ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলার সাহেব ঐ পাষাণ লিপিগুলি প্রাচীর গাত্র হইতে সযত্নে উৎখাত করেন এবং প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় উহার পাঠোদ্ধার হয়।

এতদ্ব্যতীত আজিও এই দরগায় মৃগচর্ম্মের জায়নামাজ, খড়ম, জুলফিকর তরবারি, উট পাখীর ডিম, তৈয়ম্মম প্রস্তর ফলক, ইত্যাদি মুফ্‌তি নাসিরউদ্দীন সাহেবের আন্তরিক যত্নে রক্ষিত হইতেছে।

১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার ফৌজদার মোরাদ বক্‌স্ সাহেব একটী প্রকাণ্ড তাম্র নির্ম্মিত দেকচি জালাল-এর দরগায় আগত বিদেশী যাত্রীর আহারের সুবিধার জন্য প্রেরণ করেন। তদ্দ্বারা প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোকের প্রভূত উপকার সাধিত হইতেছে।

দরগায় একটি স্বচ্ছ সলিল পূর্ণ কূপ আছে। প্রকাশ,—মক্কায় অবস্থিত জমজম্ কূপের সহিত ইহার অন্তঃপ্রবাহ বিদ্যমান। ঋতুভেদে বারোমাস ইহাতে জলভরা থাকে। তন্মধ্যে নানা রঙের সুদৃশ্য মৎস্য বিচরণ করিয়া বেড়ায়। অধুনা কূপটিকে সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার সম্বন্ধে বহু অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা শুনা যায়। কিংবদন্তী,—চষ্নী পীর সীল্‌হটের মাটি পরীক্ষা করিয়া মক্কার মাটির সহিত ইহার রূপ, গন্ধ ও স্বাদের অপূর্ব্ব মিল দেখিতে পাইয়াছিলেন।

শাহ্ জালাল-এর ৩৬০ জন অনুচরের মধ্যে ১৮ জনের নাম অদ্যাবধি জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ আসামের অরুণ জঙ্গলে, লোক-লোচনের অন্তরালে তাঁহাদের সমাধির ক্ষীণ অস্তিত্ব লুক্কায়িত আছে। ইহা বাদে এ'মন প্রদেশের রাজকুমার শেখ্ আলির দেহ গুরু-জালাল-এর সমাধির দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত।

মোহাম্মদ জিয়াউদ্দীনের কবর পুরাতন 'লেনমহল্লায়' বিরাজমান। সেখানে আরো চারিজন আওলিয়া চিরশয্যায় শায়িত। ঐ স্থানের নাম "পাচপীরের মোকাম"। তথাকার ঈদগাহ'র স্বভাব-শোভা অতীব মনোমুগ্ধকর। শেখ জিয়াউদ্দীনের কবর 'দেওরালি' পরগণায় অবস্থিত। তত্রত্য চৌধুরীগণ তাঁহার বংশধর। দরিয়া পীরের সমাধি উপাসনা-সৌধের পূর্ব্বপার্শ্বে বর্ত্তমান।

জালাল শাহের বারোজন সঙ্গীর মধ্যে আরবের জাকারিয়া, আবু দাউদ, গজনীর মক্দুম জাফর, সৈয়দ মোহাম্মদ, মুলতানের আরেফ এবং আজমীরের শরীফ বিখ্যাত।

গত ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে শিলং হইতে ফিরিবার পথে শাহ্ জালাল-এর স্মৃতিবিজড়িত কীর্ত্তিভূমি দেখিবার সুযোগ আমারও হইয়াছিল। ঐ পুণ্য-তীর্থের অল্প দূরে "ধারণ" গ্রামে মদীয় স্কুল-জীবনে পারস্যভাষার শিক্ষক শ্রদ্ধাস্পদ মৌলবী মোছদ্দর আলি চৌধুরী সাহেবের বাসভবন।

যাহা হউক, সীল্‌হট বৈষ্ণব গুরু চৈতন্যদেবের পিতৃভূমি, অদ্বৈতাচার্য্যের জন্মভূমি এবং মহাত্মা শাহ্ জালালের কর্ম্মভূমি, স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দনের সাধন-ভূমি। এখানকার হিন্দু-মুস্লিমের মধ্যে জাতিগত, ধর্ম্মগত বৈষম্য ও কুসংস্কার লইয়া কোন প্রকার অপ্রীতিকর বিরোধের সৃষ্টি হইতে শোনা যায় না। ইহা সংগ্রাম-শ্রান্ত সৈনিক, তাপস-বীরের শুভ আশীর্ব্বাদেরই ফলে বোধ হয়।*

---

* আমার পরম শুভানুধ্যায়ী মিঃ এ, সালাম, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের নিকট হইতে এই প্রবন্ধের জন্য কিছু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি—তজ্জন্য আমি তাঁহার কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। —লেখক।

মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা

—প্রবন্ধ—

—আহ্‌সান উল্লা

বর্ত্তমানে মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা একটি জটিলতম আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইহার সমাধান কিছুই হইতেছে না। সকলেরই দৃষ্টি Reformed scheme এর দিকে পড়িয়াছে। দেশের অন্যান্য শিক্ষা-পদ্ধতি যেমন দোষ-ত্রুটি শূন্য নয়, তদ্রূপ ইহাতেও বহু দোষ-ত্রুটি আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবেই। Reformed scheme সম্বন্ধে যতগুলি আলোচনা দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি, তাহার সবগুলিই অল্পাধিক কুসংস্কার (Prejudice) ও পক্ষপাত-দুষ্ট বলিয়া বোধ হইল। এরূপ হওয়াও অনেকটা স্বাভাবিক। কারণ দুই-শ্রেণীর লোক ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। সাধারণ বিভাগের (General line) শিক্ষিতগণ; যাঁহারা মাদ্রাসা, মক্তব, মৌলবী, মোল্লা ইত্যাদি মকার আদিতে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। অপর দল পুরাতন পদ্ধতির শিক্ষিত মৌলবী, মওলানাগণ; যাঁহারা নূতন কিছু ও ইংরেজীর নামে আতঙ্কিত। মুক্ত-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই কোন বিষয়ের সমালোচনা করিলে উহার ভাল ও মন্দ উভয়দিক আলোচনা করেন। কিন্তু ইঁহারা Reformed scheme এর কতকগুলি প্রকৃত বা অপ্রকৃত দোষ দেখাইয়া ফতুয়া দিয়া বসেন যে, অবিলম্বে ইহাকে জাহান্নামে পাঠান হোক্, নতুবা মুসলমানের নিস্তার নাই। ইহার দ্বারা সমাজের কোন হিত হইল কিনা—এবিষয়ে একটি শব্দও ইহাদের মুখে শুনা যায় না।

আমরা মুসলমানরূপে বাঁচিতেও চাই মরিতেও চাই, প্রত্যেক মুসলমান ইহাই কামনা করেন। আমাদের কোমলমতি বালকদের শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের ভার এমন সব লোকের হাতে ন্যস্ত করা হইয়াছিল, যাহারা অন্তরে বাহিরে পৌত্তলিক এবং মুসলমানদের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা পোষণ করে। বালকদিগকে এমন সব সাহিত্য পড়িতে দেওয়া হয়, যাহাতে মুসলমানী ভাব-ধারার লেশমাত্র নাই; কিংবা মুসলমান মহাপুরুষ ও মহৎ লোকদের নাম-গন্ধ নাই। অন্যদিকে রাম, লক্ষণ, সীতা, অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায় ইত্যাদি মহৎ লোকদের ত্যাগ ও মহত্বের কথা ও পৌরাণিক কাহিনীতে সমুদয় সাহিত্য পরিপূর্ণ। মুসলমান ছেলেরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে অন্তরে-বাহিরে হিন্দু সভ্যতার অনুরক্ত হইয়া পড়িল, এবং নিজধর্ম্মের প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ করিল। ফলে পুরাতনপন্থিগণ এই শিক্ষার বিরুদ্ধে মত দিয়া বসিলেন। ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণ প্রমাদ গণিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের সন্তানদিগকে ঐসব বিদ্যালয়ে পাঠাইতে রাজি হইলেন না। ফলে দেশে অসংখ্য পুরাতন ধরণের মাদ্রাসা গজাইয়া উঠিল। মুসলমান ছেলেরা দলে-দলে এসব মাদ্রাসায় পড়িতে লাগিল। এই মাদ্রাসাগুলি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জাতীয় ইতিহাস বিবর্জ্জিত হওয়ায় এগুলির দ্বারা কোন কাজের লোক হইল না বরং ইহারা সমাজের বোঝা হইয়া রহিল।

এই সময় কতিপয় মনীষী Reformed scheme এর উদ্ভব করিলেন। ইহার সহিত গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি থাকায় দিন-দিন ইহার প্রসার বাড়িয়া চলিল। যে সব স্থানে পুরাতন ধরণের মাদ্রাসা ছিল, সে সব স্থানে Reformed মাদ্রাসা স্থাপিত হইল। মুন্সি-সাহেব ও মিঞা-সাহেবদের কোরাণ-পাঠশালাগুলি প্রাইমারি মক্তবে পরিণত হইল। ইহার ফলে, যে সব ছেলে মোটামুটি ধরণের কোরাণ পাঠ ও সামান্য উর্দ্দু-ফারসী ব্যতীত আর কোন শিক্ষা পাইত না, তাহারা কিছু বাংলা-ইংরেজীও শিক্ষা পাইতে লাগিল।

Reformed type এর মাদ্রাসা ও মক্তব দ্বারা সমাজের কতখানি লাভ বা ক্ষতি হইল, এখন তাহাই বিবেচ্য। বাংলা সরকারের Report এ দেখা যায়, ১৯২৮—২৯ সনে মুসলমান যত বালক-বালিকা লেখাপড়া করিতেছিল, তন্মধ্যে শতকরা ৭২·৬ জন Reformed type এর মাদ্রাসা ও মক্তবে পড়িতেছে। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই Reformed scheme এর কল্যাণে প্রায় বার-আনা বালক-বালিকা অন-ইসলামিক সাহিত্য ও ভাবধারা হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছে। ইহা কম লাভের কথা নয়। যদি Reformed type এর মাদ্রাসা ও মক্তব মুন্সী-সাহেবদের কোরাণ-পাঠশালা ও পুরাতন ধরণের মাদ্রাসার স্থান দখল না করিত, তবে এই সাড়ে সাত লক্ষ বালক-বালিকার মধ্যে অধিকাংশের ভাগ্যে যে লেখাপড়া ঘটিয়া উঠিত না, ইহা অবধারিত।

বাংলাদেশে Reformed type মক্তব ২৪১৮৬টি, জুনিয়ার মাদ্রাসা ৬১০টি এবং ২৭টি সিনিয়ার মাদ্রাসা আছে। এ সব বিদ্যালয়ের শিক্ষক সমস্তই মুসলমান। প্রতি মক্তবে গড়ে ২ জন, জুনিয়ার মাদ্রাসায় ৬ জন ও সিনিয়ার মাদ্রাসায় ১৪ জন করিয়া শিক্ষক ধরিলে শিক্ষক সংখ্যা ৫৪৮৫০ জন দাঁড়ায়। ফলতঃ ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, Reformed scheme ৫৪৮৫০ জন শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিয়া সমাজের বেকার-সমস্যার কতকট সমাধান করিয়াছে; এবং ইঁহাদের অধিকাংশের যে শক্তি ও শ্রম বিপথে নষ্ট হইতেছিল, তাহা সমাজের কাজে লাগাইয়া দিয়াছে। মাদ্রাসা ও মক্তবের উৎপত্তি না হইলে শিক্ষাদান কার্য্যে মুসলমানের স্থান তেমন বিরল হইত, যেরূপ বর্ত্তমানে উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে বিরল।

মাদ্রাসা ও মক্তবে যে সব পুস্তক পড়ান হয়, প্রায় তাহার সমস্তই মুসলমান কর্ত্তৃক লিখিত, প্রকাশিত ও বিক্রীত হয়। ইহার দ্বারা মুসলমানের ঘরে কম টাকা আসে না। ইহারই কল্যাণে বহু মুসলমান গ্রন্থকার, এসলামী পুস্তকালয় ও ছাপাখানা দেখিতে পাওয়া যায়। আজ এই scheme উঠিয়া গেলে আগামী কল্যই ইহাদের তল্পি-তল্পা উঠাইতে হইবে। কারণ আমরা খুব ভাল করিয়াই জানি যে, উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে মুসলমান লিখিত পুস্তক অতি কমই পাঠ্য করা হয় এবং মুসলমান Library ওয়ালারাও এই সব বিদ্যালয় হইতে order অতি কমই পাইয়া থাকেন। এই সব বিষয় বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, Reformed scheme বাংলার মুসলমানের শত উপকার করিয়াছে এবং ইহার উদ্ভবকারী মনীষী শামসুল উলামা আবুনছর ওহীদ সাহেবের নিকট বাংলার মুসলমান কতখানি ঋণী।

এখন আমরা Reformed schemeএর দোষ ত্রুটির দিক আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। ইহার প্রধান দোষ বলা হয় যে, এখানে বাংলা, ইংরেজী, আরবী ও উর্দ্দু এই চারিটি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। ছেলেদের পক্ষে এতগুলি ভাষা আয়ত্ত করা কঠিন হইয়া পড়ে। একথাটি সম্পূর্ণরূপে ঠিক নহে। কারণ প্রথম হইতে তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত উর্দ্দু ও আরবী ভাষারূপে শিক্ষা দেওয়া হয় না। উহার বর্ণ-পরিচয় ও সহজ পঠন শিক্ষা দেওয়া হয় মাত্র। আবার আরবী ও উর্দ্দু উভয়ের বর্ণমালা এক। সুতরাং উভয়কে এক বলিলেই চলে ফলতঃ ৩য় শ্রেণী পর্য্যন্ত শুধু বাংলাই ভাষারূপে পড়িতে হয়। আরবী বর্ণপরিচয় এবং কিছু দোয়া কলেমা শিক্ষা করিতে হয়। হিন্দু ছেলেদের এরূপ কিছু শিক্ষা করিতে হয় না। কারণ তাহাদের কোন বিধিবদ্ধ উপাসনার নিয়ম নাই এবং অধিকাংশ লোক ইহার ততটা দরকারও বোধ করেন না। পূজা পার্ব্বণ যাহা কিছু হয়, তাহাতে কোন মন্ত্র-তন্ত্র আওড়াইতে হইলে, তাহা ব্রাহ্মণদেরই করিতে হয়; অন্যান্য লোকের তাহার আবশ্যতা নাই। কিন্তু প্রত্যেক মুসলমানকে নামাজ, রোজা ইত্যাদি বিধিবদ্ধ উপাসনা স্বাধীনভাবে করিতে হয়; উপাসনায় কোরাণ ও আরবী দোয়া কলেমা পাঠ করিতে হয়। মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে পার্থক্যই এইটুকু যে, মুসলমান কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ প্রকারের ধারণা ও আস্থা পোষণ করিয়া থাকে এবং বিশেষ পদ্ধতিতে উপাসনা করিয়া থাকে। সুতরাং মুসলমান মুসলমানরূপে বাঁচিতে ও মরিতে চাহিলে, এসব বিষয় তাহার শিক্ষা করিতে হইবে।

সাধারণ বিভাগে এই শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় মুসলমানের দুইটি মহাক্ষতি হইয়াছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা-হেতু এই বিভাগের ছাত্রগণ ধর্ম্ম-কর্ম্মে উদাসীন হইয়া পড়ে।

ইহার ফলে ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণ তাঁহাদের সন্তানদিগকে ঐ সব বিদ্যালয়ে আদৌ পাঠান না। অথবা প্রথমে কিছু ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া পরে পাঠান। তখন হয়ত ছেলেদের বয়স বেশী হইয়া যায় অথবা তাহার শক্তি এ দিকে ব্যয় হইয়া যায় বলিয়া আর তাহার লেখা-পড়া হয় না।

অবশ্য তৃতীয় শ্রেণী হইতে উপরের দিকে আরবী ও উর্দ্দু সাহিত্য-হিসাবে পড়ান হয়। বর্ত্তমানে আমরা উর্দ্দুর আবশ্যকতা অনুভব করি না। সুতরাং আপাততঃ ইহা উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে অথবা optional করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যদি ভারতে দেশীয় শাসন প্রবর্ত্তিত হয়, তখন হয়ত হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই উর্দ্দু বা হিন্দি শিক্ষা করিতে হইবে। বাংলা, ইংরেজী ও আরবী এই তিনটীর উপরই জোর দেওয়া হয়। সাধারণ বিভাগে সপ্তম শ্রেণীর নিম্নে আরবী-ফারসী পড়ান হয় না; এখানে পড়ান হয় এবং এখানে নিম্নেও পড়ান হয় বলিয়াই এখানের ছেলেরা উপরে গিয়া কিছু শিক্ষা করিতে পারে। সাধারণ বিভাগের ছেলেরা নিম্নে আরবী-ফারসী পড়িতে পায় না বলিয়া উপরে গিয়া তাহারা আরবী-ফারসী শিক্ষা করিতে পারে না। এমন কি বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াও আরবী ও ফারসীতে বড় একটা জ্ঞান হয় না। সুতরাং ইহা যে একটা পণ্ডশ্রম মাত্র তাহা সকল ভুক্তভোগীই স্বীকার করিবেন। এ শক্তি অন্য দিকে খাটাইলে অনেক কাজ হইত। যদি আরবী শিক্ষার দরকারই বিবেচিত হয়, তবে তাহা এই পরিমাণ হওয়া আবশ্যক যাহাতে একটা জ্ঞান হয় এবং কাজে লাগে। নতুবা এই পণ্ডশ্রমের কোন মূল্য নাই। কাজেই এ দিক দিয়া মাদ্রাসার ব্যবস্থাই যে শ্রেয় তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

মাদ্রাসা বিভাগে অতিরিক্ত কি কি বিষয় পড়ান হয় এখন তাহাই বিবেচ্য। মাদ্রাসায় আরবী সাহিত্য দুই পত্র (Papers) সপ্তাহে দশ ঘণ্টা পড়ান হয়। হাই স্কুলেও অতিরিক্ত পত্রসহ দুই পত্র আরবী বা ফারসী সপ্তাহে ৯ ঘণ্টা পড়ান হয়। এবং উভয় বিদ্যালয়ে ইংরেজী দুই পত্র সপ্তাহে ১২ ঘণ্টা পড়ান হয়। গণিত এক পত্র মাদ্রাসায় ৩ ঘণ্টা ও স্কুলে ৬ ঘণ্টা (মাদ্রাসায় এল্‌জাবরা ও জ্যামিতি দুই খণ্ড বাদ) বাংলা বা উর্দ্দু মাদ্রাসায় তিন বা চার ঘণ্টা এবং স্কুলে ৪ ঘণ্টা পড়ান হয়। অতিরিক্ত পত্র (গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি) স্কুলে দুই বা তিন ঘণ্টা এবং মাদ্রাসায় (এল্‌জাবরা ও জ্যামিতি অবশিষ্ট দুই খণ্ড এবং ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি) দুই বা তিন ঘণ্টা পড়ান হয়। এতদতিরিক্ত মাদ্রাসায় দিনিয়াতের এক Paper তিন বা চারি ঘণ্টা পড়ান হয়। এখন দেখা যায় যে, মাদ্রাসায় দিনিয়াতের পত্রটিই (Paper) বেশী, অন্যান্য সকল বিষয়ই প্রায় সমান সমান আছে। কেবল যাহারা অতিরিক্ত অঙ্ক না নেয়, তাহাদিগকে এল্‌জাবরা ও জ্যামিতি দুই খণ্ড পড়িতে হয় না। গণিতে যাহারা দুর্ব্বল, তাহাদের জন্য এটা একটা বড় সুবিধা যে, সব মাদ্রাসার ছাত্র additional Math নিলে, তাহারা ভবিষ্যতে বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদিতে ঢুকিতে পারিবে।

মাদ্রাসায় আরও সুবিধা এই যে additional paper সপ্তম শ্রেণী হইতে খোলা হয় এবং দিনিয়াত ও আরবী বাংলার Mediumএ পড়ান হয়; স্কুলে ৯ম শ্রেণী হইতে খোলা হয় এবং আরবী, ফারসী ইংরেজীতে পড়ান হয়। এস্থলে দেখা যায় যে, যাঁহারা বলেন যে, মাদ্রাসার ছেলেদিগকে অনেকগুলি অতিরিক্ত বিষয় পড়িতে হয়, এবং এখানে বহু বিষয় একত্র করিয়া একটি "খিচুড়ি" পাকান হয়, তাঁহাদের এ ধারণা ভুল। যে ছাত্র মাদ্রাসার যে শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে, সে যে কোন স্কুলের ঠিক ঐ শ্রেণীতেই ভর্ত্তি হইতে পারে। এবং Matriculation পাশ করার পর যে কোন কলেজে ভর্ত্তি হইতে পারে। তাহারা সেখানে গিয়াও ভালই ফল করে। সুতরাং মাদ্রাসার ছেলেরা কিছুই শিখে না; সাধারণ বিভাগের ছেলেদের যে জ্ঞান হয়, তাহার দশ ভাগের এক ভাগ জ্ঞানও এদের হয় না বা 'লিবারল এডুকেশন' হয় না; এই সমস্ত কথা অমূলক ও কুসংস্কারপ্রসূত। এই করটিয়ায় হাই মাদ্রাসা ও হাই স্কুল একই প্রাঙ্গনে রহিয়াছে। উভয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ উভয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া মত প্রকাশ করেন যে, মাদ্রাসার ছাত্রগণ স্কুলের ছাত্রদের চেয়ে বাংলা ও ইংরেজীতে হীন নহে এবং দিনিয়াত ও আরবীতে মাদ্রাসার ছেলেদের জ্ঞান অধিক। শিক্ষা-বিভাগের কোন কোন কর্ত্তা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, মাদ্রাসা ও মক্তবের শিক্ষা আশানুরূপে ফলোদায়কভাবে (efficiently) হইতেছে না। স্কুলের সমান Standard

এর পাঠ্য পড়াইয়া মাদ্রাসা ও মক্তবের ফল যদি ভাল না হয়, তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, কর্ত্তাদেরই যত্নের ক্রটি আছে। তাঁহারা হয়ত উপযুক্ত শিক্ষক ও পরিদর্শকের ব্যবস্থা করেন নাই। প্রকৃত ব্যাপারও তাই। বেসরকারী মাদ্রাসা ও মক্তবের শিক্ষক বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকের চেয়ে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। Reformed scheme একটি নূতন জিনিষ। ইহাকে ফলপ্রসূ করিতে হইলে, ইহার জন্ম বিশেষ প্রকারের Trained শিক্ষক ও পরিদর্শক তৈয়ার করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা করা হয় নাই, সুতরাং ফলও ভাল হয় নাই। কর্ত্তাদের এই মন্তব্য সংশোধিত পাঠ্যতালিকা (Revised syllabus) এর পূর্ব্বকার। বর্ত্তমান syllabus অনুযায়ী শিক্ষা হইলে ভাল ফল না হওয়ার কোনই কারণ নাই।

জনৈক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি লিখিয়াছেন—"মাদ্রাসা প্রথা মুসলমানকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার ভান করিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা দেয় না। সমগ্র সভ্যজগতের সংস্পর্শ হইতে মাদ্রাসার ছাত্রগণকে বহুদূর করিয়া দেয়—একটা একটানা নাকি-নাকি ভাব, তেজহীন, নিস্তেজ, নীরস মনোভাব। এই প্রথা কোমলমতি বালকদের মধ্যে এমন বিকট ভাব আনিয়া দেয় যে, মনে হয় না যে উহারা বর্ত্তমান সভ্যজগতের লোক।...যাহাকে ইংরাজীতে বলে Liberal Education মাদ্রাসা তাহা শিক্ষা দেয় না, সেইজন্য ছেলেদের মন প্রশস্ত হয় না। ধর্ম্মশিক্ষার নামে সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামী শিক্ষা হয় মাত্র।"

পাঠক উপরি উল্লিখিত পাঠ্যতালিকা একটু মনোনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই সব উক্তি কোনও বিকারগ্রস্তের প্রলাপ বই আর কিছু নয়। ধর্ম্মের সমস্ত বিষয়ই শিক্ষা দিবে মাদ্রাসা এরূপ ঘোষণা কখনও করে নাই; তাহা সম্ভবও নয়। মাদ্রাসায় ধর্ম্মের এতটুকু শিক্ষা দেওয়া হয়, যাহা না হইলে নয় এবং যাহাতে ভবিষ্যতে ধর্ম্ম বিষয়ের উচ্চশিক্ষা লাভের পথ উন্মুক্ত হয়। Old type মাদ্রাসায় প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে হইলে আরবী পঠন ও উর্দ্দু, ফারসী লিখন, পঠন এবং তাহাতে সামান্য জ্ঞান থাকা দরকার। এই পরিমাণ জ্ঞানলাভ করিতে চারি-পাঁচ বৎসরের কম সময় লাগে না। সুতরাং সেটাকে দশ বৎসরের কোর্স Course) না বলিয়া ১৪ কি ১৫ বৎসরের কোর্স বলা উচিত। Reformed মাদ্রাসায় আরবী বর্ণ পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া দশ বৎসরের কোর্স পড়ান হয়। সুতরাং পুরাতন ধরণের মাদ্রাসার সহিত তুলনা করিতে হইলে Reformed মাদ্রাসার ৩য় শ্রেণীকে পুরাতন ধরণের মাদ্রাসার প্রথম শ্রেণীর সমান ধরিতে হইবে। অর্থাৎ আরবী ও ধর্ম্মশিক্ষার দিক দিয়া Reformed মাদ্রাসার দশম শ্রেণী পুরাতন মাদ্রাসার ৮ম শ্রেণীর সমান হইবে।

গোঁড়ামী বা হটকারিতা বলিতে আমরা এই বুঝি যে, হক-নাহক বিচার না করিয়া কোন বিষয়ে আঁকড়িয়া থাকা। মাদ্রাসার কোর্সে এই প্রকারের কোন পাঠ্য নাই। পাঠক ইচ্ছা করিলে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। যে কোর্স পড়িয়া স্কুলের ছেলেরা সভ্যজগতের স্বর্গলাভ করে, মাদ্রাসার ছেলেরা সেই কোর্স পড়িয়া কি করিয়া যে সে স্বর্গ হইতে "বহুদূরে সরিয়া যায়" তাহা বুঝিতে আমরা অপারগ। ইংরেজী, বাংলা, আরবী, ফারসী ইত্যাদি পড়িয়া সাধারণ বিভাগের ছেলেদের নাকের ছিদ্র খুব খোলাসা হয়, তেজবীর্য্যও বাড়ে, আর এই মাদ্রাসার হতভাগা ছেলেগুলির নাকের ছিদ্র ত বন্ধ হয়ই, তেজবীর্য্যও চলিয়া যায়। এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। কিন্তু শিক্ষাবিভাগের কতিপয় বড় বড় কর্ত্তার কি যে মতিভ্রম হইল বুঝি না। তাঁহারা এখানকার মাদ্রাসা ও স্কুল পরিদর্শন করিয়া মন্তব্য পাশ করিলেন যে, মাদ্রাসার ছেলেগুলি স্কুলের ছেলেদের চেয়ে অধিকতর Smart ও কর্ম্মপটু বোধ হইল।

Reformed মাদ্রাসার আর একটা দোষের কথা বলা হয় যে, হিন্দু-মুসলমান দুই জাতি এক দেশে বাস করিয়া এরূপ পৃথক পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করিলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ বাড়িয়া যাইবে। আমরা বলি, যে কারণে পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা মুসলমানের জন্য দরকার, সে কারণে পৃথক শিক্ষানুষ্ঠানও দরকার। যতদিন না মুসলমানের ধর্ম্ম ও সভ্যতাকে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থান দেওয়া হইবে, ততদিন পৃথকই থাকা উচিত। যদি কখনও স্থান দেওয়া হয়, তখন শিক্ষা সমস্যার সমাধান হইবে। তাহা এরূপে হইতে পারে (১) ইংরেজীর জোর আর

একটু কমাইয়া হাইস্কুলে দিনিয়াত ও আরবী (একটী পত্র সপ্তাহে ৬ ঘণ্টা) ৩য় বা ৪র্থ শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত যোগ করিয়া দিতে হইবে। হিন্দুরা ধর্ম্ম-শিক্ষা চাহিলে তাদের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা থাকিবে। অথবা ঐ সময় তাহারা সঙ্গীত-শিক্ষা করিতে পারিবে। (২) উর্দ্দু ও ফারসী উঠাইয়া দিতে হইবে। (৩) ৭ম শ্রেণী হইতে আরবী সাহিত্য দুই পত্র (অতিরিক্ত পত্র সহ ৯ ঘণ্টা) করিতে হইবে। (৪) দিনিয়াত এক পত্র (বাংলা ভাষায়) ৩ ঘণ্টা করিতে হইবে। (৫) সমস্ত শিক্ষা বাংলা ভাষায় দিতে হইবে। (৬) বর্ত্তমানে হাই-স্কুলে যে পরিমাণ আরবী পড়ান হয়, আপোস হইলে আরবীর standard আর একটু উচ্চ করিতে হইবে, যাহাতে ছেলেদের একটু জ্ঞান হয়। এই কারণে মাদ্রাসা ও স্কুল একাকার হইয়া যাইবে। তখন আর পৃথক প্রতিষ্ঠানের দরকার থাকিবে না। আমাদের মতে এইরূপে শিক্ষা-সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

বর্ত্তমানে অধিকাংশ হাই-স্কুলে দুই জন করিয়া মৌলবী আছেন। উপরিউক্ত রূপে আপোস হইলে তিন জন মৌলবীর দরকার হইবে। Islamic B. A. বা কথকুল মোহাদ্দেসীন, একজন ফাইনাল মাদ্রাসা পাশ অথবা Islamic I. A. একজন Islamic Matric অথবা ফাইনাল মাদ্রাসা পাশ মৌলবীর দরকার হইবে। ইহা করাও বিশেষ কষ্টসাধ্য ও ব্যয় সাপেক্ষ নয়।

নটরাজ

—সৈয়দ উদ্‌দীন

তোমারে প্রণাম করি, হে কাল-বৈশাখী,
তাণ্ডব খাণ্ডব দাহী ; উগ্রচণ্ডা আঁখি
হেরি মনে জাগে শঙ্কা ! বন-বনান্তরে,
বৃক্ষে-মাঠে, শত চিহ্ন রাখিয়াছ ধরে'।
লুণ্ঠনের বিধ্বংসের লক্ষ লক্ষ রেখা,
যুগান্তের কাহিনীতে গল্পে আছে লেখা।
সাম্রাজ্যে, সমাজে, মনে বহুরূপী ঝড়
ফিরিতেছ। ভূমিকম্পে কাঁপে থরথর
নিত্য মূর্ত্তি, পীড়নেতে ভাঙ্গে শাখা-ফুল,
অর্দ্ধস্ফুট পুষ্প সম হইছে নির্ম্মূল।

শত স্বপ্ন কল্পনার প্রথম প্রভাতে,
মুছিছে সিন্দুর-বিন্দু শুভ-দৃষ্টি সাথে
বধূর ললাট হতে। চুম্বনের লাল
ওষ্ঠ হতে না মুছিতে পুড়িছে কপাল।
হে অশান্ত, হে দুরন্ত, তব কৃপা-বলে
বিশ্ব হল পরিণত মাত্র বিন্দু-জলে।
ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া সৃষ্টি করি একাকার
নটরাজ নৃত্য-ভঙ্গে নাচ অনিবার।

বিড়ম্বনা

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

—উপন্যাস— —বন্দে আলী মিয়া

অধ্যায় তের

এক বৎসর পরের কথা। ইতিমধ্যে মনসুর ২৪ পরগণার একটা জায়গায় ডিস্পেন্সারী খুলিয়া বসিয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে করুণার একটি পদ্মের মতন মেয়ে জন্মিলো, তাহাকে লইয়া স্বামী এবং স্ত্রী সারাদিন আনন্দে মশগুল হইয়া গেল। সংসারের কাজ-কর্ম্ম সারিয়া দুপুর বেলায় করুণা এক-কোণে চেয়ারে বসিয়া নতুন অতিথিটির জন্য একটি উলের জামা প্রস্তুত করিতেছিল। তিন মাসের খুকীটি চুপ করিয়া নীরবে ঘুমাইতেছিল, গোলাবের মতন টুক্‌টুকে রাঙা গালের কাছে ঠোঁট দুইটা যেন পদ্মের পাপ্‌ড়ির মতন কাঁপিতেছে। ভেনাসের মতন নবনীত মুখের উপরে রেশমের গুছির মতন কুচ্‌কুচে থোকা-থোকা চুল আসিয়া পড়িয়াছে, ছোটো ছোটো হাত দুইখানা মুষ্টিবদ্ধ, করুণা চাহিয়া চাহিয়া প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া উপুড় হইয়া তার রাঙা ওষ্ঠে মৃদু চুমা খাইল।

মনসুর এ সময়টায় বাড়ী ছিল না। সে ঘণ্টা দেড়েক আগে একটা জরুরি 'কল' পাইয়া রোগী দেখিতে গিয়াছিল, তখন অবধি ফিরিয়া আসে নাই। জামার ফোঁড়্‌ তুলিবার সময়ে মনসুরের কথা মনে পড়িতেই করুণার হাত দুইটা মাঝে মাঝে নিজের অজ্ঞাতে থামিয়া যাইতেছিল, দুর্ব্বলতাকে সবেগে ঝাড়িয়া ফেলিয়া মৃদু হাসিয়া পুনরায় সে কাজে লাগিয়া যাইতেছিল।

দীর্ঘ একটা বৎসরের অধিক তাহাদের বিবাহ হইয়াছে, এই অতি লম্বা সময়টা সে পিতা-মাতার স্নেহ-স্পর্শ পায় নাই, আত্মীয়-স্বজনের আনন্দের বেষ্টন হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া দূরে রহিয়াছে। শৈশবে-বাল্যকালে তার বন্ধু-বান্ধব কৌতুক করিয়া বিবাহের কথা বলিলে, সে নিদারুণ ভাবে চটিয়া যাইত। অতি বড়ো পরিচিত আপনার জন, পিতার মধুর সোহাগ, জননীর স্নেহের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া আর যাহার ইচ্ছা হয় অচেনা-অজানা বরের সঙ্গে যাক, সে কখনো কোনোক্রমেই তাহা পারিয়া উঠিবে না—তার দ্বারা ও কাজটি একান্ত অসম্ভব। সেই কথাটি মনে পড়িতেই করুণা দুঃখে হাসিল, বেদনায় কাঁদিল। সে সেই আনন্দের নীড়, সুখের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া ভাই-বোন, পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধবকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া কী করিয়া সুখ-স্বপ্নের মধ্যে এই একটা বৎসরেরও অধিক সুদীর্ঘ কালটা অনায়াসে কাটাইয়া দিয়াছে, মাঝে মাঝে তাহাদের কথা মনে পড়িয়াছে বটে, কিন্তু একটা দিনও যে সেই অভাব সে অনুভব করিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠে নাই, ইহাতেই সে বিস্মিত হইল।

একজন অনাত্মীয়, অচেনা লোকে এমন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া চির-পরিচিত জনকে ভুলাইয়া তাহাদের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একেবারে অতি আপনার করিয়া লইতে পারে, ইহা তার সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল। নারী চিরকাল গোপন অমৃতের স্বাদ বহিয়া আনিয়া কর্ম্মক্লান্ত পুরুষকে সান্ত্বনা এবং শান্তি দান করিয়াছে। সেই কল্যাণময়ী নারীকে বাদ দিয়া পুরুষ যেমন জীবনের পথে চলিতে অক্ষম এবং জোর করিয়া পা বাড়াইলে তাহা যেমন বিশ্রী, বে-মানান হইয়া একটা কদর্য্য রূঢ়তা তার সর্ব্বকার্য্যে মাথা ঠেলিয়া

দাঁড়ায়, পুরুষকে এড়াইয়া নারী আত্ম-সংযমের নামে কেবল আত্ম-প্রতারণা ছাড়া অন্য কিছুই করে না। মদের ফেণার মতো যৌবনের কূলছাপা উচ্ছ্বাস যখন করুণার মুখে-বুকে সর্ব্বাঙ্গে উছলিয়া পড়িতেছিল এবং যখন সে একজন তরুণ যুবকের সঙ্গ নিরন্তর কামনা করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে বসন্ত-দূতের মতন মনসুর তার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

করুণা প্রশ্ন করিল, কি খবর ?

মনসুর জামার বোতামগুলো খুলিতেছিল, পাণ্ডুর মুখে জবাব দিল, সব শেষ হয়ে গেচে। ম্যাজিষ্ট্রেটের মেয়েটা জামার কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, বিশেষ যে পুড়েচে তা নয়—ও-রকমে মৃত্যু হতে পারে না, ঘরের ভেতরে জানালা-দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলো কিনা, দম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ওই রকম accident হয়েচে। নইলে বাঁচানো যেতো।

খবর শুনিয়া করুণা চমকিয়া উঠিল। পাংশু বিবর্ণ মুখে প্রশ্ন করিল, সত্যি ? মাহ্‌মুদা মারা গেচে ?

মনসুর জামাটা আল্‌নার উপরে রাখিয়া দিতে দিতে সংক্ষেপে উত্তর দিল হুঁ।

করুণা যেন হতবুদ্ধি হইয়া কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। অনেকক্ষণ পরে আস্তে-আস্তে বলিল, আহা মেয়েটা খুব ভালো ছিলো গো। এই তো জীবন—এক নিমেষেই ধূলিময়, লোকে এরই দর্প করে। মেয়েটার মুখটা কখনো কিন্তু হাসি ছাড়া দেখি নি। আহা, ওর তো কোনো অভাবই ছিলো না। বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন সবই আছেন, পড়ে ছিলোও তো খুব বড়লোকের ঘরে, তবে শুনেচি স্বামীটা ব্যারিষ্টার হলে কি হবে, একেবারে ভয়ঙ্কর মাতাল। মনে যে কার কি আগুন আছে কে জানে ? আহা, সত্যি কান্না পাচ্চে। বলিয়া করুণা নীরব হইল।

তার আর্দ্র-সকরুণ কণ্ঠ এবং ছল-ছল চোখ দুইটার দিকে তাকাইয়া মনসুরের মনটাও ঘামিয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত্তে আপনাকে দুর্ব্বলতা হইতে রক্ষা করিয়া ধীর কণ্ঠে বলিল, তুমি খুব Sentimental দেখ্‌চি, ডাক্তারি বিদ্যেটা শিখ্‌তে গ্যাচিলে কেন, তাও আবার সুধু শেখা নয়, কৃতিত্ব অর্জ্জন করে প্রশংসার সঙ্গে সর্ব্বশেষ পরীক্ষায় পাশ হওয়া। পরীক্ষায় আবার আমার চেয়ে তুমিই তো বেশী নম্বর পেয়েচো সব Subject এ।—বলিয়া মুখ বিকৃত করিয়া কষ্টে একটু হাসিবার চেষ্টা করিল।

মন ভালো ছিল না হিসাবে করুণা ইচ্ছা সত্বেও ইহার জবাব দিতে পারিল না।

অপরাহ্নে অস্তগামী সূর্য্যের সুদীর্ঘ স্বর্ণরেখা পশ্চিম-মুখী বারান্দার উপরে খোলা দরজা-পথে মেঝের উপরে আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছিল। সদ্যজাগ্রত ক্রন্দনরতা খুকীকে দুধ খাওয়াইতে যাইয়া করুণা ভয়ঙ্কর বিব্রত এবং ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিরক্তি-ভরা মুখে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তার পিঠের উপরে থাপ্‌ড়াইয়া থাপ্‌ড়াইয়া বারে-বারে এধার-ওধার করিয়া তাকে থামাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। মনসুর ডিস্পেন্সারীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। প্রশ্ন করিল, অনর্থক কাঁদাও কেন ?

করুণা জ্বলিয়া উঠিয়া জবাব দিল, অনর্থক ? আমি আর পারি নে বাপু, আচ্ছা দুধ খেলে কার পেট ভরবে শুনি—আমার না ওর ? মানুষের ভালো কর্‌তে নেই কোনোদিন। তুমি পুরুষ—জন্ম দিয়েই বেঁচে গেচ, যত ভোগ পোয়াতে হচ্চে আমাকে—কারণ আমি মা বলিয়া করুণা ঠোঁট টিপিয়া হাসিল।

মনসুর হাসিয়া উঠিল। বলিল, ঠিক বটে।

করুণা ঘাড় ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, যাও যে, বোসো। আমি জল-খাবার নিয়ে আসি। খুকীকে একটু ধরোতো ততক্ষণ।

মনসুর সতর্কভাবে হাত বাড়াইয়া খুকীকে লইতে লইতে বলিল, পেচ্ছাব কর্‌বে না তো ? কি জানি আবার বাহ্যি-টাহ্যি কর্‌লে জামা কাপড়গুলো সব নষ্ট !

করুণা যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া বলিল, দেখ্‌লে, এতেই বলে মা আর বাপ্‌। একেবারে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

করুণা খাবারের থালাটা স্বামীর দিকে সরাইয়া দিয়া কেট্‌লিটা ষ্টোভের উপর হইতে উঠাইয়া লইয়া এক পেয়ালা নিজে লইল এবং অন্য পেয়ালায় মনসুরকে ঢালিয়া দিল।

ইদানীং তাহাদের আর পূর্ব্বের মতন হাতে-হাতে ধরিয়া একত্রে বেড়াইতে যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। মনসুর বৈকাল হইতে রাত্রি ৯টা ১০টা অবধি রোগী লইয়া এত ব্যস্ত থাকিত যে, বাহিরে আসিয়া উদাস হাওয়ায় দাঁড়াইয়া

মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলা তার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। একজন আধা-বয়সী ঝি নুরির মা এবং আবদুল নামে একটা বালক-ভৃত্য তাদের সংসারে থাকিত এবং যে সময়টা পর্য্যন্ত মনসুর বাহির হইতে পারিত না, সে অবধি ঝিটি করুণার সহিত গল্প-সল্প করিত। স্বামী ডিস্পেন্সারীতে চলিয়া গেলে কোনো কোনো দিন বৈকালের দিকে খুকীকে ঝির জিম্মায় রাখিয়া আবদুলকে সঙ্গে করিয়া অথবা একা একাই করুণা সাম্‌নের সবুজ মাঠে দীর্ঘ লাল সুড়কির রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইত।

পরদিন দুপুর বেলায় মনসুর ইজি-চেয়ারে শুইয়া লেনীনের জীবন-চরিত পড়িতে পড়িতে একটুখানি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। জাগিয়া চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, করুণা খুকীর ছোটো ছোটো জামা এবং স্যাকড়াগুলা কাচিয়া আনিয়া রেলিংএর উপরে রৌদ্রে শুকাইতে দিতেছে। মনসুর হাতড়াইয়া দেখিল, কাছে সিগারেট নাই, নিদ্রা-জড়িত অবশ শরীরটাকে টানিয়া তুলিয়া ঘরে টেবিলের উপর বা দেরাজের ভিতর হইতে কৌটাটা কষ্ট করিয়া খুঁজিয়া সংগ্রহ করিতে মন কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। তাই করুণাকে ডাক দিল, ওগো শুন্‌চো?

সে ক্ষুদ্র পেনীটা যত্ন করিয়া একমনে মেলিয়া দিতেছিল, সংক্ষেপে জবাব দিল, কি বল্‌চো?

—সিগারেটের কৌটোটা ঘর থেকে এনে দাও তো, আর জান্‌লে—ম্যাচটাও যেন ভুল করে রেখে এসো না।

—দেখ্‌চো না কাজ কর্‌চি। নিজে গিয়ে নাও না।

—নিজেই যদি পার্‌বো তবে আর তোমাকে বলচি, একটু কষ্ট করে যদি লক্ষীটি—

—আচ্ছা রোসো, আবদুল—আব্‌দুল—এই ছোড়া—

—ও, তুমি বরাত দিচ্চো যে। তোমার হাত থেকে পেতে আমার কী আনন্দ, সে কী আর ওই কাট-খোট্টা ছোড়াকে দিয়ে হয়। তা'হলে আমি-ই তো ডাকতে জানতুম।

করুণা ঈষৎ বিরক্তিতে মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল, দুষ্টু! আমাকে আর রেহাই দেবে না কিচ্ছুতে।

কৌটাশুদ্ধ দিয়াশলাইটা 'ধরো' বলিয়া চেয়ারের হাতলের উপরে রাখিয়া দিয়া করুণা দোল্‌নার দিকে অগ্রসর হইল।

মনসুর কৃত্রিম ঈর্ষ্যাপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাহার চলার দিকে এবং একবার দোল্‌নার দিকে চাহিল। করুণা কি একটা গানের সুর গুঞ্জরণ করিতে করিতে দোল্‌না ধরিয়া দোলা দিতে দিতে সদ্য-জাগ্রত কন্যার সহিত কথা বলিবার দুশ্চেষ্টায় লাগিয়া গেল। মনসুর সেদিক পানে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া সত্য-সত্যই সহসা একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। এই নতুন অতিথিটি যেন তাহাদের দু'জনের মধ্যে মস্তবড়ো একটা ব্যবধানের প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছে। করুণা যেন আজকাল দূরে দূরে সরিয়া যাইতেছে, পূর্ব্বের মতন পরিপূর্ণ ভাবে তার কাছে আর ধরা দিতে চাহিতেছে না। মেয়েটা জন্মিবার পর হইতে সে তার দুধ খাওয়ান, ঘুম পাড়ান, জামা কাপড় কাচা, তেল মাখান, কাজল পরান ইত্যাদি বিষয়ে এত অধিক মনোযোগ দিয়াছে যে, অবসর সময়ে মনসুরের কাছে আসিবার ফুরসৎ সে আদপে করিয়া উঠিতে পারে না। আসিলেও 'যাই'-'যাই' করিয়া অস্থির হইয়া উঠে। কিন্তু কেহই কাহারো নিকটে মুখ ফুটিয়া অনুযোগ করিতে পারিতেছিল না। এই ব্যবধান এবং ফাঁক-ফাঁকের আবরণটা দু'জনকেই গোপনে গোপনে পীড়িত করিতেছিল। পিতা হইয়া কী করিয়া কন্যার জননীর নিকটে কন্যার বিরুদ্ধেই নালিশ রুজু করিবে—এই কথাটা ভাবিয়া সে লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া যাইতেছিল। কি ভাবে কথাটা পাড়িলে নিজেকে নিরাপদ রাখা তো যায়ই, তা'ছাড়া খুকীর শরীরেও যেন ইহার কোনো শব্দ যাইয়া স্পর্শ না করে, অথচ করুণাও সহজে বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হয় এবং সেই সঙ্গে কার্য্যটাও সিদ্ধ হইয়া আসে, এইরূপ একটা চিন্তার অভিসন্ধি আজ কয়দিন হইতে মনসুরের মগজের মধ্যে নানাভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাকে বিব্রত এবং ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে সে সঙ্কল্প আঁটিল, উপস্থিত বুদ্ধিতে যাহা মনে আসিবে, তাহাই বলিয়া ফেলিবে, শেষ অবধি কপালে যাহা থাকে তাহাই ঘটিবে।

করুণা খুকীকে কোলে উঠাইয়া লইয়া সোহাগ করিয়া মুখে-বুকে যেখানে সেখানে চুমা দিয়া স্নেহের গভীরতা

এবং আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল। মনসুর সিগারেটে গোটা দুই টান দিয়া অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থাতেই ফেলিয়া দিয়া বুঝিতে পারিল, তৃপ্তি হয় নাই সুতরাং আর একটা ধরাইয়া করুণাকে ডাক দিল, ওগো ওকে নিয়ে এসো না এদিকে। আমি কি কেউ নই নাকি ?

করুণা আসিতে আসিতে ঠোঁট ফুলাইয়া হাসিয়া জবাব দিল, হবে না কেন, "পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ পিতাহি পরমন্তপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ" ; একেবারে সব দেবতার ওপরে।

মনসুর পত্নীর চোখে চোখ রাখিয়া অধরের উভয় প্রান্ত বিস্ফারিত করিয়া হাসির অভিনয় করিল। দাঁতে সিগারেট চাপিয়া খুকীর দিকে উভয় হস্ত বিস্তার করিয়া দিয়া অস্পষ্ট স্নেহভরা সুরে ডাক দিল, আয় মা, আয়তো নুরু।

করুণা ভ্রূ কোঁচকাইয়া বলিল, কি বল্লে—নুরু ? সে কী ? মনসুর কন্যাকে কোলে লইয়া করুণার বাঁ হাতটা ধরিয়া জোরে নিজের দিকে টান দিতেই সে তার হাঁটুর উপরে বসিয়া পড়িল। 'যাও' বলিয়া উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই মনসুর জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল, বোসো।

শোন, আমি যখন বাইরে যাই তখন চুপ করে থাকো, আমি এসেই যত রাজ্যের কাজে পায় তোমাকে ? ঝি চাকরেরা রয়েচে কেন ?

—হ্যাঁ, ঝি চাকরেরা বুঝি ওই জামা মোজা বুনতে জানে কখনো। কী বুদ্ধি !

—বুদ্ধির দোষ যাই থাক, আমি বলে রাখ্‌চি ওসব আর করতে হবে না, old girl—কেবল ওজর। আমি দোকান থেকে সব কিনে এনে দেবো'খন, তাহলে সময় পাবে তো ?

ধরা পড়িয়া করুণা মনে মনে ভয়ঙ্কর রকম জব্দ হওয়ায় তার চোখ-মুখ গোলাবের মতন রাঙা হইয়া উঠিল। বলিল, হাতে করায় কেমন তৃপ্তি সে তো তুমি জানো না। আচ্ছা এখন থেকে তাই কোরো। খুকীকে বল্‌ছিলে 'নুরু'—সে কী ?

মনসুর চেয়ারের কোণ ঘেঁসিয়া বসিয়া করুণাকে পাশে সেখানেই একটুখানি জায়গা করিয়া বসাইল। বলিল, অর্থাৎ নুরন্নেছার। হ্যাঁ, সেই কথাই তো তোমাকে বলবো বলবো মনে কর্‌ছিলুম। খুকীর কি নাম রাখা যায় লতিফা, সফিয়া, নুরজাহান, রাবেয়া, নুরন্নেছার এর মধ্যে কোন্‌টা পছন্দ হয় ?

করুণা মুখ তুলিয়া জবাব দিল, খুকীর নাম রাখ্‌বে তো এসব কেন ? যেমন ফুলের মতন মেয়ে নামও তো তেমনি মানান-সই হওয়া চাই, ধরো অনিন্দিতা, দীপ্তি, প্রতিভা, শেফালী, মায়া এই রকম আর কি।

মনসুর তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া করুণার বলা নাম গুলাকে যেন উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, পাগল ! এসব কী বল্‌চো তুমি, খুকীর কেন ও-সব নাম হতে যাবে, ওর যে আমার হিসেবে নামকরণ করতে হবে—

করুণা বাধা দিয়া বলিল, তাই ওই সব অর্থহীন বিশ্রী যা তা না রাখ্‌লেই নয়, বাঙলা নামগুলো স্থাখো তো কী সুন্দর শ্রুতিমধুর !

মনসুরও তাহাকে অর্দ্ধপথে থামাইয়া দিয়া বলিল, ওই আরবি পারশির মানে বোঝো নাতো, যদি বুঝতে তবে জানতে এর চেয়েও কত মধুর !

—জানতেও চাইনে, বাঙলা দেশে বাঙালীর মেয়ের আর ও-সব খিঁচুড়িতে প্রয়োজন নেই।

—না থাক্‌লে চলে না তো। বাঙালী হলেও মুসলমানের মেয়ে তো, সেটা লোকে জানবে কি করে শুনি ?

—একা তোমারি মেয়ে, আমি ক্রীশ্চান বলে বুঝি বাদ গেলুম।

—তা যাবে কেন, তবে কথা কি জানো, পিতৃকুল অনুসারেই তো সন্তান-সন্ততির নাম রাখা হয়।

—পিতা যে কে, সে কথা অনেকে সন্দেহ করে,—অবিশ্বাস করলেও দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু মাতাকে তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কারণ সন্তান যে তারই গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয় ; সুতরাং তার বংশ অনুসারেই তো নাম রাখা উচিত।

—কক্ষনো না। মায়ের পেট থেকে পড়াকে কেউই অস্বীকার করতে পারবে না, সে কথা আমি মানি, কিন্তু জল-জ্যান্ত বাপটা সশরীরে সাম্‌নে থাকতে তাকে আর বাদ দেবে কী করে ; সুতরাং তার বংশই যে সন্তানের বংশ এর ভূরি-ভূরি প্রমাণ ইতিহাসে রয়েচে।

—যথা ?

—যথা জাহাঙ্গীর, সাজাহান ইত্যাদি। কেন, এদের নাম বিজয় সিংহ, ভবানী সিংহ হলেই পারতো।

এমন করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে পরাজিত হইবে, ইহা করুণা পূর্ব্বে কখনো ভাবে নাই, কপোল দুইটা অস্বাভাবিক রকম রাঙা হইয়া উঠিল। নৈরাশ্য-জড়িত ক্লান্ত কণ্ঠে বলিল, কিন্তু যাই বলো—মুসলমানী নামগুলো কাঠ কাঠ, ভয়ঙ্কর বিশ্রী। চোটো না, হয় তো অর্থ তার খুবই সুন্দর, কিন্তু বাঙলাদেশে বাঙালীর ছেলের আবার ও-সব জ্যাঠামি কেন ?

—বাঙলাদেশে আমরা জন্মেচি, বাঙালীও বটে, কিন্তু মুসলমান যে—সেকথা অস্বীকার করবার জো তো নেই, লোকে বুঝতে পারবে কি করে যে আমি মুসলমান। চেহারায় পোষাকে তো আজকালকার কলেজ-ইস্কুলের ছেলেদের ধরবার উপায় নেই, নামটাও যদি না রাখি—চেনাবো কি করে ?

—সুধু যে বাঙলা দেশে জন্মেচ তাই নয়, তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ বোগ্দাদে-কান্দাহারে বসে বসে মাংস রুটি খেজুর আঙুরও খেতেন না—এখনো খান না। তাঁরা এখানকারই লোক, হিন্দু থেকে দীক্ষিত। বিশ্বাস না করো, বংশাবলীর লিষ্টি ধরে ওপর দিকে যাও প্রমাণ পাবে।...তুমি মুসলমান—সে তুমি মনে-প্রাণে থাকলেই হোল, লোককে চেনানোর তো প্রয়োজন করে না, তারা তো আপনিই জানবে। দ্যাখো ব্রাহ্মরা তো নাম পরিবর্ত্তন করেনি, সে যাক্—একটা প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে—আরবি কি পারশীতে নাম না রাখলে বৈশিষ্ট্য থাকে না, তা আমাদেরই দ্যাখো না, কোন পুরুষ যে ক্রীশ্চান হয়েছিলেন, সে আমি জানি নে, ঠাকুদ্দারা জানতেন কিনা সন্দেহ, কিন্তু আমাদেরও যিশু তো এ দেশের লোক নন, সেই দেশের অনুসারে নামকরণ তাঁরা করলেই পারতেন। এমনকি উপাধিটা পর্য্যন্ত বদলান নি। সে জন্যে কোনোই অসুবিধা আমাদের নেই, অচেনা একজনের কাছে যদি আমার নামটা বলো করুণা চট্টোপাধ্যায়, সে মনে করবে হিন্দু, কিন্তু আমি যে কী সে তো আমি নিজে জানি।

মনসুর গম্ভীর মুখে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আস্তে-আস্তে জবাব দিল, কিন্তু যা দেশাচার তাকে উপেক্ষা করবার সাহস এবং সাধ্য তো আমার নেই করুণা !

করুণা অধরের উভয় প্রান্ত বিস্ফারিত করিয়া হাসিবার মতন করিয়া বলিল, এখন না থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের বিয়েটা কোন্ দেশাচার অনুসারে হয়েছিল—তার কৈফিয়ৎ তো আজো দিতে পারো না। তখন সকল বাধাকেই তো সবেগে অগ্রাহ্য করে এড়িয়ে এসেচো, আজ খুকীর নাম রাখার অতি সামান্য ব্যাপারে লোকাচার-দেশাচারের দোহাই পাড়চো, কিন্তু তোমার তো মা আছেন, না? তুমিই তাঁর একমাত্র আশ্রয়, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী', আহা, সেই জননীর কথা পর্য্যন্ত তোমার মনে পড়ে নি—আজতো তাঁকে ভুলে আছো। লোকে তোমাকে প্রশংসা করবে কি নাক সিট্‌কাবে—সে কথা ভাব্‌বার অবসর পাও নি—সব তাচ্ছিল্য করে ডিঙিয়ে এসেচো, আজকে খুকীর নাম রাখায় এত বাধা দেওয়া তো তোমার শোভা পায় না, বিশেষ তুমি বিদ্বান-বুদ্ধিমান।

ফুঁ দিয়া প্রদীপ নিবাইয়া দিলে ঘরের চেহারা যেমন মুহূর্ত্তে বদল হইয়া যায়, জননীর প্রসঙ্গ উঠিতেই সহসা মনসুরের মুখটা ফ্যাকাসে হইয়া গেল, চকিতে অন্যমনস্ক হইতেই সে দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া দুঃসহ যন্ত্রণাকে নীরবে হজম করিয়া বাহিরে স্বাচ্ছন্দ্যের ভান করিয়া বলিল, বুঝি সবই, কিন্তু ঐ বৈশিষ্ট্যটুকু না থাকলে আমার সেই হতভাগা মায়ের কোলে যে ওর ঠাঁই হবে না করুণা ! স্বর তার বেদনায় ভরা।

করুণার সারা মুখে কে যেন এক পোঁচ কালী লেপিয়া দিল। খানিকক্ষণ মরণাহতের মতন স্তব্ধ হইয়া নীরবে বসিয়া থাকিয়া করুণা বলিল,—শুধু নামের তাৎপর্য্যতার জন্যেই কি তিনি ওকে কোলে করবেন না মনে করো ?

এইবার মনসুর বিপদে পড়িল। জননীর চরিত্র তার অবিদিত নয় এবং তিনি অত গোঁড়া নহেন, শুধু নামের জন্যে তাঁহার স্নেহধারা রুদ্ধ হইবে না, ইহা সুনিশ্চয়। আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল, তা হয় তো হতে অসম্ভব কি ?

করুণা অশ্রু ছল-ছল চোখে মাটীর দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল, তবে কি তাহার সাধ বাসনা সমস্তই স্বামীর প্রদর্শিত আইন-কানুন এবং আশঙ্কার নিকট একেবারে সমাধি

লাভ করিবে। মুখ তুলিয়া সকরুণ আঁখি দুইটি স্বামীর মুখের উপরে তুলিয়া ধরিল। একেবারে সর্ব্বশেষ চেষ্টা করিয়া অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, আচ্ছা তোমার যা ভালো হয় তাই করো, আমি না হয় যা তা বলে ডাকবো।

মনসুর সদয় দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের পানে চাহিয়া আর অমত করিতে পারিল না। বলিল, এসো, একটা এমন common নাম রাখি, যাতে কারুর মনেই ক্ষোভ না থাকে—দুইজনেরই সুবিধে হয়।

করুণা এইবার পুলকিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, তেমন কি আর পাওয়া যাবে ছাই।

'নিশ্চয়' বলিয়া মনসুর চুপ করিল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া আস্তে আস্তে বলিল, ধরো নূরন্নেহার যদি হয়, নুরু বলে আমি ডাকবো, তুমি 'নীহার' বলো কেমন?

করুণার ইহা মনঃপূত হইল না, তাই সে কোনো সাড়া না দিয়া নিঃশব্দে কাঠের পুতুলের মতন পলকহীন নেত্রে বসিয়া রহিল।

মনসুর আরো খানিকটা সময় ভাবিয়া লইয়া বলিল, লতিফা নামটা কেমন, সামান্য একটু টানের ব্যতিক্রম, আমি লতিফা বলবো, তুমি লতিকা বোলো, কি লতি বা লতা বললে আর তো কোনো আড়ষ্টতাই মনে জাগতে পারে না।

যুক্তিটা করুণার অভিলাষ অনুযায়ী না হইলেও সে দেখিল, ইহাকে অপছন্দ করিবার তেমন হেতু নাই। সুতরাং সে সম্মত হইয়া ঘাড় দোলাইয়া ঘড়ির দিকে দৃষ্টি দিয়াই ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া উঠিল; এবং মনসুরের 'নাস্তা' আনিবার জন্য কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

সেইদিন সন্ধ্যার পরে খুকীকে শোয়াইয়া করুণা নিশ্চল পাথরের মতন তাহার পাশেই খাটের উপরে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। আজকার ব্যাপারটা তখন অবধি তার মনের ভিতরে গুমরিয়া ফিরিতেছিল। পাঁচ ছয় বছর পরে খুকী যখন বড় হইয়া ইস্কুলে পড়িতে থাকিবে, তখন তাহার নাম লতিকা চট্টোপাধ্যায় হইবে, না, লতিফা খাতুন হইবে - ইহাই ছিল তার ভাবনার মস্তবড় জটিল সমস্যা। পূর্ব্বেরটা না হইয়া শেষেরটা যদি হয়, তাহা হইলে তার নিজের বৈশিষ্ট্য এবং মর্য্যাদা তো থাকিবেই না, অপমানের হীনতায় বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনের নিকটে তার এতদিনকার গর্ব্বোদ্ধত উঁচু মাথাটা একদম ধূলায় লুটাইয়া পড়িবে।... তারপর যখন সে আরো বড় হইয়া বিবাহের উপযুক্ত হইবে, তখনকার কথা মনে আসিতেই করুণার বুকের রক্ত হিম হইয়া গেল। কোন্ সমাজে যে তার স্থান হইবে, বহু চিন্তা করিয়াও সে সমস্যার কোনোরূপ সমাধান সে করিয়া উঠিতে পারিল না। মুসলমান ধর্ম্ম এবং খৃষ্টধর্ম্ম উভয়ই সমান উদার, ইহার কোন্‌টা যে খুকীকে বিনাতর্কে আশ্রয় দান করিবে, সে তো তা বুঝিতে পারে না। হয়তো একটায় সে ঠাঁই পাইয়া টিঁকিয়া থাকিবে, কিন্তু দেশাচার লোকাচার যে ধর্ম্মের বিধানকেও ছাড়াইয়া চলে। কোনো পরিবার হইতেই যদি তার প্রজাপতির আহ্বান না আসে, তাহা হইলে তার দুর্দ্দশার যে অবধি থাকিবে না, কল্পনায় কন্যার তখনকার অবস্থা স্মরণ করিয়া করুণার জননী-হৃদয় শিহরিয়া উঠিল; ব্যাকুল হইল। ঘুমন্ত খুকীর চাঁদমুখের দিকে পলকহীন নেত্রে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া উপুড় হইয়া সাপটিয়া ধরিয়া তার উভয় গণ্ডে প্রচুর স্নেহের চুমা আঁকিয়া দিল।

ঠিক সেই সময়ে মনসুর নির্জ্জনে একাকী দীঘির ধারে বসিয়া গত জীবনের উপরে দৃষ্টি বুলাইয়া চলিয়াছিল। ডাক্তার হইবার পর এই অপরাহ্ণ বেলাটা তার কখনো বাহিরে বা বেড়াইয়া বৃথা কাটে নাই, ডিস্পেন্সারীতে রোগীপত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতেই কোথা দিয়া সন্ধ্যা হইয়া রাত্রি দশটা বাজিত, তাহা সে কখনো টের পাইত না। করুণা জননীর কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় সেই হইতে তার মনটা ভালো ছিলো না। ডিস্পেন্সারীতে যাইয়া কম্পাউণ্ডারকে বলিয়া দিয়াছিল যে, যদি কোনো 'কল' আসে তবে যেন বলে ডাক্তার বাহিরে গেছেন, ঔষধ লইতে আসিলে রোগীর অবস্থা শুনিয়া সে-ই যেন বিবেচনা করিয়া একটা ঔষধ দিয়া দেয়। তারপর সে সহর হইতে মাইল খানেক দূরের একটা জনহীন দীঘির ধারে আসিয়া অবসাদ ক্লিষ্টের মতন ঘাসের শ্যামাস্তরণের উপরে বসিয়া অতীতের ঝাপ্‌সা অন্ধকারে দৃষ্টি প্রেরণ করিল। জননীর স্নেহের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া সে পাতায় ছাওয়া গরীবের এক অতি জীর্ণ কুটিরে জন্মগ্রহণ করে। পিতা-মাতার আদর এবং স্নেহের প্রাচুর্য্যতায় শৈশবটাকে

আনন্দে ভরাইয়া তুলিয়াছিল। বাপ থাকিতে সে পাড়ার ছেলেদের সহিত কড়ি, মারবেল এবং ডাণ্ডাগুলি খেলিয়া সময় কাটাইয়া দিয়াছে এবং সেই হেতু একবার এক ক্লাসে সে বার দুই পর্য্যুপরি ফেলও হইয়াছিল, তাহাতে পিতা ভয়ানক রকম ক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। যখন সে মনোযোগ দিল, তখন পিতা 'নিকা' করিয়া ভিন্ন জায়গায় নূতন করিয়া ঘর সংসার গুছাইয়া লইয়াছেন, এবং যখন সে খুব ভালোভাবে আই-এস-সি পাশ দিয়া মেডিকেল কলেজে পড়িতে ইচ্ছা করিল, তখন তিনি খরচপত্র একদম বন্ধ করিয়া দিলেন। সংসারের সমস্ত বোঝা তাহার একলার ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া পড়িল। নিঃসহায় মনসুর চারিদিকে অন্ধকার দেখিল, কিন্তু দমিয়া যাইয়া অধ্যয়নের দৃঢ় অভিলাষকে পরিত্যাগ করিল না। জননী তাহাকে সকল বিপদ হইতে বুক দিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, মনসুর আঘাত পাইয়া ঘুণাক্ষরেও যেন টের না পায় সে পিতৃপরিত্যক্ত।

মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া লোকে যত বড়ো কার্য্যেই না অগ্রসর হউক, একরূপ করিয়া তাহা সম্পাদন হইয়া যায়। মনসুর চাহিয়া চিন্তিয়া ধার কর্জ্জ করিয়া কলিকাতায় যাইয়া মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইয়া গেল এবং চেষ্টা করিয়া সকাল সন্ধ্যায় দুইটা প্রাইভেট টুইসানী যোগাড় করিয়া লইয়া সে নিজের খরচ চালাইয়া অতি কষ্টে তাহার মধ্য হইতে মাতাকে কিছু কিছু করিয়া পাঠাইতে লাগিল। এমনি করিয়া সে প্রায় ছয়টা বৎসর কাটাইয়া দিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে করুণার সহিত বন্ধুত্ব হইয়া গেল। ২২।২৩ বছরের জীবনে কলম-পুঁথি-কেতাবের ফাঁকে যৌবন আসিয়া হানা দিয়াছে—সে জানিতে পারে নাই। করুণা মূর্ত্তিমতী ফাল্গুনীর মতন সুমুখে আসিয়া দাঁড়াতেই তার ভিতরকার প্রেমিক পুরুষটি জাগিয়া উঠিয়া তাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল। তখন তার পিছনে চাহিবার, ভালো মন্দ ভাবিবার অবকাশ ছিল না। এমন কি গর্ভধারিণী জননীর কথা মনে উঠিতেই সে একটু দমিয়াছিল বটে, কিন্তু শেষ অবধি তর্কের বিজয়ে, সে পূর্ণোদ্যমে সৎকার্য্যে অগ্রসর হইয়া দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিবাহে (International marriage) আদর্শ স্থাপন করিল।

...দীর্ঘ দেড় বৎসর। ইহার মধ্যে একখানা পত্র দিয়াও সে দুঃখিনী জননীর ভালো-মন্দের খবরটা পর্য্যন্ত লওয়া কর্ত্তব্য বোধ করে নাই। সংসারে তো তিনি সম্পূর্ণ একা; কি করিয়া যে দিন কাটিতেছে, তাহা এখন মনসুরের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। বর্ত্তমানে সে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, স্ত্রী-কন্যা চাকর দাসী লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতেছে। এত বড় পাষণ্ড সে, যে জননী হাতের চুড়ি, অনন্ত, নেকলেস বন্ধক দিয়া তাহাকে কলিকাতায় টাকা পাঠাইয়াছেন, বাড়ীতে স্নেহের নীড়ে ফিরিয়া আসিলে তাঁর আনন্দের অবধি থাকে নাই, সে রোগে পড়িলে যিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া শিয়রে বসিয়া একমাত্র পুত্রের ব্যাধিক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়া কেবল খোদার করুণা প্রার্থনা করিতেন, সেই কল্যাণময়ী স্নেহশীলা মা আজ তার হয়তো অনাহারে অর্দ্ধাহারে আছেন। সে এমন পাতকী যে, বিবাহের সংবাদটা পর্য্যন্ত তাঁর নিকট হইতে সযত্নে গোপন রাখিয়াছে। ভয় ছিল পাছে বিঘ্ন ঘটান। তাঁহার মাতৃহৃদয়ে কি অভিলাষ ছিল, তাহা তো সে জানিত। একটি টুক্‌টুকে রাঙা কিশোরী বধূ আনিয়া গৃহে আনন্দের প্রতিষ্ঠা করিবেন, বছর কয়েকের মধ্যে মনসুর উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিবে, পুত্রবধূর সন্তানাদি হইবে, বধূকে সংসারের সমস্ত কার্য্য বুঝাইয়া দিয়া তিনি সংসারের ঝঞ্ঝাট হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। কিন্তু ঘটনার আবর্ত্তে কোথা দিয়া কি হইয়া গেল, তিনিও কিছু জানিতে পারিলেন না, মনসুরেরও বাধা দিবার শক্তি রহিল না। নির্জ্জনে আজ সুখ-দুঃখের স্মৃতি তাহাকে ব্যাকুল-উন্মনা করিয়া তুলিল।

—ক্রমশঃ

—প্রবন্ধ—

—রিজাউল করিম বি, এ,

তৃতীয় পর্ব্ব

যে সকল ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়া ফরাসী জাতি ক্রমে ক্রমে বিপ্লবের পথে পরিচালিত হইতেছিল, তাহা আমরা দেখিলাম। আমরা দেখিলাম যে, অর্থ-নৈতিক সমস্যাই এই বিপ্লবের মূল কারণ। দেশের অর্থসঙ্কট দূর করিবার জন্য রাজা একে-একে অনেকগুলি উপায় অবলম্বন করিয়া যখন প্রত্যেকটিতেই বিফল হইলেন, তখন বাধ্য হইয়া চরম পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক ষ্টেট্স্ জেনেরাল সভা আহ্বান করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। ১৭৮৯ খৃঃ অব্দের ৯ই জুন ফ্রান্সের ইতিহাসে এক অতি স্মরণীয় দিন। ঐ দিনই মহাবিপ্লবের প্রকৃত সূচনা হয়। ঐ দিনই রাজা স্বীয় অক্ষমতা স্বীকার করিয়া শাসনকার্য্যে প্রজার সাহায্য গ্রহণ করিতে হস্ত প্রসারিত করেন। বহুযুগ হইতে ফ্রান্সের রাজা স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন দ্বারা অত্যাচার ও পীড়ন করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু প্রজার সাহচর্য্য ও সহানুভূতি ব্যতিরেকে রাজ্য পরিচালন করা যে একেবারেই অসম্ভব, ফ্রান্সের রাজা তাহা ঐ দিনই স্বীকার করেন। তিনি স্বীকার করুন আর নাই করুন, স্বৈরশাসন যে কোনও কালে শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারে না, তাহা ঐ দিনই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়া গেল।

ইতঃপূর্ব্বে যে ষ্টেট্স্ জেনেরাল সভার কথা বলা হইল, তাহা ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট-সভার ন্যায় একটি প্রতিনিধি-মূলক সভা। বহুপূর্ব্বে সাম্রাজ্যের কোনও গুরুতর সমস্যার মীমাংসার জন্য দেশের অভিজাত, যাজক ও সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া একটি মন্ত্রণা-সভা গঠিত হইয়াছিল, তাহাই অবশেষে ষ্টেট্স্ জেনেরাল নামে অভিহিত হয়। প্রাচীনকালে ঘন-ঘন ঐ সভার অধিবেশন হইত। কিন্তু ১৬১৪ খৃঃ হইতে উহার আর কোনও অধিবেশন হয় নাই। এই সুদীর্ঘ ১৭৫ বৎসর ফ্রান্সের রাজন্যবর্গ দেশ মধ্যে স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া যদৃচ্ছা-শাসন করিয়া আসিতে-ছিলেন। অনেক দিন পর আজ উক্ত সভা আহ্বানের কথা উত্থাপিত হইবামাত্র সমগ্র দেশবাসী উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

এক বৎসর ধরিয়া সভার উদ্যোগ পর্ব্ব চলিল। তৎপর সভার জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইলে, যখন তাঁহারা মন্ত্রণা-গৃহে প্রবেশ করিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে উদ্যত হইল, তখনই নানাবিধ সমস্যা আসিয়া সভার কার্য্য পণ্ড করিতে লাগিল। বৈপ্লবিক ভাবধারা দেশময় এরূপভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, অতি সামান্য ব্যাপার এমনকি বিশেষ কোনও শব্দের বিভিন্ন অর্থ লইয়া প্রতিনিধিদের মনে সন্দেহ, ভয়, বা হিংসার ভাব জাগাইয়া দিয়াছিল। কার্য্যারম্ভে সভার Constitution (গঠন-বিধি) লইয়া বাদানুবাদ আরম্ভ হইল। অভিজাত, যাজক ও জন-সাধারণের প্রতিনিধি লইয়া সভা গঠিত ছিল। পূর্ব্বে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গ পৃথক পৃথক গৃহে বসিয়া স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিত, এবং আলোচনা শেষ হইলে, লোক হিসাবে না হইয়া শ্রেণী হিসাবে ভোট দিত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, উক্ত সভায় তিন শ্রেণীর প্রতিনিধির এক-একটি করিয়া তিনটি মাত্র ভোট ছিল। হয়ত একযুগে যখন তিন-শ্রেণীর লোকের মধ্যে কোনওরূপ হিংসা, বিদ্বেষ ছিল না, তখন ঐরূপ ভোট পদ্ধতি দেশের পক্ষে কল্যাণকর ছিল, কিন্তু এই বিপ্লবের যুগে দেশের লোক উহা সমর্থন করিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না।

শ্রেণী হিসাবে ভোট দেওয়ার রীতি বিদ্যমান থাকাতে দেশের লোকের অনেক অসুবিধা ছিল। অভিজাত ও যাজকবর্গের স্বার্থ প্রায় সমভাবাপন্ন ছিল, সুতরাং এই দুই শ্রেণীর ভোট একত্র হইলে সর্ব্বদাই তাহাদের মেজরিটি (Majority) হইবার সম্ভাবনা ছিল। তৃতীয় শ্রেণী একটি মাত্র ভোট লইয়া উহাদের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারিত না। এতদিন পর্য্যন্ত তাহারা এইরূপ স্বার্থবিরোধী পদ্ধতি নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু আজ তাহারা তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত হইল না। তাহারা প্রতিবাদ করিয়া স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিল, আমরা ঐরূপ স্বার্থবিরোধী কার্য্য হইতে দিব না। নেকার তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এক উপায় অবলম্বন করিলেন। অভিজাত ও যাজকদের মোট সংখ্যার অনুরূপ সদস্য প্রেরণ করিবার অধিকার তৃতীয় শ্রেণীকে প্রদান করিলেন। কিন্তু ইহাতেও গোলমাল মিটিল না। কেন না, শ্রেণী হিসাবে ভোট দেওয়া হইত বলিয়া, সদস্য বৃদ্ধিতে তৃতীয় শ্রেণীর কোনও লাভ হইত না। তাই, প্রথম শ্রেণীদের তুল্যরূপ সদস্য পাইয়াও, তৃতীয় শ্রেণীরা দাবী করিল, ভোট দিতে হইবে, শ্রেণীগত ভাবে নহে, ব্যক্তিগত ভাবে; কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে ভোট দিবার অধিকার দিলে অভিজাত ও যাজকবর্গের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।

৫ই মে সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার দিন স্থির হইল। কিন্তু কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই এই সকল সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিল। অভিজাতগণ বলিল, আমরা সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধির সহিত একত্র এক গৃহে বসিয়া ব্যক্তিগতভাবে ভোট দিব না। পুরাকালে যেরূপভাবে স্বতন্ত্র গৃহে বসিয়া শ্রেণী হিসাবে ভোট দিতাম, আজিও তাহাই করিব। তাহাদের এই দাম্ভিকতাপূর্ণ কথা শুনিয়া তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। তাহারাও দৃঢ়ভাবে বলিল, না, তাহা হইতে পারে না, অভিজাতবর্গের মত আমরা প্রত্যেকেই দেশের প্রতিনিধি। তাহাদের ও আমাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই, সুতরাং সর্ব্বশ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গ একই মন্ত্রণাগৃহে একই সঙ্গে উপবেশন করিয়া দেশের ভবিষ্যতের বিষয় আলোচনা করিবে; এবং একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে ভোট দিবে। আমরা কোনওরূপ শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করিব না।

"They began to consider the aristocracy as a kind of fungus growing out of the corruption of society that could not be admitted even as a branch of it." তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গ ঘোষণা করিল যে, অভিজাতবর্গ ভেক-ছত্রের ন্যায় সমাজের দূষিত অংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সমাজের অংশীভূত শাখা বলিয়া উহাদিগকে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তাহারা আরও ঘোষণা করিল যে, প্রতিনিধিবর্গের প্রত্যেকেই "সম অধিকার সম্পন্ন" মানুষ এই উপাধি ব্যতীত অন্য কোনও বিশেষ গুণ তাহাদের নাই, এবং অন্য কোনও বিশেষ ক্ষমতায় কাহাকেও দেশের শাসন কার্য্যের জন্য মন্ত্রণা সভায় আহ্বান করা যাইতে পারে না। অভিজাত ও যাজকবর্গ তৃতীয় শ্রেণীর অহমিকতা দেখিয়া আরও কুপিত হইলেন, এবং তাঁহারাও দৃঢ়তার সহিত তৃতীয় শ্রেণীর কার্য্যে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ইহারাও তদ্রূপ দৃঢ় হইয়া রহিল। উচ্চশ্রেণীকে পদে-পদে বাধা দিতে দিতে তাহাদের সাহস এতই বাড়িয়া গিয়াছিল যে, তাহারা তাঁহাদের গর্জ্জনে আর বিচলিত হইল না, বরং অবিলম্বে ক্ষিপ্রকারিতার সহিত এমন এক উপায় অবলম্বন করিল, যাহা ইতঃপূর্ব্বে কেহ কখনও কল্পনা করিতে পারে নাই। ষ্টেটস্ জেনেরাল সভার এক প্রান্তে বসিয়া তাহারা ঘোষণা করিল যে, আজি হইতে এই সভার নাম পরিবর্ত্তিত হইল। আমরা প্রত্যেকে যখন জাতির প্রতিনিধিরূপে এখানে আসিয়াছি, তখন এই সভার নাম হইল "জাতীয় সম্মিলনী" (National Assembly)। আমরা আজি হইতে ষ্টেটস্ জেনেরাল সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া উহারই উপর ফরাসী জাতির প্রতিনিধিবর্গ লইয়া জাতীয় সমিতি গঠিত করিলাম। (১৭ই জুন—১৭৮৯) প্রজা-প্রতিনিধিদের অতি অভিনব জাগরণ; পূর্ব্বে কেহ কখনও এরূপ করিতে সাহস পায় নাই। প্রকৃত বিপ্লব আজি হইতে আরম্ভ হইল।

প্রজা-প্রতিনিধিদের চরম ঘোষণাপত্র শ্রবণ করিয়া উচ্চ শ্রেণীর প্রত্যেক ব্যক্তিই শিহরিয়া উঠিল, তাহারা ব্যস্ত হইয়া রাজাকে সংবাদ দিল। নির্ব্বাচনের সময় প্রজাদের অপূর্ব্ব জাগরণ দেখিয়া রাজা একটু বিচলিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে অভিজাতবর্গের উত্তেজনায় তাহাদিগকে দমন

করিবার জন্য কঠোর আদেশ প্রচার করিলেন। তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা নিরীহের মত পূর্ব্বের নিয়ম অনুসারে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে তোমাদের নির্দ্ধারিত স্থানে আসন গ্রহণ কর; এবং শ্রেণী হিসাবে ভোট দাও। যাহাতে তাহারা সভার প্রধান গৃহটি অধিকার করিতে না পারে, তজ্জন্য তিনি সভা-গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন।

প্রজাদের কার্য্যে রাজা অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করিতেছেন বলিয়া তাহারা তাঁহার উপর কুপিত হইয়া উঠিল। তাহারা যখন সদলবলে সভাগৃহে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিল, গৃহের দ্বার বন্ধ, তখন তাহারা বিচলিত হইল না, বরং অধিকতর সাহস সঞ্চয় করিয়া নিকটস্থ টেনিস্‌কোর্ট ক্লাবে আশ্রয় লইয়া শপথ করিল, যতদিন পর্য্যন্ত নূতন Constitution গঠিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা পৃথক হইবে না, বরং তুমুল আন্দোলন দ্বারা দেশকে প্রকম্পিত করিয়া তুলিবে। ইহাকেই বলে বিখ্যাত টেনিসকোর্টের শপথ। তৎপর তাহারা সেন্টলুইস গির্জ্জায় গিয়া এক মহতি সভার অধিবেশন করিল, কয়েকজন যাজক ও অভিজাতও সেই সভায় যোগদান করিয়াছিল। প্রজাদের হঠকারিতা দেখিয়া রাজা বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে করিলেন—এক ধমকে তাহাদিগকে শান্ত করিবেন। তিনি প্রজাদের দাবীকে উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, তাহারা যদি তাহাদের মঙ্গল চাহে, তাহা হইলে তাহারা যেন অবিলম্বে পূর্ব্বের মত বিভিন্ন গৃহে উপবেশন করে। যদি তাহারা তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করে, তাহা হইলে তিনি একাই সমস্ত কার্য্য সমাধা করিবেন। জাতীয় সম্মিলনীর কার্য্য তখন হইতেছিল, সেই সময় রাজার লোক আসিয়া তাহাদিগকে এই কথা বলিল। রাজার প্রতিনিধিকে 'মিরাবে' নামক প্রজাদের জনৈক নেতা যে উত্তর দেন, তাহা একটু তীব্র হইলেও অতি সময়োচিত হইয়াছিল। তিনি বলিলেন,—Go and tell your master, we are here by the will of the people, and will not depart unless compelled by bayonets.—"তোমার যে প্রভু এখানে তোমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে গিয়া বল, আমরা প্রজাদের সম্মতিক্রমে এখানে সমবেত হইয়াছি, এবং সঙ্গীনের খোঁচা দ্বারা বিতাড়িত না করিলে আমরা এ স্থান হইতে এক পাও অন্যত্র যাইব না"। এইবার রাজা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি মনে মনে একটু ভীত হইয়া পড়িলেন, এবং নিরুপায় হইয়া প্রজাদের মতে মত দিলেন এবং অভিজাত ও যাজকবর্গকেও তাহাদিগের সহিত একই সভাগৃহে আসন গ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। এইরূপে প্রজাদের দৃঢ়তায় জাতীয় সম্মিলনী জয় লাভ করিল। বিদ্রোহের প্রথম যুগে রাজার কবল হইতে এক এক করিয়া সমস্ত ক্ষমতা প্রজাদের হাতে আসিতে লাগিল।

ষ্টেট্‌স্ জেনেরাল সভার বিলোপ সাধন করিয়া তাহারই ধ্বংসাবশেষের উপর জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। তদবধি এই সমিতিই ফ্রান্সের বিপ্লবের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিল। দেশের হিতকামনায় বহু গণ্যমান্য লোক এই সমিতিতে যোগদান করিয়া দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিল। সমিতির সদস্যগণ তখনও রাজার বিরুদ্ধে ঈর্ষ্যাভাব পোষণ করিতে শিখে নাই বা রাজপদ রহিত করিবার কল্পনাও মনে আনে নাই। তাই তাহারা রাজাকে নানা-বিষয়ে পরামর্শ দিয়া দেশের সুদিন আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু রাজা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই, বরং আপন অধিকার খর্ব্ব হইবে ভাবিয়া ইচ্ছা করিয়াই তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। তিনি জাতীয় সমিতির কাহাকেও বিশ্বাস করিলেন না, বরং পদে-পদে তাহাদিগকে সন্দেহ করিয়া বিপদাপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি জাতীয় সমিতির অনেক সভ্যকে নির্য্যাতিত করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। রাজাই দেশের দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ হইয়াও দেশের অভাব মোচনের জন্য কোনই চেষ্টা করিতেছেন না, অথচ উপদেশ বা পরামর্শ দিলেও তদনুসারে কার্য্য করিতেছেন না, বরং পরামর্শ দাতাদিগের সহিত অমানুষিক ব্যবহার করিতেছেন,—ইহা প্রত্যেক সভ্য অনুভব করিল। ইহাতে তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল যে, যতদিন দেশে শান্তি স্থাপিত না হইবে, ততদিন তাহারা পরস্পরের সহিত সম্মিলিত থাকিয়া রাজার প্রত্যেক কার্য্যে বাধা দিবে। তাঁহার নিকট হইতে মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায় করিয়া লইবে। সুতরাং এইবার হইতে জাতীয় সমিতি শুধু পরামর্শ-সভা নহে জাতীয় শাসন-পদ্ধতি সংশোধনের ভার গ্রহণ করিল।

রাজা প্রজাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রজারাও শপথ করিল, আমরা কিছুতেই ছত্রভঙ্গ হইব না, দেশের শাসনকার্য্যের একটা সুব্যবস্থা না করিয়া আমরা কিছুতেই ক্ষান্ত থাকিব না। রাজা প্রজাগণের এই প্রকার শপথ গ্রহণের কথা শুনিয়া অন্তরে ভীত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার পরামর্শদাতাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না, তাহারা তাঁহাকে কুপরামর্শ দিয়া সর্ব্বদাই বিপথে পরিচালিত করিতে লাগিল। প্রজারা নগণ্য, নিরন্ন, ক্ষুধার জ্বালায় অবসন্ন, তাহারা রাজার বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারিবে না, রাজা যদি অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া তাহাদিগকে বাধা দেন, তাহারা ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। মূর্খ সভাসদগণ এইরূপ কুপরামর্শ দিয়া নির্ব্বোধ রাজাকে প্রজাদের অপরিসীম শক্তির বিষয় ভাবিবার অবসরই দেয় নাই।

প্রজারা নিরস্ত্র ছিল সত্য, কিন্তু তাহারা নগণ্য ছিল না। স্বাধীনতার মহিয়সী বাণী যাহাদিগকে জাগাইয়াছে, তাহাদিগকে পৃথিবীর কোনও শক্তি দমন করিতে পারে না। বিপ্লবের আগুন দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, অস্ত্র-শক্তি তাহার নিকট অতি নগণ্য—অস্ত্র বলে বলীয়ান হইয়া রাজা তাহাদিগের কোনও ক্ষতি করিতে পারিলেন না, বিদ্রোহও দমন করিতে পারিলেন না।

প্রজারা বুঝিল, অতি সত্বর রাজার সহিত একটা সংঘর্ষ বাঁধিতে পারে, সেই জন্য তাহারা পূর্ব্বাহ্নেই সতর্কতা অবলম্বন করিল। তাহারা আপনাদের দল বৃদ্ধি করিতে লাগিল, দেশ-বিদেশ হইতে নানা শ্রেণীর লোক আসিয়া প্যারিসের বিদ্রোহী প্রজাদের সঙ্গে যোগদান করিল। তাহাদের মুহুর্মুহু হুঙ্কারে সমগ্র প্যারিস নগরী কাঁপিয়া উঠিল। পাছে বিদ্রোহী প্রজাগণ কোন মুহূর্ত্তে কি কাণ্ড করিয়া বসে, সেই ভয়ে রাজাও আপনার সৈন্যদল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। প্যারিসে যখন এইরূপে বিদ্রোহের আগুন ধিকি-ধিকি করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল, সেই সময় তিনি ভারসেল নগরে রাজ-প্রাসাদে পরমানন্দে বাস করিতেছিলেন। রাজধানীর প্রজা-বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য তিনি দেশের সৈন্য ত সংগ্রহ করিলেনই, তদ্ব্যতীত গোপনে গোপনে সুইজারলণ্ড ও জর্ম্মনী হইতে ভাড়াটিয়া সৈন্য আমদানী করিয়া প্যারিস নগরী অবরোধ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। মন্ত্রীবর নেকার রাজার এই কার্য্যে বাধা দিয়াছিলেন বলিয়া রাজা তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। নেকার সাধারণের পক্ষ হইয়া রাজাকে সুপরামর্শ দিয়াছিলেন, রাজা তাহা শ্রবণ করিলেন না, বরং প্রজাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী নেকারকে পদচ্যুত করিলেন, এই ধুয়া ধরিয়া তাহারা রাজার আচরণে ভয়ঙ্কর কুপিত হইল। তাহারা নেকারকে পুনর্গ্রহণ করিবার জন্য রাজাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল; এবং রাজার বিরুদ্ধে পথে পথে রাজদ্রোহ প্রচার করিয়া সমগ্র নগরী কাঁপাইয়া তুলিল। ইহাতে লুই ধৈর্য্যের সীমা লঙ্ঘন করিয়া প্যারিসের সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন,—নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালাও। কিন্তু প্যারিসের সৈন্যগণ অন্য সুর ধরিল। তাহারা ত আর ভারতের পুলিশ নহে যে, স্বদেশের অধিবাসী হইয়া, স্বদেশের অন্নে পুষ্ট হইয়া দ্বিধা সঙ্কোচ শূন্য হইয়া স্বদেশের নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালাইবে। প্যারিসের সৈন্যদল স্বাধীনতার আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে গুলি চালাইতে আদেশ করিলে তাহারা অকুতোভয়ে বলিল—Because we are soldiers, we have not ceased to be citizen. আমরা সৈন্য শ্রেণীভুক্ত বলিয়াই যে নাগরিক অধিবাসী হইতে বিরত হইব, তাহা নহে। দেশবাসীকে অন্যায় অত্যাচার হইতে রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য, স্বহস্তে দেশবাসীর প্রতি কোনও অত্যাচার করিব না। পাঠক! বিপ্লবের জ্বলন্ত প্রভাব কোথা হইতে আরম্ভ হইয়া, কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, একবার ভাবিয়া দেখুন, আর আমাদের চির হতভাগা ভারতের সহিত তুলনা করুন। আজ প্যারিসের সৈন্যগণ পর্য্যন্ত রাজার অন্যায় আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করিল। ভারতে কি এই ভাব আসিবে না? ভারতের পুলিশ কি আপনাদিগকে সর্ব্বপ্রথম দেশবাসী তৎপরে সরকারের ভৃত্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিবে না?

প্যারিসের সৈন্যগণ যখন গুলি চালাইতে অস্বীকার করিল, তখন রাজা বিদেশ হইতে আনীত ভাড়াটিয়া সৈন্যগণকে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালাইতে আদেশ করিলেন। আদেশ পাইবা মাত্র উহারা নির্ম্মমভাবে গুলি চালাইয়া কয়েকজন ব্যক্তিকে বধ করিল। তাহারা

নগরের সর্ব্বত্র ভীমবেগে অত্যাচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তখন, রাজা বিদেশী সৈন্য লইয়া নিরপরাধ দেশবাসীর উপর ভীষণ অত্যাচার করিতেছেন, এই চীৎকারে সমগ্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। রাজার এই অন্যায় কার্য্যে বিচলিত হইয়া কতিপয় রাজপক্ষীয় লোকও প্রজাপক্ষে যোগদান করিল। ইহাতে বিপ্লব-বাদিদের সাহস চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল। অল্পদিনের মধ্যে দেখা গেল, উহাদের সংখ্যা অসম্ভবরূপে বাড়িয়া উঠিয়াছে। দেশের উন্নত জনসাধারণ দলে-দলে প্যারিসে আসিয়া অসম্ভবরূপে শক্তি সংগ্রহ করিয়া ঘোর রবে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া ব্যাস্টাইল দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইল।

নরকাধম ব্যাস্টাইল দুর্গের কথা মনে করিতেই সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। অত্যাচার ও অবিচারের সহিত উহার স্মৃতি বিজড়িত। বিগত কয়েক শতাব্দী হইতে ব্যাস্টাইল দুর্গ অত্যাচার ও পাশবিকতার লীলাভূমি হইয়া পড়িয়াছিল। এই দুর্গের মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ এক অন্ধকারময় গৃহ কারাগাররূপে ব্যবহৃত হইত। রাজরোষে পতিত হইয়া কতশত নিরপরাধ ব্যক্তিকে ঐ কারাগারে জীবনের অধিকাংশ কাল কাটাইতে হইয়াছে। রাজদ্রোহে অপরাধযুক্ত ব্যক্তিগণই সাধারণতঃ উহাতে আবদ্ধ হইতেন। অন্যায় পূর্ব্বক, বিনা-বিচারে, বহুকবি, দার্শনিক সাহিত্যিক ও সম্পাদককে চিরকালের তরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাঁহারা সেইখানে আবদ্ধ থাকা কালীন কখনও আলোকের মুখ দেখিতে পাইতেন না, সেই ভীষণ কারাগারে অসহ্য যন্ত্রণায় ইহজীবনের সব লীলা সাঙ্গ করিতেন। রাজবন্দী ব্যতীত অপরাপর অপরাধে অভিযুক্ত বহু সহস্র ব্যক্তিও ঐ দুর্গে কষ্টের সহিত কালযাপন করিত। নানাশ্রেণীর অপরাধী তথায় থাকিত বলিয়া, পাছে কেহ ছলে বা কৌশলে দুর্গ-প্রাকার ভেদ করিয়া পলায়ন করে, সেইজন্য এই দুর্গ এরূপ দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত হইয়াছিল যে, তত্তুলনায় ইউরোপের কোথাও সেরূপ সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত দুর্গ ছিল না। ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভে তথাকার উন্নত জনসাধারণ দুর্গস্থিত অসহায় নরনারীকে চিরবিমুক্ত করিয়া দিবার জন্য উহাকে আক্রমণ করিতে মহোল্লাসে অগ্রসর হইল। ব্যাস্টাইল দুর্গ যাহাতে রক্ষা পায়, তজ্জন্য রাজপক্ষীয় সৈন্যগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু উন্মত্ত জনতার এ যৌবন মহাতরঙ্গ রোধিবে কে? বিক্ষিপ্ত ও নিরস্ত্র প্রজার সম্মুখে উহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। কিছুক্ষণ বাধা দেওয়ার পর দুর্গটির পতন হইল, পতনের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গটি ধূলিসাৎ করা হয়। গ্রীক ইতিহাসের মহানগরী এথেন্সের প্রাচীরগুলি ভাঙ্গিয়া দিবার সময় স্পার্টানগণ যেমন সোল্লাসে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল, "Freedom has at last come to Greece" এই দুর্গের পতনের সময় ফ্রান্সের হতভাগ্য নরনারীর মনেও ঠিক সেই ভাব উদিত হইয়াছিল। প্রাচীন অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ ব্যাস্টাইলের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের স্বাধীনতা সূচিত হয়।

ফরাসীদের আমোদপ্রিয় রাজা যে প্রজাদের সম্বন্ধে ভাবিবার কোনই চেষ্টা করেন নাই, তাহা একটি ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যাইবে। ব্যাস্টাইল আক্রমণের সময় মহানগরী প্যারিতে তাণ্ডবলীলা চলিতেছে, আর সেই সময় ভারসেল নগরে রাজা অমাত্যবর্গ সহকারে আমোদ প্রমোদে কাল হরণ করিতেছেন। যেদিন ব্যাসটাইলের পতন হয়, সেইদিন সন্ধ্যাসমাগমে তিনি শীকার করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। প্যারিসের দুঃসংবাদ তাঁহাকে দেওয়া হইলে, তিনি একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, Why this is a revolt, তদুত্তরে তাঁহাকে বলা হয়, No sir, it is a revolution.

বাস্তবিকই ব্যাস্টাইলের পতন, একটা সামান্য Revolt নহে, উহা এক সংক্রামক Revolution. উহার পতনের সঙ্গে সঙ্গে দেশময় একটা মহাচাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গেল, এবং লোকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার সম্মুখে যে কোনও বাধাই টিকিতে পারে না, তাহা প্রমাণিত হইয়া গেল। প্রজারা হর্ষোৎফুল্ল নয়নে দেখিল, অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ যে ব্যাস্টাইল দুর্গ এতদিন প্যারিসের বুকে থাকিয়া তাহাদের প্রাণে নিয়ত হাহাকার জাগাইয়া দিত, আজ সেই সুদৃঢ় দুর্গ সম্পূর্ণরূপেই তাহাদের করায়ত্ত, পুরাতন ফিউডাল প্রথার শেষ চিহ্ন আজ চূর্ণ হইল, বিপ্লব-বাদীদের আশার আজ কতকাংশ পূর্ণ হইল। সম্রাট সেই সময় ভারসেল নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার সাঙ্গ-পাঙ্গ ও সভাসদবৃন্দে পরিবৃত হইয়া কিরূপে

প্রজাদিগকে দমন করিবেন, তাহারই উপায় অন্বেষণ করিতেছিলেন। তাঁহার প্রাসাদে কুমন্ত্রণাগার বসিয়া গেল, সেখানে নানারূপ ষড়যন্ত্রমূলক প্রস্তাবাদি আলোচিত হইতে লাগিল। রাজ-প্রাসাদের এই সকল গুপ্তরহস্য প্রজাদের অবিদিত রহিল না, তাহারা রাজার উপর ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহাকে পায় ত টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলে।

বহু পূর্ব্বে যে দুর্ভিক্ষের কথা বলা হইয়াছিল, তাহা এখন প্যারীতে ভীষণাকার ধারণ করিল। দূর দূর হইতে বিভিন্ন প্রদেশের বহু বুভুক্ষিত অধিবাসী রাজধানীতে আশ্রয় লওয়ায় তথাকার দুর্ভিক্ষ আরও মারাত্মক হইয়া উঠিল। ক্ষুধায় কাতর, পিপাসায় অবসন্ন এরূপ সহস্র সহস্র অধিবাসী প্যারী সহরের দ্বারে দ্বারে শূন্য মনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহারা ভাবিল, রাজা আমোদ প্রমোদ দ্বারা জীবনপাত করিতেছেন, আর আমরা দুর্ভিক্ষে মারা যাইতেছি। তাহারা ভাবিল, রাজাই দুর্ভিক্ষের কারণ, আরও ভাবিল, রাজাই যখন অন্নদাতা, তখন তাঁহাকে প্যারিতে আনিতে পারিলেই অন্ন পাওয়া যাইবে। ৫ই অক্টোবর বুভুক্ষিতা ক্ষীণাঙ্গী একদল স্ত্রীলোক রাক্ষসী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসংখ্য বালক বালিকা সহ ভারসেল নগরে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "রুটি দাও! রুটি দাও! আমরা বড় ক্ষুধার্ত্ত! রাজা প্রথমতঃ তাহাদিগের প্রতি কর্ণপাত করিলেন না, কিন্তু তাহারা স্পষ্টভাবে রাজাকে জানাইয়া দিল, আমরা রাজাকে প্যারিস লইয়া যাইব, নতুবা কিছুতেই এস্থান হইতে এক পাও নড়িব না। রাজা এই উন্মত্ত জনতা দেখিয়া ভয়ে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি উহাদের সঙ্গে প্যারিস যাইতে সম্মত হইলেন। প্যারিসের পথে মাতঙ্গিনী-গণ যেরূপভাবে তাঁহাকে লইয়া গেল, তাহাতেই রাজার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া গেল! উন্মত্তা রমণীগণ তাঁহাকে চারিপাশে ঘেরাও করিয়া প্যারিস লইয়া যাইতে লাগিল। আর পথে যাইতে যাইতে নানাবিধ হর্ষধ্বনি করিতে লাগিল। কেহ কেহ চীৎকার করিয়া রাজাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিয়া উঠিল—We are bringing the baker, the baker's wife, and the little baker's boy. (আমরা রুটিওয়ালাকে, তাহার স্ত্রীকে এবং ক্ষুদে রুটিওয়ালার ছেলেকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছি। প্যারিসে আসিয়া রাজা দেখিলেন, তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা অন্তর্হিত, তিনি নগর-বাসীর হস্তে একপ্রকার বন্দী হইয়া টুইলারী প্রাসাদে আশ্রয় লইলেন।

প্যারিসে আনয়ন করিয়া, প্রজাবৃন্দ রাজাকে এক প্রকার বন্দী করিয়া স্বকীয় কবলে রাখিল। এক্ষণে তাহাদের প্রধান বক্তব্য হইল একটি শাসনতন্ত্র গঠিত করা। ষ্টেটস্ জেনেরাল ধ্বংস করিয়া তাহারই ভিত্তির উপর যে জাতীয় সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে দেশের শাসন সংস্কারে মনোনিবেশ করিল। এইরূপ একটি শাসনতন্ত্র গঠন করিবার জন্য যে সমিতি সৃষ্টি হইল, তাহাই "constituent assembly" বলিয়া প্রসিদ্ধ। উক্ত সমিতির প্রধান কাজ দেশের জন্য একটা শাসনতন্ত্র সৃষ্টি করা। দেশের শাসন-প্রণালীর আগা-গোড়া সব-কিছু দেখিয়া একেবারে নূতন প্রণালীতে রচনা-ধারা অতীব দুরূহ কাজ। কিন্তু তৎসত্বেও সমিতির সভ্যগণ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন এবং একটা শাসনতন্ত্রের খসড়াও প্রস্তুত করিলেন। সভ্যগণ সর্ব্বপ্রথম প্রত্যেক মানুষের স্বভাবগত অধিকারের কথা প্রচার করিলেন। তৎপরে একটী constitution প্রস্তুত হইল। নূতন নিয়ম অনুসারে ফ্রান্সে একটী মাত্র ব্যবস্থা-সভা থাকিবে। ঐ সভা দুই বৎসর পর পুনর্গঠিত হইবে। আইন করিবার সমুদয় ক্ষমতা ঐ সভাকে দেওয়া হইল। আর সঙ্গে সঙ্গে রাজার সমস্ত ক্ষমতা অপহৃত হইল, যদিও তিনি নামে মাত্র কার্য্যকরী বিভাগের শীর্ষ-দেশেই থাকিবেন। তাঁহার বিশেষ কোনও ক্ষমতা থাকিবে না, তবে তিনি কোনও প্রস্তাব দুই মাস স্থগিত রাখিতে পারেন। (Suspensive veto) এই নব-গঠিত শাসন প্রণালীর সুফল যাহাতে দেশের সর্ব্বত্র প্রকাশ পায়, তজ্জন্য সমগ্র দেশকে ৮৩টি বিভাগে বিভক্ত করা হইল। আবার প্রত্যেক বিভাগ নানারূপ উপবিভাগ ও কমিউনে বিভক্ত হইল। এইরূপে দেখিতে দেখিতে পলক মধ্যে একটি সুগঠিত মহাকেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্র ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া একটি গণতন্ত্রে পরিণত হইল।

জাতীয় মহাসমিতি দেশের শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া মনে করিল, উহাতে দেশের সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইল না। জাতীয় সমিতি

দেশের অর্থ-সঙ্কট দূর করিতে পারিল না। এই অর্থ-সঙ্কট দূর করিবার জন্যই ষ্টেট্স্ জেনেরাল সভা আহূত হয়, তৎপর ফ্রান্সের উপর দিয়া কি ভীষণ ঝড় বহিয়া গেল, কিন্তু মূল বিষয়টির দিকে কাহারও দৃষ্টিপাত হইল না। এক্ষণে নিরুপায় হইয়া এমন এক ভীষণ উপায় অবলম্বন করিল, যাহাতে অনেক ব্যক্তিই অন্তরে-অন্তরে বিপ্লবীদের উপর ভয়ানক কুপিত হইয়া উঠিল।

সমিতির সভ্যগণ অর্থপ্রাপ্তির কোনও উপায় না পাইয়া, গীর্জ্জার অন্তর্ভুক্ত বহু ভূসম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইল। সে যুগে প্রত্যেক গীর্জ্জার তত্ত্বাবধানে দেবোত্তর ও পীরোত্তর সম্পত্তির ন্যায় বহু সম্পত্তি ছিল। গীর্জ্জার মহাপ্রভুগণ ভোগ-বিলাস দ্বারা সেই সম্পত্তির অর্থ অপব্যয় করিতেন। এক্ষণে জাতীয়-সমিতি সেই সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহাকে জাতীয়-সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করিল। এইরূপে আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূর করিবার প্রয়াস পাইল। উক্ত সম্পত্তির জামীনে, কাগজের নোট (assignats) প্রচার করা হইল। এইরূপ সকল গোল মিটাইয়া দিয়া নবগঠিত শাসন পদ্ধতির স্থায়িত্বের জন্য রাজাকে ও গীর্জ্জার বিশপ ও পাদ্রীগণকে উক্ত শাসন পদ্ধতির প্রতি বশ্যতার শপথ গ্রহণ করিতে বলা হইল। রাজা নিরুপায় হইয়া শপথ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পাদ্রী-বিশপগণ কখনও পার্থিব শক্তির নিকট বশ্যতার শপথ গ্রহণ করেন নাই বলিয়া ফ্রান্সের নবগঠিত শাসনতন্ত্রের নিকট সেরূপ শপথ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু জাতীয়-সমিতি তাহাদের চাকরী ছাড়াইয়া দিবার ভয় দেখাইতেই উহারা বশ্যতা স্বীকার করিল। এইরূপ বশ্যতা স্বীকারকেই বলে Civil constitution of the clergy.

দেশের সুদিন ফিরাইয়া আনিবার জন্য এই যে নূতন শাসনতন্ত্র গঠিত হইল, ইহা অধিক দিন টিকিল না, গঠিত হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই উহা একেবারেই নষ্ট হইয়া গেল। জাতীয়-সমিতি পাদ্রী-বিশপকে পার্থিব শক্তির নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করাইয়া মহাভ্রম করিয়াছিলেন। এই ভ্রমের জন্য বিপ্লব অনেকটা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সাধারণ লোক বিপ্লবের উচ্চ আদর্শ অত-শত বুঝে না। তাহারা বুঝিল, বিপ্লবী দল তাহাদের প্রাণের ধর্ম্ম গুরুগণকে ধরিয়া ধরিয়া অপমান করিতেছে। ধীরে ধীরে লোকের মনে একটা অন্তর্বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং সামাজিক কলহের সৃষ্টি হইল। যাহারা প্রথম প্রথম বিপ্লবকে সহানুভূতি দেখাইয়া আসিতেছিল, তাহারা এক্ষণে অত্যধিক বাড়াবাড়ি দেখিয়া বিপ্লবের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। ইহা হইতে আমরা একটা বিষয় শিক্ষালাভ করিতে পারি, রাজনৈতিক বিপ্লবের যুগে যখন সর্ব্বসাধারণকেই লইয়া কাজ করিতে হয়, তখন তাহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসে সহজে হস্তক্ষেপ করিতে হয় না। এরূপ করিলে, রাজনৈতিক বিপ্লবে অনেকখানি বাধা পড়ে। মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

রাজা যদিও প্রকাশ্যভাবে নবগঠিত শাসন-পদ্ধতির বশ্যতা স্বীকার করিলেন, কিন্তু তথাপি তিনি প্যারিস হইতে পলাইয়া উহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার উপায় অন্বেষণ করিতেছিলেন। রাজা সপরিবারে টুইলারী প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। যাহাতে তাঁহার উপর কোনও-রূপ অত্যাচার না হইতে পায়, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল। কিন্তু রাজা আপনাকে নিরাপদ বিবেচনা করিতে পারিলেন না, পাছে কোনও দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি তাঁহার উপর অত্যাচার করিয়া বসে। তিনি সর্ব্বদা সেই শঙ্কা করিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি গোপনে গোপনে বিদেশ হইতে বহু সৈন্য নগরের উপকণ্ঠে আমদানী করিয়াছিলেন। তাহারা যখন মন্টমেজিনাক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল, সেই সময় রাজা এক গোপন নিশীথে সেই স্থান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে "জাতীয় প্রহরী" সৈন্যদল তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া টুইলারি প্রাসাদে আনয়ন করিল। তাঁহার গোপন পলায়নের সংবাদ শ্রবণ করিয়া অনেকেই মনে করিল, তিনি সৈন্য সংগ্রহের জন্যই বহির্গত হইয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহার প্রতি লোকের যে সামান্য পরিমাণ শ্রদ্ধা ছিল, তাহা একেবারেই তিরোহিত হইয়া গেল। এইবার হইতে প্রখর সতর্কতার সহিত তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখা হইল। যাহারা এতাবৎ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করে নাই, তাঁহার এই পলায়নে তাহারা ক্ষুণ্ন হইল এবং রাজতন্ত্রের ভিত্তিমূল একেবারেই শিথিল হইয়া গেল। রাজার কথা প্রজারা আর বিশ্বাস করিল না। রাজতন্ত্রকে চিরতরে লোপ

করিবার জন্য জাতীয় সমিতির মধ্যেই একটা রিপাবলিকান পার্টি গঠিত হইল। উহাদের প্রধান উদ্দেশ্য রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। রব্‌স্পীরি, দাঁতো প্রভৃতি চরমপন্থী লোকগণ উহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ইঁহারা সমিতির এক সভায় পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু তাহা ভোটে টিকিল না। এদিকে সম্রাট লুই আবার নূতন শাসনতন্ত্রের বশ্যতার শপথ গ্রহণ করিলেন। সুতরাং তিনিই আবার পূর্ব্বের ন্যায় নবপদ্ধতির সভাপতিপদে বরিত হইলেন। এইবার কনস্‌টিটুএণ্ট সমিতি মনে করিল, তাহার কাজ শেষ হইয়াছে, তাই উহার সভ্যগণ উক্ত সভা ভাঙ্গিয়া দিলেন (৩০ সেপ্টেম্বর ১৭৯১)।

কনস্‌টিটুয়েণ্ট এসেম্বেলির নির্দ্দেশমত ১৭৯১ সালের অক্টোবর মাসে নূতন ব্যবস্থা সভার অধিবেশন হইল। পুরাতন সভা ভাঙ্গিবার সময় একটা আইন পাশ করিয়া রাখিয়াছিল যে, নবনির্ব্বাচিত সভায় পূর্ব্ব সভার কোনও সভ্য পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না (Self denying ordinance) সুতরাং পুরাতন কোনও অভিজ্ঞ সভ্য নূতন সভায় আসিল না, বরং আনাড়ী, অনভিজ্ঞ রাজনীতি-জ্ঞানশূন্য ও অনুপযুক্ত অনেক নূতন সভ্য এই সভায় স্থান পাইল। সভ্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৭৪৫ জন। এই সকল অনভিজ্ঞ লোক নূতন সভায় গিয়া নানাবিধ গোল-যোগের সৃষ্টি করিল। বিগত দুই বৎসরে কোনও রূপ অভিজ্ঞতা ইহারা পায় নাই। উৎকট ভাববাদী ও বিপ্লবী-দল এই সভায় অধিক-মাত্রায় প্রবেশ করিয়া নানারূপ অসম্ভব ও অবাস্তব পরিবর্ত্তন আনয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

নূতন ব্যবস্থাপক-সভার মধ্যে কতকগুলি চরম গণতান্ত্রিক ছিল, উহাদের মত ছিল অতি ভীষণ। রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অনেকগুলি রাজনৈতিক ক্লাব ছিল। এই সকল ক্লাব বিপ্লবের ভাবগুলি দেশময় ছড়াইয়া দিল। এই সকল ক্লাবের মধ্যে য্যাকোবিন ক্লাব (Jacobin) ও কর্ডেলিয়ার ক্লাব (Cordelier) বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। য্যাকোবিন ক্লাবের নেতা রবস্‌পিরী ক্রমে-ক্রমে এমন শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন যে, ব্যবস্থাপক-সভায় তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া কেহই টিকিতে পারিল না। কর্ডেলিয়ার ক্লাবের নেতা ছিলেন দাঁতো। দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোক হইতে ইহার সভ্য গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া ইহা চরমপন্থীদের মত পোষণ করিত। এই সকল চরমপন্থী-সভায় দেশের রাজনৈতিক-অবস্থাগুলি অতি ভীষণভাবে আলোচিত হইত, এবং তৎপর সেই মতগুলি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া দেশময় একটা মহাচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহাদের অবাস্তব সংস্কারের কথা শুনিয়া সাধারণ লোক ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ব্যবস্থাপক-সভার চরমপন্থী-সভ্যগণ যদি পরস্পরের মধ্যে একতা রাখিয়া কাজ করিতেন, তাহা হইলে দেশের অনেক মঙ্গল হইত। কিন্তু তাঁহাদের নেতাদের মধ্যে একতা ছিল না। কেহ কেহ রাজার ক্ষমতা হ্রাস করিয়া দেশে রাজতন্ত্রই রাখিতে চাহিয়াছিলেন। জিরণ্ডিন বলিয়া এক দার্শনিক-দল, অত্যন্ত অবাস্তব ও অভিনব মত পোষণ করিত। তাহারা আইনের আক্ষরিক অর্থদ্বারা ও লজিকের সূত্র ধরিয়া কার্য্য করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সব সময় এরূপ সম্ভব নহে। য্যাকোবিনগণ ছিল চরমপন্থী। তাহারা গণতন্ত্রের নিরাপদতার জন্য যে কোনও পন্থা ন্যায়, অন্যায়, অহিংস্র ও হিংস্র অবলম্বন সমর্থন করিতে প্রস্তুত ছিল। ব্যবস্থাপক-সভা যখন কার্য্য আরম্ভ করিল, তখন এই সকল বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী মতবিশিষ্ট নেতৃবর্গ আপন-আপন মতগুলিকে চালাইয়া দিবার প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। কোনও দলই মিলিত ভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম হইল না। যাহা হউক, বহু বাদানুবাদ ও তর্ক-বিতর্কের পর দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হইল। গীর্জ্জা সমূহের যে সকল বিশপ এতাবৎ নবশাসনের বশ্যতা স্বীকার করে নাই, তাহাদিগকে এখন বাধ্য করিয়া ভয় দেখাইয়া বশ্যতার শপথ গ্রহণ করিতে হইল। যাহারা অস্বীকার করিল, তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল; এবং তাহারা গীর্জ্জা হইতেও বহিস্কৃত হইল। দ্বিতীয় প্রস্তাব, যাহারা ফ্রান্স হইতে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে। তাহাদের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট তারিখ স্থির হইল, এবং বলা হইল যে, ঐ তারিখের মধ্যেই যেন তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া আসে, নতুবা তাহাদের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে, এবং তাহাদের মৃত্যুদণ্ড হইবে। সম্রাট এই প্রস্তাব মানিতে অস্বীকার করিলেন এবং তিনি প্রস্তাবটি ভেটো করিয়া দিলেন। ইহাতে দেশের সমগ্র অধিবাসী তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, রাজা দেশের আইন রক্ষা করিতে অপারগ হইলেন। রাজার প্রতি অসন্তোষ দিন-দিন বাড়িতে লাগিল। রাজার দিন ঘনাইয়া আসিল। বিপ্লব কোথা হইতে আরম্ভ হইয়া কোথায় যাইয়া দাঁড়াইবে, তাহা ভাবিয়া রাজভক্তের দল শিহরিয়া উঠিল।

—ক্রমশঃ
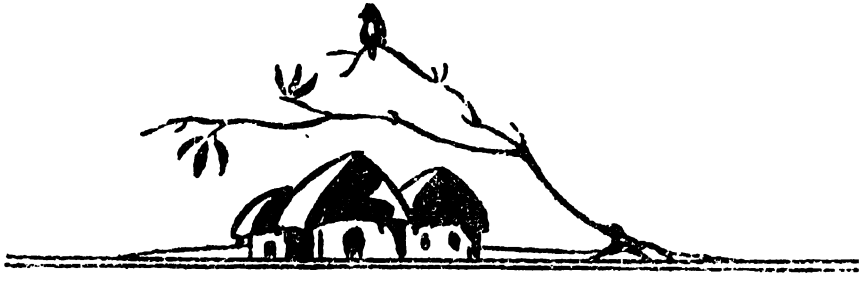
ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুস্‌লিম *

— প্রবন্ধ —

—মিসেস্ আর, এস, হোসেন

মাননীয় সভাপতি এবং সভ্য মহোদয়গণ!

আমি সর্ব্বদা আপনাদের এই স্কুলের বিষয় নিয়ে বিরক্ত করে থাকি। এমন কি অনেকে আমাকে এজন্য একটা Nuisance বিশেষ মনে করেন। আমি যদি পৌত্তলিক হতুম, আর আমার কোন দেবতা থাকতেন, তবে তিনিও নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়ে বলতেন,—'প্রার্থনার সময়ে "ধনং দেহি, মানং দেহি" এসব কিছু না বলে এ মেয়েটা কেবল এক ঘেয়ে—"স্কুলের জন্য গৃহং দেহি; স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি দেহি" বলে। দাও বেটীকে লাথি মেরে তাড়িয়ে!'

আজ আমি আপনাদের নিকট খানিকটা সময় ভিক্ষা চাই যে, আপনারা দয়া করে ধৈর্য্যের সহিত আমার দু'টী কথা শুনুন।

আপনারা সকলেই জানেন যে, এই 'সাখাওয়াত মিমোরিয়াল গার্লস স্কুল'টা না থাকলে আমি মরে যাব না। এমনটী নিশ্চয় হবে না যে—

"ঘুঘু চরবে আমার বাড়ী,
উনুনে উঠবে না হাঁড়ী,
বৈদ্যেতে পাবে না নাড়ী—
অন্তিম দশায় খাবি খাব!"

এই স্কুলটা না থাকলে আমার তিলমাত্র ক্ষতি নাই। তবে এ স্কুলের উন্নতি কেন চাই?—চাই, নিজের সুখ্যাতি বাড়াবার জন্য নয়; চাই, স্বামীর স্মৃতি-রক্ষার জন্য নয়; চাই, বঙ্গীয় মুস্‌লিম সমাজের কল্যাণের জন্য। 'সাখাওয়াত মিমোরিয়াল' শব্দ দু'টীর জন্য যদি স্কুলের অকল্যাণ হয়, তবে সাইন-বোর্ড থেকে ও শব্দ দুটী মুছে ফেলা যাক। অবশ্য মুস্‌লিম সমাজটাও টিকে থাকলে বা গোল্লায় গেলে আমার নিজের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, কারণ আমার কোন বংশধর নাই যে, তাদের ভাবী-দুর্দ্দশার আশঙ্কায় আমি শঙ্কিত হব, কিম্বা তাদের দুষ্ক্রিয়া দেখে আমি লজ্জিত হব। সুতরাং আপনারা বুঝতে পারছেন, এই স্কুল সম্বন্ধে মাথা-ব্যথায় আমার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নাই। যাদের বংশধর আছে, যাঁদের ভবিষ্যৎ আছে, তাঁরা যদি সমাজটাকে রক্ষা করতে চান, তবে সমাজের মাতৃস্থানীয়া এই বালিকা স্কুলটাকে একটা আদর্শ বিদ্যালয়রূপে গঠিত করুন।

একবার ইতিহাসের পাতা উল্‌টিয়ে দেখুন—এমন একদিন এসেছিল, যখন বাঙ্গালী-হিন্দুর আঁধার ঘরে জ্ঞানের আলোক এসে উঁকি মারলে, তখন তাঁরা চোখ খুললেন; পরে পাখীর কলরব শুনে বুঝতে পারলেন, 'আর রাত্রি নাই, ভোর হইয়াছে,' তখন তাঁরা অলস-শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু হিন্দু উঠে যাবেন কোথায়?—এটা করলে জাতি যায়, সেটা খেলে জাতি যায়; সুতরাং তখন তাঁরা দলে-দলে খৃষ্টান হতে আরম্ভ করলেন,—ক্রমে বন্দ্যোপাধ্যায় নাম বদলে 'ব্যানার্জ্জী' হলেন, আর সরকার হলেন, 'সিরকার'! সেই ঘোর সঙ্কটের সময়ে রাজা রামমোহন রায় এবং কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি সমাজ-হিতৈষী লোকেরা ব্রাহ্ম-সমাজের প্রবর্ত্তন করে হিন্দুকে সবংশে খৃষ্টান হওয়া থেকে রক্ষা করলেন। তখন তাঁদের নিজের স্কুল, কলেজ হ'ল,—তাঁদের ছেলে

* গত ৮ই মার্চ্চ রবিবার সন্ধ্যায় "সাখাওয়াত মিমোরিয়াল গার্লস্ স্কুলের" ম্যানেজিং কমিটীর অধিবেশনে উপরোক্ত লেখাটী সেক্রেটারী সাহেব কর্ত্তৃক পঠিত হয়। সভায় প্রেসিডেণ্ট সাহেবও উপস্থিত ছিলেন।

মেয়েরা আর খৃষ্টানের স্কুলে পড়তে যায় না। তাঁরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে রক্ষা পেলেন।

অপরদিকে মোসলেম সমাজ যখন 'ঝোপড়ী মেঁ শুয়ে মহলের খাব' দেখছিলেন, সেই সময়ে আলোক এসে মোসলেমের ঝোপড়ীর ভাঙ্গা চালের ভিতরও উঁকি মারল্যে। তখন তাঁরা আর কেবল 'পন্দেনামা' আর 'শাহনামা' পাঠ করেই তৃপ্ত থাকতে পারলেন না,—তাঁরা ছুটলেন হিন্দু আর খৃষ্টানের স্কুলে। তাঁরা কিন্তু নিজেদের জন্য স্কুল কলেজ কিছুই করলেন না। তাঁরা খৃষ্টানের কলেজে লেখা-পড়া শিখে দিব্যি সাহেব হয়ে গেলেন,—বলেন বিলাতি বুলি; চাকরকে বলেন বেহারা, আর মুটেকে বলেন কুলী!

তখন পর্য্যন্ত মোসলেম সমাজের তত বেশী অপকার হয় নাই; কারণ বাপ ক্লাবে গিয়ে চা খান, না চুরুট খান, ছেলে-মেয়েরা তা দেখতে পেত না,—তারা বাড়ীতে নামাজী মুসল্লী মাকে সর্ব্বক্ষণ দেখ্‌ত,—সেই আদর্শে তারা খেলা করত, নামাজ নামাজ খেলা; আর পূব, দক্ষিণ যে কোন দিকে মুখ করে আজানের অনুকরণে "আল্লাহু আকবর" বলে আজান দিত।

ক্রমে শিক্ষিত বাপ মেয়েকে আর শুধু 'রাহে-নাজাত' এবং 'সোণাভান' পুঁথি পড়িয়ে ক্ষান্ত থাকতে পারলেন না,—তাই তাঁরা মেয়েদের দিলেন, Convent এবং হিন্দু স্কুলে পড়তে। Convent এ পড়তে গিয়ে লয়লার নাম বদলে হল 'লিলী' আর জয়নব হল 'জেনী'। হিন্দু স্কুলে গিয়ে আয়শার নাম হল 'আশা', আর কুলসুম হয়ে গেল 'কুসুম'! ঐ পর্য্যন্ত হয়ে থামলেও ক্ষতি ছিল না; আমাদের অধঃপতনের ঐ খানেই শেষ নয়।

পরবর্ত্তী যুগে জেনীর ছেলে-মেয়ে মানুষ করবার জন্য দরকার হল খৃষ্টান আয়ার, যাতে ছেলে-মেয়েরা শৈশব থেকেই ইংরাজী কথা বলতে শিখে। আর তার মেয়ের নাম হল "বারবারা আরীফ"। এখন বারবারা ঘরে ত আর মাকে নামাজ পড়তে দেখে না, সুতরাং তার খেলার আদর্শ হল গির্জ্জা গির্জ্জা। আর Convent থেকে গান শিখে বাড়ীতে এসে গায়:—

"Jesus saves me this I know,
For the Bible tells me so—"!

কিম্বা:—

"মুসলমান বে-ইমান,
মারো জুতা, পাকড়ো কান!"

অপর দিকে আমাদের কুসুমের মেয়ের নাম হয়েছে "সৌদামিনী বেগম"! সৌদামিনীর খেলার আদর্শ হয়েছে, পূজা পূজা, আর মাটী দিয়ে ঠাকুর গড়া। আর সে গান করে:—

"যমুনার মাটী অঙ্গেতে লেপিয়া
হরিনাম লিখ তায়;
সব সখী মিলে বল হরি হরি,
যখন পরাণ যায়।"

অথবা:—

"নেড়ে মুসলমান,—
তার না আছে ধন, না আছে মান।"

সেদিন Bengal Women's Educational Conference উপলক্ষে জনৈক উচ্চশিক্ষিতা 'মুসলমান ব্রাহ্ম' মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি স্পষ্টই বললেন যে, যেহেতু তাঁর বাল্যকালে মুসলমান সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না, তাই তাঁর বাবা ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয়ে গিয়ে তাঁকে উচ্চ-শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা যেভাবে হয়েছে, তাতে তিনি কোর-আন হদীস আলোচনা করবার সুযোগ পান নাই। সুতরাং তিনি নিজেকে মোসলেম সমাজের উপযোগী করতে পারেন নাই।

ঐরূপ একটী সুশিক্ষিতা মহিলাকে তাঁর পিতা-মাতা এবং ভ্রাতাসহ মোসলেম সমাজ খরচের খাতায় লিখতে বাধ্য হল। স্ত্রী-শিক্ষা অভাবে আমাদের খরচের খাতা নানাপ্রকারের খরচ লিখতে লিখতে ক্রমশঃ ভারী হয়ে চলেছে। আমাদের সমাজের খরচের খাতা কিরূপে বেড়ে যাচ্ছে, তার একটু আভাস দিচ্ছি। আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে, কোন কোন সম্ভ্রান্ত মোসলিম যুবক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন যে, গ্রাজুয়েট পাত্রী না পেলে তাঁরা বিয়ে করবেন না; মোসলেম সমাজে যদি একান্তই গ্রাজুয়েট মেয়ে না পাওয়া যায়, তবে তাঁরা খৃষ্টান হয়ে যাবেন।

কেউ আবদার করে কাঁদেন যে, "মা আমাকে একটা

নিরক্ষর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন; এখন তিনিই বউ নিয়ে থাকুন,—ও কাঠের পুতুল নিয়ে আমি ঘর করতে পারব না।" কোন ভদ্রলোক বায়না ধরেছেন যে, আই, এ, পাশ পাত্রী চাই। কেউ চান, অন্ততঃ ম্যাট্রিক পাশ; তা না হলে তাঁরা খৃষ্টান বা ব্রাহ্ম হয়ে যাবেন। এসব বিকৃত রুচির প্রধান কারণ,—বর্ত্তমান ধর্ম্মহীন শিক্ষা। এলাহাবাদের কবি আকবর সাহেব বেশ বলেছেন,—

طفل سے آئے کیا ماں باپ کے اطوار کی
دودھ تو ڈبے کا ہے' تعلیم ہے سرکار کی

"তিফিল মেঁ বু আয়ে কেয়া মা বাপকে আত্‌ওয়ার কী?—
দুধ ত ডিব্বে কা হায়,—তালীম হায় সরকার কী!"

উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত ভদ্রলোকের ঘরে এখন "এম, এ, পাশ" বউ না হলে আলো হয় না। কিন্তু এজন্য সে বেচারাদের গালাগালি না দিয়ে বরং যাতে তাঁরা আমাদের হাত-ছাড়া না হন, তারই ব্যবস্থা করতে হবে।

আমার আরও জানা আছে যে, অনেক বিকৃত মস্তিষ্ক ধর্ম্মহীন লোক উপযুক্তা বিদুষী ভার্য্যার হাতে পড়ে শুধরে গিয়ে চমৎকার পাকা মুসল্লী হয়েছেন।

এই বিংশ শতাব্দীতে যৎকালে অন্যান্য জাতি নিজেদের প্রাচীন-প্রথাকে নানা-রকমে সংস্কৃত, সংশোধিত ও সুমার্জ্জিত করে আঁকড়ে ধরে আছেন; আমাদেরই উত্তরাধিকার, 'তালাক' 'খোলা' প্রভৃতি সামাজিক প্রথা নিজেদের মধ্যে সংযোগ করে, "পিতার সম্পত্তিতে কন্যার উত্তরাধিকার বিল," "পত্নী-ত্যাগ বিল," "পতি-ত্যাগ বিল" ইত্যাদি নানা-রকমের বিল পাশ করিয়ে নিবার চেষ্টা করছেন, তৎকালে আমরা নিজেদের অতি সুন্দর ধর্ম্ম, অতি সুন্দর সামাজিক আচার প্রথা বিসর্জ্জন দিয়ে এক অদ্ভূত জানোয়ার সাজতে বসেছি। "সুরেন্দ্র ছলিমুল্লা স্যামুয়েল খাঁ" গোছের নাম শুনতে কেমন লাগবে?

ফলকথা, উপরোক্ত দুরবস্থার একমাত্র ঔষধ—একটী আদর্শ মোসলেম বালিকা বিদ্যালয়,—যেখানে আমাদের মেয়েরা আধুনিক জগতের অন্যান্য সম্প্রদায় এবং প্রদেশের লোকের সঙ্গে তাল রেখে চলবার মত উচ্চ-শিক্ষা লাভ করতে পারে। অন্যান্য সুসভ্য সম্প্রদায়ের এবং এই ভারতবর্ষেরই অন্যান্য প্রদেশের মুসলমান মেয়েরা ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, কাউন্সিলার এবং গোল-টেবিল বৈঠকের সদস্য হচ্ছেন; আমাদের মেয়েরা কোন পাপে ঐ সব সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত থাকবে? আদর্শ মোসলেম বালিকা বিদ্যালয়ে আদর্শ মোসলেম-নারী গঠিতা হবে,—যাদের সন্তান সন্ততি হবে হজরত ওমর ফারুক এবং হজরত ফাতেমা জোহরার মত। এর জন্য কোর-আন শরীফ শিক্ষার বহুল বিস্তার দরকার। কোর-আন শরীফ, অর্থাৎ তার উর্দ্দু এবং বাংলা অনুবাদের বহুল প্রচার একান্ত আবশ্যক।

ছেলে-বেলায় আমি মার মুখে শুনতুম,—"কোর-আন শরীফ ঢাল হয়ে আমাদের রক্ষা করবে।" সে কথা অতি সত্য;—অবশ্য তার মানে এ নয় যে, খুব বড় আকারের সুন্দর জেলদ বাঁধা কোর-আন খানা আমার পিঠে ঢালের মত করে বেঁধে নিতে হবে! বরং আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি এই বুঝি যে, কোর-আন শরীফের সার্ব্বজনীন শিক্ষা আমাদের নানাপ্রকার কুসংস্কারের বিপদ থেকে রক্ষা করবে। কোর-আন শরীফের বিধান অনুযায়ী ধর্ম্ম-কর্ম্ম আমাদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করবে। *

---

* পরম ভক্তিভাজন বেগম ছাখায়ত হোছেন ছাহেবার এই প্রবন্ধটী আমরা বিশেষ আগ্রহের সহিত পত্রস্থ করিলাম। প্রকৃত কাজের কদর যে-সমাজে নাই, তাহাতে কাজের লোকের সৃষ্টি খুব কমই হইয়া থাকে; এবং ক্বচিৎ-কদাচিৎ হইলেও সমাজের উপেক্ষা ও অবহেলার আঘাতে আঘাতে অনেক সময়ে মানুষের প্রাণ অবসাদে—অভিমানে মুসড়িয়া পড়ে। লেখিকার ন্যায় আদর্শ-মহিলা সম্বন্ধে এরূপ আশঙ্কা করার যে বিশেষ কোন কারণ নাই, তাহা অবগত আছি। কিন্তু তত্রাচ বলিতে হইতেছে, তাঁহার এই লেখার ছত্রে-ছত্রে, বাহিরের হাসি-কৌতুকের অন্তরালে ক্ষোভের একটা মর্ম্মান্তিক জ্বালা আমরা বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছি। সমাজের চরম দুর্ভাগ্য না হইলে, আমাদিগকে আজ এ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইত না।

এই প্রবন্ধে লেখিকা এক স্থানে বলিয়াছেন—"আমার কোন বংশধর নাই।" আমরা তাঁহার এই ধারণার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইতেছি। আল্লাহ্-তাআলার মঙ্গলময়ত্বের কোমল-কঠোর আঘাতে যে মাতৃ-হৃদয়ের বিগলিত করুণা-ধারা 'পিপাসার' নামে কারবালার মরু-প্রান্তরেও স্বর্গের ছল-ছবিল প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল। 'একের' বাঁধ ভাঙ্গিয়াই ত সে আজ সহস্র-মুখী হইতে পারিয়াছে। তাই ত আজ তিনি একটীকে বিসর্জ্জন দিয়া শত-সহস্র কন্যার মাতৃ-কর্ত্তব্যের গৌরবময় জ্বালা বুক পাতিয়া লওয়ার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছেন —সম্পাদক।
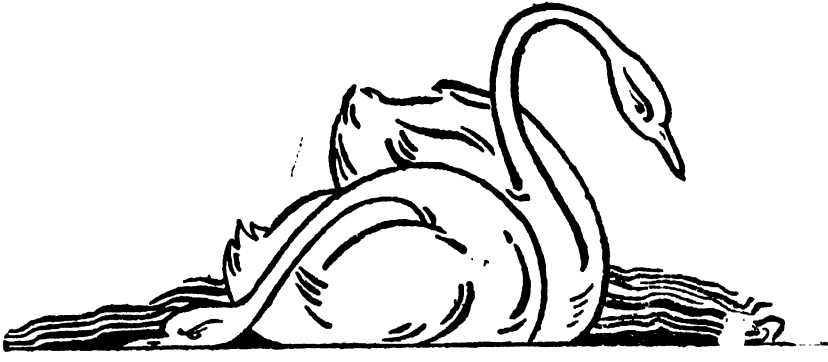
সঙ্কলন

আমেরিকা আবিষ্কারের প্রকৃত-তথ্য

গত ৫০০ বৎসর হইতে ইতিহাস প্রচার করিয়া আসিতেছে যে, পৃথিবীর বিখ্যাত নাবিক ক্রষ্টোফার্স কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে বহু উন্নততর ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, কলম্বাস প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার আবিষ্কারক নহেন। অতি প্রাচীনকালে আমেরিকার বিষয় যাঁহারা জানিতেন এবং এই স্থানের সঙ্গে যাঁহাদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল, নাবিক কলম্বাস তাঁহাদের অনেক পরের লোক।

বৌদ্ধ-মিশনের পরবর্ত্তী হেড্-কোয়াটার কাবুলের অধিবাসী জনৈক বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী আফ্গান সর্ব্বপ্রথমে আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছেন। আমেরিকা আবিষ্কারের সম্পূর্ণ সুযশঃ তাঁহারই প্রাপ্য। দীর্ঘ ৫০০ বৎসর তাঁহাকে তাঁহার ন্যায্য-প্রাপ্য কীর্ত্তিলাভে বঞ্চিত রাখিয়া ইতিহাস অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়া বসিয়াছে।

চীন-দেশের বিখ্যাত ঐতিহাসিক মা-ৎউয়ান-লীন বলেন,—এই বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী আফগান ইউয়েন পাঁচ জন বৌদ্ধ-ভিক্ষু সমভিব্যাহারে ৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনের উপকূলে উপস্থিত হন। এই ছয় জন লোক পূর্ব্বে কখনও লবণ জল দেখেন নাই এবং তাঁহারা কোন দিন নাবিকও ছিলেন না। কামস্কাট্কায় প্রেরিত একটা মালের বস্তার সঙ্গে তাঁহারা আরোহী হিসাবে এইস্থানে উপস্থিত হন। এই স্থান হইতে প্রথমে তাঁহারা এলিউসিয়ান্স্ এবং পরে উত্তর-আমেরিকার উপকূলে উপস্থিত হন। ফুচাং (বহুদূরবর্ত্তী পূর্ব্বদেশ) হইতে এই স্থানের দূরত্ব সাড়ে ছয় হাজার মাইল।

তৎকালে চীন-বাসীদের নিকট উত্তর আমেরিকার উপকূল বিশেষ পরিচিত ছিল এবং তাঁহাদের নিকট ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিস্তৃত চার্টও ছিল। বাহিরের বিস্তৃত সমুদ্রের বিষয়ও তাঁহারা জানিত। এই সমুদ্রের পরিসর ৩ হাজার ২ শত মাইল। তৎকালে ফুচাংয়ের সঙ্গে মেক্সিকো এবং সেন্ট্রাল আমেরিকার বিশেষ পরিচয় ছিল,—ইহা আমরা এই চার্টে দেখিতে পাই।

বুদ্ধ এবং গৌতম নাম গাউটেমালা শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই শব্দ হইতেই প্রিন্স গুয়াটে-মোজিন নাম আসিয়াছে। বুদ্ধদেব শাক্য বংশোদ্ভূত এবং এই শাক্য শব্দ জেকাটেকাস্, সাকাটেপেক্, জকাৎলান, সাকাপুলাস্, ওয়াক্সাকা প্রভৃতি যে কোন শব্দের ছায়ামাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ পুরোহিতকে লামা বলা হয় এবং মেক্সিকান পুরোহিতকে ৎলামা বলা হয়। মেক্সিকান শ্রেষ্ঠ পুরোহিত টেসাকা এবং শাক্যমুনি সায়াকমাল শব্দের অনুরূপ। এই স্থানে সায়াকমালের প্রস্তর নির্ম্মিত একটি প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

হান্সেন্ ভিক্ষুর যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা মেক্সিকোর উইলি-পোকারের অনুরূপ। তিনি জনসাধারণকে অহিংস এবং সাধুভাবে জীবন-যাপন করিতে উপদেশ দিয়া বেড়াইতেন। এই উপদেশ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উপদেশের নামান্তর বলিয়া মনে হয়। তিনি প্রস্তর-গাত্রে তাঁহার পদচিহ্ন রাখিয়া হঠাৎ অন্তর্হিত হন। পৃথিবীর ক্ষণজন্মা ব্যক্তিরা তাঁহাদের পরবর্ত্তী জনগণের জন্য আলোকস্তম্ভ স্বরূপ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ প্রভাবিত স্থানে এইরূপ পদচিহ্নের অভাব নাই। মাগদালেন গ্রামে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে একটী প্রস্তরমূর্ত্তি অদ্যপি দেখিতে পাওয়া যায়।

ইউয়েন টাটার জাতির মত পাগড়ি পরিহিত হস্তীযূথ

সহ গুয়াটেমালায় প্রস্তরগাত্রে অঙ্কিত আছেন। তৎকালে আমেরিকায় হাতী পাওয়া যাইত না। তিনি হাতী সহ অন্যদেশ হইতে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। "মায়া" পুস্তকে তাঁহার সম্পূর্ণ ইতিহাস বর্ণিত আছে। বৌদ্ধ মিশন ও বৌদ্ধ পুরোহিত দ্বারা এই স্থানের মায়া জাতি বিশেষ সংস্কৃত হইয়াছেন। ইউয়েন বলেন, এই জাতির লৌহ ছিল না, সৈন্য ছিল না, দুর্গ ছিল না, সুরক্ষিত নগর ছিল না; কিন্তু প্রচুর পরিমাণে তামা ছিল।

৪৯৯ খৃষ্টাব্দে ইউয়েন চীনদেশে ফিরিয়া আসেন এবং চীন সম্রাট তাহার লিখিত বিবরণ সযত্নে রক্ষা করেন। এই বিবরণে পরিস্কার জানা যায়, ইউয়েন কাবুলের লোক, বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথমে আমেরিকা আবিস্কার করিয়াছেন।

—ষ্টেট্‌স্‌ম্যান

ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ধনিগণ

নানা অর্থনৈতিক বিভ্রাটের মধ্যেও ইউরোপে বর্ত্তমানে বহু ধনীলোক বাস করিতেছেন। আমরা নিম্নে একে একে তাঁহাদের নাম করিতেছি :—

হল্যাণ্ড-প্রবাসী জার্ম্মানীর সিংহাসন-চ্যুত সম্রাট কাইসার ইউরোপের ধনিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মহাসমরের পূর্ব্বে তাহার যে ধন-সম্পত্তি ছিল, এখন তাহার পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহার বর্ত্তমান ধনের পরিমাণ ৭,৫০০,০০০ পাউণ্ড হইতে ১২,৫০০,০০০ পাউণ্ডের মধ্যে।

এই ধনের অধিকাংশ তিনি জার্ম্মানীতে এবং কতকাংশ হল্যাণ্ডে খাটাইতেছেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কাইসারের ধনের পরিমাণ ছিল ৭,০০০,০০০ পাউণ্ড। তাঁহার চারি জন প্রজা তাঁহার অপেক্ষাও বড় ধনী ছিলেন। তাঁহাদের প্রথম জনের নাম ফ্রোলিন বার্থা ক্রুপ। তাঁহার ধনের পরিমাণ ১৪,১৫০,০০০ পাউণ্ড। ক্রুপের ধন ক্রমান্বয় ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। বর্ত্তমানে হারফ্রিক্ এবং হারফ্রিজকে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় বলা যাইতে পারে।

এই দুই জনের ভিতরে কাহার ধনের পরিমাণ বেশী, তাহা সঠিক বলা যায় না। তৃতীয় ধনী ব্যক্তির নাম হার ওটো উল্ফ্। ইনি গত মহাযুদ্ধের সময়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনীদের মধ্যে একজন বলিয়া পরিচিত হন। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইহার নাম কেহ জানিত না।

ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় ধনী এম্, ফ্রান্‌কয়েস্ কোটি। ইনি গন্ধদ্রব্য ও পাউডারের ব্যবসায় করিয়া এই বিরাট ধনের অধিকারী হইয়াছেন। ইনি ১৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কর্শিকা দ্বীপ হইতে ব্যবসায় করিবার ইচ্ছায় ফ্রান্সে উপস্থিত হন এবং প্রথমে গন্ধ-দ্রব্য ফিরি করিতে আরম্ভ করেন।

বর্ত্তমানে তিনি ফ্রান্সের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। ইনি গন্ধ-দ্রব্য ও পাউডার বিক্রয় করিয়া ১০০০,০০০০০ পাউণ্ডের বেশী উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং ১০০০,০০০০ পাউণ্ডের বেশী নানা সদনুষ্ঠানে দান করিয়াছেন।

সংবাদপত্র পরিচালনায় ইঁহার বিশেষ আগ্রহ। ইনি ফ্রান্সের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ সংবাদ-পত্রের পরিচালক। ১৫ সেণ্ট মূল্যের যে কাগজখানি ইনি পরিচালন করিতেছেন, সেই খানিই ফ্রান্সের সব চেয়ে সস্তা কাগজ। ইনি কিছুদিন পূর্ব্বে সাধারণের সুবিধার্থে সস্তায় মাল চলাচলের জন্য ২ হাজার মোটর-গাড়ী ফ্রান্সে আমদানী করিয়াছেন।

যুগোশ্লাভিয়ার সব চেয়ে বড় ধনী আর্থার ডার্চ্চ। ইহার ধনের পরিমাণ ২০,০০০,০০০ পাউণ্ড। ইনি ময়দার কল এবং কাঠের ব্যবসায় করিয়া এই অর্থের মালিক হইয়াছেন। দ্বিতীয় ধনী জর্জ্জ ওয়েফার্জ্জ, ইহার ধনের পরিমাণ ১৬,০০০,০০০ পাউণ্ড। তৃতীয় ধনী ষ্ট্যাণ্ডরেজ সারাবন, ইহার ধনের পরিমাণ ৩,২০০,০০০ পাউণ্ড।

বুলগেরিয়া গরীবের দেশ, এখানে কোন উল্লেখযোগ্য ধনী নাই। এখানকার সব চেয়ে বড় ধনীর অর্থের পরিমাণ ৬০,০০০ পাউণ্ড মাত্র।

হাঙ্গেরীর শ্রেষ্ঠ ধনীর নাম প্রিন্স পল ইষ্টার হাজি। তাঁহার ভূসম্পত্তির পরিমাণ ৩০০,০০০ একর, কিন্তু তাহা সমস্তই বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পোল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ ধনীর নাম আলফ্রেড্ পোটুলি। তাঁহার ধন ও ভূসম্পত্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া না গেলেও এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে যে, তিনি কোন একটা খেলায় অবলীলাক্রমে ৫০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় ধনীর নাম র‍্যাডিজি ইউল, তাঁহার ধনের পরিমাণ সঠিকভাবে জানা যায় নাই।

জার্ম্মানীর প্রিন্স অব্ প্লেস্ একজন শ্রেষ্ঠ ধনী ও জমিদার। তাঁহার অর্থের পরিমাণ এই ঘটনা দ্বারাই বুঝিতে পারা যাইবে যে, তিনি তাঁহার আয়ের উপর বাৎসরিক ৪০০,০০০ পাউণ্ড ট্যাক্স দিয়া থাকেন।

লিথুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ধনী রিচার্ড টিল্‌ম্যানজ্। ইনি জাতিতে জার্ম্মাণ। ইঁহার অর্থের সঠিক পরিমাণ জানা যায় নাই। ২য় ধনী ইসার বার উল্‌ফ, ৩য় ধনী লিয়ন সোলোভিসিক। ইঁহাদের ধনের পরিমাণও জানিতে পারা যায় নাই।

রুমানিয়ার শ্রেষ্ঠ ধনী ডিমু মিহেল। ইঁহার ১,৩০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ মজুত আছে। ইনি চির-কুমার এবং ইঁহার কোন আত্মীয় জীবিত নাই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর ইনি তাঁহার সম্পত্তির সম্পূর্ণ মালিক হইয়াছেন।

রুশিয়ায় কোন ধনী নাই। বিখ্যাত ষ্টেলিন মাসিক ৩০ পাউণ্ড মাত্র উপার্জ্জন করেন। —ষ্টেট্‌স্‌ম্যান

মহাত্মা লোকমান

আরব-বাসীর নিকট মহাত্মা লোকমান একজন খোদা-ভক্ত, বিশ্বাসী এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিরূপে শ্রদ্ধালাভ করিয়া আসিতেছেন। এই হিসাবে মহাগ্রন্থ কোর্-আনেও তিনি জ্ঞানবান এবং বিশ্বাসীরূপে স্থান পাইয়াছেন। পবিত্র কোর্-আনে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ উপদেশ-দাতারূপেও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইতিহাসে তাঁহার সম্বন্ধে কিন্তু নানাপ্রকার মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি ছিলেন আরববাসী, কাহারও মতে তিনি হাবশী এবং কেহ তাঁহাকে ইউনানী বা গ্রীসের অধিবাসীরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আবার যাহারা তাঁহাকে আরবজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন—বংশ পরিচয়ের দিক্ দিয়া তাঁহারাও একমত হইতে পারেন নাই।

মিশরের জামে আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক "ফিল মিনার" নামক পত্রে মহাত্মা লোকমান সম্বন্ধে এক সুযুক্তিপূর্ণ সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে, তাওরাত মহাগ্রন্থে বাউরের পুত্র বলআম নামে তাঁহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যিনি এস্রাইল বংশজ ব্যক্তি নহেন—তিনিই আরবগণের নিকট লোকমান নামে পরিচিত। প্রবন্ধকার লিখিতেছেন—"বল্‌আম বিন্ বাউরকে তওরাত গ্রন্থে একজন কাফের সম্প্রদায় উদ্ভূত হাকিম বলিয়া উল্লেখিত আছে। ইঁহাকে তদীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা বনি এস্রাইলগণকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য আহ্বান করিতেছে;—তিনি গিয়াও অভিশাপ দানে বিরত থাকেন।" তওরাতে বলা হইয়াছে—তিনি খোদার অনুমতি লাভ করিয়াই অভিশাপ দেওয়ার জন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আগমনের পর আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়েন। এই বাউর পুত্র বল্‌আমই আরব-বাসীর নিকট বাউর পুত্র লোকমান নামে পরিচিত—একথা বলা চলে।

প্যারিসের প্রতীচ্য সভার বিশিষ্ট সদস্য ডাক্তার জি, ডারিনবার্গও এ প্রকার অভিমত পোষণ করেন। তাঁহার মতে লোকমান এবং বল্‌আম উভয়কেই বাউরের পুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আনোথ রচিত অতীব প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে,—বল্‌আম এবং লোকমান দুই নামে অভিহিত একই ব্যক্তি। দার্শনিক পণ্ডিত বল্‌আমকেই আরবগণ লোকনীন বা লোকমান নামে অভিহিত করিয়াছে। অভিধানের ব্যাখ্যা দ্বারাও ইহাই প্রতিপন্ন হয়। আরবী লকম এবং হিব্রু বল্‌আ একই অর্থজ্ঞাপক শব্দ। এই অভিমতের ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

এক্ষেত্রে কিন্তু একটী সমস্যা খুব গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। লোকমান এবং বল্‌আম যদি একই ব্যক্তি হন, তাহা হইলে মহাগ্রন্থ কোর্-আন এবং তওরাতে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত মতের সমাবেশ হইয়া পড়ে। বল্‌আম কাফের-দলের এক হাকীমরূপেই তওরাতে উল্লিখিত হইয়াছে এবং কোর্-আনে তাঁহাকে বিশ্বাসী, খোদাভক্ত, জ্ঞানবান ব্যক্তিরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এই সমস্যার সমাধান কি করিয়া হয়? এখন বিচার্য্য এই যে, মহাগ্রন্থ কোর্-আনের তফ্‌সিরকারগণের দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, লোকমান এস্রাইল বংশীয় ঐ ব্যক্তি, যিনি ইহুদিগণকে পূর্ব্বাপর এমন সব উপদেশ দান করিয়াছেন—যাহা বিশ্বাস আনয়নের পরই মানুষকে দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত তওরাতেও ইহাই স্বীকৃত হইয়াছে যে, বল্‌আম খোদার 'অনুমতি গ্রহণ করিয়া আসিলেন'; যে ব্যক্তি অবিশ্বাসী হইবে—তিনি

খোদার নিকট অনুমতি কি করিয়া পাইতে পারেন? উভয় গ্রন্থের মধ্যে এই সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় যে, লোকমান বা বল্‌আম খোদার আদেশ লঙ্ঘনকারী নহেন, অতএব বিশ্বাসী।

আবার তওরাতের এবং কোর্-আনের সব বিষয়ে ঐক্যমত দৃষ্ট হয় না। এ হিসাবেও আমাদের জন্য তওরাতের সমস্ত মত গৃহিতব্য হইতে পারে না। হজরত দাউদ, হজরত সোলায়মান, হজরত লুত (আঃ) মহাগ্রন্থ কোর্-আনের মতে পয়গম্বর ছিলেন; কিন্তু তওরাতে তাঁহাদিগকে পয়গম্বর বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। হজরত লুতকেও তওরাতে পাপী বলা হইয়াছে, কিন্তু কোর্-আনে তাঁহাকে নিষ্পাপ প্রতিপন্ন করা হয়। এই হিসাবেও তওরাতে উক্ত বল্‌আমকে যদি আমরা লোকমান হাকীমরূপে গ্রহণ করি, তাহাতে কোন অন্যায় হয় না এবং তওরাতের অভিমত এক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য ও অগ্রাহ্য হইতে পারে।

খৃষ্টীয় পণ্ডিতগণ তওরাতের অসামঞ্জস্য বাক্যাবলীর মধ্যে কোন স্থিরতায় পৌঁছিতে না পারায় তওরাতকে একেবারে উড়াইয়া দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই সব দিক্ বিচার করিয়া মহাগ্রন্থ কোর্-আনের উক্তি প্রামাণ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। ইতিহাস হইতেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, লোকমান হাকীম একজন খোদাভক্ত, বিশ্বাসী, জ্ঞানবান এবং সদুপদেষ্টা মহাত্মা ব্যক্তি ছিলেন সন্দেহ নাই।

—মোহাম্মদ লোকমান খাঁ

ইউনিয়ন বোর্ডের গঠন-প্রণালী

১৯২৮-২৯ সনের সরকারী বিবরণ হইতে প্রতি জেলায় ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত অধিবাসীর সংখ্যা, ভোটদাতা ও সভ্যসংখ্যা আমরা নিম্নে তুলিয়া দিলাম :—

জেলা	ইউনিয়ন বোর্ডের সংখ্যা	অধিবাসীর সংখ্যা	ভোটদাতা	সভ্যসংখ্যা					
				সরকারী	বে-সরকারী	মোট	হিন্দু	মুসলমান	অন্যা
বর্দ্ধমান	১৬৫	৯৬৪,২২১	৬৫,১৩২	৬	১,৪৫৬	১,৪৬২	১,১২৩	৩৩৯	...
বীরভূম	১৭১	৮২৩,৮৪৬	৪৩,৯৪২	৯	১,৫৩০	১,৫৩৯	১,১২৪	৪০৫	১০
বাঁকুড়া	১৮৩	৯৫৯,০৪৫	৫৪,১৪৯	...	১,৬৪৭	১,৬৪৭	১,৬৬০	১১১	৭৬
হুগলী	১২৬	৯০০,৮০২	৬০,২৯৬	...	১,১৩১	১,১৩১	৮৯৯	২৩২	...
হাওড়া	৮২	৭৭৮,৮৯৩	৪৬,৩৭৯	...	৭৩৮	৭৩৮	৬০২	১৩৬	...
২৪-পরগণা	১০৬	৭২২,৮৩০	৩৭,৩৫৯	...	...	৯৫৪	৫৪৮	৪০৫	১
নদীয়া	২৬৫	১,৩৪৭,৪৩৫	১২৩,৫৯৫	...	২,১৬৬	২,১৬৬	১,১৫৬	৯৯৬	১৪
মুর্শিদাবাদ	১৫৬	১,১৪৯,৯৬১	৪১,০৫৯	২	১,৪০২	১,৪০৪	৭২৯	৬৭৪	১
যশোহর	২৬১	১,৭০০,৯২৪	১২৭,৬৭৪	৪	২,৩৩৭	২,৩৪১	১,১১০	১,২২৯	২
খুলনা	১২০	৮৩৭,২৩৩	৫১,৭৭৭	...	১,০৮০	১,০৮০	৫৮০	৬৯৯	১
ঢাকা	৬০৭	২,৭৭৪,১৮২	১৬৬,৮১৬	...	২,৭৫৪	২,৭৫৪	১,২৭৬	১,৪৫৭	২১
ময়মনসিংহ	৩৮৬	৩,৫৮৯,৫২২	২২৪,৫৭৩	...	৩,৪৭১	৩,৪৭১	১,০০৩	২,৪৫৮	১০
ফরিদপুর	২২৫	২,১৬০,২৩২	১৬৩,৫৯৭	১০	২,০০২	২,০১২	৯২৭	১,০৭৭	৮
বাখরগঞ্জ	৫২	৪৩২,৬৮৮	৩৩,৮৯৫	২	৪৬৬	৪৬৬	১৫৬	৩০৭	৩
চট্টগ্রাম	১৫৭	১,২৮২,৩৯৯	৭১,৯৯২	১০	১,৪০৩	১৪১৩	৪০১	৯৬৩	৪৯
ত্রিপুরা	২৫৩	২,৬৭৮,৬২৭	১২২,৩২০	৭	২,২১০	২,২১৭	৭৫৪	১,৫২২	১
নোয়াখালী	৩৭	৩৭৭,০৬৫	২০৭৯৭	১	২৩২	২৩৩	৭৬	১৫৭	...
রাজসাহী	৬৯	৫১৩,১০৭	৫০,৭০৯	৯৯	৫২২	৬২১	১৫৬	৬৬৫	...
দিনাজপুর	২৭৮	১,৬৮৭,৩২৮	২৭৭,৪৮৪	১২০	২,৩৮২	২,৫০২	৯৭৭	১,৫১৯	৬
রঙ্গপুর	৩১৭	২,৩২৩,৮৩২	৩৩৩,৪৩৮	...	২,৮৫৩	২,৮৫৩	১,০৯৫	১,৭৫৭	১
বগুড়া	১৩২	১,০১৮৩৮৮	৭১,৩৫৮	...	১,১৮৮	১,১৮৮	৩০৫	৮৮০	৩
পাবনা	১৪৮	১,৩১৫,১৬৫	৬১,১৯৮	...	১,৩২২	১,৩২২	৪৭৭	৮৫১	৪
মালদহ	৯২	৭,৩৬,৯৯৩	৪২,৯৮৮	...	৭৭০	৭৭০	৩৪৫	৪২২	৩
দার্জ্জিলিং	১	...	৮৩৫	...	৯	৯	৬	২	১
	৪,০৮৯	৩১,০৭৪,৪১৮	২,২৯৩,২৬২	২৭০	৩৫,১৩৯	৩৬,৩৬৩	১৭,২৮৫	১৮,৮৬৩	২১

বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা ভাষা

— প্রবন্ধ —

ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী, মগহী এবং ভোজপুরী—এই ভাষা ছয়টিকে 'প্রাচ্য ভারতীয় আর্য্য-ভাষা' শ্রেণীভুক্ত করা হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ইহারা একই ভাষা-জননীর কন্যা। ইহাদের তুলনা ও ঐতিহাসিক গবেষণার দ্বারা ইহাদের মূল প্রাচ্য অপভ্রংশের রূপ জানা যাইবে।

এই প্রবন্ধে Indicative Mood বা নির্দ্দেশ ভাবের বর্ত্তমান কালের উত্তমপুরুষের রূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

বাঙ্গালা

একবচন	বহুবচন
চলি	চলি

আসামী

একবচন	বহুবচন
চলোঁ	চলোঁ

উড়িয়া

একবচন	বহুবচন
চালেঁ, চালি	চালু

মৈথিলী

একবচন	বহুবচন
চলোঁ*	চলী, চলিঐ+, চলিঔ+, চলিঅহু+, চলিঅ* চলিঐক+, চলিঔক+, চলিঐন্হি+

মগহী

একবচন	বহুবচন
চলুঁ	চলীঁ, চলী, চলিঅই+, চলিঅউ+

ভোজপুরী

একবচন	বহুবচন
চলোঁ*	চলীঁ

মন্তব্য। (১) তারকাচিহ্নিত পদগুলি সাধারণতঃ কবিতায় ব্যবহৃত হয়। (২) বিহারী (মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরী) ভাষাগুলিতে সাধারণতঃ বহুবচনের পদগুলি একবচনে ব্যবহৃত হয়। (৩) ছোরা-চিহ্নিত পদগুলি কর্ম্মের পুরুষ ও সম্মান-ভেদে প্রযুক্ত হয়। (৪) মগহী ও ভোজপুরীতে ধাতুরূপে স্ত্রী প্রত্যয় আছে। এগুলি অর্ব্বাচীন

যদি এই পদগুলির ঐতিহাসিক ক্রম-বিকাশের বিষয় অনুসন্ধান না করিয়া কেবলমাত্র আধুনিক রূপ লইয়া তুলনা করা যায়, তবে ইহাদের মূল রূপ স্থির করা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। এই জন্য ইহাদের ঐতিহাসিক বিচারের আবশ্যক।

বাঙ্গালা

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে উত্তম-পুরুষের রূপগুলি এই—চলোঁ, চলো, চলী, চলি, চলিএ। ইহাতে প্রয়োগের দিক্ দিয়া সর্ব্বনামের ঐতিহাসিক বহুবচন (আহ্মে, আহ্মি, আহ্মী, আহ্মেঁ) ও একবচনের (মোএ, মোএঁ, মোঁএ মোএ মোঞি, মো, মোঁ, মোঁই) কোন ভেদ নাই। এইরূপ প্রয়োগ আধুনিক বাঙ্গালায় একই ব্যক্তি একই কালে আমি ও মুই প্রয়োগ করিলে যেমন হয়, সর্ব্বতোভাবে সেইরূপ। যথা—

দূতা পাঠায়িআঁ আহ্মে নিব ত গোকুলে।
বাটত যাইতেঁ মো করিবোঁ অলঙ্কালে॥ (১২৭ পৃঃ)
পএর মগর খাড়ু মাথে ঘোড়া চুলে।
চাঁচরী খেলাওঁ মোএঁ যমুনার কূলে॥
খেড়ী [৫] খলাইএ আহ্মো নান্দের ঘরে।
নিন্দ না জাএ কংসরায় মোর ডরে॥ (৭৯ পৃঃ)

এইরূপ প্রয়োগ সর্ব্বত্র। সর্ব্বনামের এইরূপ প্রয়োগ দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন, বাঙ্গালা ভাষায় মধ্যম যুগের প্রথম ভাগে ক্রিয়াপদে উত্তমপুরুষের কোন বচন-ভেদ

ছিল না, তাহা যথার্থ হইবে না। আমরা শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন হইতে নিম্নে সেই সমস্ত বাক্যাংশ উদ্ধৃত করিব, যাহাতে উত্তম-পুরুষের কর্ত্তৃপদগুলি উক্ত হইয়াছে :—

পাওঁ মোএঁ (১০), আসি আহ্মি (১১), বোলোঁ মো, আহ্মে জানিএ (১৩), আহ্মে পারী, জাই আহ্মে (২ বার) (১৪), মো জাণোঁ (২৪), আহ্মে রহি (৩০), আহ্মে চাহী (৩১), পুছো মোএঁ, থাকোঁ মো, জাওঁ মো, দেখোঁ মো (৩৬), আহ্মে হইএ (৪২), দেওঁ মোএ (৪৩), জাণো আহ্মে (৪৪), নহোঁ মোএ (৪৫), হইএ আহ্মে (৪২), মো জাওঁ, বোলোঁ মোএঁ (৫০), বোলোঁ মো (৫৪), আহ্মে পাইএ (৫৬), ধরো মোঁ, জাওঁ মোএঁ (৫৮), জাইএ আহ্মে (৫৯), আহ্মে জাইএ (৭০), আহ্মে জানী (৭৬), খেলাওঁ মোএ, খেলাইএ আহ্মে (৭৯), দেখোঁ মো (৮০), মোএঁ ধরোঁ (৮৫), মোঁ পোহাওঁ (৯২), জাণিএ আহ্মী (৯৭), বোলোঁ মো (৯৯), ধরো আহ্মে (১০৩), কহো মোঁ (১০৫), হইএ আহ্মে, আহ্মে করী (১০৬), হইএ আহ্মে (১০৭), করোঁ মো (১০৮), মো সাধোঁ, থাকোঁ মো, সাধোঁ মোএ (১১২), আহ্মে জাই (১১৩), জাণো মোএঁ (১১৮), বোলোঁ মোএ (১১৯), মোএঁ হরোঁ (১২৯), নারোঁ মোএঁ (১৩৫), আহ্মে জাইএ (১৪০), বোলোঁ মোএঁ (২ বার) (১৪১), মোএঁ জাণো (১৪৭), করোঁ মো (১৪৮), মো জাণো (১৫০), মো জাণো (১৫১), নারোঁ মো (১৫৪), বোলোঁ মো, আহ্মে আছি (১৫৭), আহ্মে পারী (১৬৭), দেওঁ মোএঁ (১৬৯), আহ্মে মরী, নহোঁ মোএঁ (১৭৬), জাণো আহ্মে (১৭৭), লই আহ্মে (১৮৩), বোলোঁ মোএঁ (১৮৪), আহ্মে পারী, মো মানো, আহ্মে বহী (১৮৫), আহ্মে জাণী (১৮৮), আহ্মে সংহারী, আহ্মে নারী (১৯১), জাওঁ মো (১৯২), পারী আহ্মে (১৯৪), আহ্মে দেখী (১৯৯), আহ্মে জাণী (২০৪), ভুঞ্জোঁ মোএঁ (২১৬), করোঁ মো (২১৮), মো নাহিঁ নাশি, মো জাওঁ (২২৩), মোঞি জাণো (২২৪), আহ্মে পারী (২২৫), দেখোঁ মো (২২৬), আহ্মে তুলী (২৪১), মোএঁ খাটো (২৪২), রাখোঁ মো (২৪৩), মোএঁ করোঁ (২৪৫), আহ্মে জাণী (২৪৯), আহ্মে নাৰী, আহ্মে পাখি (২৫৪), নিবধিএ আহ্মে (২৬৪), যাওঁ মো (২৭১), হওঁ মো (২৭৫), নহোঁ মো (২৭৬), বোলোঁ মোঞ (২৮৫), মো হাণো (২৮৭), হরিএ আহ্মে (২৮৮), মো জাণো, মো কান্দো (২৯৫), মো দেখোঁ (২৯৬), মোএঁ জাওঁ (৩০৫), শুনো মো (৩০৬), আহ্মে করি (৩১৩), মোঞ এড়াওঁ (৩১৫), আহ্মে জাণোঁ, পুছি আহ্মে (৩১৭), মোঞঁ নেওঁ (৩১৯), আহ্মে জাণী (৩২১), আহ্মে নীএ, বোলোঁ মো, আহ্মে জাণী (৩২২), পাওঁ মো (৩২৩), আহ্মে পাই, আহ্মে নীএ (৩২৫), দিএ আহ্মে (৩৩০) চাহোঁ মো (৩৩১), জাণো মো (৩৩৫), মোঞঁ বোলোঁ (৩৪০), জাণো মো (৩৪২), আহ্মে জাণি, বোলোঁ মো (৩৪৭), ঝুরোঁ মো, মোঞঁ মানো (৩৫০), মোঞঁ দেওঁ (৩৫১), বোলোঁ মো, করোঁ মো (৩৫৭), জীঞোঁ মোঁ (৩৬০), আহ্মে পারী (৩৬৫), করোঁ মো (৩৬৯), খোজো মো, করো মো (৩৭২), আহ্মে পারী, যাঞোঁ মোঞেঁ, মোঞে জাণ (৩৭৩), মোঁ তোলোঁ (৩৭৪), আহ্মে চাহি (৩৭৫), চিন্তো মোঞেঁ, মোঁ করোঁ (৩৮৫), মো চাহোঁ (৩৮৬), মোঁ করোঁ (৩৯৪), বোলোঁ মো (৩৯৮)।

এই তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, (ঐতিহাসিক) একবচনের উদাহরণের সংখ্যা ৮৬টি। ইহার মধ্যে—

বিভক্তি			সংখ্যা
-ওঁ	বিভক্তিযুক্ত		৬৪
-ও	"		২০
-অ	"	(জাণ = জাণো)	১
-ই	"	(নাশি)	১
			৮৬

(ঐতিহাসিক) বহুবচনের উদাহরণের সংখ্যা ৫৫টি। ইহার মধ্যে—

বিভক্তি			সংখ্যা
-ইএ	বিভক্তিযুক্ত	"	১৪
-ঈ	"		২১
-ই	"		১৬
-ও	"	(জাণো ২ বার, ধরো)	৩
-ওঁ	"	(জাণোঁ)	১
			৫৫

ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, মধ্যযুগের প্রথমভাগে ক্রিয়ার উত্তম-পুরুষের একবচন ও বহুবচনের পৃথক্ রূপ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন ভিন্ন কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কবীন্দ্র পরমেশ্বর শ্রীকর নন্দীর মহাভারত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতি মধ্যযুগের পুস্তকে উত্তম-পুরুষের বিভক্তি -ও, -ওঁ,

-ইএ (-ইয়ে), -ই দেখা যায়। কিন্তু সেখানে সাধারণতঃ (ঐতিহাসিক) একবচন বহুবচন-নির্ব্বিশেষে এই বিভক্তি-গুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। মধ্যযুগের আদিতে উত্তম-পুরুষের একবচনের বিভক্তি যে ঙ এবং বহুবচনের বিভক্তি যে -ই ছিল, তাহা বাঙ্গালার কয়েকটি বর্ত্তমান dialect বা বিভাষা হইতে নিশ্চিত বোধ হইবে :—

পশ্চিম বিভাষা—সরকারী উপভাষা

একবচন	বহুবচন
মুই করুঁ	হামরা করি

উত্তর বিভাষা—কোচ-মিশ্রিত উপভাষা

মুই পাঁও	মোরা করি

রাজবংশী বিভাষা—রঙ্গপুরী উপভাষা

মুঁই করোঁ	হাম্‌রা করি

—জলপাইগুড়ি উপভাষা

মুই কঁর	হাম্‌রা করি

—কোচবিহারী উপভাষা

মুঁই মরোঁ	আমরা করি

—গোয়ালপাড়া উপভাষা

মুঁই করোঁ	আমরা করি

দক্ষিণ-পূর্ব্ব বিভাষা—চাকমা উপভাষা

মুই গরং	আমি গরি

—সিলহেটী উপভাষা

মুই যাঙ, যাউ, যাউ	আমি যাই

আসামী

বর্ত্তমান আসামী-ভাষায় ক্রিয়ার উত্তম-পুরুষে কোন বচনভেদ না থাকিলেও মধ্যযুগের প্রথমে ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। পীতাম্বর দ্বিজের উষার বিবাহ (১৫৩৩ খ্রীঃ অঃ), ভট্টদেবের (১৫৫৮—১৬৩৮) কথা-ভাগবত ও কথা-গীতা, নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ (১৭ শতক) প্রভৃতি পুস্তকে 'আমি করি' ইত্যাদি রূপ পাওয়া যায়। নিম্নে কথা-গীতা হইতে উদাহরণ দিতেছি :—

আমি করিছি (২ পৃষ্ঠা); আমরা করি, আমি ন করি (৮); আমি দেখি, আমি শুনিছি, মঞি রহোঁ, আমি করি (৯); মঞি নহোঁ (১১); মঞি ন করো (১২), আমি ন পারি (২০); মঞি কহিছুঁ (২ বার), মঞি ন কহোঁ (২২); মঞি করোঁ (২৫), মঞি করো, মঞি ন করোঁ (২৬), মঞি কহিছোঁ, মঞি জানো (২৯), মঞি ধরো, (২ বার), মঞি করো, মঞি করোঁ (৩০); মঞি সৃজিছোঁ (৩১); মঞি ন কহোঁ (৩৮); মঞি ন করো (৩৯); মঞি নহোঁ, মঞি করোঁ (৪৭); মঞি আছো, মঞি ন রহো (৫১); মঞি করোঁ (২ বার), মঞি ধরিছো (৫৩); মঞি নহোঁ, মঞি জানো (৫৪), মঞি হএো (৫৭); মঞি আছোঁ (৬৮); মঞি নাহি কএো, মঞি ধরো, মঞি থাকোঁ, মঞি সৃজো, মঞি সৃজাএ্ (৬২); মঞি করো (৬৪); মঞি দেএ্, মঞি করো (৬৫); মঞি করো (৬৬); মঞি হএ্ (৬৯); মঞি দেএ্, মঞি করো (৭০); মঞি আছোঁ (৭১); মঞি ধরিছোঁ (৭৩); মঞি ধরিছো, মঞি করো, মঞি হএ্ (৭৫); মঞি প্রবর্ত্তিছোঁ (৭৮); মঞি পাএো (৭৯); মঞি করোঁ (৮৪); মঞি হএো (৮৭); মঞি কহো (৮৮); মঞি করোঁ (৯৪); মঞি ধরোঁ, মঞি থাকি, মঞি হুয়াছোঁ (১০০); মঞি অতিক্রমিছো, মঞি হুয়াছোঁ (১০১); মঞি হএো (১০২); মঞি পেহ্লাএ্ (১০৪); মঞি কহো (১০৭); মঞি করোঁ (১১,৯); মঞি যাএ্ (১২০)।

এই ৬৯টি দৃষ্টান্তের মধ্যে কেবল 'মঞি থাকি' (১০০ পৃঃ) স্থানে একবচনে ই বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট স্থলে একবচনে ঙ, -ও, -এো (=ঙ), -এ্ (= -উঁ) ও বহুবচনে -ই বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাই যে মধ্যযুগের আসামী ভাষার আদি প্রয়োগ, তাহা আসামীর বিভাষা হইতে প্রমাণিত হয়।

ময়াং বিভাষা

একবচন	বহুবচন
মি অছু (=*osu*)	আমি অছি (=*osi*)

আসামীর এই প্রয়োগ বাঙ্গালার মধ্যযুগের আদি প্রয়োগের সহিত অভিন্ন।

উড়িয়া

পূর্ব্ব-ভারতীয় নব্য আর্য্যভাষাশ্রেণীর মধ্যে উড়িয়া অনেক বিষয়ে রক্ষণশীল। ইহাতে ক্রিয়ার উত্তম-পুরুষের বচনভেদ রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা মধ্যবাঙ্গালা ও মধ্যআসামীর একবচন ও বহুবচনের যে বিভক্তিগুলি নির্ণয় করিয়াছি, তাহার সহিত উড়িয়ার একবচন ও

বহুবচনের বিভক্তির মিল নাই। পরে আমরা ইহাদের মূল সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

মৈথিলী

মৈথিলীর একবচনের বিভক্তি -ওঁ মধ্যবাঙ্গলা ও মধ্যআসামীর একবচনের বিভক্তির সহিত অভিন্ন। বহুবচনে চলী ভিন্ন অন্য পদগুলি মৈথিলীর আধুনিক বিশেষ রূপ। অতএব বহুবচনের বিভক্তি -ঈ। ইহার সহিত বাঙ্গালা ও আসামীর মিল আছে।

মগহী

মগহীর একবচনের বিভক্তি -উঁ ও বহুবচনের বিভক্তি -ঈ, -ঈঁ। বহুবচনের অন্য বিভক্তিগুলি আধুনিক বিশেষ রূপ।

ইহাতে একবচন ও বহুবচনের বিভক্তির পার্থক্য আছে।

এক্ষণে আমরা এই ভাষা ছয়টির উত্তম-পুরুষের বিভক্তিগুলির মূল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

বৌদ্ধগান ও দোহার চর্য্যাগুলিতে উত্তম-পুরুষের বিভক্তিগুলি এই—

-(অ) মি (যেমন, জীবমি, জানমি ইত্যাদি)

-হুঁ (যেমন, দেহুঁ, লেহুঁ, অচ্ছহু=অচ্ছহুঁ, জাণহুঁ ইত্যাদি)

-ম (যেমন, অচ্ছম, চাহাম)

ইহাদের মধ্যে একবচনের বিভক্তি -(অ)মি এবং বহুবচনের বিভক্তি -হুঁ, -ম। চর্য্যার দুই স্থানে সর্ব্বনামের উত্তম-পুরুষের বহুবচনের সহিত -হুঁ বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়াপদের অন্বয় হইয়াছে (১২ ও ২২ সংখ্যক চর্য্যা দ্রষ্টব্য)।

অপভ্রংশে উত্তমপুরুষের বিভক্তি এই—

একবচন	বহুবচন
-(অ)মি (প্রাকৃত)	-হুঁ
-(অ)উঁ	-(অ)ম (প্রাকৃত)
	-(আ)ম („)

একবচন

প্রাচ্য অপভ্রংশ চলমি > চলবিঁ > চলইঁ (মধ্যউড়িয়া) > চলেঁ, চালেঁ (উড়িয়া)। এখানে উড়িয়ার সহিত মারাঠির মিল আছে।

প্রাচ্য অপ. চলমি > চলম (আদিম মধ্যবাঙ্গালা), যেমন প্রাচ্য অপ. করন্তি > করন্ত (মধ্যবাঙ্গালা)। তৎপরে চলম > * চলবঁ > * চলওঁ > চলোঁ (মধ্যবাঙ্গালা ও বিভাষা)। এইরূপে আসামী চলোঁ। আধুনিক আদিম একবচনের রূপ একবচন ও বহুবচনে অভেদে ব্যবহৃত হইতেছে। অন্য পক্ষে আমরা পরে দেখিব যে, সাধু বাঙ্গালায় আদিম বহুবচনের রূপ একবচন-বহুবচন-নির্ব্বিশেষে প্রযুক্ত হইতেছে।

প্রাচ্য অপ. চলমি > চলম > চলবঁ > চলওঁ (=চলঞো বিদ্যাপতি পদাবলী নং ৩০, ২৮৮, ৫৯৪ ইত্যাদি ; কীর্ত্তিলতা, ২ পৃষ্ঠা) > চলোঁ (মৈথিলী, ভোজপুরী)। এই দুই ভাষায় উত্তম-পুরুষের একবচন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

প্রাচ্য অপ. চলউ > চলুঁ > চলুঁ (মগহী)। মূলতঃ প্রাচ্য অপ. চলউ অনুজ্ঞার উত্তম-পুরুষের একবচন। মূল বিহারীতে চলুঁ অনুজ্ঞায় প্রযুক্ত হইত। ইহার প্রমাণ এই যে, মৈথিলীতে উত্তম-পুরুষের অনুজ্ঞায় চলুঁ হয় (পরে দ্রষ্টব্য)। অন্যান্য বিহারী ভাষায় অনুজ্ঞা ও নির্দ্দেশ (Indicative Mood) প্রয়োগ এক। এমন কি, মৈথিলীতে এই একমাত্র পদ ভিন্ন সমস্ত পুরুষে ও বচনে উভয় প্রয়োগের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। মগহীর উত্তম-পুরুষের একবচনে নির্দ্দেশ প্রয়োগের পদটি লুপ্ত হইয়া তাহার স্থান অনুজ্ঞার পদ অধিকার করিয়াছে। বিহারীর কয়েকটী বিভাষায় দুই পদই নির্দ্দেশ ভাবের উত্তম-পুরুষের একবচনে দেখা যায় ; যেমন—

মৈথিলী-ভোজপুরী বিভাষা

চলু, চলোঁ।

দক্ষিণ-মৈথিলী বিভাষা

চলুঁ, চলোঁ।

দক্ষিণ-মৈথিলী-মগহী বিভাষা

চলুঁ, চলোঁ।

মৈথিলী-বাঙ্গালা বিভাষা

চলুঁ, চলোঁ।

দুই পদ একই কথ্য বিভাষায় থাকায় চলোঁ হইতে চলুঁ উৎপন্ন নহে কিংবা দুইয়ের ব্যুৎপত্তি এক নহে বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। অবশ্য শাব্দিক পরিবর্ত্তন (phonetic change) হিসাবে চলুঁ > চলোঁ অসম্ভব নহে। যখন

আমরা ব্যুৎপত্তি বিচার করিব, তখন দৃষ্ট হইবে যে, অপ. চলউ প্রাকৃত অনুস্বার পদ হইতেই উৎপন্ন। নেপালী, হিন্দী, গুজরাতী প্রভৃতি কতিপয় নব্য ভারতীয় আর্য্যভাষার বর্ত্তমান কালের উত্তম-পুরুষের একবচন এই অপ. চলউ হইতে উৎপন্ন। অন্যদিকে বাঙ্গালা, আসামী ও উড়িয়ার ইহা হইতে ব্যুৎপন্ন কোন পদ নাই। বিহারী ভাষাগুলি মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করায় তাহাতে উভয় লক্ষণ বিদ্যমান থাকা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাশিত।

উড়িয়ার উত্তম-পুরুষের একবচনের চালি পদের ব্যুৎপত্তি বিতর্কশূন্য নহে। শাব্দিক পরিবর্ত্তনের দিক্ দিয়া প্রাচ্য অপ. চলমি > * চলবিঁ > চলইঁ > চলই > চলি, চালি সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত। কিন্তু একই সময়ে চলইঁ > চলেঁ এবং চলইঁ > চলি—এই বিভিন্নরূপ স্বরসন্ধির উপযুক্ত কারণ দেখা যায় না। আমরা এক্ষণে বহুবচন সম্বন্ধে যাহা বলিব, তাহা হইতে ইহার ব্যুৎপত্তি নির্ণীত হইবে।

বহুবচন

প্রাচ্য অপ. চলহুঁ > চলউ> চলুঁ, চালুঁ (উড়িয়া)। মধ্যবাঙ্গালায় চলহুঁ এইরূপ -হুঁ বিভক্তিযুক্ত উত্তমপুরুষের পদ ছিল। উড়িয়ার -উ বিভক্তি -অমু -অমো অম হইতে আসিতে পারিত। কিন্তু কোন পূর্ব্ব-ভারতীয় আর্য্যভাষার মধ্য বা নব্যযুগে বহু ব. -(অ)ম, -(অ) মো, -(অ) মু বিভক্তি হইতে ব্যুৎপন্ন কোন বিভক্তি নাই। নব্য বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার উত্তম-পুরুষের বহুবচনের ইতিহাস অনুরূপ।

বৌদ্ধগান ও দোহার চর্য্যাপদে কর্ম্ম বা ভাববাচ্যে বর্ত্তমানের প্রথমপুরুষের একবচনের বিভক্তি—

-(ই) অই (যেমন, করিঅই, মরিঅই, চর্য্যা ১; পাবিঅই, ভাবিঅই ২৬; ইত্যাদি)

-(ই)এ (যেমন, ছুহিএ, চর্য্যা ৩৩)

-ঈ (যেমন, দেখী, চর্য্যা ১৬; জাণী, বখাণী, ২৯, ৩৭; আবেশী, ৩৩; ইত্যাদি)

এতদ্ভিন্ন অনুরূপ আছে, তাহা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক।

অপভ্রংশে এই -(ই) অই বিভক্তি দেখা যায়; যথা, বল্লিঅই (হেমচন্দ্র ৮।৪।৩৪৫); তরিঅই (হেম ৪।৮।৩৮৩); মাণিঅই (হেম ৪.৮।৩৮৮)।

কর্ম্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে প্রথমপুরুষে মধ্যবাঙ্গালায় -ইএ, -ঈ বিভক্তি, মধ্যউড়িয়ায় -ইই, -ই বিভক্তি, এবং মধ্যমৈথিলীতে -ইঅ বিভক্তি পাওয়া যায়।

মধ্য-আসামীতে এইরূপ স্থলে -ই বিভক্তি দেখা যায়। "পরম কামুক তুমি ত্রিভুবনে জানি" (উষার বিবাহ, অসমীয়া সাহিত্যর চানেকি, ৪২৫ পৃঃ); "একে একে বুঝিলে রথী বুলি" (কথাগীতা, ৫ পৃঃ); "যি এমনে ন জানে তাক ছুর্ম্মতে কহি" (ঐ, ১১৪ পৃঃ); "যেন অগ্নি... শীতাদি নিবৃত্তির অর্থে সেবা করি" (ঐ, ১১৭ পৃঃ) ইত্যাদি।

বাঙ্গালার উত্তমপুরুষের বিভক্তি, মধ্যআসামীর উত্তম-পুরুষের বহুবচনের বিভক্তি, উড়িয়ার উত্তমপুরুষের একবচনের বিভক্তি -ই, এবং বিহারীর উত্তমপুরুষের বহুবচনের বিভক্তি -ঈ এই কর্ম্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের বিভক্তি হইতে অভিন্ন। ইহাতে তাহাদের ব্যুৎপত্তি সূচিত হইতেছে। আধুনিক গুজরাতী ও পাঞ্জাবীতেও উত্তমপুরুষের বহুবচনের বিভক্তির এইরূপ; গুজ. অমে চালীএ, পঞ্জা. অসীঁ চলিএ, = মধ্যবাঙালা আহ্মে চলিএ, = আধুনিক বাঙ্গলা আমি চলি।

কীর্ত্তিলতায় -ইঅ বিভক্তি উত্তমপুরুষের একবচনের সহিত অন্বিত হইয়াছে, যথা মন্দ করিঅ হঞো (=হওঁ= অপ. হউ; ৭ পৃঃ)। মৈথিলীর এই প্রাচীন প্রয়োগ এবং আধুনিক উড়িয়ার প্রয়োগ হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, মূলতঃ প্রাচ্য অপ. -(ই) অই, -ঈ উত্তম-পুরুষের একবচন ও বহুবচনের সহিত ব্যবহৃত হইত। আধুনিক উড়িয়ার একবচনে দুই প্রয়োগই রক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু বহুবচনের প্রয়োগে প্রাচ্য অপ. উত্তমপুরুষ বহুবচনের -হুঁ বিভক্তির নিকট ইহা পরাজিত হইয়াছে; অন্য পক্ষে নব্য বাঙ্গালা, মধ্যআসামী ও নব্য ও মধ্যবিহারী ভাষাসমূহ ইহা -হুঁ বিভক্তিকে বহিষ্কৃত করিয়াছে। কিন্তু প্রাচ্য অপ. উত্তমপুরুষ একবচন -(অ)মি বিভক্তি দ্বারা স্বয়ং বিতাড়িত হইয়াছে।

প্রাচ্য অপ. চলিঅই > চলিএ (ম. বাং) > চলী, চলি (মধ্য এবং নব্য বাং)। যেমন অসমাপিকা চালআ, চলিঅ, চলি—তিন পদই চর্য্যাসমূহে দেখা যায়, সেইরূপ আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, চলিঅই, চলিএ, চলী তিন পদই চর্য্যায় পাওয়া যায়। এইরূপে মধ্যবাঙ্গালায়ও চলিএ, চলী চলি—তিন পদই ব্যবহৃত হইত। আধুনিক বাঙ্গালায় চলিএ মৃত হইয়াছে।

প্রাচ্য অপ. চলিঅই > চলিঅ (মধ্যমৈথিলী) > চলী (নব্য মৈথিলী)। মগহীতে অতিরিক্ত চলীঁ আছে। ভোজপুরীতে কেবল চলীঁ। উত্তমপুরুষের একবচনের আনুরূপ্যে (analogy) বহুবচনও সানুনাসিক হইয়াছে। অন্য পক্ষে এই আনুরূপ্যবশতঃ মৈথিলীর অনুস্বার উত্তম-পুরুষের একবচন অনুনাসিকবিহীন হইয়াছে (পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য)।

সংক্ষিপ্ত-সার

নির্দ্দেশ ভাব (Indicative Mood)
[প্রাচ্য অপ. একবচন] চলমি [একবচন]
চলবিঁ
চলম [মধ্যবাঙ্গালা]
[ম. উড়িয়া চলইঁ ১ ব.]
* চলবঁ
[নব্য উড়িয়া চালেঁ ১ ব.]
চলওঁ (=চলঞো ম. মৈ. ১ ব.)
চলো
[ম. বাং. ১ ব.
ম. আসা, ১ ব.
নব্য „ উভয়
„ মৈ, ১ ব.
„ ভোজ. ১ ব.]
[প্রাচ্য অপ. বহুব.]
চলহুঁ
চলউ
চলহুঁ [ম. বাং]
[নব্য উড়িয়া বহুব.]
চালু
চলহো [ঐ]
অনুজ্ঞা ভাব
[প্রাচ্য অপ. ১ ব.] চলমু
চলিমু [প্রাচ্য অপ. বহুব.]
চলবঁ
চলিবুঁ
[নব্য প্রাচ্য অপ. ১ ব. চলউ
চলিউ [ম. বাং বহুব. অনুজ্ঞা]
[নব্য মগহী ১ ব. চলুঁ
নির্দ্দেশ ও অনুজ্ঞা] ।
চলিউ [ঐ]
[নব্য মৈথিলী ১ ব. অনুজ্ঞা] চলু
কর্ম্মবাচ্য বা (ভাববাচ্য)
[প্রাচ্য অপ. ১ ব.] চলিঅই
[প্রা. অপ. ১ম পু. ১ ব. কর্ম্ম বা. চলিএ
মধ্য বাং. „ উভ ব. „
„ উত্তম পু. বহু ব. কর্ত্তৃ বা.]
চলিই
[ম. উড়িয়া ১ পু. ১ ব.
চলিঅ
[মধ্য মৈ. উত্তম পু. উভ ব. কর্ত্তৃ বা.
„ „ ১ম পু. „ কর্ম্ম বা.
[পূর্ব্বের ন্যায়]
চলী
কর্ম্ম বা]
চলী [নব্য মৈ. উত্তম. বহুব. কর্ত্তৃ বা.
„ মগ. „ „ „
„ ভোজ মধ্য. ১ম. „ „
[মধ্য বাং উত্তম বহুব, কর্ত্তৃ বা.
চলি
চলি
চলী [„ „ ১ম উ, পু. „ „
নব বাং. „ „ উভ ব.
[নব্য উড়িয়া উত্তম. ১ব. কর্ত্তৃ বা]
„ „ তিন পু. „ „]
মধ্য আসা. উত্তম. বহু ব. কর্ত্তৃবা.
„ „ ১ম পু. উভ ব. কর্ম বা.]
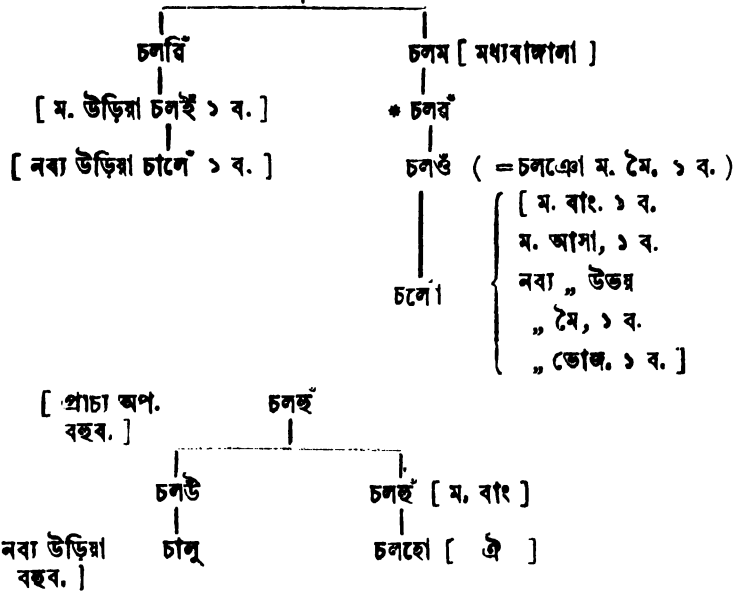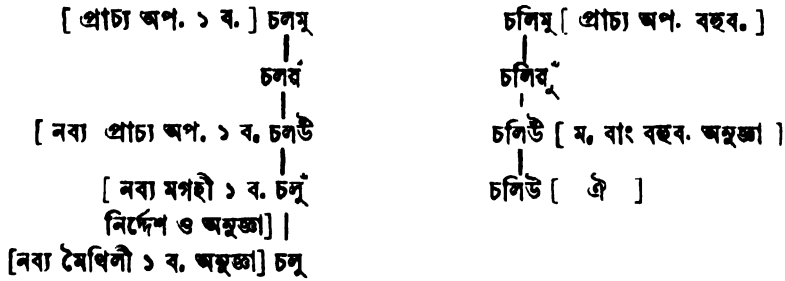
প্রাচ্য অপভ্রংশ

কর্তৃবাচ্য বর্ত্তমান কাল

নির্দ্দেশ ভাব
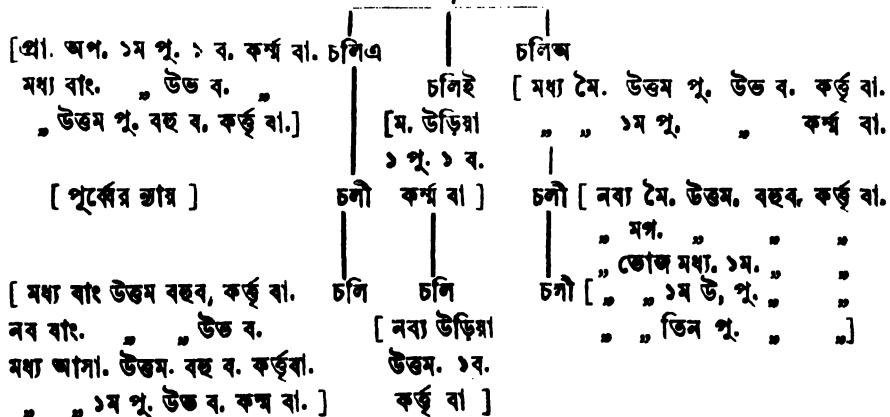
উত্তমপুরুষ

একবচন	বহুবচন
চলমি	চলহুঁ

অনুজ্ঞা ভাব

উত্তমপুরুষ

একবচন	বহুবচন
চলমু,	চলিমু
চলউ	

কর্ম্ম বা ভাববচ্য—বর্ত্তমান কাল

নির্দ্দেশ ভাব

উত্তমপুরুষ

একবচন

চলিঅই,

চলিএ, চলী

এক্ষণে আমরা এই প্রাচ্য অপভ্রংশ পদগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

অপ. চলমি < প্রাকৃত, পালি, সং, চলামি

চলহুঁ পদের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত আছে।

(১) Hoernle-এর মতে—অহঁ < -অউ < প্রা. -অমু < সং -আমঃ। হকার আগম একবচন অউ < প্রা. অমু (অনুজ্ঞা) হইতে পার্থক্যের জন্য এবং ১ম পু. বহু ব. -অহিঁ বিভক্তির আনুরূপ্যের জন্য। তাঁহার অন্যমতে -অহুঁ < প্রা. -অম্হো -অম্হ। কিন্তু তিনি এই প্রাকৃত বিভক্তি সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পান নাই। কিন্তু Pischel দেখাইয়াছেন যে, শৌরসেনী, মাগধী ও ঢক্কী প্রাকৃতে প্রায়ই এবং মাহারাষ্ট্রী ও জৈন মাহারাষ্ট্রীতে কদাচিৎ অনুজ্ঞায় উত্তম পু. বহু ব. -অম্হ, -এম্হ বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। Pischel-এর মতে এই ম্হ < -স্ম (সংস্কৃতের লুঙ্ বিভক্তি)। (২) Pischel Hoernle-র মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন; কিন্তু নিজে ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। (৩) ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে -হুঁ বিভক্তি সর্ব্বনাম -হউ হইতে ব্যুৎপন্ন। (১২) পূজ্যপাদ J. Bloch-এর মতে একবচন (বট্টউ) হইতে পৃথক করিবার জন্য বহুবচনে -হ -আগম হইয়াছে (বট্টহুঁ) (১৩)। -অহুঁ < *-অঁহ < *-অম্হ < -অম্হ অসম্ভব নহে। ডক্টর সুনীতিকুমারের ব্যুৎপত্তি অসম্ভব। হউ একবচন; কিন্তু -অহুঁ বহুবচনের বিভক্তি। হেমচন্দ্র (৮।৩।১৪৩) ও মার্কণ্ডেয়ের (৬।৮) মতে লটের -থ স্থানে লুঙের -ইত্থা বিভক্তি হইতে পারে। Pischel দেখাইয়াছেন, লোটের -ম স্থানে লুঙের -স্ম বিভক্তি হইতে পারে। লটের -মস্ স্থানেও লুঙের -স্ম হওয়া সম্ভব। মার্কণ্ডেয় (৯।১০৩) এইরূপ বিধান দেন। রত্নাবলী শকুন্তলায় এইরূপ প্রয়োগ আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, Pischel ইহা স্বীকার করেন না। মূলে অনুজ্ঞা স্বীকার করিলেও নির্দ্দেশ ভাবে চলহুঁ প্রয়োগ সর্ব্বতোভাবে সম্ভব। (তুং অপভ্রংশ লট্ সি স্থানে—হি বিভক্তি)। J. Bloch-এর মত সমীচীন নহে; কারণ, -অউ, -অহু সমকালীন নহে। অউ বিভক্তি অর্ব্বাচীন প্রয়োগ।

চলমু পদের প্রয়োগ প্রাকৃতে অনুজ্ঞায় পাওয়া যায়। ইহা চলই : চলউ :: চলমি : চলমু—এইরূপ অনুরূপ সৃষ্টি। অপভ্রংশে চলউ নির্দ্দেশ ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই চলউ < চলমু। মু স্থানে উ থাকায় চলউ পদটি অর্ব্বাচীন।

চলিমু পদ প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে লট্ মস্ স্থানে প্রযুক্ত হয়। অপভ্রংশে লট্ ও লোটে চলহুঁ। লটের চলিম পদের আনুরূপ্যে চলিমু। কিংবা লটের পদই লোটে প্রযুক্ত হইয়াছে। (তুং প্রাকৃতে লট্ ও লোটের উত্তমপুরুষের বহুবচনে চলামো)।

চলিঅই < চলীঅই (প্রাকৃত) < চল্যতে (সং)। চলিএ < চলিঅই। চলী < চলিএ। এক সময়ে তিন স্তরের প্রত্যয় লেখ্য ভাষায় থাকা সম্ভব। তু পালি -ত্তি, -হি; -ম্হা, ম্হা; -স্মিং, ম্হি; প্রাকৃত (মাগধী) -শ্শ, -(আ) হ; অপভ্রংশ—এণ, এঁ; ইত্যাদি।
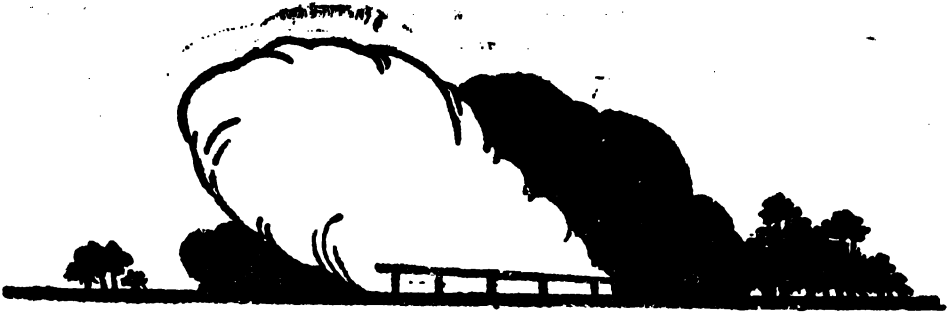
সতীনের শাস্তি

— গল্প —

—ডাঃ লুৎফর রহমান

সামান্য-সামান্য ব্যাপার নিয়েই স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য বেঁধে উঠ্‌লো। লক্ষ্মী যদি একটুখানি সতর্ক হ'য়ে চলতো, তা' হলে আর সংসারে এতটা অশান্তি ঘটত না। লক্ষ্মীর মনে যে কোন পাপ ছিল, তা' নয়। সংসারের এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে তার স্বামী যে এতটা মনে করবেন, এ সে ভাব্‌তেও পারে নাই!—তার কাছে যা ক্ষুদ্র ও নগণ্য বলে মনে হয়েছে, তা' পাহাড় হয়ে স্বামী রমেশের জীবনকে প্রতি দিন চূর্ণ করে দিচ্ছে!

রমেশ সর্ব্বদাই তার পত্নীর উপর বিরক্ত হয়ে থাকে। পত্নী লক্ষ্মীর একটা নয়, অনেকগুলি দুঃস্বভাব ছিল—সেগুলি তার নিজের নজরে ঠেক্‌তো না। কেউ বল্লেও সে তা গ্রাহ্য করতো না। তার এই সব ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ভুলে তার স্বামী যে কতখানি চটে যেতো, তা সে মোটেই ভাবতো না।

তার বড় দোষ ছিল, সে বড় অমনোযোগী। কেউ তাকে লক্ষ্য ক'রে কোন কথা বলছেন, তখন সে হয়ত আর এক দিকে চেয়ে আছে। দুই-তিন বার না ডাকলে সে কথার উত্তর দিত না। উত্তর দিলেও এমন একটা কিছু উত্তর দিত, যা শুনে ছেলে-মেয়েরাও হেসে উঠত। স্বামী রমেশ তো একেবারে ক্রোধে আগুন হয়ে যেতো।

স্বামীর ক্রোধের শেষ কোথায় যেয়ে দাঁড়াতে পারে, এ সে বুঝতে চেষ্টা করতো না। পানি যেমন দু' ভাগ হয় না, তার স্বামীর সঙ্গে তার কোন মতে বিচ্ছেদ সম্ভব নয়, এই ছিল তার বিশ্বাস।—স্বামী যতই রাগুন, ফিরে তাঁকে তার কাছে আসতেই হবে।

বউকে যতই রমেশ বলে, ঘরের কোন জিনিস এলো-মেলো করে রেখ না, ততই যেন বউ আড়ি করে সংসারের জিনিস-পত্র যত্র-তত্র ছুড়ে ফেলে। দু'পুর রাতে ঘরে বাঘ ঢুকলেও ম্যাচ বাক্সটী খুঁজে পাবার যো নাই! তেল মাথায় দিয়ে গামছা খুঁজতে খুঁজতে বেলা তিন্‌টে বেজে যাবে। দোয়াত পাওয়া গেলে কলম পাওয়া যায় না। জিজ্ঞেস কল্লে লক্ষ্মী অমনি বলে, আমি কি সংসারের কর্ত্তা?—কে কোথায় কোন জিনিস্ রাখে, আমি তার কি জানি?

জিনিসপত্র বে-গোছাল করে রাখাতে রমেশ তত রাগত না, যত সে ক্রুদ্ধ হতো লক্ষ্মীর অবাধ্যতায় এবং তার দ্বন্দ্ব-প্রিয়তায়। রমেশ একটা কথা বল্লে লক্ষ্মী দশটা বলে।—যা তা একটা উত্তর দেওয়া চাই-ই,—সে উত্তর ন্যায় হোক্ বা অন্যায় হোক্।

রমেশ হাড়ে-হাড়ে চটে যায়। লক্ষ্মী বলে, রাগলে আমার বয়ে গেল।

পুরুষ মানুষ রাগলে যে মেয়ে-মানুষের কিছু বয়ে যায় না, তা ঠিক বলা যায় না।—তাতে আসলে মেয়ে-মানুষের খুব ক্ষতি হয়। অবিনয় এবং অবাধ্যতায় মেয়েমানুষের রূপের মর্য্যাদা কমে যায়। লক্ষ্মীর বুদ্ধির গুরুত্ব ছিল না—জীবনে যে একটা ওলট-পালট সম্ভব, তা সে ভ্রমেও চিন্তা করত না।—এতেই তার এতটা জেদ।

• • • •

রমেশ তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কল্লে—ক্ষুরখানি কোথায়?

লক্ষ্মী বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিলে—ক্ষুর দিয়ে কি আমি দাড়ি চাচি?

"তুমি দাড়ী চাচ না, তা জানি ;—কিন্তু আমার জিনিসগুলি গুছিয়ে রাখা, স্ত্রীরূপে তোমার কর্ত্তব্য।

লক্ষ্মী।—আমি যদি অত না পারি।

"না পারে পরের ছেলের সঙ্গে ঘর করতে নেই। তোমার কারো বউ না হওয়াই উচিত ছিল।"

লক্ষ্মী।—আমার কোন ইচ্ছে ছিল না। বাবাই আমাকে তোমার কাছে জোর করে চেপে দিয়েছেন।

সে তর্ক করা এখন ভাল নয়।—বাবা যা অন্যায় করেছেন, তারই প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে বুঝি, আমার উপরে।

লক্ষ্মী।—আমি কারো উপর প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছি নে।

যা তা কথা ব'লে অনর্থক তর্ক ক'রে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করাই লক্ষ্মীর কাজ। সামান্য দৃষ্টি এবং সুবিবেচনা-তেই সংসারে শান্তি এবং শৃঙ্খলা স্থাপিত হতে পারে, লক্ষ্মীর ধাতে তা যেন মোটেই ভাল লাগে না। যাতে স্বামী দুঃখিত হন, অযথা কলহ বাঁধে, সে অবহেলে তাই করবে। একটু ভেবে দেখবার মত ধৈর্য্য তাতে ছিল না। আশ্চর্য্য তার প্রকৃতি—শুধু ক্রুদ্ধ হওয়া, এবং কল্পিত দুঃখে বকে-বকে কাঁদাই তার দৈনন্দিন জীবনের কাজ!

* * *

রমেশ ঠিক করেছে, সে আর বাড়ী থাকবে না। কোথায়ও চলে যাবে। একটু চিন্তা করে পুনরায় সে ভাবল 'মেয়ে-মানুষের জন্যে দেশ-ত্যাগী হবো? সেই বা কেমন কথা!' ঘর আমার, বাড়ী আমার—লক্ষ্মীর মত কত মেয়ে-মানুষ পথে-ঘাটে প'ড়ে আছে! নূতন একটা নিয়ে এলেই হলো! কিন্তু মানুষের একটা ইজ্জত-জ্ঞানও তো আছে। মেয়ে-মানুষ হলেই তো হয় না। একটা পথের নারীকে তো সে আর বাড়ীতে স্থান দিতে পারে না।—একটা বউ থাকতে আর একটা বিয়েই বা সে কি করে করবে? বিয়ে বল্লেই তো হয় না, তাতে ক'রে তার অবস্থাও তত ভাল নয়।

জীবন-জঞ্জাল বাড়াতে মেয়ে-মানুষ প্রথম নম্বরের পুরস্কার পেতে পারে। সংসারের শান্তিও কিন্তু তার হাতে! অথচ এই জঞ্জালের জিনিসটা না হলেও চলে না। পুরুষের সঙ্গে তার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।—হয়ত এই জন্যেই তার এতটা বাড়াবাড়ি! র'য়ে-স'য়ে পুরুষের উপরে কর্ত্তৃত্ব করতে পারলে, নারী পুরুষকে দিয়ে অনেক কিছু করে নিতে পারে,—সে তো তার বিনা বেতনের নফর! কিন্তু পুরুষের মনে নারীর প্রতি একবার অশ্রদ্ধা, তার ভালবাসার প্রতি একবার অবিশ্বাস জন্মলে আর কোন আশা নাই। নারী তখন অশেষ দুর্গতির পাত্রী হয়ে পড়েন। তখন তার দুঃখের অবধি থাকে না।

* * *

রমেশের চিন্তার অবধি নেই। তার শূন্য বুক কিছুতেই ভরে ওঠে না। কোন কিছুই তার ভাল লাগে না! তার সঙ্গী হয়ে যে নারী তার কাছে এসেছে, সে তার চিত্তকে আনন্দ-খোরাক্ দিতে সমর্থা হয় নাই। রমেশ ঠিক করলে, লক্ষ্মীর সঙ্গে সে সকল সংশ্রব ত্যাগ করবে।

* * *

রমেশের একটি দুষ্ট বন্ধু হঠাৎ গ্রামময় বিশেষ ক'রে লক্ষ্মীর কাণের গোড়ায় রাষ্ট্র করে দিলে, কলকাতায় রমেশ বাবুর একটা বউ আছে! এতে আর কিছু না হোক, একটা গুরুতর লাভ হলো। লক্ষ্মীর কোন্দল-প্রিয়তার অবসান সেই দিন থেকেই হলো। যে মানুষ বেলা আটটা পর্য্যন্ত শুয়ে থাকত, সে এখন ভোর না হতেই বিছানা ছেড়ে ওঠে। সংসারে ষোল আনা শৃঙ্খলা দেখা দিল। যে মানুষ আড়ি করে রমেশের সম্মুখে কালী-ধুলা মেখে থাকত, সে এখন সব সময় স্বামীকে সাবান ও এসেন্সের জন্যে তাগাদা দেয়—তার সাজ-সজ্জার অবধি নেই। মুখে এখন তার সহৃদয়তা এবং হাসি লেগেই আছে। রমেশ ও বন্ধুর কল্যাণে রক্ষা পেয়েছে!

— শ্রেষ্ঠ নাগরিক

কলিকাতার নব-নির্ব্বাচিত মেয়র

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

নব-নির্ব্বাচিত ডেপুটী মেয়র

মৌলভী আবদুর রজ্জাক

গত ১৫ই এপ্রিল বুধবার কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মেয়র ও মৌলভী আবদুর রজ্জাক ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। গতবার এই দুই পদে দুইজন হিন্দুকে নির্ব্বাচিত করায় মুসলমান সমাজে তীব্র আপত্তি উঠিয়াছিল। এইবার গতবারের ত্রুটী সংশোধন করায় আমরা কাউন্সিলারগণকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। যোগ্য ব্যক্তিই যে এই দুই পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আমরা আশা করি, নব-নির্ব্বাচিত মেয়র ও ডেপুটী মেয়রের পরিচালনাধীনে কলিকাতা কর্পোরেশনের বহুবিধ উন্নতি সাধিত হইবে।

বিজ্ঞানাচার্য্য

স্যার জগদীশচন্দ্র বসু

গত ১৪ই এপ্রিল তারিখে কলিকাতা টাউন-হলে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করা হয়। অভিনন্দন-পত্রখানি খদ্দরের উপর মুদ্রিত ছিল। উহাতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর জীবন-ব্যাপী বিজ্ঞান-সাধনার নানা সাফল্যের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। অভিনন্দন-পত্র ইংরাজীতে লিখিত হওয়ায় "খদ্দরের উপর ইংরেজী লেখা শোভা পায় না" বলিয়া উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী এবং স্বয়ং আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুও ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। বহু ইংরাজ ও অবাঙ্গালী বন্ধু উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তিনি বাঙ্গলাতেই অভিনন্দনের উত্তর প্রদান করেন। বাঙ্গলার ইংরাজী-শিক্ষিত যুবকগণ আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিলে আমরা সুখী হইব।

বাংলার অর্থনীতি বেদ্

বাংলার অর্থনীতি-শাস্ত্রের ডিরেক্টর অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার "ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা ও উহার সহিত আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ" বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য রোম বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া যান। সম্প্রতি তিনি ইতালীয় ভাষায় উক্ত বিষয়ে এক বক্তৃতা দিয়াছেন। ইতালীর সংবাদ পত্রে প্রকাশ মিঃ সরকার বিশুদ্ধ ইতালীয় ভাষায় সমগ্র বিশ্বের বর্ত্তমান অবস্থার তুলনায় ভারতের অর্থনীতির সম্বন্ধ বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা হৃদয়গ্রাহী এবং গবেষণাপূর্ণ তথ্যে পরিপূর্ণ।

পক বিনয়কুমার সরকার

গণতান্ত্রিক স্পেন

স্পেনের সিংহাসন-ত্যাগী রাজা

য়্যাল্ ফিন্ সো

স্পেনের ভূতপূর্ব্ব রাণী

ভিক্টোরিয়া দৌহিত্রী ইনা

গত ১৪ই এপ্রিল রাত্রি ভোর হইবার পূর্ব্বেই স্পেনের রাজা য়্যাল্ ফিন্ সো সিংহাসনের দাবী পরিত্যাগ করতঃ "প্রিন্স য়্যাল্ ফিন্ সো" নামক যুদ্ধ-জাহাজে স্পেনের উপকূল পরিত্যাগ করিয়াছেন। য়্যাল্ ফিন্ সো মাদ্রিদ্ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে এক ঘোষণা-পত্র লিখিয়া গিয়াছেন। এই ঘোষণায় তিনি বলেন যে, সম্প্রতি স্পেনে যে সমস্ত নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, তিনি প্রজাবর্গের ভালবাসা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বিবেক তাঁহাকে বলিতেছে যে, রাজার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ বেশী দিন স্থায়ী হইবে না, কারণ তিনি যাহা-কিছু করিয়াছেন, সমস্তই স্পেনের সেবার জন্য। তিনি দৃঢ় সংকল্প করিয়াছেন যে, তিনি এমন কোন কার্য্যের মধ্যে যাইবেন না, যাহার ফলে দেশে গৃহযুদ্ধ এবং ভ্রাতৃ-বিরোধ আরম্ভ হইতে পারে।

স্পেনের প্রেসিডেন্ট কর্ণেল জ্যামোরা

কর্ণেল জ্যামোরা স্পেনের সাধারণ-তন্ত্র রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। কর্ণেল জ্যামোরা তাঁহার শাসনের মূলনীতি হিসাবে ঘোষণা করিয়াছেন,—"ধীরে ধীরে বিশৃঙ্খলা দূর করিতে এবং রক্তপাত বন্ধ করিতে হইবে।" জ্যামোরার বর্ত্তমান বয়স ৫০ বৎসর। সম্প্রতি কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি এবং সাধারণ-তন্ত্র দলের নায়ক মেজর ফ্রাঙ্কো এই দুইজনে মিলিত হইয়া গবর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করিবার জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন

—রাজপ্রতিনিধি

সদ্য অবসর প্রাপ্ত ভাইসরয়

লর্ড আরউইন

গত ১৮ই এপ্রিল মুহুর্মুহু তোপধ্বনির মধ্যে লর্ড আরউইন, তদীয় পত্নী এবং কন্যা বোম্বাই হইতে "ভাইসরয় অব ইণ্ডিয়া" জাহাজে ইংলণ্ড রওনা হইয়াছেন। ঠিক দুইটা বাজিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহারা ষ্টীম-লঞ্চে আরোহণ করেন। সেই সময়ে তীরভূমি হইতে সম্মানসূচক তোপধ্বনি করা হয়। সস্ত্রীক বোম্বায়ের গভর্ণর আগা-গোড়া লর্ড আরউইনের সঙ্গে ছিলেন।

নবাগত ভাইসরয়

লর্ড উইলিংডন

গত ১৭ই এপ্রিল লর্ড ও লেডি উইলিংডন "ভাইসরয় অব ইণ্ডিয়া" জাহাজে বোম্বাই অবতরণ করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের মিউনিসিপ্যালিটি নূতন বড়লাটকে অভিনন্দন প্রদান করেন। অভিনন্দনের উত্তর দেওয়ার পর বড়লাট সস্ত্রীক স্থানীয় লাট-প্রাসাদে গমন করেন। তাঁহাদের গমন-পথে বহু লোক-সমাগম হইয়াছিল।

— বিবিধ

আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব বাদশাহ্

আমানুল্লাহ্ খাঁ বাহাদুর

হজব্রত উদযাপনের উদ্দেশ্যে আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব বাদশাহ্ মাননীয় আমানুল্লাহ্ খাঁ বাহাদুর "তালুদী" জাহাজের অপেক্ষায় সঙ্গীদ্বয় সহ সুয়েজ বন্দরে দণ্ডায়মান। মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান ব্যক্তি আমানুল্লাহ্।

ব্যবস্থাপক সভার সদস্য

প্রিন্স আক্রম হোসেন

ইনি আযোধ্যার শেষ স্বাধীন নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের পুত্র। গত ১৩ই এপ্রিল তারিখে ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যকরী সদস্যের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। স্যার এ, কে, গজনভি হজ্জে চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার স্থলে ইনি অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সীমান্ত-গান্ধীর হস্তলিপি

Afghans are always ready to serve the country's cause under the spirit of nonviolence.

Hindu Muslim riots are the deadly thorns in freedom's path.

I appeal the public for Hindu Muslim Unity

Abdul Ghaffar Khan

7. 4. 31

— অনুবাদ —

আফ্‌গানগণ অহিংসার পথে দেশ-সেবা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত।

হিন্দু-মোছ্‌লেম-বিরোধ স্বাধীনতা-পথের কণ্টক।

আমি সর্ব্ব-সাধারণকে হিন্দু-মোছ্‌লেম মিলনের জন্য অনুরোধ করিতেছি।

আবদুল গফ্‌ফার খাঁ

৭—৪—৩১
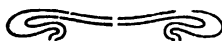
গড়ের মাঠে ঈদের নামাজের দৃশ্য

মিঃ ব্যাটা

চেকোশ্লোভকিয়ার ব্যাটা কোম্পানীর জুতার কারখানা জগতে অদ্বিতীয়। এই কারখানায় প্রস্তুত জুতা পৃথিবীর বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। টমাস ব্যাটা নামক একব্যক্তি এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা। এই কারখানায় প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক কার্য্যে নিযুক্ত আছে। ইহারা সকলেই কারখানা সংলগ্ন বাড়ীর ছোট ছোট কামরায় বাস করে। এই কারখানাটি সহর হইতে দূরবর্ত্তী জ্লিন নামক পল্লীতে অবস্থিত। এই স্থানটি মিঃ ব্যাটার জন্মস্থান বলিয়া যাতায়াত এবং বাণিজ্য বিষয়ে বহু অসুবিধা থাকা সত্বেও তিনি এই স্থানেই কারখানা স্থাপনে গৌরবানুভব করেন। এখানকার শ্রমিকেরা ইংরাজ শ্রমিক অপেক্ষা বেশী কাজ করিতে পারে। কারখানার সমস্ত শ্রমিকই যুবক। অন্যান্য কারখানার মত এখানে বহু সংখ্যক "ফোরম্যান" নাই বটে, কিন্তু উপদেশ দাতার সংখ্যা খুব বেশী। এই কারখানায় দৈনিক ১ লক্ষ জুতা প্রস্তুত হয়। প্রেগস্থিত ব্যাটা কোম্পানীর জুতার দোকান কারখানার মতই বিশাল। এই দোকানের বাড়ী সাত-তলা এবং রাত্রিতে ৪ হাজার ইলেক্‌ট্রিক লাইট জ্বলে। সকলের উপরের তলায় একটা প্রকাণ্ড রেষ্টুরেণ্ট আছে। এক কাপ চা ও কফি দেড় পেন্সে সরবরাহ করা হয়। অন্য এক-তলায় হোটেলের ব্যবস্থা আছে। এখানে একই সময়ে ২২০ জন লোককে খাদ্য সরবরাহ করা যায়। প্রত্যেক ডিসের মূল্য সাড়ে সাত পেন্স ধরা হয়। আগন্তুকগণের জুতা বিনা পয়সায় পালিস করিয়া দিবারও ব্যবস্থা এখানে আছে। এই বাড়ীতে ছেলে-পেলেদের খেলিবার প্রকাণ্ড ঘর আছে। ঐ ঘরে নানাবিধ খেলার সরঞ্জাম সাজান থাকে; প্রত্যেক তলাতেই গ্রামোফোন এবং বেতার যন্ত্র আছে। টেলিফোনে কথা বলিতে আগন্তুকগণের পয়সা লাগে না।

বগুড়ার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কয়েকজন কৃষক

পূর্ব্ব-বগুড়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থানের কতিপয় দরিদ্র লোক বগুড়া জেলা-রিলিফ কমিটীর সেক্রেটারী মৌলভী রজিবুদ্দিন তরফদার সাহেবের নিকট সাহায্য পাওয়ার আশায় উপস্থিত হইয়াছে। (১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩১ সাল)।

বাংলার শ্রেষ্ঠ হকি-খেলোয়াড়

গত পূর্ব্ব বৎসর ভারত হইতে যে বাছাই করা দল ইউরোপের নানাস্থানে হকি-খেলা প্রতিযোগীতায় যোগদান করিয়াছিলেন, মিঃ শওকৎ আলী তাহাতে রিজার্ভড্ খেলোয়াড় হিসাবে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করার সময়ে অসামান্য চাতুর্য্য ও ক্ষিপ্রকারিতার পরিচয় দিয়া থাকেন। হকি-খেলায় অসাধারণ প্রতিভা, লক্ষ্যে বল মারার অদ্ভুত কৌশল এবং সঙ্গীদের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া খেলিবার শক্তি মিঃ শওকৎ আলীর ন্যায় কচিৎ দৃষ্ট হয়। বহু বৎসর যাবৎ ইনি কাষ্টমস্ টিমে খেলিয়া আসিতেছেন। এবার বাইটন কাপের ফাইনালে ইঁহারই ক্রীড়া-নৈপুণ্যে কাষ্টমস্ দল অষ্টমবারের জন্য বাইটন কাপ লাভ করিয়াছেন।

মিঃ শওকৎ আলী

মহাত্মা ও মুছলমান—

দেশে কোন গুরুতর রাজনৈতিক-আন্দোলন উপস্থিত করার পূর্ব্বে হিন্দু-মুছলমান সমস্যার একটা সমাধান করিয়া লওয়া উচিত, কোন কোন কংগ্রেস-পন্থী মুছলমান নেতা মহাত্মা গান্ধীকে ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা, যে-কোন কারণে হউক, সার্থক হইতে পারে নাই। মহাত্মাজী ও অন্যান্য হিন্দু-নেতারা তখন বলিয়াছিলেন—গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা এদিকে মনোযোগ দিতে পারিবেন না। লর্ড আরউইনের সহিত যখন তাঁহার সন্ধির কথা-বার্ত্তা চলিতেছিল, সে সময়েও মহাত্মাজী ঘোষণা করেন—সন্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে তিনি হিন্দু-মুছলমান সমস্যার সমাধান করার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিবেন।

যথাসময়ে সন্ধি হইয়া গেল, এবং মহাত্মা গান্ধী মুছলমান সমাজকে বলিলেন—তোমরা একমত হইয়া নিজেদের যে 'সম্মিলিত দাবী' (United demand) উপস্থিত করিবে, আমি তাহাই বিনা-বিচারে গ্রহণ করিব এবং হিন্দু-সমাজ যাহাতে তাহা অবিকলভাবে গ্রহণ করেন, তাহারও যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

অতঃপর দিল্লীতে সহযোগ-পন্থী মুছলমানদের এক সম্মেলন হইল। তাহাতে তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায়, মোছলেম সংখ্যা-গুরু প্রদেশগুলিতে, স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের দ্বারা, সংখ্যার অনুপাত অনুসারে প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার চাহিলেন, এবং সংখ্যা-লঘু প্রদেশগুলিতে মুছলমানগণ যাহাতে, লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট অনুসারে, সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা দুই বা তিনগুণ অধিক আসন প্রাপ্ত হন, সে দাবীও তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত করিলেন। সিন্ধু ও সীমান্ত-প্রদেশ ইত্যাদি সম্বন্ধেও পূর্ব্ব প্রস্তাবগুলির পুনরুক্তি করা হইল।

কিন্তু 'ইহা মুছলমান সমাজের সম্মিলিত দাবী নহে।' মোছলেম-লিগের কোন প্রতিনিধি তাহাতে উপস্থিত ছিলেন না, জমিয়তে-ওলামা সে সম্মিলনে যোগদান করেন নাই, Nationalist party বা জাতীয়-দলের মুছলমানগণ তাঁহাদের মতের ঘোর বিরোধী। কাজেই মহাত্মাজী এই প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি চাহিতেছেন—মুছলমান-সমাজের সম্মিলিত দাবী।

জমিয়তে-ওলামার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। 'জাতীয় দলের' মুছলমানদের এক সম্মেলনও সেদিন লক্ষ্ণৌতে হইয়া গেল। কিন্তু হিন্দু-মুছলমান সমস্যার সমাধানের জন্য মহাত্মাজী অতঃপর কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন, আমরা এযাবৎ সে সম্বন্ধে কোন সংবাদই জানিতে পারি নাই।'

জমিয়ত ও জাতীয়দলের প্রস্তাবে যে ত্রুটি আছে, আমরা সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। এখানে মহাত্মাজীর এই "সম্মিলিত অভিমতের" দাবী সম্বন্ধে দুই-একটা কথা নিবেদন করিতেছি।

দুনয়ার অন্যান্য জাতির ন্যায়, মুছলমান সমাজেও বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন দল আছে। বিভিন্ন স্বার্থ, বিভিন্ন মানসিকতা এবং বিভিন্ন আদর্শ এই অনৈক্যের মূলে উপকরণ সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে। এ অবস্থায় সকল দলের মুছলমানদের সম্পূর্ণ একমত হইয়া কোন দাবী উপস্থিত করার সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না। কাজেই এই "সম্মিলিত

দাবী" তলব করার কোন সার্থকতাই নাই। এ অবস্থায়, জমিয়ত ও জাতীয়-দলের মুছলমানদের সম্মিলিত অভিমতকে মহাত্মাজী যদি মুছলমানদের দাবী সম্বন্ধে চরম কথা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, মীমাংসার একটা পথ বাহির হইতে পারিত।'

আজ যদি বৃটিশ-পার্লামেণ্ট ঘোষণা করেন যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির নির্বাচন-প্রণালী ও বিভিন্ন স্বার্থের লোকদিগের মধ্যে আসন-বিভাগ সম্বন্ধে ভারতের হিন্দু-সমাজ যে "সম্মিলিত দাবী" উপস্থিত করিবেন, আমরা তাহাই গ্রহণ করিব। তাহা হইলে ভারতের ২২ কোটি হিন্দুর পক্ষে ঐ প্রকার কোন সম্মিলিত দাবী পেশ করা কখনও সম্ভবপর হইতে পারিবে কি? আমরা হয়ত বলিব—পার্লামেণ্ট আমাদিগকে ফাঁকি দিবার জন্যই ঐরূপ একটা 'বদ্‌-ফরমাশ' উপস্থিত করিতেছেন। মুছলমানদের সম্মিলিত দাবী সম্বন্ধেও অবস্থা ঠিক এইরূপ। বর্ত্তমান সময়ে মুছলমানদিগের দুই-দলে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। মহাত্মাজীকে হয় কংগ্রেস বিরোধী মুছলমান নেতাদের দাবীগুলি গ্রহণ করিতে হইবে, না হয় কংগ্রেসপন্থী মুছলমানদের কথাগুলি স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। অন্যথায় আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইব যে, তিনি মুছলমানদের মতভেদ দ্বারা অন্যায় উপকার লইবার চেষ্টা করিতেছেন মাত্র।

———

জাতীয়-দলের অভিমত—

জমিয়তে-ওলামার বিশিষ্ট আলেমগণ এবং জাতীয় দলের নেতৃবর্গ গত আইন-অমান্য-আন্দোলনে কংগ্রেসের পতাকাতলে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের আহ্বানে (কংগ্রেসের সম্পাদক মহাশয়ের বিবৃতি অনুসারে) কএক শত মুছলমান প্রাণ-বলি দিয়াছেন, বহু সহস্র মুছলমান কারাবরণ করিয়াছেন। সুতরাং ইঁহাদের অভিমতকে আমরা জাতীয়-দলের অভিমত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। আমরা আশা করিয়াছিলাম—এই রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের যুগে, স্বজাতির দাবী-দাওয়াগুলি উপস্থাপিত করার সময়েও তাঁহারা যথেষ্ট সৎসাহস ও স্পষ্টবাদিতার পরিচয় দিবেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, তাঁহাদের প্রস্তাবগুলি পাঠ করার পর, আমরা তাঁহাদের সম্বন্ধেও কতকটা হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের মনে হইতেছে, যে কোন কারণে হউক, আসল দ্বন্দ্বের বিষয়গুলিকে তাঁহারা ধামা-চাপা দেওয়ারই চেষ্টা করিয়াছেন। বরং সত্য কথা এই যে, তাঁহাদের প্রস্তাবে স্থানে স্থানে হিতে-বিপরীত ঘটাইবারই ব্যবস্থা হইয়াছে।

মিঃ জিন্নার প্রস্তাব, নেহরু রিপোর্ট ও সর্ব্বদল-সম্মিলন ইত্যাদি সমস্ত শুভ প্রচেষ্টা এযাবৎ ব্যর্থ হইয়া আসিতেছে দুইটী মৌলিক মতভেদের জন্য। হিন্দু নেতারা সমস্ত আলোচনা ও অভিমতের ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন—Adult-suffrage এর উপর।' তাঁহারা বলিতেছেন—ভারতের ভাবী-শাসন-পদ্ধতিতে প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত অধিবাসীকে ভোটের অধিকার দিতে হইবে। সুতরাং প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ-নিজ লোক-সংখ্যা অনুসারে শাসন অধিকার পরিচালনা করিতে সমর্থ হইবে। অতএব কোন প্রকার স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ও Reservation বা আসন সংরক্ষণের আর আবশ্যক হইবে না। মুছলমান পক্ষ বলিতেছেন—লক্ষ্যের হিসাবে ইহা খুব ভাল কথা হইলেও বাস্তবে বর্ত্তমান সময়ে Adult-suffrage লাভ করার কোন সম্ভাবনা নাই। অনেকের মতে বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা সঙ্গতও নহে। সে যাহা হউক, মুছলমানদের কথার সার এই যে, যদি Adult-suffrage না পাওয়া যায়, সে অবস্থায় মুছলমান সমাজের স্বার্থ-সংরক্ষণের কি ব্যবস্থা হইবে, সে সম্বন্ধে একটা পাকাপাকি মীমাংসা এখন হইতে করিয়া রাখা আবশ্যক।' অন্যথায় সে সময়ে তাহাদিগকে হয়ত সমূহ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। 'হিন্দু-নেতারা মুছলমানদের এই সঙ্গত প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করিয়া আসিতেছেন। নেহরু-রিপোর্ট সংক্রান্ত সমস্ত শুভ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ইহা একটা প্রধানতম কারণ।' জাতীয়-দলের মুছলমানেরা গত লক্ষ্ণৌ সম্মেলনে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহারা এই Adult-suffrage এর উপর নির্ভর করিয়াই নিজেদের সমস্ত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু Adult-suffrage না হইলে মুছলমান সমাজের স্বার্থ-রক্ষার ব্যবস্থা কি হইবে, সে সম্বন্ধে তাঁহারা কোন মত প্রকাশ করেন নাই। ফলতঃ এক্ষেত্রে তাঁহারা হিন্দু-মতবাদের প্রতিধ্বনি করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন।

শুনিলাম, হিন্দু সমাজের ও অন্ত মতের মুছলমানদের সহিত মিটমাট করার পথ যাহাতে বন্ধ হইয়া না যায়, সেইজন্ত এই উপায়ে "দ্বার-মুক্ত" রাখা হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই দ্বার-মুক্তির দার্শনিকতা আমরা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাঁহারা স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন প্রথাকে যখন শত কণ্ঠে অভিসম্পাত করিয়াছেন, তখন অন্তদলের মুছলমানদিগের প্রধান অংশের সম্মুখে সন্ধির দ্বারকে ত চিরস্থায়ী ভাবে লৌহ-অর্গলবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। বাকি থাকিতেছে জমিয়তের মুছলমান ও কংগ্রেসের অমুছলমান নেতাদের সহিত সন্ধির কথা। প্রকাশ্ত কনফারেন্সে নিজেদের মত স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করার পর তাঁহারা জমিয়তের সহিত আপোষ-নিষ্পত্তি করার জন্য, কোন একটী কমিটীর উপর ভারার্পণ করিতে পারিতেন। পক্ষান্তরে তাহারা দ্বন্দ্বের মূল বিষয়টা চাপা দিয়া রাখিয়া হিন্দু-নেতাদের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধি করিতে যাইবেন কিসের উপর নির্ভর করিয়া, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। মহাত্মাজী তাঁহাদের নিকট জানিতে চাহিয়াছেন—মুছলমানের "দাবী"। জাতীয়দলের মুছলমানগণ নিজেদের জ্ঞান-বিশ্বাস মতে মুছলমানদের যে-সব দাবীকে সঙ্গত ও আবশ্যক বলিয়া মনে করেন, স্পষ্ট ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য ছিল। Demand নির্দ্ধারণের সময় প্রথম হইতে Compromise এর ভাবনায় এতটা চঞ্চল হইয়া পড়া তাঁহাদের পক্ষে কোন মতেই সঙ্গত হয় নাই। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বিশেষভাবে বলার দরকার। মহাত্মাজী মুছলমানদের দাবী জানিতে চাহিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, জাতীয় দলের মুছলমানেরা যে-সব দাবী উপস্থিত করিতেন, বিভিন্ন মতবাদের তুলনায় তাহা হইত মোছলেম ভারতের নিম্নতম দাবী। পক্ষান্তরে, 'তৃতীয় পক্ষের ইঙ্গিতে পরিচালিত রাজনৈতিকদের স্বার্থ-প্রণোদিত গোঁড়ামী' অথবা 'ধর্ম্মান্ধ কাঠমোল্লাদের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা' বলিয়া, তাঁহাদের দাবীগুলিকে উড়াইয়া দেওয়াও হিন্দু-নেতাদের পক্ষে সহজ সাধ্য হইত না। অধিকন্ত, হিন্দু-নেতাদের আজ্ঞাবাহী বলিয়া জাতীয়দলের মুছলমানদিগের প্রতি অপবাদ দিয়া তাহাদের গুরুত্ব খর্ব্ব করার যে অন্তায় চেষ্টা কোন কোন অঞ্চল হইতে অবিরামভাবে চলিয়া আসিতেছে, হিন্দু নেতাদের মতের প্রতিকূলে নিজেদের অভিমতগুলি স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে পারিলে, সে অন্তায় অপবাদেরও প্রতিকার হইয়া যাইত।

একদিকে এই অবস্থা, অন্তদিকে তাঁহারা স্পষ্টভাষায় প্রস্তাব করিতেছেন—সংখ্যা-লঘু প্রদেশগুলিতে মুছলমানগণ বর্ত্তমানে সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা যে অধিক আসন লাভ করিতেছে, তাহা আর তাহারা পাইবে না। মিশ্র-নির্ব্বাচনের দ্বারা তাহাদের জন্ত সংখ্যার অনুপাত অনুসারে আসন সংরক্ষিত থাকিবে মাত্র। অবশ্য, তাহা বাদে সাধারণ নির্ব্বাচনে আরও আসন লাভ করার জন্ত প্রতিযোগিতা করার অধিকারও মুছলমানের থাকিবে।

এই প্রস্তাবটী সংখ্যা-লঘু প্রদেশের মুছলমানদের পক্ষে যে কতদূর ক্ষতিজনক, তাহা আমরা পরে দেখাইব। তাহার পূর্ব্বে পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, নেহরু-রিপোর্ট ও মোছলেম-লিগের দ্বন্দ্বের ইহা আর একটা প্রধান বিষয় ছিল। মুছলমানগণ বলিয়াছিলেন—মুছলমানেরা সংখ্যা-লঘু প্রদেশগুলিতে লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট অনুসারে যে weightage লাভ করিয়া আসিতেছেন, তাহা রক্ষা করিতে হইবে। অবশ্য, এ অবস্থায় স্বতন্ত্রের পরিবর্ত্তে মিশ্র-নির্ব্বাচন গ্রহণ করিতেও লিগ তখন প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু-নেতারা তত্রাচ এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। হিন্দু-নেতারা তখন যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, জাতীয়দলের মুছলমানগণ, এক্ষেত্রেও হুবহু তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে মোছলেম সংখ্যা-লঘু প্রদেশগুলির কি প্রকার ক্ষতি হওয়া অবশ্যম্ভাবী, নিম্নে কএকটা উদাহরণ দিয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া দেখাইতেছি।

' জাতীয়দলের মুছলমানরা প্রস্তাব করিয়াছেন—ঐ সকল প্রদেশে মুছলমানদিগকে স্বতন্ত্রের পরিবর্ত্তে মিশ্র-নির্ব্বাচন গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাদের জন-সংখ্যার অনুপাত অনুসারে তাঁহাদের আসন রক্ষিত বা reserved করা হইবে। যুক্ত-প্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ প্রদেশ এবং বোম্বাই প্রদেশের মুছলমানগণ বর্ত্তমানে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের দ্বারা, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে মোট মেম্বরদিগের মধ্যে যথাক্রমে শতকরা ২৫,১৮'৫, ৯'৫,১০'৫, এবং ২৫'৫টী আসন অধিকার করিতেছেন।

জাতীয়দলের প্রস্তাব মতে জনসংখ্যার অনুপাত অনুসারে তাঁহাদের আসনের সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইলে, মুছলমান মেম্বরদিগের সংখ্যা দাঁড়াইবে—যুক্তপ্রদেশে ২৭এর স্থলে ১৪, বিহারে ১৮এর স্থলে ১০, মধ্যপ্রদেশে ৯এর স্থলে ৪, মাদ্রাজে ১০ এর স্থলে ৬, এবং বোম্বে ২৫এর স্থলে ১৯ জন মাত্র। সাইমন কমিশন ও ভারত সরকার উভয়ই স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের দ্বারা এই প্রদেশের মুছলমানদের বর্ত্তমান সংখ্যা কাএম রাখিতে স্বীকৃত। জাতীয়দলের মুছলমানরা স্বতন্ত্রের পরিবর্ত্তে মিশ্র-নির্ব্বাচন চালাইতে চাহিতেছেন, অথচ বর্ত্তমানের তুলনায় তাহাদের সংখ্যা বহু পরিমাণে কমাইয়া দিবার প্রস্তাবও করিতেছেন। তাঁহারা এই সকল প্রদেশে মুছলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব করিয়াছেন।' আসন সংরক্ষণ বা reservation এর ফলাফল সম্বন্ধে আমরা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিব। এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 'আসন সংরক্ষণের ফলে মুছলমান প্রার্থী একটী মাত্র মুছলমান ভোট না পাইয়াও ব্যবস্থাপক সভায়, মুছলমান সমাজের প্রতিনিধি-রূপে, আসন গ্রহণ করিতে পারিবেন।' জাতীয়দলের মুছলমানগণ, ঐ সকল প্রদেশের মুছলমানদিগকে অতিরিক্ত আসন লাভ করার জন্য মিশ্র-নির্ব্বাচনে দাঁড়াইবারও অধিকার দিতে চাহিয়াছেন। বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্র সম্বন্ধে যাঁহাদের সামান্য একটু অভিজ্ঞতাও আছে, তাঁহারা প্রস্তাবের এই অংশকে একটা অনর্থক স্তোক বলিয়া গ্রহণ করিবেন। এরূপ প্রতিযোগিতায় মুছলমান প্রার্থীদের সাফল্যের কোন আশা করা আর নিত্য প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা, একই কথা। অধিকন্তু কস্মিন কালে কোন ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব হইলেও, 'এই শ্রেণীর প্রার্থীকে হিন্দু-সমাজের ইঙ্গিত ও অনুকম্পার উপর কিরূপে নির্ভর করিতে হইবে, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে।'

রিজার্ভেশন (Reservation)—

এক শ্রেণীর মুছলমান রাজনীতিকের মত এই যে, স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তে বাঙ্গলার মুছলমানদের জন্য মিশ্র-নির্ব্বাচন প্রথার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুছলমানদিগের জন্য, তাহাদের সংখ্যার অনুপাত অনুসারে আসন reserved বা সংরক্ষিত করিয়া দিতে হইবে। তাঁহারা বলেন—এই প্রকারে বর্ত্তমানের আদম শুমারী অনুসারে, শতকরা ৫৪টী আসন মুছলমানদিগের জন্য নিশ্চিত হইয়া থাকিবে। কংগ্রেসের সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট কএকজন মুছলমানও সম্প্রতি এই reservation পাস করাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। তাঁহাদের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা আসনের সংখ্যা নির্দ্ধারণের সময়, মুছলমানদিগের আনুপাতিক সংখ্যার দাবী উপস্থাপন করিতে সম্মত নহেন। তাঁহারা বলেন—শতকরা ৫১টী আসন সংরক্ষিত করিতে বলিলেই যথেষ্ট হইবে, তাহার অধিক দাবী করা যেন একটা খুবই অন্যায় কাজ।

আমরা আসন সংরক্ষণের পক্ষপাতী নহি। কারণ নিজেদের সামান্য শক্তি অনুসারে এ সম্বন্ধে যতই চিন্তা ও আলোচনা করিতেছি, ততই আমাদের মনে হইতেছে—বাঙ্গলার মুছলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবী আর তাহাদের আত্মহত্যার প্রচেষ্টা, একই কথা। পক্ষান্তরে, আসন সংরক্ষিত না হইলেই বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

এ সম্বন্ধে আলোচনা করার সময়ে সর্ব্বপ্রথমে reservation বা আসন সংরক্ষণের বাস্তব দিকটা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। তাহা হইলেই প্রশ্নটার আসল রূপ আপনা-আপনি প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। কোন দলবিশেষের প্রতিনিধিগণের জন্য, মিশ্র-নির্ব্বাচনের দ্বারা আসন সংরক্ষণ করিতে হইলে, প্রত্যেক নির্ব্বাচন-কেন্দ্রের জন্য এক-একটী multiple-members constituency গঠন করার দরকার হইবে। মুছলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ করিতে হইলে প্রত্যেক নির্ব্বাচন-কেন্দ্রকে এমন ভাবে গঠন করিতে হইবে, যাহাতে অমুছলমান প্রার্থীরা ছাড়া, এক বা একাধিক মুছলমানকে নির্ব্বাচন করা ভোটদাতাদিগের পক্ষে বাধ্যতা মূলক হয়। মিশ্র-নির্ব্বাচনের ফলে, মুছলমান ও অমুছলমান উভয় শ্রেণীর ভোটারগণ উভয় শ্রেণীর প্রার্থীকে ভোট দিতে পারিবেন। ফলে বহু ক্ষেত্রে এরূপ দাঁড়াইতে পারে যে, অধিকাংশ মুছলমান কোন একজন মুছলমানকে নিজেদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করার জন্য মনোনীত করিতেছেন। কিন্তু হিন্দুরা

তাঁহাকে অনভিপ্রেত বলিয়া মনে করিলেন এবং সেজন্ত তাঁহারা নিজেদের মন-মত একজন মুছলমানকে সেই আসনের জন্ত দাঁড় করাইলেন। এ অবস্থায়, সমস্ত হিন্দু ভোট হিন্দুর মনোনীত মুছলমানই সহজে লাভ করিতে পারিবেন, এবং তাহার ফলে মুছলমান সমাজের অনভিপ্রেত এই মুছলমানই তাহাদের প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া যাইবেন, আর মুছলমানদের মনোনীত প্রার্থীকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হইতে হইবে।

আমাদের কোন কোন বন্ধু বলেন—পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের তিনটী বিভাগ সম্বন্ধে আশঙ্কা করার কোন কারণ না থাকিলেও, আসন সংরক্ষিত না হইলে পশ্চিম-বঙ্গের মুছলমানদের ক্ষতির সম্ভাবনা খুবই অধিক। এ সম্বন্ধে আমাদের নিবেদন এই যে, পশ্চিম-বঙ্গের মধ্যে প্রেসিডেন্সী বিভাগ সম্বন্ধে আশঙ্কা করারও কোন কারণ নাই। বিশেষতঃ প্রস্তাবিত মতে ভোটের যোগ্যতার ক্রম বর্ত্তমান অপেক্ষা কমিয়া গেলে, এ অঞ্চলে মুছলমান ভোটারদের অনুপাত ভবিষ্যতে বহু পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং এ অঞ্চলে কেবল মুছলমানের ভোটের দ্বারা যথেষ্ট সংখ্যক মুছলমানের নির্ব্বাচিত হওয়া আদৌ কষ্ট-সাধ্য হইবে না। অবশ্য এক বর্দ্ধমান বিভাগ সম্বন্ধে আশঙ্কা করার কতকটা কারণ আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের সোজা-সুজি উত্তর এই যে, হিন্দুরা যদি বর্দ্ধমান বিভাগে মুছলমানদিগকে একদম 'বয়কট' করিয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করেন, তাহা হইলে তাহার পরিবর্ত্তে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের বহু জেলা হইতে হিন্দুদিগকে বয়কট করিয়া দেওয়াও মুছলমানদের পক্ষে অসম্ভব বা অসঙ্গত হইবে না। পক্ষান্তরে, পশ্চিম-বঙ্গের হিন্দুরা যদি পূর্ব্ব-বঙ্গের হিন্দু প্রতিনিধি বর্জ্জিত হইয়াও হিন্দু-বঙ্গের স্বার্থ-সংরক্ষণে সমর্থ হন, তাহা হইলে পশ্চিম-বঙ্গের মুছলমানগণও পূর্ব্ব-বঙ্গের মুছলমান প্রতিনিধিদিগের উপর আস্থা ও নির্ভর করিয়া অনায়াসে নিঃশঙ্ক হইতে পারিবেন।

মুছলমানদের সংখ্যা-লঘু জেলাগুলির জন্ত আসন সংরক্ষণের সার্থকতা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা অনেকে করিয়া থাকেন, কিন্তু এই সময়ে প্রশ্নের অন্ত দিকটা তাঁহারা একেবারেই আমলে আনিতে চান না, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। আমাদের মতে, আসন সংরক্ষণের বিপদ এই সব সংখ্যা-লঘু জেলাগুলিতেই অধিকতর গুরুতর এবং অধিকতর মারাত্মক হইবে। একটা কাল্পনিক উদাহরণ দিয়া কথাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করিব।

মনে করুন—স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন উঠিয়া গিয়াছে এবং তাহার স্থলে মিশ্র-নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে মুছলমানদের জন্ত reservation বা আসন সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। এখন, হুগলী জেলার নির্ব্বাচন আরম্ভ হইতেছে। ধরুন—হুগলী জেলায় মুছলমানের জন-সংখ্যার ও ভোটারের অনুপাত শতকরা ২৫ জন। হুগলী হইতে ৪জন মেম্বর বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত হইবেন, ইহার মধ্যে একটী আসন মুছলমানের জন্ত সংরক্ষিত হইয়াছে। জেলার মোট ভোটারের সংখ্যা ৪ হাজার, ইহার মধ্যে ৩ হাজার হিন্দু ও ১ হাজার মুছলমান।

এখন মনে করুন—এই সংরক্ষিত আসনটী অধিকার করার জন্ত মুছলমান-সমাজ সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে একজন বিশেষ যোগ্য ও ইমানদার মুছলমানকে প্রার্থীরূপে দাঁড় করাইলেন, এবং বহু চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়া এই একহাজার মুছলমান ভোটের প্রত্যেকটী তাঁহার অনুকূলে রেকর্ড করাইয়াও দিলেন। কিন্তু হিন্দু-সমাজ ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া একজন ধর্ম্মদ্রোহী, উচ্ছৃঙ্খল ও হিন্দুর অনুগ্রহজীবী মুছলমানকে প্রতিযোগীরূপে দাঁড় করাইয়া দিলেন। মুছলমানরা একটা ভোটও এই হিন্দুর মনোনীত প্রার্থীকে দিলেন না। অন্তদিকে হিন্দুপক্ষ হিন্দু ভোটারদিগকে বলিয়া দিলেন—মুছলমানকে দিবার জন্ত তাহার যে ভোটটী নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা যেন তাঁহাদের মনোনীত এই উদার মুছলমান প্রার্থীর নামে রেকর্ড করাইয়া দেওয়া হয়। হিন্দু ভোটার দেখিল—কোন একজন মুছলমানকে যখন ভোট দিতেই হইবে, তখন 'মন্দের ভাল' হিসাবে বাবুদের ইঙ্গিত অনুসারে কাজ করাই শ্রেয়। এই হিসাবে তিনটী হিন্দু-পদের জন্ত যত হিন্দু ভোটার নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল, তাহারা সকলে হিন্দুর মনোনীত এই মুছলমান প্রার্থীকে ভোট দিয়া গেল। ফলে এই মুছলমানটী এক হাজারের অধিক হিন্দু ভোট পাইয়া, এবং একটীও মুছলমান ভোট না পাইয়া, নির্ব্বাচিত হইয়া গেলেন। আর মুছলমানদের মনোনীত প্রার্থীটী সমস্ত মুছলমান ভোট পাইয়াও

নির্ব্বাচিত হইতে পারিলেন না। reservation হইলে সংখ্যা-লঘু জেলাগুলিতে এই শ্রেণীর দৃশ্য আমাদিগকে সচরাচরই দেখিতে হইবে। মজার কথা এই যে, এই প্রকারে যাঁহারা হিন্দু ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইবেন মুছলমানের প্রতিনিধি বলিয়া। কারণ, আসনটী মুছলমানের জন্য সংরক্ষিত।

কংগ্রেস-পন্থী মুছলমানদিগের মধ্যকার একদল লোক শতকণ্ঠে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের প্রতিবাদ করিতেছেন। কারণ, ইহা ন্যাশনালিজ্‌মের প্রতিকূল। কিন্তু অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা সেই মুহূর্ত্তে আবার সাম্প্রদায়িক হিসাবে আসন সংরক্ষণের জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয্য প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না। অথচ এই প্রকার ধর্ম্মের হিসাবে আসন সংরক্ষণ করাও সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের প্রকার ভেদ মাত্র! স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের মূলে অন্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে যে আশঙ্কা ও অনাস্থার ভাব বিদ্যমান, আসন সংরক্ষণের দাবীর গোড়ার কথাও তাহাই।

এই প্রসঙ্গ লইয়া বিচার-আলোচনার সময়ে কোন কোন 'জাতীয়তাবাদী' বন্ধুকে বলিতে শুনিয়াছি—আসন সংরক্ষিত না হইলে, কেবল পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গ হইতেই যে, শতকরা ৫০এর অধিক মেম্বর নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন, একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ পথের ঘোরতর বিপদ এই যে, আসন সংরক্ষিত না হইলে, মুছলমান প্রার্থীগণ কেবল মুছলমান ভোটারদিগের উপর নির্ভর করিয়া নির্ব্বাচিত হওয়ার চেষ্টা করিবেন। ফলে মুছলমান যাহাতে অমুছলমানকে ভোট না দিয়া কেবল মুছলমান প্রার্থীকে ভোট দেয়, ইহার প্রোপ্যাগণ্ডা করা হইবে। ফলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাড়িয়া যাওয়াই সম্ভব।

এ সম্বন্ধে আমাদের প্রথম কথা এই যে, সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন উঠিয়া গিয়া দেশে মিশ্র-নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তিত হইলে, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পরিবর্ত্তে শ্রেণী-সংগ্রামের সূত্রপাত হওয়াই স্বাভাবিক। তখন কৃষক ও রায়তদের এক শ্রেণী হইবে, জমিদার ও মহাজনদের এক শ্রেণী হইবে, মধ্যবিত্ত ও কলম-পেশা লোকদের এক শ্রেণী হইবে, এবং সব শ্রেণী গঠনে কাজ করিয়া যাইবে সেই সব সম্প্রদায়ের সাধারণ স্বার্থগুলি, যাহার উপর তাহাদের জীবনধারণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। তবে ইহাও ঠিক যে, দেশের জনসাধারণ যতদিন নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ বুঝিয়া উঠিতে না পারিবে এবং সাম্প্রদায়িক নেতারা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যতদিন তাহাদিগকে সম্মোহিত করিয়া রাখার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারিবেন, ততদিন স্থানে স্থানে সাম্প্রদায়িক অভিনয় হওয়াও অসম্ভব নহে। অবশ্য ইহা সর্ব্বত্র অবশ্যম্ভাবী নহে। ইউনিয়ন বোর্ড ও লোকাল বোর্ড প্রভৃতির বর্ত্তমান অবস্থা ইহার একটা বড় প্রমাণ।

অধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দায়িত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। জনসাধারণ দেশ-শাসন সম্বন্ধে যখন সত্যকার অধিকার লাভ করিবে, তখন তাহাদের দায়িত্বজ্ঞানও স্বাভাবিক ভাবে উন্মেষ লাভ করিবে, ইহা স্বাভাবিক ভাবে আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু যদি কোনক্রমে অবস্থা ইহার বিপরীত হইয়াই দাঁড়ায়, তবে সেজন্য একা মুছলমানকে দায়ী করা যাইতে পারিবে না। বস্তুতঃ তখনকার ভাল-মন্দ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিবে—উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের মনোভাবের উপর। দুর্ভাগ্যবশতঃ উভয়ের দোষে সেই অনভিপ্রেত অবস্থা যদি উপস্থিতই হইয়া যায়, তাহা হইলে বর্ত্তমান অবস্থা অনুসারে তখন তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া সতর্কতার নামকরণে এখন হইতে মুছলমানের বুকে 'জগদ্দল' চাপাইয়া দেওয়া সঙ্গত হইবে না।

গত ৪।৫ বৎসরের মধ্যে হিন্দু-সমাজ এ সম্বন্ধে যেখানে যেখানে যত প্রকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটীতে এই কথাই সমবেত ভাবে বলা হইয়াছে যে, বাঙ্গলার মুছলমানের জন্য আসন-সংরক্ষণের তাঁহারা ঘোর বিরোধী। গভর্ণমেণ্ট ও সাইমন-কমিশনও ইহার সমর্থন করেন নাই। অতএব reservation লইয়া আমরা যে কাহার সঙ্গে মিটমাট করিতে যাইতেছি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। হিন্দুরা এযাবৎ সর্ব্বত্র সমকণ্ঠে ইহাই ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন যে, এই আসন-সংরক্ষণ নীতি—বিশেষতঃ সংখ্যা-গুরু সম্প্রদায়ের পক্ষে—গণতন্ত্রের সমস্ত মৌলিক-নীতির বিপরীত কথা, এই জন্য আমরা তাহার প্রতিবাদ করিতেছি। এখন আমরা যদি আসন-সংরক্ষণকে বড় করিয়া ধরি এবং তাহা গ্রহণ করার জন্য বিনয় করিতে থাকি, তাহা হইলে তাঁহারা হয়ত শেষকালে বলিবেন—আচ্ছা, তোমরা যখন কোনমতেই ছাড়িতেছ না, তখন

তোমাদের আবদার না শুনিয়া ত আর উপায় নাই। তবে আমাদের সমাজ, বিশেষতঃ হিন্দু-সভা, ইহার ঘোর বিরোধী। এদের সকলকে চটাইয়া আমরা ত দেশে তিষ্ঠিতে পারি না। অতএব এমনভাবে একটা মিটমাট করা যাউক, যাহাতে তোমাদের reservation ও বজায় থাকে, আর এই গোঁড়া হিন্দুগুলাকেও আমরা কোনমতে রস্ত করিয়া লইতেও পারি। শেষে কথা হইবে--"আর গোলমালের কাজ নাই, দুই ভাই সমান সমান ভাগ করিয়া লই। আমরা সাম্প্রদায়িক হইলাম, গণতন্ত্রের পরিপন্থী সাজিলাম, নিজদিগকে অনুগ্রহভাজন বলিয়া হিন্দুর দ্বারে ও রাজসরকারে প্রতিপন্ন করিলাম, অথচ তাহার পরিণাম এই দাঁড়াইল যে, যেখানে আমরা বিনা-সংরক্ষণে শতকরা ৬৫টী আসন সহজে অধিকার করিতে পারিতাম, সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের জয় জয়কারও করিতে পারিতাম এবং সেজন্য কাহারও অনুগ্রহ ভাজনও আমাদিগকে হইতে হইত না—সেখানে আমরা ৫০টী আসন লইয়া সন্তুষ্ট হইলাম এবং সে ৫০টীর অধিকাংশও আবার হিন্দু-প্রভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকিবে। মুছলমান এ ন্যাকুমারী করিতে যাইবে কেন? ভিতরের কথা এবং খুব সত্য কথা এই যে, বাঙ্গলার হিন্দু-সমাজ মুছলমানদিগকে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন দিতেও প্রস্তুত আছেন, reservation স্বীকার করিতেও সম্মত আছেন। কিন্তু গোড়ার শর্ত্ত এই যে, যে কোন উপায়ে হউক, বাঙ্গলার মুছলমানদের সংখ্যার গুরুত্ব কমাইয়া তাহাদিগের সংখ্যা-লঘু করিয়া দিতে হইবে, অন্ততঃ সমান সমানে পরিণত করিতে হইবে। এদিকে যেরূপ ভাব-গতিক দেখিতেছি, আমাদের স্বতন্ত্রবাদী ও জাতীয়তাবাদী উভয় দলের লোকেরা যেন মনে মনে এই দুই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পড়িতেছেন। কারণ আমি বা আমরা কি উপায়ে সহজে নির্ব্বাচিত হইয়া যাইতে পারিব, এক্ষেত্রে উভয় দলের অনেকের ভিতরের ভাবনা তাহাই।

Reservation-এর বিরুদ্ধে আমাদের শেষ কথা এই যে, উহা গ্রহণ করিলে বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভায় মুছলমান মেম্বারদের সংখ্যা তাহাদের জন-সংখ্যার অনুপাত-হিসাবে কমিয়া যাওয়া নিশ্চিত। কারণ, সংখ্যার বড়াই করিয়া একদিকে একটা বিরাট দেশের শাসনযন্ত্র পরিচালনা করার দাবী করিব, আর সঙ্গে সঙ্গে বলিব—দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমরা আত্মরক্ষায়ও অসমর্থ, অতএব স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন দিয়া, সংরক্ষণ-কবজ দিয়া আমাদিগকে প্রতিবেশীর কবল হইতে রক্ষা কর। অন্যথায় তাহারা আমাদিগকে বেমালুম হজম করিয়া ফেলিবে—এই দুইটী কথা এক-মুখে উচ্চারণ করা কেবল রাজনৈতিক বাতুলদের পক্ষেই শোভা পাইতে পারে।

প্রীতি

(হেরিক হইতে)

—জোয়াদুল করিম

নাহি চাহি অধরের সুখ-সম্মিলন,
নাহি মাগি বিম্বাধরে মৃদু-মৃদু-হাসি;
পুরিলে মনের বাঞ্ছা পাছে মোর মন
গরিমা-প্রদীপ্ত হয় পুলকে উল্লাসি'।

—নহে, নহে। যদি কিছু বাসনা আমার
অন্তরের অন্তঃস্তলে রয়েছে গোপন,
সে শুধু মাগিয়া ফেরে চুম্বন তাহার,
যে বাতাস পূর্ব্বে তারে করেছে চুম্বন।

মাস-পঞ্জী

বৈশাখ—১৩৩৮

[illegible] বৈশাখ পর্য্যন্ত—৭ই এপ্রিল সীমান্তের গান্ধী আবদুল গফ্ফর খাঁ তাঁহার লাল-কোর্ত্তাদলের সহিত দিল্লীতে পৌঁছিয়াছেন। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামীগণের সহিত দেখা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মীরাট যাত্রা করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী দিল্লীর পুরাতন পরিষদ-গৃহে ভারতীয় বণিক-সমিতির ফেডারেশনের চতুর্থ বাৎসরিক অধিবেশনে যোগদান করিয়াছেন। এই অধিবেশনে মহাত্মা বলিয়াছেন,—"আমরা শোষণও করিব না, শোষণ করিতেও দিব না।" মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট গুলীর আঘাতে আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। কলিকাতা হরিশপার্কে জাতীয়-সপ্তাহের উদ্‌যাপন উপলক্ষে শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলীর সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা হইয়া গিয়াছে। মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত বাংলার লাট সাহেবের নিকট রাজনৈতিক বন্দী বীরেন্দ্রনাথ দত্তের চিকিৎসার জন্য তার করিয়াছেন। বাঙ্গালোর মহারাজ-কলেজের গোঁড়া হিন্দু ছাত্র ও অধ্যাপকগণ মহীশূরের দেওয়ান স্যার মীর্জ্জা ইস্মাইলকে একখানা মানপত্র দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন। ৮ই এপ্রিল থারাবর্দ্দি ও ইনসিন জেলার বিদ্রোহ সম্পর্কিত মামলার শুনানী স্পেশাল ট্রাইবিউন্যালে হইয়া গিয়াছে। ৯ই এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া পোষ্টাফিসের টাকা লুঠ সম্পর্কে ১৭ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। করাচী-কংগ্রেসের আয়-ব্যয়ের হিসাব বাহির হইয়াছে। ১০ই এপ্রিল পর্য্যন্ত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার মাত্র ৫ জন আসামীর বিবৃতি গ্রহণ করা হইয়াছে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার ৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। মূল্যবান নীলমণির সন্ধান করিবার জন্য আফগান গবর্ণমেণ্ট একটি জার্ম্মাণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সহিত এক বাণিজ্য সন্ধি করিয়াছেন। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী মিঃ হবিজন ও মিঃ নিম্বকর এলাহাবাদ হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করিয়াছেন। আমানুল্লাহ্ কর্ত্তৃক লিখিত দুইশত খানা চিঠি পেশাওয়ারের পুলিশ আটক করিয়াছে। জার্ম্মাণীর ফ্রেডারিক সেকেন হইতে রওনা হইয়া ভীমকায় গ্রাফ জেপেলীন কাইরোতে পৌঁছিয়াছে। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার এপ্রুভার রামশরণ দাস ও ব্রহ্ম দত্তকে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। লিসবন হইতে একদল পর্ত্তুগীজ সৈন্য মাদিরা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। ১১ই এপ্রিল গ্রেট-বৃটেন এবং আয়র্লণ্ডের ইহুদী সমিতির পক্ষ হইতে মিঃ লয়েড জর্জকে এক প্রীতিভোজে অভ্যর্থনা করা হইয়াছে। অস্ত্র পরিত্যাগ ও যুদ্ধ বিরতি সম্পর্কে আলোচনা করিবার পরামর্শ সভা ডাকা হইয়াছে। ১২ই এপ্রিল হোসেনী দালান নামক ঢাকায় একটি প্রাচীন সৌধের উপর বজ্রাঘাত হওয়ায় উহার ২টি গুম্বজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পর্ত্তুগালের জনসাধারণ রাজ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। মিশরে বিস্ফোরকের গুদামে আগুন লাগিয়া গুদামটি ভস্মীভূত হইয়াছে। ১৩ই এপ্রিল হেজাজ নেজদ্ এবং এরাক গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ মক্কায় বন্ধুভাবে একটি সন্ধিপত্র সহি করিয়াছেন। কাবুলের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী মিঃ এয়ার মোহাম্মদ পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রিন্স আকরম হোসেন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যকরী সদস্যের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। স্থানীয় টাউন-হলে কলিকাতা কর্পোরেশন বাংলার কৃতিসন্তান স্যার জগদীশচন্দ্র বসুকে একখানি মানপত্র দ্বারা অভিনন্দিত করিয়াছেন। ১৪ই এপ্রিল স্পেনের রাজা য়্যালফিনসো সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়াছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও মৌলভী আবদুর রজ্জাক ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

৭ই বৈশাখ পর্য্যন্ত—১৫ই এপ্রিল থারাবাদ্দিতে সামরিক-পুলিশের সহিত বিদ্রোহীদের এক ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ১৬ই এপ্রিল স্পেনের রাজমহিষী এনা প্যারিসে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা য়্যালফিনসো মার্সেলিস্ নগরে পৌঁছিয়াছেন। কলিকাতা আলবার্ট হলে বাংলার জাতীয়তাবাদী মোসলেম দলের এক সভার অধিবেশন হইয়াছে। ১৭ই এপ্রিল শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত চট্টগ্রামে পৌঁছিয়াছেন। নব-নির্ব্বাচিত বড়লাট লর্ড উইলিংডন সপরিবারে বোম্বাইয়ে পৌঁছিয়াছেন। ১৮ই এপ্রিল লক্ষ্ণৌ সহরে জাতীয়তাবাদী মোসলেম সম্মিলনীর অধিবেশন আরম্ভ হয়। বড়লাট লর্ড আরউইন সপরিবারে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। মৌলভী আবুল হোসেন সাহেবের সভাপতিত্বে ঢাকার স্থানীয় মুসলমানদিগের এক সভা হয়। উহাতে মিশ্র-নির্ব্বাচন সমর্থিত হইয়াছে। ১৯শে এপ্রিল লক্ষ্ণৌতে মোস্‌লেম সম্মিলনীর দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন বসিয়াছে। ২০শে এপ্রিল জাতীয়তাবাদী মোসলেম সম্মিলনীর তৃতীয় ও শেষ দিনের অধিবেশন বসে।

১৪ই বৈশাখ পর্য্যন্ত—২১শে এপ্রিল কাউলুট ক্যাণ্টন রেলপথে এক ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। মিঃ রামট্রাস ডমাস আরবে রুব-আল-আলি নামক এক নূতন মরুভূমি আবিষ্কার করিয়াছেন। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী পানপুর গ্রামে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। আমেরিকার বিখ্যাত ডাঃ ওয়াশবার্ণকে বাগদাদ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যগণ সংবর্দ্ধনা করিয়াছেন। পদ্মা নদীতে এক প্রবল ঝড় হইয়া গিয়াছে। ২২শে এপ্রিল জাতীয়তাবাদী মুসলমান সম্মিলন হইতে ডাঃ আন্‌সারী দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। হক্স্ বে নামক স্থানে প্রবল ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ফলে বহু গৃহ ভূপতিত হইয়াছে। স্পেনের ভূতপূর্ব্ব রাজা ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছেন। ২৩শে এপ্রিল পনর জন বিদ্রোহীর একটি দল ইনসিন জেলার পশ্চিম গুকুনানের একটি গ্রাম আক্রমণ করিয়াছে। ২৪শে এপ্রিল মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মিঃ ইয়াকুব হাসান মোসলেম সম্মিলন হইতে মাদ্রাজে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ২৫শে এপ্রিল আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে বার্দ্দোলী তালুকের যে সকল গ্রাম্য কর্ম্মচারী পদত্যাগ করিয়াছিলেন, অদ্য তারিখে মহাত্মা গান্ধী তাঁহাদের সহিত দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

Printed and Published by Md. Khairul Anam Khan from the "Mohammadi Press,"
Upper Circular Road, Calcutta

বার্ষিক মূল্য সডাক তিন টাকা ছয় আনা
সম্পাদক— মোহাম্মদ আকরম খাঁ
প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা

জুয়েলার্স সুর ব্রাদার্স এণ্ড কোং জুয়েলার্স

একমাত্র গিনি সোনার অলঙ্কার নির্ম্মাতা—২০২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিদ্যুৎ চুড়ি

মূল্য প্রতি জোড়া ১৫॥০

৩ গাছার সেট ৪৬॥০

স্বর্ণ-শিল্পে আমাদের তিন-পুরুষের অভিজ্ঞতার সুফল এই বিদ্যুৎ-চুড়ি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিল্পি এবং বৈজ্ঞানিকগণের মস্তিষ্কের অপূর্ব্ব সমাবেশে এই বিদ্যুৎ-চুড়ি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমরা নবাবিষ্কৃত স্বর্ণ-বর্ণের ব্রোঞ্জ-ধাতু ডিরেক্ট ইউরোপ হইতে আমদানি করিয়া উহার উপরিভাগে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এনগ্রেভ্ গিনি স্বর্ণের পাত সংযোজন করিয়া এই সুদৃশ্য অলঙ্কার আবিষ্কার করিয়াছি। হাতে পরিলে ইহা যে সলিড্ গিনি স্বর্ণের নয়, তাহা সুদক্ষ স্বর্ণকারগণও ধরিতে পারিবে না। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং মিতব্যয়িতার প্রতীক এই বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিতা এবং সুরুচি-সম্পন্না মা-ভগ্নিগণের ইহাই চরমোৎকর্ষ সম্পন্ন এবং সাফল্য গৌরব মণ্ডিত হস্তাভরণ।

এনগ্রেভ শাখা

হস্তী-দন্তের শাঁখায় গিনি-সোনার এনগ্রেভড্ পাত মোড়া। মূল্য প্রঃ ১৫৲, মাঃ ১৩৶০, ছোঃ ১১৲, ঐ প্লেন ১০৲, ৮॥০, ৭৶০ ঐ তামার উপর প্লেন ৮॥০, ৭।০, ৬৶০

সোনার মুখ তার প্যাঁচ বালা

হস্তী দন্তের বালার প্যাঁচে প্যাঁচে সোনার পাত জড়ান ও সোনার হাঙ্গর মুখ বিশিষ্ট। মূল্য ২৫৲ সরু হইলে ২২৲

টালি শাঁখা

হস্তী-দন্তের পলওয়ালা শাঁখার গিনি সোনার এনগ্রেভড্ মনোরম পাত মোড়া। মূল্য ১৭॥০, ১৬॥০, ১৪৲ টাকা

বটফল ইয়ারিং—১৫॥০

তার প্যাঁচ বালা খুল্লু আংটি মূল্য ১০৲

হস্তী দন্তের প্যাঁচ বালার প্যাঁচে প্যাঁচে সোনার তার জড়ান, সোনার বকলেস দেওয়া অতি মনোজ্ঞ। মূল্য ১৫॥০, ঐ রুলি ১১৲

লাইন মোড় রুলি

হস্তী-দন্তের রুলিতে সোনা জড়ান, বেশ ফ্যান্সি। মূল্য ১০৸০, ৯৶০, ৭৲ টাকা

ফ্যান্সি লেস্ পিন

মূল্যবান পাথর সেটিং উৎকৃষ্ট লেস পিন টেক্‌সই ও মনোরম ডিজাইন। মূল্য ৩৫৲ টাকা হইতে উর্দ্ধ।

আড়াই প্যাঁচ সাপ তাগা

এই তাগা (অনন্ত) যেমন ফ্যান্সি তেমন মজবুত। বর্ত্তমানে সুরুচি সম্পন্ন রমণীগণ এই ডিজাইনের তাগাই পছন্দ করিয়া থাকেন। মূল্য ২৭০৲ হইতে উর্দ্ধ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আমরা নিজ কারখানায় তাগা, বাজু, হার, হীরা মুক্তা সেট জড়োয়া গহনা ও অন্যান্য অলঙ্কার প্রস্তুত করি ও মজুদ রাখি। বিবাহের গহনা ২৪ ঘণ্টায়ও দিয়া থাকি। খান কম দেওয়া আমাদের বিশেষত্ব। ব্যবহার অন্তে খানমরা বাদ না দিয়াই আমাদের জিনিস গিনি সোনার বাজার দরে ক্রয় করিয়া থাকি। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃতে মাল পাঠাই। প্রত্যেক জিনিসের সঙ্গে গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি। আমাদের সুবৃহৎ নূতন ক্যাটলগের জন্য ৵০ দুই আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইয়া দিন।

সূচীপত্র—আষাঢ়, ১৩৩৮

ঘোষ ব্রাদার্স—ম্যানুফ্যাক্চারিং জুয়েলার্স

ফোন বড়বাজার—২২৩৯ টেলিগ্রাম—"GOSEVRATA" Calcutta.

জুয়েলারিম্যান্সন, ১১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা
স্বর্ণ অলঙ্কার গ্রাহকদিগের
একমাত্র বিশ্বাস্য স্থান।
আমরা স্বর্ণ অলঙ্কার প্রস্তুত ব্যবসায়ে
যুগান্তর আনয়ন করিয়াছি।
কারণ আমাদের প্রস্তুত অলঙ্কার ব্যবহারান্তে
আমাদের নিকট বিক্রয় করিলে আমরা পানমরা
বাদ না দিয়াই গিনি সোনার মূল্যে খরিদ করি।

ইহাই কি আমাদের সততার অগ্নিপরীক্ষা নয়?

আমাদের প্রস্তুত গহনা যেমন সুন্দর তেমনি খাঁটি
৵৹ আনার ষ্টাম্প পাঠাইলে আমাদের ক্যাটালগ পাঠাই।

শ্রীঅমূল্যধন পালের

বেঙ্গল শটী ফুড

আজ বেঙ্গল শটী ফুডের এত নাম ও আদর কেন? বেঙ্গল শটীফুড আদি অকৃত্রিম ও সম্পূর্ণ দেশীয় উদ্ভিজ্জ উপাদানে প্রস্তুত। ইহা যেমন লঘু ও পুষ্টিকর তেমনি শিশু ও রোগীর একমাত্র খাদ্য ও পথ্য। ইহা গুণে ও উপকারিতায় বিলাতি ও দেশী সর্ব্বপ্রকার বার্লি, এরারুট ও কর্ণফ্লাওয়ার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সব কারণে বেঙ্গল শটী ফুডের আদর ও সুনাম। প্রত্যেকের নিকট ইহা ব্যবহারে সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবেন। বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে মুগ্ধ না হইয়া ব্যবহার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

বেঙ্গল শটী ফুডের জন্য সহর ও মফঃস্বলের প্রত্যেক ডাক্তার খানায়, সকল দোকানে ও নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

শ্রীঅমূল্যধন পাল

প্রসিদ্ধ বেনিতি মসলা বিক্রেতা, ম্যানুফাকচারার অর্ডার সাপ্লায়ার ও কমিশন এজেণ্ট
১১৩।১১৪নং খোঙ্গরাপটী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীপত্র—আষাঢ়, ১৩৩৮

জে, এম, রায় এণ্ড কোং জুয়েলার্স

৩৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমাত্র গিনি সোনা ও চাঁদি রূপার গহনা প্রস্তুতকারক।

সতী শাখা

তামার ফ্রেমের উপর গিনি সোনার পালিস পাতে মোড়া। প্রমাণ ৬।০, মাঝারী ৫।৵০, ছোট ৪৸৵০

এনগ্রেভ্ড্ সতী শাঁখা

তামার ফ্রেমের উপর গিনি সোনার এনগ্রেভ পাতে মোড়া। প্রমাণ ১১৲, মাঝারী ১০।৵০, ছোট ৮৸০

টাব

নাকছাবি

প্রতি জোড়া ১০৲ ২৲ হইতে উর্দ্ধ

চিত্তরঞ্জন চুড়ী

ইয়োলো ব্রোঞ্জের ফ্রেমের উপর গিনি সোনার এনগ্রেভ পাতে মোড়া, ফ্রেমের রং ব্যবহারে সোনার মত থাকে, হাতে দাগ লাগে না।

প্রমাণ ১৫।০, মাঝারী ১৩৸০, ছোট ১১।০

ইয়ারিং

মূল্য প্রতি জোড়া ২০৲ হইতে উর্দ্ধ।

মাকড়ী

প্রতি জোড়া ৬৲

তার প্যাচ রুলী– হস্তী দন্তের সরু প্যাচকাটা রুলীর উপর গিনি স্বর্ণের সরু পাতে মোড়া। মূল্য প্রমাণ ১২॥০ ছোট ৮॥৵০ আনা।

ঘোড়ার ক্ষুর আংটী

১৫৲—৩০৲

কাণফুল

১০৲—১২৲

ফ্যান্সি লেস্ পিন

মূল্যবান পাথর সেটিং উৎকৃষ্ট লেস পিন।

মূল্য ৩২৲ টাকা হইতে উর্দ্ধ।

পাতাওয়ালা ইয়ারিং

১২॥০—১৫৲

করগেট মাকড়ী

১২॥০—২০৲

সমস্ত অলঙ্কারই গিনি সোনায় প্রস্তুত।

তাগা, বালা, চুড়ী, হার, নেকলেস ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা মজুত থাকে, অন্যান্য জিনিষের অর্ডার দিলে নিয়মিত সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়, পরীক্ষা প্রার্থনীয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

সূচীপত্র—আষাঢ়, ১৩৩৮

ম্যালেরিয়ায় ভুগিবার পর

দুর্ব্বলতার অবসান করুন।

যদিও কুইনাইন রক্ত মধ্যস্থ ম্যালেরিয়া বিষ ধ্বংস ক'রে থাকে—তথাপি রোগীর দুর্ব্বলতার অবসান ক'রে সাবেক স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়া পাইতে বহু দিন লাগে।

কিন্তু যদি নিয়মিতভাবে স্যানাটোজেন সেবন করেন, তবে অতি সত্বর দুর্ব্বলতার অবসান হয় এবং পূর্ণ স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ করা যায়। কারণ স্যানাটোজেনে এরূপ উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে আছে—যাহা শক্তি স্বাস্থ্য এবং দেহে প্রচুর তাজা রক্ত দান করিতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিষ।

কলিকাতার কোন একজন সুবিখ্যাত চিকিৎসক লিখিতেছেন—"দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর আমি যখন বিশেষ দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ি, সেই সময় অধিক মাত্রায় স্যানাটোজেন সেবন করিতে থাকি এবং অতি সত্বর দেহে প্রচুর শক্তি লাভ করি। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতায় স্যানাটোজেন সুন্দর কাজ করে।"

ম্যালেরিয়ায় ভুগিবার পর স্বাভাবিক ভাবে দেহে কবে বল পাইবেন, এই আশায় না থেকে, আপনিও কেন স্যানাটোজেন সেবন করিয়া পূর্ণ স্বাস্থ্য ও শক্তি সত্বর লাভ করুন না? আজই স্যানাটোজেন সেবন করুন।

স্যানাটোজেন প্রস্তুত বা প্যাক করিবার সময় হস্তদ্বারা স্পর্শ করা হয় না।

আদর্শ টনিক খাদ্য

সকল ঔষধালয়ে ও বাজারে প্রাপ্তব্য।

—সুনাম—

উৎপন্নকারীর পক্ষে সুনাম অর্জ্জন করা বড় কঠিন ব্যাপার। যে জিনিষ উৎপন্নের জন্য তাঁহার সুনামের ভিত্তি স্থাপিত, তাহা যদি তাঁহার সামান্য ত্রুটির জন্য একবার কোন অংশে নিকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয় তবে সহস্র চক্ষুর দৃষ্টি তাঁহার প্রস্তুত সেই জিনিষের উপরই পতিত হয় এবং ঈর্ষাপ্রণোদিত হইয়া তাঁহাকে বাজারে খেলো করিবার জন্যই লোকে সর্ব্বপ্রকারে প্রয়াস পাইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার প্রস্তুত জিনিষ যদি বরাবরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট থাকে তবে তাঁহার সুনাম অক্ষুণ্ণ অবস্থায় চিরকালই থাকিয়া যায়।

আজ ২৬০ বৎসর ধরিয়া মার্ক পরিবারের সুনাম সমভাবেই চলিয়া আসিতেছে আর তাঁহাদের এই সুনামের দৃঢ়ভিত্তি তাঁহাদের উৎপন্ন জিনিষের বিশুদ্ধতা ও নির্ভরশীলতার উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত ইহা বিদিত জগতে। 'মর্ক মার্কা' (Merck brand) প্রতি বোতল হাইড্রজেন প্যারক্সাইডের (১২ গুণ তেজস্কর) সহিতই এই সুনাম বিজড়িত—যাহা—

মার্কোজোন (Merckozone)

নামে পরিচিত। হাইড্রোজেন প্যারক্সাইড কিনিবার সময় সুবিখ্যাত মার্ক মার্কা (Merck brand) দেখিয়া কিনিবেন তাহা হইলে আর বাজে নিকৃষ্ট জিনিষ কিনিতে হইবে না।

গৃহস্থের শত শত প্রয়োজনে হাইড্রোজেন প্যারক্সাইড ব্যবহারে আসে। বাজারে যত প্রকার হাইড্রোজেন প্যারক্সাইড থাকুক না কেন, কোনটাই মার্কোজোনের (MERCKOZONE) সমকক্ষ নহে। যাহাতে মার্কোজোনই (MERCKOZONE) পান সে দিকে সর্ব্বদাই দৃষ্টিরাখিবেন কারণ ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিষ এবং ইহার নামের সহিতই ইহার সুনাম বিজড়িত। এবং ইহা ডার্ম্মষ্টাড, জেমী, জার্ম্মানীতে ই, মার্ক কর্ত্তৃক প্রস্তুত।

৪ আউন্স, ১০ আউন্স এবং ২০ আউন্স পেটেন্ট বোতলে থাকে।

আপনার পরিচিত ঔষধালয়ে পাইবেন।

আমাদের জিনিষ সর্ব্বাংশে উচ্চাঙ্গের ও সুলভ আমাদের খরিদ্দার বিশিষ্ট ক্লাব কলেজ, স্কুল মাদ্রাসা মক্তব প্রভৃতি—আজই সচিত্র ক্যাটালগের জন্য "মোহাম্মদী" পত্রিকার নাম উল্লেখ করিয়া পত্র লিখুন

বি, রায় এণ্ড কোং,
৪৯নং হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা।

টাকের অব্যর্থ মহৌষধ।

ডাঃ এন্, সি, বসু এম, বি, আবিষ্কৃত।

দশ পনের বৎসরের পুরাতন টাক চুলে পরিপূর্ণ হইবে। বহু পরীক্ষিত। মূল্য ১৲ টাকা। কতদিনের পুরাতন টাক বা কতদিন হইতে চুল উঠিতেছে। বয়স কত, স্ত্রী কি পুরুষ, অন্য কোন রোগ আছে কিনা ইত্যাদি বিবরণ সহ পত্র লিখিয়া ব্যবহার বিধি লইলে নিশ্চয়ই উপকার পাইবেন।

ডাক্তার এন্, সি, বসু,
স্কিন ক্লিনিক বা চর্ম্মরোগ চিকিৎসালয়,
১২০নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

হারমোনিয়ম কিনিতে হইলে

ডোয়ার্কিনেরই কিনিবেন

ডোয়ার্কিনের বাড়ীতেই হাত হারমোনিয়মের প্রথম আবিষ্কার ও ডোয়ার্কিনের বাড়ীতেই উহার ক্রমোন্নতি। বাজারে এক্ষণে নানাপ্রকারের যন্ত্র বিক্রয় হইতেছে—আকৃতিতে ডোয়ার্কিনের মত কিন্তু সুরেতেই ধরা পড়িয়া যায়—ডোয়ার্কিনের সুর কিছুতেই নকল করা যায় না।

আপনার গৃহ প্রফুল্ল রাখিতে হইলে গৃহে একটী ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম প্রতিষ্ঠা করুন, গুণে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম অন্যাপেক্ষা সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ কিন্তু দামে যৎ সামান্য বেশী। সচিত্র মূল্যতালিকার জন্য পত্র লিখুন।

Telegrams: MUSICAL
Telephone: 1051

CALCUTTA.
8. Dalhousie Square, East.

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন,

ভারতের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান বাদ্য যন্ত্রালয়

৮নং ডালহাউসি স্কোয়ার ও ১২নং এসপ্ল্যানেড, কলিঃ।

হেড অপিস ১নং বনফিল্ডস লেন, ব্রাঞ্চ ২১৬ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বিশুদ্ধ ও টাট্‌কা আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ডাম /৫ ও /১০ পয়সা। কলেরা ও গৃহচিকিৎসার ঔষধ একখানি চিকিৎসা পুস্তক ও ১টা কৌটা ফেলিবার যন্ত্রসহ বাক্স ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ৮৪, ১০৪ শিশি পূর্ণ যথাক্রমে—২৲, ৩৲ ৩।০, ৫।০, ৬।৵০ ৯৲, ১০৸৵০—বাইওকেমিক ঔষধ পূর্ণ বাক্স, পুস্তক ও স্পুনসহ ১২টি এক ড্রাম কিংবা দুই ড্রাম ঔষধ পূর্ণ শিশিসহ যথাক্রমে ২।০ ও ৩৸০, ঐ ৪ ড্রাম বাক্স সাড়ে ৬।০, মাশুলাদি স্বতন্ত্র। সুগার অফ মিল্ক, গ্লোবিউল, পিলিউল, কার্ডবোর্ডের কেস, থার্ম্মোমিটার, ষ্টিথিস্কোপ টিউব শিশি, সিরিঞ্জ, হাইপো-সিরিঞ্জ, ভেলভেট কর্ক, ডিসপেন্সিং, কর্ক নানাবিধ শিশি, পুস্তক, যন্ত্রাদি এবং চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়। প্রত্যেক অর্ডার অতি যত্ন সহকারে যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে সরবরাহ করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কবিরাজ

দাশরথি কবিরত্নের

—স্বর্ণ ঘটিত—

অমৃত কুণ্ড সালসা

রক্তদোষ ও দুর্ব্বলতায় অব্যর্থ

২ নং দাঁ লেন, হাটখোলা, কলিকাতা।

১ শিশি ১৲, তিন শিশি ২।০, মাশুল স্বতন্ত্র।

গুণের পরীক্ষা

দুই সপ্তাহ মাত্র, স্বর্ণ-ঘটিত

অমৃতবিন্দু সালসা

সেবন করিয়া আপনার দেহ ওজন করিয়া দেখিবেন ওজন পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে

সাতদিন মাত্র এই অমৃতবিন্দু সালসা সেবনের পরে হস্তপদের অঙ্গুলি টিপিয়া দেখিবেন শরীরে সত্য সত্যই তরল আলতার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বিশুদ্ধ রক্তের সঞ্চার হইতেছে কিনা। অমৃতবিন্দু সালসা রক্তপরিষ্কারক, বলকারক, গরমি, পারাদোষ, প্রমেহ, খোস, পাঁচড়া চর্ম্মরোগ, নানাবিধ দৌর্ব্বল্য, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, অনিয়মিত ঋতু প্রভৃতি সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়। ১ শিশি ১৲ এক টাকা মাশুল ।৵০ আনা, ৩ শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা মাশুল ৸৵০ আনা, ৬ শিশি ৪।০ চারি টাকা চারি আনা মাশুল ১।০ **বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ** (স্বর্ণসিন্দুর) তোলা ৪৲ টাকা। উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসা গন্ধকদ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ। **চ্যবণ-প্রাশ**—উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশোলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণমাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ। ৩৲ সের।

কবিরাজ—শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত কবিরত্ন।

নবশক্তি ঔষধালয়, ২৯৭নং অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার, কলিকাতা।

দশহাজার টাকা পুরস্কার

ওজস দুঃস্বপ্ন, শুক্রতারল্য, অবসন্নতা ও পুরুষত্ব-হীনতা-নাশক রসায়ণ। শুক্রকে গাঢ় করিয়া ধাতু ও স্নায়ুকে সবল, সতেজ ও কর্ম্মঠ করিতে ইহা অদ্বিতীয়। মূল্য ১।০ টাকা।

পাচন্ক ১ মাত্রায় অম্ল ও শূলের অসহ্য কষ্টের উপশম; নিয়মিত সেবনে অম্ল, অজীর্ণ, শূল, অনিদ্রা, মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য, বায়ুবৃদ্ধি, অগ্নিমান্দ্য ও যকৃৎ-বিকৃতি আরোগ্য হয়। শিশি ১৲ টাকা। ঔষধদ্বয়ে বিজ্ঞাপিত গুণ নাই প্রমাণিত হইলে উক্ত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। পত্র দিলে ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

কবিরাজ—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মল্লিক

(অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান)

কালনা (বেঙ্গল)।

বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে

১৩৩৮ সনের সুন্দর কেলেণ্ডার তৎসঙ্গে একখানি সুন্দর গানের বই ও হজমী বটিকা নামক প্রসিদ্ধ ঔষধের নমুনা পত্র লিখিলেই পাঠাই।

করিম এণ্ড কোং,—ঢাকা

চশমা !

চশমা !!
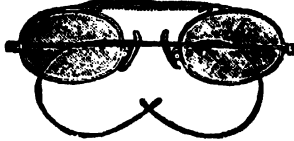
সকল রকম চশমা সুলভে পাইতে হইলে একমাত্র **টি, সি, দাস** এণ্ড ব্রাদার্সের দোকানে পদার্পণ করুন। এখানে সকল রকম সোণা রূপার চশমা নিজ কারখানায় প্রস্তুত করিয়া আপনাদের মনোমত করিয়া দেওয়া হয়। অপছন্দ হইলে ১ মাসের মধ্যে পাথর বদলাইয়া দিই।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

টি, সি, দাস এণ্ড ব্রাদার্স,

১২৮।৩ এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, (শ্যামবাজার দক্ষিণ) ক্যালঃ।

নূতন **ধর্ম্মসাক্ষী** আয়োজন

করিয়া নিষ্ফল জানাইলে মূল্য ফেরৎ দিব।

সন্তান নিরোধ—গর্ভনিবারক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধি। কেবল মাত্র এক মাসের ঋতুকালে ৭ দিন সেবনে চিরদিনের জন্য গর্ভ হওয়া বন্ধ হইয়া যায়। বেশী সন্তান হইলে স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়, অনেক কারণেও অনেকে সন্তান উৎপাদন করিতে অনিচ্ছুক। এই ঔষধ ঐ সকল অসুবিধা দূর করিয়া রূপ, যৌবন ও স্বাস্থ্যকে নষ্ট হইতে দেয় না মূল্য ৫৲।

কামিনী বাহার—১ ঘণ্টা পূর্ব্বে একটি বটী দুধের সহিত খাইলে ইহার আনন্দ চিরদিন মনে রাখিবেন। মূল্য ১৬ বটী ১৲ ৪০ বটী ২৲

Dr. Sarat Chandra Bhaduri M. B. Vaidyashastri.

Pro—Shakti Ashram. Ghiamondi, Muttra, U. P.

বহু প্রদর্শনীতে
সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত

"স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরী"

ফোন নম্বর
৩৫৫২ বড়বাজার।

জুয়েলার্স ও হস্তী দন্তের জিনিষ এবং স্বর্ণ অলঙ্কার নির্ম্মাতা। ২১৩, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কংগ্রেস চুড়ি (টালি প্যাটার্ণ)

স্বর্ণবর্ণের মেটেলের ফ্রেমে গিনি স্বর্ণের এনগ্রেভ পাতে মোড়া, ঠিক নিরেট সোণার চুড়ির ন্যায়। মূল্য প্রমাণ প্রতি জোড়া ১৮৷৷০

ললনা সোহাগ রুলী

হস্তী দন্তের লাইন মোড়া রুলীর উপর গিনি স্বর্ণের পাতে মোড়া। মূল্য প্রমাণ ১০৸০, ছোট ৭৷৷০।

তার প্যাচ রুলী (সরু)

হস্তী দন্তের সরু প্যাচকাটা রুলার উপর গিনি স্বর্ণের সরু পাতে মোড়া। মূল্যপ্রমাণ ১২৷৷০ ছোট ৮৷৷৵০ আনা।

পাতাওয়ালা ইয়ারিং

১২৷৷০ —১৫৲

করগেট মাকড়ী

১২৷৷০—২০৲

ঘোড়ার ক্ষুর আংটী

১৫৲—৩০৲

কাণফুল

১০৲ - ১৫৲

প্রেন কুমারী মাকড়ী

৬৷৷০

ইহা ব্যতীত জড়োয়া গহনা ও গিনি স্বর্ণের যাবতীয় অলঙ্কার সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। মফঃস্বলের অর্ডার ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। খাঁটী গিনি সোনার গ্যারান্টি দেওয়া হয়। সচিত্রক্যাটালগের জন্য ৵০ ষ্ট্যাম্প পাঠান। মওলানা মোহাম্মদ আলী লিখিয়াছেন, আমি "স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরীর" সুসজ্জিত দোকান দেখিয়াছি ইহাদের কাজ সুন্দর এবং কারুকার্য্য সমন্বিত। আমি এই দোকানের ক্রমোন্নতির কামনা করি। ১০ই জানুয়ারী ১৯২৫।

দি এশিয়াটিক টাইপরাইটার কোম্পানী

৯।১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিঃ

স্থাপিত ১৯০৩ খৃঃ আঃ ফোন ২৮৯২ কলিঃ

টাইপরাইটার ও তাহার সরঞ্জাম এবং রিবন কারবন আমদানীকারক এবং সস্তায় উৎকৃষ্ট যাবতীয় অফিস সংক্রান্ত দ্রব্যাদি বিক্রেতা। আমরা গ্যারান্টি দিয়া টাইপরাইটার মেরামত করি। আমরা আমেরিকা হইতে ১২নং মডেলের রেমিংটন ও আণ্ডারউড মেসিন আমদানী করিয়া মাত্র ১৭০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতেছি। গ্যারান্টি দিতেছি উক্ত মেসিন ৪৫০৲ টাকা মূল্যের নূতন মেসিনের সমতুল্য।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৫০০৲ টাকা

পর্য্যন্ত পাওয়া যায় মাসিক ১৲ ও ২৲ টাকা চাঁদা দিয়া। ১০, ১৫, ২০ বৎসর অন্তে জীবিতাবস্থায় টাকা দেওয়া হয়।

উচ্চহারে কমিশনে সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক

এসিয়াটিক ইন্সিওরেন্স

কোম্পানি লিমিটেড,

৩নং কমার্সিয়েল বিল্ডিংস, কলিকাতা।

মাসিক মোহাম্মদী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়

১। মাসিক মোহাম্মদী প্রতি বাংলা মাসের ১লা তারিখের মধ্যেই কলিকাতায় প্রকাশিত হয় এবং সেই দিনই মফঃস্বলে গ্রাহকদিগের নামে প্রেরিত হয়।

২। প্রত্যেক মাসের ৫ই তারিখের মধ্যে সেই মাসের 'মোহাম্মদী' না পাইলে, স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন। আমাদিগকে ডাকঘরের উত্তর সহ ১০ই তারিখের মধ্যে জানাইবেন; ডাকঘরের গোলযোগে কাগজ না পাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বর্ত্তমান সময়ে আমাদের পক্ষে অসম্ভব। যাঁহারা সর্ব্বদা নিয়মিত ভাবে কাগজ পান না, তাঁহাদের পক্ষে রেজেষ্টারী খরচা বহন করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট সহ পত্র না লিখিলে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

৩। চিঠি-পত্র বা টাকা-কড়ি পাঠাইবার সময় পুরাতন গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর (কাগজের মোড়কের উপর থাকে) এবং নূতন গ্রাহকগণ "নূতন" এই দুইটি বিষয় স্পষ্ট ও নির্ভুল করিয়া লিখিবেন। অন্যথায় অভিযোগ অনুযায়ী কাজ করা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

৪। কার্ত্তিক মাস হইতে মাসিক মোহাম্মদীর বৎসর আরম্ভ হয়। যিনি যে কোন মাস গ্রাহক হউন না কেন তাঁহাকে কার্ত্তিক মাস হইতে কাগজ দেওয়া হয়।

৫। ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণকে কার্ত্তিক হইতে চৈত্র কিংবা বৈশাখ হইতে আশ্বিন এই ছয় সংখ্যা করিয়া কাগজ দেওয়া হয়।

৬। মাসিক মোহাম্মদীর বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক মূল্য যথাক্রমে ভারতে সডাক ৩৷৵০ আনা ২৲ ভি, পি, ৩৷৵০ ও ২০ আনা। বিদেশে ৬৲ টাকা।

৭। পূর্ব্বে ভি, পি, পার্শ্বেল স্থানীয় পোষ্টাফিসে পৌছিলে ১২ দিন জমা থাকিত, তাহার জন্য কোন খরচা দিতে হইত না। কিন্তু নূতন নিয়ম হইয়াছে যে, এখন বিনা খরচায় মাত্র তিন দিন জমা থাকিবে, এবং তিন দিনের উপর ঐ বার দিন পর্য্যন্ত যে কয়দিন জমা রাখিতে হইবে প্রত্যেক দিনের জন্য ৵০ করিয়া টিকিট দিয়া দরখাস্ত করিতে হইবে। সেই জন্য অনেক পার্শ্বেল গ্রাহকগণের অগোচরেই আমাদের নিকট ফেরৎ আসে। এ-কারণ গ্রাহকগণের নিকট অনুরোধ তাঁহারা টাকার যোগাড় করিয়া ভি, পি,র অর্ডার দিবেন। মণিঅর্ডারে টাকা পাঠানই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, কারণ তাহাতে ৵০ কম খরচ পড়ে এবং কোন গোলমালের আশঙ্কা থাকে না।

৮। বিনামূল্যে কাহাকেও নমুনা দেওয়া হয় না। নমুনার জন্য সাড়ে পাঁচ আনার টিকিট পাঠাইতে হয়।

১০। তিন মাসের কমে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করা হয় না। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের চিঠি পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া চাই। তাহার কম সময়ের জন্য স্থান ত্যাগ করিলে স্থানীয় পোষ্টাফিসে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করাই শ্রেয়ঃ।

এজেণ্টগণের প্রতি—

১। এজেণ্টদিগকে শতকরা ২০৲ হিসাবে কমিশন দেওয়া হয়। কাগজ পাঠনের খরচা আমরাই বহন করিয়া থাকি।

২। অবিক্রীত সংখ্যা ফেরৎ লওয়া হয় কিন্তু তাহা ফেরৎ পাঠানর খরচা এজেণ্টগণের।

৩। ২৫ খানির কমে কাহাকেও এজেণ্ট করা হয় না।

৪। এজেন্সী লইবার সময় নিম্নলিখিত হারে টাকা জমা দিতে হয়:—

২৫ খানির জন্য	৮৲	৫০ খানি পর্য্যন্ত	১৫৲
৭৫ খানি পর্য্যন্ত	২২৲	১০০ খানি পর্য্যন্ত	৩০৲
তদূর্দ্ধ প্রতি শত	৩০৲ টাকা হিসাবে।		

৫। এজেন্টগণের বিক্রীত মূল্য ও অবিক্রীত কাগজ মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া চাই। অন্যথায় পরবর্ত্তী মাস হইতে আর কাগজ পাঠান হয় না।

লেখকগণের প্রতি

১। লেখকগণ দয়া করিয়া প্রবন্ধের নকল রাখিয়া পাঠাইবেন।

২। প্রবন্ধ সকল সম্পাদকের নিকট প্রেরিতব্য।

৩। প্রবন্ধের সঙ্গে ঠিকানা লেখা না থাকিলে বড় অসুবিধা হয়। প্রবন্ধ লেখকগণ দয়া করিয়া প্রত্যেক লেখার সঙ্গে ঠিকানা লিখিয়া দিবেন এবং অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ লইতে হইলে ডাক খরচা দিতে হইবে।

৪। কবিতার নকল রাখিয়া পাঠাইবেন, অমনোনীত কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। প্রবন্ধ-আদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার ও ফাঁক ফাঁক করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। কোন কবিতা বা প্রবন্ধ কেন ছাপা হইল না, সম্পাদক সে কৈফিয়ৎ দিতে রাজি নহেন।

অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন ঃ—

ম্যানেজার—মাসিক মোহাম্মদী, ৯১নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

নবজীবন দায়িনী আশ্চর্য্য দৈব শক্তি!

দৈব শক্তির আশ্চর্য্য অসীম ক্ষমতা !!

হোয়াইট ক্রীম

বিনা অস্ত্রে আরোগ্য নিশ্চয়, ধুইতে হয় না, সর্ব্বপ্রকার ঘা, পারা, গর্ম্মী, বাগী, শোথ, নালী, উরুস্তম্ভ, পৃষ্ঠাঘাত, ক্যান্সার, ভগন্দর, অর্শ, পোড়া ঘা, খোস, পাঁচড়া, কড়া ইত্যাদি অতি অল্প সময়ে নির্দ্দোষ ভাবে আরোগ্য হয়। দুর্গন্ধ বা জ্বালা যন্ত্রণা নাই, পারা বা অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ নাই। প্রতি শিশি ৸৹, ডজন ৮৷৹ টাকা।

চুক্তি করিয়াও লওয়া হয়।

এজেণ্টস্ঃ—

এম্, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।
এন, কে, মজুমদার এণ্ড কোং, ৭৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
পি, সি, পাল, এণ্ড কোং, ৮০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
এবং অন্যান্য ঔষধালয়েও পাইবেন।

ধনী ও গরীব সকলের উপযোগী

হাতে বাঁধা **ঘড়ি** (রিষ্ট ওয়াচ) দেখিতে সৌখীন ও সাইজে ছোট ; এক দমে ৩৬ ঘণ্টা চলে গ্যারাণ্টি কলকব্জা মজবুত ঠিক সময় রাখে : চামড়া অথবা সিল্ক ব্যাণ্ড সহ পুরুষ অথবা মহিলাদিগের ব্যবহারোপযোগী নিকেল কেস ৫৲, নকল সোনা ৯ ক্যাঃ গিণ্ট কেস্ ৫৷৹, ঐ ১৪ ক্যাঃ গিণ্ট ৬৲, ঐ ১৮ ক্যাঃ ৬৷০, ঝিণুকের (Mother of Pearl) কেস ৭৲, আসল চাঁদি রূপার কেস্ ৭৷০, আসল ৯ ক্যারেট খাঁটি সোণার কেস্ ১৫৲, আসল ১4 ক্যারেট খাঁটি সোনার কেস্ ২০৲, আসল ১৮ ক্যারেট খাঁটি সোণার কেস্ ২৫৲

সস্তায় সুন্দর **পকেট** ঘড়ি রেলওয়ে রেগুলেটর শেপ মাঝারি সাইজ ১ দমে ৩৬ ঘণ্টা চলে গ্যারাণ্টি কলকব্জা মজবুত ঠিক সময় রাখে, বাক্স সহ নিকেল কেস্ ২৸৵৹ ; সোণার গিণ্ট কেস্ ৩৸৵৹ ; রূপার কেস্ ৪৸৵০ ; এই ঘড়িগুলির দাম কম বলিয়া যখন তখন যেখানে সেখানে ব্যবহার করিবার বড়ই সুবিধা। ইহার মধ্যে জুয়াচুরি নাই।

আসল পকেট **রেলওয়ে** রেগুলেটার ঘড়ি ভদ্রলোকের ব্যবহারোপযোগী ছোট সাইজ দেখিতে সুদৃশ্য ও মজবুত-ত্রিপুরুষ ক্রমান্বয়ে ব্যবহার করিতে পারিবেন খারাপ হইবে না, গ্যারাণ্টি ১ দমে ৩৬ ঘণ্টা ঠিক সময় রাখে ; বাক্স সহ (Heavily Nickelled) নিকেল কেস্ মূল্য ৫৲ মাত্র।

প্রত্যেক ঘড়ির ডাঃ মাঃ খরচা।৵৹ ও ২টী ঘড়ির ডাঃমাঃখরচা।৹ আলাদা।

দি য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান ওয়াচ কোং,
পোষ্ট বক্স নম্বর ৪৬৮, কলিকাতা।

চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং

৬২।৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা (পোঃ বক্স ১১৪৩৪)
সর্ব্বাপেক্ষা সুলভে খেলার সরঞ্জাম বিক্রেতা

ফুটবল !

(T Shape) লিগ ফাইনাল ৫নং (Complete)	১১৲
ঐ ঐ 8নং ঐ	৮৷৹
সিল্ড ফাইনাল ৫নং ঐ	১১৲
ঐ (১৮ প্যানাল) ৪নং ঐ	৯৲
মিলিটারী ম্যাচ (Macgregor) ৫নং	১১৷৹
ঐ 8নং	৯৲

ব্লাডার—	১নং	২নং	৩নং	8নং	৫নং
	৸৹	১৲	১৷০	১৷৵৹	১৷৷৵৹

লিগ চ্যামপিয়ন ৫নং ৯৷৹ — লিগ চ্যামপিয়ন ৪নং ৭৲
স্কুল ম্যাচ ৫নং ৮৲ — স্কুল ম্যাচ 8নং ৬৲
রয়াল ম্যাচ ৫নং ৬৲ — রয়াল ম্যাচ 8নং 8৸৹

জুনিয়ার ম্যাচ ১নং ১৷৹, ২নং ২৷৹, ৩নং ৩৷০, ৪নং 8৷৹

WHISLE—।৵৹, ।৹, ৸৹, ১৷০

ইনফ্লেটার—১৲, ১৷৹, ১৷৹, ২৲, ২৷৹

দেশের দশের নিকট পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

Annual Contract Rate—

Buyers' Guide.

Annas Eight Per Line.

Advertising is the eye of trade.

"আমি অবাক হয়ে শুনি"

খানবাহাদুর স্যার মোহাম্মদ আলী মোহাম্মদ

(মহারাজা, মাহমুদাবাদ)

BEFORE YOU DECIDE

UPON

YOUR

FURNITURE

PLEASE COME TO US

Best Quality at Moderate Prices.

MODERN FURNISHERS

Showroom :—
8-1, Esplanade East.
Phone :—Cal. 3809.

Workshop :—
10 & 24, Madan Pal Lane, Bhowanipur.
Phone :—P. K. 210.

K. Abdul Aziz.
Wholesale and Retail Dealers Of
Darjeeling Tea.
102, Prinsep St., Cal.

Dr. K.K. Roy, M.D. (California, U.S.A.)
Specialist in Chronic Diseases.
Hours : 1 to 2 P. M. & 7 to 8 P. M,
10/A, Mudge Lane, off Lindsay St, Cal.

কাটিং শিক্ষার উৎকৃষ্ট—পুস্তক
ওস্তাগর
পুস্তকালয়ে বা ৭, আশু বাবু লেন, খিদিরপুর,
কলিকাতা।

Become young again !

Regain your vanished Age, Elasticity, vigour and Energy.

BY **'Nervigol'**

A really sensational Discovery.

Per Set Price Rs. 5/-

Forward Laboratory.
Post Box. No 2047 Calcutta.

ষোড়শী

মনোরম সুগন্ধি

মীরা

কলিকাতা।

চতুর্থ বর্ষ　　আষাঢ়, ১৩৩৮　　৯ম সংখ্যা

মুস্‌লিম সাহিত্য-সমাজ

— অভিভাষণ —　　—হাকিম হবিবুর রহমান

বন্ধুগণ,

পারস্য ভাষায় একটী প্রবাদ আছে—আদমিয়ান্ গুম্ শুদন্দ ও মুলক্-ই খোদা খর্ গিরফ্‌ত—আপনাদের সবারই বোধগম্য বাংলা-ভাষায় ইহার অনুবাদ দিয়া নিজেকে নিতান্তই লাঞ্ছিত করা সঙ্গত নয়। বর্ত্তমানে আমাদের সমাজে কর্ম্মক্ষম লোকের "দুর্ভিক্ষ" সুস্পষ্ট; তবু আমাকে আপনাদের এই সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচন বিশেষভাবে অপ্রশংসার যোগ্য এই জন্য যে, আমার মাতৃভাষা উর্দ্দু, আর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বায়ু-সেবন আমার ভাগ্যে কোনো কালেই ঘটে নাই। যাহা হউক, আমাদের উভয় পক্ষের ভুল-ত্রুটির জালে ধৃত হইয়া যখন সভাস্থল পর্য্যন্ত আসিয়া জুটিয়াছি, তখন মুখ ত আমাকে খুলিতে হইবেই। আমার মত একজন সেকেলে ও সেকাল-প্রিয় লোকের বাগ্-বিস্তার যদি শেষ পর্য্যন্ত আপনারা সহ্য করিতে পারেন, তবেই যথেষ্ট।

ইস্‌লামের প্রথম শতাব্দীতেই মুসলমানগণ আমাদের এই ভারত-ভূমিতে পদার্পণ করেন। ভারতের সঙ্গে আরব-বাসিগণের পরিচয় সুপ্রাচীন, কিন্তু এদেশের অধিবাসীরূপে পরিগৃহীত তাঁহারা হন নাই। মুসলমানগণ কিন্তু এদেশের স্থায়ী অধিবাসীই হইয়া গেলেন। ভারতের উপকূল ভাগ তাঁহাদের প্রথম অবতরণ-ভূমি এবং "আল্ আক্‌রাবু ফাল্ আক্‌রাবু" (যত কাছে তত আগে) নীতির অনুসরণে ঐ সকল ভূভাগে নবাগতগণের সংখ্যাধিক্য স্বাভাবিক। তাই পাঞ্জাব ও দোআবা মোগল তুর্কীগণের এবং সিন্ধু, বঙ্গ, সিঙ্গাপুর ও যবদ্বীপের উপকূল ভাগ আরব বণিকগণের ও মুস্‌লিম প্রচারকগণের বিচিত্র কর্ম্মভূমি। এই সমুদ্র-উপকূল-বাসীদের যে স্বর-ভঙ্গি ও তাহাদের মুখ-মণ্ডলের যে গঠন, তাহাই অনেকখানি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেয়—ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষদের আদি বাসস্থান কোথায়।

সবাই জানেন—আরব, তুর্ক, মোগল ও হাবসীদের হাজার-করা একজনও এদেশে স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে লইয়া আসেন নাই। তৎকালীন ঔপনিবেশিক প্রথানুযায়ী এদেশ হইতেই তাঁহারা স্ত্রী-গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানী সৈয়দ, হিন্দুস্থানী তুর্ক ও হিন্দুস্থানী মোগলের বংশ-ভিত্তি-স্থাপন এই

ভাবেই। তারপর, ইঁহারা আবুমা'শেরে ফলকী ও আল্‌-বেরুনীর স্থায় বিদ্যা-চর্চ্চার ব্রত লইয়া এদেশে আসেন নাই। তাই এদেশের যে ভাষা তাহাতেই তাঁহারা ব্যুৎপত্তি লাভ করিবেন, ইহা সম্ভবপর নয়। এ ভিন্ন বিজেতা ও বিজিত উভয়েই উভয়ের ভাব ও ভাষা আয়ত্ত করিতে চির-উৎসুক। তাই ইঁহাদের ভিতরে এক নব-ভাষার উৎপত্তি হইতে লাগিল—তাহার নাম হইল হিন্দী ও হিন্দুস্থানী। পারস্ত ঐতিহাসিকগণ এদেশের হিন্দুগণের ভাষা 'হিন্দুভি' ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু আমার বক্তব্য—হিন্দী ভাষা মূলতঃ হিন্দু-মুসলমানের সম্মেলন-জাত ভাষা, আর ক্রমশঃ রূপান্তরিত অবস্থায় উহা দেশের চতুর্দ্দিকে বিস্তার লাভ করিতে থাকে। এইরূপে মোগল সাম্রাজ্যস্থাপনের কিছু পূর্ব্বে পাঞ্জাবে এই ভাষার বর্ণমালা 'গুরুমুখী'তে পরিণত হয়।

মুসলমানগণ তাহাদের আনীত বর্ণমালা স্ব স্ব প্রাদেশিক ভাষায় ব্যবহার করিতেন, যেমন—সিন্ধু-প্রদেশের আরবগণ তথায় আরবী (নস্‌খ) বর্ণমালা ব্যবহার করিতেন। অদ্যাবধি সিন্ধুবাসিগণ আরবী বর্ণমালায় দেশীয় ভাষায় পত্রাদি লিখিয়া থাকেন। দাক্ষিণাত্য-অধিবাসিগণের ব্যবহৃত বর্ণমালা মোগল-প্রভাবে পারসী (নস্তালিক) বর্ণমালায় পরিণত হয়। দাক্ষিণাত্যের ভাষাসমূহের দশম শতাব্দীর লিখিত, অধুনা ইউরোপের বহু গ্রন্থাগারে রক্ষিত, পত্রাদি আমার এই উক্তির স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এইরূপে দোআবার ভাষায় পারসী বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সৈন্ত-বাহিনীর ভিতরে যে ভাষার জন্ম হইয়াছিল, তাহাই উর্দ্দু-ভাষা—তুর্ক-ভাষায় সৈন্যবাহিনীকে উর্দ্দু বলা হয়। দাক্ষিণাত্যের ভাষা ও উর্দ্দু-ভাষা প্রকৃতপক্ষে একই ভাষা। ইহাদের ভিতরে পার্থক্য এই যে, দিল্লীতে আসিয়া উর্দ্দু-ভাষা অধিক পরিমাণে পরিমার্জ্জিত হইয়াছে, এবং রাজ-শক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বিপুলকলেবর হইতে সমর্থ হইয়াছে।

বাংলায় যে-সকল মুসলমান সর্ব্বপ্রথম দেশের উপকূল ভাগে বসতি স্থাপন করেন, তাঁহারা বাণিজ্য ও নাবিকতাতেই আত্ম-নিয়োগ করেন; কেহবা দেশে আল্লার নাম ও বাণী পৌঁছাইতে নিযুক্ত হন। এই আরব ও পারস্ত হইতে আগত মুসলমানগণ তাঁহাদের বংশধরদের ভাষায় এমন কতকগুলি বিশিষ্ট ধ্বনিযুক্ত শব্দ রাখিয়া গিয়াছেন, যাহার উচ্চারণ-যোগ্য বর্ণ বাংলা ভাষায় আদৌ নাই।

পশ্চিম হইতে দ্বিতীয় জাতি যাঁহারা বাংলায় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তুর্ক ও পাঠান। ইঁহারা সকলেই সৈনিক পুরুষ ছিলেন, আর রাজ্য-বিস্তারই ছিল ইঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য—বিদ্যার্জ্জন বা অধ্যাপনা নয়। বাংলা-সাহিত্যে মুসলমানদের 'তুর্ক' বলা হইয়াছে, আর এদেশে নব-দীক্ষিতকে 'খান' উপাধি দেওয়া হয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, পাঠান-প্রভাব বাংলায় কত গভীর। সম্রাট আকবর বাংলাকে 'বেল্‌গাকখানা' (ভীমরুলের চাক) বলিতেন। বাস্তবিক পাঠানগণ আফগানিস্থানের পরেই বাংলাকে তাঁহাদের দ্বিতীয় আবাসস্থল করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সকল "খেল" ও "জই" যথেষ্ট সংখ্যায় এখানে বস-বাস করিতেছিলেন এবং কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহারা দিল্লীর শক্তি অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীনভাবে পূর্ণ গৌরবে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন কি, শেষভাগে বাংলার সন্তান শের শাহ্‌ ও ইসলাম শাহ্‌ সমগ্র ভারতবর্ষের শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। হুমায়ুন হইতে জাহাঙ্গীর পর্য্যন্ত সকলকে বাংলায় আধিপত্য বিস্তারকালে পাঠানদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

পাঠানগণ প্রকৃত প্রস্তাবে ছিলেন সৈনিক—যোদ্ধা, তবু মাদ্রাসা স্থাপন, অনুবাদকরণ এবং স্বাধীন রচনাবলীর দ্বারা সাহিত্যের পুষ্টি-সাধন—ইত্যাকার বিদ্যানুরাগের পরিচয়ও তাঁহারা দিয়াছেন। বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দিনের নাম মহাকবি হাফেজ চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তবু বলিতে হইবে, এসব তাঁহাদের শেষ সময়ের কীর্ত্তি; আর সেইজন্যই দক্ষিণদিক হইতে লিখিবার উপযুক্ত বর্ণমালার সৃষ্টি বাংলায় হইতে পারে নাই। বাংলার এই মুসলমানগণ যখন রাজ্যহারা হইয়া তরবারীর পরিবর্ত্তে হল বা হাল ধরিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই "পেদরম্‌ সুলতান বুদ" (আমার পিতা বাদসা ছিলেন) অবস্থায় তাঁহারা নিজ সম্প্রদায় ও ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট পত্রিকাদিতে মুসলমানী বাংলা দক্ষিণদিক হইতে লিখিবার প্রথার প্রচলন করে। অদূর-অতীতের এই ধরণের বহু বাংলা রচনা এখনও দুর্লভ নয়।

মুসলমানদের শাসনকালে বাংলার দফ্‌তরের ভাষা

পারসী ছিল; এবং হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে শিক্ষিত বঙ্গ-সন্তানগণ ইহাতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। বহু হিন্দু লিপিকার ও গ্রন্থকারের সুন্দর হস্তলিপির নিদর্শন আমরা এই ঢাকা নগরীতেই পাইয়াছি। মুসলমান রাজত্ব যখন ইউরোপীয় বণিকগণের হাতে আসিল, তখনও বাংলার দফ্‌তরের ভাষা পারসী ছিল, এবং হিন্দু ও মুসলমান ভিন্ন ইংরেজগণও ইহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহাদের পারসী-অভিজ্ঞতার পরিচায়ক বহু পুস্তক এখনও মজুদ আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ইংরাজ দেখিলেন যে, আশ্রয়হীন অথচ জন-সাধারণের ভাষা উর্দ্দুর ভিতরে উন্নতির সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে; তাই কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ খোলা হইলে তথা হইতেই বর্ত্তমান উর্দ্দুর বিকাশ আরম্ভ হইল। আমার বিশ্বাস—এই কলেজের সৃষ্টি হইতেই বাংলার সরকারী দফ্‌তরের ভাষা অকস্মাৎ পারসী হইতে উর্দ্দুতে পরিবর্ত্তিত হইল। এই উর্দ্দু ভাষা কতিপয় বৎসর বাংলার দফ্‌তরের ভাষা রহিল। এই সময়ে মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুগণও উর্দ্দুর ভক্ত হইয়া উঠিলেন। বাংলার এক প্রসিদ্ধ নেতার (শ্রীযুক্ত জে-এম সেনগুপ্তের) ঠাকুর-দাদা একটী উর্দ্দু পুস্তকের রচয়িতা। উর্দ্দু ভাষার কবিগণের সর্ব্বপ্রথম বিবরণীর সঙ্কলক জনৈক বাঙ্গালী হিন্দু (নুসখা-ই-দিলকুশা—রাজা জনমেজয় মিত্র)। উর্দ্দু ভাষা শুধু মুর্শিদাবাদ ঢাকা ও কলিকাতার সহিতই সম্পর্কিত ছিল না, সমস্ত বাংলাই ইহার চর্চ্চা ও আলোচনা স্থল হইয়া উঠিয়াছিল এবং এখনকার বাঙ্গালী অধিকতর সাহসী ছিলেন; তাই লক্ষ্ণৌর নবাব-দরবারের একজন রাজকবি ছিলেন হুগলীর জনৈক মুসলমান (মালিক্-উশ্-শোয়ারা কাজী মোহাম্মদ সাদেক খান আক্তার)। হজরত মোহাম্মদ ও আম্বিয়াগণের যে জীবনী সর্ব্বপ্রথম উর্দ্দু ভাষায় মুদ্রিত হয়, উহার রচয়িতা ছিলেন কুমিল্লার জনৈক মুসলমান (মৌলবী মোহাম্মদ সইদ)। উর্দ্দু ভাষায় সর্ব্বপ্রথম নাটকের রচয়িতা রংপুরের জনৈক মুসলমান (সওলাতে আলমগিরি—সৈয়দ মোহাম্মদ হায়াত)। আর সব চাইতে গৌরবের কথা এই, লক্ষ্ণৌ-ওয়ালাদের কবিত্ব বিষয়ে গবেষণা-মূলক সর্ব্বপ্রথম পুস্তক সুপ্রসিদ্ধ "তুমার-ই-আগালাত"-এর রচয়িতা এই বঙ্গমাতারই ফরিদপুরের এক সন্তান (মৌলবী আবদুল গফুর খান নস্‌সাখ); উর্দ্দুর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের কাছে আজও ইহার মর্য্যাদা অতুলনীয়। মুর্শিদাবাদের জনৈক উর্দ্দু সাহিত্যিকও সবিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি উর্দ্দুতে স্ত্রীলোকের ব্যবহৃত ভাষার (রেখ্‌তি) প্রথম বিবরণ লেখক অথবা আবিষ্কারক। বাংলার স্ত্রী উর্দ্দু সাহিত্যিকদের রচনার পরিমাণও কম নয়। মোট কথা, উর্দ্দু ভাষা ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলায় এক বড় সার্থকতা লাভ করিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু এক রাজনৈতিক চালে হঠাৎ বাংলার সরকারী দফ্‌তরের ভাষা উর্দ্দু হইতে বাংলায় পরিবর্ত্তিত হইল। এই অচিন্ত্য-পূর্ব্ব দুর্ঘটনায় মুসলমানদের এই অগ্রগতি বিষম বাধা পাইল এবং বাংলার মুসলমান ধ্বংসমুখে পতিত হইলেন। এইভাবে বাংলার মুসলমানকে সরকারী দফ্‌তর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল। সে-দুঃখের কান্না আজও আমাদের সভা-সমিতিগুলি কাঁদিতেছে।

সেকালে আমাদের সাহিত্যিকদের এক বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই একাধিক ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেন। আলাওল সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি। তিনি আবার নেজামী গাঞ্জাবীর "হপ্‌ত পায়কর" নামক পারস্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ কর্ত্তা, পারস্য ভাষায়ও তিনি কবিতা লিখিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। পুঁথি-সাহিত্যের প্রতি আমাদের শিক্ষিতদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নাই, কিন্তু এই পুঁথি-সাহিত্যের মূলে যে-সাধনা আছে, তাহা বাস্তবিকই শ্রদ্ধার যোগ্য। শাহ্‌নামার মত অতি বৃহৎ ও সুকঠিন পারসী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ উহার উর্দ্দু অনুবাদের প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপ একাধিক ভাষায় ব্যুৎপন্ন রচয়িতার সংখ্যা অদ্য হইতে ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও কম ছিল না।

ভ্রাতৃগণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আমি একজন সেকাল-প্রিয় লোক, তাই সেকালের কথা ভিন্ন আর কিইবা আমি আপনাদের কাছে বলিতে পারি। বাংলায় উর্দ্দু-চর্চ্চার কথা যে একটু বিস্তৃতভাবে বলিলাম, তাহার আর এক বড় কারণ—বাংলায় উর্দ্দু ও বাংলা চর্চ্চার ভিতরে যে একটী দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই অবাঞ্ছনীয়। **উর্দ্দু বাস্তবিকই কোনও প্রদেশের খাস ভাষা ছিল না। উহা বরং সমগ্র**

ভারতবর্ষেরই ভাষা। লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীবাসিগণ ইহাকে নিতান্তই এক খেলার সামগ্রী করিয়া তুলিলেন, নানা ভাবে ইহার এক বিশেষ মূর্ত্তি দিলেন, তাই ইহা একটী সীমাবদ্ধ স্থানের ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আজও উর্দ্দূর প্রসার ও প্রভাব বাস্তবিকই খুব বেশী। আজও ইহা ভারতের এক প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশের ভাব আদান-প্রদানের ভাষা। বিদেশীয়গণও ভারতবর্ষীয়গণের সঙ্গে সাধারণতঃ এই ভাষায় আলাপ করিয়া থাকেন। আর বঙ্গভাষা-ভাষীদেরও ক্রোধ, বিরক্তি প্রকাশের ভাষা এই উর্দ্দূ ভাষা। আপনাদের মাতৃভাষা বাংলার পুষ্টিসাধন তো আপনারা করিবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু উর্দ্দূকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলে সমস্ত ভারতের সঙ্গে আপনাদের যোগ ছিন্ন হইয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন আপনাদের ধর্ম্মকে তো আপনারা ছাড়িতে পারিবেন না, সেই ধর্ম্মের সাহিত্য-অংশ উর্দ্দূতে যেভাবে বিকাশলাভ করিয়া চলিয়াছে, তাহা নিতান্তই প্রশংসার যোগ্য। সেখান হইতে আপনারা প্রভূত প্রেরণা লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

আমরা বাঙ্গালী মুসলমান ভারতের সমগ্র মুসলমান জন-সংখ্যার এক তৃতীয়াংশেরও অধিক, অথচ আমরাই সর্ব্বপ্রকারে অবনতির গভীর-তলে পতিত আছি। কিন্তু আফসোস করিয়া আর কি লাভ হইবে? আপনারা একদল তরুণ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন, এর চাইতে আশা ও আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে? আপনারা আপনাদের মাতৃভূমির প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের পুণ্যব্রত সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করুন—এই আমার একান্ত অনুরোধ।

কিন্তু কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে কর্ম্ম-বিভাগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আপনারা কে কে পারস্য ভাষায় লিখিত অংশ গ্রহণ করিবেন, তাহা ঠিক করিয়া ফেলুন। এই সব প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া আপনারা যে শুধু প্রাচীন ইতিকথাই জ্ঞাত হইবেন তাহা নহে, আমার বিশ্বাস—বাংলাভাষা ও সাহিত্য, বাংলার লোকদের উৎপত্তি-কাহিনী, ইত্যাদি বিষয়েও বহু মূল্যবান্ তথ্য উদ্ধার করিতে পারিবেন, যেমন—বাংলার কবিত্বের উপরে পারস্য-সাহিত্যের কি প্রভাব পড়িয়াছে ও বাঙ্গালী মুসলমানের দেহে আরব রক্ত কি পরিমাণে আছে, এবং আরবের কোন্ প্রদেশেরই বা প্রভাব বাংলাদেশে বেশী, ইত্যাদি বহু মূল্যবান্ তথ্য আপনারা উদ্ধার করিয়া স্বদেশের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে পারিবেন। ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেরই মুসলিম ইতিহাস বাংলার মুসলিম ইতিহাসের মত এত অন্ধকারে পতিত নয়। অথচ এই বাংলার মুসলমান সমাজে প্রতিভাবানের জন্ম কম হয় নাই। এই বাংলার সোণারগাঁয়ে মাতামহের আলয়ে হজরত মখদুম-উল-মুল্‌কের মত মনীষী জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রথম-জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা সোণারগাঁয়ের ওলামা ও 'মোশায়েখ'দের সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়। ইমাম খাজেগীর মত ইলমে-হাদিস-অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই বাংলায়ই ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। এই বাংলারই জনৈক সুসন্তান সম্রাট ফিরোজ শাহের মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মেহেদিভি সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা এই বাংলারই সন্তান; সে-সম্প্রদায় অদ্যাবধি দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাটে অবস্থিতি করিতেছে; 'মানাহুর' নামক মুসলমান করদ-রাজ্যটী এই মেহেদিভি সম্প্রদায়েরই স্মৃতি বহন করিতেছে। আর শুধু ধর্ম্ম-চর্চ্চা নয়, কলা-বিদ্যার চর্চ্চাও সেকালের বাংলায় কম ছিল না। ইব্‌নে বতুতা এরূপ গায়িকা এই বাংলা দেশে দেখিয়াছিলেন, যাঁহারা পারসী গজলে ও মজলিসী সঙ্গীতে কৃতিত্বের পরিচয় দিতেন। কিন্তু আফসোস, সেই বাংলার ঐতিহাসিক বিবরণ আজ আমরা শিক্ষা করিতেছি কতিপয় পক্ষপাত-দুষ্ট ইংরেজি ইতিহাস হইতে! আমার ধারণা এই যে, যে-সমস্ত অমুদ্রিত পারসী-ভাষার ইতিহাসে বাংলার ইতিহাসের উপকরণ আছে, সেইগুলির এক লিষ্ট তৈয়ার করিয়া আমাদের তরুণদের হাতে দিতে হইবে। (এই উদ্দেশ্যে একটি ছোট-খাট লিষ্ট অভিভাষণের শেষে দেওয়া হইল।) কিন্তু এই সমস্তের অনেকগুলি এখন আর এদেশে পাওয়া যায় না—ইউরোপের বিভিন্ন পুস্তকাগারে সে-সব রক্ষিত আছে। তাই আমাদের দেশের যাঁহারা ইউরোপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা যদি ঐ সকল পুস্তকের নকলাদি প্রস্তুত করাইয়া আমাদের জ্ঞানেচ্ছু যুবকদিগের হাতে দিতে পারেন, তবে বড়ই ভাল হয়। বিভিন্ন জেলার ইতিহাস উদ্ধারেও আপনাদের ব্রতী হইতে হইবে। প্রচলিত ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়ারসমূহে ভুল-ত্রুটি যথেষ্ট। এইরূপে সর্ব্বক্ষেত্রেই দেশের বিশুদ্ধ ইতিহাস উদ্ধার আপনাদের লক্ষ্য হওয়া চাই।

মুদ্রা-লিপি ও শিলা-লিপি পাঠের চেষ্টা আপনাদের

সাম্‌নে আর একটী অতি বড় কাজ। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু মিঃ ভট্টশালী মুদ্রা-লিপি হইতে মুসলমান বাদশাহদের সম্বন্ধে বহু কিছু জ্ঞাতব্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু আরো অনেক কিছু বাকী।

পারসী ও আরবী শিলা-লিপি পাঠ আর একটী বড় ও সুকঠিন বিষয়। বাংলার বহুস্থানে এখনও বহু শিলা-লিপি অপঠিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটির ত্রৈমাসিক পত্রিকা এসবের কিছু কিছু সন্ধান মাঝে মাঝে দেয়। আমাদের এই ঢাকার প্রভিন্‌শীয়াল মিউজিয়ামে এরূপ অপঠিত শিলা-লিপি বর্ত্তমান। এই শিলা-লিপি-পঠন-বিদ্যা আমাদের দেশে একরূপ লুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

বিভিন্ন প্রাচীন হিন্দু মুসলমান বংশ হইতে ফরমান, নিশান সোক্কা ইত্যাদি সংগ্রহের কাজও আপনাদের একদলকে গ্রহণ করিতে হইবে। বাংলার বহু ধর্ম্ম-প্রচারকের ও আউলিয়া দরবেশের হস্তলিখিত জীবন-চরিত চেষ্টা করিলে ধ্বংসের কবল হইতে এখনও উদ্ধার করিতে পারিবেন। সার আর্ণল্ডের সুবিখ্যাত Preachings of Islamএ এই দুঃখ করা হইয়াছে যে, বাংলার ইসলাম-প্রচারকগণের জীবন-কাহিনী খুব কমই সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে। একটী বড় দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের প্রাচ্য-বিদ্যার এম-এ'গণ শুধু মুদ্রিত পুস্তকই পড়িতে পারেন, হস্তলিখিত পুস্তক পড়িতে পারেন না। কিন্তু এই প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধার-ব্রত যাঁহারা গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের হস্ত-লিপি পাঠের দক্ষতা অর্জ্জন করা চাই।

বন্ধুগণ, বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে এক বর্ণহীন চিত্র আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। ইহাকে বিভিন্ন রাগ-রঞ্জন দ্বারা চিত্রিত করিয়া এক মোহন মূর্ত্তিতে পরিণত করা আপনাদের কাজ। এইরূপে পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় বাংলার গীতাদি সংগ্রহে ও উহা হইতে ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণে আপনাদিগকে চেষ্টিত হইতে হইবে। আপনারা জানেন, বর্ত্তমানে রাজপুতনার যে ইংরাজি ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, উহা স্থানীয় গীতাদি হইতেই সংগৃহীত। বাংলার গানে দোস্তগাজি, কালুগাজি, মনোয়ার খাঁ—ইত্যাদি নাম সুপরিচিত। এই সব গীত হইতে তাঁহাদের কর্ম্ম-জীবনের সন্ধান করিতে হইবে।

"রাত্রি ছোট আর কাহিনী দীর্ঘ"—এইবার অবসান করা যাক। আপনারা সর্ব্বান্তঃকরণে কাজে লাগুন—এই আমার কামনা। আমরা বৃদ্ধেরা কিছু করিতে পারি নাই। আপনাদের যুবকদের দায়িত্ব তাই অনেক বেশী। "আগার পেদর না তাওয়ানদ পেসর তামাম কুনদ"। আপনারা গৌরবান্বিত মুসলমান হউন—এই প্রার্থনা করি।

ابتو جاتے ھیں بتکدے سے میر
پھر ملینگے اگر خدا لایا

শুক-তারা

—সনেট—　　—সৈয়দ আফতাব হোসেন

ঘুম নাই আঁখি-পাতে কেটে যায় রাতি,
নিভে নিভে আসে ধীরে তারকার বাতি,
নিশি শেষে নভ-তলে জ্বলে শুক-তারা,
ব্যথা-হত অন্তরের মোর ব্যথা-হরা।
তারকার ম্লান শুভ্র আঁখি মুদে আসে,
মানসীর মৃত্যু-ম্লান মুখ মনে ভাসে;
পুঞ্জীভূত বেদনার তীব্র হুতাশন,
অন্তহীন ব্যথা ভরে দহে প্রাণ-মন।

পূবাকাশে শুক-তারা বিথারিয়া মায়া,
দগ্ধ-বুকে শান্তি-লেপ দেয় মাখাইয়া,
মৃত্যু-যবনিকা ভেদি মানসীর ছায়া,
সান্ত্বনার ছলে যেন ধরে পুনঃ কায়া।
আঁধার মানস-গেহে জ্বলে ফের বাতি,
ওই শুভ্র মুখ চাহি' যাপি শেষ রাতি।

মাহ্মুদাবাদের মহারাজা

— জীবনী —

—মোহ্ছেন উদ্দীন আহ্মদ

বর্ত্তমান সংখ্যা "মাসিক মোহাম্মদীতে" প্রথমে যাঁহার চিত্র প্রকাশ করিয়া তাঁহার সুমধুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির কুসুমাঞ্জলী অর্পণ করিলাম, তিনি মাহ্মুদাবাদের পরলোকগত মহারাজ খান বাহাদুর স্যার মোহাম্মদ আলী মোহাম্মদ খাঁ, কে-সি-এস-আই, কে-সি-আই-ই।

গত ২৩শে মে প্রত্যুষে ৫৩ বৎসর বয়সে লক্ষ্নৌ শহরে মহারাজ পরলোক গমন করিয়াছেন। এই নিদারুণ সংবাদে আসমুদ্র-হিমাচল শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। মাত্র গত ছয় মাসের মধ্যে দুঃখিনী ভারতমাতা তাঁহার পাঁচজন কৃতী-সন্তান হারাইলেন। ক্ষণ-জন্মা পুরুষ মোহাম্মদ আলী, পণ্ডিত মতিলাল এবং শাহ মোহাম্মদ জোবেরের শোকের ক্ষত ভারতবাসীর বুক হইতে মুছিয়া যাইতে না যাইতে আবার সংবাদ আসিল,—মাহ্মুদাবাদের মহারাজ আর ইহজগতে নাই। শাহ্ মোহাম্মদ বদিউল আলমও ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। শোকের উপর শোক—আগুনের উপর ঘৃতের ছিটা। এই মহাশোকে সান্ত্বনা দিবার মত কিংবা পাইবার মত ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাই না।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ আলী মোহাম্মদ খাঁ মাহ্মুদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। ধনীর সন্তান-সন্ততি স্বভাবতঃ বিলাসী হইয়া থাকেন, কিন্তু খাঁ সাহেব বিরাট ধনীর সন্তান হইলেও এই পাপ জীবনে তাঁহাকে কোনদিন স্পর্শ করিতে পারে নাই। উত্তরকালে তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদের প্রতি যাঁহারা নজর করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের উপরোক্ত কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। চিত্তের ঐশ্বর্য্য যাঁহার যত বেশী, দেহের ঐশ্বর্য্য তাঁহার তত কম। মহারাজের সমস্ত জীবনেই আমরা এই দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করি।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তথাকথিত উচ্চশিক্ষা কিংবা ডিগ্রী লাভ করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই বটে, কিন্তু প্রকৃতির চিরোন্মুক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া তিনি যে জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের লব্ধ কোন জ্ঞান উহার সহিত তুলিত হইতে পারে কি? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী তাঁহার ছিল না, অথচ তিনিই এক সময়ে আলীগড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ণধার এবং লক্ষ্নৌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। এই ব্যাপারেই পাঠকগণ তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের পরিচয় পাইবেন।

মহারাজের হৃদয়ের বল ছিল অপরিসীম। নাতিদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবনের কোথায়ও তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। তিনি নিজে যাহা সত্য বুঝিতেন, ন্যায় বুঝিতেন, সমস্ত জগৎ বিরুদ্ধবাদী হইলেও নির্ভয়-চিত্তে তাহা প্রচার করিতেন। জীবনের বহু ক্ষেত্রে তিনি ইহার পরিচয় দিয়াছেন।

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ উপলক্ষে ভারতবর্ষে মুক্তির প্রথম স্পৃহা জন্মে। স্যার সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কংগ্রেস ও স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সমাজ হিসাবে মুছলমান ইহাতে যোগদান করেন নাই। তখন যে মুষ্টিমেয় দূরদর্শী ও চিন্তাশীল মুছলমান সসাহসে ইহার ব্যতিক্রম করেন, মাহ্মুদাবাদের মহারাজ ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। তিনি স্যার সুরেন্দ্রনাথের প্রধান সহকর্ম্মী ছিলেন। তিনি হিন্দু-মোছলেম মিলনের প্রতীক ছিলেন। ১৯১৬ সালে লক্ষ্নৌ শহরে লীগ ও কংগ্রেসের অধিবেশন এবং হিন্দু-মোছলেম চুক্তি মহারাজের যত্নের অভাবে কোন মতেই সম্ভব হইত না এবং পূর্ণ স্বেচ্ছাচারমূলক absolute শাসন পূর্ব্ববৎ বজায় থাকিত, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

মহারাজ ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র-সচিব এবং শাসন-পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। তারপর তিনি লক্ষ্নৌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুস্তক-সংগ্রহ-কমিটির সেক্রেটারী, নিখিল-ভারত শিক্ষা-সম্মেলনের

সভাপতি, মুসলিম বিদ্যালয় সমিতির সভাপতি এবং আলীগড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন এবং নিখিল-ভারত মোছলেম লীগের দুইটী সমস্যা-সঙ্কুল অধিবেশনের সভাপতিত্ব করিয়াছেন।

ভাবী শাসন-সংস্কার উপলক্ষে তিনি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন এবং যে-দৃঢ়তা ও সৎ-সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার জন্য ভারতবর্ষ চিরকাল তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে। মুছলমান রাজনীতিকদিগের মতভেদ দূর করিয়া ইনি হিন্দু-মোছলেম সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। সর্ব্বদল সম্মিলনের লক্ষ্ণৌ অধিবেশন তাঁহারই যত্নে সফল হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইনি হিন্দু-মোছলেম সমস্যা সমাধানের মুখ্য উদ্দেশ্যে ১৯২৮ সালের নিখিল-ভারত মোছলেম লীগের সভাপতিত্ব করেন।

মহারাজকে গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ঐ সময়ে তিনি অসুস্থ ছিলেন বলিয়া ঐ আমন্ত্রণ তাঁহাকে অস্বীকার করিতে হইল। তবে কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান না করাতে ঐ বৈঠকে যে কোনই কাজ হইবে না—একথা তিনি বিশ্বাস করিতেন।

মাহ্‌মুদাবাদের মহারাজা অযোধ্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারী এবং বিপুল ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি জীবনে এই ধনের সদ্ব্যবহারও করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দান ও অতিথি-পরায়ণতার দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান ভারতে বিরল। ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌএ কংগ্রেস ও লীগের স্মরণীয় অধিবেশন উপলক্ষে তিনি অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার অর্থ-সাহায্য ব্যতীত সেবারকার অধিবেশন আদৌ সম্ভব হইত না। তিনি প্রচুর অর্থ তাঁহার রাজনৈতিক মত প্রচারের জন্য ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। অসংখ্য নির্য্যাতিত রাজনীতিককে তিনি মুক্তহস্তে সাহায্য করিয়াছেন। ইনি আলিগড় কলেজে বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য ৩৫ হাজার এবং লক্ষ্ণৌ মেডিকেল কলেজের জন্য এক-কালীন ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

মহারাজের চরিত্র-মাধুর্য্যের বহু দিক আছে। আমাদের নিকট যে দিক্‌টা বিশেষ মধুর ছিল, তাহা তাঁহার সদাচার, ন্যায়-নিষ্ঠা, সদালাপ এবং অমায়িক ব্যবহার। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র দেশ একজন মহান্‌নেতা এবং একজন মহান্ দেশ-প্রেমিক হারাইল।

বর্ত্তমানে মহারাজার চারিপুত্র এবং দুই কন্যা জীবিত আছেন। আমরা মহারাজের পরলোকগত আত্মার কল্যাণ ও শান্তি কামনা করিয়া তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে হৃদয়ের গভীর সহানুভূতি জানাইতেছি।

চপল চারণ

—আবদুল কাদির

আজিকে সহসা স্বপ্ন-বিবশা
　　শিঞ্জিনী যেন শুনি—
ফাল্গুন-রাতে ফুল-মালা হাতে
　　এল কি রে ফাল্গুনী!
বন-বাঁকে কবে চপল চারণ
ঘুমে ফেলে' মোরে গেল অকারণ,—
আজি তার বীণা মানে না বারণ
　　সঙ্গীত সুরধুনী—
তাই জাগাবারে এল সে আমারে
　　বিস্মৃতি-জাল বুনি'!

কতবার যে সে এ জীবনে এসে'
খেলিয়াছে লুকোচুরি—
সুরের সুরায় স্নায়ুতে শিরায়
অগ্নি দিয়াছে পূরি' !
আন্‌মনে মোর বাতায়ন খুলি'
চকিতে চেয়েছে দু'নয়ন তুলি',—
উঠেছে এ মনে অকারণে দুলি'
স্বপনের ফুল-ঝুরি—
কত না বেদন গোপন চেতন
কুঁড়ি-সম অঙ্কুরি' !

ক্ষণে-ক্ষণে আসি' করেছে উদাসী
উত্তরী-ঈশারায়—
আঁচল বিছায়ে নিকুঞ্জ-ছায়ে
বসিয়াছে গায় গায়।
লীলা-ছলে ল'য়ে মোর অঙ্গুলি
তার বীণা-তারে দিয়েছে সে তুলি'—
মম ঝঙ্কার শুনিয়াছে ভুলি'
নির্জ্জন সন্ধ্যায় ;—
তাহার গীতিকা মোর সুর-শিখা
দুলিয়াছে মলয়ায়।

তেমনি কি হ'বে আজি উৎসবে
সুরে সুরে মালা গাঁথা—
গোধূলির ভাঙ্গা কল্পনা-রাঙা
গানের নেশায় মাতা' !
তেমনি ঘনাবে সুরে সমারোহ
অস্ত-আকাশে ভিড় করি' মোহ—
তেমনি কি হ'বে হৃদয়ের লোহ
অঞ্জলি করি' পাতা' !
ক্ষণিকের লাগি' দোঁহে কি বিবাগী
গাহিব মরণ-গাঁথা !

গণশক্তির জাগরণ

— প্রবন্ধ —

—শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী

রাজনীতি লইয়া যাঁহারা মাথা ঘামান, বিংশ শতাব্দী তাঁহাদের মতে গণতন্ত্রের যুগ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী-দার্শনিক রুসো প্রচার করিয়াছিলেন,—"মানুষ ক্রমেই এথেন্সের নজির দেখাইয়া তাঁহাদের মতের সত্যতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু এথেন্সে কোন-কালেই সত্যিকার গণতন্ত্র বলিয়া কিছু আত্ম-প্রকাশ করে নাই।

মুসোলিনী

গণতন্ত্র হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে।" ইহার কোন মতই সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য নহে। রুসো মতবাদীরা রুসো ছিলেন অতীতবাদী। অতীতের সমস্তই কল্পনার রঙে রাঙা হইয়া তাঁহার মানস-নেত্রের সন্নিধানে

আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল। আর আজিকার দিনের রাজনীতিকেরা বর্ত্তমান-বাদী ; পেছন-দিকে ফিরিয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া মরিতে তাঁহারা রাজি নহেন। আমাদের মতে

লেনিন

বর্ত্তমানকে আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিয়া অতীতকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়ার ভিতরে যতখানি ভুল আছে, আবার অতীতকে আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিয়া বর্ত্তমানকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়ার ভিতরেও ঠিক ততখানি ভুল আছে।

হিন্দু ঐতিহাসিকগণের কেহ কেহ রুসো-মতবাদের প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন,—"প্রাচীন হিন্দু-রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসন বিদ্যমান ছিল। বৈদিক-যুগের হিন্দুগণ বর্ত্তমান যুগ অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা—গণতন্ত্রের এই তিন মূলমন্ত্র ভোগ করিতেন। কিন্তু পরবর্ত্তী-যুগে ভগবানের বিরাট অভিসম্পাত স্বরূপ ব্রাহ্মণের প্রাধান্য হিন্দুর ধর্ম্মে, সাহিত্যে, রাষ্ট্রে এবং সমাজে এমন এক বিশ্রী স্বেচ্ছাচারিতার আমদানি করিল, যাহা জগতের ইতিহাসে হিন্দু-অধ্যায়টাকে চিরকালের জন্য কলঙ্ক-কালিমায় ছোপাইয়া রাখিয়াছে।"

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদকেই গণতন্ত্রের আদি প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই মতের অনুকূলে জগতের কয়েকজন মনীষীর অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

বস্‌ওয়ার্থ স্মিথ বলেন,—"সমগ্র পৃথিবী খৃষ্ট-ধর্ম্ম অপেক্ষা ইস্‌লামের দ্বারা অধিকতর উপকৃত হইয়াছে। মোহাম্মদকে যদি হেজরতের পূর্ব্বেই কোরেশগণ নিহত করিত, তাহা হইলে আজ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-জগৎ অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকিত। তিনি যদি প্রেরিত না হইতেন, তবে জগৎ গণতন্ত্রের রসাস্বাদন করিতে পারিত না।"

মিঃ ওল্‌কাকাস্‌ বলেন,—"ইস্‌লামী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য মোহাম্মদের নাম চিরকাল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত অক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে।"

মিঃ এল্‌. লিনকোল্‌ন গ্লিক বলেন —"আধুনিক শাসন-প্রণালীর বহুবিধ বিষয়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রবাদ প্রবর্ত্তনই হইতেছে চরম উন্নতির অবস্থা। ইতিহাসের যদি কোন মূল্য থাকে, তবে সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে—ইস্‌লামই ইহার পথ-প্রদর্শক।"

ডাঃ হুগো মার্ক্‌ইস বলেন,—"হজরত মোহাম্মদই প্রথম গণতন্ত্রবাদী নবী, ইহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।"

সুলতান আবদুল হামিদ

মহাত্মা গান্ধী বলেন,—"যখন পাশ্চাত্য জগৎ অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, তখন প্রাচ্য-খণ্ডে এক জ্বলন্ত ভাস্কর উদিত হইয়াছিল। উহা নিপীড়িত ধ্বংসোন্মুখ জগতে

শান্তিধারা প্রবাহিত করিয়া নিখিল-বিশ্ব আলোকোদ্ভাসিত করে। ইস্‌লাম সত্য-ধর্ম্ম, ইস্‌লামই সর্ব্ব-প্রথম জগতকে সাম্য-মৈত্রী-ভ্রাতৃত্বের মহামন্ত্রে দীক্ষিত করে।"

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বলেন,—"বিশ্ব-প্রভু এক উষ্ট্র-স্বামীকে স্বীয় তত্ত্ববাহকরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মের শিক্ষাকে গণতন্ত্রবাদের মূল প্রস্রবণ বলা যায়। যুগের আবশ্যকতা হিসাবে ইস্‌লামের শিক্ষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল।"

হিন্দু ঐতিহাসিকগণের মতবাদ অনেকটা যুক্তি-তর্কের বহিভূ'ত; কারণ যে জাতির ইতিহাস নাই, সে জাতির ইতিবৃত্ত রূপ-কথার মত শ্রুতি-সুখাবহ হয় বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে বিশ্বাস করিবার উপাদান খুব কমই পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে যে সকল মনীষী গণতন্ত্রের পরিকল্পনা করিয়া জগতের ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছেন, হজরত মোহাম্মদ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু তাঁহার সময়ে যে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, এমন কোন প্রমাণ ইতিহাস আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারে না। আমরা বলিতে চাই,

সুলতান আবদুল মজিদ

প্রকৃত গণতন্ত্র অতীতেও ছিল না, আর আজও নাই। উহা কবি এবং ভাবুকের স্বপ্ন-রাজ্যেই বিচরণ করিতেছে।

বর্ত্তমান রাজনীতিকেরা জার্ম্মাণী ফ্রান্স, রুশিয়া, আমে

আমানুল্লাহ্

রিকা, চীন প্রভৃতি দেশের নজির টানিয়া বিংশ শতাব্দী যে গণতন্ত্রের যুগ—ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু ইহার কোথাও আজ পর্য্যন্ত সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। জার্ম্মাণীতে যে প্রতিনিধি-মূলক গণতন্ত্র চলিতেছে, তাহা প্রকৃত গণতন্ত্র নয়। কারণ সাধারণ লোকের শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই। সিংহাসন-চ্যুত জার্ম্মাণ সম্রাট বলেন,—"জার্ম্মাণীতে গণতন্ত্র-মূলক শাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে।" ফ্রান্সে অর্থ-নৈতিক কারণে প্রেসিডেণ্টকে ডিক্টেটারের সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। রুশিয়ার বলশেভিকবাদ গণতন্ত্রবাদের অনেকটা কাছাকাছি হইলেও সেখানে শ্রমিকের অসংযত স্বৈরশাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশগুলির উপর আমেরিকা যে নীতি চালাইতেছেন, তাহা আদতেই গণতন্ত্র-মূলক নীতি নয়। সান প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রও সত্যিকার গণতন্ত্রের ছায়া মাত্র, কায়া নহে। এইরূপে একটু-একটু করিয়া বর্ত্তমান জগতকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা কোথাও প্রকৃত গণতন্ত্রের উপাদান খুঁজিয়া পাই না। সুতরাং বিংশ শতাব্দীকে যাঁহারা গণতন্ত্রের যুগ বলেন—আমাদের মতে তাঁহারা কতকটা ভ্রান্ত।

যে গণতন্ত্র অপরের স্বাধীনতাকে সম্মান করে, জাতিতে জাতিতে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হয়, তাহাই প্রকৃত গণতন্ত্র। সাম্রাজ্যবাদ ও গণতন্ত্রে কোন দিনই সামঞ্জস্য হইতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদের অর্থ গণতন্ত্রকে অধিকার করা—সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের মূলে কুঠারাঘাত করা। যে গণতন্ত্র প্রতিবেশী জাতির স্বাধীনতা সহ্য করিতে পারে না, তাহা গণতন্ত্র নামের কলঙ্ক। স্বৈর-শাসন একজনেই করুক, কিংবা গণ-শক্তিতেই করুক, তাহা সব সময়ে স্বৈর শাসন নামেই অভিহিত হইবে। আজকাল-কার তথাকথিত গণতন্ত্র গণশক্তির হাতের স্বৈর-শাসন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

রাজনীতিকেরা বলেন,—শাসন-তন্ত্র একটা নিয়ম মানিয়া চলে। ডিমোক্রেসীর (democracy) পর অলিগার্কী (oligarchi), অলিগার্কীর পর টিরেণী (tyrany), টিরেণীর পর মনার্কী (monarchy) অথবা রাজতন্ত্র। এই রাজ-তন্ত্রের ধ্বংস-স্তূপের উপরেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

বেগম সুরাইয়া

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকারের শাসন-তন্ত্র এখনও বাঁচিয়া আছে; সুতরাং গণতন্ত্র যে আজও প্রতি-ষ্ঠিত হয় নাই, ইহা বলাই বাহুল্য।

লেনিনের বলশেভিক নীতিকে না হয় প্রকৃত গণতন্ত্র বলিয়া মানিয়া লইলাম ; কিন্তু মুসোলিনীর ফ্যাসিইজম্ এবং প্রাইমো ডি রিভেরার ডিক্‌টেটর বাদ গণতন্ত্র তো

ফার্ডিন্যাণ্ড্

নয়ই, বরং উহার বিপরীত কোন কিছু। কৃষকদের সাহায্যে মুসোলিনী ইটালীর বুকে নিজের প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আজ এতদূর ক্ষমতাপন্ন হইতে পারিয়াছেন। বুকভরা দরদ লইয়া যে মুসোলিনী একদিন ইটালির কৃষকদিগকে বলিয়াছিলেন,—"ওগো, তোমরাই দেশের প্রকৃত মালিক" ইত্যাদি। কিন্তু আজ সেই মুসোলিনীর অত্যাচারে, পীড়নে ইটালির কৃষক জর্জ্জরিত ও নিঃস্ব।

আজ-কালকার তথাকথিত গণতন্ত্র রাষ্ট্রে এইরূপ মুসোলিনীর অভাব নাই। মুসোলিনী বলেন,—"মানুষ আজ এক নূতন দেবতার সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার নাম গণ মানব। আমি তাহার উপাসক নই। বাধ্যতা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বাধাহীন স্বাধীনতার কথা যাহারা আওড়ায়, তাহারা নিশ্চয়ই স্বপ্ন রাজ্যের লোক। বাধাহীন পূর্ণ স্বাধীনতা কখনও সম্ভব নয়।" মুসোলিনীর এই মতবাদ স্বেচ্ছাচারবাদের নামান্তর মাত্র।

বিগত মহাসমরের ফলে সমগ্র ইউরোপের বুকের উপর দিয়া অরাজকতা, দুর্ভিক্ষ এবং মৃত্যুর ঝড় বহিয়া গিয়াছে। সমরাবসানে শান্তি-প্রিয় লোকেরা মনে করিল, এবার সাম্রাজ্য-বাদীদের চোখ খুলিবে, তাহাদের সর্ব্বনাশী পররাজ্য লোলুপতা এবং রক্ত-পিপাসার নেশা এই বারে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইল কই? যুদ্ধের পরে ইউরোপের অবসন্ন জাতির উপরে নামিয়া আসিল ডিক্টেটর বাদ। একজনের ইচ্ছায় ও শাসনে দেশকে পরিচালনা করা এবং জন-মতের বিরুদ্ধ হইলেও নিজের ইচ্ছামত দেশকে গড়িয়া তোলা—ইহাই হইল ডিক্টেটর বাদ। প্রাইমো ডি রিভেরা সর্ব্বপ্রথমে এই নীতিতে স্পেনে তাঁহার সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। স্পেনবাসিগণ এই শাসনের বিরুদ্ধে বিরক্ত হইয়া উঠে এবং তাহার ফলে প্রাইমো ডি রিভেরার সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে হয়।

এইবার ফ্রান্স-গণতন্ত্রের কথা বলিব। এক-এক করিয়া ফ্রান্সে তিনবার গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। ওয়াটারলু যুদ্ধক্ষেত্রে মহাবীর নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর বিজয়ী শক্তিপুঞ্জ সগৌরবে প্যারিসে প্রবেশ করিয়া

জর্জ্জ

আপনাদের ইচ্ছামত সন্ধিশর্ত্ত প্রস্তুত করিলেন এবং পরাজিত ফ্রান্সকে তাহাই মানিয়া লইতে বাধ্য করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে তাঁহারা ফ্রান্স-গণতন্ত্রের মূল-ভিত্তি উৎপাটিত করিয়া পুনরায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

নিহত লুইএর ভ্রাতা ১৮শ লুই ফ্রান্সের রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। তৎপরে ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ ভিয়েনা নগরে মিলিত হইয়া Holy Alliance বা পবিত্র সম্মিলনী নামক

আল্‌ফোন্‌সো

এক নূতন সমিতি স্থাপন করিলেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য হইল—ইউরোপের মধ্যে যে-কোনরূপ প্রজা-বিদ্রোহ দমন করা।

ক্ষমতার মোহ মানুষকে ধীরে ধীরে স্বেচ্ছাচারিতার পথে টানিয়া লইয়া যায়। জগতের বহু মহাবীর গণতন্ত্রের নামে যুদ্ধ করিয়া যেমন জয়লাভ করিলেন ও ক্ষমতার মালিক হইলেন, অমনি পরম স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িলেন। উদাহরণ স্বরূপ জুলিয়াস্ সিজার, আগাস্টাস্, ক্রমওয়েল প্রভৃতি বীরগণের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। ফ্রান্সের ইতিহাসেও এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। প্রভুত্ব-স্পৃহা আর গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দুই বিভিন্নমুখী মনোবৃত্তি। এই দুইয়ের সামঞ্জস্য করা যায় না। ফ্রান্স গণতন্ত্রে এখনও এমন সব প্রভুত্বপ্রয়াসী ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা যে-কোন জিনিষের বিনিময়ে প্রভুত্বলাভ করিতে পারিলে ধন্য হন। সুতরাং কেমন করিয়া বলিব যে, ফ্রান্সে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে?

সত্যিকার গণতন্ত্র আজ পর্য্যন্ত কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বটে, কিন্তু সর্ব্বত্রই যে গণশক্তির উদ্বোধন আরম্ভ হইয়াছে—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চির-লাঞ্ছিতের জাগ্রত অভিমান স্বেচ্ছাচারিতার দুঃসহ আচরণ কখনই সহ্য করিতে পারে না, তাই দেশের সুপ্ত গণশক্তির জাগরণের ফলে বলদৃপ্ত স্বেচ্ছাচারিতার অবসান যে একদিন হইবেই, তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই। ইউরোপীয় মহাসমরের অব্যবহিত পরেই জার্ম্মাণী, রুশিয়া প্রভৃতি পর পর ১৮টি দেশ হইতে (সত্যিকার গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না হইলেও) রাজতন্ত্র-শাসন বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে সাম্যের আবহাওয়ায় মানুষের চিন্তাশক্তি একটু-একটু পরিচালিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। সুতরাং

রাণী ইনা

আশা করা যায়, মদগর্ব্বিতের অমানুষিক অত্যাচার ও রক্ত-চক্ষুকে গণশক্তি আর দীর্ঘকাল ভয় করিয়া চলিবে না।

বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে গণশক্তির উদ্বোধনের ফলে ১৮ জন রাজা তাঁহাদের সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা এখানে এই সিংহাসন-চ্যুত রাজাগণের একটা লিষ্ট দিতেছি

প্রথম প্রেসিডেণ্ট কামাল

১। স্পেনরাজ আলফোন্‌সো ২। পর্ত্তুগালরাজ ম্যানোয়েল ৩। জার্ম্মাণ সম্রাট উইলিয়ম ৪। গ্রীসের রাজা জর্জ্জ ৫। বুলগেরিয়ার রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড ৬। রুমানিয়ার রাজা ক্যারোল ৭। রুষ-সম্রাট সাইরল ৮। মক্কার রাজা হুসেন ৯। মিশরের রাজা আব্বাস হিল্‌মী ১০। আফগানিস্থানের রাজা আমানুল্লাহ্‌ ১০। পারস্যের রাজা আহমদ্‌ শাহ্‌ ১২। মন্টিনেগ্রোর রাজা নিকোলাস ১৩। গ্রীসের রাজা কনস্টেন্‌টিন ১৪। অষ্ট্রীয়ার রাজা কার্ল ১৫, ১৬। তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদ ও আবদুল মজিদ এবং জার্ম্মাণীর আরও দুইজন অখ্যাত রাজা।

এক জার্ম্মাণ সম্রাট উইলিয়াম ব্যতীত বাকী ১৭ জন রাজাই ইউরোপের নানাস্থানে অতি দীনভাবে দিন-যাপন করিতেছেন। অর্থ-নীতি বিশেষজ্ঞরা বলেন—"ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মাণ-সম্রাট উইলিয়াম ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ধনিগণের মধ্যে অন্যতম।" মহাযুদ্ধের পূর্ব্বের অপেক্ষা বর্ত্তমানে নাকি তাঁহার ধন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের ভূতপূর্ব্ব সুলতান আবদুল হামিদ খাঁ নব্য তুর্কীদের দ্বারা সিংহাসন-চ্যুত হন। সুবিখ্যাত কামাল পাশা বর্ত্তমানে তুর্কী সাধারণতন্ত্রের সভাপতি-পদে অধিষ্ঠিত আছেন। সুলতান আবদুল হামিদের ৩০ কোটি ৮ লক্ষ পাউণ্ডের সম্পত্তি বাজেয়াফ্‌ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার বারজন উত্তরাধিকারী ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে অত্যন্ত কষ্টের সহিত দিন-যাপন করিতেছেন।

গ্রীসের রাজা কনষ্টানটিন আট মাসের মধ্যে দুইবার সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রথমবার সিংহাসন-চ্যুতির পর যে সকল শর্ত্তে তিনি পুনরায় সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল শর্ত্ত পালন না করায় গণশক্তি পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং তাঁহাকে দ্বিতীয় বারের জন্যও সিংহাসন ত্যাগ করিতে হয়।

অষ্ট্রীয়ার রাজা কার্ল যখন সিংহাসন পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি এককোটি পাউণ্ড সঙ্গে লইয়া যান, কিন্তু ইহার শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টায় ব্যয়িত হইয়া যায়। ফলে রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা রাণী

ভূতপূর্ব্ব কাইজার

জিটা এবং ৮টি পুত্র-কন্যা অতিশয় অভাবে দিন কাটাইতেছিলেন। পরিশেষে তাঁহারা স্পেনের রাজা আলফোনসোর সাহায্য প্রাপ্ত হন।

পর্ত্তুগালের রাজা ম্যানোয়েল বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে বাস করিতেছেন। তাঁহার অভাব অভিযোগ অনেকটা কম। তবে তিনি ইচ্ছা করিয়াই দরিদ্রের মত চলা-ফেরা করেন।

জ্যামোরা

পারস্যের রাজা আহ্‌মদ শাহ্‌ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন-চ্যুত হইয়া গত বৎসর প্যারিসে দেহত্যাগ করিয়াছেন। জগতের শ্রেষ্ঠ আসন 'তখ্‌ত-এ তাউসে' উপবেশন করিয়াও যাঁহার সুকুমার তনু ব্যথিত হইত, তিনিই একখানা ভগ্ন চেয়ারে উপবেশন করিয়া নিজের দুঃখময় জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি দূর প্রবাসে কাটাইয়া দিয়াছেন; ইহাকে অদৃষ্টের বিচিত্র পরিহাস বই আর কি বলা যাইতে পারে?

স্পেনরাজ আলফোনসোর সিংহাসন ত্যাগে বেশ একটু বৈশিষ্ট্য আছে। অন্য কোন রাজার সিংহাসনচ্যুতি এমন নিরাপদে এবং নিরাতঙ্কে হয় নাই। গণতন্ত্রের সঙ্গে দীর্ঘ আট বৎসর লড়াই করিয়া রাজতন্ত্র বেশ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজতন্ত্র-বিরোধী জ্যামোরার সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইয়া রাজা বুঝিতে পারিলেন যে, বর্ত্তমান শাসন পদ্ধতিকে ধ্বংস করিয়া দেওয়াই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই তিনি আদেশ করিলেন, আগামী নির্ব্বাচনে গণতন্ত্রের জয় হইলে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিতে রাজি আছেন। অবশেষে গণতন্ত্রেরই জয় হইল। রাজা স্ত্রী-পুত্র সমভিব্যাহারে দেশ ছাড়িয়া প্যারিসে চলিয়া গেলেন।

এই যে এতগুলি রাজার ভাগ্য বিপর্য্যয় হইয়া গেল, তবু সাম্রাজ্য-বাদীদের চক্ষু খুলিল কি? ইউরোপের বুকের উপর এখনও সাম্রাজ্য-বাদের পূর্ণ-প্রভাব বিদ্যমান। এই প্রভাবের কবে অবসান হইবে তাহা কে বলিতে পারে? সমগ্র পৃথিবী ব্যথাদীর্ণ চিত্তে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের ত্রিবেণী-সঙ্গমে অবগাহন করিয়া তাহার জন্ম-জন্মার্জ্জিত ক্লেদরাশি হইতে বিমুক্ত হইতে ব্যগ্র-উৎফুল্ল। কে বলিয়া দিবে কত দূরে সে সুখের দিন তার!

ছেলে-খেলা

— গল্প —

—মতিন উদ্দিন আহমদ, বি-এল,

বিন্দুর পিতা আর রজনীর পিতা চাকরী-স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া সুনামগঞ্জে আসিয়া মিলিয়াছেন। বিন্দু ও রজনী উভয়েই এক ক্লাসে পড়িত এবং পাশাপাশি বাসা ছিল বলিয়া উভয় পরিবারে বেশ মাখামাখি ছিল। তাহারা যেবার মেট্রিক পরীক্ষা দিল, সেবার পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার আগেই বিন্দুর বাবা সুনামগঞ্জ হইতে বদলী হইলেন। মেট্রিক পাশ করিয়া রজনী সিলেট গিয়া মুরারীচাঁদ কলেজে ভর্ত্তি হইল, আর বিন্দু রাজসাহী কলেজে ভর্ত্তি হইল। সচরাচর যেমন হইয়া থাকে, বদলীর পরে মাস তিনেক উভয় পরিবারে চিঠি-পত্র চলিল, তারপরে সংখ্যা হ্রাস হইতে হইতে ছয় মাসের পর একেবারে বন্ধ হইয়া গেল, অথচ এর জন্য কোন পরিবারই দুঃখিত হইল না। নূতন আবেষ্টনের মধ্যে আপনাদের খাপ খাওয়াইয়া লইল। বিন্দু ও রজনী স্কুলের কঠোর শাসন-তন্ত্রের নিগড় ভাঙ্গিয়া কলেজ-জীবনের স্বাধীনতায় শীঘ্রই একে অন্যকে ভুলিয়া গেল।

দুই বছর পরে। বিন্দু ও রজনী উভয়ে আই-এ পাশ করিয়াছে। রজনীকে তাহার পিতা বি-এ পড়িতে কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়াছেন। রজনী প্রথম কলিকাতা আসিয়াই এই বিরাট সহর দেখিয়া মুসড়াইয়া পড়িয়াছিল, তার উপর কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার জন্য তদ্‌বির করা তাহার পক্ষে আরো কঠিন হইয়া উঠিল। একদিন সে সিটি কলেজের দিকে চলিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ তাহার পিছন দিক্ হইতে কে একজন তাহার ঘাড়ে জোরসে ধাক্কা দিল, রজনী ফিরিয়া দেখে ফুট্‌ফুটে চেহারার এক ষ্ট্যাণ্ডার্ড বাবু; মুহূর্ত্ত মাত্র ইতস্ততঃ করিয়াই চিনিতে পারিল. এই বাবুটি সুনামগঞ্জের সেই সাবেক বিন্দুর কলিকাতা-সংস্করণ। উচ্চ হাসি হাসিয়া বিন্দু বলিল—"কিরে রজনী, চিন্‌তে পাচ্ছিস্ নে বুঝি? তা তুই কবে এলি এখানে, আর উঠেছিস-ই বা কোথায়?" রজনী ঢোক গিলিয়া বলিল—"তোর যা পরিবর্ত্তন হয়েছে. চেনা বড় সহজ ব্যাপার নয়। যাক্, এসেছি পরশু, আর উঠেছি হ্যারিসন রোডে বাণী-মেসে ;- কিন্তু মুস্কিলে পড়েছি য়্যাড্‌মিশন নিয়ে।"

রজনী বলিল—"তুই এখানে কি কচ্ছিস আর আছিস্ কোথায়?"

বিন্দু বলিল—"সেই যে ম্যাট্রিক পাশ করে রাজসাহী গেলাম, তার পর হ'তেই শরীর প্রায়ই খারাপ হ'তে লাগলো। কোন রকমে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেই এখানে চলে এলাম। বাবার এক বন্ধু ব'লে-কয়ে সিটি কলেজে ভর্ত্তি করে দিলেন। এখানে আসার পর হ'তেই শরীর ভাল হ'য়ে গেল, ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ করে সিটিতেই হিষ্ট্রী অনার্স নিয়ে য়্যাড্‌মিশন নিয়েছি। এতদিন মেসে-ই থাক্‌তাম। মাস পাঁচ-ছয় হ'লো আমার ভাগ্নি-জামাই তাঁর বাসায় নিয়ে গিয়েছেন; অখিল মিস্ত্রির লেনে।"

রজনী বলিল—"তোর ভাগ্নি-জামাইটি আবার কে? আর এখানে করেন কি?"

বিন্দু বলিল—"আমার বড় দি'র মেয়ে বেণুকে তোর মনে আছে? সেই বেণুর বিয়ে হ'য়েছে ওর সঙ্গে। উনি সি-টি-ও-তে কাজ করেন। তাঁর আগের স্ত্রী মারা গেলে পর বেণুর সঙ্গে বছর দেড়েক হ'লো বিয়ে হয়েছে।

রজনী হাসিয়া বলিল—"ললিতাও আছেন না কি ?"

বিন্দু ধরা পড়িয়া বলিল—"একজন আছেন, তা'কে ললিতা বলা চলে কি সুচরিতা বলা চলে তা' তুই একদিন ওখানে গেলেই ঠিক করা যাবে।"

রজনী বলিল—"তার জন্য চিন্তা নাই এবং ভবিষ্যতও এত সংকীর্ণ হয়ে আসে নাই যে, ফুরসৎ পাওয়া যাবে না ; এখন য়্যাড্‌মিশনের ব্যবস্থা আগে করা যাক্।"

বিন্দু বেপরোয়া ভাবে বলিল—"তার জন্য ঘাবড়াচ্ছিস্ কেন ? সঙ্গে টাকা আছে ?"

রজনী বলিল—"হাঁ, যথা এবং সর্ব্বস্ব সর্ব্বদাই সঙ্গে করে বেড়াই।"

বিন্দু বলিল—"তবে চল্ এখ্খুনি হ'য়ে যাবে। ক্লার্ককে একটা 'জলপান' দিলেই হ'বে।"

"কি কম্বিনেসন নিবি ঠিক করেছিস্ ?"

রজনী বলিল—"হিষ্ট্রী-ইকনমিক্স নেব আর হিষ্ট্রীতে অনার্স। ওরে, বিদ্যা-মন্দিরেও কি 'জলপানের' রেওয়াজ আছে ?"

বিন্দু রজনীর পিঠে ফাঁকা আওয়াজের একটা চড় দিয়া বলিল—"ব্র্যাভো, তা' হ'লে দু'জনে একই কম্বিনেশন হ'বে। চল্ চল্—খাওয়াতে পারলে সব খানেই 'জলপান' চলেরে

বিন্দু যাহাকে 'ললিতা' বলিয়া পরিচয় দিতেছিল, তাহার নাম ইন্দু—বিন্দুর ভাগ্নি বেণুর সতীনের মেয়ে। ক্লাস নাইন পর্য্যন্ত স্কুলে মা-মারা যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে স্কুল ছাড়িয়া দিয়াছে ; তা' না হইলে তার আপন-ভোলা বাবার বড় কষ্ট হয়। বেণুর বিবাহের পর প্রায় সমান বয়সের এই মেয়েটিকে বেণু মায়ের চোখে না দেখিয়া সখীর চোখেই দেখিল এবং সহরের তীব্র আলোকের মধ্যে এই একটুকু স্নিগ্ধতা পাইয়া তাহাকে আর স্কুল যাইতে দিল না। তারপর তাহার 'মামা-বাবু' বিন্দু যখন তাহাদের বাসায় আসিল, তখন বিন্দুর কাছেই তাহার পড়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিল, যাহাতে সে প্রাইভেট ম্যাট্রিক দিতে পারে। বেণুর স্বামী একেই আপন-ভোলা লোক, তারপর যখন বিন্দুর মত চটপটে 'মামাবাবু' বাসায়, তখন আফিসের কাজ ছাড়া আর কিছুরই খোঁজ লইতেন না। বেণুর ঘাড়ে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছিল।

তাহারা ছোট একখানা দোতলা বাড়ী ভাড়া নিয়াছিলেন। নীচে বসিবার একখানা ঘর, ভাঁড়ার ও পাকঘর ; উপরে শোয়ার ঘর দুইটি এবং ছাদে ছোট একটা ঘর। বিন্দু ছাদের ঘরেই থাকিত। বেণুর নির্দ্দেশ মতে ইন্দু সকালে-সন্ধ্যায় দুই-বেলাই বিন্দুর কাছে পড়িত ; বিন্দু আসার পরে ইন্দু তাহার কাছে গিয়া পড়িতে প্রথম খুব-ই আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু বেণুর জিদে তাহার 'মামাবাবুর' কাছে লজ্জা করিবার কোন কারণই থাকিতে পারে না—অতএব সপ্তাহখানেক ওজর-আপত্তি, আর এক সপ্তাহ শুধু আপত্তি করিয়া ইন্দু এখন নিয়মমত বিন্দুর কাছে পড়া দেখিয়া লয়, এখন আর কোন সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা নাই।

ইন্দুর বয়স পনর-ষোল হইবে ; উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ভাসা-ভাসা চোখ দুইটী এবং সর্ব্বোপরি তাহার নিটোল স্বাস্থ্য সকল নারীর-ই কামনার বস্তু।

কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার দিনই বিন্দু রজনীকে তাহাদের বাসায় লইয়া আসিয়াছে। অনেক দিন পরে দেখিলেও বেণু রজনীকে দেখিবামাত্রই চিনিয়া ফেলিয়াছে। একবার তার মার সঙ্গে সুনামগঞ্জে গিয়া সে পুকুরে পড়িয়াছিল, তখন রজনী তাহাকে তুলিয়াছিল, পলকের মধ্যে সেই সব পুরাতন স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তার মায়ের কথা মনে পড়িল, তা'র মা রজনীকে আদরে সোহাগে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন—আজ তার মা বাঁচিয়া নাই। মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজকে সম্বরণ করিয়া বেণু বলিল—"রজনী মামা, তুমি!" আনন্দের আতিশয্যে আর কিছুই বলিতে পারিল না। রজনী বলিল—"হাঁ বেণু, রাস্তায় বিন্দুর কাছ থেকে তোমার খবর শুনলুম। নাছোড় বান্দার মত আমাকে সে পাকড়াও করে নিয়ে এসেছে। বেণু তুমি ত এই দু'বছরে অনেকখানি বড় হয়েছ।" বেণু একটু সলজ্জ হাসিয়া বলিল—"তা বড় হ'ব না কেন, দু' বছরে মানুষের কতখানি বদ্‌লে যায়। রজনী মামা, তুমি আমাকে "তুমি তুমি" করে বলছ কেন, আমি ত তোমার সেই বেণুই আছি।"

রজনী হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা তুই তবে আমার সেই বেণুই রইলি, তবে শুধু শুধু বেণু বলতে কেমন খারাপ শুনায়, তাই 'মা' জুড়ে দিয়ে তোকে আজ হ'তে বেণু-মা ডাক্‌ব।

আসন্ন-প্রসবা বেণু এই সম্বোধনে রাঙা হইয়া উঠিল—মাতৃত্বের গৌরবে। বিন্দু এতক্ষণে উপরে গিয়া ইন্দুকে ডাকিয়া আসিয়াছে। রজনী মুখ ফিরাইয়াই দেখিল—বিন্দুর পাশে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী ষোড়শী; তাহার রূপের ও অবয়বের ছটায় বিন্দুকে সত্যই বিন্দুতে পরিণত করিয়া মহিমময়ীর মত দাঁড়াইয়া। রজনী মুখ ফিরাইতেই বিন্দু বলিল—"ইন্দু, এই রজনী—এর কথা তোমাকে অনেক দিন বলেছি। আমার সম্পর্কে ওকেও তুমি দাদাবাবু বলে ডেকো।" তার পর রজনীকে বলিল—"ওহে, ইনিই ললিতা, বনামে ইন্দু।"

ইন্দু রজনীকে নমস্কার করিলে, রজনী বলিল—"দাদাবাবু আমার ভাল লাগে না, আমাকে তুমি দাদা বলেই ডেকো, আজ হ'তে তুমি হ'লে আমার ছোট বোন। এই পাগলাটা পথের মাঝখানে তোমার কথা আমাকে সব বলেছে।"

ইন্দু এতক্ষণে প্রথম মুখ খুলিল। বিন্দু ও ইন্দু দেখা দিতেই বেণু রজনী মামার জন্য জলখাবারের জোগাড় করিতে সরিয়া পড়িয়াছিল। ইহারা তিনজনে বসিবার ঘর দখল করিয়া বসিল। ইন্দু বলিল—"আমার কি বদনাম গাওয়া হয়েছে শুনি ?"

বিন্দু থিয়েটারী ঢঙ্গে বলিল—"তোমার যা বর্ণনা আমি আজ রজনীর কাছে করেছি, নারীর এমন মহিমা কীর্ত্তন শুনা কল্‌কাতার ফুটপাতের ভাগ্যে কোন দিন ঘটেনি, এবং রজনী যদি কবি হ'তো তা' হ'লে আজ মস্ত একখানা কাব্যের খোরাক জোগাড় কর্‌তে পারত।"

ইন্দুর গাল ও কাণ লাল হইয়া উঠিল।

রজনী মেসে থাকে, তবে প্রায়ই বেণুর বাসায় যায়। বেণু ইদানীং বড় সময় পায় না রজনীদের সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতে। বয়স কম হইলেও সংসারের দায়ীত্ব তাহাকে বয়সের অনুপাতে বেশী গম্ভীর ও গৃহিণী করিয়া ফেলিয়াছিল। স্বভাবতঃই সে কম কথা বলে; তার উপর কাজের চাপে তাহার চাপা স্বভাব আরো বেশী বাড়িয়া গিয়াছিল। তেতলার ছোট ঘরটিতে সারাদিন বিন্দু আর ইন্দুতে কি গল্প করে, বিন্দু তাহা খেয়াল-ই করিত না। মাস তিনেক হইল তাহার একটি ছেলে হইয়াছে; সুতরাং এখন আরো নূতন করিয়া কাজ বাড়িয়াছে। বেণু এখন আর বড় তেতলায় যায় না; যদি না বিশেষ প্রয়োজনে ইন্দুকে ডাকিয়া আনিবার দরকার হয়।

রজনীও বেণুর বাড়ীতে আসিলে সটান উপরে চলিয়া যায় এবং প্রায় প্রত্যহই বিন্দু ও ইন্দুকে সেখানে পায়। রজনীকে দেখিয়া ইন্দু কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং কোন না কোন একটা অছিলা করিয়া নীচে চলিয়া আসে। বিন্দু আজকাল বিকালে বাহির হওয়া একবারে ছাড়িয়া দিয়াছে এবং কলেজে শেষের ঘণ্টায় প্রায়ই রজনীর উপর প্রক্সি দিবার ভার দিয়া বাড়ী চলিয়া আসে।

রজনী একদিন বিন্দুর ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। ইন্দু কিছুক্ষণ পরে নীচে নামিয়া গেল। রজনী তখন বলিল—"দেখ বিন্দু, তুমি বেশী বাড়াবাড়ি সুরু করেছ। এই যে ইন্দুকে নিয়ে তুমি যে ভাবে মেতেছ, তা'র শেষ ফল কি হবে ভেবে দেখেছ ? কেন মিছামিছি এই অবোধ মেয়েটির সর্ব্বনাশ কর্চ্ছ ?"

বিন্দু দেখিল—রজনীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, সুতরাং খোলাখুলি ভাবে সব বলিয়া ফেলা ভাল। বলিল—"রজনী তুমি আমার একমাত্র বন্ধু, তোমার কাছে কিছুই গোপন করব না। ইন্দুকে আমি বিয়ে করব; ইন্দুকে না পেলে আমার জীবন মরুভূমি হ'য়ে যাবে; সত্যি বলছি—আমি ইন্দুকে না পেলে আত্মহত্যা করব।"

রজনী অবিচলিত স্বরে বলিল—"তা'তে কোন আপত্তি নাই, তুমি বিয়ে করতে পার, কিন্তু ইন্দুর কি তা'তে মত আছে—তা' কি তা'কে জিজ্ঞেস করেছ ?"

বিন্দু বলিল—"না খোলাখুলি ভাবে জিজ্ঞেস করি নাই, তবে তার হাব-ভাবে বুঝেছি, তার অমত হ'বে না।"

রজনী কথার লাইন বদলাইয়া বলিল—"তুমি ও ইন্দু ছাড়া তোমার বাপ মা, ইন্দুর বাপ, এদেরও মত হ'বে কিনা সেটাও ভেবে দেখতে হ'বে। ধর ইন্দুর মত হওয়া সত্ত্বেও যদি তোমার বাপ মা বা ইন্দুর বাপের মতে বিয়ে না হয় তবে ?"

বিন্দু চুপ করিয়া রহিল। রজনী কিছুক্ষণ পরে আবার বলিল—"তুমি যে বল্‌লে—ইন্দুর হাব-ভাবে টের পেয়েছ তার মত আছে, সে কি রকম ?"

বিন্দু বলিল—"একদিন কথায় কথায় সে আমাকে

প্রশ্ন করেছিল—আমি কি রকম মেয়ে বিয়ে করতে চাই, আমি দুষ্টুমী করে আমার মানসীর এমন বর্ণনা করলাম যে, সেই বর্ণনা দিয়ে হুলিয়া জারী করলে পুলিস ইন্দু ছাড়া আর কাউকে ধরতে পারত না; আমার জবাব শুনে সে হেসে বলেছিল যে, আমার দুষ্টুমী সে বুঝতে পেরেছে। তারপর আমি তা'কে জিজ্ঞেস করলাম—সে কি রকম বর চায়; তার উত্তরে সে আমারই নামহীন পরিচয় গেয়ে গেল; তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই হেসে উঠলাম। এইরকম আরো কত কথায় কত কাজে সে তার মনের কথা প্রকাশ করেছে।"

রজনী চুপ করিয়া এতক্ষণ শুনিয়া যাইতেছিল। বিন্দুর কথা শেষ হইলে পর বলিল—"দেখ, যা'ই বল, আমার যেন মনে হচ্ছে তোমার বাপের এই বিয়েতে মত হ'বে না, শেষে কি জানি কি হ'য়ে বসে। তুমি পুরুষ মানুষ, দু'দিনেই তোমার এ ঘা শুকিয়ে যাবে কিন্তু ইন্দু নারী—তার মনের কোণে যদি এতটুকুও দাগ তুমি বসিয়ে থাক, তবে তা কখনো মুছিয়ে ফেলতে পারবে না সে। তারপর যদি কলঙ্কের ডালি তুমি তার উপর তুলে দেও—"

বাধা দিয়া বিন্দু বলিল—"তুমি কি বলছ রজনী? আমি ইন্দুকে না পেলে মরে যাব। চাই না বাপ মা, তারা যদি মত না দেন, আমি তা'দের অমতেই ইন্দুকে বিয়ে করব।"

রজনী বলিল—"মাথা গরম করে লাভ কিছুই হবে না। ভাবের আতিশয্যে বিবেচনাকে চাপা দিলে শেষে পস্তাতে হবে। তুমি যত শীগ্‌গির পার ইন্দুর মত জেনে আমাকে বলো, তারপর তোমার বাপের মত লওয়ার চেষ্টা আমি করব।

রজনী বিকালে বেড়াইতে গিয়াছিল। সন্ধ্যার পরে মেসে ফিরিয়া দেখে বিন্দু তাহার ঘরের সামনের বারান্দায় জুতার মচ্‌ মচ্‌ শব্দ করিতে করিতে জোরে পায়চারী করিতেছে। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হইল যেন—সে ট্রেজারীর সেন্ট্রালী কাজ করিতেছে, মেসের অন্যান্য ছেলেদের যে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে, সে দিকে তা'র খেয়ালই নাই। রজনীকে দেখিবামাত্র তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে এক কোণায় একটু নিরিবিলি যায়গায় টানিয়া লইয়া গেল। তাহার মুখের অবস্থা দেখিয়া রজনীর মনে হইল—সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটিয়াছে। নিরিবিলি যায়গায় পৌঁছিয়াই বিন্দু তাহার শার্টের ওয়াচ পকেট হইতে সন্তর্পণে ছোট এক টুকরা কাগজ রজনীর হাতে দিতে দিতে কহিল,—

"আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, ইন্দু আমাকে চায় না—রজনী আমি আত্মহত্যা করব।"

বারান্দার স্বল্পালোকে রজনী সেই কাগজ টুকরার লেখা পড়িয়া হাসিয়া উঠিল। বিন্দু বলিল—"একি রজনী, আমার এ বিপদে তুমি খুসী হ'য়েছ? তোমার মত বন্ধু—"

রজনী ধমক দিয়া বলিল—"চুপ্‌ কর্‌ রাস্কেল, তুই চিঠির মানে ঠিক উল্টা বুঝেছিস্‌। এই 'না' অর্থ হচ্ছে 'হাঁ'। জানিস্‌ ত নারীর বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না, কিন্তু সে ছিল আগেকার কথা, এখন কালি-কলমের কৃপায়, মুখ না ফুটলেও হাত চলে। বুক ফেটে যাচ্ছে অথচ মুখ ফোটান যায় না, তাই ত এই চিঠি লিখেছে। আচ্ছা তুই এ চিঠি পেলি কি করে?"

বিন্দু বলিল—"বিকালে 'মডার্ণ ইউরোপ' পড়ছিলাম; একবার মাঝখানে উঠে নীচে পায়খানায় গিয়েছিলুম, তখন দেখতে পেলুম যে, বেণুর কাছে বসে গল্প কচ্ছে, পায়খানা থেকে ফেরবার সময়েও দেখলুম—সে ঠিক একি যায়গায় বসে রয়েছে। উপরে এসে দেখি বইখানা বন্ধ অথচ আমার বেশ মনে ছিল, যাওয়ার সময়ে আমি ইচ্ছা করেই খোলা রেখে গেছি। হাতে নিয়া দেখতেই চোখ পড়ল এই চিঠির উপর, ওটা দিয়া বুক মার্ক করে রেখে গেছে। পড়েই আমার চক্ষু-স্থির, তারপর তোমার ওখানে ছু'টে এলুম, এসে দেখি তুমি লাট সাহেবের মতন হাওয়া খেতে চলে গেছ, সেই অবধি তোমার অপেক্ষায় বসে আছি।"

রজনী বলিল—"দেখ বোকারাম, যা বলেছি তাই। ও আর সহ্য করতে না পেরে নিজকে তোর সাম্‌নে ধরে দিয়েছ; তা' না হ'লে এই অবসর খুজে, ঠিক 'মডার্ণ ইউরোপ' খানার ভিতরে ঐ চিঠি দিয়ে বুক মার্ক করবে কেন? যা'তে আর কারো হাতে না পড়ে এবং শীগ্‌গির তোর হাতে পড়ে, এই জন্যই এই ভাবে চিঠিখানা রেখে গেছে। আচ্ছা তুই এখন যা, কাল একবার এসে আমাকে খবর দিস্‌। এই নিয়ে যা তোর চিঠি। —দাঁড়া আর একবার পড়ে নেই—" রজনী পড়িতে লাগিল—

"ভগবান, আমি বুঝিতেছি আমার দাদাবাবু আমাকে

বিয়ে করিতে ইচ্ছুক, আমি তার উপযুক্ত নই। দাদাবাবু ইচ্ছা করিলেই আমার চেয়ে শতগুণে ভাল স্ত্রী পাইবেন। ভগবান, তুমি দাদাবাবুকে সুমতি দাও, তিনি যেন আমাকে না চাহিয়া ভাল মেয়ের খোঁজ করেন। ইন্দু।" ঠিকানা লিখিয়াছে—"শ্রীশ্রীভগবান পোঃ আঃ স্বর্গ।" রজনী জোরে হাসিয়া উঠিল; তারপর চিঠিখানা বিন্দুর হাতে দিয়া বলিল, "হ্যাঁ রে স্বর্গ কি আজকাল মডার্ণ ইউরোপের ভেতরে এই কথাটা একবার ইন্দুকে জিজ্ঞেস করে দেখিস্ দিকিন।"

বিন্দু আসিয়া সুইচ টিপিয়া দিয়া "মডার্ণ ইউরোপ" খুলিয়া বসিয়াছে। বই শুধু খোলাই আছে, মন তখন চড়িয়া বেড়াইতেছে। এমন সময়ে ঝড়ের মত ইন্দু আসিয়া উপস্থিত হইল। মুখে ঘোর কঠোরতার সৃষ্টি করিয়া বলিল—"আমার একখানা চিঠি এখানে ফেলে গিয়েছিলুম, তুমি কি তা' দেখেছ?"

ইদানীং ইন্দু 'দাদাবাবুকে' তুমি বলিতে সুরু করিয়াছিল। বিন্দু এই রণ-রঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়া বলিল,—"হ্যাঁ, এই সেই চিঠি।"

খপ্ করিয়া তাহার হাত হইতে চিঠিখানা নিয়াই ইন্দু বলিল,—"তুমি আমার চিঠি নিলে কেন?"

বিন্দু তখন জবরদস্তী করিয়া সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, —"তোমার কি চিঠি? এ চিঠি আমার। আমার বইয়ের ভিতর পেয়েছি। এ চিঠি তোমার হ'তে যাবে কেন? দাও আমার চিঠি।" বিন্দু হাত বাড়াইল।

ইন্দু একটু সরিয়া গেল, কিন্তু দরজার উল্টা দিকে। বিন্দু সে দিকে অগ্রসর হইতেই বলিল,—"না আমি দেবো না।"

বিন্দু বলিল—"তোমাকে দিতে হ'বে, ওখানা আমার।" বিন্দু তাহার দিকে চিঠিখানা আনিবার জন্য অগ্রসর হইতেই ইন্দু চট করিয়া চিঠিখানা সেমিজের গলার দিকে হাত ঢুকাইয়া রাখিয়া দিয়া বলিল—"ডাকাতি না করে নিতে পারবে না।" তখন তার মুখে আর সে কঠোর ভাব নাই—চপল হাসি—

পরদিন বিন্দু আসিয়া রজনীর নিকট বিস্তারিত বলিল। কি করিয়া সে ডাকাতি করিয়া চিঠি হস্তগত করিয়াছে, তার পর বিয়ের প্রস্তাব, ইন্দুর প্রতিজ্ঞা, বিন্দুকে স্বামীরূপে না পাইলে সে চিরকুমারী থাকবে, গৌরী মা'র আশ্রমে যাবে, বিন্দুর মারা যাওয়ার সংবাদ পেলে বিধবার মত জীবন যাপন করবে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

আজ হোলি। রজনী হঠাৎ আসিয়া বিন্দুর ঘরে উপস্থিত হইয়া দেখে—বিন্দুর বিছানায় ইন্দু অর্দ্ধ-শায়িতাবস্থায়, তাহার বসন অসংযত এবং ঘরময় আবিরের ছড়াছড়ি। সে বুঝিতে পারিল, এতক্ষণ এখানে হোলির লীলাই চলিতেছিল। ইন্দু তড়িতের মত বসন সংযত করিলেও তাহার শুভ্র বক্ষে বিন্দুর হাতের পাঞ্জার লাল ছাপ রজনীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। আঙ্গুলের ছাপ যেমন পলাতক আসামীর দোষের প্রমাণস্বরূপ দাঁড়ায়, বিন্দুর একটি আঙ্গুলের দাগও যেন তাঁহাকে সেইরূপ ধরাইয়া দিল। রজনী বিন্দুর দিকে চাহিতেই বিন্দু অপরাধীর মত মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া আর কোন কথা ফুটিয়া উঠিল না। ইন্দু অতি ধীরে ধীরে সন্তর্পণে ঘর হইতে বাহির হইয়া নীচে চলিয়া গেল—যাওয়ার সময়ে রজনীকে এমনভাবে পরিহার করিয়া গেল, যেন তাহার নিজের মনের মধ্যেই সে বুঝিতেছিল যে, তাহার বিন্দুমাত্র স্পর্শে রজনী অশুচি হইয়া যাইবে।

রজনী মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়াই বলিল—"বিন্দু আজ তুমি চরমে গিয়েছ, আমি আমার নিজের চোখে যাহা দেখে ফেলেছি, তার জন্য আমি নিজেকেই লজ্জিত মনে করছি। আমি যদি জানতাম—এখানে তোমাদের এ লীলা চলছে তা' হ'লে আমি কখনো এখানে আসতাম না। তুমি আমার বন্ধু ছিলে, কিন্তু আজ যা দেখ্‌লাম এর পরে আর তোমাকে বন্ধু বলতে ঘৃণা হচ্ছে। যাওয়ার সময়ে আজ বেণুকে বলে যাব যে, তোমাদের এখানে আমার আর থাকা হবে না। শেষ বিদায়ের সময়ে ইন্দুকে একটা কথা বলে যাবো, তুমি তাকে ডেকে নিয়ে এসো।"

বিন্দু বিনা বাক্য-ব্যয়ে নীচে গিয়া ইন্দুকে লইয়া আসিল। জজের মত গম্ভীর হইয়া রজনী ইন্দুকে বলিল, "ইন্দু, তুমি বুঝতে পারছ না, কোথায় ভেসে যাচ্ছ। এখন মনের লাগাম ছেড়ে দিয়ে যা'তে আমোদ পাচ্ছ, দু'দিন পরে তার জন্য পস্তাতে হ'বে, তখন কিন্তু আর ফেরার পথ থাকবে না।"

যতক্ষণ রজনীর কথা বিন্দুর প্রতি প্রয়োগ হইতেছিল, ততক্ষণ সে তাহা সহ্য করিয়া নীরব হইয়া রহিয়াছিল, কিন্তু

ইন্দুকে টারগেট হইতে দেখিয়াই আর সে সহ্য করিতে পারিল না, মরিয়া হইয়া "শ্রীকান্তের" শ্রীকান্তের মত বলিল,—"বল না ইন্দু, স্বামীর সঙ্গে হোলি খেলাচ্ছিলে, তা'তে লজ্জা কি ?"

বিস্মিত হইয়া রজনী বলিল—"স্বামী! কার স্বামী কে?"

বিন্দু অপ্রতিভ না হইয়া বলিল—"আমি ইন্দুর স্বামী।"

রজনী বলিল—"তাই না হয় তর্ক স্থলে মেনে নিলাম, কিন্তু আমি জান্‌তে চাই—তোমাদের বিয়ে হ'ল কখন আর কি মতে ?

বিন্দু বলিল—"আমাদের বিয়ে হ'য়েছে গন্ধর্ব্ব মতে। আমরা উভয়েই বয়ঃপ্রাপ্ত, ভাল মন্দ বুঝবার শক্তি আমাদের আছে, তার উপর এতদিন দু'জনে দু'জনকে ভাল করে দেখবার সুযোগ পেয়েছি, তারপরে উভয়ের মত হওয়ায় আমরা একে-অন্যকে জীবনের সঙ্গীরূপে গ্রহণ করেছি। এর বেশী তুমি আর কি চাও ?"

রজনী বলিল—"আমি এর বেশী এইটুকু মাত্র জানতে চাই যে, তোমাদের এ মিলনে আর ঘটনাক্রমে দিন কতক এক খোঁয়াড়ে আবদ্ধ থাকা পশু জোড়ার মিলনে প্রভেদ কোনখানে ?"

বিন্দু বলিল—"রজনী তুমি চটে গিয়েছ, তোমার সঙ্গে তর্ক করা চলবে না; তবুও এইটুকু জেনে রেখো যে, আমাদের বিয়ে পৃথিবীর অন্য যে কোন নরনারীর বিয়ের চেয়ে এক রতি কম নয়। ইন্দু আমাকে স্বামীরূপে পেতে চেয়েছে, আমি তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছি। গন্ধর্ব্ব বিয়েতে এর চেয়ে বেশীর প্রয়োজন হয় না।"

রজনী বলিল—"গন্ধর্ব্ব বিয়ে—গন্ধর্ব্ব বিয়ে যে বল্‌ছ, তার সহজ অর্থ জান কি ? সোজা করে বল্‌তে গেলে ঘরের মেয়েকে ফুসলিয়ে বের করার নাম হচ্ছে গন্ধর্ব্ব বিয়ে। তোমাকে যে ইন্দু স্বামীরূপে পেতে চেয়েছিল এবং তুমি তা'কে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিলে, তার কি সাক্ষী সাবুদ আছে ?"

বিন্দু বলিল—"না কোন সাক্ষী নাই, শুধু আমাদের দু'জনের মধ্যেই সেই সব কথা হয়েছিল।"

রজনী বলিল—"এই জন্যই বলেছিলাম, খোঁয়াড়ের পশুর বিয়ের সঙ্গে তোমাদের এ মিলনের সাদৃশ্য রয়েছে। সাক্ষী সাবুদ নাই, বস্—যতদিন তোমার মনের খোরাক ও জোগাতে পারবে, ওকে মাথায় তুলে নাচ্‌বে, তারপর যখন ওর ঐ দেহ আর তোমাকে আকর্ষণ করতে পারবে না, বা তোমার তা'তে বিতৃষ্ণা এসে যাবে তখন বুদ্ধিমানের মত সরে পড়বে। এই ত মতলব! হতভাগা মেয়ে, তখন কি করবে! তার এই তথাকথিত বিয়ের না রইল সাক্ষী, না রইল কিছু, শুধু তাহার কলঙ্কিত উচ্ছিষ্ট দলিত দেহ ছাড়া! দেখ বিন্দু, যদি সত্যি তুমি বিয়ে করতে চাও, আর ইন্দু, অন্ততঃ আরো দুজন লোকের সামনে তোমাকে প্রার্থনা করে এবং তুমি তাঁকে গ্রহণ করতে রাজী হও, তাহ'লে বুঝব সত্যিকারের বিয়ে হয়েছে; আর তাহ'লে তুমিও যখন খুসী তাকে ফেলে যেতে পারবে না—বিয়েটা অস্বীকার করতে পারবে না—তখন ইন্দুর কথা আরো দু'জন সাক্ষীর সমর্থন পাবে। রাজী আছো ?"

রজনীর কথা শেষ হইতে না হইতে রুণু ঝুণু শব্দ করিতে করিতে চার পাঁচটি মেয়ে আসিয়া ছাদের ঘরে উপস্থিত হইল। রজনী সিঁড়ির দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেদিক হইতে ইহারা আসে নাই তাহা সে দেখিয়াছে, এইজন্য হঠাৎ ইহাদের আবির্ভাবে সে চম্‌কাইয়া উঠিল। তারপর সে বুঝিতে পারিল, বাড়ীর লোকের অজ্ঞাতে ছাদের উপর দিয়া এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে যাওয়ার ব্যবস্থা ইহারা করিয়াছে। তখন তার আরো মনে পড়িল, কিছুদিন আগে বিন্দু বলিয়াছিল যে, বড়লোকদের অনুকরণে পাড়ার মেয়েদের নিয়া ছাদের উপর সে "ঋষ্যশৃঙ্গের তপো-ভঙ্গ" নাটিকা অভিনয় করিয়াছিল এবং সে নিজে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। মুহূর্ত্ত মাত্র সময়ের মধ্যে সে সকল কথা মনে করিয়া লইল। সমাগত মেয়েদের যে অগ্রণী ছিল, সে ইন্দুকে ভিজা কাকের মত বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল—"ওলো ইন্দি, আজ হোলিতে কোথায় মুখখানা লাল হ'য়ে থাক্‌বে, তা' দেখছি তুই যেন কুইনাইন খাচ্ছিস্। কি হয়েছে রে?" বলিতে বলিতে সে ইন্দুর কাছে গিয়া চিবুক ধরিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলিল—"উনি কে রে! এই বুঝি তোর সেই পিউরিটান 'দাদা'। ওঃ বুঝেছি, এই জন্যেই তুই মুস্‌ড়ে গেছিস্। দাঁড়া, তোর দাদাকে আজ আমাদের দলে টেনে নেব।" তারপর সঙ্গের মেয়েদের দিকে ফিরিয়া বলিল—"ওঁকে কনভার্ট করার ভার কে নেবে? হেম?" ভিড়ের মধ্য

হইতে একটী তন্বী যুবতী আগাইয়া আসিয়া বলিল—"হেমের এই রোগার সমান বপু নিয়ে তপোভঙ্গ চল্‌বে না গো, আমি-ই ওর ভার নিলুম।" তারপর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই মুঠা আবির নিয়া রজনীর দুই গালে সজোরে ঘষিয়া দিল। ঘষিতে ঘষিতে বলিল—"কল্‌কাতার বনে ঋষ্যশৃঙ্গের যায়গা নেই গো; আজ তোমার জাত মেরে দিলুম।" সঙ্গে সঙ্গে দলের সকল মেয়েই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া একে অন্যের উপর পড়িতে লাগিল।

রজনী ইহাদের এই উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বন্ধু-মহলে অনেক গল্প-ই সে শুনিয়াছে, কিন্তু এমন বেহায়াপণা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। ছেলের মা হওয়ার মত বয়সের মেয়েরা নিঃসম্পর্কীয় পুরুষের সঙ্গে এমনভাবে মেলামেশা, এমন "হোলি-খেলা" করিতে পারে, তাহা তাহার ধারণার অতীত। সারাদিন এই কর্ম্ম করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ইহাদের সকলেরই অসংযত বসন, ক্লান্ত দেহ-মন—রজনী ইহাদের অবস্থা দেখিয়া এতই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল যে, তাহাকে মেয়েরা যে সং সাজাইতেছিল, সেদিকে বিন্দুমাত্রও বাধা দিতেছিল না। শেষে যখন একটি তরুণী তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখে আবির মাখাইতে উদ্যত হইল, তখন যেন তাহার ধ্যান ভঙ্গ হইল; জোর করিয়া তাহাদিগকে সরাইয়া সে অত্যন্ত রুক্ষ স্বরে বলিল,—"ছি ছি, আপনারা মাতৃত্বের এমন অপমান কচ্ছেন! "রাগে ও দুঃখে তার মুখ দিয়া কথা ফুটিতেছিল না। তপোভঙ্গকারী তরুণী বলিল,—"আমরা মাতৃত্বের অপমান কচ্ছি না, নারীত্বের পূজা কচ্ছি, এতে দোষের কি দেখলেন আপনি।" রজনী আর নিজকে সামলাইতে পারিল না, বলিল—"নারীত্বের পূজা কচ্ছেন! আর যদি এই পূজার ফলে অকাল-মাতৃত্বের দায় আপনাদের কারো ঘাড়ে চেপে বসে, তখন মুখ দেখাবেন কি করে? মা বাপের মুখে কালী পড়বে না?"

তন্বী আবার বলিল—"হলো-ই বা তাই, তা'তে কি এসে যাবে। দুনিয়ায় সব লাভের ব্যবসায়েই ফেল করার ভয় থাকে, তাই ব'লে সবাই আর ব্যবসা ছেড়ে দেয় না। এই রিস্কটুকু নেওয়াই শিভাল্‌রী। ইহকাল যেমন পরকালের অনেক আগে, নারীত্বও তেমনি মাতৃত্বের অনেক আগে; সুতরাং বোকার মত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় সুনিশ্চিত নগদটা ছাড়ি কেন! কবি বলেছেন—

"নগদ যা পাও হাত পেতে নাও
　　বাকীর খাতায় শূন্য থাক—
দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে?—
　　মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক॥"

বলিতে বলিতে রজনীর মুখখানা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া তাহার ওষ্ঠে একটী চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল। রজনী দুই হাতে তন্বীর দেহখানাকে তার বুকের উপর হইতে যেন মুছিয়া ফেলিয়া বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, এবং ইহাদের হাসি টিট্‌কারী ডাকাডাকি তুচ্ছ করিয়া ততোধিক বেগে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গেল।

বছর তিনেক পরের কথা। বিন্দু শেষে মেসে চলিয়া গিয়াছিল। আর একটী ছেলেকে ল' পড়িবার খরচ দিয়া নিজের বাসায় কিছুদিন রাখিয়া, ইন্দুর বাবা তাহার সঙ্গে ইন্দুর বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের প্রথম রাত্রেই ইন্দু তাহার স্বামীকে বলিয়াছিল—"তুমি আমার সাক্ষাৎ ভগবান, তোমাকে পাবার জন্যে শিব-পূজা করেছি। আমার এ পুষ্পিত দেহ অনাঘ্রাত অবস্থায় তোমায় নিবেদন করব। কত না যুদ্ধ করেছি নিজের মনের সঙ্গে, কত না প্রলোভন জয় করেছি, শুধু তোমার পথের দিকে চেয়ে।" বিন্দুর স্বামী বলিল "প্রলোভন কি রকম?"

ইন্দু বলিল—"আমার ছোট মায়ের এক মামা আমাদের বাসায় থেকে পড়তেন, আমিও মাঝে মাঝে তার কাছে পড়া দেখে নিতাম। একদিন ছাদের ঘরে আমাকে একা পেয়ে টপ্ করে আমার হাত ধরে বললেন—ইন্দু, আমার সিগারেটে আগুন আছে, তুমি তা হাতে নিয়ে, আগুন ছুয়ে প্রতিজ্ঞা করো, তুমি আমার হ'বে। আমি জোর করে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে বল্‌লাম—"আমাকে সে রকম মেয়ে পাও নি' তারপর আর তার সামনে একদিনও বের হই নি।"

বিন্দু ওকালতী পাশ করিয়াছে এবং ব্যবসাও আরম্ভ করিয়াছে। রজনী বি-এ পাশ করিয়া এক স্কুলের মাষ্টারী লইয়াছে। একদিন বিন্দু তাহার বাসার বাইরে হুকা হাতে পায়চারি করিতেছিল, কোলে তাহার শিশু ছেলেটি। রজনী ছুটি লইয়া সেখানে কয়েকদিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়াছিল, সকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া বিন্দুর বাসার কাছ দিয়া যাইতে যাইতে তাহাকে দেখিয়া কাছে আসিল। অনেক কথা-বার্ত্তার পর রজনী জিজ্ঞাসা করিল—"ওহে ইন্দুর খবর কি?" বিন্দু লজ্জিত মুখে বলিল—"আমি ত শেষে মেসে চলে আসি। তারপর কল্‌কাতা হতে সন্তান-সম্ভবা বলে শুনে আসি। কল্‌কাতা ছাড়ার পর আর কোন খবর জানি নে।"

রজনী বলিল—"কোথায় রইল ছাদের ঘরের তোমাদের রোশনাই?"

বিন্দু সহজ ভাবে বলিল—"ওসব পুরাণো কথা তুলে লজ্জা দিস্ না রজনী; ওসব ছেলে-খেলা বলেই ধরে নে।"

শিবাজী ও আফজাল খাঁ

—গোলাম মোস্তফা

মারাঠা নায়ক শিবাজী যখন লুণ্ঠন করি' দেশ
অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার দেখাইল এক শেষ,
সংবাদ পেয়ে বিজাপুর-পতি বাদ্‌শা সেকেন্দার
দমিতে তাহারে 'আফ্‌জাল খাঁরে' পাঠাইলা সত্বর।

'প্রতাপগড়ের' দুর্গ হইতে শিবাজী দেখিল চেয়ে
আফ্‌জাল খাঁর সেনাদলে গেছে প্রান্তর-ভূমি ছেয়ে।
অগণিত যাঁর লোক-লস্কর বিপুল যুদ্ধ-সাজ
শিবাজী কেমনে তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে আজ!
অসম্ভব! এ ব্যর্থ প্রয়াস! যুদ্ধ কখনো নয়,
যুদ্ধ করিলে ভাগ্যে তাহার পরাজয় নিশ্চয়।

এতেক ভাবিয়া মারাঠা-নায়ক শিবাজী অতঃপর
আফ্‌জাল খাঁর শিবিরে পাঠালো আপনার অনুচর।
বলিল সে গিয়া—"যুদ্ধের আর নাহি কোন প্রয়োজন,
অভয় পাইলে শিবাজী করিবে আত্ম-সমর্পণ।
সেনাপতি যদি করেন তাহারে সাক্ষাৎ মঞ্জুর
আসিবে শিবাজী সন্ধি করিতে, সন্দেহ হ'বে দূর।"

দিল্‌-খোসা সেই বীরের বাচ্চা সাচ্চা মুসলমান
প্রস্তাবে তার হৃষ্ট চিত্তে সম্মতি দিল দান।
মধ্য-পথের নির্জ্জনে করি শিবির সন্নিবেশ
মিলন-মঞ্চ রচিত হইল, দ্বিধার নাহিক লেশ।
স্থির হ'ল—তা'রা মিলিবে দু'জন সেই-সে বিজনপুরে,
দেহ-রক্ষীরা রহিবে না সাথে—রহিবে সবাই দূরে।

একা আফ্‌জাল গেল সে শিবিরে, সাথে নাহি কেহ হায়!
শিবাজী কখন্‌ আসিবে—রহিল তাহারি প্রতীক্ষায়।

হোথায় শিবাজী বর্ম্মে ঢাকিল নিজ দেহ চুপি-চুপি
হস্তে লইল 'বাঘনখ্‌', শিরে পরিল লোহার টুপি;

তদুপরি তার বসন পরিল, ধরিল মিথ্যা বেশ—
কারো মনে কোন সন্দেহ যেন নাহি জাগে এক লেশ।
মায়ের নিকট বিদায় লইয়া আশীষ মাগিল তাঁর
ফিরে-বা-না-ফিরে—এই আশঙ্কা মনে জাগে বারবার।

আসিল শিবাজী সেনাদলে তার দিয়ে উপদেশ-বাণী,
নির্জ্জনপুরে শুধু দুইজন—নাহি আর কোন প্রাণী।
কম্পিত হৃদে কুর্ণিশ করি' হইল সে আগুসার
আফ্‌জাল খাঁর চরণে লুটায়ে করিল নমস্কার।
সেনাপতি তারে দু'হাতে তুলিয়া উঠাইল সেইক্ষণ
বন্ধু বলিয়া আদর করিয়া করিল আলিঙ্গন।

বাহু-বন্ধনে বন্ধ থাকিয়া সেই সে প্রবঞ্চক
আফ্‌জাল খাঁর বক্ষে বিঁধিল তার সেই 'বাঘনখ' !
"উঃ—হু-হু ! এ কি-এ ! ভণ্ড, কপট, বেঈমান, শয়তান !
কি করিলি !"—বলি' আফ্‌জাল তার তলোয়ারে দিল টান।
পদাঘাত করি' শিবাজীরে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া
ভীম বেগে তারে আঘাত করিল সকল শক্তি নিয়া।
নিষ্ফল হ'য়ে এল সে আঘাত, লৌহ-বর্ম্ম পরে
রক্ত কোথায় ?···বৃথা তলোয়ার ঘুরে মরে ক্রোধভরে !
চলিল না আর হস্ত তাহার ! মৃত্যু যন্ত্রণায়
ছট্‌ফট্‌ করি' সেনাপতি ভূমে লুটায়ে পড়িল হায় !
শিবাজী তখন সঙ্কেত-ধ্বনি করিল উচ্চ রবে,
সেনাদল তার বিদ্যুৎ বেগে ছুটিয়া আসিল সবে।

'হর-হর-বোম' ! 'হর-হর-বোম' ! করি' ভীম গরজন
আফ্‌জাল খাঁর সৈন্য-শিবির করিল আক্রমণ।
স্তম্ভিত যত মুস্‌লিম সেনা ! সন্ধির দিনে আজ
এ কী অঘটন ঘটিল সহসা ! মাথায় পড়িল বাজ !
নেতৃ-বিহীন অসংলগ্ন হতভাগ্যেরা যত
মারাঠার হাতে শহীদ হইল, বন্দী হইল কত।
অমানুষী এই কৃতঘ্নতার যোগ্য পুরস্কার
দিবার মতন অবসর তারা পাইল না খুঁজে আর।

দানবীর মুন্‌শী বু-আলী

— প্রবন্ধ —

— ডাঃ মোহাম্মদ আবুল কাসেম

কলিকাতা শিয়ালদহ ষ্টেশনের অনতিদূরে এক নম্বর কাইজার ষ্ট্রীট-এ যে মস্‌জিদ ও ফ্রী ছাত্রাবাস অবস্থিত আছে—তাহা হিজরী ১২৬২ সনে স্বনামধন্য মুন্‌শী বু-আলি সাহেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা তাঁহার জীবনী ও ষ্টেট্ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

পূর্ব্ব বঙ্গের নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত 'সুধারাম' গ্রামে মুন্‌শী বু-আলি সাহেবের আদি নিবাস। তাঁহার পিতা শিয়ালদহ আসিয়া আবাস-বাটী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার দুই পুত্র,—জ্যেষ্ঠ মুন্‌শী বু-আলি কলিকাতায় আসিয়া স্বীয় বুদ্ধিমত্তায় অল্প দিনে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া এক জমিদারী ক্রয় করেন। অনন্তর হিজ্‌রী ১২৬২ সালে—তথা ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এক মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করতঃ সমস্ত জমিদারী মস্‌জিদের নামে ওয়াক্‌ফ্ করেন। মুন্‌শী সাহেবের মাতুল খান-বাহাদুর আমিন উদ্‌দীন সাহেব তখন কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীব ছিলেন।

বু-আলী। মাতওয়াল্লীর বাস-ভবন

মুন্‌শী বু-আলী নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার জমিদারী মস্‌জিদের নামে এই মর্ম্মে ওয়াক্‌ফ্ করেন যে, উহার আয়ের এক তৃতীয়াংশ মুতাওয়াল্লী গ্রহণ করিবেন,—বাকী দুই তৃতীয়াংশ দ্বারা মস্‌জিদ সংস্কার, ট্যাক্স ও অন্যান্য যাবতীয় খরচ এবং তালবে-এলমদের আহার-বাসস্থান দেওয়ার জন্য ব্যয়িত হইবে।

মুন্‌শী সাহেবের মাতার নাম মোসাম্মাৎ ওয়াফিয়া বানো। তাঁহার নামেই সমস্ত সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা হয়। মাতার জীবিত অবস্থায় পুত্র মুন্‌শী বু-আলি দেহত্যাগ করেন। ফলে, মাতাই সমস্ত ষ্টেটের কার্য্য দেখা-শুনা করিতেন। ওয়াফিয়া বানোর মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যা ফাতিমা খানম মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত হন এবং তিনি জীবিত কালে তাঁহার চাচাত ভাই খান-বাহাদুর নবাব বদর উদ্‌দীন হয়দর সাহেবকে সহকারী মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন। অনন্তর ফাতিমা খানম অন্তিম-শয্যায় ইঁহাকেই মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করিয়া যান। তাঁহার মর্ম্মর-সমাধি অদ্যাপি মস্‌জিদের দক্ষিণ-পূর্ব্ব-কোণে অবস্থিত রহিয়াছে।

বদর উদ্‌দীন হয়দর স্বীয় কার্য্যদক্ষতা গুণে গবর্ণমেণ্ট হইতে 'নবাব' ও 'খান-বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সময়ে মস্‌জিদের যথেষ্ট উন্নতি হয়। তিনি যখন প্রথম ষ্টেটের মুতওয়াল্লী নিযুক্ত হন, তখন ষ্টেটের বার্ষিক আয় ছিল মাত্র ৭০০৲ সাত শত টাকা,—কিন্তু তাঁহার তিরোধানের সময় ষ্টেটের আয় বার্ষিক ২৭০০৲ দুই হাজার সাত শত টাকা—অর্থাৎ প্রায় চতুর্গুণ উন্নতি দেখাইয়া বিগত ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার সমাধি মস্‌জিদের উত্তর-পূর্ব্ব-কোণে বিদ্যমান আছে। হয়দর সাহেব শেষ-শয্যায় শায়িত থাকিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা নবাবজাদী জমিলা খাতুন ও নাবালক নবাবজাদা কমর উদ্‌দীন হয়দরকে মুতাওয়াল্লী বহাল করিয়া যান।
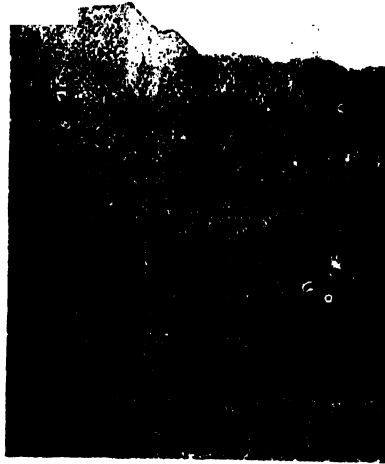
জমিলা খাতুনের স্বামী সৈয়দ ওস্‌মান আলি ওরফে জানি মিয়া। জমিলা খাতুন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ আশ্‌রাফ আলিকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করিয়া গত ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মহাপ্রয়াণ করেন। তাঁহার সমাধি গোবরা গোরস্থানে বিরাজমান আছে। তিনি ১৯১৩-১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ষ্টেটের মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত ছিলেন।

বর্ত্তমানে নবাবজাদা কমর উদ্‌দীন হয়দর ও সৈয়দ আশ্‌রাফ আলি সাহেবান মুতাওয়াল্লী পদে বৃত আছেন। কমর উদ্‌দীন ওরফে কাইজার সাহেব কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। মস্‌জিদের পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তার পূর্ব্ববর্ত্তী নাম ছিল খায়রু মুন্সী রোড। কাইজার সাহেবের নামানুসারে এই রাস্তার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "কাইজার ষ্ট্রীট" নামকরণ হইয়াছে। কমর উদ্‌দীন সাহেব বর্ত্তমানে শিয়াল-দহ-এর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও মুস্‌লিম ছাত্র যুবক-সম্মিলনীর সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ১৯২৫ সনের জুলাই মাসে হাইকোর্টের য়্যাড্‌ভোকেট মিঃ নুর উদ্‌দীন আহ্‌মদ সাহেবের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বর্ত্তমানে তাঁহার তিনটী পুত্র-সন্তান, যথাক্রমে হাসান হয়দর, ওস্‌মান হয়দর ও ওমর হয়দর। কমর উদ্‌দীন সাহেবের ভগিনীর সহিত মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক চক্ষু-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার টি, আহ্‌মদ-এর বিবাহকার্য্য সমাধা হইয়াছে।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আশ্‌রাফ আলি সাহেব কলিকাতা ইস্‌মাইল ষ্ট্রীটস্থ মৌলবী মোবারক হোসেন সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। দুঃখের বিষয়, তিনি ১৯২৭ সালে মাত্র এক বৎসর পরে দেহত্যাগ করেন। পুণ্যশীলা শাশুড়ী জমিলা খাতুনের কবরের পার্শ্বে তাঁহার কবর বর্ত্তমান আছে।

ষ্টেটের বর্ত্তমান আয় বার্ষিক ৩৫০০৲ তিন হাজার পাঁচ শত টাকা। মস্‌জিদের উত্তর পার্শ্বে মুতাওয়াল্লীর দ্বিতল অট্টালিকা, পূর্ব্বপার্শ্বে ছাত্রাবাসের এক অংশ ও দক্ষিণ পার্শ্বে বৈঠকখানা অবস্থিত।

মস্‌জিদের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০ হাত এবং প্রস্থ প্রায় ৪০ হাত। ইহাতে তিনটী দরওয়াজা, তিনটী গুম্বজ ও দুইটি জানালা আছে। মস্‌জিদের চাতাল এবং মেজে কৃষ্ণ ও শ্বেত মর্ম্মর দিয়া প্রস্তুত। উহার অভ্যন্তরে ঝাড়, ফানুস্ প্রভৃতি মস্‌জিদের উপকরণ সযত্নে রক্ষিত আছে। মস্‌জিদের ভিতরে ও বাহিরের চাতালে একসঙ্গে অন্যূন ১০০০ এক হাজার মুসাল্লী নামাজ পড়িতে পারেন।

বু-আলী ওয়াক্‌ফ্ ষ্টেট মস্‌জিদ

ইমাম হাফেজ নুর মোহাম্মদ পেশোয়ারী মাসিক ৪৫৲ টাকা ও মুয়াজ্জিন্ মুন্সী দীন মোহাম্মদ বাঙ্গালী মাসিক ২০৲টাকা বেতন পাইতেছেন। বর্ত্তমানে মস্‌জিদের কার্য্য একরূপ বেশ ভালই চলিতেছে,—আক্ষেপের বিষয়—পাখা নাই; তাহার অভাবে গ্রীষ্মকালে নামাজীদের অত্যন্ত কষ্ট হয়। তবে প্রস্রাবখানা, হাওজ, ইলেক্‌ট্রিক লাইট প্রভৃতি আছে। আমরা পূর্ব্ব-উত্তর-কোণ হইতে মস্‌জিদের ফটো গ্রহণ করিয়াছি।

ছাত্রাবাসে সর্ব্বশুদ্ধ পনরটা কাম্‌রায় মোট ত্রিশজন ছাত্রের থাকিবার স্থান আছে। ষ্টেট হইতে ছাত্রদের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র সরবরাহ করা হইয়া থাকে। তাঁহারা মুতাওয়াল্লীর কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া মিটিং করিয়া ডিবেটিং ক্লাব ও নিজেদের বোর্ডিংয়ের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট্ স্থির করিয়া লইয়া থাকেন। সিনিয়র ষ্টুডেণ্ট্ও এখানে থাকিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন, তবে বি-এ পাস্ করার পর তাঁহাদিগকে আর বোর্ডিং-এ স্থান দেওয়া হয় না। প্রতি বৎসর জুলাই মাসে স্কুল-কলেজে বৎসর আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রাবাসে নূতন ছাত্র ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হয়। আমরা দক্ষিণ পার্শ্ব

হইতে ছাত্রাবাস ও মুতাওয়াল্লীর বাস-ভবনের ফটো লইয়াছি।

পিতৃ-মাতৃহীন, বিধবা ও বাহিরের ছাত্রদিগকেও ষ্টেট্ হইতে মাসিক ও এককালীন সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ঈদ, বকর-ঈদ, মহরম প্রভৃতি শিয়া-সুন্নি উভয় সম্প্রদায়ের আনন্দ-উৎসবে বৎসর বৎসর ষ্টেট্ হইতে যথেষ্ট অর্থ-ব্যয় করা হয়। মাদ্রাসা, বালিকা বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি অনেক প্রতিষ্ঠানেও সাহায্য দেওয়া হয়। এই মসজিদের মেরামত বাবতও প্রত্যেক বৎসর বহু অর্থ-ব্যয় হইয়া থাকে। কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় মসজিদ ও সমাধি পৃষ্ঠে মার্ব্বল পাথরের উপর উজ্জ্বল ফারসী অক্ষরে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। আমরা তাহার পাঠোদ্ধার করিয়া কিছু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি।

মিঃ কমর উদ্দীন হয়দর নাবালক থাকা কালীন পূর্ব্বোক্ত নূর উদ্দীন সাহেব ষ্টেটের কার্য্য দেখা-শুনা করিতেন। প্রকাশ, ষ্টেটের বহু সম্পত্তি ইষ্টারণবেঙ্গল ষ্টেট্ রেলওয়ে কোম্পানী বারো লক্ষ টাকায় খরিদ করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে মুসলিম সাংবাদিক শ্রদ্ধাস্পদ মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও মৌলবী মুজিবর রহমান সাহেবান তৎকালে তাঁহাদের "মোহাম্মদী" ও "দি মুছলমান" পত্রিকায় জোর আন্দোলন চালাইয়াছিলেন।

বু-আলী প্রতিষ্ঠিত ফ্রি ছাত্রাবাস

মুন্সী বু-আলী স্বনামধন্য পুরুষ। তিনি নিজের চেষ্টায় নিজের ভাগ্য গঠন করিয়া লইয়াছিলেন। কর্ম্মময় জগতে মানুষ আন্তরিকতার সহিত যাহার সাধনা করে—দয়াময় তাহাকে তাহা মিলাইয়া দেন। এই চিরন্তন সত্যের উপর কেন্দ্র করিয়া মুন্সী সাহেব অর্থের আরাধনা করেন এবং উত্তরকালে সাধন-সংগ্রামে জয়যুক্ত হন। তিনি সারাজীবন পরিশ্রম করিয়া যে বিপুল অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন—জীবন-সন্ধ্যায় সে অতুল সম্পদের উপযুক্ত সদ্ব্যবহারও করিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই তিনি আজ স্বনামখ্যাত মনীষী—দাতা ও ধর্ম্মবীর বলিয়া দেশ-বিদেশে পরিচিত।

মুন্সী সাহেব সেকালের অল্প শিক্ষিত লোক,—বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন উচ্চ উপাধি তাঁহার ছিল না। কিন্তু যে অমর-কীর্ত্তি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, যাহার সাহায্যে বহু গরীব ছাত্র আজ ইউনিভার্সিটীর উন্নততর উপাধি পাইবার সুযোগ পাইয়াছে।

মানুষের উপকার করা মানুষের ধর্ম্ম এবং জাতির উপর টান থাকা মানবতা ও শিক্ষার প্রকৃত সার্থকতা। মুন্সী সাহেব এই উভয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া চির-স্মরণীয় ও চির-বরেণ্য হইয়াছেন। তিনি যাহা করিয়াছেন তজ্জন্য সমাজ আজীবন তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ—তাঁহার আদর্শ সকলের শিক্ষণীয় ও অনুকরণ যোগ্য।

মানুষ জগতে আসে—মানুষ জগত হইতে মুছিয়া যায়—এই যে অনাদিকাল আসা-যাওয়া—এই আসার পূর্ব্বে অনন্ত—যাওয়ার পরেও অনন্ত। উভয় সীমাহীন-অসীমার অফুরন্ত মাঝে জীবন-সেতু,—কর্ম্মময় এ স্থান। স্বীয় কর্ম্মের ফলে একজন মরিলে জগত-জোড়া তাঁহার নাম থাকে—জগত তাঁহার অভাবে ব্যথিত হইয়া কাঁদে। আর একজন বাঁচিয়া থাকায় মানুষ তাঁহার মৃত্যু কামনা করিয়া তাহাকে মুহুর্মুহু অভিশাপ দেয়। এই স্থানে মরা-বাঁচার প্রকৃত সার্থকতা। কেহ বাঁচিয়া অভিশপ্ত—আবার কেহ মরিয়া চির-অমর।

কর্ম্মফলের জন্যই যখন মানবের ঈদৃশ পরিণতি ঘটে—তখন জীবন-যুদ্ধে প্রত্যেকের প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকা বাঞ্ছনীয় যে, তাহার মরণের পরে পরবর্ত্তী মানুষের হৃদয়পটে তাহার একটা স্মৃতির দাগ যাহাতে উজ্জ্বল-দীপ্ত হইয়া ফুটিয়া থাকে। মুন্সী সাহেবের সে অদম্য ইচ্ছা ছিল—শুধু ইচ্ছা নয়—অটল প্রতিজ্ঞার সহিত তিনি হাতে-কলমে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার বাসনা সফলতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। দয়াময় বিশ্বপতির প্রতি তাঁহার যেমন অচল নির্ভরতা ছিল—তেমনি তিনি অসাধারণ আত্ম-নির্ভরশীলও ছিলেন। তিনি বিপুল ধনের অধিপতি হইয়াও তাই স্রষ্টাকে ভুলেন নাই,—অর্থের প্রতি তাঁহার কদাপি মোহ ছিল না এবং এই জন্যই তাঁহার যাবতীয় ধন-ঐশ্বর্য্য তিনি সমাজের হিতার্থে ব্যয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর ছিল মুকুরের ন্যায় স্বচ্ছ, এবং ব্যবহার ছিল—চাঁদের স্নিগ্ধ-ধারার মত নিষ্কলঙ্ক।

বিড়ম্বনা

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

— উপন্যাস —

—বন্দে আলী মিয়া

অধ্যায় চৌদ্দ

ইহার পর ছয়মাস কাটিয়া গেছে। করুণার ডাক্তারী পাশটা বৃথায় যাইতেছিল। খুকী আরো একটু বড়ো হইয়াছিল—তাহার সেবা করিয়া, নাচাইয়া, আদর করিয়া, শুইয়া, বসিয়া তবু করুণার যেন দিন কাটিতেছিল না। টাকা-পয়সার তার কোনো অভাবই ছিল না, মনসুরও বারে-বারে নিষেধ করিয়াছিল; কিন্তু তথাপি সে নাছোড়-বান্দা হইয়া অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া বহির্বাটী ঘরে মোটা মোটা অক্ষরের একখানা সাইন-বোর্ড টাঙাইল;—

গভর্ণমেণ্ট হইতে ডিপ্লোমা প্রাপ্তা ধাত্রী

শ্রীমতী করুণা চট্টোপাধ্যায় এম-বি

সমাগত দরিদ্র রোগীদিগকে বিনা-পয়সায় চিকিৎসা

করা এবং ঔষধ দেওয়া হয়।

সময়:—

সকাল—৭॥৹টা হইতে ৯॥৹টা।

বৈকাল—৫টা " ৭টা।

বিনা-পয়সায় ডাক্তার এবং ঔষধ, সুতরাং দুই দিনেই শ পাঁচেক রোগী জুটিয়া যাওয়ায় করুণাকে বাধ্য হইয়া সাইন-বোর্ডের 'এবং ঔষধ দেওয়া' টুকুর উপরে কালী লেপিয়া একেবারে মিলাইয়া মিশাইয়া দিতে হইল। সে না হয় বিনা-মূল্যে রোগ পরীক্ষা করিতে পারে, প্রেসক্রীপ-সান লিখিতেও কুণ্ঠিত নয়—কিন্তু ঔষধটাও ঐরূপে দেওয়া তার সাধ্যাতীত।

এই সূত্র ধরিয়া স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে কিছু মতান্তর হইল। মনসুর তাহাকে যুক্তি দিল যে, সে যখন ডিস্পেন্সারী খুলিয়া সকাল-বৈকালের অতখানি সময় ব্যয় করিতেছে, তখন একজন কম্পাউণ্ডার এবং আলমারী কয়েক ঔষধও সে তাহাকে দিতেছে, রীতিমত ভিজিট এবং ঔষধের দাম লইয়া সে চিকিৎসা করুক, তাহা হইলে সংসারেরও অনেক উন্নতি হয়, ব্যাঙ্কে টাকার সংখ্যাও উর্দ্ধদিকে অগ্রসর হয়।

করুণা সজোরে ঘাড় নাড়িয়া কথাটাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বলিল যে, সে তাহা কখনো মানিবে না। সংসার এখন অস্বচ্ছল নহে, ব্যাঙ্কে টাকা যাহা আছে তাহা থাকুক। কত গরীব লোক বিনা-চিকিৎসায় মারা যাইতেছে, তাহাদের একটুখানি উপকার সে যদি করিতে পায়, তাহাই তার পক্ষে যথেষ্ট।

মনসুর হাসিয়া জবাব দিল যে, তাহাদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা এবং ঔষধ একত্রে বিনা-মূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, সুতরাং করুণার এ সঙ্কল্প কেবল ছেলে-মানুষী এবং পাগলামী ছাড়া অন্য কিছু নয়।

করুণা একটুখানি ম্লান হইয়া গেল। সে চিরকালের জেদী মেয়ে, সুতরাং দমিল না; বলিল যে, যাহা সে ভালো বুঝিতেছে, তাহাই করিতেছে। অপরের উপদেশের প্রতীক্ষা সে কখনো করে নাই, আজো নিজের সঙ্কল্পকে অন্যায় অসঙ্গত বলিয়া দূরে ঠেলিয়া দিবে না।

'অপর' শব্দটা উচ্চারণে মনসুর মনে মনে অসন্তুষ্ট

হইল, প্রাণটা বেদনায় কাঁদিয়া উঠিল। এতদিন পরে করুণার নিকটে আজ সে কিনা 'অপর'। যে ব্যবহার বাহিরের লোকে বা অন্য কেহ করিলে মানুষ হাসিয়া তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দেয়, তাহাই প্রিয়জনের নিকট হইতে পাইলে শক্তিশেলের মতন বুকের উপরে আসিয়া আঘাত করে। করুণা 'অপর' কথাটা কখনো মনসুরকে বলে নাই, এমন কি তাহাকে উদ্দেশ করিয়াও উচ্চারণ করে নাই। 'অপর' দ্বারা অনাত্মীয় অপরিচিত দশ জনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। স্বামী যে নিজের গায়ে লইয়া এমনি ধারা অসন্তুষ্ট হইয়া সহসা গম্ভীর হইয়া পড়িবেন, ইহা করুণা কখনো ভাবে নাই। ঝোঁকের উপরে বলিয়া ফেলিয়া পাংশু-পাণ্ডুর মুখে আপনার অপরাধের গুরুত্ব বারে-বারে মনের মধ্যে তোল-পাড় করিয়া ওজন করিতে লাগিল।

ইহার কয়েকদিন পরে মনসুর অসময়ে বাড়ীতে ঢুকিয়া দেখিল, বহির্ব্বাটী ঘরে জন-দুই যোয়ান পুরুষ বসিয়া আছে, আর একজনকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া করুণা পেট টিপিয়া ষ্টেথিস্কোপ লাগাইয়া রোগ পরীক্ষা করিতেছে। স্ত্রীকে পর-পুরুষের অঙ্গ স্পর্শ করিতে দেখিয়া মনসুর মুহূর্ত্তে জ্বলিয়া উঠিল; তার ভিতরকার সংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীল মনটি করুণার এই ব্যবহারকে সরলভাবে প্রীত হইয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। সারা-মুখ কালি করিয়া সোজা ঘরে আসিয়া টেবিলের সুমুখের একখানা খালি চেয়ারে ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িল, জামা কাপড় পরিবর্ত্তনের কথা তার আদপেই মনে রহিল না।

সে মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া জীবনের এতখানি পর্য্যন্ত সেখানেই কাটাইয়া দিয়া আজ না হয় বৎসর দুই যাবৎ করুণার সহিত একত্র বাস করিতেছে, কিন্তু তার শৈশব এবং বাল্যকালের মোহ এবং সংস্কার তাহাকে তো আপনার প্রচণ্ড প্রভাব হইতে মুক্তি দেয় নাই। সে জন্মিয়া জ্ঞান হইতে দেখিয়া আসিতেছে, অনাত্মীয় পরিচিত কি অপরিচিত কোনো পুরুষ কোনো অবলম্বনের সূত্র ধরিয়া কোনো দিন তাহাদের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পায় নাই, তাহার মাতা অথবা অন্য কোনো নারীর সহিত বাক্যালাপ করা তো অতি দূরের কথা। তার পাড়ার হিন্দু-মুসলমান বন্ধু-বান্ধব বহির্ব্বাটী পর্য্যন্তই সন্তুষ্ট থাকিয়াছে, তবে যারা নিতান্ত অন্তরঙ্গ তাহাদের দু'একজন বাড়ীর মধ্য অবধি পৌঁছিয়াছে, মনসুরের নিজের অদৃষ্টেও ইহা হইতে পৃথক বিচিত্র রকমের কিছু ঘটিয়া যায় নাই।

যখন সে মেডিকেল কলেজে পড়িতে আসে, তখন মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে একত্রে পড়ে দেখিয়া সে মনে মনে কিছু বিস্মিত না হইয়া পারে নাই। তারপর এই ক্রীশ্চান তরুণীর সহিত অভাবনীয়রূপে আলাপ-পরিচয় হইয়া গেলে সে আনন্দিত হইয়া রোমান্সের আশায় উন্মুখ হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রোমান্স জমিয়া যখন তাদের দু'জনকে স্বামী-স্ত্রীরূপে একত্রে জগতের সুমুখে উঁচু করিয়া ধরিল, তখন তার তরুণ চিত্তটা লজ্জায় আশঙ্কায় আনন্দে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু করুণা যখন তার সহিত বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইবার জন্য সাজিয়া-গুজিয়া তৈরী হইত, তখন সঙ্গে লইতে তার মন আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া আসিত। বিবাহের পূর্ব্বে করুণার সহিত পথে-ঘাটে কথা বলিতে, বেড়াইতে সে আনন্দিত হইয়া ইহার মধ্যে সুপ্রসন্ন ভাগ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টির সন্ধান পাইত, একটি সুন্দর তরুণীর সহিত আপনার পরিচয় এবং আলাপ আছে মনে করিয়া অসংখ্য জন-শ্রেণীর সুমুখে তার বুক দশহাত ফুলিয়া উঠিত। কিন্তু যখন সেই নারীই তার বধূরূপে লক্ষ্মী প্রতিমার মতন মনসুরের সংসার তার নিজের বলিয়া হাতে তুলিয়া লইল, তখন তাহাকে পূর্ব্বের মত লক্ষ কোটি মানুষের সুমুখে বাহির করিয়া আগের মতন আনন্দ অনুভব করিতে, গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিতে তার আজন্ম-সংস্কারের দুয়ারে আঘাত লাগিল। করুণা যে সম্প্রদায়ে, যে আব-হাওয়ায় নিজে জন্ম-গ্রহণ করিয়া মনোবৃত্তিকে গঠিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকে আজ ধর্ম্মের দোহাই দিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা সুধু নিজের বর্ব্বরতা এবং কুশিক্ষাই প্রমাণ করিবে না, করুণার চোকে তাহাকে অনেক খানি নীচে নামাইয়া হাস্যাস্পদও হইতে হইবে, তাই সে বাধা দিতে সাহস করিল না, কাজেই অচেনা জায়গায় অজানা লোকের সম্মুখে আড়ষ্ট হাসিয়া স্বচ্ছন্দতার ভাণ করিয়া সে যেখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইত।

ইহাও ক্রমে সহিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু করুণার সেদিনকার দুর্ব্যবহার তার চিত্ত-ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল,

আজ এই কাণ্ডটা যেন ডিনামাইটে প্রবল বেগে হাতুড়ির ঘা মারিল। মনসুর রাগে-দুঃখে-লজ্জায়-ক্ষোভে আপনার স্বামীত্বের অমর্যাদায় একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া মনে মনে মরণ কামনা করিতে করিতে ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল। তখন তার এটুকু স্মরণ রহিল না যে, যখন করুণা মেডিকেল কলেজে পড়িত, ওয়ার্ডের ডিউটিতে কত প্রকারের পুরুষ রোগীকে যে বাধ্য হইয়া স্পর্শ করিতে হইত, সারা রাত্রি জাগিয়া নার্স করিতে হইত। যখন সে পায়ে হাঁটিয়া কলেজে যাইত বা বাসায় ফিরিত, তখন কত লোকে ইচ্ছা করিয়াই যে তার গায়ের সহিত গা ঘেঁসা দিয়া যাইত তাহার তো ইয়ত্তা ছিল না।

করুণা ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, মনসুর একাগ্র মনে চুরুট টানিতেছে। বিষণ্ণ ব্যথাতুর মুখের দিকে চাহিয়া সে ভয় পাইল, কিন্তু কারণ কিছুই অনুমান করিতে না পারিয়া বিপন্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার অসুখ করেছে?

দুঃসহ যন্ত্রণা নীরবে হজম করিতে করিতে মনসুর অতি ক্ষীণ এবং শুষ্ক কণ্ঠে সংক্ষেপে প্রত্যুত্তর দিল, না।

সে চিরকালের নিরীহ নম্র এবং অতি ভালো মানুষ। কাহারো সহিত কোন-দিন ঝগড়া ঝাঁটি, লাঠালাঠি করিতে কেহ তাহাকে দেখে নাই। আপোষে যাহা নিষ্পত্তি না হইত, তাহা লইয়া সে মন গুমরাইয়া থাকিত, বিবাদ করিতে প্রবৃত্তি হইত না, চাহিতও না—পছন্দও করিত না। মনসুর তাই মনে করিল, অন্য সময়ে কথাটা মৃদু-ভাবে করুণার নিকটে পাড়িয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলে প্রকাশ্যে বিবাদের চেয়ে ফল হয়তো ভালোও ফলিতে পারে।

খুকী প্রায় মাস দশেকের হইয়াছিল, এখন সে হামাগুড়ি দিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অনায়াসে চলিতে ফিরিতে পারিত। করুণা দু'পুর বেলায় তাকে দুধ খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া ঘরের মেজের উপর মাদুর বিছাইয়া চিৎ হইয়া শুইয়া সেই মাসের 'ভারতবর্ষে' একটা ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাসের যেটুকু ছিল, তাহাই অমৃত বোধে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া যাইতেছিল।

পড়া যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন খুকী খুঁৎ খুঁৎ করিতে করিতে সহসা কাঁদিয়া উঠিল। করুণা এবার ক্ষমা করিতে পারিল না, বইখানি এক পাশে উপুড় করিয়া রাখিয়া সোজা উঠিয়া বসিয়া খুকীকে বার তিনেক খুব করিয়া ঝাঁকানি দিল, রক্ত নেত্রে বলিল, আচ্ছা মেয়ে নিয়ে পড়েচি বাপু, কি, চাস্ কি তুই? ফের্ কাঁদবি তো থাপ্পর দিয়ে ঠিক করে দেবো বলে রাখচি।

মাতার ভঙ্গী দেখিয়া খুকী ভয়ে থতমত খাইয়া উচ্চ স্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেই করুণা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া চড় তুলিয়া শাসাইয়া বলিল, থাম্ বলচি—দিলুম থাপ্পর। ও, তুমি পিটুনি না খেলে ঠিক হবে না দেখচি। সোজা কথার মানুষ নোস্।

গোলমালে মনসুরের কাঁচা ঘুমটা সহসা অসময়ে ভাঙ্গিয়া গেল। সে বিরক্তি-ভরা মুখে পাশ ফিরিয়া নিদ্রা জড়িত অলস গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করিল, খামাখা কাঁদাচ্চ কেন?

করুণা মুখ তুলিয়া বলিল, তাই ত্যাখো আর কি। একটু খানি নিশ্চিন্ত হয়ে কিছু কর্‌বার জোটি নেই, পড়তে নিলুম, তা কী এই শত্তুরের চোখে সহ্য হয়।

মনসুর মুখ তুলিয়া হাসিল। বলিল, ওকে এনে আমার কোলে দাও তো। আয় আয় লক্ষি মা আমার, এসো কেঁদো না

করুণা মেয়েকে সাপটিয়া আনিয়া খাটের উপরে মনসুরের কাছে বসাইয়া দিতে দিতে বলিল, নাও, আদরের মেয়ে তোমার, আমি আবার ওর কে, ধরো দিকিন।

মনসুর হাত বাড়াইয়া কোলে লইয়া ক্রন্দনরতা কন্যার মুখে জোর করিয়া গোটা দুই চুমু দিয়া বলিল, ছি, কাঁদতে নেই—লোকে নিন্দে করবে যে। মা আমার, সোণা-মাণিক আমার। ত্যাখ্ তোর জন্য কি এনেচি। বলিয়া বিছানা হাতড়াইয়া কিছু না পাইয়া তার ডান হাতে পাসিং সো সিগারেটের কৌটা এবং বাম হাতে দিয়াশলাইর বাক্সটা উঠাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে খুকীর চীৎকার উচ্চ হইতে নিম্নে নামিয়া ক্রমে-ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল।

অদূরে বসিয়া বই পড়িতে পড়িতে করুণা ইহা লক্ষ্য করিয়া হাসিল।

খানিকক্ষণ পরে মনসুর স্ত্রীকে ডাকিয়া কাছে আনিয়া বসাইল। করুণার স্নান-সিক্ত বিপর্য্যস্ত এলো-মেলো চুলগুলি পিঠের উপরে ঘাড়ের কাছে বুকের পাশে লুটোপুটি খাইতে-ছিল, মনসুর ক্ষণকাল সেদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, সত্যিই তুমি সুন্দর।

করুণা মুখ টিপিয়া হাসিয়া জবাব দিল, Oh God, তা এতদিনে টের পেলে ?

মনসুর তার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া জোরে একটুখানি চাপ দিয়া বলিল, নিত্যি তোমাকে যেন নতুন লাগে।

করুণা চুপ করিয়া আনন্দাবেগ অন্তরের মধ্যে নীরবে চাপিয়া লইতে লাগিল। মনসুর খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, একটা কথা বল্‌তে চাচ্ছিলুম।

করুণা সচকিত হইয়া উদাস দৃষ্টি তার মুখের উপরে তুলিয়া ধরিয়া কোমল-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কি বল্‌চো ?

মনসুর একটুখানি আলগা হাসি হাসিয়া আস্তে আস্তে বলিল, যদি রাখো তো বলি, তুমি আবার আজকাল যে বিদ্রোহী হয়ে উঠেচো।

করুণা ভ্রু কোঁচ্‌কাইয়া প্রত্যুত্তরে বলিল, বলেই ফ্যালো না শুনি, অত ভনিতা কেন ?

মনসুর মিনিট কয়েক মৌন হইয়া ভাবিয়া লইয়া বলিল, ডাক্তারী করায় তোমার কাজ নেই।

—কেন ? এতদিন পরিশ্রম করে পাশ করাটা তবে ব্যর্থ হয়ে যাক্—।

—গেলই বা। সংসারের তো কোনো উপকারে লাগ্‌চে না।

—নিজেদের সংসারটাই কেবল বুঝচো তুমি। বাইরের দশজনের উপকার তো হচ্চে। উপার্জ্জন করার ইচ্ছা আমার নেই।

—না থাকলো, কিন্তু অমন করে ষণ্ডা পুরুষদের পেট চাপড়ে ডাক্তারী—ও আমি পছন্দ করি নে।

—তাতে দোষের তো কিছু নেই। ডাক্তারী করতে গেলে হাজার রকম মানুষের সাথে মিশ্‌তে হয়, সে তো তুমি নিজেও জানো।

—জানি বলেই তো নিষেধ কর্‌চি।

—যদি বুদ্ধি-বিবেচনা থাক্‌তো তবে নিষেধ করতে না। আচ্ছা, তুমি কি মানুষের ভালো করা দেখ্‌তে পারো না।

—এ যে কী উপকার হচ্চে সে তো আমি দেখ্‌চি করুণা। নিজে যদি ওষুদ বিতরণ করতে পারতে, সে না হয় একরকম হোত, কিন্তু এ করে পুরুষের কামের আগুনে ঘি-ই ঢালচো কি না বলো তো ? ক'টা পুরুষের সত্যিকারের রোগ চিকিৎসা করাতে তোমার কাছে আসে, সে তো আমি বুঝি।

—নিজের মন নিয়ে কথা বোলো না, সবাই কি আর এক রকমের লোক।

রুক্ষস্বরে মনসুর বলিল, আমার মন নিয়ে কথা বল্‌চি আমি, অতবড় কথাটা অনায়াসে বলে ফেল্‌লে, একটুও বাধ্‌লো না ! আচ্ছা করুণা, তোমাদের খ্রীশ্চান সমাজে কি স্বামীকে সব দিক দিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করাই নিয়ম, না কর্‌লে বুঝি বাহাদুরি পাওয়া যায় না ?

করুণার মুখের উপরে কে যেন এক ঘা চাবুক কষিয়া দিল। রক্তহীন বিবর্ণ মুখে সে কোনোমতে উচ্চারণ করিল, তাচ্ছিল্য কর্‌লুম তোমাকে !

—ওকে তা ছাড়া আর কি বলে শুনি ? ভালো-মন্দ বুঝ্‌বার বয়স আমার অনেক দিনই হয়েচে। ভালো কথা বল্‌চি শোনো, ডাক্তার হয়ে কাজ নেই তোমার, যদি নিতান্তই ইচ্ছাটা বলবতী হয়ে ওঠে, মেয়ে-ছেলে তুমি, মেয়েদের কাজেই লাগো—নার্স হও।

করুণা ইহার জবাব দিল না, অপ্রসন্ন মুখে নিশ্চল দৃষ্টি দেয়ালের গায়ে নিবদ্ধ করিয়া চুপ করিয়া পাষাণের মতন বসিয়া রহিল। কথাটা শুনিয়াছে অথবা শুনিতে পারে নাই, তাহার ব্যবহারে ইহার কোনো লক্ষণই প্রকাশ পাইল না।

মনসুর রাত্রে বাসায় ফিরিয়া দেখিল, ঘুমন্ত কন্যার পাশে করুণা চিন্তান্বিত মুখে গুম্ হইয়া বসিয়া তার নিজের জন্য একটা ব্লাউজ পিস্ কাটিয়া সেপে (Shape) আনিবার চেষ্টায় বিশেষ ব্যস্ত আছে। স্বামীর আগমন সংবাদ সে টের পাইয়াছিল, কিন্তু না তুলিল মুখ, না কহিল কথা।

জামা কাপড় বদ্‌লাইয়া মনসুর হাত-মুখ ধুইয়া ঘরে ঢুকিতেই করুণা নিঃশব্দে উঠিয়া আসিয়া জায়গা করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া দিয়া পানির গেলাস, ভাত-ব্যঞ্জনাদি আনিয়া রাখিয়া পূর্ব্বস্থানে যাইয়া সে তার আপনার কাজে ডুবিয়া গেল। মুখের একটা কথা বলিয়া তাহাকে খাইবার অনুরোধটা পর্য্যন্ত জানাইল না !

পিঁড়িতে বসিয়া হিন্দুস্থানী কায়দায় খাইতে মনসুরের সহসা আজ যেন সংস্কারে বাঁধিল। এমন করিয়া আজিকার

এই খাওয়াই তার প্রথম নহে, বিবাহের পর হইতে স্ত্রীর কথামত তাকে সঙ্গে করিয়া সে মাঝে মাঝে নতুন খাওয়ার আনন্দে একত্রে পাশা-পাশি বসিয়া ভিন্ন ভিন্ন থালা হইতে খাদ্য গ্রহণ করিত। মুসলমানের সন্তান মনসুর চিরকাল মাদুর অথবা ঐ শ্রেণীর আসনের উপরে বসিয়া খাদ্য গ্রহণ করিতেই নিতান্ত অভ্যস্ত, এদিকে করুণা ক্রীশ্চান হইলেও তাহাদের পরিবার হইতে হিন্দু-সমাজের আচার-ব্যবহার একদম বিদায় লইবার অবকাশ পায় নাই। মনসুর মাদুর পাতিয়া তার উপরে বসিয়া খাইবার জিদ ধরিত, করুণা আসিয়া দু'খানি পিঁড়ি পাতিয়া হাসিয়া খাবার লইয়া হাজির হইত এবং নিজ-পক্ষ সমর্থনের জন্য বহু যুক্তি-তর্ক পেশ করিত। মনসুরও হটিবার পাত্র নয়, এক বিছানায় বসিয়া খাওয়ার পক্ষে সে প্রাণপণে যুঝিয়া বলিত যে, ইহা একতা এবং এক-প্রাণতার মস্ত-বড়ো লক্ষণ—বলিয়া নিজেই হাসিতে হাসিতে যাইয়া একটা মাদুর বিছাইয়া তাহার উপরেই খাবারের থালা-বাটিগুলা উঠাইয়া লইয়া করুণার হাতে ধরিয়া একপ্রকার জোর করিয়া টানিয়া বসাইয়া এক থালাতেই উভয়ে আহারে প্রবৃত্ত হইত। এমনি করিয়া সুখ-স্বপ্নের মধ্যে তাহাদের প্রথম মিলনের দিনগুলা হাসিতে খেলিতে, দেখিতে দেখিতে কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল, তাহা দু'জনের কেহই বুঝিতে পারিল না। আজ তারা সংসারের কঠোর নিষ্পেষণ, অভাব-অভিযোগের মধ্যে আসিয়া ভয়ার্ত্ত মুখে দাঁড়াইয়াছে, আজ যেন দু'জনের মধ্যে একটা ব্যবধান, একটা সংস্কারের নিষ্ঠুর প্রাচীর মাথা ঠেলিয়া উভয়কে পৃথক করিয়া দিতেছে। আজ সেই সরল আনন্দ, প্রাণ-ঢালা ভালবাসা, অকারণ কৌতুক আর নাই, তার পরিবর্ত্তে আসিয়াছে অকাল গাম্ভীর্য্য, অসময়ে সংসারের সহিত প্রাণ-পণ যুদ্ধের আয়োজনে নিষ্করুণ উদাস যৌবন। করুণার মুখের পানে পলকমাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া সে খাইতে বসিয়া গেল। অতীতের সুখের স্মৃতি তার ক্ষুব্ধ মনকে বেদনায় পীড়িত করিতে লাগিল, তাই এইরূপ আহারের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করিতে তার প্রবৃত্তি হইল না।

পানোন্মত্ত মাতালের নেশাটা কাটিয়া গেলে সে যদি দেখিতে পায়, একটা ড্রেনে সে পড়িয়া আছে, তখন তাহার যেমন আত্মগ্লানি এবং অনুতাপের অবধি থাকে না করুণারও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। মনসুরের চেয়ে সর্ব্বাংশে বরণীয় অনেক পাত্রই তাহার সমাজে করুণার প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু সে-ই তাদের উপেক্ষা করিয়া বিজাতি-যুবকের আলিঙ্গনে স্বেচ্ছায় বদ্ধ হইয়া যৌবনের রঙিণ মদির-ভরা পেয়ালায় ক্ষুধিতের মতন চুমুক দিয়াছে। ইহা গরল কি অমৃত তাহা সে ভাবিয়া বুঝিয়া বিচার করিয়া দেখিবার অবসর পায় নাই, ধৈর্য্যও ততখানি ছিল না। নিয়মিত কঠোর পরিহাসের ধাক্কায় তার সারা অঙ্গের মধ্যে আজ সেই বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। চিকিৎসা-শাস্ত্রে ইহার কী কোনো প্রতিকারের কথাই লেখা নাই?

মনসুর আহার সমাপ্ত করিয়া বাহির হইতে হাত মুখ ধুইয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, করুণা শকরীগুলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া এবং কাপড়-চোপড় ও সেলাইয়ের সরঞ্জাম উঠাইয়া রাখিয়া শুইবার উদ্যোগ করিতেছে। মনসুর লক্ষ্য করিয়া তার ভাব গতিক ভালো বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না, কাছে সরিয়া আসিয়া আস্তে-আস্তে বলিল, ভাত খেলে না?

করুণা মুখ বুজিয়া ঝাড়া বিছানাপত্র পুনরায় নীরবে পরিষ্কার করিতে লাগিল; কথাটা শুনিতে পাইয়াছে কিনা লক্ষণ দেখিয়া কিছু বোঝা গেল না।

মনসুর প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করিয়াও কোনো সুফল ফলাইতে পারিল না। এবার সে পিছন হইতে তার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিল, বলিল, কথা না বলো জোর করতে চাই নে, কিন্তু ভাত খাবে কিনা তাই বলো।

করুণা ঝাঁকি দিয়া হাতটা ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, ছেড়ে দাও বলচি, খাবো না আমি।

—উপোস্ করবে না কি?

—দরদ ছাখো, আমি খাই আর না খাই তোমার তো পেট ভরেচে, শুয়ে পড়ো। বক্-বকানি ভালো লাগচে না।

মনসুর মুখ ফিরাইয়া খুব খানিকক্ষণ নীরবে নিঃশব্দে হাসিয়া লইয়া, গাম্ভীর্য্য সঞ্চয় করিয়া বলিল, আজ তো বক্-বকানিই হবে, পুরাণো হয়ে গেছি যে।

করুণা সকাতর-চোখের অনুযোগ ভরা উজ্জ্বল দৃষ্টি স্বামীর আনত মুখের উপরে তুলিয়া ধরিয়া মিনিট দুই দাঁড়াইয়া থাকিয়া শুইয়া পড়িল। মনসুর কাছে আসিয়া

বলিল, ক্ষিদে পেটে রেখে রাগ করতে হয় না, তাতে নিজেকেই তো সব দিক দিয়ে ছোটো করা হয়, ভোগও মন্দ পোয়াতে হয় না। শেষে সারা-রাত ক্ষিদের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ কোরো'খন, ওঠো, যাও, খেয়ে এসো। বলিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া করুণাকে উঠাইবার প্রয়াস পাইল।

করুণা পাশ ফিরিয়া শুইয়া বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল, জ্বালাতন কোরো না বলে রাখছি, খাবো না—খাবো না—খাবো না।

মনসুর অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটটা ফেলিয়া দিয়া অন্য একটা ধরাইল।

অনেক রাত্রে মনসুর জাগিয়া স্ত্রীর গায়ে হাত দিতেই সে বিরক্তিতে একপাশে ঠেলিয়া দিল। মনসুর বুঝিল, করুণা এ পর্য্যন্ত ঘুমায় নাই, এখন অবধি জাগিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

মনসুর খানিকক্ষণ ভাবিয়া লইয়া বলিল, সেই যে তখন দু'কুর বেলা ডাক্তারী করার বিরুদ্ধে বলেছিলুম, তাইতে? তুমি তো খুব মনে করে রাখতে পারো। বাস্তবিক ভাখো, আমার একজন কবি-বন্ধু ছিলেন তার যা দুরবস্থা দেখেছি, তিলকে তাল করে ভাববার তার অসম্ভব ক্ষমতা, মনে তার সে জন্যে এক ফোঁটা শান্তিও নেই। তোমাকে তো আমি জানি, কবিতা না লিখতে পারলেও তুমি কবি—অন্তর কাব্যময়—ভাবপ্রবণ। দু'কুরে কি বলেছিলুম সে কথা আমার স্মরণই নেই, অথচ তাই মনে করে রেখে তুমি সেই অবধি গুমরাচ্ছ—ধন্যি মেয়ে।

করুণা অভিমানের সুরে বলিল, মনে করে রাখবে না—হুঁ। কে যে কাকে কতখানি ভালোবাসে এতেই তার প্রমাণ।

মনসুর চমকিয়া উঠিয়া পলক মধ্যে তাহা গোপন করিয়া লইয়া হাসিয়া বলিল, এতেই প্রমাণ! লজিক আমি পড়ি নি, আচ্ছা বলো তো কী করে?

—কি করে শুনবে, ধরো, ঐ কথাটা কি তার চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু অন্য লোকে যদি বলতো, আমি গ্রাহ্যই করতুম না—হেসে উড়িয়ে দিতুম, কিন্তু যাকে পৃথিবীর সব কিছু এমন কি নিজের প্রাণের থেকেও ভালোবাসা যায়, সে যদি সামান্য কিছুও করে, যা মনকে পীড়িত করতে পারে, তা যেন বুকে বজ্র হয়েই বাজে। মনে হয় যাকে আমি এত প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি, সে যেন বাসে নাই—বাসে না। তুমি নিষ্ঠুর।

মনসুর সস্নেহে আস্তে-আস্তে বলিল, আমি ভালোবাসি নে এই সত্যিটে আবিষ্কার করেচো এতদিনে—পাগলি। যাকে ভালোবাসা যায়, তার ওপরেই দাবী চলে, সে কথাটাও তো তুমি জানো। বুক চিরে দেখাবার উপায় যে নেই তাই…। একটু থামিয়া সোহাগে স্নেহে গাল দুইটা টিপিয়া দিয়া বলিল, ডাক্তারী সম্বন্ধে আমি যা বলেচি তাই করবে তো করুণা?

করুণা আনন্দে স্বামীকে বুকের নিকট টানিয়া আনিয়া বলিল, তোমার ইচ্ছাই তো আমার ইচ্ছা। সে ইচ্ছা আমি কি কখনো অপূর্ণ রাখতে পারি? —আগামীবারে সমাপ্য

প্রভেদ

—খায়রুন্নেছা

দেহ,—পঞ্চভুতের মেলা
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোম;
আত্মা,—শুদ্ধ, দীপ্তিময়
উল্কা, গ্রহ, তারা, সূর্য্য, সোম।

রূপ,—সে ত আগুনের শিখা
বিলাসির সাধনার ধন;
গুণ,—সে যে শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার
ধরিত্রীর শিরের ভূষণ।

রসায়ন-বিজ্ঞানের রহস্য

—প্রবন্ধ—

—গুরুগোবিন্দ পাল্লাদার, বি-এ, বি-এল,

সাধারণ কর্পূরের অণুকে (molecule) বিশ্লেষণ করিয়া সংশ্লেষণ প্রণালীতে (synthetic method) কর্পূরের অণু-গঠন প্রণালী আবিষ্কার করিতে তিন বৎসর সময় লাগিয়াছিল। ঐ সময়কে দুইশত কি তিনশত দ্বারা গুণ করিলে, আমেরিকার রঙ্ প্রস্তুত-শিল্পের জটিলতার ও পুঙ্খানুপুঙ্খতার অনেকটা ধারণা হইতে পারে। কারণ, প্রত্যেকটা রঙ্ (dye)—অর্থাৎ প্রত্যেকটী বর্ণ (colour) ও তাহার সম্ভবপর প্রত্যেক প্রকার "শেড্" এর জন্য, কর্পূর প্রস্তুতের প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছে।

ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, একটী বর্ণও আল্‌কাতরা হইতে সাক্ষাৎভাবে পাওয়া যায় না। দশটী মূল দ্রব্য (ten crudes) বর্ণহীন তরল পদার্থ। রঙ্ প্রস্তুত কার্য্যে ঐগুলিকে পরস্পর মিলিত করিতে, পৃথক করিতে, কি যোগ করিতে কিম্বা বিশেষ প্রক্রিয়াধীন করিতে হয় এবং এই কার্য্যটী অণুর (molecule) ভিতরে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। ঐ অণু মধ্যে একটী পরমাণু (atom) অধিক কি অল্প হওয়া এবং তাহা যে প্রণালীতে বিন্যস্ত তাহার দ্বারা অণুর পার্থক্য হেতু, রঙ্ ঘটিত সকল প্রকার পার্থক্য সংঘটিত হয়। যেমন, মনে কর, t, r, a এই তিনটী অক্ষর লওয়া গেল; তাহারা প্রত্যেকটী যেন এক একটী পরমাণু (atom) এবং এই তিনটী অক্ষরের নানাপ্রকার বিন্যাস দ্বারা যে সকল শব্দ গঠিত হয়, সেই সকল শব্দ, ভিন্ন ভিন্ন রঙ্ স্বরূপ রাসায়নিক যৌগিকের (chemical compounds) অণু (molecules)। এই তিনটী অক্ষরকে একভাবে বিন্যস্ত করিলে art শব্দটী পাওয়া যায়; এই art শব্দের প্রথম অক্ষর a বর্জ্জন করিলে অর্থশূন্য rt হয়; কিন্তু a কে পুনর্ব্বার বসাইয়া r অক্ষরকে বর্জ্জন করিলে at হয়। রীতিমত বর্ণ-বিন্যাস না হইলে কেবল বর্ণ-সংযোগের দ্বারা কোনও অর্থ-বোধক শব্দ উদ্ভব হয় না; atr এবং tra, এই দুইটী বর্ণ-সংযোগের কোনও অর্থ নাই, অথচ ইহারাও বর্ণ-সংযোগে প্রাপ্ত। যদি এই অর্থশূন্য বর্ণ-সংযোগকে অকর্ম্মণ্য বোধে বর্জ্জন না করা যায়, সে ক্ষেত্রে atr এর পূর্ব্বে p অক্ষর যোগ করিলে patr এবং patr এর শেষে on যোগ করিলে যে patron শব্দটী পাওয়া যায়, তাহা অর্থ-বোধক। tra বর্ণ-সংযোগের পূর্ব্বে ও পরে, যথাক্রমে con ও ry যোগ করিলে অর্থ-বোধক contrary শব্দটী পাওয়া যায়। এইরূপ বর্ণবিন্যাসে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এই দুই মাপ আছে; কিন্তু জড়-পদার্থের আয়তন থাকায় তাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ এই তিন মাপ ধরিতে হয়; তজ্জন্য, শব্দ-গঠনে বর্ণ-বিন্যাস অপেক্ষা অণু গঠনে পরমাণু বিন্যাস অধিকতর জটিল ব্যাপার। কেমিষ্টগণকে অণু মধ্যে পরমাণু বিন্যাস করিতে এবং একটীকে অপরটীর উপর বসাইতে হয়। তাঁহারাও কোল্-টারের পূর্ব্বোক্ত দশটী মূল পদার্থ হইতে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ প্রণালী-ক্রমে রঙ্ সকল উৎপন্ন করেন। এতদুদ্দেশ্যে কেমিষ্ট্রীর গ্রন্থ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের, শ্রম-শিল্পের, বে-সরকারী কেমিষ্টদের লাইব্রেরীর গ্রন্থ সমূহ এবং কেমিষ্ট্রী সংক্রান্ত পত্রিকা তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইয়াছে। কেমিষ্ট্রী সংক্রান্ত লক্ষ লক্ষ কাগজ-পত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে হইয়াছে। "পেটেণ্ট্" আফিসের ৫০ বৎসরের রেজিষ্ট্রী বহি খুঁজিতে হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে যে সকল রঙ্ তখন দেশ মধ্যে চলিত, ছিল সেইগুলিরও বিশ্লেষণ পরীক্ষা (analysis) করা হইয়াছে।

রঙ্-শিল্প (dye-industry) প্রতিষ্ঠিত করিতে জার্ম্মাণীর অন্ততঃ ৫০ বৎসর সময় লাগিল। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সে রঙ্ প্রস্তুত করার কেবল সাতটী "ফারম্" এবং পাঁচশত কারিগর

ছিল এবং তথায় ব্যবহৃত রঙ্-এর সমষ্টির ১৯ ভাগ জার্ম্মাণী হইতে আমদানী হইত; কিন্তু লোকেরা দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া, এবং "আমেরিকায় রঙ্ প্রস্তুত করা অসম্ভব" এই কথা অগ্রাহ্য করিয়া ১৯১৭ খৃঃ অব্দের মধ্যে ১১৮টী রঙ্ প্রস্তুত কারখানা স্থাপিত করিয়া উৎকৃষ্ট রঙ্ সকল প্রস্তুত করিতে থাকে। আমেরিকায় ১৯১৩ খৃঃ অব্দে যে পরিমাণ রঙ্ জার্ম্মাণী হইতে আমদানী হয়, ১৯১৭ খৃঃ অব্দে তথায় সেই পরিমাণ রঙ্ প্রস্তুত করা হয় এবং ঐ সময়ের পূর্ব্বে আমেরিকায় যে পরিমাণ মূল্যের রঙ্ আমদানী করা হইত, ঐ বৎসর তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ মূল্যের রঙ্ আমেরিকা হইতে বিদেশে রপ্তানী হয়। আমেরিকায় প্রস্তুত রঙ্ জার্ম্মাণীর রঙ্-এর তুল্য এবং অনেকস্থলে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতরও বটে।

"টলুওল্" হইতে T. N. T. "এক্সপ্লোসিভ" ও রঙ্ সকল প্রস্তুত করিতে প্রথম ৪টী প্রক্রিয়া একই প্রকারের; এবং পঞ্চম প্রক্রিয়াটী দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া, দক্ষিণ শাখায় T. N. T. এক্সপ্লোসিভ্ এবং বাম শাখায় রঙ্ সকল উৎপন্ন হয়। "ডু পন্ট্ কোম্পানী" (du Pont Company) উচ্চ শ্রেণীর বিস্ফোরক সকল প্রস্তুত করার জন্য বিশেষরূপ বিখ্যাত হইলেও তাঁহারা কেন তৎসঙ্গে নানাপ্রকার রঙ্, কৃত্রিম রেশম, নানাপ্রকার "পেণ্ট্" (paint) পাকা চর্ম্মের (leather) পরিবর্ত্তে ব্যবহার-যোগ্য দ্রব্য সকল ও অন্যান্য শত শত প্রকার পণ্যদ্রব্য, ব্যবহারিক কেমিষ্ট্রীর সাহায্যে প্রস্তুত করেন,—তাহা সহজেই বুঝা যায়। T. N. T. ও নানাপ্রকার রঙ্ মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ আছে, এই সকল দ্রব্য মধ্যেও তদ্রূপ রাসায়নিক সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধও সহজ-বোধ্য। প্রত্যেক স্কুল-ছাত্রই জানে, মনুষ্যগণ নিশ্বাস-বায়ু সহ যে কার্ব্বন্ ডায়ক্সাইড্ কিম্বা কার্ব্বনিক এ্যাসিড্ গ্যাস্ পরিত্যাগ করে, তাহা বৃক্ষ ও অন্যান্য সজীব উদ্ভিদ সকল গ্রহণ করিয়া তাহাদের শরীর পোষণ করে এবং তাহা প্রতিনিয়ত চূণের (lime = CaO) সঙ্গে মিলিত হইয়া ক্যাল্শিয়াম্ কার্ব্বনেট্ ($CaCO_3 = CaO + CO_2$) উৎপন্ন করে; মার্ব্বল্ (marble) ও লাইম্ষ্টোন্ (lime stone = চূণাপাথর) উক্ত কাল্শিয়াম্ কার্ব্বনেটের সুপরিচিত দৃষ্টান্ত। এমারত নির্ম্মাণে যে চূণ ব্যবহৃত হয়, তাহা সর্ব্বদা বায়ু হইতে কার্ব্বণ ডায়ক্সাইড গ্রহণ করিয়া কঠিন আকার ধারণ করে, কারণ, চূণ, বায়ুস্থ কার্ব্বণ ডায়ক্সাইড্ সঙ্গে আস্তে আস্তে মিলিত হইয়া চা-খড়িতে (chalk = চক্) পরিণত হয়।

বৃষ্টি ও তুষারও বায়ুমণ্ডলস্থ কার্ব্বণ ডায়ক্সাইড্ ধৌত করিয়া ঝরণা সকলের জলমধ্যে মিশ্রিত করে এবং তথায় তাহা পাহাড় পর্ব্বত সকলের গাত্র হইতে বৃষ্টির জলস্রোতে স্খলিত হইয়া নীত লাইম্ ষ্টোন্ (lime stone) সহ মিলিত হইয়া জলের কষদোষ (hardness) জন্মায়। এই মিলনের ফলে ক্যাল্শিয়াম্ কার্ব্বনেট্ ও ম্যাগ্নেশিয়াম্ কার্ব্বনেট উৎপন্ন হয়; সাধারণ লাইম্-ষ্টোন্ মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় কার্ব্বণ ডায়ক্সাইড বিদ্যমান থাকিলে, কেমিষ্টগণ তাহাকে উপরোক্ত নাম প্রদান করেন।

কষ-দোষ যুক্ত জলে (hard water = হার্ড ওয়াটার) সাবান গুলিলে তাহা পিচ্ছিল না হইয়া থানা থানা কণা সকলের আকারে জলের উপর ভাসমান হয়; কারণ, সাবানের ভিতরস্থ "ফ্যাটী এ্যাসিড্" (fatty acid) জলে দ্রবনীয় "সল্ট" (salt) মধ্যে থাকে; তাহার সঙ্গে কষ-যুক্ত জলের চূণ মিশ্রিত হইয়া, জলমধ্যে অদ্রবনীয় (insoluble in water) একটী "সল্ট" (salt) উৎপন্ন করে এবং তাহাই ঐ ভাসমান কণা।

ঝরণা হইতে কার্ব্বণ ডায়ক্সাইড, চূণের ক্যাল্শিয়াম্ ধাতু সহ মিলিত হইয়া নদী সকল মধ্যে পতিত হয়। নদী সকল কর্ত্তৃক তাহা সাগরে নীত হয়; তথায় নবজাত ঝিনুক ও সাগরতলস্থ কঠিন-খোলযুক্ত (hard-shelled) প্রাণী সকল তাহা গ্রহণ করিয়া তাহার ক্যাল্শিয়াম্ দ্বারা তাহাদের খোল (shell) গঠিত করে। ইহাতে দেখা যায় যে, ঝিনুকের খোল, পাহাড়-গাত্র ধৌত চূণ, ও বায়ুমণ্ডল হইতে ধৌত কার্ব্বণ ডায়ক্সাইডের সম্মিলনে গঠিত। ঝিনুক, এমারত নির্ম্মাণের প্রস্তর, বৃক্ষ, ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ শরীর গঠনে,—প্রাণীগণের নিশ্বাস, কারখানার ও পারিবারিক "চিম্নী" (chimney) সকল ও সর্ব্বপ্রকার প্রজ্জ্বলিত অগ্নি,—সাহায্য করে। বায়ুমণ্ডলের প্রত্যেক চারি সহস্র ভাগ মধ্যে এক ভাগ মাত্র কার্ব্বণ ডায়ক্সাইড আছে। *

* American Magazine.

ফোরাত

—শেখ ফজলল করিম, সাহিত্য-বিশারদ

১

ফোরাত ! ফোরাত ! ও পোড়া-বরাত ! কান্নাই তোর ভালো।
এই বারি-রাশি থাকিতে ও-বুকে নিভে গেল নবী-বংশ আলো !
গেল জ্ঞাতিগণ, যোদ্ধ সকল,
শিশু ম'রে গেল করি 'জল' 'জল',
তুই সে কাঁদন শুনিলি না কানে, ছিলি রে কিসে বিভোর—
ফোরাত ! ফোরাত ! ও পোড়া-বরাত ! কান্নাই ভালো তোর !

২

নব-বিবাহিতা বধূরে পাষাণি ! বিধবা করিলি তুই,
ইচ্ছা হয়-না আজ আর তোর জল-টুকু হাতে ছুঁই !
এক ফোঁটা পানি দিলে কাসেমেরে,
এমন করিয়া মরিত কি সে-রে,
তোরই দোষে কত আধ-ফোটা ফুল ঝ'রে প'ড়ে হ'ল কালো !
ফোরাত ! ফোরাত ! ও পোড়া-বরাত ! কান্নাই তোর ভালো !

৩

জালেমেরদল পেল' তোর জল, মজলুম মহরুম,
মৃত্যু-মাতম শুনি' তাহাদের ভাঙিল না কাল-ঘুম !
কেন ভাসাইয়া দিলি না কাফেরে,
মিথ্যা বাঁচা'লি বধি সত্যেরে,
নবীর বাগান দিলি খালি ক'রে—নিভালি রে সব আলো !
ফোরাত ! ফোরাত ! ও পোড়া-বরাত ! কান্নাই তোর ভালো !

৪

আজ কেঁদে আর কী ফল হবে রে, থামা' কুলু-কুলু তান,
তোর কৃপণতা এনেছে ধরায় বুক-ভাঙা এক গান !
'হা' হোসেন' ধ্বনি থামিবে না আর,
আকাশে-বাতাসে ক্রন্দন সার !
ঝরিবে অঝোরে ফাতেমা মা'য়ের করুণ আঁখির লোর !
ফোরাত ! ফোরাত ! ও পোড়া-বরাত ! কান্নাই ভালো তোর !

৫

কেন শুকাইয়া গেলি নে' আজিও ওরে ও-দুঃখের দরিয়া !
কোথা গেল তা'রা এসেছিল যা'রা একদিন পথ-ভুলিয়া !
পানির পিয়াসে হ'য়ে জ্ঞানহারা
তোর কূল থেকে ফিরে গেল যা'রা,
তা'রাই যদিরে না বাঁচিল তবে তোর বাঁচা কেন আর ?
ফোরাত ! ফোরাত ! তোর বুকে ব'ক কাঁদনের পারাবার !

৬

তোর পানি আর কত মিঠা বল্, কতখানি তার দাম,
"কওসর" জলে তা'দের তিয়াস মিটিতেছে অবিরাম !
দুনিয়ার বুকে মাতম তুলিয়া
রহিলি পিপাসা-কাতরে ভুলিয়া,
ও পোড়া-কলঙ্ক বহিয়া শিরে ইতিহাস হ'ল কালো !
ফোরাত ! ফোরাত ! ও পোড়া-বরাত ! কান্নাই তোর ভালো !

৭

শত্রুও দেয় শত্রুর মুখে মরণের কালে পানি,
নবী-দুলালেরা কি করিল তোর ওরে, ওরে শয়তানি !
তোর জলে যা'রা বাঁচিল সেদিন,
জানে সকলেই তা'রা কত হীন,
খুনে লালে লাল সেই মুখগুলি জ্বল্-জ্বলে' থেকে গেল' !
ফোরাত ! ফোরাত ! ও পোড়া-বরাত ! কান্নাই তোর ভালো !

৮

মিটেছে ত তোর মনের বাসনা, হ'য়েছে ত সব শেষ,
তবু লোকে শোনে তোর ওই তানে সেই কান্নার রেশ !
লোহুর লহর আজো দেখে জারি,
চোখ ফেটে পড়ে দর-দর বারি,
বুক ফেটে যায় ! তিয়াসে নিভিল কত জীবনের আলো !
ফোরাত ! ফোরাত ! ও পোড়া-বরাত ! কান্নাই তোর ভালো
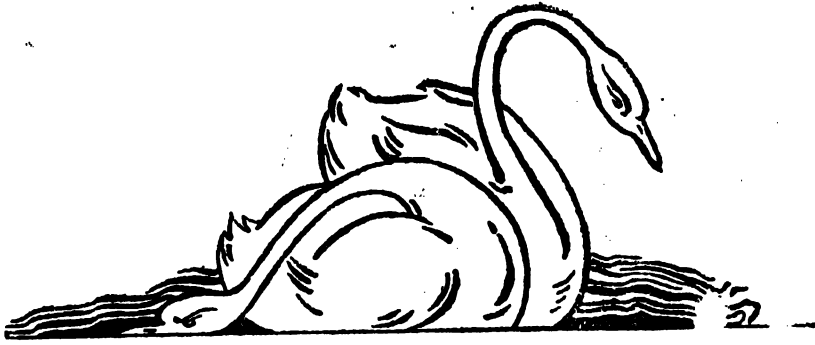
সঙ্কলন

প্রাচীন বাংলার নৌ-শিল্প

রেল ও খাল

রেল ও খাল এই দুইটী জিনিষই বাণিজ্য-উন্নতির প্রধান সহায় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। দেশ-দেশান্তর হইতে আমদানী ও রপ্তানী করিবার পক্ষে এই দুইটা পথই অপরিহার্য্য। কিন্তু রেল অপেক্ষা খালে বাণিজ্যের প্রচলন অধিকতর লাভজনক বলিয়া ইউরোপের সভ্য-দেশ সমূহে খাল খনন ও নদীসমূহের গভীরতা সম্পাদনে রাজ-পুরুষরা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন; অষ্ট্রিয়া গভর্ণমেণ্ট ১৮৫০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৯০৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৩৭৭০ কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছেন ও হাঙ্গেরী গভর্ণমেণ্টও এই বিষয়ের জন্য ১৮৭৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৯০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৩৩ কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ইউরোপের বহু দেশের গভর্ণমেণ্ট দূরবর্ত্তী নদী সমূহ বহু কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী দ্বারা সংযোজিত করিয়া নৌ-বাণিজ্য বিস্তারের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন; আর আমাদের বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কি করিতেছেন?

ইউরোপ ও আমেরিকা

ইউরোপ ও আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট জল-প্রণালীর জন্য সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াও নৌ-জীবিদিগের নিকট হইতে অতি সামান্য পরিমাণে "টোল" আদায় করেন। কিন্তু বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট নৌ-বাণিজ্য প্রসারের কোন চেষ্টাই করেন না। অথচ এদেশেই "টোল" করের হার অন্য সভ্য দেশ অপেক্ষা অধিক; নূতন খাল কাটা দূরে থাক, আমাদের দেশের পূর্ব্ব পুরুষরা অতি দক্ষতার সহিত যে সমস্ত খাল নদী হইতে কাটাইয়া আনিয়া সমস্ত বঙ্গ-ভূমিকে সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা করিয়াছিলেন, আজ রেলের জন্য সেই সমস্ত খাল ও নদীর উপর দিয়া অনুচ্চ সেতু সকল নির্ম্মাণ করিতে দিয়া বড় বড় নৌকা গমনাগমনের পথ রুদ্ধ করিয়া নৌ-বাণিজ্যের প্রসার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, ঐ সেতু সকল রক্ষায় কর্ত্তৃপক্ষ এমন উপায় অবলম্বন করিয়াছেন যে, তাহার ফলে আজ বঙ্গদেশে অধিকাংশ খালই মজিয়া গিয়াছে। নদ-নদী তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য হারাইয়া এক-একটা শুষ্ক খালে পরিণত হইয়াছে; তাই আজ করতোয়া নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নয়ন অশ্রু পূর্ণ হইয়া যায়।

রেল বিস্তারে অসুবিধা

এই রেল বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের নৌ-নির্ম্মাণ শিল্প একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে; অতি প্রাচীন কাল হইতেই নৌ-শিল্পের জন্য বাঙ্গালা দেশ বিখ্যাত ছিল; বাঙ্গালী এক সময়ে সিংহল বিজয় করিয়া বাঙ্গলার গৌরব ঘোষণা করিয়াছিল। বঙ্গবাসীই এক দিন নৌকারোহণ করিয়া সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি দেশে বসবাস করিতে গিয়াছিল; এবং শ্যামদেশ অদ্যাপি বঙ্গবাসীর বংশধরগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে। বহু শত বর্ষ ধরিয়া বাঙ্গলার নৌবল-গর্ব্বিত রাজগণ সগর্ব্বে বাঙ্গলা দেশ শাসন করিয়াছিলেন। মুসলমান আমলেও বাঙ্গলার এই নৌ-শিল্প বিনষ্ট হয় নাই। ঘটক কারিকায় বর্ণিত প্রতাপাদিত্যের জামাতার পলায়ন ব্যাপারে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাহাতে আছে—"চতুঃষষ্টি দণ্ডযুক্ত কামান সমূহে সজ্জিত সৈন্যের দ্বারা অভিরক্ষিত নৌকায় আরোহণ করিয়া কামান ধ্বনি করিতে করিতে স্বীয় গমন বার্ত্তা জানাইয়া চলিয়া গেলেন।

পুরাতন শিল্প

১৮০০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা নৌ-শিল্পে হীনপ্রভ হয় নাই; বরং দিন দিন উন্নতি লাভই করিতেছিল। ঐ সময়ে বঙ্গদেশে নির্ম্মিত অর্ণব-পোত দর্শনে বহু দেশের লোকের হৃদয়ে হিংসার উদ্রেক হইত। আজ যে গঙ্গার উপর পণ্যবাহী বিদেশী জাহাজের ভীড় দেখিতে পাই, ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ঐ স্থান বহু সংখ্যক দেশীয় শিল্পী নির্ম্মিত অতি বৃহৎ অর্ণব-পোত সমূহে পূর্ণ থাকিত এবং দেশীয় লোকের অধীনে পরিচালিত হইয়া দেশ দেশান্তরে গমন করিত।

এই সমস্ত অর্ণবপোত যে বিলাতে প্রস্তুত জাহাজ অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট ছিল—তাহা ওয়াকার সাহেবের লিখিত পুস্তক পাঠ করিলে বোঝা যায়। তিনি লিখিয়াছেন যে, তখনকার দিনে বিলাতে নির্ম্মিত জাহাজ-গুলি ১২ বৎসর পরেই অকর্ম্মণ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, কিন্তু এদেশীয় সেগুন কাঠে নির্ম্মিত জাহাজগুলি পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকিত; ১৪।১৫ বৎসর কাল ব্যবহৃত এদেশীয় জাহাজগুলি বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ অতি আগ্রহের সহিত ক্রয় করিয়া লইতেন। আজ কোথায় গেল বাংলার সেই সকল শিল্পী? আজ কেবল সেই দিনের কথাই মনে পড়িতেছে—যেদিন ভারতবর্ষে নির্ম্মিত পোত ভারতীয় পণ্য সামগ্রী লইয়া যখন লণ্ডন বন্দরে উপস্থিত হইল, তখন বিলাতের একাধিপত্যকামী শিল্প ব্যবসায়ী সমাজে কি ভয়ঙ্কর হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। এই ঘটনায় বিলাতের জনসমাজ যেরূপ বিচলিত হইয়াছিল, শত্রুপক্ষগণ যদি সহসা রণতরী লইয়া বিলাত আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলেও বোধ হয় তদপেক্ষা অধিকতর বিচলিত হইত না। টেলার সাহেবের প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায় যে, তখন লণ্ডনের নৌ-নির্ম্মাণকারীরা ভয় সূচক

চীৎকারে চারিদিক কম্পিত করিয়া বলিতে লাগিল যে, তাহাদের ব্যবসায় এইবারে উঠিয়া যাইবে এবং বিলাতের সমস্ত নৌ-শিল্পীদিগকে এইবারে নিশ্চিত সপরিবারে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

ধ্বংসের কারণ

১৭৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে বঙ্গে বাণিজ্যপোত নির্ম্মাণ বিস্তার হইতে থাকে, তখনকার দিনে খিদিরপুর, টিটাগড় এবং কলিকাতার পুরাতন টাঁকশালের নিকট এক একটি জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা ছিল; ঐ সকল স্থানে খুব বড় বড় জাহাজ নির্ম্মিত হইত। ইহাই তখনকার দিনের বিলাতের জাহাজ নির্ম্মাণকারীদের গাত্রদাহের কারণ হইয়া উঠিল। তাহারা চীৎকার করিতে লাগিল যে, বিলাত হইতে অর্থ লইয়া গিয়া ভারতবর্ষে নৌ-নির্ম্মাণ কিছুতেই সমর্থন যোগ্য নহে। তাহাদের চীৎকারে ইংরাজ বণিকদের মতি পরিবর্ত্তন হইল। তাঁহারা অধিক অর্থব্যয় করিয়া বিলাতেই জাহাজ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন, আর তখন হইতেই এদেশীয় পোতনির্ম্মাণ শিল্প ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

বৃহৎ অর্ণবপোতের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাই যে, ইংরাজ এদেশে আসিবার সময়ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু জলযান ভারত-সাগর ও আরব-সাগরের উপকূলে পণ্য সামগ্রী বহন করিত এবং লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি এই কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। রেল বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত নৌকারুলের চিহ্ন ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। আজ তাই ক্ষুধার্ত্তের হাহাকারে বঙ্গ-গগন বিদীর্ণ হইতেছে। অনাহারে, অর্দ্ধাহারে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে; কিন্তু কালের গতি ফিরাইতেই হইবে। সমস্ত লুপ্ত শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই লুপ্ত শিল্পেরও উদ্ধার করিতে হইবে; দেশের যুবকদের দেশ-বিদেশে গমন করিয়া এই বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে, অন্যান্য ভ্রাতাদের শিক্ষাদান করিয়া দেশের ও দশের উপকার করিতে হইবে এবং নূতন নূতন জাহাজ কোম্পানী গঠন করিয়া দেশ-বিদেশ হইতে অর্থ সমাগমের পথ সুগম করিতে হইবে।

এই সঙ্গেই আমরা বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠিত স্বদেশী জাহাজ কোম্পানীগুলির কর্ম্মকর্ত্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। দেশীয় লোকেরা তাহাদের সাধ্যমত স্বদেশী জাহাজ কোম্পানীতে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। স্বদেশী জাহাজ কোম্পানীর মালিকগণও যদি তাহার পুরস্কার স্বরূপ দেশীয় লোকদের জাহাজে কাজ দিয়া সাহায্য করেন, তবে অচিরে এই শিল্পের উন্নতি সম্ভবপর হইয়া উঠিবে এবং এই প্রকারে অনেক লোকের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিয়া দেশ-মাতৃকার ধন্য-বাদার্হ হইবেন।

—ব্যবসা-বাণিজ্য

ভারতীয় টাকার ইতিহাস

পাঠান সম্রাট শেরসাহের রাজত্বকালে ভারতে সর্ব্বপ্রথম টাকার প্রচার হয়। অতঃপর ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গদেশে সিক্কা টাকার প্রচলন করেন। এই টাকায় অঙ্ক সংখ্যা সম্রাট শাহ আলমের শাসনের ১৯ সাল বলিয়া লেখা ছিল। এই টাকা মেশিনে প্রস্তুত হইত বলিয়া ইহাকে কলের টাকা বলা হইত।

অতঃপর ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানি সমগ্র ভারতের জন্য টাকা প্রচলন করিতে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কোম্পানি রাজা চতুর্থ উইলিয়মের প্রতিকৃতি সহ টাকার একটি ডিজাইন্ প্রস্তুত করিয়া বড়লাটের নিকট মঞ্জুরীর জন্য প্রেরণ করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বড়লাট এই ডিজাইন মঞ্জুর করেন এবং এই সালে নূতন টাকা বাহির হয়। এই নূতন টাকার একদিকে রাজা চতুর্থ উইলিয়মের প্রতিকৃতি ও অপর দিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নাম অঙ্কিত ছিল। এই টাকাকে কোম্পানির টাকা বলা হইত এবং তাহার ওজন ছিল ১৮০ গ্রেণ।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে টাকার রূপ তৃতীয় বারের মত পরিবর্ত্তিত হয়। এবার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি টাকায় প্রকাশিত করা হয়। এই টাকায় মহারাণীর ছবিতে কোন রাজমুকুট ছিল না। টাকার পিছনের দিকে তখনও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নাম অঙ্কিত ছিল।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিংএর সময়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত হইতে ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলে পর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে আবার টাকার রূপ পরিবর্ত্তিত হয়। এবার মহারাণীর মস্তকে মুকুট পরান হয় এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নাম তুলিয়া দিয়া পিছন দিকে ইণ্ডিয়া শব্দটী মুদ্রিত হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়া সম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ করিলে পর পুনরায় টাকার পরিবর্ত্তন হয় এবং এবার রাজ্ঞী শব্দের স্থলে সম্রাজ্ঞী শব্দটী যোজনা করা হয়। এই মুদ্রা ১৮৭৬ হইতে ১৯০১ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

১৯০২ সালে কোন নূতন টাকা তৈরী করা হয় নাই। অতঃপর ১৯০৩ সালে সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ডের প্রতিকৃতি সহ নূতন টাকা প্রচারিত হয়। এই টাকায় সম্রাটের মস্তকে কোন রাজ-মুকুট ছিল না; ১৯১০ সালে রাজ-মুকুট শোভিত এড্ওয়ার্ডের নূতন ধরণের টাকা প্রচারের ব্যবস্থা হয়। এতদুদ্দেশ্যে একটি ছাঁচও তৈয়ার করা হয়; কিন্তু এই সময়ে সম্রাটের মৃত্যু হওয়ায় টাকা আর প্রচারিত হয় নাই। এই অপ্রচারিত টাকার একটি মাত্র নমুনা এখনও কলিকাতার টাকশালে রক্ষিত আছে।

১৯১১ সালের শেষ দুই মাসে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের প্রতিকৃতি সহ টাকা, আধুলি, সিকি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখা হয় এবং ১২ই ডিসেম্বর দরবার দিনে তৎসমুদায় সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হয়। কিন্তু এই নূতন টাকার মধ্যে সম্রাটের প্রতিকৃতির নিম্নে যে হাতীর প্রতিকৃতি ছিল, তাহা অস্পষ্ট থাকায় ১৯১২ খৃষ্টাব্দে নূতন ছাঁচে টাকা প্রস্তুত হয়। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের নামের টাকা ১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে ২০ লক্ষ ১০ হাজার প্রচারিত হইয়াছিল, অতঃপর আর নূতন টাকা তৈয়ার হয় নাই। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে এ পর্য্যন্ত বরাবরই টাকার ওজন ১৮০ গ্রেণ রাখা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৬৫ গ্রেণ খাঁটি রৌপ্য। —সম্মিলনী

সাইকেলে "শান্তি-নিকেতন"

— প্রবন্ধ —

—আবদুল গণি হালদার, বি-এ,

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের "বিশ্ব-ভারতী" বোলপুর "শান্তি-নিকেতনে" প্রতিষ্ঠিত। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ-গৌরব তথা ভারত-গৌরব রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ-সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের আসনে উন্নীত করিয়া যে "নোবেল প্রাইজ" লাভ করেন, তাহা তিনি আনাতোঁল ফ্রান্সের স্থায় পরহিতার্থে এই "বিশ্ব-ভারতী"তে দান করিয়াছেন। একথা অনেকদিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছি; কিন্তু "শান্তি-নিকেতন" চাক্ষুষ দেখিবার সুযোগ এ পর্য্যন্ত হইয়া উঠে নাই। এবার গুড্‌ফ্রাইডের ছুটীর সঙ্গে আমাদের কলেজ ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রায় দশ-বার দিন বন্ধ থাকে। এই সুযোগে একটা Pleasure trip ও tour দুই কাজই হইবে ভাবিয়া আমরা ঠিক করিলাম যে, সাইকেলে "শান্তি-নিকেতন" যাইতে হইবে। দূরও নেহাৎ কম হইবে না—হাঁটা-পথে প্রায় ১৪০ মাইল। আমাদের মধ্যে অনেকে গরমের জন্ত একটু আপত্তি জানাইতেই স্পষ্ট বলা গেল—"আজ-কালকার দিনে নরম-গরম, শুভ-অশুভ, লগ্ন-অলগ্ন দেখলে চলবে না—এখন আমাদের উচিত To think dangerously and to act dangerously," এই কথা শুনিয়া আমাদের এগারজনের মধ্যে প্রায় সকলেই উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল,—"অল্‌রাইট, সাইকেলেই যাব, যত কষ্ট হয় হবে।" অতঃপর চা, বিস্কুট, মাখন, কাপড়-চোপড়, ক্যামেরা ইত্যাদি ঠিক-ঠাক করিয়া প্রত্যুষে বাহির হইলাম। চন্দননগরে পৌছিতেই রৌদ্রের তাপ বেশ অনুভূত হইতে লাগিল। তখন হইতে ঠিক করিলাম যে, বেলা ১১টা হইতে অপরাহ্ণ ৫টা পর্য্যন্ত সাইকেল চালান হইবে না। এই সময়টুকু আহার ও বিশ্রামের জন্ত বাদ দিয়া রাত্রে এবং প্রত্যুষে সাইকেল চালান হইবে। বেলা ১৭টার সময়ে পাণ্ডুয়ায় পৌছিলাম। ভূদেব বাবু ভারতবাসীর আতিথেয়তা দেখাইতে গিয়া একস্থানে বলিয়াছেন—"পূর্ব্বে এক কপর্দ্দক সঙ্গে না লইয়া সারা-ভারতবর্ষ ভ্রমণ করা সম্ভবপর ছিল, কিন্তু সেদিন আর নাই।" কিন্তু আমাদের মনে হয়, সেদিন এখনও সম্পূর্ণ গত হয় নাই। পাণ্ডুয়া-নিবাসী মুন্সী খোদাবক্স সাহেব আমাদের যে যত্ন করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বাড়ীতে আহারাদি ও যত্ন পাইয়া আমাদের একাদিক্রমে ৪২ মাইল ভ্রমণের যাবতীয় কষ্ট লাঘব হয় এবং তিনি আমাদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লন যে, ফিরিবার সময়ে তাঁহার বাড়ী হইয়া ফিরিতে হইবে। বাস্তবিক আজ-কালকার এই দুর্দ্দিনে বাঙ্গালীর বিশেষতঃ বাঙ্গালী-মুসলমানের এতটা উদারতা ও অতিথি-সৎকার একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার!

বেলা ৫৷৷০ টার সময়ে পাণ্ডুয়া হইতে বাহির হইয়া রাত্রি ৯টার সময়ে বর্দ্ধমানে পৌছান গেল। রাত্রে বর্দ্ধমানের কর্জ্জন গেট্ ও রাজবাটীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া আশ্রয়ের অনুসন্ধান করিতে হইল। প্রায় ৭২ মাইল সাইকেল চালাইয়া অনেকেই একটু ক্লান্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু আশ্রয় পাওয়া দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। রাত্রি ৯টায় বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া এদিক-ওদিক ঘুরিতে রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেল। তখন রাজ-বাটীতে আশ্রয় চাহিতেই দ্বারবান বেশ বুঝাইয়া দিল,—"ম্যানেজার বাবু চলিয়া গিয়াছেন এবং গভীর রাত্রে আপনাদের ১২ জন অপরিচিত ব্যক্তিকে আশ্রয় দিতে পারি না—বিশেষতঃ আজ-কালকার দিনে।" শুনিলাম একটা স্কুল বোর্ডিংএ টুরিষ্টদের জন্ত

ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সেখানেও বিমুখ হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি—এমন সময়ে একব্যক্তি বলিল,—"আপনারা Municipal market এ থাক্‌তে পারেন, কিন্তু তার জন্য chairman এর permission আবশ্যক। চেয়ারম্যানকে এবং তাঁহার বাড়ী কোনখানে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, তিনি বর্দ্ধমান কোর্টেরই সুপ্রসিদ্ধ উকীল মৌলভী মহম্মদ ইয়াসিন সাহেব। ইয়াসিন সাহেবের নাম আমি অনেকদিন হইতে জানিতাম এবং তিনি যে এখন বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান তাহাও শুনিয়াছিলাম, কিন্তু আমরা যে তাহার বাড়ীর এত নিকটে আসিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, তাহা জানিতাম না। তাঁহার বাড়ীতে যখন যাই, তখন রাত্রি সাড়ে এগারটা। দেখিলাম—খদ্দর পরিহিত সৌম্যমূর্ত্তি এক প্রৌঢ় পার্শ্বে অনেক কাগজ-পত্রের তাড়া রাখিয়া চরকা কাটিতেছেন। বুঝিলাম, ইনিই উকীল সাহেব। রাত্রি সাড়ে এগারটার সময়ে তিনি আমাদের আহারাদির জন্য যে বিরাট আয়োজন করেন, তাহা উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। উকিল সাহেবের অমায়িক ব্যবহার, শিশু-সুলভ সরলতা, সমাজ-প্রীতি ও সর্ব্বোপরি স্বদেশ-প্রীতি আমাদিগকে মুগ্ধ করে। তিনি বলিলেন,—"অনেক হিন্দু টুরিষ্ট আমার এখানে থাকিয়া যান, আর আপনারা মুসলমান টুরিষ্ট হইয়া বাজারে থাকিবেন, তাহা কখনও হইতে পারে না; আমার এখানে থাকিতে আপনারা কোন সঙ্কোচ বোধ করিবেন না।" উকিল সাহেবের জ্যেষ্ঠপুত্র ও ভাগিনেয় আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়া বলিলেন,—"মুসলমান টুরিষ্ট আপনাদিগকে এই প্রথম দেখিতেছি, আশা করি, অচিরে আরও দেখিতে পাইব।" উকীল সাহেবের পুত্র ও ভাগিনেয় উভয়েই সুশিক্ষিত ও সুরুচি সম্পন্ন। তাঁহাদের সহিত দেশের অবস্থা, মোস্লেম সমাজের দুরবস্থা ও তাহার প্রতি-বিধানের উপায় প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইলাম।

তাহার পরদিন বর্দ্ধমান নগর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার ইচ্ছায় উকীল সাহেবের বাড়ীতেই কাটাইয়া দিই।

রাজপ্রাসাদ, কৃষ্ণসায়ার, কমলসায়ার, গোলাপবাগ ইত্যাদি দর্শনের পর আমরা পীর-বাহ্‌রাম নামক স্থানে শের আফগনের কবর দেখিতে যাই। শের আফগনের সমাধির চতুর্দ্দিকেই সুবিস্তৃত কবরস্থান। তাঁহারই পার্শ্বে মহানিদ্রায় তৎকালীন বঙ্গাধিপতি কুতুবউদ্দীন। শের আফগনের টুম্বের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া নূতন বর্দ্ধমান নগরের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলে কবির ভাষায় স্বতঃই বলিতে ইচ্ছা হয়:—

"শ্মশানের মাঝে ফুটেছিস্ তুই
চারিদিকে তোর কবরস্থান,
আজকে যখন জাগ্‌লিরে তুই
ঘুমুচ্ছে ওই মোগল পাঠান।"

শের আফগনের টুম্বের ফটো আমরা লইয়াছিলাম, কিন্তু বড় দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ফটো develop করিবার সময়ে সেখানি নষ্ট হইয়া যায়।

এই কবর দুইটীর উপর মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতির ব্যয়ে দুইখণ্ড প্রস্তরলিপি সংযোজিত হইয়াছে। প্রথমখানিতে লেখা—

Here lies Sher Afgan, Governor of Burdwan and first husband of Meherun-Nissa, afterwards the famous Mughal Empress Nurjehan A. D. 1610.

প্রস্তর-খণ্ডটির অপর পৃষ্ঠে ইহারই বঙ্গানুবাদ।

দ্বিতীয় লিপিটী এইরূপ—

Kutubuddin the foster brother of Emperor Jehangir received the promise of the high office of Subadar of Bengal on condition that he would procure for his Royal Master, the beautiful Meherun-Nissa, wife of Sher Afgan. Kutubuddin fell in the fight that ensued with his gallant opponent and is burried here A. D. 1610.

ইহারও অপর পৃষ্ঠে বঙ্গানুবাদ।

এইখানে ইতিহাস কিরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, তাহা দুই-এক কথায় না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে বর্দ্ধমানের জায়গীরদার শের আফগনের হস্তে বাঙ্গালার সুবাদার কুতুবউদ্দীন এবং কুতুবউদ্দীনের অনুচরবর্গের হস্তে শের আফগন নিহত হন।

শের আফগনের প্রকৃত নাম আলিকুলীবেগ এস্তেজালু। ইনি তাতারদেশীয়। কৈশরে একটী ব্যাঘ্র হত্যা করিয়া

'শের আফগন' অর্থাৎ "ব্যাঘ্র ভূমিতে নিক্ষেপকারী" এই উপাধি লাভ করেন। ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ ভ্রমবশতঃ তাঁহাকে শের আফগান বলিয়া থাকেন।

উপরি-উক্ত হত্যাকাণ্ড বর্দ্ধমানে সংঘটিত হয়। নানা কারণে ইহা জাহাঙ্গীরের জীবনের ও রাজত্বের প্রধান ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুসলমান বাদশাহগণের এক একটী কাল্পনিক অপবাদ সৃষ্টি করিয়া ও তাহা নানাপ্রকারে রঞ্জিত করা এককালে এদেশীয় ঐতিহাসিকগণের একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহাদের মতে, অসামান্ত রূপলাবণ্য-সম্পন্না মেহের-উন্নিসা লাভের জন্তই দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের প্ররোচনায় বা ইঙ্গিতে এই হত্যাকাণ্ড সমাধা হইয়াছিল; এবং বিভিন্ন ঔপন্তাসিক ও নাট্যকারগণ এই ঘটনার ঐতিহাসিক ভিত্তি কতটুকু তাহা আলোচনা না করিয়াই তাঁহাদের কল্পনা ও প্রতিভাবলে এই আমূল ভিত্তিহীন ঘটনাটিকে অতিরঞ্জিত করিয়া বিভিন্ন নাটক, উপন্তাস ও ইতিহাসের সৃষ্টি করিয়া হিন্দু-মোস্‌লেম সম্বন্ধ আরও তীব্র করিয়া তুলিয়াছেন। আজ দেশে এই হিন্দু-মোস্‌লেম বিরোধের জন্ত মুসলমানদের প্রতি ও তাহাদের ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ cheap-literatureএর বহুল প্রচার হইয়াছে।

শের আফগন্মের হত্যার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কারণটা উপাখ্যান মাত্র। ইহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। সমসাময়িক কোন ইতিহাসে বা জাহাঙ্গীরের স্বরচিত জীবনীতেও ইহার কোন উল্লেখ নাই। বঙ্গদেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ইতিহাস "সিরল মুতাক্ষীরীণ" বা "রিয়াজ-উস্ সালাতিনে" এইরূপ কোন কথারই উল্লেখ নাই, যদ্বারা কল্পনাও করা যাইতে পারে যে, জাহাঙ্গীরের ইঙ্গিতে বা আদেশে শের আফগন্দ নিহত হন। শাহজাদা যে মেহের-উন্নিসার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, একথার উল্লেখ একমাত্র (cheap literature) উপন্তাসেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অন্ত কোন প্রামাণিক বিবরণ নাই। বিভারিজ, ব্লকম্যান, ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি প্রতীচ্য ঐতিহাসিকগণ রিয়াজ-উস্ সালাতিন্‌কে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহোদয়ের অনূদিত রিয়াজ-উস সালাতিনে এই ঘটনার বিষয়ে যাহা লেখা আছে, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছে—

"আলিকুলীবেগ (শের আফগন্দ) সুলতান তাহমাস্ শাহের পুত্র সুলতান ইসমাইল শাহের ছাকারচি (বর্ত্তমান খানসামা) ছিলেন। সুলতানের মৃত্যুর পর তিনি কান্দাহার অতিক্রমপূর্ব্বক হিন্দুস্থানে আগমন করিয়া মুলতান আবদুর রহমান খান-খানানের দরবারে উপনীত হন। তৎকালে আবদুর রহমান ঠাট ও সিন্ধুপ্রদেশ জয় করিতে উদ্যোগী ছিলেন। তিনি আলিকুলীবেগকে বাদশাহী কর্ম্মচারী শ্রেণীভুক্ত করিয়া লন। আবদুর রহমান ঠাট ও সিন্ধু-প্রদেশ জয় করিয়া প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার অনুরোধে আকবর শাহ কুলীবেগকে উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করিয়া গৌরবান্বিত করেন। এই সময়ে কুলীবেগ তেহেরাণ নিবাসী মির্জ্জা গিয়াস-বেগের কন্তা মেহের-উন্নিসার পাণিগ্রহণ করেন। যৎকালে স্বর্গীয় শাহ দক্ষিণাপথ স্বাধিকার-ভুক্ত করিতে স্বয়ং আকবরাবাদ হইতে তথায় গমন করেন, ও শাহজাদা ওলি আহাদকে (পরে বাদশাহ জাহাঙ্গীর) উদয়পুরের রাণাকে সমূলে বিনষ্ট করিতে আদেশ করেন, তৎকালে আলিকুলীবেগ শাহজাদার সাহায্যকারী ছিলেন। শাহজাদা তৎকালে তাঁহাকে শের আফগন্দ খাঁ উপাধিতে বিভূষিত করেন। অতঃপর তিনি সিংহাসনে উপবেশন করিয়া শের আফগন্দ খাঁকে বঙ্গদেশের অন্তঃর্গত বর্দ্ধমান জেলা জায়গীর স্বরূপ দান করিয়া তথায় প্রেরণ করেন; কিন্তু শের আফগন্দ তথায় আগমন করিয়া নানাবিধ অসদনুষ্ঠান করাতে তাঁহার দুষ্কার্য্যের কাহিনী মোগল সম্রাটের কর্ণগোচর হয়। এজন্য যখন কুতুবউদ্দীন খাঁ বঙ্গদেশে আগমন করেন, তখন জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, "যদি শের আফগন্দ রাজদ্রোহী ও দুষ্ক্রিয়ান্বিত না হইয়া থাকে—তবে তাহাকে কিছু বলা দরকার নাই, অন্তথায় তাহাকে রাজদরবারে প্রেরণ করিতে হইবে। রাজদরবারে আসিতে যদি আপত্তি জানায়, তবে তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতে হইবে।"

কুতুবউদ্দীন বাঙ্গালায় পৌঁছিয়া শের আফগন্দের শাসন সংক্রান্ত কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিয়া বিশেষ অসন্তুষ্ট হন, এবং তাঁহাকে রাজসদনে উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। কিন্তু শের আফগন্দ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা কুতুবউদ্দীন বাধ্য হইয়া স্বয়ং শের আফগন্দের নিকট বর্দ্ধমানে রওয়ানা হইলেন। শের স্বয়ং

তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ম অগ্রসর হইলেন। একবার আদেশ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, এখন পাছে তাঁহাকে বন্দী করিয়া জাহাঙ্গীরের নিকট প্রেরণ করেন বা এইরূপ কোন সন্দেহবশে শের কুতুবকে তরবারি দ্বারা উদরে আঘাত করেন। ইহাতে বঙ্গেশ্বর মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাঁহার অনুচরবর্গ শেরকে হত্যা করিয়া প্রভুর মৃত্যুর প্রতিশোধ লন।

এই ঘটনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, শের আফগন্দের মৃত্যুর কারণ কুতুবউদ্দীনের প্রতি তাঁহার সন্দেহজনক ব্যবহার। এক রাজনৈতিক সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোন ব্যাপার, যথা—মেহের-উন্নিসা লাভ ইহার সহিত জড়িত নাই। প্রাদেশিক জায়গীরদারের অত্যাচার কাহিনী সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টে পৌঁছিলে, বাদশাহ তদ্বিষয়ে তদন্তের জন্ম কুতুবউদ্দীনের অধীনে একটী কমিশন প্রেরণ করেন। কিন্তু শের আফগন্দ্ কমিশনের প্রেসিডেণ্টকে সন্দেহ করিয়া হত্যা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ কর্ত্তৃক স্বয়ং নিহত হন।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, দেশীয় ঐতিহাসিক, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারগণ এই সাদা-সিদা সামান্য ব্যাপারের সহিত জাহাঙ্গীরের এক কাল্পনিক কলঙ্কের সৃষ্টি করিয়া তাহা নানাভাবে প্রচার ও অভিনয় করিয়াছেন বা করিতেছেন। স্বনামধন্য ঐতিহাসিক কীন্ সাহেব শের আফগন্দের হত্যা ব্যাপারে জাহাঙ্গীরকে নিষ্পাপ স্থির করিয়াছেন, এবং তাহার যে তিনটী কারণ তিনি দেখাইয়াছেন—তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক ঐতিহাসিক মহম্মদ হাদী এবং "ইক্‌বালনামা" নামক সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসের লেখক শেরের দুষ্কার্য্যই তাঁহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

(২) জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্মজীবনীতে আবুল ফজলের হত্যার ন্যায় অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন—কিন্তু শেরের হত্যা ব্যাপারে যে তিনি লিপ্ত ছিলেন, একথার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই।

(৩) শের আফগন্দের মৃত্যুর পর মেহের-উন্নিসা রাজসদনে আনীত হইলে বাদশাহ চারি বৎসর তাহার মুখাবলোকন করেন নাই, তাহার ভরণপোষণের নিমিত্ত যৎসামান্য ভাতা দিতেন মাত্র।

কীন্ সাহেবের নির্দ্ধারিত এই কারণগুলি বিশেষ সমীচীন বলিয়া আমাদের মনে হয়। এতদ্ব্যতীত "তওয়ারিখ্ হালাতে জাহাঙ্গীর" নামক একটী পারসী ইতিহাসে জাহাঙ্গীরকে মেহের-উন্নিসা প্রেরিত একটী আবেদন-পত্র পাওয়া যায়, তাহার বঙ্গানুবাদ নিয়ে দেওয়া গেল :—

"জগদীশ্বরো বা দিল্লীশ্বর! এ বাঁদীর বেশ স্মরণ আছে যে, বাল্যকালে বাঁদী যখন রাজ-অন্তপুরে ক্রীড়ায় মগ্ন থাকিত, তথায় জাঁহাপনা শুভাগমন করিয়া প্রায়ই ক্রীড়ায় যোগদান করিতেন। পরে যৌবনাবস্থায় শের আফগন্দের সহিত এ বাঁদীর শরিয়ত অনুযায়ী বিবাহ সম্পন্ন হয়। বাদশাহ পরে শের আফগন্দকে বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়া গৌরবান্বিত এবং আরও নানাভাবে পুরস্কৃত করেন। কিন্তু তাঁহার অকৃতজ্ঞতার জন্য আমার যে লজ্জা ও আক্ষেপ হইতেছে, তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত। তিনি স্বীয় ক্রূরমতিত্বের পরিচয় দিয়া জাঁহাপনার ন্যায় সদ্বিচারপরায়ণ, ন্যায়-নিষ্ঠ ও ধর্ম্ম-প্রাণ মহান সম্রাটের হৃদয়ে শেলাঘাত করেন। যাহা হউক, তিনি যেমন কর্ম্ম তেমন ফলভোগ করিয়াছেন। এ বাঁদী যে কিরূপ নিরপরাধ, জাঁহাপনার তাহা অবিদিত নাই। বর্দ্ধমানের রাজ-সেরেস্তায় এখনও এ বাঁদীর লিখিত অনেক কাগজ-পত্র আছে, যদ্দ্বারা প্রমাণ হইবে—এ বাঁদী তাঁহার দুষ্কার্য্য ও অন্যায় আচরণের জন্য তাহাকে একাধিকবার তিরস্কার করিত।"

জাহাঙ্গীরের সহিত মেহের-উন্নিসার পূর্ব্ব হইতে প্রণয় থাকিলে এ পত্রের কোন না কোন অংশে তাহার কিঞ্চিত আভাষও পাওয়া যাইত। এই পত্রখানি বিশদভাবে আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, জাহাঙ্গীর-মেহের-উন্নিসা আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত—ইহার কোন ভিত্তিই নাই।

এইরূপে মেহের-উন্নিসা রাজ-অন্তঃপুরে সামান্য বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া চারি বৎসর অবস্থান করেন। অবশেষে তাঁহার বিশেষ প্রার্থনায় এবং রাজমাতা সুলতান বেগমের ঐকান্তিক আগ্রহে জাহাঙ্গীর মেহের-উন্নিসাকে মহাসমারোহে বিবাহ করেন। বিবাহের পর এই কূটনীতিবিশারদ মেহের-উন্নিসা মহারাজের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করেন।

এইখানে আমরা জাহাঙ্গীর-মেহের-উন্নিসা-শের আফগন্দ

ইতিহাস শেষ করিলাম। বর্দ্ধমানে একরাত্রি ও একদিন অবস্থান করিয়া সন্ধ্যার সময়ে আমরা রওয়ানা হইলাম। পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলাম যে, ই-আই-রেলের মেন লাইনে পানাগড় ষ্টেসন পর্য্যন্ত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে যাইয়া তারপর ইলামবাজার দিয়া বোলপুরে পঁহুছিব—যদিও ইহাতে প্রায় চল্লিশ মাইল পথ অধিক অতিক্রম করিতে হয়; কারণ, শুনিয়াছিলাম, ঐ রাস্তাটাই পাকা—এবং অপেক্ষাকৃত দূর হইলেও কোন কষ্ট হইবে না। কিন্তু খানা জংসনের নিকটবর্ত্তী এক স্থানে জনৈক ডাক্তারের সহিত পরিচয় হয়, তিনি বলিলেন—"খানা জংসন দিয়াই যাওয়া সুবিধা হইবে—দূরত্ব হিসাবে অনেক কম এবং রাস্তাও নেহাৎ মন্দ হইবে না।" তাঁহার কথামত আমরা খানা জংসনেই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ছাড়িলাম—মাইল খানেক অগ্রসর হইবার পর দেখিলাম দুরতিক্রম্য বালি—প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত পুঁতিয়া যায়। তাহারই মধ্য দিয়া অতি কষ্টে ঘণ্টায় ১৪।১৫ মাইলের স্থানে মাত্র ২।৩ মাইল করিয়া অগ্রসর হইতে হইল। অনেকেই আছাড়ের পর আছাড় খাইল। কিন্তু রাস্তা বালিভরা বলিয়া কাহারও বিশেষ আঘাত লাগে নাই—এমন কি পড়িয়া গিয়া সকলে আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল—কেহ বা বলিল—"আমি Wholesale rateএ পড়ছি।" কেহবা ৩টা ডিগবাজী খাইয়া পড়িয়া গিয়া উঠিয়াই বলিল—"Cheer up please—one, two, three." এইরূপে রাত্রি ১টার সময়ে লুপ লাইনের গুস্করা ষ্টেসনে পৌছান গেল। তথায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম ও জল-যোগের পর বালির ভয়ে রাত্রি ৩টার সময়ে রেল লাইনের পার্শ্ব দিয়া অগ্রসর হইলাম। মাত্র ১৩ মাইল পথ আর বাকী। গুস্করার পর হইতেই বিরাট অজয় নদীর ঢালু আরম্ভ, সুতরাং রেল লাইনও পার্শ্ববর্ত্তী মাঠ হইতে অত্যন্ত উচ্চ হইতে আরম্ভ হইল। লুপ লাইনটী Single লাইন। ইহার মধ্যে দুই স্থানে প্রায় ৫০ হাত প্রশস্ত খাঁড়ির উপর ২।৩ ফিট অন্তর এক একখানি beam (কড়ি) বসান এবং তাহারই উপর লাইন পাতা। পার্শ্বে বিন্দুমাত্র স্থান নাই। নীচের দিকে চাহিলে প্রাণ শুকাইয়া যায়। টর্চ্চ লাইটের সাহায্যে অতিকষ্টে একপা-একপা করিয়া সকলে সাইকেল টানিয়া অগ্রসর হইতেছি, এমন সময়ে পশ্চাতে চাহিয়া দেখি—একখানি লাইট্ এঞ্জিন হু-হু শব্দে আসিতেছে। সকলেরই প্রাণ ভয়ে আড়ষ্ট। অগ্র, পশ্চাৎ, পার্শ্ব কোথায়ও পাশ দিবার স্থান নাই। সাইকেল ল্যাম্পের লাল কাঁচের দিকটা এঞ্জিনের দিকে ধরা গেল, যদি বা line blocked ভাবিয়া এঞ্জিনখানি দাঁড়ায়, কিন্তু তাহা হইবার নয়। তখন ভাবিলাম, এইখানে ১১টী জীবন্ত সমাধি বরণ করিতে হইবে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে যে সর্ব্বাগ্রে ছিল, সে সাইকেলগুলি অতিকষ্টে অথচ ক্ষিপ্রতার সহিত এক-একখানি পার করিয়া দেয় এবং কেহ বা একপা একপা করিয়া কেহ বা হামাগুঁড়ি দিয়া ব্রিজ উত্তীর্ণ হয়। শেষ ব্যক্তি অতিক্রম করিবার প্রায় এক মিনিট পরেই এঞ্জিনখানি পোল অতিক্রম করে। সকলেরই গলদঘর্ম্ম অবস্থা। তথায় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ও চা পানের পর প্রাতে ৭টার সময়ে বোলপুরে পৌছিলাম।

শান্তি-নিকেতন বোলপুর ষ্টেসন হইতে ১ মাইল দূরে অবস্থিত। চৈত্র মাসের দ্বিপ্রহরে শান্তি নিকেতনকে যেন বিরাট মরুভূমির মধ্যে একখানি রম্য-মরূদ্যান বলিয়া মনে হইল। চতুর্দ্দিকে বালুকাময় বিস্তীর্ণ প্রান্তর ধূ-ধূ করিতেছে, তাহারই মাঝে তরু-গুল্ম-লতা-পরিবেষ্টিত নানা বর্ণ-বৈচিত্র্যের মাঝখানে এই যথার্থ শান্তির আগার 'শান্তি-নিকেতন'। প্রায় এক হাজার বিঘা জমির উপর ইহা অবস্থিত।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ তদীয় পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের আশ্রমের উপর এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনিই এক স্থানে লিখিয়াছেন—"শান্তি-নিকেতন প্রতিষ্ঠা করিবার আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছাত্রদিগকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেওয়া। একাধারে বিদ্যালয় ও মন্দির এই আদর্শ লইয়া আমি নগরের কোলাহল হইতে সুদূরবর্ত্তী নিভৃত এই স্থানটী মনোনীত করি। স্বর্গীয় পিতৃদেবের পুণ্যস্মৃতি ও পূত-জীবন এই স্থানটীর সহিত চির-বিজড়িত থাকিবে।" বিদ্যালয়ের এই যথার্থ আদর্শে প্রণোদিত হইয়া গুরুদেব 'শান্তি-নিকেতন' স্থাপন করেন। ছাত্ররাই এখানকার defacto শাসনকর্ত্তা—আভ্যন্তরীণ যাবতীয় ব্যাপার তাহাদেরই কমিটী দ্বারা সমাধা হয়। এই মহা-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য বালকদিগের ব্যক্তিত্বের বিকাশ করা—মৌলিকতার পরিচয় প্রদানের যথেষ্ট সুযোগ এখানে আছে। ইহা ছাড়া যৌথভাবে কার্য্যাদি করার বেশ একটা Practical training এখানে আপনা

হইতেই পাওয়া যায়। পরস্পর সহযোগীতার শিক্ষা এখানে সুন্দরভাবে দেওয়া হয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাধি বা কড়াকড়ি নিয়ম নাই—সব ধর্ম্মের সারতত্ত্ব যে একই ইহাই ছাত্রদিগকে বেশ হৃদয়ঙ্গম করান হইয়াছে দেখিলাম। কিন্তু একেশ্বরবাদই এখানকার ধর্ম্ম শিক্ষার মূল। ছাত্রদিগকে নিয়মিতভাবে প্রাতে ও সন্ধ্যায় একেশ্বরের উপাসনা করিতে হয়। বিভিন্ন রংএর সম্পূর্ণ কাচ নির্ম্মিত উপাসনা মন্দিরটী অতি মনোরম।

আইনের কোন কড়াকড়ি প্রভাব দেখিলাম না,—যে সুশৃঙ্খলতায় আইন-কানুন পর্য্যবসিত, সেই সুশৃঙ্খলাই এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়; সুতরাং আইন-কানুনের বিশেষ দরকার হয় না। সুপ্রসিদ্ধ প্রতীচ্য বিশ্ববিদ্যালয় গুলির আদর্শে এখানে ছাত্র-গুরু একত্র বস-বাস, বিশ্রাম, আলাপন ও সহযোগে কার্য্য করিয়া থাকেন।

স্কুল বিভাগে ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দি, তামিল, উর্দ্দূ, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য, প্রাথমিক বিজ্ঞান, সঙ্গীত, নৃত্য, অঙ্ক, সূচীকার্য্য, বয়ন, সূত্রধরের কার্য্য, উদ্যান রচনা, রন্ধন ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়।

ছাত্রদিগকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উপযোগী করিবার জন্য তদনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হয়—ইহা অবশ্য যাহাদের অভিভাবক ইচ্ছা করেন, তাহাদের জন্য। সাধারণতঃ বিশ্বভারতীর সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলেই বিশ্বভারতী নিজের সার্টিফিকেট্ দেয়।

কলেজ-বিভাগেও উপরি-উক্ত নিয়ম। বি-এ ডিগ্রীর জন্য ইংরাজী সাহিত্য, সংস্কৃত, পালি ও ফিলসফিতে অনারস্ পড়ান হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুযায়ী পড়াইলেও শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ হিসাবে সঙ্গীত বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

সুসজ্জিত কলা-ভবনটী শান্তি-নিকেতনের একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য জিনিষ। এখানে 'Fine Arts'এ ছাত্রদিগের মৌলিকতা উন্মেষের বেশ সুবন্দোবস্ত আছে। লাইব্রেরীটীও অতি মনোরম। এই পুস্তকাগারটীর পুস্তকের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ চল্লিশ হাজার হইবে। পুস্তকের Collection-এ বেশ একটা সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুস্তকাগারটী ইউরোপীয় পুস্তকের আদর্শে গঠিত। আজকাল ভারতবর্ষে যে পুস্তকাগার আন্দোলন চলিতেছে, তাহা 'শান্তি-নিকেতনে'র এই পুস্তকাগারটীর আদর্শে চালিত।

স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানের জন্য সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট প্রভৃতি বিদেশীয় খেলার সহিত দেশীয় খেলা যথা কুস্তি, লাঠি, ছোরা-খেলা ইত্যাদির বেশ একটা সংযোগ আছে। দেশীয় খেলা যথা—ছেলে-খেলা, লাঠি-খেলা এবং বিদেশীয় ব্যায়াম যথা—ডাম্বেল্, বারবেল্ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন দেব নামীয় এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক নিযুক্ত আছেন। ক্রীড়া ও শরীর-চর্চ্চা ছাত্র এবং ছাত্রী উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক। উন্নত প্রথায় "জুজুৎ-সু" বা "জুদো" নামীয় জাপানী কুস্তী শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীযুক্ত এস্, টাকাগাকী (Mr. Schinzo Takagaki) নামীয় একজন জাপানী "জুদো" প্রফেসর নিযুক্ত আছেন। বর্ত্তমান জাপানে Mr. Takagaki র স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার মত ব্যক্তি 'শান্তি-নিকেতনের' একটা গৌরবের সামগ্রী। তিনি ব্রিটীশ কলম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে একজন জাপানী-ষ্টেট্-স্কলার ছিলেন। Mr. Takagaki বিশেষ ভদ্রলোক,—অতি সরল এবং অতি অমায়িক। তাঁহার সহিত দুই দিনে ৩।৪ ঘণ্টা আলাপ করিয়া বিশেষ আনন্দ ও তৃপ্তি পাইয়াছিলাম।

শান্তি নিকেতনের ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই ব্রতী বালক অর্থাৎ volunteers; তাহাদের কার্য্য নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিকে সাহায্য করা।

ছাত্র ও ছাত্রীদের থাকিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সুসজ্জিত বোর্ডিং আছে। ছাত্রীদের জন্য সম্প্রতি 'শ্রীভবন' নামে একটী মনোরম দোতলা বাটী প্রস্তুত হইয়াছে—ইহা একটী ভদ্র-মহিলার তত্বাবধানে।

'শান্তি-নিকেতনে' আহারের ব্যবস্থা অতি সুন্দর। দুই-বেলা আহারের প্রায় ২।৩ ঘণ্টা পূর্ব্বে একটা জলযোগ দেওয়া হয়। আহারের এমন সুবন্দোবস্ত অন্যত্র কচিৎ দৃষ্ট হয়। যখন শরীরের জন্য যে খাদ্যটীর প্রয়োজন পাত্রে আপনা হইতে তখন ঠিক সেই খাবারই হাজির।

শান্তি নিকেতনের প্রায় দুই মাইল দূরে সুরুলে 'শ্রীনিকেতন' অবস্থিত। এখানে কৃষি, শিল্প, গো-পালন,

গুটীপোকা-পালন, বয়ন, ট্যানিং পোল্ট্রি ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। 'শ্রীনিকেতনে'র মূল উদ্দেশ্য পল্লী-সংস্কার। ইহার দ্বারা সম্প্রতি বাঁধগোড়া, ভুবনডাঙ্গা প্রভৃতি কয়েকটী পল্লীর বিশেষ উন্নতি সাধন হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী সাঁওতাল-পল্লী হইতে সাঁওতাল বালকদিগকে আনিয়া বয়ন শিক্ষা দেওয়া হইতেছে দেখিলাম। ট্যানিং এর বিশেষ উন্নতি দেখা গেল। এখানকারই "র-মেটিরিয়েল" হইতে প্রস্তুত চামড়ার মনিব্যাগ, হ্যাণ্ড্ব্যাগ ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত দেখিলাম। এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেও বেশ প্রাথমিক কার্য্য হইতেছে। ইহা ছাড়া রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞানের জন্য দুইটী নবনির্ম্মিত সুসজ্জিত Laboratory আছে। কৃষি-বিভাগের কার্য্যও অতি সন্তোষজনক। বৈজ্ঞানিক উপায়ে জমিতে সার দেওয়ার বেশ সুবন্দোবস্ত আছে। তাহা ছাড়া কোন্ কোন্ জমিতে কিরূপে কোন্ কোন্ ফসল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা যায়, তাহার জন্য 'regular experimental work' চলিতেছে। 'শ্রীনিকেতনে'র ছাত্রসংখ্যা প্রায় চল্লিশ—এইখানেই কয়েক-জন মুসলমান ছাত্র দেখিলাম।

'শান্তি-নিকেতন' অপেক্ষা 'শ্রীনিকেতন' আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বর্ত্তমান ভারতে একদিকে যেমন culture এর ক্রমোন্নতি হইতেছে, অপর দিকে তেমনি দেশের অর্থ-নৈতিক সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। 'শ্রীনিকেতন' দেশের এই সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ সমস্যার সমাধানে ব্রতী—বোধ হয় সেই জন্যই 'শান্তি-নিকেতন' অপেক্ষা 'শ্রীনিকেতন' আমাদের এত ভাল লাগিয়াছিল।

শান্তি-নিকেতনে ছাত্র ও ছাত্রীদের মোট সংখ্যা ৩০০; শত;—২০০ ছাত্র এবং ১০০ ছাত্রী। ভবিষ্যতে Good matrons তৈয়ারী করিবার জন্য শান্তি-নিকেতন উপযুক্ত স্থান।

এখানে ছাত্র ও ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয় উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বৃক্ষের ছায়ায় আসনের উপর বসিয়া। 'শান্তি-নিকেতনে' গুরু-শিষ্য, ছাত্র-ছাত্রী সম্বন্ধ অতি মনোরম—প্রতীচ্য আদর্শের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। 'বিশ্ব-ভারতীর' কার্য্য এক কথায় সমালোচনা করিতে হইলে Victor Emanuel এর ভাষায় বলিতে হয়—"It will be like a ring which will connect Orient with the Occident," প্রাচ্যকে প্রতীচ্যের সহিত মিলিত করিবার জন্য ইহা একটী মিলনাঙ্গুরীয় স্বরূপ। 'শান্তি-নিকেতনে' গুরুদেবের (রবীন্দ্রনাথ) ভবনটী (উত্তরায়ণ) অতি মনোরম। বিভিন্ন দেশীয় স্থাপত্য-বিদ্যা যথা হিন্দু, সারাসেন্, ইটালিয়ান প্রভৃতির পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বোপরি একটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন 'School of architecture'-এর 'Stamp' ইহাতে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহা সম্পূর্ণ এতদ্দেশীয়; কিন্তু প্রাচীন বা আধুনিক কোন 'School of architecture' এর মধ্যে তাহা পড়ে না। ইহার উপযুক্ত নাম করণ করিতে হইলে বলিতে হইবে, "Tagore School of architecture"। এ দেশে যদি কোন বনিয়াদী আভিজাত বংশ থাকে, তাহা হইলে তাহা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বংশ। এই ঠাকুর বংশ বহুদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত দেশের শিল্প-কলা, সাহিত্য, সঙ্গীতপ্রভৃতি অনেক কিছু বিষয়ের জন্মদাতা। এমন কি প্রত্যেকটীর এক-একটী "Tagore School" নাম করণ হইতে পারে। মহামতি বার্ক (Edmund Burke) এক স্থানে বলিয়াছেন, "Aristocracy is the corinthien Temple of Greatness" একথাটী এদেশে ঠাকুরবংশে বর্ণে বর্ণে সত্য।

'শান্তি-নিকেতন' হইতে স্বনাম ধন্য পরলোকগত লর্ড সিংহের (Lord S. P. Sinha) জন্মভূমি রাইপুর প্রায় ৫ মাইল। 'শান্তি-নিকেতন' দেখিয়া রাইপুর না দেখিলে আমাদের ভ্রমণ যেন অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। তাহার একটী অন্য কারণ আছে। 'শান্তি-নিকেতন' যে ভূমির উপর অবস্থিত, পূর্ব্বে তাহা লর্ড সিংহের পিতার জমিদারী ছিল। 'শান্তি-নিকেতন' স্থাপন লর্ড সিংহের পিতার সহিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় এক ঘটনা প্রসূত। তাহা উল্লেখ করিয়া এ প্রবন্ধের কলেবর আর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। যাহা হউক, শান্তি-নিকেতন হইতে সিংহ ভবন দেখিবার জন্য আমরা রাইপুর যাত্রা করিলাম। রাই-পুরের সিংহভবন এক বিরাট অট্টালিকা। কিন্তু বাটীতে লর্ড সিংহের পুত্রদের কেহই নাই বা থাকিতেন না। বাটী ভগ্ন দশায় পড়িয়া আছে। গ্রামের বাসিন্দা এবং সিংহবাটীর আমলা-ভদ্রের নিকট হইতে শুনিলাম যে, লর্ড সিংহের খ্যাতি ও যশঃপ্রভা প্রাচ্য ভূভাগ অতিক্রম করিয়া প্রতীচ্য ভূখণ্ড

উদ্ভাসিত করিয়াছিল সত্য, কিন্তু এ হেন ক্ষণজন্মা মহা পুরুষ স্বীয় জন্মভূমির জন্ত কিছু করিয়া যান নাই। মাত্র একটী মাইনর স্কুল ও বাটীর সংলগ্ন একটী ক্ষুদ্র দাতব্য চিকিৎসালয় দিয়া গিয়াছেন। তবে নাকি তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শেষ জীবনটা জন্মভূমিতেই কাটাইবেন। কিন্তু তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি পরলোক গমন করেন।

কয়েকদিন বেশ আনন্দে কাটাইয়া আমরা ইলামবাজার ও পানাগড় হইয়া বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করি। পথিমধ্যে ও অজয় বক্ষে আমাদের বিপদের কাহিনী বলিয়াই এ প্রবন্ধের শেষ করিব।

সন্ধ্যা ৮টার সময়ে আমরা 'শান্তি-নিকেতন' হইতে বাহির হই। রাত্রি ১২টার সময়ে অজয় নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে নির্ম্মল মেঘমুক্ত চন্দ্রমাশালিনী আকাশ হঠাৎ মেঘাবৃত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তুমুল বালির ঝড়, বৃষ্টি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাপাত আরম্ভ হইল। তখন আমরা অজয়ের মধ্যে—একেবারে মাঝ-দরিয়ায়। নাক মুখ, চোখ বালিতে ভরিয়া গেল—চোখ কাণা হইবার উপক্রম। চক্ষুকে রক্ষা করিবার জন্ত মাথার hat ঝড়ের দিকে ঘুরাইয়া দিলাম—কিন্তু শিলা-বৃষ্টিতে তাহা মুহুর্মুহু চেপ্টা হইতে লাগিল। আর ফিরিবারও উপায় নাই—অগ্রসর হইবারও উপায় নাই। কয়েকজন সাইকেল সমেত উল্টাইয়া বালুকার উপর পড়িয়া গেল। অজয়ের জল যদিও মাত্র এক হাঁটু, কিন্তু বালির গভীরতা আরও অধিক। বালুকাগর্ভে অর্দ্ধ-প্রোথিত সাইকেল টানিয়া টর্চ্চ লইয়া এক পা তুলিতেছি, আর এক পা পুঁতিতেছি—এই অবস্থায় অগ্রসর হইতেছি। আমাদের মধ্যে ২।৩ জন নূতন Cyclists ছিল। দেখিলাম—তাহারা একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে, হইবারই কথা। একে নূতন Cyclist তাহার উপর প্রত্যেকেরই সাইকেলে সুটকেশ, সতরঞ্চি ও আহারাদির সরঞ্জাম বাঁধার দরুণ অত্যধিক ভারী হইয়াছে। কিন্তু তখন কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলে সর্ব্বনাশ। তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্ত প্রাণে সাহসের সঞ্চার করিয়া কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত লাইন কয়টী ধরিলাম—

"দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হ'বে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুসিয়ার।" ইত্যাদি

এই লাইন কয়টার আবৃত্তি যেন মন্ত্রশক্তির কার্য্য করিল। সকলেই গাহিতে গাহিতে বেমালুম অর্দ্ধমাইল বালুকাময় বেলাভূমি উত্তীর্ণ হইয়া তীরে উঠিলাম। তাহার পর আর এক নূতন বিপদ। ফিরিবার সময়ে বোলপুর বাজারে শুনিয়াছিলাম যে, পথিমধ্যে দুইটী জঙ্গল পড়িবে—একটী ৬ মাইল অপরটী ৫ মাইল লম্বা, এবং ইহার মধ্যে ব্যাঘ্র থাকে—সম্প্রতি একটী মারা গিয়াছে, আরও নাকি ২।৩টা আছে। বাজারে অনেকেই আমাদের একসঙ্গে পাশাপাশি যাইতে উপদেশ দিয়াছিল। প্রথম জঙ্গলটী শাল ও মহুয়া জঙ্গল—অতি ঘন এবং অতি বিস্তীর্ণ বনানী। অজয় পার হইয়া সেই জঙ্গলে পৌছিতেই আমার সাইকেল খানি burst হইল। সকলেই বলিল—এইবার লিডার বাবু—সর্ব্বনাশ এইখানেই আবার বাঘের ভয়। সকলে পথের উভয় পার্শ্বে জঙ্গলের দিকে টর্চ্চ জ্বালাইয়া গোলাকারে পাহারা দিতে লাগিল এবং সেই গোলকের মধ্যে বসিয়া দুইটী টর্চ্চের সাহায্যে আমরা কার্য্য করিতে লাগিলাম। হঠাৎ একটা বিকট "হুক্কু, হুক্কু" শব্দ আমাদের কাণে পৌছিল। আমাদের মধ্যে অনেকে ভল্লুকের ডাকের সহিত পরিচিত নয়, সুতরাং কিছুই বুঝিতে পারিল না—আমিও কিছু বলিয়া তাহাদিগকে nervous করিতে ইচ্ছা করিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম—"ও একটা পাগলা শিয়াল টিয়াল হবে'—ভয়ের কোন কারণ নেই—তার উপরে আমরা এগার জন।" কিন্তু সকলের প্রাণে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হওয়াতে ছোরাগুলিকে প্রত্যেকের প্যাণ্টের পকেট হইতে উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়া রহিল। গাড়ী মেরামত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে একটা তীব্র দুর্গন্ধ পাওয়া গেল এবং প্রায় তাহারই সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্রের বিকট গর্জ্জন আরম্ভ। তখন সকলের প্রাণ ভয়ে আড়ষ্ট কিন্তু আমাদের দুই চারিজন বিশেষ সৎসাহসের পরিচয় দিল। একজন কহিল—"আমি মহুয়া খাব—মহুয়া না খেয়ে যাচ্ছি না—তোমাদের যদি এতই ভয় পেয়ে থাকে, তোমরা যেতে পার, আমায় বাঘে খায় খাবে।" তাহার দেখা-দেখি আরও ২।৪ জন মহুয়া খাইতে ইচ্ছা করিল—অতঃপর সকলেরই প্রাণে একটা সাহসের সঞ্চার হওয়ায় সকলেই হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে মহুয়া জঙ্গলের ভিতরে অথচ রাস্তার নিকটে প্রবেশ করিয়া একটু আধটু ঘুরিয়া বেড়াইল। ইহাতে উপকার এই হইল যে, সকলের ভীতি-আড়ষ্ট প্রাণে একটা সাহসের সঞ্চার হইল। অতঃপর নির্ভয় প্রাণে টর্চ্চগুলি সব জ্বালাইয়া ঐ "দুর্গম গিরি" গাহিতে গাহিতে রাত্রি সাড়ে তিনটার সময়ে আমরা পানাগড়ে পৌছিলাম। অবশিষ্ট রাত্রিটুকুর মধ্যে বিশ্রাম ও জলযোগ সারিয়া বাকি ১০২ মাইল পথ ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলাম। অবশিষ্ট পথ grand trunk road সুতরাং আর বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই।

আমরা চৈত্রমাসে Tour এ বাহির হইয়া বিশেষ ভুল করিয়াছিলাম। অত্যধিক গরমের জন্ত সাইকেলগুলি আপনা হইতেই কয়েকবার leak ও burst হয়। কিন্তু রাত্রে রাত্রে ভ্রমণ করাতে ভ্রমণের জন্ত বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই।

ফরাসী-বিপ্লব

— প্রবন্ধ —

—রিজাউল করিম বি-এ,

৪র্থ পর্ব্ব

ফরাসী-বিপ্লবের উদ্যোগী বীরগণ, জাতীয় মহাসমিতির প্রারম্ভেই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করিয়া সমগ্র ইউরোপে মহাশিহরণ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। ইউরোপের যে-সকল জাতি এতাবৎ বিভিন্ন রাজ-শক্তির অধীনে নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিতেছিল, তাহারা এক্ষণে অতীব আগ্রহের সহিত বিপ্লবের কার্য্যপদ্ধতি, ইহার গতি-বিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। যুগ-যুগ ধরিয়া যে ফ্রান্স অত্যাচারী রাজার দ্বারা নিষ্পেষিত ও নিপীড়িত হইয়া আসিতেছিল, সেই ফ্রান্স আজ রাজার কবল হইতে মুক্তি পাইতে চলিল, ইহা দেখিয়া সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। রাজার অত্যাচার, ফিউডাল প্রথার অত্যাচার, পাদ্রী-বিশপদের মহাপীড়ন হইতে মানুষকে মুক্তি পাইতে দেখিয়া, প্রত্যেক ব্যক্তিই বিপ্লবীদিগকে প্রাণের অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিল। ইংলণ্ডের উদার-পন্থীদলের নেতা ফক্স (Mr. fox) ফরাসী-বিপ্লবের ভয়ানক পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। ব্যাসটাইলের পতনের সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি হর্ষিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"How much the greatest event it is that had happened on the world, and how much the best." ফরাসী-বিপ্লবকে সমর্থন করিবার জন্য, ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র নানাপ্রকার ক্লাব গঠিত হইল। তথাকার অনেক কৃতী-সন্তান নানা ভাষায় দেশের সর্ব্বত্র বিপ্লবের ভাব প্রচার করিতে লাগিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, বায়রণ, কোলরিজ প্রমুখ কবিগণ উত্তেজনাপূর্ণ কবিতা লিখিয়া দেশবাসীকে বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিশীল করিতে লাগিলেন। বিপ্লবীগণ যদি মধ্য-পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিত, তাহা হইলে বোধ হয় এই সকল আন্দোলনে ইংলণ্ডের কিছু উপকার হইত। কিন্তু মধ্য-পন্থা পরিত্যাগ করিয়া বিপ্লবীগণ চরম পন্থা অবলম্বন করিল। ফ্রান্সের সর্ব্বত্র নর-হত্যা, লুণ্ঠন, নৃশংস অত্যাচার ও আইনহীনতা, স্বাধীনতার নামে মহাবিভীষিকা বিস্তার করিল, তখন ইংলণ্ডের ও ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসিগণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। মহাবক্তা বার্ক, ফরাসী বিপ্লবের গুণ-গরিমাগুলি গোপন করিয়া উহার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সালঙ্কারে বর্ণনা করিয়া বিপ্লবের বিরুদ্ধে দেশকে ক্ষেপাইয়া তুলিলেন। বার্কের এই সব মিথ্যা অভিযোগের উত্তর দিয়া মহাত্মা টমাস পেন "The Rights of man" নামক এক অতি মূল্যবান ও সারগর্ভ পুস্তক প্রচার করেন। ইউরোপের অপরাপর প্রদেশ হইতেও বিপ্লবের সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা হইতে লাগিল। এই সব বাদানুবাদের ফলে ফরাসী-বিপ্লব প্রাদেশিকতার সীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র ইউরোপের এক মহা আন্তর্জাতিক ব্যাপারে পরিণত হইল।

বিপ্লবীগণ যে অগ্নিকণা ছড়াইতে লাগিল, তাহা সমগ্র ইউরোপে প্রসারিত হইয়া প্রচলিত রাজ-তন্ত্র ও সমাজ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। তাহারা আপনাদের মতগুলিকে কার্য্যে প্রতিফলিত করিবার জন্য বিভিন্ন-দেশের অধিবাসীগণকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিল,—"প্রাচীন প্রথা ভাঙ্গিয়া ফেল, রাজতন্ত্র বিলোপ কর, দেশে দেশে সাম্য-মৈত্রীর বিজয়-পতাকা সগৌরবে উত্তোলিত কর।" তাহাদের প্রচারের ফলে সমগ্র ইউরোপ রাজ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। ইউরোপের রাজশক্তি দেখিল, যদি এই সকল ভাবধারা দেশময় অবাধে প্রচারিত

হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহাদের আর রক্ষা নাই। তাই তাহারা বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। অবিলম্বে সমগ্র ইউরোপে রণ-দামামা বাজিয়া উঠিল।

যুদ্ধের জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রস্তুত হইল অষ্ট্রীয়া। অষ্ট্রীয়ার সম্রাট ফরাসীর রাণীর সহোদর ভ্রাতা; সুতরাং ভগ্নীকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি রুশিয়া-রাজের সহিত মিলিত হইয়া ফরাসীর বিরুদ্ধে এক চরম ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। উহা Declaration of pilnitoz বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহারা সমগ্র ইউরোপকে জানাইয়া দিলেন যে, ফরাসী-রাজকে উদ্ধার করা প্রত্যেক রাজার কর্ত্তব্য। ফরাসীরাজের স্বার্থ ও সমগ্র ইউরোপের রাজন্য-বর্গের স্বার্থ এক ও অভিন্ন। কিন্তু এই ভীতিপূর্ণ ধম্‌কিতে ফরাসী দেশের বিপ্লব-বাদীরা একটুও বিচলিত হইল না, তাহারাও আসন্ন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। কিন্তু অষ্ট্রীয়া-রাজের এই ভীতিপূর্ণ উক্তির ফলে লুইয়ের ভয়ানক ক্ষতি হইল। বিপ্লবীরা মনে করিল, সম্রাট লুই তলে তলে বহির্জ্জগতের সহিত এই সকল ষড়যন্ত্র করিতেছেন। সেই জন্য তাহারা লুইকে সন্দেহ করিয়া সতর্কতার সহিত তাঁহার কার্য্য-বিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

এদিকে যুদ্ধ আর বন্ধ হইল না, অবিলম্বে ফরাসীর সহিত ইউরোপের বিশেষতঃ অষ্ট্রীয়ার যুদ্ধ বাধিয়া গেল। দুর্ব্বল মুষ্টিমেয় ফরাসী, গৃহ-বিবাদে শতধা-বিচ্ছিন্ন ফরাসী, কি সাহসে সমগ্র ইউরোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। সেই সময়ে ফরাসীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যুদ্ধের প্রাণস্বরূপ যে রাজশক্তি, ইতঃপূর্ব্বে প্রত্যেক সমরে সৈন্যদিগের মধ্যে উৎসাহ দিয়াছিল, আজ তাহা বিচূর্ণ—এখনও দেশে কোন দৃঢ় শাসন-যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, রাজ-কোষ অর্থশূন্য—দুর্গগুলি সৈন্যশূন্য। সর্ব্বত্র অরাজকতা, বিপ্লব ও উচ্ছৃঙ্খলতা—এই সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়া কেবলমাত্র নগর ও শস্য-ক্ষেত্র হইতে ধরিয়া আনা আনাড়ী লোকগুলিকে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া কোন্ সাহসে যে বিপ্লবীরা ইউরোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল, তাহা জগতের ইতিহাসে এক বিচিত্র অধ্যায়! নিরস্ত্র ভারতবাসীদের স্বাধীনতার আন্দোলনের সময়ে অনেকেই সত্যাগ্রহীদিগকে মহাব্রত হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন! ফরাসীর ইতিহাস এই সমস্যার সমাধান করিয়া দিবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে, যুযুৎসু জাতি নিচয়ের মধ্যে কাহার কত শক্তি, তাহা কেবলমাত্র দৈহিকবল ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের আধিক্যের উপর নির্ভর করে না। আক্রান্ত ও পদানত জাতির মধ্যে যদি অদম্য উৎসাহ,, অনমনীয় সাহস, মরণ-পণ প্রতিজ্ঞা ও স্বাধীনতার মাদকতা থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বত্রই প্রবল জাতি পরাভূত হইয়া পলায়ন করিয়া থাকে! ফরাসীর বেলায় তাহাই হইল। স্বাধীনতার মাদকতায় ফরাসী-জাতি এম্‌নি পাগল হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা এই যুদ্ধের সময়ে পৃথিবীর কোনও বাধাকে গ্রাহ্য করে নাই—তাহাদের উপযুক্ত সেনাপতি ছিল না সত্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ছিল জলন্ত আত্ম-বিশ্বাস—এই আত্ম-বিশ্বাসই তাহাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত সাফল্যের পথে পরিচালিত করিয়াছিল।

ইউরোপের সহিত যে যুদ্ধ বাধিল, তাহাতে প্রথম প্রথম ফরাসীগণ পরাজিত হইয়াছিল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই যুদ্ধের গতি ভিন্ন-পথ অবলম্বন করিল, যখন সাফল্যের মদে মত্ত হইয়া বার্ণস্‌উইকের ডিউক মিত্র-পক্ষীয় সেনা লইয়া অগ্রসর হইতে হইতে প্যারিসের অভিমুখে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যদি লুই বা রাণীর কেশাগ্র পর্য্যন্ত কেহ স্পর্শ করে, তাহা হইলে তিনি তজ্জন্য প্যারি নগরীর সমগ্র অধিবাসীকে দায়ী করিয়া রাজধানী ধ্বংস করিয়া দিবেন। তাঁহার এই ঘোষণা বাণীতে বিপ্লবী প্রজাগণ আবার ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল, লুই তাহাদের রাজা, লুইকে লইয়া কি কর্ত্তব্য তাহা তাহারাই ভাল করিয়া জানে। তজ্জন্য অন্যের এত মাথা ব্যথা কেন? ইহার মূলে নিশ্চয় কোনও রহস্য আছে জানিয়া তাহাদের স্থির বিশ্বাস হইল যে, ইহার তলে রাজাও গোপন ভাবে কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। উত্তেজিত জনতা ইহাতে ভয়ানক কুপিত হইয়া টুইলারী প্রাসাদ আক্রমণ করিল। রাজা সপরিবারে প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় আশ্রয় লইলেন।

যুদ্ধ-ক্ষেত্র পড়িয়া থাকিল, এদিকে গৃহ-সংস্কারের প্রতি বিপ্লবীদিগকে মনোযোগ দিতে হইল। অবিলম্বে ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইল। এই সভার প্রধান আলোচ্য

স্থির হইল, রাজাকে লইয়া কি করা উচিত। সকলেই একবাক্যে স্থির করিল যে, এইবার হইতে রাজপদ উঠাইয়া দিয়া তৎস্থলে একটি ন্যাশন্যাল কন্‌ভেনশন গঠিত করিতে হইবে। ভবিষ্যতের শাসন-প্রণালী এই কনভেন্‌শনে স্থির হইবে। উন্মত্ত জনসাধারণের নেতা দাঁতো, মারাট ও রবস্‌পিরীই এখন দেশের মধ্যে সর্ব্বে-সর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা রাজাকে পদচ্যুত করিয়া প্যারিসের ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা একটা নূতন 'কমুন' গঠিত করিয়া রাজধানী শাসন করিতে লাগিলেন।

এদিকে অষ্ট্রীয়ান অভিযান আর রক্ষা করা যায় না। অষ্ট্রীয়ান সৈন্য প্রবল বিক্রমে প্যারিস অভিমুখে অগ্রসর হইল। তাহারা অবিলম্বে ভারড্যঁ অধিকার করিল। ভারড্যঁর পতনে প্যারিসের সর্ব্বত্র মহাচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। অনেকে মনে করিল, ফরাসী সৈন্যের মধ্যে একদল বিশ্বাস-ঘাতক লোক প্রবেশ করিয়া এইরূপ অঘটন ঘটাইতেছে। দেশের মধ্যে হয়ত গোপন ভাবে আরও অনেক লোক এই প্রকারে গণতন্ত্রের অনিষ্ট সাধন করিতেছে, মনে করিয়া তাহারা শত্রু বিনাশের জন্য কঠোর পন্থা অবলম্বন করিল। জ্যাকোবিন দলের নেতারা প্রকাশ্যে বলিল যে, রক্তপাত ভিন্ন এই সকল বিভীষণের দলকে দমন করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং দেশময় ভীষণ হত্যা-লীলার অভিনয় আরম্ভ হইল। ইহার জন্য মমতাহীন ঘাতকের অভাব হইল না। যে সকল বন্দী এতদিন বিনা-বিচারে আবদ্ধ হইয়াছিল, সন্দেহবশে তাহাদের অনেকের স্কন্ধে ঘাতকের অসি পতিত হইল। প্রায় ১০০০ নর-নারী নির্দ্দয়ভাবে নিহত হইল। নিহতদিগের মধ্যে অধিকাংশই রাজ-পক্ষীয় দলের লোক ছিল। এই ভীষণ নর-হত্যাকে সেপ্টেম্বরের হত্যালীলা বলা হয়।

এইরূপে গণতন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ব্যক্তিকে নিহত করিয়া বিপ্লবীগণ নূতন বলে উৎসাহিত হইয়া অষ্ট্রীয়াকে দমন করিবার জন্য সীমান্তে নবগঠিত সৈন্যদল প্রেরণ করিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই নবগঠিত অনভিজ্ঞ সৈন্যদল বিপুল পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া শত্রুপক্ষের সুশিক্ষিত অভিজ্ঞ সৈন্যকে কয়েক স্থানে ভীষণ ভাবে পরাজিত করিয়া দিল। প্রুশিয়ানগণ ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করিল। ভ্যাল্‌মীতে ফরাসীগণ যে জয়লাভ করিল, তাহা এই যুদ্ধের ভাগ্য নির্ণয় করিল। এই যুদ্ধ ইউরোপকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিল যে, বিপ্লবীরা দুর্ব্বল হস্তে অস্ত্র গ্রহণ করে নাই। তারপর ফরাসী সৈন্য সর্ব্বত্র জয়লাভ করিয়া অবশেষে ১৭৯৩ খৃঃ বেলজিয়াম, স্যাভয়, নাইস এবং রাইন নদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিল। চতুর্দ্দিকে জয়লাভ করার পর ফরাসী বিপ্লব এখন চরম সীমায় আসিয়া উপনীত হইল। বিপ্লবীগণ আইন-শৃঙ্খলা, ন্যায়-অন্যায় সব কিছুরই সীমা লঙ্ঘন করিয়া যদৃচ্ছা কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। বিপদের ঘন-ঘটা দেশময় ছড়াইয়া পড়িল।

বিপদের সূত্রপাত হইল "জাতীয় কনভেনশন" সভার (National Convention) আহ্বানের সময় হইতে। ব্যবস্থাপক-সভা ভাঙ্গিয়া গেলে, জাতীয় কনভেনশন-সভার অধিবেশন হইল। (১৭৯২, ২১ সেপ্টেম্বর)। এই সভার সর্ব্ব-প্রথম উল্লেখযোগ্য কার্য্য রাজ-তন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন। এই সভা এক চরম পন্থা অবলম্বন করিয়া রাজ-তন্ত্র রহিত করিল এবং তৎস্থলে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিল। গণতন্ত্র-বিদ্বেষী যে সকল ব্যক্তি (Emigres) ইতঃপূর্ব্বে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদের জন্য চির-নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা হইল। এই সভা নূতনের নামে এমনি মোহাবিষ্ট হইয়াছিল যে, পুরাতন যা কিছু ছিল, তাহার সবই পরিত্যাগ করিয়া কেবলই নূতন নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিল। খৃষ্টানধর্ম্ম রহিত হইল, এবং খৃষ্টের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া পুরাতন ক্যালেণ্ডারকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া নূতন ক্যালেণ্ডার প্রচলিত করিল।

রাজতন্ত্র উঠাইয়া যখন পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন স্বতঃই এই প্রশ্ন অনেকেরই মনে উদিত হইল, লুইকে লইয়া কি করা হইবে? জ্যাকোবিন দলের নেতা রবস্‌পিরী বলিলেন,—"তাঁহাকে বিনা-বিচারে ফাঁসী দেওয়া হউক।" জিরণ্ডিষ্টগণ বলিল,—"তাঁহার বিচারের ভার দেশবাসীর হাতে সমর্পণ কর।" এই বিষয় লইয়া দুই দলের মধ্যে নানাবিধ বাগ-বিতণ্ডা হইল, অবশেষে নামমাত্র বিচারে রাজার ফাঁসী হইয়া গেল। তাঁহার বিরুদ্ধে যে-সকল অভিযোগ আনীত হইল, তন্মধ্যে প্রধান অভিযোগ এই যে, তিনি দেশের ধ্বংস সাধনের জন্য বৈদেশিক শত্রুগণের

সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন; এবং দেশবাসীর স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা করিতেছিলেন।

রাজ-হত্যা! এই সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে ইউরোপের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। লুই হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্ম ইউরোপের প্রত্যেক রাজা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। এদিকে রাজ-রুধিরে হস্ত কলুষিত করিয়া বিপ্লব-বাদীদেরও শোণিত পিপাসা বাড়িয়া উঠিল। তাহারা যুদ্ধং দেহি বলিয়া জগতের মুকুট শোভিত জীবগুলিকে আহ্বান করিল; এবং প্রকারান্তরে রাজ-তান্ত্রিক ইউরোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। তাহারা গোপনে গুপ্তচর প্রেরিত করিয়া স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম সকল দেশের অধিবাসিগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিল।

এই সকল কারণে বিশেষতঃ লুই হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্ম ইউরোপের রাজন্যবর্গ ফরাসীকে ধ্বংস করিবার জন্ম কৃতসঙ্কল্প হইল। তদুদ্দেশ্যে, ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, অষ্ট্রীয়া, প্রুসিয়া, স্পেন, ইটালী প্রভৃতি প্রধান প্রধান শক্তিগুলি একত্র মিলিত হইয়া একটি সম্মিলন (coalition) গঠন করিল। তাহারা অবিলম্বেই ফরাসীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। কয়েকটি খণ্ড-যুদ্ধে ফরাসী ভীষণভাবে পরাজিত হইল। ইহাতে ফরাসীর শত্রুসংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। একদিকে রাজাকে বধ করার জন্ম ও ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনের জন্ম গৃহ-বিপ্লব আরম্ভ হইল। দূর পল্লীর অনেক সরল বিশ্বাসী ব্যক্তি গণতন্ত্রকে ধর্ম্মের শত্রু বিবেচনা করিয়া উহার ধ্বংস কামনা করিতেছিল। চারিদিকে বিপদ, গৃহে ও বাহিরে সর্ব্বত্র শত্রুদলের প্রাবল্য দেখিয়া বিপ্লবীরা আবার নৃশংস হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিল।

ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ ঘোর ঘন-ঘটাচ্ছন্ন দেখিয়া কয়েকজন উদার-পন্থী লোক দেশের মঙ্গল সাধনের জন্ম নয়জন সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠন করিল (commitee of public safety) উক্ত কমিটির প্রধান উদ্দেশ্য হইল, শত্রুর কবল হইতে ফ্রান্সকে উদ্ধার করা। যাহারা ভিতরে বাহিরে গোপনে প্রকাশ্যে গণতন্ত্রের ক্ষতি সাধন করিতেছিল, এই কমিটি তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিতে মনস্থ করিল। ইহার ফল এই হইল যে, অবিলম্বে গৃহ-বিবাদ আরম্ভ হইল। বিপ্লবীগণ কয়েকটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল, প্রত্যেক দল অপরকে সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিল। সুযোগ বুঝিয়া জ্যাকোবিন্‌গণ জিরিণ্ডিন্‌কে আক্রমণ করিল। এই সব আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের মধ্যে তিন জন লোক ফ্রান্সের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিলেন:—রবসপিয়ী, দাঁতো, এবং মারাটা—এই তিন জন নেতা রেশারেশি করিয়া যে হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিলেন, ইতিহাসে তাহা Reign of terror বলিয়া পরিচিত।

উপরোক্ত তিন জন নেতার মধ্যে রব্‌স্‌পীয়িই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী, অল্প দিনের মধ্যে তিনিই দেশের ভাগ্য-নিয়ন্তা হইয়া উঠিলেন। তিনি দেশময় যে মহাভীতির শাসন আরম্ভ করিলেন, তাহার পরিণাম ফ্রান্সের পক্ষে বড়ই শোচনীয় হইয়াছিল। দেশের চারিদিকে হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল। এই সময়ের মধ্যে প্রায় দুই সহস্র লোক গিলোটিনে নিহত হয়। লুইএর রাণী মেরি এনটয়নেট, মাদাম্‌রলাঁ প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তি নিহত হন। মারাট একটী বালিকার হাতে ছোরার আঘাতে নিহত হন। এই সব হত্যাকাণ্ডের প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যখন বহিঃশত্রুকে আক্রমণ করা হইবে, তখন যেন ইহারা সুযোগ বুঝিয়া দেশের কোনও ক্ষতি করিতে না পারে।

দেশের শত্রুকে দমন করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত কমিটি বৈদেশিক শত্রুকে দমন করিবার জন্ম সৈন্য-রসদ সংগ্রহে মনোযোগ দিল। কমিটির চেষ্টায় এক সুগঠিত সৈন্যদল সংগ্রহ হইল। তাহারা যখন ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জকে আক্রমণ করিল, তখন দেখা গেল, তাহাদের তুলনায় ইউরোপ কিছুই নয়। তাহারা অদ্ভুতভাবে সর্ব্বত্র জয় লাভ করিল। ইংরাজ ও অষ্ট্রীয়া পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। হল্যাণ্ড বিপ্লবীদের হস্তগত হইল। জর্ম্মনী ও স্পেন ভীত হইয়া ফরাসীর সহিত সন্ধি করিল।

এরূপ আশা করা গিয়াছিল যে, বৈদেশিক শত্রুকে পরাভূত করিয়া বিপ্লবীগণ শান্ত মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দেশের গঠনমূলক কার্য্যে মনোনিবেশ করিবে। কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না, রব্‌স্‌পিয়ীর প্ররোচনায় দেশে যে ভীতির শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার অবসান হইল না। হত্যা-লীলা পূর্ণমাত্রায় চলিল। বিভিন্ন সংস্কারকগণ নূতন নূতন মত লইয়া দেশকে ক্ষেপাইয়া তুলিতে লাগিলেন। হিবাটির অনুবর্ত্তীগণ দেশের মধ্যে নানা বিষয়ে সংস্কার আনয়ন

করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ক্যাথলিক ধর্মকে বাদ দিয়া যুক্তির ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন; এবং প্রকাণ্ড উপাসনাগার ধ্বংস করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদের সব মত রবস্পিরীর মনোনীত হয় নাই, সুতরাং তাঁহাদিগকে অবিলম্বে নিহত করা হইল। তারপর পালা আসিল দাঁতোর। তিনি বলিলেন যে, "যখন বৈদেশিক শত্রুগণ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছে, তখন আর ভীতির শাসনের প্রয়োজন নাই।" কিন্তু রবস্পীরি তাঁহাকেও বাঁচিতে দিলেন না, তাহাকে বধ করিয়া স্বয়ং দেশের মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। তিনি ঈশ্বরের আবশ্যকতা, ও আত্মার অমরতা স্বীকার করিয়া এক ঘোষণাবাণী প্রচার করিলেন। তিনি বিনা বিচারে দেশের বহু লোককে বধ করিলেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহারও দিন ঘনাইয়া আসিল। অত্যাচারের মূল নেতা বলিয়া অবশেষে গিলোটিনেই তাঁহার মস্তক ছেদন হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর কিছুদিনের জন্য ফ্রান্স শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল।

কনভেন্সন সভার আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত দেশের মধ্যে অনেক অত্যাচার সাধিত হইল, অনেক হত্যা-লীলার অভিনয় হইল, কিন্তু যে প্রধান কার্য্যের জন্য কন্ভেনসনের কার্য্য আরব্ধ হয়, তাহার কিছুই করা হইল না। এক্ষণে সেই দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

দেশ-শাসনের জন্য একটি সুগঠিত শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করাই হইল কন্ভেন্শনের প্রধান কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে রাজার হস্তেই সমস্ত কার্য্যের ভার ছিল। এক্ষণে পাঁচজন সভা লইয়া গঠিত একটি কমিটির হাতে সেই ভার প্রদত্ত হইল। এই কমিটিকে ডিরেক্টরী (directory) বলা হয়। আইন প্রণয়ন করিবার ভার দুইটি সভার উপর অর্পিত হইল—যথা :—council of five hundred এবং council of elders. যখন কনভেনশন সভা দেশের ভবিষ্যৎ শাসন পদ্ধতি প্রস্তুত করিতেছিল, তখন উহাকে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য সভা-গৃহের বাহিরে উন্মত্ত জনসাধারণ নানাবিধ অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। বাধা না পাইলে হয়ত তাহারা সভা ভাঙ্গিয়া দিত। কিন্তু সেই সময়ে তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নামক একজন অখ্যাতনামা যুবক পরম বীরত্বের সহিত উন্মত্ত জনতার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার নূতন জীবনের জয়-যাত্রা আরম্ভ হইল। উহার কিছুদিন পর কনভেনশন আপনা হইতে ভাঙ্গিয়া গেল।

জাতীয় কনভেনশনের জীবন-কাল অতি ক্ষণস্থায়ী কিন্তু এই অত্যল্পকালের মধ্যে উহা অনেকগুলি অভিনব সংস্কার আনয়ন করে। কিন্তু দেশের হিত করিতে গিয়া কন্ভেন্শন কতিপয় কঠোর পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক কয়েকটি ভীষণ অপকর্ম্মেরও প্রশ্রয় দিয়াছে। কনভেন্শন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে সত্য, কিন্তু রাজা-রাণীকে নির্দ্দয় ভাবে বধ করিয়া খুব সুবিবেচনার কার্য্য করে নাই। দেশের শত্রুকে বিনাশ করিবার নামে কনভেনশন যে ভীতির শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহাতেও দেশের অনেক নিরপরাধ ব্যক্তি নিহত হইয়াছে। কিন্তু এতৎ সত্বেও কন্ভেন্শন কয়েকটি গৌরবজনক কার্য্যও করিয়াছে। ইহারই প্রভাবে প্রবল বৈদেশিক শত্রু পরাজিত হইয়াছে। ইহা Metric System প্রতিষ্ঠা দ্বারা ওজনের সুব্যবস্থা করিয়া দেশের অনেক কল্যাণ সাধন করিয়াছে। Civil Code প্রস্তুত করিয়া দেশের সকল শ্রেণীর মানুষকে একই আইনের দ্বারা শাসন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। সুশিক্ষার জন্য কয়েকটি সুন্দর ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছে। নর্ম্মাল স্কুল, শিল্প-বিদ্যালয়, জাতীয় লাইব্রেরী প্রভৃতি জাতীয় কন্ভেন্শনের অক্ষয় কীর্ত্তি। দেশের চতুর্দ্দিকেই যখন ধ্বংস-লীলা হইতে ছিল, সেই সময়ে এইরূপ গঠন-মূলক কার্য্য বিপ্লবীদের পক্ষে কম শ্লাঘার বিষয় নহে।

জাতীয় কনভেনশনের নব ব্যবস্থা অনুসারে দেশের শাসন-ভার পাঁচজন সভ্যদ্বারা গঠিত ডিরেক্টরীর হস্তে সমর্পিত হয়। নব নিযুক্ত ডিরেক্টরীর হস্তে শাসনভার অর্পিত হইবামাত্র প্রধান সমস্যা এই দাঁড়াইল যে, বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালন করা যাইবে কিনা। নানা তর্ক-বিতর্কের পর ইংলণ্ড ব্যতীত সকলেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল। যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সেনাপতি বিভিন্ন দিকে প্রেরিত হইলেন। দুই-তিন দল সৈন্য অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মানির দিকে ধাবিত হইলেন, আর মুষ্টিমেয় সেনা ও অল্প রসদ লইয়া মহাবীর নেপোলিয়ন ইটালি অভিযানে অগ্রসর হইলেন। ইটালি যুদ্ধের কৃতকার্য্যতা

তাঁহাকে উত্তরোত্তর উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করাইয়া দিল।

সামান্য অবস্থা হইতে নেপোলিয়ন কিরূপে ধীরে ধীরে শক্তি সংগ্রহ করিয়া দেশের মধ্যে সর্ব্বে-সর্ব্বা হইয়া পড়িলেন, তাহার বিবরণ দিবার স্থান এখানে নাই। পৃথক প্রবন্ধে নেপোলিয়ন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। নেপোলিয়ন অসুর-জয়ী বীর, পরাজয় কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। তাই ইটালী অভিযানের ভার লইয়া তিনি দেশের পর দেশ জয় করিয়া যাইতে লাগিলেন। নেপোলিয়ন যখন বিদেশে বিজয়োল্লসিত, সেই সময়ে প্যারিসে ডিরেক্টরদের মধ্যে গৃহ-বিবাদ উপস্থিত হইল। এই সুযোগে বৈদেশিক শত্রুগণ নানাদিক হইতে ফরাসী দেশ আক্রমণ করিল। উহাদের আক্রমণ ফরাসী সহ্য করিতে না পারিয়া সর্ব্বত্র পরাজিত হইল। এইরূপ পরাজয়ে ডিরেক্টরীর অযোগ্যতা ও অকর্ম্মণ্যতা প্রমাণিত হইল। সেই সময়ে মিশরে নেপোলিয়ন ও ভয়ানকভাবে ইংরাজের হস্তে পরাজিত হন। পরাজিত হইয়া তিনি বিদ্যুদ্বেগে প্যারিসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ডিরেক্টরীকে ধ্বংস করিয়া স্বহস্তে ফ্রান্সের শাসন-তন্ত্র গঠন করিবার ভার লইলেন।

নেপোলিয়ন যে শাসন-তন্ত্র গঠিত করিলেন, তাহাকে consular constitution বলা হয়। ইহার বিশেষত্ব এই যে executive ক্ষমতা দশ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত তিন জন কন্‌সালের হস্তে ন্যস্ত হইল। উক্ত তিন জন কনসালের মধ্যে প্রথম কনসালের হস্তে চরম ক্ষমতা থাকিবে। শান্তি, যুদ্ধ, রাজ্য-শাসন প্রভৃতি বিষয়ে তিনিই সর্ব্বে-সর্ব্বা। এতদ্ব্যতীত তিনটি ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইল যথা:—কাউন্সিল অব্ ষ্টেট, ট্রিবুনেট, ও লেজিস্‌লেটিভ সভা। প্রথমটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিবে, দ্বিতীয়টি ভোট না দিয়া কেবল আলোচনা করিবে এবং তৃতীয়টি আলোচনা না করিয়া কেবল ভোট দিবে। ইহা ছাড়া সিনেট নামক আর একটা সভা গঠিত হইল, উহাতে ষাট জন সভ্য ছিল, ব্যবস্থাপক সভার প্রস্তাবাবলী সমর্থন করা না করাই ছিল উহার প্রধান কাজ। এই নূতন শাসন-তন্ত্রের প্রথম কনসাল হইলেন নেপোলিয়ন। তিনি কন্‌সাল হইয়া এরূপ স্বেচ্ছাচারীতার সহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন যে, অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার সম্রাট হইবার পথ পরিষ্কার হইয়া গেল। নেপোলিয়নের অদ্ভুত সাহস, প্রতিভা ও অসামান্য দূরদর্শিতা ইতঃপূর্ব্বেই প্রত্যেকের দৃষ্টি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। এক্ষণে কনসাল হইয়া তিনি ফ্রান্সকে গৌরবের পথে পরিচালিত করিতে লাগিলেন, এবং অত্যল্প কালের মধ্যে ইংলণ্ড ব্যতীত সমগ্র ইউরোপ তাঁহার করতলগত হইল। বহুদিন পর ১৪শ লুইয়ের অসম্ভব কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইল।

ইউরোপীয় ইতিহাস আলোচনা করিলে একটা বিষয় অতি সহজেই ধরা যায়। A successful militarism is the prop of despotism মহাবীরগণের বিজয়-গৌরব স্বেচ্ছাচারিতার প্রধান সোপান। কত শত বীর গণতন্ত্রের নামে যুদ্ধ করিতে করিতে বিজয় গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া অবশেষে পরম স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফরাসীর ইতিহাসে এইরূপ আর একজন বীরের আবির্ভাব হইল, যিনি সামান্য লোকের পুত্র হইয়াও কেবল বীরত্ব প্রভাবে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া স্বেচ্ছাচারী নরপতির রূপ ধারণ করিলেন। পর পর কয়েকটি ভীষণ যুদ্ধে সুনিপুণ কৌশল সহকারে তিনি এরূপ বিজয় লাভ করিলেন যে, সম্রাট হইতে তাঁহার পথে আর কোনও বাধা রহিল না। তিনি বলিয়াছেন:—I have found the crown of France lying on the ground, I picked it up with my sword—আমি দেখিলাম ফরাসীর রাজ-মুকুট ধূলায় লুণ্ঠিত, আমি তরবারির সাহায্যে তাহা কুড়াইয়া লইলাম। সত্যই তাহাই হইল, ১৮০৪ খ্রীঃ তিনি আপনাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ১৬শ লুইকে লক্ষ্য করিয়া বিপ্লব আরম্ভ হয়, সেই লুইকে বধ করিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, আর মহাবীর নেপোলিয়নের রাজ্যাভিষেকে বিপ্লবের ও গণতন্ত্রের অবসান হয়।

সম্রাট পদলাভ করিয়া অবধি একদিনের জন্যও নেপোলিয়ন বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার অজেয় বাহিনী লইয়া সমগ্র ইউরোপ জয় করিলেন। স্পেন, জার্ম্মাণী, ইটালী তাঁহার পদভরে কম্পিত, প্রবল রুশ তাঁহার ভয়ে থর থর কম্পমান। কেবলমাত্র ইংলণ্ড তাহার স্বশক্তি লইয়া কোনওরূপে বাঁচিয়া আছে। এই ইংলণ্ডের প্রচেষ্টায় শেষ পরীক্ষার জন্য আবার ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ তাঁহার বিরুদ্ধে তুমুল আয়োজন আরম্ভ করিয়া

দিলেন। সেই পরীক্ষার স্থান ওয়াটারলু। এই বিখ্যাত ওয়াটারলু প্রান্তরে ১৮১৫ খৃঃ নেপোলিয়ান শোচনীয়রূপে পরাজিত হইয়া ইংরাজদের হস্তে বন্দী হইলেন এবং সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্ব্বাসিত থাকিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরলোক গমন করেন।

পৃথিবীর বিখ্যাত বীর নেপোলিয়নের দারুণ পরাজয়ে ফরাসী জাতির দুর্দ্দশার অবধি রহিল না। ফ্রান্সের মধ্য-গগনের প্রখর সূর্য্য, আপনার মহিমান্বিত ঔজ্জ্বল্যে প্রভা বিস্তার করিবার পূর্ব্বেই হঠাৎ রাহুগ্রস্ত হইয়া পড়িল, তৎপর গাঢ় তিমির আসিয়া কিছু দিনের জন্য সমগ্র দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। দুই দিন পূর্ব্বেও যে নেপোলিয়নের নাম শ্রবণ করিবামাত্র প্রত্যেক বীরের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিত, ইউরোপের সেই বিখ্যাত বীর নেপোলিয়ন আজ বন্দী হইয়া নির্ব্বাসিত হইলেন। ফ্রান্সের গৌরব-মহিমা, তাহার স্পর্দ্ধিত আনন হঠাৎ মলিন হইয়া গেল। ওয়াটারলুর যুদ্ধের পর বিজয়ী শক্তিপুঞ্জ সগৌরবে প্যারিসে প্রবেশ পূর্ব্বক, আপনাদের ইচ্ছামত সন্ধিসর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া পরাজিত ফ্রান্সকে তাহাই পালন করিতে বাধ্য করিলেন। তাঁহারা সেই সন্ধি-সর্ত্ত অনুসারে, ফ্রান্সের গণতন্ত্রের ভিত্তি-মূল উৎপাটিত করিয়া পুনরায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিলেন। নিহত লুইএর ভ্রাতা ১৮শ লুই ফ্রান্সের রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য ফ্রান্সের নিকট প্রচুর অর্থ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আদায় করিয়া লওয়া হইল। তৎপরে ইউরোপের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের প্রজা-বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য শক্তিপুঞ্জ ভিয়েনা নগরে মিলিত হইয়া Holy alliance বা পবিত্র সম্মিলনী নামক এক নূতন সমিতি স্থাপন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহারা একযোগে কার্য্য করিবেন।

যে গণতন্ত্রকে নিরাপদ রাখিবার জন্য এত রক্তপাত এত ধ্বস্তাধ্বস্তি হইল, তাহার অবসানে সেই স্থানে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া ১৮শ লুই আসর জাঁকিয়া বসিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর ধরিয়া ফ্রান্সে আবার প্রজা-বিদ্রোহ আরম্ভ হইল, ইহার ফলে আবার দ্বিতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। (প্রথম গণতন্ত্র ১৭৯২—১৭৯৮) তৎপর আবার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সময়ে ফরাসীতে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও তজ্জনিত বহু রক্তপাত হইয়াছিল। তৎপরে পুনরায় ১৮৭৩ খৃঃ যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহাই ইতিহাসে তৃতীয় গণতন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ। অদ্যাবধি এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। ফরাসী-বাসী এক্ষণে ইহার শান্তি সুধাস্বাদনে সম্মোহিত।

—আগামী বারে সমাপ্য

আমার যৌবন

—মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ

যেদিন প্রথম এ হৃদয়-তলে
পুলক-শিহর সনে
নয়নের কোণে নবীন কাজলে,
অস্ফুট কুমারী মনে,
বুকে মুখে আর শিরায় শিরায়,
বুনিল প্রথম স্বপন মায়ায় ;
নব যৌবনের সে নব উষায়
তোমারে পড়েছে মনে
যেদিন প্রথম ডাকিল কোকিল
আমার জীবন-বনে।

সেই দিন হতে একাকী বিজনে
যৌবন ডালাখানি,
সাজায় হেথায় পরম যতনে
জীবনের ঘানি টানি'।
চির জীবনের দেবতা আমার,
অর্ঘ্য এযে গো তোমার পূজার
আর কারে দেব ? কেবা আছে আর
ডাকিতে আপন জানি' ?
তোমারই দেওয়া পূজা উপচার
তোমারই দ্বারে আনি।

এ নব যৌবন-সৌরভ-ভোলা
শত মধুকর আসে,
বুকের বসনে দিয়ে ধীরে দোলা
সান্ধ্য-সমীর হাসে।
নিলাজ কোকিলা কুহু-কুহু গেয়ে
করে জ্বালাতন একেলাটি পেয়ে,
আঁখি ঈশারায় ডাকি' চেয়ে চেয়ে
মিটি মিটি তারা হাসে।
সরমে বুকের বসন জড়াই,
কণ্ঠে কাঁদন আসে।

মাধবী যামিনী চাহেনা ত মোর
যৌবন-দীপ্ত হিয়া ;
চাহে না পরিতে গলে ফুল-ডোর
মন প্রাণ জাগানিয়া
দখিনা বাতাস, বাঁকা ফুল-বাণ,
চাহে না চাহে না আমার পরাণ
রুদ্র, তোমার বজ্র বিষাণ
এস ওগো, বাজাইয়া,
সঁপিব তোমার চরণে আমার
যৌবন-দীপ্ত-হিয়া।

যতদিন তব বজ্র বিষাণ
আমার কুটীর পাশে,
ধ্বনিয়া না উঠে দেবতা মহান্,
পঙ্গু জগত নাশে ;
ততদিন মোর এ যৌবন ভার,
বহিব এমনি আমি অনিবার,
ততদিন ওগো জীবন আমার
ধরিব তোমার আশে।
তার পর এই যৌবন ডালা
রাখিব চরণ পাশে।
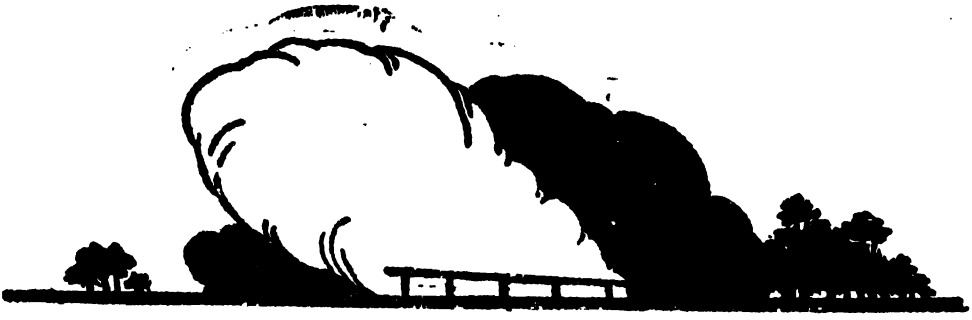
ছেলে

— গল্প —

—শ্রীঅসিত মুখোপাধ্যায়

এক মাত্র কন্যা চপলা সুন্দরীর বাম বাহু তাবিজ ও কবচে ভারাক্রান্ত করিয়া যখন তাহার বৃদ্ধা মাতা আন্নাকালী একটি দৌহিত্রের শুভাগমন প্রত্যাশা করিতেছিলেন, তখন তাহার ডাক আসিয়া পৌঁছিল।

বৃদ্ধার শরীর শেষ হইল বটে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষার শেষ হইল না। যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এ জগতের বায়ু তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের আদান-প্রদান করিতে আর রাজি নহে, তখন জামাতা কাশীশ্বর বাবুকে ডাকিয়া কহিয়া গেলেন,—"বাবা, আর-একটা বিবাহ করিও, কিন্তু দেখো, আমার 'চপুর' যেন কোন কষ্ট হয় না।"

কাশীশ্বর বাবু কুষ্টিয়ার একজন হাকিম। তাঁহার বয়স ছত্রিশ বৎসর। বিবাহের পর বারো বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু একটি ক্ষুদ্র বালিকাও যখন তাঁহাদের দাম্পত্য জীবনের মাঝখানে তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতে আসিল না, তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ই পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে বেশ-একটু অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন।

স্বামী আপিশে চলিয়া গেলে একটা কর্ম্মহীন দীর্ঘ জীবন চপলাকে বড়ই বিব্রত করিয়া তোলে। এই অলস অবকাশের মধ্যে থাকিয়া কেবল একটা কথাই তাহার মর্ম্মে আঘাত করিয়া যায়। তাহার উন্মুখ মাতৃস্নেহ যেন ব্যর্থ আলিঙ্গনে একটা সুন্দর শিশুকে বুকে জড়াইয়া ধরিতে চাহে। কত শিশু ভাঙ্গিয়া গড়িয়া এইরূপে কত দীর্ঘ দিন চপলার চলিয়া গেল।

শনিবার দুইটার সময়ে কাশীশ্বর বাবু বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, শয়ন-ঘরের জানালা খুলিয়া চপলা সুন্দরী কি যেন দেখিতেছে। আকাশ ভরা কালো মেঘের মত একরাশি চুল তাহার পিঠের উপর অযত্নে পড়িয়া রহিয়াছে। নারীত্বের এবং মাতৃত্বের নিষ্ফলতার গভীর চিহ্ন তাহার সুন্দর মুখখানিতে যেন একটা কালো ছায়া আঁকিয়া দিয়াছে। তাহার ব্যর্থ মাতৃস্নেহ গভীর বেদনায় দেবতার চরণে কত নীরব মিনতি জানাইয়াছিল; কিন্তু নিষ্ঠুর দেবতা তাহার সে বাসনা পরিপূর্ণ করিলেন না। ফুলের সার্থকতা সৌরভে, নারীত্বের বিকাশ মাতৃত্বে। নারী জীবনের যাহা আশা, তাহা চপলার গন্ধহীন ফুলের মত ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িল।

কাশীশ্বর বাবুর জুতার শব্দে চপলা সেইদিকে ফিরিয়া চাহিল। কাশীশ্বর বাবু কহিলেন,—"আহা, অত কষ্ট করে কাজ নেই, তুমি যা' করছিলে তাই কর।"

"কি করছিলাম তুমি বলদিকি ?"

"কারও ছেলের উপর নজর করছিলে।"

"কেন, আমি কি ডাইনী যে, পরের ছেলের ওপর নজর করতে যাব !"

কাশীশ্বর বাবু পোষাক ছাড়িতে ছাড়িতে কহিলেন,—"তবে সে কাজটার চেষ্টায় থাকা যাক্, কি বল ? মিয়াদ তো ফুরিয়ে এল।"

"কোন্ কাজটার ?"

"তোমার মার সেই শেষ আদেশ। এত শীগ্গির ভুলে গেলে চপু !"

বেদনা-প্রাপ্ত শিশু যেমন নিজের বাহাদুরী দেখাইবার জন্ত মলিন মুখে হাসির রেখা ফুটাইয়া তোলে, চপলাও

তদ্রূপ অনর্থক হাস্যের সহিত উত্তর করিল,—"তা বেশ তো, এই আস্‌ছে বোশেখেই শুভ কর্ম্মটা শেষ করে ফেল। শুভস্য শীঘ্রং।"

"আহা তা' সংস্কৃতটা কেন? বাংলাতেই বল যে এতে তোমার অমত নেই।"

"এক রত্তি অমত নেই, বরং মত আছে।"

চপলা তাহার বিস্তৃত উদাস-নেত্র স্বামীর মুখের উপর বিন্যস্ত করিয়া পুনরায় কহিল,—"আমার এতে বিশেষ মত আছে। আমি কে? আমার জন্য তোমার পরকাল নষ্ট করবে কেন? স্ত্রীর সন্তান না হলে স্বামী আবার স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে, স্ত্রীর মৃত্যু হলে স্বামী আবার বে' করতে পারে—এতো তোমাদের পুরুষের তৈরী আইনে চিরকাল চলে আস্‌ছে। নিয়ম তো আর আমার চাকর নয়। তুমি ফের বে' কর।"

বেদনাতুর পত্নীর এই অভিমান-মাখা বাক্যগুলি কাশীশ্বর বাবুর মর্ম্মে খোঁচা মারিয়া গেল। হায়, নারী-জীবনের সমস্ত বেদনাই ঐ একটি স্থানে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে, সেখানে হাত বুলাইয়া দিলেও রমণী তাহা সহ্য করিতে পারে না।

কাশীশ্বর বাবু চপলাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"ক্ষেপি, ছেলে হবে কিনা ভেবে আমি তোমায় বে' করেছিলুম?"

যেদিন কাশীশ্বর বাবুর বদলীর হুকুম আসিল, চপলার ভ্রাতা বিশ্বনাথ সেদিন সেখানে ছিলেন। অপরিচিত স্থানে একেবারে পরিবার লইয়া উপস্থিত হইলে একজন হাকিমের অন্ততঃ থাকিবার অসুবিধা না হইতে পারে, কিন্তু খরচ তো বটে। তাই বিশ্বনাথ প্রস্তাব করিলেন যে, চপলাকে কয়েক দিন তাহার বাসায় বেড়াইয়া আনিলে ভাল হয়।

বিশ্বনাথের কর্ম্মস্থান কোচবিহারে। কাশীশ্বর বাবু কহিলেন,—"তোমরা স্বাধীন মুলুকের লোক, তোমার ভগ্নিকে যদি বারাসাতে পৌছাইয়া দিবার অধীনতাটুকু স্বীকার করতে পার, তবে নিয়ে যাও, কিন্তু দেখ হে বিশ্বনাথ বাবু, খৎখানা আজ সই করে দিয়ে যেতে হবে।"

"কথাটা সদর-আলার মতই বটে। তাঁদের কিছু বলতে হলেই 'পেনাল কোডের' কথা মনে পড়ে। আচ্ছা তাই হবে। আমার ছুটির জন্য বাবার অসুখ বলে মিথ্যা টেলিগ্রাম করতে হবে না। চপলাকে না হয় আমিই দিয়ে যাব।"

কোচবিহারে বিশ্বনাথের দুই বৎসরের ছেলেকে নিয়া চপলার কাজ বাড়িয়া গেল।

একে হরি সিং-এর অসম্ভব লালন-পালনের দৌরাত্ম্যে খোকা মাটিতে পা ফেলিবার অবকাশ পাইত না, তদুপরি আর একটা স্নেহের উৎপাত আসিয়া তাহার শিশু-জীবনের চঞ্চলতাকে একেবারে লোপ করিয়া দিল।

সেদিন হরি সিং-এর বাজার হইতে ফিরিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতেছিল। বিশ্বনাথ বাবুর পত্নী অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন; সুতরাং এই মাহেন্দ্র-ক্ষণে খোকা মেজেতে পড়িয়া খুব গড়াগড়ি দিয়া লইল এবং হরি সিং-এর কল্কের ছাই সমস্ত মুখে মাখিয়া, কতক মুখে পুরিয়া কিম্ভুত-কিমাকার ভোম্ ভোলানাথ সাজিয়া বসিল।

চপলা সেখানে ছুটিয়া আসিয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া লইল এবং তাহার মুখের মধ্যে আঙ্গুল দিয়া লালা মিশ্রিত ছাই বাহির করিতে করিতে কহিল,—"আসুন আগে দাদা আফিশ থেকে ফিরে; চাকরের হাতে ভার দিয়ে উনি নির্ব্বিবাটে গিন্নিপনা করছেন।"

হরি সিং বাজার হইতে আসিতে আসিতেই তাহার ঐ নিদারুণ অযোগ্যতার মন্তব্যটা শুনিতে পাইল এবং চীৎকার করিয়া কহিল,—"শুনুন গিন্নি মা, ছেলে মানুষ করতে করতে বুড়ো হয়ে গেলুম, আর উনি বলছেন কিনা—ছেলে মানুষ করা কি চাকরের কাজ।"

গিন্নি কহিলেন,—"ও ঐরকম লোক, তুই ও পাগলীর কথায় কান দিস্ নে।"

আজ চপলার প্রাণে একটা রুদ্ধ অভিমান মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। তার ছেলে নাই, সে বন্ধ্যা—তার বৌদি তো সেই ইঙ্গিত করিয়াই হরি সিংকে নিরস্ত করিয়া দিল। তাহার বুকের প্রতি পঞ্জরখানা কাঁপাইয়া একটা বন্যা বহিয়া গেল। হায় বন্ধ্যা নারি, কেন এতখানি প্রয়োজন হীন স্নেহ বুকে করিয়া রাখিয়াছিস্ তুই?

বিশ্বনাথ বাড়ী আসিয়া শুনিতে পাইলেন, চপলা রাগ করিয়া খোকাকে লইয়া শুইয়া আছে।

বিশ্বনাথ বাবু গভীর স্নেহে ডাকিলেন,—"চপু, উঠ—এস দিদি আমার।"

চপলা ছল্ ছল্ চোখে খোকাকে দাদার কোলে দিয়া আবার আসিয়া শুইল। বিশ্বনাথ খোকাকে ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন,—"তুমি না খেলে তো খোকাকে খেতে দেব না দিদি, আর আমিও খাব না। ওঠ—এস দিদি, আর দেরি করো না—তোমার খোকা ক্ষিধেয় বড় কাঁদছে।"

চপলা খোকার মুখ চুম্বন করিতে করিতে উঠিয়া গেল।

অনেক লোক পাহাড়ে বেড়াইতে যায় দেখিয়া চপলা বিশ্বনাথের কাছে এক বায়না ধরিয়া বলিল,—"দাদা, আমায় পাহাড় দেখাতে হবে।"

বিশ্বনাথ বাবু কহিলেন,—"আচ্ছা চল, কাল বিকেলে সবাই মিলে পাহাড়ে বেড়িয়ে আসা যাক্।"

পরদিন সকল আয়োজন হইল। কোচবিহারের অনতিদূরে জয়ন্তিয়া পাহাড় একটা মেঘের প্রাচীরের মত দূরস্থ পথিকের চক্ষে এক বিরাট সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তোলে। চপলা এই প্রথম পর্ব্বত দর্শন করিল এবং নির্ভীক হৃদয়ে সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বেলা শেষ হইয়াছে। একটু একটু করিয়া মেঘ জমিয়া জয়ন্তিয়ার কণ্ঠদেশে যেন মাল্য রচনা করিয়া দিল। এমন সময়ে চপলা দেখিল—খানিকটা দূরে কালো কুচকুচে একটি ছেলে যেন ঘুমাইয়া রহিয়াছে। চপলা নিকটে গিয়া সেই কালো ছেলেটিকে সস্নেহে কোলে তুলিয়া লইল।

আধ-মরা ছেলেটি চপলার কোলে একটু চোখ মেলিয়া চাহিল। চপলা কহিল,—"বৌদি—ভাই, একটু মাই দাও না, দেখ ক্ষিধেয় কেমন জিভ্ বার করছে।"

"ওসব নিয়ে আমায় ছুঁয়ো না—ছুঁয়ো না বল্‌ছি। ও ছাই যেখানে ছিল, সেখানেই ফেলে রাখ।"

"তা' হলে আমিও বাড়ী যাব না বৌদি।"

বিশ্বনাথ দেখিলেন, চন্দ্রের কলঙ্কের মত একটি কালো শিশু চপলার বুকে যেন মাতৃত্বের আস্বাদ পাইয়া তাহা প্রাণপণে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে।

বিশ্বনাথ কহিলেন,—"চপু, তুমি তো ও ছেলে নিয়ে বাঁচাতে পারবে না, আমার কাছে দাও—আমি ওকে আবার ওখানে রেখে আসি।"

জমিতে যখন ভাল ফসল না জন্মে, তখন পাহাড়িয়া ধরিত্রীর পরিতৃপ্তির জন্ম একটি মানব-শিশু দান করে। এই মানব শিশুটিও সেই কুসংস্কারের উপহার তাহাতে সন্দেহ নাই।

চপলা উত্তর করিল,—"দাদা, এযে কুড়ানো ছেলে, এর ওপর আর কারুর দাবী নাই। এ ছেলে আমি কাউকে দেব না।"

অগত্যা বিশ্বনাথ বাবু সেই ছেলে লইয়াই বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই চপলা এই ছেলেটিকে আপনার করিয়া লইয়াছে। বিশ্বনাথ বাবু তাহার জন্য একসের দুধ রোজ করিয়া দিলেন। গিন্নি ঠাট্টা করিয়া কহিলেন,—"আহা, ভাগ্নের কি আদর!"

চপলা ছেলের নাম রাখিল 'শালগ্রাম'। তাহার বৌদির এ নামটা মোটেই পছন্দ হইল না। তিনি নাম রাখিলেন 'পাহাড়ে বাঁদর।'

চপলা একদিন কহিল,—"দেখ বৌদি, আমার 'শাল-গ্রাম' কেমন সুন্দর হামাগুড়ি দিচ্ছে।"

বৌদি উত্তর করিলেন,—"ও কাঠ-খোট্টা পাহাড়ে' ছেলে, দু'দিন পরে গাছে চড়তে শিখবে।"

চপলা কহিল,—"বৌদি, আমার 'শালগ্রামের' চোখ দু'টি যদি আর একটু বড় হত—"

"তা'হলে তার চাউনিতে স্বর্গ থেকে সব অপ্সরা নেমে আসত, কেমন না? কর্ত্তার কাছে একখানা চিঠি দাও না যে, আমি এক কেষ্ট পেয়ে একেবারে যশোদা হয়ে বসে আছি।"

'তা দিয়েছি'—বলিয়া চপলা তাহার ক্রীড়ারত 'শাল-গ্রামকে' কোলে নিয়া তাহার গালে গভীর একটী চুম্বন দিল।

চপলা কাশীশ্বর বাবুর নিকট চিঠি লিখিল। কি ভাবে পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়া শালগ্রামকে কুড়াইয়া পাইয়াছে, তাহা সবিস্তার জানাইল।

কাশীশ্বর বাবু চিঠির জবাব দিলেন। উত্তরে লিখিলেন, —"তুমি সত্বর এখানে চলে এসো। তোমাদের নাম রাখা ঠিক হয় নি, আমি ওর নাম রাখলুম—পাহাড়ি বাবা।"

নাম শুনিয়া চপলার বৌদি তো হাসিয়াই খুন। "বাপ্‌রে বাপ, নামের কি ঘটা! ও তোর কর্ত্তা বাবুর চৌদ্দ পুরুষের বাবা।"

চপলা বারাসাতে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইল। বিশ্বনাথ কহিল,—"আর ক'দিন থেকে যা'না দিদি।"

চপলা উত্তর করিল,—"না দাদা, আমার 'শালগ্রামের' জন্ত ঝি রেখে দিতে হবে, আমার কালই পাঠিয়ে দাও।"

চপলা 'শালগ্রামকে' লইয়া বারাসাতে পৌছিল। কাশীশ্বর বাবু কহিলেন,—"ওগো, এযে পাহাড়ের রং, তুমি কি পুষ্যি-পুত্তুর করে রাখবে নাকি?"

"ষাট—আমার 'শালগ্রাম' আমারই আছে, ওকে আবার পুষ্যি-পুত্তুর করতে যাব কেন?"

"যা হোক তোমার কপাল ভাল, তাই পাহাড়েও ছেলে জুট্‌লো।"

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। পাহাড়ির আব্দারের আক্রমণে বাড়ীর ঝি-চাকর ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার জন্ম-পত্রিকায় সকলের অজ্ঞাতসারে যে কি নিগূঢ় ইতিহাস লিপিবদ্ধ ছিল, তাহা বারাসাতের কেহই জানিতে পারিল না। বাহিরে লোকে কাণা-কাণি করিত যে, ডেপুটি বাবুর ছেলেটি যেমন সুন্দর, গিন্নিও তেমনি হবে। সুন্দর পুরুষ হইলেই সুন্দর স্ত্রী ঘটে না,—ইত্যাদি।

পাহাড়ি চপলাকে মা বলিয়া ডাকে। সে সম্বোধনে পুত্র-হীনার প্রাণ যে কি এক তৃপ্তির আস্বাদনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে! সে ডাক শুনিতে শুনিতে হয়ত সে উত্তর করিতে ভুলিয়া যাইত। ভৃত্য রামচরণ একদিন ভুল ধরিয়া কহিল,—"মা, পাহাড়ি বাবু তোমায় ডাক্‌ছে, সাড়া দিচ্ছ না যে।"

চপলা বিরক্ত হইয়া কহিল,—"চুপ কর, আমায় শুন্‌তে দে।"

বালক-বালিকা যেমন খেলার পুতুলকে নিত্য নূতন পোষাক পরাইয়া, কাল্পনিক খাদ্য খাওয়াইয়া, খেলনার বিছানায় শোয়াইয়া অশেষ আনন্দ উপভোগ করে, চপলাও পাহাড়িকে ঠিক সেইরূপ একটি জীবন্ত খেলনার মত আনন্দের সামগ্রীতে পরিণত করিল।

কাশীশ্বর বাবু একদিন কহিলেন,—"চপু, তোমার শালগ্রামকে পাঠশালায় পাঠাবার ব্যবস্থা কর; একটু লেখা-পড়া শিখতে আরম্ভ করুক।"

চপলা ভাবিয়া উত্তর করিল,—"পাঠশালার গুরুমশাই যদি ওকে মারে? তার চেয়ে বাড়ীতে মাষ্টার রেখে দাও।"

দশ টাকা মাসিক বেতনে মাষ্টার রাখা হইল বটে, কিন্তু বাল্যের নানারূপ পরিবর্ত্তনের গোলমালেই বোধ হয় বিধাতা তাহার অদৃষ্টে বিদ্যা লিখিবার অবসর পান নাই।

কাশীশ্বর বাবু লক্ষ্য করিলেন,—এই পাহাড়ে পাওয়া ছেলের বুদ্ধি পাথরের মতই শক্ত। তাহাতে কোনওরূপ চাষ দিবার সম্ভাবনা নাই। তিনি চপলাকে ডাকিয়া কহিলেন,—"দেখ, এই বুনো-গাড়োলের বাচ্চা না পুষে যদি একটা ভাল-কুত্তা পুষতে।"

পাহাড়ির শিক্ষা তাহার বয়সের সঙ্গে আটিয়া উঠিতে পারিল না। এক-এক করিয়া তিনজন মাষ্টার, দুইখানা স্পেলিং-বুক এবং তিনখানা বর্ণ-পরিচয় শেষ হইয়া গেল। অবশেষে চপলা স্থির করিল যে, পাহাড়ির বিদ্যা অর্জ্জনের কোনই প্রয়োজন নাই। একটু চিঠি-পত্র লিখিতে শিখিলেই চলিবে।

এই ব্যবস্থানুসারে বালি-কাগজের আমদানি করা হইল। কিন্তু পাহাড়ি দেখিল যে, বাড়ীর সম্মুখে প্রশস্ত মাঠ, সেখানে কত ছেলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঘুড়ি উড়াইতে আসে। বালি-কাগজে হাতের লেখা মস্ক করার চেয়ে এ কাজটা নিতান্ত সহজ; সুতরাং সে ইহাতেই মনোনিবেশ করিল।

কাশীশ্বর বাবু আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া চপলাকে কহিলেন,—"বাপু, এক জানোয়ার ধরে এনে, সেটাকে আস্‌কারা দিয়ে দিয়ে তুমি আমায় এম্‌নি করে অপমানী করবে?"

সত্যিকার অপরাধ গোপন করার সময়ে মানুষের মুখে যেমন সাহস ও দৃঢ়তার চিহ্ন মাত্র থাকে না, চপলার মুখখানিও সেইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন, কি হয়েছে?"

"হবে আর কি? তোমার নন্দ-দুলাল একটা কোচ্‌-ম্যানের সঙ্গে বসে গরুর গাড়ীতে রাস্তায় বেড়াচ্ছে। এই বুড়ো কালে তোমার ঐ খেলনা নিয়ে থাকাটা কি ভাল দেখায়? ওকে একটু শাসিয়ে দাও।"

চপলা স্বামীর কথার কোন উত্তর করিল না। একটা উদ্বেগের চিহ্ন তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। গাড়ীতে উঠিয়া পাহাড়ি কোথায় যায়,—এই চিন্তা তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তাড়াতাড়ি রামচরণকে সন্ধানে পাঠাইয়া নিজে স্বামীর জন্ত খাবার আনিতে গেল।

কাশীশ্বর বাবু খাবার খাইতে খাইতে কহিলেন,—"দেখ, একটা কালো পাহাড়ি ছেলেকে নিয়া তুমি এত অস্থির হয়ে পড়লে,—তোমার পেটের ছেলে হলে কি করতে জানি না।"

চপলা মনে মনে উত্তর করিল—কালো ত আর কালির দাগ নয় যে, সাবান দিয়ে তুলে ফেলবো! প্রকাশ্যে কহিল,—"ওগো, তোমার ভয় নেই। পাহাড়ি তোমার জমিদারীর অংশ নিতে আসে নাই। তুমি দিন-রাত ওকে অমন করে বল কেন?"

দিন-দুই বাদে রামচরণ অভিযোগ করিল যে, পাহাড়ি বাবু একতারা কিনিতে তাহার ভাঙ্গা বাক্সে যে-দুইটি টাকা ছিল, তাহা নিয়া গিয়াছে।

চপলা রামচরণের হাতে দুইটি টাকা দিয়া কহিল,—"খপরদার, বাবু যেন না শোনে।" কিন্তু পরের দিন কান্ত ঝি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"দেখ মা, আমার এই নূতন কাপড়খানা পাহাড়ি বাবু ছিঁড়ে নিয়ে গেল।"

চপলা বলিল,—"দেখ বাছা, এই টাকা নে, একজোড়া কাপড় কিনে নে যা। বাবুর কাণে যেন একথা না যায়।"

পাহাড়ির অত্যাচার যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন চপলা কতদিন শপথ করিয়াছে,—"হতভাগাটা এলে দূর করে দেব। ও আমার কে? কেন ওর জন্য আমি স্বামীর কথা শুন্‌তে যাব? কেন ওর জন্য আমি ঝি চাকরের অনুযোগ শুনি?"

কিন্তু পাহাড়ির শুষ্ক মুখখানি দেখিলে অমনোযোগী ছাত্রের মত মুখস্থ করা সকল শপথই চপলা ভুলিয়া যাইত। এই কালো শুষ্ক মুখখানিই ত জীবনের প্রথম প্রত্যূষে না জানি কোন সত্বে তাহার হৃদয়ে অ-স্থায্য অধিকার বিস্তার করিয়াছে।

বলি বলি করিয়া পাহাড়িকে কোন কথাই বলা হইল না। বরং অবিরত ঢাকিয়া রাখিয়া একটু ক্ষুদ্র ক্ষতকে দুশ্চিকিৎস্য মহাব্যাধিতে পরিণত করা হইল। স্নেহের মহিমাকে খর্ব্ব করিবার জন্য, ক্ষমার মহত্বকে দুর্ব্বলতার নিম্ন-স্তরে টানিয়া আনিবার জন্য এই প্রশ্রয় যেন ধীরে ধীরে পাহাড়িকে অধঃপাতের দিকে ঠেলিয়া দিতে লাগিল।

কয়েক দিন হইল হ্যামিল্টনের বাড়ী হইতে ফরমাইস দিয়া চপলা এক-ছড়া নেক্‌লেস্ তৈয়ার করাইয়া আনিয়াছে। তাহার লকেটে কাশীশ্বর বাবু ও তাহার দুইখানা ক্ষুদ্র ফটো ও তাহার চতুর্দ্দিকে মূল্যবান পাথরে কারুকার্য্য খচিত ছিল। বাক্স খুলিতেই পাহাড়ি সেই লকেটটি দেখিতে পাইল এবং মুচ্‌ড়িয়া মুচ্‌ড়িয়া সেটি ছিঁড়িয়া বিছানার পাশে রাখিয়া দিল। তারপর দশখানা গিনি বাহির করিয়া নিয়া যখন নেক্‌লেস্‌টি বাক্সে রাখিয়া গেল, তখন উহা ঝপাৎ করিয়া বাক্সের মধ্যে পড়িয়া গেল।

শব্দ শুনিয়া চপলার নিদ্রা-ভঙ্গ হইল; এবং পাহাড়ির কীর্ত্তি-কলাপ দেখিতে পাইয়া রুক্ষ-স্বরে কহিল,—"পাহাড়ি, তুই বাক্স খুলেছিস্ কেন রে?"

পাহাড়ি কোন কথা কহিল না।

চপলা তখন—এই বোধ হয় পাহাড়ির জীবনের প্রথম দিন—তাহার কান ধরিয়া কহিল,—"বল্, কেন বাক্স খুলেছিলি? যদি না বল্‌বি ত—"

পাহাড়ি তাহার ছল-ছল নেত্র দুইটি চপলার মুখের উপর বিন্যস্ত করিয়া নীরবে জানাইয়া দিল যে, এ কর্ম্মের কোনও উত্তর নাই। চপলা আরও একটু দৃঢ় হইয়া ডান-হাতে পাখাখানা তুলিয়া কহিল,—"কি বলবিনি—বলবিনি—"

পাহাড়ি গাল ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া অতিকষ্টে ক্রন্দন সংবরণ করিতেছিল। চপলা তাহার মুখের দিকে চাহিল। সেই দৃষ্টির সম্মুখে পাহাড়ি স্থির থাকিতে পারিল না। ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল এবং ডান-হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া অবিরত চক্ষের জল রগ্‌ড়াইতে লাগিল।

চপলা একদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল—সেই জয়ন্তিয়া পাহাড়ের তপ্ত পাষাণের উপর যখন পাহাড়ির অসাড় দেহ প্রথম দেখিয়াছিল—সেই দিনের কথা। তারপর তার বৌদির "ছুঁতে নেই—ছুঁতে নেই" বলিয়া কতদিন পাহাড়িকে ফেলিয়া দিবার পরামর্শ করিয়াছিল, সেদিন ত এই কুৎসিৎ কাল ছেলেটিকে কেহই তাহার বক্ষের সিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। সে আজ নয় বৎসরের কথা,—ভাবিতে ভাবিতে চপলার হৃদয়ে স্নেহ উথলিয়া উঠিল। সমস্ত বিশ্ব-সংসার যেন এক-বাক্যে বলিয়া গেল—"আহা, পাহাড়ির কেউ নাই।"

চপলা পাহাড়িকে কোলে করিয়া সস্নেহে কহিল,—

"বাবা, কাণে খুব লেগেছে কি? কি হয়েছে, এই যে আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।"

পাহাড়ি উত্তর করিল না। তাহার তপ্ত অশ্রু চপলার ব্যথিত বক্ষ সিক্ত করিতে লাগিল।

শনিবার কাশীশ্বর বাবু দুইটার সময়ে কোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, পাহাড়ি তাঁহার বড়-যত্নের ছড়িখানি কাটিয়া তাহাতে ঘুড়ির সুতা জড়াইতেছে। মূল্যবান হেজেলের ছড়ি, কাশীশ্বর বাবু এই কয়েকদিন হইল "লেড্‌ল্যয়ের" দোকান হইতে কিনিয়া আনিয়াছেন।

এক হাতে সুতা জড়ানো ছড়ি অপর হাতে পাহাড়ির হাত ধরিয়া কাশীশ্বর বাবু অন্তঃপুরে আসিয়া চপলাকে কহিলেন,—"দেখ, তুমি এর একুল-ওকুল দু'কুল নষ্ট করে দিলে। আমি তো এক দিন বলেছি,—ও গাড়োলের বাচ্চা—ও কখনো পোষ মানে না। এখনো এ ইডিয়টকে বাড়ী থেকে দূর করে দাও।"

চপলা একটু থমকিয়া উত্তর করিল,—"ওগো, আমি দিন-রাত্ত হাড়ে-হাড়ে জলে মরচি। ওকে তুমি যা খুসি তাই কর। বারে-বারে নালিশ জানাতে এসো না।"

চপলা পাশের ঘরে গিয়া গোপনে চক্ষের জল মুছিল। এক-পা দুই-পা করিয়া পাহাড়ি যথারীতি ঘুড়ি উড়াইতে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা হইলে পাহাড়ি বাড়ী ফিরিয়া আসিত। কিন্তু আজ দেরী দেখিয়া চপলা রাম চরণকে পাঠাইয়া দিল।

রাম চরণ ৮টার সময়ে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল,—"মা, পাহাড়ি বাবুর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।"

চপলার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। আর কোন কথা তাহার মুখে উচ্চারিত হইল না, সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

চপলা সমস্ত রাত্রি জল-গ্রহণ করিল না। রাম চরণকে কহিয়া দিল—"সমস্ত রাত্রি সদরের দরজা যেন খোলা থাকে।"

চপলা একবার শুইল। আবার গরুর গাড়ীর শব্দ শুনিয়া জানালা খুলিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল। কেরোসিনের ডিবা লণ্ঠনে পুরিয়া সেই অন্ধকার পথে কত গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানেরা মনের সুখে গান গাহিতে গাহিতে গরু তাড়াইয়া বাড়ী ফিরিতেছে। কিন্তু কেহই পাহাড়ি বাবাকে তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল না। চপলা উঠিয়া গিয়া সদর দরজার কপাটের আড়ালে অন্ধকারে হাত দিয়া দেখিল—পাহাড়ি যদি সেখানে ভয়ে-ভয়ে লুকাইয়া থাকে। কিন্তু পাহাড়িকে সেখানে পাওয়া গেল না। কাঠের কবাট যেন দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া স্বস্থান অধিকার করিয়া দাঁড়াইল। আবার ঘরে ঢুকিয়া চপলা খাটের নিয়ে উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। একটা নির্মম নিস্তব্ধতা যেন জমাট অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর চপলা প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে লাগিল—"হে ঠাকুর, হে দেবতা, একটিবার বলে দাও, আমার পাহাড়ি কোথায় গেল। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল—সে প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করিয়া পাহাড়িকে ডাকে।

পরের দিনও পাহাড়ি আসিল না। এক দিন দুই দিন করিয়া তিন দিন অতীত হইয়া গেল, কিন্তু পাহাড়ির কোন সন্ধান জুটিল না।

অনাহারে অনিদ্রায় চপলার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কাশীশ্বর বাবু সস্নেহে তাহার রুক্ষ মস্তক কোলের উপর তুলিয়া কহিলেন,—"চপু, এইভাবে আত্মঘাতী হয়ো না, দেখলে তো সন্ধানের কোনও ত্রুটি হচ্ছে না।"

চপলার কোন উত্তর দেওয়ার শক্তি ছিল না। কেবল উদাস চক্ষু-দুইটি বহিয়া তপ্ত অশ্রু-বিন্দু কাশীশ্বর বাবুর কথার উত্তর জানাইয়া গেল।

সেইদিন রাত্রিতেই চপলার জ্বর হইল। অবিলম্বে ডাক্তার ডাকিয়া পাঠান হইল। ডাক্তার রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়া গেলেন,—"হৃৎ-পিণ্ড অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, খুব সাবধানে ঔষধাদি ব্যবহার করাইতে হইবে।

রাত্রি ভোর-ভোর সময়ে চপলা প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু দিবাভাগে প্রলাপ একটু কমিয়া আসিল। কাশীশ্বর বাবু ভাবিতে লাগিলেন,—স্নেহময়ী চপুর প্রবল স্নেহে ব্যাঘাত করিয়া তিনিই তো তাহার মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। চপলার রুক্ষ চুলের মধ্যে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে করিতে তিনি গভীর স্বরে ডাকিলেন,—"চপু।"

বাসি-ফুলের মত চপুর নিষ্প্রভ মুখখানি ক্ষণকালের জন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে শীর্ণ হাতখানি স্বামীর

হাতের উপর রাখিয়া চপু একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর আবার জ্বর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আবার সেই জয়ন্তিয়ার গল্প, রামের মায়ামৃগ অন্বেষণের কথা, পাহাড়ি বাবার দুঃখময় জীবনের করুণ ইতিহাস সে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল। কাশীশ্বর বাবু বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। আকাশের ভাঙ্গা-ভাঙ্গা মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে নবমীর চাঁদ অতি ধীরে-ধীরে চলিতেছিল। চঞ্চল শিশুর মত জ্যোৎস্না-বালিকা পৃথিবীর বক্ষে ছুটাছুটি করিতেছে।

বিশ্বনাথ ও তাহার পত্নী টেলিগ্রাম পাইয়া এইমাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

বিশ্বনাথকে দেখিয়া কাশীশ্বর বাবু তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বিশ্বনাথ বাবু মেঘলা দিবসের চন্দ্রের মত জ্যোতিঃহীন চপলার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিলেন,—"চপু, দিদি আমার, এই যে আমি এসেছি।"

চপলা অতি কষ্টে স্খলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"কই, আমার পাহাড়ি এল কি?"

তারপর শুধু একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস—জীবনের শেষ নিশ্বাস!

এপারে পাহাড়ির খোঁজ মিলিল না। চপলার অন্তরাত্মা তাই তাহার বুকের ধনকে খুঁজিতে ওপারে চলিয়া গেল।

একখানা মেঠো-গান

(দিনাজপুরের চাষিদের একটা গান অবলম্বনে)

—পল্লী-গীতি- —আক্কেল মণ্ডল

"কি সাইতে দিলাম বিয়া পুর্ণিমার চান্দে"—বাংলার কোন চাষী-কবি প্রথম কোনদিন তার হালখানি চষ্‌তে চষ্‌তে এই মেঠো-গানখানি গেয়েছিল, তার সন তারিখ জানি না, কিন্তু এখনও দেখি বাংলার চাষী-ভাইরা তাদের সেই আদিম মেঠো-কবির গানে গানে বাংলার মাঠের বুক ভরে' তোলে ...... বর্ষায় অঝোর ধারায় শরৎ-মাঠের বুকে বুকে, সোনার ফসলের প্রাণে প্রাণে তা'দের বুক-ভরা বেদন-গীতি জাগে...বাঙলার চাষী-ভাই...কল্পনা বিলাসী সে...হালখানি তা'র চষ্‌তে চষ্‌তে সোনা ছড়ানো মাঠের বুকের উপর হাতের কাস্তেখানি চালা'তে চালা'তে কল্পলোকে বিচরণ করে...তার কল্পনায় স্বপন-লোকের অচিন-পুরীর রাজকন্তা নেমে আসে না; তার কল্পনার সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়, তাদেরই গাঁয়ের ছোট একটী চাষী-মেয়ে...ভিন-গাঁর বর এসে তা'কে বিয়ে করে নিয়ে গিয়েছে...ছোট্ট বউ বাপ-মা ছেড়ে দূরের গাঁয়ের শ্বশুর বাড়ীতে যেয়ে শুধু কাঁদছে তাই সে গান ধরে—

কি সাইতে দিলাম বিয়া ওরে
পুর্ণিমার চান্দে—
শ্বশুর বাড়ী যেয়ে বউ হামেসা কান্দে
ও হায় হামেসা কান্দে।"

তারপর ধীরে ধীরে দিন গেল...মাস গেল.. বছর গেল ছোট্ট বৌ বড় হল—

"কতদিনের পরে বৌ বুগ্যিমান হ'ল
হাড়ী ছেড়ে গিন্নি তাই তফাতে গেল।
ও হায় কি হ'ল—"

কাগাতে ভাঙ্‌লে হাঁড়ী, তাই কি বৌএর দোষ হ'ল?"

বৌ এখন বড় হয়েছে, বাড়ীর গিন্নি এখন তাকে রান্নার কাজ দিয়েছে...নূতন কাজ পেয়ে বৌ বড্ড বিপদে পড়লে... বুগ্যিমান হ'লে কি হয়...কৈশোরের যে চঞ্চলতা, তা'ত এখনো এই বুগ্যিমান বউকে ছেড়ে যায় নি, তাই তার ছেলেমির দোষে রাঁধবার হাঁড়ী ভেঙ্গে গেল, অমনি কবির প্রাণ বৌ-এর প্রতি সহানুভূতিতে ভ'রে উঠলো, তাই মিছে

করে' শাশুড়ীকে গিয়ে বুঝালে…"ওগো শাশুড়ী তোমার বৌ-এর ঐ রাঁধবার হাঁড়ী কাকে ভেঙ্গে ফেলেছে…কাকে ভাঙ্গলে তো আর বৌ-এর দোষ হতে পারে না, তুমি যেন বৌকে মন্দ বলো না।"

কবি ছোট্ট থেকে মেয়েকে দেখেছে, এখন বড় হয়েছে তাও দেখছে তাই বলছে—

"তোর বৌ-এর গুণ জানি
জানি পূর্ব্ব কাহিনী
ও বৌ ক্ষণেক হাসে ক্ষণেক কাঁদে
ক্ষণেক হয় গৃহিনী"।

বৌ এখন বড় হয়েছে, মনে মনে সে বুঝতে পারছে—সেই এখন এ ঘরের গৃহিনী। তাই সে তার চাষী বরের জন্ম পান সাজতে বসছে…পাড়া-পড়শীর সাথে হেসে হেসে কথা কইছে আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ তার বাপের বাড়ীর কথা মনে পড়ে কান্না পাচ্ছে। তার চাষী বাপ এখন বোধ হয় মাঠে হাল জুড়েছে…তার মা বোধ হয় 'পান্থা' খেয়ে কাঁথা সেলাই করতে বসেছে…আহা! তার ছোট্ট ভাইটে এখন না জানি কি করছে—হয়তো বা পথের ধুলোয় বসে বসে খেলা করছে, নইলে মায়ের পাশে সেলাই করবার কাঁথার এক মুড়োয় শুয়ে বেঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। পথ ধরে পথিক চলেছে বৌ ছুটে এল—

"ও কে যাচ্ছ ভাল দেখা হল বলো বাবাকে
যেয়ে মার কাছে
ওগো তোর বেটী মন আনগো তোদের
ঝি জামাইকে।"

"ওগো পথিক ভাই, তুমি একটু দাঁড়াও না। তুমি কি আমার বাপের বাড়ীর পথ দিয়ে যাবে না? তুমি আমার বাবাকে বলো, মাকেও বলো, তারা যেন তাদের ঝি জামাইকে নিয়ে যায়…অনেক দিন চাষী বরের সাথে ঘর করে মেয়ের তার উপর মমতা বসে গিয়েছে, তাই সে তার চাষী-বরকে ছেড়ে বাপের বাড়ী যেতে চাইছে না, তাকেও নিয়ে যাবে সাথে করে।

মেয়ের কথা শুনে চাষী বাপের প্রাণ কেঁদে উঠলো; সে গোয়ালীর খোঁজে ছুটলো গোয়ালীর বাড়ী, মেয়ের তত্ত্ব করতে—

"তাড়াতাড়ী গোয়ালবাড়ী যায় গোয়ালার কাছে।
ওকি দৈব হ'ল ভাঁড় ভাঙ্গিল গোয়ালীর দোষে।
গোয়ালারে!—
সাধের ভাঁড় ভাঙ্গিল আমার বেটীকে আনতে।

গোয়াল-বাড়ী যেয়ে বাপ শুনলে দৈব হয়েছে…গোয়ালার ভাঁড় ভেঙ্গেছে। কি নিয়ে যাবে সে তার ঝি জামাইকে আনতে? বাপ বেচারী আর কি করে, দৈবের দোষ দিয়ে বসে রইল ওখানে, মেয়ে দিন গুণতে লাগলো বাপের আসার আশায়…চাষী ভাই তা'র হালখানি চষতে চষতে ক্ষেতে কাজ কর্ত্তে কর্ত্তে বৌ-এর এই ব্যাকুলতার কথা ভেবে ব্যথা পায়, তাই সে ব্যথা গানের সুরে সুরে চির সাথী অঝোর বরষার কাছে…খোলা মাঠের কাছে, নিবেদন করে…ব্যথার সুরে সুরে তাদের বুকে কাঁপন জাগায়…

* * *

কোন সে অজানা…অচেনা…খেয়ালী চাষী-কবির প্রাণে সুরের এই অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা জেগে উঠেছিল, তা জানি না, কিন্তু তবুও যখন এই শিল্প-কুশলী বাংলার গেঁয়ো-কবির কথা ভাবি—মন আমার শ্রদ্ধায় ভরে উঠে।…ওগো অতীত বাংলার কবি, অজানা তুমি, তুমি আমার শ্রদ্ধার নমস্কার গ্রহণ কর।

পরলোকে

ভূতপূর্ব্ব হেজাজাধিপতি

শরিফ হোসেন

জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক

বিশ্ব-কবি

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গত ২৫শে বৈশাখ 'শান্তি-নিকেতনের' আম্র-কুঞ্জে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম্ জয়ন্তী-উৎসব 'শান্তি-নিকেতনের' আশ্রমবাসীরা এবং কবির প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বন্ধুগণ সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এই উৎসবের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য গত ২রা জ্যৈষ্ঠ 'ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট গৃহে' একটী পরামর্শ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার শ্রেষ্ঠ নাগরিকগণ এই সভায় যোগদান করিয়া বিশ্ব-কবির প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন।

জেরুজালেমে

বর্ত্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বার্ণার্ড'শ সস্ত্রীক ইজিপ্ট হইতে পেলিস্তিন রওনা হইয়া তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিবেন। পরে তথা হইতে হায়ফা হইয়া বেরুতে যাত্রা করিবেন। পরে ইটালি ও ফ্রান্স হইয়া তিনি লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

মিঃ বার্ণার্ড'শ

মিশরে নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব

প্রধান মন্ত্রী

সিদ্‌কি পাশা

জাতীয় দলের নেতা

নাহাস্‌ পাশা

নাহাস্‌ পাশার সহকর্ম্মী

মাহ্‌মুদ পাশা

গত মে মাসে মিসরের নির্ব্বাচনে জাতীয় দলের সহিত গবর্ণমেণ্ট পক্ষের একটা সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ফলে উভয় পক্ষের বহু লোক হতাহত হইয়াছে।

মিলনে

হেজাজ-অধিপতি

সুলতান আবদুল আজিজ এব্নে সউদ

ইরাকের প্রধান সেনাপতি

নূরী পাশা

সুলতান এব্নে সউদের সঙ্গে এরাক গবর্ণমেণ্টের সম্প্রতি একটি সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হইয়া গিয়াছে।

নবীন তুরস্কের রাষ্ট্র-নায়ক

গাজী মোস্তফা কামাল

গাজী মোস্তফা কামালপাশা গত নির্ব্বাচনে পুনরায় তুরস্ক-গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এইবার লইয়া তিনি চতুর্থ বারের জন্য এই পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। আঙ্গোরা রাজ্যে তাঁহার প্রভাব যে এখনও অপ্রতিহত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা এই নির্ব্বাচন হইতেই বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা যায়।

আফগানিস্থানের যুবরাজ

আফগানিস্থানের বাদশাহ্ গাজী নাদের খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স মোহাম্মদ ফকীর খাঁ একজন বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক। জালালাবাদের ভূতপূর্ব্ব রাজা আলী আহ্মদ জানের দৌহিত্রীর সহিত ইঁহার বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। গত সিনোয়ারী বিপ্লবের সময়ে আলী আহ্মদজান বাচ্চায়ে সক্কা কর্ত্তৃক অতি নৃশংসভাবে নিহত হন।

প্রিন্স মোহাম্মদ ফকীর খাঁ (জাহীর)

কর্ম্ম-সাধনায়

এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ্

মিঃ চৌধুরী নঈমতুল্লাহ্

ইনি ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "ফ্রনটিয়ার ক্রাইমস্ রেগুলেশনস্ ইনকোয়ারি কমিটি"র (The Frontier Crimes Regulations Inquiry Committee) সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর

খান বাহাদুর আবদুর রহমান

ইনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইউনিভার্সিটি সমূহের ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সে ভারতীয় ইউ-নিভার্সিটিগুলির পক্ষ হইতে ডেলিগেট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

রাজানুগ্রহে

ভারতের হাই কমিশনার

স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রয়টারের খবরে প্রকাশ, স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের মেম্বর পদে অভিষিক্ত করা হইয়াছে। উক্ত পদে দুইজন ইউরোপীয়ান ছিলেন, উঁহারা সরিয়া যাওয়ায় ঐ পদে স্যার অতুলচন্দ্র এবং আর একজন ইউরোপীয়ান নিযুক্ত হইলেন।

বহু ভাষাভিজ্ঞ

গত ৩রা জুন সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে ডাঃ আবদুল্লাহ্ সহ্রওয়ার্দ্দি "নাইট" উপাধি লাভ করিয়াছেন। বে-সরকারী মুসলমানগণের মধ্যে ঢাকার নবাব স্যার সলিমউল্লাহ্ সা.হবের পর একমাত্র ইনিই এই উপাধি লাভ করিলেন।

ডাঃ আবদুল্লাহ্ সারওয়ার্দ্দি

নিখিল-বঙ্গ মহিলা-কংগ্রেসে

মহিলা-কংগ্রেসের সভানেত্রী

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী

অভ্যর্থনা-সমিতির সভানেত্রী

শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী

সম্পাদিকা:

দওলতুন্নিসা খাতুন

কুমারী শান্তি দাশ

বিমল প্রতিভা দেবী

নওয়াব বাহাদুরের অভিভাষণ—

ঢাকার তরুণ নওয়াব, লেফটেন্যান্ট খওয়াজা হাবিবুল্লাহ্ বাহাদুর এবার নোয়াখালি মোছলেম কন্‌ফারেন্সের সভাপতির পদে মনোনীত হইয়াছিলেন এবং যথানিয়মে একটী ইংরাজী অভিভাষণও পাঠ করিয়াছিলেন। নওয়াব সাহেবের সহিত কাজ করার সুযোগ আমাদের এ যাবৎ ঘটে নাই, ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সহিত বিশেষ পরিচয়ও আমাদের নাই। তবে তাঁহার পুণ্যশ্লোক পিতা জনাব নওয়াব ছলিমুল্লাহ্ মরহুমের সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়াছিল এবং বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রহিত হওয়ার পর, মোছলেম বঙ্গের পরস্পর বিরোধী শক্তিগুলিকে যে অসাধারণ মহানুভবতার সহিত এক কর্ম্মকেন্দ্রে সমবেত করিয়া দিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা আজও আমাদের স্মরণ আছে। তাই আমরা আশা করিয়াছিলাম, জনাব নওয়াব ছাহেব উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্ররূপে, জাতির এই ঘোর সঙ্কট সময়ে, বাঙ্গলার পরস্পর বিরোধী মুছলমান নেতা ও কর্ম্মীদিগের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি আনয়নের চেষ্টা করিবেন—মোছলেম বঙ্গকে ভাবী সর্ব্বনাশের হাত হইতে রক্ষা করার প্রয়াস পাইবেন। কিন্তু অশেষ দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, জনাব নওয়াব ছাহেব আমাদিগকে সম্পূর্ণ হতাশ করিয়াছেন। তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম—বর্ত্তমানের শোচনীয় চিত্রকে শোচনীয়তর করিয়া তোলাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

আমরা জানি, নওয়াব ছাহেব স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী ও মিশ্র-নির্ব্বাচনের বিরোধী। তাঁহার ন্যায় মোছলেম-বঙ্গের আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এখনও সম্পূর্ণ সততার সহিত মিশ্র-নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন। পক্ষান্তরে বাঙ্গলার শিক্ষিত ও স্বাধীন-চেতা মুছলমানদিগের মধ্যে মিশ্র-নির্ব্বাচনের পক্ষপাতীদিগের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, এবং ইঁহারাও সম্পূর্ণ সততার সহিত স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনকে মোছলেম-বঙ্গের পক্ষে সর্ব্বনাশকর বলিয়া মনে করিতেছেন। এক্ষেত্রে একদলের নেতারা যদি যুক্তি-প্রমাণের পরিবর্ত্তে অন্যদলের প্রতি কটূক্তি করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিতে চান, তাহা হইলে সেটা খুবই দুঃখের বিষয় হইবে। অধিকন্তু এই শ্রেণীর হীন আক্রমণের দ্বারা যুক্তি-প্রমাণের অভাব এবং মতের লঘুতাই প্রতিপাদিত হয়। নওয়াব ছাহেব যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা নিজ মতের সমর্থন ও প্রতিপক্ষ মতের খণ্ডন করিলে তাঁহার অভিভাষণ সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি করার কারণ থাকিত না। কিন্তু তিনি যুক্তি-প্রমাণের সংস্পর্শে পর্য্যন্ত যান নাই, হীন-রুচির লোকদের মত প্রতিপক্ষকে গালি দিয়াই নিজের কর্ত্তব্য সমাধা করিয়াছেন।

নওয়াব ছাহেবের বক্তৃতাটা আমরা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি, এবং পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি যে, এই অভিভাষণের মূল-প্রেরণার প্রচ্ছন্ন কেন্দ্রে কোন এক ব্যর্থ অবসন্ন মানসিকতার তীব্র অভিমানই জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। সে অভিমান বজ্ররূপে বর্ষিত হইয়াছে প্রথমতঃ ন্যাশনলিষ্ট বা জাতীয় দলের মুছলমানদিগের এবং তৎপরে মোছলেম-বঙ্গের ইংরাজী শিক্ষিত বি-এ, এম-এ প্রভৃতির উপর।

নওয়াব ছাহেব একটা সম্ভ্রান্ত মোছলেম সম্মেলনের সভাপতিরূপে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, জাতীয়

দলের মুছলমানগণ হইতেছে বাস্তবপক্ষে কংগ্রেসের Hirelings বা ভাড়াটিয়া। এই ভাড়াটিয়াগুলি হিন্দু প্রভুদের ইঙ্গিত অনুসারে মুছলমানের সর্ব্বনাশ করার জন্যই মিশ্র-নির্ব্বাচনের সমর্থন ও স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের প্রতিবাদ করিতেছে। এই প্রসঙ্গে, বাহ্যতঃ অবান্তরভাবে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত মুছলমান গ্রাজুয়েট প্রভৃতিকে অপদার্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। নওয়াব ছাহেবের মন্তব্য দুইটী সম্বন্ধে কিছু বলার পূর্ব্বে তাঁহার খেদমতে সসম্ভ্রমে আরজ করিতে চাই যে, আমরা formally জাতীয় দলের মেম্বর নহি বা তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলির অন্ধ-অনুসারীও নহি। আবশ্যক হইলে তাঁহাদের অভিমত ও সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধ-সমালোচনা করিতেও আমরা কখন কুণ্ঠিত হই নাই—গত মাসের সম্পাদকীয় মন্তব্যে তিনি ইহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাইবেন। তাঁহার দ্বিতীয় আক্রমণ সম্বন্ধে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিসীমায় পদার্পণ করার দুর্ভাগ্য হইতে আমরাও এ যাবৎ রক্ষা পাইয়া আসিয়াছি; সুতরাং আক্রান্ত-পক্ষদের মধ্যে কাহারও হইয়া 'ওকালতী' করার দরকার যে আমাদের নাই, তাহা বোধ হয় তিনিও স্বীকার করিবেন। বরং শেষোক্ত আক্রমণ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমাদের সহানুভূতি থাকাই যে কতকটা স্বাভাবিক, তাহা বলাই বাহুল্য।

নওয়াব ছাহেব বলিতেছেন—'মুছলমানরা স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন লাভ করুক, হিন্দুদের ইহা আদৌ অভিপ্রেত নহে। তাই নিজেদের অর্থ-পোষ্য কতকগুলি ভাড়াটিয়া মুছলমানকে দিয়া তাহারা মিশ্র-নির্ব্বাচনের সমর্থন ও স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের প্রতিবাদ করাইতেছে।' হিন্দু রাজনীতিকদের গভীর অভিসন্ধি সম্বন্ধে যাঁহাদের সামান্য অভিজ্ঞতাও আছে, নওয়াব ছাহেবের এই মন্তব্যের লঘুত্ব তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। পূর্ব্বে হিন্দুরা স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের প্রতিবাদ করিতেন, একটা গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করার জন্য। তাঁহারা মনে করিতেন—এইভাবে জোর প্রতিবাদ চালাইতে পারিলে, হয় স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন রক্ষা করিতে গিয়া মুছলমানকে সংখ্যা-লঘু হইয়া থাকিতে স্বীকৃত হইতে হইবে, না হয় তাহারা reservation লইতে বাধ্য হইবে। এই হিসাবে তাঁহারা নিজেদের অভিসন্ধি সফল করার জন্য নানাপ্রকার 'বুদ্ধিমন্ত্র' খেলিয়া আসিতেছিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে যে বাঙ্গালী মুছলমানের চোখ ফুটিবে, তাহা কএক মাস পূর্ব্বে পর্য্যন্ত তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কিন্তু মোছলেম চিন্তাধারায় আজ এক নূতন বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, "স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন চাহি না" "Reservation চাহি না" বলিয়া বাঙ্গলার মুছলমান আজ যে নূতন সুর তুলিয়াছে, তাহাতে হিন্দু রাজনীতিকেরা স্তম্ভিত হইয়াছেন, নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বিচলিত হইয়া পড়িতেছেন—আর আত্মরক্ষার জন্য অস্থির হইয়া তাঁহারাই আজ নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন হইতে বঞ্চিত হউক, ইহা আর হিন্দুর অভিপ্রেত নহে। বরং ইতিমধ্যেই হিন্দু-সভার প্রধান মুখপাত্র ও পৃষ্ঠপোষকগণ অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক আসন ভাগ করিয়া মুছলমানকে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন দেওয়াইবার জন্য লালায়িত হইয়া পড়িয়াছেন। জনাব নওয়াব ছাহেব বা তাঁহার দলস্থ মুছলমানগণই আজ ঐ সব হিন্দু নেতার বাহন, অবলম্বন ও প্রধান সহায়। ফলতঃ মুছলমানরা স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তে মিশ্র-নির্ব্বাচনের দাবী উপস্থিত করুক, ইহা হিন্দুর স্বার্থ নহে। বরং তাহারা স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন লইয়া সংখ্যা-লঘু হইয়া থাকিতে সম্মত হউক, ইহাই হিন্দু রাজনীতিকগণের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য আজ হিন্দু-সভার প্রধানগণ নওয়াব ছাহেব ও তাঁহার সমভাবের ভাবুক মুছলমানদিগকেই হস্তগত করার প্রয়াস পাইতেছেন।

সে যাহা হউক, অন্য জাতির নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য ঋণী যাহারা, অন্য জাতীয় লোকদিগের অর্থ সাহায্য ব্যতীত জীবন যাপন করা যাহাদের পক্ষে অসম্ভব, তাহাদের পক্ষে সেই জাতির মতের বিরুদ্ধে কথা বলা, এমন কি তাহাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইঙ্গিতকে অতিক্রম করিয়া চলা যে অসম্ভব, তাহা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু প্রতিপক্ষ যে অন্য জাতির নিকট অর্থ সাহায্য পাইয়াছেন, এই প্রকার দাবী যিনি করিবেন, সর্ব্বপ্রথমে অকাট্য দলিল প্রমাণ দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়া ন্যায়তঃ তাঁহার কর্ত্তব্য হইবে। অন্যথায় ন্যায়, ধর্ম্ম ও ভদ্রতার বিচারে তিনিই অসংযতবাক, বাচাল ও মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন। জনাব নওয়াব ছাহেব জাতীয় দলের মুছলমানদিগকে কংগ্রেসের ভাড়াটিয়া বলিয়া দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। একজন মুছলমান হিসাবে, আজ

ন্যায়, ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়া আমরা তাঁহার নিকট এই মন্তব্যের প্রমাণ জানিতে চাহিতেছি। যদি তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে কোন সন্তোষজনক প্রমাণের উপর এই উক্তির ভিত্তি স্থাপিত হইয়া থাকে, তবে সৎসাহসের সহিত তিনি তাহা সমাজকে জানাইয়া দিন।

نہ گفتی ندارد کسے باتو کار
ولیکن چو گفتی دلیلش بیار

আর তিনি যদি এই কর্ত্তব্য পালনে অসমর্থ হন, তাহা হইলে সমাজ বুঝিতে বাধ্য হইবে যে, স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের অনুকূলে যুক্তি-প্রমাণের অভাবে, তিনি ভারতের বহু-সংখ্যক বিশিষ্ট মুছলমানের উপর মিথ্যা 'তোহমৎ' দিয়া, তাঁহাদিগের চরিত্রের উপর নীচভাবে আক্রমণ করিয়া, নিজেরই প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। নওয়াব ছাহেবের জানা আছে কিনা বলিতে পারি না, জাতীয় দলের মুছলমানদের এমন লোকও আছেন, যাঁহারা—ওয়াক্‌ফ ষ্টেটের খয়রাতখোর মোতাওয়াল্লী না হইলেও—তিন লক্ষ টাকার বার্ষিক মুনাফার সম্পত্তি প্রফুল্ল-চিত্তে সমাজকে দান করিয়াছেন, যাঁহাদের এক একজন প্রজার আয়ও নওয়াব ছাহেবের বার্ষিক আয় অপেক্ষা অধিক, এবং শিক্ষায়, সম্পদে, সম্মানে ও দীর্ঘকালব্যাপী সমাজ সেবার সৌভাগ্যে জনাব নওয়াব ছাহেব তাঁহাদের পদতলে স্থান লাভেরও অযোগ্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখনও যে মুছলমান সমাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সম্পূর্ণ সততার সহিত স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের সমর্থন করিতেছেন, ইহা আমরাও মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নওয়াব ছাহেবের অবস্থা তাহাদিগের হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সকলেই জানেন, স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনটা এ দেশের আমলাতন্ত্র সরকারের অযাচিত দান। যে কোন কারণে হউক, এই বিষ কণ্টকটাকে এদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী করিয়া রাখাই তাঁহাদের অভিপ্রেত। এ অবস্থায় নিজেদের অনুগ্রহজীবী লোকদিগের দ্বারা তাহার অনুকূলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রোপ্যাগণ্ডা চালান তাঁহাদের পক্ষে আদৌ বিচিত্র বা অস্বাভাবিক নহে। বিলাতের রক্ষণশীল দলের লোকেরা এই সূত্রে গোল-টেবিলের মুছলমান মেম্বরদিগকে কি ভাবে পাকড়াও করিয়াছিলেন, তাহা আমরা নওয়াব ছাহেবের পরম বন্ধু জনাব মৌলবী আবুল কাছেম ফজলুল হক ছাহেবের মুখেই সেদিন জানিতে পারিয়াছি। আমাদের মতে নওয়াব ছাহেব ও তাঁহার সম অবস্থার লোকদের পক্ষে এই আমলাতন্ত্র সরকারের মতের বিরুদ্ধে কথা বলা অথবা তাঁহাদের ইঙ্গিতকে অমান্য করিয়া চলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। দুঃখের বিষয়, অন্যের প্রতি আক্রমণ করার অসাধারণ আগ্রহ-উদ্বেগের ফলে তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, অন্য জাতির অনুগ্রহজীবী তাঁহার ন্যায় বাঙ্গলার মুছলমান সমাজে আর একটীও নাই। তিনি বিরাট বাঙ্গলা দেশের আড়াই কোটি মুছলমানের সুখ-সম্পদের বিধি-ব্যবস্থার ভার বহনের জন্য ব্যগ্র হইলেও, নিজের সামান্য জমিদারীটুকুর সুব্যবস্থা করার অবসর বা যোগ্যতা তাঁহার নাই, এবং সেজন্য আজ তাহা কোর্টের জিম্মায় রক্ষিত হইতেছে। নওয়াব ছাহেব কার্য্যতঃ কমিশনর ও কলেক্টর সাহেবদের বৃত্তিভোগী মাত্র। উপর-ওয়ালাদের একটু অসন্তোষে তাঁহাকে ঘোর বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। তাহার উপর তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট বহু টাকা ঋণ গ্রহণও করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রশ্নোত্তরে জানা যায় যে, সম্প্রতি তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা আবার ঋণস্বরূপ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি যে সরকারপক্ষের মতের বা ইঙ্গিতের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে কথা বলিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, ইহা বুঝিতে বোধ হয় কাহাকেও আর বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না।

জাতীয় দলের বড়লোকদের সম্বন্ধে আভাস দিয়াছি; কিন্তু সত্য কথা এই যে, তাহাদের মধ্যে গরীবের সংখ্যাও কম নহে। ইচ্ছা করিলে তাহাদের অনেকে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে এবং প্রবৃত্তিতে কুলাইলে "Slow horses and fast women"-এর সেবায় তাহার সদ্ব্যবহারও করিতে পারিত। কিন্তু তাহারা ইচ্ছা করিয়াই দারিদ্র্যকে বরণ করিয়াছে, সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া কারা-ক্লেশ সহ্য করিতে নিজদিগকে অভ্যস্ত করিয়া লইয়াছে—একটা মহৎ উদ্দেশ্য ও উচ্চ আদর্শের মায়ায়। টাকার দরকার হইলে তাঁহারা কাউন্সিলে গিয়া, মুছলমান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভোট দিয়া তাহা সংগ্রহ করিতে পারিতেন,—মুছলমান প্রার্থীর

বিরুদ্ধে কোন হিন্দু-মহারাজার সমর্থন করিয়া নিজেদের অভাব মিটাইয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু এ সব সুযোগ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা জীবন-ব্যাপী দারিদ্র্যকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছেন। কারণ, তাঁহাদের মতে, বিবেক ও ইমানের মর্য্যাদা সমস্ত দুনয়ার ধন-সম্পদ অপেক্ষাও অনেক অধিক। একথার সার্থকতা অনুভব করার ক্ষমতা যাঁহাদের নাই, তাঁহাদিগকে কবির ভাষায় বলিতে হয়:—

تو نقش نقشبندان را چه دانی ؟
تو شکل پیکرجان را چه دانی ؟
گیاه سبز داند قدر باران —
تو خشکی قدر باران را چه دانی ؟

বাঙ্গলার মুছলমানগণ এযাবৎ কতিপয় স্বার্থ-সর্ব্বস্ব বড় লোকের অন্ধ অনুকরণ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু নানা প্রতিকূল অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে আজ তাহাদের চোখ ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালী মুছলমানের প্রকৃত দুঃখ-দরদ কোথায়, তাহার প্রতিকার কি, এবং এতদিনের মৌরুসী নেতাদের সহিত তাহাদের স্বার্থের সংঘর্ষ বা সামঞ্জস্য কোথায় কতটুকু আছে না-আছে, সমাজ আজ তাহা স্বাধীনভাবে বিচার করিয়া দেখিতে চাহিতেছে। আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ সমাজকে ইহাতে উৎসাহিত করিতেছেন—তাহার স্বাধীন চিন্তার সহায়তা করিতেছেন। ইহাতে অনেকের আসন টলিতে আরম্ভ হইয়াছে, জনাব নওয়াব ছাহেবও সম্ভব এই কারণে শিক্ষিত সমাজের উপর এতটা বিরূপ হইয়া উঠিয়াছেন।

হাকিম ছাহেবের অভিভাষণ—

বাঙ্গলা দেশের যে কয়জন মুছলমানকে তাহাদের গভীর জ্ঞান-সাধনার জন্য আমরা শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, আর সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের অতি কৃপণ ধনকুবের বলিয়া যাহাদিগকে আমরা বরাবরই অভিমান অভিযোগ জ্ঞাপন করিয়া থাকি, ঢাকার বিখ্যাত মনীষী জনাব হাকিম হাবিবুর রহমান ছাহেব তাঁহাদের মধ্যকার একজন। ঢাকার মোছলেম সাহিত্য সমাজের কর্তৃপক্ষ এবার হাকিম ছাহেবকে কোতবখানার নিভৃতকক্ষ হইতে বাঙ্গলা-সাহিত্যের প্রকাশ্য মজলিসে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এজন্য তাহাদিগকে মোবারক বাদ জানাইতেছি।

হাকিম ছাহেব বাঙ্গলার অধিবাসী হইলেও তাঁহার মাতৃভাষা আজও উর্দ্দূই আছে। তাই সাহিত্য-সমাজের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণটী পাঠ করিয়াছেন, তাহাও মূলতঃ উর্দ্দূতেই লিখিত এবং পরে বাঙ্গলায় অনূদিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, হাকিম ছাহেবের মাতৃভাষা বাঙ্গলা না হইলেও তাঁহার অভিভাষণটী বস্তুতঃই বাঙ্গলার কথায় পরিপূর্ণ। তিনি বাঙ্গালী মুছলমানের সম্মুখে সহজে-সংক্ষেপে তাহাদের বিস্মৃত অতীতের যে কয়টী গৌরবচিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাতে বেদনা আছে, প্রেরণা আছে। মোছলেম বঙ্গের ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন বলিয়া আজ আমাদের ধারণা হইতেছে। বাঙ্গলার মুছলমানদের মধ্যে কোন বিশেষ শক্তিমান মানুষের অভ্যুদয় কোন কালেই হয় নাই, অনেক শিক্ষিত বন্ধুকেও আজকাল গম্ভীরভাবে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে দেখি। হাকিম ছাহেব কএকটা নজির দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মোছলেম বঙ্গের সত্যকার ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে সাহিত্য সাধকগণের জন্য কোন কোন উপাদানের দরকার হইবে, কোন কোন ভাষায় ব্যুৎপত্তি-লাভের আবশ্যক হইবে, তাহাও তিনি স্বতন্ত্র ভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব, আজ তাঁহার অভিভাষণটী স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

মাহ্‌মুদ ও ফেরদাওছী—

কবি ফেরদাওছী 'শাহনামা' রচনা করার পর "মুছলমানদিগের মধ্যে অগ্নিপূজক বীরবর্গের ও সম্রাটদিগের ইতিবৃত্ত লইয়াই মুছলমান-সমাজ মশগুল হইয়া থাকে, নিজেদের ইতিহাস ও অতীত গৌরব-কাহিনীর সত্য ইতিহাসকে তাহারা উপেক্ষা করিতে আরম্ভ করে"—ইহা দেখিয়া মোহাম্মদ হোছেন নামক জনৈক শক্তিমান কবি শাহনামার উত্তরে 'ওমরনামা' নামক একখানা বড় কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যে হজরত ওমরের, তাঁহার সহচর ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের, বিশেষতঃ তাঁহাদের পারস্য বিজয়ের কাহিনী

শাহনামার স্থায় তেজ-ব্যঞ্জক ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই পুস্তকখানা এদেশে এতদিন দুষ্প্রাপ্য ছিল। মওলানা শিবলী মরহুম কোন স্থানে ইহার এক নোছ্‌খা দেখিতে পাইয়াছিলেন (শে'রুল আজম ১-১৭২)। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে (নং ১৯৯২) ইহার প্রথম দিককার ৮টী পৃষ্ঠার নকল বিদ্যমান আছে।

সহযোগী "মাআরেফ" বলিতেছেন—আ'জমগড়ের একটী প্রাচীন এলমী খান্দানের অন্যান্য বহু বহি-পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে এই ওমরনামার একখণ্ড সম্পূর্ণ নকল ও দারুল-মোছান্নেফীনের হস্তগত হইয়াছে। মাআরেফের অনুগ্রহে এই পুস্তকের ভূমিকা ভাগের কতকগুলি আবশ্যকীয় অংশ পাঠ করার সৌভাগ্য আমাদেরও ঘটিয়াছে। পুস্তকের ভূমিকায় এরূপ অনেক প্রমাণ আছে, যাহা দ্বারা নিশ্চিত ভাবে জানা যাইতেছে যে, উহা ছোলতান মাহমুদের সময় এবং তাঁহার জ্ঞাতসারে রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার তাঁহার দরবারের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন এবং শাহনামার স্থায় তাঁহার এ কাব্যখানিও তিনি ছোলতান মাহ্‌মুদকে উপহার দিয়াছিলেন।

ফেরদাওছীর প্রতি ছোলতান মাহ্‌মুদের অবিচার সম্বন্ধে যে মিথ্যা কাহিনীটী দীর্ঘকাল হইতে দুনয়ার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, আমরা অন্যত্র তাহার ভিত্তিহীনতা সম্যক রূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছি। এই ওমরনামার ভূমিকার মধ্যেও স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছে যে, "কবিবর ফেরদাওছী তুছী শাহনামা রচনা করিয়া ছোলতানের খেদমতে উপস্থিত করিলে—

فردوسی طوسی کتاب شاهنامه راپر داخت و
بخدمت سلطان دین پرور یمین الدین سلطان
محمود سبکتگین خلد الله ملکه و سلطانه آورد
بعطایاے وافر و انعامات متوافر مخصوص گشت -

ধর্ম্মের পৃষ্টপোষক ছোলতান মাহ্‌মুদ ছোবকৃতগীন কবিকে প্রচুর দান ও অপর্য্যাপ্ত পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত করিলেন।"

সুতরাং ছোলতান মাহ্‌মুদ অবশেষে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছিলেন এবং কবিকে যথেষ্ট পুরস্কার দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন বলিয়া যে অপবাদটী সর্ব্বত্র সাধারণ ভাবে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, এই সমসাময়িক গ্রন্থকারের পুস্তক হইতেও তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা—

সম্প্রতি কলিকাতায় নিখিল ভারত হিন্দী সম্মেলনের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বহু বাঙ্গালী হিন্দু-মনীষী ও রাজনৈতিক নেতা এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। এই অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হইয়াছে—হিন্দীকেই ভবিষ্যতে ভারতের রাষ্ট্র-ভাষার আসন দেওয়া হইবে। বাঙ্গলা কংগ্রেসের যুযুধান নায়ক যুগল এক্ষেত্রে এক যোগে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন।

হিন্দী ও উর্দ্দূর মধ্যে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা হওয়ার যোগ্যতা কার কতটা আছে না আছে, সে সম্বন্ধে কথা কাটাকাটি অনেক হইয়া গিয়াছে। নেহরু কমিটীর বিচারের সময়েও এ সম্বন্ধে কম আলোচনা হয় নাই। অবশেষে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতারা স্থির করেন যে, হিন্দুস্থানী ভাষাই ভারতের রাষ্ট্র-ভাষার রূপে গৃহীত হইবে না। তাহারা বলেন—এই হিন্দুস্থানী ভাষা উর্দ্দূও নহে, হিন্দীও নহে। ইহাই কংগ্রেসের অভিমত। কিন্তু বাঙ্গলা কংগ্রেসের নেতারা পূর্ব্বের বিচার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত-গুলিকে বিস্মৃত হইয়া, আজ হিন্দীকেই রাষ্ট্র ভাষা বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিতেছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে মোছলেম বঙ্গে তরুণের বিপ্লব বলিয়া কতকগুলি শব্দ ও সমাসের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। ইঁহারা উর্দ্দুর বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতেন, প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহাদের লেখায় ও কথায় উর্দ্দূ সম্বন্ধে একটা বিদ্বেষের ভাবই প্রকাশ পাইত। হিন্দী সম্মেলনের উপরোক্ত সিদ্ধান্তটীর প্রতি আমরা আজ এই শ্রেণীর বন্ধুদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু ও মিঃ সেনগুপ্ত উভয়েই বাঙ্গালী, হিন্দী তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে। কিন্তু সমগ্র হিন্দুজাতিকে তাহাদের বিশিষ্ট শিক্ষা, সভ্যতা, কালচার ও ধর্ম্মের ভাবধারার দ্বারা সংহত এবং জীবন্ত করিয়া রাখার—পক্ষান্তরে মুছলমানের শিক্ষা, সভ্যতা, কালচার ও ধর্ম্মের ভাব-ধারাকে তাহাদ্বারা আবিষ্ট, আচ্ছন্ন ও আড়ষ্ট করিয়া ফেলার জন্য তাঁহারাও আজ হিন্দী-ভাষার

জয়যাত্রার তূর্য্যনিনাদ করিতে এক বিন্দুও কুণ্ঠিত হইতেছেন না। এই বিষয়টা আমাদের এই অতি তরুণের দল একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বাধিত হইব।

———

শাহ্ মোহাম্মদ বদিউল আলম—

সংবাদ আসিয়াছে, গত ১লা জুন শাহ মোহাম্মদ বদিউল আলম এন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে............) গত শতাব্দীতে বাঙ্গলার মুছলমান সমাজে যে কয়জন দুরদর্শী রাজনীতিক এবং প্রতিভাবান সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, শাহ মোহাম্মদ বদিউল আলম তাঁহাদের অন্যতম। ১৮৫৭ সালে চট্টগ্রামের অন্তর্গত ইজ্জতনগর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৭৯ সালে তিনি আই, এ, পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে তিনি চাকরী ত্যাগ করিয়া নিজে নাবিক হইয়া ১৮৯০ সালে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের মধ্যে জাহাজ পরিচালনার কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু সেখানেও তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। অতঃপর তিনি কিছুদিন করটীয়া এবং ঢাকার নওয়াব ষ্টেটের যথাক্রমে ম্যানেজার ও জেনারেল ইন্স্পেক্টরের কার্য্যও করিয়াছেন। কিন্তু কালে সেখান হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সাহিত্য ও রাজনীতি চর্চ্চায় বিশেষ মনোযোগী হন। তিনি ইংরাজী, বাঙ্গলা ও উর্দ্দু সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি কলিকাতা হইতে 'অবজার্ভার' নামে একখানি সংবাদপত্র সম্পাদন ও পরিচালন করেন। তিনি অনেকগুলি ইংরাজী, বাঙ্গলা এবং উর্দ্দু গ্রন্থের প্রণেতা। এতদ্ব্যতীত রাজনীতি ও সমাজ সেবায়ও তাঁহার ত্যাগ ও সাধনা অল্প নয়। শ্যামবাজার (কলিকাতা) মছজেদ-ভাঙ্গার ব্যাপার হইতে বাঙ্গালার প্রায় প্রত্যেক রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হয়, গত অসহযোগ বা খেলাফৎ আন্দোলনের সময়ে। এই সময়ে হইতে আমরা বহু ক্ষেত্রে একযোগে কাজ করিয়াছি, একত্রে বসিয়া নানা বিষয় চিন্তা করিয়াছি। মৃত্যুকালে শাহ্ ছাহেবের বয়স ৭৮ বৎসরের উপর হইয়াছিল। সুতরাং ভারতবর্ষের গড়-পড়তা আয়ুর হিসাবে পরিপক্ক বয়সেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করিলেন, বলা চলে। কিন্তু এই বার্দ্ধক্যেও তিনি সদা প্রফুল্লচিত্ত থাকিতেন। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহাকে কখনও চঞ্চল হইতে দেখা যায় নাই। বস্তুতঃ এই দৃঢ়চিত্ততাই তাঁহার অন্যতম বিশেষত্ব ছিল। দেখা যায়, আমাদের দেশের অনেক রাজনৈতিক কর্ম্মী ও নেতা বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ মত পরিবর্ত্তন করেন; কিন্তু শাহ্ ছাহেব চিরকাল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি কখনও মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। মৃত্যুর পর আজ সে সকল বিষয় আমাদের পুনঃ পুনঃ স্মরণে পড়িতেছে। আমরা মরহুম শাহ্ ছাহেবের মগ্‌ফেরৎ কামনা করিতেছি এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত সমবেদনা জানাইতেছি।
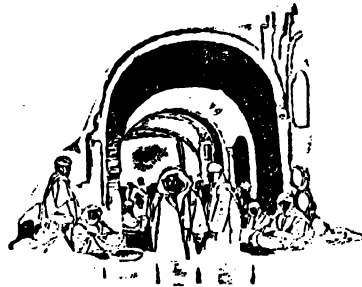
মাস-পঞ্জী

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৮

১লা হইতে ৭ই পর্য্যন্ত—৯ই মে থারাওয়াদ্দির বিদ্রোহীদের ১৫ জন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, ৪৬ জন দ্বীপান্তর দণ্ড লাভ করিয়াছে এবং ২৪ জন মুক্তি পাইয়াছে। ককেশিয়ান গণতন্ত্রের অধিবাসী মুসলমানদের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। মওলানা শওকত আলি সুরাটে আগমন করিয়াছেন। ১০ই মে নিউইয়র্কের আন্তর্জাতিক শ্রমিক রক্ষা সমিতি মীরাট আসামীদিগের সাহায্যার্থ ৫ শত ডলার পাঠাইয়া দিয়াছেন। প্রায় ৫০ জন বিদ্রোহী ব্রহ্মের হেনজাদা থানা আক্রমণ করিয়াছে। শিয়ালকোট হইতে একখানি ৫ শত টাকার চেক ভাঙ্গানো সম্পর্কে পুলিশ জম্মুতে কস্তুরিলাল নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ১১ই মে বার্লিনের শেমনীজের নিকট সিটী রেড্ক্রশ লরীর উপর কমিউনিষ্টগণ গুলি চালায়। ফলে ১ জন আহত ও ১ জন নিহত হইয়াছে। চট্টগ্রামের একটী বেওয়ারিশ পার্শেলের ভিতরে তিনশত তাজা কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছে। লাহোরে শ্রীযুক্ত মুঞ্জের সভাপতিত্বে যুব সম্মেলনের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মওলানা শওকত আলীর সভাপতিত্বে দিল্লীতে নিখিল ভারত মোছলেম কন্ফারেন্সের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ১২ই মে স্পেনে রাজতন্ত্রী ও গণতন্ত্রীর মধ্যে ভীষণ এক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। মিঃ শেরওয়ানী দিল্লীতে আগমন করিয়াছেন। চীনে প্রজা মণ্ডলীর পক্ষ হইতে যে প্রতিনিধি সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছিল, তাঁহারা প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র মানিয়া লইয়াছেন। মারেটমিও জেলার কিওকয়য়াঙের এক জঙ্গলে বিদ্রোহীদের সহিত পুলিসের এক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। গান্ধী আরউইন চুক্তি সম্পর্কে মতভেদ হওয়ায় কংগ্রেসের লণ্ডনস্থ শাখার ৩ জন সদস্য পদত্যাগ করিয়াছেন। কড়েয়া বাজার রোডে মৌলভী মুজিবর রহমানের সভাপতিত্বে জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণের কর্ম্ম-নির্ব্বাহক সমিতির এক সভা হইয়া গিয়াছে। ১৩ই মে ফরিদপুরে মৌলভী রওশন আলীর সভাপতিত্বে জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণের এক সভা হইয়া গিয়াছে। মিশরের ভূতপূর্ব্ব খেদিব আব্বাস হিলমী মিশরের সিংহাসনের দাবী পরিত্যাগ করিয়াছেন। ১৪ই মে পাঞ্জাবী সিপাহী ও একদল সশস্ত্র পুলিশ বিদ্রোহীদের কতকগুলি শিবির আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছে। প্যালেষ্টাইনের হাই কমিশনার সদলবলে বেরুতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তুরস্কের শিক্ষামন্ত্রী আহাদ বে তৈজিহ দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রবল আগ্রহে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ১৫ই মে মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। থারাওয়াদ্দি হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, কাপ্তেন জোগো বিদ্রোহীদের দ্বারা আহত হইয়াছেন। ক্লাইব ষ্ট্রীটে প্রকাশ্য দিবালোকে কে বা কাহারা এক দারোয়ানের নিকট হইতে ১২ হাজার টাকার নোট ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে।

৮ই হইতে ১৪ পর্য্যন্ত—১৩ই মে লাহোরের দৈনিক জমিদারের সম্পাদক ও মুদ্রাকর সৈয়দ গোলাম হোসেন ধৃত হইয়াছেন। ব্রহ্ম-বিদ্রোহীদের সঙ্গে সামরিক পুলিশের ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। কলুটোলা রাজবাড়ীর তিনটী মেয়ে তাহাদের দমদম বাগান-বাড়ীর পুষ্করিণীর জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সমগ্র বাংলার পক্ষ হইতে সংবর্দ্ধনা করা হইয়াছে। ১৭ই মে ঢাকার জেনারেল পোষ্টাফিসের আঙ্গিনায় ভীষণ সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। বন্দুকের গুলি বিদ্ধ অবস্থায় কর্ণেল মর্টহেডের মৃতদেহ পর্ব্বতের পার্শে পাওয়া গিয়াছে। লাটের সহিত দেখা-সাক্ষাতের পর মহাত্মাজী এসোসিয়েটেড্ প্রেসের নিকট বলিয়াছেন—বড়লাটের সহিত আমার আলোচনা সন্তোষজনক হইয়াছে। ১৮ই মে ফরিদপুরে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। দিনাজপুরের মওলানা আবদুল্লাহেল বাকীর সভাপতিত্বে বগুড়া মুসলমান সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। লাহোরে জাতীয়তাবাদী মুছলমান কনফারেন্সের ১ম দিনের অধিবেশন শেষ হইয়াছে। ১৯শে মে ঐ কনফারেন্সের ২য় দিনের অধিবেশন শেষ হইয়াছে। ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মের সেনা নায়কের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বিদ্রোহের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। ২০শে মে হেনজাদা সেনা শিবির একদল বিদ্রোহী অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়াছে। রেঙ্গুন নদীর অপর পারে কাসাকাটিতে আবগারী বিভাগের লোকেরা অর্দ্ধলক্ষ টাকার কোকেন আটক করিয়াছে। একখানা যাত্রীবাহী জাহাজ মক্কা হইতে অদ্য তারিখে হায়দ্রাবাদে আসিয়া পৌছিয়াছে। ২১শে মে থারাওয়াদ্দি স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যালে বিদ্রোহ সম্পর্কে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের অভিযোগে ৪১ জন লোকের বিচার চলিতেছে। টঙ্গু জেলা হইতে সংবাদ আসিয়াছে—কার্নিউটকিনের ১৫ মাইল দূরে একজন ভারতবাসী নিহত ও দুইজন আহত হইয়াছে। ২২শে মে আমেদাবাদের বীরগাঁও বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট কালেক্টরকে কে বা কাহারা গুলী ছুড়িয়াছে। বোম্বাইতে এছমাইল এব্রাহিম নামক এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনক অবস্থায় দেখিয়া পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

১৫ হইতে ২১শে জ্যৈষ্ঠ—২৩শে মে মাহ্মুদাবাদের মহারাজ পরলোক গমন করিয়াছেন। থাইয়েটমিওর সহরে ২ শত বিদ্রোহীর সহিত ব্রহ্ম রাইফেল ফৌজদলের এক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। চট্টগ্রাম হইতে ১০ মাইল দূরে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। স্পেনে সিলোরিটা নাম্নী ১টী মহিলা কারাগারের ডিরেক্টারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ২৪শে মে ঢাকায় মোছলেম জাতীয় সম্মেলনের এক অধিবেশনে মিশ্র নির্ব্বাচন সমর্থিত হইয়াছে। মিশরের রাজস্ব সচিব দেশে তুলাজাত দ্রব্যের একটি স্থায়ী প্রদর্শনী খুলিবার আদেশ দিয়াছেন। মুর্শিদাবাদ পাঁচথুপিতে 'বারকোনায় দেউল' নামে যে প্রাচীন কীর্ত্তি আছে, সরকারী পুরা-তত্ত্ব বিভাগ প্রাচীন কীর্ত্তি হিসাবে তাহা রক্ষা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। মাহ্মুদাবাদের মহারাজের নশ্বর দেহ মাহ্মুদা-

তাঁর পারিবারিক সমাধি ক্ষেত্রে সমাহিত করা হইয়াছে। ২৩শে মে ভারতীয় ছাত্রদের কেন্দ্রীয় সমিতি লণ্ডনে মিঃ প্যাটেলকে সংবর্দ্ধিত করিবার জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছেন। ২৫শে মে স্যার সৈয়দ আলী ইমামের বাসভবনে জাতীয়তাবাদী মুসলমানের এক বৈঠক বসে। ইহাতে স্থিরীকৃত হয় যে, মিশ্র নির্ব্বাচনের আবশ্যকতা দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচার আরম্ভ করিতে হইবে। কাবুলের আমীর নেপলসে পৌঁছিয়াছেন। মিশরের জাতীয়দল এবং উদার-নৈতিক দল দেশবাসীকে অহিংস থাকিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। পেশোয়ার তহশিলে হিন্দু ও শিখে এক ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। থারাওয়াদ্দি জেলায় একটি বিদ্রোহী-শিবির রসদ সহ পুলিশ ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। এলাহাবাদে মাহমুদাবাদের মহারাজের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য দুইটা শোক-সভার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন নৈনিতাল হইতে এলাহাবাদ ফিরিয়া আসিয়াছেন। ২৬শে মে ঢাকার নবাব হবিবুল্যা সাহেবের সভাপতিত্বে নোয়াখালী মুসলমান সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মাহমুদাবাদের মহারাজের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী মোছলেম লীগ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। রেঙ্গুনে ৭১ জন বিদ্রোহীর শাস্তি হইয়া গিয়াছে। মাহমুদাবাদের মহারাজের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য কলিকাতা টাউন হলে এক সভা হইয়া গিয়াছে। ২৭শে মে আমেরিকায় বক্তৃতা করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী আমেরিকা হইতে ২ খানা তার পাইয়াছেন। হাটুরিয়া হাউসে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের এক বৈঠকে মিশ্র নির্ব্বাচন সমর্থিত হইয়াছে। স্পেনে সামরিক আইন জারি করা হইয়াছে। ই, আই, রেলওয়ের চুঁচুড়া ষ্টেশনের নিকটেই একজন লোক রেল দুর্ঘটনায় কাটা গিয়াছে। ২৮শে মে বরিশাল মোছলেম সম্মিলনীর এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। আফগানিস্থানের প্রধান মন্ত্রী দেশ ভ্রমণের জন্য কাবুল পরিত্যাগ করিয়াছেন। ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদী ফ্যাসিষ্টগণ পোপের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন সুরু করিয়াছেন। কটকে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া বহু বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে। ঢাকা নর্থব্রুক হলে পূর্ব্ববঙ্গীয় প্রাইমারী টিচার্চ্চ কনফারেন্সের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। রংপুরের পুলিশ নানাদলে বিভক্ত হইয়া রংপুরের কয়েকটী বাড়ীতে হানা দিয়াছে। ২৯শে মে মিশরের ফাকোসার অঞ্চলের একটী বালুর স্তূপ ধ্বসিয়া পড়ায় ১৩ জন লোক নিহত হইয়াছে। ব্রহ্ম বিদ্রোহীদের সহিত সামরিক পুলিশের সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। রোমে শিরু নামক এক ব্যক্তি মুসোলিনীকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল বলিয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

১৬শে হইতে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ—৩০ মে মহাবালেশ্বরের নিকটবর্ত্তী প্রতাপগড় জঙ্গলে স্যার করিমভাই ইব্রাহিমের দৌহিত্র নাজির আবদুল্যা ধরমসীর মৃতদেহ আবিষ্কার করা হইয়াছে। মহরম উপলক্ষে কানপুরে হিন্দু মুসলমানের এক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। ফলে পুলিশের গুলীতে ২ জন নিহত ও ১৪ জন আহত হইয়াছে। দিল্লী দরিয়াগঞ্জে জাতীয়তাবাদী মোছলেম সমিতির ওয়ার্কিং কমিটির এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। আফগান সমর অফিসে দেড় টন ভার বহন করিবার উপযোগী ৪০ খানি লরী ফরাসী দেশ হইতে কাবুলাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। ব্রহ্মদেশের সমুদ্রোপকুলস্থিত জিলা সমূহে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ৩১শে মে পাটের পূর্ব্বাভাষ প্রকাশ সম্বন্ধে বঙ্গীয় বণিক সমিতি সরকারের নিকট একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। মওলানা আবদুল মজিদ বদাউনির সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ে খেলাফৎ কনফারেন্সের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উহাতে মিশ্র নির্ব্বাচন সমর্থিত হইয়াছে। ৮০০ শত ভারতবাসী রেঙ্গুন হইতে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। ১লা জুন শাহ মোহাম্মদ বদিউল আলম পরলোক গমন করিয়াছেন। আঞ্জমানে এছলামিয়ার বার্ষিক সম্মেলন শেষ হইয়াছে। ফেনির অন্যতম বিশিষ্ট উকিল মৌলভী বজলুল হক পরলোক গমন করিয়াছেন। সীমান্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আহমদ শাহকে সভাপতি এবং আমীর আলমকে সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। ত্রিচিন পল্লীর উপকণ্ঠে সম্প্রতি হিন্দু-মোছলমানে এক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। চীনগণতন্ত্র বৈদেশিক জাতির সর্ব্বপ্রকার অন্যায় সন্ধি বাতিল করিয়া দিয়াছে। ফরাসী দেশের প্রেসিডেন্টের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ২রা জুন—মাদ্রিদের গণতন্ত্রে সম্ভ্রান্ত লোকদের যে সকল সুবিধা ও উপাধি ছিল তাহা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। থারাওয়াদ্দিতে পুলিশ বাহিনী ২ শত বিদ্রোহীর একটী দলের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে। মোহাম্মদীর প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর তৃতীয় কন্যার শুভবিবাহ তাঁহার পার্ক সার্কাস্থিত বাড়ীতে জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ৩রা জুন—ডাঃ সৈয়দ মাহমুদের সভাপতিত্বে জাতীয় মোছলেম কনফারেন্সের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। একদল পুলিশ প্রবাসী অফিসে খানাতল্লাস করিয়াছে। ৪ঠা জুন বিদেশী বস্ত্র পুনরায় বিদেশে রপ্তানি করা সম্পর্কে যে স্থান করা হইয়াছিল, তাহা অন্য তারিখে পাকাপাকি করা হইয়াছে। রেলের একটি পুল ভাঙ্গিয়া পড়ায় রেঙ্গুনে মান্দালয়গামী ট্রেনখানি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। প্রোম জেলার বিদ্রোহীদের একটা আড্ডা পুলিশ ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। রেল লাইন পার হইবার সময়ে মহাত্মা গান্ধী একরাশি ছাইর উপর পদনিক্ষেপ করেন। উহার মধ্যে আগুন ছিল, তাহাতে মহাত্মাজীর পা পুড়িয়া গিয়াছে। ৫ই জুন বেলজিয়মের ক্যাথলিক মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিয়াছে। জার্ম্মাণীর রাজস্ব সচিব এবং পররাষ্ট্র সচিব লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। শ্যামবাজার পোষ্ট অফিসে কাগজের প্যাকেটের মধ্যে একটী বোমা পাওয়া গিয়াছে। ৬ই জুন কানপুরে দুইজন কনেষ্টবল গুলির আঘাতে আহত হইয়াছে। এন-বি, মোহাম্মাদ এবং টি-ই, খোছেন সাইকেল যোগে গ্লাসগো যাইবার সঙ্কল্পে ঢাকায় উপস্থিত হইয়াছেন।

Printed and Published by Md. Khairul Anam Khan from the "Mohammadi Press,"
91, Upper Circular Road, Calcutta.

মূল্যবান শেয়ার বিক্রয়

আমরা কলিকাতা সেয়ার মার্কেট চলিত যে কোন সেয়ার সামান্য লাভে খুচরা বা লট ক্রয় বিক্রয় করি। বেঙ্গল কেমিক্যাল, বঙ্গলক্ষ্মী, কেশরাম, মোহিনী, ঢাকেশ্বরী ইত্যাদি বহু কাপড়ের কলের দুষ্প্রাপ্য সেয়ার আমাদের মজুত আছে।

কিস্তিবন্দীতেও টাকা লইতে পারি।

পত্র লিখিলে দর জানিতে পারিবেন

যে কোন প্রকার সুদের গভর্ণমেণ্ট পেপার ও
স্বর্ণ রৌপ্যের গহনা বন্ধকি কার্য্য করা হয়।

প্রতি জেলায় বিশ্বস্ত চিফ এজেণ্ট আবশ্যক

ইণ্ডিয়ান ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট

৪ নং ক্লাইভঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পানমার্কা
পাতি জর্দ্দা
মকবুল ব্রাণ্ড জর্দ্দা

সুগন্ধি তৈল, আতর, কেওড়া, গোলাবি, খস, আগর-বাতি ইত্যাদি নানা প্রকার সৌখীন দ্রব্যাদি প্রচুর আমদানি করিয়া বাজার অপেক্ষা সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মকবুল এণ্ড কোং
পারফিউমার্স

৪৫।৫ লোয়ার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা।

কৃত্রিম দন্ত! কৃত্রিম দন্ত!

ডি, চক্রবর্ত্তী—(ডাক্তার এন, এন, চক্রবর্ত্তীর পুত্র) সার্জ্জিকেল এণ্ড মেকানিক্যাল ডেনটিষ্ট ৩০ বৎসরের অভিজ্ঞ। স্থাপিত ১৮৮০ সাল ২৬৭—২, অপার চিৎপুর রোড, হাটখোলা পোঃ আঃ), কলিকাতা।

1 গামপেণ্ট—অর্থাৎ মাড়ির যে কোন প্রকার ফুলা ব্যথা হউক ইহা লাগাইলে আরোগ্য হয়। পান্‌সে (Spongy) Gum নড়া দাঁত শক্ত হয় ও বিশেষতঃ pyorreah রোগ আরোগ্য হয়। মূল্য শিশি ১৲ মাত্র।

2 টুথ-এনোডাইন—ইহা ব্যবহারে দাঁতের গোড়ার বেদনা ও দন্তশূল যে প্রকার হউক না কেন ও পোকা-খেকো দন্ত হইলেও তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হয়। মূল্য শিশি ১।০ মাত্র।

3 কৃত্রিম দন্ত—ইংলিশ ও আমেরিকান প্রদেশের অতি যত্নের সহিত এই স্থানে সুলভ মূল্যে পাথরের দাঁত বাঁধান হয় ও সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগের চিকিৎসা হয় এবং অতি যত্নের সহিত বিনা যন্ত্রণায় দাঁত উঠান হয়।

* ভি পিঃ অর্ডার অতি শীঘ্র ও যত্নের সহিত সরবরাহ করি ও বিস্তারিত বিবরণ লিখিলে বিনা ফিঃতে পরামর্শ দিয়া থাকি।

দেশের দশের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

বাহির হইল! **বাহির হইল!!**

মৌঃ ফজলুর রহিম চৌধুরী এম-এ, প্রণীত—

অমূল্য গ্রন্থাবলী **কোরআন শরীফ** অমূল্য গ্রন্থাবলী

কোরআন শরীফের সরল ও বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ। প্রথম খণ্ড ১ম হইতে ১৫শ পারা পর্য্যন্ত। সুন্দর কাগজে ছাপা—সাড়ে চারি শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। রেশমী কাপড়ে সুন্দর বাইণ্ডিং—সোণার জলে নাম লেখা। মূল্য—তিন টাকা।

মেশকাত শরীফ—১ম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ৩।০ টাকা। **বোখারী শরীফ**—প্রথম খণ্ড—মূল্য তিন টাকা। **পয়গম্বর কাহিনী**—ডাইরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য মনোনীত। ৩য় সংস্করণ মূল্য ১।০ টাকা। **এসরাইল বংশীয় নবীগণ**—পয়গম্বর কাহিনীর দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ সিকা মাত্র। **কোরানের সুবর্ণ কুঞ্জিকা**—ইহা পয়গম্বর কাহিনীর শেষ খণ্ড মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। **সোহরাব রুস্তম**—ডাইরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য মনোনীত মূল্য ৫০ আনা। **মহরম চিত্র**—মূল্য ৫০ বার আনা মাত্র। **আরবী-সহচর (টেক্সট বুক**—কমিটি কর্ত্তৃক Class VII এর পাঠ্য পুস্তকরূপে অনুমোদিত) আরবী ভাষায় প্রথম শিক্ষার্থীগণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় মূল্য ২৲ টাকা। Anglo Arabic Word Book—মূল্য ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান :—মোহাম্মদী বুক এজেন্সী

৯১নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

ঢাকার একমাত্র সোল এজেন্ট "ইছলামিয়া লাইব্রেরী" পটুয়াটুলি, ঢাকা।

আমরা উপস্থিত জনসাধারণের সুবিধার জন্য সর্ব্বশ্রেণীর উৎকৃষ্ট পাথরের দাঁত ও সর্ব্বপ্রকার চশমা সুলভ মূল্যে গ্যারাণ্টি দিয়া বিক্রয় করিতেছি। আমাদের দাঁতের সর্ব্বপ্রকার জিনিষ পাওয়া যায়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মফঃস্বলের অর্ডার পাইলে আমরা বিচক্ষণ লোক পাঠাইয়া থাকি।

স্থাপিত ১৯১১ সাল **এন, ব্রাদার্স, ডেণ্টিস এবং অপটিসিয়ানস্** স্থাপিত ১৯১১ সাল

৩।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (বহুবাজার ষ্ট্রীট ও কলেজ ষ্ট্রীট সঙ্গম স্থল)

দি হোমিওপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

—ড্রাম— /৫ পয়সা ও /১০ পয়সা।	২৪ সাউথ রোড, (ইটালী) কলিঃ।	Dr. P. K. Mukharjee. Specialist Chronic Diseases Hours 8 to 11 A. M. & 5 to 9 P. M.

বোরিক এণ্ড টাফেলের বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ, গ্রবিউল, পিলিউল, সুগার অফ্ মিল্ক, কর্ক, শিশি, কার্ডবোর্ডের কেশ, থার্ম্মোমিটার, ষ্টেথিস্কোপ, সিরিঞ্জ, বাঙ্গালা ও ইংরাজী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পুস্তক আমাদের নিকট পাওয়া যায়। অর্ডারের সহিত অন্ততঃ সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।

মফঃস্বলের রোগীদিগের জন্য সুব্যবস্থা :—

রোগের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ ও ইতিহাস পাঠাইলে উপরোক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে ডাকে ঔষধ ও ব্যবস্থা পাঠান হয়। এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য সচরাচর ২৲ পড়ে—সুতরাং রোগ বিবরণের সহিত অগ্রিম ২৲ টাকা পাঠাইতে হয়।

জি, রায় এণ্ড কোং,

সম্পূর্ণ স্বদেশী উপাদানে, স্বদেশী পরিশ্রমে ও স্বদেশী মূলধনে পরিচালিত।
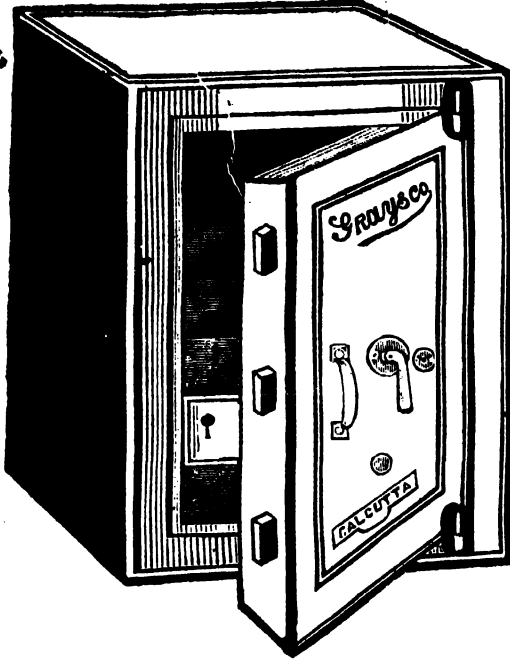
আগুন, চোর, ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়—জি, রায় এণ্ড কোম্পানীর লোহার সিন্দুক, আলমারী ও তালা। গভর্ণমেণ্ট আফিস, ব্যাঙ্ক, লোন আফিস, মার্চ্চেণ্ট আফিস সমস্ত জায়গাতেই উক্ত কোম্পানীর সিন্দুক, আলমারী ও তালা আদরে গৃহীত হইতেছে।

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৭০।১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন নং ১৮৩২ কলিকাতা

বাংলার খাঁটি গোদুগ্ধের সহিত পেঁপের রস ও ভাইটামিন লইয়া প্রস্তুত।

শিশু, শিশুজননী, রোগী ও কৃশ বালকবালিকা ও ব্যক্তিগণের জন্য।

ব্যবহারে দেহ সবল মোটা-সোটা ও কান্তি-বিশিষ্ট হয়।

আপনার নিকটবর্ত্তী দোকানে ও ঔষধালয়ে অনুসন্ধান করুন; কিংবা অফিসে লিখুন। মূল্য ৮/০ প্রতি টিন।

মিল্কল ফুড ওয়ার্কস

২নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

এই দারুণ গ্রীষ্মে আরাম চান কি?

—তবে—

পরিমল নস্য

ব্যবহার করুন।

সর্ব্বপ্রকার মাদ্রাজি নস্য ও সুগন্ধিত রোজ নস্য বিচক্ষণ ডাক্তার ও বৈদ্যগণের মতানুসারে প্রস্তুত মহোপকারী, স্মরণশক্তি বর্দ্ধক, চক্ষু, নাসিকা ও শিরঃরোগ ইত্যাদির জন্য পরম হিতকর। ইহার মূল্য এতই অল্প রাখা হইয়াছে যে, সর্ব্বসাধারণ সকলেই ইহা ব্যবহার করিতে পারেন। আমরা নিজমুখে ইহার প্রশংসা করিতে চাই না, আমাদের বিশেষ অনুরোধ বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে না ভুলিয়া একবার মাত্র ব্যবহার করিয়া দেখুন।

মেসার্স এইচ, জি, এণ্ড কোং,

৮৩, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কেশরঞ্জন

স্নানে স্নিগ্ধকর
প্রসাধনে প্রীতিকর

সুপেয়
এবং
শক্তিবর্দ্ধক

বনভিলের কোকো কেবল যে সুপেয় এবং চকলেট গন্ধযুক্ত খাদ্য এমত নহে পরন্তু ইহা শক্তিবর্দ্ধক এবং স্নায়ু পুষ্টিকারক পানীয়। ইহা একাধারে বিশুদ্ধ খাদ্য এবং উৎকৃষ্ট পানীয়।

বনভিলে কোকো বিশুদ্ধ উদ্ভিজ্জ খাদ্য—স্বাভাবিক পুষ্টিকর উপাদানে প্রস্তুত। ইহা প্রস্তুতকালীন এবং প্যাক করিবার সময় একেবারেই হস্তদ্বারা স্পর্শ করা হয় না। এই কোকোই কিনবেন।

BOURNVILLE COCOA

জান্তব চর্ব্বি বর্জ্জিত প্রস্তুতকালীন একেবারে হস্তদ্বারা স্পর্শিত নহে।

ক্যাডবেরী কর্ত্তৃক প্রস্তুত, বনভিলে, ইংলণ্ড।

জুয়েলার্স **স্থর ব্রাদার্স এণ্ড কোং** জুয়েলার্স

একমাত্র গিনি সোনার অলঙ্কার নির্ম্মাতা—২০২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিদ্যুৎ চুড়ি

মূল্য প্রতি জোড়া ১৫৷০
৩ গাছার সেট ৪৬৷০

স্বর্ণ-শিল্পে আমাদের তিন-পুরুষের অভিজ্ঞতার স্থফল এই বিদ্যুৎ-চুড়ি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিল্পি এবং বৈজ্ঞানিকগণের মস্তিষ্কের অপূর্ব্ব সমাবেশে এই বিদ্যুৎ-চুড়ি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমরা নবাবিষ্কৃত স্বর্ণ-বর্ণের ব্রোঞ্জ-ধাতু ডিরেক্ট ইউরোপ হইতে আমদানি করিয়া উহার উপরিভাগে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এনগ্রেভ্ড্ গিনি স্বর্ণের পাত সংযোজন করিয়া এই সুদৃশ্য অলঙ্কার আবিষ্কার করিয়াছি। হাতে পরিলে ইহা যে সলিড্ গিনি স্বর্ণের নয়, তাহা সুদক্ষ স্বর্ণকারগণও ধরিতে পারিবে না। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং মিতব্যয়িতার প্রতীক এই বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিতা এবং স্থরুচি-সম্পন্না মা-ভগ্নিগণের ইহাই চরমোৎকর্ষ সম্পন্ন এবং সাফল্য গৌরব মণ্ডিত হস্তাভরণ।

এনগ্রেভ শাখা

হস্তী-দন্তের শাঁখায় গিনি-সোনার এনগ্রেভড্ পাত মোড়া। মূল্য প্রঃ ১৫৲, মাঃ ১৩৵০, ছোঃ ১১৲, ঐ প্লেন ১০৲, ৮৷০, ৭৵০ ঐ তামার উপর প্লেন ৮৷০, ৭৷০, ৬৵০

টালি শাঁখা

হস্তী-দন্তের পলওয়ালা শাঁখায় গিনি সোনার এনগ্রেভড্ মনোরম পাত মোড়া। মূল্য ১৭৷০, ১৬৷০, ১৪৲ টাকা

নতুন ধরণের ইয়ারিং—১৫॥০

লাইন মোড় রুলি

হস্তী-দন্তের রুলিতে সোনা জড়ান, বেশ ফ্যান্সি। মূল্য ১০৷৵০, ৯৵০, ৭৲ টাকা

সোনার মুখ তার প্যাঁচ বালা

হস্তী দন্তের বালার প্যাঁচে প্যাঁচে সোনার পাত জড়ান ও সোনার হাঙ্গর মুখ বিশিষ্ট। মূল্য ২৫৲ সরু হইলে ২২৲

তার প্যাঁচ বালা খুর আংটি মূল্য ১০৲

হস্তী দন্তের প্যাঁচ বালার প্যাঁচে প্যাঁচে সোনার তার জড়ান, সোনার বকলেস দেওয়া অতি মনোজ্ঞ। মূল্য ১৫৷০, ঐ রুলি ১১৲

আড়াই প্যাঁচ সাপ তাগা

এই তাগা (অনন্ত) যেমন ফ্যান্সি তেমন মজবুত। বর্ত্তমানে সুরুচি সম্পন্ন রমণীগণ এই ডিজাইনের তাগাই পছন্দ করিয়া থাকেন। মূল্য ২১০৲ হইতে উর্দ্ধ।

ফ্যান্সি লেস্ পিন

মূল্যবান পাথর সেটিং উৎকৃষ্ট লেস পিন।
টেক্সই ও মনোরম ডিজাইন।
মূল্য ৩৫৲ টাকা হইতে উর্দ্ধ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আমরা নিজ কারখানায় তাগা, বালা, হার, হীরা মুক্তা সেট জড়োয়া গহনা ও অন্যান্য অলঙ্কার প্রস্তুত করি ও মজুত রাখি। বিবাহের গহনা ২৪ ঘণ্টায়ও দিয়া থাকি। পান কম দেওয়া আমাদের বিশেষত্ব। ব্যবহার অন্তে পানমরা বাদ না দিয়াই আমাদের জিনিষ গিনি সোনার বাজার দরে ক্রয় করিয়া থাকি। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃতে মাল পাঠাই। প্রত্যেক জিনিষের সঙ্গে গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি। আমাদের সুবৃহৎ নূতন ক্যাটলগের জন্য ৵০ দুই আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইয়া দিন।

সূচীপত্র—শ্রাবণ, ১৩৩৮

সুচীপত্র—শ্রাবণ, ১৩৩৮

কার এণ্ড মহলানবিশ
সর্ব্বপ্রধান
খেলার সরঞ্জাম বিক্রেতা
সচিত্র ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন
৩ নং চৌরঙ্গী কলিকাতা

সূচীপত্র—শ্রাবণ, ১৩৩৮

ভারতে সঞ্জীবন শিল্পের মহান্ আদর্শ।

ই, এ, রহিমের

জগদ্বিখ্যাত আসল দরবার হাতীমার্কা পাবনা ফিনিস ও তলোয়ার সিংহ-মার্কা বেলেঘাটা ফিনিস স্বদেশী গেঞ্জী, সুতি ও পশমী সোয়েটার, সোয়েটার কোট, জার্সি, ছেলেদের জার্সি, টুপি, লেডী সোয়েটার, কম্ফর্টার, মাফলার ইত্যাদি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

একমাত্র প্রস্তুতকারক—

এব্রাহিম আল্লারখ্যা রহিম,

৩৯নং আরমোনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে

১৩৩৮ সনের সুন্দর কেলেণ্ডার তৎসঙ্গে একখানি সুন্দর গানের বই ও হজমী বটিকা নামক প্রসিদ্ধ ঔষধের নমুনা পত্র লিখিলেই পাঠাই।

করিম এণ্ড কোং,—ঢাকা

মন্মথ কুকার
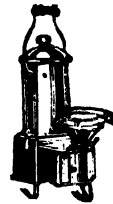
কুকারের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। কেবলমাত্র এই কুকারেই ভাজা ও রান্না এক সঙ্গে হয়। সুন্দর কারু- কার্য্য মূল্য সুলভ। যে জিনিষের মূল্য সুলভ অথচ উৎকৃষ্ট তাহাই ব্যবহার করা উচিত।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।

৯৫নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

আমেরিকার প্রসিদ্ধ বোরিক এণ্ড ট্যাফেল কোংর প্রস্তুত বিশুদ্ধ ও অকৃত্রিম হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ। ব্যাক ডাইলিউসন্ হইতে কলিকাতায় প্রস্তুত নহে। একমাত্র আমরাই ইহা আমদানি করিয়া থাকি। বায়োকেমিক ঔষধগুলি (চূর্ণ এবং ট্যাব্‌লেট) ½ আঃ, ১ আঃ, ২ আঃ ও ৪ আঃ আরিজিন্যাল্ আমেরিকান প্যাক্ শিশিতে বিক্রয় হয়। সুলভ অথচ বিশুদ্ধ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগের জন্য পত্র লিখুন।

শেঠ দে এণ্ড কোং

অরিজিন্যাল হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী ৪০এ, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিঃ

MORE BETTER

Drink Indian Special Darjeeling Tea.

Fresh & Pure. Airtight.

The

East India Tea Agency & Co.

35, Harrison Road, Calcutta.

Phone. B. B, 4289.

Ask for free Sample Packet.

জে, এম, রায় এণ্ড কোং জুয়েলার্স

৩৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমাত্র গিনি সোনা ও চাঁদি রূপার গহনা প্রস্তুতকারক।

সতী শাঁখা | **এনগ্রেভ্ সতী শাঁখা** | **টাব** | **নাকছাবি**

তামার ফ্রেমের উপর গিনি সোনার পালিস পাতে মোড়া। প্রমাণ ৬।০, মাঝারী ৫।১/০, ছোট ৪৸৵০

তামার ফ্রেমের উপর গিনি সোনার এনগ্রেভ পাতে মোড়া। প্রমাণ ১১৲, মাঝারী ১০।৵০, ছোট ৮৸০

প্রতি জোড়া ১০৲।১২৲ হইতে ঊর্দ্ধ

চিত্তরঞ্জন চুড়ী | **ইয়ারিং** | **মাকড়ী**

ইয়োলো ব্রোঞ্জের ফ্রেমের উপর গিনি সোনার এনগ্রেভ পাতে মোড়া, ফ্রেমের রং ব্যবহারে সোনার মত থাকে, হাতে দাগ লাগে না।
প্রমাণ ১৫।০, মাঝারী ১৩৸০, ছোট ১১।০

মূল্য প্রতি জোড়া ২০৲ হইতে ঊর্দ্ধ।

প্রতি জোড়া ৬৲
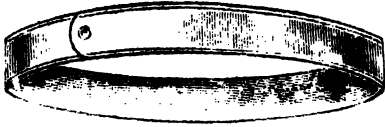
তার প্যাচ কুলী — হস্তী দন্তের সরু প্যাচকাটা কুলীর উপর গিনি স্বর্ণের সরু পাতে মোড়া। মূল্য প্রমাণ ১২॥০ ছোট ৮॥৵০ আনা।

ঘোড়ার ক্ষুর আংটী | **কাণফুল**

ফ্যান্সি লেস্ পিন

মূল্যবান পাথর সেটিং উৎকৃষ্ট লেস পিন।
মূল্য ৩২৲ টাকা হইতে ঊর্দ্ধ।

১৫৲—৩০৲

১০৲—১৫৲

পাতাওয়ালা ইয়ারিং | **করগেট মাকড়ী**

১২॥০—১৫৲

১২॥০—২০৲

সমস্ত অলঙ্কারই গিনি সোনায় প্রস্তুত।

তাগা, বালা, চুড়ী, হার, নেকলেস ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা মজুত থাকে, অন্যান্য জিনিষের অর্ডার দিলে নিয়মিত সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়, পরীক্ষা প্রার্থনীয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

এই যে দুধ দেখছেন!

ইহাই আজকাল অন্যান্য দুধের চেয়ে ভারতবর্ষে শিশুগণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

ভারতের জননীগণ তাঁহাদের নিজ নিজ শিশু সন্তানদের আজকাল এই দুধই খাওয়াইয়া থাকেন, তাই তাঁহাদের মুখে আজ প্রসন্নের হাসি ফুটিয়া উঠে, আপনার সন্তানকেও এই প্রবিদ্ধ খাদ্য খেতে দিন, দেখবেন কেমন প্রসন্ন-চিত্তে সে এই লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য হজম করে। ইহাও লক্ষ্য করবেন যে কত শীঘ্র শিশুর দেহে মাস গজায় ও হাড় পুষ্টি হয়। এই খাদ্যে স্বাভাবিক ভিটামিন ও অন্যান্য উপাদান এরূপ' পরিমাণে সংমিশ্রিত আছে, যাহা শিশুদিগের দেহ বর্দ্ধণ ও হৃষ্টপুষ্ট করিতে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

ইংলণ্ডের স্বভাবজাত শ্যামল তৃণপূর্ণ প্রদেশ হইতে এই দুধ টাটকা আমদানী—এবং বিশেষরূপে প্যাক করা। প্রস্তুত কালীন হস্ত দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না।

এজেন্টস্—কার এণ্ড কোং লিমিটেড, ওল্ড কোর্ট হাউস করণার, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং করাচি। জননীগণ স্বয়ং কাউ এণ্ড গেট চকোলেট ব্যবহার করুন।

বহু প্রদর্শনীতে
সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত

"স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরী"

ফোন নম্বর
৩৫৫২ বড়বাজার।

জুয়েলার্স ও হস্তী দন্তের জিনিষ এবং স্বর্ণ অলঙ্কার নির্ম্মাতা। ২১৩, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কংগ্রেস চুড়ি (টালি প্যাটার্ণ)

স্বর্ণবর্ণের মেটেলের ফ্রেমে গিনি স্বর্ণের এনগ্রেভ পাতে মোড়া, ঠিক নিরেট সোণার চুড়ির ন্যায়। মূল্য প্রমাণ প্রতি জোড়া ১৮৷৷০

ললনা সোহাগ রুলী

হস্তী দন্তের লাইন মোড়া রুলীর উপর গিনি স্বর্ণের পাতে মোড়া। মূল্য প্রমাণ ১০৮০, ছোট ৭৷৷০।

তার প্যাচ রুলী (সরু)

হস্তী দন্তের সরু প্যাচকাটা রুলার উপর গিনি স্বর্ণের সরু পাতে মোড়া। মূল্যপ্রমাণ ১২৷৷০ ছোট ৮৷৷৶০ আনা।

পাতাওয়ালা ইয়ারিং

১২৷৷০—১৫৲

করগেট মাকড়ী

১২৷৷০—২০৲

ঘোড়ার ক্ষুর আংটী

১৫৲—৩০৲

কাণফুল

১০৲-১৫৲

প্লেন কুমারী মাকড়ী

৬৷৷০

ইহা ব্যতীত জড়োয়া গহনা ও গিনি স্বর্ণের যাবতীয় অলঙ্কার সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। মফঃস্বলের অর্ডার ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। খাঁটী গিনি সোনার গ্যারান্টি দেওয়া হয়। সচিত্রক্যাটালগের জন্য ৵০ ষ্টাম্প পাঠান। মওলানা মোহাম্মদ আলী লিখিয়াছেন, আমি "স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরীর" সুসজ্জিত দোকান দেখিয়াছি ইহাদের কাজ সুন্দর এবং কারুকার্য্য সমন্বিত। আমি এই দোকানের ক্রমোন্নতির কামনা করি। ১৩ই জানুয়ারী ১৯২৫।

৫০০৲ টাকা

পর্য্যন্ত পাওয়া যায় মাসিক ১৲ ও ২৲ টাকা চাঁদা দিয়া। ১০, ১৫, ২০ বৎসর অন্তে জীবিতাবস্থায় টাকা দেওয়া হয়।

উচ্চহারে কমিশনে সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক

এসিয়াটিক ইন্সিওরেন্স

কোম্পানি লিমিটেড,

৩নং কমার্সিয়েল বিল্ডিংস, কলিকাতা।

Extremely cheapest and Best house for :—

New, Rebuilt, Second-hand Typewriter and spare parts, Ribbon, Carbon paper, Printing & Everything in office supplies etc.

Directly imported from America No. 12 Remington & Underwood Typewriter @ Rs. 170/- only. We Guarantee the said machines, in appearance and service, as equal as new, which is priced at Rs. 450/-

Repairs :—a speciality. Guaranteed in every way.

Pleass try. Compare & be convinced.

THE
Asiatic Typewriter Co.,

9/1, Old post Office Street, CALCUTTA.

Estd. 1903. Phone 2892 Calcutta.

মাসিক মোহাম্মদী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়

১। মাসিক মোহাম্মদী প্রতি বাংলা মাসের ১লা তারিখের মধ্যেই কলিকাতায় প্রকাশিত হয় এবং সেই দিনই মফঃস্বলে গ্রাহকদিগের নামে প্রেরিত হয়।

২। প্রত্যেক মাসের ৫ই তারিখের মধ্যে সেই মাসের 'মোহাম্মদী' না পাইলে, স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন। আমাদিগকে ডাকঘরের উত্তর সহ ১০ই তারিখের মধ্যে জানাইবেন; ডাকঘরের গোলযোগে কাগজ না পাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বর্ত্তমান সময়ে আমাদের পক্ষে অসম্ভব। যাঁহারা সর্ব্বদা নিয়মিত ভাবে কাগজ পান না, তাঁহাদের পক্ষে রেজেষ্টারী খরচা বহন করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট সহ পত্র না লিখিলে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

৩। চিঠি-পত্র বা টাকা-কড়ি পাঠাইবার সময় পুরাতন গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর (কাগজের মোড়কের উপর থাকে) এবং নূতন গ্রাহকগণ "নূতন" এই দুইটি বিষয় স্পষ্ট ও নির্ভুল করিয়া লিখিবেন। অন্যথায় অভিযোগ অনুযায়ী কাজ করা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

৪। কার্ত্তিক মাস হইতে মাসিক মোহাম্মদীর বৎসর আরম্ভ হয়। যিনি যে কোন মাস গ্রাহক হউন না কেন তাঁহাকে কার্ত্তিক মাস হইতে কাগজ দেওয়া হয়।

৫। ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণকে কার্ত্তিক হইতে চৈত্র কিংবা বৈশাখ হইতে আশ্বিন এই ছয় সংখ্যা করিয়া কাগজ দেওয়া হয়।

৬। মাসিক মোহাম্মদীর বার্ষিক ও ষাণ্মাষিক মূল্য যথাক্রমে ভারতে সডাক ৩৷৵০ আনা ২৲ ভি, পিতে, ৩৸৵০ ও ২।০ আনা। বিদেশে ৬৲ টাকা।

৭। পূর্ব্বে ভি, পি, পার্শ্বেল স্থানীয় পোষ্টাফিসে পৌছিলে ১২ দিন জমা থাকিত, তাহার জন্য কোন খরচা দিতে হইত না। কিন্তু নূতন নিয়ম হইয়াছে যে, এখন বিনা খরচায় মাত্র তিন দিন জমা থাকিবে, এবং তিন দিনের উপর ঐ বার দিন পর্য্যন্ত যে কয়দিন জমা রাখিতে হইবে প্রত্যেক দিনের জন্য ৵০ করিয়া টিকিট দিয়া দরখাস্ত করিতে হইবে। সেই জন্য অনেক পার্শ্বেল গ্রাহকগণের অগোচরেই আমাদের নিকট ফেরৎ আসে। এ-কারণ গ্রাহকগণের নিকট অনুরোধ তাঁহারা টাকার যোগাড় করিয়া ভি, পি,র অর্ডার দিবেন। মণিঅর্ডারে টাকা পাঠানই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, কারণ তাহাতে ৵০ কম খরচ পড়ে এবং কোন গোলমালের আশঙ্কা থাকে না।

৮। বিনামূল্যে কাহাকেও নমুনা দেওয়া হয় না। নমুনার জন্য সাড়ে পাঁচ আনার টিকিট পাঠাইতে হয়।

১০। তিন মাসের কমে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করা হয় না। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের চিঠি পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া চাই। তাহার কম সময়ের জন্য স্থান ত্যাগ করিলে স্থানীয় পোষ্টাফিসে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করাই শ্রেয়ঃ।

এজেণ্টগণের প্রতি—

১। এজেণ্টদিগকে শতকরা ২০৲ হিসাবে কমিশন দেওয়া হয়। কাগজ পাঠনর খরচা আমরাই বহন করিয়া থাকি।

২। অবিক্রীত সংখ্যা ফেরৎ লওয়া হয় কিন্তু তাহা ফেরৎ পাঠানর খরচা এজেণ্টগণের।

৩। ২৫ খানির কমে কাহাকেও এজেণ্ট করা হয় না।

৪। এজেন্সী লইবার সময় নিম্নলিখিত হারে টাকা জমা দিতে হয়:—

২৫ খানির জন্য	৮৲	৫০ খানি পর্য্যন্ত	১৫৲
৭৫ খানি পর্য্যন্ত	২২৲	১০০ খানি পর্য্যন্ত	৩০৲

তদূর্দ্ধ প্রতি শত ৩০৲ টাকা হিসাবে।

৫। এজেণ্টগণের বিক্রীত মূল্য ও অবিক্রীত কাগজ মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া চাই। অন্যথায় পরবর্ত্তী মাস হইতে আর কাগজ পাঠান হয় না।

লেখকগণের প্রতি

১। লেখকগণ দয়া করিয়া প্রবন্ধের নকল রাখিয়া পাঠাইবেন।

২। প্রবন্ধ সকল সম্পাদকের নিকট প্রেরিতব্য।

৩। প্রবন্ধের সঙ্গে ঠিকানা লেখা না থাকিলে বড় অসুবিধা হয়। প্রবন্ধ লেকখগণ দয়া করিয়া প্রত্যেক লেখার সঙ্গে ঠিকানা লিখিয়া দিবেন এবং অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ লইতে হইলে ডাক খরচা দিতে হইবে।

৪। কবিতার নকল রাখিয়া পাঠাইবেন, অমনোনীত কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। প্রবন্ধ-আদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার ও ফাঁক ফাঁক করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। কোন কবিতা বা প্রবন্ধ কেন ছাপা হইল না, সম্পাদক সে কৈফিয়ৎ দিতে রাজি নহেন।

অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন ঃ—

ম্যানেজার—মাসিক মোহাম্মদী, ১১নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শিল্পী—শ্রীচারু সেন

[পুষ্প-পাত্রের সৌজন্যে]

"—তাহার গীতিকা মোর সুর-শিখা
দুলিতেছে মলয়ায়—"

COME TO "THE

"Mohammadi"

FOR

IDEAS

for your
next advertisign
campaing.

Popular Engraving Co.,
"Brass-Door-Plate Engravers"
Rubber-Stamp Manufacturers.
8/A, Lallbazar Street, Cal.
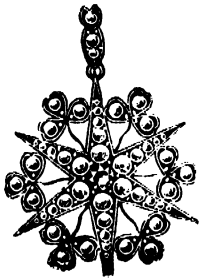
আধুনিক ডিজাইনের অলঙ্কার ও ঘড়ি

আমাদের নিকট জিনিস লইলে শতকরা ১৫৲ টাকা কমিশন পাইবেন।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং,

১৪নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সোল এজেন্টস্ :—বেনসোমণ্ড ওয়াচ কোং ও দি, পি, ওয়াচ কোং,

Phone :—**5580 CAL.**

Post Box No. **337** Cal.

বিখ্যাত জুতা প্রস্তুতকারক

বাহিরের অর্ডারী কাজের সুবন্দোবস্ত আছে।

ঘোষ ব্রাদার্স,
৩০, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলি:

বিশুদ্ধ ঔষধের উপরই রোগ মুক্তি ও চিকিৎসকের যশ নির্ভর করে।

যে কোন ঔষধালয়ের সহিত আমাদের ঔষধ পরীক্ষা করুন। উৎকৃষ্ট কর্ক ও ইংলিশ শিশিতে প্রতি ড্রাম /৫, /১০ পয়সা বাইওকেমিক ঔষধও আমাদের নিকট পাওয়া যায়।

দি ন্যাশনাল হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী

পরিচালক—টী, সি, চক্রবর্ত্তী, এম, এ,
২০৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলেরা ও গৃহ চিকিৎসার ঔষধ পূর্ণ বাক্স, পুস্তক, কৌটা কেস যন্ত্র এবং

এক শিশি ক্যাম্ফার সহ ১২, ২৪,৩০, ৪৮, ৬০, ৮৪ ও ১০৪ শিশি বাক্সের মূল্য যথাক্রমে—২৲, ৩৲, ৩।০, ৫।০, ৬৷৵০, ৯৲ ও ১০৷৵০ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

Advertising is the eye of trade.

চতুর্থ বর্ষ শ্রাবণ, ১৩৩৮ ১০ম সংখ্যা

মিশ্র ও স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন

—মোহাম্মদ আকরম খাঁ

বিচার ও বিসম্বাদ

মিশ্র ও স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন লইয়া বিভিন্ন দলের ও মতের দেশবাসীদিগের মধ্যে ঘোরতর মতানৈক্য উপস্থিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিবেচ্য বিষয় যে সব আছে, ধীরভাবে তাহার সূক্ষ্ম-বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া, যুক্তি-প্রমাণ ও অতীত অভিজ্ঞতার দিক দিয়া সেগুলির আলোচনা করা এক্ষেত্রে সকলের উচিত ছিল। কিন্তু অশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, অধিকাংশ স্থলে বিচারের পরিবর্ত্তে বিতণ্ডারই প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছে, কোন্ প্রস্তাব দ্বারা জাতির ইষ্টানিষ্ট কি পরিমাণ সাধিত হইবে না-হইবে, সেদিকে লক্ষ্য করা এখন অনেকে আবশ্যক মনে করিতেছেন না—নিজেদের জেদকে জয়যুক্ত করা আর যে-কোন প্রকারে হউক, অন্য মতের লোকদিগকে হারাইয়া দেওয়াই এখন তাঁহাদের প্রধানতম সাধনা।

যে সকল মুছলমান, সমাজের এই ঘোর সঙ্কট সময়ে স্বাধীনভাবে প্রশ্নটীর সব দিকের আলোচনা করিতে চাহিতেছেন, বর্ত্তমানে তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে বিপন্ন হইতে হইয়াছে; হিন্দু-সভা এবং কংগ্রেসের বাহিরের অন্য হিন্দু নেতারা নিজেদের সমস্ত শক্তি, সুযোগ ও প্রতিভা লইয়া মুছলমান সমাজের সকল প্রকার স্বার্থ ও দাবীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, আর কংগ্রেস বসিয়া বসিয়া তামাশা দেখিতেছেন, হিন্দু-সভার কার্য্য-কলাপকে অন্ততঃ মৌন-সমর্থন দিয়া যাইতেছেন। ইঁহাদের সঙ্গে বিচার আলোচনা করিতে যাওয়া অনর্থক-পণ্ডশ্রম। কারণ, তাঁহারা যাহা বুঝিবেন বা বুঝাইতে চাহিবেন, সম্পূর্ণ ও ষোল-আনা রকমে তাহার সমর্থন না করিতে পারিলে তাঁহাদের কাছে উদার-অসাম্প্রদায়িক বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়া অসম্ভব। স্বাধীনচেতা মুছলমানদিগের পক্ষ হইতে যতই কেন যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করা হউক, তাঁহারা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিবেন না। কারণ, এ সমস্তই তাঁহাদের পরিভাষায় সাম্প্রদায়িকতা—আর, সাম্প্রদায়িকতার ত্রিসীমায় পদার্পণ করিতে কোন হিন্দুই প্রস্তুত নহেন! অন্যমতের মুছলমান নেতাদের সহিত বিচার-

আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াও ইঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই শ্রেণীর নেতারা এক কথায় বলিয়া দিতেছেন যে, তাঁহারা যাহা বুঝিতেছেন বা বলিতেছেন, সেইটাই হইতেছে খাঁটি সত্য ও একমাত্র সত্য। কারণ, তাঁহারাই হইতেছেন একমাত্র খাঁটি মুছলমান, আর অন্যদলের মুছলমানরা যাহা বলিতেছে, সে সমস্তই হইতেছে মিথ্যা ও শয়তানী। কারণ, তাহারা সকলেই হইতেছে কংগ্রেসের ভাড়াটিয়া বেঈমান ও "তথাকথিত মুছলমান !"।

এ অবস্থায়, এই শ্রেণীর হিন্দু ও মুছলমান নেতাদের সহিত বিচার-মীমাংসার আশা আপাততঃ পরিত্যাগ করিয়া, প্রশ্নটীর সব দিক সমাজের জনসাধারণকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ার চেষ্টা পাওয়াই এখন প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। সমাজ অন্ধ নহে, বধির নহে, মূকও নহে। নিজের ভাল-মন্দ বুঝিয়া লওয়ার এবং বুঝার পর তাহা প্রকাশ করার ক্ষমতা খোদার ফজলে এখনও তাহার লোপ পায় নাই। আমরা মোছলেম-বঙ্গের স্বাধীন-চেতা ও চিন্তাশীল বন্ধুবর্গকে অনুরোধ করিতেছি, অবস্থার গুরুত্ব অনুভব করিয়া তাঁহারা সকলে নিজ নিজ সুবিধা সুযোগ অনুসারে এ বিষয় তৎপর হউন! সততা ও আন্তরিকতার সহিত যে চেষ্টা করা হইবে, তাহা কখনই বিফলে যাইবে না, যাইতে পারে না। গত কএক মাসের সামান্য আন্দোলন-আলোচনার ফলে মোছলেম-বঙ্গের বিভিন্ন স্তরে যে অভূতপূর্ব্ব বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে, তাহাই আমাদের উক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

এ সম্বন্ধে আমাদের মতামত পাঠকগণের অবিদিত নহে। আমাদের মতে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন মুছলমান সমাজের জন্য শুধু অনাবশ্যকই নহে, বরং ঘোর সর্ব্বনাশকর। অতীতের অবস্থা যাহাই থাকুক না কেন, ভবিষ্যতে দেশের শাসন-পদ্ধতি যেরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে, তাহাতে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন গ্রহণ করা আর বাঙ্গলার মুছলমানকে আইনের দ্বারা চিরস্থায়ীভাবে আড়ষ্ট, অবসন্ন এবং হিন্দুর পদানত করিয়া রাখা একই কথা হইবে। আমরা বাঙ্গালী মুছলমানের জন্য Reservation of seats বা আসন নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়ারও ঘোর বিরুদ্ধবাদী। এমন কি, এই Reservation দ্বারা মুছলমানদিগকে যদি তাহাদের জন-সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা দুই-চারিটা অধিক আসনও দেওয়া হয়, তত্রাচ আমরা উহাকে স্বজাতির জন্য ভীষণ অনিষ্টকর বলিয়া মনে করি। যে-সমস্ত কারণ ও যুক্তি প্রমাণের ফলে আমরা এই অভিমতে উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছি, তাহাই আজ সমাজের চিন্তাশীল বন্ধুবর্গের খেদমতে উপস্থাপিত করার প্রয়াস পাইব।

ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য

ব্যবস্থাপক-সভায় মুছলমান মেম্বরদের সংখ্যা কত হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতে আইনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে, সেই সংখ্যার অতিরিক্ত মেম্বর নির্ব্বাচন করার অধিকার মুছলমানের থাকিবে না। তাহার পর, এই পদ্ধতির ফলে মুছলমান প্রার্থী কোন অমুছলমান ভোটারের ভোট লইতে, অথবা মুছলমান ভোটার কোন অমুছলমান প্রার্থীকে ভোট দিতে পারিবেন না। ইহারই নাম—স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন। মিশ্র-নির্ব্বাচনে, মুছলমান-অমুছলমান সকল শ্রেণীর ভোটের তালিকা এক সঙ্গে প্রস্তুত করা হইবে। প্রত্যেক নির্ব্বাচন-চক্রে মুছলমান ও অমুছলমান সকল শ্রেণীর প্রার্থী প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন, মুছলমান ও অমুছলমান উভয় শ্রেণীর ভোটার নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে উভয় শ্রেণীর প্রার্থীদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা ভোট দেওয়ার অধিকারী থাকিবেন। অর্থাৎ সুযোগ ও আবশ্যক অনুসারে মুছলমান প্রার্থী উভয় শ্রেণীর ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন, আর অবস্থা-গতিকে দরকার হইলে কেবল মুছলমানের ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতে সমর্থ হইবেন। এই প্রথায় মুছলমানদের জন্য কোন আসন সংখ্যা-নির্দ্ধারিত থাকিবে না, শক্তিতে কুলাইলে নিজেদের অনুপাত অপেক্ষা অধিক আসনও তাঁহারা অধিকার করিতে পারেন, আইনতঃ তাহাতে কোন বাধা থাকিবে না। আসন-নির্দ্ধারণ বা রিজার্ভেশন হইলে—মুছলমান মেম্বরদের সংখ্যা স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের মতই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকিবে, এবং নির্ব্বাচনটা মুছলমান-অমুছলমান উভয় শ্রেণীর ভোটের দ্বারা সম্পন্ন হইবে। এই তিন প্রকার প্রথার মধ্যে কোনটী বর্ত্তমান অবস্থায় মুছলমানদিগের পক্ষে হিতজনক আর কোনটী অনিষ্টকর, তাহাই এ প্রবন্ধের প্রধান বিচার্য্য বিষয়।

অতীত ইতিহাস

এই প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে, সর্ব্বপ্রথমে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের অতীত-ইতিহাস সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলা আবশ্যক হইবে। তাহা হইলে আলোচনার সুবিধা হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

আমরা যতদূর জানি, 'স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের প্রকৃত ইতিহাসের সূত্রপাত হইতেছে—১৯০৬ সালের অক্টোবর মাস হইতে।' এই সময়ে স্যার আগা খাঁর নেতৃত্বে একটী ডেপুটেশন সিমলা-শৈলে তখনকার রাজ-প্রতিনিধি লর্ড মিণ্টোর নিকট উপস্থিত হয় এবং তাহার সদস্যগণ তাঁহাদের দরখাস্তে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের দাবী উপস্থিত করেন। তাঁহারা এই দরখাস্তে আরও বলেন যে, কেবল সংখ্যার হিসাবে মুছলমান দিগকে আসন দিলেই যথেষ্ট হইবে না। বরং 'মুছলমান-দিগের রাজনৈতিক গুরুত্বের এবং সাম্রাজ্য-রক্ষার্থ তাহাদের সামরিক সাহায্যের হিসাবে তাহাদিগকে আসন দিতে হইবে। লর্ড মিণ্টো ইঙ্গিতে-ইসারায় স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের সমর্থন করিলেও, তখন সে সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে কোন মত প্রকাশ করেন নাই। তবে, মুছলমানদের "রাজনৈতিক গুরুত্ব ও সামরিক সাহায্যের" দাবীটা তিনি স্পষ্ট ভাষায় সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন।'

'সিমলা ডেপুটেশনের প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ দাবীটা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বলিতেছেন :—

(১) সমস্ত জেলা ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে মুছলমান-দিগকে স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক-নির্ব্বাচনের অধিকার দিতে হইবে। অন্যথায় মিশ্র-নির্ব্বাচনের দ্বারা নিজেদের যথাযথ স্থান অধিকার করা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, ডেপুটেশনের মেম্বর-গণ তাহাও পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩) প্রাদেশিক কাউন্সিলের মুছলমান মেম্বরদিগকে নির্ব্বাচিত করার জন্য যে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন চক্র গঠিত হইবে, তাহার ভোটার হইবেন—

(ক) মুছলমান জমিদারগণ,
(খ) " উকিলগণ,
(গ) " বণিকগণ,
(ঘ) জেলা ও মিউসিপ্যাল বোর্ডের মুছলমান মেম্বরগণ,
(ঙ) কিছুকালের পুরাতন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মুছলমান গ্রাজুয়েটগণ,
(চ) অন্যান্য আবশ্যকীয় স্বার্থের প্রতিনিধিবর্গ,

(৪) ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার মুছলমান মেম্বরগণ, মুছলমান জমিদার, উকিল, ব্যারিষ্টার, বণিক, প্রাদেশিক কাউন্সিলের মেম্বর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো'দিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন।

১৯০৯ সালে, Indian Councils Act পাস হওয়ার কিছুকাল পূর্ব্বে, বিলাতে ভারত সচিবের নিকট মোছলেম লিগের পক্ষ হইতে আর একটী ডেপুটেশন প্রেরিত হয়। জনাব ছৈয়দ আমীর আলী মরহুম এই ডেপুটেশনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই সময়ে, ভারত সচিব লর্ড মর্লে মুছলমান-দিগকে স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক-নির্ব্বাচন দেওয়ার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি উপস্থিত করেন। পক্ষান্তরে তিনি বলেন, প্রত্যেক প্রদেশের ব্যবস্থাপক-সভায় সেই প্রদেশের মুছল-মানদিগের জন-সংখ্যার অনুপাত অনুসারে আসন-সংখ্যা নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হউক, তবে নির্ব্বাচনটি স্বতন্ত্রের পরিবর্ত্তে মিশ্র করিতে হইবে।

প্রধানতঃ ভারত সচিবের এই অভিমতের প্রতিবাদ করার জন্যই এই ডেপুটেশন পাঠান হইয়াছিল। তাঁহারা মিশ্র-নির্ব্বাচন প্রথার প্রতিবাদ ত করিলেনই, সঙ্গে সঙ্গে The members "—also protested against Moslem representation being fixed on a population basis, urging that this did not give due weight to the political and military importance of their community. অর্থাৎ জন-সংখ্যার অনুপাত অনুসারে ব্যবস্থাপক সভায় মুছলমান মেম্বরদের আসন-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করার প্রস্তাবেও ডেপুটেশনের মেম্বরগণ আপত্তি করিলেন। কারণ, তাঁহাদের মতে, জন-সংখ্যার অনুপাত অনুসারে আসন নির্দ্ধারিত করিলে, মুছলমানদের রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয় না।

ডেপুটেশনের সমর্থনমতে এবং তাহার অধিনায়করূপে, ছৈয়দ আমীর আলী ছাহেব যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাঁহারই নিজের ভাষায় তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি বলেন :—

"We therefore submit, as a standard of adequate representation, that the numbers of Muhammadan members on the several councils should be so fixed that, if the Muhammadans were to join a certain number of

what may be called 'non-partisan' members, or to receive their support on any particular question, the issue may be decided accordingly."

ইহার মর্ম্ম এই যে,—মুছলমানদিগকে যথাযথভাবে প্রতিনিধি পাঠাইতে দেওয়ার নিদর্শন, আমাদের মতে এই যে,—বিভিন্ন ব্যবস্থাপক সভায় মুছলমান-মেম্বরদের সংখ্যা এমন ভাবে নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা কোন নিরপেক্ষদলের সঙ্গে যোগ দিলে অথবা সেই দলের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিলে, শেষ সিদ্ধান্ত হইয়া যাইবে তাহাদেরই মত অনুসারে। (১)

ইতিহাসের শিক্ষা

বর্ত্তমান অবস্থার পরিচয় দেওয়ার পূর্ব্বে, অতীত ইতিহাসের শিক্ষা সম্বন্ধে দুই-একটা বিষয়ের প্রতি বাঙ্গালী-মুছলমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি।

প্রথম ডেপুটেশনের বিবরণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আমাদের নেতারা জেলা-বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল-বোর্ড প্রভৃতিতেও স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন পাওয়ার জন্য তখন নির্ব্বন্ধাতিশয্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহারা আশঙ্কা করিতেছিলেন যে, স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন না পাইলে হিন্দুরা তাঁহাদিগকে ঐ সব স্বায়ত্ত শাসন সঙ্ঘের ত্রিসীমায়ও পদার্পণ করিতে দিবে না, যথাযথ অংশ বুঝিয়া পাওয়া ত দূরের কথা। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট মুছলমান নেতাদের এই আবেদন গ্রহণ করেন নাই এবং এই সব বোর্ডে সাধারণ মিশ্র-নির্ব্বাচনই প্রচলিত আছে। পক্ষান্তরে ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে মুছলমানদিগকে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন দেওয়া হইয়াছে। ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ড, লোকাল-বোর্ড ও ইউনিয়ন-বোর্ডের অবস্থা বাঙ্গলার মুছলমানগণ আজ নিত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। মিশ্র-নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তিত থাকার ফলে বাঙ্গলার মুছলমান বর্ত্তমান অসংহত ও বিক্ষিপ্ত অবস্থাতেও কিরূপে সগৌরবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়া চলিয়াছে, এই উপলক্ষে কিরূপে রাজনৈতিক চেতনা ক্রমশঃই জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে এবং ১৯০৬ সালের নেতাদের আতঙ্ক ও আশঙ্কাকে কার্য্য-ক্ষেত্রে সামান্য চেষ্টায় কিরূপে অসার বলিয়া প্রতিপাদিত করিয়া দিতেছে, পাঠকগণ এখানে তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন! স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন প্রচলিত থাকিলে শতকরা ২৭টী মাত্র আসন লইয়া এই সব ক্ষেত্রে মুছলমানদের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িত, এই সঙ্গে তাহাও চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। আমাদের মতে, মিশ্র-নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তিত হইলে বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভাতেও মুছলমানগণ এইরূপে অতি সহজে নিজেদের অধিকার ও প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে পারিবেন।

প্রথম ডেপুটেশনের ইতিহাসে ইহাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, আমাদের তখনকার নেতারা দেশ-শাসনের অধিকার চাহিয়াছিলেন কেবল জমিদার, উকিল ও উচ্চ-শিক্ষিত মুছলমানদিগের জন্য, জাতির সাধারণ স্তরে রাজনৈতিক-জীবনের উন্মেষসাধন করাই যে প্রথম আবশ্যক, তাঁহারা তখন তাহা আদৌ অনুভব করেন নাই। তাই কেবল ধনিক, বণিক ও ইংরাজী শিক্ষিত রাজকর্ম্মচারী-দিগের তুষ্টি ও পুষ্টির ভাবনা ভাবিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হইয়াছিলেন—তাঁহাদের গণ্ডীর বাহিরে উৎপীড়িত, নির্য্যাতিত, হৃত-সর্ব্বস্ব কোটি কোটি মুছলমানকে—তাহাদের স্বার্থ ও রাজনৈতিক-অধিকারকে, তাঁহারা অতি নির্ম্মম ভাবে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানেও মিশ্র ও স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের বিসম্বাদের মূল বীজটী এইখানেই লুকাইয়া আছে। একদল চাহিতেছেন, মুছলমান সমাজের নামকরণে সঞ্চিত সমস্ত সুবিধা ও অধিকারগুলি নিজেরা ভোগ করিতে, আর একদল চাহিতেছে বাঙ্গলার প্রত্যেক মুছলমান অধিবাসীকে শক্তি দিয়া সম্পন্ন করিতে, অধিকার দিয়া জাগ্রত করিতে—প্রকৃত শত্রুদের গ্রাস হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে।

অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে আর একটী কথা বাঙ্গালী মুছলমানদের বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। উভয় ডেপুটেশনের বিবরণে দেখা যাইতেছে, আমাদের নেতারা জন-সংখ্যার অনুপাত অনুসারে প্রতিনিধি-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করার কঠোর ও ক্রমাগত প্রতিবাদ করিয়া চলিয়াছেন। মুছলমানের "রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্বের" মর্য্যাদানুসারে তাহাদের আসন-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করার প্রতিই তাঁহারা বরাবর জোর দিয়া গিয়াছেন।

(১) এই প্যারার উদ্ধৃতাংশ ও অন্যান্য উপকরণ সাইমন রিপোর্ট, ২য় খণ্ড, ১৮৩—১৮৬ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত।

আমাদের মতে বাঙ্গালী মুছলমানের স্বার্থের মাথায় কুঠারাঘাত করা হইয়াছে এইখানে, সর্ব্বপ্রথমে। বাঙ্গালী মুছলমানের সামরিক গুরুত্ব কিছুই নাই, একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। আবার, আমরা যতদূর জানি, বাঙ্গলার মুছলমানদের মধ্যে এরূপ লোক একজনও নাই, * যিনি সঙ্গত ভাবে দাবী করিতে পারেন যে, ইংরাজ এদেশ অধিকার করার সময়ে আমার অমুক পূর্ব্বপুরুষ অমুক সিংহাসনের মালেক বা অমুক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তিনি ইংরাজের হাতে পরাজিত হওয়ার গৌরব অর্জ্জন করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বংশধর বলিয়া আমি নিজেদের রাজনৈতিক গুরুত্বের গৌরবময় দাবী উপস্থিত করিতেছি! কাজেই রাজনৈতিক গুরুত্বের নামে বাঙ্গালী মুছলমানদের দাবী করার যে বিশেষ কিছু নাই, অগত্যা তাহাও আমাদের স্বীকার্য্য। এক থাকিল সংখ্যার গুরুত্ব, আমাদের নেতারা প্রথম হইতে তাহার গোড়া কাটিয়া আসিয়াছেন। এই উপক্রমের চরম উপসংহার হইয়াছে দ্বিতীয় শাসন সংস্কারের পর ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের সংখ্যা নির্দ্ধারণে। তাই, যুক্তপ্রদেশে মুছলমান অধিবাসীদের জন-সংখ্যার অনুপাত শতকরা ১৪ হইয়াও তাঁহারা পাইতেছেন সর্ব্ব-সাকুল্যে মোটের শতকরা ২৬টী আসন, আর শতকরা ৫৪ জন হইয়া আমরা পাইতেছি সর্ব্ব-সাকুল্যে মোট ২৭টী আসন। বাঙ্গালী মুছলমানদের সম্বন্ধে এই অবিচারকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা এখনও চলিতেছে।

ভাবী-আলোচনার সুবিধার জন্য, আমাদিগকে বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের নেতারা অতীতে নিজেদের সংখ্যা বা শক্তির উপর আদৌ নির্ভর করেন নাই। তাঁহারা নির্ভর করিয়াছিলেন ব্যবস্থাপক সভার non-partisan বা নিরপেক্ষ দলের সাহায্য ও সহযোগের উপর। দরকার মত, এই নিরপেক্ষ দলের সহিত যোগ দিলে অথবা তাহাকে নিজেদের সঙ্গে লইলে মুছলমানদের মতই যাহাতে জয়যুক্ত হইতে পারে, বিভিন্ন ব্যবস্থাপক সভায় সেইভাবে মুছলমানদের আসন-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করাকেই তাঁহারা সঙ্গত ও সন্তোষজনক অবস্থা বলিয়া দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন।' মিঃ আমীর আলীর মন্তব্যে এই অভিমতটী খুবই স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে।

ব্যবস্থাপক-সভায় মুছলমান নেতাদের প্রধান বিপদ ও আতঙ্কের কারণ হইয়াছিলেন তাহার হিন্দু মেম্বরগণ। এই বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্যই তাঁহারা যত চেষ্টা-চরিত্র করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা যে হিন্দু মেম্বরদিগকে নিরপেক্ষ দল বলিয়া প্রকাশ করিতে পারেন না, তাহা বলাই বাহুল্য। ' কাজেই আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের নেতারা তখন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়াছিলেন official block বা সরকারী হল্‌কার উপর। ইহাকেই তাঁহারা নিজেদের জন্য standard of adequate representation বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনকে আঁকড়াইয়া ধরার সময়ে বাঙ্গলার মুছলমানকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহার আদি ভিত্তি-স্বরূপ এই সরকারী হল্‌কার অস্তিত্ব আগামী শাসন-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের তরে লুপ্ত হইয়া যাইবে। ' এ সম্বন্ধে পরে বিশদভাবে আলোচনা করা হইবে।

বর্ত্তমান অবস্থা

অতীত ইতিহাস আলোচনা করার এবং তাহার শিক্ষা-গুলি স্মরণ রাখার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে এখন বর্ত্তমান অবস্থার হিসাব-নিকাশটাও ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে।' তাহা হইলেই ভাবী ব্যবস্থাগুলি সম্বন্ধে নির্ভুল মতামত নির্দ্ধারণ করা আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা নিম্নে সে সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া রাখিতেছি :—

(১) বাঙ্গলার মুছলমানদিগের জন-সংখ্যার অনুপাত শতকরা ৫৪ জন, স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের দ্বারা তাহারা আসন পাইতেছে মাত্র শতকরা ২৭টী।

(২) বাঙ্গলায় সকল দেশের, সকল জাতির, সকল ধর্ম্মের প্রবাসী ও অধিবাসী অমুছলমানদের জন-সংখ্যা হইতেছে মোট শতকরা ৪৬ জন। স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের কল্যাণে এই শতকরা ৪৬ জন অমুছলমান শতকরা ৭৩টী আসনের মালেক হইয়াছেন, আর শতকরা ৫৪ হইয়াও মুছলমান পাইতেছে শতকরা ২৭টী মাত্র।

* অবশ্য একমাত্র মীরজা'ফরের বংশধরগণ ব্যতীত।

(৩) মোটামুটি ভাবে মোছলেম বঙ্গের মোট অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন হইতেছে কৃষক ও কৃষিজীবী প্রজা। সাইমন কমিশন তৃতীয় কাউন্সিলের সংখ্যা লইয়া হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহার ১৪০ জন মেম্বরের মধ্যে ৪৭ জনই হইতেছেন জমিদার।

(৪) বর্ত্তমান সময়ে, স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের ফলে, মুছলমান নেতাদের মধ্যে যথেষ্ট গৃহ-যুদ্ধ ও আত্ম-কলহের সৃষ্টি হইয়াছে।

(৫) স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের রক্ষা-কবচের ফলে এখন যাঁহারা কাউন্সিলে আসিতেছেন, পরীক্ষার সময়ে তাঁহারা সকলেই যে নিজেদের দৃঢ় ইমানের প্রমাণ দিতে পারিতেছেন, একথা সত্য নহে। হিন্দুরা তাঁহাদের কাহাকে কাহাকে কবে কি কি উপায়ে হস্তগত করিয়াছিলেন, অভিজ্ঞদিগকে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

(৬) মিশ্র-নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী বা কংগ্রেস-পন্থী হওয়ার জন্য যাহাদিগকে হিন্দুর ভাড়াটিয়া ও অনভিপ্রেত বলিয়া উল্লেখ করা হইতেছে, স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের বেড়া দিয়া তাহাদিগকে আট্‌কাইয়া রাখাও অসম্ভব হইতেছে না। প্রমাণ—মৌঃ ছৈয়দ জালালুদ্দিন হাশেমী ও শামছুদ্দিন আহ্‌মদ, মৌলবী ছৈয়দ নওশের আলি ও মৌলবী আবদুচ্ছামাদ প্রভৃতি।

(৭) বাঙ্গলার দরিদ্র-জনসাধারণ সাধারণতঃ এবং মুছলমান রায়তগণ বিশেষতঃ নানা দুঃখে-দৈন্যে, অত্যাচারে-অবিচারে, এবং অন্যায় শাসনে-শোষণে আজ একেবারে মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত। স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন গত ২০ বৎসরে তাহার কোন দিকের সামান্য কিছুও প্রতিকার করিতে পারে নাই। বরং স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন বলবৎ থাকার কালেই সর্ব্বনাশকর প্রজাস্বত্ব আইন পাস হইয়া গিয়াছে।

(৮) স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলেই বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী ধনিক ও বণিকগণের এবং বাঙ্গলার প্রধান শাসক ও শোষক জমিদার ও মহাজনদিগের জন্য বিভিন্ন বিশেষ নির্ব্বাচন-চক্র গঠন করা সম্ভব ও সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

(৯) স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের ফলে, মুছলমান প্রজা নিজেদের যমস্বরূপ মুছলমান জমিদারকে ভোট দিতে বাধ্য হইতেছে। ব্যবস্থাপক-সভায় প্রবেশ করিয়া এই জমিদারগণ জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিকূল কাজ করিতেছেন, প্রজাস্বত্ব আইনের অনুকূলে ভোট দিতেছেন।

(১০) প্রজা ও জমিদারের স্বার্থ বিভিন্ন, বহু ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী। পক্ষান্তরে জন-সংখ্যার হিসাবে কৃষকই হইতেছে বাঙ্গলার প্রধানতম অধিবাসী এবং কৃষক-সমাজের স্বার্থই হইতেছে বাঙ্গলার প্রকৃত ও প্রধান স্বার্থ। এই স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে হিন্দু-মুছলমান প্রভৃতি সমস্ত কৃষককে ভোটাধিকার দেওয়াইতে এবং তাহাদিগকে এমন ভাবে সংহত করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে নিজেদের সমাজের সত্যকার প্রতিনিধি ব্যতীত তাহারা আর কাহাকেও ভোট দিবে না। কিন্তু স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের ফলে কৃষক-শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে কৃষক-শক্তি দ্বিধা বিভক্ত—এমন কি, একটী অন্যের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতেছে।

ভবিষ্যৎ-ভাবনা

অতীত ও বর্ত্তমানের অবস্থা অবগত হওয়ার পর, ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত কএকটা সুনিশ্চিত fact সম্বন্ধে আমাদিগকে বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ইহার মধ্যে অতি দরকারী কএকটা কথা আজ উল্লেখ করিতেছি।

স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের অতীত-ইতিহাস আলোচনার সময়ে আমরা দেখিয়াছি—এই ব্যাপারে আমাদের নেতারা মুছলমানের সংখ্যার উপর আদৌ নির্ভর করেন নাই। বরং নিজেদের সংখ্যার কম-বেশীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া তাঁহারা প্রথম হইতে নির্ভর করিয়া আসিয়াছেন সরকারের ও সরকারী হল্‌কার মেম্বরদিগের সাহায্য ও সহযোগের উপর। এই প্রকার নির্ভর করা তখন কত দূর সঙ্গত হইয়াছিল না হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় চলিয়া গিয়াছে। তবে এই নির্ভরের ফলাফলের সঙ্গে ভবিষ্যতের যতটুকু সম্বন্ধ আছে, এখানে তাহার একটু আভাস দেওয়ার দরকার হইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলা-কাউন্সিলে সরকারী, সরকার মনোনীত, ইউরোপীয়ান ও এংলো-ইণ্ডিয়ান মেম্বরদের মোট সমষ্টি হইতেছে ৪৪ জন, আর মুছলমান মেম্বর হইতেছেন ৩৮ জন। কাউন্সিলের মেম্বরদের সব সমেত মোট সমষ্টি

হইতেছে ১৪০ জন। এতদিন মুছলমান মেম্বরগণ সুযোগ পাইলেই গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে যোগ দিয়া হিন্দুর মোকাবেলায় তাঁহাদিগকে জয়যুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অবশ্য গবর্ণমেণ্ট মুছলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়া হিন্দুর মোকাবেলায় তাহাদিগকে জয়যুক্ত করিয়া দিয়াছেন, ইহার বিশেষ কোন নিদর্শন গত ২০ বৎসরের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সে যাহাই হউক, সরকারী হল্‌কা বর্ত্তমান থাকার দরুণ মুছলমানরা এতদিন হিন্দুদের অনিষ্ট করার বা প্রতিশোধ লওয়ার সুযোগ পাইতেন। কোন কোন গুরুতর সংঘর্ষের সময়ে অল্পক্ষণের জন্য তাঁহারাই deciding factor-এর গর্ব্বও অর্জ্জন করিয়াছেন। (১)

কিন্তু মুছলমান সমাজের খুব ভাল করিয়া স্মরণ রাখা দরকার যে, ভাবী শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সরকারী হল্‌কার অস্তিত্ব চিরকালের তরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ইউরোপীয় ও মনোনীতদিগের সংখ্যাও কমিয়া যাইবে। এ অবস্থায় মুছলমানকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে হইবে নিজেদের শক্তির উপর। ব্যবস্থাপক সভার আসল শক্তি হইতেছে সংখ্যা লইয়া। সেখানে যে সমাজের বা শ্রেণীর মেম্বরদের সংখ্যা অধিক হইবে, তাঁহারাই জয়যুক্ত হইবেন; আর সংখ্যায় কম হইবেন যাঁহারা, তাঁহাদিগকে পরাজিত হইতে হইবে।

এই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, হিন্দুদের সহিত একটা 'যুদ্ধের অবস্থা' (state of war) স্বীকার ও ঘোষণা করিয়াই আমরা আজ স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন লইতে যাইতেছি—হিন্দুর অত্যাচার-অবিচার হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য। নির্ব্বাচন-কালীন হিন্দুর মনোভাব যে নির্ব্বাচনের পরই হঠাৎ বদলাইয়া যাইবে, এরূপ বিশ্বাস করা সঙ্গত নহে। কাজেই "মুছলমানের উপর অত্যাচার করার এবং তাহাদের স্বার্থকে অন্যায় ভাবে পদদলিত করার" এই যে হিন্দু মনোভাব, ইহা কাউন্সিলে গিয়াও অন্ততঃ সমান ভাবেই বিদ্যমান থাকার কথা। 'অন্ততঃ' বলিলাম, কারণ, অন্যদিকে অবদানের মোটেই অভাব নাই। তার উপর আমাদের মনোভাবের স্বাভাবিক প্রতি-ক্রিয়াও ত একটা আছে। কাজেই আমরা দেখিতেছি, কাউন্সিলে গিয়াও হিন্দু মেম্বররা আমাদের শত্রুতা করার কোন সুযোগই পরিত্যাগ করিবে না। হিন্দু-মুছলমানে বা মুছলমান-অমুছলমানে এই প্রকার সংঘর্ষ উপস্থিত হইলেই জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হইবে একমাত্র ভোটের উপর। ফলতঃ যদি সেখানে মুছলমানের ভোটের সংখ্যা অধিক হয়, তাহা হইলেই তাহারা আত্মরক্ষা ও উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে পারিবে। আর যদি তাহাদের ভোটের সংখ্যা কম হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহাদিগকেই পরাজিত হইতে হইবে। অতএব স্বতন্ত্র হউক আর মিশ্র হউক, কোন্ পদ্ধতিতে মুছলমান মেম্বরদের সংখ্যা কত অধিক হইবে, তাহাই সত্যকার মুছলমান জননায়কদের প্রথম ও প্রধান আলোচ্য হওয়া উচিত।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা সংক্ষেপে আরজ করিতে চাই। সকলেই জানিতেছেন, অদূর-ভবিষ্যতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলি প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিবে। অর্থাৎ, অতঃপর দুই-চারিটা গুরুতর কেন্দ্রীয় বিষয় ব্যতীত, বাঙ্গলার আইন-কানুন ও শাসন-পালন ইত্যাদি সমস্ত রাষ্ট্রীয় ব্যাপারই এই প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত মেম্বরদিগের মতামত অনুসারেই প্রবর্ত্তিত ও পরিচালিত হইবে। বর্ত্তমান সময়ে কাউন্সিলগুলি বিশেষ গ্রাহ্যের বিষয় না হইলেও, নূতন ক্ষমতা ও নূতন অধিকার লাভের পর দেশবাসীর জীবন-মরণ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিবে কাউন্সিলের নীতি ও শাসন-পদ্ধতির উপর। যে পরম শত্রুদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করার জন্য স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, মুছলমানের সংখ্যা তখন যদি তাহাদের তুলনায় কম হয়, তাহা হইলে সে সময়ে তাহারা ত মুছলমানকে ধনে-প্রাণে বিনাশ করিতে একটুও কসুর করিবে না। তখন "আমরা স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন পাইয়াছি" বলিলেই কি হিন্দুরা আমাদের পরাজিত করার সুযোগ ছাড়িয়া দিবে? অধিকাংশ অমুছলমানের বা হিন্দুর ভোটে তাঁহারা যাহা পাশ করিয়া লইবেন, তাহাই তখন আইন হইবে এবং রাষ্ট্রীয় শক্তিদ্বারা তাহাই বলবৎ হইয়া যাইবে। কাজেই আমরা বুঝিতেছি যে, যে নির্ব্বাচন প্রথাদ্বারা ভাবী ব্যবস্থাপক সভায় মুছলমান মেম্বরদের সংখ্যা অমুছলমানের

(১) অবশ্য এ নীতির পরিবর্ত্তন হইতে সুরু হইয়াছিল। তাহারই ফলে, কংগ্রেসদলের ঘোর অসহযোগী হিন্দু-মেম্বরদের সহায়তায়, গবর্ণমেণ্ট মুছলমান সমাজের শত প্রতিবাদ সত্ত্বেও প্রজাসত্ব আইন পাস করাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তুলনায় কম হইয়া যাওয়ার বিশেষ আশঙ্কা থাকিবে, তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, যে প্রথা-দ্বারা মুছলমান মেম্বরদের সংখ্যা অধিক হওয়ার আশা সঙ্গতভাবে করা যায়, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। মিশ্র ও স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের সঙ্গতি-অসঙ্গতি সম্বন্ধে ইহাই হইবে আমাদের বিচারের প্রথম মাপকাঠি।

স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের বিচার

এখন এই মাপকাঠি অনুসারে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন প্রথার বিচার করিয়া দেখা যা'ক—তাহা দ্বারা আমরা বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক-সভায় চরমপক্ষে কতগুলি আসন অধিকার করিতে পারি। বড়ই দুঃখের বিষয়, প্রশ্নের এই গুরুতর দিকটা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী নেতারা সমাজকে কোন স্পষ্ট আভাস বা আশ্বাস আজ পর্য্যন্ত প্রদান করেন নাই। বরং তাঁহাদের আলোচনার ধারা দেখিয়া মনে হয়, এই প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া রাখার জন্যই যেন তাঁহারা এযাবৎ চেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন।

এসম্বন্ধে সাইমন কমিশন যাহা বলিয়াছেন, ভারত-সরকারের ভাষায়, তাহার সারমর্ম্ম এই যে,...The Commission offer the muslim community a choice between two alternatives; either, ... representation on a basis of their population in Bengal and the Punjab, but with the loss of their weightage in the six provinces; or joint electorates by mutual consent in Bengal and the Punjab and the existing scale of weightage elsewhere.

বস্তুতঃ সাইমন কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টের প্রথম খণ্ডে মুছলমানদের স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের সমর্থন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার দ্বিতীয় খণ্ডে এই সব শর্ত্ত জুড়িয়া দিয়া বাঙ্গলার মুছলমানের জন্য তাহাকে দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—বাঙ্গলা দেশে মুছলমানরা যদি জন-সংখ্যার অনুপাত অনুসারে আসন চায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে দুইটী শর্ত্ত পালন করিতে হইবে। যথা:—

(১) হিন্দুদের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তি করিয়া মিশ্র-নির্ব্বাচন গ্রহণ,

(২) অন্য ছয়টী প্রদেশের অতিরিক্ত আসনগুলি পরিত্যাগ।

আর ইহা যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বর্ত্তমান অনুপাত অনুসারে, অর্থাৎ শতকরা ২৭টী মাত্র আসন লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। গোল-টেবিল বৈঠকের অব্যবহিত পূর্ব্বে, ভারত সরকার বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট যে ডেস্‌পাচ প্রেরণ করেন, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গলার মোছলেম সংবাদপত্র মহলে এবং মুছলমান নেতাদের মধ্যে কতকগুলি নিতান্ত অমূলক ভ্রান্ত ধারণা প্রসার লাভ করিয়াছে। কেহ কেহ প্রচার করিয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট অবশেষে প্রস্তাব করিয়াছেন—বাঙ্গলার মুছলমানদিগকে তাহাদের জন-সংখ্যার অনুপাত অনুসারে আসন দিতে হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ ভারত গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রকার প্রস্তাব আদৌ করেন নাই; বরং ইহার বিপরীত প্রস্তাবই তাঁহারা প্রেরণ করিয়াছে।

ভারত গবর্ণমেণ্টের ডেস্‌পাচ

গোল-টেবিল বৈঠক বসার ঠিক পূর্ব্বে ভারত সরকারের ডেস্‌পাচ বা সাইমন কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে তাঁহাদের মন্তব্য বিলাতে পৌঁছিয়া যায়। এই সময়ে, এদেশের নিউজ এজেন্সীগুলির মারফতে, এই দীর্ঘ মন্তব্যের একটা সংক্ষিপ্ত সার বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই সংক্ষিপ্ত সারের উপর নির্ভর করিয়া এবং স্থানে স্থানে তাহার স্পষ্টতঃ অপ্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রথমতঃ এই অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন আমাদের সাংবাদিকেরা। তারপর আমরা সব "চিন্তা-নায়কের দল" এই সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট ও ভ্রান্ত অভিমতের উপর নির্ভর করিয়া যে গড্ডলিকা প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাই আজ জনসাধারণের চিন্তা ও বিচারের পথে প্রধান বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গত বৎসরের ১৫ই নভেম্বর তারিখের "দি মুছলমান" পত্রে দেখিলাম:—"The despatch says that in Bengal representation on the basis of population is the fairest method in general constituencies ... &c. অর্থাৎ ডেস্‌পাচ বলিতেছে—বাঙ্গলা দেশে জন-সংখ্যার অনুপাত অনুসারে সাধারণ নির্ব্বাচন-চক্রগুলিতে আসন বিভাগ করিয়া দেওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত ব্যবস্থা—ইত্যাদি। এই মন্তব্য পড়িয়া স্পষ্টতঃ বিশ্বাস হয়, ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের মন্তব্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহাদের অনুপাত অনুসারে বিভাগ করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা অপ্রকৃত কথা। ইহা

ভারত গবর্ণমেণ্টের মতই নহে। ডেস্‌পাচে ভারত গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন—

"With regard to Bengal, the local Government states that there is irreconcilable disagreement between thier Hindu and Muslim members. The European members of the Government have come to the conclusion that representation on the basis of population is the fairest method of distributing the seats in general constituencies; and that any weightage that is to be given to the non-Mohammadans in respect to their wealth, education or position should be allowed for in the special constituencies. অর্থাৎ বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের হিন্দু ও মুছলমান মেম্বরদের মধ্যে যে মতানৈক্য, তাহার সমাধান অসম্ভব। তবে তাঁহাদের ইউরোপীয়ান মেম্বরগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সাধারণ নির্ব্বাচন-চক্রগুলিতে জন-সংখ্যার অনুপাত অনুসারে আসন বিভাগ করিয়া দেওয়াই হইতেছে সঙ্গততম ব্যবস্থা। তাঁহারা আরও বলেন যে, শিক্ষা, সম্পদ ও position হিসাবে অমুছলমানদিগকে যে অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া আবশ্যক, তাহা বিশেষ নির্ব্বাচন-কেন্দ্রগুলিতেই দিতে হইবে।

ভারত সরকারের এই মন্তব্যে শুধু এইটুকু জানা যাইতেছে যে, ইহা বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের ইউরোপীয় মেম্বরদের মত। আমরা ইহাকেই ভারত সরকারের অভিমত বা প্রস্তাব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। ভারত সরকার এ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কোন অভিমত প্রকাশ করিতে সম্মত হন নাই। তবে নীতি হিসাবে সাধারণ ভাবে তাঁহারা এই মাত্র বলিয়াছেন যে, "অন্যত্র মুছলমানদিগকে weightage দেওয়া হইতেছে, কেবল এই কারণে বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের মুছলমানদিগকে তাহাদের অনুপাতের দাবী হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে না।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা আরও বলিয়াছেন :—

At the same time we appreciate the objections to Communal majorities in the legislature guaranteed on a population basis at the wish of a majority Commumity through Communal Constituencies. অর্থাৎ, 'ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যা-গুরু সম্প্রদায়ের ইচ্ছানুসারে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের দ্বারা অনুপাত-নীতির দোহাই দিয়া কোন সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য নির্দ্ধারিত হওয়ার বিরুদ্ধে যে সব আপত্তি হইয়াছে, আমরা যুগপৎভাবে তাহার সারবত্তাও স্বীকার করিতেছি'।

এই মন্তব্যে প্রকারান্তরে ও অস্পষ্টভাবে এইটুকু মাত্র জানা যাইতেছে যে, বাঙ্গলার মুছলমানগণ বর্ত্তমান অপেক্ষা কিছু অধিক আসন প্রাপ্ত হউন, ইহাতে ভারত গবর্ণমেণ্টের সম্মতি আছে। কিন্তু পক্ষান্তরে এই মন্তব্যে যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের মধ্যবর্ত্তিতায় মুছলমানগণ জন-সংখ্যার অনুপাত অনুসারে আসন পাইতে পারিবেন না। বরং স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন-চক্রের দ্বারা মুছলমানরা যে আসন গ্রহণ করিবেন, অমুছলমানের তুলনায় তাহা কমই হইবে। সুতরাং ভারত গবর্ণমেণ্টের স্পষ্ট অভিমত এই জানা যাইতেছে যে, স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের সঙ্গে এবং তাহা দ্বারা মুছলমানদিগকে অনুপাত অনুযায়ী আসন দিতে, (এমন কি, শুধু majority দিতেও) তাঁহারা প্রস্তুত নহেন।

অতঃপর, "Various suggestions have been put forward" বলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট যে কয়টী প্রস্তাব প্রদান করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের অভিমতও নহে এবং তাহার মধ্যে কোনটীর দ্বারা সাফল্যলাভ করা মুছলমানের সাধ্যায়ত্তও নহে। যেমন, প্রস্তাব করা হইয়াছে—স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন দ্বারা মুছলমানরা যে কয়টা আসন পাইল, তাহা ত তাহাদের থাকিলই; অধিকন্তু বিশেষ নির্ব্বাচন-কেন্দ্রগুলিতে প্রতিযোগিতা করিয়া তাহারা আর কতকগুলি আসন অধিকার করুক, তাহা হইলেই তাহাদের সংখ্যা মোটের উপর অধিক হইয়া যাইবে। কিন্তু, এইসব special-electorate বা বিশেষ কেন্দ্রগুলিতে মুছলমান ভোটার নাই বলিলেই হয়। সুতরাং তাহা হইতে মুছলমান প্রার্থীর নির্ব্বাচিত হওয়া—বিশেষতঃ এই যুক্তের অবস্থা ঘোষণা করার পর—যে একেবারেই অসম্ভব, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

ফলতঃ স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন লইলে মুছলমানদিগকে যে বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক-সভায় নিশ্চয়ই সংখ্যা-লঘু হইয়া থাকিতে হইবে, তাহা স্থির নিশ্চিত। ভারত সরকারেরও ইহাই সুচিন্তিত শেষ অভিপ্রায়। যে প্রথায় মুছলমান মেম্বরদের সংখ্যা অমুছলমানের তুলনায় কম হইয়া যাইবে, মুছলমানের স্বার্থের দিক দিয়া তাহা অবশ্য বর্জ্জনীয়, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

সুতরাং স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন যে এদিক দিয়া মুছলমানের স্বার্থ-রক্ষা করিতে পারে না, তাহা স্থির নিশ্চিত।

স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের স্থায়িত্বকাল

স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন বহাল রাখা এখন আর সরকার পক্ষের অভিপ্রেত নহে। তাই গত শাসন-সংস্কারের সূচনা হইতে তাঁহারা এই প্রথাকে স্পষ্ট-ভাষায় অভিসম্পাত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তখন হইতে তাঁহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, Communal eletorate গুলি হইতেছে :—

..."Opposed to the teaching of history"
ইতিহাসের শিক্ষার বিপরীত

"They presented class division"
ইহা সাম্প্রদায়িক মতভেদের সৃষ্টি করে

"They stereotyped existing relations"
স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন বর্ত্তমানের সম্বন্ধটাকে স্থায়ী করিয়া দিয়াছে।

"They constituted a very serious hindrance to the development of the self-governing principle"
স্বায়ত্ত-শাসন-নীতির উৎকর্ষ-লাভের পথে ইহা অতিশয় গুরুতর বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে।

"Separate electorate is an undoubted obstacle in the way of the growth of a sense of common citizenhip" (১)
সাধারণ দেশাত্ম-বোধের বিকাশের পথে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন যে একটা বাধা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সাইমন কমিশন মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টের এই মন্তব্যগুলির সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। (২)

বাতাস কোন দিকে বহিতেছে, এই মন্তব্যগুলি পাঠ করিয়া তাহার আভাস বেশ বোঝা যাইতেছে। কিন্তু ভারত-গবর্ণমেণ্ট কেবল আভাস দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন যে আর অধিককাল স্থায়ী হইতে পারিবে না, তাঁহাদের অভিমত ও প্রস্তাবগুলি পাঠ করিলে তাহা খুব স্পষ্টভাবে জানা যায়। বড়ই দুঃখের বিষয়, ভারত-সরকারের ডেস্‌পাচ সম্বন্ধে বিচার-অনুশীলনের সময়ে এই মূলের কথাটীর প্রতি অতি মারাত্মকভাবে অবহেলা দেখান হইতেছে।

বর্ত্তমানে যেখানে যেখানে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন-প্রথা প্রচলিত আছে, সেখানে তাহা বহাল থাকিবে এবং ব্যবস্থাপক সভার ও মুছলমান মেম্বরদের মত না হইলে তাহা তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে না, ভারত-গবর্ণমেণ্ট এই মত প্রকাশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যে উপক্রম-উপসংহার যোজনা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে জানা যাইতেছে যে, শীঘ্র শীঘ্র এই বিপদটাকে দূর করিয়া দেওয়ার জন্য তাঁহারাও যেন খুবই ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। পাঠক-সাধারণের অবগতির জন্য এই উপক্রম ও উপসংহারের মন্তব্য দুইটী নিম্নে যথাক্রমে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

The existing differences between the voting strength and the numerical strength of the various Communities lie at the root of the present difficulties, when with the extension of the franchise these differences disappear and the voting strength more correctly reflects the population the justification for communal electorates for majority communities would cease. The perplexity which now presents itself of deciding between the apparently irreconcilable claims of rival communities would have passed away.

অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভোটারদের অনুপাতে এবং তাহাদের জন-সংখ্যার অনুপাতে যে তারতম্য আছে, তাহাই হইতেছে সব মুশ্‌কিলের মূল। ভোটাধিকারের যোগ্যতাকে ব্যাপক ও সম্প্রসারিত করিয়া দেওয়া হইলে যখন এই তারতম্য দূর হইয়া যাইবে এবং জন-সংখ্যা ও ভোটার-সংখ্যার সামঞ্জস্য আরও সঙ্গতভাবে সমাধিত হইবে, তখন সংখ্যা-গুরু সম্প্রদায়গুলির সাম্প্রদায়িক-নির্ব্বাচন লাভের দাবী করার আর কোন সঙ্গত কারণ থাকিবে না। বর্ত্তমানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দাবীগুলির মীমাংসা সম্বন্ধে যে-একটা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়তার ভাব দেখা যাইতেছে, সে অবস্থায় তাহা অন্তর্হিত হইয়া যাইবে।

গত আদম-শুমারী অনুসারে বাঙ্গলায় মুছলমানদিগের জন-সংখ্যার অনুপাত হইতেছে মোটামুটিভাবে শতকরা ৫৪ জন, আর তাহাদের ভোটার সংখ্যার অনুপাত হইতেছে

(১) মন-ফোর্ড রিপোর্ট, ২২৭ হইতে ২৩২ প্যারা দ্রষ্টব্য।

(২) ২য় খণ্ড, ৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শতকরা ৬৫ জন। (১) অতএব ভারত-গবর্ণমেণ্টের মতে মুছলমান ভোটারদের আনুপাতিক সংখ্যা শতকরা ৯ জন বাড়িয়া গেলে বাঙ্গলায় তাহাদের স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন লাভের দাবী করা আর সঙ্গত হইবে না। Franchise কমাইয়া দিয়া আগামী শাসন-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে ভোটারের সংখ্যা যে বহু পরিমাণে বাড়াইয়া দেওয়া হইবে, তাহা সকলের বিদিত ও স্বীকৃত। এ অবস্থায় বাঙ্গলায় মুছলমানদের স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের আয়ুষ্কাল যে খুবই সঙ্কীর্ণ, তাহা স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে। ভারত-গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে মুছলমানদের স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন বহাল রাখার প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে উপসংহারে আরও স্পষ্টতর ভাষায় বলিয়া দিতেছেন :—

But we attach importance to providing machinery in the Act for the disappearance of such electorates and for their replacement by normal systems of representation more suited to responsible Self-Government on democratic lines.

অর্থাৎ—কিন্তু যাহাতে এই শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক-নির্ব্বাচন-চক্রগুলি তিরোহিত হইয়া যায়, এবং যাহাতে গণতন্ত্রের ধারা-সম্মত দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকতর উপযোগী স্বাভাবিক নির্ব্বাচন-প্রথাগুলি তাহার স্থান অধিকার করিতে পারে, সে প্রকার 'কল' আইনের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া দেওয়া আমরা আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি।

ফলতঃ ভারত-গবর্ণমেণ্টও অদূর ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন তুলিয়া দেওয়ার প্রস্তাবই করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রস্তাব অনুসারে কাজ হইলে, আইনের মধ্যেই এমন 'কল' সন্নিবেশিত করিয়া রাখা হইবে, যাহার ফলে ভবিষ্যতে তাহা আপনা-আপনিই (Automatically) উঠিয়া যাইবে, মুছলমানরা সমবেতভাবে আপত্তি করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না, গ্রাহ্য করার অধিকারও কাহার থাকিবে না।

অতএব এদিক হইতে দেখিলেও আমরা স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনকে কোন গুরুত্ব দিতে পারি না। কারণ, অন্য বহু বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে, উহা একটা অস্থায়ী জিনিষ মাত্র। অন্য প্রদেশের মুছলমানদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু বাঙ্গলার মুছলমানকে যে অদূর ভবিষ্যতে ইহার মায়া কাটাইতে এবং মিশ্র-নির্ব্বাচনের সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতেছে না। মৌলবী ফজলুল হক ছাহেবও বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া কএকটা প্রকাশ্য-সভায় ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট ইহার বিরুদ্ধে, সাইমন কমিশন ইহার বিরুদ্ধে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহার বিরুদ্ধে, ভারতের বিরাট হিন্দু-সমাজ ইহার বিরুদ্ধে, একদল মুছলমানও ইহার বিরুদ্ধে, সমস্ত যুক্তি ইহার বিরুদ্ধে। সুতরাং ইহার আয়ুষ্কাল যে খুবই সংক্ষিপ্ত, তাহা বলাই বাহুল্য।

ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষতিজনক স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের দু'দিনের মায়ার-মোহে অধিকতর অবসাদের সৃষ্টি না করিয়া আমরা বাঙ্গালী মুছলমানকে এখন হইতে সেই অবশ্যম্ভাবী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিতেছি।

কৃষক ও স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন

ঢাকার নওয়াব, মিঃ শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দ্দী, দেল-ডুয়ারের জমিদার মিঃ গজ্‌নভী, প্রভৃতি বড়লোকেরা স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন উপলক্ষে শতকণ্ঠে-সহস্রভাষে "আড়াই কোটি মুছলমানের স্বার্থ-রক্ষার" আর্ত্তনাদ আজ পর্য্যন্ত অবিরামভাবে চালাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু এই "আড়াই কোটি মুছলমান" বলিতে কাহাদিগকে বুঝায়, তাহাদের প্রকৃত দরদ কোথায় আর সে দরদের ও তাহার প্রতিকারের সঙ্গে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের সার্থকতা কতটা আছে না আছে, সমাজকে তাহা দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দেওয়ার চেষ্টা তাঁহারা কোনদিনই করেন নাই। আমরা তাঁহাদের এই কথাগুলির সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিব এবং তাঁহাদের কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য কতটুকু আছে, তাহারও পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করিব।

বাঙ্গলায় মুছলমানের মোট সংখ্যা হইতেছে—২,৫৪,৮৬,১২৪ জন, ইহার মধ্যে কৃষক ও কৃষিজীবীদের সংখ্যা—২,২৪, ১৯, ৮৮৭ জন। অতএব—

মোট মুছলমান···	২৫৪৮৬১২৪
বাদ কৃষক ..	২২৪১৯৮৮৭
	৩০,৬৬,২৩৭

অর্থাৎ বাঙ্গলার আড়াই কোটি মুছলমানের মধ্যে ২।০ কোটি, অর্থাৎ মোটামুটি হিসাবে তাহাদের একশত জনের

(১) সাইমন রিপোর্ট, ১—৬১।

মধ্যে ৯০ জনই কৃষক ও কৃষিজীবী। সুতরাং স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গলার কৃষকের স্বার্থ ও মুছলমানের স্বার্থ কার্য্যতঃ একই কথা। পক্ষান্তরে কৃষক-প্রজার স্বার্থ এবং জমিদারের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে পরস্পর বিরোধী।' বাঙ্গলার কৃষক কেবল আইন-সঙ্গত কর হিসাবে ১৫ হইতে ১৬ কোটি টাকা ভূম্যাধিকারীদিগকে দিতে বাধ্য হয়; ইহা ছাড়া অন্যায় আবওয়াব ও কাছারীর জবরদস্তি আদায় কত রকম আছে, তাহা সকলেই জানেন। • কোটি কোটি কৃষকের বুকের উপর জমিদারগণ জগদ্দল পাহাড় হইয়া চাপিয়া আছেন। • এই জগদ্দল পাহাড়কে অপসারিত না করিতে পারিলে বাঙ্গলার কৃষকের—সুতরাং বাঙ্গালী মুছলমানের উদ্ধারের আর কোনই উপায় নাই। কিন্তু 'এই উদ্ধারের উপায় অবলম্বন করিতে গেলে প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার-শক্তির সহিত তাহাদিগকে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বে-আইনী সংঘর্ষ বিফল, বরং গরিব প্রজার পক্ষে চরম সর্ব্বনাশকর। সুতরাং সংঘর্ষ করিতে হইলে Constitutional বা আইন-সঙ্গত পদ্ধতিতে। এই সংঘর্ষের প্রকৃত ক্ষেত্র হইতেছে ব্যবস্থাপক-সভা। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা অসম্ভব। বাঙ্গলা কাউন্সিলে মোট দেশীয় নির্ব্বাচিত মেম্বরের সংখ্যা ৮৭ জন। ইহার মধ্যে ৪৭ জনই জমিদার। * জমিদারের স্বার্থের সমর্থন করেন, এমন মেম্বরও ইহা ছাড়া আরও আছেন। প্রজাদের জয়যুক্ত হইতে হইলে আগামীতে ব্যবস্থাপক-সভার অধিকাংশ আসন তাহাদের নিজস্ব মেম্বরদের দ্বারা দখল করাইতে হইবে এজন্য তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে; বাঙ্গলার সমস্ত কৃষককে মিলিয়া একযোগে নিজেদের মনোনীত লোকদিগকে ভোট দিতে হইবে। কিন্তু স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন বিদ্যমান থাকিতে এ সব চেষ্টা সম্পূর্ণ অনর্থক। কারণ, তাহার ফলে হিন্দু কৃষক ও মুছলমান কৃষককে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এই জন্যই আজ হিন্দু ও মুছলমান কৃষক হিন্দু ও মুছলমান জমিদারদিগকে ভোট দিয়া বা দিতে বাধ্য হইয়া নিজ হাতে নিজেদের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ততর করিয়া তুলিতেছে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের দ্বারা মুছলমানের স্বার্থ রক্ষিত হইতেছে না, বরং ২॥০ কোটির মধ্যে অন্ততঃ ২।০ কোটি মুছলমানের দারুণ সর্ব্বনাশ ইহা দ্বারাই সাধিত হইতেছে।'

•এই প্রসঙ্গে নিকট-অতীতের একটি নির্ম্মম চিত্রের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আজ স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের জন্য, মুছলমানের স্বার্থের দোহাই দিয়া, সব চাইতে বড় গলায় আর্ত্তনাদ করিতেছেন—ঢাকার নওয়াব ছাহেব, মিঃ শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দ্দীর দল ও মিঃ গজনভীর দল। কিন্তু বাঙ্গলার মুছলমানের ক্ষীণ-স্মৃতি বোধ হয় এখনও বলিয়া দিতে পারিবে যে, মুছলমান সমাজের এই মহানুভব নেতারা এবং তাঁহাদের দলস্থ মেম্বরগণই কিছুদিন পূর্ব্বে প্রজাস্বত্ব আইনের সমর্থন করিয়া এবং মুছলমান জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে ভোট দিয়া (অথবা ঠিক পরীক্ষার সময় পলাইয়া থাকিয়া) মুছলমানের স্বার্থ-রক্ষার চরম আদর্শ প্রদর্শনে এক বিন্দুও কুণ্ঠিত হন নাই! ইহা অপেক্ষাও শোচনীয় সত্য এই যে, বাঙ্গলার সমগ্র মুছলমান সমাজের সমবেত অভিমতের এবং তাহাদের গুরুতর স্বার্থের মস্তকে এই প্রকারে পদাঘাত করার পর, 'অব্যবহিত পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে, স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন দ্বারা এই সব মহাজনরাই মুছলমানের অকৃত্রিম প্রতিনিধিরূপে ব্যবস্থাপক-সভায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন! উদাহরণ স্থলে ঢাকার নওয়াব, মিঃ শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দ্দী, স্যার গজনভী, মাননীয় মুছলমান-মন্ত্রী মিঃ ফারুকী, মিঃ রেজাউর রহমান, নওয়াব মোশাররফ হোছেন, নওয়াবজাদা আলতাফ আলী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।' সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনে আড়াই কোটি মুছলমানের স্বার্থ কতটুকু রক্ষা করিতে পারে এবং অতীতে কতটা করিয়াছে, এই সমস্ত যুক্তি ও উদাহরণের হিসাবে তাঁহারা তাহার বিচার করিয়া দেখুন।

এ সম্বন্ধে আরও অনেক ভাবিবার বিষয় আছে। মিশ্র-নির্ব্বাচনের অনুকূলে বলার কথা যাহা আছে, তাহা এখনও বলা হয় নাই। আগামী মাসে সে-সমস্ত লইয়া আলোচনা করার চেষ্টা পাইব। —ক্রমশঃ

---

* সাইমন রিপোর্ট।

আধুনিক কলিকাতার একটু

—ডাঃ মোহাম্মদ আবুল কাসেম

সোমবার। বিকাল-বেলা আফিসের ছুটির পর দুই বন্ধু বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। কলেজ-স্কোয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, আর মাঝে-মাঝে সিঁড়ি-ঘাটে দাঁড়াইয়া জলের নীচে মাছের খেলা দেখিতেছি—এমন সময়ে আমার বন্ধু মিঃ বেকার বলিলেন,—"বহুদিন ভাই লেকে যাওয়া হয় না—জ্যোছ্না আছে চলো, আজ্‌কের সন্ধ্যা ভ্রমণটা লেকে গিয়ে শেষ ক'রে আসি।" তাঁহার কথায় আমিও রাজী হইলাম,—উভয়ের মত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই কাজ আরম্ভ হইল।

আমরা দুইজনে ওয়ালফোর্ড-এর দ্বিতল বাসে চড়িয়া দুইখানা কালিঘাটের টিকিট কিনিলাম। কলেজ ষ্ট্রীট, ধর্ম্মতলা, এস্‌প্লানেড হইয়া বাস্ ভবানীপুর অভিমুখে ভীম-বেগে ছুটিয়া চলিল। আমরা আপন-আপন চিন্তা-ধারায় মশ্‌গুল—ক্ষণে-ক্ষণে কন্‌ডাক্টরের "চল্লো এই যে পার্ক ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, কালিঘাট, চার পয়সা" রবে চীৎকার করিয়া আমাদের তন্ময়তা ভাঙ্গিয়া দিতেছিল। ক্রমে আমরা রসা-রোড-এ পৌছিলাম—এই জায়গা হইতে লেক বেশী দূরে নয়—কাজেই এইখানে আমরা বাস্ হইতে অবতরণ করিলাম। নানা গল্প-গুজব করিতে করিতে উভয়ে লেক রোড দিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিলাম এবং যখন গন্তব্য-স্থানে উপস্থিত হইলাম—তখন প্রায় সাতটা বাজে।

ট্রেণ বজ্‌বজ্‌ যাইতেছে

কৃত্রিম হ্রদ—লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ করিয়া করপোরেশন-কর্ত্তৃপক্ষ হ্রদটীকে অতি মনোরম করিয়াই রচনা করিয়াছেন। বহুদূর পর্য্যন্ত দীর্ঘ আঁকা-বাঁকা কৃত্রিম হ্রদ—অসীম কালো জলের মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ—আবার দ্বীপের মাঝে সযত্নে রোপিত নিবিড় তরু-লতা-গুল্ম হ্রদের সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে।

আমরা হ্রদে উপস্থিত হইয়া প্রথমে একবার চতুর্দ্দিক ঘুরিলাম—উপরে নীল উদার আকাশে হাস্যময়ী চন্দ্রমা, গাছের সবুজ মায়া, বন-বীথির অশ্রান্ত মর্ম্মর-ধ্বনি, বাতাসের আদর-করা মুক্ত-পরশ আমাদের অন্তর মাঝে মুহুর্মুহু পুলক-শিহরণ জাগাইয়া দিতেছিল—আর অনতিদূরে রেলপথ দিয়া লৌহ-শকট তাহার গহ্বরে হাজার যাত্রী লইয়া বালিগঞ্জ ষ্টেশন ছাড়িয়া হুশ্ হুশ্ শব্দে বজ্‌বজ্‌ অভিমুখে ছুটিতেছিল। জ্যোৎস্না-স্নাত মধুর নিশীথে আমরা সে অভাবনীয় দৃশ্য দেখিতেছিলাম। ভ্রমণরত বহু লোকের পাশ কাটাইয়া আমরা ধীরে অতি ধীরে লেকের দক্ষিণ-পার্শ্বের দোদুল্যমান সেতু-প্রান্তে পৌছিলাম। ব্রীজের উপর উঠিতেই উহা আস্তে আস্তে দুলিতে লাগিল—কতক্ষণ দোল্ খাইয়া আমরা সেতুর অপর ধারে দ্বীপের উপর প্রতিষ্ঠিত ছোট সাদা ধব্‌ধবে মস্‌জিদ-এ উপস্থিত হইলাম। দিনের আলো বহুপূর্ব্বে নিভিয়া গিয়াছে—নিশীথের ঘুমন্ত জ্যোৎস্না তাহার আব্‌ছা কোমল পর্দ্দা সমস্ত হ্রদের উপর টানিয়া দিয়াছে। মাথার উপর দিয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া সমীরণ তাহার স্বভাবের স্নেহের

পরশ বুলাইয়া দিতেছে—সে কী আনন্দ,—সে কী গভীর অনুভূতি!

মস্‌জিদের ধারে গাম্ভীর্য্যে ভরা বৃক্ষরাজি দণ্ডায়মান, আভা, মানস-হারিণী মানস সরোবরের স্নিগ্ধ-মাধুরীময় সুষমা, কলম্বোর যুগ-যুগান্তরের প্রাচীন স্মৃতির পশরা, এবং বিশাল ঘোড়াদীঘির উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা—

হ্রদের দোদুল্যমান সেতু

হ্রদের মধ্যে অবস্থিত মস্‌জিদ

তাহার নীচে বেঞ্চ পাতা। আমরা নির্ব্বাক্‌-নিস্পন্দ হইয়া বেঞ্চের উপর বসিয়া ভাবিতেছিলাম—কাশ্মীরের ডল্‌. হ্রদের কথা, শিলং-এর বিডন ও বিশপ প্রপাতের সৌন্দর্য্য, সবারই স্মৃতি থাকিয়া-থাকিয়া অন্তর মাঝে আলেখ্যর মত মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

হ্রদের কালো-জলে তরঙ্গ তুলিয়া কত লোক তরণী
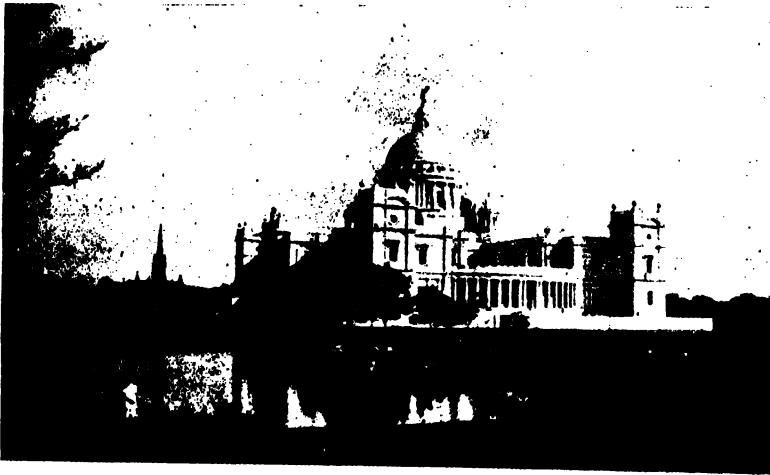
ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধ

কলনাদিনী-স্রোতস্বিনী যমুনার শোভা, চিল্কার দূর-বিস্তৃত বিচিত্র ছবি, পূর্ব্ব-ঘাটের অভ্রভেদী গিরি-শ্রেণী, পাগলা-ঝোরার পাগল ঝরা, ভারত মহাসাগরের দিগন্তের রক্তিম বাহিয়া বেড়াইতেছিল,—ক্ষেপনীর মৃদু শব্দ করিয়া নৈশ শীতল-বায়ু উপভোগ বাসনায় যাইতেছিল এক দ্বীপ হইতে আর এক দ্বীপে। অদূরের লাইট-পোষ্টের তীব্র বিজলী ও

গ্যাসের আলোকের মোহন-মাধুরী প্রতিফলিত হইয়া তাহাদের মুখে অস্পষ্ট লাবণ্য ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে কী নয়নাভিরাম দৃশ্য! অফুরন্ত আনন্দে নিমেষের জন্য আমাদের মন-প্রাণ মাতিয়া উঠিল—সমস্ত জগৎ যেন কী এক অভূতপূর্ব্ব শ্রীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

কত নর-নারী ইতস্ততঃ ঘুরিতেছিল। কত বিরহী আপন আপন প্রতিচ্ছবির মাঝে মানসীর মুখ কল্পনা করিয়া মুগ্ধ-আনন্দে বিভোর হইয়া উর্দ্ধ গগনে অসীমের পানে চাহিয়া লক্ষ্যহীন উদাস-প্রাণে ভ্রমণ করিতেছিল। কত সার্থক প্রেমিক সেই নিঃসঙ্গ ব্যর্থ প্রেমিকের অন্তর-বেদনা বুঝিয়া সহচরী দয়িতাকে হাসিয়া হাসিয়া তাহা জানাইয়া দিতেছিল—আর বলিতেছিল,—"আমি তোমায় বড্ড ভালবাসি হৃদয়-সর্ব্বস্ব!" মানস প্রতিমা তাহাতে কটাক্ষ করিয়া গর্ব্ব-অভিমানে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছিল—আর শিথিল কবরী ঠিক করিতে করিতে প্রেমার্থীর কথায় সায় দিতেছিল,—"হ্যাঁ তা বটে।" আবার প্রেমিক-প্রেমিকার অসামঞ্জস্য আলাপন চলিল।

মমতাজ স্মৃতি-সৌধ

দেখিতে দেখিতে বসন্তের মৃদু-হিল্লোল স্তব্ধ হইয়া আসিল—একে একে সব লোক আপন আপন আলয়ে ফিরিয়া যাইতে লাগিল—দূরে কর্ম্ম-কোলাহল পূর্ণ শহর নীরবতায় ভরিয়া উঠিল। তখনো অভিসারে আসার। আশায় বসিয়া থাকা বিরহ-বিধুর পথ ভোলা এক উদাসীর বাঁশীর সুরের বিয়োগান্তক রাগিনীর শেষ রেশটুকু আমার হৃদয়ের নিভৃত-কন্দরে সাড়া দিতেছিল।

চারিদিকের ঝাপ্‌সা গাছগুলি মৌনতায় ভরিয়া উঠিল—লক্ষ তারা দূর নভঃমণ্ডলে মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল—সবুজ ঘাসগুলির উপর শিশির-বিন্দু মুক্তা-ফলকের ন্যায় বোধ হইতেছিল। আমরা সে নীরব-নিথর স্বপন-সায়র-এ আর মোহ-মুগ্ধ হইয়া থাকিতে পারিলাম না—ধীর পাদবিক্ষেপে ট্রাম-রাস্তার দিক অগ্রসর হইতে লাগিলাম,—শেষ ট্রাম ঢং ঢং করিয়া ত্রস্তভাবে ছুটিয়া আসিল—আমরা উঠিয়া পড়িলাম। যখন নিরবচ্ছিন্ন মাঠ চিরিয়া পূর্ণ-বিক্রমে ট্রাম দৌড়াইতেছিল, তখন সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া দেখিলাম—শ্বেত-দ্বীপের শ্বেত-রাণীর

ইডেন গার্ডেন

শ্বেত-মর্ম্মরে নির্ম্মিত স্মৃতি-সৌধ। কী বিরাট—কী মহীয়ান সে দৃশ্য! মেঘচুম্বী তাহার চূড়া—উজ্জ্বল শশীর মোহন চাঁদিনী প্লাবিত তাহার অমল-ধবল দেহখানি। সমগ্র স্থানটা যেন
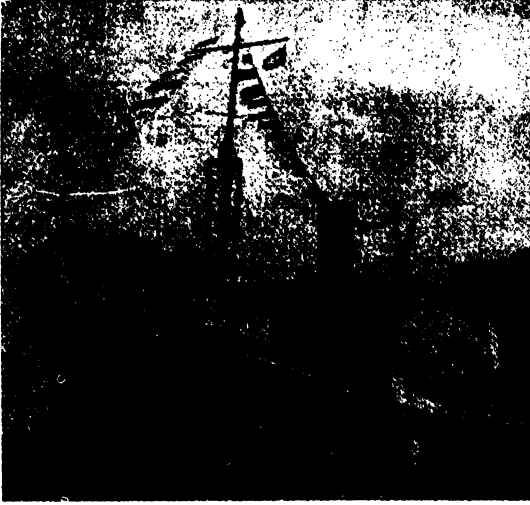
আউটরাম ঘাটে যুদ্ধ জাহাজ

শহরের নীরব-বিভীষিকা ভাঙ্গিয়া এক অপূর্ব্ব মাধুরীমায় উচ্ছ্বসিত। এই বিশাল মার্ব্বল সৌধটী দেখিয়া বহুদিনের একটা হারাণো মুখ মনে পড়িল—যে মুখের তুলনা জগতে নাই—যে মুখের স্মরণ-চিহ্ন রক্ষাকল্পে শাহান্‌শাহ্‌ শাহ্‌জাহান সারা দুনিয়ার মূল্যবান পাথর, হীরা-জহরৎ চুনিয়া চুনিয়া জমাট অশ্রু দিয়া তাঁহার শেষ-সাধ 'তাজমহল' গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। আজ কোথায় বেদন-ব্যথিত সম্রাট দয়িতা বেগম মমতাজ—আর কোথায় আলবার্ট প্রেয়সী সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া! যুগান্তরের প্রবাহ সব ভাসাইয়া লইয়াছে, পৃথিবীর বুকে আছে শুধু স্মৃতির মূর্ত্ত-আদর্শ—আর বুক জোড়া হা-হুতাশ! কত কথাই ভাবিতেছি—যখন চমক ভাঙ্গিল তখন দেখি—আমাদের ট্রাম এস্‌প্লানেড-এ পৌঁছিয়া গিয়াছে,—আমরা নামিয়া পড়িলাম।

জানিনা কেন, রাতটা আমাদের অত বেশী ভাল লাগিতেছিল—তাই বাসায় না ফিরিয়া ইডেন গার্ডেন দেখিবার জন্য কার্জ্জন পার্ক-এর ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। তখন প্রকৃতি-রাণী শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। কচিৎ গঙ্গাগর্ভে আউটরাম ঘাটের যুদ্ধ জাহাজের গুরু-গম্ভীর নিনাদ আমাদের গভীর চিন্তার স্রোতে প্রতিবন্ধকতা উৎপাদন করিতেছিল। আমরা স্বরগ-উদ্যানের মাঝে প্রবেশ করতঃ হ্রদের তীরে অবস্থিত 'প্যাগোডা'র পাদদেশে উপবেশন করিলাম। আশে-পাশের ঝোপ-নিকুঞ্জের মধ্যে খদ্যোৎকুল আকুল প্রাণে তাহাদের জ্যোতিঃ নির্ব্বাণ-বিকাশ করিতেছিল। অদূরে ঝরণা-ধারা আপন মনে উৎসারিত হইতেছিল—হ্রদের ছোট্ট লহর তালে-তালে নাচিয়া-দুলিয়া বহিতেছিল—সে দৃশ্য অতীব মনোলোভা! বহুক্ষণ বাগানের মধ্যে বিচরণ করিলাম—কখনো কৃত্রিম পাহাড়ের সানুদেশে বসিলাম—আবার কখনো ধীর-মন্থর-গতিতে মৃদুবায়ে গা ঢালিয়া দিলাম। তারপর আমরা গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া পুষ্পবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া—একটা ট্যাক্সিতে উঠিয়া

ইডেনগার্ডেনের প্যাগোডা

বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। যতকাল জীবিত থাকিব—এই সুখ-স্মৃতি মানস-চিত্রপটে দীপ্ত হইয়া ফুটিয়া থাকিবে।

* * *

দিন যাইতেছে—বছর যাইতেছে—কিন্তু সেই একটা দিনের নৈশ-ভ্রমণ আজিও ভুলিতে পারি নাই—বোধ হয় কোনদিন পারিবও না।
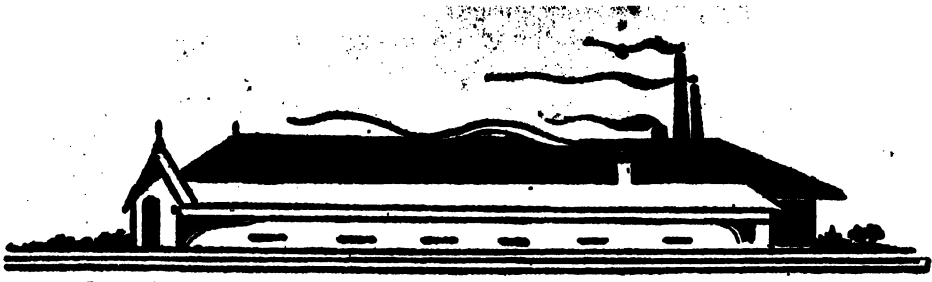
মঙ্গল-ভবিষ্যৎ

— গল্প — —ডাক্তার লুৎফর রহমান

প্যারী শহরের এক ম্যাজিষ্ট্রেটের বাপ ছিলেন একজন রাজতন্ত্রী। তিনি ইটালী থেকে একখানা পত্র খুব গোপনে পুত্রের হাতে দেবার জন্যে এক বিশ্বস্ত যুবককে পাঠাইয়া দেন।

যুবকের নাম ছিল জর্জ্জ ব্রাডলে। পত্রে বিশেষ কোন নাম ছিল না,—শুধু সময়মত খুব সতর্কতার সঙ্গে প্যারি শহরের অমুক ম্যাজিষ্ট্রেটকে দিতে হবে, এই ছিল তার মৌখিক উপদেশ।

জর্জ্জ ব্রাডলে ছিলেন একটি জাহাজের কর্ম্মচারী—তার কার্য্য-দক্ষতায় তার মনীব তার উপর খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। জাহাজের কাপ্তানও তাকে খুব স্নেহ করতেন। সবাই তাকে ভালবাসত, শুধু একটা লোক তাকে ভাল জানত না—তার নাম যোশেফ। যোশেফও জাহাজের একজন কর্ম্মচারী। যোশেফ কি জন্যে জর্জ্জ ব্রাডলেকে দেখতে পারত না, তা অনেকটা অনুমান করেও বলা যায়।

অপ্সরীর মত রূপসী কুমারী এলিজা আজ তিন বৎসর থেকে জর্জ্জকে প্রেমপত্র লেখে। এলিজা যশোফেরই আত্মীয়া, সম্পর্কে বোন। যোশেফ কুমারী এলিজার প্রণয়-প্রার্থী হয়ে পুনঃপুনঃ হতাশ হয়েছে। এক কথায় তার কোন আশা নেই।

জর্জ্জকে হিংসা করবার যোশেফের আরও একটা কারণ ছিল। তার দ্রুত পদোন্নতি হচ্ছিল। হয়ত এই বৎসরেই সে জাহাজের কাপ্তান হবে—যোশেফকে তার জীবনের এক পরম শত্রুর অধীনে কাজ করতে হবে,—তার কাছে সর্ব্বদা তাকে নত হয়ে থাকতে হবে;—যোশেফের কাছে যা একেবারে অসহ।

* * * *

ইটালী থেকে জাহাজ যথাসময়ে ফ্রান্সের উপকূলে ভিড়ল। জাহাজের মালিক এসে জর্জ্জ ব্রাডলের সঙ্গে করমর্দ্দন করে বল্লেন,—"বন্ধু, আপনার কার্য্য-দক্ষতায় আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছি। শুনেছি সত্বরই কুমারী এলিজের সঙ্গে আপনার বিবাহ হবে। বিবাহের পর পুনরায় যখন আপনি কাজে যোগ দেবেন, তখন আমি আপনাকে জাহাজের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব দেব;—আপনিই কাপ্তান হবেন। আপনার বেতনও দ্বিগুণ করে দেওয়া হবে।"

যোশেফ সব কথাই কাণ দিয়ে শুনলো।—সে অন্তরালে একটা ক্রোধ-হাসি হেসে মনে মনে বল্লে—"আচ্ছা দেখা যাবে।"

মার্সেলিজ বন্দরের এক পরিচিত হোটেলে জর্জ্জ এবং যোশেফ উভয় যেয়ে উপস্থিত হলেন। হোটেলের কর্ত্তা বুড়া গিলবার্ট তার যুবক বন্ধুদ্বয়কে দেখে বল্লে,—"আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হউক। আজ সকালেই বুঝি দেশে ফিরলেন।"

জর্জ্জ বুড়া গিলবার্টের সঙ্গে করমর্দ্দন করে বল্লেন,—"গত রাত্রিতে জাহাজ কূলে ভিড়েছে। আজ সকালে ছুটী পেলাম। বিয়েটা এই সুযোগেই সেরে নেবো। তোমার নিমন্ত্রণ দিলাম বুড়া গিলবার্ট,—ঠিক সেই বিয়ের দিন তুমি উপস্থিত থাকবেই—নিশ্চয় থাকবে। বন্ধু যোশেফ এবং তুমি উপস্থিত না থাক্‌লে আমার কিছুতেই ভাল লাগবে না। আমার বিবাহের উৎসবটাই মাটী হবে।"

বুড়া গিলবার্ট জর্জ্জের পিঠ চাপড়ে বল্লে,—"বটে,—তাই নাকি, কুমারী এলিজার সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে?—তারি সৌভাগ্য তোমার! তা হলে যোশেফ, বেচারী—ফাঁকেই পড়ল।"

যোশেফ খুব কষ্ট করে নিজেকে উৎফুল্ল করতে চেষ্টা করে বল্লে,—"এলিজা আমার পর নয়—আমার বোন। সে যাতে সুখী হয়, তাতেই আমার সুখ।

বাহিরে সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখালেও যোশেফের ভিতরটা আগুনময় হয়ে উঠেছিল। লজ্জা ও অপমানের বিষ তার সমস্ত দেহটাকে অবশ করে আন্‌ছিল।

ইত্যবসরে চা এবং বিস্কুটের সদ্ব্যবহার সবাই করতে আরম্ভ করছেন। বুড়া হোটেলের কর্ত্তা গিলবার্টও। যোশেফের অবশ হাত থেকে গরম চায়ের পেয়ালাটা পড়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি পেয়ালাটা টেবিলের উপর নাবিয়ে রেখে গিলবার্টকে লক্ষ্য করে যোশেফ জোর করে বল্লে,—"রাস্‌কেল, চা তৈরী করা ভুলে গিয়েছ?—এমন বিস্বাদ চা ভারতবাসীও খায় না!"

গিলবার্ট মৃদু হেসে বল্লে,—"চা তো বিস্বাদ হবেই হে!—অমন একটা সুন্দরী যুবতী নারী হাত ছাড়া হলে সবারই কাছে চা বিস্বাদ হয়।"

জর্জ্জ এতক্ষণ চুপ করেই ছিল।

যোশেফ গিলবার্টের হাত চেপে ধরে বল্লে,—"শোন হে, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। একটু ঐ দিকে চল।"

গিলবার্ট উঠতেই জর্জ্জ বল্লে,—"গিলবার্ট, তা হলে আসি।"

জর্জ্জ একা-একাই রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ল। এলিজার জন্যে কতকগুলি মূল্যবান উপহার ক্রয় করে সে তার মায়ের সঙ্গে প্রথমে দেখা করবে।—তারপর মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে বিবাহের উৎসবটা কি ভাবে সম্পন্ন করতে হবে, তার আয়োজন করতে হবে।—আর তো বেশী দেরী নাই, মাত্র দু'দিন।

যোশেফ চুপে চুপে গিলবার্টকে বল্লে,—"হাজার খানেক টাকা উপায় করতে চাও কি?—সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করে যারা দেশে গণতন্ত্র শাসন আনতে চান, সেই সব জাতীয়তা-বাদীদিগকে দমন করবার জন্যে গভর্ণমেণ্ট উঠে পড়ে লেগেছেন। পুলিসের নজর সর্ব্বত্র। এজন্য গোপনে মোটা-মোটা পুরস্কার দেওয়া হবে। জর্জ্জের কাছে ন্যাশন্যালিষ্টের একখানা চিঠি আছে, কার চিঠি বা কাকে দিতে হবে, কিছুই তাতে লেখা নাই। এই সময়ে বিষয়টা পুলিসকে জানালেই তোমারও কিছু লাভ হবে, আমারও বিয়ে করার সাধ মিটে যাবে। একটা মোটা রকমের পুরস্কার কিন্তু তোমার হাত ছাড়া হচ্ছে!—পুলিসের বরাবর সামান্য একখানা গোপন চিঠিতেই কাজ হবে।—আন আন, একখানা কাগজ আন। যা লিখতে হয়, আমিই লিখে দিচ্ছি। তুমি শুধু নাম দস্তখৎ করবে। আমিই পোষ্ট করে দেব।"

গিলবার্ট একখানা কাগজ নিয়ে এল। যোশেফ তাতে লিখল। গিলবার্ট নাম স্বাক্ষর করলো। চিঠিখানি যোশেফ নিজেই ডাক ঘরে পোষ্ট করে শিশ্‌ দিতে দিতে একদিকে চলে গেল।

বিবাহের দিন চলে এসেছে। ঠিক বিবাহের আগের দিন যোশেফ একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে, যদি এলিজাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কোন রকমে তার সঙ্কল্প থেকে ফেরানো যায়।

কুমারী এলিজা জর্জ্জকে ভালবাসে। সে কিছুতেই তার সঙ্কল্প ত্যাগ করবে না—এ একেবারে ধ্রুব সত্য। তথাপি যোশেফের অবুঝ মন একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে।

আগামী কল্যকার সুখ-স্বপ্ন নিয়ে এলিজা একাকিনী সন্ধ্যার ঘন ছায়ার অন্তরালে নির্জ্জনে বসেছিল—এমন সময়ে ধীরে ধীরে যোশেফ পেছন থেকে সেখানে উপস্থিত হলো।

সুন্দরী এলিজা মুখ ফিরিয়ে দেখল, যোশেফ এমন অসময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে তার কাছে উপস্থিত।

যোশেফ্ বল্লে—"এলিজা, আর একবার ভাল করে ভেবে দেখ। এ বিবাহের শেষ ফল ভাল হবে না।—তুমি বুঝতে পাচ্ছ না। তুমি কোন ছুতা-নাতা ধরে বলে দাও, কোন বিশেষ কারণে কিছু দিনের জন্যে বিবাহ স্থগিত থাক।"

এলিজা নিতান্ত বিরক্তির সঙ্গে বল্লে,—"আমি পারব না যোশেফ। তুমি কি আমাকে একেবারেই পাগল সাব্যস্ত করেছ? এদিকে সব ঠিক্-ঠাক্ হয়েছে, সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান হয়েছে। জর্জ্জ দিবারাত্র পরিশ্রম করছে—এ অবস্থায় কি করে আমি বিবাহের দিন ফেরাই?—সে কি মনে করবে? লোকেই বা কি বলবে?—যোশেফ্ তুমি পাগল হয়েছ? নতুবা এমন কথা, এমন প্রস্তাব তুমি কিছুতেই করতে না।"

যোশেফ—"পাগলই হয়েছি এলিজা!—পাগল আজ হয়নি। আজ দশবৎসর থেকে তোমার পেছনে পেছনে আমি ঘুরেছি।—একটি বারও তুমি আমাকে একটি আশার কথা বল্লে না।—এ আমার কম দুঃখ না। জর্জ্জের সঙ্গে সবে এই দু'বছরের পরিচয় তোমার। এরই মধ্যে সে তোমার হৃদয় অধিকার করেছে।—সে ভাগ্যবান সন্দেহ নাই!—নইলে এত অল্প সময়ে সুন্দরী এলিজার অনুগ্রহ লাভ সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।"

এলিজা—"ভুল বুঝেছ যোশেফ। জর্জ্জ ভাগ্যবান নয়, সৌভাগ্য আমার। আমার মত একজন রূপ-গুণহীনা বালিকা এত শীঘ্র তার ভালবাসা পেয়েছে, এতেই আশ্চর্য্য হচ্ছি। প্রার্থনা করি, ভবিষ্যতে আমার কোন ব্যবহারে তিনি বিরূপ না হন। জর্জ্জ একবারে আদর্শ ভদ্রলোক—তিনি বীর এবং চরিত্রবান। তুলনায় তার কাছে আমি কিছুই নই। তুমি যদি আমার সত্যিকারের আত্মীয় হও, তা হলে আমার এ বড় সাধের বাস্তব-স্বপ্নকে ভাঙ্গতে যেয়ো না। তা'হলে আমার বুক ভেঙ্গে যাবে। যোশেফ, ভাই আমার!—তুমি কি আমায় সুখী দেখতে চাও না? আমার প্রতি কি তোমার একটুও মায়া নাই?"

যোশেফ—"এলিজা, প্রিয়তমে! আমার জীবন মন্দিরের স্বর্ণ-লক্ষী! আমার কল্পনা খেয়ালে তোমার মতিভ্রম উপস্থিত হয়েছে। আবার বলছি, এ বিবাহে তুমি কিছুতেই সুখী হবে না। জর্জ্জ বিদেশী, তার প্রতিপত্তি, যশঃ এবং সুনামের কোন মূল্য নেই। আমিই তোমাকে সুখী করতে পারি, সে কিছুতেই তোমাকে সুখী করতে পারে না।"

এলিজা—"ভুল, তুমি কিছুতেই আমাকে সুখী করতে পার না, যোশেফ! তোমাকে অনেকবার আমি ভালবাসতে চেষ্টা করেছি, পারি নি। আমার আশা তুমি ত্যাগকর। আমার মঙ্গল উৎসবের পূর্ব্ব দিনে বৃথা অমঙ্গলের কথা বলে আমার মন খারাপ করো না।—তাতে তোমার কিছুই লাভ নেই।"

যোশেফ—"সুখী আমিই তোমাকে করতে পারতাম। তোমার সুখের জন্তে আমি যে কোন অন্যায় করতে পারি, মানুষ খুনও করতে পারি। ভাব দেখি, আমার ভালবাসা কত গভীর! সুন্দরী নারীকে কি করে ভালবাসতে হয় তা আমি জানি, জর্জ্জ জানে না।"

হঠাৎ যোশেফ এলিজার সম্মুখে জানু পেতে বসে বল্লে—"হে আমার আরাধ্যা দেবী, সত্যি কি তুমি আমাকে ফেলে যাবে? এ আঘাত আমি কি করে সইব?"

এলিজা ভ্রূক্ষেপ না করে বল্লে,—"যোশেফ, তুমি পাগল হয়েছ? যা হওয়া অসম্ভব, যা কিছুতেই ফেরানো যাবে না, তারই জন্তে তুমি জেদ্ ধরেছ। কে কবে আপন হাতে নিজের মাথা কাটতে চায়? আমার এই সৌভাগ্যের দিনে, তুমি অভিশপ্ত শয়তানের মত আমার জীবনকে মরুভূমিতে পরিণত করতে এসেছ? তুমি ভূতের মত আজ দশ বৎসর হতে আমাকে জ্বালাতন করেছ; আজ আমায় ছুটী দিয়ে যাও, আমার সুখের পথ থেকে সরে যাও;—আর আমায় দুঃখ দিও না।"

যোশেফ নিতান্ত নিরুপায় হয়ে এলিজার সম্মুখ থেকে উঠে চলে গেল।

কতখানি ব্যথা, কতখানি নিরাশা, কতখানি অন্ধকার যোশেফের তরুণ চিত্তখানিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, তা এলিজা মোটেই বুঝতে পারে নাই।—সে যোশেফের হাত থেকে শেষবারের মত মুক্তি পেয়ে একটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠল,—"খোদা! আমায় বাঁচালে!"

* * *

থিয়েটারে যেমন বিবিধ বাদ্য-যন্ত্রের সমন্বয়ে একটা সুমধুর স্বপ্নলোক সৃষ্টি হয়—তা যেমন সত্যি এবং মিথ্যে; এলিজার বিবাহ রজনী সঙ্গীত, সুর, হাস্য, উপস্থিত অতিথি-গণের সুমধুর আলাপে তেমনি একটি স্বপ্নলোক সৃষ্টি করেছিল।

যে দু'টী প্রাণীকে নিয়ে আজ মানুষের এত আনন্দ তারা নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় লজ্জা-রক্তিমমুখে পাদরীর পার্শ্বে বিবিধ ফুল-মালায় শোভিত হয়ে মৌন অবস্থায় বসেছিল।

দূরে যোশেফ ও হোটেল-ওয়ালা গিলবার্টও বসেছিল। যোশেফের মুখ আজ আশ্চর্য্যভাবে আনন্দ সমুজ্জল হয়েছে। তারই বোনের বিয়ে! সকলের চাইতে তারই তো আজ আনন্দের অবকাশ বেশী! গত দিনের সমস্ত কথাই সে ভুলে গিয়েছে। সবার চাইতে সেই আজ বেশী আনন্দিত। এলিজা যোশেফের এই আশ্চর্য্য আকস্মিক পরিবর্ত্তনে খোদাকে শত ধন্যবাদ দিয়েছে। শুধু তাই

য়, উৎসবের সমস্ত খুটি-নাটি সেই পর্য্যবেক্ষণ করেছে, ক্রিয়ার সমস্ত সুবিধা-অসুবিধা, শত অভাব সেই পূরণ করেছে।

এতক্ষণ পরিশ্রম করে একটু বিশ্রামের জন্যে সে তার বন্ধু গিলবার্টের সঙ্গে দূরে বসে একটু আলাপ করছে।

বিবাহের ব্যাপারটা হয়ে গেলেই নিমন্ত্রিতেরা গিলবার্টের হোটেলে আহার করতে যাবেন। ধর্ম্ম-যাজক নর-নারীর সুপবিত্র বিবাহিত জীবনের উচ্চভাব সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত ধর্ম্ম-বক্তৃতা দিলেন। তারপর বিবাহের মন্ত্র পড়াবেন, এমন সময়ে সদর দরজার বাহিরে দুম্ দুম্ করে প্রচণ্ড মুষ্টির আঘাত শোনা যেতে লাগল। দরজা খুলে দিতেই এক পাল লাল-পাগড়ী-ধারী, চোখা হ্যাট পরা পুলিসের লোক বিবাহ-সভার সমস্ত অতিথিগণকে আতঙ্কিত করে ফেল্লে। ইনেস্‌পেক্টর বজ্রকণ্ঠে বল্লে,—"এখানে জর্জ্জ বলে কোন জাহাজের নাবিক আছে ?"

যাজক বল্লেন,—"হাঁ মহাশয়, তার আজ বিবাহ। আজ ফিরে যান, কাল আসবেন। এ সময়ে বিরক্ত করবেন না।"

ইনেস্‌পেক্টর দৃঢ়কণ্ঠে বল্লে,—"মহাশয়, কর্ত্তব্য কার্য্যে বাধা দেবেন না। বলতে বলতেই সিপাহীরা জর্জ্জকে হাত কড়া দিলে। তারপরে তারা তাকে নিষ্ঠুরের মত টানতে টানতে বের করে নিয়ে গেল।

—ক্রমশঃ

পূর্ণিমা

— সনেট —

—রিয়াজ উদ্দিন চৌধুরী

ষোড়শী রূপসী বালা, সখি সুহাসিনী
হাসে বুঝি নীলিমায়। মিটি মিটি তারা,
বিচ্ছুরিত তার হাসি বুদ্‌বুদের পারা—
ক্ষণে ভাসে ক্ষণে ডুবে, নভঃ নির্ঝরিণী।
তারি পানে চেয়ে চেয়ে হাসে কুমুদিনী
ওষ্ঠে তার নাচে যেন উর্ব্বসী-মেনকা।
চকোরের চোখে হাসি, ধরণী অলকা
সে হাসি হৃদয়ে ধরি'। ঝুরে বিরহিনী।

কোটি-কল্প শতাব্দীর মৌন অন্ধকারে
অমাবস্যা যে-রহস্য রাখিলো গোপন ;—
তাহারে প্রকাশ করি' কৌমুদী-সম্ভারে
বিস্ময়ে দেখিছ, সখি, অপূর্ব্ব স্বপন।
তবু তব বুকে জাগে কলঙ্কের ছাপ,
বেদনা ঢাকিয়া হাসা, সেও বুঝি পাপ।
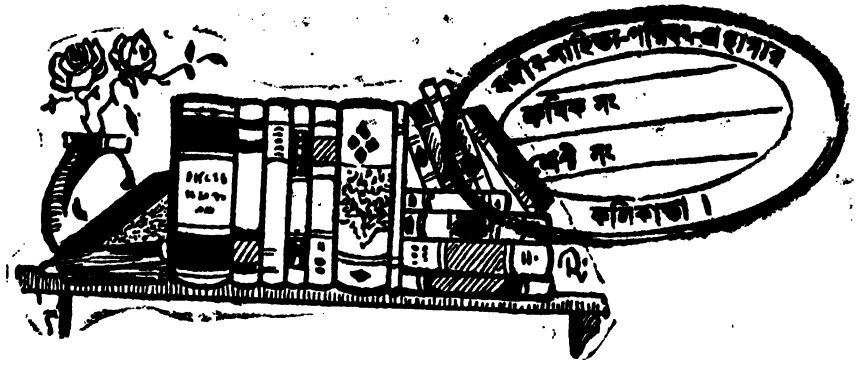
মহরম

— প্রবন্ধ —

—এস, ওয়াজেদ আলী, বি-এ (কেণ্টাব) বার-এট-ল

মহরম হচ্ছে এক আরবী মাসের নাম। হিজরির ৬১ অব্দে, মহরম মাসের প্রথম ভাগে, ইস্‌লামের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মোহাম্মদের দৌহিত্র, চতুর্থ খলিফা আলির পুত্র হোসেন, আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে, ইউফ্রেটীস নদীর তীরে, আমির মাবিয়ার পুত্র এজিদের সৈনিকদের দ্বারা নৃশংসভাবে নিহত হন। এই ঘটনা এমনই অপ্রত্যাশিত এবং হৃদয়-বিদারকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে, এখন পর্য্যন্ত, এই দীর্ঘ সাড়ে তেরশত বৎসর ধরে, সমস্ত মোস্‌লেম জগৎ এর জন্য মাতম (বিলাপ) করে আসছে, কারবালা প্রান্তরের এই করুণ Tragedyর কথা স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জ্জন করে আসছে, আর এর অনুষ্ঠাতা এজিদ এবং তাঁর অনুচরদের উপর লা'নৎ এবং অভিসম্পাত বর্ষণ করে আসছে।

এখন ঘটনার ঐতিহাসিক কার্য্য-কারণ এবং করুণ-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যাক।

ইস্‌লামের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মোহাম্মদ মোস্‌লেম রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। তিনি অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। মোস্‌লেম দায়ভাগ বা Law of Succession এর নিয়ম অনুসারে তাঁর কন্যা, এমাম হোসেনের মাতা, বিবি ফাতেমা জহরা, আর তাঁর স্বামী হজরতের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং প্রিয় সহচর, হজরত আলি, ছিলেন তাঁর উত্তরাধিকারী। কে হজরত মোহাম্মদের স্থানে মোস্‌লেম রাষ্ট্রের নেতার পদে প্রতিষ্ঠিত হবেন, তা নিয়ে হজরতের শিষ্যবর্গের মধ্যে বিষম মতভেদ উপস্থিত হয়।

একদল বলেন, হজরতের আইন-গ্রাহ্য উত্তরাধিকারী আলিকেই এই পদ দেওয়া উচিত। আর একদল বলেন, মহাপুরুষ মোহাম্মদ স্বয়ং বলে গিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন আল্লার একজন প্রতিনিধি, তাঁর কোন বংশগত উত্তরাধিকারী নাই। আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্ব্বিশেষে সমস্ত মোস্‌লেম জাতি হচ্ছে তাঁর উত্তরাধিকারী; সুতরাং আলির আত্মীয়তামূলক দাবী গ্রাহ্য হতে পারে না।

আজকালকার পরিভাষায় প্রথমোক্ত দলকে Royalists বা রাজতন্ত্রবাদী, এবং দ্বিতীয় দলকে Republicans বা সাধারণতন্ত্রবাদী বলা যেতে পারে। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর দ্বিতীয় দলের মতই সর্ব্ব-সাধারণে গ্রহণ করেন, এবং আবুবকরকে মোস্‌লেম রাষ্ট্রের খলিফা নির্ব্বাচিত করেন।

আবুবকর মাত্র দুই বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ওমার খলিফা নির্ব্বাচিত হন। ওমারের শাসনকালে মোস্‌লেম সাম্রাজ্য পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। তিনি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ Empire Builders দের মধ্যে গণ্য। দশ বৎসর রাজত্বের পর একজন পারসিক গুপ্ত ঘাতকের হস্তে তিনি নিহত হন। তাঁর স্থানে, ওসমান খলিফা নির্ব্বাচিত হন। তিনি বার বৎসর রাজত্ব করেন। স্বগোত্রের লোকদের প্রতি তিনি অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব দেখান, এবং যোগ্যতা এবং চরিত্রের বিচার না করে তাঁদেরই রাজ্যের প্রধান প্রধান পদগুলিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁরা নানারকম অনাচার-অত্যাচারের অনুষ্ঠান করেন। রাজ্যময় অশান্তি উপস্থিত হয়। প্রজাদের মধ্যে শেষে বিদ্রোহ দেখা দেয়। একদল বিদ্রোহী রাজধানী মদিনায় অভিযান করে, এবং খলিফা আর তাঁর স্ত্রীকে

নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করে। তারপর, তারা পরলোকগত খলিফার স্থানে আলিকে খলিফা নির্ব্বাচিত করে।

আলি খলিফার পদ গ্রহণ করেন, এবং প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তাদের তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে আহ্বান করেন। কেউ কেউ তার বশ্যতা স্বীকার করেন, কেউ কেউ আবার অস্বীকার করেন। এজিদের পিতা মাবিয়া ছিলেন এই শেষোক্ত দলের অন্যতম। পরলোকগত খলিফা ছিলেন তাঁর একজন নিকট আত্মীয়। তিনি বলেন, বিদ্রোহীরা ওসমানকে অন্যায় ভাবে হত্যা করেছে। যতক্ষণ তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া না হয়, এবং হত্যাকারীদের উপযুক্ত শাস্তি না দেওয়া হয়, ততক্ষণ তিনি আলিকে খলিফারূপে গ্রহণ করতে, এবং তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। উত্তরে আলি বলেন, রাজ্যময় এখন অরাজকতা বিদ্যমান। প্রথমতঃ শান্তি এবং শৃঙ্খলার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করা দরকার। তারপর, উপযুক্ত সময়ে, ওসমানের হত্যাকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা তিনি করবেন। আপাততঃ সে বিষয় কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়।

এই অপ্রীতিকর বিষয় নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে পাঁচ বৎসর যাবৎ বাদানুবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি হতে থাকে। ইতিমধ্যে হজরত আলি রাজধানী কুফায় স্থানান্তরিত করেন। মাবিয়া দামেস্ক থেকেই স্বপক্ষীয়দের পরিচালিত করেন। শেষে আলি এবং মাবিয়ার মধ্যে একটা আপোষ নিষ্পত্তি হয়ে যায়। আলি মাবিয়াকে সিরিয়া এবং মিশরের শাসনকর্ত্তারূপে গ্রহণ করেন। মাবিয়া আলিকে অবশিষ্ট মোস্‌লেম সাম্রাজ্যের অধীশ্বররূপে স্বীকার করেন। পাঁচ বৎসর অশান্তিপূর্ণ রাজত্বের পর, আলি খারেজী সম্প্রদায়ের এক গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হন। এই দলেরই আর একজন ষড়যন্ত্রকারী সেই একই দিনে মাবিয়াকেও আক্রমণ করেছিল। তিনি গুরুতররূপে আহত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু মৃত্যু থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন।

আলীর মৃত্যুর পর কুফা-বাসীরা হোসেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাসানকে খলিফা নির্ব্বাচিত করে। অবসর বুঝে এই সময়ে মাবিয়া ইরাক আক্রমণ করেন। এমামের স্বপক্ষীয়দের মধ্যে অনেকে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে আরম্ভ করে, কেউ কেউ আবার মাবিয়ার দলে গিয়ে যোগ দেয়। হাসান ধর্ম্মানুরাগী সুফি লোক ছিলেন, যুদ্ধ বিগ্রহ তাঁর ভাল লাগতো না। শক্তি পরীক্ষা না করেই তিনি মাবিয়ার সঙ্গে সন্ধি করেন। স্থির হয়, মাবিয়া তাঁর জীবন কাল পর্য্যন্ত খলিফার পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। হাসান রাজকার্য্য থেকে অবসর গ্রহণ করবেন, এবং সপরিবারে মদিনায় গিয়ে বাস করবেন। আরও স্থির হয়, মাবিয়ার মৃত্যুর পর হাসানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোসেন খলিফার পদে বরিত হবেন।

এই সন্ধির পর হাসান সপরিবারে মদিনায় গিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। কিছু দিন পরেই, কিন্তু শত্রুর প্রদত্ত বিষপানে তার মৃত্যু হয়।

এজিদ ছিলেন মাবিয়ার একমাত্র পুত্র। উচ্ছৃঙ্খল, মদ্যপায়ী, ব্যাভিচারী, কুক্রিয়াসক্ত যুবক। হজরত মোহাম্মদের প্রতিনিধি হবার কোন যোগ্যতাই তাঁর ছিল না। তা ছাড়া Republic-এর আদর্শ তখনও মোস্‌লেম সমাজ থেকে বিলুপ্ত হয় নি। তাই মাবিয়া যখন পূর্ব্ব অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, এবং যোগ্যতার কোন বিচার না করেই, এই এজিদকে মোস্‌লেম সাম্রাজ্যের ভাবী খলিফা নির্ব্বাচিত করবার প্রস্তাব সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করেন; তখন তাঁর আশ্রিত এবং দলভুক্ত লোকেরা যদিও তাঁর কার্য্যের অনুমোদন এবং সমর্থন করেন, অনেক ন্যায়-নিষ্ঠ এবং জাতির মঙ্গলকামী লোক তার ব্যবহারের প্রতিবাদ করতে কুণ্ঠিত হন নি।

মাবিয়া তার অবৈধ প্রস্তাব নিয়ে শেষে মদিনায় এসে উপস্থিত হলেন। তার প্রভাব প্রতিপত্তির ভয়ে অনেকেই তাঁর প্রস্তাবের অনুমোদন করলেন। এমাম হোসেন ছিলেন, হজরত মোহাম্মদের দৌহিত্র, বীরকেশরী আলির সন্তান; ভীত হবার লোক তিনি ছিলেন না। তা ছাড়া ন্যায়ের অনুমোদন এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ ছিল তাঁর বংশানুগত ধারা। তিনি এবং খলিফা ওমরের পুত্র আবদুল্লা, খলিফা আবুবকরের পুত্র আবদুর রহমান, জোবেরের পুত্র আবদুল্লা এজিদকে ভাবী খলিফারূপে গ্রহণ করতে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করলেন। হোসেন মাবিয়াকে এই উপলক্ষে যে পত্র লেখেন, নির্ভীক তেজস্বীতার এবং স্পষ্টবাদীতার সেটী অতুলনীয় এক দৃষ্টান্ত। মাবিয়াকে সম্বোধন করে তিনি বলেন—"আপনি আমায় ভয় প্রদর্শন করেছিলেন যে, যদি আমি আপনার প্রতি

শত্রুতাচরণ করি, আপনিও তা হলে আমার প্রতি শত্রুতাচরণ করবেন। বেশ, আপনার যেমন ইচ্ছা আমার প্রতি শত্রুতাচরণ করুন। ইহলোকের স্বামী এবং রছুলের শিষ্যবর্গের স্বার্থরক্ষা করতে হলে, আমার মতে আপনার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করাই কর্ত্তব্য। আমি যদি তা করতে পারি, তা হলে ধর্ম্মের অনুসরণ করা হবে, আর তা করতে না পারি, তা হলে আল্লার কাছে প্রার্থনা, আমার অক্ষমতার জন্য তিনি যেন আমায় ক্ষমা করেন। আমার পরিচালনার ভার তাঁরই ইচ্ছার উপর আমি সমর্পণ করেছি।

আপনি ধর্ম্ম-নিষ্ঠ হাজর এবং তাঁর সঙ্গিগণকে বিনা দোষে হত্যা করেছেন। আপনি ধর্ম্ম-ভীরু আমার এবনে হামিকে নিহত করেছেন। দোহাই আল্লার, আপনি মোছলমানের যোগ্য কাজ করেন নি। আপনি খোদা-তালার নামে কলঙ্ক এনেছেন। আপনি চিরকাল ধার্ম্মিক-গণের প্রতি শত্রুতাচরণ করেছেন। খোদাকে ভয় করুন। নিশ্চয় জানবেন, তিনি ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত গোণাহ লিপিবদ্ধ করেন। মনে রাখবেন যে, মিথ্যা দোষারোপ করে লোককে হত্যা করার অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আপনি একটী মদ্যপায়ী যুবককে আপনার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করেছেন। আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, আপনার এই কাজ থেকে জনসাধারণের সমূহ অমঙ্গল সাধিত হবে। আপনি ক্ষমার যোগ্য বিবেচিত হবেন না।" এই পত্রের মধ্যেই কারবালা Tragedyর পূর্ব্বাভাষ অন্তর্নিহিত রয়েছে।

উপরোক্ত ঘটনার তিন-চার বৎসর পর মাবিয়া পরলোক গমন করেন। এজিদ নির্ব্বাচনের অপেক্ষা না করেই সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং এমাম হোসেনকে বশ্যতা স্বীকার করতে আহ্বান করেন। এমাম বিষয়টীর সম্বন্ধে চিন্তা করার জন্য সময় চান এবং মদিনা পরিত্যাগ করে মক্কায় গিয়ে আশ্রয় নেন। জোবেরের পুত্র আবদুল্লা তখন মক্কার অধিপতি ছিলেন। তিনি এজিদের একটী বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে সেখানে রাজত্ব করছিলেন। এমাম তাঁর এলাকায় বসবাস করাই নিরাপদ বলে মনে করলেন।

এই সময়ে কুফাবাসীরা এজিদের বিরুদ্ধে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত করে, এবং তাঁকে খলিফার দায়ীত্ব এবং গৌরবপূর্ণ পদের অযোগ্য বলে মত প্রকাশ করে। তারা এমাম হোসেনকে খেলাফতের যোগ্য এবং ন্যায্য অধিকারীরূপে ঘোষণা করে; এবং কুফায় এসে খলিফার পদ গ্রহণ করবার জন্য তাঁর কাছে ঘন ঘন অনুরোধ পত্র এবং দূত পাঠাতে থাকে।

হোসেন রাজ্যলোভী ছিলেন না। কিন্তু ইস্লামের গৌরব এবং মহত্বকে তিনি প্রাণের চেয়েও প্রিয় জ্ঞান করতেন। আর এই ইস্লামের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য নিজের প্রাণপাত করতে সর্ব্বদাই তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কুফার প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্য মোস্লেম নামক একজন নিকট আত্মীয়কে তিনি সেখানে পাঠালেন। কুফাবাসীরা মহাসমারোহে মোস্লেমের অভ্যর্থনা করলে, আর তিনি উপস্থিত হওয়া মাত্র প্রায় দশ সহস্র লোক তার হাতে এমামের বায়ৎ বা বশ্যতা স্বীকার করলে। কুফার এই অনুকূল অবস্থা দর্শন করে তিনি এমামকে সেখানে আসতে অনুরোধ করে পাঠালেন।

এমামের কাছে এই অনুরোধ পত্র পাঠাবার পরই কিন্তু কুফার অবস্থা একেবারে বদলে গেল। ইবনে জেয়াদ তখন ছিলেন ইরাকের শাসনকর্ত্তা। তিনি কুফায় এসে উপস্থিত হলেন এবং সেখানকার এমাম ভক্ত শাসন-কর্ত্তাকে পদচ্যুত করলেন। চক্রান্ত করে মোস্লেমকে তিনি হত্যা করলেন। ছল, চাতুরী এবং প্রলোভনের দ্বারা কুফাবাসীদেরও তিনি হস্তগত করলেন।

এদিকে মোস্লেমের কাছ থেকে অনুকূল সংবাদ পেয়ে এমাম কুফায় যাবার জন্য কৃত-সঙ্কল্প হলেন। বন্ধু-বান্ধবেরা কুফাবাসীদের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করতে তাকে নিষেধ করেন। তিনি তাঁদের উপদেশে কর্ণপাত করলেন না। কয়েকজন আত্মীয় স্বজন, বিশ্বাসী অনুচর, এবং পরিজনবর্গকে নিয়ে তিনি কুফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সেই যাত্রাই তাঁর কাল হল।

পথে কাদেসিয় নামক স্থানে তিনি কুফার অবস্থা-বিপর্য্যয়ের সংবাদ পান এবং মোস্লেমের অপমৃত্যুর বিষয় অবহিত হন। মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করাই তিনি তখন যুক্তিযুক্ত মনে করেন। মোস্লেমের আত্মীয় স্বজনেরা কিন্তু এবিষয় মহা আপত্তি উপস্থিত করেন, এবং মোস্লে-মের হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে মক্কায় ফিরে যাওয়া একান্ত

অনুচিত বলে মত প্রকাশ করেন। এমাম বাধ্য হয়ে তখন কুফার পথেই অগ্রসর হন। কয়েকদিন পথ অতিক্রম করবার পর তিনি কারবালা প্রান্তরে এসে উপস্থিত হন, এবং সেখানে শিবির সন্নিবেশ করেন।

ইরাকের শাসনকর্তা জেয়াদ, আমর-বিন সাদের অধীন চার সহস্র অশ্বারোহী পাঠিয়েছিলেন। এই কারবালা প্রান্তরে উভয়দলের সাক্ষাৎ হয়।

আমরুর বিরাট বাহিনীর সঙ্গে মোকাবেলা করা এমামের ক্ষুদ্র দলের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এমাম তাই আমরুর নিকট সন্ধীর বিষয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাঠান, যথা, (১) হয় তাকে কোন সুরক্ষিত স্থানে যেতে দেওয়া হোক, যেখান থেকে তিনি ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে পারেন, অথবা (২) তাকে মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করতে দেওয়া হোক। সেখানে গিয়ে বাকী জীবন তিনি এবাদত আরাধনাতেই কাটাবেন। খেলাফতের দাবীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক আর রাখবেন না। অথবা (৩) উপরোক্ত দু'টী শর্ত্ত যদি গ্রাহ্য না হয়, তা'হলে, এজিদের সকাশে তাকে উপস্থিত করা হোক।

আমরু তৃতীয় প্রস্তাবে সম্মত হন, এবং পত্রের দ্বারা এজিদের অনুমতি প্রার্থনা করেন। এজিদ এমামের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, এবং বলেন এমামকে বিনা শর্ত্তে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে হবে। অন্য কোন প্রস্তাব তিনি স্বীকার করবেন না। এজিদের উত্তর সম্বন্ধে আমরু যথাসময়ে এমামকে অবহিত করেন। এমাম এজিদের আনুগত্য স্বীকার করতে অস্বীকৃত হন। ফলে, কারবালার Tragedy অনুষ্ঠিত হয়।

আপনারা একবার কল্পনা করুন,—অন্তহীন, রৌদ্র-তাপদগ্ধ এক মরু-প্রান্তর; আর স্ত্রী-পুত্র, পরিজনবর্গ, এবং কয়েকজন মাত্র বিশ্বস্ত অনুচর পরিবেষ্টিত হয়ে এমাম হোসেন সেখানে পড়ে আছেন। সাহায্য করবার লোক নিকটে কেউ নাই। পালাবারও কোন স্থান নাই। যুদ্ধে কেবল নিজের মৃত্যু অনিবার্য্য নয়, বন্ধু-বান্ধব, পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, সকলেরই মৃত্যু অনিবার্য্য! স্ত্রীর, ভ্রাতৃ-জায়ার, পুত্র-বধূর, বংশের অন্যান্য পুরমহিলাদের লাঞ্ছনা, নিগ্রহ, অসম্মান, যা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর, মৃত্যুর চেয়েও বিভীষিকা পূর্ণ, মৃত্যুর চেয়েও হৃদয় বিদারক, তাও অনিবার্য্য! আর এই সব অবর্ণনীয়, অতুলনীয়, অকল্পনীয় বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া একান্ত সহজ। "আমি এজিদের বশ্যতা স্বীকার করলাম"—এইটুকু বললেই সব বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, সব লাঞ্ছনার শেষ হয়। শত্রুরা পরম সমাদরে তাঁকে নির্ব্বিঘ্নে এজিদ সকাশে পৌঁছে দেয়। পরম সম্মানে এজিদ কর্ত্তৃক তিনি অভ্যর্থিত, অভিনন্দিত হন। সাধারণ মানুষ মুক্তির, শান্তির, আত্মরক্ষার এমন সহজ উপায় কখনও পরিত্যাগ করতো না; কারবালার হৃদয় বিদারক Tragedyর অনুষ্ঠানও হত না। আর দীর্ঘ ত্রয়োদশ শতাব্দী ধরে "হায় হোসেন" "হায় হোসেন"-এর করুণ ক্রন্দন গগন-পবন বিদীর্ণ করতো না!

হোসেন কিন্তু সাধারণ মানুষ ছিলেন না। নিজের জীবন, সন্তান-সন্ততির জীবন, বন্ধু-বান্ধবদের জীবন; পুর-নারীদের সম্মান এবং ইজ্জত, যা নিজের জীবনের চেয়ে, সন্তান-সন্ততির জীবনের চেয়ে, বন্ধু-বান্ধবদের জীবনের চেয়ে প্রিয়, সে সবই তিনি বলি দিলেন, কোরবাণী করলেন, ধর্ম্মের গৌরবের জন্য, জাতীয় গৌরবের জন্য, সত্যের গৌরবের জন্য, মনুষ্যত্বের গৌরবের জন্য, আল্লার গৌরবের জন্য। এইখানেই হোসেনের মহত্ব, এইখানেই কারবালার Tragedyর দারুণ মর্ম্ম-বিদারকতা, এইখানেই মহররমের মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের করুণ রহস্য।

কারবালার Tragedyর সঙ্গে Kalveryর মর্ম্ম বিদারক ঘটনার, ক্রস কাঠে যিশুখৃষ্টের মৃত্যুর তুলনা করা হয়ে থাকে। আমার মনে হয়, কারবালার Tragedy, Kalveryর Tragedyর চেয়েও হৃদয় বিদারক, করুণ-রসাত্মক। দীর্ঘ সার্দ্ধ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর আজও যে তিনটী মহাদেশের আকাশ, পাতাল "হায় হোসেন, হায় হোসেন" শব্দে প্রকম্পিত হচ্ছে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই।

মহররমের সাত তারিখ থেকে ইউফ্রেটিস নদী অবরোধ করা হল। এমাম ও তাঁর পরিজনবর্গকে মরুভূমির সেই ভীষণ তাপে পিপাসার দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণার একমাত্র প্রতিষেধক নদীর শীতল বারিধারা থেকে বঞ্চিত করা হল। শত্রু মনে করলে পিপাসার অসহনীয় যন্ত্রণায় কাতর হয়ে এমাম এবং তাঁর পরিবারবর্গ শেষে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। কিন্তু মানব শ্রেষ্ট মোহাম্মদ এবং বীর শ্রেষ্ট

আলীর বংশধরদের তারা চিন্‌তো না। পিপাসার সেই অকল্পনীয় যন্ত্রণাও তাঁদের উন্নত মস্তককে নত করতে পারলে না, তাদের অদম্য ইচ্ছা-শক্তিকে দমন করতে পারলে না; ন্যায়ের পথ থেকে, আত্ম-সম্মানের পথ থেকে, আল্লার পথ থেকে তাঁদের বিচলিত করতে পারলে না। তাঁরা ছিলেন নিগ্রহের ভিখারী, লাঞ্ছনার ভিখারী, মৃত্যুর, শাহাদতের ভিখারী। তাঁরা এসব দেখে ভয় কেন পাবেন? এসব যে ছিল তাদের প্রার্থনার জিনিস!

সর দে কে কাটকে তেরী রাহ মে আয়ে,
দিল দে কে জো সিনেমে কাতেল কো উঠায়ে;
লাব ওহ্‌দে কে শেকওয়া কাবহি না পেয়াস কে লায়ে;
তান ওহ্‌দে কে জখম তেরি রাহ মে খায়ে।

যা' হল তাকে ঠিক যুদ্ধ বলা যায় না। একে-একে এমামের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই নির্ম্মম আততায়ীর হস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। বীরের মত যুদ্ধ করে, অসংখ্য শত্রু নিপাত করেই তাঁরা মরলেন। তাঁদের সেই অলৌকিক বীরত্ব জগতে অতুলনীয়। আজ দীর্ঘ ত্রয়োদশ শতাব্দী ধরে মোস্‌লেম কবিরা সেই বীরত্বের অফুরন্ত-উৎস থেকে রস সংগ্রহ করে মোস্‌লেম জাতির অন্তরে ভাবের তুমুল বন্যা বাহিয়ে দিতেছেন! যতদিন মানুষ থাকবে, ততদিন সেই Fpic বীরত্বের কাহিনী কেউ ভুলবে না।

মহরমের ১০ তারিখ। অপরাহ্ণ কাল। এমামের ক্ষুদ্র বাহিনীর বীরেরা বীরত্বের পরকাষ্ঠা দেখিয়ে একে-একে সকলেই স্বর্গারোহণ করেছেন। পুরুষদের মধ্যে এক এমামই জীবিত, আর জীবিত তার ক্ষুদ্র শিশু-সন্তান জায়নাল আবেদিন। সে আবার তখন রোগ-শয্যায় শায়িত। জায়নাল আবেদিনকে ওমিয়েত বা শেষ উপদেশ স্বরূপ কয়েকটী কথা বলে এমাম যুদ্ধ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলেন। বর্ম্ম-চর্ম্ম পরে পাপী শমর তাঁর প্রতিরোধার্থ অগ্রসর হল।

এমাম এজিদের সৈনিকদের এই পাপ কার্য্য থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিলেন, ধর্ম্মের বিষয়, পাপের শাস্তির বিষয় চিন্তা করতে তাদের উপদেশ দিলেন, অন্যায় থেকে, অত্যাচার থেকে হস্ত সম্বরণ করতেও তাদের উপদেশ দিলেন। কিন্তু উপদেশ তখন শোনে কে?

পাপী শমর এমামের ললাট-দেশ লক্ষ্য করে তার বর্ষা নিক্ষেপ করলে। বর্ষার আঘাতে এমাম ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হলেন। সুযোগ বুঝে শমর তাঁর বুকের উপর চেপে বসলে।

জোম্মার দিন। নামাজের সময় সমাগত। শমরকে সম্বোধন করে এমাম বললেন—"হে শমর, আজ জোম্মার দিন। আজ লোক মস্‌জিদে আমার মাতামহের এবং তাঁর বংশধরদের গৌরব-কাহিনী কীর্ত্তন করছে। শমর, আমি বেশ জানি, তোমার হাতেই আমি শাহাদতের গৌরব লাভ করবো। একটী অনুরোধ আমার শোন,—দু'রেকাত নামাজ পড়ে আমার আল্লাকে ধন্যবাদ দিতে দাও। তার পর তোমর ইচ্ছামত কাজ কর।"

শমর এমামের শেষ অনুরোধ শুনলে। তাঁর বুক থেকে নেবে সে খঞ্জর হাতে করে পায়চারি করতে লাগলো। এমাম নামাজ আরম্ভ করলেন। সেজদায় তাঁর ললাট ভূমিতল স্পর্শ করলে। এমামকে সে অবস্থায় দেখে শমর আর ধৈর্য্য ধারণ করতে পারলে না। খঞ্জরের আঘাতে তাঁর পবিত্র মস্তককে স্কন্ধ-চ্যুত করলে। মহাপুরুষের আত্মা অমর-লোকে প্রয়াণ করলে। এজিদের বাহিনীতে আনন্দের শাদিয়ানা বাদ্য বেজে উঠলো। আর ক্রন্দনের করুণ কলরোল উঠলো এমাম বংশের পুর-মহিলাদের মধ্যে।

রূপ-স্মৃতি

—শাহাদাৎ হোসেন

ফুটেছিল ফুল সখি মনের বনে
সে কোন্ ফাগুন-রাতে মধু-পবনে।
নিরালায় নদী-কূলে কবে একেলা
স্বপনে ভাসা'য়েছিনু সোনার ভেলা।
পটে-আঁকা ছবিখানি শ্যামল-কূলে
বনতলে আলো-ছায়া দোলে ও-কূলে।
হাসে চাঁদ অসীমায় নীল বিথারে
ঝরে সুধা ধরণীর বন-কিনারে।
আন্-মনে চলেছিনু তরণী বেয়ে
সুদূর স্বপন-পুরে নবীন নেয়ে।
কেবা যেন হাত ছানি আঁখি-ঈসারায়
ডেকেছিল মোরে তার দূর নিরালায়।
তখন বুঝি নি কে সে মায়া-মায়িকা
রূপের কমল-দলে রূপ-নায়িকা।
কি কথা বলিতে চায় কেন বা ডাকে
আলো-ছায়া তটিনীর কুহেলী-বাঁকে।
চলেছিনু ভেসে তবু কিসের মায়ায়,
বুঝিবা সে ভুলেছিনু আঁখি-ঈসারায়।
সহসা কি অজানার পরশ-পাওয়া
গন্ধ-মদির মধু দখিন-হাওয়া,
দূর হতে ভেসে এসে মনের বনে
কি যেন কহিয়া গেল সংগোপনে।
ফোটো-ফোটো কলি মোর সহসা ফুটি'
শতদলে বিথারিল আগল টুটি'।
সুদূরের গান এল আকাশে ভেসে,
সুরের পরশ-মায়া বুলাল এসে।

ঘিরে এল মোহাবেশ নয়ন-পাতে,
উছল নদীর বুকে ফাগুন-রাতে।
সহসা ভিড়িল তরী পারের কূলে
কল-কল জল-দল উঠিল দুলে।
জোয়ার জাগিল বুকে কূল-হারানো
পরাণ উঠিল জেগে বাঁধ-ছাপানো।
ফুটিল রূপের রেখা সারা ভুবনে
আঁখি মেলি হেরিলাম রূপ-নূতনে,—
লীলায়িত তন্বী সে রূপ-নায়িকা
গলে দোলে মঞ্জুল বন-মালিকা।
রাঙা ঠোঁটে মধু-হাসি মন-ভুলানো
গন্ধ-মদির শ্বাস—মায়া-বুলানো।
বঙ্কিম আঁখি—দিঠি হানে মরমে
পরশনে সঙ্কোচ, নত সরমে।
রক্তের আল্পনা কম চরণে—
রেখায় রেখায় ফুটে বর বরণে।
পাশরিনু আপনারে,—রূপ-কমলে
বসিনু মাতাল অলি বিদারি' দলে।
নিঠুর পীড়ন-দাহে বেদন-দুখে
অকালে শুকা'ল কলি ফুটন-মুখে।

*　　*　　*

সে আজি স্বপন-কথা তবু সে জাগে—
ছিন্ন মরম-দলে শোণিত-রাগে।
আন্-মনে চাহি যদি পারের কূলে
করুণ বেদনে নদী কাঁদে সে ফু'লে।
যুগের সমাধি-পারে স্মৃতির তীরে
তাহারি ব্যথার গান কাঁদিয়া ফিরে।

ভিখারিণী

— গল্প —

—মহিউদ্দীন

ঘন কোঁকড়ানো এক মাথা উস্কো-খুস্কো এলো চুল—খোঁপা বাঁধা যায় না, কাঁধের উপর দোল খায় তার প্রত্যেকটী চঞ্চল গতি-ছন্দে। কী চোখ, কী নাক, কী সুন্দরই না তার তপ্ত-কাঞ্চন বর্ণ দেহের গড়ন! প্রাসাদ নাই, বিলাস-ব্যসন নাই, মণি-মুক্তা হীরা-জহরত নাই, জরী-জরোয়া খচিত সাজ-সজ্জাও নাই।

ভিখারীর রাণী।

রাত্রের অন্ধকারে কাণা-খোঁড়া ভিখারীর দল আগুনের কুণ্ডলী ঘিরে বসে। অগ্নি-কুণ্ডের উপর চাপানো টিনের বাল্‌তীতে চায়ের জল টগ্-বগ্ করে। রাণী গান গায়।

দূরে দৈত্যাকার খোঁড়া ভিখারী মোটা একটা লাঠির উপর ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলছিল। দূর থেকে একজন পথিককে দেখতে পেয়ে সে অন্ধের ভান করে চারদিকে হাতড়াতে লাগলো।

এই, এই, আর একটু হ'লেই নর্দমার মধ্যে পড়ে গেছলে!—পথিক ওকে ধ'রে ফেললে!

—আমি অন্ধ বাবা! আমাকে ফকির-টুলীর পথ দেখিয়ে দিতে পার? আল্লাহ্ তোমার ভালো করবে!

—সেখানে একা যাবে কি করে? এসো আমার সঙ্গে এসো! সেখানে কোথায় থাক?

ভিখারী তার ঠিকানা জানালো।

পথিক লাঠির অগ্রভাগ ধরে আগে-আগে ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

ভিখারী বললে,—ফকির মিস্‌কীনকে যে দয়া করে, তা'র প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত নাজেল হয়। আমি দোওয়া করছি, আল্লাহ্ তোমার ভালো করবে। ওই যে গান শোনা যাচ্ছে—ঐখানে চল বাবা!

অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দু'জনে এগিয়ে চললো—যেখানে সভাসদ্‌গণ পরিবেষ্টিত হ'য়ে ভিখারীর রাণী গান গাইছিল।

পথিকের বেদনা-সুন্দর শান্ত মুখের পানে চেয়ে ভিখারীর রাণী স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালো!

খোঁড়া ভিখারী পথিকের হাত থেকে লাঠিটা টেনে নিয়ে তার মাথায় আঘাত করতে উদ্যত হ'তেই রাণী বেগে ছুটে এসে লাঠিখানা ধরে ফেললে।

পথিক ফিরে চেয়ে দেখলে—ভিখারী অন্ধ নয়—তার দুই চোখে ভীষণ হিংস্র ক্ষুধা! তার ওষ্ঠে হাসি ফুটে উঠলো। শান্ত-কণ্ঠে সে বললে,—আমি তোমাদেরই ন্যায় ভিখারী, আমাকে মেরে কিছুই পেতে না। দিনে ভিক্ষে কর, রাত্রে মানুষ খুন কর, এই বুঝি তোমাদের পেশা? এই নাও আমার কাছে যা ছিল সবই দিলাম।

পথিক চলে গেল।

কিছুক্ষণ সমস্ত নিস্তব্ধ। মৃদু বাতাসে কেবল আগুনের শিখা কাঁপতে লাগলো!

পথিকের দেওয়া টাকা ক'টা কুড়িয়ে নিয়ে, ঘূর্ণী বাতাসের ন্যায় একটা ঘুর-পাক দিয়ে রাণী থির হ'য়ে দাঁড়ালে। কঠিন কম্পিত কণ্ঠে ডাকলে,—রহমত্!

খোঁড়া ভিখারী জওয়াব দিলে,—রাণি!

—ওই পথিককে আমি চাই। যেমন করেই হোক্ রাত্রি প্রভাত হ'বার আগে ওর সন্ধান আমাকে এনে দিতে হবে।

ভিখারী মাথা নত করে রাণীর আদেশ গ্রহণ করলো। মোটা লাঠির উপর ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চল্‌লো যে পথ দিয়ে পথিক চলে গেছে।

খোঁড়া ভিখারীটা কড়ার মধ্যে লাঠি ঢুকিয়ে দিয়ে চায়ের বাল্‌তী উঠিয়ে নিলে। একটা টিনের পাত্রে চা ঢেলে ডাষ্ট-বীন থেকে কুড়িয়ে আনা কয়েক টুক্‌রা শুক্‌নো রুটী ও পাত্রটা রাণীর সম্মুখে নিয়ে রাখলে। নিঃশেষে চা-টুকু পান করে রাণী টিনের পাত্রটা আছাড় দিয়ে ফেলে দিলে।

ভোরের আলোয় ভিখারীর রাজ্য জেগে উঠলো—ঘুমন্ত নরক-পুরীর ন্যায়।

মুহম্মদের ঘুম ভাঙলো। চোখের সম্মুখে জেগে উঠলো অনশন-ক্লিষ্ট দুঃখী নর-নারীর নিত্যকার অভিশপ্ত জীবন!—চিরন্তন দুঃখ—চিরন্তন বেদনা! সুদূর গ্রাম-প্রান্তের ক্ষুদ্র কুটীরখানি—দুঃখিনী জননীর বিষাদময় মুখচ্ছবি! এ ঘুম কেন ভাঙলো?

ভিখারীর রাণী গৃহের মধ্যে প্রবেশ করলো। টাকা ক'টা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বল্‌লে,—টাকা তোমার কাছে ভিক্ষা চাই নি' রাজা! তোমার টাকা তুমি ফিরিয়ে নাও।

মুহম্মদ মুখ তুলে চেয়ে দেখলে—এ সেই রাত্রের অপরূপ সুন্দরী ভিখারিণী!

ভিখারিণী সম্মুখে এগিয়ে এলো। স্বচ্ছ সজল সুন্দর দু'টী চোখ—অলক্ত-রঞ্জিত কম্প্র ওষ্ঠাধর—সমগ্র দেহলতা ছাপিয়ে জেগে উঠেছে তার অনন্ত যৌবন-শিখা!

এ যে আগুন! মুহম্মদ দূরে সরে দাঁড়ালে।

ভিখারিণী এগিয়ে এলো—রাজা! দুই চোখে তার জল! কৃতাঞ্জলী-পুটে সে হাঁটু গেড়ে বসলে তার পায়ের কাছে।

—তুমি কী চাও আমার কাছে?

—তোমাকে চাই আমি রাজা!

—আমাকে চাও?

—হাঁ তোমাকে চাই।

সহজ-শান্ত কণ্ঠে সে বল্‌লে,—আমি কারো নই—আমি নিপীড়িত বিশ্ব-মানবের।

—তুমি কারো নও রাজা—তুমি আমার! ভিখারিণী তা'র দুই পা জড়িয়ে ধরতে হাত বাড়ালে।

মুহম্মদ দূরে সত্রে দাঁড়ালে,—ভিখারিণি!

ভিখারিণী তার মুখের পানে চাইলে—দুই চোখ দিয়ে যেন তার আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে। এমন তেজোদীপ্ত চোখ তো সে কখনও দেখে নি'! সে দেখেছে অত্যাচারীর হিংস্র চাউনী, ব্যভিচারীর কাম-লোলুপ দৃষ্টি! এই দৃষ্টি-বহ্নি যে তার অন্ধকার হৃদয়ের তলায় একটা পবিত্র আলোকের ঝঙ্কার জাগালো!

—তুমি রাগ করেছ রাজা? আমি চল্‌লুম—কিন্তু, মনে রেখো তুমি আর কারো নও—তুমি আমার!

রাণী চলে গেল। অন্ধকার ভিখারীর-রাজ্যে ও যেন একটা বিদ্যুৎ-রেখা—অন্ধকারের বুকে বুকে ওর চঞ্চল গতি-ছন্দ!

মুহম্মদের মনে হলো ভিখারিণী যেন এখনো যায় নি'। এখনো তার চোখে জেগে আছে সেই মুখ, সেই চোখ!

নিজের অজ্ঞাতে নিজেই সে বলে উঠলো,—এত রূপ!...

চারদিকে জেগে উঠলো সেই চোখ, সেই মুখ!

চারদিকের পাষাণ-প্রাচীর যেন কথা ক'য়ে উঠলো—তুমি আমার! তুমি আমার!

মুহম্মদ পাগলের ন্যায় উঠে দাঁড়ালে। ভিখারিণি! ভিখারিণি! না না ইয়া আল্লাহ্......

দূরে কারখানার বাঁশী বেজে উঠলো—

ভিখারীর দল তাদের ছিন্ন-ঝুলী নিয়ে পথে বা'র হয়ে পড়লো। গোলপাতার ঘরে আর অন্ধকার খোলার খুবড়িতে মানুষগুলি জেগে উঠলো—একটা ক্ষুধা, একটা বেদনা, একটা অসন্তুষ্টি নিয়ে—ভাতে-মরা দেহ ব'য়ে নিয়ে ছুটে চল্‌লো কল-কারখানা, ডক, জাহাজের পানে!

তাদের পায়ের শব্দে মুহম্মদের স্বপ্ন ভাঙলো! একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে সে ঘর হ'তে বহির্গত হ'লো প্রতিদিনকার কাজে যোগ দেবার জন্য!

যন্ত্র চলে উদ্দাম অবিশ্রান্ত বেগে—হাজার হাজার

মজুরের দেহের বলে! শক্তিমান হস্তে 'শ্যাভেল' চলে—মণের পর মণ কয়লা নিক্ষিপ্ত হয় ভীষণ অগ্নি প্রজ্জলিত কুণ্ডের ভিতরে—বয়লারের জল টগ্‌বগ্‌ করে ফুটে, ঝড়ের মত ইঞ্জিন চলে। মেশিনে লক্ষ লক্ষ বস্ত্র তৈরী হ'য়ে যায় মজুরদের হাত দিয়ে।

যন্ত্রের অবিরাম পাগ্‌লা গতি সেদিন মধ্যদিনে হঠাৎ থেমে গেল। সমস্ত কারখানা-ব্যাপী একটা চাপা আর্ত্তনাদ জেগে উঠলো—একটা রৈ-রৈ শব্দ!

মেশিনে পিষ্ট ইস্‌মাইলের মৃতদেহটা ঘিরে মজুররা ভীড় করে দাঁড়ালে। ভীড়ের মধ্য হ'তে কে যেন বলে উঠলো,—আহা……হা হতভাগ্য!

মৃতদেহ স্থানান্তরিত হ'লো!

শুধু কয়েকটা মুহূর্ত্ত—শুধু কয়েকটা মুহূর্ত্ত মাত্র যন্ত্র নিস্তব্ধ হ'য়ে রইলো—মানুষগুলি থমকে দাঁড়ালো! আবার যন্ত্র চল্‌লো—আবার মানুষগুলির দেহ নড়ে উঠলো।

হিসাব করবার অবসর নাই—কে মরলো, কে বাঁচলো!

পাঁচটী কঙ্কালসার পুত্র-কন্যা নিয়ে মৃত ইস্‌মাইলের বিধবা-স্ত্রী মুহম্মদের সম্মুখে এসে দাঁড়ালে!

কম্পিত শীর্ণ হস্তে সাতটী আশ্‌রুপী মুহম্মদের সম্মুখে রেখে দিয়ে বল্লে,—মুহম্মদ! এতিম ছেলে-মেয়েদের নিয়ে মুনীবের কাছে গিয়েছিলাম—সাতটী আশ্‌রুপী দিয়ে সে আমাকে বিদায় করে দিয়েছে! এই সাতটী আশ্‌রুপীই কি আমার স্বামীর জীবনের মূল্য? এই সাতটী আশরুপীই কি আমার এতিম পুত্র-কন্যাদের জীবনের উপযুক্ত সম্বল? বল বল মুহম্মদ!

মুহম্মদের দুই চোখ ভিজে উঠলো—হায় খোদা, একি অন্যায়! একি অবিচার!

আমি চাই না—এই অকিঞ্চিতকর ক'টা আশ্‌রুপী! আমি পারবো না এ ক'টা আশ্‌রুপী গ্রহণ করে আমার মৃত স্বামীর অপমান করতে। তুমি নাও এই আশ্‌রুপী ক'টা মুনীবকে ফিরিয়ে দিয়ো!

পুত্র-কন্যাদের নিয়ে সে চলে যায়!

ক্ষুধিত পুত্র-কন্যাদের ঘরে রেখে হতভাগিনী মা পথে বা'র হ'লো—ছেলে-মেয়েদের বলে গেল, সে তাদের অন্ন-জলের সন্ধানে যাচ্ছে!

জন্ম-দুঃখিনী বঞ্চিতা-নারী, প্রতিহিংসা সে জানে না—জগতের সমস্তের বিরুদ্ধে প্রাণে জেগে উঠলো তার একটা বিরাট অভিমান!

উচ্চ সেতুর উপর হ'তে নিম্নতম নদীর জলে সে আত্ম-বিসর্জ্জন দিল।

অন্ধকার খোলার ঘরের মাটীর প্রাচীরের মধ্যে অভুক্ত পুত্র-কন্যাগুলি আর্ত্তনাদ করে উঠলো—মায়ের দেরী দেখে!

ঐশ্বর্য্যপূর্ণ প্রাসাদ—লতা, পত্র, পুষ্পে সুশোভিত চারদিক!

ইস্‌মাইলের এতিম পুত্র-কন্যাদের নিয়ে মুহম্মদ প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করলো! শান্ত পদ-বিক্ষেপে কারখানার মালিক শিবশেখরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালে!

—মৃত ইস্‌মাইলের স্ত্রী তার এতিম পুত্র-কন্যাদের নিয়ে তোমার কাছে এসেছিল—তুমি তাকে মুষ্টি ভিক্ষার ন্যায় সাতটী আশ্‌রুপী দিয়ে বিদায় করে দিয়েছ! সে তোমার আশ্‌রুপী ফিরিয়ে দিয়েছে—সে চায় না তোমার দেওয়া এই হীন আশ্‌রুপী ক'টা নিয়ে তার মৃত স্বামীর অবমাননা করতে! জগতের অন্যায়ের প্রতি অভিমান করে সে আত্মবিসর্জ্জন দিয়েছে!

মুহম্মদ আশ্‌রুপী ক'টী শিবশেখরের সম্মুখে রেখে দিলে।

ক্রোধে শিবশেখরের চোখ-মুখ অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করলো! সে কঠিন-কণ্ঠে বল্লে, সাবধান মুহম্মদ! তুমি আমারি একজন বেতন-ভোগী দাস! সংযত হয়ে কথা বলো।

মুহম্মদ সোজা হয়ে দাঁড়ালে। একবার মুনীবের পানে চাইলে।

কী প্রদীপ্ত তার চোখের জ্যোতি! শিবশেখর মনে মনে সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো—এ তো আত্ম-চেতনহীন মজুর নয়—এর মধ্যে যেন একটা ন্যায়ের কঠোরতা, সত্যের অনলচ্ছটা বিরাজ করছে!

মুহম্মদ হাস্‌লে। ধীর কণ্ঠে বল্লে—ভয় আমি করি না—শুধু ভয় হয় তোমাদের এই গর্ব্বিত জীবনের শোচনীয় পতনের জন্য।

ইস্মাইলের এতিম পুত্র-কন্যাদের নিয়ে সে কক্ষ হ'তে বা'র হ'য়ে গেল।

কারখানার দ্বারের সম্মুখে মজুরদের ভীড়। ময়লা পুরাণো জামা-কাপড়, অনশন-ক্লিষ্ট দেহ, শুষ্ক-ব্যথাতুর মুখ চোখ! তাদের বহুদিনের পুঞ্জীভূত অত্যাচারের বেদনা আজ বিদ্রোহ হ'য়ে প্রকাশ হয়েছে। মৃত ইস্মাইলের বিধবা স্ত্রীকে সাতটী আশ্রুফী দিয়ে বিদায় করে দিয়েছে, এই দুঃখে সে আত্মহত্যা করেছে—মুহম্মদ গিয়েছিল তার অসহায় পুত্র-কন্যাদের নিয়ে—তা'কে অপমান করে বিদায় করেছে। সামান্য কারণে একজন শ্রমিকের কর্ম্ম-চ্যুতির জন্য আপত্তি জানাতে বহু শ্রমিককে কর্ম্ম-চ্যুত করা হয়েছে! এর প্রতিকার হওয়া চাই—তাই তারা আজ ধর্ম্মঘট করে বসেছে।

কারখানার বাঁশী বেজেছে অনেকক্ষণ। প্রশস্ত উন্মুক্ত দোয়ার রাক্ষসের ন্যায় হা করে আছে তার প্রতিদিনকার খোরাক হাজার হাজার হতভাগ্য শ্রমজীবিদের জন্য! একজন মজুরও আজ কারখানায় প্রবেশ করলো না। বিরাট অগ্নি-কুণ্ডে কয়লা নিক্ষিপ্ত হ'লো না, আগুণ জ্বললো না, বয়লারের জল টগ্‌বগ্‌ করে ফুঠে উঠ্‌লো না। যন্ত্র চল্‌লো না।

শিবশেখর জনতার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। জনতার মধ্যে একটা অসংযত হট্টগোল জেগে উঠ্‌লো।

শিবশেখর গর্ব্বিত-কণ্ঠে হেঁকে উঠ্‌লো,—তোমরা কেন এখানে কাজ বন্ধ ক'রে বসে আছ? শীঘ্র কাজে এসে যোগ দাও! কাজ বন্ধ করবার দুর্ব্বুদ্ধি তোমাদের কে দিলে?

জনতার মধ্য হ'তে মুহম্মদ দাঁড়ালে,—আমাদের দাবী সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ না করা পর্য্যন্ত আমরা কাজে যোগ দেব না।

ক্রোধ-কম্পিত-কণ্ঠে শিবশেখর বল্লে,—তোমাকে আমি বরখাস্ত করেছি—এখানে আবার কেন এসেছ?

—সমস্ত মজুরদের পক্ষ হ'তে এসেছি!

মজুরদের প্রতি লক্ষ্য করে শিবশেখর বল্লে,—তোমরা দরিদ্র লোক, পেটের দায়ে এখানে মজ্‌দুরী করতে এসেছ। ওই নিমকহারামটার প্ররোচনায় কাজ বন্ধ করে ভালো করো নি! এখনও সময় আছে, ভিতরে প্রবেশ কর। এই পাঁচ মিনিট—এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে যদি কাজে যোগ না দাও, তা হ'লে—আমি কারখানার দরজা বন্ধ করে দেবো। তা'তে আমার কিছুই হ'বে না—তোমরাই না খেয়ে শেয়াল-কুকুরের ন্যায় মরবে।

মুহম্মদ বল্লে,—নিমক-হারাম আমরা নই। যাদের দেহের শোণিত শোষণ করে খেয়ে তুমি আজ পুষ্ট হ'য়ে উঠেছ, তাদেরকে নিমক-হারাম বল্‌তে তোমার লজ্জা হয় না?

ক্রোধে ক্ষিপ্ত-প্রায় হয়ে শিবশেখর বল্লে,—খবরদার শূয়র—আর একটী কথা উচ্চারণ করবে তো তোমাকে গুলী করে মারবো!

জনতা গর্জ্জন করে উঠলো! চারিদিক থেকে শিব-শেখরকে তারা আক্রমণ করলো। ক্ষিপ্ত জনতার সম্মুখে শিবশেখরের শক্তি টিকলো না—মুহম্মদের অনুরোধও না। মুহূর্ত্তের মধ্যে তার অচেতন দেহ ধূলায় বিলুণ্ঠিত হ'য়ে পড়লো!

মুহূর্ত্তকাল মাত্র সমস্ত নিস্তব্ধ! তারপর জনতা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়লো!

গভীর নিশীথে মুহম্মদ তার ঘরে এসে একেলা উপস্থিত হ'লো। তার মাংস-পেশী-বহুল বাহু হ'তে রক্ত বার হ'য়ে জমাট বেঁধে আছে। শুষ্ক মলিন মুখচ্ছবি—অব্যক্ত দুঃখের আগুনে প্রজ্বলিত দু'টী আয়ত চক্ষু!

ভিখারীর রাণী এসে তার সম্মুখে দাঁড়ালে,—রাজা!

মুহম্মদ কোন জওয়াব দিলে না।

—এ কি, তোমার গায়ে এ কিসের আঘাতের চিহ্ন? ভিখারিণী নিজের গায়ের বসন ছিঁড়ে তা'র ক্ষত-স্থান বেঁধে দিলে।

মুহম্মদ বাধা দিলে না।

ভিখারিণী তা'র পায়ের কাছে বস্‌লো—তা'র মুখের পানে চেয়ে রইলো!

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ। মুহম্মদের দুই চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলো।

ভিখারিণী তার দুই পা' জড়িয়ে ধরে আকুল-কণ্ঠে বলে উঠলো,—রাজা! রাজা! তুমি কেন কাঁদ্‌ছো? তোমার কিসের দুঃখ? বল বল আমাকে!

মুহম্মদ হাত ধরে ওকে উঠালে।

ব্যথিত-ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকলে,—ভিখারিণি! ভিখারিণি! তুমি এখান থেকে চলে যাও!

—আমি তোমাকে ভালোবাসি রাজা! তুমি আমার।

—তুমি আমাকে ভালোবাস? মুহম্মদ ওর হাতের কব্জী চেপে ধরলো। সমস্ত চোখে মুখে কী এক ভীষণ আগুন জ্বলে উঠলো—বুকের তলায় যেন কী এক প্রলয় বাসনা আলোড়িত হ'য়ে উঠলো!

—ভিখারিণি, তুমি আমায় ভালোবাস?

ভিখারিণীর চোখে অশ্রু!

হাত ছেড়ে দিয়ে মুহম্মদ বললে,—তাই যদি সত্য হয়, তা'হলে তোমার ভালোবাসা নিপীড়িত মানুষের ব্যথায় পূর্ণ হোক! যাও তবে, যেখানে ব্যথিতের আর্ত্তকণ্ঠ ধ্বনিত হচ্ছে—দুঃখে-অত্যাচারে জর্জ্জরিত মানুষ যেখানে চির অন্ধকারে জীবনের আলো খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ভিখারিণী উঠে দাঁড়ালে।

এ যেন নারীর এক নতুন রূপ। মুহম্মদ বললে,—যাও!......

ভিখারিণী আর একবার তার পানে চাইলে। তন্দ্রিত আঁখি, প্রশান্ত সুন্দর মুখচ্ছবি। সে ঘর হ'তে বেগে বা'র হ'য়ে গেল!

"মহর্ষি শাহ্ জালাল"

গত ১৩৩৮ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের মোহাম্মদীতে ডাঃ মোহাম্মদ আবুল কাসেম সাহেব "মহর্ষি শাহ্ জালাল" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহাতে একটি কথা সঠিক হয় নাই। প্রবন্ধের শেষ পৃষ্ঠায় (৫৮৮) ডাক্তার সাহেব লিখিয়াছেন,—"হজরত শাহ্ জালালের ৩৬০ জন আউলিয়ার অন্যতম আউলিয়া শেখ জিয়াউদ্দীনের কবর দেওরালি পরগণায় অবস্থিত। তত্রত্য চৌধুরীগণ তাঁহার বংশধর।" দেওরালিতে যে আউলিয়ার কবর আছে, তাহা শেখ জিয়াউদ্দীনের নহে,—শাহ্ আদম খাকির এবং তত্রত্য চৌধুরীগণও কোন আউলিয়ার বংশধর নহেন। দেওরালি পরগণায় শাহ্ জিয়াউদ্দীন নামে আরো একজন আউলিয়ার কবরও ছিল। সম্প্রতি বরাক নদীতে উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দেওরালির চৌধুরীগণ তাঁহারও বংশধর নহেন। যতদূর জানা যায়, শাহ্ আদম খাকির মত শাহ্ জিয়াউদ্দীনেরও কোন আওলাদ্ নাই। পিল্লাকান্দি নামক গ্রামে শাহ শরীফের কবর অবস্থিত আছে। মূল কবর কুশিয়ার নদীর গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় অধিবাসিগণ মূল কবরের মাটি নদীর তীরে অন্যত্র আনিয়া 'দফন' করিয়াছেন। এখানে পিল্লাকান্দি মৌজার লোকে ইদের নামাজ এক জামাতে পড়ে। ৩৬০ আউলিয়ার অনেকে বিবাহাদি করিয়া সংসারী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধর এখনো বর্ত্তমান আছেন। হজরত শাহ্ জালালের বিস্তারিত জীবনী জানিতে হইতে মৌলবী আবদুল মালেক চৌধুরী প্রণীত শাহ্ জালালের জীবনী পাঠ করিতে ডাক্তার সাহেবকে অনুরোধ করি।

—মতিনউদ্দীন আহমদ
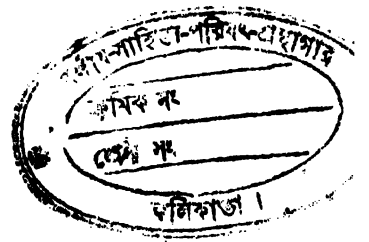
মনের কর্ষণ

— প্রবন্ধ —

—তোরাব আলী, এম্-এ

সাহস ও শক্তির কেন্দ্র হইতেছে মন। কেবলমাত্র শারীরিক-শক্তি দ্বারা কিছুই সম্ভব নহে। তাই ব্যায়াম-চর্চ্চার ন্যায় চিত্ত-কর্ষণেরও প্রয়োজন আছে। দুই প্রকারে মনের উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে:—নিজের মনের উপর প্রভূত আধিপত্য বিস্তার করিয়া এবং মন যে সম্পূর্ণ আমাদের নিজের হাতে, তাহা কার্য্যতঃ উপলব্ধি করিয়া। আমরা এখানে এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

যাহার মন যত বড়, সে নিজের মনের উপর তত আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ। মন যদি প্রশান্ত হয়, তাহা হইলে অসাধারণ আনন্দের কারণ হইলেও আনন্দে আত্ম-হারা হয় না, অথবা খুব শোক-দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলেও মুসড়ে পড়ে না। ক্ষুদ্র মন হইলে নির্ব্বিকার চিত্তে আনন্দের কারণকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। নিজের মনের উপর একটু দখল থাকিলে ছোট-খাট ২।১টা বিপদকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াও সম্ভব হয়।

এ বৎসর (১৯৩০) Williams কে আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। সে কোন এক কোম্পানীর ব্যাঙ্ক-ঘরে সংবাদ-বাহক বালকের কাজ করিত। দুই পেরী যখন পরীক্ষার ফল প্রকাশ করিয়া Williams কে জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বালক বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তখন তাহার মুখে কোন পরিবর্ত্তনের চিহ্ন দেখা গেল না। পুরস্কার-দাতা এডিসন, হেন্‌রী ফোর্ড প্রমুখ আমেরিকার মনীষীবৃন্দ, প্রতিযোগী বালকগণ এবং বায়োস্কোপ ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ সকলেই ভিড়ের মধ্যে হর্ষে উদ্বেল হইয়া উঠিল, কিন্তু Williams এর মুখে স্বাভাবিক-ভাবের কোনই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। এত বড় আনন্দ ও সম্মানের সংবাদ সে ধীর-নির্ব্বিকার চিত্তে গ্রহণ করিল। সকলে যখন তাহাকে ধরিয়া বলিল, "হে আমেরিকার গৌরব, আমরা তোমাকে লইয়া একটা বিরাট উৎসব করিতে চাই", তখন Williams বলিল, "তাহাতে আমার আপত্তি নাই, তবে এ ব্যাপারে আমি খুব আনন্দ বোধ করি না।"

মনের উপর এই যে আধিপত্য, ইহা বাস্তবিকই আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বালকের যোগ্য বটে। দুঃখ-দৈন্যকে আল্লাহ্‌তালার অভিপ্রেত জানিয়া তাহা ধীর চিত্তে গ্রহণ করা সম্বন্ধে একটী অল্প দিনের ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

হুগলী জেলায় সিঙ্গুর থানার এলাকায় মুন্সী জয়নাল আবেদিন নামক একজন ব্যবসায়ী আছেন; বর্ত্তমানে ধর্ম্মতলায় তাঁহার একটী দোকানও আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পাটের গুদামে আগুন লাগে, বাস-গৃহের বাক্সে কিছু নগদ টাকা ছিল, তাহা বাহির করিয়া আনিয়া তিনি প্রজ্জ্বলিত গুদামের সম্মুখে ছড়াইতে থাকেন। উপস্থিত সকলে তাঁহার এই কার্য্যে অবাক হইয়া গেল। কেহ কেহ বলিল, "উহার মাথা খারাপ হইয়াছে, এত টাকার গুদাম পুড়িয়া গেল,—সেজন্য দুঃখিত হওয়া দূরের কথা, অধিকন্তু ঘরে যে টাকা ছিল, তাহাও নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে।" আবেদিন সাহেব বলিলেন, "দানের দক্ষিণা ত চাই। গচ্ছিত মালের উপর আবার মায়া কেন? এতদিন যাহা ব্যবহার করিয়াছি, তাহার জন্য ত কিছু দেওয়া চাই।" এই ঘটনার পর বৎসর তিনি নাকি পাটের ব্যবসায় তিন-গুণ লাভবান হন। সে যাহা হউক, মন প্রশান্ত না হইলে আদৌ এরূপ সম্ভব নহে।

মনের উপর অসাধারণ প্রতিপত্তি না থাকিলে সমস্ত দুঃখ-দৈন্যকে সর্ব্বশক্তিমানের দান জানিয়া অম্লান-চিত্তে গ্রহণ করা অসম্ভব। বিপদের মাঝেও যে তাঁহার শুভেচ্ছা নিহিত আছে, ইহা মনে-প্রাণে না বুঝিলে আল্লাহ্‌র চরণে যথা-সর্ব্বস্ব

সমর্পণ করা যায় না। মুন্সী জয়নাল আবেদিন সত্যিকার মুসলমান। ইস্‌লাম অর্থই এইরূপ একান্ত আত্ম-নিবেদন।

* * * *

সামান্য সামান্য কারণে দমিয়া যাওয়া ক্ষুদ্র মনের লক্ষণ। যাহারা সত্য জানিয়াও, জোর করিয়া বলিতে সাহস পায় না, শারীরিক-বল থাকিতেও যাহারা তাহার সদ্ব্যবহার করে না, যাহারা অপমান হজম করে, যাহারা নিজেকে যুগের হাওয়ায় ছাড়িয়া দেয় এবং অপরের মুখে ঝাল খায়, মনের দিক দিয়া তাহারা বড়ই দরিদ্র।

আর্থিক আমরা যতই দরিদ্র হই না কেন, মন-রাজ্যে নিজেকে রাজা সাজাইবার মালিক আমরা নিজে। মনের দিক দিয়া খোদাতালা কাহাকেও ছোট, কাহাকেও বড় করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। যে ব্যক্তি নিজেকে অন্যের চেয়ে খাটো মনে করে, সে যে বাস্তবিকই খাটো, শুধু তাহা নহে, সে দয়ার পাত্র।

অর্থ না থাকিলে কি আর মনে বড় হওয়া যায় না? কড়ির কাঙ্গালও কি ধনীর চেয়ে মন বড় করিতে পারে না? রাজার বাড়ী হইতেও অভুক্ত অতিথি ফিরিয়া যাইয়া থাকে এবং দিন-মজুরও সম্মুখের আহার্য্য ক্ষুধার্ত্তকে দিয়া থাকে। অনেক শক্তিশালী ব্যক্তি ভাদ্রের ভরা-গাঙ্‌ দেখিয়া ভয় পায়—আবার অনেক ক্ষীণকায় মহাপ্রাণ ব্যক্তি, অপরের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য সেই গাঙে অম্লান-বদনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। অনেকের একটু নরম বিছানা না হইলে ঘুম হয় না, আবার এমন অনেক ধনীর সন্তানও আছে, যাহারা যে-কোন স্থানে, যে-কোন অবস্থাতে শান্তিতে নিদ্রা যাইতে পারে। মন ছোট কি বড়, এই সব স্থানে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

"মনের দিক দিয়া আমি কাহারো চেয়ে খাটো নহি," এই চিন্তা যে কার্য্যতঃ নিজের মধ্যে আনিতে পারিয়াছে, তাহার পক্ষে বড় হওয়া অতি সহজ ব্যাপার। এরূপ ভাবিবার অন্তরায় কিছু আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। "রেজক দৌলত" এর উপর মানুষের হাত নাই, কিন্তু আল্লাহ্‌ মনকে সম্পূর্ণ মানুষের হাতে দিয়াছেন। মন ও জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশের জন্য ইল্‌ম ফরজ করিয়া দিয়াছেন।

* * * *

মনের বলের কাছে যে, কোন শক্তি কিছু নয়, তাহা নিম্নের দুইটী অতি সাধারণ ব্যাপার হইতেই আমরা বুঝিতে পারিব।

(১) যখন গাঁয়ে আগুন লাগে, তখন অনেক রোগীও বড় বড় কলসী অথবা বাল্‌তি ভরিয়া পানি লইয়া ছুটাছুটি করে, কিন্তু সেই সব লোকই আগুন লাগিবার পূর্ব্বে হয়তঃ লাঠি ছাড়া হাঁটিতে পারে নাই।

(২) গাড়ীতে প্রায়ই দেখা যায়, কাবুলীরা শুইয়া যায়। তাহাদিগকে একটু যায়গা দিতে বলিলেই, এক ধমকে গাড়ী-শুদ্ধ বাঙ্গালীকে 'থ' খাওয়াইয়া দেয়।

ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মনই সকল শক্তির আধার এবং মনের বলের নিকট শারীরিক বল কিছুই নহে।

আমরা এমনই বে-খবর যে, খোদাতালা যে অমূল্য রত্ন আমাদের হাতে দিয়াছেন, আমরা তাহার সদ্ব্যবহার না করিয়া অযথা নিজেকে অভাবগ্রস্ত মনে করি। আমরা দেখিয়াছি, আমাদের মানসিক দুর্ব্বলতাই অধিকাংশ সময়ে আমাদের শোক দুঃখের কারণ। বাহিরের কোন জিনিষের সহিত সুখের সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। সুখের আসল সম্বন্ধ মনের সাথে। "*My mind to me a kingdom is*" কার্য্যতঃ মনকে এইরূপ না করিতে পারিলে kingdomও মানুষকে সুখী করিতে পারে না।
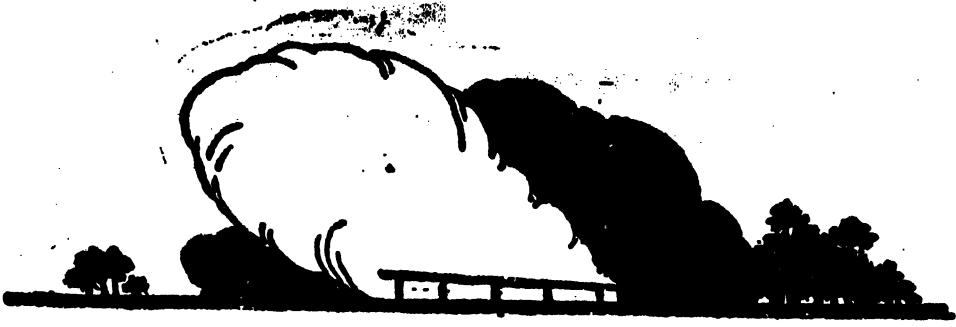
"অবরোধ-বাসিনী"

— প্রতিবাদ —

— কাজী হায়দরজান

আমার এই প্রতিবাদ-প্রবন্ধে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি অবরোধ-প্রথার পক্ষপাতী থাকিয়া অবরোধ-প্রথার স্বপক্ষেই যুক্তি দেখাইতেছি। অথবা আমি মহিলা-গণকে নির্ম্মম অবরোধে রাখিবার মতাবলম্বী। অবরোধ-প্রথা বিরোধী পাঠক-পাঠিকাগণ মনে করিবেন না যে, আমি নারী-সমাজকে কিছু কম সম্মানের চক্ষে দেখি বা নারী সমাজকে কঠোর পর্দ্দায় আবদ্ধ রাখিবার প্রথাকে অনুমোদন করি। দিন-কালের আবহাওয়া অনুযায়ী মহিলা-শিক্ষা কিরূপ উন্নত প্রণালীতে হওয়া উচিত, অবরোধ-প্রথার কিরূপ সংস্কার হওয়া উচিত—এ বিষয়ে বারান্তরে ভিন্ন প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

অবরোধ-প্রথার উচ্ছেদ সাধন মানসে অবরোধ-প্রথার দোষ দেখাইতে গিয়া মাননীয়া মিসেস্ আর, এস্, হোসেন সাহেবা মাসিক মোহাম্মদীতে ১৩৩৫ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া পর্য্যায়ক্রমে মহিলা-মহ্ফিল বিভাগে অবরোধ-বাসিনী নাম দিয়া সত্য ঘটনা উল্লেখে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করিয়া আসিতেছেন। উল্লিখিত ঘটনাগুলির ভিতর দিয়া তিনি অবরোধ-বাসিনীদিগের একশেষ দুর্দ্দশা দেখাইয়া অবরোধ-প্রথার কিরূপ ভয়াবহ অনিষ্ট সাধন হইতেছে, তাহা সমাজকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার চেষ্টা পাইতেছেন। মাননীয়া লেখিকা সাহেবার বর্ণিত ঘটনাগুলি একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলেই সেগুলি এতই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় যে, শিশুদিগের জন্ত লিখিত 'আষাড়ে গল্প' বা 'ঠাকুর-মার উপকথা'ও বুঝি এত অধিক পরিমাণে অস্বাভাবিকভাবে বর্ণিত হয় না। লেখিকা সাহেবা বলেন, অবরোধে বসবাস করায় মহিলাগণের কিছুমাত্র বুদ্ধি-বৃত্তি বিকাশ প্রাপ্ত না হইয়া স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তাহার ফলে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রতি কার্য্যে মহিলাগণ অস্বাভাবিকভাবে বিপদগ্রস্থা হইতে থাকেন। অবরোধ-প্রথা যতই কঠিন থাকুক না কেন, লেখা-পড়া শিক্ষার দ্বারা জ্ঞানার্জ্জন ব্যতীত প্রাকৃতিক শিক্ষার ফলে মানুষের যে সাধারণ বুদ্ধি-বৃত্তি বা জ্ঞানের উন্মেষ হয়; তাহা অবরোধ-প্রথা আট্কাইয়া রাখিতে পারে না। লেখা-পড়া শিক্ষার কোন সুযোগ কিছুমাত্র না পাইলেও কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তি যেরূপ প্রস্ফুটিত হয়, তাহাতেও মানুষের জীবন-যাত্রার পথে দৈনন্দিন কার্য্যের ঘটনাবলীতে কোনও অবরোধ-বাসিনীর পক্ষে লেখিকা সাহেবার লিখিত বর্ণনার মত বিপদগ্রস্থা হওয়া সম্পূর্ণরূপে অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। কেবলমাত্র হাবা, কালা, বোবা হইলেই বর্ণিত ঘটনাগুলি সংঘটিত হওয়া অনেকটা সম্ভবপর। লেখিকা সাহেবা সমুদয় ঘটনাগুলি নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার সুযোগ নিশ্চয়ই পান নাই। হয়তো সামান্ত একটু মাত্র সূত্র হইতে ক্রমশঃ পল্লবিত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত তিনি যেরূপ শুনিতে পাইয়াছেন, তাহাই আবার মার্জ্জিত ভাষায় পাঠক-পাঠিকাগণকে তিনি উপহার দিয়াছেন। প্রকাশের পূর্ব্বে লেখিকা সাহেবা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিতেন, সেগুলি উপকথায় পরিণত হইয়াছে। পর-পর সমস্ত বর্ণিত ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে গেলে, পর্য্যায়ক্রমে মাসের পর মাস প্রতি সংখ্যায় প্রতিবাদ-প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে হয়। তাহা মোটেই

সম্ভবপর নহে। লেখিকা সাহেবার বর্ণিত সামান্য কয়েকটী মাত্র ঘটনা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি।

মাসিক মোহাম্মদীর ১৩৩৫ সনের কার্ত্তিক সংখ্যায় অবরোধ-বাসিনী প্রবন্ধের ২য় দফার সংক্ষিপ্ত :—"বেহারাগণ সওয়ারী নামিয়াছে ভাবিয়া হাশমত বেগম ও তাঁহার শিশু-পুত্র সহ পাল্কী লইয়া চলিয়া গেল এবং বটতলায় পাল্কী রাখিয়া দিল। শিশু-পুত্রসহ বেগম সাহেবা শীতকালের সন্ধ্যা হইতে সারা-রাত্রি বটতলায় পাল্কীর মধ্যে আবদ্ধা থাকিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় সওয়ারী বহন করিবার জন্য বেহারাগণ পাল্কী লইয়া বাড়ীর দরজায় রাখিল। তখন দরজা খুলিয়া দেখা গেল, শিশু-পুত্রসহ বেগম সাহেবা পাল্কীতেই রহিয়াছেন। তিনি পাল্কী হইতে নামিবার পূর্ব্বেই বেহারাগণ পাল্কী ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তিনি টুঁ শব্দও করেন নাই, পাছে তাঁহার কণ্ঠস্বর বেহারাগণ শুনিতে পায়। শিশুকেও প্রাণপণ যত্নে কাঁদিতে দেন নাই—যদি তাহার কান্না শুনিয়া কেহ পাল্কীর দ্বার খুলিয়া দেখে।"

এখন কথা হইতেছে—সওয়ারী নামিয়াছে ভাবিয়া বেহারাগণ যখন পাল্কী লইয়া যায়, তখন তাহারা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিল না যে, পাল্কী খালি কি না। পাল্কী রীতি-মত ভারী ও দরজা বন্ধ, এরূপ অবস্থায় পাল্কী শূন্য নহে এরূপ বুঝিতে পারা খুবই স্বাভাবিক। সওয়ারী-পাল্কী ও খালি-পাল্কী তুলিতেই তাহা বুঝিতে পারা বেহারাগণের মধ্যে অতি সহজ। যদি ধরিয়া লওয়া যায়, সওয়ারী নামিয়াছে, এই বিশ্বাস বেহারাগণের ছিল! কিন্তু পাল্কী খালি নহে, ভারী বোধ হয়, সুতরাং কোন জিনিষ-পত্রাদি থাকা সম্ভব বিবেচনায় দরজা খুলিয়া দেখাও স্বাভাবিক। বেগম সাহেবা কথা-বলা দোষনীয় মনে করিলেও পাল্কীতে কোন শব্দ করিতে পারেন, ইহাও স্বাভাবিক। বেগম সাহেবা তাঁহার শিশু-পুত্রের কান্না প্রাণপণ যত্নে বন্ধ রাখিয়াছিলেন। শিশুর ক্ষুধা-তৃষ্ণার সময়ে হইলে তাহার কান্না কিরূপ ভাবে আটকাইয়া রাখা যায়, ইহা বুঝিতে পারা যায় না। বটতলায় পাল্কীতে বেগম সাহেবা আবদ্ধা থাকিলেন। ক্রমশঃ যখন রাত্রি অধিক হইতে থাকিল, তখন অবরোধ প্রথার চিন্তাকে ছাপাইয়া উদ্ধার লাভের উপায় চিন্তা করাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। পাল্কীতে ঐরূপ অবস্থায় একাকিনী থাকিয়া নানারূপ বিপদের আশঙ্কা মনে উদিত হওয়া ও তাহা হইতে সত্বর উদ্ধার-লাভের উপায় চিন্তা করাই স্বাভাবিক, না অবরোধ-রক্ষা করাই স্বাভাবিক? যদি উদ্ধার-লাভের উপায় চিন্তা করাই স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে রাত্রির অন্ধকারে পাল্কী হইতে বাহির হইয়া বাড়ীতে যাওয়া অতি সহজ ব্যাপার। বেহারাগণ পাল্কী রাখিয়া নিজ-নিজ কাজে ব্যস্ত আছে, তাহারা আহারাদি করিয়া নিদ্রা গেলেও বেগম সাহেবা পাল্কী হইতে চলিয়া আসিতে পারেন। পাল্কীর দরজা কিছু ফাঁক করিয়া কোথায় কি অবস্থায় তিনি আছেন, জানিবার ইচ্ছা হওয়া বেগম সাহেবার স্বাভাবিক। অবরোধ-প্রথা যত কঠোরই হোক্ না কেন, এরূপ অবস্থায় পড়িলে সেই অবরোধ-প্রথাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা কখনও সম্ভব নয়। যেরূপ পর্দ্দানশিন-সমাজ সম্বন্ধে উক্ত ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, সেই সমস্ত সমাজের সাধারণ নিয়ম এই যে, পাল্কীতে কোন মহিলা আগমন করিলে, আগমন সংবাদ বাটীর মধ্যে প্রথমে পাঠান হয়। তখন বিবি সাহেবাগণ আড়ালে গমন করিলে বেহারাদিগকে পাল্কী বাটীর মধ্যে লইতে অনুমতি দেওয়া হয়। তারপর বেহারাগণ পাল্কী বাটীর মধ্যে রাখিয়া বাহিরে আসে। তখন পাল্কীর আরোহিনী নামিয়া এবং অন্যান্য মহিলাগণ পুনরায় আড়ালে অবস্থান করিয়া খালি পাল্কী ফিরাইয়া লইবার জন্য বেহারাগণকে পুনরায় বাটীতে প্রবেশ করিতে বলা হয়। বিনা-অনুমতিতে বেহারা-গণ ভিতরে যাইতে পারে না, এরূপ স্থলে ভুল করিয়া বেগম সাহেবা সহ পাল্কী ফেরত লইয়া যাওয়া কিরূপ সম্ভবপর হইতে পারে?

উক্ত সংখ্যার ৩ দফার সংক্ষিপ্ত :—"সম্ভ্রান্ত জমীদারের মাতা, পিসি, মাসী, কন্যা ইত্যাদি ২০।২৫ জন মহিলা তাঁহাদের সঙ্গীয় হাজি সাহেবের উপদেশে মোটা-মোটা বোরকা পরিয়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে উবু হইয়া বসিলেন, তখন হাজি সাহেব একটা সতরঞ্চ দিয়া তাঁহাদিগকে ঢাকা দিলেন। ... জনৈক ইংরাজ-কর্ম্মচারী বস্তা মনে করিয়া জুতার ঠোকর মারিলেন ইত্যাদি।" হাজি সাহেব বেগম সাহেবাগণকে ওয়েটীং রুমে রাখিতে যদি সাহস না পান, তবে প্ল্যাটফরমের কোন নিভৃত-স্থান দেখিয়া উক্ত সতরঞ্চ বা কাপড়াদি দ্বারা ঘিরিয়া বেগম সাহেবাগণকে বসিবার জায়গা করিয়া দিতে পারিতেন। পর্দ্দানশিন

স্ত্রীলোকগণকে সেইভাবে রাখাই খুব স্বাভাবিক। প্ল্যাটফরম সর্ব্বসাধারণের যাতায়াতের রাস্তা। সেখানে পর্দ্দানশিন স্ত্রীলোকগণকে উবু করিয়া বসাইলেন, আবার সতরঞ্চ ঢাকা দিলেন। প্ল্যাটফরমের বিভিন্ন স্থানের লোকজন নিশ্চয়ই চক্ষু মুদিয়া ছিল না। এইরূপ ভাবে রাখা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। উবু হইয়া বসিয়া থাকা আর তাহার উপর সতরঞ্চ চাপা দেওয়া, একটা কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যখন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া দম আটকাইয়া যাইবার অবস্থাপ্রাপ্ত হইবে, তখন পর্দ্দার কথা, অবরোধের কথা ভুল হইয়া যাওয়া এবং শ্বাস-প্রশ্বাস করিবার মুক্ত বাতাস-লাভের জন্য প্রবল আগ্রহ হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। কঠোর অবরোধ-প্রথা মানিলেও ঐ অবস্থায় পাঁচ মিনিটের বেশী লোক কখনও থাকিতেই সক্ষম হইবে না।

উক্ত সংখ্যার ৫ম দফার সংক্ষিপ্ত :—"কোন বেহারী ভদ্রলোক সস্ত্রীক রেলে যাইতে স্ত্রীকে মহিলা গাড়ীতে না দিয়া বোরকা পরাইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়াছেন। পুরুষ ভদ্রলোকটী বাথ-রুমে গেলে তাঁহার বাথ-রুমে থাকা অবস্থায় কোন ষ্টেশনে ট্রেন থামে। তখন সেই ষ্টেশনে অন্য একজন পুরুষ ঐ কামরায় প্রবেশ করে। বেগম সাহেবা তখন বেঞ্চের-তলায় প্রবেশ করেন। তারপর ট্রেন ছাড়িয়া দিলে পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকটী বাথ-রুম হইতে আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার বিবি সাহেবা কামরায় নাই। পরের ষ্টেশনে তিনি রেল-পুলিশে সংবাদ দেন—তাঁহার বিবি সাহেবা হারাইয়া গিয়াছেন।......একজন কনেষ্টবল বেঞ্চের তলা হইতে বিবি সাহেবাকে বাহির করেন।"

সেকেণ্ড ক্লাশের উপযুক্ত ভদ্রলোক যদি তাঁহার স্ত্রী বশী পর্দ্দানশিন হন এবং মহিলা কামরায়ও রাখা না চলে, তবে তিনি কোন একটা কামরা রিজার্ভ করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। রিজার্ভ না করিলে অন্য পুরুষ উঠা তিনি বন্ধ করিতে পারেন না, ইহা তাঁহার জানা না থাকা সম্ভব নয়। ঐ পর্দ্দানশিন স্ত্রীলোককে মেয়ে-কামরায় দেওয়া বা রিজার্ভ কামরায় দেওয়াই খুব স্বাভাবিক। যদি ঐরূপ ভাবে সেকেণ্ড ক্লাশে উঠিয়া পড়েন, তবে কাপড়াদি লটকাইয়া দিয়া তাঁহাকে আড়াল করিয়া রাখা চলে। অন্য পুরুষ ঐ ট্রেণে উঠিলে স্বামী বাথ-রুমে ছিলেন। বিবি সাহেবা বরং বেঞ্চ হইতে নীচে নামিয়া একটু সঙ্কুচিত থাকিবেন, ইহাই কতকটা সম্ভব। বেঞ্চের-তলায় ঢুকিয়া পড়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। বেঞ্চের-তলায় একজন লোকের পক্ষে শয়ন করিয়াও থাকা আদৌ সম্ভব নহে। বিবি সাহেবা বেঞ্চের-তলায় ঢুকিলেন এবং দীর্ঘকাল সেখানে থাকিলেন, পরে একজন কনষ্টবল আসিয়া বাহির করিল। ইহা সম্পূর্ণভাবে অস্বাভাবিক কাহিনী। যে পুরুষ ঐ কামরায় প্রবেশ করিলে বিবি সাহেবা বেঞ্চের-তলায় ঢুকিয়াছিলেন, সেই পুরুষ ভদ্রলোকটী নামিয়া গেলেও বিবি সাহেবা বেঞ্চের-তলা হইতে বাহির হন নাই। বেঞ্চের তলায় নিশ্চয়ই বিবি সাহেবা আরামে ছিলেন না এবং উক্ত পুরুষ লোকটী কখন নামিয়া যায়, তাহা দেখিবার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব থাকা তাঁহার তখনকার অবস্থায় স্বাভাবিক; কারণ ঐ পুরুষ ভদ্রলোকটী নামিয়া গেলে বেঞ্চের-তলায় থাকার যন্ত্রণা হইতে তিনি অব্যাহতি পান। যাক্, একজন পূর্ণ বয়স্ক লোকের পক্ষে যখন বেঞ্চের-তলায় প্রবেশ করা এবং সেখানে সুদীর্ঘ সময় অবস্থান করা একেবারেই অসম্ভব তখন এই অস্বাভাবিক উপকথার বিষয়ে আর অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

ইহা অপেক্ষা আরও অস্বাভাবিক দুই-একটা ঘটনা যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কোন-ক্রমেই বিশ্বাস-যোগ্য হইতে পারে না। অবরোধ-প্রথার নিন্দা করিতে যাইয়া মাননীয়া লেখিকা কতকগুলি উপকথার অবতারণা না করিলেই বোধ হয় পাঠকগণ বেশী সুখী হইতেন।

সংগ্রহ

ইংলণ্ডের ধনাগম

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

এবার আমাকে আড়াই মাসের জন্য হঠাৎ ইউরোপে যাইতে হইয়াছিল। প্রথম যখন মার্সেল্‌স্ সহরে নামি, তখন মনে হইল, সে দেশের ঘোড়াগুলি যেন হাতীর মত। সকাল বেলা, বারো হইতে পনরো বছরের মেয়েরা স্কুলে চলিয়াছে, যেন নিটোল স্বাস্থ্যের জাজ্জ্বল্যমান প্রতিমূর্ত্তি। প্যারিস মার্সেল্‌স্ হইতে প্রায় ১৪।১৫ ঘণ্টার পথ। ফ্রান্স কৃষি-প্রধান দেশ। বাঙ্গালা-দেশকে কবিরা বলেন,—সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা; ফ্রান্সও অনেকটা সেইরূপ। সেখানে এক টুকরা ভূমিও খালি পড়িয়া নাই। নানা নদ-নদী ও স্বভাবজ ঝরণার জলে ফ্রান্সের সমতল-ভূমি সিক্ত হইতেছে; বরুণদেবও নিতান্ত বিরূপ নহেন। সুতরাং নানাপ্রকার ফল, শস্য, গম, যব, আলু, দ্রাক্ষা, কমলা-লেবু, আপেল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। লিওঁর (Lyons) রেশমের চাষ বিশ্ব-বিশ্রুত। গ্রাসে (Grasse) চামেলী প্রভৃতি নানাপ্রকার গন্ধ-দ্রব্য প্রচুর-পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্যারিসে যে হোটেলে আমি ছিলাম, তাহার নিকটেই একটী প্রসিদ্ধ বাগান (বাগিচা) আছে। সেখানে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রাতঃ-সন্ধ্যা মুক্ত-বায়ু সেবন করিতেছে; মুক্ত-প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ-পরিচয় পাইবার আশায় দলে-দলে লোক তথায় মিলিয়াছে। আর আমাদের এই বৃহৎ সহর কলিকাতার যুবকগণের উন্মুক্ত মাঠে যাইবার খেয়াল হয় সেই দিন—যেদিন মোহনবাগান বা অন্য কোন প্রসিদ্ধ দলের খেলা ময়দানে থাকে, তাহাও যদি যাতায়াতের সময়ে নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে দুঃখ করিবার কিছু থাকিত না। ফুলের প্রতি সমগ্র ফরাসী-জাতির অগাধ ভালবাসা। প্রতি-মোড়ে ফুলের দোকান। এক পয়সা, দুই পয়সা হইতে আরম্ভ করিয়া চারি-পাঁচ টাকা মূল্যের ফুল বা তোড়া যাহার যেমন সাধ্য কিনিতেছে। পূর্ব্ব-বঙ্গে খদ্দর প্রচার উপলক্ষে অনেকে আমাকে দয়া করিয়া ফুলের মালা দিয়া সংবর্দ্ধিত করেন; কিন্তু সে সব বন-ফুলের তীব্র গন্ধে আমার শিরঃ-পীড়া উপস্থিত হয়। আমাদের দেশে ফুলের চাষ উঠিয়া গিয়াছে; বরং ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে অনেক সৌখিন ব্যক্তি সখ করিয়া ফুলের বাগান করিতেন। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই কলিকাতার ময়দানে ধনী-সন্তানগণের মধ্যে ঘোড়ায় চড়ার রেওয়াজ ছিল, এখন উঠিয়া গিয়াছে।

ক্যালে বন্দরে জাহাজে চড়িয়া ডোভারে আসিয়া নামিলাম। কে বলে ইংলণ্ডে শুধু ইট-কাঠ-পাথরের স্তূপ। ডোভার হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত রেলের দুই পার্শ্বে চাষের জমি; মাঝে-মাঝে স্থূলকায় বৃষ স্বচ্ছন্দে চলিতেছে বা শুইয়া আছে। আর আমাদের দেশের গোজাতির কি দুর্দ্দশা! ইংলণ্ডের শতকরা ৮০ জন লোক সহরে বাস করে। সেখানে বছরে যত শস্য হয়, তাহাতে ৩।৪ মাসের বেশী কুলায় না। কিন্তু যখনই রেলের দুই পার্শ্বে চাহিয়া দেখি, তখনই যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখি, শস্যের ক্ষেত। লণ্ডন হইতে এডিনবরা যাইবার পথে, মিড্‌ল্যাণ্ড রেলওয়ের দুই পার্শ্বে শুধু শস্য ও ঘাসের ক্ষেত।

সেখানে দুধই বা কি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মিলে! প্যারিসে খাঁটী দুধ টাকায় ৮ সের পাওয়া যায়। লণ্ডন সহরের লোক-সংখ্যা ৭০ লক্ষ; উত্তরে বারাকপুর আর দক্ষিণে বজবজ, পূর্ব্বে ভাঙ্গড় ও পশ্চিমে কদমতলা—কলিকাতার সীমানা বাড়াইয়া দিলে যাহা দাঁড়ায়, লণ্ডনের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কের কেন্দ্র বাদ দিলেও প্রায় সেইরূপ হয়।

এই লণ্ডন সহরে কেহ ১১টা ১২টার আগে রাত্রিকালে শুইতে যায় না; সুতরাং সকালে উঠিতে একটু দেরী হয়; আর শীত-প্রধান দেশে ভোরও হয় একটু বিলম্বে। সেখানকার সকাল সাতটা আমাদের দেশের রাত্রি চারিটার সমান।

ভোর হইবার পূর্ব্বে ৭০ লক্ষ লোকের দুধ টিনে বোঝাই হইয়া লণ্ডনের উপকণ্ঠস্থ গ্রাম হইতে রেলে আসিয়া হাজির হয়। আর সকাল ৭টার পূর্ব্বে টিনে বা বোতলে করিয়া এই দুধ লণ্ডনের অধিবাসীর দুয়ারে উপস্থিত হয়। এই দুধ কেহ হস্তের দ্বারা স্পর্শ করে না। কোন রকম দুষ্ট জীবাণু ইহার ভিতর ঘর-কন্না পাতাইতে পায় না। গোয়ালা আসিয়া সুপ্ত গৃহস্বামীকে বিরক্ত করে না, নিঃশব্দে দ্বারের পার্শ্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে দুধের পাত্র রাখিয়া চলিয়া যায়। কোন রকম গোলযোগ নাই, গোয়ালার সহিত বকাবকি নাই, সবই যেন কলে চলিতেছে। আবার ১২টা ১টায় খালি পাত্র সংগৃহীত হইয়া সহরতলীতে চালান হইয়া যাইতেছে। বৎসরে তিনশত পঁয়ষট্টি দিন এই ব্যাপার যন্ত্র-চালিতের মত চলিয়া যাইতেছে; একদিনের তরেও বিকল হইতেছে না। শুধু লণ্ডন বলিয়া নহে, এডিনবরা, ম্যাঞ্চেষ্টার যেখানেই গিয়াছি, সেইখানেই এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি। আর সে দুধই বা কি ঘন ও সুমিষ্ট! কৃষি-মন্ত্রী, স্বাস্থ্য-সচিব সকলেরই নজর আছে যেন পীড়িত গাভীর দুধ বিক্রয় না হয়। সর্ব্বদাই গরুর পরীক্ষা চলিতেছে, যক্ষ্মা বা অ্যান্থ্রাক্স (anthrax) রোগ-দুষ্ট গরু বিনা বাক্যব্যয়ে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হইতেছে এবং সঙ্গে-সঙ্গে পোড়াইয়া ফেলিয়া রোগের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করা হইতেছে, পাছে ব্যাধি সংক্রামিত হইয়া মহামারিতে পরিণত হয়। দুধও টিনে বা বোতলে পুরিবার পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা হইতেছে। দামও প্রায় কলিকাতার কাছাকাছি, টাকায় আড়াই সের হইতে তিন সের, আবার পাড়ায়-পাড়ায় দুধের আড়ৎ (Dairy) আছে। সেখানে গব্য সব জিনিষ, যথা পনীর, ননী প্রভৃতি এবং ডিম যথেষ্ট পরিমাণে মজুত থাকে। যাহার খুসী যখন-তখন আসিয়া খাইয়া বা লইয়া যাইতেছে। কলিকাতার কথা ছাড়িয়া দিন, মফঃস্বলেও বৎসরে অধিকাংশ দিন

৪।৫ আনা সেরের কম দুধ পাওয়া যায় না। ঘাসের চাষের সুবন্দোবস্ত সেখানে আছে; বৎসরে দুই তিন বার ফসল কাটা হয়। গ্রীষ্মকালে যখন প্রচুর ঘাস জন্মে, তখন শুকাইয়া রাখা হয়, যাহাতে শীতের সময়ে কম না পড়ে। তাহা ছাড়া গরুর জন্য শালগম, বীট প্রভৃতি ফসলের রীতিমত চাষ করা হয়। সেদিন আমি একটী ডেয়ারী-ফার্ম (গোশালা) দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিয়া মনে হইল যে, জাতি—ইংরাজ। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে একটা গরু একমণ দুধ দিয়াছিল বলিয়া খবরের কাগজে হুলুস্থূল পড়িয়া যায়; অবশ্য সাধারণ গরু প্রতিদিন ১৫ সের হইতে আধ মণ পর্য্যন্ত দুধ দেয়। ইংরাজ অবশ্য গো-খাদক জাতি; কিন্তু আমাদের দেশে গো-মড়কে যত গরু মরে, তাহার এক চতুর্থাংশও ইংরাজ খায় কিনা সন্দেহ। খাইবার জন্যই গরুর সংখ্যা আমাদের দেশে কমিতেছে, একথা মোটেই সত্য নহে। আসল কথা, আমরা মুখে বলি, আমাদের গোমাতার প্রতি ভক্তি অসাধারণ, কিন্তু গোজাতিকে আমরা যে তাচ্ছিল্য করি, বিলাতের গো-খাদক জাতিও সেরূপ করে না।

একজন ইংরাজ গড়ে কত খায়! শুধু মদই কত পান করে—হুইস্কী, বিয়ার—সব তাহাদের নিজস্ব। অবশ্য কিছু কিছু সাম্পেন্‌শেরী ফ্রান্স হইতে আইসে। ইংলণ্ডে দুনিয়ার অর্থ ঝাঁটাইয়া আইসে। বাল্যে পড়িয়াছিলাম—ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের দুগ্ধবতী গাভী; আমার মনে হয়, একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। সারা পৃথিবীই ত ইংলণ্ডের দ্বারে অর্থের ডালি লইয়া উপস্থিত; ভাগ্যবান জাতি ইহাকেই বলে। ইংলণ্ডের প্রতি আট জনের একজনের অন্ন-সংস্থান ভারতবর্ষের উপর নির্ভর করে।

আসাম ও বাঙ্গালার যত চা-বাগিচা আছে, তাহার শতকরা সাতানব্বই ভাগ ইংরাজের। শতকরা তিন ভাগ বাঙ্গালী ও আসামীর। অর্থাৎ যখন আমরা এক শত টাকার চা কিনি, তখন ৯৭৲ টাকার অধিক শ্বেত-দ্বীপে গিয়া হাজির হয়। কয়লার খনি গিরিডি, ঝরিয়া, আসানসোল প্রভৃতি স্থানে আছে। ইহাদের মধ্যে গভীর খাদ যেগুলি, তাহা প্রায় সবই ইংরাজের। কেনিয়া-কয়লা আমদানি হওয়ায় ইংরেজ মালিকের বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই, কিন্তু বাঙ্গালী ও মাড়োয়ারীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

পাটের কল বাঙ্গালাদেশে প্রায় ৮০টি। দুইটি মাড়োয়ারীর আর বাকী সব ইংরাজের ও স্কট্‌লণ্ডবাসীদিগের। বৎসরে ৫০।৬০ কোটি টাকার কাঁচা-পাট বাঙ্গালা-দেশে উৎপন্ন হয়। তাহার পর, সূতা ও বস্তায় পরিবর্ত্তিত হইলে ইহার মূল্য অনেক গুণ বাড়িয়া যায়। এ সব টাকা পায় স্কট্‌লণ্ডের তাঁতীর বণিকেরা।

আসাম ও বাঙ্গালা দেশের উপকণ্ঠে তৈলের খনি আছে; কিন্তু মালিক ইংরাজ। বর্ম্মায় সেগুন কাঠ, তৈলের খনি, মূল্যবান চুনী সবই ইংরাজের হাতে কেনা-বেচা হইতেছে। মহীশূরের অন্তর্গত কোলার প্রদেশের স্বর্ণের খনি ইংরাজ চালাইতেছে ও শতকরা এক শত টাকা লভ্যাংশ প্রতি বৎসর দিতেছে। কি অসাধারণ অধ্যবসায়। ২৮ মণ পাথর হইতে নানা প্রক্রিয়ার পর এক পেনী-ওজনের সোণা বাহির হয়।

পৃথিবীর মালবাহী জাহাজের অধিকাংশই ইংরাজের। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ডের ৬ শত কোটি টাকার জিনিষের লেন-দেন কারবার হয়। আর যে সকল জাহাজে এই সকল জিনিষ যাওয়া-আসা করে, তাহাদের দুই-চারিখানি ছাড়া সমস্তই ইংরাজের। আর এক-একখানি জাহাজের ভার-বহনের ক্ষমতাই বা কি! ইংলণ্ডের Ocean Liner কোম্পানীর vaterland (Leviathan) জাহাজখানি পঞ্চাশ হাজার টন-বাহী; আর একখানি ষাট হাজার টনের জাহাজ তৈয়ারী হইতেছে। ইহাদের মধ্যে বাগান, নাচ-ঘর, মজলিস-ঘর সমস্তই আছে। একবার ইহাদের এক-একখানির দাম জানিবার বাসনা হইয়াছিল। অনুসন্ধানে জানিলাম, ১৬ হাজার টন জাহাজের মূল্য অনুমান দেড় কোটি টাকারও অধিক ($1\frac{1}{2}$ million sterling); সুতরাং ত্রৈরাশিক নিয়মানুসারে পঞ্চাশ হাজার টন জাহাজের মূল্য কষিয়া বাহির করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য নহে। লয়েডের খাতা (Lyod Register) হইতে জানা যায় যে, সুয়েজ প্রণালী দিয়া যে সকল জাহাজ যাতায়াত করে, তাহার শতকরা নব্বইটা ইংরাজের।

—বাংলার-বাণী

ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প

"টেক্‌স্‌টাইল রেকর্ডার" নামক বস্ত্র-ব্যবসায় সম্পর্কিত কাগজে, ল্যাঙ্কাসায়ার হইতে ভারতে আমদানী-বস্ত্রের হিসাব দিয়া দেখান হইয়াছে, ভারতে ইংলণ্ডীয় বস্ত্রের আমদানী বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ল্যাঙ্কাসায়ার হইতে ভারতে কাপড় আমদানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল—৩,০৫৭, ৩০৫,৩০০ গজ; তারপর মহাযুদ্ধ এবং মহাযুদ্ধের অবসানে—বাণিজ্য সম্পর্কিত হাঙ্গামাদি চুকিয়া গেলে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে, আমদানী বিলাতী কাপড়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৩০৭,৬৪৪,১০০ গজ। তাহার পর হইতে ১৯২৯ পর্য্যন্ত গড়-পড়তা প্রতি বৎসর ১,৪১৬,২১৬,০০০ গজ কাপড় আমদানী হইয়াছে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সেই সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে, ৭৭৪,০৭৯,৫০০ গজ। ১৯১৩এর তুলনায় বর্ত্তমান পরিমাণ এক-চতুর্থাংশ মাত্র। অর্থাৎ ১৯১৩ এবং ১৯৩০এর মধ্যে ভারতের বাৎসরিক আমদানী হ্রাস পাইয়াছে ১,৫৭৪০ লক্ষ গজ। ঐ সময়ে জাপান হইতে আমদানী কাপড়ের পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে ৩১৪০ লক্ষ গজ। ভারতে যত বিদেশী বস্ত্র আমদানী হইত, তাহার শতকরা ৭২·৬ ভাগ আসিত ইংলণ্ড হইতে, ১৯৩০এ মাত্র ২১·৩ ভাগ আসিয়াছে।

পক্ষান্তরে ভারতীয় কলগুলিতে ১৯১৩ হইতে ১৯৩০এ ১,৫৭৪০ লক্ষ গজ কাপড় বেশী তৈয়ার হইয়াছে। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের নিজস্ব বস্ত্রের দ্বারা ২৭·২ ভাগ পূরণ হইত; বর্ত্তমানে ঐ পরিমাণ ৭০ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। জাপান ১৩·৩ ভাগ বস্ত্র আমদানী করিত, কিন্তু বিদেশী বস্ত্রের উপর রক্ষণশীল শুল্ক স্থাপিত হওয়ায় ঐ সংখ্যা নামিয়া ৯·৫ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। ল্যাঙ্কাসায়ারের ভারতীয় বাণিজ্যের লোকসান হিসাব করিলে মোটা-মুটি বলা যায়, ২ লক্ষ ২৭ হাজার তাঁত এবং ১ কোটি ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার সূতা কাটিবার টাকু বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ তাহার প্রয়োজনের মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ কাপড় বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াছে। ইহা অবশ্য বয়কট আন্দোলনের ফল। বয়কট আন্দোলনের ফলে গত বৎসর ইংলণ্ড হইতে ১০০ কোটী গজ কম কাপড় ভারতে আসিয়াছে। ল্যাঙ্কাসায়ারের কলওয়ালারা যে আর্ত্তনাদ করিয়া বৃটিশ পার্লামেণ্ট কাঁপাইয়া তুলিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? কার্পাস-বস্ত্রের আমদানী হ্রাস পাইলেও সকল রেশমী সূতা ও বস্ত্র আমদানী বিশেষ হ্রাস পায় নাই। ১৯২৯-৩০এ ৫৭০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯৩০-৩১এ ৫১০ লক্ষ পাউণ্ড সকল রেশম ভারতে আসিয়াছে। ১৯২৯-৩০এ জাপান হইতে আসিয়াছিল ৩৮০ লক্ষ পাউণ্ড। এই সকল রেশম দিয়া ভাগলপুর, কাশী, দেরাদুন, মাদ্রাজে সাড়ী, থান তৈয়ারী হয়। বোম্বাই, আমেদাবাদ এর দেশী তাঁতের কাপড়ে চটকদার পাড় প্রভৃতি তৈয়ারের জন্য ইহা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

বিদেশী কার্পাস-সূত্র আমদানীর হিসাবে দেখা যায়, ১৯২৯—৩০এ ৪৪০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা আসিয়াছিল, পর বৎসর আসিয়াছে ২৯০ লক্ষ

পাউণ্ড। পরে আসিয়াছে ১০০ লক্ষ পাউণ্ড। তৎপর জাপান হইতে ১০০ লক্ষ পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে আসিয়াছে ৭০ লক্ষ পাউণ্ড। এই বিদেশী সূতায় মাদ্রাজ ও বাঙ্গালায় তাঁতের সাড়ী ও ধুতি তৈয়ারী হয় এবং বোম্বাইয়ের কলে বিদেশী সূতায় কিছু কাপড় তৈয়ারী হয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় প্রচুর বিদেশী সূতা আসিয়াছে। এই বিদেশী সূতা কোন কোন কাপড়ের কল এবং তাঁতিরা ব্যবহার করিয়াছে।

এই সকল সংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, জাতির স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারে অনুরাগ বৃদ্ধি এবং আমদানী বিদেশী বস্ত্রের উপর রক্ষণমূলক কিছু শুল্ক প্রতিষ্ঠা হওয়ায় ভারতের বস্ত্র-শিল্প আজ পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। বলাবাহুল্য বোম্বাইয়ের বড় বড় কলওয়ালা ধনীরা এই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছেন। আমেদাবাদও পশ্চাদ্বর্ত্তী নহে। আমেদাবাদে ৬টি নূতন কাপড়ের কল হইতেছে; তাহার মধ্যে ৪।৫ টিতে শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হইবে। বোম্বাই ও আমেদাবাদের কোন কোন পুরাতন কলে নূতন যন্ত্রপাতি আনান হইতেছে।

কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতিও প্রতিযোগিতায় অপেক্ষাকৃত সস্তায় বিক্রয় হইতেছে। কেননা ইংলণ্ডে যাহারা কল-কব্জা তৈয়ার করে, তাহাদের কল-কব্জা আর ম্যাঞ্চেষ্টার বা ল্যাঙ্কাশায়ারে বিক্রয় হইতেছে না। ফলে ভারতে নূতন কাপড়ের কল করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই সুবিধা গ্রহণ করিয়া আজ আমেদাবাদ, বোম্বাইয়ের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুক্ত-প্রদেশ, মধ্য-ভারত এবং পাঞ্জাবের কাপড়ের কলগুলিও যথেষ্ট লাভ করিতেছে।

কিন্তু বাঙ্গালাদেশ এই অবস্থার বিশেষ সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। বাঙ্গালাদেশে বাৎসরিক ১৫ কোটি টাকার কাপড়ের দরকার হয়। বঙ্গলক্ষ্মী, মোহিনী, ঢাকেশ্বরী, কেশোরাম প্রভৃতি মিলে মোট বাৎসরিক এক কোটী টাকার কাপড় উৎপন্ন হয় কিনা সন্দেহ! বাঙ্গালাদেশে আরও কয়েকটি নূতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে। অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ও ধনীরা এবিষয়ে তৎপর না হইলে, বাঙ্গালাকে বহুল পরিমাণে বোম্বাই, আমেদাবাদ অথবা জাপান এবং ল্যাঙ্কাশায়ারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে।

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের ত্রৈমাসিক সভায়, অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী, অর্থনীতিজ্ঞ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়, বোম্বাই ও আমেদাবাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ প্লাবন হইতে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর ব্যবসায় ও শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট যে সময়োচিত ও যুক্তিপূর্ণ সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, যদি তাহা বণিক-সভার সদস্যগণ হৃদয়ঙ্গম করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালীর জন্য নব নব কর্ম্মক্ষেত্র সহজেই রচিত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত সরকার যথার্থই বলিয়াছেন, "নব নব উদ্যম প্রকাশ ব্যতীত ব্যবসায় ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ হয় না। অর্থ নিরাপদে রাখাই মূল লক্ষ্য হইলে, ব্যবসায় হয় না। আমরা (বাঙ্গালী) সমস্ত টাকা জমীতে, জমীদারীতে আট্কাইয়া রাখি, কিন্তু বাড়ী বা জমিদারীর অপেক্ষা কৃষিকার্য্যের আয় হইতে বেশী লাভের সম্ভাবনা। আমরা ভুলিয়া যাই যে, অত্যধিক জমিদারী-প্রীতির ফলে বাঙ্গালীর অর্থ একই ক্ষেত্রে নিযুক্ত হইয়া বাঙ্গালীকে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বিদেশী ও অন্যান্য প্রদেশের অধীন করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালীর দুঃখ-দুর্দ্দশার এই এক প্রধান কারণ।"

বাঙ্গলার ধনিগণ কি এই শুভ সময়ে বাঙ্গালীর বস্ত্র-শিল্পকে সমৃদ্ধ করিয়া লাভবান হইবার এই সুযোগ ত্যাগ করিবেন? বাঙ্গালায় অন্ততঃ আরও ২৫টী কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। বাংলার ধনীরা এদিকে লক্ষ্য করিলে এ সমস্যার সমাধান বড় একটা শক্ত বিষয় হইবে না বলিয়া আমাদের ধারণা।

—জয়শ্রী

পৃথিবীর রাস্তা-ঘাট

পৃথিবীর রাস্তা-ঘাটের যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, বিগত ১৯২৯ সালের শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর রাস্তার পরিমাণ মোট ৭৮ লক্ষ, ৫ হাজার ৬ শত ২৯ মাইল ছিল। ১৯২৯ সালেই সমস্ত পৃথিবীতে ১২ লক্ষ, ২৩ হাজার, ৬ শত, ২৮ মাইল রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দিন-দিন উন্নতভাবে চলাচলের ইচ্ছা লোকের মনে কি ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, এই বিবরণী হইতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য-বিভাগ অতিশয় আয়াস স্বীকার করিয়া এই বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। আমেরিকা গভর্ণমেণ্ট অন্যান্য দেশের সরকারী রিপোর্ট ও বিভিন্ন দেশে যে সকল আমেরিকান কন্‌সাল আছেন, তাঁহাদের প্রদত্ত রিপোর্ট হইতে এই বিবরণী সংগ্রহ করিয়াছেন।

ইউরোপ ও আমেরিকা:—ভূমির পরিমাণের অনুপাতে পৃথিবীর পাঁচটী মহাদেশের মধ্যে ইউরোপের স্থান সর্ব্বোচ্চে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার রাস্তার পরিমাণ এক সঙ্গে গ্রহণ করিলে আমেরিকাই প্রথম স্থান অধিকার করিবে। কিন্তু আমেরিকা ও ইউরোপের ভূমির পরিমাণ তুলনা করিলে প্রথম স্থান ইউরোপেরই প্রাপ্য।

রাস্তার পরিমাণ:—আমেরিকা ৩৭২৭৩৬৩ মাইল, আফ্রিকা ২৬২৯-২০ মাইল, এশিয়া ১০১৪০১৪ মাইল, ইউরোপ ২৪৫০৪৩৭ মাইল, অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড ইত্যাদি ৩৫০৮৬৩ মাইল।

অনুন্নত রাস্তা:—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার রাস্তার দৈর্ঘ্য একযোগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলেও ২৭ লক্ষ, ৬৫ হাজার ৯ শত ৬১ মাইল রাস্তা অনুন্নত। অন্যান্য মহাদেশের অনুন্নত রাস্তার পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল:—ইউরোপ ৫৮৯১৮ মাইল, আফ্রিকা ১২৯৩৩৭ মাইল, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড ২৩৭০১১৮ মাইল, এশিয়া ৫৭৮৮৮৮ মাইল।

পাকা রাস্তার পরিমাণ:—পাকা রাস্তার পরিমাণ ইউরোপে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কোন্ দেশে কত পাকা রাস্তা আছে, নিম্নে তাহার দৈর্ঘ্যের পরিমাণ দেওয়া হইল:—ইউরোপ ৩৭০৮৫৮ মাইল, এশিয়া ১০৬৮১২ মাইল, আমেরিকা ৮১০৮১ মাইল।

পাথর বাঁধান রাস্তা:—পাথর বাঁধান রাস্তা এশিয়াতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কোন্ মহাদেশে কত পরিমাণ পাথর বাঁধান রাস্তা আছে, নিম্নে তাহার দৈর্ঘ্যের পরিমাণ দেওয়া হইল:—এশিয়া ৭৯৫৮ মাইল, ইউরোপ ৬৮৮৭ মাইল, আফ্রিকা ১৩৫২ মাইল।

আলকাতরা দ্বারা পাকা করা রাস্তা:—ইউরোপ ও আমেরিকায় রাস্তা পাকা করিতে আলকাতরা খুব বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আলকাতরার সাহায্যে বাঁধান রাস্তার পরিমাণ ইউরোপে ৩ হাজার ৬ শত ৮০ মাইল এবং আমেরিকায় ৩ হাজার ৩ শত ২৯ মাইল।

বিলাতী মাটির বাঁধান রাস্তা:—রাস্তা শক্ত করিতে হইলে কঙ্কর ও বিলাতী মাটীই (সিমেণ্ট) সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। ইউরোপ ও আমেরিকায় বিলাতী মাটির ব্যবহার অত্যন্ত অধিক। আমেরিকার ও ইউরোপের রাস্তার মধ্যে যথাক্রমে ৫৬৬৩৪ ও ১১০২ মাইল রাস্তা বিলাতী মাটি ও কঙ্করের সাহায্যে শক্ত করিয়া পাকা করা হইয়াছে।

ইটক দ্বারা বাঁধান রাস্তার পরিমাণ আমেরিকা ও ইউরোপে যথাক্রমে ৪৫১৮ ও ১৪০ মাইল।

—সঞ্জীবনী

পরহেজগার

— নক্‌শা —

—ইব্রাহীম খাঁ, এম-এ, বি-এল্

মক্তবের ছাত্র আবদুল হক পাশের ঘরে বসিয়া প্রথমে মাথা ঘুরাইতে ঘুরাইতে, পরে ঝিমাইতে ঝিমাইতে ক্রমাগত আবৃত্তি করিয়া যাইতেছিল,—"পরহেজগার অর্থ ধর্ম্ম-ভীরু, পরহেজগার অর্থ ধর্ম্ম-ভীরু......উ...উ...উ............"

ডাক দিলাম—'আবদুল হক'.........।

আবদুল হক ধড়ফড়াইয়া উঠিয়া আওয়াজ দিল—"উ...উ...আঁ...আঁ...পরহেজগার, পরহেজগার, পরহেজগার..."

ফের ডাক দিয়া বলিলাম, "পরহেজগার কি রে ?"

উত্তর দিল—"এই—এই—এই—ভীরু, ভীরু, ভীরু...পরহেজগার অর্থ ভীরু, পরহেজগার অর্থ ভীরু, পরহেজগার অর্থ ভীরু...।"

এবার ধমক দিলাম, "বই দেখে পড় না।"

একটু বিলম্বে, উত্তর পাইলাম—"দোয়াতটা কেমন ক'রে উল্টে গিয়ে ধর্ম্মের উপর কালি পড়ে গেছে, শুধু 'ভীরু' টুকু বাকী আছে।"

হঠাৎ মনে হইল, সত্যই কি পরহেজগারের ধর্ম্মে কালি পড়ে গেল, সে এখন শুধু ভীরু ?

কয়েকজন পরহেজগারের কথা মনে পড়িল।

(১)

তখন পড়ি। বর্ষাকাল। শুক্রবার। মছজিদে গিয়া একজন নূতন লোক চোখে পড়িল,—শুনিলাম তিনি মদিনা হইতে আসিয়াছেন। বিশ্বাস হইল। বাস্তবিক তাঁহার মুণ্ডিত মস্তক, চতুর্ভুজ আকৃতি, জরীর পাগড়ী, সুরমা-আঁকা চোখ, তলোয়ারের ধারের মত অতি সূক্ষ্ম গুম্ফ-রেখা, মাথা হইতে ঝুলান বিস্তীর্ণ রেশমী রুমাল, অতি লম্বা, অতি লম্বকাল লেবাছ, গর্ব্বিত গতি, গম্ভীর বদন, প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক কটাক্ষ দেখিয়া যে কেহ মনে করিতে পারিত, ইনি হয় ত আমীর কয়ছলের সাক্ষাৎ বৈমাত্রেয় ভাই ; দুনিয়ার দাগায় দিল-রঞ্জিদা হইয়া আখেরের ছওদা হাছেল করিতে এই দারুল হরবে তবলিগে বাহির হইয়াছেন। নমাজ অন্তে হোষ্টেলে ফিরিলাম।

কিছুক্ষণ পরে একটি বিজ্ঞাপন হাতে পড়িল ; তাহার মর্ম্ম এই :—পীরানে পীর, আমীরুল মোহাদ্দেছিন, রঈছুল মোফাচ্ছেরীন, ফখরুল ওয়ায়েজীন, হাজী, পুর-নুর, হজরত শা......কাকী ছাহেব মেহেরবানী করিয়া এতদঞ্চলে তশরীফ আনিয়াছেন ; যে যেখানে যে অবস্থায় আছ, অবিলম্বে তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া তাঁহার সঙ্গে যে সব তবরুরোক আছে, তাহার জিয়ারত করিয়া আখেরাতের নাজাত হাছেলের রাস্তা খোলাছা কর। খবরদার ! এই তবরুরোক যে অবিশ্বাস করিবে, সে কাফের মরদুদ হইবে।

'কাফের—মরদুদ !' মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। বিজ্ঞাপন বিলি-কর্ত্তা আরও জানাইল,—নামাজ বাদ শাহ্‌ ছাহেব তবরুরোক টেবিলের উপর রাখিয়া সবাইকে দেখাইয়াছেন ; তাহার পর সেই টেবিল মছজিদের ইমাম ছাহেবের মাথায় দিয়া নিজ নৌকায় নিয়াছেন ; যে-সে তবরুরোকের টেবিল ছুঁইতে পারে না ; ইমাম ছাহেব ছুঁইতে পারেন বটে, তবে হাত দিয়া ছুইলে বেয়াদবী হয়, তাই তাঁহাকে টেবিলের নীচে গিয়া বসিয়া টেবিল মাথায় লইয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে।

আমাদেরই ইমামের মাথায় টেবিল !—তাও আবার টেবিলের নীচে গিয়া তবে মাথায় !!

পাশের ঘরে গিয়া মাষ্টার ছাহেবকে সব কথা বলিতেই তিনি উঠিয়া বলিলেন, "চল যাই।" মৌলভী ছাহেবও সঙ্গে চলিলেন।

গিয়া দেখিলাম, গ্রামের কয়েকজন মুছুল্লীকে শাহ্ ছাহেবের জনৈক চেলা মদিনার রওজা মোবারকের মোমবাতি দেখাইতেছেন ও মুছুল্লীরা তাহা টুকরা টুকরা করিয়া খরিদ করিতেছেন। রওজা মোবারকের মোমবাতির নাজাত-দান শক্তিতে বিশ্বাস না করিলে কাফের মরতুদ হইতে হয়, ইহা কোরাণ, হাদিছ বা ফেকার কোথায় আছে, মৌলভী ছাহেব শাহ্ ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শাহ্ ছাহেব কখনও আমতা-আমতা করিয়া, কখনও ধমক দিয়া আসল কথা এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন। সুতরাং আলোচনা অধিকক্ষণ নরম রহিল না।

এমন সময়ে সেখানে যিনি আসিলেন, তাঁহাকে শুধু আমাদের অঞ্চলের সমস্ত লোক নয়, তাঁহার পরিচিত বাহিরের সমস্ত লোকেও মনে-প্রাণে গভীর ভক্তি করিয়া থাকে—তাঁহার চির-নির্ম্মল চরিত্র, তাঁহার অচল ধর্ম্মনিষ্ঠা, তাঁহার মধুর অমায়িক ব্যবহার, তাঁহার সুদৃঢ় সত্য প্রিয়তার জন্য। আমরা এখানে তাঁহাকে ক ছাহেব বলিব। আমরা ক ছাহেবকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিলাম। তিনি উপস্থিত আলোচনার কিঞ্চিৎ শুনিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মৌলভী সাহেব তাঁহাকে একটু অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করায় তিনি কানে-কানে বলিলেন, "না ভাই, আমি যাই, কার মধ্যে কি আছে, কে জানে?" তখন উপস্থিত আর নৌকা না থাকায় আমি শাহ্ ছাহেবের নৌকায় তাঁহাকে পার করিয়া দিতে ইচ্ছা করায় তিনি দুই হাতে মানা করিয়া বলিলেন, "ঐ মোমবাতি ত নৌকায় আরো আছে; আমি ও তাবাররোকের নৌকায় পা দিব না।" তিনি জুতা-মোজা খুলিয়া, পা-জামা টানিয়া পানিতে হাঁটিয়া পার হইয়া গেলেন।

বিজ্ঞাপন সংশোধনের প্রতিজ্ঞা করিয়া শাহ্ ছাহেব তখনই নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। আমাদের অনুপস্থিতিতে লোকে বলাবলি করিল,—"একটা কামেল লোক এসেছিল, দুষ্টেরা টিক্‌তে দিল না। মৌলভী ছাহেব কোরাণ-হাদীছে হাজার লায়েক হউন না কেন, পরহেজগার ত নন; পরহেজগার যিনি তিনি এ সব বাজে আলাপের আঁচ পেয়ে আগেই চলে গেলেন।"

(২)

গ্রামে হাজার দুই পরিমাণ মুছলমান বাসিন্দা। নানা কারণে অনেকদিন হইতে গ্রামটীর সঙ্গে পরিচয়। গ্রামে ঝগড়া-বিবাদ আদৌ ছিল না, এমন বলা যায় না; গরু-বাছুরে ক্ষেত খাওয়া লইয়া বচসা শুনিয়াছি; জুমার নমাজ বাদ মুছুল্লীদিগকে দল বাঁধিয়া গিয়া মাঠে আইল ভাঙ্গার কলহ মিটাইতে দেখিয়াছি, তার বেশী কিছু কখনও নজরে পড়ে নাই, কানেও আসে নাই।

সেই গ্রামে অকস্মাৎ খুনাখুনি হইয়া গেল—শুনিয়া গেলাম। সংবাদ লইয়া যাহা জানিলাম, তাহার মর্ম্ম এই—প্রায় এক বৎসর কাল আগে গ্রামের দক্ষিণ-পাড়ার মোড়ল বাড়ীতে এক পেশোয়ারী মওলানা ছাহেব আসিয়া উঠেন এবং পাড়ার লোকের নমাজ, রোজা, অজু, গোছল বিষয়ে বহুত গলত তাঁহার নজরে পড়ে। তিনি সে সবের সংশোধন করতঃ চুল পরিমাণ মত লম্বা রাখিয়া কিরূপে ছোয়ত, বাবড়ীর ছওয়াব হাছেল করিতে হয়, মিলাদ মহফেল করা কি কারণে হারাম, ইত্যাদি শরীয়তের মছলা মছায়েল বিশদভাবে বুঝাইয়া, হক-রাস্তা বাৎলাইয়া দিয়া যান। উত্তর-পাড়ার মোড়ল মওলানা ছাহেবকে দাওয়াত করিয়াছিলেন; কিন্তু দক্ষিণ-পাড়ার মোড়লের বিবির আগ্রহাতিশয্যে মওলানা ছাহেব যে কয়দিন গ্রামে ছিলেন, সে কয়দিন সে বাড়ী ছাড়িতে পারেন নাই। ফলে উত্তর-পাড়া সংশোধিত মছলা মছায়েল গ্রহণ করার সুযোগ পায় নাই। ইহার মাস ছয় পরে এক বোগদাদী মওলানা ছাহেবকে পথ হইতে দাওয়াত করিয়া উত্তর-পাড়ার মোড়ল নিজ বাড়ীতে আনেন এবং পেশোয়ারী মওলানার চুল সংশোধন ও মৌলুদ হারাম করার কথা তাঁহাকে বলেন। শরীয়তের উপর এইরূপ দস্ত-আন্দাজী করার বেয়াদবী মওলানা ছাহেব বরদাস্ত করিতে না পারিয়া উত্তর-পাড়ার সবাইকে ডাকিয়া আরবী জবানে হাদীছ, কোরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, দক্ষিণ-পাড়ার সব লোক কাফের, লা-মোজহাবী মরতুদ হইয়া গিয়াছে; তাদের সঙ্গে নমাজ পড়া, খাওয়া-দাওয়া, বিবাহ-শাদী এমন কি উঠা-বসা করা পর্য্যন্ত হারাম। মোরতেদ, কাফের, লা-মোজহাবীরা জুমা-ঘরে নমাজ পড়ায় উহা এতকাল নাপাক হইয়া রহিয়াছিল;

মওলানা সাহেব তৎক্ষণাৎ আদেশ দিয়া স্বয়ং সামনে হাজির থাকিয়া উহা ধোয়াইয়া, মুছাইয়া পাক করিয়া দিয়া যান। ইহার পর দক্ষিণ-পাড়ায় একটি জুমা-ঘরের পত্তন হয়; গ্রামের ধর্ম্মভাবও বেশ সতেজ হইয়া উঠে।

দক্ষিণ-পাড়ার মুছুল্লীরা উত্তর-পাড়াকে বলে, "তোমরা নমাজ পড়, না মাথা দিয়া ধান ভান, আমরা ত ভাই, বুঝি না।" উত্তর-পাড়ার মুছুল্লীরা দক্ষিণ-পাড়াকে বলে, "তোমরা নমাজ পড়, না ছেজদায় গিয়ে আল্লাকে ফাঁকি দিয়ে ঘুমিয়ে নেও, আমরা ত ভাই বুঝি না।" কথা ক্রমে গরম হইয়া উঠে। শরীয়তের এই সব সূক্ষ্ম প্রশ্নের মীমাংসার জন্য শাগরিদানের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া বিশেষতঃ পার্শ্ববর্ত্তী গোমরাহ্‌দের জেহালত হইতে নিজ মুরিদানের ইমানে যাহাতে কোনরূপ খলল না আসে, তৎসম্বন্ধে হুশিয়ার করিবার জন্য পেশোয়ারী, বোগদাদী উভয় মৌলানা ছাহেবান কয়েকবার ঘন-ঘন আগমন করেন, ক্রমে উভয় পাড়ায় জেহাদী যোশের সৃষ্টি ও পুষ্টি হয়, ফলে উল্লিখিত দাঙ্গায় উভয় পক্ষে আজ মোট ৭ জন জখম হইয়াছে; তার মধ্যে দুইজনের অবস্থা সঙ্গীন। উভয় পক্ষ হইতে কতক আহতগণকে লইয়া মহকুমা হাসপাতালে গিয়াছে, কতকজন থানায় গিয়াছে, আর যাহারা বাড়ীতে আছে, তাহারা বাঁশ-ঝাড় উজাড় করিয়া লাঠি, শড়কি, বল্লম তৈরীতে লাগিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যা

—খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন

বেদনার বিষ-জ্বালা সহিতে না পারি,
কৃষ্ণ-আবরণে ঢাকি সলাজ-কুণ্ঠিতা,
আসে নিতি সন্ধ্যা-সতী কবি-চিত্তহারী
ধরার অঙ্গনে হেরি চিরাবগুণ্ঠিতা।

কী বেদনা বিষে ওর কৃষ্ণ হলো মুখ,
প্রকৃতির রঙ্গ-মঞ্চে ব্যথিতা কুমারী,
পশ্চিমের রক্ত-রাঙা আকাশ কামুক,
পীড়িত করিছে আরো পীড়নে চুমারি।

ছায়া-ঘেরা গোধূলীর ম্লানিমার পাশে,
ফুটে ওঠে সন্ধ্যা-তারা আকাশ-আঁচলে,
নীড়-মুখি বিশ্ব-পাখী ঝিমাইয়া আসে,
"ঘরে ফিরি চল" শুধু ক্লান্ত-কণ্ঠে বলে।

রাতের শিশির-কণা পান করিবারে,
ফুলেরা জাগিয়া ওঠে সাঁঝের আঁধারে।
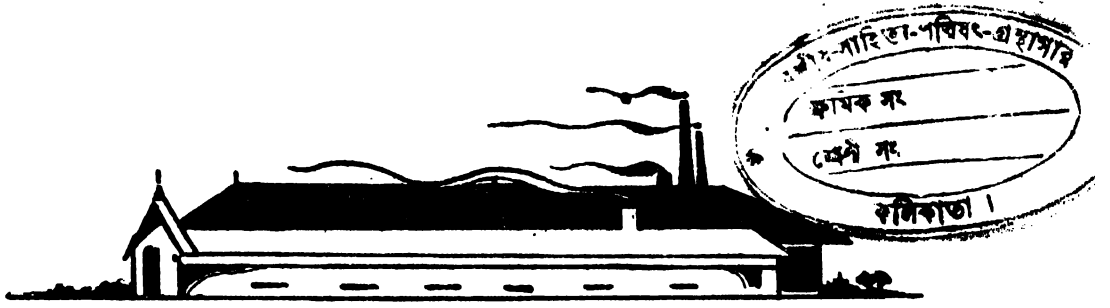
গণতান্ত্রিক স্পেন

—প্রবন্ধ—

—অসিত মুখোপাধ্যায়

যে-সব মাল-মশলার সংমিশ্রণে প্রস্তুত দৃঢ় ভিত্তির উপর গণতন্ত্র-সৌধ গড়িয়া উঠে, সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার তাহাদের মধ্যে অন্যতম। গণতন্ত্র-প্রণালীর রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় জন-সাধারণের মতে রাষ্ট্রীয়-কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। সেখানে মহাকবি কালীদাসের ভোটের যে মূল্য, বটতলার নাটক

সিংহাসন-চ্যুত স্পেন-রাজ আল্‌ফোন্‌সো

লেখকের ভোটেরও ঠিক সেই মূল্য। যে-ব্যক্তি কোটিপতি তাঁহার ভোটও অন্ন-বস্ত্রহীন ভিখারীর ভোট অপেক্ষা কিছু মাত্র অধিক মূল্যবান নহে। এই ব্যবস্থার মূলে এই সত্যই নিহিত আছে যে, জগতের সব মানুষই সমান, প্রত্যেক মানুষেরই অবয়বাদি এক প্রকার। রাম ধনী আর শ্যাম ভিখারী, মতি পণ্ডিত আর হরি মূর্খ, ইহা আকস্মিক ঘটনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সকলেরই ধন-প্রাণের মূল্য আছে, সুতরাং ধন-প্রাণ রক্ষার কর্ত্তা যে শাসন-প্রণালী তাহাতে সকলেরই মতামত গ্রাহ্য হওয়া উচিত।

ভূতপূর্ব্ব স্পেনের রাণী ইনা

উনবিংশ শতাব্দী, বিশেষ করিয়া, বিংশ শতাব্দীকে যাঁহারা গণতন্ত্রের যুগ বলেন, তাঁহারা এই ভোটাধিকারের নজির দেখাইয়া তাঁহাদের মতের সত্যতা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান। সার্ব্বজনীন ভোটাধিকারের মূল-ভিত্তি যে,

সত্যিকার ভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে কতক পরিমাণে এবং বিংশ শতাব্দীতে বহু পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের সংস্কার আইন-অনুসারে নগরের শ্রমিকবৃন্দ ও ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে গ্রামের কৃষক-সম্প্রদায় ভোটের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের আইনে ত্রিশ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্কা নারীর রাজনৈতিক-অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে নারী ও পুরুষের রাজনীতি-ক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে সমান-অধিকার স্থাপিত হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ফ্রান্স ব্যতীত ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সমস্ত দেশই

স্পেনের ভাগ্য-বিধাতা কর্ণেল জ্যামোরা

নারীর রাজনৈতিক-অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এইভাবে গণতন্ত্রের মূল-ভিত্তি পাশ্চাত্য জগতে স্থাপিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এথেন্স নগরে সমস্ত গ্রীক-পুরুষ দিগকে ভোটের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। কোন-কোন ঐতিহাসিক বোধ হয়, এই ভোটাধিকারের উপর নির্ভর করিয়াই প্রাচীন এথেন্সকে গণতান্ত্রিক এথেন্স বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর রাজনীতিকগণ গণতন্ত্রের যে-সংজ্ঞা দিয়াছেন, সে-সংজ্ঞায় প্রাচীন এথেন্সকে কোন-ক্রমেই গণতন্ত্রের গণ্ডীর ভিতরে ফেলিতে পারা যায় না। ফলকথা, সে-যুগে রাজতন্ত্র, অভিজাত-তন্ত্র এবং স্বেচ্ছাচার-তন্ত্রের উৎপীড়নে উৎপীড়িত প্রজাবৃন্দ নিজেদের অবস্থার চেয়ে একটু উন্নততর অবস্থার শাসন-প্রণালী দেখিলেই তাহাকে গণতন্ত্র বলিয়া ধরিয়া লইত। যে-ব্যক্তি দীর্ঘকাল অন্ধকার কারা-কক্ষে বাস করিয়াছে, বাহিরের মেঘাচ্ছন্ন দিন তাহার নিকট আলোকোদ্ভাসিত বলিয়া প্রতীয়মান হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু এই কারা-কক্ষ-বাসীর আলোকের সংজ্ঞা জগতের অভিধান মানিয়া লইবে কি ?

১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যখন অভিজাতবর্গ দ্বিতীয় জেমস্‌কে রাজ-সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিলেন, তখন সকলেই মনে করিল যে, ইংলণ্ডে বুঝি গণতন্ত্রের যুগ প্রবর্ত্তিত হইল। ফলতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে অভিজাতবর্গ রাজ-ক্ষমতায় একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, গণতন্ত্রের এই নগ্ন এবং কৃত্রিম রূপ দেখিয়াই ফরাসী-বিপ্লবের অন্যতম হোতা মনটেস্কুই এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি ফরাসী-জাতির সম্মুখে এই অভিজাত-তন্ত্রকেই আদর্শ শাসন-তন্ত্র বলিয়া উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। উত্তর আমেরিকার ঔপনিবেশিকেরাও ইহারই আদর্শ লইয়া তাহাদের United States-এর রাষ্ট্র-প্রণালীর ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছিলেন।

স্পেনের কথা বলিতে যাইয়া এত নজির উদ্ধারের কারণ হইল এই যে, গণ-আন্দোলন প্রথমেই যে, গণতন্ত্র-স্থাপন-প্রয়াসী হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অন্ততঃ উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস হইতে আমরা ইহাই বুঝিতে পারি। বিংশ শতাব্দী গণতন্ত্রের যুগ—এ যুগের ইতিহাসের এবং গণতন্ত্রের মাপদণ্ড বহুলাংশে, সর্ব্বাংশে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, বিভিন্ন প্রকারের

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে স্পেনে গণতন্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু রাজতন্ত্রীদের কুচক্রে এই গণতন্ত্র বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে নাই। তাহারা গণতন্ত্রের ভিত্তির উপর, স্পেনের উদীয়মান গণদেবতাকে লাঞ্ছিত করিয়া, পুনরায় রাজতন্ত্র এবং স্বেচ্ছাচার-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। সে-দিন রাজতন্ত্রের নায়কগণ ভুলিয়া গিয়াছিল,—চির লাঞ্ছিতের জাগ্রত আত্মাভিমান স্বেচ্ছাচারিতার দুঃসহ আচরণ কখনই সহ্য করিতে পারে না। তাই পুনরায় গত ১৪ই এপ্রিল স্পেনের সুপ্ত, ব্যাহত জন-মনের জাগরণের ফলে বলদৃপ্ত স্বেচ্ছাচারিতার দেদীপ্যমান প্রতীক স্পেনের রাজতন্ত্রের

এবং স্বেচ্ছাচার-তন্ত্রের আসন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

১৪ই এপ্রিল প্রভাত পর্য্যন্ত স্পেনে স্বেচ্ছাচারের যে তাণ্ডব-লীলা চলিয়াছিল, তাহা কল্পনা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। এ যুগেও যে জন-সাধারণ স্বেচ্ছাচারী রাজার উৎপীড়ন এবং অত্যাচার এরূপভাবে বিনা-বাক্য ব্যয়ে সহ্য করিতে পারে, তাহা কেহই ভাবিতে পারে নাই। তাই সমস্ত জগৎ ব্যথাদীর্ণ-সহানুভূতির হৃদয় লইয়া স্পেনের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়াছিল। স্বেচ্ছাচার-তন্ত্র অব্যাহত রাখিবার জন্য রাজা ত্রয়োদশ আলফোন্‌সোর অনুষ্ঠিত কার্য্য-কারণগুলি সমগ্র পৃথিবীর জন-মনের উপর রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা বিজাতীয় ঘৃণার ভাব আনয়ন করিল।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে গণতন্ত্রমূলক শাসন-নীতির মূলোৎপাটন করিয়া স্পেনে সামরিক স্বেচ্ছাচার (Military Dictatorship) প্রতিষ্ঠিত হইল এবং জনগণের প্রতিনিধি সভা Cortes কে দলিত করিয়া রাজার ইচ্ছানুসারে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটাকে পর্য্যন্ত ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়া রাজা নিজকে নিষ্কণ্টক মনে করিয়া সোয়াস্তির হাফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন বটে, কিন্তু পৃথিবী মনে করিল, রাজা নিজের হাতেই নিজের কবর খনন করিয়া রাখিলেন। অনতি-বিলম্বে এই কবরে শুধু রাজা নয়, রাজার সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রও সমাহিত হইবে।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে স্পেনে যখন নূতন শাসন-তন্ত্র প্রচলিত হয়, তখন প্রজাদের প্রতিনিধি লইয়া "Cortes consti tuyentes" নামে একটি রাষ্ট্রীয়-পরিষদ গঠিত হয়। প্রচলিত শাসন-তন্ত্রের যে-কোন সময়ে যে-কোন পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা Cortes কে দেওয়া হয় এবং রাজা ও Cortes এক হইয়া দেশের রাজদণ্ড (Sovereignty) পরিচালন করিবেন বলিয়া ঠিক হয়। রাজা ত্রয়োদশ আলফোন্‌সোর পূর্ব্ব হইতেই স্পেনে দুইটী রাজনৈতিক-দল প্রবল ছিল। Canooas এর নেতৃত্বাধীনে উদার-নৈতিক দল ও Sagasta র নেতৃত্বাধীনে রক্ষণশীলদল স্পেনের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করিত। রাজা নিজের খাম-খেয়ালে রাজদণ্ড পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের প্রবর্ত্তিত রাষ্ট্রীয় পরিষদ এবং এই দুই-দলকে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ফলে রাজ্যের ভিতরে সর্ব্বত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে রাজাকে আর একটা ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। মরক্কোর স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রীফ্ মহাবীর আবদুল করিম স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। মরক্কোর যুদ্ধে মুষ্টিমেয় আরব-সৈন্যের সহিত বিপুল স্পেন বাহিনী পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইতে লাগিল। জগতের চক্ষে স্পেনের যে-টুকু কদর ছিল, এই যুদ্ধে স্পেন

কারাগারে কর্ণেল জ্যামোরা

তাহা চিরকালের জন্য হারাইয়া ফেলিল। একদিকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দলে দলে আরব-সৈন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে, অন্য দিকে রাজ্য-লোলুপ স্পেন-রাজের জঘন্য পররাজ্য-লোলুপতা চরিতার্থ করিবার জন্য স্পেন বাহিনী সমর-ক্ষেত্র নর-রক্তে রঞ্জিত করিতেছে। এ দুইয়ে কি তুলনা হইতে পারে? একজন স্বার্থের কৃমিকীট, অন্যজন স্বদেশের স্বাধীনতা-কামী মহাপুরুষ। সুতরাং স্বাধীনতার স্বর্গীয় আদর্শের নিকট স্বার্থের নারকীয় মনোবৃত্তি পরাজয় স্বীকার করিল।

স্পেনে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধনের প্রয়াস বিশেষ ভাবে আরম্ভ হইয়াছে গত ১৫ই নভেম্বর মাদ্রিদে ধর্ম্মঘট ঘোষণার দিন হইতে। কঠোর সামরিক আইন জারি করিয়া এই

স্পেনের নব-গঠিত মন্ত্রী-সভা

ধর্ম্মঘটকে অল্পদিনের মধ্যেই প্রশমিত করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনের নেতাগণ ধৃত হইয়া নির্ব্বাসিত হন। ইহার কিছুদিন পরেই ১২ই ডিসেম্বর জ্যাকো সহরে এবং মাদ্রিদের সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠে। কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ তৎপরতার সহিত এবারেও সামরিক আইন জারি করিয়া বিদ্রোহ দমন করিলেন বটে, কিন্তু প্রজা-সাধারণের মনে যে বিদ্রোহাত্মক মনোবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা এই সামরিক আইনে দমিত না হইয়া বরং ইন্ধন লাভ করিল। ইহার পরে যে প্রলয়াগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল, তাহা স্পেনের স্বেচ্ছাচার-তন্ত্রকে ভস্মীভূত না করিয়া আর নির্ব্বাপিত হইল না।

স্বেচ্ছাচারী রাজার উৎপীড়নে উৎপীড়িত জন-সাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া শেষে রাজাকে শুধু রাজ-গদি নয়, ধরাপৃষ্ঠ হইতে সরাইয়া দিবার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা আরম্ভ করিল। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনবার, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে দুইবার এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে একবার বিদ্রোহীরা রাজাকে গুলী করে, কিন্তু কোনবারেই লক্ষ্য স্থির করিতে না পারিয়া অকারণ তাহারা কতকগুলি নিরীহ লোকের জীবন নষ্ট করিয়া ফেলে। গত বৎসরও রাজাকে হত্যা করিবার জন্য বিদ্রোহীদের শক্তিশালী একদল সর্ব্বদা তাহাকে অনুসরণ করিতে থাকে।

ইহাই স্পেনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বাভাস। রাজা আলফোন্‌সো স্বয়ং রাজতন্ত্রের হাল কোন উপায়েই ঠিক রাখিতে না পারিয়া প্রাইমো ডি রিভেরাকে সম্মুখে রাখিয়া, নিজে গা ঢাকা দিয়া রাজকার্য্য চালাইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা ডি রিভেরাকেও হত্যা করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিল। অগত্যা তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই ১৯২৯ সালে সিংহাসনের সম্পর্ক হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। আলফোন্‌সো রাজ্য-রক্ষার কোন উপায়ান্তর খুঁজিয়া না পাইয়া অগত্যা সিংহাসনের দাবী পরিত্যাগ করাই সঙ্কল্প করিলেন।

স্বেচ্ছাচারী এবং মদগর্ব্বি রাজার চির উন্নত মস্তক গণদেবতার পায় লুটাইয়া পড়িল। রাজা রাজতন্ত্র-বিরোধী দলের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা চালাইয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তাহারা বর্ত্তমান শাসন-তন্ত্রকে ধ্বংস না করিয়া কোন ক্রমেই প্রতি-নিবৃত্ত হইবে না। অবিলম্বে রাজা রাজ্যের মধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন, আগামী নির্ব্বাচনে গণতন্ত্রের জয় হইলে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিতে সম্মত আছেন। অবশেষে গণতন্ত্রেরই জয় হইল। রাজা স্ত্রী-পুত্র সমভিব্যাহারে দেশ ছাড়িয়া গত ১৪ই এপ্রিল প্রভাতে প্যারিসে চলিয়া

গেলেন। সমগ্র পৃথিবী হর্ষোৎফুল্ল নয়নে চাহিয়া দেখিল—স্পেনে গণদেবতা, স্বেচ্ছাচার-দানবের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মের সিংহাসন স্থাপন করিল।

গণতন্ত্র-সরকার স্পেনের ভূতপূর্ব্ব ডিক্টেটর জেনারেল বেরেঙ্গার এবং রাজতন্ত্রী-দলের ডাঃ আল্‌বিনাস নামক প্রভাবশালী একব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ইঁহাকে স্পেনের হিট্‌লার বলা যাইতে পারে। জার্ম্মাণীতে হারহিট্‌লার যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, স্পেনে ডাঃ আল্‌বিনাসও অনেকটা সেইভাবে কার্য্য করিয়াছেন। একদল বিক্ষোপ প্রদর্শনকারী এই মর্ম্মে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছে যে, ভূতপূর্ব্ব ডিক্টেটরগুলিকে মারিয়া ফেলা হউক। কিন্তু ন্যায়-নিষ্ঠ মহামতি জ্যামোরা পূর্ব্বতন ডিক্টেটরগণের প্রতি কোনরূপ নিষ্ঠুরতা না দেখাইয়া ক্ষমা করিবারই একান্ত পক্ষপাতী।

স্পেনের ডিক্টেটর প্রাইমো ডি রিভেরা

রাজতন্ত্র-গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ গণতন্ত্র-আন্দোলনের নায়ক উক্ত মহামতি কর্ণেল জ্যামোরা অস্থায়ীভাবে স্পেন গণতন্ত্রের কর্ণধার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইনি দুইবার মন্ত্রী-পরিষদের সভ্য ছিলেন। স্পেনে গণতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের মূলে ছিল এই মহাপুরুষের দেশাত্মবোধ, কর্ম্ম-প্রেরণা, স্বার্থ-ত্যাগ, আত্ম-নিগ্রহ, রাজনৈতিক-দূরদর্শিতা এবং বিচক্ষণতা। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কর্ণেল জ্যামোরাকে অভিনন্দিত করিতেছি; আর অভিনন্দিত করিতেছি—রাজা আলফোন্‌সোকে,—যিনি তাহার দেশবাসীর বক্ষ-রক্তে স্পেনের রণ-ক্ষেত্র কলুষিত না করিয়া জগতের ইতিহাসে একটা অভিনব দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন।

রীফ্‌-বীর গাজী আবদুল করিম

মানস-প্রতিমা

—এস, শামছুল হুদা

গহন কানন, গিরি-গুহা-বন খুঁজিনু সকলি বৃথা,
দ্যুলোক ভূলোক আলোকে কোথাও নাই মোর নিবেদিতা
নীলিম গগন, সাঁঝের আঁধার রাখি নাই কিছু বাকী,
হেনার পরাগ খুঁজিয়া নিরালা বুঝেছি কেবলি ফাঁকি।
আলেয়ার পাছে ঘুরেছি নিশীথে তোমারে ভাবিয়া সখি,
সাধ করে তোমা চেয়েছি বলে কি নাই তব সাড়া একি!
খুঁজেছি দুরন্ত মধুপ যেথায় উলসিয়া লুটে মধু,
লাজে ম্রিয়মান কোমল বদন, কেঁপে ওঠে ফুল-বধূ।
তটিনী যেখানে সাগরে মিশিয়া লহরে লহরে চলে,
দিবাকর সবে লুকাল আনন বিভাবরী বুকে ঢলে।
আকাশ বাতাস, সাহারা সরিতে একই মাতম রোল,
"পাই নি প্রিয়ারে পাই নি কোথাও," সকলি গণ্ডগোল।
ঝরিছে সদাই বক্ষের সুধা, নয়ন পেলব বাহি,
ব্যথার দরিয়া উছলিয়া উঠে, পাড় নাহি কূল নাহি।
তবে কি তাহাই? ধরণী ত্যজিয়া আছ প্রিয়া কোন বনে,
এদের চেয়ে কি সুন্দর আরো—রমণীয় কোন স্থানে?
সে স্থান কোথা? এত মাধুরিমা কোন্ সে দিঠির দূর?
মাটীর কুসুম আঁচলে গাঁথিয়া রচিলে অমরাপুর!
বল বল মোরে নিরাশ করো না, ওগো চির-বরনীয়া;
ছল করি প্রিয়া কিবা সুখ পাও? নিতুই বেদনা দিয়া!
মরমের মাঝে কে কহে—"মাতাল, আমি বেশী দূর নই,
চোখের আবর ছুঁড়ে ফেলে দেখ তব সাথে সদা রই।
গোপনে মিলন মালিকা গাঁথিয়া স্বপনে বরিছি তোমা,
গোপনে মধুর প্রেম-পরিচয়, নাহি লাজ মলিনিমা।"
হৃদয়-মুকুর খুলিয়া দেখিনু জ্বালিয়া প্রেমের বাতি,
বিরাজিছে সেথা মানস-প্রতিমা কুসুম শয়ন পাতি।
জ্বলিছে উজল রূপের দেয়ালী, প্রিয়ার অঙ্গ-জ্যোতি,
সে আলো পরশে বিকশিত মোর হৃদি-শতদল নিতি।

* * *

কবিতার রূপ-পরস-সুধা-ধারা, তুমিগো তন্বী সাকি!
পেয়েছি আঁধার গোপনে তোমারি ফুল-লেখা দুটো আঁখি।
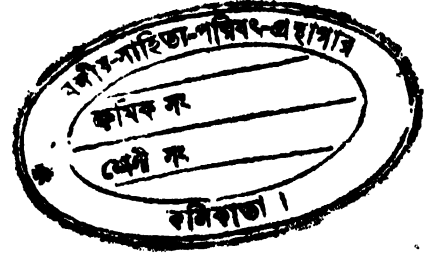
বিড়ম্বনা

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

— উপন্যাস —

— বন্দে আলী মিয়া

— অধ্যায় পোনের —

এক বৎসর পরের কথা। মনসুরের মেজাজ দিন-দিন রুক্ষ হইয়া উঠিতেছিল। সে কারণে-অকারণে করুণার সহিত ঝগড়া-বিবাদ করিয়া দিন-রাত রোগী ঘাঁটিয়া খুঁত-খুঁত করিয়া নিরানন্দে দিন কাটাইয়া দিতেছিল।

সে-দিন দুপুর হইতে নানা-কারণে তার মনটা ভালো ছিল না। করুণাকে পূর্ব্বের মতন সেই প্রেমময়ীরূপে সোহাগ করিয়া জীবনটা রঙিন করিয়া তুলিবার জন্য তা'র প্রাণটা ছট্‌-ফট্ করিত। কিন্তু করুণার প্রাণহীন নীরস ব্যবহার এবং উদাসীনতায়-ভরা বিরস মুখের পানে চাহিয়া এক মুহূর্ত্তে সকল আশা-ভরসাকে বিদায় দিয়া মনসুর সহায়-হীনের মতন চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিত। ব্যথায়, নিরাশায়, দীনতায় তাহার ব্যবহার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও ক্রমশঃ কর্কশ হইয়া উঠিতেছিল; তাই আজ ডিস্পেন্সারীতে যাইয়া অবধি তার মনটা কোনোক্রমেই সুস্থ অবস্থায় ছিল না। রোগী-পত্রের দৌরাত্ম্য এ-বেলা বিশেষ ছিল না এবং যে দু'একটা 'কল' এবং রোগী আসিয়াছিল, শরীর অসুখের দোহাই দিয়া তাহাদিগকে নমস্কার জানাইয়া সে চুপ করিয়া এক কোণে বসিয়া রহিল।

করুণা যে-সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় তাহার মনের স্বাধীনতাও সেই-রূপে গঠিত হইয়াছে। জন্ম-অবধি ঘরে-বাহিরে এমন করিয়া মিলিয়া-মিশিয়া সে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে যে, একটাকে বাদ দিয়া অন্যটাকে তাহার চরিত্রের সহিত কোনোক্রমেই কখনো খাপ্ খাওয়াইয়া লওয়া চলে না। তাহাকে আজ যদি মনসুর মুসলমান ঘরের পর্দ্দানশীনা ও লজ্জাশীলা বধূরূপে পাইতে আশা করে এবং তার মধ্যে স্বামী-ভক্তি, প্রীতি ও শ্রদ্ধা সেইরূপ পরিপূর্ণ দেখিতে চাহে, তবে মনসুরের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা নিশ্চয়ই সন্দিহান হইবেন।

করুণার অতীত জীবনটা শিক্ষা-দীক্ষায় চারিদিক দিয়া যেমন পরিপূর্ণ তেমনি উজ্জ্বল; তাহার সহিত মনসুরের আগা-গোড়া জীবনের ইতিহাসের কোথাও কিছুমাত্র মিল নাই। সমানে-সমানে প্রাণের বিনিময় না হইলে শেষ অবধি কোনো-পক্ষেরই মান থাকে না এবং সে-অতিরিক্ত সম্বন্ধের সমাপ্তি কোনো-দিনই প্রীতির মধ্য দিয়া না হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। মনসুর নিজের বিগত শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের উপর দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে আড়ষ্ট হইয়া গেল। পাংশু-পাণ্ডুর মুখে অর্দ্ধ-দগ্ধ সিগারেটটি 'এ্যাসট্রে'র উপরে ফেলিয়া রাখিয়া পুনরায় আর একটি ধরাইল।

সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে অখ্যাত পল্লীগ্রামে নিতান্ত গরীবের ঘরের একটি পর্ণকুটীরে। সেখানে তার আদর-যত্ন এবং স্নেহের কিছুমাত্র কমতি ছিল না বটে, কিন্তু করুণার সহিত কোনো প্রকারেই তুল্য হইবার যোগ্য সে নহে। পিতা-মাতার অফুরন্ত স্নেহের ছায়ায় বাড়িয়া উঠিলেও গরীবের ঘর বলিয়া একটি চাকর দাসীরও সন্ধান সে

পায় নাই, তথাপি তার শিশু-চিত্ত ইহাকেই আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লইয়াছিল। লতা-পাতা, আমের বন, খেজুর গাছ, বাঁশের ঝাড়, দেবদারু সারির মধ্যে তাহাদের খড়ের ঘর এবং টিনের খান-কয়েক ঘর ছবির মতন পথিকের চোখকে টানিয়া লয়। সে নির্ম্মল হাসিতে বুক ভরিয়া ইহার মধ্যে খেলা-ধুলা করিয়া আনন্দে দিন কাটাইয়া দিতে লাগিল; তারপর যখন সে আর একটু বড়ো হইল, তখন তার আত্মীয়-স্বজনের যে-ভাবে পরিচয় পাইল, তাহা মোটেই প্রীতিপ্রদ নহে।

বিরাট অভাব-দৈন্যের বোঝা ঘাড়ে লইয়া কণ্টকাকীর্ণ জীবন-পথে সে হুঁচোট খাইতে খাইতে গত কৈশোর এবং যৌবন কাটাইয়া আসিয়াছে। সে সমাজের উপর প্রতিশোধ লইবার মানসে—যাঁহারা তাহাকে পৃথিবীতে আনিয়া এমন অপমান করিয়াছেন—তাঁহাদের উপরে প্রচণ্ড অভিমান লইয়া সকলের হিংসার প্রায়শ্চিত্ত করিতে করুণাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সেই করুণাকে সুখী করিতে সে পিতা-মাতা সকলকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া পলাতক খুনী আসামীর মতন আজ গা ঢাকা দিয়া রহিয়াছে;—ইহা অপেক্ষা তার মরণও যে অনেকাংশে বোধ করি শ্রেয়ই ছিল।

......কয়েকটা তারা জানালার ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছিল; তাহারা ছিন্ন-মালার ফুল-দলের মতন এদিক-সেদিক অগোছাল ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া অপটু বধূর সযত্নে জ্বালা প্রদীপ শিখার মতন দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতে-ছিল। উদাস দৃষ্টিকে সেদিক পানে তুলিয়া ধরিয়া মনসুর অবুঝের মতন চাহিয়া রহিল, ঐ তারাগুলো যেন জননীর স্নেহের দৃষ্টি দিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ অমৃতে ভরিয়া তুলিতেছে। সে একটা দমকা নিশ্বাস ফেলিয়া চুরুটে টান দিয়া পুনরায় চেয়ারের উপরে নড়িয়া-চড়িয়া বসিল।......যে জননী তাহাকে বুকে ধরিয়া সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মতন দুঃখ-দৈন্যের ঝাপ্টা নীরবে সাম্লাইয়া লইয়াছে, তাহার খোঁজ এ কয় বৎসরের মধ্যে একটিবারও সে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে নাই, এমনি অকৃতজ্ঞ এমনি নিষ্ঠুর সে। সহসা তার দুই চক্ষু আলা করিয়া বড়ো বড়ো ফোঁটায় কয়েক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়া বুকের জামার খানিকটা সিক্ত করিয়া দিল। করুণা রাক্ষুসী এতকাল মায়াজাল বিস্তার করিয়া তাহার সুমুখ হইতে দুনিয়ার সব কিছুকে লুপ্ত করিয়া দিয়া নিখিল ভুবন ব্যাপিয়া আপনাকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল। তাই সে ইচ্ছা সত্বেও কাহারো পানে ফিরিয়া চাহিবার অবকাশ পায় নাই। আজ তাহার সে ভুল টুটিয়া যাওয়া অবধি মায়ের সেই স্নেহ-মণ্ডিত দীপ্তিময় মুখখানি, তাঁর সকরুণ স্নিগ্ধ স্থির-দৃষ্টি বারে-বারে মনে পড়িতে লাগিল। তাঁহাকে আর একটিবার মাত্র দেখিবার জন্য, তাঁহার কোলে সেই শিশু-বেলাকার মতন আর একবার বসিয়া সোহাগে-আনন্দে আব্দার জানাইবার জন্য তার চিত্তটা মোহের দুয়ারে বারে-বারে মাথা কুটিয়া আছড়াইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কত যুগ যেন সে মাকে দেখে নাই, না-জানি কোথায় সংসারের নিষ্ঠুর পীড়নে কি শোচনীয়রূপে তিনি দিন কাটাইতেছেন। মা—মা—জননি আমার, মনসুরের অনিরুদ্ধ অবিরল অশ্রু-ধারা কোঁচার কাপড় ভিজাইয়া দিতে লাগিল।

মনসুর এতদিন পরে আজ হঠাৎ স্ত্রীর পূর্ব্বেকার সেই সহজ সুর শুনিয়া চমকিয়া উঠিল, কিন্তু নিজেকে সংযত করিয়া জবাব দিল, হ্যাঁ—বোসো। বায়স্কোপে গেছিলে নাকি, কেমন দেখলে?

করুণা সে প্রশ্ন কাণে না তুলিয়া ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁগা, এখন আবার কোথায় যাবার সখ হোলো শুনি?

মনসুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বার-দুই পৃষ্ঠাটা দেখিয়া বইখানি বন্ধ করিয়া বলিল, সখ হয় নি করুণা, এ সখ নয়। প্রাণের ডাক এবং কর্ত্তব্য আমাকে বাধ্য করাচ্ছে যেতে। একটু থামিয়া ঘরের বড় ঘড়িটার দিকে চাহিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিল, এখন ন'টা পনেরো, দশটা আট-চল্লিশে ট্রেণ। খুব পাওয়া যাবে।

করুণা ব্যাকুল-আগ্রহে বলিয়া উঠিল, এত শীগ্গীর? আজই? কোথায় যাবে শুনি?

—শুনে কাজ নেই তোমার, যদি ফিরে আসি ঢের অবসর হবে। আমাকে চাট্টি খেতে দাও তো আগে, তারপর সুট-কেসটা গুছিয়ে দিয়ো। সারা-রাত আর কালকে বেলা পাঁচটা অবধি এই ট্রেণে আর মোটরেই কেটে যাবে। যাও জলদি।

করুণা মনে মনে শঙ্কায়-ভয়ে কণ্টকিত হইয়া বিনা

প্রতিবাদে স্বামীর আদেশ পালন করিতে রান্না-ঘরের উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল; এবং খানিকক্ষণের মধ্যে ভাত, ব্যঞ্জন ইত্যাদি লইয়া হাজির হইয়া মেঝের উপরে সযত্নে নামাইয়া রাখিয়া একটা মাদুর বিছাইয়া স্বামীর আহারের জায়গা করিয়া দিল। মনসুর কথাটি মাত্র বলিল না; নীরবে নিঃশব্দে একে-একে জামা কাপড় ছাড়িয়া বাহির হইতে হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া আহারে বসিয়া গেল। করুণা গোটা-কয়েক পান সাজিয়া বাটার উপরে রাখিয়া সুটকেশে মনযোগ প্রদান করিল।

মনসুর বাহিরে যাইবার উপযোগী বেশ-বিন্যাসে সজ্জিত হইতে হইতে প্রদীপের আলোকে স্ত্রীর বেদনা-ভরা অশ্রু-সিক্ত মুখের পানে চাহিয়া মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া গেল। কিন্তু আজ সে গলিল না, নিজেকে দৃঢ়রূপে সংযত করিয়া আপন মনে পরিচ্ছদ শেষ করিয়া ফেলিল।

করুণা কঠিন হস্তে চোখ মুছিয়া আপনাকে পূর্ব্বাহ্নেই প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিল। মনসুর পান মুখে দিয়া সিগারেট ধরাইয়া ব্যাগটা হাতে উঠাইয়া লইবার উদ্যোগ করিতেই সে আসিয়া পথ-রোধ করিয়া তার পায়ের গোড়ায় বসিল। ক্ষীণ-অস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল, "তখন যে বলছিলে, 'যদি ফিরে আসি তখন শুনো,' প্রভু না করুন কিন্তু কোথায় চলেচো, আর কি আসবে না?"

মনসুর পকেটে হাত ঢুকাইয়া একতাড়া নোট বাহির করিয়া স্ত্রীর হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "নাও, যদিই না আসতে পারি, মাসে মাসে খরচ পাবে, সে জন্যে ভেবো না।"

করুণা নোটের তাড়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া অশ্রুভরা কণ্ঠে বলিল, "দূর হোক ছাই, টাকার জন্যেই কী সকলকে ছেড়ে তোমার সাথে এসেছিলুম, ছিঃ ছিঃ এত নীচ ভাবো তুমি, টাকা কী ছিল না আমার? এমন করে তুমি ত্যাগ করে যাবে সে তো আমি আগে জানতুম না, ছিঃ, তোমরা পুরুষ—মনে করো নারী-জীবনের বুঝি কোনো মূল্য নেই, খেলা শেষে ধুলো-বালির মতন অনায়াসে পথের উপরে ফেলে আসা চলে?"

মনসুর থতমত খাইয়া বলিল, "না, চলে না। তোমাকে পরিত্যাগ করবার সাধ্যও আমার নেই, কিন্তু করুণা, আমাকে এবার মাফ করো, আর পারি নে, ক্লান্ত হয়ে আজ ছুটি চাচ্চি।"

—"কেন?"

—"তারও জবাব দিতে হবে? এমন দিনরাত নীরব ঝগড়া, এক জায়গায় থেকে কথা না বলা, এমন মন-মরা গুমোটভাব আমার ধাতে আর সহ্য হয় না। প্রথম যৌবনের উন্মত্ততা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখের নেশাও কেটে গেছে, আমার আজ মনে হচ্ছে, তুমি যে জন্যে অনুতপ্ত, আমিও সে জন্যে তোমার সহজ লীলার পথ-রোধ করে থাকতে চাই নে, আমাকে ক্ষমা করো।"

করুণা বিস্ময়ে, ব্যথায়, দুঃখে, ক্ষোভে তার মুখের উপরে তপ্ত অশ্রু-ভরা ঝাপসা দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়া পাষাণ প্রতিমার মতন চুপ করিয়া বসিয়া বোধ করি আপনার মধ্যে আপনাকে খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল।

নয়ন-নীরের মাঝে

—কাজী মোশার্‌রফ্‌ হোসেন

কোন্‌ সে ব্যথার সুরখানি আজ গুমরিয়া বুকে বাজে ?
আজি এ নয়ন-তারা—
কোন্‌ অতীতের চিত্র আঁকিতে হয়েছে আপন-হারা ?
যুগ যুগ হতে কোন্‌ সাধনায় আপনারে বাঁধা রেখে
পলকে পলকে কোন্‌ 'লায়লীর' মূরতি চলিছে এঁকে।
কোন্‌ শরতের কাননের পথে জ্যোছনা খেয়ালী রাতে
জানি না কখন 'চাউনি' তাহার মিলেছে আমার সাথে।
মোর এ-ক্ষুব্ধ হিয়া—
কোন্‌ বেদনায় থেকে থেকে আজ উঠিতেছে ফুঁপাইয়া ?
বরষের পর বরষ চলেছে তবু তার 'চাওয়া' খানি
কালে কালে শুধু জাগায়ে এনেছে তাহারই স্মৃতি টানি।
ওই বালু-চর আঁকিয়াছে কার রাতুল চরণ-রেখা
উর্ম্মির শিরে জাগিছে কাহার কমল হস্ত-লেখা।
ওরে ও দূরের প্রিয়া—
কোন্‌ অজানায় হারা হয়ে গেছে তোর অভিমানী হিয়া।
তবু এ 'চাউনি' হায়—
যেই পথ ধরে চলিয়াছ তুমি সেই পথ-পানে ধায়।
দূরের বাতাস ওই ঝাউ-বনে আসে কার কথা নিয়া
কাহার ব্যথার সুর জাগাইয়া উড়িছে ব্যথার 'পিয়া'।
আকাশের চাঁদ গগনের তারা ঝোপের জোনাকী বধূ
যুগে যুগে ওগো তোমারি রূপের সাক্ষ্য দিয়েছে শুধু।
ওই শূনো-চর নীরব হয়েছে কাহার বিরহ স্মরি
কাহার ব্যথায় তাটিনীর জল দু'কূলে পড়িছে গড়ি।
ফাগুন বাতাস কেন রে উদাস শ্বাস ফেলে যায় দূরে
কার পথ বেয়ে সিমুলের তূলা পিঁজিয়া চলিছে উড়ে।
কেন ঝরে আজ পাষাণ ভেদিয়া—কাহার অশ্রু জল
গহন কাননে বুক ফেটে কাঁদে কেন রে 'ফটিক জল'।
ওগো স্বপন খেয়ানী মেয়ে—
হাসির মাঝারে ফুটে উঠে গেলে অশ্রুর সাথে বেয়ে।
আমার আমাতে পাই নাই মোরে—তোমারই হৃদয়-দেশে
আপনার রূপ আঁকিয়া চলিতে হারা হয়ে গেছি দিশে।
আমার আমাতে চেনে নাই কেহ জগতের যত জন
তোমারই রূপের মাঝখানে আমি ফুটিয়াছি অনুখন।

ওগো মোর রূপ রাণি—
সাঁঝের আকাশে লেখা পড়ে গেছে তব ও বিদায় বাণী।
যত দূরে তুমি চাও লুকাইতে আমার 'চাউনি' হতে
যুগে যুগে হেরি পথ ভুলে আস জ্যোছনা মাখানো রাতে।
অলক-লতায় রেখে গেছ তব কেশের গুচ্ছ-ভার
বকুলের শাখে দোলাইছ প্রিয়ে, তোমার কণ্ঠহার।
কোকিল কণ্ঠে রেখে গেছ ওগো তোমার কণ্ঠ সুর
কাননে মেখেছ তব আঁচলের গন্ধ সে অগুরুর।
প্রভাত কমলে ফুটে ওঠে নিতি তোমার সুচারু হাসি,
জীবন থাকিতে ভুলিব না প্রিয়া কখনও হবে না বাসি।
যত দিন দেহে থাকিবে জীবন বুকেতে জাগিবে ভাষা
তোমারই মনের গান গেয়ে যাব এই মোর চির আশা।
হৃদয়-দুয়ার খোল—
তোমার বুকেতে যত ব্যথা আছে আমার বুকেতে ঢাল।
আজি এই একা প্রাণে
ব্যথার পিয়ালা পান করে যাব খনে খনে অনুখনে।
ওগো ও চপল মেয়ে—
কোন্ কথা নিয়ে এসেছিলে তুমি গেলে কোন্ কথা দিয়ে।
সেই কথা আজ যুগে যুগে স্মরি কাটিছি যেরূপে দিন
কেমনে কহিব বুকের ভাষা যে বুকেতে হয়েছে লীন।
শুধু পড়ে মনে—'এ-শেষ বিদায় এই বেলা ফিরে যাই
বাদলের শেষে বিদায় বন্ধু।'—আর কিছু মনে নাই।
সেই দিন হতে ঝরিল যে জল জমিয়া হইল ব্যথা
সে ব্যথা ফুটাল রাখালের সুরে 'প্রিয়ার বিরহ গাঁথা'।
সেই সুর ফের ফুঁকারি উঠিল মাঠের আধেক দূরে
বুকের বেদনা গলিয়া পড়িল দোঁহার অশ্রু নীরে।
তোমার অশ্রু আমার অশ্রু দোঁহার অশ্রু মিশে
গুমরিয়া উঠি ব্যথার বন্যা ছুটিয়াছে কোন দেশে।

* * *

বিশ্বে আমার সবাই অচেনা—তুমি আমি বই আর,
কি জানি কখন এ-দোঁহার মাঝে রচিয়াছে পারাবার
আজি এই ব্যবধান—
কোন্ কাল হতে হয়ে গেছে প্রিয়া পাপিয়ার সুর-গান।
ওগো বিদেশিনি, আসিয়াছি আজ এই আশাটুকু নিয়া
দূরের পথিক দূরে মিশে যাব তোমার আশীষ দিয়া।

ফরাসী-বিপ্লব

— প্রবন্ধ —

—রিজাউল করিম বি-এ,

উপসংহার

অনেকেই ধারণা করিয়াছিল, ওয়াটারলু-প্রান্তরেই ফরাসী-বিপ্লবের চির-সমধি হইয়া যাইবে—কিন্তু তাহা হইল না। বিপ্লবের উত্তেজনাময় দিনে ফরাসীর কৃতি-সন্তানগণ দেশময় যে আগুন ছড়াইয়া দিয়াছিলেন, তাহা চিরতরে নির্ব্বাপিত হইবার নহে, তাহা প্রত্যেক প্রদেশে তুষানলের ন্যায় ধিকি-ধিকি জ্বলিতেছিল এবং প্রজ্বলিত হইয়া প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিবার জন্ম সময়ের অপেক্ষা করিতেছিল। এই আগুনের একটা উল্কা একদিন প্রজ্বলিত হইয়া ইটালীকে স্বাধীন করিয়া দিল, চির-পদানত জার্ম্মাণীকে একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করিল। উহারই প্রভাবে বেলজিয়াম স্বাধীন হইল, আর সেই আগুন আজিও সর্ব্বত্রই জ্বলিতেছে এবং মনে হয়, যে-কোন মুহূর্ত্তে আবার উহা প্রজ্বলিত হইয়া কোথায় কি কাণ্ড করিয়া বসে।

ফরাসী-বিপ্লব স্বাধীনতার নামে বহু অত্যাচার করিয়াছিল, কিন্তু এই অত্যাচারের মধ্য দিয়া উহাই আবার ইউরোপকে নানাবিধ অত্যাচার, অন্যায় ও স্বৈরাচার হইতে উদ্ধার করিয়াছে। সত্য কথা বলিতে গেলে, বলিতে হয়, বর্ত্তমান ইউরোপ ফরাসী-বিপ্লবেরই সৃষ্টি। স্বৈরাচারী রাজ-শক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত ইউরোপের কোথাও Personal liberty 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতা' বলিয়া কোনও জিনিষের অস্তিত্বই ছিল না, রাজার ইচ্ছাই ছিল প্রজার ইচ্ছা, রাজা Divine Right থিওরী দ্বারা পরিচালিত হইতেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে টু শব্দটী পর্য্যন্ত করিবার অধিকার কাহারও ছিল না। কিন্তু ফরাসী-বিপ্লব একজন ভীষণ অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া এবং তাঁহার দ্বারা মানবের সর্ব্বপ্রকার অধিকার ও স্বাধীনতা স্বীকার করাইয়া লইয়া মানুষের Personal liberty কে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করিল। ফরাসী-রাজার শেষ পরিণাম দেখিয়া ইউরোপের রাজন্যবর্গ অধিক কাল প্রজার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিলেন না, আর প্রজারাও বুকে সাহস পাইয়া আপনাদের ন্যায্য-দাবী পুরাপুরিভাবে আদায় করিয়া লইতে শিখিল। প্রজারা সম্মিলিত ভাবে দাবী করিতে শিখিল বলিয়া ক্রমেই রাজার শক্তি হ্রাস পাইতে লাগিল, রাজ-শক্তি হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের স্বাধীন-চিন্তার পথ নিষ্কণ্টক হইয়া গেল।

রাজতন্ত্র সকল অনিষ্টের মূল বলিয়া বিপ্লববাদীরা উহারই বিলোপ-সাধন করিয়া দেশ-বিদেশে সেইরূপ রাজদ্রোহের আদর্শ প্রচার করিবার কোনওরূপ চেষ্টার ক্রটি করে নাই। কিন্তু তখন কোথাও রাজতন্ত্র লোপ পায় নাই সত্য, কিন্তু তথাপি বিপ্লবের প্রভাবে স্বৈরাচারী রাজ-পুরুষগণ স্ব-স্ব রাজ্যে নিয়ম-তান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য হন। রাজা, প্রজাদের প্রদত্ত সর্ত্তাবলী স্বীকার করিয়া তদনুসারে দেশ-শাসন করিতে প্রতিশ্রুতি দেন; এবং কোথাও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলেই প্রজারা আবার রাজাকে চাপিয়া ধরিয়া নিজেদের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আদায় করিয়া লইত। ইউরোপের সর্ব্বত্র এইরূপ হইতে লাগিল। যেখানে নিয়ম-তান্ত্রিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানেই প্রজারা শাসন কার্য্যে অধিকার পায়, এবং এই অধিকার হইতে ক্রমে-ক্রমে পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে। এইরূপে ফরাসী-বিপ্লবের

প্রভাবে প্রজারা স্বীয় রাজ্যে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া পড়িল। আর এযাবৎ কাল যে-সকল অভিজাত রাজ-কার্য্যের সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে ক্ষমতাচ্যুত হইয়া জনসাধারণের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়া জনসাধারণের সহিত মিশিয়া গেলেন।

ফরাসী-বিপ্লব আর একটা বিষয়ে ইউরোপের তথা জগদ্বাসীর মহদুপকার সাধিত করিয়াছে;—যাহা এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার বিব্রত ভারতবাসী হয়ত ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে না—তাহা হইতেছে "Idea of Nationality" জাতীয়তার আদর্শ! কোনও দেশ বিশেষ কোনও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তি না হইয়া দেশবাসী সকল সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্পত্তি হইবে। এই ভাব ফরাসী-বিপ্লব ইউরোপকে শিক্ষা দিয়াছে। বহু পূর্ব্বে সমগ্র ইউরোপে Theocratic form of Goverment (ধর্ম্মতন্ত্র) প্রচলিত ছিল। পোপ ছিলেন সেই তন্ত্রের প্রধান পুরোহিত। ইউরোপের প্রত্যেক দেশে পার্থিব শাসন ও পোপের শাসন পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে প্রচলিত ছিল। এইরূপ A State within state (রাজ্যের মধ্যে রাজ্য) বিদ্যমান থাকায় সর্ব্বদাই শাসন-ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা আসিয়া উপস্থিত হইত। "পোপের প্রাধান্য আগে মানিব, না, রাজার প্রাধান্য আগে মানিব" এই সমস্যা উদিত হইয়া নানাবিধ অনর্থের সৃষ্টি করিত। রাজা ও পোপের অধিকার লইয়া সব সময়ই দ্বন্দ্ব-কোলাহল এমন কি রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হইত। এই পোপের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া টমাস বেকেট প্রাণ-দান পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। সে-যুগের মানুষের রাজনৈতিক-জ্ঞান এতটা উদার হয় নাই যে, সে বুক ফুলাইয়া বলে, আমি প্রথমে দেশবাসী তারপর অন্য কিছু। বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে লইয়া একটি বিরাট 'জাতি' (Nation) গঠন করিবার ক্ষমতাও সে-যুগের কাহারও ছিল না। প্রত্যেক দেশে পোপ-প্রথার প্রাধান্য থাকাতে একটা বিষয়ে দেশের লোকের ভয়ানক অসুবিধা হইত। শত অভাব পড়িয়া থাকিতেও দেশের অর্থ বিদেশের কাজে ব্যয়িত ও শোষিত হইত। বিদেশী পোপ বিভিন্ন দেশের সুখ-সমৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তাঁহার নিজের কাজের জন্য লোকের অন্ধ-বিশ্বাসের সুবিধায় বহু অর্থ লুণ্ঠিত করিয়া হয়ত সেই দেশেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন করিতেন। ইহাতে প্রত্যেক দেশের নানাবিষয়ে অসুবিধা হইত। সর্ব্বপ্রধান ক্ষতি এই হইত যে, তাহাতে জাতীয়-ভাব লোকের মনে জাগিতে পারে নাই। লোকে একই সঙ্গে দুই প্রভুকে মান্য করিত, ইহাতে জাতীয়তার স্ফুরণ হয় না। এই ভাব ইংলণ্ড হইতে ক্রমে-ক্রমে বিদূরিত হইতে ছিল। ইত্যবসরে রিফরমেশন আসিয়া প্রত্যেক দেশকে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া দিল—রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট। যেখানে Protestant প্রবল, সেখানে Catholicগণ সর্ব্ব প্রকার রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল, আবার যেখানে Catholic গণ প্রবল সেখানে Protestant গণের সেইরূপ দুর্দ্দশা হইল। একে অপরকে নির্য্যাতন করিতে ছাড়িত না। একই দেশের বিভিন্ন মতাবলম্বীকে দমন করিবার জন্য বিদেশের শত্রুকে আহ্বান করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতাকেও বিপন্ন করিতে ছাড়িত না। এই প্রকার সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষে ইউরোপের কোথায়ও জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। দেশের চেয়ে ধর্ম্মকেই বড় জানিত বলিয়া লোকে দেশের প্রতি তত্তটা লক্ষ্য করিত না। দেশ উৎসন্নে যাউক, দেশের অধিবাসীরা মারা যাউক, কিন্তু বিদেশের স্বধর্ম্মাবলম্বীকে সাহায্য করাই চাই, এই ছিল ইউরোপের মনোবৃত্তি। ফরাসী-বিপ্লব এই সব মধ্যযুগীয় আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া ইউরোপকে জাতীয়তার প্রকৃত অর্থ শিখাইল।

ফ্রান্সের নিগৃহীত জনসাধারণ অত্যাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমরোদ্যোগ করিয়া যে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের অভিনয় করিয়াছিল, তাহারই পরিণাম দেখিয়া রাজতন্ত্র ও প্রজা-পীড়নের সমর্থনকারিগণ মানুষের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর মাত্র, রাজা পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ, স্বাধীনতার উপযুক্ত না হইলে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নহে। এই প্রকার আরও নানারূপ স্বাধীনতানাশিনী উক্তি প্রয়োগ করিয়া একদল মানুষ বহুকাল হইতে মানুষের জন্মগত অধিকার স্বাধীনতার উপর কটাক্ষপাত করিয়া আসিতেছে, কিন্তু যাঁহারা স্বাধীনতার জন্য উন্মত্ত হইয়াছে, তাঁহারা ইহাতে বিচলিত হয় না।

স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ নিগৃহীত জাতি যে-সব

অত্যাচার-বিভীষিকার প্রশ্রয় দিয়া থাকে, তাহা এত স্বাভাবিক যে, শত চেষ্টা করিয়াও মানুষ তাহা পরিহার করিতে পারে না। দীর্ঘকাল পরাধীন অবস্থায় থাকিয়া তাহার বিবেক ও ধর্ম্মজ্ঞান একেবারেই লোপ পায়। বৈদেশিক অত্যাচার-মূলক শাসন-পদ্ধতি জাতির অন্তর এরূপ ভাবে কলুষিত করিয়া দেয় যে, কোন উচ্চ-চিন্তা ও উচ্চ-ভাব তথায় অবস্থান করিতে পারে না, নীচ-ভাব ও নীচ-কল্পনায় তাহা সদাই পরিপূর্ণ থাকে। এইরূপ মানসিক ও নৈতিক অবসাদের সময়ে যদি দেশের লোক অত্যাচারী শাসকের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য তাহারা প্রচণ্ডভাবে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। এইরূপ উন্মত্ততার সময়ে মানুষ যে-সব বিভীষিকার অভিনয় করিয়া থাকে, তাহা অপরাধ জনক হইলেও অমার্জ্জনীয় অপরাধ নহে, তাহার জন্য সে জাতিকে ক্ষমা করিতে হইবে ও অনুগ্রহ দেখাইতে হইবে।

দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পৃথিবীতে যে সকল বিদ্রোহ সংগঠিত হইয়াছে, একদল ছিদ্রান্বেষী লোক তাহার মন্দ-দিকের প্রতি লোকের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া থাকেন, "এই দেখ, বিদ্রোহ দ্বারা কত অকাণ্ড, কত রক্তপাত হইতেছে"। কিন্তু ইঁহারা যে চরম একদেশদর্শী তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিদ্রোহের শুভফল ও কল্যাণের প্রতি ইঁহারা একেবারেই উদাসীন। পরাধীন জাতি কিছুকাল স্বাধীনতা উপভোগ না করিলে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে না। বহুদিন পরাধীন অবস্থায় থাকিয়া দাসত্ব-শৃঙ্খল-মুক্ত হইবার সময়ে জাতি প্রথম প্রথম অত্যাচার বিভীষিকার প্রশ্রয় দেয় বটে, কিন্তু The final and permanent fruits of liberty are wisdom, moderation and mercy" বহু যুদ্ধ-বিগ্রহের পর স্বাধীনতার চরম ও চিরন্তন ফল প্রজ্ঞা, উদারতা ও দয়া। চির-পরাধীন জাতি যে সময়ে স্বাধীন হয়, সেই সময়ে সে যে বিভীষিকার প্রশ্রয় দিয়া থাকে, স্বাধীনতার বিরোধিগণ তৎপ্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে ভালবাসেন, কিন্তু স্বাধীনতা-লাভের পর জাতি যে মহাশান্তি লাভ করে, তৎপ্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হয় না।

নব স্বাধীনতা-প্রাপ্ত জাতি স্বাধীনতা লাভের সময়ে যে-সব অনাচার করিয়া থাকে, একটি উপায়ে তাহাদিগকে তাহা হইতে প্রতি-নিবৃত্ত করিতে পারা যায়, আর সেই উপায় হইতেছে স্বাধীনতার জন্য দাবী করিবামাত্র তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ স্বাধীন হইতে দেওয়া, সেইরূপ ক্ষেত্রে তাহাদিগকে বাধা না দিলে কোনওরূপ অনাচার অনুষ্ঠিত হইবে না।

আধুনিক অনেক রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, স্বাধীনতার উপযোগী না হইলে কোন জাতিরই স্বাধীন হওয়া উচিত নহে। দাসত্ব অবস্থায়ও জ্ঞানী ও উপযুক্ত হইবার আশায় যাহারা অপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহারা চিরকালই অপেক্ষা করুক। স্বাধীনতাই মানুষকে স্বাধীনতার উপযুক্ত করে; অন্য কিছুতে নহে। অধীন অবস্থায় মানুষ কখনও স্বাধীনতার উপযুক্ত হইতে পারে না। অতএব উপযুক্ত হইবার পূর্ব্বেই প্রত্যেক জাতিকে স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।
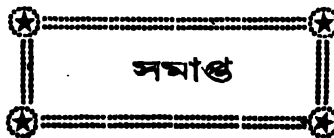
স্মরণে

এনেছিলে সাথে ক'রে
মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই আজ
ক'রে গেলে দান।

দেশবন্ধু

চিত্তরঞ্জন দাশ

বাংলার শিক্ষা-গুরু
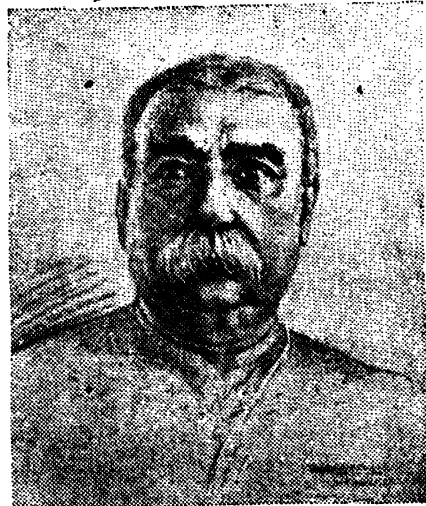
স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

কর্পোরেশন-অভিনন্দনে

কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট

ডাঃ এম-এ, আনসারি

গত ৩০শে জুন মঙ্গলবার অপরাহ্নে কলিকাতা টাউন-হলে কর্পোরেশনের মেয়র কর্ত্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে ডাঃ এম্-এ, আনসারি বলেন,—"ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাকে সম্মান দেওয়া হয় নাই, এ সম্মান দেশের একজন সেবকের উপর অর্পিত হইয়াছে। রমনীয় কলিকাতা মহানগরী সর্ব্ববিষয়ে ভারতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। ইহার চমৎকার সামাজিক জ্ঞান এবং শিক্ষাপ্রদ জীবনের তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও মিলে না। কলিকাতা ও বঙ্গদেশ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে চিরদিন অগ্রণী হইয়া আসিয়াছে। আজও অনেক শক্তিমান দেশমাতৃকার সুসন্তান মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য তাঁহাদের যথা-সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছেন * * *।"

বিজ্ঞানাচার্য্য

ডাঃ সি-ভি, রমণ

গত ২৬শে জুন কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে ডাঃ সি-ভি, রমণকে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। অভিনন্দনের উত্তরে ডাঃ রমণ বলেন,—"কলিকাতার নিকট আমি বহুলাংশে ঋণী। এই কলিকাতা-কেই কেন্দ্র করিয়া আমার সাধনা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আমি আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় ছাত্রগণ বিদেশে না যাইয়া ভারতবর্ষেই বিজ্ঞানানুশীলনের পথ খুঁজিয়া পাইবেন। আমি ভারত-বর্ষেই এমন বিজ্ঞান শিক্ষায়তন দেখিতে চাই, যাহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক গবেষণা-কেন্দ্রের সহিত তুলিত হইতে পারে।

শেষ-নিঃশ্বাসে

সিম্‌সন হত্যাপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত

দীনেশ গুপ্ত

মাতার নিকট শেষ পত্র

মা, যদিও ভাবিতেছি কাল ভোরে তুমি আসিবে, তবুও তোমায় কাছে না লিখিয়া পারিলাম না। তুমি হয়ত ভাবিতেছ ভগবানের কাছে এত কাতর প্রার্থনা করিলাম তবুও তিনি শুনিলেন না। তিনি নিশ্চয়ই পাষাণ, কাহারও বুক ভাঙ্গা আর্ত্তনাদ তাঁহার কাণে পৌঁছায় না। ভগবান কি আমি জানি না, তাহার স্বরূপ কল্পনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু তবুও এ কথাটা বুঝি তাঁহার সৃষ্টিতে কখনও অবিচার হইতে পারে না। তাঁর বিচার ঘরের দ্বার চিরকাল খোলা, নিত্যই তাঁর বিচার চলিতেছে। তার বিচারের উপর অবিশ্বাস করিও না, সন্তুষ্টচিত্তে বিচার ফল মাথা পাতিয়া নিতে চেষ্টা কর। কি দিয়া যে তিনি কি করিতে চান তাহা আমরা বুঝিব কি করিয়া? মৃত্যুটাকে আমরা এত বড় করিয়া দেখি বলিয়াই সে আমাদিগকে ভয় দেখাইতে পারে। এ যেন ছোট ছেলের মিথ্যা জুজু বুড়ীর ভয়। যে মরণকে একদিন সকলেরই বরণ করিয়া লইতে হইবে, সে আমাদের হিসাবের দুদিন আগে আসিল বলিয়াই কি আমাদের এত বিক্ষোভ, এত চাঞ্চল্য? যে খবর না দিয়া আসিত, সে খবর দিয়া আসিল বলিয়াই কি আমরা তাকে পরম শত্রু মনে করিব? ভুল, ভুল, মৃত্যু মিত্ররূপেই আমার কাছে দেখা দিয়াছে। আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে। তোমার 'নসু' (দীনেশ গুপ্ত)

বড় ভগ্নির নিকট শেষ পত্র

মণিদি, আজ পত্র পেলাম। ভগবানের আশীষ যারা পায় অশেষ দুঃখ জোটে তাদেরই কপালে। সে দুঃখের মালা গলায় পরবার সৌভাগ্য ও শক্তি কত জনের হয় জানি না, কিন্তু যার হয় তার জীবন পরম সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভগবান যাকে আপন কাজের জন্য বেছে নেন, তার সুখ সম্পদ সব কিছু দেন ধূলোয় লুটিয়ে, করেন তাকে পথের ভিখিরী রিক্ত কাঙাল। তিনি যাকে বরণ করেন, মরণ-মালা তারই গলায় পরিয়ে দেন।

সে মালা কি সহজ?

"এতো মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন
বজ্র হেন ভারী—
এ যে তোমার তরবারি।"

এ জীবনে সুখ পাওয়া বড় কথা হ'তে পারে, কিন্তু দুঃখ পাওয়া তার চেয়েও বড়। সুখ ভোগ করতে পারে সকলেই, কিন্তু স্বেচ্ছায় দুঃখের বোঝা বইতে পারে ক'জন? শক্তির উৎস তিনি। যাকে তিনি তাঁর কাজের ভার দেন, সে ভার বহন করবার শক্তিও তাকে অযাচিতভাবেই দান করেন। নইলে সাধ্য কি তার যে সে, সে-গুরুভার এক মুহূর্ত্তও সহ্য করে? যার প্রাণ আছে শ্রেয়ঃকে বরণ করবার জন্য যার আছে শ্রদ্ধা, সে কি কখনও তাঁর মহাশঙ্খের আহ্বান শুনে স্থির থাকতে পারে? কী শক্তি আছে সংসারের এ মিথ্যা মোহের যে তাকে আটকে রাখবে?

তাঁর আহ্বানে কি শক্তি আছে জানি না।

শুধু জানি—

যে শুনেছে কাণে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জ্জন,
নির্য্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি; মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত।"

আজ তবে যাই দিদি! হয়ত এই-ই আমার শেষ প্রণাম জানাচ্ছি—স্নেহের দীনেশ।

ভূ-পর্য্যটনে

সাইকেলে ভূ-পর্য্যটন প্রয়াসী

মিঃ টি, ই, হোসেন

মিঃ এন্, বি, মোহাম্মদ

মিঃ এন্, বি, মোহাম্মদ বোম্বাই প্রদেশের সুরাট জিলার অধিবাসী। চীন দেশের হংকং শহরে মাতুলালয়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে ইঁহার সমগ্র জগৎ ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়, কিন্তু নিঃসম্বল ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যতিরেকে শুধু খোদার উপর ঐকান্তিক বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মানুষ কেমন করিয়া দুর্গম অরণ্য, দুর্ভেদ্য পাহাড়, দুস্তর সাগর প্রভৃতি অতিক্রম করিতে পারে, ইনি তাহা জগতকে দেখাইতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া গত ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর জাপান-এর রাজধানী টোকিও হইতে সাইকেলে ভুবন পর্য্যটনে বাহির হন। অতঃপর তিনি জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, চীন, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, বৃটিশ বোর্ণিও, ফেডারেটেড মালয় রাজ্য, শ্যাম এবং ব্রহ্মদেশ অতিক্রম করেন। রেঙ্গুনে মিঃ টি, ই, হোসেনের সহিত মিঃ মোহাম্মদের সাক্ষাৎকার হয় এবং তথাকার ভারত প্রবাসীদের অনুরোধে তিনি মিঃ হোসেনকে গ্লাসগো পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে স্বীকৃত হন এবং ঐ স্থানে ইঁহারা ভূপ্রদক্ষিণ শেষ করিবেন। মিঃ হোসেন-এর জন্মভূমি সুরাট জিলায়। মিঃ এন্, বি, মোহাম্মদ ধর্ম্ম ও জাতীয়তা বিষয়ে উদারভাব পোষণ করেন। ইনি অবিবাহিত এবং অনেক ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে পারেন। ইনি জাপানী, ফিলিপাইনী ও ব্রহ্মদেশীয় ভাষা জানেন এবং ইঁহার প্রণীত কয়েকখানি পুস্তক আছে। জাপানী বন্ধুগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত মিঃ মোহাম্মদের পুরাতন সাইকেলখানি চট্টগ্রাম পৌঁছিলে নষ্ট হইয়া যায়। চট্টগ্রামের মুসলিম যুব-সঙ্ঘ ইঁহাকে একটী নূতন সাইকেল উপহার দেন। পুরাতন সাইকেলের ভগ্ন অংশ সকল কলিকাতা যাদুঘরে (Museum) রক্ষিত হইবে। মিঃ মোহাম্মদ জাপান, কোরিয়া, চীন, শ্যাম প্রভৃতি দেশের বহু উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং বিভিন্ন দেশ হইতে যথাক্রমে ১৪টী কাপ, ১১টী স্বর্ণ পদক, ৯টী রৌপ্যপদক এবং একটী রৌপ্যের রিষ্ট ওয়াচ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি লণ্ডনের স্বাস্থ্যসমিতি এবং আমেরিকার ওলিম্পিয়াম লিগের প্রথম ভারতীয় মেম্বর। মিঃ মোহাম্মদ জুলাই মাস পর্য্যন্ত কলিকাতা থাকিয়া গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া পুনর্যাত্রা করিবেন। সম্প্রতি সুরাটীওয়ালারা কলিকাতায় ইঁহাকে একটী টি পার্টি দিয়াছেন। মিঃ মোহাম্মদ সবল-সুস্থ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সাহসী যুবক। ইঁহার বর্ত্তমান বয়স ৩১ বৎসর এবং এ যাবত ইনি ১০,০০০ হাজার মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন।

সন্তরণ-প্রতিযোগিতায়

সন্তরণ বীর

মিঃ শফী আহ্‌মদ, বি-এ

মিঃ প্রফুল্লকুমার ঘোষ

বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তরণ বীর মিঃ শফী আহ্‌মদ একাদিক্রমে ৬৯ ঘণ্টা সন্তরণ করিয়া পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। ইনি হায়দ্রাবাদের অধিবাসী এবং হায়দ্রাবাদ ওছমানিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট। মিঃ শফীর এই রেকর্ড ভঙ্গ করিবার জন্য বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তরণ বীর মিঃ প্রফুল্লকুমার ঘোষ গত ৩রা জুলাই শুক্রবার সকাল ৬-২১ মিনিটের সময়ে কলিকাতার হেদুয়া-পুষ্করিণীতে সন্তরণ আরম্ভ করেন। ৬৬ ঘণ্টা সাঁতার কাটিবার পর তাঁহার শরীর শীতল হইয়া সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইতে থাকে। ডাঃ ধর তাঁহাকে জল হইতে উঠাইয়া আনেন। ইতোপূর্ব্বে ইনি এই পুষ্করিণীতেই কিঞ্চিদধিক ৬৭ ঘণ্টা সন্তরণ করিয়াছিলেন।

কর্ম্ম-সাধনায় নারী

পত্রিকা-সম্পাদিকা

মিসেস্ সেজা নেবারাবুল

মিশরের একমাত্র বিখ্যাত নারী-প্রগতিমূলক পত্রিকা "L' Egyptienn" এর সম্পাদিকারূপে সেজা নেবারাবুল জগদ্বিখ্যাতা হইয়াছেন।

মহিলা-সম্মিলনীর সভানেত্রী

ত্রিবাঙ্কুরের ছোটরাণী

সম্প্রতি মান্দ্রাজে মহিলা-সম্মিলনীর যে বার্ষিক বৈঠক হইয়া গিয়াছে, এই কৃতি মহিলা তাহার সভানেত্রীর কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

ভারত-বিখ্যাত

মাঙ্গালোর মহিলা-সমিতি

মাঙ্গালোরের মহিলা-সমিতি ভারত-বিখ্যাত। কিছুদিন পূর্ব্বে লেডী বিয়াট্রিস্ ষ্টান্লী এই প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়া ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

সাধু সংকল্পে

তুরস্কের প্রেসিডেণ্ট

মোস্তফা কামাল পাশা

তুরস্কের মহাজন ও সুদ-ব্যবসায়ীদের হাত হইতে দরিদ্র ঋণ-প্রার্থিগণকে বাঁচাইবার জন্য মোস্তফা কামাল পাশা এক নূতন আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। এই আইনের ফলে সুদ-ব্যবসায়ীরা আর কাহারও নিকট হইতে যথেচ্ছভাবে সুদ আদায় করিতে পারিবে না। অন্যায় ভাবে সুদ আদায় করিলে আদায়কারীর তিন হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট

মিঃ হুভার

সম্প্রতি মিঃ হুভার এক বিবৃতিতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমেরিকা ইউরোপকে সমর ঋণ হইতে রেহাই দিতে পারে না, তবে এক বৎসরের জন্য কিস্তি পরিশোধ স্থগিত রাখা যাইতে পারে। মিঃ হুভারের এই ঘোষণায় ঋণভার-গ্রস্ত সমগ্র ইউরোপ একটা সোয়াস্তির হাফ্ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে।

কাবুলের ভূতপূর্ব্ব বাদশাহ্

রাজর্ষি আমানুল্লাহ্ খাঁ

সম্প্রতি আমানুল্লাহ্ খাঁ হজ্জ্ করার উদ্দেশ্যে বিশ্বমোছলেম-মিলনকেন্দ্র মক্কায় গমন করিয়াছেন। হজ্জ্ সমাপনান্তে ইনি শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে শ্মশ্রু রাখিয়াছেন এবং আরবীয় পোষাক পরিধান করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছেন।

বৃটিশ ভারতের কারখানা সমূহে ও চা-বাগান প্রভৃতিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, যোগ্যতা, জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য যে রাজকীয় শ্রমিক কমিশন গঠিত হইয়াছে, তাহার রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। আগামী শাসনতন্ত্রে শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্টে আলোচিত হইয়াছে এবং এ সম্পর্কে আইনাদি প্রণয়নের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখাই সুপারিশ করা হইয়াছে। ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে একটি শ্রমিক পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। শ্রমিক, ধনিক ও সরকার পক্ষের প্রতিনিধিগণ এক হইয়া তাহাতে শ্রমিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিবেন বলিয়া কমিটি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হুইট্‌লি কমিশনের সভাপতি

মিঃ হুইট্‌লি

অসাধু প্রচেষ্টা ও তাহার কারণ—

ফরিদপুরের জাতীয়-দলের মুছলমানদের কন্‌ফারেন্স যাহাতে কোন-প্রকারে সুসম্পন্ন হইতে না পারে, বাঙ্গলার কএকজন মুছলমান-জমিদার সে-সম্বন্ধে কোমর বাঁধিয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ঢাকার মান্যবর মিঃ আবদুল হাফিজ, মিঃ আবদুল হালিম গজনভী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "যে কোন উপায়ে হউক, কন্‌ফারেন্স ভাঙ্গিয়া দাও"—এই মর্ম্মের ২৫।৩০ খানা টেলিগ্রাম কএকদিনের মধ্যে ফরিদপুরের মুছলমানদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। সুখের বিষয়, অন্যমতের মুছলমান নেতারা এই সব হীন প্ররোচনায় উত্তেজিত হওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই। এজন্য তাঁহারা সকলের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

জাতীয়-দলের ও অন্যমতের মুছলমানদের মধ্যে প্রধান অনৈক্য হইতেছে নির্ব্বাচনের পদ্ধতি লইয়া। অন্যমতের মুছলমানদের কনফারেন্সে কিছুদিন পূর্ব্বে এই ফরিদপুরেই মিশ্র-নির্ব্বাচনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। সুতরাং জাতীয়-দলের ও অন্যমতের নেতাদের মধ্যে মারাত্মক পার্থক্যও কিছু ছিল না। এই সমস্ত কারণে এতগুলি টেলিগ্রাম পাঠাইয়া, এমন কি টাকা পাঠাইবার আশ্বাস দিয়াও, মিঃ গজনভী ও মিঃ আবদুল হাফিজ প্রভৃতি কনফারেন্সের কাজে সামান্য একটুও বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হন নাই।

আমরা ফরিদপুর গিয়া জানিয়াছিলাম—এলাহাবাদের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক ডাঃ শাফায়াত আহ্‌মদ খাঁ ছাহেবও কনফারেন্স ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য টেলিগ্রাম প্রেরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। উত্তমরূপে অবস্থার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে জানা যাইবে—বাঙ্গলার কএকজন মুছলমান জমিদার আর পশ্চিম অঞ্চলের কএকজন অনাহুত দরদী নিজেদের কোন একটা সাধারণ স্বার্থ-উদ্ধারের জন্য এক-যোগে আসরে নামিয়াছিলেন।

বাঙ্গলার জন-সাধারণ কোনপ্রকার রাজনৈতিক অধিকার লাভ করুক, তাহাদের মধ্যে গণশক্তির জাগরণ হউক, জমিদাররা ইহা দেখিতে ও সহিতে পারেন না। তাই গবর্ণমেণ্ট যখন ব্যবস্থাপক-সভার ভোটারদিগের যোগ্যতার মান বহু পরিমাণে কমাইয়া দিবার প্রস্তাব করিতেছেন, তাঁহাদের দলস্থ একজন মেম্বর তাহার ঘোর প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। গবর্ণমেণ্টের অন্য মেম্বরগণ যখন প্রস্তাব করিতেছেন—বর্ত্তমানের এক টাকা রোড-সেসের পরিবর্ত্তে, ভবিষ্যতে রোড ও পাবলিক ওয়ার্কসেস মিলাইয়া যাহারা এক টাকা দিবে, তাহাদিগকে ভোটের অধিকার দিতে হইবে। সেই সময়ে বাঙ্গালী মুছলমানের এই দরদী হিতৈষী তাহার প্রতিবাদের জন্য স্বতন্ত্র-মন্তব্য লিখিয়া প্রস্তাব করিতেছেন—যাহারা অন্যূন ১০৲ টাকা সেস বা ৫০ টাকা রেভিনিউ দিবে, তাহাদিগকে ভোটের অধিকার দিতে হইবে। তাঁহার মতে, মুছলমানদের স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের মধ্যেও আর-একটা বিশেষ স্বতন্ত্র-চক্রের সৃষ্টি করিতে হইবে, এবং "of the total number of Muhammadan seats that may be decided, say 25 to 30 per cent. should be returned by a separate class voters with higher property qualification." অর্থাৎ, 'মুছলমান মেম্বরদের জন্য যে সংখ্যা

নির্দ্ধারিত হইবে, তাহার মধ্যকার ২৫।৩০ জন মেম্বর স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের অভ্যন্তরস্থ আর একটা বিশেষ নির্ব্বাচন-চক্রের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। এই বিশেষ-চক্রের ভোটারদের যোগ্যতার মান খুবই উচ্চ করিতে হইবে।" এই মানের পরিচয় উপরে দেওয়া হইয়াছে।

মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে মুছলমান মেম্বরদের অধিকাংশই যে নির্ম্মম ব্যবহার করিয়াছেন, এই মেম্বর সাহেবের মন্তব্যে সে-সম্বন্ধে একটা তীব্র অভিমান ও প্রতিহিংসার ভাব পরি-স্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহাতে তাঁহার নাম না থাকিলেও এখানে তাঁহার পরিচয়টা খুবই স্পষ্টরূপে ধরা পড়িয়া যাইতেছে। সে যাহা হউক, এই মন্তব্যে তিনি বলিতেছেন—মন্ত্রীদের সম্বন্ধে সহযোগপন্থী-মুছলমান মেম্বররা যাহা করিয়াছেন, তাহা হিন্দু সহযোগীদের তুলনায়ও নিতান্ত অন্যায় হইয়াছিল। এই প্রকার সংঘর্ষের সময়ে দেখা গিয়াছে—সহযোগী-হিন্দু মেম্বরদের ৩ অংশের অধিক মন্ত্রীদের সমর্থন করিতেছে, কিন্তু সহযোগপন্থী মুছলমান মেম্বরদের এক তৃতীয়াংশের সমর্থনও এক্ষেত্রে কখনও পাওয়া যায় নাই। এই জন্য তিনি মাথার দিব্য দিয়া বলিতেছেন—'খবরদার, মুছলমান মেম্বরদের উপর নির্ভর করিও না, franchise কম হতে দিও না!' তিনি আরও বলিতেছেন :—

(1) "I do not think, however, that the assumption is right that the Muhammadans who would be returned to the Legislative Council on an extended franchise will not be Anti-British."

"যোগ্যতার মান কমাইয়া বা ভোটারের সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়ার ফলে যে-সব মুছলমান ব্যবস্থাপক-সভায় আসিবেন, তাঁহারা যে বৃটিশ-বিরোধী হইবেন না—এ অনুমানকে আমি সঙ্গত বলিয়া মনে করি না।"

(2) "There are already the beginings of a movement, not very serious at the present movement, amongst the younger section of the Muhammadans which are Anti-British and decidedly antagonistic to the opinion of the older and soberer section of Muhammadans."

"উপস্থিত বিশেষ সাংঘাতিক না হইলেও, ইতিমধ্যে মুছলমান যুবকদের মধ্যে বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হইয়া গিয়াছে। এই আন্দোলনটী ধীর ও প্রাচীন মুছলমানদের মতের নিশ্চিত ঘোর পরিপন্থী।"

(3) With the extention of franchise young pleaders, journalists and men with very little stake amongst the Muhammadan Community will have a much better chance of being returned.

"যোগ্যতার মান কমাইয়া বা ভোটারের সংখ্যা বাড়াইয়া দিলে, ছোকরা-উকিলদের, সাংবাদিকগণের এবং মুছলমান-সমাজে যাহাদের কোন ভিত্তি নাই—তাহাদের পক্ষে ব্যবস্থাপক-সভায় আসা খুবই সহজ হইয়া যাইবে।"

এই মন্তব্যটী, ১৯৩০ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে প্রেরিত বাঙ্গলা-গবর্ণমেন্টের রিপোর্টের সহিত সংযোজিত হইয়াছে। সুতরাং উদ্ধৃতাংশগুলি পাঠ করিয়া এবং তারিখের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিয়া দেখিলে এই সরকারী মেম্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে খুব সহজে অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

এই শ্রেণীর মুছলমান জমিদাররা সমাজের জনসাধারণকে কোন প্রকার ক্ষমতা বা অধিকার দিতে কুণ্ঠিত, তরুণ উকিল ও সাংবাদিকগণের ভয়ে ইহারা সদা সন্ত্রস্ত, এবং জাতির নব-জাগরণের উদ্দাম-আকাঙ্খাকে গবর্ণমেন্টের সাহায্যে গলা টিপিয়া মারার জন্য ইহারা সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত। অথচ তাঁহারা সমাজের এই সর্ব্বনাশ করিতে চাহেন, তাহারই স্বার্থের দোহাই দিয়া। একমাত্র এই কারণে তাঁহারা মিশ্র-নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন।

পক্ষান্তরে, জাতীয়দলের মুছলমানরা চাহিতেছেন—দেশে সত্যকার গণতন্ত্র স্থাপন করিতে। এজন্য স্ব-সমাজের জনসাধারণকে তাঁহারা আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ও অধিকার দিতে চান, সকল শ্রেণীর বুরজুয়াদের সকল প্রকার শাসন-শোষণের নিষ্পেষণ হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিতে চান, শিক্ষিত তরুণদিগের নব-প্রগতির জাগ্রত-আকাঙ্খাকে জয়যুক্ত করিতে চান।

উপরোক্ত সরকারী মেম্বর ছাহেব পরে স্পষ্ট করিয়া

বলিয়াছেন—franchise কমাইয়া দেওয়ার পর সমাজের প্রাচীন ও প্রতিপত্তিশালী প্রধানদের দুর্দ্দশার আর অবধি থাকিবে না। কারণ, তরুণগণ এবং মোল্লা ও মৌলবীর দল মিলিয়া তখন কদিমী বড়লোকদের পক্ষে কাউন্সিলে যাওয়া অসম্ভব করিয়া তুলিবে। এই দলের সমস্ত আতঙ্কের ইহাই হইতেছে একমাত্র কারণ, এবং এই কারণেই তাঁহারা জাতীয়দলের নামে এতটা বিচলিত হইয়া পড়িতেছেন।

বাঙ্গলার এই stake-ওয়ালা প্রবীণ ও কদিমী বড়-লোকের দল, স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন-রক্ষার জন্য কেন এতটা আদা-জল খাইয়া লাগিয়া গিয়াছেন, উপরে আমরা তাহা সম্যকভাবে দেখাইয়াছি। এখন বুঝিতে হইবে যে, মধ্য-প্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশের মুছলমান-নেতাদের জাতীয়দলের সভা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য এতটা মাথা-ব্যথা হওয়ার কারণ কি? বাঙ্গলার মুছলমানদের জন্য মিশ্র বা স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের মধ্যে কোন্‌টা উপকারী বা অপকারী, বাঙ্গলার মুছলমানরাই তাহার বিচার করিতে পারে। তাহাদের প্রত্যেক পক্ষ স্বাধীনভাবে নিজেদের যুক্তি-প্রমাণ জাতির সম্মুখে উপস্থিত করুন, অবশেষে জাতির লোকমতই তাহার শেষ-মীমাংসা করিয়া লইবে। এজন্য ডাঃ শাফায়ত আহ্‌মদ খাঁ ছাহেবের এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের এতটা ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটার কারণ কি?

এই কারণ-নির্দ্দেশের জন্য আমাদিগকে ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের, সাইমন-রিপোর্টের এবং গোল টেবিলের কার্য্য-বিবরণের প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে। আমাদের এই বিদেশী দরদীরা তখন স্থির করিয়া দিয়াছিলেন—মোট 'নির্ব্বাচিত ভারতীয়' মেম্বরদের শতকরা ৪০টী আসন বাঙ্গলার মুছলমানরা পাইবেন। অথচ বাঙ্গলার মুছলমানদের সংখ্যা হইতেছে ২ কোটি ৫৪ লক্ষ। পক্ষা-ন্তরে পাঞ্জাবের মুছলমানদের সংখ্যা ১ কোটি ১৪ লক্ষ হইলেও তাহাদিগকে দেওয়া হইল শতকরা ৫০টী আসন। এই দরদের ফলে, বর্ত্তমানে বাস্তব-ক্ষেত্রে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, নিম্নে তাহার একটা তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

প্রদেশ	মুছলমানের অনুপাত	মোট কাউন্সিলে মুছলমানের অনুপাত	লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের অনুপাত
১। পাঞ্জাব	৫৫·২	৪০	৫০
২। যুক্ত-প্রদেশ	১৪·৩	২৫	৩০
৩। বাঙ্গলা	৫৪·৬	৩০ *	৪০
৪। বিহার ও উড়িষ্যা	১০·৯	১৮·৫	২৫
৫। মধ্যপ্রদেশ	৪·৪	৯·৫	১৫
৬। মাদ্রাজ	৬·৭	১০·৫	১৫
৭। বোম্বে	১৯·৮	২৫·৫	৩৩·৩

এইরূপে বাঙ্গলার মুছলমানদিগকে নির্ম্মমভাবে জবাই করিয়া, এই বিদেশী দরদীরা নিজদের কিরূপ সুবিধা করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা এই তালিকা হইতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে (সাইমন-রিপোর্ট, ১—১৮৯)।

মোছলেম-কনফারেন্সের পক্ষ হইতে মুছলমানদের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তিনটী দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন—(১) সকল প্রদেশে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন বহাল থাকিবে, (২) যুক্ত-প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ ও মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের মুছলমানরা বর্ত্তমানে যে weightage বা অনুপাতের অতিরিক্ত আসন-সংখ্যা ভোগ করিতেছেন, তাহাও পূর্ব্বের ন্যায় বজায় থাকিবে, এবং (৩) বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের মুছলমানদিগকে তাহাদের জন-সংখ্যার অনুপাত-অনুসারে আসন-নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে হইবে।

সরকার পক্ষের সকলে একবাক্যে এই দাবীর প্রতিবাদ করিয়াছেন। সাইমন কমিশন যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার এই যে, মুছলমানরা যদি সর্ব্বত্র স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন বহাল রাখিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সংখ্যা-লঘু ৬টা প্রদেশে বর্ত্তমান weightageও বজায় রাখিতে চায়, তাহা হইলে

* মিঃ এফ. রহমান ঢাকা ইউনিভার্সিটী হইতে নির্ব্বাচিত হওয়ায় সেইবার মাত্র সংখ্যা ৩০ হয়। বস্তুতঃ প্রকৃত সংখ্যা ২৯ ধরিতে হইবে

বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের ব্যবস্থাপক-সভায় তাহাদিগকে বর্ত্তমানের অনুপাত স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ফলতঃ সর্ব্বত্র স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন বহাল রাখিয়া বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবে জন-সংখ্যার অনুপাতের দাবী উপস্থিত করিতে হইলে যুক্ত ও মধ্য-প্রদেশ প্রভৃতির অতিরিক্ত আসন ভোগের অধিকার প্রথম চোটেই নষ্ট হইয়া যায়। তাই ডাঃ শাফায়ত আহ্‌মদ প্রমুখ বিদেশী দরদীরা বাঙ্গলার মুছলমানকে পূর্ব্বের ন্যায় আবার জবাই করিতে চাহিতেছেন, তাহাদিগকে চিরস্থায়ীভাবে সংখ্যা-লঘু করিয়া রাখিয়া নিজেদের মতলব হাসিল করিয়া লওয়ার চেষ্টা পাইতেছেন। এই কারণেই বাঙ্গলায় স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন বহাল রাখার জন্য তাঁহাদের এই অসাধারণ চাঞ্চল্য।

বাঙ্গলার জমিদারদের সহিত বিদেশী দরদীদের স্বার্থ এইখানে মিলিয়া যাইতেছে, এবং সেইজন্য তাঁহারা উভয় দল মিলিয়া স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন রক্ষা করার নিমিত্ত আজ এতটা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

সংবাদপত্র পাঠকগণ অবগত আছেন—গত ১৪ই জানুয়ারী তারিখে, গোল টেবিলের Minorities Sub-Committeeর যে অধিবেশন হয়, তাহাতে স্যার মোহাম্মদ শফি "সমস্ত মুছলমান মেম্বরগণের পক্ষ হইতে এবং তাঁহাদের সম্মতি ও নির্দ্দেশ অনুসারে" যে সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলেন যে,—

(১) পাঞ্জাবের মুছলমানদিগকে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন দ্বারা ব্যবস্থাপক-সভার মোট আসনের মধ্যে শতকরা ৪৯টী দখল করার অধিকার দেওয়া হউক, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে বিশেষ নির্ব্বাচন-চক্রগুলিতে প্রতিযোগিতা করারও অধিকার দেওয়া হউক।

(২) ৬টী সংখ্যা-লঘু প্রদেশে, মুছলমানদিগকে বর্ত্তমানের ন্যায় পূর্ণ weightage বা অতিরিক্ত আসনগুলি দখল করার অধিকার দেওয়া হউক।

(৩) বাঙ্গলার মুছলমানদিগকে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের দ্বারা ৪৬টী আসন লাভের অধিকার দেওয়া হউক। বিশেষ নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে অতিরিক্ত আসন-লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করার অধিকার তাহাদের থাকিবে।

এই প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেন যে,... In the Punjab they have a possibility of securing two seats through the special constituencies. অর্থাৎ "পাঞ্জাবে বিশেষ-নির্ব্বাচনের দ্বারা আর দুইজন মুছলমানের নির্ব্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।" ফলে স্যার শফীর প্রস্তাব মতে স্বতন্ত্র ও বিশেষ-নির্ব্বাচন মিলাইয়া পাঞ্জাবের মুছলমানদের সংখ্যা-গুরু (=শতকরা ৫১ জন) হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

পাঞ্জাবের ও অন্য প্রদেশগুলির বেলায় এইরূপে কড়ায়-গণ্ডায় নিজেদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করার বিনিময় স্বরূপ বাঙ্গলার মুছলমানদিগকে হিন্দুদের হাতে চিরস্থায়ী ভাবে বিক্রয় করিয়া ফেলার চেষ্টা করিতে তাঁহারা একবিন্দুও কুণ্ঠিত হন নাই। হিন্দুর অমতে বাঙ্গলার কোন বিশেষ নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে কোন মুছলমানের নির্ব্বাচিত হওয়া যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। স্যার মোহাম্মদ শফী ঐ সভায় নিজেই বলিয়াছিলেন,—

The result of the proposal I have made for Bengal will be that the Mussalmans will remain in a permanent minority although they constitute a majority of the population.

অর্থাৎ—"আমি যে প্রস্তাব করিয়াছি, তাহার ফলে, সংখ্যা-গুরু হওয়া সত্ত্বেও, বাঙ্গলার মুছলমানদিগকে চিরকালের জন্য সংখ্যা-লঘু হইয়া থাকিতে হইবে।" এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে বাঙ্গলা কাউন্সিলে মুছলমানের ও অমুছলমানের অনুপাত দাঁড়াইত যথাক্রমে ৪৬ এবং ৫৪ হিসাবে। বলা বাহুল্য যে, সরকারী হল্‌কা উঠিয়া যাওয়ায় এবং প্রাদেশিক স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর এই প্রকার প্রস্তাব করা আর বাঙ্গলার মুছলমানকে চিরকালের জন্য হিন্দুর দাসত্বে সমর্পণ করা, একই কথা। স্যার মোহাম্মদ শফী উপরোক্ত সর্ব্বনাশকর প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন—এই ডাঃ শাফায়ত আহ্‌মদ ও অন্য যত সব বিদেশী দরদীর অভিপ্রায় ও নির্দ্দেশ অনুসারে, এবং মোছলেম-বঙ্গের পুণ্যশ্লোক প্রতিনিধি মিঃ আবদুল হালিম গজনভী ও মৌলভী এ, কে, ফজলুল হক ছাহেবানের সম্মুখে—তাঁহাদের সম্মতি অনুসারে! অথচ এই নির্ম্মমতার চিত্রকে নির্ম্মমতর করিয়া তোলা হইতেছে, বাঙ্গলার মুছলমানের স্বার্থের দোহাই দিয়া।

ফরিদপুর-সম্মিলনের প্রস্তাব—

গত ২৭শে ও ২৮শে জুন ফরিদপুরে নিখিল-বঙ্গ জাতীয়তাবাদী মোছলেম-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ডাঃ মোখতার আহমদ আনছারী ইহার সভাপতি ছিলেন। সম্মিলনে অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে যে প্রস্তাবটী গৃহীত হয় এবং যাহাকে সম্মিলনের মূল-প্রস্তাব বলা যাইতে পারে, তাহা এই ঃ—

নিখিল-বঙ্গ জাতীয়তাবাদী-মুছলমান দলের এই সম্মেলনের মতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের সন্তোষজনক ও ন্যায়সঙ্গত উপায় ঃ—

(১) প্রত্যেক বালেগ স্ত্রী-পুরুষের ভোটের অধিকার সহ যুক্ত-নির্ব্বাচন-প্রথা আগামী শাসন-সংস্কারের ভিত্তি হইবে। কিন্তু যদি এই ভোট-অধিকার (Adult suffrage) প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে ভোটের অধিকার এমনভাবে বাড়াইতে হইবে, যাহাতে যে সকল ব্যক্তি যে-কোন-পরিমাণ 'হুজুর রাজস্ব' (Revenue), হস্তবুদ খাজানা (Rent) ট্যাক্স বা সেস্ দিয়া থাকে, সে সকল ব্যক্তি ভোটারের তালিকায় শামেল হয়।

(২ ক) Adult suffrage (বালেগ স্ত্রী পুরুষের ভোটাধিকার) অথবা হুজুর রাজস্ব, হস্তবুদ খাজানা, টেক্স বা সেসের ভিত্তির উপর ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে, যে সকল সম্প্রদায় সংখ্যায় শতকরা ২৫ জন অপেক্ষা কম, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভায় জন-সংখ্যার অনুপাত অনুসারে তাহাদের প্রতিনিধি-সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইবে এবং অতিরিক্ত আসন দখল করারও অধিকার তাহাদের থাকিবে।

(খ) যে সকল প্রদেশে মুছলমানরা সংখ্যা-লঘু এবং শতকরা ২৫ জনের কম, তাহাদের জন্য সংখ্যার অনুপাত অনুসারে আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবে এবং অতিরিক্ত আসন দখল করারও অধিকার থাকিবে। কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়কে যদি Weightage (নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক অতিরিক্ত আসন) দেওয়া হয়,—তাহা হইলে মুছলমানদের জন্যও তাহাদের বর্ত্তমান Weightage বজায় রাখিতে হইবে।

(৩) ফেডারেল বা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার উভয় গৃহে মোছলেম-প্রতিনিধির সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ হইবে।

(৪) সর্ব্বপ্রকার সরকারী চাকুরীতে পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের দ্বারা সর্ব্বনিম্ন যোগ্যতার মাপকাঠি অনুসারে নিয়োগ কার্য্য সমাধা হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কোন সম্প্রদায়কে তাহার ন্যায়সঙ্গত অংশ হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। নীচের গ্রেডের চাকুরীতে কোন সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকার স্থাপিত হইবে না।

(৫) বিভিন্ন ব্যবস্থাপক-সভায় সর্ব্বদল-স্বীকৃত কনভেনশনের দ্বারা ফেডারেল বা প্রাদেশিক কাউন্সিলে মোছলেম স্বার্থ যথাযথ ভাবে রক্ষিত হইবে।

(৬) সিন্ধুকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিতে হইবে।

(৭) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ ও বেলুচিস্থানে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় একই প্রকারের শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবে।

(৮) আগামী সংস্কারে দেশে ফেডারেল পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবে এবং "অবশিষ্টাত্মক ক্ষমতা" (Residuary powers) প্রত্যেক ফেডারেটেড্ ইউনিটে (প্রদেশে) থাকিবে।

(৯ ক) কন্‌ষ্টিটিউশনে (Constitution) প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে এরূপ বিধান থাকিবে, যাহাতে তাহার কাল্‌চার, ভাষা, বর্ণসঙ্কেত, শিক্ষা, ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান পালন, ধর্ম্মার্থ উৎসর্গিত সম্পত্তি (ওয়াকফ্ সম্পত্তি) এবং আর্থিক অবস্থার নিরাপদতা ঘোষণা করা হইবে।

(খ) মৌলিক অধিকার ও ব্যক্তিগত আইনকে স্পষ্ট বিধানের দ্বারা যথোপযুক্ত ভাবে নিরাপদ করিয়া শাসনতন্ত্রের (Constitution) অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(গ) কেন্দ্রীয় সভার উভয় গৃহের পাঁচ ভাগের চার ভাগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মতাধিক্য ব্যতীত মুছলমান-সংক্রান্ত মৌলিক অধিকার-সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে না।

(১০) ফেডারেল শাসনতন্ত্রের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায়—

(ক) কোনো প্রকারের বিশেষ কেন্দ্র থাকিবে না।

(খ) কোনো প্রদেশে দ্বিতীয় চেম্বার থাকিবে না।

এই ক্ষুদ্র মন্তব্যে এই দীর্ঘ প্রস্তাবের বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। অতএব আমরা ইহার বর্জ্জন ও অর্জ্জন-নীতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিতে চাই। এই

প্রস্তাবের দ্বারা মুছলমানদিগের "স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন অধিকার" ত্যাগ করা হইয়াছে। কেননা, ইহা দেশের রাজনৈতিক অগ্রগতির পথে অন্তরায়। পক্ষান্তরে গত যুগে ইহার দ্বারা মুছলমান সমাজের কোন উপকার হয় নাই। ভবিষ্যতেও ইহার দ্বারা আমরা কোন উপকার লাভ করিতে পারিব, এরূপ কোন আশা পোষণ করাও বৃথা। এই কারণে জাতীয়তাবাদী মুছলমানেরা এখনই "স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন-অধিকার" বর্জ্জন করার পক্ষপাতী। লক্ষ্ণৌ এবং ফরিদপুর সম্মিলনে ইহা বর্জ্জন করিয়া পরিবর্ত্তে মিশ্র-নির্ব্বাচন-অধিকার তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা কতকগুলি নূতন অধিকার দাবী করিয়াছেন। এগুলির তুলনায় "স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন-অধিকার" নিতান্ত তুচ্ছ, তাহা যিনি একবার প্রস্তাবটি মনোযোগ সহকারে পড়িয়া দেখিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। "(চ)" এর দফাতে সরকারী চাকুরীর কথা বলা হইয়াছে। "বঙ্গব্যবচ্ছেদ-আন্দোলনের" সময়ে "শতকরা ৩৩" এর সরকারী সারকুলার জারি হয়। কিন্তু সে সারকুলার অনুসারে কোন কার্য্য হয় নাই। অথচ ইতোমধ্যে আবার "শতকরা ৪৫" এর ঘোষণা প্রচারিত হয়। এই ঘোষণা অনুসারেও আজ পর্য্যন্ত কোন কার্য্য হয় নাই। তাহার কারণ, বিভাগীয় কর্ত্তাগণের অবাধ ক্ষমতা এবং সরকারের অবহেলা ও অনিচ্ছা। ইহার প্রতিকারের জন্য এই দফায় একটি নিরপেক্ষ কমিশনের দাবী করা হইয়াছে। এখানে বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়, বাঙ্গলা ও পঞ্জাবের বাহিরে সরকারী চাকরীতে মুছলমানের অনুপাত তাহাদের জনসংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক। সুতরাং সেখানকার মুছলমানদিগের জন্য 'কমিশনের' প্রয়োজন নাই। যদি প্রয়োজন থাকে, তবে তাহা সেখানকার অন্য-অন্য সম্প্রদায় এবং বাঙ্গলা ও পঞ্জাবের মুছলমানদিগের জন্য। আর একটি দাবী করা হইয়াছে, "৯ (ক). (খ) ও (গ)" দফা সমূহে। প্রকৃতপক্ষে ইহাই "এছ্‌গামী স্বার্থ।" বর্ত্তমান শাসন-সংস্কারে এরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। ফলে ব্যবস্থা-পরিষদের 'সংস্কারবাদী' সদস্যগণ যখন খুশী ধর্ম্ম সংশোধনের প্রস্তাব আনয়ন করিয়া থাকেন। ইহার প্রতিকারার্থেই এই দাবী। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভার "বিশেষ কেন্দ্র" (Special Constituency) তুলিয়া দিবার এবং "দ্বিতীয় চেম্বার" প্রতিষ্ঠা না করার প্রস্তাবের সহিত বাঙ্গলা দেশ ও তাহার কৃষি ও কৃষকের—সুতরাং মুছলমান সমাজের জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে। ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে "যুক্ত-নির্ব্বাচন-প্রথা" গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কেননা, আমরা যদি "মুছলমান বলিয়া সংখ্যা-গুরু হইয়াও" স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন-অধিকার দাবী করি, তবে ইউরোপীয় প্রবাসী এবং অন্য-অন্য ধনিক-বণিকের সে অধিকার ন্যায়তঃ আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

মাস-পঞ্জী

আষাঢ়—১৩৩৮

১লা হইতে ৭ই আষাঢ় পর্য্যন্ত—১৬ই জুন—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতার নানাস্থানে শোক-সভার অনুষ্ঠান হইয়াছে। রাজ্যের আর্থিক দুরবস্থা হেতু বোম্বাই-সরকার ভারত-সরকারের অনুমোদনক্রমে খয়েরপুরের মীর সাহেবের ক্ষমতা হ্রাস করিয়াছেন। পেশাওরের এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, পাঞ্জু-মোয়ারের নামক জেলায় ভূমিকম্প হইয়া ১৫ জন লোক হত ও ৫০টি বাড়ী বিনষ্ট হইয়াছে। ১৭ই জুন—নারায়ণগঞ্জ মহকুমার মনোহরদি থানার অধীন চরবহর নামক স্থানে পুলিশ ও জনকয়েক গ্রাম-বাসীর মধ্যে লড়াইয়ের ফলে একজন গ্রামবাসী নিহত ও দুইজন কনেষ্টবল গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। ১৮ই জুন—নোয়াখালী, দুর্গাপুর মহিলা সমিতি দুর্গাপুরে খাদি ও শিল্প-প্রদর্শনী খুলিয়াছেন। ১৯শে জুন—সীমান্তের গান্ধী অদ্য বরোদা রওনা হইয়াছেন। হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ২০শে জুন—বোরসাদ তালুকের প্রজাগণ সন্ধ্যাকালে মহাত্মার সঙ্গে দেখা করিয়াছেন। নাগপুর হইতে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী পেরি নামক গ্রামে ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যায় ৫০ খানা বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে। ২১শে জুন—আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থার প্রতিকারকল্পে আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট এক বৎসরের জন্য সমস্ত রাষ্ট্রের নিকট হইতে কিস্তি আদায় স্থগিত রাখিবেন। সিমলায় মৌলানা সৌকত আলী বলিয়াছেন, আমাদের মীমাংসার আশা এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। ২২শে জুন—লণ্ডনে একটী জনসভায় বক্তৃতাকালে আর্ল উইণ্টারটন বলেন যে, "ইংলণ্ড ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। অদ্য লর্ড আরউইন বিলাতের রক্ষণশীলদলের অন্তর্গত ভারত সম্পর্কিত কমিটির সদস্যগণের এক সভায় ৪৫ মিনিটকাল বক্তৃতা করিয়াছেন।

৮ই হইতে ১৪ই আষাঢ় পর্য্যন্ত—২৩শে জুন—বহু মুসলমান পিকেটার অদ্য প্রাতে ম্যাক্‌লেগান ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পিকেটিং করিয়াছে। কমন্স সভায় কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে সহকারী সচিব বলেন যে, সাইপ্রাস দ্বীপে স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তনের জন্য বর্ত্তমানে কোন পথই অবলম্বিত হইবে না। ডরসেটের নিকট এক কারখানায় বিস্ফোরণের ফলে ১৯ জন লোক আহত এবং ১১ জন নিহত হইয়াছে। বিলাতের রক্ষণশীলদলের এক সভায় লর্ড আরউইন এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভারতবর্ষে ইংরাজের প্রেষ্টিজ চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে। ২৪শে জুন—চলন্ত ট্রেণে ডাকাতি করার অপরাধে তিন ব্যক্তি মজফ্‌ফরপুরে অভিযুক্ত হইয়াছে। ফরিদপুর, চৌদ্দরশি গ্রামে ফরিদপুর জেলা যুব-সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মিঃ শাকলাতওয়ালা, সি-বি, উকিল এবং লণ্ডন কংগ্রেস কমিটির আরও ৪ জন সদস্য এক ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে, করাচী কংগ্রেসে গান্ধী-আরউইন চুক্তি সমর্থন করায় চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হইয়াছে। ইটালী-সরকার শাসন-কার্য্যে পোপের অবৈধ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এক পত্রে প্রতিবাদ করিয়াছেন। ২৫শে জুন—উত্তর বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, সেই সম্পর্কে বাংলার গভর্ণর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত আলোচনা করিয়াছেন। লাঠী লইয়া চলা-ফেরা করিতে নিষেধ করিয়া বারাবাঁকিতে ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে। রাত্রি ১০টায় মহাত্মা গান্ধী, মিঃ যমুনালাল বাজাজ ও আব্বাস্ তায়েবজী সহ তাজমহল হোটেলে উপস্থিত হইয়াছেন। মিঃ স্নোডেন পার্লামেণ্ট মহাসভায় ভূমি-রাজস্ব সম্বন্ধে উদার-নৈতিক দলের ভাবগতিকে তীব্র আক্রমণ করিয়াছেন। আমেরিকার চারিটি ব্যাঙ্ক একযোগে জার্ম্মাণীর কোন ব্যাঙ্ককে অল্প দিনের মিয়াদে ২ কোটি পাউণ্ড ঋণ দিয়াছে। ২৬শে জুন—করাচী কংগ্রেসে সাধারণের মূল অধিকার সমাধানের নিমিত্ত যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল, অদ্য তাহার শেষ সভা হইয়া গিয়াছে। নোয়াখালী, সেনবাগ থানার অন্তর্গত এক গ্রামে নূরবানু নামে এক স্ত্রীলোক ক্ষুধার তাড়নায় আত্মহত্যা করিয়াছে। কৃষ্ণনগর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে কৃষ্ণনগর বোমার মামলার পুনরায় শুনানী আরম্ভ হইয়াছে। ২৭শে জুন—মিঃ আবদুল লতিফ ফরোকোর সভাপতিত্বে মান্দ্রাজ প্রাদেশিক মুক্তি-সম্মেলনের এক সভায় ত্রিপলীতে আরব দেশীয় লোকদের উপর যে অত্যাচার হইয়াছে, তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সকলকে ইটালীয় দ্রব্য বর্জ্জন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। ফরিদপুর সহরে নিখিল বঙ্গ জাতীয়তাবাদী মোছলেম সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সিরাজগঞ্জে অর্থ-কষ্টের জন্য সিরাজগঞ্জ কংগ্রেস কমিটি একটি সাহায্য-কেন্দ্র খুলিয়াছেন। অদ্য রাত্রিতে লর্ড উইলিংডন রাজ-প্রতিনিধিরূপে চেমস্‌ফোর্ড ক্লাবে প্রথম ভারতের রাজনীতি সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। জেলের মধ্যস্থ একটি শস্যের গুদাম সহসা পড়িয়া যাওয়ায় রায়বেরেলী জেলে ২ জন বন্দী নিহত হইয়াছে। ২৮শে জুন—রাজসাহী কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র বাবু সুধীরচন্দ্র লাহিড়ীকে ফৌজদারী সংশোধন আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বেঙ্গল বাস সিণ্ডিকেটের এক সাধারণ সভায় নূতন কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। ফরিদপুর সহরে নিখিল-বঙ্গ জাতীয়তাবাদী মোছলেম-সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ২৯শে জুন—জমইয়তে ওলামার সম্পাদক মওলানা আহ্‌মদ ছইদ, পীর বাদশাহ্ মিয়া এবং মুজিবর রহমান নারায়ণগঞ্জে উপস্থিত হইয়াছেন। আগরা জেলার শাহাগঞ্জ নামক স্থানে পুলিশের গুলী চলার ফলে ২ জন লোক নিহত হইয়াছে। চট্টগ্রাম জেলার ৫২টি গ্রামে যে নোটিশের অনুবলে পিটুনি পুলিশ বসান হইয়াছিল, ঐ নোটিশ অদ্য শেষ হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ আজ সহরের সর্ব্বত্র একযোগে তাড়ির দোকানে পিকেটিং আরম্ভ করিয়াছে। ব্রহ্ম-বিদ্রোহীদিগকে ক্ষমা করা হইবে বলিয়া ব্রহ্ম-সরকার এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। ইনসিন জেলায় পাবাল অঞ্চলের বিদ্রোহীদের ছাউনী পুলিশ আক্রমণ করিয়াছে।

১৬ই হইতে ২১শে আষাঢ় পর্য্যন্ত—৩০শে জুন—লালা লাজপত রায় প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'পিপল' কার্য্যালয়ে পুলিশ খানাতল্লাশ করিয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পরোয়ানা বলে বেতুল কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক বাবু এস্-টি, ধর্ম্মাধিকারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ময়মনসিংহের বাবু ভক্তিভূষণ সেনের বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ তাহাকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার করিয়াছে। নাগপুরের মুসলমানগণ ইটালীর দ্রব্য বর্জ্জন করিয়া ইটালীর টুপির একটি বড় বহ্ন্যুৎসব করিয়াছেন। রাজদ্রোহের অভিযোগে সরকার বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'শতাব্দীর সঙ্গীত' বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। ডাঃ আন্‌সারিকে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে, নিখিল-বঙ্গ ছাত্র-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে এবং বঙ্গীয় চিকিৎসক সম্মিলনীর পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। ১লা জুলাই—১৬নং হ্যারিসন রোডে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু-সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এক জরুরি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এলাহাবাদে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং আরম্ভ হইয়াছে। ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী কোদালিয়া গ্রামে পুলিশের সহিত একদল ডাকাতের সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। হুভারের মন্তব্যে অদ্য তারিখ ফ্রান্স সম্মতি প্রদান করিয়াছে। ২রা জুলাই—কমন্স সভার কোনও প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বলেন, ভারতবর্ষকে আর্থিক সাহায্য দানের কোন প্রয়োজন এখনও হয় নাই। গ্রেট বৃটেনের কয়লার খনির মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার আশা অদ্য একেবারেই তিরোহিত হইয়াছে। পুলিশ বারাণসী নওজোয়ান ভারত সভার সম্পাদক সীতারাম শাস্ত্রীর বাড়ী খানাতল্লাস করিয়াছে। নিখিল-ভারত রেল কর্ম্মচারী সমিতি এই মর্ম্মে একটি সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন যে, রেল কর্ম্মচারীদিগকে যেভাবে ছাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে, তাহা বন্ধ না হইলে তাহারা দেশব্যাপী ধর্ম্মঘট করিবে। ৪৯ জন বিদ্রোহী অদ্য আত্মসমর্পণ করিয়াছে। থারাওয়াদ্দী বিদ্রোহের দ্বিতীয় মামলায় ৩৬ জন আসামীর পক্ষ হইতে যে আপীলের আবেদন করা হইয়াছিল, অদ্য হাইকোর্টে উহার শুনানী হইয়া গিয়াছে। ৩রা জুলাই—গৌরীপুর জংসনের নিকট আসাম-বেঙ্গল রেল লাইনে এক ভীষণ ট্রেণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। সংযুক্ত প্রদেশে কৃষকদের খাজানা আদায় ব্যাপার লইয়া প্রায় সাত শত লোকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছে। দেশীয় রাজ্য প্রজা-সম্মেলনের সম্পাদক মিঃ অভয়ঙ্কর আজ বোরসাদে পৌঁছিয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিয়াছেন। জাম নগরের নেতৃবৃন্দকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া না হইলে প্রজাসঙ্ঘের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মিঃ আত্মারাম ভট সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবেন বলিয়া জাম সাহেবকে চরম পত্র দিয়াছেন। নিখিল ভারত মুসলিম সম্মেলনের সম্পাদক মওলানা শফি দাউদী এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। বাংলার সন্তরণ বীর প্রফুল্লকুমার ঘোষ হেদুয়া পুষ্করিণীতে সন্তরণ আরম্ভ করেন। ৪ঠা জুলাই—সেকেন্দ্রাবাদে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এবং গবর্ণমেণ্টের মধ্যে পত্র ব্যবহারের ফলে রায় বেরেলীর কর্ম্মীদের উপর হইতে ১৪৪ ধারার নোটিশ প্রত্যাহার করা হইয়াছে। থেটমো জেলায় ৫০ জন সশস্ত্র বিদ্রোহী ২২টী বাড়ী লুঠ করিয়াছে। ব্রহ্মে মেড্‌ণত বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করিয়াছে। সুখদেব তাহার মামলা স্পেশাল ট্রাইবিউনাল হইতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য লাহোর হাইকোর্টে আবেদন করিয়াছিল, অদ্য তাহার আবেদন মঞ্জুর হইয়াছে। উড়িষ্যার বিশিষ্ট মহিলাকর্ম্মী শ্রীযুক্তা সরলা দেবী তামিল নাড়ু প্রাদেশিক মহিলা সম্মেলনের সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ৫ই জুলাই—কলিকাতায় বিবেকানন্দ স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে নিখিল ভারত ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের একাদশ অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। খুলনায় কংগ্রেস নারীকর্ম্মী সংঙ্ঘের সাধারণ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ৬ই জুলাই—রাত্রি ৩-১৫ মিনিটের সময়ে দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। বোম্বাইয়ের কামাটিপুরা নামক পল্লীতে হিন্দু ও মুসলমানে এক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। ত্রিপুরা জেলা যুব সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

২২শে হইতে ২৬শে আষাঢ়—৭ই জুলাই—বিশ্ব ভারতীর পল্লী-সেবা বিভাগের কর্ম্মী শ্রীযুক্ত নিশাপতি মাজি মফঃস্বলে ঘুরিয়া মাদক দ্রব্য বর্জ্জন ও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন বিষয়ে প্রচার করিয়াছেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। বগুড়ার প্রজাবাহিনী অফিসে খাজনা ও সুদ নিয়ন্ত্রণ কমিটির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মওলানা শওকৎ আলী ও জাতীয়তাবাদী মুসলমান দলের মধ্যে ৪ ঘণ্টা কাল আলোচনার ফলেও অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। ৮ই জুলাই—কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মৈত্র মহাশয়ের নেতৃত্বে একদল স্বেচ্ছাসেবক মফঃস্বলে প্রচার কার্য্যে বাহির হইয়াছেন। দীনেশ গুপ্তের ফাঁসীর সংবাদে বাংলার বিভিন্ন স্থানে হরতাল পালিত হইয়াছে। ৯ই জুলাই—অদ্য বোম্বাইয়ে জাতীয়তাবাদী মুসলিমদলের এক সভা হইয়া গিয়াছে। ডাঃ আনসারি ও ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য মুসলমান সদস্যগণ অদ্য সন্ধ্যায় জিন্নাহলে এক সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে ডাকাতি সম্পর্কে মতিহারিতে প্রায় ৫৫ জন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইণ্ডিয়া অফিসের আনুসঙ্গিক আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ মঞ্জুরী উপলক্ষে কমন্স সভায় ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। ১০ই জুলাই—জনৈক দোকানদারের অভিযোগে পিকেটিং করার জন্য ৫ জন স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মীকে বাঁকুড়াতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অদ্য ব্যয় সঙ্কোচের প্রশ্নাবলীর খসড়ার অবশিষ্ট অংশ সিমলায় পর্য্যালোচনা হইয়াছে। পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট রতন সিং কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'মজদুর কৃষাণ' নামক উর্দ্দু সাপ্তাহিকের ১৪ই জুন তারিখের সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। আজ বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসিয়াছে। বাংলার শিল্প ও কৃষি বিভাগের মন্ত্রী মিঃ ফারোকী ঢাকায় আগমন করিয়াছেন। মুসলিম কনফারেন্সের নির্ব্বাচিত সভাপতি ডাঃ শাফায়াত আহমদ ঢাকায় পৌঁছিয়াছেন। ১১ই জুলাই—১১ই এবং ১২ই জুলাই ঢাকায় মুসলিম কনফারেন্সের অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। ১১ এবং ১২ই জুলাই মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের সভাপতিত্বে যশোহর জেলা কনফারেন্সের অধিবেশন বসিয়াছে। মহাত্মার বর্ত্তমান বাসভবন বোম্বাইয়ের মণি-ভবনে ওয়ার্কিং কমিটির এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। আজ মহাত্মা গান্ধী স্বরাষ্ট্র-সচিব ইমার্সনের নিকট হইতে তাঁহার পত্রের উত্তর পাইয়াছেন। ব্রহ্ম-সরকার একটি অতিরিক্ত পুলিশ দল নিয়োগের প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। একদল মারাঠা পদাতিক বাহিনী ব্রহ্ম অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

Printed and Published by Md. Khairul Anam Khan from the "Mohammadi Press,"
91, Upper Circular Road, Calcutta.

একজিবিশন-চুড়ী

ইয়েলো ব্রোঞ্জের ফ্রেমের উপর গিনিসোনার সুন্দর সুদৃশ্য পাতে মোড়া।

ইহা আমাদের দুই বৎসর ব্যাপী বিলাতে শিক্ষালাভের ফল।

একজিবিশন চুড়ী

একজিবিশন শাঁখা

প্রতি জোড়া প্রমাণ ১৫৲, বালিকা সাইজ ১২॥০ শিশু সাইজ ১০৲

প্রতি জোড়া প্রমাণ ১৯৲, বালিকা সাইজ ১৫॥০ শিশু সাইজ ১৩৲

গিনসোণায় বাঁধা হস্তী দন্তের ভিন্ন ভিন্ন অলঙ্কারের নমুনা।

এনগ্রেভ পল পেঁচ বালা

প্রমাণ ১৬৲, ছোট ১৩॥০—১১৲

তার পেঁচ রুলি

প্রমাণ ১২৲, ছোট ১০৲—৮৲

তার পেঁচ বালা
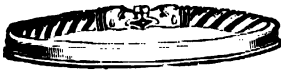
প্রমাণ ১৪৲, ছোট ১২৲—১০৲

কল্যাণী চিরুণী
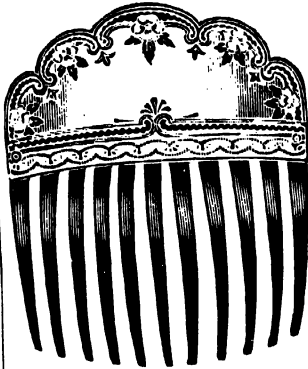
মহিষ শৃঙ্গের চিরুণীর উপর গিনি সোণার সুদৃশ্য এনগ্রেভ পাত বসান।

মূল্য ঃ—

১১ দাড়া—১৩

১০ দাড়া—১১।০

৯ দাড়া—৯॥০

সেফ্‌টি পিন

চুনী, পান্না বা মুক্তা বসান, মূল্য ১৪৲ হইতে।

ব্রেসলেট

সাচ্চা চুনী, পান্না মুক্তা সেট করা। মূল্য ১৫০৲ হইতে।

অলঙ্কারের বিস্তৃত ক্যাটালগ পত্র লিখিলেই পাঠান হয়।

ECONOMIC JEWELLERY WORKS

ইকনমিক্‌ জুয়েলারী ওয়ার্কস,

200, Cornwallis St. ২০০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য সডাক তিন টাকা ছয় আনা সম্পাদক—মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা

বর্ন্‌ভিলে কোকো
হওয়া চাই-ই
যদি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এবং সব চেয়ে বিশুদ্ধ কোকো ব্যবহার করিতে চান, তাহা হইলে বর্ন্‌ভিলের কোকোই ক্রয় করিবেন। বর্ন্‌ভিলের কোকো পান করিতে যেমন সুস্বাদু, তৈয়ারী করিতেও সেইরূপ কোনও হাঙ্গামা নাই। ইহাতে খাদ্য-গুণ বিশেষভাবে আছে এবং সহজেই হজম হয়, সেই জন্য ইহা শরীরে নব-শক্তি আনিতে পারে। আপনি প্রত্যহ বর্ন্‌ভিলে কোকো পান করুন—ছেলেমেয়েদেরও নিয়মিতভাবে পান করান। সস্তায় এবং সন্দেহাতীতভাবে স্বাস্থ্য ও শক্তিলাভের ইহা অপেক্ষা আর কোনও সহজ পন্থা নাই।
বর্ন্‌ভিলের কোকো আদর্শ পানীয় খাদ্য। ইহাতে জান্তব চর্ব্বি নাই এবং প্রস্তুতকালীন কোনও প্রকারে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা হয় না।
BOURNVILLE
COCOA
PURE
SOLUBLE COCOA
স্বাস্থ্য ও শক্তির জন্য
জান্তব চর্ব্বি বর্জ্জিত এবং
প্রস্তুত কালীন হস্তদ্বারা পৃষ্ট হয় নাই।
ক্যাডবেরীর দ্বারা প্রস্তুত, বর্ন্‌ভিলে, ইংলণ্ড

সূচীপত্র—ভাদ্র, ১৩৩৮

সূচীপত্র—ভাদ্র, ১৩৩৮

সূচীপত্র—ভাদ্র, ১৩৩৮

হাঁ! স্যানাটোজেনই

আপনার শক্তি বৃদ্ধি করিবে।

যদি আপনি ধাতুদৌর্ব্বল্য দুর করিয়া দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি করাইতে চান তাহা হইলে এমন কোন জিনিষ আপনার সেবন করা উচিত যাহাতে শক্তি বৃদ্ধি করিবার উপাদান প্রচুর পরিমাণে আছে।

সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে আপনার সুবিখ্যাত শক্তিবর্দ্ধক খাদ্য স্যানাটোজেন সেবন করা উচিত। কারণ স্যানাটোজেনে এরূপ উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে আছে যাহা স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা পুরুষত্বহীনতা এবং নষ্টশক্তি পুনরুজ্জীবিত করিতে অদ্বিতীয় উপাদান।

ডাঃ বিহিইম 'সিলোন ইন্‌ডেপেনডেন্ট' পত্রে লিখিয়াছেন,—

"নষ্টশক্তি পুনরুজ্জীবিত করিতে স্যানাটোজেনের তুল্য শক্তিশালী খাদ্য আর নাই।"

স্যানাটোজেন আপনার পেশী গঠিত করিবে—আপনার জীবনীশক্তি ফিরাইয়া আনিবে—আপনার দেহে প্রচুর তাজারক্ত হইবে এবং কয়েক সপ্তাহ ব্যবহারে আপনাকে হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ ষণ্ডের ন্যায় শক্তি দান করিবে।

আজই এক বোতল স্যানাটোজেন ক্রয় করুন।

আদর্শ টনিক খাদ্য
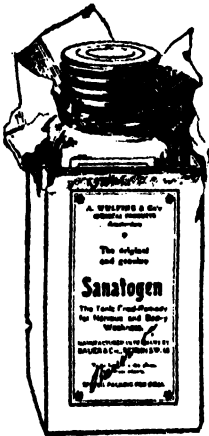
সকল ঔষধালয়ে ও বাজারে প্রাপ্তব্য।

স্যানাটোজেন প্রস্তুত ও প্যাক করিবার সময় হস্তদ্বারা স্পর্শ করা হয় না।

Cow & Gate Milk Food

FOR INFANTS AND INVALIDS
A Complete Baby Food from Birth

Babies Love it!
COW & GATE, Ltd.
GUILDFORD, SURREY, England

AWARDED 39 GOLD, SILVER & BRONZE MEDALS
INCLUDING GOLD MEDAL
CALCUTTA, 1923

NATURALLY RICH IN VITAMIN "D"
PACKED FOR USE IN HOT CLIMATES

"কাউ এণ্ড গেট" স্বাস্থ্য ও সুখ দান করে।

যে সকল ছেলে মেয়ে এই খাদ্য খায় তারা সদাই সুখী। বাল্য জীবনের উদ্যম প্রবাহ তাদের ধমনীতে বহিতে থাকে—তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৃঢ় এবং সবল হয়—এমন কি এই দারুণ গ্রীষ্মের দিনেও তারা বলবান ও কর্ম্মপটু থাকে। সম্পূর্ণ বিশ্বাসে এবং নির্দ্দোষ জ্ঞানে প্রত্যেক জননীই অনায়াসেই তাঁর সন্তানদিগকে এইখাদ্য খাওয়াইতে পারেন। ইহা তাঁর সন্তানকে স্বাস্থ্য এবং জীবন দান করিবে। তাদের স্বাস্থ্য ও সুখ দেখে তখন তিনি ভারতের অন্যান্য বহু জননীর ন্যায় প্রকৃতই সুখী ও গর্ব্ব অনুভব করিবেন এবং বলিতে পারিবেন :—

"কাউ এণ্ড গেট খাইয়াই আমার
সন্তান পুষ্ট হ'য়েছে।"

শক্ত দাঁত এবং পরিপুষ্ট মাড়ী সন্তানের কাম্য হইলে
"কাউ এণ্ড গেট" রস্ক সেবন করাইবেন।

ভারতবর্ষের এজেণ্টগণ :—

মেসার্স কার এণ্ড কোং লিঃ, ব্যালার্ড ষ্টেট, বোম্বাই
এবং কলিকাতা, করাচি ও মাদ্রাজ।

সাতদিন মাত্র এই অমৃতবিন্দু সালসা সেবনের পরে হস্তপদের অঙ্গুলি টিপিয়া দেখিবেন শরীরে সত্য সত্যই তরল আলতার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বিশুদ্ধ রক্তের সঞ্চার হইতেছে কিনা। অমৃতবিন্দু সালসা রক্তপরিষ্কারক, বলকারক, গরমি, পারাদোষ, প্রমেহ, খোষ, পাঁচড়া চর্ম্মরোগ, নানাবিধ দৌর্ব্বল্য, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, অনিয়মিত ঋতু প্রভৃতি সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়। ১ শিশি ১৲ এক টাকা মাশুল ।৵০ আনা, ৩ শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা মাশুল ১৲ এক টাকা, ৬ শিশি ৪।০ চারি টাকা চারি আনা মাশুল ১।০ **বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ** (স্বর্ণসিন্দূর) তোলা ৪৲ টাকা। উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসা গন্ধকদ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ। **চ্যবণ-প্রাশ**—উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশোলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণমাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ্ কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ। ৩৲ সের।

কবিরাজ—শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত কবিরত্ন।

নবশক্তি ঔষধালয়, ২৯৭নং অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার, কলিকাতা।

টাকের অব্যর্থ মহৌষধ

দশ পনের বৎসরের মসৃণ টাকেও কেশ উৎপন্ন হইবে। মূল্য ১৲ টাকা।

কুচের তৈল:—কেশ পতন নিবারণে ও কেশ উৎপাদনে এরূপ তৈল অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। শিশি ১৲ তিন শিশি ২।০

কুচের নির্য্যাস:—চুলকানী ও খুস্কী সংযুক্ত টাক ও কেশ পতনে অদ্বিতীয়। শিশি ১৲ টাকা।

• রোগ বিবরণ সহ পত্র লিখিলে ঔষধ পাঠান হয়।

ডাঃ এন্, সি, বসু, এম, বি

১২০নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,

শ্যামবাজার, কলিকাতা।

বিখ্যাত সম্পাদক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

যৌবন-রহস্যের অভিনব পুস্তক

দাম্পত্য-রহস্য

Sexiology ও Life Science এর বিচিত্র বিশ্লেষণ। নর-নারী, স্বামী-স্ত্রী যে সব রহস্য জানিতে উৎসুক, এই গ্রন্থের প্রতি ছত্রে তাহা আছে। জনন-নিরোধের বহু নূতন তথ্য জানিবেন। ২।০ টাকায় এই গ্রন্থে এমন জিনিষ পাইবেন, যাহার মূল্য লাখ টাকায়ও বেশী। অপূর্ব্ব প্রচ্ছদপট-মণ্ডিত বিরাট গ্রন্থ।

রমণী-রহস্য

এই মাত্র বাহির হইল। নারীর বাল্য, যৌবন ও যৌবন শেষের অবস্থা এবং পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের নিগূঢ় কথায় ভরা অপূর্ব্ব গ্রন্থ। দাম আড়াই টাকা।

ভালবাসার নেশা

দাম্পত্য-জীবনের বিরাট উপন্যাস। বাহিরের না ঘরের ভালবাসা ভাল? দাম আড়াই টাকা।

জ্ঞান পাবলিশিং হাউস,

৪৪, বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, ইন্দ্রিয় শৈথিল্য, স্বপ্নদোষ, ধ্বজভঙ্গ, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য ও ধারণাশক্তি বৃদ্ধির অদ্বিতীয় শক্তিসম্পন্ন মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ১।০, ৩ শিশি ৩৵০, ডজন ১৩॥০, মাশুলাদি ১ শিশি হইতে ১ডজন পর্য্যন্ত ।৵০ মাত্র।

বিনামূল্যে সুপ্রসিদ্ধ "স্বাস্থ্য ও শিল্প" বই লিখিলেই পাঠান হয়।

বেঙ্গল লেবরেটরী,

১নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

Imperial Art Cottage.,

High Class Lithographers & Fashion Printers.

1, Tagore Castle Street,

CALCUTTA.

PHONE B. B. 1924

চশমা! চশমা!!

সকল রকম চশমা সুলভে পাইতে হইলে একমাত্র টি, সি, দাস এণ্ড ব্রাদার্সের দোকানে পদার্পণ করুন। এখানে সকল রকম সোণা রূপার চশমা নিজ কারখানায় প্রস্তুত করিয়া আপনাদের মনোমত করিয়া দেওয়া হয়। অপছন্দ হইলে ১ মাসের মধ্যে পাথর বদলাইয়া দিই।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

টি, সি, দাস এণ্ড ব্রাদার্স,

১২৮৫৩ এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, (শ্যামবাজার দক্ষিণ) ক্যালঃ।

Annual Contract Rate— **Buyers' Guide.** Annas Eight Per Line.

Advertising is the eye of trade.

"আমি অবাক হয়ে শুনি"

বসন্তে——

বিশ্ব যখন সঙ্গীতময়
হয়ে ওঠে—আপনার
গৃহ আনন্দময় করতে

রেডিও

যন্ত্রই সর্ব্বোৎকৃষ্ট=

সকল রকম আধুনিক রেডিও যন্ত্র ও সরঞ্জাম আমরা সকল সময়ে মজুত রাখি। অডার দিলে যন্ত্র ঘরে বসাইয়া দিবার ভার নিয়া থাকি

পত্র লিখিলেই মূল্য তালিকা
পাঠান হয়

সাইকেল, হারমোনিয়ম, রেডিও
ও
সকল রকম বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা

মল্লিক ব্রাদার্স

Telephone :— Cal :—2877 } ১৮২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। { Telegrams :— "Phonograph"

সৃষ্টি-বিবর্ত্তন

মোহাম্মদী প্রেস

শিল্পী—মিঃ জিয়োভানি রে

চতুর্থ বর্ষ ভাদ্র, ১৩৩৮ ১১শ সংখ্যা

মিশ্র ও স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন

—মোহাম্মদ আকরম খাঁ

(২)

'বাঙ্গলার মুছলমানদিগের জন্য মিশ্র-নির্ব্বাচনের দরকার ও উপকার সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আমাদিগকে বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলার মুছলমান ও অমুছলমান অধিবাসী-দিগের সংখ্যাগত-তারতম্যটা সর্ব্ব-প্রথমে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।' 'গড়ে হাঁটুজল' নীতির অনুসরণ করিলে প্রকৃত অবস্থার সন্ধান পাওয়া যাইবে না। 'আমাদের এক শ্রেণীর নেতা, বিশেষতঃ আমাদের পশ্চিমবাসী দরদীরা জনসাধারণকে বুঝাইতে চাহেন যে,—'বাঙ্গলার মুছলমানের আনুপাতিক সংখ্যা শতকরা ৫৪ জন মাত্র, অর্থাৎ অমুছলমান অপেক্ষা শতকরা ৮ জন মাত্র অধিক। কিন্তু অমুছল-মানরা সংখ্যায় সামান্য কম হইলেও, শিক্ষায় ও সম্পদে মুছলমান অপেক্ষা অনেক প্রবল; সুতরাং মিশ্র-নির্ব্বাচন প্রচলিত হইলে অমুছলমানদের পক্ষে নিজেদের আনু-পাতিক প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক আসন দখল করিয়া লওয়া খুবই সহজ-সাধ্য হইবে।'' এই হিসাবকেই আমরা 'গড়ে হাঁটু জল' নীতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

সকলে জানেন, 'বাঙ্গলার ২৮টী জেলার গড়-পড়তা হিসাবে মুছলমানের অনুপাত শতকরা ৫৪ জন হইলেও, সকল জেলার অনুপাত একরূপ নহে। কোন জেলায় তাহারা ইহা অপেক্ষা অনেক কম, আবার কতক জেলায় তাহাদের অনুপাত ইহা অপেক্ষাও অধিক। সুতরাং প্রত্যেক জেলাকে এক-একটা নির্ব্বাচন চক্র ধরিয়া লইয়া হিসাব করিয়া দেখিতে হইবে যে, কোন্-চক্রে মুছলমানদের অনুপাত কত দাঁড়াইতেছে।' তাহা হইলে প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট করিয়া জানিতে পারা যাইবে। 'আমরা ১৯২১ সালের আদম-শুমারীর রিপোর্ট হইতে নিম্নে কএকটা তালিকা সঙ্কলন করিয়া দিতেছি। তালিকাগুলি উত্তমরূপে খতাইয়া বোঝার জন্য আমরা ধরিয়া লইতেছি যে,—বাঙ্গলার প্রতি এক-লক্ষ অধিবাসীকে একজন করিয়া মেম্বর নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হইবে। বাঙ্গলা দেশে বৃটিশ এলাকায় মোট অধিবাসীদের সংখ্যা হইতেছে— ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫ শত ৩৮ জন। সুতরাং এই হিসাবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার মেম্বরগণের মোট সংখ্যা হইবে ৪৬৭ জন। এখন, প্রতি লাখে একজন মেম্বর পাঠাইবার ব্যবস্থা হইলে, কোন্ বিভাগ ও কোন্ কোন্ জেলা হইতে মোট কতজন মেম্বর প্রেরিত হইবেন, প্রথমে তাহারই দুইটা তালিকা দিতেছি।

১ম তালিকা

বিভাগের নাম	মেম্বর সংখ্যা	মুছলমানের অনুপাত
১। চট্টগ্রাম	৬০	৭২.৬
২। ঢাকা	১২৮	৬৯.৭
৩। রাজশাহী	১০৩	৬১.৪
৪। প্রেসিডেন্সী	৯৫	৪৭.৫
৫। বর্দ্ধমান	৮০	১৩.৪

২য় তালিকা

(ক) বর্দ্ধমান বিভাগ। মোট আসন সংখ্যা…৮০

জেলার নাম	ধর্ম্মের হিসাবে অধিবাসীদের সংখ্যা	মুছলমানের অনুপাত	মোট আসন
১। বর্দ্ধমান	মোট ১৪,৩৮,৯২৬		
	মুঃ ২,৬৬,২৮১	১৮.৪	১৪
২। বীরভূম	মোট ৮,৪৭,৫৭০		
	মুঃ ২,১২,৪৬০	২৫.১	৮
৩। বাঁকুড়া	মোট ১০,১৯,৯৪১		
	মুঃ ৪৬,৬১০	৪.৬	১০
৪। মেদিনীপুর	মোট ২৬,৬৬,৬৬০		
	মুঃ ১,৮০,৬৭২	৬.৮	২৭
৫। হুগলী	মোট ১০,৮০,১৮২		
	মুঃ ১,৭৩,৬৩৩	১৬	১১
৬। হাওড়া	মোট ৯,৯৭,৪০৩		
	মুঃ ২,০২,৪৭৫	২০.৩	১০

(খ) প্রেসিডেন্সি বিভাগ। মোট আসন সংখ্যা…৯৫

জেলার নাম	ধর্ম্মের হিসাবে অধিবাসীদের সংখ্যা	মুছলমানের অনুপাত	মোট আসন
৭। ২৪ পরগণা	মোট ২৬,২৮,২০৫		
	মুঃ ৯,০৯,৭৮৬	৩৪.৬	২৬
৮। কলিকাতা		২৩.০	৯
৯। নদীয়া	মোট ১৪,৮৭,৫৭২		
	মুঃ ৮,৯৫,১৯০	৬০.২	১৫
১০। মুর্শিদাবাদ	মোট ১২,৬২,৫১৪		
	মুঃ ৬,৭৬,২৫৭	৫৩.৬	১৩

জেলার নাম	ধর্ম্মের হিসাবে অধিবাসীদের সংখ্যা	মুছলমানের অনুপাত	মোট আসন
১১। যশোহর	মোট ১৭,২২,২১৯		
	মুঃ ১০,৬৩,৫৫৫	৬১·৭	১৭
১২। খুলনা	মোট ১৪,৫৩,০৩৪		
	মুঃ ৭,২২,৮৮৭	৪৯·৮	১৫

(গ) রাজশাহী বিভাগ। আসন সংখ্যা···১০৩

জেলার নাম	ধর্ম্মের হিসাবে অধিবাসীদের সংখ্যা	মুছলমানের অনুপাত	মোট আসন
১৩। রাজশাহী	মোট ১৪,৮৯,৬৭৫		
	মুঃ ১১,৪০,২৫৬	৭৬·৬	১৫
১৪। দিনাজপুর	মোট ১৭,০৫,৩৫৩		
	মুঃ ৮,৩৬,৮০৩	৪৯·১	১৭
১৫। জলপাইগুড়ি	মোট ৯,৩৬,২৬৯		
	মুঃ ২,৩১,৬৮৩	২৪ ৮	৯
১৬। রংপুর	মোট ২৫,০৭,৮৫৪		
	মুঃ ১৭,০৬১৭৭	৬৮·১	২৫
১৭। বগুড়া	মোট ১০,৪৮,৬০৫		
	মুঃ ৮,৬৪,৯৯৮	৮২·৫	১০
১৮। দার্জিলিং	মোট ২,৮২,৭৪৮		
	মুঃ ৮,৫১৬	৩·২	৩
১৯। পাবনা	মোট ১৩,৮৯,৪৯৪		
	মুঃ ১০,৫৩৫৭১	৭৫ ৮	১৪
২০। মালদহ	মোট ৯,৮৫,৬৬৫		
	মুঃ ৫,০৭,৬৮৫	৫১·৬	১০

(ঘ) ঢাকা বিভাগ। মোট আসন সংখ্যা···১২৮

জেলার নাম	ধর্ম্মের হিসাবে অধিবাসীদের সংখ্যা	মুছলমানের অনুপাত	মোট আসন
২১। ঢাকা	মোট ৩১,২৫,৯৬৭		
	মুঃ ২০,৪৩,২৪৬	৬৫·৪	৩১
২২। ফরিদপুর	মোট ২২,৪৯,৮৫৮		
	মুঃ ১৪,২৭৮৩৯	৬৩·৫	২৩
২৩। বাখরগঞ্জ	মোট ২৬,২৩,৭৫৬		
	মুঃ ১৮,৫১,২৩৯	৭০·৬	২৬
২৪। ময়মনসিংহ	মোট ৪৮,৩৭,৭৩০		
	মুঃ ৩৬,২৩,৭১৯	৭৪·৯	৪৮

জেলার নাম	ধর্ম্মের হিসাবে অধিবাসীদের সংখ্যা	মুছলমানের অনুপাত	মোট আসন
	(৬) চট্টগ্রাম বিভাগ।	আসন সংখ্যা…৬০	
২৭। ত্রিপুরা	মোট ২৭,৪৩,০৭৩		
	মুঃ ২০,৩৩,২৪২	৭৪·১	২৭
২৬। নোয়াখালি	মোট ১৪,৭২,৭৮৬		
	মুঃ ১১,৪২,৬৬৮	৭৭·৬	১৫
২৭। চট্টগ্রাম	মোট ১৬,১১,৪২২		
	মুঃ ১১,৭৩,২০৫	৭২·৮	১৬
ঐ, পার্ব্বত্য	মোট ১,৭৩,২৪৩		
	মুঃ ৭ হাজার	৪·১	২

এখন সর্ব্ব-প্রথমে পাঠকবর্গকে বিভাগ-ওয়ারী তালিকা-টীর প্রতি মনোযোগ দিতে অনুরোধ করিতেছি। মুছলমান অধিবাসীর জন-সংখ্যার অনুপাত অনুসারে শ্রেণী-বিভাগ করিলে দেখা যাইবে যে, বর্দ্ধমান বিভাগে তাহাদের সংখ্যা গড়ে শতকরা ১৩ জন মাত্র। সুতরাং এটাকে আমরা সম্পূর্ণ "হিন্দু বিভাগ" বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। পক্ষান্তরে প্রেসিডেন্সী বিভাগে মুছলমানের সংখ্যা গড়ে ৪৭·৫ এবং অমুছলমানের সংখ্যা ৫২·৫ জন। সুতরাং (অন্য সমস্ত সূক্ষ্ম বিচার উপস্থিতের মত স্থগিত রাখিয়া) আমরা মোটামুটিভাবে ইহাকে "হিন্দুপ্রধান বিভাগ" বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছি। এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগে মুছলমানের অনুপাত হইতেছে শতকরা ৭২½ ও ৭০ জন হিসাবে। সুতরাং এই দুই বিভাগকে "সম্পূর্ণ মুছলমান বিভাগ" বলিয়া ধরিতে হইবে। প্রেসিডেন্সী বিভাগে শতকরা ৫২½ জন অমুছলমান থাকায় উহাকে আমরা হিন্দুপ্রধান প্রদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু রাজশাহী বিভাগে মুছলমানের অনুপাত শতকরা ৬১½ জন হইলেও উহাকে আমরা আপাততঃ মুছলমান প্রধান বিভাগ বলিয়াই ধরিয়া লইলাম। সম্পূর্ণ হিন্দু বিভাগে আসন হইতেছে ৮০টী, আর সম্পূর্ণ মুছলমান বিভাগ দু'টীতে হইতেছে (৬০+১৮০=) ২৪০টী আসন। হিন্দু মুছলমানের সঙ্গে অসদ্ভাব ঘটিলে বর্দ্ধমান বিভাগ হইতে যদি একজন মুছলমান মেম্বরও নির্ব্বাচিত হইতে না পারেন, তাহা হইলে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ হইতেও কোন হিন্দু নিশ্চয়ই নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে যদি ধরা যায় যে, শতকরা ৫২½ জন হওয়ার জন্য প্রেসিডেন্সী বিভাগের আসনগুলিও সমস্তই হিন্দুর হস্তগত হইবে,—তাহা হইলে ৬১½ জন হইয়াও কি রাজশাহী বিভাগের মুছলমানরাও নিজেদের বিভাগের আসনগুলি অধিকার করিতে সমর্থ হইবে না? এই অনুমান যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে মোটের উপর হিন্দুর হস্তগত হইবে:—

প্রেসিডেন্সী বিভাগের	৯৫	টী	আসন
বর্দ্ধমান "	৮০	"	"
মোট	১৭৫		

আর মুছলমানের হস্তগত হইবে:—

চট্টগ্রাম বিভাগের	৬০	টী	আসন
ঢাকা "	১২৮	"	"
রাজশাহী "	১০৩	"	"
মোট	২৯১		

জেলা-ওয়ারী হিসাবের ফল

বিভাগের হিসাব এইখানে পরিত্যাগ করিয়া এখন আমরা ২য় বা জেলা-ওয়ারী তালিকাটীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। তাহা হইলে প্রকৃত অবস্থাটা আরও স্পষ্টভাবে বুঝিয়া

লওয়া সকলের পক্ষে সহজ হইয়া দাঁড়াইবে। এই তালিকা হইতেও জানা যাইবে যে, বাঙ্গলা দেশে গড়ে মুছলমানের অনুপাত শতকরা ৫৪ জন হইলেও সকল জেলাতে তাহাদের অনুপাত সমান নহে। কোন জেলায় তাহারা শতকরা ৩ জন মাত্র, আবার কোন স্থানে তাহারা শতকরা ৮২ জনেরও অধিক। মিশ্র নির্ব্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার করিতে হইলে, প্রত্যেক জেলা সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে,—কোন্ জেলায় মুছলমানের অনুপাত কত এবং তাহার আসন-সংখ্যাই বা কত? তাহা হইলে জানা যাইবে, হিন্দুদের সঙ্গে অসদ্ভাবের অবস্থায়, কেবল মুছলমানের ভোট দ্বারা কতগুলি আসন অধিকার করা মুছলমানের পক্ষে সহজ হইবে, আর কতগুলি দখল করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে।

এই হিসাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইলে বাঙ্গলার জেলাগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হইবে। যথা:—

(১) হিন্দু-প্রধান জেলাসমূহ,
(২) মুছলমান-প্রধান জেলাসমূহ,
(৩) প্রায় সমান সমান জেলাসমূহ।

এই তিন শ্রেণীর স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র তালিকা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি:—

(ক) হিন্দু প্রধান জেলাসমূহ

জেলা	আসন সংখ্যা
১। বর্দ্ধমান	১৪
২। বীরভূম	৮
৩। বাঁকুড়া	১০
৪। মেদিনীপুর	২৭
৫। হুগলী	১১
৬। হাওড়া	১০
৭। জলপাইগুড়ি	৯
৮। দার্জ্জিলিং	৩
৯। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	২
১০। কলিকাতা	৯
মোট	১০৩

অসদ্ভাবের অবস্থায় এই ১০টী জেলা হইতে একজন মুছলমান প্রার্থীও নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না। সুতরাং এই ১০৩টী আসন যে নিশ্চয়ই হিন্দুদের অধিকারে যাইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

(খ) মুছলমান-প্রধান জেলাসমূহ—

জেলা	আসন সংখ্যা
১। নদীয়া	১৫
২। যশোহর	১৭
৩। রাজশাহী	১৫
৪। রংপুর	২৫
৫। বগুড়া	১০
৬। পাবনা	১৪
৭। ঢাকা	৩১
৮। ফরিদপুর	২৩
৯। বাখরগঞ্জ	২৬
১০। ময়মনসিংহ	৪৮
১১। ত্রিপুরা	২৭
১২। নোয়াখালি	১৫
১৩। চট্টগ্রাম	১৬
মোট	২৮২

এই ১৩টী জেলার ২৮২টী আসন মুছলমানপক্ষ সম্পূর্ণ একচেটিয়াভাবে অধিকার করিয়া লইতে পারিবেন এবং সেজন্য হিন্দু ভোটারের দ্বারস্থ হওয়ার একটুও দরকার তাঁহাদের হইবে না।

(গ) প্রায় সমান-সমান জেলা সমূহ—

জেলা	আসন সংখ্যা	মুছলমানের অনুপাত
১। মুর্শিদাবাদ	১৩	৫৩.৬
২। ২৪ পরগণা	২৬	৩৪.৬
৩। খুলনা	১৫	৪৯.৮
৪। দিনাজপুর	১৭	৪৯.১
৫। মালদহ	১০	৫১.৬
মোট	৮১	

এই তালিকায় দেখা যাইতেছে যে, পাঁচটা জেলার মধ্যে খুলনায় হিন্দু ও মুছলমানের অনুপাত সমান সমান, মালদহ ও মুর্শিদাবাদে মুছলমানের অনুপাত অধিক, এবং ২৪ পরগণা ও দিনাজপুরে মুছলমানের অনুপাত অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু বস্তুতঃ শেষোক্ত দুইটী জেলার এই অনুপাত ধরা হইয়াছে প্রধানতঃ বিদেশ হইতে সমাগত হিন্দু বা সাঁওতাল কুলি-মজুরদিগকে লইয়া। ইহারা বাঙ্গলার স্থায়ী অধিবাসীও নহে, ভোটারও নহে। এই দুইটী জেলার অনুপাতের রহস্য পাঠকগণ পরে জানিতে পারিবেন। উপস্থিতের মত ইহাকেই প্রকৃত অনুপাত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যা'ক।

এখন যদি ধরা যায় যে, হিন্দু-প্রধান জেলাগুলির সমস্ত আসন হিন্দুদেরই হস্তগত হইবে, আর সমান সমান জেলাগুলির ৮১ আসনের মধ্যে অর্দ্ধেক বা ৪০টা মুছলমানের হস্তগত হইবে, তাহা হইলে দুই সম্প্রদায়ের হস্তগত আসনের সংখ্যা দাঁড়াইবে :—

হিন্দুর হস্তগত··· ১০৩+৪১=১৪৪টী আসন

মুছলমানের হস্তগত···২৮২+৪০=৩২২ „

৪৬৬টীর ⅓ হইতেছে ১৫৫, আর ⅔ হইতেছে ৩১০। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, এই হিসাবে হিন্দুর আসন দাঁড়াইতেছে শতকরা ৩৩এরও কম, আর মুছলমানের আসন-সংখ্যা হইতেছে শতকরা ৬৬এরও অধিক।

অসম্ভবকে সম্ভব মনে করিয়া যদি আমরা কিছুক্ষণের জন্য স্বীকার করিয়া লই যে, হিন্দু-প্রধান জেলাগুলির ন্যায়, সমান সমান জেলাগুলির সমস্ত আসনও হিন্দুরা অধিকার করিয়া লইবেন, তাহার মধ্যকার একটী আসনও মুছলমানের হস্তগত হইবে না ;—তাহা হইলেও মিশ্র-নির্ব্বাচনের ফলে মুছলমান পক্ষই সংখ্যা-গুরু হইয়া থাকিবে। যথা :—

হিন্দু-প্রধান জেলা সমূহের···	১০৩টী	আসন
সমান সমান „ ···	৮১ „	„
মোট	১৮৪	

তাহা হইলেও হিন্দুর হস্তগত হইবে মোট ১৮৪টী, আর মুছলমানের দখলে আসিবে ২৮২টী আসন। ফলতঃ—

মুছলমান···	২৮২
বাদ হিন্দু···	১৮৪
	৯৮

৯৮টী আসনের দ্বারা মুছলমানদের আধিক্য বা Majority লাভ করা সুনিশ্চিত। এখন, স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন লইয়া আইনতঃ চিরস্থায়ীভাবে সংখ্যা-লঘু হইয়া থাকা, আর মিশ্র-নির্ব্বাচন স্বীকার করিয়া বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক-সভায় বহুগুণে সংখ্যা-গরিষ্ট হইয়া যাওয়া—এই দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টা মুছলমানের পক্ষে কি পরিমাণে উপকারী বা অপকারী, পাঠকগণই তাহার বিচার করিয়া দেখুন !*

ভোটার সংখ্যার তারতম্য

এখন আমাদিগকে Franchise বা ভোটের যোগ্যতা এবং এ হিসাবে হিন্দু-মুছলমান ভোটারদের তারতম্য সম্বন্ধে একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিতে হইবে, অন্যথায় পূর্ব্বের সিদ্ধান্তগুলির বিশেষ কোন মূল্য থাকিবে না। কারণ, এখানে খুবই সঙ্গতভাবে বলা যাইতে পারে যে, বিভিন্ন জেলার সমস্ত অধিবাসীকে ধরিয়া এই অনুপাত কষা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ভোটার কত হইবে এবং কেবল ভোটারের হিসাবে মুছলমান ও অমুছলমানের অনুপাত কি দাঁড়াইবে, এ আলোচনায় তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। মুছলমান ভোটারের অনুপাত যে তাহাদের মোট অনুপাতের সমান হইবে, তাহার কোন মানে নাই। বর্ত্তমানেই ত "তাহাদের ভোটারদিগের অনুপাত অপেক্ষাকৃত অনেক কম।" আমাদের মতে—এই আপত্তিটী খুবই সঙ্গত, প্রাথমিক যুগে মিশ্র-নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে যে-সব যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছিল, এই আপত্তির উপরই প্রধানতঃ সেগুলির ভিত্তি-স্থাপন করা হয়। অতএব আপত্তিটী সম্বন্ধে ভাল করিয়া বিচার হওয়া উচিত।

এই বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে আমাদিগকে বর্ত্তমান Franchise ও তাহার ফলাফল সম্বন্ধে কএকটা সত্য সর্ব্ব-প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতে হইবে। তাহা হইলেই প্রকৃত অবস্থার ধারণা করা সকলের পক্ষে সহজ-সাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা নিম্নে এই বিষয়গুলি পর পর উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

(১) ১৯১৮ সালে, নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের জন্য যে Franchise কমিটী গঠিত হয়, তাহারই সুপারিশ মতে, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার ভোটারদিগের যোগ্যতা (qualification)

নির্দ্ধারিত করেন। এই সব যোগ্যতা অনুসারে, মুছলমান ও অমুছলমান ভোটারদের সংখ্যা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহার একটা হিসাবও সে সময়ে তাঁহারা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কলিকাতা ও অন্যান্য মিউনিসিপ্যাল এলাকাগুলির বাহিরে ভোটার হওয়ার জন্য যে সব যোগ্যতা নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল, প্রধানতঃ তাহা এইরূপ :—

(ক) যে সমস্ত লোক অন্যূন ১৲ টাকা সেস্ দেয়, বা

(খ) যাহারা অন্যূন ২৲ টাকা ইউনিয়ন রেট বা চৌকিদারী ট্যাক্স দেয়, বা

(গ) যাহারা ইন্‌কম ট্যাক্স প্রদান করে

তাহারা সকলেই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ভোটার হওয়ার অধিকারী। কলিকাতা ব্যতীত অন্য মিউনিসিপ্যালিটীগুলিতে সেসের পরিমাণ একটাকার স্থলে ১৷৷৹ টাকা নির্দ্ধারিত হয়। সরকার পক্ষ তখন হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, এই সব যোগ্যতা অনুসারে বাঙ্গলা দেশে অমুছলমান ভোটারের সংখ্যা হইবে ৭ লক্ষ ৮৬ হাজার, আর মুছলমান ভোটারের সংখ্যা হইবে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার দ্বারা তাঁহারা পরে স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, "ভোটারদের নির্ভুল তালিকা প্রস্তুতের সন্তোষজনক সুব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও," মুছলমান ভোটারদের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। তাঁহারা ইহাও স্বীকার করেন যে, মুছলমান ভোটারদের সংখ্যা কম করিয়া এবং অমুছলমান ভোটারদের সংখ্যা প্রথমে খুব বেশী করিয়া হিসাব করা হইয়াছিল। প্রথমে তাঁহারা মুছলমান ভোটারদের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৪০ হাজার বলিয়া হিসাব ধরেন। কিন্তু ১৯২০ সালের প্রথম নির্ব্বাচন তালিকায় তাহাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ১ শত ২১ জন, এবং ১৯২৬ সালের তালিকায় তাহা ৫ লক্ষ ২৯ হাজার ৯ শত ৯৫ জনে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে প্রথমে অমুছলমান ভোটারের সংখ্যা ৭ লক্ষ ৮৬ হাজার বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু ১৯২০ সালে ৫ লক্ষ ৪১ হাজার হইতে আরম্ভ করিয়া যথেষ্ট চেষ্টা ও আগ্রহ সত্ত্বেও ১৯২৬ সালে তাহা ৬ লক্ষ ২৩ হাজার ২ শত ১১ জনের অধিক হইতে পারে নাই। তারপর সরকারী কাগজ-পত্রে দেখা যায়, ১৯২৬ সালে অমুছলমানদের মোট সংখ্যার অনুপাতে তাহাদের শতকরা ২·৯ জন ভোটের অধিকার পাইয়াছিল, এবং ঐ হিসাবে মুছলমান ভোটারদের অনুপাত ছিল শতকরা ২ জন মাত্র। (১)

(২) সাইমন কমিশন হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন — বাঙ্গালার মোট অধিবাসীর তুলনায় সর্ব্ব-সাকুল্যে ভোটারদের অনুপাত ছিল ১৯২১ সালে ২·৫জন, ১৯২৬ সালে তাহা প্রায় ২·৮ জনে পরিণত হয়। কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন, ভোটের যোগ্যতার মান এমনভাবে কমাইয়া দিতে হইবে, যাহাতে মোট অধিবাসীদের শতকরা ১০ জন ভবিষ্যতে ভোটার শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। ইহাতে ভোটারের সংখ্যা বর্ত্তমানের তুলনায় তিন গুণের অধিক হইয়া দাঁড়াইবে তাঁহারা আরও বলিয়াছেন :—

But with lowering of the franchise these classes will not only secure more votes in aggregate, but their voting ratio will be more nearly approximate to their population ratio. This is very clearly brought out in the case of Muhammadans of Bengal. One of the qualifications for a vote for the Legislative Council is the payment of chaukidari tax of not less than two rupees. For electorates Union Boards there is a similar qualification, except that the minimum payment to qualify for a vote is one rupee instead of two. Now, the Muhammadans are 55·3 per cent. of the rural population of Bengal. But in the rolls of rural electors for the Legislative Council they are only 48·8 percent.; whereas for Union Boards, where the qualification is halved, Muhammadan voters are 57·7 per cent, which much more nearly corresponds to their population ratio. It is calculated that out of an additional 968,000 voters in rural Bengal brought in by such a lowering of franchise, 608,000 would be Muhammadas.

ইহার মর্ম্ম এই যে, franchise বা ভোটদানের যোগ্যতার মান কমাইয়া দিলে অনুন্নত শ্রেণীর লোকদিগের সংখ্যাই যে শুধু মোটের উপর কতকটা বাড়িয়া যাইবে, তাহাই নহে; বরং ইহা দ্বারা তাহাদের ভোটারগণের অনুপাতও তাহাদের জন-সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা কিছু

(১) বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের ১৯২৯ সালের রিপোর্ট—১৩০ পৃষ্ঠা।

অধিক হইয়া যাইবে। বাঙ্গলার মুছলমানদের সম্বন্ধে এই কথাটা খুবই পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারা যায়। ব্যবস্থাপক সভার ভোট-দানের একটা যোগ্যতা হইতেছে—অন্যূন দুই টাকা চৌকিদারী ট্যাক্স দান। ইউনিয়ন বোর্ডে কিন্তু একটাকা চৌকিদারী ট্যাক্স দিলে ভোটার হওয়া যায়। মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাহিরে মুছলমানদের অনুপাত হইতেছে ৫৫·৩ জন। আর ব্যবস্থাপক-সভার এই শ্রেণীর মোট ভোটারদের মোকাবেলায় মুছলমান ভোটারদের অনুপাত হইতেছে ৪৮·৮ জন মাত্র। কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ডে দুই টাকার স্থলে এক টাকা সেস্ দেওয়ার যোগ্যতা গৃহীত হওয়াতে মুছলমান ভোটারদের অনুপাত ৫৭·৭ জনে পরিণত হইয়াছে। অথচ তাহাদের সংখ্যা হইতেছে ৫৫·৩ জন মাত্র। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই ভাবে (এই একটী মাত্র যোগ্যতার মান কমাইয়া দেওয়ার ফলে) পল্লী-বঙ্গে যে নূতন ৯ লক্ষ ৬৮ হাজার ভোটার বেশী হইবে, তাহার মধ্যে ৬ লক্ষ ৮ হাজার হইবে মুছলমান। (১)

(৩) সাইমন কমিশন ও ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশে Immediate Adult suffrage দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন, শতকরা ১০জনকে ভোটার বানাইবার মত যোগ্যতার মান নির্দ্ধারণ করিতে সুপারিশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কংগ্রেস নিজেদের সমস্ত দাবী ও পরিকল্পনার ভিত্তি করিয়াছেন এই Adult suffrage এর উপর। সুতরাং কংগ্রেসের সহিত সরকার পক্ষের যদি মিটমাট হইয়া যায়, তাহা হইলে হয়'ত কংগ্রেসকে কিছু নামিতে এবং গবর্ণমেণ্টকে কিছু উঠিতে হইবে। সাইমন কমিশন বলিতেছেন, মোট অধিবাসীর শতকরা ১০জনকে আগামীতে ভোটের অধিকার দিতে হইবে। ইহাতে বয়োপ্রাপ্ত অধিবাসীদের শতকরা ২০ জন ভোটের অধিকার পাইবে, ইহাও তাঁহারা দেখাইয়াছেন। কংগ্রেস প্রত্যেক বয়োপ্রাপ্ত অধিবাসীকে ভোটের অধিকার দেওয়ার দাবী করিয়াছেন। ইহাতে শতকরা ৫০ জনকে ভোটের অধিকার দিতে হইবে। এখন এই দুইদলে যদি সন্ধি হয়, তাহা হইলে অন্ততঃপক্ষে বয়োপ্রাপ্তদের শতকরা ৩০ জনকে বা মোট অধিবাসীদের অন্যূন শতকরা ১৫ জনকে যে ভোটের অধিকার দেওয়া হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে মুছলমানদের মাত্র শতকরা দুইজন ভোটের অধিকার ভোগ করিতেছে, ইহাতেই তাহাদের সংখ্যা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, নিম্নে সরকারী রিপোর্ট হইতে তাহার একটা তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

বিভাগ	অমুছলমান	মুছলমান
বর্দ্ধমান	১,৯০,৯৪১	৩১,৪০৭
প্রেসিডেন্সী	১,৮০,৯৮২	১,০২,৪৮৪
রাজশাহী	৯৬,৮০২	১,৪৩,৭৯৯
ঢাকা	১,২০,৫৬০	১,৮৫,৮৮৮
চট্টগ্রাম	৩৪,২৩৫	৬৬,১৬০
মোট	৬,২৩,৫২০	৫,৩০,০৩৫

এখন, এই ভোটারের সংখ্যা উল্লিখিত পরিমাণে বাড়াইতে হইলে, ভোটারের যোগ্যতা বা Franchise ও সেই পরিমাণে কমাইয়া দিতে হইবে, এবং ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, Franchise কমার সঙ্গে সঙ্গে মুছলমান ভোটারদের সংখ্যা ও অনুপাত উভয়ই বহুগুণে বাড়িয়া যাইবে। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট হইতে উপরে তাহার একটী মাত্র নমুনা তুলিয়া দিয়াছি, নিম্নে বিষয়টা আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিতেছি।

ইউনিয়ন বোর্ডের আদর্শ

সরকারী কাগজ-পত্রগুলি ভাল করিয়া আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, তাঁহারা ভোটারের সংখ্যা-বৃদ্ধি বা যোগ্যতার মান হ্রাস করা সম্বন্ধে ইউনিয়ন বোর্ডকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সাইমন কমিশনের সাহায্যের জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ১৯২৯ সালে যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রথম হইতে এই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াই সব বিষয়ের বিচার করা হইয়াছে। সাইমন কমিশনও পরোক্ষভাবে ইহারই সমর্থন করিয়াছেন। তাহার পর, ১৯৩০ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট সাইমন রিপোর্টের সমালোচনা করিয়া যে শেষ মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতেও তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে ইহার

(১) সাইমন রিপোর্ট, ১—১৯১ এবং ২—৯২, ৯৩ পৃষ্ঠা।

সমর্থন করিয়াছেন। * তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন—সাইমন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে, শতকরা ১০জনকে ভোটের অধিকার দিতে হইলে Franchise বা যোগ্যতার মান ইউনিয়ন বোর্ড অপেক্ষাও কমাইয়া দিতে হয়, কারণ ইহাতে শতকরা ৮ জন অধিবাসী মাত্র ভোটের অধিকার পাইয়াছে। আগামী শাসন-সংস্কারের পর ইউনিয়ন বোর্ডের ভোটদাতাগণই প্রধানতঃ বাঙ্গলা কাউন্সিলের ভোটার শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

এই হিসাবে মুছলমান ও অমুছলমানদিগের ভোটার সংখ্যার তারতম্য কিরূপ দাঁড়াইবে, এখন আমাদিগকে তাহাই হিসাব করিয়া দেখিতে হইবে। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের শেষ মন্তব্যে যে "Appendix V of the Bengal Report"-এর বরাত দেওয়া হইয়াছে, সেই রিপোর্টে তাঁহারা বলিতেছে—"১৯২১ সালের আদম শুমারীর রিপোর্ট অনুসারে বাঙ্গলা দেশে মুছলমান অধিবাসীদের অনুপাত হইতেছে ৫৩·৫৫ জন। কেবল পল্লী-বঙ্গের হিসাবে তাহাদের অনুপাত শতকরা ৫৫·৩৩ দাঁড়ায়। শহর ও মফস্বলের সমস্ত মুছলমান ভোটারের সংখ্যা লইয়া একজাই হিসাব করিলে, অমুছলমানের তুলনায় তাহাদের অনুপাত দাঁড়ায় ৪৫·৯৫ জন মাত্র; কেবল মফস্বলের হিসাবে মুছলমানের অনুপাত দাঁড়ায় ৪০·৮৪ জন। ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলার ৩টী জেলাতে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পক্ষান্তরে কোন কোন জেলার সমস্ত থানাতে ঐ সময় পর্য্যন্ত ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই। তাহা হইলেও ২৮টী জেলার মধ্যে ২৫টী জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সব বোর্ডের মুছলমান ও অমুছলমান ভোটাদের সংখ্যা খতাইয়া দেখা যাইতেছে যে, franchise কম করার সঙ্গে সঙ্গে মফস্বল এলাকায় ব্যবস্থাপক-সভার মুছলমান ভোটদাতাদের অনুপাত দাঁড়াইবে ৫৭·৭৫ আর হিন্দু প্রভৃতি অমুছলমান ভোটারদিগের অনুপাত (৫৪·০৫ হইতে) ৪২·২৫ এ নামিয়া যাইবে। এ অবস্থায় মুছলমান ও অমুছলমান ভোটারের সংখ্যা কি পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে, নিম্নে তাহার একটা মোটামুটি হিসাব দিতেছি :—

(ক) অমুছলমান

ভবিষ্যতে হইবে	৯,০০০০০
বর্ত্তমানে আছে	৫,৪০,০০০
মোট বাড়িবে	৩,৬০,০০০ জন।

(খ) মুছলমান

ভবিষ্যতে হইবে	১১,২১,০০০
বর্ত্তমানে আছে	৫,১৩,০০০
মোটে বাড়িবে	৬,০৮,০০০ জন।

সুতরাং সমস্ত জেলার গড়-পড়তা হিসাবেও জানা যাইতেছে যে, ইউনিয়ন বোর্ডের আদর্শ গৃহীত হইলে বাঙ্গলায় মুছলমান ভোটারের সংখ্যা দাঁড়াইবে ৫৭¾ জন, আর সকল ধর্ম্মের ও সকল শ্রেণীর অমুছলমান ভোটারের অনুপাত হইবে মাত্র ৪২¼ জন। সুতরাং এ হিসাবেও মুছলমান ভোটারের সংখ্যা অমুছলমান অপেক্ষা শতকরা ১৬ জন হিসাবে অধিক হইবে।

কিন্তু, এখানেও সমস্ত বাঙ্গলা সম্বন্ধে 'গড়ে হাঁটুজল' নীতির অনুসরণ না করিয়া, আমাদিগকে প্রত্যেক জেলার হিসাব স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। এই হিসাবের গুরুত্বটা সম্যকরূপে বুঝাইবার জন্য, আমরা মুছলমান-প্রধান জেলাগুলি পরিত্যাগ করিয়া, 'প্রায় সমান শ্রেণীর' দু'টী সংখ্যা-লঘু জেলার বেওয়ারা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের সমর্থকগণ মিথ্যা জুজুর ভয় সৃষ্টি করিয়া মুছলমান সমাজের কিরূপ সর্ব্বনাশ সাধন করিতে যাইতেছেন, এই উদ্ধৃতাংশ হইতে তাহা খুবই স্পষ্টরূপে প্রকট হইয়া যাইবে।—

২৪ পরগণা

২৪ পরগণা জেলার যে-সব থানায় ঐ সময় পর্য্যন্ত ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার গড় হিসাবে দেখা যায়—ঐ জেলায় মুছলমানের অনুপাত ৩৪·৬ এবং

* বেঙ্গল-রিপোর্ট, ২৭৩ পৃষ্ঠা, ৫ প্যারা :—The members of Government are of opinion that the figures indicate that the adoption of franchise similar to that now in force for Union Board elections would provide an electorate which would still be workable and would at the same time be more adequate to express the views of the people.

বাঙ্গলা কাউন্সিলে তাহাদের ভোটারের অনুপাত ৩১·২ * জন। কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ডে ২৪পরগণার মুছলমান ভোটারদের অনুপাত হইতেছে ৫৩·৫ জন। ইউনিয়ন বোর্ডে হিন্দু প্রভৃতি সকল জাতি ও ধর্মের অমুছলমান ভোটারদিগের মোট সংখ্যা হইতেছে ১৭,২০২ জন, আর একমাত্র মুছলমান ভোটারের সংখ্যা হইতেছে—১৯,৮০৩ জন। খোলাসা এই যে, ২৪ পরগণার মুছলমানগণ মোট অনুপাতে ৩৪ জন মাত্র হইলেও, ইউনিয়ন বোর্ডে তাহাদের ভোটার সংখ্যা হইতেছে শতকরা ৫৩½ জন।

দিনাজপুর

মুছলমান অধিবাসীদের সংখ্যা হইতেছে শতকরা ৪৯ জন। কাউন্সিলে এই জেলার মুছলমান ভোটারদের বর্ত্তমান অনুপাত ৫৩·২ জন এবং ইউনিয়ন বোর্ডে তাহাদের ভোটারদিগের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৬২·৩ জন। ইউনিয়ন বোর্ডে সকল শ্রেণীর অমুছলমান ভোটারের মোট সংখ্যা ৪৭,০৯৩ জন, আর মুছলমান ভোটারের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৭৭,৭৬৯ জন।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই দুইটী জেলার নমুনা হইতে প্রত্যেক নিরপেক্ষ পাঠকই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, ভাবী ব্যবস্থাপক সভার ভোটারদের জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের যোগ্যতার আদর্শ গৃহীত হইলে, কোন জেলাতেই মুছলমান ভোটারদের অনুপাত তাহাদের জন-সংখ্যার অনুপাত হইতে কোন ক্রমেই কম হইতে পারিবে না, বরং বহু স্থলে এই অনুপাত বাড়িয়াই যাইবে। অবশ্য, বর্ত্তমানে ভোটারদের লিষ্ট তৈরী করার ব্যবস্থার যে সব দোষ-ত্রুটি আছে—এবং প্রথম রিপোর্টে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট যাহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন—সেগুলির প্রতিকার করিয়া লইতে হইবে, এবং মুছলমানদিগকে তাহার জন্য নিজেরাও একটু চেষ্টা-চরিত্র করিতে হইবে।

একদিন এমন ছিল, যখন সপ্তদশ জন মাত্র প্রবাসী মুছলমান বাঙ্গলা আক্রমণ করিতে সাহসী হইয়াছিল, তাহাদের সে সাহস জয়যুক্তও হইয়াছিল। আজ বাঙ্গলার অধিবাসীর হিসাবে তাহারা সংখ্যা-গুরু, ভোটারের হিসাবেও তাহারা সংখ্যা-গুরু। তত্রাচ তাহাদের নেতারা নাকি আশঙ্কা করিতেছেন—স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের রক্ষাকবচ উঠিয়া গেলে হিন্দুরা তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়া, হজম করিয়া ফেলিবে। এই শ্রেণীর উক্তি ও যুক্তিগুলির মধ্য দিয়া তাঁহাদের মানসিকতার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে দুইটী অতি হীন ভাবধারার স্পষ্ট সন্ধান জানিতে পারা যাইবে। তাঁহাদের মধ্যকার একদল লোক সত্য সত্যই হিন্দুর ভয়ে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। নিজেদের প্রতি তাঁহাদের বিশ্বাস নাই, জাতির প্রতি তাঁহাদের আস্থা নাই, সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হওয়ার মত সৎসাহস তাঁহাদের নাই। বস্তুতঃ তাঁহাদের মন ও মস্তিষ্ক বহুপূর্ব্বে হিন্দুর নিকট পরাজয় স্বীকার ও আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়াছে। তাই সংঘর্ষের সম্ভাবনা হইলেই তাঁহারা চোখে অন্ধকার দেখিতে থাকেন এবং একটা অভিনব Political Purdah System প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহার অন্তরালে নিজেদের ও স্ব-সমাজের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে চান! কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, সংঘর্ষই জীবনের দ্যোতক। সংঘর্ষকে এড়াইয়া যাহা লাভ করা যায়, তাহা হইতেছে মুমূর্ষার অবসাদ বা মৃত্যুর বিরাম, এই বিরামকে তাঁহারা স্বস্তি বলিয়া মনে করিতেছেন। প্রতিবেশী হিন্দু মহিলারা পর্য্যন্ত যখন স্ব-সমাজের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে প্রবল প্রতাপ বৃটিশ রাজ্যের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করিতেছেন, পরিপূর্ণ আত্ম-বিশ্বাস লইয়া অভিপ্সিতের জন্য জয়-যাত্রা করিতেছেন—আমাদের নেতারা তখন সমাজের বুকে এই প্রত্যয়কে বদ্ধমূল করিয়া দিতেছেন যে, তাহারা অতি হেয়, অতি হীন, অতি অকর্ম্মণ্য, অতি অপদার্থ। এমন কি সংখ্যা-গরিষ্ঠ হইয়াও প্রতিবাসী বাঙ্গালী-হিন্দুর কবল হইতে আত্ম-রক্ষা করিতেও তাঁহারা অসমর্থ। এই সব মরণের অগ্রদূতেরা সমাজকে ধ্বংসেরই পয়গাম অবিরত শুনাইয়া আসিতেছেন।

ইঁহাদের আর এক দল বস্তুতঃ মুছলমানকে এতটা অকর্ম্মণ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা জানেন, সামান্য চেষ্টায় তাওহীদের এই আড়াই কোটি সেবক নিজদিগকে অজেয় করিয়া তুলিতে পারে। কিন্তু তাঁহারাও ঐরূপ উক্তি করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। কারণ, সেই প্রাণ বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া জাতির অঙ্গে অঙ্গে

* ইহা কেবল মফস্বল এলাকার হিসাব, শহর ও মফস্বলের একত্রই হিসাব ধরিলে এই অনুপাত আরও কমিয়া যাইবে।

জীবনের সাড়া জাগিয়া উঠুক, ইহা তাঁহারা চান না। তাই সিংহ-শাবকের অন্তরে শৃগালত্বের অনুভূতিকে সদা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখার জন্য তাঁহাদের এই ব্যস্ততা। এই জন্য, বিদেশী আমলাতন্ত্রও যখন ভাবী গণতন্ত্রের জন্য ভোটারের যোগ্যতার মান কমাইয়া দিতে বলিতেছেন—আমাদের এই শ্রেণীর নেতারা তখন উল্টা প্রস্তাব করিতেছেন, যোগ্যতার মান দশগুণ বাড়াইয়া দিতে। তাই, চাপা দেওয়ার শত চেষ্টা সত্ত্বেও ডাঃ শাফাআৎ আহ্‌মদ তাঁহার ঢাকা অভিভাষণে, প্রজা-আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিতেও এক বিন্দু কুণ্ঠিত হন নাই।

হিন্দু টাকা দিয়া মুছলমানের বিবেককে কিনিয়া লইবে, চোখ রাঙ্গাইয়া তাহাদের ঈমানকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলিবে, খোদার ফজলে মুছলমান সমাজ আজও এরূপ অপদার্থ হইয়া যায় নাই। জমিদারের হুমকি, মহাজনের চোখ রাঙানীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বাঙ্গালার দিকে দিকে এখন নিত্যই ইহার পরীক্ষা হইতেছে। ফলতঃ মরণের অগ্রদূতদিগের এই সব ধ্বংসের বাণী শুনিয়া বিহ্বল হইয়া পড়ার কিছুই নাই। আর, খোদা না করুন, বস্তুতঃই যদি বাঙ্গলার মুছলমান এই শোচনীয় পরিণামে উপনীত হইয়াই থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, জাতির হিসাবে তাহাদের মরণ বহুপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। এখন স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের প্রাচীর গাঁথিয়া তাহাদের গোরস্থানের হেফাজত করারই চেষ্টা হইতেছে—যেন বাহিরের শকুনি, গৃধিনী তাহাদের হৃৎপিণ্ডগুলি ছিঁড়িয়া খাইতে না পারে! আমরা বলি, প্রাচীর তুলিয়া না হয় বাহিরের শত্রুকে রক্ষা করিলে, কিন্তু, সে রক্ষা পাওয়ার কি কোন স্বার্থকতা আছে, কোন সম্ভাবনা আছে? মৃতকে মৃত্তিকায় পরিণত করার জন্য বাহিরের শত্রুর দরকার হয় না। গোরস্থানের মাটি হইতে, মৃতের নিজ পচা-খসা দেহ হইতেই সে জন্য হাজার হাজার পোকা-মাকড় আপনা আপনিই পয়দা হইয়া যাইবে। ইহাই হইতেছে মৃত্যুর ধর্ম্ম।

এই প্রসঙ্গে আরও বলিতে চাই, জমিদার-মহাজনদিগের প্রভাব-প্রতিপত্তির যুগ শেষ হইয়া আসিয়াছে। স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন উঠিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চরম বিনাশের সূত্রপাত হইবে। তাহার পর, দেশে গণতন্ত্রের আবহাওয়া সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, শাসন ও শোষণের এই সব এজেন্সিগুলির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের প্রথম কিস্তিতে আমরা দেখাইয়াছি যে—

(১) স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন গ্রহণ করিলে বাঙ্গলার মুছলমানকে আইনের দ্বারা চিরস্থায়ীভাবে সংখ্যা-লঘু হইয়া থাকিতে হইবে। প্রদেশের শাসন-অধিকার প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার হস্তগত হওয়ার এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারী হলকা বা Official block গুলি উঠিয়া যাওয়ার পর এইরূপে সংখ্যা-লঘু হইয়া থাকার বাস্তব অর্থ কি হইতে পারে, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে নিবেদন করিয়াছি।

(২) স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন দ্বারা বাঙ্গলার মুছলমান জনসাধারণের স্বার্থ অতি নির্ম্মমভাবে পদদলিত হইতেছে।

(৩) স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না।

প্রবন্ধের দ্বিতীয় কিস্তিতে দেখান হইয়াছে যে—

(১) মিশ্র-নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তিত হইলে মুছলমানের আশঙ্কা করার কিছুই নাই। বরং মিশ্র-নির্ব্বাচন প্রথার দ্বারা মুছলমানগণ কেবল মুছলমান ভোটারের সাহায্যে তাহাদের জন-সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা বহু অধিক আসন সহজে অধিকার করিয়া লইতে পারিবে।

(২) গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব মতে ইউনিয়ন বোর্ডের আদর্শ গৃহীত হইলেও, মুছলমান ভোটারদের অনুপাত তাহাদের জন-সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা বাড়িয়া যাইবে।

এখন, বাঙ্গলার মুছলমানদিগের স্বার্থ-রক্ষার জন্য মিশ্র বা স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন প্রথার মধ্যে কোনটা উপকারী আর কোনটা অপকারী, চিন্তাশীল ও ন্যায়দর্শী পাঠকগণই তাহার বিচার করিবেন।

কেবল সাম্প্রদায়িক স্বার্থের দিক দিয়া মিশ্র ও স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের দোষ-গুণের বিচার করিয়াছি। কারণ, এক্ষেত্রে যাঁহাদের সঙ্গে মতভেদ, তাঁহারা কেবল এই দিক দিয়া সমাজকে সম্মোহিত করার চেষ্টা পাইতেছেন। আমাদের মতে, স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন প্রথা উঠিয়া যাওয়ার পর, দেশে যে রাজনৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ-সংঘাতের মনোভাব তাহাতে আপনা-আপনি বিলীন হইয়া যাইবে। মিশ্র-নির্ব্বাচনের ফলে দেশে শ্রেণী-বিভাগ হইবে স্বার্থের হিসাবে—ধর্ম্মের হিসাবে নহে। মুষ্টিমেয় হিন্দু ও মুছলমান অভিজাত শ্রেণীর লোক আমলা-তন্ত্রের পূর্ণ সমর্থন পাইয়া বর্ত্তমানে "হিন্দু-স্বার্থ" বা "মুছলমান-স্বার্থ" বলিয়া যে অন্যায় অবাস্তব ও সর্ব্বনাশকর সম্মোহন সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার প্রহেলিকাজাল তখন স্বতঃই ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবে।

চিরন্তনী

—শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

হে আমার শাশ্বত প্রেয়সী,
মোর মনোরমা তুমি হবে বলি' ঢেলেছিলে মসী
নিখিলের রূপসীর মুখে ?
হাহাকার তুলেছিলে বুকে ?
অজানা শোভনা লাগি' বাসনার দীপ্ত দাবানল
জ্বেলেছিলে এ জীবনে, ভস্মশেষ করিতে কেবল
ইন্দ্রিয়ের ফুল্ল বনভূমি ?
তখন বুঝি নি হায় অগ্নিকাণ্ড করেছিলে তুমি
আপনার হাতে,
বহ্নি মুখী পতঙ্গের পক্ষ দু'টি নিঃশেষে পুড়াতে।

দগ্ধ পক্ষে ছিলাম পড়িয়া,
নির্ব্বাপিত বহ্নি-ভস্মরাশি মাঝে মাটি আঁকড়িয়া।
দেহ-মনে জ্বালা দহনের,
দৃষ্টিহীন অন্ধ নয়নের
অশ্রুজলে বয়েছিল বেদনার লবণাম্বু-ধারা,
প্লাবিয়া সে দাহ-শেষ ভস্মময় ধূসর সাহারা।
হেনকালে রূপসী আমার,
এলে দগ্ধ মরু মাঝে। অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পেল তার
পতঙ্গ যে হ'ল প্রজাপতি,
রামধনু-আঁকা পাখা মেলি' সে যে হ'ল স্বৈরগতি।

ক্ষুদ্র পক্ষে অনন্ত প্রেরণা,
সীমা হারা রূপে তব অফুরন্ত তার বিচারণা!
নদী-গিরি সাগর-বেলায়
কি আলো বাতাসে সে যে ধায়!
জল-স্থল অন্তরীক্ষে প্রসারিত তুমি মনোরমা,
দিকে দিকে রূপে তব অন্তহীন তার পরিক্রমা
কি অধীর আনন্দ উল্লাসে!
কভু বদ্ধ পক্ষপুটে পুষ্পলীন অবরুদ্ধ শ্বাসে
পান করে মধু,
নব জন্ম দিয়া তারে হ'লে তার চিরন্তনী বধূ!

বেগম লাল বিবি

—প্রবন্ধ—

—এম, আবদুর রহমান

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এক অজ্ঞাত-অখ্যাত পল্লী-বালা বীরভূমের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া বঙ্গ-ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। বাংলা তথা বাঙালীর গৌরব এই বীরাঙ্গনা মহিয়সী মহিলার নাম বেগম লাল বিবি।

নানা প্রচলিত কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া জানা যায়, ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দের এক শুভ মুহূর্ত্তে বীরভূম জেলার অন্তর্গত চণ্ডীদাস-নানুর থানার অধীন পরোটা-পল্লীতে লাল বিবি জন্ম-গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বাহ্‌রাম খাঁ এবং মাতার নাম চাঁদ বিবি। বাহ্‌রাম খাঁ ৩৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নিঃসন্তান থাকিয়া চল্লিশ বৎসর বয়সে মোহাম্মদ তকী খাঁ নামে এক পুত্র-রত্ন লাভ করেন। তকীর জন্মের পাঁচ বৎসর পরে বেগম লাল বিবি জন্ম-গ্রহণ করেন।

বাহ্‌রাম খাঁ সম্বন্ধে কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া না গেলেও আজিকার হিন্দু অধ্যুষিত পরোটা নির্ম্মম কালের কঠোর শাসনকে উপেক্ষা করিয়া সেই অতীত যুগের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। আজিও পাঠানহীন পাঠান পাড়া, শেখহীন শেখের পুকুর, খাঁহীন খাঁয়েরগড়, ঈদ্‌হীন ঈদ্‌গাহ, পীরের আস্তানা, আড়ম্বরহীন উদাস গোরস্থান—আর খাঁ সাহেবের বাড়ীর ইট-পাটকেলের ধ্বংসাবশেষ মুস্‌লিমের অধুনা লুপ্ত অতীত গৌরব-কাহিনীর জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

পাঁচ বৎসর বয়সে বৌদাদীর কাছে লাল বিবির বিদ্যা-শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং চৌদ্দ বৎসর বয়সে শেষ হয়। এই নাতিদীর্ঘ নয় বৎসরে লাল বিবি ঘরে বসিয়া যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার মূল্য নিতান্ত কম নয়। উত্তরকালে জটিল রাজকার্য্যের নানাবিষয়ে তাঁহার এই শিক্ষা বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল। উর্দ্দু ভাষায় তিনি বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল। তিনি যখন কোর-আন তেলাওয়াৎ করিতেন, তখন শ্রোতাগণ এমন মুগ্ধ হইয়া যাইত যে, মনে হইত বুঝি তাহাদের বাহ্য-জ্ঞান লোপ পাইয়াছে।

বৌদাদী ছিলেন সেকালের একজন শিক্ষিতা রমণী। আরবী, উর্দ্দু ও পার্শী ভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। চিকিৎসা ও ধাত্রী-বিদ্যায় সমগ্র বীরভূমের মহিলা-মহলে তাঁহার তুল্য কেহ ছিলেন না। তিনি ছিলেন গ্রামের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষয়িত্রী এবং রূপকথা বলিবার ঠাকুরমা, তরুণীদের আনন্দে উৎসাহ-দাত্রী, প্রৌঢ়াদলের দুঃখের দরদী আর বৃদ্ধা-মহলে ধর্ম্মগুরু স্বরূপ। স্বয়ং বাহ্‌রাম খাঁ অনেক সময়ে বৈষয়িক বিষয়ে পরামর্শ-লাভের জন্য বৌদাদীর সাহায্য-প্রার্থী হইতেন। অনেক দিন হইল বৌদাদী ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু আজিও তাঁহার কথা প্রবাদ-বাক্যের মত লোকের মুখে-মুখে ফিরিতেছে।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দ পরোটা-পল্লীর পক্ষে এক স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরের এক শুভদিনে বীরভূমস্থ রাজনগরের নবাবজাদা আসাদজ্জমান খাঁ রাজনৈতিক কোন কার্য্য ব্যপদেশে মুর্শিদাবাদে গিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদ হইতে রাজনগর ফিরিবার পথে তিনি কীর্ণাহারে শিবির সন্নিবেশ করেন। পরোটা-পল্লী কীর্ণাহারের অনতিদূরে অবস্থিত। নবাবজাদা যে স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, সে স্থান হইতে পরোটার নবাব বাহ্‌রাম খাঁ সাহেবের বাড়ী কয়েক শত ফুট মাত্র ব্যবধান।

অদূরে লোক-লস্করের কোলাহল শুনিতে পাইয়া ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য লাল বিবি তদীয় প্রাসাদের ছাদ হইতে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ নবাবজাদার যৌবন-সুলভ আঁখি-যুগল সেইদিকে পতিত হইল। অপ্রত্যাশিতভাবে লাল বিবির সহিত নবাবজাদার দৃষ্টি-বিনিময় হইয়া গেল। লজ্জায় লাল বিবি ত্বরিত গমনে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

লাল বিবি ছিলেন পরমা সুন্দরী। কথিত আছে—এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের জন্যই নাকি তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল লাল বিবি। কিংবদন্তী অনুসারে লাল বিবির প্রকৃত নাম লুৎফুন্নেছা। কিন্তু কোন ইতিহাস গ্রন্থে আমরা এ নামের সন্ধান পাই নাই।

পলকের দৃষ্টি-বিনিময়ে লাল বিবি নবাবজাদার হৃদয়-রাজ্যখানি পূর্ণভাবে অধিকার করিয়া বসিলেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে নবাবজাদা জনৈক প্রিয় পার্শ্বচরকে তাঁহার মনের কথা খুলিয়া বলিলেন। পরে অনুসন্ধানে জানা গেল, এই মনোহারিণী মূর্ত্তিটি বাহ্‌রাম খাঁ সাহেবের অবিবাহিতা কন্যা লাল বিবি।

এই ঘটনার পাঁচ দিন পরে নবাবজাদার পিতার অজ্ঞাতসারেই প্রিন্স আসাদজ্জমান খাঁয়ের সহিত লাল-বিবির বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। শোনা যায়, পরোটা গ্রাম সন্নিহিত শিমড়া গ্রাম-নিবাসী জনৈক মুন্সি সাহেব এই বিবাহে পৌরহিত্য করিয়াছিলেন।

বিবাহ-অন্তে নবাবজাদা নব পরিণীতা পত্নী লইয়া রাজনগর যাত্রা করিলেন। তাঁহার পিতা বদীয়জ্জমান খাঁ এই আকস্মিক বিবাহের কথা শুনিয়া সে সময়ে খুব অসন্তুষ্ট হইলেও—পরে পুত্র-বধূর অতুলনীয় রূপ-গুণ দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন।

১৭৫২ খৃষ্টাব্দে আসাদজ্জমান খাঁ বাহাদুর পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। হেতমপুর-দুর্গে জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা আলী নকী খাঁ সাহেবের মধ্যবর্ত্তিতায় তিনি সিংহাসন-প্রাপ্তির সনন্দ প্রাপ্ত হন। এই ঘটনা হইতে আলী নকী খাঁয়ের উদারতা ও নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃ-প্রেমের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

আসাদজ্জমান খাঁ সাহেবের সময়ে বীরভূম রাজ্যের বিস্তৃতি বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সেকালের বীরভূমি একালের বীরভূমের মত ছিল না। তখনকার বীরভূমির সীমানা ছিল পূর্ব্বে ভাগীরথি, পশ্চিমে পঞ্চকোট, দক্ষিণে অজয় নদ, আর উত্তরে ভাগলপুর—এই সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে আসাদজ্জমান খাঁ বাহাদুরের অখণ্ড-প্রতাপ বিরাজ করিত।

১৭৫৭ অব্দের ২৩শে জুন পলাশী-প্রাঙ্গনে মোস্‌লেম সৌভাগ্য-রবি অস্ত যায়। দুরপনের কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া মীর জাফর আলী খাঁ অন্তঃসারশূন্য বাংলার মসনদে উপবেশন করেন। সে দিনও বীরভূম-রাজ্যের সম্মান অটুট ছিল। সেবারের পুণ্যাহে বীরভূম-রাজ অন্যান্য বৎসরের মত কয়েক সহস্র টাকা নবাব দরবারে প্রেরণ করিয়াছিলেন মাত্র। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ে তিনি পূর্ব্বের মতই স্বাধীন ছিলেন।

মুর্শিদাবাদের নবাবের আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতার আভাস পাইয়া বীরভূমির বীরপুত্র রাজনগর-রাজ নবাব আসাদজ্জমান খাঁ বাহাদুর সমগ্র বঙ্গ-রাজ্য জয় করিবার জন্য নবাবের অধীনস্থ প্রদেশসমূহ অধিকার করিতে করিতে চুণাখালী দুর্গ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। নবাব, বীরভূমির বীর সন্তানের এই অগ্রগমনে বাধা দান করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে ইংরাজ-সৈন্য নবাবের সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়ায় এবং বীরভূমির বীর সেনাপতি আফজল খাঁ নিহত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে সম্মানজনক এক সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হয়। বীরভূম-রাজকে নবাব মীর কাশিমের সহিতও কয়েকবার যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধে তিনি যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বাংলার ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই।

যুদ্ধ-ব্যপদেশে বীরভূম-রাজকে যখন দেশ-দেশান্তরে ঘুরিতে হইত, বেগম লাল বিবি তখন বিচক্ষণ রাজার মত রাজধানীতে থাকিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। তিনি এমন সুচারুভাবে রাজকার্য্য সমাধা করিতেন যে, অনেক সময়ে নবাব আসাদজ্জমান খাঁ অবাক না হইয়া পারিতেন না। এই কারণেই তিনি দূরদেশে যাইয়া রাজ্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিতেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, এজন্য তকী খাঁ তাঁহাকে "দ্বিতীয় নুরজাহান" (Nurjehan the second) বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

১৭৭৭ অব্দে বীরভূমির ভাগ্য-বিধাতা প্রজারঞ্জক, উন্নত-মনা, রাজর্ষি নবাব অসাদজ্জমান খাঁ বাহাদুর কলিকাতা

নগরীতে ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার পবিত্র শবদেহ কলিকাতা হইতে আনীত হইয়া রাজনগরের গুলবাগে (Flower Garden) সমাধিস্থ করা হয়।

নবাব আসাদজ্জমান খাঁ বাহাদুরের পরলোক-গমনের পর তাঁহার ভ্রাতা বাহাদুরজ্জমান খাঁ সিংহাসন-লাভের জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই ঘটনা অবগত হইয়া পরলোকগত নবাবের বিধবা পত্নী বেগম লাল বিবি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের দরবারে নিজের দাবীর কথা জ্ঞাপন করেন এবং বিশেষভাবে জানান যে, বাহাদুরজ্জমান খাঁ রাজনগরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইতে পারেন না। কারণ তিনি বদীয়জ্জমান খাঁ বাহাদুরের অবৈধ সন্তান (Ilegitimate son)। সুতরাং তিনিই (বেগম লাল বিবি) সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী। উক্ত আবেদন-পত্রে তিনি নানাযুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন দ্বারা নিজের দাবীর কথা এমনভাবে পেশ করেন যে, কোম্পানীর কাউন্সিল তাঁহার মত সমর্থন না করিয়া পারেন নাই। এ সকল কারণে বিনা-বাধায় তিনি রাজনগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বাহাদুরজ্জমান খাঁ সিংহাসন-লাভে বঞ্চিত হইয়া গুপ্তভাবে রাণী লাল বিবির বিরুদ্ধে এক ভীষণ ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। ভোতান খাঁ নামক তাঁহার জনৈক পার্শ্বচর এই চক্রান্তের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। কুট-বুদ্ধি ভোতান খাঁ রাণী সাহেবার একজন দ্বারবানকে অর্থ প্রলোভনে বশীভূত করিয়া, তাহাকে বাহাদুরজ্জমান খাঁয়ের দ্বারবানকে হত্যা করিবার জন্য প্ররোচিত করেন এবং তাহাকেও প্রকাশ করিতে বলেন যে, বাহাদুরজ্জমান খাঁ ও তাঁহার ভৃত্যকে হত্যা করিবার জন্য বেগম সাহেবা তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু দ্বারবানকে হত্যা করিবার পর আর সে বাহাদুর খাঁকে হত্যা করিতে সাহসী হইল না। পরে এই চক্রান্ত সম্পূর্ণ সফল করিবার মানসে বাহাদুরজ্জমান খাঁ কোম্পানীর কাউন্সিলে এই ঘটনা জ্ঞাপন করেন। কোম্পানীর কাউন্সিল বাহাদুরজ্জমানের পক্ষপাতিত্ব করিয়া বেগম লাল বিবির নিকট হইতে রাজ্য-ভার লইয়া তাঁহাকে প্রদান করেন।

১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে বেগম লাল বিবি বীরভূম রাজ্যের শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঘটনা-চক্রে অতি অল্প দিনের মধ্যে অর্থাৎ দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই গৃহ-শত্রুর ভীষণ চক্রান্তের ফলে বীরভূমের শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপার হইতে তাঁহাকে সরিয়া দাঁড়াইতে হইল। কিন্তু এই স্বাধীন-চেতা ও তেজস্বিনী মহিলা দমিবার পাত্রী ছিলেন না। তিনি কোম্পানীর বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে আপীল করিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব তখন ইংরাজের কেনা-গোলাম। সুতরাং তাঁহাদের বিচারের বিরুদ্ধে নবাবের কোন কথা বলিবার শক্তি ছিল না। তাই বেগম লাল বিবি সেখানে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অতঃপর কিছুদিন নীরব থাকিয়া চক্রান্তের গতি-বিধি ভাল-ভাবে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় তিনি ১৭৮৩ অব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর হৃতরাজ্য উদ্ধারের নিমিত্ত ভারতের তৎকালীন বড়লাট বাহাদুরের নিকট আবেদন করিলেন। তিনি ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে এই ঘটনার তদন্তের ভার দেন বীরভূমের কালেক্টার সাহেবের উপর। বাহাদুরজ্জমান খাঁ এই সময়ে পূর্ণ-প্রভাবে বীরভূম-রাজ্য শাসন করিতে-ছিলেন। কাজেই কালেক্টার সাহেব বেগম লাল বিবির স্বপক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ পাইলেন না। সুতরাং তাহার মন্তব্য মতে বেগম সাহেবা রাজনগরের সিংহাসন আর প্রাপ্ত হইতে পারিলেন না। কিন্তু মহামহিম বড়লাট বাহাদুর ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর বেগম লাল বিবির জন্য মাসিক দুই শত টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

বেগম লাল বিবি স্বাধীনচেতা ও তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন। মৃত স্বামীর সিংহাসন-লাভের জন্য তিনি নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু গৃহ-শত্রুর চক্রান্তের ফলে ও পারিপার্শ্বিক নানা প্রতিকূল ঘটনার জন্য তিনি রাজ্য উদ্ধারে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। দিল্লীশ্বরী সোলতানা রাজিয়াকে একদিন এমনি অবস্থায় পড়িয়া ভারতের শাসন দণ্ড ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। অন্তঃপুরচারিণী নারী সিংহাসনে বসিয়া বিচার করিবে, পুরুষের মত পৌরুষ-কণ্ঠে হুকুম চালাইবে, আর মন্ত্রী-মণ্ডল, ওমরাহগণ বিনা বাক্য-ব্যয়ে, নত মস্তকে তাহা মানিয়া চলিবে,—এ কি সহ্য হয়? শুধু এই কারণেই বেগম লাল বিবিকে রাজনগরের সিংহাসন ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

বেগম লাল বিবির কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। কলি-মন্নেছা নামে তাঁহার এক অনিন্দ্য-সুন্দরী কন্যা ছিল মাত্র।

তাঁহার কন্যার গর্ভেও কোন সন্তান-সন্ততি না হওয়ায়, তাঁহার মনের জোর অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল। তাঁহার শেষ সময়ের এই মনোভাব লক্ষ্য করিয়া বীরভূম-রাজ বাহাদুরজ্জমান খাঁ বেগম সাহেবার সহিত সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু স্বাধীনতা হারাইয়া তাঁহার শরীর ও মন ভাঙিয়া পড়ে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি রাজ্যের অনাথ-আতুরদিগকে কাঁদাইয়া জীবন-লীলা শেষ করেন। তাঁহার মৃত্যুর সঠিক তারিখ আমরা দিতে পারিলাম না।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে বেগম লাল বিবির যথেষ্ট বিচক্ষণতা ছিল। তাঁহার বীর স্বামীকে যুদ্ধ-বিগ্রহ লইয়া প্রায়ই নানাস্থানে ঘুরিতে হইত। ঐ সময়ে বেগম লাল বিবির হস্তে শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিত। তিনি উপযুক্ত রাজা এবং বিচক্ষণ মন্ত্রীর মত নিখুঁতভাবে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহার ন্যায় বিচারে প্রজাবৃন্দ অতিশয় সন্তুষ্ট ছিল। কতিপয় রাজভক্ত প্রজার সাহায্যেই উত্তরকালে তিনি হৃতরাজ্য পুনঃ-প্রাপ্তির জন্য নবাব দরবারে ও লাট সভায় আপনার দাবী পেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দান-খয়রাত ছিল তাঁহার জীবনের অন্যতম বিশেষত্ব। তাঁহার গুপ্ত দানের সংখ্যাই ছিল বেশী, আর এই দান প্রাপ্ত হইত অনাথ বালক-বালিকা ও আশ্রয়হীনা বিধবার দল। সাধারণ মেয়ে-মহলে এজন্য তিনি "রাণী মা" বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

বেগম লাল বিবি ছিলেন পতির একমাত্র প্রিয়তমা পত্নী। বেগম সাহেবার স্বর্গীয় ভালবাসার অচ্ছেদ্য বন্ধনে নবাব সাহেব এমনভাবে বাঁধা ছিলেন যে, তিনি আর দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। আসাদজ্জমান খাঁ ব্যতীত রাজনগরের প্রায় প্রত্যেক নবাবই একাধিক পত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন। লাল বিবি ছিলেন স্বামীর সুখ-দুঃখের প্রকৃত সঙ্গিনী, সহকর্ম্মিনী এবং সহধর্ম্মিনী।

লাল বিবি ছিলেন আদর্শ মহিলা। রূপে, গুণে, জ্ঞানে, কর্ম্মে, ধর্ম্মে, সতীত্বে, বীরত্বে তেজস্বিতায় এবং বদান্যতায় তিনি ছিলেন সেকালের নারী সমাজের শিরোমণি। সকল প্রকার মানবীয় গুণের সমাবেশে তাঁহার চরিত্র এমন মাধুর্য্য-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, বাংলার-ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ঊষা

—খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন

ঘুম-ভার নত আঁখি ধীরে ধীরে মেলি,
কে তুমি উঠিলে জাগি স্বপ্ন-সহচরি ?
লালসার রক্ত-রাঙা পরি রক্ত-চেলী
কী গান গাহিছ তুমি বালিকা-কিশোরি !

কী তুমি কহিতে চাহ কী তোমার বাণী,
কার বক্ষে আঁকা তব হেম-কান্তি ছবি,
আধ-স্বপ্ন জাগরণে কারে অঙ্কে টানি,
লহ তুমি কহ মোরে হে কিশোরী কবি !

প্রভাতের ঘুম-জাগা পাখীর কূজনে,
ভেসে আসে দূর হতে উদ্দাম সঙ্গীত
এলায়িত তনু-তটে বাহুর বিতানে
কারে তুমি পেতে চাহ পূর্ণ করি চিত।

জানি আমি জানি তোমা হে কলুষা সতি,
লজ্জা-রাঙা মুখে আঁকা কামনার রতি।

বঞ্চিত

—বড় গল্প— —মোহাম্মদ আবদুল বারি

(১)

বিধাতা কঠোর হস্তে যখন একে-একে সংসারের সব-কয়টী বাঁধন খুলিয়া লইলেন, তখন আজাদ যেন একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল,—যাক্ এখন দু' চোখ যে-দিকে যায়, সে-দিকেই যাওয়া যাবে।

বহুক্ষণ অবিরল-ধারে বর্ষণের পর বৃষ্টি একটু থামিয়াছে, কিন্তু গুমর কাটে নাই। মুহুর্মুহুঃ মেঘ-গর্জ্জন হইতেছিল। আকাশে যেন ক্রোধোন্মত্ত দৈত্যদলের ভীষণ লড়াই বাঁধিয়া গিয়াছে; তাহাদের ঘন-ঘন ভৈরব হুঙ্কারে মেদিনী প্রকম্পিত হইতেছে।

আজাদের কিন্তু সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সে তখন তাহার ব্যর্থ জীবনের অতীত ইতিহাস খুলিয়া বসিয়াছিল। ভাবনার অন্ত নাই। আজাদ এক মনে ভাবিতেছিল,—বিধাতা আমাকে কেন পৃথিবীতে পাঠাইলেন? যদি পাঠাইলেন, তবে কেন এমন হতভাগ্য করিয়া পাঠাইলেন? তিনি ত ইচ্ছা করিলেই এ-জীবনটাকে সফল-সুন্দর করিতে পারিতেন। আমি যে বুকভরা প্রেম লইয়া বহুকাল প্রতীক্ষা করিয়াছি; আর যে পারি না। নিষ্ঠুর উপেক্ষার আঘাতে হৃদয় শান্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। এ ভাঙ্গা হৃদয় আর জোড়া লাগিবে কি?

রমণীর প্রেম কি এতই দুর্ল্লভ? তবে এত নাটক, নভেলের সৃষ্টি হইল কিরূপে? এগুলি কি তবে মিথ্যা—নিছক কল্পনা? তাই বা বলি কিরূপে? আমার মত ত আর সকলেই হতভাগ্য নয়! আলমগীরের কি ভাগ্য! সার্থক জীবন তার!

আলমগীর আজাদের জনৈক বন্ধু। বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই মেহের ও আলম পরস্পরের প্রেমে পড়িয়াছিল। কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নহে।

আজাদের ভাবনা স্রোত বহিয়াই চলিল। হায় নারীর প্রেম! আমি যে তোমার শতাংশের একাংশ পাইলেও ধন্য হইয়া যাইতাম, জীবন-স্রোত আর-এক অভিনব পথে প্রবাহিত হইত। এই যে আমার জীবনটা ঊষর মরুতে পরিণত হইতে চলিয়াছে, কেহ কি ইহাকে বিহগ-কাকলী মুখরিত, কুসুম-সুবাস স্নিগ্ধ, ভ্রমর ঝঙ্কৃত উদ্যানে পরিণত করিতে পারিত না? আজ আমার জীবনে ধিক্কার জন্মিয়া গিয়াছে। জীবনটা নিরর্থক একটা ভার স্বরূপ বোধ হইতেছে। হায় রমণীর প্রেম! তোমাকে পাইলে আমিও হয় ত কীর্ত্তির তাজমহল গড়িতে পারিতাম! কিন্তু বিধির বিধান বোধ হয় অন্যরূপ। আমি ত বন্ধনেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তাহা ত হইলই না, অধিকন্তু বিধাতা সংসারের শেষ বাঁধনটাও কাটিয়া দিলেন।

মৃত্যুকালে মা যখন রুকুকে আমার হাতে দিয়া যান, তখন ভাবিয়াছিলাম—এ ভার বহিতে পারিব কি? কিন্তু এতদিন ত ভার বলিয়া বোধ হয় নাই। বরং সেই আমার জীবনের বোঝাটা নিজের ঘাড়ে তুলিয়া লইয়াছিল। বেশ চলিতেছিলাম, কে ভাবিয়াছিল যে, এত শীঘ্র অর্দ্ধপথে বোঝাটা আবার আমার ঘাড়ে ফেলিয়া দিয়া সে চলিয়া

যাইবে? এ বোঝা যে আমি আর একা বহিতে পারি না। ভ্রাতৃ-স্নেহের বারি-সিঞ্চনে রুক্ষ আমার জীবন-মরুটাকে কথঞ্চিৎ স্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। নিষ্ঠুর মৃত্যুর নিষ্ঠুর ঝঞ্ঝা আসিয়া তাহাও যে উড়াইয়া লইয়া গেল! হায় খোদা—

এমন সময়ে অদূরবর্ত্তী থানা হইতে ঘণ্টার আওয়াজ আসিয়া তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিল। আজাদ যেন বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিল। টেবিলের টাইম্-পিস্‌টার দিকে চাহিয়া দেখিল—রাত্রি 'বারোর কোঠা' পার হইতে চলিয়াছে।

বৃষ্টির জন্য সে দ্বার বন্ধ করিয়া বসিয়াছিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, প্রকৃতি সুপ্তির ক্রোড়ে নিমগ্ন। আকাশের প্রান্ত হইতে তখনও রণ-ক্লান্ত দৈত্যদের গোঙানির ন্যায় মেঘ-গর্জ্জন ভাসিয়া আসিতেছিল। অসুরদলের বিকট ভ্রূকুটির ন্যায়, অন্ধকারের বুক চিরিয়া থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুতালোক প্রকম্পিত হইয়া নয়ন ধাঁধিয়া দিতেছিল। ব্যথিতের অতি কষ্টে অশ্রু-দমনের ন্যায় প্রকৃতি যেন আপন আসন্ন বর্ষণটাকে রোধ করিয়া রাখিয়াছে। আর একটু আঘাত পাইলেই অঝর-ঝরে ঝরিয়া পড়িবে। নিকটবর্ত্তী কোনও ঝোপ হইতে বর্ষণ-প্রিয় একটি পাখী ডাকিয়া উঠিল—ডুব্—ডুব্—ডুব্—। তাহার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বিপরীত দিক্ হইতে আর একটি পাখী ডাকিল—ডুব্—ডুব্—ডুব্—। তাহাদের তীব্র কণ্ঠ আর নিবৃত্ত হইতে চায় না। পাখী দুইটি যেন পরস্পরকে পাল্লা দিবার জন্যই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া ডাকিতেছে—ডুব্—ডুব্—ডুব—।

আজাদ বিরক্ত হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল। কিন্তু নিদ্রাদেবী তখন সে তল্লাটেও নাই। চিন্তার জের চলিতে লাগিল। সে চীৎ হইয়া শুইয়া নানারূপ বিরুদ্ধ ভাবনা ভাবিতে লাগিল।

চিন্তার প্রকৃতিই এই—মনের কপাট খোলা পাইলে সে হু-হু করিয়া কেবল আসিতেই থাকে। আজাদের হইয়াছিল তাই। অনেকক্ষণ ভাবিয়া সে যখন কোন কূল-কিনারা পাইল না, তখন জোর করিয়া চিন্তার হাত হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত সচেষ্ট হইল। তখন অল্প অল্প শীত বোধ হইতেছিল, তাই আজাদ একখানা চাদর টানিয়া লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

(২)

কোন্ মুহূর্ত্তে যে আজাদের মাথায় খেয়াল চাপিয়া বসিয়াছিল—কোন রমণী তাহার প্রেমে পড়ুক—তাহা সে নিজেই বলিতে পারে না। সেই মুহূর্ত্ত হইতে আজ ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সে শুধু তাহারই প্রতীক্ষায় কাটাইয়াছে। নাটক-নভেল পড়িয়া এবং দুই-একটি বন্ধুর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় তাহার অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষাটি হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে মনে করিত, নারীর কাছে প্রেম যাচ্ঞা করিতে যাওয়া কাপুরুষতারই নামান্তর। পুরুষ যদি নিজের দিকে নারীকে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করিতে না পারিল, তবে তার জীবনই বৃথা। এমন বিড়ম্বিত জীবন লইয়া তাহার পুরুষ-সমাজে বাহির না হওয়াই ভাল। তাহার এ মনোভাবের পরিচয় পাইয়া বিধাতা বোধ হয় অদৃশ্যে থাকিয়া হাসিতেছিলেন। সে-কি জানিত—তাহার জীবনটা এমনই ব্যর্থ বিড়ম্বিত হইয়া যাইবে! বিধাতা এমনভাবে তাহার দর্প-চূর্ণ করিবেন!

দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষার পরও যখন আজাদ প্রার্থিত বস্তুর কোন সন্ধান পাইল না, তখন বিশ্বের সমগ্র নারী-জাতির প্রতিই তাহার মন অভিমানে গুমরিয়া উঠিল। রূপজ মোহও তখন হইতে তাহাকে কোন দিন বিচলিত করিতে পারে নাই। যখন সে তাহার মনে রূপজ মোহ-জনিত দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়াছে, তখনই অভিমানের কষাঘাতে মনকে 'সাবুদ' করিয়া লইয়াছে। পুরুষত্বের অতিরিক্ত মর্য্যাদা-বোধ এরূপ ক্ষেত্রে বরাবরই তাহাকে সাহায্য করিয়া আসিয়াছে।

আজাদ অল্প বয়সেই পিতৃহারা হয়। মাতা তাহার বিবাহ দিবার জন্য অনেক সাধ্য-সাধনা, কান্নাকাটি করিয়াছিলেন; কিন্তু আজাদ অটলভাবে মাতার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। অভাগিনী মাতাকে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়াই দুনিয়া ছাড়িতে হইয়াছে। কারণ আজাদ 'রোমান্স' বা বৈচিত্র্যহীন বিবাহের পক্ষপাতী ছিল না। বন্ধু-মহলে তর্কস্থলে সে বরাবরই বলিত—"গাছের গোড়ায় একটি লতা রোপণ করিলে লতাটি গাছকে জড়াইয়া ধরিবেই, এতে আর আশ্চর্য্য কি? বিবাহের পর স্ত্রী ত স্বামীকে ভালবাসিবেই, এতে স্বামীর বাহাদুরীটা কোথায়?"

সুতরাং সে এতদিন এহেন বৈচিত্র্যহীন বিবাহে বিমুখ থাকিয়া পুরুষত্বের তুঙ্গ-শৃঙ্গে বসিয়া অযাচিত নারী-প্রেমের প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, নিষ্ঠুর মদন আজ পর্য্যন্ত তাহার হইয়া কোন রমণীর মর্ম্মস্থলে প্রেমবাণ বর্ষণ করে নাই।

বাড়ীতে দুইটি মাত্র প্রাণী। রোকেয়ার মৃত্যুর পর আজাদ বুঝিতে পারিল,—দিন সুখেই যাউক আর দুঃখেই যাউক, পোড়া পেটের কাজ বন্ধ থাকে না। তখন সে একটি বাবুর্চি রাখিল। বাবুর্চি একাধারে পাচক, ভৃত্য সবই।

বাবুর্চি চা লইয়া আসিয়া দেখিল, আজাদ তখনও ঘুমাইতেছে। সে দ্বারে করাঘাত করিতেই আজাদ ধড়্ফড়্ করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল, এবং এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইতেছিল বলিয়া তাহার একটু লজ্জা বোধ হইল। সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিল।

বাবুর্চিকে চা আনিতে দেখিয়া বলিল,—"চা এখন রাখিয়া দাও, হাত-মুখ ধুইবার জল লইয়া এস।"

প্রাতঃকৃত্য এবং নামাজাদি সমাপন করিয়া সেদিন সে একটু বেলাতেই চা খাইল।

(৩)

সে বৎসর সে ম্যাট্রিকুলেশন দিবে। তাহার স্কুলের একজন মুসলমান শিক্ষকের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বর হইয়াছিল। হেড্‌মাষ্টারের আদেশে তাঁহার পরিচর্য্যার ভার পড়িয়াছিল আজাদ ও তাহার সহপাঠী খলিলের উপর। খলিল ছিল বড় ঘুমে কাতর। তাই আজাদ একাই সমস্ত রাত্রি জাগিয়া মাষ্টার সাহেবের সেবা করিত। তাহার সঙ্গে জাগিত আর একটি প্রাণী—সে দৌলত—আজাদের শিক্ষক-কন্যা। দৌলতের মাতা রুগ্নতা বশতঃ জাগিতে পারিতেন না। এই দুইটী কিশোর কিশোরীর সপ্তাহকাল ব্যাপী সেবা-যত্নে শিক্ষকটী আরোগ্য লাভ করিলেন।

শিক্ষক আবদুল লতিফ সাহেব বেশ উদার-ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি আজাদকে সচ্চরিত্র ও ভাল ছেলে বলিয়া জানিতেন,—এই কারণে কতকটা এবং কতকটা অনন্যোপায় হইয়াও ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কন্যা দৌলতন্নেছাকে আজাদের সম্মুখে বাহির হইতে দিতেন। প্রথম প্রথম উভয়ের বড়ই সঙ্কোচ বোধ হইয়াছিল। কেহ কাহারও দিকে চোখ তুলিয়া চাহিতে পারে নাই। কলের পুতুলের মত নিজ নিজ কাজ করিয়া যাইত। কাজ ফুরাইলে দৌলত আজাদকে একা রাখিয়াই ভিতরে চলিয়া যাইত। ক্রমে সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। দুই-একটি কথা হইতে হইতে শেষে আলাপটা বেশ জমিয়া উঠিল। দৌলত মাঝে মাঝে পান ও চা প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দিত। আজাদ দৌলতের এসকল হাতের দান পাইয়া প্রায়ই কর্ত্তব্য ভুলিয়া কল্পনার রমণীয় রাজ্যে বিচরণ করিত। ক্রমে এমন হইল—এ যেন সাত দিনের পরিচয় নয়—সাত বৎসরের।

কিন্তু দৌলত কি তাহার প্রেমে পড়িয়াছিল? তা'ত মনে হয় না। বিদায়কালে সে যখন বলিয়াছিল—"আজ বিদায়—আর ত দেখা হইবে না বোধ হয়।" দৌলতও তখন দিব্বি স্মিতমুখে বলিয়াছিল—"বড় কষ্ট করিলেন কিন্তু সমানে কয়টি রাত জাগিয়া। আপনি না থাকিলে আমাকে কি বিপদেই না পড়িতে হইত! মাঝে মাঝে আসেন যেন—" বলিয়াই পর্দ্দার অন্তরালে চলিয়া গিয়াছিল। প্রেমের লক্ষণ কি তাহাতে কিছু ছিল? কৈ মুখ মলিন, চোখ ছল্-ছল্ ইত্যাদি প্রেম-রোগের অনিবার্য্য লক্ষণগুলি ত মোটেই তাহার মধ্যে প্রকাশ পায় নাই। পান আর চা!—আরে দূর, এত যে-কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে গেলেই দেয়। বিশেষতঃ রাত্রি জাগিয়া তাহার পিতার সেবা করিতেছে নিঃস্বার্থভাবে—এই ভাবিয়া হয় ত একটু কৃতজ্ঞতা, একটু স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকিবে; এ নিছক কৃতজ্ঞতা—রমণীর চিরন্তন প্রেম নয়। সেরূপ হইলে লুকাইয়া ছোট ভাইটির মারফতে এক আধখানা চিঠিও অবশ্য লিখিত।

আজাদ অনেকদিন পর্য্যন্ত দৌলতের ছোট ভাই সিরাজের নিকট খুটিয়া-খুটিয়া দৌলত সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে। কিন্তু আশার কোনও লক্ষণ পায় নাই—হতাশই হইয়াছে। ইহার পর আর কোন দিন—রাগে কি অভিমানে ঠিক বলা যায় না,—আজাদ লতিফ সাহেবের বাড়ীর ছায়াও মাড়ায় নাই।

সকিনা আজাদের ফুফুত বোন রহিমার সই। রহিমাদের বাড়ী আজাদের বাড়ী হইতে বেশী দূরে নহে। সকিনা প্রায়ই সখির সহিত তাহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিত। সেই সূত্রে সকিনার সহিত আজাদের ঘনিষ্ঠতা ঘটে।

প্রথম প্রথম সকিনা আজাদের সম্মুখে বাহির হইত না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা টিকে নাই। এ বাড়ীতে আসিলেই অনিচ্ছা সত্বেও নিতান্ত অসতর্কভাবে সে আজাদের সম্মুখে পড়িয়া যাইত। ইহাতে দুইজনেই সসঙ্কোচে সরিয়া যাইত। ক্রমে ক্রমে এ সঙ্কোচটুকু দূর হইয়া যায়। আবার এমন হইয়াছে, হয় ত আজাদ মা ও বোনের সহিত বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছে, এমন সময়ে সকিনা আসিয়া উপস্থিত। সকিনা পলায়ন করিতে যায়, কিন্তু রহিমা সইএর অঞ্চল ধরিয়া টানিতে টানিতে ফিস্-ফিস্ করিয়া বলে—"ইস্ ভারি ত লজ্জা! আমার ভালমানুষ ভাইটী তোকে গিলিয়া খাইবে না সই! আয় সকলে মিলিয়া একটু গল্প করি।" ঘর হইতে তাহাদের অবস্থা অনুমান করিয়া আজাদের মা বলেন—"লজ্জা কি মা, আজাদ যে তোর ভাই। ভাইর সাম্নে ছোট বোনের লজ্জা কি! আজাদের কাছে রুহুও যেমন তুইও তেমন।" সকিনা আর পলায়ন করিতে পারে না। লজ্জায় লাল হইয়া জড়-সড় ভাবে সইএর পিছনদিকে আসিয়া বসে।

এইরূপে ঘন-ঘন যাতায়াতে ক্রমে-ক্রমে আজাদ ও সকিনার অবাধ মিলনে আর কোন সঙ্কোচ রহিল না।

একদিন রহিমা কয়েকটি সাজা পান আনিয়া আজাদকে দিল। আজাদ মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল,—রহিমা মৃদু মৃদু হাসিতেছে। সে একটি পান তুলিয়া মুখে পূরিতে পূরিতে বলিল—"কিরে রুহু হাস্‌ছিস্ যে বড়?"

"আচ্ছা এ কার সাজা পান বল দেখি?"

"কেন, তোর নয়?"

"না, সইএর—সই।—"

"সইএর, সকিনার? বেশ মোলায়েম পান ত। মুখে দিতে না দিতেই মিলাইয়া যায়। খুব ভাল সাজিতে পারে—না?" এই বলিয়া সে আর একটি পান মুখে পূরিল। রহিমা স্মিতহাস্যে বলিল,—"সইএর বলিতেই দেখি ভাই সাহেবের কাছে পান আচ্ছা রকম ভাল লাগিয়া গেল! প্রশংসা যে আর ধরে না! এই যে কি বলে—"

আজাদ বেশ সপ্রতিভভাবেই বলিল,—"এতে আর বলাবলি কি? আমার পক্ষপাতিত্বটা দেখিলে কোন্ খানে? যা ভাল তার প্রশংসা সকলেই করে। তা তোর সই যে রকম পান সাজে—তাতে তার একটি দাঁত-পড়া বর হইলেই মানাইবে ভাল। কি বলিস্?"—বলিয়া আজাদ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

সকিনা মেয়েটি ছিল বড় সরল। চৌদ্দটি বৎসর যদিও একে-একে তাহার গায়ে পরশ বুলাইয়া গিয়াছিল, তথাপি তাহার মনটা ছিল একেবারে কচি-শিশুর মত সরল, সকল আবিলতা বর্জ্জিত।

সকিনার হাব-ভাবে আজাদের মনে হইল—বুঝি বা তাহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাটি সফল হয়। সকিনা বোধ হয় তাহাকে ভালবাসে। এই যে আসিলেই পান সাজিয়া দেয় বিনা আহ্বানে—সে পান কত যত্ন, কত আগ্রহ মিশানো! তা'ত দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। তথাপি একটা সন্দেহ রহিয়া গেল। ঠিক ত? আর একটু দেখা যাক।

একদিন আজাদ তাহার শয্যায় শুইয়া শুইয়া নরেশ বাবুর 'বিপর্য্যয়' পড়িতেছিল। এমন সময়ে সকিনা পান লইয়া ঘরে ঢুকিল। পানদানখানা আজাদের শিয়রের দিকে টেবিলের উপর রাখিতেই—'আমার দুইটী হাতই জোড়া,—যদি একটি পান—হা—'বলিয়া আজাদ মস্ত এক হা করিয়া রহিল। সকিনা প্রথমতঃ একটু ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে আল্‌গা হাতে একটি পান আজাদের মুখে ছাড়িয়া দিল। আর যায় কোথায়, আজাদ জ্যা-মুক্ত ধনুর ন্যায় সোজা হইয়া বসিয়া সকিনার একখানি হাত ধরিয়া বলিয়া ফেলিল,—"সকিনা, তুমি আমাকে ভালবাসো?" তাহার মুখে একটা করুণ প্রার্থনার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। স্বরটা ততোধিক করুণ ও কম্পিত।

আজাদের ভাব দেখিয়া সকিনা প্রথমে থতমত খাইয়া গিয়াছিল। এবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিল, "হাঁ, ভালবাসি।"

আজাদের হৃদয়-তন্ত্রী দ্রুত-তালে বাজিয়া উঠিল। একি! কি শুনিলাম! এ সত্য না স্বপ্ন! হায় খোদা, এতদিনে বুঝি—হোক একটু কাল, রং চাই না—মন চাই। আর একটু দেখি, কি জানি—তবু সন্দেহ। এক মুহূর্ত্তে আজাদের মনে কত কথাই না খেলিয়া গেল।

ব্যগ্রতাপূর্ণ দৃষ্টিতে সকিনার মুখের দিকে চাহিয়া ধৃত হস্তে একটু চাপ দিয়া আজাদ বলিল,—"ভালবাসো,—আচ্ছা কি রকম ভালবাসো?" স্বর আবেগ কম্পিত।

এবার সকিনা হাসিতে হাসিতে হাত ছাড়াইয়া লইয়া

বলিল,—"আপনি ত আচ্ছা। ভালবাসা আবার কি রকম! সকলকে—সইকে, রুহুকে, মামি-মাকে যেমন—এক জায়গায় থাকিলে ভালবাসা কি আর হয় না?—আর আপনারা ত আমাদের পর নন্।" বলিতে বলিতে সে সইএর সন্ধানে বাহির হইয়া গেল।

ফুল ফোর্সের মোটরখানা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। তাল মান লয়ে যে গানটি গীত হইতেছিল; অর্দ্ধ-পথে বীণার সব কয়টি তার ছিঁড়িয়া গেল—ধপাস্ করিয়া আজাদ বিছানায় শুইয়া পড়িল।

সেই সকিনার বিবাহ হইয়াছে অপরের সঙ্গে। কোলে একটি ছেলে। দিব্যি আরামে আছে।

তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি সুদূর অতীতের অন্ধকারে প্রেরণ করিয়া আজাদ আবার নূতন করিয়া খুঁজিয়া দেখিল;—না—নাই—কোথাও রমনী প্রেমের এক গণ্ডুস জলও নাই। শুধু উষর মরুভূমি ধূ-ধূ করিতেছে। ও গুলা কি? এযে মরীচিকা! না, আর এগুলিতে ভ্রম হ'বে না।

এমন সময়ে পাচক-ভৃত্য আসিয়া বলিল,—"দশটা বাজে, আপনি গোছলে যান।"

'যাই—' বলিয়া আজাদ উঠিল।

(৪)

রমনী-প্রেমে আজ পর্য্যন্ত বঞ্চিত থাকিলেও আজাদ বন্ধু-প্রেমে বঞ্চিত ছিল না। যাহার সাহচর্য্যে আসিয়াছে, সেই তাহার অমায়িক ব্যবহারে তাহাকে অকৃত্রিম বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছে।

রফিক ছিল আজাদের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ। আজাদ ও রফিক পরস্পরের হৃদয়ের সঙ্গে পরিচিত ছিল। তাহাদের বন্ধনটা পড়িয়াছিল প্রাণে প্রাণে। তাই তাহাদের বন্ধুত্বটা ছিল অনন্ত-সাধারণ। রফিক বয়ঃকনিষ্ঠ এবং অবিবাহিত। দুই বন্ধুতে কথা হইতেছিল।—রফিক বলিল,—"তোমার কথা শুনিয়া বিবাহের জন্ত অনুরোধ করিতে সাহস হয় না। ঐ যে কথায় বলে—'হাতী, ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল।' মা বোনের চোখের জলে যে পাষাণ হৃদয় গলে নাই, তাকে বন্ধুত্বের চাপে নরম করিতে যাওয়া হাস্তকরই বটে।"

আজাদ গম্ভীরভাবে কি চিন্তা করিতেছিল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া রফিক বলিল,—"আচ্ছা এতদিন না হয় বিবাহ না করিলেও চলিয়া গিয়াছে; মা ছিলেন, বোন ছিলেন, কোন কিছু ভাবিবার দরকারও করে নাই। কিন্তু এখন তোমার বিবাহ না করিলে চলিবে কেমন করিয়া বল? ঘর সংসার আছে। তারপর পেটেও ত দুইটি দিতে হইবে সময় মত।"

আজাদ এবার ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল,—"তোমার মুখে একথাটি শুনিব বলিয়া আশা করি নাই রফিক! শুধু খাওয়া পরাটাই কি সংসারে একমাত্র কাম্য? ভাল খাইতে পাইলে, পরিতে পাইলেই কি হৃদয়ের সব দাবী চুকিয়া যায়? আর কি মানুষের চাহিবার মত কিছুই থাকে না? এবং থাকিলে সেটা কি এতই দুর্ল্লভ?"

কথাগুলি হৃদয়ের ব্যথার সরোবরে সিক্ত হইয়া বাহির হইতেছিল।

রফিকের হৃদয়ে বাজিল। কিন্তু সে আমল দিল না। বন্ধুর বর্ত্তমান উড়ু-উড়ু ভাব দেখিয়া সে ভয় পাইয়া গিয়াছে। টিয়াটির পায়ে স্বর্ণ শৃঙ্খল না পরাইলে কোন্ দিন বা দুই ডানা মেলিয়া বসে—অনন্ত নীল আকাশ লক্ষ্য করিয়া! রফিক কথাগুলি উড়াইয়া দিবার ভাবে বলিল,—"কি জানি ভাই—আমি বেচারা খাঁটী গদ্য মানুষ। আমি খাওয়া পরাটাই ভাল বুঝি। আকাশের দিকে দুই চোখ তুলিয়া দিন-রাত মানসী-টানসীর ধ্যান—এসব ভাই আমার মগজের ধার দিয়াও আসে না। আর 'মলয়-বাতাস' অপেক্ষা অন্ন-ব্যঞ্জনের দ্বারাই পেটটা আমার শীঘ্র পূর্ণ হয়। লক্ষ্মী-ছাড়ারাই হা-হুতাশ করিয়া মরে। আর যার ভাতের চিন্তা করিতে হয় না, সেই করে কবিতার চিন্তা।" বস্তুতঃ রফিকের এসব বালাই ছিল না।

এত বিপরীত-মুখী মনোবৃত্তির অধিকারী হইয়াও আজাদ ও রফিক ছিল পরস্পর প্রাণের বন্ধু। দুইটি বিপরীত শক্তিরই মিলন ঘটে—তড়িৎ বিজ্ঞানের এই তথ্যটা আজাদ ও রফিকের বন্ধুত্বে সুপরিস্ফুট হইয়াছিল।

আজাদ বলিল,—"তুমি বলিতেছ, দিন চলিবে কি করিয়া? দিন কি আর আমার মুখ চাহিয়া বসিয়া আছে? আগে যেমন চলিয়াছে, এখনও তেমনি চলিতেছে এবং ভবিষ্যতেও যে আট্‌কাইয়া থাকিবে আজ পর্য্যন্ত অন্ততঃ তাহার কোন প্রমাণ পাই নাই। সংসারের প্রকাণ্ড চক্রটী

অনন্তের পথে চলিতেছেই। তা'তে আমাদের মত দুই চারিটি প্রাণী যদি নিষ্পেষিত হইয়া যায়, তার হিসাব করে কে? বিধাতার জগৎ-শৃঙ্খলা অটুট থাকিবে—মহাপ্রলয় অবধি।"

রফিক কি উত্তর দিবে তাই ভাবিতেছে,—হঠাৎ আজাদ বলিয়া উঠিল,—"তুমি আমাকে বিবাহের জন্য তাগিদ দিতেছ, কিন্তু তোমার নিজের চর্কায় তেল দিবে কবে শুনি?" বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

রফিকও পরিহাসের স্বরে বলিল,—"বিবাহের ফুর্‌সুৎ পাইলাম কৈ বল? এতদিন ত গেল পরীক্ষা-সাগর পাড়ি দিতে দিতেই। এখন একটু বিশ্রাম করিয়া লই। এর পরেই কোমর বাঁধিয়া বিবাহ করিতে লাগিয়া যাইব আর কি? এখন একটু জিরাইয়া না লইলে এ জীবনে আর এ সুযোগ আসিবে না। বিবাহের পরেই ত ঘানি-গাছের বলদের মত লেজ-মোড়া খাইতে খাইতে সংসারের যোয়াল টানিয়া চলিতে হইবে।"

"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্—তুমি কার কাছে বিবাহের ব্যাখ্যা করিতেছ হে রফিক! এ তেঁতুল-তলায় আমের দর কেন?" বলিতে বলিতে তাহাদের বন্ধু সোলেমান ঘরে ঢুকিয়া একখানি চেয়ারে বসিল।

সোলেমান নব-বিবাহিত এবং একটু রসিক। বন্ধুরা তাহার গুরু-গম্ভীর নামটি লইয়া সর্ব্বদা নাড়া-চাড়া না করিয়া তাহাকে 'রসিক' বলিয়া ডাকিত।

সোলেমানের বরাবরের ইচ্ছা ছিল—সে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া একটি শিক্ষিতা, সুন্দরী—যাকে বলে 'আপটু ডেট্'—মেয়ে বিবাহ করিয়া জীবনটা সার্থক করিবে। বিধাতা কিন্তু তাহার সে ইচ্ছায় বাধ সাধিলেন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে না দিতেই তাহার পিতা মারা যান। সুতরাং সব উচ্চ শিক্ষার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া সে পিতার পরিত্যক্ত সংসারের বোঝাটি নিজের ঘাড়ে তুলিয়া লইতে বাধ্য হয়।

সোলেমান চেয়ারে বসিয়া চকিতে বন্ধুদ্বয়ের মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইল, তারপর সহাস্যে বলিল,—"তা আদার বেপারীদের জাহাজের খবর কেন? তোমাদের এ অনধিকার চর্চ্চায় আমাদের বিবাহিতদের মান-হানি হয় জান?" বলিয়া সে একটু গম্ভীর ভাবের অভিনয় করিল, আজাদ ও রফিক উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

হাসিতে হাসিতে আজাদ বলিল,—"ইনি আমাকে বিবাহের তালিম দিতেছেন, আর নিজেরটি এখনো—কোন্ তটিনীর কোন কূলে সে, কোন কাননের মাঝখানে—"

"বাহ্‌বা—কেয়াবাৎ"—সোলেমান চেয়ারের হাতল চাপ্‌ড়াইয়া সরস ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিল—"মূর্ত্তিমান কবিতা সুন্দরীর আবির্ভাব—"

আবার হাসির তরঙ্গ উঠিল। রফিক হাসির বেগ সংবরণের বৃথা প্রয়াস পাইতে পাইতে বলিল,—"বিবাহ ত করিয়াছ দাদা, কিন্তু লিঙ্গ-জ্ঞানটি এখনো জন্মে নাই—মূর্ত্তিমান নয় মূর্ত্তিমতী।"

সোলেমান বেশ সপ্রতিভভাবে হতাশের ভঙ্গীতে বলিল,—"দিল সব মাটী করিয়া। এ কাব্যালোচনার মাঝখানে ব্যাকরণের আমদানি কেন? তুই আস্তা একটা অরসিক।"

তারপরে প্রকৃতই একটু গম্ভীরভাবে সোলেমান বলিল,—"বিবাহ ত করিবে নিশ্চয়ই, কিন্তু দেখিও, আমার মত ভুলটা যেন না কর। তাহা হইলে জীবনের সব 'আইডিয়া' মাটী হইবে।"

কথার অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া আজাদ ও রফিক সোলেমানের মুখের প্রতি জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সোলেমান বলিতে লাগিল,—"ছাত্র-জীবনে বড় বড় সুখের রঙ্গিন ছবিগুলি কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। শিক্ষিত পুরুষের পক্ষে অশিক্ষিতা স্ত্রী গ্রহণ যেন বিধাতার অভিশাপ!"

সোলেমানের বিবাহিত জীবন আজাদের জানা ছিল। আজাদ সহানুভূতির স্বরে বলিল,—"স্ত্রীর শিক্ষার ভারটা—তুমিই কেন নেও না এখন। বেশ নিজের মত গড়িয়া তুলিবে।"

উদাস কণ্ঠে সোলেমান উত্তর করিল,—"এরূপ পরামর্শ বাহির হইতে দেওয়া যায় ভাল। প্রকৃত রূপ ভুক্তভোগীই ভাল বুঝে।"

রফিক বলিল,—"স্ত্রীর উপর তোমার রাগটা তাহা হইলে খুব—"

বাধা দিয়া সোলেমান বলিল,—"রাগ—রাগ করিব কাহার উপর? সে বেচারীর দোষ কি? যে যাহা শিক্ষা পায় নাই, তাহার কাছে তাহা পাইতে যাওয়া বাতুলতারই নামান্তর। রাগ যদি কিছু করিতে হয়, তবে বর্ত্তমান

সমাজের উপরই করা উচিত। সমাজ স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে মেয়েরা শিখিবে কোথায়? আমি আমার স্ত্রীর দোষ দেই না। সব দোষ অদৃষ্টের ঘাড়ে চাপাইয়া ইহাকে নিয়াই সুখী হইবার চেষ্টা করিতেছি।"

সোলেমানের এ গুরু-গম্ভীর বক্তৃতা রফিকের ভাল লাগিতেছিল না। সে তাহার পূর্ব্ব প্রফুল্লতা ফিরাইয়া আনিবার জন্য বলিল,—"তোমার নাম রসিক, তোমার রসে ডুবিলে মাটীর ঢেলাও যে রসগোল্লা বনিয়া যায়।"

রফিকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল না। সোলেমান সরস কণ্ঠে বলিল,—"এই খানেই ত যত মুস্কিল। আমি চাই একটু রঙ্গ-রস, মান-অভিমান করিতে। তা সে বেচারী আমার ভাষাই বোঝে না।"

আজাদ সুযোগ পাইয়া বলিল,—"তোমার স্ত্রী কি বাঙ্গালীর মেয়ে নন?"

"বাঙ্গালী হইলে কি হইবে দাদা! শোন না,—ভালবাসা আর অভিমান এই দুইটি এক সঙ্গে না চলিলে প্রেমের খেলাই যে মাৎ, তা অবশ্য বুঝিতেই পার। কি বলিব আমার তিনি ত এই দুইটি কথার মানেই বুঝেন না। নিরুপায় হইয়া প্রতিশব্দ খুঁজিতে লাগিলাম—অবশেষে শব্দ-সাগর মন্থন পূর্ব্বক, ভালবাসার অর্থ করিলাম 'মায়া' আর অভিমানের অর্থ দিলাম 'রাগ'; আচ্ছা বলত, 'মায়া' আর 'রাগ' দ্বারা হৃদয়ের প্রকৃত ভাব প্রকাশ পাইল কি? প্রথমটি হইয়া পড়িল একেবারে পাত্‌লা—জলবৎ তরলম্, আর দ্বিতীয়টি হইয়া গেল দুর্ব্বাসার অবতার। প্রেমের অভিধানে এই দুইটি শব্দই অচল। কি করিব নিরুপায়! এই বংশদণ্ড দিয়াই বাহিয়া আমাকে প্রেমের তরণি পারাপার করিতে হইবে জীবন ভর।"

রফিক বলিল,—"তা আমাদের সমাজে শিক্ষিতা পাত্রীর যেমন দুর্ভিক্ষ, তাহাতে কয়জনের মনের বাসনা বাস্তবে পরিণত হইতে পারে বল? উচ্চ শিক্ষিতা পাত্রী ত নাই-ই। সামান্য লেখা-পড়া জানা মেয়েও—'ডুমুরের ফুল'। ভাগ্য নেহাৎ সুপ্রসন্ন হইলে কোথাও মিলিলে মিলিতে পারে। সকল শিক্ষিত বরের প্রার্থনা পূর্ণ হইতে পারে, বর্ত্তমান সমাজের ততদূর উন্নত অবস্থা হইয়া উঠে নাই।"

সোলেমান বলিল,—"মেয়ে ত আর চিরকাল মা-বাপের ঘরে বসিয়া থাকিবে না। স্বামীর ঘরে তাহাকে একদিন যাইতেই হইবে। ইহা যখন দিবালোকের মত সত্য, তখন স্বামীর পরিবারে বিশেষতঃ স্বামীর সহিত কি-ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ—কথঞ্চিৎই বা বলি কেন, যতদূর সম্ভব শিক্ষা মেয়েদের পিত্রালয়েই পাওয়া আমি খুবই উচিত মনে করি।"

ততক্ষণে প্রত্যেকেরই উদর-গহ্বরে ক্ষুধা-রাক্ষসী আবির্ভূত হইয়া নিজের দাবী ঘোষণা করিতেছিল। এ দাবী উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। সুতরাং তিন জনেই উঠিয়া পড়িল।

(৩)

আজাদ রফিকের পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বেই ছাত্র-জীবনে দাঁড়ি চিহ্ন দিয়া ঘরে আসিয়া বসিয়াছিল। রফিক বি, এস, সি, পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছে—ফল এখনও জানা যায় নাই। তাহার শিক্ষা এখানেই খতম হইবে কিনা—তাহা এখনো অমীমাংসিত রহিয়াছে। ফল বাহির হইলে যাহা হয় একদিক হইবে। তবে রফিকের একান্ত ইচ্ছা সে ডাক্তারী পড়ে।

রফিক ইতঃপূর্ব্বে আরো কয়েকবার আজাদকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু আজাদ তাহা আমলে আনে নাই। কখন হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, কখন বা গম্ভীরভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

সেদিন রফিক একপ্রকার মন স্থির করিয়াই গিয়াছিল যে, যেরূপেই হউক আজাদকে বিবাহে সম্মত করিয়া ফিরিবে। কিন্তু সোলেমান আসিয়া পড়ায়, আলোচনায় স্রোত ভিন্নমুখী হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া সে তাহার বাসনা কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ পায় নাই। বিশেষতঃ সে একটু নির্জ্জনতা চায়। সোলেমান তাহাদের বন্ধু হইলেও সে আজাদের অন্তরের নিগূঢ় বেদনাটি জানিত না। সুতরাং রফিক সেদিন আর এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নাই। সে যদি একান্ত চাপিয়া ধরে, তাহা হইলে আজাদ কিছুতেই তাহার কথা ফেলিতে পারিবে না—এ ভরসাটুকু রফিকের বরাবরই আছে।

রফিক বুঝিতে পারিয়াছে, বন্ধুকে এ খেয়ালের হাত হইতে উদ্ধার করিতে না পারিলে জীবনটা সে মাটী করিয়াই দিবে। সে আরো মনে করিয়াছে, জোর করিয়া

কোন প্রকারে একটি শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রীর সহিত বন্ধুর বিবাহ ঘটাইতে পারিলেই দুইদিন পরে তাহার এ খেয়াল আর থাকিবে না। শিক্ষিতা স্ত্রীর ভালবাসার প্রলেপে যখন হৃদয়ের ক্ষতটি শুকাইয়া যাইবে, তখন নিশ্চয়ই সে নবজীবন লাভ করিয়া সুখী হইতে পারিবে।

রফিক সকালের চা পান শেষ করিয়া তাহার শয্যায় শুইয়া শুইয়া 'আওরঙ্গজেবের জীবনী' খানি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু কখন যে তাহার মন মোগল বাদশাহের জীবনী ছাড়িয়া বন্ধুর জীবনী আলোচনায় মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সে নিজেই লক্ষ্য করে নাই। পুস্তকখানি তখনও তাহার বুকের উপর বিরাজ করিতেছিল।

"বুবুজান আপনাকে খাইতে ডাকিয়াছেন"—বলিয়া জমিলা হঠাৎ সেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। রফিক চাহিয়া দেখিল, সে একখানা চেয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বুঝিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই জমিলা এই কথাগুলি বলিল।

রফিক উঠিয়া বসিতে বসিতে বলিল,—"তুমি কখন আসিলে জমিলা?"

"এই কতক্ষণ হইল আসিয়াছি। আপনি ত আমাদের ওখানে যাওয়া ছাড়িয়াই দিয়াছেন। এইত কয়দিন হইল আসিয়াছেন,—একটিবারও ত গেলেন না। তাই মনে করিলাম, আমিই না হয় একবার আসি গিয়া।"

রফিক সস্মিত মুখে বলিল,—"ভাল ত?"

"ভাল না হইলে কি আর আসিতে পারি। আপনার খাওয়ার ডাক পড়িয়াছে।"

জমিলা রফিকের বড় ভাই শফিকের স্ত্রীর ছোট বোন। শফিকের শ্বশুরালয় তাহাদের একই পাড়ায়। শ্বশুর-পরিবারের সহিত তাহাদের পূর্ব্বাবধিই আত্মীয়তা ছিল। শফিকের চাচি-মাই আগ্রহ করিয়া নিজের বোন-ঝিকে শফিকের সহিত বিবাহ দিয়া আনিয়াছিলেন।

শফিকের শ্বশুর ইব্রাহিম সাহেব গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। মেয়েদের আগ্রহ দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে নিজেই লেখা-পড়া শিখাইতে আরম্ভ করেন। বড় মেয়েটি বয়স্কা হইয়া পড়ায় তাহাকে বাড়ীতে শিখাইতেন। কিন্তু ছোট মেয়ে জমিলার আগ্রহাতিশয্য এবং সর্ব্বোপরি তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, এই মেয়েটিকে তিনি একটু উচ্চ-শিক্ষা দিবেন। কিন্তু তাঁহার বাসনা পূর্ণ হয় নাই। জমিলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই ইব্রাহিম সাহেবের প্রতি আজরাইলের ডাক পড়িল। সুতরাং জমিলার লেখা-পড়া সেইখানেই খতম হয়। তবে জমিলা অন্যান্য পাড়াগেঁয়ে মেয়েদের ন্যায় নিজের অর্জ্জিত বিদ্যাটুকু হাঁড়ি-বাসনের তলায় চাপা না দিয়া, সুযোগ মত নিজে নিজে কিছু কিছু আলোচনা করিত।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া রফিক আসিয়া বিছানায় শুইল। চোখ দুইটি জড়াইয়া আসিতেই কিসের শব্দে রফিক চাহিয়া দেখিল,—তাহার আট মাস বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে বাঁ কাঁখে করিয়া এবং ডান হাতে পানদান লইয়া জমিলা ঘরে ঢুকিয়াছে।

জমিলা রফিককে ঘুমন্ত মনে করিয়া পানদানখানি টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া যাইবে মনে করিয়াছিল। কিন্তু খোকার অবোধ্য-ভাষার শব্দে রফিককে চাহিতে দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিল,—"আপনার ঘুমটা নষ্ট করিয়া দিলাম?"

রফিক একটি পান লইতে লইতে বলিল,—"আমি ত ঘুমাই নাই। আর দিবা-নিদ্রাটা যদি বা এক-আধ দিন নষ্ট হইয়াই যায়, তার জন্য কোন ক্ষতি হইল বলিয়া আমি মনে করি না। আচ্ছা তোমার 'আনোয়ারা' শেষ হইয়াছে?"

"আনোয়ারা কবে শেষ হইয়াছে, কিন্তু আর কিছু না পাইয়া উহাই আবার পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি।"

"কেমন লাগিল?"

"বেশ বই, আমার খুব ভাল লাগিয়াছে। আপনার কাছে আর কিছু থাকে ত দিবেন।"

"আমার কাছে তোমার অপঠিত আর ত কিছু নাই। আচ্ছা বিকালে খোঁজ করিও। আজ ত এখানেই আছ?"

"না, আম্মাজানকে বলিয়া আসি নাই। কাল সুমুকে পাঠাইব।"

খোকা ইতঃপূর্ব্বেই চাচার কোল অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। তাহা এখন অপছন্দ হওয়ায় আবার জমিলার দিকে হস্ত প্রসারণ করিল। জমিলা তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া মুখে চুমো খাইতে খাইতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

—ক্রমশঃ

জগতের ঐতিহাসিক হীরক *

— প্রবন্ধ —

—অসিত মুখোপাধ্যায়

হীরকের সাধারণ ইতিহাস

জগতের ঐতিহাসিক হীরক কয়খানির বিষয়ে বিস্তৃতভাবে কিছু বলিতে হইলে প্রসঙ্গতঃ হীরকের এবং হীরক-খনির মোটামুটি একটু ইতিহাস না দিলে চলে না। তাই প্রথমে হীরকের এবং হীরক-খনির সম্বন্ধে কিছু বলিয়া আমার বক্তব্য বলিতে চেষ্টা করিব।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষই ছিল হীরকের একমাত্র জন্মস্থান। শুধু একদিন দুইদিন নয়, শতাব্দীর পর শতাব্দী পৃথিবীর বাজারের সমস্ত হীরক একা ভারতবর্ষই আমদানি করিত। বিখ্যাত পরিব্রাজক ট্রাভারনিয়ার বলেন,—"আমি মূল্যবান পাথর ক্রয় করিবার জন্য ১৬৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছয়বার ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছি। তৎকালে হীরক-খনির কার্য্যই ছিল এদেশের শ্রমিকদের প্রধান জীবনোপায়, এবং হীরকের ক্রয়-বিক্রয়ই ছিল এদেশের সওদাগরদের প্রধান ব্যবসায়।" ট্রাভারনিয়ারএর বিবরণে হীরক-উৎপাদনকারী দেশ বলিয়া

সিটি-হল—কিম্বার্লি

বোর্ণিয়ো দ্বীপেরও নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ভারতের সহিত তুলনায় বোর্ণিয়োকে তিনি অতি নগণ্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন,—যে হীরকের ভিতর হইতে ঈষৎ নীলাভ শুভ্র আভা প্রতিফলিত হয়, তাহাই প্রথম শ্রেণীর হীরক। এইদিক্ দিয়া বিচার করিলে ভারতজাত হীরকগুলিকেই প্রথম স্থান দিতে হয়; কারণ একমাত্র ভারতের

* এই প্রবন্ধের কতকটা উপাদান এবং অধিকাংশ ব্লক কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মণিকার মেসার্স ঠাকুরলাল হীরালাল কোম্পানীর সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে। আমি "মোহাম্মদী"র পক্ষ হইতে এই সৌজন্যের জন্য উক্ত কোম্পানীর স্বত্বাধিকারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

হীরকই এই গুণের অধিকারী। এই গুণের জন্যই পৃথিবীর বাজারে আজও অন্যান্য দেশের হীরক অপেক্ষা ভারতজাত হীরকের চাহিদা ও মূল্য অনেক বেশী। এই জাতীয় হীরকের সাধারণ নাম "গোলকুণ্ডা হীরক"। এককালে ভারতের হীরক-উৎপাদনকারী দেশসমূহের মধ্যে গোলকুণ্ডা ছিল অন্যতম। গোলকুণ্ডা খনিতে এই জাতীয় হীরক উৎপন্ন হইত বলিয়াই বোধ হয় লোকে এগুলিকে "গোলকুণ্ডা-হীরক" বলে। দক্ষিণ আফ্রিকার কোন কোন খনির হীরক "গোলকুণ্ডা-হীরকের" অনুরূপ। তবে বিশেষজ্ঞেরা এই নিকৃষ্টতার একমাত্র হেতু; কারণ পুরাতন খনির উৎপন্ন হীরক নূতন খনির উৎপন্ন হীরক অপেক্ষা গুণে অপকৃষ্ট হয়। ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে ভারতের খনিতে প্রচুর পরিমাণে হীরক পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর হইতেই অধিকাংশ খনি একবারে বন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

১৭২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ব্রাজিলের হীরক ভারতের হীরক অপেক্ষা গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হয়। আফ্রিকার হীরক-খনি আবিষ্কার হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একা ব্রাজিলই পৃথিবীর বাজারের প্রায় সমস্ত
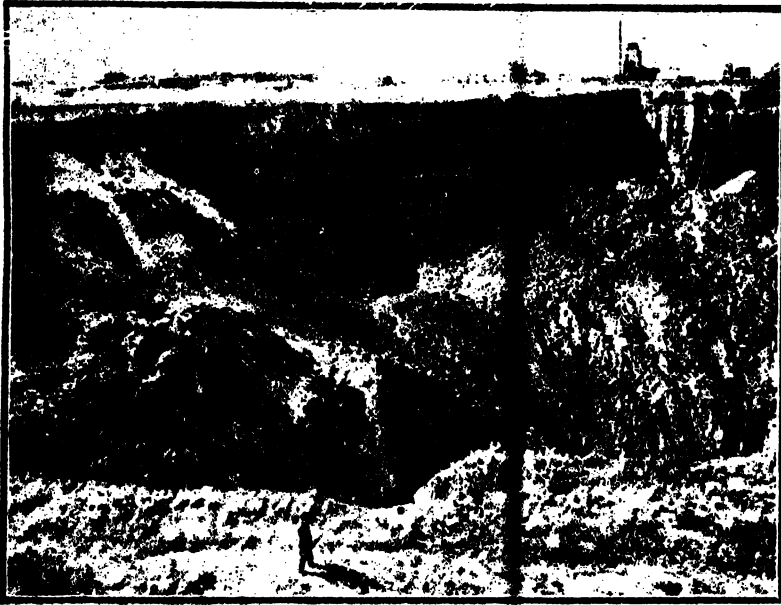
ওয়েসেল্টন হীরক-খনি

এই দুইয়ের বিভিন্নতা অতি সহজেই ধরিতে পারেন। ইউরোপের রাজন্যবর্গের মুকুট শোভিত ঐতিহাসিক হীরকগুলির অধিকাংশই ভারতের খনি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

বর্ত্তমানে ভারতে হীরক-খনির সংখ্যা বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। এই সকল খনি হইতে যে-পরিমাণ হীরক উৎপন্ন হয়, তাহা প্রাচীন ভারতের উৎপন্ন হীরকের তুলনায় অতি নগণ্য। দক্ষিণ আফ্রিকার হীরক-বিশেষজ্ঞেরা বলেন,—ভারতে বর্ত্তমানে যে-সব হীরক উৎপন্ন হয়, তাহা অতি সাধারণ শ্রেণীর; দক্ষিণ আফ্রিকার উৎপন্ন হীরকের সহিত গুণের প্রতিযোগিতায় এগুলি বাজারে দাঁড়াইতেই পারিতেছে না। খনির প্রাচীনতাই হীরকের হীরক সরবরাহ করিত। বর্ত্তমানে ব্রাজিলের হীরক পৃথিবীর বাজারে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। নিউ সাউথ ওয়েল্‌সএ এবং আমেরিকাতেও বর্ত্তমানে সামান্য পরিমাণ হীরক উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু প্রধানতঃ পৃথিবীর বিরাট চাহিদা পূরণ করিতেছে একা দক্ষিণ আফ্রিকা। দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল এবং কিম্বার্লির হীরক-খনিই সম্প্রতি পৃথিবীতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিকাংশ হীরক-খনি বুয়র যুদ্ধাবসানে ইংরাজদের হস্তগত হইয়াছে। পৃথিবীর যেখানে ধন-রত্ন সেখানেই ইংরাজ আর সেখানেই উৎকর্ষ! একটা বিরাট জাতি বটে!

জার্ম্মাণ দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাতেও বর্ত্তমানে প্রচুর

পরিমাণে হীরক উৎপন্ন হইতেছে। তবে এগুলি বিশেষ উচ্চ স্তরের হীরক নহে; কাজেই দামও অনেক কম। জার্মাণীতে প্রস্তুত সব জিনিষেরই দাম কম। হীরকের বেলায়ও এ নীতি সুন্দরভাবেই খাটিয়া গিয়াছে। দুই
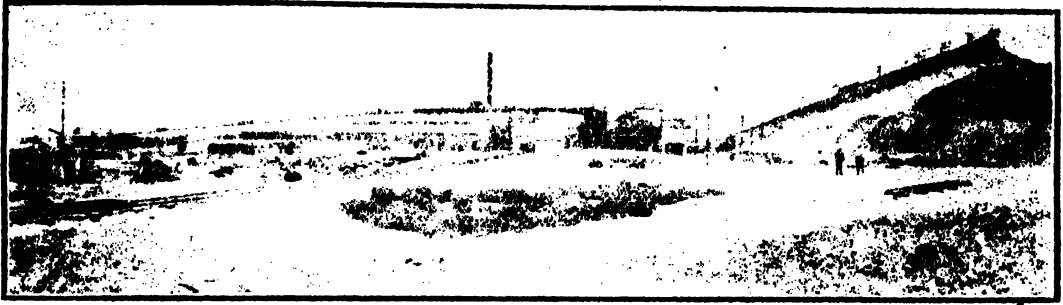
হীরক-খনির সাধারণ দৃশ্য

কারণে হীরকের মূল্য বৃদ্ধি হয়; প্রথম কারণ উচ্চ শ্রেণী, দ্বিতীয় কারণ উৎকৃষ্ট কাটিং। নিম্ন শ্রেণীর হীরকও কাটিং এর গুণে অনেক সময়ে উচ্চশ্রেণীর হীরক অপেক্ষা বেশী দরে বিক্রয় হইয়া থাকে।

ট্রান্সভালের সমস্ত খানিতেই প্রথম শ্রেণীর হীরক

করণার হাউস—ডায়মণ্ড বিল্ডিং

উৎপন্ন হইতেছে। নিম্নে ক্ষুদ্র একটি বিবরণ দিয়া পাঠকগণকে ট্রান্সভালে উৎপন্ন হীরকের মূল্যের একটু আভাস দিতেছি :—

ডিউটয়ট্ (Dutoit) ও বোথা (Botha) নামক কপর্দ্দকহীন দুই ব্যক্তি ক্রমান্বয় কয়েক মাস যাবৎ পশ্চিম ট্রান্সভালের লিক্‌টেন্‌বার্গ প্রদেশের হীরক-ক্ষেত্র খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু তাহাদের ভাগ্যে এক-কণা হীরকও মিলিল না। একদিন বৈকালে তাহারা পকেটে হাত দিয়া দেখিল, মাত্র ৯টী পেনি রহিয়াছে। তাহারা ইহা হইতে তাহাদের নিজের ও আট জন আশ্রিতের জন্য ৬ পেন্সের শস্য-চূর্ণ ও ৩ পেন্সের মাংস কিনিল। হাতে আর কিছুই রহিল না। তারপর তাহারা আবার অবিচলিত উদ্যম সহকারে হীরক-খনি খুঁড়িতে প্রবৃত্ত হইল। এতদিন পরে বিধাতা প্রসন্ন হইলেন। খনি খুঁড়িতে খুঁড়িতে তাহারা ২০০ ক্যারেট (প্রায় দেড় আউন্স) ওজনের একখণ্ড হীরক পাইয়া তখনই ইহা ৩০ হাজার পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিল। বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন যে, এই

হীরক-খণ্ডের মূল্য ৬০ হাজার পাউণ্ড হইতে পারে। কেবল ওজন ধরিয়া হীরার মূল্য নির্ণীত হয় না। ব্রিটিশ-সম্রাটের রাজমুকুটশোভী কোহিনুরের ওজন ১০৬ ক্যারেট, তার দাম ৪ লক্ষ পাউণ্ড। হোপ নামক একটা হীরকখণ্ডের ওজন ৪৪ ক্যারেট, তার মূল্য ৩০ হাজার পাউণ্ড। ষ্টার অব্ দি সাউথ নামক হীরার ওজন ১২৫ ক্যারেট, তার মূল্য ১৮ হাজার পাউণ্ড। ক্যালিন্যান (Cullinan) নামক হীরাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার মূল্য ৫ লক্ষ পাউণ্ড হইবে। রাণী মেরী রাজকীয় উৎসবাদি উপলক্ষে ইহা পরিয়া থাকেন। প্রবন্ধের শেষভাগে এই ঐতিহাসিক হীরকগুলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইবে।

কিম্বার্লি প্রদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে হীরক-খনি আছে। এখানকার চাষীরা জমি চাষ করিবার সময়েও মাঝে মাঝে লক্ষ লক্ষ টাকার হীরক পাইয়া থাকে। হীরক-খনির কার্য্য কতকটা কয়লার খনির কার্য্যেরই অনুরূপ। বৃহদাকার লিফ্‌টের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ কর্দ্দমাক্ত হীরক উপরে তোলা হয় এবং সংশোধিত হইবার জন্য উহা বিভিন্ন কারখানায় প্রেরিত হয়। এ অঞ্চলে ওয়েসেল্‌টন হীরক-খনি হইতেই বর্ত্তমানে অধিকতর পরিমাণে হীরক উৎপন্ন হইতেছে।

এক-একটি খাদে দুই হাজার আড়াই হাজার শ্রমিক ঠিক কলের পুতুলের মত কার্য্য করিয়া যায়। সোণা, রূপা, কয়লা প্রভৃতি খাতের গভীরতা হইতে হীরক-খাতের গভীরতা সাধারণতঃ অনেক বেশী। খনির ভিতরে বার শত ফিট হইতে তিন হাজার ফিট নিম্ন পর্য্যন্ত হীরকের সন্ধান পাওয়া যায়। অন্যান্য মূল্যবান ধাতুর খনিতে যেমন কড়া পাহারার ব্যবস্থা আছে, হীরক-খনিতে সেরূপ কোন

এন্টোয়ার্পের হীরক কাটাইয়ের কারখানা—বামদিক হইতে দণ্ডায়মান তৃতীয় ব্যক্তি মেসার্স ঠাকুরলাল হীরালাল কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী।

ব্যবস্থা নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রমিকগণ খুব বিশ্বাসী এবং তাহারা প্রচুর পরিমাণে বেতনও পাইয়া থাকে। ইহাই বোধ হয় কড়া পাহারা আবশ্যক না হওয়ার প্রধান কারণ।

প্রথমে ডিনামাইটের সাহায্যে খাতের ভিতরের জমাট-বাঁধা হীরক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলা হয়। তারপর গ্রাইণ্ডিং রুমে কুলির সাহায্যে সেগুলি গুঁড়াইয়া কাচ বা অন্য কোন দ্রব্য হইতে বাছাই করিয়া হীরক বাহির করা হয়। হীরক বাছাই হওয়ার পর ওয়াশিং রুমের কার্য্য আরম্ভ হয়। এখানে বড় বড় কড়ায়ে সেগুলি জ্বাল দেওয়া হয়। কড়ায়ে

যে ভীষণ উত্তাপ দেওয়া হয়, তাহাতে অন্যান্য সমস্ত পদার্থ গলিয়া যাইয়া একমাত্র হীরকই চর্ব্বির গায়ে কাচ-খণ্ডের ন্যায় লাগিয়া থাকে। জগতের সমস্ত পদার্থ অপেক্ষা হীরক অধিকতর কঠিন, তাই এই ভীষণ উত্তাপ পাইয়াও উহা গলিয়া যায় না। ষ্টীমারের কিংবা রেলের ইঞ্জিনে যেমন ভাবে কয়লা দেওয়া হয়, কুলিরা সেই ভাবে চেপ্টা কোদালিতে করিয়া অপরিস্কৃত হীরকগুলি এই উত্তপ্ত কড়ায়ে নিক্ষেপ করে।

গভর্ণমেণ্টের লাইসেন্স ব্যতীত এক টুক্‌রা হীরকও কাটাই কিংবা পালিশ করিবার অধিকার কেহর নাই; কাজে কাজেই এখানে পাহারার কোন কড়াকড়ি ব্যবস্থা না থাকিলেও বিশেষ কিছু আসে যায় না।

এণ্টোয়ার্পের হীরক কাটাইয়ের এবং পালিশের কারখানা জগদ্বিখ্যাত। দক্ষিণ আফ্রিকার অর্দ্ধেক এবং পৃথিবীর বাজারের প্রায় বারোআনা হীরক এই সব কারখানায় কাটাই করা এবং পালিশ করা হয়। অনুন্নত

প্রিমিয়ার হীরক-খনি

এই সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ হইয়া যাওয়ার পর পরিস্কৃত হীরকগুলি "করনার হাউস" নামক হীরক-ভাণ্ডারে আনীত হয়। এইখানে দুইটী মহামূল্য হীরক আছে, উহার মূল্য এখনও নির্ণীত হয় নাই। কালে কালে বোধ হয়, এই হীরকখণ্ড দুইটাই জগতের শ্রেষ্ঠ হীরক বলিয়া পরিগণিত হইবে। কত কোটি টাকা যে ইহার মূল্য স্থিরীকৃত হইবে এবং কোন্ ভাগ্যবান পুরুষ যে ইহা খরিদ করিবেন, তাহা কে বলিতে পারে! এখানেও পাহারার কোন কড়াকড়ি ব্যবস্থা নাই। হীরকগুলি কাটিয়া পালিশ না করিলে ইহার দাম বিশেষ কিছুই নহে, এবং

শ্রেণীর হীরককেও এণ্টোয়ার্পের কারিকররা কাটাই গুণে উন্নত শ্রেণীর হীরকে পরিণত করিতে পারেন। হীরক-কাটাইয়ের ভিতরে এমনই আর্ট আছে যে, এক জাতীয় দুইখানি হীরক দুই কারখানায় কাটাই হইলে কাটাইয়ের দোষ-গুণের জন্য দুইখানার ভিতরে মূল্যের প্রভেদ লক্ষাধিক টাকাও হইতে পারে।

ঐতিহাসিক হীরকের কথা

১। কোহিনুর—ইহা জগদ্বিখ্যাত ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ একখানি হীরক। এই সুবৃহৎ সমুজ্জ্বল হীরকখানি

কতকাল হইল পাওয়া গিয়াছে, তাহা সঠিক জানিবার কোন উপায় নাই। অতি প্রাচীন কালে ইহা মালবের হিন্দুরাজাদের অধিকারে ছিল। আলাউদ্দীন খিলিজি মালবের অধীশ্বর হইলে, এই হীরকখানিও তাঁহার অধিকারে যায়। তৎপরে কোনক্রমে ইহা গোয়ালিয়রের রাজার হস্তগত হয়। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট বাবর তাহার নিকট হইতে ইহা প্রাপ্ত হন। তদবধি ইহা মোগল সম্রাটগণের অধিকারেই ছিল। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সিংহের আশ্রয় লন, সেই সময়ে রণজিৎ তাঁহার নিকট হইতে ইহা গ্রহণ করিয়া বিনিময়ে তাঁহার ভরণ-পোষণের জন্য সুবিস্তৃত জায়গীর প্রদান করেন। রণজিতের মৃত্যুর পর এই মহারত্ন তদীয় মহিষী মহারাণী ঝিন্দন ও নাবালক পুত্র দলিপ সিংহের অধিকারভুক্ত হয়। দলিপের নাবালক অবস্থায় ভারতের তৎকালীন গভর্ণর জেনেরল লর্ড ডালহাউসি পাঞ্জাবের কোষাগারে হস্তক্ষেপ করিয়া এই অমূল্য নিধি হস্তগত করেন এবং পরে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন।
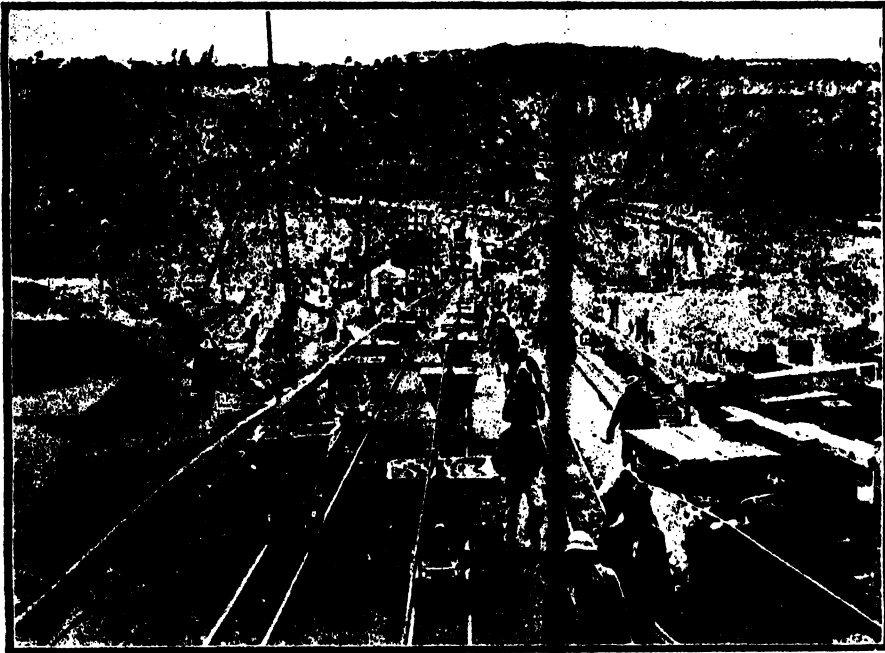
খনি হইতে হীরক উপরে তোলা হইতেছে

নাদির শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। সেই সময়ে নাদির শাহ এই হীরকের পরিচয় পাইয়া কৌশলে মোহাম্মদ শাহের নিকট হইতে হস্তগত করেন এবং ইহার নাম "কোহিনুর" রাখেন। "কোহিনুর" শব্দটী সংস্কৃত কিংবা বাংলা নহে। নাদির শাহের পর "কোহিনুর" তাঁহার পুত্রের অধিকারে যায়। তৎপর কাবুলাধিপতি আহ্‌মদ শাহ উত্তরাধিকারী সূত্রে ইহা প্রাপ্ত হন। আহ্‌মদ শাহের মৃত্যুর পর ইহা তাঁহার জ্যেষ্ঠ [illegible] শাহ সুজার হস্তগত হয়। শাহ সুজা যখন [illegible] হইতে পলায়ন করিয়া পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ এক্ষণে ইহা ইংলণ্ডেশ্বরের মুকুটের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময়ে ব্যবহারের উপযোগী করিবার জন্য ইহাকে কাটিয়া পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেক ছোট করা হয়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ইহা লণ্ডনের বিশ্ববিখ্যাত একজিবিশনে (Exhibition) প্রদর্শিত হয়। আমষ্টার্ডামের বিখ্যাত হীরক-শিল্পী মিঃ কোষ্টার ইহার সর্ব্বশেষ কাটাইয়ের কার্য্য করিয়াছিলেন।

এই হীরক-খণ্ডের প্রথমে ওজন ছিল ৭৯৩ ক্যারেট। প্রথম বারের কাটাইয়ের পর ওজন দাঁড়ায় ১৮৬ ক্যারেট এবং দ্বিতীয় কাটাইয়ের পর দাঁড়ায় ১০৬ ক্যারেট। কথিত

আছে, রণজিৎ সিংহ এই হীরকখানিকে হাতে বাঁধিতেন। কোন সময়ে একব্যক্তি ইহার মূল্য জিজ্ঞাসা করায় রণজিৎ উত্তর করিয়াছিলেন—"পাঁচ জুতা"—অর্থাৎ যাহার শক্তি আছে, সেই ব্যক্তিই ইহা কাড়িয়া লইতে পারে, মূল্য দিয়া এই অমূল্য পদার্থটি ক্রয় করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। এই হীরকখানির বর্ত্তমান মূল্য ৫৬ লক্ষ টাকা হইতে পারে বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

২। অরলফ্ হীরক—এই হীরক রুশিয়ার জারের সম্পত্তি ছিল। বর্ত্তমানেও ইহা রুশিয়ার রাজকোষেই রক্ষিত হইতেছে। প্রবাদ আছে—কোন একব্যক্তি ভারতীয় দেব-মূর্ত্তির চক্ষু খুঁড়িয়া এই রত্ন অপহরণ করে এবং বহু হাত ঘুরিয়া অবশেষে রুশিয়ার ক্যাথারিণের নিকট প্রচুর অর্থের বিনিময়ে বিক্রীত হয়। এই প্রবাদ বাক্যের মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য আছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। ইহার বর্ত্তমান ওজন ১৯৩ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য ৫১ লক্ষ টাকার উপর।

৩। নিজাম—এই মূল্যবান হীরকখানি গোলকুণ্ডার রাজার অধিকারে আছে। আধুনিক রুচি অনুসারে এখনও ইহাকে কাটাই করা হয় নাই। ইহার ওজন ৩৪০ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা। বর্ত্তমান রুচি-অনুসারে কাটাই করিলে মূল্য আরও অনেক বাড়িয়া যাইবে।

৪। গ্রেট মোগল—এই হীরকখানির কাটাই ঠিক গোলাপ ফুলের অনুরূপ। কেহ কেহ বলেন—কোহিনুরের যে দুইটি অংশের কোন খোঁজ মিলিতেছে না, ইহা তাহারই একটি অংশ। সম্ভবতঃ দিল্লী লুণ্ঠিত হইবার সময়ে ইহা

খনি হইতে হীরক উপরে তোলা হইয়াছে

অপহৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমান রুচি অনুসারে কাটাই করিবার পর বর্ত্তমান ওজন দাঁড়াইয়াছে ২৮০ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য প্রায় ৫৮ লক্ষ টাকা।

৫। রিজেণ্ট হীরক—এই হীরক ফ্রান্সের রাজমুকুটে সংযোজিত আছে এবং বর্ত্তমানে উহা প্যারিসে রক্ষিত হইতেছে। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে ইহা ডিউক অব্ অরলিয়ান্সের সম্পত্তি ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে ইনিই ফ্রান্সের রিজেণ্ট ছিলেন। ইনি এই বৎসরেই ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের গভর্ণর মিঃ পিটের নিকট হইতে এই হীরকখানি ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্ব ওজন ছিল ৪১০ ক্যারেট এবং বর্ত্তমান ওজন ১৩৬ ক্যারেট। ইহাকে বর্ত্তমান রুচি

অনুসারে কাটাই করিতে দুই বৎসর সময় এবং ৪৯ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার বর্ত্তমান আনুমানিক মূল্য ৬৭ লক্ষ টাকার উপর।

৬। ষ্টার অব্ দি সাউথ—১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই অমূল্য হীরকখানি জনৈক নিগ্রোর অধিকারে ছিল। কাটাইয়ের পূর্ব্বে ইহার ওজন ছিল ১২৫ ক্যারেট। আকার ঠিক গোল নহে এবং ভিতরের দীপ্তি খুব উজ্জ্বল। খুব সাদা না হইলেও ইহা যে উচ্চশ্রেণীর হীরকের অন্তর্ভুক্ত

কিম্বার্লির ওয়াশিং মেশিন

তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমষ্টার্ডামের বিখ্যাত হীরক-শিল্পী মিঃ কোষ্টার ইহাকে কাটাই করেন এবং নানা কারণে তিনিই কিছুদিনের জন্য ইহার মালিক হন। বর্ত্তমানে ইহা কোন এক ভারতীয় রাজার রাজকোষে রক্ষিত হইতেছে। তিনি কিঞ্চিদধিক ১১ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এই অমূল্যরত্ন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

৭। গ্রেট স্যান্সি—এই হীরকখানির আশ্চর্য্য ইতিহাস আছে। ডিউক অব্ বারগাণ্ডি তাহার রাজকীয় [illegible]কের সহিত ইহা পরিধান করিতেন। ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে ইহা পর্টুগালের রাজার অধিকারে যায়, ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি নিকোলাস ডি বার্লি, ব্যারণ ডি স্যান্সির নিকট বিক্রয় করেন। তিনি তাঁহার নামানুসারে ইহার নামকরণ করেন। স্যান্সি তাহার অনুচরের দ্বারা উপহার স্বরূপ ইহা রাজার নিকট পাঠান। অনুচর পথিমধ্যে দস্যুদ্বারা আক্রান্ত হইয়া হীরকখানিকে গিলিয়া ফেলে এবং তাহার মৃত্যুর পর ইহা তাহার শরীরের মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা কিছুদিনের জন্য রাণী বিসের অধিকারে ছিল এবং পরে কোন্ ভারতীয় নৃপতির নিকট বিক্রয় করা হয়। ইহার বর্ত্তমান ওজন ৫৩½ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য প্রায় ৫½ লক্ষ টাকা।

৮। ফ্লোরেনটাইন বৃলিয়াণ্ট—হলুদ বর্ণের পুরু হীরক। ইহার কাটাই গোলাপ ফুলের অনুরূপ। অন্যান্য ঐতিহাসিক হীরকের মত এখানাও বহু হাত ঘুরিয়া পরে দ্বিতীয় পোপ জুলিয়াসের অধিকারে আসে এবং তিনি ইহা অষ্ট্রীয়ার সম্রাটকে দান করেন। ইহার বর্ত্তমান ওজন ১৩৯½ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য প্রায় ১৫½ লক্ষ টাকা।

৯। ম্যাটাম হীরক—বোর্ণিয়োর অন্তর্গত ম্যাটামের রাজার অধিকারে আছে। ইহার আকার এবং কাটাই

উৎকৃষ্ট। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইহা গ্যাটামের রাজার হাতে আসে। এতদতিরিক্ত আর কোন ইতিহাস জানা যায় নাই। বহু ক্রেতা প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ইহা সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু রাজা বিক্রয় করেন নাই। ওজন ৩৬৭ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য ৩৮ লক্ষ টাকা।

করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্ব ওজন ছিল কিঞ্চিদধিক ৮৯ ক্যারেট, বর্ত্তমান ওজন ৭৮ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য কিঞ্চিদধিক ৪ লক্ষ টাকা।

১২। ইংলিশ ড্রেসডেন—এই বৃহৎ হীরকখানি বরোদার গাইকোয়ারের কোষাগারে রক্ষিত হইতেছে। ইহার প্রথম
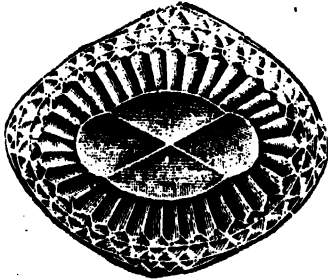
কোহিনুর—পুরাতন কাটাই (ইংলণ্ড)
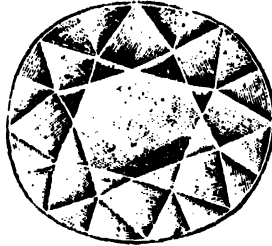
কোহিনুর—নূতন কাটাই (ইংলণ্ড)
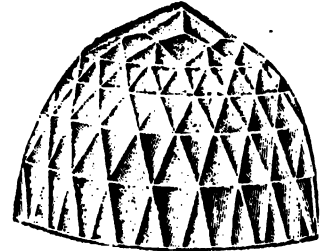
গ্রেট মোগল (রুশিয়া)

১০। পিগট্ হীরক—ডিম্বাকৃতি উৎকৃষ্ট হীরক। বর্ত্তমান ওজন ৪৭½ ক্যারেট। গত শতাব্দীতে প্রায় ৪ লক্ষ টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল। তৎপর রানডেল এণ্ড ব্রিজ ইহা ৮৪ হাজার টাকায় ক্রয় করেন এবং কিছুকাল নিজেদের অধিকারে রাখিয়া মিশরের পাশার নিকট প্রায় ৪ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করেন। বর্ত্তমানে ইহা কাহার অধিকারে আছে, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

ওজন ছিল ১১৯½ ক্যারেট এবং বর্ত্তমান ওজন ৭৬½ ক্যারেট। ইহার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৫½ লক্ষ টাকা।

১৩। কাম্বার্ল্যাণ্ড হীরক—এই হীরকখানি লণ্ডনে ক্রয় করা হয় এবং ক্যালোডেনের যুদ্ধের পর কাম্বার্ল্যাণ্ডের ডিউককে উপহার দেওয়া হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়া পরবর্ত্তীকালে ইহা হনোবরের রাজাকে দান করেন। ইহার ওজন ৩২ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য প্রায় ১½ লক্ষ টাকা।

রিজেণ্ট (ফ্রান্স)

অরলফ্ (রুষিয়া)

ফ্লোরেণ্টিন (আফ্রিকা)
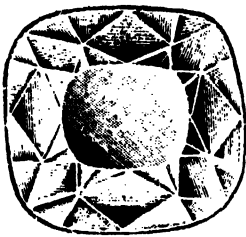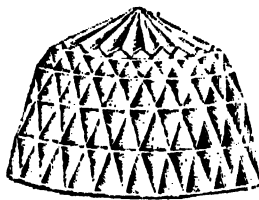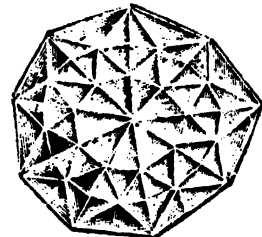
১১। ন্যাসাক হীরক—ত্রিকোণাকার হীরক। দাক্ষিণাত্যে অভিযানকালে মার্কুইস অব্ হেষ্টিংস্ এই হীরকখণ্ড সংগ্রহ করেন এবং তদবধি ইহা ভূতপূর্ব্ব মার্কুইস অব্ ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের অধিকারে ছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্য-প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই যে তাঁহার জন্মতিথি উৎসব হইয়াছিল, সেই উৎসবের দিনে মার্কুইস অব্ ওয়েষ্ট মিনিষ্টার তাহার তরবারির ফলকে এই হীরক সংযোজিত করিয়া ঐ তরবারি পরিধান করতঃ উৎসবে যোগদান

১৩। ইউজিন বৃলিয়াণ্ট—সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এই মূল্যবান হীরকখানি ক্রয় করেন। ইহা ঠিক গোলাকার নহে এবং একদিকের কাটাই উৎকৃষ্ট না হইলেও অন্য দিকের কাটাই খুবই চমৎকার। পূর্ব্বে ইহা মহারাণী ইউজিনের সম্পত্তি ছিল। পরে তিনি বরোদার গাইকোয়ারের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলেন। ইহার ওজন ৫১ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা।

১৪। মাউণ্টেন অব্ স্পেলেণ্ডার—পারস্য-রাজকোষের

...শ্রেষ্ঠ রত্ন। ইহার ওজন ১৩৫ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য প্রায় ২০½ লক্ষ টাকা।

১৫। দি হল্যাণ্ড—এই হীরক নেদারল্যাণ্ডের রাজার রাজ-মুকুটে শোভা পাইতেছে। ইহার ওজন ৩৬ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য প্রায় ১½ লক্ষ টাকা।

রাজকোষে রক্ষিত হইতেছে। ইহার ওজন ১২০ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য প্রায় ৭ লক্ষ টাকা।

১৯। হোপ হীরক—রঙীন হীরকের মধ্যে হোপই সব চেয়ে বড়। ইহার আকার ডিম্বাকৃতি। নীল বর্ণের হীরকের মধ্যে বিশেষজ্ঞেরা এইখানাকেই প্রথম স্থান দিয়াছেন। ইহার

পাশা অব্ ঈজিপ্ট (মিশর)
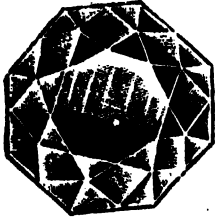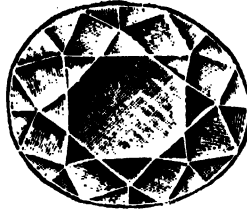
পিগট (ইংলণ্ড)
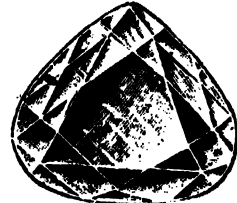
ন্যাসাক—ত্রিকোণ হীরক (ইংলণ্ড)

১৬। পোর্টার রোড্স্—১৮৮০ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় কিম্বার্লি হীরক-খনিতে এই মহামূল্য হীরকখানি পাওয়া গিয়াছে। ইহা বর্ত্তমানে মিঃ আর, পোর্টার রোড্স্এর সম্পত্তি। ওজন ১৫০ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা।

১৭। অষ্ট্রীয়ান ইয়েলো—মরিয়া থেরেসার সময় পর্য্যন্ত এই মূল্যবান পাথরখানি অষ্ট্রীয়া-সম্রাটের সম্পত্তি ছিল।

ওজন ৪৪ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য কিঞ্চিদধিক ৪ লক্ষ টাকা। ডাচেস্ অব্ নিউ ক্যাসেল্ ইহা ক্রয় করিয়াছিলেন।

২০। পাশা অব্ ঈজিপ্ট—শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর হীরক। ইব্রাহিম পাশা ইহার বর্ত্তমান মালিক। ওজন ৪০ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা।

২১। রিজেন্ট অব্ পর্টুগাল—এই হীরক পর্টুগাল রাজার রাজ-মুকুটের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। জনৈক

জুবিলী—জাগার্স ফন্টেন (ইংলণ্ড)

হোপ— নীলাভ হীরক (নিউক্যাসেল)
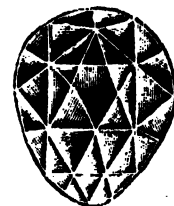
শাহ্ (ভারতবর্ষ)

ইহার ওজন ১৩৯ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য প্রায় ৭ লক্ষ টাকা।

১৮। মুন অব দি মাউন্টেন—অনেকে ভুল বশতঃ ইহাকে অমূল্য হীরক বলিয়া থাকেন। নাদির শাহ্ দিল্লী হইতে এই মূল্যবান হীরকখানি প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর জনৈক আফগান সৈন্য ইহা চুরি করিয়া লইয়া যায় এবং সাফরাস্ নামক এক আমেরিকানের নিকট বিক্রয় করে। রুষ-সম্রাট বহু অর্থের বিনিময়ে এই মূল্যবান পাথর ক্রয় করিয়া নিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে উহা রুষিয়ার

নিগ্রোর নিকট হইতে পর্টুগালের রাজা ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার ওজন ২১৫ ক্যারেট, মূল্য এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

২২। জাগার্স ফন্টিন—১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এই হীরকখানি সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহার বর্ত্তমান ওজন ২০৯ ক্যারেট, মূল্য এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

২৩। দি ষ্টিওয়ার্ট—১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই হীরকখানি দক্ষিণ আফ্রিকায় পাওয়া গিয়াছে। ইহার ওজন ২৮৮ ক্যারেট, মূল্য এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

২৪। দি ক্যালিন্তান—প্রিমিয়ার ডায়মণ্ড মাইনিং কোম্পানীর প্রেসিডেণ্টের নামানুসারে এই হীরকখানির নামকরণ হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান ওজন ৩০২৫ ক্যারেট। দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট ইহা ক্রয় করেন এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে জন্মদিন উৎসব উপলক্ষে সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ডকে দান করেন। এই হীরককে বর্ত্তমানে নয় ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এই ভাগ করার জন্য আরও ওজন ৯ ক্যারেট কম হইয়া গিয়াছে এবং এই জন্য বর্ত্তমানে ইহার উপর নাম খোদাই করার কোন চিহ্ন নাই। ইহার আনুমানিক মূল্য কিঞ্চিদধিক ৪ লক্ষ টাকা।

২৬। একসেলসিয়ার—ক্যালিন্তানের আবিষ্কারের পূর্ব্বে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন এই হীরকখানিকে জাগার্স-ফন্‌টিন খনিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা দক্ষিণ আফ্রিকার খনি হইতে প্রাপ্ত সুবৃহৎ হীরকগুলির অন্যতম এবং

পোলার ষ্টার (রুষিয়া)

শাহ্ অব্ পার্সিয়া (রুষিয়া)

একশত খণ্ড টুক্‌রা মূল হীরক হইতে বাহির হইয়াছে। এই টুক্‌রাগুলির দামও একেবারে কম নহে। কাটাই হওয়ার পূর্ব্বে ইহার মূল্য ছিল ৭০ লক্ষ টাকা।

২৫। শাহ্ অব্ পার্সিয়া—১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে আব্বাস মির্জ্জার কনিষ্ঠ পুত্র যুবরাজ খসরু এই অমূল্য রত্নখানি জার নিকোলাসকে দান করেন। এই হীরকের উপর তিনজন পারস্য সম্রাটের নামাঙ্কিত ছিল। শেষবার কাটাই করায় ইহার শুভ্র-নীলাভ দীপ্তির জন্য বিখ্যাত। ইহাকে কাটিয়া ২১ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান ওজন ৩৬৪ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য কিঞ্চিদধিক ৩ লক্ষ টাকা।

২৭। পোলার ষ্টার—রুষিয়ার রাজ-কোষে রক্ষিত হইতেছে। ওজন ৪০ ক্যারেট, আনুমানিক মূল্য কিঞ্চিদধিক ২ লক্ষ টাকা।

কোনো মুক্ত বিহঙ্গের প্রতি

—শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

(১)

নিয়ে চল মোরে ওই মেঘ-লোকে
ভাসায়ে তোমার গানে,
তোল একবার যেখানে তোমার
আকাশে বাতাসে মেঘের মাঝার
কাঁপিছে মন্দ্র কল-ঝঙ্কার,
সুরের নিবিড় নিরিবিলি নীড়
বাঁধিয়াছ যেইখানে।

(২)

কণ্টকবনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
কাতর চরণ আজ,
তোমার মতন পাখা যদি পাই
এখনি তোমার কাছে উড়ে যাই
মাতোয়ারা হয়ে নীরবে তলাই
মুক্তির মহা মণির কোঠায়
সুর-সায়রের মাঝ!

(৩)

নীলাকাশে কিবা নীল অঞ্জন
গুরু গুরু দেয়া করে গর্জ্জন
পবনে কেতকী বাস,
ভুলি বন্ধন পিঞ্জর বন
স্বাধীন পরাণে গাহ অনুখন
কুণ্ঠা-বিহীন কণ্ঠে সঘন
মিটায়ে প্রাণের আশ।

(৪)

চাহ নি জীবনে তুমি ত কখন
হতে পথ-চারী আমার মতন
চরণে জড়িত পাশ,
স্বাধীনতা-সুধা পলে পলে পিয়া
মাতালের মত টলিয়া টলিয়া
কোথায় চলেছ উধাও হইয়া
ভেদিয়া অসীমাকাশ?
যে সুরে মাতালি আপনি মাতিয়া
দে রে সে সুরের সকল অমিয়া
বাঁটিয়া আমার পাশ।

(৫)

ওগো ব্যোমচর! জীবনের মম
বন্ধুর পথখানি
কণ্টকে ভরা ধূলি-ধূসরিত
এঁকে-বেঁকে গেছে জানি।
মুক্ত গগনে কিন্তু তোমার
বন্ধন-হীন সঙ্গীত-ধার
পিয়িয়েছি যত শ্রবণে আমার
শ্রান্তি পথের নাহি পাই টের
ভাগ্য সফল মানি।
মনে হয় যেন দীর্ঘ এ পথ
দেখিতে দেখিতে হয়ে যাবে গত
মরণ মোহন সোণার স্বপন,
করতলে দিবে আনি।

পঞ্জিকা-সংস্কার

— নক্সা —
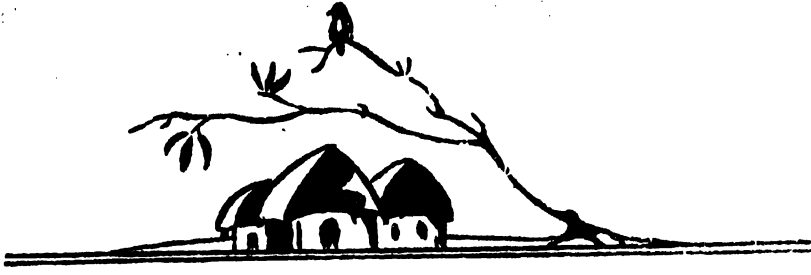
—মতিনউদ্দিন আহ্‌মদ

[হাম বড়া বাহাদুর, জমিদার—হাজার দশেক টাকা বাৎসরিক আয় আর হাজার বিশেক পুরুষানুক্রমিক ঋণ—বাড়ীতে বেকার বসিয়া থাকেন, নিজের বিষয়টুকুও নিজে দেখেন না, তাই মহাজনদের দেনা আদায়ের পর, নায়েব কর্ম্মচারীর উচ্ছিষ্ট-ই তাহার ভাগে পড়ে। সর্ব্বদাই খোসা-মুদে মোসাহেবের দল পরগাছার মত তাহার রক্ত চুষিয়া খাইতেছে, তিনি গাছের মতই নির্ব্বাক। রোজ সন্ধ্যার সময়ে মজলিস বসে এবং এই সময়ের মজলিসে যাহা যাহা না থাকিলে শোভন হয় না, তার সবই থাকে—লালপানি, বায়া-তবলা, নুপুর—পায়জেব......

মোসাহেবের দলের মাঝে একজনের মা-বাপের দেওয়া নাম বদলাইয়া জমিদার সাহেব গুণের আদর করিয়া নাম রাখিয়াছেন গপ্পী খাঁ, এখন তার আসল নামের খোঁজই কেউ জানে না, হয়ত সে নিজেও ভুলিয়া গিয়াছে। জমিদার সাহেবের যখন খুসী ফরমায়েস করিয়া বলেন,—'গপ্পী খাঁ, গপ্প বলো।' সঙ্গে সঙ্গে কলের গানের রেকর্ডের মত গপ্পী খাঁর গল্প সুরু হয়; জমিদার সাহেব যখন ইচ্ছা মাঝে মাঝে 'লোক্‌মা' দিয়া দিয়া গল্পটা চালাইয়া নেন। আর একজনের নাম রাখিয়াছেন 'সরবতী'—(ঈকারান্ত হইলেও সে পুরুষ)—প্রথম কয়েকদিন সে সকলকে সরবত দিত এবং পরে হুজুরের কথায় কথায় এমন অবিরত সায় দিত যে, অন্য সব মোসাহেব তাহার কাছে হার মানিতে বাধ্য হইয়াছিল—হুজুর-রূপ পাত্রে পড়িয়া অবিকল তাহারই আকার ধারণ করিয়াছে বলিয়া তরল পদার্থের মত এই অপদার্থকে সকলে সরবতী বলিয়া ডাকিত। এইরূপে কারো নাম ছিল পা-পোশ আলী, কারো নাম ছিল দিল-গুলজার, জানে বুল্‌বুল্ ইত্যাদি।]

কাল সন্ধ্যা। মজলিস বসিতে সুরু হইয়াছে।

হাম বড়া বাহাদুর তাকিয়া ঠেস্ দিয়া মকমল-মোড়া নলে চাঁদির মুখনল লাগাইয়া তামাক খাইতেছেন। গপ্পী খাঁ বাম দিকে, আর সরবতী পিছনে বসিয়া, মস্ত বড় এক তালপাতার পাখা নিয়া হাওয়া দেওয়ার অভিনয় করি-তেছে। আরো দশ-বারো জন সাঙ্গপাঙ্গ বসিয়া আছেন, চার-পাঁচ জনের তখনো আসিতে দেরী। স্বচ্ছ নেটের পরদার আড়ালে গোলাপী মুখের ফিস্-ফিস্, সোনার চিক্-চিক্—টুন-টুন আর চুনি-পান্নার ঝল্‌মলি দেখা যাইতেছে। এমন সময়ে সস্তা দামের উগ্র গন্ধের এসেন্স লাগাইয়া বক্‌বক্ আলী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া জমিদার সাহেব সেই অবস্থায় থাকিয়াই চর্ব্বির প্রাচুর্য্য হেতু কণ্ঠনালীর সরু ছিদ্র দিয়া কোন রকমে আওয়াজ বাহির করিয়া বলিলেন,—'তারপর, কি খবর বক্‌বক্ আলী! নতুন কিছু আছে কি?'

জমিদার সাহেবের মুদ্রাদোষ ছিল 'তারপর কি খবর!'

বক্‌বক্ আলী। (কুর্ণিস করিয়া) হুজুর, বাড়ী থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়েই দেখি, অনেক লোক জড় হয়ে পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে কি দেখছে। একটা কথা প্রথমেই খেয়ালে এলো—জনতার সকলের মাথায়ই টুপী, তখন ভাবলাম, হয় ত কোন টাট্‌কা পীর সাহেব হাওয়াই জাহাজে আসবেন, আর মুরিদান তারই অপেক্ষা করছে; তারপর মনে পড়লো আজকাল হিন্দু-মুসলমান সকলেই টুপী পড়ে—এতে নাকি সহজে স্বরাজ পাওয়া যায়—তা' হ'লে আগের আন্দাজ ঠিক হ'লো না, তখন ভাবলাম, আল্লাহো আকবরে আর বন্দেমাতরমে যখন খিঁচুড়ি হয়ে গেছে, তখন নিশ্চয়ই কোন নেতা আসছেন। একজনকে

চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলাম,—'আজই কি ঠিক দিন?' সে বল্লে,—'পাঁজিতে ত তাই বলে।' আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লাম,—'পাঁজিতে কি এসব কথাও লেখা থাকে?' সে ততোধিক আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লে,—'এসব কথা থাকে না ত গোলেবকাওলির কেচ্ছা থাকে নাকি?' আমি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলাম,—'এখুনি কি এসে পৌঁছাবেন?' সে বল্লে,—'কি আবোল-তাবোল বক্‌ছেন সাহেব, কে এসে পৌঁছাবেন আবার?' আমি বল্লাম,—'কেউ যদি আসবেন না তবে হাওয়াই জাহাজ কি শুধু হাওয়া খেতে এখানে এসে পড়বে?' সে বল্লে,—'আপনি ত আচ্ছা মানুষ দেখছি, হাওয়াই জাহাজ কোথায় দেখলেন আপনি? আপনার অভিভাবক কি হাজারিবাগের কি তেজপুরের সরকারী দাওতখানার খবর রাখেন না?' আমি রাগ না করেই বল্লাম,—'চটেন কেন জনাব, আশমানের দিকে আপনারা তা' হ'লে কি খুঁজছেন?' সে হেসে উঠলে, তারপর বললে,—'ও তা'ই নাকি! আমরা হাওয়াই জাহাজ দেখছিলাম না সাহেব, আমরা চাঁদ খুঁজছি। জানেন না আজ রবিউল-আউয়ালের চাঁদ দেখা যাবার কথা।' আমি বললাম,—'তাই নাকি।' সে বল্লে,—'আপনি কি তা'ও জানেন না! আপনি হিন্দু না মুসলমান, থুতুতে কেপ কমরিন মার্কা (কুমারিকা অন্তরীপ)—দাড়ী ত দেখছি?' আমি হা-হা করে হেসে বল্লাম,—'ওহে আগে আমার ধর্ম্ম ছিল ঈব্রাহিম, এখন সেটা বদলে ফেলে শুধু হিম ধর্ম্ম গ্রহণ করেছি। ঈসায়ীর ঈ বিদেশী বলে ছেড়ে দিয়েছি, ব্রাহ্মর ব্রা হিন্দুর গর্ভে আশ্রয় নিয়েছে, তাই এখন হিন্দুর হি আর মুসলমানের ম নিয়া 'হিম' ধর্ম্ম অবলম্বন করেছি। এই বলেই হঠাৎ মনে পড়ল হুজুরের বেহেস্তসানির কথা—এতক্ষণে হয় ত গুলজার হ'য়েই আছে, তাই ছুটে এসেছি—হুজুর, এর চেয়ে টাট্‌কা খবর আর কি দেব?'

হা-ব-বা। বহুত খুব! বেশ বলেছ! তা' হ'লে দেখা যাচ্ছে রবিউল আউয়াল চাঁদ এসে পড়ল। এই চাঁদে নাকি কি পর্ব্ব আছে?

গপ্পী খাঁ। (মুখ হইতে লুফিয়া লইয়া) হুজুর, বন্দা পরওর, ফতে দোয়াজদহম্‌।

হা-ব-বা। অর্থাৎ?

গপ্পী খাঁ। অর্থাৎ হজরতের পয়দায়েস ও উফাতের চাঁদ।

হা-ব-বা। (একটু নীরবে চিন্তা করিয়া) তা' হ'লে আজ একটু মুখ বদ্‌লান যাক্‌।

সরবতী। জী হাঁ হুজুর, বিলিতি একঘেয়ে হয়ে গেছে, আজ মুখ বদলানো যাক্‌—ধেনো দিয়ে আজ ফতে দোয়াজদহম হোক্‌।

গপ্পী খাঁ। চুপ করো হে বাবাজি। আজ তুমি ইদ না সবেবরাত পেয়েছ যে ধেনো চালাবে! হুজুরের যা' মর্জ্জি তাই হবে।

হা-ব-বা। আজ ওসব থাক্‌। একটা ভাল চাঁদ এসেছে, আজ পানি-পায়জেব বিদেয় করে দাও; আর মসজিদ হ'তে মোল্লাজীকে ডাক। আজ ফতে দোয়াজদহম হোক।

গপ্পী খাঁ। ফতে দোয়াজদহমের গপ্প বলো।

(মোল্লাজী আসিলেন এবং মসজিদের এক কোণায় সন্তর্পণে বসিলেন)

হা-ব-বা। মোল্লাজী, বক্‌বক্‌ আলী এসে বলছে আজ নাকি ফতে দোয়াজদহম, আমার মরজী আজ ফতে দোয়াজদহম করি।

মোল্লাজী। (পুরাণো ধরণের আলেম—মুসল্লী মানুষ পেটের দায়ে চাকরী করেন ফতে দোয়াজদহম করা যে কি, ভাল করিয়া বুঝিলেন না।) হুজুরের যা' মরজী। তবে আজ রবিউল আউয়ালের চাঁদ দেখা গেল মাত্র, ফতে-দোয়াজদহম আজ নয়, বারই তারিখ, তবে খুব ফজিলতের চাঁদ।

গপ্পী-খাঁ। বারই নয় হুজুর, নয়ই রবিউল আউয়াল হচ্ছে হজরতের পয়দায়েসের তারিখ—

মোল্লাজী। কভি—ঈ—না হুজুর।

গপ্পী-খাঁ। থামুন মোল্লাজী, আমার কথা আগে শেষ করতে দিন। আজ ত সবে মাত্র চাঁদ দেখা গেল, এখনো পয়লা তারিখই আসে নি, আর আপনারা ঝগড়া করতে সুরু করেছেন, তা'হলে অমাবস্যা আস্‌তে আস্‌তে আপনারা খুনোখুনি করে বসবেন—বেশ ফজিলতের চাঁদ ত! মোল্লাজী আজ ফতে দোয়াজদহম করুন।

মোল্লাজী। হুজুর ১২ই তারিখে ফতে দোয়াজদহম হ'বে—

গপ্পী খাঁ। না হুজুর, ১২ই যদি হয় তবে আজও হ'তে পারবে, কারণ ১২ই যেমন ঠিক তারিখ নয়, আজও তেমন ঠিক তারিখ নয়—

হা-ব-বা। তা' হ'লে ঠিক তারিখ তোমার কবে স্থির হয়েছে?

গপ্পী-খাঁ। নয়-ই রবিউল আউয়াল—

মোল্লাজী। নাউজু-বিল্লাহ্। ৯ই তারিখে বলে ফতে দোয়াজদহম! জাহেল ফাছেক্......

হা-ব-বা। সত্যিই ত! সে কি করে হবে?

গপ্পী-খাঁ। তা' হয় হুজুর। ছোট বেলায় একবার গুডফ্রাইডে রবিবারে পড়ে যাওয়ায় আমাদের স্কুলে এক দিনের ছুটি মাঠে মারা পড়েছিল। ও রকম সময়ে সময়ে হ'য়ে থাকে হুজুর,—

হা-ব-বা। তাই—ত! মোল্লাজী হজরতের পয়দায়েস্ যে ১২ই তারিখে হয়েছিল, তার কি কোন দলিল আপনি দেখাতে পারেন?

মোল্লাজী। এর আবার দলিল দস্তাবেজ কি হুজুর! হাজার হাজার বছর ধরে কত লাখ লাখ আলেম ফাজেল বলে আসছেন, আর আখেরী জামানার গুটি কয়েক ওহাবী এসে বলছে—৯ই, আর আপনারা দানা দানিশমন্দ বুজুরগাণ তাই বলে দলিল তলব করছেন। আফসোস্ হুজুর! এই সব আলেমে দীনের কথাতে সন্দেহ করা মানে হুজুর, কি বল্‌ব, হাবিয়া দোজখে কিম্বা অয়েল দোজখে পুড়ে মরা। যে ১২ই তারিখ ভুল বল্‌বে, তার উপর তওবা লাজিম হবে, সে হাবিয়া দোজখে, অয়েল দোজখে পুড়ে মরবে, তার গায়ে ফোস্কা পড়বে।

হা-ব-বা। (হুজুর তখন ঝুলিতে সুরু করিয়াছেন—সাপুড়ের বাঁশী শুনিয়া সাপ যেমন ঝুলিতে সুরু করে)। কি গপ্পী খাঁ এখনো তুমি ৯ই বলতে চাও?

গপ্পী খাঁ। হুজুর, আমি যদি ভুল বলে থাকি তবে অয়েল দোজখে কেন, ঘিয়ের দোজখে না হয় কেরোসিনের কি প্যারাফিনের দোজখে পুড়ে মরতে রাজী আছি, আর সে অয়েল, ঘি, কেরোসিন, প্যারাফিন যেন তখন টগ্‌বগ্ করে ফুটতে থাকে, আর তারপর যত খুসী ফোস্কা আমার গায়ে পড়ুক আমি আপত্তি করব না; কিন্তু মোল্লাজীকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই—যদি ইজাজত দেন—

হা-ব-বা। আচ্ছা বেহায়া বেগয়রত তুমি গপ্পী খাঁ! যাক্ দু'দিন পরে যখন অয়েল দোজখে তুমি ভাজা হ'বে, তখন তোমার আর এ সাধ বাকী রাখি কেন? যা ইচ্ছা তুমি মোল্লাজীকে জিজ্ঞেস কর।

গপ্পী খাঁ। মোল্লাজী, আপনি নিশ্চয় ইহা মানেন যে, হজরতের জন্ম সোমবারে হয়েছিল?

মোল্লাজী। হাঁ তা ঠিক মানি।

গপ্পী খাঁ। আর ৮ই হ'তে ১২ই রবিউল-আউয়াল তারিখের মধ্যে হজরতের পয়দা হয়েছিল?

মোল্লাজী। হাঁ, তা'ও ঠিক!

গপ্পী খাঁ। তা হ'লে হিসাব করে দেখা যা'ক, সেই সনে ৮ই হ'তে ১২ই পর্য্যন্ত কোন তারিখে সোমবার পড়ে। আজ হলো কি বার, বুধবার না? সফরের চাঁদের ৩০শে, কাল ছিল সফরের ২৯শে আর মঙ্গলবার—

মোল্লাজী। মানি না তোমার এ চুল-চেরা হিসাব—

হা-ব-বা। মানুন না মোল্লাজী, এতে কি আপত্তি আছে?

মোল্লাজী। আপত্তি আছে জনাব, আমি মান্‌ব না, আপনিও মান্‌বেন না; তা' না হ'লে আপনাকে ও ওহাবী করে ফেল্‌বে।

হা-ব-বা। আজ যখন সত্যি সত্যিই বুধবার, আর কাল যদি তা'ই বলে মঙ্গলবার মেনে-ই ফেলি, তাই বলে আমাকে ও ওহাবী করে ফেলবে কি করে মোল্লাজী?

মোল্লাজী। হুজুর, ও যেভাবে পিছু মুখে হিসেব করে বলছে, তা'তে আজ বুধবার আর কাল মঙ্গলবার মান্‌তে সুরু করলেই, হজরতের পয়দায়েসের চাঁদ ৮ই হ'তে ১২ই পর্য্যন্ত যখন পৌছাবে, তখন সোমবার পড়েই যাবে ৯ই তারিখে। তা কি আর হয় হুজুর! এতদিনের সব আলেম ফাজেল তাহ'লে কি ভুল বলে গেলেন! যত সব হারাম চিজ আছে, তার কছম হুজুর, ওই গপ্পী খাঁর হিসাব মান্‌বেন না হুজুর, মান্‌লে ওহাবী হ'য়ে যাবেন। গপ্পী খাঁ, তোমার উপর তওবা লাজিম—অয়েল দোজখ—লা হাওলাওলা কুওতা।

গপ্পী খাঁ। হুজুর, আমার ছেলে দু'টোকে ত দেখছেন ভয়ঙ্কর দুষ্টু, কিছুতেই পড়াতে পারি না। মাষ্টার রাখলে দু'দিনেই বেচারাকে নাকাল করে তোলে, সে পালাবার পথ

পারে না; এই করে যে কত মাষ্টার এল, আর কত গেল, তার লেখা-জোখা নাই, কিন্তু এদিকে শ্রীমানদ্বয় খ পর্য্যন্ত গিয়েই খতম। শেষে হুসিয়ার দেখে আনলাম এক মাষ্টার, সে আর পড়ার নাম মুখেও নেয় না, দিন রাত চরকীর মত, ওদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, পাখীর বাচ্চা ধরা, গাছে চড়া, সাঁতার কাটা, এই নিয়েই থাকে। বড় ছেলে একটু শান্ত, সে সহজেই ধরা দিলে কিন্তু ছোটটি দুষ্টুর শিরোমণি, চূড়াতীর্থ, মাষ্টার নামক জীবের কাছে এই সমস্ত কাজ এবং পড়ার তাগিদ না পাওয়ায়, তার ভাল লাগলেও মাষ্টারকে সে সন্দেহের চক্ষে দেখতে লাগল। কিছু দিন পরে যখন ওরা মাষ্টারের কথায় ওঠে-বসে, তখন একদিন শুধু বড় ছেলেকে নিয়ে মাষ্টার ঘরের ভিতর বসে পাখীর বাচ্চার কথা বলছিল। হঠাৎ ছাদের দিকে তাকিয়ে মাষ্টার বললে,—'বল দেখি, এই ঘরে কয়টী কড়ি আর কয়টি বীম্ আছে? বড় ছেলে তখন গুণতে শুরু করেছে, ছোটটি জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে ওত পেতে সব শুনছিল, সে চীৎকার করে বললে,—'দাদা, বলিস্ নারে বলিস্ না, ও বজ্জাত মাষ্টার ফাঁকি দিয়ে তোকে আঁক কষিয়ে নিচ্ছে।

মোল্লাজী। হুসিয়ার হুজুর, শয়তান এই করে ফাঁকি দিয়েই আমাদের সর্ব্বনাশ করে।

হা-ব-বা। যাই বল গপ্পী খাঁ, তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়ে ওহাবী করে ফেলতে পারবে না। মোল্লাজী আজ হতে আপনার তন্‌খা মাহ্‌ওয়ারা একটাকা বেশী হ'লো। গপ্পী খাঁ, এখান হতে গিয়ে আজ তুমি মোল্লাজীর কাছে তওবা করো। আর তোমার ওই ওহাবী-পণা হিসাব ছেড়ে দিয়ে হজরতের পয়দায়েসের তারিখ ১২ই করো।

গপ্পী খাঁ। হুজুর আজ যে বুধবার—

হা-ব-বা। হোক বুধবার, আমি পাঁজি কেটে আজ শুক্রবার করে দেবো। এখন আপনি আসুন মোল্লাজী, আমরা একটু ফতে দোয়াজদহম করি। (মোল্লাজীর প্রস্থান) কোন্ হ্যায় … … …

আকাঙ্ক্ষা

— সনেট — —কে-এম, শম্‌শের আলী

ভালবাসি তারে আমি তাই নিশিদিন
প্রণয়-পীযূষ-মাখা গীতিকা-নিক্কনে
অলক্ষ্যে বাজিয়া উঠে হৃদয়ের বীণ,
তারি স্তব-স্তুতি গানে মরমের কোণে
ভালবাসি তারে তাই সারা বিশ্ব মাঝে
যখনি যে-দিক পানে ফিরাই নয়ন
তাহারি মধুর ছবি সুমোহন সাজে
হেথারি রয়েছে আঁকা নয়ন-রঞ্জন।
আপনারে রিক্ত করি' ভালবাসি তারে
তাই এ বরণ-মালা গাঁথি সযতনে
লজ্জা-ভীতি শূন্য প্রাণে হৃদি-পুষ্প-হারে
পরা'তে তাহারি গলে আজি মনে মনে।
ভালবাসি মিশে যেতে তাই তার সনে
আকুল বাসনা জাগে জীবনে মরণে।

আরবী-নাটকের প্রারম্ভ

— প্রবন্ধ —

—এ-এফ্, মোহাম্মদ আবদুল হক

ইউরোপীয় দেশসমূহে গ্রীকদের সময় হইতেই নাটকের প্রচলন হইয়াছিল; কিন্তু আরবগণ কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও উহার অনুকরণ করিতে কোন উৎসাহ প্রদর্শন করে নাই। ইস্‌লামী ইতিহাসের স্বর্ণ-যুগে, অর্থাৎ আব্বাসীয় খিলাফতের প্রথমভাগে আরবগণ গ্রীক-দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি উৎসাহের সহিত শিক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা কাব্য, নাটক, ইতিহাসের প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করে নাই। রঙ্গমঞ্চে স্ত্রীলোকের আবির্ভাব অরুচিকর বলিয়াই বোধ হয়, তৎকালীন মুসলমানগণ নাটককে কখনও স্নেহের চক্ষে দেখে নাই। কাজেই নাটক ব্যতিরেকেই ইস্‌লামী সভ্যতা সর্ব্ব-বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল।

মোগল-যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে কিছু কিছু নাট্য-প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। যথা—মুসোলের ইব্‌ন দানিয়াল প্রণীত طيف الخيال বা 'কল্পনা-মানসী'কে নাটক শ্রেণী-ভুক্ত করা যায় বটে, কিন্তু উহা এত অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ যে, উহাকে সভ্য-সমাজে গ্রহণ করা অসম্ভব। কেহ কেহ হারিরী ও বদীযুজ্জমান প্রভৃতির 'মকামাত'কে নাটক শ্রেণীভুক্ত করিতে চাহেন। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে, উহাদিগকেও নাটক বলা চলে না।

বর্ত্তমান ইউরোপীয় নাটকের সহিত আরবদের প্রথম পরিচয় হয় নেপোলিয়নের মধ্যস্থতায়। তিনি সংবাদ-পত্র, ছাপাখানা ইত্যাদির সহিত এই জিনিষটিও মিশরে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুচরদের মধ্যে কতিপয় কলাবিদ্ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। প্রবাসে অবসর সময়ে মনোরঞ্জন করিবার জন্য তাঁহারা কয়েকটি ফরাসী-নাটকের অভিনয় করেন। জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের উৎসাহে অচিরেই মিশরে একটী স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়; কিন্তু ফরাসীদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই ইহা লয়-প্রাপ্ত হইয়া যায়। নাট্যানুশীলনে আরবী-ভাষীদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে সিরিয়াবাসিগণই অগ্রগামী ছিলেন, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আরবী-সাহিত্যে ইউরোপীয় নাটক প্রবেশলাভ করিয়াছে মাত্র গত শতাব্দীর মাঝা-মাঝি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সিরিয়া-বাসিগণই এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম অগ্রসর হইয়াছে। ইউরো-পীয়দের সহিত মেলা-মেশা, ইউরোপীয় দেশসমূহে পরিভ্রমণ, তাহাদের রঙ্গমঞ্চ ও নাটক পরিদর্শন, তাহাদের চিন্তাধারা, আদর্শ ও সাহিত্যের সহিত পরিচয়ই ইহার প্রধান কারণ। এই কার্য্যে সর্ব্বপ্রথমে হস্তক্ষেপ করেন বৈরূতবাসী মারুণ আল্-নক্কাশ। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখনও সে দেশের শিক্ষা-বিভাগে নব-জাগরণের সাড়া পড়ে নাই। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম আরবী-নাটকের অভিনয় করান সিরিয়ার বৃহৎ কলেজসমূহ ও প্রথম সংবাদপত্র স্থাপিত হওয়ার দশ বৎসর পূর্ব্বে। তখন আমেরিকান কলেজ, খৃষ্টানদের কলেজ বা স্বদেশী মাদ্রাসা ইহার কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। বুস্তানী, য়াজজী ও শিদয়াক প্রভৃতি লেখকদের আবির্ভাব তখনও হয় নাই। কিন্তু সংবাদপত্র ও পরিপূর্ণ শিক্ষা-দীক্ষার পূর্ব্বে আবির্ভূত হইলেও অন্য সকল বিষয়ের তুলনায় নাটক অনেক পিছনে পড়িয়া গিয়াছে। তবুও একথা বলা যাইতে পারে যে, আমরা আরবী-নাটকের প্রথম যে নমুনা পাইয়াছি, তাহা কতকটা পক্কতা ও পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। কারণ নক্কাশের নাটকগুলি আজও আরবী নাট্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। এইখানে নক্কাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মারুণ-আল্ নক্কাস ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বৈরূতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব হইতেই তাঁহার প্রবল জ্ঞান-স্পৃহা ছিল। তুর্কী, ফরাসী ও ইটালীয়ান ভাষা তিনি ভালরূপে

জানিতেন, সঙ্গীত ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় জিনিষ। তিনি ব্যবসায়ে প্রবেশ করিয়া দেশ-ভ্রমণ মানসে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে মিশরে পদার্পণ করেন, তথা হইতে ইটালী গমন করেন এবং তথায় অনেক রঙ্গমঞ্চে নাটকের অভিনয় দর্শন করেন। ইহাতে তিনি এত প্রীতিলাভ করেন যে, উহাকে স্বদেশে প্রবর্ত্তন করিতে কৃতসংকল্প হন। বৈরুতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই তিনি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, এবং কয়েকজন বন্ধুকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া স্বীয় সহযোগী করিয়া তোলেন। ফলতঃ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে আরবী ভাষায় প্রথম নাটক তাঁহার 'কৃপণ' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে বৈরুতে বহু গণ্য-মান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। সিরিয়ায় তখনও কোন সংবাদপত্র ছিল না; কিন্তু বিদেশী সংবাদপত্রের সাহায্যে এই সংবাদ ইউরোপময় প্রচারিত হয় এবং উৎসাহজনক সমালোচনা লাভ করে। ইহাতে নক্কাশের উৎসাহ চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "আবিল হাসান মুগাফ্‌ফাল বা হারুনুর রশীদ" নাট্য অভিনীত হয়। ইহাতে সিরিয়ার কয়েকজন মন্ত্রী এবং প্রধান প্রধান সরকারী কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন, সকলেই নাটক ও অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অল্পকাল মধ্যেই নক্কাশ তাঁহার বাড়ীর সঙ্গেই একটী রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেন। এইখানে 'পরশ্রীকাতর' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হয়। এই সব নাটকে তিনি ফরাসী লেখক মলিয়রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন, কিন্তু নাট্য-সাধনা ছিল তাঁহার অবসর সময়ের কাজ; জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য তাঁহাকে ব্যবসায় পরিচালনা করিতে হইত, তাঁহার বন্ধুদেরও ছিল সেই অবস্থা।

নূতনের প্রতি স্বাভাবিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ বশতঃ প্রথমতঃ অধিক লোক অভিনয় দর্শন করিতে আসিত না। কিন্তু একবার অভিনয়ের স্বাদ উপভোগ করিবার পর আর দর্শকের অভাব হয় নাই। সুখের বিষয়, তাঁহার সহযোগিগণ সকলেই শক্তিশালী লোক ছিলেন এবং পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদের অনেকেই সাহিত্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, নক্কাশ আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে আরবী নাট্য-সাহিত্যের সমধিক উন্নতি করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি অকালে জীবনলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার ভ্রাতা নিকোলা নক্কাশের তত্ত্বাবধানে তাঁহার গ্রন্থাবলী ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সময় হইতে সিরিয়াবাসীদের মধ্যে নাটকের অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং বহু সাহিত্যিক এই দিকে মনোনিবেশ করেন, মারুণের ভ্রাতুষ্পুত্র সলীম নক্কাশ প্রভৃতি অনেক বিদেশী নাটক আরবীতে অনুবাদ করিয়া সফলতার সহিত অভিনয় করিয়াছেন।

ইতঃমধ্যে মিশরের খেদিবের সিংহাসনে ইস্‌মাইল পাশা আরোহণ করেন (১৮৬৩ খৃঃ)। তিনি জ্ঞান ও সাহিত্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কাজেই সাহিত্য-সেবিগণ তাঁহার সিংহাসনারোহণে বিশেষ উৎফুল্ল হইয়া উঠেন; এবং সিরিয়ার নব্য-সাহিত্যিকগণ 'সৌভাগ্যের দেশ' মিশরে সমবেত হইতে থাকেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সুয়েজ প্রণালী খনন কার্য্য শেষ হওয়া উপলক্ষে বিশেষ ধুমধামের সহিত উহার উদ্বোধন ক্রিয়া সমাপ্ত হয়। খেদিবের প্রমোদ-ভবনে এই সময়ে ফরাসী অভিনেতাগণ বিশেষ কৃতকার্য্যতার সহিত একটি ফরাসী-নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করেন।

তখন হইতে সাহিত্য ও কলার পৃষ্ঠপোষকরূপে ইস্‌মাইল পাশার নাম বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। ফলতঃ সিরিয়া হইতে একদল সাহিত্যিক, কবি ও লেখক মিশরে আগমন করেন। ইঁহাদের মধ্যে নাট্যকার সলীম নক্কাশ, সাহিত্যিক ইস্‌হাক এবং কয়েকজন অভিনেতাও ছিলেন। ইঁহারা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে আলেকজেন্দ্রিয়াতে অবতরণ করেন; এবং জিজিনিয়া রঙ্গমঞ্চে কয়েকটি নাটকের অভিনয় করেন। কিন্তু আশানুরূপ সফলতা লাভ করিতে না পারিয়া উভয়ে উক্ত দল ছাড়িয়া সংবাদপত্র পরিচালনায় মনোনিবেশ করেন। তখন অভিনেতাদের তদানীন্তন নেতা খাইয়াত স্বীয় দলসহ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে খেদিবের রাজধানী ও আমীর ওমরাদের কেন্দ্র কায়রোতে আগমন করেন। ইস্‌মাইল পাশা ইঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন, এবং স্বীয় প্রমোদ-ভবনে নাটক অভিনয় করিবার অনুমতি দেন; এমন কি, নিজেও উহাতে উপস্থিত থাকিতে রাজি হন।

তাঁহাদের নাটকের নাম ছিল 'উৎপীড়িত'। এই নাটক অভিনয়ের সময়ে ইস্‌মাইল পাশাও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অত্যাচার ও উৎপীড়নের জীবন্ত চিত্র দেখিয়া তিনি

কুপিত হন এবং সন্দেহ করেন যে, উহারা তাঁহারই রাজত্বের সমালোচনা করিতেছে। কাজেই খাইয়াতকে দলবলসহ মিশর ত্যাগ করিয়া সিরিয়ায় ফিরিয়া যাইতে হয়।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত আরবী-নাটকের প্রসার বন্ধ থাকে। উক্ত খৃষ্টাব্দে সুলায়মান করদাহী স্বীয় অভিনেতা দলসহ মিশরে আগমন করেন। তাঁহার সহিত শেখ সালামত হিজাজীও ছিলেন। মিশর সরকার খেদিবের প্রমোদ-ভবনে অভিনয়ের অনুমতি দেন। তখন ইঁহারা বেশ কৃতকার্য্য হন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহারা আবার লায়লা নাম্নী এক অভিনেত্রী সহ প্রত্যাগমন করেন, এবং এই সময়ে আশাতীত সফলতা লাভ করেন। প্রতিদিন প্রমোদ-ভবন লোকে লোকারণ্য হইতে থাকে। কিছুদিন পরে সরকার প্রমোদ-ভবনে অভিনয় বন্ধ করিয়া দেন।

ইতঃমধ্যে মিশরবাসিগণ নাটকের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠে। স্কুল-মাদ্রাসার ছাত্রগণ এবং উৎসাহী এমেচারগণ এখানে-সেখানে অভিনয় করিতে থাকে। আবদুল্লাহ্ নদীমের পূর্ব্বে নাটকাভিনয়কে কোন মিশরবাসী জীবিকা-রূপে গ্রহণ করিতে সাহস করে নাই। তিনিই প্রথমে আলেকজেন্দ্রিয়ার জিজিনিয়া রঙ্গমঞ্চে 'আল্-ওতন' (Home) এবং 'আল-আরব' নামক নাটকদ্বয়ের অভিনয় করেন। উহাতে খেদিবও উপস্থিত ছিলেন। তিনি অভিনয় দেখিয়া এতই সন্তুষ্ট হন যে, নদীমকে একশত গিণি পুরস্কার দেন।

প্রথম প্রথম যাঁহারা আরবী নাটকের অভিনয় করিতেন, তাঁহারা সাধারণের রুচির দিকে লক্ষ্য করিতেন না। বরং স্বীয় পৃষ্ঠপোষক খেদিব অথবা আমীর ওমরাদের অবসর বিনোদন করাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যখন সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি এদিকে পড়িল, তখন হইতে নাটকীয় সাহিত্যের উন্নতি আরম্ভ হইল। কারণ এখন হইতে লেখকগণ সাধারণের রুচির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সহজে বোধগম্য ভাষায় তাহাদের চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। দেখা গেল, সঙ্গীত ও হাস্যকর প্রহসনাদির দিকেই সাধারণের ঝোঁক বেশী। কাজেই ঐ ধরণের নাটক রচিত হইতে লাগিল। এমন কি, সাধারণ আখ্যায়িকার সহিতও প্রহসনাদি যোগ করিয়া দেওয়া হইত। ক্রমে সাধারণের রুচি মার্জ্জিত হইয়া উঠায় নাটক এবং অভিনয় উভয়ের উন্নতি হইতে লাগিল।

আজ পর্য্যন্ত আরবী ভাষায় যতগুলি নাটক লিখিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ইউরোপীয় নাটকের তর্জ্জমা বা অনুকরণ। প্রথমতঃ অভিনেতাগণই নাট্য-রচনা করিতেন। ক্রমে অন্যান্য সাহিত্যিকগণও নাট্য-রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে শেখ নজীব হাদ্দাদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মৌলিক রচনার মধ্যে শেখ খলীল য়াজজীর 'আল-মরুওৎ অল-ওফা' المروة و الوفا নামক নাটকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কোন বিদেশী অপেরার চেয়ে উহা কোন অংশে হীন নহে।

রাজকীয় পৃষ্ঠ-পোষকতায় আরবী-নাটক এক নবযুগে প্রবেশ করিয়াছে। উপযুক্ত যুবকদিগকে বিদেশে পাঠাইয়া অভিনয়ের কলা-কৌশল শিখাইয়া আনা হইতেছে, এবং সাহিত্যিকগণ মৌলিকভাবে সাধারণের ভাষায় ভাল ভাল নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যুবকগণ নবীন উৎসাহে রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়ের উন্নতি করিতে চেষ্টা পাইতে-ছেন। কাজেই মনে হয়, আরবী-নাটকের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।
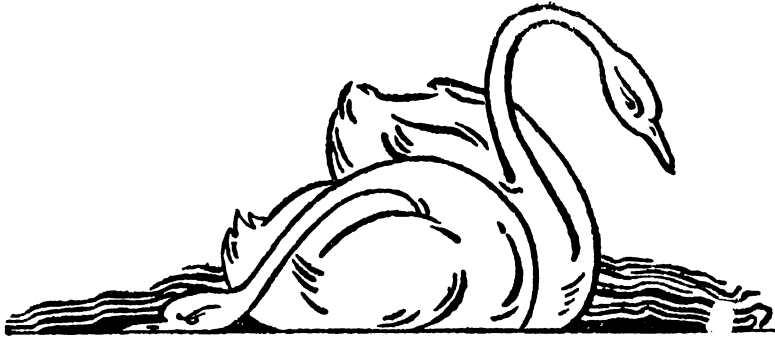
সঙ্কলন

চিনির ইতিহাস

যে চিনি আজ সমস্ত বিশ্বের দরবারে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য হইয়া পড়িয়াছে, এবং আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের প্রতি কাজে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার প্রকৃত ইতিহাসটুকু হয়ত আমরা অনেকেই জানি না, এবং জানিবার সামান্য একটু চেষ্টাও করি না। পূর্ব্বে ভারত এবং আরব হইতে বহু দিন ধরিয়া যে বিকৃত মধু ইউরোপে যাইয়া পৌঁছিত, ইউরোপবাসিগণ তাহাকেই অতি সমাদরে গ্রহণ করিত। উহা এতই দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য ছিল যে, বড় লোক ব্যতীত অন্য কেহ উহা ক্রয়ও করিতে পারিত না। কেবল ঔষধ-পত্রেই উহা ব্যবহৃত হইত। যাহা হউক, ৩০০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই ভারতে বৈজ্ঞানিকগণ এক প্রকারের সুমিষ্ট গাছ-গাছড়ার রস হইতে বর্ত্তমান চিনির প্রথম সংস্করণ আবিষ্কৃত করেন।

ইক্ষুর চাষ

তারপর এই নব আবিষ্কৃত চিনি এতই মহামূল্য হইয়া পড়িল যে, এশিয়াবাসী রাজন্যবর্গের প্রাসাদ ব্যতীত অন্য কোথাও ইহা দেখা যাইত না। রাজ-রাজড়াদিগের যাবতীয় বিলাসের সামগ্রীর ভিতর ইহা অন্যতম সামগ্রী বলিয়া গৃহীত হইত। আমরা ১০০০ খৃষ্টাব্দে ইজিপ্ট এবং অন্যান্য দেশের বিলাসী খলিফাগণের বিলাস-সামগ্রীর তালিকায় ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই। ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে নবযুগের প্রারম্ভেই উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ ইউরোপে ইক্ষুর চাষ প্রথম আরম্ভ হয়। অতঃপর ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিতর অবাধ-বাণিজ্য প্রসারের ফলে এই ইক্ষুদণ্ডের চাষ পশ্চিম ভারতে আরম্ভ হয়। সেই সময় হইতেই চিনির ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সুরু হইল।

শেওলা হইতে চিনি প্রস্তুত

অতঃপর বৈজ্ঞানিক মহলে ইহার কোনরূপ উন্নতি সাধন হইতে পারে কি না, তাহারই গবেষণা আরম্ভ হয়। এই গবেষণার ফলে ১৭৪৭ খৃঃ বার্লিনের বিজ্ঞানাগারের অধ্যক্ষ মিঃ মারগ্রাফ এক প্রকার সেওলা আবিষ্কার করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা উহাকে শর্করা জাতীয় দ্রব্যে পরিণত করেন। মিঃ মারগ্রাফ অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহাকে আবিলতা হইতে মুক্ত করিতে পারিলেন না। অবশেষে ১৭৮৬ খৃঃ তাঁহারই প্রিয় শিষ্য ফ্রাঙ্ক আর্কার্ড (জন্ম ২৮শে এপ্রিল ১৭৫৩) গুরুর এই জীবনব্যাপী সাধনাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইহাকে তিনিও একেবারে আবিলতা হইতে মুক্ত করিতে পারিলেন না বটে, তবে উক্ত শর্করা জাতীয় সেওলার আবাদ করিবার নিমিত্ত বার্লিনের নিকটবর্ত্তী কলডফ নামে একটি যায়গা কিছুদিনের জন্য পত্তনি লইলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এমন আশ্চার্য্যজনক ও অপ্রত্যাশিতভাবে আবাদের কার্য্যে সাফল্য লাভ করিলেন যে, সমস্ত জার্ম্মাণদেশ এই তরুণ বৈজ্ঞানিকের কার্য্য-কলাপের উপর যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহারই কোন এক বন্ধু বৈজ্ঞানিকের সহায়তায় তিনি চিনিকে নানাপ্রকার আবিলতা হইতে কিয়ৎপরিমাণে মুক্ত করিলেন। কিন্তু ইহার বর্ণ-সংস্কার করিতে সক্ষম হইলেন না।

বৈজ্ঞানিকের বাধা

সাফল্য তাঁহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে—সফলতা তাঁহাকে অর্জ্জন করিতেই হইবে, অক্ষমতা বা নিরুৎসাহীতা তাঁহার জীবনের অভিধানের কোন পৃষ্ঠায়ই লেখা নাই। তিনি প্রকৃত বীরের ন্যায় সমস্ত বাধা বিঘ্ন দুর্দ্দমনীয় স্রোতঃস্বতীর ন্যায় দুই হাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময়ে তাহার আরব্ধ কার্য্য সমাপনের জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হয়, তখন আর্কার্ড ১৭৯৯ সালের ১১ই জানুয়ারী তাঁহার দ্বারা প্রস্তুত সামান্য কিছু চিনি তদানীন্তন জার্ম্মাণ-রাজ্যের অধীশ্বর রাজা উইলিয়ম ৩য়কে উপহার প্রদান করিলেন। (উহা এখনও ফরাসী দেশের মিউজিয়মে বাণিজ্য শাখায় রক্ষিত) সম্রাট আর্কার্ড প্রদত্ত নমুনায় অত্যন্ত সুখী হইয়া তাঁহাকে উৎসাহ দান করার জন্য তাহার যাবতীয় ব্যয় বহন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু আর্কার্ড তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনায় সাফল্য লাভ করিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নেপোলিয়নের সাহায্য

জার্ম্মাণীতে তাহার আরব্ধ কার্য্যকে শেষ করিবার মত উপযুক্ত লোক কেহই ছিল না, কিন্তু গুণগ্রাহী ফরাসী দেশ এই বৈজ্ঞানিকের কথা ভুলিতে পারিল না। ফরাসী দেশের বৈজ্ঞানিকগণ তাহার আরব্ধ কার্য্য শেষ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নেপোলিয়ন ফরাসী সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি বদ্ধপরিকর। তিনি এই বৈজ্ঞানিকদলকে রাজকোষ হইতে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই অর্থ সাহায্যের ফলে ফরাসী দেশ বার্ষিক ৩৩০০০ হাজার টন চিনি প্রস্তুত করিতে লাগিল। এই সময়ই বৈজ্ঞানিক উপায়ে জীব-জন্তুর হাড়ের সাহায্যে শর্করার বর্ণ সংস্কার সাধিত হইল, তাহার পর জগতের অধিকাংশ স্থানেই এই সুন্দর লাভজনক ব্যবসায়টি অবাধ গতিতে ছড়াইয়া পড়িল। —পকারেৎ

মাতৃত্ব-বিদ্যা

আজকাল আমরা প্রায়ই "মাতৃত্ব-বিদ্যার" কথা শুনিতে পাই। যে-কোন বিদ্যা বা শিল্পেই মানুষের নৈপুণ্য এবং বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। শিল্প-শিক্ষায় শিল্পীকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়—শিল্পকার্য্য করার জন্য তাহার বিশেষ নিপুণতা ধৈর্য্য এবং পরিশ্রমেরও প্রয়োজন হয়।

যে-কোন শিল্পীর কথাই ভাবা যাউক, যথা—কাঠুরে, মিস্ত্রী, চর্ম্মকার, অথবা কুম্ভকার, যদি তাহাকে সফল হইতে হয়—তবে কি তাহার ঐ সকল গুণের প্রয়োজন হয় না? মাতৃত্ব মায়ের কাজ—মাতার জীবনব্যাপী পরম প্রয়োজনীয় সাধনা। ইহাতে শুধু মায়েরই জ্ঞান, ধৈর্য্য, নৈপুণ্য এবং প্রেমের প্রয়োজন হয় তাহা নহে, পরন্তু শিশু যাহাদেরই সংস্পর্শে আসে, তাহাদেরও ঐ সকল গুণের বিশেষ প্রয়োজন।

সুস্থ শিশু জাতির প্রধান সম্পদ—কেন? কারণ তাহারাই জাতির ভবিষ্যৎ মেরুদণ্ড। আজ শিশুরা যে-প্রকার হইবে, ভবিষ্যতে জাতি সেইরূপ হইয়া উঠিবে। তাই মাতা, ধাত্রী, শিক্ষক সকলেই জাতীয় সম্পদের রক্ষক।

প্রত্যেক বিষয়ের আরম্ভই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে ভিত্তি প্রতিষ্ঠার ভুল হইয়াছে, সেখানে ঐ ভিত্তির উপরে বহুকাল-স্থায়ী হইবে এমন সুদৃঢ় সৌধ-রচনা সম্ভব হয় না। কেবল মাত্র গত কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, জীবনের প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যেই স্বাস্থ্য, চরিত্র এবং বুদ্ধি-বৃত্তির ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা হয়। শিশুদের ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত, যদি সেই সকল শিশুর জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য করিতে চান—তবে শিক্ষক, ধাত্রী এবং মাকে সর্ব্বপ্রথমে এই সত্যকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ বৎসরের এবং কখনো কখনো সাত বৎসরের ভার সম্পূর্ণরূপে মাতার উপরে। শিশু স্বাস্থ্যবান ও রূপবান, সুখী ও বুদ্ধিমান হইবে, কি একেবারে বিপরীত হইবে, তাহা সম্পূর্ণরূপে মাতার উপরই নির্ভর করে।

আদর্শ মায়ের কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন:—

(ক) স্বাভাবিক অবস্থায় পশু এবং মনুষ্য-মাতার শিশুর প্রতি প্রেম থাকে। এই প্রেমের জন্য মা শিশুর মঙ্গলের নিমিত্ত তাহাকে খাওয়ানো, আদর করা এবং যত্ন করায় আনন্দ-লাভ করিয়া থাকেন। মায়ের প্রেম বুদ্ধিমত্তা এবং স্বার্থহীনতা দ্বারা পরিচালিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, যে-শিশুর নিদ্রা যাওয়া উচিত, সে ক্রন্দন করিতেছে, (ধরা যাউক সে শিশু স্বাস্থ্যবান এবং সবল) মা মূর্খ এবং স্বার্থপর হইলে বলেন,—"আমি শিশুর ক্রন্দন সহ্য করিতে পারি না," এবং শিশুকে তুলিয়া লইয়া খাওয়ানর ব্যবস্থা করেন। যে মা বুদ্ধিমতী এবং যথার্থ স্বার্থহীনা, তিনি শিশুকে তোলেন না, কারণ তিনি জানেন যে, শিশুকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে খাওয়াইলে তাহার হজম-শক্তির ব্যাঘাত হয়, এবং ইহা তাহার চরিত্রের পক্ষে ততধিক অনিষ্টকর—কারণ সে জানে যে, শুধু কাঁদিয়াই যাহা তাহার ইচ্ছা, তাহাই আদায় করিতে পারে।

(খ) জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়, শুধু অনুমান অথবা কল্পনায় কাজ চলে না। পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক উপায়ের ফলে আমাদের পক্ষে শিশুকে সুস্থ ও সবল করিয়া তোলা সহজ হইয়াছে। কেবলমাত্র শিক্ষার জন্যই আমাদের ঔৎসুক্য এবং ইচ্ছার প্রয়োজন।

(গ) শিশুর পক্ষে যাহা মঙ্গলকর, তাহা করিবার সাহস থাকা আবশ্যক। অন্যলোকেরা কি বলে, সে দিকে কর্ণপাত করিতে হয় না। যখন কিছু শিক্ষা করিয়াছেন, তখন সাহসের সহিত তাহা কার্য্যে পরিণত করুন।

(ঘ) যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, স্বাস্থ্য বহুল পরিমাণে জ্ঞানের ফল, এবং আমরা যাহা জানি, তাহা কার্য্যে পরিণত করিলেই হয়, তাহা হইলে সহজেই বোঝা যায় যে, প্রত্যেকেই কিয়ৎপরিমাণে স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারেন। স্মরণ রাখিবেন, স্বাস্থ্যও ব্যাধির ন্যায় সংক্রামক। আমরা শিশুদের নিকট স্বাস্থ্যের জীবন্ত আদর্শস্বরূপ হইতে চাই।

সন্তান-সম্ভবার কর্ত্তব্য

বিজ্ঞান স্বাস্থ্য বিষয়ে আমাদিগকে বলে, আরোগ্য করার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করাই শ্রেয়। স্বাস্থ্য-লাভের জন্য গোড়ার ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা খুব ভাল হওয়া চাই। প্রসবের পূর্ব্ব সময়টাই এই ভিত্তি-প্রতিষ্ঠার সময়, এবং ভাবীশিশুর স্বাস্থ্য তাহারই উপর নির্ভর করিবে। এই সময়ে মায়ের রক্ত-স্রোত হইতে আহৃত দ্রব্যেই শিশুর মন ও শরীর গঠিত হয়। যদি মা সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকেন, তবে শিশুও সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিবে। মায়ের জানা উচিত যে, কতকগুলি স্বাস্থ্যের বিধি সকল মানুষের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, শিশুই হউক, আর বয়স্কই হউক, এই নিয়মগুলি জীবন-ব্যাপী পালন করিতে হইবে—বিশেষভাবে গর্ভকালীন ত পালন করিতে হইবেই। নিম্নে কতকগুলি পালনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা গেল:—

১। দিন-রাত পবিত্র বাতাস, রক্ত পরিষ্কার রাখার জন্য এবং বিশেষ-ভাবে ঠাণ্ডা লাগা ও কাসি ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজন, তাই জানালা খোলা রাখিবেন।

২। সূর্য্যালোকে শরীর সবল করে, রোগ-বীজাণু ধ্বংস করে, এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি-সাধন করে। সম্ভব হইলে প্রতিদিন কিছু সময়ে রৌদ্র-কিরণে অতিবাহিত করিবেন।

৩। মাংসপেশীগুলিকে সুস্থ এবং শরীর শক্ত ও নীরোগ রাখার জন্য ব্যায়াম আবশ্যক। ভ্রমণ করাই সব চেয়ে সহজ ও নিরাপদ ব্যায়াম। সতর্কতার সহিত অত্যন্ত ক্লান্ত হইবার পূর্ব্বেই থামিতে হইবে। যে সকল কঠিন পরিশ্রমে আপনি অনভ্যস্ত, তাহা করিবেন না। অতিরিক্ত ভার উত্তোলন করা, হঠাৎ কোন প্রকার ঝাঁকি এবং অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক ক্লান্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে।

৪। খাদ্য সুসঙ্গত ও পরিমিত হওয়া আবশ্যক। প্রতিদিনের খাদ্যে কিছু ফল ও তরি-তরকারী থাকা দরকার। গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাদ্যে অজীর্ণ রোগ হইতে পারে বলিয়া উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

৫। জল খাওয়া বিশেষ প্রয়োজন। জলে রক্ত পরিষ্কার করে, অন্ত্রের সকল ময়লা পরিষ্কার করিয়া বাহির করিয়া দেয়, এবং কোষ্ঠবদ্ধতা-নিবারণের সাহায্য করে। দিনে যত জল সম্ভব পান করিবেন, বিশেষতঃ প্রাতে জল পান করা শরীরের পক্ষে একান্ত উপকারী। খুব সতর্ক হইতে হইবে যেন, খাবার জল ফুটাইয়া লইয়া পরিষ্কার কলসী অথবা কুঁজোতে রাখিয়া দেওয়া হয়।

৬। নিয়মিত ভাবে পেট পরিষ্কার হওয়া সর্ব্বদা প্রয়োজন, কারণ শরীরের সকল ময়লা পাকস্থলীতে থাকিয়া যায় ও পচিতে থাকে এবং সমস্ত শরীর বিষাক্ত করিয়া তোলে। কোষ্ঠবদ্ধতা হইতে মাথাধরা, অবসাদ, অম্লশূল এবং বহুবিধ ব্যাধির উৎপত্তি হয়। প্রতিদিন অন্ততঃ একবার পাকস্থলী পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা

রোগ জন্মিতে পারে। নিম্নলিখিত প্রণালীতে উহার প্রতিরোধ করা যাইতে পারে :—

(অ) রেচক খাদ্য খাইবেন, যথা—ভারতীয় শস্য, আটা, দাল, কলাই, মটর, শাক-সব্জি (কাঁচা, রান্না) এবং ফল।

(আ) উপরোক্ত প্রণালীতে জল-পান।

(ই) ব্যায়াম।

(ঈ) নিয়মিত অভ্যাস না হওয়া পর্য্যন্ত অল্প-মাত্রায় এপারিয়েন্ট ব্যবহার করা যাইতে পারে। ধীরে ধীরে ঐ ঔষধ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(উ) খুব বাতাস-যুক্ত ঘরে নিদ্রা ও বিশ্রাম করা উচিত। রাত্রে ৮ঘণ্টা নিদ্রা যথেষ্ট। গর্ভাবস্থায় পা উঁচুতে তুলিয়া অপরাহ্নে এক ঘণ্টা বিশ্রাম লওয়া উচিত। ভাবী মাতাকে গর্ভাবস্থায় দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসেই ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন। গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবকালে যে সকল ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহা প্রথমে জানিতে পারিলে সবই নিবারণ করা যায়। নিম্নলিখিত কিছু ঘটিলেই ডাক্তারকে খবর দিতে হইবে :—

(ক) রক্তস্রাবে ডাক্তার আসা পর্য্যন্ত শয্যায় শুইয়া থাকিতে হইবে।

(খ) অধিক মাসে চাপের জন্য পা ফুলিতে পারে, কিন্তু যদি হাত এবং মুখও ফোলে, তাহা হইলে ডাক্তার দেখাইতে হইবে। শিরা ফুলিলেও ঐ বিধি।

(গ) তিন মাস পরে দাঁত পরীক্ষা করা এবং চিকিৎসা করা প্রয়োজন; খারাপ দাঁত প্রায়ই অস্বাস্থ্যের কারণ। শিশুর জন্মের দুই মাস পূর্ব্ব হইতেই স্তনের বোঁটা প্রস্তুত করিতে হইবে; তাহা হইলে শিশু-পালনে অশেষ উদ্বেগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

(ঘ) প্রতিদিন ঠাণ্ডা জলে স্তন ধৌত করিয়া শক্ত গামছা দ্বারা রগ্‌ড়াইয়া দিতে হইবে।

(ঙ) স্তনের বোঁটা প্রতিদিন টানিয়া তেলযুক্ত অঙ্গুলিদ্বারা বোঁটাগুলিকে আস্তে আস্তে মর্দ্দন করিতে হইবে। যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে বোঁটাগুলিকে সাবান এবং নখ পরিষ্কারের ব্রুস দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া শক্ত করিয়া নিতে হইবে। —ঢাকা প্রকাশ

বাঙ্গালীর অজ্ঞতা

বাংলাদেশের বনে-জঙ্গলে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে 'বন্যফল' উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা আমাদের অজ্ঞতাবশতঃ সে সমস্ত ফলের উপকারিতা এবং আবশ্যকতা বুঝিতে না পারিয়া ঐগুলিকে বনে-জঙ্গলেই নষ্ট হইতে দিতেছি। এইভাবে দেশের কত অমূল্য সম্পদই যে আমরা হেলায় হারাইয়া ফেলিতেছি, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই ফলগুলিকে একটু বুদ্ধি করিয়া ব্যবসায়ের পথে আনিতে পারিলে দেশের অর্থকৃচ্ছ্রতা এবং বেকার-সমস্যার যে কতকটা সমাধান হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

সুখের বিষয়, বর্ত্তমানে বাংলার ইনডাষ্ট্রীয়াল ডিপার্টমেণ্ট এই দিকে মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং ইতঃমধ্যেই অনেকগুলি আবশ্যকীয় তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহাদের আবিষ্কৃত তথ্যগুলি ইনডাষ্ট্রীয়াল ডিপার্টমেণ্টের বুলেটিনে যথারীতি বাহির হইতেছে। আমরা ঐ বুলেটিন হইতে যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা সাধারণের জানিবার জন্য নিম্নে প্রকাশ করিতেছি :—

পানাল নামক একপ্রকার ফল সমুদ্রোপকূলের নিকটবর্ত্তী স্থানে বিশেষতঃ নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও সন্দ্বীপের জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এই ফল দ্বারা সাবান প্রস্তুতের উপযোগী এক প্রকার তৈল পাওয়া যাইতে পারে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন—পানাল ফল হইতে প্রস্তুত তৈল সাবান তৈয়ারির পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই তৈল হইতে কাপড়-কাচা সাবান এবং তৈলকে ভালরূপে পরিষ্কার করিয়া উৎকৃষ্ট গায়ে-মাখা সাবান প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের অজ্ঞতা-বশতঃ এই কার্য্যকারী ফলগুলিকে জগতের কোন কাজে না লাগাইয়া ঝরিয়া পড়িয়া যাইতে দিতেছি।

রয়না গাছ বাংলা দেশের সর্ব্বজন পরিচিত। বাংলার সমস্ত জেলায় এই গাছ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গাছের ফলকে রয়না ফল বলে। পূর্ব্বে এই ফল দ্বারা প্রস্তুত তৈল প্রদীপ জ্বালানোর কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু কেরোসিনের বহুল প্রচারের ফলে আমাদের এই জাতীয়-শিল্পটি এদেশ হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। এই ফল প্রতি বৎসর অজস্র পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৪৬নং বুলেটিনে সাবান বিশেষজ্ঞ জনৈক ব্যক্তি বলিতেছেন—সাবান প্রস্তুতের পক্ষে ইহা একটী অত্যাবশ্যকীয় তৈলরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

তারপর নিমের কথা বলা যাইতেছে। বাংলাদেশে রয়নার চেয়েও নিম বেশী পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। নিমফলের তৈলের দুর্গন্ধের জন্যই অনেকে মনে করেন—ইহাকে কোন প্রকারেই ব্যবহারোপযোগী করা যাইতে পারে না। নিম তৈল চর্ম্মরোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। সাবান প্রস্তুতের তৈলগুলির মধ্যেও নিমের স্থান সর্ব্বপ্রথম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঔষধে নিমের আবশ্যকতা অনবগত থাকার দরুণ এই ফল বহু পরিমাণে অনর্থক নষ্ট হইয়া যাইতেছে। বুলেটিনে প্রকাশ, ইহার দুর্গন্ধ নষ্ট করিয়া ইহাকে সহজেই সুগন্ধযুক্ত করা যাইতে পারে এবং ব্যবহারের উপযোগী তৈল বা সাবান প্রস্তুত হইতে পারে। ভারতে বর্ত্তমানে ইহার ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু আরও অধিকতর প্রসার হওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

কারঞ্জ তৈল নিম-তৈলের মতই ঔষধে ব্যবহৃত হইতে পারে। ফলের বাৎসরিক উৎপন্নের সহিত তুলনা করিলে তৈল প্রস্তুতের মাত্রা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইবে। সাবান অভিজ্ঞেরা এই তৈলকে সাবান প্রস্তুতে লাগাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ এখনও তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই ফলের তৈল দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

—ষ্টেট্সম্যান
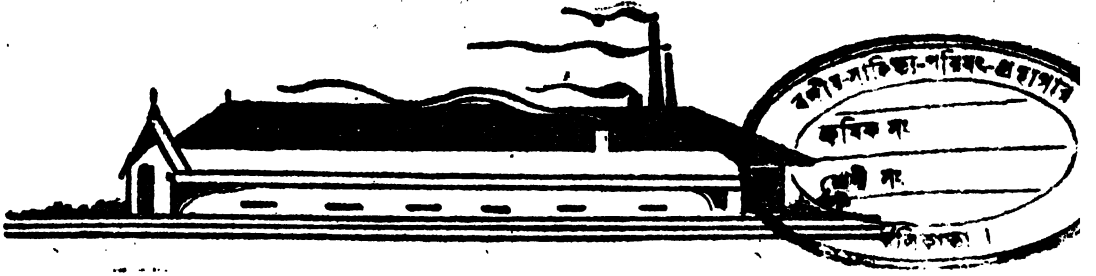
কাঁচা মাছ ও শুটকী মাছ

—আহ্‌মদুর রহমান নেজাম,

বি-এ (কলিঃ) বি-এস্‌-সি (কিশারী) এম্‌-এস্‌-সি (ওয়াশিং) এফ্‌-জেড্‌-এস্‌; এফ্‌-আর-এস্‌ (লণ্ডন)

আমাদের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য যতগুলি অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য রয়েছে, তন্মধ্যে খাদ্য-সার, শর্করা, চর্ব্বি ও ভাইটামিনই প্রধান। আহার্য্যের মধ্যে যাহাতে উপযুক্ত অনুপাতে উপরোক্ত দ্রব্যাদি থাকে, সে-দিকে আমাদের বিশেষ-দৃষ্টি রাখা দরকার। নতুবা স্বাস্থ্যের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। খাদ্যের মধ্যে খাদ্য-সারের অভাব ঘটিলে শরীরের মাংস-পেশী বর্দ্ধিত ও বিকশিত হয় না, এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির বিলক্ষণ ক্ষতি হয়। দেহের উত্তাপ রক্ষার জন্য Carbohydrate বা শর্করার প্রয়োজন। ভাইটামিন পাঁচ প্রকার। আহার্য্যের মধ্যে ইহার যে-কোনটীর অভাব হইলেই কোন না কোন রোগ দেখা দেয়। মাছ, মাংস ও ডিম হতে আমরা অধিকাংশ খাদ্য-সার সংগ্রহ করে থাকি।

রুই, কাতলা, মৃগেল, চিতল, ভেটকী, ইলিশ, বাটা ও ভাঙ্গন বা খরুল মাছে খাদ্য-সারের অংশ প্রায় মাংসের সমান বলিয়া ডাঃ চুনীলাল বসু ও অন্যান্য জীব-তত্ত্ববিৎদিগের (Bio-Chemists) ধারণা। মাংসের মধ্যে গো-মাংসেই সব চেয়ে বেশী খাদ্য-সার বা প্রোটিন আছে। বাঙ্গালা-দেশে শতকরা প্রায় ৪৩ জন হিন্দু। তাদের জন্য গো-মাংস নিষিদ্ধ। অবশিষ্ট প্রায় ৫৪ জন মুছলমানের মধ্যেও অনেক লোক গো-মাংস খায় না, বা নানা-কারণে খেতে পারে না। বাঙ্গলার আবহাওয়ায় গো-মাংস ভক্ষণ করা অনেকের পক্ষে একটু কষ্ট-সাধ্য। যাহা হজম হয় না, তাহা খাওয়া বৃথা বরং অনিষ্টকর। পাড়াগাঁয়ে একমাত্র কপোত ও মুরগী ছাড়া অন্য মাংস প্রায়ই পাওয়া যায় না। এদেশে শতকরা প্রায় ৮৫ জন লোক পাড়াগাঁয়ে বাস করে। সুতরাং কয়জন লোক গো-মাংস খেতে পায়, তাহা সহজেই অনুমেয়। যে দেশের লোকের দৈনিক আয় /৩ পয়সা, যে দেশে শতকরা ৪০ জনেরও বেশী লোক অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হয়; তাদের পক্ষে আহার্য্যের মধ্যে নিয়মিত খাদ্য-সার ও চর্ব্বি সরবরাহের জন্য গরু, ছাগল, মুরগী বা কপোতের মাংস সংগ্রহ করা শুধু কষ্ট-সাধ্য নয়, কতকটা অসম্ভবও বটে।

মাছ, মাংসের চেয়ে সহজে হজম হয়। প্রায় প্রত্যেক ভাল মাছেই চর্ব্বি ও খাদ্য-সার বর্ত্তমান। বাঙ্গালা নদী-মাতৃক দেশ, ইহা ছাড়া পুকুর, ডোবার অভাব অন্ততঃ পল্লী-গ্রামে নেই। যে-কোন গরীব-দুঃখী সামান্য চেষ্টা করলেই প্রত্যেকের বাড়ীর আশ-পাশের পুকুর, ডোবায় মাছের চাষ করে সমস্ত বৎসরের খাওয়ার মাছের আয়োজন করতে পারে। গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী পুষতে হলে তাদের খাদ্য ও বাস-স্থানের বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। লীলাময়ের এমনি লীলা যে, যেখানে জল সেখানে কোন না কোন মাছ আছেই, এবং আমাদের বিনা-চেষ্টায় জলীয় কীটাণুকীট ও জীবাণুর দ্বারাই মৎস্য-জগতে খাদ্য-সমস্যার সমাধান সুচারুরূপে হয়ে যাচ্ছে।

Cod মাছের যকৃতে ভাইটামিন A ও D বর্ত্তমান। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কড্ মাছ দেখা যায় না। হাঙ্গর মাছের যকৃতের তৈলে ভাইটামিন A ও D প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, তাহা আমেরিকার University of Washington ও কানাডার University of British Columbia-র বিজ্ঞানাচার্য্যগণ বহু বৎসর গবেষণার পর প্রমাণ করিয়াছেন। এদেশে হাঙ্গর যথেষ্ট পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে হাঙ্গরের যকৃতের তৈল বের করে তাতে যে

ভাইটামিন A ও D র অভাবজনিত রোগ নিবারণ করা যায়, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

আহার্য্যের মধ্যে আইয়োডিনের (Iodine) অভাবে গলগণ্ড হয়। চিংড়ী জাতীয় মৎস্যে আইয়োডিন প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। সময়ে সময়ে উহা খেলে গলগণ্ড রোগ থেকে বাঁচা যায়।

যত প্রকারের লবণ ও খনিজ দ্রব্য আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে প্রয়োজন, তাহার কোন-কোনটা সমুদ্রের জলে, আবার কোন-কোনটা বৃষ্টি বা পার্ব্বত্য স্রোতের জলে বর্ত্তমান। জলজ মৎস্যেও উহা প্রায় একই অনুপাতে রয়েছে। মৎস্যাহারে উপরোক্ত অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অনায়াসে পাওয়া যায়।

আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় খাদ্য-সার, চর্ব্বি, শর্করা, ভাইটামিন ও খনিজ দ্রব্যাদির মধ্যে একমাত্র Carbohydrate বা শর্করা ছাড়া সবই যথেষ্ট পরিমাণে মৎস্যে বর্ত্তমান। শর্করা, ভাত ও ডালে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। বাঙ্গালী যদি উপযুক্ত পরিমাণে ভাত ও মাছ খেতে পায়, তবে তাদের খাদ্য-সমস্যার বিহিত সমাধান হয়।

কাঁচা মাছের ৭৫—৮০ ভাগ জল শুকাইয়া গেলে উহা শুট্‌কীতে পরিণত হয়। সাধারণতঃ কাঁচা মাছ রৌদ্রেই শুকান হয়। চিংড়ী (স্থান বিশেষে ইহা 'ইচা' মাছ নামে পরিচিত) মাছ ছাড়া অন্য কোন প্রকারের মাছ আগুনে শুকাতে প্রায়ই দেখা যায় না। সূর্য্যের তাপ যতই প্রখর হোক না কেন, ফুটান জলের তাপের চেয়ে উহা ঢের কম। সূর্য্য-তাপ ১০৯।১১০ ডিগ্রী ফাহরেন হাইটের উর্দ্ধে বাঙ্গালা দেশে প্রায়ই উঠে না। ফুটান জলের তাপমান ২১২ ডিঃ ফাঃ। অত্যধিক তাপে ভাইটামিন নষ্ট হয় ও খাদ্য-সার গলে যায় বলে বৈজ্ঞানিকদিগের ধারণা। কিন্তু কত ডিগ্রী তাপমানে উহা নষ্ট হয় ও গলে যায়, তার এখনও শেষ সিদ্ধান্ত হয় নি। ২১২ ডিঃ ফাঃ ফুটান জলে কাঁচা মাছ রান্না করলে যদি খাদ্য-সার ও ভাইটামিন না কমে, তবে ১০৯।১১০ ডিঃ ফাঃ সূর্য্যতাপে শুকান শুট্‌কীতে যে উহা নষ্ট হবে, তাহার মূলে কোন সত্য নাই।

শুট্‌কী মাত্রেই দুর্গন্ধ, এ ধারণা ভিত্তি-হীন। তাজা মাছ শুকান হলে তাতে মাছের স্বাভাবিক গন্ধ ছাড়া অন্য কোন খারাপ গন্ধ থাকতে পারে না

কেহ কেহ বলেন, শুট্‌কীতে পোকা হয়, সুতরাং ইহা অখাদ্য। শুকটীর পোকা প্রায়ই মাছির ডিম থেকে হয়, এবং উপযুক্ত আবহাওয়া পেলে উহা মাছিতে পরিণত হয়। Maggot বা ক্রিমিগুলি অল্পক্ষণ উত্তাপে রাখলেই মরে যায় বা চলে যায়। পোকায় খেলে মাছ অখাদ্য হয় না। জীবাণু-তত্ত্ববিদ্‌রা (Bacteriologists) নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে, দুগ্ধে নির্দ্দিষ্ট-শ্রেণীর জীবাণু বা Bacteria না জন্মালে দধি ও পনির হয় না। জাম, খেজুর, আঁকের রসে নির্দ্দিষ্ট-শ্রেণীর জীবাণু উৎপন্ন হলেই উহা সির্কায় পরিণত হয়।

দধি, পনির ও সির্কা জীবাণু বা তার রস সহ খেতে যদি আমাদের ঘৃণা না জন্মে ; তবে পোকা ছাড়ান শুট্‌কী খেতে অশ্রদ্ধার কোন কারণ আছে কি ? শুট্‌কীর প্রতি ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক।

শুট্‌কী কতকটা শুষ্ক-পাক। কারণ, ইহাতে চর্ব্বি ও খাদ্য-সার অনেকটা ঘনীভূত। কাঁচা মাছের ১০-২০ ভাগ খাদ্য-সার ও ৬০-৭০ ভাগ জল। সুতরাং জল-মিশান কাঁচা মাছ যে পরিমাণে খাওয়া যায় বা হজম করা যায়, চর্ব্বি ও খাদ্য-সার কেন্দ্রীভূত শুট্‌কী সে পরিমাণে হজম করা যায় না। শুট্‌কী কাঁচা মাছের অর্দ্ধেক পরিমাণে খেলেই যথেষ্ট।

বোম্বাই, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, বিহার, সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী বাঙ্গালা দেশ ও ব্রহ্ম দেশে প্রচুর শুট্‌কীর আমদানী হয়। শুট্‌কী যদি অখাদ্যই হত, তবে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ডের শুক্‌নো হেরীং (ইলিশ জাতীয় মাছ) স্কটল্যাণ্ড ও ইউরোপের স্থানে স্থানে ইউরোপীয়ান ও আমেরিকানদের জন্য দেশ-বিদেশে চালান হচ্ছে কেন ? তারা আমাদের চেয়ে স্বাস্থ্যের মূল্য বেশী বুঝে ও আহার্য্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। সমাক্ অনুসন্ধান করলেই জানা যাবে যে, বোম্বাই থেকে অনেক 'বোমলা' বা 'লটীয়া' শুট্‌কী Bombay duck নামে বিলাতের বহু উচ্চদরের হোটেলের ডাইনিং টেবিলের শোভা বর্দ্ধন করছে। স্থানীয় Cold Storage ও Railway Co-operative Store এ ও শুক্‌নো হেরীং, হেডক, ও সেলমন ইউরোপীয়ানদের রসনা-তৃপ্তির জন্য বিরাজ করছে।

খাদ্যের অবশ্য-প্রয়োজনীয় অভাবাদি মোচনের জন্য কাঁচা মাছ এবং তার অভাবে শুট্‌কী আহার্য্যে উপযুক্ত পরিমাণে সংযোগ করা বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-রক্ষার্থে একান্ত আবশ্যক।

মঙ্গল-ভবিষ্যৎ

—গল্প— —ডাঃ লুৎফর রহমান

(৩)

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ভিলাপোর দপ্তরে পুলিশ কর্ত্তৃক সেই চিঠিখানি হাজির করা হইয়াছিল। হঠাৎ তাঁহার দপ্তর হইতে চিঠিখানি যে কেমন করিয়া হারাইয়া গেল, তাহা কেহ বলিতে পারিল না। অফিসের সর্ব্বত্র চিঠিখানি তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও পাওয়া গেল না।

চিঠিখানি যে একজন ন্যাশন্যালিষ্টের লেখা, এবং সেই জাতীয়তাবাদী বিপ্লব-পন্থী যে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ভিলাপোর বৃদ্ধ পিতা এবং তিনিই যে চিঠিখানি বিশ্বস্ত জর্জ্জের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, একথা জর্জ্জ কিংবা আর কেহ বুঝিতে না পারিলেও, ম্যাজিষ্ট্রেট স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন। নিজকে নিরাপদ এবং তাঁহার চাকুরীর উন্নতির পথকে নিষ্কটক করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ভিলাপোর একটা বিচারের প্রহসন করিয়া অতি তাড়াতাড়ি জর্জ্জকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কারাগারে পাঠাইলেন। তাঁহার পিতা বিপদে না পড়েন এবং তাহার নিজের চাকুরীর কোন ক্ষতি না হয়, এই জন্য তিনি চিঠিখানি নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিলেন এবং নিরপরাধ জর্জ্জকেও সম্মুখ হইতে সরাইয়া দিলেন। এই গুরুতর পাপের শাস্তি তাঁহাকে মানুষের হাতে না হইলেও ঈশ্বরের হাতে অতি কঠিন ভাবে পাইতে হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে জানিতে পারিব। জর্জ্জের পক্ষ হইতে একটা নামমাত্র আপীল করা হইল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না।

জর্জ্জ বিচার শেষ হইলে মাটির অনেক নীচে সমুদ্র-কূলের বিখ্যাত সরকারী ফরাসী-জেলের এক কারাকক্ষে নীত হইল। কতকগুলি সরকারী কর্ম্মচারী এবং কতকগুলি মায়া মমতাহীন সিপাহী তাহাকে এই অন্ধকার কারা-গৃহে বন্ধ করিয়া রাখিয়া আসিল। সেখানে তাহার হাতে ও পায়ে বেড়ী দেওয়া হইল। পাছে পলাইয়া যায়, এই ভয়ে তাহার কোমরেও একটি লৌহ-বেড়ী পরাইয়া দেওয়া হইল।

সেই অন্ধকার ঘরে বায়ু চলাচল করে না, বাহির হইতে কোন মানুষের শব্দ কাণে পৌঁছে না। সরকারী জেলে আরও বহু কয়েদী ছিল। তাহাদের অন্ধকার-জীবনের প্রতি সহানুভূতি জানাইবার মত কেহ ছিল না। কাহারও সহিত কাহারও দেখা সাক্ষাৎ হইবার কোন উপায় ছিল না। যে যাহার মত বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া আপন কারা-বিবরে অবস্থান করিত এবং সেইখানেই মলমূত্র ত্যাগ করিত। প্রাতে ও সন্ধ্যায় বাহির হইতে মাটিতে একখণ্ড পোড়া রুটী ও একখণ্ড লবণহীন সিদ্ধ মাংস ভিতরে ফেলিয়া দেওয়া হইত। কয়েদীরা তাহাই কুকুরের মত মাটী হইতে মুখ দিয়া তুলিয়া খাইত, কারণ প্রায়ই তাহাদের হস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিত। জর্জ্জ একজন বড় রকমের বিপ্লবী, সুতরাং তাহার হস্ত-পদের স্বাধীনতা যে সর্ব্বাগ্রে হরণ করা হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে!

সেই অন্ধকার কারাগৃহে মাটির উপর জর্জ্জ শৃঙ্খলিত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। তাহার অপরাধটা কি, তা সে পুনঃ পুনঃ ভাবিয়া ঠিক করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন মতেই সে তাহা ঠিক করিতে পারিল না।

মানুষের ভাগ্য কি এমনভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে! সে স্বপ্ন দেখিতেছে, না সত্যই তাহার ভাগ্যের নির্ম্মম

বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহা সে অনেক সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। এক দিন, দুই দিন করিয়া সাত দিন পরে জর্জ্জ বুঝিল, তাহার বর্ত্তমান অবস্থাটা স্বপ্ন নয়, সত্য!—বিবাহ-সভা হইতে সে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। তাহার মণিবন্ধে যখন হাত-কড়া লাগান হয়, তখন পুরোহিতের বেদি-পার্শ্বে তাহার প্রিয়তমা শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল। ওঃ, সে যে কি অসহ দুঃখ! হায়! কি পাপে তাহার প্রতি তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা এই কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন! মানুষ কি মানুষকে এত বড় কঠিন শাস্তি দিতে পারে?

নিশ্চয়ই সে মুক্তি পাইবে।—হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাকে শৃঙ্খল-মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। জেল-মুক্ত হইয়া সে আবার তাহার প্রণয়িনীর সম্মুখে উপস্থিত হইবে। আহা, সে কথা ভাবিতেও আজ কত সুখ! কিন্তু সত্য করিয়া জর্জ্জের ভাগ্যের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। অন্ধকার কয়েদ-ঘরের দুর্গন্ধ হাওয়া-বাতাসের অবসান হইল না।

প্রথম সাত দিন জর্জ্জ কিছুই আহার করিল না। শুষ্ক-রুটী এবং মাংস সিদ্ধ যেমন প্রহরী ফেলিয়া যাইত, তেমনি অবস্থায় পড়িয়া রহিত। কয়েদীর এই অবস্থায় প্রহরীর পাষাণ মন ভিজিত না। সে ক্রোধে বকিয়া বলিয়া উঠিত—ব্লাডি! কুকুর! কতদিন না খাইয়া থাকিবি?

কয়েদিগণকে যে খাদ্য দেওয়া হইত, তাহা কুকুরের উপযোগী খাদ্য হইতে পারে, মানুষের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা অসম্ভব। চামড়ার মত নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়েকখণ্ড শুষ্ক রুটী আর কয়েক খণ্ড দুর্গন্ধ লবণহীন পোড়ান মাংস—ইহাই কয়েদীর খাদ্যের বহর ছিল। সরকার হইতে কয়েদীদের জন্য যাহা-কিছু বরাদ্দ ছিল, তাহার অধিকাংশ চুরি হইয়া যাইত।

জেলের কর্ম্মচারীরা হতভাগ্য কয়েদীদের মুখের গ্রাস চুরি করিয়া নিজ পরিবার প্রতিপালন করিত,—সামাজিক মর্য্যাদা, জাঁকজমক ও ঠমক রক্ষা করিত। কেহ দেখিবার বা বিচার করিবার ছিল না। পরিদর্শকেরা কয়েদীদের উপর কঠিন শাসন পূর্ণ মাত্রায় চালান হইতেছে কি না, তাহাই দেখিতেন। নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী কর্ম্মচারীদের পদ-মর্য্যাদা সর্ব্বাগ্রে বাড়িত। উত্তম সাজ-সজ্জা, পরিষ্কার উঠান, চুণকাম করা জেলখানার সাদা ধপ্‌ধপে দেওয়াল, এবং সুশৃঙ্খল ও নিয়মিত নমস্কার পাইয়া তিনি পরিদর্শন বহিতে "উত্তম" লিখিয়া চলিয়া যাইতেন।

(৪)

হায়! সত্যই জর্জ্জ কারাগারে বন্দী হইয়াছে। সেই ইটালীতে একটী ভদ্রলোক তাহাকে একখানি চিঠি দেয়—ঐ চিঠিখানি পুলিস তাহার পকেট হইতে ছিনাইয়া লয়। ঐ চিঠিখানিতে কি লেখা ছিল, তাহাও সে জানে না। চিঠিতে কোন ঠিকানাও ছিল না। ঐ চিঠিতে কি এমন অপরাধের বিষয় ছিল? ঐ চিঠির সংবাদ তাহার বন্ধু যোশেফ ছাড়া তো আর কেহই জানে না। চিঠিতে যদি কিছু বিপদের কারণ থাকে, তাহা হইলে যোশেফই তো তাহাকে সতর্ক করিতে পারিত। তবে কি যোশেফই তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছে? তাহার কি এমন শত্রুতা যোশেফের সহিত আছে, যাহার জন্য যোশেফ তাহার প্রতি এত বড় কঠিন শত্রুতা সাধন করিতে পারে! এলিজা তো ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহিয়াছিল, সে তো জোর করিয়া যোশেফের পথে অন্তরায় হয় নাই। সে যদি একদিনও জানিতে পারিত, এলিজা তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে না, তাহা হইলে সে কখনও এলিজাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিত না,—সে দূর হইতে সরিয়া দাঁড়াইত। এ বিবাহে এলিজারই আগ্রহ বেশী—তাহার তো কোনই দোষ নাই। এলিজার জন্য তাহার ভালবাসা কম নয়; যদি এলিজা তাহাকে বিবাহ না করিত, সে দূর হইতে তাহাকে প্রেমের নিবেদন জানাইয়া তুষ্ট থাকিত। সে কোন মতে এলিজার সুখের পথে কণ্টক হইত না। তাহার প্রেম গভীর এবং স্বর্গীয়, তাহা স্বার্থ-মিশ্রিত, আকাঙ্খা কলুষিত নহে।

যোশেফ তো দশ বৎসর ধরিয়া এলিজাকে তাহার সুগভীর ভালবাসা জানাইয়া আসিয়াছে। এলিজা কোন মতে স্বীকৃতা হয় নাই। যোশেফ কি এলিজাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল? ইহা তো প্রেমিকের কার্য্য নহে। জর্জ্জের এই দুর্দ্দশাগ্রস্থ বন্দী-জীবন কি যোশেফের কোন হীন ষড়যন্ত্রের ফল? জর্জ্জ শিহরিয়া উঠিল—তাহার সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া পড়িল! হায়! এলিজা এক্ষণে

কি করিতেছে? কতখানি দুঃখ ও বেদনা লইয়া সে দিনের পর দিন কাটাইয়া দিতেছে! কত অশ্রু ঝরিয়া তাহার বুকের বসন ভাসাইতেছে?

জর্জ্জ মাটিতে উপুড় হইয়া বহুক্ষণ কাঁদিল। দুর্ব্বল দেহে শব্দ করিয়া কাঁদিবার ক্ষমতা ছিল না। সে নীরবেই বহু কাঁদিল,—কিন্তু কাঁদিয়া কোন লাভ হইল না। সে ভাবিয়াছিল, প্রাণহীন কারাগৃহের প্রাচীরগুলি তাহার বেদনার বিশালতায় মুখর হইয়া তাহার সহিত কথা বলিবে। কিন্তু সত্য করিয়া মানুষের সুগভীর দুঃখে মানুষ কি পাষাণ, কেহই কাতরতা জানায় না! সে নিজে দুঃখ-বেদনায় চূর্ণ হইয়া যায়, কাহারও তাহাতে কিছু আসে যায় না।

অন্ধকার কারা-প্রাচীর নিশ্চল, নির্ব্বাক হইয়া তেমনি ভাবে রহিল। তাহারা হাত বাড়াইয়া জননীর স্নেহে তাহার সুবিপুল দুঃখে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল না,—একটা সান্ত্বনার কথাও বলিল না। জর্জ্জ নিজ মনে শোক করিয়া করিয়া কাতর হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। হঠাৎ প্রহরী আসিয়া সংবাদ জানাইয়া গেল—জেলের ইনস্পেক্টর আসিতেছেন,—ঠিক হইয়া থাক।

জর্জ্জ আশায় বুক বাঁধিল। হয়ত তাহারই মুক্তি-সংবাদ দিবার জন্য ইনস্পেক্টর আসিতেছেন। ইনি নিশ্চয়ই মহা-জ্ঞানী, সে যে নিরপরাধ, তাহা ইনি বুঝিতে পারিয়াছেন, নতুবা এত বড় সম্মানজনক পদ তিনি লাভ করিবেন কেন? সবারই মত মূর্খ কি তিনি? সে যে আপীল করিয়াছিল, তাহাতে নিশ্চয়ই ফল হইয়াছে!—এ বন্ধন হইতে সত্বরই সে মুক্তি পাইবে! সে প্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিল।

হঠাৎ তাহার কক্ষের সুবৃহৎ লৌহ-দ্বার সামান্যভাবে মুক্ত করা হইল। ইনস্পেক্টর দূর হইতে নাকে কাপড় ঢাকা দিয়া কহিলেন,—এই ব্যক্তি গভর্ণমেণ্টের ঘোর শত্রু ন্যাশন্যালিষ্টদের গুপ্তচর। ইহার জন্য যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। ইহাকে খুব সতর্কতার সহিত রাখিবে।

জর্জ্জের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তের মধ্যে মুক্তির স্বপ্ন শতধা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। ইনস্পেক্টর চলিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে জর্জ্জ হঠাৎ তাঁহার জুতার উপর মাথা রাখিয়া মিনতি করিয়া কহিতে যাইতেছিল,—তুমি যে-ই হও, আমার এই অন্ধকার জীবনে আজিকার দেবতা তুমি! আমি মানুষের মুখ দেখিতে পাই না, দেখিবার আশাও নাই। আজ যখন তোমায় পাইয়াছি, তখন তোমার পা ধরিয়া নিবেদন করি—হে দয়াবান! আমি নিরপরাধ,—এই কথা তুমি ফরাসী গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দাও। তোমার রাজাকে তুমি যাইয়া বল, একটা নিরপরাধ মানুষ অযথা কারাগৃহে অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। তাহার মত নগণ্য মানুষকে আবদ্ধ রাখিয়া ফরাসী-গভর্ণমেণ্টের কোনই লাভ নাই।

ইনস্পেকটর লাফাইয়া দশ হস্ত দূরে যাইয়া পড়িলেন। লৌহ-দ্বার অবিলম্বে অর্গলাবদ্ধ হইল। তিনি পরিদর্শন-রিপোর্ট বহিতে লিখিয়া গেলেন,—জর্জ্জ নামক বিপ্লববাদীর ভীষণতা একটুও কমে নাই। আমি তাহার অবস্থা দেখিতে গিয়াছিলাম, যে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আমাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল। পুলিস এবং জেল-কর্ম্মচারী সর্ব্বদা তাহার উপর কড়া পাহারা রাখিবে। তাহার কণ্ঠে আর একটি লৌহ শৃঙ্খল লাগাইয়া দিলে ভাল হয়।

ইনস্পেকটর মহাশয়ের আদেশ মত সেই দিনই সন্ধ্যাকালে জর্জ্জের কণ্ঠে আর একটি লৌহ-শৃঙ্খল পরাইয়া দেওয়া হইল।

(৫)

তাহার পর একমাস অতীত হইয়া গিয়াছে। তাহার দুঃসহ দুঃখের কোন প্রতিকার হইল না, সে ক্ষোভে-দুঃখে আপন চুল ছিঁড়িতে লাগিল, বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল এবং দাড়ী ধরিয়া টানিতে লাগিল। ঈশ্বর ও তাঁহার সুবিচারে তাহার কোন বিশ্বাস রহিল না। একজন ন্যায় বিচারক পরমেশ্বর আছেন, সে কথা অনেক চেষ্টা করিয়াও সে বুঝিতে পারিল না।

এত বড় অধর্ম্ম, এত বড় অবিচার মনুষ্য-সংসারে কি প্রকারে সম্ভব? মনুষ্য যে চিরদিনই ধর্ম্মের বড়াই করিয়া আসিয়াছে,—ধর্ম্মই সার—একথা দিনের মধ্যে শতবার কহিয়াছে। ঈশ্বর মহামহিম;—ন্যায় ও সত্যই শেষকালে জয়যুক্ত হয়,—কিন্তু কার্য্যতঃ অন্যায় অধর্ম্মকেই তো জয়যুক্ত হইতে দেখা যায়। জর্জ্জ আবার চিন্তা করিতে লাগিল,—ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাহাকে অন্যায় করিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছেন,—তাহার কি বলিবার আছে,—জেল পরিদর্শক একবারও তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন না। তাহার বন্ধু যোশেফই ঠিক

তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছে। ভগবান জানেন সে নির্দ্দোষ, একেবারেই নির্দ্দোষ। মানুষ মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া সুখের সন্ধান করে, মানুষ অধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া জগতে আসন-লাভ করে, প্রতিষ্ঠা ও সমাদর আকাঙ্খা করে। ধিক! শত ধিক এই অধর্ম্মের সম্পদে ও উচ্চাসনে। সে বরং শত বৎসর কারারুদ্ধ হইয়া থাকিবে,—সেও ভাল, তথাপি জানিয়া শুনিয়া এত বড় মহাপাপ করিয়া সুখ-সম্পদ অর্জ্জন করিতে কিছুতেই সে রাজী নয়। সে আবার ভাবিতে লাগিল,—মানুষের সান্ত্বনা কোথায়? মানুষ কি দেখিয়া, কিসের আশায় বাঁচিয়া থাকে? কি আকর্ষণ, কি মাদকতা তাহার জীবন-যুদ্ধের অবলম্বন? হায়! কোথায় ধর্ম্ম—কোথায় ঈশ্বর—কোথায় তাঁহার সিংহাসন?

জর্জ্জের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে বিশ্বের ও তাহার সৃষ্টি-কর্ত্তাকে খুব করিয়া গালি দিল। বিশ্বের নিন্দায় সে কারা-কক্ষকে মুখরিত করিয়া তুলিল। কিন্তু কেহ তাহার কথার কোন উত্তর দিল না। পরক্ষণে সে আবার ভাবিল,—ওঃ! কতকাল আগে সে নিঃসহায় মাতৃ-পিতৃহীন হইয়াছিল। কে তাহাকে শক্তি ও সৌন্দর্য্যে বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন? কাহার প্রেমময় সতর্ক দৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াইয়া সে এতখানি বড় হইয়াছে?

রাস্তা হইতে কুড়াইয়া-আনা শিশুর মত সে এক ধর্ম্মশীলা নারীর স্নেহ-বেষ্টনের মধ্যে সেয়ানা হইয়াছিল। সেই নারীর তো তাহাতে কোন স্বার্থ ছিল না। ছিঃ! ছিঃ! কে বলে ভগবান নাই, তাহার প্রেম নাই, বিচার নাই? তিনি আছেন, নিশ্চয়ই আছেন।

একবার সে হাসপাতালে রোগ-শয্যায় অনেকদিন পড়িয়াছিল—কত মানুষ, কত ভুগিয়া ভুগিয়া তাহার আশ-পাশ হইতে মরিয়া গেল, সে কিন্তু সুস্থ ও সবলকায় হইয়া বাঁচিয়া উঠিল। ভগবানের এত দয়া তাঁহার উপরে, তবুও সে বলিতেছে, ভগবান নাই—ধর্ম্ম নাই—তাহার বিচার নাই! কতবার সে কত বিপদে পড়িয়াছে, কাহার অদেখা মঙ্গল হস্ত তাহাকে সকল বিপদ-মুক্ত করিয়া কোলে তুলিয়া লইয়াছে। হায়! দুঃখে পড়িয়াই আজ সে ভগবানে অবিশ্বাসী হইয়াছে।

সমুদ্র-বক্ষে সে একবার ঝড়ের মুখে পড়িয়াছিল, সে ডেকের উপরে সেজদা করিয়া অপরিসীম বিশ্বাসে ঈশ্বরের সাহায্য-ভিক্ষা করিয়াছিল;—প্রার্থনা তাহার ব্যর্থ হয় নাই, সঙ্গে সঙ্গে ঝড় থামিয়া গিয়াছিল। সে কত অনুগ্রহ পাইয়াছে, তবু তাহার অসহিষ্ণু দুঃখ-দগ্ধ মন আজ এত অবিশ্বাসী হইল! জর্জ্জ অনুতপ্ত হইয়া নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

তাহার পর সে ঘুমাইয়া পড়িল, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখিল,—এলিজা বিধবার বেশ ধারণ করিয়াছে, তাহার দীর্ঘ কুন্তল শোকে রুক্ষ হইয়া গিয়াছে, কর্ণের স্বর্ণ-দুল সে খসাইয়া ফেলিয়াছে, বাহুতে তাহার বলয় নাই। সে জর্জ্জকে দেখিয়া কহিল,—প্রিয়তম, যতদিন তুমি কারাগারে দুঃখ ভোগ করিবে, ততদিন এ বিধবার বেশ ত্যাগ করিব না। এ জীবনে আর কাহাকেও স্বামীরূপে গ্রহণ করিব না।

জর্জ্জ আনন্দের আতিশয্যে কহিল,—প্রিয়তমে, কোন্ রাক্ষস আমাকে তোমার স্নেহ-স্পর্শ হইতে দূরে রাখিবে? ভগবান আমাকে শয়তানের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন—আমি মুক্ত হইয়া আসিয়াছি। কল্য প্রভাতেই আমরা মিলিত হইব।

জর্জ্জ দুই বাহু বাড়াইয়া এলিজার বসন স্পর্শ করিতে যাইবে, এমন সময়ে নির্ম্মম কঠিন লৌহ-বেড়ীর নিষ্ঠুর আঘাতে সে জাগিয়া উঠিল। হায়! সে যে কারাগারের বন্দী! সে যাহা দেখিল, তাহা তো স্বপ্ন!

(৬)

জর্জ্জের অবুঝ মন কোন সান্ত্বনাই মানে না। তাহার আর মুক্তির আশা কোথায়?—তাহার সম্বন্ধে আর কোন বিচার বা বিবেচনা হইবে না। এই অন্ধকার বন্দীশালায় তাহাকে চির-জীবন আবদ্ধ থাকিতে হইবে।

হায়! সে খুনীও নয়, ডাকাতও নয়, অথচ তাহাদেরই মত দুঃসহ অপমান তাহাকে ভোগ করিতে হইতেছে। নর-হন্তার মুক্তির সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তাহার মুক্তির আশা নাই! তাহার এবং তাহারই মত শত-সহস্র বিপ্লববাদী উন্মার্গচারী বন্দীর শৃঙ্খলিত জীবনের ভিত্তির উপর ফরাসী রাজা, তাহার স্তাবক ও অনুগৃহীতদের সুখ-সমৃদ্ধি নিত্য গড়িয়া উঠিতেছে। হায় মানব সংসারের অবিচার!

তাহার বিশ্বাস হইল না—তাহার পয়গম্বর হজরত ঈসা মরিয়া মানুষের সকল পাপভার বহন করিয়াছেন,—যে কেহ

তাঁহাকে ঈশ্বর-পুত্র এবং ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিবে, তাহার সর্ব্ব পাপের ক্ষমা হইবে—কারণ তিনি জানেন, মনুষ্য দুর্ব্বল। পাপের ক্ষমা কি এত সস্তা? ঈশ্বর-বাক্যের নামে ধিক্ প্রতারকদের এই মিথ্যা শিক্ষা-প্রচারে! সে ভাবিল,—না—না, কখনও এরূপ হইবে না। মনুষ্যের পাপের ক্ষমা কখনও এইভাবে হইবে না। তাহার কৃত অন্যায় ও পাপের শাস্তি আছেই—তাহার পাপের ক্ষমা নাই—কিছুতেই নাই!

আনন্দ উদ্বেল মানব-সমাজের আনন্দ-হাস্যের অন্তরালে, গোপনে-নিরালায়, কুটীরে কুটীরে, কারাকক্ষে, অন্ধকারের অতল-তলে, মানব চক্ষুর অগোচরে মানবাত্মা কত অন্যায় পীড়নে চূর্ণিত হইতেছে,—কত নিঃসহায় মনুষ্য আত্মা অবিচার-বেদনায় কাঁদিয়া মরিতেছে—কে তাহার খবর রাখে? মানুষ থাকিতে মানুষের উপরে অত্যাচার হইবে—এ কি কথা!

জর্জ্জ ভাবিয়া চলিল,—মানুষের আত্মায় কি খোদার আসন নাই—তাহার বাক্য ও আদেশের প্রতিধ্বনি কি সেখানে জাগে না—সে কি ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বোঝে না? তবে সে কেন মানুষের দুঃখ ও অবিচারের সম্মুখে নীরব থাকে?

জর্জ্জ নিতান্ত অশিক্ষিত লোক—সে নিজের নামটীও লিখিতে জানে না। জাতীয়তাবাদ কি, বিপ্লব কাহাকে বলে, তাহা সে কিছুই জানে না। সে সহজ ভাবে চিন্তা করে—সে নিরপরাধ—সে কিছুই করে নাই!—মনুষ্য সংসারে কেহ তাহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করে না,—তাহার কোনদিন কোন ক্ষমতা প্রতিপত্তি ছিল না,—তাহার মত একজন সামান্য অশিক্ষিত মানুষকে এতগুলি লৌহ বেড়ী দিয়া বাঁধিয়া রাখায় পৃথিবীর কি মঙ্গল সম্ভাবনা আছে?

জেল-ইনস্পেক্টরের একটা কথায় সে বুঝিয়াছিল,—তাহার সহিত তিনশত জন বিপ্লবী জেলের ভিন্ন ভিন্ন কুটীরে বন্দী অবস্থায় আছে। হায়, ইহারা সকলেই কি তাহারই মত ভাগ্যহীন?

মুক্তি নাই, মুক্তি নাই—তাহার মুক্তির কোন আশা নাই। যতদিন সে বাঁচিবে, তাহাকে এই কারা-কক্ষেই থাকিতে হইবে।—তাহার মনে প্রশ্ন হইল—মনুষ্য-সমাজের শত শত ধর্ম্ম-মন্দিরের বেদীতে দাঁড়াইয়া বিভিন্ন জাতির ধর্ম্ম-পুরোহিতেরা কি এই কথাটী মনুষ্য-জাতিকে সারা জীবনে একটিবারও বলেন না—"অন্যায় করিও না—নিরপরাধকে নির্য্যাতিত করিও না।" ঈশ্বরীয়-গ্রন্থের মধ্যে কি এই কথাটী লেখা নাই? সেখানে কত জ্ঞানগর্ভ অমৃতময় ঈশ্বর-বাক্য আছে—এত বড় গুরুতর কথাটী কি ঈশ্বরীয় গ্রন্থ হইতে বাদ পড়িয়াছে। কেমন ঈশ্বরীয়-গ্রন্থ? সে গ্রন্থের প্রথমেই তো এই কথাটী লিখিত হওয়া উচিত ছিল—"অন্যায় করিও না—ইহাই সমস্ত ঈশ্বরীয়-গ্রন্থের সার কথা।" হয়ত ঈশ্বর শয়তান ও তাহার দুর্ব্বৃত্ত শত্রুদের ভয়ে কথা কয়টী বলিতে সাহস পান নাই!

জর্জ্জ ক্রোধে প্রলাপ বকিতে লাগিল—অত্যাচারের অবসান হইবেই, শয়তানের বিষ-দন্ত ভাঙ্গিবেই, ভয় নাই! বিচার এবং জ্যোতিঃই মানব সংসারে রাজত্ব করিবে—ধরায় স্বর্গ নামিয়া আসিবে, স্থবির-ভগবানের পরিবর্ত্তে, নূতন ভগবান মহাপ্রতাপে আসিতেছেন—হস্তে তাঁহার যোজনব্যাপী গদা, অত্যাচার, অন্যায় ও অধর্ম্মকে তিনি ধূলিতে পরিণত করিবেন। জর্জ্জ, দুঃখ করিও না, দুঃখ করিও না। সত্বরই তোমার দুঃখের প্রতিকার হইবে।

—ক্রমশঃ

ভগ্ন-প্রেম

—জসীম উদ্‌দীন

নারে নারে তোর ছেঁড়া হারে আর কভু জোড়া নাহি লাগে,
যত টানি আর যত গিরা দেই কুসুমের কলি ভাঙে।
ভগ্ন পীরিতি জোড়া দিতে গেলে 'পরাণ সহিতে খসে'
ঘসির অনল জ্বলে ধিকি-ধিকি হৃদয়ের মাঝে ব'সে।
নিঠুর বঁধুর দহন-অনলে শুকাল প্রেমের-ফুল,
প্রেম যদি গেল, স্মৃতি কেন সই রয়ে গেল করি ভুল।
সে স্মৃতিও যদি রহিল সজনি, মনেরে লইয়া তার
নিমেষের তরে ভুলিতে পারে না নিঠুরালি কারবার!

বন্ধু আছিল নিঠুর সজনি, আসিত বর্ত্তমানে,
স্মৃতি যে তাহার সুগম নিঘুম ত্রিকালের পথ জানে।
বন্ধুর যত ছিল বাঁকা তীর বিঁধিত যে জাগরণে,
স্মৃতির সায়ক আসে আর যায় স্বপনেও মোর মনে।

প্রেমের তটিনী বড় বাঁকা সখি বাঁকা এর পথ-ঘাট,
এ দেশেতে সখি জলের ডিঙা ফেরে ডাঙার বাঁট।
বনের বাঘেতে ছোঁয় না মানুষ, মনের বাঘের ভয়,
বনের বাঘের সন্ধানে লোক ছেড়ে যায় লোকালয়।
যে যায় বুকেতে আঘাত করিয়া তারে দিতে হয় মালা,
সবার চাইতে আপন সে দেয় সবার চাইতে জ্বালা।
এদেশেতে সখি, দিবসের কালে ঘরে দিতে হয় দোর,
রাতের বেলায় দুয়ার খুলিয়া খুঁজে নিতে হয় চোর।

এদেশেতে আসি ছিঁড়ে গেল সখি, বুকের কুসুম মালা,
ছিন্ন সুতায় যত গিরা দেই তত বাড়ে বুকে জ্বালা।
নিঠুর আমারে ভুলিল সজনি, আমারি হইল দায়,
যে দিল আমারে এমন আঘাত তারে লয়ে দিন যায়।
বাঘের ঘরেতে শয়ন পাতিয়া পোয়াই দীঘল রাতি,
সাপের মাথায় মণি রেখে আমি আঁধারে জ্বালাই বাতি।

বয়ন-শিল্প

—প্রবন্ধ—

—ফকির আহ্‌মদ

চরকা দ্বারা সূতা প্রস্তুত এবং বস্ত্র-বয়ন এক সময়ে এ-দেশের ধনী-দরিদ্র সকলের মধ্যেই প্রচলিত ছিল,—এ কথার আর নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। এ-দেশের লোকের আর্থিক-জীবনে সূতা কাটাই উল্লেখ-যোগ্য বিষয় ছিল। তবে অনুন্নত প্রণালীতে উক্ত ব্যবসায় চালাইতে যাইয়া লাঙ্কাসায়ারের মিলের কাপড়ের সঙ্গে এ-দেশীয়েরা প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। ফলে এদেশে বয়ন-ব্যবসায় নিস্তেজ হইয়া আসিল—লাঙ্কাসায়ারেরই জয় হইল।

তন্তুবায়েরা ব্যবসায় ছাড়িয়া দিল বটে, কিন্তু অতীত গৌরবের চিহ্ন স্বরূপ সেই ব্যবসায়ের নাম-অনুসারে এক একটী 'খেতাব' আপনাদের নামের সঙ্গে সংযোগ করিয়া লইল।

মহাত্মা গান্ধীর 'চরকা-বাণীতে' বয়ন-শিল্প আবার ভারতবর্ষে মূর্ত্ত হইয়াছে। এখন সকলেই বিদেশী বর্জ্জন করিতে শিখিয়াছে, ইহাতে এ-দেশীয় বয়ন-শিল্প উন্নতির বিপুল পরশ পাইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে খদ্দর পরিধান ও বস্ত্র-বয়ন যেন একটা ফ্যাসান বলিয়া গণ্য হইতেছিল। কিন্তু এবার দেশের লোক ইহাকে এমনি ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে শিখিয়াছে যে—লাঙ্কাসায়ারের মিহি সূতার সরু বস্ত্র আর ভাল লাগে না—ভাল লাগে—চরকা কাটা সূতায় তাঁতে বোনা মোটা কাপড়, ইহার স্বাভাবিক কর্কশ ঘর্ষণও আজ এ-দেশীকে এত আনন্দ দান করিতেছে, যাহা বিদেশী পণ্যের কোমল-স্পর্শ হইতে পাওয়া যায় না।

তন্ত-শিল্পের ভবিষ্যৎ কিরূপ উজ্জল হইবে—তাহা কল্পনা করিতে বড়ই আনন্দ লাগে। কেহ কেহ বলেন—ভারতের যে মুষ্টিমেয় লোকে সূতা-কাটা ও কাপড় বোনা আরম্ভ করিয়াছে, তাহারা বিদেশী মিলে প্রস্তুত বস্ত্র সরবরাহের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিবে কি? ঢাল নাই, তলোয়ার নাই, ভারত কেন আজ নিধিরাম সর্দ্দারের মত দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইল?

এ-কথার উত্তরে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহার সার-মর্ম্ম এই যে, ভারতের লোক-সংখ্যার অনুপাতে শতকরা প্রায় ৭২ জন কৃষক। তাহাদের অধিকাংশই বৎসরে ছয়মাস বসিয়া বসিয়া অর্জ্জিত অন্ন ধ্বংস করিতে থাকে। ভারতের আবহাওয়া উষ্ণ, তাহাতে বাকী ছয়মাস মাঠে কাজ না করিয়া ঘরে বসিয়া সূতা কাটিতে আপত্তি কি?

এ-দেশের কোন কোন প্রদেশে একটী কু-প্রথা চলিয়া আসিতেছে যে, পরিবারে একজনেই রোজগার করে, আর বাকী স্ত্রী-পুরুষ সকলেই অলস আয়াস ও বৃথা গল্প-গুজবে সময় নষ্ট করে। যদি সেই সময়টুকু লাভজনক পরিশ্রমে ব্যয়িত হয়, তাহা ত ভালই—তবে বেঙ্গায় শ্রম-বিমুখ বলিয়া তাহারা কি সূতা কাটার মত এই অল্প পরিশ্রমটুকু স্বীকার করিতে পারিবেন না? কেহ কেহ বলেন, দেশে যে চেতনার ঢেউ খেলিয়াছে, তাহা স্বরাজ-প্রেরণা লইয়া অশিক্ষিত পল্লীতে স্ত্রী-পুরুষ সকলের প্রাণে দোলা দিতে না পারিলেও অধুনা-লুপ্ত অথচ পল্লীবাসীর মজ্জাগত সূতা প্রস্তুত ও বস্ত্র-বয়ন হয়ত পুনরুদ্ধার করিয়া দিতে পারিবেন।

বাপ-দাদার আমলের পুরাতন প্রণালীতে সূতা না কাটিয়া আর-একটু উন্নত প্রণালীর চরকায় অধিক পরিমাণ সূতা-কাটা যাইতে পারে। গ্রামে গ্রামে ইহার প্রবর্ত্তন হইলে পল্লী-বাসীর স্বল্প আয়ের মাত্রা সূতা কাটার আয়ের সঙ্গে একত্রিত হইয়া তাহার মোট আয় দ্বিগুণিত হইবে। আর ঠিক এই উপায়ে—অনেকেই লাভজনক ব্যবসায় চালাইয়া দেশের ও দশের কল্যাণ সাধন করিতে পারে এবং সকলের সমবেত চেষ্টায় তাঁতে-বোনা কাপড় দিয়াও মিলে-প্রস্তুত বিদেশী বস্ত্র-সরবরাহের সঙ্গে এ-দেশ প্রতিযোগীতায় টিকিয়া যাইতে পারে।

ঘরে বসিয়া বস্ত্র-বয়ন আরম্ভ করা যায়। মূলধন বলিতে শুধু তাঁতটী। ঘর ভাড়ার দরকার হইবে না, কুলি-মজুরের দরকার হইবে না—যাহা কিছুর আবশ্যক হইবে, তাহা

ঘরের অপরাপর সকলেই করিয়া দিতে পারিবে। ঘরের নৈতিক-প্রভাব হইতেও দূরে যাইতে হইল না, টাউনের বিধূমিত আবহাওয়ার সংস্পর্শে আসিতে হইল না—টাউনের কুটিলতা, অবনতিপূর্ণ লোভ-লালসা বা ভোগ-বিলাসেও নিজকে বিকাইয়া দিতে হইল না।

প্রকাণ্ড কেপিটেল্ ত লাগিবেই না; তা'ছাড়া প্রতি গ্রামে, প্রত্যেক ঘরে ভাল তা'লিম দেওয়া লোকও পাওয়া যায়। তাঁতী হয়ত সারাদিন অন্যান্য জরুরী কাজটা করিল—গৃহস্থের কত কাজ,—হালের কাজ, চাষের কাজ,—সব শেষ করিয়া অবসর সময়ে প্রত্যেকেই চরকায় সূতা কাটিতে পারে, আর তাঁতে কাপড় বুনিতে পারে।

চিকণ ও শিল্প-নৈপুণ্যে ভরা 'টেক্‌সই' জিনিষগুলি কেবল তাঁতেই প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এদিকে মোটা কাপড়ের ত কথাই নাই। তাঁতে যে মোটা কাপড় প্রস্তুত হইবে, তাহা মিলের কাপড় অপেক্ষা অধিক দিন স্থায়ী এবং মজবুত হইবে এবং অল্প পয়সায় ক্রেতারও কার্য্য-সিদ্ধি হইয়া যাইবে।

যাহারা তন্তু-বয়নের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, তাঁতীদের মানসিক উন্নতি এবং নজর পরিসরের জন্য তাহাদের শিক্ষার একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। মাননীয় শিক্ষা-মন্ত্রী এবার যে "বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষা বিল্"টী পাশ করিয়াছেন; তাহা অচিরেই কাজে পরিণত হইলে এ ব্যাপারে দেশের অনেক কল্যাণ সাধিত হইবে।

ভারতে যত প্রকার শিল্প বা ব্যবসায় আছে, তন্মধ্যে বয়ন-শিল্প অন্যান্য জরুরী শিল্পের অন্যতম। ইহার স্থান কৃষি-শিল্পের পরে হইলেও, গত ৩০।৩২ বৎসর ব্যাপিয়া ভারতে বয়ন-শিল্পের অপরিসীম উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এতক্ষণ আমরা শুধু কুটীর-শিল্প হিসাবে আলোচনা করিয়াছি, ফ্যাক্টরী শিল্প হিসাবে দেখিতে গেলে দেখিতে পাই, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশে গত ৩০।৩২ বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি মিল স্থাপিত হইয়াছে। ইহার বিস্তার আরো যত বেশী হয়, ততই ভাল।

এই বয়ন-শিল্পই বিলাতী উন্নতির মেরুদণ্ড। তবে তাহার উন্নতির মূলে যে হেতু নিহিত আছে তাহা এই,—এই ব্যবসায়ে বিলাত প্রচুর পরিমাণে মূলধন লাগাইতে পারিয়াছে। মূলধনের অভাবে তাহাদের ব্যবসায়ের কোন ক্ষতি হইতেছে না। উন্নত প্রণালীর কল-কব্জায় উন্নত ধরণের জিনিস সরবরাহ করিয়া বিলাতের ব্যবসায়ী লোককে চটক্ লাগাইয়া দিতে জানে। এই ব্যবসায়ের জন্য বিলাতের আবহাওয়া বড়ই অনুকূল। বিশেষতঃ এ-ব্যবসায়ের সঙ্গে তাহাদের খুব পরিচয় আছে বলিয়া একটা প্রবাদ আছে। তাহাতেই তাহাদের সুখ্যাতি ও সুনাম দেশ জোড়া; তবে বিলাতের এই ব্যবসায়ীদিগকেও কাঁচা মালের জন্য আমেরিকা, মিশর এবং ভারতের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই অভাবের প্রতিকার বিলাত কখনো করিতে পারে না। বিশেষ করিয়া বিলাতের মাল বিদেশে না গেলে বিলাতের ব্যবসায় চলা ভার হইয়া উঠে, কিন্তু ভারতের সুযোগ সুবিধা এ-ব্যাপারে অতুলনীয়।

ভারতে তুলা জন্মে প্রচুর পরিমাণে। যদিও তাহা খুব উচ্চদরের নহে, তবু উন্নত ধরণের তুলা জন্মাইবার চেষ্টা চলিতেছে। আজকাল ভারতের যে মতি-গতি, তাহাতে ভারতের ব্যবসায়িগণ বিদেশের উপর নির্ভর না করিয়া তাহাদের মাল ক্রয়ের জন্য ভারতের উপর পূর্ণ-মাত্রায় আস্থা স্থাপন করিতে পারে। এই ব্যবসায়ের প্রতি এ-দেশের লোকের যেরূপ ঝোঁক দেখা গিয়াছে এবং যাইতেছে, তাহাতে মূলধনের অভাব হইবে না বা হওয়ার কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। তুলা উৎপাদনের জন্য যেরূপ আবহাওয়ার প্রয়োজন, তাহা কৃত্রিম উপায়ে এ-দেশে পাওয়া যাইতে পারে। স্বভাবতঃই এ-দেশীয় লোক এ-ব্যবসায়ে দিন-দিন পাকা হইয়া উঠিতেছে। তবে একটী মাত্র অসুবিধা এই যে, ভারতে বিলাত অপেক্ষা সুদের হার উচ্চ, কিন্তু সমবায়ের কল্যাণে এই সমস্যায় অনেকটা সমাধান হইবে।

পরলোকে

অধ্যাপক ও ব্যারিষ্টার মিঃ এস. খোদাবখ্‌শ
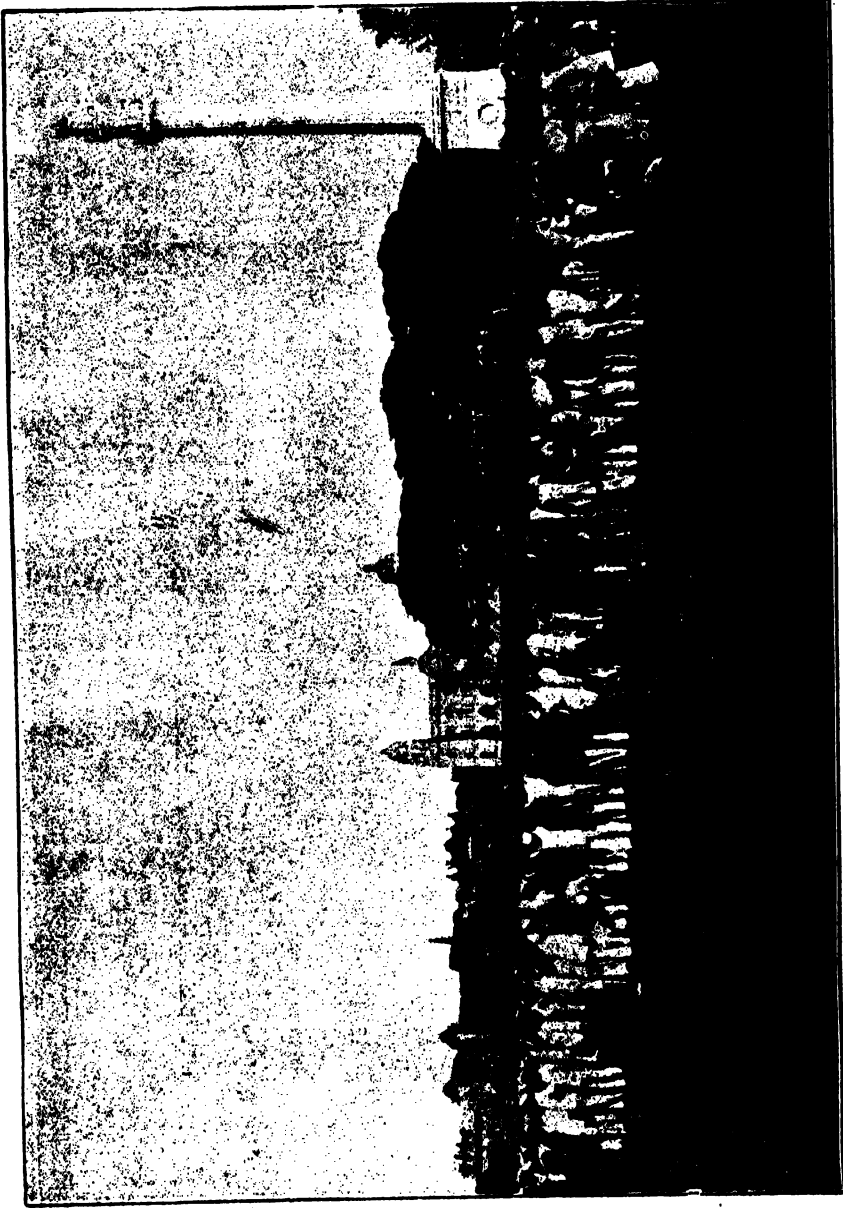
হজরত মোহাম্মদের জন্মতিথি-উৎসব

মনুমেণ্টের নিকট

ভারতের রাষ্ট্র-গুরু

মহাত্মা গান্ধী

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিবার জন্য মহাত্মা গান্ধীর বিলাত-যাত্রা যে সুনিশ্চিত হইয়াছে, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর একটি টেলিগ্রামে তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। শ্রীযুক্তা নাইডু 'মুলতান' জাহাজে মহাত্মার জন্য একটি বার্থ রিজার্ভড্ করিবার জন্য বড়লাটের নিকট একখানা টেলিগ্রাম করিয়াছেন। প্রথমবারের গোল টেবিল বৈঠকে যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা তো সকল আছেনই, অধিকন্তু এবারে নূতন একুশজন সদস্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। তাঁহাদের নাম,— ১। মহাত্মা গান্ধী ২। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ৩। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ৪। স্যার সৈয়দ আলী ইমাম ৫। মিঃ ই·সি, বেণ্থলী ৬। স্যার মাণেকজি দাদাভাই ৭। মিঃ শফী দাউদী ৮। ডাঃ এস্-কে, দত্ত ৯। স্যার পদমজি জিনওয়ালা ১০। ভি-ভি, গিরি ১১। স্যার মোহাম্মদ ইক্‌বাল ১২। মিঃ রামস্বামী আয়েঙ্গার ১৩। স্যার সৈয়দ মেহের শাহ্‌, ১৪। সৈয়দ মোহাম্মদ পাতশাহ্‌, ১৫। মওলানা শওকৎ আলী ১৬। স্যার পুরুষোত্তম দাস ১৭। রাজা মোহাম্মদ খান ১৮। ছত্রীর নবাব ১৯। কোরিয়ার রাজা ২০। সরিলার রাজা ২১। দেওয়ান বাহাদুর রাঘবিয়া। আমরা আগামীবারে এই নব-নির্ব্বাচিত সদস্যগণের চিত্র প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

বোম্বাইয়ের অস্থায়ী গবর্ণর
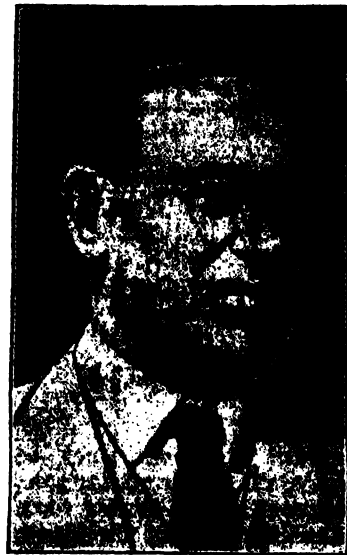
স্যার আর্ণেষ্ট হট্‌সন

গত ২২শে জুলাই পুনার ফার্গুসান কলেজ পরিদর্শনের সময়ে বাসুদেও বলবন্ত গোগেট নামক জনৈক ছাত্র স্যার আর্ণেষ্ট হট্‌সনকে লক্ষ্য করিয়া রিভলভারের দুইটী গুলি ছোড়েন। কিন্তু সুখের বিষয়, তিনি কোন আঘাত পান নাই। গবর্ণর নিজেই আততায়ীকে ধরিতে সমর্থ হইয়াছেন
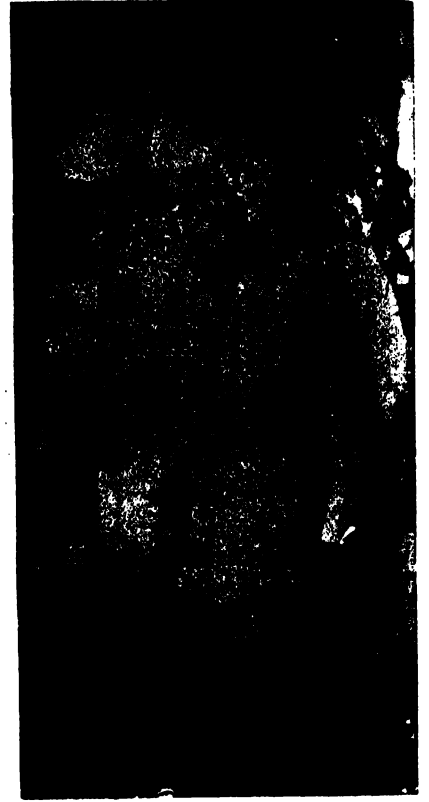
চ্যাং কাইসেক ৪০ হাজার সৈন্য লইয়া ক্যাণ্টন হইতে কমিউনিষ্ট বিদ্রোহীদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তিনি জানাইয়েছেন যে, বিষম যুদ্ধের পর সরকারী সৈন্যদল কমিউনিষ্ট সেনাদের দক্ষিণপার্শ্ব ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং কিয়ান সিফুকিয়েন সীমানার নিকটবর্ত্তী কোয়াং চাং দখল করিয়াছে। কমিউনিষ্টগণ বিশৃঙ্খল হইয়া দক্ষিণ দিকে পলায়ন করিতেছে। সম্প্রতি নানকিং সহরে এক বক্তৃতায় চ্যাং কাইসেক বলিয়াছিলেন যে, কমিউনিষ্টদিগের অত্যাচারে শত শত গ্রাম নিশ্চিহ্ন, হাজার হাজার নির্দ্দোষ লোক নিহত এবং অগণিত নারীর উপর বলাৎকার করা হইয়াছে। ইহাদিগকে দমন করিতে না পারিলে চীন-জাতি ও চীন-গবর্ণমেণ্টের রক্ষা নাই।

চীন-গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট

জেনারেল চ্যাংকাইসেক

স্পেনের ভাগ্য-বিধাতা

কর্ণেল জ্যামোরা
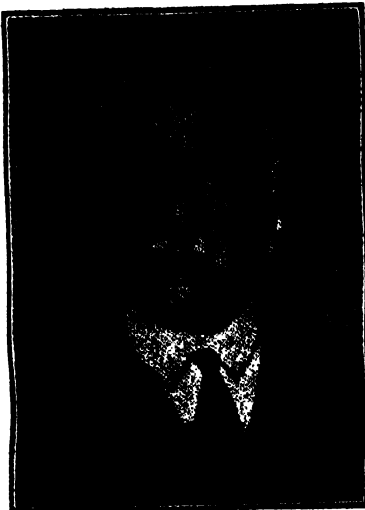
রোম্যান ক্যাথলিক গীর্জ্জা ও ধর্ম্মযাজকগণের সহিত ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের যে সম্পর্ক থাকিবে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে স্পেনের অধিবাসী ক্যাথলিকগণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছেন। কর্ণেল জ্যামোরা এই বিধান করিয়াছেন যে, জাতীয় ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য ধর্ম্মযাজকের শূন্যপদগুলিতে আর লোক নিযুক্ত করা হইবে না। এই বিধানের ফলে প্রথম বৎসরেই পাঁচলক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হ্রাস হইবে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন। যে সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায় এখনও তাহাদের সম্পত্তির পরিমাণ ঘোষণা করেন নাই, তাঁহাদিগকে এই বলিয়া ভয় দেখান হইয়াছে যে, অগৌণে সমস্ত বিবরণ প্রদান না করিলে, তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া, স্পেন হইতে তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করা হইবে। প্রতি বৎসর সরকারী তহবিল হইতে ধর্ম্ম-যাজকদিগকে ২ লক্ষ পাউণ্ড অর্থ সাহায্য করা হইত। এই সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়ার কথাও উঠিয়াছে।

রীফ মহাবীর

গাজী আবদুল করিম

স্পেনে সাধারণতন্ত্র শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত হওয়ায় রীফ নেতা গাজী আবদুল করিম অনেকটা আশান্বিত হইয়াছেন। আবদুল করিমের নেতৃত্বে মরক্কোবাসীরা নিজেদের দাবী স্পেন সরকারের নিকট পেশ করিবার জন্য এক সভায় সম্মিলিত হইয়া এক আবেদনপত্র তৈয়ারী করিয়াছেন। এই আবেদনপত্রে মরক্কোর প্রায় ৫০০ শেখ স্বাক্ষর করিয়াছেন। দেশের জনগণের মধ্যে আত্ম-সম্মান বোধ জাগাইবার জন্য প্রচারকের আবশ্যক। সেজন্য বিশিষ্ট নেতৃবর্গ সৈয়দ ফহামি মুহম্মদ বিন্ হাজী আহ্মদ অল খতিবকে প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি জনসাধারণের মধ্যে এমনভাবে প্রচার চালাইবেন যে, দেশবাসী তাহাদের দাবী-দাওয়া সম্বন্ধে যেন সজাগ হয় এবং গভর্ণমেণ্টের কাছে যেন তাহাদের সম্মিলিত দাবী উপস্থিত করিতে পারে। শীঘ্রই বিশিষ্ট নেতৃবর্গকে লইয়া একটী প্রতিনিধিদল গঠন করা হইবে, তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের নিকট তাহাদের দাবী উপস্থিত করিবেন।

রুষ-বিপ্লবের অন্যতম নায়ক

মিঃ ষ্টেলিন

সব-হারাদের পক্ষ সমর্থনকারী সোভিয়েট-রাষ্ট্রের সমস্ত অনুষ্ঠানই অভিনব। ধনিক দেশগুলি জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্প-সম্পদে উন্নত, অতএব রুশিয়াকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই ধনিক দেশগুলিকে ছাড়াইয়া যাইতে হইবে। তাই মিঃ ষ্টেলিন একটী নূতন মোসাবিদা করিয়াছেন। এই মোসাবিদার উদ্দেশ্য—সমগ্র রাষ্ট্রকে টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা দান করা। এই নূতন মোসাবিদার কাজ আরম্ভ হওয়ার সময় মোট ১৬,০০০ ইঞ্জিনীয়ার এবং ১৭,০০০ টেক্‌নিসিয়ান নিযুক্ত করা হইবে। কাজ শেষ করার জন্য কম্‌সেকম ১২০,০০০ জন গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনীয়ার এবং ১৮৫,০০ জন টেক্‌নিসিয়ানের প্রয়োজন। সোভিয়েট রাষ্ট্র তাই ব্যগ্রতার সহিত কাজে নামিয়াছেন। বিদেশ হইতে শত শত ইঞ্জিনীয়ার আনয়ন করিয়া রুশবাসীকে ব্যবহারিক বিদ্যায় নিপুণ করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার মোট ব্যয় পড়িবে ২৭,০০০ লক্ষ রুবল্ অর্থাৎ ৯ কোটী পাউণ্ড। যে সমস্ত ছাত্র ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা শিখিতেছে, তাঁহাদের অধিকাংশই বেতনভোগী ; ১৯৩৩ সালের মধ্যে শতকরা ৯০ জন ছাত্রকে বেতন দেওয়া হইবে।

কলিকাতা শীল্ড প্রতিযোগিতা

ডারহাম লাইট ইন্‌ফ্যান্ট্রি

হাইল্যাণ্ডার্স লাইট ইন্‌ফ্যান্ট্রি

এবার কলিকাতার আই-এফ-এ শিল্ড প্রতিযোগিতায় খেলাগুলি প্রথম হইতেই খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। একদিক্ হইতে এবারের কলিকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ন ডারহাম্‌স দল ওয়েষ্টকেণ্টকে (১-০), ক্যামেরন্‌স্‌কে (০-০,২-২,১-০) পুলিসকে (২-০), গতবারের শিল্ড বিজয়ী সিফোর্থকে (১-০) হারাইয়া ফাইনালে উঠে। অন্যদিক হইতে হাইল্যাণ্ডার্স দল রেঞ্জার্সকে (৪-১), হাওড়া ইউনিয়নকে (৫-১), ইষ্ট ইয়র্ককে (২-০) মোহন বাগানকে (১-১,৩-০) পরাজিত করিয়া ফাইনালে উঠে। গত ১লা আগষ্ট ফাইনাল খেলা হয়। খেলায় উভয়দলই একটি করিয়া গোল দেওয়ায় খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। ৩রা আগষ্ট পুনরায় খেলা হয়। সেই খেলায় কানপুরের সৈনিক হাইল্যাণ্ডার্স দল ব্যারাকপুরের সৈনিক ডারহাম্‌স দলকে (২-১) পরাজিত করিয়া শিল্ড লাভ করিয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনেরল

লর্ড আরউইন

দিল্লী-চুক্তি সম্পর্কে লর্ড আরউইন সম্প্রতি লণ্ডনে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—ইংরাজ ভারতবর্ষে যদি তাহার বাণিজ্য ও অন্যান্য স্বার্থ সত্যই রক্ষা করিতে চাহেন, তবে জবরদস্ত শাসন তাহার প্রকৃষ্ট পথ নহে। পরস্পরের উপর সন্দেহ ও ভ্রান্ত ধারণা দূর করার উপরেই তাহা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে। ভারত সম্পর্কে আমার যে অভিজ্ঞতা আছে, সেই অভিজ্ঞতায় আমাদের দেশবাসীর প্রতি ইহাই আমার একমাত্র সুচিন্তিত পরামর্শ।

ফাতেহা দোয়াজদহম

এস, ওয়াজেদ আলী বি-এ (কেন্টাব) বার-এট-ল

আজ হচ্চে আরবী বৎসরের তৃতীয় মাস রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ। এই তারিখে হিজরীর একাদশ অব্দে হজরত মোহাম্মদ পরলোকে প্রয়াণ করেন। মৃত্যুর ঠিক তেষট্টি বৎসর পূর্ব্বে আজকের তারিখেই তিনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

প্রথমতঃ হজরত মোহাম্মদের জীবনেতিহাসের কয়েকটা বৈশিষ্ট্যের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি। অন্যান্য ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদের বিষয় অনেক রকম কিম্বদন্তি-জনপ্রবাদ প্রভৃতি শোনা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য যাকে সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্যে প্রামাণ্য সত্যরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে, তার কিছুই পাওয়া যায় না বললেও অত্যুক্তি হবে না। হজরত মোহাম্মদের সম্বন্ধে কিন্তু একথা বলা চলে না। তাঁর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

দ্বিতীয়তঃ তাঁর জীবনের বিষয় যতটা আমরা জানি, অন্য কোন মহাপুরুষের বিষয় ততটা জানি না। তিনি কি কাপড় পরতেন, কি খেতেন, এবং কি ভাবে খেতেন, কখন তিনি উঠতেন এবং কখন শুতেন, এ সবেরই detailed সংবাদ আমাদের জানা আছে। আর কোন ঐতিহাসিক পুরুষের বিষয় এতটা detailed information আমাদের নাই।

তৃতীয়তঃ তাঁর প্রচারিত মতবাদের বিষয় যতটা নিশ্চিত তথ্য আমাদের হস্তগত হয়েছে, আর কোন মহাপুরুষের মতবাদের বিষয় তার শতাংশের একাংশও আমাদের হস্তগত হয় নি। কোরাণ শরীফের শ্লোকগুলি তাঁর মুখ থেকে যেভাবে বের হয়েছিল, ঠিক সেই অবস্থাতেই আমাদের কাছে এসে পৌঁচেছে। তাদের কোন রদ-বদল হয় নি।

তার বচনামৃত একান্ত যত্নের সঙ্গে সংগৃহীত হয়েছে এবং সাক্ষ্য-দলিল সমেত লিপিবদ্ধ হয়েছে। তিনি কি মত প্রচার করেছিলেন, তা জানতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না। তাঁর জীবনের চতুর্থ বিষয় হচ্চে, তাঁর জীবন-কাল থেকে আরম্ভ করে এখন পর্য্যন্ত তাঁর মতাবলম্বীদের সঙ্গে খৃষ্টান এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চলে আসছে। আর তার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ তাঁর চরিত্রের বিষয় যতটা মিথ্যা অপবাদ এবং কলঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে, তাঁর শিক্ষা এবং সাধনাকে বিকৃত করে দেখাবার যতটা চেষ্টা হয়েছে, তাঁর মতবাদের হীনতা প্রতিপাদনের জন্য যতটা অসাধু ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, ততটা অন্য কোন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের ভাগ্যে ঘটে নি। এই সব কারণে হজরত মোহাম্মদের চরিত্রের বিশেষত্ব এবং শিক্ষার মহত্ত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করা কাজে-বাজে সাধারণ লোকের পক্ষে এখন এক রকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিথ্যা Propaganda যে কতটা সফলতা লাভ করতে পারে এবং তার ফল যে কতদূর বিষময় হতে পারে, তা হজরত মোহাম্মদের জীবনেতিহাস থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়। একটী বিশেষ কারণ তাঁর চরিত্রের বিষয় বিকৃত মতবাদের সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। অন্যান্য মহাপুরুষেরা কেবল ধর্ম্ম এবং নীতি শিক্ষাই দিয়ে গিয়েছেন। সংসারের সঙ্গে, রাজনীতির সঙ্গে, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষের সঙ্গে কোন সম্পর্ক তাঁরা রাখেন নি। তাঁদের কথা ভাববার সময়ে আমরা কেবল তাঁদের মহৎ শিক্ষার কথা, তাঁদের বিমল আদর্শ-বাদের কথা, তাঁদের নির্ম্মল চরিত্রের কথাই ভাবি, তাঁদের চরিত্রের মহত্ত্ব বুঝতে তাই আমাদের বেগ পেতে হয় না। মোহাম্মদ কিন্তু কেবল সংসার-মুক্ত সাধক পুরুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন সংসারী লোক। শেষ বয়সে প্রকাণ্ড এক রাজ্যের তিনি একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। আরব জাতির তিনি রাষ্ট্র-নেতা ছিলেন। তিনি একজন দক্ষ সেনাপতি ছিলেন। তাঁর বিভিন্নমুখী প্রতিভার উপযুক্ত মূল্য নিরূপণ করা, তাঁর বিভিন্ন আকারের এবং প্রকারের সাধনা থেকে তাঁর চরিত্রের মূল মন্ত্রটী খুঁজে বের করা, দেশ-কাল-পাত্রের গণ্ডির মধ্যে যে বিরাট কর্ম্ম-বহুল জীবন অভিনীত হয়েছে, তার Permanent element বা চিরন্তনী বৈশিষ্ট্যটাকে সে সবের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া ধীশক্তি সম্পন্ন মুক্ত চিত্ত লোকের পক্ষে উপযুক্ত

সাধনার পরই সম্ভব; যার-তার পক্ষে, যখন তখন সম্ভব নয়।

হজরত মোহাম্মদের দান

প্রত্যেক মহাপুরুষ মানবজাতিকে বিশেষ কিছু না কিছু একটা দান করে যান। বিভিন্ন মহাপুরুষের দানেই আজ আমরা এতটা সমৃদ্ধ, তাঁদের দানের কল্যাণেই আমরা আমাদের সভ্যতা Progress প্রভৃতি নিয়ে গৌরব করে থাকি; হজরত মোহাম্মদ আমাদের অর্থাৎ নিখিল মানব-জাতিকে কি দান করে গিয়েছেন, এবং সে দানের মূল্য কি তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক্।

সাম্যবাদ বা Ideal of Equality—হচ্ছে বিশ্ব সভ্যতায় হজরত মোহাম্মদের একটা প্রধান দান। কাল-সাদা, অভিজাত এবং অন্ত্যজ, ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র—এসবের প্রভেদ পৃথিবীতে আবহমান কাল থেকে চলে এসেছে এবং এখন পর্য্যন্ত যায় নি। হজরত মোহাম্মদই সর্ব্বপ্রথম এই নির্ম্মম ভেদ-জ্ঞানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পতাকা উত্তোলন করেন। জীবন-ব্রত উদ্‌যাপন করার পর, বিদায় হজ্জের দিনে সমবেত শিষ্য-মণ্ডলীকে সম্বোধন করে তিনি বজ্র-কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "আরববাসীর আরবের বাইরের লোকেদের উপর উচ্চতার দাবী করবার কোন অধিকার নাই, এবং আরবের বাহিরের লোকেরও আরববাসীদের উপর উচ্চতার দাবী করবার কোন অধিকার নাই। তোমরা সকলেই আদমের বংশধর। আর আদম মৃত্তিকা থেকে নির্ম্মিত হয়েছিল। সাম্যের সমর্থক এত বড় কথা হজরত মোহাম্মদের পূর্ব্বেও কেউ বলেন নি, আর পরেও কেউ বলেন নি। তিনি কেবল সাম্যের ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হন নি, কর্ম্মক্ষেত্রে এই উসুল বা নীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। এখন পর্য্যন্ত মুসলমানের মসজিদে সুলতান এবং ফকিরে, কোরেশ বংশজ কুলিনে এবং কৃষ্ণকায় হাবশীতে কোন পার্থক্য করা হয় না। বর্ত্তমান যুগের সাম্যের আদর্শ যে হজরত মোহাম্মদেরই শিক্ষার ফল, তা প্রত্যেক নিরপেক্ষ লোককে স্বীকার করতে হবে।

স্রষ্টা এবং সৃষ্টের মধ্যে নৈকট্য স্থাপন

সব ধর্ম্মেই পুরোহিত স্রষ্টা এবং সৃষ্টের মধ্যে বিরাট এক ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে। ভগবানকে পেতে হলে পুরোহিতের সাহায্য নিতে হবে, একথা ধর্ম্মমাত্রেই স্বীকার করে আসছে। হজরত মোহাম্মদই সর্ব্বপ্রথম এই মত-বাদের মূলে কুঠারাঘাত করেন। তার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে পুরোহিতের কোন স্থান নাই। সমাজের জন্য, জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়া-কর্ম্মের জন্য, জন্মের জন্য, মৃত্যুর জন্য, পুরোহিতের কোন প্রয়োজন নাই। মুসলমান মাত্রেই তার নিজের পুরোহিত, এবং প্রয়োজন মত অন্যেরও পুরোহিত। যে কোরাণ শরীফ পড়তে পারে, সেই পুরোহিতের কাজ করতে পারে। এই মতবাদ পৃথিবীতে যে কত বড় বিপ্লব উপস্থিত করেছিল, যাঁরা অন্যান্য ধর্ম্মের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা সহজেই তা বুঝতে পারবেন। হজরত মোহাম্মদের মহা প্রয়াণের প্রায় এক হাজার বৎসর পর Reformation এর যুগে Martin Luther, John Calvin প্রভৃতি ধর্ম্ম সংস্কারকেরা Europe মহাদেশে যে তাঁর প্রবর্ত্তিত মত-বাদেরই প্রবর্ত্তন করেন, নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক একথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবেন না।

স্বাভাবিকতার আদর্শ

হজরত মোহাম্মদের পূর্ব্বে এবং পরে যত ধর্ম্ম প্রবর্ত্ত হয়েছেন, তাঁরা সকলেই প্রকৃতির বিরুদ্ধে, ঈশ্বরদত্ত মান স্বভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গিয়েছেন, সেই স্বভাবকে স্বকপোল-কল্পিত অভিনব এক পথে চালাবার চেষ্টা করেছেন। তাদের ভ্রান্ত ধারণার ফলেই নানারকম কৃচ্ছ্র, সাধক, সন্ন্যাসী, কাপালীক প্রভৃতির উদ্ভব হয়েছে। হজরত মোহাম্মদ হচ্ছেন একমাত্র ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক—যিনি এই বিশ্বব্যাপী ভুলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, কেবল প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হন নি, প্রকৃতি এবং খোদাদত্ত মানব-স্বভাবের উপরই তিনি তার ধর্ম্মমতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কোরাণের কথায়

"তোমার অবিকৃত ধর্ম্মের দিকে মুখ কর—স্বভাব-ধর্ম্মের দিকে, যে স্বভাব-ধর্ম্মকে আল্লা সৃষ্টি করেছেন, যে স্বভাব-ধর্ম্ম দিয়ে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লার সৃষ্টিকে কেউ বদলাতে পারে না। সেই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম্ম, কিন্তু অধিকাংশ লোকে তা বুঝে না।"

এ যে কত বড় বিপ্লবাত্মক এক পরিবর্ত্তন তা দু-এক কথায় বর্ণনা করা যায় না। হজরত মোহাম্মদের মতবাদ

আজ সমস্ত সভ্য জগত কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। ফরাসী বিপ্লবের স্রষ্টা মহাত্মা Rausseauর Natural man বা স্বাভাবিক মানবের পরিকল্পনা, হজরত মোহাম্মদের প্রবর্ত্তিত শিক্ষার ভাষ্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

Universal moral God বা নিখিলের ন্যায়নিষ্ঠ আল্লার পরিকল্পনার জন্যও আমরা হজরত মোহাম্মদের কাছে ঋণী। moral God বা ন্যায়নিষ্ঠ পরমেশ্বরের কল্পনা বিশ্ব-সভ্যতার সেমিটিক জাতির বিশিষ্ট দান। আর্য্যেরা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মার পরিকল্পনায় পৌঁচেছিলেন, কিন্তু moral God বা ন্যায়নিষ্ঠ পরমেশ্বরের কল্পনায় পৌঁছুতে পারেন নি। মানুষের অন্তর এই ন্যায়নিষ্ঠ পরমেশ্বরকেই চায়, আর তাই সেমিটিক ধর্ম্মবাদ বিশ্বময় আজ ছড়িয়ে পড়ছে। সেই সেমিটিক ধর্ম্মবাদের চরম এবং পরম অভিব্যক্তি হচ্ছে মোহাম্মদের একেশ্বরবাদ। হজরত মোহাম্মদের এই নিখিলের ন্যায়নিষ্ঠ অধীশ্বরের পরিকল্পনা আজ বিশ্বময় বিস্তার লাভ করছে। Europe এর Protestant এবং Uniterian Christianity ভারতবর্ষের শিখ-ধর্ম, ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম, আর্য্য-ধর্ম্ম বর্ম্মা, সিংহল প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধদের মধ্যে একেশ্বরবাদের প্রাধান্য হজরত মোহাম্মদের শিক্ষারই ফল।

হজরত মোহাম্মদের একটী অতুলনীয় দান হচ্ছে মহাগ্রন্থ কোরাণ শরিফ। এখন পর্য্যন্ত এই মহাগ্রন্থের মূল্য মানবজাতি সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারে নি। এই গ্রন্থের এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, যার জন্য এটীকে মানব হৃদয়ের সব চেয়ে মূল্যবান দলিল, The most valuable human document রূপে ঘোষণা করতে আমি তিলমাত্র দ্বিধা বোধ করি না।

জটীল জীবনারণ্যে মানবের পথ-প্রদর্শক হিসাবে এ গ্রন্থের তুলনা নাই। কোরাণের বিশেষত্ব হচ্ছে, এ গ্রন্থ মানুষকে সংসার ত্যাগ করতে বলে না, সমাজ ত্যাগ করতে বলে না, রাষ্ট্র ত্যাগ করতে বলে না, ব্যবসায়-বাণিজ্য, কাজ-কর্ম্মও ত্যাগ করতে বলে না, পরন্তু জীবনের এই সব বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেবার জন্য তাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে, উপদেশ দেয়। জীবনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, সমাজের বিভিন্ন বন্ধন হচ্ছে তার সাধন-ক্ষেত্র। এ সবের বাহিরে সে তার ব্যক্তিত্বকে, তার মানবতাকে কখনও উপলব্ধি করতে পারে না। এই অভিনব আদর্শ অবলম্বন করে, কোরাণ ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের যে মহৎ আদর্শ মানুষের সামনে উপস্থিত করেছে, তার তুলনা আর কোথাও পাওয়া যায় না।

শিখ জাতির ধর্ম্ম-গুরু মহর্ষি গুরু নানক, কোরাণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তাই বলেছেন—

"The age of the Vedas and Puranas is gone. Now the Quran is the only book to guide the world."

"The only reason as to why man is constantly restless and goes to hell is that he has no regard for the Prophet."

হজরত মোহাম্মদের আর একটী মাত্র দানের উল্লেখ আজ এখানে করবো; **সেটী হচ্চে তার বিরাট, অতুলনীয় চরিত্রের অমূল্য অবদান।** কোরাণ শরীফ মানবতার যে অতুলনীয় শিক্ষা দিয়েছে, সে শিক্ষার ততটা মূল্য থাকত না, হজরত মোহাম্মদ যদি নিজের জীবনের মধ্যে সেটীকে, সে শিক্ষার প্রতি অক্ষরটীকে মূর্ত্ত করে না তুলতেন। হজরতের স্ত্রী বিবি আয়েষাকে তাঁর চরিত্রের বর্ণনা করতে হজরতের শিষ্যেরা অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, তোমরা কি কোরাণ পড় নি? তাঁর চরিত্র ছিল কোরাণের নিভুল এক ভাষ্য।

হজরত আলি আজীবন হজরতের সাহচর্য্যে কাটিয়েছিলেন। তিনি হজরতের বিষয় বলেছেন—"হজরতের মুখ সদা হাস্যোজ্জ্বল থাকতো, তাঁর অন্তর অত্যন্ত কোমল ছিল, তিনি বড় দয়ালু ছিলেন। তাঁর অন্তরে কঠোরতা কিম্বা সংকীর্ণতা ছিল না। কথায় কথায় তিনি রেগে উঠতেন না। কখনও কোন খারাপ কথা মুখ থেকে বের করতেন না। লোকের দোষ খুঁজে বেড়াতেন না। সহজে কারও দোষ ধরতেন না। তর্ক-বিতর্ক, অনাবশ্যক কথা বলা, অনাবশ্যক বিষয় নিয়ে সময় নষ্ট করা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি কারও কখনও নিন্দা করতেন না। কারও দোষের সন্ধানে থাকতেন না। কারও ভিতরের কলঙ্কের তল্লাস করতেন না। সেই সব আলোচনাই করতেন, যা থেকে সুফলের আশা করা যায়। কেউ কথা বললে, তার কথা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চুপ করে শুনতেন। কৌতুকের কথা শুনে অন্য লোক যখন হাসতো, তিনিও তখন মৃদু হাসতেন।

চমৎকারক কথা শুনে অন্য লোক যখন বিস্ময় প্রকাশ করতো, তিনিও বিস্ময় প্রকাশ করতেন। বাহিরের লোক এসে যদি স্পর্দ্ধার সঙ্গে কথা বলতো, তিনি ধৈর্য্য ধরে তা শুনতেন। অপরের মুখে নিজের প্রশংসা শুনতে হজরত ভালবাসতেন না, কিন্তু কেউ যদি তাঁর দয়ার কিম্বা অনুগ্রহের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিত, তিনি সে ধন্যবাদ গ্রহণ করতেন। হজরত একান্ত দানশীল, একান্ত সত্যবাদী, একান্ত কোমল-হৃদয়, একান্ত সামাজিক লোক ছিলেন।"

হজরত নম্রতার অবতার ছিলেন। শিষ্যেরা বলতেন, হজরত একজন অনূঢ়া যুবতীর চেয়েও বেশী নম্র ছিলেন। মূক প্রাণীদের উপর তাঁর দয়ার সীমা-পরিসীমা ছিল না। একজন কুঁয়া থেকে পানি তুলে একটা কুকুরকে খাইয়েছিল। হজরত তার প্রশংসা করে বললেন—"মূক প্রাণীর উপর এই দয়ার জন্যই লোকটা বেহেস্তে স্থান পাবে।" অতিথিদের তিনি নিজ হস্তে পরিবেশন করতেন। এমন অনেকবার ঘটেছে, সমস্ত খাদ্য অতিথিকে পরিবেশন করে পরিজন সহ তিনি অনশনে কাটিয়েছেন।

ওহদের যুদ্ধে তিনি গুরুতররূপে আহত হন। একটা প্রস্তরের আঘাতে তাঁর দাঁত ভেঙ্গে যায়। হজরতের অবস্থা দেখে একজন শিষ্য তাঁকে কোরেশদের উপর অভিশাপ দিতে অনুরোধ করেন। হজরত উত্তর দেন, "আল্লা আমায় অভিশাপরূপে পৃথিবীতে পাঠান নি,—লোককে সৎপথে আহ্বান করবার জন্য তার করুণারূপেই পাঠিয়েছেন। হে আল্লা, আমার জাতিকে তুমি পথ দেখাও। নিশ্চয় তারা ভাল মন্দের বিষয় অজ্ঞ।" স্ত্রী-জাতির প্রতি হজরতের স্নেহ এবং সহানুভূতির সীমা ছিল না। তিনি বলতেন, "স্বর্গ তোমাদের জননীদের পদতলে প্রতিষ্ঠিত।"

এত দয়া, এত নম্রতা, এত লজ্জা, এত কোমলতা, অথচ, সেই দুর্দ্ধর্ষ আরব জাতির মধ্যেও হজরতের অদম্য সাহসের, বিপদের সামনে নির্ব্বিকল্প স্থিরতার তুলনা ছিল না।

মক্কায় তার প্রাণ-হরণের জন্য যখন শত্রুরা ক্ষুধিত শার্দ্দূলের মত চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তখন তিনি শিষ্যদের একে একে স্থানান্তরে পাঠিয়ে দেন, কিন্তু স্বয়ং অবিচলিতভাবে সেই মক্কাতেই ধর্ম্ম প্রচার করতে থাকেন। সর্ব্বশেষে আবুবকরের সঙ্গে তিনি মক্কা থেকে প্রস্থান করেন। পথে এক গুহায় তাঁরা আশ্রয় নেন। হঠাৎ তাঁরা দেখতে পেলেন, একদল দুর্দ্ধর্ষ আরব অশ্বারোহী তাঁদের অনুসরণ করে সেইদিকে আসছে। আবুবকর সাহসী বীর-পুরুষ ছিলেন; কিন্তু এই অশ্ববাহিনী দেখে তিনি নিরাশ হয়ে পড়লেন; সন্ত্রস্ত কণ্ঠে হজরতকে সম্বোধন করে বললেন,—"আর আমাদের রক্ষা নাই। আমরা মাত্র দুইজন, অগণ্য শত্রু আমাদের সম্মুখে।" নির্ভীক কণ্ঠে হজরত বললেন—"আবুবকর, তুমি ভুল করছ। আমরা দুইজন নই, তিনজন। আল্লা আমাদের সঙ্গে আছেন।"

এই মদিনার পথেই হজরত একস্থানে বিশ্রাম করেছিলেন, এমন সময়, একজন অশ্বারোহী আরব বর্শা হস্তে সবেগে ঘোড়া চালিয়ে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হল। বর্শা উদ্যত করে সে বললে,—"মোহাম্মদ, এখন কে তোমায় রক্ষা করবে বল?" নির্ব্বিকার চিত্তে, নির্ভীক কণ্ঠে হজরত উত্তর দিলেন—"আল্লা।" সে উত্তর শুনে অশ্বারোহীর হৃত-কম্প উপস্থিত হল। বর্শা তার হাত থেকে পড়ে গেল। হজরত তখন সেই বর্শা তুলে অশ্বারোহীকে সম্বোধন করে বললেন,—"তোমায় এখন কে রক্ষা করবে বল?" ভীত অশ্বারোহী উত্তর দিল, মোহাম্মদ তুমিই আমার রক্ষা-কর্ত্তা। হজরত বললেন,—"হতভাগা, এখনও আল্লার নাম তোমার স্মরণ হল না।"

অনেক মহামানবের কথা পড়েছি এবং শুনেছি; কিন্তু ধৈর্য্যের এবং উগ্র কর্ম্ম-কুশলতার, নম্রতার এবং উন্নত আত্ম-সম্মানের, ক্ষমাশীলতার এবং ন্যায়নিষ্ঠার, বীরত্বের এবং নারী দুর্লভ কোমলতার, বৈরাগ্যের এবং সৌন্দর্য্য-প্রীতির, আধ্যাত্মিকতার এবং রাজনৈতিক ও সংসারিক জ্ঞানের, উদারতার এবং স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠার অন্তহীন জ্ঞানের এবং শিশু সুলভ সরলতার এমন অপূর্ব্ব সমাবেশের কথা অন্য কোন মহাপুরুষের জীবনে কখনও শুনি নি এবং পড়িও নি।

ডাঃ উইলের পুস্তক—

মিঃ ছেলাহুদ্দিন খোদাবখ্‌শ এদেশের সুধী-সমাজে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও শক্তিশালী সাহিত্যিক বলিয়া সুপরিচিত। মুছলমানদিগের ইতিহাস ও 'কাল্‌চার' সম্বন্ধে কতিপয় জর্ম্মান লেখকের বহি-পুস্তকাদির অনুবাদ করিয়া এবং স্বতন্ত্র প্রবন্ধাদি লিখিয়া তিনি দেশ-বিদেশে যশস্বী হইয়াছেন।

বহুদিন পূর্ব্বে তিনি জর্ম্মান পণ্ডিত ডাঃ উইলের "মোছলেম জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত" (A short history of the Islamic people) নামক পুস্তকখানি ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন এবং ভারতের কএকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে উহা পাঠ্য-তালিকা ভুক্তও হইয়া যায়। সাধারণ ইউরোপীয় লেখকদের মত ডাঃ উইলও তাঁহার এই পুস্তকের স্থানে স্থানে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার চরিত্রের উপর অতি জঘন্য আক্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অনুবাদক মিঃ খোদাবখ্‌শ পুস্তকের ভূমিকায় এই সকল আক্রমণের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি লেখকের কতিপয় মন্তব্যের সহিত একমত নহেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে উহার বিস্তারিত প্রতিবাদ করিবেন বলিয়া আভাসও দিয়াছেন। এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে মিঃ খোদাবখ্‌শ পরে "Mohamed—The prophet of God" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার "Essay, Indian and Islamic" পুস্তকের সঙ্গে ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই প্রবন্ধটী পড়িয়া দেখিয়াছি, এবং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, ভাষা, ভাব ও সূক্ষ্ম বিচারের হিসাবে বস্তুতঃই এই পুস্তক প্রণয়ন তাঁহার সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইয়াছে।

ষোল বৎসর পরে, পাঞ্জাবের এক নির্ব্বাচন-প্রতিযোগীতা উপলক্ষে ডাঃ উইলের পুস্তক সম্বন্ধে মুছলমান সমাজে নূতন করিয়া একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করা হইয়াছে। পুস্তকখানি যখন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে মনোনীত হইয়াছিল, তখন মিঃ শোজাউদ্দিন নামক কোন এক ভদ্রলোক সিনেটের মেম্বর ছিলেন। তিনি বর্ণিত নির্ব্বাচনের একজন প্রার্থী হওয়াতে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দী ডাঃ উইলের পুস্তকের আপত্তিজনক অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া বিজ্ঞাপন ছাপিয়া বিতরণ করিতে থাকেন, এবং ঐ পুস্তকখানি মিঃ শোজাউদ্দিনের মেম্বরির আমলে পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হইয়াছিল —এই হেতুবাদে পুস্তকের আপত্তিজনক অংশগুলির বোঝা তাঁহার মাথায় চাপাইয়া সমাজকে উত্তেজিত করিতে থাকেন। সাংবাদিকেরা এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া বর্ত্তমানে তাহাকে গুরুতর করিয়া তুলিয়াছেন, এবং ক্রমশঃ তাহা মিঃ খোদাবখ্‌শের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের মতে, ডাঃ উইলের এই পুস্তকখানিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করা সর্ব্বতোভাবে অন্যায় হইয়াছে। বহু বৎসর পূর্ব্বে "মোহাম্মদী"তে আমরাই প্রথমে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। কিন্তু, মুছলমান নেতাদের ধর্ম্মভাবটা দলাদলির স্বার্থ বা রাজনৈতিক গরজ ব্যতীত সহজে বড় একটা ক্ষুণ্ণ হয় না। কাজেই আমাদের প্রতিবাদের প্রতি তখন কেহই মনোযোগ প্রদান করেন নাই। যাহা হউক, এই শ্রেণীর পুস্তক পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হওয়া যে সম্পূর্ণ অন্যায়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। পরিণত জ্ঞানের অনুশীলনকারীদের সম্মুখে "Food for fresh criticism" হিসাবে কোন বহি-পুস্তক পেশ করা, আর তরলমতি যুবকদের মনকে এই শ্রেণীর জঘন্য মন্তব্য দ্বারা বিষাক্ত হইতে দেওয়া, কখনই এক

কথা নহে। পুস্তকখানি পাঠ্য-তালিকাভুক্ত না হইলে, মিঃ খোদা বখ্‌শের মন্তব্য বা তাঁহার স্বতন্ত্র-প্রবন্ধ যথেষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত। ছাত্রদের জন্ত সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ একটু করিয়া সংক্ষিপ্ত টীকা দেওয়া অনুবাদকের খুবই উচিত ছিল বলিয়া মনে করি। কারণ, অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষে তাঁহার স্বতন্ত্র প্রতিবাদ প্রবন্ধটী পাঠ করার সুযোগ না ঘটার সম্ভাবনাই অধিক। অবশ্য, যাঁহারা এই আন্দোলন উপস্থিত করার সময়ে, অনুবাদের ভূমিকায় প্রকাশিত মিঃ খোদাবখ্‌শের মন্তব্যটীর অথবা উল্লিখিত স্বতন্ত্র প্রতিবাদ প্রবন্ধটীর উল্লেখ করিতেছেন না, তাঁহাদের কাজের সমর্থনও আমরা করিতে পারিতেছি না। আমাদের মতে, ইহাতে অনুবাদকের প্রতি ঘোর অন্যায় ও অবিচার করা হইতেছে।

শনিবারে উপরের মন্তব্যটী প্রেসে পাঠাইয়া দেই। চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়, পরদিন ২৪শে শ্রাবণ রবিবার দুই প্রহর হইতে না হইতে এই মর্ম্মবিদারক সংবাদ পাইলাম যে, মানুষের বিচার-বিতণ্ডার সীমা অতিক্রম করিয়া মিঃ খোদাবখ্‌শ অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর ঠিক এক সপ্তাহ পূর্ব্বে, একজন বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে, তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই লেখকের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। অবশেষে তিনি বলেন—"মুছলমানের ইতিহাস কালচার ও সভ্যতাকে দুনয়ার চোখে গৌরবমণ্ডিত করিয়া দেখাইবার জন্ত আজীবন যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছি। তাহার পুরস্কার এই পাইলাম যে, এখন বৃদ্ধ বয়সে ঘাতকের ছুরিকার আশঙ্কায় সর্ব্বদাই আমাকে শশব্যস্ত থাকিতে হইতেছে।......ভবিষ্যতের জন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর কলম ছুঁইব না।" তিনি নিজের অভিমানকে যে এমন নিদারুণভাবে সফল করিবেন, তখন তাহা কল্পনাতেও স্থান দিতে পারি নাই। এই অক্লান্ত জ্ঞান-সাধকের আকস্মিক মৃত্যুতে কোন ভাষায় মুছলমান সমাজের দুর্ভাগ্যের মাতম করিব, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এক এক সময় মনে হইতেছে, এই মৃত্যুর জন্ত মুছলমান সমাজও বুঝি কতক পরিমাণে দায়ী। যাহা হউক, এই অক্লান্ত-কর্ম্মী জ্ঞান-সাধকের মৃত্যুতে, বিশেষ করিয়া মুছলমান সমাজের যে ক্ষতি হইল, তাহার পূরণ সহজে হইবে না।

প্রস্তাবিত ওয়াক্‌ফ আইন—

ইংরাজ আমলদারীর অব্যবহিত পূর্ব্ব যুগে যে সব ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বাঙ্গলার মুছলমানদিগের দখলে ছিল, বর্ত্তমানে তাহার অধিকাংশই পরের হস্তগত হইয়া গিয়াছে। শিক্ষা বিস্তার, আর্ত্তের সেবা, মছজেদ ও খানকা প্রভৃতির খেদমত এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য সৎকর্ম্ম যাহাতে চিরকাল নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইতে পারে, আমাদের সদাশয় ও ধর্ম্ম-প্রাণ পূর্ব্বপুরুষগণ এই উদ্দেশ্যে ঐ সকল সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ বা আল্লার নামে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রাজ্য হারা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সব কারণের দুর্ব্বার চাপে বাঙ্গলার মুছলমানকে সর্ব্বহারা হইতে হইয়াছিল, তাহারই ফলে প্রথম চোটে এই সব সম্পত্তির এক বিরাট অংশ মুছলমান সমাজের হস্তচ্যুত হইয়া যায়। কেন যায় এবং কোথায় যায়, এই শাসন সংযত দেশে সে কথা বলিয়া ফেলা খুব সহজ নহে। যাহা হউক, প্রথম দফার হৃতাবশিষ্ট যে সব ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি তখনও মুছলমানের হস্তগত থাকিয়া যায়, তাহার সংখ্যা ও বার্ষিক মুনাফার পরিমাণও কম নহে। এই কলিকাতা শহরে আমরাই প্রথম জীবনে যে সব ওয়াক্‌ফ ষ্টেটের কথা শুনিয়াছি, তাহারও এক বিরাট অংশ আজ অমুছলমান মহাজন প্রভৃতির হস্তগত হইয়াছে, অথবা তথাকথিত মৌরূসী মোতাওয়াল্লীর দল তাহা বেমালুম হজম করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু তত্রাচ এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে, আমাদের অনুমান, সেগুলির বার্ষিক আয়ও কএক লক্ষ টাকার কম হইবে না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে এই সব সম্পত্তির অধিকাংশ আয় মোতাওয়াল্লী পরিবারের বিলাস-ব্যসনে এবং অন্যান্য অকথ্য অনাচারে অপব্যয়িত হইয়া যায়, ওয়াকফের উদ্দেশ্য অনুসারে ষ্টেটের আয়ের সদ্ব্যবহার খুব কমই হইয়া থাকে। কলিকাতার ন্যায় বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই একই অবস্থা।

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্ত মুছলমান সমাজে বহুদিন হইতে একটা আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু কর্ম্ম-ক্ষেত্রে এযাবৎ উহার বিশেষ কোন সফলতা দেখিতে পাওয়া যায় নাই। না হওয়ার একটা বড় কারণ এই যে, যেসকল মুছলমান এযাবৎ সরকার কর্ত্তৃক বাঙ্গলার মুছলমান-দিগের নেতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই

হইতেছেন, নিজেরা মোতাওয়াল্লী অথবা অন্য মোতাওয়াল্লীদের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট।

অবশেষে ১৯২৩ সালে যেন-তেন প্রকারে একটা ওয়াকৃফ আইন পাস হইয়া যায়। সংবাদপত্রে এই আইন পাস হওয়ার রিপোর্ট পাঠ করা ব্যতীত কার্য্যক্ষেত্রে তাহার কোন উপকার আমরা আজ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই। আইনটী যেরূপভাবে রচিত, তাহাতে উহা দ্বারা বিশেষ কিছুর আশা করাও যায় না। জনসাধারণের স্বার্থ-রক্ষার জন্য প্রবল প্রতাপান্বিত মোতাওয়াল্লীদের সহিত বিবাদ করা, মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হওয়া এবং শেষ রক্ষা করিয়া সে মোকদ্দমায় জয়যুক্ত হওয়া কয়জন মুছলমানের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। ফলতঃ ১৯২৩ সালের আইনটী কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে এবং মোতাওয়াল্লীগণ ওয়াকৃফ সম্পত্তিগুলির আয় পূর্ব্বের ন্যায় যথেচ্ছাচারের সহিত নির্ব্বিঘ্নে ব্যয় করিয়া আসিতেছেন।

দেখিয়া সুখী হইলাম, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য মৌলবী আবদুলগণি চৌধুরী ছাহেব এই সব অপচয় ও অনাচারের প্রতিকারের জন্য "১৯৩১ সালের বঙ্গীয় ওয়াকৃফ আইন"—নামে একটী আইনের খসড়া কাউন্সিলে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই সাধু প্রচেষ্টার জন্য আমরা চৌধুরী ছাহেবকে সমাজের পক্ষ হইতে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই মুসাবিদায় আইনের খুঁটি-নাটি যদি কিছু থাকে, সে সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশের অধিকারী আমরা নহি। তবে ওয়াকৃফ সম্পত্তিগুলির উদ্ধার, রক্ষা ও তাহার সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে এই আইনটী যে বিশেষ কার্য্যকরী হইবে, মুসাবিদাটী মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া সে বিশ্বাস আমাদের জন্মিয়াছে। মুছলমান সমাজ এই প্রকার একটা আইনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। বড় লাট বা গবর্ণর সাহেবের সম্মতির অভাবে যাহাতে মুসাবিদাটীকে অঙ্কুরে বিনাশ-প্রাপ্ত হইতে না হয়, সমাজের সেদিকে অবহিত হওয়া উচিত। চৌধুরী ছাহেবের প্রস্তাব মত আইনটী পাস হইয়া গেলে মোছলেম বঙ্গে একটা সুপ্রভাতের সৃষ্টি হইবে এবং তাহাদের কএকটা গুরুতর অভাবের প্রতিকার সঙ্গে সঙ্গে হইয়া যাইবে। এই শ্রেণীর আইনে বাধা দিবার লোকের অভাব মুছলমান সমাজে নাই। বিশেষতঃ বর্ত্তমানে "বেড়ায় কাঁকুর খাওয়ার" আশঙ্কাও কতকটা আছে। তাই সমাজকে সতর্ক থাকিতে অনুরোধ করিতেছি।

"সনাতন ধর্ম্মের সন্ধানে"—

মাসিক "বিশ্ববাণী"তে, শ্রীযুত শৈলেশ নাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ নামক জনৈক ভদ্রলোক উপরোক্ত শীর্ষ দিয়া একটা ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের ২য় কিস্তির ১৩ দফার প্রতি জনৈক স্নেহভাজন বন্ধু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই দফায় বলা হইতেছে :—

"বাইবেল এবং কোরাণ সনাতন ধর্ম্মীর ন্যায় এক ঈশ্বর স্বীকার করিলেও তাঁহাদের মত ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব স্বীকার করেন না। সনাতন ধর্ম্মী বলেন, জগৎ ও ঈশ্বর এক এবং ঈশ্বর জগৎ হইতেও অতিরিক্ত। কোরাণ ও বাইবেল এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তাঁহারা পরমাত্মা একং বলিতে শিখিয়াছেন "এব অদ্বিতীয়ং" এতদূর পর্য্যন্ত বলিতে শেখেন নাই। তাই তাঁহারা পরস্পরের ধর্ম্মমতে অসহিষ্ণু! ··· ··· বাইবেল ও কোরাণ বলেন, ঈশ্বর জগৎ হইতে ভিন্ন, সৃষ্ট-বস্তু ও স্রষ্টা এক নন। এই খানেই তাঁহাদের সহিত সনাতন ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মতদ্বৈধ"—ইত্যাদি।

শৈলেশবাবু তাঁহার "সনাতন ধর্ম্মের" ব্যাখ্যা ও আলোচনা যে প্রকারে ইচ্ছা করিতে পারেন, ধর্ম্মের হিসাবে কোন অহিন্দুর তাহাতে বলার কিছুই থাকে না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই আলোচনায় অন্যের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ তুলনামূলক সমালোচনা করিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে সমীচীন হয় নাই। তিনি এখানে যে তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার মূল হইতেছে—দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের বহু প্রাচীন ও বিদিত মত-ভেদের উপর। প্রত্যেক উন্নত জাতির দার্শনিক পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে নানাবিধ সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। ফলতঃ বিষয়টী তাঁহাদেরই একচেটিয়া আয়ত্ত বা অধিকারভুক্ত নহে। মুছলমান দার্শনিক ও সাধকগণের ইতিবৃত্ত এবং তাঁহাদের কৃত শাস্ত্র-ব্যাখ্যা প্রভৃতি পাঠ করিয়া দেখিলে শৈলেশবাবু এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন।

শৈলেশবাবু খৃষ্টান ও মুছলমানদিগের ধর্ম্মমতের অপূর্ণতা প্রতিপাদন করিতে গিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহারা একং

বলিতে শিখিয়াছেন কিন্তু "এব অদ্বিতীয়ং" পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়ার শক্তি তাঁহাদের হয় নাই, আর এইজন্যই তাঁহারা পরস্পরের ধর্ম্মমত-অসহিষ্ণু। এই উক্তিটী আগাগোড়াই ভুল। প্রথমতঃ, খৃষ্টানেরা ত্রিত্ববাদী, একত্ব স্বীকার করিলে তাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মূল ভিত্তিটাই ধ্বংস হইয়া যায়। অথচ শৈলেশবাবু তাঁহাদিগকে একত্ব-বাদী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। তাহার পর, তিনি বারম্বার কোরআনের দোহাই দিয়া বলিতেছেন—মুছলমানরা একত্ব মানেন, কিন্তু 'এব অদ্বিতীয়ং' পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এই মন্তব্য দ্বারা জানা যাইতেছে যে, কোরআন বা অন্যান্য এছলামী ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করার সুযোগ জীবনে তাঁহার কখনও ঘটিয়া উঠে নাই। নচেৎ তিনি মুছলমান-ধর্ম্মশাস্ত্রের সর্ব্বত্রই وحده বা 'তিনি এক' এই পদের সঙ্গে সঙ্গে لاشريك له অর্থাৎ 'তিনি অংশী বা দ্বিতীয় রহিত' এই পদটীও দেখিতে পাইতেন। তবে এই 'অদ্বিতীয়' শব্দের যে তাৎপর্য্য শৈলেশবাবু এবং তাঁহার ন্যায় আধুনিক অদ্বৈতবাদীরা গ্রহণ করিয়া থাকেন, এছলাম নিশ্চয়ই সে ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন না। শৈলেশবাবু একটু যত্ন-সহকারে নিজেদের ঘরের সন্ধান লইলেই জানিতে পারিবেন যে, বস্তুতঃ তাঁহাদের এই 'অদ্বৈতবাদের' থিওরিটা সনাতনও নহে শাশ্বতও নহে, এবং হিন্দুশাস্ত্রকার ও দার্শনিকেরা এ সম্বন্ধে একমতও নহেন। দ্বৈতবাদও তাঁহাদের "সনাতন শাস্ত্রের" একটা অভিমত। "সৃষ্টি ও স্রষ্টা অভিন্ন"—হিন্দু ধর্ম্মের আধুনিক সংস্কারকগণও এ মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। শৈলেশ বাবুকে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর পুস্তকগুলি, বিশেষতঃ তাঁহার "সত্যার্থ প্রকাশ" পুস্তকের ৭ম ও ১১শ সমুল্লাস দুইটী ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। আমরা যতদূর জানি, ব্রাহ্ম সমাজও বেদান্তের "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" পদের, মুছলমানদের অনুরূপ তাৎপর্য্যই গ্রহণ করিয়াছেন। ফলতঃ 'সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর এবং তাঁহার সৃষ্ট জীব ও জগৎ ভিন্ন'—এই কথা বলিলে ঈশ্বরের অদ্বিতীয়তাকে অস্বীকার করা হইল, এরূপ দাবী করার কোনই দার্শনিক কারণ নাই। ঈশ্বর দ্বিতীয় রহিত হইতেছেন তাঁহার সত্তায় ও গুণে, অর্থাৎ তাঁহাতে দ্বিতীয় বা শরিক আর কেহ নাই।

শৈলেশ বাবু বলিতেছেন—খৃষ্টান ও মুছলমানেরা "এব অদ্বিতীয়ং"এর সন্ধান পান নাই বলিয়া পরস্পরের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে তাঁহারা এতটা অসহিষ্ণু। বেশ কথা, তাঁহারা তো এই পরমার্থটা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন? তাহা হইলে মুছলমান আর খৃষ্টানের মত খণ্ডন করার জন্য লেখকের এত আগ্রহ কেন? ইহাই কি পরমত সহিষ্ণুতা? জিজ্ঞাসা করি, যে শঙ্করাচার্য্যকে কেন্দ্র করিয়া এই অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছে, জৈন ধর্ম্মমত সম্বন্ধে তিনি ও তাঁহার শিষ্যবর্গ যে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, শৈলেশ বাবু কি তাহার কোন সন্ধান রাখেন। "শঙ্করাচার্য্যের সময়ই জৈন প্রধ্বংস হয় এবং জৈনদিগের মূর্ত্তি ও মন্দিরগুলি বলপূর্ব্বক বিধ্বস্ত করিয়া ফেলা হয়"—একথা কি মিথ্যা? জিজ্ঞাসা করি—

> ন বদেদ্ যাবনীং ভাষাং প্রাণৈঃ কণ্ঠাগতৈরপি।
> হস্তিনা তাড্যমানোঽপি ন গচ্ছেজ্জৈন মন্দিরম্॥

প্রভৃতি শ্লোকগুলি কাহারা রচনা করিয়াছিল? "এব অদ্বিতীয়ং"-এর পরমার্থজ্ঞান প্রথম যুগের অদ্বৈতবাদীদের মধ্যে যে পরমত সহিষ্ণুতার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল, তাহা স্মরণ রাখিয়া কলম চালাইলে লেখক মহাশয় কখনই এরূপ অন্যায় অভিমত প্রকাশ করিতে পারিতেন না।

এছলাম যে ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপকতা স্বীকার করেন না—ইহাও আর একটী অসত্য কথা। অবশ্য, কোন বস্তু অন্য কিছুর ব্যাপক হইলে তাহাকে ব্যাপ্যের সঙ্গে অভিন্ন হইতে হইবে, এছলাম এ প্রতিজ্ঞা স্বীকার করেন না।

———

গোল-মেজ—

মাওলানা শওকত আলী এবং তাঁহার প্রধান খলিফা মৌলভী শ'ফী দাউদ নগরী ছাহেব গোল-মেজ কনফারেন্সের মেম্বর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। ইঁহারা এজন্য অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া ও মান-অভিমান দেখাইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা এখন যথেষ্ট স্বস্তিলাভ করিয়াছেন বলিয়া আশা করি। মিঃ শহীদকে লইলে আর কোন হাঙ্গামা থাকিত না। বেচারীর এত সাধ্য-সাধনা ব্যর্থ হইয়া যাওয়া ঠিক হয় নাই।

মৌঃ দাউদ নগরী, মিঃ ছোহরাওয়ার্দ্দী প্রমুখ মুছলমান সমাজের নামজাদা নেতারা বড়লাটকে তার করিয়া ধমক দিয়াছিলেন—জাতীয়দলের কাহাকেও প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত

করিলে, মোছলেম কনফারেন্সের সদস্যবর্গের অত্যন্ত ক্রোধ হইবে। এমন কি, গোলটেবিলকে তাঁহারা হয়তো "বয়কট" করিয়া ফেলিবেন। জাতীয় দলের একজন বা দুইজন মুছলমানকে গোলটেবিলে নিমন্ত্রণ করিলে যে তাঁহাদের দলের মূল্য-মর্য্যাদা কিছু বাড়িয়া যাইবে অথবা হিন্দু-সভা ও মোছলেম কনফারেন্সের প্রতিনিধিদের সংঘর্ষের মধ্যে তাঁহারা যে বিশেষ কিছু সফলতা অর্জ্জন করিতে পারিবেন, এ আশা আমাদের কখনও ছিল না, এখনও নাই। কিন্তু তবুও এই বয়কটের ধমকের পর আমাদের বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল—যেন জাতীয়দলের একজন মুছলমানও গোল মেজে যাইতে পারেন। কারণ তাহা হইলে ইহাদের কথার মূল্যটা দুনয়ার সম্মুখে প্রকাশ পাইতে পারিবে। সুখের বিষয়, প্রথম তালিকায় সার ছৈয়দ আলি এমামের নাম বাহির হইয়াছে। কিন্তু বয়কটের নাম গন্ধও আর কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না।

এই উপলক্ষে গবর্ণমেন্টের ভাব-গতিক দেখিয়া আমরা অবাক হইয়াছি। তাঁহারা দরদীর অভিনয় করিয়া বলিতেছেন—হিন্দু মুছলমান! দোহাই তোমাদের, নিজেদের ঘরওয়া বিবাদগুলি মিটাইয়া লও, একমত হইয়া স্বরাজ গ্রহণ কর! কিন্তু গোলটেবিলের জন্য বাছিয়া বাছিয়া হিন্দুসভার ও মোছলেম কনফারেন্সের পাণ্ডাদিগকেই মেম্বর নির্ব্বাচিত করা হইতেছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, গোল টেবিলে ইহাদের দ্বারা মেড়ার লড়াই লাগাইয়া তাহাদের শোচনীয় আত্মকলহ ও অপদার্থতাটা দুনয়াকে প্রদর্শন করা এবং অবশেষে নিজেদের দরকার ও সুবিধামত তাহার 'মীমাংসা' করিয়া দেওয়া—ইহাই হইতেছে তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। নচেৎ বাছিয়া বাছিয়া ভারতের যত Re-actionary forceকে তাঁহারা গোল টেবিলে কেন্দ্রীভূত করিতেছেন কেন? যাহাদের স্বার্থ হইতেছে সংঘর্ষে ও যাহাদের প্রকৃতি হইতেছে সংঘর্ষের, সাম্প্রদায়িকতার কলহ-কোন্দলের উপরই যাহাদের নেতৃ-জীবনের অস্তিত্ব ও সফলতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে, গবর্ণমেণ্ট বাছিয়া বাছিয়া তাহাদের প্রত্যেককে গোল টেবিলে সমবেত করিতেছেন—সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্য!

———

মতভেদের মূল কোথায়?—

মোছলেম কনফারেন্সের ও জাতীয় দলের মুছলমান-দিগের মন্তব্যগুলির বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে সকলে স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, এক নির্ব্বাচন-প্রণালীর মতভেদ ব্যতীত, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছুই নাই। তত্রাচ মওলানা শওকৎ আলী ও তাঁহার খলিফাবর্গ জাতীয়দলের মুছলমানদের নামে একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিতেছেন, গুণ্ডা লাগাইয়া এবং ছুরি ও লাঠি চালাইয়া তাহাদিগকে জব্দ করার চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি এই দলের গুণ্ডাদিগের হাতে বোম্বের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ চাগলা, বোম্বে ক্রনিকেলের স্বনামখ্যাত সম্পাদক মিঃ আবদুল্লাহ বেরেলভী এবং হাকিম আবদুল জলিল নদভী প্রভৃতির ন্যায় সম্ভ্রান্ত মুছলমানদিগকে নির্ম্মমভাবে প্রহৃত হইতে হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই বোম্বে নগরে জাতীয়দলের একজন সম্ভ্রান্ত যুবককে কিরূপে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হইয়াছিল, সংবাদপত্র পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। সে দিন হজরতের জন্মতিথি উপলক্ষে কলিকাতার গড়ের মাঠে খেলাফৎ কমিটীর পক্ষ হইতে যে সভার অধিবেশন হইয়াছিল, মিঃ শহীদ তাহাতে দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া অন্য দলের মুছলমান-দিগকে যেরূপ ইতর-ভাষায় আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাও সকলে অবগত আছেন!

"একমাত্র নির্ব্বাচন-প্রণালী সম্বন্ধে মতভেদ, কিন্তু এই মতভেদের জন্য মুছলমান সমাজে যে ঘোর আত্মকলহের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অতি শোচনীয়"—সংবাদ পত্রের জনৈক রিপোর্টারের নিকট, স্যার মোহাম্মদ ইয়াকুব সেদিন এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সকল দিকের অবস্থা আলোচনা করিয়া আমাদের মনে হইতেছে—স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন বাহ্যতঃ মতভেদের কেন্দ্ররূপে গৃহীত হইলেও, প্রকৃত পক্ষে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে অন্য এক স্থানে।" আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, জাতীয়দলের নেতারা যদি আজ স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন স্বীকার করিয়া লন, তাহা হইলেও এ সংঘর্ষের নিবৃত্তি হইবে না।

প্রকৃত পক্ষে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে দুইদলের পরস্পর বিরোধী মানসিকতায়। 'দুই দলের লক্ষ্য ও আদর্শ স্বতন্ত্র, বরং পরস্পর বিরোধী। এই বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী আদর্শকে জয়যুক্ত করার আগ্রহের ফলে এই বিপরীত মানসিকতার সৃষ্টি। জাতীয়দলের মুছলমান-দিগের প্রধানতম আদর্শ হইতেছে—দেশের মুক্তি! এই আদর্শকে জয়যুক্ত করার জন্য তাঁহারা মুছলমানদিগের স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে কংগ্রেসের সহিত একটা আপোষ নিষ্পত্তি করিয়া লওয়ার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। এমন কি, হিন্দু নেতাদের অন্যায় জেদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেও তাঁহারা সময়ে সময়ে কুণ্ঠিত হন না। পক্ষান্তরে, এই আদর্শের খাতিরে তাঁহারা সকল প্রকার অগ্নি-পরীক্ষাকে সাদরে বরণ করিয়া লইতেও সর্ব্বদা প্রস্তুত। অন্য দলের আদর্শ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রকৃতপক্ষে অন্তরে অন্তরে তাঁহারা স্বরাজ বা স্বাধীনতার ঘোর পরিপন্থী। এইজন্য মুক্তি-সাধনার প্রত্যেক উপায় ও উপকরণকে তাঁহারা বিদ্বেষের চক্ষে দর্শন করেন এবং তাহার পন্থাগুলিকে বিঘ্ন-সঙ্কুল করিয়া দেওয়ার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া থাকেন। লবণ আইন পুনঃ-প্রবর্ত্তিত করার প্রস্তাবে, আবকারীর দোকানগুলিতে

পিকেটিং করার বিরুদ্ধাচরণে, বহুল পরিমাণে বিলাতী মদ ব্যবহার করার অনুরোধে এবং স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্যকে ধ্বংস করার জন্য দশ কোটি টাকার কোম্পানি গঠনের কল্পনায় সেই একই ভাব-ধারার অভিব্যক্তি হইয়া যাইতেছে।' হিন্দু-মুছলমান সমস্যায় কোন সমাধান যাহাতে না হইতে পারে এবং এই অজুহাতে বিদেশী শাসন যাহাতে এদেশে চিরস্থায়ী হইয়া থাকে, একমাত্র এই কারণে নির্ব্বাচন-প্রণালীর কলহ-কোন্দলটাকে তাহারা বড় করিয়া পাকাইয়া তুলিয়াছেন। বিদেশী শাসক ও শোষক সম্প্রদায়ের লোকেরা যে এই দলের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইবেন বা পরোক্ষভাবে তাহাদের পৃষ্ঠ-পোষকতা করিবেন, ইহা অস্বাভাবিক নহে।

প্রকৃত পক্ষে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে দুই বিপরীত মানসিকতার মধ্যে, পরস্পর বিরোধী দুইটী আদর্শ উপলক্ষে। সুতরাং ইহাদের মধ্যে সন্ধি হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। বর্ত্তমান সময়ে অন্তদলের নেতাদের কাজ ও কথার মধ্য দিয়া যে ক্ষিপ্ততা ও বিকারের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা দ্বারা তাঁহাদের দলের স্বাভাবিক জীবন-অবদানের চরম দৈন্যই সূচিত হইতেছে। পক্ষান্তরে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে আজকাল বিভিন্ন সূত্রে যে সব সাড়া পাওয়া যাইতেছে, তাহা দ্বারা বেশ জনা যাইতেছে যে, সমাজের শিক্ষিত যুবকগণের অন্তরাত্মা অন্তদলের আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে। এই শক্তিকে সংহত ও নিজেদের সঙ্গে সমাবেশিত করিয়া লইতে পারিলেই জাতীয় দলের মত জয়-যুক্ত হইয়া যাইবে এবং ইহাই হইতেছে অন্তদলের বর্ত্তমান বিকারের প্রকৃত ঔষধ।

কিন্তু এজন্য জাতীয়দলের নেতাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে নিজেদের মত ও পথকে আরও দৃঢ় ও আরও স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে, তাঁহাদের মতের সমর্থন করিলেও অনেকে তাঁহাদের দল ভুক্ত হইতে প্রস্তুত হন না। কারণ, তাঁহারা মনে করেন যে, যে কোন অবস্থায় কংগ্রেসের সমর্থন করাই 'ন্যাশন্যালিষ্ট পার্টির' প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের মতে, আসলে এই ধারণাটা অমূলক হইলেও, এই অমূলক ধারণার সৃষ্টির জন্য জাতীয়দলের কতিপয় মেম্বরই প্রধানতঃ দায়ী।' ভবিষ্যতে যাহাতে এই প্রকার অমূলক সন্দেহের সুযোগও না ঘটিতে পারে, সেজন্য সতর্ক হইতে হইবে। আমাদের মতে, যাঁহারা ন্যাশন্যালিষ্ট পার্টির মেম্বর নহেন অথচ তাঁহারা অগ্রসর নীতির সমর্থন করেন—বিভিন্ন জেলা হইতে এই শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া কলিকাতায় বা ঢাকায় এ সম্বন্ধে অনতিবিলম্বে একটা পরামর্শ সভার অধিবেশন হওয়া আবশ্যক।' কর্তৃপক্ষ আমাদের এই নিবেদনটীর প্রতি মনোযোগ দিলে বাধিত হইব।

শেখ আবদুর রহিম—

হজরতের জীবন-চরিত ও অন্যান্য বহু সৎগ্রন্থ রচয়িতা এবং মিহির ও সুধাকর ও মোছলেম হিতৈষী প্রভৃতি সংবাদপত্রের স্বনামখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও সম্পাদক জনাব মুনশী শেখ আবদুর রহিম ছাহেব পরলোক গমন করিয়াছেন। মুনশী ছাহেবের সহিত মোছলেম-বঙ্গের বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর ইতিহাসের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যে কয়জন মুছলমান বাঙ্গলা ভাষার মধ্যবর্ত্তিতায় অধঃপতিত বাঙ্গালী মুছলমানের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং নিজেদের অশেষ ত্যাগ ও অটুট সঙ্কল্প লইয়া জাতির জীবন-সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন, জনাব মুনশী ছাহেব সেই অগ্রদূত কয়জনের অন্যতম বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করা এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে সম্ভবপর নহে। তবে এটুকু খুব দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, তাঁহার দানকে বাঙ্গলার মুছলমান চিরকালই কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মাথায় করিয়া রাখিবে। আল্লাহতাআলার হুজুরে বিনীত প্রার্থনা—তাঁহার আত্মা শান্তিলাভ করুক, মগফেরাৎ প্রাপ্ত হউক! মরহুম শেখ ছাহেবের শোক-সন্তপ্ত পরিজনবর্গের সহিত আমরা গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

শিরাজী ছাহেব—

বিপদ কখনও একাকী আসে না। শেখ ছাহেবের এন্তেকাল সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে, সিরাজগঞ্জের বিখ্যাত বাগ্মী, কবি, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক নেতা জনাব মৌলবী মোহাম্মদ এছমাইল হোছেন শিরাজী ছাহেবের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া আমরা যারপরনাই মর্ম্মাহত হইয়াছি। মরহুম শিরাজী ছাহেব বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং নানাদিক দিয়া সে প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয়ও তিনি দিয়া গিয়াছেন। শিরাজী ছাহেবের এই অকাল এন্তেকালে মুছলমানমাত্রই বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। তাঁহার শোকার্ত্ত স্বজনগণের প্রতি আমরা অন্তরের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য গফুরর রহিমের দরগাহে কাতরে মোনাজাত করিতেছি।

Printed and Published by Md. Khairul Anam Khan from the "Mohammadi Press,"
91, Upper Circular Road, Calcutta.

IMPERIAL DENTAL WORKS

রমনীর, রমনীয়-রূপের আধার
কেশরঞ্জন
স্নানে স্নিগ্ধকর
প্রসাধনে প্রীতিকর

Printed at The "Mohammadi Press," 91, Upper Circular Road, Calcutta.

মোহাম্মদী

১৩৩৮

...ক তিন টাকা ছয় আনা। সম্পাদক—মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা

বন্‌ভিলের কোকোই চাহিবেন

তাহা হইলেই আপনি নিঃসন্দেহে গ্যারাণ্টিযুক্ত বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট কোকোই পাইবেন। এই কোকো খুব যত্নের সহিত প্রস্তুত করা হয় এবং ইহার গন্ধও খুব সুন্দর।

বন্‌ভিলের কোকোর দাম একটু বেশী পড়ে বটে, কিন্তু খতিয়ে দেখ্‌তে গেলে ইহা যথেষ্ট সস্তা কারণ এতটুকু "বন্‌ভিলের" উপকার যথেষ্ট।

বন্‌ভিলের কোকো উদ্দীপক, হৃদ্য এবং পুষ্টিকারক, ইহা পান করিলে সারাদিনের কার্য্য করিবার উৎসাহ ও উদ্যম বাড়ে, এবং রাত্রে ঘুমাইবার পূর্ব্বে পান করিলে রাত্রে বেশ সুনিদ্রা হয়। ইহা উৎকৃষ্ট খাদ্য এবং পানীয়।

BOURNVILLE COCOA

স্বাস্থ্য এবং শক্তির জন্য

জান্তব চর্ব্বি বর্জ্জিত এবং প্রস্তুত কালীন হস্ত দ্বারা স্পর্শিত নহে

BOURNVILLE COCOA
PURE SOLUBLE COCOA

ক্যাডবেরী কর্ত্তৃক প্রস্তুত, বর্নভিলে, ইংলণ্ড

সূচীপত্র—আশ্বিন, ১৩৩৮

কুসুমের সুষমা-
ও
চাঁদমুখ
প্রিয়মুখ
পাইতে—
বিনামূল্যে নমুনা
স্নো
ইণ্ডিয়ান পারফিউমারি
—ওয়ার্কস—

সূচীপত্র—আশ্বিন, ১৩৩৮

সূচীপত্র—আশ্বিন, ১৩৩৮

The original and genuine
Sanatogen

SANATOGEN

মার্কোজোন

(হাইড্রোজেন প্যারক্সাইড ১২ গুণ তেজস্কর)

শক্তি, স্থায়িত্ব এবং বিশুদ্ধতার জন্য বিখ্যাত

আধুনিক বিজ্ঞান মতে হাইড্রোজেন প্যারক্সাইড একটি বিশেষ আবশ্যকীয় উপাদান। ক্ষত, ফোড়া ইত্যাদির চিকিৎসায় ইহার তীব্র প্রতিষেধক এবং ইহার রোগবীজাণু ধ্বংসকরী গুণের তুলনা নাই। ইহার দ্বারা মুখ ধুইলে বা কুলকুচা করিলে কণ্ঠনলী ও ফুসফুস পীড়া হয় না। দাঁতগুলি পরিস্কার এবং সাদা ধপধপে থাকে। মাথায় মাখিলে মাথার মরামাস এবং গায়ে মাখিলে ঘামাছি, চুলকানি আদি আরাম হয়। হাতের নখ সাদা রাখিয়া ইহা নখের কনি পরিস্কার রাখে এবং কুৎসিৎ নখ উজ্জ্বল করে। ইহা গৃহস্থের শত শত প্রয়োজনে ব্যবহারে আসে—কিন্তু ইহা শক্তিশালী, নির্ভরশীল এবং বিশুদ্ধ হওয়া চাই।

‘মার্কোজোনই’ কিনিবেন, তাহা হইলেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিষই পাইবেন এবং ইহার উপরই আপনি নিঃসন্দেহে নির্ভর করিতে পারিবেন। কারণ ইহার সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা এবং নির্ভরশীলতার জন্য খ্যাতি ইহার প্রস্তুতকারগণ ২৬০ বৎসরের উপর পাইয়া আসিতেছেন। এবং ইহা ডার্ম্মষ্টাড, হেসী, জার্ম্মানীতে ই, মার্ক কর্ত্তৃক প্রস্তুত।

৪ আউন্স, ১০ আউন্স এবং ২০ আউন্স পেটেণ্ট বোতলে থাকে।

সকল ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

ধনী ও গরীব সকলের উপযোগী

হাতে বাঁধা **ঘড়ি** (রিষ্ট ওয়াচ) দেখিতে সৌখীন ও সাইজে ছোট; এক দমে ৩৬ ঘণ্টা চলে গ্যারাণ্টি কলকব্জা মজবুত ঠিক সময় রাখে; চামড়া অথবা সিল্ক ব্যাণ্ড সহ পুরুষ অথবা মহিলাদিগের ব্যবহারোপযোগী নিকেল কেস ৫৲, নকল সোনা ৯ ক্যাঃ গিল্ট কেস্ ৫৷৹, ঐ ১৪ ক্যাঃ গিল্ট ৬৲, ঐ ১৮ ক্যাঃ ৬৷০, ঝিণুকের (Mother of Pearl) কেস ৭৲, আসল চাঁদি রূপার কেস্ ৭৷০, আসল ৯ ক্যারেট খাঁটি সোণার কেস্ ১৫৲, আসল 14 ক্যারেট খাঁটি সোনার কেস্ ২০৲, আসল ১৮ ক্যারেট খাঁটি সোণার কেস্ ২৫৲

সস্তায় সুন্দর **পকেট** ঘড়ি রেলওয়ে রেগুলেটর শেপ মাঝারি সাইজ ১ দমে ৩৬ ঘণ্টা চলে গ্যারাণ্টি কলকব্জা মজবুত ঠিক সময় রাখে, বাক্স সহ নিকেল কেস্ ২৸৴৹; সোণার গিল্ট কেস্ ৩৸৴৹; রূপার কেস্ 8৸৴০; এই ঘড়িগুলির দাম কম বলিয়া যখন তখন যেখানে সেখানে ব্যবহার করিবার বড়ই সুবিধা। ইহার মধ্যে জুয়াচুরি নাই।

আসল পকেট **রেলওয়ে** রেগুলেটার ঘড়ি ভদ্রলোকের ব্যবহারোপযোগী ছোট সাইজ দেখিতে সুদৃশ্য ও মজবুত- পুরুষ ক্রমান্বয়ে ব্যবহার করিতে পারিবেন খারাপ হইবে না, গ্যারাণ্টি ১ দমে ৩৬ ঘণ্টা ঠিক সময় রাখে; বাক্স সহ (Heavily Nickelled) নিকেল কেস্ মূল্য ৫৲ মাত্র।

প্রত্যেক ঘড়ির ডাঃ মাঃ খরচা।৶০ ও ২টী ঘড়ির ডাঃ মাঃ খরচা ৷৹ আলাদা

দি য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান ওয়াচ কোং,
(হ) পোষ্ট বক্স নম্বর ৪৬৪, কলিকাতা।

ডাক্তার কর্ণেল সাহেবের

‘গয়টার কিওর’

গলগণ্ড বা ঘ্যাগ রোগের একমাত্র মহৌষধ।

ঔষধ ব্যবহারের পূর্ব্বে। ঔষধব্যবহারের পরে।

গলগণ্ড বা ঘ্যাগ অতি ভীষণ রোগ। ইহার একমাত্র প্রতিকার “গয়টার কিওর”। যে কোন প্রকার গলগণ্ড বা ঘ্যাগ হউক না কেন ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহাতে কোন প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা বা ঘা হইবার আশঙ্কা নাই। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা মাশুল স্বতন্ত্র।

ডাক্তার কর্ণেল এণ্ড কোং
৯ নং আন্তনী বাগান লেন, কলিকাতা

Cow & Gate শক্তি দান করে।

যে সকল ছেলে মেয়ে "কাউ এণ্ড গেট" সেবন করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে তারা সদাই বীর্য্যবান ও উৎসাহী। রাত্রে তারা গাঢ় নিদ্রা যায়—প্রত্যুষে স্ফূর্ত্তিতে বেড়ায়—সদাই প্রাণে স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ লেগেই আছে।

এই সুপ্রসিদ্ধ খাদ্য খাইয়াই তাদের স্বাস্থ্য গঠিত হ'য়েছে—যাহা অপর কোন শিশুদের খাদ্যতে দান করিতে পারে না। ইহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ—অত্যধিক পুষ্টিকারক এবং সেইরূপ সুপাচ্য। পৃথিবীর সর্বত্রই "কাউ এণ্ড গেট" খাইয়াই ছেলে মেয়েরা এরূপ সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ করিয়া প্রকৃতই সুখে জীবন যাপন করিতেছে।

"কাউ এণ্ড গেটের"
নূতন রক্ষ
চাহিবেন।

ভারতবর্ষের এজেণ্টগণ ঃ—

মেসার্স কার এণ্ড কোং লিঃ, ব্যালার্ড ষ্টেট, বোম্বাই

এবং কলিকাতা, করাচি ও মাদ্রাজ।

ড্রাম ৴৫ এস, কে, রায় এণ্ড কোং ড্রাম ৴১০

এমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী

৯, বনফিল্ডস্ লেন।

হেড অপিস ১নং বনফিল্ডস লেন, ব্রাঞ্চ ২১৬ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বিশুদ্ধ ও টাট্‌কা আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ড্রাম ৴৫ ও ৴১০ পয়সা। কলেরা ও গৃহচিকিৎসার ঔষধ একখানি চিকিৎসা পুস্তক ও ১টা কৌটা ফেলিবার যন্ত্রসহ বাক্স ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ৮৪, ১০৪ শিশি পূর্ণ যথাক্রমে—২৲, ৩৲ ৩৷০, ৫৷০, ৬৷৴০ ৯৲, ১০৸৴০—বাইওকেমিক ঔষধ পূর্ণ বাক্স, পুস্তক ও স্পুনসহ ১২টি এক ড্রাম কিংবা দুই ড্রাম ঔষধ পূর্ণ শিশিসহ যথাক্রমে ২৷০ ও ৩৸০, ঐ ৪ ড্রাম বাক্স সাড়ে ৬৷০, মাশুলাদি স্বতন্ত্র। সুগার অফ মিল্ক, গ্লোবিউল, পিলিউল, কার্ডবোর্ডের কেস, থার্ম্মোমিটার, ষ্টিথিস্কোপ টিউব শিশি, সিরিঞ্জ, হাইপো-সিরিঞ্জ, ভেলভেট কর্ক, ডিসপেন্সিং, কর্ক নানাবিধ শিশি, পুস্তক, যন্ত্রাদি এবং চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়। প্রত্যেক অর্ডার অতি যত্ন সহকারে যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে সরবরাহ করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আমাদের জিনিষ সর্ব্বাংশে উচ্চাঙ্গের ও সুলভ, আমাদের খরিদ্দার বিশিষ্ট ক্লাব, কলেজ, স্কুল, মাদ্রাসা, মক্তব প্রভৃতি—আজই সচিত্র ক্যাটালগের জন্য "মোহাম্মদী" পত্রিকার নাম উল্লেখ করিয়া পত্র লিখুন।

বি, রায় এণ্ড কোং,

৪৯নং হ্যারিসন রোড,

কলিকাতা।

WANTED CLERKS & STUDENTS.

To Study Accountance by post. No matter where you live or what you do. We can train you to be an *Accountant* for P. W. D., Railways, Banking Municpal, Dist. Boards and Mercantile Services *to earn big salaries.* Best postal Tuition small fees. Apply for free prospectus No. 145-B with Calender 1931, to the *Superintendent,*

TRE INDIA SCHOOL OF ACCOUNTANCY,
Post Box 2020, Calutta

দশহাজার টাকা পুরস্কার

ওজস দুঃস্বপ্ন, শুক্রতারল্য, অবসন্নতা ও পুরুষত্ব-হীনতা-নাশক রসায়ণ। শুক্রকে গাঢ় করিয়া ধাতু ও স্নায়ুকে সবল, সতেজ ও কর্ম্মঠ করিতে ইহা অদ্বিতীয়। মূল্য ১৷০ টাকা।

পাচক ১ মাত্রায় অম্ল ও শূলের অসহ কষ্টের উপশম; নিয়মিত সেবনে অম্ল, অজীর্ণ, শূল, অনিদ্রা, মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য, বায়ুবৃদ্ধি, অগ্নিমান্দ্য ও যকৃৎ-বিকৃতি আরোগ্য হয়। শিশি ১৲ টাকা। ঔষধে বিজ্ঞাপিত গুণ নাই প্রমাণিত হইলে উক্ত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। পত্র দিলে ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

কবিরাজ—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মল্লিক
(অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান)
কালনা (বেঙ্গল)।

বর্ষা আসিতেছে

লোহার কড়ি বরগা

এঙ্গেল করগেট প্রভৃতি

সংগ্রহ করুন।

প্রতিযোগিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লৌহ বিক্রেতা

নিরঞ্জন এণ্ড কোং,

৬৭-১নং স্ট্রাণ্ড রোড,
বড়বাজার, কলিকাতা।
ফোন নং ৩৯৫৬ বড়বাজার

কেন বৃথা কষ্ট পান ?

আপনিও নবশক্তি লাভ করিতে পারেন -

দেহমধ্যে ক্যাল্সিয়াম্ (Calcium) অর্থাৎ চুণের অভাব হইলেই নানাপ্রকার উপসর্গের সৃষ্টি হয়। দেহের প্রত্যেক অনুপরমাণুতে ক্যাল্সিয়ামের আবশ্যক সুতরাং উহার পরিমাণ হ্রাস হইলেই আপনার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবে।

কিরূপে শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাব বুঝা যায়, এই পুস্তিকাখানি পাঠ করিলেই তাহা সম্যক্ অবগত হইবেন। ইহার মধ্যে অনেক উদাহরণে দেখিতে পাইবেন যে দেহস্থিত ক্যাল্সিয়ামের অল্পতা বা অভাব দূর করিতে পারিলেই আপনি নিরাময় হইয়া নবস্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ করিতে পারিবেন ; এবং অতি সহজেই আপনি নিম্নলিখিত মন্দ উপসর্গগুলি যথা— দন্তক্ষয়, চর্ম্মরোগ, (Eczema,) উদরাময়, রাত্রি-কালীন ঘর্ম্ম, স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনা প্রভৃতি দূর করিতে পারিবেন। আপনি কালজানা ব্যবহার করুন। ইহা আপনার দেহ মধ্যে আবশ্যকীয় উপাদানসমূহ সরবরাহ করিয়া আপনাকে পুনরায় নিরাময় করিয়া সবল ও স্বাস্থ্যবান্ করিবে।

স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের পক্ষে কালজানা অত্যন্ত উপকারী। অনেক স্ত্রীলোকই রক্তস্রাবে ও বেদনায় কষ্ট পাইয়া অকালবার্দ্ধক্যে উপনীত হন। কালজানা সেবনে তাঁহারা পুনরায় যৌবন ও শক্তি ফিরাইয়া পাইবেন।

দুর্ব্বল শিশুগণও কালজানা ব্যবহার করিয়া অচিরে সুস্থ ও শক্তিমান্ হইয়া উঠে।

ছেলেমেয়েদের ক্ষুধাশক্তি ও স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে এবং তাহারা পিতামাতার গর্বস্থল হইয়া উঠে।
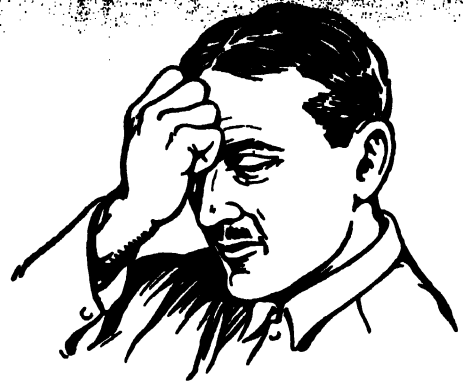
কালজানা সর্ব্বপ্রকার স্নায়বিক উত্তেজনার কুউপসর্গগুলি দূর করিতে সক্ষম। মাথাঘোরা, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট পাওয়া, বুকধড়ফড়ানি প্রভৃতি অসুখে প্রৌঢ়গণের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী।

কিরূপে নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ও স্নায়বিক উত্তেজনা প্রশমিত হয়?

সাধারণ দুর্ব্বলতায়, বিশেষতঃ রোগোন্মুক্তির পর কালজানা দৈনিক ৪।৬টী বটিকা ব্যবহার করিলে রোগীর শীঘ্রই স্বাস্থ্যোন্নতি হয়। কালজানার সহায়তায় সমগ্র শরীরে শক্তিসঞ্চার হয় এবং পুনরায় রোগের আক্রমণ কিম্বা সংক্রামকতাকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

যাঁহারা নানাপ্রকার কীটপতঙ্গাদি (মশক প্রভৃতি) সঙ্কুলস্থানে বসবাস করিয়া থাকেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা অতীব প্রয়োজনীয়।

কেহ কেহ হয়ত কীটাদি দংশনে বিশেষ কষ্ট পান না, কিন্তু অনেকেই অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকেন। কীটাদি দংশনে চর্ম্ম ফুলিয়া উঠে, চুলকানি বৃদ্ধি পায় এবং ইহা ক্রমশঃ শরীর ভগ্ন করিয়া ফেলে। কালজানা এই সমস্ত উপসর্গ দূর করে। যদি কিছুকাল নিয়মিতভাবে কালজানা ব্যবহার করেন, তাহা হইলে আপনি দেখিতে পাইবেন যে চর্ম্মস্ফীতি, চুলকানি প্রভৃতি অনেক মাত্রায় হ্রাস পাইয়াছে এবং আপনার শরীরেরও রোগপ্রতিরোধক-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বেকার খিট্‌খিটে মেজাজ ও অসুস্থতা দূর হইয়া আপনি সবল, সুস্থ ও সুখী হইবেন।

কালজানা পুনরায় আপনাকে নবশক্তি ও আনন্দ দান করিবে।

খিট্‌খিটে স্বভাব ইত্যাদি দূর করিতে কালজানার প্রভাব অসীম। বৎসরের কোন কোন ঋতুতে মানবগণ প্রায়ই খিট্‌খিটে স্বভাব ও দুর্ব্বল হয়। তাহারা নিজেদের সদাই শক্তিহীন ও ক্লান্ত বলিয়া অনুভব করেন। কালজানা সেবনে এই সমস্ত উপসর্গ হইতে মুক্তি লাভ করিবেন। কালজানা আপনার স্নায়ুমণ্ডলীকে স্নিগ্ধ করিয়া গাত্রদাহের উপশম করিবে।

শরীরের কোন স্থানে যদি চর্ম্মরোগ হয় সে ক্ষেত্রেও কালজানার উপকারিতা দেখা যায়। আপনার দেহের কোনও এক অংশ স্ফীত কিম্বা আপনার কোন প্রকার চর্ম্মরোগ হইলেও আপনি নিজেকে স্বাস্থ্যবান বলিয়া মনে করিতে পারেন কিন্তু, যদি আপনি নিয়মিতভাবে কালজানা ব্যবহার

করেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে কত অল্প সময়ে সেই স্ফীত স্থানের বেদনা প্রভৃতি দূর হয়। যদি ঐ স্ফীতস্থান হইতে পুঁজ বা রক্ত নির্গত হয়, তাহাও শীঘ্র শুষ্ক হইয়া ঐ ক্ষতস্থানের বেদনা ক্রমশঃই কমিয়া যাইবে। কালজানা সেবনের সহিত বাহ্যিক প্রলেপাদিও ব্যবহার করিতে পারেন—এই উভয়প্রকার ঔষধ পরস্পরের সহায়তা করে।

উদরাময়

প্রকৃতপক্ষে ইহাও একপ্রকার দৈহিক আভ্যন্তরিক স্ফীতি। পূর্ব্বেবর্ণিত কালজানার কার্য্যকারিতা এই সব ক্ষেত্রেও সমান ফলদায়ক। কালজানায় ক্ষতের রস শুষ্ক হয়,—ফলা কমিয়া যায় এবং ক্ষত স্থানটিও পুনরায় সবল হয়। আপনার পেটের পীড়া শীঘ্র উপশম হইবে এবং দুর্ব্বলতা ও অস্থিরতা দূর হইয়া আপনি পুনরায় সবল ও সুখী হইবেন।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কালজানা অবিলম্বে ব্যবহার করা উচিত?

দুর্ব্বলতা, খিট্‌খিটে স্বভাব, পুনঃ পুনঃ চর্ম্মরোগ, উদরাময় প্রভৃতি ব্যতীত শরীরে খনিজ পদার্থের অভাব উপলব্ধি করিতে অত্যধিক সময় সাপেক্ষ। কিন্তু, কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায় যে কালজানা ব্যবহার করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

দুর্ব্বল দন্তে—যখনই আপনি দন্তরোগে কষ্ট পাইবেন তখনই কালজানা সেবন করিবেন। কয়েক সপ্তাহ যাবৎ দিনে ৪টি করিয়া বটিকা ব্যবহার করিবেন। শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন যে আপনার দন্তসমূহ উজ্জ্বলআভাযুক্ত, শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হইয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকার দন্ত বেদনা দূর হইয়াছে। কালজানা ব্যবহার করিলে আপনার সমস্ত শরীরের উন্নতি হইবে।

অধিককাল স্থায়ী সর্দ্দি কাশিতে—যাহারা কালজানা ব্যবহার করেন, তাঁহাদের ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ করিলেও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করেন। বহুকালব্যাপী সর্দ্দি কাশিতে ভুগিলে বুঝিতে হইবে যে আপনার কালজানা ব্যবহার করা বিশেষ আবশ্যক।

চর্ম্মরোগে—আপনার দেহের চর্ম্ম হঠাৎ স্ফীত হইলে কালজানা সেবনে বিশেষ উপকার হইবে। শরীর ও চর্ম্মকে সুস্থ রাখিতে এই খনিজ পদার্থের বিশেষ প্রয়োজন।

রাত্রিকালীন ঘর্ম্মে—ইহাতে বুঝিতে হইবে যে আপনার দেহ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রায়ই ইহা ক্ষয়রোগসম্ভূত। কালজানা ব্যবহার করিলে রাত্রিকালীন দুর্ব্বলতাজনক ঘর্ম্ম বন্ধ হইবে এবং শরীর সুদৃঢ় হইয়া অন্তর্নিহিত পীড়াকে দমন করিতে সক্ষম হইবে। কালজানা নিয়মিতভাবে ব্যবহার করিলে সর্ব্বপ্রকার পীড়া দূর করিতে সক্ষম হইবেন।

আকস্মিক ও অস্বাভাবিক রক্তস্রাবে—কেহ কেহ নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে কষ্ট পান। সামান্য পরিশ্রমেই ঐ রক্ত বহির্গত হইয়া রোগীকে দুর্ব্বল করে।

কালজানা ব্যবহার করিয়া শক্তিশালী হইলে ঐরূপ রক্তস্রাব ভবিষ্যতে হইবে না।

কালজানা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ঋতুকালীন অত্যধিক রক্তস্রাব বন্ধ করিয়া দেয় এবং অপরাপর আনুসঙ্গিক উপসর্গগুলি অতি সহজেই দূর করে।

স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে—রক্তস্রাবে কালজানার উপকারিতা বিশেষ আশ্চর্যজনক। তাঁহারা প্রায়ই অধিক স্রাবজনিত বেদনায় কষ্ট পান। এইরূপ স্রাবে তাঁহারা দুর্ব্বল হইয়া অকালবার্দ্ধক্যে উপনীত হন এবং শরীরে রক্তের পরিমাণও হ্রাস হয়। কালজানা তাঁহাদের নব জীবন প্রদান করিবে। তাঁহারা পুনরায় সবল হইবেন, রক্তস্রাব সুনিয়ন্ত্রিত হইবে, এবং বেদনাও দূরীভূত হইবে। তাঁহারা পুনরায় যৌবনসুলভ শক্তি ও সৌন্দর্য্য ফিরিয়া পাইবেন।

"ঋতুকালে অত্যধিক রক্তক্ষয়ে কালজানা ব্যবহার করিয়া আমি অত্যন্ত সুফল পাইয়াছি।"

এম, আর, সি, এস ; এল, আর, সি, পি।

কেশ বিরল হইলে, অস্থি দুর্ব্বল বা যন্ত্রনাদায়ক হইলে, দন্তসমূহ শিথিল হইলে—বর্দ্ধনশীল শিশুগণকে, আসন্নপ্রসবা ও শালস্থিত্রী মাতাদিগকে, এই সব ক্ষেত্রে, কালজানা সেবন করান বিশেষ আবশ্যক। এই সব উপসর্গ হইতে স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে কালজানাতে যে সব পদার্থ বর্ত্তমান আছে শরীরে তাহারই অভাব ঘটিয়াছে।

শিশুদিগেরও কালজানা আবশ্যক

বয়স্কদিগের অপেক্ষা বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের জন্য কালজানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শিশুদের দৈনিক ৩-৪ টি কালজানা বটিকা সেবন করাইলে ক্ষুধাশক্তি বৃদ্ধি পাইবে, অস্থিসমূহ সুদৃঢ় হইবে, দন্ত সবল হইবে এবং শীঘ্রই সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবান্ হইবে।

কালজানা ব্যবহার করিলে, শিশুদিগের রোগপ্রতিরোধকক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। আপনার শিশুপুত্রকে সবল করিতে হইলে উহাকে

নিয়মিতভাবে কালজানা ব্যবহার করান বিশেষ আবশ্যক। শিশুগণ এই বটিকা কতদূর পছন্দ করে দেখিয়া আপনি বিস্মিত হইবেন। এই বলকারক ঔষধটীকে বালকবালিকারা সুমিষ্ট দ্রব্যাদির মত ভালবাসে।

গর্ভাবস্থায় ইহার আবশ্যকতা

গর্ভাবস্থায় মাতার শরীর ও পেশী হইতে বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের জন্য অতিমাত্রায় ক্যাল্‌সিয়াম বহির্গত হয়। গুর্ব্বিণীকালে যে সমস্ত মন্দ উপসর্গ প্রকাশ হয়—যথা, চুল উঠা, দাঁতপড়া, বমন, মাথাঘোরা প্রভৃতি, তাহা ক্যাল্‌সিয়ামের (চূণের) অল্পতা হেতুই ঘটিয়া থাকে। কালজানা সেবনে ঐ উপসর্গগুলি অবিলম্বে দূর হইয়া গর্ভাবস্থা সুখে অতিবাহিত হয় এবং মাতৃত্বও নিয়ত আনন্দপ্রদ হয়। কারণ, কালজানা প্রসূতির শরীর রক্ষা করে এবং ভ্রূণেরও দেহ সংগঠন করিয়া থাকে।

কালজানা প্রস্তুতকালের প্রথম হইতে প্যাকিং কালের শেষ পর্য্যন্ত হস্তদ্বারা স্পর্শ করা হয় না। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে যে কেহই ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

সকল ডাক্তারখানায় ও বাজারে পাওয়া যায়।

কালজানা

কলিকাতা ট্রেডিং কোম্পানী, প্রিণ্টার্স, কর্ত্তৃক রচিত ও মুদ্রিত।

Annual Contrct Rate— **Buyers' Guide.** Annas Eight Per Line

Advertising is the eye of trade.

Artist–Wynne O. Apperly R. I.

"কোন্ সুরে আজ বাঁধিব বক্ষ
কি নব ছন্দে গাওয়া ?"

মোহাম্মদী প্রেস, কালকাতা

স্থাপিত ১৮৩৩

আধুনিক ডিজাইনের অলঙ্কার ও ঘড়ি

আমাদের নিকট জিনিস লইলে শতকরা ১৫৲ টাকা কমিশন পাইবেন।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং

১৪নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সোল এজেণ্টস্ :—বেনলোমণ্ড ওয়াচ কোং ও দি, পি, ওয়াচ কোং,

Post Box No. 337 Cal. Phone :—5580 CAL.

বিখ্যাত জুতা প্রস্তুতকারক

বাহিরের অর্ডারী কাজের সুবন্দোবস্ত আছে।

ঘোষ ব্রাদার্স,
৩০, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলিঃ

ড্রাম /৫ পয়সা

ড্রাম /১০ পয়সা

বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ ড্রাম /৫ ও /১০ পয়সা কলেরা ও গৃহ চিকিৎসার ঔষধ পূর্ণ বাক্স, পুস্তক ও ফোঁটা ফেলা যন্ত্র সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ৮৪ ও ১০৪ শিশি বাক্সের মূল্য যথাক্রমে—২৲, ৩৲, ৩।০, ৫।০, ৬৷৵০, ৯৲ ও ১০৸৵০, মাশুলাদি স্বতন্ত্র। শিশি, কর্ক, সুগার প্রবিউলস্ ইংরাজী ও বাংলা পুস্তক এবং চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় সরঞ্জামাদি বাজার অপেক্ষা সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকি, পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

পরিচালক—টি, সি, চক্রবর্ত্তী, এম, এ, ২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Advertising is the eye of trade.

চিত্র ও কাব্যামোদীগণকে আনন্দ দান করিতে শারদীয়া পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী নরেন সরকারের অঙ্কিত ৫০খানি বহুবর্ণ চিত্র সম্বলিত,
সংযুক্তা প্রণেতা ছায়াচিত্র নাট্যকার সতীশ ঘোষ কর্ত্তৃক আখ্যানভাগ গ্রথিত।
প্রিয়জনের হাতে দিবার শ্রেষ্ঠ উপহার
সুবৃহৎ আকার, ঝকঝকে ছাপা, মনোরম বাঁধাই, চিত্র ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠসম্পদ। মূল্য ৪৲ চারি টাকা।

বিশেষ সুবিধা

এক টাকা অগ্রিম জমা দিয়া গ্রাহক হইলে তিন টাকায় পাইবেন।
অদ্যই গ্রাহক হউন।

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক

প্রকাশক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দে।

নিউ পপুলার প্রেস— ৭৭, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ADVERTISING —FOR—
CALENDAR 1932

Most Popular Style printing in Colour size 18" x 12" Rs 85/- per 1000. Tin mounted with monthly Sheets 20 Specimen sent on Receipt of Re 1/8/—only. Agents wanted Everywhere.

NEW POPULAR PRESS, 77, *SIMLA STREET, CALCUTTA.*

পঞ্চাশ বৎসরের স্থাপিত

বাঙ্গালী জহরীর দোকান

আমাদের নিকট নূতন ফ্যাসানের জহরতের অলঙ্কার উচিৎ মূল্যে খরিদ করুন
সাচ্চা জিনিষের গ্যারাণ্টি পাইবেন।
অন্যত্র বিদেশীয় দোকানদারের নিকট খরিদ করিবার পূর্ব্বে আমাদের সততার পরীক্ষা করুন।
দেশের দশের নিকট সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

এলাহাবাদ একজিবিসনে সুবর্ণপদক প্রাপ্ত—

ভারতের রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষিত।

বিনোদবিহারী দত্ত,—ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার

একমাত্র ঠিকানা :—

১-এ বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, মারকেণ্টাইল বিল্ডিং, কলিকাতা।

ফোন—৩৯৪, কলিকাতা।

চতুর্থ বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৩৮ | ১২শ সংখ্যা

বর্ষ-শেষের নিবেদন

"মাসিক মোহাম্মদীর" বয়সের চতুর্থ বৎসর এই সংখ্যায় পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। আশ্বিনের মাঝামাঝি তাহার পঞ্চম বৎসরের প্রথম সংখ্যা সমাজের খেদমতে উপস্থিত হইবে।

"মাসিক মোহাম্মদী" খেয়ালের বিলাস নহে, ধন-উপার্জ্জনের উপলক্ষও নহে। খেয়াল-বিলাসের সময় ও সামর্থ্য আমার নাই, ব্যবসায় হিসাবে সফলতার আশাও এ ক্ষেত্রে খুবই কম। জীবন ব্যাপিয়া যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, জাতি-সাধনার যে কল্প-চিত্র অঙ্কন করিয়া আসিয়াছি, "মাসিক মোহাম্মদী" সেই স্বপ্নেরই একটা অস্পষ্ট রূপ, সেই কল্পনারই একটা ক্ষীণতর বাস্তব অভিব্যক্তি। আল্লাহ্‌তাআলাকে অশেষ ধন্যবাদ, তাঁহার কৃপায় এ সাধনা সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতেছে, সমাজ তাহার গুরুত্ব ক্রমে ক্রমে অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে, "মাসিক মোহাম্মদী" হাতে লইয়া যখন প্রথমে সমাজের দ্বারে উপস্থিত হই, তখন একদল বন্ধু যেমন অন্তরের আশীর্ব্বাদ দিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, আর একদল হিতৈষীও সেইরূপ তাহার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রকাশের ত্রুটি করেন নাই। খোদার ফজলে উভয় দলের নিকট হইতে আমরা প্রেরণা লাভ ও শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং আজ এই বর্ষ-শেষে সকলেরই খেদমতে অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

"মাসিক মোহাম্মদীর" সকল প্রকার উৎকর্ষ সাধনের জন্য এ যাবৎ ব্যয় ও শ্রম-স্বীকারের সাধ্যপক্ষে কোনই ত্রুটি করা হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না বলিয়া আশা করি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একা সম্পাদকের চেষ্টাই যথেষ্ট নহে, এ জন্য সমাজের সমধিক সাহায্য ও সহানুভূতি পাওয়ার আশা করি। অন্যথায় "মাসিক মোহাম্মদীর" সাধনা সত্বরে আশানুরূপ সফলতা লাভে সমর্থ হইবে না। বিশেষ করিয়া বর্ত্তমানের এই ঘোর দুর্দ্দিনে সহৃদয় গ্রাহক ও পাঠকবর্গের সাহায্য ও সহানুভূতি যে অন্য বৎসর অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আবশ্যক, আশা করি, এ কথাটা সকলে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিবেন।

বিনীত—**মোহাম্মদ আকরম খাঁ**

মহামানব হজরত মোহাম্মদ

—প্রবন্ধ— —টি-এল, ভাস্বানী

জগতের মহামানবদের অন্যতম হজরত মোহাম্মদকে আমি নমস্কার করি! হজরত মোহাম্মদ ছিলেন মূর্ত্তিমান মহাশক্তি; এই মহাশক্তি জগতের বহু জাতিকে মুক্তির আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। ঐতিহাসিক তথ্যগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়,—তাঁহার জীবন কত মহান্, কত সুন্দর, কত মধুর ছিল। তিনি সমগ্র মুসলমান সমাজের সম্রাট ও আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন; অথচ নিজের পরিধেয় বস্ত্র নিজে সেলাই করিতেন, রুগ্নদের সেবা-শুশ্রূষা করিতেন, রাস্তার ছোট ছোট বালক-বালিকাগণকে স্নেহ করিতেন এবং অতি সাধারণ খাদ্য গ্রহণ করিতেন। কখনো কখনো বা তিনি শুধু খেজুর ভক্ষণ করিয়া ও জলপান করিয়া থাকিতেন, গাভী, মহিষ ইত্যাদি দোহন করিতেন, ক্রীত-দাসদিগের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন এবং জনসাধারণের সঙ্গে তাহাদের প্রিয় সহচরের ন্যায় ব্যবহার করিতেন।

"আমি একজন ভৃত্যের মত আমার খাদ্য গ্রহণ করি," "আমাদের শান্তির পথ দেখাও,"—ইহাই ছিল হজরত মোহাম্মদের প্রার্থনা। "ইছলাম্" শব্দটার অর্থ "শান্তি"। তিনি এক স্বর্গীয় বাণী শ্রবণ করিতেন,—"হে অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানব, জাগো, ধর্ম্মপ্রচার কর।" তিনি অসহনীয় নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন: এমন কি বহুবার তাঁহার জীবন পর্য্যন্তও বিপদাপন্ন হইয়াছে; কিন্তু তবু তিনি কখনো খোদাতা'লার বাণী বিস্মৃত হন নাই।

হজরত মোহাম্মদ সর্ব্বদাই শান্তির বার্ত্তা প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার মূর্চ্ছা হইত; মূর্চ্ছার সময়ে তিনি এক বিরাট স্বর্গীয় শক্তিতে শক্তিমান হইয়া অলৌকিক প্রাজ্ঞ তথ্যসমূহ প্রচার করিতেন। এই স্বর্গের সওগাতই পর-বর্ত্তীকালে কোরআনে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তথাপি একজন ইংরেজ সমালোচক স্পেলেন্‌জার বলেন,—"মোহাম্মদের মূর্চ্ছা সন্ন্যাস রোগ ব্যতীত আর কিছুই নহে।" কিন্তু কারলাইল্ মোহাম্মদকে বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বলেন,—"মোহাম্মদ জগতের একজন আদর্শ শক্তিশালী ধর্ম্মগুরু।" আমি স্পেলেনজারের কথার প্রতিবাদ করিতে চাই না। চন্দ্রের গুণরাশি যাহাদের চোখে না পড়িয়া শুধু কলঙ্কই চোখে পড়ে, তাহারা কি করুণার পাত্র নয়?

হজরত মোহাম্মদের তিরোধানের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি যে কয়েকটী মহাবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, আমি বহুবার তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছি এবং মুগ্ধ হইয়াছি। "প্রভু, আমাকে ক্ষমা কর, এবং ঊর্দ্ধে আমার সহিত সম্মিলিত হও।" এমন মহামানব জীবনে ও মরণে মহাসুন্দর এবং মহামহান ছিলেন, একথা যে অবিশ্বাস করে, সে জগতের মহাসত্যগুলির অনেক দূরে অবস্থান করিতেছে।

একবার মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিয়া দেখ, তিনি যে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন—তাহার কি বিরাট অবদান! ইছলাম জগতকে একটী মহাধর্ম্ম দান করিয়াছে; ইছলাম আরবে শিশু-হত্যা ও মদ্যপান নিবারণ করিয়াছে; ইছলাম বিশ্বাস, সাহস, সহিষ্ণুতা, আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর উপর বিশেষ জোর দিয়াছে। ইছলাম এসিয়ায় এবং ইউরোপে এমন একটি নৈষ্ঠিক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছে, যাহাতে তাস-খেলা, এমন কি নৃত্য পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে। কোরআনে আছে, "মুসলমান মাত্রেই সত্য-পথের সন্ধানী। ইছলাম "আল্লা-রহমান"এর বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছে।"

ইছলাম আফ্রিকা, চীন, মধ্য এশিয়া, ইউরোপ, পারস্য, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে সভ্যতা এবং জ্ঞানের বর্ত্তিকা জ্বালাইয়াছে! চীনের মুছলমানেরা এখনও বীর এবং সাহসী বলিয়া খ্যাত। বাগদাদ খিলাফতের সময়ে ইছলাম যে প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহাতে প্রত্যেক মুছলমান এবং প্রত্যেক সিন্ধি গর্ব্ব অনুভব করিতে পারে। ইউরোপে ইছলামের অবদান সম্পর্কে সিন্ধুর হিন্দু অথবা মুছলমানগণের খুব কমই জানা আছে। তথাপি গভীর অনুশীলন করিলে বুঝা যাইবে—মধ্য-যুগে ইউরোপে ইছলাম কি করিতে সমর্থ হইয়াছিল? করডোভার বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় ইছলামের এক বিরাট কীর্ত্তি। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণ এখানে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য আসিতেন! ইঁহাদেরই একজন পরবর্ত্তীকালে রোমের পোপের পদপ্রাপ্ত হন। ইউরোপ যখন অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, তখন স্পেনীয় মুছলমান পণ্ডিতগণ বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের বর্ত্তিকা ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া

ধরিয়াছিলেন। তাঁহারা সমগ্র ইউরোপকে চিকিৎসা-বিজ্ঞান, অঙ্ক-শাস্ত্র, রসায়ন, প্রাকৃতিক ইতিহাস, দর্শন এবং চারু-শিল্প শিক্ষা দিয়াছেন।

আরবীয় পণ্ডিতগণ কয়েকখানা হিন্দু গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন; এবং এই অনুবাদের সহায়তায় হিন্দু কৃষ্টি ইউরোপের কোনো কোনো শিক্ষায়তনে প্রবেশলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। স্পেনের মুছলমান নরপতি আল্-হাকুমের সময়ে গ্রাণাডা, ভেলেনসিয়া এবং আরগনে সেচ-প্রণালী বিস্তর উন্নতিলাভ করিয়াছে। স্পেনের বহু সহরে মুছলমানগণ গরীবখানা এবং হাসপাতাল তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন। বহু শ্রম-শিল্পেরও এই সময়ে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। জলযান-গঠন, উদ্যান-রচনা, ফলের মোরব্বা প্রস্তুত এবং কাঁচ, লৌহ, তাম্র তৈজস-পত্রাদি, কিংখাপ, রৌপ্য-খনি, বস্ত্র-শিল্প, পশমী কার্পেট, রেশম, ধাতব কারু-শিল্প প্রভৃতি স্পেনের মোস্লেম শ্রম-শিল্পের উল্লেখ আমরা আরবীয় গ্রন্থে দেখিতে পাই।

এখন একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, ভারতীয় চিন্তা এবং জীবন-গঠনে ইছলামের দান সামান্য নহে। ভারতের জাতীয়তা গঠনে ইছলামের শক্তি অন্যতম। ভারতের কলা, স্থাপত্য-শিল্প, কাব্য এবং দর্শনকে ইছলাম প্রভূত পরিমাণে সম্পৎশালী করিয়াছে। তাজমহলের মত কল্পনাময় স্থাপত্য-শিল্প বোধ হয় জগতে আর দ্বিতীয় নাই। এই তাজমহলও জগতে ইছলামের এক অদ্বিতীয় দান।

খলিফা ওমর যখন জেরুজালেম জয়ের পর সমস্ত ক্রীতদাসদিগকে মুক্তি প্রদান করেন, তখনই দাসত্বের বুকে প্রথম পদাঘাত পড়ে। আকবরের স্বপ্ন,—নিখিল ভারতীয় জাতির স্বপ্ন,—একটি বিরাট ভারত, একটি মহা-ভারতের স্বপ্ন আজিও ইংরেজ শাসকগণ দ্বারা সত্যে পরিণত হয় নাই। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর সংস্কারক নানক, কবীর এবং দাদুর সংস্কার আন্দোলনে ইছলামের প্রভাব পরিস্ফুট ছিল। মুলতানের পীর তাবরেজ এবং সিউহানের লাল সাবাজের ন্যায় মুসলিম সাধু মনীষিগণ আজও হিন্দুর অন্তরে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইউরোপ যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, তখন মুস্লিম কাব্য, সাহিত্য, স্থাপত্য-শিল্প এবং চিত্র-শিল্প স্পেনকে বিখ্যাত করিয়াছিল। সেভিল, করডোভা এবং বারসিলোনার মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এমন ঔদার্য্যের সহিত বিজ্ঞান এবং দর্শন শিক্ষা দিতেন, যাহার অভাবে খৃষ্টীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় ব্রানোকে পুড়িয়া মারিয়াছিল এবং গ্যালিলিওকে অশেষভাবে নির্য্যাতিত করিয়াছিল। মুসলিম নরপতিগণ পুস্তকাগার, মান-মন্দির এবং রসায়নাগার স্থাপন করিয়াছেন; মুসলিম সঙ্গীতজ্ঞগণ ইউরোপের জীবনে ও সাহিত্যে একটি অলৌকিক অভিনব আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং মুসলিম দার্শনিকগণ গ্রীক্ মনীষীদিগের চিন্তাধারাকে সংশোধন, ব্যাখ্যা এবং অনুবাদ করিয়াছেন।

কোরআন একটি মহাজাতিকে প্রদত্ত হইয়াছিল; ইহার কোনো কোনো স্থলে এমন গূঢ় জ্ঞান-তত্ত্বের বীজ পরিলক্ষিত হয়, যাহা অন্য কোন শাস্ত্রে ক্বচিৎ পরিলক্ষিত হয়। "তুমি যে দিকে মুখ ফিরাইবে, সেদিকেই খোদাকে প্রত্যক্ষ করিবে।" আহা, কোরআনের এই একটি কথায় কত বড় জ্ঞান নিহিত আছে! আমাদের সা'লতিফ প্রমুখ বড় বড় মুসলিম কবিগণ বারংবার বিশুদ্ধ জ্ঞান-তত্ত্ব সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন;—"বাগ্মীতা নহে, তুষ্ণীম্ভাবই বিজ্ঞতার লক্ষণ", "মনে করিয়াছিলাম যে, আমি খোদাতা'লাকে ভালবাসি, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলাম, তিনিই আমাকে আগে ভালবাসিয়াছেন", "তোমার নিঃস্বতা যখন খোদার কাছে নিবেদন কর, তখনই তিনি তোমাকে তাঁহার সর্ব্বস্ব দান করেন", "পুস্তক, শিক্ষক এমন কি গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে নিজের অন্তঃকরণে নীরব জ্ঞান উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর," "বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের মস্জিদে আল্লার উপাসনা করা উচিত; কারণ সেখানেই আল্লার বসতি, পষাণময় মস্জিদে নয়", "তিনি আমার হৃদয়ে উঁকি দিলেন, এবং উঁকি দিয়াই চলিয়া গেলেন।" মুস্লিম মনীষিগণের সঙ্গীত এবং বাণী হইতে এই কয়টি মাত্র কথা উদ্ধৃত করা গেল। মুস্লিম মনীষীদিগের এই জ্ঞানতত্ত্ব যে আর্য্যাবর্ত্তের ঋষি এবং তত্ত্ব-দর্শীদিগের জ্ঞান-তত্ত্ব হইতে বিজাতীয় একথা কে বলিবে?

সত্য, প্রেম, ন্যায়-নিষ্ঠা, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি উচ্চতর মানসিক বৃত্তিগুলি কোনো জাতির বা কোনো ধর্ম্মের একচেটিয়া নহে; ইহা পৃথিবীতে—স্বর্গরাজ্যের দান; এবং এই মহা-দানেই ইছলাম পরিপুষ্ট—এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। *

* হিন্দু মনীষী টি-এল, ভাস্বানীর "দি লাইট" এ লিখিত ইংরাজি প্রবন্ধের অনুবাদ।
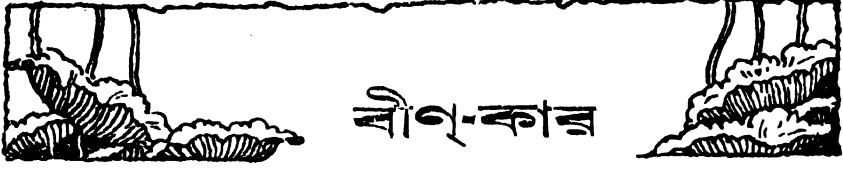
বীণ্-কার

—আবদুল কাদের

হেরিয়া গগন-পারে ভিড়ে মেঘভার—
তমাল-তালের ছায়ে
আসিনু নুপূর পায়ে
গাহিতে মল্লার ;
আমি এক ভাঙা বীণ্-কার।

পশ্চিমের সিংহ-দ্বারে
বংশী গাহে বারে বারে
করুণ পূরবী ;
গোধূলি-রঙীণ চুলে
মুখ ঢাকি' গিরি-মূলে
নামে অস্তরবি।

আঁধার-উন্মদ নিশি
ছিঁড়ে ফেলে দশদিশি
তারকার হার,—
পরাণে সংশয় ছায়
পাঠাইতে অলকায়
সুদূরিকা সখি লাগি ভীরু নমস্কার।
আমি এক ভাঙা বীণ্-কার॥

অরণ্যে লাবণ্য জাগে, লাগে অন্ধকার।
চোখে নামে নীল মোহ
সবুজের সমারোহ,—
বাঁধি ছিন্ন তার।
আমি এক ভাঙা বীণ্-কার।
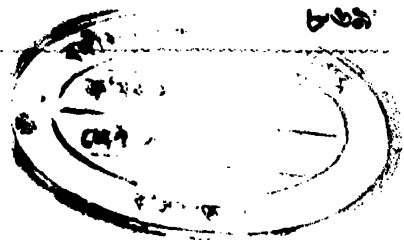
পূবের প্রান্তর-তলে
আলেয়ার আলো জ্বলে—
ভয়ে ভীতা ধরা !
নিঃসঙ্গ নিঃসীম মাঠে
একা গেয়ে রাতি কাটে
গীতি ব্যথাঙ্করা।

বিদায়ী পান্থরা ডাকে—
"ফিরে এসো, চাহি কাকে
সুরে হাহাকার ?"
ভাবিয়া না পাই মনে
খুঁজি কোন্ বন্ধুজনে,
গানে দিই কার পদে প্রাণ উপচার !
আমি এক ভাঙা বীণ্-কার ॥

আকাশে আকাশে কাঁদে ঝঞ্ঝার ঝঙ্কার।
দেহ-দীপ নিভে আসে,
শ্বাস-গন্ধ ফেলে ত্রাসে
মনের মন্দার।
আমি এক ভাঙা বীণ্-কার।

কোথা মোর মালবিকা
জ্বালিয়াছে সুর-শিখা
সন্ধ্যাগ্নি-চিতায় :
পারায়ে ঝড়ের রাতি
আসিতে নারে সে ভাতি
মোর কবিতায়।

সঙ্গীতের শীর্ষ-লোকে
বসিয়া সে স্বপ্ন-চোখে
অঙ্গে অহঙ্কার ! —
আমার উৎসব-ঘরে
আসিবে সে কোন্ ভোরে,
বাজিবে সুখের সুরে দুঃখ-অলঙ্কার ?
আমি এক ভাঙা বীণ্-কার ॥

বর্ত্তমান অর্থ-সমস্যা

— প্রবন্ধ —

—আনওয়ার হোসেন, এম-এ

একদিন ছিল যখন এদেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার ঢেউ আসিয়া পৌছে নাই, তখন পল্লীর শান্ত, সুশীতল ছায়ায় কৃষক তাহার গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, মাচাভরা তরকারী নিয়া স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিত। দিয়াশলাই, কেরোসিন তৈল, চা, বিসকিট, কিংবা নানা রং-বেরং ও সুগন্ধি সাবানের 'বাই' তখনও আমাদের দেশে প্রবেশ লাভ করে নাই। তখন লোকে চীনা-বাসনে আহার করিত না, বিদেশী কোন জিনিষ কিনিত না, কিংবা হারিকেন ব্যবহার করিত না। কালের নিত্য পরিবর্ত্তনশীল গতিতে পুরাতনের স্থান আসিয়া নূতনে দখল করিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও কালচারের আওতায় পড়িয়া আমরা শ্বাস-রুদ্ধ হইয়া মরিতে বসিয়াছি। সভ্যতার অন্যান্য উপকরণ বেমালুম হজম করিয়া নিয়াও আজ দু'চক্ষে সব অন্ধকার দেখিতেছি। বাহ্য চাকচিক্যে ভুলিয়া ফ্যাসান ও ভদ্রতার খাতিরে বিদেশী বহু বিলাস-সামগ্রী আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য করিয়া নিয়াছি। বাঙ্গালীর নিত্য আহার্য্য মুড়ি, চিড়া, গুড়, দধি বাদ দিয়া আজ আমরা চা, চপলেট, রুটী, বিসকিট ধরিয়াছি। উন্নত জীবন যাপন প্রণালীর যাবতীয় উপকরণই আমরা ব্যবহার করিতে শিখিয়াছি! এক কথায় বলা যায়, আমাদের জীবন-ধারণের মান (Standard of living) আমরা অনেক দূর উঁচুতে তুলিয়া নিয়াছি। ইহা অবশ্যই সুলক্ষণ হইত, যদি আমাদের আয়ের পথও সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রশস্ত করা যাইত।

উন্নত ধরণের জীবন যাপনের সঙ্গে আমাদের আয় কিন্তু মোটেই তাল রাখিয়া চলিতে পারে নাই। কৃষি এদেশের একমাত্র ব্যবসায় বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রী করিয়া আমরা এযাবৎ খুব লাভবান হইতে পারি নাই; কেন পারি নাই—তার কারণ নির্দ্দেশ করা অনেকটা দুরূহ। আমাদের কৃষককুল কৃষিজাত পণ্য উপযুক্ত মূল্যে বিক্রী করিবার সুবন্দোবস্ত করিতে পারে কই? যৌথভাবে বেচা-কেনার কোন উপায় নাই। ঘরে শস্য রাখিয়া বহুদিন অপেক্ষা করিবার মত শক্তি তাহাদের নাই, কাজেই যে কোন দামে জিনিষ বিক্রী করিতে পারিলেই তাহারা বাঁচে। ধরা যাক পাটের কথা,— বাংলাদেশই পাটের একমাত্র জন্মস্থান। কিন্তু অন্য কোন দেশে এরূপ একচেটিয়া জিনিষের দাম যেরূপ হইত, এখানে সেরূপ হয় নাই। এভাবে দেখা যায়, আয় আমাদের মোটেই বাড়ে নাই; কিন্তু দৈনন্দিন-জীবন যাপনের ব্যয় তাহার চেয়ে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সভ্যতার বিবিধ উপকরণ, দ্রব্য-সামগ্রী উন্নত জীবন ধারণে নিয়োজিত হউক—তাহা প্রত্যেক উন্নতিকামী ব্যক্তিরই কাম্য। নিতান্ত অনুন্নত ও সেকালের জীবন এ উন্নতিশীল, সভ্যযুগে দুঃসহ ভার বই আর কি? বাইসাইকেল, মটর, ঘড়ী, গ্রামোফোন, হারমনিয়াম প্রভৃতি প্রত্যেক ঘরে বিরাজ করুক—ইহাই আমরা কামনা করি'। কিন্তু ব্যয়ের সঙ্গে আয়ও বাড়াইতে হইবে। তাহা না হইলে কেবল আপাত-দৃষ্টিতে বড়লোক সাজিলে চলিবে কেন? দুঃখের বিষয়, আজকাল সব ক্ষেত্রেই আমাদের কপটতা, মিথ্যা-আত্মগৌরব, বাহ্য-ধুমধামের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এখন কাজের কথা পাড়া যাক। এতদিন আমরা নিতান্ত দুর্ব্বল ভিত্তির উপর যে সমাজ-সৌধ গড়িয়াছি, তাহা আজ একেবারে ধ্বসিয়া গিয়াছে। গত বৎসর পাটের দর অভাবনীয় রূপে কমিয়া যাওয়ায় দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যেই একটা হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। বাংলার কৃষক একমাত্র পাট বিক্রী করিয়াই দুইটা নগদ পয়সার মুখ দেখে। আর ইহা দিয়াই তাহাকে জমীর খাজানা, মহাজনের ঋণ স্ত্রীর গহনা, ছেলে-মেয়ের বিবাহ, সামাজিক আচার পালন,

ইত্যাদি বহু কাজ করিতে হয়। পাটের মণ যখন ২৲ টাকায় নামিয়া আসিল, তখন নৈরাশ্যজনিত অবসাদ তাহাকে একেবারে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় করিয়া তুলিল। চতুর্দ্দিক তাদের নিকট অন্ধকার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ধান না জন্মাইয়া প্রচুর পরিমাণে পাট জন্মাইয়াছে, কাজেই খোরাকীর অভাব। হাতে টাকা নাই যে, খোরাকী বাজার হইতে কিনিবে। পরণে কাপড় নাই, তার উপর আবার মহাজনের তাগাদায় অতিষ্ঠ, তাই সে বসিয়া বসিয়া কেবলই ভাবে অদৃষ্টে তার কি আছে! ভাবিয়াছিল, অদৃষ্ট-দেবী তাহার প্রতি অদূর ভবিষ্যতে হয় ত সুপ্রসন্না হইবেন, কিন্তু চলিত বৎসরে পাটের দাম আর বাড়ে নাই। তার উপর বন্যার প্রলয়ঙ্করী দৃশ্য আজ চতুর্দ্দিকে বিরাজমান। যাহারা এতদিন কায়-ক্লেশে মৃত্যুর সঙ্গে অবিরত লড়িয়া প্রাণে বাঁচিয়াছিল, আজ তাহারা অতি দ্রুত মৃত্যুর কবলে পতিত হইতেছে। দুনিয়ার বুকে তাহাদের স্থান হয় নাই;—সলিল সমাধি তাহাদের দুঃখ-কষ্টে জর্জ্জরিত জীবনের শেষ পরিণতি

এতগুলি বিপদ পূর্ব্বে আর কখনও একসঙ্গে বাংলার বুকে মৃত্যু-লীলার অভিনয়ে মাতিয়াছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু প্রতীকার কি? প্রতীকার নাই বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন? মানুষের ক্ষুদ্র-শক্তিতে যতদূর কুলায় বিপন্ন, দুঃস্থ মানবকুলকে উদ্ধারের চেষ্টা যথাসম্ভব করিতে হইবে। সুখের বিষয় যে, দেশবাসী তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা প্রদর্শন করিতেছেন না। বহু সেবা-সমিতি বন্যায় বিপন্নের সাহায্যের জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। যদিও ইহারা প্রাণে বাঁচিয়া যায়, তথাপি অদূর-ভবিষ্যতে ইহাদের অর্থ-নৈতিক সমস্যার মীমাংসা কি?

বর্ত্তমানে অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে; তাহাতে মনে হয়, অতি শীঘ্র পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসিবে না। সমস্তই এখন বিশৃঙ্খল, জলপ্রবাহের মত অস্থির ও অনবরত ঘুরপাক খাইতেছে। করে যে আবার স্বাভাবিক স্থির ও স্থায়ী অবস্থা ফিরিয়া আসিবে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই। অর্থ-নৈতিক জগতে চিরকালই এরূপ গতিশীল অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। কোথাও কোন কিছু চির স্থির হইয়া বসিয়া নাই;—ঘড়ীর পেণ্ডুলামের মত সর্ব্বদাই নড়িতেছে। কিন্তু সে চঞ্চল গতির মধ্যে একটা ঐক্যতান ও তালের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা তার উল্টা। কোনও কিছুর তালমান নাই, সব কিছু উদ্দাম নৃত্য করিয়া চলিয়াছে। সুতরাং শীঘ্র যে একটা সুনিয়ন্ত্রণ, একটা সুশৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হইবে, তাহা আপাততঃ খুবই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি? খাদ্য-শস্যের দাম অসম্ভব কমিয়া গিয়াছে, অন্যান্য নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির দামও কমিয়াছে। অবশ্য টাকার দাম যেরূপ অসম্ভবরূপ বাড়িয়া গিয়াছে, সেই অনুপাতে ব্যবহার্য্য জিনিষের দাম কমে নাই। পাটের দামও এত কমিয়াছে যে, আর ভবিষ্যতে পাট জন্মাইয়া কৃষক লাভবান মোটেই হইতে পারিবে না। তখন নগদ টাকা কোথা হইতে মিলিবে? ক্ষেতে প্রচুর ধান, বাড়ীতে তরি-তরকারী বা অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিষ সংগ্রহ করা হইল কিন্তু কাপড়, লবণ ইত্যাদি খরিদ করিবে কি দিয়া? যথা-সম্ভব বিদেশী দ্রব্য বয়কট করিয়া নিজেই অনেক জিনিষ প্রস্তুত করিয়া নেওয়া যায়। কেরোসিনের পরিবর্ত্তে রয়না, ভেরণ্ড প্রভৃতি গাছের ফল হইতে প্রদীপ জ্বালানের তৈল সংগ্রহ করিতে হইবে। এইভাবে আস্তে আস্তে প্রত্যেকেই Self sufficient (আত্মনির্ভর) হইতে শিখিবে। তাহা হইলেও কি মুদ্রার অভাব অনুভূত হইবে না? কৃষক তাহার হালের গরু কিনিবে কি দিয়া, জমীর খাজনা দিবে কিরূপে? ছেলে-পেলের লেখা-পড়ার খরচ চালাইবে কি করিয়া? সর্ব্বোপরি এই যে রাশি রাশি ঋণ তাহার মাথায় চাপিয়া বসিয়া আছে এবং তাহার বসত-ভিটা গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছে, তাহার কি ব্যবস্থা হইবে? এমন একটী কৃষক পরিবার বাংলায় আছে কি, যাহার এক পয়সাও ঋণ নাই? নিঃসন্দেহে এর উত্তর খুব জোরে 'না' বলা যায়। অনেক সময়ে পেটের দায়ে, ছেলের বিবাহের জন্য, স্ত্রীর গহনার জন্য, মক্কাশরীফ যাওয়ার জন্য কিংবা অন্যান্য সামাজিক আচার-ব্যবহার পালনের জন্য বাংলার অর্থহীন কৃষক মহাজনের ফাঁদে গিয়া পড়ে। একবার যে সে মায়ার ফাঁদে পড়ে, তাহার আর কি উদ্ধার আছে? বর্ত্তমান জটীল অর্থ-নৈতিক সমস্যার যুগে সর্ব্বহারা কৃষক কি করিয়া যে এই ঋণদায় হইতে মুক্ত হইবে, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মুদ্রার দাম অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গিয়াছে। অন্য সময় ৫৲ টাকায় যে কাজ হইত, আজ সেখানে ১৲ টাকা হইলেই বোধ হয় সে কাজ চলে।

এ কথার অর্থ-নৈতিক ব্যাখ্যা কি? মুদ্রার দাম এখন

আড়াই গুণ বাড়িয়াছে বলিতে হইবে। সুতরাং এক বৎসর পূর্ব্বে যদি কেহ ১০০৲ টাকা ঋণ শতকরা মাসিক ৪৲ টাকা হারে গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে ঐ হারে সুদে-আসলে মোট ১৪৮৲ টাকা দিতে হয়। যদি টাকার দাম কোনরূপ বেশ-কম না হইত অর্থাৎ যদি ইহার দাম ২।৷০ গুণ না বাড়িত, তবে মহাজন বা দায়িকের কাহারও ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছু হইত না। কারণ এক বৎসরের মধ্যে টাকার দাম বাড়ে নাই ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে! কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থানুযায়ী দেখা যায়, পূর্ব্ব চুক্তি অনুসারে যদি ১৪৮৲ টাকাই দিতে হয়, তবে তাহার বাজার দর মোট ৩৭০৲ টাকা। সুতরাং মহাজন সস্তার বাজারে ১০০৲ টাকা ঋণ দিয়া দামের বাজারে ৩৭০৲ টাকা পাইয়া যায়। অবশ্য নগদ সে ১৪৮৲ টাকাই পাইল কিন্তু এই ১৪৮৲ টাকার বর্ত্তমান মূল্য ৩৭০৲ টাকা অর্থাৎ এক বৎসর পূর্ব্বে ৩৭০৲ টাকায় যে কাজ হইত, আজ ১৪৮৲ টাকায়ই তাহা হয়। এই ভাবে হিসাব করিলে দেখা যায়, যদি পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হারে মহাজনের ঋণ আদায় করিতে হয়, তবে বাংলার কৃষক সর্ব্বস্বান্ত হইবে। তাহাদের বাস্ত-ভিটা মহাজনের কবলে গিয়া পড়িবে, কারণ নগদ টাকা দিবার মতো সঙ্গতি তাহার আজ আর নাই। এখানে যে হিসাব ধরা হইয়াছে, তাহা মাত্র উদাহরণ স্বরূপ দেখানো হইয়াছে। টাকার মূল্য যে ঠিকই ২।৷০ গুণ বাড়িয়াছে, তাহার সঠিক হিসাব এখনও কেহ বাহির করে নাই! এত কথা বলার মোটামুটি উদ্দেশ্য হইল এই যে, যদি মহাজনের ঋণ আদায় করিতেই হয়, তবে তাহা বর্ত্তমান মুদ্রা-বাজারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সম অনুপাতে কমাইয়া দিতে হইবে। নতুবা ঋণগ্রস্ত কৃষকের আর উদ্ধার নাই।

বক্তব্য যদি এইখানেই শেষ হয়, তবে বুঝিতে হইবে, কৃষক-সমাজ ঋণ আদায় করিতে এখনই প্রস্তুত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নয়। এখন যদি মহাজন ঋণের জন্য খাতককে চাপিয়া ধরে, তবে ফল এই দাঁড়াইবে যে, নগদ টাকায় ঋণ আদায় করিতে অক্ষম খাতকের বাস্ত-ভিটা নীলামে চড়িবে। এই ভাবে সমগ্র বাংলাদেশে বাস্ত-ভিটা হীন একদল বেকার লোকের সৃষ্টি হইবে। তাহাদের জীবন-সংস্থানের কোন ব্যবস্থা কেহ করিতে পারিবে কি? দেশের সে অবস্থার কথা ভাবিতে গেলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। যদি দেশের কৃষক-সমাজই ধ্বংস হয়, তবে গোটা দেশ বাঁচিবে কি করিয়া? জমীদার, মহাজন, ব্যবসায়ী বা সরকারী চাকুরিয়ার কোন অস্তিত্ব তখন রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে কি?

যাহাদিগকে শোষণ করিয়া বাংলার তহশীলদার, জমীদার, ও রক্তশোষক, পরভৃৎ এক শ্রেণীর জীব অর্থাৎ মহাজনকুল ধরাকে সরা জ্ঞান করে, তাহারাই যদি ধরা-পৃষ্ঠ হইতে ধুইয়া মুছিয়া যায়, তবে ইহাদের অবস্থা কি দাঁড়াইবে? দেশের মেরুদণ্ড কৃষক-সমাজকে বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে! আর এই গুরুদায়িত্বভার গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ না করিলে আর কে করিবে? অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ঋণদায়ে প্রপীড়িত, দরিদ্র ও নিঃস্ব কৃষককুলকে ঋণদায় হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে। আইনের আশ্রয় না নিয়া ইহা সম্ভবপর হইবে না। যতদিন দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থা কতকটা ভাল না হয়, ততদিন যেন মহাজন আদালতের আশ্রয় নিয়া প্রাপ্য টাকার জন্য খাতককে নির্য্যাতিত করিতে না পারে। ইহাতে হয় ত মহাজনের সাময়িক অসুবিধা হইতে পারে, কিন্তু মৃত-প্রায়, নিঃস্ব কৃষকের চেয়ে কি তাহারা এখনও কতকটা ভাল নয়? হয় ত তাহারা ইচ্ছা করিলে কিছুকাল অপেক্ষাও করিতে পারে। এক গ্রাস অন্নের জন্য যাহারা আজ হাহাকার করিতেছে, তাহারা কি করিয়া আবার ঋণ আদায় করিবে? দেশের মহত্তর মঙ্গলের জন্য কি তাহারা সাময়িক একটু অসুবিধা ভোগ করিতে প্রস্তুত নহেন? যদি তা না হয়, তবে বুঝিতে হইবে—তাহারা পাষাণ হৃদয়, এই মর্ম্মভেদী, করুণ ক্রন্দনেও তাহাদের হৃদয়ে এতটুকু দয়ার সঞ্চার হয় নাই।

কৃষক সমাজের প্রতি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যও কম নয়। অজস্র অর্থ আজ তাহাদিগকে দান করিতে হইবে। কোন ক্ষেত্রে অবস্থামত প্রচুর কৃষি-ঋণ দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে (অবশ্য অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য)। জমীদারদিগকে রাজস্বের দায় হইতে কিছুকালের জন্য অব্যাহতি দিতে হইবে। আর Co-operative Bank এর নিকট হইতে গৃহীত টাকা যেন এসময়ে আদায়ের চেষ্টা করা না হয়। আশা করা যায়, এতগুলি উপায় অবলম্বন করিলে কৃষক সমাজকে এখনও মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে।

আ'ল্লামা সৈয়দ জামাল-উদ্‌দীন আফগানী *

— প্রবন্ধ —

— সৈয়দ আফতাব হোসেন

বিশ্বের মুক্তবক্ষে অধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ বন্দী মানবের ব্যথার দরদে যাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়াছিল,—স্বাধীনতা বঞ্চিত 'বন্দী নরের' রুদ্ধ কারাদ্বারে মুক্তির নামে যাঁহারা বুকের তাজা খুন ঢালিয়া জীবনপাত করিয়াছিলেন, আ'ল্লামা সৈয়দ জামালউদ্‌দীন আফগানীর নাম তাঁহাদের ইতিহাসে যুগে-যুগে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। এই ক্ষণ-জন্মা পুরুষ-সিংহের জীবনেতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠার সহিত প্রাচ্য তথা সমগ্র জগতের রাজনৈতিক ইতিহাস অতি ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। পাশ্চাত্য জগতের কূট রাজনীতি বিশারদ রাজন্যবর্গ যখন রাজশক্তির নামে প্রাচ্যের মাথায় 'কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া' খাইতেছিলেন, সৈয়দ সাহেব তখন তাঁহাদের কূট রাজনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তুরস্ক, ঈরাণ, মিশর, আফগানিস্থান প্রভৃতি ইসলামী রাজ্যে তথা সমগ্র 'আলমে ইসলামে' আত্মবোধ, সাম্যবাদ ও ইস্‌লামের সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বীজ বপন করিয়া সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তির সকল দর্প চূর্ণ করিয়া দেন।

আ'ল্লামা সৈয়দ জামাল উদ্‌দীন আফগানী

আ'ল্লামা সাহেবের শৈশব জীবন আফগানিস্থানের অন্তর্গত 'কেনার' পরগণার 'আমৌরাবাদ' পল্লীর এক

* এই প্রবন্ধের মাল-মসলা সংগ্রহ কার্য্যে আমি জনাব মৌলবী ফররোখ আহ্‌মদ নেজামপুরী সাহেবের লেখা হইতে বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি; এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

দরিদ্রের পর্ণকুটীরে অতিবাহিত হয়। 'হোসেনী সৈয়দ' বংশের প্রসিদ্ধ হাদিস-শাস্ত্র বিশারদ মহামনীষী সৈয়দ আলী তরন্দীর সুযোগ্য বংশধর সৈয়দ সফদর সাহেবের পর্ণকুটীর আলোকিত করিয়া ১৮৩৯ খৃঃ অব্দের (১২৫৪ হিজরী) কোন এক সুপ্রভাতের মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তে সৈয়দ জামাল ভূমিষ্ট হন। কে জানিত অদূর ভবিষ্যতে এক দিন এই শিশুর কর্ম্ম-জীবনের কঠোর সাধনায় সমগ্র প্রাচ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে? সৈয়দ সফদর সাহেব দরিদ্র হইলেও স্বয়ং বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার ন্যায় সর্ব্ববিদ্যায় বুৎপন্ন মহাজ্ঞানী দেশে অতি অল্পই ছিলেন। শিশু জামাল যখন অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিলেন, তখন হইতেই তিনি পুত্রের শিক্ষাভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। শৈশবকালেই জামালের অসাধারণ প্রতিভা ও ধীশক্তি দেখিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ-জীবন সম্বন্ধে পিতা অনেকখানি আশান্বিত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। স্বীয় অনন্যসাধারণ প্রতিভা প্রভাবে আ'ল্লামা সাহেব অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিজ্ঞান, দর্শন, ন্যায়, গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ন, উদ্ভিদ-তত্ত্ব, চিকিৎসা, হাদিস, ফেকাহ্, ওসুল, মন্তেক প্রভৃতি বিভিন্ন বিদ্যায় অশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া আলেম হিসাবে দেশে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিলেন। অবসর সময়ে পিতার নিকট হইতে রাজনীতি ও অর্থনীতি শিক্ষা করিয়া অষ্টাদশ বর্ষ বয়ক্রম কালেই তিনি রাজনীতি ও অর্থনীতি বিশারদ বলিয়া সকলের নিকট সুপরিচিত হন। এত জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াও সৈয়দ সাহেবের অসীম জ্ঞান-পিপাসার নিবৃত্তি হইল না। পাশ্চাত্য জ্ঞান-ভাণ্ডার লুণ্ঠনের জন্য তিনি অবশেষে বৃটীশ শাসিত ভারতবর্ষে আগমন করিলেন এবং ন্যূনাধিক দুই বৎসর কাল এখানে অবস্থান করিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞান অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ করিলেন। এই সময়ে পূণ্যভূমি হেজাজ সন্দর্শনের আকুল বাসনা তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাই ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের ৭ই জুন তিনি হজযাত্রা করিলেন, এবং মক্কা মুয়াজ্জমায় উপনীত হইয়া হজব্রত উদ্‌যাপনান্তে মদিনা মনওয়ারা ও জেরুজেলাম প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন করিয়া দুই বৎসর পর কাবুলে প্রত্যাগমন করিলেন।

আমির দোস্ত মোহাম্মদ খান তখন কাবুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি অনেক দিন হইতেই জনৈক অভিজ্ঞ মন্ত্রীর অভাব অনুভব করিতেছিলেন। এক্ষণে আ'ল্লামা সাহেবের সন্ধান পাইয়া তিনি তাঁহাকেই স্বীয় মনোবাসনা জ্ঞাপন করিলেন। আমির বাহাদুরের একান্ত অনুরোধে তিনি তাঁহার মন্ত্রীর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন এবং কার্য্যভার গ্রহণের অব্যবহিত পর হইতেই শিক্ষা, শাসন ও আইন সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। ফলে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রে যুগান্তরের সৃষ্টি হইল। এই সময়ে সহসা দোস্ত মোহাম্মদ খান মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর শের আলী খান সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই সৈয়দ সাহেবকে মন্ত্রীত্ব পদ হইতে অপসারিত করিয়া রফিক মোহাম্মদ খানকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। নব নিযুক্ত মন্ত্রীর অদূরদর্শিতা ও স্বেচ্ছাচারিতার ফলে আফগানিস্থানের রাজনৈতিক আকাশে বিপ্লবের মেঘ ঘনীভূত হইতে থাকে;—অপরিণামদর্শী মন্ত্রীর প্ররোচনায় শের আলী খান সহোদরত্রয়কে বন্দী করিয়া নিহত করিতে মনস্থ করেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়াই আজম খান ও আমির খান প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করেন এবং আবদুল খান বন্দী হন। কিন্তু জনৈক কারারক্ষীর অনুগ্রহে আবদুল খান মুক্তি লাভ করিয়া পলাইয়া যান। আজম খান রাজ-পরিবারের আবদুর রহমান্ খানের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার সাহায্যানুকূলে রাজধানী আক্রমণ করিয়া মসনদ দখল করিয়া লইলেন। আবদুর রহমানের পিতা আফজল খান ইতিপূর্ব্বে সিংহাসনচ্যুত হইয়া গজনীতে বন্দী জীবনযাপন করিতেছিলেন। তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া আনিয়া সন্ধির শর্ত্ত অনুযায়ী কাবুলের সিংহাসনে বসান হইল। প্রায় এক বৎসর কাল রাজত্ব করিবার পর আফজল খান দেহত্যাগ করিলেন এবং সন্ধিসূত্রে আজম খান মসনদে বসিলেন। তিনি পুনরায় জামালউদ্দীন সাহেবকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অধীনে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া সৈয়দ সাহেব অধিক দিন টিকিয়া থাকিতে পারিলেন না। আজম খান কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার শাসনকাল স্বেচ্ছাচারিতায় পরিপূর্ণ। শের আলী খান রাজ্যহারা হইয়া কান্দাহারে গিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য আজম স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রেরণ করিলেন। ইংরেজগণ শের আলী খানকে পরামর্শ ও অর্থ-সাহায্য করিতে লাগিলেন।

ফলে আজম খানের অভিযান ব্যর্থ হইয়া গেল। শের আলী খান কাবুল আক্রমণ করিলেন। আজম খান এবং তাঁহার সাহায্যকারী আবদুর রহমান্ খানের মিলিত বাহিনীকে পর্য্যুদস্ত করিয়া শের আলীর সেনাপতি ইয়াকুব খান কাবুলের সিংহাসন দখল করিয়া বসিলেন। অতঃপর শের দাঁড়াইয়া আ'ল্লামা সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইলেন না। এই সময়ে সৈয়দ সাহেব পুনরায় হজ্ করিবার বাসনা জ্ঞাপন করিলে শের আলী খান তাঁহাকে ভারতের পথে হজ্জযাত্রার অনুমতি দেন। আজম খান তখনও জীবিত ; সুতরাং সৈয়দ সাহেব পারস্যের পথে হজযাত্রা করিলে আজম

সোলতান আবদুর রহমান খান

আলী আফগানিস্থানের সর্ব্বময় প্রভু হইলেন। আবদুর রহমান্ বোথারা এবং আজম নায়সাপুরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

আফগানিস্থানের এই অন্তর্বিপ্লবের দিনেও সৈয়দ সাহেব কাবুলেই অবস্থান করিতেছিলেন। শের আলী খান তাঁহার প্রতি পূর্ব্ব হইতেই রুষ্ট ছিলেন। কিন্তু দেশবাসী তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি করায় তিনি দেশবাসীর মতের বিরুদ্ধে খানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আবার বিপ্লবের আগুন জ্বালাইতে পারেন, ইহাই শের আলীর ধারণা। এই ধারণায় বিশ্বাসী হইয়াই তিনি সৈয়দ সাহেবকে ভারতের পথে হজে যাইবার অনুমতি দিলেন এবং তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

আ'ল্লামা সাহেব ভারতে পদার্পণ করিলে ভারত গভর্ণমেণ্ট মহাসমারোহে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইলেন,

এবং যথোচিত সম্মান সহকারে তাঁহাকে রাজকীয় তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দিলেন। দুঃখের বিষয়, সে সময়ে অনেক পদস্থ ব্যক্তি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়াছিলেন। যেহেতু রাজকর্ম্মচারীদের বিশেষ আদেশ ব্যতীত কাহাকেও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল না। কিছুদিন ভারতে অবস্থান করিয়া তিনি সমুদ্রপথে মিশরের রাজধানী কায়রো নগরে গমন করেন। কায়রোর বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় "জামে-আজহারের" অধ্যাপকগণ তাঁহার আগমনে একান্ত আনন্দিত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। আ'ল্লামা সাহেব প্রায়ই "জামে-আজহারে" গমন করিতেন এবং তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বিবিধ-প্রসঙ্গের বক্তৃতা দান করিয়া অধ্যাপক ও অধ্যার্থিগণকে অশেষ জ্ঞানদান করিতেন। অত্যল্প সময় মধ্যে তাঁহার জ্ঞান-গরিমার কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে এবং মিশরের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু জ্ঞানান্বেষী জ্ঞানানুশীলনের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে থাকেন। মাত্র দেড় মাস কাল তাঁহার অবস্থান করিবার পর সকলকে বিদায় সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া সৈয়দ সাহেব তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুল নগরে গমন করেন।

জামে আজহার

কনষ্টাণ্টিনোপলে উপস্থিত হইয়া জামালউদ্দীন সাহেব তদানিন্তন তুরস্ক-মন্ত্রী মোহাম্মদ মাহ্‌মুদ পাশার আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিলেন। অল্প সময় মধ্যে এখানেও আ'ল্লামা সাহেবের জ্ঞানসৌরভ ও গুণগৌরব চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। দলে দলে লোক জ্ঞানালোচনার জন্য তাঁহার নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে তিনি তুরস্কের তদানিন্তন জাতীয় সমিতি "আঞ্জুমানে দানেশের" সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। এই সময় হঠাৎ একটা বিপদ আসিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিল; ফলে তিনি তুরস্ক দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন।

ওসমানিয়া ইউনিভারসিটী (দারু-উল্‌-ফনুন") তৎকালে তুরস্কের প্রধানতম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সৈয়দ সাহেব বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের অভিনন্দন গ্রহণে সম্মত হন। তুরস্কের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ছাত্রগণ কর্ত্তৃক এক বিরাট জনসভা আহূত হয়। আ'ল্লামা সাহেব তাঁহার অভিভাষণে তুর্কী ভাষায় এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি দর্শন ও প্রেরিতত্ব (নবুয়ত) সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করেন। তুরস্কে আ'ল্লামা সাহেবের যশঃ-গৌরব দেখিয়া কতিপয় প্রাচীন-পন্থী

তথা কথিত গোঁড়া শ্রেণীর স্বার্থ-সর্ব্বস্ব আলেম তাঁহার প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ পোষণ করিয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন তৎকালীন "শেখ্-উল্-ইস্‌লাম" সাহেবই এই দলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে

মাহ্‌মুদ পাশা

তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, "সৈয়দ সাহেব নবীগণকে ব্যবসায়ী ও নবুয়তকে ব্যবসায় রূপে বুঝাইয়া লোকের অন্তরে ভ্রম ধারণা জন্মাইতেছেন। ফলে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় তুরস্ক গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তুরস্ক পরিত্যাগের আদেশ প্রদান করিলেন।

১৮৭১ খৃঃ অব্দের ২২শে মার্চ্চ সৈয়দ সাহেব পুনরায় কায়রো নগরে আগমন করিলেন। তাঁহার গুণগ্রাহিগণ আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন। দলে দলে ছাত্র ও জ্ঞানপিপাসুগণ বিবিধ বিষয়ের আলোচনার জন্য তাঁহার নিকট সমবেত হইতে লাগিল। তিনি সমাগত ছাত্রগণকে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, হাদিস, ওসুল, ফেকাহ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানদান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মিশরের বড় বড় আলেমগণ তাঁহার নিকট জটিল বিষয় সমূহের মীমাংসা করিয়া লইতেন। সৈয়দ সাহেব মিশর পরিত্যাগের বাসনা করিলে তাঁহার একান্ত অনুরক্ত বন্ধু রিয়াজ পাশা তাঁহাকে যাইতে দিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার চেষ্টায় সৈয়দ সাহেব স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট হইতে বার্ষিক পৌনে দুইলক্ষ টাকার বৃত্তিলাভ করিয়া মিশরে কিছুদিনের জন্য স্থায়ীভাবে বাস করিতে বাধ্য হন। এখানে তিনি একটী সাহিত্য-সমিতি গঠন করেন এবং প্রাচীন ও প্রবীন লেখকদের লেখা লইয়া আলোচনা করিতে থাকেন। ফলে তথায় সাহিত্যের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং অনেক সমালোচকের সৃষ্টি হয়। আ'ল্লামা সাহেব প্রত্নতাত্ত্বিকগণকে খুব ভালবাসিতেন, কিন্তু উপন্যাস
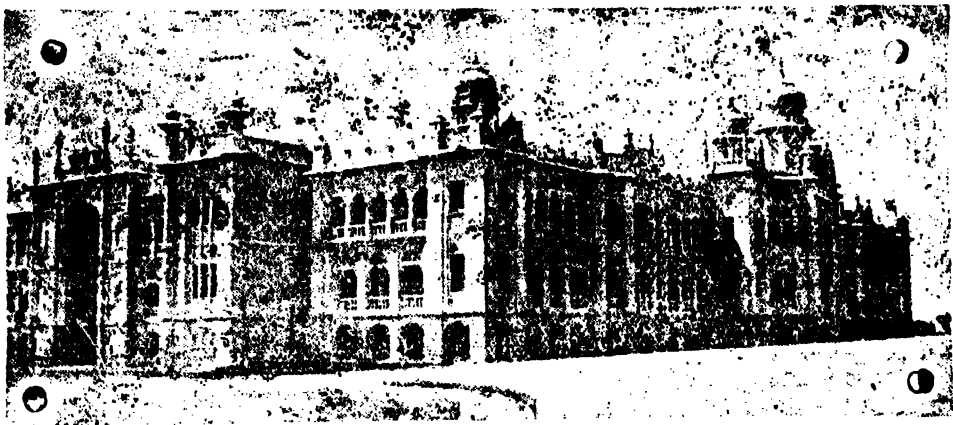
ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি

ইহাতে দেশময় হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল বহুস্থানে সভা-সমিতি করিয়া সৈয়দ সাহেব এই মিথ্যা অপবাদের খণ্ডন করিতে লাগিলেন, বিরুদ্ধবাদিগণের সহিত বহুস্থানে তর্ক-যুদ্ধ ও সংঘর্ষ চলিতে লাগিল। দেশে দুইটী দলের সৃষ্টি হইল। ও ঔপন্যাসিকগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তুরস্কের জননেতা ও বর্ত্তমানে প্রেসিডেণ্ট মুস্তাফা কামাল পাশা এই সময়ে সৈয়দ সাহেবের নিকট সাহিত্য ও রাজনীতি আলোচনা করিতেছিলেন। স্বাধীন মিশরের ভাগ্যবিধাতা মরহুম সা'দ

আহ্‌মদ পাশা জগ্‌লুল এবং তাঁহার অন্যতম সহকর্ম্মী মুফ্‌তি মোহাম্মদ আবত্নহু এই সময়ে সৈয়দ সাহেবের সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহার সহিত বিবিধ রাজনৈতিক আলোচনায় যোগদান করেন।

মিশরের সিংহাসনে তখন খেদিব তৌফিক পাশা আসীন। তাঁহার যথেচ্ছাচারিতা ও প্রজা-পীড়নের দরুণ শাসক ও

গাজী মোস্তফা কামাল পাশা

শাসিতের ভিতর মনোমালিন্যের আগুন ধূমায়িত হইতেছিল। বিশেষতঃ মিশরে বৈদেশিক প্রভাব অনেকের নিকট বিসদৃশ অনুমিত হইতেছিল। ফলে মিশরে জাতীয়দলের সৃষ্টি হইল। অধিকার-বঞ্চিত মানবের করুণ আহ্বানে সৈয়দ সাহেব স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি সাময়িক ভাবে এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া মিশরের রাষ্ট্রের দ্বারে আঘাত করিয়া বসিলেন। মিঃ বডিয়ন্‌ এই সময়ে মিশরে ইংরেজ কাউন্সিল জেনারেল। সৈয়দ সাহেবের এই রাজনৈতিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কোনরূপ বাহ্যিক শত্রুতা না দেখাইয়া তিনি ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র পাকাইয়া খেদিব তৌফিক পাশাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন এবং তাঁহারই দ্বারা সৈয়দ সাহেবকে মিশর পরিত্যাগের আদেশ জানাইলেন।

মিশর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আ'ল্লামা জামালউদ্দীন সাহেব ভারতে পদার্পণ করিলেন এবং হায়দরাবাদ অঞ্চলে অবস্থান করিয়া তথাকার 'নাস্তিক্যবাদ' বিনাশে আত্মনিয়োগ করিলেন। এই সময়ে তিনি উক্ত মতের বিরুদ্ধে পারস্য ভাষায় একখানি গ্রন্থ প্রনয়ন করেন। অত্যল্প সময় মধ্যে উহার আরবী অনুবাদ সংস্করণও বাহির হয়। * হঠাৎ ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কোপদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। বিরুদ্ধ রাজনৈতিক মতের পোষক এবং মিশরের জাতীয়দলের সাহায্যকারী বলিয়া বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন এবং 'নজরবন্ধ' করিয়া রাখিলেন। কিয়দ্দিবস পর মিশরে স্বেচ্ছাতন্ত্রের হস্তে জাতীয়তার সাময়িক পতন হইলে বৃটীশ সরকার তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন।

মুক্তিলাভের অব্যবহিত পর সৈয়দ সাহেব লণ্ডন গমন করেন। কিছুদিন লণ্ডনে অবস্থান করিয়া তিনি নগরীকুলরাণী প্যারিস নগরে গমন করেন। এখানে মিশর গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত মুফ্‌তি মোহাম্মদ আবদুহু সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উভয়ে মিলিয়া আবার বিবিধ রাজনৈতিক চর্চ্চায় মনোযোগ দেন। এই সময় মুফ্‌তি সাহেবের সহায়তায় সৈয়দ সাহেব একখানি আরবী সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন। † গবেষণামূলক রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য অতি শীঘ্র ইহার প্রচার বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করে। বৃটীশ রাজনীতির বিরুদ্ধে ইহাতে জ্বলন্ত ভাষায় উদ্দীপনাময়ী প্রবন্ধ সতত প্রকাশিত হইতে থাকে; ফলে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ভারতে ইহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল হইল না; সমগ্র প্রাচ্য জগতে হু হু করিয়া পত্রিকাখানির প্রচার বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। হঠাৎ কোন অনিবার্য্য কারণে উহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। আ'ল্লামা সাহেব ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়া তৎকালীন

* মূলগ্রন্থ ও তাহার অনুবাদ যথাক্রমে ১৮৮৪ ও ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে বায়রুতে প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

† পত্রিকাখানির নাম—"ওরোয়াতুল্‌ ওস্‌কা"।

ফরাসী পণ্ডিতগণের সহিত ইস্‌লাম ও বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক গবেষণামূলক আলোচনা করিতে থাকেন। তাঁহার রাজনীতি চর্চ্চার জন্য ইংরেজ রাজনীতিকগণ বিপ্লবের আশঙ্কায় এমন সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, লর্ড চার্চ্চহিল, লর্ড স্যালসবেরী, লর্ড অ্যালফ্রেড্‌ ব্রেষ্ট প্রমুখ রাজনীতি বিশারদগণও তাঁহার নিকট আপোষের প্রস্তাব করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন

মুসলমানদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় স্বাধীনতার দাবী উপস্থাপিত করেন এবং জারের অনুমতি লইয়া কোরআন, হাদিস প্রচারে আত্ম-নিয়োগ করেন। তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টায় বহু ধর্ম্মগ্রন্থ দেশীয় ভাষায় অনূদিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে রুষীয় মুসলমানগণ একমাত্র তাঁহারই প্রচেষ্টায় ধর্ম্ম সম্পর্কে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন।

সেণ্টপিটার্সবার্গে অবস্থান কালে পারস্য সম্রাট নাসির

জগলুল পাশা

প্যারিস পরিত্যাগ করিয়া আ'ল্লামা সাহেব ইউরোপের বিভিন্ন অংশে কিছুদিনের জন্য ভ্রমণ করেন। এই সময়ে একদিন রাত্রে বার্লিন সহরের রাস্তায় তিনি আততায়ী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন এবং সৌভাগ্যক্রমে জনৈক আরবীয় ভ্রমণকারীর সাহায্যে পরিত্রাণ পান। ইহার পর তিনি মস্কো হইয়া রুষিয়ার রাজধানী সেণ্ট্‌ পিটার্সবার্গে গমন করেন। রুষিয়ার মুসলমানদের দুরবস্থা দেখিয়া তিনি জার মহোদয়ের নিকট

উদ্দীন শাহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয় এবং শাহ বাহাদুরের অনুরোধ ক্রমে তিনি তথা হইতে পারস্য গমন করেন। সহসা পারস্যের শাসন সংস্কার লইয়া শাহের সহিত আ'ল্লামা সাহেবের মতানৈক্য ঘটে এবং তিনি পারস্যের তদানিন্তন শাসন-পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। এই সময়ে তথায় কর্ম্মসূত্রে প্রাচ্য রাজনীতি বিশারদ বিখ্যাত পার্শী পত্রিকা "হাব্‌লুল্‌-মতিনের" সম্পাদক মরহুম আগা

মঈড়ল ইস্‌লাম জালালউদ্‌দীন ইস্পাহানী সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আগা সাহেব রাজনীতি আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিয়া উপযুক্ত "গুরু"র সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিলেন। এক্ষণে আ'ল্লামার সাক্ষাতে তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। গুরু শিষ্য মিলিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে করিলেন। এই সময়ে তিনি পীড়িত হইয়া তেহরানের প্রসিদ্ধ তাপস শাহ্‌ আব্দুল আজিমের মাজার শরিফে শয্যাশায়ী ছিলেন। পারস্য সম্রাট বহুশত সৈন্য সমভিব্যাহারে উক্ত মাজার আক্রমণ করেন এবং আ'ল্লামাকে গেরেফতার করিয়া পীড়িত অবস্থাতেই তুরস্কে রাখিয়া আসেন। শাহ্‌

মুফ্‌তি মোহাম্মদ আবদুহু

কাজে লাগিয়া গেলেন। হঠাৎ আ'ল্লামা সাহেব ইউরোপ গমনের আবেদন পত্র পারস্য সম্রাটের নিকট উপস্থিত করিলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। জামালউদ্‌দীন সাহেব নাসিরউদ্‌দীনের সিংহাসন চ্যুতির নিমিত্ত দেশময় তুমুল আন্দোলন জুড়িয়া দিলেন। পারস্য সম্রাট তাঁহার উপর খড়্গ হস্ত হইয়া তাঁহাকে গেরেফ্‌তার করিবার জন্য লোক নিযুক্ত সাহেব মাজার অবরোধ করায় পারস্যের আপামর প্রজা সাধারণ নাসিরউদ্‌দীনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠেন এবং তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে বদ্ধপরিকর হন।

আ'ল্লামা কিছুদিন 'বোরজান' পল্লীতে হেকিম রাশেদ মির্জ্জা ইস্‌হাকের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া আরোগ্য লাভ করেন এবং ইস্তাম্বুল শহরে উপস্থিত হন। সোল্‌তান্‌ দ্বিতীয়

আব্দুল হামিদ খান তখন তুরস্কের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি সৈয়্যদ সাহেবকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং মাসিক পঁচাত্তর পাউণ্ড হিসাবে বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া স্বীয় প্রাসাদ সংলগ্ন একটী সুসজ্জিত সুরম্য মহলে তাঁহাকে স্থান দান করেন।

আগা মঈদুল ইসলাম

সোলতান আব্দুল হামিদ খান অতিশয় জ্ঞান-পিপাসু ও খ্যাতনামা রাজনীতি-বিশারদ্ বাদ্‌শাহ্ ছিলেন। তিনি দিবসের অবসর সময়ে এবং গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সৈয়্যদ সাহেবের সহিত বিবিধ শাস্ত্রালোচনা, রাজনীতি চর্চ্চা প্রভৃতি জ্ঞানানুশীলনে নিরত থাকিতেন। আব্দুল হামিদ খান আ'ল্লামা জামালউদ্‌দীন সাহেবের খুব গুণগ্রাহী ছিলেন এবং তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধাও করিতেন। ইত্যোমধ্যে সৈয়্যদ সাহেব আর একবার জীবনের শেষবার ইউরোপ যাত্রা করেন এবং পূর্ণ দুই বৎসর কাল ইউরোপের বিভিন্ন অংশ পর্য্যটন

করিয়া ১৮৯২ খৃঃ অব্দে আবার ইস্তাম্বুলে ফিরিয়া আসেন। ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি পারস্য গভর্ণমেণ্ট এবং তাঁহার শাসন পদ্ধতির বিরুদ্ধে ইংরাজী পত্রিকা সমূহে প্রতিবাদ প্রবন্ধ লিখিয়া ইউরোপখণ্ডেও তুমূল আন্দোলন জাগাইয়া তুলেন। ইউরোপ হইতে তুরস্কে প্রত্যাগত হইলে পারস্য

সোলতান আবদুল হামিদ খান

রাজদূতের অনুরোধ ক্রমে সোলতান আব্দুল হামিদ খান তাঁহাকে পারস্যের বিরুদ্ধাচরণ পরিত্যাগ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। একমাত্র সোলতানের অনুরোধে তিনি নাসিরউদ্দীন শাহ্‌কে ক্ষমা করেন।

এক সময়ে পারস্য সম্রাট কোন ইংরেজ ব্যবসায়ীকে তামাকের ইজারা দিয়াছিলেন। এই লাভজনক ব্যবসায় অন্য জাতির হাতে যায় দেখিয়া, সৈয়দ সাহেব ইহার বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন এবং যে পর্য্যন্ত উক্ত ইজারা কোন মুসলমানকে দেওয়া না হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত তামাক হারাম বলিয়া পারস্যের মোজতাহেদ আজমের দ্বারা ফৎওয়া প্রচার করাইলেন। দেশের সমস্ত তামাক এমন কি শাহের ব্যবহার্য্য তামাক পর্য্যন্ত পোড়াইয়া ফেলা হইল। অবশেষে পারস্য সম্রাট পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়া ইজারা বাতিল করিয়া দিলেন।

এই সময়ে ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে হঠাৎ পারস্য সম্রাটের গুপ্ত হত্যার পর সমগ্র পারস্য খণ্ডে এক ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং এই হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া পারস্য গভর্ণমেণ্ট সৈয়দ জামালউদ্দীন এবং তাঁহার সহকর্ম্মী বন্ধুত্রয় মির্জ্জা ইসান খান, মির্জ্জা আকা খান এবং শেখ আহ্‌মদকে বন্দী করিয়া পারস্যে পাঠাইবার জন্য তুরস্ক গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। সৈয়দ সাহেব ব্যতীত অপর তিনজনকে বন্দী করিয়া পাঠান হয় এবং পথে পারস্যোপ কূলে তারেজ বন্দরে তাঁহারা গুপ্তঘাতক কর্ত্তৃক নিহত হন। কিছুদিন পরে সন্দেহ ক্রমে তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট সৈয়দ সাহেবকে পারস্য সম্রাটের হত্যার অভিযোগে আদালতে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি বিচারকের নিকট নিরপরাধী প্রতিপন্ন হওয়ায় মুক্তি লাভ করেন।

ইহার পর আর একবার পুণ্যভূমি হেজাজ দর্শনের জন্য তাঁহার তৃষিত আত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠে। কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে তিনি দুরন্ত "ক্যানসার" রোগে আক্রান্ত হন। আবু তোরাব প্রমুখ তাঁহার কতিপয় অনুরক্ত শিষ্য তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য বহুবিধ চিকিৎসার
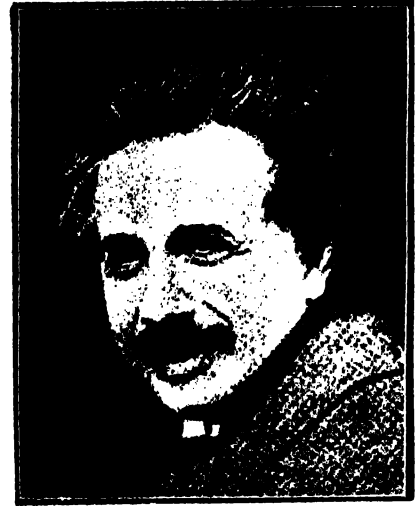
মিঃ ব্লানষ্টাইন

ব্যবস্থা করেন। সৈয়দ সাহেব অধ্যাত্মিক জ্ঞানেরও যথেষ্ট অধিকারী ছিলেন। মৃত্যুর মলিনিমা যে তাঁহার জীবনের সম্মুখে ঘনাইয়া আসিতেছিল, ইহা তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—"আবু তোরাব! অন্ধকার পথের যাত্রীর জন্য বৃথা এ আলোর ব্যবস্থা কেন?" হয় ত আবু তোরাব গুরুর এ অস্পষ্ট ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়াছিল না। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের ৯ই মার্চ্চের সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সত্য

সত্যই এই আদর্শ কর্ম্মবীরের জীবনের সন্ধ্যাও ঘনাইয়া আসিল। জীবনব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন কঠোর কর্ম্ম-সাধনার অবসানে ৫৮ বৎসর বয়সে চিরসংগ্রামশ্রান্ত সৈনিক অনন্ত নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িলেন। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অবসান হইল। মুক্তির জন্য তিনি পাগল হইয়া উঠিয়াছিলেন,—আত্মা তাঁহার স্বীয় মালিকের আহ্বানে মুক্তির দেশের পানে ছুটিয়া চলিল।

কনষ্টান্টিনোপলের সমীপবর্ত্তী "মাজারে শেখ" নামক কবর স্থানে তাঁহার সুপবিত্র দেহাবশেষ রক্ষা করা হইল। বিশ্ব-মোস্‌লেমের ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া নিদারুণ কাল সেদিন

মিঃ ব্রাউন

যে মহামণিটি অপহরণ করিল, কবে তাহার পূরণ হইবে কিংবা কোন দিন হইবে কি না, তাহা সেই অন্তর্য্যামী খোদাতা'লাই জানেন।

আ'ল্লামা সাহেব আত্মত্যাগী, নিঃস্বার্থ ও সংযমী মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি জীবনে কোন দিন অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ অনুসন্ধান করেন নাই। অর্থলালসা তাঁহাকে ক্ষণেকের জন্যও স্পর্শ করিতে পারে নাই। জাতির স্বাধীনতা-কামনা লইয়া তিনি আমাদের মধ্যে আসিয়াছিলেন, আজীবন সেই কৃচ্ছ্র সাধনাকেই আশ্রয় করিয়া চলিয়াছেন। মিশর হইতে কপর্দ্দকহীন অবস্থায় বহিষ্কৃত হইয়া যখন তিনি সুয়েজ বন্দরে গমন করেন, তখন পারস্যের রাজদূত তাঁহাকে এক থলিয়া মোহর উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করেন। সৈয়দ সাহেব্ সে উপহার প্রত্যাখান করিলে পারস্য দূত ঋণ স্বরূপে উহা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। আ'ল্লামা সাহেব সহাস্য বদনে তাঁহাকে বলেন,—"এ উপহার আমার পক্ষ হইতে আপনিই গ্রহণ করুন। যে হেতু আপনি আমার চেয়ে অধিকতর অভাবগ্রস্ত।" এমনি ছিল তাঁহার ভোগ নিস্পৃহ অন্তরের উদারতা!

প্রফেসর ব্রাউন, ডাঃ ব্রাসলি, কর্ণেল য়্যানষ্টাইন প্রভৃতি পাশ্চাত্য রাজনীতি-বিশারদগণ যাঁহারাই জামালউদ্‌দীন সাহেবের জীবন কথা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই বিস্ময়ের সহিত মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, রাজনীতি ও ধর্ম্ম-শাস্ত্র একাধারে এতগুলি বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপন্ন মহামনীষী হিসাবে একমাত্র জামালউদ্‌দীন সাহেবই জগতের নিকট সুপরিচিত। গভীর রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রতিযোগিতায় তিনি পাশ্চাত্য রাজনীতি বিশারদগণকেও হার মানাইয়াছেন।

প্রাচ্যের মুক্তি এবং এক "খলিফাতুল-মুসলেমিনে"র অধীনে একচ্ছত্র বিরাট ইস্‌লামী রাজ্য-স্থাপনই ছিল তাঁহার কর্ম্মজীবনের একমাত্র ধ্রুব-লক্ষ্য। এই কঠোর সাধনার মূলেই বুকের রক্ত ঢালিয়া তিনি নিজকে তিলে তিলে ক্ষয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই তিনি এই কঠোর সঙ্কল্পকে আংশিকভাবে সাফল্য মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কালের কুটীল দৃষ্টি অকালে তাঁহার উপর পতিত না হইলে, তিনি তাঁহার কঠোর ব্রত উদ্‌যাপনে সক্ষম হইতেন,—জাতি ও দেশকে অনেক কিছু দান করিয়া যাইতে পারিতেন। হতভাগ্য জাতি ও দেশের নবারুণ-রঞ্জিত রক্ত-ভালে গোধূলির ধূসর মলিনিমা ছায়াপাত করিয়া বসিয়াছে। স্বাধীন মতের উপাসক মুক্তির আগ্রহে মুক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন; পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে—তাঁহার কঠোর কর্ম্মময় জীবনের সহস্র উজ্জ্বল আদর্শ। জাতি ও দেশ যুগে-যুগে তাঁহার এই প্রোজ্জ্বল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার অজেয় সাধনার স্মৃতির পূজা করিয়া চলিবে; অন্তরীক্ষের মুক্ত গবাক্ষ-পথে তাঁহার অমর-আত্মা কওমের শীরে আশীষের শতধারা ঢালিয়া দিবে!

আমি বুঝি কেঁদে যাই—

—আবু নয়ীম মোহাম্মদ বজলুর রশীদ

মুখর ধরার গায়
বাদলের নটী চরণ ফেলিবে মলিন মেঘের ছায় ;
বেণু-বনে যবে মর্ম্মর ধ্বনি বাজিয়া উঠিবে ক্ষণে
আকাশের মুখ ভাবিয়া আমার মুখ যদি পড়ে মনে,
তোমার ও-খোঁপা খুলে' দিও সখি একটু করুণা ভরে
আঁচলে মুছিও কাজল নয়ন যদি আঁখি জল ঝরে।
মলিন মেঘের মুকুরে তোমার মুখখানি দেখো চে'য়ে
হয় ত' এমনি বাদলের মত বেদনায় গে'ছে ছে'য়ে।

খুলিও বুকের বাস,
মনে ভেবো সখি তোমারে স্মরিয়া ফেলি শত নিঃশ্বাস ;
এ পারে কাজল মেঘ ঝরে হায় ও পারের পানে চাহি
মাঝখানে ছোট নদী বহে চল বেদনায় অবগাহি'।
এপারে আকাশ জলে ভেসে যায় ওপারে আকাশ খানি
ছল-ছল চোখে চে'য়ে থাকে যেন নয়নে কাজল টানি ;
আমি ভাবি সখি, আমি কেঁদে যাই তুমি যেন চে'য়ে থাকো
ওপারে তোমার জল-ভরা চোখে কত যে বেদনা আঁকো।

ঝরা শিউলীর ফুলে
তোমার অধর যদি ছুঁয়ে যায় বারেকের তরে ভুলে'।
মনে ক'রো সখি তোমারে ভাবিয়া আমারও অধর দু'টী
ওর বুকে হায় বাদলের শেষে ব্যথায় পড়িবে লুটি'।

মোর মধু-চন্দ্রিমা
হয় যদি ক্ষীণ ভেবো সখি শেষ মোর জীবনের সীমা।

চিত্রে

বন্যা-বিধ্বস্ত বঙ্গ ও আসাম
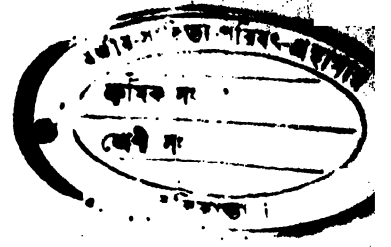
ভেলার উপরে বিপন্ন গৃহস্বামী এবং তার বড় আদরের ছাগ-শিশুটি! উভয়েই অকূলের যাত্রী! উভয়ের চোখেই চির বিদায়ের অকথিত বাণী !!

পাবনা-জেলার একটি বন্যা-প্লাবিত গ্রাম

মৃত্যুর গতিরোধ করিতে যে দুর্গ উঠিয়াছে, প্রকৃতির নির্মম পরিহাসে সেখানেও মৃত্যু আসিয়া হানা দিয়াছে!
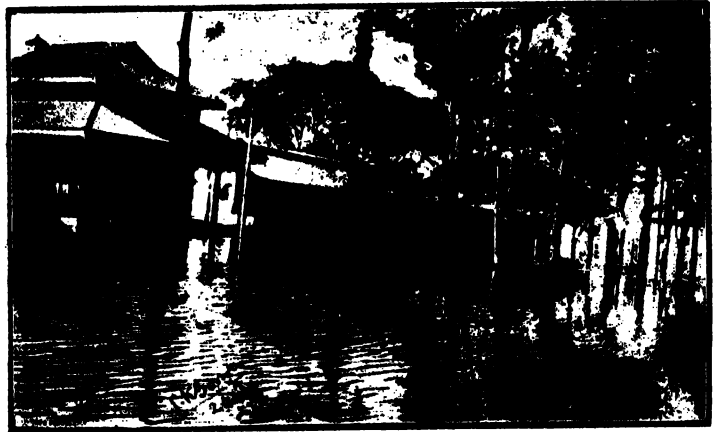
ডিব্রুগড় হাসপাতাল

কাল যেখানে ছিল জনাকীর্ণ জনপদ
আজ সেখানে সাগরের জল থৈ-থৈ করিতেছে !

টাঙ্গাইলের অন্তর্গত যমুনা-নদীর তীরস্থ বন্যা-প্লাবিত একটি চরের দৃশ্য।
চরের বাড়ী-ঘর সমস্ত বন্যার জলে ভাসিয়া গিয়াছে।

কৃষির প্রাণ গরু রক্ষাকল্পে বাঙ্গলার কৃষক মৃত্যুর সঙ্গে যুঝিতেছে।

সিরাজগঞ্জের একটি বন্যা-প্লাবিত গ্রাম

ডিব্রুগড় মেডিকেল স্কুল বোর্ডিং কম্পাউণ্ড।

বগুড়া জেলার মেঘাগাছা গ্রামের অধিবাসীদের চরম দুর্দ্দশার একটি চিত্র।
হতভাগ্য সর্ব্বহারাদের শেষ অবলম্বন !

বগুড়া জেলার মদনা গ্রামের বন্যার জলে প্লাবিত বিদ্যালয় গৃহের দৃশ্য।

বিদায়-বেলায়

—মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ

(১)

বিদায়-বাঁশী উঠ্‌ল বাজি'
আজ্‌কে মোদের মিলন-পুরে ;
মিলন-আকুল দুইটী হিয়া
চল্‌ছে ভেসে কোন্‌ সুদূরে।
টান্‌ছে সে কে কিসের টানে,
পথ হারালে কাহার গানে ?
কোন বিরহীর আকুল বাঁশী
ডাক দিলে আজ তোমায় প্রিয়ে ?
চল্‌ছ ভেসে কাহার পাশে,
আমার ঘরের আগুন দিয়ে ?

(২)

আজ্‌কে তোমার বিদায়-বেলায়,—
—চ'লছ যখন সুখের আশে,
চোখের জলের বাঁধন নিয়ে,
থাক্‌ব না ত পথের পাশে।
তোমার পথে কাঁটার মত
ওই চরণে বিঁধ্‌ব না ত,
ধূলা হ'য়ে রইব সেথায়,
চরণ ছোঁয়া লইব বুকে।
আমার সুখের প্রদীপ জ্বালি'
সাধব না বাদ তোমার সুখে।

(৩)

চ'লছ যেথায় আমায় সেথায়
ভুলার কথা ওঠ্‌বে যবে,
ভু'লো আমায়, দুঃখ কি তায় ?
তোমার তাতে সুখ ত হবে।
আমার দেশের বাতাস দোলে
বুকের বসন যদিই খোলে,
ক্ষণিকের সে ভুলটী তাহার
গোপন রেখো যতন ক'রে।
সুধা'য়োনা আমার খবর ;
ভু'লেও পথের পথিক ধ'রে।

(৪)

আমার জীবন কেমন হবে ?
কি কাজ তোমার তাই বা শুনি'।
হয়ত তখন সুখীই হব,
তোমার সুখের স্বপন বুনি'।
হয় ত কখন দখিণ বায়ে,
পুলক শিহর লাগ্‌বে গায়ে,
আকুল হৃদয় উঠ্‌বে নেচে
হয়ত তোমার আসার আশে।
হয় ত কখন থাক্‌ব ব'সে
তোমার ফেরার পথের পাশে।

বঞ্চিত

—বড় গল্প—

—মোহাম্মদ আবদুল বারি

৬

রফিক আজাদকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিতেছিল বটে, কিন্তু একটি উপযুক্তা পাত্রীর যোগাড় না করা পর্য্যন্ত তাহার মন স্থির ছিল না। যাকে তাকে ত আর স্থির করা চলে না। ইহাতে হিতে বিপরীত হওয়ারই সম্ভাবনা। আজ জমিলাকে দেখিয়া তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে বলিয়া ভরসা জন্মিল।

জমিলা সুন্দরী। যদিও সে উচ্চ শিক্ষার ডিগ্রী লাভ করে নাই, তথাপি চেষ্টা ও স্বাভাবিক বুদ্ধি সহযোগে নিজের জ্ঞানের গণ্ডীকে অনেকটা পরিবর্দ্ধিত করিয়া লইয়াছিল। বিশেষতঃ তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য রফিক তাহাকে বেশ একটু শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভালবাসার চক্ষে দেখিত।

বৈকালে বন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া রফিক দেখিল, আজাদ বেজায় পরিশ্রান্ত। যেন এইমাত্র কোথা হইতে আসিয়াছে। চাকর ওরফে বাবুর্চি পাখা দিয়া বাতাস করিতেছে, এবং আজাদ একখানি চেয়ারে গা ছাড়িয়া বসিয়া আছে।

রফিক প্রশ্ন করিল,—"কি বড় পরিশ্রান্ত যে, কোথাও গিয়াছিলে না কি ?"

"হাঁ মাণিকপুর হইতে এইমাত্র আসিলাম।"

"কি কাজে মাণিকপুর গিয়াছিলে ?"

"সেখানকার জমি-জমাটুকুর একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য।"

"কি ব্যবস্থা করিতে চাও ?"

"বিক্রয়।"

"বিক্রয় ! জমি বিক্রীর এত তাড়া পড়িল কেন ?"

আজাদ মৃদু হাস্যের সহিত উত্তর করিল,—"তল্পী গুটাইতে আরম্ভ করিয়াছি।"

রফিক ক্ষুব্ধ ভাবে প্রশ্ন করিল,—"তল্পী গুটাইতে ? তোমার উদ্দেশ্যটা কি ?"

"উদ্দেশ্য ভব-ঘুরেদের তালিকায় নাম লেখান। এর পূর্ব্বে জমি-জমাটুকুর একটা ব্যবস্থা করা চাই ত ? আমি মনে করিয়াছি, জমিটুকু বিক্রী করিয়া ফেলিব। বাড়ীখানি থাক্—উহা তোমাদেরই তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যাইব।"

রফিক ক্ষুব্ধভাবে বলিল,—"বাড়ীটাই বা আর থাকে কেন ?"

"বলা ত যায় না, কোন দিন যদি ফিরিতে হয় ?"

"কোথায় যাইবে মনে করিয়াছ ?"

"কোন প্রোগ্রাম নাই। ভ্রমণই যখন উদ্দেশ্য, তখন তার আবার স্থিরাস্থির কি ?"

"তুমি মনে মনে এতদুর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছ, অথচ আমি এর বিন্দু-বিসর্গও অবগত নহি।"

আজাদ বলিল,—"কাহাকেও জানান আমার উদ্দেশ্য নহে। তোমাকেও জানাইব কি না ইতস্ততঃ করিতেছিলাম।

বন্ধুর কথা শুনিয়া রফিক মনে মনে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তাহা সে বাহিরে প্রকাশ না করিয়া ঈষৎ পরিহাসের স্বরে বলিল,—"ময়না উড়িবে ! কিন্তু আমি যে খাঁচার ফরমাইস দিয়া বসিয়াছি।—তোমাকে বিবাহ করিয়া ঘর-সংসার করিতেই হইবে। এ ভাবে উদাসীন বেশে তোমাকে যাইতে আমি দিতে পারি না।"

আজাদ বলিল,—"খোদার উদ্দেশ্য বোধ হয় সেরূপ নহে ভাই! নতুবা তিনি আরো পূর্ব্বেই আমার জীবন-স্রোত অন্য পথে চালিত করিতে পারিতেন। এরূপ ব্যর্থতার মধ্য দিয়াই আমাকে এপারের যাত্রা শেষ করিতে হইবে। আর এ সুখের মরীচিকার পিছনে ছুটিতে মোটেই প্রবৃত্তি নাই।"

রফিক বলিল,—"আমি আর তোমার কোন আপত্তি শুনিতে চাই না। তুমি বিবাহের জন্য প্রস্তুত হও, আমি পাত্রী স্থির করিয়া ফেলিয়াছি।"

আজাদ বিস্মিতভাবে বলিল,—"স্থির করিয়া ফেলিয়াছ? পাত্রী! কে?"

"জমিলা।"

আজাদ জমিলাকে জানিত; সুতরাং পরিচিত নামটি শুনিয়া একটু হাসিল।

"আর কিন্তু নয়। তোমার পরিস্কার জবাবটি চাই, বিলম্ব করিলে চলিবে না। বিবাহের আয়োজন করিতে হইবে ত?"

আজাদ বলিল,—"অত তাড়াতাড়ি করিলে চলিবে না ভাই, আমাকে একটু ভাবিবার অবসর দাও।"

"আমি কালই তোমার পরিস্কার সম্মতিটি চাই"—বলিয়াই রফিক তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

আজাদের সহিত জমিলার বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া রফিকের বাড়ীর সকলেই খুসী হইল। জমিলাদের বাড়ী হইতেও কোন আপত্তি উঠিল না, বরং জমিলার মা ও বড় ভাই সোলেমান ইহাতে আনন্দিতই হইল। কিন্তু সুখী হইল না কেবল একজন—সে স্বয়ং জমিলা।

জমিলা যে মুহূর্ত্তে বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইয়াছে,—যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া তাহার মাথায় পড়িল। সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাহার সদা প্রফুল্ল-মুখমণ্ডল হইতে হাস্যরেখা মুছিয়া গিয়াছে। অকস্মাৎ কোথা হইতে যেন অশান্তির দারুণ দাবানল ছুটিয়া আসিয়া তাহার হৃদয়-কাননের সমস্ত শান্তি-স্নিগ্ধতা পোড়াইয়া ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে।

তবে কি জমিলা আজাদকে পছন্দ করে নাই? না, তাহা নহে। আজ যদি আজাদের সহিত না হইয়া কোনও রাজ-পুত্রের সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইত, তাহা হইলেও তাহার বর্ত্তমান মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইত বলিয়া মনে হয় না। কারণ একমাত্র জমিলা রফিককেই ভালবাসে।

জমিলা বুঝিতে পারিল, তাহার হৃদয়-সর্ব্বস্ব রফিকই এ বিবাহের অগ্রণী। ইহাতে তাহার খুবই অভিমান হইল; কিন্তু এ ভাব তাহার মনে বেশীক্ষণ স্থান পাইল না। সে মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিল, ইহাতে তাঁর দোষ কি? তিনি ত তাঁহার কর্ত্তব্যই করিতেছেন। আমার মনের কথা ত তিনি জানেন না।

বিবাহের আর মাত্র দুই দিন বাকী আছে। অনন্যোপায় হইয়া জামিলা রফিককে একখানা পত্র লিখিল। মুখে বলিতে পারিবে না তাই এ পত্র লেখা। দুই-তিনখানা পত্র ছেঁড়ার পর যাহা দাঁড়াইল, তাহা এই :—

"প্রিয়তম! সম্বোধন পাঠ করিয়াই তুমি চমকিয়া উঠিবে জানি। কিন্তু এ ছাড়া আমি আর কিছুই খুঁজিয়া পাই নাই। এত কাল অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে তোমাকে এই নামেই সম্বোধন করিয়া আসিয়াছি। আজ না হয় প্রকাশ্যে সম্বোধন করিয়া ফেলিলাম, কিন্তু কি করিব, নিতান্ত অনন্যোপায় হইয়াই আজ আমাকে এ হেন নির্ল্লজ্জের মত ব্যবহার করিতে হইতেছে। তবে এ দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, অবস্থা বুঝিয়া আমার এ প্রগল্‌ভতার জন্য তোমার উদার হৃদয়ে ক্ষমার অপ্রতুলতা ঘটিবে না।

মনে করিয়াছিলাম,—নীরবেই তোমার ধ্যান করিয়া জীবনটা কাটাইয়া দিব। কোন দিন প্রতিদানের আশা রাখি নাই; কোন দাবী লইয়াও তোমার নিকট উপস্থিত হই নাই। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ, তাই যাহা কোন দিন কল্পনাও করিতে পারি নাই, আজ আমাকে তাহাই করিতে হইল।

আমি জানি,—তুমিই অগ্রণী হইয়া এ বিবাহ ঘটাইয়াছ। কিন্তু হে নিষ্ঠুর প্রিয়তম! যদি জানিতে—ইহাতে আমার হৃদয়ে কি আগ্নেয়-গিরির সৃষ্টি হইয়াছে, তবে তুমি বুঝিতে—সে আগুনে আমি তো জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবই, আর একজনও আমার সঙ্গে সঙ্গে ভস্ম হইবে। তাঁহাকে কি আমি সুখী করিতে পারিব মনে করিতেছ? আমার এ হৃদয় যে তোমারই চরণে বাঁধা পড়িয়াছে। অন্যকে দিবার ক্ষমতা কোথায়? খোলসটা লইয়া কি কেহ কখনো সুখী হইতে পারে? যত ফুল ফোটে—সবটিরই কি পুষ্প জন্ম সার্থক হয়?

কত এমনিই [illegible] পড়ে। আমাকেও সেরূপ পড়িতে দাও।

অভাগিনী—জমিলা।"

সেদিন বৈকালে রফিক বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলে, জমিলা আস্তে আস্তে তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। দেখিল, একখানি পুস্তক বালিশের উপর পড়িয়া আছে। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। সে তাড়া-তাড়ি চিঠিখানি পুস্তকের ভিতরে রাখিয়া দিল;—মনে করিল, সন্ধ্যার পরে পুস্তকখানি পড়িতে গেলেই উহা রফিকের চোখে পড়িবে।

* * *

নির্দ্দিষ্ট দিনে বেশ ধুম-ধামের সহিত জমিলার সঙ্গে আজাদের বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের দিনই রফিক পরীক্ষার ফল জানিতে পারিল। সে প্রথম বিভাগে ডিষ্টিংশনে বি-এস-সি পাশ করিয়াছে। বন্ধুর বিবাহের দুই দিন পরেই রফিক মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইবার যোগাড়-যন্ত্র করিবার জন্য কলিকাতায় চলিয়া গেল।

জমিলার দৃঢ় ধারণা হইল, পত্র রফিকের হাতে পড়ে নাই। যদি তাঁহার হাতে না পড়িয়া অন্যের হাতে পড়ে, তাহা হইলে ত সব প্রকাশ হইয়া পড়িবে। সে লজ্জা অপেক্ষা মরণই যে ভাল। জমিলার মন এই নূতন চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিল। সে নিজের দুর্ব্বুদ্ধির জন্য আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিল, এবং চিঠিখানি যাহাতে আর কাহারো হাতে না পড়ে, তজ্জন্য কায়মনোবাক্যে খোদার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল।

পুস্তকখানি ছিল আজাদের। রফিক পড়িবার জন্য চাহিয়া আনিয়াছিল। সেদিন উহা ফেরৎ দিবার উদ্দেশ্যেই বালিশের উপর রাখিয়াছিল; কিন্তু ভুলিয়া পুস্তকখানি না লইয়াই বাহির হইয়া পড়িল—হঠাৎ মনে পড়ায় পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুস্তকখানি লইয়া গেল।

আজাদের অধিকাংশ সময়ই এখন বাড়ীর ভিতরে কাটে। স্ত্রীর সাহচর্য্য ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্ত কালও কোথাও সরিতে চাহে না। কৃপণের ধনের ন্যায় সে এতদিন যে প্রেমরাশি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল, হৃদয়-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া তাহার সবটুকু স্ত্রীর নিকট ঢালিয়া দিল। দুর্ভিক্ষ পীড়িতের বহুদিন পরে সুখাদ্য ভক্ষণের ন্যায় আজাদের প্রেম-বুভুক্ষিত হৃদয় জমিলাকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিল। ধাবনোন্মুখ অশ্ব শ্লথ-বল্গ হইলে যেমন প্রবল বেগে ছুটিতে থাকে, আজাদের ভালবাসাও তেমনি উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া জমিলাকে একেবারে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল।

জমিলা আজাদের এই প্রেম-ব্যগ্র-বন্ধনে হাঁপাইয়া উঠিল। সে এই প্রেম-কারা হইতে বাহির হইলেই বাঁচে। তাহার মন চায় একটু নির্জ্জনতা। কিন্তু আজাদ তাহাকে মোটেই ছাড়িতে চায় না এজন্য জমিলা মনে মনে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। আজাদের সংসর্গ তাহার নিকট কণ্টকময় বোধ হইতে লাগিল।

আজাদের এ ভাব বেশী দিন রহিল না। প্রেমের দুইটী স্তর আছে—নিষ্কাম এবং সকাম। নিষ্কাম প্রেম প্রতিদানের আশা রাখে না। কিন্তু সকাম প্রেম প্রতিদান না পাইলে বেশী দিন চলিতে পারে না।

আবেগ আতিশয্য বশতঃ আজাদ প্রথমে স্ত্রীর প্রতিদানের হিসাব নিকাশ করে নাই। কিন্তু সে আবেগ কিছুদিনেই মন্দীভূত হইয়া আসিল, এবং বুঝিতে পারিল স্ত্রীর নিকট হইতে সে তাহার প্রেমের যথাযোগ্য প্রতিদান পাইতেছে না। এ চিন্তা যখন তাহার মনে উদিত হইল, তখন সে তাহার দাম্পত্য জীবনের সমস্ত ঘটনা তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিল—প্রেমের খাতায় সে কেবল খরচই করিয়াছে,—জমার ঘরে কিছুই নাই। তাহার মনে সংশয় জাগিয়া উঠিল। কিন্তু সে মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিল যে, এ হয়ত স্ত্রী স্বভাব সুলভ লজ্জার ফল,—সময়ে এভাব নিশ্চয়ই থাকিবে না।

* * *

সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণেই আজাদ বাড়ী ফিরিয়াছিল। সে গৃহে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীকে দেখিতে পাইল না। পরিশ্রান্ত ভাবে শয্যায় বসিয়া পড়িয়া মনে মনে স্ত্রীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সে মনে করিয়াছিল, জমিলা হয়ত রান্নাঘরে জল-খাবার প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত আছে,—এখনই আসিয়া পড়িবে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন স্ত্রীর কোন সাড়া-শব্দ পাইল না, তখন তাহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। রান্নাঘরের দিকে যাইবার উদ্দেশ্যে ঘর হইতে বাহির হইয়াই আজাদ যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার পিত্ত জলিয়া উঠিল।

দেখিল, পেয়ারা গাছটির নীচে জমিলা প্রস্তর মূর্ত্তির মত বসিয়া আছে।

জমিলা প্রদীপ লইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াই বুঝিল—স্বামী আসিয়াছেন। কিন্তু কখন আসিয়াছেন এবং বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া কোথায় গেলেন বা কেন গেলেন, তাহার কিছুই অনুমান করিতে পারিল না। সে ডীজ্ লণ্ঠনটী জ্বালাইয়া দিয়াই খাওয়ার জোগাড় করিবার জন্য তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

নামাজ-অন্তে আজাদ ঘরে আসিয়া দেখিল,—জমিলা প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি যথাস্থানে রাখিয়া তাহারই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। উদরে ক্ষুধার তাড়নাটাও একটু বেশীভাবে অনুভূত হইতেছিল। বিশেষতঃ স্ত্রীকে এভাবে দেখিয়া মনটাও একটু ভিজিয়া আসিয়াছিল, আজাদ আর বাক্য-ব্যয় না করিয়া খাইতে বসিল।

৭

প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া আজাদ সেই যে বাহিরে আসিয়াছিল, আর বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে নাই। বিবাহের পর হইতেই আজাদ বাড়ীর ভিতরে আস্তানা গাড়িয়াছিল। বন্ধু-বান্ধবেরা কতদিন বাহির-বাড়ী হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। ইদানীং বন্ধুরাও আজাদের বাড়ীতে আড্ডা জমাইবার আশা ত্যাগ করিয়া যে যাহার পথ দেখিয়াছে। অনেক হাসি-টিট্‌কারী নেপথ্যে স্থিত আজাদের উপর বর্ষিত হইয়াছে; অবশেষে বন্ধুরা এই ভাবিয়া ক্ষুণ্ণ এবং ততোধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে যে, যে আজাদ বন্ধু-প্রেমে মাতোয়ারা ছিল, সে কেমন করিয়া এমন হইল?

দুইটি বিপরীত শক্তির তুমুল দ্বন্দ্ব আজাদের হৃদয়ে একই সঙ্গে চলিতেছিল, এবং তাহার আঘাতে সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। প্রবল অভিমান-বশে সে স্ত্রীর সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সে আশা করিয়াছিল, জমিলা নিশ্চয়ই সাধাসাধি করিয়া তাহার এ অভিমান ভাঙ্গাইয়া দিবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা যখন হইয়া উঠিল না; তখন তাহার মন আরো তিক্ত-বিরক্ত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথাও তাহার মনকে পীড়া দিতেছিল, সে কেন হঠাৎ এমন বিপরীত কাণ্ড করিয়া বসিল। স্ত্রীর প্রথম অপরাধ হিসাবে সে তাহা সহজেই ক্ষমা করিতে পারিত। ইহাতে লাভ হইল কি? এর নাম কি স্ত্রীকে শাস্তি দেওয়া? এ যে নিজের হাতে নিজের গায়ে বিছুটি লাগান!

এদিকে কিন্তু আজাদের প্রেম-বুভুক্ষিত মন স্ত্রীর সাহচর্য্য লাভের জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। বিচ্ছেদজাত সন্তাপে অভিমানের পুঞ্জিত বাষ্প ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। আজাদের হৃদয়াকাশ আবার সুনির্ম্মল হইয়া উঠিল।

আজাদ ছল খুঁজিতে লাগিল। একবার শয়নকক্ষে গিয়া পূর্ব্বদিনের পরিত্যক্ত জামার পকেট হইতে সিগারেট ও দেশলাই লইয়া আসিল। সে নিজেও বুঝিল এসব তুচ্ছ সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হইতে গেলে, বিচ্ছেদের এ বিরাট দূরত্বের অবসান বহু সময় সাপেক্ষ হইবে। তাহার প্রাণ চাহিতেছিল, কোন সূত্রে আলাপ করিয়া পূর্ব্বভাব ফিরাইয়া আনে। শীতল পানীয় সম্মুখে,—অথচ পিপাসায় কণ্ঠ শুকাইয়া যাইতেছে—এ যে বড় অসহ্য যাতনা! কিন্তু আর ত উপায় নাই। আজাদ মনে স্থির করিল—মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়ে এর একটা দফা-রফা করিয়া ফেলিবে। তাহার বেশ ভয় হইতে লাগিল, কি জানি যদি সকালের চা-এর দৃষ্টান্তে মধ্যাহ্নের খাবারও জমিলা বাহিরে পাঠাইয়া দেয়।

* * *

অনেক সময়ে মানুষ দূর হইতে এক রকম ভাবিয়া রাখে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে করিয়া বসে তাহার সম্পূর্ণ উল্টা। গৃহে প্রবেশ করিতেই আজাদের মন কি জানি কেন বাঁকিয়া বসিল। সমস্ত প্লান উলট্-পালট্ হইয়া গেল।

জমিলা আহার্য্য সামগ্রী যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিয়া পান প্রস্তুত করিতেছিল। আজাদের গৃহ-প্রবেশ অনুভূত হইলেও তাহার কোন অবস্থান্তর ঘটিল না।

আজাদ বক্র দৃষ্টিতে তাহা দেখিয়া লইয়া গুম্ হইয়া খাইতে বসিয়া গেল! খাইতে লাগিল বটে, কিন্তু খাওয়া ক্রিয়ার সঙ্গে তাহার মনের কোন সংশ্রব ছিল না। অভ্যাস বশে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যন্ত্রের মত স্ব-স্ব কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে লাগিল মাত্র। খাওয়া শেষ করিয়া সে বিছানাতে উঠিয়া বসিল এবং অপাঙ্গ দৃষ্টিতে স্ত্রীর কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। অন্তরের জমাট বাঁধা বিদ্রোহে আজাদ ফুলিতেছিল।

জমিলা চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ আজাদের মুখ হইতে

কতকটা তাহার অজ্ঞাতসারেই বাহির হইয়া পড়িল—"শুনে যাও।"

জমিলা ফিরিল এবং সহজ সরলভাবেই বলিল,—"কি ?"

আজাদ গম্ভীর স্বরে বলিল,—"কাল সন্ধ্যায় তুমি কোথায় ছিলে ?"

জমিলা শান্ত স্বরেই উত্তর দিল,—"বাড়ীতেই ত ছিলাম।"

"বাড়ীতে ছিলে ? তোমাকে তবে খুঁজিয়া পাই নাই কেন ?"

জমিলা তেমনি সহজভাবেই বলিতে লাগিল,—"রান্না-ঘরে—" কিন্তু কথা সমাপ্ত করিতে পারিল না। আজাদ সমস্ত কথাটি শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া বিছানা হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক স্ত্রীর সমীপস্থ হইয়া তাহার একখানি হাত দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিয়া তেমনি গম্ভীরভাবে বলিল,—"থাম, আমি আর কিছু শুনিতে চাই না। শুধু একটা কথা জানিতে চাই—তুমি আমাকে ভালবাস কিনা ? আজ কিছুদিন হইতে আমার মনে একটা সন্দেহের উদয় হইয়াছে। আজ সেই সন্দেহের নিরাকরণ করিতে চাই, বল তুমি আমাকে ভালবাস কিনা ?"

এমন সময়ে বালক-ভৃত্য আহ্ছান একখানা চিঠি আজাদের হাতে দিয়া চলিয়া গেল।

আজাদ বিছানায় শুইয়া শুইয়া ঈষৎ অন্যমনস্কভাবে চিঠিখানি খুলিল। খামের গর্ভ হইতে দুইখানি চিঠি বাহির হইল। একখানি আবার একটু ভালরূপে মোড়া—উপরে লেখা আছে—'জমিলা খাতুন'। অপরখানি তাহার নিজের, লেখক রফিক। সে লিখিয়াছে—

"ভাই আজাদ, কেমন আছ ? আমার বোধ হয় এ 'ভরা ভাদরে' তুমি বসন্তেরই স্বপ্ন দেখিতেছ। নতুবা আজকাল পত্র লিখিতে তোমার সময়ের এত অভাব ঘটে কি করিয়া ? হায়রে অদৃষ্ট ! তুমি যখন স্বপ্নের নন্দন-কাননে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পারিজাত সংগ্রহে ব্যস্ত ; আমি তখন হয় ত শ্মশানের মরা টানিতে টানিতে হয়রাণ হইয়া মরি ! অদৃষ্টের বিড়ম্বনা আর কাহাকে বলে—কেমন নয় ?

তোমাদের যুগলমূর্ত্তি দেখিবার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, যা হোক্ পূজার ছুটির আর দেরী নাই। ভাল আছি। ইতি— তোমারই—রফিক

পুনশ্চ,—সঙ্গীয় চিঠিখানি জমিলাকে লিখিলাম। তোমার বিনানুমতিতে তাহাকে পত্র লেখা সঙ্গত মনে করি নাই। তাই একই খামে পুরিয়া দিলাম। অবশ্য ইহাতে চারিটি পয়সাও যে 'সেভ্' না হইয়াছে এমন নয়। তুমি হয় ত ভাবিবে, আমি বুঝি 'ইঞ্চকেপ কমিটি'র মেম্বর হইয়া গেলাম। হইতে পারিলে ভালই হইত।"

পত্রে রফিক জমিলাকে কি লিখিয়াছে জানিবার জন্য প্রবল কৌতুহল জন্মিলেও আজাদ তাহা দমন করিল। বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে ভাবিয়া প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও সে তাহা খুলিয়া পড়িতে পারিল না। যার চিঠি তার হাতেই দিল।

জমিলা তখন ভাত খাইতে বসিয়াছে। পত্রের পৃষ্ঠে নাম দেখিয়াই সে হস্তাক্ষরে চিনিতে পারিল চিঠিখানি কে লিখিয়াছে। রফিকের নিকট হইতে এই তাহার প্রথম পত্র-লাভ। তাহার বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। জমিলার আর তর সহিল না। সে অর্দ্ধাহারেই আহার সমাধা করিয়া ফেলিল এবং নিবিষ্টমনে পত্রখানি পড়িতে বসিল। রফিক লিখিয়াছে—

"বোন জমিলা ! আজ তোমাকে কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা লিখিতেছি। তুমি জান না, তোমার স্বামীকে বিবাহে রাজি করাইতে আমাকে কি পরিমাণ বেগ পাইতে হইয়াছে। সে একটু খেয়ালী মানুষ, কোন্ খেয়াল তাহার মাথায় চাপিয়াছিল জানি না, যাহার ফলে সে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছিল—বিবাহ করিবে না।

আমিই অগ্রণী হইয়া তোমার সহিত তাহার বিবাহ ঘটাই। আমি জানি, তোমার মত স্ত্রীলোক না হইলে এ জঙ্গলী পাখীকে আর কেহ পোষ মানাইতে পারিবে না। তুমি বুদ্ধিমতী ;—তোমাকে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য এ চিঠি লিখিতেছি না। তবে এ কথাগুলি জানা থাকিলে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অনেক সময়ে সাহায্য পাইবে।

বনের পাখীটি ধরিয়া তোমার হাতে সঁপিয়া দিয়া আমি এখন নিশ্চিন্ত। আমার কাজ শেষ হইয়াছে। এখন তোমার কাজ আরম্ভ হইল। এ ভরসা আমার আছে যে, পাখী যতই কেন জঙ্গলী হউক না, সে তোমার কাছে হার মানিবেই। পূজার ছুটির আর বেশী দেরী নাই। আসিয়া তোমাদিগকে সুখী দেখিতে পাইলে আমারও সুখের অবধি থাকিবে না। ইতি— তোমাদের—রফিক

পুনশ্চ—এ পত্রের উত্তর না দিলেও চলিবে। চিঠি-পত্র লিখিলে স্বামীর জ্ঞাতসারেই লিখিবে ।

চিঠি পড়িয়া জমিলার কান্না পাইতে লাগিল। সে কি ইহাই শুনিবার আশা করিয়াছিল? এ যে জল চাহিতে বজ্রাঘাত। তাহার বিশ্বাস ছিল—প্রবাসী দয়িতের নিকট হইতে না জানি কতই সান্ত্বনার বাণী বুকে পুরিয়া লইয়া পত্রখানি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এ কি হইল? এ যে তাহার অশ্রান্ত দয়কে আরও উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। এর চেয়ে পত্র না পাইলেই যে ছিল ভাল।

রান্নাঘরের দেয়ালে একখানা ক্ষুদ্র চাটাই ঝুলিতেছিল। জমিলা তাহা রান্নাঘরের মেজেতে বিছাইয়া শুইয়া পড়িল, কিছু করিবার ইচ্ছা বা শক্তি আর তাহার ছিল না।

পত্রখানি তখনো জমিলার পাশে খোলা পড়িয়াছিল। আজাদ কৌতুহল দমন করিতে না পারিয়া কম্পিত হস্তে পত্র-খানি তুলিয়া লইয়া এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল।

পত্র পড়িয়া আজাদ রফিকের বন্ধু-প্রেমের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল, রফিক এখনো নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। তাই জমিলাকে সতর্ক করিয়া উপদেশ দিয়া পত্র লিখিয়াছে

রাত্রে আজাদ জমিলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"কই, আমার সে কথার তো কোন উত্তর দিলে না?" জমিলা বুঝিয়াও যেন বুঝিল না,—বলিল,—"কোন্ কথার?" "আমি যে জানিতে চাহিয়াছিলাম—তুমি আমাকে ভালবাস কিনা?"

জমিলা চুপ করিয়া রহিল।

"বল, বল, চুপ করিয়া রহিলে কেন?"

আজাদ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

জমিলা তথাপি নিরুত্তর।

আজাদ ব্যগ্র কাতর কণ্ঠে বলিল,—"বল না চুপ করিয়া রহিলে কেন? তবে কি আমার—" আজাদের স্বর কাঁপিয়া উঠিল, সে আর বক্তব্য শেষ করিতে পারিল না।

এতক্ষণে জমিলা কথা কহিল,—"এতদিন যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, ক্ষমা করিও। তোমাকে সুখী করিবার জন্য আমি জীবনপণ করিয়াছি। আমার প্রাণের বিনিময়েও যদি তোমার সুখ-সন্তোষের ব্যবস্থা করিতে হয়, আমি অকাতরে তাহাই করিব।"

পরদিন সকালে উঠিয়া জমিলা গৃহকর্ম্ম শেষ করিয়া রফিককে পত্র লিখিতে বসিল।

"ভাই ছাহেব! আপনি লিখিয়াছেন—আপনার সে পত্রের জওয়াব না দিলেও চলিবে। আর আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন—আমি যেন স্বামীর জ্ঞাতসারেই পত্র লিখি। কিন্তু আপনার প্রথম আদেশ যে রক্ষিত হয় নাই, তাহা পত্র পাইয়াই বুঝিতেছেন এবং আমি নিজে স্বীকার করিতেছি যে, আপনার দ্বিতীয় কথাটিও রক্ষা করিতে পারি নাই—অর্থাৎ এ পত্রের কথা তিনি জানেন না। কোন দিন আপনার আদেশ-উপদেশের অন্যথাচরণ করি নাই ভবিষ্যতে ও করিব না। শুধু আজিকার জন্য ক্ষমা করিবেন।

আপনি লিখিয়াছেন,—"তোমাদিগকে সুখী দেখিতে পাইলেই আমার সুখের অবধি থাকিবে না।" আপনি যদি ভাবিয়া থাকেন সুখ জিনিষটা এতই সুলভ তবে নিশ্চই ভুল করিয়াছেন।

মানুষের স্বতন্ত্র সত্তার ন্যায় আত্মার আশা-আকাঙ্ক্ষাও যে স্বতন্ত্র হইতে পারে, আমাদের দেশের অভিভাবকেরা মেয়েদের বিবাহের সময়ে এ কথাটি ভুলিয়াও একবার মনে করে না। নতুবা একটি সমগ্র জীবনকে যার তার কাছে 'গছাইয়া' দিবার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে তাহার মতামতটাও যে একবার জানা আবশ্যক, সে কথা ভুলিয়া যাইবে কেন?

আপনার আদেশ প্রাণপণে রক্ষা করিব। আপনার "জঙ্গলী পাখীর" সেবা-যত্নের ক্রুটী হইবে না। বন্ধুর জন্য আপনি অনেক করিয়াছেন এবং দেখিতেছি এখনো সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত হউন—আমি আপনার বন্ধুর সুখ-শান্তি বিধানের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হইব না।

আমি সুখী হইয়াছি কি না—আপনার মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে। সে সম্বন্ধে আমার বলিবার মত কিছুই নাই। শুধু এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে, আমি মোটেই সুখী হইতে পারি নাই। ইতি

আপনার—জামিলা খাতুন"

৮

চাঁদপুর রেলওয়ে ষ্টেশন। পূজার ছুটি হইয়াছে। কোম্পানীর যাত্রী গাড়ীগুলি স্কুল-কলেজের ছাত্র দ্বারা বোঝাই হইয়া ছুটিয়াছে। গাড়ী ছাড়িবার আর বেশী দেরী নাই।

অনেক ছুটাছুটির পর রফিক একটি ছোট মধ্যম শ্রেণীর নির্জ্জন কামরা আবিষ্কার করিয়া বন্ধু আমজাদের সহিত তাহাতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

অন্ধকার রাত্রির বুক চিরিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। সৌভাগ্য বশতঃ অন্য কোন যাত্রী তাহাদের কামরাতে উঠিল না। হঠাৎ ঝম্ ঝম্ শব্দে মুষল ধারে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। আমজাদের অন্তরের কবিত্ব সাড়া দিয়া উঠিল। সে একটি জানালার নিকট সরিয়া বসিল এবং বাহিরের মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের দিকে চাহিয়া গান ধরিল—

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুসিয়ার—"

কুলাউড়া জংশনে আমজাদ নামিয়া গেলে রফিকের হঠাৎ মনে পড়িল, কাল আসিবার সময়ে পিওন যে চিঠিখানি দিয়াছিল, তাহা এখন পর্য্যন্ত পড়া হয় নাই। তাই সে সুটকেসের ভিতর হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া পড়িতে বসিল।

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে রফিকের মুখের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কে যেন তাহার মুখে এক পোছ কালী মাখাইয়া দিল। রফিকের মনে হইল—কে যেন তাহাকে আকাশ হইতে হঠাৎ একেবারে মাটিতে ফেলিয়া দিল। সে বুঝিল—এ বিবাহে জমিলা সুখী হয় নাই। কিন্তু জমিলার কথা অপেক্ষা আজাদের কথা বেশী করিয়া রফিকের মনে পড়িতে লাগিল। আজাদকে সে ত ভাল করিয়াই জানে। সে যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারে যে, জমিলা তাহাকে চাহে না—তবে? জমিলা যতই কেন আশ্বাস দিক না, রফিকের মন কিন্তু তাহাতে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না।

পত্রের শেষ কথাগুলি পড়িয়া রফিকের অত্যন্ত কষ্ট হইল। সে স্পষ্ট অনুভব করিল—কথাগুলিতে জমিলার হৃদয়ের তীব্র বেদনা মিশ্রিত অভিমানটী মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

* * *

আছরের নামাজ পড়িয়া জলযোগান্তে আজাদ একখানি পুস্তক লইয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল। পুস্তকখানি খুলিতেই একখানি ভাঁজ করা কাগজ মাটীতে পড়িল। আজাদ কাগজখানি তুলিয়া লইয়া দেখিল, উপরে মেয়েলি অক্ষরে রফিকের নাম লেখা। কৌতুহলবশে পত্রখানি খুলিয়াই সে একেবারে চমকিয়া উঠিল। যেন পত্রখানির ভিতর হইতে কোন বিষধর সর্প বাহির হইয়া তাহাকে ছোঁ মারিল। তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আজাদ পত্রখানি পড়িতে গেল, কিন্তু অর্থবোধ শক্তি লোপ পাইয়া গিয়াছিল। পত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই সে দেখিতে পায়, অক্ষরগুলি যেন সজীবতা লাভ করিয়া কাগজময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! বহুক্ষণ চেষ্টায় অনেক কষ্টে সে ধৈর্য্য ধারণ-পূর্ব্বক পত্রখানি আগাগোড়া পাঠ করিল।

আজাদ অস্থিরভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সেই অবস্থাতেই ঘর হইতে বাহির হইয়া একদিক লক্ষ্য করিয়া চলিল। এ ভাবে কতক্ষণ চলিত বলা যায় না। কিন্তু সম্মুখে নদী পড়িল—আজাদ আর অগ্রসর হইল না, ঘাসের উপর এক-স্থানে বসিয়া পড়িল।

শরতের নীলাকাশে শাদা শাদা মেঘখণ্ডগুলি বায়ুতাড়িত ধূম্রপুঞ্জের ন্যায় ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছিল! স্বল্পতোয়া রুক্মিণী নদী মন্থরগতিতে আজাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়াছে! বক্ষে জ্যোৎস্নারাশি প্রতিফলিত হওয়াতে জলস্রোত গলিত রজত ধারার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। তপনতাপক্লিষ্ট শারদ-প্রকৃতি শীতল-সান্ধ্য-সমীরণ সেবনে স্নিগ্ধতা লাভ করিতেছে। আজাদের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সে তখন আত্ম-চিন্তায় তন্ময়।

পত্রখানি আজাদের সঙ্গেই ছিল। জ্যোৎস্নালোকে সে তাহা আবার পড়িল। এবার সে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিল,—রফিক জমিলার মনোভাব অবগত ছিল না। হয় ত বা এখনো নহে। হয়ত বা কেন, নিশ্চয়ই নহে। জমিলাকে লিখিত রফিকের পত্রের কথা তাহার মনে পড়িল। তাহার সকল সন্দেহ দূর হইল। আজাদ একটা মহা দুর্ভাবনার হাত হইতে নিস্তার পাইল। বন্ধুর প্রতি অন্যায় সন্দেহ করিয়াছিল, ভাবিয়া তাহার বাস্তবিকই অনুতাপ হইতে লাগিল।

আর জমিলা? তাহারই বা দোষ কি? সে ত অনেক আগেই রফিককে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। এই বিবাহ না হইবার জন্যই সে এই পত্র লিখিয়াছিল। আজাদ রাগ করিবে কাহার উপর?

আজাদের আজ নূতন করিয়া মনে পড়িল—তাহার মত

হতভাগ্য জগতে আর দ্বিতীয় নাই। 'বিবাহিতা নারী স্বামীকে ভালবাসিবেই'—আজ নিষ্ঠুর বিধাতা প্রমাণ করিয়া দিলেন, তাহার চিরকালের সে ধারণার কোনই মূল্য নাই। দারুণ ব্যথায় তাহার বুক টন্ টন্ করিয়া উঠিল। ব্যর্থতার নিদারুণ আঘাতে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

আজাদ দোদুল্যমান-চিত্তে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইল। পশ্চাতে নদী-বক্ষে নৌকা হইতে কোন লোক গাহিয়া উঠিল—

"আমার সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল
সকলি ফুরায়ে যায় মা—"

আজাদ ভাবিল,—ইহা তাহার অন্তরের প্রতিধ্বনি নহে ত ?

৯

রফিক চিন্তার যে গুরুভার লইয়া বাড়ী আসিয়াছিল, আজাদের সহিত দেখা হওয়ায় তাহা অনেকটা দূর হইয়াছে। আজাদ যে নিতান্ত অসুখী, তাহার কথায়-বার্ত্তায় হাব-ভাবে এমনও বোধ হইল না। কিন্তু জমিলার সহিত এখনো তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই।

জমিলার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য রফিক একেবারে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। জমিলা শয়ন গৃহে কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল। পদ শব্দে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, রফিক ঘরে ঢুকিতেছে।

এমন ভাবে যে হঠাৎ রফিকের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়া যাইবে, জমিলা তাহা মোটেই ভাবে নাই। বিবাহের পরে নির্জ্জনে পাওয়া দূরে থাক, চোখের দেখা পর্য্যন্ত তাহাদের হইয়া উঠে নাই। জমিলা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। নিজের গৃহে আগন্তুকের প্রতি কর্ত্তব্য পালন দূরে থাক, একটী শব্দ মাত্র তাহার মুখ দিয়া উচ্চারিত হইল না।

রফিক জমিলার এ ভাবান্তর লক্ষ্য করিল না। সে সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"ভাল আছ ত জমিলা? আজাদ-দা কোথায় ?"

জমিলা অতি সংক্ষেপে জানাইল যে, সে ভাল আছে এবং আজাদ কোথায় তাহা বলিতে পারে না।

রফিক চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। দুই পদ অগ্রসর হইলও। কিন্তু একটি কথা মনে করিয়া আর গেল না। আজাদের বিছানায় আসিয়া পা ঝুলাইয়া বসিল।

রফিক জমিলাকে একটু নির্জ্জনে পাইতে চাহিতেছিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, জমিলার মনের কথাটি জানিয়া লইয়া উপস্থিত মত 'বুঝ-সুঝ' দিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিবে।

রফিক ভূমিকা মাত্র না করিয়া জমিলাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"তুমি কি বিবাহে সুখী হও নাই জমিলা ? আমাকে তোমার মনের কথাটি সত্য করিয়া বল দেখি।"

জমিলার হৃদয় স্পন্দন আরও দ্রুত চলিল। সংক্ষেপে উত্তর দিল—"কেন ?"

"তোমার পত্রের ভাষায় বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি সুখী হও নাই। কিন্তু কেন হও নাই, সে কথা আমাকে জানাইতে তোমার কোন আপত্তি আছে কি ?"

জমিলা নিরুত্তর রহিল।

রফিক জমিলাকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া বলিল, —"আজাদ-দা সুখী হইয়াছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। কিন্তু তুমি যদি অসুখী হও, তাহা হইলে আমি কিছুতেই শান্তি পাইব না।"

কি এক দারুণ উত্তেজনার বশে জমিলার দেহ কম্পিত

রফিক জমিলার দিকে চাহিয়া বলিল,—"কোন কথা বলিতেছ না কেন জমিলা ?"

"একটি মাত্র ভিক্ষা দেন আমাকে—"স্বর অতিশয় গাঢ়—কম্পিত।

"ভিক্ষা! ভিক্ষা কিসের জমিলা? কোন কিছুর আবশ্যক হইলে, সে ত তুমি চাহিলেই পাইতে পার।"

"চাহিলেই যদি পাওয়া যাইত, তবে আজ বুঝি এমন হইত না। মুখের চাওয়াটাই কি চাওয়া ? হৃদয়ের চাওয়ার কি কোন মূল্য নাই ?"

"তুমি একি বলিতেছ জমিলা? আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! তুমি কবে আমার নিকট কি চাহিয়া পাও নাই ?"

"তোমার নিকট চাহিয়া সবই পাইয়াছি,—শুধু তোমাকেই পাই নাই"—জমিলা সমস্ত লজ্জা সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়াছিল। ইহাই তাহার জীবনের প্রথম ও শেষ মুহূর্ত্ত— যেন জীবন মরণের সন্ধিস্থল। তাই সে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল।

ধরে বজ্রাঘাত হইলেও বুঝি রফিক এত স্তম্ভিত হইত

না। সে ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠেই বলিল,—"এ কি ! একি বলিতেছ জমিলা ? তুমি পাগল হইলে না কি ? তুমি"—

বাধা দিয়া জামিলা পরিস্কার কণ্ঠে বলিল,—"আজকের মত পাগলই হইয়াছি। শুধু একটি বার বল—তুমি আমাকে ভালবাস—।" বলিতে বলিতে জামিলা রফিকের পা জড়াইয়া ধরিতে গেল।

রফিক তড়িৎ স্পৃষ্টের ন্যায় লাফাইয়া দুইপদ সরিয়া গেল। কি একটা আশঙ্কায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে চাহিতেই হঠাৎ যেন তাহার বোধ হইল, পথের দিকের জানালা হইতে কে যেন সরিয়া গেল। রফিক আর কাল বিলম্ব না করিয়া সেখান হইতে ত্রস্তপদে বাহির হইয়া পড়িল।

বিছানায় শুইয়া রফিক ঘুমাইতে পারিল না। দারুণ দুর্ভাবনা তাহার হৃদয়ে জমাট হইয়া উঠিয়াছিল। জামিলার আজিকার ব্যবহার রফিককে এমনি স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল যে, সে অনেকক্ষণ কিছুই ভাবিতে পারিল না। ভূত-গ্রস্তের মত বিছানায় পড়িয়া রহিল। তারপরে, ধীরে ধীরে যেন তার দিব্য চক্ষু খুলিয়া গেল। অতীত জীবনে তাহার প্রতি জমিলার ব্যবহার—যতটুকু স্মরণ হয়, রফিক আজ উলট্ পালট্ করিয়া দেখিল, এবং আজ যেন তাহাতে একটা অর্থ নিহিত ছিল বলিয়াই তাহার মনে হইল।

শেষ রাত্রে রফিক ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অনেক বেলায় ডাকাডাকিতে জাগিয়া সে শুনিতে পাইল, আহ্ছান অনেকক্ষণ হইতে তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। ডাকিতেই সে জানাইল, তাহাকে এখনই একবার যাইতে হইবে।

রফিক তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া ফেলিল, এবং কিছু একটা ঘটিয়াছে ভাবিয়া নিতান্ত অপ্রসন্ন মনে বন্ধুর বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইল।

রফিক ঘরে ঢুকিতেই জমিলা বিছানার উপর পতিত দুই-তিনখানা কাগজ দেখাইয়া বলিল,—"পড়ুন, টেবিলের উপরে পাইয়াছি।"

দুরু দুরু বুকে রফিক কাগজগুলি তুলিয়া দেখিল, দুইখানা পত্র, একখানা 'তালাক-নামা'! তন্মধ্যে যেখানা আজাদ লিখিয়াছে, তাহাই সে অগ্রে পাঠ করিতে লাগিল। আজাদ লিখিয়াছে—

"ভাই রফিক ! এ চিঠি যখন তোমার হাতে পড়িবে, তখন আমি বহু দূরে থাকিব। ভাই, তুমি আমাকে সুখী করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছ, কিন্তু আমি সুখী হইতে পারিলাম কৈ ?—ইহা আমারই অদৃষ্ট-লিপি। তুমি কিছু মনে করিও না, চির-বঞ্চিত হতভাগা বন্ধুকে ক্ষমা করিও।

আমার যাহা কিছু ছিল সমস্তই জমিলাকে একখানা কাগজে দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিলাম, এ কথা সে জানে না। কাগজখানা বড় বাক্সে আছে। যদিও আমার সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক রহিল না, তথাপি ইহা ভালবাসার দান হিসাবেই যেন সে গ্রহণ করে। চির বিদায় !!

ভাগ্যহীন—আজাদ"
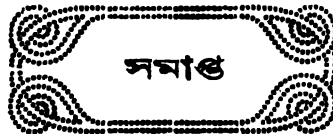
ঐশী-বাণীর আবশ্যকতা

—প্রবন্ধ—

—এস, এইচ্, বি, মন্‌সুর আহ্‌মদ, বি এ,

সৃষ্টি-রহস্য-ভেদ করিতে হইলে,—মানব-জীবন সমস্যা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমরা আমাদের সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। সাধারণ ইন্দ্রিয়-প্রদত্ত জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ হয়;—চক্ষু দ্বারা সামান্য উপলখণ্ডের ন্যায় একটী নক্ষত্র দেখিলাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা অনেক বৃহৎ; উপরন্তু যে স্থানে ইন্দ্রিয়ের আর অধিকার চলে না—তথায় মানব-বুদ্ধির পরিণতি কি? গাঢ় অন্ধকারের ভিতরে আমাদের চক্ষু কি কোন পথ দেখাইতে পারে?—অবশ্যই নয়। তবে আমরা কেবল অনুমানের রাজ্যে বিচরণ করিয়া—সাধারণ চিন্তা ও বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচালনায় সে অকূল সমুদ্রে কেমন করিয়া পাড়ি দিতে পারি?

"আমি কে, আমার উদ্দেশ্য কি, আমি কোথা হইতে আসিয়াছি, পুনঃ কোথায় যাইব?"—আমাদের এই স্বাভাবিক প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর কেমন করিয়া পাইব? মানুষ কাহার প্রেরণায় কোথা হইতে আসিয়া আবার কোথায় চলিয়া যায়? আমরা কি স্ব-স্ব অভিলাষ অনুযায়ী এ জগতে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছি, পুনরায় ইচ্ছামত কি এ জীবনলীলা সাঙ্গ করিব? জন্মিবামাত্র মানব-শিশুর যে শ্বাস চলিতে আরম্ভ হইল, মৃত্যুর সময়ে সে শ্বাস রুদ্ধ হইল;—কে আসিল, কে গেল—এ যে মহাপ্রহেলিকা!

মানব এ জগতে আসিয়া কি যেন হৃত বস্তুর পুনরনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়;—কি এক প্রচ্ছন্ন শক্তির দিকে মানব-হৃদয় যেন স্বতঃই আকৃষ্ট হইতে থাকে। সত্য-সনাতন কোর-আন্ গ্রন্থে এই নিরুদ্দেশ-যাত্রীর চিত্র—কি যেন "ধরি ধরি করি, ধরিতে না পারি" এই সত্যান্বেষী অন্তরের ব্যাকুলতার অতি স্বাভাবিক ও মর্ম্মস্পর্শী ইতিবৃত্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মহানবী হজরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার অপরিণত জীবনে আকাশে প্রথমতঃ সন্ধ্যা-তারা দর্শন করিয়া তাহাকেই তাঁহার প্রণম্য-প্রভু বলিয়া মনে করেন, পরে উজ্জ্বল চন্দ্রোদয় নিরীক্ষণে তাহাতেই তাঁহার প্রভুত্বের আরোপ করেন, পরিশেষে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যকেই তাঁহার উপাস্য প্রভু বলিয়া ধারণা জন্মে; কিন্তু সর্ব্বশেষে তাঁহার দিব্য-জ্ঞানের প্রভাবে তিনি সেই আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তনশীল দ্রব্যকে তাঁহার প্রভু বলিয়া গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। সেই হেতুই তিনি এই সকলের স্রষ্টা ও পরিচালক মহাপ্রভুর ধ্যান-ধারণায় মনোনিবিষ্ট করিয়া সত্যোদ্ধারে ব্রতী হন। *

স্থল ও জলভেদে এই জড়-জগতের রচনা কৌশল, ব্যোমচারী চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা ও গ্রহরাজির সুনিয়ন্ত্রিত গতিবিধি, মনুষ্যদেহ ও মনের গঠন পদ্ধতি এবং এই বিশাল বিশ্বপরিচালনে বিস্ময়কর প্রাকৃতিক বিধি-বিধান অনুশীলনে এই সবের স্রষ্টা, পাতা ও নিয়ন্তার অস্তিত্বের কথা স্বাভাবিক ও সম্ভবপর

---

* فلما جن عليه اليل را كوكبا - قال هذا ربى - فلما افل قال لااحب الافلين ٥ فلما را القمر بازغا قال هذا ربى - فلما افل قال لئن لم يهدنى ربى لاكونن من القوم الضالين ٥ فلما را لشمس بازغة قال هذا ربى هذا اكبر - فلما افلت قال يقوم انى برئ مما تشركون ٥ (سورة الانعام)

বলিয়া মনে হয় সত্য ; কিন্তু ইহা দ্বারা তো অবিসম্বাদিতরূপে প্রমাণ করা যায় না যে, তাঁহার অস্তিত্ব, শক্তি ও প্রজ্ঞা প্রতি অণু-পরমাণুতে বিরাজমান। মহা মহা জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিক বিদ্বৎকুল বহু গবেষণা ও পর্য্যালোচনার পরে তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিগ্ধ ও বিশ্বাসহীন হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু স্রষ্টা আছেন—এ ধ্রুবজ্ঞান কেমন করিয়া জন্মিবে? "তিনি আছেন" বলিয়া অন্তরের অন্তঃস্থলে যে প্রতিধ্বনি, সন্দেহ বা সমস্যা জন্মে, তাহার যথার্থতা কিরূপে নিরূপণ করিব? মূলে একজন স্রষ্টা ও বিধাতা আছেন, ইহার প্রতি নিঃসন্দেহ প্রতীতি ও দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিলে আমাদের হৃদয়-দেশের সংশয়-তিমির তো দূরীভূত হইবে না ; ফলে সত্য ও শান্তির সুবিমল জ্যোতিঃ আমাদের অন্তরে প্রতিভাত হইতে পারে না। এ ভ্রান্তি ও সন্দেহের ঘোর কি ঘুচিয়া যাইবে না? যাঁহাকে আমি ডাকিয়া খুঁজিয়া ফিরি, তাঁহার অস্তিত্ব থাকিলে তিনি কি চিরতরে লুকাইয়া থাকিতে পারেন? তিনি কি উদাসীন, না অচেতন, না মৃত? মানবীয় ক্ষীণ বিচার-বুদ্ধি ও অনুমানের অতল সাগরেই কি শুধু হাবুডুবু খাইব?

যদি কোন গৃহের সমুদয় গবাক্ষ-দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে স্বভাবতঃই প্রতীয়মান হয় যে, দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভিতরে অবশ্যই কেহ অবস্থান করিতেছে। কিন্তু এইভাবে যদি বহুবর্ষ অতিবাহিত হইয়া যায়, অথচ ভিতর হইতে সে ভাবজ্ঞাপক কোন নিদর্শন না পাওয়া যায় ;—বহির্ভাগে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের ক্রমাগত চীৎকার ধ্বনির কোন প্রত্যুত্তর না আসে ; তাহা হইলে ভিতরে কাহারও অবস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের মতের পরিহার করিয়া কোন অপরিজ্ঞেয় কারণ নির্দ্দেশ করিতে হয়। সেই প্রকার মাত্র প্রকৃতির কার্য্যাবলী অনুশীলন করিয়া বিশ্বস্রষ্টার কোন অভ্রান্ত নিদর্শন ও ধ্রুব-জ্ঞান লাভ করা যায় না। মানব-বুদ্ধির যুক্তি-মীমাংসার প্রতিপাদ্যের উপরই কি তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণ সাপেক্ষ? না, আমরা ইহা কখনও ধারণা করিতে পারি না। বিশ্বের স্রষ্টা, পাতা ও নিয়ন্তা কখনও অচেতন বা বাক্‌শক্তিরহিত নহেন।

মানবজাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে এক শ্রেণীর তত্ত্বজ্ঞ সাধকের সন্ধান পাওয়া যায় ; সচ্চিদানন্দ বাক্ময় আল্লাহ্ অসীম করুণা-পরবশ হইয়া বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে তাঁহাদের সমীপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন ; স্বীয় বাণীর অমিয়-ধারায় তাঁহাদের উৎসৃষ্ট জীবন সঞ্জীবিত উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। অন্যথায় ক্ষীণবুদ্ধি ভ্রান্ত মানব কেমন করিয়া ধ্যান-ধারণা ও কল্পনাতীত অসীমের গূঢ় তত্ত্ব ও মহিমা উপলব্ধি করিবে?

এই ঐশী প্রত্যাদেশবাণী ইস্‌লামিক পরিভাষায় "ওহি" বা "ইল্‌হাম" (وحى او الهام) নামে অভিহিত। ইহাই পবিত্র ধ্রুব জ্ঞানের একমাত্র উৎস। সর্ব্বাগ্রে এই সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা দূর করা আবশ্যক মনে করি। "ইল্‌হাম" অর্থে কোন মৌলিকভাব ও নূতন ধারণা বিষয়ে অনুধাবন করা নহে। কোন কবির নব কাব্যকলা অথবা বৈজ্ঞানিকের নূতন গবেষণাকে ধর্ম্মের পরিভাষায় "ইল্‌হাম" বলিতে পারি না। কারণ এমতাবস্থায় সদসৎ বা সত্য-মিথ্যার কোন পার্থক্য সূচিত হয় না।* কিন্তু "ওহি" সম্যক ঐশী প্রত্যাদেশ-বাণী,—ইহা মানবকে অনুমান-রাজ্য হইতে বহু ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া অফুরন্ত দিব্য জ্ঞান-ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়া আত্মোন্নতির পরম ও চরম পথে আনিয়া দাঁড় করায়। ইহা যুক্তিসম্মত, বুদ্ধিবৃত্তির পরিপোষক এবং অভ্রান্ত সত্য। এই খোদার আধ্যাত্মিক বাণী, অপার্থিব জ্যোতিঃ, স্বর্গীয় মহিমা, অলৌকিক তত্ত্বজ্ঞান ও অনাবিল শান্তি সমাধি সহকারে অনুগৃহীত মহাসাধক-পয়গম্বরের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া গূঢ় রহস্যের ভেদ করিয়া দেয়।

সত্য-জ্ঞানের উৎস ঐশী অধ্যাত্মবাণী অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়াই হজরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রথম বয়সের অজ্ঞতা ও সন্দেহ বিমুক্ত হইয়া অবশেষে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিয়াছিলেন যে :—

انى وجهت وجهى للذى فطر السموت والارض

حنيفا وما انا من المشركين ٥ (الانعام)

---

* নবী রসুল ও পয়গম্বরগণের নিকটে অবতীর্ণ অধ্যাত্ম-তত্ত্বপূর্ণ ঐশী প্রত্যাদেশবাণীই "ওহি" নামে অভিহিত। মহাতাপস ওলি-আল্লাহ্ যে ঐশীজ্ঞান (এল্‌মে এলাহি (علم الهى) লাভ করেন, তাহা "ইল্‌হাম" নামে কথিত হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য যে কোন প্রকার অমানুষিক দৈবজ্ঞানকেই "ওহম্" বা "ইস্তেক্‌তার" (الوهم او الاستفهار) বলা হয়। —লেখক।

ব্যাখ্যা :—"আমি নিশ্চিত সেই আল্লাহ্ তাআলার দিকেই মুখ ফিরাইতেছি (অর্থাৎ একমাত্র তাঁহাকেই আমার প্রভুত্বে বরণ করিয়া তাঁহারই আশ্রয়-ভিক্ষা চাহিতেছি), যিনি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য সৃজন করিয়াছেন ; (সুতরাং চন্দ্র সূর্য্য তারকা গ্রহ-উপগ্রহ সকলই তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ)। আমি একেশ্বরবাদী এবং তাঁহার অংশীবাদীদিগের অন্তর্ভুক্ত নহি।" (আল্-কোরআন্)

বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এইরূপ একজন খোদার বিশেষ অনুগৃহীত মহারসূল ছিলেন। কোরআন্ শরিফে তিনি বলিতে আদিষ্ট হইয়াছেন যে,—

قُلْ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُم يُوحَى اِلَىَّ

"(হে মোহাম্মদ ! জনমণ্ডলীকে) বল যে, আমি তোমাদেরই স্থায় একজন মানুষ সত্য, তবে (বৈশিষ্ট্য এই যে) আমার উপর খোদার ঐশীবাণী "ওহি" অবতীর্ণ হয় (তদ্দ্বারা পরমার্থিক অধ্যাত্মতত্ত্ব আমার নিকট সুপরিস্ফুট ও সুপরিজ্ঞাত)।

আল্লাহ্ তাআলা কোরআনে বলিতেছেন যে,—

وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء الخ ـ

ব্যাখ্যা :—"তাহারা আল্লাহ্‌কে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই, যাহারা বলিয়াছে যে, তিনি কোন মানবের উপর (তাঁহার বাক্য ও নিদর্শন হইতে) কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই।"

বিশ্বের কল্যাণস্বরূপ মহানবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) দীর্ঘ চল্লিশ বর্ষব্যাপী কঠোর সাধনার বিনিময়ে খোদার বাণী "ওহি" প্রাপ্ত হন। * এই আয়াত পাঁচটী তাঁহার নবুয়ত জীবনের আদি প্রত্যাদিষ্ট বাণী :—

اِقرأ باسم ربك الذى خلق ○ خلق الانسان من علق ○ اِقرأ و ربك الاكرم ○ الذى علّم بالقلم ○ علم الانسان مالم يعلم ○ (العلق)

অর্থ:—"তোমার সেই প্রতিপালকের নাম লইয়া পাঠ কর, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ; যিনি ঘনীভূত রক্তপিণ্ড (Blood-clot) হইতে (অপূর্ব্ব কৌশলে) মানবত্ব রচনা করিয়াছেন। সেই অসীম মহিমান্বিত প্রতিপালক প্রভুর নামে আবৃত্তি কর, যিনি কলম দ্বারা (লিপিবিদ্যা) শিক্ষা দিয়াছেন এবং তিনি মানুষকে তাহার অপরিজ্ঞাত জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।"—(আল্-কোরআন)।

এই ঐশী-প্রত্যাদেশবাণী নানারূপে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) উপর অবতীর্ণ হইত। কখন প্রত্যক্ষ সজ্ঞানে, কখন সাধনা সমাহিত অবস্থায়, কোন সময়ে শব্দাকারে ও কোন-ক্ষেত্রে পবিত্র স্বপ্নসংযোগে খোদাতাআলার নিকট হইতে তিনি আদেশ নিষেধ ও বিধি-ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইতেন। হাদীস্ শরীফে বর্ণিত আছে যে, হজরত হারছ বেন্ হেশাম (রাঃ) (حرث بن هشام) নামীয় একজন 'ছাহাবা' হজরত রসুলকে "ওহি" অবতরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদুত্তরে 'রসুলুল্লাহ্' বলেন :—

فقال احيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس ... و قد وعيتُ ما قال و احيانا يتمثّل لى الملكُ رجلا فيكلّمنى فاعى ما يقول ـ

অর্থ :—"কোন সময়ে ঘণ্টা-ধ্বনির স্থায় স্বরতরঙ্গে আমার নিকটে "ওহি" সমাগত হয়, এবং তন্মধ্যকার বাণী আমি মনোযোগ সহকারে অনুধাবন ও শ্রবণ করি ; কখনও বা পবিত্রাত্মা ফেরেশ্‌তা (জ্ঞানদূত) মনুষ্যাকৃতি ধারণ করিয়া আমার নিকটে আগমন করেন ও বাক্যসুধা বর্ষণ করেন, সুতরাং তাঁহার মুখনিঃসৃত বাণী আমি স্মরণ রাখি।" (হাদীস্)। হজরত নবী করীম আরও বলিয়াছেন যে,—

الا و انى لا اعلم الا ما علمنى الله

অর্থাৎ "বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাআলা আমাকে যে ঐশীজ্ঞান দান করেন, তদতিরিক্ত অন্য কিছু আমি অবগত নহি।"

দার্শনিক পণ্ডিতবৃন্দ তাঁহাদের অপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তায় চিরজাগ্রত জীবন্ত নিরাকার নির্ব্বিকার আল্লাহ্ তাআলার প্রকৃত স্বরূপ ও প্রকৃতি (True Conception of Divine nature and His Being) উপলব্ধি করিয়া তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার শাশ্বত বাণী পবিত্র

* আমি আমার সর্ব্ববিধ অজ্ঞতা ও অক্ষমতা সত্ত্বেও "সাধকরূপে হজরত মোহাম্মদ (দঃ)" শীর্ষক আমার এক প্রবন্ধে তাঁহার ক্রমবর্দ্ধমান মহাসাধক জীবনের বিকাশ ও পরিণতি দেখাইতে কথঞ্চিৎ প্রয়াস পাইয়াছি। Vide "Islamia College Magazine" Vols. I. & II, 1930,

"কালামুল্লাহ্" হইতে তাঁহার সত্য-স্বরূপ (ذات الهی) ও পবিত্র গুণাবলী (صفات الهی) পরিজ্ঞাত হইয়া আমাদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তি ঘটে। পরম করুণাময় আল্লাহ্ আমাদের অতি অন্তরঙ্গ ও নিকটতম সহচর। যথা :— نحن اقرب اليه من حبل الوريد
অর্থ : —"আমি মানুষের মেরুদণ্ড-শিরারও (neck-vein) অতি সন্নিকটে বিদ্যমান।" আমাদের আকুল আহ্বান এবং অন্তরের কামনা তিনি সদয় অনুকম্পায় শ্রবণ করেন। যথা :— فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان —
অর্থাৎ "আমি মনুষ্যের অতিশয় নিকটবর্ত্তী এবং প্রত্যেক প্রার্থীর প্রার্থনা অনুক্ষণ শ্রবণ ও পূরণ করিয়া থাকি।" তিনি আমাদের এ মানবজীবন নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই, ইহার ভিতরে গভীর তাৎপর্য্য ও মহদুদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন :—

افحسبتم انما خلقناكم عبثا

"(হে মানবমণ্ডলী !) তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদিগকে নিরর্থক সৃষ্টি করিয়াছি ?" মানব প্রত্যুত্তরে যেন বলে :—

ربنا ما خلقت هذا باطلا —

অর্থ :—"হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদিগকে অনর্থক বা ব্যর্থ সৃষ্টি কর নাই।"

জড় জগতের সৃষ্টি সমাধা করিয়া বিশ্ব-স্রষ্টা আল্লাহ্ যখন জীব-সৃষ্টির দিকে মনোনিবেশ করিলেন, তখন তিনি ফেরেশ্তাদিগের নিকটে প্রকাশ করিলেন যে,—

انى جاعل فى الارض خليفة

অর্থাৎ "আমি মর্ত্ত্য জগতে স্বীয় প্রতিনিধি সৃষ্টি করিতে মনস্থ করিয়াছি।" ভাবী অনাসৃষ্টি ও অনর্থপাতের আশঙ্কা করিয়া ফেরেশ্তাবৃন্দ ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন যে,—

نحن نسبح بحمدك و نقدس لك

অর্থ :—"(হে আমাদের পরম উপাস্য প্রভো !) আমরাই তোমার যশঃ-মহিমা কীর্ত্তন করিব ও তোমার পবিত্রতা প্রচার করিব, (সুতরাং রিপু ও ইন্দ্রিয়াদি সম্বলিত মানব সৃজনের কোন আবশ্যক নাই)। তদুত্তরে সর্ব্বদ্রষ্টা সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ্ উত্তর করেন ;— انى اعلم مالا تعلمون —
"(হে ফেরেশ্তাবৃন্দ !) তোমাদের অবিদিত গূঢ় বিষয় সমূহ আমি উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত আছি। তোমরা তোমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান-প্রয়োগে জীবশ্রেষ্ঠ (اشرف المخلوقات) মানব-সৃষ্টির সুগভীর উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে না।)" ধন্য আল্লাহের অনুগৃহীত মানুষের এ জীবন !

যাত্রা

—খোন্দেকার আবুল কাসেম

ওগো দেব ! আজ শুধু তব নাম স্মরি'
ভাসাব সাগর-বুকে মোর ভাঙা তরী।
বিপদ-সঙ্কুল পথে তরঙ্গের রাশি
হয় ত ফেলিবে মোর তরীটিরে গ্রাসি
হয় ত বহিবে শুধু প্রতিকূল বায়ু
হয় ত পথের মাঝে শেষ হবে আয়ু
সে সঙ্কটে চিত্ত হ'তে মুছায়ে সংশয়
তুমি মোর সাথে সাথে থেকো দয়াময়।

পথ খুঁজে সারা হ'লে ব্যর্থ মনোরথ
তুমি মোর ধ্রুব তারা দেখাইবে পথ।
আঁধার ঘনাবে যবে আকাশের ভালে
তোমারে বসা'ব আনি আত্মার আড়ালে।
বসাব নির্জ্জনে তোমা হৃদয়ের পাশে
যথায় বিষাদ নিত্য উৎসবেরে গ্রাসে
বিবেক-বৈরাগ্যভরা সে আঁধার মাঝে
তোমার সঙ্গীত যেন নিশিদিন বাজে।

মঙ্গল-ভবিষ্যৎ

—গল্প—

—ডাঃ লুৎফর রহমান

(৭)

শুধু একখানি মুখ জর্জ্জের বুকের ভিতর অহরহঃ জ্বলিতেছিল। সে খোদাতালাকে ভুলিয়া গেল, কিন্তু এলিজার মুখখানি ভুলিতে পারিল না। বিদ্রোহী নাস্তিকের মত সে তাহার সৃষ্টি-কর্ত্তাকে পুনঃ পুনঃ গালি দিতেছিল, কিন্তু এলিজাকে একবারও গালি দিল না। সবই তাহার কাছে শূন্য মনে হইল, শুধু এলিজার মুখখানি সত্য হইয়া তাহার বুকের ভিতর জাগিয়া রহিল।

খোদা থাকুন আর না থাকুন—তাহাতে তাহার কিছুই যায় আসে না। নিষ্ঠুর, নিষ্ক্রিয়, দৃষ্টির বহির্ভূত খোদাকে সে মানিবে না। তাহার জন্য এমন খোদা চাই, যিনি অন্যায়ের বিনাশ সাধন করেন—যাহার শাস্তি বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র। তাহার কল্পিত খোদা যদি নাই থাকেন, সে সৃষ্টি-রক্ষার জন্য এক নূতন খোদা গড়িয়া লইবে—অথবা দুর্জ্জয় ক্রোধে সে নিজেই খোদা হইয়া উঠিবে। সে এমন লক্ষ্মীছাড়া প্রাণহীন খোদাকে ভক্তি করিবে না, মানিবেও না।

তাহার শৃঙ্খলিত দেহ জুড়িয়া এক দুর্জ্জয় শক্তি জাগিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, সে যেন আকাশকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে,—তাহার দুই বাহু পৃথিবীর প্রান্ত সীমা পর্য্যন্ত প্রসারিত লম্বিত হইয়াছে। সে দুর্জ্জয় অশান্ত ক্রোধে পৃথিবীর সমস্ত পাপ-গ্লানিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিবে! কোথায় খোদা?—সেই তো খোদা! বুদ্ধি, জ্ঞান, চেতনা ও বিচাররূপে সেই তো ঈশ্বর, যদিও সে ভাগ্য দোষে শৃঙ্খলিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। সে অপরিসীম ক্ষোভে দুর্জ্জয়, দুঃসহ, মনস্তাপে তার সারা দেহের শৃঙ্খলভারকে খসিয়া পড়িতে আদেশ করিল। পাষাণ প্রাচীরকে পথ ছাড়িয়া দিতে কহিল। খোদাকে কে রুদ্ধ করিয়া রাখিবে? কাহার এত বড় দুঃসাহস? এত সাহস?—যাহা পাপ, তাহাই রাজ-সম্মান লাভ করিবে? এত বড় ধৃষ্টতা মানুষের? কিছুতেই সে তাহা হইতে দিবে না।

সে পাষাণ বন্ধন ভাঙ্গিবে, পায়ের আঘাতে বসুন্ধরার বক্ষঃ চূর্ণ করিয়া দিবে, প্রশান্ত সাগরের সমস্ত জল সে শোষণ করিয়া লইবে! ধর্ম্ম ও ন্যায়ের রূপ ধরিয়া শয়তানকে সে কিছুতেই সত্যের অপমান করিতে দিবে না। মিথ্যা ও অন্যায় নমস্কার পাইবে! জ্যোতির্ম্ময় হেম-কণ্ঠমালা কুকুরের পদাঘাতে ছিঁড়িয়া যাইবে—কিছুতেই নয়!

ধর্ম্ম দিয়া সে কি করিবে?—উপাসনায় তাহার কি প্রয়োজন? সত্য ও ন্যায়ের নির্ভীক খোদাকেই সে মানবের দুয়ারে দুয়ারে প্রচার করিবে—পঙ্গু, দুর্ব্বল, সঙ্কুচিত, অসত্য ও অন্যায়ের পক্ষাবলম্বী,—মৌন, সরম-নম্র ঈশ্বরকে সে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম-মন্দির হইতে দূর করিয়া দিবে। দুর্ব্বৃত্তেরা ধার্ম্মিকতার ভণ্ডামী করে—এই অন্তঃসার শূন্য ধার্ম্মিকতাকে সে দুই পায়ে দলাইয়া দিবে। সমস্ত দুর্ব্বলচিত্ত, রাজাশ্রিত, তস্কর দলের অনুগৃহীত, সত্যের গোপনকারী ভীরু পুরোহিত দলের নাক ও কান সে কাটিয়া দিবে; তে-মাথা পথের উপর দাঁড় করাইয়া, তাহাদের মাথা ন্যাড়া করিয়া ঘোল ঢালিয়া দিবে।—ধর্ম্মের সার কথাটুকু, সমস্ত ঈশ্বরীয় গ্রন্থের নির্য্যাসটুকু তাহারা প্রকাশ করিয়া দিতে পারে না—দুর্ব্বল কাপুরুষের দল তারা, শত ধিক তাদের!

প্রচণ্ড বিক্রমে যে শরীরের তাবৎ শৃঙ্খলভারকে খসিয়া পড়িতে আদেশ করিল। স্বাধীন ও মুক্ত হইয়া সে এখনই সারা পৃথিবীর পথে পথে, সমস্ত জ্যোতিঃ ও আলোয় বন্যায় ভাসিয়া ভাসিয়া, সমস্ত মানুষের কাছে প্রচার করিয়া

বেড়াইবে—অন্ধকার, পাপ, দুঃখ, অবিচার, ব্যাধি ও জ্বালার অবসান হোক, কল্যাণ ও ন্যায়, মহানন্দ ও শান্তি, জ্ঞান ও বিচাররূপে খোদা—পৃথিবীর সর্ব্বত্র রাজত্ব করিবেন। অসত্য দূর হইবে, অন্ধকার দূর হইবে—ঈশ্বরের রাজ্য আসিবে! মনুষ্য-সন্তান এই জগতেই স্বর্গ রচনা করিবে।

কে তাহাকে আবদ্ধ রাখিবে?—কোন পাষাণ শক্তি তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে? সে উন্মাদের ন্যায় হাতে তুড়ি দিয়া বিজয়ের হাসি হাসিয়া উঠিল।—সে তো এখনই মুক্ত হইবে!!

সে আপন শরীরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল,—রে শয়তানের শৃঙ্খল বন্ধনভার, দূর হও আমার দেহ হইতে! এখনই, এখনই এই মুহূর্ত্তে!

কারাকক্ষের চারিদিককার প্রাচীর শ্রেণীকে লক্ষ্য করিয়া সে বজ্র-কণ্ঠে কহিল,—আমিই ঈশ্বর, আমিই সৃষ্টি-কর্ত্তা, আমার আদেশে এই মুহূর্ত্তে হে শয়তানের দূতেরা পথ ছাড়িয়া দাও—আমি বাহির হইব। এক মুহূর্ত্তও এখানে আমার বিলম্ব করিবার সময় নাই।

কিন্তু কেহই তাহার আদেশ মান্য করিল না। শরীরস্থ শৃঙ্খল স্তূপগুলি যেমন ছিল, তেমনি রহিল। পাষাণ প্রাচীর শ্রেণীও তাহার পথ ছাড়িয়া দিল না! বরং তাহারা যেন তাহাকে উপহাস করিয়া উঠিল।

(৮)

ওগো আমার মনোমোহিনী! ওগো আমার জীবনের একমাত্র সহচরী! এখন তুমি কি করিতেছ, কোথায়, কি অবস্থায় আছ? আমার বিচ্ছেদ ব্যথায় কতই তুমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছ। হয় ত তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছ। তুমি কাহারও সহিত হাসিয়া কথা বল না। আজ বাহিরের মুক্ত-পৃথিবী কারাগারের মতই তোমার কাছে অন্ধকারে ভরিয়া উঠিয়াছে। বাহিরের কারা ঠেলিয়া আজ যদি তুমি আমার কাছে আসিতে পারিতে, তাহা হইলে শৃঙ্খলিত হইয়াও আমরা কত সুখী হইতাম। এই মাটীর ঘরে, এই পাতালের সমাধিতে আমরা অনন্তকালের জন্য ঘুমাইয়া রহিতাম। জর্জ্জ এমনি করিয়া আক্ষেপ করিতেছিল।

জর্জ্জের কারাগারে আসার পর নয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। এই নয় মাস ধরিয়া জর্জ্জ কত কাঁদিয়াছে, আপন মনে ক্রুদ্ধ হইয়াছে, আপন চুল ছিঁড়িয়াছে, বক্ষে করাঘাত করিয়াছে, পৃথিবীর বিরুদ্ধে, মানব-সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে, খোদাতালাকে গালাগালি দিয়াছে। এখন অনেকটা সে শান্ত হইয়াছে। তাহার এলিজাকে সে কোন মতে ভুলিতে পারে নাই। শয়নে-স্বপনে সর্ব্বক্ষণই সে এলিজার কথা ভাবে।

একদিন দ্বাররক্ষী আসিয়া কহিল,—তুমি কিছুদিন হইতে শান্তভাব ধারণ করিয়াছ। পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে শৃঙ্খল-মুক্ত করিয়া কারাগৃহে বাস করিতে দেওয়া হইবে। এখন হইতে পাচক একাকী আসিয়া বাহির হইতে তোমাকে খাদ্য দিয়া যাইবে, তুমি হাত বাড়াইয়া তাহা লইবে। এখন হইতে তুমি আপন কক্ষে যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে পারিবে।

বলিতে বলিতে কয়েকজন প্রহরী আসিয়া জর্জ্জকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া দিয়া পুনরায় ভীষণ শব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

* * *

প্রহরীরা যখন জর্জ্জকে শৃঙ্খল মুক্ত করিবার জন্য ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল—সেই সময়ে লৌহশৃঙ্খলাঘাতেই হউক বা দৈবক্রমেই হউক জনৈক প্রহরীর শক্ত বুটের তলা হইতে একটা কঠিন ইস্পাত-লোহার নাল খুলিয়া পড়িয়া গেল। প্রহরীরা তাহা লক্ষ্য করিল না। তাহারা চলিয়া গেলে জর্জ্জ ক্ষুধার্ত্ত সিংহের মত সেই ইস্পাতটুকু তুলিয়া লইল। একেবারে নিঃসম্বল, অস্ত্রহীন অবস্থায় জর্জ্জ ভাবিল, হয় ত সে এই ইস্পাতটুকু দিয়াই একটা কিছু করিয়া ফেলিতে পারিবে। পরক্ষণেই সে আপন মনে হাসিয়া উঠিয়া ভাবিল,—এটা কামানও নয়, বন্দুকও নয়—সে ইহা দিয়া কি করিবে? সে বেশ করিয়া ইস্পাতটুকুর এপিঠ ওপিঠ পরীক্ষা করিল। তারপর সে অনেকক্ষণ চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিল। সে হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া দেখিল চারিদিকেই কঠিন পাষাণ-প্রাচীর কোথায়ও একটুখানি ছিদ্র নাই। এই পাষাণ-কারা ভাঙ্গিয়া বাহির হওয়া মানুষের সাধ্যের অতীত।

ইন্দুর যেমন উদ্দেশ্যহীন হইয়াই তাহার দাঁত দিয়া যাহা পায়, তাহাই কাটিয়া চলে,—পাথর হউক আর লৌহ আস্তরণ হউক, সে যেমন লক্ষ্য করে না—আপন মনে তার তীক্ষ্ণদন্তগুলি নিরন্তর ব্যবহার করে, ফলাফল লক্ষ্য করে না,

নিষ্কর্ম্মা জর্জ্জও তেমনি করিয়া ইস্পাতখানি দিয়া জেল-প্রাচীরের নিম্নদেশে একস্থানে ঘর্ষণ করিতে লাগিল। আর তো কোন কাজ নাই তাহার—সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে এইরূপ করিল।

পাচক আসিয়া আহার দিবার কিছু পূর্ব্বে সে আপন শয্যাখানিতে কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। পাচক যথাসময়ে বাহির হইতে খাবার লইবার জন্য তাহাকে ডাকিল। সে ভিতর হইতে তাহা হাত বাড়াইয়া লইল।

সামান্য কিছু আহার করিয়া সে পুনরায় সেই স্থানে যাইয়া বসিল এবং ইস্পাত-খণ্ডটুকু ঘর্ষণ করিতে লাগিল। এই ভাবে সাত দিন ঘষিয়া ঘষিয়া সে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ স্থান খুঁড়িয়া ফেলিল!

জর্জ্জের আর কোন কাজ নাই—এলিজার চিন্তায় মাতালের মত সে বিভোর হইয়া থাকে! পাচক আসিবার সময় সাবধান হয়, তারপর অবিরাম পাথর ঘষে।

তাহার চোখে ঘুম নাই,—আহারে সময় অপব্যয় হইতেছে ভাবিয়া তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া লয়।

বোধ হয় কাজের অভাবেই জর্জ্জ এ অসম্ভব কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। শিশুর পক্ষে পর্ব্বত লঙ্ঘন যেমন অসম্ভব, কোন কয়েদীর পক্ষে ফরাসী-ব্যাষ্টিল (ফরাসী ষ্টেট্ কারাগার) ভাঙ্গিয়া বাহির হওয়া তেমনি অসম্ভব। জর্জ্জ নিশ্চয়ই পাগল হইয়াছে! পাগল না হইলে সে এমন অসম্ভব কার্য্যে লিপ্ত হইবে কেন? কোন্ দিকে যে খোলা পথ, তাহা কোন কয়েদীর জানা সম্ভব ছিল না, তথাপি জর্জ্জ নিরস্ত হইল না—খুঁড়িয়াই চলিল। সুদীর্ঘ তিন বৎসর কাল দিবারাত্র খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া সে এক হস্ত পরিমিত একটা পাথর টানিয়া তুলিল। তাহার পর আবার সে খুঁড়িয়া চলিল।

পাথরের গুঁড়াগুলি সে প্রতিদিন ভুক্তাবশিষ্ট জল ও রুটীর সহিত মিশাইয়া রাখিত। পাচক তাহা বাহিরে ফেলিয়া দিত। সারাদিনের পরিশ্রমে সে মাত্র দুই চার রতি গুঁড়া বাহির করিত, পাচক তাহা লক্ষ্যও করিত না। দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া আরও সাত বৎসর সে খুঁড়িল। চতুর্দ্দশ বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের পর সে প্রাচীরের অপর পার্শ্বে তাহারই মত একটা ভাগ্যহীন মানুষের ক্ষীণ পদধ্বনি অনুভব করিল। হায়! পথ ভুলিয়া সে বিপথে সুড়ঙ্গ করিয়াছে;—তাহার এতদিনের পরিশ্রম বৃথাই হইয়াছে। প্রাচীর কাটিয়া মুক্তির পথ সে বাহির করিতে পারে নাই;—একটি দ্বিতীয় হতভাগ্যের কক্ষপার্শ্বে সে উপস্থিত হইয়াছে মাত্র। হায় ভাগ্য!—তথাপি সে একটা মানুষের নিকট-স্পর্শ অনুভব করিয়া আনন্দিত হইল।

কয়েক দিনে একটা লোহার চাবীর মুখের মত ছিদ্র বাহির করিতে সে সমর্থ হইল। সেই ক্ষুদ্র ছিদ্র পথ দিয়া সে খুব অস্পষ্টভাবে দেখিল, একটা শ্বেত-শ্মশ্রু প্রবীণ-বৃদ্ধ বসিয়া বসিয়া পুনঃ পুনঃ আপন কর গণিতেছেন। কি উদ্দেশ্যে তিনি এরূপ করিতেছেন, তাহা খোদাতালাই জানেন। তাহার গণনায় বিরাম, বিচ্ছেদ নাই। অবিরামভাবে গণিতেছেন। একবার গণিয়া শেষ শেষ করিতেছেন, আবার গণিতেছেন। জর্জ্জ অনেকক্ষণ ধরিয়া বৃদ্ধের এই আশ্চর্য্য রহস্যময় কার্য্য নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর অপরিসর সুড়ঙ্গ পথ দিয়া কষ্টে দেহটাকে টানিয়া আনিয়া সে আপন কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শয্যায় শুইয়া পড়িল। এখন সে কি করিবে, তাহাও সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। স্তব্ধ মৃতের মত সে শুইয়া রহিল।
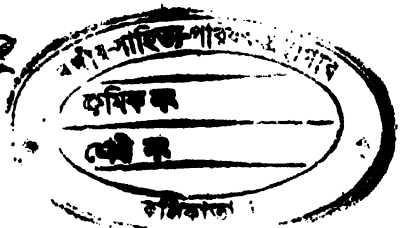
প্রফুল্লতা আনিবার উপায়

—প্রবন্ধ—

— তোরাব আলী, এম্-এ,

অলস ব্যক্তিই সাধারণতঃ বিষণ্ন। কর্ম্মীর চিন্তা করিবার অবসর নাই। কর্ম্মই তাহাকে সংসারের যাবতীয় শোক-তাপ ভুলাইয়া রাখে। অলস ব্যক্তি কেবলই দুঃখের স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। অলসভাবে বসিয়া থাকিলে চিন্তা আপনা-আপনি আসিয়া জুটে। কি করিয়া সময় কাটিবে, সে তাহা ভাবিয়া পায় না। তাহার নিকট সময় কষ্টদায়ক বলিয়া বোধ হয়।

সংসারে দুঃখ-কষ্ট থাকিবেই। তাই বলিয়া একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, চেষ্টা করিয়াও প্রফুল্লচিত্ত হওয়া সম্ভব। মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া অথবা যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারা শত দুঃখ-দৈন্যের মধ্যেও আমরা জোর করিয়া প্রফুল্লতা সৃষ্টি করিতে পারি। আমাদের দুঃখ কষ্টের কিয়দংশ যে কাল্পনিক, তাহা মানিতেই হইবে। যখন বাস্তবিক কোন দুঃখ বা চিন্তার কারণ উপস্থিত হয়, তখন একাকী বসিয়া না থাকিয়া বন্ধু-বান্ধব বাহিরের পাঁচজনের নিকট গেলে, দুঃখ কষ্টের কথা যে অনেকটা ভুলিয়া থাকা সম্ভবপর, সে-বিষয় হয় তো অনেকেরই কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তাই যেখানে গেলে মন একটু ভাল লাগে, দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ সেইখানে যাওয়াই ঠিক।

সঙ্গে সঙ্গে শোক-তাপ দমন করিবার মত শক্তি সঞ্চয় করিতে হয়। ইহা করিতে হইলে মনের উপর যথেষ্ট আধিপত্য থাকা দরকার। আমি আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের বিষয় এখানে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। তিনি বর্ত্তমানে গাইবাধাতে ওকালতি করিতেছেন। কোন এক মেসে থাকিয়া তিনি কলিকাতায় এক সরকারী আফিসে চাকুরী করিতেন। কোন কারণে তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া মেসের বন্ধু-বান্ধবের সাথে অধিক মেলামেশা করিয়া আফিসের সময়টা কাটাইতেন। একদিন তাস খেলিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার একখানি চিঠি আসিল। খেলিতে খেলিতে চিঠিখানি পড়িয়া লইলেন। কাহাকেও কিছু না বলিয়া যেন অধিক আনন্দের সাথে খেলিতে লাগিলেন। যাহারা তাঁহার সঙ্গে খেলিতে-ছিলেন, তাহারা মনে করিলেন, চিঠিতে নিশ্চয় কোন ভাল খবর আছে। কিছুক্ষণ খেলিবার পর বন্ধুদের ভ্রম দূর করিবার জন্য তিনি বলিয়া ফেলিলেন যে, তাঁহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। সকলেই অবাক্! আমরা কি বলিব যে এই ব্যক্তি নির্ম্মম পাষাণ?

প্রফুল্ল চিত্ত হইতে হইলে সদা হাসি-মুখ রাখিতে অভ্যাস করিতে হয়। খোশ-মেজাজী লোকের সঙ্গলাভ করিতে হয়। মনে রাখিতে হয়, যখনই যাহা বলিব, হাসিমুখে বলিব, কিছুতেই রাগ করিব না; কাহারো প্রতি অনেক দিন ক্রোধ পোষণ করিব না; অপরের সুখ ও সৌভাগ্যে হিংসাকে মনে স্থান দিব না। এই সব অভ্যাস করিতে পারিলে আমাদের পক্ষে প্রফুল্ল চিত্ত হওয়া অতি সহজ হইয়া পড়ে।

স্বামী বা স্ত্রী ও বন্ধু-বান্ধবের সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা বলা এবং তাহাদিগকে অবিশ্বাস না করা, প্রফুল্লতা আনয়নে খুব সহায়তা করে। তাহাদিগের প্রতি সন্দিগ্ধ চিত্ত হওয়া উচিত নহে। সাংসারিক অভাব বোধ করিলেও প্রফুল্লতা নষ্ট হয়। আমাদের চেয়ে যাহারা অধিক অভাবগ্রস্ত, তাহা-দের কথা একটু ভাবিলে, আমাদের অভাবের কথা মনে আসিতে পারে না।

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতাও প্রফুল্লতা বৃদ্ধি করে। বাড়ী, ঘর, দরজা, আসবাব-পত্র পরিস্কার ও পরিপাটী করিয়া রাখিতে

হয়। শরীর, জামা-কাপড় ও অন্যান্য ব্যবহারী জিনিষপত্র যদি মলিন থাকে, তবে মনও মলিন হওয়া অস্বাভাবিক নহে। ঘর-বাড়ী যদি আবর্জ্জনা শূন্য থাকে, তাহা হইলে যে মনও প্রফুল্ল থাকে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ছেলে-মেয়েকেও বেশ ফিট্‌ফাট্‌ রাখিতে হয়। এমন কি চাকর-চাকরাণীকেও নোংড়া থাকিতে দিতে নাই। এই সব বাহিরের জিনিষ মনের উপর বিস্তর আধিপত্য-বিস্তার করে। ভাল জিনিষ দেখিলে মন ভাল থাকা স্বাভাবিক।

প্রতিনিয়ত নিজকে কোন না কোন আনন্দদায়ক কার্য্যে লিপ্ত রাখিতে হয়। জগতে কাজের অভাব নাই। কাজ ঠিক করিয়া লইতে পারিলে, ক্রমে তাহার ভিতর আনন্দও পাওয়া যায়। কাজে আনন্দ পাইলে স্বাস্থ্য সুন্দর থাকে, সংসার সুখের হয়। প্রফুল্লতা তখন স্বভাবগত হইয়া পড়ে।

ভাল কাজ জুটিল না বলিয়া ভাগ্যকে দোষারোপ করা উচিত নহে। আনন্দের সাথে কর্ত্তব্য সম্পাদন না করিলে জীবনে সুখী এবং জয়ী হওয়া অসম্ভব। কাজের ভিতর হইতে আনন্দ বাহির করিয়া লইতে হইবে। অসন্তুষ্ট-চিত্তে কোন কাজ করা ঠিক নহে। যে কাজে আনন্দ পাওয়া যায় না, তাহা করিয়া আবার অন্যের নিকট অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতে নাই। সে কাজ ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত নিজের মনোভাব কাহারও নিকট ব্যক্ত না করাই ভাল।

নিজের কোন দুঃখের কথা অপরকে বলিতে নাই। তাহাতে দুঃখের লাঘব না হইয়া বরং তাহা দুঃখ বৃদ্ধি করে। কারণ প্রথমাবস্থায় সহানুভূতির কথাতে মন অধিক বিমর্ষ হয়। দুঃখের সাগর আরো উথলিয়া উঠে।

মন যাহা করিয়া আনন্দ পায়, তাহা না করা মস্ত বেকুবী। লোক-ভয় ত্যাগ করিয়া, নিজে যাহাতে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা করিয়া যাওয়া প্রকৃত বুদ্ধিমানের লক্ষণ। পাপ বা অন্যায় করিয়া মানুষ কিছুতেই আনন্দ পাইতে পারে না। তাহাই সত্যিকার আনন্দ, যাহাতে পূর্ব্বে মনে কোন দ্বিধা আসে না এবং পরে অনুতাপ-অনুশোচনা হয় না।

দুঃখ-চিন্তা মানুষ অনেক ক্ষেত্রে নিজে তৈয়ার করিয়া থাকে। অতীতের স্মৃতিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া এবং ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়া কত লোক জীবনকে অযথা দুর্ব্বহ করে। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা ভাবিয়া কি ফল? অতীতের কথা স্মরণ করিয়া বর্ত্তমানের সুখটুকুকে কি নষ্ট করা হয় না? আবার ভবিষ্যতে কি হইবে, যে বিষয়ে আগেই ভাবিয়া অস্থির হওয়াই বা কেন? কবে কি হইবে, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইয়া বর্ত্তমানের সামান্য শান্তিটুকু নষ্ট করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। ভবিষ্যতের উপর মানুষের একদম হাত নাই। ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা "আলেমুল-গায়েব" ছাড়া আর কেহই জানেন না। মনকে যুক্তি-তর্ক দ্বারা বুঝাইতে হইবে যে, অতীত, সে ত চলিয়াই গিয়াছে। ভবিষ্যতে যাহা হইবার, তাহা হইবেই। সে জন্য হাতের জিনিষ নষ্ট করিয়া কি লাভ। ভাবী সুখের কল্পনাতেও আনন্দ আছে। তাই যখন ভবিষ্যৎ দুঃখের কথা মনে উঠে, তখন একটু চেষ্টা করিয়া সুখের স্বপ্ন দেখাতেও লাভ আছে।

পেট পুড়িয়া খাইতে না পাওয়া স্ফূর্ত্তিহীনতার একটী কারণ হইলেও, যাহাদিগকে সংসারে খাটিয়া খাইতে হয় না, তাহারাই যে প্রফুল্লচিত্ত, একথা বলা যায় না। তাহাদিগকে প্রফুল্লচিত্ত হইতে হইলে নিজ নিজ সময় কোন না কোন প্রকার আনন্দদায়ক কার্য্যে ব্যয় করিতে হয়। সেই সময়টুকু তাহারা অলস চিন্তায় নষ্ট করে, তাহা তাহারা অন্ততঃ ললিত-কলার চর্চ্চা করিয়া অনায়াসে সুখের করিতে পারে।

শাক-সবজী ও ফুলের বাগান করা, প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শন ও উপভোগ, গীত-বাদ্য শ্রবণ, সাহিত্য-আলোচনা, ছবি-আঁকা, ফটো উঠান, ভ্রমণ, খেলা-ধূলা, শিকার, এইরূপ অনেক কিছু আনন্দদায়ক কাজ আছে, যাহাতে লিপ্ত থাকিয়া, তাহারা নিজ দুঃখের কিয়দংশ লাঘব করিতে পারে অথবা অতিরিক্ত আনন্দ উপভোগ করিতে পারে।

তবে এ সব সাধারণতঃ গরীবের পোষায় না। প্রথমেই বলিয়াছি, কর্ম্ম করা ছাড়া তাহার দুঃখ-মোচনের দ্বিতীয় উপায় নাই। ইহাতে একদিকে তাহার অন্ন-সংস্থান হইবে, অপর দিকে তাহাকে দুঃখের কথা ভুলাইয়া রাখিবে।

উল্লিখিত আনন্দদায়ক কাজ ছাড়া আরও অনেক মহত্তর কাজ আছে, যাহাতে লিপ্ত থাকিলে মানুষ সংসারের অভাব-অভিযোগ দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়া থাকিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারে। সাধু-সঙ্গে বাসের মধ্যে যে আনন্দ আছে, যে ব্যক্তি একবার তাহার সন্ধান পায়, পার্থিব কিছুই তাহার প্রফুল্লতা নষ্ট করিতে পারে না।
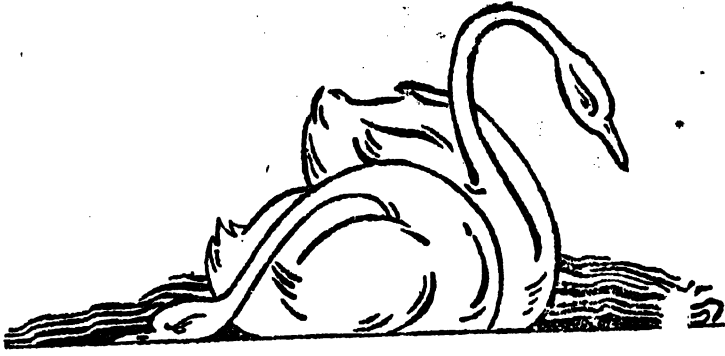
সংকলন

ভারতীয় বস্ত্র ও মুসলমান

(আমীন উদ্দিন আহ্মদ্)

খবরের কাগজের মারফতে জানিতে পারিলাম—বোম্বাইয়ের খোজা সম্প্রদায়ের নেতা, অথবা বলিতে গেলে নেতা-বিহীন মুসলমান সমাজের নেতা, আগা খান নাকি ভারতবর্ষে বিলাতী বস্ত্র বা বিলাতী জিনিষ চালাইবার জন্য সর্ব্ব প্রকার বন্দোবস্ত করিবেন। ইহা যদি সত্যই হয়, তবে আমাদের ইহাতে অনেক কিছু ভাবিবার আছে। প্রথম জিজ্ঞাসা করিতে চাই, তিনি কোন্ উদ্দেশ্য ও লাভের আশায় বিলাতী-দ্রব্যের বেসাতী করিতে এত দূর উদ্যোগী হইতেছেন? তাঁহার জন্য ভারতের মঙ্গলকর অন্য কিছু মিলিল না? যদি উত্তরে কেহ বলেন, বিলাতের কুলী-মজুর শ্রমিক ও কলওয়ালাদের মধ্যে যে-প্রকার হাহাকার লাগিয়া গিয়াছে, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া-শুনিয়া তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না, তজ্জন্যই তাঁহার উদার প্রাণ তাহাদের জন্য কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তাহার উত্তরে আমরা সসম্ভ্রমে তাঁহাকে নিবেদন করিতে চাই যে, তিনি কি একবার ভারতের বিষয় ভাবিয়া দেখিতে মর্জ্জি করিবেন? ভারতে যে-প্রকার হাহাকার লাগিয়া গিয়াছে,—গিয়াছে বলিলে হয় ত ঠিক বলা হয় না—লাগিয়া রহিয়াছে আজ বহু দিন ধরিয়া, তাহা কি তিনি লক্ষ্য করিবার কোন সুযোগ পান নাই? ভারতবর্ষের হাহাকার যদি ফ্রান্স বা ইটালীতে থাকিয়া তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ না করে, তবে বলিব ইহা আমাদের বদ্-নসীব, বা দুর্ভাগ্য।

বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে যাইয়া যদি তিনি বিলাতী মালের প্রচলনে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন বা করেন, তবে তাঁহাকে এইটুকু বিবেচনা করিতে হইবে যে, মূলে ভারতের বহির্বাণিজ্য বিনষ্ট করিল এবং কড়ির কাঙাল করিয়া আমাদিগকে ছাড়িল কে? বর্ত্তমানে আমাদের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, সে অবস্থায় শুধু বিলাতী কাপড় পরিধান করিলেই অথবা বিলাতী দ্রব্য ভক্ষণ করিলেই আমাদের দুর্দ্দশা দূরীভূত হইবে, এই কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। ইহার মূল কারণ এই যে, ভারতে বিক্রয়ের জন্য যত কোটী টাকার বিলাতী মাল পূর্ব্বে আগমন করিত, তন্মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল কাপড়। আর এই কাপড় সস্তায় চলিলেও ভারতের দরিদ্র-সমাজ যে বেশী উপকার লাভ করিয়াছে, অথবা মজুর-শ্রেণী যে বিলাতী কাপড়ই শুধু ব্যবহার করিয়াছে, এই কথা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারেন না।

বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে বিলাতী কাপড় যেরূপ সস্তা ছিল, তাহাতে দরিদ্র-সমাজ বিলাতী ব্যবহারের একটা ঝোঁক সামলাইতে পারে নাই বলিয়া তাহাকে অনেক দিকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। যুদ্ধের পরে সব জিনিষের দর বাড়িয়া যাওয়ায় কাপড়ের দরও বাড়িয়া চলে, কিন্তু দরিদ্র ভারত বিলাতীর মোহ অথবা ঝোঁক (যাহাই বলা যাক্) সামলাইতে পারে নাই। ইহাতে সে বিলাতের নিকট বিশেষ করিয়া ঋণী হইতে থাকে। কিন্তু তখন দেশের দরিদ্র-সমাজ আস্তে আস্তে দেশীয় জোলা-তাঁতীর কাপড়ের দিকেই ফিরিতে বাধ্য হয়। ভারতের দুর্ভাগ্য যে, এই জোলা-তাঁতীদিগের তেমন কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় নাই, যাহাতে করিয়া তাহারা বিদেশী কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে। তবু তাহারা কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকে—ভারতের জন্য তাহাদের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল, এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে বলিয়াই। কারণ ভারতের তাঁতী-জোলা যেমন মরিতে পারে না, তেমন ভারতের দরিদ্র শ্রেণীও মরিতে পারে না। কারণ এই দুইটি শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। লক্ষ লক্ষ তাঁতীর ভাত-কাপড় নির্ভর করে এই কোটী কোটী দরিদ্রের উপর; আর কোটী কোটী দরিদ্রের গাত্রাচ্ছাদন নির্ভর করে এই জোলা-তাঁতীর তাঁতের কারখানার উপর।

যাহারা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবেন, তাঁহারা এখনও দেখিতে পাইবেন যে, সাধারণ সমাজ বা দরিদ্র সমাজ এখনও সস্তার বিলাতীতে ডুবিয়া মরে নাই বা মরিতে পারে না। বিলাতী দ্রব্য ও কাপড়ের সদ্ব্যবহার হইয়াছে ভারতবর্ষের মধ্য-শ্রেণী দ্বারা এবং ভবিষ্যতেও যদি হয়, তবে তাহাদেরই দ্বারা হইবে কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি এবং জানি যে, অদূর ভবিষ্যতে কোন জ্ঞান-সম্পন্ন বা দায়িত্ব সম্পন্ন কোন ভারতবাসীই বিলাতী কাপড়ের সদ্ব্যবহার করিবেন না। ইহা বলিতে সাহস করি—বর্ত্তমানের সুদৃঢ় মানসিকতার উপর দাঁড়াইয়া।

যদি কেহ বলেন, দরিদ্র ভারতকে লজ্জা-সরম হইতে রক্ষা করিয়াছে বিলাতের বা বিদেশের সস্তা সামগ্রী। তখন আমরা ইহার উত্তরে বলিব—এই কথা বলিবার দিন বহু দিন পূর্ব্বে অতীত হইয়াছে; ভারতের লজ্জাকেও লজ্জা দিয়া, তাহার উলঙ্গতাকে ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছে,—সস্তার-বিলাতী ও বিলাতী-মোহ। কারণ বিলাত কাপড় দিয়া ভারতবর্ষকে যে ভাবে বহির্বাণিজ্যের পথে পঙ্গু করিয়াছে, তাহা ধারাবাহিকভাবে বিচার করিয়া দেখাইতে গেলে অনেক সময়ে সরকার বাহাদুরের অনুগ্রহ দৃষ্টিতে পড়িবার খুবই সম্ভাবনা আছে।

এই কথা কোন জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিই বলিতে পারেন না যে, ভারতবর্ষ বিলাতের সস্তা মাল ব্যবহার করিয়া খুব লাভবান হইয়াছে। ভারতবর্ষ প্রকৃতির বিধানানুযায়ী "কুটীর-শিল্পের"ই দেশ—এবং এই কুটীর-শিল্পকে যে কত দিক দিয়া পিষিয়া মারা হইয়াছে, এবং কত শ্রেণীর শিল্পীকে যে অকালে মরিতে হইয়াছে, তাহার কি কোন ইতিহাস আছে? বহির্বাণিজ্যের

সহায়ক কুটীর-শিল্প আমরা যে আমাদের দোষেই হারাইয়াছি, সেই কথা বোধ হয় আমাদের শাসক সম্প্রদায়ও বলিতে সাহস করিবেন না।

এই অবস্থায়, ভারতের আপ্রাণ-চেষ্টা ও সাধনায় যে কুটীর-শিল্প জিয়াইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে, যে দুর্দ্দিনে ভারতের সর্ব্বসাধারণ বিদেশী দ্রব্য পরিত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছে, যে শুভ মুহূর্ত্তে হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ প্রদান করিয়াছে, সেই সময়ে ভারতের জাতীয়তার বিরুদ্ধে এমন ভাবে যে কে দাঁড়াইতে পারেন বা পারে তাহা আমরা বিচার করিতে চাহি না, সমাজ বা জাতি তাহার বিচার করিবে।

বলিতে গেলে, যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিলাতী মাল ব্যবহার করিয়া বিলাতকে জীবন্ত রাখিয়াছে, সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিলাতের উপর এখন বীতশ্রদ্ধ, তবে যাহারা চাকুরীজীবি তাহারা হয়তঃ প্রকাশ্যভাবে বিলাতী ব্যবহারই খা করেন, কিন্তু আসলে আজ ভারতের মধ্য-শ্রেণীই বিদেশীর উপরে বীতশ্রদ্ধ বেশী। এই অবস্থায় ভারতবর্ষে বিলাতী প্রচলনের জন্য প্রোপাগাণ্ডা চালাইলে বা সস্তার চূড়ান্ত করিলে যে বিলাতি-বন্ধুদের তেমন কিছু লাভ বা সুবিধা হইবে, সেই আশা আমাদের নাই-ই, তাহাদেরও না-থাকা বাঞ্ছনীয়।

কারণ, ভারতের হিন্দু সমাজে এমন কুলাঙ্গার নাই যে, যে মহাত্মা গান্ধীর বাণীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ও বৃহত্তর ভারতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া মীরজাফরী চাল চালাইবে। অন্য দিকে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, ইসলাম ও মুসলিম সাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কোন মুসলমানই আজ ভারতের অমঙ্গলের পথে দাঁড়াইতে পারে না। আজ যদি কোন কারণে তাহারা হিন্দু সমাজের সঙ্গে মিলিতে না-ই পারেন, যদি হিন্দুর সঙ্গে মিলিতে গেলে তাঁহাদের নিজের স্বার্থ অথবা ইসলামেরই কোন স্বার্থ বিনষ্ট হয় বলিয়া তাঁহারা আশঙ্কা করেন, তবে তাই বলিয়াই কি তাহারা ভারতের কাঁধে দাসত্বের জিঞ্জিরকে আরো কিছুদিন জড়াইয়া রাখিতে দিবেন? নিশ্চয়ই নয়।

এই সময়ে বিলাতী প্রচলনের জন্য কোটী কোটী টাকা খরচ করিতে যাওয়ার চেয়ে যে, ভারতের বুকে তাহার অর্দ্ধেক টাকা খরচ করিয়া মিল স্থাপন করা লাভজনক, তাহা অতি সাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন। আর যদি বিলাতী ব্যবহারে মুসলমান সম্প্রদায়ের তেমন কোন গুপ্ত-লাভ থাকে, তাহা প্রকাশ করাই ভাল। আমরা বিলাতী ব্যবহার করিলে বিলাত তাহার বদলে যে আমাদিগকে কি অশ্ব-ডিম্বই প্রদান করিবে, তাহা বেশই জানা আছে। আর বিলাত জানে যে, শুধু দরিদ্র মুসলমান সমাজ বিলাতকে বাঁচাইতে পারে না। আর যদি পারে, এবং সত্যই বিলাত ভারতের দরিদ্র মুসলমানকে কিছু দেয়, তবে সে দান আমরা চাহি না। কারণ ভারতের যাহা প্রাপ্য, সে তাহার নিজের পরিশ্রম, সাধনা ও শক্তি দ্বারাই লাভ করিতে চাহে। জাগ্রত-শক্তি আজ এই কথাই বার বার করিয়া বলিতেছে ও বলিবে।

অবশেষে বলিতে চাহি, যে মুসলিম বাদশাহগণ ভারতের 'কুটীর-শিল্পের' জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন, সেই মুসলিম জাতির যাঁহারা আজ মুকুটবিহীন ভোগের-রাজা, তাঁহারা ভারতের কুটীর-শিল্পকে বলিতে চাহেন 'উচ্ছন্ন যাও'। ইহা ভারতের মুসলিম জাতির পক্ষে কত বড় কলঙ্ক, তাহা ভাবিলেও শরীর ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া আসে। বিগত আন্দোলন হইতে ভারতের তাঁতী-জোলার অবস্থা অনেকটা ভাল হইয়াছে, হইবারই কথা, কিন্তু তাহা বিলাতের সহিবে কেন, অথবা 'বিলাত-বন্ধুর' সহিবে কেন? জানি না বোম্বাইর খোজা মুসলমানদের এই বিলাতী প্রচলন প্রচেষ্টা ও তাহার সংবাদ কতটুকু সত্য। যদি সত্যই হয়, তবে তাঁহাদের খুলিয়া বলা প্রয়োজন ছিল যে, বিলাতী বস্ত্রে আমাদের কি লাভ? যদি সত্যই লাভ হয়, তবে কি তাহা মাত্র মুসলমানদেরই হইবে? হিন্দুরা কোন্ দোষ করিল ইহাতে?

তৎপরে বিলাতের ইসলাম-মিশন সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি। আমরা জানি, এই মিশনের উদ্দেশ্য ইসলাম প্রচার—কোর-আনের-সত্য পাশ্চাত্যের ঘরে ঘরে পৌছানো। কিন্তু সেদিন দেখিলাম, ইসলাম মিশনের প্রেসিডেণ্ট নাকি বিলাতী মাল চালাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন। ইহার মূলে আবার কোন্ গূঢ় উদ্দেশ্য লুক্কায়িত রহিল? ইসলাম প্রচারের সঙ্গে বিলাতী প্রচার বা প্রচলনের কোন সম্বন্ধ রহিয়াছে কি? বিলাতে এই মিশনকে থাকিতে দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই কি বিলাতী মালকে ভারতে থাকিতে দেওয়া উচিত? জানি না ইহার রহস্য। তবে বলিতে চাহি, আমরা আশা করি নাই, ইসলাম প্রচারক ইসলামের জন্য প্রাণ দিতে গিয়া ফের বিলাতী মালের জন্য প্রাণ দিবেন। যদি ইহার মূলে কোন গূঢ় সত্য অবশ্যই থাকে, তাহাও তিনি জানাইলে ভাল হইত।

ভারতের দারিদ্র্য-বিদূরণে—ভারতের হাহাকার নিরাকরণে বিলাতের এই প্রকার সাহায্যের যে কোন প্রয়োজনই থাকিতে পারে না, তাহা ভারতের নেতারা—যাঁহারা নিজের প্রাণের চেয়েও ভারতকে ভালবাসেন, তাঁহারা 'একশ' বার বলিতেছেন। এই অবস্থায় আমরা সসম্ভ্রমে ইমাম-সাহেবকে বলিব, ভারতের বুকে বিলাতী মাল প্রচলনের জন্য যে পরিশ্রম করিতে হয় বা হইবে, তাহাতে ইসলাম মিশনের শক্তি ব্যয় করা কোন প্রকারেই বাঞ্ছনীয় নহে। যদি এই জন্য বিলাত সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতিই দেয়, তবু তাহাতে সংযুক্ত ভারতের বা মুসলিম ভারতের বা কোন ভারতেরই মঙ্গল হইবে না। ভারতের মঙ্গল ভারতবাসীই করিবে, এবং ইহার জন্য ভারতে যে সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহাই আমাদিগের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করিবে—বিলাত নহে। —বাংলার বাণী

ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ

(অসিত মুখোপাধ্যায়)

সম্প্রতি শারদা 'বাল্য-বিবাহ-নিরোধ বিল' পাশ হইয়া গিয়াছে। এই আইন প্রনয়নের উদ্যোক্তাগণ বলেন,—"অপরিণত বয়স্ক পিতামাতার সন্তান সন্ততি জীর্ণ-শীর্ণ, রুগ্ন এবং স্বল্পায়ু হয়। দেশে শিশু-মৃত্যুর বাড়াবাড়ির প্রধান কারণ হইল বাল্য-বিবাহ। এই আইনের ফলে দেশে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা অনেকাংশে কমিয়া যাইয়া ঘরে ঘরে রাম-মূর্ত্তি, ভীম ভবানীর আবির্ভাব হইবে।" আমরা বলিতে চাই,—এই বিরাট শিশু-মৃত্যুর প্রধান কারণ বাল্যবিবাহ নহে, পরন্ত উহা গৌণ কারণগুলির মধ্যে একটা হইলেও হইতে পারে। শিশু মৃত্যুর প্রধান কারণ হইল—গো-দুগ্ধের অভাব, দুর্ম্মূল্যতা এবং উহা যথাযথ সরবরাহ না হওয়া। দেশে প্রচুর পরিমাণে খাঁটি গো দুগ্ধ পাইবার সম্ভাবনা না হইলে, যতগুলিই বাল্য-বিবাহ নিরোধ বিল পাশ হউক না কেন, শিশুর জীর্ণ-শীর্ণতা, রুগ্নতা এবং মৃত্যু সংখ্যা যে খুব বেশী একটা কিছু কমিয়া যাইবে এরূপ বিশ্বাস আমরা করি না।

গো-দুগ্ধ মানব জীবনের প্রথম ও চরম ক্ষুন্নিবৃত্তির উপাদান। শিশু ভূমিষ্ট হইবার পর মুহূর্ত্ত হইতেই গো-দুগ্ধ পান করিয়া মানব জীবনের প্রথম ক্ষুধা নিবারণ পূর্ব্বক জীবন-যাত্রা আরম্ভ করে। অন্যদিকে জরাজীর্ণ স্থবির মুমূর্ষু ব্যক্তি গো-দুগ্ধ পান করিয়া তাহার অস্তগামী শেষ জীবনের জ্যোতিঃটুকু

রক্ষা করে। গো-দুগ্ধ মুখে লইয়াই মানব জীবন-যাত্রার সুরু আবার গো-দুগ্ধ মুখে লইয়াই মানবলীলার অবসান। এই সুরু এবং অবসানের মাঝখানে যে আমাদের একটা নাতিক্ষুদ্র জীবন, সেই জীবনের সঙ্গে গো-মাতা ও গো-দুগ্ধের যে কতদূর নিকট সম্বন্ধ; তাহার ইতিহাস প্রদান করা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কুলায় না—প্রকাণ্ড গ্রন্থের আবশ্যক হয়।

আমরা যে সমস্ত জিনিষ আহার করি, তাহার কোন একটা জিনিষ আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না;—শুধু একাই বাঁচাইয়া রাখিবার মত পরিপূর্ণ ক্ষমতার দাবী করিতে পারে গো-দুগ্ধ। মানব জীবন ধারণোপযোগী শর্করা, লবণ, জল, চর্ব্বি প্রভৃতি সকল পদার্থই গো-দুগ্ধে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। তাই ভারতের নীতিবেত্তা গাহিয়াছেন—"গব্যহীনং কুভোজনং", "আয়ুর্ঘৃতং হবি," "সর্ব্ব রোগ-হরং তক্র," "ন তক্রসেবী ব্যথতে কদাচিন্ন তক্রদগ্ধা প্রভবন্তি রোগাঃ," "সুরাণাম মৃতং সুখায় তথা নরাণাং ভুবি তক্রমাহু।"...তার্কিক-প্রবর চার্ব্বাক উপদেশ করিয়াছেন—"যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" আমরাও এই মহাপুরুষের সুরে সুর মিলাইয়া বলিব—ঋণ করিয়াই যদি কিছু উপভোগ করিতে হয়, তবে তাহা একমাত্র গো-দুগ্ধই।

গো-দুগ্ধের বিশেষত্ব প্রদর্শনের জন্য অন্যান্য প্রাণীর দুগ্ধের সহিত ইহার একটু তুলনা করা যাইতেছে। দুগ্ধকে সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা :—

গো-দুগ্ধ

গো দুগ্ধ	গুরুত্ব	নিরেট পদার্থ	ক্ষীর	নবনীত	প্রোটীন (আমিষ)	দুগ্ধ-শর্করা	জল
মহীশূরী „	১০·২৭	১৩·১১	·৬৯	৪·৫০	৩·৮৫	৪·০৩	৮৬·৮৯
আজমীরী „	১০·২৯	১২·৫৫	·৭২	৪·১৬	৩·৬৪	৪·০৩	৮৭·০৫
বরোদা „	১০·২৮	১২·৪৪	·৭০	৪·০২	৩·৬৯	৪·০৩	৮৭·৫৬
দিল্লী „	১০·২৫	১২·৯৫	·৯৯	৪·৫১	৩·৫১	৪·২৪	৮৭·০৬
ইংলিশ „	১০·২৭	১৩·৪৪	·০৫	৪·৮৯	৩·৭৯	৪·০১	৮৯·৫৬
নেলোর „	১০·২৭	১২·৭৯	·৭২	৪·৪৭	৩·৪৯	৪·১১	৬৮·২৭
সনিবল „	১০·২৪	১৮·০৮	·৬৯	৪·৯৭	৩·৩৮	৪·০৪	৮৬·৯২

মানবী, অশ্বী, ও গর্দ্দভীর দুগ্ধ

শ্রেণী	জল	চর্ব্বী	শর্করা	প্রোটিন	ক্ষার
মানব	৮৮·২০	৩·৩০	৬·৮০	১·৫০	০·৩
অশ্ব	৮৯·৮৩	১·১৭	৬·৮৯	১·৮৪	০·৩০
গর্দ্দভ	৯০·১২	১·২৬	৬·৫০	১·৬৬	০·৩৬

ছাগ, মেষ ও মহিষের দুগ্ধ

শ্রেণী	জল	চর্ব্বী	শর্করা	প্রোটিন	ক্ষার
ছাগ	৮৬·০৪	৪·৬৩	৪·২২	৪·৩৫	০·৭৬
মহিষ	৮২·৬৩	৭·৬১	৪·৭২	৪·১৪	০·৯০
মেষ	৭৯·৭৬	৮·৬৩	৪·২৮	৬·৬৮	০·২৭

জলচর জন্তুর দুগ্ধ

শ্রেণী	জল	চর্ব্বী	শর্করা	প্রোটিন	ক্ষার
শুশুক	৪১·১	৪৮·৫০	১·২৩	৮·৫৯	০·৫৭
তিমি	৪৮·৬৭	৪৩·০৭	৭·১১	×	০·৪৬

কোন কোন বিষয়ে অন্য দুগ্ধের উৎকর্ষ থাকিলেও অভিনিবিষ্ট চিত্তে বিবেচনা করিলে সাধারণভাবে গো-দুগ্ধই প্রথম স্থান অধিকার করিবে। শিশু এবং বৃদ্ধের জীবন ধারণোপযোগী এনাবলিক ও মেটাবলিক শক্তি গো-দুগ্ধেই বেশী পরিমাণে বিদ্যমান আছে।

বাঙ্গালোরের ডাক্তার শ্রীনিবাস রাও রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইউরোপীয় গো-দুগ্ধ অপেক্ষা ভারতীয় গো-দুগ্ধ উৎকৃষ্ট। ভারতীয় গো-দুগ্ধে ইউরোপীয় গো-দুগ্ধ হইতে নবনীতের পরিমাণ অনেক বেশী। গো-দুগ্ধ দোহনকালে প্রথম অংশের দুগ্ধে নবনীতের অংশ কম থাকে। তাড়াতাড়ি দোহন করিলে ঐ দুগ্ধে মাখনের ভাগ বেশী থাকে। কল দিয়া দুগ্ধ দোহন না করিয়া হাত দিয়া দোহন করিলে উহাতে অপেক্ষাকৃত বেশী নবনীত পাওয়া যায়।

হরিদ্রাবর্ণ ও ঘন দুগ্ধে নবনীত বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। সাদা ও ঘন দুগ্ধে বেশী ছানা পাওয়া যায়, দধিও ভাল হয়; কিন্তু সেরূপ বেশী নবনীত পাওয়া যায় না। পাতলা নীলাভ দুগ্ধে ছানা ও মাখনের ভাগ কম থাকে, তাই উহা শিশু ও রোগীর ব্যবহারের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

সময়ের ও খাদ্যের তারতম্য অনুসারে গো-দুগ্ধের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বর্ষাকালের গো-দুগ্ধে অন্যান্য কাল অপেক্ষা জলীয়ভাগ বেশী থাকে। গাভী যে শ্রেণীর খাদ্য বেশী খায়, দুগ্ধেও সে শ্রেণীর গুণ বেশী পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। প্রাতঃকালের দুগ্ধ অপেক্ষা অপরাহ্নের দুগ্ধে নবনীতের পরিমাণ অনেক বেশী থাকে।

গাভীর বর্ণ ভেদেও দুগ্ধের গুণাগুণের তারতম্য হইয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণ গাভীর দুগ্ধ পিত্তনাশক, শ্বেতবর্ণা গাভীর দুগ্ধ বাতঘ্ন, রক্তবর্ণা গাভীর দুগ্ধ কফঘ্ন, কপিলা (কটা রঙের) গাভীর দুগ্ধ ত্রিদোষঘ্ন।

"সিতানাং বাতঘ্নং কৃষ্ণানাং পিত্তনাশকং।

শ্লেষ্মঘ্নং রক্ত বর্ণানাং ত্রিনহন্তি কপিলাপয়ঃ।"

দুগ্ধ অল্পক্ষণ জ্বাল দিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে পান করা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিয়ম। কাঁচা দুগ্ধ গুরুপাক এবং স্বাদহীন; তাহাতে নানাবিধ রোগ-বীজাণু থাকাও অসম্ভব নহে। কাঁচা দুগ্ধ যেমন গুরুপাক, জ্বাল দিয়া বেশী ঘন করা দুগ্ধও তদ্রূপ গুরুপাক। বিলাতে কাঁচা দুগ্ধ পানের সমুচিত ব্যবস্থা আছে। গাভী দোহন করার পর কিছু সময় পর্য্যন্ত দুগ্ধ গরম থাকে,—ঐ দুগ্ধকে ধারোষ্ণ দুগ্ধ বলে। ধারোষ্ণ দুগ্ধ সেরূপ গুরুপাক হয় না; ঠাণ্ডা দুগ্ধ পান বিবিধ রোগের হেতু।

দুগ্ধের অস্বচ্ছতার কারণ এই যে, উহাতে জলীয় পরমাণুর সহিত ঘৃতের পরমাণু, লিউকোসাইটিস্, কেজিন ও ক্যালসিয়াম পরমাণু সকল এরূপে বিদ্যমান আছে যে, দুগ্ধ অধিক সময়ে রাখিয়া দিলেও ঐ সকল পরমাণু জলীয় পরমাণু হইতে পৃথক হইয়া নীচে জমিয়া যাইতে পারে না। শিশু, বৃদ্ধ, কৃশ এবং দুর্ব্বলের পক্ষে গো-দুগ্ধ অমৃতোপম রসায়ন। বাংলায় গো-দুগ্ধের অভাব হইয়াছে বলিয়াই আমরা স্বল্পায়ু, দুর্ব্বল এবং ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছি।

আয়ুর্ব্বেদে দুগ্ধের গুণ :—

শুক্রবর্দ্ধক, কফ, বায়ু ও পিত্তনাশক, মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক, পিত্তশ্লেষ্মাবর্দ্ধক, বলকারক, অগ্নি উদ্দীপক, দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিকারক, ক্ষয় নিবারক এবং কান্তি বর্দ্ধক।

—আর্থিক উন্নতি

তোমারে কুড়ায়ে পেনু বিদায় বেলায়—

—বন্দে আলী মিয়া

তুমি মোরে ভালোবাসো এ কথাটি গিয়েছিনু ভুলে
তোমারেই পড়িত না মনে ;—
কোনো দিন যদি কোনো ক্ষণে
সহসা জাগিত মনে মুখখানি—হাসিটুকু তব
ভাবিতাম—নারীর পরাণ বুঝি চির অভিনব—
একদা যে ভালোবেসে কাছে আসি বসিয়াছে পাশে
কহিয়াছে কত কথা আধ্-ফোঁটা কলিকার ভাষে
আজি তাহা মনে নাই—ভুলে গেছে—
এমনি ভুলিতে জানে তারা
তার লাগি চোখে কেন বহে মোর ধারা !
আপনি সে বেসেছিলো ভালো—এসেছিলো জীবনের কূলে
আজ যদি সে-কথাটি যায় গো সে ভুলে
আর কারে বেসে থাকে ভালো
কিবা দোষ তার ;
এর লাগি কেন হাহাকার !
চিরকাল একজনে দিতে হবে প্রাণ
এর কোনো নাহিক বিধান।
—সে যে মোর কেহ ছিলো নাকি
বুকের গহন তলে সে কথা লুকায়ে রাখি
ভাবিতাম—কেহ নহে মোর
যার লাগি ফেলিয়াছি এত আঁখি-লোর
সে তো কভু দেখে নি চাহিয়া ;
সে যদি ভুলিতে পারে ও-বেলার কথা
মোর বুকে তার লাগি রাখিব না দাহ—
রাখিব না মন-ব্যাকুলতা।

আজি তুমি অকারণে এতদিন পরে
এলে মোর ঘরে
জানাইলে—কহিলে গোপনে
'ভালোবাসি আজো প্রিয়—পূজি তোমা মনের গহনে।

তোমারে ভুলিতে পারি হেন মোর শকতি যে নাই
নিখিল ভরিয়া তব মুরতিরে দেখিবারে পাই।'
আঁখি জল দিয়া
গান গেতে কেঁদে কেঁদে কয়ে ছিলে প্রিয়া।
গানের সুরের সাথে
কুমারী বুকের গোপন কামনা ঝরে পড়ে বেদনাতে।

কানে মোর বাজে আজো সেই সুর ধ্বনি
আঁধার হিয়ার তলে বেদনার জলে যেন মণি
ওই সুরে ডেকে গেল মানসী আমার
আর কি থাকিতে পারি রুধি দিয়া দ্বার
সবুজ মাঠের সীমা—সুদূরের মায়ালোক পানে
পাড়ি দিয়া চলে গেনু আলোকের ধ্যানে।

পাঠরতা প্রিয়তমা হাসি দিয়া বন্দিলে আমায়
কাছে ডেকে বসাইলে পাশে
—হৃদয়ের প্রেম যেন ওই চোখে ওই মুখে ভাসে;
কাছে বসি শুধালে খবর
কানে কানে কয়ে গেলে—'প্রিয়তম, পথ চেয়ে গণিছি প্রহর।
কাল কেন এলে নাকো—আজ এত বেলা
মোরে বুঝি করো অবহেলা।'
অভিমান রাঙা মুখখানি
বেদনায় ফোটে নাকো বাণী।

এত মোর আপনার করি—এত হিয়া ভরি
আর কভু পাই নিক মোর বুক পাশে
তার লাগি কাঁদে মোর চির বিভাবরী;
তোমার ছবির চেয়ে তুমি অতুলন
তিল তিলরূপ গড়া ভুবন মোহন।
প্রিয়তমা জানো নাকি
তোমার আলেখ্য দিতে মোরে দিলে ফাঁকি—
পাশে বসি মৃদু ভাষে কহিলে গোপনে
'তোমার ছবিটি যে গো নিয়ে গেছ—
এ কথা কী নাহি তব মনে!

তুমিই জিতিবে বুঝি, হবে নাকো তা।'
অভিমান করেছিনু—কহি নাই কথা।
ভালোবাসো মোরে এত যার লাগি নাহি তব ভয়
তোমার সখিরা হেসে আব্ডালে কত কথা কয়।
কত ছলে মোরে তুমি বাঁধিতে যে চাহ
কথায় ফুটিয়া ওঠে মনের প্রদাহ
আসিবারে করো মানা
এ কথা তো আছে জানা
'চলেই যাইবে প্রিয়—পারিব না ধরিয়া রাখিতে
বসো আরো ক্ষণকাল—হিয়া মোর ভরে তুলি গীতে'।

চাহিয়া ও-মুখ পানে হাহাকারে কেঁদে ওঠে প্রাণ
বিরহ বেদনাতুরা মোর পরে চির অভিমান।
তোমারে বুকেতে ধরি রাঙা ঠোঁটে চুমু দিতে চাই
কঠিন নিষেধ জাগে
গোপন কথায়ে মোর চিরকাল মরমে লুকাই।
জীবন এমনি করে তিলে তিলে মরিবে পুড়িয়া
তবু মোরা ছিঁড়িব না সমাজের কঠিন নিগড়
যাবো নাতো দূরে বাহিরিয়া।
পিষে পিষে হবো শেষ তবু যেন ভালো
তবু মোরা হেরিব না আকাশের চাঁদ
হেরিব না নীলিমার আলো।

কাল চলে যায়
বিদায়ের কালিমা ঘনায়,
তব লাগি নোনা জলে ভরে আসে আঁখি
মুখেতে হাসিয়া তারে ঢাকি।
ডালিম শাখার তলে দাঁড়াইলে মোর মুখে চেয়ে
মোর সাথে এলে তুমি একা পথ বেয়ে।
তোমার সাহস দেখি মনে জাগে ভয়
অপার বিস্ময়।
তোমারে শুধানু প্রিয়া 'এ কী তব লীলা সাহসিকা!'
হাসিয়া কহিলে তুমি 'সবে মোর ভালে দেছে এঁকে
কালিমার কালো-রাজটীকা

এর বেশী তাহাদের শকতি তো নাই।
সেই সে কালিমা মাঝে মোর যেন জয়ধ্বনি শুনিবারে পাই;
ওই সুরে বাজে মোর মুক্তির লেখা
—তোমায় আমায় যেন শাশ্বত দেখা।'

ঝোপের আঁড়ালে এসে দাঁড়াইলে রাণী
নয়নে ঘনায় তব বিদায়ের অকথিত বাণী—
দুই চোখে ভরে এলো জল
জীবন-রহস্য হোথা আঁধার অতল।
তোমারে একেলা ফেলি চলে যেতে মন নাহি চায়
নিঠুর মরণ সম লইনু বিদায়।
আজি এই বিদায়ের মাঝে
তোমারে কুড়ায়ে পেনু মোর সারা কাজে।

কুঁড়ি-ফোটা

—কথিকা—

—এ, রাজ্জাক

—বিশ্বোদ্যানের মাঝে ছোট্ট একটা ফুলের গাছ—তাতে ছোট্ট একটা ফুলের কুঁড়ি—ফোট ফোট।—

দিনের পর দিন রাতের জ্যোস্না আর ভোরের হাওয়া তাদের মোহন ছোঁয়া দিয়ে যেত—কিন্তু কুঁড়ি তার ফোটা-টাকে পরিপূর্ণ ক'রে তুল্‌তো না।......

কেউ যদি তাকে জিজ্ঞেস্ ক'রতো, 'কুঁড়ি, তুমি ফুট্‌চো না কেন?'—সে বল্‌তো, 'বাঞ্ছিত আস্‌চে না যে, তাই ফুট্‌বো কেমন ক'রে?'

* * * *

একদিন একটা ভ্রমর গুন্ গুন্ ক'রতে ক'রতে এসে কুঁড়ির চারি-পাশে একবার ঘুরে গেল—একবার তার অন্তর-সুধা পান ক'রবার চেষ্টাও ক'রেছিল বুঝি।

—কুঁড়ি ফুটে উঠ্‌লো—

রাতের জ্যোস্না আর ভোরের হাওয়া যখন আবেশ-ভরা ঢুলু-ঢুলু চোখে কুঁড়ির পাশ দিয়ে যায়, তখন ভুর্-ভুর্ ক'রে একটা সুবাসের বাহার তাদের নাকে এসে লাগে।

চেয়ে দেখে তারা কুঁড়ি ফুটেচে।

জিজ্ঞেস্ ক'রলে তারা, 'আজ যে বড় ফুটে উঠেচে?'

—'বাঞ্ছিত এসেছিল যে'—

'কে—সে?'

'ধ্যেত্, তার নাম কি বল্‌তে আছে আমায়?'

'ব'ল্লে কেড়ে নেবো নাকি?'

'বিশ্বাস কি।'

'সত্যি বল না—'

'কেন ব'লবো?

'কেন ব'লবে? আজ বাঞ্ছিত-জনের সোণার পরশ পেয়ে তোমার হৃদয়-বীণায় যে সুরের রাগিনী খেলে যাচ্ছে—তা তুমি লুকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌চো না ব'লেই বল্‌বে। তাকে পাওয়ার পরিপূর্ণ আনন্দ—তোমার সমস্ত অপূর্ণতাকে ডুবিয়ে দিয়ে ভেসে যাবে। সুতরাং তার নাম-না-বলার অপূর্ণতাটুকু রেখে আর পরিপূর্ণ আনন্দ-টাকে খর্ব্ব ক'রচো কেন?'

'আচ্ছা, তবে বল্‌চি না হয়—তার নাম ভ্র-ভ্র-ভ্রমর—।'

* * * *

মানুষের অন্তর-কন্দরে যে চিরন্তন প্রেম-প্রিয়া তার লজ্জা-রাঙা মুখখানি ঘোমটা-ঘেরা ক'রে রাখে—সেই বুঝি কুঁড়ি—আর তার বাঞ্ছিতই ভ্রমর হয় ত।......
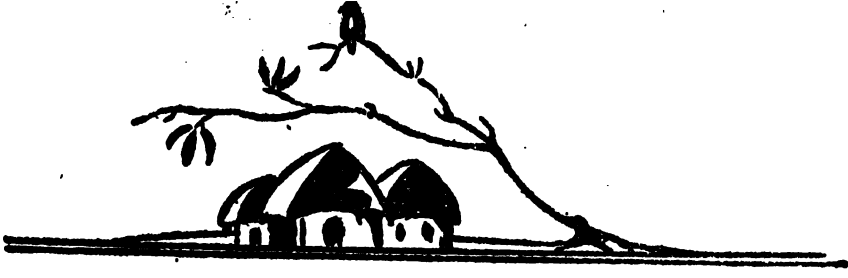
উল্টার আত্মকথা

-প্রবন্ধ—

—এম-এ, আজম, বি-এস-সি

বিশ্ব সৃষ্টির বহু পূর্ব্বে অন্তরীক্ষে আমার জন্ম হয়। সৃষ্টি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমারও ক্রম-বিকাশ হইয়াছে। পরম দয়ালু বিধাতার বরে আমি মৃত্যুঞ্জয়ী। আমার এ জন্মকে সার্থক করিয়া তিনি সর্ব্ব চরাচরে আমার অসীম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। স্বরাজ-শাসন, স্বায়ত্ত-শাসন, ব্রিটিশ-শাসন—যাহাই হউক না কেন, আমার শাসনই প্রকৃতপক্ষে সমস্ত নিয়ন্ত্রিত করিতেছে! আল্লার আরশতলে আমিই অপ্রতিদ্বন্দ্বী অপ্রতিহত প্রভাবশালী—সার্ব্বভৌম!

আমারই ইঙ্গিতে লক্ষ লক্ষ লোকের চোখে ধূলি দিয়া আপাতঃ সমতল চেপ্টা পৃথিবীটা গোল হইয়া গেল। শুধু তাহাই নহে, উহা প্রচণ্ড গতিতে সূর্য্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, আর ঐ গতিশীল সূর্য্যটা নিশ্চল!! সাধারণতঃ মনে হয়, যতই উপরে উঠা যায়, সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইবে বলিয়া অধিকতর উষ্ণতা অনুভূত হইবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত! পরন্তু ভূগর্ভে যত অধিক প্রবেশ করা যায়, ততই অধিকতর তাপ উপলব্ধি হয়—আর ঊর্দ্ধে ক্রমেই শৈত্য। একটা নির্জ্জীব পৃথিবীর আকর্ষণে (gravity) সজীবেরাও স্ব-স্থানে নিরাপদে রহিয়াছে। তদুপরি নির্জীব সূর্য্যের আকর্ষণে পৃথিবী শূন্যে অবস্থান করিতেছে। পূর্ব্বে শুনিতাম যে, কোন বৃষ, বা কোন মেষ, বা অজগর পৃথিবীকে মস্তকে ধারণ করিয়াছে। কাহারো মতে Atlas (এটলাছ) নামক মহাশক্তিশালী দেবতা উহা স্কন্ধে করিয়া রাখিয়াছেন। এই সমস্ত জীবনধারী মেষ, বৃষ, অজগর কিংবা এটলাছের দাবী ব্যর্থ করিয়া আমি পৃথিবীটাকে নির্জীব অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করিয়াছি। তারপর এই নির্জীব চন্দ্র-সূর্য্যেরই আকর্ষণে নদী আর সাগরের জল ফুলিয়া জোয়ার হয়। এখানেই আমার রহস্য! আমারই প্রভাবে আজকাল কলকারখানার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জীবিতদের সকল শক্তি নিঃশেষে নির্জীব শরীরে লক্ষ-গুণ শক্তি প্রবলাকারে দৃষ্ট হইতেছে।

সূর্য্য আর চন্দ্রকে একই সমান দুইখানা থালার মতো দেখা যায়,—পৃথিবীকে ত মনে হয় বিরাট, বিপুল, এবং অনন্ত! কিন্তু আমার কল্যাণে সমস্তই উল্টা! পৃথিবী বা চন্দ্র হইতে সূর্য্য লক্ষ লক্ষ গুণ বৃহৎ। আর ঊর্দ্ধে—অতি ঊর্দ্ধে যে মিটু মিটু করিয়া তারকা-হাসে—তার কারণ, তাহার সম্বন্ধে একটা অপমানজনক ধারণা পোষণ করা হয় বলিয়া। উহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মনে হয়,—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাদের অনেকেই সূর্য্য হইতেও অধিকতর বৃহৎ। ঐ দূর দিগন্তের সীমার আকাশপ্রান্ত পৃথিবীর বুকে মিশিয়া রহিয়াছে বোধ হয়—বস্তুতঃ আমার কর্তৃত্বাধীন তাহা হইবার যো নাই।

আকাশের চন্দ্রকে অবলম্বন করতঃ কত কবি কবিত্বের ফোয়ারা ছুটাইয়া পৃথিবীর বক্ষঃ প্লাবিত করিয়া দিয়াছেন। চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না ধারায় অবগাহন করিয়া বৃক্ষ-লতা, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, মানুষ-দেবতা সকলেই কৃতার্থ। 'চকোর' পাখী নাকি উহারই আলোক-সুধা পান করিয়া জীবন রক্ষা করে। চন্দ্র কবিতার প্রাণ, সাহিত্যের রস, প্রেমিকের সান্ত্বনা আর সৃষ্টির শান্তি। ইহার বিভিন্ন নাম সংখ্যাধিক্যে ভগবানের নামকেও পরাস্ত করিয়াছে; কিন্তু আমার কৌশলে চন্দ্রদেব সত্যিকার আকার ধারণ করিয়া সুধা বিলাইতে আসিলে সে 'সুধা' দেখিয়া মৃত্যু-ভয়ে সকলেই পলায়নপর হইবে। তারপর সৌন্দর্য্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ এ চন্দ্রদেবের চেহারাখানা প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করিয়া আর কাহারও বিন্দুমাত্র স্পৃহা হইবে না যে, পুত্র-কন্যার নাম পূর্ণেন্দু বা বিধুমুখী রাখে। যুগ যুগান্তরের বদ্ধমূল ধারণার

বুকে নিষ্ঠুর পদাঘাত করিয়া সে স্থলে কতগুলি পাহাড়-পর্ব্বত এবং বিশাল গহ্বরের সৃষ্টি করিয়াছি ;—এ যে আমার বিধাতার দেওয়া শক্তি !—চন্দ্রের মা সুতা কাটুনী বুড়ী বহু পূর্ব্বে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, আর চন্দ্রদেব যে খরগোসটীকে (শশ) ক্রোলে-পিঠে করিয়া মানুষ (?) করিয়াছেন—তাহা হয় ত কোন একটী গহ্বরের নীচে নিরুদ্দেশভাবে পড়িয়া রহিয়াছে।

আকাশটা কি? আসলে 'আকাশ' বলিয়া কোন জিনিষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। উল্টা হওয়া চাই-ই চাই! একটা অবলম্বনও থাকিতে দিব না। বাইবেলে আছে—আকাশের কবাট খুলিয়া দিলে পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত হয়! দেখিতেও ইহাকে প্রকাণ্ড একটা ঘরের ছাদ কিংবা চাঁদোয়া বলিয়া মনে হয়। আমারই অঙ্গুলী-সঞ্চালনে একটা প্রচণ্ড প্রভঞ্জনের সঙ্গে উহা অতি দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া হয় ত পরপারের সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে। এখন যদি মানুষের যত দূর ইচ্ছা উচ্চে উঠিবার শক্তি থাকিত—তবে তাহার মস্তক কিছুতেই বাধা প্রাপ্ত হইত না!—এ অবাধ গতিপথ আমিই উন্মুক্ত করিয়াছি। আমি অমিত পরাক্রমশালী আমি— উল্টা আমার নাম!

আপামর-সাধারণ গাছপালাকে সাধারণতঃ অনুভূতি শক্তিবিহীন মনে করিয়া থাকে, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার উল্টাই প্রমাণিত হইয়াছে। স্যার জগদীশ বসু গাছকে মানুষের মত বেহুশ (Chloroform) করিতে সমর্থ হইয়াছেন ;—গাছে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সবই আছে!—আমোদ-প্রমোদের নেশা—তাও আছে। উদ্ভিদগণ গীত বাদ্য প্রিয়।

শরীরের যে রক্ত—যাহা একেবারে লাল বলিয়াই সকলে জানে—উহা প্রকৃত বর্ণহীন। অসংখ্য লাল জীবাণু (Red Corpuscles) তাহার মধ্যে অবস্থান করে বলিয়াই উহাকে তাদৃশ বলিয়া ভ্রম হয়। এই জীবাণুগুলি দেহ রক্ষীর কাজ করে। দেহ ধ্বংস করে জীবাণু—রক্ষাও করে জীবাণু—এখানেই উল্টার বাহাদুরী। জগত স্তম্ভিত হইয়া দেখুক উল্টার শক্তি—উল্টার মাহাত্ম্য—উল্টার স্পর্দ্ধা! উল্টার নির্দ্দেশেই 'বিষস্য বিষ ঔষধম'! বসন্ত রোগের প্রতিষেধক বসন্তেরই জীবাণু! (Vaccine) উল্টার নির্দ্দেশেই যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণঘাতী হইয়া দাঁড়ায়! অগ্নি, জল, বায়ু, মৃত্তিকা—ইহার যে কোনটীর অভাব হইলে এক দণ্ডও চলিতে পারে না, কিন্তু ভীষণ উগ্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া যখন উহারা ধ্বংস লীলায় মত্ত হইয়া উঠে—তাহাদের সে দুর্ব্বার প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিকে উপেক্ষা করে কাহার সাধ্য? তাহাদের সে বিকট ভ্রুকুটীতে মৃত্যুর ছায়া প্রতিফলিত হয়, আর সে উৎকট তাণ্ডব নৃত্যে মুহুর্মুহু মৃত্যুর বিষাণ বাজিয়া উঠে।

খাদ্য দ্বারা জীবন রক্ষা হয়—আর খাদ্যই দেহে নানা রোগের সঞ্চার করে, যে জিনিষগুলি আপাততঃ শূন্য, (Empty) কিন্তু উহারা প্রকৃতপক্ষে বাতাসে পরিপূর্ণ! সাধারণতঃ বাতাসে প্রদীপ নিভিয়া যায়—আবার বাতাস না হইলে মোটেই প্রদীপ জ্বলিবে না।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবে যে, সূর্য্যালোক বর্ণ-হীন—উহার কোন রঙ নাই, কিন্তু এ 'নাই' এর ভিতর আমি সাত সাতটী রঙ ভরিয়া রাখিয়াছি। রামধনুর সাতটী বর্ণের বিভিন্নানুপাতের সংমিশ্রনে (বেগুনে, নীল (গাঢ়), নীল (পাতলা) সবুজ, হরিদ্রা, কমলা, লাল) বর্ণহীন স্বচ্ছ সূর্য্য লোকের উৎপত্তি। বিশ্লেষণ করিয়া (Spectrum Analysis) এ বর্ণ সপ্তক প্রত্যক্ষ করা যায়।

যে বিদ্যুৎ কত শত প্রাণীর অকাল মৃত্যুর কারণ ছিল, এক্ষণে উহা সহস্র প্রকারে মানুষের জীবন রক্ষার সহায়তা করিতেছে। আমিই তাড়িৎ-শক্তিকে 'যমদূতের' পদ হইতে অপসারিত করিয়া বর্ত্তমানে 'জীবন-দূতের, পদে বহাল করিয়াছি।

যে সমস্ত পদার্থের মধ্য দিয়া তাড়িত অতিক্রম করিতে পারে (Conductors) উহাদের ঘর্ষণের ফলে (Friction) তাড়িৎ উৎপন্ন হয় না, অথচ যে সকল বস্তুতে তাড়িৎ অবরুদ্ধ হয় (Insulators) উহাদের ঘর্ষণের ফলে তাড়িতের উদ্ভব হয় (Frictional Electricity) চুম্বক লৌহ পরস্পরের বিপরীত প্রান্ত (Opposite Pole) আকর্ষণ করে। বৃদ্ধদের মুখে গল্প শুনা যায়, তাহাদের প্রপিতামহেরা নাকি দুঃসময়ের জন্য কলসী পূর্ণ করিয়া 'রৌদ্র' রাখিয়া দিতেন এবং আবশ্যক হইলে বৃষ্টির দিনে সে রৌদ্রের দ্বারা ধান চাল শুকাইতেন। ইহা অতি অস্বাভাবিক মনে হয় না কি? কিন্তু আমার সাম্রাজ্যে অস্বাভাবিক—কি স্বাভাবিক সে বিচার সম্পূর্ণ আমার; কাহারও মতামতের কোন তোয়াক্কা আমি রাখি না। উল্টাই আমার রীতি, উল্টার শাসন মানিয়াই সমস্তকে চলিতে হইবে। যাহা হউক, আমার অভিপ্রায়

অনুসারে রৌদ্রকেও আবদ্ধ করিয়াছি (Conservation of Energy)

প্রাণীদের চক্ষু ফটোগ্রাফের কেমেরার মত ফটোতে প্রথম যে ছবি প্রতিফলিত হয়, উহা উল্টা (Negative) পরে উহাকে 'ভাও' Positive করিয়া লইতে হয়। তদ্রূপ চক্ষুর ছায়াপটে (Retina) উদ্ধৃত দৃশ্য ও (Reverse) উল্টাই থাকে—উহাকে কেহ আর ভাও করিয়া দেয় না, পরন্তু এ 'উল্টা'কেই ভাও মনে করিয়া সকলে সন্তুষ্ট থাকে। গোড়াতেই আমি সব উল্টা করিয়া দিয়াছি—তবু আশ্চর্য্য এই, মানুষের প্রকৃতি আমায় পরিহাস করিবার স্পর্দ্ধা পোষণ করে।

বাতাসের কোন 'ওজন' 'ভার' বা 'চাপ' আছে বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু বায়ুর চাপের ন্যূনাধিক্যেই ঝড়, বাত্যা ইত্যাদি সংঘটিত হয়—যাহার দাপটে আতঙ্কে শরীর শিহরিয়া উঠে।

জলে আগুন নিভিয়া যায়, আবার আগুনই জলকে চুষিয়া লয়। তরল জলের স্রোত আমারই গুন-কীর্ত্তন করিতে করিতে পাষাণের কঠিন বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সাগর সঙ্গমে ছুটিয়া যায়।

রসায়ন-শাস্ত্র আমার এক অতি বিচিত্র সৃষ্টি! সহস্র মুদ্রার একখণ্ড হীরক (Diamond) আর অতি তুচ্ছ নগণ্য কয়লা (corbon) এর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই! স্ফটিক-স্বচ্ছ উজ্জ্বল দুষ্প্রাপ্য মণি—আর অপরটি তাহার সম্পূর্ণ উল্টা—তা স্বপ্নেও আমার 'খেয়াল' যে দুইটী একই হউক! অব্যর্থ ভাবে তাহাই ফলিয়াছে।

পুরাকালে মনীষিগণ প্রচার করিয়াছেন,—ক্ষিতি (Earth) অপ্ (Water) তেজঃ (Fire) মরুৎ (Air) ব্যোম (Ether)—এ কয়টী মৌলিক পদার্থ (Elements) কিন্তু আমার চক্রান্তে ইহার একটীও মৌলিক নহে 'ব্যোম' বলিয়া কোন বস্তুর 'অস্তিত্ব'ই নাস্তি করিয়া দিয়াছি! জীবন ধারণের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় জল—যাহার অপর নাম 'জীবন' উহা যে দুইটী উপাদানে প্রস্তুত, বিভিন্নভাবে উহারা প্রাণ সংহার করিতেই উদ্যত হয়—ঠিক তদ্রূপ দুইটী মারাত্মক বিষাক্ত দ্রব্যের রাসায়নিক সংমিশ্রনে লবণ তৈয়ারী হয়! দুই বা ততোধিক বায়বীয় পদার্থের সংযোজনে একটী তরল পদার্থ—তরল পদার্থের সমন্বয়ে একটী কঠিন পদার্থ—আবার কঠিনে কঠিনে (solid) মিলিয়া বায়বীয়—ইত্যাকার অভিনয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে অহরহঃ চলিতেছে। দুইটী দুর্গন্ধ বা গন্ধহীন দ্রব্য পরস্পর মিলিত হইয়া একটী সুগন্ধের উদ্ভব। দুইটী বর্ণহীন দ্রব্য হইতে একটী বর্ণের উৎপত্তি; বৈজ্ঞানিকের চক্ষে ইহা এখন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। দুইটী 'না' একত্র মিলিয়া 'হাঁ', যদিও ইহা ব্যাকরণের সূত্র—তত্রাচ ইহার সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে রসায়নে এবং তাহা আমারই কৃপায় এবং কৃতিত্বে!

কয়লা (Charcoal) আর জল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একত্র হইয়া সুমিষ্ট চিনি প্রস্তুত হয়। বস্তুতঃ গন্ধ দ্রাবক (Sulfuric Acid) দ্বারা চিনির জলীয় অংশ সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত করিয়া নিলে কেবল কাল কয়লাই অবশিষ্ট থাকে।

তারপর আলকাত্‌রা (Coal Tar) যাহা হইতে কাল দুনিয়াতে আর দ্বিতীয়টী নাই, তাহা হইতেই শত শত প্রকারের রঙ্ প্রস্তুত হইতেছে। এত রঙ্ (Synthetic Dyestulf) যে ঐ কালোর বুকে লুক্কায়িত থাকিবে, তাহা স্বপ্নেও কেহ ভাবিতে পারেন নাই। তারপর কুৎসিৎ দুর্গন্ধময় আলকাত্‌রা হইতে নানাপ্রকার আতর (Perfumes) প্রস্তুত হইতেছে, আর সেখারিণ (Saccharine) নামক এক প্রকার চিনি যাহা সাধারণ চিনি হইতে অন্ততঃ ৫০০ পাঁচ শত গুণ অধিক মিষ্ট, তাহাও এ বিস্বাদ বিষাক্ত দ্রব্য হইতে উৎপন্ন করা হয়, ফলতঃ জার্ম্মানদের জাতীয়-সম্পদের ভিত্তি এই তুচ্ছ আলকাত্‌রা!!

যবক্ষার যান (Nitrogen) কে একটা বড় অকর্ম্মণ্য গ্যাস (Inert gas) বলা হয়—কিন্তু আমার কৌশলে উহা না হইলে সাধারণতঃ কোন বিষ, বারুদ, বিস্ফোরক (Explosives) কিছুই প্রস্তুত হয় না। গাছকে 'গাছ' আর মাছকে 'মাছ' বলিয়াই সকলে জানে—দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক উপাদানে গঠিত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। গাছ আর মাছকে মূলতঃ এক বলিয়া যে প্রকাশ করে, লোক-সমাজে পাগল বলিয়াই সে পরিচিত হয়; কিন্তু আমার বিচিত্র লীলায় আজ সেই মহাপাগলামী—সেই মহা উল্টার-বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দিকে দিকে সাড়া পড়িয়াছে; কত-গুলি গন্ধ, বর্ণ, ভারহীন সূক্ষ্ম তাড়িৎ-কণার বিভিন্ন সমাবেশে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে।

দুনিয়াকে আমি একটা সাংঘাতিক রকমের 'উল্টার' বায়ু-মণ্ডলে ডুবাইয়া রাখিয়াছি—যে দিন এ 'উল্টা'র অস্তিত্ব থাকিবে না, সে দিন দুনিয়ার ও শেষ!

কল্পনা

— কথানাট্য —

—আক্কেল মণ্ডল

[কবির গৃহ……নিশীথ রাত্রি……স্তিমিত দীপালোকে কবির ম্লান···পাণ্ডুর···বেদনাতুর মুখমণ্ডল দেখা যাইতেছে··· সাম্‌নে সদ্য-সমাপ্ত গানের পাণ্ডুলিপি···চক্ষে কবির উদাসীনের দৃষ্টি···মুখে সব কিছু না পাওয়ার ব্যথা···বাহিরে বর্ষার রিমিঝিমি রিমিঝিমি নাচন সুরু হইয়াছে···সেই দিগন্তভরা নৃত্যের ছন্দে কবির মুখে বেদনার রেখা···চক্ষে উদাসীনতার ছায়া আরও গাঢ় হইয়া নামিয়া আসিল···কবি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সম্মুখে চাহিতেই বিস্মিত হইয়া গেলেন···তাহার সাম্‌নে স্তিমিত দীপালোকের আধো আলো আধো ছায়ায় এক তন্বী তরুণী···তরুণী অপূর্ব্বা সুন্দরী···মাথায় তাহার মেঘ বরণ চুল···কণ্ঠে তাহার বন ফুলের মালা···পরিধানে মেঘ-ডুম্বুর শাড়ী···নয়নে বঙ্কিম কটাক্ষ···অধরে মৃদু-মৃদু হাসি ···বিস্মিত কবি অস্ফুট বিস্ময়ে উচ্চারণ করিলেন—কল্পনা ?]

তরুণী মূর্ত্তি—হাঁ আমি কল্পনা—।

কবি—রাজকন্যা কল্পনা—?

কল্পনা—রাজকন্যা কল্পনা—।

কবি— কিন্তু তুমি এখানে কেন ?

কল্পনা—কেন, তুমি যে আমায় ডাক্‌লে, না এসে কি করে থাকি বল ত ?

কবি—আমি আবার কখন ডাকলুম তোমায় ?

কল্পনা—ডাক নি আমায় ?—ডাকছিলে না আমাকে ? [সদ্য সমাপ্ত গানের পাণ্ডুলিপি দেখাইয়া] ঐ যে তোমার গানে তোমার প্রাণের ব্যথার অর্ঘ্য যাকে নিবেদন কর্লে—সে ত আমি—আমি নই ? এমন বাদল রাতে একলা ঘরে একলা তোমার অনেক দুঃখ, তাই না আমাকে চাই—

কবি—হাঁ, তুমিই, কিন্তু আমি ভাবছি কি করে এলে তুমি—তোমার সেই রাজপুত্র ?

কল্পনা—রাজপুত্র মৃগয়ায় গিয়েছে—সেই সুযোগে আমি তোমার কাছে চলে এসেছি।

কবি—তবে তুমি আমায় আজও ভোল নি—আজও ভালবাস ?

কল্পনা—বাসি না—তবে এলুম কেন ?

কবি—সেই ত এলে কল্পনা—কিন্তু দু'দিন আগে যদি আসতে তবে এমন ছন্ন-ছাড়ার মত জীবন কাট্‌তো না আমার—যদি দু'দিন আগে আসতে কল্পনা, তবে আমার এই নিরানন্দ নীড়ে আনন্দের উৎস উথলে উঠতো—

কল্পনা—সে কি আমারই দোষ কবি ? বাবা যে দিন তোমার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—রাজকন্যা কল্পনার একজন খেলার সাথী হল—তারপর রাজপুত্র এসে আমাকে না চাওয়া পর্য্যন্ত একদিনও যদি কিছু ব'লে থাক তুমি !

কবি—কি বলছো কল্পনা ! কিছুই বলি নি আমি ? কেন আমি ত গান গাইতুম—আমারই গাঁথা বন ফুলের মালা তোমার ঐ কম-কণ্ঠে দুলতো—আমার সে গানের অর্থ, আমার সে মালার ইঙ্গিত কি একদিনও তুমি বোঝ নি ?

কল্পনা—বুঝেছিলুম—সবই বুঝেছিলুম—সেই যে তোমার গানে যার পানে চেয়ে তরী তোমার ভাসিয়েছিলে, সে আমিই—তোমার হাতের গাঁথা মালার আমি ইঙ্গিত পেয়েছিলুম, তুমি আমায় চেয়েছিলে—কিন্তু তেমন ক'রে চাইতে পার নি আমাকে—তেমনি করে চাও নি আমাকে, যেমন করে চেয়েছিল সেই রাজপুত্র—সমস্ত আশা দিয়ে—সমস্ত আকাঙ্ক্ষা দিয়ে—সমস্ত প্রাণ দিয়ে—

কবি—কিন্তু আমি তোমার ভার তোমারই ওপর ছেড়ে

ছিলুম কল্পনা—ভেবেছিলুম, আমার প্রিয়তমা আপনিই এসে বাহুপাশে ধরা দেবে।

কল্পনা—না—না! সব সময়ে তা' ঠিক হয় না কবি। এর আরও একটা দিক্ আছে—প্রকৃতিকে—বসুন্ধরাকে ভোগ করে শক্তিমান—তোমার এতগুলো কাব্যতেও এর উপর তোমাকে তেমন জোর দিতে' দেখলুম না—তাই ত তুমি আমায় পাও নি—রাজপুত্র চেয়েছিলো—পেয়েছিলো—তার চাওয়ার মধ্যে এমন একটা জোর ছিল, যাকে আমি উপেক্ষা করতে পারি নি—প্রত্যাখ্যান করতে পারি নি।

কবি—আমার কিন্তু ধারণা ছিল কল্পনা, তোমার বাবা তোমারই জন্য রাজসভায়—রাজপ্রাসাদে আমাকে স্থান দিয়েছিলেন।

কল্পনা—না—না! ওটাও তোমার ভুল ধারণা—বাবার একটা খেয়াল ছিল—যাকে তাঁর ভাল লাগত, তাকেই তিনি রাজ-সভায় স্থান দিতেন—তোমাকে দিয়েছিলেন—রাজ্যহারা রাজপুত্রকেও দিলেন—রাজপুত্র রাজ্যও জয় কর্লো—আমাকেও জয় কর্লো—আর ভালবাসার কথা যদি বল, তবে সে ক্ষেত্রে আমি ছিলুম স্বাধীন—বাবাই দিয়েছিলেন সেই স্বাধীনতা—

কবি—আমার আরও ধারণা ছিল কল্পনা, যে, তুমি শুধু আমাকেই ভালবাসতে—

কল্পনা—এ ত তোমার ভুল কবি—ভাল আমি তোমাদের দু'জনকেই বেসেছিলুম—রাজপুত্রের রূপ ছিল—তুমিও ছিলে রূপবান, কিন্তু তোমার নীরব চাওয়ার চেয়ে রাজপুত্রের সজোর চাওয়া আমায় আকর্ষণ করতো বেশী, তাই তো তাকে বরণ করেছিলুম—রাজপুত্রের রূপে পুরুষের কঠোরতা!—আর তোমার রূপে নারীর কোমলতা! অল্পে ভেঙ্গে পড়া! অল্পে পুলক ছোঁওয়া!!

কবি—কবি কোমলতাই জানে কল্পনা—রূঢ়তাকে—অসুন্দরকে সে ঘৃণা করে—তাকে তা' মানায় না—

কল্পনা—ঠিক বলেছ কবি—রূঢ়তা—তা' কবিকে মানায় না—তা' মানায়—হাঁ, সুন্দর মানায় ঐ রাজপুত্রকে [কল্পনা কল্পনার চক্ষে রাজপুত্রের পুরুষ-সুন্দর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলেন] তাই ত তোমাকে আজও ভলোবাসি কবি [আপন মনে] কোমল কবি—কোমল নারী—একে কে না ভালবাসে! একে কে না ভালবাসে—— !!

কবি—আজও বাস?

কল্পনা—বাসি।

কবি—কাকে বেশী? আমাকে না তোমার ঐ রাজপুত্রকে?

কল্পনা—তোমার কি মনে হয় কবি?

কবি—ঐ রাজপুত্রই তোমার বেশী ভালবাসা পেয়েছে—

কল্পনা—কে জানে, হয় ত বা তাই—হয় ত বা নয়—

কবি—[উল্লাসে] নয়? তবে আমাকেই বেশী ভাল-বাস তুমি!

কল্পনা—হাঁ, তোমাকেই সব চেয়ে ভালবাসি কবি।

কবি—সবচেয়ে—বাসো?

কল্পনা—নইলে তোমার ডাকে এসেছি কেন? আর দেখছ না বন্ধু! রাজকন্যার রাজ আভরণ অঙ্গে আমার নেই—কোথায় আমার মণি কাঞ্চন—! কোথায় আমার হীরের দুল—রাজমতি হার—!! কই বা আমার পাইজোর!!! আমি জানি কবির প্রেয়সী রাজার প্রেয়সী নয়—কবির মানসী রাজপুত্রের মানসী নয়—তাই তার সাজ হবে বন-বালার—প্রকৃতির সাজে সে সাজবে—তাই না অঙ্গে আমার মেঘডুম্বুর শাড়ী—অলকে আমার বনফুল—কণ্ঠে আমার বর্নফুলেরই সাতনরী হার—কুন্তলে আমার সোঁদাল গন্ধ।

কবি—[ক্ষণিক নিস্তব্ধতার পর] সত্যই কি তুমি এসেছ কল্পনা? না আমারই এ শূন্য মাথায় শূন্য কল্পনা তুমি?

কল্পনা—ঠিক জানি নে কবি—আমি নিজেই যে কল্পনা।

কবি—কিন্তু এ কল্পনা আর আমার ভাল লাগে না

কল্পনা—[হতাশায়] আর এ ছেড়ে কিই বা নিয়ে রইব আমি—! রাজপুত্রের গলায় দোলে প্রেমের মালা আর আমার কণ্ঠে প্রেমের জ্বালা। রাজপুত্রের রাজপ্রাসাদে ওঠে আনন্দের গুঞ্জরণ আর আমার নীড়ে হাহাকার ক'রে ফেরে না পাওয়ার চির নিপীড়ন—

হায় হায় রাজকন্যা!—হায় হায় কল্পনা—!! তোমায় ভালবেসে আমি কি পেলুম, আমার প্রেমের কি দান দিলে তুমি—?

কল্পনা—সব পেয়েছ কবি—সব পেয়েছ তুমি—রাজপুত্রও তা' পায় নি যা দিয়েছি তোমাকে—

কবি—[বিষম বিরক্তিতে] কি দিয়েছ তুমি? কি পেয়েছি আমি—?

কল্পনা—কিই বা পাও নি কবি? এই যে তোমার কণ্ঠভরা গান—এই যে তোমার দুনিয়া-জোড়া যশ—সবই ত আমি তোমাকে দিয়েছি—বিরহের জ্বালা দিয়েই তো তোমার কথার মালা অত সুন্দর করে গাঁথো—আমি যে বেদনা তোমাকে দিয়েছি, সেই বেদনা দিয়েই তো তুমি তোমার অমন ধারা প্রাণ মাতান গান রচনা করেছ,—দুঃখের গান—বেদনার গান—সব চেয়ে মধুর গান—তাই না তুমি কবি—তাই না তোমার কাব্য অত মধুর!—বিশ্বের কণ্ঠে কণ্ঠে তোমার জয় গান—তোমার গানের জয় গান—বিশ্বের ঘরে ঘরে তোমার পূজা এ যে আমারই দান বন্ধু! এই ত আমার ভালবাসার মালা তোমার চারিদিকে জড়িয়ে রেখেছি' আমি—

কবি—এ সব তোমারই দান কল্পনা?

কল্পনা—হাঁ বন্ধু, আমারই দান—তোমার কল্পনার দান—[স্তিমিত দীপালোক ক্রমে আরও নিস্তেজ হইয়া আসিতে লাগিল—কল্পনার মূর্ত্তিও ক্রমে ছায়ারূপ ধারণ করিতে লাগিল—কবি চীৎকার করিয়া উঠিলেন]

কবি—কল্পনা! কল্পনা তুমি চলে যাচ্ছ—আমায় ছেড়ে যাচ্ছ?

কল্পনা—হাঁ বন্ধু, তুমি এখন বিশ্রাম কর—আমি যাই, আমার রাজপুত্র যদি হঠাৎ ফিরে আসে তবে আমায় খুঁজবে।

কবি—কল্পনা! কল্পনা!! যেও না তুমি রাজপুত্রের কাছে—মরে যাবে তুমি—

কল্পনা—মরলে—আবার আমি বেঁচে উঠবো তোমারই কল্পনায়—যুগের কবি—কালের কবি—যুগে যুগে—কালে কালে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।—

কবি—যেওনা—যেওনা—যেওনা—

কল্পনা—গান রচনা কর তুমি।

কবি—তবে তুমি আমাকে ছেড়ে যেওনা—গান আমি রচনা করবো—মিলনের গান—আনন্দের গান—বিরহের ব্যথা আর সইতে পারি নে—

কল্পনা—না—না—তবে সে গান মধুরতম হবে না—সুন্দরতম হবে না—ব্যথার কথা—বিরহের কথা সব চেয়ে মধুর কথা—ব্যথার গান—বিরহের গান সব চেয়ে মধুর গান—

কবি—যেও না—যেও না—যেও না—

কল্পনা!! না—না—না দুনিয়া জুড়ে তোমার আরও জয় জয়কার হোক—আমাকে ভালবাসা তোমার সার্থক হোক কবি—

কবি—উঃ তুমি কি কল্পনা!

কল্পনা—হাঁ, আমি কল্পনা! শুধু কল্পনা—তোমার কল্পনা—কবির কল্পনা—

[দীপ নিভিয়া গেল—অন্ধকারে কক্ষপূর্ণ হইল—কল্পনার মূর্ত্তিও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইল—উন্মাদের মত কবি-কক্ষের দ্বার খুলিলেন—কোথাও কল্পনা নাই—বাহিরে অন্ধকার—নিশীথ পৃথিবীতে বাদলের মাতন তখনও চলছে রিম্‌ঝিম্! রিম্‌ঝিম্!! খোলা দ্বারপথে বাদল বাতাস সাঁ সাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল—কবি চীৎকার করিতে লাগিলেন। কল্পনা—কল্পনা—কল্পনা।]

কবি—কল্পনা—কল্পনা—কল্পনা—

বাদল-বাতাস—সাঁ—সাঁ—সাঁ—

কবি—কল্পনা—কল্পনা—কল্পনা—

বাদল-বাতাস—না—না—না—

দ্বিতীয় গোল-টেবিলে

নব-নির্ব্বাচিত ভারতীয় প্রতিনিধি

নিখিল ভারত কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি
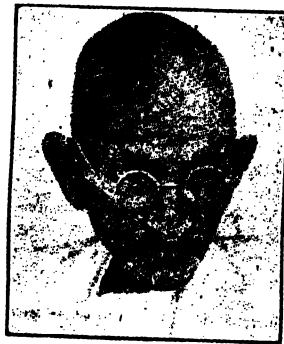
মহাত্মা গান্ধী

মিসেস্ সরোজিনী নাইডু
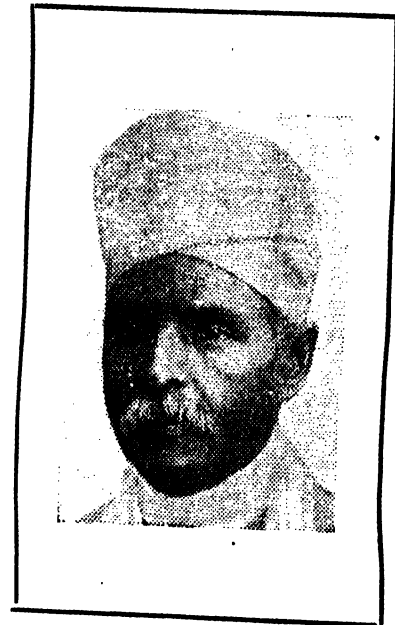
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

নিখিল-ভারত জাতীয়তাবাদী
মোছলেম দলের একমাত্র প্রতিনিধি

স্যার সৈয়দ আলী এমাম

নিখিল-ভারত মোছলেম সম্মিলনীর
প্রতিনিধি

মওলানা শওকৎ আলী
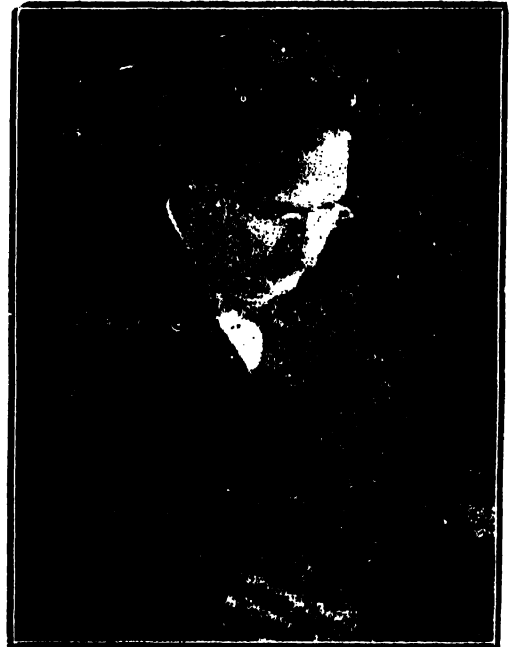
স্যার মোহাম্মদ একবাল

বঙ্গীয় সঙ্কট-ত্রাণ-সমিতির সভাপতি

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

বাংলা দেশ প্রবল বন্যায় আক্রান্ত হইয়াছে। বন্যার পূর্ব্বে দেশে যে অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছিল, বন্যার পর তাহা আরও সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছে। ১০ বৎসর পূর্ব্বে উত্তর বঙ্গে যে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, তদপেক্ষা ইহা ভীষণতর হইয়াছে। বন্যা-প্রপীড়িত লোকদের প্রতি এই সময়ে কেবল মুখে সহানুভূতি দেখাইলে চলিবে না, যথাসাধ্য কার্য্যতঃ সাহায্য করিতে হইবে। যাহার দুই বেলার সংস্থান আছে, তিনি এক বেলা খান, আর এক বেলার আহার এই সর্ব্বহারাদের দুর্দ্দশা-মোচনে দান করুন। ক্ষুধার্ত্ত ভাই-ভগ্নিগণকে উপবাসী রাখিয়া আপনি খাদ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন কি?

—শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায়।

বিশ্বভারতী বন্যা সাহায্য সমিতির সভাপতি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বন্যা সাহায্য সমিতি সম্পর্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ জানাইতেছেন—"কংগ্রেস, কংগ্রেস সংশ্লিষ্ট কোন দল বা অপর কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত আমার কোন সংস্রব নাই। বর্ত্তমানে আমি কেবল উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের বিপন্নদের সাহায্য দান কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট। বিশ্ব-ভারতীর ছাত্র ও অধ্যাপকগণ যখন নিজেরাই সাহায্য দান কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন, তখন আমি অন্য কোন সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা আবশ্যক বলিয়া মনে করি না। কাজেই জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আমার নিকট যে সকল টাকা আসিবে, উহা বিশ্বভারতীর সাহায্য সমিতির জন্য প্রেরিত বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে এবং অন্য কোন সমিতির আয়-ব্যয়ের জন্য আমি দায়ী নহি।"

"আমার অর্ঘ্য দুর্গতদের দুঃখ হরণের জন্য"

নূতন 'জাতীয়' গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী

মিঃ র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড্‌

নূতন ভারত-সচিব

স্যার স্যামুয়েল হোর

প্যারিসে বাঙ্গালী ব্যবসায়ী
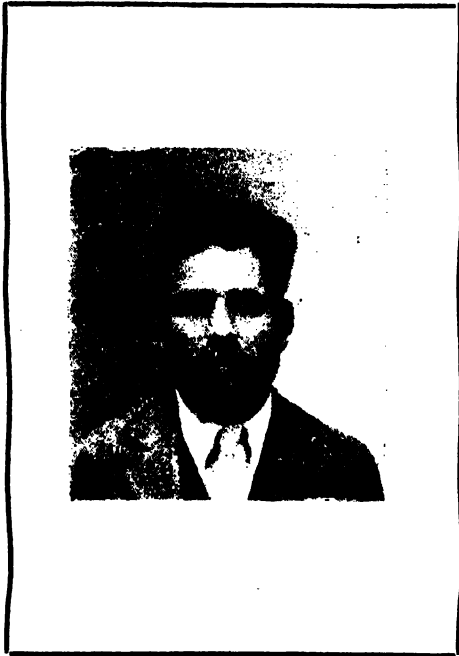
মিঃ অক্ষয় কুমার নন্দী

প্যারিস প্রবাসী

কুমারী অমলা নন্দী

মাতৃমন্দির সম্পাদক ও ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের সত্বাধিকারী মিঃ অক্ষয়কুমার নন্দী প্যারিস ইণ্টার ন্যাসন্যাল কলোনিয়াল একজিবিসনে নিজের কারখানায় প্রস্তুত অলঙ্কার ও বাংলার অন্যান্য স্থানের শিল্পদ্রব্য প্রদর্শন করিতেছেন। অক্ষয়বাবুর বারো বৎসরের কন্যা অমলা নন্দীও ইয়োরোপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় পিতার সঙ্গে প্যারিসে গিয়াছে। প্যারিসে গিয়া সে বর্ত্তমানে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিতেছে।

আমেরিকায়
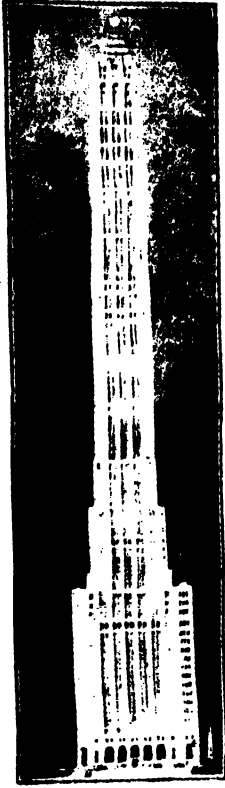
পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ বাড়ী

ইহার উচ্চতা ৯২৫ ফুট।

আমেরিকার অদ্ভুত বিশ্রাম-গৃহ

দূর হইতে জীব-জন্তুর ছবি বলিয়া বোধ হয়। এইভাবে গৃহস্বামী দর্শকের ভীড় জমায়। উপরের ঘরখানি ঠিক একটি পেচকের মত।

বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত গৃহ

রাজপথ পার্শ্বে প্রাসাদের সম্মুখ ভাগের ন্যায় ফটক ও দেয়াল,—অভ্যন্তরে কক্ষ বা দেয়াল কিছুই নাই। দূর হইতে দেখিতে প্রাসাদের ন্যায়।

বলশেভিকী সংকল্প—
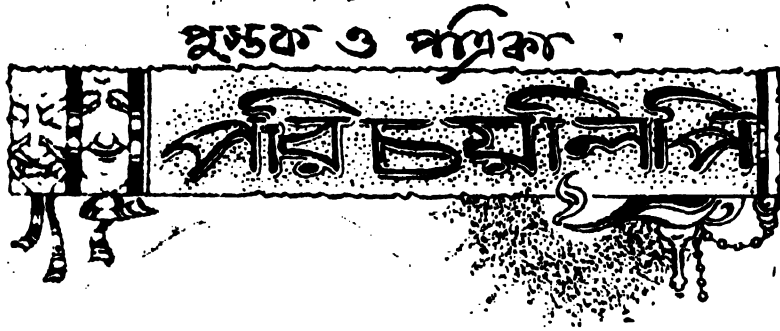
বাবু পুলকেশ দে প্রণীত। প্রকাশক—বাবু সুরেশচন্দ্র বর্ম্মণ, আর্য্য পাবলিশিং কোং, ২৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

রুশিয়ার বলশেভিকী সংকল্প বিশ্বের চিন্তা ও কর্ম্মধারায় একটা বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে। ইহা জগৎকে নূতন করিয়া গড়িবার আয়োজনে নিয়োজিত হইয়াছে। রুশিয়ার এই অপূর্ব্ব প্রচেষ্টাই 'ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান' নামে কথিত। আমাদের দেশের অনেকেই হয়ত রুশিয়ার এই 'ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের' নাম শুনিয়াছেন, কিন্তু ইহা আসলে কি বস্তু, জগৎকে নূতন করিয়া গড়িবার কিরূপ অদ্ভুত কল্পনা ইহার মধ্যে বিরাজিত, তাহা অধিকাংশই জানেন না—জানিবার ইচ্ছাশক্তি তাঁদের মধ্যে জন্মিয়াছে, এমনও মনে করিবার কারণ দেখা যায় না। অথচ জগতের অন্যান্য দেশের শিক্ষিত সমাজের সকলের মধ্যেই এ-সম্বন্ধে জানিবার ও শুনিবার জন্য একটা বিস্ময়-মিশ্রিত বিপুল আগ্রহ দেখা যায়। কারণ তাঁহারা জানেন - এর উপরই জগতের ভবিষ্যৎ গঠন নির্ভর করিতেছে।

এ-সম্পর্কে গ্রন্থকার এদেশের শিক্ষিত-শ্রেণীকে ভূমিকায় বেশ একটু বিদ্রূপ করিয়াছেন। লেখক বলেন—"অনেকেই ইকনমিক পড়েন, অনার্স ও নেন,...কিন্তু মার্ক্সের 'ক্যাপিটাল' নামে একখানা বই যে থাকিতে পারে, এ ধারণা পর্য্যন্ত অনেকের নাই,—পুস্তক পাঠ তো দূরের কথা। কথাটা রূঢ় হইলেও সত্য।" লেখক আরো বলেন—"সকলেই আমরা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের ছেঁড়া কাঁথা এমনই আগুলিয়া রাখিয়াছি যে, ইহার উপর আর কোনো দেশের ইতিহাসের ঘটনা বিপর্য্যয় ছাড়িয়া দিতে চাই না। সংস্কার বশতঃ যতক্ষণ পর্য্যন্ত সম্ভব, উহাকে দুই হাত দিয়া ঠেলিবার চেষ্টা করি।"

এ দেশের লোকের প্রকৃতিতে জ্ঞানানুসন্ধিৎসা অপেক্ষা যে সংস্কারের বৈশিষ্ট্য অধিকতর কর্য্যকরী দেখা যায়—এ কথা দুঃসহ হইলেও সত্য, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

লেখক এই গ্রন্থে রুশিয়ার 'ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের প্রয়োগ ও কার্য্যকারিতার পরিচয় সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি বিচার করিয়াছেন, শ্রমিক ও কৃষকদের অর্থনৈতিক দাসত্ব-মুক্তি কি অদ্ভুত কার্য্যক্রমের ফলে সংসাধিত হইতেছে, তাহার পরিচয় দিয়াছেন, এবং শুধু অর্থনীতি নয়,—শিক্ষানীতিক্ষেত্রেও কিরূপ বিপ্লব সাধনের পর সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে বিপুল শিক্ষা-বিস্তার করা হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়াছেন। নবজীবনকামী প্রত্যেক বাঙ্গালীর এই সব বিষয় জানা উচিত। পুস্তকের রচনা মনোরম, ছাপা, কাগজ, বাঁধাই চমৎকার।

দেশবন্ধুস্মৃতি—

বাবু হেমন্তকুমার সরকার প্রণীত। প্রকাশক—গ্রন্থকার, ৭।১, নন্দী ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

ইহা জীবনীগ্রন্থ নহে,—জীবনের টুক্‌রো টুক্‌রো ঘটনার স্মৃতিকথা মাত্র। দেশবন্ধু জীবনের এই টুক্‌রো টুক্‌রো ঘটনা-চয়নে হেমন্তবাবুর বাহাদুরী আছে। ইহার ফলে দেশবন্ধুর বিরাট ব্যক্তিত্ব পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। "দেশবন্ধুর ভাবপ্রবণ মন, তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা, তাঁর সাহিত্য-প্রীতি ও রসজ্ঞতা, তাঁর স্বদেশ-প্রেমের তীব্রতা" হেমন্তবাবু রেখার টানে চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। পুস্তকের ভাষা সুন্দর ও প্রাঞ্জল, রচনা-প্রণালী উপন্যাসের মতো মনোরম—পাঠ আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। অন্ধ ভক্তের লেখা জীবনী যেমন সমজদার পাঠকের নিকট স্তুতি-বাহুল্যের জন্য বিরক্তিকর হইয়া উঠে, এ-গ্রন্থ তেমন নহে। হেমন্তবাবু দেশবন্ধুর ভক্ত শিষ্য,—তবে অন্ধ ভক্ত নহেন। তাই এই দেশবন্ধু-চিত্রে হেমন্তবাবুর যে সত্য দৃষ্টির পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা জীবনী সাহিত্যের পক্ষে একটা পরম সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে। আমরা দেশহিতকামী প্রত্যেক বাঙ্গালীকে দেশবন্ধুর এই সরস স্মৃতিকথা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ছাপা, কাগজ সুন্দর।

নেকনজর—

মৌলভী মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ্ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—দি মুছলমান পাবলিশিং কোং লিঃ, ১১।৫, কড়েয়া বাজার রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

ইহা একখানা উপন্যাস। লেখক 'প্রদীপ ও চেরাগ' নামক গল্প পুস্তক লিখিয়া ইতিপূর্ব্বেই মোছলেম সাহিত্য-সমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাই এই গ্রন্থ আমরা আগ্রহে পাঠ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। উপন্যাসখানার প্লট ভাল, তবে ইহার রচনা-প্রণালী এতই নূতন যে, আমরা তাহা হজম করিয়া উঠিতে পারি নাই। ইহার ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ভাল।

বিপ্লবের ধারা—

বাবু পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এ প্রণীত। প্রকাশক—বাবু সুরেশচন্দ্র বর্ম্মণ,

আর্য্য পাবলিশিং কোং; ২৬নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

লেখক এই গ্রন্থে আধুনিক যুগের বিপ্লবের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন। ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লব ও ফরাসী-বিপ্লব হইতেই আধুনিক যুগের জন্ম। এই পাশ্চাত্য বিপ্লবের ধারা কিভাবে বহিয়া গিয়া বর্ত্তমানে নবতর বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের সূচনা করিয়াছে, লেখক সুন্দরভাবে তাহা বিবৃত করিয়াছেন। ফরাসী-বিপ্লবের ফলে যে দেশগত 'জাতীয়তার' জন্ম হইয়াছিল, তাহা কিরূপে নূতন বিপ্লবাদর্শের সংঘাতে আন্তর্জ্জাতিক সমাজ-তন্ত্রবাদে পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছে, লেখক তার ধারাবাহিক ইতিহাস দিয়াছেন। এই নূতন যুগ ও নবজগৎগঠনে অগ্রসর বিপ্লবের ধারার সহিত পরিচিত হওয়া প্রত্যেক মুক্তিকামী জীবনশীল ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। আমরা সকলকেই এই সুন্দর বইখানা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহাতে ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লব, ফরাসী-বিপ্লব, মার্কসের সমাজতন্ত্রবাদ, শ্রেণী-সংগ্রাম, সিনফিন্ আন্দোলন, এনাকিজম প্রভৃতির ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সুন্দর সুষ্ঠু প্রাঞ্জল ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকের ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সুন্দর। —নূরী

দাম্পত্য-রহস্য—

জ্ঞানেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত যৌনতত্ত্বের গ্রন্থ। মূল্য ২৷৹ টাকা, প্রকাশক জ্ঞান পাবলিশিং হাউস ৪৪, বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। যৌনতত্ত্বের এই বিখ্যাত গ্রন্থখানি বাংলার প্রায় সকল সাময়িক পত্রে ও সুধীজন কর্ত্তৃক অজস্র সুখ্যাতি পাইয়াছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে যৌনতত্ত্বের অনেক বিখ্যাত গ্রন্থ আছে—বাংলায় তেমন গ্রন্থের একান্ত অভাব ছিল—খ্যাতনামা সম্পাদক ও সুলেখক জ্ঞানেন্দ্র বাবু তাঁহার 'দাম্পত্য রহস্যে' সেই অভাব অনেকটা পূরণ করিয়াছেন। Life science বা জীবন-বিজ্ঞান হিসাবেই তিনি যৌন-বিজ্ঞান বা Sexiogloyর আলোচনা করিয়াছেন। আমরা প্রত্যেক বিবাহিত নর-নারীকেই যৌনতত্ত্বের এই মূল্যবান গ্রন্থ দাম্পত্য-রহস্য পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহাতে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা প্রভৃতির জীবন সুখকর হইবে; সাংসারিক সুখের সকল রহস্য জানা যাইবে। —ধূর্জ্জটি

মুক্তপ্রেম—

মৌলভী আবদুল করিম প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে যে রোমাণ্টিক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের জীবনেরই বিচিত্র কাহিনী। হিন্দু বাল-বিধবা গৌরীর জীবন যখন ব্যর্থতায় ভরিয়া উঠিতেছিল, সেই সময়ে গ্রন্থকার পরিপূর্ণ জীবনের বাণী লইয়া তাহার জীবনের দ্বারে উপস্থিত হন। পরিণামে তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত বিবাহ সংঘটিত হয়। গ্রন্থকার এই কাহিনীই অত্যন্ত সরল ভাষায় হৃদয়তার সহিত বিবৃত করিয়াছেন। দুইটী বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে এই হৃদয়ের যোগ-সাধন ব্যাপারে যে দুরতিক্রম্য বাধা ছিল, তাহা কিভাবে, কত ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনার ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়াছিল, লেখক তাহারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়াছেন। একে ব্যাপারটা রোমাণ্টিক, তদুপরি ব্যাপারটা এতই সরস মধুর ভাষায় বিবৃত হইয়াছে যে, এক নিশ্বাসে শেষ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। উপন্যাস না হইলেও ইহা উপন্যাস অপেক্ষা মধুর ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

১৯০৫ সালে বাংলা—

১৯০৫ সালের কতকগুলি সাময়িক পত্রিকা ও বাঙ্গলার তৎকালীন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বক্তৃতা হইতে ঐ সনের বাঙ্গলার রাজনৈতিক ঘটনা সমূহ চয়ন করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রকাশক—বাবু জীবনকৃষ্ণ তপস্বী; সোল এজেণ্ট—আর্য্য পাবলিশিং কোং, ২৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য একটাকা চারি আনা। চয়ন সুনিপুণ ও সম্পাদন সুন্দর হইয়াছে। সাময়িক-পত্র ও বক্তৃতার বড় বড় 'কাটিং' এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। তাই সমস্ত ব্যাপারটা সুসংবদ্ধ সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। আমাদের মতে 'কাটিং' বাহুল্য কমাইয়া ঘটনা সমূহের একটা পারম্পর্য্য রক্ষাকল্পে সম্পাদকীয় মন্তব্য যুড়িয়া দিলে গ্রন্থখানা আরও সুপাঠ্য হইতে পারিত। শুধু 'কাটিং' দিয়া কোনো সময়ের ইতিহাস পরিস্ফুট করা কঠিন কথা। আগামী সংস্করণে প্রকাশক এই গ্রন্থখানার একটু উন্নতিবিধানে যত্নবান হইবেন, আশা করি। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই মন্দ নয়। —নূরী

রমণী-রহস্য—

এখানি জ্ঞানেন্দ্র বাবুর যৌন-রহস্যের দ্বিতীয় গ্রন্থ। মূল্য ২৷৹ টাকা যৌনতত্ত্বের এই গ্রন্থখানিতে লেখক নারীর বাল্য, যৌবন ও যৌবন-শেষের সকল অবস্থারই বিশদ পরিচয় দিয়াছেন। নারীকে যাঁহারা জীবন-সঙ্গিনী ও গৃহলক্ষ্মী মনে করেন; যে নারী মাতা, ভগ্নী, কন্যা ও পত্নীরূপে সংসারকে নন্দন-কানন করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের শরীর সংস্থান ও দেহ-মনের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কত সুনিবিড় তাহা জানিতে চাহেন, তাঁহাদের সকলেরই 'রমণী-রহস্য' খানা পাঠ করা কর্ত্তব্য।

প্রচারক—

পাক্ষিক পত্রিকা। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অতুল রায়, ২এফ, নলিন সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য দুই টাকা, প্রতি সংখ্যা এক আনা।

এখানি বাঙ্গলা-দেশের বিজ্ঞাপন বিষয়ক একমাত্র পত্রিকা। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুল রায় বাঙ্গলার বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞগণের অন্যতম; সুতরাং যোগ্য ব্যক্তিই যে যোগ্য কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর পদে পদে পরাজয়ের যতগুলি কারণ আছে, বিজ্ঞাপন বিষয়ে অজ্ঞতা তাহাদের মধ্যে একটা প্রধান কারণ। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর ঘরে ঘরে এই সত্য পৌঁছাইয়া তাহাদিগকে প্রকৃত ব্যবসায়ী করিয়া গড়িয়া তোলাই প্রচারকের একমাত্র উদ্দেশ্য। কাগজ খানির সবে মাত্র ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যা দেখিয়াই আমরা আশা করিতে পারি যে, অতুল বাবুর এ শুভ প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হইবে।

অতুল বাবু একজন প্রতিপত্তিশালী বিজ্ঞাপনের এজেণ্ট বটে, কিন্তু সাহিত্য চর্চ্চায়ও তিনি পশ্চাৎপদ নহেন। তাঁহার লিখিত গল্প ও প্রবন্ধ আমাদের ভাল লাগিয়াছে। সম্পাদকীয় আলোচনার ভিতরেও বেশ যুক্তি আছে। প্রচ্ছদপট পরিকল্পনায়, বিজ্ঞাপন সজ্জায়, চিত্রে, প্রবন্ধে, গল্পে, কবিতায়, মুদ্রনে এবং কাগজে প্রচারক বাস্তবিকই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই নবীন সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

—ধূর্জ্জটি

হজরত ঈসা

(প্রতিবাদ)

—আবুল হাছান এশারতুল্লাহ্

বিগত অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যার মাসিক মোহাম্মদীতে ইবনুল আব্বাছ নামক জনৈক বি-এ ভদ্রলোক হজরত ঈসার (আঃ) জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, হজরত ঈসার (আঃ) বে-বাপে জন্ম হওয়া, দোলনায় লোকের সহিত কথা বলা, জীবন্ত আছমানে উত্থিত হওয়া—এসব মোফস্সীর মৌলবী সাহেবগণের স্বকপোল কল্পিত অস্বাভাবিক মো'জেজা বর্ণনা মাত্র। ইহাতে মানুষের শিখিবার কিছুই নাই। তাই তিনি প্রবন্ধের উপক্রম ভাগে এই কথার উপর বিশেষ ভাবে জোর দিয়াছেন যে, "কোন নবী বিশেষের মো'জেজা প্রচারের জন্য তাহা কোরআনে স্থান পায় নাই। বরং সেই আয়াতগুলি—একত্রে আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃ মনে হয় যে, যাহাদের জন্য কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাদের সুশিক্ষার জন্যই ঐ বিবরণগুলি অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু মোফস্সীর মহোদয়গণ, ও অন্যান্য মোতাকাদ্দেমীন ও মস্কে সালেহীনগণ একটু অদল বদল করিয়া কোরআনের আয়েতের মন-গড়া বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া হজরত ঈসাকে বাড়াইয়া ফেলিলেন।" আমরা বলি, হজরত ঈসার জন্ম ও আছমানে উত্থিত হওয়ার ঘটনাগুলি কোরআন মজিদে ও হাদিস শরিফে অতি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে মোফস্সীর ও মৌলবী সাহেবগণের মন-গড়া ব্যাখ্যার আবশ্যকতা নাই। এবং এ সম্বন্ধে ছাহাবা, তাবেয়ীন, মোহাদ্দেসীন, মোদাস্সেরীন ও ওলামায়েদীনের মধ্যে কাহারও মতভেদ নাই। তারপর হজরত ঈসার জন্ম ও আছমানে উত্থিত হওয়ার আয়েত সমূহের মধ্যে মানুষের জন্য

قدر مطلق সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্তা'লার অনন্ত অসীম শক্তির মহান শিক্ষা নিহিত আছে। আল্লাহ্তা'লা সৃষ্টির সম্মুখে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমানতা ও অসীম ক্ষমতা যুগে যুগে প্রকাশ করিয়া ভ্রান্ত মানুষের মূঢ়তা দূর করতঃ তাহাদিগকে স্বীয় তৌহিদের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। সেগুলি মানুষের নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া ধারণা হইতে পারে, কিন্তু স্বভাবের হাতে যাহা হইয়াছে, তাহাকে অস্বাভাবিক বলা হয় কোন্ বিচারে? হজরত ঈসা (আঃ)র ঘটনা ব্যতীত কোরআনে আরও অনেক বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, যাহাতে কেবল আল্লাহ্তা'লার সর্ব্বশক্তিমানতার শিক্ষাই নিহিত আছে। যেমন অত্যাচারী ফেরআউনের ভীষণ অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া হজরত মুসা (আঃ) ও তাঁহার সহচরবৃন্দ মিশর হইতে পলায়ন কালে সম্মুখে লোহিত সাগর তাঁহাদের গতিপথ রোধ করিলে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা পানির গতিরোধ করিয়া মধ্য দিয়া পথ আবিষ্কার করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তারপর সুরা বকরার ৩২শ রুকুতে কয়েক সহস্র লোকের মৃত্যু হওয়া ও তাহার পর তাহাদের নবীর দোওয়ায় জীবিত হওয়া। অতি বৃদ্ধ হজরত জাকারিয়া (আঃ)র বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা স্ত্রীর গর্ভে অস্বাভাবিকরূপে হজরত এহয়ার জন্ম হওয়া ইত্যাদি বিবরণগুলি শুধু মো'জেজা বর্ণনার জন্য কোরআনে স্থান পায় নাই বরং সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্তা'লা তাঁহার অসীম কুদরতের কথা জ্ঞাপন করিয়া মানুষকে তাঁহার তৌহিদের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন।* হজরত ঈসা (আঃ)র ঘটনাটিও উপরের বর্ণিত ঘটনা সমূহের অনুরূপ। এই ত

* লেখক এই ঘটনাগুলিকে যেরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, অন্ততপক্ষ তাহা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করেন না। সুতরাং এই শ্রেণীর ঘটনাগুলি তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। —সম্পাদক।

গেল তাঁহার ভূমিকা সম্বন্ধে দুই এক কথা। এক্ষণে মূল বিষয়টির দিকে পাঠক মহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। হজরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে মাননীয় গ্রাজুয়েট মহাশয়ের আলোচনার সংক্ষিপ্ত সার এই যে, (১) অন্যান্য নবীগণের ন্যায় হজরত ঈসার (আঃ) মৃত্যু হইয়াছে। (২) তাঁহার জীবিত থাকা বা আছমানে উত্থিত হওয়ার প্রমাণ কোর-আনে কুত্রাপি নাই। (৩) তাঁহার দোলনায় লোকের সহিত কথা বলা, ও বে-বাপে জন্ম হওয়া মোফাস্‌সীর ও মৌলবী সাহেবগণের বিকৃত মন-গড়া ব্যাখ্যা। তিনি আলো-চনার সুবিধার জন্য হজরত ঈসার (আঃ) মৃত্যুর কথাটা প্রথমে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথমে জন্মের তৎপর মৃত্যুর কথা গ্রহণ করিব।

১। কোরআন মজিদের স্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা আমরা দেখাইয়া দিব যে, হজরত ঈসা (আঃ) কুমারী মরয়মের গর্ভে আল্লার আদেশে স্থান পাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা নাই, তিনি দোলনায় মানুষের সহিত কথা বলিয়াছিলেন। দেখুন সুরা আলএমরানে আল্লাহ্‌ তা'লা বলিতেছেন:—

اذ قالت الملٰئكة يمريم ان الله يبشرك بكلمة
منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها فى الدنيا
والاخرة ومن المقربين ۙ ويكلم الناس فى المهد
وكهلا ومن الصلحين o قالت رب انى يكون لى
ولد ولم يمسسنى بشر قال كذلك الله يخلق
ما يشاء ط اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون o

"যখন ফেরেস্তাগণ বলিল, হে মরয়ম! নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আপন পক্ষ হইতে তোমাকে এক কথার সুসংবাদ দিতেছেন। তাহার নাম মসিহ ঈসা মরয়মের পুত্র। তিনি ইহকাল ও পরকালে মান্য এবং আল্লাহ্‌র নিকটবর্ত্তিগণের অন্তর্গত। এবং দোলনায় ও পূর্ণ বয়সে লোকের সহিত কথা কহিবে। এবং নেককারদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে। (মরয়ম) বলিল, হে আমার প্রভু! কিরূপে আমার পুত্র হইবে, বস্তুতঃ কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই। (ফেরেস্তা) বলিলেন, আল্লাহ্‌ যাহা ইচ্ছা এইরূপই সৃজন করিয়া থাকেন। যখন তিনি কোন কার্য্যের মনন করেন, তাহাকে হও ব্যতীত আর কিছুই বলেন না, তাহাতেই হইয়া যায়।"

এতদ্ভিন্ন সুরা মরয়মের আয়েতগুলির সঠিক অনুবাদ নকল করিতেছি। সেগুলি সুরা আল-এমরানের বর্ণিত আয়েত হইতে আরও সুস্পষ্ট। আল্লাহ্‌-তা'লা বলিতেছেন—

"পরে আমি তাহার (মরয়মের) নিকট আপন রূহ (জিব্রাইল)কে পাঠাইয়াছিলাম। অবশেষে সে তাহার (মরয়মের) জন্য পূর্ণাঙ্গ মনুষ্য-মূর্ত্তি ধারণ করিল। (মরয়ম) বলিল, নিশ্চয় আমি রহমানের নিকট আশ্রয় লইতেছি, তুমি যদি পরহেজগার হও। (ফেরেস্তা) বলিল, ইহা ভিন্ন নহে যে, আমি তোমার পালনকারীর প্রেরিত। উদ্দেশ্য যে, আমি তোমাকে বিশুদ্ধ পুত্র দান করিব। (মরয়ম) বলিল, কিরূপে আমার পুত্র হইবে? যেহেতু কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই। এবং আমি দুশ্চরিত্রা নই। (জিব্রাইল) বলিল, এইরূপই তোমার পালনকারী বলিয়াছেন যে, উহা আমার প্রতি সহজ।"

বর্ণিত আয়েতগুলির ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। কেন না অতি স্পষ্টভাবে জানা যাইতেছে যে, হজরত ঈসা (আঃ)র জন্মের পূর্ব্বেই আল্লাহ্‌র ফেরেস্তা হজরত মরয়মের নিকট উপস্থিত হইয়া একটি বাক্যের সংবাদ দিতেছেন। এবং সেই বাক্য যে একটি সন্তান, তাহাও নাম সহকারে জানাইয়া দিতেছেন। এবং منه শব্দ দ্বারা উহা যে স্রষ্টারই একটি সৃষ্টি তাহাও জ্ঞাপন করিতেছেন। তথাপি কুমারী মরয়মের প্রাণে প্রবোধ মানিল না, ব্যাকুল হইয়া প্রভুর নিকট আপত্তি জানাইতেছেন যে, হে প্রভু! আমার কিরূপে সন্তান হইবে, আমাকে যে কোন পুরুষে স্পর্শ করে নাই! প্রিয় পাঠকগণ এখানে বিচার করিয়া দেখিবেন যে, হজরত মরয়মের স্বামী থাকিলে পুত্রের সুসংবাদে আপত্তি তুলিবেন কেন? "আমি দুশ্চরিত্রা নহি পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেন নাই" এসব বলারই বা হেতু কি? তার পর فانما يقول له كن فيكون "হও বলিলেই হইয়া যায়" هو على هين "উহা আমার নিকট অতি সহজ" এ সকল অসীম কুদরতের কথা জ্ঞাপন করিয়া কুমারী মরয়মের প্রাণে প্রবোধ দিবারই বা দরকার কি? এগুলি কি মোফাস্‌সেরীন ও সলফে সালেহীনগণের মন-গড়া ব্যাখ্যা না আয়েতের মূল অনুবাদ? এতদ্ভিন্ন সুরা আল-এমরানের বর্ণিত আয়েতে শেষাংশে আল্লাহ্‌ তা'লা বলিতেছেন—

ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون o الحق من ربك فلا تكن من الممترين -

নিশ্চয় ঈসা আল্লার নিকট আদমের স্থায়, উহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃজন করিয়াছেন। তারপর ইহাকে 'হও' বলাতে হইয়া গিয়াছে। সত্য, তোমার প্রভুর নিকট হইতে অতএব ইহাতে সন্দেহ করিও না।" এখানে হজরত ঈসা আলায়হেস্‌সালামকে হজরত আদমের সহিত তুলনা করা হইয়াছে সৃষ্টির দিক দিয়া। অন্য কোন বিষয় নহে। অর্থাৎ বলা হইয়াছে যে, হজরত আদম যেমন বে-বাপে জন্ম হইয়াছে, হজরত ঈসা (আঃ) ও তদ্রূপ বে-বাপে জন্ম হইয়াছে। তারপর ভূত ভবিষ্যৎ সকল জ্ঞানের আধার মহিমান্বিত আল্লাহ্‌তা'লা জানিতেন যে, যুক্তি বাদীর দল অস্বাভাবিকতার প্রশ্ন তুলিয়া আমার কুদরতকে অস্বীকার করিবে। তজ্জন্য তিনি সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, খবরদার কেহ যেন এ বিষয় সন্দিহান হইও না।

২। হজরত ঈসা (আঃ) র দোলনায় লোকের সহিত কথা বলার ঘটনা সম্বন্ধে কোরআন মজিদে সুরা মরয়মের পূর্ব্ব বর্ণিত আয়েতের শেষ দিকে আল্লাহ্‌তা'লা বলিতেছেন যে—

فاتت به قومها تحمله قالوا يمريم لقد جئت شيئا فريا o يأخت هرون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا o فاشارت اليه ط قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيا o قال انى عبدالله الخ -

"অবশেষে (অর্থাৎ প্রসব করার পর) তাহাকে (ঈসাকে) কোলে লইয়া তৎসহ আপন স্বজাতির নিকট উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল, হে মরয়ম! নিশ্চয়ই তুমি এক আশ্চর্য্যজনক বস্তু আনিয়াছ। হে হারুনের ভগ্নি! তোমার পিতা অসৎ লোক ছিলেন না। এবং তোমার মাতা দুশ্চরিত্রা ছিলেন না। অনন্তর সে (মরয়ম) তাহার (ঈসার) দিকে ইসারা করিল। তাহারা বলিল যে, কোলের শিশু তাহার সহিত আমরা কেমন করিয়া কথা বলিব। (হজরত ঈসা) বলিলেন, আমি আল্লার বান্দা (তিনি) আমাকে কেতাব দিয়াছেন ও আমাকে নবী করিয়াছেন।"

এই আয়েত দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, কুমারী মরয়ম হজরত ঈসা (আঃ) কে নির্জ্জন স্থানে প্রসব করার পরই তাহাকে কোলে করিয়া লোকালয়ে স্বজাতির নিকট উপস্থিত হইলে তখনই ছেলে সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল এবং সেই সময়েই হজরত ঈসা আলায়হেস্‌সালাম প্রশ্নের উত্তর দানে তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছিলেন।

আগামী কার্ত্তিক মাস হইতে বিখ্যাত কথা-শিল্পী মৌলভী আকবর উদ্‌দীন সাহেবের উপন্যাস "অভিনেতা" ধারাবাহিক প্রকাশিত হইবে।

সতী

—গল্প— —এক্‌রামদ্দিন

এক

খালেদের বড় লোকের ঘরে বিবাহ হইয়াছিল। খালেদ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল, এই জন্য তাহার বাস্তু-ভিটা ছাড়া অন্য কিছু ভূসম্পত্তি না থাকিলেও, সে ভবিষ্যতে একটা ম্যাজিষ্ট্রেট বা কমিশনার এইরূপ কিছু হইবে ভাবিয়া, করিমনের পিতা বিষয়-সম্পত্তিসম্পন্ন লোক হইলেও তাহাকে কন্যাদান করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ খালেদ আই-এ পাশ করিবার পর এমন কঠিন পীড়া-গ্রস্থ হইল যে, ডাক্তার বাবুরা তাহাকে বই ছুঁইতে একেবারেই নিষেধ করিয়া দিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, সে পুনরায় পড়া আরম্ভ করিলে আর কিছুতেই বাঁচিবে না। খালেদ দুই বৎসর পীড়ায় ভুগিয়া অগত্যা ৫০৲ টাকা বেতনে একটী কেরাণীগিরি স্বীকার করিতে বাধ্য হইল, করিমন পিতৃ-গৃহেই রহিল।

কিছুদিন পরে একদিন স্বামীকে পাইয়া করিমন বলিল, "আমার আর পিতৃ-গৃহে থাকা ভাল দেখায় না, আমাকে তোমার কাছে লইয়া চল। খালেদ বলিল, "আমার যা বেতন, তা'তে দু'জনের খাওয়া-পরা চলিতে পারে না ; আমি তোমাকে সেখানে লইয়া গিয়া কিরূপে চালাইব ?"

করিমন বলিল, "তোমার একার যাহা খরচ, আমি তাহাতেই দুইজনের চালাইয়া লইব।"

খালেদ বলিল, "তোমাকে লইয়া গেলে একটা বাড়ী ত ভাড়া করিতে হইবে। বাড়ী ভাড়াতেই যে আমার সমস্ত বেতন চলিয়া যাইবে, খাইব কি ?"

করিমন বলিল, "আমরা যেমন-তেমন একটা কুঁড়ে ঘরে থাকিব,—চিন্তা করিও না।"

খালেদ কহিল, "তুমি বাপের ঘরে দু'তলা দালানে থাকিয়া কি কুঁড়ে ঘরে বাস করিতে পারিবে ? তা'ছাড়া তোমার জন্য ত চাকর-চাকরাণী চাই। তাহার খরচ যোগাইব কোথা হইতে ?"

করিমন বলিল, "আমার বাপের বাড়ী দু'তলা দালান আছে, চাকর-চাকরাণী আছে, তাতে আমার কি ? আমার স্বামী যেমন গরীব, আমিও তেমনি। আমি চাকর-চাকরাণী কিছু চাই না। আমি নিজেই রাঁধিব। ঘর ঝাঁট দেওয়া, হাঁড়ী-বাসন মাজার জন্যে একটা ঠিকা লোক রাখিলেই চলিবে।"

করিমনের আগ্রহ এবং দৃঢ়তা দেখিয়া খালেদের কতকটা প্রত্যয় হইল। সে চাকুরী স্থানে গিয়া যেমন-তেমন একটা মাটীর ঘর ভাড়া লইয়া করিমনকে লইয়া আসিল। করিমনের পিতা-মাতার ইতঃপূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা খিজির কোন আপত্তি করিল না।

দুই

করিমন স্বামীর চাকুরী স্থানে আসিয়া যাহা কখনও করে নাই, তাহাই করিতে লাগিল, নিজের হাতে রাঁধিতে লাগিল। ঘর ঝাঁট দেওয়া, হাঁড়ী-বাসন মাজা এবং জল আনার জন্য একটা ঠিকা লোক রাখিল।

ভাত রাঁধিতে সে নিজের চাউল লইত না—স্বামীর উচ্ছিষ্ট যাহা পড়িয়া থাকিত, তদ্দারাই যথাসম্ভব ক্ষুন্নিবৃত্তি

করিত। তাহা কোন দিনই তাহার জন্ত যথেষ্ট হইত না, কিন্তু সে কোন দিনই অভিযোগ করিত না এবং স্বামীকে জানিতেই দিত না যে, সে প্রায়ই অর্দ্ধ উপবাসিনী থাকে। সে সর্ব্বদাই স্বামীর নিকট হাসি মুখে থাকিত। এইরূপে দিন চলিতে লাগিল।

করিমন একদিন স্বামীকে বলিল, "আমি যাহা বলিয়াছি তাহা করিব, তোমার বেতন হইতেই আমাদের দু'জনের খরচ চালাইব; কিন্তু আর একটু বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া দেখ না, অসময়ের জন্ত কিছু সংস্থান করিতে হইবে ত!"

খালেদ বলিল, "আর কিরূপে বাড়াইব? শুধু শুধু ত আর আমার বেতন বাড়াইয়া দিবে না।"

করিমন হাসিয়া কহিল, "আমি কি তোমার বাড়াইবার কথা বল্‌চি? তুমি দুই-একটা গৃহ-শিক্ষকের কাজের যোগাড় কর না কেন? সকালে এবং সন্ধ্যায় তুমি দুই ঘণ্টা করিয়া বেশ ছেলে পড়াইতে পার। আমাকেও একটা চরকা কিনিয়া দাও, আমি সূতা কাটিয়া দুইজনের কাপড় করিব।"

কথাটা খালেদের মনে লাগিল। সে চেষ্টা করিয়া দুইটি গৃহ-শিক্ষকের কাজের যোগাড় করিল এবং করিমনকে একটা চরকা আনিয়া দিল। গৃহ-শিক্ষকের কাজে তাহার মাসিক ৩০৲ টাকা আয় হইল, করিমন সূতা কাটিয়া উভয়ের কাপড় যোগাইতে লাগিল।

তিন

একদিন খালেদের কাজে গলদ বাহির হইল। গলদ্ তাহার নিজের নয়, তাহার অধস্তন কর্ম্মচারীর। একটা হিসাবের ভুল তাহার হাত দিয়া গিয়াছিল, সে ধরিতে পারে নাই,—এই তাহার অপরাধ, এই অপরাধে তাহার চাকুরীর জবাব হইল।

খালেদ ঘরে আসিয়া করিমনকে বলিল, "আর তোমাকে এখানে রাখিতে পারি না—আমার চাকুরী গিয়াছে। তুমি বাপের বাড়ী যাও।"

করিমন বলিল, "সে কি কথা? তোমার অসময়ে আমি তোমাকে ছাড়িয়া যাইব? তোমার গৃহ-শিক্ষকের কাজের ত জবাব হয় নাই? আমার সূতা কাটাও আছে। না হয় আমরা এক বেলা করিয়া খাইব,—বাপের বাড়ী যাইব কেন?"

খালেদ তাহাকে জোর করিয়া বাপের বাড়ী পাঠাইতে পারিল না। সে রহিয়া গেল। ঘর ঝাঁট দেওয়া, হাড়ী-বাসন মাজা, জল তোলার জন্ত যে ঠিকা লোক ছিল, করিমন তাহাকে জবাব দিল। এই সকল কাজও সে নিজে করিতে লাগিল। খাদ্য-সামগ্রীর মধ্যে সে মাছ ও দাল ছাড়িয়া দিল। শাক্-শব্জী ভাজী এবং আলু-কলাই সিদ্ধ তরকারী খাইতে লাগিল। করিমনের পরামর্শে খালেদ বৈকালে আর একটি ছেলে পড়াইবার কাজ জুটাইয়া লইল। করিমনও রাত-দিন সূতা কাটিয়া, সূতা কাটার কাজও বাড়াইয়া দিল এবং উদ্বৃত্ত সূতা বিক্রয় হইতে লাগিল। এত করিয়াও যখন অভাব দূর হইত না, তখন সে গোপনে নিজের ভাল ভাল অলঙ্কার বিক্রয় করিত; কিন্তু স্বামীকে কখনও সে কথা জানিতে দিত না।

চার

কিছু দিন পরে খালেদ পীড়া-গ্রস্ত হইল। পীড়া সামান্ত নয়—টাইফয়েড্। সে অনেক দিন ধরিয়া শয্যাগত রহিল—তাহার গৃহ-শিক্ষকের কার্য্যও বন্ধ হইল। এখন আর তাহার কোন আয়ই নাই। আয়ের মধ্যে করিমনের সূতা কাটা ও অলঙ্কার বিক্রয়। যখন সমস্ত অলঙ্কার শেষ হইল, তখন সে তাহার দাদাকে চিঠি লিখিল। এত অভাবে পড়িয়াও সে তাহার দাদাকে চিঠি লিখে নাই, আজ বিষম বিপদে পড়িয়া এইরূপ লিখিল :—

"দাদা,

আমার স্বামীর চাকুরী গিয়াছে, তিনি আবার কঠিন পীড়া-গ্রস্ত। আমি বিদেশে একা অসহায়। আমার এই অসময়ে তুমি একবার আসিও।"

পাঁচ

খিজির খালেদকে দেখিতে আসিল। সে ঘরে পা দিয়াই বলিয়া উঠিল, "এমন ঘরে কি মানুষ থাক্‌তে পারে? এ রকম ঘরে থাক্‌লে আর ব্যামো হবে না? ছিঃ! ছিঃ!! ছিঃ!!!"

খিজির খালেদকে একবার দেখিয়াই চলিয়া যাইবার জন্ত ব্যস্ত হইল। করিমন বলিল, "এত তাড়াতাড়ি! চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিবে না?"

খিজির জুতার ফিতা আঁটিতে আঁটিতে বলিল, "রোগীর চিকিৎসা খোদাতালার হাতে। আমি হোয়াইটওয়ে লেড্‌লর বাড়ী থেকে একটা সুট আন্‌তে চল্লুম। বড় জরুরী দরকার। এ দরকারটা না থাক্‌লে আমি বোধ হয় আস্‌তেই পাত্তুম না।"

করিমন জিজ্ঞাসা করিল,—"কি এমন জরুরী দরকার?"

হাসিতে হাসিতে খিজির বলিল,—"কালেক্টর সাহেবের বাড়ীতে ভোজের নিমন্ত্রণ! অনেক বড় বড় লোক আস্‌বেন। সেখানে কি পুরাণ সুট পরে যাওয়া যায়?" খিজির তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল, করিমন আর তাহাকে কিছু বলিল না।

ছয়

খালেদ আর পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিতে পারিল না, কলিকাতাতেই ইহলীলা সম্বরণ করিল। করিমন বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে আসিল। সে পিত্রালয়ে থাকিয়া শুনিল যে, তাহার পিতা তাহার নাবালিকাবস্থায় তাহাকে পাঁচ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন এবং খিজির তাহার আয় ভোগ করিতেছে। একথা এত দিন কেহ তাহাকে বলে নাই।

করিমন খিজিরকে বলিল,—"আমার সম্পত্তি আমাকে ফিরাইয়া দাও।"

খিজির কহিল,—"তুমি বিধবা মানুষ, সম্পত্তি লইয়া কি করিবে? আমার ঘরে বসিয়া বসিয়া রাজার হালে থাক—খাও আর পর। একটি পয়সার অভাব নাই—দাস-দাসীর অভাব নাই—একটি কাজ ছুঁইতে হইবে না। বিষয় লইয়া কি করিবে?"

করিমন বলিল,—"আমার সম্পত্তির আয় অল্প বেতনের চাকুরেদের চিকিৎসায় ব্যয়িত হইবে। আমি আর সুখ ভোগ করিতে এখানে থাকিতে চাহি না। আমার স্বামী জীবনে যে সুখ ভোগ করেন নাই, আমি তাহা ভোগ করিব না। আমি আমার স্বামীর ভদ্রাসন বাটীতে যাইয়া বাস করিব। আমার সম্পত্তির আয়ের অতি অল্পাংশই বিধবার ভরণ-পোষণে ব্যয়িত হইবে।

আমার স্বামী বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু-শয্যায় ছট্‌ফট করিতেছিলেন, তুমি সে দিকে একটু ফিরিয়াও না চাহিয়া হোয়াইট সাহেবের বাড়ী সুট কিনিতে গিয়াছিলে,—এ বেদনার স্মৃতি আমি এখনও ভুলি নাই, বোধ হয় জীবন থাকিতে ভুলিতেও পারিব না। চোরের মত গোপনে আমার সম্পত্তি ভোগ করিয়া সে দিন তুমি যে পাশবিকতা দেখাইয়াছিলে, তাহাতে তোমাকে কি আর আমি মানুষ বলিয়া গণ্য করিতে পারি?

আমার স্বামীর গ্রামের যে-সব দীনহীন বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুকে বরণ করিয়া লয়, সেই হতভাগাদের চিকিৎসায় আমার সম্পত্তির শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া আমার বুকের সেদিনকার ক্ষত একটু উপশম করিতে চেষ্টা করিব।"
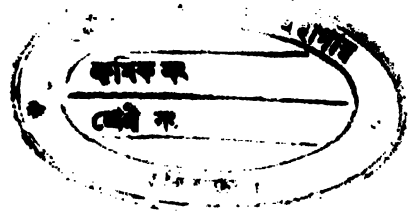
ধর্ম্মানুষ্ঠানে সংশয়—

জনাব ডাঃ মোহাম্মদ শারাফত আলি (ডেন্টিষ্ট) ছাহেব লিখিতেছেন,—"বহু ইংরাজী শিক্ষিত (শুধু ইংরাজী শিক্ষিত কেন, অনেক উর্দ্দু-আরবী শিক্ষিত) লোকের মনে ইছলামের কতকগুলি ধর্ম্মানুষ্ঠানের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সংশয় আছে। কারণ, এই সকল সংশয়ের যুক্তি-সম্মত ব্যাখ্যা কেহই জানেন না। মৌলভী ছাহেবদের মধ্যেও অনেকে ইহার ঠিক উত্তর অবগত নহেন। অনেক যুবক বন্ধুর মুখে অনেক সংশয়ের কথা শুনিয়াছি।..."অপ্রিয় আলোচনার ভয়ে অনেকে আবার মনের সংশয় প্রকাশ করেন না।" এই প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করার পর ডাক্তার ছাহেব কএকটা সংশয়ের কথা লিখিয়া "মাসিক মোহাম্মদীর" সম্পাদক ও পাঠকগণের নিকট তাহার উত্তর পাওয়ার বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন। *প্রথম দফার প্রশ্নগুলি নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত* করিয়া দিতেছি :—

১। (ক) পেশাব-পায়খানা হইতে ফিরিয়া ওজু করিবার আবশ্যকতা সহজেই অনুমেয় ; কিন্তু মলদ্বার দিয়া বায়ু নির্গমনের দ্বারা ওজু নষ্ট হইবার যৌক্তিকতা কি? বিশেষতঃ যখন পুনরায় ওজু করিবার সময়ে মলদ্বার ধৌত করিতে হয় না।

(খ) শরীরের কোনও অঙ্গ হইতে রক্ত নির্গত হইলে ওজু ভঙ্গ হয় কেন? ঐ অঙ্গ ধৌত করিলেই কি হয় না? রক্ত নির্গত হইয়া প্রবাহিত না হইলে ওজু ভঙ্গ হয় না কেন?

আমি জানি, অনেক যুবক শুধু ঐ সব কারণে ওজু করিবার অসুবিধার ভয়ে নমাজ কাজা করিয়া থাকেন। জুতা-মোজা খুলিয়া বার বার অজু করা অনেকেই অত্যন্ত অসুবিধাজনক জ্ঞান করেন। এই প্রসঙ্গে মৌলভী মোহাম্মদ আলী ছাহেব কৃত কোরআন মজিদের ইংরেজী তর্জ্জমার ভূমিকার প্রতি আপনার ও "মাসিক মোহাম্মদীর" পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রথম সংস্করণের অনুবাদের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন যে, মাত্র পেশাব-পায়খানার পর ওজু 'দোহ্‌রাইতে' হয়।

(গ) নামাজের মধ্যে উচ্চ হাস্য করিলে নামাজ ভঙ্গ করার যৌক্তিকতা স্পষ্ট ; কিন্তু ওজু ভঙ্গ হইবার কারণ কি?

প্রশ্নগুলির মধ্যে দুইটী সিদ্ধান্তের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। প্রথমতঃ কতকগুলি ধর্ম্মানুষ্ঠানের যৌক্তিকতা সহজে বুঝিতে পারা যায় না ; এবং সেজন্য অনেকেই সে সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ প্রশ্নে ওজু নষ্ট হওয়ার যে-সব কারণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার জন্য অনেক যুবককে অসুবিধায় পড়িতে হয়, জুতা-মোজা খুলিয়া বার বার ওজু করা অনেকের পক্ষে অসুবিধাজনক হয় বলিয়া তাঁহারা নামাজ কাজা করিয়া ফেলেন। প্রথমে এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। প্রশ্নকারী একজন শিক্ষিত চিকিৎসক, সুতরাং বিচারটা এই দিক দিয়া করিলেই ভাল হইবে।

রোগ যন্ত্রণায় আমাদের সকলকেই মধ্যে মধ্যে অল্প-বিস্তর কষ্ট পাইতে হয়, এবং সে সময়ে আমরা তাহা হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য ডাক্তারদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকি। তাঁহারা রোগের অবস্থা বুঝিয়া প্রেস্‌ক্রুপশন লিখিয়া দেন এবং আমরা চোখ বুজিয়া সেই প্রেস্‌ক্রুপশন লইয়া দোকানে যাই, টাকা দিয়া ঔষধ কিনিয়া আনি, এবং তিক্ত-তীব্র হইলেও আগ্রহের

সঙ্গে সেগুলি গলাধঃকরণ করিয়া থাকি। ডাক্তার কি ঔষধ দিলেন, কেন দিলেন, তাহার খোঁজ-খবর আমরা রাখি না, তাহার রাসায়নিক ফলাফল ইত্যাদি আমরা কিছুই জানি না। এ সময়ে হেতুবাদ ও যৌক্তিকতার সন্ধান করার জন্য আমাদের মনে আদৌ কোন উদ্বেগ উপস্থিত হয় না। কারণ, আমরা প্রথমেই চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে মোটের উপর এতটা বুঝিয়া লইয়াছি যে, উহার ব্যবস্থাগুলি সমস্তই মানুষের হিতের দিক্ দিয়া আবশ্যক ও উপকারী। সেই জন্য ডাক্তারের রোগ নির্ণয়ের যৌক্তিকতা, ঔষধ-নির্ব্বাচনের হেতুবাদ এবং ঔষধ গুলির রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং শরীরের উপস্থিত অবস্থার সহিত ঐ ব্যবস্থার সঙ্গতি সম্বন্ধে কোন সংশয় না করিয়াই আমরা ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাই। আমার মতে, সর্ব্ব-প্রথমে ধর্ম্মকে এইভাবে মোটামুটি ভাবে দেখিয়া ও বুঝিয়া লওয়া উচিত। যদি মোটের উপর ধর্ম্মের আবশ্যকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে আমাদের মনে এই প্রকার বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া যায়, তখন আমাদের একমাত্র বিচার্য্য হইবে যে, যে মত বা নিয়মকে আমরা ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া মনে করিতেছি, বস্তুতঃ ধর্ম্ম-শাস্ত্রের কোন অনুজ্ঞায় তাহার সমর্থন আছে কি না? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা নিজেরাই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি। তবে বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা অনেকের পক্ষেই সহজ-সাধ্য বলিয়া বোধ হইবে না। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত চিকিৎসকের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে, হাতুড়েদিগকে বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইবে। তখন যাহা শাস্ত্রের ব্যবস্থা বলিয়া জানা যাইবে, সংশয়হীন মনে তাহার অনুসরণ করিতে হইবে। সে ব্যবস্থান হেতুবাদ ও যৌক্তিকতা বুঝিয়া লওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হইতেছে না বলিয়া তাহাকে অমান্য করিতে যাওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না। বরং এ অবস্থাতেও অন্তরে এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে পোষণ করিতে হইবে যে, আমি বুঝিতে না পারিলেও, ঐ ব্যবস্থাই আমার পক্ষে আবশ্যক ও হিতকারী। সমস্ত পার্থিব বিজ্ঞানের ন্যায় ধর্ম্ম-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এই একই কথা। দুনয়ায় কত বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে, যাহার রহস্য আমরা অনেকেই বুঝিতে পারি না, কিন্তু আবশ্যক মতে আমরা তাহা দ্বারা উপকার লাভ করিয়া থাকি। ফলতঃ কোন বিষয়ে আমি বুঝিতে না পারিলেই যে তাহা যুক্তিহীন হইয়া যাইবে, এরূপ ধারণা করাও সঙ্গত নহে।

ডাক্তার ছাহেবের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, নানা কারণে ওজু নষ্ট হইয়া যায় এবং সে জন্য জুতা-মোজা খুলিয়া বারম্বার ওজু করা অসুবিধাজনক হয় বলিয়া অনেক যুবক শুধু এই কারণে নামাজ কাজা করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে আমার প্রথম নিবেদন এই যে, প্রত্যেক ইষ্টলাভের জন্যই মানুষকে কতকটা কষ্ট স্বীকার বা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সব সাধনাই এইরূপ পরীক্ষার দ্বারা পরিবেষ্টিত। ফজর ও এশার নামাজ আমরা সাধারণতঃ বাড়ীতে ও অবকাশের সময়ে পড়িয়া থাকি। এ সময়ে জুতা-মোজা খোলার ঝঞ্ঝাট আমাদের বড় একটা থাকে না। জোহর, আছর ও মগরব লইয়াই যত অসুবিধা। এই সময়ে যাঁহারা স্কুল-কলেজ ও আফিস-আদালত প্রভৃতিতে অবস্থান করেন, জোহরের সময়ে তাহাদের সকলের প্রায়ই অল্প বিস্তর অবকাশ হইয়া থাকে। আছর ও মগরবের সময়ে সাধারণতঃ লোকের অবকাশই থাকে। একটু সাবধান থাকিলে দুই ওজুতে তিন অক্তের নামাজ অনায়াসেই পড়া যাইতে পারে, অবশ্য যদি পড়ার ইচ্ছা থাকে।

এখন লেখকের প্রশ্ন সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলিব। বায়ু নির্গত হইলে ওজু ভাঙ্গিয়া যায়, ইহা বহু হাদিছ হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে। মিঃ মোহাম্মদ আলির ভূমিকা পাঠ করিলে বিপরীত ধারণা হয়, ইহা সত্য। কিন্তু ইহা অত্যন্ত অন্যায় ও হাদিছ বিগর্হিত সিদ্ধান্ত। অবশ্য হাদিছে ইহাও বলা হইয়াছে যে, কেবল বায়ু নিঃসরণের অনুভূতিমাত্রেই ওজু নষ্ট হয় না, সেজন্য তাহার শব্দ শুনিতে বা গন্ধ জানিতে পারাও আবশ্যক। অর্থাৎ যদি শব্দ বা গন্ধ জানিতে পারা না যায়, তাহা হইলে ওজু নষ্ট হইবে না।

ডাক্তার ছাহেব বলিতেছেন,—"*পেশাব-পায়খানার পর ওজু করার আবশ্যকতা সহজেই অনুমেয়, কিন্তু বায়ু নিঃসরণের পর ওজু ভঙ্গ হওয়ার যৌক্তিকতা কি আছে? বিশেষতঃ পুনরায় ওজু করার সময়ে যখন মলদ্বার ধৌত করা হয় না।*" প্রশ্নটীর মধ্যেই তাহার একটা উত্তরের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। মল ত্যাগ করার পর কেবল শৌচ করাই যথেষ্ট হয় না, বরং তাহার পর আবার নূতন করিয়া ওজু করিতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, স্থানীয় গলিজ পরিষ্কার করা ব্যতীত ওজুর অন্য কিছু উদ্দেশ্য বা সার্থকতাও আছে। ফলতঃ মল ও মূত্রদ্বার ধোওয়ার পরও যে কারণে ওজু করার দরকার হয়, বায়ু-নিঃসরণের পর, মল দ্বার ধৌত

করা না হইলেও, ঠিক সেই কারণে নূতন ওজু আবশ্যক হইয়া থাকে।

শরীরের বাহির দিকটা নির্ম্মল ও পবিত্র করিয়া লওয়া যেমন উপাসনার সাত্ত্বিকতার জন্য আবশ্যক, ভিতরের ইন্দ্রিয়গুলিকে শুদ্ধ, শান্ত ও সংযত করিয়া লওয়া তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে দরকার। দেহের বহির্ভাগ মলমূত্রের সংশ্রবে আসিলে, তাহার সংস্পর্শে ও দুর্গন্ধে ভিতরের ইন্দ্রিয়গুলির শুদ্ধ-শান্ত ভাবটাও ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়। সেই জন্য ওজু করিয়া আবার সেই ভাবটা ফিরাইয়া আনিতে হয়—ইহাই একমাত্র কারণ, অন্যথায় পায়খানা হইতে ফিরিয়া কুলি করার বা হাত-মুখ ইত্যাদি ধোওয়ার কোনই দরকার থাকে না। বায়ু-নিঃসরণ হইলেও ঠিক এই জন্য ওজু করার আবশ্যক হয় এবং যেহেতু দেহের বহির্ভাগে উহার ফলে কোন গলিজ স্পর্শ করে না, সেই জন্য তাহা ধৌত করারও দরকার হয় না।

ডাক্তার ছাহেবের প্রশ্ন হইতে আরও জানা যাইতেছে যে, ওজু করার সময়ে সর্ব্বদাই জুতা-মোজা খুলিয়া পা ধুইতে হইবে, ইহাকে যেন শরিয়তের হুকুম বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এটা খুবই ভুল ও অত্যন্ত ক্ষতিজনক ধারণা। মোজার উপর বা মোজা ও জুতার উপর মছহ করিয়া লইলেই চলিতে পারে, ওজুর জন্য সর্ব্বদা জুতা ও মোজা খুলিয়া পা ধোওয়ার আবশ্যক নাই। ইংরাজি শিক্ষিত বন্ধুগণ এই সব বিষয় জানিতে উৎসুক হইলে, হাদিছ দলিল (ও এমামদের অভিমতাদি) উদ্ধৃত করিয়া এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ও সম্পূর্ণ আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি।

শরীরের কোন স্থান হইতে রক্ত প্রবাহিত হইলে, সে জন্য ওজু নষ্ট হইয়া যায়—ইহা অল্প সংখ্যক এমামের মত। অধিকাংশ এমামের মতে এই সিদ্ধান্তটী ভ্রান্ত ও প্রমাণহীন। আমার সামান্য জ্ঞানে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে শেষোক্ত মতটিকেই সঙ্গত ও সুদৃঢ় বলিয়া বিশ্বাস করি। ব্যক্তি ও উক্তি পরিত্যাগ করিয়া দলিল প্রমাণের সন্ধান লইলে জানা যাইবে যে, 'দারকুৎনীর' যে একটা মাত্র হাদিছের উপর নির্ভর করিয়া প্রথম মতের সমর্থন করা হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহাকে হাদিছ বা হজরতের উক্তি বলাই যাইতে পারে না। রেওয়য়তের হিসাবেও তাহা অবিশ্বস্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এমাম দারকুৎনী ঐ হাদিছটী বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই দোষ-ত্রুটির কথাও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছেন। (১) এখানে আরও জানাইয়া রাখিতে চাই যে, নামাজ পড়ার জন্যও মোজা-জুতা খোলার আবশ্যক নাই। ইচ্ছা করিলে আমাদের যুবক বন্ধুরা জুতা পায়ে দিয়াই নমাজ করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে হজরতের অনুমতি আদর্শ এমন কি আদেশ পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে।

নামাজ পরার সময়ে উচ্চ শব্দে হাসিলে নামাজ নষ্ট হয় না, অথচ ওজু নষ্ট হইয়া যায়, একজন মাত্র এমামের নামকরণে এই প্রকার একটা মছলা প্রকাশ করা হইয়া থাকে। (২) কিন্তু একমাত্র তিনি ব্যতীত অন্য সমস্ত এমাম একবাক্যে বলিয়াছেন যে, নামাজে উচ্চ শব্দে হাসিলে নামাজ নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু ওজু নষ্ট হয় না। (৩) প্রথম মতের সমর্থক কোন প্রমাণ কোরআনে বা হাদিছে আছে বলিয়া আমরা বহু সন্ধানেও জানিতে পারি নাই।

উপসংহারে নিবেদন, শরিয়তের বিধি-ব্যবস্থাগুলি খুব স্পষ্ট, সহজ ও সকল অবস্থার মানুষের উপযোগী। এগুলি সম্বন্ধে সঙ্গতভাবে আপত্তি করার উপায় নাই। বিপদ ঘটাইয়াছে উভয় দিকে। এক দিকে আমাদের মৌলভী ছাহেবেরা নিজেদের মনগড়া কঠোর ব্যবস্থার বজ্র-বাঁধনে ঐ বিধি-ব্যবস্থাগুলিকে দুর্ব্বহ ও অচল করিয়া তুলিতেছেন, অন্য দিকে একদল লোক সে গুলিকে অমান্য করার কৈফিয়ৎ স্বরূপ কেবল সংশয়ের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন। ইহার প্রকৃত প্রতিকারের জন্য উভয় দিকের মতি ও গতি পরিবর্ত্তনের দরকার।

এই প্রসঙ্গে একটা টাট্‌কা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। সে দিন একজন বিশিষ্ট বন্ধু আসিয়া বলিলেন,—'ক' মিয়া বলিতেছিলেন—"কোরআনে পাঁচ অক্ত নামাজের আদেশ নাই, তিন অক্তের মাত্র আছে।" 'ক' মিয়া কিন্তু তিন অক্তের বা কোন অক্তেরই নামাজ পড়েন না। আমি বলিলাম,—তিনি প্রথমে নিয়মিত ভাবে তিন অক্তেরই নামাজ পড়িতে

(১) ৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

(২) ছেকরূচ্ছা আদৎ ১৮ পৃষ্ঠা :—او قال صلوا فى نعالكم خلافا لليهود

(৪) মীজান শা'রাণী ১—:২৯ পৃষ্ঠা।

অভ্যাস করুন, আর দুই অক্ষের বিচার পরে করা যাইবে। ফলতঃ কোন প্রকারে নিজেদের দল ভারি করা আর নিজেদের অপকর্ম্মের একটা কৈফিয়ৎ দেওয়াই তাঁহাদের এসব আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য। অবশ্য, আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এরূপ যুবকের সংখ্যাই খুব অধিক, যাঁহারা মনে-প্রাণে যথার্থই মুছলমান এবং অধিকতর আস্থা ও ভক্তির সহিত শরিয়তের বিধি-ব্যবস্থাগুলি পালন করার উদ্দেশ্যেই তাঁহারা নিজেদের সন্দেহ-সংশয়গুলির নিরাকরণ করিয়া লইতে চান। জনাব ডাক্তার ছাহেব তাঁহাদেরই কথা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

———

সেবায় সাম্প্রদায়িকতা—

দেশে যে ভীষণ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার প্রতিকারের জন্য প্রত্যেক হৃদয়বান দেশবাসী উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন, নিজেদের শক্তি ও সুযোগ অনুসারে স্বদেশের দুঃস্থ নর-নারীদিগকে রক্ষা করার চেষ্টা পাইতেছেন। অন্য প্রদেশের লোকেরাও বাঙ্গলার বিপন্নদের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। এমন কি বিদেশী বণিকেরাও এক্ষেত্রে সহৃদয়তার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না।

বড়ই দুঃখের বিষয়, দেশের এই চরম বিপদের সময়েও কতিপয় হিন্দু-নেতা নিজেদের অতি সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিতে এক বিন্দুও কুণ্ঠিত হইতেছেন না। কিছুদিন পূর্ব্বে এলবার্ট হলের এক সভা উপলক্ষে কতকগুলি বেনামী বিজ্ঞাপন বিলি করা হয়! এই বিজ্ঞাপনে কতকগুলি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার উল্লেখ করিয়া উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় হিন্দুদিগকে চাঁদা দিতে নিষেধ করা হয়। এই সব প্রতিষ্ঠান হইতে বিপন্ন মুছলমানদিগকে সাহায্য দেওয়া হইবে না, ইহাই ছিল এই সব উত্তেজনা ও প্রতিবাদের একমাত্র কারণ। এই শ্রেণীর ভদ্রলোকেরা কেবল বিজ্ঞাপন বিলি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কেবল হিন্দুদিগকে সাহায্য দিবার জন্য এবারও স্বতন্ত্র-প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়াছে, কোন কোন সংবাদ-পত্রও এই প্রকার মানসিকতার সমর্থন করিতেছেন! তবে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, ইঁহাদের সংখ্যা খুবই কম! বিরাট হিন্দু-সমাজ ইহাদের কু-পরামর্শে বিচলিত হন নাই। তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বিপন্ন দেশবাসীদিগকে বর্ত্তমান সঙ্কট হইতে ত্রাণ করার জন্য নিজেদের উদার অন্তঃকরণের সকল সহানুভূতি লইয়া সেবা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

যে সব হিন্দু ভ্রাতা মনে করিতেছেন যে, এই বিপদের সময়ে বিপন্ন মুছলমানদিগকে সাহায্য না দিয়া তাহাদিগকে জব্দ ও ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন, তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। এই প্রকার আচরণের দ্বারা মুছলমানদিগকে জব্দ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না, "তাহাদের হিন্দু-বিরোধী মনোভাবের" প্রতিকার করার প্রকৃষ্ট উপায়ও ইহা নহে। বরং সত্য কথা এই যে, এই শ্রেণীর আচরণের দ্বারা একটা শোচনীয় প্রতিক্রিয়ার ভাবকেই ডাকিয়া আনা হয় মাত্র। তাহার পর, এই আচরণের দ্বারা মুছলমানের যতটুকু ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা, ইহার প্রবর্ত্তনকারীদের ক্ষতি তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। মনে কর, তুমি বগুড়ায় সাহায্য বিতরণ করিতে গিয়াছ। তোমার সম্মুখের গাছতলায় এক শীর্ণদেহ কৃষক দম্পতি তাহাদের ক্ষুধাতুর সন্তানদিগকে লইয়া বসিয়া আছে, আর সকলে মিলিয়া "এক মুঠো ভাত" বলিয়া ক্ষীণকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিতেছে। করুণা-বিগলিত হৃদয়ে সাহায্য দিতে অগ্রসর হইয়া তুমি দেখিলে—বিপন্ন হইলেও তাহারা মুছলমান, এবং কোলের সন্তানটি মুমূর্ষু হইলেও সে মুছলমান পিতামাতার সন্তান,—যে মুছলমানের সহকর্ম্মীরা কিশোরগঞ্জের হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিয়াছিল। তুমি মুখ ফিরাইয়া ফিরিয়া আসিলে। ফলে, কোলের শিশুটী ঘণ্টা কএক পরে মরিয়া গেল। পিতা বুক চাপড়াইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, মাতা সন্তানের মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল, সেও হয় ত সন্তানের সহযাত্রী হইল।

এক মুষ্টি অন্নের জন্য কাঙ্গালের সন্তান মরিল, চির-জীবনের সঙ্গিনীর সহিত বিচ্ছেদ ঘটিল, সন্তানগুলি মাতৃহারা হইল। তুমি মনে করিবে—মুছলমানকে খুবই জব্দ করিয়াছি, উপযুক্ত প্রতিশোধ লইয়াছি। কিন্তু, এই জব্দ করার আগ্রহাতিশয্যে বস্তুতঃ তুমিই যে মনুষ্যত্বের সকল সম্পদ হইতে নিজকে বঞ্চিত করিয়া ফেলিলে, সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ তুমিই হইলে।

ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন,—"যে সকল হিন্দু মুসলমানকে সাহায্য দিতে বা যে সকল

মুসলমান হিন্দুকে সাহায্য দিতে চান না, তাঁহাদের মনের ভাব বা বাহ্য আচরণ জোর করিয়া বদলান যায় না, সেরূপ জোর করিবার অধিকারও কাহারও নাই।" এই মন্তব্যের আর একস্থানে বলা হইয়াছে,—"জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বিপন্নের সাহায্যের জন্য যে সব ফণ্ড খোলা হইয়াছে, তাহাতে যাঁহারা দান করিবেন, তাঁহারা সকল ধর্ম্মের বিপন্নকে দান করিবার জন্যই টাকা দিতেছেন, বুঝিতে হইবে। কেবল মুসলমান বা কেবল হিন্দুদের সাহায্যের জন্য যে যে চেষ্টা হইতেছে, তাহাও অনেক লোকের সহায়তা পাইতে পারিবে।" এই মন্তব্যের উদ্দেশ্য কি, এবং উহাতে কি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে! প্রবাসী সম্পাদকের মন্তব্য পাঠ করিয়া লোকের মনে এই ধারণা হইতে পারে যে, বিপন্ন হিন্দুদিগকে বঞ্চিত করিয়া কেবল মুছলমানদিগকে সাহায্য দেওয়ার জন্য মুসলমানরাও চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা সম্পূর্ণ অপ্রকৃত কথা। এই প্রকার হীন কল্পনা মুছলমানের মনে আজও স্থানলাভ করিতে পারে নাই, এবং বর্ত্তমানের এই চরম অধঃপতনের যুগেও নিজেদের আদর্শ হইতে এতটা নামিয়া আসা মুছলমানের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। মুছলমান কর্ম্মীরা নিজেদের সামান্য শক্তি অনুসারে এ যাবৎ দেশবাসী দুঃস্থদিগের সেবার জন্য যে কোন আয়োজন করিয়াছেন, তাহাদের কুত্রাপি এই শ্রেণীর হীন মনোভাব কস্মিন কালেও স্থান লাভ করে নাই, ভবিষ্যতেও করিতে পারিবে না বলিয়া আশা করি। যে সকল হিন্দু নেতা দুঃস্থ মুছলমানদিগকে সাহায্য দিতে কুণ্ঠিত, তাঁহাদের কাজের সমালোচনা করিতে চাই না, তাহার বিশেষ দরকার আছে বলিয়াও মনে করি না। তবে এই প্রসঙ্গে এইটুকু মাত্র বলিয়া দিতে চাই যে, এই শ্রেণীর ভদ্রলোকদের সাহায্য ব্যতীত মুছলমানের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে সে জীবন অপেক্ষা তাহাদের মৃত্যুকেই আমরা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিব!

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বর্ত্তমান আশ্বিন-সংখ্যায় "মাসিক মোহাম্মদীর" চতুর্থ বর্ষ পূর্ণ হইয়া গেল। পঞ্চম বর্ষের প্রথম সংখ্যা আশ্বিন মাসের ১৫ই তারিখে বাহির হইবে এবং এই তারিখেই মফঃস্বলের পুরাতন গ্রাহকদিগের নিকট ভিঃ পিঃ পাঠান হইবে। ১৫ই আশ্বিনের মধ্যে যাঁহাদের ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ১৪ই আশ্বিনের মধ্যেই আমাদিগকে তাঁহাদের নূতন ঠিকানা জানাইবেন, কিংবা নূতন ঠিকানায় ভিঃ পিঃ প্যাকেট পাঠাইয়া দিবার জন্য স্থানীয় পোষ্ট মাষ্টারকে বলিয়া রাখিবেন।

মনি-অর্ডার যোগে টাকা পাঠাইলে খরচ অপেক্ষাকৃত কম লাগে এবং কাগজও যথাসময়ে পাওয়া যায়। এই জন্য আমরা গ্রাহকগণকে পঞ্চম বর্ষের মূল্য অনতি-বিলম্বে মনিঅর্ডার যোগে আমাদের অফিসে পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি। আশ্বিন মাসের ১৪ই তারিখ পর্য্যন্ত টাকা না পাইলে তাঁহারা আমাদিগকে ভিঃ পিঃ যোগে কাগজ পাঠাইবার অনুমতি দিয়াছেন বলিয়া মনে করা হইবে। আশা করি, পুরাতন গ্রাহকগণ এজন্য প্রস্তুত থাকিবেন এবং যথাসময়ে ভিঃ পিঃ গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে বাধিত ও উৎসাহিত করিবেন।

পুরাতন গ্রাহকগণ মনি-অর্ডারের কুপনে অথবা পত্রে তাঁহাদের গ্রাহক নম্বর এবং নূতন গ্রাহকগণ "নূতন গ্রাহক" কথাটি উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

বিনীত—মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ,
ম্যানেজার—"মোহাম্মদী"
৯১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

Printed and Published by Md. Khairul Anam Khan from the "Mohammadi Press," 91, Upper Circular Road, Calcutta.
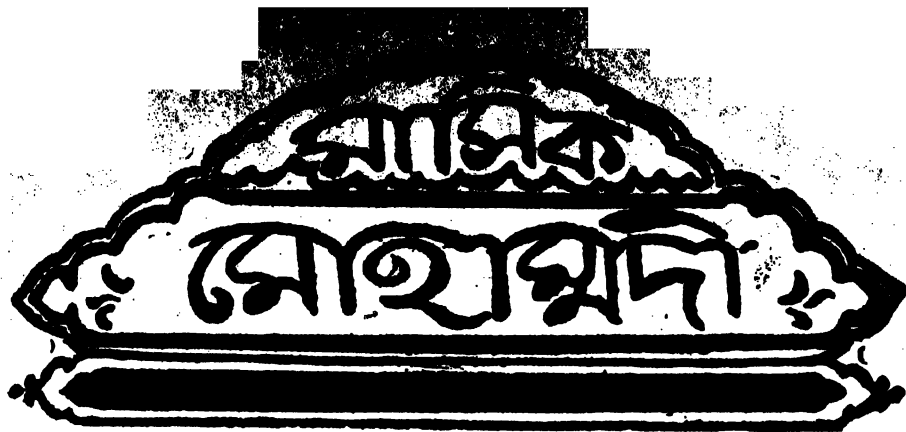
চতুর্থ বর্ষ

কার্ত্তিক, ১৩৩৭—আশ্বিন, ১৩৩৮

—সম্পাদক—

মোহাম্মদ আকরম খাঁ

বার্ষিক মুল্য ৩৷৵০ আনা

আফিস—৯১নং আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।
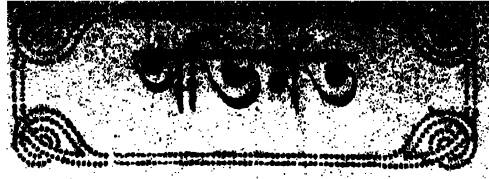
"মাসিক মোহাম্মদী" দেশের সমস্ত সাময়িক পত্রের এবং সাহিত্যিকগণের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে। স্থানাভাব বশতঃ সেগুলির মধ্য হইতে কয়েকটি মাত্র অভিমতের সারাংশ গ্রাহকগণের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

Advance—We acknowledge with thanks the Bhadra issue of The Monthly Mohammadi which has already made a mark in Bengali journalism. The present number contains some very well-written articles, pleasant stories and poems from the pen of some leading writers of Bengal. The journal is profusely illustrated in comparison of which the price seems to be quite moderate.

Amrita Bazar Patrika—The Monthly Mohammadi edited by Moulana Mohammad Akrum Khan is one of the best Magazines in Bengali literature. The Bhadra issue which we have just received, is replete with many interesting articles. The well-written articles are "আরবী নাটকের প্রারম্ভ," "বেগম লালবিবি", "জগতের ঐতিহাসিক হীরক", "বয়ন-শিল্প", "ফাতেহা-দোয়াজদহম্", "কাঁচা মাছ ও শুট্‌কী মাছ" Besides these, there are some very nice stories and poems. We wish all success to our contemporary which we doubt not is being very ably conducted.

বসুমতী—প্রবন্ধ গৌরবে, ছাপা ও বাঁধাইর উৎকর্ষে, পরন্তু চিত্র সৌন্দর্য্যে "মাসিক মোহাম্মদী" বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে আপনার যোগ্য স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে,—একথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের লিখিত সমস্ত প্রবন্ধই সুচিন্তিত ও সারগর্ভ। তাঁহার লিখিত প্রত্যেক প্রবন্ধের ভিতর দিয়াই তাহার জাতীয়তা ও দেশ-প্রেমের পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। * * * *

নায়ক—মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন লোক। মোস্লেম সাহিত্যে তাঁহার দান অপরিশোধনীয়। এই যোগ্য লোকের যোগ্য সম্পাদকতায় "মোহাম্মদী" দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। প্রবন্ধে, গল্পে, কবিতায়, আলোচনায় এবং চিত্রে এমন সুন্দর মাসিক পত্র বাংলায় ২।১ খানার বেশী নাই। এক কথায় বলিতে গেলে—"মোহাম্মদী" মাসিক সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। * * * *

নবশক্তি—মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের যোগ্য সম্পাদকতায় "মাসিক মোহাম্মদীর" দিন দিন চমৎকার উন্নতি হইতেছে। … … … আমরা এই প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা খানির উন্নতি কামনা করি।

বঙ্গবাণী—"মাসিক মোহাম্মদী" বহু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও কবিতায় পরিপূর্ণ থাকে। * * *

শিশির— * * * মাসিক "মোহাম্মদীর" পৃষ্ঠায় মুসলমান যুবকগণ বাঙ্গলা সাহিত্যের নানাশাখায় যেরূপ প্রশংসনীয় আলোচনা করিতেছেন, তাহা অশেষ আনন্দের বিষয়। আশা করি, "মোহাম্মদী" হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক বাঙ্গালীরই আদরের জিনিষ হইয়া উঠিবে।

ভগ্নদূত—"মোহাম্মদীর" ন্যায় একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মাসিক মাসে মাসে বেরুচ্ছে, অথচ আমরা তা যেন টের ও পাচ্ছিনে। সাহিত্য-সেবী হিসাবে এ আমাদের লজ্জা, এ আমাদের কলঙ্ক। ছবিতে প্রবন্ধে, গল্পে, কবিতায় এত সমৃদ্ধ বাংলার কয়েকখানি আট আনা দামের কাগজ ছাড়া আর নেই—এ কথা অসঙ্কোচে স্বীকার করা চলে।

পাঞ্চজন্য—প্রবন্ধ গৌরবে "মাসিক মোহাম্মদী" বাংলায় যথাযোগ্য স্থান লাভ করিয়াছে। প্রত্যেক প্রবন্ধের মধ্যে লেখকের চিন্তা-শীলতা ও যুক্তিপ্রয়োগের পরিচয় পাইয়া সুখী হইয়াছি। বাঙ্গলায় এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মাসিক বেশী নাই—একথা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।**

সুচিকিৎসা মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব সমগ্র মোস্লেম ও হিন্দু বাংলার সর্ব্বজন পরিচিত নিরপেক্ষ রাজনৈতিক নেতা। "মাসিক মোহাম্মদীর" প্রতি পৃষ্ঠায়, প্রতি ছত্রে, প্রতি চিন্তা-ধারায় তাঁহার এই নিরপেক্ষতার পরিচয় পাইয়া আমরা সুখী হইয়াছি। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধে এবং মাসিক আলোচনায় এমন সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হয়, যাহা আমরা অন্যান্য সাময়িক সংবাদ পত্রে কচিৎ দেখিতে পাই। আমরা এই বহু চিত্রে শোভিত, প্রবন্ধ গৌরবে গৌরবান্বিত নিরপেক্ষ মাসিক পত্রিকা খানির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

আধুনিক চিকিৎসা—"মাসিক মোহাম্মদী" বাংলা মাসিক সাহিত্যের গৌরব-স্বরূপ—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, চিত্র সমস্তই সুনির্ব্বাচিত। আমরা এই শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রখানির উন্নতি এবং বহুল প্রচার কামনা করিতেছি।

স্বদেশী মূলধনে
গঠিত ও দেশীয়
লোকের পরিচালিত
কারখানায় প্রস্তুত
সকল প্রকারের

লিলি বিস্কুট

বিশুদ্ধ মুখরোচক ও স্বাস্থ্যকর।

ভেজিটেবেল ঘি ও চর্ব্বি-বর্জ্জিত, আধুনিক রুচি অনুযায়ী সকল প্রকারের বিস্কুট প্রস্তুত হয়।

দি লিলি বিস্কুট কোং,

কলিকাতা।

চির বাঞ্ছিত
গৌরবোজ্জ্বল
সৌন্দর্য্যের
অনন্ত উৎসব

"সুষমা"

সুরভি কেশ তৈল

চূর্ণ কুন্তলে রেশমী আভা,
তাতেই বাড়ে মুখের শোভা।

পি, সেউ্ এণ্ড কোং,

কলিকাতা।

—পূজার—

শ্রেষ্ঠ উপহার

হারমোনিয়ম
২০৲ টাকা হইতে
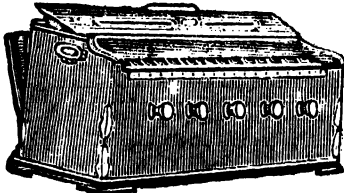
গৃহ-বায়স্কোপ
মূল্য ৮৮৲ টাকা।

আনন্দময়ীর আগমনে আপনার গৃহ আনন্দে মুখরিত করিবার সকল আয়োজন করিয়াছি দয়া করিয়া আমাদের ফার্ম্মে পদার্পণ করুন বা তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

মেলোফোন পোর্টেবেল
মূল্য ৩৬৲ টাকা।

রেডিও সেট ৮৲ টাকা হইতে

সর্ব্ব প্রধান গ্রামোফোন, বাদ্যযন্ত্র, সিনেমা, রেডিও, ফটো ও সাইকেল বিক্রেতা

৩।১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ও ৭ সি, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট,

ফোন নং কলিঃ ২২৯০ —কলিকাতা।— ফোন নং কলিঃ ৭০০
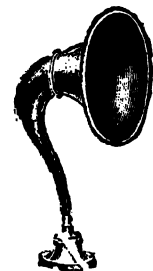
ইলি ব্রাদার্স এণ্ড কোং'র আবিষ্কৃত

গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টারী কৃত

গণোফ্যান

যাবতীয় মেহ, প্রমেহ, গণোরিয়া, ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রক্ষীণতা ও ধ্বজভঙ্গের অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা জীবনীশক্তি বর্দ্ধক, স্মৃতিশক্তি ও মেধার উন্মেষক এবং বাজীকরণে ব্রহ্মাস্ত্র। নিয়মিত সেবনে পরিণত বয়সেও যৌবনের শ্রী ও সৌন্দর্য্য ফিরিয়া আসে, এবং পুরুষের সমস্ত নষ্টশক্তি পুনরুদ্ধার করিয়া জীবন সুখময় করিয়া তুলিতে ইহার গুণ অসীম, ক্রিয়া অব্যর্থ ও শক্তি অতুলনীয়। যাঁহারা যৌবনে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় পরিচালনার ফলে অকালে জরাগ্রস্ত হইয়া জীবনের সকল সুখে ও সাধে বঞ্চিত হইয়া, জীবনে হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারা একবার এই অমোঘ শক্তিসম্পন্ন ঔষধ ব্যবহার করিলে মন্ত্রশক্তির ন্যায় ইহার আশ্চর্য্য ক্ষমতায় মুগ্ধ হইবেন। মূল্য প্রতি শিশি ১॥০, ডাক মাশুল।৵০, একত্রে তিন শিশি ৪৲ ডাক মাশুল ॥৵০ আনা।

ঠিকানা ঃ—ইলি ব্রাদার্স এণ্ড কোং, বায়রা, ঢাকা।

স্থাপিত ১৯১৫

ডাঃ এস, এন, চ্যাটার্জ্জী এল, ডি, এস, (কলিঃ)

(কলেজ অফ ফিজিসিয়ানস এণ্ড সার্জনস্ অফ কলিকাতা)

সার্জান ডেণ্টিষ্ট

বৃগেড নেসীরাবাদের ব্রিটিশ ষ্টেসন হাঁসপাতালের ভূতপূর্ব্ব ভিজিটীং ডেণ্টাল সার্জন

৩০, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হেড আফিস—আজমীর, রাজপুতানা

সর্ব্বপ্রকার সোনার দাঁত ব্রিজ, পাথরের দাঁত ও ভিকোলাইট পাটী, সঙ্গত মূল্যে করা হয়।

আনন্দ সংবাদ ! আনন্দ সংবাদ !!

এবার পূজায় স্বদেশী পোষাকের বিপুল আয়োজন !!

পারুলালয়

১৪৮।১, অপার চিৎপুর রোড, বেনেটোলার মোড়, কলিকাতা

সকল রকম নূতন ডিজাইনের হাল ফ্যাসানের স্বদেশী কাপড়ের যাবতীয় পোষাক পড়তা দামে বিক্রয়ের জন্য মজুত রাখা হয়।

সরেষ ছিটের প্রমাণ সার্ট		৸৵০
„ লংক্লথ	„ পাঞ্জাবী	৸/০
„ „	„ সেমিজ	৸/০
„ „	„ সায়া	॥৶০

অগ্রিম সিকি মূল্য পাঠাইলে মফঃস্বলের অর্ডার অতি যত্নের সহিত সরবরাহ করা হয়।

স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিয়া স্বদেশের

শ্রীবৃদ্ধি করুন।

স্বদেশীয় মূলধনে ও স্বদেশী কারিকর দ্বারায় প্রস্তুত

আমাদের গায়ে মাখা ও কাপড়কাচা সাবান

ব্যবহার করিয়া

স্বদেশী শিল্পের সাহায্য করুন।

দি গুজরাট সোপ ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং,

১০৩নং, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কারখানা ঃ—৪৪।৩, ক্যানেল ইষ্ট রোড,

মাণিকতলা, কলিকাতা।

নিউ রোল্ড-গোল্ড ওয়ার্কস্

খাঁটী রোল্ড-গোল্ডের গহনা।

ইহা জঘন্য বাজারের কেমিকেলের বা মেটেল নামধারী পিত্তলের গহনা নহে। ইহা খাঁটী রোল্ড-গোল্ডের গহনা। ইহার রং সর্ব্বদা ব্যবহারেও চশমার ফ্রেমের রং এর মত গিনী সোণার ন্যায় উজ্জ্বল রং বরাবরের জন্য থাকিবে কখনও ময়লা বা কালো হইবে না তজ্জন্য গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি। ইহার রং হাইপালিশ ও কারুকার্য্য গিনি সোনার গহনাকেও পরাস্ত করিয়াছে। বহু প্রশংসাপত্র আছে। ১ সেট গহনা লইয়া পরীক্ষা করুন। কয়েকটী জিনিসের মূল্য ১। যে কোনও নমুনার চুড়ী ১ সেট ৬৲ ২। ঐ রুলী ১ জোড়া ৮৲। ৩। ঐ অনন্ত বালা এক জোড়া ১০৲। ৪। ঐ হার নেকলেস মফচেন মটরমালা প্রতি ছড়া ১০৲ ৫। চিরুণী ১টা ৬৲। ৬। বোতাম ১ সেট ৩।০ ৭। আংটি ১টা ৩৲ ৮। ইয়ারিং ১টা ২৷০ ৯। নাকছাবী ৷০ ১০। কানের টাপ ৩৲। ১১। মাকড়ী ১ জোড়া ৩৲। ১২। নথ ১টা ৩৲। ঐ নথের টানা ১টী ৩৲। ১৩। ব্রুস ফ্যান্সী পিন ১টি প্লেন ৪৲ ঐ জোড়া ৬৲। ১৪। নলক মাকড়ী ১।০। ১৫। জশম মাদুলী প্রত্যেকটি ১।০।

ম্যানেজার :—এস, মুখার্জ্জী ২১৬, বি, হালদারপাড়া রোড, কালিঘাট পোঃ কলিকাতা।

কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
১৮/১-১৯ লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা
কেশরঞ্জন তৈল
কেশের
বর্ণ
প্রাচুর্য্য ও
দীর্ঘতার সৃষ্টি করে

শ্রীবর্দ্ধক সুনিদ্রা

যদি আপনি শয়ন করিবার পূর্ব্বে ধীরে ধীরে ওটীন ক্রীম দ্বারা গাত্র মার্জ্জনা করিয়া অবসাদগ্র পেশীগুলিকে সতেজ করেন, তাহা হইলে রাত্রি যত অধিক হউক না কেন আপনি সুনিদ্রা উপভোগ করিতে পারিবেন।

যাঁহারা কখনও ওটীন ব্যবহার করেন নাই, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না যে ক্লান্ত দেহচর্ম্মের উপর এই সুন্দ আরামপ্রদ, উপকারী, আনন্দবর্দ্ধক দ্রব্যের কি আশ্চর্য্যজনক ক্ষমতা!

দিনের পর দিন—সুখে কিম্বা দুঃখে—যেরূপেই আপনার দিন যা'ক না কেন, আপনার দৈনিক শ্রী অল্লা নষ্ট হইবেই; প্রতিদিনই তাহার প্রতিকার করা আবশ্যক। ওটীন ক্রীম ব্যবহার করিলে গাত্রচর্ম্ম ও পেশীসমূহ পরিষ্ক সংস্কৃত, সতেজ ও কোমল হয় এবং যুবাজনোচিত কমনীয়তা ও সৌন্দর্য্য বজায় থাকে।

ওটীন ক্রীম— প্রতি রাত্রে ব্যবহারের জন্য।

ওটীন স্নো—দিবাভাগে ব্যবহারের জন্য—ইহা মাখিবামাত্রই গাত্রচর্ম্মের সহিত মিলাইয়া যায় এ চর্ম্মকে কোমল ও সুশ্রী করে।

বাজারে সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

কুপন— নমুনাস্বরূপ ওটীন ক্রীম, ওটীন স্নো, ওটীন সাবান, ওটীন ফেস্ পাউডার, ১টী বড় ওটীন স্যাম্পু পাউ ওটীন সৌন্দর্য্য পুস্তক আমাকে পাঠাইবেন। এই সঙ্গে ।৵০ মূল্যের ষ্টাম্প পাঠান হইল।

নাম ....

ঠিকানা ....

দি ওটীন কোম্পানী।

১৭, প্রিনসেপ্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

M. M 4